৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত

সচিত্র মাসিকপত্র

ষষ্ঠ বর্ষ—প্রথম খণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ,

১৩২৫

সম্পাদক—শ্রীজলধর সেন

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্—২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

P30363

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

ষষ্ঠ বর্ষ,—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, ১৩২৫

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক

অন্বেষণ (কবিতা)—শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায় বি-এল ... ৮০৮
অভিভাষণ—শ্রীযুক্ত দার আশুতোষ চৌধুরী এম-এ, বার-এট-ল ২৬১
অন্বেষা (ধর্ম্ম)—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার বি-এ ৭৮০
আগমনী (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ ... ৭১১
আগমনী-সঙ্গীত (কবিতা)—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮২১
আধুনিক আলোক-তত্ত্ব (বিজ্ঞান)—
শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় বি-এস্‌সি ৭৮৪
আনন্দময়ী (গল্প)—শ্রীঅনঘর সেন ... ৫৫৫
আনন্দ-মিলন (গল্প)—শ্রীহিরণকুমার রায়চৌধুরী বি-এ ৬২৮
আন্দামান-ভ্রমণ (ভ্রমণ-কাহিনী)—শ্রী— ৫৬৬
আমার গর্ব্ব (কবিতা)—শ্রীগিরিজাকুমার বসু ৩৭৭
আমার প্রিয়া (কবিতা)—শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী ৬২৩
আলোক-বিজ্ঞানের প্রাচীন কথা (বিজ্ঞান)—
শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় বি-এস্‌সি ৫৪
আলোচনা—সম্পাদক ১২৯,২৭১,৪১১
আলোচনা (বৈদেশিক)—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৪৩১,৮৩৫
আসামের-কথা (ভ্রমণ)—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৭৭
আসার আশায় (গল্প)—শ্রীনিশিকান্ত সেন ৬১৬
ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা (চিকিৎসা-বিজ্ঞান)—
ডাক্তার শ্রীরাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৫২
উড়ে বাবুর (গল্প)—শ্রীযতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৯৭
উৎকল-সাহিত্য (মাসিক সাহিত্যালোচনা)—
শ্রীরমেশচন্দ্র দাস ১৯,২৮১,৩৯২,৪৭৩,৮২৩
উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে চায়ের চাষ (কৃষি)—
অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন সিংহ এম-এ ... ৮০১
উত্তর-বঙ্গের কৃষির কান্না (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ৭০২
উদ্ভট-সাগর (প্রাচীন কবিতা)—কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে,
কাব্যরত্ন, উদ্ভট-সাগর, বি-এ ৬৬৮,৫২৩
ঋগ্বেদে সূর্য্যগ্রহণ (জ্যোতিষ)—
অধ্যাপক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ
"এই বেলা নে ঘর গেরে" (আলোচনা)—
শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা
কপালকুণ্ডলা ও মিরাণ্ডা (সাহিত্য)—
শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল ... ৭০২
কাশ্মীরের কথা (ভ্রমণ-কাহিনী)—শ্রীবিমলা দাসগুপ্তা ... ৬৫৮
ক্ষমা (গল্প)—শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ... ৬৮০
খোস গল্প (রঙ্গ)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৬২৪
গঙ্গনী (গল্প)—শ্রী— ৫২৬
গৃহবিচ্ছেদ (গল্প)—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায় ৩২৯
৺গোবিন্দচন্দ্র দাস ... ৮৪৪
চট্টগ্রামে জাহাজ-নির্ম্মাণ (শিল্প)—শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী ২৫২
চণ্ডী-মাহাত্ম্য—(পুরাণ)—শ্রীযোগেন্দ্রবিজয় বসু, এম-এ, বি-এল ৫৭৯
চর্ম্ম-প্রস্তুতি (শিল্প)—শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী ৪৮২
চিতোর (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৫২১
চিরকুমার (কবিতা)—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৪৬
চুটকী (রঙ্গ)—অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
বিদ্যারত্ন এম-এ ...
ঋষি (গল্প)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু
জড়ের রূপান্তর (বিজ্ঞান)—
অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় এম-এস্‌সি ... ৩৪৩
জাপানের যৎকিঞ্চিৎ (বেশাচার)—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ৭৭৮
জাপানের শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের উপযোগী কি না ? (শিক্ষা)—
শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু এম-এ, বি-টি ... ৪৭৭
জ্যৈষ্ঠে নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব (জ্যোতিষ) শ্রীজগদানন্দ রায় ২৮৩
জ্যোতিষ-বেদাঙ্গ (জ্যোতিষ)—
অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার এম-এ ৯

বি (গল্প)—অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ ৬১০
টিকে তুলন (গল্প)—শ্রীমতীবালা দেবী ১০১
তাসের খেয়ে (গল্প)—
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এট-ল ... ১০৪
তাজ (কবিতা)—শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী ১০১
তাড়ানো ছেলে (গল্প)—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ৮১৩
ত্রিশূল ও সরলা নক্ষত্র (জ্যোতিষ)—
অধ্যাপক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ ১৫৪
ত্রিস্তোত্র মন্দির (প্রত্ন)—
অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রত্নতত্ত্ববারিধি বি-এ ৭৪১
দত্তা (উপন্যাস)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩১, ২২৮, ৫০০
দিল্লী (ইতিবৃত্ত)—শ্রীনিখিলনাথ রায় বি-এল ৫৭
দীনবন্ধু (গল্প)—শ্রীবিধুভূষণ বসু ৮০১
দুই কথা (কবিতা)—শ্রীগিরিজাকুমার বসু ... ৪২৯
দুর্যোগে (গল্প)—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি এল ৬২২
দ্বিতীয় পক্ষ (গল্প)—শ্রী— ... ৩৭৩
নবীনা ও কলিকাতার কতকগুলি চলিত কথা (আলোচনা)—
শ্রীহেমন্তকুমার সরকার বি এ ৪১৯
নবীনার স্থানীয় ইতিহাস (ইতিবৃত্ত)—
শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এ ... ১৯৬
নারীর দাগাবাজী (কবিতা)—শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী ৮২৯
নারী বড়রূপা (কবিতা)—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ২০৩
নিমাই (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ ৩৩৬
নিরুদ্দেশ (গল্প)—শ্রীযোগেন্দ্রবালা বসু ... ৩৩
নেতা (গল্প)—শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... ৯১
পাখী-পোষা (জীবতত্ত্ব)—শ্রীসত্যচরণ লাহা এম এ, বি-এল ২০৪,৪৯১
পাপার তীর্থে (গল্প)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত ... ২৪১
পিঁয়োরা কিল্লা (ইতিহাস)—শ্রীনিখিলনাথ রায় বি-এল ৫১০
পুরীর কথা (ভ্রমণ)—শ্রীতরুবালা সরকার এম-এ ৭৯২
পুষ্পাঞ্জলি (গল্প)—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু ৭১১
পুস্তক-পরিচয়—সম্পাদক ... ৩১৪, ৮৪৬
পূজার ছুটী (গল্প)—শ্রীমাধবরতন চট্টোপাধ্যায় বি-এল ... ৬৬২
পৃথ্বীরাজ (সমালোচনা)—শ্রীতরুবালা সেন ... ৪০৫
প্রতাপ-কাহিনী (ইতিহাস)—শ্রীহিরণকুমার রায়চৌধুরী এম এ ৩০৬
প্রতিমা (নাটক)—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম-এ, বি-এল, সরস্বতী ৫২১
প্রস্তর-লোত (বিজ্ঞান)—শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ... ৮৭
ফরিদপুরের উপাসনাপ্রাঙ্গণ মেঘদূতগাছ (বিজ্ঞান)—
অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ ১৯
ফরাসী-স্তোত্র (কবিতা)—
কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন, উড়টসাগর, বি-এ ৬০৭
বাংলার টান (গল্প)—শ্রীকালিভূষণ মুখোপাধ্যায় ১২৮
ভারতবর্ষ (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচি বি-এ ... ১
ভারতীয় বন বিজ্ঞান (অর্থশাস্ত্র)—
অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্-এ,পি-আর-এস ৪৯০
ভারতীয় শিক্ষার বিশেষত্ব (শিক্ষা)—
অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-টি ৪৭
ভারতের নীতি-শিক্ষা-সমস্যা (শিক্ষা) ঐ ... ৭৮১
ভাব-চালনা (অধ্যাত্ম বিজ্ঞান)—শ্রীশ্রীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৩১৩
ভূ-পর্য্যটন (ভ্রমণ)—শ্রীমনোমোহন বসু বি এল ... ৬৩৬
ভাবের অভিব্যক্তি (চিত্র)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১২৬,৬৮৪
মনোবিজ্ঞান (দর্শন)—
অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম-এ ২০৭,৪০৩, ৭২৮
ফলট প্রস্তর-বিধি (বিজ্ঞান)—
অধ্যাপক শ্রীমলিনীনাথ রায় এম এ
মহারাজা শিশিরকুমার ঘোষ (জীবনী)—
শ্রীমনাথনাথ বসু ৩৩৩,৪৫১,৭৯৬
মহাদেব (গল্প)—শ্রীমতীবালা দেবী ৪১২
মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতি-উৎসব ২৬৪
মা (উপন্যাস)—শ্রীঅনুরূপা দেবী ৩৩৭,৪৬৪,৭২০
মায়ের কোলে (গল্প)—শ্রীমলয়র সেন ... ৭১৫
মিলন (গল্প)—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ ৯১
মুটি (গল্প)—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া ৮০০
মুসলমান কবির বিদ্যাসুন্দর (সাহিত্য)—
শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ ৬৩১
যোগল সম্রাট আকবর (ইতিহাস)—
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১১৯,৩৫৮
যাব (কবিতা)—মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর ৩৩৮
রসসাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী (জীবন-কথা)—
কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন, উড়টসাগর, বি-এ ৪১, ১৮৭, ৩০৯, ৪৭৩, ৭৭৭
রাধাকান্ত (বর্ণলিপি)—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৪১
রায়বহুর 'আগমনী' (সাহিত্য)—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় ... ৭১৩
রাজের চাকরী (গল্প)—শ্রীযোগীন্দ্রলাল তালুকদার ৮২৪
লক্ষ্মী (কবিতা)—শ্রীঅপরাজিতপ্রসন্ন ঘোষ ... ৭৯৩
শুভরম্ভ (সাহিত্য)—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় ...৫ ৪১৯,৪৪৩
শরীরের স্বাস্থ্যে ঘড়ির ব্যবস্থা (স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান)—
শ্রীনীলেন্দ্রকুমার রায়
শরের সুকুমার শিল্প-কলা (শিল্প)—
শ্রীনন্দীগোপাল গোস্বামী চিত্রকলাবিনোদ ১৮৯
শরী (কবিতা)—শ্রীকুসুমরঞ্জন মল্লিক বি-এ ... ১৩৭
শত্রু সঙ্কট হইতে উদ্ধার (সামরিক)—রায় বাহাদুর অধ্যাপক
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম-এ ৬৮৯

বঙ্গ-সমাজ (আলোচনা)—শ্রীবৈকুণ্ঠচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১১

বাঙ্গালার কথা (আলোচনা)—
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় ২৫৮,৩১৯,৫০০

বাঙ্গালায় শিক্ষা (শিক্ষা)—
ডাক্তার শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম-এ বি-এল ... ১৪৫, ২৮৯

বাহাদুর (গল্প)—শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ ৮১২

বিকাশের (ভ্রমণ)—শ্রীমতেন্দ্র মুস্তোফি ২১২

বিজ্ঞান (বর্ণলিপি)—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৪৪

বিজাপুর (ইতিহাস)—শ্রীঅমর সেন ৫৩৭

বিবাহের বিধান (গল্প)—
শ্রীনিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল ... ১০২

বিধিলিপি (উপন্যাস)—শ্রীনিরুপমা দেবী ১১,১৮০,৩১০,৪৫৮

বিরহের এ-পিট ও-পিট (গল্প)—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার বি-এ ৭০৭

বিশ্ববোধী (ধর্ম)—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ... ৭৮১

বৈষম্যতার আবাহন (কবিতা)—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৪৭৭

বৃদ্ধিমান্ (কবিতা)—কাশীর কিঞ্চিৎকার প্রণীত ... ৬৮৮

ব্যবধান (গল্প)—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য বি-এ ৪৯২

ব্রাহ্মণ-পরিবার (গল্প)—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১৭০

শরতে পূর্ণবঙ্গ (কবিতা)—শ্রীঅশ্বিনীকুমার মণ্ডল ... ৩১৫

শুকনো বালুক (গল্প)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ ৪০০

শৈলপথে প্রাতিবেশিকান (ভ্রমণ)—
শ্রীযোগেশচন্দ্র গাঙ্গুলী এম-এ, বি-এল ৫৪৬

শোক সংবাদ ১৪০,৮৫৬

শ্যামা মা (গল্প)—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার বি-এ ৪৮৫

শ্রীশঙ্কর ভ্রমণ-কাহিনী (উপন্যাস)—
শ্রীসুরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩১,৩৯৭,৪৪৬

শ্রীকৃষ্ণ (কবিতা)—শ্রীঅবনেন্দ্র

শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ হইতে বিদায় (কবিতা)—
রায় বাহাদুর ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর ৫৭৬

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (গুণ-বিবেচন)—
শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ২৩৮

সখী (সাহিত্যিক বঙ্গ) —
অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ
২৫,১৬৮,৪১৭

সঙ্গীত ও বর্ণলিপি—শ্রীঅরুণাদেবী ৭০৪

সঙ্গীত—শ্রীপ্রতিভা দেবী ৭০৩

সমাজ-চিত্র— ৮৬

সম্রাটের জন্মদিনে উপাধি-প্রাপ্ত বরেণ্যগণ ২৬৬

সাগর (কবিতা)—শ্রীঋষিপতিপ্রসন্ন ঘোষ ৪১৮

সাময়িকী—সম্পাদক ১৩২

সাহিত্য-প্রসঙ্গ (সাহিত্যালোচনা)—
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় ১১৬,২৮৫

সাহিত্য-সংবাদ— ১৪৪,২৮৮,৪৩২,৫৭৬,৭২০,৮৪৬

সুখ স্মৃতি (গল্প)—শ্রীষষ্ঠীন্দ্রমোহন বসু ... ৫২১

সুখী (কবিতা)—শ্রীসুধরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৬১০

স্বর্ণলিপি (সমালোচনা)—
অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম-এ ২৪২

স্বপ্ন-মিলন (গল্প)—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ৮৩০

স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায় বি-এসসি ৪২৩

স্বামী বিবেকানন্দ (জীবন কথা) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ৭৪

হরিনাম (কবিতা)—শ্রীসুধরঞ্জন মল্লিক বি-এ ৭৭

হাবেজ (জীবন-কথা)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৮১৭

চিত্র-সূচি

আষাঢ়

ফরিদপুরের উপাসনা-গৃহ-প্রাঙ্গণে খেলুড়গণ ২০
হাসপাতাল ও স্কুল—ডিব্রুগড় ৮১
দৃশ্য—ডিব্রুগড় ৮১
তৈল উত্তোলন—ডিব্রুগড় ৮২
তৈলের কারখানা—ডিব্রুগড় ৮২
শিলংয়ের বৃক্ষ ৮৩
কোষা নৌকা ৮৩
খাসিয়া রমণী ও বালিকা ৮৪
লেফ্‌টেন্যাণ্ট হেমেন্দ্র মিত্র ৮৪
ষ্টেজ, ব্যবস্থাপক ও বয় ৮৫
পাঠগৃহ ৮৫
একখানি প্রস্তরনির্ম্মিত বোটের লঙ্গর ৮৭
একখানি প্রস্তরনির্ম্মিত নৌকা ৮৮
কোম্পেনায় কোম্পানীর জাহাজখানা ৮৮
সেখ্ সলীম্ চিশ্‌তী ১২১
যৌবনে জহাঙ্গীর ১২২
আকবরের নাগোরে বন্য-গর্দ্দভ-শিকার ১২২
সলীমের জন্ম ১২৩
আকবর ও কুমার সলীম্ ১২৩
চিতোর ১২৪
আজমীর দুর্গ ১২৪
ফতেপুর সীক্রী ১২৪
সেকাল ১২৬
একাল ১২৬
১ম অঙ্ক—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ১২৭
২য় অঙ্ক—শিথিলপ্রতিজ্ঞ ১২৭
৩য় অঙ্ক—দুষ্পুত্র ১২৮
৪র্থ অঙ্ক—অনুগত ১২৮

শ্রাবণ

টিয়া জাতীয় পক্ষিগণ ২০৯
রুচি এবং স্বভাব অনুযায়ী এদেশে সংরক্ষিত "মায় রাঙা" এবং "খঞ্জন" পক্ষী ২০৯
মৌমাছিভোজী কিঙ্ জাতীয় পক্ষী ২১০
কীট-ভোজী "কোবল-চঞ্চু" বিভিন্ন শ্রেণীর পক্ষী ২১০
মিঃ আল্‌ফ্রেড এডওয়ার্ড লওনস্ পক্ষি-গৃহে রক্ষিত বিভিন্ন শ্রেণীর হুর্গাটুনটুনি ২১১
মিঃ ষ্টেভিন্স্ এডওয়ার্ড কলিকাতার পক্ষিভবনে একত্র সংরক্ষিত বিভিন্ন শ্রেণীর সারস-পক্ষী ২১২
গাজনের প্রাসাদের দূরের দৃশ্য ৮১
লালগড় প্রাসাদ ৮১
মরুভূমি হইতে সহরের দৃশ্য ৮২
সাগর-তীর্থ ৮২
গাজনের প্রাসাদ ৮৩
রাজ-প্রাসাদ ৮৩
প্রাসাদের সম্মুখভাগ ৮৪
রতন বেহারীজীর মন্দির ৮৪
রেলওয়ে ষ্টেসন ৮৫
লছমীনাথজীর মন্দির ৮৫
নূতন জাহাজ তৈয়ার হইতেছে ৮৭
নদীবক্ষে ভাসমান নূতন জাহাজ ৮৮
নূতন জাহাজ ভাসাইবার উৎসব ৮৮
সমুদ্রে সফর দিবার জন্য প্রস্তুত ১২১
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১২২
মধুসূদনের সমাধি ...
ধায়তাপুরার মহারাজ বাহাদুর দায়—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র সিংহ, কে-বি-ই, সি-সি-আই-ই ২৬৪
মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড, জি-সি আই-ই ২৬৬
সার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু, নাইট, ও-বি-ই ২৬৬
বোম্বাইয়ের গবর্ণর লর্ড উইলিংডন, জি-সি-আই-ই ... ২৬৬
ডাক্তার শ্রীযুক্ত পরংকুমার মল্লিক, সি-বি-ই, ও-বি-ই ... ২৬৭
ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বর সার উইলিয়ম ডিউক, জি-সি আই-ই ২৬৭
বঙ্গভারতের ব্যাঙ্কার সার শেঠ স্বরূপচাঁদ হুকুমচাঁদ নাইট ... ২৬৭
মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সার নীলরতন সরকার নাইট ... ২৬৮
মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, নাইট, সি-আই-ই ২৬৮
শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২৬৯
স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত ২৭০
স্বর্গীয় সুবাদার অরুণকুমার মিত্র ২৭০

ভাদ্র

বসোহরে প্রাপ্ত ইষ্টক খণ্ড (১) ৩০৮
" (২) ৩০৮
" (৩) ... ৩০৯

হাতীখেদার বেড়া ৩৫৭
পোষা হস্তী দ্বারা বন্য-হস্তী বন্ধন ... ৩৫৯
পোষা হস্তী দ্বারা বন্য-হস্তী বন্ধন—(খেদার অপর অংশ) ৩৬১
আকবরের সমাধি—সিকন্দ্রা ৩৬১
আকবর ও মরিয়ম্ ৩৬১
সম্রাট্ চতুষ্টয়—বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জহাঙ্গীর ৩৬২
সম্রাট্ আকবর ৩৬২
জহাঙ্গীর ৩৬২
শাহ্‌জহান্ ৩৬৪
জহাঙ্গীর-মহিষী যোধবাঈ ৩৬৩
শিশিরকুমার ঘোষ (যৌবন বয়সে) ৩৬৪
৺হেমন্তকুমার ঘোষ ৩৬৪
শিশিরকুমারের স্মৃতিকা-গৃহ ৩৬৪
শিশিরকুমারের আবাস-ভবন ৩৬৫
শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ ৩৬৬
" শ্রীযুক্তকান্তি ঘোষ ৩৬৭
" অনাথনাথ বসু ৩৬৮

আশ্বিন

বিচিত্র পাখীর বাসা ১নং ৪১৩
ঐ ২নং ৪১৪
ঐ ৩নং ৪১৬
গগনমহল, সিদ্ধী ও সপ্তমঞ্জিল ৪১৮
দুর্গ-প্রাচীর ৪১৮
ইশ্‌লাম খাঁর মসজিদ ৪১৯
ইব্রাহিমের পুরাতন জুম্মা মসজিদ ৪১৯
ইব্রাহিমপুর মসজিদ ৪২০
রঙ্গীন মসজিদ ৪২০
জুম্মা মসজিদের সম্মুখভাগ ৪২০
আলি মর্দ্দান খাঁয়ের মসজিদ ৪২১
হাইদরিয়া মসজিদ ৪২১
প্রথম আলির সমাধি ৪২১
আইন-উল্-মুল্‌কের সমাধি ও মসজিদ ৪২২
আইনাপুরে আইন-উল্-মুল্‌কের মসজিদ ৪২২
গগন মহল ৪২৩
গগন মহল ও সড়খাই ৪২৩
৩০ বৎসর পূর্ব্বের সপ্তমঞ্জিল ও সড়খাই ৪২৪
দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে জুম্মা মসজিদ ৪২৪
বঙ্গোপসাগরে "কোকো" দ্বীপ ৪৬৭
আন্দামান—"হোম" ৪৬৮
আন্দামান—"করবীরের বৃক্ষ" ৪৬৯

কার্ত্তিক

কাশ্মীরে গ্রাম্য জীবন ৪৪১
চাল দুধ ও নদীর মধ্যস্থ খাল ৪৪১
নদীতীরে বরামূলার দৃশ্য ৪৪২
শীতকালে মুরীর দৃশ্য ৪৪৩
মুরী—তাম পাহাড় হইতে বাগানের দৃশ্য ৪৪৩
মুসীবাগ—কাশ্মীর ৪৪৪
মুরী—হোটেল ও গির্জ্জা ৪৪৪
বড়-ঘরানার বিবাহ-বেশ ৪৮১
জাপানী বিবাহ—মধ্য শ্রেণীর (১) ৪৮১
জাপানী বিবাহ—মধ্য শ্রেণীর (২) ৪৮১
জাপানী বিবাহ-উৎসব ৪৮১
জাপানী শিশুদের দেবদর্শন ৪৮২
জাপানী শিশুর উৎসব ৪৮২
জাপানী শিশুর পেলনা-উৎসব ৪৮২
বিবাহের যৌতুক ৪৮২
জাপানী 'কনে'র বিবাহের যৌতুক ৪৮৩
জাপানী অভিবাদন-প্রথা ৪৮৩
দেবদর্শনার্থী জাপানী শিশু ৪৮৩
জাপানী মহিলার পরিচ্ছদ ৪৮৪
জাপানী শ্রমজীবীদের উল্‌কী ৪৮৪
স্বামিন্ তুমি মারিবে ৪৮৫
এমনি করিয়াই একদিন তোমায় হারাইব ৪৮৫
গত রাত্রে অনিয়ম করিয়াছ ৪৮৬
গহনা লইতে আসিয়াছ ৪৮৬
আশা ৪৮৭
বৈরাগ্য ৪৮৭
খৃষ্টানাভিসন্ধি ৪৮৭
লোমশ বৃষ্টি ৪৮৭

অগ্রহায়ণ

বারাণসীর মন্দির ৪৯১
ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির ৪৯২
সোনপুরের মন্দির ৪৯২
পাভ্রাদের শিব-মন্দির ৪৯৩
ছাপরার শিব মন্দির ৪৯৩
হর-মন্দির ৪৯৪
কমলেশ্বরনাথের মন্দির ৪৯৪
বাগাহার শিব-মন্দির ৫০৭
সৌরঠের মহাদেব-মন্দির ৫০৮
রামজী মন্দির ৫০৯

রাজাবাসপুরের শিব-মন্দির	১৪০	শ্রীরামপুরের রাধাজী-মন্দির ... ১৫৩
রামচন্দ্র-মন্দির	১৪০	বাড়ার রামজী-মন্দির ১৫৭
রাসাধার শিব-মন্দির	১৪১	পঞ্চরত্ন মন্দির ১৫৭
রাধাকৃষ্ণ মন্দির	১৪১	ছাপরার পঞ্চরত্ন মন্দির ১৫৮
শিব-মন্দির	১৪২	বাড়ার পঞ্চরত্ন মন্দির ১৫৮
রাম-মন্দির	১৪২	ছাপরার পঞ্চরত্ন মন্দির ১৫৯
হরৌলির হর-মন্দির	১৪৩	চৈনপুরের পঞ্চরত্ন মন্দির ১৫৯
ভগবতী-মন্দির	১৪৩	কনৌলির ঠাকুর-বাড়ী ১৬০
আষাঢ়াঘাটের মহাদেব-মন্দির	১৪৪	রামনগরের মহাদেব মন্দির ১৬০
শ্রীনগরের শিব ও ঠাকুর-মন্দির	১৪৪	পিপড়ার রাজমাতা-মন্দির ১৬১
বহু জয়রাম বাসজীর মন্দির	১৪৫	মজফরপুর রাম-মন্দির ১৬১
কনকালী দেবী-মন্দির	১৪৫	মজফরপুর রাম ও জানকী-মন্দির ১৬২
শিওহরের শিব-মন্দির	১৪৬	

ত্রিবর্ণ চিত্র

কমলদেবী	চাকশিল্প
রথযাত্রা	মুরলী শিক্ষা
আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষের	কিরাত ও অর্জ্জুন
মুনিয়া জাতীয় পক্ষিগণ একত্র সংরক্ষিত	সংসার বন্ধন
আমেরী ও ভিক্ষুক	বৃক্ষ-দম্পতি
"কার পথ চাহি, এ জনম বাহি	নির্ব্বাসিতা
কার মরমন যাচি রে"—	বীণাপাণি

শিল্পী— শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু

বন্ধনশালা

চিত্রের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে।

The Emerald Printing Works
CALCUTTA

আষাঢ়, ১৩২৫

প্রথম খণ্ড] ষষ্ঠ বর্ষ [প্রথম সংখ্যা

ভারতবর্ষ

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি-এ]

গঙ্গাগোদাবরীসিন্ধুসরস্বতীতরলধারাবলিহারা,
বিন্ধ্যহিমাচলকাঞ্চিমুকুটধরা মলয়বলয়শোভাসারা ;
নিযুতনিঝরঝরঝঙ্কৃতশিঞ্জিনী উপলনূপুরমণিপৃক্তা,
লক্ষতড়াগহ্রদ বক্ষের মৃগমদ চন্দনপঙ্কানুলিপ্তা ;
জয়জয় ভারত নর-অমরাবতি জয় ভুবনেশ্বরি মাত',
চিরসম্পদখনি দেশশিরোমণি ! চরণে ধরা নতমাথা ।

বর্ষাশরতহিমশীতমধুঋতুপল্লিতফলফুলডালা,
শালতালীবটখর্জ্জুরনারিকেলআম্রকাননকেশমালা ;
ধান্যগোধূমযবহরিতহিরণরুচি ঝলমল অঞ্চল দোলে,
চামেলিচম্পককুন্দকমলনীপ গ্রন্থিত বক্ষনিচোলে,
জয়জয় ভারত নর-অমরাবতি জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
চিরসুষমাখনি রাণীশিরোমণি ! চরণে নিখিল নতমাথা ।

বারণহয়মৃগসিংহমহিষবৃষশার্দ্দূলবাহনসাথী,
হংসপারাবতশুকপিকচন্দনাময়ূরমুখরবনপাঁতি ;
তীর্থদেবালয়মন্দিরমন্ত্রিতশঙ্খঘণ্টারতিরাবা,
সপ্তস্বরাবেণুমৃদঙ্গনিনাদিত ঝঙ্কৃতবীণরবাবা ;
জয়জয় ভারত নর-অমরাবতি জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
নিখিলশিল্পকলাগৌরবমণ্ডিতা ! চরণে পৃথ্বী নতমাথা ।

নিত্যালোকচিরবন্দিতপদযুগ নন্দিতবিশ্বনমস্যা,
দীপ্তজ্ঞানরবিরাগবিভাসিত আদিমযুগঅমাবস্যা ;
বিপুলবীর্য্য তব আর্য্যকীর্ত্তি বল অর্পিল দুর্ব্বল দীনে,
আশ্রমউচ্ছ্রিত সামমন্ত্র তব শান্তি,সঁপিল সুখহীনে ;
জয়জয় ভারত নর-অমরাবতি জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
কর্ম্মদাত্রী তুমি ধর্ম্মধাত্রীভূমি ! তব চরণে নতমাথা ।

অম্বরপরে চিরগম্ভীরমন্দ্রে বাজিছে কালের ডঙ্কা,
ধাবিত মানব যুগে-যুগান্তরে অন্তরে সঙ্কটশঙ্কা ;
অভয়বাণী তব নাশি' পন্থাভয় মাভৈঃ রবে দিল আশা,
আত্মা অমর বলি' প্রথম প্রচারিল জাগ্রত তব দেবভাষা ;
জয়জয় ভারত নর-অমরাবতি জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
দুঃখবিপদজয়ী স্নেহ মূর্ত্তিময়ী ! তব চরণে নতমাথা ।

নিখিললোক যেথা পুণ্যমিলন লভি' ধন্য হইল তব বক্ষে,
নিখিল ধর্ম্ম চিরলোকধর্ম্ম ধরি' শান্তি লভিল নব লক্ষ্যে ;
দিকেদিকে উত্থিত দ্বন্দ্বকলহ যত ক্ষান্ত করিয়া মধুমন্ত্রে,
দীপ্ত বাণী তব ঝঙ্কৃত করি' দিলে বিশ্ববিপুলবীণযন্ত্রে ;
জয়জয় ভারত নর-অমরাবতি জয় ভুবনেশ্বরি মাতা,
শাশ্বতমানবমনমন্থনধন ! তব চরণে নতমাথা ।

জ্যোতিষ-বেদাঙ্গ

[অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ]

বেদ আর্য্যদিগের আদি গ্রন্থ। বেদমন্ত্রের মর্ম্মার্থ সম্যক্ অবগতির নিমিত্ত প্রাচীন ঋষিগণ কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাদের নাম "ব্রাহ্মণ"। বেদ পাঠ করিতে হইলে "উচ্চারণ" ও "ছন্দো"জ্ঞানের প্রয়োজন, বেদমন্ত্র বুঝিতে হইলে "ব্যাকরণ" এবং "নিরুক্তে"র প্রয়োজন, এবং যজ্ঞার্থে বেদমন্ত্রের ব্যবহার করিতে হইলে "জ্যোতিষ" এবং "কল্পের" জ্ঞানই উপযোগী। এই ছয়টী বিষয়ের সমস্ত নিয়মই "ব্রাহ্মণ"গুলির মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছিল; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ব্যবহারের সুবিধার জন্য উপরিউক্ত প্রত্যেকটী বিষয়ের নিয়মগুলি সংগ্রহ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ হইল—যথা, "শিক্ষা" (যাহাতে উচ্চারণ-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়), "ছন্দ", "ব্যাকরণ", "নিরুক্ত" (বর্ত্তমান "কোষের" মত), "জ্যোতিষ" এবং "কল্প" (ইহাকে আধুনিক "করণ" গ্রন্থ বলা যাইতে পারে)। এই ছয়টীকে "বেদাঙ্গ" বলে। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জ্যোতিষ ষড়্বেদাঙ্গের একটী বেদাঙ্গ। সেকালের যজ্ঞকাল নির্ণয়ের উপযোগী নিয়মগুলি মাত্র ইহাতে সংগ্রহ করা আছে। যে উদ্দেশ্যে রচিত, সেই উদ্দেশ্যের উপযোগী সূত্রগুলি মাত্র ইহাতে আছে। কিন্তু এই জ্যোতিষ-বেদাঙ্গ হইতে সেকালের ঋষিদের জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা আমাদের উচিত নহে, কারণ পরবর্ত্তী "সিদ্ধান্ত"গুলির ন্যায় জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া জ্যোতিষ-বেদাঙ্গের উদ্দেশ্য নহে। ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট উল্লেখ আছে, আমরা সে উদ্দেশ্য উপরে জ্ঞাপন করিয়াছি।

জ্যোতিষ-বেদাঙ্গখানি অত্যন্ত সঙ্ক্ষিপ্ত গ্রন্থ। ঋগ্বেদীয় জ্যোতিষ-বেদাঙ্গের মাত্র ৩৬টী শ্লোক, এবং যজুর্ব্বেদীয় জ্যোতিষ-বেদাঙ্গের মাত্র ৪৩টী শ্লোক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দুইটীর কতকগুলি শ্লোক সাধারণ এবং কতকগুলি পৃথক্। দুইটী মিলাইয়া আমরা সর্ব্বশুদ্ধ মাত্র ৪৯টী পৃথক্ শ্লোক পাই। শ্লোকগুলি অত্যন্ত সঙ্ক্ষিপ্ত এবং বিষয়ানুক্রমে সাজান নাই। অধিকাংশগুলিই অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে জোন্স(১) (Sir W. Jones), কোল্‌ব্রুক্(২), বেণ্টলি(৩) এবং ডেভিস্(৪) বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ অধ্যয়ন করেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই সমগ্র বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কোল্‌ব্রুক্ সাহেব মাত্র ঋগ্বেদীয় ৩৪, ৭ম ও ৮ম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া এবং কতকগুলি সাধারণ উক্তি করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে মোক্ষমূলর(৫), বেবর(৬) ও হুইট্‌নি(৭) এই বিষয়ে মনোযোগ দেন। কিন্তু যে বিষয়গুলি পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছিল—অর্থাৎ অয়নের অবস্থিতি ও নক্ষত্রচক্রে "নক্ষত্র"গুলির সংখ্যা—সেই বিষয়গুলির পুনরালোচনা করিয়াই তাঁহারা নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। তবে বেবর সাহেব (১৮৬২ খ্রীঃ) অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি দেখিয়া নানাবিধ পাঠান্তরের সহিত এই উভয় (recension) শাখার শ্লোকগুলির মূল, জার্ম্মান ভাষায় অনুবাদ, যজুর্ব্বেদীয় বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সোমকারের টীকা এবং এই টীকাকে ভিত্তি করিয়া নিজের টীপ্পনী সহ জ্যোতিষ বেদাঙ্গের একটী সংস্করণ প্রকাশ করেন। যদিও তিনি সকল শ্লোকের সম্যক্ অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তথাপি নানাবিধ পাঠান্তরের সহিত জ্যোতিষ-বেদাঙ্গের এই সংস্করণটী প্রকাশ করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীরই

---

(১) Sir W. Jones, *Collected Works*, Vol. I.
(২) Colebrooke, *Essays*, Vols. II & III.
(৩) Bentley, *Hindu Astronomy*, Part I, Sections I & II.
(৪) Davis, *Asiatic Researches*, Vol. II.
(৫) Max Muller, *Rigveda Samhita, Vol. 4, Preface.*
(৬) Weber, *Uber den Vedakalendar, Namen, Jyotisham.*
(৭) Whitney, *The Lunar Zodiac.*
— *Oriental & Linguistic Studies*, Series II (1875), Twelfth Essay.
— *Indian Antiquary*, Vol. 24 (1895) p. 365.
— Appendix to Colebrook's Essay, *On the Vedas.*

কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কারণ এখন যে কেহ এই পুস্তকখানির সাহায্যে অল্প বিশেষ সাহায্য ব্যতিরেকেও জ্যোতিষ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিতে পারেন। এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, হুইট্‌নি সাহেব বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সম্যক্ অর্থ পরিগ্রহণ করিতে না পারিয়া স্থানে স্থানে যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠকবর্গ যেন বিশেষ আলোচনা না করিয়া সেগুলিকে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ না করেন।

বেবর সাহেবের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার ১৫ বৎসর পরে (১৮৭৭ খ্রীঃ) বাঙ্গালাদেশের এসিয়াটীক সোসাইটীর পত্রিকায় থিবো সাহেব (Dr. Thibaut) বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ(৮) লেখেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতেরা বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের যতদূর অর্থ গ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি নিজে আর কতকগুলি শ্লোকের স্পষ্টার্থ প্রদানে যত্নবান্ হন। থিবো সাহেবও তাঁহার প্রবন্ধের শেষে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনিও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সকল শ্লোকগুলির অর্থ গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই। থিবো এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণ মাত্র ২৩টী শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮৯৬ খ্রীঃ স্বর্গীয় শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত এই ২৩টী শ্লোক ব্যতীত ৯টী শ্লোকের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন।

তাহার পরে ১৯০৮ খ্রীঃ "হিন্দুস্থান রিভিউ" পত্রিকায় কাশীর এক্‌জিকিউটিভ্ এঞ্জিনিয়ার লালা ছোটেলাল "বার্হস্পত্য" ছদ্মনামে কতকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ সকল প্রবন্ধে তিনি সমগ্র জ্যোতিষ-বেদাঙ্গের মূল, ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ এবং স্পষ্টার্থ প্রকাশ করিয়া একটী বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছেন। পরে এই প্রবন্ধগুলি(৯) একত্র করিয়া একখানি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন; কিন্তু এই পুস্তিকাখানি এখন আর পাওয়া যায় না। ইহার কিছু পরেই স্বর্গীয় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় "যাজুষ-জ্যোতিষং সোমাকরসুধাকরভাষ্যসহিতং" নামে বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের এক সংস্করণ প্রকাশ করেন।

উপরিউক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মতামত অবলম্বন করিয়া বঙ্গে সুধীসমাজে জ্যোতিষ-বেদাঙ্গের বহুল প্রচারের জন্য কতকগুলি প্রবন্ধ বঙ্গভাষায় "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশের উদ্যোগী হইয়াছি। সমালোচনা হইলে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে, এ আশাও আছে।

প্রথমে ঋগ্বেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের শ্লোকগুলির প্রচলিত ও সাধুপাঠ, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও স্পষ্টার্থ প্রদান করিব। পরে বিষয়ানুক্রমিক বিশদ আলোচনার চেষ্টা করিব।

ঋগ্বেদীয় জ্যোতিষ

প্রচলিত পাঠ।

পঞ্চ সংবৎসরময়ং যুগাধ্যক্ষং প্রজাপতিং।
দিনর্ক্ষরনমাসাংগং প্রণম্য শিরসা শুচিঃ ॥ ১ ॥
প্রণম্য শিরসাকালমভিবাঞ্ছ সরস্বতীং।
কালজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি লগধস্য মহাত্মনঃ ॥ ২ ॥
জ্যোতিষাময়নং কৃৎস্নং প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ।
বিপ্রাণাং সম্মতং লোকে যজ্ঞকালার্থ সিদ্ধয়ে ॥ ৩ ॥

বেবর সংগৃহীত পাঠান্তরাদি—প্রণম্য শিরসা কালম্ইতি। কালমভিজ্ঞায়প্রবক্ষ্যামি ইতি ॥

সাধু পাঠ।

পঞ্চসংবৎসরময়ং যুগাধ্যক্ষং প্রজাপতিম্।
দিনর্ক্ষরনমাসাঙ্গং প্রণম্য শিরসা শুচিঃ ॥ ১ ॥ ঋ য, ১
প্রণম্য শিরসাকালমভিবাঞ্ছ সরস্বতীম্।
কালজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি লগধস্য মহাত্মনঃ ॥ ২ ॥
জ্যোতিষাময়নং কৃৎস্নং প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ।
বিপ্রাণাং সম্মতং লোকে যজ্ঞকালার্থ সিদ্ধয়ে ॥৩॥ য, ২

---

(৮) Dr. Thibaut, *Contributions to the Explanation of the Jyotisha Vedanga*, J. A. S. B., 1877.

ডাঃ থিবোর "পর্য্যপ্তি" সম্বন্ধে প্রবন্ধও ১৮৮১ সালের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় দ্রষ্টব্য।

ডাঃ থিবোর আর একটী প্রবন্ধেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে—*On some recent attempts to determine the antiquity of Vedic Civilisation*, Ind. Antiquary, 1895.

(৯) লালা ছোটেলালের সৌজন্যে তাঁহার স্বকীয় পুস্তিকাখানি আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। কোন কোন শ্লোকের লালা ছোটেলাল কৃত ব্যাখ্যার সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব।

* ঋগ্বেদীয় এবং যজুর্ব্বেদীয় জ্যোতিষের সাধারণ শ্লোকগুলি এইরূপে প্রদর্শিত হইবে।

অন্বয়ঃ—শুচিঃ (অহং) পঞ্চসংবৎসরময়ং যুগাধ্যক্ষং দিনর্ত্বয়নমাসাঙ্গং প্রজাপতিং শিরসা প্রণম্য কালং শিরসা প্রণম্য (চ) সরস্বতীং অভিবাদ্য (চ) মহাত্মনঃ লগধস্য কালজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি। লোকে যজ্ঞকালার্থসিদ্ধয়ে বিপ্রাণাং সম্মতং জ্যোতিষাং কৃৎস্নং অয়নং অনুপূর্ব্বশঃ প্রবক্ষ্যামি।

অনুবাদ :—আমি শুচি হইয়া পঞ্চবৎসরময় যুগের অধ্যক্ষ, এবং দিন, ঋতু, অয়ন (=বর্ষার্দ্ধ) ও মাস যাঁহার অঙ্গবিশেষ সেই প্রজাপতিকে মস্তকের দ্বারা অভিবাদন করিয়া, কালকে মস্তকের দ্বারা অভিবাদন করিয়া এবং সরস্বতীকে অভিবাদন করিয়া, মহাত্মা লগধের (শিক্ষানুযায়ী) কালজ্ঞানের বর্ণনা করিব। এই জগতে যাহা যজ্ঞকালের উপর নির্ভর করে সেই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য (জ্যোতির্ব্বিদ) বিপ্রদের অভিমত জ্যোতিষদের সর্ব্ববিধ গতির আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিব।

দ্রষ্টব্য—(১) এখানে বৎসরকেই প্রজাপতিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। দিন, ঋতু, অয়ন ও মাস বৎসরেরই অঙ্গ বিশেষ—প্রজাপতিতে আরোপিত হইয়াছে। (২) পাঁচ বৎসরে যুগ ধরা হইয়াছে—বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের অন্যতম বিশেষত্ব। (৩) কিন্তু এই মহাত্মা লগধ কে? এ বিষয়ে এখনও স্থির মীমাংসা হয় নাই। কেহ বলেন ইহা "লগহ" এই শব্দের অপভ্রংশ মাত্র; "লগহ" হইতে লগহের অপত্যাদি অর্থে "লাগহয়ঃ" পাওয়া যায়। "লাগহয়"দের পূর্ব্বপুরুষের নাম "লগধ" হইতে পারে। গোত্রপ্রবর-কদম্বনিবন্ধম্, by P. Chentsal Rao, C. I. E., ১১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। গোত্রপ্রবরকদম্বনিবন্ধে "লগধ" নাম নাই। (১০)

প্রচলিত পাঠ।

নিরেকং দ্বাদশার্দ্ধাব্দং দ্বিগুণং গতসংজ্ঞকং।
ষষ্টা ষষ্টা যুতং দ্বাভ্যাং পর্বণাং রাশিরুচ্যতে ॥ ৪ ॥

বেবরসংগৃ—দ্বাদশর্দ্ধাব্দং ইতি। দ্বাদশার্দ্ধাব্দং ইতি। গতসংজ্ঞিকং ইতি। গতসঞ্জিকং ইতি। পর্বাণাং ইতি।

সাধু পাঠ।

নিরেকং দ্বাদশাভ্যস্তং দ্বিগুণং গতসংযুতম্।
ষষ্ট্যা ষষ্ট্যা যুতং দ্বাভ্যাং পর্বণাং রাশিরুচ্যতে ॥৪॥

য, ১৩

(১০) Appendix to Sudhakara Dvivedi's "Yajusha-Jyotisham", by Pd. Muralidhar Jha.

অন্বয়ঃ—(ইষ্টবর্ষং) নিরেকং (কৃত্বা শেষং) দ্বাদশাভ্যস্তং (কৃত্বা ফলং) দ্বিগুণং (কৃত্বা ফলং) ষষ্টা ষষ্টা দ্বাভ্যাং যুতং (কৃত্বা যৎফলং লভ্যতে তদেব) গতসংযুতং (কৃত্বা যঃ রাশিঃ লভ্যতে সঃ) পর্বণাং রাশিঃ উচ্যতে।

অনুবাদ :—[যুগের প্রচলিত বর্ষের সংখ্যা (১,২,৩,৪ কিম্বা ৫) হইতে] ১ বিয়োগ করিয়া অবশিষ্ট সংখ্যাকে ১২ দিয়া গুণ করিয়া ২ দিয়া গুণ করিতে হইবে। (গুণফলের) প্রতি ৬০ সংখ্যার জন্য ২টী করিয়া পর্ব্ব ধরিতে হইবে। (লব্ধ ফলের সহিত প্রচলিত বর্ষের) অতীত পর্ব্বগুলির সংখ্যা যোগ করিলে (যুগের প্রারম্ভ হইতে অতীত) পর্ব্ব সমষ্টি পাওয়া যাইবে।

স্পষ্টার্থ :—এখানে "পর্ব্ব" অর্থে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা বুঝিতে হইবে। এক যুগে ৫টী সৌর বৎসর, এবং ১২৯টী পর্ব্ব আছে। প্রতি মাসে সাধারণতঃ দুইটী পর্ব্ব ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ৫ বৎসরে বা ৬০ মাসে ৫টী পর্ব্ব বেশী হয়। ইহাদিগকে অধিপর্ব্ব বলা যাইতে পারে। ১২০ পর্ব্বে যদি ৪ অধিপর্ব্ব হয়, তাহা হইলে ৬০ পর্ব্বে ২ অধিপর্ব্ব হইবে। বর্ত্তমান সৌরাব্দমান হইতে ১ বিয়োগ করিলে গত সৌরাব্দমান পাওয়া যায়। তাহাকে ১২×২ দিয়া গুণ করিলে গত বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত স্থূল পর্ব্বসংখ্যা পাওয়া যায়। ইহার প্রতি ৬০ সংখ্যার জন্য ২টী করিয়া পর্ব্ব ধরিলে গত বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ পর্ব্বসংখ্যা হইবে। ইহার সহিত প্রচলিত বর্ষের গত পর্ব্বসংখ্যা যোগ করিলে যুগের প্রারম্ভ হইতে বিশুদ্ধ পর্ব্বসংখ্যা হইবে। পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী বলেন যে জ্যোতিষ-গণনায় প্রচলিত প্রথা অনুসারে "ষষ্টা ষষ্টা যুতং দ্বাভ্যাং" ইহার অর্থ এই যে স্থূল পর্ব্ব সমষ্টির দ্বিগুণের প্রতি ৬০ সংখ্যার জন্য একটী করিয়া পর্ব্ব অধিক ধরিতে হইবে। স্থূল পর্ব্ব-সমষ্টির প্রতি ৩০ সংখ্যার জন্য একটী করিয়া পর্ব্ব ধরাও একই কথা। তাহা না হইলে গণনায় সামান্য ভুল হইতে পারে। স্থূল পর্ব্ব সমষ্টি ৯০ হইলে $\frac{৯০ \times ২}{৬০} = \frac{৯০}{৩০} = ৩$ যোগ করিতে হইবে, ২ নহে।

* পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদীর মতে মাসার্দ্ধই এক এক পর্ব্ব; সৌর মাসার্দ্ধ সৌর পর্ব্ব, এবং চান্দ্র মাসার্দ্ধ চান্দ্র পর্ব্ব। এক যুগে সৌর মাস = ৬০, সৌর পর্ব্ব = ১২০; চান্দ্র মাস = ৬২, চান্দ্র পর্ব্ব = ১২৪। অতএব এক যুগে অধিপর্ব্ব সংখ্যা = ৪।

যদি মূলপর্ব্ব সমষ্টি ৩০ হইতে ৫৯ পর্য্যন্ত কোন সংখ্যা হয় তাহা হইলে ১ যোগ করিতে হইবে; ৬০ হইতে ৮৯ পর্য্যন্ত ২; ৯০ হইতে ১১৯ পর্য্যন্ত ৩; এবং ১২০ হইলে ৪ যোগ করিতে হইবে।

স্বর্গীয় শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত মহাশয় এই শ্লোকে "গত সংবৎসর" অর্থে "গতমাস-সংখ্যা" যুক্ত ধরিয়াছিলেন। কিন্তু "বার্হস্পত্য" এবং পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী "গত" অর্থে "গত পর্ব্ব-সংখ্যা" গ্রহণ করিয়াছেন। আমিও তাহাই করিয়াছি। "গত" শব্দের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সামান্য মত-ভেদ থাকিলেও স্বর্গীয় শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, "বার্হস্পত্য" এবং স্বর্গীয় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী তিন জনেই এই শ্লোকের একই প্রকার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। গত বর্ষ সংখ্যা = ব, এবং প্রচলিত বর্ষের গত মাস সংখ্যা = ম, এবং গত পর্ব্ব সংখ্যা = প ধরিলে, শঙ্করবালকৃষ্ণ দীক্ষিতের মতে যুগারম্ভ হইতে পর্ব্ব সমষ্টি = $(ব \times ১২ + ম) \times ২ + \frac{(ব \times ১২ \times ম) \times ২ \times ২}{৬০}$;

(বলা বাহুল্য "পর্ব্বসংখ্যা" বাহির করিতে শেষের মিশ্র ভগ্নাংশটী হইতে ভগ্নাংশ ত্যাগ করিয়া অখণ্ড রাশিটীই (integer) গ্রহণ করিতে হইবে)।

"বার্হস্পত্য" মতে এই পর্ব্ব সমষ্টি—

$$= (ব \times ১২ \times ২ + প) + \frac{ব \times ১২ \times ২ + প}{৬০} \times ২।$$

পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী মতে এই পর্ব্ব সমষ্টি—

$$= (ব \times ১২ \times ২ + প) + \frac{(ব \times ১২ \times ২ + প) \times ২}{৬০}।$$

কোন সৌর মাসের শেষ পর্য্যন্ত ধরিলে ফল একই হইবে, কারণ, সাধারণতঃ মাসে দুইটী করিয়া পর্ব্ব হওয়াতে, প = ২ম। সৌর মাসের শেষ পর্য্যন্ত পর্ব্ব-সংখ্যা নির্ণয় করাই যদি শ্লোকের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে আমার মনে হয় যে স্বর্গীয় শঙ্করবালকৃষ্ণ দীক্ষিতের ব্যাখ্যাই উৎকৃষ্ট। কারণ ৺শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত নির্দ্দিষ্ট প্রণালীমতে যে কোন সৌর মাসের শেষ পর্য্যন্ত পর্ব্ব সংখ্যা নির্ভুল পাওয়া যাইবে; কিন্তু কোন ক্ষেত্রে যদি প = ২ম না হয়, তখন "বার্হস্পত্যে"র ও পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের প্রণালী মতে পর্ব্ব-সংখ্যা অশুদ্ধ হইবে। কারণ পরে নির্দ্দেশ করিতেছি। কিন্তু "বার্হস্পত্য" এবং পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় মনে করেন যে শ্লোকটী একটী সাধারণ নিয়ম প্রদান করিতেছে—যে কোন পর্ব্ব পর্য্যন্ত পর্ব্বসমষ্টি নির্ণয় করাই শ্লোকের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমিও তাঁহাদের সহিত একমত; কিন্তু প্রণালী সম্বন্ধে আমার সামান্য মতভেদ আছে। সাধারণতঃ মাসে দুইটী পর্ব্ব বা বৎসরে ২৪টী পর্ব্ব ধরা হইলেও, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ৫ বৎসরে ১২৪টী (অর্থাৎ ২½ বৎসরে ৬২টী, বা ১৫ মাসে ৩১টী) পর্ব্ব হইবে। সেইজন্যই ঐ মূল পর্ব্বসমষ্টিতে "শুদ্ধিবীজ" (correction) প্রদান করিবার আবশ্যকতা। অতএব গত বর্ষশেষ পর্য্যন্ত মাসে দুইটী পর্ব্ব ধরিয়া যে মূল পর্ব্বসমষ্টি হইয়াছে, তাহাতে এই "শুদ্ধিবীজ" প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু প্রচলিত বর্ষের শুদ্ধ অতীত পর্ব্ব-সংখ্যাতে এই "শুদ্ধি বীজ" প্রয়োগ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই,—বরং করিলে ফল অশুদ্ধ হইবে। এই হিসাবে স্বর্গীয় শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিতের প্রণালীটী নির্ভুল—কারণ "বীজ" প্রয়োগের পূর্ব্বে তিনি প্রচলিত বর্ষের শুদ্ধ পর্ব্বসংখ্যা গ্রহণ করেন নাই, অতীত মাস-সংখ্যা লইয়া প্রতি মাসে দুইটী করিয়া পর্ব্ব ধরিতেছেন; ইহাতে ঐ সৌর-মাস পর্য্যন্ত মূল পর্ব্ব-সমষ্টি পাওয়া যাইতেছে; তাহাতে "বীজ" প্রয়োগ করিলেই শুদ্ধ পর্ব্ব সংখ্যা নির্ণীত হইবে। তবে শ্লোকের উদ্দেশ্যটীকে সামান্য ছোট করা হইয়াছে। একটী সামান্য উদাহরণ লইলেই বিষয়টী স্পষ্ট হইবে।

যদি দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ পর্ব্ব পর্য্যন্ত পর্ব্ব-সংখ্যা বাহির করিতে হয়, তাহা হইলে "বার্হস্পত্য" এবং পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদীর প্রণালী অনুসারে

$$\text{পর্ব্ব সমষ্টি} = (১ \times ১২ \times ২ + ৬) + \frac{(১ \times ১২ \times ২ + ৬) \times ২}{৬০}$$
$$= ৩০ + ১ = ৩১।$$

দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ পর্ব্ব পুষ্যধন মাসেই হইবে; কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪ মাসের কোন মাসেই দুইটীর অধিক পর্ব্ব থাকিতে পারে না। কারণ প্রকৃতপক্ষে প্রথমে ১৪শ মাসেই ৩টী পর্ব্ব পড়িবে; পরে ৩০শ, ৪৫শ ও ৬০ম মাসের প্রত্যেকটীতে ৩টী করিয়া পর্ব্ব হইবে। অতএব ২য় বর্ষের ৬ষ্ঠ পর্ব্ব পর্য্যন্ত পর্ব্ব-সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে ৩০ হওয়া উচিত। আমার প্রণালী অনুসারে তাহাই হইবে। কারণ প্রথম বর্ষের মূল

পর্ব্ব-সংখ্যা ২৬ ; এই সংখ্যা ৩০এর কম বলিয়া $\frac{২৬ \times ২}{৩০}$ এর অন্তর্গত অখণ্ড রাশি = ০, অতএব "শুদ্ধিবীজ" = ০ ; ২৪এর সহিত প্রচলিত বর্ষের ৬টী পর্ব্ব যোগ করিলে আমরা বিশুদ্ধ পর্ব্ব-সংখ্যা "৩০"ই পাই।

স্বর্গীয় পণ্ডিত শঙ্করবালকৃষ্ণ দীক্ষিতের প্রণালী মতে ২য় বর্ষের ৩য় মাসের শেষ পর্য্যন্ত পর্ব্ব-সংখ্যা—

$$= (১ \times ১২ + ৩) \times ২ + \frac{(১ \times ১২ + ৩) \times ২ \times ২}{৬০}$$

$$= ৩০ + ১ = ৩১,$$

এবং প্রকৃত পক্ষে ১৪ মাসে পর্ব্ব-সংখ্যা ৩১ই হয়।

অতএব আমার মতে প্রণালীটীর এইরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে—

$$\text{পর্ব্বসমষ্টি} = ব \times ১২ \times ২ + \frac{ব \times ১২ \times ঘ \times ২}{৬০} + প$$

(অবশ্য ২য় রাশি হইতে ভগ্নাংশ ত্যাগ করিয়া অখণ্ড রাশিই গ্রহণ করিতে হইবে)।

এই প্রণালীমতে উপরোক্ত উদাহরণটীর পর্ব্ব-সমষ্টি

$$= ১২ \times ২ + \frac{১২ \times ২ \times ২}{৬০} + ৬ = ২৪ + ০ + ৬ = ৩০$$

যদি ৩য় বর্ষের ১ম পর্ব্ব পর্য্যন্ত পর্ব্ব-সমষ্টি বাহির করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা পাই,

$$২ \times ১২ \times ২ + \frac{২ \times ১২ \times ২ \times ২}{৬০} + ১$$

$$= ৪৮ + ১ + ১ = ৫০ ;$$

যদিও আমরা দেখিয়াছি যে ২য় বর্ষের ৩য় মাসে ৩টী পর্ব্ব হয়, তথাপি ৩য় বর্ষের কোন পর্ব্ব পর্য্যন্ত পর্ব্ব-সমষ্টি বাহির করিতে হইলে গত দুই বৎসরের জন্য আমরা ২৪টী করিয়া পর্ব্ব ধরিতেই বাধ্য। অতএব ইহাতেই "বীজশুদ্ধি"র প্রয়োজন।

আমি যে প্রণালীর নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা দ্বারা যুগের যে কোন বর্ষের যে কোন পর্ব্ব পর্য্যন্ত পর্ব্ব-সমষ্টি বিশুদ্ধ ভাবে নির্ণীত হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

প্রচলিত পাঠ।

স্বরার্কমেকে সোমার্কৌ যদা সাকং সবাসবৌ।
স্যাত্তদাদিযুগং মাঘস্তপঃ শুক্লোঽহরনং হ্যুদক্ ॥ ৫ ॥

বেবরসংগৃ—স্বরার্কৌমেকে ইতি। দিনং ত্যজা ইতি॥

সাধু পাঠ।

স্বরাক্রমেতে সোমার্কৌ যদা সাকং সবাসবৌ।
স্যাত্তদাঽদিযুগং মাঘস্তপঃ শুক্লোঽয়নং হ্যুদক্ ॥৫॥ ঘ, ৬

অন্বয় :—যদা সবাসবৌ সোমার্কৌ স্বঃ সাকং আক্রমেতে তদা আদি যুগং স্যাৎ মাঘঃ (মাসঃ স্যাৎ) তপঃ (শুচুঃ স্যাৎ) শুক্লঃ (পক্ষঃ স্যাৎ) অয়নং হি উদক্ (স্যাৎ)।

অনুবাদ :—বাসবের (শ্রবিষ্ঠা বা ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের) সহিত সূর্য্য এবং চন্দ্র যখন একত্র আকাশে উদিত হন, তখন আদিযুগ, মাঘ মাস, তপঃ শুচু, শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণের আরম্ভ হয়।

দ্রষ্টব্য— এখানে শ্রবিষ্ঠা নক্ষত্রের আদি বিন্দুর সহিত সূর্য্য এবং চন্দ্রের স্ফুট অবস্থান (= longitude) সমান, ইহাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের যুতি অর্থাৎ গ্রহণ না হইতেও পারে। অতএব সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রোদয় না হইতেও পারে, তবে সূর্য্য ও চন্দ্রের স্ফুট (longitude) সমান হওয়াতে সেই সময়ে অমাবস্যার শেষ এবং শুক্ল প্রতিপদের আরম্ভ হইবে। জ্যোতিষবেদাঙ্গকার মতে সূর্য্যোদয় হইতে, শুক্ল প্রতিপদ হইতে এবং সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইতে আদিযুগের আরম্ভ হইয়াছে।

প্রচলিত পাঠ।

প্রপদ্যেতে শ্রবিষ্ঠাদৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুদক্।
সার্পার্দ্ধে দক্ষিণাঽর্কস্তু মাঘশ্রাবণয়োঃ সদা ॥ ৬ ॥

বেবরসংগৃ—সূর্য্যাচান্দ্রমসাবুদক্ ইতি। মাঘঃ ইতি।

সাধু পাঠ।

প্রপদ্যেতে শ্রবিষ্ঠাদৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুদক্।
সার্পার্দ্ধে দক্ষিণাঽর্কস্তু মাঘশ্রাবণয়োঃ সদা ॥ ৬ ॥ ঘ, ৭

অন্বয়:— সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ শ্রবিষ্ঠাদৌ উদক্ প্রপদ্যেতে, সার্পার্দ্ধে দক্ষিণা (প্রপদ্যেতে) অর্কঃ তু সদা মাঘশ্রাবণয়োঃ (মাসয়োঃ) (উদক্ দক্ষিণা প্রপদ্যেতে)।

অনুবাদ :—সূর্য্য এবং চন্দ্র শ্রবিষ্ঠা (= ধনিষ্ঠা) "নক্ষত্রে"র আদি বিন্দুতে আসিলে তাঁহাদের উত্তরায়ণ, এবং সর্প (= আশ্লেষা) "নক্ষত্রে"র মধ্যবিন্দুতে আসিলে তাঁহাদের দক্ষিণায়ণ, আরম্ভ হয়। সূর্য্য সর্ব্বদা যথাক্রমে মাঘ এবং শ্রাবণ মাসেই এই দুই বিন্দুতে আসিয়া থাকেন (অর্থাৎ

সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সর্ব্বদা মাঘ এবং শ্রাবণ মাসেই ঘটিয়া থাকে)।

দ্রষ্টব্য :—জ্যোতিষ-বেদাঙ্গ মতে ক্রান্তিবৃত্ত (বা রবি-মার্গ) ২৭ সমান ভাগে বিভক্ত। প্রতি ভাগের নাম এক "নক্ষত্র", এবং ইহার পরিমাণ ১৩ অংশ ২০ কলা। শ্রবিষ্ঠা আদি "নক্ষত্র" এবং অশ্লেষা ১৪শ "নক্ষত্র" হওয়াতে শ্রবিষ্ঠা নক্ষত্রের আদি বিন্দু হইতে আশ্লেষা নক্ষত্রের মধ্যবিন্দু ১৮০ অংশ দূরে অবস্থিত। "সার্পার্দে" এবং "শ্রবিষ্ঠাদৌ" হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে অন্ততঃ, বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ রচনার সময় নক্ষত্রচক্রের (ক্রান্তিবৃত্তের) বিভাগ বিশুদ্ধ ভাবে নির্ণীত হইয়াছিল।

প্রচলিত পাঠ।

ঘর্মবৃদ্ধিরপাংপ্রস্থঃ ক্ষপাহ্রাস উদগ্‌গতৌ।
দক্ষিণেতৌ বিপর্যস্তৌ ষণ্মুহূর্ত্যয়নেন তু ৫ ৭॥
বেবরসংগৃ—ঘর্মবৃদ্ধিরপ্রো প্রস্থঃ ইতি। উদগাতৌ ইতি। ষণ্মুহূর্ত্যয়নেন ইতি॥

সাধু পাঠ।

ঘর্মবৃদ্ধিরপাংপ্রস্থঃ ক্ষপাহ্রাস উদগ্‌গতৌ।
দক্ষিণেতৌ বিপর্যাসঃ ষণ্মুহূর্ত্যয়নেন তু ॥ ৭ ॥ ষ, ৮

অন্বয়:—ঘর্মবৃদ্ধিঃ (তথা) ক্ষপাহ্রাসঃ উদক্ গতৌ অপাং প্রস্থঃ (স্যাৎ) দক্ষিণা ইতৌ বিপর্যাসঃ (স্যাৎ) অয়নেন তু ষণ্মুহূর্তী (ভবতি)।

অনুবাদ :—উত্তরায়ণ হইতে প্রতিদিন "জলের এক প্রস্থ" পরিমাণ দিনের বৃদ্ধি এবং রাত্রির হ্রাস হইয়া থাকে। দক্ষিণায়ন হইতে ইহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে। এক অয়নে (এই বৃদ্ধি বা হ্রাসের পরিমাণ) ছয় মুহূর্ত্ত মাত্র।

স্পষ্টার্থ :—৯ ১৭ শ্লোকে "এক প্রস্থ জল" সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। এখানে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে উহা সময়ের পরিমাণ বিশেষ। ১ মুহূর্ত্ত = ২ নাড়িকা = ৩০ "প্রস্থ জল"। এক বৎসর = ৩৬৬ দিন; এক অয়ন = ১৮৩ দিন। প্রত্যহ দিবাভাগের "এক প্রস্থ" করিয়া বৃদ্ধি ঘটিলে ১৮৩ দিনে ১৮৩ "প্রস্থ" = ১৮৩ × ৩০ মুহূর্ত্ত = ৬ মুহূর্ত্ত বৃদ্ধি হইবে। অর্থাৎ বৎসরে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দিন সর্ব্বাপেক্ষা ছোট দিন অপেক্ষা ৬ মুহূর্ত্ত অধিক। রাত্রির পক্ষেও এইরূপ। গণিত সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে প্রায় ৬৫.৪৪।৪৭ অক্ষাংশে বসতি হইলে এইরূপ ঘটিবে। ভারতবর্ষে পঞ্জাবের উত্তরাংশের অধিবাসীদের পক্ষেই ইহা সম্ভব হইতে পারে।

৯ প্রচলিত পাঠ।

দ্বিগুণং সপ্তমং চাহুরয়নাদ্যং ত্রয়োদশ।
চতুর্থং দশমং চৈব দ্বিযুগ্মাদ্যং বহুলেপ্যতৌ ॥৮॥ ষ, ৯
বেবরসংগৃ—দ্বিগুণমংইতি। চাহুরয়নাদ্যম্ ইতি॥
(অত্র নবাক্ষরময় চতুর্থপাদঃ ইতি আর্ষপ্রয়োগঃ)

সাধু পাঠ।

প্রথমং সপ্তমং চাহুরয়নাদ্যং ত্রয়োদশম্।
চতুর্থং দশমং চৈব দ্বিযুগ্মাদ্যং বহুলে ঽপ্যতৌ ॥৮॥ ষ, ৯

অন্বয়:—(তে জ্যোতিবিদঃ) প্রথমং (চ) সপ্তমং (চ) ত্রয়োদশং (চ) চতুর্থং (চ) দশমং (চ) এব (দিনং) অয়নাদ্যং আহুঃ দ্বি: যুগ্মাদ্যং (দিনং) বহুলে অতৌ অপি (অয়নাদ্যং স্যাৎ)॥

অনুবাদ :—জ্যোতির্ব্বেদেরা বলেন প্রথম, সপ্তম ও ত্রয়োদশ (তিথি), এবং চতুর্থ ও দশম তিথি, অয়নের আদি দিন হইয়া থাকে। যুগ্ম (চতুর্থ ও দশমী) তিথি দুইটী চান্দ্র-মাসের কৃষ্ণ (= বহুল) পক্ষেই পড়িবে।

স্পষ্টার্থ :—এক বর্ষে চান্দ্রতিথিসংখ্যা ৩৭২; অতএব এক অয়নে ১৮৬ তিথি আছে। ছয়টী চান্দ্রমাস হইয়া ছয় দিন বেশী হয়। প্রথম অয়ন শুক্লপ্রতিপদে আরম্ভ হওয়াতে পরের অয়নগুলি যথাক্রমে (ছয় চান্দ্রমাস পরে পরে) শুক্লা সপ্তমী (= ১ + ৬), শুক্লা ত্রয়োদশী (= ৭ + ৬), কৃষ্ণা চতুর্থী (= ১৩ + ৬ − ১৫ = ৪) এবং কৃষ্ণা দশমীতে (= ৪ + ৬) হইবে। ইহার পরের অয়ন শুক্ল প্রতিপদে (১০ + ৬ − ১৫ = ১) হইবে। তাহার পর পূর্ব্ব মত হইবে।

দ্রষ্টব্য :—"বার্হস্পত্য" বলেন এখানে "ঋতু" বৈদিক "মাস" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

যা দেবীঃ পঞ্চ প্রদিশো যে দেবা দ্বাদশর্তবঃ।
সংবৎসরস্য যে দংষ্ট্রাস্তে নঃ সন্তু সদা শিবাঃ॥
অথর্ব্ববেদসংহিতা, ১১ − ৬ − ২২।

পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী বলেন, ছয় ঋতু হওয়াতে "ঋতু" অর্থে এখানে "৬" ধরিতে হইবে। তিনি এইরূপ অর্থ করেন —কোন অয়নের তিথি হইতে পরবর্ত্তী অয়নের তিথির

অন্তর "ধ্রুব"। এক যুগের দশটী অয়নাদিতে নিম্নলিখিত তিথি হইবে—

১ গ।১৩;৪।১০—১৭।১৩;৪।১০।

কিন্তু ৬ তিথি অন্তর অন্তর অয়নান্ততিথিগুলির উল্লেখ করিয়াও, "তাহারা ছয় তিথি অন্তরে হইবে" এরূপ বলা পুনরুল্লেখ মাত্র, অতএব নিষ্প্রয়োজন।

প্রচলিত পাঠ।

বসুস্বষ্টা ভগো জশ্চমিত্রঃ সর্পোঽশ্বিনৌ জলং।
ধাতাকশ্চায়নান্তাশ্চার্দ্ধপংচ নভস্যতুঃ॥ ৯॥

বেবরসংগৃ—ভবো ইতি। জশ ইতি। চার্দ ইতি॥

সাধু পাঠ।

বসুস্বষ্টা ভবোঽজশ্চমিত্রঃ সর্পোঽশ্বিনৌ জলং।
ধাতা কশ্চায়নান্তাঃ স্যুরর্ধপঞ্চমভস্যতুঃ॥৯॥ য, ১০

অন্বয়ঃ—বসুঃ ত্বষ্টা ভবঃ অজঃ (একপাৎ) মিত্রঃ সর্পঃ অশ্বিনৌ জলং চ ধাতা কঃ চ (ইতি এতাঃ দশ নক্ষত্র দেবতাঃ) অয়নান্তাঃ স্যুঃ। ঋতুঃ তু অর্ধপঞ্চমতঃ (ভবতি)॥

অনুবাদঃ—অয়নের আদিতে (চন্দ্রের অবস্থান) যথাক্রমে বসু (শ্রবিষ্ঠা নক্ষত্রাধিপ), ত্বষ্টা (চিত্রা-নক্ষত্রাধিপ) ভব (=রুদ্র, আর্দ্রানক্ষত্রাধিপ), অজ (পূর্ব্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রাধিপ), মিত্র (অনুরাধানক্ষত্রাধিপ), সর্প (আশ্লেষা নক্ষত্রাধিপ), অশ্বিনী (অশ্বযুজ নক্ষত্রাধিপ), জল (=আপ, পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রাধিপ), ধাতা (=অর্য্যমা, উত্তর-ফল্গুনী-নক্ষত্রাধিপ) এবং ক (=প্রজাপতি, রোহিণী নক্ষত্রাধিপ) "নক্ষত্রে" হইবে। এক ঋতু ৬½ নক্ষত্রের সমান।

স্পষ্টার্থ:—(১) নক্ষত্রাধিপের নাম হইতে সেই নক্ষত্র বুঝিতে হইবে। জ্যোতিষ-বেদাঙ্গ মতে সূর্য্যের এক অয়নে চন্দ্র $\frac{২৭\times৬৭}{১০}=১৮০\frac{৯}{১০}$ নক্ষত্র পরিভ্রমণ করেন; নক্ষত্র চক্র ৬ বার সম্পূর্ণ ঘুরিয়া আসিয়া $\left(১৮০\frac{৯}{১০}-৬\times২৭=\right)১৮\frac{৯}{১০}$ নক্ষত্র অধিক পরিভ্রমণ করেন। অতএব কোন অয়নে চন্দ্র যে বিন্দুতে থাকেন, পরবর্ত্তী অয়নসমূহের প্রারম্ভে চন্দ্র সেই বিন্দু হইতে যথাক্রমে $১৮\frac{৯}{১০}\left(১=\times১৮\frac{৯}{১০}\right)$ ও

$\left(২\times১৮\frac{৯}{১০}=\right)৩৭\frac{৮}{১০}$

$\left(৩\times১৮\frac{৯}{১০}=\right)৫৬\frac{৭}{১০}$ $\left(৪\times১৮\frac{৯}{১০}=\right)৭৫\frac{৬}{১০}$

$\left(৫\times১৮\frac{৯}{১০}=\right)৯৪\frac{৫}{১০}$ $\left(৬\times১৮\frac{৯}{১০}=\right)১১০\frac{৪}{১০}$

$\left(৭\times১৮\frac{৯}{১০}=\right)১২৯\frac{৩}{১০}$ $\left(৮\times১৮\frac{৯}{১০}=\right)১৪৯\frac{২}{১০}$

$\left(৯\times১৮\frac{৯}{১০}=\right)১৬৮\frac{১}{১০}$

নক্ষত্র পরে অবস্থিত থাকিবেন। অতএব প্রথম অবস্থান-বিন্দু হইতে যথাক্রমে ১৯শ (=ঊনবিংশ), ১১শ, ৩য়, ২২শ, ১৪শ, ৬ষ্ঠ, ২৫শ, ১৭শ, ও ৯ম নক্ষত্রে অবস্থিত থাকিবেন। আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি যে, যুগের প্রথমে অয়নাদিতে চন্দ্র শ্রবিষ্ঠা নক্ষত্রের আদি বিন্দুতে ছিলেন। অতএব পরবর্ত্তী অয়নসমূহের আদিতে চন্দ্র যথাক্রমে (শ্রবিষ্ঠা হইতে ১৯শ নক্ষত্র) চিত্রা, (১১শ) আর্দ্রা, (৩য়) পূর্ব্বভাদ্রপদ; (২২শ) অনুরাধা, (১৪শ) আশ্লেষা, (৬ষ্ঠ) অশ্বিনী, (২৫শ) পূর্ব্বাষাঢ়া, (১৭শ) উত্তরফল্গুনী ও (৯ম) রোহিণী নক্ষত্রে অবস্থান করিবেন। পরবর্ত্তী অয়ন পুনরায় শ্রবিষ্ঠা নক্ষত্রের আদি বিন্দুতে হইবে।

(২) সূর্য্য একবৎসরে ২৭ নক্ষত্র পরিভ্রমণ করিয়া আসেন, এবং এক বৎসরে ৬ ঋতু, অতএব সূর্য্য এক ঋতুতে ৬½ নক্ষত্র ভোগ করেন। এখানে অর্দ্ধপঞ্চম-স্য অর্থে পঞ্চম নক্ষত্রের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। [Cf. Gr. Fuenftehalb = $4\frac{1}{2}$; Drittehalb = $2\frac{1}{2}$]

প্রচলিত পাঠ।

ভাংশা স্যুরষ্টকাঃ কার্য্যাঃ পক্ষা দ্বাদশচোদ্গতাঃ।
একাদশগুণশ্চোনঃ শুক্লেঽর্দ্ধং চৈত্রবা যদি॥ ১০॥

বেবরসংগৃ—ভাশা ইতি। কার্য্যা ইতি। দ্বাদশচোদ্গতাঃ ইতি। গুণঃ শোনঃ ইতি। শুক্লেঽর্দ্ধং ইতি। চৈত্রবা ইতি।

সাধু পাঠ।

ভাংশাঃ স্যুরষ্টকাঃ কার্য্যাঃ পক্ষা দ্বাদশকোদ্গতাঃ।
একাদশগুণশ্চন্দ্রোঃ শুক্লেঽর্দ্ধং চৈন্দবা যদি॥

য, ১০, ১৫॥৩

* শেষের চরণে আমি পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের পাঠ গ্রহণ করিয়াছি।

অন্বয় :—পক্ষাঃ কার্য্যাঃ (স্যুঃ)। দ্বাদশকোদ্‌গতাঃ ইন্দোঃ ভাগাঃ অষ্টকাঃ স্যুঃ। (পক্ষে) একাদশগুণাঃ স্যুঃ। যদি ঐন্দবাঃ শুক্লে (ভবেয়ুঃ তর্হি), অর্ধং (তং) চ (যোজ্যং)।

অনুবাদ :—(যুগের প্রথম হইতে) পক্ষসংখ্যা নির্ণয় করিবে। দ্বাদশ পক্ষে ৮ নক্ষত্রাংশের উদ্গম হয়। (কৃষ্ণ পক্ষান্ত হইলে) প্রতি পক্ষে চন্দ্রের ১১ নক্ষত্রাংশের উদ্গম হয়; চান্দ্রপক্ষ শুক্ল হইলে ইহার সহিত আরও অর্দ্ধ নক্ষত্র যোগ করিতে হইবে।

স্পষ্টার্থ :—একযুগে চান্দ্র মাস = ৬২; চান্দ্রপক্ষ = ১২৪। চন্দ্রভগণ = ৬৭। প্রতি ভগণে চন্দ্র ২৭ নক্ষত্র ভোগ করেন, অতএব এক যুগে চন্দ্রভুক্ত নক্ষত্র সংখ্যা = ৬৭ × ২৭।

অতএব দ্বাদশ পক্ষে, চন্দ্রভুক্ত নক্ষত্র সংখ্যা = $\frac{৬৭ \times ২৭ \times ১২}{১২৪}$

= ১৭৫$\frac{১৩}{১২৪}$। নক্ষত্র = ১৭৫ নক্ষত্র ৮ নক্ষত্রাংশ। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ মতে গণনায় প্রায়ই ১২৪ দিয়া ভাগ করিতে হয় বলিয়া, নক্ষত্রের ১২৪ ভাগের ১ ভাগকে ১ নক্ষত্রাংশ বা "ভাংশ" বলা হইয়াছে। এইরূপ অহোরাত্রেরও ১২৪ ভাগের এক ভাগকে অহোরাত্রের ১ অংশ ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ ১ অংশ = ১২৪ ভাগের ১ ভাগ। অতএব আমরা পাইতেছি যে ১২ পক্ষে চন্দ্র ১৭৫ নক্ষত্র এবং ৮ নক্ষত্রাংশ ভোগ করেন। পূর্ণ নক্ষত্র পরিত্যাগ করিলে ৮ অংশ থাকে। অতএব ১২ পক্ষে ৮ অংশের উদয় হয়। যুগের প্রারম্ভে শুক্ল প্রতিপদে চন্দ্র শ্রবিষ্ঠা নক্ষত্রের আদিবিন্দুতে ছিলেন। অতএব দ্বাদশ পক্ষ পরে চন্দ্র যে নক্ষত্রে থাকিবেন তাহার ৮ অংশে তাঁহার অবস্থান হইবে।

১ পক্ষে চন্দ্রভুক্ত নক্ষত্র সংখ্যা = $\frac{৬৭ \times ২৭}{১২৪}$ = ১৪$\frac{৭৩}{১২৪}$

নক্ষত্র = ১৪ নক্ষত্র ৭৩ নক্ষত্রাংশ। পূর্ণ নক্ষত্র পরিত্যাগ করিলে আমরা পাই $\frac{৭৩}{১২৪}$ নক্ষত্রও ১১ ভাংশ। অতএব ইষ্ট পক্ষ সংখ্যা "ই" হইলে, ইষ্ট পক্ষে ভাংশ হইবে $\frac{৭৩}{১২৪}$ নক্ষত্র × ই × ১১ × ই ভাংশ। কৃষ্ণ পক্ষ হইলে "ই" সমরাশি হইবে, এবং $\frac{৭৩}{১২৪}$ নক্ষত্র × ই পূর্ণ নক্ষত্র হইবে। অতএব পূর্ণ নক্ষত্র ত্যাগ করিলে কৃষ্ণপক্ষে আমরা (১১ × ই) ভাংশ পাইব। যদি শুক্লপক্ষ হয় তাহা হইলে "ই" বিষমরাশি হইবে; তখন $\frac{৭৩}{১২৪}$ নক্ষত্র × ই + ১১ × ই ভাংশ হইতে পূর্ণ নক্ষত্র পরিত্যাগ করিলে, $\frac{৭৩}{১২৪}$ নক্ষত্রও (১১ × ই) ভাংশ পাইব। অতএব সূত্রটী হইল এইরূপ—

"প্রতি পক্ষে ১১ ভাংশ করিয়া ধরিতে হইবে। পক্ষ-সংখ্যা সমরাশি হইলে (অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষান্ত হইলে) ইহাই চন্দ্রের নক্ষত্রাংশ হইবে। পক্ষ-সংখ্যা বিষমরাশি হইলে (অর্থাৎ শুক্লপক্ষান্ত হইলে) প্রতিপক্ষে ১১ ভাংশ ধরিয়া ইহার সহিত অর্দ্ধ নক্ষত্র যোগ করিলে চন্দ্রের নক্ষত্রাংশ (অর্থাৎ নক্ষত্রভুক্তি) পাইব।" এখানে বার্হস্পত্যের এবং পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদীর ব্যাখ্যার সহিত আমার সামান্য মত ভেদ আছে।

এখানে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে—যদি সাধারণ সূত্রই দেওয়া হইল, তবে আবার দ্বাদশ পক্ষের কথা বিশেষ করিয়া বলা হইল কেন? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, কৃষ্ণপক্ষের জন্য (সমপক্ষসংখ্যার জন্য) পূর্ণ নক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশ পক্ষেই আমরা প্রথমে ভুক্ত নক্ষত্রাংশ ১১ হইতে কম পাই; কারণ ১১ × ১২ ভাংশ = ১ নক্ষত্র ৮ অংশ। পরে দেখিব বিষম পক্ষসংখ্যা ধরিলে ১৭ পক্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প নক্ষত্রাংশ পাওয়া যায়; কারণ (১১ × ১৭ + ৬২) অংশ = ২ নক্ষত্র ১ অংশ। এইরূপ গণনা প্রদান করা জ্যোতিষ-বেদাঙ্গকারের একটী বিশেষত্ব।

বিধিলিপি

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মহামায়া দেবী শোদপুর হইতে নিজেদের বাস তুলিয়া দিতেই ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহারই উপলক্ষ ধরিয়া সেদিন জমিদার-তরফের সহিত প্রজাদের এত বড় একটা দাঙ্গা হইয়া গেল যে, সে গ্রামে বাস করিতে তিনি অন্তরে-অন্তরে লজ্জিতা হইয়া পড়িতেছিলেন। দাঙ্গা বড় সোজা হয় নাই; মারামারি হইতে খুনজখমের গা ঘেঁসিয়াই চলিয়া গিয়াছে,—মায় পুলিশ-দারোগাকে পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে ম্যাজিষ্ট্রেটও সেই সময়ে সেই দিকে সফরে আসিয়াছিলেন। বিবাদে জমিদার পক্ষেরই অন্যায় প্রকাশ পাওয়ায় মায় কামাখ্যানাথ বাবুকে পর্য্যন্ত সেখানে হাজির হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে রীতিমত লজ্জা পাইতে হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে এ সব বিষয়ে কামাখ্যানাথের সুযশের অন্ত ছিল না; কিন্তু শোদপুরের এই ব্যাপারে তাঁহার সুনামের যথেষ্ট হানি হইয়াছে। অথচ মহামায়া দেবী এবং অনেক লোকেই বেশ জানেন, এ ক্ষেত্রে জমিদারের কোনই অপরাধ নাই। নায়েব এবং মহেন্দ্রই এ বিবাদের উত্তেজক; উভয়ের দোষেই এ দাঙ্গা ঘটিয়াছে; অথচ এই বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, উভয়েই জমিদারের লোক। আপনা-আপনির মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া মাঝে হইতে তাহারা জমীদারেরই মুখে চুনকালি লেপিল; আর নিরীহ প্রজা ও পাইক-বরকন্দাজেরা কেবল মার খাইয়া জখম হইল। মহেন্দ্র যখন জমিদারেরই পরিদর্শক, তখন তাঁহারই লোকজনের সহিত এ অযথা মারামারি বাধাইবার কি দরকার ছিল! জমিদারকে জানাইলেই তো নায়েবের নায়েবী ঘুচাইয়া যাইত! এই ত দেওয়ান মহাশয় নায়েবকেই বরখাস্ত করিয়া দিয়া মহেন্দ্রকে সেই পদে বসিতে সাধাসাধি করিতেছেন। মহেন্দ্র সে পদও লইবে না, অথচ সে জমিদারের লোক হইয়া প্রজাদের সুখ-দুঃখ দেখিয়া বেড়াইতে জমিদারের সুযশ-কুযশের প্রতি দৃষ্টি রাখে না; বরং এ ক্ষেত্রে অন্যায়-অপযশেরই সৃষ্টি করিয়া তুলিল—এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! যাঁহার সম্পত্তি লইয়া এ বিবাদের সূত্রপাত, সেই মহামায়া দেবীই এই ব্যাপারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। নায়েব যে কেন তাঁহার শত্রুতা করিয়া তাঁহাকে উদ্বাস্ত করিবার চেষ্টায় আছে, তাহা তাঁহার অজানা নাই; কিন্তু তাঁহার সেই আপনার ঘরের লোকের শত্রুতায় অত্যাচারী জমিদার বলিয়া যে নির্দ্দোষ জমিদারকে সম্মান হারাইতে হইল, ইহাতে তিনি নিজের কাছে লজ্জায় মরিয়া গেলেন। মহেন্দ্রের অসম্মতিতে এতদিন যখন জমিদারের শরণাগত হইতে পারেন নাই, তখন এখনও আর মহেন্দ্রকে অসন্তুষ্ট করিয়া কাজ নাই; কিন্তু এ গ্রামে আর তিনি মুখ দেখাইতে পারিতেছিলেন না। অন্যত্র উঠিয়া যাইতে হইবে;—কিন্তু কোথায় যাইবেন? আর কমারই বা কি হইবে? এখানে তবু আর এখন বিপদের আশঙ্কা নাই, কিন্তু অন্যত্র তো সে ভয় যথেষ্টই থাকিবে। এক উপায়—যদি মহেন্দ্র,—কিন্তু কি জানি কেন, তাহার নিকটে এ আশা করিতে মহামায়া দেবীর কেমন যেন ভরসা হয় না।

মহেন্দ্র যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিল যে, "অন্যত্র যে বাস্ করতে যাবেন বল্‌ছেন, কিন্তু সেখানে যে আপনাদের কোন বিপদ হবে না, এ কি ঠিক্ জানেন?" তখন তিনি আর তাঁহার সে চিন্তাকে গোপন করিতে পারিলেন না। বিষণ্ণ মুখে বলিলেন,—"বিপদ হবে না কি! বরং তারই বেশী সম্ভাবনা বলে জান্‌ছি।" "তবে? নিজের বাড়ীতেই এখন আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ।" মহামায়া নতশিরে বলিলেন "তা জানি বাবা; তবু যাঁর লোকের সাহায্যেই আমার এ নিরাপদতা, তাঁরই মাথায় এমন কলঙ্কের ডালি চাপিয়ে তাঁরই প্রজা হয়ে আর বাস করবার মুখ আমার কই?"

মহেন্দ্রের মুখ দেখিতে-দেখিতে আরক্ত হইয়া উঠিল।

ঈষৎ তীব্র স্বরে বলিল, "আপনি কি তবে জমিদারের লোক বলেই আমার এই সাহায্যটুকু নিয়েছিলেন? মানুষ মানুষকে সাহায্য করছে বলে ভাবেন্ নি? অবশ্য সেই নাম নিয়েই আমি এ গ্রামে এসেছিলাম বটে; কিন্তু এতদিনে বোধ হয় এটুকুও লক্ষ্য করেছেন যে, নিজের মনুষ্যত্বের সাহায্য ছাড়া আর কোন সাহায্যই আমি আমার কোন কাজে নিই না। তবু আমার এ নামটুকুও আমি আজ থেকে ছাড়লাম জান্‌বেন। আমায় আর থেকে আর জমিদারের লোক বলে ভুল কর্‌বেন না। যদি কিছু আমায় বল্‌তে চান, মহেন্দ্র বলে' একটা মানুষের কাছেই বল্‌বেন—জমিদারের মার্কা-মারা গোলামের কাছে নয়।"

মহামায়া দেবী বিস্মিত, ব্যথিত হইয়া মহেন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; বহুক্ষণ তাঁহার বাক্‌নিষ্পত্তি হইল না। এবার মহেন্দ্রের ভাব-বিপর্য্যয় তিনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া পর্য্যন্তই লক্ষ্য করিতেছিলেন। সেই বিনীত, প্রিয়ভাষী, শান্ত, বিষণ্ণ দেবকুমারের মত মুখখানি কেমন যেন একটা উত্তেজনায় সর্ব্বদা অশান্ত; উদার বিস্তৃত ললাটে সারি সারি কুঞ্চন-রেখা; ভ্রূযুগ অসরল; চক্ষে কিসের একটা ঔজ্জ্বল্য, যাহা দেখিলে মোটেই সুখী হওয়া যায় না! মহামায়া দেবী প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, পালয়িত্রী মাতা পরলোকে গমনই করাতেই বুঝি মহেন্দ্রের এই পরিবর্ত্তন! মহেন্দ্র যে আর তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ভদ্রতার সম্বোধনও করে না, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে মহেন্দ্রের উপর তাঁহার স্নেহের বৃদ্ধিই হইয়াছিল! আহা, মাতৃহীনের যে প্রথম-প্রথম এমনি হয়! কিন্তু তবু আশা রাখিতেছিলেন, সেই মাতৃহীন আবার যে দিন তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিবে, তাহাকে অন্তরের সব শিশুত্বটুকই যে সে অর্পণ করিবে। সেদিনের সেই 'মা' ডাকের প্রতীক্ষা তিনি নিজেই যে অন্তরে লইয়া বসিয়া ছিলেন! কিন্তু আজ মহেন্দ্রের এই অপ্রত্যাশিত কাঠিন্যে যেন বজ্রাহত হইয়া পড়িলেন! তবে কি তাঁহার সব আশাই মিথ্যা? মহেন্দ্রের এ কেবল পরোপকার মাত্র? নহিলে মহেন্দ্র তাঁহার সরল কথায় এমন কুটিল পথে গেল কেন? সত্য কি তাহাকে স্নেহের বন্ধনে বাঁধিবার সম্ভাবনা মাত্র নাই? যখন তাঁহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল, তখন তিনি বলিলেন, "না বাবা, তোমাকেও আর কষ্ট দিতে চাই না; আমাদের জন্য তুমি যা করেছ তার প্রতিদানে তোমায় আমরা যদি এমনি অসম্মানই দিয়ে থাকি, দুপক্ষেরই তাই যথেষ্ট। এইবার দেখি, মানুষ ছাড়াও আর কেউ বিপদের পক্ষে আছেন কি না।"

মহেন্দ্র একটু মাথা হেঁট করিয়া থাকিয়া আবার প্রশ্ন করিল "কোথায় যেতে চান?"

"নবগ্রামে স্বামীর ভিটেতেই যাব মনে করছি।"

"সে কি? কমলাকেও নিয়ে যাবেন!"

"তা ছাড়া ওকে আর কোথায় রেখে যাব বাবা?"

"আপনি বলেন কি? সব কথা কি ভুলে গেলেন?"

"কিছুই ভুলিনি; তবু সেই এক পথ ছাড়া আর তো পথ দেখ্‌ছি না।"

"কমলাকে তারা বাঁচ্‌তে দেবে কি মনে করেন? আর সেই বিষম বিবাহের কথা"—"সবই মনে আছে; তবু আমাদের আর উপায় কি! এখানে থাক্‌তে হলে হয় ত নিত্য এই রকম বিভ্রাট উপস্থিত হবে। সম্বলের মধ্যে এক তুমি; কিন্তু তোমারও আর কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না—আর এমন অশান্তি উদ্বেগ নিয়ে পালিয়ে থাকার চেয়ে তার মধ্যে ঝাঁপ্ দেওয়াই ভাল। যা হবার হয়ে যাক্! শ্বশুর যদি এখনো বেঁচে থাকেন, তারাও আপনার লোক, এতটাই কি করবে! করে—ভগবান মাত্র আমার সম্বল যা করাবেন তাই হবে।"

মহেন্দ্র একটু ব্যথিত, একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে থাকিয়া, সহসা বলিয়া উঠিল, "কিন্তু তারা যে মতলবে নায়েবের সঙ্গে ষড় করেছিল, তাই যে আপনি সফল করে দিচ্ছেন! তবে এতদিন আমাদের এত কাণ্ড কিসের জন্য করা গেল? না—না, সে কিছুতেই হবে না; আপনি সেখানে যেতে পাবেন না। এখানে না থাক্‌তে চান, অন্য কোথাও চলুন,—তাদের মনস্কামনা সিদ্ধ করতে কিছুতেই পাবেন না।" মহামায়া ম্লান মুখে বলিলেন, "অন্যত্র কার ভরসায় যাব? কে আমাদের দেখ্‌বে?"

"এখানেই বা কে দেখ্‌ছিল! এমনি করেই থাক্‌বেন।"

"এ যে আমার বাপের ঘর—চিরজন্মের বাস আমার! তার ওপর তোমার ভরসাতেই যে এ ক'মাস আমি এ ঘরেও বাস করেছি, তা তো জান তুমি।"

"সেই আমি এখনো তো থাকতে পারি। এখন জমিদারের লোক না হ'লেও আমি—" বাধা দিয়া বাথিত কণ্ঠে মহামায়া বলিলেন, "তুমি যখন বিলের ধারে আমার কমাকে বাঁচিয়েছিলে, তখন তো তোমায় জমিদারের লোক বলে আমি ভরসা পাইনি বাবা। সেই তুমিই তো, তবে আর কেন বারে-বারে ওকথা বলে' আমায় বাথা দাও। কিন্তু তুমি কি আমাদের কাছে চিরদিন থাকবে? তোমায় কি আমরা—" "চিরদিন না হোক্ কিছুদিন অন্ততঃ আপনাদের বিপদটা কাটিয়ে দিয়ে যাব।" "আমাদের বিপদ—কমার বিপদ—তার বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত কতকটাও কাটবে কি?" "বেশ, তার বিয়ে দিয়েই তবে আমি যাব।" "কেন তবে তার চিরদিনেরই আশ্রয়ের স্থল হও না বাবা? যদি তার জন্ত এতটাই করতে পারলে, তবে হতভাগীকে পায়েই একটু স্থান দাও। তোমার যোগ্য যদিও সে না হয় তবু তার ওপর দয়ার তো কম কর নি;—এটুকুও না হয় স্বীকার কর।" মুহূর্ত্তে মহেন্দ্রের মুখ মৃতের ন্তায় বিবর্ণ হইয়া গেল। অতি বড় বেদনার স্থানকে দুই পা দিয়া চাপিয়া ধরিলে বেদনাগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন করিয়া উঠে, নিজের অজ্ঞাতে সে ঠিক্ তেমনি করিয়া উঠিল। একটু পরে ধাক্কাটা সাম্‌লাইয়া লইয়া হেঁট মাথায় বলিল, "আমরা তো কুলীন নই, শ্রোত্রীয়;—আপনাদের কুল নষ্ট হবে—"

"হোক্, কুলে আমার কোন দরকার নেই।"

"আপনার না থাক্, আপনার আত্মীয়-স্বজনের নিশ্চয়ই আছে। কমলাকে হয় ত এর জন্ত তার পিতামহের যৌতুক বা সম্পত্তিতেও বঞ্চিত হতে হবে—"

"সে সম্পত্তিতে কমার কোন দরকার নেই। তোমার পায়ে যদি সে—"

"কমলা আমার বোন্—মা, আর ও-কথা বলবেন না—অন্ত কথা বলুন।"

মহামায়া দেবী এ কটু স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, মা বলে কথা কইলে, তাই বল্‌ছি—কোন্ অধিকারে তবে আমরা তোমার কাছ থেকে এত নেব?" "মায়ের অধিকারে—বোনের অধিকারে! জগতে ঐ এক সম্বন্ধ ছাড়া কি আর সম্বন্ধ নেই? আমারও মা নেই, বোন নেই! মা, আপনারা আমার সেই অভাব পূরণ করুন।"

মহেন্দ্রের কণ্ঠস্বরে, মুখের কাতরভাবে মহামায়া আর ক্ষুব্ধ হইতে পারিলেন না; কেবল একবার বলিলেন, "সত্যই কি কমা তোমার এত অযোগ্য হত, মহীন্?"

"না মা—সে যে আমার বোন্—সে যে স্বয়ং রাজরাজেশ্বরী কমলা—তাকে যার হাতে আমি দেব, সে যে রাজরাজেশ্বর হবে। আমাকেই এই অধিকার দাও মা, আমি তাকে তার যোগ্য-পাত্রে বড় ভাইয়ের মত সম্প্রদান করব,—এইটুকু অধিকার ভিক্ষা দাও।" মহামায়া দেবী অগ্রসর হইয়া মহেন্দ্রের আনত মস্তকের উপর মুখ নামাইয়া শিরশ্চুম্বনের সঙ্গে উত্তর করিলেন, "তাই হোক্, ধর্ম্ম সাক্ষী—আজ থেকে তুমি কমার সহোদর! তার সব ভার তোমার ওপর! তাকে বাঁচাবার-রাখবার ভার তোমারই! তোমার যা ভাল বোধ হবে, তার জন্ত সেই ব্যবস্থা কর; আমার আর আজ থেকে কোন দায় নেই।"

মহেন্দ্র সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার পায়ের নিকটে মাথা নামাইল; আর মহামায়ার বুক অশ্রুধারায় তাহার চুলগুলা ভিজিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কোন মতে সে অশ্রু রোধ করিয়া মহামায়া ডাকিলেন, "কমা—কমা!" কক্ষান্তর হইতে কমলা তাঁহাদের নিকটে আসিল।

"তোর দাদাকে প্রণাম কর্।" হঠাৎ আজ আবার নূতন করিয়া দাদাকে এ প্রণাম কেন? কমলা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল। মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "দেখছেন মা, কি-দুষ্টু মেয়ে! মাথা হেঁট করতে চায় না, দাদাকে দেখে সমীহ হয় না—বাঃ!" কমলা কিক্ করিয়া হাসিয়া মায়ের আঁচলে মুখ লুকাইল। মা তাহাকে মহেন্দ্রের পায়ের নিকটে নত করিয়া দিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "এই নাও তোমার বোন্‌কে! দাদার পায়ের ধূলো নে কমি।" কমি তাহার কণ্ঠস্বরে তখন বুঝিল, এ কোন গম্ভীর ব্যাপারই বটে; তখন সেও গম্ভীর হইয়া যথানির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মহেন্দ্র বলিল, "আমিও আর এখানে থাকব না। আপনি যদি শ্বশুরকে দেখতে যেতে চান, যান্; কিন্তু কমাকে আমার সঙ্গে দেন্; ওকে নিরাপদে রেখে আমি তখন বর খুঁজতে বেরুব।"

"তুমি কোথায় তাকে রাখবে? কার কাছে?"

"আমার—আমার মার বাড়ীতে।"

"সেখানে আর কে আছে তোমার?

"মার মেয়ে আছেন, তাঁরই কাছে কমা থাকবে।"

"তোমার বোন্? তাহলে তো ভালই হবে। আমিও একবার শ্বশুরকে এর মধ্যে দেখে আসি—তিনি কি অবস্থায় আছেন; তাদেরই বা কি মতলব। তুমি তোমার বোনের কাছে কমাকে তবে কবে নিয়ে যেতে চাও?"

বিবর্ণ, বেদনা-প্রাপ্ত মুখখানাকে অন্যদিকে ফিরাইয়া রাখিয়া মহেন্দ্র বলিল, "কালই।"

"কালই?" ত্রস্তে তিনি কন্যাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া নিঃশব্দে তাহার মস্তকের উপরে নিজের মুখটি চাপিয়া রাখিলেন। কন্যাও তেমনি নিঃশব্দে মায়ের বুকের মধ্যে যেন লুকাইয়া পড়িতে চাহিল। কমলা এখন বড় হইতেছে, এবং তাহাকে লইয়া তাহার মায়ের যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও যেন কতকটা বুঝিতে পারিয়াছে; তাই সে তাহার এই চির-নির্ভর মাতৃ-ক্রোড় হইতে বিচ্যুতির কথায়ও ভয়ে শিহরিয়া উঠিল না, কাঁদিয়া হাট বসাইল না। মহেন্দ্রও ক্রমে আপনার ব্যথা সরাইয়া ফেলিয়া তত্ত্ব নেত্রে মাতা-কন্যার এই নিঃশব্দ বিচ্ছেদ-বেদনাকে আপনার অন্তরে অনুভব করিতে লাগিল। সকলের এই নীরবতা ভাঙিয়া কমলা যখন সহসা 'মা' বলিয়া ডাকিল, তখন মহামায়া ও মহেন্দ্র ব্যস্ত, উদ্বিগ্নভাবে তাহার মুখের পানে চাহিল—কমলা মূর্চ্ছা যায় নাই ত! দেখিল,—না; ভীরু পাখীটার মত যে বালিকাটি সেদিন নদীর ধারে একটা পরুষ কণ্ঠ শুনিয়াই অজ্ঞান হইয়াছিল, সে আজ এই কয়মাসে অনেক-খানি বল সঞ্চয় করিয়াছে। কেবল শুষ্ক রৌদ্রতপ্ত ফুলের মত মুখখানি ঊর্দ্ধে তুলিয়া কমলা বলিল, "মা, আমি দাদার সঙ্গে যাচ্ছি; কিন্তু তুমি বাড়ীতে থাক মা, সেখানে যেও না।" কন্যার মুখের উপর মুখ রাখিয়া মাতা উত্তর দিলেন,—"একবার তোমার ঠাকুরদাদাকে দেখে আসি,—তিনি যে বারে-বারে ডেকে পাঠাচ্ছেন। তোমায় কোথায় রাখব বলেই এতদিন যেতে পাইনি, জান ত!" "তিনি যে তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলেন,—এখন ডাকলেই বা তুমি কেন যাবে?" "না মাণিক, ওকথা বলতে নেই। তিনি হাজারবার তাড়ালেও আবার ডাকলেই আমায় যেতে হবে। বিশেষ তিনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়েছেন, আমারই যে এখন তাঁর সেবা করবার কথা। এতদিন পরে যখন আমায় ডাকছেন, তখন না গেলে যে আমার পাপ হবে।" "তবে কেন তারা আমাদের এত ভয় দেখায়? এমন কেন আমাদের ওপরে?" "সে তিনি নন্, তাঁর দৌহিত্র,—সেই যে এখন সর্ব্বে-সর্ব্বা। তাই মনে করছি একবার পরেশের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বলে আসি যে, আমাদের কিছুতেই দরকার নেই; কমাকে ঠাকুরদা যদি কিছু দিয়েও থাকেন, তার একচুলও আমরা চাইনে। আমার যা আছে, কমার সেই যথেষ্ট। কেবল আমাদের শান্তিতে তারা থাকতে দিক্, আর কিছু না।" মহেন্দ্র এইবার কথা কহিল, "মা, কমলা ছেলেমানুষ হলেও যা তার মুখ দিয়ে বেরুল, আমার মনেও যেন সেই কথা নিচ্ছে। আপনি তাদের হাতের মধ্যে গিয়ে পড়বেন।"

"তোমরা আমায় আর বাধা দিও না বাবা,—বহুকাল পরে স্বামীর ভিটা দেখতে, শ্বশুরকে দেখতে আমার প্রাণ বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এতদিন যেতে পাইনি; কিন্তু আজ তিনি যখন ডাকছেন, তখন এ লোভ সাম্‌লাতে পারব না। ভাবনা ছিল কমার জন্য; আজ তুমি যখন তার ভার নিলে, তখন একবার আমি সেখানে যাই। আমার আর তারা কি করবে! কমার বিয়ে ঠিক্ হলেই আবার চলে আস্‌ব। ততদিন এ বাড়ীতে"—"তার জন্য কিছু ভাবতে হবে না, আপনার পিসি লোকজন নিয়ে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন। যে নতুন নায়েব হয়েছে, তার দ্বারা প্রজার আর কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই।"

মহামায়া দেবী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "শুনেছিলাম তোমাকেই এই নায়েবী নিতে জমিদার-পক্ষ সাধাসাধি করেছিলেন?" "হাঁ; কিন্তু তাদের বাঁধা চাকর হওয়া আমাদের পোষায় না।"

"কিন্তু তুমি তাঁরই নিয়োজিত লোক নও কি বাবা?" মহেন্দ্র এবার একটু উত্তপ্ত হইয়া যেন ঘৃণায় ঈষৎ ওষ্ঠ-কুঞ্চিত করিয়া উত্তর দিল, "হাঁ। আমার ভাগ্যগুণে—তাই বা কেন বলি—ভাগ্য ব'লে জগতে কি আছে? নিজের পূর্ব্বাপর বোঝবার অক্ষমতায় এই নামই আমি নিয়েছিলাম বটে; কিন্তু কাজ আমি স্বাধীন, ন্যায়ের পক্ষেই কেবল করেছি। এখন ও নামটাও আমি ত্যাগ করছি জান্‌বেন। এ ভাবে আর আমি থাকব না। জমিদারের সঙ্গে আর আমার কোন সম্পর্কই রাখব না।"

"কেন বাবা! যতদূর শুনতে পেলাম, দেওয়ানজী এসে তোমায় না কি—" বাধা দিয়া মহেন্দ্র বলিল "সে কথা সত্য; তাঁদের পক্ষ থেকে আমার ওপর শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের কোন ত্রুটি নেই; তবু আমি আর এ কাজে থাকতে চাইনে।" চিন্তিত ভাবে মহেন্দ্র একবার চুপ করিল, আবার নিজ মনেই যেন বলিল, "নিরঞ্জন ঠিকই বলেছিল। এ কাজে ক্রমে মানুষকে নীচতার দিকেই টানে! ভাল নয়—ভাল নয় এখন আমার পক্ষে এত ক্ষমতা হাতে থাকা,—এদের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখা।" মহামায়া দেবী নিঃশব্দে রহিলেন; বুঝিলেন, মহেন্দ্র যে হঠতার বশে জমিদারের অনেক ক্ষতি করিয়াছে, মুনাফা হানি করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া অনুতাপের বশেই তাঁহার কার্য্য ত্যাগ করিতেছে। ইহা খুবই সঙ্গত, এবং মহেন্দ্রের মত উদারহৃদয় যুবকের পক্ষে ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। মহেন্দ্রের চরিত্রের মধ্যে যে বিষয় উপলক্ষে সহসা একটু কাঁটা উঠিয়া তাঁহার মনে খচ্‌খচ্ করিয়া বেদনা দিতেছিল, মহেন্দ্রের এই ভাবে সে কণ্টকটুকু যেন উঠিয়া গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া, সস্নেহ নির্ভরতার সহিত তিনি এখন মহেন্দ্রের ম্লান মুখের পানে চাহিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সমস্ত দিন গুমোট গ্রীষ্মের পর বৈকালে খানিকটা মেঘ করিয়াছিল; কিন্তু বায়ুর দৌরাত্ম্যে সে মেঘ স্থিতি লাভ করিতে পারিতেছিল না। কাত্যায়নীর রক্ষয়িত্রী রমার বৃদ্ধা ধাত্রী সেজন্য পবন-দেবতাকে যথেষ্ট গালি দিল। কিন্তু পবন-দেব মেঘটুকুকে হটাইতে পারিতেছে না দেখিয়া তাহার রোখ্ উত্তরোত্তর চড়িয়াই উঠিতে লাগিল। কাত্যায়নী বলিল, "আজ হয়ত রমা ঠাকুরবাড়ী আসতে পারবে না।" বাহিরে রুক্ষ বায়ুর প্রাবল্য, কিন্তু ঘরের ভিতরে গুমোট গরম। বৃদ্ধা পাখা নাড়িতে-নাড়িতে বলিল, "দেবতাকুল বঞ্চিত হলেও তার ঠাকুরবাড়ী আসা বাদ পড়ে না। বেশী কথা কি—বাবু কি দাদাবাবুর অসুখ-বিসুখ হলেও সে দিনান্তে একবার ছুটে আসবেই। এতটুকু বেলা থেকে তার এই অভ্যাস।"

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা নিজ মনে সহসা অস্থির হইয়া উঠিয়া বলিল "কৈ এখনো যে দিদিমণির দেখা নেই। অন্য দিন তো এতক্ষণে ঠাকুরবাড়ী যায়। আরতির সময় হয়ে এল যে। আমি আবার মরতে অসুখ-বিসুখের নাম কেন করলাম জানি নে,—মনের মুখে মারি সাদ্ধ্য ঝাঁটা।" কাত্যায়নী মাতার নিত্যকার্য্য তুলসীতলায় প্রদীপ দেওয়া সারিয়া অঙ্গনে একটু দাঁড়াইল। নানাপথে অগণ্য বেল-মল্লিকার সৌরভ প্রবেশ করায় একবার সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। গাছগুলার তখনো বিরাম নাই। তেমন জল পায় না—কেহ মূলও তোলে না; তথাপি অসংখ্য ফুল-ভারে গাছগুলা ছোট-ছোট ফুল-ঝাড়ের মত সাজিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রমা যে দিন আসে, ঠাকুরের জন্য তুলিয়া লইয়া যায়; নতুবা ফুটে আর শুখাইয়া পড়ে। কাত্যায়নীকে অঙ্গনে দাঁড়াইতে দেখিয়া বৃদ্ধা আবার বলিল, "হাঁগা, বলি কেউ আসছে কি?" "না" বলিয়া কাত্যায়নী বায়ুবেগে তুলসীমঞ্চের বক্ষ-কুহরস্থ প্রদীপটি নির্ব্বাণোন্মুখ দেখিয়া উস্‌কাইয়া দিতে লাগিল।

"এই যে বাছা তোরা এসেছিস। ঘাট্ ঘাট্, আমি বুবস্‌ড়ী কি বলতে যে কি বলি—কি ভাবতে কি ভাবি—অসুখ হবে কেন, বালাই।" বৃদ্ধার সানন্দ স্বরে কাত্যায়নী ফিরিয়া দেখিল, আলোক-হস্তা দাসীর সঙ্গে রমা। কাত্যায়নী বলিল, "আজ দেরী হল কেন?" "বাবা ভোরে কোথায় যাবেন—শোদপুরে না কোথায়—তাই—" কাত্যায়নী একটু অন্যমনা হইয়া বলিল, "তাই কি?" "তাঁর ক'-খা রোজ লাগে, গুছিয়ে রাখ্‌ছিলাম। ক'দিন হবে তা তো জানি না। আচার-টাচার না হলে ভাল খাওয়া হয় না—" কাত্যায়নী বাধা দিয়া বলিল, "শোদপুর? মহেন্দ্র সেইখানে থাকে না?" "আমি তো অত জানি না; তবে কি যেন একটা হয়েছে—বাবা ভারী ব্যস্ত দেখ্‌লাম। এই সন্ধ্যাতেই রওনা হচ্ছিলেন—কিন্তু ঘোড়ার পায়ে ব্যথা, আর দেওয়ানজীর পাঁজী ঠিক্ হয়নি না কি, তাই অগস্ত্যা ভোরে যাবেন ঠিক হ'লো। দাদা সহরে—একা এ ক'টা দিন—তুমি যাবে দুপুরে আমার কাছে দু'এক দিন?" "যাব। শোদপুরে ওঁরা ব্যস্ত হয়ে কেন যাচ্ছেন, বলতে পার না?" "না। বাবা তো ওসব কথা কিছু বলেন না—খুব উদ্বিগ্ন ভাব তাঁর, এইটুকু মাত্র বুঝলাম। চল মন্দিরে যাই, আরতির সময়—ও কি! পশ্চিমে কি কালো মেঘ উঠছে আখ। ভোরে যদি খুব জল-ঝড় হয়?"

কাত্যায়নী মেঘের পানে চাহিয়া বলিল, "হাওয়ার

উড়িয়ে দেবে, ভয় কি।" রমা কাতর ভাবে বলিল, "কি জানি কি হবে। মন্দিরে যাবে ত চল।" "আজ আর যাব না,—মন্দিরে তোমার জন্য আর কেউ আছেন ত?" "রাঙা বিদিমা এসিয়ে গেলেন। চলাম তবে, কাল নিশ্চয় যেও।"

রমা চলিয়া গেল। তখনও বৃদ্ধা নিম্ন স্বরে বলিতেছিল, "হাতে করে ছেলেমেয়ে দুটোকে মানুষ করেছি। বাবু-ই যখন দাদাবাবুর মতন, তখন ও-বাড়ীতে চুকি। বালাই, সব ভাল থাক্—আমার যেমন পোড়া মন।"

কাত্যায়নীকে দাওয়ায় উঠিয়া একখানা মাদুর বিছাইতে দেখিয়া বৃদ্ধা ঈষৎ অসন্তোষের সহিত বলিল, "গেলে না কেন ঠাকুরবাড়ী? বাছা একলাটি মুখ বুজে কতক্ষণ দোর-দুয়োরে ধন্না দেবে এখন, জানি না! তোমার সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কৈতে ভালবাসে;—ও রাঙা ঠাকুরুণ-টাকুরুণ—ওরা এক রকমেরই মানুষ।" কাত্যায়নী উত্তর না দিয়া শুইয়া পড়িল দেখিয়া, অগত্যা তখন সেও একখানা মাদুর বিছাইয়া অনতিদূরে শুইয়া পড়িয়া বলিল, "হরি হে! তোমারই ইচ্ছে।"

কাত্যায়নী দাওয়ার এক প্রান্তে শুইয়া আকাশপানে চাহিয়া দেখিল, মেঘ ক্রমে চলিয়া যাইতেছে, বায়ুও ক্রমে নিস্তেজ। রমার আশঙ্কা যে কাটিয়া গেল, ইহাতে সে একটু তৃপ্তি বোধ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। তুলসী-মঞ্চের প্রদীপটি মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিয়া অঙ্গনের অন্ধকার দূর করিতে পারিতেছিল না। মনে হইল; মা যদি আজ থাকিতেন, এখনো হয় ত ঐখানে বসিয়া জপ করিতেন। শোদপুর সম্বন্ধে এতটুকু চিন্তাতেও তিনি হয় ত কতই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেন।

ক্রমে কাত্যায়নীর তন্দ্রা আসিতে লাগিল। তন্দ্রার ঘোরে একবার যেন মনে হইল, মাতা তাহার শিয়রেই বসিয়া আছেন;—তাঁহার শীতল হস্ত তাহার ললাট স্পর্শ করিতেই কাত্যায়নী চমকিয়া উঠিয়া কপালে হাত দিল। বুঝি ছিন্নভিন্ন মেঘের কোন্ এক ক্ষুদ্র অংশ গলিয়া বায়ুবেগে সেই এক ফোঁটা জল তাহার কপালে পড়িয়াছে। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, সম্মুখেই একটা দীপ্ত তারকা। কাত্যায়নী চিনিল; ইনিই বৃহস্পতি গ্রহ, এ সময়ে প্রত্যহ তিনি সম্রাটের মত মধ্য-আকাশে বিরাজ করেন। সঙ্গে-সঙ্গে পিতার জ্যোতিষ-গণনাও মনে আসিতে লাগিল।

বৃদ্ধার পাখা হস্তচ্যুত হইয়া সশব্দে দাওয়ার নীচে পড়িয়া গেল—সে জানিতেও পারিল না। কাত্যায়নীও ঘুমে চোখ খুলিতে পারিল না। কিন্তু স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—পিতা যেন মেঘের উপরে বসিয়া আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রদের একত্র করিতেছেন—দুষ্ট ও বিমুখ গ্রহদের অঙ্গুলী-সঙ্কেতে শুভস্থানে যাইতে আদেশ করিতেছেন। মাতা যেন তাহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, 'কর্ত্তার ওসব ছেলেমানুষী তুই দেখিস্ না—তুই ঘুমো! মহেন্দ্র আমার কথা শুনলে না, ঐ খেলা দেখ্‌তে গেল,—তুই মেয়েমানুষ কোথায় যাবি, ঘুমো।'—'না না—আমি যাই' বলিয়া কাত্যায়নী যেন উঠিতে চেষ্টা করিল; পারিল না—ক্রমে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

রাত্রিশেষে একটা বিকট শব্দে জাগরিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, আকাশ ঘনান্ধকার। মেঘের মাথায়-মাথায় আগুনের সাপের মত বিদ্যুৎ—কোন্ অদৃশ্য হস্তের প্রচণ্ড ডমরুর বাদ্যে খেলিয়া-খেলিয়া বেড়াইতেছে। সঙ্গে-সঙ্গে বোঁ-বোঁ শব্দে গর্জ্জন করিয়া ঝড় আসিল। কাত্যায়নী ত্রস্তে উঠিয়া বসিল। বৃদ্ধাও জাগরণের সঙ্গে-সঙ্গেই "বাবাগো, মাগো" বলিয়া চেঁচাইতেছে শুনিয়া বলিল, "ভয় কি, ঝড় আস্‌ছে—ঘরে যাও।" বৃদ্ধা মাদুর গুটাইয়া পাখা খুঁজিয়া না পাইয়া মহা অসন্তোষের সহিত বলিল, "বৃষ্টিও এল যে,—তুমিও উঠে চল।" কাত্যায়নী নড়িল না। দেখিতে-দেখিতে ঝম্‌-ঝম্ শব্দে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। বায়ুর এবার পরাজয় হইল। তাহাকে অসতর্ক পাইয়া মেঘদল এবার গগনে তাহাদের সুদৃঢ় অধিকার পাতিয়া লইয়াছে। অগত্যা ক্রমে তাহাকে থামিতে হইল, বৃষ্টি চলিতে লাগিল। বৃদ্ধার পুনঃ পুনঃ রুষ্ট আহ্বানে অগত্যা কাত্যায়নী ঘরে গেল। শয্যায় শুইয়া রুদ্ধ-গৃহে বৃষ্টির বিচিত্র শব্দ যতটুকু শুনিতে পাওয়া যায়, শুনিতে-শুনিতে ভাবিল, রমার আশঙ্কা তো মিথ্যা হইল না; কিন্তু এই দুর্য্যোগে কি কেহ ঘরের বাহির হয়? কিন্তু যদি কোন বিশেষ দরকারই পড়িয়া থাকে?—এমনই বা কি বিশেষ দরকার পড়িতে পারে? শোদপুরেই তো মহেন্দ্র আছে; সেখানে কি এমন বিশেষ দরকার ঘটিবে?" সহসা কাত্যায়নী মনকে ধমক দিল, এসব অযথা চিন্তা তাহার কেন? যাঁহার ভার, তিনিই তাহা ভাবিতেছেন।

• •

প্রভাত হইল; কিন্তু বৃষ্টি সমানে চলিল। বৃদ্ধা বলিল, "মঙ্গলবারে যখন দেবতা নেমেছে, তখন আট দিন না হয়ে তো যাবে না।" কাত্যায়নীর ইচ্ছা হইতেছিল যে, জমিদার-বাড়ীর সংবাদ কেহ তাহাকে আনিয়া দেয়। কিন্তু এ বৃষ্টিতে কে আসিবে বা যাইবে! দ্বিপ্রহরে সে একবার চঞ্চল হইয়া যেন নিজ মনে বলিল, "রমা যেতে বলেছিল, হয় ত সে একা আছে।" বৃদ্ধা প্রতিবাদ করিল,—"এই বৃষ্টিতে কি কেউ বাড়ী থেকে বেরোয়?" কাত্যায়নীরও লজ্জা করিল—সত্যই তো, লোকে বলিবে কি! সন্ধ্যার মন্দ ধারার মধ্যে একজন দাসী গামছা মাথায় দিয়া আসিয়া বলিয়া গেল, "দিদিমণি ঠাকুরবাড়ী গেলেন; বলে দিলেন, কাল যদি বৃষ্টি ছাড়ে, আপনি দুপুরে একবার যাবেন,—বাবু ভোরে মহালে গেছেন।"

পরদিন দ্বিপ্রহরেও বৃষ্টি ছাড়িল না, কিন্তু বৃদ্ধা ভোজনের পরই গামছা মাথায় দিয়া সাজিয়া দাঁড়াইল এবং কাত্যায়নীকে উপদেশ দিল, "বিধুর মা রইল—ঘটটে-বাটটে আছে; দুজনে দুয়োর বন্ধ করে থাক। আমি একবার বাড়ী যাই,—মেয়েটা একলা আছে! এই বৃষ্টিতে বাবু চলে গিয়েছেন—হেই মা, এমনই কি কাজ।" কাজেই কাত্যায়নীর রমার কাছে যাওয়া হইল না। চিন্তার কিছুই নাই; তবু অস্বস্তি তো ছাড়ে না;—এমন দুর্য্যোগেও যখন স্বয়ং জমিদারকে নিজের মহালে যাইতে হইল,—না জানি সে কি প্রয়োজন!

বৃদ্ধার ভবিষ্যৎ-বাণীর সবটা সফল হইল না—তিন দিনের দিনই বৃষ্টি থামিয়া গেল; এবং রমাই হাসিমুখে আসিয়া কাত্যায়নীকে সংবাদ দিল, সেই বৃষ্টি মাথায় করিয়াও তাহার পিতা নিরাপদে যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছেন ও ভাল আছেন। মহেন্দ্রের সংবাদও রমা লইয়াছে,—সে ভালই আছে। এ বাস্তুতা কেবল বৈষয়িক কার্য্যের জন্যই, চিন্তার কিছুই নাই। তথাপি কাত্যায়নীর মন সহসা প্রসন্ন হইতে পারিল না।

আরও দিন-দুই কাটিয়া গেল। জমিদার যে বাটী কিনিয়া আসিয়াছেন, তাহা কাত্যায়নী শুনিয়াছে; এবং রমার স্নিগ্ধ, প্রসন্ন মুখের কোন বৈলক্ষণ্য না দেখিয়া, নিজের অর্থশূন্য কু-চিন্তাকেও দূরে সরাইয়া দিয়াছে। সেদিন একাদশী তিথি,—রমার অত্যন্ত অনুরোধে সেদিন দ্বিপ্রহরে কাত্যায়নী রমার নিকটে আসিয়াছিল।

রমা নক্সাকাটা পাথরের রেকাবের উপরে আম গুলিয়া চালিয়া দিতেছে—কাত্যায়নীও তাহাকে সাহায্য করিতেছিল। অচিরধারা-স্নাত বৃক্ষগুলা প্রচণ্ড রৌদ্রের কিরণে তাহাদের হরিদ্‌বর্ণকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়া চক্ষুকে যেন পীড়া দিতেছিল। আকাশ উজ্জ্বল নীল। রৌদ্রের তীব্রতায় পাখী-গুলাও কোথায় যেন লুকাইয়া পড়িয়াছে। কাত্যায়নীই রেকাবগুলা লইয়া, রৌদ্রে যাতায়াত করিয়া, রমাকে ছায়ার দিকে রাখিয়াছিল। তথাপি রমার পানে চাহিয়া বলিল, "আজকের দিনে এ কাজটা বাদ্ দিলে না কেন?" ঈষৎ ক্লিষ্ট মুখে স্নিগ্ধ হাসিয়া রমা উত্তর দিল, "আজকের দিনে যত কাজ হয়, অন্য দিন তেমন হয় না। দাদা শীগ্‌গির বাড়ী আস্‌বে—এই আমের আমসত্ত্ব সে ভালবাসে। এই গোলাটা দিলেই আজকের মত হয়।" কাত্যায়নী তাহার হাত হইতে বাটিটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "তুমি ঘরে যাও তো, আমি এটুকু সেরে নিচ্ছি।" অগত্যা রমা উঠিয়া বলিল, "তা'হলে আজ অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু পড়তে হবে।" কাত্যায়নী হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা।" "কি পড়বে?" "যা ইচ্ছা তোমার।" "ভাগবত্?" "আচ্ছা।"

কর্ম্ম সমাপনান্তে কাত্যায়নী ঘরে গিয়া দেখিল, রমা একখানি আসন পাতিয়া তাহার উপরে একখানি বৃহৎ পুস্তক রাখিয়াছে। "রীতিমত শুকদেবের আসন যে—" বলিয়া সহাস্যে কাত্যায়নী রমার নিকটে বসিয়া পড়িয়া পুস্তকখানা টানিয়া হাতে লইতে গেলে, রমা ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল, "আঃ! কি যে কর! আসনে নিজে না ব'স—বইখানিকে রাখ। শুকদেব না হলেও, শুকপাখী হইতে হবে এমন তো কথা নেই।" কাত্যায়নী একভাবেই হাসিয়া বলিল, "আমার বৈশম্পায়নকে তুমি আমল দাও না, তাই তো আমার রাগ হয়। একাদশ স্কন্ধ? কি পড়্‌ব?" রমা ভাবিয়া বলিল "দ্বিতীয় অধ্যায়।" "গোবিন্দ ভুজ-গুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং—থেকে?"

"হাঁ। আচ্ছা দিদিমাদের ডাকি না?" কাত্যায়নী পুস্তক বন্ধ করিল দেখিয়া, রমা অগত্যা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল,—"আচ্ছা, থাক্; আরম্ভ কর এইবার।"

কাত্যায়নী পড়িতে আরম্ভ করিল। ক্রমে নব-যোগীন্দ্র-

সংবাদে ভাগবতধর্ম্ম কি—এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল। রমা এই শ্লোকের কথাগুলি আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করায়, কাত্যায়নী হাসিয়া বলিল "আমার দ্বারা কি এর চেয়ে আর ভাল করে বোঝানো হয় রমা? গুরুপাধীর আর কতটা সাধ্য! তুমি যদি হ'তে তা' হলেই এর সে অর্থ উদ্ধার হ'ত।"

"কি বক্‌ছ! একটু মন দাও, এইমাত্র বল্‌ছি—আর কিছু না।"

"আচ্ছা"; কাত্যায়নী পড়িতে-পড়িতে অগ্রসর হইতে লাগিল—

"ধানাস্থায় নরোরাজন্ প্রনাস্তেত কহিচিৎ,
ধাত্র স্বিনীলা বা নেত্রে নস্থলেন্নগতে দিহ।
কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃত স্বভাবাৎ
করোতি যদ্যাৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ।

এবং ব্রত স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্তা জাতানুরাগো দ্রুত চিত্ত উচ্চৈঃ,
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্ নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ,
যং বাত্মনিঃ সলিলং নহীক জ্যোতীংষি সত্বানি দিশো
দ্রুমাদীন্

শরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎকিঞ্চিদুতং প্রণবেদনন্তঃ।
ভক্তিঃ পরেণানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈবত্রিক এক কালঃ
প্রপদ্য মানস্ত যথাশ্নতঃ স্থ স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদ পায়োঽনু
ঘাসং।"

কাত্যায়নী তাহার সাধ্যমত শ্রীধরস্বামী টীকার ও জীব গোস্বামীর ক্রমসন্দর্ভঃ টিপ্পনিকে ভাষায় বুঝাইতে চেষ্টা করিল (কেন না তখনও এ সকলের বঙ্গানুবাদ দুর্লভই ছিল); কিন্তু রমার দিকে চাহিয়া ক্রমশঃ তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। তাহার মত বিদ্যাবত্তা না থাকিলেও, রমা যাহা বুঝিতেছে কাত্যায়নীর যে তাহার এক অংশও অনুভব করিবার সাধ্য নাই, সে তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল।

কাত্যায়নীর কণ্ঠ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ায়, রমা সহসা যেন কি একটা তন্ময়তা হইতে জাগরিত হইয়া বলিল "থাম্‌লে যে?"

আবার কাত্যায়নী ভগবৎভক্তের ক্রমপর্য্যায় পড়িতে আরম্ভ করিল।

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু বা
প্রেম মৈত্রি কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ
অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে
নতদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।—"

তাহাদের আর পড়া হইল না। বিধুর মা দ্বারের নিকটে আসিয়া ডাকিল, "দিদিঠাকরুণ, বাড়ী আসুন।"

কাত্যায়নী বিস্মিত হইয়া তাহার পানে চাহিল। রমাও আশ্চর্য্য ভাবে চাহিয়া বলিল, "কেন রে!" "দরকার আছে, চলুন তো।"

বাড়ীতে কাত্যায়নীর দরকার আর কি এমন আছে! তাহার বাড়ী যে শূন্য শ্মশানমাত্র। কাত্যায়নীর অন্তর পীড়িত হইয়া উঠিল। রমা প্রশ্ন করিল, "মহেন্দ্র বাবু এসেছেন কি।" কি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে কুণ্ঠিত হইলেও, উত্তরেই বুঝিল, মহেন্দ্রই নিশ্চয়, নহিলে—আসিবার আর কে আছে!

কাত্যায়নীর অন্তর এ প্রয়োজনে সহসা একটা আন্দোলন অনুভব করিল; কিন্তু তাহা যে কিসের, সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। রমার দিকে চাহিয়া বলিল, "বেশী পড়া তো হল না?"

"অনেক হয়েছে,—তুমি এখন এস গিয়ে।"

রমার শান্ত সুন্দর মুখের দিকে একটু চাহিয়া লইয়া কাত্যায়নী বিদায় লইল।

ফরিদপুরের উপাসনা-পরায়ণ খেজুরগাছ

[বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে লর্ড রোণাল্ডসের সভাপতিত্বে আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর প্রথম বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার সারাংশ। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও বাঙ্গলায় অনূদিত]

ফরিদপুরের একটী খেজুর-গাছের কথা বলিব। সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলে মন্দিরে যখন সন্ধ্যাদীপ প্রজ্বালিত হয়, শঙ্খ-কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে সমস্ত পল্লী মুখরিত হইয়া উঠে, পূজার্থী তাহার ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে দেবচরণে যখন প্রণত হয়,—এই গাছটী তখন মস্তক অবনত করিয়া ভূমি স্পর্শ করে; আবার প্রভাতে নবোদিত সূর্য্যের প্রতি উন্মুখ হইয়া সমস্ত প্রকৃতি যখন নবপ্রাণে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, এই গাছও আকাশ পানে তাহার মাথা তুলিয়া থাকে। স্থানীয় মুসলমানগণ এই নামাজী খেজুর-গাছকে তাহাদের সম্মান প্রদর্শন করে, এবং হিন্দু অধিবাসিগণ নিয়মিতরূপে ইহাকে পূজা দেয়; দেশ-দেশান্তর হইতে লোক সমাগত হয়; অনেকে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিকার কামনায় এই গাছের নিকট মানৎ করে। তাহাদের ঐ সকল রোগ সারে কি না, আমি অনুসন্ধান করি নাই; এবং এ সম্বন্ধে কোন মতামতও প্রকাশ করিতে চাহি না; তবে বিশ্বাসে রোগ সারার (faith-cure) কথা সুদূর পাশ্চাত্যেও শুনিতে পাই।

সবিশেষ তথ্য অবগত হইবার জন্য আমার কয়েকজন ছাত্রকে ইহার জন্য বিশেষভাবে নির্ম্মিত কয়েকটী যন্ত্র সঙ্গে দিয়া তথায় পাঠাই। তাহারা যে সহজে সেখানে আমল পাইবে না, এ আশঙ্কা আমার পূর্ব্ব হইতেই ছিল; তাই উহাদের মধ্যে এমন একজনকে সঙ্গে দিই, যাহার পিতা একজন পুরোহিত।

ষ্টেশন হইতে ৮ মাইল দূরে সেই গ্রামে তাহারা উপনীত হইল; এবং স্নাত হইয়া শুদ্ধবসনে নগ্নপদে গাছ ছুঁইবার অধিকার পাইল; কিন্তু গাছের স্বত্বাধিকারী কিছুতেই গাছের গায়ে কল লাগাইতে দিবেন না—পাছে বিদেশী যন্ত্রের সংস্পর্শে গাছের এই অলৌকিকত্ব নষ্ট হয়। অনেক বলা-কহার পর যখন তিনি নিঃসংশয় রূপে বুঝিলেন যে, যন্ত্রগুলি সম্পূর্ণ স্বদেশী, এই দেশেই দেশী মিস্ত্রী দ্বারা দেশী লোকের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত, তখন আর তাঁহার আপত্তি রহিল না। সেইদিন-ই তাহারা একবার গাছের গায়ে কল লাগাইল। পরদিন সকাল হইল, বেলা ৮টা ৯টা বাজিতে চলিল, কিন্তু গাছ আর উঠে না। স্থানীয় লোকেরা ভাবিল, পূর্ব্বদিনের ছেলেদের উৎপাতে গাছ একেবারে চটিয়া-মটিয়া বসিয়া আছে; আমার ছাত্রেরাও বোচ্‌কা-বুচ্‌কী ফেলিয়া কোন রকমে দিন কয়টা বাঁচাইয়া ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইবার মতলব করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ মেঘ কাটিয়া গিয়া রৌদ্র দেখা দিল, গাছও আস্তে-আস্তে উঠিতে লাগিল।

তবে কি সূর্য্যের আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের সঙ্গে এই গাছের উঠা-নামা বিশেষভাবে জড়িত? তা যদি হয় তো পৃথিবীতে গাছও অগণিত, সূর্য্যও সর্ব্বত্র বিদ্যমান; তবে এত দেশের এত রকমের এত গাছ থাকিতে ফরিদপুর জেলার একটী বিশেষ খেজুর-গাছের সহিত সূর্য্যের এমন কি নাড়ীর টান? শুধু এই গাছটীই বা কেন সূর্য্য উঠিলে মাথা তুলে, আবার সূর্য্য নামিয়া গেলে মাথা নোয়ায়?

মানুষকে আঘাত করিলে সে চীৎকার করিয়া হাত-পা নাড়িয়া সাড়া দেয়; কোন বোবা জন্তু চীৎকার করে না, শুধু হাত-পা-ই নাড়ে। কিন্তু এই বোবা জন্তুটীকে হাত-পা বাঁধিয়া যদি আঘাত করা যায়, তো সে কোনরূপই সাড়া দিতে পারে না; কিন্তু এই সাড়া দিতে না পারাকে তো তাহার চৈতন্য না পাওয়া বলিয়া ধরা যায় না। আঘাত করিলে, উত্তাপ দিলে, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রেরণ করিলে একটী লজ্জাবতী লতার ডাল পড়িয়া যায়; কিন্তু হাজার কিল-চড়-লাথি মারিলেও আম-জাম-কাঁঠাল গাছ কোনরূপ সাড়া জ্ঞাপন করে না। ইহা দেখিয়া পূর্ব্ব-বৈজ্ঞানিকগণ উদ্ভিদকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতেন,—এক যাহারা সাড়া দেয় এবং আর এক যাহারা সাড়া দেয় না। কিন্তু এই বিভাগ মানিয়া লইবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে, এই আম-

জাম-কাঁঠালের প্রাকৃতিক গঠনে এমন কোন বিশেষত্ব আছে কি না, তাহার জন্য হাত-পা-বাঁধা ঐ বোবা জন্তুর ন্যায় ইহারা সাড়া দিয়া নিজেদের টের পাওয়া জানাইতে পারিতেছে না। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, লজ্জাবতীর একটী প্রশাখা যেখানে শাখার সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সংযোগ-স্থলে নীচের দিকে খানিকটা স্থূল মাংসল উদ্ভিদপেশী আছে; সংযোগ-স্থলের উপরে বা আশে-পাশে আর কোথাও সেরূপ নাই। বাহির হইতে যখন উত্তেজনা আসে, তখন

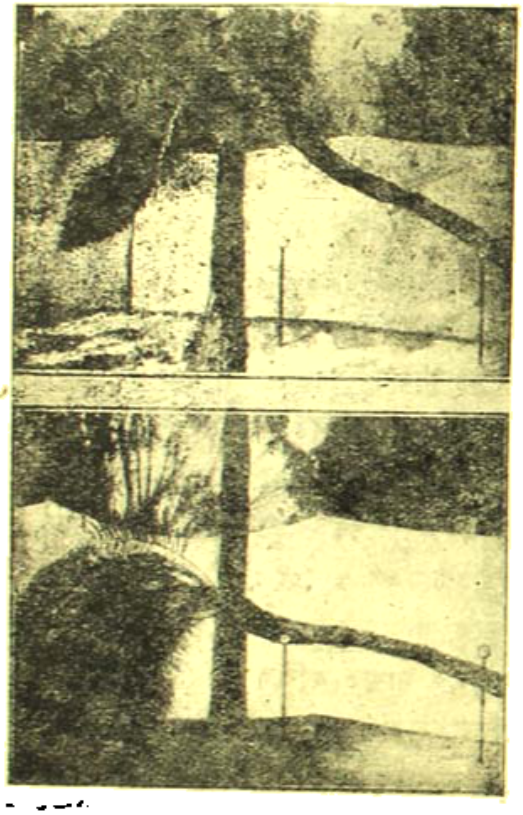

করিদপুরের উপাসনা-পরায়ণ খেজুরগাছ

এই পেশী সঙ্কুচিত হয়; তাহার ফলে লজ্জাবতীর ঐ প্রশাখাটী পড়িয়া যায়। আম-জাম-কাঁঠালে বাহিরের উত্তেজনাজনিত এই সঙ্কোচন গাছের চারিদিকে সমভাবে হয়, সুতরাং দুইটী ব্যক্তিকে পিঠে-পিঠে বাঁধিয়া প্রহার করিলে, প্রত্যেকেই সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিতে চেষ্টা করিয়া, তাহারা যেমন না পারে চলিতে, না পারে নড়িতে,—সেইরূপ এই আম-জাম-কাঁঠালও মার খাইয়া চুপ করিয়া থাকে। কোন কারণে গাছের এই সঙ্কোচন-শক্তি যদি একদিকে থাকে, বা একদিকে কম একদিকে বেশী থাকে, তবে এই আম-জাম-কাঁঠালও লজ্জাবতীর ন্যায় মাথা নাড়িয়া সাড়া দিবে।

করিদপুরের এই খেজুর-গাছটী মাটী হইতে একেবারে সোজা হইয়া জন্মায় নাই; শিশু অবস্থায় একটা ঝড়ে কাত হইয়া যায়,—তাই খানিকটা হেলিয়া গিয়া তাহার পর হঠাৎ একস্থানে মোচড় খাইয়া সোজা হইয়া উঠিয়াছে। গাছটা যেখানে বাঁকিয়াছে, মনে করা যাউক, সেই স্থানটা কোনরূপে উত্তেজিত করা হইল,—উত্তাপ দিয়া, বা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রেরণ করিয়া, বা আঘাত করিয়া। লজ্জাবতীর ন্যায় ইহার কোন গঠন-বৈচিত্র্য না থাকায়, বাহিরের আঘাত-জনিত সঙ্কোচন চারিদিকে সমভাবেই হইবে; সুতরাং গাছ নাড়িয়া সাড়া দিবে না; এই তো হইবার কথা। কিন্তু আর একটী বিষয় আমাদের ভাবিতে হইবে।

এই পৃথিবীতে যে অনেক পোড় খাইয়াছে, স্বল্প দুঃখ তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। যে সংসার-পথে নূতন যাত্রী, সে-ই সামান্য দুর্ঘটনায় মুহ্যমান হইয়া পড়ে। এমনও হয়, যখন বাহিরের একই ঘটনা প্রবীণ ও নবীনকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে চালিত করে, তখন নবীন ভাবে, প্রবীণ বড় মন্থরগতি; আর প্রবীণ মনে করে, এই বুঝি নবীন বুঝার বাহিরে চলিয়া যায়। বংশধারা, পূর্ব্ব-ইতিহাস, পারিপার্শ্বিক অবস্থা কত না অদল-বদল ঘটায়। গ্ল্যাড্‌ষ্টোন (Gladstone) যে টোরি (Tory) হইয়া তাঁহার রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করেন, তাহার কারণ, তিনি ছিলেন এক প্ল্যান্টারের (planter) পুত্র; কিন্তু বাহিরের অবস্থা তাঁহাকে শুধু লিবারেল (liberal) নয়, হোম-রুলার (Home-ruler) এ দাঁড় করাইল।

ঐ খেজুর-গাছের যে স্থানটা বাঁকিয়া গিয়াছে, সেখানে উপর দিকটা ক্রমাগত রোদ-ঝড়-জল খাইয়াছে; কিন্তু নীচেটা অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত; তাই মধ্যাহ্নের উত্তাপ যখন ঐ স্থানটাকে উত্তেজিত করে, তখন তলা ও উপর ভিন্ন ভাবে সঙ্কুচিত হয়; ফলে গাছের মাথাটী নামিয়া যায়। সুতরাং ঐ অংশে উপর-নীচের অবস্থার তারতম্যই গাছের উঠা-নামার কারণ এবং বাহিরের উত্তাপ দ্বারাই উহা সংঘটিত হইতেছে।

সূর্য্য হইতে আলোও আসিতেছে, উত্তাপও আসিতেছে। পরীক্ষায় দেখা যায়, উদ্ভিদের উপর আলোর ক্রিয়া

উত্তাপের ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। আলোহীন উত্তাপে লজ্জাবতীর লতা যদি পড়িয়া যায়—উত্তাপহীন আলোকে উহা আরও উপরে উঠিবে। খেজুর-গাছের এই যে উত্তেজনা, উহা আলোর জন্য, না উত্তাপের জন্য বা উভয়ের সংমিশ্রণে?

একটী সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মিত হইল, যদ্দ্বারা উত্তাপের সামান্য পরিবর্ত্তনও লিপিবদ্ধ হইতে পারে। সমস্ত দিন ধরিয়া গাছের উঠা-নামা ও উত্তাপের পরিবর্ত্তন পাশাপাশি লিখিত হইতে লাগিল। দেখা গেল, দুইটী লিপিই সম্পূর্ণ একই রকমের—মিশাইয়া দিলে চেনাই যায় না যে, একটায় গাছের উঠা-নামা অঙ্কিত হইয়াছে, আর একটায় সমস্ত দিনের উত্তাপের বিভিন্নতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, গাছের উত্থান-পতন কেবল মাত্র বাহিরের উত্তাপের বিভিন্নতাজনিত। আর তাহাই হওয়া উচিত; কারণ গাছটী প্রাচীন হওয়ায় উপরে শক্ত ছাল জমিয়া গিয়াছে, তাহা ভেদ করিয়া আলো ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না।

সুতরাং যে গাছ এইরূপ ভাবে জন্মায়, যাহাতে করিয়া তাহার দুই দিক ভিন্ন অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছে, সেই গাছই বাহিরের উত্তাপের তারতম্যে বাঁকিবে—তা সে আম-ই হউক, জাম-ই হউক বা খেজুর হউক,—সে গাছ ফরিদপুরে বা রামপুরহাটে বা ঘুঘুডাঙ্গার বাগানে যেখানেই জন্মাক না কেন। তাই প্রেসিডেন্সি-কলেজ-সংলগ্ন একটী খেজুর-গাছে এবং উলুবেড়িয়ার আর একটী গাছে ফরিদপুরের এই খেজুর-গাছের ন্যায় একই রকমের উঠা-নামা লক্ষ্য করিয়াছি।

মানব হয়ত মনে করে, প্রকৃতির নানান্ পরিবর্ত্তন কেবল মাত্র তাহাকেই বিচলিত করে;—সে জানে না, তাহার সুতীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় বাহিরের অবস্থার যে তারতম্য লক্ষ্য করিতেও পারে না, এই ক্ষুদ্র নির্ব্বাক উদ্ভিদ্ কিরূপে তাহাতে চঞ্চল হইয়া উঠে; এবং তাহার এই অভিব্যক্তি জ্ঞাপন করিয়া জানায় যে, এই বিশ্বে তাহার স্থানও একেবারে অকিঞ্চিৎকর নহে।

P30363

মিলন

[শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ]

(১)

[পত্র-পুষ্পে সজ্জিত, শুভ্র আলিম্পনে চিত্রিত একখানি সুন্দর অট্টালিকা। পশ্চাতে একখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কিন্তু সজ্জাহীন কুটীর। মণ্ডপের উপর করুণ সুরে সানাই বাজিতেছে।]

রবি। ঠাকুরমা, মা কই? কোথাও তো মাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

ঠাকুরমা। বৌমা তো আজ ওঠেন নি, সেই প্রসাদের ঘরেই পড়ে আছেন।—ছি, চোখের জল ফেলিস্‌নে রবি, আজ শুভদিনে মুখে হাসি আন্ ভাই!

রবি। আজকের দিনেও মা একটীবার এ বাড়ীতে এলেন না! মা যখন এ বাড়ীতে আস্‌বেন না জানেন, কেন আমাকে দিয়ে এ বাড়ী এত খরচ করে, এত সুন্দর করে করালেন। আগে জান্‌লে, আমিও বাবার ঘরের পাশে আর একখানি কুঁড়ে বাঁধতাম। মার পূজার ঘর, মার শোবার ঘর মার্ব্বেল-পাথর দিয়ে কেমন সুন্দর করে তৈরী করালাম, মা একটীবার সে ঘরে পাও দিলেন না।

ঠাকুরমা। তুই তো সে দুঃখ ভুলেছিস রবি। তোর মার কি দুঃখ তা তো জানিস্। প্রসাদ আমার কত কষ্ট পেয়ে গেছে, সব তো শুনেছিস্। বৌমার প্রথম থেকেই স্বামী-অন্ত প্রাণ। সেই স্বামীকে হারিয়ে বৌমা কেবল তোদের মুখপানে চেয়ে বুকে বল করেছিলেন। প্রথম-প্রথম আমি তোদের সামনেই কেঁদে ফেলতাম, কিন্তু বৌমা একদিনের জন্যও টলেননি। আমাকে কেবল বলেছেন—'মা, তিনি কাজ দিয়ে গিয়েছেন—ওঁর রবি-শান্তিকে মানুষ করতে হবে,—তার আগে তো আমাদের চোখের জল ফেলবারও সময় নেই।'

রবি। সেই তো আমার বেশী দুঃখ ঠাকুরমা। এমন মা কজনে পায়? কার মা পরের বাড়ী রান্নাকাজ ক'রে, শিল্পকাজ বেচে ছেলেকে খাওয়াতে পারে? সেই মাকে আমি একদিনের জন্যেও সুখী করতে পারলাম না!

ঠাকুরমা। তাঁর সুখ-দুঃখ সব যে প্রসাদ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে। তবু তোদের যে বৌমা প্রসাদের মনের মত করে মানুষ করতে পেরেছেন, এই তাঁর দুঃখ-সাগর মন্থন-করা অমৃত। তোদের মানুষ করবার জন্য বৌমা যখন শিল্পকাজ বেচ্‌তে দিতেন, পরের বাড়ী রান্নার কাজ করতে যেতেন, প্রথম-প্রথম আমার বুকটা যেন ফেটে যেত। একদিন বৌমাকে বল্‌লাম;—'বৌমা, এতে যে আমার প্রসাদের অমর্য্যাদা হবে।' বৌমার দুটী চক্ষু ভরে জল এল; বল্লেন, 'না মা, এতেই তাঁর মর্য্যাদা বাড়বে। তিনি নিজে জীবনে কখন পরের অনুগ্রহ নেননি, মরণেও তিনি সেই ক্ষমতা আমার মধ্যে রেখে গেছেন; নইলে সামান্য মেয়েমানুষ হয়ে আমি এ জোর কোথায় পাব?'

রবি। আমি অবাক্ হয়ে যাই ঠাকুরমা,—পুরুষ যে অনুগ্রহের জন্যে লালায়িত হয়ে বেড়ায়, মা নারী হয়ে কেমন করে সে অনুগ্রহকে এমন অগ্রাহ্য করতে শিখ্‌লেন!

ঠাকুরমা। এ ক্ষমতা সত্যিই তাঁর খুব বেশী। তুই যখন ডাক্তারী পড়্‌তে গেলি, আমাদের জমীদার নরেন বাবু তোর সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলেন। বল্লেন, তোর পড়ার ও বাড়ীঘর করবার খরচ সব তিনি দেবেন। আমার সত্যিই সে সম্বন্ধের উপর লোভ হয়েছিল। বৌমা আমার কিন্তু স্থির রইলেন। আমি তাঁকে সে কথা বল্‌তে, আমাকে বল্লেন—'মা তা'হলে তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করা হবে। তবে তুমি যদি বল, আমি তো না বল্‌তে পারব না।' শেষে ভেবে দেখে আমি তাঁর মতেই মত দিলাম।

রবি। আচ্ছা ঠাকুরমা, মা তো তোমার কথা ঠেল্‌তে পারেন না। মাকে তোমার আজ একটীবার সন্ধ্যার সময়, অন্ততঃ বর আস্‌বার সময় এ-বাড়ী আস্‌তে বল্‌তে হবে।

ঠাকুরমা। বৌমা আমার কথা অমান্য করবেন না বলেই তো আমি বল্‌তে সাহস করিনে; হয় ত তাতে তাঁর বড় কষ্ট হবে।

রবি। না ঠাকুরমা, আজ অন্ততঃ একটীবার মাকে আস্‌তে বল্‌তেই হবে। বল বল্‌বে?

ঠাকুরমা। আচ্ছা, বল্‌ব।

রবি। আর দেখ ঠাকুরমা, বিয়েটা মিটে গেলেই, মা যাতে শরীরের একটু যত্ন করেন, তা করতেই হবে। তাঁর বুকটা ইদানী এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে যে, কখন কি হয় কিছুই ঠিক নেই—কিন্তু মা যে শরীরের দিকে মোটে চাইবেন না!

(২)

[আকাশে মেঘের মত অন্ধকার পৃথিবীকে ধীরে ধীরে সবেমাত্র ছাইয়া ফেলিতেছে। দূরের আলোকরাশি ও বাদ্যধ্বনি ক্রমশঃ নিকটে আসিতেছে।]

ঠাকুরমা। বৌমা, এমনি করে সমস্ত দিন কেটে গেল, একটীবার ওঠো মা।—কথা কচ্ছ না কেন মা? তোমাকে সারাদিন না দেখে শান্তির চোখের জল পড়্‌ছে, রবি মুখখানি ম্রিয়মাণ করে রয়েছে; একবার চল মা। ওই বাজনা শোনা যাচ্ছে, বর এলেন বলে,—একটীবার দাঁড়িয়ে আবার ফিরে এস।

মা। না—

ঠাকুরমা। ছি বৌমা, এ দশবছর এমন শক্ত থেকে আজ কেন এমন কচ্ছ? এতদিন আমাকে যে তুমি কত বুঝিয়েছ মা!

মা। মা, আজ যে আমার হাতের কাজ ফুরিয়েছে, আর তো মনকে কিছুতে বোঝাতে পাচ্ছিনে। তাঁর যে বড় সাধ ছিল, শান্তির বিয়ে কত ঘটা করে সুপাত্রে দেবেন।

ঠাকুরমা। রবি তো তোমার সে খেদ রাখেনি বৌমা। শান্তির অনেক তপস্যা ছিল, তাই রূপে-গুণে অমন সুন্দর স্বামী পাচ্ছে। একবার দেখ্‌বে চল মা।

মা। মা, আজকের দিনটা আমায় ক্ষমা কর। আজ এ ঘর ছেড়ে যেতে আমার বুক ফেটে যাবে।

ঠাকুরমা। বৌমা, আমি কি প্রসাদকে ভালবাসিনি, আমার কি কষ্ট হচ্ছে না?

মা। তোমার চেয়ে তাঁকে যে কেউ ভালবাসেনি, তা কি আমি জানিনে! তোমার অবাধ্য আমি আর কখন কি হয়েছি মা? কিন্তু আজ আমার এখান থেকে

পা উঠ্‌ছে না। তোমার পায়ে পড়ি মা, আমার আজ্‌কের অপরাধ নিও না।

ঠাকুরমা। বৌমা, আজকের শুভদিনে আমাকেও কাঁদালি! তুই যে আমার মেয়ের চেয়ে বেশী। প্রসাদের দুঃখ যে আমি তোর মুখ চেয়ে ভুলি বৌমা—তোর ওপর আমি কি করে রাগ কর্‌ব?

মা। মা, মাগো ——

ঠাকুরমা। বৌমা, লক্ষ্মী আমার, স্থির হও।

(৩)

[বৈশাখের সুন্দর প্রভাত। বাসর-শয়নের ফুলের রাশি, দুয়ারে দেওয়া ফুলের মালা ম্লান হইয়া আসিয়াছে। বর-বধূর কণ্ঠের ফুলহার হইতেও অনেক ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে। একটী মিষ্ট করুণ গন্ধ অট্টালিকার প্রতি কক্ষ, মুক্ত প্রাঙ্গণ ভরিয়া আছে। ভৈরবীর উদাস-করুণ সুর সানাইয়ের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া মেঘমুক্ত গগনে মিলাইয়া যাইতেছে।]

রবি। ওমা, মা।

মা। রবি, ঘরে আয়।

রবি। একবার শান্তির পানে চাও মা। এখনও কেউ জাগেনি, তাই চুপি চুপি শান্তিকে তোমার কাছে নিয়ে এলাম। শান্তিকে তোমার কেমন মানিয়েছে দেখ না!

মা। আয় মা! ফুলের মত মুখখানি ম্লান কেন মা? আজ তোর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন, এ কথা যেন কখন ভুলে যাস্‌নে মা। ওই জানালাটীর কাছে দাঁড়িয়ে প্রত্যহ তিনি উষার আলো দেখ্‌তেন। ওইখানটীতে প্রণাম করে মনে-মনে তাঁর কাছে আশীর্ব্বাদ চা।—ওরে এত আনন্দ আমি কি করে সইব!

রবি। না, এবার তুমি আশীর্ব্বাদ কর।

মা। তোমার বাবা যেমন আমায় ভালবাসতেন, তোমার স্বামী যেন তোমায় তেমনি ভালবাসেন।

(৪)

[বাগানের পত্রনিবিড় গাছগুলিকে সেকরা শিরস্ত্রাণ পরাইয়া দিয়া অপরাহ্নের সূর্য্যকিরণ পশ্চিমের জানালা দিয়া কুটীরের ভিতর পড়িয়াছে। বাতাসের মন্দ হিল্লোলের ভিতরেও একটা উদ্দামতার আভাস জাগিতেছে।]

মা। মা, শান্তি এতক্ষণ শ্বশুরবাড়ী পৌঁছেছে?

ঠাকুরমা। কখন পৌঁছে গেছে মা। এখান থেকে ৪টা ষ্টেশন তফাৎ বই ত নয়।

মা। আজ ঠিক দশবছর পূর্ণ হ'ল, নয় মা?

ঠাকুরমা। হাঁ মা।

মা। দেখ মা, ওই যে রৌদ্দুরটী খাটের পায়ার কাছ পর্য্যন্ত এসেছে, সেদিনও ঠিক ও এমনি জায়গাটীতে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখে আমার যেন সেখানকার ডাক বলে মনে হয়।

ঠাকুরমা। সে ব্যথাটা কেমন বোধ হচ্ছে এখন বৌমা?

মা। এখন ত আর টের পাচ্ছিনে, বোধ হয় সেরে গেছে।

ঠাকুরমা। তবে আর এক দাগ ওষুধ খেয়ে ফেল ত মা।

মা। না মা, আর যাবার সময় ওষুধ দিও না।

ঠাকুরমা। ছি বৌমা, ও কথা বল্‌তে আছে!

মা। শোন মা, তোমাকে একটা কথা বলি। তিনি আমাকে যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন—'শান্তির বিয়ে আর রবির শিক্ষা রইল তোমার কাজ। ও শেষ হলেই তুমি আমার কাছে যাবে।' আজ তো মা সে দুটী কাজই শেষ হয়েছে, আজ কি তিনি আমাকে ডেকে নেবেন না?

ঠাকুরমা। ও-সব কথা কেন ভাব্‌ছ মা? এখনও তোমার কাজ শেষ হয়নি। সেরে উঠে রবির বৌ ঘরে আন্‌বে, তাকে আশীর্ব্বাদ করে ঘরসংসার চিনিয়ে দেবে, তবে ত?

মা। না মা, আর সেরে উঠ্‌তে চাইনে। রবির বিয়ের ভার তোমার। রবির বৌ তোমার মনের মতন এন। তুমি তাঁকে আশীর্ব্বাদ কোরো—সেই আশীর্ব্বাদ সব-চেয়ে বড় হবে।

ঠাকুরমা। বৌমা, ডাক্তার কথা কইতে বারণ করেছেন। একটু চুপ করে ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি।

মা। না, আজ আমার শেষ দিন। আজ যদি চুপ করে থাকি, আর তো তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে পাব না!—রবি কোথা মা।

ঠাকুরমা। রবি ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইছে;—ওই যে আস্‌ছে।

মা। রবি!

রবি। এই যে মা।

মা। আমার সামনে এসে বস্। মা!

ঠাকুরমা। কি বৌমা?

মা। দেখ মা, তিনি বলেছিলেন—'তোমাকে বলার কোন দরকার নেই তা জানি। তবু এ কথাটা আমার বড় মনের কথা তাই বল্‌ছি—যাকে ঠিক আপনার মা মনে কোরো। সংসারের চক্ষে আমার জীবনটা ব্যর্থ; কিন্তু আমার অন্তর্যামীর চরণে আমি যেটুকু সফলতা নিবেদন করেছি, তার ক্ষমতাটুকু আমি আমার মায়ের কাছ হতে লাভ করেছি। আমার এই মার মনে কখন ব্যথা দিও না।'—তোমাকে শুধু জিজ্ঞাসা করি, মা, তাঁর সে আদেশ রাখ্‌তে পেরেছি ত? তা নইলে, যখন তাঁর কাছে যাব, কিছুতেই তিনি আমার উপর প্রসন্ন হতে পারবেন না।

ঠাকুরমা। ও রকম করে কেন বল্‌ছ, বৌমা। অনেক পুণ্যে আমি তোমার মত গুণের বৌ পেয়েছি। তুমি চির-দিনই আমার ব্যথা নিবারণ করে এসেছ, কখন কোন ব্যথা দাওনি মা।

মা। আঃ, বাঁচলাম মা! আবার যদি আসি, মা, এমনি করে তোমার পায়ে যেন ঠাঁই পাই। (একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া) দেখ মা, আজ ছবিতে মুখখানি বেশ হাসি-হাসি দেখাচ্ছে, নয়?

ঠাকুরমা। জান ত মা, কোন দুঃখই আমার প্রসাদের মুখের হাসি ম্লান করতে পারেনি। স্বর্গে বসে আজ তার সে হাসি যে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মা। তাঁর প্রথমকার জীবনের দু'একটা গল্প বল না মা!

ঠাকুরমা। তার চেয়ে একটু ঘুমোও না কেন মা। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।

মা। না মা, তুমি বল, আমি চুপটী করে শুন্‌ছি।

ঠাকুরমা। ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত হয়েও প্রসাদ আমার চিরদিন সে ঐশ্বর্য্যে অনাসক্ত ছিল। তোমার শ্বশুর যখন ব্যবসায়ে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মারা গেলেন, প্রসাদ তখন একটুও ইতস্ততঃ না করে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি মহাজনের হাতে দিয়ে এই কুঁড়ে ঘরে বেরিয়ে এল। আমার হাতে তখন কিছু নগদ টাকা ছিল, গহনাও হাজার-খানের ছিল। প্রসাদকে তাই দিয়ে একটা ছোট খাট বাড়ী তৈরী করতে বল্‌লাম। প্রসাদ বল্‌ল, 'মা, তোমার যদি আপত্তি না থাকে, এই সব দিয়ে আমি বাবার বাকী ঋণ শোধ করি। তাঁকে যে কেউ একটু নিন্দা করবে, তা আমার সহ্য হবে না।' তাই করা হ'ল। এর কিছুদিন পরে আমার খুব অসুখ হয়, তুমি তখন বাপের বাড়ীতে। প্রসাদ তোমাকে আন্‌তে গেল। আমাদের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা সব সেখানে পৌঁছেছিল। বেহাই মহাশয় সে জন্য সে সময়ে পাঠাতে একটু অমত করেন, এবং তোমার গহনাগুলো যে খোয়া যেতে পারে, ইঙ্গিতে সে কথাও প্রসাদকে বলেছিলেন। প্রসাদ যখন তোমাকে নিয়ে আসে, তুমি কেমন হাসিমুখে বাপের দেওয়া গহনাগুলি সেখানে খুলে রেখে প্রসাদের সঙ্গে চলে এলে—এসব কথা আমাকে বলল। তখন কি গর্ব্বে যে আমার এ ভাঙা বুক ভরে উঠেছিল, তা আর কি বল্‌ব বৌমা!

* * * *

বৌমা! বৌমা! এ কি! রবি, রবি, দেখ্ ত বৌমা কি রকম করছেন। শীগ্‌গির ডাক্তার বাবুকে ডাক্।

মা। এত দিনে মনে পড়্‌ল? এই দীর্ঘ দশ বছর কি করে একটী বারও না এসে ছিলে?

* * * *

তা কষ্ট হবে না? তুমি একটী দিনের জন্য বিদেশে গেলে দিন-রাত পথ-পানে চেয়ে রইতাম,—আর এই দশ বছর—উঃ—

* * * *

সহ্য করে না থেকে কি কোরব? তুমি যে কাজের ভার দিয়ে গিয়েছিলে, প্রাণপণে সেই কাজ নিয়ে ছিলাম। কেবল ভেবেছি, এই কাজ শেষ হলে তবে তোমার কাছে যেতে পাব।

* * * *

তোমার রবিকে তোমার মনের মত করে মানুষ করেছি, শান্তিকে যোগ্য বরে দিয়েছি;—এখন আমার উপর প্রসন্ন হয়েছ তো? আর কিন্তু এখদিনও আমার কাছছাড়া হতে পাবে না।

* * * *

চোখের জলের কি দোষ বল? এত দিন তাকে বাধা

দিয়ে রেখেছি, আর কি পারি! আর কি দেরী করি! এখনি যাব। এস, আরো কাছে এস—আঃ—কতদিন—কত দিন এ সৌভাগ্য হয়নি—

রবি। মা, মা, ওমা! ডাক্তার বাবু, আর একবার হাতটা দেখুন না।

ডাক্তার। আর হাত দেখে কি হবে রবি! দেখ্‌ছ না, সতী সাধ্বীর মুখে স্বর্গের হাসি ফুটে উঠেছে। মার পায়ের ধূলো নেও। অনেক পুণ্যে এমন মা পেয়েছিলে!

ঠাকুরমা। বৌমা! বৌমা! এতদিন ম্লান মুখে থেকে শুধু যাবার দিনটা হাসিমুখ দেখিয়ে গেলে!

সখী

(বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি-অবলম্বনে)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম-এ]

অবতরণিকা

রাধাকৃষ্ণের প্রেম-সম্বন্ধে মহাজনগণ বড় গলা করিয়া বলিয়াছেন, 'এমন পিরীতি না দেখি কখন, কখন হবার নয়', 'এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি, ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে,' 'এমন দোঁহার প্রেম কভু দেখি নাই, জ্ঞানদাসেতে বলে বলিহারি যাই।' তাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকেই আদর্শ ধরিয়া কথাটা পাড়িলাম। এই 'অদ্ভুত প্রেমে'র সহায় ললিতা-বিশাখাদি অষ্ট সখী, বৃন্দা দূতী এবং আরও বহু অপ্রধানা সখীর কথা সকলেই জানেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি মহাজনের পদাবলীতে এবং ভক্তমাল, চমৎকারচন্দ্রিকা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কবি-চিত্রকরদিগের নিপুণ তুলিকায় সখীদিগের প্রকৃতি ও কার্য্য উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়াছে।

নায়কের রূপগুণবর্ণন বা প্রতিকৃতি-চিত্রণ দ্বারা নায়িকার হৃদয়ক্ষেত্রে পূর্ব্বরাগের বীজবপন করিতে, (১) 'পিরীতি ব্যেয়াধি'তে রোগ চিনিতে ও ঔষধের ব্যবস্থা করিতে; (২) নায়কের বার্ত্তা লইতে ও নায়কের নিকট সংবাদ বহন করিতে, প্রেমলিপি লেখাইতে ও পৌঁছাইয়া দিতে, প্রিয়প্রসঙ্গে মনোরঞ্জন করিতে, বাসক-সজ্জায় সজ্জিত করিতে ও মিলনের সহায়তা করিতে, হৃদয়নিধিকে নিভৃতে মিলাইতে, বিরহে প্রবোধ দিতে ও মিলনের উপায় উদ্ভাবন করিতে, মিলনে নর্ম্মালাপ ও আনন্দ-উৎসব করিতে, বিঘ্ন-ব্যাঘাত দূর করিতে, সখীরা সুনিপুণ। তাঁহারা সলা-পরামর্শে সিদ্ধ-হস্ত, দূতীগিরিতে দড়। আর নায়িকা 'পরাণের সই' 'প্রাণ-রজনী'কে সুখের দুঃখের ভাগ দিয়া, (৩) 'রজনী-আনন্দে'র রহস্য ও মরমের কথা প্রেমের ব্যথা জানাইয়া তৃপ্তা। সখীগণও শ্রীরাধার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, দরদের দরদী, মরমের মরমী।

'অদ্ভুত হেরনু প্রিয়সখী প্রেম।
নিজ সখী দুখে দুখী সুখে মানে ক্ষেম॥'—গোবিন্দদাস

'প্রেমে সেবা করে সবে পরম উৎসাহে।
তাঁহার সুখের লাগি প্রাণ দিতে চাহে॥
শ্রীমতীর সুখের সুখী দুখের সে দুখী।
কিসে বা অন্তরে সুখ থাকিবে নিরখি॥'—

ভক্তমাল ২৬শ মালা

শ্রীরাধার অন্যতমা সখী ললিতার চিত্রে ইহার পরাকাষ্ঠা, চরম আদর্শ পাওয়া যায়। তিনি রাধাকৃষ্ণের মিলন-সুখে তন্ময়চিত্তা, পরমনির্বৃতা, কৃতার্থম্মন্যা।

'প্রিয়াপ্রিয়সখীমুখে তাম্বূল অর্পিয়া।
আনন্দসাগরে ভাসে প্রেমময় হিয়া॥'—

ভক্তমাল ৯ম মালা

(১) 'প্রবণাৎ'। 'সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।' 'বর্ণনাৎ'। 'বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া, বিশাখা দেখালে আমি।'

(২) 'রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।' 'যতন করব হায় সেই কানু বৈদ্যে তুয়া বল মোই।'

(৩) 'শুনগো মরম সই।' 'সই মরম কহিয়ে তোকে।' 'কহে দুখবনী, শুনগো রজনী, দুখ কি কহিব আর।'

তাই শ্রীরাধাও আদর করিয়া বলিয়াছেন,—

'আমার ললিতা সখী রূপে গুণে শীলে।
এমন একটি নাহি ত্রিভুবনে মিলে॥'—

ভক্তমাল, ২৬শ মালা

আদর্শ-হিসাবেই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার দৃষ্টান্ত দিলাম; নতুবা, 'নায়িকা-সহায়িনী' সখী কৃষ্ণলীলাত্মক সাহিত্যের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। সকল দেশের কাব্য-নাটকেই নায়িকার এক বা একাধিক 'সমদুঃখ-সুখ সখীজনে'র ব্যবস্থা আছে। নায়িকার জীবনে সখীজনের জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; কাব্যনাটকে তাঁহাদিগের নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের স্থান নাই, তাঁহাদিগের নিজের প্রেমে পড়িবার অবসর নাই, (৪) নায়িকার উত্তর-সাধিকার কার্য্য-সাধনেই তাঁহাদিগের কার্য্য পর্য্যবসিত, তাঁহাদিগের জন্ম ও জীবন সার্থক। এই হিসাবে তাঁহাদিগকে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' বলিলেও বলিতে পারা যায়।

[ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম। তবে কোথাও কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। কতকগুলি কাব্য-নাটকে নায়কের সহচর বা পরিচারকের সহিত নায়িকার সখীর প্রেম-সংঘটনের ব্যাপার আছে। 'মৃচ্ছকটিকে' নায়িকা বসন্তসেনার সখী মদনিকার শর্ব্বিলকের সহিত প্রণয় ও পরিণয় ঘটিয়াছে (তবে শর্ব্বিলক নায়ক চারুদত্তের সহচর বা অনুচর নহে)। সেক্‌স্‌পীয়ারের 'The Merchant of Venice'এ Gratiano-Nerissaর পরিণয় ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'তে পিরিজায়া-দিগ্‌বিজয়ের পরিণয় ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী কমেডিতে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের 'পরিবর্দ্ধিত' 'ইন্দিরা'য় সুভাষিণী ইন্দিরার সখীরূপেই কল্পিত, অথচ সুভাষিণীর পতিপ্রেম, সন্তানস্নেহ প্রভৃতির, অর্থাৎ তাঁহার ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের, চিত্র অতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। আবার 'কপালকুণ্ডলা'র নায়িকার ননদ শ্যামা ও 'বিষবৃক্ষে' নায়িকার ননদ কমলমণি ভাজের প্রিয়সখীবৃত্তি-সাধনের জন্যই সৃষ্ট, অথচ শ্যামার নিজস্ব সুখদুঃখের ক্ষুদ্র চিত্র ও কমলমণির ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের পূর্ণায়তন চিত্র গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, এই বিশেষবিধি সম্বন্ধে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই।]

সখী ও দূতী সম্বন্ধে সংস্কৃতভাষার অলঙ্কারশাস্ত্রে যথেষ্ট আলোচনা আছে। দশরূপকে 'নায়িকা-সহায়িকাঃ' সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য আছে:—

দূত্যো দাসী সখী কারুর্ধাত্রেয়ী প্রতিবেশিকা।
লিঙ্গিনী ভিক্ষুণী স্বৈরং চ নেতুর্মিত্রগুণাদিতাঃ॥

দ্বিতীয় প্রকাশ, ২৯শ শ্লোক।

দশরূপকার আরও বিশদভাবে বলিয়াছেন:—

লেখাসংস্থাপনৈঃ স্নিগ্ধৈরীক্ষিতৈর্মৃদুভাষিতৈঃ।
দূতীসম্প্রেষণৈর্নর্ম্মা ভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে॥
দূত্যঃ সখী নটী দাসী ধাত্রেয়ী প্রতিবেশিনী।
বালা প্রব্রজিতা কারুঃ শিল্পিস্ত্রাগ্যাঃ স্বয়ং তথা॥
কলাকৌশলমুৎসাহো ভক্তিশ্চিত্তজ্ঞতা স্মৃতিঃ।
মাধুর্য্যং নর্ম্মবিজ্ঞানং বাগ্মিতা চেতি তদ্‌গুণাঃ॥
এতা অপি যথৌচিত্যাদুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১৩০—৩২ শ্লোক

রসমঞ্জরীতে সংক্ষেপে সখী ও দূতীর লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে:—বিশ্বাসবিধ্রামকারিণী পার্শ্বচারিণী সখী। অস্যা মণ্ডনোপালম্ভশিক্ষা-পরিহাস প্রভৃতীনি কর্ম্মাণি॥ দূত্য-ব্যাপার-পারঙ্গনা দূতী। তস্যাঃ সংঘট্টন-বিরহ-নিবেদনাদীনি কর্ম্মাণি॥ অস্যার্থঃ—

'নায়িকার বিশ্বাস যে করে উৎপাদন,
সঙ্গে থেকে তোষে তারে সখী সেইজন;
নায়িকার প্রসাধন, মধুর ভর্ৎসন,
শিক্ষা-পরিহাস-আদি সখী-আচরণ॥
দৌত্যকার্য্যে নিপুণা যে তারে দূতী কয়।
সংঘট্টন সংবাদাদি তার কার্য্য হয়॥' (৫)

কটমট সংস্কৃত-ভাষার অলঙ্কার-শাস্ত্রেই যে শুধু ইহার আলোচনা আছে তাহা নহে, দেশভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিতেও ইহার প্রসঙ্গ আছে। কৌতূহলী পাঠক বিখ্যাত 'ভক্তমাল' গ্রন্থের ৯ম মালায় গোপীমুখ-আদিভেদ-প্রকরণে ও ২৬শ মালায় শ্রীকৃষ্ণলীলাসহ শ্রীবৃন্দাবন-মহিমাবর্ণনে এবং ২৩শ মালায় রসপ্রকরণে সখীগণের ও আপ্তদূতী পত্রহারী

(৪) ব্রহ্মলীলায় সকল গোপীই শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগিণী, অথচ শ্রীরাধার প্রতি এবং পরস্পরের মধ্যে কোন ঈর্ষ্যাদ্বেষ নাই, ইত্যাদি নিগূঢ়তত্ত্ব আছে।

(৫) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম-এ মহোদয়ের পদ্যানুবাদ। পাঠকবর্গ ইচ্ছা করিলে ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীও দেখিতে পারেন।

প্রকৃতির লক্ষণ ও কার্য্যের সরস বর্ণনায় প্রভূত জ্ঞান ও আনন্দলাভ করিবেন। ধরিতে গেলে, সখীর কার্য্য দূতীর কার্য্য অপেক্ষা উচ্চতর; কিন্তু দূতীরাও যখন সখীদিগের মতই 'বিশ্বাস-বিশ্রাম-কারিণী পার্শ্বচারিণী' এবং সখীরাও যখন প্রয়োজন হইলে দূতীর কার্য্য করিয়া থাকেন, তখন উভয়শ্রেণীর প্রভেদের উপর তত জোর দিবার প্রয়োজন দেখি না।

[আবার কাব্য-নাটকে 'নায়িকা-সহায়িনী' সখীর অনুরূপগুণবিশিষ্ট 'নেতৃমিত্র' অর্থাৎ নায়কের সখারও ব্যবস্থা আছে। কৃষ্ণলীলায় 'সুবল সাখ্যাতি' ইহার সুবিদিত দৃষ্টান্ত। 'মালতীমাধবে' মাধবের সখা মকরন্দ, 'বাসবদত্তা'র কন্দর্পকেতুর সখা মকরন্দ, প্রেমগ্রস্ত নায়কের ব্যথার ব্যথী, নায়ক তাহাকে নব-অনুরাগের কথা বলিয়া স্বস্তি পান। শেক্‌স্‌পীয়ারের 'The Merchant of Venice'এ Bassanio সুহৃদ্‌বর Antonioকে পূর্ব্বরাগ-বৃত্তান্ত বলিতেছেন, আবার তাঁহার প্রেমের তীর্থযাত্রায় Gratiano সাথী; অপ্রধান আখ্যানে Lorenzoর প্রণয়-ব্যাপারে Gratiano বিশ্বাসপাত্র ও সহায়। প্রেমিকপ্রবর রোমিও দুইবার প্রেমে পড়িয়াছিলেন, তাই বুঝি কবি তাঁহার দুইজন সদাপ্রাণ সখার (Benvolio ও Mercutio) ব্যবস্থা করিয়াছেন! শেক্‌স্‌পীয়ারের The Two Gentlemen of Verona'র ভ্যালেন্টাইন প্রাণের বন্ধু প্রোটিয়াস্‌কে নিজের প্রেমের কাহিনী বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রোটিয়াস্ তাঁহার বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' রাজা মদনদেব পুরন্দর শ্রেষ্ঠীর সহায়; তবে পূর্ব্বরাগের আমলে নহে; শেষরক্ষার সময়ে। এই প্রসঙ্গে 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্রনাথ দত্তের কুন্দনন্দিনী-ঘটিত রূপজমোহ-ব্যাপারে বন্ধুবর হরদেব ঘোষালের সহিত পত্র-ব্যবহার স্মর্ত্তব্য। নায়ক নগেন্দ্র দত্তের হরদেব ঘোষালের ন্যায়, প্রতিনায়ক দেবেন্দ্র দত্তের 'সমবয়স্ক' 'মাকুলপুত্র সুরেন্দ্র' একমাত্র হিতকামী সুহৃদ্, সুতরাং তিনি কুন্দঘটিত ব্যাপারে সহায়তা করেন নাই, নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রেমের ব্যাপারে বহুস্থলে বিদূষক নায়কের বিশ্বাসপাত্র ও সহায়। কৃষ্ণলীলায় মধুমঙ্গল ইহার প্রেত। ইংরেজী সাহিত্যে ও হালের বাঙ্গালা সাহিত্যে নায়িকার সখী দাসী-বাঁদীর ন্যায়, নায়কের প্রণয়-দূত, সন্দেশহারক—ভৃত্য বা খানসামা (সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের চেট)। শেক্‌স্‌পীয়ারের 'The Merchant of Venice'এর অপ্রধান আখ্যানে Lorenzo-Jessicaর সন্দেশহারক Launcelot Gobbo এবং Cymbelineএ বিশ্বস্ত ভৃত্য Pisanio এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী কমেডীতে প্রণয়দূত ভৃত্যের বহু উদাহরণ আছে। 'মৃণালিনী'তে হেমচন্দ্রের ভৃত্য দিগ্‌বিজয় ইহার অন্যতম উদাহরণ। 'ছদ্মবেশ' প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, নায়কের অনুরাগিণী নারী বহুস্থলে নায়কের বালক-ভৃত্যের ছদ্মবেশে নায়কের প্রণয়-পাত্রীর নিকট প্রণয়দূত সন্দেশহারকের কার্য্য করিয়াছে।]

কাব্য ও রসশাস্ত্রের জগৎ ছাড়িয়া বাস্তব-জগতের অর্থাৎ সাধারণ মানবসমাজের দিক্ হইতে কথাটার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের বর্ত্তমান সমাজে 'কন্যাত্বমাতোপবনা সলজ্জা নবযৌবনা'র পূর্ব্বরাগের, রাসক-সজ্জা, মান, বিরহ, মিলন প্রভৃতি অবস্থায়, স্বয়ংবরার গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহের, অথবা স্বাধীনযৌবনার উদ্দাম প্রেমলীলার সুযোগ না থাকিলেও, আজও বাঙ্গালীর ঘরে-ঘরে কুলকন্যা ও কুলবধূদিগের সই, মিতিন, মনের কথা, মনমিল, মোহন-হাসি, মকর, গঙ্গাজল, মহাপ্রসাদ, বেগুনফুল, আতর, গোলাপ, ল্যাভেণ্ডার, ওডিকলন প্রভৃতি সমবয়স্কা প্রতিবেশিনী আছেন; তাঁহাদিগের কাছে সুখের দুঃখের কথা বলিয়া লজ্জাবতী কুলবতীরা হৃদয়ের ভার লঘু করিয়া তৃপ্তিবোধ করেন।

'জানালে আপন জনে মনের বাসনা।
ব্যথিত হৃদয় পায় অনেক সান্ত্বনা।'

—নবীন তপস্বিনী, ৪র্থ অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক।

এইরূপ সমদুঃখসুখা সমবয়স্কা প্রতিবেশিনী সুখের সময় রঙ্গব্যঙ্গ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, আবার দুঃখে সান্ত্বনা ও সৎপরামর্শ দেন, অসময়ে সাহায্য ও শুশ্রূষা করেন, পতি-পত্নীতে মনোমালিন্য ঘটিলে নারীসুলভ উপায়ে প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন, ইত্যাদি। যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় দেখা যায়, শ্রীরাধা সখীদিগের কর্ণে রজনীবিলাসের কথা-মধু ঢালিয়া 'আনন্দ ওর' পাইতেছেন, তেমনি বাস্তববর্ণনায় (realistic picture) বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন, 'কোন রসিকা যুবতী অর্দ্ধস্ফুটস্বরে স্বামীর রসিকতার বিবরণ সখী-

দের কাণে কাণে বলিয়া' তৃপ্তি পাইতেছেন। ('বিষবৃক্ষ', ৯ম পরিচ্ছেদ।) আবার সহরের বড় বড় ঘরে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর পেয়ারের দাসী (বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় খাস কী) থাকে, এই দাসীই মন্থরার ন্যায় মন্ত্রণাদায়িনী, আবার অসময়ে সান্ত্বনাদায়িনী। আর মনিব ঠাকুরাণীর 'প্রসাধন' অর্থাৎ সাবান মাখাইয়া গা ধোয়াইয়া চুল বাঁধিয়া টিপ পরাইয়া দেওয়া ত তাহার নিয়মিত কায। বিলাতী সমাজের Lady's maid বা femme-de-chambre ইহার সহিত তুলনীয়। অতএব দেখা গেল, এই শ্রেণীর পাত্রীগণ শুধু যে কাব্যজগতের উপযোগী উপকরণ তাহা নহে, বাস্তব-জগতেও তাহাদিগের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আছে। আসল কথা, সাহিত্য সমাজের দর্পণ; সমাজে প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার সুসংস্কৃত অলঙ্কৃত বা idealised হইয়া কাব্যে স্থান পায়। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু আদিরসের ব্যাপারেই সখীর কার্য্য পর্য্যবসিত নহে, সংসারের ছোট বড় সকল সুখদুঃখেই সখী সমবেদনাময়ী ও বিশ্বাসপাত্রী।

যাক্, বাস্তবজগৎ ছাড়িয়া আবার কাব্যজগতে ফিরিয়া যাই। শুধু লৌকিক সাহিত্যে কেন, ধর্ম্মসাহিত্যেও দেখা যায়, দিব্য বা দিব্যাদিব্য নায়ক-নায়িকাদিগের প্রেমলীলায় এই অঙ্গ অপরিহার্য্য। কৃষ্ণলীলার কথা-ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি; আবার শিবদুর্গার-লীলাত্মক শিবায়ন, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে দেখা যায়, ভগবতীর জয়া-বিজয়া যুগল-সখী আছেন; ঠাকুরের সঙ্গে ঠাকুরাণীর অকৌশল হইলে তাঁহারা নানা-ভাবে ঠাকুরাণীকে সাহায্য করিতে, সৎ-পরামর্শ দিতে, শান্ত বা উত্তেজিত করিতে, তৎপর।

লৌকিক সাহিত্যে দেখা যায়, কালিদাস-ভবভূতি, শ্রীহর্ষ-বাণভট্ট প্রভৃতি মহাকবিগণের কাব্য-নাটকেও এই ব্যবস্থা বাহাল আছে। মহাভারতের শকুন্তলা একাই একশ', প্রগল্‌ভা নায়িকা, বাহাদুর মেয়ে; তিনি অম্লানবদনে দুষ্মন্তের নিকট নিজের জন্মবৃত্তান্ত তারাইয়া তারাইয়া বলিলেন, এবং নিজের গর্ভজাত পুত্র রাজা হইবে দুষ্মন্তের সহিত এই সর্ত্ত আঁটিয়া তবে গান্ধর্ব্ববিবাহে রাজী হইলেন; এমন প্রবলা অবলার সখীর সহায়তার প্রয়োজন নাই; কিন্তু কালিদাসের ব্রীড়াবতী শকুন্তলার যুগলসখী আছে। আর্ষ-রামায়ণে জনমদুঃখিনী সীতার সখী নাই, কিন্তু শ্রীকণ্ঠ-পদলাঞ্ছন ভবভূতি ও মাইকেল-পদলাঞ্ছন মধুসূদন করুণা-পরবশ হইয়া তাঁহার দুঃখের ভাগ লইবার জন্য (বাসন্তী ও সরমা) সমবেদনাময়ী সখীর সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ উর্ব্বশীর চিত্ররেখা আছে, মালবিকার বকুলাবলিকা আছে, সাগরিকার সুসঙ্গতা আছে, মালতীর 'ধাত্রেয়ী পরমার্থ-ভগিনী প্রিয়সখী' লবঙ্গিকা আছে, বসন্তসেনার মদনিকা আছে, 'নাগানন্দে' মলয়বতীর চতুরিকা আছে, কাদম্বরীর তরলিকা আছে, সুবন্ধুর বাসবদত্তার তমালিকা আছে, সে নায়িকার স্বপ্নদৃষ্ট নায়কের* সন্ধানে যাইতে প্রস্তুত।

প্রতীচীর শ্রেষ্ঠ কবি শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে দেখা যায়, মিশরসুন্দরী ক্লিওপেট্রার (কালিদাসের শকুন্তলার ন্যায়) যুগলসহচরী চার্ম্মিয়ান ও আইরাস আছে; পোর্শিয়ার সহচরী নেরিসা আছে, ('The Two Gentlemen of Verona'র) জুলিয়ার সহচরী লুসেটা আছে, ফরাসী রাজকুমারী ক্যাথারিনের নর্ম্মসখী Alice আছে, ডেস্‌ডে-মোনার পার্শ্বচারিণী এমিলিয়া আছে, (The Winter's Tale এ) হার্ম্মিওনির দুঃখের দিনে শুভানুধ্যায়িনী সম-বেদনাময়ী পলিনা আছেন। Coriolanusএর পত্নী কোমল-প্রকৃতি ভার্জ্জিলিয়ার ভ্যালেরিয়া সখী আছেন (ইহা ছাড়া স্নেহময়ী শ্বশ্রূও তাঁহার হৃদয়ে বল দিতেছেন); হার্ম্মিয়া-হেলেনা সমবয়স্কা সহপাঠিনীদিগের ছেলেবেলা হইতে গলায় গলায় ভাব ছিল, তাহারা প্রাণের কথাটি পরস্পরকে না বলিয়া কখনও স্বস্তিবোধ করিত না; শেষে কন্দর্প-ঠাকুরের ও পরীরাজ্যের বিদূষকের খেয়ালে তাহারা প্রেমের পথে প্রতিযোগিনী হইলে সে অনুপম সখ্যরস ঈর্ষ্যাদুষ্ট বিকৃত হইয়াছিল। এই অবস্থায় হেলেনার অনুযোগবাক্যগুলি (৬) হইতে তাহাদের পূর্ব্ব-সখিত্বের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

---

(৬) Is all the counsel that we two have shared,
The sister's vows, the hours that we have spent,
When we have chid the hasty-footed time
For parting us,—O, is it all forgot?
All school-days' friendship, childhood innocence?
We, Hermia, like two artificial gods,
Have with our needles created both one flower,

'বোনে বোনে' প্রবন্ধে ('ভারতবর্ষ' ৪র্থ বর্ষ, ১ম খণ্ড ভাদ্র ১৩২৩, পৃঃ ৩৯২ অথবা লেখকের 'স্বাবাসুধা' পৃঃ ৪০-৪২ দ্রষ্টব্য) বলিয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র কোন কোন স্থলে সখীর পরিবর্ত্তে স্নেহময়ী ভগিনী, ননন্দা বা সপত্নীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারাও সখীস্থানীয়া। (শেক্‌স্‌পীয়ারের কয়েকখানি নাটকে ভগিনীর সখিত্বের সুন্দর চিত্র আছে, উক্ত প্রবন্ধে তাহাও প্রাসঙ্গিক-ভাবে দেখাইয়াছি।) উল্লিখিত প্রবন্ধে ইহাও বুঝাইয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে নায়িকা অনূঢ়া হইলে সখীর ব্যবস্থা, বিবাহিতা হইলে বোন, ননদ, সতীন প্রভৃতি আত্মীয়াদিগের সখিত্বের ব্যবস্থা। কোথাও কোথাও বিবাহিতার বেলায়ও সখীর ব্যবস্থা আছে ; এই ব্যতিক্রমের কারণও উক্ত প্রবন্ধে দর্শাইয়াছি।

অবশ্য, সর্ব্বত্র যে নায়িকার সখী বা সখীস্থানীয়া ভগিনী, ননন্দা প্রভৃতি আত্মীয়ার অবতারণা করিতে হইবে এমন কোন মাথার দিব্য দেওয়া নাই। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা নাই, সে সকল ক্ষেত্রে একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে এরূপ ব্যবস্থা না থাকার সঙ্গত কারণও ধরা পড়ে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে দেখি, হিমালয়-কন্যা গৌরীর নর্ম্মসখীর অপ্রতুল নাই, কিন্তু দক্ষকন্যা সতীর সখী নাই ; ইহাতেই পিতৃ-বিড়ম্বিতা পতিপ্রাণা সতীর পতিনিন্দা-শ্রবণে প্রাণত্যাগের অরুন্তুদ করুণরস (tragic pathos) আরও ঘনীভূত হইয়াছে, নিদারুণ বিয়োগান্ত শোককাব্য আরও জমাট বাঁধিয়াছে। এইরূপ অবিচলিত-পতিভক্তিমতী সীতা-সাবিত্রীর রামায়ণ মহাভারত-পুরাণাদিতে এবং সমশ্রেণীয় নায়িকা বেহুলার প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে সমবেদনাময়ী সখীর সমাগম নাই। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকেও দেখা যায় যে, ভাগ্যবিপর্য্যয়ের নিদারুণ করুণরস ঘনীভূত করিবার জন্য কবি কোর্ডিলিয়া-জুলিয়েট-ওফিলিয়াকে সখীভাগ্যে বঞ্চিত করিয়াছেন। কোর্ডিলিয়ার ভগিনীদ্বয়ের ঈর্ষ্যাদুষ্ট ও নীচ স্বার্থপর ক্রূর ব্যবহার, জুলিয়েটের ধাই-মার স্থূল গ্রাম্য রসিকতা ও অবশ্য বিষয়বুদ্ধি এবং ওফিলিয়ার প্রতি পিতা ও ভ্রাতার উপদেশবাণ-নিক্ষেপ তাহাদিগের নিদারুণ কাহিনীকে আরও নিদারুণ করিয়া তুলিয়াছে। স্বামিসহচরীবিতা আইমোজেনের রাজকন্যার উপযুক্ত lady-in-waiting আছে, কিন্তু তাঁহার যত কিছু সুখ-দুঃখের কথা, যত কিছু পরামর্শ, স্বামীর বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত। আবার লঘুপ্রকৃতি ভীনাস্, হেলেন্, ক্লেওপেট্রা ও হেমলেট-জননীর সখী নাই। প্রকৃতি-দুহিতা মিরাণ্ডা-পার্ডিটার 'রঙ্গিনী সঙ্গিনী' থাকিতে পারে না। উগ্রচণ্ডা ক্যাথারিন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লেডি ম্যাক্‌বেথ, দানবী Goneril Regan, বীরনারী হিপোলাইটা, রোম্যান মেট্রনের আদর্শ Cato's daughter, Brutus' Portia ও লুক্রেশিয়া, (৭) সংযমশীলা ধর্ম্মপ্রাণা ইজাবেলা, আত্মসমাহিতা ভায়োলা,—ইঁহাদের কাহারও সখী নাই, থাকিতে পারে না, থাকিবার প্রয়োজন ও উপযোগিতা নাই। ইহার সাধারণ সূত্র এইভাবে বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে :—যে সকল নায়িকার সখীর ব্যবস্থা নাই, তাহারা হয় গম্ভীরা দৃঢ়প্রকৃতি আত্মসমাহিতা আত্মবলে নির্ভরক্ষমা, না হয় নিতান্ত লঘুপ্রকৃতি, সখ্যবন্ধনের, গভীর স্নেহ-অনুভবের অনুপযুক্তা। এই উভয় শ্রেণীর নায়িকার সখীর ব্যবস্থা করিলে তাহাদিগের চরিত্রের অসঙ্গতি হইত, অসঙ্গতি ঘটিত। (৮) ইহা ছাড়া, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিদারুণ করুণরস ঘনীভূত

Both on one sampler, sitting on one cushion,
Both warbling of one song, both in one key,
As if our hands, our sides, voices and minds ;
Had been incorporate. So we grew together,
Like to a double cherry, seeming parted,
But yet an union in partition ;
Two lovely berries moulded on one stem ;
So, with two seeming bodies, but one heart.
A Midsummer Night's Dream, Act III Sc. II.

(৭) লুক্রিসের পরিচারিকা আছে, সে তাঁহার সর্ব্বনাশের পর তাঁহার বিবর্ণ অশ্রুমুখ মুখ দেখিয়া সমবেদনায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছে এবং তাঁহার মর্ম্মান্তিক বেদনার কারণ জানিতে চাহিয়াছে ; কিন্তু লুক্রিস্ তাহাকে সেই মর্ম্মান্তিক বেদনায়, সেই অকথ্য অত্যাচারের কথা, বলেন নাই। সুতরাং পরিচারিকা 'বিশ্বাসবিশ্রম্ভকারিণী পার্শ্বচারিণী সখী' নহে।

(৮) এক্ষেত্রে লেডি ম্যাক্‌বেথ সম্বন্ধে Mrs Jameson-এর মন্তব্য স্মর্ত্তব্য :—"To have given her a confidante would have been a degrading resource and have disappointed

করিবার উদ্দেশ্যেও কবিগণ নায়িকাকে একাকিনী অসহায়া সখীভাগ্যহীনা করিয়া কল্পনা করিয়াছেন।

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে নির্দ্দিষ্ট মূলসূত্র ধরিয়া বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারিব, কিজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকা-বর্ণিতে আত্মসমাহিতা আয়েষার, আত্মনির্ভরক্ষমা সদা-হাস্যময়ী ললিতলবঙ্গলতার,(৯) সখীর প্রয়োজন নাই, জাঁহাবাজ ও রাশভারী রোহিণীর(১০), ঐশ্বর্য্যদৃপ্তা ভোগ-সুখনিরতা জেবউন্নিসার,(১১) সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা বিলাসবাসনা-পূরিতা সুরামত্তা উদিপুরীর সখীর প্রয়োজন নাই, ধর্ম্মপ্রাণা পতিদেবতা কল্যাণী বা নন্দার সখীর প্রয়োজন নাই। সখীর সমবেদনা, সাহচর্য্য ও সাহায্যের অভাবে ঊনষোড়শী যুবতী রজনীর এবং মনোরমা, কুন্দনন্দিনী(১২) ও দরিয়ার(১৩) জীবনকাব্য করুণভাবে ফুটিয়াছে। রামদয় মিত্রের প্রথম পক্ষ 'দুখা' ভুবনেশ্বরীকে গ্রন্থকার এমন অবহেলা করিয়া back-groundএ ফেলিয়াছেন যে, তাহার জন্য একটা 'দুর্ব্বলা দাসী'র পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের অঙ্কিত সখীবৃন্দ।

এইবার 'নেতি নেতি' ছাড়িয়া দেখা যাউক, কোথায় কোথায় বঙ্কিমচন্দ্র আবহমানকাল-প্রচলিত প্রাচীন পন্থার অনুসরণ করিয়া নায়িকা প্রতিনায়িকা প্রভৃতির সখীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে শৈলেশ্বর-মন্দিরে নায়ক কুমার জগৎসিংহ-নায়িকা তিলোত্তমার সনভিব্যাহারিণী 'বাগ্‌বিদগ্ধা বয়োধিকা' বিমলাকে দেখিয়া 'বিবেচনা করিলেন যে, ইনি নবীনার সহচারিণী দাসী হইবেন; অথচ সচরাচর দাসীর অপেক্ষা সম্পন্না।' পাঠকও যদি সেইরূপ ধারণা করেন, তাহা হইলে অসঙ্গত হয় না, কেন না আখ্যায়িকার প্রথম খণ্ডে বিমলার আচরণ এই শ্রেণীর সখীর ন্যায়। নায়ক-নায়িকার চারি চক্ষুঃ সংমিলিত হইলে তিনি পরিহাস করিলেন, 'কি লো! শিবলাভাৎ স্বয়ংবরা হবি না কি?' পরে তিনি তিলোত্তমার পূর্ব্বরাগ-লক্ষণ দেখিয়া উৎকণ্ঠিতা হইলেন। সরলা বালিকার সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তায় বুঝা যায় যে তিনি ব্যথার ব্যথী। তাহার পর তিনি তিলোত্তমার

---

and enfeebled all our previous impression of her character."

একজন ইংরেজ আখ্যায়িকা-কারের বিশ্লেষণ এস্থলে বেশ কার্য্যকর :—

There are some moments in life in which both men and women feel themselves imperatively called on to make a confidence.....There are people of both sexes who never make confidences;.....but such are generally dull, close, unimpassioned spirits, "Gloomy Gonmes, who live in cold dark mines."

Anthony Trollope; Barchester Towers, Ch. 41.

(৯) গ্রন্থকার অবতরণের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন :—

'ললিতলবঙ্গলতা কিছুতেই টলে না। লবঙ্গলতা মহান্ ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যে পড়িয়াছে—তবু সেই সুখময় হাসি; যে রজনী হইতে এই ঘোর বিপদ ঘটিয়াছে, তাহারই মুখে উঠিতেছে, তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে, তবু সেই সুখময় হাসি! আমি সম্মুখে—তবু সেই সুখময় হাসি! অথচ, আমি জানি, লবঙ্গ কোন কথাই ভুলে নাই।'—'রজনী' ৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ, অবতরণের কথা।

অবতরণের গ্রন্থও এই সাটিফিকেট সত্ত্বেও কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে, দুইটিবার স্থলে ললিতলবঙ্গলতা তাহার স্বভাবসিদ্ধ সংযম হারাইয়াছে। কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য।

(১০) 'রোহিণী একা জল আনিতে যায়—জল বাঁধিয়া ঘড় হালকা মেঘের সঙ্গে হালকা হাসি হাসিতে হাসিতে হালকা কলসীতে হালকা জল আনিতে যাওয়া রোহিণীর অভ্যাস নহে। রোহিণীর কলসী ভারি, চলেচলনও ভারি।'—'কৃষ্ণকান্তের উইল', প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(১১) 'তাহার [দর্পচূর্ণ হইলে চঞ্চলকুমারী নবাবকের সহিত তাহার মিলন সংঘটন করিয়া দিয়া সখীর কার্য্য করিয়াছেন।'—'রাজসিংহ' ৮ম খণ্ড, ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(১২) বঙ্কিমচন্দ্র 'মন্দভাগিনী চিরদুঃখিনী' কুন্দনন্দিনীকে একেবারে সখীভাগ্যে বঞ্চিত করেন নাই। বাল্যে পিতৃবিয়োগের পরেই তাহার 'দয়াময়ী ও সঙ্গিনী' চাঁপাকে তাহার পার্শ্বে বসাইয়াছেন। চাঁপা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, কুন্দও তাহাকে মনের কথা বলিয়াছে। (৪র্থ পরিচ্ছেদ।) যৌবনে কোনও কোনও সময়ে কমলমণি তাহাকে স্নেহবাক্য বলিয়াছেন। (বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করিব)। তথাপি বলিতে হইবে, যৌবনে তাহার গভীর মনোবেদনায় শান্তি দিবার জন্য সমবেদনাময়ী সখী নাই। হীরার দিনকতকের জন্য কপট ভালবাসা অবশ্য সখির নহে।

(১৩) দরিয়ার অতিবেশিনী কতেমা বিবি ও 'মোটা গুজরাটী আর একটা বুড়ী দুটু কি খালা'—ইহাদের কাহারও কাছে সে মনের বেদনা প্রকাশ করে নাই। ('রাজসিংহ' ১ম খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।) সে আত্মসমাহিতক্ষমা, এজন্যও তাহার সখীর প্রয়োজন হয় নাই।

দূতী সাজিয়া জগৎসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং অন্যের অজ্ঞাতে প্রেমিক-প্রেমিকার নিভৃতে মিলন ঘটাইয়া দিলেন। 'তিনি গল্পিকে মনোরথ সিদ্ধ করিয়াছেন' বলিয়া 'তাঁহার মুখ অতি হর্ষপ্রফুল্ল'; আবার তিনি 'কৌতূহল-প্রযুক্ত দ্বারধার্য এক ক্ষুদ্র রন্ধ্র হইতে গোপনে তিলোত্তমার ও রাজকুমারের ভাব দেখিতে লাগিলেন।' এ সকলই শ্রীরাধার ললিতা-সখী ও বৃন্দা-দূতীর ন্যায়। তিনি তিলোত্তমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহশালিনী ও তাহার হিতকামী। যাহা হউক, পরে নায়িকা ও পাঠক জানিলেন যে, বিমলা প্রকৃতপক্ষে তিলোত্তমার বিমাতা, কোনও গুরুতর কারণে 'পরিচারিকা' বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। সুতরাং বিমলার সখিত্বকে বিমাতৃ-স্নেহের উজ্জ্বল চিত্র-হিসাবে 'সতীন ও সংসার' প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। (ভারতবর্ষ কার্ত্তিক ১৩২১)।

আবার পূর্ব্বকথা (বিমলার পত্র 'সমাপ্ত' ২য় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ) হইতে জানা যায় যে, বিমলা এক সময়ে মানসিংহের অন্যতমা মহিষী উর্ম্মিলা দেবীর 'সহচারিণী' ছিলেন; তবে তিনি সখীর ন্যায় উর্ম্মিলা দেবীর পতিপ্রেমে সহায়তা করেন নাই, উর্ম্মিলা সখীই তাঁহার গুপ্তপ্রণয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই সময়ে আসমানি বিমলার পত্রহারী দূতীর কার্য্য করিয়াছে এবং প্রেমিক বীরেন্দ্র-সিংহকে বারিবাহক দাসের ছদ্মবেশে প্রেমিকার নিকট নিভৃতে মিলাইয়াছে।

আর এক কথা। তিলোত্তমা যখন কারাগারে জগৎ-সিংহের রূঢ় ব্যবহারে মূর্চ্ছাগতা, তখন আয়েষা জগৎসিংহের অজ্ঞানে তথায় আসিয়া তিলোত্তমার পরিচয় পাইয়া, শ্রীরাধার সখীজনের ন্যায়, 'তিলোত্তমাকে কোলে করিয়া বসিলেন। আর কেহ কোনরূপ সঙ্কোচ করিতে পারিত; সাত পাঁচ ভাবিত, আয়েষা একেবারে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।' ইত্যাদি (২য় খণ্ড, ১৪শ পরিচ্ছেদ)। এ ক্ষেত্রে তাঁহার আচরণ সমবেদনাময়ী সখীর ন্যায়। কবি এই ব্যাপারে 'চমৎকার-কারিণী পরহিত মূর্ত্তিমতী' আয়েষার করুণা, উদারতা ও ঈর্ষ্যাহীনতার পরিচয় দিয়াছেন।

'কপালকুণ্ডলা'র নায়িকা কপালকুণ্ডলা কুমারী-জীবনে হিজলীর জঙ্গলে মিরাণ্ডার ন্যায় সঙ্গিনীহীনা ছিলেন, ইহাই প্রকৃতি-দুহিতার উপযোগী। কিন্তু বিবাহিত-জীবনে সপ্তগ্রামে তিনি স্নেহময়ী ননন্দা শ্যামার সহিত সখিত্বসূত্রে আবদ্ধা। এই সখিত্বের আলোচনা 'ননদ-ভাজ' প্রবন্ধে করিয়াছি। (ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক ১৩২০ বা লেখকের 'কাব্যসুধা' দ্রষ্টব্য।) প্রতিনায়িকা নূৎফউন্নিসার জীবন-কাব্য যখন ঘোরালো হইয়া আসিল, তখন তাঁহার পার্শ্বে বাঁদী পেষ্‌মন্‌কে দেখিতে পাই। আবার তিনি ও মিহরুন্নিসা 'বাল্যসখী' ছিলেন। আবার নূৎফউন্নিসা, রাজপুতপতি রাজা মানসিংহের ভগিনী, 'যুবরাজ সেলিমের প্রধানা মহিষী' খস্রুজননীর 'প্রধানা সহচরী' ছিলেন। তবে সম্পর্কটা ঠিক উর্ম্মিলাদেবীর সহিত বিমলার সম্পর্কের অনুরূপ নহে। 'নূৎফউন্নিসা প্রকাশ্যে বেগমের সখী, পরোক্ষে যুবরাজের অনুগ্রহভাগিনী হইলেন।' (৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।) যাহা হউক, এরূপ সম্পর্ক-সত্ত্বেও রাজ-নীতিক ষড়যন্ত্রে তিনি বেগমের সম্পূর্ণ সহায়তা করিয়া-ছিলেন, তবে সে 'আত্মপ্রাধান্য-রক্ষার জন্য।'

মৃণালিনীর সখীভাগ্য শকুন্তলা-ক্লিওপেট্রা অপেক্ষাও সুপ্রসন্ন। তাঁহার তিন সখী—মণিমালিনী, গিরিজায়া ও রত্নময়ী, তবে ঠিক সমকালে নহে। ইহা ছাড়া পিতৃগৃহে গুপ্তপ্রণয়-ব্যাপারে 'দূতী' ছিল। এই দূতীই মাধবাচার্য্যের নিকট হইতে হেমচন্দ্রের সঙ্কেত-আঙ্গটি আনিয়াছিল (৩য় খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ)। একবার ধাত্রীযাত্র(১৪) সঙ্গে লইয়া রাত্রিকালে হেমচন্দ্রের সহিত তিনি গোপনে মিলিত হইয়াছিলেন। আবার তিনি নিজে মথুরার রাজকন্যার সখী ছিলেন (৪র্থ খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ)। তাঁহার সহিত জলবিহার করিতে গিয়াই মৃণালিনী জলমগ্ন হইয়াছিলেন ও উদ্ধারকর্ত্তা হেমচন্দ্রের সহিত মৃণালিনীর অন্যোন্যানুরাগ হইয়াছিল।

'বিষবৃক্ষে' নায়িকা সূর্য্যমুখীর স্নেহময়ী ননন্দা কমলমণি সখীর ন্যায় সমবেদনাময়ী। এই চিত্রের বিচার 'ননদ-ভাজ' প্রবন্ধে করিয়াছি। প্রতিনায়িকা কুন্দনন্দিনীর বাল্যসখী চাপার কথা ও মন্দভাগিনীর যৌবনকালে কখনও কখনও কমলমণির সমবেদনার কথা ১২ নং পাদটীকায় উল্লেখ

(১৪) সাহিত্যদর্পণে 'ধাত্রেয়ী' নায়িকা-সহায়িনী হইবার কথা আছে, মালতীমাধবে উহার উদাহরণও আছে, ধাত্রীর কথা নাই। তবে ডুমিরেটের ধাত্রী সম্ভব। ইহা ইতালীয় সমাজের বহুদর্শিনী duenna দের।

করিয়াছি। ইহারা দাসী কুন্দর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল বটে, নিজ বাটীতেও তাহাকে দিনকতক যত্ন আদর করিয়াছিল তাহাও বটে, কিন্তু ইহা 'ভাইনের মায়া'; তাহার মনোগত ঈর্ষা ও কুটিলতা পাঠকের অবিদিত নাই। (২০, ৩৩শ ও ৪৭এর পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।) শেষে সে কুন্দকে বিষ খাইতে প্রবৃত্তি দিল ও বিষের মোড়ক তাহার হাতের কাছে রাখিল। অতএব 'অসামান্যা সরলা' কুন্দ তাহাকে 'বিশ্বাসভাগিনী' বিবেচনা করিলেও, পাঠকবর্গ তাহাকে অবশ্য সমদুঃখসুখা 'বিশ্বাস-বিশ্রামকারিণী পার্শ্বচারিণী সখী' মনে করিবেন না। ইহার 'গঙ্গাজল' মাসতী গোয়ালিনীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনীর দূর-সম্পর্কীয়া ননন্দা সুন্দরী সখীস্থানীয়া। এই চিত্রের বিচার 'ননদ-ভাজ' প্রবন্ধে করিয়াছি। দলনীর পরিচারিকা কুলসম্ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'রজনী'তে সখীর বালাই নাই। পূর্ব্বেই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমরের দুঃখের দিনে জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনী সখীস্থানীয়া। 'বোনে বোনে' প্রবন্ধে এই চিত্রের বিচার করিয়াছি। সুখের দিনে ভ্রমরের কেন সখী নাই, সে কথার বিচারও উক্ত প্রবন্ধে করিয়াছি। কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম :—"ভ্রমরের সুখের দিনে, স্বামি-সৌভাগ্যের দিনে, সখীর প্রয়োজন হয় নাই—গোবিন্দলালের প্রগাঢ় প্রণয়ে তাঁহার হৃদয় এমন ভরপুর যে, তিনি সখীর অভাব অনুভব করেন না, ননদের সহিত মাখামাখিরও প্রয়োজন বুঝেন না। এইটুকু বুঝাইবার জন্য কবি ভ্রমরের সুখের দিনে সখী প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন নাই। (যেমন ভবভূতি সীতার সুখের দিনে বাসন্তী সখীর ব্যবস্থা করেন নাই, কারণ তখন সমদুঃখসুখা সখীর প্রয়োজন নাই।)" ভ্রমরের প্রসঙ্গে ক্ষীরি চাকরানী উল্লেখযোগ্য।

'পুনর্লিখিত ও পরিবর্দ্ধিত' 'ইন্দিরা'র ইন্দিরার সুখের দিনে কনিষ্ঠা ভগিনী কামিনী সখীস্থানীয়া। এই চিত্রের বিচার 'বোনে বোনে' প্রবন্ধে করিয়াছি। ইন্দিরার দুঃখের দিনে, অর্থাৎ সে "যখন পিতৃগৃহ ও পতিগৃহ হইতে চ্যুতা, প্রবাসিনী পরান্নজীবিনী পরাবসথশায়িনী, স্বামীর সহিত মিলনের আশা সুদূরপরাহত, তখন সেই দুর্দ্দিনে স্নেহময়ী সমবেদনাময়ী সতত শুভানুধ্যায়িনী সখী সুভাষিণী তাহার সান্ত্বনাদায়িনী ও পরমসহায়।" ('বোনে বোনে' প্রবন্ধ।) সুভাষিণীর সখিত্ব এই আখ্যায়িকার উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। তাহারই (prelude) সূচনা-স্বরূপ অমলা-নির্ম্মলা বালিকাদ্বয়ের সখিত্বের ক্ষুদ্র চিত্র (৪র্থ পরিচ্ছেদ) গ্রন্থের প্রথম ভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দাসী চারাণী একটিবার পত্রহারী দূতীর কার্য্য করিয়াছে (১২শ পরিচ্ছেদ), ইহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

'যুগলাঙ্গুরীয়ে' নায়িকা হিরণ্ময়ীর 'প্রতিবাসিনী অমলা নামে গোপকন্যা' উল্লেখযোগ্য।

'রাধারাণী'তে বসন্তকুমারীর সখিত্ব পরিবর্দ্ধিত 'ইন্দিরা'র সুভাষিণীর সখিত্বের পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য। আর দাসী চিত্তা যথাসময়ে শাঁকে ফুঁ দিয়াছে (৮ম পরিচ্ছেদ)। ইহাতে শ্রীরাধার ললিতা সখীকে একটু একটু মনে পড়ে না কি?

'আনন্দমঠে' শান্তির গার্হস্থ্য জীবনে স্নেহময়ী ননন্দা নিশাই সখীস্থানীয়া। সে শান্তির দুঃখে সমবেদনা দেখাইয়াছে, পতির সহিত শান্তির মিলন সংঘটন করিয়াছে, মিলনান্তে তাহার মুখে সুখবোধ করিয়াছে, নর্ম্মালাপ করিয়াছে, সকলই সখীর কার্য্য। এই চিত্রের বিচার 'ননদভাজ' প্রবন্ধে করিয়াছি। পরে শান্তির জীবনে যে মহা-পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, তাহাতে আর তাঁহার সখীর প্রয়োজন হয় নাই, তখন সে স্বামীর সহিত একাত্মতাবন্ধনে মিশিয়াছে।

'দেবীচৌধুরাণী'তে প্রফুল্লর স্বামি-সন্দর্শনে জন্ম সার্থক করাইয়া অসূয়াশূন্যা সমবেদনাময়ী সপত্নী সাগর সখীর কার্য্য করিয়াছে। আবার প্রফুল্ল পরে সাগরের মানভঞ্জনে, ব্রজেশ্বর-কর্ত্তৃক সাগরের চরণ-সংবাহনে, সহায়তা করিয়া প্রিয়সখীর কার্য্য করিয়াছে। ('দেহি পদপল্লবমুদারম্' এর আর বাকী রহিল কি?) এই সপত্নীচিত্রের বিচার 'সতীন ও সংমা' প্রবন্ধে করিয়াছি। (ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক ১৩২১।) আর দেবী চৌধুরাণীর উত্তরজীবনে যুগলসখী নিশি ও দিবা।

'সীতারামে' দেবী চৌধুরাণীর স্থানীয়া শ্রীর যুগল-সখীর স্থলে এক সখী সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী। আর রমার স্নেহময়ী সপত্নী নন্দা সখীস্থানীয়া। এই চিত্রের বিচার 'সতীন ও সংমা' প্রবন্ধে করিয়াছি। যদিও বিচার শেষে রমা মুক্তিস্নাত

হইলে তাঁহাকে 'সখীরা ধরাধরি করিয়া আনিয়া শুয়াইল' এইরূপ গ্রন্থকারের উক্তি আছে বটে (৩য় খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ), তথাপি নন্দাই রমার প্রকৃত সখী। বিপৎকালে সমবেদনা দেখাইয়া ও সৎপরামর্শ দিয়া, পতিকে রমার অনুকূল করিয়া, রমার কলঙ্কভঞ্জনে সবিশেষ সহায়তা করিয়া, রমার মরণকালে পতির সহিত তাহার মিলন-সংঘটন করিয়া, নন্দা প্রকৃত হিতৈষিণী সখীর কার্য্য করিয়াছেন। দাসী মুরলাকে লোকে রমার 'দূতী' মনে করিয়াছিল এবং পাঁচকড়ির মা শ্রীকে বিপৎকালে তাহার স্বামিসন্দর্শনে সহায়তা করিয়াছিল, এই দুইটি উদাহরণও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য।

'পুনঃ প্রকাশিত' 'রাজসিংহে' রূপনগরের রাজকন্যা নায়িকা চঞ্চলকুমারীর সখী নির্ম্মলকুমারী সখীকুলশিরোমণি। ঘোষ-পুত্রী বেগমের বিশ্বাসপাত্রী দেবী চাকরানীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য (১৫)।

বর্ত্তমান প্রবন্ধ অবতরণিকা-মাত্র। ক্রমশঃ এই সখী সম্প্রদায়ের শ্রেণীভেদে সবিস্তারে আলোচনা করিব।

(১৫) দেবী চাকরানী, দেবী চাকরানী প্রভৃতিকে কেন এই শ্রেণীভুক্ত করিলাম, তাহার কৈফিয়ত পরবর্ত্তী প্রবন্ধে দিব।

নিরুদ্দেশ

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু]

সান্ধ্য-ভ্রমণ আমার নিত্য-অভ্যাস। কিন্তু আজ আমি শ্রান্ত, ক্লান্ত, একান্ত অবসন্ন,—আজ আর পারিয়া উঠিতেছি না। আমার কেবলই মনে হইতেছে, এই যে নবনীত-কোমল শয্যার উপর শ্রান্ত কায় ঢালিয়াছি, আর যেন না উঠিতে হয়,—যেন অনন্ত—অনন্ত কাল এমনি নিশ্চিন্ত তন্দ্রাঘোরে বহিয়া যায়। আঃ কি আরাম!

মুক্ত বাতায়ন দিয়া পা টিপিয়া-টিপিয়া দক্ষিণ-পবন অতি সন্তর্পণে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তার গা'ময় বেলফুলের গন্ধ। সে গন্ধে আমার মন যেন আজ কোন্ অতীতের দেশে ভাসিয়া যাইতেছে। আজ দশ বৎসর ধরিয়া বৈদ্যুতিক পাখার ঝাপট খাইতেছি। নিখরচা বাতাস যে এমন মিষ্টি, তাহা আর মনেই নাই। সে আমাকে বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য ভয়ে-ভয়ে আস্তে-আস্তে আমার বস্ত্র ধরিয়া টানিতে লাগিল। দূর বৃক্ষশাখা হইতে একটা পাখী বাতাসের সেই নীরব মিনতি মুখরিত করিল। আজ কয়েক বৎসর কেবল টাকার ঝন্‌ঝন্ শব্দ শুনিতেছি। সাগর-কালা বাঘের মত আমার কাণ অন্য শব্দে বধির হইয়াছে। কিন্তু তবু পাখীর সে আকুল আহ্বান আজ বহুদিনের কি বিস্মৃত বারতা বহিয়া আনিতেছে! আমি আধ-ঘুম-ঘোরে, অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্রে পড়িয়া-পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম, আজ আমি মোটর চড়িতেছি, ঘুড়ি হাঁকাইতেছি, দশ-বিশ হাজার চাহিলে আমার হাতবাক্স হইতে বাহির করিয়া দিতে পারি; তথাপি এমন এক দিন ছিল যে, পাখীর গান, ফুলের গন্ধ, চন্দ্র-সূর্য্যের আলো আর পনের টাকা মাহিনার চাকরী বৈ আমার কোন ঐশ্বর্য্য ছিল না। ছিল না? একেবারে ছিল না বলিলে ভুল হয়। ছিল—সুখে-দুঃখে সদা হাস্যমুখী, অকাতর-শ্রমশালিনী, কুৎসিত গৃহের শ্রী, নিরৈশ্বর্য্যের ঐশ্বর্য্য—এক স্ত্রী। আমি মাসকাবারে মাহিনার পনেরটি টাকা আনিয়া তাঁহার হাতে দিতাম। সেই বৎসামান্য মূলধনে তিনি যে কেমন করিয়া সংসারের কার-কারবার চালাইতেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। মাসিক পাঁচ টাকা ঘরভাড়া দিয়া বাকী দশটি টাকায় দুইটি প্রাণীর কেমন করিয়া দিন যাইত, জানি না। তিনি কি আহার করিতেন, আমি জ্ঞাত নহি। কিন্তু আমার সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, নিত্য রাজ-ভোগ খাইয়া আমার দেহে দারিদ্র্যের কোন লক্ষণই বিদ্যমান ছিল না। নিঃস্বের গৃহে নিত্য সে উৎসবের আয়োজন কিরূপে হইত, কেমন করিয়া অনাপেক্ষা আমার জুতা মোজা কাপড় চাদর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত, সে ইতিহাস আমার বিদিত

নাই। আমাদের দাওয়ার সামনে একরত্তি অঙ্গনের মত ছিল। আমার স্ত্রীর ঘরে তাহাতে অজস্র বেলফুল ফুটিত। তাঁহারই গাঁথা গোড়ে গলায় দিয়া চাঁদনী রাত্রে যখন দাওয়ায় বসিতাম, ফুলের গন্ধ, পাখীর গান লইয়া কোথা হইতে বাতাস ছুটিয়া আসিত, আর লালপাড়ে ঘেরা, অস্থি-আভা-দীপ্ত গণ্ডযুগল স্পর্শ করিয়া কুঞ্চিত অধরে মু' দিতে-দিতে আমার স্ত্রী যখন কলিকাটি আনিয়া দিতেন, তখন পনের টাকা বেতন ভোগী গোলামের মনে হইত, অদৃষ্টে এত সুখ সহিলে হয়! সুখ বাস্তবিকই সহিল না। এখন লক্ষ্ণৌয়ের রহিস্‌বর্গ সেবিত খাস অম্বরী সেবন করিয়াও তেমন আবেশ পাই না। আমার স্ত্রী স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা এবং স্বল্পভাষিণী ছিলেন। আমাদের সে সান্ধ্য-বাসরে 'প্রাণপ্রিয়ে, প্রাণনাথ' শব্দের আবির্ভাব ছিল না। তিনি একটু দূরে দেওয়ালে ঠেস দিয়া তাঁহার স্বভাবতঃ অনবরাড় পা দুখানি ছড়াইয়া সুপারি কাটিতেন; মাঝে-মাঝে পরস্পরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতাম। কদাচ-কখন তাঁহার জ্যোৎস্নামাখা মুখে প্রাঙ্গণভরা বেলফুলের মত স্নিগ্ধ হাসি' ফুটিয়া উঠিত;—ব্যস্, এই পর্য্যন্ত! এখন যে কুঞ্চিত-কুন্তলা, ঝলমলাঞ্চলা, বিলাসচপলা, দামিনী-হাসিনী ভামিনীকে দেখিয়া বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাক, ইহাকে দেখিয়া তোমরা আমার সে স্ত্রীকে বুঝিতে পারিবে না। সে নিরাভরণা, জীর্ণবসনা, সম্বলরহিত, দীপ্ত-সিন্দুর-শিখা-শোভিত লক্ষ্মীমূর্ত্তি, এই প্রমোদ-চঞ্চলা, প্রসাধন-কুশলা, উগ্র-ভোগাকুলা রমণীতে নাই। যদি সে বাঁচিয়া থাকিত, যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য সেই শান্ত-শ্রীমণ্ডিত মুখখানি তোমার চক্ষের সম্মুখে ধরিতে পারিতাম—দেখিতে, তপস্বিনী আর বিলাসিনীতে কি প্রভেদ! কিন্তু আমি স্বহস্তে তাহাকে হত্যা করিয়াছি!

শুনিয়াছি, জলমগ্ন ব্যক্তি জীবনের সহিত যুদ্ধ করিয়া যখন নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, তখন একটা সুশীতল, শান্তিময় অবসন্নতা আসিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে অভিভূত করে। তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও অতীত জীবনের স্মৃতিচিত্র-সকল তাহার অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইতে থাকে, এবং সাক্ষীর ন্যায় সেই সকল দৃশ্য দেখিতে-দেখিতে সে অন্তিম নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়—আর জাগে না। আজ আমার ঠিক অনুরূপ অবস্থা,—কেবল সেই শীতল শান্তিময় অবসন্নতা নাই। আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, আমার এক বন্ধু যাচাই করিবার জন্য আমাকে এক জোড়া সোণার বালা দিয়া গেলেন। সাবাসিধে জোড়েন-পাকের গড়ন, ওজনে পাঁচভরি,—তাঁহার স্ত্রীর জন্য গড়ান লইয়াছে। যাচাই করিয়া ফেরত দিবার পূর্ব্বে কৌতুক-কুতূহলে টুক্‌টুকে বালা-দুগাছি একবার আমার স্ত্রীর হাতে পরাইয়া দিতে গেলাম। পরিতে-পরিতে তিনি হাসিমুখে বলিলেন—'পরাচ্ছ, আর আমি কিন্তু খুলে দোব না!'—'তা বেশ ত' বলিয়া পরাইলাম। সেই নিটোল মৃণাল-কোমল হাত দু'খানি বলয়িত করিয়া সোণা কি ভাবিয়াছিল বলিতে পারি না; কিন্তু আমার মনে যে ছাপ পড়িয়াছিল, তাহা এখনও মুছে নাই। বালা পরিয়া, গলায় আঁচল দিয়া আমার স্ত্রী ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে একটি প্রণাম করিলেন। তার পর উঠিয়া বালা খুলিয়া লইবার জন্য হাসিমুখে হাত দু'খানি প্রসারিত করিয়া দিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি অতি সূক্ষ্মশ্বাস সে স্বচ্ছ হাসির উপর আঁচড় কাটিয়া তীক্ষ্ণশির কাঁটার মত আমার বুকে আসিয়া বিঁধিল। সহসা আমার হাত যেন অসাড় হইয়া গেল। ক্ষণিকের স্বপ্নমোহে আমার স্ত্রী বোধ করি একটু অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। তাই তাড়াতাড়ি বলিলেন—'আশীর্ব্বাদ করলে না?' আমিও হাসিয়া বলিলাম—'করেছি।'—'কি?' 'সে খুব ভাল আশীর্ব্বাদ।'—'কি বল না?' 'জন্ম এইস্ত্রী হও?'—'সে আশীর্ব্বাদ ত আমাকে হল! আমি বেঁচে না থাকলে ত আর তুমি এইস্ত্রী থাকবে না।' আমার স্ত্রী কহিলেন—'তা হ'ক! ঐ ছাড়া আর আমাদের আশীর্ব্বাদ নেই।' আমি হাসিয়া বলিলাম—'কি? চিরকাল এমনি বাঁদিবৃত্তি? না, তা হবে না, ননী! (আমার স্ত্রীর নাম ছিল ননীবালা) যেদিন তোমার হাতে এমনি সোণার বালা দোব, সেদিন আশীর্ব্বাদ হবে।' তাঁহার মুখ একটু বিষণ্ণ হইল।—'বালা খুলে দোব না বলেছিলুম বলে বুঝি রাগ হয়েছে? তামাসা বোঝ না? একটা কথা বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, তোমার কাছে কি কখন কিছু চেয়েছি?'—বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু দুটি ছলছল করিয়া উঠিল। আমি বিপরীত বুঝিলাম। মনে হইল—গভীর অভিমান। বলিলাম—'চাও না, সেই ত তোমার দোষ! তুমি যদি খেতে শুতে আমার পিঠে চাবুক দিতে—' কথাটা

শেষ না হইতেই আমার স্ত্রী লজ্জায় অধোবদন হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'ছি ছি!'

আমি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলাম—'ছি ছি নয়, ননী, শোন। কত লোকের স্ত্রী কত কি আব্দার করে, উপদ্রব করে; তুমি একদিনের জন্যে আমার কাছে একখানা কাপড় পর্য্যন্ত চাওনি। তোমার শতগ্রন্থি কাপড় দেখে আমি যদি নিজে এনে দিয়ে থাকি, তখন হাত পেতে নিয়েছ। তাও যদি সকপাড় এনে দি, জোড়া কেটে একখানি আমার জন্যে তুলে রাখো। তুমি যে কি পরে, কেমন করে দিন কাটাও, তা আমি জানি নি, জানতে কখন কিছু চাইও নি। তুমি ত কখন কিছু বলই না। বোধ করি আমাকে নিতান্ত নাচার দেখেই কখন কিছু বল না। কিন্তু সেটা ঠিক নয়, ননী। মেয়েমানুষের তাড়ায় পুরুষমানুষ রোজকার করে, নইলে আমারই মতন লক্ষ্মীছাড়া হয়।' স্ত্রী অল্প হাসিয়া বলিলেন—'তা, বাপু, যার নেই, সে কি জাল-জুচ্চুরি করবে, না সিঁদ কাটবে?' আমি উত্তর দিলাম—'কেন? তোমার মতন লক্ষ্মী যার ঘরে, তার সংসারে কি পাপ ঢুকতে পারে?' তাঁর মুখের উপর যেন একটা ছায়াপাত হইল, বলিলেন—'লক্ষ্মী ত কেমন! বলে, স্ত্রী-ভাগ্যে ধন। আমার দুঃখের কপাল, তা তুমি কি করবে?' আমার মনে হইল, এই ত সাক্ষাৎ ছয়না! যেখানে এমন সন্তোষ—আপনার দুঃখ-দৈন্যকে সৌভাগ্যের মত চিরবরণ করিয়া অটল ধৈর্য্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সেইখানেই ত বৈকুণ্ঠ বিরাজমান! ইঁহার অক্ষয় পুণ্যফলে আমার কোন কামনা অপূর্ণ থাকিবে না। আমাকে তাঁহার মুখের পানে নীরবে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন—'কি দেখছ?' আমি উত্তর দিলাম—'লক্ষ্মীমন্ত মাড়োয়ারিরা কি বলে জান, ননী! তারা বলে, বাঙালী বাবুরা নোকরীর কাছে নসীব বাঁধা রেখে।' স্ত্রী উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—'তুমি কি চাকরী ছেড়ে দেবে না কি?'—'মাড়োয়ারীদের কথাটা একবার পরীক্ষা করব।' বলিয়া বালা দুগাছি লইয়া আমি বন্ধুকে ফেরত দিতে গেলাম। স্ত্রী একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, উৎকণ্ঠিত চিত্তে গৃহকর্ম্মে রত হইলেন।

তার পর কেমন করিয়া কি হইল, আমিই বুঝিতে পারি না, তোমাকে বুঝাইব কি? এক বৎসরের সংসার-খরচ একশো আশীটি টাকা স্ত্রীর হাতে দিয়া সামান্য মূলধন আর অসামান্য আশা, উৎসাহ, উদ্যম লইয়া আমি ব্যবসা-সাগরে ঝাঁপ দিলাম—মাণিক তুলিতে। তার পর তরঙ্গের সঙ্গে রণ, ঘূর্ণাবর্ত্তে আবর্ত্তন, ডোবা ওঠা ভাসা,—সে সব কাহিনীর বাহুল্যরূপে বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। আমি আবেদা রোকড় পত্তিয়ান লিখিতে বসি নাই। তোমাকে বলিতেছি আমার অন্তরের ইতিহাস। কেমন করিয়া কি হয়, তাহা আমি জানি না। নারিকেলে জল-সঞ্চার হয় কেমন করিয়া? একটি ক্ষুদ্র বীজ মহাকাননে পরিণত হয়, তা কি জান না? ফল কথা, আমি মাণিক তুলিয়াছি। সম্মোহন-বিদ্যা, ইচ্ছাশক্তি, এসব আমি এখন খুব মানি। মাসিক পনের টাকা হইতে যাহার আয় পনের হাজারে উঠিয়াছে, তাহাকে এ সব মানিতেই হয়।

লোকে টাকা খুঁজে, আমি দেখি টাকা আমাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। বুভুক্ষুর ক্ষুধা, আতুরের বেদন, অনাথের অশ্রু, বিধবার রোদন, সব উপেক্ষা করিয়া অর্থ আমার উপাসনা করে। লক্ষ্মীরও বর্ণাকরণ-যন্ত্র আছে। সংসার-রণক্ষেত্রে আজ আমি জীবন-যুদ্ধে জয়ী। লোকের মুখে আমার জয়গান। বলে—মতি মিত্তির বিদ্বান, বুদ্ধিমান্, ভাগ্যবান্। আমি গণ্য, মান্য, ধন্য। আজ আমার চৌরঙ্গীতে বাড়ী, চারখানা মোটর গাড়ী, দেউড়ীতে শান্ত্রী-পাহারা, ব্যাঙ্ক-ক্রেডিট্ (Bank credit) বেহুমার। সব পার্টিতে নিমন্ত্রণ পাই, সাহেব-সুবোর সঙ্গে খানা খাই! আমার স্ত্রীও এখন পার্টিতে যান, মোটর চড়িয়া হাওয়া খান, পিয়ানো বাজাইয়া গান গান। তাঁর মুখে ইংরাজী কথা শুনিয়া সাহেব মেম তারিফ্ করেন। কিন্তু এ সকল একদিনে হয় নাই, অনায়াসেও নহে। কত গুরুর আপত্তি, মান অভিমান, অশ্রুজল যে তাঁহার এই উন্নতির পশ্চাতে আছে, তাহা বলিবার সময় আমার নাই।

এক দিনের কথা বলি। যে দিন প্রথম স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়া আমি আদরে তাঁহার মুখচুম্বন করিলাম—তখনও এরূপ বেয়াদবি করিবার মত আমার বয়স, অনুরাগ সবই ছিল,—সে চুম্বনে তাঁহার প্রীতি-প্রফুল্ল চক্ষু হইতে দুইটি সুবৃহৎ অশ্রু-গোলক প্রবাল-কপোল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। তিনি আগেকার মত আমাকে একটি প্রণাম

করিয়া আমার পাদমূলে বসিলেন। তার পর কাতর ভাবে আমার মুখ চাহিয়া বলিলেন—'আজ আমায় একটি ভিক্ষা দাও।' আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—'সে কি, ননী! এত ভণিতা কেন? কি চাই বল না? তোমার জন্যেই যে আমি সব করছি।'—'তা জানি। কিন্তু অনেক হয়েছে, আর দরকার কি? চল, আমাদের সেই পাঁচ টাকার ঘরে ফিরে যাই।' আমি অধিকতর বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কেন ননী?'—'আমি ত এ সব চাই না।' স্ত্রীলোকের গহনায় অরুচি শুনিয়া আমার আশ্চর্য্যের অবধি রহিল না। বলিলাম—'এসব চাও না? তবে কি চাও?' সন্ধ্যার গগনে রক্তরাগের মত তাহার বিষণ্ণ বদন রঞ্জিত হইয়া উঠিল। ধীর সলজ্জ কণ্ঠে সে বলিল—'আমি শুধু তোমায় চাই।' আমি উচ্চ হাসিয়া উত্তর দিলাম—'তা বেশ ত! আমিই কোন্ কল্পতরুর মত উবে গেছি!' সে সজল চক্ষে আমার মুখ চাহিয়া কহিল—'বাওনি, কিন্তু যেতে বসেছ—আর দু'দিন পরেই যাবে। তোমার মুখের সে নরম ভাব শক্ত হয়ে উঠেছে। তোমার কাছে এগুতে ভয় করে। আরসীতে একবার মুখ দেখবার যে সময় হয় না, নইলে দেখতে তোমার নাথার ডায়গায় ডায়গায় যেন কষ্টিপাথরে রূপোর রঙ ধরেছে।' সে কথা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। বলিলাম—'চেহারা কি চিরকাল সমান থাকে? আমি কি বুড়ো হবো না?'—'হবে না কেন? বয়সে সবাই হয়। কিন্তু তুমি যে হাঁকিয়ে যাচ্ছ! আমার মাথা খাও, কথা শোন।' কথাটা তামাসা করিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য বলিলাম—'ও বাবা! তোমার ঐ একরাশ চুল শুদ্ধ মাথা আমি হজম করব কেমন করে? একে ত আমার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia), পেটে কিছু হজম হয় না। রাঁধা জিনিস সব সেখানে গিয়ে জমা হয়ে ওঠে, দিন-রাত হট্‌পাট করে বেড়ায়।'—'আমি ত সেই কথাই বলছি। দিন-দিন তোমার কি শ্রী হচ্ছে, দেখ! আগে সাকভাত যে রকম তৃপ্তিতে খেতে, এখন পঞ্চাশ ব্যাঞ্জন তোমার রোচে না। তোমার খাওয়া গেছে, ঘুম নেই—' কথাটা আর বাড়িতে না দিয়া আমি তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিলাম—'ঘুম নেই, তোমায় কে বললে? তুমি কি সারারাত জেগে থেক না কি?'—'আমাসা নয়! যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত—জান না? ভোরের বেলা যদি তোমার একটু ঘুম আসে, অমনি সোণার খনি, হীরের খনি, কত কি স্বপন দেখ, বিড়বিড় করে বকো। দিনরাত তোমাকে ভূতে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি সারাদিন একদণ্ড তোমায় কাছে পাই না। রাত্রে আমার কাছে থেকেও এত দূরে থাক যে, তোমার নাগাল পাওয়া যায় না!' বলিয়া সে ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি আদরে হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে বসাইয়া বলিলাম—'ছি ছি, গয়না পরে কত মেয়েমানুষ আহ্লাদ করে, আর তুমি কাঁদছ?' ননী তেমনি ফোঁপাইতে-ফোঁপাইতে বলিতে লাগিল—'আমি থাকতে বামুন তোমায় রেঁধে দেয়, চাকরে তোমার কাজ করে, দাসীতে বিছানা পাতে;—আমার সহ্য হয় না। আমার মনে হয়, তুমি আমাকে বিলিয়ে দিয়েছ।' বলিয়া আবার সে অনুচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। আমি তাহাকে অনেক চেষ্টায় শান্ত করিলাম। পরে সে বলিল—'সারাদিন আমার হাতে কোন কাজ নেই, এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। চল আমরা এখান থেকে পালাই। এ বাড়ীর চার দিকে যেন আগুন জ্বলেছে, আমার সর্ব্বশরীর ঝল্‌সে গেল।' আমি বলিলাম 'পালাতে হবে কেন? আমি তোমার হাতে এত কাজ দোব যে সেই পাবে না।' সে সবিস্ময়ে আমার মুখ চাহিল। আমি বলিলাম—'শোন! আমি একজন মেম্ রেখে দোব, সে তোমায় লেখাপড়া, ইংরেজিতে কথা-কওয়া শেখাবে, বুনতে শেখাবে, বাজনা শেখাবে। তোমার এমন মিষ্টি গলা, চর্চ্চা না করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—' ননী আমার মুখ চাপিয়া ধরিল। বলিল—'কে বললে, আমি গাইতে পারি?' আমি যে একদিন লুকাইয়া শুনিয়াছিলাম, তাহা সে জানে না। আমি তাহার হাত ছাড়াইয়া বলিলাম—'আমি জানি।'—'তা হ'ক! আমি কোণের বউ, কি হবে আমার ইংরেজিতে কথা-কওয়া শিখে? আমাকে ত আর সাহেবদের সঙ্গে কথা কইতে হবে না। এখানে আমি কিছু শিখতে পারব না। দিনরাত্তির আমার ভেতর হুহু করে!' তাহার মনের গুরু ভার হাল্‌কা করিয়া আনিবার জন্য আমি পুনরায় ঠাট্টার ছলে বলিলাম—'সেখানেও ঐ সারাক্ষণটি আমি তোমার আঁচলে বাঁধা থাকতুম না।'—'তা কেন? সেখানে আমি সারাদিন তোমার বাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াতুম, আর সন্ধ্যের মুখ চেয়ে

থাকতুম—কখন তুমি আসবে। এখানে আমার কারুর জন্যে কিছু করবার নেই। সব আমার অচেনা অজানা—ঠিক যেন ভেসে এসেছি। তোমার পায় পড়ি, সেখানে ফিরে চল। সেই ঘর, সেই দাওয়া, সেই বেলফুলের গন্ধ! আমার ছেলেপুলে হয়নি—যখন সেই সব গাছে জল দিতুম, মনে হত তাদের দুধ দিচ্ছি। চল, আর কেন? আমাকে আশার অতিরিক্ত অনেক দিয়েছ। তোমারও আশা পূর্ণ হয়েছে!'—'না ননী! আমার আশা এখনও পূর্ণ হয় নি।'

সে কিছুক্ষণ আমার মুখ চাহিয়া বলিতে লাগিল—'আশা পূর্ণ হয় না। বরং আশার আশা বাড়ে। ছেলেবেলা আমার বাপের কাছে একটি গল্প শুনেছিলুম, তোমায় বলি, শোন!' বলিয়া সে গল্প বলিতে আরম্ভ করিল।—'এক জন ভিখারী, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিল, ঠাকুর, পাঁচটাকা হলে আমার বেশ চলে! আমায় পাঁচটি করে টাকা আর করে দাও। ঠাকুর দয়া করে তাই দিলেন। কিছুদিন পরে পাঁচ টাকায় আর তার মন উঠ্‌ল না। তখন সে দশ টাকা চাইলে। তাই পেলে। তার পর দশটাকাতেও সে সুখী হল না। ঠাকুরের কাছে বেশী করে চাইলে। ক্রমে কুড়ি, ত্রিশ, পঞ্চাশ, একশ, শেষে হাজার টাকা তার আয় হল। তখন সে রাজা হতে চাইলে।' আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম—'রাজা হ'ল?'—'হ'ল বৈকি? তাতেই কি তার নিবৃত্তি হল? তার পর সে ভাবলে, পৃথিবীর রাজত্বে সুখ নেই, ইন্দ্রত্ব নিতে হবে। ইন্দ্র তার মনের ভাব জান্‌তে পেরে ভয় পেলেন। এক সন্ন্যাসীর রূপ ধরে এসে বললেন, রাজামশাই, আমায় কিছু ভিক্ষে দিন। রাজা বললেন, কি চাও, বল? ইন্দ্র বল্‌লেন, আপনার যা ইচ্ছে। কিন্তু যা দেবেন, আমার এই কমণ্ডলুটি ভরে দিতে হবে। রাজা মনে মনে হাসলেন,—কি ছোট আশা! তার পর ভাঁড়ারীকে ডেকে বল্‌লেন, এঁর কমণ্ডলু ভরে চাল দাও। ভাঁড়ারী চাল আনলে, কিন্তু যত দেয় কমণ্ডলু আর ভরে না! রাজ্যে যত চাল ছিল, সব ওজোড় হয়ে গেল! তার পর টাকা কড়ি হীরে জহরৎ রাজভাণ্ডার শূন্য করে সেই কমণ্ডলুতে ঢেলে দিলে। কোথায় সব তলিয়ে গেল! রাজা তখন ভাবলেন, নিশ্চয় কোন দেবতা ছলতে এসেছে। আচ্ছা, আমি ত শীগ্‌গিরই ইন্দ্রত্ব নোব, আমার এ রাজ্যে আর কি হবে? বললেন, সন্ন্যাসীঠাকুর, আমার রাজ্য দিলুম, আর যা কিছু আছে, সব দিলুম। কমণ্ডলু তখনও খালি! তখন রাজা সন্ন্যাসীর পায় ধরে বললেন, আমি কমণ্ডলু পূরে দান দোব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। না দিলে আমার সত্য-ভঙ্গ হবে। কিসে কমণ্ডলু পূরবে আমায় বলে দিয়ে ধর্ম্ম-রক্ষা করুন! ইন্দ্র তখন হেসে বললেন, বৎস, দুটি ছাই আনাও দিকি! রাজা তাই আনালেন। ইন্দ্র বল্‌লেন, কমণ্ডলুতে দাও। সেই ছাই দিতেই কমণ্ডলু উথলে উঠল। রাজা আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? ইন্দ্র গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন, বাপু হে, এর নাম—আশাভাণ্ড। ত্রিভুবন দিলেও পূর্ণ হয় না; শুধু এর মুখে ছাই দিলেই ভরে ওঠে।' তার পর ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমার স্ত্রী বলিল—'আশা কি পূর্ণ হয়? কখন কারুর হয়নি।'

আমি বলিলাম—'আমার আশা ইন্দ্রত্ব অবধি পৌঁছায় না। আমার শুধু সাধ, আমার বন্ধুর স্ত্রীরা যেমন সাজগোজ করে বেড়ান, তুমিও তেমনি তাঁদের ওপর টেক্কা দিয়ে বেড়াও। কিন্তু তুমি এমনি হয়েছ যে আজকাল চুল পর্য্যন্ত বাঁধ না।'—'কার জন্যে বাঁধব? কে দেখছে? যে দেখ্‌বে, সে ত দিনরাত টাকার ধান্দায় ঘুরছে।' এই সূত্রে কথাটা পাড়িবার সুযোগ বুঝিয়া বলিলাম—'আচ্ছা, আমি যে রকম করে তোমায় সাজাতে চাই, তুমি করে দেখ, যদি দশজন তোমার প্রশংসায় চক্ষে না দেখে—' কথাটা সে আর শেষ করিতে দিল না। 'ছি' বলিয়া এমনি কঠোর ভৎর্সনার চক্ষে আমার পানে চাহিল যে, আমি থতমত খাইয়া গেলাম। তার পর মনে মনে ভাবিলাম, ছাড়িলে হইবে না। ভাত থাকতে-থাকতে লোহার ঘা না মারলে বাঁকে না। বলিলাম—'ননী, মিসেস্ রায়, ডাস, ডে, যেমন করে বেড়ায়, আমার কি ইচ্ছে হয় না, তুমি তেমনি দশজনের একজন হয়ে বেড়াও।' তার পর অতি কাতর কণ্ঠের ভান করিয়া বলিলাম—'আমার জন্যে কি এতটুকু ত্যাগস্বীকার করতে পার না, ননী?' সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বোধ করি সেই অজস্র অশ্রুজলে সে আপনাকে ভাসাইয়া দিল। আজ সে অশ্রু স্মরণ করিয়া আমারও চক্ষুতে জল আসে।

শুনিয়াছি, প্রত্যেক মানুষের ভিতর হরেক রকমের ব্যক্তিত্ব থাকে। আমাদের 'আমি' একটা নয়, অনেক।

বৃদ্ধ শ্যামাচরণ যখন গম্ভীর ভাবে বুকবিরানা করেন, আর যখন বিধুর টপ্পা গাহিয়া তৃতীয়-পক্ষের মনোরঞ্জন করিতে যত্নবান হ'ন—এ দুজন আলাদা ব্যক্তি। কোর্টের কড়া হাকিম যে ঐ গৃহিণীর ঘূর্ণিত-নেত্র-ভীত ত্রৈণ, তাহা চোখে না দেখিলে কেহ হলপ করিয়া তোমায় বিশ্বাস করাইতে পারিবে না। যাহাকে মিষ্টার মিটার বলিয়া তোমরা জানো, তাহার ভিতর এক অর্থগৃধ্নু পিশাচ, এক মুক্তহস্ত স্বামী এবং আরও কত কে বাস করে। কিন্তু আর যাহারা আছে, তাহারা কেহ মাথা তুলিতে গেলেই ঐ পিশাচটা ঘাড় চাপিয়া ধরে, কেবল মুক্তহস্ত স্বামীকে সে পারিয়া উঠে না। আমার ভিতর একজন দয়ালীল ব্যক্তি আছেন; পরের দুঃখ দেখিয়া তিনি একটু উস্‌খুস্ করিলেই পিশাচটা এমন কটমট করিয়া চোখ রাঙায় যে, ভদ্রলোক ভয়ে আর মাথাটি তুলিতে পারে না। একজন সাধু আছেন, তিনি আমার পানে চাইলেই পিশাচটা এমন দাঁত কড়্‌মড়্ করে যে, বেচারীর মুখে আর কথা সরে না। কিন্তু তাহার বেদনাপূর্ণ চক্ষুর মূক মিনতি দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারি, তিনি বলিতেছেন—বাবাজি, কার জন্য এত করছ, কিসের জন্য? এক বিবেকী পুরুষ আছেন, তিনি আমার কাণে-কাণে বলেন—বাপুহে, ত্যাগৈনেব—কিন্তু তাঁর কথা শেষ হইতে না হইতে পিশাচ এমনি ভ্রূকুটী করিয়া তাকায় যে, বিবেকীর ঠোঁট শুকাইয়া যায়, বাক্য আর শেষ হয় না। মিষ্টার মিটারের ভিতরে একজন স্বদেশহিতৈষী আছেন, তিনি আমার মজুত তহবিল দেখিয়া লোকহিতার্থ অনেক কল্পীকাল্পা করেন—কেমন করিয়া আমার লোহার সিন্দুক লুট করিবেন, কিন্তু ঐ পিশাচ বড় সজাগ, সতর্ক প্রহরী। কেবল মিসেস্ মিটারের সামনে তার কেমন ভাবাচাকা লাগিয়া যায়; আমাকে বলে—দাও দাও, যা চায় দিয়ে ফেল। জান না, স্ত্রীভাগ্যে ধন? ভয় কি? হাজারের জায়গায় লাখ এনে দোব! আতুর, অন্ধ, অনুপায়, কন্যাদায়গ্রস্ত, ইহাদের দর্শনমাত্রেই পিশাচটা এমনি হুঙ্কার দিয়ে ওঠে যে, তাহারা মুহ্যমান হইয়া পড়ে। আমি পিশাচ-রাজকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া তাহাদের দুই চারি আনা দিয়া বিদায় করি। তাহারা অন্তর্ধান হইলে পিশাচটা মুখ ভোলোহাঁড়ি করিয়া বলে—বাজে খরচ! যা দিলি সব গেল। ওর সিক্তিপয়সা আমি ক্ষতিপূরণ করব না। এই একটা পিশাচের কথা তোমায় বলিলাম। শাস্ত্রে বলে, আমাদের এই দেহ পঞ্চভূত-নির্ম্মিত। ইহার ভিতরে যে কত ভূত বাস করে, তাহারা আত্মপ্রকাশ না করিলে জানা যায় না।

মিষ্টার মিটারকে দেখিয়া তোমরা এখন সে মতি মিত্তিরকে চিনিতে পারিবে না। একই মানুষের ভিতর এমন বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ দেখা যায় যে, বিস্মিত হইয়া বলিতে হয়—এই কি সেই! আমার স্ত্রীর সম্বন্ধেও এখন এমনি একটা বিস্ময় প্রকাশের সময় আসিয়াছে। যাহারা সেই পতিগতপ্রাণা, সেবাপরায়ণা, গৃহকর্ম্মনিপুণা ননীবালাকে দেখিয়াছে, তাহারা মিসেস্ মিটারকে দেখিয়া বলে—এই কি সেই! তাহারা যাহা বলে বলুক, আমি নিশ্চিত জানি, এ সে নয়। তাহাকে—আমার ননীকে—আমি স্বহস্তে হত্যা করিয়াছি। একদিনে নয়, পলে পলে, তিলে তিলে অতি উগ্র বিষপ্রয়োগে। এমন অনেক পাপ, বিস্তর দুষ্ক্রিয়া আছে, যাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে অভিনীত হয়, কিন্তু তাহাদের পরিণাম অতি ভয়াবহ, অতি শোচনীয়, অথচ সমাজ বা রাজদণ্ড তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে না। রোগ, শোক, দুর্দ্দিন বা দুর্দ্দৈবের ছদ্মবেশে এই ক্ষণভঙ্গুর পাঞ্চভৌতিক দেহটাকে যখন কেহ চুরমার করিয়া ভাঙিয়া ফেলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করে, তাহার আইনের প্রহার হইলে তখন তাহার দণ্ডবিধান হয়। কিন্তু প্রলোভনের বশে যখন আমাদের ভিতরের আসল মানুষটি আত্মহত্যা করে, তাহার দণ্ডবিধান হয় কৈ? খুন করিলে ফাঁসী হয়, কিন্তু যে আততায়ী নিরন্ন, কেবলমাত্র দুর্ম্মতি-বিষপ্রয়োগে একজনের অন্তরাত্মার নিধন সাধন করে, তাহার কি শাস্তি হয়? এই যে কয়েক বৎসর ধরিয়া অল্পে-অল্পে আমার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছি, সে মহাপাতকের জন্য সমাজে আমাকে সম্মানিত করিয়াছে,—আমার সৎসাহস, সুদৃষ্টান্তের জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিয়াছে।

একজাতীয় সৌন্দর্য্য আছে, যাহা মধ্যবয়সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। মিসেস্ মিটার এখন যৌবনের প্রান্ত সীমায়। কিন্তু সে সুবেশা, সুবেশা, মণিমৌক্তিকোজ্জ্বলা রমণীকে দেখিতে তোমাকে বলিতেই হইবে যে, এই অমেঘবাহিনী দামিনী—অনন্ত-যৌবনা। তখন ইন্দ্রের শচী বা ইন্দ্রপ্রস্থের কুন্তীর কথা বিশ্বাস করিতে আর তোমার কুণ্ঠা থাকিবে

না। যে পার্টিতে ইহাঁর নিমন্ত্রণ না হয়, সে পার্টি—চাম্‌পার্টি (champarty); আর বজ্রাঘাত হইলেও ইহাঁর পার্টিগমন নিবারণ হয় না। দুইদিন পূর্ব্বেকার একটা ব্যাপার বলি। সেদিন আমার ভয়ানক মাথা ধরিয়াছে। অন্ধকার ঘরে চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছি। সহসা কক্ষমধ্যে কে যেন রাশি-রাশি সদ্য-প্রস্ফুটিত সুরভি ফুল ছড়াইয়া দিল। পুষ্পসারের গন্ধ বুঝিয়া আমি অতি কাতরকণ্ঠে ডাকিলাম,—'ননী!' সে যেন একটু বিরক্তির স্বরে বলিল—'বেশ! তুমি এই অন্ধকারে বাপ্‌টিমেরে বসে আছ, আর আমি এ-ঘর সে-ঘর চুঁড়ে বেড়াচ্ছি?' আমার কান্না পাইল, বলিলাম—'তা নয় ননী! আজ আমার ভারি মাথা ধরেছে!' সেই পাঁচ টাকার ঘরে এমনি আর একদিন তাহার শীতল হস্তের সুশ্রূষার কথা মনে করিয়া অতি বেদনাভরা মিনতি স্বরে বলিলাম—'আমার কাছে একটু বস না, ননী!' আমার এই নিতান্ত স্পর্দ্ধার অনুরোধে সে যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল—'বা-রে! ভুলে গেছ বুঝি? আজ না সরোজিনী রায়ের পার্টি? হাঁ, তোমায় যে জন্যে খুঁজছিলুম! দেখ, আমার এ নেক্‌লেসটা দেখে দেখে লোকের চোখ পচে গেছে! তোমাকে সেদিন যেটার কথা বলেছি, সেইটে পরে আমি লেডিজ্ সোসিয়াল্ পার্টিতে যাব।' বোসেদের দোকানের—সে নেক্‌লেসের দর—লক্ষ টাকা! আমার মাথার ভিতর তখন মুগুর পড়িতেছে, কি চেঁকি কুটিতেছে, কি একখানা ষ্টিম্ এঞ্জিন্ ছুটিতেছে, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। নেক্‌লেস্ সেখানে চুরমার হইয়া গেল। আমি চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। আমার স্ত্রী জানিতেন, এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় আদেশ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমার চুপ করিয়া থাকাটা তাঁহার পছন্দ হইল না। বলিলেন—'চুপ করে রইলে কেন? একটা মুখের কথাই বলাও। ওঠ! কাপড় বদলাও।' আমি হতাশ স্বরে বলিলাম—'উঠতে পারছি নি, ননী! ভারি কষ্ট হচ্ছে! শরীর এলিয়ে পড়েছে, নড়তে পারছি নি।'—'কেন বল দিকি? মোট বইছিলে না কি?' আমার চক্ষে জল আসিল। হায়, যে পরের মোট বয়, তার ত বোঝা নামাইবার স্থান আছে। যাহাকে নিজের বোঝা বইতে হয়, তাহার মোট নামাইবার স্থান নাই! মিসেস্ মিটার পুনরায় আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কি সত্যি যাবে না, না কি?' হায় রে আশা! আমি আবার মিনতি করিয়া বলিলাম—'আজ তুমিও যেয়ো না, ননী! আমার কাছে থাকো।'—'বাঃ! তা কি হয়! আজ আমার গান শোনবার জন্যে দুজন ফিউডেটরী চীফ্ (Feudatory chief) আসবেন। পাগলামী কোর না। ওঠ! আর সত্যি যদি তোমার মাথা ধরে থাকে, এখানে পড়ে থাকলে কি সারবে? তার চেয়ে চল, বাগানের হাওয়ায় আমোদ-প্রমোদ করলে মাথা ছেড়ে যাবে! আর না গেলে আমি সেখানে কি এক্সকিউজ্ (Excuse) দোব?' আমি ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলাম—'সত্যি না তাই বোলো, মাথা ধরেছে!'—'আ পোড়াকপাল! আমারই বিশ্বাস হয় না, তারা নাকি তাই বিশ্বাস করবে! সবাই মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসবে, আর মনে করবে, মিটার মিটার অন্ধকারে একলা বসে কি ভাল বুনছে, যাতে সেই অলি অলি রূপসী সাথীগুলি লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা দেয়।' বলিয়া তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দিয়া আমার চিবুকে দুইটি টোকা মারিয়া মিসেস্ মিটার চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় দরজার নিকট হইতে হাঁকিয়া বলিয়া গেলেন—'টা-টা!' হঠাৎ আমার 'আর্‌রণ ওয়ার্কের' কথা মনে পড়িল।

তখন আমার মনে হইল, আমি নিতান্ত একা। যেন সহসা আমি কোন্ বায়ুহীন, গহন গহ্বরে পড়িয়া গিয়াছি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখবন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই বুকচাপা জমাট অন্ধকারে আমার প্রাণ হাঁকাইয়া উঠিতেছে, ছট্‌ফট্ করিতেছে; আমি প্রাণপণে চীৎকার করিতেছি; কিন্তু আমার সে আকুল বেদনার আহ্বান শুনিবার কেহ নাই, সাড়া দিবার কেহ নাই। একা, একা, নিতান্ত একা; কিন্তু তথাপি আমি ক্ষুব্ধ নহি। কিসের ক্ষোভ? আর ক্ষোভে ফল কি? তখন ভাবি নাই কেন যে, হাতের তীর ছুঁড়িলে আর তোমার নয়?" কিন্তু কেন এমন হয়? এ কি বিদ্যাশিক্ষার দোষ? না, না, সহস্রবার না! তবে কিসের? বড় জটিল তর্ক! সে মীমাংসা আজ করিতে পারিতেছি না। আমার মাথার শিরায়-শিরায় যুদ্ধ বাধিয়াছে।

আজ আমার কেবলই মনে হইতেছে, কেন এতটা করিলাম? আজিকালি কখন-কখন এই নিরর্থক 'কেন'

আসিয়া অতি রূঢ় আঘাতে আমার শান্তিভঙ্গ করে। সময়ে অসময়ে সে আমাকে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলে। এত যে করিলে, কেন? অর্থের জন্য এই অবিশ্রাম সংগ্রাম, এই বিরামবিহীন দুশ্চিন্তা, এই অনুক্ষণ গুড়নপাড়ন, জলি-বরন কেন? আজি আর সে থামিতেছে না, কেবল বলিতেছে—কেন? এই নন্দনতুল্য উদ্যান, ইন্দ্রতুল্য প্রাসাদ, বহুমূল্য পরিচ্ছদ, অলঙ্কার সম্পদ্—কেন? ইহার কতখানি তুমি ভোগ কর, কতটুকুতে তোমার প্রয়োজন? তোমার চারিদিকে অভাবের দুরন্ত গর্জ্জন,—শুধু নাই-নাই চাই-চাই রব—তুমি এ অর্থরাশির উপর আরাম-শয্যা পাতিয়া বসিয়া আছ কেন? উলঙ্গ আসিয়াছ, উলঙ্গ যাইবে,—এ ধরণীর এক ধূলিকণাও তোমার অনুগমন করিবে না; তবে মাঝখানে কয়দিনের জন্য এ বিড়ম্বনা কেন? সত্য! কেন এ জঞ্জাল সংগ্রহ করিয়া দিন কাটাইলাম! তোমরা বলিয়া থাক, কারণহীন কার্য্য হয় না। নিরুদ্দেশ কিছুই হইতে পারে না। বল দেখি, আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? আমার উর্দ্ধতন আদিপুরুষ হইতে বংশধারা যে আমাতে পর্য্যবসিত হইল; জীবন-সংগ্রাম জয় করিবার জন্য বংশ-পরম্পরায় কত উৎকট অধ্যবসায়, অসীম উৎসাহ, অদম্য উদ্যম, একাগ্র সাধনা, অনন্ত ব্রত, অপ্রতিহত সাহস; কত বিপর্য্যয়, শক্তিক্ষয়, নিবিড় নিরাশার বক্ষ হইতে আশা সঞ্চয়; কত বাসনা, দেবতার উপাসনা, সব যে পণ্ড হইয়া আমাতে চরম সমাপ্তি লাভ করিল—ইহার অর্থ কি? কেন? আবার সেই কেন? চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মতি মিত্তির যে এই টাকার কাঁড়ি—কেবল কতকগুলা জঞ্জাল জড় করিল, কেন? যদি অন্যত্র কোথাও এ 'কেন'র জবাবদিহি থাকে, তবে কি উত্তর দিব? কাঁটাইয়া যে পৃথিবীর আবর্জ্জনা জড় করিলাম—কেবল পাঁচভূতে লুটিয়া খাইবে বলিয়া?

লোকে মনে করে, মতি মিত্তির বেশ মজায় আছে, খুব সুখী। আমিও তাই মনে করি। পিশাচগ্রস্ত জানিতে পারে না যে তাহাকে ভূতে পাইয়াছে। সে ভাবে আমি বেশ আছি। কিন্তু ভূতেরও কৌতুকবোধ, রহস্য-জ্ঞান আছে। ক্ষণিকের জন্য কখন-কখন সে আপনি প্রভাব প্রত্যাহার করে। তখন সহজ চৈতন্য ফিরিয়া পাইয়া মানুষ তাহার পৈশাচিক কীর্ত্তি দেখিয়া আপনি বিস্মিত, স্তম্ভিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়, চন্দনভ্রমে যাহা সে অঙ্গে মাখিয়াছে, তাহা নরশোণিত; উপাদেয় জ্ঞানে যাহা সে আহার করিয়াছে তাহা মেদাস্থির বিকারমাত্র। কিন্তু এ চৈতন্য ক্ষণিকের জন্য। যখন আসে, তখন বুঝিতে পারি—মধু মিষ্ট বটে, কিন্তু অতিরিক্ত সেবনে গা আলা করে। আজ আমার বেশ মনে পড়িতেছে, যে ননী শাক-মাছের মত ষাট টাকায় সেক্‌লেস্‌টা ক্রয়দাস করিয়া গেল; আমার নিদারুণ যন্ত্রণায় যে আমাকে সঙ্গদান করিতে সম্মত হইল না, সেই ননী একদিন আমায় কাঁদিয়া বলিয়াছিল—'আর কেন? অনেক হয়েছে, এখন আমাদের সেই পাঁচ টাকার ঘরে ফিরে চল।' তখন ফিরি নাই, এখন বুঝিয়াও ফিরিতে পারি না। কে আমার কষাঘাতে চালনা করে? সে যে-ই হ'ক, সে অতি নির্দ্দয় প্রভু। তাহাকে আমি একে-একে সর্ব্বস্ব দিয়াছি; আমার সর্ব্ব সুখের আকর সেই পাঁচটাকার ঘর, সেই বেলিঙ্গুরভিত প্রাঙ্গণ, আর যার পর নাই,—সেই সুখে সঙ্গিনী, দুঃখে সান্ত্বনাদায়িনী, রোগে শুশ্রূষাকারিণী ননীকে দিয়াছি। তবু সে আমার কষায় তীব্র আঘাতে তাড়না করে। আমার হৃদয় জরজর, চিত্ত ক্ষতবিক্ষত, অবিশ্রান্ত রক্ত-মোক্ষণে প্রাণ মুহ্যমান, তবু সে ছাড়ে না। আজ আমার অর্থের মোহ কাটিয়াছে, কিন্তু তৃষ্ণা যায় নাই। এই স্বর্ণমরুতে মরীচিকার মোহকর ভ্রান্তিটুকু পর্য্যন্ত অভাব—শুধু ধূধূ ধূধূ, নীরস নির্ব্বিকার বিস্তার! শুধু মরুতে শরীর জ্বলিতেছে। দীপের মত জ্বলিতে-জ্বলিতে একদিন অকস্মাৎ নিবিয়া যাইব—এই ত আমার চরম পরিণাম! হায়, এই স্বর্ণ-বাণিজ্যে লাভ হইল কি? স্বহস্তে আগুন জ্বালিয়া সুখের হাট পুড়াইয়াছি, মঙ্গলঘট পদাঘাতে ভাঙিয়াছি; আর এক নিরপরাধা নারীকে হত্যা করিয়া সে মতি মিত্তির ইন্দ্রজালের মত কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রস-সাগর

স্বর্গীয় কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী

[কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ]

সরস্বতীর পরম প্রিয় বাসভূমি ভারতবর্ষে অসংখ্য মহাপুরুষ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারও জীবনচরিত লিখিতে হইলে জীবন-চরিত-লেখকের চক্ষু স্থির হইয়া যায়। কোনও একটী সূক্ষ্ম কথা জানিতে হইলেই তিনি চতুর্দ্দিকে বিপৎ-সাগর দেখেন। এদেশে পূর্ব্বকালে জীবন-চরিত লিখিবার প্রথা ছিল না। এই হেতুই আমরা ভূতপূর্ব্ব মহাপুরুষ-গণের জীবন-চরিত সম্বন্ধে নিতান্ত অন্ধ হইয়া রহিয়াছি। বহু পূর্ব্বের কথা দূরে থাকুক, শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তাহাও ঘোরতর অজ্ঞানতা-তিমিরে সমাচ্ছন্ন। সমগ্র ভারতবর্ষের কথা দূরে থাকুক, চল্লিশ বা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা-প্রদেশেও যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভূমির মুখ সমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে নানাবিধ মতভেদ দৃষ্ট হয়। কিরূপে আধ্যাত্মিক বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা হইবে, কিরূপে পারমার্থিক বিষয়ের সংবাদ অবগত হওয়া যাইবে, কিরূপে এই ক্ষণ-ভঙ্গুর ঐহিক মানব-জীবনে পারত্রিক কার্য্য সংসাধিত হইবে, কিরূপেই বা এই মহামোহময়ী পৃথিবীর দুর্ভেদ্য বন্ধন ভেদ করিয়া মোক্ষ লাভ করা যাইতে পারিবে,—এই সকল তত্ত্ব লইয়াই তৎকালীন মনীষী হিন্দুসমের মন নিয়ত ব্যাপৃত থাকিত। পার্থিব জীবন নিতান্ত অলীক ও অসার। সুতরাং এই পার্থিব জীবনের কোনও কথা লিপিবদ্ধ করিয়া যাওয়া তাঁহারা মহা বিড়ম্বনা বলিয়াই মনে করিতেন। কালিদাস, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ, বাণভট্ট প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত মহাকবি-গণের জীবন-বৃত্তান্ত বিষয়ে অনেকেই অনেক কথা জানিতে চাহেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দুই একটী গল্প ভিন্ন তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। যে সকল বিষয় অনন্ত কালের গর্ভে বিলয়-প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের অন্ততঃ কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া রাখা গবেষণানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি-গণের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

আমরা এখন যে মহাপুরুষের জীবন-চরিত লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি, তিনি বিশেষ প্রাচীন লোক নহেন। তথাপি তাঁহার জীবন-চরিতের উপাদান সামগ্রী সংগ্রহ করা অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার। যে সময়ে (১১৯৮-১২৪১ বঙ্গাব্দ; ১৭৯২-১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ) আমাদিগের সমালোচ্য কবি রস-সাগর মহাশয়ের আবির্ভাব ও তিরোভাব, সে সময়ের কথা স্বতন্ত্র। সে সময়ে লোকের জ্ঞানানুশীলনে বিশেষ আস্থা ছিল না। বিশেষতঃ তৎকালে বর্ত্তমান সময়ের মত বাঙ্গালা-ভাষায় ভাবুকী আলোচনা ও পরিপুষ্টি হয় নাই। রস-সাগর মহাশয়ের জীবন-চরিত ও তৎকৃত বাঙ্গালা সমস্যা-পূরণের কথা লিখিবার পূর্ব্বে তাঁহার সময়ে বাঙ্গলা ও অন্যান্য ভাষা-শিক্ষার প্রণালী বর্ণনা করা উচিত।

কবি রস-সাগর মহাশয়ের যে সময়ে আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছিল, সে সময়ে সমগ্র বাঙ্গালা-প্রদেশে কোন্ ভাষার কিরূপ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইত, তাহাও এস্থলে উল্লেখ করা উচিত। তখন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার যেরূপ সুন্দর ব্যবস্থা ছিল, বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিবার সেরূপ ব্যবস্থা ছিল না। গুরু-মহাশয়-গণ এক একখানি গ্রামে এক-একটী "পাঠশালা" খুলিয়া তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিতেন। তাঁহারা প্রায়ই কায়স্থ-জাতীয় ছিলেন। তাঁহাদিগের অধিকাংশই বর্দ্ধমান জেলা হইতে আসিয়া স্থানে-স্থানে "পাঠশালা" খুলিয়া বসিতেন। পাঠশালার নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্থানের প্রয়োজন হইত না। কোন ভদ্র লোকের চণ্ডীমণ্ডপেই "পাঠশালা" বসিত। প্রথমতঃ বালকগণ মাটীর উপরে ক, খ, ইত্যাদি লিখিয়া বর্ণমালা শিক্ষা করিত। দ্বিতীয়তঃ যাবান লিখিবার ও অঙ্ক শিখিবার জন্য তাহারা তাল পত্র বা কদলী-পত্র ব্যবহার করিত। পরিশেষে জমীদারী-কার্য্যে জ্ঞানলাভ ও হস্তাক্ষরের সৌষ্ঠব-সাধন করিবার জন্য তাহারা কাগজ ব্যবহার করিত। চারি বা পাঁচ বৎসরের মধ্যে মেধাবী ও বুদ্ধিমান্ ছাত্রগণ একরূপ শিক্ষালাভ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতেন। ছাত্রগণের হস্তাক্ষরের প্রতি গুরু-মহাশয়-গণ বিশেষ-রূপ লক্ষ্য রাখিতেন। বস্তুতঃ তৎকালে লোকের যেরূপ সুন্দর হস্তাক্ষর ছিল, বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ শিক্ষিত লোকের সেরূপ হস্তাক্ষর অতি বিরল। তৎকালে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার বা কথা কহিবার প্রথাই ছিল না। কথা কহিবার বা লিখিবার সময় স্থানে স্থানে অনেক পারসী ও হিন্দী শব্দ ব্যবহৃত হইত। জমীদারী সেরেস্তায় হিন্দু মুন্সীগণ প্রায় কিছু কিছু সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন; কিন্তু পত্র-মধ্যে পারসী এবং হিন্দী শব্দও ব্যবহার করিতেন। তৎকালে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-গণ বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতেন; কিন্তু পত্রাদি লিখিবার সময়ে সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষা অথবা সংস্কৃত-মিশ্রিত বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিতেন।

ধনাঢ্য লোকদিগের মধ্যে কিরূপ ভাষা শিক্ষা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহারও এস্থানে উল্লেখ করা উচিত। রাজপুত্র, রাজ-দৌহিত্র এবং রাজার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারি-গণের পুত্রগণ পারসীভাষা শিক্ষা করিতেন। তৎকালে পারসীভাষা শিক্ষা বিলক্ষণ অর্থকরী

বলিয়া বিশ্বাস থাকায় এবং রাজ-সংসারে দুই একটি কন্যা যাতীত অন্য কোনও কার্য্যে ইহার উপযোগিতা না থাকায় সাধারণ লোকে ইহা শিক্ষা করিত না। নবাব-সরকারের লোকগণের এবং কৌজদার প্রভৃতি সম্রাটের প্রধান-প্রধান কর্ম্মচারিগণের সহিত কথোপকথনে ও লেখন-পঠনে উর্দ্দু ও পারসী ভাষা ভিন্ন অন্য কোনও ভাষার প্রচলন না থাকায়, রাজা ও তাঁহার প্রধান-প্রধান কর্ম্মচারিগণ বাল্যকালে এই দুইটী ভাষা শিক্ষা করিতেন। যে সকল নগরে নবাব ও কৌজদার থাকিতেন, সেই সকল নগরে ও উৎপাদনবহুল গ্রামেই এই দুই ভাষার বিশেষ আলোচনা ছিল। পরে ইংরাজ বাহাদুর এই দেশ অধিকার করিলে মুসলমান নবাবদিগের প্রথানুসারে সকল বিচারালয়েই এই দুইটী ভাষার বহুল প্রচলন ছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৯ বিধি-অনুসারে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সমস্ত বাঙ্গালা-প্রদেশে প্রত্যেক জেলার বিচারালয়ে পারসী ভাষার পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার হইতে লাগিল। সুতরাং সেই সময় হইতেই হিন্দু-সমাজ-মধ্যে, এমন কি মুসলমানদিগের মধ্যেও পারসী ও উর্দ্দু ভাষার প্রচলন মন্দীভূত হইয়া আসিল; এবং ক্রমশঃ বাঙ্গালা ভাষারই সমধিক সমাদর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বাগোয়ানের সন্নিহিত "বাড়েবাঁকা" নামক গ্রামের প্রান্তভাগে একঘর বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি দুইটি শিশু পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া বিধবা পত্নীর করে সমর্পণ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই ব্রাহ্মণ মুরশিদাবাদে "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর" রেশমের কুঠীতে চাকরী করিতেন। এইরূপ কথিত আছে যে, তিনি মৃত্যুকালে অনেক ধন সম্পত্তি রাখিয়া যান। কেহ কেহ বলেন, মুরশিদাবাদে চাকরী করিতেন বলিয়াই তিনি এখানে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তিনি যখন মুরশিদাবাদেই চাকরী করিতেন, তখন সেই স্থানেই তিনি বাস করেন নাই কেন? এ কথার উত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, তৎকালে মুরশিদাবাদে স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া বাস করা বড়ই বিপজ্জনক ছিল। তখনও মুসলমানদিগের অত্যাচার থাকায় তাঁহাদের নিকটে স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া বাস করিতে হিন্দুদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। ইংরাজ-রাজত্বের অনুগ্রহ হইলেও তৎকালে লোকের মান-সম্ভ্রম নিরাপদ ছিল না। এই হেতুই বোধ হয়, উক্ত ব্রাহ্মণ ঠাকুর বারেন্দ্র-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া নিজ কর্ম্মস্থান মুরশিদাবাদেরই অবতিদূরে-নবীনা জেলায় স্ত্রী-পুত্রাদি সহ বসতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা পত্নী দুইটি পুত্র ও একটী কন্যা লইয়া বাড়েবাঁকা গ্রামেই বসতি করিতে লাগিলেন। দুইটি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের বয়ঃক্রম ১০ বৎসর ও কনিষ্ঠের বয়ঃক্রম ৫ বৎসর। কন্যাটি সর্ব্বকনিষ্ঠা, সুতরাং তাহার বয়ঃক্রম ৭ বা ৮ বৎসর,—এইরূপ অনুমান করা যায়। এই জ্যেষ্ঠ পুত্রটীই আমাদের কবি রঙ্গলাল—ইঁহারই নাম কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বাগোয়ানের সন্নিহিত "বাড়েবাঁকা" নামক একখানি ক্ষুদ্রগ্রামে ১১৯৮ বঙ্গাব্দে (১৭৯২ খৃষ্টাব্দে) কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রথমভাগে তিনি বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। তৎকালে গ্রাম্য গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায় যাহা কিছু শিক্ষা করিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাই তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে পিতৃ-বিয়োগ হইলে তিনি পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া নিজগৃহে ঠাকুর-পূজা করিতেন এবং গ্রাম্য বন্ধুগণের সহিত মিলিয়া গান বাজনা করিয়া বেড়াইতেন। তিনি দৃঢ়াঙ্গ ও দীর্ঘকায় ছিলেন; এবং এত কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন যে, পাড়ার লোক সকলে তাঁহাকে "কাল ঠাকুর" বলিয়া ডাকিতেন। যদি কথা এই যে, তাঁহার মত কুৎসিত পুরুষ তৎকালে অতি বিরল ছিল। কিন্তু এই কৃষ্ণ মূর্ত্তি কি অমূল্য রত্নরাজি দ্বারা বিরাজিত ছিল, তাহা পাঠকগণ পরে দেখিতে পাইবেন। বাল্যকালে তাঁহার স্বভাব অতি চঞ্চল, বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও স্মরণশক্তি নিতান্ত বলবতী ছিল।

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয়ের সময়ে বাঙ্গালা-প্রদেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। দস্যু ও তস্করের ভয়ে রাত্রিকালে গৃহস্থগণের ঘুমিয়া হইত না। কৃষ্ণকান্তের পিতা মুরশিদাবাদে "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর" রেশমের কুঠীতে চাকরী করিয়া অনেক অর্থ সঞ্চিত রাখিয়া গিয়াছেন, এই ধারণা তৎকালে অনেকেরই মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই ধারণা-বশতঃ কতকগুলা দস্যুর কুদৃষ্টি এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের উপরেই নিপতিত হইল। একদিন অন্ধকারবতী রজনীতে কয়েকজন দস্যু মশাল জ্বালিয়া কৃষ্ণকান্তের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার বাটীতে সোণাগাছীর এক বলবান্ ভৃত্য ছিল। তৎকালে কি ভদ্র, কি অভদ্র সকল লোকেই লাঠিখেলা শিক্ষা করিত। তখন কৃষ্ণকান্তের বয়ঃক্রম প্রায় ১৮ বৎসর। তিনিও লাঠিখেলায় বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন। প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া দস্যুদিগের গৃহ-প্রবেশ রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, ভৃত্যটী একজন দস্যুর লাঠির আঘাতে ভূতলশায়ী হয়। কৃষ্ণকান্ত প্রাণভয়ে পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে একজন দস্যু গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া একটা খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখিয়া দিল। পরে তাঁহার মাতাকে পীড়ন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত ধন অপহরণ-পূর্ব্বক দস্যুগণ প্রস্থান করিল। তাহারা যে আশা করিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। বস্তুতঃ কৃষ্ণকান্তের পিতা পরলোক-গমন-সময়ে বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই দুর্ঘটনায় পড়িয়া কৃষ্ণকান্ত একবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। প্রথমতঃ তাঁহার ভূমি-সম্পত্তি ছিল না। দ্বিতীয়তঃ তিনি তত লেখা-পড়া শিক্ষা করেন নাই বলিয়া চাকরী করিবারও তাঁহার কোনও আশা ছিল না। সুতরাং সংসার চালাইবার উপায় দেখিতে না পাইয়া তিনি চতুর্দ্দিকে বিপৎ-সাগর দেখিতে লাগিলেন।

১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালেই কৃষ্ণকান্ত সংসারের চিন্তায় নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, মুরশিদাবাদে গমন করিয়া পিতৃবন্ধুগণের সাহায্যে সেই স্থানেই একটী চাকরী গ্রহণ

কৃষ্ণকান্ত তজ্জন্য মুরশিদাবাদে গমন করিয়া কোনও পিতৃ-বন্ধুর নিকটে নীর দুঃখের কথা বিজ্ঞাপিত করিলেন। পিতৃ-বন্ধু কহিলেন, "কৃষ্ণকান্ত! তুমি যেরূপ লেখাপড়া শিখিয়াছ, তাহাতে তোমার চাকরী হওয়া অসম্ভব। যদি তুমি কিছু পারসী ভাষা শিখিতে পার, তবে নবাব-সরকারে তোমার একটী চাকরী করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারি।" কৃষ্ণকান্ত আপনাকে নিরুপায় জানিয়া উর্দু ও পারসী ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অতি অল্প কালের মধ্যেই তিনি এই দুইটী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি-লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার পিতৃ-বন্ধুর—অর্থাৎ মুন্সীর মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহাকে মুরশিদাবাদ ত্যাগ করিয়া ও চাকরী করিবার আশা বিসর্জ্জন করিয়া বাড়ীখাকায় প্রত্যাগমন করিতে হইল। দুঃখের সময় নানা বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হয়। কৃষ্ণকান্তের এই দারুণ দুঃসময়ে তাঁহার জননীরও মৃত্যু হইল। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীর কি হইল, তাহা আমরা সবিশেষ অবগত নহি। কেহ-কেহ কহেন যে, কৃষ্ণকান্ত যখন কৃষ্ণনগরে গমন করেন, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাও সেই সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন; এবং কিছুদিন পরে জ্যেষ্ঠের আশ্রয়-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পৃথগন্ন হইয়াই কৃষ্ণনগরে বসতি করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর জীবন-চরিত লিখিতে হইলে কৃষ্ণনগর-রাজবংশের কথা উল্লেখ করা চাই; কারণ, তাঁহাকে আজীবন এই রাজবংশেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই পবিত্র কৃষ্ণনগর-রাজবংশ বদান্যতা ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্য প্রসিদ্ধ। প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গলা-প্রবেশে দ্বিতীয় 'বিক্রমাদিত্য' ছিলেন। তাঁহার মত বিদ্যোৎসাহী মহারাজ বাঙ্গলা-প্রবেশে বহুদিন জন্মগ্রহণ করেন নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে কৃষ্ণনগর-রাজবংশের যেরূপ সুনাম ও গুণ-গরিমা ছিল, তাঁহার প্রপৌত্র মহারাজ শিরীশচন্দ্রের সময়ে সেরূপ ছিল না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার পুত্র শিবচন্দ্রের পর সময় হইতেই কৃষ্ণনগর-রাজবংশের সুনাম-মহিমা ও ঐশ্বর্য্য-গরিমা দিন-দিন হীনপ্রভ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। মহারাজ শিরীশচন্দ্র সর্ব্ব-চিন্তায় নিরত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার কিছুমাত্র বিষয় বুদ্ধি না থাকায় তাঁহার রাজ-সংসারে বিষম অর্থাভাব ও নিদারুণ কষ্ট হইয়াছিল। এরূপ অর্থকষ্ট হইলেও মহারাজ শিরীশচন্দ্র স্বীয় প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্রের মত পণ্ডিতগণের সম্মান করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

কৃষ্ণকান্ত চাকরীর আশায় কৃষ্ণনগরে গমন করিলেন; এবং রাজ-সংসারে চাকরী করিবার অভিপ্রায়েই রাজ-পুরোহিত মহাশয়ের শরণাগত হইলেন। বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণকান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙ্গলা কবিতা রচনা করিতেন। পুরোহিত মহাশয়ের বাটীতে আশ্রয় লইয়া তিনি বাঙ্গলা-সমস্যাও পূরণ করিবার অভ্যাস করিতে লাগিলেন। কেহ কোনও একটী কথা বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা পদ্যে, ত্রিপদী বা অন্য কোনও ছন্দে মনে মনে পূর্ণ করিয়া রাখিতেন। বস্তুতঃ এই সময় হইতেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তির উন্মেষ হইতে আসিল। পুরোহিত মহাশয় মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বাঙ্গলা-সমস্যা পূর্ণ করিতে দিতেন। কৃষ্ণকান্তও তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিয়া পুরোহিত মহাশয়কে বিস্মিত ও পুলকিত করিয়া রাখিতেন। চাকরী পাইবার আশায় যখন কৃষ্ণকান্ত পুরোহিত মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণকান্তের মত প্রতিভাশালী পুরুষ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে ভবিষ্যতে বিলক্ষণ যশস্বী ও কীর্ত্তিশালী হইবেন। পুরোহিত মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এজন্য কৃষ্ণকান্তকে নিজগৃহে রাখিয়া তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন। ৩।৪ বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় তিনি বিলক্ষণ জ্ঞানলাভ করিলেন বটে, কিন্তু চাকরীর কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া অবশেষে তিনি স্থানত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। একে তিনি নিরন্ন, তাহাতে আবার এই সময়ে তাঁহার বিবাহের কথা আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃষ্ণকান্ত বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণনগর-নিবাসী একজন সম্পন্ন ও শিক্ষিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ উক্ত পুরোহিত মহাশয়ের মুখে কৃষ্ণকান্তের বিদ্যা-বুদ্ধির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ও তাঁহাকে কন্যাদান করিবার ইচ্ছা করিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য লালায়িত হইলেন। কন্যাটী বিলক্ষণ রূপবতী ছিলেন। কৃষ্ণকান্ত কুৎসিত পুরুষ বলিয়া কন্যার মাতা এই বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কন্যার পিতা কৃষ্ণকান্তের করে কন্যাটী অর্পণ করিবেন বলিয়া দৃঢ়-সংকল্প হইলেন। এই দুঃসময়ে কৃষ্ণকান্ত বিবাহের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন এবং বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি কহিলেন "আমি স্বয়ং নিরন্ন; আবার একটী পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া তাহাকেও নিরন্ন রাখি কেন?" কিন্তু কুলীনে কন্যাদান করিবার নিমিত্ত কন্যার পিতা অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিলেন "আপনি এজন্য চিন্তিত হইবেন না। আমি কন্যা ও জামাতা উভয়কেই গৃহে রাখিয়া উভয়েরই ভরণ-পোষণের ভার লইব।" কৃষ্ণকান্ত কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। এই দুঃসময়ে বিবাহ করিলে তাঁহার ভবিষ্যজ্জীবন কিরূপ হইবে, ইহাই তিনি মনে মনে নিয়ত চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে মহারাজ শিরীশ-চন্দ্র কৃষ্ণনগরের অধিপতি ছিলেন। তিনি মধ্যে-মধ্যে প্রাতঃকালে বায়ু-সেবনার্থ নগরের স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি কয়েকজন পরম আত্মীয় ও বন্ধুর সহিত অতি প্রত্যূষে ভ্রমণ করিতে যাইতেছিলেন। মহারাজ যাইতে যাইতে দেখিলেন, পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদিত হইতেছেন; তাঁহার উদয়ে প্রকৃতির অপরূপ শোভা হইয়াছে। তিনি কথাচ্ছলে একজন বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বসন্তকালে সূর্য্যোদয়ে সকলেরই মন প্রফুল্ল হয়।" তখন সেই বন্ধু রহস্যচ্ছলে বলিলেন "মহারাজ! বসন্তকালে সূর্য্যোদয়ে যে সকলেরই মন প্রফুল্ল হয়, তাহা নহে। বিদ্যা-বুদ্ধি যতই থাকুক না কেন, অর্থ না থাকিলে মনুষ্যের মনে শান্তি থাকে

না।" তখন মহারাজ তাঁহার কথা প্রত্যাদিষ্ট মনে করিয়া কহিলেন, "কাণা খোঁড়া তরে যায় শুধু অর্থ-বলে।"

এই ঘটনাটী কৃষ্ণকান্তের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করিয়া দিল। যখন মহারাজ বন্ধুবর্গের সহিত উদ্বিগ্নিত বিষয়ে কথা কহিতে কহিতে গমন করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণকান্তও বায়ু-সেবনার্থ বহির্গত হইয়া সেই রাস্তা দিয়াই যাইতেছিলেন। ভগবানের কৃপায় মণি-কাঞ্চনের সংযোগ ঘটিয়া উঠিল। কবির হৃদয় সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। কোনও রসের কথা পাইলেই কবির হৃদয়-সমুদ্র ভাব-তরঙ্গে উদ্বেল হইয়া উঠে। তিনি মহারাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিলেন। মহারাজের বদন-বিনিঃসৃত "কাণা-খোঁড়া তরে যায় শুধু অর্থ বলে"—এই বাক্যটী শ্রবণমাত্র কৃষ্ণকান্ত অবশিষ্ট অংশ এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

বসন্তের আগমনে, সকলেই সুখী মনে
যে যাহার প্রিয় অতি, সেই তারে পায়।
বিশেষতঃ প্রাতঃকালে, যার 'যায় যায়' ব'লে
মলয়ের সৈন্য ল'য়ে চারিধারে ধায়।
উদিয়া সহস্র-কর, শোভা করে সরোবর,
পদ্মিনীর নেত্রবারি দেয় মুছাইয়া।
পদ্মিনী আঁচল খুলে, পতিপানে মুখ তুলে,
নিশার বিরহানল দেয় নিবাইয়া।
অলিনীর সনে অলি, কুসুমে করিছে কেলি,
চক্রবাক চক্রবাকী একসঙ্গে রয়।
এ কি অপরূপ দৃশ্য, পুলকে পূরিল বিশ্ব,
মদন রাজার শিঙ্গা বন্ধ কেবা নয়?
এ সোণা বামুন-পুত্র, বিবাহ-বন্ধন-সূত্র,
ছেঁড়িতে উদ্যত,—গাত্র জ্বলে উঠে তাই।
দেখি জামাতার কই, শ্বশুর বা হন্ কই,
শাশুড়ীর মন নাই, একি রে বালাই।
শ্রীমতীর মুখখানি, হেরিলে জুড়ায় প্রাণী,
অর্থ নাই বলে তাই দুর্গতি কপালে।
যত কিছু লেখাপড়া, সকলি ত কলাপোড়া,
'কাণা খোঁড়া তরে যায় শুধু অর্থ-বলে'।

কৃষ্ণকান্ত এই কবিতাটিতে বসন্ত-ঋতুর প্রভাত বর্ণনা করিলেন। কয়েকদিন হইতে তাঁর বিবাহের কথা তিনি মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন। কিন্তু নিজ দারিদ্র্য-দুঃখ-বশতঃ তিনি বিবাহ করিতে পারিতেছেন না। এই সমস্ত বিষয়ই তিনি এই কবিতায় প্রবেশ করাইয়া মহারাজের গোচর করিলেন।

কৃষ্ণকান্তের মুখে সমস্যা-পূরণের কবিতাটী শুনিয়া মহারাজ বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি কে? আপনার নাম কি ও নিবাস কোথায়?" মহারাজের সহচরবর্গও উৎসুক হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকান্ত মহারাজকে চিনিতেন না। তিনি কহিলেন, "মহাশয়! আমি কৃষ্ণনগরাধিপতির একজন নগণ্য প্রজা; নাম কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী; নিবাস বাড়েঁয়াকা গ্রাম।" তখন মহারাজের একজন সহচর প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কৃষ্ণনগরে কি কার্য্য করেন?" কৃষ্ণকান্ত উত্তর করিলেন, "মহাশয়! গুণগ্রাহী প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নগরে আসিয়া দ্বারে দ্বারে নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। শুনিয়াছিলাম, কৃষ্ণনগর কাশীধামের তুল্য; কারণ, এই স্থানে ব্রাহ্মণ অভুক্ত থাকেন না। এখন দেখিতেছি, সে কথা বৃথা,—কথায় কথা মাত্র। এক্ষণে নিরুপায় হইয়া রাজপুরোহিত মহাশয়েরই আশ্রয়ে আছি।" তখন কৃষ্ণকান্ত মহারাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! যখন আপনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমি কি আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি?" ইহা শুনিয়া মহারাজের একজন সহচর কহিলেন, "ইনিই কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ শিরীশচন্দ্র। ইনিই গুণগ্রাহী প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র।" মহারাজ ও তাঁহার সহচর-গণ কৃষ্ণকান্তের দুঃখের কথায় ম্রিয়মাণ হইয়া স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণকান্ত আর কোথায় যাইবেন! আশ্রয়-দাতা পুরোহিত মহাশয়ের গৃহেই গমন করিতে বাধ্য হইলেন।

যেদিন পথে মহারাজ শিরীশচন্দ্রের সহিত কৃষ্ণকান্তের সাক্ষাৎকার হয়, সেই দিনই বৈকালে রাজপুরোহিত মহাশয় স্বীয় চণ্ডী-মণ্ডপে বসিয়া কৃষ্ণকান্তের সহিত তাঁহার চাকরী সম্বন্ধে কথা কহিতেছিলেন। কথায় কথায় কৃষ্ণকান্ত তাঁহাকে কহিলেন, "অদ্য প্রাতঃকালে নগর-প্রান্তে ভ্রমণ করিতে গিয়া মহারাজ শিরীশচন্দ্রের সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছি।" কৃষ্ণকান্তের এই কথা শুনিবামাত্র পুরোহিত-মহাশয় তাঁহার মুখে আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনা শুনিয়া নিরতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিলেন, এবং কহিলেন, "এতদিন পরে তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। মহারাজ শীঘ্রই তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন।" উত্তরে বসিয়া এইরূপ কথোপ-কথন করিতেছেন, এমন সময় মহারাজের একজন ভৃত্যকর্ম্মা আসিয়া পুরোহিত-মহাশয়কে কহিলেন, "মহারাজ আপনাকে এবং আপনার বাটীতে যে ব্রাহ্মণী-সম্প্রতি আসিয়াছেন, তাঁহাকেও এখনই রাজ-সভায় যাইতে আদেশ করিয়াছেন। অতএব উভয়ে মিলিয়া এখনই আমার সঙ্গে চলুন।"

রাজ-পুরোহিত মহাশয় কৃষ্ণকান্তকে সঙ্গে করিয়া মহারাজ শিরীশ-চন্দ্রের সভায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ কৃষ্ণকান্তের সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন। মহারাজ কহিলেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি শীঘ্রই অন্তঃপুর হইতে ফিরিয়া আসিতেছি।" ইহা বলিয়াই মহারাজ অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। সেখানে কোনও কারণ-বশতঃ মহারাণীর সহিত মহারাজের একটু বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল। মহারাজ- রাণীকে বিবিধ প্রিয় বাক্য বলেন। তাহাতে রাণী কহেন, "তুমি স্বামী, ভগবান্ তোমাকে বলিতে দিয়াছেন, বল বল বল।" মহারাজ ক্রোধভরে রাজ-সভায় ফিরিয়া আসিয়া কবি কৃষ্ণকান্তকে ইঙ্গিত করিয়া সহাস্য-বদনে কহিলেন,

"বল বল বল!" কবি কৃষ্ণকান্তও মহারাজের আকার-প্রকার-বর্ণনে তাঁহার মনের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ এই সমস্যাটী এই ভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

বম্পতি-কন্ধরে বামী হ'য়ে রোষে রম
কহেন শ্রেয়সী প্রতি অগ্নির বচন।
পতি-বাক্যে সতী-চক্ষে জল ছল ছল,
বলিতে দিয়াছে বিধি 'বল বল বল।'

কৃষ্ণকান্তের একটী অদ্ভুত শক্তি ছিল। তিনি যাঁহার সহিত আলাপ করিতেন, তাঁহার আলাপযন্ত্রক নিরীক্ষণ না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। মহারাজ অন্তঃপুরে গিয়া রাণীর সহিত কলহ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার আকার-ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়াই, কৃষ্ণকান্ত সমস্যাটী পূর্ণ করিয়াছিলেন। মহারাজ ইহা বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণকান্তের অদ্ভুত শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন।

তৎপরে শিরীশচন্দ্র স্বীয় প্রপিতামহ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ও তাঁহার সভাসদ্-গণের গুণ-গরিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় তিনি কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিয়া কহিলেন "কাহে আওয়ান।" কৃষ্ণকান্ত মহারাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সমস্যাটী এই ভাবে তৎক্ষণাৎ পূরণ করিয়া দিলেন :—

তিন জনে তিন মাতৃ-শ্রাদ্ধ করিলেন যবে,
গমন করিয়াছিল তাঁহাদের রবে।
কৃষ্ণচন্দ্র, নবকৃষ্ণ, গোবিন্দ মেওয়ান,—
কার সাধ্য ইঁহাদের 'কাহে আওয়ান।'

টীকনী। কৃষ্ণচন্দ্র—কৃষ্ণনগরাধিপতি প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। নবকৃষ্ণ—শোভাবাজারের সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ নবকৃষ্ণ। গোবিন্দ মেওয়ান—ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সুবিখ্যাত মেওয়ান্ পাকপাড়ানিবাসী গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।

মহারাজের একজন সভাসদ্ কৃষ্ণকান্তকে প্রশ্ন করিলেন, "অন্ধ-বলে বংশোলাভ হয় ভূমণ্ডলে।" কবি কৃষ্ণকান্ত মহাশয় তৎক্ষণাৎ ইহার এইভাবে উত্তর দিলেন :—

কুন্তী ও দ্রৌপদী হায় এই দুই জন
প্রত্যেকে ভজিলা পঞ্চ পতির চরণ।
তবু তাঁরা মহাসতী,—সকলেই বলে,
'পুণ্য-বলে বংশোলাভ হয় ভূমণ্ডলে।'

মহারাজ কবি কৃষ্ণকান্তকে প্রশ্ন করিলেন "ওড়ি মেরে যায়।" কৃষ্ণকান্তের কবিত্ব-শক্তি অসীম। তিনি কণবিলম্ব না করিয়া এইভাবে প্রশ্নের উত্তর দান করিলেন :—

রূপসী নারীর যদি রহিল যৌবন,
তার চেয়ে নাহি তার আদরের ধন।
যৌবন অমূল্য নিধি,—পড়েছে হারিয়ে,
কোথা গেলে পাব আমি তাহারে খুঁজিতে?
ইহা ভাবি' যার তার খুঁজিতে তাহায়,
তাই বুড়ি নড়ি ধরে 'ওড়ি মেরে যায়।'

মহারাজ সভায় বসিয়া স্বীয় প্রপিতামহ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুণ-গরিমার কথা কৃষ্ণকান্তকে বলিতেছিলেন। কথায় কথায় তিনি বলিলেন "রন্ ভূমণ্ডলে।" কবি কৃষ্ণকান্ত সরস্বতীর বরপুত্র। তিনিও তৎক্ষণাৎ সমস্যাটী এই ভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ পুরন্দর নবরাজ
ছু-জনার কেবা বড় নর না বুঝিল।
তুলা-দণ্ডে দুই নিধি স্থাপন করিয়া বিধি
ওজন করিতে তাঁর বাসনা জন্মিল।
লঘু বলি শচিপতি ঊর্দ্ধদিকে তাঁর গতি
লঘু বস্তু ঊর্দ্ধদিকে যায় কুতূহলে।
কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি পণ্ডিত জনার পতি
অতি গুরু বলিয়াই 'রন্ ভূমণ্ডলে।'

মহারাজ মনে করিলেন, এইবারে কবি কৃষ্ণকান্ত মহাশয়কে একটী জটিল সমস্যা দিয়া দেখিব, তিনি ইহা পূরণ করিয়া দিতে পারেন কি না! ইহা মনে করিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ঘরমে ঘরিলা পত্নী পতির সম্মুখে!" কবি কৃষ্ণকান্তের শক্তি অসীম। তিনি বিলম্ব না করিয়াই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

ঘুরে ঘুরে বনে বনে পঞ্চ পাণ্ডবের সনে
ক্লান্ত হ'য়ে পড়িলেন দ্রুপদের বালা।
ভীমসেন মহামতি কহেন শ্রেয়সী প্রতি
শ্রম দূর কর,—তুমি রাজার মহিলা।
ইহা শুনি ধীরে ধীরে যাইয়া নদীর তীরে
কৃষ্ণতনু বলিলেন ধনী মহাদুখে।
পবনের তরে হায় হইয়া পাগল-প্রায়
'ঘরমে ধরিলা পত্নী পতির সম্মুখে।'

এইবারে মহারাজ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, আমরা সভায় বসিয়া সকলেই যে যে প্রশ্ন করিতেছি, কবি কৃষ্ণকান্ত মহাশয় তাহাদের উত্তর তৎক্ষণাৎ দিতেছেন। অতএব এইবারে এরূপ একটী জটিল সমস্যা দিব যে, তাহা তিনি কিছুতেই পূরণ করিতে না পারিয়া পরাস্ত হইবেন। ইহা ভাবিয়া তিনি কহিলেন "অর্জ্জুন বালিকা বধূ, দ্রৌপদী দুর্য্যোধন।" কবি কৃষ্ণকান্তও তৎক্ষণাৎ তাহা এইভাবে পূরণ করিয়া সভাস্থ সকলকেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন :—

জয়দ্রথ-বধ হেতু অর্জ্জুনের পণ,—
সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তারে করিব নিধন।
যদি না বধিতে পারি অনলে প্রবেশ করি',
জুড়াইব হৃদয়ের যতেক যাতনা।
শুনি অর্জ্জুনের পণ কুরুরাজ দুর্য্যোধন
ত্বরাই সূর্য্যাস্ত হোক,—করিল কামনা।

অর্জ্জুনের ইচ্ছা যায় শূন্যাগু বিলম্বে হয়
উত্তরে শূন্যের পানে রাখিলা নয়ন।
বালিকা না সঙ্গে চায় প্রৌঢ়া নারী চায় তায়
'অর্জ্জুন বালিকা বধূ, প্রৌঢ়া দুর্য্যোধন'।

মহারাজ এই জটিল সমস্যাটির অদ্ভুত পূরণ শুনিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তখন মহারাজের একটী নিকট-সম্পর্কীয় লোক প্রশ্ন করিলেন, "বেশ কচি খোকা।" কবি কৃষ্ণকান্ত প্রশ্নটীর এইরূপ উত্তর তৎক্ষণাৎ প্রদান করিলেন :—

আহারমুখ হইলেই কমলা বিমুখ,
আহারমুখের কভু নাহি হয় সুখ।
না শুনিল শুক-মাকা,—এমি বলি খোকা,
সন্ধেশ খোয়ালে যাদুটী 'বেশ কচি খোকা।'

মহারাজ কহিলেন, "এইবারে আপনাকে একটী শুক্তিরসের সমস্যা পূরণ করিতে দিলাম। সমস্যাটী এই :—"পায় পায় পায়।" কবি কৃষ্ণকান্ত মহারাজের প্রকৃত মনের কথা বুঝিতে পারিয়া এই সমস্যাটী তৎক্ষণাৎ এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

কেঁদে কহে কৃষ্ণাবলী, বলিরাজ! শুন বলি,
ছলিবারে বামনালী হলেন উদয়।
হেন ভাগ্য কবে হবে যার বস্তু সেই লবে,
জগতে ঘোষণা রবে ঘর বলি ঘর।
এক পদ আছে বক্ষী, প্রকাশ করিলে চক্ষী,
এ দেহ করিয়া বিক্রী, ঘর যে মাথায়।
তুমি আমি দু জনের, ঘুচিবে কর্ম্মের ফের
বিশাই বামনের, 'পায় পায় পায়।'

মহারাজ ও তদীয় সভাস্থ লোক সকল মিলিয়া কবি কৃষ্ণকান্তকে নানারূপে জটিল ও কূটিল সমস্যা দিয়া পরাস্ত করিবার বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কবি কৃষ্ণকান্ত স্বয়ং পরাস্ত না হইয়া স্বয়ং মহারাজ ও তদীয় সভাসদ্‌গণকেই পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে আপনার সংসার চলে?" কৃষ্ণকান্ত উত্তর করিলেন, —"মানুষ কবি হইলে তাহার অন্ন হয় না;—ইহাই পোড়া বিধাতার লেখা।" কবি কৃষ্ণকান্ত এমন প্রাণের কথা খুলিয়া মহারাজের প্রদত্ত 'পোড়া বিধাতার লেখা' সমস্যাটী তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

তব হে গিরীশচন্দ্র করি নিবেদন,
যখন গিরীশ তুমি,—তুমি গিরিনন্দন।
যে নেত্রে উত্তাপ তব, সেই নেত্র দিয়া
একবার মোর দিকে দেখ তাকাইয়া।
ঘর ঘর করি' ঘর্ম্ম-বিন্দু দিক্ দেখা,
ঘুচে যাক্ যত 'পোড়া বিধাতার লেখা।'

এইবারে মহারাজ পরাস্ত হইলেন। তিনি আর কৃষ্ণকান্তকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন না। তিনি মনেমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কবির দৈবী শক্তি আছে; নচেৎ এরূপ জটিল ও কূটিল সমস্যাগুলি কণবিলম্ব না করিয়াই তিনি কিরূপে মনের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিয়া পূরণ করিয়া দেন! আমার রাজ-সংসারে আর্থিক কষ্ট হইলেও, ইহাকে আমি নিজ সভায় সভাসদ্ করিয়া রাখিব। আমার সর্ব্বদাই নানাবিধ মানসিক কষ্ট আছে। ইহার মত সুরসিক ও জ্ঞানী লোককে নিকটে রাখিলে আমি মনে শান্তি লাভ করিতে পারিব।" মহারাজ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় মহারাজের একজন পরম আত্মীয় ও পুরোহিত মহাশয় কহিলেন "মহারাজ! আপনি স্বয়ং ধার্ম্মিক, দয়ালু ও বিদ্যোৎসাহী। আপনার প্রপিতামহ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন পণ্ডিত-রত্নগণের আশ্রয়-স্থল ছিলেন, তখন আপনিও এই সুপণ্ডিত কবির আশ্রয়-স্থল হউন।" মহারাজ তথাস্তু বলিয়া কবি কৃষ্ণকান্তকে কহিলেন, "মহাশয়! আপনি আমাকে ও সভাস্থ সকল লোককেই স্বরচিত কবিতা শুনাইয়া নিজ কবিত্ব-শক্তির প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন, তখন আমি পরম প্রীত হইয়া আপনাকে অদ্য "রস-সাগর" উপাধি দিলাম। এতদ্ভিন্ন আপনার সাংসারিক ব্যয়ের জন্য আপনাকে ত্রিশটাকা মাসিক বেতন দিব। তাহা হইলেই আপনার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। আপনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে রাজ-সভায় আসিয়া আপনার কবিতা শুনাইয়া যাইবেন।" ইহা শুনিয়া কবি কৃষ্ণকান্ত আনন্দে অধীর হইয়া মনে মনে ভগবান্‌কে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বজন্মে পরিশ্রমে কবি কৃষ্ণকান্ত যে কবিতালতা মহারাজের সমীপে পুষ্পিত করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন, অদ্য ভগবানের কৃপায় তাহা ফলিত হইল। তখন তিনি মহারাজ ও সভাসদ্-গণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া রাজপুরোহিত মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহারই বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

এখন হইতে আমরা কবি কৃষ্ণকান্তকে "রস-সাগর" বলিয়া আখ্যাত করিব। রস-সাগর এখন নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার পরমহিতৈষী রাজ-পুরোহিত মহাশয়ও দীন ব্রাহ্মণ সন্তানকে সংস্কৃত-ভাষায় শিক্ষা দান করিয়া এবং মহারাজের নিকটে তাঁহার উপরাজের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। রস-সাগরের মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা ধার্য্য হইল। তৎকালে মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা হইলে যে সংসার স্বচ্ছন্দে চলিত, বর্ত্তমান সময়ে মাসিক বেতন তিন শত টাকা হইলেও সে সংসার স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে না। রস-সাগর যে সময়ে মহারাজের সভাসদ্ হইলেন, সে সময়ে কৃষ্ণনগরে খাদ্যদ্রব্যের কিরূপ মূল্য ছিল, তাহাও এস্থলে বলা আবশ্যক। "কিতীশ-বংশাবলি-চরিত"-রচয়িতা স্বর্গীয় মহারাজ ঈশ্বরচন্দ্র কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় স্বীয় গ্রন্থে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা অবিকল এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম :—

"৫০ বৎসর পূর্ব্বে [অর্থাৎ ১২৫২ বঙ্গাব্দে বা ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে] আমরা দেখিয়াছি যে, এ প্রদেশ-মধ্যে তণ্ডুলের মণ ৸০ আনা, কলাই, ছোলা ও অড়হরের মণ ৷০ আনা, মুগের মণ ১৲ টাকা, তৈলের মণ ৪৲ টাকা, ঘৃতের মণ ১০৲ টাকা, গুড় খেঁসারি ও মুসুরির মণ ৵০ আনা ছিল। অন্য অন্য খাদ্যও এইরূপ সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত। ইহার পূর্ব্বে এই সকল দ্রব্যের মূল্য আরও অল্প ছিল।"

কৃষ্ণনগর-রাজবংশ বহুকাল হইতেই বিদ্যোৎসাহিতার জন্য প্রসিদ্ধ। একাকী মহারাজেন্দ্র-বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ-স্থল; তাঁহার প্রপৌত্র মহারাজ শিরীশচন্দ্রও প্রপিতামহের গুণানুসরণ করিয়া তাঁহার যশ রক্ষা করিলেন। রস-সাগর এখন মহারাজ শিরীশচন্দ্রের সভাসদ্ হইয়া নিজ মৌখী শক্তির বলে জটিল ও কুটিল এবং সরল ও প্রাঞ্জল সমস্যা পূর্ণ করিয়া সভাস্থ ও অন্যান্য লোকদিগের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অর্থাভাব ও অন্নের জন্য হাহাকার গেল। ক্রমে ক্রমে সমগ্র নদীয়া জেলায় এবং কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী স্থান-সমূহে কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয় "রস-সাগর" নামে পরিচিত হইলেন। সকলেই তাঁহাকে "রস-সাগর" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তিনি যে মহারাজ-প্রদত্ত এই গৌরবাত্মক উপাধির যথার্থ যোগ্যপাত্র ছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

রস সাগর মহাশয় দেখিতে কুৎসিত পুরুষ ছিলেন; কিন্তু তিনি সুরসিক, সুচতুর ও সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার সুরস বাক্-পটুতায় শ্রোতার হৃদয় দ্রবীভূত হইত। তাঁহার রস-ভাব-সমন্বিত মিষ্ট কথায় তাঁহার নিত্য-সহচরগণ সর্ব্বদাই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া থাকিতেন। অতি দুঃখের সময়েও লোকে তাঁহার কথা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার এক মৌখী শক্তি ছিল,—তিনি প্রশ্নকর্ত্তার ভাব-ভঙ্গী দ্বারা তাঁহার প্রকৃত মনোগত অভিপ্রায় অনায়াসে অনুভব করিয়া লইতে পারিতেন। দ্রুত-রচনা সম্বন্ধেও তাঁহার শক্তি অতি বলবতী ছিল। তাঁহার দ্রুত কবিত্ব-শক্তি থাকাতেই তিনি এতাদৃশী খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কোনও ব্যক্তি কোনও ভাবের এক বা অর্দ্ধ চরণ অথবা চরণের কিয়দংশ 'সমস্যা' দিলেই তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া উপর্য্যুপরি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে তাহা পূরণ করিয়া দিতেন।

"শিউীল-বংশাবলি চরিত"-লেখক স্বনাম ধন্য মহাত্মা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় কৃষ্ণনগর-রাজবংশে প্রায় ৪০ বৎসর দেওয়ানী ও ১০ বৎসর অন্যান্য কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজ শিরীশচন্দ্রের সময়ে রাজ সংসারে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রস সাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে রস-সাগরকে লইয়া নানা রঙ্গ ভঙ্গ করিতেন ও তাঁহার রসের উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিতেন। দেওয়ান মহাশয় স্বীয় গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন:—

"একদা রাজ-সভায় কোনও ব্যক্তি সমাগত হইয়া রস-সাগরকে এই সমস্যা দিয়াছিলেন 'কুঞ্জের আগরে কৃষ্ণ রাধা সঙ্গে খেলে।' নব-নিকেতনে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের ঘুলিবার অসম্ভাবনা প্রযুক্ত সমস্যা-দাতার মনে এই সমস্যার উদয় হয়। রস-সাগর সমস্যাটী পাইবামাত্র ইহা চারি চরণে পূরণ করিলেন। রাজা কবিতার অপূর্ব্ব-ভাবে সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে চারি টাকা পুরস্কার দিবার ইঙ্গিত করিলেন। রস সাগর মহারাজকে বলিলেন, 'যদি অনুজ্ঞা হয়, তবে পুনরায় আর এক ভাবে ছয় চরণে ইহা পূরণ করি।' মহারাজ অনুমতি দিলেন। রস-সাগর দ্বিতীয়বার যাহা রচনা করিলেন, তাহাও অতি চমৎকার হইল। মহারাজ পুরস্কার ছয় টাকা দিবার ইঙ্গিত করিলেন। রস-সাগর চারে চরণে পুরস্কার-দর্শনে উৎসাহিত হইয়া মহারাজের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তৃতীয়বার নূতন ভাবে আট চরণে এই সমস্যাটী পূরণ করিয়া আট টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন।" কার্ত্তিকের বাবু এই উদ্ধৃত অংশের পাদ-টীকায় লিখিয়াছেন "এই কয়েকটী কবিতা আমি কবির নিজের মুখে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ স্মরণ না থাকাতে তাহা পাঠকগণের গোচর করিতে পারিলাম না।" তিনি স্বীয় গ্রন্থের আরও একস্থানে লিখিয়াছেন, "রস-সাগরের নিজের ও প্রাচীন লোকের মুখে তাঁহার রচিত যে সকল কবিতা শুনিয়াছি, দুর্ভাগ্য-বশতঃ তন্মধ্যে উৎকৃষ্টগুলি বিস্মৃত হইয়াছি। সুতরাং তাঁহার গুণের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারিলাম না।"

ভারতীয় শিক্ষার বিশেষত্ব

[অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-টি]

প্রাচীন ভারতের জাতীয় শিক্ষার ইতিহাস বলিয়া যদিও কোন প্রকারের স্বতন্ত্র পুস্তক নাই, তথাপি যখনি শাস্ত্র হইতে হিন্দুর শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর তত্ত্ব অবগত হইতে পারি। মনু তাঁহার ধর্ম্ম-সংহিতায় শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমি শুধু সেই সকল তত্ত্ব ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব।

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, অতি প্রাচীন হিন্দুগণের মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না। সে সকল বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ পরম্পরাগত ছিল; এবং শিষ্যগণ গুরুমুখে যাহা শুনিতেন, পুত্র, পিতা-পিতামহ প্রভৃতি বৃদ্ধলোকের মুখে যাহা অবগত হইতেন, তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। একপে এই সকল তত্ত্ব একমুখ হইতে অন্যমুখে, বংশ হইতে বংশান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু যখন আলোচ্য বিষয় বহুমুখী হইতে লাগিল এবং লোকসংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন এই উপায়ে হিন্দুশাস্ত্র রক্ষিত রাখা সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল; সমাজ-হিতৈষিগণ বিস্মৃতির অতলগর্ভ হইতে আপনাদের শাস্ত্ররত্ন উদ্ধার করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন; এবং সূত্রাকারে সেই সকল তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিলেন। এইরূপে আমাদের শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্ম-সূত্রের সৃষ্টি হইল।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে, মনু সেই সকল ধর্ম্মসূত্র অবলম্বনে তাঁহার মানব-ধর্ম্মসংহিতা রচনা করেন। মনু তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে সমাজ-তত্ত্বের যে সকল গবেষণা ও চিন্তাপূর্ণ নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান শিক্ষাভিমানী ও স্বেচ্ছাচারী সমাজের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় ও ইষ্টকর। এই সকল নিয়ম পালন না করিয়াই, বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ দিন-দিন দুর্ব্বল ও অন্তঃসারশূন্য হইয়া

পড়িতেছে, এবং শ্রীহীন চিত্তবৃত্তি ও অসংযমের দ্বারা ইহার সবল ও সুস্থ সন্তান প্রসব করিতে অক্ষম হইয়া পড়িতেছে।

নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে মনু কি বলিয়াছেন, সেই প্রাচীন হিন্দু-সমাজে গুরুশিষ্যে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, পরস্পর প্রীতি, গুরুভক্তি, আত্মসংযম বিষয়ে কতদূর দৃষ্টি ছিল, এবং নানাপ্রকার অনুষ্ঠান ও অভ্যাসের সাহায্যে কিরূপে শিষ্য-চরিত্র গঠিত হইত, তাহাই প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান ভারতে যে ধর্ম্মবিহীন ও নীতি-বিবর্জ্জিত শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহার কুফল এক্ষণে সকলেই প্রাণে-প্রাণে অনুভব করিতেছেন, শাসনকর্ত্তৃপক্ষ ও সমাজহিতৈষী মনীষিগণ তাহার প্রতীকার-চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন। নানা ধর্ম্মাবলম্বী ও নানা দলে বিভক্ত ভারত-সমাজে কিরূপে ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে এবং কিরূপই বা বিদ্যব্যসায়ী, স্বেচ্ছাচারী যুবকগণ সুসংযত ও চরিত্রবান্ হইয়া দেশের ও সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবে, যেই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে যে অচিরে আমাদের সমাজ ধ্বংসমুখে পতিত হইবে, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।

বর্ত্তমান সমাজের শিক্ষার উন্নতি করিতে হইলে, প্রাচীন সমাজের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আমরা কিছুতেই অবহেলা করিতে পারি না। প্রাচীনকে ভিত্তি করিয়া সংস্কার, পরিবর্জ্জন বা পরিবর্দ্ধন-রীতি অনুসরণপূর্ব্বক আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। আশা করি আপনারা সকলে মনু-প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রণিধান করিয়া দেখিবেন, এবং বর্ত্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে সেগুলি প্রযোজ্য কি না তাহাও বিবেচনা করিবেন।

প্রাচীন হিন্দুযুগে ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসিগণ ব্রহ্মজ্ঞানকে অতি সমাদরে, হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রেমে, শীর্ষে পূজা করিতেন। বিষয়-বাসনা বা পার্থিব সুখস্পৃহা তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপথ হইতে অণুমাত্র বিচলিত করিতে পারিত না। ধর্ম্মকে মূলভিত্তি না করিলে যে শিক্ষা ফলপ্রদ হইতে পারে না, সত্যের উপর স্থাপিত না হইলে নীতিশিক্ষাও যে অচিরে অহঙ্কার-কলুষিত হইয়া, আত্মম্ভরিতা আনয়নপূর্ব্বক হৃদয় ও মনকে অধিকৃত করিয়া ফেলিবে, তাহা প্রাচীন ঋষিগণ উপলব্ধি করিয়াই ধর্ম্মকে এত উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছিলেন। ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকিলে, সেই সর্ব্বশক্তিমানের প্রভায় আমরা প্রভাবিত, এই সত্যে প্রত্যয় না জন্মিলে, আত্মার মূল করিয়া তাঁহাতে বাসভাবে তন্ময় করিতে না পারিলে, ভগবৎ-প্রেমে মত্ত হইয়া তৎসৃষ্ট জীবে দয়া প্রদর্শন করিতে না শিখিলে, মানবজীবন বিফল হইয়া যাইবে; পাশব বলে বল বৃত্ত মানব দর্প ও দম্ভের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জগতের সমক্ষে আত্ম সুখ্যাতি ও আত্ম-বল ঘোষণা করিতে প্রয়াস পাইবে, ইহা হৃদয়ে অনুভব করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ঈশ্বর প্রীতির জন্য নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন; এবং ধর্ম্মবিহীন শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে গণ্য করেন নাই।

জীবন-যাত্রার ধর্ম্ম, বিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তি চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে দুষ্প্রাপ্য। অসংযত ইন্দ্রিয়সকল দিন দিন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুগণকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। ঐ সকল রিপুর তাড়নায় চিত্তের চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা উপস্থিত হইয়া মানবকে পাপপঙ্কে নিমগ্ন করে। প্রাচীন ঋষিগণ এই ভ্রমসঙ্কুলতাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য বা সংযমের বিধান করিয়াছেন। যে চিত্তশুদ্ধি ধর্ম্মলাভের একমাত্র উপায়, যে চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ধর্ম্মরাজ্যে একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না, যে চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত শিক্ষাভিমান ও জ্ঞান-গরিমা মনুষ্যের অবনতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়, যে চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত সমাজ-হিতৈষণা ও স্বজাতি-প্রেম মানুষকে ক্ষুদ্র স্বার্থের কারাগার করিয়া তোলে, সেই চিত্তশুদ্ধি লাভের জন্য ঋষিপ্রবর মনু শিষ্যের অবশ্য পালনীয় যে সকল নিয়মের ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র আদৃত হইতেছে ও হইবে।

আত্মসংযম সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন:—

বিদ্যার্থী প্রলোভন-জনক বিষয় হইতে স্বকীয় ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে চেষ্টা করিবে; কারণ অসংযত অশ্ব যেরূপ উষর ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া আরোহীকে বিপদাপন্ন করে, সেইরূপ মানুষের অসংযত দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়সকল তাহাকে বিপদসঙ্কুল করিয়া ধ্বংসমুখে নিপাতিত করে। সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে এই সকল ইন্দ্রিয়কে বশে আনিতে হইবে; কারণ অবশীভূত ইন্দ্রিয়সকলের সংস্পর্শে আমাদের জীবনে নানা-প্রকার দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং। ৮৮। ২য়
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ং।
সন্নিয়ম্যতু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিয়চ্ছতি। ৯৩।

ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রধান উপায় দিন দিন ভোগস্পৃহাকে খর্ব্বতর করা; কারণ উপভোগের দ্বারা মানবের ভোগ-বাসনা দিন-দিন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মনু বলিতেছেন—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে। ৯৪। ২য়।

মনু ইহা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, বিষয়ীর পক্ষে বিষয়-বাসনা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা সম্ভবপর নয়। তাই তিনি বলিতেছেন যে, পার্থিব বিষয়ের অসারতা স্মরণ করিয়া প্রকৃতজ্ঞানের দ্বারা ধীরে-ধীরে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে। হঠাৎ সকল প্রকার বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিলে মনের দৌর্ব্বল্য ও জ্ঞানের অভাববশতঃ তাহা পুনরায় আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে। এরূপ চেষ্টার সফলতা সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ আছে। যে পর্য্যন্ত প্রকৃত জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হইবে, সে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গণের হস্ত হইতে পূর্ণ মুক্তিলাভের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই মনু বলিতেছেন—

ন তস্যৈতানি শস্ত্রাস্ত্রে নিশ্চিত্ত মনেবহা।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথাজ্ঞানেন বিত্তাশ: । ১৬।

তিনি বলেন শরীরকে নানাপ্রকার কষ্ট প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই। অনাহারে অনিদ্রায় বা অন্য কোনও কঠোর ব্রতাবলম্বন করিয়া আত্মনিগ্রহ করাকে তিনি সংযমের প্রশস্ত পথ বলিয়া মনে করেন নাই। স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া বা তনু ক্ষীণ করিয়া শিক্ষার্থীকে সংযম শিক্ষা করিতে তিনি উপদেশ দেন না। বিনয়ানে দুই সন্ধ্যা গায়ত্রী জপকে সংযম শিক্ষার প্রশস্ত উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

বদেকুদ্রেন্দ্রিয় গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদ্দর্ম্মানক্ষিণয়ং যোগতস্তনুং।
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ সাবিত্রীমর্ক দর্শনাৎ
পশ্চিমাঞ্চ সমাসীন: সম্যগৃক্ষ বিভাবনাৎ।

১০০ । ১০১ । ২য় অধ্যায়।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শিষ্য তাহার চরিত্রগত উন্নতি সাধনকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞান করিয়াও তদ্দেশে যত্নপরিকর ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া, কতিপয় ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা দেহকে কষ্টসহ ও মনকে দৃঢ় করিতেন। প্রাচীন হিন্দুগণ ইহা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, নীতিশিক্ষা নীতিবিষয়ক উপদেশ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাই তাঁহারা শুধু সে সকল উপদেশ প্রদানে নিরস্ত না থাকিয়া, কার্য্যতঃ দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া যাহাতে শিষ্যের চরিত্র তাহার অলক্ষিতে অনায়াসে গঠিত হইয়া উঠিতে পারে, তাহার সুশৃঙ্খলা ও সুবন্দোবস্ত করিতে যত্নপর হইতেন। কর্ম্মহীন ও পুস্তকসর্ব্বস্ব যুবকগণকে কুচিন্তা ও কুকার্য্য, জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, অধঃপাতের চরম সীমায় লইয়া যাইবে, ইহা তাঁহারা নখদর্পণে প্রতিফলিত দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা এইরূপ বিধান করিয়া গিয়াছেন যে, শিষ্যগণ অনন্তচিত্তা বা কুবাক্যে মন দিবার সময় বা সুযোগ যেন কখনও প্রাপ্ত না হয়। সমস্ত দিবসমানে তাহাদের পুস্তকমাত্র অবসর ছিল না। তাহারা পুস্তকপাঠ বা গুরুর উপদেশ শ্রবণে কতক সময় অতিবাহিত করিত; অবশিষ্ট সময় বিভাগ করিয়া, বিভিন্ন সময়োপযোগী অবশ্য-করণীয় কার্য্য এই ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইত যে, শিষ্য সেই বাল্য জীবন হইতেই দেবসেবা, কষ্টসহিষ্ণুতা, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জন, ও গুরু-সেবা প্রভৃতি কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন। সেই আত্মনির্ভরতা ও পরসেবাই তাঁহার জীবন-সঙ্গী হইয়া তাঁহাকে পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন শিক্ষা দিত। শিষ্য স্বীয় স্বার্থসুখ আত্মবিসর্জ্জন দিয়া নানাপ্রকার কষ্ট-সাধ্য ব্রত পালন করিতেন। উপনয়ন-কাল হইতে সূর্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত শিষ্য যজ্ঞকাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেন, ভূমিতে শয্যায় শয়ন করিতেন এবং গুরুসেবায় রত থাকিতেন; গুরুসেবা শিষ্যের অন্যতম কর্ত্তব্য ছিল। শিষ্য স্বীয় শান্তিসুখ বিসর্জ্জন দিয়া, দৈহিক ক্লেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, নিজের জীবনপাত করিয়া, গুরুর পরিচর্য্যা ও শুশ্রূষাতে রত থাকিতেন। সেই সেবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত; তাহাতে পীড়নের লেশমাত্র ছিল না; তাহাতে শিষ্যের ক্লেশ উৎপাদন বা করিয়া বা সমাজের চক্ষে তাহাকে হেয় বা ঘৃণ্য না করিয়া, বরং তাঁহার প্রীতি, আদর ও গৌরববর্দ্ধন করিত। গুরু শিষ্যকে পুত্রজ্ঞানে স্নেহ ও বাৎসল্য করিতেন; শিষ্যও পক্ষান্তরে গুরুকে দেবজ্ঞানে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে স্নেহের বন্ধন ও ভালবাসার টান ছিল, অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রভুত্ব ছিল না।

মনু গুরুর স্থান পিতামাতা ও ভ্রাতার উপরে প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

আচার্য্যো ব্রহ্মণোমূর্ত্তি: পিতামূর্ত্তি: প্রজাপতে:।
মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিস্তু ভ্রাতাস্বোমূর্ত্তিরাত্মন:। ৪২৫। ২য়।

পিতা, মাতা, গুরু ও অগ্রজভ্রাতাকে সর্ব্বদা ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিবে; তাহাদের দ্বারা উৎপীড়িত হইলেও কখনও তাহাদিগের অবমাননা করিবে না।

আচার্য্যশ্চ পিতাচৈব মাতাভ্রাতাচ পূর্ব্বজ:।
নার্ত্তেনাপ্যা ন মন্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিশেষত:। ২২৩। ২য়।

পিতা, মাতা ও গুরু এই তিনজনের প্রিয় কার্য্য নিত্য অনুষ্ঠান করিবে। তাঁহারা তুষ্ট হইলেই সকল তপ সার্থক হইবে। মাতৃভক্তি দ্বারা ভূলোক, পিতৃভক্তি দ্বারা দ্যুলোক এবং গুরুভক্তি দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে। যে এই তিনজনকে সমাদর করে, তাহার সকল কর্ম্মই সমাবৃত হইবে। পরন্তু ইঁহারা যাহা দ্বারা অনাবৃত হইবেন, তাহার সমস্ত ক্রিয়া নিষ্ফল হইবে। যতদিন তাঁহারা জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁহাদের প্রিয় কার্য্যে রত থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা ও শুশ্রূষা করিবে, অন্য কোনও কার্য্যে মন দিবে না। এই গুরুত্রয়ের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন মানবের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মণীয়; ইহাই পরম ধর্ম্ম, আর সকলই উপধর্ম্ম।

তেষাং নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা
তেষেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপ: সর্ব্বং সমাপ্যতে। ২২৮। ২য়
ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যাপিতৃভক্ত্যাতু মধ্যমং।
গুরু শুশ্রূষয়াত্বেব ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে। ২৩১। ২য়
সর্ব্বেষ্বস্যাবৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আবৃতা:।
অনাবৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্য ফলাক্রিয়া: । ২৩৩। ২য়
যাবত্ত্রয়স্তে জীবেযুস্তাবন্নস্যাবরং সদাচরেৎ
তেষেব নিত্যং শুশ্রূষাং কুর্য্যাৎ প্রিয়হিতেরত:। ২৩৪। ২য়
ত্রিষ্বেতেষ্বিতিকৃত্যং হি পুরুষস্য সমাপ্যতে
এষ ধর্ম্ম: পর: সাক্ষাদুপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে। ২৩৭। ২য়

গুরুজনে ভক্তির ইহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ জগতে দুর্লভ। জপ: তপ:, হোম, আরাধনা যত প্রকারের ধর্ম্মকর্মই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, সকলই নিষ্ফল হইবে—যতদিন না মানব পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও গুরুদেবকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে। ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম শুরু স্বীয় ভবনে ও গুরুমুখে আরম্ভ হয়; শিক্ষার্থী ধীরে-ধীরে গুরু

হইতে স্বরান্তরে আরোহণ করিয়া স্বাধীনজীবনের শেষ স্তর প্রাপ্ত হয়। একদমে প্রাসাদে আরোহণ যেরূপ অসম্ভব, গুরুজন-উক্তি শিক্ষা না করিয়া স্বাধীনজীবন লাভ করাও তেমনই অসম্ভব।

প্রাচীন হিন্দুগণের ধর্ম্ম কল্পনামূলক ছিল না। উহা বাস্তবিকই কার্য্যগত ছিল। প্রতিদিনের কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করিয়া শুধু ইষ্টের রূপ ধ্যান করিয়া স্বর্গলাভের আশা করা আত্মপ্রবঞ্চনামাত্র। হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত। কর্ত্তব্যকর্ম্ম যতই সামান্য হউক না কেন, অতি সুচারুরূপে সম্ভাবে সুসম্পন্ন করিতে না পারিলে ধর্ম্ম জীবনে একপদও অগ্রসর হইতে পারিবে না।

সেই জন্য মনু অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছাত্রের কর্ত্তব্যসকল বিবৃত করিয়া তদনুষ্ঠানে তাহাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন। মনুর মতে এই সকল কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। মনু বলেন,—গুরু-গৃহে বাসকালে শিষ্য প্রত্যহ স্নান করিয়া শুচি হইয়া দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে; দেবতার অর্চ্চনা করিবে ও যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক হোম করিবে।

—নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষি পিতৃতর্পণম্।
দেবতাভ্যর্চ্চনঞ্চৈব সমিদাধানমেব চ। ২।১৭৬। ২৫

গার্হস্থ্য বিষয়ে শিষ্যকে কতকগুলি নিয়ম পালন করিয়া চলিতে হইবে। যাহাতে চিত্তের চাঞ্চল্য বা মনের উত্তেজনা জন্মায়, শিষ্য এইরূপ দ্রব্য আহার করিবে না। মধু, মাংস, রস (গুড় প্রভৃতি) শুক্ত (যে সকল বস্তু স্বভাবতঃ মধুর, কারণবশে অম্ল হয়) বর্জ্জন করিবে, ও প্রাণহিংসা করিবে না।

বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্। ২।১৭৭। ২৬

উপরিউক্ত বিধান ভিন্ন আরও কতিপয় নিয়ম পালন দ্বারা শিষ্য বিলাসিতা বর্জ্জন করিবে ও তাহার বীর চিত্তকে সর্ব্বদা রিপুগণের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে প্রয়াস পাইবে।

মনু বলিতেছেন :—

গন্ধ দ্রব্য ভক্ষণ বা বিলেপন করিবে না। মাল্যধারণ করিবে না, স্ত্রী সম্ভোগ করিবে না। ক্ষৌম ব্যবহার করিবে না, চক্ষে অঞ্জন দিবে না, ছত্র ব্যবহার করিবে না, পাদুকা পরিধান করিবে না।

বিষয়-বাসনা, ক্রোধ, লোভ ত্যাগ করিবে। নৃত্য, গীত বাদন করিবে না, দ্যূতক্রীড়া প্রবৃত্ত হইবে না, অক্ষক্রীড়ায় যোগদান করিবে না।

কলহ-বিবাদ, পরনিন্দা ও মিথ্যা পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রীলোক অবলোকন করিবে না, অনিষ্টাচরণ হইতে বিরত হইতে হইবে।

সর্ব্বদা একাকী শয়ন করিবে, কখনও শুক্রপাত করিবে না। কামের বশবর্ত্তী হইয়া রেতঃপাত করিলে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয়। স্বপ্নাবস্থায় কামহীন থাকিলেও, যদি শুক্রপাত হয়, তবে স্নানান্তে সূর্য্যদেবের আরাধনা করিবে।

"পুনঃ মাং এতু ইন্দ্রিয়ং" অর্থাৎ আমার বীর্য্য পুনরায় আমাকে প্রাপ্ত হউক - এই মন্ত্র তিনবার জপ করিবে।*

এই সমুদায় মনু তাঁহার ধর্ম্ম-সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে একত্রভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপানহ্ছত্র ধারণম্।
কামঃ ক্রোধঃ লোভশ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্। ১৭৮
দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানৃতম্।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণং শশ্বদুপঘাতং পরস্য চ। ১৭৯
একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ। ১৮০
স্বপ্নে সিক্ত্বা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ।
স্নাত্বার্ক মর্চ্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনর্মামিত্যৃচং জপেৎ। ১৮২

মনুসংহিতা আলোচনা করিয়া আমরা এই সত্যে উপনীত হইলাম যে, নীতিশিক্ষাই প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ ছিল। বর্ত্তমানে সুসভ্য জগৎ সেই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগেও মনুপ্রদর্শিত পথই শিক্ষার প্রকৃষ্ট পথ, ইহা বুঝিতে পারিয়াই যেন সুসভ্য য়ুরোপীয় সমাজ তাঁহারই মতের প্রতিধ্বনি করিতেছেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, চরিত্র গঠনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। "Formation of character is the aim of Education."

বঙ্গপল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা।

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।]

বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে জনসংখ্যা প্রতিদিন যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, বঙ্গীয় পল্লীসমূহের জনসংখ্যা সেই অনুপাতে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। নগরগুলিকে দেশের মস্তক বলিয়া ধরিয়া লইলে পল্লীগুলিকে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিলে, অসঙ্গত হয় না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি শুষ্ক, বিকৃত ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, মস্তক যে দীর্ঘকাল সবল, সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম থাকিবে, এরূপ আশা করা দুরাশামাত্র। নানা কারণে আমাদের দেশের পল্লীসমূহ দিন দিন বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে; ইহার ফলে নগর-গুলির অবস্থাও যে ক্রমে শোচনীয় হইয়া উঠিবে, এ আশঙ্কা অমূলক নহে। কেবল কয়েকটি প্রধান নগর লইয়াই আমাদের দেশ নহে; অসংখ্য বঙ্গ-পল্লীর সমষ্টিই বঙ্গদেশ; সুতরাং পল্লীসমূহের উন্নতি ভিন্ন এদেশের উন্নতির আশা নাই, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

পল্লীর প্রতি পল্লীবাসী শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের অধ্যয় ও উপেক্ষাই পল্লীসমূহের অবনতির প্রধান কারণ। যাঁহারা চেষ্টা করিলে স্ব স্ব গ্রামের উন্নতি করিতে পারেন, যাঁহাদের শক্তি সামর্থ্য আছে, পল্লী

* মনুসংহিতা—ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রামস্থ ভূমিসম্পত্তির আয়ই যাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের অবলম্বন—তাঁহাদের প্রায় সকলেই স্ব-স্ব বাস্তুভিটার মায়া ত্যাগ করিয়া সহরে গিয়া বাস করেন। অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে, বা অন্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের জন্য সহরে বাস করিতে বাধ্য হন। তাঁহারা গ্রামের কথা চিন্তা করিবার অবসর পান না! কিন্তু অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি পল্লীগ্রামে বাস করা অসুবিধাজনক বা কষ্টকর ভাবিয়া, আমোদ-প্রমোদ বা আরাম বিরামের অনুরোধে পিতৃপিতামহের বাস্তুভিটাকে তাজিল্য করিয়া বারমাস সহরেই পড়িয়া থাকেন! তাঁহাদের নায়েব গেমস্তারা প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা দরিদ্র প্রজার জীর্ণ অস্থি নিষ্পেষিত করিয়া লাটখাজনা, মামলা-মোকদ্দমার খরচ, এবং সহর-প্রবাসী জমিদার মহাশয়ের বিলাসিতার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। সৌভাগ্য জমিদারী হইতে যথাবিহিত টাকা আসিলে, তবে তাঁহাদের মুখে অন্ন উঠে; রাজধানীর প্রাসাদতুল্য-প্রবাস-ভবনে বিদ্যুতের আলো ও পাখার সঙ্গে নাচগান আমোদের ফোয়ারা ছুটে; চৌরঙ্গীর প্রশস্ত পথে তাঁহাদের 'হাওয়াগাড়ীর' যাতায়াত ঘটে; এবং ইচ্ছামত আজ দার্জ্জিলিং, কাল ওয়াল্টেয়ার, পরশু সিমলা বা নীচীতে হাওয়া খাইতে যাইবার সুবিধা ঘটে। কিন্তু তাঁহাদের আরামবিরাম, বিলাস ও ব্যসনের ব্যয় যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যথাসময়ে যোগাইয়া আসিতেছে, তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি, তাহাদের অভাব-অভিযোগে তাঁহাদের করজনের কতটুকু লক্ষ্য আছে? তাঁহারা মনে করেন, যাহারা তাঁহাদের জমিদারীতে বাস করে ও চাষ করিয়া খায়, তাহারা যথারীতি খাজনা দিতে ও নানাপ্রকার জুলুম অবৈধমতে সহ্য করিতে বাধ্য! তাহারা বাঁচুক মরুক, তাহাদের ক্ষেতের ফসল হাজুক মজুক—তাহার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ কি? তাঁহাদের সন্তানতুল্য প্রজা ও মুখাপেক্ষী আত্মীয় স্বজনের সহিতই যে তাঁহাদের সম্বন্ধ বিজড়িত হইতেছে, এরূপ নহে; তাঁহাদের পিতৃপিতামহের কীর্ত্তিকলাপ বিলুপ্ত-প্রায়; প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড অট্টালিকাগুলি জীর্ণসংস্কারের অভাবে খসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; বৈঠকখানার আর বাতি জ্বলে না, জয়প্রাণ চণ্ডীমণ্ডপ জঙ্গলে—পারাবত ও চর্ম্মচটিকার বিহার ভূমি; তাহা সাপ, চামচিকা, বিছা ও আরশুলার স্থায়ী বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে। যে সুপরিত্র দেবায়তন একদিন সায়ংকালে শঙ্খঘণ্টারবে মুখরিত হইত, সেখানে এখন 'ফেরুপাল ফিরে,ফিরে হুকারে গভীর!' যে মন্দির-প্রাঙ্গণে সন্ধ্যারম্ভের মহিমা শতমুখে কীর্ত্তিত হইত, সমস্ত বৈশাখ মাস যেখানে সঙ্কীর্ত্তনের সুরধ্বনি ও মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইত—আজ সেখানে লাল ডোরাদার ও কালকাসিয়ার সিবিড় জঙ্গল। জীর্ণ মন্দিরের ভগ্ন-চূড়ায় বসিয়া শুষ্ক রাত্রে 'হুতুমপ্যাঁচা' বিকট আর্ত্তনাদে শ্মশানবিহারী প্রেতের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিতেছে!

গ্রামের বাহিরের অবস্থাও এইরূপ শোচনীয়। গ্রীষ্মকালে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত জলাশয়গুলি নরককুণ্ডে পরিণত হয়; তাহা দুর্গন্ধময়, বিসূচিকা ও বসন্তের জীবাণুতে পূর্ণ থাকে। গ্রামের পুকুর, ডোবা, গর্ত্ত বর্ষাকালে জলে পূর্ণ হইয়া উঠে। সেই জল নিষ্কাশের কোন ব্যবস্থা নাই; সুতরাং নানাপ্রকার উদ্ভিদ সেই জলে পচিয়া দুষ্ট বাষ্প উদ্গত করিতে থাকে। তাহাতে পল্লীবাসীদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়; কর্দ্দমময়, দুর্গন্ধ-দূষিত গ্রাম্য পথগুলি বর্ষায় গমনাগমনের অযোগ্য হইয়া উঠে। গ্রামবাসীরা নিরুপায় হইয়া সংবাদপত্রে আর্ত্তনাদ করে, অথবা লোকালবোর্ডে, জেলাবোর্ডে প্রতিকার প্রার্থনার দরখাস্ত করে। সর্ব্বব্যাপী অভাবের প্রতিকার-ক্ষমতা বোর্ডের নাই, সুতরাং তাহারা বিশেষ কোনও ফল না পাইয়া গবর্ণমেণ্টরূপ মন্দ্যোষের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করে। দেশে সংক্রামক ব্যাধি যারা আক্রান্ত হইয়া দলে-দলে মরিতে আরম্ভ করে—গ্রামকে গ্রাম কাবার হইয়া যায়।

আমাদের জাতীয় জীবনের পল্লির অধার-স্বরূপ পল্লীগুলি যে ক্রমে ধ্বংসোন্মুখ হইতেছে—অন্নের অভাবই ইহার মূল কারণ। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কেবল দরখাস্ত করিয়া বা সংবাদপত্রে অভাব জ্ঞাপন করিয়া ও সংবাদ ছাপিয়া পল্লীস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিবার আশা নাই। বাঙ্গালী ক্রমে দুর্ব্বল, রুগ্ন ও অল্পায়ু হইতেছে। বঙ্গপল্লীসমূহের অবস্থা দিন-দিন অধিকতর শোচনীয় হইতেছে, এবং যে যে লোকে, অশান্তিতে আমাদের জীবন-বন্ধন ক্রমশঃ শিথিলতর হইতেছে,—ইহা কে অস্বীকার করিবে? আমরা আমাদের দেশের শিক্ষা-সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতেছি, রাজনীতিক অধিকার লাভের আশায় ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছি, দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত হইয়াছি। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, সমাজসংস্কার, স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্বাধ্যায়মূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন, অবনতিত জাতিসমূহের উন্নতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আন্দোলন আলোচনায় সমগ্র দেশে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু গোড়ায় যদি বাঁচিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিতে না পারি, তাহা হইলে এ সকলই গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালার মত বিফল হইবে।

আমাদের এই বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া, কলেরা ও মা ষষ্ঠীর প্রসাদে কি বিপুল জনক্ষয় হইতেছে, তাহা স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে হৃদয় আতঙ্কে ও নিরাশায় পূর্ণ হয়! এক ম্যালেরিয়াতেই কি সমগ্র বঙ্গে প্রতি বৎসর তিনলক্ষাধিক লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না? গত বৎসরে গড়ে ৪-৪৫০ লক্ষ লোকের মৃত্যু বাঙ্গালী জাতির কি শোচনীয় পরিণাম সূচনা করিতেছে, ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়!

কিন্তু পল্লীবাসিগণের খাদ্যের প্রতি অমনোযোগ, দারিদ্র্য, গ্রামের ভিতর জঙ্গলের প্রাচুর্য্য, বর্ষার জল নিঃসারণের জন্য উপযুক্ত পরিখাপথ-প্রণালীর অভাব এবং অজস্রতানিবন্ধন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান যে আমাদের এই শোচনীয় অকাল-মৃত্যুর প্রধান কারণ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ আমাদের দেশের পল্লীসমূহের স্বাস্থ্যোন্নতির উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ কি পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমাদের দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত-সমাজ, ধনাঢ্য সম্প্রদায়, ধনিক ও চাকুরীজীবিগণ জলস্রোতে ভাসমান শৈবালের মত বিশাল সমাজের উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, সমাজের সুগভীর নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব বদ্ধমূল হয় নাই, সমগ্র সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ বা একভাবে অনুপ্রাণিত

করিবার শক্তি তাহাদের নাই। তাঁহারা রিজার্ভ্‌ড্‌ির সাহায্যে অর্থ আহরণ করেন বটে, কিন্তু অর্থ উৎপাদনের শক্তি তাঁহাদের নাই। পল্লীগ্রামের চিরদরিদ্র কৃষকগণ, নিম্ন শ্রমজীবি-সম্প্রদায় অনাহারে, অনিদ্রায় দিবারাত্রি হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া নিদারুণ দুঃসহ আতপ-তাপে ঝিঁই হইয়া, বর্ষায় অবিরল বৃষ্টিধারায় সিক্ত হইয়া, শীতনিবারণোপযোগী বস্ত্রের অভাবে পৌষমাসের প্রচণ্ড শীতে 'জাড়ুতাড়ু কুশাড়ু' মাত্র আশ্রয় করিয়া, আমাদের অন্নবস্ত্র এবং 'জীবন ধারণ কিংবা আরামে কাটান' যাহা কিছু আবশ্যক, সে সমস্তই সংগ্রহ করিবার উপাদান উৎপাদন করিতেছে। এই অশিক্ষিত, অজ্ঞানান্ধ, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস-হীন, অদৃষ্টবাদী, বিরাট, বিশাল জনসঙ্ঘই আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড। ইহাদের স্বাস্থ্য, সুখস্বচ্ছন্দতা, অর্থের সচ্ছলতা ও উন্নতির উপর সমাজের কল্যাণ ও জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য নানা রোগের আকরস্বরূপ পল্লীসমূহের স্বাস্থ্য কিরূপে উন্নত হইতে পারে, এবং সেই সঙ্গে পল্লীবাসী নিরক্ষর দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবিবর্গের আর্থিক অবস্থা কি উপায়ে সচ্ছল হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য কর্তৃপক্ষও নিশ্চেষ্ট নহেন। কিন্তু কোন উপায়ই এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে বর্ষীয়া জেলার একজন যুবকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার শাসনাধীন পল্লীসমূহে এ সম্বন্ধে যে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার ফল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আমরা নিম্নে তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রেসীডেন্সী বিভাগের মধ্যে নদীয়া সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র জেলা কি না, তাহা ঠিক জানা না থাকিলেও এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, এরূপ দরিদ্র জেলা বঙ্গদেশে অতি অল্পই আছে। এই জেলার সমৃদ্ধিসম্পন্ন জমীদারের সংখ্যা নিতান্ত অল্প, অধিকাংশ পর্য্যায়ভুক্ত জমিদার পরিবার দুই একটির অধিক আছেন কি না সন্দেহ; তেমন বিস্তৃত ব্যবসায়ের অধিকারীর সংখ্যাও অত্যন্ত বিরল। জনসাধারণের অধিকাংশই নিম্ন কৃষিজীবি ও শ্রমজীবি, তাহাদের 'নুন আনতে পান্তা ফুরায় পান্তা আনতে নুন!'—এই জেলার মধ্যে মেহেরপুর মহকুমা কেবল যে অতি দরিদ্র, ইহাই নহে, ম্যালেরিয়ার লীলাক্ষেত্র বলিয়া বহুদিন হইতেই এই মহকুমার দুর্নাম আছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে নদীয়ার যে সকল প্রাচীন ও সমৃদ্ধ পল্লী বহুদিন পূর্ব্বে বিজনপ্রায় হইয়া বিরল-বসতি ও বন্যার ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুপূর্ণ বিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, মেহেরপুর তাহাদের অন্যতম।

এই মেহেরপুর মহকুমার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ ফজলল্‌ করিম সাহেব মেহেরপুর মহকুমার শাসনভার গ্রহণের পর হইতেই, এই উপবিভাগের বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করিয়া বুঝিয়াছিলেন, নিবিড় জঙ্গলের ও দূষিত জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খানা ডোবা-গর্ত্ত প্রভৃতির বাহুল্যই এখানে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের আতিশয্যের প্রধান কারণ। কিন্তু স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি বা বোর্ডের প্রদত্ত অর্থ দ্বারা এই সকল জঙ্গলের বা খানা-ডোবা-গর্ত্তগুলির বিলোপ-সাধন সম্ভবপর নহে; এবং মফঃস্বলীদের আর্থিক অবস্থা এরূপ সচ্ছল নহে যে, তাঁহারা যথাযোগ্য অর্থব্যয়ে এই সকল জঙ্গল কাটাইয়া বা খানা-ডোবাগুলি ভরাট করাইয়া ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হ্রাসের ব্যবস্থা করেন। মৌলবী সাহেব দেখিলেন, যদি কোন উপায়ে এই সকল জঙ্গল কাটাইতে পারা যায়, তাহা হইলে কিছুদিনেই তাহা সুপ্রশস্ত, উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে। বড় বড় খানা-ডোবাগুলি খনন করাইতে পারিলে নূতন নূতন জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা হয়; তাহা নদীহীন বহুপল্লীর পানীয় জলের অভাব দূর করিবে।

মৌলবী সাহেব এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক-একটি সমৃদ্ধ গ্রামের উৎসাহশীল, পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ লোকদের সাহায্যে এক-একটি সমিতি সংগঠিত করিয়াছেন। এই সকল সমিতি স্থানীয় জমিদারদের নিকট হইতে এক-একটা অব্যবহার্য্য জঙ্গল অল্প খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। পতিত জমি ও জঙ্গল বহু বৎসর আবাদের অযোগ্য অবস্থায় পড়িয়া থাকায়, তাহা হইতে আয়ের কোন সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া জমিদারেরা আগ্রহ সহকারে ঐ সকল জমি নামমাত্র খাজনাতেই গ্রাম্য-সমিতির হস্তে প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, সমিতির চেষ্টায় যদি ঐ সকল জঙ্গলাকীর্ণ জমি কালে উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহাদের স্থায়ী আয়ের একটা উপায় হইতে পারে।

জঙ্গল কাটাইবার জন্য বোর্ড কতক টাকা মঞ্জুর করেন। মৌলবী সাহেব সেই টাকা অংশানুযায়ী ঐ সকল সমিতির হস্তে প্রদান করিলে, সমিতি জঙ্গল কাটাইয়া সেখানে আবাদ আরম্ভ করিলেন। পাট ও বিবিধ শস্য এই সকল জমিতে উৎপন্ন হইতে লাগিল। এই সকল জমীতে আবাদের জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহা প্রথমে উক্ত সমিতির দুই একজন অবস্থাপন্ন লোকই প্রদান করিয়া থাকেন; সেই জমীতে যে পাট বা ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা তাহাদের ঋণ পরিশোধ করা হয়, যাহা লাভ হয় তাহা সমিতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে। এই সঞ্চিত অর্থই গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায়-বিধানের সম্বল। এই উদ্বৃত্ত অর্থে এবং লোকাল বোর্ড জঙ্গল কাটাইবার জন্য যে টাকা মঞ্জুর করেন, তাহার সাহায্যে জঙ্গল কাটাইয়া চাষ আরম্ভ করায়, জঙ্গলের পরিমাণ যেরূপ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, চাষের উপযোগী কৃষিক্ষেত্রও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে।

বিভিন্ন গ্রামে যদি কয়েক বৎসর এইভাবে কাজ চলে, তাহা হইলে সেই সকল স্থানের অধিকাংশ জঙ্গল বিলুপ্ত হইবে; এবং যে সকল স্থান দীর্ঘকাল যাবৎ বন্যবরাহ ও ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ জন্তুর বিহার-ক্ষেত্র হইয়া গ্রামবাসীদের ভীতি উৎপাদন করিতেছে, তাহা অদূর ভবিষ্যতে উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়া সমৃদ্ধিশালী ধানের শস্যের সোণায় তাহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্যে কৃষিক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে, গ্রামবাসীদের অবস্থা উন্নত হইবে, জমিদারগণেরও অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হইবে।

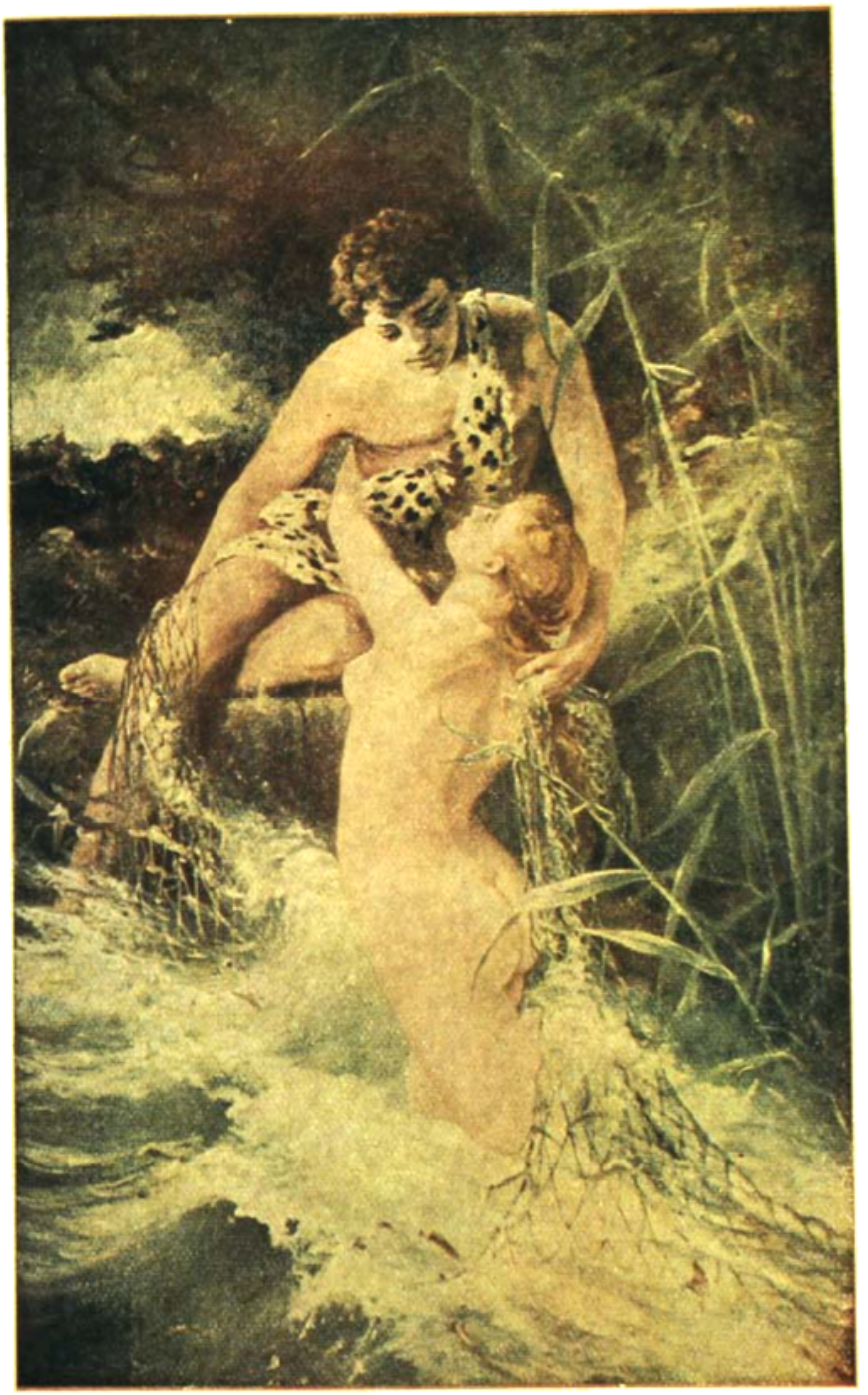

জলদেবী

[বিলাতি চিত্র হইতে

The Emerald Printing Works
CALCUTTA

জঙ্গলগুলি এই ভাবে নষ্ট করায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কতকটা খর্ব্ব হইলেও গ্রামের অভ্যন্তরস্থিত খানা-ডোবা গর্ত্ত প্রভৃতি দুর্গন্ধ-দূষিত পঙ্কিল জলাশয়গুলি ভরাট করিতে বা তাহা হইতে জলপূর্ণ সুপরিচ্ছন্ন জলাশয়ে পরিণত করিতে না পারিলে, পল্লীসমূহের স্বাস্থ্য উন্নত হইবার আশা বাই বুঝিয়া, সরকার মৌলবী সাহেব উক্ত সমিতি-গুলির হস্তে আর একটি গুরুতর কার্য্যের ভার সমর্পণ করিতেছেন। যে সকল ডোবা ও গর্ত্ত নদীর অদূরে অবস্থিত, তাহাদের বক্রগতি খাল কাটিয়া নদীতে প্রবাহিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে; এতদ্ভিন্ন অদূরবর্ত্তী কৃষিক্ষেত্রে সেই জল সেচন করিয়া ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি ও সরসতা সম্পাদন সম্ভব হইলে তাহারও ব্যবস্থা করা হইতেছে। যে সকল গ্রামে দূষিত জলপূর্ণ ডোবা বা গর্ত্তের সংখ্যা অধিক, সেখানে সেই সকল গর্ত্তের জল পয়ঃপ্রণালী সংযোগে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর গর্ত্তে নিঃসারিত করিয়া ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গর্ত্তগুলিকে শুষ্ক রাখিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে; বৃহত্তর গর্ত্তে ক্ষুদ্র ডোবাগুলির জল সঞ্চিত হইলে তাহাতে রোদ-বাতাস খেলিবার সুবিধা হইবে। জঙ্গলের মধ্যে গাছের ছায়ায় অন্ধকারে যে সকল পঙ্কিল জলাশয়ে বিষাক্ত বাষ্প উদ্গত হইয়া, বা ম্যালেরিয়ার কারণস্বরূপ মশকাদি উৎপন্ন হইয়া, পল্লীগুলিতে ম্যালেরিয়ার আবাদ করিতে থাকে—তাহা শুষ্ক হইলে আর সেখান হইতে দূষিত বাষ্প উত্থিত হইবে না, মশকও জন্মিবে না; অধিকন্তু যে সকল বৃহৎ গর্ত্তে ঐ সকল জল সঞ্চিত হইবে, তাহাতে কৈ, মাগুর প্রভৃতি মশকভিন্ন ভোজ্য মৎস্যের চাষ আরম্ভ করিলে, গ্রামে মশার উপদ্রব তিরোহিত হইবে। এবং এই উপায়ে পল্লীগুলি ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে। এই সকল বৃহৎ গর্ত্ত কালে পুষ্করিণীতে পরিণত হইবার আশাও দুরাশা বলিয়া মনে হয় না। নদীহীন স্থানসমূহের জলকষ্ট নিবারণের জন্য অল্প অর্থব্যয়েই এই সকল বৃহৎ গর্ত্ত কাটাইয়া পুষ্করিণী করিবার ইচ্ছা অনেক সমৃদ্ধ গ্রামবাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

মৌলবী সাহেব তাঁহার এই মহৎ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা দেখিয়া আশা হয়, যে সকল স্থানে প্রাথমিক পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, অল্পদিনেই নানা ভাবে সেই সকল স্থানের উন্নতি লক্ষিত হইবে। ইহাতে গ্রামের জনসাধারণের আত্ম-নির্ভরের শক্তি বর্দ্ধিত হইবে, এবং তাহারা দলবদ্ধ একত্র মিশিয়া কায করিবার অভ্যাস ক্রমে আয়ত্ত করিতে পারিবে। আমাদের মনে হয়, প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনের ইহাই প্রথম সোপান। ইহাতে গ্রামবাসি-গণের পরস্পর মিলনের পথ প্রশস্ত হইবে, এবং গ্রাম্য মণ্ডলেরা এই ভাবে গ্রামবাসীদের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলে, তাহারা তাহাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস-ভাজন হইবে। গ্রামের নিষ্কর্ম্মা অলস লোকেরা এইরূপ উন্নত আদর্শ সম্মুখে দেখিয়া তাহার প্রভাবে ক্রমে মানুষ হইতে শিখিবে, ইহাও আশা করা যাইতে পারে।

কোন-কোন সংশয়বাদী লোক মৌলবী সাহেবের এই চেষ্টাকে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার প্রস্তাবের মত নিষ্ফল ও হাস্যোদ্দীপক মনে করিয়া অবিশ্বাসভরে বিদ্রূপের মত মাথা নাড়িবেন। কিন্তু একদাবে সকল করিয়া অল্পেশে পুঞ্জ আন্দোলন করাই যাহারা সংস্কারের চরম সার্থকতা মনে করে—তাহাদের বিজ্ঞতা দ্বারা দেশের বা সমাজের কোন কল্যাণ সাধনের আশা নাই; মৌলবী সাহেবও তাহাদের সমালোচনায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার এই সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এবং বঙ্গের প্রধানতম গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে এই সুবিস্তীর্ণ দেশের অধিকাংশ ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়ার দমনের জন্য সচেষ্ট হওয়ায় আমাদেরও আশা হইয়াছে—বর্ত্তমান সঙ্কটকালেও মৌলবী সাহেবের আরব্ধ কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের অনুকূল দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে, এবং তাঁহার এই সাধু অনুষ্ঠান কর্ত্তৃপক্ষের সহানুভূতি লাভ করিয়া সাফল্যের পথে অগ্রসর হইবে। মৌলবী সাহেব মেহেরপুর উপবিভাগের উত্তরাংশে মুজলপুর গ্রামে গত বৎসর এই শুভানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করেন। পরীক্ষায় যে ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা আশাপ্রদ; এই ফল মুজলপুর গ্রামের ভবিষ্যৎ কল্যাণের আভাস জ্ঞাপন করিতেছে। এইজন্য তিনি বর্ত্তমান বর্ষে অধিকতর উৎসাহের সহিত নারায়ণপুর, কুচুইডাঙ্গা, রামনগর, বল্লভপুর, শিপুলখোলা, আরবপুর, ক্ষেচুয়াডাঙ্গা, নতিডাঙ্গা ও শ্যামনগর প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রামে এই সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। গ্রামবাসীরা সোৎসাহে ও আগ্রহ সহকারে তাঁহার প্রদর্শিত পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। আমরা আশা করি, অদূর-ভবিষ্যতে এই সকল গ্রামের স্বাস্থ্য ও গ্রামবাসিগণের সমবায়-লব্ধ অর্থের যথেষ্ট উন্নতি লক্ষিত হইবে। এই সকল গ্রামে কার্য্যদক্ষ, চিন্তাশীল, বুদ্ধিমান, উৎসাহী যুবকের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয় সন্দেহ নাই; তাহাদের তেমন অর্থবলও নাই; কিন্তু কর্ম্মবীর মৌলবী সাহেবের অক্লান্ত চেষ্টায় ও অনন্ত-সাধারণ উৎসাহে তাহারা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সমিতি সংগঠিত করিয়া অস্থায়িক যত্নের সহিত সঙ্কল্পিত পথে অগ্রসর হইতেছে, এবং দলাদলি, রেশারেশি ও পরশ্রীকাতরের প্রতি অবিশ্বাস ও ঘৃণা পরিত্যাগপূর্ব্বক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া স্ব-স্ব গ্রামের উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিতেছে—স্বদেশোদ্ধারের বক্তৃতা ও রাজনীতিক অধিকার লাভের জন্য আবেদন-নিবেদনের ঝুলি-ঝাড়া অপেক্ষা তাহা সহস্রগুণে বরণীয় ও অনুকরণীয় ভবিষ্যতে সন্দেহ নাই। সুখের বিষয়, মেহেরপুর লোকাল বোর্ড মৌলবী সাহেবের এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে যথাশক্তি সহায়তা করিতেছে। এবং লোকাল বোর্ডের কার্য্যদক্ষ, উদ্যমশীল ভাইস্-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সান্যাল, বি-এল মহাশয় নানা ভাবে এই সকল গ্রামবাসীর সাধু অনুষ্ঠানের সহায়তা করিতেছেন. নিজের আরাম-বিরাম তুচ্ছ করিয়া বাইসিক্লে চাপিয়া গ্রামে-গ্রামে অক্লান্ত ভাবে ঘুরিয়া তাহাদের কার্য্য-প্রণালী পরিদর্শন করিতেছেন, তাহাদিগকে উৎসাহ দান করিতেছেন। মৌলবী সাহেবের ন্যায় নিরপেক্ষ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শাসনকর্ত্তা এদেশে অনেক আছেন; কিন্তু পল্লীবাসিগণের সুখ, স্বাস্থ্য ও প্রকৃত উন্নতি বিধানের জন্য এরূপ চেষ্টা শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে নিতান্ত বিরল, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার অনুকরণে যদি বঙ্গের বিভিন্ন জেলায়

পল্লীসমূহের ম্যালেরিয়া-পীড়িত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত, ভীষণভূত অধিবাসিবৃন্দ সমুখে এইরূপ অফিনব কারখানের প্রসারিত হয়, তাহা হইলে দেশের একটি প্রকাণ্ড অভাব দূর হইতে পারে।

আলোক-বিজ্ঞানের প্রাচীন কথা

[শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় বি এস্ সি]

দিনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা অভাব, অব্যক্ত দৌন্দর্য্যহরণ মানুষের বক্ষে-চক্ষে-মুখে ফুটিয়ে পড়ে; কি যেন একটা অনুভূতপূর্ব্ব বর্ণবিন্যাসে এ নিখিল বিশ্বখানি মণ্ডিত হইয়া যায়। মাঝে-মাঝে বৈশ আকাশে একটা স্নিগ্ধ, তরল, মনোরম লোহার হিল্লোল দেখিয়া মানুষ মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে। জ্ঞানপিপাসু, অনুসন্ধিৎসু মানবের মনে এই সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। তাহারই ফলে আধুনিক আলোক-বিজ্ঞান। আজ এই বিজ্ঞানের এত উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, ইহার অভাবনীয় সূত্রসমূহ শুধু মানব-মনে একটা নির্ম্মলানন্দ-বিজড়িত বিস্ময় উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; বিজ্ঞানে ইহার বহুল প্রয়োগে আজ অনেক "চিরন্তন প্রহেলিকার" দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে, বিজ্ঞান-শাস্ত্রে নানা নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে; জ্যোতির্ব্বিদ্যার (Astronomy) একটা নূতন যুগ-প্রবর্ত্তন করিয়াছে। ইহারই সাহায্যে বর্ণচ্ছত্রে (Spectrum) নির্দ্দিষ্ট রেখার (Franhofiline) স্থান-বিচ্যুতি দর্শনে গ্রহের গতি নির্ণীত হইতেছে; রশ্মি-বিশ্লেষণ দ্বারা গ্রহে বিবিধ ধাতুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে; ইহারই সাহায্যে আজ নবনব গ্রহ উপগ্রহের আবিষ্কার হইতেছে। কিন্তু এ বিজ্ঞানবী সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণের এই যে বহুতী আকাঙ্ক্ষা কবে কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে মানুষের মনে প্রথম উদয় হইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না; অতি প্রাচীন যুগে আলোক-বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও সূত্রসমূহ অজ্ঞাত ছিল। সমগ্র আলোক-বিজ্ঞানের যন্ত্রসমূহ তাহাদের অভাবনীয় সূক্ষ্মতাসহ বিগত তিন শতাব্দীর মধ্যে গঠিত হইয়াছে। তবে আলোক-বিজ্ঞানের হৃদয়গ্রাহী মৌলিক ঘটনাসমূহ প্রাচীন সভ্যতার প্রারম্ভেই মানবগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং নানাভাবে আলোচিত হইয়াছিল। আধুনিক দৃষ্টি-বিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহ প্রাচীন যুগের জনগণের নিকট দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা হইতে পারে বটে, কিন্তু আলোক-প্রতিফলনের (Reflection) সরল নিয়ম বা প্রতিবিম্ব-গঠনের কারণ অনুধাবন করিতে তাঁহারা অকৃতকার্য্য হয়েন নাই। স্বচ্ছসলিলা নদীবক্ষে বা বাপীনীরে তরুলতার সুস্পষ্ট মনোরম প্রতিচ্ছবি বা নিছ কায়ার প্রতিচ্ছায়া নিতান্ত জ্ঞানহীন দর্শকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আলোক-বিজ্ঞানের কোন আলোচনা লিপিবদ্ধ হওয়ার অনেক পূর্ব্বে ধাতুনির্ম্মিত ও কাচ-নির্ম্মিত দর্পণের বর্ণনা বিবিধ স্থানে পাওয়া যায়। Old Testamentএ ইহার উল্লেখ আছে। তার পর কাচ-নির্ম্মাণ-প্রণালীর আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই আরশী কাচের আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। Aristophanes (খৃঃ পূঃ ৪২৪ অব্দে) এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর Pliny একস্থানে বলিতেছেন যে, এক প্রকার কাচ-নির্ম্মিত গোলক সূর্য্যকিরণে ধরিলে তাহাদ্বারা সম্পাদন করিতে সক্ষম। কাচ-নির্ম্মিত গোলকের মধ্যে জল রাখিয়া রৌদ্রে ধরিলে উহা অগ্নি উৎপাদন করিতে পারে। এই ঘটনাটী (খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে) Lactantius তাঁহার পুস্তকে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

আমার জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন তেজ কণার এমন একটা শক্তি আছে, যাহা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিয়া দর্শন ক্রিয়া সম্পাদিত করে—এ ব্যাখ্যা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের নিকট অতি সরল বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু প্রাচীন যুগে দৃষ্টি-ক্রিয়ার মূলীভূত কারণ একটা মহাসমস্যা বলিয়া পরিগণিত ছিল। কোন বস্তু তাহারই পরিত্যক্ত কোন পদার্থের সাহায্যে দৃষ্ট হয়, বা, চক্ষু-নিঃসৃত কোন দ্রব্যাদ্বারা প্রভাবে দৃষ্ট হয়—এই বিষয়ে তৎকালে বিষম মতদ্বৈধ ছিল এবং তর্কের বন্যা ছুটিত। Pythogorasএর মতে (খৃঃ পূঃ ৫৪০—৫১০) কোন বস্তুর উপরিভাগ হইতে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা বিনির্গত হইয়া চক্ষুর উপর প্রতিহত হইয়া দৃষ্টি-ক্রিয়া সাধিত করে। Emdocles (খৃঃ পূঃ ৪৪৪) এবং Platoর শিষ্যবৃন্দ ঠিক তাঁহার বিপরীত মতাবলম্বী। তাঁহারা বলেন চক্ষু হইতে বিকীর্ণ তেজকণা কর্ত্তৃক দর্শন-ক্রিয়া সাধিত হয়।

Platoর মতে দর্শন-ক্রিয়ার জন্য তিনটী বিষয়ের প্রয়োজন—(১) দর্শনেন্দ্রিয়-স্থিত জ্যোতিকণার তরঙ্গ বা চক্ষুর দিব্য তেজ, (২) সূর্য্যালোক এবং (৩) দৃষ্ট বস্তু হইতে নির্গত একপ্রকার পদার্থ। চক্ষু হইতে বিনির্গত তেজ সূর্য্যকিরণসহ মিশ্রিত হইয়া দৃষ্ট বস্তু নিঃসৃত পদার্থের সহিত মিলিত হইলেই দর্শন-কার্য্য সংঘটিত হয়। 'চক্ষু-নিঃসৃত জ্যোতিঃ' ও 'দৃষ্টবস্তু বিচ্ছিন্ন অভাবনীয় পদার্থ'—এ দুই সিদ্ধান্তের Aristotleই প্রথমে (খৃঃ পূঃ প্রায় ৩৪০ অব্দে) প্রতিবাদ করেন। Aristotle বলেন, আলোক পদার্থ নহে; উহা দৃষ্ট বস্তু ও চক্ষুর মধ্যস্থিত একটা কিছুর ক্রিয়া বা তদ্ভাবমাত্র। এই যে "একটা কিছু"—ইহাকে তিনি Pellucid নামে অভিহিত করিয়াছেন। Pellucid সম্বন্ধে তিনি বলেন:—By Pellucid is meant something which is visible—not visible by itself, but visible by reason of some foreign colour which effects its neutral Pellucidity."

যদিও Aristotleএর বিচার বা যুক্তিসমূহ আসাত্মক এবং যদিও তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহ সুস্পষ্ট নহে, তথাপি আলোক ও দৃষ্টি-বিজ্ঞানের বহু ঘটনা সূক্ষ্ম রূপে পরিদর্শনের জন্য তিনি বহু প্রশংসা ও

বস্তুবাদের পাত্র। তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করিলে, বর্ত্তমান আলোক-তরঙ্গ সিদ্ধান্তের (Undulatary theory of light) যেন একটা আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ১০০০ বৎসর পরে, Young, Huggins ও Fresnel প্রমুখ পণ্ডিতগণের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

ইন্দ্রধনু, চন্দ্রমণ্ডল, প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ প্রাচীন যুগের জন-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। Aristotle বলিয়া গিয়াছেন যে বৃষ্টিবিন্দুতে আলোক প্রতিফলিত হইয়া ইন্দ্রধনু রচিত করে; এবং তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, সূর্য্যের দিকে পশ্চাত ফিরিয়া নৌকার ক্ষেপনী-উৎক্ষিপ্ত শীকর-কণায় ইন্দ্রধনুর মত বর্ণবিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়।

Plato প্রবর্ত্তিত আলোক-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ ভিত্তিহীন ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার সময়ে, তাঁহার জ্যামিতি-শাস্ত্রজ্ঞ শিষ্যবৃন্দ আলোক-বিজ্ঞানের দুইটি আদি সত্য পরিজ্ঞাত ছিলেন। তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, আলোকরশ্মি ঋজুপথাবলম্বী এবং আলোকরশ্মি কোন সমতল মসৃণ ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইলে পতিত কিরণ রেখা (Incident-ray) পতন-বিন্দুতে (incident point) লম্বের (normal) সহিত সমান কোণ প্রস্তুত করে। এই দুই সত্যের আবিষ্কারের জন্য তাঁহারা আলোক-বিজ্ঞানের প্রাচীন বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মধ্যে স্থায়ী আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। Epicurus, Lucritius এবং প্রাচীন মতের অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকগণ প্রাকৃতিক দৃশ্যবলির ব্যাখ্যার জন্য বহু সিদ্ধান্ত প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের সিদ্ধান্ত সত্য কি না, তাহা দেখিবার জন্য কোন পরীক্ষা (Experiment) করিয়া-ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

ইহা বড় আশ্চর্য্যের কথা যে, ঐ সকল অনিশ্চিত, ভিত্তিহীন সিদ্ধান্ত বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া নির্ব্বিবাদে প্রচলিত ছিল, এবং আলোক-বিজ্ঞানের আর কোন উন্নতি দৃষ্ট হয় নাই। অবশেষে একাদশ শতাব্দীতে আরবী জ্যোতির্ব্বিদ Alhazen প্রচার করিলেন যে, দ্রব্য হইতে আলোক আসিয়া দর্শনক্রিয়া সাধিত করে, চক্ষু হইতে তেজ বহির্গত হইয়া নহে।

Aristotle যুগের কিছুদিন পরে (খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দে) মহাজ্ঞানী বিশ্ববিখ্যাত জ্যামিতিশাস্ত্রজ্ঞ Euclid দৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। কিন্তু তাহা এতই ভ্রমাত্মক ও যুক্তিহীন হইয়াছিল যে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর বিচার ও প্রমাণযুক্তিপূর্ণ জ্যামিতির প্রণেতাই যে উহার লেখক, তাহা অনেকে স্বীকার করিতে চাহেন না। দৃষ্টিবিজ্ঞানের প্রাচীন লেখকগণের মধ্যে Ptolemy সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত; তিনি দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিসরদেশীয় একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ। Ptolemy রশ্মির দিক-পরিবর্ত্তন (Refraction) সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করেন। ব্যোমদেহে গ্রহগণ যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছে, সেখান হইতে তাহারা কিছু নিম্নে পরিলক্ষিত হয়—এই ঘটনাকে বিজ্ঞানের ভাষায় Astronomical refraction বলিয়া অভিহিত করা হয়। বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া গমনকালীন রশ্মির দিক-পরিবর্ত্তনই ইহার কারণ। Ptolemy উহার যথাযথভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি বায়ুস্তর হইতে কাচে এবং কাচ হইতে জলে প্রবেশ কালীন রশ্মির পতন-কোণ (angle of incidence) এবং দিক-পরিবর্ত্তন কোণের (angle of refraction) পরিমাপ করিয়া একটা তালিকা করিয়া-ছিলেন। চক্রবালের নিকট সূর্য্যচন্দ্রের ব্যাস পরিবর্দ্ধনের কারণ Ptolemyই প্রথম নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন।

ইহার পরই আলোক-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক গতব্য স্তর (medium) হইতে অন্য গতব্য স্তরে প্রবেশকালীন রশ্মির দিক-পরিবর্ত্তনের কয়েকটী পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য।

(১) একটী পাত্রে জল রাখিয়া একটী যষ্টির একাংশ নিমজ্জিত করিলে ঐ যষ্টি বক্র দেখায়।

(২) একটী পাত্রে একটী মুদ্রা রাখিয়া তন্মধ্যে জল ঢালিলে মুদ্রাটী যেন একটু উপর দিকে উঠিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

Cleomedes এ দুইটী পরীক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন (খৃঃ পূঃ ৫০ অব্দে)। সূর্য্য চক্রবালের একটু নিম্নে যাইলেও, বায়ুস্তরে আলোক-রশ্মির দিকপরিবর্ত্তন হেতু উহা দৃষ্ট হইতে পারে—Cleomedesই প্রথমে ইহার উল্লেখ করেন।

মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন যুগে আলোক-বিজ্ঞানের জ্ঞান অতি অল্প ছিল; তাহাদের সিদ্ধান্ত সকল যুক্তিমূলক ছিল না; কিন্তু তাঁহারা আলোকরাজ্যের বহু ঘটনা-বৈচিত্র্যের সহিত পরিচিত ছিলেন।

এখানে প্রাচীন ভারতের আলোকতত্ত্ব উল্লেখযোগ্য। বহুশত বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণের প্রণীত বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে স্থানে-স্থানে আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রব্য হইতে দৃষ্টিক্রিয়ার সূচনা, কি চক্ষু হইতে দৃষ্টিক্রিয়ার সূচনা ইহা লইয়া, তাঁহাদের মধ্যেও মতদ্বৈধ দেখা যায়। তাঁহাদের লিখিত বিবরণীতে মরীচিকা দর্শন ও প্রতিচ্ছবির প্রাচীন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রাচীন আর্য্য-বিজ্ঞানের মতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তেজ তরঙ্গের বিকার অর্থাৎ উর্ম্মিভঙ্গীতে আলোকের বিকাশ। চক্ষুর গঠন সম্বন্ধেও কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের আলোকতত্ত্ব আলোচনা করিতে প্রবন্ধান্তরের প্রয়োজন। আয়ুর্ব্বেদের বিবরণীতে আলোকতত্ত্বের উল্লেখ দেখিয়া আলোকবিজ্ঞানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়।

Cleomedesএর পর বহুবর্ষব্যাপী একটা নিষ্ক্রিয়তার, কর্ম্মহীন যুগ অতীত হইলে আরবী পণ্ডিত Alhazen আলোকবিজ্ঞানের আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলেন। Alhazen সর্ব্বপ্রথম গণিত-শাস্ত্রের সাহায্যে আলোকবিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া, ইহার চমৎকার্য্য সাধনের একটা সুপ্রশস্ত পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তারপর তিনি চক্ষুর গঠনপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করেন; এবং তাহার প্রত্যেক অংশ দর্শনকার্য্যে কিরূপভাবে কার্য্য করিতে থাকে, তাহা সুচারুরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। কেবল করিয়া আমরা দুই চক্ষু দিয়া একটী বস্তু একটিই দেখি—Alhazen তাহার সুন্দর-

ভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি আরও বলেন যে,—কোন দ্রব্য—যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন—একটী মাত্র রশ্মিদ্বারা পরিলক্ষিত হয় না; একটা রশ্মিগুচ্ছ কর্তৃক প্রতিভাত হইয়া তবে দৃষ্ট হয়। ঐ রশ্মিগুচ্ছ দৃষ্টবস্তু হইতে চক্ষুতে প্রবিষ্ট হইলে দর্শনক্রিয়া সংসাধিত হয়। যদিও Alhazenএর সমস্ত ব্যাখ্যা Ptolemyর উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তথাপি তিনি তদপেক্ষা অতি প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; তাঁহার হস্তে সেগুলি এত পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছিল যে, তিনি পাঁচশত বৎসর ব্যাপিয়া ইউরোপের নিকট শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আখ্যা পাইয়াছিলেন।

১২৭০ খৃঃ অঃ Alhazenএর পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়া অতি সুশৃঙ্খলতার সহিত পোলাণ্ডনিবাসী Vitellio দৃষ্টি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি বলেন দর্শকের ও নক্ষত্রের মধ্যস্থিত বায়ুস্তরের বিভিন্নতার জন্য নক্ষত্র একবার উদ্ধে একবার নিম্নে দৃষ্ট হয়। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, কোন কাচ পাত্রে জল রাখিয়া তাহা চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া কোন একটী নক্ষত্রকে দেখিবার সময় মৃদু মৃদু কাঁপাইলে নক্ষত্র উদ্ধনতর দেখায়। Vitellio এক গন্তব্য স্তর হইতে অন্য গন্তব্য স্তরে গমনকালীন আলোকের দিক-পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশাঙ্ক (Refractive index) গণনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা গণনা প্রায় নির্ভুল হইয়াছিল।

Roger Bacon Vitellioর সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক। তিনি বিজ্ঞানের সকল শাখারই আলোচনা করিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই গবেষণক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের মতামত তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রভাবক বাণীর দোষ-নির্ম্মুক্ত ছিল। কিন্তু Alhazen অপেক্ষা তিনি যে বিজ্ঞানের সমধিক উন্নতি সাধিত করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। Roger Bacon ছায়াবীক্ষণ যন্ত্রের (Magic Lantern) উদ্ভাবনকর্ত্তা। তাঁহার সময়ের যে সকল বৈজ্ঞানিক সমাচার পাওয়া যায়, তাহাতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। তথাপি Roger Baconই যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারকর্ত্তা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রকৃত গঠনপ্রণালী ১৬০৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল।

Middleburgএর চশমাপ্রস্তুতকারী Hans Lippershy দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারকর্ত্তা বলিয়া প্রখ্যাত। তিনি ১৬০৮ খৃঃ অঃ সর্ব্বপ্রথম এই যন্ত্র গঠন করিয়া জনসমাজের সম্মুখে ধরিয়া তাহার অদ্ভুত ক্রিয়ার সাধারণকে বিমোহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাবিয়া দেখিলে Galileoকেও দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা বলা যাইতে পারে। Galileo যে মুহূর্ত্তে শুনিলেন যে, Middleburgএর একজন চশমা-প্রস্তুতকারী এমন একটী যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে যে, তাহার দ্বারা অতি দূরের বস্তু নিকটে দেখা যায়, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি ঐরূপ একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসাধ্য উদ্যম, অনন্ত অধ্যবসায়ের ফলে ১৬০৯ খৃঃ অঃ তিনি একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবিত করিলেন; এবং তাহা এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাহার সাহায্যে বৃহস্পতিগ্রহের উপগ্রহগুলি আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল। যেদিন Galileoর দূরবীক্ষণে বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগুলি প্রতিভাত হইয়াছিল, সেদিন বৈজ্ঞানিক জগতের এক শুভদিন। সেদিন জ্যোতিষিজ্ঞা নূতন উষার আলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

দূরবীক্ষণের আবিষ্কার হইল বটে, কিন্তু তখন ইহার ক্রিয়ার কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারিত না। ইহার কার্য্য যেন একটা অদ্ভুত দৈবিক রহস্য ছিল। Kepler প্রথমে দূরবীক্ষণের ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আকার পরিবর্দ্ধক শক্তি (magnifying power) এবং অধিস্রাবণ-বিন্দুর (focus) দূরত্ব মাপিবার সূত্র নির্ণয় তিনিই বাহির করিয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে (১৫৪৫-১৬১৫) দার্শনিক John Baptisa Porta তাঁহার Magica naturalis প্রকাশিত করেন। B. Porta caluna obscura যন্ত্রের উদ্ভাবক। একটী ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে আলোক আসিয়া কোন অন্ধকার গৃহের দেওয়ালে পড়িলে গৃহের বাহিরের তরুলতাদি তাহাদের প্রাকৃতিক বর্ণে ও আকারে গৃহমধ্যে অঙ্কিত হয়। ঐ ছিদ্রপথের নিকট একখানি আতশী কাচ ধরিলে ঐ প্রাকৃতিক প্রতিচ্ছবি অতি সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই সকল বিষয়ে B. Porta প্রথম লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

১৬১১ খৃঃ অঃ ইন্দ্রধনু উৎপত্তির প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারিত হয়। সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে ইন্দ্রধনু দুইটী হয়—একটী উপরে একটী নীচে। A. de Dominies (Archbishop of Spalatro) প্রথম ইন্দ্রধনুটীর কারণ নির্দ্দেশ করেন। তিনি দেখান আলোক-রশ্মি বৃষ্টিবিন্দুতে একবার প্রতিফলিত হইয়া ও দুইবার দিক-পরিবর্ত্তন করিয়া—ইন্দ্রধনু রচিত করে। Descartes দুইটী ইন্দ্রধনুরই উৎপত্তির কারণের অতি সুশৃঙ্খল ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

ইহার পরই আলোকবিজ্ঞানের প্রধান নেতা Smell "দিক-পরিবর্ত্তন সূত্র" (Law of refraction) আবিষ্কার করেন। তিনি রশ্মির দিক-পরিবর্ত্তন ক্রিয়া খুঁটিনাটিরূপে পরিদর্শন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে এক গন্তব্য স্তর হইতে অন্য গন্তব্য স্তরে গমনকালে আলোকরশ্মি একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে পতন-কোণ ও দিক-পরিবর্ত্তন-কোণ উৎপাদন করে।

কিন্তু এই সূত্র প্রকাশিত করিবার পূর্ব্বেই Smell মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৬২৬ খৃঃ অঃ)। Descartes ঐ সূত্র প্রকাশিত করেন; Huggins বলেন, Descartes Smellএর লিখিত বিবরণী পাঠ না করিয়াই ঐ সূত্র লিখিয়াছিলেন।

এখন বেশ বোঝা যাইতেছে যে Descartesএর সময়ে আলোক-বিজ্ঞান সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছিল; কিন্তু তখন ও ইহার পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় ছিল; অনেক সত্য তখন গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। Smell ও Descartes দিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে দুই আলোচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা ভাবিতেন, Refraction হইলেই বিবিধ

বর্ণের উৎপত্তি হয়; ভাবিতেন না যে, সূর্য্যালোক সাত প্রকার বর্ণরশ্মির একটী সংমিশ্রণ। ঐ সপ্তরশ্মিই যে সাতটী বর্ণরশ্মিতে বিশ্লেষিত হয়, তাহা তাঁহাদের ধারণা হয় নাই।

১৬৬৬ খৃঃ অঃ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণিত-শাস্ত্রবিদ্ মহাত্মা Newton তাঁহার প্রতিভা প্রভায় জগতকে মুগ্ধ করিয়া ঐ সত্যের আবিষ্কার করিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, সূর্য্যরশ্মি সাতটী বিভিন্নবর্ণ-রশ্মির সংমিশ্রণ মাত্র। সাতটি বর্ণ পরস্পরের সহিত একটী নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে সূর্য্যালোকে অবস্থান করিতেছে। Refraction দ্বারা ঐ সাতপ্রকার বর্ণরশ্মি পৃথক পৃথক ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, ঐ বিশ্লেষিত বর্ণরশ্মি পুনরায় একত্রীভূত করিয়া শুভ্র রশ্মি উৎপাদন করা যায়। যে সময় Newton refractionএর বিবিধ ঘটনাসমূহ পরীক্ষা করিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় Grimaldi নামা পরীক্ষার বিবরণ সহ defraction সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করেন। একটী ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে অন্ধকার গৃহে প্রবেশকালে রশ্মি ছিদ্রের চারিধারের অতি অল্পপরিমাণ স্থান আলোকিত করে; Grimaldi এই ঘটনাকে defraction নামে অভিহিত করিয়াছেন। ছিদ্রপথে অতি অল্প পরিমাণ স্থানে আলোকের এই ব্যাপ্তি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, আলোক সরল রেখা ধরিয়া যাইবার চেষ্টা করে। ইহা অবশ্য কতক পরিমাণে রশ্মির ঋজু-গমন সত্যের বিরোধী।

Grimaldi লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে রশ্মিগুচ্ছ প্রবেশ করিলে স্থানে স্থানে যে আলোক বিলীন হইয়া অন্ধকারের উৎপাদন করে, ইহা আধুনিক বিজ্ঞানে Interference নামে অভিহিত। Grimaldi ঐ ঘটনা লক্ষ্য করিয়াছিলেন মাত্র; যথার্থ Interference তাঁহার কাছে অজ্ঞাত ছিল।

Newton ও Grimaldiর সময়েই আধুনিক বিজ্ঞানের প্রারম্ভ। তাঁহাদের সময় হইতেই ইহার দ্রুত পরিপুষ্টিসাধন হইতে লাগিল। বৈজ্ঞানিকগণ ক্রমে ক্রমে এক নূতন দিগ্ মহিমান্বিত পুলকময় জগতে উপনীত হইলেন। তাহার পর হইতে তাঁহারা এক একটী অভাবনীয় আবিষ্কারে নিখিলবিশ্ব বিস্ময়াপ্লুত করিয়াছেন। Newton ও Grimaldi'র যুগই আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাত।

* Preston হইতে সংগৃহীত।

দিল্লী

[শ্রীনিখিলনাথ রায় বি-এল]

পুরান দিল্লী

(যোগমায়া মন্দির)

ঐশ্বর্য্য ও গৌরবের প্রতিমূর্ত্তি দিল্লীনগরী আপনার পুরাতন নিদর্শন আজিও যে বক্ষে ধরিয়া রহিয়াছে, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। যিনি একবার সেই যুগ-যুগান্তরের সাক্ষী-স্বরূপিনীর সাক্ষাতে আসিয়াছেন, তিনি অবশ্যই যে তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, এ কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। তাহার অগণ্য ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে কত স্মৃতি যে জাগিয়া উঠিতেছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? কত প্রবাদ, কত কাহিনী, কত ইতিহাস যে সেই রাশিরাশি স্তূপের মধ্যে নিহিত আছে, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। কত জাতির, কত বংশের উত্থান-পতনের সাক্ষ্য লইয়া আজিও যে তাঁহারা অবস্থিতি করিতেছে, তাহাও সহজে স্থির করা যায় না। সুতরাং আমরাও যে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদানে সমর্থ হইব, সে কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। সে যাহা হউক, আমরা যথাসাধ্য দিল্লীর ঐতিহাসিক স্থান সকলের চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু আমাদের কঠোর তুলিকায় তাহা কতদূর ফুটিয়া উঠিবে, বলিতে পারি না।

আমরা প্রথমে যোগমায়া মন্দিরের কথা বলিতেছি। পুরান দিল্লীর প্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভ হইতে প্রায় ৫২০ হস্ত দূরে একটি বিচিত্র মন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে; উক্ত মন্দিরই যোগমায়া মন্দির নামে প্রসিদ্ধ। পুরান দিল্লী কাহাকে বলে, আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব। এক্ষণে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, হিন্দু রাজত্বের শেষে ও মুসলমান রাজত্বের প্রথমে যেখানে দিল্লী নগরীর অবস্থান ছিল, তাহাই সাধারণতঃ পুরান দিল্লী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যোগমায়া মন্দির দেখিয়া ইহাকে পুরাতন বলিয়া বোধ হয় না,—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। কিন্তু প্রবাদমুখে

এইরূপ শুনিতে পাই যে, ইন্দ্রপ্রস্থের যুধিষ্ঠির প্রথমে যোগমায়ার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে প্রাচীন মন্দিরের কোন চিহ্নই দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। যিনি নন্দগোপের গৃহে আবির্ভূতা হইয়া কংস-হস্তে প্রস্থতা হওয়ায়, তাহার ধ্বংসের সূচনা করিয়াছিলেন, তিনিই যোগমায়া নামে এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু আবার বিন্ধ্যাচলেও যোগমায়ার অধিষ্ঠানের কথা প্রচলিত আছে। পৃথ্বীরাজের সময়েও এই যোগমায়াই দিল্লীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। চাঁদ কবি তাঁহাকেই যোগিনী দেবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; এবং তাঁহারই নামানুসারে দিল্লীকেও যোগিনীপুর বলিত। মাতামহ অনঙ্গপালের হস্তে দিল্লী যখন ছিল, পৃথ্বীরাজ তখন একদিন শৈশবে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, যোগিনীপুরের যোগিনী দেবী বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিতা হইয়া আসিয়া তাঁহারই ললাটে তিলক পরাইয়া তাঁহার রাজ্যাভিষেক সম্পাদন করিতেছেন; এবং ইহাই তাঁহার ভবিষ্যতে দিল্লী-লাভের সূচনা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজের স্বপ্নসম্বন্ধে চাঁদকবি বলিতেছেন;—

"বালপন প্রথিরাজ নে, ইহ সুপনওর চিত্ত।
লৈ জুগ্গিনি জুগ্গিনী পুরহ, তিলক হথ করি মিত্ত॥
কছু সোবত কছু জাগতে, লিপি সুপনওর সার।
অভ কয়নকে অংতরৈ, মুখ মুওহ মুতদার॥
অভয়দায়িনী নাম তিহিং, জুগ্গিনি জগ আধার।
সুপনংতর মুতদায়িনী, আরৈ অপ পধার॥
কনক কংত্তি ছুতি অংগকী, নিরখি-মু পাতগ জাত।
পরমানন্দপ্রদায়িনী, পার করন জগ মাত॥
নখ সিখ প্রভা প্রকাশ ছুতি, চখ মুখ কমল সুফুল।
ওর ওর নখ জোতি জগ, জরকস কংত্তি ডকুল॥"

(পৃথ্বীরাজ রাসো)

চাঁদ কবির লিখিত যোগিনীপুরের যোগিনীদেবীকে দিল্লীর অধিষ্ঠাত্রী যোগমায়াদেবী বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু পৃথ্বীরাজের সময় তাঁহার কোন মন্দির ছিল কি না, থাকিলে কোথায় ছিল, তাহা স্থির করা কঠিন। পৃথ্বীরাজের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের নির্ম্মিত মন্দির বলিয়া কোন মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল কি না, বলা যায় না। যদি প্রবাদের উপর কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করিতে হয়, তাহা হইলে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, এক্ষণে যেখানে যোগমায়া মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, যুধিষ্ঠির, অনঙ্গপাল বা পৃথ্বীরাজের সময় তথায় কোন মন্দির বা দেবীর কোন স্থান বিদ্যমান ছিল। দেবীর সেই প্রাচীন স্থান নির্ণয় করিয়াই বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। নতুবা মুসলমান রাজত্বের সময় বাদশাহগণের প্রাসাদের নিকট কোন হিন্দু মন্দির থাকার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া মনে হয় না। পৃথ্বীরাজের সময়ে দিল্লী নগরীর নিকট এক চতুর্ভুজা দেবীর অবস্থানের কথা চাঁদকবি তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। পৃথ্বীরাজ যে সময়ে সমুদ্রশিখর-গড়ের রাজকন্যা গৌরাঙ্গী পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, সেই সময়ে মহম্মদ ঘোরী তাঁহার পথাবরোধ করায় তিনি তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন, এবং গৌরী পদ্মাবতী ও গৌরী সুলতানকে লইয়া দিল্লীর নিকট চতুর্ভুজা দেবীর নিকট উপস্থিত হন।

"বর গৌরী পদমাবতী। গহি গৌরী সুরতান।
নিকট নগর দিল্লী গয়ে। চতুজা চহ আন॥"

(পৃথ্বীরাজ রাসো)

কিন্তু এই চতুজা বা চতুর্ভুজা যোগমায়া অথবা তোগলকাবাদের নিকটস্থ কালিকা দেবী, তাহা বলা যায় না। দিল্লীর নিকটে চতুর্ভুজার অবস্থানে তাঁহাকে কালিকা দেবী বলিয়াই মনে হয়; কারণ যোগমায়ার অবস্থান তদানীন্তন দিল্লী নগরীর মধ্যেই দেখা যায়। আর কালিকা দেবীর সহিত যে পৃথ্বীরাজের সম্বন্ধ ছিল, প্রবাদ-মুখে এখনও তাহা শুনিতে পাওয়া যায়।

আমরা এক্ষণে বর্ত্তমান যোগমায়া-মন্দিরের কথাই বলিব। মন্দির ও তাহার সংলগ্ন ২১টি গৃহ ২৮৭ বর্গহস্ত পরিমিত একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে অবস্থিত। মন্দির ও অধিকাংশ গৃহই ১৮০৬ হইতে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হয়। বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের সময় আমীর খেদমত এ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দিল্লীর লালা হরধিয়ান সিংহ পরবর্ত্তীকালে কোন-কোন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ইহার উন্নতি সাধন করেন। মন্দিরটি ভূতলদেশ হইতে চূড়া পর্য্যন্ত ২৮ হস্ত উচ্চ, মন্দিরতল মর্ম্মরপ্রস্তর-মণ্ডিত, তাহার পরিমাণ প্রায় ১২ বর্গহস্ত হইবে। মন্দিরের চৌকাট মর্ম্মর-নির্ম্মিত। মন্দিরমধ্যে দেবীর কোন

স্পষ্ট মূর্ত্তি নাই, একটি মর্ম্মর-প্রস্তরাবৃত ক্ষুদ্র গহ্বরে বস্ত্রাচ্ছাদিত একখানি কৃষ্ণ প্রস্তর-খণ্ড দেবীরূপে পূজিত হইয়া থাকে। গহ্বরের সম্মুখে একখানি মর্ম্মর-প্রস্তরের চৌকিতে পূজার দ্রব্যাদি অর্পিত হয়। দেবীর নিকট মদ্য-মাংস উৎসর্গের বিধি নাই। মন্দিরের সম্মুখে একটি লৌহ-পিঞ্জরমধ্যে দুইটি প্রস্তর-নির্ম্মিত ব্যাঘ্র-মূর্ত্তি আছে। যোগ-মায়া মন্দির পুরাণ দিল্লীর একটী দর্শনীয় স্থান। হিন্দুরা ইহার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রাচীন দিল্লীর অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া সকলেই যোগমায়া দেবীর নিকট মস্তক অবনত করেন। যুধিষ্ঠির গিয়াছেন, অনঙ্গপালেরও নাম শুনা যায় না, পৃথ্বীরাজের কথা এখন কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু প্রাচীন দিল্লীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী আজিও আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন। এই মন্দিরের নিকট অনঙ্গপালের নির্ম্মিত পুষ্করিণী অনঙ্গতাল নামে অভিহিত হইতেছে। কানিংহামের মতে উহা ১১৩ হস্ত দীর্ঘ, ১০২ হস্ত প্রস্থ, ও ২৭ হস্ত গভীর ছিল। এক্ষণে উহা শুষ্ক অবস্থায় পরিণত হইয়াছে, বর্ষাকালেও তাহাতে জল সঞ্চয় হয় না।

বিষ্ণুধ্বজ বা লৌহস্তম্ভ।

কাল-সাগরের অনন্ত গর্ভে হিন্দুর সমস্তই নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে; তথাপি, বেলাভূমিতে যে কিছু সামান্য চিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে হিন্দুর প্রাচীন গৌরবের পরিচয় পাওয়া যায়। পুরান দিল্লীর কুতব-উল-ইস্‌লাম মস্‌জীদের মধ্য-প্রাঙ্গণে মস্‌জীদের সম্মুখস্থ দেওয়ালের বৃহত্তম খিলান হইতে প্রায় ২০ হস্ত পূর্ব্বে এক বৃহৎ লৌহস্তম্ভ দণ্ডায়মান রহিয়া প্রাচীন হিন্দু-শিল্প-কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সুপ্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভের (লোহা কি লাট) সহিত অনেক প্রবাদ বিজড়িত রহিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রচলিত প্রবাদ এই যে, তোমর-বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম অনঙ্গপাল স্বীয় রাজ্য সুদৃঢ় করিবার জন্য কোন সাধু ব্রাহ্মণের উপদেশ-ক্রমে ইহাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করায়, তাহা বাসুকির মস্তক-ভেদ করে; রাজা তাহা পরীক্ষার জন্য তাহাকে পুনরায় উত্তোলন করিয়া তাহাতে রক্তের চিহ্ন দেখিতে পান। তিনি আবার উক্ত স্তম্ভ বা কীলক প্রোথিত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু এবার তাহা ঢিলা হইয়া যায়; তাহাতে তাঁহার রাজা ঢিল হয়, এবং তদবধি রাজধানীর নাম ঢিল্লী বা দিল্লী হয়। এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত একটি গাথা প্রচলিত আছে—

"কিল্লীতো ঢিল্লী ভই
তোমার ভয় মত হীন।"

উক্ত গাথা চাঁদ কবির উক্তির অপভ্রংশ বলিয়াই বোধ হয়। চাঁদ কবির গ্রন্থে এ প্রবাদ অন্যরূপ লিখিত আছে। চাঁদ কবি দুইজন অনঙ্গের সহিত দিল্লীর সম্বন্ধের কথার উল্লেখ করিয়াছেন; একজন পাণ্ডব ও দ্বিতীয় তোমর-বংশীয়, এবং তিনিই অনঙ্গপাল নামে খ্যাত।

"পাণ্ডব বংস অনংগ নৃপ। পতি হথিনাপুর ঠাম॥
এক সমৈ জমুনা তটহ। বসিয় রাজ তহং গাম॥
অনঁগপাল তুঁ অর তহাং। দিলী বসাই আনি॥
রাজ প্রজা নর নারি সব। বসে সকল মন মানি॥"

(পৃথ্বীরাজ রাসো)

এই দ্বিতীয় অনঙ্গ বা তোমর অনঙ্গপালের প্রসঙ্গে বাসুকির মস্তক-ভেদী কীলকের উত্তোলন ও তাহাতে রক্তের চিহ্ন থাকার কথা চাঁদ কবির গ্রন্থে দেখা যায়, এবং উক্ত অনঙ্গপালই পৃথ্বীরাজের মাতামহ। চাঁদ কবি অনঙ্গ-পালের পূর্ব্বপুরুষ কল্‌হন নামক এক নৃপতি কর্ত্তৃক দিল্লী স্থাপনেরও উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সময়েও এক কীলক প্রোথিত হওয়ায় বাসুকির মস্তক স্পর্শ করার কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পুনরুত্তোলন বা তাহাতে রক্তের চিহ্ন থাকার কথা নাই। পৃথ্বীরাজের মাতা দিল্লী কিল্লী দিল্লী বা দিল্লী কিলকের পরিচয় প্রদানকালে পুত্রকে বলিয়াছিলেন যে, যেখানে দিল্লী নগরের প্রতিষ্ঠা হয়, সেখানে তাঁহার পিতার পূর্ব্বপুরুষ কল্‌হন শিকার করিতে আসিয়া দেখিতে পান যে, একটি শশক একটি কুকুরকে আক্রমণ করিতেছে। কল্‌হন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উক্ত স্থানে একটি নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার কুল-পুরোহিত ব্যাসদেব তথায় এক কীলক প্রোথিত করায়, তাহা বাসুকির মস্তক স্পর্শ করে, উক্ত নগর কল্‌হনের নামানুসারে কল্‌হনপুর হয়। কল্‌হনের কিছুকাল পরে অনঙ্গপাল তাহার অধিকার লাভ করেন।

"তব অনগাখী পুত্তি, কহৈ সুনি পুত্ত সুকওহ।
পুব্ব কথা জোং ভই, সুনৌ তোং কহং অপুব্বহ॥
হম পিতু পুরিথা পুব্ব, নৃপতি কল্‌হন বন ক্রীলত।

সুসা ছংডি তা পুত্র, স্থান সংচরিয় সচীলস্ত ঃ
সিই সংমুখ হুই বৈঠী সুতহাং, ভন্নিস্থান ভৈভীত হুঅ।
সব সম্বতস্থ আচিজ্জ ভয়, করি পারস ঠচ্চে সুভয় ॥
ব্যাস জ্যোতি জগজোতি তই, সিদ্ধ মহুরত ভাব।
দৈব জোগ সেসহ মিরহ, কিল কিল্লিত সুগ্রাব ॥
কলহন পুর কলহন নৃপতি বাসী নৃপ নিজ সাজ।
কিতক পাট অংতর নৃপতি, অনঙ্গ পাল ভয়রাজ ॥

(পৃথ্বীরাজ রাসো)

তাহার পর পৃথ্বীরাজের মাতা, অনঙ্গপাল কিরূপে আবার তথায় পাষাণ প্রতিষ্ঠা ও কীলক প্রোথিত করিয়াছিলেন, পুত্রকে তাহারও পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা অনঙ্গপাল কুশলাদি লাভের জন্য তাঁহাদের কুলপুরোহিত ব্যাস দেবের* নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি মুহূর্ত্ত শোধন করিয়া দিল্লী নগরীর স্থানে পাষাণ প্রতিষ্ঠা ও কীলক প্রোথিত করার ব্যবস্থা করেন। ৮০ অঙ্গুলি মাপের এক লৌহ-কীলক ভূগর্ভে প্রোথিত করা হয়। ব্যাস বলেন যে, তাহা বাসুকির মস্তক ভেদ করিয়াছে, ইহাতে রাজার রাজ্য অচল থাকিবে। তিনি পাঁচ ঘড়ী পর্য্যন্ত উহা স্পর্শ করিতে নিষেধ করেন। রাজা কৌতূহল নিবারণের জন্য পাষাণ উৎপাটন করিয়া রক্তের চিহ্ন দেখিতে পান, ও আশ্চর্য্যান্বিত হন। অনঙ্গপাল নিম্ন কার্য্যের জন্য অনুতপ্তও হইয়াছিলেন। এ ব্যাপার শুনিয়া ব্যাস, রাজার মূর্খতার জন্য কীলক ঢিল হওয়ায়, তাঁর রাজ্য থাকিবে না বলিয়া প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, তোমরের পর চৌহান, পরে তুর্কী, অবশেষে মেবাত পতি দিল্লীর রাজা হইবেন।

"অনঙ্গ পাল পুত্তীয়, কোরবুরী সুতসম্মহ।
এহবত আচিজ্জ, উপজি যো পিত্তহু তব্বহ ঃ
পুচ্ছি ব্যাস জগজোতি, রাজমংডো উচ্ছবধন।
পুচ্ছি ব্যাস জগজোতি, রাজ মংডো উচ্ছবধন।
গ্রাম নাম অম্মিরৈ, কুসল জিন হোয় গ্রেহধন ঃ
চিংতরো চিত্ত ভুজরাজ তব, অপর-নিগম করি কট্টরো।
সুভধরী মহরত সংধিকৈ, কিরি পাষাণ সুগচ্ছরো ঃ
কহই ব্যাস জগজোতি, সুনহি তুংবর নরিংদ তুঅ।
এহ সেস সিরগ্রাব, অচল নিহচ্চল সুরংগ ধুঅ ॥
মোহি অরথ পল এহ, দেহ অগ্গ নহ রাজন।
পংচ ঘরী ইহ মুক্কিক, রাজ রহিয়ো ইন কাজন ॥
ইতনোহু কহোং বর ব্যাস তই, ইন অনঙ্গ কামানারো।
ভবছিত্ত বত্ত মিটৈনকো, ক্রত্ত ক্রম্ম নহ জানরো ॥
সুনী বত্ত ইহবত্ত প্রমানং, ব্যাসকরী কিল্লীপুর থানং।
সাঠি হু অংতল লোহর কিল্লিয়, সুকর সেস নাগন
সির মিল্লিয় ॥
মুখ লোহ আচিজ্জ সুমাত্তো, ভাবী গতি সোব্যাসন
জাত্তো।
বরজে সহ পরিগহ পরিমানং, উথ্থাপী কিল্লী ভূ থানং ॥
অনংগ পাল পৃথ্বী, নরেশ আচিজ্জ সুমাত্তো।
ভবসি বত্তরো হোয়, সোয় ব্রহ্মান ন জাত্তো ॥
আরবিত বরগ্যান, সোই সংসার মুখাত্তো।
দৈব ক্রম্ম করি জোগ, সোই পাখান উখাত্তো ॥
রুধিছংচ ছুটি সংমুহ চলিয়, অতি অদ্ভুত সুচিখ্খিয়ো।
পরিগহ ববাস মংত্রী নৃপতি, ইন আচিজ্জ সুলাখ্খিয়ো ॥
মুনি আয়ো বরব্যাস তংহ, দুখ পায়ো মনমজ্ঝ।
কা জংপ্যো মুখ নৃপতি সোং, ইহমতি মূঢ় অবুজ্ঝ ॥
অনংগ পাল ছক্কৈব, বুদ্ধি জো ইসী উকিল্লির।
ভয়ো তুর্কর মতিহীন, করী কিল্লীর তৈং ঢিল্লির ॥
কৈ ব্যাস জগজোতি, অগম আগম হোংজনোং।
তুং অর তৈং চহআন, অংত হৈলঃ হৈ তুরকানোং ॥
তুং অর সু অবটি মংডব ধরহ, ইক রায়বলি বিক্কৈব।
নবসত্ত অংত মেবাতপতি, ইক্কত্ত মহি চক্কৈব ॥"

চাঁদ কবির গ্রন্থে পৃথ্বীরাজের মাতামহ তোমর অনঙ্গপালের পূর্ব্বে তদংশীয় কলহন ও পাণ্ডব-বংশীয় অনঙ্গের উল্লেখ দেখা যাইতেছে, এবং অনঙ্গ ও কলহন দুইজনই অনঙ্গপালের পূর্ব্বে দিল্লীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যাইতেছে। সেইজন্য পাণ্ডব অনঙ্গ ও কলহন যদি অভিন্ন ব্যক্তি হন, তাহা হইলে প্রথম অনঙ্গেরও কীলক স্থাপনের কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু চাঁদ কবির গ্রন্থ হইতে সে কীলকের পুনরুত্তোলন বা তাহাতে রক্তের চিহ্ন দেখার কোনই উল্লেখ নাই। তাহা বাসুকির মস্তক স্পর্শ করিয়াছিল, এই মাত্রই জানা যায়। কীলকের পুনরুত্তোলন ও তাহাতে রক্তের চিহ্ন থাকার কথা পৃথ্বীরাজের মাতামহ

* অনঙ্গপালের কুলপুরোহিত বলিয়া ব্যাস, তোমর বংশের পুরোহিতগণের 'ব্যাস' উপাধি ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

অনঙ্গপালের কীলক প্রসঙ্গেই দেখা দিয়া থাকে। এ কথা আমরা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের আলোচ্য লৌহস্তম্ভ চাঁদ কবির বর্ণিত কীলক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, তিনি ভূগর্ভে কীলক প্রোথিত হওয়ার ও উপরে পাষাণ প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন। সুতরাং এই লৌহস্তম্ভ তাঁহার বর্ণনার বিষয় নহে বলিয়াই মনে হয়। প্রবাদ ছাড়িয়া আমরা এক্ষণে লৌহস্তম্ভের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিতেছি। লৌহস্তম্ভ নিজেই তাহা বলিয়া দিতেছে।

লৌহস্তম্ভের গাত্রে কয়েকটি খোদিত-লিপি আছে। তন্মধ্যে ইহার পশ্চিম মুখের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রধান লিপিটি এই,—

"যস্যোদ্বর্ত্তয়তঃ প্রতীপ মুরসা শত্রূন্ সমেত্যাগতান্।
বঙ্গেষাহব বর্ত্তিনো ভিলিখিতা খড়্গেন কীর্ত্তির্ভুজে॥
তীর্ত্বা সপ্তমুখানি যেন সমরে সিন্ধোর্জ্জিতা বাহ্লিকা।
যস্যাদ্যাপ্যধিবাস্যতে জলনিধির্বীর্য্যানিলৈর্দ্দক্ষিণঃ॥
খিন্নস্যেব বিসৃজ্য নাং নরপতের্গ্যামাশ্রিত স্যেতরাং।
মূর্ত্ত্যা কর্ম্মজিতাবাধং গতবতঃ কীর্ত্ত্যা স্থিতস্য ক্ষিতৌ॥
শান্তস্যেব মহাবনে হুতভুজো যস্য প্রতাপো মহান্।
নাদ্যাপ্যুৎসৃজতি প্রণাশিতরিপোর্য্যস্যেষ শেষঃ ক্ষিতিম্॥
প্রাপ্তেন স্বভুজার্জ্জিতঞ্চ সুচিরঞ্চৈকাধি রাজ্যং ক্ষিতৌ।
চন্দ্রাহ্বেন সমগ্র চন্দ্র সদৃশীং বক্ত্রশ্রিয়ং বিভ্রতা॥
তেনায়ং প্রণিধায় ভূমিপতিনা ধী (ভা) বেন বিষ্ণৌমতিং
প্রাংশু (প্রাং) শু-বিষ্ণুপদে গিরৌ ভগবতো
বিষ্ণোর্দ্ধ্বজঃ স্থাপিতঃ॥"

ইহার মর্ম্ম এই যে, বঙ্গদেশ সকলে যুদ্ধে মিলিত হইয়া আগত শত্রুদিগকে বক্ষদ্বারা মর্দ্দিত করিয়া পরাঙ্মুখ করায়, যাঁহার ভুজে খড়্গের দ্বারা কীর্ত্তি লিখিত হইয়াছিল। যিনি যুদ্ধে সিন্ধুর সপ্তমুখ উত্তীর্ণ হইয়া বাহ্লিকদিগকে জয় করিয়াছিলেন, অদ্যাপি যাঁহার বীর্য্যানিলে দক্ষিণ সমুদ্র অধিবাসিত হইতেছে, যে নরপতি খিন্ন হইয়াই যেন এ জগৎ পরিত্যাগ করিয়া অন্য জগতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি শরীরের কর্ম্মজিত লোকে গমন করিলেও, কীর্ত্তিদ্বারা পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছেন, মহাবনে দাবাগ্নির ন্যায় যে অরাতিশত্রুর যত্নের শেষ মহান্ প্রতাপ অদ্যাপি পৃথিবী পরিত্যাগ করে নাই, যিনি পৃথিবীতে স্বভুজার্জ্জিত একাধিরাজ্য লাভ করিয়া ভোগ করিয়াছিলেন, সেই পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মুখশ্রীধারী চন্দ্রাখ্য ভূমিপতি ধর্ম্মভাব বশে বিষ্ণুর প্রতি মতি অভিনিবেশ করিয়া বিষ্ণুপাদ গিরিতে ভগবান্ বিষ্ণুর এই উন্নত ধ্বজ স্থাপিত করিয়াছিলেন।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, চন্দ্র নামক* কোন রাজা বিষ্ণুপাদ গিরিতে এই উন্নত বিষ্ণুধ্বজ স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি অনেক দেশ জয় করিয়া কীর্ত্তি সম্ভব করেন, এবং যে সময়ে এই লিপিটি খোদিত হয়, সে সময়ে স্বর্গগত হইয়াছিলেন। তাহা হইলে এই চন্দ্র রাজা কে?† আর বিষ্ণুপাদ গিরিই বা কোথায়? পূর্ব্বে কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এই চন্দ্ররাজাকে গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; এক্ষণে কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে যে, তিনি মরুপ্রদেশের পুষ্করণা নগরের অধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা। তিনি সিংহবর্ম্মার পুত্র ও অজবর্ম্মার পৌত্র, তাঁহার ভ্রাতার নাম নরবর্ম্মা। বঙ্গদেশের বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পর্ব্বত গাত্রে চন্দ্রবর্ম্মার এক শিলালিপি আছে বলিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করেন; তাহাতে তাঁহাকে সিংহবর্ম্মার পুত্র ও চক্রস্বামী বা বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া জানা যায়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়

* শ্লোকের শেষ চরণের উপরিস্থ চরণে 'যাবেন' শব্দ হইতে তাঁহার 'যাব' নামও বুঝা যায়, যদিও বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ 'যাবেন' স্থলে 'ভাবেন' পাঠ করিয়া এক্ষণে তাঁহার 'চন্দ্র' নামই সিদ্ধান্ত করিতেছেন; কিন্তু খোদিত লিপিতে উহা 'যাবেন'ই দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ফ্লিটপ্রমুখ পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণ তাঁহারে 'যাব' নামই স্থির করিয়াছিলেন। 'যাবেন' পাঠে তাহা নামই বুঝায়; ইহার অন্য অর্থ করিতে যাওয়া কষ্ট-কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। 'যাব' শব্দে যৌত করা বা প্রক্ষালন বুঝায়, তাহা হইলে শুদ্ধি অর্থও করা যাইতে পারে। তাহা হইলে 'যাবেন' শব্দে চিত্তশুদ্ধির জন্য বা চিত্তশুদ্ধির দ্বারা, এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে। অথবা 'যাব' শব্দকে প-ন করিয়া লইয়া তাহার প্রাপ্তি অর্থ করা যায়, তাহাতে ব্যাকরণ দোষও ঘটে। এ সমস্তই কষ্ট-কল্পনা। 'যাবেন পাঠ করিলে 'যাব' শব্দে নামই বুঝায়। 'যাব' যদি নাম হয়, তাহা হইলে উহা আবার 'চন্দ্রের' নামান্তর হইয়া উঠে। অথবা 'চন্দ্রের' সহিত যুক্ত হইয়া 'চন্দ্র-যাব' বা 'যাবচন্দ্র'ও বুঝাইতে পারে। এই লিপিটি যেরূপ বিতর্ক, তাহাতে 'যাবেন' স্থলে 'ভাবেন' পাঠ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সে যাহা হউক, আমরা বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের দ্বিরীকৃত তাঁহার 'চন্দ্র' নামই ধরিয়া লইলাম এবং 'যাবেন' স্থলে 'ভাবেন' পাঠই গ্রহণ করিলাম।

† চাঁদ কবির গ্রন্থের সমর্থনকারিগণ কলহনকে চন্দ্রবাচক বলিয়া লইয়া চন্দ্র ও কলহনকে অভিন্ন মনে করেন।

মালবদেশে প্রাচীন দশপুরের (বর্ত্তমান মন্দশোর) ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একখানি শিলালিপির আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রবর্ম্মার ভ্রাতার নাম নরবর্ম্মা এবং তিনি ৪৬১ বিক্রমাব্দে (৪০৩-৪০৪ খৃঃ অব্দে) জীবিত ছিলেন। এই শিলালিপি আবিষ্কারের পর শাস্ত্রী মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, গুপ্তনিয়া পর্ব্বতলিপির চন্দ্রবর্ম্মা ও দিল্লীর লৌহস্তম্ভের চন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি, এবং নরবর্ম্মা তাঁহারই ভ্রাতা। এলাহাবাদের দুর্গমধ্যে অশোকস্তম্ভের গাত্রে সমুদ্রগুপ্তের যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্ম্মা নামে কোন আর্য্যাবর্ত্তরাজকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকেও লৌহস্তম্ভের চন্দ্ররাজের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া থাকেন। † কিন্তু তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। লৌহস্তম্ভের চন্দ্ররাজ স্বর্গগত হইলে তাহার পর লৌহস্তম্ভে তাঁহার কীর্ত্তিকথা খোদিত হয়; লৌহস্তম্ভের লিপি হইতে তাহাই বুঝা যাইতেছে। উক্ত চন্দ্ররাজ যদি সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে গুপ্ত সম্রাটগণের রাজত্বকালে তাঁহারা যে তাঁহাদের কর্ত্তৃক চন্দ্ররাজের বিনষ্ট হওয়ার কথা উল্লেখ না করিয়া শত্রুর এরূপ প্রশস্তি উৎকীর্ণ করিবেন বা করিতে দিবেন, ইহা কদাচ মনে করা যাইতে পারে না। অথবা উক্ত লিপি যে গুপ্ত সম্রাটগণের পরে কেহ খোদিত করিয়াছিলেন, তাহাও বলা যুক্তিযুক্ত নহে। গুপ্ত অক্ষরের সহিত উক্ত লিপির সাদৃশ্য আছে, এবং তাহা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া স্থির হইয়া থাকে। বিশেষতঃ লৌহস্তম্ভের লিপির লিখন-ভঙ্গিতে বুঝা যায় যে, চন্দ্ররাজ যেন এই পৃথিবীর প্রতি বিরক্ত হইয়া অর্থাৎ তাহার জয় শেষ করিয়া অন্য জগতে গিয়াছিলেন এবং লিপির সময়েও তাঁহার প্রতাপ ও কীর্ত্তি পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। সমুদ্রগুপ্ত তাঁহাকেই বিনষ্ট করিলে, গুপ্ত সম্রাটগণের সময় তাঁহার প্রতাপ ও কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকার কথা খোদিত করা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। সেইজন্য আমরা মনে করি যে, সমুদ্রগুপ্ত দিল্লীর লৌহস্তম্ভের চন্দ্ররাজকে বিনষ্ট করেন নাই, অন্য কোন চন্দ্রবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। গুপ্তনিয়া পর্ব্বতলিপির চন্দ্রবর্ম্মা, মন্দশোরের শিলালিপির নরবর্ম্মার ভ্রাতা চন্দ্রবর্ম্মা ও লৌহস্তম্ভের চন্দ্ররাজ অভিন্ন ব্যক্তি হইলেও হইতে পারেন; কিন্তু তিনি সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক বিজিত চন্দ্রবর্ম্মা হইতে যে স্বতন্ত্র, তাহা পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

এক্ষণে বিষ্ণুপাদগিরি সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলা যাইতেছে। যেখানে লৌহস্তম্ভ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই পুরাণ দিল্লী একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের গাত্রে স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত পর্ব্বতের নাম বিষ্ণুপাদগিরি হওয়া বিচিত্র নহে। পৃথ্বীরাজ সেইখানে বিষ্ণুমন্দির স্থাপিত করায় উহার নাম বিষ্ণুপাদগিরি হওয়াই সম্ভব। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই লৌহস্তম্ভ প্রথমে ইন্দ্রপ্রস্থে ছিল, পৃথ্বীরাজ তথা হইতে ইহাকে উত্তোলন করিয়া নিজ বিষ্ণুমন্দিরে স্থাপন করেন। কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থের সহিত বিষ্ণুপাদগিরির কি সম্বন্ধ ছিল, বুঝা যায় না। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ বলেন যে, উক্ত স্তম্ভ প্রথমে সম্ভবতঃ মথুরায় ছিল; অনঙ্গপাল উহাকে দিল্লীতে লইয়া আসেন; এবং তাহাতে খোদিত অনঙ্গপালের লিপি তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া স্মিথ সাহেব নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যদি অন্য স্থান হইতে স্তম্ভ আনীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে গয়া হইতেও তাহার আনয়নের কথা বলা যাইতে পারে। কারণ, গয়াকেও বিষ্ণুপাদগিরি বলা অসঙ্গত নহে। সে যাহা হউক, যেখানে লৌহস্তম্ভ রহিয়াছে, তাহারই সংলগ্ন ক্ষুদ্র পর্ব্বতকেই বিষ্ণুপাদগিরি বলাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

তাহার পর, লৌহস্তম্ভে আরও যে সকল খোদিতলিপি আছে, আমরা তাহাদেরই কথা আলোচনা করিতেছি। লৌহস্তম্ভে একটি এইরূপ লিপি দেখা যায়, "সম্বৎ দিহানী ১১০৯ অনঙ্গপাল বাহি"। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার এইরূপ অর্থ করেন যে, ১১০৯ সংবৎ অর্থাৎ ১০৫২ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় অনঙ্গপাল দিল্লীতে লোক বাস করাইয়াছিলেন। যিনি পৃথ্বীরাজের মাতামহ, তিনি দ্বিতীয় অনঙ্গপাল নহেন বলিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করেন, সেইজন্য তৃতীয় অনঙ্গপালের কল্পনা করিতে হয়। আবার পৃথ্বীরাজ যে অনঙ্গপালের দৌহিত্র ছিলেন না, এরূপ মতও প্রচলিত হইতেছে। চাঁদ কবির গ্রন্থে কিন্তু অনঙ্গপালকে পৃথ্বীরাজের মাতামহ বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অনঙ্গপালই লৌহস্তম্ভে দিল্লী প্রতিষ্ঠার কথা খোদিত করিয়াছিলেন, এবং তিনিই

† শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম ভাগ, ৯১ পৃঃ।

পৃথ্বীরাজের মাতামহ হইতে পারেন, তৃতীয় অনঙ্গপালের কল্পনার প্রয়োজন হয় না। চাঁদ কবির গ্রন্থে এক অনন্দ বিক্রম সম্বতের ব্যবহার দেখা যায়। পূর্ব্বে তাহার প্রচলনও ছিল। প্রচলিত সনন্দ বিক্রম সংবৎ হইতে তাহা ৯০—৯১ বৎসর ও খৃঃ অব্দ হইতে ৩৪।৩৫ বৎসর পরে প্রবর্ত্তিত হওয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে পৃথ্বীরাজের অবসান হইয়াছিল। তাহা হইলে লৌহস্তম্ভের অনঙ্গপালের খোদিত লিপির ১১০৯ সংবৎকে যদি অনন্দ বিক্রম সংবৎ ধরা যায়, তাহা হইলে উহা ১১০৪-১১৪৪ খৃঃ অব্দ হইয়া উঠে। সুতরাং দ্বিতীয় অনঙ্গপালের পৃথ্বীরাজের অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকা বলা যাইতে পারে। এবং দ্বিতীয় অনঙ্গপালের পৃথ্বীরাজের মাতামহ হওয়াও অসম্ভব হয় না। পৃথ্বীরাজের পূর্ব্বপুরুষ বিশালদেব আর্য্যাবর্ত্তের সার্ব্বভৌম নরপতি হইলেও দিল্লী হইতে তোমর বংশের যে উচ্ছেদ হইয়াছিল, একথা বলার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না। সে যাহা হউক, লৌহস্তম্ভের ১১০৯ সংবৎকে অনঙ্গ বিক্রম সংবৎ ধরিয়া লওয়াই সঙ্গত মনে হয়। সেইরূপ পৃথ্বীরাজের যে ১২৪১ সংবৎ আছে, তাহাকেও অনঙ্গ সংবৎ ধরিয়া লইলে উহা ১১৮৫—১১৮৬ খৃঃ অব্দ হয়, এবং তাহাই পৃথ্বীরাজের প্রকৃত সময়। চৌহানরাজ ছত্রসিংহের ১২৮৩ সংবতে লিখিত দুইটি লিপি দেখা যায়, তাহাকে অনন্দ বা সনন্দ বিক্রম সংবৎ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, এই ছত্রসিংহকে পৃথ্বীরাজের বংশধর বলিয়া অনুমান করা হয়। কুতুব-উল-ইস্‌লাম মস্‌জিদের প্রাঙ্গণস্থিত লৌহস্তম্ভে সে সময়ে হিন্দু-রাজলিপি খোদিত করা কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল, বলিতে পারা যায় না। চন্দেরীর বন্দেল রাজাদিগের ছয় ছত্রের একটি লিপি ১৭৬৭ সনন্দ সম্বৎ বা ১৭১০ খৃঃ অব্দে খোদিত দেখা যায়। তদ্ভিন্ন ১০৩০ ও ১০৩১ হিজরা বা ১১৪১—১১৪২ খৃঃ অব্দে খোদিত দর্শকগণের নামযুক্ত দুইটি ফারসী লিপিও আছে।

এই লৌহস্তম্ভ প্রাচীন হিন্দু-শিল্পের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইহা ঢালাই নহে, পিটাইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। রোড্‌স্ দ্বীপের প্রতিমূর্ত্তি অথবা ইউয়েন-চুয়াং বর্ণিত বিরাট বৌদ্ধমূর্ত্তিসকল পিত্তল ও তাম্রনির্ম্মিত এবং তাহারা শূন্যগর্ভ। কিন্তু এই লৌহস্তম্ভ সম্পূর্ণ নিরেট। ইহার গাত্রে খোদিত চন্দ্ররাজের প্রশস্তির অক্ষরগুলি রৌপ্য-খচিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। স্তম্ভ ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চ উচ্চ হইবে, তন্মধ্যে ২২½ ফুট ভূমির উপর দণ্ডায়মান আছে। নিম্নভাগের ব্যাস ১৬ ইঞ্চের উপর ও উপরিভাগের ব্যাস ১২ ইঞ্চের উপর হইবে। ইহার অগ্রভাগ দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তাহাতে কোন প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। বিষ্ণুধ্বজে গরুড়াদির প্রতিমূর্ত্তির অবস্থানই সম্ভব। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, নাদির শাহ ইহাকে উত্তোলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহার গাত্রে প্রায় মধ্যস্থলে গোলার আঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ভরতপুরের জাঠ সৈন্যগণ উহাতে গোলা বর্ষণ করিয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। দিল্লী ব্যতীত ধার নগরেও একটি লৌহস্তম্ভ আছে। চন্দ্ররাজের প্রশস্তি বর্ত্তমান দেবনাগরী অক্ষরে মর্ম্মরপ্রস্তরফলকে লিখিত হইয়া লৌহস্তম্ভের নিকটস্থ দেওয়ালে স্থাপিত করা হইয়াছে। ১৯০৩ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারিতে দিল্লীর নওয়াল গোস্বামী পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর দাসের পুত্র বাবু রায় উহা স্থাপন করিয়াছেন।

দত্তা

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিলাস যখাসময়ে কাছারিতে আসিয়া নিজের কাজ করিয়া বাড়ী চলিয়া যাইত; নিতান্ত প্রয়োজন হইলে কর্মচারী পাঠাইয়া বিজয়ার মত লইত, কিন্তু আপনি আসিত না। তাহাকে ডাকাইয়া না পাঠাইলে যে নিজে যাচিয়া আসিবে না, ইহাও বিজয়া বুঝিয়াছিল। অথচ, তাহার আচরণের মধ্যে অনুতাপ এবং আহত অভিমানের বেদনা ভিন্ন ক্রোধের জ্বালা প্রকাশ পাইত না বলিয়া বিজয়ার নিজেরও রাগ পড়িয়া গিয়াছিল।

বরঞ্চ, আপনার ব্যবহারের মধ্যেই কেমন যেন একটা নাটক অভিনয়ের আভাস অনুভব করিয়া মাঝে মাঝে তাহার ভারি লজ্জা করিত। প্রায়ই মনে হইত, কত লোকেই না জানি এই লইয়া হাসি-তামাসা করিতেছে। তা' ছাড়া, যে লোক সকলের চক্ষেই এতদিন সর্ব্বময় হইয়া বিরাজ করিতেছিল, বিশেষ করিয়া জমিদারীর কাজে-অকাজে সে যাহাদিগকে শাসন করিয়া শত্রু করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের সকলের কাছে ইহাকে অকস্মাৎ এতখানি ছোট করিয়া দিয়া বিজয়া আপনার নিভৃত হৃদয়ে সত্যকার ব্যথা অনুভব করিতেছিল। পূর্ব্বের অবস্থাকে ফিরাইয়া না আনিয়া, শুধু এই ঘটনাকে কোন-মতে সে যদি সম্পূর্ণ 'না' করিয়া দিতে পারিত,—তাহা হইলে বাঁচিয়া যাইত; এম্‌নি যখন তাহার মনের ভাব, সেই সময়ে হঠাৎ একদিন বিকালে কাছারির পরে বেহারা আসিয়া জানাইল, বিলাসবাবু দেখা করিতে চান।

ব্যাপারটা একেবারে নূতন। বিজয়া চিঠি লিখিতেছিল; মুখ না তুলিয়াই কহিল, আস্‌তে বল। তাহার মনের ভিতরটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় দুলিতে লাগিল; কিন্তু বিলাস প্রবেশ করিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শান্তভাবে নমস্কার করিয়া কহিল, "আসুন।" বিলাস আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, "কাজের ভিড়ে আস্‌তে পারিনে, তোমার শরীর ভাল আছে?" বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ। "সেই ওষুধটাই চল্‌চে?" বিজয়া ইহার উত্তর দিল না, কিন্তু, বিলাসও প্রশ্নের পুনরুক্তি না করিয়া অন্য কথা কহিল। বলিল, "কাল নব-বৎসরের নূতন দিন,—আমার ইচ্ছা হয়, সকলকে একত্র কোরে কাল সকালবেলা একটু ভগবানের নাম করা হয়।"

সে যে তাহার প্রশ্ন লইয়া পীড়াপীড়ি করিল না, কেবল ইহাতেই বিজয়ার মনের উপর হইতে একটা ভার নামিয়া গেল। সে খুসি হইয়া বলিয়া উঠিল, "এ তো খুব ভাল কথা।" বিলাস বলিল, "কিন্তু নানা কারণে মন্দিরে যাওয়ার সুবিধে হোলো না। যদি তোমার অমত না হয় ত, আমি বলি এইখানেই—" বিজয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া সায় দিল, এমন কি উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কহিল, "তাহ'লে ঘরটাকে একটুখানি ফুল-পাতা-লতা দিয়ে সাজালে ভাল হয় না? আপনাদের বাড়ীতে ত ফুলের অভাব নেই,—যদি মাশীকে হুকুম দিয়ে কাল ভোর থাক্‌তেই,—কি বলেন? হতে পারে না কি?"

বিলাস বিশেষ কোন প্রকার আনন্দের আড়ম্বর না দেখাইয়া সহজ-ভাবে বলিল, "বেশ, তাই হবে। আমি সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক কোরে দেব।" বিজয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, "কাল ত বৎসরের প্রথম দিন;—আচ্ছা আমি বলি কি, অম্‌নি একটু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন কর্‌লে কি—" বিলাস এ প্রস্তাবও অনুমোদন করিল এবং উপাসনার পরে জলযোগের আয়োজন যাহাতে ভাল রকম হয়, সে বিষয়েও নায়েবকে হুকুম দিয়া যাইবে জানাইল। আরও দুই-চারিটা সাধারণ কথাবার্ত্তার পরে বিলাস বিদায় গ্রহণ করিলে, বহুদিনের পরে বিজয়ার অন্তরের মধ্যে তৃপ্তি ও উল্লাসের দক্ষিণা বাতাস দিতে লাগিল। সেইদিনকার সেই প্রকাণ্ড সংঘর্ষের পরে হইতে অব্যক্ত গ্লানির আকারে যে বস্তুটি তাহাকে অনুক্ষণ দুঃখ দিতেছিল, তাহার ভার যে কত ছিল, আজ নিষ্কৃতি পাইয়া সে যেমন

অনুভব করিল, এমন বোধ করি কোন দিন করে নাই! তাই আজ তাহার ব্যথার সহিত মনে হইতে লাগিল, এই কয়দিনের মধ্যেই বিলাস পূর্ব্বেকার অপেক্ষা যেন অনেকটা রোগা হইয়া গিয়াছে। অপমান ও অনুশোচনার আঘাত ইহার প্রকৃতিকে যে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে, তাহা চোখের উপর সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়া, অজ্ঞাতসারে বিজয়ার দীর্ঘশ্বাস পড়িল, এবং বৃদ্ধ রাসবিহারীর সেদিনের কথাগুলি চুপ করিয়া বসিয়া মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। বিলাসবিহারী তাহাকে যে অত্যন্ত ভালবাসে, তাহা অত্যন্ত করিয়াই ভাষার ইঙ্গিতে, ভঙ্গীতে নানা প্রকারে ব্যক্ত করা হইয়াছে, অথচ একটা দিনের জন্যও সে সত্য-মিথ্যার তর্কই তাহার মনে উদয় হয় নাই। বরঞ্চ সন্ধ্যার ঘনীভূত অন্ধকারে একাকী ঘরের মধ্যে সঙ্গ-বিহীন প্রাণটা যখন ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে ধীরে-ধীরে যে আসিয়া তাহার পাশে বসে, সে বিলাস নয়। অলস মধ্যাহ্নে বইয়ে যখন মন বসে না, শেলাইয়ের কাজও অসহ্য বোধ হয়, প্রকাণ্ড শূন্য বাড়ীটা রবিকরে খাঁ-খাঁ করিতে থাকে, তখন সুদূর ভবিষ্যতে একদিন এই শূন্য গৃহই পূর্ণ করিয়া যে ঘর-কন্নার স্নিগ্ধ ছবিটি তাহার কল্পনায় জাগিয়া উঠে, তাহার মধ্যে কোথাও বিলাসের জন্য এতটুকু স্থান থাকে না। অথচ, যে লোকটি সমস্ত বায়না ছুড়িয়া বসে, সংসারযাত্রার দুর্গম-পথে সহায় বা সহযোগী হিসাবে মূল্য তাহার বিলাসের অপেক্ষা অনেক কম। সে যেমন অপটু, তেমনি নিরুপায়। বিপদের দিনে ইহার কাছে কোন সাহায্যই মিলিবে না। তবুও এই অকেজো মানুষটারই সমস্ত অকাজের বোঝা সারাজীবন মাথায় লইয়া চলিয়াছে, মনে করিতে বিজয়ার সমস্ত দেহ মন অপরিমিত আনন্দবেগে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে। বিলাস চলিয়া গেলে বিজয়ার এই মনোভাবের আজও যে কোন ব্যতিক্রম ঘটিল, তাহা নহে; কিন্তু, আজ সে বিনা প্রার্থনায় বিলাসের দোষের পুনর্ব্বিচারের ভার হাতে তুলিয়া লইল; এবং ঘটনাচক্রে তাহার স্বভাবের যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, বাস্তবিক স্বভাব যে তাহার অত হীন নহে, কাহারও সহিত কোন তর্ক না করিয়াই সে আপনা-আপনিই তাহা মানিয়া লইল। এমন কি, নিরতিশয় উদারতার সহিত ইহাও আজ সে আপনার কাছে গোপন করিল না যে, বিলাসের মত মানসিক অবস্থায় পড়িয়া জগতের অধিকাংশ লোকেই হয় ত ভিন্নরূপ আচরণ দেখাইতে পারিত না। সে যে ভালবাসিয়াছে এবং ভালবাসার অপরাধই তাহাকে লাঞ্ছিত এবং দণ্ডিত করিয়াছে, ইহাই বারবার স্মরণ করিয়া আজ সে করুণা-মিশ্রিত মমতার সহিত তাহাকে মার্জ্জনা করিল!

সকালে উঠিয়া শুনিল, বিলাস বহুপূর্ব্বেই লোকজন লইয়া ঘর-সাজানোর কাজে লাগিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া লজ্জিতভাবে কহিল, "আমাকে ডাকিয়ে পাঠাননি কেন?"

বিলাস স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, "দরকার কি!" বিজয়া একটু হাসিয়া প্রসন্নমুখে জবাব দিল, "আমি বুঝি এতই অকর্ম্মণ্য যে, এদিকেও কিছু সাহায্য করতে পারিনে? আচ্ছা, এখন বলুন, আমি কি কোরব?" অনেকদিনের পরে বিলাস আজ হাসিল; কহিল, "তুমি শুধু দেখো, আমাদের কাজে ভুল হচ্ছে কি না।"

"আচ্ছা" বলিয়া বিজয়া হাসিমুখে একটা কোচের উপর গিয়া বসিল। খানিক পরেই প্রশ্ন করিল, "খাবার বন্দোবস্ত।" বিলাস ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "সমস্ত ঠিক হচ্ছে,—কোন চিন্তা নেই।" "আচ্ছা, আমি কেন সেই-দিকেই যাইনে?" "বেশ ত।" বলিয়া বিলাস পুনরায় কাজে মন দিল।

বেলা আটটার মধ্যেই সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে বিজয়া অনেকবার আনাগোনা করিয়া, অনেক ছোট-খাটো ব্যাপারে বিলাসের পরামর্শ লইয়া গেছে,—কোথাও বাধে নাই। না জানিয়া কখন্ যে সঞ্চিত বিরোধের গ্লানি কাটিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তার পথ এমন সহজ ও সুগম হইয়া গিয়াছিল, দুইজনের কেহই বোধ করি খেয়াল করে নাই।

বিজয়া হাসিয়া বলিল, "আমাকে একেবারে অপদার্থ মনে করে বাদ দিলেন, কিন্তু আমিও আপনার একটা ভুল ধরেচি, তা বল্‌চি।" বিলাস একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অপদার্থ একবারও মনে করিনি, কিন্তু ভুল কি রকম?" বিজয়া বলিল, "আমরা আছি ত মোটে চার পাঁচজন, কিন্তু খাবারের আয়োজন হয়ে পড়েচে প্রায় কুড়ি জনের, তা জানেন?" বিলাস কহিল, "সে ত বটেই! বাবা

তাঁর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করেছেন। তাঁরা ক'জন, কে-কে আস্‌বেন তা ত ঠিক জানিনে।" বিজয়া ভয়ানক বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, "কৈ সে ত আমাকে বলেন নি?" বিলাস নিজেও বিস্মিত হইল। কহিল, "এখান থেকে কাল আমি যাবার পরে বাবা তোমাকে চিঠি লিখে জানান নি?"

"না।" "কিন্তু তিনি যে স্পষ্ট বল্‌লেন—" বিলাস থমকিয়া গেল। বিজয়া প্রশ্ন করিল, "কি বল্‌লেন?" বিলাস ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল, "আমারই শোনবার ভুল হয়েচে। তিনি চিঠি লিখে জানাবেন বলে বোধ করি ভুলে গেছেন।" বিজয়া আর কোন প্রশ্ন করিল না; কিন্তু তাহার মনের ভিতরে জ্যোৎস্নার প্রসন্নতা সহসা যেন মেঘে ঢাকিয়া গেল।

আধ-ঘণ্টা পরে রাসবিহারী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বেলা নয়টার মধ্যেই তাঁহার নিমন্ত্রিত বন্ধুর দল একে-একে দেখা দিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সকলেই ব্রাহ্মসমাজের নহেন, সম্ভবতঃ রাসবিহারীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়াই আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রাসবিহারী সকলকেই পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং বিজয়ার সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, তাঁহাদের পরিচিত করিয়া দিতে গিয়া অচিরে ভবিষ্যতে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ইঙ্গিত করিতেও ত্রুটি করিলেন না। বিজয়া অস্ফুটকণ্ঠে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। এই সকল প্রচলিত ভদ্রতা-রক্ষার কার্য্যে সে যখন ব্যাপৃত, তখন অদূরে বাগানের সঙ্কীর্ণ পথে দয়ালবাবু দেখা দিলেন। কিন্তু তিনি একা নহেন, একজন অপরিচিত তরুণী রমণী আজ তাঁহার সঙ্গে। মেয়েটি সুশ্রী, বয়স বোধ করি বিজয়ার অপেক্ষা কিছু বেশী। দয়াল তাহাকে আপনার ভাগ্নী বলিয়া পরিচয় দিলেন। নাম নলিনী, কলিকাতায় কলেজে বি, এ, পড়ে। এখনো গরমের ছুটি সুরু হয় নাই বটে, কিন্তু, মামীর অসুখে সেবা করিবার জন্য কিছু পূর্ব্বেই দিন দুই হইল মামার কাছে আসিয়াছে, এবং স্থির হইয়াছে গ্রীষ্মের অবকাশটা এইখানেই কাটাইয়া যাইবে।

নলিনীকে যে বিজয়া কলিকাতায় একেবারে দেখে নাই, তাহা নহে; কিন্তু আলাপ না থাকিলেও এতগুলি পরিচিত ও অপরিচিত পুরুষের মধ্যে আজ এই মেয়েটিই তাহার কাছে সকলের চেয়ে অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে হইল। সে দুইহাত বাড়াইয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিল এবং পাশে বসাইয়া ভাব করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

উপাসনা সাড়ে নয়টায় সময় সুরু করিবার কথা। তখনও কিছু বিলম্ব ছিল বলিয়া পুরুষেরা সম্মুখের বারান্দায় কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বেঞ্চের উপর বসিয়া, আলাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাসবিহারীর গলা ঘরের মধ্যে শোনা গেল। তিনি অত্যন্ত আদর করিয়া কাহাকে বলিতেছিলেন, "এসো বাবা, এসো। তোমার কত কাজ; তুমি যে সময় কোরে আস্‌তে পারবে, এ আমি আশা করিনি।"

এই সম্মানিত কাজের ব্যক্তিটি কে, জানিবার জন্য বিজয়া মুখ তুলিয়া সম্মুখেই দেখিল, নরেন্দ্র। কিন্তু অসম্ভব বলিয়া হঠাৎ তাহার প্রত্যয় হইল না। নলিনীও একই সঙ্গে কৌতূহল বশে ঝুঁকিয়া দেখিয়া কহিল, নরেন্দ্রবাবু। রাসবিহারী তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন, এবং সে সেই নিমন্ত্রণ রাখিতে এই বাটীতে প্রবেশ করিয়াছে! ঘটনাটা এমনি অচিন্তনীয় যে, বিজয়ার সমস্ত চিন্তাশক্তি পর্য্যন্ত যেন বিফল-বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। আর সে সে-দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না; কিন্তু, বিলাসবিহারীর সবিনয় অভ্যর্থনা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিল; এবং পরক্ষণেই উভয়কে লইয়া রাসবিহারী ঘরের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন; সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আসিলেন। তখন বৃদ্ধ শান্ত, গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, "তোমাদের বাপেদের সম্পর্কে তোমরা দুজনে যে ভাই হও, এই কথাটাই আজ তোমাদের আমি বিশেষ ক'রে বল্‌তে চাই, বিলাস। বনমালী গেলেন, জগদীশ গেছেন, আমারও ডাক পড়েছে। ইহজগতে আমাদের যে শুধু দেহ ভিন্ন, আর কিছুই প্রভেদ ছিল না, এ কথা তোমরা আজকালকার ছেলেরা হয় ত বুঝবে না; বোঝা সম্ভবও নয়,—আমি বোঝাতেও চাইনে। শুধু কেবল আজ নব-বৎসরের এই পুণ্য দিনটিতে দুজনের কাছে এইমাত্র অনুরোধ জানাতে চাই, যে, তোমাদের গৃহ-বিচ্ছেদের কালী দিয়ে এই বৃদ্ধের বাকী দিন ক'টা আর অন্ধকার কোরে তুলো না—" তাঁহার শেষ কথাটা কাঁপিয়া

উঠিয়া ঠিক যেন কান্নায় রুদ্ধ হইয়া গেল। নরেন আর সহিতে পারিল না; সে অগ্রসর হইয়া গিয়া বিলাসের একটা হাত নিজের ডান-হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবেগের সহিত কহিল, "বিলাসবাবু, আমার সকল অপরাধ আপনি মাপ করুন। আমি ক্ষমা চাইচি।" প্রত্যুত্তরে বিলাস হাত ছাড়িয়া দিয়া নরেন্দ্রকে সবলে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল, "অপরাধ আমিই করেচি নরেন। আমাকেই তুমি ক্ষমা কর।" বৃদ্ধ রাসবিহারী মুদিত নেত্রে কম্পিত বৃহৎকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হে, সর্ব্বশক্তিমান পরমপিতা পরমেশ্বর! এই দয়া, এই করুণার জন্য তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার কোটী কোটী নমস্কার!" এই বলিয়া তিনি দুইহাত জোড় করিয়া কপালে স্পর্শ করিলেন; এবং চাদরের কোণে চক্ষু-মার্জ্জনা করিয়া "আজিকার শুভ মুহূর্ত্ত তোমাদের উভয়ের জীবনে অক্ষয় হোক! আপনারাও আশীর্ব্বাদ করুন!" বলিয়া তিনি বিস্ময়-বিহ্বল অভ্যাগত ভদ্রলোকদিগের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

দয়াল ভিন্ন কেহই কিছু জানিতেন না; সুতরাং, মর্ম্ম-স্পর্শী করুণ অনুষ্ঠানের যথার্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ইঁহাদের বাস্তবিকই বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না। রাসবিহারী চক্ষের পলকে তাহা অনুভব করিয়া তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া স্নিগ্ধভাবে একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "মেয়েরা যে বলে শাঁকের করাত, আস্‌তে কাটে, যেতেও কাটে, আমারও হয়েছিল তাই। আমার এও ছেলে, ও-ও ছেলে—" বলিয়া নরেন্দ্র বিলাসকে চোখের ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিলেন,—"আমার ডান-হাতেও যেমন ব্যথা, বাঁ-হাতেও তেম্‌নি ব্যথা। কিন্তু আপনাদের কৃপায় আজ আমার বড় শুভদিন, বড় আনন্দের দিন! আমি কি আর বোল্‌ব!" ভিতরের ব্যাপারটা তলাইয়া না বুঝিলেও প্রত্যুত্তরে সকলেই হর্ষসূচক একপ্রকার অস্ফুট ধ্বনি করিলেন।

রাসবিহারী ঘাড়টা একটুখানি মাত্র হেলাইয়া উত্তরীয়-প্রান্তে পুনরায় চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া নিকটবর্ত্তী আসনে গিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিলেন। সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর মুখের প্রতি চাহিয়া উপস্থিত কাহারও অনুমান করিতে অবশিষ্ট রহিল না যে, হৃদয় তাঁহার অনির্ব্বচনীয় ভাবরাশিতে এমনি পরিপূর্ণ হইয়া গেছে যে, বাক্যের আর তিলার্দ্ধ স্থান নাই। দয়াল তাঁহার পাকা দাড়ীতে হাত বুলাইতে-বুলাইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ভগবৎ-উপাসনার প্রারম্ভে ভূমিকাচ্ছলে বলিলেন, "যেখানে বিরুদ্ধ হৃদয় সম্মিলিত হয়, তথায় ভগবানের আসন পাতা হয়। সুতরাং, আজ এখানে পরম পিতার আবির্ভাব সম্বন্ধে দ্বিধা করিবার কিছু নাই।" অতঃপর তিনি নূতন বৎসরের প্রথম দিনটিতে প্রায় পোনর মিনিট ধরিয়া একটি সুন্দর প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার নিজের মধ্যে অকপট বিশ্বাস ও আন্তরিক ভক্তি ছিল বলিয়া যাহা কিছু কহিলেন, সমস্তই সত্য এবং মধুর হইয়া সকলের হৃদয়ে বাজিল। সকলের চক্ষু-পল্লবেই একটা সরলতার আভাস দেখা দিল; শুধু রাসবিহারীর নিমিলিত চোখ বাহিয়া দর-দরধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। শেষ হইয়া গেলেও একই ভাবে বসিয়া রহিলেন। তিনি অচেতন কিম্বা সচেতন, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাই বুঝিতে পারা গেল না। আর একজনের মনের কথা টের পাওয়া গেল না—সে বিজয়ার। সারাক্ষণ সে অনিত নেত্রে পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। তারপরে যখন মুখ তুলিল, তখন মুখখানা শুধু পাথরের মতই অস্বাভাবিক রূপে সাদা দেখাইল। দয়ালের ভক্তি-গদ্গদ ধ্বনির প্রতিধ্বনি তখনও অনেকেরই হৃদয়ের মধ্যে কম্পিত হইতেছিল, এম্‌নি সময়ে রাসবিহারী চক্ষু মেলিলেন; এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রায় কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিলেন, "আমার সে সাধনার বল নাই, কিন্তু দয়ালের মহাবাক্য যে কত বড় সত্য, আজ তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। সম্মিলিত হৃদয়ের সন্ধিস্থলে যে সেই একমাত্র ও অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের আবির্ভাব হয়, আজ তাহা অন্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আমার জীবন চিরদিনের জন্য ধন্য হইয়া গিয়াছে!" এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া গিয়া দয়ালকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "দয়াল! ভাই! এ শুধু তোমারই পুণ্যে, তোমারই আশীর্ব্বাদে!" দয়ালের চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া আসিল, কিন্তু সে কোন কথা কহিতে না পারিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পাশের ঘরেই জলযোগের প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। এখন বিলাস সেই ইঙ্গিত করিতেই রাসবিহারী তাহাকে বাধা দিয়া অভ্যাগতগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আপনাদের কাছে আজ আর একটি বিষয়ে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। বনমালী বেঁচে থাক্‌লে তাঁর কন্যার বিবাহের কথা

তিনিই আপনাদিগকে জানাতেন, আমাকে বল্‌তে হোতো না; কিন্তু এখন সে ভার আমার পরেই পড়েছে। এখন আমিই বর-কন্যার পিতা। আমি এই মাসেরই শেষ সপ্তাহে পূর্ণিমা তিথিতে বিবাহের দিন স্থির করেছি,—আপনারা সন্তানঃকরণে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন শুভকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।" এই বলিয়া তিনি একজোড়া মোটা সোণার বালা পকেট হইতে বাহির করিয়া দরজার হাতে দিলেন।

দরজা সেই দুটি লইয়া বিজয়ার কাছে অগ্রসর হইয়া গিয়া হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "শুভকর্ম্মের সূচনায় কায়-মনোবাক্যে তোমার কল্যাণ কামনা করি, মা, হাত দুটি একবার দেখি?"

কিন্তু সেই আনতমুখী, মূর্ত্তির মত আসীনা রমণীর নিকট হইতে লেশমাত্র সাড়া আসিল না। দরজা পুনরায় তাঁহার প্রার্থনা আবৃত্তি করিলেন; তথাপি সে তেমনি স্থির বসিয়া রহিল। নলিনী পাশেই ছিল; সে মামার অবস্থা-সঙ্কট অনুভব করিয়া হাসিয়া বিজয়ার হাত দুটি তুলিয়া ধরিল, এবং দরজা না জানিয়া একজোড়া অত্যাচারের হাত-কড়ি আশীর্ব্বাদের স্বর্ণবলয় জ্ঞানে সেই মূর্চ্ছিতপ্রায় নিরুপায় নারীর অশক্ত, অবশ দুটি হাতে একে-একে পরাইয়া দিলেন।

কিন্তু, কেহই কিছু জানিল না। বরঞ্চ, ইহাকে মধুর লজ্জা কল্পনা করিয়া, স্বাভাবিক এবং সঙ্গত ভাবিয়া তাঁহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, এবং নিমিষে শুভকামনার অস্ফুট ধ্বনিতে সমস্ত ঘরটা মুখরিত হইয়া উঠিল।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার সমাধা হইয়া গেলে, বেলা হইতেছিল বলিয়া সকলেই একে-একে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়টার কি করিয়া যে বিজয়া আত্মসম্বরণ করিয়া অতিথিদের সম্ভ্রম এবং মর্য্যাদা রক্ষা করিল, তাহা অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর যে লোকটার অগোচর রহিল না, সে রাসবিহারী। কিন্তু তিনি আভাস মাত্র দিলেন না। জলযোগ সমাপন করিয়া একটি নমস্কার মুখে দিয়া হাসিমুখে কহিলেন, "মা, আমি চল্‌লুম। বুড়োমানুষ রোদ উঠ্‌লে আর হাঁটতে পারব না।" বলিয়া আর একপ্রস্থ আশীর্ব্বাদ করিয়া ছাতাটি মাথায় দিয়া ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া পড়িলেন।

শুধু বিজয়া এবং নলিনী তখনও বাহিরের বারান্দায় একধারে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। বিজয়া কহিল, "আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে কত যে সুখী হলুম, সে বল্‌তে পারিনে। এখানে এসে পর্য্যন্ত আমি একেবারে একলা পড়ে গেছি—এমন কেউ নেই যে দুটো কথা বলি। আপনার যখন ইচ্ছে হবে, যখন সময় পাবেন, আসবেন।" নলিনী খুশী হইয়া সম্মত হইল।

তখন বিজয়া কহিল, "আমি নিজেও হয় ত ও-বেলায় আপনার মাসীমাকে দেখ্‌তে যাবো।" কিন্তু তখনই রৌদ্রের দিকে চাহিয়া একটু ব্যস্ত হইয়াই বলিয়া উঠিল, "দরজাবাবু নিশ্চয় কাছারীতে ঢুকেছেন, ডেকে পাঠাই—" বলিয়া বেহারার সন্ধানে পা বাড়াইবার উদ্যোগ করিতেই নলিনী বাধা দিয়া বলিল, "তিনি ত এখন বাড়ী যাবেন না, একেবারে সন্ধ্যাবেলায় ফিরবেন!"

বিজয়া লজ্জিত হইয়া বলিল, "এ কথা আমাকে আগে বলেননি কেন? আমি দরওয়ানকে ডেকে দিচ্চি, সে আপনার—" নলিনী কহিল, "না দরওয়ানের দরকার নেই, আমি নরেন্দ্রবাবুর জন্যে অপেক্ষা করচি। তিনি তাঁর মামার সঙ্গে একবার দেখা করতে গেছেন, এখুনি এসে পড়বেন।" বিজয়ার বিস্ময়ের অবধি রহিল না, কহিল, "আপনার সঙ্গে কি তাঁর পরিচয় ছিল নাকি? আমি ত এ কথা জানতুম না।" নলিনী কহিল, "পরিচয় কিছুই ছিল, না। শুধু পরশুদিন মামার চিঠি পেয়ে ষ্টেসনে এসে দেখি তিনি দাঁড়িয়ে আছেন! তাঁর সঙ্গেই এখানে এসেচি।" বিজয়া বলিল, "ওঃ—তাই বুঝি?" নলিনী কহিল, "হাঁ। কিন্তু কি চমৎকার লোক দেখেছেন। দুদিনেই যেন কত দিনের আত্মীয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন; এ-বেলায় আমাদের ওখানেই উনি স্নানাহার করে বিকেল-বেলা কল্‌কাতায় যাবেন, স্থির হয়েছে। আমার মামী-মা ত ওঁকে একেবারে ছেলের মত ভাল বাসেন।" বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া শুধু কহিল "হাঁ, চমৎকার লোক।" নলিনী কহিতে লাগিল, "ওঁর সঙ্গে যে কারও কখনো মনোমালিন্য ঘট্‌তে পারে, এ আমি চোখে না দেখ্‌লে হয় ত বিশ্বাস করতেই পারতুম না। আমি বড় খুসি হয়েচি যে, আজ বিলাসবাবুর সঙ্গে তাঁর মিল হয়ে গেল। কিন্তু কি চমৎকার লোক ওঁর বাবা। আমার মনে হয়, আমাদের সমাজে সকলেরই ওঁর মত হবার চেষ্টা করা উচিত। রাসবিহারী বাবুর আদর্শ যেদিন ব্রাহ্ম-সমাজের ঘরে-ঘরে প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই দিনই বুঝব আমাদের

শ্রাদ্ধধর্ম্ম সফল হ'ল, সার্থক হ'ল! কি বলেন? ঠিক নয়?"

অদূরে দেখা গেল, নরেন্দ্র টুপিটা হাতে লইয়া দ্রুতবেগে এইদিকে আসিতেছে। বিজয়া নলিনীর প্রশ্নের উত্তরটা এড়াইয়া গিয়া শুধু সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিল, "ঐ যে উনি আস্‌চেন।"

নরেন্দ্র কাছে আসিয়া বিজয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এই যে, এরই মধ্যে দুজনের দিব্যি ভাব হয়ে গেছে। বাস্তবিক, আজ বছরের প্রথম দিনটায় আমার ভারি সুপ্রভাত! সকালটা চমৎকার কাটল। দেখে আশা হচ্চে, এ বছরটা হয় ত ভালই কাটবে। কিন্তু, আপনাকে অমন শুক্‌নো দেখাচ্চে কেন বলুন ত?"

বিজয়া উত্যক্ত স্বরে কহিল, "একদিনের মধ্যে ও-প্রশ্ন কতবার করা দরকার বলুন ত?" নরেন্দ্র ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আরও একবার জিজ্ঞাসা করেচি, না? তা' হোলোই বা। আচ্ছা, খপ্ কোরে অমন রেগে যান কেন বলুন দেখি? ওটা ত আপনার ভারি দোষ।" বলিয়া হাসিয়া ফেলিল।

বিজয়া নিজেও কোন মতে হাসি চাপিয়া ছদ্ম গাম্ভীর্য্যের সহিত জবাব দিল, "ও বিষয়ে সবাই কি আপনার মত নির্দ্দোষ হতে পারে? তবুও দেখুন, কালিপদর মত এমনও সব নিন্দুক আছে, যারা স্বীকার করতে চায় না।" কালিপদর নামে নরেন্দ্র উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে কহিল, "আপনি ভয়ানক অভিমানী, কিছুতেই কারও দোষ মার্জ্জনা করিতে পারেন না। কিন্তু সবটা কারা শুনি? কালিপদ আর আপনি নিজে এই ত?" বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আর ষ্টেসনে যারা দেখেচে, তারা।" নরেন কহিল, "আর?" বিজয়া কহিল "আর যারা শুনেচে, তারাও।" নরেন কহিল, "তা'হলে আমার সম্বন্ধে রাজ্যশুদ্ধ লোকেরই এই মত বলুন?" বিজয়া পূর্ব্বের গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়াই জবাব দিল, "হাঁ। আমাদের সকলের মতই এই।" নরেন কহিল, "তা'হলে ধন্যবাদ। এইবার আপনার নিজের সম্বন্ধে সকলের মত কি, সেইটে বলুন।" বলিয়া হাসিতে লাগিল। তাহার ইঙ্গিতে বিজয়ার মুখ পলকের জন্য রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই হাসিয়া কহিল, "নিজের সুখ্যাতি নিজে করতে নেই—পাপ হয়। সেটা বরঞ্চ আপনি বলুন। কিন্তু এখন নয়, নাওয়া-খাওয়ার পরে।" একটু থামিয়া কহিল "কিন্তু অনেক বেলা হয়ে গেছে,—সে কাজটা এখানেই সেরে নিলে ভাল হোতো না।" বলিয়া সে নলিনীর মুখের প্রতি চাহিল। নলিনী কহিল, "কিন্তু মামী-মা যে অপেক্ষা করে থাক্‌বেন।" বিজয়া কহিল, "আমি এখ্‌খুনি লোক পাঠিয়ে খবর দিচ্চি।" নলিনী কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কহিল, "আমাকে যেতেই হবে। মামী-মা রোগা মানুষ, বাড়ীতে সমস্ত দুপুর-বেলাটা কেউ কাছে না থাক্‌লে চল্‌বে না।" কথাটা সত্য, তাই সে আর জিদ্ করিতে পারিল না; কিন্তু তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কি ভাবিয়া নলিনী তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল, "কিন্তু আপনি না হয় এখানেই স্নানাহার করুন, নরেন বাবু, আমি গিয়ে মামী-মাকে জানাবো। শুধু যাবার সময় একবার তাঁকে দেখা দিয়ে যাবেন।" "আর আমাকে এমনি অকৃতজ্ঞ নরাধম পেয়েছেন যে, এই রোদের মধ্যে আপনাকে একলা ছেড়ে দেব?" বলিয়া নরেন সহাস্যে বিজয়ার মুখের পানে চোখ তুলিয়া কহিল, "আপনার কাছে একদিন ত ভাল-রকম খাওয়া পাওনা আছেই,—সেদিন না হয় সকাল-সকাল এসে এই খাওয়াটার শোধ তোলবার চেষ্টা কোরবো। আচ্ছা, নমস্কার।" নলিনীকে কহিল, "আর দেরি নয়, চলুন।" বলিয়া হাতের টুপিটা মাথায় তুলিয়া দিল।

নলিনী নামিয়া কাছে আসিল, কিন্তু আর একজন যে কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার দুই চক্ষে যে শান-দেওয়া ছুরির আলো ঝলকিতে লাগিল, তাহা দুজনের কেহই লক্ষ্য করিল না; করিলে বোধ করি নরেন্দ্র দুই এক পা অগ্রসর হইয়াই সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিতে সাহস করিত না,—"আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না? যে জিনিসটি সুরু থেকেই এত দুঃখের মূল, যার জন্যে আমার দেশময় অখ্যাতি, আমাকেই কেন সেটা আজকের আনন্দের দিনে বকশিস্ করে দিন না? সেই দুশো টাকাটা কাল পরশু যেদিন হয় পাঠিয়ে দেব।" বলিয়া আরও একবার হাসিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু উৎসাহের অভাবে সুবিধা হইল না। বরঞ্চ ও-পক্ষ হইতে প্রত্যুত্তরে একেবারে অপ্রত্যাশিত কড়া জবাব আসিল। বিজয়া কহিল, "দাম নিয়ে দেওয়াকে যখন আপনি উপহার দেওয়া মনে করেন, তখন এ রকম উপহার নিজে বোধ করি বন্ধু-বান্ধবকে

অনেক দিয়েছেন? হয় ত হাতে গুণে শেষ করাই যায় না?"

এই আঘাতের কঠোরতায় নরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেল। এম্‌নিই ত সে বিজয়ার মেজাজের প্রায়ই কোন কূল-কিনারা পায় না,—তাহাতে আজ তাহার বুকের মধ্যে যে দুঃখের আগুন জ্বলিতেছিল, তাহার দাহ যখন অকস্মাৎ অকারণে বাহির হইয়া পড়িল, তখন নরেন্দ্র তাহাকে চিনিয়া লইতে পারিল না। সে ক্ষণকাল তাহার কঠিন মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া, অত্যন্ত ব্যথার সহিত বলিয়া উঠিল, "আমার একান্ত দীন অবস্থা আমি ভুলেও যাইনি, গোপন করবার চেষ্টাও করিনি যে, মনে করিয়ে দিচ্ছেন।" নলিনীকে দেখাইয়া কহিল, "আমি এঁকেও আমার সমস্ত ইতিহাস বলেছি। বাবা অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়ে মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে বাড়ী ঘর দ্বার যা কিছু এখানে ছিল, সর্ব্বস্ব দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গেছে, কিছুই কারো কাছে লুকোইনি। আচ্ছা, বলুন ত, এ সব কথা কি আপনাকে জানাইনি?" নলিনী সলজ্জে মাথা দিয়া কহিল, হাঁ। বিজয়ার মুখ বেদনায় লজ্জায় ক্ষোভে বিবর্ণ হইয়া উঠিল—সে শুধু বিহ্বল আচ্ছন্নের মত একদৃষ্টে উভয়ের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।

তাহার সেই অপরিসীম বেদনাকে বিমথিত করিয়া নরেন্দ্র ম্লান মুখে পুনশ্চ কহিল, "আমার কথায় আপনি প্রায়ই অত্যন্ত উত্যক্ত হয়ে ওঠেন। হয় ত ভাবেন, নিজের অবস্থাকে ডিঙিয়ে আমি নিজেকে আপনাদের সমান এবং সমকক্ষ বলে প্রচার করতে চাই;—হতেও পারে, সব কথায় আপনার ওজন ঠিক রাখ্‌তে পারিনে; কিন্তু সে আমার অন্তমনস্ক স্বভাবের দোষে;—কিন্তু যাক্,—অসম্ভ্রম যদি করে থাকি, আমাকে মাপ করবেন।" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত পথটার মধ্যে দু'জনের শুধু এই কথাটা হইল। নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপহার দেবার কথা বল্‌ছিলেন?" নরেন্দ্র ক্লান্ত কণ্ঠে কহিল, "আর একদিন এ কথা আপনাকে বোল্‌ব,—কিন্তু আজ নয়।" সেই বাঁশের পুলটার কাছে আসিয়া নরেন হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, "আজ আমাকে মাপ করতে হবে,—আমি ফিরে চল্‌লুম।" কিন্তু, নলিনীকে বিস্ময়ে অভিভূতপ্রায় দেখিয়া পুনরায় বলিল, "আমার অন্যায় যে কি পর্য্যন্ত হচ্ছে, সে আমি জানি। কিন্তু, তবুও ক্ষমা করিতে হবে—আজ আমি কোন মতে যেতে পারব না। আপনার মামীমাকে বলে যেবেন, আমি আর একদিন এসে—"

তাহার সঙ্কল্পের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে নলিনী যত আশ্চর্য্য হইয়াছিল, এখন তাহার কণ্ঠস্বর ও মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঢের বেশি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বোধ হয় এই জন্যই সে এ বিষয়ে আর অধিক অনুরোধ না করিয়া তাহাকে শুধু কহিল, "আপনার যে খাওয়া হোলো না। কিন্তু আবার কবে আস্‌বেন?" "পরশু আস্‌বার চেষ্টা কোরব," বলিয়া নরেন যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে দ্রুতপদে রেলওয়ে ষ্টেসনের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

মাঠ পার হইতে আর যখন দেরি নাই, এমন সময়ে দেখিল কে একটা ছেলে হাত উঁচু করিয়া তাহারই দিকে প্রাণপণে ছুটিয়া আসিতেছে। সে যে তাহার জন্যই ছুটিতেছে, এবং হাত তুলিয়া তাহাকেই থামিতে ইঙ্গিত করিতেছে, অনুমান করিয়া নরেন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইল। খানিক পরেই পরেশ আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিল, "মা'ঠান ডেকে পাঠালেন তোমাকে। চল।" "আমাকে?" "হিঁ—চল না।"

নরেন্দ্র নিশ্চল হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "তুই বুঝতে পারিসনি রে—আমাকে নয়।" পরেশ প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হিঁ, তোমাকেই। তোমার মাথায় যে সাহেবের টুপি রয়েছে। চল?" নরেন্দ্র আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, "তোর মা'ঠান কি বলে দিলে তোকে?" পরেশ কহিল, "মা'ঠান সেই চিলের ছাত থেকে দৌড়ে নেবে এসে বল্‌লে, 'পরেশ ছুটে যা—এই সোজা গিয়ে বাবুকে ধরে আন্। মাথায় সাহেবের টুপি,—যা ছুটে যা,—তোকে খুব ভালো একটা লাটাই কিনে দেব।' চল না?"

এতক্ষণে ইহার ব্যগ্রতার হেতু বুঝা গেল। সে লাটাইয়ের লোভে এই রৌদ্রের মধ্যে ইঞ্জিনের বেগে ছুটিয়া আসিয়াছে। সুতরাং কোনমতেই ছাড়িয়া যাইবে না। তাহার একবার মনে হইল, ছেলেটাকে নিজেই একটা লাটাইয়ের দাম দিয়া এইখান হইতে বিদায় করে। কিন্তু আজই এমন করিয়া ডাকিয়া পাঠাইবার কি কারণ, সে

কৌতূহলও কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিল না। কিন্তু, যাওয়া উচিত কি না, স্থির করিতে তাহার আরও কিছুক্ষণ লাগিল; এবং শেষ পর্য্যন্ত স্থির ও কিছু হইল না; তবুও অনিশ্চিত পদ তাহার এই দিকেই ধীরে-ধীরে ঠেলিতে লাগিল। সমস্ত রাস্তাটা সে ডাকিবার কারণটাই মনে মনে ছাতড়াইয়া মরিতে লাগিল, কিন্তু ডাকাটাই যে সব চেয়ে বড় কারণ, সেটা আর তাহার চোখে পড়িল না। বাহিরের ঘরে পা দিতেই বিজয়া আসিয়া সুমুখে দাঁড়াইল। দুটি আর্দ্র উৎসুক চক্ষু তাহার মুখের উপর পাতিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "না খেয়ে এত বেলায় চলে যাচ্ছেন যে বড়? আমিই মিছিমিছি রাগ করি, আমিই ভয়ানক মন্দ লোক,—আর নিজে?" নরেন গভীর বিস্ময়ভরে বলিল, "এর মানে? কে বলেছে আপনি মন্দ লোক, কে বলেছে ও-সব কথা আপনাকে?" বিজয়ার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল; কহিল, "আপনি বলেছেন। কেন নলিনীর সামনে আমাকে অমন কোরে অপমান করলেন? আমাকেই অপমান করলেন, আবার আমাকেই শাস্তি দিতে না খেয়ে চলে যাচ্ছেন? কি করেছি আপনার আমি?" বলিতে-বলিতেই তাহার দুই চক্ষু ছলছল্ করিয়া আসিল। বোধ করি, তাহাই সামলাইবার জন্য সে তৎক্ষণাৎ ও-দিকের জানালায় গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নরেন হতবুদ্ধির মত বাক্‌শূন্য হইয়া চাহিয়া রহিল। এ অভিযোগের কোথায় কি যে জবাব আছে, তাহাও যেমন খুঁজিয়া পাইল না, ইহার কারণই বা কি, তাহাও তেমনি ভাবিয়া পাইল না।

স্নানের জল প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে বেহারা জানাইয়া গেলে, বিজয়া ফিরিয়া আসিয়া শান্তভাবে শুধু কহিল, "আর দেরি করবেন না, যান।" নরেন্দ্র আহারে বসিলে, একখানা পাখা হাতে করিয়া বিজয়া অদূরে আসিয়া যখন উপবেশন করিল, তখন অত্যন্ত সঙ্কোচনে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আলোড়িত করিয়া যেন লজ্জার ঝড় বহিয়া গেল, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ পাইল না। বাতাস করিতে উদ্যত দেখিয়া নরেন সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "আমাকে হাওয়া করবার দরকার নেই, আপনি পাখাটা রেখে দিন।" বিজয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "আপনার দরকার না থাকলেও আমার দরকার আছে। বাবা বলতেন, মেয়েমানুষকে শুধু হাতে কখনো বসতে নেই।" নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার খাওয়াও ত হয়নি?" বিজয়া কহিল "না। পুরুষ মানুষদের খাওয়া না হলে আমাদের খেতে নেই।" নরেন খুসি হইয়া বলিল, "আচ্ছা, ব্রাহ্ম হলেও ত আপনাদের আচার-ব্যবহার আমাদের মতই।" বিজয়া এ কথা বলিল না যে অনেক ব্রাহ্ম বাড়ীতেই তাহা নয়, বরঞ্চ ঠিক উল্টা। শুধু তাহার পিতাই কেবল এই সকল হিন্দু আচার নিজের বাড়ীতে বজায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। বরঞ্চ কহিল, "এতে আশ্চর্য্য হ'বার ত কিছু নেই। আমরা বিলেত থেকেও আসিনি, কাবুল থেকেও আমাদের আমদানী করতে হয়নি। না হলেই বরং আশ্চর্য্য হবার কথা।" চাকর দ্বারের কাছে আসিয়া কহিল, "মা, সরকার মশাই হিসেবের খাতা নিয়ে নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন কি যেতে বলে দেব?" বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হাঁ, আজ আর আমার দেখবার সময় হবে না, তাঁকে কাল আসতে বলে যাও।"

ভৃত্য চলিয়া গেলে নরেন বিজয়ার মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া কহিল, "এইটি আমাকে সব চেয়ে বেশি আনন্দ দেয়।" "কোন্‌টি?" "চাকরদের মুখের এই ডাকটি।" বলিয়া হাসিয়া কহিল, "আপনি ব্রাহ্ম-মহিলাও বটে, আলোক-প্রাপ্তও বটে, এবং বিশেষ করিয়া বড়-মানুষও বটে। এমনি আলোক-পাওয়া অনেক বাড়ীতেই আমাকে আজকাল চিকিৎসা করতে যেতে হয়। তাঁদের চাকর-বাকরেরা মেয়েদের বলে 'মেম সাহেব।' সত্যিকারের মেম-সাহেবরা এঁদের যে চক্ষে দেখে, তা' জানেন বলেই বোধ করি মাইনে-করা চাকরদের দিয়ে 'মেম-সাহেব' বলিয়ে নিয়ে আত্ম-মর্য্যাদা বজায় রাখেন!" বলিয়া প্রকাণ্ড একটা পরিহাসের মত হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া অট্টহাস্যে বাড়ীটা পরিপূর্ণ করিয়া দিল। বিজয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিল। নরেনের হাসি থামিলে কহিল, "বাড়ীর চাকর-বাকরদের মুখের মাতৃ-সম্বোধনের চেয়ে 'মেমসাহেব' ডাকটা যেন বড় ইজ্জতের! প্রথম দিন ত আমি বুঝতেই পারিনি বেহারাটা 'মেম' বলে কারে? সে কি বললে জানেন? বলে, 'আমি অনেক সাহেব-বাড়ীতে চাকরি করেচি, সত্যিকারের মেম সাহেব কি, তা' খুব জানি। কিন্তু কি কোরব ডাক্তার বাবু! নতুন হিন্দুস্থানী দরওয়ানটা গিন্নীকে 'মাইজী' বলে ফেলেছিল বলে মেম সাহেব তার এক টাকা জরিমানা করে

দিলেন। চাকরিটা যে বজায় রইল এই তার ভাগ্যি। এম্‌নি রাগ।' আচ্ছা, আপনিও বোধ হয় এ রকম অনেক দেখেছেন? না?" বিজয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। নরেন কহিল, "আমাকে এইটে একদিন দেখ্‌তে হবে, এই সব মেম-সাহেবদের ছেলে-মেয়েরা মাকে মা বলে, না 'মেম-সাহেব' বোলে ডাকে!" বলিয়া নিজের রসিকতার আনন্দে আর একবার ঘর ফাটাইয়া তুলিবার আয়োজন করিল। বিজয়া হাসিমুখে কহিল, "খেয়ে-দেয়ে সমস্ত দিন ধ'রে পর-চর্চ্চা কোরে আমোদ করবেন, আমার আপত্তি নেই; কিন্তু আমাকে কি আজ খেতে দেবেন না?" নরেন লজ্জিত ভাবে তাড়াতাড়ি দু'চার গ্রাস গিলিয়া লইয়াই সব ভুলিয়া গেল। কহিল, "আমিও ত চার-পাঁচ বছর বিলেতে ছিলুম, কিন্তু এই দিশি-সাহেবরা—" বিজয়া তর্জ্জনী তুলিয়া কৃত্রিম শাসন করার ভঙ্গীতে কহিল, "আবার পরের নিন্দে!" "আচ্ছা, আর না" বলিয়া সে পুনরায় আহারে মন দিয়াই কহিল, "কিন্তু আর খেতে পাচ্ছিনে—" বিজয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, "বাঃ—কিছুই ত খান নি। না, এখন উঠ্‌তে পাবেন না। আচ্ছা, না হয় পরের নিন্দে করতে-করতেই অন্যমনস্ক হয়ে খান, আমি কিছু বোল্‌বো না।" নরেন হাসিতে গিয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। কহিল, "আপনি এতেই বল্‌চেন খাওয়া হোলো না,—কিন্তু আমার কলকাতার রোজকার খাওয়া যদি দেখেন, ত অবাক হয়ে যাবেন। দেখ্‌চেন না, এই ক'মাসের মধ্যেই কি রকম রোগা হয়ে গেছি। আমার বাসায় বামুন ব্যাটা হয়েছে যেমন পাজি, তেমনি বদমাইস জুটেছে চাকরটা। সাত সকালে রেঁধে রেখে কোথায় যায় তার ঠিকানা নেই—আমার কোন দিন ফিরতে হয় দুটো, কোন দিন বা চারটে বেজে যায়। সেই ঠাণ্ডা কড়-কড়ে ভাত,—দুধ কোন দিন বা বেরালে খেয়ে যায়, কোন দিন বা জানালা দিয়ে কাক ঢুকে সমস্ত ছড়াছড়ি কোরে রাখে—সে দেখ্‌লেই যেন ঘৃণা হয়। অর্দ্ধেক দিন ত একেবারেই খাওয়া হয় না।" রাগে বিজয়ার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; কহিল, "এমন সব চাকর-বাকরদের দূর করে দিতে পারেন না? নিজের বাসায়, এত টাকা মাইনে পেয়েও যদি এত কষ্ট, তবে চাকরি করাই বা কেন?" নরেন কহিল, "এক হিসেবে আপনার কথা সত্যি। একদিন বাক্স থেকে কে ছ'শ টাকা চুরি কোরে নিলে, একদিন নিজেই কোথায় একশ টাকার দুখানা নোট হারিয়ে ফেল্‌লুম। অন্যমনস্ক লোকের ত পদে-পদেই বিপদ কি না!" একটুখানি থামিয়া কহিল, "তবে না কি দুঃখ-কষ্ট আমার অনেক দিন থেকেই সয়ে গেছে, তাই তেমন গায়ে লাগে না। শুধু অত্যন্ত ক্ষিদের উপর খাওয়ার কষ্টটা এক-একদিন যেন অসহ্য বোধ হয়।" বিজয়া মুখ নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল। নরেন কহিতে লাগিল, "বাস্তবিক, চাকরি আমার ভালও লাগে না, পারিনে। অভাব আমার খুবই সামান্য,—আপনার মত কোন বড়-লোক দুবেলা চারটি-চারটি খেতে দিত, আর নিজের কাজ নিয়ে থাকতে পারতুম, ত আমি আর কিছুই চাইতুম না,—কিন্তু সে রকম বড়লোক কি আর আছে?" বলিয়া আর এক দফা উচ্চ হাসির ঢেউ তুলিয়া দিল। বিজয়া পূর্ব্বের মতই নত মুখে নীরবে বসিয়া রহিল। নরেন কহিল, "কিন্তু, আপনার বাবা বেঁচে থাক্‌লে, হয় ত এ সময়ে আমার অনেক উপকার হতে পারত—তিনি নিশ্চয় আমাকে এই উঞ্ছবৃত্তি থেকে রেহাই দিতেন।" বিজয়া উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কোরে জানলেন? তাঁকে ত আপনি চিন্‌তেন না?" নরেন কহিল, "না, আমিও তাঁকে কখনো দেখিনি, তিনিও বোধ হয় কখনো দেখেননি। কিন্তু তবুও আমাকে খুব ভালবাসতেন। কে আমাকে টাকা দিয়ে বিলেত পাঠিয়েছিল, জানেন? তিনিই। আচ্ছা, আমাদের ঋণের সম্বন্ধে আপনাকে কি কখনো তিনি কিছু বলে যান নি?" বিজয়া কহিল, "বলাই ত সম্ভব। কিন্তু আপনি ঠিক কি ইঙ্গিত করচেন, তা' না বুঝ্‌লে ত জবাব দিতে পারিনে।" নরেন ক্ষণকাল মনে-মনে কি চিন্তা করিয়া কহিল, "থাক্‌গে। এখন এ আলোচনা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন।" বিজয়া ব্যগ্র হইয়া কহিল, "না বলুন। আমি শুন্‌তে চাই।" নরেন আবার একটু ভাবিয়া বলিল, "যা চুকে-বুকে শেষ হয়ে গেছে, তা' শুনে আর কি হবে বলুন?" বিজয়া অভিমান জিদ্ করিয়া কহিল, "না, তা হবে না। আমি শুনতে চাই, আপনি বলুন।" তাহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া নরেন হাসিল; কহিল, "বলা শুধু যে নিরর্থক তাই নয়,—বল্‌তে আমার নিজেরও লজ্জা হচ্চে। হয় ত আপনার

মনে হচ্ছে, আমি কৌশলে আপনার সেটিমেণ্টএ ঘা দিয়ে—" বিজয়া অধীর হইয়া কথার মাঝখানেই থামাইয়া দিয়া বলিল, "আমি আর খোসামোদ করতে পারিনে আপনাকে—পায়ে পড়ি বলুন।" "খাওয়া-দাওয়ার পরে?" "না, এখ্খুনি—" "আচ্ছা বল্‌চি বল্‌চি। কিন্তু একটা কথা পূর্ব্বে জিজ্ঞেসা করি, আমাদের বাড়ীটার বিষয়ে কোন কথা কি তিনি কখনো আপনাকে বলেন নি?" বিজয়া অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। নরেন মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, রাগ করতে হবে না, আমিই বল্‌চি। যখন বিলেত যাই, তখনি বাবার কাছে শুনেছিলুম, আপনার বাবাই আমাকে পাঠাচ্ছেন। আজ তিন দিন হল দয়ালবাবু আমাকে একতাড়া চিঠি দেন। যে ঘরটায় ভাঙা-চোরা কতকগুলো আস্‌বাব পড়ে আছে, তারই একটা ভাঙা দেরাজের মধ্যে চিঠিগুলো ছিল,—বাবার জিনিস বলে দয়ালবাবু আমার হাতেই দেন। পড়ে দেখ্‌লুম, খান-দুই চিঠি আপনার বাবার লেখা। শুনেছেন বোধ হয়, শেষ বয়সে বাবা দেনার জ্বালায় জুয়া খেল্‌তে সুরু করেন। বোধ করি সেই ইঙ্গিতই একটা চিঠির গোড়ায় ছিল। তার পরে নীচের দিকে এক জায়গায় তিনি উপদেশের ছলে সান্ত্বনা দিয়ে বাবাকে লিখেছেন, "বাড়ীটার জন্যে ভাবনা নেই,—নরেন আমারও ত ছেলে, বাড়ীটা তাকেই যৌতুক দিলাম।" বিজয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "তার পরে?" নরেন কহিল, "তার পরে সব অন্যান্য কথা। তবে এ পত্র বহুদিন পূর্ব্বের লেখা। খুব সম্ভব, তাঁর এ অভিপ্রায় পরে বদ্‌লে গিয়েছিল, বলেই কোন কথা আপনাকে বলে যাওয়া আবশ্যক মনে করেন নি।" পিতার শেষ ইচ্ছাগুলি বিজয়ার অক্ষরে-অক্ষরে মনে পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িল। কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, "তা'হলে বাড়ীটা দাবী করবেন বলুন?" বলিয়া হাসিল। নরেন নিজেও হাসিল। প্রস্তাবটা চমৎকার পরিহাস কল্পনা করিয়া কহিল, "দাবী নিশ্চয় কোরব, এবং আপনাকেও সাক্ষী মান্‌ব। আশা করি, সত্যি কথাই বল্‌বেন।" বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "নিশ্চয়। কিন্তু সাক্ষী মান্‌বেন কেন?" নরেন কহিল, "নইলে প্রমাণ হবে কিসে? বাড়ীটা যে সত্যিই আমার, সে কথা ত আদালতে প্রতিষ্ঠিত করা চাই।" বিজয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, "অত আদালতের দরকার নেই,—বাবার আদেশই আমার আদালত। ও বাড়ী আপনাকে আমি ফিরিয়ে দেব।" তাহার মুখের চেহারা এবং কণ্ঠস্বর ঠিক রহস্যের মত শোনাইল না বটে, কিন্তু সে ছাড়া যে আর কি হইতে পারে, তাহাও মনে ঠাঁই দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ পরিহাসের ভঙ্গী তাহার এত নিগূঢ়, যে, শুধু মুখ দেখিয়া জোর করিয়া কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন। তাই নরেন্দ্র নিজেও ছদ্ম গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "তা'হলে তাঁর চিঠিটা চোখে না দেখেই বোধ হয় বাড়ীটা দিয়ে দেবেন?" বিজয়া কহিল, "না, চিঠি আমি দেখ্‌তে চাই। কিন্তু এই কথাই যদি তাতে থাকে, তাঁর হুকুম আমি কোন মতেই অমান্য কোরব না।" নরেন্দ্র কহিল, "তাঁর অভিপ্রায় যে শেষ পর্য্যন্ত এই ছিল, তারই বা প্রমাণ কোথায়?" বিজয়া উত্তর দিল, "ছিল না, তারও ত প্রমাণ নেই।" নরেন্দ্র কহিল, "কিন্তু, আমি যদি না নিই? দাবী না করি?" বিজয়া কহিল, "সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আপনার পিসীর ছেলেরা আছেন। আমার বিশ্বাস, অনুরোধ করলে তাঁরা দাবী করতে অসম্মত হবেন না।" নরেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "এ বিশ্বাস আমারও আছে। এমন কি হলফ্ কোরে বল্‌তেও রাজী আছি।" বিজয়া এ হাসিতে যোগ দিল না,—চুপ করিয়া রহিল। নরেন্দ্র পুনরায় কহিল, "অর্থাৎ, আমি নিই না নিই, আপনি দেবেনই।" বিজয়া কহিল, "অর্থাৎ, বাবার দান করা জিনিস আমি আত্মসাৎ কোরব না, এই আমার প্রতিজ্ঞা।" তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখিয়া নরেন মনে-মনে বিস্মিত হইল, মুগ্ধ হইল। কিন্তু নিঃশব্দে কিছুক্ষণ হাসিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ও বাড়ী যখন সৎকর্ম্মে দান করেছেন, তখন আমি না নিলেও আপনার আত্মসাৎ করার পাপ হবে না। তা'ছাড়া, ফিরিয়ে নিয়ে কি কোরব বলুন? আপনার কেউ নেই যে, তারা বাস করবে। আমাকে বাইরে কোথাও না কোথাও কাজ করতেই হবে! তার চেয়ে, যে ব্যবস্থা হয়েছে, সেই ত সবচেয়ে ভাল হয়েছে। আরও এক কথা এই যে, বিলাসবাবুকে কোন মতেই রাজী করাতে পারবেন না।" এই শেষ কথাটায় বিজয়া মনে-মনে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "নিজের জিনিসে অপরকে রাজী করানোর চেষ্টা করার মত অপর্য্যাপ্ত সময় আমার নেই। কিন্তু আপনি ত

আর এক কাজ করতে পারেন। বাড়ী যখন দরকার নেই, তখন তার উচিত মূল্য আমার কাছে নিন। তা'হলে চাকরিও করতে হবে না, অথচ নিজের কাজও স্বচ্ছন্দে করতে পারবেন। আপনি সম্মত হোন্ নরেনবাবু।" এই একান্ত বিনতিপূর্ণ অনুনয়ের স্বর অকস্মাৎ শরের মত গিয়া নরেনের হৃদয়ে বিঁধিয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। এবং যদি চ বিজয়ার অবনত মুখে তাহার অন্তরের কথা পড়িয়া লইবার সুযোগ মিলিল না, তথাপি ইহা যে পরিহাস নয়, সত্য, ইহাও বুঝিতে বিলম্ব ঘটিল না। পিতৃ-ঋণের দায়ে তাহাকে গৃহহীন করিয়া এই মেয়েটি যে সুখী নয়, বরঞ্চ হৃদয়ে ব্যথাই অনুভব করিতেছে, এবং কোন একটা উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া তাহার চোখের ভার লাঘব করিয়া দিতে চায়, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ প্রস্তাবও ত স্বীকার করা চলে না। যাহা প্রাপ্য নয়, তাহাই বা কিরূপে ভিক্ষা লইবে? আরও একটা বড় কথা আছে। যে সকল সাংসারিক ব্যাপার পূর্ব্বে একেবারেই সমস্যা ছিল, তাহার অনেকগুলিই এখন তাহার কাছে সহজ হইয়া গেছে। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, বিলাসের সম্বন্ধে বিজয়া আবেগের উপর যাহাই কেন না বলুক, তাহার বাধা ঠেলিয়া শেষ পর্য্যন্ত এ সঙ্কল্প কিছুতেই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে না। ইহাতে শুধু কেবল তাহার লজ্জা এবং বেদনাই বাড়িবে, আর কিছু হইবে না।

কিছুক্ষণ তাহার অবনত মুখের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলিল, "আপনার মনের কথা আমি বুঝেচি। গরীবকে কোন একটা ছলে কিছু দান করিতে চান, এই ত?" ঠিক এই কথাটাই আজই একবার হইবার গেছে। তাহারই পুনরাবৃত্তিতে বিজয়া এক মুহূর্ত্তেই আগুন হইয়া উঠিল; চোখ তুলিয়া তীব্র কণ্ঠে কহিল, "মিথ্যে কথা। এ কথায় আমি কত কষ্ট পাই, আপনি জানেন?" এবার নরেন মনে-মনে হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "তবে সত্যি কথাটা কি শুনি?" বিজয়া তেম্‌নি তীব্রতার সহিত জবাব দিল, "সত্যি কথাই আমি বরাবর বলেচি; আপনার পাপ মন বলেই শুধু বিশ্বাস করতে পারেন নি। আপনি গরীব হোন্, বড় লোক হোন্, আমার কি? আমি কেবল বাবার হুকুম পালন করবার জন্যেই আপনাকে ফিরিয়া দিতে চাচ্ছি।" নরেন তাহাকে গাম্ভীর্য্যে পরিণত করিয়া বলিল, "ওর মধ্যেও একটু মিথ্যে রয়ে গেল,—তা' থাক্। কিন্তু খুব বড়-বড় প্রতিজ্ঞা ত করচেন; কিন্তু, বাবার হুকুম মত ফিরিয়ে দিতে হলে আরও কত জিনিস দিতে হয়, জানেন? শুধু ওই বাড়ীটাই নয়।" বিজয়া কহিল "বেশ। নিন, আপনার সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে নিন।" নরেন হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। কহিল, "খুব বড় গলায় চীৎকার করে ত আমাকে দাবী করতে বল্‌চেন। আমি না করলে আমার পিসীমার ছেলেদের দাবী করতে বল্‌বেন, ভয় দেখাচ্চেন। কিন্তু, তাঁরই আদেশ মত দাবী আমার কোথা পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারে, জানেন কি? শুধু কেবল ওই বাড়ীটা আর কয়েক বিঘে জমি নয়, তার ঢের-ঢের বেশি।" বিজয়া উৎসুক হইয়া কহিল, "বাবা আর কি আপনাকে দিয়েছেন?" নরেন বলিল, "তাঁর সে চিঠিও আমার কাছে আছে। তাতে যৌতুক শুধু তিনি ঐটুকু দিয়েই আমাকে বিদায় করেন নি। যেখানে যা কিছু দেখ্‌চেন, সমস্তই তার মধ্যে। আমি দাবী শুধু ওই বাড়ীটাই করতে পারি, তাই নয়। এ বাড়ী, এই ঘর, ওই সমস্ত টেবিল-চেয়ার-আয়না-দেয়ালগিরি-খাট-পালঙ্ক, বাড়ীর দাস-দাসী-আমলা-কর্ম্মচারী, আর তাদের মনিবটিকে পর্য্যন্ত দাবী করতে পারি, তা জানেন কি! বাবার হুকুম, বাবার হুকুম,—দেবেন এই সব?" বিজয়ার পদনখ হইতে চুল পর্য্যন্ত বারম্বার শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু সে কোন উত্তর না দিয়া অধোমুখে কাঠের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। নরেন সগর্ব্বে ভাতের গ্রাস মুখে তুলিয়া দিয়া খোঁচা দিয়া বলিল, "কেমন, দিতে পারবেন বলে মনে হচ্চে? বরঞ্চ একবার না হয় বিলাসবাবুর সঙ্গে নিরিবিলি পরামর্শ করবেন!" বলিয়া হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু এইবার বিজয়া মুখ তুলিতেই তাহার প্রবল হাস্য সহসা মার খাইয়া যেন রুদ্ধ হইয়া গেল। বিজয়ার মুখের উপর যেন একবিন্দু রক্তও আর ছিল না;—এম্‌নি শুষ্ক পাণ্ডুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে উদ্বিগ্ন শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি পাগল হয়ে গেলেন না কি? আমি কি সত্যি-সত্যিই এই সব দাবী করতে যাচ্চি, না, করলেই পাবো। বরঞ্চ আমাকেই ত তা'হলে ধরে নিয়ে পাগলা গারদে পুরে দেবে।" বিজয়া এ সকল কথা যেন শুনিতেই পাইল না। কহিল, "কই, দেখি বাবার চিঠি?" নরেন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "বেশ! আমি কি পকেটে কোরে নিয়ে বেড়াচ্চি না কি? আর সে দেখেই বা লাভ কি আপনার?" "তা হোক। দরওয়ানের হাতে চিঠি দুটো আজই দেবেন? সে আপনার সঙ্গে কলকাতায় যাবে।" "এত তাড়া?" "হাঁ।"

স্বামী বিবেকানন্দ

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত]

দেখিতে দেখিতে পঞ্চদশবর্ষ অতীত হইয়া গেল স্বামী বিবেকানন্দ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। স্মরণ করি আমরা তাঁহার জীবন ও বীরবাণী। মাঘের পুণ্য তিথিতে বেলুড় মঠে বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে; সহস্র সহস্র দরিদ্র-নারায়ণ—যাহারা তাঁহার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা পূজার ও সেবার যত্ন ছিল, যাহাদের দুঃখ ও পতিত অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিত,—সহস্র কাঙ্গাল অন্ন পাইয়া তৃপ্ত হইয়াছে; শ্রীত কীর্ত্তনে, ভাব স্পন্দনে ভাগীরথীতীর মুখরিত করিয়া ঐ বীর-বৈরাগী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। স্মরণ করি আজ আমরা তাঁহার অমর গাথা :—

"ব্রহ্মহ'তে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়,
বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর—"

শাস্ত্রে আছে, যে বংশে একজন ত্যাগী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার চতুর্দ্দশ পুরুষ মুক্তি লাভের অধিকারী হয়। এক বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীকে মুক্তির পথে অর্দ্ধেক অগ্রসর করিয়া দিয়া গিয়াছেন। যে বাঙ্গালার বিদ্যাসাগরের প্রাণ ও বিবেকানন্দের প্রেম বৈরাগ্য বাঙ্গালীর সম্পদ, সে বাঙ্গালা মহৈশ্বর্য্যশালিনী, গৌরবশালিনী।

এক কথায় বলিতে গেলে, বিবেকানন্দ একজন খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালীতে যাহা ছিল, বাঙ্গালীতে যাহা আছে, বাঙ্গালীতে যাহা হইবে, একাধারে এক বিবেকানন্দে সে সকলেরই সমাবেশ হইয়াছিল। বাঙ্গালীর মাহাত্ম্য বিঘোষিত করিয়া মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের চারিশত বৎসর পরে, পুনরায় নিদ্রিত ভারতকে ধর্ম্মপ্রাণতার মাতোয়ারা করিয়া ভারতবাসীকে প্রেমপূর্ণ বাণীতে বিবেকানন্দ ডাকিয়াছিলেন "উঠ ভাই মায়ের সন্তানগণ, নিখিল জগৎ ডাকিছে তোমায়। তোমার এত দেবার সামগ্রী, যাহার জন্য পৃথিবী তৃষিত, তবু ঘুমিয়ে রয়েছ তুমি"। সে কি মন-মাতানো, প্রাণ-ভুলানো আশা-সঞ্চারিণী বাণী, চির-পুরাতন বেদবাণী ব্রহ্মবাণী "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"..... "দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ আমার বাণী শ্রবণ কর, আমি সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষকে জানিয়াছি; তাঁহাকে জানিয়াই মানব মৃত্যুকে অতিক্রম করিবে, আর ত পন্থা নাই"; অতএব জাগ্রত হও, শ্রবণ কর "বয়ান্ নিবোধত"—আপনাকে জান এবং তাঁহাকে জানিতে প্রচেষ্ট হও"।

বিবেকানন্দের বীর-বাণীতে পরমহংসদেবেরই লীলাভিনয়, বরাভয়কর বাণী শত শত আর্ত্তজনকে মঙ্গল-পথ দেখাইল, প্রাণদান করিল, নিদ্রিত বাঙ্গালা বিবেকানন্দের বিজয়-ঘোষণায় মুখরিত হইয়া উঠিল, যেন বহুদিন পরে পূজা-মণ্ডপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। ঐ ভৈরিকে মানবকে অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধ করিবার ছিল না কি! ঐ ভেরীরবে যেমন ত্যাগ, তেমনই তেজ: যেমন প্রেম, তেমনই কর্ম্ম ছিল; যেমন ভক্তি তেমন জ্ঞান; যেমন প্রতীচ্যের রজ-শক্তি-বিকাশ, তেমনই প্রাচ্যের সত্ত্বগুণ-সমাবেশ; শঙ্করের বৈরাগ্য, রামানুজের বিষ্ণুভক্তি, কর্ম্মযোগীর কর্ম্মকুশলতা, জ্ঞানযোগীর জগদালোড়নকারিণী চিন্তাশক্তি! তিনি যে স্পন্দনের সূচনা করিয়া গিয়াছেন, বৈজ্ঞানিকের ভাষায় বলিতে গেলে, তাহারই ক্রিয়ায় আজ ভারতমহাবারিধি স্পন্দিত ও বিক্ষুব্ধ; আজ যে বাঙ্গালী আত্মসম্মান-জ্ঞানে দীক্ষিত, তাহা সেই মহাপুরুষেরই পবিত্র জীবনব্যাপী উজ্জ্বল আদর্শের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

বহু পুণ্য-বলে বঙ্গমাতা বিবেকানন্দকে পুত্র রূপে পাইয়াছিলেন। মাতার নয়নবিগলিত ধারা মুছাইতে, নিদারুণ মর্ম্মপীড়া ঘুচাইতে, দুঃখ-দৈন্য দূর করিতে বিবেকানন্দ বাঙ্গালী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কি করিয়া মাতৃপূজা করিতে হয়; সংসারসুখ, বিলাস-বৈভব, সমৃদ্ধি, সম্পদ, কামিনী-কাঞ্চন পরিহার করিয়া কেমন করিয়া মাতৃপূজায় বসিতে হয়, তিনি দেখাইয়া গেলেন;—তিনি উদ্বোধন করিয়া

দিয়াছেন, বহুজনসাপেক্ষ যে মাতৃপূজা তাঁহার মঙ্গলঘট স্থাপন করিয়া তাইদের ডাকিয়াছিলেন—উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী তাহার উদ্বোধন—উদ্‌যাপন করুন।

এই স্মরণীয় দিনে আমি অকিঞ্চন ঐ মহাপুরুষের জীবনকথা কোন্ ভাষায় কি বলিব! আমেরিকা-প্রবাস-কালে তিনি কিয়ৎকাল মিশিগ্যানের শাসনকর্ত্তার বিধবা পত্নী মিসেস্ ব্যাগলির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইনি যুক্ত রাজ্যের একজন শ্রেষ্ঠ বিদুষী রমণী। তিনি বলিয়াছেন, স্বামীজীর অবস্থানে গৃহ যেন "অবিরত মঙ্গল-প্রবাহে পূর্ণ ছিল", "তিনি কত লোকের ভালবাসাই না আকর্ষণ করিয়াছেন! মানুষ যে তাঁহার মত এত অমল-ধবল, এত নিষ্কলঙ্ক হইতে পারে, তাহা আমি ভাবনায়ও আনিতে পারিতাম না। উহাই তাঁহাকে অন্য সকল মানব হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ রূপ-লাবণ্যসম্পন্না রমণীগণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সৌন্দর্য্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিত না; তিনি প্রায়ই বলিতেন 'আমি তোমাদের তীক্ষ্ণধী বিদুষীগণের সহিত তর্কযুদ্ধ করিতে চাই; আমার পক্ষে ইহা একটি অভিনব ব্যাপার, কারণ আমার দেশে নারীগণ অধিকাংশ স্থলেই অন্তঃপুরচারিণী'; আমরা অনুভব করিতাম, যেন এক মালাময়ী ঐশীশক্তি পুরাকালের খৃষ্টশিষ্যদিগের ন্যায় তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল। ত্যাগ-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে সৈন্যিক বসন-ধারী যতিগণের আনন্দ ও স্বাধীনতার কথা বর্ণনা করিতে-করিতে সহসা উঠিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণেই ত্যাগ-বৈরাগ্যের চরম সীমা স্বরূপ 'সন্ন্যাসীর গীতি' শীর্ষক কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন।" "ভগবৎ প্রেমই তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণাস্বরূপ ছিল। প্রেমময়ী জগজ্জননীর প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিল। চন্দ্রালোক-বিভাসিত অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা, কখনও বা সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গ-ভঙ্গ, এই সকল রহস্যবিব্যঞ্জক স্বভাব-সুষমা সম্বন্ধে কিছু-কিছু বলিতেন এবং বলিয়া উঠিতেন 'দেখ, এই সকল মায়ারাজ্যের বস্তুই যদি এত সুন্দর হয়, তবে ভাবিয়া দেখ দেখি ইহাদের পশ্চাতে যে নিত্যবস্তু রহিয়াছে, তাহার সৌন্দর্য্য কত অপরূপ'!"

রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "আমি ব্রহ্মলোক হইতে টানিয়া আনিয়াছি; নরেন্দ্র সমাধিমগ্ন ছিল, আমি জগতের কল্যাণের জন্য ওকে টানিয়া আনিয়াছি; নিজকে যেদিন জানতে পারবে, দেহ রেখে চলে যাবে"—

সেই যুগাবতার রামকৃষ্ণ-বাণী তিনি বহন করিয়া জগৎকে বিলাইয়াছিলেন। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়কারী রামকৃষ্ণ-বাণী, যখনই সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখনই অতি ক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন:—"যাহারা রামকৃষ্ণ নামের প্রতিষ্ঠা ও প্রতাপে দাসজাতসুলভ ঈর্ষা ও দ্বেষে জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়া বিনা কারণে, বিনা অপরাধে নিদারুণ বৈর প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি যে, হে ভাই, তোমাদের এ চেষ্টা বৃথা। যদি এই দিগ্‌-দিগন্তব্যাপী মহাধর্ম্মতরঙ্গ—যাহার শুভ্র শিখরে এই মহা-পুরুষমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন—তাহাদের কখনও বা প্রতিষ্ঠা-লাভের উদ্যোগের ফল হয়, তাহা হইলে তোমাদের বা অপর কাহারও চেষ্টা করিতে হইবে না, মহামায়ার অপ্রতিহত নিয়ম-প্রভাবে অচিরাৎ এ তরঙ্গ মহাজলে অনন্ত কালের জন্য লীন হইয়া যাইবে; আর যদি জগদম্বা পরি-চালিত মহাপুরুষের নিঃস্বার্থ প্রেমোচ্ছ্বাসরূপ এই বন্যা জগৎ প্লাবিত করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে হে ক্ষুদ্র মানব, তোমার কি সাধ্য মায়ের শক্তিপ্রবাহ রোধ কর?"

তাই ভারতবাসীকে ডাকিয়াছিলেন, যুগযুগব্যাপী আধ্যাত্মিকতার অধিকারী তোমরা ভাই, নীচ প্রবৃত্তি পরিহার কর, —"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই নিষ্ঠুরতা, এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই কাপুরুষতা-সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে?……হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল আমি ভারতবাসী; ভারত-বাসী আমার ভাই; মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই; ভারত-বাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী! বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর দিবারাত্র বল, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে; আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর"।

আজ এই মহাপুরুষ-বাণী মোহাচ্ছন্ন ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে, দিকে দিকে ধ্বনিত হউক।

হরিনাম

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ]

১

এই সে নামের বৃন্দাবনে
বসত করেন ব্রজের বঁধু,
গীতা গৌরচন্দ্রাননে,
নারদ বীণার সুরের মধু।
মুক্ত মাঠের কল্পতরু,
অক্ষয় ফল আপনি ঝরে,
হয় রে সুধায় সিক্ত মরু,
বল রে হরেকৃষ্ণ হরে।

২

উদ্ধারের এ মন্দাকিনী
শ্যামের সরল বাঁশীর সাড়া,
মুমূর্ষুর এ সঞ্জীবনী
অন্ধ জনের নয়নতারা।
শোকের প্রলেপ, দুখের সাথী,
জীবন-মরণ সফল করে,
আঁধার বুকের উজল বাতি
বল রে হরেকৃষ্ণ হরে।

৩

এই ত জীবের গঙ্গা গয়া
আচণ্ডালের জগন্নাথ এ,
এক সাথেতে দয়াল দয়া
মহাপ্রসাদ হরির হাতে।
গুরুর দেওয়া গায়ত্রী ভাই,
মন্ত্র জপ ও যজ্ঞ ওরে,
পাষণ্ডের এ গৌর-নিতাই
বল রে হরেকৃষ্ণ হরে।

৪

রসনা হও কৃতার্থ রে,
সার্থক হ'ক্ আমার ভাষা ;
ডাক্ রে আকুল আবেগভরে
মিটুক প্রাণের প্রবল আশা ;
ডাক্ রে কোলের ছেলের মত
বিরাম-বিহীন ব্যাকুল স্বরে,
হও রে নামের মধুব্রত,
বল রে হরেকৃষ্ণ হরে।

কল্পতরু

আসামের কথা

[শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত]

(ডিব্রুগড় ও ডিগবয়)

শিলং হইতে গৌহাটি আসিয়া একদিন মাত্র বিশ্রাম করিয়াই ডিব্রুগড় রওয়ানা হইলাম। শিলংএর কথা অনেকেই লিখিয়াছেন, আমি আর সেখানকার কথা কি লিখিব। তবে একটা কথা এই যে, আমাদের দেশের বাঙ্গালী বড়লোকেরা এখনও বড় একটা শিলংএ হাওয়া-পরিবর্ত্তন করিতে আসেন না,—শোন হয় দূরত্বই ইহার প্রধানতম কারণ ; কিন্তু দূরত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া, যদি কোন ধনীসন্তান কলিকাতা হইতে জাহাজে চড়িয়া গৌহাটি পর্য্যন্ত আসেন, এবং তথা হইতে শিলং এ যান, তাহা হইলে নদী ও পাহাড়ের বিচিত্র সৌন্দর্য্যে স্বাস্থ্য ও মন উন্নত ও প্রফুল্ল না হইয়া যাইবে না। শিলংএর ন্যায় সুন্দর স্থান, বিশেষ বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের পক্ষে, অন্য কোথাও নাই। আমরা দার্জ্জিলিং, মুসৌরী প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস দর্শন করিয়াছি ; কিন্তু এরূপ মধুর মাতৃস্নিগ্ধতোয়া স্থান দেখি নাই। তার পর সৌন্দর্য্যের ইহা পরম রমণীয়। এখানে শীত তেমন ভীষণ নহে—আমি জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে ঠিক আমাদের দেশের অগ্রহায়ণ মাসের মত শীত অনুভব

করিয়াছিলাম। সমতলবাসীর পক্ষে এ স্থান প্রীতিপ্রদ হইবার অন্যতম কারণ, এখানে তেমন গুমোট নাই। যাহা আছে তাহা অধিবাসী সিংহ সমতল ভূমি হইতে ৪৮০০ ও ৫০০০ ফিট উচ্চ। রাস্তাঘাট অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এখানকার সমস্ত ঘরই কাঠের তৈরী—ইটকের উপর বাটির প্রলেপ দেওয়া, তার উপর চুণকাম করা বেড়া। কাঁচের জানালা বেশিতে বেশ। পথের সর্ব্বত্রই বেতুপাতির জঙ্গল। শিচু, বেতপাতি, কমলা, আনু, ভুট্টা ও ধান ইত্যাদি এখানে বেশ জন্মে।

এখানকার অধিবাসী খাসিয়াদের সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলিব। ইহারা দিন-দিনই সুসভ্য হইতেছে। ইহাদের মধ্যে চলন প্রাথমিক শিক্ষার খুব বেশী। পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা অনেকেই ইংরেজীতে কথা বলিতে পারে। যাহারা বাড়ী বাড়ী ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ফিরে, তাহারাও ইংরেজী জানে,—রবিবার দিন সিঙ্গিং বাইবেল পড়িতে যায়। খাসিয়ারা সাধারণতঃ বেশ ভদ্র। আমরা খাসিয়াদের বাড়ীতে যাইয়া দেখিয়াছি, ঠিক সাহেবদের বাড়ীর মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মেয়েরা খালি-বাড়ীতেও সিংহদ্বারে আমার অভ্যর্থনা করে। আমার অত্যন্ত প্রতিবেশী সুহৃদ্ ডাক্তার শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দাস মহাশয় আমাকে খাসিয়াদের ছোট বড়, ভদ্র ও অভদ্র সর্ব্বশ্রেণীর সহিত মিলিয়া-মিশিয়া আলাপ করিবার ও তাহাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিবার বিশেষ সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি হইতেই শিক্ষিতা খাসিয়া রমণীগণের পোষাক-পরিচ্ছদের পরিচয় পাইবেন। শিলংএর কথায় এখানেই ইতি টানিলাম।

আমি যেদিন গৌহাটি পঁহুছি, সেদিন ঠিক দু'টা পনের মিনিটের গাড়ীতেই ডিব্রুগড় রওয়ানা হইলাম। গৌহাটির বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনেরা ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। গৌহাটি হইতে ডিব্রুগড় বহু দূর :—সারারাত্রি গাড়ীতে কাটাইয়া পরদিন বেলা শেষে সেখানে পৌঁছিব। এক কথায় একেবারে চব্বিশ ঘণ্টার পথ। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে নবপরিচিত বন্ধুবান্ধবের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আবার কোন্ অজ্ঞাত বন্ধুর অতিথি হইয়া তাঁহাকে পীড়ন করিব! আমার এক বন্ধু ডিব্রুগড়ে স্কুলে মাষ্টারী করেন। তাঁহাকে পূর্ব্বেই পত্র লিখিয়াছিলাম। কাজেই তথায় যাইয়া একেবারে বিপদে পড়িব—এ বিশ্বাস আমার ছিল না, কতকটা নিশ্চিন্তই ছিলাম। গৌহাটি ছাড়াইলেই দুই দিকে পাহাড় ও জঙ্গল। পাহাড়গুলি তেমন উচ্চ না হইলেও শুষ্ক-শুষ্কাঙ্গের। মাঝে-মাঝে দুই-একটি খাল বা নদী বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বক্ষ ভেদ করিয়া অজানা পথে কোথায় বহিয়া চলিয়াছে কে জানে! গৌহাটি হইতে লামডিং পর্য্যন্তই পাহাড়-পর্ব্বতের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তার পর একেবারে সমতলক্ষেত্র বাহিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিল। লামডিং পৌঁছিতে রাত্রি প্রায় আটটা বাজিয়া গিয়াছিল। এখানে একটা কথা বলা ভাল,—যাঁহারা (Upper Assam) আসামে বেড়াইতে যাইবেন, তাঁহাদের কোনও প্রকার সঙ্গে বা ষ্টেশন হইতে ভাল জল-খাবার ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লওয়া ভাল; নচেৎ পরে কষ্ট পাইতে হইবে,—এদিকের কোন ষ্টেশনেই ভাল খাবার পাওয়া যায় না। তবে যাঁহারা সাহেবী আদবকায়দা, তাঁহাদের কোনও কষ্ট নাই; প্রায় বড়-বড় ষ্টেশনেই Refreshment Room আছে, যথেচ্ছ ভোজন চলিতে পারে। একে একে নানা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া চলিলাম, গাড়ীতে তেমন ভিড় ছিল না, কাজেই দিব্য আরামে বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলাম। ডিমাপুর ষ্টেশনে গাড়ী আসিলে জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া চাহিয়া রহিলাম। বাহিরে ঘন বনশ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ষ্টেশনের অনতিদূরে ডিমাপুরের জঙ্গলে প্রাচীন কাছাড়ী রাজবংশের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানে ইষ্টক-প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন তোরণ, ও সৌধাবলীর চিহ্ন অদ্যাপি বিরাজিত।* ডিমাপুরের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ বাঙ্গালী স্থপতিবৃন্দের হস্তনির্ম্মিত বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন।† অতি অল্প বাঙ্গালীই ঘনশ্যাম বনস্থলীবেষ্টিত ডিমাপুরের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি তেমন মনোযোগের সহিত দেখিয়াছেন। এখানে কয়েকটী সুন্দর ডাকবাঙ্গলা বিদ্যমান আছে। বর্ষাকালের বনজঙ্গল-পরিবেষ্টিত এ সব স্থান বর্ষণ নিরাপদ নহে বলিয়া আমাকে কয়েকজন আসামী ভদ্রলোক এখানে নামিতে বাধা দিলেন। তার পর গভীর রাত্রিতে অপরিচিত স্থানে বৃষ্টি বাদলের ভিতর কেই বা অজ্ঞাত জনকে আশ্রয় দিবে? জীবনে এক-আধটেমির ফল অনেক ভুগিয়াছি, কাজেই একার ইচ্ছাসত্ত্বেও আর এখানে নামিলাম না।

ভোরে যখন জাগিলাম, তখন চারিদিকে নাগা পর্ব্বত চক্ষে পড়িল। খুব উঁচু পাহাড়। কটি বেড়িয়া সাদা মেঘের দল। আর ঊর্দ্ধে পুঞ্জীভূত কৃষ্ণকালো মেঘ, পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গসমূহ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। পাশে দুইদিকে ঘন বন। সমতল ক্ষেত্রে চা-বাগান। কুলিরা স্ত্রী-পুরুষে কাজ করিতেছে, সারিসারি তাহাদের কুটীর। বৃষ্টি পড়িতেছে, তথাপি নিশ্চিন্ত মনে ছাতা মাথায় দিয়া 'পাতি' তুলিতেছে। বড়-বড় কারখানা-ঘর (factory) ও সাহেবদের বাঙ্গালাগুলি বেশ দেখাইতেছে; একজন সহযাত্রী গাড়ীর ভিতরেই ষ্টোভে করিয়া চা প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলেন। শরীরে যেন নবশক্তি ফিরিয়া আসিল। নাগা পাহাড়

---

* ডিমাপুর সম্বন্ধে অনেক কথা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্-এ মহাশয় নানা মাসিকে লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য জানিতে উৎসুক, তাঁহারা Major Godwin Austen-লিখিত J. A. S. B. 1874 ও Dr. T. Bloch's Archaeological Report for 1902-3 এবং Gaits' History of Assam পড়িতে পারেন।

† "It will be remembered that, when the Ahom King Rudra Singh determined to erect brick buildings at Rungpur, he called in an artisan from Bengal to direct the operations."—History of Assam.

"The curved battlement of the gateway, as well as the pointed arch over the entrance, points distinctly to the Bengali style of Muhamadan architecture." *Ibid.*

বেশ সুদীর্ঘ পাহাড়—সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছে, তাহাকে আর সহজে ছাড়াইয়া যাইতে পারিতেছি না। বেলা প্রায় দুইটার সময় তিনসুকিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এ ষ্টেসনটি বেশ বড়; এখান হইতে ডিব্রু-সাদিয়া রেলওয়ের আরম্ভ। মার্গারেটা, ডিব্রুগড়, লেডো প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলে এ লাইনের গাড়ীতে যাইতে হয়। খানিক পরে ডিব্রু-সাদিয়া রেলে ডিব্রুগড় রওয়ানা হইলাম। তিনসুকিয়া হইতে ডিব্রুগড় যাইতে দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার অধিক সময় লাগে না। এ পথের দুইধারেই কেবলি চা বাগান। বেলা প্রায় চারিটার সময় ডিব্রুগড় ষ্টেসনে গাড়ী দাঁড়াইল। বন্ধুবরকে ষ্টেসনে পাইব বলিয়া ভরসা ছিল; তাঁহাকে ষ্টেসনে না পাইয়া একটু বিব্রত হইয়া পড়িলাম,—কোথায় যাইব, এ ভাবনাটাও দুই একবার যে মনে না হইয়াছিল তাহা নহে। অবশেষে বন্ধুবর যেখানে থাকেন সেই সুপরিচিত খাতনামা আসামপ্রবাসী ডাক্তার রায় সাহেব কালী-মোহন সেন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মহাশয়ের বাসায় দিকেই ঠক্কা-টঙ্গা তুলিয়া রওয়ানা হইলাম। কালীমোহনবাবুর নাম আসাম-প্রবাসী-মাত্রেরই সুপরিচিত। তার পর, তিনি বহুদিন যাবৎ ডিব্রুগড়ে আছেন, সকলেই তাঁহাকে জানেন; কাজেই,না জানা থাকিলেও পাড়াওয়ান অতি সহজেই আমাকে তাঁহার বাসায় পঁহুছাইয়া দিল। বন্ধুবর সুপ্রেমপাশ আবেশের সহিত অভ্যর্থিত করিয়া লইলেন। খানিক পরে কালীমোহন বাবু আসিলেন, তিনিও অত্যন্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন। দীর্ঘ ক্লান্তির পর স্নানাহার শেষে সুকোমল শয্যায় গা এলাইয়া দিয়া যে কি শান্তি পাইলাম, তাহা ভ্রমণকারী ছাড়া অন্যের বুঝা অসম্ভব।

ডিব্রুগড়

এইবার ডিব্রুগড়ের কথা বলিব। ডিব্রুগড় সহরটি যে খুব বড় তাহা নহে,—মাঝারি গোছের। এ অঞ্চলের স্বাস্থ্য খুব ভাল। শিলঙের পরেই আসাম অঞ্চলে ইহার স্বাস্থ্যের খ্যাতি খুব বেশী। ঘনাকাশ,—আকাশ নির্ম্মল নহে, কৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন,—তবু আমরা সহর দেখিতে বাহির হইলাম। নদীর ধারে সবুজ ঘাস, বৃষ্টিবিন্দু ঘাসের উপর পড়িয়া কোটী মণি মুক্তার ন্যায় ঝলকিতেছিল। ব্রহ্মপুত্র ও ডিব্রু নদীর সঙ্গমস্থলে ডিব্রুগড় অবস্থিত। ঠিক নদীর উপরেই ডিব্রুগড়ের গড়টি বিরাজমান। ডিব্রু নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গমস্থলটী দেখিতে অতি সুন্দর। উত্তরে ও দক্ষিণে সুবিস্তৃত ব্রহ্মপুত্র নদী বহিয়া চলিয়াছে। নদের অপর পারে বহু দূরে মিষ্মি, মিশ্‌মি, আবর ইত্যাদির বাসস্থান হিমালয়ের উপত্যকা ও নিম্নতর গিরিশ্রেণী;—তাহার পশ্চাতে আরো দূরে নগাধিরাজ হিমালয়ের হিমস্তম্ভ-বিস্তারী শৃঙ্গরাজি। যেদিন আকাশ নির্ম্মল থাকে সেদিন হিমালয়ের অপরূপ মাধুরী দর্শনে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

ডিব্রুগড় আধুনিক সহর। ইংরেজী আমলের। এখানকার গড়টিও নামেমাত্র গড়—কয়েকজন মাত্র সিপাহী আছে। পূর্ব্বে পাহাড়িয়া জাতিরা এ পারে আসিয়া লুটতরাজ করিত বলিয়া তাহার রক্ষার জন্য এই গড় তৈরী হইয়াছিল। নদীর তীরে বহুদূর পর্য্যন্ত বেড়াইবার রাস্তা—লাল সুরকি ও পাথরের তৈরী। আমি যখন ডিব্রুগড় যাই, সে সময়ে চিফ্ কমিশনার সাহেবের শুভাগমন হওয়ায় সহরটি সরগরম ছিল। চা-বাগানের ও মফস্বলের নানাস্থানের সাহেবেরা সহরে সমবেত হইয়া উহাকে নন্দনবাগানসম করিয়া তুলিয়াছিলেন। কাজেই নদীর ধারের সেই সুন্দর রাস্তাটি তখন আর নির্জ্জন ছিল না—মোটরের পর-পর যাতায়াতে, চিফ্ কমিশনারের দর্শন-প্রার্থী জনগণের আগমনে চারিদিক সরগরম হইয়া পড়িয়াছিল। ডিব্রুগড়ের নদীর ধারে বেড়ান বড়ই প্রীতিপ্রদ। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব এই তিন দিক খোলা; নদী,পাহাড় ও বনের অপূর্ব্ব সমাবেশ; আকাশের নীলিমায়, তুঙ্গ গিরিশ্রেণীর নীলিমায়, আর শ্যামল তরুশ্রেণীর সবুজ শোভায়, নদীর স্বচ্ছ-শীতল শ্বেত সলিলের লহরী-লীলায় এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে মাঝে-মাঝে,—বিশেষ বর্ষাকালে বন্যা আসে, বন্যার জল বাড়িলে সময়-সময় সহরের উপরেও জল উঠে। কয়েকদিন যাবৎ বন্যা দেখা দিয়াছে, ধীরে-ধীরে জল বাড়িতেছে; লোকে বলিতেছে যে এবার বন্যায় জলে রাস্তা ঘাট সব ভাসিয়া যাইবে। তিন বৎসর পূর্ব্বে একবার বন্যায় সারা সহর ভাসিয়া গিয়াছিল, তখন আশ্রয়বিহীন নরনারী জাহাজ ঘাটের ষ্টেটে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল।

ডিব্রুনদীর উপরে একটা ঘাটলা। এ ঘাটলাটি বড়ই নির্জ্জন। এ ঘাটে না কি ভূতের ভয় আছে। সে কাহিনীটুকু এই- কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক রূপবতী পশ্চিম-প্রদেশীয়া রমণী কোনও এক অজ্ঞাত কারণে জলে ডুবিয়া মারা যান। তাহা হইতেই এই লৌকিক কাহিনীর উৎপত্তি। জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে প্রায়ই না কি তাহাকে শ্বেত বস্ত্র পরিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছে। এই ভয়ে গভীর রাত্রে মানুষ সাধ্যপক্ষে এ পথে বড় একটা যাতায়াত করে না।

ডিব্রু নদী তেমন সুপ্রশস্ত নহে, কিন্তু স্রোত বড় ভয়ানক। পূর্ব্বে ইহারই পারে সৈনিকাবাস ছিল। সে সময়ে এ-পারের একটা বড় গাছ এবং ও-পারের একটা বড় গাছের মধ্যে শিকল ঝুলান থাকিত—সাহসী সৈনিকেরা বর্ষাকালে ঐ শিকল ধরিয়া-ধরিয়া এ-পার হইতে ও-পারে চলিয়া যাইত। মাঝে মাঝে প্রায়ই যে দুর্ঘটনা ঘটিত তাহা নিঃসন্দেহ। নিম্নে সুপ্রশস্ত বেগবতী নদী—পদস্খলিত হইলে কি আর রক্ষা আছে? এখনও দুই তীরের দুইটা বৃহৎ বৃক্ষশাখে সেই শিকল ঝুলান আছে। এখানকার লোকে ব্যাপারতঃ "কোন্দা" নৌকায় চলা-ফেরা করে। এ সব নৌকা আস্ত গাছ খুদিয়া তৈরী করা হয়। খরস্রোতা নদীবক্ষে উহারা বাহিয়া চলিতে এ সকল নৌকা বিশেষ উপযোগী।

ডিব্রুগড়ে বাঙ্গালীর সংখ্যা অল্প নহে। তাহাদের প্রতিপত্তিও বেশ আছে। সহরের রাস্তা-ঘাট, বাড়ী-ঘর-দুয়ার দিব্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ডিব্রুগড়ের আশে-পাশে নানা চা-বাগান—শুনিলাম ডিব্রুগড়ের ন্যায় ঐ সকল চা-বাগানেও ম্যালেরিয়া নাই। এখানে গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, গর্ডন ইন্‌ষ্টিটিউশন, বঙ্গল মার্চ্চেণ্ট হাইস্কুল, ভিক্টোরিয়া মার্চ্চেণ্ট স্কুল প্রভৃতি (মোসলীদের), রেলওয়ে M. E. স্কুল প্রভৃতি কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে। ডিব্রুগড়ে চা-করদের প্রাণটি বিখ্যাত। উহা ঠিক নদীর ধারে অবস্থিত।

প্রকাণ্ড বাড়ী—আধুনিক বিলাসিতার অত্যন্ত সাহেব-বিবিদের মনোরঞ্জনের সমস্তরি আয়োজনই ইহাতে আছে। এখানে সাপ্তাহিক মিলন ত আছেই; তা' ছাড়া, বিশেষ কোনও ঘটনা বা সম্বোপলক্ষে উৎসবের জের অনবরতই চলিতেছে। স্থানীয় সংবাদপত্রের মধ্যে ইংরেজী সাপ্তাহিক "Times of Assam" ও দুইখানি আসামিয়া কাগজ আছে। একখানার নাম "আলোচনী" ও 'আসাম বান্ধব'। এখানে "Times of Assam"ই বেশ নাম আছে,—গভর্মেণ্টও ইহার মতামত শুনেন। চা-কর সাহেবদের ক্লাবের মত এখানকার স্থানীয় ও প্রবাসী ভদ্রলোকগণ মিলিয়া "Indian Club" স্থাপন করিয়াছেন। এখানে সংবাদপত্রাদিও আসে, ঘড়িও বন্ধ নয়; কিন্তু আমি প্রায়ই উহা বন্ধ দেখিতাম। সন্ধ্যার সময় মাঝে-মাঝে দুই-একজন ভদ্রলোক আসিয়া সমবেত হইতেন, এই মাত্র। অলস, অবশ, কলহপরায়ণ জাতির যাহা হয়—দুদিনের চমক দুদিনে মিলাইয়া যায়—এ ক্ষেত্রেও তাহাই দেখিলাম। আমরা কি চিরদিনই এমন করিয়া সব কাজে পিছনে পড়িয়া থাকিব? 'Indian Club'এর দুর্দশায় বড়ই ব্যথা পাইলাম। সকলেই আমাদের দলাদলি। এখানেও তাহা বিলক্ষণ আছে—এক ডিব্রুগড়ে বাঙ্গালীর তিনটি ক্লিক্‌টায়! এ সহরের বাজারটিও বেশ বড়; তবে দোকানদারদের মধ্যে মাড়োয়ারীর ভাগই বেশী। এ সব বাজারে জিনিসপত্রের মধ্যে তেমন কোনও বিশেষত্ব দেখিলাম না। Planters' Stores নামক দোকানে বিবিধ দ্রব্যজাত মিলে। স্থানীয় চাক-বাংলোটি দেখিতে অতি সুন্দর।

সমস্ত আসামের মধ্যে মাত্র একটী মেডিকেল স্কুল। মেডিকেল স্কুলটির নাম Berry-White Medical School. বেরি হোয়াইট সাহেব পূর্ব্বে এখানকার সিবিল সার্জ্জন ছিলেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার উইলে দেখা গেল যে তিনি এতদঞ্চলে একটা মেডিকেল স্কুল স্থাপনের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই প্রাথমিক দানের সহিত গভর্মেণ্ট প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া এই মেডিকেল স্কুলটি স্থাপন করিয়াছেন। স্কুলের সৃষ্টি হইতেই বহু বাঙ্গালী ছাত্র এখানে আসিয়া পড়াশুনা করিতেছে। পূর্ব্বে আসামীতে ও বাঙ্গালীতে তেমন প্রভেদ ছিল না, গভর্মেণ্টও করিতেন না; কিন্তু এখন ব্যাপারটা একটু বাড়িয়া উঠিয়াছে। আসাম গভর্মেণ্ট বাঙ্গালীকে সুনজরে দেখেন না, আসামীদের ত কথাই নাই। ইহা ভাল কি মন্দ, তাহার বিচার করিতে চাহি না; এইমাত্র বলিতে পারি যে, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর অর্থাগমের পথ রুদ্ধ না হইলেও, চাকরীর পথ বিশেষরূপেই বন্ধ হইয়া আসিতেছে। ডিব্রুগড়-প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে বাঙ্গলা সাহিত্যের তেমন চর্চ্চা আছে বলিয়া বুঝিলাম না। তবে ব্যক্তিবিশেষ করিতে পারেন,—তাহাতে আর বিশেষত্ব কি আছে?

ডিব্রুগড়ে আমি রায় সাহেব কালীমোহন সেন মহাশয়ের বাসায় অতিথি ছিলাম। তিনি এখানকার মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। বহুদিন যাবৎ তিনি আসামে আছেন। যে কয়দিন এখানে ছিলাম, আদর আপ্যায়নের বিন্দুমাত্রও ত্রুটি ছিল না। একদিন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইয়া কেরোসিন তৈলের খনিসমূহ দেখিবার জন্য ডিগ্‌বয় যাওয়া হইল। মাকুম-জংসনে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া ডিগ্‌বয়ের দিকে চলিলাম। নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পরে গাড়ী আসিল। গাড়ীতে তুলিয়া যেমায় ভিড়। মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে বিন্দুমাত্রও স্থান ছিল না। সেজন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলাম। আজ বৃষ্টি নাই, গাড়ীতে ভয়ানক গরম। তার পর দুই ধারে ভীষণ জঙ্গল ও সম্মুখে এবং দূরে পর্ব্বত-শ্রেণী। সন্ধ্যার সময়কালে ডিগ্‌বয়, মার্গারিটা প্রভৃতি ষ্টেসন ছাড়াইয়া লেডো পঁহুছিলাম। লেডো কয়লার খনির জন্য বিখ্যাত। পাকটিয়া রেঞ্জ নামক পর্ব্বতশ্রেণীর উপর কয়লার খনির অফুরন্ত ভাণ্ডার। লেডোর খনির ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিন্থারেণ বাবু অনেক দিন যাবৎ এখানে আছেন। আমি ইঁহার বাসাতে অবস্থান করিয়াছিলাম। মাদী-গঞ্জ, শিবিডি প্রভৃতি অঞ্চলের কয়লার খনির সহিত এখানকার খনির একটু পার্থক্য আছে। পাকটিয়া পাহাড়শ্রেণীর এই অফুরন্ত কয়লার ভাণ্ডার প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি পাহাড়ের উপর সুড়ঙ্গ কাটিয়া তৈরী করা হইয়াছে। ভিতরে অতি সাবধানে ঢুকিতে হয়, দীর্ঘকায় মনুষ্যের পক্ষে ঢোকা বিশেষ ক্লেশজনক; প্রতিপদে মাথায় আঘাত লাগিবার আশঙ্কা। লেডো জায়গাটি বেশ—চারিদিকে ছোট-বড় পাহাড়। পাকটিয়া রেঞ্জ বাহিয়া পার্ব্বত্য পথে ক্রমাগত তিনদিন চলিলে ব্রহ্মরাজ্যের সীমান্তে পঁহুছান যায়। এখানে নাগাদেরও বসতি আছে। আসামী, নাগা, মণিপুরী ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের কুলিও আছেই; তা' ছাড়া, শুভরাট অঞ্চলের লোকও যথেষ্ট আছে। আজকাল লেডো হইতে নানাস্থানে প্রচুর কয়লার রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানকার কয়লা খুব উৎকৃষ্ট।

লেডো হইতে ডিগ্‌বয় চলিলাম। পথে ডিহিংব্রিজ পার হইলাম। ডিহিং আসামের একটী বিখ্যাত নদী। নম্ নিয়াঙ্গ হ্রদ (Nong Nyang) হইতে উৎপন্ন হইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে যাইয়া মিলিত হইয়াছে। অন্যান্য পাহাড়িয়া নদীর ন্যায় ইহাও গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায় বা অতি ক্ষীণ ভাবে প্রবাহিত থাকে। আবার বর্ষার দিনে পূর্ণবেগে বনজঙ্গল ভাসিয়া চুরিয়া উন্মাদিনী অট্টহাস্যে ছুটিতে থাকে। পথে মার্গেরিটা ষ্টেসন উত্তীর্ণ হইয়া ডিগ্‌বয় পঁহুছিলাম।

ডিগ্‌বয় একটী দেখিবার মত জায়গা। এখানে Assam Oil Company's Factory আছে। ইহার ইতিহাস আমাদের জানা উচিত। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ডিব্রুগড়ের ভূতপূর্ব্ব সিবিলসার্জ্জন Berry-White সাহেব ইহার সন্ধান পান। ব্রহ্মপুত্রের জলে কেরোসিন তেল ভাসিতে দেখিয়া, সেই তেলের সন্ধান করিতে যাইয়াই অবশেষে ইহার আবিষ্কার ঘটে। ব্রহ্মদেশে Burma Oil well আছে। সম্প্রতি ইঁহারা বরদপুরেও খনির সন্ধান পাইয়া তথায় একটি কারখানা খুলিয়াছেন। এই দুইটী তেলের খনি ছাড়া ভারতবর্ষে আর কোথাও তেলের খনি নাই। এই তেলের খনি দেখিতেই

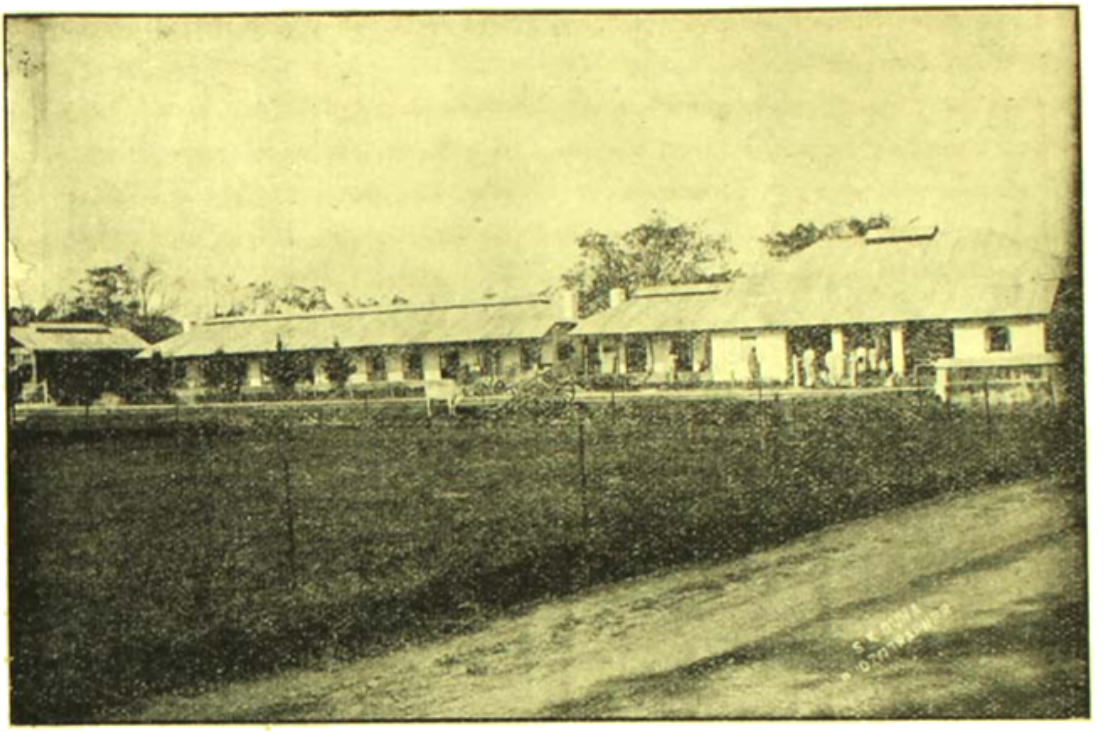

হাসপাতাল ও স্কুল ডিব্রুগড়

ঘর—ডিব্রুগড়

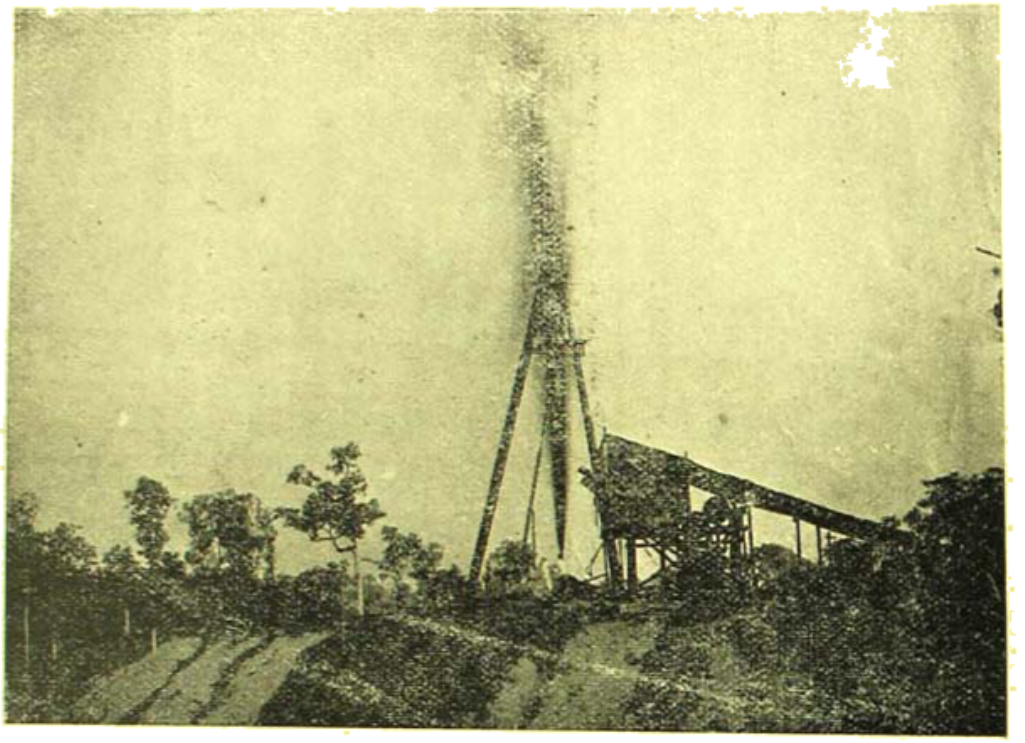

তেল-উত্তোলন ডিব্রুগড়

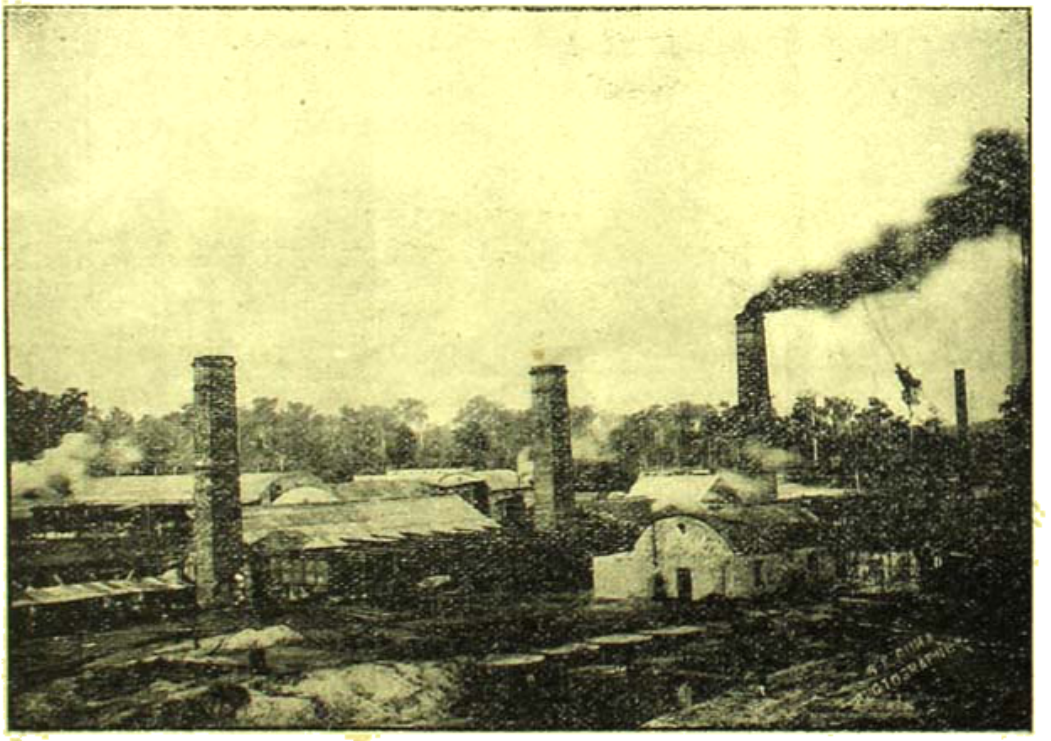

তেলের কারখানা—ডিব্রুগড়

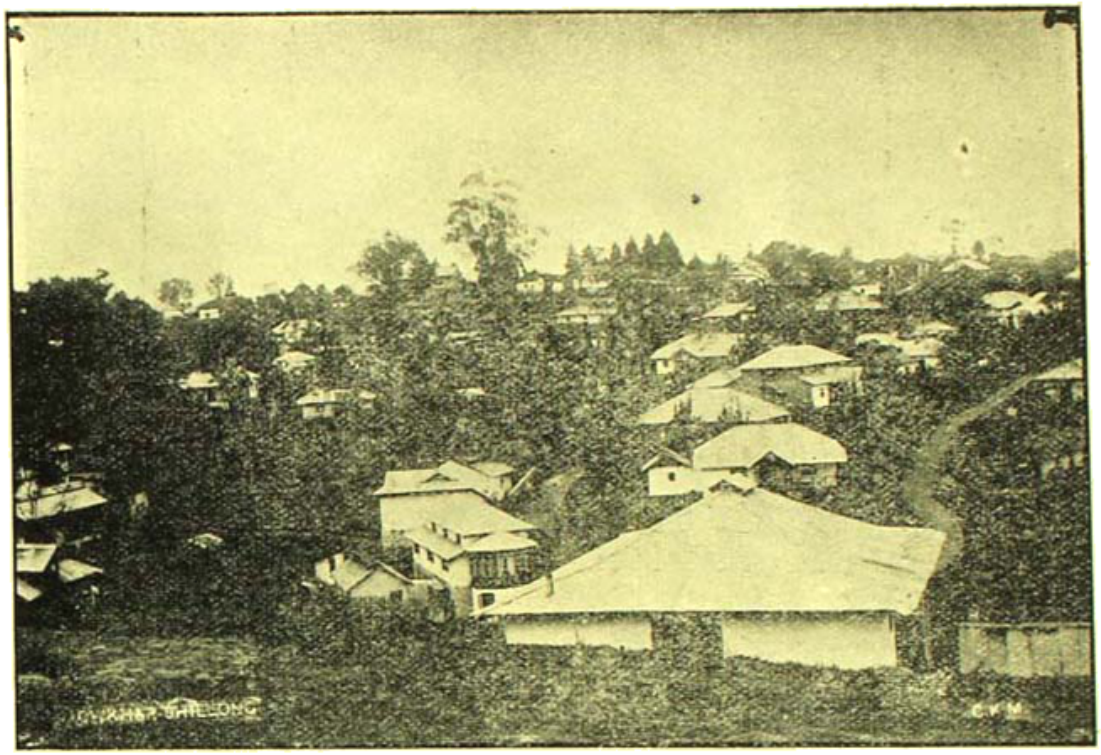

শিলংয়ের দৃশ্য

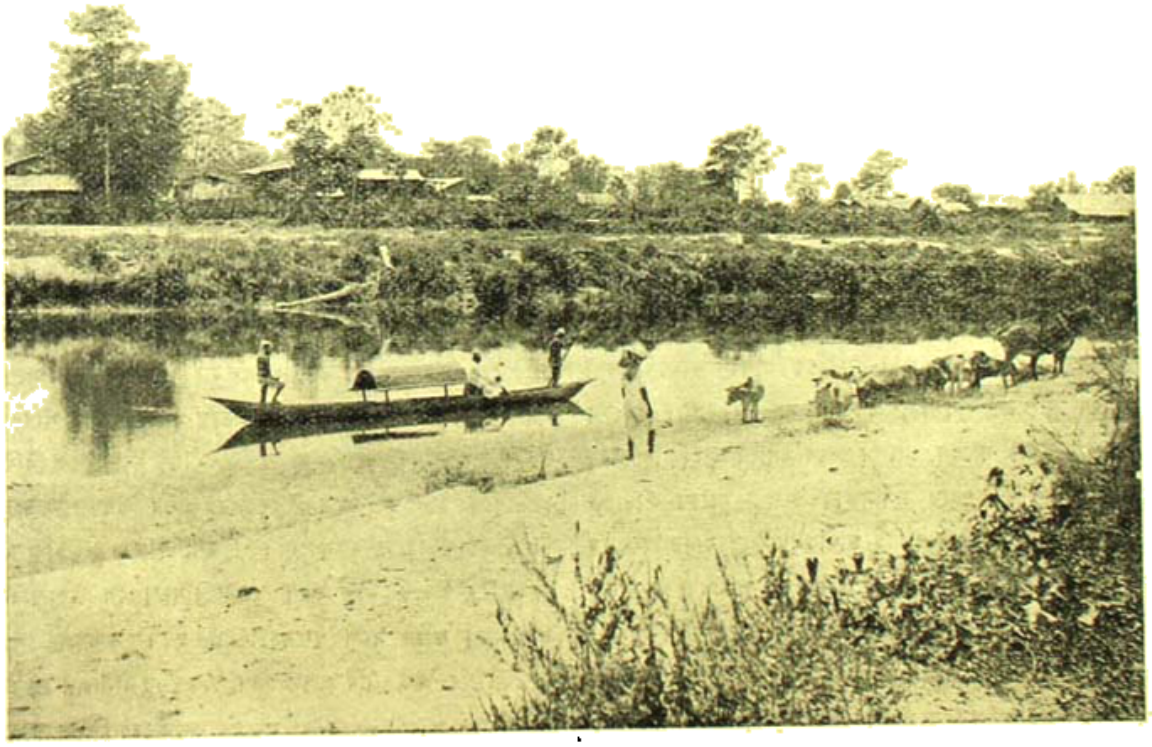

কোপা-নৌকা ডিব্রুগড়

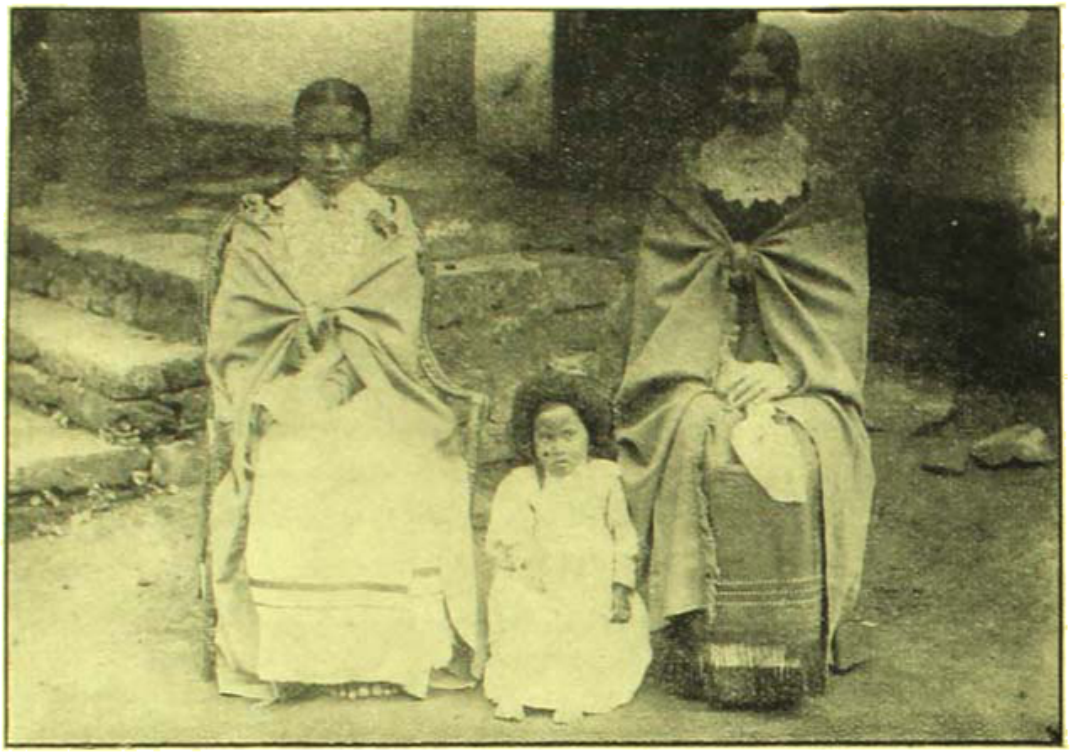

খাসিয়া রমণী ও বালিকা

আমার এখানে আসা। এখানকার কোম্পানীর নাম "Assam Oil Company Limited—incorporated in England. ডিগ্‌বয় একটি পাহাড়িয়া মহকুমা। কেবল উঁচুনীচু টিলায় ভরা। টিলার উপরেই সাহেবদের বাঙ্গলো, বাবুদের বাসা ও কুলিদের কুটীরের শ্রেণী। এক-একটি টিলার উপর এক-একটি তেলের কূপ (well)। এখানে সর্ব্বশুদ্ধ একশত সাতটি 'ওয়েল' আছে। তন্মধ্যে এখনে ৬০টি কূপ হইতে তেল তোলা হইতেছে। এখানকার ফ্যাক্টরী ও তেলের কূপ ইত্যাদি দেখিতে হইলে স্থানীয় প্রধান ইংরেজ কর্ম্মচারীর অনুমতি লইতে হয়। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত এখানে প্রবেশ করা অসম্ভব। যদিই বা দেখিতে পাইলেন—কিন্তু কোন বিষয় 'নোট' করিয়া লইয়া আসিতে পারিবেন না, ইঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক। এখানকার ভিতরের খবর বাহিরে প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ নারাজ। এখানে গল্প শুনিলাম, একবার না কি Burma Oil Companyর একজন সাহেব গোপন ভাবে এখানে আসিয়াছিলেন; কিন্তু পরে উহা প্রকাশ হওয়ায় এখানকার এজেণ্ট সাহেব তাঁহাকে এ স্থান হইতে বাহির করিয়া দেন। স্থানীয় ডাক্তার বাবুর অনুগ্রহে আমার কারখানা ইত্যাদি দেখিবার পক্ষে কোনও অসুবিধা হয় নাই। কোম্পানীর ওয়ার্কসপ্, হাসপাতাল ইত্যাদি সমুদায়ই এখানে আছে। এখানকার ডিরেক্টর ও কেমিষ্ট দুইজন বাঙ্গালী। তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমুদয় দেখাইয়াছিলেন। ডিগবয়ের সম্বন্ধে তেমন কোন কথা কেহ লেখেন নাই। গেট সাহেবের আসামের ইতিহাসে মাত্র দুইটী লাইন আছে—"Coal has been discovered and worked in varions parts, especially in the neighbourhood of Makum in the Lakhimpur district, and mineral oil has been found at Digboi in the same district, where wells have been sunk for its extraction." এখানকার কুলিরা free labourer। পুরুষেরা মাসিক বার টাকা এবং স্ত্রীলোকেরা মাসিক আট টাকা মাহিনা পাইয়া থাকে। ইহার উপর নির্দ্ধারিত কাজের উপর অতিরিক্ত কাজ করিতে পারিলে Extra পাইবার ব্যবস্থা আছে। আমি ঠিক বিনা বিলম্বে তৈলের প্রথম ঝোঁক মাথায় লইয়া সব দেখিতে বাহির হইলাম। অসহ্য গরম, বাতাস মাত্রও নাই। একজন আসামিয়া ভদ্রলোক আমাকে সঙ্গে লইয়া চারিদিক দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে একটা কূপের নিকট গমন করিলাম। এই কূপটী অত্যন্ত গভীর—প্রায় পাঁচশত ফিট; ইহা হইতে তেল উঠিতেছে;—৩০ ফিট ৭০ ফিট উচ্চে তেল বিক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তেলের প্রথম অবস্থা ঠিক কাদার মত, রং আলকাতরার ন্যায় কালো। প্রথমঃ ঐ তেল চুষিয়া লইয়া ষ্টোরেজ ট্যাঙ্কে নীত হয়। সেখানে নানারূপে রূপান্তরিত হয়,—এবং নানা ভাবে নানা স্থানে Refine হয়। কর্দ্দমাক্ত অংশ হইতে Wax, Petrol ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। Waxএর নানারূপ ব্যবহার দেখিলাম। তিন-চারিবার Refine হইয়া বড়-বড় কড়াইয়ের ভিতর তরল অবস্থায় যখন আইসে তখন উহার বর্ণ শ্বেত হয়,—এই তরল অবস্থা হইতে ছাঁচে

ঢালিয়া বোর্ড প্রস্তুত হইয়া থাকে। তেলও কত প্রকারে যে চুয়াইয়া কতরূপ অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া অবশেষে পরিশুদ্ধ বর্ণহীন অবস্থায় পরিণত হয় তাহা না দেখিলে বুঝাইবার উপায় নাই। প্রচুর পরিমাণে তেল টিন বোঝাই হইয়া বাহিরে যাইতেছে, খোল প্যাক হইয়া বাড়োদারী এজেন্টের সাহায্যে বাজারে রপ্তানী হইতেছে। আমাদের চাষাগানে ডিগবয়ের তেল ও খোল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। প্রতিদিন কি পরিমাণ তেল উত্তোলিত হয়, কিরূপ রপ্তানী হয়, এবং কি কি প্রক্রিয়া অনুযায়ী তেল পরিষ্কৃত ইত্যাদি হইয়া থাকে, এসব বিষয়ে বাহিরের কোন লোকের পক্ষে কোন কথা জানা অসম্ভব। এখানকার রাসায়নিক একজন পূর্ব্ববঙ্গবাসী যুবক— আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কৃতী ছাত্র। তিনি অনেক কথা বলিলেন। আমার মনে হয়, রসায়ন শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী যুবকগণের এখানে আসিয়া কর্ম্ম প্রণালী দেখা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষ প্রকৃতই রত্নপ্রসূ - কিন্তু আমরা কোন বিষয়েরই সন্ধান রাখি না। তেলের খনি দ্বারা বিদেশী কোম্পানী বড় লোক হইতেছে— আর আমার বিশ্বাস অনেকে ডিগবয়ের এই তেলের খনির খবরই রাখেন না। কারখানার কর্ম্মচারীদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা কম নহে— উত্তর বঙ্গবাসীই অধিক। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির ভাবও বেশ দেখিলাম। আসামীরা কর্ম্মচারীও বেশী কম নহে। আসামী ও বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণের থাকিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কোয়ার্টার আছে। পাঠকবর্গ চিত্র হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে ডিগবয়ে তেলের কারখানা কিরূপ বৃহৎ; এবং খনির কার্য্যাদি কিরূপ কৌতূহলোদ্দীপক তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমি চেষ্টা করিয়াও এই সামান্য সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকু ব্যতীত বিশেষ কোন কথা জানিতে পারিলাম না। আমার এই বিবরণটি পড়িয়া যদি কোন আমোদ ভ্রমণকারী ডিগবয়ের তেলের খনি দেখিয়া আসেন, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব স্থানীয় ভদ্রলোকগণ আমাকে নানা ভাবে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন— এই অবসরে তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার প্রলোভনটুকু ছাড়িতে পারিলাম না।

---

১৩ নং পঞ্জাব বেঙ্গিমেণ্টের মেডিকাল অফিসার লেপ্টেন্যাণ্ট হেমচন্দ্র মিত্র আই-এম-এস

সমাজ-চিত্র

প্রস্তর-পোত

[শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই বর্ত্তমান মহাসমরের জন্য যেমন এক পক্ষে সহস্র সহস্র লোকক্ষয়, অর্থনাশ ও বিশ্বব্যাপী হাহাকারে সমগ্র জগৎ প্রপীড়িত, সেইরূপ অন্যপক্ষে ইহা নব নব বৈজ্ঞানিক ও বৈষয়িক আবিষ্কারের উপঢৌকনে পৃথিবীকে সমৃদ্ধিশালী করিতেছে। নব-নব অভাবের আবর্ত্তনে পড়িয়া বড়-বড় বৈজ্ঞানিকেরা ও মহামহা মনীষিগণ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া তাঁহাদের অমানুষিক উদ্ভাবনশক্তি বলে নূতন-নূতন আবিষ্কারের দ্বারা বিজ্ঞান-জগতে মুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। যখনই কোন নূতন অভাব অনুভূত হইতেছে, তখনই পৃথিবীকে আবশ্যক করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের অভাব কেবল যুদ্ধ-লিপ্ত জাতির মধ্যে সমস্ত নহে—নিরপেক্ষ জাতিকেও ইহা ব্যতিব্যস্ত করিবার ভয় দেখাইতেছে;—সেইজন্য অন্যান্য জাতিও এ বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে বাধ্য হইতেছে।

লৌহ ও কাষ্ঠের অভাব আজ অসহ্যরূপ। জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য যে লৌহপাত ও কড়ি উত্তোলির প্রয়োজন, তাহা ইচ্ছামত পাওয়া যাইতেছে না। সেইজন্য মনীষিগণ লৌহ ও কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে অন্য কি বস্তু ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহার অন্বেষণে নিযুক্ত থাকিয়া আজ

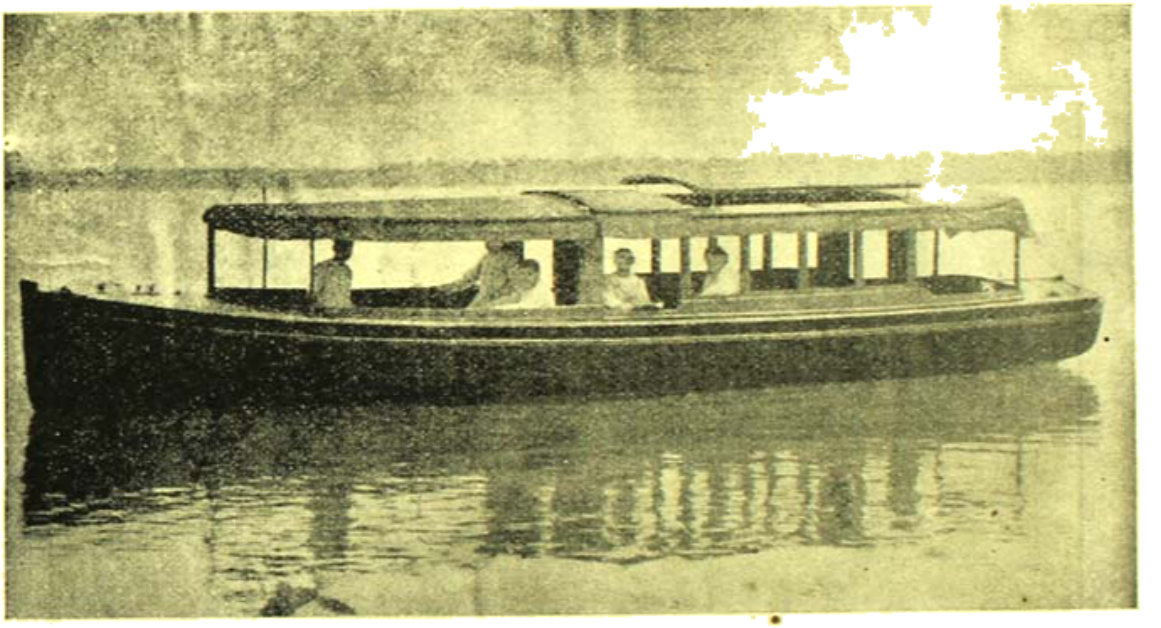

একখানি প্রস্তর-নির্ম্মিত মোটর লঞ্চ

কোন স্থানে কিছুমাত্র দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইতেছে, তখনই সে অভাব পূরণ করিবার জন্য, সে স্থান সবল করিবার মানসে শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ উদ্ভাবনীশক্তিতে অহোরাত্র চিন্তা করিতেছেন। গত বৎসরের প্রথমভাগ হইতে জার্ম্মাণী যেরূপ আধুনিক বিধিমতে জাহাজ ধ্বংস করিতেছে তাহাতে আজ সমগ্র জগতে জাহাজের দুর্ভিক্ষ পড়িয়া গিয়াছে। প্রতিযোগিতায় সাবমেরিণের অপ্রতিহত গতি অনেকটা রুদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু যে বহুসংখ্যক জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে তাহা পূরণ করা এই যুদ্ধ সময়ে একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবলমাত্র লোহাভাবই যে নূতন জাহাজ নির্ম্মাণের পথে প্রধান অন্তরায় তাহা নহে,—যুদ্ধোপকরণের প্রচুর ব্যবহারের জন্য জাহাজ নির্ম্মাণের উপকরণেরও অনটন ঘটিয়াছে। অধুনা যুক্ত আমেরিকা জাহাজ নির্ম্মাণের ভার লইয়া সেই অত্যাবশ্যক বস্তু পাইয়াছেন এবং এতদ্বিষয়ে জগৎকে অভয় দিতেছেন। সেই পরম বস্তু আর কিছুই নহে—ইহা প্রস্তর-পোত। আজ প্রকৃতই "পাথর ভাসে সাগর জলে।"

লৌহ-বৃদ্ধীকৃত কৃত্রিম প্রস্তর (Ferro-concrete) এখনে সমগ্র সভ্য জগতে আদৃত। বর্ত্তমান মহাসমরে এই কৃত্রিম প্রস্তর যেরূপ ভূরি পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে ও হইতেছে, বোধ হয় লোহাদিও সেরূপ ব্যবহৃত হয় নাই। এই কৃত্রিম প্রস্তর হইতে যে জাহাজ নির্ম্মিত হইতে পারে এ বিষয়ে যুদ্ধের পূর্ব্বে অনেক মতভেদ ছিল; এমন কি ইহা অসম্ভব বলিয়া অনেকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন অভাবের তাড়নায় সকলেই প্রপীড়িত, তখন সেই পুরাকালের মতামত একত্র করিয়া সমবেত চেষ্টায় ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, অল্প ব্যয়ে

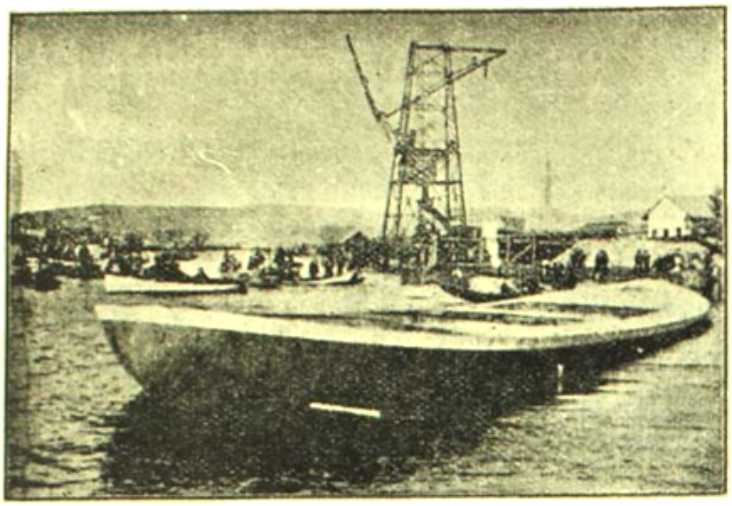

একখানি প্রস্তর-নির্ম্মিত নৌকা

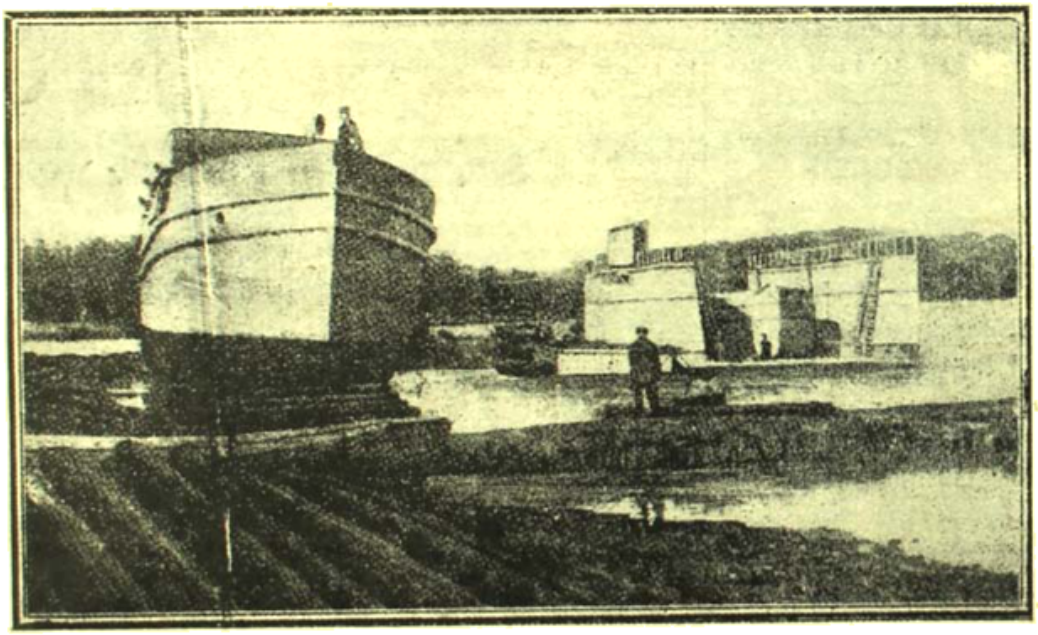

কোম্পানীর কোম্পানীর জাহাজখানা

স্বল্প পরিশ্রমে ও সময়েই কার্য্যোপযোগী সমুদ্রগামী, বাষ্পপোত সকল লৌহের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম প্রস্তর হইতে প্রস্তুত হইতে পারে।

এই প্রস্তর পোতের প্রকৃত উদ্ভাবক কে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে কিছু বলা যায় না। পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে ইহা দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও রোমানদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অতি পুরাকালে রোমানরা প্রস্তরের পাথার নির্ম্মাণ করিয়া সুদূরের জলে ভাসাইয়া দিত। এমন কি প্রতীচ্যদেশ সমূহেও যে ইহার প্রচলন ছিল না, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে আধুনিক যুগে ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ল্যাম্বোট (Lambot) নামক জনৈক ফরাসী সর্ব্বপ্রথম কৃত্রিম প্রস্তরের একখানি ছোট নৌকা নির্ম্মাণ করেন এবং আজও তাহা সকল প্রকার জলবায়ুর অত্যাচার অতিক্রম করিয়া ভ্রালের মিরাভেল (Miravel) নগরে ল্যাম্বোট পরিবারের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই নৌকাখানি পরিদর্শিত ও পরীক্ষিত হয়। কিন্তু সচরাচর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যাহা করিয়া থাকেন, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল ;—অর্থাৎ কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে মনঃসংযোগ না করিয়া উহা সাধারণের উৎসাহের উপর ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া এ বিষয়ে কেহই আর মনঃসংযোগ করেন নাই এবং এই ল্যাম্বোট বোটই (Lambot boat) প্রস্তরতরীর একমাত্র দৃষ্টান্ত স্বরূপ অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া সাধারণের বিস্ময় উদ্রেক করিয়া আসিয়াছে। পরে বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন লৌহ-দৃঢ়ীকৃত কৃত্রিম প্রস্তর (Ferro-Concrete)

লইয়া সমস্ত-সভ্যজগতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া যায়, ব-ম মিরবিজ্ঞের আলোচনার ফলে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে ইহা হইতে সেতু-নির্ম্মাণে, গৃহ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি এতদ্বিষয়ক সর্ব্বপ্রকার কার্য্যই নির্ভয়ে ও নিরাপদে সম্পন্ন করা যাইতে পারে, তখন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যক্তি কৃত্রিম প্রস্তর হইতে নৌকা, ডক প্রভৃতি নির্ম্মাণে মনঃসংযোগ করিলেন। নরওয়ে, সুইডেন হইতে ফরাসী, ইটালী পর্য্যন্ত সকলেই এ বিষয়ে আপন-আপন বিশেষজ্ঞদিগকে নিয়োজিত করিলেন। সুদূর আমেরিকাতেও ইহার আলোচনা হইতে লাগিল।

ইহার পর প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রস্তরপোত সকলের মধ্যে ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে রোম নগরে ৯৭ ফিট দীর্ঘ ও ২১ ফিট প্রস্থ একটি কৃত্রিম প্রস্তরের তালমসে প্রাসাদে নির্ম্মিত হয় ও পরবৎসরই উত্তর আটলান্টিক মহাসমুদ্র-তীরস্থ বন্দরসমূহে বাণিজ্যার্থে একখানি বড় দ্রুতগামী পাইলের জাহাজ নির্ম্মিত হইয়া উক্ত বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়। এই জাহাজখানির কার্য্যকারিতা ও দৃঢ়তার পক্ষে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা পরবর্ত্তী অনেক বৎসর ধরিয়া উক্ত উপকূল-বাণিজ্যে ব্যাপৃত ছিল এবং চার্লস্ অন্তরীপের (Cape Charles) নিকটস্থ গিরিশ্রেণীতে আহত হইয়াও অল্প অবস্থায় নিজ বন্দরে ফিরিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিল।

১৯০০ খৃঃ অব্দে প্যারিসের হেনেবিক (Hennebique) সাহেবই নূতন সঙ্কল্প ও নূতন বন্দোবস্ত দ্বারা প্রস্তর-পোতের উন্নতির পথ সুগম করিয়া দেন। তাঁহার design অনুযায়ী Grancher and Singlar Company পাথরের খোলা বহন করিবার জন্য ৪০′ × ১৫′ × ৩′ ৬″ একখানি ডক প্রস্তুত করেন। এই সময়ে সৌন্দর্য্য বা গঠন-কারুকার্য্যের দিকে একেবারেই লক্ষ্য করা হইত না। কর্ম্মা প্রস্তুতের ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য এবং প্রস্তরতরীর সমস্ত খরচ লৌহ কিম্বা কাষ্ঠতরী অপেক্ষা কম করিবার জন্য কেবল গঠনই অবলম্বিত হইত। এই সকল নৌকা ও ডক প্রভৃতি দেখিতে সুন্দর না হইলেও অত্যন্ত কার্য্যোপযোগী হইত এবং মূলাও অপেক্ষাকৃত কমই হইত। ইহার আর এক বিশেষ সুবিধা এই যে, ইহার সংস্কার-ব্যয় কিছুই লাগে না।

গঠন-সৌন্দর্য্যের জন্য প্রস্তরপোত প্রকৃত পক্ষে ইটালীর নিকট ঋণী। অন্যান্য দেশের ন্যায় কেবলমাত্র কার্য্যকারিতার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ইটালী ইহার সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির বিশেষ চেষ্টা করে। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ইটালী প্রস্তরকার্য্যে চিরদিনই অধিকতর নিপুণ বলিয়া, এবং বোধ হয় খৃষ্টপূর্ব্ব হইতে প্রস্তরপোত তাহাদেরই জাতীয় সামগ্রী হওয়ায়, ইটালীই আজ পর্য্যন্ত প্রস্তরপোত-নির্ম্মাণে সর্ব্বাগ্রগণ্য। রোমের Gabillini Company বিশেষভাবে এই কার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে এই কোম্পানী ২০ খানি ডক ও বজরা ও নৌসেতুর জন্য ৬০ খানি বড়-বড় Pontoon প্রস্তুত করিয়াছে এবং ইটালী গবর্ণমেণ্টকেও অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের বজরা ও মালবোট সরবরাহ করিয়াছে। ইটালীর অন্যান্য বহুসংখ্যক পানসী, বজরা, প্রমোদতরী ও পাইলের জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে ও হইতেছে। তবে যুদ্ধের জন্য ইটালীতে এখন প্রস্তরপোত নির্ম্মাণ কিছু অল্প হইতেছে।

দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকাতে বহুসংখ্যক ডক, বজরা, নৌসেতু এবং পাইলের জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। ছোট ছোট নৌকা ছাড়িয়া দিলেও Ontarioতে ৮১′ × ২৪′ × ৭′ মাপের অনেক ডক ও বজরা নির্ম্মিত হইয়াছে, San Franciscoতে ১০০ ফিট দীর্ঘ ও ৩০ ফিট প্রস্থ অনেকগুলি খোলা মালবোট নির্ম্মিত হইয়াছে এবং Fair Fieldএ ১১২′ দীর্ঘ ও ২৮′ ফিট প্রস্থ বহুসংখ্যক পাইলের জাহাজ ও বজরা নির্ম্মিত হইয়াছে। শেষোক্তগুলির মধ্যে কয়েকখানি পাইলের জাহাজ ধাক্কা-ধিক্কাড়িত হইয়া নোঙ্গর ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া যায় এবং পরস্পর সম্বন্ধের পরেও তাহাদিগকে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে, এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহার দৃঢ়তার পক্ষে ইহাও একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

জার্ম্মাণী ও হলাণ্ডে প্রস্তর-নির্ম্মিত, অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তনের পাইলের জাহাজ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতেছে। এমন কি ১৯১৩ খৃঃ অব্দ হইতে জার্ম্মাণীতে প্রস্তর-নির্ম্মিত মটর-লাঞ্চ ও টীম-লাঞ্চ প্রস্তুত হইতেছে। Stettinএর একটী কোম্পানী চারি-কামরা-বিশিষ্ট একখানি মটর বোট নির্ম্মাণ করিয়াছে। নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কে প্রস্তর-নির্ম্মিত অর্ণবপোতের প্রচলনের বিশেষ আয়োজন হইতেছে। ডিনেমার ইঞ্জিনিয়ার-সম্প্রদায় (Danish Board of Engineers) কপেনহেগেনে বাণিজ্যের জন্য বহুসংখ্যক বাষ্প ও তৈল-ইঞ্জিন-চালিত জাহাজ ও মালবোট নির্ম্মাণে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ডিনেমার হইতে ফ্রেডরিক্সহাভ্ন হইতে নৌসেতু, নদী খননের জন্য ভারী ডক, ছোট বড় নানাপ্রকার পাইলের জাহাজ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করান হইতেছে। এমন কি ডিনেমার গবর্ণমেণ্ট সমুদ্রগামী প্রস্তরপোত সকল নির্ম্মাণের জন্য সম্পূর্ণ Dock প্রস্তুত করাইতেছেন, এবং প্রকাশ যে, বহু গবেষণা ও বহু অর্থব্যয়ের ফলে ডিনেমার গবর্ণমেণ্ট প্রস্তরপোত বিষয়ক আবশ্যক অঙ্ক-সঙ্কেত (Formula) ও নিয়মাবলী সংগঠনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। Copenhagen স্থিত কৃত্রিম-প্রস্তর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ Prof. Suensen এ সম্বন্ধে কার্য্যকরী অঙ্কসঙ্কেত ও নিয়মাবলী সংগঠন করিয়াছেন। এ বিষয়ে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রস্তরপোত-নির্ম্মাণে নরওয়ে কার্য্যক্ষেত্র সকলের অগ্রগণ্য। নরওয়ে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তরপোত নির্ম্মাণের জন্য সম্পূর্ণ ডক নির্ম্মাণ করাইয়াছেন এবং প্রস্তরপোত-সমিতির শেষ রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই Moss নগরস্থিত Fougener কোম্পানী দ্বারা ৬০০ টন হইতে ৩০০০ টন পর্য্যন্ত ভারবহনের শক্তিবিশিষ্ট প্রস্তর নির্ম্মিত বাষ্পপোতসকল নির্ম্মাণ করাইতেছেন।

ইংলণ্ড প্রস্তরপোত সম্বন্ধে এতদিন প্রায় সম্পূর্ণরূপে উদাসীন ছিল। কেবলমাত্র ১৯১০ খৃঃ অব্দে Manchester Ship Canal কোম্পানী Hennebique এর সঙ্কল্পমতে একখানি ১০০′ × ২৮′ × ১৩′ ও ২০০

টন ভারবাহী প্রস্তরপোত নির্ম্মাণ করাইয়াছে এবং ইহা আজও উক্ত কোম্পানীর কাজে নিযুক্ত আছে। এ যাবৎ উল্লেখযোগ্য আর কিছুই সেখানে নির্ম্মিত হয় নাই। অধুনা সর্ব্বত্র জাহাজের অভাব পরিলক্ষিত হওয়াতে কয়েকমাস পূর্ব্বে লয়েড শিপিং কমিটি (The Committee of Lloyd's Register of Shipping) বন্দরে হইতেও প্রভৃতি দেশে ইঞ্জিনিয়ার পাঠাইয়া ৫০০ টনের প্রস্তরপোত নির্ম্মাণ করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষেও এ বিষয়ে দুই-একটি ship-yard খুলিবার জন্য কোন-কোন কোম্পানী চেষ্টা করিতেছেন।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তসমূহ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আভ্যন্তরীণ ও সমুদ্র-উপকূলে বাণিজ্যের জন্য বৃহৎ আকারের বাষ্প-পোতসকল নির্ব্বিবাদে ও নিঃসঙ্কোচে কৃত্রিম প্রস্তর হইতে নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। তবে পরের হাজার টনের জাহাজ ও মাঝারী জাহাজ প্রভৃতি এই কৃত্রিম প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত হইতে পারে কি না, তাহা ভবিষ্যৎ পরীক্ষা সাপেক্ষ। উপস্থিত ক্ষেত্রে লৌহ ও কাষ্ঠ যখন দুর্ম্মূল্য ও একরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে এবং কৃত্রিম প্রস্তরে যখন অনেকগুলি সুবিধা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন ইহা হইতে ছোট-ছোট জাহাজ নির্ম্মাণে কিছুমাত্র বাধা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। অন্যান্য সুবিধার মধ্যে ইহা অতি সহজে ও অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ের মধ্যে নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে; ইহা নির্ম্মাণের ব্যয় খুবই কম,—কার্পাস ও লবণব্যবসায়ীদিগের মতে শতকরা ২৫ টাকারও কম,—একই কর্ম্মা পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা মধ্যে মধ্যে মেরামত করাইতে হয় না; এবং ইহার রক্ষণব্যয় একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মেরামতের নিতান্ত প্রয়োজন হইলে অতি সহজে ও অতি সত্বর তাহা সম্পন্ন করা যাইতে পারে। ইহার সমস্ত দেহ একরূপে নির্ম্মিত হয় বলিয়া অতি সত্বর ইহা পরিষ্কার করা যাইতে পারে। ইহাতে আগুন লাগিবার ভয় নাই বলিলেই চলে; এবং ইহার মসৃণতার জন্য সমুদ্রে গমনকালে ইহাতে জলের বাধা (resistance of water) অপেক্ষাকৃত কম লাগে।

লৌহ-দৃঢ়ীকৃত কৃত্রিম প্রস্তরে বিস্ফোটকতা বর্ত্তমান থাকাতে ইহা জাহাজ-নির্ম্মাণের বিশেষ উপযোগী; এবং যদিও প্রস্তরপোত নির্ম্মাণ করিতে হইলে ইহার বহিরাবরণের জন্য লৌহ অপেক্ষা স্বভাবতঃ অধিকতর মূল্য হইবে, তাই বলিয়া কাষ্ঠ অপেক্ষা ইহা যে খুব বেশী মূল্য হইবে, তাহা স্বীকার করা যায় না। ৩ ইঞ্চ হইতে ৬ ইঞ্চ মোটা করিলেই ইহা যথেষ্ট দৃঢ় হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়; এবং ৩ ইঞ্চ মোটা কৃত্রিম প্রস্তরের প্রতি বর্গফুটের ওজন একইঞ্চ মোটা লৌহ অপেক্ষা কম। সুতরাং প্রস্তরপোত যে অতিরিক্ত ভারী হইবে, সে আশঙ্কাও সম্পূর্ণ অমূলক। এতদ্ভিন্ন জাহাজের বিশেষ ওজন বিশেষ বিবেচ্য বিষয় নহে; কেন না জাহাজের বহিষ্কৃতের ওজন ইহার কল-কারখানা ও বোঝাই মালের ওজনের তুলনায় কিছুই নহে।

কাহার-কাহারও ধারণা যে, লোনা জলে সিমেন্টের জোর দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয় না, এবং এইরূপ কৃত্রিম প্রস্তর দ্বারা জাহাজ নির্ম্মাণ করিলে তাহা সমুদ্র-জলে দীর্ঘ-স্থায়ী হইবে না। এ ধারণা যে সম্পূর্ণ অমূলক, তাহার বহু প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। সমুদ্রতীরস্থ ডক ও বন্দর প্রভৃতিতে বহু পরিমাণে কৃত্রিম প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে। ডোভার (Dover) বন্দর, বোষ্টন (Boston) বন্দর, মাদ্রাজ বন্দর প্রভৃতিই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কোন কোন স্থলে আধার প্রস্তরে লোহা ধরিয়াছে ও ক্ষয় পাইয়াছে বটে; কিন্তু ভাল সীমেন্ট, বালী ও পাথর টুক্‌রা সঠিক পরিমাণে ও সতর্কতার সহিত মিশ্রিত করিয়া যে সকল প্রস্তরবস্তু গঠিত হয়, তাহা যে দীর্ঘস্থায়ী এবং জলবায়ু প্রভৃতি তাহার সম্বন্ধে যে কিছু ক্ষতি করিতে পারে না, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

উপস্থিত যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য, বিশেষ নদীপথে সোজাসুজি ও রসদ বহনের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ৫০০।৫০০ টনের প্রস্তর-পোত নির্ম্মাণ করাইবার আয়োজন করিতেছেন। নদী পার হইবার জন্য খণ্ড-খণ্ড অংশে এরূপ নৌসেতু সকল নির্ম্মিত হইতেছে যে, ইহা ইচ্ছামত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সহজে লইয়া যাওয়া যায় এবং খণ্ডগুলি পরস্পর যুক্ত করিয়া সেতু ইচ্ছামত দীর্ঘ করা যায়। অল্প সময়ের মধ্যে এবং অল্প ব্যয়ে ইহা নির্ম্মাণ করা যায় বলিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধে ইহা বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। মেসোপটেমিয়াতে ব্যবহারের জন্য ভারতবর্ষেও দু'একটি বিলাতী কোম্পানী প্রস্তরপোত ও প্রস্তর-নৌসেতু নির্ম্মাণ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

আমাদের দেশে প্রস্তরের অভাব নাই। এ দেশে বিলাতী সীমেন্টের ন্যায় ভাল সীমেন্ট উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া সাধারণের একটা ভুল ধারণা ছিল; কিন্তু কয়েকটি কোম্পানী এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে বিলাতী সীমেন্টের ন্যায় উৎকৃষ্ট সীমেন্ট প্রস্তুত করাইতেছেন। কর্ণার কাষ্ঠ যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং বিদেশের শরণাপন্ন না হইয়া টাটা কোম্পানী হইতে লৌহ রড প্রভৃতি যথেষ্টই পাওয়া যাইতে পারে। অধিকন্তু, আমাদের দেশে মজুরী অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এত কম যে, দুইচারি জন এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ আনাইয়া আমাদের দেশের ধনিগণ যদি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের দেশ এ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইতে পারে। আমাদের দেশে সাধারণের অর্থের অভাব, পরস্পর সহানুভূতির অভাব ও চেষ্টার অভাব; সেইজন্য আমাদের ভাল কিছুই হয় না। ধনীর ধনবৃদ্ধির চেষ্টা নাই,—তাঁহারা সামান্য সুদেই সন্তুষ্ট। বিদেশী বণিকেরা এক টাকায় দুই টাকা পর্য্যন্ত লাভ করিয়া আমাদের দেশে বসিয়া ধনকুবের হইতেছেন; কিন্তু আমাদের দেশের ধনীরা ধনলাভের ভয়ে বক্ষের ন্যায় ধন আগুলিয়া বসিয়া আছেন, আর আমরা সমগ্রদেশবাসী বিদেশীর ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষায় পরস্পরকে দোষারোপ করিতেছি। সামান্য বিষয়ের জন্যও যখন আমরা বিদেশের চেষ্টা না করিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিয়া বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করি, তখন এ সকল বৃহৎ বিষয়ের আলোচনা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। তবে আমাদের দেশেও এই সব বৃহদ্ব্যাপার সম্ভবপর, সেই কথা বলিবার জন্য এই চেষ্টা।

নেতা

[শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

রসময় বোস সারাটা জীবন ফৌজদারীর পেশকারী করিয়া, যখন শেষ বয়সে গ্রামে আসিয়া বসিলেন, তখন দেখিলেন—তাঁহার কর্ম্মব্যস্ত, একঘেয়ে জীবনটা সহসা কেমন একরকম ফাঁকা হইয়া উঠিয়াছে। রসময়বাবু ক্রমে তিনটী বিবাহ করিয়া, সান্ত্বনার ধন একমাত্র পুত্ররত্ন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাই আদর করিয়া পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন—প্রবোধচন্দ্র। বৃদ্ধ বয়সে কর্ম্মহীন রসময়ের ফাঁকা, শুষ্ক, নীরস দিনগুলি পুত্র-মুখ চাহিয়াই ক্রমে পল্লবিত হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময়ে তাঁহার এক কর্ম্ম জুটিল।

যে দিন মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট সহসা রসময়বাবুকে ডাকিয়া লইয়া, তাঁহাকে সহরের সৈন্য-সংগ্রহ-সমিতির একজন মেম্বর করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, সে দিন তাঁহার মনে হইল, আবার যেন তিনি প্রথম যৌবনের আশা-উৎসাহটা সম্পূর্ণ ফিরিয়া পাইলেন। বাস্তবিকই, এই অবৈতনিক পদের কি যেন একটা অনির্দ্দিষ্ট লাভ বা সম্মানের মোহে রসময়ের কুব্জ মেরুদণ্ডও সেই দিন হইতে সহসা অস্বাভাবিক সোজা ও সতেজ হইয়া উঠিল। গ্রামের বারোয়ারিতলার মজলিশে সমজদার মোড়ল বাক্তিরা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল,—"দাদা, রসময় বোস কি কাজ ছাড়া থাকিতে পারেন,—পেশকারীতে ত তিনি একজন নামজাদা লোক ছিলেন। সাহেব তাঁহাকে কাজের লোক জেনেই ত ডেকে নিয়ে গিয়ে চাকুরী দিয়েছেন। দেখ্‌বে, এটীতেও তাঁর উপরি-পাওনা নেহাৎ কম হবে না। তা'ছাড়া সম্মান ত আছেই।" বস্তুতঃই রসময় বোস কাজের লোক ছিলেন। পেশকারীতে তাঁহার উপরি-পাওনা সন্তোষজনক ছিল এবং পক্ষদের ভক্তি-দত্ত মাছ, শাক ও ফল-ফলারিটা তাঁহার নিত্য-পূজার উপকরণ ছিল। এক কথায় বলিতে গেলে, এই লোভনীয় চাকুরীটা বহুজ মহাশয়ের পেট ও পকেট, এ দু'য়েরই পরিপুষ্টির পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক ছিল। এমন একটা চাকুরী ছাড়িয়া রসময় প্রকৃতই দমিয়া গিয়াছিলেন,—এখন যেন সহসা ঘরা-গাঙ্গে বান ডাকিয়া উঠিল।

একদিন রসময়বাবু গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ সকলকে ডাকিয়া এক বৈঠক করিলেন, এবং নিজে ওজস্বিনী ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দিলেন,—"যেহেতু অপ্রকাশ নাই যে, এই দেশের লোক—অর্থাৎ কি না আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা—কি বলে—চিরকালই যুদ্ধ জান্‌তেন, এবং তাঁরা বরাবরই কি না, কি বলে—বিনা ওজরে দেশের জন্য প্রাণ দিতেন। তাঁদের সন্তান আমরা, সুতরাং হে বন্ধুগণ, প্রাণ ত অবশ্যের বটে; একদিন যাবেই,—অর্থাৎ কি বলে, মাদ ফুরাইলে একদিন ক্রোক-আমলে আসিবেই; বলুন দেখি, কে তাহাকে বে-দখল করতে পার্ব্বেন্? কেউ না। অতএব হে বন্ধুগণ, আপনারা সকলে মেহ ধরিয়া—কি বলে, দেশের জন্য,—নিজ মাতৃভূমির উন্নতির জন্য যুদ্ধে গমন করুন। আপনাদের ছেলেদিগকে উৎসাহিত করুন। ছেলেরা যুদ্ধ করিয়া—কি বলে, যদিও মরে, তা'হলেও আপনারা অমর হবেন। সুতরাং আপনারা—কি বলে, এই সময় মুলতবী না রাখিয়া তদ্বির কছু করুন; ইহাতে কৈফিয়ৎ বা গাফিলি কর্ব্বেন না। যেহেতু বন্ধুগণ,—কি বলে, বারম্বিগর এমন সুযোগ ঘটবে না।" রসময়বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া যদিও অনেকে হাসি চাপিতে গিয়া কাশিয়া ফেলিলেন, অনেকে চাপা হাসির গুরুভার চাপে উদরে দরদ অনুভব করিলেন, তবু যুদ্ধে যাইবার জন্য কেহ বড় একটা আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু বসুজ মহাশয় দমিবার লোক নহেন; তিনি গ্রামের পথে-পথে ঘুরিয়া সকলকে অযাচিত উপদেশ দিতে লাগিলেন।

একদিন প্রবোধচন্দ্র ম্লান মুখে রসময়কে কহিলেন,—"বাবা, তুমি গ্রামে ঘুরে-ঘুরে আর কাউকে যুদ্ধে যেতে বোলো না।" রসময় বিস্মিত ভাবে কহিলেন,—"কেন রে প্রবোধ? ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে যে কর্ম্ম দিয়াছেন,—কি বলে, তা না করলে চল্‌বে কেন?" প্রবোধ মুখখানা অন্ধকার করিয়া কহিল,—"না বাবা, তুমি এ কাষ ছেড়ে দাও। গ্রামের লোকগুলি ভাল নয়; তারা তোমার কথায়

ছেলেদের যুদ্ধে যেতে দেবে না।" বিস্ময়-নিরাশায় রসময় বাধিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল কি প্রবোধ, দেশের এত ছেলে যাচ্ছে, আর কি বলে, এ গ্রামের কেউ যাবে না? তুমি ছেলেমানুষ, বুঝতে পাচ্ছ না। এক দিনে কি—কি বলে, মানুষের মন গলে বাবা! বুঝাতে-বুঝাতে উৎসাহ জন্মাবে।" প্রবোধ কাঁদ-কাঁদ সুরে কহিল,—"না বাবা, ওরা তোমার কথা শুনবে না। ওরা সবাই বলছে, তুমি না কি শেষ বয়সে একটা খেতাবের লোভে সরকারের মন যোগাবার জন্য, তাদের ছেলেদের মরণের মুখে তুলে দিতে মৎলব আঁটছো। ও-পাড়ার দীনু চাটুজ্যে সবাইকে বুঝাচ্ছেন,—'তোমরা কেউ ওর কথা শুনো না, ঢের বাক্য-বীর দেখেছি। ও আগে তার নিজের ছেলেটা দেক্ দেখি, তবে বুঝি বুকের পাটা'।" পিতার অপমানের কথাগুলি বলিতে-বলিতে প্রবোধ কাঁদিয়া ফেলিল। রসময় বাবু উচ্ছ্বসিত স্নেহে পুত্রকে বুকে টানিয়া লইলেন। প্রবোধ কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—"বাবা, আর ওদের কথাকে যুদ্ধে যেতে বোলো না। যদি নেহাৎ পাঠাতে হয়, আমাকেই আগে পাঠিয়ে দাও বাবা।" রসময় পুত্রকে বুকে চাপিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে কহিলেন,—"বাবা প্রবোধ, তোকে কি আমি ছাড়তে পারি রে! তুই যে আমার আঁধার ঘরের মাণিক! তোকে ছেড়ে—কি বলে, আমি কি থাকতে পারি রে' বাবা!' বলিতে-বলিতে বৃদ্ধের অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বাস্তবিকই প্রবোধচন্দ্র রসময় বাবুর আঁধার ঘরের মাণিক। নিজ-নিজ অপরিমিত কপাল-জোরেই হোক, কিম্বা বসুজা মহাশয়ের ভাগ্যের ফেরেই হোক্, তাঁহার তিন স্ত্রীই শাঁখা সিঁদুর লইয়া একে একে স্বামীর হাতে চিতায় শয়ন করিয়াছিলেন। প্রবোধচন্দ্র তাঁহার তৃতীয়া পত্নীর গর্ভজাত। প্রবোধের জন্মের অব্যবহিত পরেই তাহার মা স্বামীর হাতে শিশুপুত্র তুলিয়া দিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সে আজ সতর বৎসরের কথা। আজ সেই শোক-দৃশ্যটা রসময়ের মনে জাগিয়া উঠিল। বৃদ্ধ আর উদ্‌গত অশ্রু দমন করিতে পারিলেন না।

প্রবোধচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আই-এ পড়িতেছিল। সরল যুবক লোক-মুখে পিতার অপযশ শুনিয়া মনে-মনে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিতেছিল। দীনু চাটুজ্যের দলের লোকেরা পথে-ঘাটে প্রবোধকে দেখিতে পাইলেই, পরস্পর চোখ-টেপাটিপি করিয়া হাসিত, এবং চাপা গলায় বলাবলি করিত,—'হিংসে কি না শেষ বয়সে ছেলে ধরা সেজেছেন। খেতাবের এমি নেশা থাকে, নিজের ছেলে পাঠিয়ে দেও না বাপু—' শুনিতে-শুনিতে প্রবোধের কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিত। কিন্তু অপ্রিয় হইলেও সে এই উচিত কথাটার প্রতিবাদ করিতে পারিত না।

(২)

এই ঘটনায় রসময়ের হৃদয়টা একদিকে যেমন কিঞ্চিৎ দমিয়া গেল, অন্যদিকে তেমনি আর একটা নূতন উত্তেজনা সর্ব্বদা যেন তাহাকে অদৃষ্ট-তাড়নায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে লাগিল। রসময়বাবু সৈন্য-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে-ছিলেন বটে, কিন্তু এই কার্য্যে সুফল দেখাইতে পারিলে, সরকার যে তাঁহাকে 'রায়বাহাদুর' বা অন্য একটা কিছু খেতাব দিয়া ফেলিবেন, এত বড় আশা ত তিনি করিতে পারেন নাই। তবে দীনু চাটুজ্যে একথা বলে কেন? হ'তে পারে, ঈশ্বরেচ্ছায় এই বুড়োবয়সে সরকার বাহাদুরকে খুসী কর্ত্তে পারে ··· ভাবিতে ভাবিতে রসময়ের বুকের ভিতরে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত; আর হৃদ্‌পিণ্ডটা চঞ্চল ছেলের মত বেতালা লাফাইয়া উঠিত।

এই নূতন আশার প্রবল উত্তেজনায় বসুজ মহাশয় আর বেশী দিন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না; পুনঃ দ্বিগুণ উৎসাহে সৈন্য-সংগ্রহের চেষ্টায় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। গ্রামের দুষ্ট লোকে নানা কথা বলাবলি করিতে লাগিল; আর পিতৃনিন্দা শুনিয়া প্রবোধের উজ্জ্বল মুখখানা দিন-দিন কালিপানা হইয়া যাইতে লাগিল। মাঝে-মাঝে অসহ্য বেদনায় অধীর হইয়া প্রবোধচন্দ্র পিতাকে নিরস্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিত বটে, কিন্তু তাহার ভক্তিনম্র অনুরোধ কোমল বাণের মত বৃদ্ধের কঠোর উৎসাহবর্ম্মে ঠেকিয়া চুরমার হইয়া যাইত।

একদিন রসময়বাবু গৃহে বসিয়া কতকগুলি কাগজপত্র দেখিতেছেন, এমন সময়ে একজন বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া অতি কষ্টে পা ফেলিতে-ফেলিতে গৃহে প্রবেশ করিল, এবং বলিবার অপেক্ষা না করিয়াই হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বসিয়া পড়িল। রসময় চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে বেচু, কি মনে করে?" বেচারাম কাতরভাবে গেঙানির সুরে কহিল—"আজ্ঞে কর্ত্তাবাবু,

আপনি মুনিব, মা-বাপ। আপনি মাল্লে কোথা দাঁড়াব বলুন! একটা ছেলে বাবু—আমার একটা ছেলে চলে গেলে আমি বাঁচব না। আমাকে ছেলেটা ভিক্ষা দিন বাবু!" রসময়বাবু অন্যদিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"এ কি বল্‌ছ বেচারাম! কি বলে, আমি ত তোমার ছেলেকে জোর করে আনিনি, সে যে ইচ্ছা করেই যুদ্ধে যাচ্ছে।" বেচারাম বলিতে লাগিল—"তা ইচ্ছে করেই ত যাচ্ছে বাবু। আপনি মালিক মুনিব,—আপনি বুঝায়ে বল্লে সে বেটা কি ইচ্ছা না ক'রে পারে বাবু!" "তবে আমি কি করব বল?" "আপনি ছেলেটাকে আমায় ভিক্ষা দেন বাবু। জমিজিরাত ত সেই-ই, বারমাস কিনে খেতে হয়। তাই ভেবে দেখুন কর্ত্তাবাবু, আমি ত বুড়া-হাবড়া, ছেলেটা যদি চলে যায়, তা'লে যে মারা যাব—না খেয়ে মারা যাব বাবু!" বলিতে-বলিতে বৃদ্ধের লোল গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। এমন সময় পাশের রুদ্ধ কপাটটা একটু নড়িয়া উঠিল। প্রবোধচন্দ্র আড়ালে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধের কান্নাকাটি শুনিতেছিল, আর পরিধেয় বস্ত্রে চোখ দুটী মুছিতে-মুছিতে লাল করিয়া তুলিতেছিল। রসময়বাবু বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বৃথা কান্নাকাটি কোরো না বুড়ো! কি বলে—ছেলে যুদ্ধে যাচ্ছে ব'লে ত এত ভাবছ,—যমে নিলে কি কর্ত্তে বল দেখি? তখন চল্‌ত কি করে?"

এইবার বেচারাম ভ্যা করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল,—"বাবু, বাবু, ও-কথা বল্‌বেন না, এক ছেলে আমার, আপনার পায় পড়ি বাবু, গরীবের সর্ব্বনাশ কর্ব্বেন না; ঈশ্বর আপনার মঙ্গল কর্ব্বেন।" বলিতে-বলিতে বেচারাম রসময়ের পা দুখানা চাপিয়া ধরিল। রসময় ছ্যাঃ ছ্যাঃ করিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন—"বেচারাম, পাগলামি কোরো না, ও সব পাগ্‌লামিতে কিছু হবে না। আমি—কি বলে,—একটা লোক পাঠাচ্ছি বলে সাহেবের নিকট লিখে দিয়েছি। এখন আর তাকে রাখ্‌বার সাধ্য নাই। ছিদামকে—কি বলে,—কাল সকালে পাঠিয়ে দিও, কালই তাকে সাহেবের কাছে যেতে হবে। এখন যাও, আর বিরক্ত করো না।" বেচারাম হতভম্বের মত কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতে লাগিল—"বাবু, আমায় বলি দিন, আমার ছিদামকে নেবার আগে আমায় মেরে ফেলুন। আমি ওর মাকে নিয়ে একা সংসারে দাঁড়াতে পার্ব্ব না। ওদের কান্না থামাতে পার্ব্ব না, ওরা বুক ফুটে মর্ব্বে, আমি দেখতে পার্ব্ব না—বাবু—বাবু, যাবেন না; ভিক্ষা দিন, আমার ছিদামকে ভিক্ষা দিন্ বাবু, যাবেন না!" বোধ হয় বৃদ্ধের কাতর চীৎকার রসময়বাবুর কিঞ্চিৎ অসহ্য হইয়াছিল, তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন "সাহেবকে কথা দিয়েছি, কালই একজনকে পাঠাব। তোমার ছেলেকেই ঠিক করেছি। বেশ ত, আর একটা কাউকে এনে দেও, তোমার ছেলেকে ছেড়ে দিচ্ছি।" বেচারাম বলিল "আর কার ছেলে পাব কর্ত্তা।" রসময়বাবু এ কথার আর কি জবাব দিবেন, তিনি দ্রুত-পদে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

প্রবোধচন্দ্র খুব ভাল করিয়া ভিজা চোখ দুটি মুছিয়া মনটা শক্ত করিয়া লইল; এবং আস্তে-আস্তে পাশের দরজাটা খুলিয়া তথায় প্রবেশ করিয়া বলিল,—"বুড়ো, তোমার ছেলে কি যুদ্ধে যেতে চায়?" বেচারাম প্রবোধের মুখের দিকে এমন ভাবে হাঁ করিয়া চাহিল যে, যেন এই জটিল প্রশ্নের উত্তরটা ওই চাঁদপানা মুখেই লেখা রহিয়াছে।

তখন বেচারামের হৃদয়ের পুত্রস্নেহটা তাহার সারাটা হৃদয় জুড়িয়া যেন ক্ষুধার জ্বালায় হা-হা করিয়া ফিরিতেছিল। সে যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছিল, তাহার বুকজোড়া ছেলে ছিদাম আর ইহজগতে নাই। একটা প্রবল শক্তি তাহাকে তাহার হৃদয় হইতে জোরে ছিঁড়িয়া লইয়া দূরে—অতি দূরে ফেলিয়া দিয়াছে। এমন সময়ে প্রিয়দর্শন যুবক প্রবোধচন্দ্রকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া, পুত্র-স্নেহাতুর আত্মহারা বৃদ্ধ, পাগলের মত তাহাকে দুই হাতে বুকে জড়াইয়া ধরিল। প্রবোধচন্দ্র নীরব নিশ্চেষ্টভাবে কিয়ৎ-কাল বেচারামের বুকে মিশিয়া রহিল। প্রবোধকে বুকে লইয়া বৃদ্ধ যেন একটা বহুকালের প্রবল ক্ষুধা মিটাইয়া লইতেছিল। কারণ সে যখন প্রবোধকে ছাড়িয়া আস্তে-আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মুখে আর বেদনা বা অতৃপ্তির কোন চিহ্ন দেখা গেল না। প্রবোধচন্দ্র পুনরায় বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল—"বুড়ো, তোমার ছেলে কি যুদ্ধে যেতে চায়?" এই প্রশ্নে বেচারাম যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া, আত্মসংবরণ করিয়া কহিল—"বাবা সে কি আর যেতে চায়? তবে বাবুর নিকট যেতে স্বীকার করেছিল বটে; তা কি করে! বাবা, ছেলেটাকে কি রাখ্‌তে পার্ব্ব না?" বেচারামের মুখে পুনরায় বেদনা ও

উদ্বেগের চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিল। প্রবোধ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল,—"বৃদ্ধ, তুমি ভেবো না। বাবার কথা মত কাল সকালে তোমার ছেলেকে এখানে পাঠিয়ে দিও; আমি সাহেবের কাছে বলে-ক'য়ে তাকে ফিরিয়ে আন্‌ব।" বৃদ্ধ উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিল,—"বাবা—বাবা, তুমি তাকে রাখ্‌তে পার্ব্বে কি?" তাহার মুখে আশা ও নিরাশার আলো ও ছায়াপাত হইতেছিল। প্রবোধচন্দ্র স্থিরভাবে কহিল,—"হাঁ, তা, পার্‌ব বুড়ো, নিশ্চয়ই পার্‌ব, তুমি ভেবো না, বাড়ী যাও।" "পার্ব্বে বাবা, তুমি আমার ছিদামকে রাখ্‌তে পার্ব্বে? বেঁচে থাক বাবা।" বলিতে-বলিতে বেচারাম ঠক্‌ঠক্ করিয়া আস্তে-আস্তে গৃহের বাহির হইয়া গেল।

(৩

বাহিরে তুমুল ঝড় হইতেছিল। নিশীথের গাঢ় অন্ধকারে আকাশের সমস্ত দৈত্যদানবগুলি যেন সারাটা পৃথিবী তোলপাড় করিয়া তুলিতেছিল। আর বুঝি অনেকগুলি চিতার আগুনের অতৃপ্ত শিখা মুহুর্মুহুঃ সারাটা আকাশ উজ্জ্বল করিয়া আবার মুহূর্ত্তেই নিবিয়া যাইতেছিল; এবং সঙ্গে-সঙ্গে এক-একটা প্রবল গর্জ্জনে পৃথিবী কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। রসময় বাবু ও তাঁহার পুত্র একই ঘরে ভিন্ন বিছানায় শয়ন করিয়া ছিলেন। এই দুর্য্যোগের মধ্যে কাহারও নিদ্রা আসিতেছিল না। প্রবোধ ছিদামের কথাই ভাবিতেছিল; বুড়া কি ভাবিতেছিলেন, তিনিই জানেন। এমন সময় প্রবোধ বলিল, "বাবা, তুমি ছিদামকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছ?" "হা, তা সে যাচ্ছে বটে।"—"তাকে কি রাখা যায় না?" "রাখ্‌ব কি কোরে! সাহেবের নিকট লিখে দিয়েছি, কাল একজনকে পাঠাব। এখন তাকে না পাঠালে তিনি আমাকে অপমান কোত্তে পারেন।" প্রবোধ কিয়ৎকাল মনে-মনে কি ভাবিল; পরে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, ছিদাম সাহেবের কাছে একা যাবে কি?" "না, একজন চৌকিদারকে সঙ্গে দেব মনে করেছি।" "চৌকিদার ত সাহেবের নিকট কিছু বল্‌তে সাহস কর্‌বে না।" "তা বলবার কিছু দরকার হবে না; কি বলে,—আমি লিখে দেব।" "আমি সঙ্গে যেতে পারি বাবা?" বাহিরে প্রবল মেঘগর্জ্জন হইল। রসময় চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কেন যাবে?" "যদি সাহেবকে বলে-ক'য়ে ছিদামকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারি।" "ওসব ছেলেমানুষী কোরো না বাবা। সাহেবকে, কি বলে—ও রকম বল্লে তিনি রাগ করবেন যে!" "আমি ত একবার আমাদের ক্লাবের চাঁদার প্রার্থী হ'য়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম, তিনি ত খুব ভাল মানুষ" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া প্রবোধ আবার বলিল, "আচ্ছা, আমি ছিদামের সঙ্গে যাই না কেন; দেখি যদি কিছু করতে পারি!" "তুমি সঙ্গে গিয়ে ছিদামকে সাহেবের কাছে উপস্থিত ক'রে দিতে পার, তাতে আমার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু কি বলে, একে ছাড়িয়ে আনার জন্য সাহেবকে বল্লে আমার অপমান হবে।" প্রবোধ পিতার মনের ভাব বুঝিল। বুঝিল যে, তাঁহার কঠোর চিত্ত আর গলিবে না। সে স্থিরকণ্ঠে কহিল—"না বাবা, আমি ও-সম্বন্ধে সাহেবকে কিছু বলবো না। আমাকে শুধু সঙ্গে যেতে অনুমতি দাও।" রসময় ভাবিলেন—এও মন্দ নয়। এই সুযোগে প্রবোধ সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হতে পারিলে ভবিষ্যতে আশা আছে। তা ছাড়া, প্রবোধ সঙ্গে গেলে ছিদামটার আর এদিক-ওদিক যাবার যো নাই। তিনি কহিলেন—"আচ্ছা প্রবোধ, তা'হলে তুমি ওর সঙ্গে যেও। আর দেখ, সাহেবকে সেলাম-টেলামটা ভাল করে' দিও। সাহেব সুবোকে খুসী কর্‌তে পার্‌লে লাভ আছে বাবা।"

প্রবোধচন্দ্র সে কথায় মনোযোগ না দিয়া ছোট একটী "আচ্ছা" বলিয়াই চোখ বুজিল। রসময়বাবু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

(৪)

যখন সারাটা প্রকৃতির গায় একটা ধূসরকৃষ্ণ ছায়া বিছাইয়া ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল, তখন রসময়বাবু নির্জ্জন গৃহে বসিয়া জানালার ফাঁকে আকাশের খানিকটা অংশ একদৃষ্টে দেখিতেছিলেন; যেন একটা দুর্ব্বোধ্য অস্পষ্ট লেখা নিবিষ্টমনে পড়িতেছিলেন। সেদিনও সন্ধ্যার আঁধারের সঙ্গে-সঙ্গেই কালমেঘে ক্রমশঃ বর্ষার আকাশটা ছাইয়া ফেলিতেছিল। রসময় ভাবিতেছিলেন—প্রবোধ সকালে ছিদামকে লইয়া সহজ গিয়াছে, কিন্তু এখনও আস্‌ছে না কেন! বোধ হয়, আজ সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারেনি, সাহেব হয় ত মফঃস্বল গিয়ে থাক্‌বেন। ছিদামকে পাঠানোতে কাজের সুরু হল। আহা

ছিদাম যদি না যেত, তবে সাহেবকে তিনি কি বলে কৈফিয়ৎ দিতেন! রসময়ের মনে হইল, প্রবোধচন্দ্র তাহাকে সান্ত্বনা দিয়ে সঙ্গে না গেলে ছিদাম যখন বাড়ী হ'তে শেষ বিদায় লইয়া চলিয়া যায়, তখন তার মার উচ্চক্রন্দন, এখনও যেন রসময়ের কাণে থাকিয়া-থাকিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন—দূর হোক্ ছাই! এই রকম দুর্ব্বলতাতেই বাঙ্গালী জাতটা উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। আকাশে গুরু-গুরু মেঘ-গর্জ্জন হইল এবং সঙ্গে-সঙ্গে একটা ভিজা বাতাসের ঢেউ শর্-শর্ শন্-শন্ শব্দে যেন একটা অশ্রান্ত কান্নার রোল তুলিয়া দিল।

* * * * *

দেওয়ালের ক্লক্‌টায় ঠং-ঠং করিয়া রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। ঝি ডাকিল—"বাবু, খেতে আসুন!"

রসময়বাবু একখানা ইজি চেয়ারে চিৎ হইয়া পড়িয়া তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিলেন। ঝির ডাকে চেতনা পাইয়া কহিলেন—"যাচ্ছি। প্রবোধ এসেছে?" "না বাবু, তিনি ত এখনও আসেনি। সে বোধ হয় আজ সহরেই থাকবে।" রসময় অন্যমনস্ক ভাবে কহিলেন—"আচ্ছা।" রাত্রি যখন গভীর হইল, তখনও প্রবোধকে না দেখিয়া রসময়বাবু আহারাদির পর শুইতে গেলেন। কিন্তু আজ আর তাহার ঘুম আসিল না। প্রবোধের জন্য একটা তীব্র ব্যাকুলতায় রসময়ের সারাটা রাত্রি কাটিল। চিন্তার তেমন কোন কারণ ছিল না। ছেলে সহরে গিয়েছে, হয়ত দু'চার দিন পরেও আসিতে পারে। কিন্তু আজ রসময়ের হৃদয় প্রবোধ মানিতেছিল না। প্রভাতে যখন তিনি শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন, তখন ভৃত্য জল দিতে আসিয়া বাবুর চোখ-মুখের চেহারা দেখিয়া অবাক্ হইল। এই এক রাত্রিতেই তাঁহার মুখের সতেজ ভাবটা একেবারে সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; চক্ষু দু'টীর উজ্জ্বলতা আর নাই।

রসময়বাবু প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। সে দিনও রৌদ্রের সম্ভাবনা ছিল না। খণ্ড-খণ্ড মেঘে প্রায় সমগ্র আকাশটা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। অদূরে শ্রেণীবদ্ধ বাউগাছগুলির উপর দিয়া কয়েকখণ্ড পাতলা মেঘ যেন বিশেষ একটা প্রয়োজনে উধাও হইয়া উত্তর দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল। আজ ভোর হইতেই রসময়ের মনে হইতেছে, এই বুঝি প্রবোধ আসছে! ঐ শব্দ হইল, ঐ সে আসছে নয়! একটা দা'রুণ উৎকণ্ঠা তাঁহাকে আর স্থিরভাবে বসিতে দিতেছিল না। সহসা একটা লোক চৌকাঠে পা দিয়াই বলিয়া উঠিল—"বাবা, ধন্য তুমি! এ কলিকালে তোমার মত কাজ কে কর্ত্তে পারে? বাবা, আমরা তোমাকে না জেনে নিন্দা করেছি, মার্জ্জনা কর।" লোকটী বৃদ্ধ, তাঁহার গলায় রুদ্রাক্ষমালা, মাথায় পাকা চুলের শিখা, গলায় যজ্ঞোপবীত।

রসময় সহসা চকিতভাবে চাহিয়া দেখিলেন—ওপাড়ার দীনু চাটুজ্যে। ইহাকে দেখিয়া তিনি বিনর্ষ হইয়া উঠিলেন। লোকটা বিশ্বনিন্দুক; রসময়ের সৈন্যসংগ্রহকার্য্যে এই ব্যক্তিই লোক ভাগাচ্ছে। তিনি দীনু চাটুজ্যেকে অভ্যর্থনা করিতে ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু চাটুজ্যে মহাশয় অভ্যর্থনার অপেক্ষা না করিয়াই একখানা কেদারায় বসিয়া পূর্ণ আবেগে অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"বাবা, তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দোবো বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।" রসময় বাবু অতি কষ্টে দুইবার ঢোক্ গিলিয়া, চোখ দু'টী অপরিমিত ভাবে বিস্ফারিত করিয়া আহতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—"কি বল্‌ছেন্ চাটুজ্যে মশায়, আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে" তাঁহাকে কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই চাটুজ্যে দ্বিগুণ উৎসাহে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"কি বল্‌ছ বাবা, বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? তা পার্ব্বে না। ফুলের গন্ধ ফুল নিজে বুঝ্‌তে পারে না, তুমিও পার্ব্বে না। এমন সোণার ছেলে, তাকে কি না আজ নিজ হাতে ধ'রে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিলে!—এমন কাজ কে কর্ত্তে পারে! ভাগ্যি কাল সহরে গিয়েছিলাম; তাইতে ত প্রবোধকে শেষ দেখা দেখ্‌তে পেলাম। আমাকে দেখে সে বল্লে—'দাদাঠাকুর, আমি যুদ্ধে চল্লাম। বাবাকে আমার প্রণাম জানাবেন, আর আশীর্ব্বাদ কর্‌তে বল্‌বেন;—আমি যেন তাঁর সুনাম রেখে মর্ত্তে পারি। আপনারা বাবাকে নিন্দা করেছিলেন—তিনি নিজের ছেলে না পাঠিয়ে, শুধু পরের ছেলে পাঠাতে চেষ্টা করেন, কথাটি সত্য নয়। আমি ছিদামকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে তার পরিবর্ত্তে যাচ্ছি!' আহা সত্য ত নয়ই, ভয়ানক মিথ্যা! তোমার মত মহৎ লোক ক'জন আছে বাবা! কাল কি না সাহেব-সুবো-হাকিম সকলে তোমাকে কত প্রশংসা কল্লে, প্রবোধকে কোলে নিলে, তার গলায় ফুলের মালা দিলে! তুমিই ভাগ্যবান্। চল যাই, তোমার দৃষ্টান্ত দেখে এখন এ গ্রামে অনেকেই এগুবে। এইরূপেই পথ দেখাতে হয়, কি বল বাবা? এই ত নেতার কাজ!" নেতা কিন্তু তখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন!

উৎকল-সাহিত্য

১। "বিবিধ প্রসঙ্গ"—সম্পাদক—শ্রীবিশ্বনাথ কর।

(১) "ভাবুকতা"—ভাব বা emotion মানব হৃদয়ের এক উপাদেয় সামগ্রী। ইহা জগৎ-পুরায় প্রকৃতি উপকরণ এবং বহু সৎ-কর্ম্মের প্রসূতি। ভাবের প্রেরণায় মনুষ্য অবাধাসে দুরূহ ত্যাগ-স্বীকার করে; কিন্তু এই ভাবের আতিশয্য ভাবুকতা আকার ধারণ করিয়া মনুষ্যকে সর্ব্বকর্ম্মে পঙ্গু করিয়া ফেলে। ভাবুকতার কাল্পনিক সুখ বা উপভোগের মধুরতা অনেক সময় জীবনের সার বস্তুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে। আবার ভাবুকতার কৃত্রিমতার অনুযোগের মধুরত্ব পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়া যায়; আমাদের দেশে বর্ত্তমানে ভাবুকতার আধিপত্য অল্প নয়। আজ, কি, দেশ, কল্য, অদ্য, গুজ, মূর্খ প্রভৃতি বর্ণভাবের উচ্চ অবয়া রূপে পরিণমিত হইয়া যথার্থ বহুজীবন অপেক্ষা অনেক বেশী সম্মান লাভ করিতেছে। এই অসার ভাবুকতা কত চিন্তাপুত নরনারীকে প্রকৃত কর্ম্মপথে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সাহিত্য-জগতেও ভাবুকতা প্রকাশের প্রশস্ত ক্ষেত্র। ভাবুকতা বহু সাহিত্যিক নাম-ধারীর জীবিকা। আজকাল আমার দেশীয় জীবন-ক্ষেত্রে এই ভাবুকতা বিচিত্রভাবে লীলা প্রদর্শন করিতেছে। সরলচিত্ত নরনারীকে ভাবুকতায় মোহাচ্ছন্ন করিয়া নিম্নস্থ উদ্দেশ্য সাধন অতি সহজ। কেহ কেহ আবার তাহাতে শিব, দুর্গা প্রভৃতিকে বশীভূত করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। এই শ্রেণীর লোকসংখ্যা যে দেশে অত্যধিক এবং যে জাতির ভিতরে ইহাদের অবাধ প্রতিষ্ঠা, সে দেশের উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত!

(২) "আশ্রম বা শেপুর"—আমেরিকার পূর্ব্বীয় মহিলা কুমারী ইুয়ার্ট প্রায় তিন বৎসর হইল কতক সময়ে অনাথা, অসহায়া বালিকার নিমিত্ত এক আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা-বিঘ্নের সম্মুখে অসাধারণ ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও ঈশ্বরনির্ভরতা গুণে এই মনস্বিনী মহিলা কঠোর কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতেছেন এবং ইতিমধ্যে স্থানীয় বহু গণ্য ব্যক্তির অনুরাগ ও সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ৫৫টী বালিকাকে মৃত্যু বা নরক মুখ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে গৃহের সুখ শান্তি ও ভবিষ্যৎ আশাময় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহা সামান্য আয়াসের কথা নয়। এই পুণ্যাশ্রমের স্থায়ী গৃহাদিও স্থাপিত হইয়াছে। আমরা এই পবিত্র অনুষ্ঠানের প্রতি দেশের সর্ব্বশ্রেণীয় নরনারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। জগতের দুঃস্থ পতিতদের উদ্ধার জন্য যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা যথার্থই ধন্য। যাহাদের সে সৌভাগ্য নাই, তাহারা এরূপ পবিত্র অনুষ্ঠানে হৃদয়ের অনুরাগ ও যথাবিহিত সাহায্য প্রদান করিয়া অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও আপনাকে ধন্য করিতে পারেন। আহা, সেটুকু হইলে এ হতভাগ্য পৃথিবী যে স্বর্গে পরিণত হইয়া যাইত!

২। "কুরুক্ষেত্র অগ্নাধি"—লেখক শ্রীশশিভূষণ রায়।

কিয়দ্দিন হইল মাদ্রাজ বিশ্বাধারস্থ প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বর রাজা বীরভদ্রের ৫২ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। পরলোকগত নৃপতি ২৮ বর্ষ বয়সে বিপত্নীক হইয়া অদ্য যাবৎ পরিগ্রহ করেন নাই। ওয়ালটেয়ারের প্রাসাদে তাঁহার স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণীর স্মরণার্থ যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ভিজিগাপটম কিংবা ওয়াল-টেয়ারের মন্দিরসমূহ-মধ্যে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ওয়ালটেয়ারের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে এই রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। রাজধানীর চতুর্দ্দিকে দুর্গের উচ্চ প্রাচীর। উদ্যানের প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিলে এক প্রাচীর-বেষ্টন দৃষ্ট হয়। তাহারই মধ্যে ঐ মন্দির অবস্থিত। উদ্যান এরূপ সুপরিষ্কৃত ও বিচিত্রভাবে সজ্জিত এবং নানাবর্ণের পুষ্প এরূপ অজস্র-ভাবে প্রস্ফুটিত যে, কোনও চিত্রশালের সুচিত্রিত বিশাল বৃক্ষপট বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির নিমিত্ত মৃত্তিকার উপরে মনোরম কূপ এবং নিম্নে স্নেহ-শীতলকারী গহ্বর নির্ম্মিত হইয়াছে। নানাবিধ সুদৃশ্য, সুগন্ধযুক্ত বৃক্ষ,—কৃত্রিম উৎসাকার ঝাউ, জল-তাল (water-palm), বিচিত্র বিবিধ পাখাগজেরী (ferns), এবং গোত্রাবিশিষ্ট নানারূপ আকাশলম্বিত উদ্ভিদ (orchids) প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে।

মন্দিরটী অবশ্য সুবৃহৎ নয়। ইহা প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং সমস্ত গাত্র ও গুম্বজসমূহ বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত। এতদ্ব্যতীত মন্দির-গাত্রে দশাবতার ও অন্যান্য মূর্ত্তি চতুর্দ্দিকে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। অবতারগুলির পরিকল্পনায়ও কবির প্রকাশ পাইতেছে। মৎস্যাবতার মূর্ত্তির নিম্নার্দ্ধ মৎস্য, উপরার্দ্ধ মানবী এবং চারিটী শিশু তাহার স্তন-পানে রত।

মন্দিরাভ্যন্তরে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, কেবল রমণীগণ যাইতে পারেন। মন্দিরের মধ্যে পরলোকগতা রাণীর শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত এক মূর্ত্তি এবং ভিন্ন ভিন্ন অবয়ার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি আলোক-চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। মূর্ত্তির সম্মুখে দিবারাত্রি আলোক প্রজ্বলিত এবং পুষ্প ধূপাদি দ্বারা আমোদিত হইয়া থাকে। কৌটায় সযত্ন-রক্ষিত রাণীর সিন্দূর সধবা অন্তঃপুরিকাগণের ললাটে প্রদত্ত হয়। মন্দির-রক্ষকদিগকে কোনরূপ পারিশ্রমিক কিম্বা পারিতোষিক প্রদান রাজাজ্ঞায় নিষিদ্ধ।

রাণীর নাম লক্ষ্মী। ১৮৯৪ অব্দে তাঁহার বিবাহ হয় এবং ১৯০১ অব্দে দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া তিনি স্বর্গলাভ করেন। তিনি

শিক্ষিতা, পতিব্রতা ও মহাবতী ছিলেন। মন্দিরের বহির্গাত্রে চতুর্দ্দিকে সৈলঙ্গ ও ইংরেজী ভাষায় ইহাঁর জীবন-কথা, লোকান্তর স্বামীর শোক-গাথা, ভগবদ্ভক্তির শ্লোক এবং শোকপূর্ণ নানা কবিতা শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরে খোদিত রহিয়াছে। তাহাদের দুই একটীর ভাব মাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) "এখানে আমার প্রিয়া লক্ষ্মীর দেহ সমাহিত, এইখানে আমার অন্তরও সমাহিত।"

(২) "বসন্তের প্রারম্ভে গোলাপ প্রস্ফুটিত হইতে না হইতে কোন্‌খানদায় ছিন্ন হইল।"

(৩) "পৃথিবীর একটি দেবী কমিয়া গেল, স্বর্গে একটি বাড়িয়া গেল।"

(৪) "পৃথিবী অধিক বয় মাত্র।" একাধারে বিচিত্র সৌন্দর্য্য এবং করুণ শোককাহিনী পূর্ণ এই স্থান দর্শনে মনে বিষাদ মিশ্র আনন্দের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক।

মুকুর -চৈত্র, ১৩২৪

"প্রাচীন উৎকল"—(রাজবংশানুচরিত)—লেখক—

শ্রীযদুবন্ধু সিংহ।

'মুকুরে' ইতঃপূর্ব্বে আমরা 'হাতী-গুম্ফা' লিপির উদ্ধার করিয়াছি। সে সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ পত্রিকায় কে, পি, জয়সবাল—এম-এ মহাশয় তাহার বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত আলোচনা হইতে জানা যায়, উড়িষ্যার খারবেল ঐর নামে এক রাজা ছিলেন, এবং উৎকল রাজবংশ একদিন ভারতব্যাপী কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিল। 'হাতীগুম্ফা' লিপি প্রাচীন উৎকলের বিভব, ক্ষমতা, প্রতাপ, ঐশ্বর্য্য, সীমা, সাহস, সৈন্যবল, রণ-কুশলতা, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

জয়সবাল মহাশয় 'হাতিগুম্ফা' লিপির অতি সুন্দর ও পরিষ্কার পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। ঐ লিপি যতদূর অধিকার করিয়াছে তাহার পরিমাণ ১৫—১৭ × ৪½' অর্থাৎ প্রায় ৮৪ বর্গফিট। ইহাতে ১৭টি পাক্তি ও প্রতি পাক্তিতে ৯০ হইতে ১০০ অক্ষর। প্রত্যেক অক্ষরের উচ্চতা ৩½ হইতে ৪ ইঞ্চ। ইহার ভাষা অপভ্রংশে প্রাকৃত অর্দ্ধমাগধী এবং বৈদেশ প্রাকৃত মিশ্রিত পালির সহিত ইহার অনেকাংশে সাদৃশ্য রহিয়াছে। বহু প্রত্নতাত্ত্বিকের দৃষ্টি ঐ লিপির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। নিম্নলিখিত পণ্ডিতবর্গ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন।

১। প্রথমে টার্নার সাহেব	১৮২৫	খৃষ্টাব্দ
২। কেমস্ প্রিন্‌সেপ এডিটো	১৮৩৭	"
৩। স্যার আলেকজাণ্ডার কনিংহাম	১৮৭৭	"
৪। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র	১৮৮০	"
৫। ডাক্তার ভগবান লাল ইন্দ্রাজি	১৮৮৫	"
৬। ডাক্তার বর্জ্জ সুলার	১৮৯৪।৯৮	"
৭। প্রফেসর সুব্রার	১৯১০	"
৮। ডাক্তার ফিট	১৯১০	"
৯। আর, ডি, ব্যানার্জি, এম, এ,	১৯১৩	"
১০। ভি, এ, স্মিথ	১৯১৭	"
১১। কে, পি, জয়সবাল	১৯১৮	"

লিপির বয়স সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায়। নানা তর্ক-বিতর্কের পরে ব্যানার্জি মহাশয় সমস্ত মত খণ্ডন করিয়া ১৭০ কি ১৭৫ খৃঃ পূঃ বলিয়া স্থির করিয়াছেন; কিন্তু জয়সবাল মহাশয়ের মতে ১৯০ খৃঃ পূঃ।

উৎকলের কোথায় কি মহামূল্য ইতিহাস নিহিত আছে, তাহা অবগত হওয়া কঠিন। অবশ্য উৎকলীয়গণের আপন ঘরের প্রতি দৃষ্টি নাই; কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মুরুপেশাগত প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর্গ বহু প্রমধীকার পূর্ব্বক ইতিহাস আবেষণ করিতেছেন। খারবেলার ইতিহাস প্রাপ্ত হইলে উৎকল-ইতিহাসের এক প্রধান অধ্যায়ের অভাব মোচন হইবে; কেবল উড়িষ্যার ইতিহাস কেন, ভারত-ইতিহাসেরও অনেক কথা উদ্ঘাটিত হইতে পারে। যাঁহারা উৎকলের প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া উড়িষ্যার প্রাচীন গৌরব-কীর্ত্তি সর্ব্ব-সাধারণে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট উৎকলসন্তানগণ চিরঋণী।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস।

উড়ে বামুন

[শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

"ঠাকুর, ও ঠাকুর,—বলি, ও ঠাকুর! শুনতে পাও না না কি হে? তোমাদের কল-ঘর কোথায়?" মুখ হইতে সিগারটি নামাইয়া উদ্দিষ্ট লোকটি উঠিল,—কল-ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিল, "এই।" "পাইখানা?" "ঐ দিকে।" ভূপতি পাইখানায় চলিয়া গেলে যোগেশ পূর্ব্ববৎ বসিল।

ভূপতিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন থার্ড-ইয়ারে পড়িতেছিল, তখন তাহার বিবাহ হয়। বিবাহ কলিকাতাতেই হইয়াছিল। তখন কার্য্যের খাতিরে তাহার শ্যালক যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যাইতে পারেন নাই। সেই কারণে শ্যালক-ভগ্নীপতি কেহ কাহাকেও চিনিতেন না। বি-এ পাশ করিয়া ভূপতি এখন আইন পড়িতেছিল। পূজার ছুটিতে যোগেশ তাহাকে দিল্লী আসিতে অনুরোধ করিয়া পত্র

লেখায় ভূপতি আসিল। যে-দিন ভূপতি দিল্লী পৌঁছিল, সে-দিন অনেক চেষ্টা করিয়াও যোগেশ নূতন দিল্লী হইতে রাত্রি বারটার পূর্ব্বে বাসায় ফিরিতে পারিল না। ওভার-সিয়ারদের অনুযোগ, ঠিকাদারদের বিলের তাগাদায় তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। কাহাকেও ধমকাইয়া, কাহাকেও ভাল কথায় বুঝাইয়া ইঞ্জিনিয়ার (Engineer) সাহেব প্রায় ১২টার সময় মোটর হাঁকাইয়া রাত্রি ১টার সময় বাসায় আসিলেন। তখন ভূপতি শুইয়াছে। কয়দিন না খাওয়া, না ঘুম,—কাজেই যোগেশ তখন তাহাকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করিল না।

দোতালার ছাদে একধারে যোগেশের মা চা, গরম জল প্রভৃতি সুচরা কাজের জন্য দুইটা উনান পাতিয়াছিলেন। উনান দুইটি ঠিক সিঁড়ীর সম্মুখে হওয়ায়, যোগেশ পর্দ্দার জন্য জনৈক ঠিকাদারকে আদেশ দেন। সেই ঠিকাদারটি উহার পেনে চাঁদিক মাত্র এনায়াইয়া ফিরিতে পারিয়াছিল। এই স্থানটিতে বসিয়া যোগেশের চা খাওয়া একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। আজও প্রত্যূষে উঠিয়া, সে একটি পিঁড়ীর উপর বসিয়া, কোঁচার কাপড়টি গায়ে দিয়া, চায়ের জল হইল কি না দেখিতেছিল। লম্বা মুখ, দাড়ী-গোঁফ কামান, মাথায় এক টিকি চেহারাটা ভূপতির কেমন এক অদ্ভুত রকম মনে হইল। তার উপর ঐ অবস্থায় আবার এইরূপ সময়ে উনানের সম্মুখে উপবিষ্ট—ভূপতি তাহাকে বামুন ঠাকুর বলিয়া মনে করিতে বিলম্ব করিল না। যোগেশও পশ্চাৎপদ হইবার ছোকরা নয়। সর্ব্বদাই একটা-না-একটা রঙ্গ-তামাসা লইয়াই আছে। তাহার স্ত্রী এ-সম্বন্ধে তাহাকে এক দিন কত কথা বলিয়াছে,—"এখন তুমি এঞ্জিনীয়র, একটু ভারীত্ব না দেখালে লোকে মানবে কেন? এখনও তুমি ঐ রকম ভাবে কাটিয়ে দেবে?" কড়কী কলেজ হইতে যদিও ভাল পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে এবং একেবারে চাকরি মিলিয়াছে, তবুও যোগেশের অহঙ্কার-জেনাক মোটেই ছিল না; স্ত্রীর কথা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিত। কিন্তু তা বলিয়া তাহার যে কর্ত্তব্য-জ্ঞান ছিল না তাহা নহে। বাড়ীতে সে যতই ছেলেমানুষি করুক না কেন, আফিসের লোক বেশ বুঝিতে পারিত, ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের দাপট কতটা। বাড়ীতে কিন্তু সে-ভাব দেখাইতে সে ইচ্ছুক নয়। সে স্ফূর্ত্তি ভালবাসে,—স্ফূর্ত্তি করিয়া সময় কাটাইয়া দেয়। যতটুকু সময় বাড়ীতে থাকে,—স্ত্রী ভাই-ভগ্নীদের লইয়া আমোদে কাটায়। প্রতিবাসীরা বা অন্য যাহারাই তাহার সংস্পর্শে আসে, তাহারাই তাহার বন্ধু হয়। যাহার সহিত যে সম্পর্কই হউক—প্রকৃতই কি, আর পাতানই কি, যোগেশ দিল্লীতে সকলের কাছে যোগ-দা নামেই খ্যাত। শুনা যায় উহার কাঁকা একবার দিল্লী বেড়াইতে আসিয়া, সকলের মুখে যোগ-দা যোগ-দা শুনিয়া তাহাকে যোগ-দা বলিয়াই ডাকিয়াছিলেন। যেমন যোগেশ, ভাগ্যক্রমে তাহার স্ত্রীটিও সেই রকম। সে যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি সরল-প্রকৃতি; সদাই আমোদ লইয়াই আছে। আন্না-কালীর মুখ-ভার, রাগ কেহ কখন দেখেন নাই। এমন স্ত্রী পাইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় আমাদের যোগ-দা অত প্রফুল্ল—তাই এত সদানন্দ। কিন্তু আন্নাকালী সম্পূর্ণ একেলে ধরণের বাটীতে প্রায় ঘোমটার ব্যাপার রাখিত না। এই একটা কারণে দুই একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গোপনে মেয়েদের লেখা-পড়া শিক্ষার নিন্দা করিত।

যাহা হউক, ভূপতির যেমন "বামুন ঠাকুর" অনুমান করা, যোগেশেরও তখনই বামুন ঠাকুর হইয়া যাওয়া। তাই যখন স্ত্রী আন্নাকালী আসিয়া তাহার পিঁড়িটি দাবী করিয়া স্বামীকে উঠাইয়া দিতে চাহিল, যোগেশ বলিল, "না—না, ঠাকুর আজ পিঁড়ে ছাড়বে না। ঐ তোমার নন্দাই আসছে।" "ও ঠাকুর, মাটি কোথায় আছে বল দিকি?" "ঐ যে কল-ঘরে সাবান্ আছে।" "সাবান?" "আজ্ঞে হাঁ।" জামাইবাবু আরও চটিল। আন্নাকালী বুঝিতে পারিয়া ঠাকুর-জামাইকে কল-ঘরের কোথায় কি আছে, দেখাইয়া দিতে আসিল। যোগেশ ইসারা করিয়া দিলেন। ইসারা না করিলেও আন্নাকালীর বুঝিতে বাকী ছিল না,—যোগেশ আজ সত্যই বামুন ঠাকুর হইবে। যাহা হউক, তাহাকে দেখিয়া ভূপতি বলিয়া উঠিল, "বৌদিদি, আপনারা এই উড়ে বামুনটা কোত্থেকে এনেছেন? কুড়ের বেহদ্দ, তার উপর আহাম্মুখ। চাইলুম হাতে-মাটির মাটি—বল্লে কি না, কল-ঘরে সাবান আছে। হত আজ আমাদের বেস, শালাকে বুঝিয়ে ছাড়তুম।" "ঠাকুর-জামাই, কি করবো বল। ঐ আমাদের বরাতে জুটেছে! তাও আবার দুঃখের কথা কি বলবো, নিজেদেরই রাঁধতে-রাঁধতে হাতের বালা ক্ষয়ে গেল।" "তবে ছাই ওটাকে রেখেছেন কেন? পয়সা কি কামড়ায়? বাবুর তো

এই সকাল না হতে চা-পান দিগার চাই। তার পরে বাবু রান্না করবেন—তাও খামখেয়ালী। এ মিথ্যে-মিথ্যে মাইনা গোণার আবশ্যক কি? আজকাল গাঁধুনী-বামুন রাখা একটা ফ্যাসান (fashion) হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা নইলে বুঝি বড়-লোকত্ব দেখান হয় না। দেখুন বৌদিদি, আমি জামাই হই আর যাই হই, স্পষ্ট কথা বল্‌বো, রাগ করবেন না।" "না ঠাকুর-জামাই, রাগ করবো কেন?" "দাদাকে বলে ওটাকে তাড়ান না কেন?" "তাড়ান যে যায় না; যতই বল না কেন, ঘনিয়ে-ঘনিয়ে সেই উহুনের গোড়ায় আস্‌বেই আস্‌বে। এমনটি কি আর কোথাও চলে ঠাকুর-জামাই? ও কি আর কারু কাছে—" "ঐ ত আপনাদের আস্কারা। ভালমানুষ পেয়েছে কি না?"

ভূপতি মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া আপনার নির্দিষ্ট ঘরের দিকে যাইতে-যাইতে, দেখিল বামুন-ঠাকুর চা প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। মনোযোগের সহিত অপর পাত্রস্থ হালুয়ার সুবিচার করিতেছে। ভূপতি মনে-মনে আরও গরম হইয়া উঠিল। ঘরে আসিলে শালাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর-জামাই, কাপড়-চোপড় ছাড়া হয়েছে?" "হাঁ"। "বামুন-ঠাকুর, জামাই-বাবুর চা, খাবার নিয়ে এস।" "আহা, বেচারীকে বিরক্ত করবেন না। সবেমাত্র হালুয়ার পিয়ালাটি ধরেছে।" "হাঁ, তাতো আর কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। ঠাকুর—" "বৌদিদি মাফ করবেন; আমি এখন চাও খাব না, খাবারও খাব না। দাদা কি কাল আসেন নি?" "আস্‌বে না কেন। কই ঠাকুর—" "তবে কি সকালেই চলে গেলেন। দেখা করলেন না!" "আর জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন? সবে ত আজ ষষ্ঠী। ঠাকুরটার আক্কেল দেখলে? ঠিক বলেছ, ঠাকুর-জামাই। ও ঠাকুর—" "না বৌদিদি, ও-শালাকে ডাকবেন না—আমি চা খাব না।" বলিতে-না-বলিতে বামন-ঠাকুর দ্রুত আসিয়া ঘরের মেঝের উপর একটা গালিচার আসন দক্ষিণ-মুখো পাতিয়া দিয়া গেল। ভূপতি একবার ঠাকুরের দিকে চাহিল, একবার আসনের দিকে দেখিল। পায়ের রাগ গায়ে মারিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল, "ওঃ, বাবুর আবার কালাপেড়ে কাপড় পরা হয়েছে!" ঠাকুরকে (cup) কপ্-হস্তে পুনঃ-প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভূপতি বলিয়া উঠিল, "কি ঠাকুর, কি?" "আজ্ঞে, চা" "তোমাকে কতবার করে বল্‌বো, আমি চা খাব না।" "তবে কি করবো, দিদিমণি যে বকবে?" "তা হ'লে আমার মাথায় ঢেলে দিয়ে যাও।" ঠাকুর ভাকামি করিয়া "দোব না কি" বলিয়া জামাইবাবুর দিকে অগ্রসর হইলে, জামাইবাবু নিজেই ঠাকুরের হাত ধরিয়া বলিলেন, "বৌদিদি, দেখলেন বেকুবের—" চারিদিকে চাহিয়া দেখে, বৌদিদি ঘরে নাই। বাহিরে একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল।

ঠাকুর বলিয়া উঠিল "আজ্ঞে, আপনি তো বল্‌লেন—" "ওরে শালা—" "আজ্ঞে, সে কথা বল্‌তে পারেন, কিন্তু—" "ওহে, আমারই বকমারি—যাও, যাও।" দ্বিরুক্তি না করিয়া বামুন ঠাকুর চলিয়া গেল। আয়াকালী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঠাকুর-জামাই, চা খেলে না?"

"না; চা খাব না। যখন উড়ে বামুন পর্য্যন্ত চা চালুয়া খেতে লেগেছে, তখন ও-সব আমাদের ছেড়ে দেওয়াই ভাল।"

ভূপতি কিছুতেই চা খাইল না। কথাটা ক্রমে তাহার শাশুড়ী ও অন্যান্য শ্যালকের কাণে পৌঁছিল। "কি বৌমা, জামাইটাকে তোরা এত রাগাচ্ছিস্ কেন বাছা?". "না মা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এখন আহ্নিক করগে—ওখানে যেও না।" "দুষ্টু বেটী" মাত্র বলিয়া যোগেশের মা হাসিয়া নিরস্ত হইলেন। ভূপতির ভাগ্যে অপর শ্যালক দুইটীর বিবাহ হয় নাই! একা রামেই যে রক্ষা নাই। যাহা হউক বাটীশুদ্ধ লোকে একটা মজা পাইয়া বসিল।

বেড়াইবার ভান করিয়া ভূপতি বাটী হইতে চলিয়া গেল। জল খাইয়া যাইবার জন্য সকলে তাহাকে যথেষ্ট জিদ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সে মুহূর্ত্তকাল রহিল না। বেলা ১১টার সময় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সেই রান্নাঘরের সম্মুখ দিয়াই আসিতে হইল; দেখিল তাহার স্ত্রী ও বামুন-ঠাকুর দু'জনেই রান্না করিতেছে। বামুন-ঠাকুর হাঁড়ি হইতে তরকারী লইয়া চাকিতেছে, আর তার স্ত্রীর, নূন বেশী-কমের রায়ের প্রতীক্ষায় হাঁ করিয়া তাকাইয়া বসিয়া আছে। হলই বা উড়ে বামুন—পুরুষমানুষ তো বটে। ইঁহাদের বাটীর ধরণ-ধারণটা ভূপতির মোটেই পছন্দ হইল না; পরন্তু মনে-মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইল। কি করিবে, বিদেশ, নাচার। ভূপতির কাপড়-চোপড় ছাড়া হইতে-না-হইতেই ঠাকুর আসিয়া বলিল, "জামাইবাবু,

রান্নাবান্না সব প্রস্তুত।" ভূপতি চটিয়া বলিল, "তবে আর কি, নিয়ে এস!"

"না, তা বলচি না, তবে রান্না হয়ে গেচে - স্নান করতে পারেন। তাই বলছিলুম।"

• • •

"বলি ঠাকুর, শোন তো, তোমার বাবু কি রকম হে,—তামাক-টামাক্ খান্ না?" "কেন খাবেন না! আপনাকে কেউ দেয় নি?" "তোমাদের কি ভদ্রস্থানা আছে?" "আজ্ঞে তা আছে বৈ কি। বলদেও!" দূর হইতে এক হিন্দুস্থানী চাকর বলিয়া উঠিল, "হুজুর"! "জামাই বাবুকো—" "আরে চুপ চুপ-বৌদিদি টের না পায়।" "কেন? আমাদের বাবু তো বৌদিদির সাম্নে তামাক খায়।" "আরে ঠাকুর, এত বুদ্ধি না হলে তোমাকে রাঁধুনীগিরি করতে হয়!" এমন সময় বলদেও আসিয়া উপস্থিত হইলে বামুন ঠাকুর হুকুম করিলেন, "জামাইবাবুকে বাস্তে এখটো ছিলাম তর দিয়াও জলদি! সিনান কো বাস্তে পানি-আনি ঠিক হায়?" "হাঁ হুজুর" বলিয়া বলদেও চলিয়া গেল। পরে বামনঠাকুরও চলিয়া গেল। আন্নাকালী আসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরজামাই, কোথায় গিয়েছিলে, জলটল খাবে না? ভাত যে শুকিয়ে যাচ্ছে।" "জল খাব কি বৌদি, বেটাদের দেশের আদব-কায়দা দেখে আক্কেল গুড়ুম হ'য়ে যাচ্ছে। বামুনঠাকুরকেও হুজুর না বলে চাকরেরা কথা কয় না।" "আচ্ছা, ঠাকুর-জামাই, তুমিই বল না, বামনঠাকুরের চেহারা কি মন্দ? আমারই যে দিনের মধ্যে কতবার হুজুর বলতে ইচ্ছে হচ্ছে।" "মন্দ আর কে বলচে। ঐ জন্যেই তো আমার একটা কি রকম বোধ হচ্চে, বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে যে ভাবে—" এমন সময় বলদেওর সহিত বামনঠাকুর আসিয়া আন্নাকালীকে বলিল, "আপনি একটু ও-ঘরে যান। জামাই বাবু তামাকু খাবেন।" ভূপতি দাঁতের উপর দাঁত দিয়া, চোখ রাঙাইয়া, মুখে বিড়বিড় করিয়া বলিয়া উঠিল, "বেকুব কোথাকার!" আন্নাকালী হাসিতে হাসিতে কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

ভূপতি বামনটার আহাম্মুখীতে বড়ই উত্যক্ত বোধ করিতেছিল। কিন্তু সাহস করিয়া তাহাকে বিশেষ কিছু বলিতে পারিতেছিল না। কারণ, সে ছেলেবেলা হইতেই না কি ইহাদের বাড়ীতে আছে। আর সব হিসাবে সে বড়ই বাধা; কিন্তু মেয়েদের কাছে বসিয়া যে হাসি-তামাসা করে, এইটি ভূপতি কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না। কতবার চেষ্টা করিল—বৌদিদিকে কথাটা বলিবে; কিন্তু পারিল না, পাছে তিনি কিছু মনে করেন। মনে-মনে সে ঠিক করিল, আকার-ইঙ্গিতে যোগেশের কাণে কথাটা তুলিতে হইবে। যাহা হউক, সেই টিনঘেরা রান্নাঘরের পাশ দিয়া সে স্নান করিতে চলিল। একদিকে টিনের একটু ফাঁক ছিল, ভূপতি সেখানে দাঁড়াইয়া বামুনের কাজটা দেখিবে ইচ্ছা করিল। দেখিল, বৌদিদি পাখা লইয়া বামুন ঠাকুরকে বাতাস করিতেছেন, আর ঠাকুর ডেক্‌চিতে কাটি দিতেছে। উত্তরে কি কথা হইল, সে বুঝিতে পারিল না। বৌদিদি পাখা ফেলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, ঠাকুর জোর করিয়া তাহার হাংসের হাতাটি বৌদিদির কাপড়ে-চোপড়ে মাখাইয়া দিল। তিনি হাসিয়া হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন; কিন্তু এমন সময় কিরণবালা তথায় উপস্থিত হওয়াতে হাত ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুরঝি, দেখ্‌তো মাংসটায় নুন হয়েছে কি না?" কিরণ কুঁ দিয়া কোন মতে একটু ঝোল চাকিয়া বলিল, "বোধ হয় ঠিক হয়েছে।" "বোধ হয় কিরে?" বলিয়া বামুনঠাকুর যেন রাগ করিয়া উঠিলেন। টিনের পাশে খস্ খস্ শব্দ হওয়ায় আন্নাকালী বলিলেন, "বামনঠাকুর, জামাইবাবু স্নান করতে যাচ্চেন, মাংসতো এখনো নামলো না।" কিরণ মাথায় কাপড় দিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। ঠাকুর বলিল "আজ্ঞে, জামাইবাবুর স্নান করতে-করতে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ভদ্রলোকের বাড়ী এ কি রকম ব্যাপার! রাগে ভূপতির সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। কি করা উচিত, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। নানা রকম ভাবিতে ভাবিতে স্নান করিয়া ফেলিল। ভাবিল, আহারাদি না করিয়াই সে এ বাটী হইতে সরিয়া পড়িবে। কিন্তু কোথায় বা যায়,...তখন তো ট্রেণও নাই। মনে-মনে সাত-পাঁচ তোলাপাড়া করিতে-করিতে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। দেখিল মেঝের উপর জলখাবার, অন্ন-ব্যঞ্জন সব একেবারে সাজান। একদিকে বৌদিদি পাখা-হাতে বাতাস করিতে-করিতে মাছি তাড়াইতেছেন; অপর দিকে ঠাকুরটি গোবর-গণেশের মত দাঁড়াইয়া আছে। উভয়ের অনেক সাধ্য-সাধনায় ভূপতি আহারে বসিল। এত আয়োজন, এত জিনিষপত্র, কিন্তু কিছুই

তাহার মুখে রুচিতেছিল না। খাইতে হয় খাইতেছিল। না বৌদিদির কথা, না বাবুন-ঠাকুরের কথা তাহার ভাল লাগিতেছিল। বৌদিদি তাহাকে খাইবার জন্য জিদ করিতেছিলেন; ভূপতি রাগত ভাবে জবাব দিতেছিল। এমন সময় আর্দ্দালি রামসহায় পাঁড়ে আসিয়া ডাকিল, "বাবুজী!" ভূপতি দেখিল, আন্নাকালী ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। বামন-ঠাকুর হাতা ফেলিয়া কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়া বাহির হইয়া বলিলেন, "কোন্ হায়?" পাঁড়েজী মাথা নোয়াইয়া, মাটি স্পর্শ করিয়া সেলাম করিল। বলিল, "দলরঙ্গিল সাব্ আপ্‌কো সাড়ে পাঁচ বাজে সেলাম দিয়া।" "কোন্,—Mr. Dalrymple! আচ্ছা, কয় দেনা, ইঞ্জিনীয়ার সাব্ উসি বখত মনাবকা দৌলতখানামে হাজীর হোঙ্গে।" "হজুর।" বলিয়া সেলামান্তে পাঁড়েজী চলিয়া গেল। ভূপতি আন্নাকালীর দিকে চাহিল. আন্নাকালী ভূপতির দিকে চাহিল। উভয়েই হাসিয়া ফেলিলেন। অপ্রস্তুত ভূপতি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বৌদিদি, আপনার এই উড়ে বামুনটিকে কত করে দিতে হয়? আমাদের বামুনের কষ্ট।" বাহির হইতে যোগেশ বলিয়া উঠিল, "শুধু খোরাক-পোষাক হে, তাতেও মুখতার ঘোচে না।"

আন্নাকালী হাসিয়া বলিলেন, "আমার কাছে সুবিধা না হয়, ঠাকুরঝি যখন ঘর করতে যাবে, সঙ্গে না হয় দেবো অখন।"

তাজ

[শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী]

১

সতীর প্রণয় সম'শুভ্র শির অভ্রে তুলি আজ!—
মর্ম্মের মর্ম্মর!—এই তাজ?
না, এ কোন বিরহী দেওয়ানা
রাখিবারে প্রেমের নিশানা
খুলে খুলে বুকের পাঁজর,
জমাইয়া অশ্রুর সাগর,
মর্ম্মরের ইন্দ্রজাল করেছে নির্ম্মাণ?
অকস্মাৎ স্তব্ধতারে চিরে
দেহহীন লেহ কাঁদে কি রে,—
হো হো, মেরা জান্, মেরা জান্!

২

রূপসী বিধবা যেন ব্যর্থ রূপে বৃথা পায় লাজ!—
তুমি কি গো তারই ছবি তাজ?
গম্বুজে গম্বুজে ছায়া-পরী—
শুয়ে আছে মায়া-রূপ ধরি',
মহলে মহলে ঘুরি' ঘুরি'
খোঁজে কারে বিরহিণী হুরী!
বিপক্ষীক পারাবত গায় তার গান!
নিখিলের প্রিয়াহীন প্রিয়
শ্বাসে—পিয়ে বিষাক্ত অমিয়!—
হো হো, মেরা জান্, মেরা জান্!

৩

দেখি, দেখি,—ফিরে ফিরে দেখি তোরে, তাজ!
স্মৃতি-রাজ্যে রাজ-অধিরাজ!
পাথর, না কাতর কাহিনী?
হেথা বুঝি রাধা বিরহিণী
কালো বলে' কালিন্দীর গায়
হেম-অঙ্গ মিশাইতে—হায়,
পাথার শুকা'য়ে হ'ল যাদুর পাষাণ!
না, এখানে উন্মাদ ফরহাদ
করিতেছে মৌন আর্ত্তনাদ!—
হো হো, মেরা জান্, মেরা জান্!

৪

রৌদ্র মাখে শ্মশান-বিভূতি—জ্যোৎস্না দেয়
বাসরের সাজ,
হে শোকের চারু কারুকাজ!

পাষাণের বস্তুগৃহখানি
জ্বালাইয়া যায় উষারাণী,
ভাঙ্গি ভাঙ্গি সোণার কবিতা
সন্ধ্যা-বর্ণে গড়ে স্বর্ণ-সীতা,—
প্রিয়ার প্রতিভূ রাখে প্রণয়ের মান!
বুকে নিতে যায়ার সে হেম
বাহু মেলি ডাকে নীল প্রেম!
হো হো, মেরা জান্, মেরা জান্!

(৫)

অন্ধ-প্রীতি-পদ্ম-গন্ধ প্রতি শিরা মাখ—
ধরণের স্বপ্ন তুমি আজ!
অরসিকে করিছ রসিক,
অপ্রেমিকে করিছ প্রেমিক,
বক্ষের ফিরিছে হ'য়ে শুচী,
সাধু হ'য়ে ফেরে—এসে খুনী,
কি মধুর, কি বিধুর, বঁধুর আহ্বান!
ছবি, না এ কবির নন্দন?
নেশা, না এ তৃষার ক্রন্দন?—
হো হো, মেরা জান্, মেরা জান্!

(৬)

একেলার পূজা-মঠ সর্ব্ব ঘটে করিছে বিরাজ!—
প্রেমের বিজয়-ধ্বজা তাজ!
নির্ম্মাইল অপূর্ব্ব প্রণয়ী
অভিজ্ঞান—সর্ব্বকাল-জয়ী!
ধ্বংস হোক্ সুখের কবর,
চূর্ণ হোক্ মর্ম্মর-বাসর,
প্রিয়ারে ভীরু'ল তার হিয়ার ঈশান!
তবু কাঁদে—কায়া, না ও ছায়া
বিশ্বময় হারাইয়া আয়া,—
হো হো, মেরা জান্, মেরা জান্।

বিধাতার বিধান

[শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্]

আমার বাবার অবস্থা খুব ভাল। কলিকাতায় আমাদের প্রকাণ্ড বাড়ী, আস্‌বাব-পত্র, ইলেক্‌ট্রিক আলো, পাখা, গাড়ী-জুড়ি। আমি বাবার একমাত্র আদরের মেয়ে। এক সময়ে ছেড়ে চলে যাবেই বলে' বাপ-মার মেয়ের ওপর স্নেহটা যেন ছেলের চেয়ে আরও গভীর, আরও নিবিড় হয়।

এই অশেষ স্নেহ আর সমৃদ্ধির মধ্যে লালিত হ'য়ে, আরও একটা দরকারী জায়গার কথা আমি, আর বাপ-মা উভয়েই ভুলে ছিলাম। সে জায়গাটা আমার স্বামী-গৃহ। ছোট একটা পাড়াগাঁয়ে আমার শ্বশুর-বাড়ী; সেই সবরকম আড়ম্বরহীন বাড়ীটি কবি-কন্যার শ্বশুরবাড়ী হ'লে চলে যেতে পারত, কিন্তু কলিকাতার ত্রিতলবাসী মনুষ্য-কন্যার শ্বশুর-বাড়ী হ'য়ে একটু গোল হ'য়েছিল।

শুনেছি, আমার যখন বিয়ে হ'য়েছিল, তখন না কি আমার শ্বশুরের অবস্থাও ভাল ছিল, কলিকাতায় তাঁরও বাড়ী গাড়ী জুড়ি ছিল। কিন্তু তারপরেই ব্যবসায়ের দ্রুত অবনতি হ'য়ে তাঁকে নিঃস্ব করে,—বছর দু'-একের মধ্যেই এই গ্রামে কুটীরবাসী ক'রেছিল।

এই জন্যে শ্বশুরবাড়ীতে আমার একটু বদ্‌নাম হয়েছিল যে, আমি অপয়া। সেই কারণে তাঁরা আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কোন চেষ্টাই করলেন না, আর বাবাও তাঁর আদরের মেয়েকে পাড়াগাঁয়ের নির্ব্বাসনে পাঠাবার কোন আগ্রহই প্রকাশ করলেন না!

এই উভয় পক্ষের অনাগ্রহের মধ্যে পড়ে আমিও যেন হাঁপ্ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। সেটা কতখানি আমার দোষ, আর কতখানি যে অবস্থা-বিশেষের দোষ, তা' বলতে পারিনে। কিন্তু তখন আমার সেই বয়স ছিল, যখন কুটীরের চেয়ে তেতালা বাড়ীই বেশী পছন্দ করতাম; যখন ঈশ্বরের দেওয়া হাওয়ার চেয়ে কলের হাওয়াই বেশী অপরূপ বলে মনে হোত; তখন মা-বাপের স্নেহ-ধারাই জীবনকে

শান্ত-শীতল ক'রে রাখত, আর কোনও নতুন স্নেহের সাড়া তেমন পাওয়া যেত না। সুতরাং দোষ আমার তত ছিল না।

২

যে ব্যাপার নিয়ে এর একটা হেস্ত-নেস্ত হোল, তাও আমার মনে আছে। পাড়ার লোকের পরামর্শে বাবা আমার শ্বশুরকে লিখে পাঠালেন, যেন আমার স্বামীকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়; অর্থাৎ সহজ কথায় ঘর-জামাই করবার প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন। আমার স্বামী তখন তাঁদের গ্রামের ইস্কুলের মাষ্টারি করতেন।

অবস্থার যখন হীনতা হয়, তখন সহজ কথাও আর সহজ ভাবে নেওয়া চলে না। এক্ষেত্রেও তাই হোল। এই প্রস্তাবটা তাঁদের বড়ই অপমানজনক বোধ হ'ল; এবং তাঁরা যে উত্তর লিখে পাঠালেন, শুনেছি না কি, তাতে বাবারও যথেষ্ট সম্মান রাখা হয় নি!

রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণটি যায়! এই উত্তর পেয়ে বাপ স্থির করলেন যে, আর কোনও দিন আমাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবেন না; এবং আমার শ্বশুর যদি উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করেন, তবেই আবার এ-সব কথা উঠবে।

তাই বলছি, দোষ আমার তত ছিল না; কিন্তু ভাগ্য ধীরে-ধীরে আমাকেই তার কঠিন, নির্মম কবলে কবলিত ক'রে ফেলছিল। এই কথা শুনে তখন বোধ হয় মোটের ওপর আমার আমোদই হয়েছিল; কিন্তু এখনও মনে আছে, মা আমার এই আমোদে চোখের জল ফেলেছিলেন! তখন আমি ভাল বুঝতে পারিনি, কিন্তু তার অল্পদিনের মধ্যেই তার অর্থ বুঝতে পেরেছিলাম।

৩

বয়স যখন বাড়তে লাগলো, তখন ধীরে-ধীরে তার সঙ্গে অনুভূতিও আসতে লাগলো! এই যে শীতের পর বসন্ত আসে, গাছপালা নতুন ফুলে-ফলে ভ'রে ওঠে, চারিদিকে কিসের একটা সাড়া পড়ে,—এটা যে শুধু জড়-জগতেই আবদ্ধ নয়, সে কথা মানুষেও একদিন অভ্রান্ত ভাবে বোঝে!

সে একটা সুন্দর রাত ছিল। ছাদের ওপর একলাই ব'সে ছিলাম। সম্পূর্ণ চাঁদ মাথার ওপরে, বোধ হয় তাই দেখছিলাম। এমন সময় পাশের বাড়ীর কমলা এলো। কমলা আমারই বয়সী; আমারই সঙ্গে, একই সময়ে তারও বিয়ে হ'য়েছিল। সে কাল শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে। ইতিপূর্ব্বে সে যখন শ্বশুরবাড়ী যেত, আর আমি নিজের বাড়ীতেই থাকতাম, তখন তার দুর্ভাগ্যে আমার সমবেদনা হ'তো; আজকাল আর তা হয় না; আজকাল মনে হয়, সে এমন একটা অধিকার পেয়েছে, যা' আমি পাইনি!

কমলা এসে তার শ্বশুরবাড়ীর গল্প করতে লাগলো; তার স্বামীর স্নেহের, ভালবাসার কথা বলতে লাগলো! সে যেন কি হ'য়ে গিয়েছিল, কিসের যেন তেজী লেগেছে! বিয়ে ত' সবারই হয়, স্বামী ত' সবারই হয়, কিন্তু এ কি! নির্লজ্জের মত সে এত হাসতে লাগলো যে, আমার মনে হ'লো, হয় ত' নীচে বাবা-মা শুনে কি বলবেন। আমার মনে-মনে রাগ হ'তে লাগলো। তার স্বামীর একশ'বার-দেখা চিঠি বার ক'রে পড়তে লাগলো। আমি ভাবলাম, গেলে বাঁচি।

কমলা যখন চ'লে গেল, তখন আমার কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করলো না। আমি সেইখানেই বসে রইলাম। রাগে আমার গা গস্ গস্ করতে লাগলো, অভিমানে চোখে জল এলো! এ আমাকে অপমান না?

বোধ হয় রাত বেশী হয়েছিল, হঠাৎ মার গলার শব্দে চমক ভাঙ্গলো। তিনি আমার হাত ধরে বললেন 'শুতে যাবি চল'!

গল্পের রাজ-কন্যার যখন সোণার কাঠির স্পর্শ হ'তো, তখনও সে ঘুমিয়ে,—জেগে উঠে দেখত, কখনকার সেই অজ্ঞাতস্পর্শে তার জীবন সুখময় হয়ে উঠেছে! সেদিন রাত্রে বুঝতে পারলাম যে, আমি জেগেছি—কিন্তু কখন যে সোণার স্পর্শ হয়ে গিয়েছে, তা জানতে পারিনি!

৪

তার পরদিন সকালেই আমার ননদকে একখানা চিঠি লিখলাম। চিঠি সংক্ষিপ্ত,—"ঠাকুরঝি তোমরা সবাই কেমন আছ, খবর দিও। আমরা একরকম আছি।"

বাবা শুনলে বোধ হয় রাগ করতেন, তাই কাউকে জানতে দিলাম না। মানুষের যদি হৃদয় থাকত ত' সে

বুঝত, এ চিঠিখানার কতখানি অর্থ! আমিও তখন বুঝতে পারিনি—এখন বুঝি! এ আমার পরাজয়ের অভ্রান্ত পরিচয়! মানুষকে স্পর্শ না করুক, এ চিঠি বিধাতার হৃদয় স্পর্শ ক'রেছিল, এ কথা ঠিক!

রোজই উত্তরের আশা করতাম,—পেতাম না। এমনি ক'রে চার দিন গেল।

সে-দিন সন্ধ্যার সকলের থিয়েটারে যাবার কথা,—আমাদের বাড়ীর, কমলাদের বাড়ীর সবাই। আমাকেও যেতে হবে! কলের পুতুল বই ত নই। মানুষে-মানুষে লড়াই হয়, মারা যাই আমরা মেয়েমানুষ!

সকালবেলা স্নান ক'রে উঠেছি, এমন সময় ঠাকুরঝির চিঠি এলো। এলো-মেলো লেখা, দোমড়ান, কতক-ছেঁড়া, কতক তেল-লাগা। বোধ হয় তার ছেলের হাতে পড়েছিল। চিঠিতে লেখা—"বউদিদি, তোমার চিঠি পেলাম। উত্তর দিতে দেরী হ'লো—আমরা সব ভারি ব্যস্ত, পরশু আমার দাদার বিয়ে। তোমরা কেমন আছ?" দাদার বিয়ে,—আমার স্বামীর বিয়ে? পৃথিবীটা আমার চোখের সামনে কালো-কাপলা হ'য়ে গেল,—চারিদিক ঘুরতে লাগলো, আমি সেইখানেই ব'সে পড়লাম।

জ্ঞান যখন হোল, তখন মনে হ'ল, আমার ত এ অবীর হবার সময় নয়। কাল বিয়ে; আমাকে এখনই বেরোতে হবে; তবে যদি উপায় হয়। অসম্ভব বিপদ না এলে অসম্ভব বলও আসে না; তাই আজ মনে হয়, এ বিধাতার ইচ্ছা! এমনি অসম্ভব বিপদ তিনি যদি না দিতেন, ত' বোধ হয় আমার কোনও দিনই উদ্ধার হ'তো না!

মাকে গিয়ে বললাম "মা, আমি এখনই যাব"। বলে চিঠিখানা তাঁর পায়ের কাছে ফেলে দিলাম। মা চিঠিখানা পড়ে বললেন, "হাঁ, যেতে হবে।" বলতে-বলতে তাঁর দু' চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়তে লাগল। বাবা এসে আমার অশ্রুসিক্ত মুখখানা তাঁর কোলের উপর তুলে নিয়ে, আঙুল দিয়ে আমার চুলের গোছা সরাতে-সরাতে বললেন, "তোর সঙ্গে আমিও যাব মা, এখনই বেরুবো।"

৫

ষ্টেশন থেকে তিনক্রোশ গরুর গাড়ীতে যেতে হয়। বাবা আর আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা হ'য়েছে। বাড়ীতে তখন উৎসবের সানাই বাজ্‌ছে! নির্ব্বাক হ'য়ে বাবা আর আমি নামলাম। ঢুকতেই আমার শ্বশুরের সঙ্গে বাবার দেখা। তিনি নমস্কার ক'রে বাবাকে বল্লেন, "বেহাই যে! বড় সৌভাগ্য আমার!" সে—সব কথা শোনবার সময়ও ছিল না, মনও ছিল না। বুকের ভেতর তখন কি করছিল,—কেমন ক'রে বলব! আমি সোজা বাড়ীর ভেতর ঢুকে একটা ঘরে গেলাম, যদি তাঁর দেখা পাই! তিনি ঘরেই ছিলেন। একেবারে তাঁর দু'-পা জড়িয়ে ধরে বল্লাম, "একটিবার মাপ্ করো।" তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত আমার দিকে চেয়ে বললেন "এ কি, নলিনী?"

আমি বল্লাম, "চিরকাল তোমার পায়ের ধুলোর চেয়ে নীচু হ'য়ে থাকবে, আর বিয়ে ক'রো না।" তখন স্বামী ধীরে-ধীরে বসে পড়ে' আমাকে তাঁর বুকের ভেতর তুলে নিয়ে বললেন, "ভুল হয়েছে তোমার, কাল যে সুরেশের বিয়ে।" তখন সেই সকাল-থেকে নিরুদ্ধ অশ্রু উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ল। আমি একশ'বার তাঁর পায়ের ধুলো নিলাম। তিনি আমার মাথায়, কপালে হাত বুলিয়ে বল্লেন "আমি কি তা' করতে পারি?" তখনও আমাদের মিলনকে মধুর ক'রে উৎসবের সানাই বাজছিল!

কমলা লিখেছিল 'মেজদাদার' বিয়ে, কিন্তু তার ছোট ছেলে 'মেজ' কথাটা ছিঁড়ে ফেলে এই অঘটন ঘটিয়েছে। বিধাতার বিধান! তাই আজও সন্ধ্যার সময় যখন দীপ জ্বালি, তখন অসম্ভবকে যিনি সম্ভব করেন, তুচ্ছের মধ্যে দিয়ে যিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁকে বারবার প্রণাম করি।

ডাগর মেয়ে

[শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বি-এ, বার-এট-ল]

প্রথম পরিচ্ছেদ

আগন্তুক।

মুটিয়ার মাথায় মসীবর্ণ ট্রাঙ্কটি, তদুপরি লাল-নীল ডোরা-কাটা শতরঞ্জ জড়ানো এক বাণ্ডিল বিছানা, পশ্চাতে, একহাতে ছাতা অন্য হাতে মাঝারি আকারের একটি চামড়ার ব্যাগ লইয়া, হৃষ্টপুষ্ট নধর দেহ জনৈক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক ফুলপুর গ্রামে প্রবেশ করিলেন। বেলা তখন তিনটা কিম্বা সাড়ে তিনটা। আষাঢ়মাস, আকাশে মেঘ করিয়া রহিয়াছে, ছাতাটি তাই খুলিতে হয় নাই। রেল ষ্টেশন অধিক দূর নহে, ক্রোশখানেক মাত্র ব্যবধান;—তথা হইতে হাঁটিয়াই আসিয়াছেন।

গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুটিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোন পাড়ায় যাবেন বাবু?"

"পশ্চিম পাড়া।"

"কাদের বাড়ী?"

বাবুটি কোনও উত্তর না করিয়া, পথের উভয় পার্শ্ব দেখিতে দেখিতে আপন মনে চলিলেন। দুই ধারেই জঙ্গল, মাঝে মাঝে একখানি করিয়া বাড়ী। কিয়দ্দূর আসিয়া, এক পুরাতন মজিয়া-যাওয়া পুষ্করিণী দেখিয়া বাবুটি সেইখানে দাঁড়াইলেন; পুকুরটির পানে চাহিয়া রহিলেন। মুটিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল—"এ পশ্চিম পাড়া নয়, এ জেলেপাড়া।"—"ওঃ" বলিয়া বাবুটি আবার পথ চলিতে লাগিলেন। আরও কিছুদূর আসিয়া এক প্রাচীন বটবৃক্ষ,—সেখানে দাঁড়াইলেন। গাছটির পানে চাহিয়া রহিলেন। মুটিয়া আবার বলিল—"বাবু আবার দাঁড়ালেন যে!—এটা মোড়ল পাড়া।"—"ওঃ" বলিয়া বাবুটি পুনর্ব্বার অগ্রসর হইলেন।

কিয়দ্দূর গিয়া মুটিয়া বলিল—"এই পশ্চিম পাড়া আরম্ভ হল বাবু। কোন বাড়ীতে যাবেন?"

বাবুটি বলিলেন—"চল্ না, দেখা যাক্।"

মুটিয়া ভাবিল, বাবুটি বোধ হয় কোনও ভদ্রগৃহস্থের বাড়ী অতিথি হইবেন—তা সে যেখানেই হউক। কিয়দ্দূর গিয়া সে বলিল—"এইটে বিশ্বেভূষণ মশায়ের বাড়ী, তিনি বড় পণ্ডিত।" আর কিয়দ্দূর গিয়া বলিল—"এই চাটুয্যে-বাড়ী। আগে এঁরাই ছিলেন গাঁয়ের জমিদার।" বাবু তথাপি দাঁড়ান না দেখিয়া, মুটিয়া অগ্রসর হইল।

আরও কিছুদূর গিয়া বাবুটি আবার দাঁড়াইলেন। চতুর্দ্দিক্ জঙ্গলে ঘেরা একখানি ভাঙ্গা বাড়ী, অধিকাংশই পড়িয়া গিয়াছে, এখানে ওখানে এক-আধটা দেওয়াল মাত্র দাঁড়াইয়া আছে। বাবুটি সেই ভগ্নাবশেষের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মুটিয়াও কিয়দ্দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল—"কতক্ষণ দাঁড়াব বাবু, কোথায় যেতে হবে চলুন।"

বাবুটি তাড়াতাড়ি চাদরের প্রান্তে চক্ষুমার্জ্জনা করিয়া বলিলেন—"আর, চাটুয্যে-বাড়ীতেই যাব।"

"চাটুয্যে-বাড়ী ত ছাড়িয়ে এলাম। সেইকালে বল্লেই হত!"—বলিয়া মুটিয়া ফিরিল।

চট্টোপাধ্যায়-ভবনে প্রবেশ করিয়া বামদিকে বৈঠক-খানা। বাবুটি সেই বৈঠকখানায় গিয়া উঠিলেন। বারান্দায় এক ভৃত্য বসিয়া তামাক খাইতেছিল, সে ইহাঁকে দেখিয়া হুঁকাটি নামাইল।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাড়ীতে কে আছেন হে?"

ভৃত্য বলিল—"কর্ত্তা বাবু আছেন।"

"রমণকৃষ্ণ বাবু?"

ভৃত্য একটু বিস্মিত হইয়া, ইহাঁর মুখপানে চাহিয়া বলিল—"আজ্ঞে না, তিনি ত স্বর্গে।"

"স্বর্গে? তবে কে, সদয়কৃষ্ণ বাবু আছেন?"

ভৃত্য বলিল—"আজ্ঞে না, তেনারও কাল হয়েছেন। বিনয় কিষ্ট বাবুর মধ্যম পুত্তুর বিনয় কিষ্ট বাবুই এখন মালিক। জ্যেষ্ঠ পুত্তুর অতুল কিষ্ট বাবুও গত হয়েছেন।"

বাবুটি বলিলেন—"বটে! তাঁরাও গত হয়েছেন? বিনয় বাবু বাড়ী আছেন ত?"

ভৃত্য বলিল—"আজ্ঞে না, তিনি ঘুমুচ্ছেন।"

ইহা শুনিয়া, বাবুটির ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি দেখা দিয়া তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া গেল। আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া তিনি বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন। মুটিয়ার মাথা হইতে বাক্স বিছানা নামাইয়া লইয়া, বখ্‌শিস্ দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। জুতা খুলিয়া চৌকির উপর পা তুলিয়া বসিয়া ভৃত্যকে বলিলেন—"ওহে, তোমার নামটি কি বাপু?"

"আজ্ঞে, আমার নাম কেষ্টধন মণ্ডল। আমরা সদ্গোপ।"

"সদ্গোপ? বেশ বেশ। তা, একছিলিম তামাক খাওয়াতে পার বাবা?"

"আজ্ঞে, পারি বৈকি! ব্রাহ্মণের হুঁকো?"

"হাঁ—ব্রাহ্মণের হুঁকোই নিয়ে এস।"

কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষ্ণধন কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে হুঁকাটি আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু কোথা থেকে আসছেন?"

"উপস্থিত কল্‌কাতা থেকে।"

"নিবাস?"

আগন্তুক হাত বাড়াইয়া হুঁকাটি লইয়া বলিলেন—"তোমার বাবু ঘুম থেকে উঠেছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"কি করছেন?"

"ঘুমিয়ে উঠে একটু বিশ্রাম করছেন।"

বাবুটির মুখে পুনর্ব্বার একটু হাসি দেখা দিল। জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবুকে আমার কথা বলেছ?"

"আজ্ঞে হাঁ, বলেছি। তিনিই বল্লেন, বাবুটি কে, কোথা থেকে আসছেন, জিজ্ঞাসা করে আয়।"

"তোমার বাবু আমায় চিন্‌বেন হে, চিন্‌বেন। যাও, তাঁকে ডেকে আন।"—বলিয়া আগন্তুক ধূমপান আরম্ভ করিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল। বৈঠকখানার ঘড়িটিতে ঠং ঠং করিয়া চারিটা বাজিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকথা।

যেজো হুঁকাটি হাতে কুরুৎ কুরুৎ করিয়া যিনি তামাক খাইতেছেন, তাঁহার নাম নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়। এই গ্রামেই ইঁহার আদিবাস। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যে ভগ্নস্তূপের নিকট দাঁড়াইয়া চাদরের প্রান্তে চক্ষু মুছিয়াছিলেন, সেই ছিল ইঁহার পৈত্রিক ভিটা ও জন্মস্থান। বিনয় বাবুদের সহিত জ্ঞাতি সম্পর্ক।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, ইস্কুল-পলায়ন জন্য পিতৃব্যের নিকট জুতা খাইয়া, পুঁটীমার বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া পিতৃ-মাতৃহীন নন্দলাল যখন পশ্চিমগামী হন, তখন তাঁহার বয়স ষোল বৎসর মাত্র। পশ্চিম বলিয়া পশ্চিম—একেবারে দেশীয় রাজ্য ভাওয়ালপুর। কতক রেলে, কতক গোরুর গাড়ীতে, বাকী হাঁটিয়া। নবাব সাহেবের নিজস্ব আদালতে পেস্কারী কর্ম্মে নিযুক্ত, নদীয়া জেলা নিবাসী রামজয় বিশ্বাস নামক এক কায়স্থ ভদ্রলোক ভাওয়ালপুরে সপরিবারে বাস করিতেন। তিনিই তখন সেখানে একমাত্র বাঙ্গালী। ক্ষুধাতুর ছিন্নবসন কপর্দ্দকশূন্য বালক নন্দলাল তাঁহারই নিকট গিয়া আশ্রয়ভিক্ষা করিল। রামজয় দয়াপরবশ হইয়া, খোরাক পোষাক দুইটাকা বেতনে নন্দলালকে নিজগৃহে পাচক নিযুক্ত করিলেন। যাহারা ফার্সী জানে, রাজ্যে তাহাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি দেখিয়া নন্দলালেরও সখ্ হইল সে ফার্সী পড়িবে। বেতনের দুইটি টাকাই ব্যয় করিয়া, প্রতিবেশী মুন্সী নেউলকিশোরের নিকট অবসর সময়ে প্রত্যহ সে উর্দ্দু ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিল। দেশে থাকিতে যে বালক বাগ্দেবীকে বাঘ-তুল্য মনে করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিত, সেই, বিদেশে উদরান্নের জন্য হীনকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, লেখাপড়ায় আশ্চর্য্য মনোযোগ দেখাইতে লাগিল। দুই-তিন বৎসরেই সে উর্দ্দু ও ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিল। তাহার মেধা ও অধ্যবসায় দেখিয়া রামজয় ভারি খুসী হইয়াছিলেন; পাচক-বৃত্তি ছাড়াইয়া, আদালতের নকল নেরেস্তায় ২০৲ বেতনে তাহাকে একটী মুহুরীগিরি কর্ম্ম করিয়া দিলেন। আরও দুই তিন বৎসর পরে, পেন্সন লইয়া রামজয়ের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইলে, আদালতে নন্দলালের ওকালতী করিবার সনন্দের জন্য প্রধান কাজি মির্জ্জা আসনউল্লা খাঁ সাহেবকে তিনি ধরিলেন। খাঁ সাহেব ফার্সীতে নন্দলালের অসাধারণ অধিকার দেখিয়া, সহজেই সনন্দ সহি করিয়া দিলেন। নবাব সরকার হইতে

তুমিদান পাইয়া গ্রামস্থ ভাওয়ালপুরে যে গৃহখানি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা, পাঁচ বৎসর মধ্যে মূল্য পরিশোধের মেয়াদে নন্দলালকে কোবালা করিয়া দিয়া তিনি দেশে চলিয়া আসিলেন।

অল্পদিনেই নন্দলালের পশার জমিয়া গেল, ওকালতীতে বেশ অর্থোপার্জ্জন হইতে লাগিল। গান্ধর্ব্ব-মতে এক সুন্দরী বোড়শী রাজপুত বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ে কিঞ্চিৎ ইংরাজি শিক্ষা হইয়াছিল, এখন হইতে অবসর মত সে বিদ্যারও চর্চ্চা করিতে লাগিলেন।

কুলপুর হইতে নন্দলালের পলায়নের পর তাঁহার খুড়া কিছুদিন তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। পৈত্রিক সম্পত্তির অংশীদারকে তাঁহার এই অনুসন্ধান, নিতান্তই "ঢেলানায়া গোছ" হইয়াছিল। মুহুরীগিরি চাকরী হওয়ার পর নন্দলাল বাড়ীতে প্রথম চিঠি লেখেন এবং মনি-অর্ডার করিয়া খুড়ার নামে দশটি টাকা পাঠাইয়া দেন। খুড়া তখন ৮প্রাপ্ত, খুড়তুতো ভাই সে টাকা সহি করিয়া লইয়াছিল। তখন হইতে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলিত। তাঁহার উকীল হওয়ার সংবাদও গ্রামে পৌঁছিয়াছিল। রাজপুতনীকে গৃহে আনিবার পর হইতে নন্দলাল পত্রাদি বন্ধ করেন। এই রাজপুতনীর গর্ভে তাঁহার দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা-সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহারা কেহই শৈশব অতিক্রম করিতে পারে নাই। গতবৎসর রাজপুতনীও ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। প্রথমটা নন্দলাল তাহার শোকে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন সামলাইয়া উঠিয়াছেন। তবে, ভাওয়ালপুরে আর মন টেকে না। টাকা কড়ি বিস্তর জমিয়াছে, কে তাহা ভোগ করিবে এই চিন্তাই এখন তাঁহার মনে প্রবল। সঞ্চিত অর্থে কিছু ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া, একটি স্বজাতীয়া ডাগর মেয়ে বিবাহ করিয়া অতঃপর পৈত্রিক ভিটায় বাস করিলেই মনে শান্তি পাইবেন, এখন ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। তাই আজ পঁচিশ বৎসর পরে নন্দলাল দেশে ফিরিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, বিনয়বাবু প্রথমে নন্দলালকে চিনিতে পারেন নাই। পরে পরিচয় পাইয়া, খুব সমাদর করিয়াই তাঁহাকে গৃহে রাখিলেন। সেদিন অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত দুই বন্ধুর সুখ-দুঃখের কথা আর ফুরায় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাত্রী অন্বেষণ।

সপ্তাহ মধ্যে গ্রামে রটনা হইয়া গেল, নন্দ চাটুয্যে ভাওয়ালপুরে ওকালতী করিয়া একেবারে টাকার 'কুমীর' হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন, বিবাহ করিবার জন্য একটি ডাগর মেয়ে এবং ক্রয় করিবার জন্য জমিদারী সম্পত্তি খুঁজিতেছেন, পৈত্রিক ভিটায় এক ইমারত তৈয়ারি হইবে, কলিকাতার বার্টিন কোম্পানী তাহার নক্সা প্রস্তুত করিতেছে ইত্যাদি।

এই জনরবের কিছু যে ভিত্তি ছিল না এমন নহে। দূর-গ্রামবাসী যে ধনী মহাজন বিনয় বাবুদের বিরুদ্ধে ডিক্রীর বলে কুলপুর গ্রাম নীলাম-খরিদ করিয়া লইয়াছিলেন, এখন তিনি ইহা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু দর হাঁকিয়াছেন অসম্ভব। দরের কষাকষি চলিতেছে। গৃহনির্ম্মাণের জন্য কার্ত্তিক মাসে ইষ্টক প্রস্তুত আরম্ভ হইবে, তাহার জন্যও জমি ঠিক হইয়াছে। এবং গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর লোক, খুব একটি ভাল মেয়ে খুঁজিয়া দিবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন।

একে একে অনেকগুলি মেয়ে দেখা হইল, কিন্তু কোনটিই তাদৃশ পছন্দ হইল না। বেশী ডাগর মেয়ে পাড়াগাঁয়ে পাওয়া একটু শক্ত - যাহাও বা দুই একটি আছে, তাহারা সুন্দরী নহে। একটি মেয়ে পাওয়া গিয়াছে, বয়স ১৪।১৫, সে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা।—আর একটি আছে, খুব সুন্দরী বটে, কিন্তু বয়স তাহার ১২ বৎসর মাত্র। এই দুইটি মেয়ে সম্বন্ধে নন্দবাবু বিষম দ্বিধায় পড়িয়া গিয়াছেন, কাহাকে মনোনীত করিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। পাড়ার একজন রসিক ঠাকুর্দ্দা বলিয়াছেন—"তুমি ত কুলীনের ছেলে হে, তার আর ভাবনা কি? ও—দুটিকেই বিয়ে করে ফেল, লাঠা চুকে যাক্।"

আগামী রবিবারে বিনয়বাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন। স্বর্ণকার ডাকাইয়া, বৈঠকখানায় বসিয়া নন্দবাবু বন্ধু-তনয়ের মুখ দেখিবার জন্য একছড়া হার ফরমায়েস দিতেছিলেন, এমন সময় একখানি চিঠি হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে বিনয়বাবু প্রবেশ করিলেন। নন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে, হাসছ কেন?"

বিনয় বলিলেন—"আগে সেকরাকে বিদায় কর, তারপর বলছি।"

স্বর্ণকারকে কয়েকটি গিনি ও উপযুক্ত উপদেশ দিয়া, "বুঝলে ত, শনিবার বিকেলবেলা হার ছড়াটি চাই-ই চাই —দেখো যেন দেরী না হয়" প্রভৃতি কথায় সাবধান করিয়া নন্দবাবু তাহাকে বিদায় দিলেন। তখন নিরিবিলি পাইয়া বিনয়বাবু বলিলেন—"ওহে, ভাগর মেয়ে ভাগর মেয়ে করে বেড়াচ্ছ, একটি খুব ভাগর মেয়ে আসছে।"

"কোথা আসছে?

"এই আমাদের বাড়ীতেই আসছে।"

"কোথা থেকে আসছে?"

"কলকাতা থেকে। আমার মেজ শালা হরিভূষণ কলকাতায় থাকেন, তিনি তাঁর স্ত্রী, ছেলে মেয়ে নিয়ে খোকার অন্নপ্রাশনে আসছেন। এই মেয়েটি, আমার শালাজ ঠাকুরুণের মাসতুতো বোন। তারা অন্য বাড়ীতে থাকে। সেও এঁদের সঙ্গে আসছে।"

"তুমি দেখেছ সে মেয়েকে?"

"দেখেছি। গত বৎসর কলকাতাতেই দেখেছি।"

"কেমন দেখতে? বয়স কত?"

"দেখতে খুব সুন্দরী যে, তা নয়। তবে মুখশ্রী, গড়ন-পিটন, বেশ। কথাগুলি তার ভারি মিষ্টি। বয়স—এই ষোল কি সতেরো হবে আর কি। কিন্তু, তাই বলে লাফিয়ে উঠো না ভায়া, কিন্তিং বাধাও আছে।" —বলিয়া বিনয়বাবু ওষ্ঠযুগল কুঞ্চিত করিলেন।

নন্দলাল উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বাধা?"

"তারা ব্রহ্মজ্ঞানী।"

শুনিয়া নিরাশভাবে নন্দলাল বলিলেন—"ব্রহ্মজ্ঞানী! তবে আর কি হবে? বেল পাকলে কাগের কি, বল! —তা, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে, হিঁদুর বাড়ীতে যে আসছেন? বাড়ীতে শালগ্রাম আনতে হবে, সহ্য করতে পারবেন?"

বিনয়বাবু বলিলেন—"সে ওসব ধর্ম্ম টর্ম্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না—সে হল একজন কবি। মাসিক পত্রে শ্রীমতী কাননবালা দেবী সই-করা কবিতা ছাপা হয়, দেখেছ কখনও?"

"কৈ, না।"

"চিরকাল পড়ে' আছ খোট্টার দেশে, বাঙলা সাহিত্যের কোনও খবরই রাখ না!—এ, সেই কবি কাননবালা।"

"বেশ লেখাপড়া জানে তা হলে?"

"খুব।—সে কি করতে আসছে জান? পাড়াগাঁ দেখতে আসছে। আজ কাল পাড়াগাঁ বর্ণনা করা কবিদের ভারি ফেসান হয়েছে কি না! যত ছেলে কলু হাড়ি মুচির ঘর-কন্নার কথা, পানা-পুকুর পচা ডোবা শেওড়া বনের বর্ণনা, কবিরা আদা-জল খেয়ে আরম্ভ করে' দিয়েছেন। কানন-বালা ত কখনও পাড়াগাঁ দেখেনি, চিরকাল কলকাতাতেই মানুষ; ঐ সব বর্ণনা করতে না পেরে অন্য কবিদের কাছে সে হেরে যাচ্ছে! তাই তার খেয়াল হয়েছে, পাড়াগাঁ দেখবে। এই যে আমায় শালায় কি লিখেছেন দেখনা" —বলিয়া বিনয়বাবু পত্রখানি নন্দলালের হস্তে দিলেন।

নন্দলাল বাবু পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া ধীরে ধীরে পত্রখানি পাঠ করিলেন। শেষে বলিলেন—"তা, এসে দেখুন। পানাপুকুর শেওড়া বনের কিছু অভাব নেই এখানে। আমরাও এই সুযোগে কবি-দর্শন করে' নিই।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কবি-দর্শন।

শুক্রবার হইতেই বিনয়বাবুর গৃহে জ্ঞাতি-কুটুম্ব-সমাগম আরম্ভ হইল। শনিবার অপরাহ্নের গাড়ীতে হরিভূষণ বাবু সপরিবারে আসিয়া পৌঁছিলেন। শ্যালক ও শ্যালক-পত্নীকে অভ্যর্থনা করিয়া বিনয়বাবু অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। সোণার চশমা চোখে বছর বাইশ তেইশ বয়সের এক যুবক, ব্যাগ হাতে করিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। ব্যাগটা ধুপ করিয়া ফেলিয়া, চৌকীর উপর বসিয়া খবরের কাগজ নাড়িয়া নিজেকে হাওয়া করিতে লাগিল। "উঃ কি গরম! ফ্যান্‌ও নেই দেখ্‌ছি"—বলিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল।

নন্দবাবু সেইখানে বসিয়া ছিলেন। বলিলেন—"পাড়াগাঁয়ে আর ফ্যান্ কোথায় পাবেন বলুন। এখানে ত বিদ্যুতের কল নেই।"

যুবক বলিল—"গোটাকতক ইয়ষ্ট-ফ্যান্ এনে রাখলেই হয়। কেরোসিন তেলে চলে। কিম্বা টানা-পাখা।"

নন্দবাবু বলিলেন—"তা আছে বৈকি,—বড় বড় লোকের বাড়ীতে আছে। আমাদের ত অবস্থা সে রকম নয়।"

একথা শুনিয়া যুবক যেন একটু অপ্রতিভ হইল। বলিল —"আর, পাড়াগাঁয়ে বোধ হয় অত দরকারও হয় না। চারিদিকে এই সব খাল বিল বন জঙ্গল থাকাতে, অনেকটা ঠাণ্ডা রাখে। মশায় কি—এই বাড়ীরই—"

নন্দলাল বলিলেন—"না, আমি এ বাড়ীর নই। এঁরা আমার জ্ঞাতি—বন্ধুও বটেন। আপনার নামটি কি?"

যুবক বলিল—"আমার নাম দেবকুমার মুখোপাধ্যায়। হরিভূষণ বাবু যিনি এসেছেন, উনি সম্পর্কে আমার ভগ্নী-পতি হন।"

নন্দলাল বাবু বলিলেন—"ওঃ, তা বেশ বেশ। তামাক ইচ্ছে করুন।"—বলিয়া হুঁকাটি বাড়াইয়া দিলেন।

দেবকুমার বলিল—"সর্ব্বনাশ!—হুঁকো দেবেন না মশায়! আপনার হুঁকোর জাতটি একদি মারা যাবে। আমি যে ব্রাহ্ম।"—বলিয়া সে হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল। শেষে বলিল—"আমি তামাক খাইনে।"

নন্দলাল বলিলেন—"হলেনই বা ব্রাহ্ম—তাতে কি হয়েছে? হুঁকোর আমার জাত যাবে কেন? ওসব প্রেজুডিস্ আমার নেই।"

অন্যান্য দুই চারিটী কথার পর নন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাদের সঙ্গে কে একটি মেয়ে এসেছেন তিনি নাকি খুব ভাল কবিতা লিখ্‌তে পারেন?"

যুবক বলিল—"কানন? হ্যাঁ, কবিতা লেখে বটে।"

"উনি কি আপনার কেউ হন?"

"আমার মাস্‌তুতো ভাইয়ের পিস্‌তুতো বোন। ওদেরই বাড়ীতে আমি মানুষ—তবে এখন আলাদা থাকি বটে।"

মাস্‌তুতো ভাইয়ের পিস্‌তুতো বোন পদার্থটা নন্দলাল বাবু হঠাৎ ধারণা করিতে পারিলেন না। মনে-মনে হিসাব করিতে লাগিলেন। এমন সময় বিনয় বাবু আসিয়া বলিলেন—"ওহে দেবকুমার, তোমার দিদি ডাকছেন, বাড়ীর ভিতর যাও। মুখ হাত ধুয়ে একটু জলটল খাওগে। কেষ্টা, যা বাবুকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে যা।"

দেবকুমার চলিয়া গেলে বিনয় বাবু চুপি চুপি বলিলেন—"যদি ব্রাহ্ম মেয়েকে বিয়ে করতে কোনও আপত্তি না থাকে তবে এই সুযোগ ভায়া। আমি তোমার পথ অনেকটা পরিষ্কার করেও এসেছি।"

নন্দবাবু আগ্রহের সহিত বলিলেন—"কি রকম?"

বিনয় বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"কানন আমার বড় জামাই বাবু,—আমাকে, আমার শালাজের সম্পর্ক ধরে' ডাকে কিনা—বড় জামাই বাবু, সাতটি দিন ত আমার মেয়াদ, এই সাত দিনে, পাড়াগাঁয়ে যা কিছু দেখবার আছে আমায় দেখিয়ে দিতে হবে কিন্তু। আমি বল্লাম বেশ ত, খুব চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখে শুনে বেড়াও। সে বল্লে, আমি কার সঙ্গে যাব? আপনি আমায় নিয়ে যাবেন? আমি মাথা চুল্‌কে বল্লাম—আমার ত অত সময় হবে না। আমি বরঞ্চ তোমার একজন গাইড্ ঠিক করে দিচ্ছি। আমারই একজন বন্ধু, প্রবীণ লোক। আর, তিনিও কবি। তবে বাঙ্গালা কবি নন, কার্সী ভাষায় অতি সুন্দর সুন্দর কবিতা তাঁর আছে।"

নন্দলাল বলিলেন—"এতগুলি মিথ্যে কথা বলেছ?"

"কেন, মিথ্যেটা কি বলেছি?"

"প্রথম নম্বর, আমি নিজে কবি নই। যে সব কার্সী কবিতা মাঝে মাঝে তোমার কাছে আওড়াই, তা সব বড় কবির রচনা—হাফেজ, সাদী, ফির্দৌসী। দ্বিতীয় নম্বর, আমি প্রবীণ লোক নই। আমার বয়স মোটে একচল্লিশ বছর। মাথায় টাক পড়লে আর চশমা নিলেই কি মানুষ প্রবীণ হয়?"

বিনয় বলিলেন—"ওহে বুরচনা? তোমার প্রবীণ বলে বর্ণনা না করলে মেয়েটি তোমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে চাইবে কেন? তারপর, কবিতা টবিতা বলে তুমি তোমার নবীনত্ব প্রমাণ করে' দিও এখন।"

নন্দলাল বলিলেন—"ওকে নিয়ে রোজ আমার বেড়াতে যেতে হবে নাকি?"

"হবে না?—নৈলে কে নিয়ে যাবে?"

"কেন, ঐ যে ছোকরাটি এসেছে—পিস্‌তুতো বোনের মাস্‌তুতো ভাই না কি শুন্‌লাম।"

বিনয় বলিলেন—"তাও কি হয়? তোমাকেই যেতে হবে। তুমি কবি শুনে, তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে মেয়েটি অস্থির হয়েছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁর কি কোনও ছাপানো কার্সী কেতাব আছে? আমি বল্লাম—তা ত জানিনে; একটু পরেই তিনি জল খেতে ভিতরে আস্‌বেন, সেই সময় তুমি বরং জিজ্ঞাসা কোরো।"

নন্দলাল বাবু বলিলেন—"তুমি ত ভাল কাণ্ডটি বাধিয়ে

বসেছে দেখছি! ওসব স্বাধীনতাওয়ালা মেয়েছেলের সঙ্গে আমি কি বেড়াতে পারি? আমার চৌদ্দ পুরুষে কখনও বেড়ায়নি! সে সব আমি পারবো না ভাই। আমরা সেকেলে মানুষ, ও সব ইংরিজি ধরণধারণ জানিও না, বুঝিও নে; কি বলতে কি বলব, শেষে আমায় একটা জানোয়ার ঠাওরাবে!"

কিন্তু অর্দ্ধঘণ্টা পরে নন্দবাবু যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, কাননবালা আসিয়া প্রণাম করিয়া অতি সহজ ভাবে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিল, তখন "স্বাধীনতাওয়ালা মেয়েছেলে" সম্বন্ধে নন্দলাল বাবুর সকল শঙ্কা দূর হইয়া গেল;—এমন কি, যে যে পত্রিকায় কাননবালার কবিতা ছাপা হইয়াছে তাহা যদি সঙ্গে থাকে তবে সেগুলি দেখিবার জন্য প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভালবাসার নূতন থিওরি।

বিনয় বাবুর ছেলের অন্নপ্রাশন হইয়া গেলে, সোমবার প্রাতের ট্রেণে হরিভূষণ বাবু কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। দেবকুমার রহিল, সে এক সপ্তাহ পরে মেয়েদের লইয়া যাইবে।

প্রতিদিন প্রাতে ও অপরাহ্নে কাননবালা সাজিয়া গুজিয়া ছুতামোজা পরিয়া নন্দলাল বাবুর সঙ্গে পাড়াগাঁ দেখিতে বাহির হয়। চাষাভূষার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মেয়েদের সহিত নানা গল্প জুড়িয়া দেয়, নন্দলাল বাবু বাহিরে বসিয়া কলাপাতের নলে দা-কাটা তামাকু সেবন করেন। কাননবালা মাঠে গিয়া চাষাদের নাঙলচষা, পুকুর ধারে দাঁড়াইয়া জেলেদের মাছ ধরা, ছুতার বাড়ী গিয়া ছুতার-মেয়েদের চিঁড়ে কোটা—এই সব দেখিয়া বেড়ায় এবং প্রশ্নে প্রশ্নে নন্দলাল বাবুকে অস্থির করিয়া তুলে। মাঝে মাঝে পকেট হইতে ছোট একখানি খাতা বাহির করিয়া নোট করিয়া লয়। নোটগুলি কতকটা এই ধরণের:—"ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কোমরে একপ্রকার রঙীন সুতা বাঁধা থাকে তাহাকে ঘুন্সী বলে। মেয়েরা চেরা বাঁশে নির্ম্মিত এক প্রকার লম্বা গোল (cylindrical) পাত্রে পুকুর ঘাট হইতে চাউল ধুইয়া আনে, ঐ পাত্রের নাম ঘুচুনী। পল্লীগ্রামে তামাককে গুড়ুক এবং দাড়ি কামানোকে খেউরি হওয়া বলে। বর্ষাকালে বনে জঙ্গলে পাতালকোঁড় নামক একপ্রকার বৃহৎ লাল ফুল (ডাল নাই পাতা নাই) মাটী ফুঁড়িয়া বাহির হয়, অনেক দূর হইতে ইহার দুর্গন্ধ পাওয়া যায়।" ইত্যাদি। শ্রান্ত হইলে পাকা সড়কের পুলের আলিসায় বসিয়া দুইজনে সূর্য্যাস্তের শোভা দেখে। নন্দবাবু মাঝে মাঝে ফার্সী কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহার অর্থ বুঝাইয়া দেন—এক একটির কবিত্ব সৌন্দর্য্যে কাননবালা একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; খাতা বাহির করিয়া সমগ্র কবিতাটি অর্থসহ লিখিয়া লয়। এইরূপে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল।

* * * * *

দেবকুমার, নন্দবাবুর সহিত বৈঠকখানাতেই শয়ন করিত। একদিন রাত্রে সে বলিল—"নন্দবাবু, আপনি শুনলাম অবিবাহিত।"

নন্দবাবু বলিলেন—"হ্যাঁ।"

"আপনি শুনলাম, একটি বয়স্থা সুন্দরী মেয়ে খুঁজছেন, কিন্তু মনের মতনটি পাচ্ছেন না।"

নন্দলাল বাবু হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, তাই বটে। তুমি ঘটকালি করবে না কি?"

দেবকুমার বলিল—"যদি বলেন ত পারি বৈ কি! আচ্ছা, আপনার ত ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে কোনও প্রেজুডিস্ নেই সেদিন বল্লেন। যদি একটি বয়স্থা সুন্দরী ব্রাহ্ম মেয়ে পান,—তা হলে কোনও আপত্তি আছে কি?"

নন্দবাবু বলিলেন—"কোথা সে মেয়ে?"

দেবকুমার বলিল—"এই ধরুন, আমাদের কাননবালার কথাই যদি বলি। ওর জন্যে একটি ভাল পাত্র দরকার ত!"

নন্দলাল বাবু বলিলেন—"তা, আমাকে কি তুমি ভাল পাত্র ঠাওরালে?"

"কিসে নয়? বিদ্যায়, অর্থে, পদমর্য্যাদায়—"

"আমার বয়স চল্লিশ বৎসর।"—কথা সংক্ষেপ করিবার জন্যই নন্দলাল বাবু একচল্লিশ স্থানে চল্লিশ বলিলেন, অথবা বলিবার ভুল, তাহা আমরা অবগত নহি।

দেবকুমার বলিল—"চল্লিশ আর বেশী বয়স কি? আমাদের সমাজে ত লোকে নিজে বিলক্ষণ উপার্জ্জনক্ষম না হলে বিবাহই করে না—চল্লিশ বৎসরে প্রথম বিবাহ ত আমাদের সমাজে ঢের লোকেরই হয়।"

নন্দলাল বলিলেন—"বয়স সম্বন্ধে আপত্তি না হলেও, অন্য সব সম্বন্ধে ত আপত্তি হতে পারে। রূপে, গুণে, কিসে আমি কাননবালার যোগ্য? ওর মা বাপের যদি বা আপত্তি নাও হয়, ওর নিজের ত আপত্তি থাকতে পারে!"

দেবকুমার হেঁহেঁহেঁ করিয়া হাসিতে লাগিল।

নন্দবাবু বলিলেন—"হাসছ যে?"

দেবকুমার বলিল—"আপনার কথা শুনে। বল্লেন কিনা কানন কি আমায় পছন্দ করবে?—তাই হাসি পেল।"

নন্দবাবু বলিলেন—"কেন, তাতে হাসবার কারণ কি হল?"

"সে কথাটা গোপনীয়। আপনাকে বলা উচিত হবে কিনা তাই ভাবছি। আচ্ছা, বলিই না হয়। কিন্তু কাউকে আপনি বলবেন না প্রতিজ্ঞা করুন।"

নন্দবাবু অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত বলিলেন—"আচ্ছা কাউকে বল্‌ব না। কথাটা কি?"

দেবকুমার উঠিয়া, নিজের মশারি হইতে মুখ বাহির করিয়া, নন্দলাল বাবুর মশারিতে মুখ চাপিয়া তাঁহার কাণের কাছে বলিল—"আপনাকে কাননের ভারি পছন্দ হয়েছে।"

নন্দলাল বাবু উচ্চ শব্দে বলিয়া উঠিলেন—"ধুৎ!"—কিন্তু তাঁহার বুকের ভিতরটা গুর্‌গুর্ করিতে লাগিল।

দেবকুমার বলিল—"সত্যি বলছি আপনাকে।"

নন্দ বলিলেন—"যাও যাও আর ঠাট্টা করতে হবে না। কিসে বুঝলে, শুনি?"

"এ আর বোঝাবুঝি কি? কাননের কথাতেই আমি বুঝেছি।"

"কথাতেই? কি বলেছে সে?"

"আপনার কথা সে যে রকম করে' বলে, তাতেই বেশ বুঝতে পারা যায়। আপনার সুখ্যাতি তার মুখে আর ধরে না! আপনার কবিতা শুনে সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছে। সত্যি কথাটা বলেই ফেলি। সে স্পষ্টই আমাকে বলেছে, নন্দবাবুকে আমি ভালবাসি। আমার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই ওর ভাব কিনা, এক বাড়ীতে ছিলাম, একসঙ্গে খেলা করেছি—আমার কাছে ত ওর কোন কথা গোপন নেই। এমন কথা পর্য্যন্ত বলেছে—উনি ত একটি অগ্রজ মেয়ে খুঁজছিলেনই—কি জানি যদি আমাকে ওঁর পছন্দই হয়, আমাকে প্রোপোজই করেন, আমার বাপ মা রাজি হবেন ত?—এই ত অবস্থা মশায়। আপনাকে খুলেই বল্লাম—লোহাই আপনার, কথা যেন প্রকাশ না হয়।"

নন্দবাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আশ্চর্য্য ত!"

"আমারই প্রথম প্রথম একটু আশ্চর্য্য ঠেকেছিল যে আপনার দিকে ও এ-রকম ঢলে পড়লো কেন! তারপর ভেবে চিন্তে কারণটা বেশ জলের মত বুঝতে পারলাম। এ সম্বন্ধে আমার একটা থিওরিই আছে কিনা।"

"কি থিওরি।"

"থিওরিটা এই। যেমন দুই আর দুই—চার, তিনও নয় পাঁচও নয়—সেই রকম, উপযুক্ত বয়সের ও সামাজিক অবস্থার একজন মেয়ে-কবি আর একজন পুরুষ-কবিকে একসঙ্গে করে' দিন—তারা পরস্পরকে ভালবাসবেই বাসবে। কিন্তু অন্য কিছু হলে হবে না, দুজনেই কবি হওয়া চাই। কবিদের প্রাণটা ভারি মেলাবেশ কিনা! আপনিও কবি—না না—প্রতিবাদ করবেন না—পাখী সব করে রব রাতি পোহাইলো, কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিলো—ইলো আর ঠিলো মিল করতে জান্‌লেই কবি হয় না—যার কবির হৃদয় আছে সেই কবি—সেই হিসাবে আপনি কবি। দুজনেই কবি—সুতরাং দুই আর দুইয়ে চার হয়েছে;—এ আর নতুন কথা কি?"

নন্দবাবু নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন। দেবকুমার আধ মিনিট কাল অপেক্ষা করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—"নন্দবাবু!"

"কি?"

"একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী—একথা মানেন ত?"

নন্দবাবু ভাবিলেন, আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে কোনও আপত্তি হইবে কি না, তাহা জানিবার জন্যই বোধ হয় জেরা করিতেছে। বলিলেন—"মানি বৈ কি।"

দেবকুমার বলিলেন—"ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী—এখানেও তিনি উপস্থিত। আপনি ঈশ্বরসাক্ষী বলুন দেখি, কাননবালার প্রতি এক'দিনে আপনার কিঞ্চিৎ প্রেমভাব হয়েছে কি না?"

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া নন্দবাবু বলিলেন—"হয়েছে।"

দেবকুমার বলিয়া উঠিল—"তা'হলে, আমার থিওরি নিঃসংশয়েই প্রমাণ হয়ে গেল। আপনারা যখন পরস্পরকে ভালবেসেছেন, তখন এর একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম—বিবাহ। কথাটা আপনি ভেবে দেখ্‌বেন নন্দবাবু। আজ আর এ বিষয়ে আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করব না। কাল দুজনে কোনও সময় নিরিবিলিতে একথা হবে।"—বলিয়া দেবকুমার পাশ ফিরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইল।

নন্দলাল কিন্তু সারারাত্রি চক্ষুর পাতা বুজিতে পারিলেন না।

পরদিন নিভৃতে দেবকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইলে নন্দলাল তাহাকে বলিলেন—"ভায়া, কাননকে আমি বিবাহ করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু 'প্রোপোজ' কি করে' করতে হয় আমি ত কিছুই জানিনে। ওর বাপ মাকে চিঠি লিখব? —না কি করবো?—আমি ত ভাই এ সব ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি, কি করতে টরতে হবে সব আমায় বলে দাও।"

দেবকুমার বলিল—"আমরা ত আজ রাত্রের ট্রেণেই চল্লাম;—দু'চারদিন পরে আপনাকেও তা হলে কলকাতায় আসতে হয়।"

"তার পর।"

"ওদের বাড়ী আপনাকে আমি নিয়ে যাব, ওর বাপমার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব। আপনি যাতায়াত আরম্ভ করবেন।"

"তার পর?"

দেবকুমার বলিল—"যাতায়াত করতে করতে, একদিন সুযোগ বুঝে, কাননের কাছেই আপনি 'প্রোপোজ' করবেন।"

"তার পর?"

"কানন রাজি হলে,—রাজি ত হবেই, ও ত আপনারই জিনিষ—তার পর ওর বাপ মাকে বলতে হবে। তাঁদের মন আমি আগে থাকতেই ভিজিয়ে রাখব এখন। তাঁরা সম্মতি দিলেই বিবাহ স্থির হবে—অর্থাৎ আমরা যাকে 'এন্‌গেজমেণ্ট' বলি তাই হবে।"

"তার পর?"

"তার পর থেকেই ওরা আপনাকে প্রায়ই আহারের নিমন্ত্রণ করবেন। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—আপনি ছুরি কাঁটা ব্যবহার করতে জানেন ত? ওঁরা আবার টেবিলে খান কি না।"

"না, ছুরি কাঁটা ত কখনও ধরিনি ভাই।"

"আচ্ছা, সে আপনাকে আমি শিখিয়ে নেব। এমন কিছু শক্ত নয়। দু'চারদিন অভ্যেস করলেই হবে—আপনি কলকাতায় আসুন ত। ভাল কথা—রামপাখী টাখী আপনার চলে?"

নন্দলাল বলিলেন—"না ভাই। মুসলমান রাজ্যে থাকি বটে, কিন্তু ওটা ত কখনও খাই নি। না খেলে কি—নিতান্তই—চলবে না?"

দেবকুমার একটু চিন্তিত হইয়া বলিল—"চলা একটু শক্ত বটে। আর কিছু নয়, ওঁরা মনে করতে পারেন, লোকটা ভারি কুসংস্কারাপন্ন। আজকাল না খাচ্ছে কে? ওটা আর শিখে নিতে পারবেন না?"

"তা, নিতান্ত যদি দরকার হয়, না হয় শিখেই নেব। তার জন্যে আটকাবে না।"

সারাদিন ধরিয়া দুজনে নানারূপ পরামর্শ চলিল। স্থির হইল, দেবকুমার কলিকাতায় পৌঁছিয়াই ইহাঁর জন্য একটি ছোট খাট বাড়ীর সন্ধান করিবে। বাড়ী ও চাকর বামুন ঠিক করিয়া সংবাদ দিলেই নন্দলালবাবু কলিকাতা যাইবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমাজ-সমস্যা।

দেবকুমার, কাননবালা প্রভৃতিকে লইয়া রাত্রের ট্রেণেই কলিকাতা চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতে বিনয়বাবুও একটু কাযে গ্রামান্তরে গমন করিলেন, দুই তিন দিন পরে ফিরিবেন।

নন্দলালবাবুর মনটা বড় উদাস। কিছুই আর ভাল লাগে না। লোকজন সাক্ষাৎ করিতে আসিলে বিরক্ত হন। কোথাও বাহির হন না—বৈঠকখানার বারান্দায় চুপটি করিয়া বসিয়া তামাক খান, আর মনের মধ্যে কাননবালাকে ধ্যান করেন। কবে সে কোন মিষ্ট কথাটি বলিয়াছিল, দিনে দশবার তাহাই মনে পড়ে। কেবলই কল্পনা করেন, কাননের সহিত যেন তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, কানন তাঁহার

নবনির্ম্মিত গৃহখানি আলো করিয়া রহিয়াছে, সুখের ও আনন্দের পার নাই কূল নাই ;—ভাবিতে ভাবিতে নন্দবাবু বিহ্বল হইয়া পড়েন। খালি মনে হয়, কানন এখন কলিকাতায় কি করিতেছে, তাহারই কথা ভাবিতেছে কিনা! কলিকাতায় যাইবার জন্ত, কাননকে আবার দেখিবার জন্ত তাঁহার প্রাণটা ছট্‌ফট করিতে লাগিল।

তিন দিন পরে বিনয়বাবু বাড়ী ফিরিলেন। বন্ধুর মনটি উদাস দেখিয়া বলিলেন—"ভায়া, তুমি যেন একটু হতাশ হয়েছ মনে হচ্ছে। আমি বলি কি, ঐ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মেয়েটিকেই বিয়ে করে ফেল। আমি শুন্‌লাম অন্ত মেয়েটির চেয়ে রূপে একটু খাটো হলেও, গুণে সেটুকু ও পুষিয়ে নিয়েছে। আমার স্ত্রী বলছিলেন, মেয়েটির স্বভাবটি ভারি নরম—যেমন বুদ্ধি বিবেচনা,সেবা যত্ন করতেও তেমনি পটু। কি বল, কথা দেব ওর বাপকে?"

নন্দলাল বাবু বলিলেন--"না ভাই, থাক। আমি ওকে বিয়ে করতে চাইনে।"

"তবে? কাকে বিয়ে করতে চাও?"

"যাকে চাই, তাকে দিতে পারবে?"

"কাকে চাও, শুনি?"

"কাননবালাকে।"

বিনয় বাবু বলিলেন—"বল কি হে! অ্যাঁ! ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়ে করবে? জাতটি যাবে যে!"

"জাত গেল ত বয়েই গেল।"

বিনয় কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া বন্ধুর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—"ও কি কথা হে?—সত্যি বলছ তুমি?"

নন্দবাবু যেন একটু অধীর হইয়াই বলিলেন—"তোমার যে অন্ত পাওয়া ভার দেখ্‌ছি। গোড়ায় তুমিই বলেছিলে খাসা একটি ডাগর মেয়ে আসছে, যদি বিয়ে করতে চাও ত এই সুযোগ!—এখন এ রকম কথা বলছ কেন?"

বিনয়বাবু বলিলেন—"আমি তখন আমোদ করে বলেছিলাম বৈ ত নয়। আমি কি তখন জানি যে সত্যিই তুমি ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়ে করবার জন্তে ক্ষেপবে—বিশেষ এই বয়সে?"

ইহার পর নন্দলাল নিজের মনের অবস্থাটা অল্পে অল্পে সবই বিনয় বাবুকে বলিলেন। দেবকুমার যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছে—সকল কথা নয়—তাহারও কিছু কিছু প্রকাশ করিলেন।

সকল কথা শুনিয়া বিনয়বাবু বলিল—"তাইত হে, বুড়ো বয়সে তোমায় এ-রোগে ধরল? এ ত বড় সোজা রোগ নয়!"

নন্দ বলিলেন-"রোগ ত সোজা নয়ই ;—আরোগ্য হতেও ইচ্ছে করে না।"

বিনয় বাবু হাসিয়া বলিলেন—"ও রোগের লক্ষণই ত তাই, ভায়া। তা, তোমার মনের ভাব যখন এরকমটাই দাঁড়িয়েছে, তখন বিবাহ কর, আমি বাধা দেব না। আর ব্রাহ্ম হলেও, ব্রাহ্মণের মেয়ে ত বটে, ওর বাপ ব্রাহ্ম হবার আগে মস্ত কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিয়েটা ত হয়ে যাক্, তার পর দুজনে একটা প্রায়শ্চিত্ত-টিত্ত করে নিও। ফুলপুর যদি তোমায় কিনে দিতে পারি—আশা ত আছে পারবো—তখন তুমি হবে গ্রামের জমিদার—কোনও ব্যাটা টঁ্যাকোঁ করতে পারবে না। ভট্‌চায্যি মশায়দের—"

নন্দবাবু বলিলেন—"তাই হবে। সেই ব্যবস্থাই হবে। শুভকর্ম্মটা ত আগে হয়েই যাক্। এখন থেকে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দিয়ে দরকার নেই।"

বিনয় হাসিয়া বলিলেন—"যে রকম শুনছি, সে ত হয়েই গেছে ধর। কথায় বলে, গাই-বাছুরে ভাব থাকলে বনে গিয়ে দুধ খাওয়ায়।"

নন্দলাল কৃত্রিম রোষ বলিলেন—"চুপ্! এটা কি একটা উপমা হল?"

বিনয় বাবু বলিলেন—"কেন, মন্দ কি হল? তুমি একটা উপমা দিলে, তাই আমিও একটা দিলাম।—সম্পর্কে গাই বাছুর না হলেও, বয়সে ত বটে!"—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

দুই দিন ধরিয়া উভয় বন্ধুতে এ সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ হইল। স্থির হইল, এখন বিবাহ করিয়া দেশে না আসিয়া, কলিকাতা হইতেই ভাওয়ালপুরে চলিয়া যাওয়া ভাল। বাড়ীখানি তৈয়ারি হইতেও অন্ততঃ পক্ষে বছর খানেক লাগিবে। ফুলপুরের বর্ত্তমান অধিকারী এখন যেরূপ মূল্য হাঁকিয়াছেন, কিছুদিন চুপচাপ থাকিলে সে মূল্যও কিছু কমিতে পারে। সকল দিক বিবেচনা করিয়া এখন দুই তিন বৎসর এখানে বধূসহ না আসাই ভাল।

কয়েকদিন পরে কলিকাতা হইতে দেবকুমারের পত্র আসিল, বাড়ী প্রভৃতি ঠিক হইয়াছে। নন্দলাল বাবু কলিকাতা যাত্রা করিলেন। বিনয় বাবু ষ্টেশনে গিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভ্রান্তি-নিরাস।

আজ একমাস নন্দবাবু কলিকাতায় আসিয়াছেন। কাননবালার পিতা সুরেশ বাবুর সহিত তাঁহার বেশ আলাপ পরিচয় হইয়াছে, যাতায়াতও আরম্ভ করিয়াছেন। কাননের মাতা বলিয়া থাকেন—"লোকটি ভারি চমৎকার। এমন সরল আর অমায়িক, যেন ছেলে-মানুষটি।" প্রায়ই বিকাল বেলা উহাদের বাটীতে যান, ভাওয়ালপুর রাজ্যের নানাবিধ গল্প করেন, ফার্সী কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহার অর্থ বুঝাইয়া দেন; কাননবালা একখানি খাতায় ইহাঁর নিকট হইতে ভাল ভাল ফার্সী কবিতা টুকিয়া রাখে। খাতা প্রায় ভরিয়া আসিল। সে ইহাঁর নিকট ফার্সী পড়িতেও আরম্ভ করিয়াছে। যে যে মাসিকপত্রে কাননের কবিতা বাহির হয়, নন্দবাবু তাহার সকলগুলির গ্রাহক হইয়াছেন। কাননের অনেক কবিতা তিনি ফার্সীতে তর্জ্জমাও করিয়াছেন। শীঘ্র সেগুলি বহি করিয়া ছাপাইবেন।

কিন্তু একটা বিষয় নন্দবাবু কিছুই বুঝিতে পারেন না। দেবকুমার, কাননের মনের ভাবের যে সংবাদ দিয়াছিল, অদ্যাবধি কাননের ব্যবহারে তাহার কিছুমাত্র বাহ্যচিহ্ন নন্দবাবু দেখিতে পান না। ভাবেন, দেবু কি তবে উপহাস করিয়া ঐ সকল কথা বলিয়াছিল? না, তরুণীর স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃই কানন তাহার মনোভাব প্রকাশ করে না?—নন্দবাবু সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

একদিন তাঁহার পৌঁছিতে একটু বিলম্ব হইল। সেখানে গিয়া শুনিলেন, সুরেশ বাবু সস্ত্রীক কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছেন, কানন বাড়ী আছে। কাননের সঙ্গে বসিয়া তিনি গল্পগুজব ও কাব্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পর ছাদে জ্যোৎস্নায় বেড়াইতে বেড়াইতে নন্দ বাবু কাননকে নিজের মনের কথাটি বলিলেন।

শুনিয়া কাননবালা যেন কাঠ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ সে কথা কহিতে পারিল না।

নন্দবাবু বলিলেন—"বল কানন, উত্তর দাও। আমি নিজেকে তোমার পায়ের কাছে রেখে দিলাম। বল কানন, তুমি আমায় নেবে কি না। এ ছেড় মাস, দিনে তুমি আমার ধ্যান, রাত্রে তুমি আমার স্বপ্ন,—তোমার আশাতেই আমি প্রাণ ধরে আছি। বল, তুমি আমার আশা পূর্ণ করবে কি না।"

এইবার কাননের চক্ষে জল আসিল। সে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"নন্দবাবু, একথা আপনি আমায় কেন বলছেন!—ছি ছি আর বলবেন না। বড় ভাইকে কিম্বা অন্য কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়কে লোকে যে চোখে দেখে, আমি যে এতদিন আপনাকে ঠিক সেই চোখেই দেখে এসেছি! আপনার কাছে আমি কত শিখেছি—আমি ছাত্রী, আপনি গুরু—আপনার আমার মধ্যে এই সম্পর্কই ত এতদিন জানতাম!"

নন্দলাল বলিলেন—"কানন, তোমার আমার মধ্যে বয়সে যা তফাৎ, তাতে আমাকে ওরকম মনে করা তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়। আমি তোমার নিতান্তই অযোগ্য, তা আমি বেশ জানি। কিন্তু যে অযোগ্য, তাকে কি খুব সামান্য একটুখানি ভালবাসা যায় না? আমি এমন বলছি নে যে আজ থেকেই তুমি আমাকে, লয়লা যেমন মজনুকে ভালবাসতো, সোরাব যেমন রুস্তমকে ভালবাসতো, সেই ভালবাসা আমায় দাও। আমি খুব সামান্য পেলেও এখন বেঁচে যাই কানন। তুমি আমার গৃহিণী হও—হয়ত কালক্রমে—"

কানন বলিয়া উঠিল—"তা অসম্ভব নন্দবাবু—তা একবারেই অসম্ভব। আপনি আমার কাছে যা চাচ্ছেন—তার কণামাত্র আপনাকে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।"

নন্দবাবু বাবু বলিলেন—"এখনি না হোক—পরে যদি—"

কানন প্রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"সারা জীবনেও তা পারবো না নন্দবাবু। আপনি আমায় মাফ্ করুন। আমার অপরাধ নেবেন না। আমি ত—জানতাম না নন্দ বাবু। আমি যে কিছুই তখন বুঝতে পারিনি।"

নন্দলাল বাবু কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবার পর

বলিলেন—"তুমিই আমায় মাফ্ কর কানন। আমারই ভারি ভুল হয়ে গেছে। যদিও জিজ্ঞাসা করবার আমার কোনও অধিকার নেই—তুমি কি—আর কাউকে—"

কানন বলিল—"ও কথা জিজ্ঞাসা করবার আপনার খুব অধিকার আছে নন্দবাবু! আপনাকে আমি নিজের ভাইয়ের মত মনে করি।"—তাহার পর কানন অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্বরে বলিল—"আপনি—যা অনুমান করেছেন—তাই ঠিক।"

"তিনি কোথায়?"

"বিলাতে। তিন মাস পরে ফিরে আসবেন।"

কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নন্দবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"আচ্ছা কানন—এখন তবে আসি।"

কানন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"এখনি যাবেন?—কলকাতায় এখন আছেন ত?"

"না, কালই চলে যাব।"

"ফুলপুর যাবেন?"

"হাঁ, সেখানে দুই একদিন থেকে, কাযকর্ম্ম সেরে আবার ভাওয়ালপুর চলে যাব।"

"আবার কবে আসবেন?"

"তা ঠিক নেই।"

কানন নিজ হাত খানি তাঁহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"বলুন নন্দবাবু, আমায় ক্ষমা করলেন?"

নন্দবাবু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা আচ্ছা, সে হয়েছে। বিয়ের সময় আমায় খবর দিও—ভুলো না।"

কানন আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি আসবেন নন্দবাবু?"

"পারি যদি। এখন আসি তবে।"

কানন নীরবে তাঁহাকে সিঁড়ি অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

পরদিন ফুলপুরে ফিরিয়া নন্দলাল, বিনয় বাবুকে সব কথাই বলিলেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন—"বটে!—এ সবই তা হলে ঐ দেবাটার কারসাজি। কাল রাত্রেই আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিনি বল্লেন, দেবা এক সময় কাননকে বিয়ে করবার জন্যে ঘটা ক্ষেপেছিল,—কানন রাজি হয়নি—একটি ছেলের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই নাকি ওর ভাব, তাকে ছাড়া ও আর কাউকে বিয়ে করবে না। সেই ছেলেটিই বোধ হয় বিলেত গেছে।"

নন্দবাবু বলিলেন—"সম্ভব। সেই আক্রোশে, নিজে না পেলে নাই পা'ক, তার বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে সমাজে তাকে অপদস্থ করবার মৎলবেই, দেবা বোধ হয় এই কন্সিটি করেছিল।"

পরদিন বিনয় বাবু বলিলেন—"ওহে, আজ আমি একটি মেয়ে দেখে এলাম, দিব্যি চেহারা। তারও বয়স ১৫।১৬—ও তোমার কাননবালা কোথায় লাগে তার কাছে! যতই যা বলনা কেন, কাননবালার রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—তার বেশী নয়। এবার যেটি দেখে এলাম, যেমন মুখ চোখ, তেমনি গড়ন, টক্ টক্ করছে রঙ—যেন ইহুদীদের মেয়ে। বংশও ভাল। আমি তোমার কথা বলতে তারা আকাশের চাঁদ হাতে পেলে। বীরপুরের বাঁড়ুয্যেরা আর কি। উঁচু বংশ, কিন্তু এখন অবস্থা খারাপ। সেই মেয়েটিকে বিয়ে করে ফেল ভায়া। গতস্য শোচনা নাস্তি—ওসব যা হয়েছে ভুলে টুলে যাও।"

নন্দলাল বলিল—"না ভাই, সে আমি পারবো না। আর না।"

দুইদিন ধরিয়া বিনয় বাবু নন্দলালকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। নন্দলাল ভাওয়ালপুর চলিয়া গেলেন।

পর বৎসর কাননবালার বিবাহ-সভায় দেখা গেল, রাশি-কৃত উপহার দ্রব্যের সহিত, বহুমূল্য কিংখাবে বাঁধানো সোণার ফ্রাচ্ দিয়া আঁটা একখানি পুস্তক। বহিখানির বাহ্য সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নিমন্ত্রিতগণ সকলেই সেখানিকে একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন। সুন্দর পার্চ্চমেণ্ট কাগজে উজ্জ্বল কালিতে ছাপানো ফার্সী কবিতা। কেহই তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিলেন না। হাইকোর্টের জনৈক মুসলমান উকীল অবশেষে সেখানির পাঠোদ্ধার করিয়া বলিলেন—"এগুলি প্রেমের কবিতা—নূতন কবিতা বলিয়াই বোধ হইতেছে—কখনও পড়ি নাই। গ্রন্থকারের নামও ইহাতে ছাপা নাই একটা ছদ্মনাম মাত্র আছে—তাহার অর্থ—ব্যথাতুর।"

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

সাহিত্যের তাৎপর্য্য :—

এদেশে সাহিত্য বলিয়া এখন যেমন একটা সোরগোল উঠিয়াছে—একটা হৈচৈ রব শুনা যাইতেছে, পূর্ব্বে তাহার কিছুই ছিল না। 'প্রভাকরে,' 'ভাস্করে' বা অন্য কোনও সেকেলে বাঙ্গালা কাগজে সাহিত্য শব্দের ব্যবহার খুঁড়ে দেখিয়াছি বলিয়া মনেই পড়ে না। এখন কিন্তু কাগজে-কাগজে ঐ শব্দের ছড়িরলুঠ হইয়া থাকে।—ঐ শব্দের সহিত অন্যান্য শব্দ মিলিত হইয়া এখন নিত্য নূতন শব্দ বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে আমদানী হইতেছে। শুধু তাহাই নহে,—সাহিত্য শব্দকে ভাঙ্গিয়া-পিটিয়া বাঙ্গালী লেখকেরা নূতন শব্দ গড়িবারও চেষ্টা করিয়াছেন ;—'সাহিত্যিক' শব্দটি তাঁহাদের সেই চেষ্টারই ফল !

এখন কথা এই যে, যে শব্দ লইয়া আমাদের এত কাড়াকাড়ি—এত নাড়ানাড়ি, সেই শব্দের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আমাদের সকলের অভিমত একরূপ নহে।—একই অর্থে সকলে আমরা উহার ব্যবহারও করি না। তাহার উপর, অর্থ-বিভ্রাটও যে উহার সময়ে-সময়ে না হয়, এমন নহে। কাজেই, কথাটি লইয়া একটু আলোচনা করা—তাহার মর্ম্ম একটু বুঝিয়া দেখা প্রয়োজন মনে করি।

সাহিত্য কাহাকে বলে, তাহা বাঙ্গালী-পাঠককে বুঝাইবার জন্য স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ই মনে হয় প্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই সত্য, কিন্তু সে কথা স্মরণযোগ্য এবং উল্লেখযোগ্যও বটে। এই সঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, রাজেন্দ্রলাল হইতেই এদেশে প্রকৃত সাহিত্য-আলোচনার সূত্রপাত হয়, এবং সাহিত্য শব্দের প্রচলনও এক-একটু করিয়া বৃদ্ধি পায়। তাঁহার 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র বহু পৃষ্ঠাতেই এ কথার প্রমাণ আছে। মাইকেল, দীনবন্ধু ও রায় নারায়ণ প্রভৃতি বহু কবিরই কাব্য-নাটকাদি আলোচনা ঐ 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'ই প্রথম হইয়াছিল। অলঙ্কার-শাস্ত্রকে বাঙ্গালী পাঠকের বোধগম্য করিবার জন্য যে চেষ্টা, তাহার পরিচয়ও ঐ 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রথম পাওয়া যায়। এ সব কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সত্যের অনুরোধে এ কথা স্বীকার্য্য যে, 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র 'সাহিত্যে'র সংজ্ঞাটি সুস্পষ্ট হয় নাই, এবং সঙ্গতও হয় নাই। প্রথম বর্ষের ঐ পত্রে 'সাহিত্য-বিবেক' নাম দিয়া যে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহারই একস্থানে আছে,—"অভিপ্রায় ভিন্ন কেহই বাক্য উচ্চারণ করেন না, এবং সেই বাক্য দুই প্রকার হইয়া থাকে ; প্রথমতঃ 'বাক্যানুদ্দেশ্য বাক্য' অর্থাৎ মনোগত ভাবপ্রকাশ করণার্থে আপনার প্রতি প্রোক্তবাক্য ; দ্বিতীয়, 'উদ্দেশ্যবাক্য' অর্থাৎ কোন এক বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমূহের উদ্দেশে প্রোক্তবাক্য ; এবং যে শাস্ত্রে ঐ বাক্য সকলের সুশৃঙ্খলার প্রয়োগ বিষয়ক বিধি নিরূপণ করে, তাহার নাম "সাহিত্য' অর্থাৎ বাক্য বিষয়ক হিতকারী শাস্ত্র।" —এইটুকু পড়িয়া যাহা বুঝা যায়, তাহাতে মনে হয় যে, লেখক মহাশয় যেন ব্যাকরণ জিনিষটাকেই সাহিত্য বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এরূপ অর্থ আর কোথাও কাহাকেও করিতে দেখি নাই। লেখক কোন্ যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া যে অমন কথা লিখিলেন, তাহা বুঝা যায় না।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার হইতে যখন আমরা ঐ শব্দ গ্রহণ করিয়াছি, তখন উহার অর্থের জন্য এদিক-ওদিক অনুসন্ধান না করিয়া সংস্কৃত গ্রন্থাদি দেখিলেই তো সকল গোল চুকিয়া যায়।—এরূপ মনে হওয়াটা স্বাভাবিক বটে ; কিন্তু সংস্কৃত ভাষার কোনও অলঙ্কার শাস্ত্রেই সাহিত্য শব্দের কোনও রূপ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি, 'অমরকোষ' ও 'অভিধান চিন্তামণি' প্রভৃতিতেও উহার নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। এই জন্য মনে হয় ঐ শব্দটি সংস্কৃত হইলেও উহা প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ নহে।

যাহা হউক, সংস্কৃত অভিধানে ঐ শব্দটি না থাকিলেও বাঙ্গালাভাষার অভিধানে উহার অস্তিত্ব আছে। তাহাতে সাহিত্য অর্থে লিখিত হইয়াছে,—'সংসর্গ, মিল, কাব্য শাস্ত্র'

ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এ অর্থের সহিত রাজেন্দ্রলালের অর্থের কোনই মিল নাই।—মিলও নাই, এবং এ অর্থ রাজেন্দ্রলালের অর্থের ন্যায় উপেক্ষিত বা অনাদৃতও নহে। সাহিত্য বলিতে অনেকেই 'সংসর্গ, মিলন' বুঝুক আর না বুঝুক—কাব্য-শাস্ত্রটা যে বুঝিয়া থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ দর্শনের স্থির সিদ্ধান্ত। অনেক চিন্তাশীল লেখকই নানাভাবে, নানা আকারে ঐ অর্থই ব্যক্ত করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু বলেন,—'সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।'—এ স্থলে মনে হয়, নাটক-নবেল-কাব্য-কবিতাকেই সাহিত্য বলা হইয়াছে। কারণ জাতীয় চরিত্রের চিত্র ঐ কয়টি জিনিষ ছাড়া আর কোথাও প্রতিফলিত হইবার তেমন উপায় নাই। তার পর, স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও অনেকটা বঙ্কিমবাবুরই মতের প্রতিধ্বনি। তিনি বলেন,—"সাহিত্য জাতীয় হৃদয়ের আদর্শ,—জাতীয় হৃদয়ের ইতিহাস। যে জাতির হৃদয় যে সময়ে যে ভাবে পরিপূর্ণ কি পরিপ্লুত থাকে, সেই জাতির সেই সময়ের সাহিত্যও সেইভাবে সম্পূর্ণরূপে বিলাসিত রহে। মনুষ্যের মন যখন শোকে আকুল, ক্রোধে উদ্দীপ্ত, অথবা দুঃখে কি দুশ্চিন্তায় অবসন্ন রহে, তাহার মুখচ্ছবি তখন তমসাচ্ছন্ন এবং কণ্ঠধ্বনি বিকৃত হয়,—এবং যখন তাহার হৃদয় আনন্দভরে নৃত্য করে, চিত্ত নূতন সুখের সুধাময় স্পর্শে প্রফুল্ল হইয়া উঠে, তাহার চক্ষু তখন সেই আনন্দ ও সেই সুখে হাসিতে থাকে,তাহার কণ্ঠস্বর বসন্ত-মদ-মত্ত কোকিল-কণ্ঠের মাধুরীতে মিশিয়া যায়। মনুষ্য সম্বন্ধে প্রকৃতির এই নিয়ম অলঙ্ঘনীয়, এবং জাতীয় সাহিত্যও সর্ব্বপ্রকারে সেই নিয়মের অধীন। উহাতে কখনও ক্রোধের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন কখনও অবরুদ্ধ ক্রোধের তদ্ভোধিক ভয়ঙ্কর স্তম্ভিতভাব। কখনও প্রেমের উচ্ছ্বাস, কখনও শোক ও পরিতাপের হৃদয়বিদারী করুণা নিঃস্বন,কখনও বীরগর্ব্ব ও বাহুবল দর্পের সিংহনাদ, কখনও স্বার্থপরতা ও বণিগ্‌বৃত্তির সংকোচ ও সাবধানতা। কখনও বিলাসের আলস্য ও আবেশ, কখনও ভয়ের বিকৃত ভক্তি এবং বীভৎস বিকার। সাহিত্য পরিমার্জ্জিত দর্পণের ন্যায় জাতীয় পরিবর্ত্তনের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বর্ণভেদও আমাদিগের সম্মুখে আসিয়া প্রদর্শন করে।"—তার পর, রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও দেখিতে পাই, সাহিত্যকে তিনি প্রকারান্তরে কাব্যশাস্ত্রই বলিয়াছেন। তাঁহার মতে,—"এক কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয়, সাহিত্যের বিষয় মানব-হৃদয় এবং মানব-চরিত্র। কিন্তু মানব চরিত্র, এটুকুও যেন বাহুল্য বলা হইল। বস্তুত,বহিঃ প্রকৃতি এবং মানব-চরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।"—অতএব, স্বীকার করিতে হইবে যে, বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে সাহিত্য অর্থে যে কাব্যশাস্ত্র বলা হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালার বড় বড় লেখক ও ভাবুক কর্ত্তৃকও অনুমোদিত।

তবে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তির আকার ধরিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উহার ব্যাখ্যা আর একটু অন্য রকম করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"সহিত শব্দের উত্তর 'ষ্ণ' করিয়া সাহিত্য শব্দ হইয়াছে; কিন্তু কিসের সহিত? বোধ হয়, ব্যাকরণের সহিত পড়া হইত বলিয়া কাব্য, নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতিকে সাহিত্য নাম দেওয়া হইয়াছে। সংস্কৃতে সাহিত্য শব্দে স্মৃতি, জ্যোতিষ, বেদ, দর্শন, এ সকল কিছুই বুঝায় না, কেবল বুঝায়,—কাব্য, নাটক ও অলঙ্কার।"

কিন্তু সংস্কৃতে সাহিত্য বলিতে 'অলঙ্কার' বুঝায় কি না, সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সংস্কৃত ভাষায় 'সাহিত্যদর্পণ' নামে যে একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ আছে,তাহার নামকরণ বিচার করিয়া দেখিলেই শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা মূলাহীন হইয়া পড়ে। সাহিত্য অর্থে অলঙ্কার ধরিলে 'সাহিত্য-দর্পণ' নামটার বিশেষ কোনই সার্থকতা থাকে না। "কাব্য-প্রকাশ", "কাব্যাদর্শ", "কাব্যদীপিকা" প্রভৃতি অলঙ্কার-গ্রন্থগুলির নামের যেখানে 'কাব্য' শব্দটি আছে, সেখানে 'অলঙ্কার' কথাটি বসাইলে যেমন উহার অর্থ হয়, 'সাহিত্য-দর্পণের' সাহিত্য শব্দটি উঠাইয়া লইয়া তৎপরিবর্ত্তে 'অলঙ্কার' কথাটি বসাইলেও প্রায় সেই রকম অর্থ হয়। সাহিত্য শব্দ এক্ষেত্রে 'কাব্য' শব্দের পরিবর্ত্তেই বসিয়াছে। অলঙ্কার জিনিষটাকে সাহিত্যের আলোচনা বলিলে ক্ষতি হয় না, কিন্তু উহা সাহিত্যের একার্থবোধক শব্দ নহে। আমাদের মনে হয়, কাব্য জিনিষটা নানা রস ও নানা তত্ত্বের,—নানা ভাব ও নানা তথ্যের মিলন-ভূমি বলিয়া আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা উহার আর

একটা নাম দিয়াছেন—সাহিত্য। সংহিত শব্দ বা সহিত শব্দের পর ষ্ণ্য প্রত্যয় যোগে সাহিত্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। —বিবিধ ভাব, রস ও তত্ত্ব প্রভৃতি সংহিত অর্থাৎ মিলিত হইয়া যাহা সৃষ্ট হয়, তাহাই সাহিত্য।

কিন্তু সাহিত্য শব্দটার ঐ অর্থে কেহ কেহ এখন সন্তুষ্ট নহেন;—তাঁহারা উহার অর্থ আরও অনেকটা বাড়াইয়া লইতে চাহেন। হরপ্রসাদ বলেন,—"লিটারেচার শব্দের প্রথম অর্থ ছিল—কাব্য, নাটক, অলঙ্কার; কিন্তু পরে দাঁড়াইয়াছে, যাহা কিছু লেখা হইয়াছে, তাহাই লিটারেচার। দিনকতক আগে বিজ্ঞান ও দর্শনে লিটারেচার শব্দের প্রয়োগ হইত না, এখন তাহাও হইতেছে। এখন গভর্মেণ্টের কসলের রিপোর্ট দিতে হইলেও সে সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা আছে, সব পড়িতে হয়, সে সম্বন্ধে সব লিটারেচার পড়িতে হয়। জেলেদের মাছ ধরা সম্বন্ধেও এখন সব লিটারেচার হইয়াছে। আমাদেরও এখানে সাহিত্য শব্দের এইরূপ মুলুকজোড়া অর্থ লইতে হইবে।" —শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্ব্বে স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ঐ ধরণের কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনিও লিখিয়াছেন,—"শব্দ শক্তির সহিত চিন্তাশক্তির সংযোগকেই সাহিত্য বলি।.....সাহিত্য বলিতে বিস্তর বুঝায়।..... কর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, বিয়োগশাস্ত্র, কাব্য-কবিতা, গণিত-জ্যোতিষ সকলেই মোটের উপর সাহিত্যেরই অধিকারাধীন। ভাগ বিভাগ, শ্রেণী, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গাদি ভেদে, সাহিত্যেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রযুক্ত হয়।"—কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, এ মতটি অনেকে পছন্দ করেন না। পাশ্চাত্য দেশেও এখনও উহা সর্ব্ববাদীসম্মত হয় নাই। উহা More সাহেবের উক্তিরই প্রতিধ্বনি। তিনি বলেন,—"I use the word Literature, not as opposed to science, but in its larger sense including everything which is written, taking the term literature in its Primary sense, of an application of letter to the records of facts or opinion."—কিন্তু বিলাতের অনেক সমালোচক এ মতে সায় দেন না। গণিতকে অনেকেই সাহিত্যের অধিকারাধীনে আনিতে চাহেন না। হাড্‌সন ও আর্‌নল্ড্‌ প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিকেরা সাহিত্য শব্দটাকে অতটা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিতে সম্মত নহেন। এই জন্য মনে হয়, বিলাতী বড় বড় অভিধানে 'লিটারেচার' শব্দের ঐ দুই রকম অর্থই লিখিত হইয়াছে। আমাদের দেশেও সাহিত্য শব্দকে ঐ দুই প্রকার অর্থে ব্যবহার করিলে কিছু ক্ষতি হয়, মনে করি না। তবে একজন লেখকের একই লেখায় সাহিত্য শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার নিতান্তই অশোভন ও অন্যায়। কিন্তু সেইরূপ ব্যবহারই আমাদের দেশের অনেকের লেখাতেই দেখিতে পাই। মনে পড়ে, স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মত প্রাজ্ঞ লেখকও ঐ বিষয়ে সতর্ক ছিলেন না। তিনি বলিতেন,—"ভাষায় রস সঞ্চার হইলে,তখন তাহাকে সাহিত্য বলা যায়। রস-রচনার নাম সাহিত্য।"—অথচ তাঁহার লেখায় বহুস্থলেই 'সুকুমার সাহিত্য' কথাটির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যদি রস-রচনার নামই সাহিত্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ শব্দের পূর্ব্বে 'সুকুমার' কথাটা কেমন করিয়া আসে, বুঝা যায় না। যাহা সরস, তাহাই তো সুকুমার। যাঁহারা রচনামাত্রকেই সাহিত্য নামে অভিহিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের লেখায় 'রস-সাহিত্য' 'সুকুমার সাহিত্য' প্রভৃতি কথার ব্যবহার দেখিলে তাহা অন্যায় বা অসঙ্গত মনে হয় না,—তাহার অর্থ বুঝা যায়। কিন্তু সাহিত্য বলিতে যাঁহারা কাব্যশাস্ত্রই বুঝেন, তাঁহারা কোন্ হিসাবে 'রস-সাহিত্য', 'সুকুমার সাহিত্য' প্রভৃতি কথাগুলার ব্যবহার করেন, তাহা বুঝিতে পারি না। ইহাতে লেখকের বক্তব্যও এলোমেলো হয়, এবং পাঠকেরও ক্ষতি হয়,—পাঠক ভুল কথা শিখিয়া থাকেন। এই জন্যই আমাদের কথা এই যে, বঙ্গীয় সাহিত্যিকেরা সাহিত্য শব্দটা একটু সাবধানের সহিত ব্যবহার করিলে ভাল হয়।

মোগল-সম্রাট্ আক্‌বর

শাসনকার্য্য-সংস্কার ; রণ্‌তাম্‌ভোর ও কালঞ্জর-বিজয় ; সলীমের জন্ম।

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

অন্তরাত্মা হইতে যে রক্তচিহ্ন ক্ষালনের জন্য ভারতের মহামহিম সম্রাট্ তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইয়াছিল কি না, কে জানে! কিন্তু ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। আক্‌বর দেখিলেন যে, আগ্রার সিংহাসনে রাজশক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে হইলে অগ্রে আট্‌কা-খইলের (Foster relatives) অনৃত আধিপত্য নিঃশেষে ক্ষয় করা আবশ্যক। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে অনগ-তনয় আধম্ খাঁর বিনাশে আট্‌কা-আধিপত্য বিচালিত হইলেও ভূপাতিত হয় নাই। সুদূর পঞ্চনদ প্রদেশ এই পরাক্রান্ত খইলের সূতিকাগার। তাহাদের অধিকাংশ জাগীর এই বিভাগের অন্তর্গত, এবং এখানে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া একাধিপত্য করিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুচতুর সম্রাট্ স্থির করিলেন, এই দৃঢ় একতাবন্ধন ছিন্ন করিতে না পারিলে, সাম্রাজ্যের মঙ্গল নাই; ভ্রাতা হকীম্ কর্ত্তৃক পঞ্জাব-আক্রমণে তাঁহার মনে এই খইলের উপর সন্দেহের সূত্রপাত হইয়াছে। আট্‌কা-সম্পর্কীয়গণকে অবিলম্বে আগ্রায় আসিবার আদেশ প্রচার হইল। সকলে উপস্থিত হইলে আক্‌বর তাহাদিগকে স্বীয় অধিকারে ভারতের স্থানে স্থানে পঞ্জাবের অনুরূপ জাগীর ও ভূসম্পত্তি দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সম্রাটের দৃঢ়তায় কাহারও কোন আপত্তি করিতে সাহস হইল না। নির্ব্বিবাদে আট্‌কা-খইল দলভঙ্গ হইল। কেবল আট্‌কা খাঁর পুত্র, সম্রাটের স্তনদা-ধাত্রী জীজী অনগের গর্ভজাত মীর্জ্জা আজীজ্ কোকার (খান্-ই-আজম্) জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইল; তিনি পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার পঞ্জাবস্থ জাগীর—দেবাল্‌পুরের অধিকারী রহিলেন। পঞ্জাবের শাসনভার খান্ জহান্ হুসেন্ কুলীর উপর ন্যস্ত হইল।

আক্‌বর ও তাঁহার পিতার পুরাতন ভৃত্য বায়াজীদ্ বীয়াৎ বলেন (*J. A. S. B.*1898,P. 313) যে আধম্ ও মুরজ্জমের দণ্ডবিধানের কিছুদিন পরে সম্রাট্ তাঁহার নবমন্ত্রী খান্ খানান্ মুনিম্ খাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—তাঁহার রাজ্যশাসন সম্বন্ধে প্রজাসাধারণের মনোভাব কিরূপ। মুনিম্ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন:—"শাহান্ শাহ্! আপনার প্রতি সাধারণের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অসীম; আধম্ ও মুরজ্জম সুলতানের প্রাণদণ্ড করিয়া আপনি যে নিরপেক্ষ ন্যায়-বিচারের পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য প্রজাবর্গ আপনার প্রশংসা করিয়া থাকে।" আক্‌বর উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"তুমি যে বিষয়ের উল্লেখ করিলে, তাহা অপেক্ষা আমি আর একটী ভাল কাজ করিয়াছি; কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য, জানিয়া-শুনিয়াও কতকগুলি কারণে তোমরা তাহার উল্লেখ কর না।" মুনিম্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শাহান্ শাহ্! এমন কি ভাল কাজ, যাহা আমরা জানাসত্ত্বেও বিশেষ কারণবশতঃ উল্লেখ করি না?" আক্‌বর তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন,—"আমি আট্‌কা-বংশীয়দিগকে লাহোর হইতে স্থানান্তরিত করিয়া তাহাদিগকে সপ্তর্ষিমণ্ডলের তারকারাজির ন্যায় হিন্দুস্থানের নানা প্রদেশে দূরে দূরে স্থাপিত করাইয়াছি।" সম্রাটের উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে আট্‌কা-খইল্ 'সাতভাই' নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় দলবদ্ধভাবে পঞ্জাবে পরস্পরের সান্নিধ্যে অবস্থিতি করিয়া শক্তি ও বল সঞ্চয় করিতেছিল; সাম্রাজ্যের হিতপক্ষে এইরূপ সঞ্চিত-শক্তি কোনপ্রকারেই বাঞ্ছিত নহে; আক্‌বর তাঁহাদিগকে দলভঙ্গ করিয়া যে কূট শাসন-নীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই প্রশংসার্হ। সম্রাট্ বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, আট্‌কা-খইল্‌কে পঞ্জাব হইতে কেবলমাত্র বিতাড়িত না করিয়া তাহাদের সকলকে অন্যত্র জাগীর দিয়া প্রতিষ্ঠিত করায় যে ন্যায়পরতা এবং উদারতা প্রদর্শিত হইয়াছে, মুনিম্ ঈর্ষাবশতঃ তাহার উল্লেখ করেন নাই; কারণ আট্‌কা খাঁ ও তাঁহার মধ্যে মনোমালিন্য ছিল; এমন কি আট্‌কা-খাঁর হত্যাকাণ্ডে তিনি যে আধম্‌কে উত্তেজিত

করিয়াছিলেন, এরূপ আভাসও পাওয়া যায় (Bloch-mann, 321)।*

সম্রাট্ কেবলমাত্র যে সাম্রাজ্যের ভাবী অনিষ্টাশঙ্কা দূর করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, তাহা নহে; এখন হইতেই আভ্যন্তরীণ সুশাসনের প্রতি তাঁহার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত-প্রয়াস পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি শিহাব্-উদ্দীন্ অহমদ্ খাঁ নামক অনেক যোগ্য ব্যক্তিকে রাজস্ব-সচিবের পদ প্রদান করেন। এই বিভাগের সংস্কারকার্য্য শিহাব্-উদ্দীনের পক্ষে বিশেষ আয়াসসাধ্য হইয়াছিল; কারণ 'তদবধি তদরূপ অপরাধে নিলিপ্ত, এরূপ রাজকর্ম্মচারী তৎকালে প্রায় ছিল না বলিলেও চলে।' যাহা হউক, নব মন্ত্রী, বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় অন্যায়কারিগণকে অনেকটা সংযত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

চিতোর বিজিত, কিন্তু চিতোরাধিপতি এখনও আত্ম-সমর্পণ করেন নাই,—দুর্গম গিরিপ্রদেশে লুক্কায়িত। অধিকন্তু রাজপুতানার অন্যতম দুর্ভেদ্য দুর্গ রণ্‌তাম্‌ভোর (সংস্কৃত রণস্তম্ভপুর) ধনুশ্চরে মোগলপ্রতাপ উপেক্ষা করিতেছে, এবং স্পর্দ্ধিত কালঞ্জর গড় এখনও স্বাধীনতার পতাকা ধরিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। সাম্রাজ্যের শৈশবকাল হইতেই রাজপুত-গৌরবস্তম্ভ রণ্‌তাম্‌ভোর সম্রাটের লোলুপদৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। রাজ্যাঙ্কের চতুর্থ বর্ষে আকবর এই দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। যে সকল আমীর চিতোর-অবরোধে অনুপস্থিত ছিলেন, আজ্‌মীর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সম্রাট্ তাঁহাদিগকে রণ্‌তাম্‌ভোর-বিজয়ে প্রেরণ করিলেন;—বীর মুন্‌শী আশরফ্ খাঁ এই অভিযানের নায়ক। কিন্তু আশরফের ভাগ্যে সে সম্মান ঘটিল না; এই সময়ে সংবাদ আসিল, বিদ্রোহী মীর্জ্জাগণ গুজরাট ত্যাগ করিয়া উজ্জয়িনী অবরোধ করিয়াছে। সম্রাটের পুনরাদেশে আশরফ্‌কে সেই বিদ্রোহ-দমনে গমন করিতে হইল; কিন্তু তিনি বিদ্রোহীগণের সম্মুখীন হইবার পূর্ব্বেই তাহারা মালু অভিমুখে পশ্চাদ্‌পদ হয়; পরে সম্রাট্-সৈন্য কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া পুনরায় গুজরাটে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

এদিকে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। সম্রাট্ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং রণ্‌তাম্‌ভোর আক্রমণে ছুটিলেন;—দুর্গ তখন রাজপুতগণের চৌহান্ শাখাভুক্ত হারাদিগের অধিকারে। সাবাৎ এবং তৎকালীন রণবিজ্ঞান-সঙ্গত সরঞ্জামসহ অবরোধ-কার্য্যের সূচনা হইল। সম্রাটের চিতোর-জয়-খ্যাতি এবং তদনুরূপ বিশাল আয়োজন-দর্শনে সকলে বুঝিল যে, রণ্‌তাম্‌ভোর দুর্গের পতন অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু তাহা যে অদূর ভবিষ্যতে সম্ভাবিত হইবে, অতি দূরদর্শী রণপণ্ডিতগণও তাহা অনুমান করিতে পারেন নাই। প্রায় মাসাবধিকাল বিপুল অধ্যবসায় এবং উৎসাহে অবরোধকার্য্য পরিচালনা করিয়া, হতাশ সম্রাট্ ক্রমে আত্মবলের উপর সন্দিহান হইতে লাগিলেন; কিন্তু বলের যাহা অসাধ্য,—ছল তাহা সহজে সুসিদ্ধ করিল; রাজবারাবাসিগণ সহসা একদিন দেখিলেন —রণ্‌তাম্‌ভোর দুর্গশিরে মোগলের বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান! কি উপায়ে অসম্ভব সম্ভব হইল, মুসলমান-ঐতিহাসিকগণ তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশ করেন নাই; কেবল মহাত্মা টডের (Tod) অনুসন্ধানালোকে সে কুহেলিকাজাল ছিন্ন হইয়াছে। তাঁহার হারা-রাজধানী 'বুন্দীর বিবরণে' প্রকাশ:—

'সিংহাসনারোহণের অনতিকাল পরেই আকবরের মনে রণ্‌তাম্‌ভোর-অধিকারের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং এই দুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গাধিপতি সূর্য্যন্ হারা প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, চিতোর-মহারাণার সামন্ত স্বরূপে তিনি প্রাণপণে দুর্গরক্ষা করিবেন। কিছুকাল অবরোধের পর দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকার সম্রাটের হৃদয়ে যখন নৈরাশ্য সঞ্চার করিতেছিল, সেই সময় অম্বরাধিপতি ভগবান্ দাস ও তৎপুত্র সুবিখ্যাত রাজা মানসিংহ সূর্য্যন্ হারার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করাইবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইলেন। বিবদমান্ হইলেও রাজপুতজাতি পরস্পরের প্রতি সৌজন্য-প্রদর্শনে বিমুখ নহেন। সেইজন্য বিপক্ষপক্ষসত্ত্বেও অক্লেশে দুর্গে অনায়াস-প্রবেশলাভে মানসিংহের কোন বাধা হইল না। সম্রাট্ আকবর চোপদারের (Mace-bearer) ছদ্মবেশে তাঁহার অনুগমন করিলেন। অতঃপর যখন রাজা মান্

* আকবর ও মুনিমের এই কথোপকথন নিশ্চয়ই যুদ্ধক্ষেত্রের প্রান্তরেতে পর সংঘটিত হইয়াছিল; কারণ বদায়ুনী লিখিয়াছেন যে, (ii. 109) লাহোর হইতে আট্‌কা-খইল্ ১৭৭ হিজরায় (১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) নির্ব্বাসিত হন।

দুর্গাধিপতির সহিত কথোপকথনে রত, সেই সময় সূর্যানের এক পিতৃব্য সম্রাট্‌কে চিনিতে পারিয়া তাঁহার হস্ত হইতে আশাসোঁটা কাড়িয়া লইলেন এবং সসম্ভ্রমে তাঁহাকে দুর্গাধিপতির আসনে বসাইলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি, সদা-সপ্রতিভ সম্রাট্ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন,—'সূর্যান্! এক্ষণে কর্ত্তব্য কি?' মানসিংহ তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন,—'কর্ত্তব্য—রাণার আনুগত্য ত্যাগ করিয়া সম্রাট্‌কে রণ্‌তাম্‌ভোর অর্পণ এবং তাঁহার অধীনে উচ্চপদ, সম্মান প্রভৃতি ভোগ করা।' উৎকোচস্বরূপে সূর্যান্‌কে যে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা হইল, তাহা প্রকৃতপক্ষে রাজোচিত।

শেখ্ সলীম্ চিশ্‌তী

দুর্গ অর্পণ করিলে ৫২টী জেলার শাসনভার এবং তৎসঙ্গে তাহার সমস্ত আয় সূর্যান্ প্রাপ্ত হইবেন। তজ্জন্য নির্দ্ধারিত সৈন্যসাহায্য ব্যতীত সম্রাট্‌কে কোনরূপে হিসাব পর্য্যন্ত দিতে হইবে না; ইহা ব্যতীত সূর্যানের অন্য প্রার্থনাও সম্রাট্ পূর্ণ করিবেন।

'অম্বর-কুমারের মধ্যস্থতায় তখনই সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইল; তাহার সর্ত্ত এইরূপ:—

(১) রাজপুতের পক্ষে অপমানজনক, বাদ্‌শাহ্‌কে কন্যাদান (ডোলা) করিবার প্রথা হইতে বুন্দী-প্রধানগণ অব্যাহতি লাভ করিবেন; (২) তাঁহারা জিজিয়া কর হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন; (৩) বুন্দী-প্রধানগণ আটকের বহির্দ্দেশগমনে বাধা হইবেন না; (৪) বুন্দীর সামন্তকুল-রমণীগণ 'নওরোজ' (নববর্ষ) উৎসবে মীনা-বাজারে গমন করিবেন না; (৫) বুন্দী-প্রধানগণ দেওয়ান্-ই-আমে সশস্ত্র প্রবেশ করিবার অধিকার পাইবেন; (৬) তাঁহাদের দেবমন্দির সমূহের পবিত্রতা সুরক্ষিত হইবে; (৭) তাঁহারা কোন হিন্দুনেতার অধীনে কার্য্য করিবেন না; (৮) তাঁহাদের অশ্বে রাজকীয় 'দাগ্' (কপোলদেশে পুষ্পচিহ্ন) অঙ্কিত হইবে না; (৯) তাঁহারা রাজধানীতে গমনাগমন সময়ে লাল দরওয়াজা পর্য্যন্ত নাকারা বাদ্যসহকারে গমন করিবার অধিকার পাইবেন; এবং (১০) তাঁহারা সম্রাট্-সমক্ষে 'সিজ্‌দা' (সাষ্টাঙ্গ অভি-নমন) করিতে আদিষ্ট হইবেন না।'

এই সন্ধির বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য এবং ইহা হইতে হিন্দু-গণের তাৎকালিক মনোভাবের বিশদ্ চিত্র পাওয়া যায়; অপিচ এই বিবরণ আবুল্ ফজল্-বর্ণিত মূল গল্পাংশের বিরোধী নহে; কারণ তিনিও লিখিয়াছেন, 'সভাসদ্‌গণের মধ্যস্থতায়'

[১] See Blochmann, p. 276.

এবং 'কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর চেষ্টায়' সূর্যান্ দ্বারার আত্মসমর্পণ কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল (*A.N.*, II, 404)। দণ্ডধারীর বেশে সম্রাটের দুর্গপ্রবেশের রোমহর্ষণ ঘটনা, আকবর-চরিত্রেরই অনুরূপ ; অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় আকবর রাত্রিকালে আগ্রা-জনতার মধ্য দিয়া

যৌবনে জয়মল

অনেক সময়ে ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। (*A.N.*, II, 225-26)।

রণ্থাম্ভোর মোগল-সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ বলিয়া পরিগণিত এবং যথাসময়ে আজ্মীর সুবার (প্রদেশ) একটী সরকাররূপে (জেলা) অন্তর্ভুক্ত হইল। সূর্যান্

প্রতিভক্তি-ভক্তের প্রচুর পুরস্কার পাইলেন—সম্রাটের অধীনে দুই-হাজারী মন্সব্দারের পদ এবং প্রথমে সড়কটঙ্ক, পরে বারাণসী ও চুণার দুর্গের শাসনভার। এতদ্ব্যতীত সম্রাট্ তাঁহাকে বারাণসীধামে দেবালয়-সন্নিবিষ্ট এক বিশাল প্রাসাদ দান করেন। আকবরের গুজরাট ও

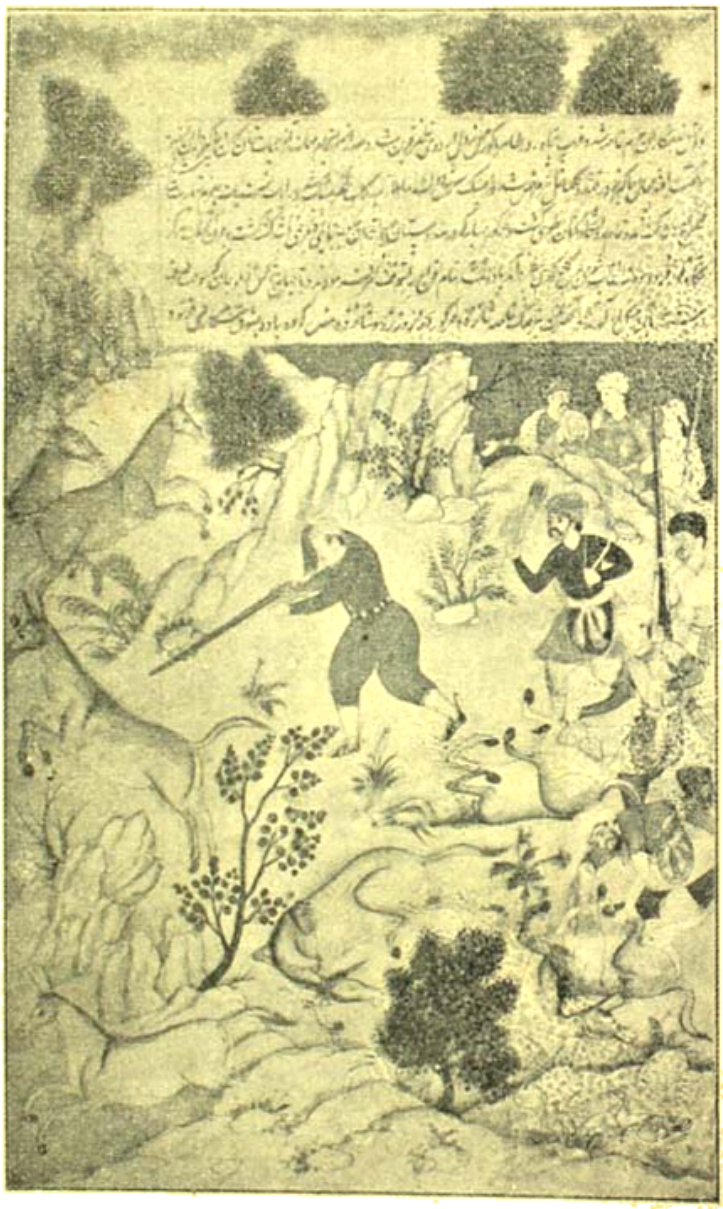

আকবরের নাগোরে বন্য-গর্দ্দভ-শিকার

দাক্ষিণাত্য অভিযানকালে সূর্যানের দুই পুত্র তাঁহাকে সাধ্যমত সাহায্য দান করিয়াছিল।

রণ্থাম্ভোর অবরোধের সময়সময়ে সম্রাট্ মজনুন্ খাঁ কাক্শালকে কালঞ্জর* বিজয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

* কালঞ্জর দুর্গ বর্ত্তমানে বান্দা জেলায় (যুক্ত প্রদেশ)

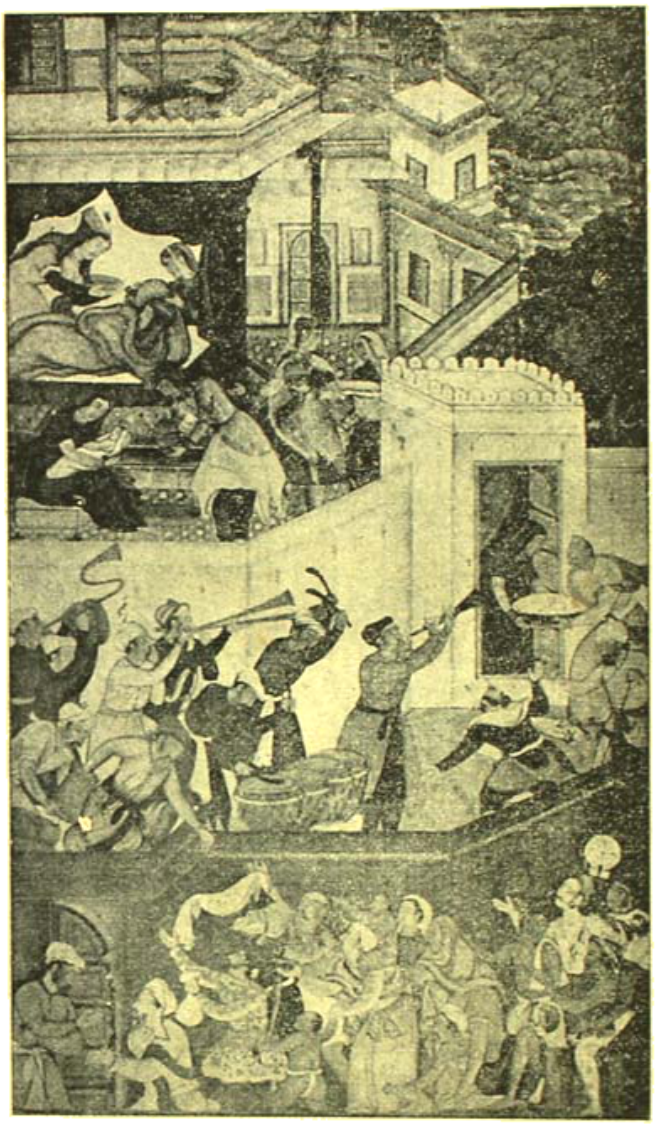

সলীমের জন্ম

আক্‌বর ও কুমার সলীম্

ভাট্ বা রীওয়ার রাজা রামচাঁদ বাঘেলা তখন এই দুর্গের অধিপতি। এই দুর্জ্জেয় দুর্গ অধিকারকল্পে ৪ মাস কাল অবরোধের পর, বীরচূড়ামণি শের শাহ্‌র অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ-নাশ হয়। মোগলসৈন্য চিতোরের বক্ষে কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, রামচাঁদ সম্ভবতঃ তাহা জানিতেন; সুতরাং তিনি প্রবল মোগলের গতিরোধ না করিয়া নিরাপত্তে দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সম্রাটের নিকট এই সুসংবাদ পৌছিল; তিনি রাজাকে এলাহাবাদের সন্নিকটে এক জাগীর প্রদান করিলেন।

আক্‌বরের জীবনের পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা—গুজরাট্-অভিযান; তাহা লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, আমরা অন্যান্য কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিব।

অবস্থিত। ইহার অবস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে "Description of the Antiquities of Kalanjar" F. Maisey (J.A.S. B., 1849. March) দ্রষ্টব্য।

আক্‌বর অল্প বয়সে পরিণীত, এবং তাঁহার ভার্য্যাও একাধিক ; তথাপি তিনি এখনও অপুত্রক, কারণ ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার যে কয়টী সন্তান জন্মিয়াছিল তাহার সকলগুলিই শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দিল্লীর সিংহাসনের দিকে চাহিয়া সম্রাট্ ব্যথিত হইতেন এবং পুত্রকামনায় মধ্যে মধ্যে

১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে আক্‌বর জ্ঞাত হইলেন যে, তাঁহার প্রথমা হিন্দু-পত্নী, অম্বররাজ বিহারী মল্-দুহিতা অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছেন। সাধুর আশ্রমে সন্তান জন্মিলে সম্রাট্ তাঁহার আশীর্ব্বাদের পূর্ণ ফললাভ করিবেন, এই আশায় তিনি পুত্র-সম্ভবা পত্নীকে অবিলম্বে সাধুর সন্নিধানে সীক্‌রীতে প্রেরণ

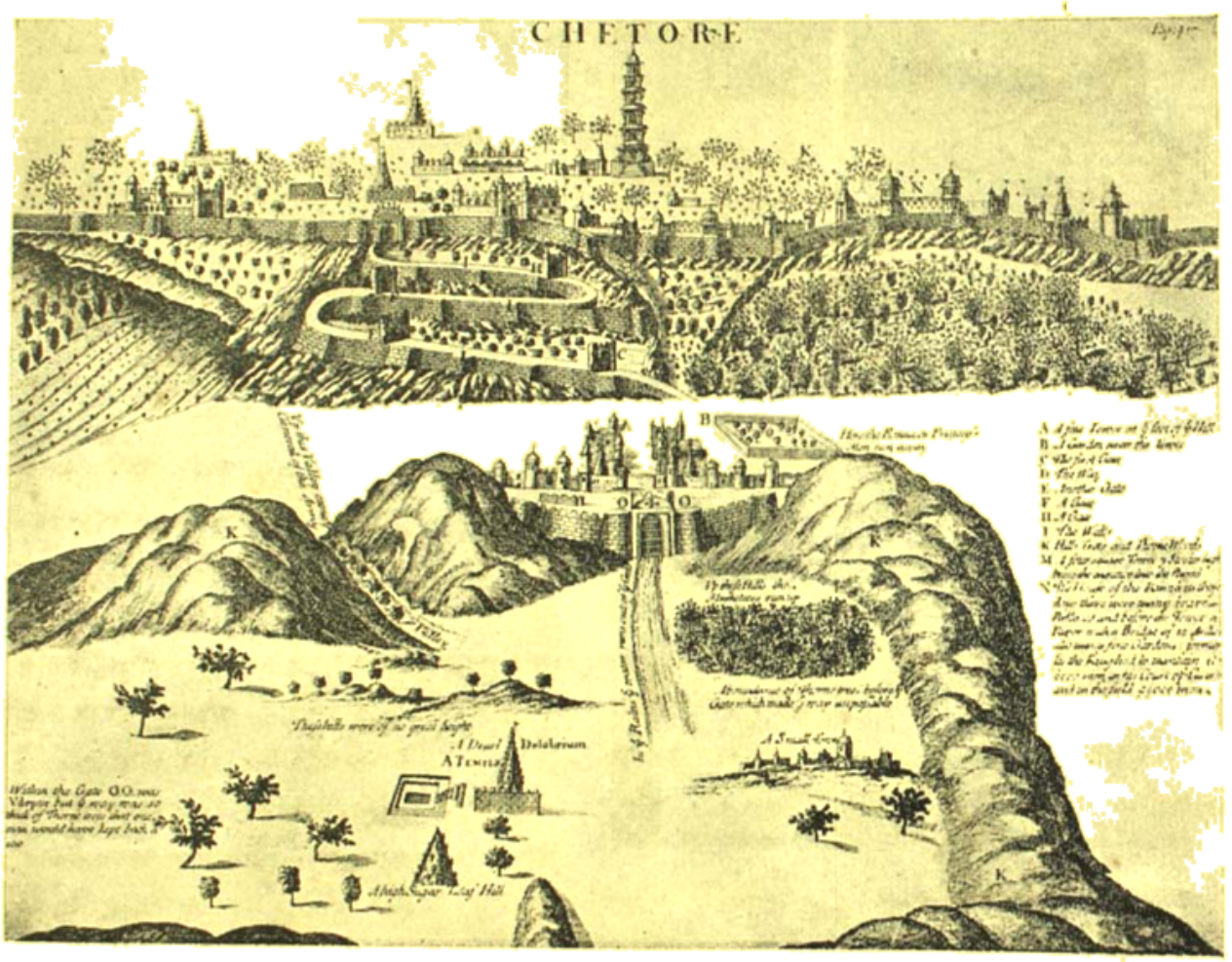

চিতোর

দিল্লী, আজ্‌মীর ও অন্যান্য স্থানে মুসলমান সাধুগণের দরগায় গমন করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেন। যখন বাবরের সহিত রাণা সঙ্গের ভাগ্যপরীক্ষা হইয়াছিল, তৎসন্নিকটে সীক্‌রীর শৈল-শৃঙ্গে সাধু শেখ্ সলীম্ চিশ্‌তীর শরণাপন্ন হইলেন। সাধু প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে, এবং তিনটী পুত্রলাভ করিবেন। করেন এবং তথায় ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সম্রাট্ জীবনের চির-আকাঙ্ক্ষিত একটী পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। শেখ্ সলীম্ চিশ্‌তীর শুভ-আশীর্ব্বাদে জন্ম বলিয়া সম্রাট্ পুত্রের নাম রাখিলেন—সলীম্ (উত্তরকালে জহাঙ্গীর)। পরবৎসর জুন মাসের ৮ই তারিখে সম্রাটের অপর এক পুত্রসন্তান জন্মে। এই পুত্রের নাম মুরাদ্।

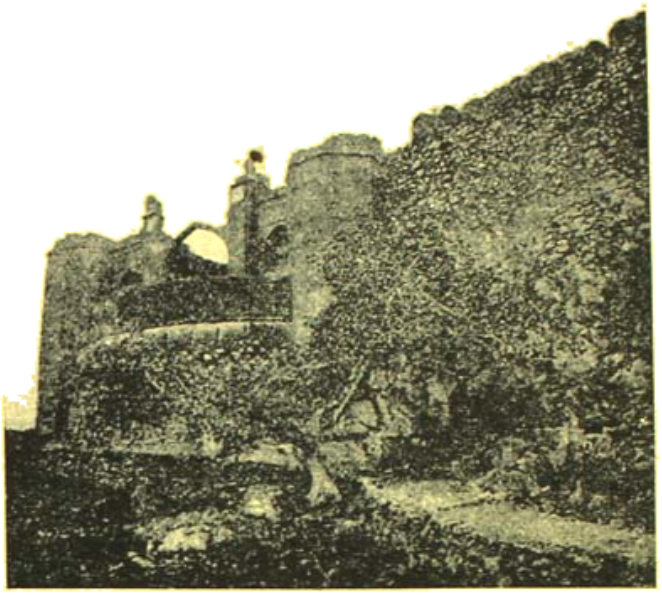

আজমীর দুর্গ

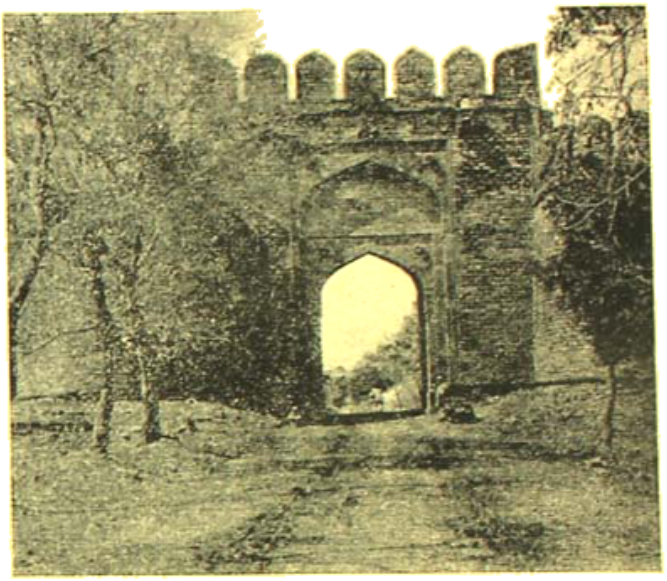

ফতেপুর সীক্‌রী

কুমার সলীমের জন্মের দুই এক বৎসর পূর্ব্বে সম্রাটের সহিত শেখ্ সলীম চিশ্‌তীর পরিচয় হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। সাধুর আশীর্ব্বাদ ফলবতী হওয়ায় সম্রাট্ অবিলম্বে 'অপয়া' নগরী আগ্রা ত্যাগ করিয়া সীক্‌রীতে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিতে মনস্থ করেন; সীক্‌রী তৎকালে তাঁহার নিকট 'পয়মন্ত' স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। সদ্‌বিবেচক ও সুবুদ্ধিমান্ হইলেও আক্‌বর তৎকাল-প্রচলিত অন্ধসংস্কারের প্রভাব হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন নাই।

১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আক্‌বর পুনরায় আজ্‌মীর গমন করেন, এবং তথায় কৃতী স্থপতিগণের সাহায্যে আজ্‌মীর দুর্গের সংস্কার ও পরিবর্দ্ধন কার্য্য সম্পন্ন করাইবার ব্যবস্থা করিয়া, নভেম্বর মাসে রাজযাত্রার নাগোরে উপস্থিত হন। রাজপুতানায় অবস্থানকালে যোধপুররাজ মাল্‌দেওর পুত্র চন্দ্রসেন ও বীকানীর-রাজ রায় কল্যাণ্‌মল্ সম্রাট্‌কে সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া ইতঃপূর্ব্বে আক্‌বর হিন্দুর সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই একই অভিপ্রায়ে এক্ষণে তিনি বীকানীর ও জয়সল্‌মীর রাজ-কুমারীর পাণিগ্রহণ করিলেন। (A. N, ii, 518-19)।

ভাবের অভিব্যক্তি

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]

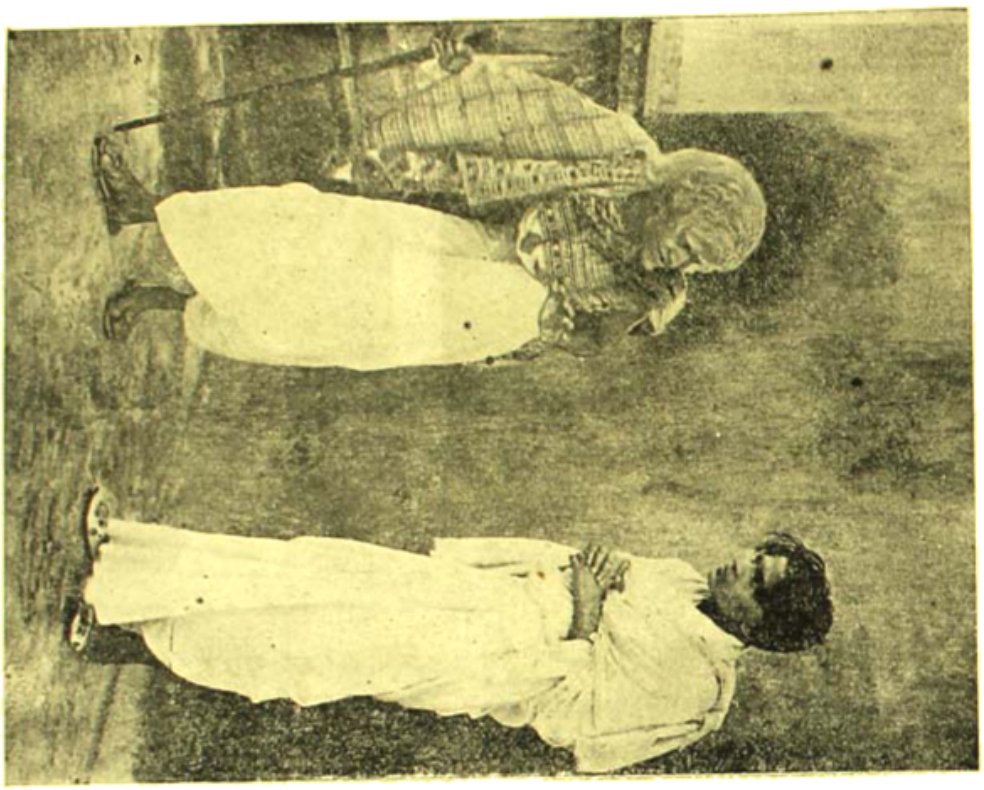

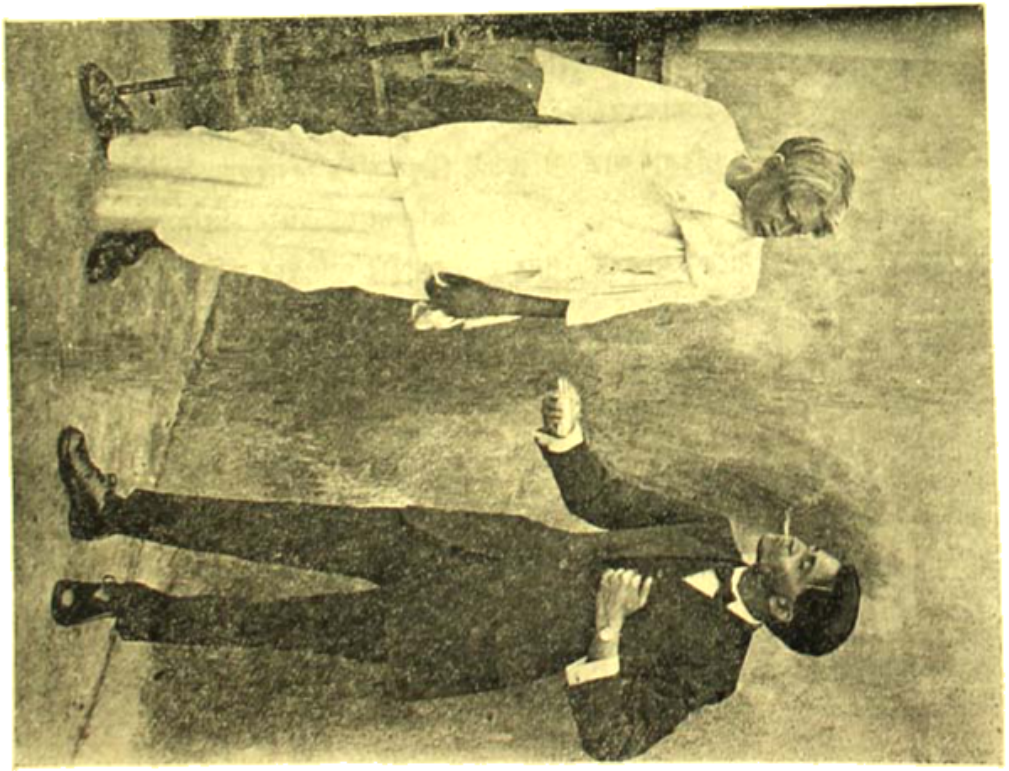

৫ম অঙ্ক—মৃত-অভিনয়

না—কিছুতেই বিবাহ করিব না।

৬ষ্ঠ অঙ্ক—শিখিত-অভিনয়

(স্বগতঃ)—আর একবার বলিলেই বিবাহ করিব।

৫ম অঙ্ক—৫ম দৃশ্য

বিবাহ না করিয়া কি আর করি !!!

৫ম অঙ্ক—৬ষ্ঠ দৃশ্য

মা কই দুটী করা ও চাই !

৫ম অঙ্ক—৬ষ্ঠ দৃশ্য

বিজয়—ওগো, একটী মাত্র ও কি বোতামে মেয়ে না ?

মায়া, অমলা—এই বসুন, বসুন !

আলোচনা

সম্প্রতি বাঙ্গালার শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ ডব্লিউ, এচ, হর্ণেল মহোদয় ১৯১২—১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৬—১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫ বৎসরের জন্য বঙ্গদেশের যে শিক্ষা-বিবরণ সর্ব্বমেন্টে দাখিল করিয়াছেন, তাহার কোন-কোন অংশ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯১১—১২ অব্দে পুরুষদিগের জন্য ৩৪৯৬৫টী এবং স্ত্রীলোকদিগের জন্য ৭২৭৪টি বিদ্যালয় ছিল। ১৯১৬—১৭ অব্দে উহাদের সংখ্যা বাড়িয়া যথাক্রমে ৫৮৪৮৯ ও ১৮৮৪টি দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গলার যে সকল বালক ও বালিকা বিদ্যাভ্যাস করিবার উপযুক্ত বয়স, বঙ্গের সমগ্র লোক-সংখ্যার অনুপাতে শতকরা ১৫ জন হিসাবে তাহাদের সংখ্যা ৬৮১২৬৩১; তন্মধ্যে বালকের সংখ্যা ৩৪০৪১৮১ এবং বালিকার সংখ্যা ৩৩১৭৯৭৭।

বাঙ্গলায় ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডসমূহের খাস বিদ্যালয়, সাহায্যকৃত বিদ্যালয় এবং প্রাইভেট স্কুলসমূহে ১৯১৭ অব্দের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ১৫২০৮৩০ জন ছাত্র ছিল। আর মিউনিসিপ্যালিটীর খাস এবং সাহায্যকৃত বিদ্যালয়-সমূহের ছাত্র সংখ্যা ঐ তারিখে ১৯৪০৮৭ ছিল। এই সকল স্কুল চালাইতে এবং ইহাদের অর্থ সাহায্য করিতে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটী-সমূহের যথাক্রমে ২২২৫৪৭৮ এবং ২০৭৩৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই সকল বিদ্যালয় পরিচালনের অন্যান্য ব্যয় জন-সাধারণ বহন করিয়াছেন। ইহা গেল প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা।

উক্ত পাঁচ বৎসরের উচ্চশিক্ষার অবস্থাও শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার মহোদয়ের রিপোর্টে আলোচিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে সরকারী কলেজের সংখ্যা সমানই ছিল। বেসরকারী কিন্তু সরকারী সাহায্যকৃত কলেজসমূহের সংখ্যা ১০ হইতে ১৪ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সাহায্যকৃত নয় এমন কলেজ তিনটি কমিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ছিল ১৩টি, এখন আছে ১১টি। মোটের উপর সর্ব্বপ্রকারে কলেজের সংখ্যা সমানই আছে। এই সকল কলেজে উক্ত পাঁচ বৎসরে ছাত্রসংখ্যা ৭৯৯৮ অর্থাৎ শতকরা ৩৩ হিসাবে বাড়িয়াছে। কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ২০জন মাত্র সর্ব্বমেণ্ট কলেজে এবং বাকী ৮০ জন বেসরকারী কলেজে অধ্যয়ন করে। এই সকল কলেজ পরিচালনে সর্ব্বসমেত ১৩৮৪৯২৯ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে সরকারী তহবিল হইতে ৭৪৩৫১৩ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে; এবং ছাত্রদিগের বেতন হিসাবে ১০৭১০৬১ টাকা ও অন্যান্য সূত্রে ১৩৪৫১৯ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ১৯১১—১২ অব্দে উচ্চশিক্ষা বাবদে ব্যয় হইয়াছিল সর্ব্বসমেত ১৩৫৩৩১২ টাকা।

সেকেণ্ডারি স্কুলের সংখ্যা ১৯১১-১২ অব্দে ছিল ৫২৫৩ এবং ছাত্র-সংখ্যা ৩১১৩১৯ ছিল। ১৯১৭ অব্দের ৩১ শে মার্চ্চ তারিখে এই শ্রেণীর স্কুলের সংখ্যা ২৬৩৯ এবং ছাত্র সংখ্যা ৩৯৯১৮২ দেখা যায়। মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয় সরকারী ও বেসরকারী সর্ব্বপ্রকারে ৭২৩৯৩৭৬ টাকা পড়িয়াছে।

এই সকল হিসাব হইতে কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা জানা যায় না। বাঙ্গলা দেশে শিক্ষার, বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা এবং ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি, দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় এ দেশে শিক্ষা যেরূপভাবে হওয়া উচিত, ঠিক সেরূপ ভাবে হইতেছে না। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর এবং শিক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থার সম্বন্ধে আমাদের বিবেচনের মতামত ও ব্যক্ত করিয়াছি; এক্ষণে দেখিতেছি, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের মুখপাত্র কোন-কোন বৈদেশিক সহযোগীও বিবেচনা করিতেছেন যে, বাঙ্গালার শিক্ষা আশানুরূপ ও প্রয়োজনানুরূপ হইতেছে না। সহযোগী ইংলিশম্যান ত স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া দিয়াছেন যে, দেশে শিক্ষার যথোচিত উন্নতি হইতেছে না, এবং যাহা হইতেছে তাহাও ঠিক পথে চলিতেছে না। কেবল স্কুল ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার ব্যয়-বৃদ্ধি হইলেই শিক্ষার উন্নতি হইল না; প্রকৃত শিক্ষা কিছুই হইতেছে না। ইংলিশম্যানের মতে "The great majority of the boys who attend school, primary or secondary, receive a mere smattering of useful instruction." আমরা এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিতে চাহি না। শিক্ষা অর্থে আমরা মনুষ্যত্বের বিকাশ বুঝিয়া থাকি। তাহা হইতেছে কই? দেশের শিক্ষার এই দুরবস্থার সম্বন্ধে আমরা দেশের আপামর সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং অচিরে ইহার প্রতিকারের পন্থা নির্দ্দেশ করিতে সবিনয় অনুরোধ করিতেছি।

এক সময়ে ধান্য আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রধান ফসল ছিল। সে সময়ে ধান্য বহির্বাণিজ্যের পণ্য না হওয়ায়, তাহার মূল্যও অতি অল্প ছিল। এখন ধান্যের অপেক্ষা দেশে পাটের চাষ বেশী হইতেছে; যুদ্ধের পূর্ব্বে পাট ও পাটজাত দ্রব্য বহুপরিমাণে বিদেশে চালান যাইত; পাট বিক্রয় করিয়া চাষী ধান্য অপেক্ষা অধিক মূল্য প্রাপ্ত হইত। কিন্তু যুদ্ধ উপলক্ষে পাটের অবাধ গতায়াত রহিত হওয়ায়, পাটের মূল্য অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। তাহার উপর, কৃষক যে পরিমাণ পাট উৎপাদন করিয়াছিল, ক্রয়িকদলের অভাবে ঐ অল্প মূল্যেও সে সমস্ত পাট বিক্রীত

হয় নাই এবং হইতেছেও না। কাজেই বাঙ্গলার কৃষককে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হইয়াছে।

যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের অন্যতম শত্রু জার্ম্মানি বাঙ্গলার পাটের প্রধান খরিদ্দার ছিল। পাট যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় বলিয়া, যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধের পক্ষে অপরিহার্য্য এমন একটা উপকরণ যাহাতে শত্রুর হস্তগত না হয়, সে পক্ষে সুব্যবস্থা করিতেই হয়। সেই জন্য যুদ্ধ-ঘোষণার অব্যবহিত পরেই পাটের অবাধ রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়াই স্বাভাবিক। ইহাতে পাট-উৎপাদক কৃষক বা পাটের চালানী ব্যবসায়ীদের অসুবিধা হইলেও নাচার।

কিন্তু একটা কথা আছে। যুদ্ধের সময় পাট যেমন শত্রুর পক্ষে প্রয়োজনীয়, তেমনি, যুদ্ধে লিপ্ত মিত্রপক্ষীয় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশ সকলের পক্ষেও পাট অপরিহার্য্য। শান্তির সময় জর্ম্মানি যেমন অনেক পাট ক্রয় করিত, যুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া অষ্ট্রিয়া-জার্ম্মানির বিরুদ্ধ পক্ষীয় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ইটালী, ইউনাইটেড ষ্টেটস প্রভৃতি অনেকগুলা দেশে সমবেত ভাবেও কি সেই পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ পাটের প্রয়োজন হইতেছে না? সহজ বুদ্ধিতে ইহাই ত মনে হয়। কিন্তু যাঁহারা পাটের ব্যবসায়ে নিযুক্ত, যাঁহারা এ সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতার দাবী করেন, তাঁহারা বলেন, কর্ণেলিকে পাট বিক্রয় করা সরকারী বিধান অনুসারে রহিত হওয়ায়, পাটের প্রয়োজন অনেক কমিয়া গিয়াছে; সুতরাং তাঁহারা যুদ্ধের পূর্ব্বে যে মূল্যে পাট ক্রয় করিতেন, এখন আর সে মূল্য দিতে পারেন না।

আমাদের অনুমান এবং অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীগণের উক্তি—এই দুইটী পরস্পর বিরোধী বিষয়ের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অন্য প্রকার অবস্থা দেখা যাইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে পাট-ব্যবসায়ী এবং পাটের কলের অধিকারীরা যাহা লাভ করিতেন, এখন তদপেক্ষা অনেক বেশী লাভ করিতেছেন। সহযোগিনী "সঞ্জীবনী" পাটের কলওয়ালাদের গত বর্ষের লাভের যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে অবস্থা কতকটা বুঝা যাইবে। সহযোগিনী বলেন,—

"চাষাদের সর্ব্বনাশে
কলওয়ালাদের পৌষ মাস।

"পাটের দাম অল্প, চাউলের দাম অল্প; সুতরাং কৃষকদের ঘরে হাহাকার লাগিয়াই আছে। ফসল না ফলিলে তাহাদের যেমন দুর্গতি, ফসল উপযুক্ত ফলিলেও তেমন দুর্গতি। অথচ যাহার দাম পাইয়া কেলিয়া পাট যাহারা জন্মাইল, তাহাদের চাষাবাদের খরচ ও মহাজনের দেনা পরিশোধ করিয়া পেটে ভাত ও অঙ্গে বস্ত্র জুটিতেছে না।

"এই ত কৃষকদের অবস্থা; কিন্তু পাটের কলওয়ালাদের এখন অতি সুযোগ। তাহারা এখন লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিয়া সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে। কলওয়ালাদের লাভের হিসাব শুনুন :—

শ্রীপুর কল গত অর্দ্ধ বাৎসরিক লাভ হইতে অংশীদারদিগকে শতকরা ১৫০ টাকা লভ্য অংশ দিয়াছেন। কিরিসন কলে অংশীদারগণ শতকরা ১২৫; কোর্ট প্রোপ্রাইর কলের অংশীদারেরা শতকরা ৮৭৲ টাকা লাভ পাইয়াছে।

শ্রীপুর কলে ২২২০, কোর্ট প্রোপ্রাইর কলে ১২৫০, কিরিসন কলে ১২২১ খানা তাঁত চলিতেছে। এইরূপ প্রকাশ যে, ৩৫০ খানা তাঁত চালাইয়া আলবিয়ন কল ১৩ কি ১৪ লক্ষ রুপা উপার্জ্জন করিয়াছেন।

পাট যাহারা জন্মাইল তাহারা উপবাসী; আর সেই পাটের ব্যবসায় করিয়া কলওয়ালারা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইতেছে।

ইহার মধ্যে যে অন্যায় ও অত্যাচার আছে, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমরা নিরক্ষর কৃষকদের তরফ হইতে গবর্ণমেণ্টকে এই অন্যায়টুকু দূর করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

কিন্তু বুরোপীয় সংবাদপত্রসমূহ সেরূপ মনে করেন না। তাঁহারা বলেন, কলওয়ালারা যতই লাভ করুন, চাষাদের প্রতি তাঁহারা কিছুমাত্র অবিচার করেন না। কলওয়ালারা ৭ টাকা মণ দরে পাট ক্রয় করিয়া থাকেন; আর চাষারা প্রতি মণ পাটের জন্য মাত্র আড়াই টাকা পাইয়া থাকে। অথচ, পাট উৎপাদন করিতে চাষার মণকরা প্রায় ঐরূপই খরচ পড়ে। সুতরাং তাহাদের লাভ সত্য-সত্যই কিছু থাকে না।

কলওয়ালারা যদিচ্ছু মূল্য দেন সাত টাকা; আর চাষারা পায় আড়াই টাকা; তবে ঐ মাঝের টাকাটা যায় কোথায়? না, বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারী ব্যাপারী ও মহাজনের পেটে। কোন একখানি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র হিসাব দিয়াছেন যে, পাটের গাঁট বাঁধিতে, বাছাই করিতে, স্থানান্তর করিতে মণকরা এক টাকা খরচ পড়ে। আর, ব্যাপারীরা পুরা সাড়ে তিন টাকা মণ লাভ করে। বাঙ্গালা দেশে বৎসরে ৩০০০০০০০ মণ পাট উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে বাঙ্গালী বা মাড়োয়ারী পাট ব্যবসায়ীরা বৎসরে ১০০০০০০০০ টাকা লাভ করিতেছে। কিন্তু কলওয়ালারা ঐ পাট হইতে থলিয়া তৈয়ার করিয়া কত লাভ করে, সে সংবাদ উক্ত সংবাদপত্র প্রকাশ করেন নাই। ইহা সুবিবেচনার কাজ হইয়াছে। কারণ, তাহা করিলে হয় ত এত হিসাবপত্র সমস্তই মিথ্যা হইয়া যাইত। ঝোঁকের উপর ঝোঁকটা তাঁহারা এ-দেশীয়দিগের উপরই চাপাইতেছেন।

বস্ত্র সমস্যা এখন দেশের আপামর সাধারণের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমরাও একটু-আধটু আলোচনা করিতে পারি। যুদ্ধারম্ভে সমগ্র বঙ্গদেশের নানা স্থানে

হাট-বাজার লুঠপাট হইয়াছে এবং এখনও কিছু-কিছু হইতেছে। অন্নের দুর্ভিক্ষের সময় লোকে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া নিজের স্ত্রী-পুত্রদের হত্যা করিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে; বস্ত্রের দুর্ভিক্ষের সময়ও এখন লোকে সেইরূপ স্ত্রী-জাতির মর্য্যাদা পর্য্যন্ত রাখিয়া চলিতে পারিতেছে না,—পথে-ঘাটে অসহায়া স্ত্রীলোক দেখিলে তাহাদের একমাত্র পরিধের বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া পলাইতেছে। অনেক স্ত্রী-পুরুষ লজ্জা-নিবারণের কোন উপায় করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতেছে। অবস্থা যে কতখানি ভীষণ, তাহা এই সকল ঘটনা হইতেই উপলব্ধি হয়।

বেঙ্গলীর অতিশয্যে অনেকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিতেছেন। সহযোগী "দর্পক" একটী সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কিছু দিনের জন্য বিলাতী বস্ত্র এবং দেশী মিলের বস্ত্র বয়কট করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। সহযোগী লিখিয়াছেন,—

"যত দিন না বস্ত্রের মূল্য করিয়া ন্যায্য হারে আসিয়া দাঁড়ায়, তত দিন আমরা দেশী বা বিলাতী মিলের বস্ত্র ব্যবহার করিব না। অর্থাৎ ন্যায্য মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য দিয়া মিলের বস্ত্র খরিদ করিব না; তত দিন আমরা কেবল দেশী তাঁতের কাপড় ব্যবহার করিব।"

সহযোগী "নায়ক"ও ঠিক এই মর্ম্মের পরামর্শ দিয়াছেন। উভয়েরই বিশ্বাস, বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা এবং তাহাদের মিলওয়ালারা দেশের লোকের নিরুপায় অবস্থা দেখিয়া অন্যায়রূপে বস্ত্রের অতিরিক্ত মূল্য আদায় করিয়া লইতেছে। সহযোগীদের কথাগুলি শুনিতে মন্দ নয়; তথাপি আমরা এরূপ প্রস্তাবের সমর্থন করিতে পারি না। প্রথমতঃ, বস্ত্রের এইরূপ মূল্য-বৃদ্ধি অন্যায় না হইতে পারে, - বাজারে demand and supplyএর অবস্থা বিবেচনা করিয়া, সত্য-সত্যই বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধির কারণ ঘটিয়া থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা কঠিন। বৎসর যখন পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থায় বিলাতী বস্ত্র বয়কট করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, এখন, বস্ত্রের মূল্য-বৃদ্ধি ব্যতীত অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা সেরূপ নহে। সুতরাং যাহা হইবার নহে, এরূপ প্রস্তাব করিয়া কায নাই। তবে সমগ্র দেশে তুলার চাষের প্রবর্ত্তন করিয়া চরকায় সুতা কাটিয়া তাঁতে বস্ত্র প্রস্তুত করিবার যে প্রস্তাব চলিতেছে, আমরা তাহার পূর্ণ সমর্থন করি। আর যদি গবর্ণমেণ্ট একজন কণ্ট্রোলার নিযুক্ত করিয়া বস্ত্রের মূল্যের হ্রাস ন্যায়সঙ্গতভাবে বাঁধিয়া দেন, তাহাতেও আমরা সম্পূর্ণ রাজী আছি।

সুখের বিষয়, কথার অপেক্ষা এ বিষয়ে কাযের দিকে লোকের বিশেষ লক্ষ্য পড়িয়াছে, দেখা যাইতেছে। দেশের সর্ব্বত্রই তুলার চাষের প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলিতেছে এবং স্থানীয় সহকারী কর্ম্মচারীরাও এ বিষয়ে দেশবাসীকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে বরিশাল ও মৈমনসিংহে দুইটী বড়-বড় সভা হইয়া গিয়াছে। তুলার চাষের প্রবর্ত্তনের জন্য প্রায় সকল স্থানেই কমিটি গঠিত হইতেছে এবং ধনশালী ভদ্রলোকেরা চাষা ও গৃহস্থ লোকদিগকে বিনামূল্যে তুলার বীজ সরবরাহ করিবার জন্য কমিটিসমূহকে অর্থ-সাহায্য করিতেছেন। এই সুযোগে বাঙ্গলার বস্ত্র শিল্প যদি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে অমঙ্গল হইতে যে মঙ্গলের উৎপত্তি হয়, এ কথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

শিক্ষার অভাবে কত অসম্ভব ব্যাপার যে সম্ভব হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। অশিক্ষিত লোকের হৃদয় অতি বিশ্বাসপ্রবণ। সেই জন্য মিথ্যা কথার প্রচারের দ্বারা তাহাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করা কত সহজ দেখুন। মৈমনসিংহের সহযোগী "চারুমিহির" লিখিয়াছেন,—

"কোন কোন স্থানে একটী গুজব উঠিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট বহু হাত কড়ি প্রস্তুত করিয়া থানায়-থানায় পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং যাহারা যুদ্ধের কার্য্যে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিবে, তাহাদিগকে এই সকল হাত-কড়ি পরাইয়া আবদ্ধ করা হইবে।"

কথাটা যে কতদূর মিথ্যা, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু দেশে শিক্ষার অবস্থা এতই হীন যে এরূপ মিথ্যা কথার প্রচারও সম্ভব হয়, এবং লোকে তাহা বিশ্বাস করিতেও ইতস্ততঃ করে না। এই কারণেই,—দেশের লোকে একটা অশিক্ষিত এবং বিশ্বাসপ্রবণ বলিয়াই, কন্‌স্ক্রিপ্‌সন বা বাধ্যতামূলক সৈনিক বৃত্তির প্রস্তাব হইলে গোরারা,—দেশের লোকে অবশ্য আতঙ্কিত হইয়া বিদ্রোহ ঘটাইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আপত্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

মেয়েদের শিক্ষার অভাবে যে দেশের অত্যন্ত অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা অনেকেই বুঝিতেছেন এবং সাধ্যমত প্রতিকারের চেষ্টাও করিতেছেন। এ সম্বন্ধে এক ভদ্রলোক একটী উত্তম প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা সেই প্রস্তাবটির মর্ম্ম "ত্রিপুরাহিতৈষী" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"সৌহার্দ্য হইতে গত ৭ই যে বাবু দিজেশর ঘোষ এই পত্রখানি বেঙ্গলীতে পাঠাইয়াছেন যে, তাঁহার কোন ধনী বদান্য বন্ধু বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার জন্য এককালীন এক লক্ষ টাকা দান করিতে চাহেন। উক্ত দাতা ইহা ইচ্ছা করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার সহিত গৃহশিল্প শিক্ষার আয়োজন থাকিবে, যাহাতে মধ্য-শ্রেণীর হিন্দু-মহিলা ও বালিকারা এমন শিক্ষা পাইবেন যে, তাঁহারা স্বগৃহে থাকিয়া সদুপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন।"

দাতার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। পত্রলেখক এ সম্বন্ধে সাধারণের মতামত জানিতে চাহেন। দেশের লোক এ সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করিতে চাহেন? দাতার এই দানের সদ্ব্যবহার তাঁহারা করিতে পারিবেন কি? এই লক্ষ টাকা উপলক্ষ করিয়া দেশ সুদ্ধার একটী জাতীয় হিতকর মহৎ কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। মেয়েদের শিক্ষার প্রসারের জন্য এরূপ দাতা একজন নহেন, খুঁজিলে আরও অনেক পাওয়া যাইতে পারে। কয়েক জনের নিকট হইতে এইরূপ মোটা মোটা টাকা এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের সাহায্যে একটী ট্রাষ্ট ফাণ্ড গঠন করিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। দেশের লোক কথাটা ভাবিয়া দেখুন

সাময়িকী

'ভারতবর্ষ' আজ ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিল। যে মঙ্গলময় বিধাতা বিগত পাঁচ বৎসর ইহাকে পরিচালিত করিয়াছেন, আজ সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে প্রণাম করি। আমরা জানি, আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে 'ভারতবর্ষ' পরিচালিত হয় নাই; আমাদিগকে উপলক্ষ করিয়া সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পাঁচ বৎসর এই পত্রখানিকে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণের সম্মুখে প্রতি মাসে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!

যাঁহার প্রেরণায় দ্বিজেন্দ্রলাল এই পত্রিকা সম্পাদনের ব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহারই ইচ্ছায় তিনি 'ভারতবর্ষ' সম্পাদন অপেক্ষাও মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার ক্রোড়ে চলিয়া গেলেন। পরলোকগমনের কিছু দিন পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রাণের প্রবল আগ্রহে যে কামনা করিয়াছিলেন—"এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি",—তাঁহার সে কামনা পূর্ণ হইল। তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র-কন্যা পড়িয়া রহিল, তাঁহার সাধের 'ভারতবর্ষে'র প্রথম সংখ্যাও তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। তাহার পর বিধাতার বিধানে আমরা পাঁচ বৎসর তাঁহারই ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া 'ভারতবর্ষে'র সেবা করিলাম; আমরা আজ তাঁহারই নাম স্মরণ করিয়া এই ষষ্ঠ বর্ষে 'ভারতবর্ষে'র সেবায় প্রবৃত্ত হইলাম। তিনিই আমাদের জন্য লেখক সংগ্রহ করিয়া দেন, তিনিই আমাদের পাঠক-পাঠিকা আনিয়া দেন; নতুবা আমাদের কি সাধ্য আছে, কি শক্তি আছে যে, আমরা এত সুলেখকের সাহচর্য্য লাভ করি, এত পাঠক-পাঠিকা আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। তাই আমরা এক-এক সময়ে ভাবি—

"এ কি করুণা তোমার ওহে করুণানিধান!
অধম সন্তানে প্রভু, এত তোমার করুণা কেন?"

এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর 'ভারতবর্ষ'কে ভগবান যে আশ্রয়ে রাখিয়াছিলেন, সেই কর্ম্মবীর, বাঙ্গালা-সাহিত্যের পরম সুহৃদ্ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ষষ্ঠ বর্ষারম্ভের পূর্ব্বেই আমাদিগকে ছাড়িয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি রোগশয্যায় থাকিয়াও 'ভারতবর্ষে'র প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন, 'ভারতবর্ষে'র উন্নতি কামনা করিতেন; যখনই তাঁহার রোগশয্যার পার্শ্বে গিয়া বসিতাম, তখনই নানা কথার সঙ্গে 'ভারতবর্ষে'র কথা বলিতেন, আমাদিগকে উৎসাহ দান করিতেন। বৃদ্ধ গুরুদাস বাবুর সেই উৎসাহ-বাক্যে আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে বলের সঞ্চার হইত; বিধাতার আশীর্ব্বাণী গুরুদাস বাবুর ক্ষীণ কণ্ঠের মধ্য দিয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্য প্রতিপালনে অনুপ্রাণিত করিত। আজ তিনি নাই; তাঁহার অভাব আমরা বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছি। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই পাঁচ বৎসর গুরুদাস বাবুর উপযুক্ত পুত্রদ্বয়ের আগ্রহ, সহানুভূতি ও কর্ত্তব্যপরায়ণতাই আমাদিগকে বলীয়ান করিয়াছে। ভবিষ্যতে 'ভারতবর্ষে'র জন্য তাঁহাদের চেষ্টা, যত্ন আরও বর্দ্ধিত হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

'ভারতবর্ষে'র প্রতিষ্ঠাতা দ্বিজেন্দ্রলাল 'ভারতবর্ষে'র সূচনায় যে কথা বলিয়াছিলেন, আজ ষষ্ঠ বর্ষে প্রবেশ করিবার সময় আমরা সেই মহতী বাণী স্মরণ করি। —"আমাদের ভাগ্যবিধাতা দূরে অলক্ষ্যে বসিয়া আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন করিতেছেন। আমরা যেন না পিছু হটি। আমরা যেন না ভয় পাই। আমরা যেন সাহিত্যের বাতাসকে পবিত্র রাখিতে পারি। আমাদের বন্দনায় যেন বিগলিত-স্নেহা জননীর চক্ষু ফাটিয়া জল পড়ে। আমাদের গানে যেন জগৎ মাতিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমাদিগকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করে। আমরা যেন আত্ম-সম্মানকে বক্ষে রাখিয়া অপবিত্রতাকে দূরে রাখিয়া মনুষ্যত্বকে মাথায় রাখিয়া, সাহিত্যের কুসুমিত পথে নির্ভয়ে চলিয়া যাই। তাহা হইলে আমাদের আর জগতের কাছে সম্মান ভিক্ষা করিতে যাইতে হইবে না। সে সম্মান দ্বারে আপনি আসিয়া ধরা দিবে।"

সংবাদপত্রের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, সুরবালা ও

গায়ত্রী নামধারিণী দুইটী বারবিলাসিনী বিগত মহাষ্টমীর দিন গঙ্গাস্নানের পথে সুভাষিণী নাম্নী একটী গৃহস্থ-বধূকে ভুলাইয়া তাহাদের গৃহে লইয়া যায় এবং নানা কৌশলে তাহার সতীধর্ম্ম নষ্ট করায়; অনেক অনুসন্ধানের পর পুলিশ সুভাষিণীর উদ্ধার-সাধন করেন। হাইকোর্টের সেসনের বিচারে সুরবালা ও গায়ত্রীর সাত বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

সুরবালা সম্পন্ন, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা ছিল; তাহার স্বামী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সুরবালা কুলত্যাগ করে; কেহ-কেহ বলেন, সধবা অবস্থাতেই তাহার চরিত্র কলুষিত হয়। তাহার কন্যা গায়ত্রী (পিতা বড় সাধ করিয়াই পুত্রীর এই পবিত্র নামকরণ করিয়াছিলেন) সুপাত্রে অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু মাতা সুরবালার প্রলোভনে পড়িয়া কন্যাও সতীধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া মাতার পথাবলম্বিনী হয়। পিতৃকুল ও স্বামীকুলে দুরপনেয় কলঙ্ক ঢালিয়া দিয়াই তাহারা নিরস্ত হয় নাই; তাহারা গৃহস্থ-কন্যাদিগকে ভুলাইয়া কুপথ অবলম্বন করাইবার ব্যবসায়ও আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারই ফলে গঙ্গাস্নান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সুভাষিণী তাহাদের কবলে পড়ে; তাহার পর যাহা হইয়াছে, সংবাদ-পত্রের পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। সে পাপ কথা, সে নারকীয় বীভৎস ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা art-র মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিতে একেবারেই অসমর্থ; বিশেষতঃ, সে কথা বলিবার জন্য আমরা এ প্রস্তাবের অবতারণাও করি নাই।

সুরবালা ও গায়ত্রী তাহাদের দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কারা-গৃহে বসিয়া তাহারা তাহাদের ঘৃণিত, অভিশপ্ত জীবন-কথা আলোচনা করিয়া সাত বৎসর অতিবাহিত করুক। কিন্তু নিরপরাধা সুভাষিণীর কথাই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা পত্রান্তরে একটী গল্প প্রকাশিত করিয়াছিলাম। সে গল্পটীর নাম "আমরা কোথায় যাই?" তাহাতে দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক অপহৃত একটী কুল-কামিনীর নির্য্যাতন-কাহিনী, পাষণ্ডগণের বিচার ও শাস্তি, রমণীর আত্মীয়গণের দুর্ব্ব্যবহার ও তাহার স্বামী কর্ত্তৃক তাহার গ্রহণ ও সমাজ-ত্যাগ এবং নির্জ্জনে স্বামী-স্ত্রীর জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সেই স্বামীর মুখ দিয়াই হিন্দু-সমাজপতিগণকে আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"আমরা কোথায় যাই?"

উপরিউক্ত কাহিনীটী নিছক গল্প জন্য আমরা নিরপরাধা, নির্য্যাতিতা যুবতীকে কল্পনার বলে স্বামীর আশ্রয়ভাগিনী করিয়াছিলাম;—সমাজে প্রবিষ্ট করাইতে আমাদের উদ্দাম কল্পনাও সাহসী হয় নাই। কিন্তু কার্য্য-ক্ষেত্রে কি তাহা হয়? এই যে প্রতি বৎসর কত রমণী এই ভাবে নির্য্যাতিত হইয়া থাকে, তাহাদের কেহ যে স্বামীর আশ্রয় লাভ করিয়াছে, এ সংবাদ কখনও আমাদের কর্ণ-গোচর হয় নাই—সমাজে গ্রহণ ত দূরের কথা। এ দেশে কত যুবতী যে বিপদে পড়িয়া বিড়ম্বিত হয়, পাষণ্ডের অমানুষী পীড়নে সতীধর্ম্মে বঞ্চিত হয়, আত্মীয়গণের আশ্রয় লাভে অকৃতকার্য্য হইয়া গত্যন্তর অভাবে বারবিলাসিনীর দল বৃদ্ধি করে, কেহ কেহ বা হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহার সংবাদ কি সকল সময় আমাদের গোচরীভূত হয়? কলিকাতা মহানগরীর বুকের উপরই যে কত ব্যাপার প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার সংবাদই কি পাওয়া যায়? পুলিশের চেষ্টায় এবং সুরবালা গায়ত্রীর পাপের ভরা পূর্ণ হওয়ায় সুভাষিণীর এই হৃদয়-ভেদী ঘটনা প্রকাশিত হইল। কিন্তু, তাহার পর—তাহার পর হতভাগিনী সুভাষিণী! সংবাদপত্রে দেখিলাম, সুভাষিণী এখন পরদুঃখকাতর, হৃদয়বান, অবসর-প্রাপ্ত লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (Dr, U. N. Mukherji. I. M. S.) মহাশয়ের গৃহে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। হতভাগিনীর কোষ্ঠির কোন্ কোণে বোধ হয় একটু শুভগ্রহের জোর ছিল, তাই সে এমন আশ্রয় পাইয়াছে। কিন্তু, তার পর—

তারপর—ছোট্টো একটা সংবাদ আছে। সংবাদ এই যে, নবদ্বীপ, ভাটপাড়া ও ব্রাহ্মণ-সভার কয়েক জন পণ্ডিত সুভাষিণীকে সমাজে তুলিয়া লইবার সপক্ষে মত দিয়াছেন।

কথাটা কিন্তু ষোল আনা বিশ্বাস করিতে সাহসে কুলাইতেছে না। কারণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ সকলে যে একবাক্যে এত বড় একটা পাঁতি দিবেন, তাহা মনে হইতেছে না; হয় ত দুই চারি জন উদারহৃদয় পণ্ডিত মত দিয়াছেন। কিন্তু হয় ত দুই চারি দিনের মধ্যেই আবার কোন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজ বলিয়া উঠিবেন, "সর্ব্বনাশ! এমন ব্যবস্থা কিছুতেই দিতে পারা যায় না।" ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং সর্ব্ববাদিসম্মত পাঁতি যে পাওয়া যাইবে, এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাহার পর, এখন দেশের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বিক্রমপুর প্রভৃতি সমাজের পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা যে সকলেই শিরোধার্য্য করেন, তাহাও ত দেখি না; পণ্ডিত-সমাজের পূর্ব্বের প্রতিপত্তি যে কারণেই হউক অনেক কমিয়া গিয়াছে। পল্লী-অঞ্চলের নিষ্কর্ম্মা লোকেরা আর কিছু না পারুক, দলসং উভয় কার্য্যই পণ্ড করিয়া দিবার জন্য দলাদলি করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। সুতরাং দেশের সকলে মিলিয়া-মিশিয়া যে কোন একটা ব্যবস্থা প্রচলনে বদ্ধপরিকর হইবেন, এ কথা বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা দেখিয়া কল্পনা করিতেও আমরা সঙ্কুচিত হই।

আরও এক কথা। কলিকাতার বা এই রকম বড় সহরে সবই চলিতে পারে, চলিয়াও থাকে; এখানে কেহ কাহারও খোঁজ নেয় না; যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করিতে পারে; অর্থাৎ আমরা যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে বলিতে পারি, কলিকাতা সমাজ-বহির্ভূত স্থান। এখানে যে কোন সদ্বংশ ব্যক্তিই সুভাষিণীর ন্যায় নিরপরাধা, নির্য্যাতিতা যুবতীকে সমাজের ভয় না করিয়াই আশ্রয় দিতে পারেন; কিন্তু পল্লীগ্রামে তাহা সম্ভব নহে। সেখানে এই প্রকার যুবতীকে যদি স্বামী গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়িবে। সেই ভয়েই সকলে এই কার্য্যে বিরত থাকেন। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি? এই শ্রেণীর রমণীরা স্বামীর ঘর করিবে, তাহাদের পুত্রকন্যাগণ সমাজে চলিবে, সে কথা সাহস করিয়া কেহ বলিতে পারিবে না। এই সমস্ত কারণে আমাদের মনে হয় যে, এত বড় একটা সামাজিক কথার এত সহজেই মীমাংসা হইবে না, এবং এই শ্রেণীর নির্য্যাতিতা যুবতীরা আজই স্বামী-গৃহে গৃহীত হইবে না; ধীরে ধীরে এই কার্য্য সংসাধিত করিতে হইবে।

আমাদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সহানুভূতিপূর্ণ পাঁতি অনুসারে সুভাষিণীর শ্বশুর ও স্বামী তাহাকে যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন, এই সংবাদ আমরা পাইয়াছি, তবে একথাও শুনিতেছি যে, তাহার স্বামী তাহাকে লইয়া তাঁহার পল্লীভবনে বাস করিতে সাহস করিতেছেন না; তাঁহারা কলিকাতাতেই থাকিবেন। যে ভাবেই হউক সুভাষিণী আপাততঃ কূল পাইল বলিয়া আশা হইতেছে। সুভাষিণীর ঘটনা কলিকাতায় হইল, সংবাদপত্রে লেখালেখি হইল; তাই তাহার একটা কিনারা হইল; কিন্তু এই শ্রেণীর অন্য হতভাগিনীদের দশা কি হইবে? আমরা এ সম্বন্ধে দুইটি প্রস্তাব করি। প্রথমতঃ, এই শ্রেণীর যুবতীদিগকে সদ্বংশ হিন্দুগৃহে আশ্রয় দানের ব্যবস্থা করা হউক; তাহারা যেন সেই সকল আশ্রয়দাতার গৃহে দাসীর মত ঘৃণিত জীবন যাপন না করে; আশ্রয়-দাতা ব্যক্তিগণ যেন তাহাদিগকে কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করেন, এবং সমাজের লোকেরা বা প্রতিবেশীরা যেন এই প্রকার আশ্রয়দাতাগণকে অপাংক্তেয় বা একঘরে না করেন। এইটুকু অনুগ্রহ যদি গ্রামবাসীগণ ও আত্মীয়স্বজনেরা আপাততঃ করেন, তাহা হইলেই ক্রমে ভবিষ্যতের পথ খোলা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, অনাথা-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। এই শ্রেণীর যুবতীরা যদি কোন হিন্দুভাবে সুপরিচালিত অনাথা-আশ্রমে স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই তাহারা বাঁচিয়া যায়, তাহাদিগকে গত্যন্তর অভাবে কুপথে যাইতে হয় না, বা ভিন্ন ধর্ম্ম অবলম্বনও করিতে হয় না। ইহার অধিক সংস্কারের কথা আপাততঃ না ভাবিয়া ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিলেই হতভাগিনীরা রক্ষা পায়; নতুবা সাময়িক উত্তেজনায় প্রবল একটা সংস্কার সাধনের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিলে, এতাদৃশ আর দশটা ব্যাপারেরও যেমন পরিসমাপ্তি হইয়াছে, ইহারও তাহাই হইবে; বক্তা-উন্মাদ বকিয়া যাইবে, আর 'শোনা'-উন্মাদ শুনিয়া যাইবে, বাহোবা দিবে। তারপর সব চুপ্।

ভারত-গবর্ণমেণ্ট এ বৎসরও সময়-গুণ গ্রহণ করিবেন।

সকলেই বলিতেছেন, আমরাও দেখিতে পাইতেছি, যুদ্ধ এবার ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে; পৃথিবীর শত্রু, সভ্যতার শত্রু জর্ম্মাণ শেষ চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে। তাহার সংবাদে প্রকাশ, জর্ম্মাণী সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে। ইংরাজ ও মিত্রশক্তিপুঞ্জও এই ভীষণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ভারতবর্ষ এ কয় বৎসর এই যুদ্ধে সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিয়াছে এবং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এবার 'সাহায্য' নহে; এ ভীষণ যুদ্ধে আমরা আর সাহায্যকারী নহি; এখন এ যুদ্ধ আমাদেরই যুদ্ধ; ইংরাজের, ভারত-সম্রাটের শুভাশুভ, জয়-পরাজয়, আমাদেরই জয়-পরাজয়। আমরা প্রকৃত পক্ষেই যে আমাদের রাজার, আমাদের সম্রাটের সম্পদ-বিপদের ভাগী, তাহা আমাদিগকে এইবার দেখাইতে হইবে। যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে আমরা বহুদূরে রহিয়াছি; তাই আমরা সম্যক বুঝিতে পারিতেছি না আমাদের সদাশয় ইংরাজ-রাজ এই যুদ্ধে কি করিতেছেন। পাঠকপাঠিকাগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, আমাদের সম্রাট্ মহোদয় তাঁহার নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য কম করিয়া ফেলিয়াছেন, রাজ-পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত করিয়াছেন। আমরা ত এখনও তাহা করি নাই। এইবার আমাদিগকে তাহাও করিতে হইবে; সভ্য জগৎকে দেখাইতে হইবে যে আমরা আমাদের রাজার জন্য যথাসর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এবারের এই সমর-যুগে এ কথা সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই সমর-যুগে টাকা আনা পাইয়ের হিসাব কেহ করিও না; লাভের কথা, সুদের কথা কেহ ভাবিও না; যাহার যাহা আছে, সমস্ত সম্রাটের কার্য্যে উৎসর্গ কর। আর সম্রাটের কার্য্যই বা বলি কেন? আমাদেরই কার্য্য। যাঁহারা যুদ্ধের সংবাদ পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন যে, জর্ম্মাণীরা কেন দৃষ্টি ভারতবর্ষের দিকেও বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। এ সময় ভারতবর্ষকে নিরাপদ করিবার জন্য আমাদের সকলকেই প্রস্তুত হইতে হইবে; জর্ম্মাণ যেন বুঝিতে পারে যে, এদিকে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। এই আয়োজন ত মুখের কথায় হইবে না; লক্ষলক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইবে, কোটী কোটী অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। সুতরাং ক্ষতি-লাভ গণনার আর সময় নাই। এবারে সমরযুগে আমাদের যাহা কিছু আছে, সমস্ত অর্পণ করিতে হইবে, প্রদেশে প্রদেশে গ্রামে গ্রামে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে। এবার আমাদের দিবার পালা, লইবার সময় নহে। যুদ্ধের অবসান হউক, আমরা জয়লাভ করি, তখন কিছুই চাহিতে হইবে না; আপনা হইতেই সমস্ত অধিকার আমাদের করতলগত হইবে। এবার আমাদের দেখাইতে হইবে, আমরা শুধু বাক্যবীর নহি—আমরা কর্ম্মবীর; আমরা দেশের জন্য, রাজার জন্য সর্ব্বস্ব দিতে পারি।

শ্রীকান্তর ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

কলিকাতার ঘাটে জাহাজ ভিড়িল। দেখিলাম। ছোটর উপর বন্ধু দাঁড়াইয়া আছে। সে সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "না রাস্তার উপর গাড়ীতে অপেক্ষা করচেন। আপনি নেবে যান, আমি জিনিস-পত্র নিয়ে পরে যাচ্ছি।" বাহিরে আসিতেই আর একটা লোক নত হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, "রতন যে। ভাল ত?"

রতন একগাল হাসিয়া কহিল, "আপনার আশীর্ব্বাদে। আসুন।" বলিয়া পথ দেখাইয়া গাড়ীর কাছে আনিয়া দরজা খুলিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, "এসো। রতন, তোরা বাবা আর একটা গাড়ী করে পিছনে আসিস,—দুটো বাজে, এখনো ওঁর নাওয়া-খাওয়া হয় নি, আমরা বাসায় চল্লুম। গাড়োয়ানকে যেতে বলে দে।" আমি উঠিয়া বসিলাম। রতন 'যে আজ্ঞে' বলিয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গাড়োয়ানকে হাঁকাইতে ইঙ্গিত করিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া পদধূলি লইয়া কহিল,

"তাহাতে কষ্ট হয় নি ত?" "না।" "বড্ড অসুখ করেছিল না কি?" "অসুখ করেছিল বটে, বড্ড নয়। কিন্তু তোমাকে ত ভাল দেখাচ্ছে না। বাড়ী থেকে কবে এলে?" "পর্শু। অভয়ার কাছে তোমার আস্‌বার খবর পেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়ি। সেই আস্‌তেই ত হোতো,—দু'দিন আগেই এলুম। এখানে তোমার কত কাজ আছে জানো?" কহিলাম, "কাজের কথা পরে শুনবো। কিন্তু তোমাকে এ রকম দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছিল?" রাজলক্ষ্মী হাসিল। এই হাসি যে কতদিন দেখি নাই, তাহা এই হাসিটি দেখিয়াই শুধু আজ মনে পড়িল। এবং সঙ্গে-সঙ্গে কতবড় যে একটা অদম্য স্পৃহা নিঃশব্দে দমন করিয়া ফেলিলাম, তাহা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ জানিল না। কিন্তু দীর্ঘশ্বাসটা তাহাকে লুকাইতে পারিলাম না, সে বিস্মিতের মত ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম দেখাচ্ছে আমাকে, রোগা?" সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। রোগা? হাঁ রোগা একটু বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়। মনে হইল, সে যেন কত দেশ-দেশান্তর পায়ে হাঁটিয়া তীর্থ-পর্যটন করিয়া এই মাত্র ফিরিয়া আসিল,—এম্‌নি ক্লান্ত, এমনি পরিশ্রান্ত। নিজের ভার নিজে বহিবার তাহার আর শক্তিও নাই, প্রবৃত্তিও নাই,—এখন কেবল নিশ্চিন্ত নির্ভরে চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার একটু যায়গা অন্বেষণ করিতেছে। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া কহিল, "কৈ বল্‌লে না যে?" কহিলাম, "নাই শুন্‌লে।" রাজলক্ষ্মী ছেলেমানুষের মত মাথার একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, "না, বল। লোকে যে বলে আমি একেবারে বিশ্রী দেখ্‌তে হয়ে গেছি। সত্যি?" আমি গম্ভীর হইয়া কহিলাম, "সত্যি।" রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "তুমি মানুষকে এম্‌নি অপ্রতিভ করে যাও যে,—আচ্ছা, বেশ ত! ভালই ত! শ্রী নিয়ে আমার কি-ই বা হবে! তোমার সঙ্গে আমার সুশ্রী-বিশ্রী দেখা-দেখির ত সম্পর্ক নয় যে, সে জন্যে আমাকে ভেবে মরতে হবে!" আমি বলিলাম, "সে ঠিক, ভেবে মরবার কিছু মাত্র হেতু নেই। একে ত লোকে ও-কথা তোমাকে বলে না, তা ছাড়া বল্‌লেও তুমি বিশ্বাস কর না। মনে-মনে জানো যে—" রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি অন্তর্যামী কি না, তাই সকলের মনের কথা জেনে নিচ্চে! আমি কস্‌মিনো ও-কথা আর ভাবিনে। তুমি নিজেই সত্যি করে বল ত, সেই শিকার করতে গিয়ে আমাকে যেমন দেখেছিলে, তেম্‌নি কি এখনো দেখ্‌তে আছি না কি? তার চেয়ে কত কুচ্ছিত হয়ে গেছি।" আমি কহিলাম, "না, বরঞ্চ তাহার চেয়ে ভাল দেখ্‌তে হয়েচ।" রাজলক্ষ্মী চক্ষের নিমিষে জানালার বাহিরে মুখ ফিরাইয়া বোধ করি তাহার হাসি মুখখানিই আমার মুগ্ধ দৃষ্টি হইতে সরাইয়া লইল, এবং কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে পরিহাসের সমস্ত চিহ্ন মুখের উপর হইতে অপসৃত করিয়া ফিরিয়া চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি জ্বর-টর হয়েছিল? ও-দেশের আব-হাওয়া কি সহ্য হচ্চে না?"

কহিলাম, "না হলে ত উপায় নেই। যেমন কোরে হোক্ সহ্য করিয়ে নিতেই হবে।" আমি মনে-মনে নিশ্চয় জানিতাম রাজলক্ষ্মী এ কথার কি জবাব দিবে। কারণ, যে দেশের জল-বাতাস আজও আপনার হইয়া উঠে নাই, কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে তাহাকে আত্মীয় করিয়া লইবার আশায় নির্ভর করিয়া সে যে কিছুতেই আমার প্রত্যাবর্তনে সম্মত হইবে না, বরঞ্চ ঘোর আপত্তি তুলিয়া বাধা দিবে, ইহাই আমার মনে ছিল। কিন্তু সেরূপ হইল না। সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "সে সত্যি। তা'ছাড়া সেখানে আরো ত কত বাঙালী রয়েচেন। তাঁদের যখন সইচে, তখন, তোমারই বা সইবে না কেন। কি বল?" আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাহার এই প্রকার উদ্বেগহীনতা আমাকে আঘাত করিল। তাই, শুধু একটা ইঙ্গিতে সায় দিয়াই নীরব হইয়া রহিলাম। একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবিতাম, আমার প্লেগের কাহিনীটা কি ভাবে রাজলক্ষ্মীর শ্রুতিগোচর করিব। সুদূর প্রবাসে আমার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে যখন দিন কাটিতেছিল, তখনকার সহস্র প্রকার দুঃখের বিবরণ শুনিতে-শুনিতে তাহার বুকের ভিতরে কি ঝড় উঠিবে, দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া কেমন করিয়া অশ্রুধারা ছুটিবে, তাহা কত রসে, কত রঙে ভরিয়া যে, দিনের পর দিন কল্পনায় দেখিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। এখন সেইটাই আমাকে সব চেয়ে লজ্জায় বিঁধিল। মনে হইল ছি ছি—ভাগ্যে কেহ কাহারো মনের খবর পায় না। নইলে—, কিন্তু থাক্‌গে সে কথা। মনে মনে বলিলাম, আর যাহাই

করি, সেই মরণ-বাঁচনের গল্প আর তাহার কাছে করিতে যাইব না। বউবাজারের বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। রাজলক্ষ্মী হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, "এই সিঁড়ি,—তোমার ঘর তেতলায়। একটু শুয়ে পড়গে, আমি যাচ্চি।" বলিয়া সে নিজে রান্না-ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, এ ঘর আমার জন্যই বটে। পাটনার বাড়ী হইতে আমার বইগুলি, আমার গুড়গুড়িটি পর্য্যন্ত আনিতে পিয়ারী বিস্মৃত হয় নাই। একখানি দামী সূর্য্যাস্তের ছবি আমার বড় ভাল লাগিত। সেখানি সে নিজের ঘর হইতে খুলিয়া আনিয়া আমার শোবার ঘরে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিল। এই ছবিটি পর্য্যন্ত সে কলিকাতার সঙ্গে আনিয়াছে এবং ঠিক্ তেম্‌নি করিয়া দেয়ালে ঝুলাইয়া দিয়াছে। আমার লিখিবার সাজ সরঞ্জাম, আমার কাপড়, আমার সেই লাল মখ্‌মলের চটি জুতাটি পর্য্যন্ত ঠিক তেমনি সযত্নে সাজানো রহিয়াছে। একখানি আরাম-চৌকি আমি সর্ব্বদা সেখানে ব্যবহার করিতাম। সেটি বোধ করি আনা সম্ভব হয় নাই, তাই নূতন একখানি দেখিলাম সেইভাবে জানালার ধারে পাতা রহিয়াছে। ধীরে-ধীরে তাহারি উপরে গিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম। মনে হইল যেন ভাঁটার নদীতে আবার জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের শব্দ মোহানার কাছে শুনা যাইতেছে। স্নানাহার সারিয়া ক্লান্তি-বশতঃ দুপুর-বেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুম ভাঙিতে দেখিলাম পশ্চিমের জানালা দিয়া অপরাহ্ণ-রৌদ্র আমার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে এবং পিয়ারী এক হাতে ভর দিয়া আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অন্য হাতে আঁচল দিয়া আমার কপালের, কাঁধের এবং বুকের ঘাম মুছিয়া লইতেছে। কহিল, "ঘামে বালিশ-বিছানা ভিজে গেছে। পশ্চিম খোলা—এ ঘরটা ভারি গরম। কাল দোতলায় আমার পাশের ঘরে তোমার বিছানা কোরে দেব।" বলিয়া আমার বুকের একান্ত সন্নিকটে বসিয়া পাখাটা তুলিয়া বাতাস করিতে লাগিল। রতন ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, বাবুর চা' নিয়ে আস্‌ব?" "হাঁ, নিয়ে আয়। আর বদু বাড়ী থাকে ত একবার পাঠিয়ে দিস্।" আমি আবার চোখ বুজিলাম। খানিক পরেই বাহিরে চটি-জুতার আওয়াজ পাওয়া গেল। পিয়ারী ডাকিয়া কহিল, "কে, বদু? একবার এ-দিকে আয় দিকি।" তাহার পায়ের শব্দে বুঝিলাম, সে অতিশয় সঙ্কুচিত ভাবে ঘরে প্রবেশ করিল। পিয়ারী তেম্‌নি বাতাস করিতে-করিতে বলিল, "ওই কাগজ-পেন্সিল নিয়ে একটু বোস্। কি কি আন্‌তে হবে, একটা ফর্দ্দ কোরে দরওয়ান সঙ্গে কোরে একবার বাজারে যা বাবা। কিচ্ছুটি নেই।" দেখিলাম এ একটা বস্তু নূতন ব্যাপার। অসুখের কথা আলাদা, কিন্তু সে ছাড়া, সে ইতিপূর্ব্বে কোন দিন আমার বিছানার এত কাছে বসিয়া আমাকে বাতাস পর্য্যন্ত করে নাই; কিন্তু তা-না হয় একদিন সম্ভব বলিয়াও ভাবিতে পারি, কিন্তু, এই যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিল না, চাকর-বাকর, এমন কি বন্ধুর সম্মুখে অবধি মর্পভরে আপনাকে প্রকাশ করিয়া দিল, ইহার অপরূপ সৌন্দর্য্য আমাকে অভিভূত করিয়া তুলিল। আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন এই বদুই পাছে কিছু মনে করে বলিয়া পাটনার বাটী হইতে আমাকে বিদায় লইতে হইয়াছিল।

জিনিসপত্রের ফর্দ্দ করিয়া বদু প্রস্থান করিল। রতনও চা ও তামাক দিয়া নীচে চলিয়া গেল। পিয়ারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "একটা কথা জিজ্ঞেসা করি তোমাকে,—আচ্ছা, রোহিণী বাবু আর অভয়ার মধ্যে কে বেশি ভালবাসে বল্‌তে পারো?" হাসিয়া বলিলাম, "যে তোমাকে পেয়ে বসেছে,—সেই অভয়াই নিশ্চয় বেশি ভালবাসে।" রাজলক্ষ্মীও হাসিল। কহিল, "সে আমাকে পেয়ে বসেছে, তুমি কি করে জান্‌লে?" বলিলাম, "যেমন কোরেই জানি, সত্যি কি না বল ত?" রাজলক্ষ্মী এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া কহিল, "তা সে যাই হোক্, বেশি ভাল বাসেন কিন্তু রোহিণী বাবু। বাস্তবিক এত ভাল বেসেছিলেন বলেই সংসারে এত বড় দুঃখ তিনি মাথা পেতে নিলেন। নইলে, এ তো তাঁর অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল না। অথচ, সে তুলনায় কতটুকু স্বার্থ-ত্যাগ অভয়াকে করতে হয়েচে বল দেখি?" তাহার প্রশ্ন শুনিয়া সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কহিলাম, "বরঞ্চ আমি ত দেখি ঠিক বিপরীত। এবং সে হিসাবে যা কিছু ইহার কঠিন দুঃখ, যা কিছু ত্যাগ, সে অভয়াকে করতে হয়েচে। রোহিণী বাবু যাই কেন করুন না, সমাজের চক্ষে তিনি পুরুষ মানুষ,—এ অভ্রান্ত সত্যটা ভুলে যাচ্ছো কেন?" রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া কহিল, "আমি কিছুই

তুলিনি। পুরুষ মানুষ বল্‌তে তুমি যে সুযোগ এবং সুবিধের ইঙ্গিত করচ, সে ক্ষুদ্র এবং ইতর পুরুষের জন্যে, রোহিণীবাবুর মত মানুষের জন্যে নয়। সখ ফুরোলে, কিম্বা হালে-পানি না পেলে ফেলে পালাতে পারে, আবার ঘরে ফিরে মান্য-গণ্য ভদ্র জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারে,—এই ত বল্‌চ? পারে বটে, কিন্তু সবাই পারে? তুমি পারো? যে পারে না, তার ভারের ওজনটা একবার ভেবে দেখ দিকি। তার নিশ্চিত জীবন ঘরের কোণে নিরালায় কাটাবার জো নেই, তাকে সংসারের মাঝখানে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নেমে আস্‌তে হবে, অবিচার ও অপযশের বোঝা একাকী নিঃশব্দে বইতে হবে, তার একান্ত স্নেহের পাত্রী, তার ভাবী সন্তানের জননীকে বিরুদ্ধ সমাজের সমস্ত অমর্য্যাদা ও অকল্যাণ থেকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে,—সে কি সোজা দুঃখ তুমি মনে কর? আবার সকলের চেয়ে বড় দুঃখ এই যে, সে যে অনায়াসে এই দুঃখের বোঝা নাবিয়ে দিয়ে সরে যেতে পারে, তার এই সর্ব্বনাশা বিকট প্রলোভন থেকে অহোরাত্র আপনাকে আপনি বাঁচিয়ে চলার গুরুভারও তাকেই বয়ে বেড়াতে হয়। দুঃখের মানদণ্ডে এই আত্মোৎসর্গের সঙ্গে ওজন সমান রাখ্‌তে যে প্রেমের দরকার, পুরুষ মানুষে আপনার ভিতর থেকে যদি বার করতে না পারে, ত কোন মেয়ে মানুষেরই সাধ্য নয় তা পূর্ণ করে দেয়।" কথাটা এদিক হইতে কোন দিন এমন করিয়া ভাবি নাই। রোহিণীর সেই শাদা-সিধা চুপ-চাপ ভাব, তার পরে অভয়া যখন তাহার স্বামীর ঘরে চলিয়া গেল, তখন তাহার সেই শান্ত মুখের উপর অপরিসীম বেদনা নিঃশব্দে বহন করিবার যে ছবি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম, তাহাই চক্ষের পলকে রেখায় রেখায় আমার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে বলিলাম,—"চিঠিতে কিন্তু একা অভয়ার উদ্দেশেই পুষ্পাঞ্জলি পাঠিয়েছিলে।" রাজলক্ষ্মী কহিল, "তাঁর প্রাপ্য আজও তাঁকে দিই। কেন না আমার বিশ্বাস, যা কিছু পাপ, যা কিছু অপরাধ, সে তাঁর অন্তরের তেজে দগ্ধ হয়ে তাঁকে শুদ্ধ, নির্ম্মল করে দিয়েচে। তা নইলে ও আজ তিনি নিতান্ত সাধারণ স্ত্রীলোকের মতই তুচ্ছ, হীন হয়ে যেতেন।" কহিলাম, "হীন কেন?" রাজলক্ষ্মী বলিল, "বেশ। স্বামী পরিত্যাগের পাপের কি সীমা আছে না কি? সে পাপ ক্ষয় করবার মত আগুন তাঁর মধ্যে না থাক্‌লে ত আজ তিনি—" কহিলাম, "আগুনের কথা থাক্। কিন্তু, তার স্বামীটি যে কি পদার্থ, সে একবার ভেবে দেখ।" রাজলক্ষ্মী বলিল, "পুরুষ মানুষ চিরকালই উচ্ছৃঙ্খল, চিরকালই কিছু কিছু অত্যাচারী; কিন্তু তাই বলে ত স্ত্রীর স্বপক্ষে পালিয়ে যাবার যুক্তি খাটতে পারে না? মেয়ে মানুষকে সহ্য করতেই হয়, নইলে ত সংসার চল্‌তে পারে না!" কথা শুনিয়া আমার সমস্তই গোলমাল হইয়া গেল। মনে মনে কহিলাম, মেয়ে মানুষের এ সেই সনাতন দাসত্বের সংস্কার! একটু অসহিষ্ণু হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এতক্ষণ তা'হলে তুমি আগুন আগুন কি বক্‌ছিলে?" রাজলক্ষ্মী সহাস্য মুখে কহিল, "কি বক্‌ছিলুম শুন্‌বে? আজই ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে পাটনার ঠিকানায় লেখা অভয়ার চিঠি পেয়েছি। আগুনটা কি জানো? সেদিন প্লেগ বলে যখন তাঁর সবে-পাতা সুখের ঘর-করার দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন, যে বস্তুটি নির্ভয়ে, নির্ব্বিচারে তোমাকে ভিতরে ডেকে নিয়েছিল, আমি তাকেই বল্‌চি তাঁর আগুন। তখন সুখের খেয়াল আর তাঁতে ছিল না। কর্ত্তব্য বলে বুক্‌লে যে তেজ মানুষকে সুমুখের দিকেই ঠেলে, পিছতে দেয় না, আমি তাকেই এতক্ষণ আগুন আগুন বলে বকে মরছিলুম। আগুনের এক নাম সর্ব্বভুক জানো না? সে সুখ-দুঃখ দুইই টেনে নেয়,—তার বাচ-বিচার নেই। তিনি আর একটা কথা কি লিখেচেন জানো? তিনি নিজেকে সার্থক করে তুল্‌তে চান। কারণ তাঁর বিশ্বাস, নিজের জীবনের সার্থকতার ভিতর দিয়েই শুধু সংসারে অপরের জীবনে সার্থকতা পৌঁছোতে পারে। আর ব্যর্থ হতে শুধু একটা জীবন একাকীই ব্যর্থ হয় না, সে আরও অনেকগুলো জীবনকে নানাদিক দিয়ে নিষ্ফল করে দিয়ে তবে যায়। খুব সত্যি না?" বলিয়া সে হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল; তারপরে দুজনেই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মৌন হইয়া রহিলাম। বোধ করি, সে কথার অভাবেই এখন আমার মাথার মধ্যে আঙুল দিয়া রুক্ষ চুলগুলা নিরর্থক চিরিয়া-চিরিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার এ আচরণও একেবারে নূতন। সহসা কহিল, "তিনি খুব শিক্ষিত, না? নইলে এত তেজ হয় না!" বলিলাম, "হাঁ, যথার্থই তিনি শিক্ষিতা রমণী।" রাজলক্ষ্মী কহিল, "কিন্তু একটা কথা তিনি আমাকে

লুকিয়েছেন। তাঁর মা হবার লোভটা কিন্তু চিঠির মধ্যে বারবার চাপা দিতে গেছেন।" বলিলাম, "এ লোভ তাঁর আছে না কি? কৈ আমি ত শুনিনি?" রাজলক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, "বাঃ—এ লোভ আবার কোন্ মেয়েমানুষের নেই! কিন্তু তাই বলে বুঝি পুরুষ মানুষের কাছে বলে বেড়াতে হবে! তুমি ত বেশ!" কহিলাম, "তা'হলে তোমারও আছে না কি?" "যাও"—বলিয়া সে অকস্মাৎ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই সেই আরক্ত মুখ লুকাইবার জন্য শয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তখন অস্তোন্মুখ সূর্য্যরশ্মি পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল; সেই আরক্ত আভা তাহার মেঘের মত কালো চুলের উপর অপরূপ শোভায় ছড়াইয়া পড়িল, এবং কাণের হীরার দুল দুটিতে নানাবর্ণের দ্যুতি ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া খেলা করিয়া, ফিরিতে লাগিল। ক্ষণেক পরেই সে আত্মসম্বরণ করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, "কেন, আমার কি ছেলে-মেয়ে নেই যে লোভ হবে? মেয়েদের বিয়ে দিয়েচি, ছেলের বিয়ে দিতে এসেছি,—একটি দুটি নাতী-নাত্‌নী হবে, তাদের নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকব,—আমার অভাব কি বল ত?" চুপ করিয়া রহিলাম। এ কথা লইয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

রাত্রে রাজলক্ষ্মী কহিল, "বহুর বিয়ে ত এখনো ১০।১২ দিন দেরি আছে; চল কাশীতে তোমাকে আমার গুরুদেবকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।" হাসিয়া বলিলাম, "আমি কি একটা দেখ্‌বার জিনিস?' রাজলক্ষ্মী কহিল, "সে বিচারের ভার যারা দেখে তাদের, তোমার নয়।" কহিলাম, "তা'ও যদি হয়, কিন্তু এতে আমারই বা লাভ কি, তোমার গুরুদেবেরই বা লাভ কি?" রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া বলিল, "লাভ তোমাদের নয়, লাভ আমার। না হয় শুধু আমার জন্যেই চল।" সুতরাং সম্মত হইলাম। সম্মুখে একটা দীর্ঘকালব্যাপী অকাল থাকায় এই সময়টায় চারিদিকে যেন বিবাহের বন্যা নামিয়াছিল। যখন-তখন ব্যাণ্ডের কর্কশ এবং ব্যাগ-পাইপের বাঁশি বিবিধ প্রকারের বাদ্যভাণ্ড সহযোগে মানুষকে পাগল করিয়া তুলিবার যোগাড় করিয়াছিল। আমাদের ষ্টেশন-যাত্রার পথেও এম্‌নি করেকটা উন্মত্ত শব্দের ঝড় প্রচণ্ড বেগে বহিয়া গেল। তেজটা একটু কমিয়া আসিলে রাজলক্ষ্মী সহসা প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, তোমার মতেই যদি সবাই চলে, তা'হলে ত গরীবদের আর বিয়ে করাও হয় না, ঘর-সংসার করাও চলে না? তা'হলে সৃষ্টি থাকে কি কোরে?" তাহার অসামান্য গাম্ভীর্য্য দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, "সৃষ্টিরক্ষার জন্যে তোমার কিছুমাত্র দুশ্চিন্তার আবশ্যক নেই। কারণ আমার মতে চল্‌বার লোক পৃথিবীতে বেশি নেই। অন্ততঃ আমাদের এ দেশে ত নেই বল্‌লেই চলে।" রাজলক্ষ্মী কহিল, "না থাকাই ত ভাল। বড়লোকেরাই শুধু মানুষ, আর গরীব বলে কি তারা সংসারে ভেসে এসেছে? তাদের ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-করার সাধ-আহ্লাদ নেই?" কহিলাম, "সাধ-আহ্লাদ থাক্‌লেই যে তাকে প্রশ্রয় দিতে হবে, তার কি কোন অর্থ আছে?" রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন নেই, আমাকে বুঝিয়ে দাও।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, "দরিদ্র-নির্ব্বিশেষেই আমার এ মত নয়, আমার মত শুধু দরিদ্র ভদ্র-গৃহস্থদের সম্বন্ধেই, এবং তার কারণও তুমি জান বলেই আমার বিশ্বাস।" রাজলক্ষ্মী জিদের স্বরে কহিল, "তোমার ও মত ভুল।" আমারও কেমন জিদ্ চাপিয়া গেল, বলিয়া ফেলিলাম, "হাজার ভুল হলেও তোমার মুখে সে কথা শোভা পায় না। বহুর বাপ যখন তোমাদের দু বোনকেই এক সঙ্গে মাত্র বারোশোটি টাকার লোভে বিয়ে করেছিল, সে দিন এখনো এত পুরোনো হয় নি যে তোমার মনে নেই। তবে না কি সে লোকটার নেহাৎ পেশা বলেই রক্ষে; নইলে, ধর, যদি সে তোমাকে তার ঘরে নিয়ে যেত, তোমার দুটি একটি ছেলে-পুলে হোতো,—একবার ভেবে দেখ দিকি অবস্থাটা?" রাজলক্ষ্মীর চোখের দৃষ্টিতে ঝলক ঘনাইয়া উঠিল, কহিল, "ভগবান যাদের পাঠাতেন, তাদের তিনিই দেখ্‌তেন। তুমি নাস্তিক বলেই কেবল বিশ্বাস কর না।" আমিও জবাব দিলাম, "আমি নাস্তিক হই বা হই, আস্তিকের ভগবানের দরকার কি শুধু এই জন্য? এই সব ছেলে মানুষ করতে?" রাজলক্ষ্মী ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "না হয় তিনি নাই দেখ্‌তেন। কিন্তু তোমার মত আমি অত ভীতু নই। আমি দোরে-দোরে ভিক্ষে করেও তাদের মানুষ করতুম। আর যাই হোক, বাইউলী হওয়ার চেয়ে সে আমার ঢের ভাল হোতো।" আমি আর তর্ক করিলাম না। আলোচনাটা নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং অপ্রিয় ধারায়

নামিয়া আসিয়াছিল বলিয়া জানালার বাহিরে রাস্তার দিকে চাহিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিলাম।

আমাদের গাড়ী ক্রমশঃ সরকারী এবং বে-সরকারী আফিস কোয়ার্টার ছাড়াইয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িল। সে দিনটা ছিল শনিবার। বেলা দুইটার পর অধিকাংশ আফিসের কেরাণী ছুটি পাইয়া আড়াইটার ট্রেণ ধরিতে দ্রুতবেগে চলিয়াছিল। প্রায় সকলের হাতেই কিছু-না-কিছু খাদ্য সামগ্রী। কাহারও হাতে দুইটা বড় চিংড়ী, কাহারও রুমালে বাঁধা একটু পাটার মাংস, কাহারও হাতে পাড়াগাঁয়ে দুষ্প্রাপ্য কিছু কিছু তরি-তরকারী এবং ফল-মূল; সাত দিনের পরে গৃহে পৌঁছিয়া উৎসুক ছেলে-মেয়ের মুখে একটু আনন্দের হাসি দেখিতে প্রায় সকলেই সামর্থ্য মত অল্প-স্বল্প মিষ্টান্ন কিনিয়া চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া ছুটিতেছে। প্রত্যেকেরই মুখের উপর আশা, আশঙ্কা ও ট্রেণ ধরিবার উৎকণ্ঠা এমনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে যে, রাজলক্ষ্মী আমার হাতটা টানিয়া অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, কেন এঁরা সব এমন ভাবে ইষ্টিসনের দিকে ছুটচেন? আজ কি?" আমি ফিরিয়া চাহিয়া কহিলাম "আজ শনিবার। এঁরা সব আফিসের কেরাণী, রবিবারের ছুটিতে বাড়ী যাচ্চেন।" রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হাঁ তাই বটে। আর দেখ, সবাই একটা-না-একটা কিছু খাবার জিনিস নিয়ে যাচ্চেন। পাড়াগাঁয়ে ত এ সব পাওয়া যায় না, তাই বোধ হয় ছেলে-মেয়েদের হাতে দেবার জন্যে নিয়ে যাচ্চেন, না?" আমি কহিলাম, "হাঁ।" তাহার কল্পনা দ্রুতবেগে চলিয়াছিল, তাই তৎক্ষণাৎ কহিল, "আঃ—ছেলেমেয়েগুলোর আজ কি স্ফূর্ত্তি। কেউ চেঁচা-মেচি করবে, কেউ গলা জড়িয়ে বাপের কোলে উঠ্‌তে চাইবে, কেউ মাকে খবর দিতে রান্না-ঘরে দৌড়বে—বাড়ীতে-বাড়ীতে আজ যেন একটা কাণ্ড বেধে যাবে, না?" বলিতে বলিতেই তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমি সায় দিয়া বলিলাম, "খুব সম্ভব বটে।" রাজলক্ষ্মী গাড়ীর জানালা দিয়া আবার কিছুক্ষণ তাহাদের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ কোঁস করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হাঁ গা, এঁদের মাইনে কত?" বলিলাম, "কেরাণীর মাইনে আর কত হয়, পঁচিশ ত্রিশ কুড়ি—এমনি।"

রাজলক্ষ্মী কহিল, "কিন্তু বাড়ীতে ত এঁদের মা আছেন, ভাই-বোন আছে, স্ত্রী আছে, ছেলে-পুলে আছে—"

আমি যোগ করিয়া দিলাম, "দুই একটি বিধবা বোন আছে, কাজকর্ম্ম, লোক-লৌকতা, ভদ্রতা আছে, কলকাতার বাসাখরচ আছে, অবিচ্ছিন্ন রোগের খরচ,—বাঙালী কেরাণী-জীবনের সমস্তই নির্ভর করে এই ত্রিশটি টাকার উপর।" রাজলক্ষ্মীর যেন দম আট্‌কাইয়া আসিতেছিল। সে এমনি ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি জান না। এঁদের বাড়ীতে সব বিষয়-আশয় আছে। নিশ্চয় আছে।" তাহার মুখ দেখিয়া তাহাকে নিরাশ করিতে আমার বেদনা বোধ হইল, তথাপি বলিলাম, "এঁদের ঘর-করার ইতিহাস আমি ঘনিষ্ঠ ভাবেই জানি। আমি নিঃসংশয়ে জানি, এঁদের চোদ্দ আনা লোকেরই কিচ্ছু নেই। চাকরি গেলে হয় ভিক্ষা, না হয় সমস্ত পরিবারের সঙ্গে উপোস করতে হয়। এঁদের ছেলেমেয়েদের কথা শুনবে?" রাজলক্ষ্মী অকস্মাৎ দুই হাত তুলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "না না, শুনব না, শুনব না—আমি চাইনে শুনতে।" সে যে প্রাণপণে অশ্রু সম্বরণ করিয়া আছে, সে তাহার চোখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম। তাই আর কিছু না বলিয়া পুনরায় পথের দিকে মুখ ফিরাইলাম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর তাহার সাড়া-শব্দ পাইলাম না। এতক্ষণ অবধি বোধ করি সে নিজের সঙ্গে ওকালতি করিয়া, শেষে নিজের কৌতূহলের কাছেই পরাজয় মানিয়া, আমার জামার খুঁট ধরিয়া টানিল। ফিরিয়া চাহিতেই সে করুণকণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা, বল ওঁদের ছেলেপুলের কথা। কিন্তু তোমার দুটি পায়ে পড়ি মিছিমিছি বাড়িয়ে বোলো না। দোহাই তোমার।" তাহার মিনতি করার ভঙ্গী দেখিয়া আমার হাসি পাইল, কিন্তু হাসিলাম না; বরঞ্চ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলাম, "বাড়িয়ে বলা ত দূরের কথা, তুমি জিজ্ঞেসা করা সত্ত্বেও তোমাকে শোনাতাম না, যদি না তুমি একটু আগে নিজের সম্বন্ধে ভিক্ষে করে ছেলে মানুষ করার কথা বলতে। ভগবান যাদের পাঠান, তিনিই তাদের সুব্যবস্থার ভার নেন, এ একটা কথা বটে। অস্বীকার করলে নাস্তিক বলে হয় ত আবার আমাকে গাল-মন্দ করবে; কিন্তু, সন্তানের দারিদ্র বাপ-মায়ের উপর কতটা, আর ভগবানের উপর কতটা, এ

দুই সমস্যার মীমাংসা তুমি নিজেই কোরো, আমি যা জানি তাই শুধু বোল্‌ব। কেমন?" সে নীরবে আমার দিকে জিজ্ঞাসু মুখে চাহিয়া আছে দেখিয়া কহিলাম, "ছেলে জন্মালে তাকে কিছুদিন বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব তার মায়ের ওপরেই থাকে বলে আমার মনে হয়। ভগবানের ওপর আমার অচলা ভক্তি, তাঁর দয়ার প্রতিও আবার অন্ধ বিশ্বাস। কিন্তু মায়ের বদলে তাঁর নিজের এই ভারটা নেবার উপায় আছে কি না—" রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "দেখ, চালাকি কোরো না—সে আমিও জানি।" "জানো? থাক্, তা'হলে একটা জটিল সমস্যার মীমাংসা হ'ল। কিন্তু ত্রিশ-টাকা-ঘরের-জননীর দুধের উৎস শুকিয়ে আস্‌তে কেন যে বিলম্ব হয় না, সে জান্‌তে হলে কোন ত্রিশ-টাকা-ঘরের-প্রসূতির আহারের সময়ে উপস্থিত থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে যখন পারবে না, তখন, এ ক্ষেত্রে আমার কথাটা না হয় মেনেই নাও।" রাজলক্ষ্মী ম্লান মুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম, "পাড়াগাঁয়ে যে গো-দুগ্ধের একান্ত অভাব, এ কথাটাও তোমাকে মেনে নিতে হবে।" রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি কহিল, "এ আমি নিজেও জানি। ঘরে গরু থাকে ত ভাল, নইলে আজকাল মাথা খুঁড়ে মলেও কোন পল্লীগ্রামে একফোঁটা দুধ পাবার জো নেই। গরুই নেই, তার আবার দুধ!" বলিলাম, "যাক, আরও একটা সমস্যার সমাধান হ'ল। তখন ছেলেটার ভাগ্যে রইল স্বদেশী খাঁটি পানা-পুকুরের জল, আর বিদেশী কৌটা-ভরা খাঁটি বার্লির গুঁড়ো। কিন্তু তখনও দুর্ভাগাটার অদৃষ্টে হয় ত এক-আধ ফোঁটা তার স্বাভাবিক খাদ্য জোটে, কিন্তু, সে সৌভাগ্য এদব ঘরে বেশিদিন থাকার আইন নেই। মাস চারেকের মধ্যেই আর একটি নূতন আগন্তুক তার আবির্ভাবের নোটিশ দিয়ে দাদার মাতৃদুগ্ধের বরাদ্দ একেবারে বন্ধ করে দেয়। এ বোধ করি তুমি—" রাজলক্ষ্মী লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিয়া উঠিল,—"হাঁ হাঁ, জানি, জানি। এ আর আমাকে ব্যাখ্যা কোরে বোঝাতে হবে না। তুমি তারপরে বল।" কহিলাম, "তারপরে ছোঁড়াটাকে ধরে পেটের রোগে এবং স্বদেশী ম্যালেরিয়া জ্বরে। তখন বাপের দায়িত্ব হচ্চে বিদেশী কুইনিন ও বার্লির গুঁড়ো যোগানো, এবং মায়ের ঘাড়ে পড়ে—ঐ যে বললুম, আঁতুড়ে গিয়ে ভর্ত্তি নেবার মূলতুবির মুরসতে—ঐ গুলো বাঁটি দিশী জলে গুলে তাকে গেলানো। তারপরে যথাসময়ে সূতিকাগৃহের হাঙ্গামা মিটিয়ে নবকুমার কোলে কোরে বেরিয়ে এসে প্রথমটার জন্যে দিনকতক ট্যাঁচানো।" রাজলক্ষ্মী নীলবর্ণ হইয়া কহিল, "ট্যাঁচানো কেন?" বলিলাম, "ওটা মায়ের স্বভাব বোলে। এমন কি কেরাণীর ঘরেও তার অন্যথা দেখা যায় না, যখন ভগবান তাঁর দায়িত্ব শোধ করতে ছেলেটাকে শ্রীচরণে টেনে নেন।" "বাছারে!" এতক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়াই কথা কহিতেছিলাম, অকস্মাৎ দৃষ্টি ফিরাইতে দেখিলাম তাহার বড় বড় দুটি চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিতেছে। অতিশয় ক্লেশ বোধ করিলাম। মনে হইল, এ বেচারাকে নিরর্থক দুঃখ দিয়া আমার লাভ কি? অধিকাংশ ধনীর মত ইহারও না হয় জগতের এই বিরাট দুঃখের দিকটা অগোচরেই থাকিত! বাঙ্গালার ক্ষুদ্র চাকুরীজীবি প্রকাণ্ড দরিদ্র গৃহস্থ-পরিবার যে শুধু খাদ্যাভাবেই ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা প্রভৃতি উপলক্ষ্য করিয়া প্রতিদিন শূন্য হইয়া যাইতেছে, অন্যান্য বড়লোকের মত এও না হয় এ কথা নাই জানিত। কি এমন তাহাতে বেশি ক্ষতি হইত! ঠিক এমনি সময়ে রাজলক্ষ্মী চোখ মুছিতে-মুছিতে অবরুদ্ধ স্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "থোক্ কেরাণী, তবু তারা তোমার চেয়ে ঢের ভাল। তুমি ত পাষাণ! তোমার নিজের কোন দুঃখ নেই বলে এঁদের দুঃখ-কষ্ট এমন আহ্লাদ কোরে বর্ণনা কোরচ। আমার কিন্তু বুক ফেটে যাচ্চে।" বলিয়া সে অঞ্চলে ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল। ইহার প্রতিবাদ করিলাম না। কারণ, তাহাতে লাভ হইত না। বরঞ্চ সবিনয়ে কহিলাম, "এঁদের সুখের ভাগটাও ত আমার কপালে জোটে না। বাড়ী পৌঁছুতে এঁদের আগ্রহটাও ত ভেবে দেখ্‌বার বিষয়।" রাজলক্ষ্মীর মুখ হাসি ও কান্নায় মুহূর্ত্তেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কহিল, "আমিও ত তাই বল্‌চি। আজ বাবা আস্‌চে বলে ছেলেপুলেরা সব পথ চেয়ে আছে। কিসের কষ্ট? ওঁদের মাইনে হয় ত কম, তেম্‌নি বাবুয়ানীও নেই। কিন্তু, তাই বলে কি পঁচিশ ত্রিশ টাকা,—এত কম? কখ্খনো নয়। অন্ততঃ, একশ দেড়শ টাকা, আমি নিশ্চয় বল্‌চি।" বলিলাম, "হতেও পারে। আমি হয় ত ঠিক জানিনে।"

উৎসাহ পাইয়া রাজলক্ষ্মীর লোভ বাড়িয়া গেল। অতিশয়

ক্ষুদ্র কেরানীর জন্যও মাসে সেড়শ টাকা মাহিনা তাহার মনঃপূত হইল না। কহিল, "শুধু কি ওই মাইনেটিই ওঁদের ভরসা তুমি মনে কর? সবাই উপ্‌রিও ত কত পান!" কহিলাম, "উপ্‌রিটা কি? প্যালা?" আর সে কথা কহিল না, মুখ ভারি করিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে বাহিরের দিকেই চোখ রাখিয়া বলিল, "তোমাকে যতই দেখ্‌চি, ততই তোমার ওপর থেকে আমার মন চলে যাচ্চে। তুমি ছাড়া আর আমার গতি নেই জানো বলেই আমাকে তুমি এমন কোরে বেঁধো।" এতদিনের পরে আজ বোধ করি এই প্রথম তাহার হাত দুটি জোর করিয়া নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইলাম। তাহার মুখের পানে চাহিয়া কি যেন একটা বলিতেও চাহিলাম, কিন্তু গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনের ধারে দাঁড়াইল। একটা স্বতন্ত্র গাড়ী রিসার্ভ থাকা সত্ত্বেও বহু কিছু কিছু জিনিসপত্র লইয়া পূর্ব্বাহ্ণেই আসিয়াছিল। সে রতনকে কোচবাক্সে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। হাত ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিলাম; যে কথাটা মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, আবার তাহা নীরবে অন্তরের ভিতরে গিয়া লুকাইল।

আড়াইটার লোকাল ছাড়ে-ছাড়ে। আমাদের ট্রেণ পরে। এমন সময়ে একটি প্রৌঢ় গোছের দরিদ্র ভদ্রলোক একহাতে নানাজাতীয় তরি-তরকারীর পুঁটুলি এবং অন্য হাতে দাঁড়শুদ্ধ একটি মাটির পাখী লইয়া শুধু প্ল্যাটফরমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ভাবে ছুটিতে গিয়া রাজলক্ষ্মীর গায়ে আসিয়া পড়িল। মাটির পুতুল মাটিতে পড়িয়া গুঁড়া হইয়া গেল। লোকটা হায় হায় করিয়া বোধ করি কুড়াইতে যাইতেছিল, পাঁড়েজী হুঙ্কার ছাড়িয়া এক লম্ফে তাহার ঘাড়ে চাপিয়া ধরিল এবং বহু ছড়ি তুলিয়া বুড়ো কাণা ইত্যাদি বলিয়া মারে আর কি! আমি একটু দূরে অন্যমনস্ক ছিলাম, শশব্যস্তে রঙ্গস্থলে আসিয়া পড়িলাম। লোকটি ভয়ে এবং লজ্জায় বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, "দেখতে পাইনি। মা, আমার ভারি অন্যায় হয়ে গেছে,—" আমি তাড়াতাড়ি ছাড়াইয়া দিয়া বলিলাম, "যা হবার হয়েছে, আপনি শীঘ্র যান্—আপনার ট্রেণ ছেড়ে দিল বলে।" লোকটি তবুও তাহার পুতুলের টুকরা কয়টা কুড়াইবার জন্য বার কয়েক ইতস্ততঃ করিয়া শেষে দৌড় দিল, কিন্তু অধিক দূর ছুটিতে হইল না, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখন ফিরিয়া আসিয়া সে আর এক দফা ক্ষমা-ভিক্ষা করিয়া সেই ভাঙা অংশগুলা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, "ওতে আর কি হবে?" লোকটি কহিল, "কিছুই না মশাই। মেয়েটার অসুখ,—গেল সোমবারে বাড়ী থেকে আস্‌বার সময় বলে দিলে আমার জন্যে একটি পাখী পুতুল কিনে এনো না। কিন্তে গেলুম, ব্যাটা গরজ বুঝে দর হাঁকলে কি না—দু আনা—তার একটি পয়সা কম নয়। তাই সই। মরি-বাঁচি কোরে আট-আট্‌টা পয়সা ফেলে দিয়ে নিলুম; কিন্তু এমনি অদেষ্ট দেখুন না, যে ঘোর-গোড়ায় এনে ভেঙে গেল! রোগা মেয়েটার হাতে দিতে পারলুম না। বেটি কেঁদে বল্‌বে, বাবা, আন্‌লে না। যা হোক্ টুক্‌রোগুলো নিয়ে যাই, দেখিয়ে বোল্‌ব, মা, এ মাসের মাইনেটা পেলে আগে তোর পুতুল কিনে তবে আমার অন্য কাজ।" বলিয়া ভগ্নাংশগুলি কুড়াইয়া সযত্নে চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া কহিল "আপনার স্ত্রীর বোধ হয় বড্ড লেগেচে—আমি দেখ্‌তে পাইনি—লোক-সানকে লোকসানও হোলো, গাড়ীটাও পেলুম না,—পেলে তবুও রোগা মেয়েটাকে আধ-ঘণ্টা আগে গিয়ে দেখ্‌তে পেতুম।" বলিতে বলিতে ভদ্রলোকটি পুনরায় প্ল্যাটফর্মের দিকে প্রস্থান করিল। বহু পাঁড়েজীকে লইয়া কি একটা প্রয়োজনে অন্যত্র চলিয়া গেল; আমি হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখি শ্রাবণের ধারার মত রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছে। ব্যস্ত হইয়া কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "খুব লেগেচে না কি? কোথায় লাগল?" রাজলক্ষ্মী আঁচলে চোখ মুছিয়া চুপি-চুপি কহিল, "হাঁ, খুবই লেগেছে—কিন্তু সে এমন যায়গায় যে, তোমার মত পাষাণের দেখবারও যো নেই, বোঝবারও যো নেই।"

শোক-সংবাদ

রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী

আজ যে বিদুষী পুণ্যশীলা রমণীর পরলোকগমন সংবাদ লিখিত হইতেছে, তিনি স্বাধীন ত্রিপুরার রাজকুমারী। রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী ১৭৮৫ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিপুরাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য-বাহাদুর তাঁহার পিতা; স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য-বাহাদুর তাঁহার ভ্রাতা এবং ত্রিপুরার বর্ত্তমান অধীশ্বর মহারাজ শ্রীশ্রীযুত বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যবাহাদুর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। অনঙ্গমোহিনী ত্রিপুরার রাজমন্ত্রী স্বর্গীয় উজীর গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর সাহেবের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। বিগত ২৮শে বৈশাখ, শনিবার সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনীর জীবন-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। ত্রিপুর রাজপরিবারে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না মহিলা অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই। স্বামী গোপীকৃষ্ণ ঠাকুর সাহেব সবিশেষ গুণসম্পন্ন ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারই যত্নে ও উৎসাহে অনঙ্গমোহিনীর শিক্ষালাভের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। রাজকুমারী বাল্যকাল হইতেই কবিতার অনুশীলন করিতেন। পিতা বীরচন্দ্র একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। পিতৃগুণ কন্যায় সম্যক্ সঞ্জাত হইয়াছিল। বীণাবাদনে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। শিল্প-নৈপুণ্যে তিনি সুদূর আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশেও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। গত বর্ষে বঙ্গেশ্বর শ্রীযুক্ত রোণাল্ডশে মহোদয়ের শুভাগমন উপলক্ষে আগর-তলায় যে কৃষিশিল্পপ্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে রাজকুমারীর নির্ম্মিত "রিয়া" (ত্রিপুর-মহিলাগণের বক্ষঃআবরণ-বস্ত্র) সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় প্রদর্শনী-সমিতি হইতে তাঁহাকে একটী সুবর্ণ-পদক দেওয়া স্থিরীকৃত হয়। বড়ই আক্ষেপের বিষয়, রাজকুমারী সেই পদক দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। অনঙ্গমোহিনী আদর্শ গৃহিণী ছিলেন। দয়া-দাক্ষিণ্য তাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল। দুঃখী দরিদ্র তাঁহার দয়া হইতে কখনও বঞ্চিত হয় নাই। তাঁহার কুসুম-কোমল হৃদয় পরদুঃখে গলিয়া যাইত। আশ্রিত জন প্রতিপালনে তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোথাও নাই। রাজ-নন্দিনী সকল সুখের অধিকারিণী হইলেও স্বীয় গর্ভজাত সন্তান লাভে বঞ্চিতা ছিলেন। যাহা হউক, দুইটী সপত্নী-তনয়ের দিকে চাহিয়া সেই দুঃখ একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। সপত্নী-পুত্র হইলেও তাঁহাদিগকে তিনি স্বীয় সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। ভ্রাতৃদ্বয়ও তাঁহাকে গর্ভধারিণী জ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর রাজকুমারী উপযুক্ত পুত্রদ্বয়ের হস্তে যাবতীয় সাংসারিক কার্য্য-ভার ন্যস্ত করিয়া জ্ঞানধর্ম্মানুশীলনে কালাতিপাত করিতেছিলেন। কিন্তু ভগবান্ তাঁহার সেই সুখে বাদ সাধিলেন। মৃত্যুর ছয় দিবস পূর্ব্বে ধর্ম্মভীরু, পরম বৈষ্ণব কনিষ্ঠ পুত্র রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর সাহেব সহসা বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। পুত্রের এই অভাবনীয় আকস্মিক মৃত্যুতে মাতা একেবারে ভ্রিয়মাণা হইয়া পড়িলেন। পরদিবসই তিনি আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়িনী হইলেন। ক্রমে জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া আসিল। অবশেষে ষষ্ঠ দিবসে সজ্ঞানে গীতাপাঠ শ্রবণ ও হরিনাম করিতে-করিতে সাধ্বী অনঙ্গমোহিনী শান্তিধামে প্রস্থান করিলেন। মহারাজের আদেশানুসারে যথোচিত সম্মান ও সমারোহে স্বামীর সমাধিক্ষেত্রে সতীর যথাবিধি সৎকার করা হইল। মৃত্যুকালে রাজকুমারীর বয়ঃক্রম কিঞ্চিদধিক ৫৪ বৎসর হইয়াছিল।

৺ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত

৺ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, আমাদের পূজনীয় দাদা মহাশয়, গত ২৩শে মে রাত্রিতে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি সংবাদপত্র-লেখকগণের সকলেরই দাদা মহাশয় ছিলেন। আমরা তাঁহারই চরণতলে বসিয়া সংবাদ-পত্র সম্পাদনের প্রথম পাঠ লইয়াছি। তিনি প্রথমে স্কুলের ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টর হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন; তাহার পর সে কার্য্য ত্যাগ করিয়া সংবাদ-পত্রে যোগদান করেন। প্রভাতী, দৈনিক-চন্দ্রিকা ও দৈনিক-বঙ্গবাসীর

তিনি সম্পাদক ছিলেন; এতদ্ভিন্ন সহচর, নববিভাকর, সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী, বসুমতী, হিতবাদী, প্রভৃতি পত্রের তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। বঙ্গবাসী কার্য্যালয়েই দাদা-মহাশয়ের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। দাদা মহাশয়কে আমরা Encyclopedia বলিতাম; ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এমন কোন ঘটনা নাই, যাহার সঠিক বিবরণ, মায় সন তারিখ তিনি মুখে মুখে বলিয়া দিতে না পারিতেন। সংবাদপত্র সম্পাদনকালে তাঁহাকে, যত বড় কঠিন বিষয়ই হউক না কেন, প্রবন্ধ লিখিতে বলিলে, পুথিপত্র না দেখিয়া তখন-তখনই এমন প্রবন্ধ লিখিয়া দিতেন যে, আর কেহ মাসাধিককাল পরিশ্রম করিয়াও তত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। অমন জলদ্ লিখিয়ে আমরা দেখি নাই, অমন বহুদর্শী সম্পাদকও আর ছিল না। শেষ অবস্থায় দাদা মহাশয় অনেক শোক পাইয়াছিলেন। তাঁহার সকল শোক, সকল কষ্টের অবসান হইয়াছে, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পুত্রকন্যাগণের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। দাদা মহাশয় শ্রেণীর লোক আর যে বড় দেখিতে পাইতেছি না; অমন মেরু-পরায়ণ বৃদ্ধের পরলোকগমনে আমরা গভীর শোক পাইলাম।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "কমলে কণ্টক" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য বার আনা। কাঁটা হেরি কেহ যেন কমল তুলিতে ক্ষান্ত হইবেন না, আশা করি।

শ্রীযুক্ত বিভেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "বিভাবতী" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

অস্ত্র-আইনের দেশে শ্রীযুক্ত দক্ষপাণি শর্ম্মার "খোপাদের মা" বাহির হইল; মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীপ্রসাদ পাল বাঙ্গালী পাঠকবর্গের সম্মুখে যে "প্রলোভন" ধরিয়াছেন, তাহাতে একটি টাকা ব্যয় না করিয়া কাহারও নিস্তার নাই।

শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামনাথ পাল, বি-এ প্রণীত "বিলাতী হাওয়া" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীমতী বনলতা দেবী প্রণীত "সহধর্ম্মিণী" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সরকার প্রণীত "বধূবরণ" প্রকাশিত হইয়াছে: দেড় টাকা দক্ষিণা দিয়া পাঠকেরা বই দেখুন।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রণীত "ছাত্রেরা থাকে কি?" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য এক আনা।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী রায় বক্তিয়ার প্রণীত "গৃহিণীর হিতোপদেশ" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য দুই আনা।

শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "পৈত্রিক সম্পত্তি" পাঁচ সিকা মূল্যে বিকাইয়া যাইতেছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এস্-সি প্রণীত "ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতি" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য নয়সিকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নীর অসুখ হওয়ায়, এবং তাঁহার 'বড়' ও 'শ্রীকান্ত' ধারাবাহিক ভাবে প্রতি মাসে প্রকাশিত হওয়ায়, তিনি 'গৃহদাহ' নামক উপন্যাসের অবশিষ্ট অংশ বিগত কয় মাস দিতে পারেন নাই: সত্বরই 'গৃহদাহ' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।

"ক্লিওপেট্রা" প্রণেতা ৺প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের পাঠক-পাঠিকাগণ অবগত আছেন। সম্প্রতি তাঁহার অন্যতম বন্ধু, পরলোকগত সুরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নওপা-মুক্তেশ্বরস্থিত "কেয়ারীভিলা" নামক ভবনে (যে স্থানে প্রমথবাবু অন্তিম শয্যায় শায়িত হইয়াছিলেন) এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়; বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত অনুপকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এস্, সি, বি, এল্, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় এই সুদূর প্রবাসে একজন বাঙ্গালী সাহিত্যিকের এইরূপ আদর দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে (যিনি লেখকের অন্তিম কালে সেবা শুশ্রূষায় তার অক্লান্তচিত্তে যত্ন করিয়াছিলেন) সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

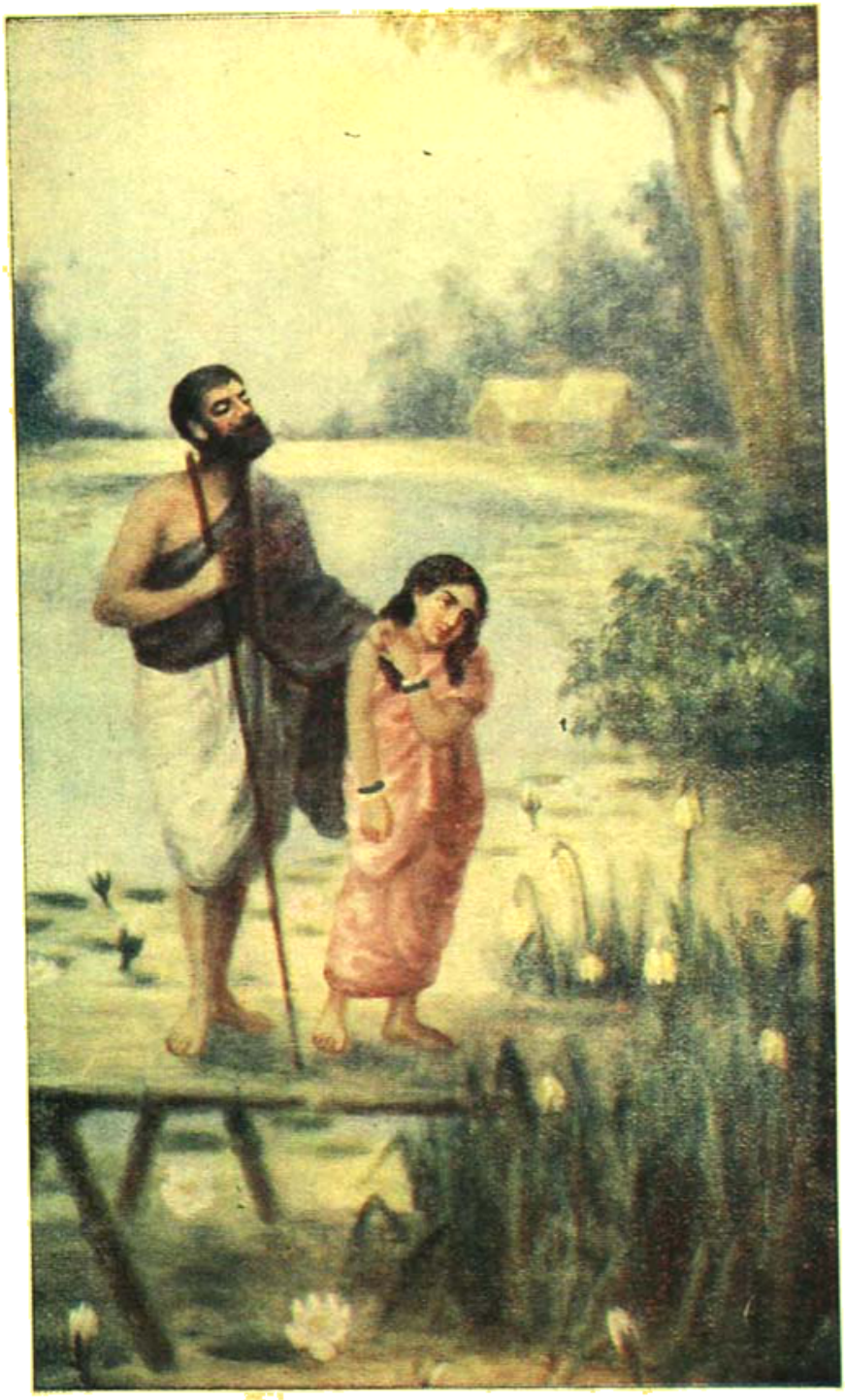

আত্রেয়ী ও ভিক্ষুক

[চক্রবর্ত্তী—শ্রীবিনোদলাল রায়

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গোস্বামী, চিত্রকলা-বিনোদ, এফ্-এন্-বি-এ
কর্ত্তৃক অঙ্কিত মূল তৈল-চিত্র হইতে শিল্পীর সৌজন্যে

Emerald Printing Works
CALCUTTA

শ্রাবণ, ১৩২৮

প্রথম খণ্ড] ষষ্ঠ বর্ষ [দ্বিতীয় সংখ্যা

বাঙ্গালীর শিক্ষা

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্.]

(পূর্ব্বভাষ)

শিক্ষাবিষয়ক বহু প্রবন্ধ নানা আকারে অনেক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলেও, বর্ত্তমান প্রবন্ধটিতে সম্পূর্ণ নূতন দিক দিয়া ঐ বিষয়ের আলোচনা করিতে চাহি। ইহাতে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ যৎকিঞ্চিৎ থাকিলেও, ইহা শিক্ষাবিষয়ক সময়োপ-যোগী আলোচনা, আমার এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছে বলিয়া, আজ আমি ইহাকে সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম। ইহা যে শুধু শিক্ষাবিভাগীয় ব্যক্তিবর্গের জন্য লিখিত হইতেছে, তাহা নহে ; পরন্তু প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ও প্রত্যেক অভিভাবককে এই প্রবন্ধটির সাহায্যে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে নিজ-নিজ স্বার্থ সম্বন্ধীয় দু'চারিটি কথা বলিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি।

আমাদিগের দেশে, বর্ত্তমানকালে, ছেলেরা পিতৃপুণ্য-ফলে আপনা-আপনিই মানুষ হইতেছে—অভিভাবকেরা ক্বচিৎ নিজ-নিজ সন্তানদিগকে মানুষ করিয়া থাকেন। এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যদিও অভিভাবকেরা সন্তান প্রতিপালন করিবার উদ্দেশ্যে অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন, যদিও তাঁহারা যথাকালে পুত্রদিগকে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন, যদিও তাঁহারা যথাকালে এবং যথেষ্ট সংখ্যক প্রাইভেট শিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং যদিও অভিভাবকগণ অকাতরে পাশের পর পাশের পড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তথাপি আমাকে বলিতেই হইবে যে, পুত্রকে মানুষ করার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পিতার কোন হাত থাকে না। এই কথা যদি ভ্রান্ত হইবে, তবে আজ দেশে মানুষের এত অভাব কেন? পিতা ব্যয় করিতেছেন, পুত্র অধ্যয়ন করিতেছেন,—তথাপি মানুষ তৈয়ারি হইতেছে কৈ? বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য—মানুষ তৈয়ারি করা। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে আজ পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কত সহস্র যুবক তথাকথিত "শিক্ষা" লাভ করিয়াছেন ; কিন্তু মানুষ হইয়াছেন কয়জন? কয়জন যুবক বিদ্যাশিক্ষা করিয়া নিজ দেহকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ করিয়াছেন? কয়জন যুবক উপযুক্তরূপে নিজ-নিজ

পরিবারবর্গের প্রতিপালন করিতে পারিয়াছেন? কয়জন দেশের ও মানবজাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারিয়াছেন? তাই বলিতেছিলাম যে, আমাদের ছেলেরা যথার্থরূপে শিক্ষিত হয় না, এবং যেটুকুও শিখে, সেটুকুর জন্য তাহাদের পিতার দারিদ্র ও কৃতিত্ব অতি সামান্য। অধিক কি বলিব, আমাদের দেশে, লোকে পাখী পুষিলে তাহার কতবার তত্ত্ব লয়, কিন্তু নিজ-নিজ স্ত্রী-পুত্র কি ভাবে, কি ভাবে থাকে, তাহা অনেক গৃহকর্ত্তা জ্ঞাত নহেন। স্ত্রী-পুত্রাদি শয্যা-গ্রহণ করিলে, তবে আমাদিগের চৈতন্যোদয় হয় যে, তাহাদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। তাই আবার বলি, আমাদিগের দেশে পিতা অর্থ ব্যয় করেন, পুত্র "পাশ" দিতে থাকেন; কলে কাজ চলে। কলে পুতুল তৈয়ারি হইতে পারে, কলে মানুষ তৈয়ারি হয় না। মানুষ তৈয়ারি করিতে হইলে, প্রাণ উৎসর্গ করিতে হয়। সেই কথাটা শুনাইবার জন্যই আজ আমি আপনাদের দ্বারস্থ।

শিক্ষার উদ্দেশ্য—মানুষ গড়া, অর্থাৎ একাধারে দেহ, মন ও চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করা। দেহ, মন ও চিত্ত-বৃত্তি—এই তিনটির মধ্যে একের বা দুইয়ের আপেক্ষিক উৎকর্ষ লাভ হইলে, শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হয় না। এই তিনটিরই একাধারে, এককালীন এবং সম্যক উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে, মানুষ প্রকৃত "মানুষ" হইতে পারে; অর্থাৎ, ঐরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের ও পরিবারবর্গের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে পটু হয়; সে নিজ সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারে এবং তাবৎ জগতের অশেষ হিতসাধনে সমর্থ হয়;—সে সাংসারিক হিসাবে পূর্ণ মানবত্বের বিকাশ দেখাইতে পারে।

কিন্তু, শিক্ষিত মানব নিজের, পরিবারের, সমাজের—এমন কি সমগ্র জগতের উপকার সাধন করিতে পারিলেও, কখনও পূর্ণ শান্তি ও মনের সুখ উপলব্ধি করিতে পারে না; তাই আজ "সুশিক্ষিত" য়ুরোপ, উন্মত্তহৃদয় সাগরের ন্যায়, সুখের আশায় পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে! অন্তর্দৃষ্টি করিতে না শিখিলে, তথা ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখী করিতে অভ্যাস না করিলে, মানবজীবনে শান্তি ও সুখ লাভ হইতে পারে না। কিন্তু, পাশ্চাত্য জগতে জড়বাদেরই একাধিপত্য; তাই আজ সমস্ত পাশ্চাত্য জগতে দেহ, মন ও চিত্তবৃত্তির এত উৎকর্ষ সাধিত হইলেও, অশান্তি রাক্ষসীর বিনাশ সাধিত হয় নাই;—তাই আজ শিক্ষিতাভিমানী, সভ্য য়ুরোপ বাহ্য জগতকেই যথাসর্ব্বস্ব জ্ঞানে, উন্মত্তের মত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে! আমাদিগের এই ভারতভূমি আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত বলিয়া, এতদিন জড়বাদী পাশ্চাত্যদিগের নিকটে উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছিল; আমরাও গড্ডালিকা-ন্যায়ের অনুসরণে অধ্যাত্ম-বিদ্বেষী সেই ভাব পোষণ করিবার অভ্যাস করিতে শিখিতেছিলাম; কিন্তু শ্বেতাঙ্গ গুরুর দশা দেখিয়া আজ আমাদের মনে পুনরায় যুগ-যুগান্তরের সংস্কার আসিয়া উঠিতেছে,—তবে বুঝি শুধু training of the hands, of the head and of the heart (অর্থাৎ শরীর, মন ও চিত্তবৃত্তির একাধারে উৎকর্ষ সাধনই) চূড়ান্ত শিক্ষা নহে। কারণ, hands, head ও heart (দেহ, মন ও চিত্তবৃত্তি) যাহাকে লইয়া—অর্থাৎ যে hands, head ও heartএর প্রকৃত প্রকাশক—সেই আত্মাকে (spirit) বাদ দিলে শিবশূন্য যজ্ঞ, রামশূন্য রামায়ণ হইয়া পড়ে! একটা ফলের মধ্যে প্রধান জিনিষটি বীজ; সেই বীজেরই রক্ষার্থ ফলের শাঁস, রস ও আবরণ প্রভৃতির আবশ্যক। তেমনি, মানুষের মধ্যে আত্মাই বড়, আত্মাই সর্ব্বস্ব; সেই আত্মারই সাময়িক আধার এই নরদেহ—যাহার hands, head ও heart জাগাইয়া তোলাকে পাশ্চাত্যেরা প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া বলেন। অতএব, শিক্ষাকার্য্যে training of the spirit (আধ্যাত্মিক উন্নতি) বাদ দিলে ত চলিবেই না, পরন্তু শিক্ষাকে বিকলাঙ্গ করিবেই করিবে। আমরা এমনও বলিব যে, আত্মাকে মাঝখানে রাখিয়া, সেই আত্মার সুরে দেহ, মন ও চিত্তবৃত্তিকে বাঁধিয়া লইতে হইবে। তবে সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা হইবে। আমাদিগের দেশে ঐ আধ্যাত্মিক ভাব ওতঃপ্রোত ভাব ছিল বলিয়া, আমরা গুরুজনদিগকে দেবতা জ্ঞান করিয়াছি এবং এখনও করিয়া থাকি; কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, আজকালকার ছাত্র-দিগের মধ্যে সে ভাবের ক্রমশঃ লোপ হওয়ায়, আজকাল এমন কি পিতামাতাকেও নিজ-নিজ সন্তানগণকে ভয়ে-ভয়ে শাসন করিতে হয়। আজ তবে শিক্ষা কি উল্টামুখী ভাবেই হইতেছে!!!

পূর্ব্ব—পশ্চাৎ।

আমাদিগের দেশে, পূর্ব্ব-পশ্চিম গঙ্গা-যমুনার ন্যায় একাঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে; আমাদিগের সমাজে, দৈনিক জীবনে এবং ধর্ম্ম ও চিন্তাজগতে, প্রাচীর প্রাচীন আদর্শ পশ্চিমের নববেশে ক্রমশঃই দেখা দিতেছে। আমাদিগের মধ্যে প্রাচীন ও নূতন, পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য, দেশী ও বিদেশী স্বচ্ছ ও আবিল চিন্তার ধারা, কালের বিরাট রসায়নে অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি করিতেছে। সেইজন্যই, নির্জ্জলা স্বদেশী শিক্ষার প্রণালী ও পাশ্চাত্য প্রণালী এই উভয়কে স্বতন্ত্র আকারে দেখিবার আবশ্যকতা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

এতদ্দেশীয় বৈদিক ও বৌদ্ধযুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, টোলের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, টোলমাত্রেই একাধারে চারিটি কায করিত; প্রত্যেক টোলই বিদ্যালয় ত বটেই, পরন্তু, বিশিষ্ট-বিদ্যালয়; এবং তৎসঙ্গে, সাধারণ ছাত্রাবাস (hostel) ও ধর্ম্ম-মন্দির এবং সংসার-প্রবেশের প্রকৃষ্ট শিক্ষাস্থল। বর্ত্তমান কালে, open-air-life (মুক্ত স্থানে বসিয়া বিদ্যাভ্যাস করা), specialized university (বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়) hostel life (অর্থাৎ সাধারণ ছাত্রাবাসে একত্র থাকা) এবং sports (খেলাধূলা ও ব্যায়াম)—এইগুলিই শিক্ষার আদর্শ বিষয় ও একান্ত সহচর বলিয়া বিবেচিত হয়; একমাত্র sports বাদে, অপর সকলগুলিই তৎকালের টোলে একাধারে থাকিত। খেলা-ধূলাতে esprit de corps (সংঘ-জনিত একাত্মবোধ) comradeship (সৌভ্রাত্র), দেহের শক্তি, মনের স্ফূর্ত্তি, কার্য্যকুশলতা, স্থির-লক্ষ্য, উপস্থিত-বুদ্ধি, বিচারশক্তি প্রভৃতির বিকাশ হয় বলিয়া আজ sports-এর আদর। কিন্তু টোলে যে ভাবে বাঙ্গালীর ছেলেকে গৃহস্থালীর কাযকর্ম্ম করিতে হয়, যে উচ্চাদর্শে বাঙ্গালীর ছেলেরা টোলে প্রতিপালিত হন, যে পূর্ণ ঐকান্তিকতার মধ্যে তাঁহারা ছাত্রজীবন যাপন করেন, তাহাতে বাঁধাবাঁধি sportsএর অবর্ত্তমানে, সাধারণ টোল-জীবনেই sportsএর সকল গুণই সম্পূর্ণভাবে বিকসিত হইতে পারে এবং হয়। হয় না শুধু ক্রমিক শারীরিক শক্তির বিকাশ। টোলজীবনে বর্ত্তমান কালের পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল উচ্চাদর্শই ছিল; কেবল বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যায়ামের বা ক্রীড়ার বন্দোবস্ত ছিল না। কিন্তু গৃহস্থালীর নিত্যকর্ম্ম করিলে শারীরিক পুষ্টি ও বিকাশ যথেষ্টই হইয়া থাকে, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য।

টোলে প্রাতঃকালে ও বৈকালে অধ্যাপনা হয়; ইংরাজী বিদ্যালয়ে দুপুর-বেলাতেই অধ্যাপনা হইয়া থাকে। ইংরেজেরা শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী বলিয়া, দুপুরে ভিন্ন তাঁহাদিগের দেশে শিক্ষাকার্য্য চলে না; এদেশে আসিয়াও ইংরেজ সেই পদ্ধতি চালাইয়াছেন। তাহার ফলে আমাদিগের গার্হস্থ্য-জীবনে ও সমাজে নানারকমের ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। এদেশে পবিত্র বিদ্যাদানকে ইংরেজেরাই পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিয়াছেন, এবং রাজ-ভাষাকে, রাজার জাতিকে ও রাজভাষাভিজ্ঞ শিক্ষকদিগকে উচ্চাসন দান করিয়া, এক ঢিলে দুই পাখী মারার মত, এতদ্দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীকে ও এদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যকে অনাদর করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন। শিক্ষকগণকে বেতন-ভুক করিয়া, গুরু-শিষ্যকে স্বতন্ত্র করিয়া, ধর্ম্মশিক্ষাকে বাদ দিয়া, বৎসরান্তে পারিতোষিকের লোভের সৃষ্টি করিয়া—ছাত্রদিগের নৈতিক শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। আমরা এমন বলিতেছি না যে, ইংরেজেরা ইচ্ছা করিয়া এই সকল কায করিয়াছেন। আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহা না বুঝিয়া-সুঝিয়া সাহেবিয়ানার ফল। তাই আজ আমরা সোণার পাথরবাটি, কাঁটালের আমসত্ত্ব, ধান গাছের কড়ি-কাঠ হইতেছি !!!

বর্ত্তমান শিক্ষার রূপ।

শিক্ষার উদ্দেশ্য—মানুষ গড়া। "মানুষ" বলিলে, শুধু তাহার মস্তিষ্ককেই বুঝায় না। মানুষ বলিলে, দেহসম্পন্ন, মস্তিষ্ক সংবলিত জীবকে বুঝায়। "মানুষ গড়া" বলিলে মানুষের দেহের, মস্তিষ্কের ও চিত্তবৃত্তির একাধারে উন্নতি করা বুঝায়; অর্থাৎ যে ব্যক্তি যাহা-যাহা লইয়া জন্মিয়াছে, সেই সকলের মধ্যে এমন ঔৎকর্ষ্যের সামঞ্জস্য ঘটান চাই, যাহাতে সেই ব্যক্তি নিজ প্রকৃতি, নিজ আবশ্যকতা, ও নিজ সামর্থ্যের অনুযায়ী কায করিয়া নিজের ও পরের উপকার সাধন করিতে পারে। মানুষ সর্ব্বপ্রথমে চাহে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, তাহার পরে চাহে নিজ সুখ। শিক্ষার উদ্দেশ্য,—মানুষকে স্বাধীনভাবে সুখে থাকিবার উপযোগী করিয়া তোলা। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথা আরো স্পষ্ট করিতেছি।

মনে করুন, যদি দুর্ভাগ্যক্রমে আমার চক্ষের দৃষ্টি অতীব ক্ষীণ এবং আমার শারীরিক বলবিক্রমও বৎসামান্য, অথচ আমার মাথা খুব পরিষ্কার হয়, এমন অবস্থায়, আমাকে যদি কেহ বি-এ, এম্-এ, পর্য্যন্ত পড়িতে বাধ্য না করিয়া, মৌখিক নানাবিষয়িণী জ্ঞান দান করিবার সঙ্গে-সঙ্গে হাতের কায (যেমন কুম্ভকারের কায, কলকব্জার কায, টাইপরাইটিং কায প্রভৃতি) শিক্ষা দেয়, তাহা হইলে, আমার চক্ষের দৃষ্টিও আর খারাপ হয় না, আমার জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে অর্থোপার্জ্জনের উপায় হইয়া যায়,—আমি কাহারও গলগ্রহ না হইয়া অনায়াসে দুপয়সা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হই। কিন্তু আমাদিগের দেশে ঠিক ইহার উল্টা ব্যবস্থাই আছে—তাহা পরে দ্রষ্টব্য। আমরা লেখাপড়া শিখিয়াও পরের গলগ্রহ হইয়া পরাঙ্গপুষ্ট জীবরূপে সমাজে বিচরণ করিতে পারি মাত্র!

উচ্চ আদর্শের অভাব।

এরূপ হয় কেন? এরূপ হইবার কারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চ আদর্শের অভাব। আমাদিগের দেশে প্রকৃত প্রস্তাবে কি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তাদিগের, কি শিক্ষার্থীদিগের, কি অভিভাবকদিগের—কাহারও মনে শিক্ষাসম্বন্ধে একটা স্থির উচ্চাদর্শ নাই বলিয়াই নানা বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। এদেশে "শিক্ষাবিভাগ" বলিলে, তাহার সঙ্গে বিদ্যালয়-গুলিকেও বুঝায়—যেহেতু, উভয়েই সাক্ষাৎসম্বন্ধে বা পরোক্ষে গবর্ণমেণ্ট-শাসিত। গবর্ণমেণ্টের এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্য, কতকটা রাজকার্য্য পরিচালনোপযোগী লোক প্রস্তুত করা, কতকটা জ্ঞানবৃদ্ধি দ্বারা দেশের উন্নতি ও শান্তির বিস্তার করা। গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য যতই সাধু হউক না কেন, গবর্ণমেণ্ট বিজাতীয় হওয়ায়, আমাদিগের ধাতু, আমাদিগের প্রাণের কথা, প্রাণের ব্যথা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সকল সময়ে ঠিক বুঝিতে পারেন না। গবর্ণমেণ্ট বিজাতীয় হওয়ায়, আমাদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবার কথা। কাযেই, গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিষয়িণী কোন সাধু উদ্দেশ্য যখন কার্য্যে পরিণত হয়, তখন শত সতর্কতার নাগপাশবদ্ধ হইয়া তাহা আমাদিগের কাছে পৌঁছায়। শিক্ষা-জগতে প্রাণের সহিত প্রাণ না মিশিলে শিক্ষার সুফল কখনও ফলে না। পুষ্প-উদ্যানে প্রাতঃসমীরণ-বীজন ব্যর্থ হয়, যদি ভ্রমণকারীর মন দুশ্চিন্তার দোলায় দুলিতে থাকে। মন্দিরের দেবতার প্রতি আন্তরিকতার ফলেই শির স্বতঃই নত হয়,—অবিশ্বাসে লৌকিক প্রণাম দেওয়া পর্য্যন্ত চলে! আমাদিগের দেশে এই ফল এখন হাতে-হাতে পাওয়া যাইতেছে। বাধ্যতামূলক ছাত্রাবাসের সৃষ্টি করিলেই যে গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ নিকট হইবে, তাহা নহে। যতক্ষণ, এদেশে স্কুল করা ব্যবসায় বর্ত্তমান থাকিবে, যতদিন শিক্ষকেরা নিজ-নিজ প্রাপ্য বেতনকেই যথাসর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া বেতনদাতাকে অহর্নিশ অর্ঘ্য দিতে থাকিবেন, যতদিন শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কালা ছাত্রদিগকে বিজাতীয় চক্ষে দেখিবেন, এবং ছাত্রেরাও বুঝিবে যে, বাধ্যতামূলক ছাত্রাবাসের সৃষ্টির সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছাত্রগুলিকে গবর্ণমেণ্টের মুষ্টির মধ্যে আনয়ন করা—ততদিন বাঁধনের উপর বাঁধন দিলেও প্রেম ও ভক্তি শিথিল হইবেই হইবে। যেখানেই যত আইনের বাহুল্য, সেইখানেই তত নূতন-নূতন পাপের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কাযেই, ওপথে না যাইয়া, গবর্ণমেণ্টকে বর্ত্তমান কালে তাঁহাদিগের পক্ষে নূতন পথে চলিতে হইবে; শাসন-নীতি ত্যাগ করিয়া প্রেমের পথে চলিতে হইবে। ছাত্রা-বাসের বাহুল্য সর্ব্বথাই প্রার্থনীয়; কিন্তু ছাত্রাবাসের নামে যেন জেলসংস্করণ জেল চলিত না হয়। যে শ্বেতাঙ্গ পুরুষ কালা ছাত্রকে আন্তরিক ভালবাসিবেন না, তিনি শিক্ষা-মন্দিরের ত্রিসীমানায় আসিবার অনুপযুক্ত। আজ হইতে গবর্ণমেণ্ট ভালবাসা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা—এই তিনটি আদর্শের উপরে শিক্ষামন্দির স্থাপন করুন, আজ গবর্ণমেণ্ট কালা ছেলেদিগকে সত্যসত্যই মানুষ রূপে গড়িবার আদর্শ সম্মুখে রাখুন, কাল এরূপ প্রবন্ধের প্রয়োজন হইবে না! হয় ত গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে সত্যসত্যই মানুষ গড়িয়া তুলিতে চাহেন,—কিন্তু কতকটা অর্থের অভাবে, কতকটা আমাদিগের কি প্রকৃত অভাব তাহা ঠিকমত বুঝিতে না পারার জন্য, আমরা শিব না হইয়া আর কিছু হইতেছি। কিন্তু সে কথায় আমাদিগের কায নাই। আমরা কি চাই ও কি-পাইতেছি,—আমাদিগের কি হওয়া উচিত ছিল এবং কি হইয়াছি,—আমরা কি হইতে পারিতাম এবং কি হইতে পারিয়াছি,—এই কথাগুলির আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাই যে, আমাদিগের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের সম্মুখে কোনও বাঁধাবাঁধি উচ্চাদর্শ নাই। আধ্যাত্মিক ভারতভূমিতে, জ্ঞানগর্ব্বনয় এই পুণ্যদেশে, ধর্ম্মবিহীন,

পণ্য তুল্য শিক্ষাকে আজ কি আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

বিজাতীয় বলিয়া গবর্ণমেণ্ট যেরূপ আচরণ করুন না কেন, অভিভাবকেরা কোন্ আদর্শ-প্রণোদিত হইয়া স্ব-স্ব পুত্রগণকে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন? এ কথার উত্তর—অর্থলোভের আদর্শে! সকলেই মনে করেন যে, রীতিমত কৃতবিদ্য হইতে পারিলে তাঁহার পুত্ররত্নটি হাইকোর্টের জজ হইবেন,—অতএব তাহাকে পরে-পরে যথাক্রমে বি-এ, এম্-এ পাশ দিয়া চলিতেই হইবে! সকলেরই ধারণা এই যে, "পাশ" করিলেই ছপয়সা উপার্জ্জন হইবে, পাশ করিলেই চাকুরী জুটিবে—এবং "যেমন-তেমন চাকুরী ঘি-ভাত"। পিতামাতার পক্ষে এই "পাশের" মোহ বড় শক্ত মোহ। এই "পাশ" করাইবার জন্য পিতামাতা যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া বসেন; এই "পাশ" করাইবার জন্য, শিশুকাল হইতে পিতা নিজ প্রাণাধিক পুত্রকে রাত্রিকালে যথেষ্ট নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে দেন না, প্রাণ খুলিয়া খেলিতে দেন না, যথোপযুক্ত বিশ্রাম পর্য্যন্ত করিতে দেন না,—পাছে সেরূপ করিলে অযথা সময় নষ্ট হয়, পাশে দেরী পড়ে। এই পর-বিদ্যায় পাশ করাইবার জন্য, নিজ-নিজ সন্তানের নিজস্ব মেধা, বুদ্ধি-বৃত্তি ও সুকুমার বৃত্তিগুলিকে নির্ম্মমভাবে নিষ্পেষিত করিয়া, শিখান-বুলির রাশি ভারে-ভারে বহন করিতে বাধ্য করেন; এই পাশ করাইবার জন্যই, সন্তান-দিগের স্বাস্থ্য বলিয়া যে পদার্থটা আছে, তাহা জানিয়া-শুনিয়াই সত্যসত্যই "ধামা-চাপা" দিয়া রাখেন! এক কথায় বলিতে গেলে; এই পাশের সুরেই সমস্ত বাঙ্গালা-দেশটাকে বাঁধা হইয়াছে!

গৃহে পিতামাতাকে বিলাসিতার সেবায় নিযুক্ত দেখিয়া, বাহিরে কাঞ্চনের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া এবং পুস্তকে "লেখা পড়া করে যেই, গাড়ীঘোড়া চড়ে সেই" এই বীজমন্ত্রের সন্ধান পাইয়া, ছাত্রগণ যে কি আদর্শে বিদ্যাশিক্ষায় নিযুক্ত হয়, তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না। সেই প্রলোভনের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া, বিধাসূত্র হইয়া তাহারা ক্রমাগত অগ্রসর হইতে থাকে। পরে যখন তাহারা দেখে যে, সে আদর্শ মরীচিকার মত দূর হইতেই প্রলুব্ধ করে মাত্র,—এবং বিদ্যাভ্যাস সমাপ্ত হইলে যখন সে বুঝিতে পারে যে, এতকাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বাস্তব লাভ কিছুই হয় নাই এবং তাহার জীবনে অপরাহ্ণের ছায়াপাত হইতে আরম্ভ করিয়াছে,—তাহার হস্ত-পদাদি আর তাহার দেহের ভার তেমন বহনে সমর্থ নহে, তাহার নিজস্ব মেধা, বুদ্ধিবৃত্তিগুলি একে-একে লোপ পাইয়াছে—তখন তাহার তথাকথিত "শিক্ষা" তাহাকে ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দেয়,—"কত ধানে কত চাল" হইয়াছে!

তাই বলিতেছিলাম যে, শুধু একটা মস্ত ভুলের জন্য আজ আমাদিগের দেশে শিক্ষা জিনিসটা সব দিকে পণ্ড হইয়া যাইতেছে। সে ভুলটা—উচ্চাদর্শের অভাব। জানি না, জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তিত না হইলে কোনও কালে এই ভুলটা আমূল সংশোধিত হওয়া সম্ভবপর কি না।

বৈশিষ্ট্যের অভাব

একটা মানুষেরই পাঁচটা অঙ্গুলি সমান হয় না। ব্যক্তিগত ধাতু-প্রকৃতির বৈষম্য স্বাভাবিক। এমন অবস্থায়, একই "পাশ" দেওয়া যাঁতাকলে সকলকেই পেষণ করিলে, কখনও সুফল ফলিতে পারে না। যাহার যেমনই শারীরিক গঠন হউক না কেন, যেমনই স্বাস্থ্য হউক না কেন, তাহার মেধা ধাতু প্রভৃতি যাহাই হউক না কেন, সে যে অবস্থাগ্রস্ত হউক না কেন, জীবনে তাহার সুবিধা-সুযোগ কোন দিকে থাকুক আর না থাকুক—বাঙ্গালা দেশে জন্ম-গ্রহণ করিলেই, দেশের জলহাওয়ার গুণে, প্রত্যেক বালককে বিশ্ববিদ্যালয় নামক যাঁতা-কলে পিষ্ট হইতেই হইবে। কিন্তু পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই অন্যরূপ নিয়ম। সেখানে যখনই কোন বালক বা বালিকা শিক্ষাগ্রহণ করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তখনই তাহাকে কোনও বিদ্যালয়ে সরাসরি ভর্ত্তি করান হয় না। সে বালক বা বালিকার মনের গতি, স্বাস্থ্য ও বিষয়-বিশেষের উপরে অনুরাগ-বিরাগের উপরে পিতামাতা তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখেন, এবং যথাসম্ভব তদনুসারে কাজ করেন। কোনও বালক শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে নীত হইলে, সর্ব্বপ্রথমে তাহার রীতিমত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান হয়। স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ফলে, তাহার শারীরিক দোষগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং সেই সকল দোষ যদি সাধারণ প্রণালীতে শিক্ষা করার ফলে ক্রমশঃই বাড়িবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে বালককে আদৌ সাধারণ বিদ্যালয়ে দেওয়া হয় না। মনে করুন, যদি কোনও

ব্যবহার লক্ষ্য করুন), child-welfare (শৈশব হিতসাধন) লইয়া কতই যে আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বলা যায় না। আমাদিগের দেশে, দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে, ঐ সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথার উল্লেখ মাত্র শুনিয়া, এ দেশীয় ছাত্রেরা বি-এ, এম্-এ উপাধি ভূষিত হন। তৎকালে বা পরবর্ত্তী সময়ে, কি ছাত্র কি শিক্ষক, কেহই এ বিষয়ে হাতে-কলমে মন দেন না। কেন, শিশু কি আমাদিগের দেশে নাই? বাঙ্গালীর ঘরে-ঘরে নব-ষষ্ঠীর অসীম কৃপা; অথচ, মনীষী পাশ্চাত্য দর্শনাধ্যাপকবৃন্দ ইংরেজী পুঁথির বুলি আবৃত্তি করিয়াই ঐ বিষয়ে নিজ বিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন! এ দেশে চিকিৎসকেরও অভাব নাই—অথচ একজনও এ পর্য্যন্ত এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই! রামপ্রসাদী ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—আমাদের দেশে "এমন জমী রইল প'ড়ে, আবাদ ক'রলে ফ'লত সোণা!" সে যাহাই হউক, এই মোটা কথাটা খুব বড় করিয়া আমাদের দেশের লোকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, শিশুর শরীরই বল, আর মনই বল—উভয়ই অতি সুকুমার ও ভঙ্গপ্রবণ এবং সহজেই ধারণা-সক্ষম; এই জন্যই একটু শারীরিক পরিশ্রম করিলেই শিশুরা একেবারে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়—অত্যধিক পরিশ্রম করিলে তাহাদিগের আহারে রুচি পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। শারীরিক পরিশ্রমের ফল যাহা, মানসিক পরিশ্রমেরও ফল তাহাই। শিশুরা কখনও বেশীক্ষণ কোনও বিষয়ে মনোযোগ করিয়া থাকিতে পারে না; সামান্যক্ষণ মনোযোগের ফলেই শারীরিক অবসাদ অবশ্যম্ভাবী! এই কারণেই, স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদেরা একেবারে ধরিয়া লিখিয়া দিয়াছেন,—কত বয়সের বালকের কত ঘণ্টা পাঠাভ্যাস করা উচিত। আমি কিছুকাল পূর্ব্বে (১৯১৬ খৃষ্টাব্দে) প্রায় এক সহস্র স্কুল-বালকের স্বাস্থ্য রীতিমত পরীক্ষা করি। সে পরীক্ষার ফল Indian Medical Gazette (November 1917) ও Amrita Bazar Patrika (10 issues in December 1917) প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পরীক্ষা কালে আমি প্রত্যেক ছাত্রকে তন্ন-তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, সে বিদ্যালয়ে কত ঘণ্টা পড়ে ও বাটীতে কত ঘণ্টা অধ্যয়ন করে। এই পরীক্ষার ফল, পাদটীকার কোষ্টকাকারে দেওয়া গেল।—পাদটীকার কোষ্টকার উপর টিকা অনাবশ্যক; যে হেতু উহা চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে যে, কি হওয়া উচিত এবং কি হইতেছে! এরূপ "মুড়ি-মিছরির এক-দর" এরূপ বয়স-নির্ব্বিশেষে স্কুলে অধ্যয়নের সময় নির্দ্দেশ, জগতে আর কুত্রাপি দেখা যায় না, এবং সম্ভবপর নহে!!! এই অনবরত অধ্যয়ন-বাহুল্যের কারণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে, আমরা মাত্র দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি - বাঙ্গালী "পাশ"-সর্ব্বস্ব বলিয়া এবং বিজাতীয় ভাষায় ও অতিরিক্ত বিষয় অধ্যাপনা করান হয় বলিয়া। এক্ষণে তৃতীয় কারণটির উল্লেখ করিব। এ বিষয়ে ইঙ্গিত পূর্ব্বেই করিয়াছি। সে কারণটি আমাদের দেশের লোকের ঔদাসীন্য। গৃহে পিতামাতা কত ধানে কত চাউল হয়, তাহার সন্ধান রাখেন না; অর্থাৎ কত বয়সের ছেলের কতক্ষণ পাঠাভ্যাস করা উচিত, তাহার বেশী সময় অধ্যয়ন করিলে কি কুফল হয় এবং তাঁহার নিজ সন্তানের পরিশ্রম করিবার সামর্থ কতটুকু, এ গুলির বিষয়ে অভিভাবকগণ জানেন না, জানিতে ঔৎসুক্যও প্রকাশ করেন না; পরন্তু জানাইয়া দিলেও, গতানুগতিক ন্যায়ানুসারে, সুবন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত থাকেন না।

বালকদিগের বয়স	যে বয়সে যত ঘণ্টা	আমাদের দেশে যত ঘণ্টা পড়ান হয়।		
(বৎসর)	এক সপ্তাহে পড়া উচিত	প্রত্যহ বিদ্যালয়ে	প্রত্যহ প্রাতে	প্রত্যহ বৈকালে
৭ হইতে ৮	১২ ঘণ্টা	৪ ঘ ৪৫ মি	১ ঘ ২ মি	১ ঘ ২ মি
৮ " ১০	১৮ "	ঐ	১ " ৪০ "	১ " ৫ "
১০ " ১৩	২৪ "	ঐ	১ " ৩০ "	১ " ২০ "
১৩ " ১৫	৩০ "	ঐ	২ " ০ "	২ " ০ "
১৫ " ১৭	৩৬ "	ঐ	২ " ১ "	২ " ৫ "
১৭ " ১৯	৪২ "	ঐ	২ " ১০ "	২ " ১২ "

সমাজও তাদৃশ উদাসীন। সমাজ আজ কর্ণধারহীন, সমাজের লোকেরা স্ব-স্ব উপজীবিকা উপার্জ্জনে ব্যস্ত। জগতে প্রত্যেক প্রাণীরই কতকটা কর্ত্তব্য আছে, কতকটা তাহার প্রাপ্য দাবীও আছে। অভিভাবকগণ কর্ত্তব্য-বোধে নিজ-নিজ পুত্রগণকে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন বা গৃহে প্রাইভেট শিক্ষক নিযুক্ত করেন; এইটুকু তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করা হইল; কিন্তু যে বিদ্যালয়ের বা প্রাইভেট শিক্ষকের সঙ্গে তাঁহার ঐ রূপে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, ঐ দুই পক্ষ হইতেই অভিভাবকের প্রাপ্য দাবী কিছু আছে। কিন্তু সে প্রাপ্য কি ও কতটুকু, সে প্রাপ্য আদায় কি করিয়া বা কোন্ পথে হইবে, তাহা অভিভাবকেরা জানেনও না, জানিতে চেষ্টাও করেন না। ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলে, স্থানে স্থানে প্রাপ্য আদায় হইতে পারে বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত চেষ্টা বিফল হইবারই বেশী সম্ভাবনা, যেহেতু, আমাদিগের দেশে অধিকাংশ অভিভাবকই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বলিয়া, অন্নচিন্তায় ক্লিষ্ট, অবসরশূন্য, স্ফূর্ত্তিহীন এবং নিজ-নিজ প্রাপ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ ও উদাসীন। কিন্তু সেরূপ করিয়া এত দিন কাল হরণ করার ফলে আজ আমরা শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত—আজ বুঝি আমাদের নন্দের দুলালরা আমাদিগের হাতছাড়া হইয়া যায়! আজ আমরা অর্থব্যয় করিয়াও সার্থক হইতেছি না! এই অবস্থায় থাকিলে আর চলিবে না। যেখানে-যেখানে বিদ্যালয় আছে,—গ্রামে-গ্রামে, অভিভাবকগণ সংঘবদ্ধ হউন। ব্যষ্টিতে দৌর্ব্বল্য, সমষ্টিতে শক্তি; ব্যষ্টিতে কার্য্য পণ্ড, সমষ্টিতে কার্য্যোদ্ধার। গ্রামে-গ্রামে Guardians' Association বা অভিভাবকগণের সংঘ স্থাপিত হউক। সংঘে শিক্ষাবিষয়িণী আলোচনা হউক, লোকমত সৃষ্ট হউক, ছাত্রদিগের কিসে হিত হয় তৎসম্বন্ধে প্রবল ভাবে আলোচনা চলুক; তাহার ফলে, যেখানে যত বিদ্যালয় আছে, সকলেই জাগিয়া উঠিবে। বর্ত্তমান কালে, কি ব্যক্তিগত-সম্পত্তি-বিশেষ বিদ্যালয়ে, কি সরকারী বিদ্যালয়ে, অভিভাবকের ন্যায্য সম্বন্ধ স্বীকৃত হওয়া দূরে থাকুক, অভিভাবকগণ উপেক্ষিত হন—অথচ তাঁহাদিগেরই অর্থে বিদ্যালয়টি পুষ্ট। এরূপ হইবার কারণ এই যে, শিক্ষকেরা জানেন যে, কোনও অভিভাবক নিজ প্রাপ্য কি তাহা জানেন না। কিন্তু সংঘবদ্ধ হইলে অভিভাবকগণ নিজ-নিজ প্রাপ্য আদায় করিতে পারিবেন, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বাধ্য রাখিতে পারিবেন, এবং কালে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পরিচালনে অভিভাবকগণের মত প্রবল হইবে। এই রূপে যদি গ্রামে অভিভাবক-সংঘ স্থাপিত হয়, এবং যদি সেই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সংঘগুলি প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া বড় সংঘ স্থাপন করিতে পারেন এবং সমগ্র বঙ্গে তাবৎ সংঘই যদি একমত হইয়া কার্য্যে যোগ দিতে পারেন, তবে দেশ হইতে শিক্ষা সম্বন্ধে সকল গোলই অচিরে দূর হইয়া যায়। সুদূর দার্জ্জিলিং শৈলাবাসে বসিয়া, ধোপ-খেয়ালের বশে, কোনও ডাইরেক্টর বাহাদুর তাহা হইলে লোকমতের বিরুদ্ধে বাহাদুরী করিতে অবকাশ পান না, টেক্সট্‌বুক-কমিটি বসিয়া উদ্ভট বিড়ম্বনা তাহা হইলে আর বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগের কণ্টক রূপে বিরাজমান থাকিতে পারে না, বিশ্ববিদ্যালয় তাহা হইলে বই বেচিবার হেয় দপ্তরী-খানা সাজিতে পারে না! লোকমত এ দেশে নাই বলিয়াই আমরা এত বিড়ম্বিত হইয়াছি। "যাহা হইতেছে তাহাই হউক" বলিয়া উদাসীন থাকিলে চলিবে না। কর্ম্মীর কর্ম্মের সময় আসিয়াছে।

অনবরত অধ্যয়ন-বাহুল্যের চতুর্থ ও শেষ কারণ, দেশে প্রাইভেট শিক্ষকের অতি-প্রসার। বিদ্যালয়ে যদি পাঠ গ্রহণের প্রথা বন্ধ হইয়া পাঠ দানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে প্রাইভেট শিক্ষকের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু, সেরূপ হইবার সম্ভাবনা কম। কারণ, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সস্তায় কায সারিবার উদ্দেশ্যে অল্প বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং সেই সকল শিক্ষকের মর্য্যাদা সকল সময়ে রক্ষা করিয়া চলেন না; কাযেই, শিক্ষকেরা প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিবার কল্পনাও করেন না। তাঁহারা অস্থায়ী ভাবে বিদ্যালয়ের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং ওকালতি বা অপর ব্যবসায় করিবার সুযোগ অন্বেষণ করেন। আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, জীবনের গুরুতম দায়িত্বপূর্ণ যে তিনটি "ব্যবসা" আছে, বাঙ্গালাদেশে সেই তিনটি "ব্যবসায়ই" দায়িত্ব-জ্ঞানহীনের হাতে ন্যস্ত এবং তজ্জন্য বাঙ্গালীর "হাড় ভাজা ভাজা হইয়াও" উঠিয়াছে। সে তিনটি —বিদ্যাদান করা, মন্ত্রদান করা ও চিকিৎসা করা। এ দেশের সকলেরই মনে একটা ধারণা আছে যে, পড়ান কাযটা অতীব সহজসাধ্য,—যে দুপাতা পড়িয়াছে, সেই পড়াইতে পারে। কিন্তু এ দেশের লোকেরা জানে না যে, বরং

গাধাকে পিটিয়া ঘোড়া গঠন করা সম্ভবপর হইতে পারে, তবু যে আজন্ম শিক্ষকের সংস্কার লইয়া জন্মে নাই, তাহার দ্বারা শিক্ষকতা অসম্ভব। এই জন্যই ইংরেজী প্রবাদ-বচনটি বড় খাঁটি সত্যজ্ঞাপক—teachers are born, not made। অতএব যদি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ প্রকৃত সুশিক্ষক নিযুক্ত করেন, এবং যদি সেই শিক্ষকদিগকে সারাদিনে ৩ ঘণ্টার বেশী বিদ্যালয়ে পরিশ্রম না করান, যদি তাঁহাদিগকে যথেষ্ট বেতন দান করেন,—এমন বেতন যে, শিক্ষককে প্রাইভেট পড়াইয়া বা পুস্তক লিখিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়াইতে না হয়—এবং যদি শিক্ষকগণের যথাযোগ্য মান-মর্য্যাদা দিতে থাকেন, তবেই শিক্ষকেরা মনোযোগ দিয়া শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন; যেহেতু, বোর্ডে অঙ্ক লিখিয়া দিয়া ছাত্রদিগকে কসিতে আজ্ঞা দেওয়া, শ্রুতিলিখন অভ্যাস করান, রচনা প্রণয়নে ছাত্রগণকে প্রবৃত্ত করা এবং তাহাদিগের পাঠ গ্রহণ করায়, পরিশ্রম লাঘবই হয় না,—শিক্ষাদান কার্য্যে পরিশ্রমের আধিক্যই হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আর একটি কায করা আবশ্যক। বর্ত্তমান কালে, এক একটি বিদ্যালয়ে নয় দশটি করিয়া শ্রেণী-বিভাগ আছে এবং কোন-কোনও শ্রেণীর ছয়-সাতটি করিয়া শাখা-বিভাগ আছে। এরূপ বন্দোবস্তে স্কুলের আয় বাড়ে বটে এবং স্কুলের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের হর্ষ বর্দ্ধিত হইতে থাকে বটে, কিন্তু ইহার ফলে শিক্ষকে ও ছাত্রে তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। এইজন্য নিয়ম হওয়া উচিত যে, ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির শৈশব শ্রেণী হইতে বর্ত্তমান কালের পঞ্চম-শ্রেণী পর্য্যন্ত লইয়া মধ্য-বিদ্যালয় সংগঠিত হউক, এবং চতুর্থ-শ্রেণী হইতে ম্যাট্রিকুলেশন-শ্রেণী পর্য্যন্ত উচ্চ বিদ্যালয় করা হউক। এই উভয়বিধ বিদ্যালয় স্বতন্ত্র গৃহে ও স্বতন্ত্র প্রধান শিক্ষকের অধীন রাখা হউক। তাহা হইলে প্রত্যেক ছাত্রই নিজ-নিজ শিক্ষকের সহিত ঘনিষ্ট রূপে পরিচিত হইতে পারিবে। সেইরূপ ঘনিষ্টতা ও ব্যক্তিগত যত্ন ব্যতীত ছাত্রদিগের প্রকৃত উপকারের সম্ভাবনা নাই। আর, এই সকল সুশিক্ষার উপায়ের অভাব আছে বলিয়াই আজ প্রাইভেট শিক্ষক, এবং তদপেক্ষা মারাত্মক অধ্যাপনার বিদ্যালয় বা কোচিং ক্লাস যথা-তথা সৃষ্ট হইতেছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের সময়ে যৎকিঞ্চিৎ নির্ব্বাচনের বিশেষত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু প্রাইভেট শিক্ষক মহাশয় স্বয়ম্ভূ। তাঁহার আর্থিক অসচ্ছলতাই তাঁহার শিক্ষকত্ব-গ্রহণের হেতু; তাঁহার স্বল্প বিদ্যা, তাঁহার সময়াভাব, তাঁহার শারীরিক ও সাংসারিক অস্বচ্ছন্দতা যে সহস্রবার তাঁহার ঐ গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ গুরুগিরির অন্তরায়, তাহা তিনি ভাবেন না; সে হেতু অভিভাবকগণের ঐরূপ ভাবনা কখনো হয় নাই! কাযেই, অভিভাবকগণ অবিচারিত চিত্তে যে-সে ব্যক্তিকে শিক্ষক করিয়া দিতেছেন এবং দারিদ্র্য-পীড়িত, অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত প্রাইভেট শিক্ষকও নির্ব্বিকার-চিত্তে ঐ গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন। কাযেই, ফল যাহা হইতেছে তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন!

প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িল। বারান্তরে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ত্রিশূল ও সরমা নক্ষত্র

[অধ্যাপক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

বাঙ্গালা দেশে যাহাকে কালপুরুষ নক্ষত্র বলে, পাশ্চাত্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে উহার নাম ওরায়ণ। প্রাচীন গ্রীকগণ ইহার ওরায়ণ নামকরণ করিয়াছিলেন। চলিত ইংরেজীতে ইহার নাম ব্যাধ (Hunter) নক্ষত্র। আকাশে এই নক্ষত্রের অবস্থান সহজেই স্থির করা যায়। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের সন্ধ্যাকালে ইহাকে পূর্বগগনে এবং চৈত্র ও বৈশাখ মাসের সন্ধ্যাকালে পশ্চিমগগনে দেখা যায়। এই নক্ষত্রের মধ্যদেশে তিনটী উজ্জ্বল তারকা এক সরল-রেখায় একটু হেলাইয়া বর্ত্তমান। পাশ্চাত্য জ্যোতিষ মতে এই তারকাত্রয়ের নাম ওরায়ণের কটিবন্ধ (The belt of Orion)। এই তিনটী তারার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে দুই পার্শ্বে একটী করিয়া তারা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের বাম দিকের

সম্মুখীন তারাটী ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং দক্ষিণ দিকের তারা হইতে উজ্জ্বলতর। এই দুই তারাকে কালপুরুষের দুই হস্ত বলে। তাহা হইলে রক্তবর্ণ তারাটী কালপুরুষের দক্ষিণ হস্ত। সিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে ইহার নাম আর্দ্রা(১)। পাশ্চাত্যগণ ইহাকে বেটেলগিজ (Betelgeuse) বলেন। এই তারাদ্বয়ের অল্প উপরে ও অনুজ্জ্বল তারকার কিছু নিকটে একটী অস্পষ্ট তারাপুঞ্জ আছে। এই তারাগুলিকে কালপুরুষের মস্তক রূপে কল্পনা করা হয়। সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মতে ইহাই মৃগশিরা নক্ষত্র।

কালপুরুষ নক্ষত্রের উত্তর-পশ্চিমে ও কিছু দূরে একটী উজ্জ্বল ও রক্তবর্ণ তারকা দেখিতে পাওয়া যায়। উহা যে নক্ষত্রের মধ্যে বর্ত্তমান, তাহাকে আর্য্যগণ রোহিণী নাম প্রদান করিয়াছেন। পাশ্চাত্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে উহার নাম অল্‌ডি-বরণ (Aldebaran)। এই নক্ষত্র কতকগুলি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র তারা লইয়া গঠিত। উহারা এরূপ ভাবে সজ্জিত, যেন একটী দীর্ঘ ত্রিকোণ আকার গ্রহণ করিয়াছে। এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে উহার আকার শকটের সদৃশ কল্পনা করা হইতেছে(২)। বৈদিক যুগে রোহিণী নক্ষত্রের দেবতাকে ঊষা বলা হইত, পরে দেখান যাইবে।

কালপুরুষ নক্ষত্র হইতে কিছু দূরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে একটী অত্যন্ত উজ্জ্বল তারকা ঝপ্‌ঝপ্ করিয়া জ্বলে। ইংরেজী জ্যোতিষ-শাস্ত্রে ইহার নাম সিরিয়াস (Serius) তারা। চলিত ইংরেজীতে ইহাকে কুক্কুর (Dog) তারা বলে। ল্যাটিন ভাষায় ইহার নাম কেনিস মেজর (Canis Major) অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ কুক্কুর। বৈদিক যুগে এই সকল নক্ষত্রের কি নাম ছিল, ইহা জানিবার কৌতূহল বোধ হয় অনেকেরই মনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাঠকদিগের এই কৌতূহল পরিতৃপ্তি করিবার জন্য, আমরা এই প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব।

বৈদিক যুগে ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে একটী গল্প প্রচলিত ছিল; তাহা নানা আকারে বৈদিক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। প্রজাপতি দক্ষ হইতে কিরূপে আদিত্য-গণ, ভৃগু, অঙ্গিরা-ঋষিগণ ও বৃহস্পতি উৎপন্ন হন, ইহাই ছিল গল্পের বিষয়। ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছে, দক্ষের দুহিতা অদিতি। কিন্তু অদিতির গর্ভেই দক্ষের আদিত্য-পুত্রগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, ইহাও দেখিতে পাই(৩)। একটী সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে, প্রজাপতির স্খলিত ওজঃ হইতে দেবগণ বাস্তোষ্পতি (আদিত্যকে) গঠন করেন (৪)। এই নিয়ম বহুর শাসন বলিয়া এক ঋকে উক্ত হইয়াছে(৫)। অতএব মনে হয় ঋগ্বেদের যুগে কন্যার পুত্রোৎপাদন দোষাবহ ছিল না। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কালে ইহা পাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদেরই ব্রাহ্মণ; ঋগ্বেদ রচনার কিছু কাল পরে ইহা রচিত হইয়াছিল, অনুমান করি। এই ব্রাহ্মণে গল্পটী কিছু অন্য আকার ধারণ করিয়াছে। প্রজাপতির কন্যা অদিতি না হইয়া ঊষা কিম্বা দ্যৌ বলা হইয়াছে। প্রজাপতির এই কর্ম্ম দেবগণ অকৃত বলিয়া গণনা করিলেন ও তাঁহার প্রাণদণ্ড শাস্তি বিধান করিলেন। কিন্তু আপনাদের মধ্যে কোন জনকে প্রজাপতির সমকক্ষ দেখিতে না পাইয়া, প্রত্যেকের অংশ মিলন করিয়া ভূতবান নামে এক দেবতার সৃষ্টি করিলেন(৬)। এই দেবের ধনুকের বাণ তিন কাণ্ডযুক্ত। ইনিই যে রুদ্র, তাহা পরে প্রকাশিত হইয়াছে। যজ্ঞস্খলনকারী প্রজাপতিকে রুদ্রদেব বাণ-বিদ্ধ করিলে, তিনি লম্ফ প্রদান করতঃ আকাশে উত্থিত হইলেন। এক্ষণেও আকাশে নক্ষত্ররূপে মৃগব্যাধ রুদ্র, মৃগ (অর্থাৎ মৃগ) রূপধারী প্রজাপতি, লোহিতবর্ণা রোহিণী, এবং রুদ্রের ত্রিকাণ্ড ইষু ঐ ঘটনার নিদর্শনরূপে বর্ত্তমান(৮)। ইহার পর প্রজাপতির ওজঃ দ্বারা আদিত্যসূর্য্য, আদিত্যগণ, ভৃগু, অঙ্গিরাগণ, বৃহস্পতি এবং নানাবর্ণের পশুদিগকে দেবগণ সৃজন করিলেন। কারণ দেবতাগণ ওজঃ ধাতুকে নির্দ্দোষ স্থির করিয়াছিলেন।

---

(১) তৈঃ ব্রাহ্মণে আর্দ্রার একটি নাম যায়। তথায় উহা দ্বিবচনান্ত।...সিদ্ধান্তের আর্দ্রায় একটী তারা। "জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" —পৃঃ ৪৩২।

(২) পাঁচটী তারায় রোহিণী নক্ষত্র দীর্ঘ ত্রিকোণ শকটের আকারে রচিত হইয়াছে। এই জন্য উহার এক নাম রোহিণী শকট। (যোগেশ-চন্দ্র রায়ের "জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী।"—পৃঃ ৪২৬।)

(৩) ঋগ্বেদ...১০।৭২।

(৪) ঋগ্বেদ...২।৩১।৭।

(৫) ঋগ্বেদ - ৩।৩১।১।

(৬) ঋগ্বেদ, ব্রাঃ...১৩।৩।৩৩।

(৭) তাঃ ঋগ্বো বৃষা রোহিতঃ বৃতাঃ অন্যোৎ। ঐঃ ব্রাঃ ১৩।৩।৩৩।

(৮) তং অভি আয়ত্ত ঋষিবাহস; বিদ্ধ উর্দ্ধ উদপ্রপৎ; তং এতঃ

ঋগ্বেদে উষাকে দিব্যলোকের দুহিতারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। উষার শকটের উল্লেখ ঋগ্বেদে দেখিতে পাই। ইন্দ্র ঐ শকট ভাঙ্গিয়া দেন। বিপাশা নদীতীরে এখনও ঐ শকট পড়িয়া রহিয়াছে। (৯)

উদ্ধৃত শ্লোকে বিপাশা নদীর উল্লেখ রহিয়াছে। এই নদী কোথায়? ঋগ্বেদের ঋষিগণ আকাশের ছায়াপথকে স্বর্গীয় সপ্তসিন্ধুরূপে কল্পনা করিতেন। এখানে যেমন বিপাশা নদীর নাম দেখিতেছি, সেইরূপ অংশুমতী নাম্নী আর এক স্বর্গীয় নদীর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১০) অনুমান করি স্বর্গীয় সপ্তসিন্ধু সেকালে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদের অপর একস্থলে উষাকে রোহিণীও বলা হইয়াছে। (১১) রোহিণী তারার বর্ণ লাল বলিয়াই উহার নাম রোহিণী রাখা হইয়াছে। আমরা দেখাইয়াছি, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষ গ্রন্থে রোহিণী নক্ষত্রের আকার শকট সদৃশ কল্পিত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা গেল, এই কল্পনার মূল ঋগ্বেদে রহিয়াছে। ইহাও দেখা গেল, উষা রোহিণী নক্ষত্রের দেবতা। অন্ততঃ ঋগ্বেদের উদ্ধৃত শ্লোকসকলে তাহাই রহিয়াছে।

ঋগ্বেদে রুদ্রের যে সকল গুণ ও কর্ম্মের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে প্রজাপতি বধের উল্লেখ নাই। তাহা হইলে এই উপাখ্যান পরে রচিত হইয়াছে, অনুমান করি। ঋগ্বেদের যুগে অদিতি হইতে আদিত্যদিগের উৎপত্তি হইয়াছিল, দেখা গিয়াছে। দেখা যায় পুনর্বসু নক্ষত্রের দেবতা অদিতি। এই নক্ষত্র মিথুনরাশির অন্তর্গত। অনুমান করি, ঋগ্বেদের ঋষিগণ এই নক্ষত্রে আদিত্যদিগের উৎপত্তি-স্থান কল্পনা করিতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রুদ্র-প্রজাপতির উপাখ্যান রচনাকালে রোহিণীতে আদিত্যদিগের উৎপত্তি-স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষ-শাস্ত্রমতে আর্দ্রার (বা বেটেল-গিজের) দেবতা রুদ্রদেব। শিবপুরাণেও রুদ্রদেবকে আর্দ্রা নক্ষত্রের দেবতা বলিয়া বর্ণিত দেখি। শিব বা রুদ্রের প্রধান অস্ত্র ত্রিশূল। ইহার এক নাম পিনাক। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে ইষুর উল্লেখ আছে, তাহা ত্রিকাণ্ডযুক্ত। সায়নাচার্য্য ত্রিকাণ্ডের নিম্নলিখিত রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনীকং শল্য স্তেজনং ইতি অবয়ব ত্রয়োপেতা। এরূপ অর্থ করিলে, প্রত্যেক বাণের যে তিনটী ভাগ আছে, তাহাই বুঝায়—যথা বাণের শল্য, ফলা, ও পক্ষ। ইহা দ্বারা রুদ্রদেবের প্রসিদ্ধ ত্রিশূল বুঝায় না। ত্রিশূলের শল্যের অগ্রভাগে তিনটী ফলা আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রুদ্রের ইষুর—ত্রিকাণ্ড বিশেষণ দ্বারা ত্রিশূল বুঝাইতেছে মনে করি। এই ব্রাহ্মণের মতে আকাশে 'ত্রিকাণ্ড ইষু' বর্ত্তমান। সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যার যাথার্থ্য আকাশস্থ নক্ষত্র দ্বারা স্থির করিতে হইবে। পাঠক একবার কালপুরুষ নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন। যে তিন তারাকে পাশ্চাত্যগণ ওয়ায়ণের কটিবন্ধ বলেন এবং প্রফেসর হুইটনীর মতাবলম্বী লোকমান্য তিলক ও আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়

মুখ ইতি আচক্ষতে; ৎ ই এব মুখমাধঃ স ই এব স; বা রোহিৎ বা রোহিণী; যো এব ইষুঃ ত্রিকাণ্ডা সো এবম্ ত্রিকাণ্ডা ইতি।

ঐঃ ব্রাঃ ১৩।৯।৩৩।

তাহার (অর্থাৎ প্রজাপতির) অভিমুখে (ধনু) বিস্তার করিয়া (তাঁহাকে) বিদ্ধ করিয়াছিলেন; বিদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধে লম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই তাঁহাকে দৃশ্যবৎ দেখা যাইতেছে। যিনি মৃগ-ব্যাধ তিনিও ঐ তিনি। যিনি রক্তবর্ণ তিনি রোহিণী। তিন কাণ্ডযুক্ত ইষু (অর্থাৎ বাণ) যাহা, তাহাও ঐ ত্রিকাণ্ড ইষু।

(৯) দিবঃ। চিৎ। ম। দুহিতরঃ। মহান্। মহীয়বানাং
ঊষসঃ। ইন্দ্র। সং। পিনক্। ১।৩০।১।

হে ইন্দ্র! মহান্ (তুমি) দিব্যলোকের দুহিতা পূজ্যমানা উষাকে সম্যক প্রকারে পেষণ করিয়াছিলে।

এতং। মে। সরস্বতি। প্রবঃ। পরে। সুদাংসি। বিপাশি। ওজ।
সসায়। যৎ। পয়োভিঃ। ৬।৩০।১১

এই তোমার শকট; বিপাশা তীরে ভগ্ন হইয়া শায়িত রহিয়াছে; (তিনি) দুরদেশ হইতে আসিয়াছিলেন।

(১০) ত্রিপ্তঃ। অপঃ। বিষুণে। চরন্ত্
উপ প্রবে। নঃ। অংশুমত্যাঃ। ৮।৮৫।১৪

অংশুমতী নদীর নিকট বিস্তৃত দেশে সোমকে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি।

(১১) ইয়ং। যা। নীলী। অরিণী। কপর্দা। রোহিণ্যা। কৃতা।
চিত্রা ইব। প্রতি। আয়তী। অদর্শি। আয়তী। অজঃ। বৃষণ্। বাজম্।
৮।৯১।১৩।

অর্থ:—এই যাহাকে নিম্নমুখী অরিষ্টরূপা (অর্থাৎ অহিরূপা) রোহিণী করা হইয়াছে, দর্শনিকের মধ্যে আগমনকারিণী (তাহাকে) চিত্রার মত দেখাইতেছে।

যাহাদিগকে রুদ্রের ইষু কল্পনা করিয়াছেন, (১২) আমাদের মতে, উহারা ত্রিশূলের মূল তিনটীই তারা। ঐ তিন তারাকে মূল করিয়া ত্রিশূলের তিন কাণ্ড বা শূল নিম্নে বহির্গত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যতারকা, উপরে আর্দ্রা ও নিম্নে আর এক উজ্জ্বল তারার সহিত এক সরল রেখায় বর্ত্তমান। এই রেখার যে উর্দ্ধ অংশ আর্দ্রা ও মধ্য তারকার অন্তর্গত, উহাই ত্রিশূলের হাতল বা শলা। ত্রিশূলের মধ্য-কলা ঐ রেখার নিম্ন অংশ। একটু নিবিষ্ট চিত্তে ওরায়ণ নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে, উহার কটিবন্ধের অপর দুই তারা হইতে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কতকগুলি তারা লইয়া নিম্নে ত্রিশূলের অপর দুই ঈষৎ বক্র, পার্শ্বস্থ কলা উৎপন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্যদিগের মতে মধ্য ও দক্ষিণ দিকস্থ রেখা ওরায়ণের পদদ্বয়, এবং বামদিকের রেখা তাহার তরবারি (Sword)। বৈদিক ঋষিদিগের চক্ষে তারকাপুঞ্জ যে আকার গ্রহণ করে, ঠিক সে আকারে অন্য জাতি দেখিতে পাইবে না। কারণ, তাঁহাদের দেবতা সম্বন্ধীয় নানাবিধ উপাখ্যানের উপযোগী করিয়াই তাঁহারা তারকাপুঞ্জের আকার কল্পনা করিতেন। রুদ্রের ত্রিশূল অস্ত্র আছে। আকাশের কোন্ নক্ষত্রের আকার ত্রিশূলবৎ, তাহা তাঁহাদের চক্ষে পড়িয়াছিল। একবার যিনি ওরায়ণ নক্ষত্রকে তারতীয় চক্ষে দেখিবেন, অমনি তিনি ত্রিশূলের এত স্পষ্ট আকৃতি দেখিতে পাইবেন যে, তাহাতে কোন ভ্রম থাকিবে না। অধ্যাপক হুইট্‌নি সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা অনুসারে ওরায়ণের কটিবন্ধের তিনটী তারাকে রুদ্রের ত্রিকাণ্ড অর্থাৎ তিনজোড় বিশিষ্ট ইষু বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু সায়নাচার্য্য বাণে তিন অংশ আছে বলায়, উহাতে ছইটি জোড়া হইবে। কটিবন্ধের তিনটী তারা দ্বারা হয় দুই অংশ, নয় চারি অংশ উৎপন্ন হইয়াছে। চারি অংশের দুই অংশ দৃশ্য ও অপর দুইটী অদৃশ্য। ইহা দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে যে, কটিবন্ধের তারাত্রয় ত্রিকাণ্ড ইষু নহে। তিলক মহোদয় হুইট্‌নির মতাবলম্বী। এই মত গ্রহণ করায় তাঁহারা যে সকল ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা এক্ষণে দেখান যাইতেছে।

১ম। সিরিয়াস তারাকে মৃগব্যাধ বা রুদ্র রূপে গ্রহণ করা। ওরায়ণের কটিবন্ধের তারাত্রয়কে শররূপে গ্রহণ করিলে, তাহার নিক্ষেপের স্থান সিরিয়াস তারা না লইলে চলে না। অথচ সিদ্ধান্ত ও নানা পুরাণে আর্দ্রা নক্ষত্রের অধিপতি রুদ্র কল্পিত হইয়াছে (১৩)। এই সমস্যা হইতে

(১২) To quote the words of Professor Whitney "there is the whole story illustrated in the sky; the innocent and lovely Rohini (Aldebaran); the infamous Prajapati (Orion) in full career after her, but laid sprawling by the three jointed arrow (the belt of Orion), which shot from the hand of the near avenger (Serius) is even now to be seen sticking in his body."

The Orion by B. G. Tilak p. 102.

I subscribe to every word of what is here so forcibly expressed." Do. p. 102.

ত্রিকাণ্ড শর, পশুপতির পাশুপত বাণ, শিবের ত্রিশূল, সিদ্ধান্তের ইষুকা নক্ষত্র বাণ।...বস্তুতঃ কালপুরুষ, যজ্ঞপুরুষ, বা প্রজাপতির আকার এই উপাখ্যানে মৃগের সদৃশ কল্পিত হইয়াছে। মৃগব্যাধ বা লুব্ধক তারা হইতে রোহিণী নক্ষত্র পর্য্যন্ত একটী রেখা টানিলে সেই রেখা ইষুকা তারাত্রয় দিয়া গমন করে। ইহাই ভূতবান্ কর্ত্তৃক মৃগরূপী প্রজাপতির শরবেধ এবং ব্রহ্মা রোহিণীর দেবতা হইবার কারণ।—আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী; পৃ ২৭৭।৭৮।

(১৩) শিবপুরাণে আছে "ষষ্ঠ নক্ষত্রে (আর্দ্রার) সেই শর এখনও আকাশে রহিয়াছে এবং মৃগের শিরঃ পঞ্চম নক্ষত্রে আছে।"

আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী পৃঃ ২৮০।

বায়ুপুরাণে (শার্ব্বরবে) ভূতবান্ পিনাকী, ত্রিশূলী; যেহেতু তিনি পিনাক বা ত্রিশূল দ্বারা যজ্ঞ বা যজ্ঞরূপ দক্ষকে বিদ্ধ করেন।" ঐ পৃঃ ২৮০।

Rudra is the presiding deity of Ardra, and we may therefore suppose Rudra to be represented by the star in the right shoulder of Orion. But the Aitareya Brahmanas (iii, 33) identifies Rudra with Serius or what is now called the Mriga Vyadha.

Orion p. 102.

এই (iii, 33) অংশই তিলক বলেন পশুপতি ত্রিকাণ্ড ইষু দ্বারা প্রজাপতিকে বিদ্ধ করেন বর্ণিত হইয়াছে। Orion হইতে উদ্ধার করিতেছি:—The Aitareya Brahmana (iii, 33) gives the same story and there too Pashuman or Bhutavan is said to have pierced Prajapati with an arrow. p. 102.

আমরা যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ধার করিয়াছি, তাহাতে

উদ্ধারের জন্য তিলক মহোদয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, বৈদিক কালে সিরিয়াসকে মৃগব্যাধ বলা হইত। তাঁহার মতের প্রধান ও একমাত্র প্রমাণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মৃগব্যাধ শব্দ। যে স্থলে মৃগব্যাধ শব্দ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে উদ্ধার করিয়াছি। ঐ অংশের পূর্ব্বেই ভূতবানের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। ভূতবান্ যে রুদ্র তাহাও পরে বিশেষ করিয়া এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে। প্রজাপতি বাণবিদ্ধ হইলে পরে মৃগব্যাধ শব্দ দ্বারা ঋষি রুদ্রকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মৃগরূপী প্রজাপতিকে যিনি বিদ্ধ করিলেন, তাঁহাকে মৃগব্যাধ নাম দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি। কিন্তু ইহা দ্বারা ঋষি যে সিরিয়াস নক্ষত্রকে বুঝাইতেছেন, তাহা তিলক মহোদয় কিরূপে স্থির করিলেন? ইহার উত্তরে পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে তিনি লিখিয়াছেন, আধুনিক কালে সিরিয়াস তারাকে মৃগব্যাধ বলে। এইরূপ আধুনিক প্রমাণের বলে তিনি বৈদিক কালের মত স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত ও পুরাণে বৈদিক মতের অনুসরণ করা হয় নাই, এই কথা তিনি প্রচার করিয়াছেন।

২য়। অমরকোষে মৃগশিরার শিরোদেশের তিনটী তারার নাম ইষকা বলা হইয়াছে। (১৩) সিদ্ধান্ত জ্যোতিষেরও এই মত। কিন্তু তিলক মহোদয় বলেন, মৃগশিরা নক্ষত্র যদি কেবল মৃগের শিরোদেশ হয়, তবে ইষকা ও মৃগশিরা একই হইয়া পড়ে। অতএব ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ না থাকায় ইষকা নাম অর্থহীন হইয়াছে। (১৪) আমরা কিন্তু ইহা অর্থহীন মনে করি না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মৃগ নক্ষত্রকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে মৃগশীর্ষ নক্ষত্রই যে প্রজাপতির মস্তকদেশ ইহা বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (১৫) মৃগশীর্ষ নক্ষত্র কতকগুলি তারকা দ্বারা গঠিত। উহাদের সমবায় নাম মৃগশিরা নক্ষত্র এবং প্রত্যেকের নাম ইষকা তারা। অমরকোষের এইরূপ অর্থ কি গ্রহণ করা যায় না? এইরূপ অর্থ যে হইতে পারে, তিলক মহোদয় তাহা ভাবিয়াও দেখেন নাই। তাঁহার মতে প্রাচীন কাল হইতে মৃগের শির এবং তাহাতে বিদ্ধ শর লইয়া মৃগশিরা নক্ষত্র গৃহীত হইয়া আসিতেছে। ওরায়নের কটিবন্ধের তিনটী তারাই সেই শর এবং উহার নিম্নভাগই মৃগের শির। কিন্তু প্রাচীন কাল হইতে সমগ্র মৃগ নক্ষত্র এবং ইহার শিরোদেশ বিভিন্ন রূপে গৃহীত হইয়াছে, দেখান গেল। তিলক মহোদয় নিজের কথা ভিন্ন অন্য প্রমাণ উদ্ধার করেন নাই।

বৈদিক কালে সিরিয়াস নক্ষত্রকে কি নাম দেওয়া হইয়াছিল, এক্ষণে আমরা উহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। পাশ্চাত্য আর্য্য জাতিগণ ইহাকে কুক্কুর নক্ষত্র নাম দিয়াছেন। ঋগ্বেদেও ইন্দ্রের সরমা নামে এক কুক্কুরীর সন্ধান আমরা প্রাপ্ত হই। এই কুক্কুরীর ঋ নামে এক পুত্র ছিল। এই দুইটী কুক্কুর ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও অঙ্গিরাদিগের সূর্য্য, উষা, অর্ক ও গাভী উদ্ধারে বিশেষ সাহায্য করে। সেইজন্য অঙ্গিরাদিগের যজ্ঞে উহারা ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই গল্পটী অতি প্রাচীন; কারণ অঙ্গিরাবংশ অতি প্রাচীন ঋষিবংশ। ইঁহাদের কর্ম্ম সকল প্রবাদ রূপে ঋগ্বেদের ঋষিদিগের নিকট আগমন করিয়াছিল। এই গল্পে আমরা দেখি, পণি নামক এক দেব-সম্প্রদায় সূর্য্য, উষা, অর্ক ও গাভী অপহরণ করিয়া একটী পর্ব্বতে আবদ্ধ করিয়া

(iii, 33) না হইয়া ১০ম অধ্যায়, ২য় খণ্ড, ৩০ অংশে। অতএব মৃগব্যাধ শব্দ এই অংশ হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অপর কোন অংশে নাই।

(১৩) ইষকা শুক্লিরোদেশে তারকাঃ মিথঃসঙ্ঘি যাঃ। অমর ১।৫।২০। শুক্লিরোদেশে তৃগশীর্ষ-শিরোদেশে (ভানু দিক্ষীত)।

(১৪) Sanskrit writers have described a small group of Stars in Mrigashiras called Invaka. Amarsingha tells us that they are on the top of Mrigashiras. Now if Mrigashiras itself be understood to denote the three small stars in the head of Orion, Invakas become identical with them and the distinction given in Amara must be put aside as meaningless. I am, therefore, of opinion that the asterism of Mrigashiras was once really believed to possess the form of an antelope's head with an arrow sticking to it. The mention of the arrow in these traditions at once enables us to determine the form, for the arrow can be readily and easily identified with the three stars in the belt of Orion. Orion,—pp. 99—100.

(১৫) For Mrigasirsha, indeed, is the head of Prajapati. 2—1—2—8.

মুলিয়াস এজেলিং কৃত ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থ।

রাখে। পণিদিগের শ্রেষ্ঠের নাম বল। বলের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং অঙ্গিরা ঋষিগণ উহাদের উদ্ধার করেন। যে সময়ে উহাদের উদ্ধার সাধন হয়, সেই সময় হইতে দিবসে সূর্য্য এবং রাত্রে নক্ষত্র ও চন্দ্র উদিত হইতেছেন, ঋষিগণ এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। প্রথমে ইন্দ্র জানিতে পারেন নাই কোন্ পর্ব্বতে পণিগণ উহাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছিল। সেইজন্য তাঁহার সরমা নামক কুক্কুরীকে সন্ধান লইতে প্রেরণ করেন। সরমা বৃহৎ জলরাশি পার হইয়া পণিদিগের পর্ব্বত প্রাপ্ত হয়। (১৭) পরে ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও অঙ্গিরাগণ আসিয়া উহাদের উদ্ধার সাধন করেন।

আকাশের ছায়াপথকে ঋষিগণ স্বর্গীয় সিন্ধু ও অর্ণবরূপে গ্রহণ করিতেন। সরমা ছায়াপথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল বলিয়া পণিগণ মনে করিতেন; অতএব সরমা কুক্কুরী ছায়াপথের নিকট অবস্থিত। ইহার পুত্রকেও আমরা ছায়াপথের পার্শ্বে দেখিতে আশা করি। কারণ, সরমা-পুত্রও যজ্ঞে ভাগ পাইয়াছে। (১৮)

এক্ষণে আমরা যষ্টপি সিরিয়াস তারকার নিকটবর্ত্তী আকাশে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিতে পাইব, ছায়াপথের দুই পার্শ্বে সিরিয়াস ও প্রশায়ন নামক দুই তারা অবস্থান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে সিরিয়াস তারা ছায়াপথের পরপারে অর্থাৎ দক্ষিণে এবং প্রশায়ন উত্তর পারে অবস্থিত। আমরা অনুমান করি, এই তারাদ্বয়ই ঋগ্বেদে বর্ণিত সরমা ও বা। সিরিয়াসকেই আমরা সরমা মনে করি।

ঋগ্বেদে যমেরও দুই কুক্কুরের উল্লেখ আছে। (১৯) তাহাদের বর্ণনায় বুঝা যায়, তাহারা সরমার বংশেই উৎপন্ন; কারণ, তাহাদিগকে সারমেয় বলা হইয়াছে। ইন্দ্রের কুক্কুরদ্বয় বোধ হয় পরে যমের দেবলোক রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল,—পাছে পণি, দাস, দস্যু, অব্রাহ্মিক প্রভৃতি দেবলোকে প্রবেশ করে। কিম্বা সরমার দুই পুত্র বিটা কেনিস মেজর ও প্রশায়ন (Procyon)—ইহারা পিতৃ (বা দেব) লোকের দ্বার রক্ষা করিতেছে। এই অর্থই আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি।

সিরিয়াস তারাকে কুক্কুর তারা বলে কেন? পাঠক যষ্টপি সিরিয়াস তারার সন্নিহিত তারকা পুঞ্জ মনোযোগ দিয়া অবলোকন করেন, তবে কল্পনা-চক্ষে দেখিতে পাইবেন যে, সিরিয়াস তারকাটী একটী বৃহৎকায় কুক্কুরের জিহ্বা রূপে লক্‌লক্ করিতেছে। ঐ তারকার উপরে চারিটী ক্ষুদ্র তারা উহার ললাটদেশ রচনা করিয়াছে। নিম্নে সম্মুখের একটী পদ একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র দ্বারা কল্পনা করা যায়। দূরে

---

(১৭) কিং। ইচ্ছন্তী। সরমা। প্র। ইদং
আনট্। দূরে। হি। অধ্বা। জগন্থিঃ।
পরাচৈঃ। কা। অস্যেহিতিঃ। কা। পরিতক্ম্যা
আসীৎ। কথং। রসায়াঃ। অতরং। পয়াংসি ।১০।১০৮।৩
ইন্দ্রস্য। দূতীঃ। ইষিতা। চরামি
মহঃ। ইন্দ্রস্য। পণয়ঃ। নিধীন্। বঃ।
অতিষদঃ। ভিয়সা। তৎ। নঃ। আবৎ
তথা। রসায়াঃ। অতরং। পয়াংসি ।১০।১০৮।৪

সরমা কি প্রার্থনা করিয়া এখানে আসিয়াছ? বিপরীত দিকে গমন করা যায় না যে পথ, তাহা (এখান হইতে) দূরে রহিয়াছে। আমাদের নিকট কি প্রয়োজনে আসিয়াছ? তোমার ভ্রমণের কারণ কি? কিরূপে নদীর জল উত্তীর্ণ হইয়াছ? ১ হে পণিগণ! (আমি) ইন্দ্রের দূতী; (তাঁহার দ্বারা) প্রেরিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছি। (পাছে) লক্ষ দিয়া পার হই এই ভয়ে আমাকে রক্ষা করিয়াছে। তখন নদীর জল উত্তীর্ণ হইয়াছি।৪

(১৮) ইন্দ্রস্য। অঙ্গিরসাং। চ। ইষ্টৌ
বিদৎ। সরমা। তনয়ায়। ধাসিং ।১।৮২।৩

ইন্দ্রের ও অঙ্গিরাদিগের যজ্ঞে সরমা নিজ পুত্রের (বা গৌরবের) নিমিত্ত অন্ন পাইয়াছিল।

স্থানং। বন্ধঃ। যোধয়িতারং। অব্রবীৎ।
সংবৎসরে। ইদং। অদ্য। বি। অখ্যৎ ।১।১৬১।১৩

অগ্নি যাকে উষোধয়িতা বলিলেন; অদ্য সংবৎসরে ইহাকে বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছে।

(১৯) অতি। দ্রব। সারমেয়ৌ। শ্বানৌ।
চতুরঃ অক্ষৌ। পথিরক্ষী। নৃচক্ষসৌ। তাভ্যাং
অধি। পিতৄন্। সুবিদত্রান্। উপ। ইহি
যমেন। যে। সধমাদং। মদন্তি ।১০।১৪।১০
যৌ। তে। শ্বানৌ। যম। রক্ষিতারৌ
চতুরঃ অক্ষৌ। পথিরক্ষী। নৃচক্ষসৌ। তাভ্যাং ।১১

(হে অগ্নে!) চারিচক্ষুবিশিষ্ট, কর্ব্বুরবর্ণ, যা নামক সরমা পুত্রদ্বয়কে অতিক্রম করিয়া সাধুপথে (গমন কর); অনন্তর সুজ্ঞানী পিতৃদিগের নিকট গমন কর, যাঁহারা যমের সহিত একত্র থাকিয়া আনন্দ করিতেছেন। হে যম! তোমার যে দুই চারিচক্ষুবিশিষ্ট, পথরক্ষক, দেবদ্যোতিযুক্ত, রক্ষক কুক্কুর (আছে)।

দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে উহার পশ্চাৎদিকের এক পদ ও লাঙ্গুল কল্পনা করা যাইতে পারে। লাঙ্গুলটী উর্দ্ধদিকে কতকগুলি তারার দ্বারা বক্রাকারে রচিত। সিরিয়াস নক্ষত্র প্রাচীন-কালে আর্য্যজাতির বিভিন্ন শাখায় কুক্কুর নক্ষত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের মিথুন রাশির অন্তর্গত আল্‌ফা মেজর কেনিস, বিটা মেজর কেনিস ও প্রশায়ন এই তিন তারাকে বৈদিক আর্য্যগণ সরমা ও তাহার পুত্র শ্বাপদ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সরমাকেই ইন্দ্রের নক্ষত্র এবং শ্বাপদকে যমের নক্ষত্ররূপে ঋষিগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, অনুমান করি।

আমাদিগের এই নির্দ্ধারণে ভ্রম না থাকিলে, বৈদিক যুগে ইন্দ্র-দূতী সরমাকে রুদ্র আখ্যা দেওয়া কখন সম্ভবপর নহে। অতএব অধ্যাপক হুইটনির ব্যাখ্যা ভ্রমসঙ্কুল এবং তিলক মহোদয়ের মত ভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। আর্দ্রা তারাই রুদ্রের তারা; এখান হইতে তাঁহার ত্রিশূল নিক্ষেপ কল্পনা করায় কোন দোষ দেখা যায় না। কারণ আর্দ্রা ও ত্রিশূল এক রেখায় বর্ত্তমান। অতএব সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ ও পুরাণ, বৈদিক মতের বিরোধী নহে। আর্দ্রাযুক্ত ওরায়ণের কটিবন্ধ হইতে নিম্ন ভাগ ত্রিশূল নক্ষত্র নামে এবং সিরিয়াস নক্ষত্র ইন্দ্রদূতী সরমা নামে বৈদিক যুগে যে প্রসিদ্ধ ছিল, তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

বিধিলিপি

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কাত্যায়নীকে দেখিয়া মহেন্দ্র কুণ্ঠিত ভাবে উঠিয়া বসিল। ঘরের দ্বার খোলা রহিয়াছে; তথাপি সে ঘরের মধ্যে বিশ্রাম না করিয়া, তুলসীতলায় যে ছায়া পড়িয়াছিল, সেইখানে অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া ছিল। কাত্যায়নী ব্যথিত মনে বলিল, "এই রৌদ্রের তাপে এখানে? ঘরে যাওনি কেন?" মহেন্দ্র একটু মলিন হাসে তাহার উত্তর দিয়া বলিল, "চল যাই।" মহেন্দ্র দাওয়ার উপরে উঠিয়া একটা পতিত কাঠাসনে বসিয়া পড়িল; আর কাত্যায়নী আস্তে-ব্যস্তে ঘরে গিয়া এক ঘটী জল, গামছা ও একখানা পাখা আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিল, "এই রোদে কেন এলে? হাত-মুখ ধোও।" মহেন্দ্র ক্লান্তিতে চোখ বুজিয়া ছিল—সেই অবস্থাতেই উত্তর দিল, "বৃষ্টির জন্য মাটী ঠাণ্ডা আছে, কষ্ট হয় নি। আমি যে তোমার কাছে একটা ভিক্ষার জন্য এসেছিলাম।" কাত্যায়নী বাধা দিল, "কথা পরে হবে, চোখে-মুখে জল দাও আগে।" মহেন্দ্র এইবার চোখ মেলিয়া চাহিয়া তেমনি হাসিয়া বলিল, "দরকার তো নেই। একটু সুস্থ হয়েই যাব, ব্যস্ত হয়ো না। তোমায় ব্যস্ত করতে বিধুর মাকে বারণও তো করেছিলাম; তবু দেখছি ডেকে এনেছে।" "তাতে তো এমন কিছু ক্ষতি হয় নি। তুমি হাত-পা ধোও দা, তার পরে কথা ক'য়ো।" "না আগেই কথার শেষ হোক। আচ্ছা, সত্য কি ক্ষতি হয় নি কিছু? সত্য ব'লো।" কাত্যায়নী ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কি অনাবিল, স্নিগ্ধ, উচ্চ ভাবের মধ্য হইতেই সে এই সঙ্কীর্ণতার বিরক্তি-কর ধূমের মধ্যে আসিয়া পড়িল,—এ কি ক্ষতি নয়? নিশ্চয়ই ক্ষতি। এমন করিয়া তাহাকে যে কেবলই অপমান করে, তাহার সঙ্গ সত্যই যে ক্রমে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিতেছে! মহেন্দ্র তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া, কাত্যায়নী ঈষৎ রুষ্ট মুখে উত্তর দিল, "হাঁ, ক্ষতি করেছ বৈ কি। কি তোমার ভিক্ষা তাই শুনি, বল।" "তাই বলছি; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এ অসঙ্গত আস্পর্দ্ধা ক'রে ভাল কাজ করিনি।" "যখন করেই ফেলেছ বলছ, তখন আর উপায় কি!" "না কাত্যায়নি, এখনো তার সংশোধন হয়। ফিরিয়ে নিয়ে যাই মেয়েটিকে। তার পরে তাকে আশ্রয় দিতে না পারি, যা তার ভাগ্যে আছে হবে।" কাত্যায়নী বিস্মিত ভাবে বলিল, "কাকে আশ্রয় দিতে না পেরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে? কাকে এনেছ? কই সে?" "আর ঘরেরই এক কোণে পড়ে আছে তাখ। বোধ হয় ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে।" কাত্যায়নী আস্তে-ব্যস্তে ঘরে গিয়া দেখিল,

গৃহের এক পার্শ্বে সভাই তো একটি ক্ষুদ্রকায় মনুষ্য নিঃশব্দে পড়িয়া আছে। নিকটে গিয়া দেখিল, বৃন্তচ্যুত ফুলের মত একটি বালিকা, বোধ হয় ঘুমাইতেছে; মুখে তাহার বেদনার ছায়া! ইহাকেই কি আশ্রয় দিবার কথা মহেন্দ্র বলিতেছিল? এমন প্রাণীটিও কি এত বড় জগতে নিরাশ্রয়? কাত্যায়নী বাহিরে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে—পাছে মেয়েটির ঘুম না ভাঙে, এমনি ভাবে—বলিল, "কে এ মেয়েটী? কোথায় পেলে?" "শোণপুরেই। আমাদেরই স্বজাতির মেয়ে। আমার বোন্ এটি।" "তবে যে নিরাশ্রয় বলছিলে?" "আমার বোন হ'লে সে কি জগতে নিরাশ্রয় নয়?" "থাক্; —এখানে কেন এনেছ। আমার কাছে রাখ্‌বে বলে?" "তাই মনে করে এনেছিলাম; কিন্তু—" "কিন্তু কি মহেন্দ্র? আমি একা থাকি, তাই আমার জন্য যদি একটি অবলম্বন এনেই থাক, আবার কি কেড়ে নিয়ে যাবে? এটুকুও দিতে পারবে না?" "তুমি একাও নও, নিরবলম্বনও নও। তোমার জন্য ওকে তো আনিনি কাত্যায়নি, এনেছি আমারই অন্য স্থান নেই বলে। আজ মা থাকলে—" "মা না থাকলেও তাঁর বাড়ী আছে,—তাঁর মেয়ে আছে। সে জায়গায় কি তোমার এ সামান্য সম্পর্ক কিম্বা এতটুকু অধিকারও থাকতে পারে না আর মহেন্দ্র?" "থাকতে পারত, যদি,—আচ্ছা তোমারই কাছে আমি একে রাখতে পারি, কিন্তু একটা কথা আমায় দিতে হবে তোমায়।" "কি কথা?" "অন্য কারু সাহায্য না নিয়ে, কেবলমাত্র নিজের ওপর নির্ভর করে, আমার এই দায়িত্ব কি তুমি রাখতে পারবে? মনে রেখো, এর জন্য কোন বিষয়ে তুমি জমিদার-বাড়ীর সাহায্য নিতে পাবে না! রাজী আছ?" কাত্যায়নী বিরক্ত ভাবে বলিল, "কি পাগলের মত কথা কও? একটি মেয়েকে কাছে রাখতে জমিদারদের সাহায্য কি জন্য নিতে যাব? আমার কি কিছুর অভাব আছে? তবে তারা নিজেদের কর্ত্তব্য ভেবে একটা লোক রাখেন, কি খোঁজ-তল্লাস নেন্, তাতে বাধাই বা কেন দেব?" "না, তোমাকে এ বিষয়ে বাধা দেবার কথাও নয় আমার; কিন্তু কমলাকে যদি কাছে রাখতে চাও, আমার নিজস্ব এই ব্যাপারের ওপরেও যেন তাঁদের কোন অনুগ্রহের হস্ত না পড়ে। তুমি নিজে যদি একে নিয়ে কোন বিব্রতে পড়, আমায় ডেকে আমার জিনিষ আমায় ফিরিয়ে দেবে—এই আমার সর্ত্ত! রাজী আছ? নয় ত বল—ফিরিয়ে নিয়ে যাই।" "ফিরিয়ে কোথায় নিয়ে যাবে?" "পথে-পথে—যেখানে আমার বাস।" কাত্যায়নী একটু ভাবিয়া, সহসা ঈষৎ হাস্যোজ্জ্বল মুখে মহেন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিল, "সে কিন্তু মন্দ হয় না মহেন্দ্র! মেয়েটি আমাদের স্বজাতীয়ই তো বললে! বংশ-কুলও নিশ্চয়ই ভাল,—এত সুন্দরও সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাবার আগে যেটুকু করা দরকার, তার ভার আমায় আগে দাও না?" মহেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কাত্যায়নীর কোমল কণ্ঠস্বরের উত্তরে কঠিন মুখে বলিল, "বেলা যাচ্ছে, আর দেরী করতে পারি না। ওকে তুলে দাও।" "তুলে দিয়ে বলব যে, আমার এতগুলো খালি ঘর থাকতেও তোমাকে একটু জায়গা দিতে পারব না—তুমি চলে যাও, কেমন?" "আমিই ডেকে নিচ্ছি।" "কি পাগলামি কর! ডেকো না বলছি, ফের। আমিই এর পরে ডেকে তুলব,—তার আগে তোমার সঙ্গে আমার কগড়াটাই শেষ হয়ে থাক।" মহেন্দ্র চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, বালকের মত দুই হাতে মুখ ঢাকিল। কাত্যায়নীও নিজের কথায় নিজেই অপ্রস্তুত হইয়া একটু হাসিল; তার পর দৃঢ়স্বরে বলিল, "তোমায় ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে না। তুমি যা বললে, তাই হবে। ওর জন্য জমিদারদের কোন সাহায্যই আমার দরকার হবে না; দরকার হলেও নেব না, এ তোমায় বলে রাখছি। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে এইবার হাত-মুখ ধোবে ত?" মহেন্দ্র সেই ভাবে মুখ ঢাকিয়াই বলিল, "না, আগে জমিদারের দাসত্বে জবাব দিয়ে আসি, তার পরে! কিন্তু তার পরেও আমায় বাড়ীতে ডাকতে পারবে ত? তাদের সঙ্গে আমি আর কোন সম্বন্ধ রাখব না।" কাত্যায়নী বিস্মিত হইয়া বলিল, "তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ ছেড়ে দেবে?" "হ্যাঁ, আমার কথার উত্তর দাও এইবার।" "তোমার যা ইচ্ছা করতে পার, কেবল মেয়েটি আমার কাছে থাক্—" "কিন্তু শোন—" "না, মেয়েটি ক্ষিধে-তেষ্টাতেই নিশ্চয় অমন করে পড়ে আছে। তুমিও যাও—আমিও আমার কাজে যাই।" কাত্যায়নী গৃহের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল দেখিয়া, অগত্যা মহেন্দ্র ধীরে-ধীরে বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেল।

কাত্যায়নী ঘরের মধ্যে গিয়া দেখিল, মেয়েটি জাগিয়া চাহিয়া আছে। কাত্যায়নীকে দেখিয়া, উঠিয়া বসিয়া,

বিস্মিত, ম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কাত্যায়নী তাহার নিকটে বসিয়া বলিল, "তোমার নাম কমলা?" কমলা চোখ নামাইল মাত্র, উত্তর দিল না। "কমলা, তুমি হাত-মুখ ধোবে চল, তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে। কিছু খাবে—ওঠো।" কমলা কাত্যায়নীর অনুসরণে বাহিরে আসিয়া নিঃশব্দে তাহার নির্দিষ্ট কর্ম্মগুলি করিয়া গেল মাত্র; কোন কথা কহিল না। কেবল কাত্যায়নী যখন তাহাকে খাইতে দিল, তখন আহার্য্য সম্মুখে লইয়া মেয়েটি সহসা কাঁদিয়া ফেলিল। সে চোখের জলও সে এত ধীরতার সঙ্গে সম্বরণ করিতে লাগিল যে, কাত্যায়নী দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল। মেয়েটি যে তাহার কোন আত্মীয়কে স্মরণ করিয়াই কাঁদিল, তাহা বুঝিতে কাত্যায়নীর বাকী থাকিল না; কিন্তু না সে-ই কোন উচ্চবাচ্য করিল, না কাত্যায়নীই তাহাকে কোন সান্ত্বনা দিতে পারিল। কাত্যায়নীর কেবল মনে হইতেছিল, ইহাকে রমার হাতে দিতে পারিলে, হয় ত মেয়েটি তাহার নিকটে থাকার চেয়ে অনেক বেশী ভাল থাকিত। কিন্তু তাহা যে কোন মতেই হইবে না—মহেন্দ্র তাহা হইলে এখনি ইহাকে কাড়িয়া লইয়া যাইবে। মেয়েটি একবার বলিল, "দাদা কোথায়?" একেই তাহার ফুলের মত সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া কাত্যায়নী স্নেহাকৃষ্টা হইয়া পড়িতেছিল; কণ্ঠস্বরে অতোধিক প্রীতা হইয়া বলিল, "মহেন্দ্র বুঝি তোমার দাদা? ভয় কি,—তুমি আমার কাছে থাকবে।" মেয়েটি আর কথা কহিল না। কাত্যায়নী বুঝিল, আরও একটু কিছু বলার দরকার; কিন্তু হায়, বাক্যে স্নেহপ্রকাশে সে একেবারেই অনভ্যস্তা।

• • • •

ক্রমে এক প্রহর রাত্রি অতীত হওয়ায় পাড়াগ্রাম যেন গভীর রাত্রির মত নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। কমলাকে খাওয়াইয়া, তাহার সহিত আরও একটু কথাবার্ত্তা কহিয়া, কাত্যায়নী তাহাকে নিজের শয্যার পার্শ্বে শোয়াইয়াছে। রমার ঝি-মাও ঘরের একপাশে শুইয়া ঘুমাইতেছে; কেবল বিধুর মা কাত্যায়নীর অদূরে বসিয়া চুলিতেছে,—আজ আর সে বাড়ী যায় নাই। মহেন্দ্র সেই যে গিয়াছে, এখনো আসে নাই। যদিই সে আসে—তাই কাত্যায়নী তাহার আহার্য্য লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল।

দ্বারে আঘাতের শব্দে সচেতন হইয়া, বিধুর মা দ্বার খুলিয়া দিয়া, এইবার নিশ্চিন্ত মনে দাওয়ার একপার্শ্বে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। কাত্যায়নী মহেন্দ্রকে প্রশ্ন করিল, "খাবে তো?" "হাঁ।" "তবে এসে ব'স, সব ঠিকই আছে।" ভোজনে বসিয়া মহেন্দ্র বলিল, "কমলা কি করছে?" "ঘুমুচ্ছে।" "তোমার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কয়েছে?" "না কওয়ারই মধ্যে—ভয়ানক মন-মরা আর দুঃখিত বলে মনে হ'ল। মেয়েটির কি কেউই নেই?" "মা আছেন; কিন্তু সে কথা ওকে কিছু বলো না,—কষ্ট বোধ করবে হয় ত। ওর পরিচয়ও ওর কাছে চেও না।" "সেটুকু বুদ্ধি আমার আছে। আমারও বেশী কিছু না জান্‌লেও চল্‌বে; কেবল যেটুকু বলার দরকার তাই মাত্র বল।" "তাই বল্‌ছি। ওর শত্রু অনেক—তাই তোমার কাছে ওকে লুকিয়ে রাখ্‌লাম। একটি সুপাত্র খুঁজে বিয়ে দিতে যতদিন না পারি, ততদিনই তোমার কাছে থাকবে।" "তুমি এখন শোদপুরেই কি যাবে আবার?" "না।" কাত্যায়নী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "সত্যই জমিদারের সঙ্গে সম্বন্ধ ছেড়ে দিচ্ছ?" মহেন্দ্র আহার্য্য হস্তেই মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "যদি দিই—কি বল্‌তে চাও তার জন্য?" "কাজ ভাল করবে না।" "বটে? আর শোদপুরে যা ঘটে গেল, সেটা খুব ভালই হয়েছে, না? সেটাতে তাঁর কিছুই ক্ষতিও হয় নি কি—তাই তোমাদের এত সাহস? আমাকে কি একটা মানুষ বলেও তোমাদের বিশ্বাস নেই?"

কাত্যায়নী বিস্মিত এবং ঈষৎ শঙ্কিত হইয়া বলিল, "শোদপুরে কি ঘটেছে? কৈ, আমরা কিছু শুনিনি তো! জমিদার একবার ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর মেয়ের মুখে এই মাত্র শুনেছি; কিন্তু তাতে যে তাঁদের কিছু ক্ষতি হয়েছে, এমন তো বোধ হয়নি!" মহেন্দ্র একটু গুম্ হইয়া থাকিয়া বলিল, "আমি তা'হলে তাঁর কাছে পিপড়েরও অধম, তাই—আবার সেই আমাকে ডেকেই এতবড় পদ দেওয়া হ'ল! ভাল।" মহেন্দ্র মুখ গুঁজিয়া আহার করিতে লাগিল। কাত্যায়নী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল "কোন্ পদ পেলে তুমি।" "তাঁর সব চেয়ে বড় তালুকের সর্ব্বেসর্ব্বা। পিপড়ের দাঁতেও যে বিষ থাকে, তা তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন্ না দেখ্‌ছি।" "তুমি যে তাঁর কায ছেড়ে দেবে বল্‌ছিলে, কেন তাই ছেড়ে দিলে না?" "ছাড়বার উপায় কই কাত্যায়নি?—ভাগ্য-

সূত্রের সম্বন্ধ যে বড় কাছাকাছি। থাক্ এ কথা—মেয়েটিকে সর্ব্বদা কাছে-কাছে রেখো, কোথাও নিয়ে যেয়ো না।" "আমি কি কোথাও যাই?" "যাও না কি? রমাও আসে না কি?" "আজ ছাড়া অন্য কোন দিন তো যাইনি। তবে রমা আসে বটে এক-এক দিন।" "যাই হোক্, যে জন্য বল্‌ছি শোন। মেয়েটির ভাগ্যের বিড়ম্বনার কথা যখন শুন্‌বে, তখন বুঝ্‌বে, কেন এ কথা বলছি। একটি কথা মনে রেখ, নগরের জমিদার এর প্রবল শত্রু।" "শত্রু? কি কর্‌বে তারা এই কচি মেয়েটির?" "সব রকমেই সর্ব্বনাশ করতে পারে। ওদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই এ ব্যবস্থা,—নৈলে কমলা ভদ্র গৃহস্থঘরেরই মেয়ে।"

ভোজনান্তে মহেন্দ্র উঠিয়া আচমন করিল। কাত্যায়নী বলিল, "বাইরের ঘরেই বিছানা আছে—বিধুর মাকে ডেকে দিই—" "না, আমায় জমিদার-বাড়ীই যেতে হবে—দরকার আছে।" "তুমি কি তোমার এ নতুন পদ নিয়েছ?" "আমার কাজে তোমার এত খোঁজ কেন কাত্যায়নি।" "যদি নিয়ে থাক, তাও ছেড়ে দাওগে। তুমি যা বল্‌ছিলে সেই ভাল,—ওর কাজ আর তুমি ক'র না।" মহেন্দ্র অপলক দৃষ্টিতে কাত্যায়নীর পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিল, "সেই জন্য? পাছে সেই পিপড়ের কামড়েও ওর কিছু ক্ষতি হয়, সেই ভয়েই একথা বল্‌ছ এখন? নৈলে একটু আগে ওর দায়ত্ব ছাড়লে আমার ভাল কাজ হবে না, এই কথাই যে বল্‌তে শুনেছি। আমার ভালর জন্য তোমার কিছু যায়-আসে না যখন, তখন তোমার উপদেশে আমারও তো কোন কাজ দেবে না।" মহেন্দ্রকে গমনোন্মুখ দেখিয়া কাত্যায়নী ব্যস্ত ভাবে ডাকিল, "শোন মহেন্দ্র, শোন আমার কথা—" "না—না, বরং সেই কাজই আমি নিশ্চয় নেব এইবার, জেনো।" "শোন,—তোমার দায়িত্ব—" "যেদিন তোমার ওকে ভারস্বরূপ বলে মনে হবে, আমাকে খবর দিও,—আমি অন্য ব্যবস্থা কর্‌ব।"

মহেন্দ্র অন্তর্হিত হইল। একটা অব্যক্ত শব্দ করিয়া কাত্যায়নী সেইখানেই বসিয়া পড়িল। বিধুর মাকে ডাকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিবার কথাও তাহার আর মনে পড়িল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

একটি প্রাণীকে অবলম্বনস্বরূপ পাইলে তাহার নিঃসঙ্গ জীবনের দিনগুলা একটু ভাল ভাবেই যে কাটিবে, কমলাকে পাইবামাত্র কাত্যায়নীর অন্তর তাহার নিজেরও অজ্ঞাতে এই আশায় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাই মহেন্দ্রের অত্যদ্ভুত রকমের প্রতিজ্ঞা, মেয়েটির অপরিচয়, এবং সর্ব্বোপরি তাহাকে লইয়া একটা বিপদেরও আভাষ—ইহার কিছুতেই কাত্যায়নীকে দমাইতে পারে নাই। মহেন্দ্র তাহার কাছে রাখিবার জন্য মেয়েটিকে লইয়া আসিয়াছে, ইহা জানিতে পারিবামাত্র, আর সব বিঘ্ন-বাধার কথা কাত্যায়নী একবারও ভাবিয়া দেখিতে অবসর পায় নাই। এমন কি, কথাবার্ত্তার মধ্যে মহেন্দ্র যে কতকগুলা অশান্তিকর কীট তাহার মস্তকের মধ্যে চালাইয়া দিয়াছে, তাহাদের দংশনে ক্রমে কাত্যায়নী একটু অস্থির হইয়া পড়িলেও, মেয়েটিকে কাছে রাখার বিষয়ে সে একবারও দ্বিধা বোধ করে নাই। মহেন্দ্র তাহার কথার অর্থ না বুঝিতে পারিয়া বলিয়াও গিয়াছে যে, ইহাকে ভার বোধ করিলে কাত্যায়নী যেন মহেন্দ্রকে জানায়,—মহেন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাহাকে এ ভারমুক্ত করিবে। অতএব, কমলার জন্য তাহার ভাবিবার কিছুই নাই। তা' ছাড়া, কাত্যায়নী সে বিষয়ে তেমন কিছু তো ভাবিতেছে না। সে কেবল ভাবিতেছিল, তাহার দিনগুলা তো ভাল করিয়া কাটেনই না, উপরন্তু যেন আরও মন্দ হইয়া উঠিতেছে। দিন কাটাইবার বিষয়ে সে এত দিন একবারও ভাবে নাই; কিন্তু এইবার ক্রমে যেন সে চিন্তা আসিতেছে। এই তাহার নিঃশঙ্কচিত্তে চলমান উনবিংশ বৎসরের গত দুই বৎসর তাহাকে জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদনা দিয়া, একেবারে অনাথা করিয়া বিশ্বের পথে ত্যাগ করিলেও, আপনার অন্তরের তেজস্বিতায় সে তো ইহাতে দীনতায় নত হয় নাই! মুখে সে বলিয়াছে এবং আপনিও ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে বটে যে, রমাদের সহায়তাতেই সে নিশ্চিন্ত থাকে; কিন্তু তাহা প্রকৃত কথা নয়। তাহার অন্তর সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল। নিজের জন্য আবার ভাবিবার কি থাকিতে পারে? মানুষের জীবন ও দিনরাত্রি নদী-স্রোতের মতই অবিশ্রাম বহিয়া চলিয়াছে। সে যেমন কিছুরই মুখাপেক্ষী নয়, তেমনি মানুষকেও কিছুর মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। কিছুদিন হইতে তাহার এ বিশ্বাস ভাঙিতেছিল। গতিপথ মুক্ত না থাকিলে নদীস্রোতের যে অবস্থা, মানুষেরও জীবন-ধারার এমনি ব্যতিক্রম ঘটিতে

পারে। বহমান কাল-স্রোত তাহার দিনরাত্রিকে বহিয়া লইয়া চলিলেও, তাহা যেন না চলারই সামিল। রমার কথাই বোধ হয় সত্য,—রক্তমাংসের হাতে আঁকড়াইয়া ধরিবার মত কিছু একটু মানুষের চাই। কাত্যায়নী যাহাদের মনুষ্যত্বের চরম ও পরম বিকাশ বলিয়া জানিত, এ যেন তাহাদের ছাড়াও নূতন কোন বস্তু।

কমলাকে সে যথাসাধ্য স্নেহ ও যত্নে রাখিয়াছে, তথাপি তাহার মনে হয়, রমার কাছে থাকিলে সে হয় ত ইহার চেয়ে অনেকটা ভাল থাকিত। নিজের মধ্যে কিসের একটা অভাব সে এখন সর্ব্বদাই বুঝিতে পারে। কমলা যখন নিঃশব্দে মুখ লুকাইয়া কাঁদে, তখন আত্মীয়ের বিরহে কাতর সেই শিশুপ্রকৃতিটিকে সে একটুও সান্ত্বনা দিতে জানে না,—নিঃশব্দেই সরিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু মনে হয়, রমা হইলে নিশ্চয় অন্য কিছু করিত। জমিদারবাড়ী না গেলেও সে রমার সঙ্গে এতদিন মাঝে-মাঝে ঠাকুরবাড়ী যাইত; এখন কমলাকে একা রাখিয়া যাইতে হয় দেখিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে দিনান্তে এই যে তাহার ক্ষণেকের চোখে চোখে দেখা, এটিও যে তাহার কতখানি ছিল, তাহা এতদিন সে না বুঝিলেও এখন বুঝিতেছে। রমা যথানিয়মে তাহার নিকটে আসে; কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বের মত যেন কাত্যায়নীর চিত্ত আর ভরে না। নিজের অন্তরের সঙ্গে তেমন কোন সংযোগ অনুভব না করিলেও, সেই প্রস্তর-গঠিত দেবতা ও সেই মন্দিরের মধ্যে রমাকে সে যেমন ভাবে এত দিন পাইয়া আসিতেছে, মাত্র নিজের কক্ষে নিজের অঙ্গনের মধ্যে রমাকে যেন তেমন করিয়া আর সে পায় না। জগতের ক্রমশঃ এই পরিবর্ত্তন কাত্যায়নীর পক্ষে বিস্ময়জনক হইলেও, ইহার কারণ অনুসন্ধানেও তাহার মনের বিরাম ছিল না। এ পরিবর্ত্তন কি জগতেরই—কিম্বা তাহার নিজের? যাহারই হউক, সে তো আর এমন করিয়া দিন কাটাইতে পারে না।—এ দুর্ব্বলতা তাহার ভিতর কোথা হইতে আসিল, লজ্জার সহিত প্রতিদিন একথা অনেকবার করিয়া ভাবিয়াও, ইহার হাত হইতে সে নিস্তারও তো পাইতেছে না। রমা মাঝে-মাঝে আসে; কাত্যায়নী দেবালয়ে যাইতে চাহে না দেখিয়া, আর সে অনুরোধও করে না। কমলার বিষয়ে বেশী কিছু সে জানিতে না পারিলেও, এই মেয়েটিই যে কাত্যায়নীর এ বন্ধনের কারণ, তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছে। রমা আর ডাকে না বটে, কিন্তু কাত্যায়নীর অন্তরই যে একটা ডাকের জন্য অস্থির হইয়া উঠিতেছে। সে যেন চায়, কেহ তাহাকে জোর করিয়া কোথাও টানিয়া লইয়া যাক; জোর করিয়া কর্ত্তব্য, প্রতিজ্ঞা, সত্য প্রভৃতি বড়-বড় কথাগুলা তাহার জীবন হইতে একটু অস্পষ্ট করিয়া দিক্। রমার মত সরল সুন্দর মুখে অমনি স্নেহ-দয়া-মায়ার আলোয় তাহারও দিনগুলা হাসিয়া কাঁদিয়া চলিয়া যাক। কিম্বা যে দিনগুলায় তাহাকে দিনরাত সশস্ত্র থাকিতে হইয়াছে,—পিতৃবৎসলা কন্যাকে পিতার আন্তরিক অনিচ্ছা বুঝিবামাত্র মহেন্দ্রের বিষয়ে সতর্ক হইয়া উঠিয়া তাহার সম্বন্ধে আজন্ম সংসর্গজাত সহজ স্নেহস্রোতকেও মাতার বিরুদ্ধাচরণে যেরূপে রুদ্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে, সে দিনগুলাও যেন ইহার অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। যেদিনে পিতার অসঙ্গত ইচ্ছা একটা দুরূহ ব্রতের আকারে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেদিনও তো সে একবারও পশ্চাৎপদ হয় নাই, বা অন্তরের মধ্যেও কোন দৌর্ব্বল্য অনুভব করে নাই। বরং সেই সব দিনের সংঘাতে, বিক্ষোভে, যুদ্ধে তাহার অন্তর আরও তেজীয়ান্ হইয়া সবল হইয়া উঠিয়াছিল। আজও যে সে—শান্তি যদি দুর্লভ হয় তো সেই সব দিনের সংক্ষোভের মধ্যেই নিজের এই অবসাদগ্রস্ত প্রাণীকে বাঁচাইয়া তুলিতে চাহিতেছে। আবার কামাখ্যা বাবু তেমনি করিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলুন; তাহার জন্য একটু চিন্তিত হইয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কথা আনিয়া তাহার নিস্তেজ অন্তরকে আবার বলিষ্ঠ করিয়া দেন। সে এই বিশ্ব সংসারের ভবিষ্যত চিন্তাকে উপহাস করিয়া আবার নিজের বলে মাথা তুলিয়া দাঁড়াক্। যাহাকে সংসার সহজ বলিয়া ভাবে না, তাহা যে কত সহজ, হাসিতে-হাসিতে অবহেলায় কাত্যায়নী তাহা অনুভব করুক।

কিন্তু কিছুই যে আর নূতন করিয়া তাহাকে জাগাইতে আসে না! যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে—বলিয়া জগৎ যেন তাহার কারবার তুলিয়া দিয়া, দোকানপাট বন্ধ করিয়া, হাত গুটাইয়া বসিয়া আছে,—আর যেন তাহার কোথাও কোন 'লেনা দেনা' হিসাবনিকাশের কিছুই বাকী নাই। সে অশেষের সবই যেন শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সত্যই

কি তাই? জগতের ক্ষুদ্র সংস্করণ এই মানবের অন্তর,—এ যে মানবকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে জানাইতে থাকে—হয় নাই, শেষ হয় নাই, আছে, আরও আছে! অদূরদর্শী মানব এক দিনে তাহার এ বাণী শুনিতে পায় না; কিন্তু পরে,—ক্রমে-ক্রমে, কালে-কালে শুনিতে পায়,—বুঝিতে পারে, এবং সর্ব্বশেষে এই অশেষকে অনুভব করে।

মহেন্দ্র এবার যাইবার সময় তাহাকে অনেকখানি বিরক্ত এবং শঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। মহেন্দ্র যেন ক্রমে হীন বিদ্বেষেরই বশীভূত হইয়া উঠিতেছে,—এই সন্দেহে কাত্যায়নী তাহার বিষয়ে অনির্দ্দিষ্ট অনেক রকমই আশঙ্কা করিয়াছিল; এবং সেই কারণে তাহার মনও আবার মহেন্দ্রের উপরের রুষ্ট ভাবকে উদ্যত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু মাসেক কাটিয়া গেল, তথাপি মহেন্দ্রের আর কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া, সেই উদ্যতাস্ত্র মনটাও ক্রমে-ক্রমে যেন কোন্ অতলে নামিয়া যাইতেছে। ইহার চেয়ে মহেন্দ্র যদি আসিয়া, আবার তাহার সঙ্গে সেই রকম কথা কহিয়া তাহাকে বিরক্ত করিত, সেও যেন ভাল ছিল। তাহার উপরে রাগ ভাবটা জাগিয়া থাকিলেই যেন কাত্যায়নী ইহা অপেক্ষা সবল থাকে।

কামাখ্যা বাবুরই কি তাহার বিষয়ে এমন নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা উচিত? সে না হয় বলিয়াছে যে, রমার দ্বারা খোঁজ লইলেই যথেষ্ট; কাত্যায়নীর আর কোন তত্ত্বাবধানের তাঁহার দরকার নাই। কিন্তু তাঁহারও তো একটা নিজস্ব কর্ত্তব্য আছে? মাসান্তেও কি তাঁহার;—না, কাত্যায়নীর বিষয়ে তাঁর এতখানি নিশ্চিন্ত হওয়া কখনই উচিত নয়। একবারও কি তাঁর মনে পড়ে না,—কি তাঁহার মনে পড়া উচিত তাহা কাত্যায়নী ভাবিয়া অবশ্য ঠিক করিতে পারে না; কিন্তু তিনি যে অন্যায় করিতেছেন, এই কথাই তাহার যে মাঝে-মাঝে মনে হয়!

রমা সেদিন আর তাহার কাছে আসে নাই। দেবালয়ে আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিলে, কাত্যায়নী ঘর হইতে বাহির হইয়া অঙ্গনে উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইল; যেন কেহ তাহাকে ডাকিবে, কেহ তাহাকে এখান হইতে টানিয়া ঐ উন্মুক্ত নদীর তীরে গিয়া দাঁড় করাইয়া দিবে। রমা যে বলে তাহার দেবতা সত্যের, কিন্তু সেই পাষাণের মধ্যে এতখানি প্রাণ কি আছে যে, আজ তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যায়? যদি পারে তো সে লউক্—লউক্—কাত্যায়নী যেন সেই জন্যই প্রতীক্ষার ভাবে অঙ্গনে নামিয়া দাঁড়াইল।

পিছন হইতে বালকণ্ঠে কে বলিল "যাবেন না?" কাত্যায়নী ফিরিয়া দেখিল, তাহার সঙ্গে-সঙ্গে কমলাও বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। "কোথায় যাব কমলা?" "ঠাকুর দেখ্‌তে।" "না, এস আমরা এই তুলসীতলায় বসি।" "কেন, ঠাকুর দেখতেই চলুন্ না।" কমলা এমন করিয়া তাহার সহিত কোন বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কথা কহে নাই। কাত্যায়নী ইহাতে আনন্দিত হইল; কিন্তু বলিল, "ঠাকুর তো আমায় ডাকে না কমলা, আমি গেলে রাগ করে, তাই আমি যাই না।" কাত্যায়নী এমন ছেলেমানুষের মত কথা বোধ হয় কখনো কহে নাই; কিন্তু কমলার সহিত আজ এই রকম কথাই কহিতে যেন তার ইচ্ছা হইতেছিল। কমলা প্রথমে একটু অবাক্ হইল; শেষে বলিল, "না—না, ঠাকুর তো কারও ওপর রাগ করেন না,—তিনি কক্‌খোনই রাগ কর্‌বেন না; আপনি চলুন।" কাত্যায়নী উত্তর দিতে যাইতেছিল; কিন্তু সম্মুখে একটা আলোক দেখিয়া সবিস্ময়ে সেই দিকে চাহিল। রমার দাসী আলোক হস্তে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দিদি আপনাকে ডাক্‌ছেন; বড্ড দরকার,—আপনি একবার ঠাকুরবাড়ীতে চলুন।" নিশ্চয়ই রমার হঠাৎ কোন বিশেষ প্রয়োজনই পড়িয়াছে; নহিলে সে এমন করিয়া তো কখনো ডাকিয়া পাঠায় না। ইদানীং তো কমলার জন্য মাসাবধি আর ডাকেই নাই। কাত্যায়নী উঠিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু কমলাকে না লইয়া সে কি করিয়া যাইবে? এখনো যে ঠাকুরবাড়ীর এই আহ্বান শুনিয়া সে উৎসুক ভাবে চাহিয়া আছে। না—তাহার যাওয়া তো হইবে না। কাত্যায়নীর এই ইতঃস্তত্তের মধ্যে দাসী আবার বলিল, "এঁকেও নিয়ে চলুন—কে একজন মেয়েমানুষ এঁকে দেখ্‌তে এসেছে।" কমলা আর কাত্যায়নীকে ভাবিবার বা কমলাকে বারণ করিবার তিলার্দ্ধও অবসর দিল না,—দাসীর আগে-আগে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। অগত্যা কাত্যায়নীও তাহাদের পশ্চাতে-পশ্চাতে ঠাকুর-বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

মন্দিরের পাশের ঘরে রমার নিকটে কে একজন অপরিচিতা রমণী বসিয়া ছিল। তাহাকে দেখিবামাত্র কমলা

ছুটিয়া গিয়া তাহার বুকের উপর পড়িল। উভয়ের মুখাকৃতির সাদৃশ্য দেখিয়া কাত্যায়নী ও রমা দুইজনেই বুঝিল, ইহারা মাতা-কন্যা। যেন বহু বিপদের পরে সম্পূর্ণ নিরাশার মধ্যে দীর্ঘ বিচ্ছেদান্তে মাতা কন্যাকে এবং কন্যা মাতাকে পাইয়াছে। রমণী আত্ম-সংবরণ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, কন্যাও মুখে কিছু বলিতেছে না—কেবল মাতাকে সাপটিয়া ধরিয়া তাঁহার বুকে মুখ গুঁজিয়া বিহ্বলের মত পড়িয়া রহিয়াছে। মাতাও মৃদুস্বরে কিছু যেন বলিবার চেষ্টার সঙ্গে কন্যার মস্তকে হাত বুলাইতেছেন—অথচ ভাল করিয়া বলিতেও পারিতেছেন না। হয় ত ইহাদের গোপনীয় কিছু কথা আছে;—রমা কাত্যায়নীকে ডাকিল, "ঘাটে যাবে?" "চল" বলিয়া কাত্যায়নী বাহিরে আসিল।

ঘাটের চাতালে একটি দীন-বেশা রমণী বসিয়া ছিল। রমাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে সে উঠিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। রমা বিস্মিত ভাবে একটু চাহিয়া তার পরে মিত হাস্যে বলিল, "তুমি বাছা এখানে কোথা থেকে? ভাল আছ তো?" রমণী বিনীত প্রফুল্লমুখে বলিল, "হাঁ মা, উনার সঙ্গেই আমি এসেছি। এ গাঁয়ের আর কাউকে তো আমি জানি না—আমার মা-জননীকে কেবল জানি; তাই আপনার কাছেই ওঁকে পুঁইছে দিলাম।" "তোমার ছেলে-পিলে ভাল আছে তো?" "হাঁ মা, আপনার আশীর্ব্বাদে। আর তারা আপনার দয়ার ঘরের তলায়ও বাস করছে। ঠাকুরণের সঙ্গে নৌক'র করে এলাম, নৈলে তাদেরও আপনার পায়ের তলায় গড় করাতে নিয়ে আস্‌তাম।" কাত্যায়নী বুঝিল, রমণীটি রমারই কোন ভিন্ন-গ্রামবাসী উপকৃতের মধ্যে একজন। জিজ্ঞাসা করিল, "এঁর বাড়ী কি তোমাদেরই গ্রামে?" "না মা, আমরা দুঃখী মানুষ, এগাঁ ওগাঁ বেড়াই, ওঁনাদের বাড়ীও যাই। উনি মাঝিদের সঙ্গে একা আসবেন তাই, আর আমি যে এ গাঁ চিনি তা আমার মুখে শুনেছেন বলেই, আমাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।" "ওঁর বাড়ী কোন্ গাঁয়ে?" রমণী চারিদিকে চাহিয়া চুপি-চুপি বলিল, "তা মা, বল্‌তে ওঁর বারণ; তবে আপনার বল্‌তে কি, উনি আমাদের জমীদারদেরই কোন কুটুম্বের মেয়ে বোধ হয়;—তা না হলে—" রমা বাধা দিল "থাক্ না বাছা,—যা জানাতে ওঁর ইচ্ছা নেই, তা কারুকে নাই জানালে।" দীনা রমণী অপ্রস্তুত হইয়া থামিল। ইতিমধ্যে রমার দাসী আসিয়া ডাকিল "উনি এখনি যাবেন, আপনাদের ডাক্‌ছেন।" রমা ও কাত্যায়নী কক্ষে প্রবেশ করিতে-করিতে এইটুকু শুনিতে পাইল, মাতা কন্যাকে সান্ত্বনার স্বরে বলিতেছেন, "শীগ্‌গিরই এসে তোমায় নিয়ে বাড়ী যাব। তোকে দেখ্‌বার জন্যেই পিসিকে দেখার ছল করে এসেছিলাম, ঠাকুর দেখব বলে এ গাঁয়ে নৌক লাগিয়েছি। তোমার দাদার কাজটা মিটলেই আমার কর্ত্তব্য সারা হয়। তার পরে যা থাকে ভাগ্যে—তবু এমন করে আর থাক্‌তে পার্‌ব না।"—রমা ও কাত্যায়নীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, কমলার মাতা কমলার মস্তক বক্ষ হইতে একটু সরাইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন "মা, যেদিন এ দুর্দ্দিনের শেষ হবে, সেইদিন আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা কর্‌ব,—আজ আর আমার এর বেশী সময় হল না। কমা'র সম্বন্ধে আমি আর তোমায় কি বল্‌ব—মহেনই যা বলার বলেছে। আজ তবে আসি মা!"—রমা ও কাত্যায়নী তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনিও তাহাদের শিরশ্চুম্বন করিলেন। এই সংযত-স্বভাবা মহীয়সী-কান্তি মহিলার সঙ্গে একটু কথা কহিতে তাহাদেরও ইচ্ছা হইতেছিল; কিন্তু তিনি আর দাঁড়াইলেন না। ঠাকুর প্রণাম করিয়া কমলার মাথাটাকে আর একবার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ত্বরিত গতিতে ঘাটের দিকে চলিয়া গেলেন।

কমলা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল; কাত্যায়নীও তেমনি নিঃশব্দে কেবল তাহার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রমা গিয়া কমলার স্কন্ধে হস্ত দিয়া বলিল, "মা তো আবার শীগ্‌গিরই আস্‌বেন, তার জন্য কান্না কিসের? এস কমলা, আমরা ঘাটে দাঁড়িয়ে ওঁর নৌকা-খানা দেখিগে, কেমন?" কমলা চোখ মুছিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রস্ফুট চন্দ্রালোকে তিনজনে ঘাটের চাতালে দাঁড়াইয়া দেখিল, একখানা ছোট বোট তাহাদের ঘাটের অদূর হইতে খুলিয়া চলিয়া যাইতেছে। ক্রমে যখন নৌকাখানা অস্পষ্ট হইয়া গেল, তখন কমলা রমার নিকটে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতেই, রমা সস্নেহে তাহার হাতখানি ধরিয়া নিকটে টানিয়া লইয়া বলিল, "এইবার চল, আমরা বাড়ী যাই। কাল আবার তুমি আরতি দেখ্‌তে এস, কেমন কমু?" কমলা কাত্যায়নীর পানে চাহিল, কাত্যায়নীও সে সময়ে আর তুচ্ছ বাধা-বন্ধের কথা ভাবিতে পারিতে-

ছিল না ; বলিল, "ইচ্ছা কর তো এস।" কমলা একটু আনন্দের সহিত রমাকে বলিল, "আপনি তা'হলে ডাকতে পাঠাবেন।" "আচ্ছা।"

সেইদিন হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় কমলা মন্দিরে যাইবার জন্য এমনি উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইত যে, কাত্যায়নী নিষ্ঠুর ভাবে তাহাকে আর নিবারণ করিয়া উঠিতে পারিত না। সে যে দেখিয়াছিল, সে যেমন তাহার পিতৃবিয়োগের পর সেই ঘাটে গিয়া পা ডুবাইয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত, কমলাও তেমনি করিয়া ঘাটের চাতালে দাঁড়াইয়া নদীর এক দিকে চাহে—যেন তাহার মার নৌকা তখনি আসিয়া ঘাটে লাগিবে। প্রত্যহ নিরাশ হইয়া ফিরিলেও, রমার সস্নেহ বাক্যে ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে কমলা আগের চেয়ে সুখে আছে বলিয়াই কাত্যায়নীর বোধ হইত ; তাই সে আর মহেন্দ্রের নিষেধকে মনে রাখিতে পারিত না ; এবং অনাবশ্যক সাবধানতার যে কিছু দরকার আছে, এমনও তাহার আর বোধ হইত না।

দিন কয়েক পরে—সেদিন আরতির পর কাত্যায়নী রমার সহিত কথা কহিতেছিল,—হঠাৎ এক সময়ে চাহিয়া দেখিল, কমলা মন্দিরে নাই। রমা বলিল "বোধ হয় ঘাটের ধারে গেছে,—আরতির পরই আর তাকে দেখিনি।" কাত্যায়নী এতক্ষণ রমারই ঠাকুর-সেবার অঙ্গীভূত একটা কার্য্যে একটু ব্যস্ত ছিল, জানিত কমলা রমারই নিকটে আছে। এখন রমার এই কথায় সহসা তাহার মন যেন অকারণে একটু ভয় পাইয়া উঠিল। ত্রস্তে ঘাটে গিয়া দেখিল, কমলা নাই। তাহার ব্যস্ত ভাব দেখিয়া রমাও সঙ্গে-সঙ্গে আসিয়াছিল ; বলিল, "বোধ হয় বাড়ী গিয়েছে।" একা ? হতেই পারে না, তবু একবার ঝিকে পাঠাও দেখি"—বলিয়া কাত্যায়নী সেইখানে বসিয়া পড়িল।

ঝি ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, কমলা বাড়ীতেও যায় নাই—কমলা কোথাও নাই।

বন্দী

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

ক্ষণে ক্ষণে পড়ছে মনে মায়ের মলিন মুখ,
গাঁয়ের শ্যামল বুক রে আমার, নায়ের সুখ দুখ।
পড়ছে মনে ক্ষণে-ক্ষণে নদীর কালো জল,
পাখীর কল্‌কল্ রে আমার পাখীর ফুল-ফল।
মধুর মধুপুর সে কোথা, সুখের সুরপুর,—
বহুৎ বহুৎ দূর সে আমার বহুৎ বহুৎ দূর !

(২)

জান্‌তে আমি পেলাম না যে আমার কি যে দোষ !
বিনা দোষে রোষের ভাগী বড় যে আপশোষ্ !
শৃঙ্খলেতে সিংহলেতে স'ই যে অবরোধ,
ক্রোধের প্রতিশোধ বলে কি নাই রে বোধাবোধ ?
মধুর মধুপুর সে কোথা, সুখের সুরপুর !
বহুৎ বহুৎ দূর সে আমার বহুৎ বহুৎ দূর !

(৩)

বৃথায় মা যে চণ্ডী পূজে, বৃথায় মাগে বর ;
ডুবলো আহা মাঝ দরিয়ায় 'চাঁদর' মধুকর।
কমল-কানন কোথায় গেল, কালীদহের কূল ;—
ভুল কি হল আমার আগি শ্মশান-ভূমির শূল ?
মধুর মধুপুর সে কোথা, সুখের সুরপুর !
বহুৎ বহুৎ দূর সে আমার বহুৎ বহুৎ দূর !

সখী

(বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি অবলম্বনে)

পূর্ব্বানুবৃত্তি

[শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম্-এ.]

সখিগণের শ্রেণীবিভাগ।

দর্পণকার নায়িকাদিগের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগ করিয়া সখীদিগের বেলায় —'এতা অপি যথৌচিত্যাদুত্তমাধমমধ্যমাঃ' বলিয়া পরিশ্রম বাঁচাইয়াছেন। ভগিনী, ননন্দা, ধাত্রী, ভ্রাতৃজায়া, সপত্নী প্রভৃতি আত্মীয়াগণের সখিত্বের কথা সংস্কৃতভাষার সাহিত্যে, তথা অলঙ্কার-শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। যাহা হউক, আত্মীয়াদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, নানা দেশের সাহিত্যে সখীজনের যে সকল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, অভিনিবেশপূর্ব্বক সেগুলির আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, তাহাদিগকে তিনটি শ্রেণীতে ফেলা যায়। জানি না, এই তিন শ্রেণীই দর্পণকারের 'উত্তমাধমমধ্যমাঃ' কি না।

(১) প্রথম শ্রেণীর সখী বৃত্তিভোগিনী সহচরী নহেন, নায়িকার ন্যায়ই স্বাধীনা, অনেক সময়ে সামাজিক পদবীতে নায়িকা অপেক্ষা ন্যূন নহেন (যদিও সামাজিক পদবীতে ন্যূন হইলেও সখিত্ব ঘটিবার কোন বাধা নাই)। সাধারণতঃ তিনি প্রতিবেশিনী। (সাহিত্যদর্পণে 'প্রতিবেশিনী' ও দশরূপকে 'প্রতিবেশিকা'র উল্লেখ আছে। (পূর্ব্বপ্রবন্ধে উদ্ধৃত শ্লোক দেখুন, ভারতবর্ষ আষাঢ় ১৩২৫, পৃঃ। ২৬) আমাদের বর্ত্তমান সমাজে সই, মিতিন, মক্কর, গঙ্গাজল প্রভৃতি ইহার সুপরিচিত দৃষ্টান্ত। শ্রীরাধার সখিগণ এই শ্রেণীভুক্ত। অধিকাংশ কাব্য আদিরসপ্রধান; সুতরাং প্রণয়ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্য সখীজনের অবতারণা; কিন্তু অন্যান্য রসের স্থলেও সখীজনের প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুকুন্দরামের 'চণ্ডী'তে দেখা যায়, ব্যাধ-রমণী ফুল্লরা দারিদ্র্যের পীড়নে 'সই বিমলার মাতা'র নিকট চাউল ধার করিতে গেল, দেখা হইলে দুই সই কোলাকুলি করিল,

আশ্বাসিয়া আইস আইস বলে তারে সই।
এতদিন দেখা নাই গিয়াছিলে কই॥
• • • •
শিরে তৈল দিয়া তার বান্ধিল কবরী।
সরস সিন্দুর ভালে দিল সহচরী॥
আঁচল ভরিয়া সই দিল খই মুড়ি।
বসিতে আসন দিল চৌখণ্ডিয়া পীড়ি॥
• • • •
আইস পরাণের সই বইস ভগিনী।
মোর মাথার গোটা দুই দেখহ উকুনি॥
দুহে বসি কথায় মজিয়া গেল চিত্ত।

ইহা পল্লীনারীর সখিত্বের বিশদ বাস্তব (realistic) চিত্র। আবার উক্ত কাব্যের দ্বিতীয় আখ্যানে, সমাগর-পত্নী লহনা সতীনকাঁটার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য সই-লীলাবতী ব্রাহ্মণী'র শরণ লইয়াছেন; সেখানেও 'দুই সইয়ে কোলাকুলি দোঁহে আলিঙ্গন'। লীলাবতী ব্রাহ্মণীর অনেক 'গুণজ্ঞান' ছিল, তিনি লহনাকে 'আশ্বাস' দিলেন ও তাহার বিপদ্ উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে হার্মিয়া-হেলেনা এই শ্রেণীর সুন্দর দৃষ্টান্ত। (পূর্ব্বপ্রবন্ধ দেখুন, ভারতবর্ষ আষাঢ় ১৩২৫, পৃঃ ২৮।) য়াজী হার্মিওনির শুভানুধ্যায়িনী সমবেদনাময়ী পলিনাও এই শ্রেণীভুক্ত। ভবভূতি তথা মাইকেলের সীতার সখী বাসন্তী ও সরমা, ৺দীনবন্ধু মিত্রের জামাইবারিকে কামিনীর শুভানুধ্যায়িনী 'মুড়কিমুখী মন্নয়াদিদি' যদিও সামাজিক পদবীতে ন্যূন), 'লীলাবতী'তে লীলাবতীর সখী সারদাসুন্দরী ও রাজলক্ষ্মী, ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা'র সরলার সখী অমলা, কমলা, বিমলা, 'সংসারে' বিন্দু ও কালীতারা, ইত্যাদি বহু

দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'কুলজানি'তে নায়িকা কুলকুমারীর আবাল্যসখী ক'নী এই শ্রেণীর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে কুন্দর বাল্যসখী চাঁপা, লুৎফউন্নিসার বাল্যসখী মিহরুন্নিসা, হীরার গঙ্গাজল মালতী গোয়ালিনী, উচ্চমঞ্চে শ্রীর শুভানুধ্যায়িনী জয়ন্তী—এই শ্রেণীভুক্ত। ধনিকন্যা মৃণালিনী বোধ হয় এইভাবেই মথুরার রাজকন্যার সখী ছিলেন। ('মৃণালিনী', ৪র্থ খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ।) সুন্দরী যদি চন্দ্রশেখরের জ্ঞাতিকন্যা না হইতেন অর্থাৎ নিঃসম্পর্কীয়া হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও এই শ্রেণীতে ফেলা যাইত।

কোন-কোন স্থলে এই শ্রেণীর সখী প্রতিবেশিনী নহেন, নায়িকার সহিত এক গৃহবাসিনী। কিন্তু সে কেবল বঙ্কিমচক্রে; প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা এক পরিবারের নহেন। কালিদাসের শকুন্তলার যুগলসখী, বিমলার সখী আসমানি, ও 'দেবীচৌধুরাণী'র নিশি ও দিবা এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত। 'ইন্দিরা'র অমলা-নির্ম্মলা বালিকাদ্বয়, ইন্দিরার সখী সুভাষিণী, তথা মৃণালিনীর সখী মণিমালিনী ও পরে রত্নময়ী, এই শ্রেণীর সুন্দর দৃষ্টান্ত। বসন্তকুমারী কিছুদিন নায়িকা রাধারাণীর সহিত এক গৃহবাসিনী, পরে ভিন্ন গ্রামবাসিনী।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর সখী প্রাচী-প্রতীচী উভয় এই অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল। এই শ্রেণীর সখীরা বৃত্তিভোগিনী ও নায়িকার অধীন, কিন্তু তাঁহারা ভদ্রবংশজা, সাধারণ দাসীশ্রেণীর অর্থাৎ 'দাসী নীচকুলোদ্ভবা' নহেন (১)। এবং রাজমহিষী বা রাজকন্যার সহিত অনেকটা সমানভাবে মিশেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের রাজ্ঞীদিগের maids of honour, ladies in waiting বাস্তব জগতে ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কাব্য-নাটকে ইহার অজস্র উদাহরণ মিলে। ক্লিওপেট্রার যুগলসখী চার্ম্মিয়ান-আইরাস,—এই শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত; তাহারা পরলোকেও রাজ্ঞীর পার্শ্বচারিণী হইবার জন্য তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে আত্মঘাতিনী হইয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রায় প্রত্যেক নাটকে প্রত্যেক কাব্যেই এই শ্রেণীর সখী আছে। মেঘনাদবধ কাব্যে প্রমীলার সখী মৃদুমালিনী, ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'কমলেকামিনী'তে রাজকন্যা রণকল্যাণীর সখী সুরবালা, বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহে' রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীর সখী নির্ম্মলকুমারী এই শ্রেণীভুক্ত। (বীরসিংহ রাজের কন্যার সখীগণেরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।) বিমলা যদি তিলোত্তমার বিমাতা না হইতেন, তাহা হইলে তিনিও এই শ্রেণীতে পড়িতেন। এই হিসাবেই বিমলা পূর্ব্বজীবনে নানসিংহ-মহিষী ঊর্ম্মিলাদেবীর সখী ছিলেন। লুৎফউন্নিসা প্রকাশ্যে এইভাবেই খসরুজননীর সখী ছিলেন। পোর্শিয়ার সখী নেরিসা। (২) জুলিয়ার সখী লুসেটা এই শ্রেণীর (পোর্শিয়া-জুলিয়া রাজকন্যা না হইলেও ধনিকন্যা অভিজাতবংশীয়া।) বৃত্তিভোগিনী হইলেও এই শ্রেণীর সখীর সখ্য অকৃত্রিম, তাহাদের মুখের ভালবাসা নহে। তাহাদিগের স্নেহ সহোদরা ভগিনীর ন্যায়। দুর্গেশ-নন্দিনীতে বিমলা যে ঊর্ম্মিলাদেবী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "তিনি আমাকে সহচারিণী দাসী বলিয়া জানিতেন না; আমাকে প্রাণাধিকা সহোদরা ভগিনীর ন্যায় জানিতেন,—" ইহা এই শ্রেণীর সকল সখী-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

(৩) তৃতীয় শ্রেণী আপাতদৃষ্টিতে সখীসম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে কি না সন্দেহ, তাহারা রীতিমত দাসী, চাকরাণী বা বাঁদী। কিন্তু তাহারা শুধু যে প্রয়োজন পড়িলে দূতীর কার্য্য করিতেছে এমন নহে, তাহারা অনেক সময় নায়িকার সুখদুঃখভাগিনী, সুখের সময় আনন্দোচ্ছ্বাসিতা ও কৌতুক-নটী, দুঃখে সমবেদনাময়ী, সান্ত্বনাদায়িনী, মন্ত্রণাদায়িনী, সাহায্যকারিণী। সুতরাং এই শ্রেণীকে সখীসম্প্রদায় হইতে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। সংস্কৃত সাহিত্যে কৈকেয়ীর দাসী মন্থরা, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে লহনার দুর্ব্বলা দাসী ও ভারতচন্দ্রের ভবানন্দ মজুমদারের দুইপক্ষ চন্দ্রমুখী-পদ্মমুখীর সাধী-মাধী দাসী এই শ্রেণীর। রবীন্দ্রনাথের 'মান-ভঞ্জন' গল্পে গোপীনাথ শীলের অবহেলিতা পত্নী গিরিবালার 'সুরসিকা দাসী সুধো অর্থাৎ সুধামুখী' এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য। 'মৃণালিনী'তে গিরিজায়া এই শ্রেণীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'কপালকুণ্ডলা'য় পেশমন্, 'চন্দ্রশেখরে' কুলসম্, 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'

(১) এই ব্যবস্থার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি 'বিষবৃক্ষে' আছে। 'নগেন্দ্র ও তাঁহার পিতা একটু ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকদিগকে দাসী নিযুক্ত করিতে চেষ্টা পাইতেন।' (১৫শ পরিচ্ছেদ।) হীরা সূর্য্যমুখী বা কুন্দনন্দিনীর এই শ্রেণীর সখী হইতে পারিত। কিন্তু গ্রন্থকার অন্যরূপ বিধান করিয়াছেন।

(২) Mrs. Jameson নেরিসাকে Confidential woman-in waiting or female companion বলিয়াছেন।

অমলা, 'ইন্দিরা'র হারাণী, 'রাধারাণী'তে চিরা, 'সীতারামে' পাঁচকড়ির মা ও মুরলা, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ক্ষীরি চাকরাণী, 'রাজসিংহে' যোধপুরীর দেবী চাকরাণী—ইহাদিগকে এই শ্রেণীতে ফেলা যায়।

এই তৃতীয় শ্রেণীর প্রসঙ্গে বহু ও পাঠকবর্গের ধারণা হইতেছে যে, দাসীমাত্রেই সখী, প্রবন্ধলেখক ইহাই বলিতে চাহেন। বস্তুতঃ কিন্তু যেখানেই নায়িকার পার্শ্বে দাসী বা বাঁদী দেখিয়াছি, সেখানেই তাহাকে ধরিয়া সখীর রেজিমেণ্ট-ভুক্ত করিয়াছি,—তাহা নহে। আয়েষার পরিচারিকা ও কংসদূর্গার অন্তঃপুরের দাসী, 'বিষবৃক্ষে' কৌশল্যা-নাম্নী পরিচারিকা, 'চন্দ্রশেখরে' চন্দ্রশেখরের বাটীর দাসী, শৈবলিনীর সমভিব্যাহারিণী পুরন্দরপুরের দাসী পার্ব্বতী, তকীখাঁর অন্তঃপুরে দলনীর নূতন বাঁদী করিমন, 'রজনীতে' তিনকড়ি বা রজনীর বা লবঙ্গলতার সঙ্গের পরিচারিকা, 'দেবীচৌধুরাণী'তে কুলমণি নাপিতানী ও গোবরার মা (!), 'সীতারামে' মুরলার পদচ্যুতির পর রমার দাসী যমুনা,—ইহাদিগকে ত তৃতীয়শ্রেণীতে ফেলি নাই। যে কয়জনকে আপাততঃ এই শ্রেণীতে ফেলিয়াছি, সখীসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইবার পক্ষে ইহাদিগের কি দাবী আছে, আগামী বারে ভাল করিয়া তাহার বিচার করিব। বিচারে যদি দেখি সে দাবী দুর্ব্বল, তাহা হইলে তাহাদিগকে এই কক্ষ হইতে খারিজ করিতেও আপত্তি করিব না।

ব্রাহ্মণ-পরিবার

[শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য]

(১)

কৌলীন্য-মর্য্যাদাভারে অতিশ্রান্ত দেশপূজ্য প্রাচীন বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম মহাশয় একদিন আমার পিতার চতুষ্পাঠী-গৃহের দ্বারে আসিয়া জানাইলেন যে, "বৎসরাবধি গৃহত্যাগ করিয়া বহু অন্বেষণের পরও আমার একমাত্র কন্যার যোগ্য পাত্র নির্ব্বাচন করিতে অক্ষম হইয়াছি। যোগ্য পাত্রের অভাবে কন্যাও অরক্ষণীয়া হইয়াছে। যোগ্য পাত্রে কন্যার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা আমার শক্তিতে আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। স্বার্থপর সমাজের সাহায্যহীন দারুণ শাসন-দৃষ্টির ভিতরে বাঁচিয়া থাকিতেও আর ইচ্ছা নাই। তাই স্থির করিয়াছি,—সঙ্কল্প করিয়াছি, যদি সূর্য্যাস্তের মধ্যে আমার শেষ চেষ্টা সফল না হয়, তবে এই অভিশপ্ত দেশ ত্যাগ করিব।" আশাহীন, আস্থাহীন, কর্ম্মক্লান্ত অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের প্রত্যেক বাক্যের উপর যেন একটা দৃঢ়তা, একটা সঙ্কল্প, একটা অভিমান ও একটা বিরাট অভিসম্পাত একসঙ্গে মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমার পিতার চতুষ্পাঠী-গৃহের দ্বার, দর্শন, বেদান্ত-শাস্ত্রাধ্যয়নশীল ছাত্রদিগকে স্তম্ভিত করিয়া, চতুঃশাস্ত্রজ্ঞানের মূর্ত্তি স্বরূপ সৌম্য শান্ত গম্ভীরভাব আমার পিতার মর্ম্মস্থলে আঘাত করিয়া চতুষ্পাঠী-গৃহের চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার মাতৃ-বিয়োগ হইয়াছিল। সংসারে মা না থাকার জন্য ছাত্রদিগকে লইয়া বাবা বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাবার বৃদ্ধা পিসিমাতা একা বিশজন ছাত্রের, আমাদের পিতা-পুত্রের এবং ঠাকুর-সেবার ভারে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহার শক্তি যেন শীঘ্র চির অবসর লইয়া বার্দ্ধক্যের—স্থবিরত্বের শেষ শক্তিতে পরিণত হইবে বলিয়াই একজন সাহায্যকারীর প্রার্থনায় সর্ব্বদাই পিতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। সেই জন্যই আমার মনে হইল, বাবা যদি বিবাহ করিয়া এই বিপন্ন ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করেন, তাহা হইলে সব দিক্ রক্ষা হয়। বাবার প্রিয়পাত্র ছাত্রদেরও পাঠের ক্ষতি হয় না; আমিও মাতৃহারা হইয়া আছি, আমারও সে অভাব কথঞ্চিৎ পূরণ হয়, ঠাকুর-সেবারও আর কোন ত্রুটি হয় না।

কিন্তু আমরা এখন আর কুলীন নহি। বল্লালসেনের অনুগ্রহ-প্রদত্ত কৌলীন্যের উপর অনেকদিন পূর্ব্বে আমার পূজনীয় পিতামহ কুঠারাঘাত করিয়া, এমনই এক বিপন্ন ব্রাহ্মণকে তাঁহার কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এ কথা আমি তাঁহারই মুখে অতি শৈশবে শুনিয়াছিলাম।

পিতামহ তাঁহার বিবাহের গল্প করিবার সময় আমাকে আরও বলিয়াছিলেন,—"বিপন্নকে রক্ষা করিতে, অতিথিকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করিতে, কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিতে কখনও নিজের দিকে চাহিয়া পরাঙ্মুখ হইও না ভাই, এই আমার উপদেশ।" যখন পিতামহের গলদ্গলে এই সব উপদেশ আমার মনের উপর অধিকার বিস্তার করিত, তখন আমার বয়স সাত কি আট বৎসর, এখন আমার বয়স বিশ বৎসর। পিতার টোলে ব্যাকরণ শেষ করিয়া ভট্টি প্রভৃতি কাব্য পড়িতেছি। পিতামহ প্রদত্ত ঐ কয়টি মূল সূত্রের, মূল মন্ত্রের অর্থ যাহা নিজের ধারণায়—নিজের জ্ঞানে আমার হৃদয়ফলকে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার বুদ্ধির উন্নতি হইয়াছিল। সেই বুদ্ধির শক্তিতেই আমি আবিষ্ট হইয়া পিতার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া, তখনই বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট প্রাণের আবেগে বলিয়াছিলাম, "সার্ব্বভৌম মহাশয়, আপনি প্রকৃতিস্থ হউন, বিশ্রাম করুন, আপনাকে এই দায় হইতে আমরা মুক্ত করিব। আমি পিতার একমাত্র সন্তান, মাতৃহারা; যদি আপনার কন্যা আমার মাতার অভাব পূরণ করিতে পারেন, আমার পিতার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় এই সব ছাত্রদের মাতৃস্থানীয়া হইয়া আমার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর ন্যায় ইঁহাদের লালন-পালন করিতে পারেন, তবে এই মুহূর্ত্তে আপনি কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন মনে করিয়া পরমানন্দে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন।" আমার এই প্রস্তাব শুনিয়া, আমার এই দৃঢ়তা দেখিয়া পিতা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; তিনি একটী কথাও বলিতে পারিলেন না। আমারও মনে হইল, আমি পিতার পিতৃদেবের স্থান অধিকার করিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে যে আদেশ প্রচার করিলাম, উপযুক্ত পুত্রের ন্যায় তিনি সেই আদেশ পালন করিতে বাধ্য। পিতাকে মৌন থাকিতে দেখিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় পরম আগ্রহভরে বলিলেন,—"আমার বহু সৌভাগ্য—আমার পিতৃপুরুষের বহু পুণ্য যে, আমার কন্যা এমন যোগ্য পুত্রের মাতা হইয়া আমার পিতৃকুলের উদ্ধার সাধন করিবে।"

(২)

শুভ দিনে—শুভ লগ্নে পিতার বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল; লোকে বলিতে লাগিল আমার স্বর্গীয়া মাতা অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় আমাদের গৃহে আগমন করিয়া সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন। মাতৃ-চরিত্রের সমালোচনা যদিও পুত্রের মুখে শোভা পায় না, তবুও আমি না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি না বলিলে যে সে মাতৃমহিমা সকলে শুনিতে পাইবে না; তাই আমি আনন্দে সে মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের কন্যা অতি শৈশবে মাতৃহারা হইয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এ নর-জগতে, এ সংসারে যাহার মা নাই, তাহার অভাব কেমন করিয়া পূরণ করিতে হয়। আরও এক কথা,—মহামায়া যাঁহাদিগকে মা হইবার জন্যই এ বিশ্বে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের সে শক্তির কোনও অভাব রাখিয়া পাঠান নাই। মহামায়াই যে নারীরূপে—মাতৃরূপে সন্তান পালন করিবার জন্যই আসিয়া বিশ্বের পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন, আমার মাতা তাঁহার জ্ঞানী পিতা সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট আজীবন সে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ইহা আমি তাঁহার অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহের আবরণে থাকিয়াও বুঝিতে পারিয়াছিলাম। শাস্ত্রে দেখিয়াছি, লীলা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শিনী ছিলেন; কিন্তু আমি চক্ষে দেখিয়াছি তাঁহাদের হইতেও সর্ব্বজ্ঞা আমার মাতাকে। চতুঃশাস্ত্র-বিশারদ আমার পিতাকেও অনেক স্থলে সময় লইয়া, বুঝিয়া আমার মাতার অনেক শাস্ত্রীয় কূট বিষয়ের উত্তর দিতে হইয়াছে। পিতার অনুপস্থিতিতে অনেক সময় আমি মাতার নিকট উপদেশ লইয়া বিদেশাগত ব্যক্তিদিগকে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়াছি। যে সব ব্যবস্থা খুব জটিল, তাহারও মীমাংসা আমার মাতা যাহা করিতেন, তাহা অভ্রান্ত হইত।

কন্যার বিবাহের পর হইতেই পাঁচ বৎসর কাল নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া যখন সার্ব্বভৌম দাদামহাশয় আমাদের গৃহে আসিলেন, তখন আমার একটি ভাই হইয়াছে। তাহার অন্নপ্রাশনের কাল উপস্থিত। কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্নপ্রাশন সময়ে সার্ব্বভৌম দাদামহাশয় তাঁহার প্রভূত সম্পত্তির একখানি দানপত্র আমার পিতার হস্তে দিয়া বলিলেন—"আমার প্রথম দৌহিত্র শ্যামাদাসকে আমার সম্পত্তি দান করিয়াছি। আর দ্বিতীয় দৌহিত্র আমার

অবর্ত্তমানে আমার নগদ টাকা যাহা কিছু থাকিবে, তাহাই পাইবে; এ কথাও দানপত্রে লেখা আছে। এখন আমি ৺কাশীবাস করিব। ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা।" দাদামহাশয়ের এ প্রকার দানপত্রের মর্ম্ম সকলে প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। পরে আমার মাতাঠাকুরাণী সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"আমার বড় ছেলে শ্রীমান্ শ্যামাদাস বাবাজীবনকে আমার অনুরোধে বাবা সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দিয়াছেন, আর ছোট ছেলে শ্রীমান্ উমাদাস বাবাজীবন আমার পিতার অবর্ত্তমানে, যাহা কিছু নগদ থাকিবে, তাহাই পাইবে। এই দানপত্র আমার ইচ্ছায় হইয়াছে, আমি আমার উপযুক্ত পুত্রকে যৌতুক দিবার জন্যই এ কথা বাবাকে বলিয়াছিলাম।"

বিষয়-বুদ্ধিতে যাঁরা আমাদের দেশে তখন খুব ভাল লোক ছিলেন, তাঁরা তখন কেহই এ দানপত্রের সুখ্যাতি করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু সার্ব্বভৌম দাদামহাশয়ের যে বার্দ্ধক্য বশতঃ মস্তিষ্ক-বিকৃতি হইয়াছে, এ কথা বলিবারও সুযোগ কেহ পরিত্যাগ করেন নাই। বাবার সম্পত্তির মধ্যে পঞ্চাশ বিঘা লাখরাজ, আর পাণ্ডিত্যের মান-সম্ভ্রম; ইহাতেই বাড়ীতে বিশ জন ছাত্র রাখিয়া, অন্ন দিয়া, বিদ্যা দান করিতেন। মায়ের শুভাগমনের পর হইতেই সংসারের উন্নতি হয়। সংসারের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে ছাত্রসংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছিল। কোনও দিন কোনও অভাবের কথা তিনি কাহাকেও জানিতে দেন নাই। সার্ব্বভৌম দাদামহাশয় রাজ-পরিবারের পৌরোহিত্য করিয়া প্রায় বিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি করিয়াছিলেন। নগদ টাকাও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। চিরসংযমী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারের হঠাৎ এমন অবস্থার পরিবর্ত্তনে—বৈষয়িক উন্নতি দর্শনে সকলেই একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন; কিন্তু বিষয়বাসনারহিত শাস্ত্রানোদী, বেদপরায়ণ, শান্ত, সৌম্য-ঋষি-স্বভাব আমার পিতা আজীবন যে ভাবে নিজের উদ্দেশ্যকে গঠন করিয়া, বিদেশাগত ছাত্রদিগকে পুত্রাপেক্ষা যত্নে প্রতিপালন করিয়া বিদ্যা দান করিতেন, আমার মাতাও যেমন স্বহস্তে সংসারের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সকলের তুষ্টি-সাধনের ব্রত গ্রহণ করিয়াই, আমাদের গৃহে জগদ্ধাত্রীর মূর্ত্তিতে বিচরণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার কোনও ব্যতিক্রম হইল না দেখিয়া সাধারণ সকলেই যেন কেমন একটা বিশেষ আগ্রহের সহিত আমাদের কার্য্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিল। এই তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিই আমার ভবিষ্যৎ-জীবনে আশীর্ব্বাদের কার্য্য করিয়া সার্ব্বভৌম দাদামহাশয়ের কপমাল হইতে উদ্ধার হইবার সহায়তা করিয়াছিল।

(৩)

পঁচাশী বৎসরের বৃদ্ধ দাদামহাশয় ৺কাশীবাস করিবেন, তাঁহার সঙ্গে কেহই যাইবে না,—ইহা আমার মনঃপুত হইল না; তাই আমি দাদামহাশয়ের সহিত ৺কাশীধামে যাইয়া বেদান্ত পড়িবার প্রার্থনা করিয়া পিতার নিকট সে কথা জানাইলাম। সাধু ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হওয়া তখনকার রীতি ছিল না। বিদেশে যাইয়া অধ্যয়ন করা তখনকার দিনে লোকে গুরুগৃহ-গমনই মনে করিত। তাহাতে ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাভ্যাস দুই হইত। তাই বৃদ্ধ দাদা-মহাশয়ের সেবার ভার লইয়া, বেদান্ত পড়িবার জন্য পিতামাতার আশীর্ব্বাদে দাদামহাশয়ের হস্তেই সমর্পিত হইয়া বিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণ প্রান্তে গিয়াছিলাম। আমার ৺কাশী-ধামে দাদামহাশয়ের নিকট থাকিয়া বেদান্ত পড়িবার ব্যাপারে লোকের মনে নানারূপ ধারণা জন্মিল। কেহ বলিল শ্যামাদাসের বিষয়-বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ; তাই দাদা মহাশয়ের সেবার অছিলায় নগদ টাকার উপর চাঁক করিয়া, তাহার পিতার ন্যায় জ্ঞানী পণ্ডিত লোক দেশে থাকিতেও সে ৺কাশীধামে বেদান্ত পড়িতে চলিল। ৺কাশীধাম হইতেও শ্যামাদাসের পিতার নিকট যখন ন্যায়-শাস্ত্র পড়িবার জন্য সন্ন্যাসীর দল আসিয়া থাকে, তখন দাদামহাশয়ের সেবা, 'বেদান্ত পাঠ' এ সব ওজর না দিলে কি লোকে তাহার বিমাতার অনুরোধ-প্রদত্ত দাদামহাশয়ের "রাজ-জায়গীর" কাড়িয়া লইত?

দুই বৎসর কাল দাদামহাশয় ৺কাশীধামে বাস করিয়া স্নেহের আবরণে আমাকে আবৃত রাখিয়া বেদান্ত শিক্ষা দিলেন। যাঘী পূর্ণিমার দিন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দাদামহাশয় আমাকে বলিলেন, "শ্যামাদাস, ভাই, মনে হইতেছে, আজ আমার শেষ দিন। আজই মধ্যাহ্নের সময় আমার ইহজীবনের কার্য্যাবসান হইবে। চল ভাই, একবার

বাবা বিশ্বেশ্বর ও মাতা অন্নপূর্ণার দর্শন করিয়া গঙ্গাদেবীর পবিত্র তীরে অন্নপায় শেষ করি।

মধ্যাহ্ন সময়ে পতিতপাবনী সুরধুনীর পবিত্র তীরে ঈশ্বর-চিন্তা করিতে-করিতে, আজীবন স্বধর্ম্ম ও স্ববৃত্তি রক্ষা করিয়া বর্ণাশ্রমের গুরু, একনিষ্ঠ, স্নেহময় আমার দাদা-মহাশয়,—আমার গুরু—আমার জীবনের আদর্শ দাদা-মহাশয় নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া পরমাত্মায় বিলীন হইয়া গেলেন।

(৪)

আমার পঠদ্দশা এখানেই শেষ। দানপত্রের মর্ম্মানুযায়ী আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ উমাদাস ভাই-জীবনের প্রাপ্য নগদ প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার বোঝা মাথায় করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলাম। যথাসময়ে আমার মাতাঠাকুরাণী দাদামহাশয়ের শ্রাদ্ধ সমাপন করিলেন। সাধ মিটাইয়া ব্রাহ্মণ-সজ্জন, অতিথি-কাঙ্গালী ভোজন, এবং দরিদ্রের অভাব যথাসাধ্য পূরণ করা হইল। শ্রাদ্ধান্তে নগদ টাকা যাহা কিছু ছিল, সবই মায়ের নিকট দিলাম।

৺কাশীধাম হইতে বেদান্ত পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া দেশে আসিয়াছি—দেশে-বিদেশে এই কথা প্রচারিত হইয়া গেল। বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম দাদামহাশয় যে রাজপরিবারের পৌরোহিত্য করিতেন, আমার ভাগ্যচক্র আমার আর্থিক উন্নতির প্রলোভনের মধ্যে ফেলিয়া, আমার ইহ-পরকাল দুই-ই ডুবাইয়া দিবার জন্য, সেই রাজপরিবারের পৌরোহিত্যের মাঝখানে আমাকে বসাইয়া দিল। রাজ-পৌরোহিত্য লাভের পরই, রাজ-অনুরোধে পড়িয়া বাবা এক বিশিষ্ট ধনী জমিদারের ভোগবিলাস মধ্যে পরিবর্দ্ধিত, আদরে প্রতি-পালিত জমিদার-কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিলেন। বিষয়ীর সহিত আমাদের বংশের এই প্রথম সম্বন্ধ স্থাপন। বিষয়-বুদ্ধি-পরিচালিত ব্যক্তির মধ্যে পড়িয়া, ভোগীর সংসর্গে থাকিয়া যোগিগণ যেমন আপনার ক্রম-অবনতির পথে প্রতি পলে অগ্রসর হন, স্বেচ্ছায়-অনিচ্ছায় স্বপথভ্রষ্ট হন, আমারও তাহাই হইল। শিক্ষার ভিত্তি কর্ম্মের সঙ্গে সুদৃঢ় হইতে না হইতে ভোগী হইয়া পড়িলাম; বিষয়-সংস্পর্শে স্বপথ; স্ববৃত্তি, স্বধর্ম্মচ্যুত হইলাম। আদর্শ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম লইয়া, সনাতনের সেবা করিতে পারিলাম না, বর্ণাশ্রমের গুরু হইয়া তাহার মর্য্যাদা রাখিতে পারিলাম না। সেই ভোগ-বাসনার মধ্যেই আমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রের নামকরণ হইল দেবদাস।

রাজ-পৌরোহিত্যে বৃত হইবার পর রাজ-চতুষ্পাঠীর ভার আমার উপরেই পড়িয়াছিল। সময়ের স্বল্পতার জন্য সব সময় দেশে যাইতে পারিতাম না বলিয়া আমার স্ত্রী-পুত্র রাজ-বাড়ীর নিকটে আমার জমিদার শ্বশুর মহাশয়ের বাড়ীতেই থাকিত। আমার পত্নী আজীবন ভোগে লালিত-পালিত হওয়ায় নিষ্ঠাবান্, সংযমশীল, ত্যাগ-ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের কঠোরতাময় সংসারে—শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবার জন্য শ্বশুর-বাড়ীতে বাস করা কারাদণ্ডের মতই মনে করিত। উদার-প্রকৃতি সার্ব্বভৌম দাদামহাশয়ের সম্পত্তি আমার আয়ত্তে ও কর্তৃত্বে আসিয়াছে। আমার ভোগের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার আয়ও বাড়াইয়া তুলিয়াছি। রাজ-পৌরোহিত্যের অপার কৃপায় অর্থ আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লয়—আমাকে চেষ্টা করিয়া অর্থের উপাসনা করিতে হয় না। বিবেক-বুদ্ধির কৃপায়, আমার প্রাক্তন সুকৃতির বলে, পিতামাতার আশীর্ব্বাদে এক দিন নিজের জীবনের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম,—ভোগের চক্রে, অর্থের কুহকে পড়িয়া, পিতা-মাতার মুখের দিকে না চাহিয়া, পিতার বার্দ্ধক্যে সেবা-শুশ্রূষা করিবার অধিকার পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছি—নিজের উদ্দেশ্য সমূলে নষ্ট করিয়াছি! নারীর রূপদ মোহে আবদ্ধ হইয়া বংশ-মর্য্যাদার হানি করিয়াছি—পুত্রের পিতা হইয়াও, পরের সন্তানকে আপনার সন্তান-জ্ঞানে শিক্ষা দিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াও, সে কর্ত্তব্যপালনে বিশেষ ত্রুটি করিতেছি। আপনার সন্তানের সংশিক্ষার—জাতীয় শিক্ষার, স্বধর্ম্ম ও স্ববৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া, তাহাদিগকে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিতে দেখিয়াও তাহার প্রতিকারের কোনও উপায় করিতেছি না। তখন আমার জীবনের গতি ফিরাইবার জন্য বহু দিন পরে পিতামাতার শ্রীচরণ-প্রান্তে আসিলাম।

দশ বৎসরের মধ্যে আমার দেশে আসিবার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। এই সময়ের মধ্যে সেই বৃদ্ধার—বাবার পিসিমাতার মৃত্যু হইয়াছে। আমাকে একবারমাত্র দেখিবার সাধ অপূর্ণ রাখিয়াই তিনি অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে আসিয়া তাঁহাকে দেখিবারও আমার সময় হইল না। আমার চরম উন্নতির

কথা বোধ হয় ইহাতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন। মনুষ্যত্ব আমার হৃদয়ের পাপস্তূপের মধ্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। মনুষ্যত্বের অমিত শক্তিও বুঝি সে ভার ঠেলিয়া উঠিতে, আমাকে আবার মানুষ হইবার পথে টানিয়া আনিতে পারে নাই।

(৫)

একটি পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণাধার—পবিত্র জীবনের প্রথম সূত্রপাত আমার জীবনের কতকটা গ্লানি, কতকটা দুঃখের ভার অপসৃত করিয়া দিয়াছিল। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ উমাদাস ভাইজীবনকে দেখিয়া মনে হইল, পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের অসীম শক্তি—অপার মহিমা, অনন্ত পবিত্রতার মধ্যে থাকিয়া সে তাহার চিত্তবৃত্তিকে প্রবল অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া, বেদের গূঢ়ার্থ বুঝিবার জন্য জীবনের সমস্ত লক্ষ্য এক করিয়া, জ্ঞানের মূর্ত্তিতে আমাদের গৌরব, —আমাদের বংশের গৌরব বর্দ্ধন করিতে তাহার জীবনকে উৎসর্গিত করিয়াছে। কনিষ্ঠের অপূর্ব্ব ভ্রাতৃভক্তিই আমার জীবনের ক্রন-অবনতির দারুণ দুঃখের জ্বালা হইতে আমার পরিত্রাণ করিয়াছিল,—আবার মানুষ হইবার পথে আমাকে টানিয়া আনিয়াছিল। তাহার সৌজন্য, তাহার প্রাণের আগ্রহ আমাকে জীবনের গতি ফিরাইয়া লইতে বাধ্য করিয়াছিল। আমি যেন মন্ত্রাবিষ্ট হইয়াই তাহার উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমার জীবনের পথভ্রষ্ট উদ্দেশ্যকে আবার নূতন করিয়া গঠন করিতে, তাহার উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিশাইতে প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলাম। যখন আমার মনের অবস্থা এই প্রকার, সেই সময়ে আমাদের দুইটি ভাইকে অভিন্ন-হৃদয় হইয়া থাকিবার আশীর্ব্বাদ করিয়া, বংশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিবার উপদেশ দিয়া, বিদেশাগত ছাত্রদিগকে পুত্রাপেক্ষা যত্নে প্রতিপালিত করিতে আদেশ করিয়া, এবং বংশের যে কেহ পূর্ব্বপুরুষ-স্থাপিত চতুষ্পাঠীর আচার্য্য হইবার যোগ্য হইয়া পূর্ব্বপুরুষের অক্ষয় কীর্ত্তি স্মরণীয় করিয়া রাখিবে, সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষা দিবে, তাহাকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-পালন করিবার মত শক্তি সঞ্চয় করিয়া তবে গৃহী হইবার উপদেশ দিবে—এই সব মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া আমাদের পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী সাধ্বিলোকে গমন করিলেন। বলিতে ভুলিয়াছি, সার্ব্বভৌম দাদামহাশয়ের প্রদত্ত যে অর্থ আমি ৺কাশীধাম হইতে আনিয়া মায়ের নিকট রাখিতে দিয়াছিলাম, উমাদাসের অসাক্ষাতে তাহাও আমাকে দিয়া, যাবতীয় বিষয়-রক্ষার ভার আমারই উপর দিয়া তিনি সর্ব্বশেষে বলিয়াছিলেন,—"বাবা শ্যামাদাস, যোগ্য পুত্র তুমি, অন্তিম সময়ে তোমাকে আর অধিক কি বলিব; তবে জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করি, যোগ্যের পুরস্কার দিয়া চিরদিন যিনি এই সৃষ্টি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তিনিই তোমার পুরস্কার দিবেন, ইহা জানিয়াও, বাবা শ্যামাদাস, মা আমি, আমার শক্তিতে যতটুকু পারি তাহা না দিলে যে আমার তৃপ্তি হইবে না—আমি পরলোকে গিয়াও শান্তি পাইব না;—তাই আমার ইহপরলোকের তৃপ্তির ধন, শান্তির ধন উমাদাসকে তোমায় দিয়া, ভ্রাতৃ ভক্তির মঙ্গল-বর্ম্মে তোমাকে আবৃত করিয়া পরমানন্দে পরপারের পথে যাইতেছি। সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, মান-অভিমান সমজ্ঞান করিয়া বিশ্বের হিতসাধন করিও। দয়াময় তোমায় সেই শক্তি দিন, এই প্রার্থনা করি।" মাতার সেই অন্তিম সময়ের কথা গুলি আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধশান্তির পরই পিতাঠাকুর পিতৃপুরুষের স্থাপিত চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাকে "প্রতিষ্ঠান" আখ্যা দিয়া তাঁহার পৈতৃক যাবতীয় সম্পত্তিই সেই প্রতিষ্ঠানের সেবার জন্য অর্পণ করিয়া আচার্য্যরূপে আমাকে রাখিয়া উমাদাসকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইলেন। পরে, বহু তীর্থ দর্শন করিয়া সর্ব্বশেষে উমাদাসের বেদ-পাঠের সুবিধার জন্য ৺কাশীধামেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

(৬)

আমার পত্নীকে তখনও আমাদের দেশে আনা হয় নাই; এখন আর না আনিলে চলে না। বাড়ীতে ৪০ জন ছাত্র। তাহাদের লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। বিদেশাগত ছাত্রেরাই তাহাদের মধ্যে পালা করিয়া রন্ধন ও ঠাকুরসেবার ভার লইয়াছে। যাহারা আমার প্রতি-পাল্য হইয়া—আমার মুখ চাহিয়া—আমারই হস্তে জীবন সমর্পণ করিয়াছে, মাতাপিতার স্নেহের বন্ধন হইতে দূরে বিদ্যাশিক্ষার জন্য আমার আশ্রয়ে আসিয়াছে, তাহাদের প্রতি আমি এইরূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। মনে

প্রাণে দারুণ অশান্তি ভোগ করিতেছি। সাহায্যের আশায়, আমার কর্ত্তব্য-ত্রুটি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমার পত্নীকে আমার গৃহে আনিলাম।

ভাবিয়াছিলাম এক, হইল আর! পত্নীর প্ররোচনায় পড়িয়া, তাহার কষ্টের লাঘব করিতে যাইয়া, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগৃহে পাচক ব্রাহ্মণের হাতে দেবসেবার ভার—দেবতার ভোগের ভার অর্পিত হইল। পিতার পুত্রাধিক স্নেহে পালিত বিদ্যার্থীদিগের জন্য সংসার হইতে পৃথক্ ব্যবস্থা হইল। বহুকাল হইতে যে বংশে পুত্রাধিক যত্ন পাইয়া, পরকে কিরূপ যত্নে প্রতিপালন করিতে হয় এই শিক্ষালাভ করিয়া, যাঁহারা দেশের ও দশের মঙ্গল বিধান করিতেন, সেই বংশের যোগ্য পুত্র হইয়া, কৃতিমান্ পুত্র হইয়া পত্নীর অনুরোধে—পত্নীকে যত্ন করিতে যাইয়া—তাঁহাদের যে ব্যবস্থা করিলাম, তাহাতে বংশে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছি বলিয়াই মনে হইল। দারুণ অশান্তিতে, আত্ম-গ্লানিতে প্রায় দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি—বিলাস-বাসনায়, স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য—তুষ্টির জন্য অন্যায় খরচও অনেক করিয়াছি। শ্বশুরকুলের অনুরোধে এবং স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছার বাধ্য হইয়াই পুত্রকে দেবভাষার পরিবর্ত্তে রাজভাষায় পারদর্শী করিয়া সভ্য বাবু প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে গৃহে বিষবৃক্ষের বীজবপন করিয়াছি।

(৭)

বেদান্ত-তীর্থ উপাধিতে ভূষিত হইয়া দশ বৎসর পরে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ উমাদাস ভাইজীবন দেশে ফিরিয়া আসিল; বাবা আর দেশে ফিরিলেন না, উমা-দাসের পঠদ্দশাতেই তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। দেবদাস বি-এ পাস করিয়া এম-এ, পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রতি পরীক্ষায়ই প্রশংসার সহিত পাশ করিয়া ইংরেজী আদব-কায়দাও দুরস্ত করিয়াছে। আমাদের সংসারের প্রাচীন ভাব, চাল-চলন যতটুকু লোকলজ্জার ভয়ে সাগ্রহে রক্ষা করিতেছিলাম, দেবদাসের তাহা আদৌ পছন্দ হইত না। তাহার অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিয়া বেশ বুঝিতে পারিতাম, আমার ব্যবহার সে অসভ্যতাপূর্ণ বলিয়া মনে করিত। দেবদাস বলিত, "প্রাচীন লোক সব কুসংস্কারে আবদ্ধ। জীবনের উন্নতি কোন্ পথ দিয়া কেমন করিয়া হয় তাহা তাহারা জানে না, সভ্যতা, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের উন্নতির দিকে তাহাদের কোনও লক্ষ্য নাই। আমাদের দেশের একটা খুব বড় সংস্কারের আবশ্যক হইয়াছে, আর সে সংস্কারের জন্য একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব বিশেষ আবশ্যক।" তাহার এই সব কথা শুনিয়া, তাহার হাবভাব দেখিয়া বুঝিতাম, সে আমাদের ঘৃণার চক্ষে দেখে, আমাদের প্রাচীন মর্য্যাদা—প্রাচীন জ্ঞান—অতীতের ইতিহাস জানে না, শেখে নাই। অতীতের গৌরব যে আমাদের হস্তে পড়িয়াই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সে কখনও শোনে নাই। আমরা যে তাহারই মত গোপন তাচ্ছিল্যে সে পুণ্যের সেবা—অতীতের গৌরব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, পতিত হইয়া জীবন যাপন করিতেছি, তাহা সে জানে না; শত জন্ম প্রাণপাত করিয়া যে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের প্রত্যেক বংশধরকেই করিতে হইবে, তাহা কেহ তাহাকে শিখায় নাই।

দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে উমাদাস ভাইজীবন মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হইয়াছে, পুত্র দেবদাস সুখ্যাতির সহিত এম-এ পাস করিয়াছে। তাহাদের বিবাহের জন্য দেশের চারিদিক হইতে লোকজন যাতায়াত করিতেছে। ধনীর দল পুত্র দেবদাসের বিবাহের জন্য প্রচুর অর্থের লোভ দেখাইয়া আমাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে; প্রাচীনের দল ভ্রাতা উমাদাসের বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতেছেন। এমন সময়ে আমার শ্বশুর মহাশয়, এক ধনী জমিদারের কন্যার সহিত উমাদাসের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত না হওয়ায় তিনি অপমান বোধ করিলেন। কিন্তু উপায় নাই। আমার জীবনের উপর দিয়া চূড়ান্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছি বলিয়াই, যথাসময়ে এক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের পরমাসুন্দরী কন্যার সহিত ভ্রাতার বিবাহ দিলাম, অর্থের কুহকে পড়িয়া বংশের শেষ স্মৃতিটুকু মুছিয়া ফেলিবার সহায়তা করিতে সাহস হইল না। উমাদাসের বিবাহের সময় আমার শ্বশুরবাড়ীর সকলেই, এমন কি আমার পত্নীও, অসুখের ভান করিয়া, শুভকার্য্যে যোগদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করেন নাই। দেবদাসের বিবাহের সময়ও যদি ভগবান্ আমার পত্নীর ও আমার শ্বশুরকুলের সেইরূপ মতিগতি দিতেন, তাহা হইলে আমার ভবিষ্যৎ কতকটা হয় ত শান্তিতে কাটাইতে পারিতাম; কিন্তু বিধাতার বিধানের

অন্যথা করিতে যে বিধাতারই শক্তি নাই। আমাকে না জানাইয়া—আমার মতের অপেক্ষা না করিয়া, ভাল-মন্দ বিচার করিবার কণামাত্র ভার না দিয়া, আমার একমাত্র পুত্রের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করিতে আমার পত্নী ও শ্বশুর মহাশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। আমার একমাত্র পুত্র, আমার বংশের আলোক,—আমার পিতৃপুরুষের শান্তির স্থল দেবদাসকে অর্থের বিনিময়ে এক জমিদার-কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর আমরা দুই ভ্রাতা সংবাদ পাইলাম। আত্মগ্লানিতে আমার হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। আমার চিরপোষিত উদ্দেশ্যের মূলে কুঠারাঘাত হইল।

(৮)

স্বর্গীয় সার্ব্বভৌম দাদামহাশয় যে রাজবাড়ীতে পৌরোহিত্য করিতেন, আমিও সেই রাজবাড়ীতেই চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের কার্য্য ও পৌরোহিত্য করিয়াছিলাম। সেই রাজবাড়ীর সকলেই আমাদের চিনিতেন, ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। এখন সে সব প্রাচীন মর্য্যাদা রক্ষার ভার যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, তাঁহাদের রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে চতুষ্পাঠীর পরিবর্ত্তে কলেজের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই রাজবাড়ী কলেজের প্রধান শিক্ষকের পদ আমার পুত্র দেবদাসের জন্য স্থির করিয়া তাহার মাতামহ একখানি পত্র দিয়াছেন। ঐ পদের বেতন মাসিক ২৫০ টাকা। চাকুরী করা তখনকার দিনে ব্রাহ্মণের পক্ষে অতি হেয় কর্ম্ম বলিয়া সকলের ধারণা ছিল; সেই জন্য, এবং দেবভাষা সংস্কৃত তাহার আদৌ শিক্ষা হয় নাই, ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার রক্ষা করিতে সে আজ পর্য্যন্ত চেষ্টাও করে নাই, তাহাতে তাহার শ্রদ্ধাও নাই—এই সব জানিয়া তাহাকে চক্ষের বাহিরে, অধঃপতনের শেষ সীমায় পাঠাইতে উমাদাসের আদৌ ইচ্ছা হইল না। উমাদাসের ইচ্ছা নাই বুঝিতে পারিয়া আমিও দেবদাস ও তাহার মাতার এবং মাতামহের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলাম না। একেই ত বাবুর আচার, সাহেবী কায়দা-কারণ, তাহাকে অভিভূত করিয়া বংশ-মর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে দেয় নাই; তাহাতে আবার চাকুরীজীবী হইলে আমার সব আশা সমূলে নষ্ট হইবে; এই ভয়ে তাহাকে সেখানে পাঠাইলাম না।

আমাদের দুই ভ্রাতার এই ব্যবহারে আমার পত্নী সুধী হইতে পারে নাই। এই সময় হইতেই তাঁহার দুর্বিনীত ব্যবহার প্রতিদিন আমাকে অধীর করিয়া তুলিতে লাগিল। দেবোপম ভ্রাতা উমাদাস যেন তাহার শত্রুর কার্য্য করিয়াছে, তাহার জাতির কার্য্য কলে-কৌশলে সম্পাদন করিতেছে,—এই ধারণার বশীভূতা হইয়া সে আমাকেও তাহার বদ্ধমূল ধারণার অভিভূত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। অহর্নিশ দুশ্চিন্তা-বিষ ভোগে আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। মানসিক কাল শয্যাশায়ী থাকাতে সংসারের খরচ-পত্রের ভার উমাদাসকেই দিতে চাহিলাম। কিন্তু সরলহৃদয় উমাদাস আমার ইঙ্গিতের আভাষ মাত্র বুঝিতে পারিল না। সংসারের কূটনীতির মধ্যে যে কখনও যায় নাই, তাহাকে সংসারের ভ্রূকুটি-কুটিল আনন ত কখন দেখিতে হয় না। উমাদাস যে 'অনাসক্ত অনুরাগী সংসারী সংসার-ত্যাগী' এই চক্ষেই সংসারকে দেখিয়া আসিতেছে। বিধাতা বিচিত্র বিধানে তাহার চরিত্র গঠিত করিয়া আমার পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান রক্ষা করিতে, আমার ন্যায় পতিতের উদ্ধার করিতে, আমার সন্তানকে সনাতন ধর্ম্মে আস্থাবান্ করিতে, আমার পত্নীর মতিগতি ধর্ম্মের দিকে টানিয়া আনিয়া তাঁহার লীলার পূর্ণ বিকাশ করিলেন। আমি আমার পত্নীর ব্যবহার জানি বলিয়া পুত্রের ঘৃণিত দৃষ্টির উপর আমাকে জীবন অতি-বাহিত করিতে হয় বলিয়াই উমাদাসকে সংসারের আয়ব্যয় কতটা কি, তাহা জানাইয়া দিতে চাহিলাম; কিন্তু তাহার সরল হৃদয়, দৃঢ় বিশ্বাস, উদারতা তাহাকে সে পথে যাইতে দিল না। দেবদাসকে সংসারের সবই কিছু-কিছু এখন হইতেই জানান উচিত বলিয়া আমাদের যাবতীয় আয়ব্যয়ের ভার তাহাকেই দিতে হইবে বলিয়া, উমাদাস তাহার জীবনে আমার নিকট এই প্রথম অনুরোধ করিল। তাই যেন কেমন একটা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, ইহার ভাবী পরিণাম দেখিবার আশায়, বিনা বিচারে তাহার অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্যই, যাবতীয় কাগজ-পত্র, টাকাকড়ি যে বাক্সে ছিল, তাহার চাবি উমাদাসকে দিয়া বলিলাম—"আমার জ্ঞান ও ধারণা মত তুমিই আমাদের সমস্ত সম্পত্তির ন্যায্য অধিকারী, তাই আমি ইহা তোমাকেই দিতেছি। এবার তোমার কর্ত্তব্য-জ্ঞানে—তোমার বিবেক বুদ্ধিতে যাহা ভাল বিবেচনা কর, তাহাই করিতে পার;—তাহাতে আমার

কোনও আপত্তি নাই।" আমার বাক্যাবসানের সঙ্গে-সঙ্গেই উমাদাস পরমানন্দে দেবদাসকে তৎক্ষণাৎ সেই চাবি দিয়া, আমার পত্নীর সাক্ষাতেই বলিল,—"বাবা দেবদাস, আমার ধারণায় তুমিই ইহার যথার্থ অধিকারী; শুধু ইহার কেন, আমাদের বংশের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের তুমি ভাবী হর্ত্তা-কর্ত্তা। ভগবান তোমাকে যে আমাদের বংশের যোগ্য করিয়াই পাঠাইয়াছেন, এই মহৎ বংশের সম্মান যে তোমারই পবিত্র হস্তে বর্দ্ধিত হইবে, ইহাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি যে তোমাকে আমাদের কুলের উপযোগী করিয়াই, আমাদের কুলধর্ম্ম রক্ষা করিবার শক্তি দিয়া, আমাদের বংশধর করিয়াই তোমাকে পাঠাইয়াছেন; তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার জন্যই তোমার মনের পরিবর্ত্তন কোন শুভ মুহূর্ত্তে হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? তোমার ন্যায় উপযুক্ত সেবক থাকিতে আমরা তোমার সেবা না লইব কেন? আমরাই বর্ণাশ্রমের—সংসার-ভিত্তির আদর্শ—ব্রাহ্মণ—সনাতন ধর্ম্মের আদর্শ। আবার রীতিনীতি আমাদের নিকটেই—ব্রাহ্মণের নিকটেই আপামর সাধারণে শিক্ষা করে। ব্রাহ্মণ আমরা—আমরাই বর্ণশ্রেষ্ঠ—আমাদের কর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—আদর্শ কর্ম্মও নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই কর্ম্ম সম্পাদনে জীবন অতিবাহিত করিয়া—লোকশিক্ষার আদর্শ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম সার্থক করিতে হইবে। বর্ণাশ্রমের গুরুর কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। আপামর সাধারণকে সেই মহান্ কর্ত্তব্যে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের জীবনও সার্থক করিয়া দিতে হইবে। বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, মানীর মান রক্ষা করিয়া পরোপকার মহাব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবেই, এই উদ্দেশ্য হৃদয়ে সর্ব্বদা পোষণ করিয়া আমাদের পরম পবিত্র এই পিতৃকুলের গৌরব রক্ষা কর—বৃদ্ধি কর; আমার এই অনুরোধ। আশীর্ব্বাদ করি, প্রার্থনা করি সর্ব্বশক্তিমান্ তোমার হৃদয়ে এই পবিত্র ভাব ধারণ করিবার শক্তি দিয়া আমাদের পবিত্র করুন। সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম তোমার মাতার পরামর্শে, আদেশে সম্পন্ন করিবে। প্রথম হইতে স্বমত চালনা করা নীতিবিরুদ্ধ। তুমি উপযুক্ত হইয়াছ—লেখাপড়া শিখিয়াছ—তোমাকে অধিক আর কি বলিব।"

একটি মহা মন্ত্রশক্তি দেবদাসের অভিমান-পূর্ণ, অহঙ্কার-পূর্ণ হৃদয়ের উপর আপনার মহিমা দেখাইয়া—মুগ্ধ করিয়া পাষাণের গড়া প্রাণহীন পুতুলের মত করিয়া দিল। সে যেন চিত্রের দৃশ্য বস্তুর মত—জড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। সে তাহার মুখ—ভয়-চকিত দৃষ্টি আর পৃথিবীর উপর হইতে উঠাইয়া লইতে পারিতেছিল না।

তাহার এই ক্ষণমাত্র অভিভূত অবস্থা আর কেহ লক্ষ্য করিয়াছে কি না, তাহাই দেখিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে সে আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার সেই মুখ এখনও আমার মনে আছে, হৃদয়ে আঁকা রহিয়াছে। সেই মুখ দেখিয়াই ত আমার ধারণা হইয়াছিল, তাহার হৃদয়ে সৎশিক্ষার বীজ রোপণ করিলে, তাহাকে সৎসঙ্গে রাখিলে তাহার মালিন্য দূর হইয়া যাইবে, তাহার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন শক্তি জাগরিত হইয়া আবার তাহাকে মানুষ হইবার পথে আনিয়া বংশের গৌরব রক্ষা করিবে।

সদ্‌বৃত্তি হৃদয়ে জাগরূক হইলেই, মন্দবৃত্তির একেবারে নাশ হয় না। বিবেকবুদ্ধি-পরিচালিত সদ্‌বৃত্তি তখন আজীবন আশ্রিত মন্দবৃত্তির সহিত হৃদয়ের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের শক্তিকে হ্রাস করিয়া দেয়; আবার ক্ষেত্রবিশেষে—অধিকারীভেদে সদ্‌বৃত্তির নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া বিবেক-বুদ্ধির সংস্কারের উপর পা চালিয়া দিয়া কর্ম্মীর সাহায্যকারী হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইল না। দেবদাস তাহার পিতৃব্যের হস্ত হইতে কম্পিত হস্তে চাবি-কাটিটি লইয়া তাহার স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতার পাদমূলে রক্ষা করিয়া কাতরভাবে বলিল—"মা, পথ ভুলে অনেক দূর চ'লে এসেছি; আজ তা বুঝতে পেরেছি; কিন্তু আর কি ফেরবার শক্তি হবে? সে শিক্ষা যে—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া উমাদাস দৃঢ়তার সহিত বলিল "নিশ্চয় হবে দেব! যে বংশে তোমার জন্ম, হবে না কেন? প্রাণে যদি প্রবল আগ্রহ হয়, তাহা হইলে তুমি অচিরেই পথ দেখিতে পাইবে। তোমার ভয় কি? তোমাকে পথ দেখাবার জন্য ঐ ব্রাহ্মণ-প্রবর, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তোমার পিতৃদেব, হস্ত প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন। আমার ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয়ই সফল হইবে; তুমি এই বংশগৌরব নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে পারিবে।"

দেবদাস একবার তাহার পিতৃব্যের মুখের দিকে চাহিল; দেখিল ব্রহ্মতেজে সে বদন উদ্ভাসিত। তাহার মনে হইল স্বয়ং ব্রহ্মণদেব তাহাকে বরদান করিবার জন্যই তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। ভক্তি পরিপ্লুত চিত্তে সে তাহার পিতৃব্যের চরণ-বন্দনা করিল।

উন্মাদের তাহার হস্ত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "দেব! আমাকে নয়, আমার দাদাকে প্রণাম কর।"

দেবদাস আবার পদধূলি গ্রহণ করিল; আমি তাহাকে আমার বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম—আমি আমার হারানিধি ফিরিয়া পাইলাম। সে যে কি আনন্দ! কি প্রাণারাম আনন্দ!

আমার স্ত্রী অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার হৃদয়ে এ সুখ একটু রেখাও অঙ্কিত করিল না।

দেবদাসের জন্মতিথি উপলক্ষে যে দিন ব্রাহ্মণাদি ভোজন করান হয়, সেই দিন তাহার মাতা তাহাকে বাড়ীর মধ্যে আহার করিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করা সত্ত্বেও সে আহার করিল না। কেবলমাত্র দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বলিল,—"প্রতিজ্ঞার পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত, আমার ব্রতের উদ্‌যাপন না হওয়া পর্য্যন্ত ভবিষ্যতে ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করিব না, খাইব না। পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের বিদ্যার্থীদিগের যে ভাবে রাখিয়া যেরূপ যত্নে প্রতিপালন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, এখন সেইভাবেই আমার দিন অতিবাহিত করিব। তাহাদের রাজভোগ দিবার শক্তি যতদিন না আসিবে, ততদিন নিজের উদর পূরণের জন্য রাজভোগ গ্রহণ করিব না; পিতৃব্যের সহিত আমিও এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। ব্রাহ্মণ-সন্তান আমি ব্রাহ্মণের শক্তিতে যতদূর পারি করিব; তাহার কণামাত্র ভাণ্ডারে নষ্ট করিব না। আর সে শক্তির সীমা কতদূর, তাহা দেখিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছি। মা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার অভীষ্ট পূর্ণ হয়।"

আমি আনন্দে অধীর হইয়া সেই মুহূর্ত্তে ইষ্ট স্মরণ পূর্ব্বক আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, আমার ইহ-পরকালের শান্তির ধন, আমার বংশগৌরব পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলাম, "বাবা দেবদাস, আমার পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদে—তাঁহাদের পুণ্যে—তোমার আশা, তোমার ব্রত, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে।" কিন্তু তাহার মাতার মনে আনন্দ হইল না, আশীর্ব্বাদ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না, পুত্রের মনের পবিত্রতা—জীবনের উদ্দেশ্য সে বুঝিতে পারিল না, বুঝিবার শক্তি বুঝি ছিল না; তাই সেই পুণ্যদিনে, পুত্রের জন্মতিথির দিনে অভিসম্পাত উদ্দেশেই বলিয়াছিল,—"মা হইয়া আমি তোমার ন্যায় হতভাগ্য পুত্রকে অভিসম্পাত করি, আমার মনস্কুণ্ণের ফলে, যেন তোমাকে আজীবন পরমুখাপেক্ষী তোমার পিতৃব্যের পথই অনুসরণ করিতে হয়। যার মান-অপমান জ্ঞান নাই, নিজেকে প্রতিপালন করিবার শক্তি পর্য্যন্ত যার নাই, ভ্রাতৃ-অনুগ্রহে পালিত একটা ঘৃণ্য জীবনই তোমার জীবনের আদর্শ হইল, তখন আর তোমার ন্যায় মন্দভাগ্য পুত্রের না হইয়া আমার জীবন-যাপনে আবশ্যক নাই। এমন ঘৃণ্য পুত্রে আমার আবশ্যক কি? তুমি আমার পুত্র নও, আমি তোমার মা নহি।"

"মা, এ কথা ত তোমার অভিসম্পাত নয়, ইহা যে আমার পক্ষে 'শাপে বর'। মন্দভাগ্য পুত্র না হইলে কি হেলায় ব্রাহ্মণের পবিত্রতায় এতদিন বঞ্চিত থাকিতাম? সৌভাগ্যবান্ হইবার জন্যই ত মা, এত কঠোরতা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি। সৌভাগ্য কাহাকে বলে, আমার মা যে দিন বুঝিবেন, সেই দিনই তিনি পুত্রের মা হইবেন। ভাল-মন্দের বিচার যে দিন আমার মা বুঝিতে পারিবেন, সেই দিনই মাতৃ-আহ্বান পুত্রের নিকট পৌঁছিবে, তাহার পূর্ব্বে মনে করিব, আমি মাতৃহারা।" দেবদাস এই কয়টি কথা তাহার মাতার অন্তরের প্রতি স্থানে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া আঁকিয়া দিয়া সুধীমনে প্রতিষ্ঠানে চলিয়া গেল। সামান্য এই কয়টি কথাতেই আমি আমার পত্নীর সম্যক্ পরিচয়, মনোভাব বুঝিতে পারি, তাহার এ ভুল আজীবনের। এই ভুলই আমার সংসারে অশান্তির কারণ। পূর্ব্বে ইহা বুঝিতে পারিলে বিষবৃক্ষ অঙ্কুরেই নাশ করিতাম, কিন্তু আমার প্রারব্ধ-বশে তাহা বুঝিতে পারি নাই। বুঝিতে পারিলে হয় ত আমার পুত্রের চরিত্র এতটা দৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত হইত না। আদরেই মত স্বল্পবিশারদ হইয়া পুথিগত বিদ্যা অধিগত করিয়া

পণ্ডিত আখ্যা পাইত। পাণ্ডিত্যের বিকাশ হইত না, আমারই ন্যায় ভোগে মজিয়া যাইত। ভগবান যাহা করেন, তাহাই মঙ্গলের জন্য।

দেবোপম ভ্রাতা উমাদাস জাতিত্বের পরিশোধ লইবার জন্যই যেন আমার পুত্র—তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র দেবদাসকে আচারের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল; এম্-এ পাশ করা ছেলের মাথা খাইবার ইচ্ছা করিয়াই সে প্রতিষ্ঠানের শুরু হইয়াছে, আমার পত্নীর এই ধারণা কিছুতেই তাহার মন হইতে দূর করিতে পারিলাম না, অনেক বুঝাইয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ্য ভাবের অভাবের, পবিত্রতার মর্ম্ম অবগত করাইতে পারিলাম না। উত্তরোত্তর সে অধিক ঘৃণার চক্ষে উমাদাসকে দেখিতে লাগিল। পুত্রের উপর পর্য্যন্ত তাহার বিষদৃষ্টি পড়িল। পুত্রের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন তাহার অপমান বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আর তাহার এ সংসারে থাকা চলিবে না, এ সংসারে থাকিলে সে আর বেশী দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না; এই সব অভিযোগ প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় আমার রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে বসিয়া অনবরত বলিয়া বলিয়া আমাকে অধীর করিয়া তুলিতে লাগিল। আমার যাবতীয় হিতোপদেশ তাহার বিষ তুল্য বোধ হইল। আমি নিরুপায় হইয়া স্বীকার করিলাম—তাহার উদ্দেশ্য জানিতে পারিলে সেই মত কার্য্য করিব।

"আমার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে। তোমারই ভালর জন্য আমার প্রাণ কাঁদে; তাই বলিতেছি, সময় থাকিতে একটা ব্যবস্থা কর। ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই আছেই, দিন থাকিতে তাহার ব্যবস্থা করিলে ভবিষ্যতে আর কোনও গোলযোগ হইবে না। এ কথায় আমার দোষ ধরিবে, তা জানি। ভগবান্ আমাদের যখন স্ত্রীলোক করিয়া, তোমাদের দাসী করিয়া, তোমাদের সেবার ভার দিয়া সংসারের সকল জ্বালা সহিতে পাঠাইয়াছেন, তখন আর সামান্য দোষাদোষের বিচার করিয়া নিজের পায়ে নিজে আর কেন কুঠারাঘাত করি। তাই বলিতেছি, বিষয়ের ব্যবস্থা কর; নিজের-নিজের সকলেই দেখিয়া লউক। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, শরীরপাত করিয়া, দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া যাহা কিছু করিয়াছ,—তাহাতে আর ভূত-ভোজন করাইবার প্রয়োজন নাই। চিরদিনই কি ঐ পৃথিবীর অলসের দল, বিশ্ব-কুঁড়ের দল ভোজন করাইয়া তোমার প্রাণাধিক ভ্রাতার অপরাধের প্রশ্রয় দিবে। আর সহ্য করা যায় না, মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে। তাহার নিজের অদৃষ্টের উপার্জ্জন করিয়া যাহা পারে তাহাই করুক, তাহাতে কেহই তাহাকে বাধা দিবে না। বুকে বসিয়া দাড়ি উপড়াইবার আস্পর্দ্ধা দিবার আবশ্যক নাই। আমারই খাবি, আবার আমারই উপযুক্ত ছেলের পরকাল - উন্নতির আশা নষ্ট করিয়া দিবি। যে মানুষের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই, তাহাকে সংসারে রাখিতে নাই,—তাহাতে সংসারের মঙ্গল নাই, অকল্যাণই আছে। একালে মানুষের ভাল করিতে নাই। কেহ তোমার ভাল করিলে, উপকার করিলে তুমি যেন তাহার উপকার করিতেই বাধ্য; তাহারা এই বুঝিবে। সে উপকারের প্রত্যুপকার এখন নাই; যাহা আছে, তাহাতে তাহার মন্দ করা—উপযুক্ত পুত্রের মাথা খাইবার ষড়্‌যন্ত্র করা। তাই বলিতেছি, পৃথক হও, নিজের যাহা কিছু সব লও! পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায্য ভাগ উহাকে দিয়া বিষয়ের একটা 'বণ্টন-পত্র' কর। যাহাতে ভবিষ্যতে আর কোনও গোল করিতে না পারে, তাহার মত পাকাপাকি করিয়া "বণ্টন-নামা" রেজিষ্টারী করিয়া লও। বিষয়ের ব্যবস্থা হইলেই ছেলে হাতে আসিবে; নিজের হাতে আনিয়া শাসন করিয়া ঘরে তুলিয়া লইব। ছেলে বিসর্জ্জন দিতে পারিব না। টাকার সব হয়, পর আপনার হয়, ছেলে ত নিজেরই। আমাদের অভাব কি? আমি দেখিয়াছি, তোমার এই বারের আনা টাকা, আর সাবেক মজুত বলিয়া যাহা তোমার হাতের লেখা সহীকরা একটা তোড়া তোমার সিন্দুকের এক পার্শ্বে রহিয়াছে, তাহা মোট-মাট পাঁচ লক্ষ টাকা। 'রাজ-জামিন' ত তোমার। তোমার নামেই রহিয়াছে। উহার আছে কি? যাহার আছে, তাহাকে ভোগ করিতে দিবে না। আমার ছেলেকে আমি ভাল খাওয়াইব, ভাল পরাইব, তাহা দেখিয়া সহ্য করিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত ভগবান যাহাকে দেন নাই, তাহার প্রতি আমার মায়া মমতা কি? সে কি মানুষ।"

"মানুষ ত নয়ই। মানুষ হইলে, সুখ দুঃখ বুঝিত। মানে, অপমানে বিচলিত হইত, নিজের নিজত্বই বুঝিত। পরকে পরই ভাবিত। পরের ছেলেকে নিজের বলিয়া—নিজের করিয়া তাহার নিজের মাথা খাইত না। এই সব

করিয়াই ত সে সব হারাইতে বসিয়াছে। মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ করিয়াছে। মানুষের বুদ্ধি থাকিলে—মানুষের মত কাজ করিলে আর আমার ভাই যে, তার আজ এ দশা হইবে কেন?" এই অভিনয় করিয়া সে দিনকার মত উদ্ধার পাইলাম।

(১০)

রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। 'রাজরাজেশ্বরী' সর্ব্বভৌম দাদামহাশয়ের প্রদত্ত। আমার নামে তাঁহার দানপত্র আছে, তাহাতে আমার ন্যায্য অধিকার কই? নাবালক দৌহিত্রের সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইলে যাহা করিতে হয়,—বিশেষ একটা প্রকাণ্ড জমিদারী রক্ষা করিতে হইলে সে ক্ষেত্রে যাহা করিতে হইয়াছিল, তাহাই করিয়া যোগ্যের হস্তে সম্পত্তি রক্ষার ভার দিয়াছিলেন মাত্র; এখন আমি কি তাঁহার প্রদত্ত সেই জমিদারী নষ্ট করিতে পারি? সে সম্পত্তিই যে নিজ শক্তিতে সনাতন পদ্ধতি রক্ষার যোগ্যতা লইয়া, যোগ্যের ভাগ্যলক্ষ্মী হইয়াই—যোগ্যের পুরস্কার রূপেই জন্ম লইয়াছিল। রাজার সম্পত্তি—রাজ অন্নলক্ষ্মী—কি অযোগ্য অপাত্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যোগ্যের পুরস্কার দিবার জন্যই ঐ সম্পত্তির সৃষ্টি। তাই আমাদের বংশের ও প্রতিষ্ঠানের রক্ষার ভার যে যোগ্যপাত্রে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম, তাহাকেই ঐ সম্পত্তি যোগ্যের পুরস্কার রূপে প্রদান করিলাম। আর ভবিষ্যতেও বংশের যে কেহ প্রতিষ্ঠানের গুরুভার বহনে সমর্থ হইবেন, তিনিই উহা ভোগ করিবেন,—গুরুর আদেশে গুরুপরম্পরাক্রমে ঐ সম্পত্তির অধিকারী হইবেন, এই ব্যবস্থা করিলাম।

'রাজরাজেশ্বরী'এর সঞ্চিত মুনফা ও দাদামহাশয় প্রদত্ত নগদ টাকা লইয়াই ঐ পাঁচলক্ষ টাকা। তাহাতে স্বীকৃতঃ আমার অধিকার নাই—উমাদাসেরই অধিকার। অযোগ্যের হস্তে পড়িয়া নষ্ট হয় নাই, হইবার নহে। যাহা যোগ্যের ভোগের, তাহা কি অযোগ্যের ভোগে বাধিত হইতে পারে? তাই সেই অর্থ নিজের শক্তিতেই সঞ্চিত হইয়া এত অধিক হইয়াছিল। রাজ-পরিবারে পৌরোহিত্য করিয়া সংসারের খরচপত্র কুলাইয়া কিছু-কিছু করিয়া যাহা বাঁচিয়াছিল, তাহাতেই বাবা পৈতৃক বাড়ীখানির সংস্কার করেন। পূর্ণ ভোগ-বিলাসের মধ্যে পড়িয়া বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর কখনও পাই নাই। পুত্রকে কৃতী করিবার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া অনেক অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়াছি। পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ বিঘা লাখেরাজ। তাহা পিতাঠাকুর মহাশয়ই প্রতিষ্ঠানের বিদ্যার্থীদিগের সেবার জন্য দেবত্র সম্পত্তি করিয়া দিয়া গিয়াছেন; তাহাতে দেবাধিকার। আমাদের কাহারও সে সম্পত্তিতে হাত নাই। পৈতৃক বাড়ীখানিতে আমরা বাস করিতেছি, আর তাহারই পার্শ্বে কতকটা বাস্তু একটী অশ্বত্থবৃক্ষে আবৃত হইয়া থাকাতে পতিত ছিল; অশ্বত্থ ও নারায়ণে সমজ্ঞান তখনও ছিল বলিয়াই নারায়ণের উচ্ছেদ করিয়া সেখানে বাড়ী করিতে কেহ সাহস করেন নাই। এই দুইটীই আমাদের পৃথক্-অন্নের বণ্টন-পত্রের মধ্যে আছে। আমাদের অতুল সম্পত্তির মধ্যে ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দের সন্ধিস্থলে পবিত্র স্নেহ-ভক্তি সূত্রের বন্ধন স্বরূপ অমূল্য সম্পত্তি ঐ দুইটিই আমাদের বিভাজ্য। আমার পত্নীর মনস্তুষ্টির জন্য, বণ্টন-পত্রের বিষয়ে কিছু পরামর্শ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলাম—"তুমি যদি বল, তবে এই বাড়ীখানি উহাকে দিই, নতুবা উহার দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না। কাহারও মুখ চাহিয়া কোনও কাজ করায় আমি কখনও অভ্যস্ত নহি। ন্যায্য অধিকারে কাহাকে কখনও বঞ্চিত করি নাই, করিবও না, তুলাদণ্ডে পৈতৃক বিষয় বিভাগ করিব। এখন বণ্টন-পত্র করিয়াছি, তাহা দেখিয়া—তুমি স্তম্ভিত হইয়া যাইবে। সময়ে সব বুঝিতে পারিবে। এখন বল, তোমার কি অভিপ্রায়? কোনও দিন তোমার কথার তিলমাত্র অন্যথা করি নাই, আর এক্ষেত্রেও সহস্র লোকের অপমান সহ্য করিব, তবুও তোমার কথার অন্যথা করিব না। ভাবিবার সময় নাই, আজই সব শেষ করিব। নূতন সংসারের ভিত্তি আজই সূচনা হইবে,—আজই তোমার কথামত তোমার শেষ অনুরোধে "বণ্টন-পত্র" রেজিষ্টারী হইবে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সব জানিতে পারিবে, শীঘ্র বল, তোমার কি অভিপ্রায়?"

"দাও তবে ঐটুকু; না দিলে কোথায় থাকিবে, তোমারই ত ভাই বটে। আর দিলেও পুণ্য আছে, এই মনে করিয়াই দাও; মরার পাত্র বটে, এই হিসাবেই দাও।"

"সে অশক্ত নয়; মহাদেবের মত তার মূর্ত্তি, রুদ্রের মত তার তেজ; পাছে আমার মর্য্যাদার হানি হয়, এই অছিলা

দিয়াই আমার আশীর্ব্বাদটুকু আদায় করিয়া লয়। ভাল মন্দ, লাভ-লোকসানের দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। মানুষে কি এমন পারে, না এমন হয়? আমি বুঝি সব, কিন্তু মনের আগুন এতদিন মনে চাপিয়া রাখিয়াছিলাম; এবার সে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সে বলে 'অপ্রতিগ্রাহী হইয়া বংশের পূর্ব্ব-মর্য্যাদা চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিবে।' সে কি আমার—তোমার দয়ার দান এই পৈতৃক বাড়ীখানি লইবে বলিয়া বিশ্বাস হয়? এই বাড়ীর তুল্য-মূল্যের পার্শ্বের ঐ যে দেখিতেছ অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে বাস্তু, ঐটাই আমাদের থাক্, আর এই বাড়ীখানি নিয়ে সে বাস করুক।"

"তাই কর, তোমার চেয়ে কি আর আমি বেশী বুঝি?"

"ও কথা বলো না, তুমিই আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছ। ছেলে যে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, এর প্রতিবিধান আমি এতদিন কিছুই করিতে পারি নাই। তুমিই তা দেখিয়ে দিয়েছ। দয়াময় মুখ তুলে চেয়েছেন, তিনিই আমাকে শক্তি দিন, আমি যেন আমার কর্ত্তব্য পালন কর্ত্তে পারি।"

লেখাপড়া সমস্ত শেষ করিয়া, একবার প্রতিষ্ঠান-গৃহে যাইয়া উমাদাসকে বলিলাম,—"ভাই, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া আমাদের সমস্ত বিষয়ের একটা ব্যবস্থা করিয়াছি। তাহা রেজিষ্টারী করিব। আজ দুই ভাইকেই একবার রেজিষ্টারী আফিসে যাইতে হইবে। দেবদাসকে উৎসাহিত করিয়া ব্রাহ্মণের আচারের মধ্যে ফিরিয়া যাইবার জন্য, আর তোমার চির উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি আরও দৃঢ় করিবার জন্য একটু জটিল করিয়াই বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়াছি। রেজিষ্ট্রার তোমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তরে বলিও—'আমি আজীবন বিষয়ের কিছুই জানি না, দাদাই জানেন; তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা আমার অবশ্য পালনীয় ও স্বীকার্য্য।' আর একটি আমার অনুরোধ আছে—অনুরোধ কেন ভিক্ষা আছে;—বল, তাহা যতই কঠিন হউক, পূরণ করিবেই স্বীকার কর। জীবনে কখনও কোনও দিন কোন কথা বলি নাই, কোন অনুরোধ করি নাই। আজ আমার একটা ইচ্ছা পূরণ কর, তাহাতে আমার হৃদয়ে শান্তি ফিরিয়া আসিবে, শান্তির সঙ্গে-সঙ্গে আমার স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া নবীন উৎসাহ পাইব, বড় আনন্দিত হইব।"

"দাদা, 'অনুরোধ'—'ভিক্ষা' এ সব না বলিয়া আদেশ কর, 'করিতেই হইবে' বল, কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের আদেশ চিরদিন সমান ভাবে তাহার শক্তি লইয়া এ মরজগতের গুরুর স্থান অধিকার করিয়া আছে। তোমার আদেশে প্রাণ দিতে পারি, প্রতিষ্ঠানের মায়াও ত্যাগ করিতে পারি; অন্য কথা অতি তুচ্ছ।"

"রেজিষ্টারী আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সন্ধ্যার সময় বাড়ীর সকলের সাক্ষাতেই তোমাকে বলিতে হইবে 'দাদা, আজ হইতেই তবে বণ্টন-পত্রের সর্ত্ত অনুযায়ী কার্য্য হউক।' শুধু এই কয়টি কথা। এই কয়টি কথাতেই আমার যথেষ্ট উপকার হইবে। আমার পত্নীর মতি পরিবর্ত্তনের জন্য—তাহার গর্ব্বের মূলে—তাহার চিরভ্রান্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতে অন্য উপায় পাই নাই বলিয়াই অবশেষে তোমার মুখে, কনিষ্ঠের মুখে এই মহামন্ত্র-মহৌষধির নির্দ্দেশ। আমার প্রাক্তন দুষ্কৃতিই আমার পত্নীরূপে আসিয়া আমার সংসারে অশান্তির বীজ বপন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। আমার কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উপর তাহার নিজের শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমার মনুষ্যত্বকে পশুজ্ঞানে বলি দিবার ইচ্ছা করিয়াছে। অধিক কি বলিব, আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করিবার ইচ্ছায় নিজের প্রাধান্য বিস্তার করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেছে না। তাহার এই ব্যবহারে আমি কখন্ হয় ত আমার মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া ফেলিব, তাহার ঠিক নাই। তাই নিজের কর্ত্তব্যবুদ্ধি হারাইবার পূর্ব্বেই একবার তাহার মতির পরিবর্ত্তনের শেষ চেষ্টা স্বরূপ তোমাকে এই অনুরোধ করিতেছি। আমার অনুরোধ যত কঠিনই হউক, তোমাকে তাহা পালন করিতেই হইবে। বিষয়ের বণ্টন-পত্র দেখিয়াই সে তাহার স্বামীর অবস্থা বুঝিতে পারিবে, আর বলিতে পারিবে, তাহার এত শক্তি নাই, যে শক্তির প্রভাবে তাহার স্বামীর মনুষ্যত্ব নষ্ট করিতে পারিবে। আমি তাহাকে জানাইতে চাই, নারীর আজীবন প্ররোচনার ফলেও পুরুষের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির নাশ হয় না। আমি তাহাকে জানাইতে চাহি, সে যে অস্ত্র-প্রয়োগে আমার বুদ্ধি-নাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, তাহার সে অস্ত্র আমার উপর পতিত হইয়াও

তাহার উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে, ক্ষোভে, মর্ম্মযাতনায় অস্থির হইয়া তাহারই দিকে প্রতিগমন করিয়াছে। যেমন অর্জ্জুনের প্রতি নিক্ষিপ্ত কর্ণের ব্রহ্মাস্ত্র অর্জ্জুনের প্রাণঘাতী না হইয়া কর্ণেরই প্রাণঘাতী হইয়াছিল, তেমন তাহারই নিক্ষিপ্ত অস্ত্র তাহারই কুবুদ্ধির মূলোচ্ছেদ করিয়াছে। যাহাকে সহধর্ম্মিণী রূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাহার এই বিপরীত ব্যবহার আমাকে দিবারাত্রি কি প্রকার শান্তি দিতেছে, তাহা আর কাহার নিকট জানাইব; যিনি জানেন, তিনিই ত আমাকে উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন। এ উপায়ে তাহার মতি-পরিবর্ত্তন হইবেই; সেই জন্যই ত তোমাকে আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। একই শোণিতে জন্ম হইয়াছে, উভয়েই পিতার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি, দেবভাষা শিক্ষা করিয়াছি, ব্রাহ্মণের আচার যতদূর সম্ভব, দেশকালের উপর দিয়া তাহাও পালন করিয়াছি। স্বামীর অতি আদরে, অতি যত্নে স্ত্রীর হৃদয় যে অপবিত্রতায় —দূষিত হইয়াছে, স্বামীর কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় স্ত্রীর হৃদয়ের পবিত্রতার বিশুদ্ধ নির্ম্মালো তাহা শোধিত করিয়া লইব। অন্যায়ের প্রশ্রয় প্রদান করিয়া যে ভুল করিয়াছি, সেই মহা ভুল সংশোধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই, তোমার ন্যায় ভ্রাতৃ-ভক্তি-পরায়ণ ভ্রাতার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। 'বণ্টন-পত্র' বিষয়ের। ভ্রাতৃভক্তির - ভ্রাতৃস্নেহের বণ্টনপত্র নহে। তবে কেন ভাই বৃথা আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হইতেছে। পূর্ব্ব-পুরুষগণ যে ভাবে, যে নিয়মে সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া জীবন-যাপন করিয়াছেন, আমরাও সেই ভাবে, সেই নিয়মে, সেই সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, সেই সনাতনের সেবা করিয়া জীবন-যাপন করিব। পিতৃপুরুষের স্থাপিত প্রতিষ্ঠানে যাহাতে চিরদিন সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, লোক-শিক্ষার ভার বহনে সক্ষম থাকে, তাহারই প্রাণপণ চেষ্টা আমাদের উভয়কেই করিতে হইবে। তাহারই জন্য যথাসর্ব্বস্ব দিতে হয়, দিব। বংশ-মর্য্যাদা চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, ভবিষ্যৎ সন্তানগণের সৎ শিক্ষা-দীক্ষার জন্য—প্রতিষ্ঠানের আচার্য্য হইবার যোগ্য শিক্ষা লাভের জন্য আমরা বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া যাইব। আমাদের আজীবনের কল্পিত আশা আজ আমার চক্ষুর সম্মুখে মূর্ত্তিমান হইয়া সেই সৎ দিকে পরিচালিত করিতেছে। সেই জন্য তোমাকে আমার এই অনুরোধ।"

"দাদা,—হৃদয়ের অতি পবিত্র স্থানে পূজার আসন পাতিয়া মনে মনে এত দিন আপনারই পূজা করিয়া আসিয়াছি; যে ভাবে যখন যাহা আদেশ করিয়াছেন, ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন, তাহাই আমার দেবতার আদেশ বলিয়া সানন্দে সম্পাদন করিয়াছি। অনধিকারী আমি, জানি না, কখন কোন্ ত্রুটি করিয়াছি, তাহারই ফলে আজ এই শাস্তি। আজ আমার পরীক্ষার দিন। দাদা, যতই কঠিন হউক, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। বিচার করিবার শক্তি ত আমার নাই। আমি আপনার আদেশ জীবনে-মরণে পালন করিবই। পিতার শেষ আজ্ঞা যাহা জীবনের ব্রত, তাহা উদ্‌যাপন করিবই।" উমাদাস এই বলিয়া সেই দেবপ্রতিম পিতার তৈল-চিত্রের দিকে একদৃষ্টিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া চাহিয়া রহিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, অপার্থিব ভাব!

যথাসময়ে দুই ভ্রাতা রেজেষ্টারী আপিসে গিয়া রেজিষ্ট্রার মহাশয়ের নিকট, দলিল দাখিল করিলাম। যথাসময়ে আমাদের ডাক পড়িল। রেজিষ্ট্রার মহাশয় আমাদের "বণ্টন-পত্র" পড়িয়া প্রথমে আমাকে উন্মাদ স্থির করিলেন। উমাদাসকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার মস্তিষ্ক বিকৃত কি না, কখনও উন্মাদ হইয়াছিলাম কি না। উমাদাসের কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না; অধিকন্তু স্বার্থের জন্য মিথ্যা বলিতেছে বলিয়া দু'একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। "উপযুক্ত লোকের মুখে আপনাদের সম্যক্ পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত এ দলিল রেজিষ্টারী করিতে পারি না, আপনারা উভয়ে অপেক্ষা করুন", বলিয়া তিনি নিজের কার্য্য করিতে লাগিলেন। সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া পুনরায় আমাদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের এখানে এমন কেহ পরিচিত আছেন কি না, যাঁহাকে আমি বিশেষরূপে জানি।" ভাগ্যক্রমে সে দিন যে সব লোক সেখানে কার্য্যোপলক্ষে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই আমাদের চিনিতেন। তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া রেজিষ্ট্রার মহাশয়ের ভুল ভাঙ্গিল, আমাদের "বণ্টন-পত্র" রেজিষ্টারী হইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই দুই ভাই বাড়ীতে ফিরিয়া

আসিলাম। আমার পত্নী "বণ্টন-পত্রে"র মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য উৎগ্রীব হইয়া গৃহদ্বারেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। উমাদাস ভিতরে গিয়া আমার পত্নীকে উৎগ্রীব দেখিয়াই বলিয়া উঠিল,—"দাদা, আজ হইতেই তবে 'বণ্টন-পত্রে'র সর্ত্ত অনুযায়ী কার্য্য হউক।"

"চল ব্রাহ্মণী, চল গৃহিণী, চল সহধর্ম্মিণী, চল জীবন-সঙ্গিনী, চল—এ গৃহে আর আমাদের স্থান নাই, তোমারই যুক্তিমত—মন্ত্রণামত, তোমারই আদেশে বিষয় দুইভাগ করিয়াছি, বাড়ী উমাদাসকেই দিয়াছি। আর ঐ যে দেখিতেছ অশ্বত্থ বৃক্ষ, উহারই পবিত্র পাদমূলে আমাদের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। বাড়ী আর ঐ বাস্তু ব্যতীত আমাদের আর কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি নাই, তাহা ত তোমারই মধ্যস্থতায় বণ্টন হইয়াছে। যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই প্রতিষ্ঠানের। গৃহিণি, আর কেন এখানে! আজ হইতেই বণ্টন পত্রের সর্ত্ত অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। তোমার ধারণায় যে চিরদিন পরের গলগ্রহ, পরমুখাপেক্ষী, যে তোমার সন্তান কাড়িয়া লইয়াছে, বিশ্বকে পর করিবার বিদ্যা শিক্ষা দিতেছে, তোমার এন-এ পাশ করা ছেলের মাথা খাইতে বসিয়াছে, সেই এ কথা বলিতেছে। তোমার সে তেজ কোথায়, যে তেজে আমাকে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় উত্তেজিত করিতে, আমার ভাইকে পর করিবার মন্ত্র পড়াইতে। সেই তেজ সঙ্গে লইয়া চল, এ সংসারে তাহা আর রাখিয়া যাইও না; তাহা হইলে এই পবিত্র বংশের বংশধরগণকেও হয় ত আমারই মত দিবারাত্রি শত বৃশ্চিকদংশনজ্বালা সহ্য করিতে হইবে। চল গৃহিণী, চল জীবনসঙ্গিনী, সন্ধ্যার এই অন্ধকারে আমাদের জীবনের শেষ পথে।"

• • • •

এখন আমরা কাশীবাসী। গৃহ, গৃহিণী—সব পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি। গৃহ গিয়াছে—কাশী পাইয়াছি; গৃহিণী গিয়াছে—সহধর্ম্মিণী পাইয়াছি; বিশ্ব গিয়াছে—বিশ্বনাথকে পাইয়াছি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রস-সাগর

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী

[কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উভটসাগর বি-এ]

রস-সাগর মহাশয় বাস্তবিকই 'রসের সাগর' ছিলেন। যখন তিনি ছোট ছোট মজ্‌লিসে বসিতেন, তখন তাঁহার রসের ফোয়ারা ছুটিত। কিন্তু যখন তিনি বড় বড় মজ্‌লিসে থাকিতেন, তখন তাঁহার রসের সাগর উথলিয়া উঠিয়া চারিদিক্ প্লাবিত করিয়া দিত। কেহ কোনও রসের কথা বলিয়া তাঁহাকে পরিহাস করিলে তিনি এরূপ সরল-ভাবে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেন যে, পরিহাসকারীকে অপ্রতিভ হইয়া নিরুত্তর থাকিতে হইত। রস-সাগরের যেরূপ রসিকতা ছিল, তাঁহার সেইরূপ প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বও বিরাজ করিত। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক রসিকতার গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। এস্থলে তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা গেল।—

১ম গল্প।

মহারাজ শিরীশচন্দ্রের সময়ে রাজ-সংসারে অত্যন্ত আর্থিক কষ্ট হইয়াছিল। এজন্য রস-সাগরের দুই এক মাসের বেতন বাকী ছিল। চৈত্র সংক্রান্তির দিন কলস উৎসর্গ করিবেন বলিয়া রস-সাগর মহাশয় তৎপূর্ব্ব দিবসে মহারাজের প্রধান কর্ম্মচারী রামমোহন মজুমদারের নিকটে বেতন আনিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ অভিপ্রায় সিদ্ধ না হওয়াতে বিষণ্ণ-বদনে যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন কতকগুলি বয়স্য-সমভিব্যাহারে তিনি সভায় বসিয়া ছিলেন। যুবরাজ তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন "রস-সাগর মহাশয়! আজ নূতন কি?" রস-সাগর উত্তর করিলেন "শাস্ত্রকার-গণ কহিয়া-ছেন, কোনও শিষ্ট-ক্রিয়া পণ্ড হইলে অরণ্যে রোদন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এ কারণ আমি কিয়ৎক্ষণ মজুমদারের নিকটে রোদন করিয়া আসিলাম।"

২য় গল্প।

কোনও সময়ে নদীয়া জেলায় কোনও জমীদারের বাটীতে রাজ-সভাস্থিত যাবতীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সুতরাং

রস-সাগরকেও সেখানে যাইতে হইয়াছিল। কর্ণকর্ত্তা ওঁহার সহিত যে গৃহে বসিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে বিদায় করিতেছিলেন, সেই গৃহের প্রবেশ দ্বার অত্যন্ত কিছু ক্ষুদ্র ও নিম্ন। এজন্য উন্নত-কায় রস সাগর বিদায়-গৃহে প্রবেশ করিবার সময় মস্তকে কিঞ্চিৎ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে সমবেত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "আহা, আপনাকে বড় লাগিয়াছে।" রস-সাগর কহিলেন, "কি করি, ছোট দুয়ারে ত কখনই আসা অভ্যাস নাই!" ইহা শুনিয়া কর্ণকর্ত্তা ও সমবেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণ অপ্রতিভ ও নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

৩য় গল্প।

লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস নামক একজন প্রসিদ্ধ পাঁচালিওয়ালা কলিকাতায় বাস করিতেন। তাঁহার মত পাঁচালি-ওয়ালা তৎকালে এ প্রদেশে অতি বিরল ছিল। তিনি যেরূপ সুরসিক ও সুকবি, সেইরূপ আবার সুবক্তা ও সুগায়ক ছিলেন। দুঃখের কথা এই যে, তাঁহার একটী মাত্র চক্ষু ছিল। এই সময়ে নদীয়া-জেলায় একজন ধনাঢ্য বৈদ্য জমীদার বাস করিতেন। ইনি লক্ষ্মীকান্তের পাঁচালি গান ও ছড়া শুনিবার জন্য তাঁহাকে কলিকাতা হইতে নিজ বাটীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালে রস সাগরকেও সমাদর-পূর্ব্বক আহ্বান করেন। উভয়ের মধ্যে রসিকতা ও বাক্‌পটুতার যুদ্ধ বাঁধাইয়া দেওয়াই বৈদ্য মহাশয়ের প্রধান অভিপ্রায় ছিল। কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্মণদিগের অধিকার-মধ্যে কোনও বৈদ্যই সমক্ষেপে যজ্ঞ-সূত্র ধারণ করিতে পারিতেন না। যে গ্রামে এই বৈদ্য জমীদার মহাশয়ের বাস, সেই গ্রাম অল্প রাজার অধিকার ভুক্ত হওয়ায় সেই স্থানের বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের মত যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতেন। সুতরাং তত্রত্য ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইত না। রস-সাগর আপনার পৈতার এক কড়া কড়ি বাঁধিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। একজন কড়ি বাঁধিবার কারণ জিজ্ঞাসা হইলে রস-সাগর উত্তর করিলেন "এ বামুণে পৈতে।" ইহা শ্রবণ করিবামাত্র সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন, এবং বৈদ্যগণ লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। লক্ষ্মীকান্ত এক-চক্ষুহীন এবং রস-সাগর গ্রীবাহীন ছিলেন। "আসুন আটপুরে ঠাকুর!" বলিয়া লক্ষ্মীকান্ত রস-সাগরের সংবর্দ্ধনা করিলেন; রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ "থাক্ রে ন্যাটা চায় পুবে" বলিয়া লক্ষ্মীকান্তের কৃত্রিম শিষ্টাচারের প্রতিশোধ দিলেন। সভাস্থ লোক সকল উভয়কেই জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনাদের কি বাক্-চাতুরী হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।" তখন রস-সাগর কহিলেন "প্রথম সম্ভাষণকারী লক্ষ্মীকান্তকেই ইহা জিজ্ঞাসা করুন।" লক্ষ্মীকান্ত উত্তর করিলেন, "এই ঠাকুরটির আটপুরের (শ্রৌত্র ব্রাহ্মণের) মত চেহারা কি না দেখুন।" রস-সাগর প্রত্যুত্তর করিলেন "হাঁ, আমি আটপুরে বটে, কারণ আমার দুই চোক, কিন্তু এ ন্যাটার চারিপোয়ে এক চোক।' ইহা শ্রবণ করিবামাত্র সভাস্থ লোক সকল উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।

৪র্থ গল্প।

একদিন সন্ধ্যাকালে রাঢ় প্রদেশীয় একদল যাত্রা-ওয়ালা "কালিয়-দমন যাত্রা" করিবার মানসে কৃষ্ণনগরে আনন্দময়ী দেবীর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। রস-সাগর ও তাঁহার কতিপয় বন্ধু আনন্দময়ী দর্শনে সমন করিয়া যাত্রার দলের সন্ধান লইলেন, এবং সেই রাত্রিতেই পাড়ার মধ্যে তাহাদের গানের বায়না করিলেন। নিয়মিত সময়ে গাওনা আরম্ভ হইল, কিন্তু যে ব্যক্তি যশোদা সাজে, হঠাৎ সে ব্যক্তির পীড়া উপস্থিত হইল। পাছে আমোদ ভঙ্গ হয়, ইহা দেখিয়া সকলেরই অনুরোধে রস সাগর 'যশোদা' সাজিলেন। ব্রজাঙ্গনাগণ যশোদার নিকটে আসিয়া অভিযোগ করিল "মা যশোদা! তোমার কৃষ্ণ আমাদের ননী চুরী ক'রে খেয়েছেন।" ইহা শুনিয়া যশোদা কৃষ্ণকে কহিলেন "বাপু কৃষ্ণ! চুরি করার মহাপাপ। এমন কর্ম্ম আর কখনই করো না।" ব্রজাঙ্গনাগণ দ্বিতীয়বার ঐরূপ অভিযোগ করিল। যশোদা পুনর্ব্বার কৃষ্ণকে কহিলেন "কৃষ্ণ! কাজ বড়ই অন্যায় হচ্ছে। আমি একবার বারণ করেছি। তথাপি তোমার চৈতন্য হলো না। আবার যদি কাণে শুনি, তুমি ঐরূপ কার্য্য করেছো, তা হ'লে আমি তোমাকে বিলক্ষণ শাস্তি দিব।" ব্রজাঙ্গনাগণ তৃতীয়বার আসিয়া অভিযোগ করিল 'মা যশোদা! কৃষ্ণের জ্বালায় আর আমাদের এখানে বাস করা চলে না। এবার শিকে ছিঁড়ে ভাণ্ড ভেঙ্গে ননী চুরি ক'রে খেয়েছে।" এই কথা শুনিবামাত্র যশোদা ক্রোধে অন্ধ হইয়া বাম-হস্তে কৃষ্ণের চূড়া ধরিলেন, এবং দক্ষিণ হস্তে কৃষ্ণের চাঁদ গালে প্রহার করিতে করিতে বলিলেন "ন্যাটাকে দুই দুই বার বারণ করেছি, তথাপি চুরি! আজ ননী চুরি, কাল ক্ষীর চুরি, পরশ্ব ঘটী বাটী চুরি,—এই রকম ক'রে কি আমাকে ফাঁসাবে মনে করেছ?" প্রহারের চোটে অস্থির হইয়া কৃষ্ণ চীৎকার করিতে লাগিল, যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল এবং শ্রোতারা হাসিয়া মজলিস্ কাটাইয়া দিল।

এই গল্পটী সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ কহেন যে, রস-সাগর যেরূপ গম্ভীর ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন, তাহাতে তিনি যে একটা যাত্রার দলে যশোদা সাজিবেন, এরূপ কথা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। আবার কেহ কেহ বলেন, রস-সাগর মহাশয়ই এই ঘটনার অধিনায়ক ছিলেন। তবে ইহা কৃষ্ণনগরে সংঘটিত হয় নাই।

৫ম গল্প।

কোনও সময়ে রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ জমীদার পাল-চৌধুরী বাবুদের বাটীতে প্রসিদ্ধ "গোবিন্দ অধিকারীর" যাত্রা হইতেছিল। ইহার পূর্ব্বে এই অঞ্চলে এইরূপ যাত্রা আর কখনই হয় নাই। উক্ত বাবুদের বাটীতে এত জনতা হইয়াছিল যে "নং স্থানে তিলধারণম্।" রস-সাগর মহাশয় কতকগুলি বন্ধু লইয়া উক্ত যাত্রা শুনিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু জনতা ভেদ করিয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিতে তাঁহারা কিছুতেই সমর্থ হইলেন না। কি প্রকারে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করা যায়, রস-সাগর মহাশয় মনে

মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি দেখিলেন যে, এক জন 'বাদুরে' লাফিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিতেছে। তখন রস-সাগর তাহাকে বল-পূর্ব্বক ধরিয়া ফেলিলেন। মুদি-গোঁসাই "বাদুরে বাদুরে" বলিয়া যত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে, বাদুরে ততই চীৎকার করিয়া বলে যে "আমায় ধরিবার শক্তি নাই। আমায় এক বামুনে ধরিয়া রাখিয়াছে।" সভায় বাবুরা অবাক্ হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, রস-সাগর বাদুরেকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন। তাঁহারা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রস সাগর কহিলেন "বাদুরেের আত্মা গ্রহণ না করিলে কিরূপে এই দুস্তর সাগর পার হইয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার লাভ করিতে পারি?" তখন তাঁহারা সদম্ভমে তাঁহাকে ও তাঁহার বন্ধুবর্গকে বাটীর ভিতরে লইয়া গিয়া অতি উত্তম স্থানেই বসাইয়া দিলেন।

এই গল্পটীর সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। কেহ কেহ বলেন, রস সাগর মহাশয় কখন বাদুরেকে ধরেন নাই। তাঁহার সঙ্গী ও পরম আত্মীয় বৈকুণ্ঠনাথ রায় বাদুরেকে ধরিয়া টানাটানি করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ রায় অতি সুরসিক পুরুষ ছিলেন। তবে রস-সাগর যে এই অভিনয়ের পরামর্শ-দাতা, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

এখন কবি রস-সাগর ও তাঁহার অন্নদাতা মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের মানসিক ও সাংসারিক অবস্থার বিষয় আমরা পর্য্যালোচনা করিব। রস-সাগর মহাশয় স্বীয় জন্মভূমি বাড়েরাকা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া উত্তরাঞ্চলের বিখ্যাত মুরশিদাবাদ নগরে গমন করিলেন। সেখানে হতাশ হইয়া কৃষ্ণনগরে আসিলেন এবং রাজপুরোহিত মহাশয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া স্বীয় অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি-দ্বারা মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের মনোরঞ্জন করিলেন। মহারাজও তাঁহার গুণে বিমুগ্ধ হইয়া শ্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় সভাসদ্ করিলেন, এবং তাঁহার পরিবার-বর্গের ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক ত্রিশ টাকা বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। রস-সাগরও আপনাকে ভাগ্যবান্ ও গৌরবান্বিত মনে করিলেন। তাঁহার যশোগরিমা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও লোকে রাজসভায় আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া যাইতে লাগিলেন। রস সাগর ঘাটে, বাটে, মাঠে ও রাজ-সভায় আপনার কবিতা শুনাইয়া ও রসিকতার ফোয়ারা ছুটাইয়া সাধারণের নিকটে অতি আদরের ধন হইয়া উঠিলেন। তিনি যতক্ষণ বাটীর বাহিরে থাকিয়া কবিত্বের উৎস উন্মুক্ত করিয়া রাখিতেন, ততক্ষণ তিনি নির্ম্মল মানসিক শান্তি অনুভব করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। কিন্তু বাটীতে গিয়া যখন তিনি স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার মুখের দিকে চাহিতেন, তখনই তাঁহার হৃৎকম্প হইত এবং চক্ষু দিয়া জল আসিত। যখন তিনি মুদির দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইতেন, তখন মাথের ঘরে তাঁহার অন্নদায়া শুকাইয়া যাইত। তখন মাসে যেড় টাকা বা দুই টাকা খরচ করিলেই এক জন লোক পরম-সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। সুতরাং মাসে ত্রিশ টাকা বেতন পাইয়াও স্বয়ং তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা নিরন্ন থাকিতেন কেন? তিনি মহারাজের পরম প্রিয়পাত্র হইয়াও এত মানসিক অশান্তি ভোগ করিতেন কেন! মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের অবিবেচনা ও অর্থাভাবই রস-সাগরের এই অশান্তির একমাত্র কারণ! কবির উদরে অন্ন, দেহে বস্ত্র ও মনে শান্তি না থাকিলে কবিত্বের উৎস উন্মুক্ত রাখা অসম্ভব! মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট অপরিসীম। সুতরাং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রিত রস-সাগরেরও শারীরিক, মানসিক ও সাংসারিক যন্ত্রণা অনিবার্য্য। আশ্রয়-দাতা মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের জীবনের সহিত আশ্রিত রস সাগরের জীবন সংমিশ্রিত ছিল। অতএব রস সাগরের কবিত্ব-রস যে অন্নাভাবে ও মানসিক অশান্তিতে ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যাইবে, ইহা আর বিচিত্র কি!

রস-সাগর যেরূপ ভাগ্যবান্, সেইরূপ আমরা ভাগ্যহীন। তিনি স্বীয় দৈবী কবিত্ব-শক্তি-বলে মহারাজ ও তদীয় আত্মীয়গণ এবং অন্যান্য লোকের মনোরঞ্জন করিয়া প্রভূত যশোলাভ করিয়াছিলেন, এই জন্য আমরা তাঁহাকে ভাগ্যবান্ বলি। কিন্তু গিরীশ-চন্দ্রের বিরহ সংসারে থাকিয়া তাঁহাকে একদিন মুদির দোকানে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে এবং স্বীয় পরিবার-বর্গকেও নিরন্ন রাখিতে হইয়াছিল, এজন্য আমরা তাঁহাকে ভাগ্যহীন বলি। তিনি গিরীশ-চন্দ্রের সময়ে জন্মগ্রহণ না করিয়া যদি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই জন্মগ্রহণ করিতেন;—যদি মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সভায় না থাকিয়া তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বিদ্যমান থাকিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে প্রকৃত ভাগ্যবান্ বলিতাম। যাহা হউক, রস-সাগর মহাশয় যে

"ত্রিশ টাকার কাত, তিন মাস তন্তু-পাত"

করিয়াও স্বীয় রসের সাগরকে শুষ্ক হইতে দেন নাই, ইহাই ভগবানের কৃপা!

রস সাগরের একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা ছিলেন। তন্মধ্যে পুত্র ও একটী কন্যা অকালে প্রাণত্যাগ করেন। একটী মাত্র কন্যা জীবিত ছিলেন। জীবনের শেষ অবস্থায় গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে শান্তিপুরে এই কন্যাটীর বিবাহ দিয়া আজীবন শ্বশুর-গৃহেই তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন। নদীয়া-জেলার অন্তর্গত মাটুয়ারি-নিবাসী, মনস্বী, মহাত্মা, শ্রদ্ধেয় ও কর্ম্মবীর স্বর্গীয় পরম-সম্মান ভাজন শ্রীযুক্ত বাবু মকরচন্দ্র পালচৌধুরী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, রস সাগরের জ্যেষ্ঠা দুইটী পৌত্র তাঁহার জমীদারী সেরেস্তায় কর্ম্ম করিতেন। অদ্য সূত্রে আরও অবগত হইয়াছি যে, উক্ত শ্রীযুক্ত মকরচন্দ্র বাবু মহাশয়ের স্বর্গীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজদাস পালচৌধুরী মহাশয়ের জমীদারীতে, আজি কয়েক বৎসর হইল, রস-সাগরের দৌহিত্র বৃদ্ধ বয়সেও কার্য্য করিতেন। ১২৭১ বঙ্গাব্দে (১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে) ৭৩ বৎসর বয়সে রস-সাগর মহাশয় স্বর্গারোহণ করেন।

রস-সাগর মহাশয়কে দেখিয়াছেন, এরূপ একটী মাত্র লোক কৃষ্ণনগরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার নাম রায় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস

রায় বাহাদুর। ইনি কৃষ্ণনগর-রাজবংশের সহিত সংশ্লিষ্ট। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহার পিতামহের মাতামহের পিতা। শ্রীযুক্ত কুমারনাথ রায় মহাশয় সুপণ্ডিত ও মহাশয় পুরুষ। ইঁহার নিকটে কৃষ্ণনগরের রাজবংশ ও রস সাগরের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি। ইঁহারই মুখে শুনিয়াছি যে, রস সাগর হৈকার, কৃশাঙ্গ, নিতান্ত কৃষ্ণবর্ণ ও অত্যন্ত কুৎসিত পুরুষ ছিলেন। রস সাগর মহাশয় যেরূপ হাস্যরসিক ও সুচতুর, সেইরূপ আবার আমোদ-প্রিয় ও উপস্থিত বক্তা ছিলেন। তিনি সকল প্রকার লোকেরই সহিত মিশিয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। তিনি স্পষ্ট কথা মুখের সম্মুখেই বলিয়া ফেলিতেন। তাহাতে তিনি কিছুমাত্র লজ্জা-বোধ করিতেন না। তবে কাহাকেও কোনও কিছু স্পষ্ট-ভাবে বলিতে ইচ্ছা করিলে তিনি তাহা সরল-ভাবেই বলিতেন, এবং তাহাতে লোকের মনে কষ্ট বা ক্ষোভ হইত না। তাঁহার কবিতায় বিলক্ষণ রস থাকিত। যে কবিতাটি যে রসে রচনা করিলে তাহা বিষয়োপ-যোগিনী হয়, তাহা সেই রসেই তিনি রচনা করিতেন। তাঁহার কোনও কোনও কবিতায় ছন্দঃপতন দৃষ্ট হয়। বোধ হয়, দ্রুত রচনা করিতে গিয়াই মধ্যে মধ্যে এইরূপ ছন্দঃপতন হইত। ইহাই বিস্ময়ের বিষয় যে, যে কোনও লোক যে কোনও ভাবের সমস্যা-পূরণ করিতে দিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিয়া দিতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে ভারিপাড়া নিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অনিলম্বে সংস্কৃত সমস্যা পূরণ করিয়া দিতেন বটে, কিন্তু রস-সাগরের মত বাঙ্গালা-সমস্যা পূরণ করিবার লোক বড়ই বিরল। রস-সাগর যে সকল কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রায় সমস্তই কষ্টকল্পনা-রহিত। কষ্টকল্পনা-কবিতা বস্তুতঃ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় না। কবি স্বাধীন-ভাবে কবিতা রচনা করিলে তাহা যেমন তাঁহার মনঃপূত হয়, কষ্টকল্পনা-অনুসারে কবিতা রচনা করিলে তাহা তেমন মনঃপূত হয় না। রস সাগর স্বরচিত কবিতায় যে পরিমাণে কবিত্ব-শক্তি দেখাইয়াছেন, তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি যে তদপেক্ষা অধিক ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার স্বরচিত সমস্যা-পূরক কতকগুলি কবিতা সংস্কৃত শ্লোকের রূপান্তর ও ভাষান্তর বলিয়াই বোধ হয়। ইহা দ্বারা বোধ হয় যে, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। নতুবা কোনও কোনও সংস্কৃত শ্লোকের সহিত তাঁহার স্ব-রচিত কবিতার ঠিক ঐক্য হয় কেন! যাহা হউক, ইহা বোধের বিষয় নহে। ভাব লাঘবের যে কোনও প্রকারে সমস্যাটির যথাযথ পূরণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য তিনি সংস্কৃত কিংবা যে কোনও ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করুন, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র প্রত্যবায় নাই!

সমস্যা-পূরণ-কবিতা।

(১)

কৃষ্ণনগরাধিপতি প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ মহারাজেন্দ্র-বাহাদুর সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহারাজের মত তদীয় সভাসদ-গণও পরম বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তদনুসারে তদীয় প্রপৌত্র মহারাজ শিরীশ চন্দ্রও বিদ্যার পরম সমাদর করিতেন। স্বকীয় কবি রস সাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয় স্বকীয় কবিত্ব-প্রভায় তাঁহার রাজসভা সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন প্রাতঃকালে মহারাজ শিরীশ-চন্দ্র রাজসভায় বসিয়া রস-সাগরের সহিত রসালাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক ঘাত ব্যাধি-গ্রস্ত ভদ্রলোক মহারাজের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ইনি মহারাজের পরম মিত্রপাত্র ছিলেন, এবং রস-সাগরেরও সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। মহারাজ তাঁহাকে বসিতে বলিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেমন আছেন?" তিনি বলিলেন, "মহারাজ! 'অমাবস্যা গেল, আবার পূর্ণিমা আসিল।'" তখন মহারাজ সহাস্য-বদনে রস-সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "রস-সাগর! 'অমাবস্যা গেল, আবার পূর্ণিমা আসিল',—এই সমস্যাটী এখনই পূর্ণ করিয়া দিন। প্রত্যুৎপন্ন-মতি রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ ইহা নিম্ন লিখিত রূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"অমাবস্যা গেল, আবার পূর্ণিমা আসিল।"

ওরে নিষ্ঠুর বিধি! কত খেলা খেল,
সংসার-যন্ত্রণা যত হাবাতের ঘাড়ে ফেল।
বেতো রোগী কেঁদে বলে কোন্ দিন বা ভাল,
'অমাবস্যা গেল, আবার পূর্ণিমা আসিল'। (ক)

(২)

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় কৃষ্ণনগর রাজবংশের যেরূপ সুনাম, সম্মান ও ঐশ্বর্য্য ছিল, মহারাজ শিরীশ-চন্দ্রের সময় সেরূপ ছিল না। তাঁহার সময়ে রাজ সংসারে বিষম আর্থিক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালে রামমোহন মজুমদার নামক এক ভদ্রলোক রাজবাটীর সর্ব্ব-প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি সুচতুর ও বুদ্ধিমান্। তিনি নানা কৌশলে রাজার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন এবং পাওনাদার দিগকে "দিব, দিচ্ছি" বলিয়া নানা কৌশল-সহকারে মিথ্যা আশ্বাস দিয়া রাখিতেন। এই সময়েই গ্রাউডিন্ নামক এক সাহেব, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ শিরীশ-চন্দ্রের যাবতীয় অঙ্কর ও দেবত্র ভূমি বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাহার উপরে কর সংস্থাপন করিতেছিলেন। মহারাজের এই দুঃসময়ে রস-সাগরের তিন চারি মাসের বেতন বাকী ছিল। তিনি মাসিক ত্রিশ টাকা করিয়া বেতন পাইতেন। মাসে মাসে তাহা প্রাপ্ত হইলে তিনি স্বচ্ছন্দে স্বীয় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। তৎকালে ত্রিশ টাকা বেতন পাইলে যে ভদ্রলোকের সংসার পরম-সুখে চলিত, এখন দুইশত টাকা বেতন পাইলেও সেরূপ সুখে সংসার চলে না। অর্থাভাবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া রসসাগর মহারাজের সভায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, প্রধান কর্ম্মচারী রামমোহন মজুমদার সে স্থানে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। রস-সাগর ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন, "আমার বেতন দিন।" তখন

(ক) "অমাবস্যা গেল, আবার পৌর্ণমাসী এল।"—এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্টিতে পাওয়া যায়।

মজুমদার মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আর মেনে পারি নে।" ইহা শুনিয়া মহারাজ রস-সাগরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া এই সমস্যাটী পূরণ করিতে বলিলেন। রস-সাগর এই ভাবেই ইহা পূর্ণ করিলেন (ক) :—

সমস্যা—"আর মেনে পারি নে।"

বাঁড়ি ফেলে শ্রী কেঁদে, শুধু বাঁড়ি পাতে বেঁধে,
বচনে রেখেছি বেঁধে, আশা ভঙ্গ করি নে।
সবে বলে মজুমদার, দয়া ধর্ম্ম কি তোমার,
তিনকড়ার পুরস্কার, তুণ বোধ করি নে।
খরচ চাই দণ্ড দণ্ড, না মেলে রজত-খণ্ড,
কোন-রূপে কর্ম্ম-কাণ্ড, ক্রিয়া-পণ্ড করি নে।
কোম্পানী কুপিত তায়, যাবণ সূর্য্য-উদয়,
মাটচিনের পূর্ণোদয়, বাঁচিও নে মরিও নে।
সকলি দুঃখের পড়া, এ রস-সাগরে চড়া,
শ্রীহরণ-ছাড়া ছাড়া, কারো ধার ধারি নে।
তিন দিকে তিন তেওয়া, কি হইবে অপরূপা,
কূল দাও মা জগদ্ধাত্রী, 'আর মেনে পারি নে'।

(৩)

একদা মহারাজ শিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে কহিলেন, "অদ্য আপনাকে একটী জটিল সমস্যা দিব।" রস-সাগর কহিলেন "কৃপা করিয়া দিন।" মহারাজ কহিলেন,—"অর্জ্জুন বালিকা বধূ, প্রৌঢ়া দুর্য্যোধন।" রস সাগরও জয়দ্রথ-বধের বিষয় লক্ষ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ ইহার পূরণ-পূর্ব্বক মহারাজকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"অর্জ্জুন বালিকা বধূ, প্রৌঢ়া দুর্য্যোধন।"

জয়দ্রথ-বধ হেতু অর্জ্জুনের পণ,
সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তারে করিব নিধন;
যদি না বধিতে পারি অনলে প্রবেশ করি'
জুড়াইব হৃদয়ের যতেক যাতনা।
শুনি অর্জ্জুনের পণ কুরুরাজ দুর্য্যোধন
শীঘ্রই সূর্য্যাস্ত হোক্—করিলা কামনা।
অর্জ্জুনের ইচ্ছা রয় সূর্য্যাস্ত বিলম্বে হয়
উত্তরে সূর্য্যের দিকে রাখিলা নয়ন।
বালিকা যা সন্ধ্যা চায় প্রৌঢ়া নারী চায় তায়
'অর্জ্জুন বালিকা বধূ, প্রৌঢ়া দুর্য্যোধন।'

(৪)

একদা মহারাজ শিরীশ-চন্দ্রের বয়স্ক-পুত্র যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র রস-সাগরকে কহিলেন, "অদ্য আপনাকে একটী সমস্যা দিব, কিন্তু আমাদিগের রাজবংশীয় কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া আপনাকে ইহা এখনই পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে।" সমস্যাটী এই :—"কারো ভাগ্যে সৌধ মাল, কারো সর্ব্বনাশ।" রস সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া যুবরাজ ও সভাস্থ সকল লোককেই মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন :—

[প্রস্তাব। স্বীয় পুত্র মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইলে মীরজাফর পুত্রশোকে অভিভূত হইলেন। তখন তাঁহার জামাতা মীরকাশিম তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ইংরাজদিগের আধিপত্য-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য মুরশিদাবাদ ত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ইংরাজের পরম শত্রু হইয়া উঠিলেন; এবং যাঁহাদিগকে ইংরাজের মিত্র বলিয়া জানিতেন, তাঁহাদিগকে তিনি নানা কৌশলে হস্তগত করিতে লাগিলেন। একদা নবাব, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে হুগলীতে আসিতে আদেশ দেন। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ওঁহারা নবাবের সহিত কথা কহিয়া শিবপুরের বোহারার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে নবাবের একজন দূত আসিয়া কহিল "মহারাজ, কি জন্য আপনাদিগকে পুনর্ব্বার ডাকিতেছেন।" মহারাজ ইহা শুনিবামাত্র কহিলেন, "এ ডাক ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না।" তখন তিনি শিবচন্দ্রের পরামর্শে পুনর্ব্বার হুগলী-যাত্রা করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র বন্দীকৃত হইয়া নৌযোগে মুঙ্গের-দুর্গে প্রেরিত হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া পিতা-পুত্রে কারাগারে বাস করিতে লাগিলেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে কাটোয়া, গড়িয়া ও উদয়নালা নামক স্থানে ইংরাজদিগের সহিত মীরকাশিমের যুদ্ধ হয়। এই তিন যুদ্ধেই ইংরাজদিগের জয় হইয়াছিল। নবাব এতদিন মুঙ্গেরে অবস্থান করিতেছিলেন। স্বীয় সৈন্যের পুনঃ পুনঃ পরাজয়-বার্ত্তা শুনিয়া তিনি রাজমহলে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সেখানেও পরাজিত হইয়া মুঙ্গেরে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। ইংরাজ-সৈন্যও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। গর্গিন নামক এক জন রণকুশল আর্ম্মাণী নবাবের সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার এক ভ্রাতা কলিকাতায় থাকিতেন। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ ভ্যান্সিটার্ট সাহেব তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাঁহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। ইহাতেই নবাবের পরাজয় ঘটে।

মীরকাশিম ইংরাজদিগের ভয়ে মুঙ্গের হইতে পাটনায় পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় সেনাপতি গর্গিনের বিশ্বাস-ঘাতকতায় ক্রোধান্ধ হইয়া বন্দিগণকে বধ করিবার আদেশ দেন। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও শিবচন্দ্র উভয়েরই সত্বর প্রাণ-সংহার করিবার অনুমতি দিলেন। যে সময়ে মুঙ্গের হইতে নবাবকে প্রস্থান করিতেই হইবে, কৃষ্ণচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। ঠিক সেই সময় তিনি অবসর হইয়া যাহাতে আপনাদের প্রাণদণ্ডের বিলম্ব ঘটে, তাহারই উপায় দেখিতে লাগিলেন।

যে সময়ে হতভাগ্য বন্দিগণের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রকাশ হইবে, তাহার ঠিক পূর্ব্বেই পিতাপুত্রে অনেকদিন অপেক্ষা বিশেষ সমারোহ সহকারে পূজা করিতে বসিলেন। উভয়েই অতি সুপুরুষ ও গৌরবর্ণ

(ক) "কিরীশ-বংশাবলী-চরিত"-রচয়িতা স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় এই পাদ-পূরণের সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিয়া গিয়াছেন, তাহারই তাৎপর্য্য এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

ছিলেন। বহু বিষয় বন্ধী থাকায় তাঁহাদের শত্রু, দেশ ও সখ সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গা-মৃত্তিকা লেপন এবং গলদেশে রুদ্রাক্ষ-মালা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয় পার্শ্বে ধূপ, ধুনা দীপ ও নৈবেদ্যাদি বিন্যস্ত ছিল। তাঁহারা এইরূপ সমারোহে ও আন্তরিক ভক্তি-সহকারে পূজা করিতেছেন, এমন সময়ে নবাবের প্রহরিগণ তাঁহাদিগকে বধ করিবার জন্য লইতে আসিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সকল-বদনে ও কাতর-স্বরে কহিলেন "বাপু সকল, একটু অপেক্ষা কর; আমরা ভক্তের মত ভগবানের পূজা করিয়া লই। পূজা শেষ হইলেই তোমাদের সঙ্গে যাইতেছি।" তাঁহারা পূজা করিতে লাগিলেন এবং প্রহরিগণ তাঁহাদের জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা পূজা শেষ করিবার জন্য যতই তাড়না করে, মহারাজ ততই বলেন, "এই শেষ হইল।" এ দিকে এইরূপ বিলম্ব হইতেছিল, অন্য দিকে নবাব সজ্জিগণ সহ পলায়ন করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই জন্য দুর্গ-মধ্যে একটা বিষম গোলযোগ ও কোলাহল উপস্থিত হইল। প্রহরিগণ নবাবের প্রস্থান দেখিতে ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল। কথিত আছে, এই সময়ে মহারাজ প্রহরিদিগকে বিলক্ষণ অর্থ-লোভ দেখাইতেও ত্রুটী করেন নাই। যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় পিতাপুত্রে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই দিন পিতাপুত্রে যে বেশে ও যে ভাবে মুঙ্গের দুর্গে পূজা করিতে বসিয়াছিলেন, তাহার অবিকল চিত্র কৃষ্ণনগর-রাজবাটীতে অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

যৎকালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও শিবচন্দ্র মুঙ্গের-দুর্গে অবরুদ্ধ ছিলেন, তৎকালে মুঙ্গের-দুর্গের কারাগারস্থ বন্দিগণের মৃত্যু-সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়াছিল। এই হেতু মহারাজের কনিষ্ঠ পুত্র শম্ভুচন্দ্র মনে করিয়াছিলেন যে, পিতা ও ভ্রাতা উভয়েই নবাবের আদেশে নিহত হইয়াছেন। তখন শম্ভুচন্দ্র পিতা ও ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করিয়া দিয়া পৈতৃক সম্পত্তি ও ধনাগার অধিকার করেন এবং মহা সমারোহে পিতার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। কিন্তু পরে তিনি যখন শুনিলেন যে, তাঁহারা উভয়েই মুঙ্গের হইতে মুরশিদাবাদে আনিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া পিতাকে একখানি পত্র লেখেন। শম্ভুচন্দ্রের লিখিত আচরণ দেখিয়া মহারাজ নিজ মুন্সী দ্বারা তাহার যথোচিত উত্তর লিখাইয়া স্বাক্ষরের নিম্নদেশে স্বয়ং এই কয়েক পঙ্‌ক্তি লিখিয়া দিলেন।*

সমস্যা—"কারো ভাগ্যে সৌখ মাস, কারো সর্ব্বনাশ।"

হস্তি-শুণ্ডে লক্ষ্মি দিলে ছাড়ান মুস্কিল,
কুশায় ভূমিতে বীজ কাড়ান মুস্কিল।
মনঃ-শিলা জানিলে ঘোড় লাগান মুস্কিল,
হাঁদোদিয়া বাঘিনেরে ভুলান মুস্কিল।
রসনীয় দরবারে কাশিম বসিয়া
কৃষ্ণচন্দ্রে আনিলেন ছলয় করিয়া।
শিবচন্দ্রে সঙ্গে করি' যাইলেন রাজা,
কে জানে তাঁহার ভাগ্যে ছিল এত সাজা!
"ইংরাজের চর তারা",—নবাব ভাবিয়া
রাখেন মুঙ্গের দুর্গে আবদ্ধ করিয়া।
"পিতা পুত্র উভয়েরে করহ সংহার",—
বীর-কাশিম এ আদেশ করেন প্রচার।
প্রাণ ভরি' পূজা করি' কালীর কৃপায়
পিতা পুত্র এড়ালেন এ বিষম দায়।
রাজপুত্র শম্ভুচন্দ্র ভাবিলেন মনে,—
দু-জনাই গিয়াছেন শমন-ভবনে।
আজ হতে আমি রাজা, রাজত্ব আমার,—
ইহা বলি' সাধারণে করেন প্রচার।
পিতার ভ্রাতার মৃত্যু শুনিয়া উল্লাস,
"কারো ভাগ্যে সৌখ মাস, কারো সর্ব্বনাশ।"

(৫)

রস সাগর মহাশয় কোনও এক মুদির দোকানে সংসার চালাইবার উদ্দেশে ধার করিয়া কিছু জিনিস খরিদ করিয়াছিলেন। রাজবাটীতে যথাকালে বেতন প্রাপ্ত না হওয়ায় তিনি উক্ত মুদির দেনা শোধ করিতে পারেন নাই। মনের ভয়ে তিনি মুদির দোকানের সম্মুখ দিয়াও যাইতেন না। কোনও কারণ-বশতঃ রস সাগর একদিন অতি প্রত্যূষে রাজ-সভায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এমন সময় মুদি আসিয়া তাঁহাকে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে অনেক বাগ্‌-বিতণ্ডা হইয়া গেল। মুদি তাঁহাকে দুই চারিটা কড়া কথা বলায় তিনি আপনাকে অত্যন্ত অবমানিত বোধ করিয়া রাজ-সভায় গিয়া বসিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ ক্রোধ-ভরে ও বিরস-বদনে বসিয়া আছেন, এমন সময় মহারাজ শিরীশ-চন্দ্রও সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রস-সাগরকে মলিন-মুখ ও আরক্ত-নয়ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! আজ আপনার এরূপ ভাব কেন?" তখন রস-সাগর কহিলেন, "মহারাজ! এক ব্যাটা মুদীর জ্বালায় অস্থির হইয়াছি। তাহার নিকটে ধার করিয়া কিছু জিনিষ-পত্র কিনিয়া সংসার খরচ করিয়াছি। টাকা দিতে না পারায় সে অদ্য প্রত্যূষে আমাকে বিলক্ষণ দশ কথা শুনাইয়া গেল। আপনার খাতাঞ্চী বদুমজুমদারও টাকা দিবার নাম করে না। এখন কি করি। মুদি ব্যাটা ত পাগল করিল!" ইহা শুনিয়া মহারাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ওজনে কমায় ব্যাটা রামেতে চড়ায়।" তখন রস-সাগর প্রাণভরিয়া মুদির গুণ-গ্রাম-বর্ণনা সহ এই সমস্যাটী তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"ওজনে কমায় ব্যাটা রামেতে চড়ায়।"

---

* স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় কৃত "কিতীশ-বংশাবলী-চরিত" হইতে সার সংগ্রহ করিয়া এই প্রস্তাব লিখিত হইল।

যদি ব্যাটাদের নাই কর্ম্ম-কাণ্ড-জ্ঞান,
যারা মুখে আসে বলে,—না রাখে সম্মান।
বেচিবার কালে বেণ ঘাড়ে চাপাইয়া,
আমারের কালে বসে মাথায় চাপিয়া।
জিজ্ঞাসিলে কোন কথা সদুত্তর নাই,
কথায় কথায় শুধু নিজের বড়াই।
মরমা বেচিলে ব্যাটা নীচে লেখে ঘৃত,
অড়র বেচিলে পুনঃ লেখে সেই মত।
বস্তা পচা সস্তা মাল কিনি কম দরে,
রাস্তায় রাখিয়া ব্যাটে আগুনের ঘরে।
সত্য কথা কারে বলে, নাহি তার জানা,
মিথ্যা কহিবার কালে কিন্তু ষোল আনা।
নিরীহ ভাড়ার মত তর্কেতে হারিলে,
প্রচণ্ড ষাড়ার মত তাহাতে জিতিলে।
গুঁড়ি আছে, মুড়ি নাই, চায় শুধু কড়ি,
কলসী না জোটে যদি, গলে দিস্ দড়ি।
হিসাব মিলায়ে লয় কড়ায় কড়ায়,
"ওজনে কমায় ব্যাটা ধামেতে চড়ায়।"

——— (ক্রমশঃ)

বঙ্গের সুকুমার-শিল্প-কলা

[শ্রীননীগোপাল গোস্বামী, চিত্রকলা-বিনোদ]

প্রমশিল্পের উন্নতি ও বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রতি আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের যেরূপ দিন-দিন দৃষ্টি পড়িতেছে, চিত্রাদি কলাবিদ্যার প্রতি, দুর্ভাগ্যবশতঃ, আজ পর্য্যন্ত সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে, নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, আমাদের ভাষার উন্নতিকল্পে একটা ইচ্ছা ও চেষ্টা দেখা গিয়াছিল। তাহার ফলে আমাদের ভাষা বর্ত্তমান সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। দেশবাসীর সাহিত্যানুরাগ ও লেখকদিগের সহিত তাঁহাদের সহানুভূতি ইহার মূল কারণ। কলিকাতায় আর্ট স্কুল স্থাপিত হইবার পর বহু বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু আমাদের কলাবিদ্যার কতটা উন্নতি হইয়াছে, তাহা কেহ কি কখন ভাবিয়া দেখেন?

কলা-সৌষ্ঠব-বিবর্জ্জিত জাতি ফল-পুষ্পবিহীন উদ্যান স্বরূপ! চিত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সৌরভ! এ সকল কথা আমাদের মনে স্থান পাইলে, এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট উন্নতি হইত। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে চিত্রাদি কলাবিদ্যার বিশেষ আদর ছিল; কিন্তু, এক্ষণে এ সকলের প্রতি কাহারও কোন আস্থা আছে বলিয়া বোধ হয় না। কেবলমাত্র সখের জিনিস ও আসবাব-পত্রের সহিত তুল্য বিবেচনা করিয়া, আলোচনা অনাবশ্যক জ্ঞানে, অনাদৃত ভাবে ঘরে ফেলিয়া রাখিবার বিষয় ইহা নহে। অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় যথোচিত ভাবে ইহার আলোচনা ও ইহার প্রতি অনুরাগ ব্যতীত কখনই ইহার উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। ঐতিহাসিক চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া, জাতি ও ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়া, এবং সৌন্দর্য্যানুশীলন দ্বারা লোক-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া যে বিদ্যা জাতীয় সভ্যতার পরিচয় প্রদান করে, তাহাকে উপেক্ষা করা কোন মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। আমরা অন্যান্য নানা বিষয় লইয়া আপনাদের মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে ব্যস্ত, কিন্তু প্রকৃতির যাবতীয় বস্তুর বাহ্যিক শোভা ও আভ্যন্তরিক ভাব যে বিদ্যার দ্বারা পরিস্ফুটমান হয়, তাহার আলোচনা ও অনুশীলন হইতে বিরত থাকা আমাদের কোনমতে কর্ত্তব্য নহে।

সৃষ্টির আশ্চর্য্য কৌশলে বিধাতা আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তু সকলে, প্রয়োজনীয়তার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইয়া প্রদান করিয়াছেন, এবং মানুষকেও সৌন্দর্য্যপ্রিয় করিয়া গড়িয়াছেন। সৌন্দর্য্যের আকর্ষণী শক্তির প্রভাব মনুষ্য-চিত্তের উপর বড় কম নহে। সৌন্দর্য্যের অনুশীলন ও উৎকর্ষ-সাধন হইতে কলাবিদ্যার উৎপত্তি। ইহা আমাদের বহু প্রকারে হিতকর। অবশ্য কলাকুশলিগণ যেমন আপনাদের কার্য্য-নৈপুণ্যে কলাকে উন্নত করিয়া জনসাধারণের রুচি মার্জ্জিত করিয়া থাকেন, তেমনই আবার জনসাধারণের সহানুভূতি ও কলানুরাগ ব্যতীত সে কার্য্য সাধন করা তাঁহাদিগের পক্ষে কঠিন। উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাইলে কেহ কখন কোন বিষয়ে সুফল প্রদর্শন করিতে পারেন না; এবং তাহার অভাবে বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। যতদিন জনসাধারণ ও শিক্ষিত সমাজ কলাবিদ্যার প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া তাহার আলোচনা ও অনুশীলনে প্রবৃত্ত না হইতেছেন, ততদিন আমাদের জাতীয় কলার উন্নতির কোন আশা দেখি না। অনেক শিক্ষিত ও পূজনীয় মহোদয়গণ,—কলা সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই বুঝেন না এই হেতু প্রদর্শনপূর্ব্বক,—কলানুশীলন, এমন কি তাহার আলোচনায় পর্য্যন্ত প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের জাতীয় কলার প্রতি অবজ্ঞা-সূচক বলিয়াই মনে হয়।

আমাদের বিশ্বাস যে, ইচ্ছা করিলে তাঁহারা উহা অতি অল্প চেষ্টাতেই বুঝিতে পারেন। অবশ্য, বোধশক্তি ভগবান সকলকে সমান ভাবে দান করেন না; এবং যে কয়জনকে তাহা দেন, তদপেক্ষা অল্পলোককেই প্রকৃত রসজ্ঞ করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্বাপেক্ষা অল্প লোককেই সেই রস-বিকাশের শক্তি প্রদান করেন। কিন্তু, শিক্ষা ও অনুশীলন দ্বারা প্রত্যেকেই আপন-আপন শক্তিকে যথেষ্ট বর্দ্ধিত করিতে পারেন। শিক্ষার কার্য্য শক্তির প্রসার বৃদ্ধি ও প্রবৃত্তিকে উন্নত করা। যতদিন শিক্ষা আমাদের মধ্যে কেবল অর্থকরী হিসাবে থাকিবে, ততদিন কিছুতেই আমাদের সমাজের উন্নতি নাই; এবং শিক্ষার মূল-মন্ত্র যে আমরা অবগত হইতে পারি নাই, তাহা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে। জাতীয় শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীন ও সর্ব্বতোমুখী হওয়াই বিধেয়। একটা জাতির শিক্ষা বিষয়ে সকল দিক্ দেখা আবশ্যক; একদিক্ বাদ দিয়া অন্য দিক্ লইয়া থাকিলে জাতীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না। একটা জাতি যখন নানা লোকে ও নানা সম্প্রদায়ে গঠিত, তখন তাহার শিক্ষাও নানা দিকে ও নানা বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

যে শিক্ষা, সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান ও সমস্ত শিল্পকলার মূলতত্ত্বের জাতীয় সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করে, তাহাই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা। শিক্ষা ও বিদ্যার কোনও বিষয়, বিভাগ, এমন কি কোন অংশটিকে পর্য্যন্ত হেয়জ্ঞানে পরিত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমার ভাল লাগিল না বলিয়া কোন বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা অন্যায়। কোন কিছুর প্রয়োজন নাই, এ কথাও বলা চলে না; বিশেষতঃ যখন, অভাবপূরণই উন্নতির মূল।

পূর্ব্বে আমাদের 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের' 'প্রবেশিকা পরীক্ষায়' 'রেখাঙ্কন' (Drawing) স্বেচ্ছাধীন (Optional) ভাবে থাকাতে কলাবিদ্যা-জ্ঞানলাভের পক্ষে ইহা যৎসামান্য হইলেও, ছাত্রগণের শিক্ষাকর্ষণ হওয়ার যথেষ্ট উপকার হইতেছিল। কিন্তু উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সরস্বতীর চরণের নিগড় স্বরূপ বোধ করিয়া ইহাকে দূরীভূত করিয়া দেওয়াতে, ছাত্রগণ ইহার প্রতি আর সেরূপ আস্থা প্রদর্শন করে না; তথাপি যে যে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ, ছাত্রদিগের পক্ষে ইহার অনুশীলন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, এখনও 'রেখাঙ্কন' বিষয়টি স্কুলে রাখিয়াছেন, সেই সেই স্কুলের ছাত্রগণ ঐ বিদ্যা শিক্ষার সময়টুকু অবসর (leisure hour) বলিয়া মনে করে; ইহা কম দুঃখের বিষয় নহে। রেখা অর্থবোধক। 'রেখাঙ্কনের' একটা বিশেষ উপকারিতা আছে। যেমন কথার দ্বারা আমার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া অপরকে বলিতে পারি, এবং লিখনদ্বারা সেই ভাব আমার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও অপরে জানিতে পারে—'রেখাঙ্কন' ঠিক, সেইরূপ, আমরা বস্তুর যে আকৃতি দেখি, তাহা অন্য আর কোন প্রকারেই প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। চক্ষু দিয়া বস্তুটি সঠিক দেখা এবং হস্তদ্বারা রেখা টানিয়া তাহার যথার্থ ভাবটি আকৃতি দানে প্রকাশ করাই 'রেখাঙ্কনের' কার্য্য। 'রেখাঙ্কন' জ্ঞান ব্যতীত, বস্তুর আকৃতির সঠিক প্রকাশ ও অঙ্কিত রেখা হইতে তাহার যথাযথরূপ আকৃতি উপলব্ধি করা যাইতে পারে না। প্রকৃতির যে কোন বস্তুর যথার্থ আকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি ইহার দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। তাবিয়া দেখিলে আমাদের লিখিবার অক্ষরগুলিও রেখাঙ্কনের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে। যেমন কথা ও শব্দের ঝঙ্কারমাধুর্য্য হইতে সঙ্গীতের, সেইরূপ রেখা ও বর্ণের সৌন্দর্য্যবিন্যাস হইতে চিত্রের উৎপত্তি। চিত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্যের মধ্যে অঙ্কিত রেখা না থাকিলেও রেখা-সন্নিবেশের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া আপনাদের গঠন প্রাপ্ত এবং ভাব প্রকাশে সমর্থ হয়। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা 'রেখাঙ্কন' ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না।

অনেকের আন্ত বিশ্বাস আছে যে, চিত্রাদি দেখিলেই তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারা যায়; এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন শিক্ষার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কাব্যাদির রসগ্রহণ সম্বন্ধে লোকের সেরূপ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাষাবিজ্ঞ কোন এক ব্যক্তিকে কোন কাব্য পাঠ করিয়া শুনাইলে, সে যে তাহার রস ঠিক উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা বোধ হয় না। কেন না, কাব্য-রচনার একটা প্রণালী আছে, যাহার দ্বারা তাহার সমস্ত ভাব প্রকাশিত হয়। সেই প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে কি করিয়া তাহা বুঝিতে পারা যাইবে? ভাষার ভাষা, ছন্দ, ভাব ঠিক তত মানুষের সচরাচর কথাস্বরূপ নহে। মানুষ শোকে যেরূপ চীৎকার করে, অথবা সুখে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করে, এবং সাধারণতঃ যেরূপ কথা কহে, কাব্যের নায়ক নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রগণ ঠিক সেইরূপ করে না। তাহারা কবির ভাষায় একটা বিচিত্র উপায়ে সেই ভাব ব্যক্ত করে। অতএব, ভাষাজ্ঞান ভিন্ন যেমন কাব্য এবং সুর তাল-লয় বোধ ব্যতীত যেমন সঙ্গীত উপলব্ধি করা কঠিন, অনুশীলন ব্যতীত সেইরূপ চিত্রাদির ভাব ও সৌন্দর্য্য উপভোগ করাও সম্ভবপর নহে।

'কলানুশীলন-মন্দির' (Academy of Art) কলানুশীলন ও সাধারণের মধ্যে জাতীয় কলার একটা আদর্শ স্থাপন করে, এবং উভয় পক্ষই ইহার দ্বারা যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহা যেমন একপক্ষে অনুশীলন-মন্দির, আবার তেমনই অপর পক্ষে ইহা শিল্পী ও সাধারণের সম্মিলন-স্থল। শিল্পিগণ এখানে সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের সহিত ভাব-বিনিময় এবং আপনাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া জাতীয় কলার উন্নতি সাধন করেন। ইহার আনুষঙ্গিকে শিল্পাগার, পুস্তকালয় এবং শিল্পবিদ্যালয় অবস্থিতি করে; এখানে শিল্পিদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য নানা তথ্যপূর্ণ শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধাদি পঠিত হয়। ইহার প্রদর্শনীতে তাঁহাদের চিত্রাদি প্রদর্শিত এবং ইহা হইতে কলাসম্বন্ধীয় পত্রিকাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই মন্দির কলানুশীলীদিগকে উপাধির দ্বারা ভূষিত করিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত করে এবং তাঁহাদিগকে সাধনা ও অনুশীলন-নিরত থাকিতে বহুপ্রকারে সাহায্য করিয়া থাকে। সাধারণের রুচি পরিমার্জ্জিত করিয়া ইহা নানা উপায় ও বিধি অবলম্বনে জাতীয় কলাকে উন্নত করে। এইরূপে একটি কলা-মন্দিরের অভাবেই এ পর্য্যন্ত আমাদের জাতীয় কলা কোন উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

কলিকাতা ও দার্জ্জিলিঙ্গে মধ্যে-মধ্যে কলা-প্রদর্শনী (Art Exhibition) হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা ঐরূপ উদ্দেশ্যে স্থাপিত কোন মন্দিরের সহযোগে হয় না। তাহা যে সংস্পর্শে হয়, তাহা একেবারে জাতীয়-ভাববিবর্জ্জিত বলিলেও চলে। জাতীয় কলার উন্নতি জাতিরই আলোচনার বিষয়। বঙ্গভাষার বা বঙ্গীয় কাব্যের উন্নতি যেমন বাঙ্গালীর দ্বারাই সম্ভব, কোনও বিজাতীয়ের দ্বারা হইতে পারে না, সেইরূপ, জাতীয় কলার উন্নতি সেই জাতীয় ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারা সাধিত হইবার নহে। এখন এ প্রদেশের কলা-সম্বন্ধে একমাত্র দেবতা ব্রাউন (Mr. Brown) সাহেব; এবং বোধ হয় 'গবর্ণমেণ্ট আর্ট এ্যাড্‌ভাইসরি কমিটি' (Government Art Advisory Committee) নামে একটা অচল বস্তু, সরকারী তরফ হইতে খাড়া আছে। তাঁহাদিগের সহিত দেশীয় কলার ও শিল্পিদের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা জানি না। দুই-একজন ধনবান সখের (Amateur) শিল্পী ব্যতীত অন্যান্য দরিদ্র শিল্পিকুলের সহিত তাঁহাদের বোধ হয় কোন সম্বন্ধ নাই। দেশীয় কলা ও শিল্পীদের অবস্থা সম্বন্ধে বিনা অভিজ্ঞতায়, তাঁহারা কোন পরামর্শ প্রদান করিতে

পারেন বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের জাতীয় কলার উন্নতির জন্য তাঁহারা কি পরামর্শ প্রদান করিতেছেন এবং উক্ত নাম ধারণ করিয়া তাঁহাদের অবস্থিতির হেতু যে কি, তাহাও সাধারণে বড় একটা অবগত নহে। শিল্পীর দ্বারাই শিল্পের উন্নতি হয়। শিল্পানভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা গঠিত সমিতি হইতে, শিল্পিদের সহায়তা করা ব্যতীত, অপর কিছুই আশা করা যাইতে পারে না। যে সভা, সমিতি বা ব্যক্তি সাধারণ শিল্পিকুল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘুরে অবস্থিত এবং দেশীয় শিল্পবিষয়ে অভিজ্ঞতাবিহীন, তাহাদের হাতে জাতীয় কলার উন্নতির ভার কোন ক্রমে ন্যস্ত হওয়া উচিত নহে। ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের সংখ্যাই অধিক; এবং সেই দারিদ্র-দোষই যদি কোন প্রতিভাবান শিল্পীর প্রতিষ্ঠা লাভের পক্ষে বাধা স্বরূপ হয়, তাহা হইলে কখনই আমাদের জাতীয় কলার উন্নতির আশা নাই। এই সকল এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ, সকল অবস্থায় শিল্পীদের লইয়া, তাঁহাদের অভাব অভিযোগ জ্ঞাত হইয়া, তাঁহাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া, জাতীয় কলার মঙ্গল কামনায় বঙ্গদেশে একটি 'কলা-মন্দির' (Academy of Art) স্থাপন করা আবশ্যক। আমাদের ছাত্রদিগের কলাবিদ্যা শিক্ষার জন্য এ দেশের শিল্পবিদ্যালয়গুলির শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সংস্কারের প্রয়োজন—এ কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আমরা উক্ত প্রকার একটি কলা মন্দির স্থাপনার চেষ্টা করি। গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টার স্বর্গীয় অবনীপ্রনাথ বাগচী মহাশয়, আমরা এই কার্য্যে ব্রতী হইলে, সভাপতিরূপে আমাদের সহিত যোগ দান করেন। একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—উহার নাম দেওয়া হয় 'বঙ্গীয় কলা-সংসদ্'। ইহার প্রথম অধিবেশনে বঙ্গের বহু শিল্পী ও কলাবিদ্ সমবেত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে যাঁহাদের লইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছিল তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল;—বাবু অবনীপ্রনাথ বাগচী মহাশয়—সভাপতি, বাবু অমলিকুমার মুখোপাধ্যায়—সহকারী সভাপতি, বাবু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সম্পাদক, বাবু মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী ও বাবু যোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত সহযোগী সহকারী সম্পাদক, বাবু যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হরিনারায়ণ বসু, বাবু বরদাকান্ত দত্ত, বাবু পরেশনাথ সেন, বাবু সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যামিনী প্রকাশ গাঙ্গুলী, বাবু অর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী, বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক, সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। স্বর্গীয় আশুতোষ ধাসের নাম ইহার মধ্যে না থাকিলেও তিনি আমাদের সহিত সকল কার্য্যে যোগদান করিতেন এবং এই সমিতির একজন প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর চিত্রকলাবিদ্ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অপরিণত বয়সে প্রাণত্যাগ না করিলে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কিন্তু কি দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজ সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে সেরূপ ভাবে জানে না। পরে কোন কারণ বশতঃ উক্ত 'কলা-সংসদ্' সাধারণের গোচরে আসিবার পূর্ব্বেই তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহার কিছু কাল পরে 'ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটি অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট' (Indian Society of Oriental Art) নামক সমিতি স্থাপিত হয়—তাঁহারা ভিন্ন মতাবলম্বী। জাতীয় কলার উন্নতি বিভিন্ন পন্থায় হইয়া থাকে; কেহ কখন বলিতে পারেন না যে—'এই পথে সিদ্ধি, অন্য পথে নাই'। যাহা হউক, তাঁহারা আপনাদের মধ্যে আপনাদের মতানুযায়ী কার্য্য করিতেছেন। উহা অবনীন্দ্র বাবু এবং তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের জন্য—অন্যের সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। অন্য সম্প্রদায়ের মতামত তাঁহাদের নিকট অগ্রাহ্য।

অবনীন্দ্রবাবু যে একজন মহা প্রতিভাবান্ শিল্পী, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই এবং তাঁহার উপর আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে। তাঁহার সহিত কলা সম্বন্ধে অনেক সময় আলোচনা করিয়া পরিতোষ লাভ করিয়াছি। তাঁহার উত্তেজনায় ভারতীয়-চিত্রকলা পদ্ধতি' অবলম্বন করিতে একবার অগ্রসর হইয়াছিলাম—কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গের কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তির পরামর্শে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করি। কলাবিদ্যা সম্বন্ধে প্রায় বিংশতি বৎসরব্যাপী আলোচনা ও অনুশীলনের ফলে যেটুকু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে এ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে। তাহা কলাবিৎ পণ্ডিতদিগের পক্ষে বৎসামান্য বিবেচিত হইলেও, শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপকারে আসিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। কলা-রচনা-তত্ত্বে ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় এই দুই পদ্ধতি লইয়া যখন মহা সংশয় উপস্থিত, তখন শিক্ষার্থীরা কোন্ পথ অবলম্বন করিবে, তাহার সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাহাদের পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার নহে। দেশীয় কলাও কোন্ পথে অগ্রসর হইবে, তাহাও ভাবিবার বিষয়;—কারণ, শিক্ষার গতি যেই দিকে, সিদ্ধির পথও সেই দিকে। এখন তবে 'ভারতীয় পদ্ধতি' ছাড়িয়া দিয়া প্রথমতঃ দেখা যাউক, চিত্রকলার কি পদ্ধতি;—পরে সে বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে। একটি সমতল ক্ষেত্রের উপর কোন একটি বিষয় অঙ্কিত করিয়া উহার ভাব প্রকাশ করাই চিত্রের উদ্দেশ্য। বিষয়টিতে যে যে বস্তু থাকিবে, ঐ সমতলক্ষেত্রের উপর তাহাদের যথানুরূপ আকৃতি ও গঠন প্রদান করিয়া, তাহাতে সৌন্দর্য্য সন্নিবেশপূর্ব্বক বিষয়টির ভাব ব্যক্ত করাই চিত্রকলা। যে উপায়ে উহা ব্যক্ত করিতে হয়, তাহাই চিত্রকলার পদ্ধতি বলিয়া আমরা জানি। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় পদ্ধতি, জাপানী পদ্ধতি বা য়ুরোপীয় পদ্ধতি কি, তাহা আমাদের মস্তিষ্কে আসে না। অবশ্য ভারতবাসীর ভাব, ভঙ্গী—আকার, প্রকার অন্য জাতি হইতে বিভিন্ন; কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার পদ্ধতি স্বতন্ত্র হইতে পারে না এবং হইবারও নহে। হরিষোষের মূর্ত্তি আঁকিতে যদি কেহ জেম্‌সের (James) মূর্ত্তি আঁকেন, তাহা হইলে সেটা হাস্যকর ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু জেম্‌সের চিত্র অঙ্কিত করিতে যে পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, হরিষোষের ছবিতেও তাহাই করিতে হইবে। ভাব-ভঙ্গী, আকার-প্রকার, পোষাক, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্নতা থাকিলেও—অঙ্কন বা 'রচনা তত্ত্বে'

(Techniques) জাতীয়তা-বিবর্জিতও নাই। আমাদের জাতীয় রীতি নীতি বজায় রাখিয়া যে কোন জাতির নিকট শিক্ষা বা জ্ঞান লাভার্থে যখন করিয়া আমরা তৎসংগ্রহে জাতীয় কলার পুষ্টি সাধন করিতে পারি। মহামান্য বঙ্গের লাট বাহাদুর Lord Ronaldshay এ সম্বন্ধে 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে' (University Institute) ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান কালে যাহা বলিয়াছিলেন, দেশবাসীর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"That you should bring to bear upon the Western teaching, that you receive a discerning and discriminating mind. You may benefit enormously by the arts and the science of the West, but believe me, it is not necessary in order that you should so benefit that you should cut yourselves entirely adrift from your own paths • • • • It does not follow that because a Bengali artist studies anatomy on Western lines he need, when he sits down to paint a portrait, divest himself on the artistic conceptions of his own country. Far from it. He may be a better artist by reason of the fact that he has made a scientific study of anatomy, but at the same time he need not divest from his painting the spirit of his own people."

'ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির' প্রশংসা প্রকৃত রস-উপলব্ধি হইতে বিচ্যুত নহে। 'ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি' নামে একটি কাল্পনিক বস্তু গতির আবিষ্কার হইয়াছে। আবিষ্কারে কর্ত্তাদিগের স্মরণ থাকা উচিত যে, নিরাকার পদার্থ চিত্রের বিষয় নহে এবং হইতে পারে না। চিত্র সাকার পদার্থ ভিন্ন ভাব প্রকাশে অসমর্থ। ভাব-মাধুর্য্যই চিত্রের প্রাণ, কোন 'সাঙ্কেতিক-চিহ্ন' (Symbolic feature) নহে। স্বাভাবিক রচনার পরিবর্ত্তে 'ভারতীয় চিত্রকলায়' 'প্রথা-নির্দ্দেশিত গঠনাকৃতি' (Conventional Forms) দ্বারা, চিত্রে উচ্চভাব বা মেহভাব আনয়ন করা অসম্ভব। কারণ, 'নির্দ্দেশিত-প্রথা, (convention) অপেক্ষা 'স্বাভাবিক' ভাবের রচনায় ভাব অধিক পরিস্ফুট হয় এবং বিশেষ রকম একটা কুহক সৃষ্টি না করিয়া, আমাদের মনে একটা নির্দ্দিষ্ট ভাব আনিয়া উপস্থিত করে। 'স্বভাব' (Nature) না আঁকিয়া 'স্বভাবের আত্মা' (Spirit of the Nature) আঁকিতে যাওয়া শুধু অক্ষমতার অপব্যবহার নহে, ধৃষ্টতার পর্য্যায়! কল্পনাকে যতই যোগাসিদ্ধ কর না কেন, চিত্রে তাহাকে স্পষ্ট, সত্য, দৃষ্ট এবং অবয়ববিশিষ্ট করিয়া আঁকিতে হইবে। চিত্রের অস্পষ্টতা কাব্যের অস্পষ্টতার ন্যায় ঘৃণনীয়। আমাদের এমন শক্তি নাই যাহাতে আমরা বাস্তবজগতের সহিত একেবারে সম্বন্ধবিহীন হইয়া কেবলই মানস-বৃদ্ধি-সম্ভূত ভাবরাজ্যে উড়িয়া বেড়াইতে পারি। 'প্রকৃতি-দেবীই' সর্ব্ববিধ উদ্ভাবনার জননী—এবং শিল্পী আপনার বুদ্ধি বিদ্যার দ্বারা 'প্রকৃতির' বহির্ভূত অদ্ভুত কিছুই সৃষ্টি করিতে পারেন না। শিল্পীর শিল্পকার্য্য 'প্রকৃতির' অনুসরণে যেরূপ কৃতকার্য্য হয়, তাহা দেখিয়াই তাঁহার গুণাগুণের বিচার করা যায়। শিল্পীর মানসগৃহীত সূক্ষ্ম ভাব (Abstract thought) কোন ক্রমেই কোন বস্তুর স্বাভাবিক আকৃতি বিকৃত করিতে এবং স্বভাবের মধ্যে মানুষ যাহা দেখিয়াছে তাহা ব্যতীত, অন্য কিছুই কল্পনা করিতে পারে না। শিল্পী তাঁহার শিল্প-রচনায় সৌন্দর্য্য অথবা দেবভাব বিকাশের জন্য, স্বভাবের কোন অংশ গ্রহণ করিয়া অংশ বিশেষের পরিত্যাগ, এক অংশের সহিত অপরাংশের সংযোগ, এবং কাহারও বা মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তিনি, কোন বিধি পদ্ধতির দ্বারা কাহাকেও তাহার স্বাভাবিকত্ব হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন না। 'স্বভাবকে' যে মূর্ত্তিতে আমরা দেখি, স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বনে তাহা অঙ্কিত করিতে হইলেও, তাহার স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখা চাই। স্বভাব হইতে যাহা কিছু বিচ্যুত হইবে, তাহাই অসঙ্গত এবং দূষণ হইয়া পড়িবে। রাজা দুষ্মন্ত অঙ্কিত শকুন্তলার চিত্রের স্বাভাবিকতার জন্য রাজ-বয়স্য যেখানে দুষ্যন্তি করিতেছেন, সে স্থল পাঠ করিলে, আমাদের পুরাতন ভারতীয় চিত্রকলার একটা উদাহরণ পাওয়া যায়। বিদ্যাটীয় ও 'বিলাস-শিল্পের' (Decorative Art) প্রভাব বর্জ্জিত পুরাতন 'প্রত্নরাশি' হইতে এবং 'অজন্তার' চিত্রাবলী হইতে বেশ বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে আমাদের শিল্পে স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখা প্রতি শিল্পীদের সবিশেষ লক্ষ্য ছিল।

আমাদের পুরাতন চিত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্যের উপরই ভারত শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত। ইহা কোন নবাবিষ্কৃত দুর্ব্বোধ্য ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতে পারে না। ভারতের পুরাতন চিত্রাবলী ও প্রস্তরে গোদিত মূর্ত্তিনিচয় দেখিলে, আমাদের কলার গতি উন্নতির যে অর্দ্ধ পথে রুদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। মিসর ও য়ুরোপীয় অতি পুরাতন চিত্র, ভাস্কর্য্যাদির সহিত ইহার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। য়ুরোপ পরে বিজ্ঞানাদির ন্যায় কলাবিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছে এবং পুরাতনের সেই গতি ছাড়াইয়া স্বাধীন ভাবে মুক্ত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বহু উর্দ্ধে অবস্থান করিতেছে। একটু মনোযোগের সহিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের কলা রুদ্ধগতি হইয়া যেখানে পড়িয়া আছে, য়ুরোপীয় কলা-বিদ্যা তাহার পূর্ব্বাবস্থা হইতে ভবিষ্যতে আনিয়া ক্রমে আরও বহু উর্দ্ধে উন্নত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। কলাবিদ্যা যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, ততই বিধি ও নিয়মের উপর আপনার ভিত্তি দৃঢ় করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এই বিধি ও নিয়মগুলিই য়ুরোপীয় কলানুশীলন ও সাধনার ফল। এই বিধি ও নিয়মগুলি না জানা অথবা না মানাই কি 'ভারতীয় কলা পদ্ধতির' যাহাদ্বারা রক্ষণ?

ভারতীয় চিত্রে দেখিতে পাই, বিষয়-সমষ্টির ও পাত্র সমাবেশের যথা তাঁহে সমস্ত স্থান সংরুদ্ধ হইয়া একত্রে পরস্পরের সহিত এরূপ

জড়াইয়া গিয়াছে যে দর্শকের চোখ হারিয়া দৃষ্টিকে বিশ্রাম দিবার একটু স্থান কাঁক পড়িয়া নাই। সেই পাত্রসমাবেশ ও বিষয়-সমষ্টির মহা গোলমালের মধ্যে পড়িয়া সকলেই যেন হারাইয়া গিয়াছে। আবার যেখানে তাহারা চিত্র মধ্যে পৃথক ভাবে অঙ্কিত, সেখানে তাহারা পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবিহীন। চিত্রস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও কোন স্বতন্ত্রতা নাই, তাহাদের সকলের মুখ যেন এক ছাঁচে ঢালা, এবং চিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কি, তাহা সহজে বুঝা যায় না। ভারতীয় চিত্রে বিকৃত ভাবের পরিহার, স্বাভাবিকতার সংরক্ষণ, চিত্রস্থিত বিষয়গুলির মধ্যে যেখানে যেটি যেরূপ থাকা যায়, সেইরূপ দিয়া চিত্রের গঠন ঠিক রাখিয়া পাত্রপাত্রী ও অন্যান্য বিষয়ের সমাবেশ, তাহাদের অনুপাত বা পরিমাণের নির্ভুল নিদর্শন (Perspective) 'পরিপ্রেক্ষিত' বিজ্ঞানের নিয়মাধীনে রচিত হইয়া বস্তুগুলির গঠন, অবস্থান, দূর-নিকট সম্বন্ধ প্রভৃতির দ্বারা তাহারা আমাদের চক্ষের সম্মুখে যেরূপ প্রতীয়মান হয় তদনুরূপ বিন্যাস; আলোক-ছায়া ও প্রতিচ্ছায়ার-প্রতিবিম্বে প্রতিফলিত বস্তু সকলের যথানুরূপ পূর্ণ বিকাশ; (Chiaroscuro) বা 'পরিস্ফুটচ্ছায়তার' আলোকপাতের প্রশস্ত ব্যবহার দ্বারা চিত্রের প্রধানাংশের উজ্জ্বলতা ও অপ্রধানাংশের ছায়াচ্ছন্নতা প্রদর্শন; বস্তুবিচারের বর্ণের আলোক-স্নাত ভাব; এবং (Chromatic Scale) 'বর্ণক্রম-ধারা' অনুযায়ী বর্ণ-সমন্বয়ে 'ঐক্য ও বৈষম্য সম্বন্ধ বিধান' (Harmony and Contrast of Colours) একেবারে দৃষ্ট হয় না। পুরাতন শিল্পের রক্ষা আবশ্যক, কিন্তু তাহার পুনরানুকরণ বৃথা। অবনীন্দ্র বাবু এবং তাঁহার ছাত্রবৃন্দের অঙ্কিত চিত্র ঠিক পুরাতন ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত নহে। তবে তাঁহারা তাহার কতকগুলি দোষ রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন, যথা—বর্ণের মলিনতা, চিত্রের অস্পষ্টতা, রেখার অস্বাভাবিকতা ইত্যাদি। তাহা না রাখিলে 'ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতিতে' অঙ্কিত চিত্র বলা চলে না। কেবল 'ভারতীয় প্রথায়' আপনাদের আবদ্ধ রাখিতে তাঁহারা এত ইচ্ছুক, তাঁহাদের চিত্রেও ভারতীয় ভাব ব্যতীত য়ুরোপীয়, জাপানী, এমন কি তাঁহাদের বিলুপ্তিবিষয়ক চিত্রেও, মোগলাই ভাব—অজ্ঞাতসারে আসিয়া তাঁহাদের চিত্র বিশেষভাবে প্রভাবে ছুই করিয়া ফেলিয়াছে। 'ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির' একনিষ্ঠ উপাসক হইয়াও, এত গণ্ডির মধ্যে থাকিয়াও —যদি তাঁহাদের এবং অবনীন্দ্রবাবুর মতন প্রতিভাবান শিল্পীর এই পরিণাম হয়, তবে জলপানার্থে কূপ খনন না করিয়া য়ুরোপীয় শিল্পের বিধি ও নিয়মগুলি লইলে কি দোষ হইতে পারে? আর এক কথা,—অবনীন্দ্র বাবুর চিত্রের যাহা গুণ, তাহা তাঁহার কল্পনা, ভাব ও নিপুণতায়; কোন পদ্ধতিবিশেষের নহে। আর পদ্ধতি?—য়ুরোপীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি শিক্ষা না করিয়া এবং তদ্দ্বারা ভারতীয় পদ্ধতির উন্নতি সাধন না করিয়া, যদি তিনি শুধু অন্ধ অনুকারকের কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে কেহ তাঁহার চিত্র দেখিত কি না সন্দেহ। 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি' শুনিতে বেশ, যেন আমাদের একটা জাতীয় জিনিস। কিন্তু আসলে ইহা কি? তাহার কথাই বল, আর শিল্পের বিষয়েই বল,—কাহাকেও আবদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার উন্নতি নাই। মুক্তিবাদ বাঙ্গালায় একজন বড় কবি, কিন্তু তাঁহার ভাবকে আদর্শ করিয়া রাখিলে কখনও কি বঙ্গীয় কাব্যের উন্নতি হইত? সঙ্কীর্ণতায়, আবদ্ধতায় উন্নতি নাই। উদার, মুক্ত, স্বাধীন ভাবই উন্নতির মূল। বিবিধ জাতির সংস্পর্শে না আসিলে যেমন জাতীয় উন্নতি নাই, সেই রূপ, বিবিধ জাতির সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত জাতীয় কলার উন্নতি অসম্ভব। আমাদের কলাসম্বন্ধীয় আলোচনা ও অনুশীলন পৃথিবীর উন্মুক্ত, প্রশস্ত ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবে; এবং পুনরায় আমরা মহামান্য লাট বাহাদুর Lord Ronaldshayর পূর্ব্বোক্ত উক্তির অপরাংশ উদ্ধৃত করিয়া ইহার সমর্থ করিতেছি:—

"I would beg you, each man according to his ability, to play his part in weaving the golden threads of Indian idealism into the more sombre way of Western empiricism, for in that way he will play his part, a worthy part in weaving under Providence that great cosmic pattern which embodies strivings and achievements and which represents the evolution not of this country or of that country, not of this race or of that race, but of mankind."

পরিশেষে, বঙ্গের সর্ব্বসাধারণ—শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও সম্ভ্রমিপন্ন মুসলমানদিগের সহানুভূতি ও সহায়তা, এবং সরকার বাহাদুরের কৃপা-দৃষ্টি ভিক্ষা করিয়া একান্তভাবে নিবেদন করিতেছি, যেন তথা-কথিত 'ভারতীয় পদ্ধতির' মিথ্যা কুহক হইতে রক্ষা পাইয়া আমাদের 'জাতীয় কলা' স্বাধীন, মুক্ত, সত্য পথে উন্নতিলাভের জন্য বৃহৎপথে অগ্রসর হয়! আমাদের এই সম্বন্ধে যাহা আলোচিত হইল, আশা করি, তাহা আমাদের দেশীয় সুধিগণের এবং সরকার বাহাদুরের নিকট বিশেষ ভাবে গৃহীত হইবে।

মণ্ট-প্রস্তুত-বিধি

[অধ্যাপক শ্রীনলিনীনাথ রায়, এম্-এ]

মণ্ট্ দ্বারা যবকে পরিবর্ত্তন-করণের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; কি প্রকারে মণ্ট প্রস্তুত করিতে হয় এক্ষণে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিব। যবকে কোন পাত্রকে ভিজাইয়া রাখা যায়, তখন তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হয়, এবং এই অবস্থায় তাহার diastaseএর পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। বার্লি প্রভৃতি শস্য হইতে মণ্ট প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ যবই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মণ্টের জন্য যব উত্তম হওয়া আবশ্যক। যে সকল যবের উপরের আবরণ পাতলা, আকারে বড়, ওজনে ভারি, ভাঙ্গিলে সাদাদাগ দেখা যায় ও অন্ততঃ তিন মাসের পুরাতন, তাহাই মণ্টের জন্য মনোনীত করা হয়। সমস্ত দানা যাহাতে এক সময়ে অঙ্কুরিত হয়, সে জন্য দানা সমান

আকারের দেওয়া হয়। মনোনীত হওয়ার পর যবকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিতে হয়। ইহাতে ধূলা, ঢুঁষ, ভূষা ও অন্যান্য শস্য ত থাকেই; ইহা ব্যতীত কখন-কখনও জীবাণু ও উদ্ভিদাণু পর্যন্ত থাকিতে দেখা গিয়াছে। এজন্য বিশেষ যত্নের সহিত উহা পরিষ্কার করিতে হয়। পরিষ্কার করিবার যন্ত্রকে "উদ্‌ব্লিং বক্স" বলে। ইহা লোহার জালে প্রস্তুত ঢোলের আকারবিশিষ্ট বাক্স ভিন্ন আর কিছুই নহে। জালের ছিদ্রের পরিসর এরূপ রাখা হয় যে, তাহার মধ্য দিয়া ছোট শস্য ও অন্যান্য পদার্থ অনায়াসে বাহির হইতে পারে, কিন্তু যব বাহির হইতে পারে না। ঢোলটি চারু ভাবে রাখিয়া ঘুরিতে হয়; ইহাতে সমস্ত অপরিষ্কার দ্রব্য পৃথক্ হইয়া যায়। ইহার পর যবকে একবার জল দিয়া ধুইয়া, পরে গামলায় দুই-এক দিন ভিজাইয়া রাখিতে হয়,—ইহাতেই যব বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়। এই পরিষ্কার করিবার প্রণালী অঙ্কুরোদ্গমের ব্যাঘাতকারী জীবাণু সকলকে দূর করে ও fermentation রোধ করে বলিয়া যব পরিষ্কার করা বিশেষ প্রয়োজন।

কখন-কখনও আর একটি প্রথার অনুসরণ করা হয়। গামলাতে যব ভিজাইতে দিয়া তাহার মধ্য দিয়া অধিক চাপে বায়ু চালনা করা হয়, ও জল আলোড়িত হইয়া সমস্ত অপরিষ্কার দ্রব্য ধুইয়া যায়। যে কোন উপায় অবলম্বন করা যাউক না কেন, শস্যের দানা যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে।

পরিষ্কার হইয়া যাওয়ার পর যবকে লোহার কিম্বা সিমেণ্টের চৌবাচ্চায় ভিজাইতে দেওয়া হয়। শস্যের উপর অন্ততঃ তিন চারি আঙ্গুল জল থাকা উচিত; এবং প্রথম দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে বার-কতক উপর-নীচে করিয়া দিতে হয়—যেন সমস্ত শস্যে জল পৌঁছায়। যে সকল শস্য জলের উপর ভাসিয়া উঠে, সেগুলিকে ফেলিয়া দেওয়া হয়। শস্য ভিজিতে ৩৬ হইতে ৪৮ ঘণ্টা লাগে; কিন্তু ইহা অঙ্কুর উপর অনেকটা নির্ভর করে। জল উষ্ণ হইলে শীঘ্র ভিজে; আবার শীতকালে কখন-কখনও চারি-পাঁচ দিন লাগিয়া যায়।

শস্য উত্তম রূপে ভিজিল কি না পরীক্ষা করিতে হইলে, দুইটি দানা হাতে লইয়া সবেগে মর্দ্দন করিতে হয়; যদি গুঁড়া হইয়া যায়, কিম্বা নখে রাখিয়া চাপ দিলে যদি না ভাঙ্গিয়া কাটিয়া যায়, তাহা হইলে শস্য সম্পূর্ণ ভাবে ভিজিয়াছে বুঝিতে হইবে। যবকে নখার দিকে চাপিলে বসিয়া যায় ও তাহার উপরের ত্বক পৃথক হইয়া যায়। গ্রীষ্মকালে যবে যাহাতে fermentation না হয়, সে জন্য দুই-তিন-বার জল বদলাইয়া দিতে হয়। যব অধিক ভিজা অপেক্ষা অল্প ভিজা উত্তম।

যব সম্পূর্ণ ভাবে ভিজিলে, জল বাহির করিবার জন্য বসিতে দিতে হয়। জল বসিতে প্রায় বার ঘণ্টা লাগে। ইহার পর ভিজা যব গৃহের মেঝের উপর স্তূপাকারে রাখা হয়। বার হইতে চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে স্তূপগুলি আপনি-আপনি গরম হইয়া উঠে। তখন স্তূপ ভাঙ্গিয়া মেঝের উপরে ২০ ইঞ্চ উচ্চ স্তরে বিছাইয়া দেওয়া হয়। যদি গৃহের তাপ-পরিমাণ অল্প হয়, তাহা হইলে স্তর আরও উচ্চ করিতে হয়। এই অবস্থায় শস্যগুলিকে হয় কিম্বা আট ঘণ্টা অন্তর এক-একবার উপর-নীচে করিয়া উল্টাইয়া দিতে হয় এবং পাঁচিশ হইতে ত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে তাপের সাহায্যে প্রত্যেক শস্যের অঙ্কুর বাহির হয়। স্তরের মধ্যস্থিত শস্য প্রথমে অঙ্কুরিত হয়। সমস্ত শস্য যাহাতে এক সময়ে সমভাবে অঙ্কুরিত হয়, এ জন্য স্তরগুলিকে মধ্যে-মধ্যে উল্টাইয়া দেওয়া হয়। এই সময় শস্য পরীক্ষা করিলে আর্দ্র বোধ হয়। অঙ্কুর বাহির হইলে ক্রমশঃ স্তরের উচ্চতা কমাইতে হয় ও দুই ইঞ্চ হইতে ক্রমশঃ দুই ইঞ্চিতে আনিতে হয়। এই সময়ে দিনে দুইবার করিয়া বায়ু লাগাইবার জন্য উল্টাইয়া দিতে হয়। কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে, অঙ্কুরিত হইতে যেমন জল প্রয়োজন, সেইরূপ উষ্ণতা ও বায়ুরও প্রয়োজন হয়; সে জন্য স্তরের উচ্চতা শীঘ্র কমাইয়া যেন শস্যগুলিকে শুষ্ক করিয়া না ফেলা হয়। অঙ্কুর যখন প্রথমে বাহির হয়,-তখন দেখিতে সাদা ও চক্‌চকে হয়। যদি শুষ্ক দেখায়, কিম্বা রং ফ্যাকাসে (pale) দেখায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, জলের প্রয়োজন হইয়াছে; এবং সেই সময়ে অল্প অল্প জলসেচনে আবশ্যক। অঙ্কুর যখন শস্যের সমান লম্বা হয়, তখন অঙ্কুরোদ্গম শেষ হইয়াছে মনে করিতে হইবে। অঙ্কুর বাহির হইতে সাত কিম্বা দশ দিন লাগে; কিন্তু কখন-কখনও একপক্ষ কালও লাগিয়া যায়। সময়ের ন্যূনাধিক্য তাপ-পরিমাণ, শস্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাহার ভিজার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। আট দশ দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত শস্যে মল্টের উত্তম অবস্থা মনে করা হয়। আজকাল যে মল্ট প্রস্তুত হয়, তাহাতে অধিক লম্বা অঙ্কুর বিশিষ্ট যব ব্যবহার করা হয় বলিয়া কুড়ি দিনের কম অঙ্কুর বাহির হওয়া শেষ হয় না; অধিকবার জলসেচন ও শস্য অধিকবার উপর-নীচে করিবার প্রয়োজন হয়। এই সময়ে তাপ পরিমাণ ৬০ ফ্যাঃ রাখা হয়। এই যবে diastase অত্যধিক থাকে।

শস্যে সাধারণতঃ ষ্টার্চ (দুই প্রকার—দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয়), গ্লুটেন, মধুশর্করা, গ্লুকোজ, স্নেহ পদার্থ (fat), সিলিকেট্, ফস্‌ফেট্ ইত্যাদি থাকে। অঙ্কুরিত হইলে যবের আঘাণ মিষ্ট হয়, অধিকাংশ গ্লুটেন নষ্ট হইয়া যায় এবং অদ্রবণীয় ষ্টার্চ দ্রবণীয় ষ্টার্চে পরিণত হয়। এই দ্রবণীয় ষ্টার্চের উপর ইষ্ট কার্য্য করিয়া থাকে। মল্ট প্রস্তুত করিবার পক্ষে মার্চ্চ মাসই প্রশস্ত এবং সদ্য-প্রস্তুত মল্টের কার্য্যকরী ক্ষমতা অধিক। কিন্তু ইহাতে এই অবস্থায় অধিক দিন রাখা যায় না; সে জন্য ব্যবহারের জন্য ইহাকে শুষ্ক অবস্থায় রাখা হয়।

মল্টকে শুষ্ক করিবার দুইটি প্রণালী আছে। (১) গ্রীষ্মকালের উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ুতে, কিম্বা (২) তন্দুরে শুষ্ক করা। প্রথম প্রণালীতে মল্টকে পাতলা স্তরে বিছাইয়া গরম বাতাস লাগিতে দেওয়া হয় এবং বারে-বারে উল্টাইয়া দিতে হয়। দ্বিতীয় প্রণালীতে ইহাকে তন্দুরের মেঝের আট কিম্বা বার ইঞ্চি উচ্চ স্তরে বিছাইয়া দেওয়া হয়। এই মেঝের নিম্নে অগ্নি থাকে এবং তাহার দ্বারা উত্তাপ দেওয়া হয়। তাপ-পরিমাণ প্রথমে ৮০° ফ্যা রাখা হয় এবং সমস্ত জল যখন চলিয়া যায়, তখন তাপ পরিমাণ ১০০° ফ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ইহার পর তাপ-পরিমাণ ১২০° কিম্বা ১৩০° ফ্যা বৃদ্ধি করিয়া সম্পূর্ণ ভাবে শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়।

মল্‌ট্‌ প্রস্তুত হইলে পর চালনি সাহায্যে অঙ্কুরগুলি পৃথক করিয়া, বায়ু বা লাগে এমন কোন পাত্রে ইহাকে বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। মল্‌ট্‌ উত্তম হইলে ঘরের ঘানাগুলি সুগোল ও নরম দেখায় এবং হাতে রাখিয়া চাপ দিলে চূর্ণ হইয়া যায়। ২২০ পাউণ্ড ঘব, আর্দ্র মল্‌ট্‌ ২৭০ হইতে ৩০০ পাউণ্ড, বায়ুতে শুষ্ক মল্‌ট্‌ ২০০ পাউণ্ড, এবং উনুনে শুষ্ক মল্‌ট্‌ ১৭০ হইতে ১৮০ পাউণ্ড পাওয়া যায়।

ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে মল্‌ট্‌ কুটিয়া লইতে হয় কিম্বা ঘবের তৈয়ারের সহিত কুটিয়া লইলেও চলিতে পারে। কুটিয়া ইহাকে একেবারে ময়দার মত করিয়া ব্যবহার করা সুবিধাজনক নহে।

বীট্‌ বা চুকন্দর

বীট্‌ গাজরের জাতীয় একপ্রকার মূল। ইহা আমাদের ভাল পরিচিত নয়; কিন্তু ইহা হইতে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহা আমাদের সকলের নিকট পরিচিত। বীট্‌ অনেক প্রকারের আছে; তাহার মধ্যে যে জাতি ভারতে উৎপন্ন হয়, তাহার মূল রক্তবর্ণ ও পাতার শিরা সকল লাল বর্ণের এবং আস্বাদ মিষ্ট। য়ুরোপে ইহার চাষ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। ফ্রান্স, জার্ম্মানি, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, ও রুষিয়াতে অধিক, ইংলণ্ডে ও নিউজিল্যাণ্ডে অল্প পরিমাণে এবং ক্যানাডা ও আমেরিকায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ইহা হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু আজকাল সুরাসার প্রস্তুত হইতেছে। ইহার জাতিভেদ অনেক প্রকার আছে; কিন্তু যে জাতি হইতে সর্করা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহা (B. alba) বি, এল্‌বা জাতীয় ও সাধারণ বীট্‌ হইতে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক বিবেচনা করা হয়। ইহার মূল বায় ইক মথা ও পাঁস সাদা হয়। মূল মাটি হইতে উপর উঠে না। এই জাতির দুইটি (species) বর্ণভেদ আছে—একজাতির মূলের রং গোলাপি ও পাতার শিরা সকল লাল বর্ণের হয় এবং অপরের মূল সাদা ও পাতা সবুজ বর্ণের হয়। দুই জাতির চাষ একরূপই হয় ও সর্করার পরিমাণ একই হইয়া থাকে। উত্তম বীটের লক্ষণ:—(১) মূলের শুষ্ক মস্তক এবং আকার মোটা হইতে ক্রমশঃ সরু; (২) পাঁস সাদা ও শক্ত, গন্ধ মিষ্ট—পাতা বড় হইলে সর্করার পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে—(৩) ইহার ওজন গড়ে ১½ হইতে ১½ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হয়, মূল অধিক লম্বা কিম্বা মোটা হইলে সর্করার অংশ কম হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে যে সকল বীটের ওজন ৩০ পাউণ্ড হয়, তাহাতে জলের ভাগ অধিক ও সর্করার ভাগ কম থাকে; আবার ½ পাউণ্ড ওজনের বীট্‌ হয় অপক্ক অবস্থে অতি অল্প সর্করাযুক্ত হয়। সকালিত বীট্‌মূলের রসের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·০৩ হইতে ১·০৭। ইংলণ্ড জাত বীটমূলের গুরুত্ব কখন কখনও ১·০৭৮ পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। ইহাতে সর্করার পরিমাণ শতকরা ১৩ ভাগ থাকে। যে সকল বীট্‌-রসের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·০৩ এর কম, তাহাতে সর্করার পরিমাণ অত্যল্প থাকে। উত্তমরূপে কর্ষিত জমিতে বীট্‌মূল মাটির নিচেই জন্মিয়া থাকে; কেবল পাতাগুলি বাহিরে থাকে।

বীট্‌মূল শতকরা কোট ঘোট কোষের সমষ্টি। এই কোষগুলিতে সর্করা ভিন্ন পটাসিয়ম্‌, সোডিয়ম্‌ ও ক্যালসিয়মের ক্লরেট্‌, অক্সালেট্‌, ম্যালেট্‌ এবং ফোস্ফেট্‌ ও কিছু পরিমাণে খেতসার দ্রব অবস্থায় থাকে। ইহাতে যে সর্করা থাকে, তাহা ইক্ষু-সর্করা; কিন্তু পটাসিয়ম্‌ লবণের সহিত মিলিত থাকায়, ইক্ষু সর্করা অপেক্ষা ইহার মিষ্টতা কম হয়; কারণ ইক্ষু-সর্করা হইতে পটাসিয়ম্‌ লবণ পৃথক করা অসাধ্য। বীট্‌-মূলে শতকরা ৮৫ ভাগ জল, ১০ ভাগ সর্করা এবং ৫ ভাগ অন্যান্য পদার্থ থাকে।

বীট্‌মূল হইতে সুরাসার প্রস্তুত-প্রণালী। বীট্‌ হইতে সুরাসার প্রস্তুত করিবার তিনটি উপায় আছে; তন্মধ্যে প্রথম দুইটি উপায় প্রশস্ত।

১ম। মূল পাতলা করিয়া কাটিয়া চাপ দ্বারা রস বাহির করিয়া তাহা হইতে সুরাসার প্রস্তুত করা।

২য়। গরম জল দ্বারা ইহার সর্করা বাহির করিয়া লইয়া তাহা হইতে সুরাসার প্রস্তুত করা।

৩। মূল হইতে চুয়াইয়া সুরাসার প্রস্তুত করা।

ক্ষেত হইতে লইয়া আসার পর বীট্‌মূলগুলিকে ধুইয়া মাটি ও কাঁকর পরিষ্কার করিতে হয়। তাহার পর ঘর দ্বারা পাতলা টুকরা করিয়া কাটিয়া হাইড্রলিক্‌ প্রেসে চাপ দিয়া ইহার রস বাহির করা হয়। ভাল প্রেসে দুইজন লোক ও একটি বালকে ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ১০২,৬০০ পাউণ্ড রস বাহির করিতে পারে। কিন্তু আজকাল বীট্‌চিনির কারখানায় প্রেসের পরিবর্ত্তে diffusion দ্বারা সর্করা বাহির করা হইয়া থাকে। কখন কখনও রেসোয় প্রেস্‌ ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা প্রতিদিন ৮৫,০০০ হইতে ১১৭,০০০ পাউণ্ড বীট্‌ সকালিত হয়। রস বাহির করিয়া লওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ গো মহিষাদির খাদ্যের জন্য ব্যবহার করিতে পারা যায়।

দ্বিতীয় প্রণালীতে পাতলা টুকরা করিয়া কাটা বীট্‌মূল লোহার কিম্বা কাঠের গামলাতে রাখিয়া তদুপরি ফুটন্ত গরম জল ঢালিয়া দিতে হয়—বা প্রতি ২২০০ পাউণ্ডে ৩৪ পাউণ্ড সফক ক্রাবক মিশাইতে হয়। এই অবস্থায় এক ঘণ্টা রাখিয়া পরে ঐ জল দ্বিতীয় গামলায় আনিতে হয় ও তাহাতে নূতন বীট্‌মূল দিয়া এক ঘণ্টা রাখিতে হয়। পরে তৃতীয় গামলায় ঐ জল আনিয়া আরও কতকটা বীট্‌মূল তাহাতে দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় এক ঘণ্টা রাখিতে হয়। এই প্রকারে যখন তৃতীয় গামলা হইতে জল বাহির করা হয়, তখন তাহার গুরুত্ব সকালিত রসের গুরুত্বের সহিত সমান হইয়া যায়। এইরূপে যখন মূল হইতে সমস্ত সর্করা বাহির হইয়া যায়, তখন সেগুলিকে ফেলিয়া দেওয়া হয় ও নূতন মূল গামলায় দেওয়া হয় এবং পর্য্যায়ক্রমে গামলার জল এক হইতে অন্য গামলায় চালান হয় এবং নূতন বীট্‌ মূল দেওয়া হয়। তৃতীয়

গামলা হইতে যখন রস বাহির হয়, তখন তাহার তাপ পরিমাণ ৭১°১° হইতে ৭৪°৭° ফ্যা'র মধ্যে থাকে এবং ইহাতে ৮২° ফ্যা: তাপে পরিমাণে আনিয়া fermenting vat এ চালাইয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে ইহাতে আরও কিছু পরিমাণে গন্ধক-দ্রাবক মিশাইয়া দেওয়া হয়; প্রতি ১২২০ গ্যালন রসে ১০ পাউণ্ডের অধিক নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বীটরসে পটাসিয়ম্, সোডিয়ম ক্যালসিয়ম্ সল্ট আছে, এগুলি ক্ষার পদার্থ। সেজন্য এসিড্ দ্বারা এইগুলিকে নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, এবং ইহা দ্বারা fermentationএর সাহায্য হয়। প্রতি ২২ গ্যালন রসে ১½ আউন্স ডায়াস্টেজ মিশাইয়া ৬৮° হইতে ৭৮° ফ্যা তাপ পরিমাণে রাখিয়া ferment করিতে দেওয়া হয় এবং ৪ হইতে ৫ ঘণ্টার মধ্যেই fermentation শেষ হইয়া যায়। বীটরসের fermentation অতি শীঘ্র হয় এবং ইহার উপরে যে ফেনা উঠে, তাহাতে fermentationএর বিষ ঘটায়; সেজন্য কতকগুলি গামলা ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ তিনটি গামলা হইলেই যথেষ্ট হয়। প্রথম গামলার রস রাখার চার ঘণ্টা পরে তাহার অর্দ্ধেক অংশ দ্বিতীয় গামলায় রাখিয়া তাহাতে নূতন রস দিয়া পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। দ্বিতীয় গামলায় রস ৪ ঘণ্টা থাকার পর আবার যখন ফেনা হইয়া ফাঁপিয়া উঠে, তখন ঐ রস কাটিয়া অর্দ্ধেক আন্দাজ তৃতীয় গামলায় রাখিয়া, পুনরায় নূতন রস দিয়া পূর্ণ করিতে হয়। ইতিমধ্যে প্রথম গামলার রসের fermentation শেষ হইয়া যায় ও প্রথম গামলায় তৃতীয় হইতে রস লইতে পারা যায়। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে fermentation তিনটি গামলায় চালাইতে পারা যায়। fermentation অতি ধীরে হইলে মধ্যে-মধ্যে কিছু পরিমাণে ঈষ্ট দিতে হয়।

তৃতীয় প্রণালীতে সুরাসার মূল হইতে প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে রস পৃথক করিয়া বাহির করিবার প্রয়োজন হয় না। প্রায় ২০০ গ্যালন জল ও ২২০০ পাউণ্ড বীটমূল ধরিতে পারে এরূপ বড়-বড় গামলা লইয়া, তাহাতে ১০০ গ্যালন গন্ধক-দ্রাবক মিশ্রিত জল রাখিয়া তাহাতে টুকরা করিয়া কাটা বীটমূল ছালা মধ্যে রাখিয়া ঐ জলে ডুবাইয়া দিতে হয়। জলের তাপ-পরিমাণ ৭৭° হইতে ৮০° ফ্যা: মধ্যে রাখিয়া কিছু পরিমাণে ঈষ্ট মিশাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে fermentation শীঘ্র আরম্ভ হইয়া চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হইয়া যায়। পরে ছালাগুলি বাহির করিয়া লইয়া নূতন মাল পূর্ণ ছালা তাহাতে রাখা হয়, এবং তাহাতে ঈষ্ট না দেওয়া সমেত fermentation শীঘ্র আরম্ভ হয়। এইরূপে একই জলে তিন চারিবার বীটমূল ferment করিয়া লইতে পারা যায়। এই প্রক্রিয়া দ্বারা বীটমূলের অবস্থিত সর্করা fermentation দ্বারা সুরাসারে পরিণত হয়। ছালায় বীটমূল চুয়াইবার যন্ত্রে রাখিয়া চুয়াইয়া লইলেই সুরাসার পাওয়া যায়।

এই প্রবন্ধে সর্করা, শস্য, ফল ও মূল হইতে সুরাসার কি উপায়ে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার মোটামুটি প্রণালী বর্ণনা করিয়াছি। যদি কোন পাঠক এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব।

নদীয়ার স্থানীয় ইতিহাস

[শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সরকার বি-এ]

আন্দা

কিছু দিন পূর্ব্বে নদীয়ার মেহেরপুর সবডিভিসনে জলঙ্গী নদীর প্রায় উপরে অবস্থিত আন্দা নামক গ্রামে 'পালরাজার কীর্ত্তি' বলিয়া স্থানীয় লোকের নিকট পরিচিত এক ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাই। ইহার বিষয়ে এখনও কিছু লেখা হয় নাই। গ্রামখানির 'আন্দা' নামটী একটু সন্দেহজনক। আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত যতেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় আমাকে সর্ব্বপ্রথমে 'আন্দার' বিষয়ে বলেন। অনুসন্ধানে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

গ্রামের মধ্যে একটী স্থানের নাম মহারূপোঠা। এই স্থানে প্রায় দশ বার হাত উচ্চ ও একবার চাদ্ একটী ঢিপি আছে। ঢিপির নিম্নে একটী রাস্তা ও বড় পুষ্করিণী দেখা যায়। এইরূপ আট-নয়টী পুকুর নিকটবর্ত্তী স্থানে আছে। ঢিপি ও পুকুরের স্থানবিশেষে চাষ-আবাদ হয়। একটী পুকুরের নাম 'হিরণ্যপালের পুকুর'। স্থানটীতে প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে অনেক মূর্ত্তি মাটির নীচে আছে, এইরূপ সাধারণের ধারণা।

প্রবাদ আছে, পালবংশীয় রাজা হিরণ্যপাল এক সময়ে এখানে রাজা ছিলেন। ইনি শেষ রাজা। ইহার সময়ে বর্গীর হাঙ্গামাতে এই রাজবংশ নষ্ট হয়। পাতালপুরীর গহ্বরে ঘর ছিল। বর্গীরা আসিলে রাজা সবংশে পাতালে প্রবেশ করেন। পাতালের চাবি উপরে বর্কন্দাজের হাতে ছিল। বর্গীরা আসিলে বর্কন্দাজ বাঁশী লইয়া গাছে চড়ে। তাহারা আসিয়া কিছু না পাইয়া খানিক ঘুর চলিয়া গিয়াছে, এমন সময়ে লোকটী ফুৎকার দিয়া শিঙ্গার ফুঁ দেয়। তাহাতে বর্গীর দল ফিরিয়া আসিয়া উহাকে কুটিলাৎ করিল, আর রাজপরিবার পাতালপুরেই চিরঘরে রহিয়া গেল। বলা বাহুল্য বর্গী-বিষয়ক প্রবাদ এক নদীয়া জেলাতেই অনেক স্থানের সহিত বিজড়িত দেখা যায়। 'আন্দা'র বিষয়ে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন। আশা করি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে সেরূপ ব্যবস্থা হইবে।

ফুলবাড়ী :—'আন্দা'র নিকট 'ফুলবাড়ী' গ্রামে 'ফুল কুরী' নামে রাজা ছিল, প্রবাদ আছে। সেখানে রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষও দেখিতে পাওয়া যায়। আন্দার 'হাঁড়াড়ী' নামে একটী ভগ্নাবশেষ আছে। উহার ইষ্টকগুলি ছোট ও নক্সা-কাটা।

কোম্পানীর বাগান :—মোরাড়ীর কিছু দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘুর্ণাক্ষি মোড়ের পূর্ব্বধারে 'কোম্পানীর বাগান' নামে একটী বহু পুরাতন ও বড় বাগান দেখা যায়। ফলের বাগিচা, উৎকৃষ্ট জাতের নানা জাতীয় বৃক্ষ, তরকারী ও ফসলের ক্ষেত, বন জঙ্গল, পুষ্করিণী, লম্বা সড়ক ও দু'তারিণী পাকী পর্য্যন্তও বাগানটীর মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বাগান একশত বৎসরেরও বেশী পুরাতন। দুই-পুরুষিয়াদিগবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সরকার মহাশয়দের নিকট

একখানি দলিলে লেখা আছে, "তোমার পিতা ৺রামচন্দ্র মুন্সীর বিশ্বাসের নামে সরকারের বাকীজা কারণ জরিপ জমাবন্দি হইয়া.....জমা ধার্য্য হইয়াছে। অদ্য আপন দেস্তখৎপূর্ব্বক মালিয়ানা ও জমার সরকারের বাকবাকিজা করিতে মোকররি পট্টা দিলে।" বাংলা ১২১৯ সালের ৭ই আশ্বিন। সেপ্টেম্বর, ৩১ ; ১৮১২।

জাহাঙ্গীরপুর :—কোম্পানীর বাগানের ভিতর দিয়া যে রাস্তা দক্ষিণ রাঙতারা গ্রামে গিয়াছে, ঐ রাস্তার খানিক দূর গেলেই একটী খেজুর বাগান ও তথায় তালগাছ-ঘেরা একটী সুন্দর দীঘি দেখা যায়। খেজুর বাগানটীর পিছনে মাঠের মাঝখানে জাহাঙ্গীরপুর নামে গ্রাম আছে। প্রাচীন লোকের মুখে শুনা যায়, জাহাঙ্গীর বাদ্‌শাহের নামানুসারেই গ্রামের নাম জাহাঙ্গীরপুর হইয়াছে। লোকে এখন ইহাকে জাহেরপুর বলিয়া থাকে।

শান্তিপুর গড় ও হুগলীর ন্যায় এখানেও বাদ্‌শাহের ফৌজদারের অধীন সৈন্য সামন্ত থাকিত। শান্তিপুর গড়ের ভগ্নাবশেষ বাদ্‌শাহের ফৌজদারের সহিত সংশ্লিষ্ট। এ অঞ্চলের পাঠান অধিবাসীরা ফৌজদারের ফৌজের লোকগণের বংশধর। এখানে তোপখানার অবশেষ এখনও দেখা যায়। কোম্পানীর বাগান ও খেপাড়ার মধ্যে কতকগুলি পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বা জলাশয় দেখা যায়। এগুলি মুসলমান আমলে খনন করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। জাহেরপুরের নিকটে কোম্পানীর বাগানের মধ্যে যে সকল পুরাতন বাঁশ গাছ দেখা যায়, সেগুলি জাহাঙ্গীর বাদ্‌শাহের আমলের। এখানে ইষ্টকময় ভগ্নাবশেষও আছে। কাজি মহম্মদীর মেরিট্টার গোয়াড়ী-নিবাসী প্রবীন মৌলভী মহম্মদ ফজলার রহমানের নিকট হইতে এই বিবরণের অধিকাংশ সংগৃহীত।

খেপাড়া :—খেপাড়াতে কমল ও রক্ত-কমল-বিলসিত একটী সুন্দর দীঘি আছে। দীঘির চারি ধারে তরঙ্গায়িত পাহাড়ী জমী ও আবাদের মাঠ; মাঝে-মাঝে ছোট ছোট বন ও ঝোপ বিদ্যমান থাকিয়া স্থানটীকে অধিকতর মনোজ্ঞ করিয়াছে। কি সুন্দর দৃশ্য! ইহারই একস্থানে ভাঙ্গ ও ঘন বিটপী শ্রেণীর মাঝে কয়েকটী আম্র ও জম্বুগাছ শোভা পাইতেছে; প্রকৃতির সেই শান্ত রসাসমন্বিত স্থানে নৃসিংহের মূর্ত্তি ক্ষুদ্র এক কুটীরে প্রতিষ্ঠিত।

নৃসিংহদেব কপিলা গাভীর দুধ খাইতেন। গাভী বর্ষে বর্ষে প্রসবিত। প্রবাদ আছে, বহুপূর্ব্বে এক সন্ন্যাসী আসিয়া ঠাকুরের মাথার পরশমণি চুরি করিয়া লইয়া পলায়। পরদিন রাত্রিতে অভিসম্পাতে সন্ন্যাসী যখন ঘানি ঘুরাইয়া মরে, তখন ঠাকুর না কি চীৎকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সে রাত্রিতে চীৎকার কেহ শুনিয়াও শুনে নাই। প্রত্নবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক ভগ্নমিশ্রের মাতুলালয় বলিয়া অবধারিত, ও নদীয়ার দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত দেবগ্রামে কিম্বদন্তী বিজড়িত যেরূপ রাজার আবির্ভাবের সহিত খেপাড়ার নৃসিংহদেবের মাথার পরশমণি চুরির কথা বিজড়িত দেখা যায়। কিম্বদন্তী সত্য হইলে খেপাড়া দেবগ্রামের অন্ততঃ সমসাময়িক।

তাদুকা :—প্রাচীন কবি নরহরি চক্রবর্ত্তী বর্ণিত নবদ্বীপের অন্তর্দ্বিপের অন্তর্গতই বর্ত্তমান জোয়ানিয়া তাদুকা। এখানে পূর্ব্বে ৯।১০ শত ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল। উলা বীরনগরের সহিত ইহাও একই সময়ে মালেরিয়ার গ্রাসে প্রাণ হয়। তাদুকার দক্ষিণে 'তাদুকার বিল' অবস্থিত। বিলের জলের প্রায় ওপারে একটী সুবৃহৎ গাছ দেখা যায়। গাছটীর গুঁড়ি সর্ব্বদাই জলে ডুবিয়া থাকে। গাছটীর নাম "বঙ্গে বুড়ি"। গাছটী কোন্ জাতীয় তাহা কেহই বলিতে পারে না। কেহ-কেহ উহাকে হেজলী গাছ বলিয়া অনুমান করেন। হেজলী গাছ পূর্ব্ব-বঙ্গের স্থানবিশেষে দেখা যায়; এতদঞ্চলে উহা বিরল। বঙ্গে বুড়ি জলে শিকড় বিস্তার করিয়া উপরে মস্তক তুলিয়া আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, বন্যার সঙ্গে-সঙ্গে ইহা কিছু ভাসিয়া উঠে এবং জল নামিতে থাকিলে আবার নামিয়া যায়। প্রবাদ আছে, গাছটী এক প্রবল বন্যাতে ভাসিয়া আসিয়াছিল। ইহার বয়স এক শত বৎসরেরও অধিক। এরূপ গাছ নিকটে আর নাই। তাদুকার নিকটে কামাখ্যাতলায় মাঠেও একটী স্বাভাবিক বর্দ্ধিষ্ণু গাছ আছে। এটী পাকুড় গাছ—নাম কামাখ্যা গাছ। ইহাও প্রবল বন্যাতে ভাসিয়া আসিয়াছিল। সাধারণের বিশ্বাস ইহা 'চালানে' গাছ।

বিহারিয়া :—মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি ফুলিয়ার নিকটে বিহারিয়া গ্রামে একটী ভগ্নাবশেষ আছে। এখানে বহু পূর্ব্বে কোন রাজা ছিল। পুষ্করিণী প্রভৃতি এখনও আছে। রাজার বিষয়ে প্রবাদও শুনা যায়।

জপুর :—কৃষ্ণনগর হাঁসখালি রোডের ধারে কৃষ্ণনগর হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণে জপুরে একটী ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে পূর্ব্বে জঙ্গল ছিল। কাঁটা সমেত বেড় বাঁশে ঘেরা গড় ও ইষ্টকের মসজিদ অবশেষ এখনও দেখা যায়। প্রবাদ যে, ইহা 'গরেশায়' বাদ্‌শাহের কীর্ত্তি। 'গরেশায়' হিন্দু কি মুসলমান ছিলেন তাহা স্থানীয় অধিবাসীরা বলিতে পারে না। (আলোচ্য বিষয়ে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।)

বাহাদুরপুর :—গোয়াড়ীর কিছু উত্তর-পশ্চিমে জলঙ্গী নদীর অপর পারে বাহাদুরপুর নামক গ্রামে একটী ইষ্টক ও মৃত্তিকার স্তূপ দৃষ্ট হয়। স্তূপটী পাঁচ ছয় হাত উচ্চ। শুনা যায় ইহা পলাশীর যুদ্ধের সময় ইংরাজ সৈনিকদলের ব্যবহারার্থ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইংরাজের অরোপণ পত্তন যখন পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল তখনই এই স্তূপ হইতে দূরবীক্ষণ সাহায্যে শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য এই স্তূপ প্রস্তুত করা হয়।

অভিযানকালে এইরূপ স্তূপ অনেক স্থলেই নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। বাহাদুরপুরের স্তূপটী মাত্র এখনও বর্ত্তমান আছে।

(সিরাজ-উল মুতাখরীণে এ বিষয়ে উল্লেখ থাকিতে পারে।) মৌলভী ফজলার রহমানের মতেও এ ক্ষুদ্র মৃত্তিকা স্তূপটী পলাশীর যুদ্ধের সময় (observation post রূপে) নির্ম্মিত হইয়াছিল। মৌলভী সাহেব এক সময়ে নদীয়া জেলার জরিপ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। *

* বাদুলপুকুর স্তূপ, কাঁঠালডাঙ্গার গড়, সুবর্ণবিহার স্তূপ, শালিগ্রামের শালিবাহন রাজা, ফুলিয়া ও বাগ্‌চড়ার টাঁদরায়ের গড়—নদীয়ার এই কয়েকটীর বিবরণ বর্ত্তমান লেখক 'ভারতবর্ষ', 'মুকুল' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কয়েকটী সাধারণের অজ্ঞাতপূর্ব্ব স্থানের পুরাতত্ত্বের পরিচয় দেওয়া গেল। ইতি লেখক।—

ভাইয়ের টান

[শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়]

(১)

বিনয় যেদিন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া বাটী ফিরিল, সেইদিন সন্ধ্যার সময় তাহার পিতার হৃদ্‌রোগে হঠাৎ মৃত্যু হইল। সে রাত্রি ফাল্গুনের কৃষ্ণাষ্টমী; আকাশের ছোট বড় তারাগুলা তাহার চক্ষে যেন এক-একটা স্ফুলিঙ্গবৎ বোধ হইতে লাগিল। বাহিরের অন্ধকার অপেক্ষা তাহার বুকের ভিতর অন্ধকার আরও জমাট, আরও গাঢ় বোধ হইল। সংসারে তাহার অপর অভিভাবক বড় কেহ ছিল না। পিতা উপার্জ্জন করিয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সে সমস্তই তাহার বিমাতা কামিনীর লোহার সিন্দুকের মধ্যে সযত্নে স্থান পাইতেছিল। সপত্নী-পুত্রের উপর সাধারণ স্ত্রীলোকের যেরূপ ঘৃণা বা বিদ্বেষভাব লক্ষিত হয়, কামিনীর তাহাতে ত্রুটি ত ছিলই না, বরং কিছু বেশী ছিল। এইজন্য বিনয়ের বাল্যজীবনটা তেমন সুখের হয় নাই। বিমাতার ব্যবহার তাহার এক রকম সহিয়াছিল। কিন্তু বিমাতার সহোদর ভ্রাতার মামাবাবুর অত্যাচার একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মত গণ্ডমূর্খ, পশু-প্রকৃতির লোক বড়-একটা দেখা যায় না। সে বিনয়ের পিতা তারিণীচরণের আমল হইতেই এ সংসারে আশ্রয় পাইয়াছিল। শুধু আশ্রয় পাইয়াই যে সে ক্ষান্ত ছিল এমন নয়; সে যে এ সংসারের একটা যে সে লোক নয়, এটা পাড়ার লোকের কাছে প্রতিপন্ন করিতে সে বিধিমতে চেষ্টা-যত্ন করিত। আর সে চেষ্টা-যত্নটা পড়িত বেচারি বিনয় ও তাহার অষ্টম বর্ষীয়া সহোদরা সরস্বতীর উপর। এই দুইটি মাতৃহীন বালক-বালিকাকে কারণে বা অকারণে ব্যথিত করিতে নিষ্ঠুর নিমাইএর বুকে বেদনার একটু আঁচড়ও লাগিত না। যখন মাতুলের অকারণ তিরস্কারে অভিমানিনী সরস্বতী ছলছল চোখে, নতমুখে একমাত্র সান্ত্বনার স্থল দাদার কাছে গিয়া, পীঠের উপর মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকিত, তখন বিনয়েরও চোখ দুটিও বাষ্পে ভরিয়া উঠিত। পিতা বর্ত্তমানেই যখন এরূপ নির্ম্মম ব্যবহার তাহাদের সহ্য করিতে হইত,—এখন পিতার মৃত্যুতে তাহারা আরও অসহায়, আরও নিরুপায় হইল।

মাত্র দুইমাস হইল তারিণীচরণ পরলোকে গমন করিয়াছেন, ইহারি মধ্যে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারে বেশ একটা বিবাদের ঝড় উঠিয়াছে। সেই ঝড়ের প্রকোপে পিতৃ-মাতৃহীন ভাইবোন দুটি বেতস-পত্রের মত কম্পিত, ত্রস্ত। আজ রবিবার, বিশেষ কোন কাজ না থাকায় বিনয় তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া আপন মনে তাহার স্বর্গগতা জননীর মধুর স্মৃতিগুলির আলোচনা করিতেছিল—এমন সময় দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তাহার পীঠে পড়িয়া সমস্ত চিন্তাকে গলাইয়া ভাসাইয়া দিল। পিছন না ফিরিয়াই অনুমান করিয়া ভগিনীর কোমল তরুণ হাতখানি ধরিয়া কহিল, "কিসের জন্য কান্না সরস্বতী?" "আমায় মামা মেরেছে।" "মেরেছে? কেন?" "আমার হাত থেকে একটা কাঁচের বাটি পড়ে ভেঙ্গে গিয়েছে বলে।" "সাবধানে কাজ করতে হয় দিদি! কোথায় মেরেছে?" "এইখানে।" সরস্বতী তাহার কপাল দেখাইল। বিনয় দেখিল ভ্রূর উপরের জায়গাটা ফুলিয়া কালিবর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি! কি দিয়ে মামা তোকে মেরেছে রে?" "হাত দিয়ে।" ঠিক সেই সময়ে কামিনী কোথা হইতে ঝড়ের মত উড়িয়া আসিয়া, কঠোর স্বরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "সরি! এখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে? ও দিকে নিমু খেতে বসেছে, তা এক গেলাস জল গড়িয়ে দিয়ে উপকারটি করতে পার না? আমি একলা ক'দিক দেখব? এদিকে বেলা দশটার ভিতরেই পিত্তি দিদ্ধ করে না দিলে ত পেটের জ্বালায় দশদিক অন্ধকার দেখবে।" বিমাতার কথায় মর্ম্মাহত হইয়া বিনয় মুখ নীচু করিয়া রহিল। পরে সরস্বতীকে কহিল—"যা সরি, মামা খেতে বসেছেন, কি দরকার হবে দেখগে যা।" সরস্বতী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

(২)

এইরূপ অনাদরে-অযত্নে আরও দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বিনয় এখন আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এই আই-এ পাশ-করা বিনয় ভিন্ন অপরের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিত কি না বলিতে পারি না। কেন না, এই দুই বৎসর কলেজে পড়িবার খরচ সে বিমাতার নিকট হইতে কিছুই পায় নাই। নিজের পড়া বজায় রাখিয়া, ছেলে পড়াইয়া সে কলেজের বেতন জুটাইয়াছে। তাহাতেও সে কিছুমাত্র দুঃখিত নয়; কিন্তু এদিকে দেখিতে-দেখিতে সরস্বতী দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল—তাহার অঙ্গে কৌমার-শ্রী ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু বিমাতা বা মাতুলের তাহার প্রতি কোন লক্ষ্যই নাই। বিনয়ের এখন একমাত্র ভাবনা —কি করিয়া তাহাকে কোন সুপাত্রে অর্পণ করিতে পারা যায়। একদিন সে তাহার বিমাতাকে বলিল, "মা! সতী ত বার বছরে প'ড়ল। তার বিষয়ে উদাসীন থাকা ত আর উচিত হয় না!" কাদিনী মুখ বিকৃত করিয়া উত্তর দিল, "তা, আমায় কি করতে বল? আমি কি তোমার বোনের বিয়ের জন্য দেশে-দেশে ঘুরে পাত্রের সন্ধান করব?" "না মা, সে কাজটা না হয় আমিই কর্ব্ব। কিন্তু পাত্র ত অমনি জুটবে না? আর তুমি কি রকম খরচ করিবে, তা' না জানলে পাত্রের সন্ধানে কিরূপে করা যায়?" "আমি আবার কি খরচ করব? আমি কোথায় কি পাব? তুমি বেটা ছেলে, তুমি পয়সার যোগাড় না কর্লে, আমি স্ত্রীলোক কি করব? যে ক'রে সংসার চলছে, তা আমি জানি, আর উপরে ভগবান জানেন। এ বিবাহে আমি এক পয়সাও দিতে পারব না। তুমি যা হয় উপায় কর।" "বেশ"—বলিয়া বিনয় চুপ করিল। 'বেশ' বলিল বটে, কিন্তু কি উপায় যে সে করিবে, তাহা সেও জানে না। আর 'বেশ' না বলিয়াই বা বলিবার কি ছিল? সেই দিন হইতে বিনয়ের মুখে দুর্ভাবনার একটা কালো ছায়া পড়িল। সে বাহ্যিক চাঞ্চল্য কিছুই দেখাইল না বটে, কিন্তু সতীর চিন্তায় দিন-দিন শীর্ণ, মলিন হইতে লাগিল।

দুশ্চিন্তার ন্যায় মানুষের আর ব্যাধি নাই। এই ব্যাধির তাড়নায় মানুষ উন্মাদ হয়, হিতাহিত জ্ঞান হারায়। বিনয়ের অবশ্য সে সব কিছু না হইলেও, আজকাল তাহাকে প্রায়ই অন্যমনা দেখা যাইত। সে যেদিন বুঝিল, সরস্বতীর বিবাহে বিমাতা এক কপর্দ্দকও সাহায্য করিবেন না, সেইদিন হইতে 'নিজে যে উপায়ে পারি সতীকে সুপাত্রে অর্পণ করিব' এই প্রতিজ্ঞা করিল। অনেক পাত্রের পিতার কাছে নিজের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিয়া, যাহাতে সে দায় হইতে উদ্ধার পাইতে পারে, তাহার জন্য কত কাকুতি-মিনতি করিল; কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। বিনা অর্থে সরস্বতীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে কোন পিতাই সম্মত হইলেন না। প্রায় দুইমাস হাঁটাহাঁটির পর সেদিন বিনয় রাধানগরে গিয়া যখন শুনিল যে, অন্ততঃ হাজার টাকার কমে তাঁহারা ছেলের বিবাহ দিবেন না, তখন রোষে, ক্ষোভে তাহার মাথা ঘুরিতে সুরু করিল। রাধানগর তাহাদের বাটী হইতে প্রায় চারি ক্রোশ পথ। এই দুই-মাসের মধ্যে ন্যূন সংখ্যায় আঠার দিন সে এই পথ গিয়াছে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। এবং প্রথম দিনই সে বলিয়াছিল যে, অলঙ্কার বা পণ সে কিছুই দিতে পারিবে না; তবে যে বস্ত্র সে দিবে, তাহা অমূল্য। একথা অতি সত্য যে, সরস্বতীর যে পরিমাণে রূপগুণ ছিল, তাহার তুলনায় ঐশ্বর্য্য অতি তুচ্ছ। কিন্তু শুধু রূপগুণ দেখিয়া বধূ গৃহে আনার প্রথা যে আজকাল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে,—এ সহজ সত্যটা বিনয় কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। সে মনে ভাবিত সরস্বতীকে যে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবে, সে ভাগ্যবান;—সুতরাং তাহার বিবাহের কোন ভাবনা নাই। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল।

(৩)

পরদিন অপরাহ্ণ ৫টার সময় নৈরাশ্যের বেদনা লইয়া সেই যে বিনয় বাটী ফিরিয়াছে, আর একবারও বাটীর বাহির হয় নাই। সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময়ে বিনয়ের সহপাঠী সুধাংশু বিনয়ের সংবাদ লইতে আসিল। দুইচারিবার ডাকাডাকির পর সরস্বতী আসিয়া দ্বার খুলিয়া বলিল—"দাদার কাল থেকে জ্বর হয়েছে।" "জ্বর হ'য়েছে? এখন কেমন আছে?" "খুব জ্বর—গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।" "তাই ত—একবার দেখে গেলে হ'ত।" "আসুন দাদার ঘরে!" "যাব?" "হাঁ, আমার সঙ্গে আসুন" বলিয়া সরস্বতী সুধাংশুর অগ্রবর্ত্তিনী হইল। ঘরে চুকিয়া সুধাংশু দেখিল, জ্বরের প্রাবল্যে বিনয় বেহুঁস্ হইয়া পড়িয়া আছে। চক্ষু রক্তবর্ণ, দেহের উত্তাপ অত্যন্ত বেশী। দেখিয়া তাহার

একটু ভয় হইল। সে সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করিল "কে দেখছে সরস্বতী?" "কোন ডাক্তার আসেনি। আজ সকালে মাকে বলেছিলাম; তা মা বল্লে, আমার অত টাকা নেই যে ডাক্তার ডেকে দেখাব'।" শুনিয়া সুধাংশু স্তম্ভিত হইল। তাহার কারণ, এ পর্য্যন্ত সে যতবার বিনয়কে তাহার বিমাতার আচরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, ততবারই 'ভাল' শুনিয়াছে। কিন্তু আজ সরস্বতীর কথা শুনিয়া বুঝিল, বিনয় নিজগুণে তাহার বিমাতার দোষ চাপিয়া রাখিয়াছিল। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "সরস্বতি! তোমার মা আজ বিনয়কে দেখতে এসেছিলেন?" "না।" "একবারও নয়?" "না—একবারও নয়।" "কালরাত্রে কেমন ছিল?" "এই রকমই। আমি সমস্ত রাত্রি বাতাস করেছি, তবু গায়ের জ্বালা কমেনি।" "আচ্ছা, তুমি একটু বোস, আমি একবার ডাক্তার ডেকে আনি" বলিয়া সুধাংশু ত্বরিত পদে বাহির হইয়া গেল। সুধাংশু বাহিরে যাইবার পরমুহূর্ত্তেই কামিনী আসিয়া পরুষ বচনে জিজ্ঞাসা করিল, "সরি! ঘরে কে এসেছিল?" "সুধা দাদা।" "সুধা দাদা কে?" "দাদার বন্ধু।" "বাড়ীর ভিতরে তাকে কে আনলে?" "আমিই এনেছি। দাদাকে ডাকতে এসেছিলেন, আমি গিয়ে বললাম, অসুখ হয়েছে; তাই একবার দেখতে এলেন।" "এটা ত তোমার একার বাড়ী নয় যে, যাকে ইচ্ছা বাড়ীর ভিতর আনবে?" এবার সরস্বতীর বড় রাগ হইল। একে দাদার অসুখের জন্য তাহার মন আদৌ ভাল ছিল না, তার উপর বিমাতার রুক্ষ ব্যবহার তাহাকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিল। সে একবার মনে করিল, বেশ দুটা কড়া কথা শুনাইয়া দেয়; তবে ভ্রাতার এই অসুখের উপর আবার একটা অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া তাহাকে দগ্ধ করা অপেক্ষা নীরব থাকাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিল। বিনয় যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ডাকিল, "সতি!" "কি দাদা?" "বড় যন্ত্রণা হ'চ্ছে।" "মাথায় হাত বুলিয়ে দিব?" "না, থাক। সতি! মা কোথায় রে?" সরস্বতী উত্তর দিল না। কামিনীও সেখানে উপস্থিত ছিল; সেও কোন উত্তর দিল না। "সরস্বতি! ডাক্তারবাবু এসেছেন"—বলিতে-বলিতে সুধাংশু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কামিনী ঘরের বাহিরে গেল। ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া বলিলেন, "রোগ শক্ত।" সুধাংশু ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল হবে ত?" "ঈশ্বরের ইচ্ছা" বলিয়া দর্শনী পকেটস্থ করিয়া ডাক্তারবাবু বাটী ফিরিলেন। ডাক্তার চলিয়া গেলে সুধাংশু ভাবিতে লাগিল, এখন কর্ত্তব্য কি? এ অবস্থায় বিনয়কে এখানে ফেলিয়া রাখিলে, বেচারি হয় ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষা অভাবে মারা যাইবে। ডাক্তারের অনুমান মিথ্যা নহে; সত্যসত্যই বিনয়ের পীড়া কঠিন। বুক জুড়িয়া সর্দ্দি আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতেছে। নিউমোনিয়ার পূর্ব্বলক্ষণ। নিউমোনিয়া যে ভয়ঙ্কর ব্যাধি, তাহা সুধাংশুর অবিদিত ছিল না। কেন না গত বৎসর তাহার এক কনিষ্ঠা ভগিনী এই রোগাক্রান্তা হইয়া মরা বাঁচিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাই তাহার বেশ একটু ভয় হইল। কিন্তু সে অবস্থায় তাহাকে মুখের কথায় সাহায্য করে এমন লোকও সেখানে কেহ ছিল না। তাহার প্রাণের মধ্যে একটা ভাবনার ঝড় বহিতেছিল। সে নীরব, গভীর চিন্তামগ্ন। সুধাংশু যখন বিনয়ের চিন্তায় একান্ত অধীর, সেই সময়ে সরস্বতী মূর্ত্তিমতী জননীর ন্যায়, নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার মত দাদার শিয়রে বসিয়া ছিল; তাহারও প্রাণের মাঝে একটা তুমুল ঝড় বহিতেছিল। তাহার সে সময়ের মূর্ত্তি দেখিলে, তাহাকে সহসা বালিকা বলিয়া মনে হইত না। সুকুন্তলা সরস্বতীর যত্নবিহীন অলকরাশি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কতক পৃষ্ঠদেশে, কতক কুণ্ডলাকারে মুখের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, তাহার সেই সদ্যঃপ্রস্ফুটিত নলিনীতুল্য মুখকমলের সঙ্গে চটুল ভৃঙ্গের ন্যায় ক্রীড়ায় উন্মত্ত। চক্ষের সে স্থির দৃষ্টি দেখিলে মনে হইত, বুঝি ইহা জীবিতের চাহনি নয়। যেন কোন সুনিপুণ শিল্পী আপনার শিল্পচাতুর্য্য প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে সেই চক্ষু দুটি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সন্তানের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় মাতার প্রাণে যেমন একটা অব্যক্ত কঠোর বেদনা অনুভূত হয়, সরস্বতীর অবস্থাও সেইরূপ। ডাক্তারের মুখভাব লক্ষ্য করিয়া সে বুঝিয়াছিল যে, দাদার অসুখ সহজ নয়। তাই দাদার শিয়রে বসিয়া সে কত কি ভাবিতেছিল। সে ভাবনার কি অন্ত আছে?

(৩)

সরস্বতী মনে-মনে তাহার অতীত জীবনের ঘটনার কথা ভাবিতেছিল। সেই গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, সহসা

নিমাইয়ের রাসভ-নিন্দিত কর্কশ আওয়াজ, যেন বিনা মেঘে অশনি-সম্পাতের মতই শ্রুত হইল। উভয়ে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখে, ঘরের মধ্যস্থলে নিমাই। ভয়ে সরস্বতীর মুখ শুকাইয়া গেল। নিতান্ত অপরাধিনীর মত জড়সড় হইয়া সে একটু সরিয়া বসিল। নিমাই কালবিলম্ব করা অকর্ত্তব্য ভাবিয়া, যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহার ভূমিকা আরম্ভ করিল। সুধাংশু প্রথমে বুঝিতে পারে নাই যে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়াই এই ভূমিকার অবতারণা। পরে বুঝিতে পারিয়াও সে কথার প্রতিবাদ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু যখন নিমাইএর কথাগুলা ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিল, তখন সুধাংশুরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে আর নীরব থাকিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল, "আপনি কি মানুষ, না একটা জানোয়ার? বুঝি বা তারও অধম! আপনাকে জানোয়ার বললে জানোয়ারকে গালাগালি দেওয়া হয়।" এই কথায় নিমাই একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিল। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সুধাংশুকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। বিনয় এতক্ষণ অচেতন অবস্থায় পড়িয়া ছিল, গোলযোগে চমকিয়া উঠিয়া ভুল বকিতে সুরু করিল। সুধাংশু বুঝিল, মূর্খের কথার প্রতিবাদ করিয়া সে ভাল করে নাই। সে নিমাইকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করিল। কিন্তু যে আগুন জ্বলিয়াছিল, তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হইবার নহে। তাহার মুহুর্মুহু সংজ্ঞা-লোপের সম্ভাবনা দেখিয়া, "সরস্বতি! একটু অপেক্ষা কর, আমি আস্‌ছি"—বলিয়া সুধাংশু বাহির হইয়া গেল। নিমাইও কি জানি কি মনে করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। ভয়-বিহ্বলা সরস্বতী দাদার সেই অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অনতিকাল পরেই সুধাংশু পাল্কি-বেহারা সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "সরস্বতি! চল, বিনয়কে এখান থেকে নিয়ে যাই। এ রাক্ষস রাক্ষসীদের নিশ্বাসেও বিষ আছে।" সরস্বতী 'হাঁ—না' কিছুই উত্তর করিল না। বেহারাদের সাহায্যে রোগীকে পাল্কিতে উঠাইয়া লইয়া সুধাংশু সেই রাত্রেই আপনার বাটীতে চলিল। বলা বাহুল্য যে সরস্বতীও সে পাল্কিতে ছিল। সুধাংশু তাহার মাতার কাছে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলে, জননী-হৃদয়ে এককালে হর্ষ ও বিষাদের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইল। বিনয় এতদিন পরে আর এক মায়ের অতুল স্নেহে আশ্রয় পাইল। পরদিন হইতে নিয়মিত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইল। ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা হইল। আর শুশ্রূষার ত কথাই নাই। সুধাংশুর মাতা আহার-নিদ্রা ভুলিয়া বিনয়ের রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিলেন। দুই দিন একই ভাবে কাটিল; রোগ উপশমিত হওয়া পরের কথা, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। রোগীর সর্ব্বদা অচেতন ভাব দেখিয়া ডাক্তারও ভয় পাইলেন। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তিনি কোনও সুরাহা দেখিতে পাইলেন না।

(৫)

সরস্বতী এখন আর সে সরস্বতী নাই। তাহার সেই সদা-হাসিমাখা মুখখানিতে আর সে হাসি নাই, সে আভায় নাই, সে উপদ্রব নাই। দাদার এই কয়দিনের অসুখে তাহার জীবনের একটা মস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ভাবনায় ও রাত্রিজাগরণে তাহার চোখের কোলে কালিমা পড়িয়াছে, আরক্তিম গণ্ডদ্বয় পাণ্ডু বর্ণ ধারণ করিয়াছে, সে সোণার রং যেন কোথায় লুকাইয়াছে। আহার নাই বলিলেই চলে। সকলের পীড়াপীড়িতে ভাতের কাছে বসে মাত্র, কিন্তু আহারে রুচি নাই। বিনয়ের অবস্থা দেখিয়া সুধাংশুরও প্রাণ ভয়ে উড়িয়া গিয়াছে। দিবানিশি সে যে একটা দুশ্চিন্তার তাড়নায় অস্থির, এটা তাহার মুখ দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায়। পরের ছেলে বিনয়—যদিও সে আপনার ভাবে, তথাপি এই অবস্থায় তাহাকে বাটী হইতে লইয়া আসিয়া ভাল করে নাই, এই চিন্তা দিনের মধ্যে অনেকবার তাহার মনে উঠে। কাজটা যে সে খারাপ করিয়াছিল, তাহা নহে; কিন্তু পাড়ার আর পাঁচজনে সে ভাল দিকটা না লইয়া, মন্দ দিকটাই আগে লইবে, এই চিন্তাই তাহার অধিক।

ভোর হয়-হয়; এখনও ঠিক উষা দেখা দেয় নাই—গাছপালার ভিতর হইতে এখনও অন্ধকার চলিয়া যায় নাই। পাখীরা কূলায়ে বসিয়া প্রভাতী সঙ্গীতে নির্জ্জীব জগতকে সজীব করিবার প্রয়াস পাইতেছে। উষার শীতল সমীর স্পর্শে রোগীর অবস্থা এখন একটু ভাল। চক্ষু মেলিয়া বিনয় ডাকিল, "সতি!" "কি দাদা?" "আমার কাছে আয়।" সরস্বতী দাদার কাছে গিয়া বসিল। বিনয় তাহার হাতখানি আপনার বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া

ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"সতি! আমার সময় ফুরিয়েছে। তবে তোর যে কোথাও একটু আশ্রয় ঠিক ক'রে দিয়ে যেতে পার্লাম না, এতে মরণেও আমি সুখ পাব না।"

বিনয়ের কথাগুলা সরস্বতীর বুকে তীরের মত বিঁধিতেছিল। সে কথা কহিতে পারিল না। ঝরঝর অশ্রুধারে তাহার বুক ভাসিতেছিল।

সরস্বতীকে কাঁদিতে দেখিয়া বিনয়ও আর কথা কহিতে পারিল না। চোখের জল বাধা না মানিয়া, দুই গণ্ড বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া করিয়া পড়িল।

এইরূপে অনেকক্ষণ উভয়ে নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিল। সুধাংশু কার্য্যান্তরে ছিল, ঘরে ঢুকিয়া উভয়কে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া, সে যে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে, তাহার এমন কথা খুঁজিয়া পাইল না।

সুধাংশুকে দেখিতে পাইয়া বিনয় ডাকিল "সুধা!"

"কি ভাই?"

"তুমি আমার সহোদর ভায়ের চেয়েও অধিক উপকার করেছ। তোমার ঋণ জন্মান্তরেও পরিশোধ করতে পারব না। যাবার সময় তোমায় আর একটী শেষ অনুরোধ কচ্ছি; সতীকে তুমি দেখ'। তার আর কেউ নাই। সে বড় অভিমানিনী।"

"বিনয়! তুমি কেন অমন কচ্ছ? আজ ত তুমি অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল আছ। আর সরস্বতীর বিবাহ? তার জন্ত তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করো না। মা বলেছেন তুমি ভাল হ'য়ে উঠলে, আমাদের নলিনীর সঙ্গে তার বিবাহ দিবেন।"

নলিনীনাথ বিনয়ের বিশেষ পরিচিত। তাহার মত চরিত্রবান যুবক সে অঞ্চলে খুবই কম ছিল। সে এতদিন বিবাহ করিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছিল, এক্ষণে বিনাপণে কোন দরিদ্রের কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত জানিয়া, সুধাংশুর মাতা সরস্বতীর সহিত তাহার বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন। তাহাদের আর্থিক অবস্থাও বেশ সচ্ছল। তাহার মত সুপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিলে কন্যার পিতা আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন।

সেই নলিনীনাথের সহিত সরস্বতীর বিবাহ হইবে শুনিয়া আনন্দের আবেগে বিনয়ের কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। বহুকষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল "ভাই সুধাংশু, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আমি বেঁচে থাকতে যাতে সে দৃশ্য দেখে যেতে পারি, তার বন্দোবস্ত কর।"

সুধাংশু ও বুঝিয়াছিল যে, বিনয়ের বাঁচিবার আশা নাই। সুতরাং যদি এ সময়ে বিবাহ না দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিনয় শান্তিতে মরিতে পারিবে না।

কিন্তু এ বিপদের মাঝে বিবাহই বা হয় কি প্রকারে? যাহা হৌক সে তাহার মাতাকে বুঝাইয়া বলিয়া, সেই বিপদের মাঝেই উৎসবের আয়োজন করিল।

যথাসময়ে শুভলগ্নে সুধাংশুর মাতুল পুত্র শ্রীমান নলিনীনাথের সহিত সরস্বতীর শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের দিন বিনয় আনন্দে আপনার রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়াছিল বটে, কিন্তু পরদিন যখন সরস্বতী কাঁদিতে-কাঁদিতে দাদার কাছে বিদায় গ্রহণ করিতে আসিল, তখন বিনয়ের অশ্রু বন্যার মত, সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া উদ্দাম বেগে ছুটিয়া বাহির হইল।

বিনয়, নলিনী ও সরস্বতীর হাত ধরিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল "নলিনী, আমার সরি——"

আর তাহার কথা বাহির হইল না; স্নেহময়ী ভগিনীর মুখের দিকে একবার শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই তাহার সব খেলা ফুরাইয়া গেল; যে দেশে বিমাতা নাই—যে দেশে বিমাতার ভ্রাতা নাই, বিনয় সেই দেশে চলিয়া গেল।

নারী-ষড়রূপা

[শ্রীগৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

(১)

অয়ি ষড়রূপে! তব অপরূপ অবগুণ্ঠন দাও খুলি,
লহ কাঙ্গালের অভিনন্দন ভক্ত এসেছে পথ ভুলি।
নিদাঘে ক্লান্ত মেলিলে নয়ন শান্ত বায়ুর মন্তরে,
সিনানে ভরিছে তনু-অমৃত ফুল ফুটি' ওঠে অন্তরে।
স্বেদ-বিন্দু সে বিরামের হার, মানব-প্রাণের ক্লান্তির ভার,
শান্তি লভেছে পরশে তোমার আসিলে মরতে কোন্ বরে?
লক্ষ্মীর প্রেমে মূরতি লভিলে মানবের ঘরে বন্দিনি;
লহ অন্তর-প্রেম-বন্দন নন্দন-বন-নন্দিনি!

(২)

যবে বরষার প্রণয়-স্বপনে যায় ধরণীর প্রাণ ছেয়ে,
বিরহী-হিয়ায় কে করুণ-সুরে আসে বেদনার গান গেয়ে।
সুন্দর সেই মুখরিত দিনে তোমার মানস-মন্দিরে,
ধ্বনি' ওঠে সারা বিশ্বের সুর জীবনের আশা ছন্দি'রে।
আজি এ কি তুমি মূর্ত প্রকৃতি, অন্তরে ভরা বরষার গীতি,
বেজে ওঠে শত ঝঙ্কার তুলি' প্রেমিকের প্রাণানন্দি'রে।
লক্ষ্মীর প্রেমে মূরতি লভিলে মানবের ঘরে বন্দিনি;
লহ অন্তর-প্রেম-বন্দন নন্দন-বন-নন্দিনি!

(৩)

শরতে পড়ে গো নয়ন-দিঠিতে ভুবনের স্নেহ প্রেম ঝরি',
জ্যোছনায় তুমি বাহিলে বসিয়া নাথের মিলনে মন্-তরী।
কুন্তলে তব মেঘ-মন-ছলে হাসিতে বিশ্ব প্রাণ পেলে,
সিঁদুর-কৌটায় তারকাবালারা অম্বরে দেছে টীপ্ মেলে।
চরণ ফেলিতে মুঞ্জরে কলি, বদনে মহিমা পড়েছে উছলি',
হৃদি-নিঙ্গালায় সেফালির মালা প্রীতির গন্ধ দেয় ঢেলে।
লক্ষ্মীর প্রেমে মূরতি লভিলে মানবের ঘরে বন্দিনি;
লহ অন্তর-প্রেম-বন্দন নন্দন-বন-নন্দিনি!

(৪)

হেমন্তে তব করুণা-শস্য দোল দিয়া যায় প্রাণ-কূলে,
তোমার স্নেহের করুণা-ধারায় তৃষিত এসেছে তাপ ভুলে।
অঙ্গ-সুবাস বুলিতেছে তব ভবনের দিক গন্ধিয়া,
নব অন্নের থালা লয়ে করে দাঁড়ালে ভুবনে ছন্দিয়া।
হেরি' সে উদার মহা রূপ-ছবি, হ'ল নত শির শত দীন কবি,
মুগ্ধ এ দাস সরিল না ভাষ রহিল নীরবে বন্দিয়া।
লক্ষ্মীর প্রেমে মূরতি লভিলে মানবের ঘরে বন্দিনি;
লহ অন্তর-প্রেম-বন্দন নন্দন-বন-নন্দিনি!

(৫)

হিমানী যখন ধরণীর গায় বিষাদ-ধূসরা দেয় ঢালি'
তুমি আসি' ধীরে সংসার ঘিরে রহ আনন্দ-দীপ জ্বালি'।
জীবন-প্রবাহ বহে গো শিরায় পুলকে পরাণ চঞ্চলে,
বিলায়েছ নরে চির-সুন্দরে ছলিতে এসেছ কোন্ ছলে?
রঞ্জিত হেরি তব করতল, গরবী গোলাপ সরমে বিকল,
কমল-তনুর সুষমায় তব নিখিলের আজি মন গলে।
লক্ষ্মীর প্রেমে মূরতি লভিলে মানবের ঘরে বন্দিনি;
লহ অন্তর-প্রেম-বন্দন নন্দন-বন-নন্দিনি!

(৬)

বসন্তে তুমি মঙ্গলরূপা দেহে যায় চন্দন ঝরি'
রূপের পূজায় শান্তির জল ছিটালে বিশ্বে প্রাণ ভরি'।
সুষমায় অয়ি পূর্ণ-বিকাশে এসেছি তোমারে বন্দিতে,
উষর-জীবনে গঙ্গার ধারে রহিয়াছ হেথা নন্দিতে।
আনন্দময়ি! তুমি আছ তাই মানবের সাথ বাঁচিতে ধরায়
সুর হয়ে ফির জীবন-বীণায় সান্ত্বনার গানে ছন্দিতে।
লক্ষ্মীর প্রেমে মূরতি লভিলে মানবের ঘরে বন্দিনি;
লহ অন্তর-প্রেম-বন্দন নন্দন-বন নন্দিনি!

পাখী-পোষা

[শ্রীসত্যচরণ লাহা এম-এ, বি-এল্]

(মেম্বর, ন্যাচারেল্ হিষ্ট্রি সোসাইটি –বোম্বাই)

আধুনিক যুগের য়ুরোপীয় পক্ষিপালকগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। প্রথম, যাঁহারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া উদ্যান-শোভন জীবজন্তুপালন প্রভৃতি প্রীতিপ্রদ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া আপনাদিগের অবসরকাল সুখে অতিবাহিত করেন। কর্ম্মহীন সুদীর্ঘ অবসরে আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখিবার বাসনাই অনেক-স্থলে তাঁহাদিগের এই প্রকার সুখদ অনুষ্ঠানের মূল। দ্বিতীয়,—আর এক-শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা অর্থ বা যশোলিপ্সু হইয়া পক্ষিপালনে ব্রতী হন। ইঁহাদিগের চিত্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপভোগ বা বিজ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা তত আকৃষ্ট হয় না, যতটা নাম এবং ধনোপার্জ্জনের তীব্র বাসনা ইহাদিগকে বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ডে প্রবর্ত্তিত করে। য়ুরোপের বিভিন্ন স্থানে পাখীদিগের প্রদর্শনীর নিমিত্ত যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, ঐ প্রদর্শনী কর্ত্তৃক অর্পিত পদকাদির লোভে প্রণোদিত হইয়া ইঁহারা কৃত্রিম খাদ্যাদির সাহায্যে পাখীদিগের স্বাভাবিক বর্ণের বিকৃতি(১) ঘটাইবার নিমিত্ত উদ্যত হন, এবং কূটবুদ্ধিপ্রভাবে খাঁচার বিচিত্র নির্ম্মাণ-কৌশল প্রদর্শন করিয়া বাহবা পাইবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। প্রদর্শনীকালে তাঁহাদিগের উদ্ভট ক্রিয়াকলাপের প্রতি সহজেই দর্শক-বৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় আপনা-দিগের যশোলাভের পন্থা সুগম হইয়া উঠে; সঙ্গে-সঙ্গে বর্ণবৈচিত্র্যপ্রাপ্ত পক্ষীদিগকে ইহারা অসম্ভব দরে বিক্রয় করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। তৃতীয়;—এই শ্রেণীর পক্ষিপালকগণ ধন, মান বা স্বার্থের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একাগ্রমনে বিজ্ঞানচর্চ্চায় ব্যাপৃত থাকেন। বিহঙ্গজাতির জীবন-বৈচিত্র্যের ধারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিয়া ইঁহারা যে সকল তথ্যে উপনীত হইতেছেন, ঐ তথ্য বা সিদ্ধান্তসমূহ তাঁহাদিগের চিত্ত উল্লাসিত করিয়া জ্ঞানপিপাসা মুহুর্মুহুঃ জাগাইয়া তুলিতেছে। যিনি পক্ষিপালনের উদ্দেশ্য যথাযথরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনি যে দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষিপালকগণকে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করিবেন, সে বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীর পক্ষিপালকগণের প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপ এত স্বার্থ-বিজড়িত যে, সেগুলি প্রদর্শনীর দর্শকবৃন্দের নিকট অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া পরিগণিত হইলেও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকের তত্ত্বমীমাংসার অল্পই সহায়তা করে। পরন্তু অনেক সময়ে তাহাদিগের চেষ্টা প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রযোজিত হইয়া থাকে এবং কখন কখন ইহাকে প্রাকৃতিক শক্তির ব্যতিক্রম(২) ঘটাইয়া কল্পিত পথে সগর্ব্বে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। এই বিজয়দম্ভ যে বহুকালের নিমিত্ত নহে

(১) পাশ্চাত্য পক্ষিপালকগণ যে সকল কৃত্রিম খাদ্যবস্তুর সাহায্যে পক্ষিগণের এই প্রকার অস্বাভাবিক বর্ণ-বৈচিত্র্য ঘটাইয়া থাকেন, তন্মধ্যে উদ্ভিজ্জ পদার্থই প্রধান উপকরণ। যে উপকরণগুলি একত্র মিশাইয়া সেবন করাইলে কেনেরী (canary) পক্ষীর বর্ণান্তর সাধিত হয়, তাহাদের একটি তালিকা নিম্নে—

গাঢ় পীতবর্ণ হরিদ্রাচূর্ণ.....২ আউন্স
Annato seed.....২ „
Salad oil .....৯ „

উল্লিখিত উপকরণসমূহের ভাগের তারতম্য অনুসারে কেনেরী পক্ষীর বর্ণের তারতম্য ঘটিতে দেখা যায়,—যথা কোন স্থানে গাঢ় পীত-বর্ণের আধিক্য, কোথাও বা কমলালেবুর রঙ্। এইরূপ বর্ণ-কৃত্রিমতা উৎপাদনের নিমিত্ত লঙ্কা এবং জাফরান (saffron) সময়ে-সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২) বিজ্ঞানসেবী পাশ্চাত্য পক্ষিপালকগণ বিহঙ্গজীবন লইয়া যাহা কিছু experiment করিতেছেন, তাহার কোনটিও প্রকৃতির বিরুদ্ধগামী নহে। প্রকৃতির পন্থানুসরণে যে সকল কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা চিরস্থায়ী; সুতরাং চিরস্থায়ী কার্য্যের উপায় উদ্ভাবনই তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। তদ্ভিন্ন তাঁহারা খাদ্য-কৃত্রিমতার সাহায্যে পক্ষীর অস্থায়ী বর্ণ-বৈচিত্র্যের প্রতি আদৌ লক্ষ্য না করিয়া পক্ষিমিথুনের সুনির্ব্বাচন, একত্র সংস্থাপন এবং তদবস্থায় সন্তান-

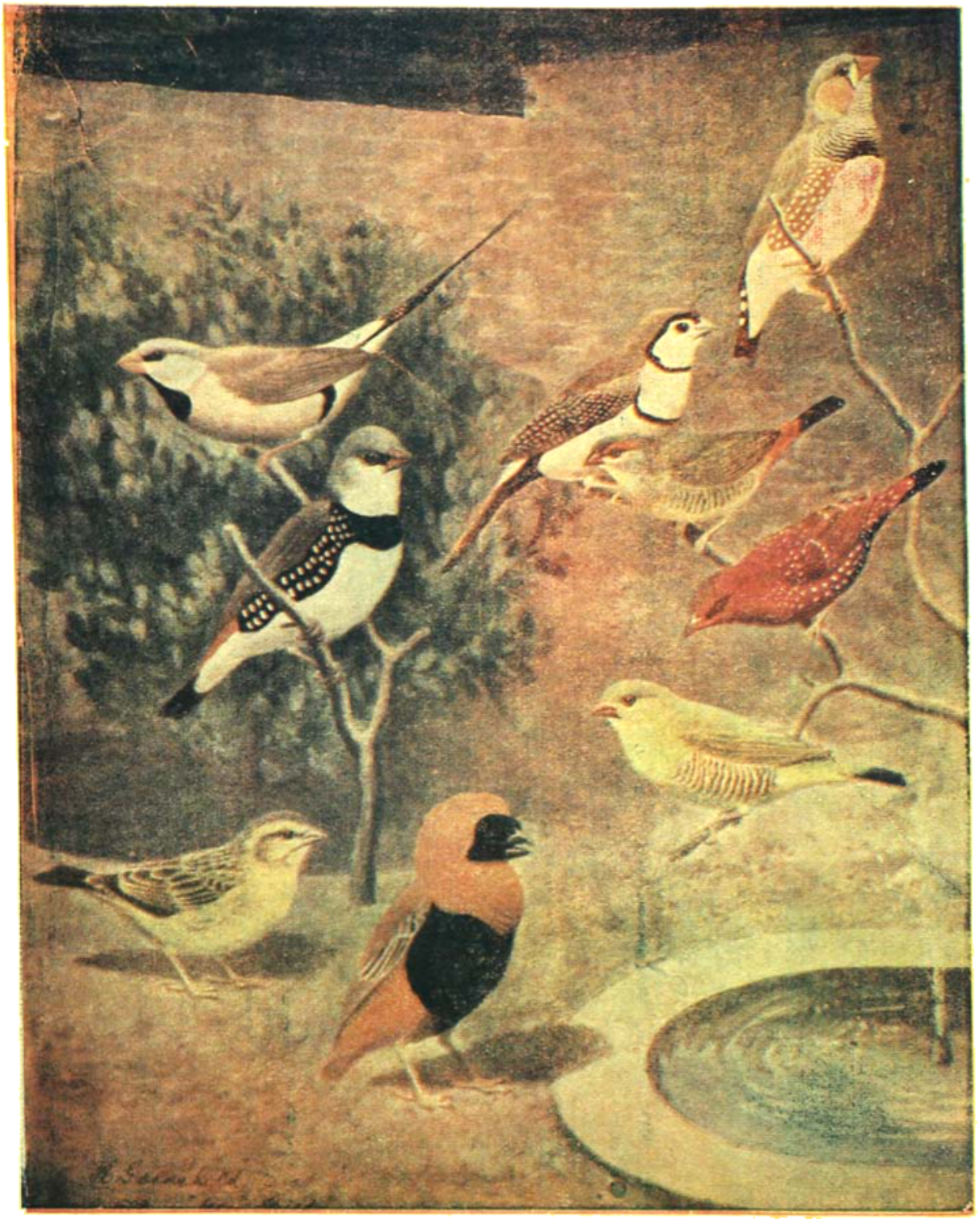

আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষের মুনিয়া জাতীয় পক্ষিগণ একত্রে সংরক্ষিত

Emerald Printing Works
CALCUTTA

তাহা বিজ্ঞানসেবী নিঃস্বার্থ পক্ষিপালকমাত্রেই ধ্রুব জানেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে, বর্ণোৎপাদক খাদ্যাদি-প্রয়োগে কেনেরী (Canary) পক্ষীর স্বাভাবিক বর্ণ সম্বন্ধে বৈচিত্র্য লাভ করে ; এবং যদিও ঐ পক্ষীর স্বভাবসিদ্ধ হুই একটি পুচ্ছের বর্ণ দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষিপালকগণের চক্ষে বিসদৃশ বোধ হয়, প্রদর্শনীর নিমিত্ত পাখীগুলি "প্রস্তুত" করিবার সময়ে উহা উৎপাটন করিতে তাঁহারা দ্বিধা বোধ করেন না। এই সমস্ত কৃত্রিম অনুষ্ঠান বৈজ্ঞানিকের চক্ষে বাস্তবিকই হাস্যাস্পদ ; এবং সেগুলি যিনি যত্ন সহকারে অনুধাবন করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, এই প্রকৃতি-পরাজয় ব্যাপার ক্ষণস্থায়ী ব্যতীত আর কিছুই নহে। কৃত্রিম উপায়ে বৈচিত্র্যপ্রাপ্ত পক্ষীর বর্ণ উহার স্বভাবগত নহে। কৃত্রিম খাদ্যাদির প্রয়োগ বন্ধ করিবামাত্র কেনেরী (Canary) পক্ষীর স্বাভাবিক বর্ণ পরিস্ফুট হইতে দেখা যায় ; প্রকৃতি সজাগ হইয়া উঠে।

প্রকৃতপক্ষে পরস্পরের তুলনায় উল্লিখিত তিন শ্রেণীর পক্ষিপালকগণের ক্রিয়াকলাপ উচ্চ-নীচরূপে গণ্য হইলেও আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না যে, তাঁহাদিগের পালন-ব্যাপারে সাফল্য লাভের চেষ্টা বিজ্ঞানসেবার পথ অল্প-বিস্তর সুগম করিয়া দিতেছে। পালনব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া পালকেরা সবিশেষ যত্ন এবং অধ্যবসায়ের ফলে যে সমস্ত অভিজ্ঞান লাভ করিয়া বিহঙ্গ-জাতির জীবন-ঘটিত তথ্য উপনীত হইতেছেন, ঐ তথ্যসমূহ সাধারণের গোচরীভূত করিবার সুযোগ উল্লিখিত পক্ষি-প্রদর্শনীসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে। ক্ষীণপ্রাণ বিহঙ্গ-জীবনের খুঁটিনাটি লইয়া যে সকল সমস্যা উপস্থিত হইয়া পালকগণকে চঞ্চল করিয়া তুলে, সেগুলি যে সম্যক্‌রূপে মীমাংসিত হইতেছে, তাহার অলন্ত প্রমাণ প্রদর্শনীর পাখীরাই প্রদান করিয়া থাকে। কারণ উহাদিগের সানন্দ লাবণ্যময় অঙ্গকান্তির প্রতি তাকাইয়া দেখিলে অবদ্ধাবস্থায় অসুস্থতানিবন্ধন শারীরিক বা মানসিক বৈপরীত্যের কিছুই নিদর্শন লক্ষিত হয় না ; বরং পাখীগুলির স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ পূর্ণমাত্রায় দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ পক্ষি-জীবনের সমস্যা-ভঞ্জন এবং তথ্য নিরূপণের ফলে বিজ্ঞান, শাস্ত্রের কলেবর উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রদর্শনীকালে এই সকল নিরূপিত তথ্য বিহ্বল দর্শকবৃন্দের যতই জ্ঞান-গোচর হয়, ততই তাঁহাদিগের চিত্ত বিহঙ্গ-তত্ত্বে কৌতূহল পরবশ হইয়া বিজ্ঞান-সেবায় ধাবিত হইয়া থাকে।

তত্ত্বলাভের তীব্র বাসনা য়ুরোপীয় পালকবৃন্দকে যে কেবলমাত্র দেশীয় পক্ষীর পালন-ব্যাপারে লিপ্ত রাখিতেছে, তাহা নহে ; তাঁহারা বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নানাবিধ বিদেশীয় পক্ষীকে সাবধানে সযত্নে স্বদেশে আনয়ন পূর্ব্বক অনভ্যস্ত প্রকৃতি-প্রতিকূল জলবায়ু কৃত্রিম উপায়ে অভ্যাস করাইয়া কৃত্রিম খাদ্যাদির সাহায্যে উহাদিগের পুষ্টিসাধন করতঃ বৈদেশিক পাখীগুলির জীবন-লীলা পর্য্যবেক্ষণের যথেষ্ট অবসর পাইতেছেন। এমন কি কোন কোন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু (৩) কেবলমাত্র বৈদেশিক পক্ষিপালনে নিযুক্ত থাকিয়া ধারাবাহিকরূপে উহার জীবন-রহস্য উদ্ঘাটনের নিমিত্ত আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, পাখীগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে যে সমস্ত সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়, ঐ সমস্যা-সমূহের সম্যকরূপে সমাধান ব্যতীত বিহঙ্গজাতির অতি সূক্ষ্ম জীবন-রহস্যগুলির উদ্ঘাটনের প্রয়াস নিষ্ফল হইয়া থাকে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে ৪) আমরা য়ুরোপীয় পক্ষিপালকগণের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে পালন সম্বন্ধে কয়েকটি সমস্যার অবতারণা করিয়া সেগুলি মীমাংসার চেষ্টা করিব।

জলবায়ুর ফলে পক্ষিশাবকের চিরস্থায়ী রূপান্তর সংসাধনে প্রয়াসী হইয়াছেন।

(৩) বৈদেশিক পক্ষিপালনে একনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের মধ্যে আমরা ডাক্তার কীস্ (Dr. Keays)এর নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী East Hoathly গ্রামে তিনি যে সকল পক্ষিভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার সুচারু বর্ণনা ১৯১৫ খৃঃ অব্দের নভেম্বর মাসের "Cage Birds" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অন্যূন পাঁচশত পক্ষী তিনি ঐ সময়ে পালন করিতেছিলেন ; এবং তাহাদিগকে রাখিবার নিমিত্ত প্রায় ৫০০০ টাকার ফুট আদায় তাঁহাকে জলধারা বেষ্টন করিতে হইয়াছিল। উক্ত বর্ষের গ্রীষ্ম-কতুর শেষাশেষি তাঁহার পক্ষিগৃহ মধ্যে আটাত্তরটি বিভিন্ন শ্রেণীর পক্ষিশাবক আপন-আপন নীড় পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। vide "cage Birds" edited by F. Carl, Nov 13th, 1915.

(৪) 'পাখীর খাঁচা' নামক প্রবন্ধ দেখুন, ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩২৩।

পূর্ব্বে(৫) কথিত হইয়াছে যে, পালকগণ কি প্রকার পক্ষী পালন করিতে ইচ্ছুক আছেন, তাহা অবধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পাখীদিগের রক্ষণোপযোগী স্থান নির্ম্মাণ এবং উহার বাহ্যাভ্যন্তরীণ সজ্জা-সামগ্রীর সন্নিবেশ ব্যাপারে যেরূপ যত্নবান হইতে হইবে, তদ্রূপ তাঁহাদিগের মনোনীত পক্ষিসমূহের সঙ্কর এবং সেগুলির পিঞ্জর (Cage) অথবা পক্ষিগৃহ (aviary) মধ্যে স্থাপন বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। পক্ষি-মিথুন অথবা এক একটি পক্ষীকে পৃথকভাবে রাখিবার অনুকূল সুকৌশলে নির্ম্মিত বিবিধ পিঞ্জরসমূহের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। বিভিন্ন শ্রেণীর বহুবিধ পক্ষিগণের গৃহমধ্যে একত্র সমাবেশ ও সংরক্ষণ বড়ই দুরূহ সমস্যা। আকার প্রকার স্বভাব ও শ্রেণীগত বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত পাখীগুলির পরস্পর বিদ্বেষাচরণ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া গৃহমধ্যে তাহাদের একত্র অবিমৃষ্ট সমাবেশ কখনই সম্ভবপর নহে। এই প্রকার যথেচ্ছ সংরক্ষণের ফলে দুর্ব্বল এবং ভীরুস্বভাব পক্ষিগণ বৃহৎ ও উগ্র প্রকৃতির বিহঙ্গের তাড়নায় উপদ্রুত হইয়া অকালে কালমুখে পতিত হইতে পারে। এই নিমিত্ত হঠকারিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুদক্ষ পালকগণের আত্মসংযত জ্ঞানমার্গে পরিচালিত হইলে অকারণ নৈরাশ্যের তীব্রবেদনা অনুভব করিতে হয় না।

পালনাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে, বিহঙ্গজগতে এত প্রকার পক্ষী দৃষ্ট হয়, যাহাদিগের রুচির তারতম্যপ্রযুক্ত খাদ্যাদির পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যদিও অধিকাংশ পক্ষী কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করে, তথাপি কোন একটি বিশিষ্ট খাদ্যের উপর তাহাদিগের অধিকতর ঝোঁক দেখা যায়। বুলবুল জাতীয় পক্ষিগণ কীটাদি ভোজন করিলেও তাহারা সুপক্ক ফলের বিশেষ পক্ষপাতী; কোকিল, "বসন্ত", "হরেওয়া" প্রভৃতি কতিপয় পক্ষীও সুপক্ক ফল খাইতে বড়ই ভালবাসে। মুর্গাঝুনটুনি এবং এই জাতীয় ক্ষুদ্রকায় পক্ষী প্রজাপতি প্রভৃতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করিলেও মধুমক্ষিকার ন্যায় মধুপানের তীব্র বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে, এবং বিধি-বিনির্দ্দিষ্ট সুপটু চঞ্চুপুটের সাহায্যে সরস কুসুম-নিচয় হইতে মধুপান করিয়া আপনাদিগের দেহের পুষ্টিসাধন করে। কতিপয় পক্ষী বীজাণুভোজী হইলেও তাহাদিগকে সময়ে-সময়ে কীট পতঙ্গ ভোজন করিতে দেখা যায়। কীটপতঙ্গপ্রিয় কোন কোন জাতীয় বিহঙ্গ উদর-তৃপ্তির নিমিত্ত ক্রমাগত ক্ষুদ্র কীটাদির বিনাশ সাধন করতঃ এতই হিংস্র ভাবাপন্ন হইয়া উঠে যে, গৃধ্র প্রভৃতি শ্মশানী পক্ষীর ন্যায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় ক্ষীণপ্রাণ বিহঙ্গগণকে হনন করিতে উদ্যত হয়। "মাছরাঙা" জাতীয় পাখীগুলি যদিও কীটাদি ভক্ষণ করে, তথাপি মৎস্যের উপর উহাদিগের আসক্তি বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। ভিন্নরুচি এই সকল পক্ষীকে একত্র একগৃহমধ্যে রক্ষা করা কতদূর সঙ্গত এবং সম্ভবপর, তাহা নির্ণয় করা একমাত্র অভিজ্ঞানসাপেক্ষ। মোটামুটি বলিতে গেলে, তুল্যাবয়ব এবং সমানস্বভাবের পাখীগুলিকে একত্র রক্ষা করিলে বিপদ্‌পাতের অতি অল্পই সম্ভাবনা। উল্লিখিত হিংস্রভাবাপন্ন কীটপতঙ্গভোজী বিহঙ্গগণকে অপরাপর নিরীহ পক্ষিসমূহের সহিত রক্ষা করা কখনই বিধেয় নহে। প্রায় দেখা যায় যে, পক্ষিপালকগণ অবয়ব এবং স্বভাবের সামঞ্জস্য সত্ত্বেও বীজাণুভোজী এবং কীটপতঙ্গ-ভক্ষণকারী পক্ষিগণের মধ্যে পরস্পর সবিশেষ পার্থক্য বোধে উহাদিগকে একত্র রাখিতে অনিচ্ছুক। ইহা তাঁহাদিগের ভুল ধারণা মাত্র। স্বভাব এবং অবয়বের সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই দুই জাতীয় বিহঙ্গগণের একত্র সংরক্ষণ দোষাবহ নহে; কারণ সচরাচর বীজাণুভোজী পাখীকে কীট পতঙ্গও ভক্ষণ করিতে দেখা যায়; এবং পক্ষিগৃহমধ্যস্থ কীটপতঙ্গপ্রিয় বিহঙ্গগণের নিমিত্ত যে সমস্ত কৃত্রিম খাদ্য প্রদত্ত হয়, তাহা যে বীজাণুভোজী পক্ষিসমূহের পক্ষে হিতকর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ ইহা তাহাদিগের সবিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। টিয়া (parrot) জাতীয় বিহঙ্গগণের চঞ্চুপুট স্বভাবতঃ অতিশয় সবল এবং তীক্ষ্ণ; ইহার আঘাতে অপর পক্ষী সহজে ক্লিষ্ট ও অধম হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত উহাদিগকে স্বতন্ত্র গৃহে রক্ষা করা সঙ্গত।

একত্র সমাবেশকালে পাখীগুলির স্বভাব এবং দেহের আয়তনের প্রতি পালকের যেরূপ লক্ষ্য রাখা উচিত, তদ্রূপ তুল্যপ্রকৃতি ও সমান আকারের নির্ব্বাচিত পক্ষী বা পক্ষি-মিথুনগুলিকে গৃহমধ্যে ছাড়িয়া দিয়া তাহাদিগের পরস্পর আচরণ প্রত্যক্ষ করা তাঁহার একটি অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম, কারণ এই প্রকারে তিনি ভাবী বিপদ্‌পাত প্রতিকারের

(৫) 'পাখীর-খাঁচা' নামক প্রবন্ধ দেখুন, ভারতবর্ষ ফাল্গুন ১৩২৩।

অবসর পাইয়া থাকেন। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, পাখীগুলির স্বভাব বা শ্রেণীগত কোন প্রকার দোষ না থাকিলেও শ্রেণীমধ্যস্থ কোন এক বিশিষ্ট পক্ষীর আচরণ অকারণ রূঢ় হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সুকোমল-স্বভাব বুলবুল জাতীয় পক্ষিগণের মধ্যেও কোন কোনটির বিদ্বেষপ্রিয়তা লক্ষিত হয়। মানবগণের মধ্যেও এরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। এইরূপ স্থলে রূঢ়-প্রকৃতি পাখীটিকে অবিলম্বে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য; নচেৎ অন্যান্য প্রকৃতি-কোমল পক্ষিসমূহ যে ইহার দ্বারা আহত কিম্বা ইহার সংস্রবে থাকিয়া স্বভাব-দুষ্ট হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বীজাণুভোজী ফিঙ্কজাতী (finch family) বিভিন্ন শ্রেণীর পক্ষিগণকে একত্র কিম্বা অপরজাতীয় তুল্যাবয়ব এবং সমান প্রকৃতি বিহঙ্গগণের সহিত এক গৃহ-মধ্যে রক্ষা করিবার পূর্ব্বে উহাদিগের চঞ্চুপুটের সামর্থ্য এবং পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত, কারণ পরস্পর বিবাদ বাধিলে চঞ্চুপুটই তাহাদিগের অস্ত্রের ন্যায় কার্য্যকরী হইয়া থাকে। অতএব সহজেই অনুমিত হয় যে, আক্রমণ কিম্বা আত্মরক্ষার সময়ে যে পাখীটির চঞ্চু তীব্র এবং সুদীর্ঘ, তাহার বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবী; এবং যাহাদিগের চঞ্চুপুট অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও হীনবল, তাহারা আহত ও উপদ্রুত হইয়া থাকে। বিহঙ্গজাতির মধ্যে এরূপ পক্ষীও আছে, যাহাকে অযুগ্মাবস্থায় অপরজাতীয় পক্ষিগণের সহিত গৃহমধ্যে রাখিলে শান্ত ও সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায়; কিন্তু মিথুনা-বস্থায় উক্তরূপে অপর পক্ষীর সহিত রক্ষা করিলে পক্ষিদ্বয় নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া অপরাপর পাখীগুলিকে আক্রমণ করিতে থাকে। বীজাণুভোজী "ক্রস্‌বিল" (crossbill) পক্ষী মিথুনাবস্থায় উগ্রস্বভাবাপন্ন হয় বলিয়া কখনই উহাকে অপর পক্ষিগণের সহিত একত্র রাখা বিধেয় নহে।

ইহাই মোটামুটি সংরক্ষণের বিধি। পাখীগুলির স্বভাব যদি সুকোমল এবং বিদ্বেষবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে ইহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের প্রতি রুচি অথবা অবয়বের অল্পবিস্তর প্রভেদ থাকিলেও কিছু আসে যায় না। পক্ষিভবনটি বৃহৎ এবং সুপ্রশস্ত হইলে যথেচ্ছ বিচরণ এবং অবস্থানের নিমিত্ত প্রচুর জায়গা পাইয়া পাখীদিগের পরস্পর বিবাদ ঘটিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা হয় না। অনেক সময়ে এইরূপ পক্ষি-ভবনে অবয়বের পার্থক্য সত্ত্বেও সুকোমল-স্বভাব বিহঙ্গ-গুলিকে একত্র রাখা বেশ চলে। শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের যে পক্ষিগৃহের চিত্র পূর্ব্বে (৬) প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অতি ক্ষুদ্রকায় চুর্গাটুনটুনি হইতে বৃহৎকায় কৃষ্ণ-গোকুল (Oriole) পর্য্যন্ত একত্র নির্ব্বিবাদে অবস্থান করিতেছে। এইরূপ গৃহমধ্যে বিবিধ পাখীগণের উপযোগী খাদ্যের প্রাচুর্য্য এবং খাদ্যপাত্রগুলির বহুস্থানে স্থাপন বিষয়ে পালকের সবিশেষ মনোযোগী থাকা আবশ্যক।

মনোনীত পাখীগুলির একত্র সংরক্ষণ পালকের পক্ষে দুরূহ সমস্যা হইলেও আবদ্ধাবস্থায় তাহাদিগের উপযোগী খাদ্যের নির্ব্বাচন আরও দুরূহ সমস্যা; কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় উহারা এত প্রকার খাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকে যে, ঐ সকল খাদ্য-সামগ্রী আহরণ করা পালকের পক্ষে অসম্ভব। আবার, বিবিধ খাদ্যের মধ্যে কোন্‌টি পক্ষিবিশেষের প্রধান আহার, তাহার নির্ণয়ও সুকঠিন। বিহঙ্গজাতির বিবিধ খাদ্যের প্রতি আসক্তি এবং উহার রুচিভেদ সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। এখন, আবদ্ধ পাখীদিগের এই রুচিভেদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে সমস্ত কৃত্রিম খাদ্য সামগ্রীর উদ্ভাবনা বা আবিষ্কার হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। আমাদের দেশে প্রচলিত ছাতুর ব্যবহার বিষয় অনেকেই অবগত আছেন; এমন কি মাংসের টুকরা ঘৃতপক্ক ছাতুর সহিত মিশ্রিতাবস্থায় কীট-ভোজী পক্ষিগণের আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই খাদ্য-কৃত্রিমতার বৈচিত্র্য য়ুরোপেই অধিক পরিলক্ষিত হয়; তথায় পালকগণ পাখীগুলিকে আপন উপযোগী কৃত্রিম খাদ্যের আখ্যানুরূপ অভিধা প্রদান করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড প্রদেশে আমরা দেখিতে পাই যে, কীটপতঙ্গভোজী পাখীদের নিমিত্ত যে সকল কৃত্রিম আহার্য্যের প্রচলন আছে, তাহারা "কোমল খাদ্য" বা "soft food" নামে অভিহিত হয় এবং খাদ্যের নামানুরূপ পাখীগুলিও (যাহাদিগের নিমিত্ত এইরূপ খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন) "কোমল চঞ্চু" বা soft bill আখ্যা পাইয়া থাকে। তথায় এই "কোমল খাদ্য" প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ছাতুর পরিবর্ত্তে হংস-কুক্কুটাদি পক্ষীর সুসিদ্ধ ডিম্ব প্রধান উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়; অপরাপর উপকরণের মধ্যে বিস্কুটচূর্ণ এবং পিপ্‌ড়ার ডিম (ants' eggs), সময়ে সময়ে বোল্‌তার ডিম (wasp

(৬) ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩১৪।

grub) এবং মৃত শুষ্ক মক্ষিকার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যে সকল নানাজাতীয় শস্যবীজ (৭) বীজাণুভোজী পক্ষিগণের আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়, ঐ বীজসমূহের শক্ত খোসা ছাড়াইয়া অভ্যন্তরস্থ শস্যদানা ভক্ষণ করিতে হইলে পাখী-গুলিকে তাহাদিগের সুকঠিন চঞ্চুপুটের সাহায্য সর্ব্বদাই গ্রহণ করিতে হয়। এই জাতীয় পক্ষিবৃন্দ ইংলণ্ডে "কঠিন চঞ্চু" বা "hard bill" নামে অভিহিত হয় এবং ইহাদিগের প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রী "hard-bill food" আখ্যা পাইয়া থাকে। আর এক প্রকার কৃত্রিম খাদ্য এই "কঠিন চঞ্চু" পাখীগণের স্বাস্থ্যের একান্ত অনুকূল—দূর্ব্বাঘাস, মূলা ও কপি প্রভৃতি শাক সব্জীর সুকোমল পত্রসমূহ। বিলাতে ইহারা "সবুজ খাদ্য" বা "green food" নামে পরিচিত। মানব-ভোগ্য সুমিষ্ট সুপক্ক ফল পিঞ্জর-বিহঙ্গগণের স্ব স্ব রুচি-বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও যে অতি উপাদেয় খাদ্য, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। যদিও "কোমলচঞ্চু" বিহঙ্গগণের নিমিত্ত "কঠিন খাদ্যের" আবশ্যকতা প্রায় দৃষ্ট হয় না, আবদ্ধাবস্থায় সকল রকম পাখীগুলির নিমিত্ত কিন্তু অন্নবিস্তর "কোমল খাদ্যের" প্রয়োজন; এমন কি সন্তানোৎপাদনকালে (breeding time) "কঠিন চঞ্চু" পিঞ্জর-পক্ষিগণ "কোমল খাদ্যের" সাহায্য ব্যতীত শাবক প্রতিপালনে সমর্থ হয় না। "কোমল চঞ্চু" বিহঙ্গগুলির ত কথাই নাই। য়ুরোপে নানা প্রকার কৃত্রিম খাদ্যের নিত্য নূতন আবিষ্কার দেখিয়া সহজেই অনুমিত হয় যে, আধুনিক যুগের পক্ষিপালকগণের পালন-সাফল্য তাহাদিগের কৃত্রিম খাদ্যপ্রস্তুতকুশলতার উপর অধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত। একদিকে যেরূপ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু বুধমণ্ডলী মুক্ত আকাশতলে বিহঙ্গগণের স্বাধীন আহার বিহার হাবভাব ভঙ্গী প্রভৃতি সূক্ষ্ম জীবনরহস্যগুলির উদ্ঘাটনের প্রয়াস পাইতেছেন, তদ্রূপ আবার আর এক সম্প্রদায় পাখীদিগের আবদ্ধ-জীবন সুদীর্ঘ এবং সুখময় করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের উপযোগী আহার্য্য ও অপরাপর আবশ্যক উপাদান নিরূপণ বিষয়ে অনন্যমনা হইয়াছেন। এইরূপে উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টা এবং অভিজ্ঞানের ফলে যে সকল পক্ষীকে ইতঃপূর্ব্বে আবদ্ধাবস্থায় জীবিত রাখা একান্ত অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইত, ইদানীং তাহাদিগকে স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব সত্ত্বেও কৃত্রিম আহার্য্যের সাহায্যে অসঙ্কোচে পালন করা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে। এই প্রসঙ্গে মিঃ আলফ্রেড এজরার (Mr. Alfred Ezra) নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। লণ্ডনের প্রতিকূল জলবায়ু এবং আব-হাওয়ার মধ্যে তিনি বহুক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক স্বভাব-চঞ্চল ও লঘুকায় দুর্গাটুনটুনির রক্ষণোপযোগী যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার চিত্র পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে (৮)। নিরুপম সৌন্দর্য্যশালী এই জাতীয় পক্ষিগণের আহার-বিধান এতদিন মানবের অপ্রাতীত ছিল। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভাবে এজরা মহোদয় ইহাদিগের আহার্য্য এবং পালন-বিধির আবিষ্কার ও নিরূপণদ্বারা পালন-ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দুগ্ধ এবং মধু পিঞ্জর-টুনটুনির প্রধান খাদ্য। উক্ত জলের সহিত বৎসামান্য ছাতু, মধু বা শর্করা, Mellins food, condensed milk প্রভৃতি য়ুরোপীয় কৃত্রিম দুগ্ধ একত্র উত্তমরূপে মিশাইয়া যে তরল আহার্য্য প্রস্তুত হইবে, তাহাই শীতল করিয়া দুর্গাটুনটুনির বিশিষ্ট খাদ্যরূপে ব্যবহার্য্য। পিঞ্জর-বিহঙ্গগণের নিমিত্ত কৃত্রিম আহার্য্য বিধান সত্ত্বেও যে বিবিধ কীটপতঙ্গের আবশ্যকতা আছে, তাহা স্বতন্ত্ররূপে উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। জীবন্ত অবস্থায় প্রায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া বিলাতে উহারা "live food" বা "জীবন্ত খাদ্য" নামে পরিচিত; কতিপয় কীটও আবার মৃত এবং শুষ্ক অবস্থায় বিহঙ্গ-ভোজ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত বৃহৎকায় মাংসাশী পাখীদিগের জন্য চড়াই প্রভৃতি ছোট ছোট পক্ষী অথবা মূষিক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী খাদ্যরূপে গণ্য হয়; মাংসের টুকরাও সচরাচর এই নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়।

পথ্যহিসাবে খাদ্যবিশেষের ব্যবস্থা পীড়িত পাখীদিগের নিমিত্ত আবশ্যক হয়। পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি (৯) যে বীজাণুভোজী পক্ষিগণের পক্ষে বালি (sand) অতিশয় হিতকর, কারণ ইহা তাহাদিগের পরিপাক শক্তির বিশেষ রূপে সহায়তা করে। তদ্রূপ আবার কতিপয় শ্রেণীর কীট পতঙ্গ কীটভোজী পাখীদিগের স্বাস্থ্যের অনুকূল।

(৭) সাধারণতঃ Canary seed, শাটবীজ (hemp seed), সর্ষপদানা (rape seed), গোস্তদানা, তিসি (linseed), কাঁকনি দানা এই জাতীয় বিহঙ্গগণকে খাইতে দেওয়া হয়।

(৮) "পাখীর খাঁচা" নামক প্রবন্ধ দেখুন, ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৭৪।

(৯) ভারতবর্ষ, বাঁধ ১৩২৪, 'খাঁচার পাখী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রতি এবং পশ্চাৎ অঙ্গুলী একত্র অবস্থিত
"মাছরাঙা এবং "ধনেশ" পক্ষী

উষ্ণপ্রদেশীয় পক্ষিগণ

কপি, মূলা প্রভৃতি শাক সবজীর সুকোমল পত্র বীজভোজী পাখীদিগের কোষ্ঠ-পরিষ্কারক ; দুগ্ধ মিশ্রিত রুটিও য়ুরোপীয় পালকগণ কর্ত্তৃক এই নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। উদরাময় রোগ নিরাকরণের জন্য এইরূপ দুগ্ধ মিশ্রিত arrowroot বিস্কুটের সহিত গোটাকতক পোস্তদানা একত্রিত করিয়া রুগ্ন পক্ষীকে খাওয়াইতে হয়। এতদ্ব্যতীত পালিত পক্ষিগণের নানাবিধ ব্যাধির প্রতিকারের নিমিত্ত বিবিধ ঔষধের প্রয়োগ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইয়া থাকে। আবশ্যকতাই যে উহাদিগের

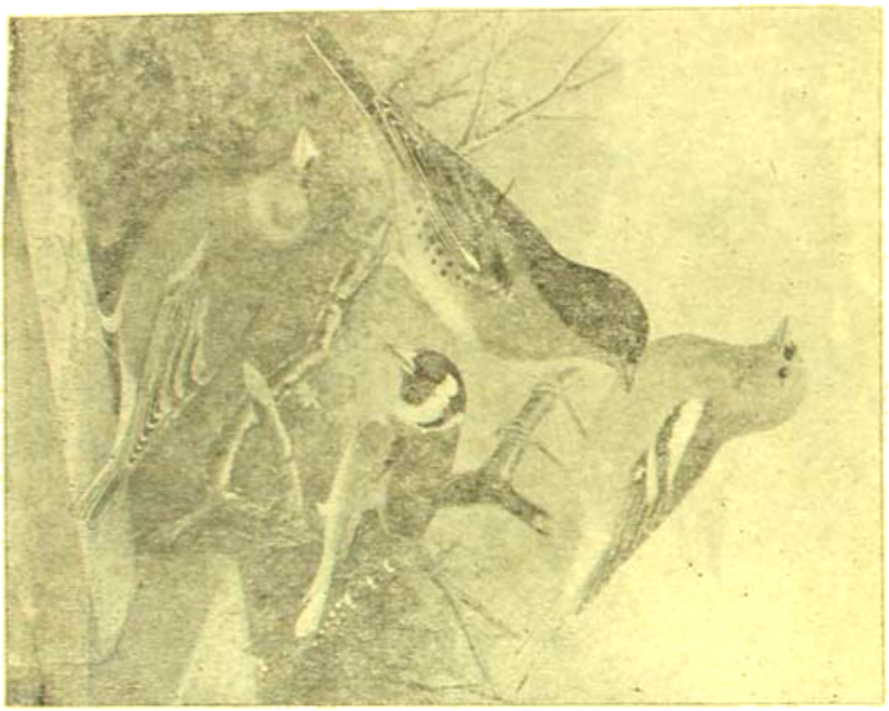

চিত্র ৩। হরিয়াল (Green hard-bill) নামক পক্ষীর পীড়া

চিত্র ৪। ঘুঘু (Indian turtle-dove) নামক পক্ষীর পীড়া

এই সকল রোগের হেতু তাহা নহে; পরন্তু অবদ্ধাবস্থায় পাখীদিগের ব্যাধির সুচিকিৎসা হইবার সম্ভাবনা অধিক। বনে জঙ্গলে যে উহাদিগের স্বাধীন জীবন রোগমুক্ত নহে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এমন কি মিঃ গ্যালোয়ে বলেন (১০)—মে-জুন (May, June) মাসে ও

(১০) "Diseases of Birds, and their treatment and cure—I," by P. F. M. Galloway in the Avicultural Magazine, April 1918.

মিঃ আলফ্রেড এডওয়ার্ড পক্ষিযুথে রক্ষিত বিভিন্ন শ্রেণীর দুর্লভ চুনচুনি

(যখন বিহঙ্গগণের স্বাভাবিক খাদ্যের অনটন নাই) যখন তিনি জীর্ণ শীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার রুগ্ন পক্ষীকে ভূমি হইতে কুড়াইয়া পাইয়াছেন, তখন সহজেই বুঝা যায় যে পাখী দিগের স্বাধীন জীবন যে সম্পূর্ণ নিরাময়, তাহা নহে। তিনি আরও বলেন যে, বনে জঙ্গলে তাহারা ব্যাধিনাশক কোনও ঔষধ পায় না বলিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বস্তুতঃ, মানবদিগের মধ্যে যে সকল ব্যাধি পরিদৃষ্ট হয়, বিহঙ্গগণের মধ্যেও ঐরূপ অধিকাংশ ব্যাধি লক্ষিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ পাখীদিগের নিম্নলিখিত ব্যাধিগুলি উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি:—মূর্চ্ছা, হাঁপানি, সর্দ্দিকাসি, বিসূচিকা, বিকলাঙ্গ, উদরাময়, আমাশয়, যক্ষ্মা, প্লীহারোগ, বাত, চক্ষুরোগ, ক্ষত, ফোড়া ইত্যাদি। এই সকল রোগের উপশমনের নিমিত্ত উপযোগী ঔষধের মাত্রা স্বল্প পরিমাণে বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যবহার্য্য। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত ঘটিয়া গিয়াছে, যখন এক ফোঁটার স্থলে দুই ফোঁটা ঔষধ প্রয়োগের ফলে রুগ্ন পক্ষীগুলির রোগোপশমন দূরে থাকুক অবিলম্বে তাহাদিগের মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে। এই সকল ব্যাধির চিকিৎসার নিমিত্ত হোমিওপ্যাথি ঔষধ প্রয়োগই প্রশস্ত; কিন্তু আমরা সময়ে-সময়ে এলোপ্যাথি ঔষধও ব্যবহার করিয়া থাকি—যেমন দাস্ত পরিষ্কারের নিমিত্ত Epsom salt; হাঁপানি রোগের নিমিত্ত Glycerine এবং Gum arabic; যক্ষ্মার নিমিত্ত Cod liver oil ব্যবহার করিতে হয়। পাখীগুলিকে সবল রাখিতে হইলে Parrish's Chemical food প্রভৃতি স্বাস্থ্যবর্দ্ধক ঔষধ প্রয়োগ দরকার। ঘা এবং ফোড়ার নিমিত্ত Vaseline এবং আবশ্যক হইলে অস্ত্র-চালনাও বিধেয়। পালক ঔষধের সাহায্যে পীড়িত পক্ষীগণের রোগের উপশম করিতে সমর্থ না হইলেও চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। স্বাস্থ্যকর স্থানে উহা-দিগকে রাখিয়া, স্বাস্থ্যবর্দ্ধক খাদ্য

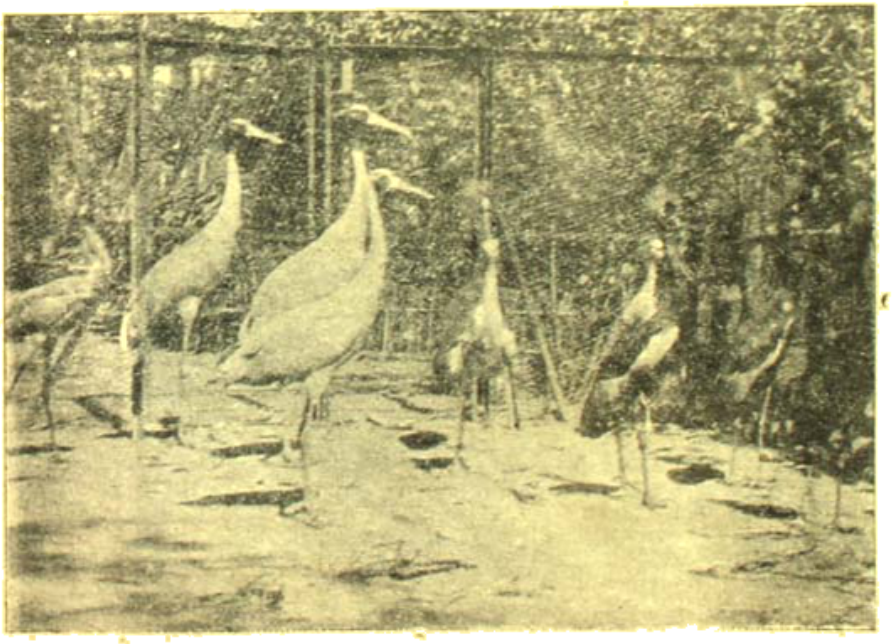

মিঃ ডেভিড এডওয়ার্ড কলিযাতাতে পক্ষি ভবনে এবং তৎ সংরক্ষিত বিভিন্ন শ্রেণীর দারুণ পক্ষী

এবং পানীয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, মাঝে-মাঝে পথ্যের তারতম্য করিয়া এবং অসুস্থতার সূত্রপাত হইতে না হইতেই উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তিনি পাখীগুলিকে রোগাক্রান্ত হইবার সুযোগ দেন না। সুপ্রশস্ত পক্ষিগৃহে যদি কোনও পক্ষীর অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধৃত করিয়া একটি স্বতন্ত্র পিঞ্জর মধ্যে রাখিতে হইবে। উপযোগী খাদ্য এবং ঔষধ ইহার নিমিত্ত আবশ্যক; পিঞ্জরটি এরূপ স্থলে রাখিতে হইবে, যেখানে রুগ্ন পক্ষীটিকে কোনরূপ ঠাণ্ডা না লাগে;—কারণ দেখা গিয়াছে উত্তাপের সাহায্যে পাখী শীঘ্র-শীঘ্র রোগমুক্ত হইয়া থাকে। য়ুরোপীয় পক্ষিপালকগণ রোগ-নিবারণের জন্য একপ্রকার তাপযন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার নাম Radiator। য়ুরোপে এই যন্ত্রের ব্যবহার যত বেশী আবশ্যক, ভারতবর্ষের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অবশ্যই ঠিক তত বেশী নহে। এখানে আমরা অনেক সময়ে বুঝিতে পারি যে, অত্যধিক উত্তাপের মধ্যে পাখীগুলি আরামাবস্থায় হাঁপাইতে থাকে; গৃহমধ্যস্থ এবং গৃহের বাহিরের পারিপার্শ্বিক উত্তপ্ত বায়ু তাহাদিগকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলে। তখন পাখীগুলিকে সেখান হইতে সরাইয়া ঘন-পল্লবিত বৃক্ষান্তরালে স্নিগ্ধ বনচ্ছায়ার পিঞ্জর মধ্যে রাখিয়া আসিলে তাহারা শান্তি লাভ করে।

এমনি করিয়া মানুষ সর্ব্বান্তঃকরণে পক্ষিজাতির সেবা করিতেছেন। প্রকৃতির ক্রোড় হইতে ছলে বলে কৌশলে বিচ্যুত বিহঙ্গগুলিকে কৃত্রিম গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া তিনি হয় ত কতকটা স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন; হয় ত তাঁহার নিজের আনন্দের জন্য অথবা তাঁহার চারিদিকে সমাজবদ্ধ মানবজাতির আনন্দের জন্য অথবা কেবলমাত্র আনন্দহীন বিজ্ঞান-রাজ্যে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার জন্য তিনি এই কার্য্যে প্রথমে ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু যে তাঁহাকে এত আনন্দ দেয়, তাঁহার বিজ্ঞান চর্চ্চায় এত সাহায্য করে, সেই মূক বন্দী বিহঙ্গকে যেমন তিনি তাঁহার নিজের জ্ঞানের ও আনন্দের কাজে লাগাইয়াছেন, তেমনি তিনি আবার সেই একান্ত নির্ভর-পরায়ণ বন্দীটির সেবক হইয়া প্রাণপণে তদ্গতচিত্ত হইয়া তাহাকে সুস্থ ও আনন্দিত রাখিবার চেষ্টা করেন। যখন তাহাদের আনন্দোচ্ছ্বসিত কলকাকলীতে তাঁহার সযত্নরচিত লামাস্থ পক্ষি-ভবনটি মুখরিত হইয়া উঠে, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা থাকে না।

বিকানের

[শ্রীনরেন্দ্র মুস্তোফি]

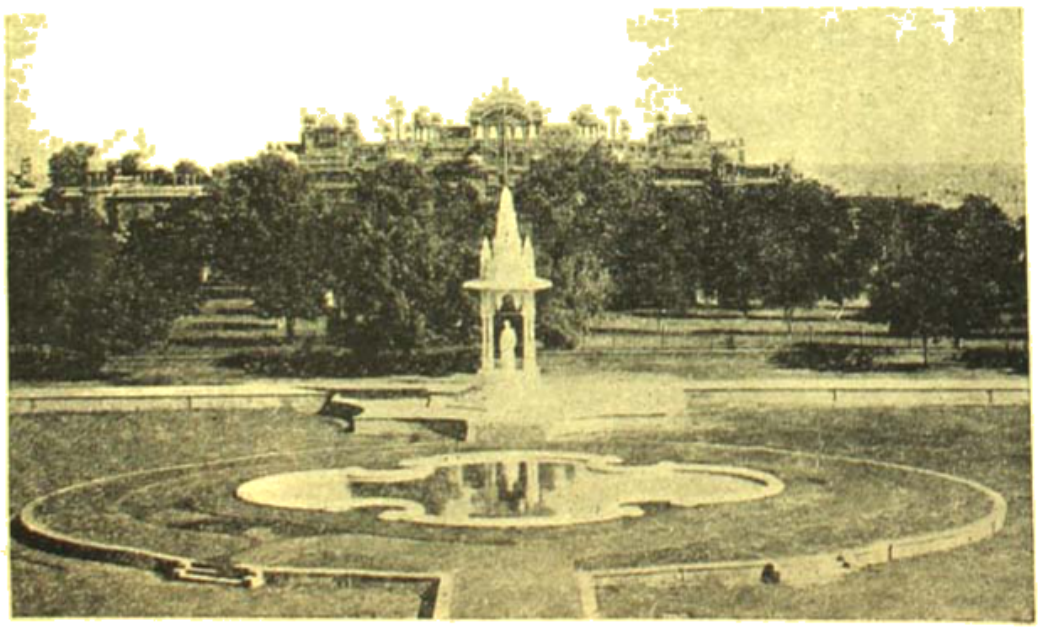

গাজনের প্রাসাদের সুখের গৃহ

মাণ্ডবগড়

কর্ণসাগর ও কর্ণমহল

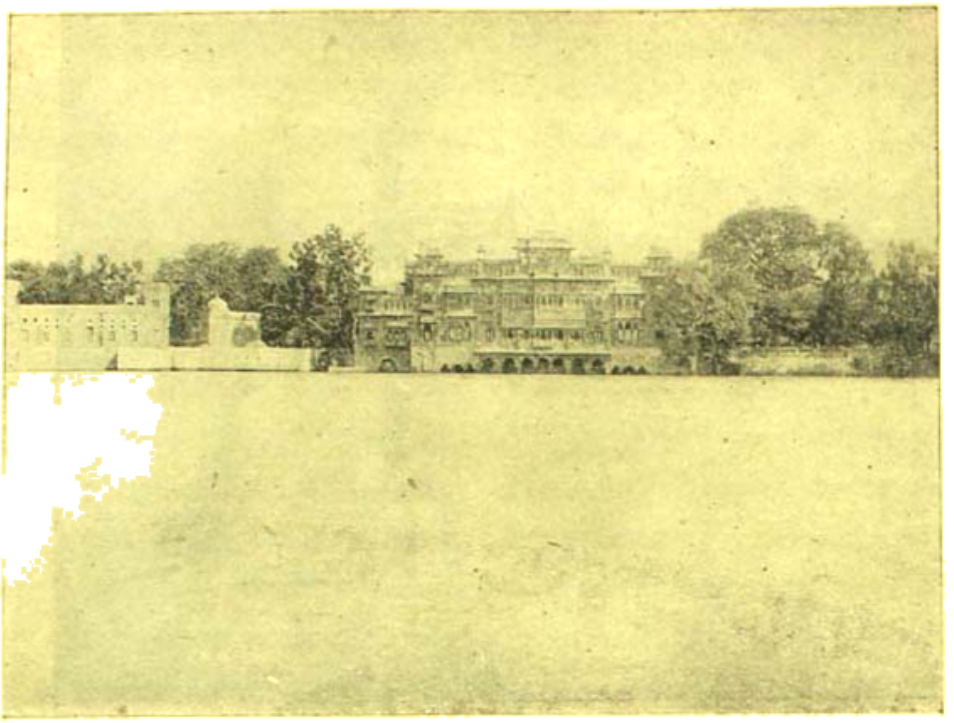

গাদলের প্রাসাদ

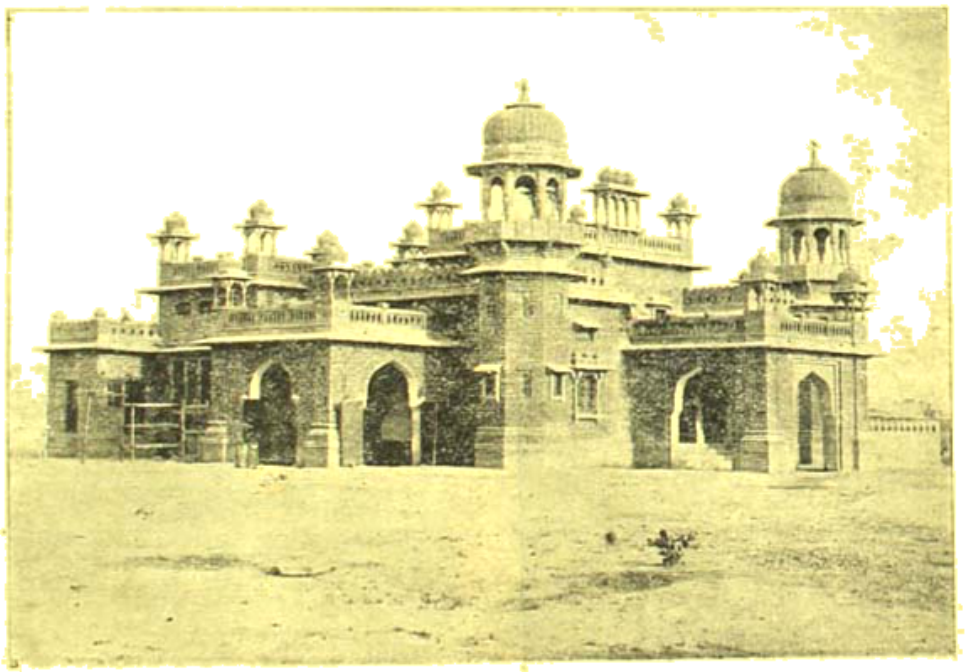

রাজ-প্রাসাদ

রাজপুতানার বিশাল মরুপ্রান্তর-মধ্যে বিকানের রাজ্য। ১৯১৪ অব্দের ২৩এ জানুয়ারী সেই বিকানের রাজ্যের বিকানের সহরে ভ্রমণ করিতে যাওয়ার প্রস্তাব স্থির হওয়ায়, আমার মন মহা উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু এরূপ স্থলে যাত্রা সচরাচর ঘটিয়া থাকে—অনেকেই সেই দেশের নানা অসুবিধার উল্লেখ করিয়া, সেখানকার মরুভূমি, জলাভাব প্রভৃতির বিভীষিকাময়ী বর্ণনা করিয়া আমার প্রদীপ্ত উৎসাহবহ্নি ম্লান, নিষ্প্রভ করিয়া দিবার

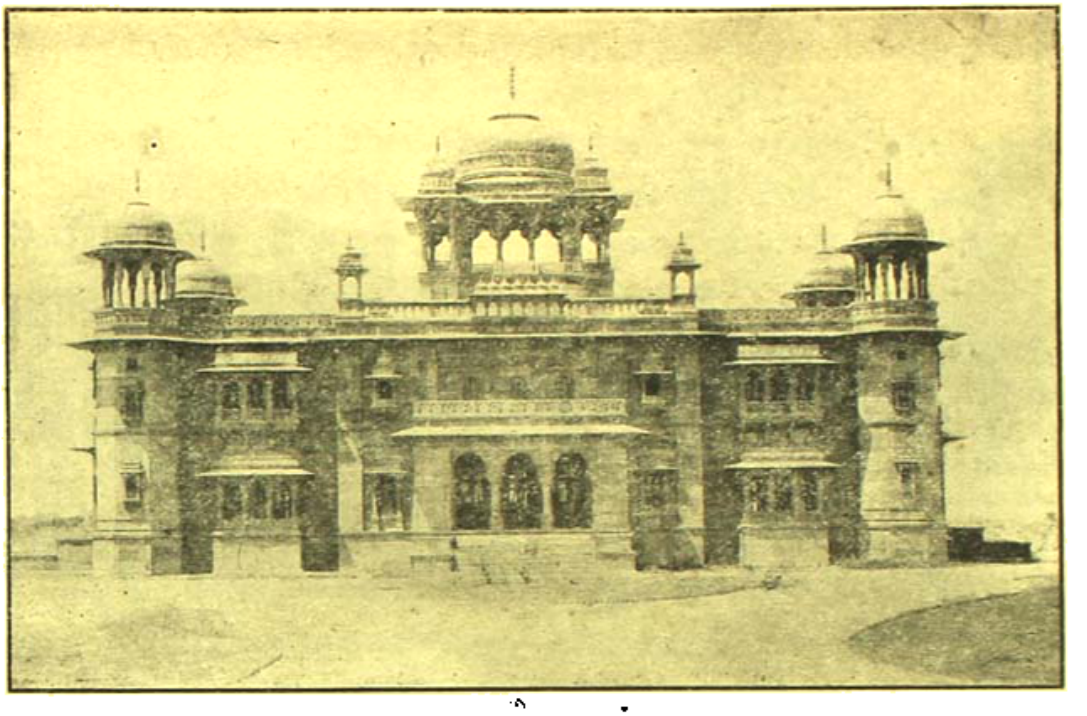

প্রাসাদের সম্মুখভাগ

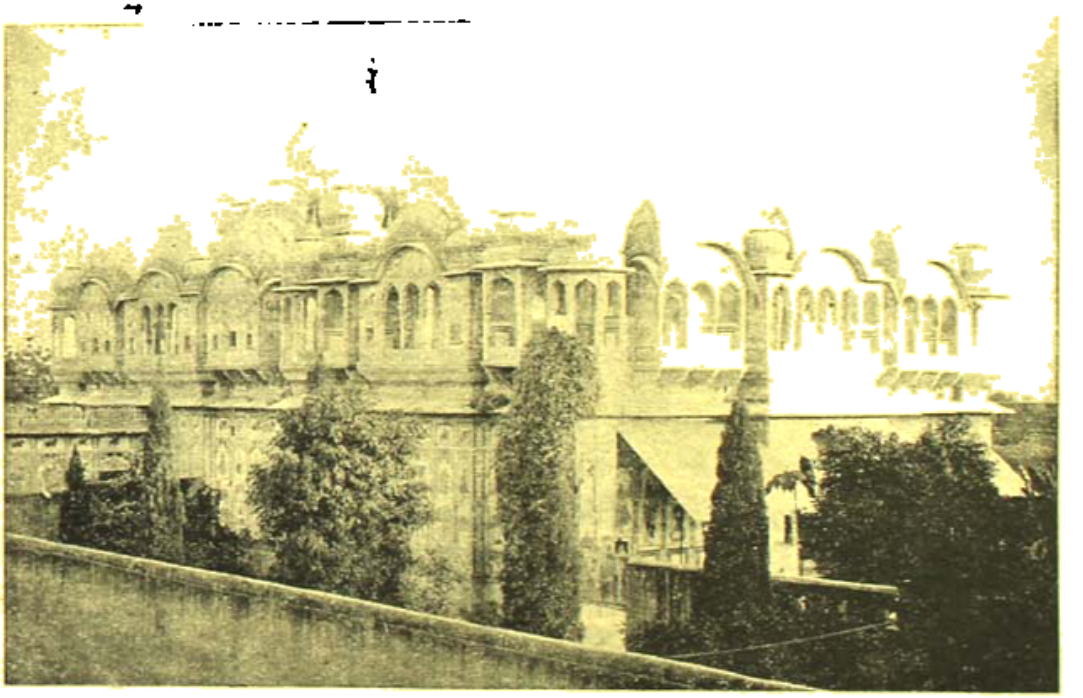

রতনবেহারিজীর মন্দির

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাহা-হউক, কোনরূপ দ্বিধা বা ইতস্ততঃ না করিয়া ১৩ই ফেব্রুয়ারী যাত্রার দিন স্থির করিয়া ফেলিলাম; এবং টেলিগ্রাম করিয়া বিকানেরের বন্ধুগণকে আমার যাত্রার সংবাদ প্রদান করিলাম; এবং নির্দ্ধারিত দিবসে একজন চাপরাশীকে সঙ্গে করিয়া পঞ্জাব-মেলে রওনা হইলাম। বিকানেরে যাইবার তিনটি পথ আছে; একটা দিল্লী হইয়া, দ্বিতীয়টা আগ্রা দিয়া এবং তৃতীয়টা হিসারের পথে। আমরা আগরার পথে যাত্রা করিলাম।

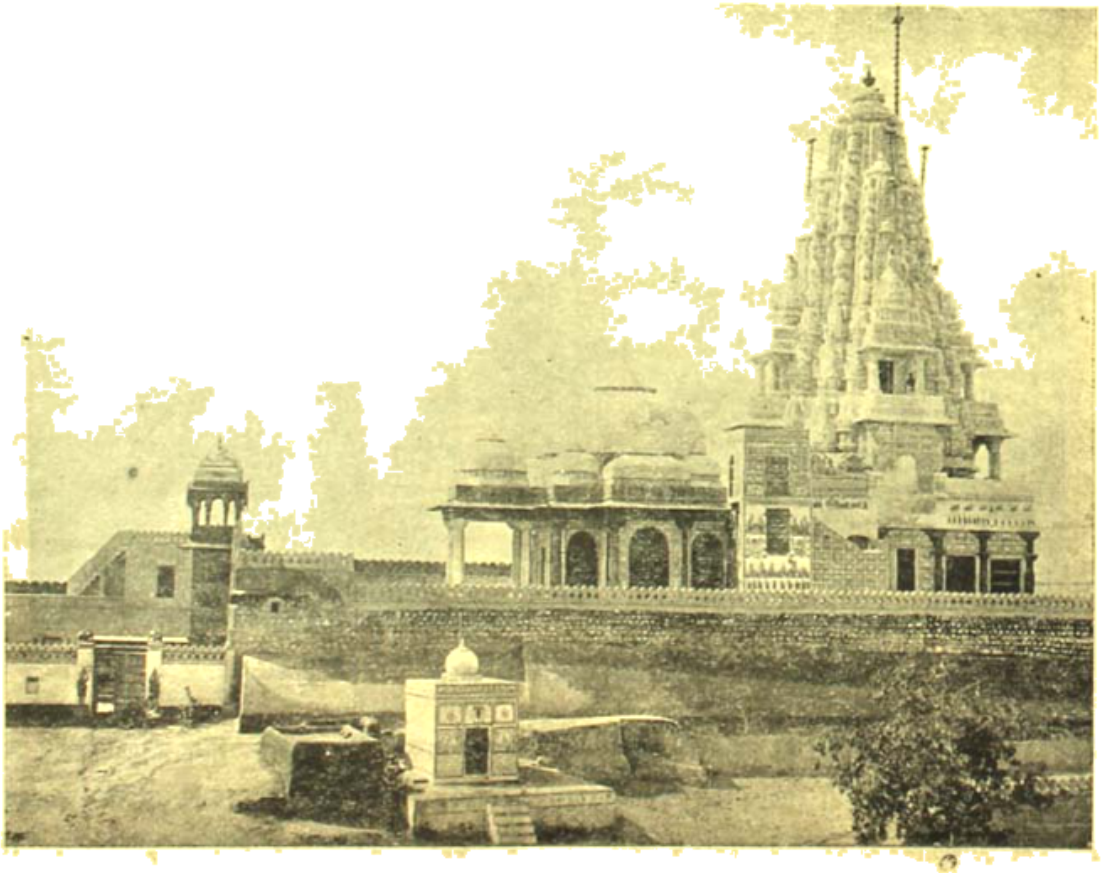

লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির

মাড়োয়ারী হিন্দু ভদ্রলোকেরা সাধারণতঃ আগরার পথেই যাতায়াত করিয়া থাকেন; কারণ, এই পথে প্রায় বড়-বড় ষ্টেসন মাত্রেই হিন্দু ফেরিওয়ালারা খাবার বিক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু এদিকে পাঁচবার গাড়ী বদল করিতে হয়। আগরা হইতে B. B. C. I. Ry. কোম্পানীর মিটার গেজ লাইন এবং ফুলেরা ষ্টেসন হইতে I. B. Ry. line আরম্ভ হইয়াছে। আমরা সকাল ৭টার সময় ফুলেরায় পৌছিলাম। তখন কন্‌কনে শীত। ফেরিওয়ালারা আসিয়া গরম জল বিক্রয় করিতে লাগিল। বড়ই সুবিধা হইল—আমি গরম জলে উত্তমরূপে স্নান করিলাম। অনেক খাবারওয়ালাও সেই সময়ে ষ্টেসনে খাবার ফেরী করিতেছিল। তাহাদের একজনকে ডাকাইয়া ফরমায়েস দিলাম, সে অনতিবিলম্বে প্রচুর গরম-গরম খাবার আনিয়া হাজির করিল। আমাদের প্রাতরাশ উত্তমরূপে সমাধা হইল।

ফুলেরা জংসন ষ্টেসন—এখানে গাড়ী বদল করিতে হয়। আমরা যোধপুর-বিকানের লাইনের ট্রেণে আরোহণ করিলাম। যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িল। গাড়ী কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর, আমার চক্ষের সম্মুখে এক সম্পূর্ণ অভিনব দৃশ্য খুলিয়া গেল। ফুলেরা পর্য্যন্ত যে দৃশ্য দেখিতে-দেখিতে আসিয়াছিলাম, তাহা চিরপুরাতন, বহুবার-দৃষ্ট; কিন্তু ফুলেরার পর হইতে যা দেখি তাহাই নূতন। মন আনন্দে মাতিয়া উঠিল।

প্রথমেই চোখে পড়িল লবণের পাহাড়। রেলপথের দুই ধারে রাশীকৃত লবণ পাহাড়ের ন্যায় স্তূপাকারে সাজান রহিয়াছে। খনি হইতে লবণ উঠাইয়া প্রথমে এখানে জমা করা হয়, পরে রেলপথে নানাস্থানে প্রেরিত হয়।

ক্রমে লবণের পাহাড় শেষ হইয়া রাজপুতানার বিশাল মরুভূমি আরম্ভ হইল। মরুভূমির উপর দিয়া রেলপথ গিয়াছে; গাড়ীতে বসিয়া পথের দুই ধারে যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়—ধূ ধূ বালুকারাশি—অনন্তবিস্তৃত মরুভূমি। আমি পূর্ব্বে কখনও মরুভূমি দেখি নাই। সুতরাং এই নূতন দৃশ্য আমার চক্ষে যে কত সুন্দর লাগিল, তাহা বলা বাহুল্য। পূর্ব্বে সমুদ্র দেখিয়াছিলাম, আজ মরুভূমি দেখিলাম। উভয়ের তুলনা করিলাম; দেখিলাম, কতকটা মেলে বটে। কারণ, সমুদ্রের যেমন প্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না,—যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখা যায়, সুদূরে সমুদ্র ও আকাশ পরস্পর মিশিয়া গিয়াছে; মরুভূমিতেও সেইরূপ মনে হয়, যেন আকাশ নামিয়া আসিয়া বালুকারাশির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এই মরুপ্রান্তরের মাঝে মাঝে ছোট-ছোট গুল্ম দুই-চারিটি করিয়া দেখা যায় মাত্র; তা ছাড়া বড় গাছ, তৃণক্ষেত্র, কি শস্য-ক্ষেত্রের কোন চিহ্ন কোথাও দেখা যায় না।

এই মরুভূমির মাঝে-মাঝে পাথরের খনি (quarry) আছে। এই সকল খনিতে রক্ত ও শ্বেত এই দুই প্রকারের পাথর পাওয়া যায়। একটি শ্বেত-পাথরের খনির নাম মাকরাণা। এই নাম হইতে ষ্টেসনটির নামও মাকরাণা হইয়াছে।

মরুভূমির দৃশ্য দেখিতে-দেখিতে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই কিন্তু ইহার বৈচিত্র্য হ্রাস হইতে লাগিল। তাহার কতকগুলি অপর কারণও ছিল। প্রথমতঃ এই লাইনে খাবার-দাবার ভাল পাওয়া যায় না। খাবারের মধ্যে কেবল ভুজিয়া (কাটীভাজা) এবং একপ্রকার লাড্ডু। তাহাও সকল ষ্টেসনে মেলে না, কেবল বড়-বড় দুই একটা ষ্টেসনে মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, মরুভূমির মধ্যে জলের কষ্ট অত্যন্ত বেশী। কোন-কোন স্থলে সামান্য জল পাওয়া যায়; অধিকাংশ স্থলেই আদৌ পাওয়া যায় না। ফুলেরা ষ্টেসনে ফেরীওয়ালা এবং ষ্টেসনের লোকদের পরামর্শে সৌভাগ্যক্রমে একটা বড় কলসীতে জল ভরিয়া লইয়াছিলাম, তাই রক্ষা। তৃতীয়তঃ রৌদ্রের তেজ অতি প্রচণ্ড। শীতকালে গাড়ীর ভিতর থাকিয়াও সে প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করা কঠিন। তাহার উপর, গাড়ীর জানালা খুলিয়া রাখা অসম্ভব। চারিদিকে এত বালি উড়িতেছিল যে, জানালা একটুখানি খুলিয়া রাখিলেই গাড়ীখানি বালিতে ভর্ত্তি হইয়া যাইতেছিল। এরূপ অবস্থায় তৃষ্ণায় মাঝে-মাঝে গলা শুকাইয়া যায়। এই সকল কারণে এবং উভয় পার্শ্বের দৃশ্যে বৈচিত্র্যের অভাববশতঃ বড় একঘেয়ে বলিয়া মনে হয়। এইরূপে অসীম অনন্ত বালুকারাশি ভেদ করিয়া আমাদের ট্রেণ রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময় বিকানের ষ্টেসনে পৌছিল। সমস্ত দিন এবং রাত্রির প্রথম প্রহর ট্রেণেই কাটিয়া গিয়াছিল।

বিকানের ষ্টেসনে আমার বন্ধুগণের প্রেরিত লোক গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। গাড়ীর কোচম্যান জাতিতে

মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণ, উপাধি ওঝা। বাসায় পৌঁছিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। বিকানেরে আমি যাঁহাদের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলাম, তাঁহাদের সুবিবেচনার প্রশংসা করিতে হয়। সেই রাত্রি দশটার সময়ে বাসায় পৌঁছিয়া দেখিলাম, স্নানের জন্য গরম জল এবং আহারের জন্য সদ্য প্রস্তুত গরম গরম খাদ্য হাজির। আমিও কালবিলম্ব না করিয়া স্নানাহার শেষ করিয়া লেপমুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর শয্যা ত্যাগ করিয়াই দেখি, আমার প্রিয় সুহৃৎ শেঠ মদনগোপাল ও শ্রীগোপাল কক্ষমধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের পরামর্শে তখনই স্নান সারিয়া লইয়া মন্দিরে দেবী দর্শন ও প্রণাম করিতে চলিলাম।

দেবী দর্শনান্তে বাসায় ফিরিয়া ছাদে উঠিয়া, যতদূর দৃষ্টি চলে, মোটামুটি সহরটি দেখিয়া লইলাম। সহরের চারি দিকে দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমি—সেই অনন্ত বালুকারাশি ঠিক যেন সমুদ্রের মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাহারই মাঝখানে নগরটি একটী দ্বীপের মত বোধ হইল। সমুদ্রের ন্যায় মরুভূমিতেও প্রাতে ও সন্ধ্যায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত যে এত সুন্দর দেখায়, এ ধারণা আমার পূর্ব্বে ছিল না,—আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলাম।

বিকানের সহরটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। একটী পুরাতন সহর; সেটী চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। সেই প্রাচীর-বেষ্টনীর চারিদিকে নূতন সহর পড়িয়া উঠিতেছে। এইরূপে সহরের আয়তন বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সহরে অনেক লোকের বাস।

পুরাতন সহরে নাগরিকদলের বাসগৃহগুলি কলিকাতার বড়-বাজারের ন্যায় ঘনসন্নিবিষ্ট। রাস্তাগুলি অত্যন্ত অপ্রশস্ত এবং একটীও সোজা নয়। যে ভূমির উপর নগরটি নির্ম্মিত, তাহা সর্ব্বত্র সমতল নহে, অত্যন্ত উঁচু-নীচু। সেই কারণে রাস্তা এবং বাড়ীগুলিও উঁচু-নীচু। প্রায় সমস্ত রাস্তা গলিরাস্তা, অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং ধূলি ও বালুকাময়। স্থানীয় সাধারণ অধিবাসীদিগের আচার-ব্যবহারও পরিষ্কার নয়; প্রায় সকলেই নোংরা ও অসভ্য। কেবল যাহাদের কলিকাতায় যাতায়াত আছে, তাহারাই যা কিঞ্চিৎ সভ্য ও পরিষ্কার। মোটের উপর বিকানের সহর কিরূপ, তাহা স্থানীয় একটী ছড়া হইতে কিছু বুঝা যাইতে পারে—

সহর ত বিকানের ছায়, নেহি কুছ আচ্ছা,
যো নেহি দেখা, সো জানে থোড়েই সাচ্চা।

বিকানের নগরে, আমাদের ন্যায় কলিকাতাবাসীর চক্ষে, দিবসের প্রথম ভাগেই অর্থাৎ শেষ রাত্রিতে যে দৃশ্য উদ্ভাসিত হয়, তাহা অত্যন্ত চমৎকারজনক। সেটী—এখানকার সহরের ক্ষুদ্র-বৃহৎ গলি-ঘুঁজিতে স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকলের প্রকাশ্য ভাবে মল-মূত্র-ত্যাগের ব্যবস্থা। সহরবাসী দুই চারিটী ধনী ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহারও বাটীতে পায়খানার বন্দোবস্ত নাই। সেই হেতু শেষ রাত্রিতে প্রত্যেক গলি রাস্তায় কি আদমী, কি আউরত (কি পুরুষ, কি স্ত্রী) টাট্টি (পায়খানা) ফিরিতেছে। কাহারও কোনরূপ লজ্জা বা সরম নাই; লোক যাতায়াত করিলেও কেহ তাহা গ্রাহ্য করে না। কেবল শেষ রাত্রিতে নহে, দিনমানেও প্রায় সমস্ত দিনই এরূপ চলে। এ বিষয়ে এখানকার নাগরিক ও নাগরিকারা মানব সমাজের আদিম অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে নাই। তবে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যবস্থা মন্দ নহে। শেষ রাত্রিতে মিউনিসিপ্যালিটীর মেথর গাধা লইয়া আসিয়া ময়লা তুলিয়া লইয়া যায়; এবং সমস্ত দিনই মিউনিসিপ্যালিটীর লোক রাস্তা-পরিষ্কারকার্য্যে নিযুক্ত থাকে।

বিকানের-প্রবাসীর চক্ষে আর একটী দৃশ্য বড় নূতন ঠেকে। সেটী ষাঁড়ের লড়াই। রাস্তায়-রাস্তায় অনবরত ষাঁড়ের লড়াই চলিতেছে, সময়ে-সময়ে রক্তারক্তিও হয়। একদিন সকালে পার্কে বেড়াইতে যাইবার জন্য বাহির হইতেছি, এমন সময়ে ভয়ানক একটা গোলমাল শুনিয়া সদর দরজার কাছে আসিয়া দেখিলাম, রাস্তা লোকে লোকারণ্য। সেই লোকারণ্যের মাঝখানে যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে চক্ষু স্থির হইয়া গেল। দেখিলাম, দুইটী প্রকাণ্ড বণ্ড যুদ্ধে নিযুক্ত। একটা ষাঁড়ের মস্তক রক্তরঞ্জিত। তথাপি যুদ্ধের বিরাম নাই। এই বণ্ড-যুদ্ধ ভিন্ন-ভিন্ন পল্লীর ষাঁড়ের মধ্যে হইয়া থাকে; এবং উভয় পল্লীর অধিবাসীরা নিজ নিজ পল্লীর বণ্ডকে patronize করে এবং উৎসাহ দিয়া থাকে। একে অপ্রশস্ত পথ, তাহার উপর এরূপ ঘটনা—সে দিন প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া বণ্ড-যুদ্ধ চলিয়াছিল এবং সে সময়ে

রাস্তার লোক-চলাচল বন্ধ ছিল। ইহাতে কাহারও কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। নিষ্কর্ম্মা অলস লোকে ইহাতে কোন অসুবিধা অনুভব করে না। এমন কি সেদিনকার যণ্ড যুদ্ধে একটী দোকানঘর ভাঙ্গিয়া গেল; তাহাতেও কাহারও দৃক্‌পাত নাই। দুই ঘণ্টা পরে, অন্য পাড়ার যণ্ডটী পরাজিত হইয়া পলায়নপর হইলে, যত লোক তাহার পশ্চাতে চীৎকার করিতে-করিতে তাহাকে তাড়া করিয়া ছুটিতে লাগিল। এ দিকে আমাদের পাড়ার যণ্ডটি বিজয়-গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া majestic ভাবে দাঁড়াইয়া হুঙ্কার দিল। এই সময়ে একজন লোক ঘী আনিয়া তাহার মাথায় মালিশ করিতে লাগিল। তাহার তখন আদর দেখে কে? আমিও তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া একটু আদর করিলাম। এরূপ যণ্ডযুদ্ধ এখানকার নিত্য ঘটনা।

বিকানেরের রাজপথে কুকুরের উৎপাত অত্যন্ত অধিক। এত কুকুর আমি আর কখনও অন্য কোথাও দেখি নাই। লাঠি না লইয়া পথ চলিতে সাহস হয় না। ক্ষিপ্ত এবং ক্ষতযুক্ত কুকুরও প্রচুর। পূর্ব্বে পাগলা কুকুর রাজাদেশে অস্ত্রচিকিৎসা লইয়া গিয়া গুলি করিয়া হত্যা করা হইত। কিন্তু মারোয়াড়ীরা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী; তাঁহারা জীবহত্যা সহ্য করিতে পারেন না; তাই তাঁহারা একটা সভার বৈঠক করিয়া কুকুর-হত্যা বন্ধ করিবার জন্য রাজার নিকট প্রার্থনা করেন। সেই সময় হইতে কুকুর-হত্যা নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং কুকুর-কুল নির্ব্বিবাদে বংশবৃদ্ধি করিয়া যাইতেছে।

এদেশে শূকরের উপদ্রবও বড় কম নয়। রাত্রিতে কখনও কখনও সহরের মধ্যে শূকর আসিয়া অত্যাচার করিয়া যায়।

এদেশে জীবহত্যা নিষিদ্ধ এবং জীবে দয়া সার্ব্বজনিক সাধারণ ধর্ম্ম। প্রায় সর্ব্বদাই দেখা যায়, কেহ না কেহ রাস্তায় গরু, কুকুর, কাক, চিল, পায়রা, হরিণ, ময়ূর প্রভৃতি জীবজন্তুকে কিছু না কিছু খাওয়াইতেছেই। চিলের জন্য প্রত্যহ ফুলুরি তৈয়ার হয় এবং জঙ্গলে ময়ূরের জন্য ছোলা প্রেরিত হয়।

এখানকার সামাজিক আচার-ব্যবহারও আমাদের চক্ষে বড় নূতন ঠেকে। ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা উৎসব-বেশে সজ্জিতা হইয়া দলে-দলে কোন প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজনের গৃহে সমবেত হইয়া উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে গান আরম্ভ করে। সে সঙ্গীত-কলার মর্ম্ম বা মাধুর্য্য আমি বুঝিতে পারিতাম না; সেইজন্য উহা আমার কর্ণে বিকট চীৎকার মাত্র বলিয়া বোধ হইত। খুব সাজগোজ করিয়া, জরীর-সাড়ী চড়িয়া ধনী গৃহস্থের মেয়েরা প্রায় ৫০।৬০ জন এক-এক দলবদ্ধ হইয়া মধ্যে-মধ্যে এইরূপ সঙ্গীত-উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কাহারও বাড়ীতে কোন শুভ-কর্ম্ম উপলক্ষে, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে আবৃতা ভদ্র গৃহস্থ-কন্যারা দলবদ্ধ হইয়া রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া গান গাহিতে-গাহিতে উৎসব-ভবনে গমন করিয়া থাকেন।

বাঙ্গলা দেশের মত এদেশে অবরোধ-প্রথা নাই। পুরুষের ন্যায় মহিলারাও রাস্তায় অবাধে বাহির হইতে ও চলাফেরা করিতে পারেন; যে কোন লোকের বাড়ীতে যাইতে পারেন। অপরিচিত পুরুষ বাড়ীতে আসিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার উত্তর দিয়া থাকেন। পথে-ঘাটে অপরিচিত লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার পক্ষেও কোন নিষেধ নাই। এ সকলই কিন্তু দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া। রাস্তায় বাহির হইবার সময় ঘোমটার উপরও ওড়না ঢাকা দিতে হয়।

এখানকার যান-বাহনও বিচিত্র। উটের গাড়ী, গরুর গাড়ী, একা ও উট ভাড়া পাওয়া যায়। অনেকের ঘরের গাড়ী ও মোটরকার প্রভৃতিও আছে।

এ অঞ্চলে জলকষ্ট অত্যন্ত অধিক। মরুভূমিতে সহজে বৃষ্টি হয় না। কয়েকটি কূপ নগরবাসীদিগের একমাত্র অবলম্বন। কূপগুলি প্রায় তিন-চারি শত হস্ত গভীর; বলদের সাহায্যে বড়-বড় পাত্রে করিয়া জল উত্তোলিত হয়। এক-একটী কূপ খনন করিতে প্রায় ৩০০০ টাকা খরচ পড়ে। সেই জন্য সকলে এত অর্থব্যয়ে নিজ-নিজ বাড়ীতে কূপ খনন করাইতে পারে না। জলের দামও এখানে দুধের সমতুল্য। বড়-বড় বাড়ীতে জলের খরচ মাসে প্রায় ৩০৲ ৪০৲। কালে-ভদ্রে যে দিন এখানে বৃষ্টি হয়, সে দিন লোকের মহা ব্যস্ত ভাব দেখা যায়; সকলেই যথাসাধ্য বৃষ্টির জল সঞ্চয় করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। বৃষ্টির উপক্রম দেখিলেই, জল ধরিবার জন্য লোকে বালতি প্রভৃতি নানা প্রকার জলপাত্র লইয়া প্রস্তুত থাকে। কেহ বাড়ীর উঠানে

ছোট কূয়ার মত খনন করিয়া তাহাতে জল সঞ্চয় করে। এই কূয়ার নাম কুণ্ড। কুণ্ডে সঞ্চিত জল সকল কাজেই ব্যবহৃত হয়। উষ্ট্র বা গরুর পৃষ্ঠে মশক চাপাইয়া ভিস্তিরা রাস্তায়-রাস্তায় জল বিক্রয় করিয়া বেড়ায়।

একদিন দেখিলাম, আমাদের দেশে যেরূপ ভাবে কাঙ্গালী-ভোজন হয়, সেইরূপ ভাবে রাস্তায় গরীব লোকেরা নিমন্ত্রণ খাইতে বসিয়াছিল। থালা, ঘটী, বাটী প্রভৃতি বাসন প্রত্যেকেই নিজ-নিজ বাটী হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। ভোজ্য পদার্থ ছিল খিচুড়ী আর ভাজা। আহারাদির পর সকলে আপন-আপন বাসন বালি দিয়া মাজিয়া পুঁছিয়া লইয়া চলিয়া গেল,—জলাভাবে কি আর করিবে? বড়লোকের বাড়ীতেও সময়ে সময়ে এরূপ করিতে হয়।

এখানকার বাড়ীগুলির নর্দ্দমার জল বাড়ীর বাহিরে একটী পাথরের চৌবাচ্চায় আসিয়া জমে। এক-একটী চৌবাচ্চার সহিত কয়েকটী করিয়া বাড়ীর নর্দ্দমার যোগ আছে। হাত-মুখ-ধোয়া বা সমস্ত প্রকার ময়লা জল এই চৌবাচ্চায় আসিয়া পড়ে এবং রাস্তার গরু, কুকুর প্রভৃতি জন্তু সেই জল পান করে। জল ভালই হউক বা মন্দই হউক, একটুও নষ্ট হইতে দেওয়া হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরাতন সহরটী চারিদিকে প্রাচীর দিয়া ঘেরা। এই প্রাচীর প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং খুব উচ্চ। ইহার চারিদিকে নূতন সহর। পুরাতন সহর হইতে বাহির হইবার জন্য প্রাচীর-গাত্রে চারিটী বড় ও ছয়টী ছোট ফটক আছে। রাত্রি নয়টার সময় সমস্ত ফটক বন্ধ হইয়া যায়, কেবল একটী ফটক রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে।

পুরাতন সহরটি যেরূপ নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন, নূতন সহর সেইরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এই অংশে রাস্তাগুলি বেশ চওড়া এবং সোজা। এখানে পার্ক, কেল্লা, ক্লাব, ধর্ম্মশালা, ষ্টেশন, লাইব্রেরী, রাজ-প্রাসাদ, মহারাজের খাসাগার, ধনী মাড়োয়ারীদিগের সুন্দর-সুন্দর প্রকাণ্ড প্রস্তর-গঠিত অট্টালিকা, কাছারী, কোর্ট, জেলখানা, চিড়িয়াখানা, হাসপাতাল প্রভৃতি আছে।

পাবলিক পার্কটি দেখিতে অতি সুন্দর এবং সাধারণের বেড়াইবার জায়গা। মরুভূমে কেবল এই স্থানেই কিছু গাছপালা দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। নানাবিধ আকারের বৃক্ষ এবং ছোট-ছোট ফুলের গাছ কিছু-কিছু আছে। বাগানে কয়েকটি হরিণ আছে। একটী ছোট রকমের মনুমেণ্ট আছে, তাহার চারিদিকে পয়ঃপ্রণালী। এখানে রৌদ্রের তেজ অত্যন্ত প্রখর বলিয়া দিনে তিনবার করিয়া জল সেচন না করিলে গাছপালা বাঁচে না। বিকানেরে লক্ষপতির সংখ্যা অনেক; ক্রোড়পতিও দুই-চারিজন আছেন। ক্রোড়পতি ভিন্ন অন্য কেহ বাগান করিতে বড় সাহস করে না। গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য জলই যখন অপ্রচুর, তখন সখের জন্য জল কোথা পাওয়া যাইবে?

এখানে ধনীলোক যথেষ্ট থাকিলেও বাড়ীঘর প্রায় সকলেরই সামান্য ধরণের। সকল বাড়ীর নীচেই মৃত্তিকা-গর্ভে একতলা বা দোতলা আছে। ইহার নাম তয়খানা। গরমের সময় তয়খানা অনেকটা আরামপ্রদ। তয়খানার সঙ্গে সকলেরই প্রায় একটী করিয়া চোঙা কুঠরী বা শুপ্ত-গৃহ থাকে।

বিকানেরের রাজ-প্রাসাদ সহর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। রাজ-প্রাসাদের নিকটে সাহেবদিগের বাড়ী, ক্লব, ডাকবাংলো, লাইব্রেরী ও চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানায় সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, চিতা প্রভৃতি কয়েকটি জন্তু আছে।

নূতন সহর সম্পূর্ণ আধুনিক। সমস্ত রাস্তায় বিদ্যুতের আলো জ্বলে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের Power-house খুব বড় ও latest ধরণের। তিনটী dynamo; তাহার দুইটী দিনমানে এবং একটী রাত্রিতে চলে। অনেক বাড়ীতে বিদ্যুতের আলো এবং টেলিফোন আছে। বিদ্যুতে চালিত জলের কল বা Pumping Station কূয়া হইতে জল তুলিয়া রাজোদ্যান, হাসপাতাল, ষ্টেশন প্রভৃতি স্থলে নলের ভিতর দিয়া সরবরাহ করা হয়। সাধারণে এই জল ব্যবহার করিতে পারে না।

সহর হইতে চার পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত বেড়াইবার জায়গা আছে। এই স্থানের মধ্যে-মধ্যে জঙ্গল আছে। জঙ্গলে গাছপালা ছোট-ছোট, ফলও তদ্রূপ ক্ষুদ্রকায়। কোপ, মেসারী প্রভৃতি গাছের ফলে-তরকারী হয়; সাংরা গাছের ফলে আচার হয়। খেজড়া গাছ জ্বালানি কাঠের কাজ করে। এখানে কুল গাছ খুব প্রচুর; তাহার ফল অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু খুব মিষ্ট। জাল, মুই, নীল, অশ্বত্থ, সারাইলি প্রভৃতি অন্যান্য গাছও জঙ্গলে আছে; সকলেরই আকার কিন্তু

ছোট-ছোট। বিকানেরের বালুকাময় ভূমিতে খুব উৎকৃষ্ট তরমুজ জন্মে। তরমুজের স্থানীয় নাম মতিরা।

বাজরী, মোট, গম এবং চাউল এখানকার প্রধান খাদ্য-দ্রব্য। বাজরীর রুটী খুব মোটা হয় এবং গরীবেরাই তাহা খায়। এখানকার অধিবাসীরা লঙ্কা ও আচারের খুব ভক্ত। ইতর ভদ্র সকলেই যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃত খাইয়া থাকে।

সহর হইতে দূরে দলে-দলে হরিণ চরিয়া বেড়ায়; ময়ূরও এখানে যথেষ্ট। ধনী, দরিদ্র সকলেরই উষ্ট্রই প্রধান গৃহ-পালিত পশু; মরুদেশে ইহার আদরও যথেষ্ট। গরীবেরা যথেষ্ট পরিমাণে গাধাও পুষিয়া থাকে।

বিকানের-রাজের প্রাসাদের নাম লালগড়। রাজ-প্রাসাদ দেখিতে অতি সুন্দর; দেশবিদেশের লোকে এই প্রাসাদ দেখিতে আসিয়া থাকে। সহরের কেল্লাটিও দেখিতে সুন্দর, সুপ্রশস্ত, চতুর্দ্দিকে প্রস্তর গঠিত প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত। এই কেল্লায় বিকানের-রাজের উষ্ট্রারোহী সেনারা প্রধানতঃ বাস করে।

বিকানের রাজ্যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ দেবদেবীর মন্দির আছে। তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ—

গাজনের। বিকানের হইতে ২০ মাইল। বরাবর পাকা রাস্তা আছে। এইখানে মহারাজ বাহাদুরের সুন্দর উদ্যানবাটী আছে এবং একটী প্রকাণ্ড হ্রদ আছে। বিকানের সহরে কয়েকটী পুষ্করিণী আছে, কিন্তু গ্রীষ্ম-কালে কোথাও জল থাকে না। কিন্তু গাজনের হ্রদে কমিয়া গেলেও বেশ জল থাকে।

কোলায়েৎ। ২৮ মাইল। একটী তীর্থ স্থান। এখানে হিন্দি ১০ই কার্ত্তিক সুদ্দি হইতে মেলা আরম্ভ হয় এবং ৬ দিন থাকে।

সুবাড়ী। বিকানেরের ভিতর একটী প্রধান মন্দির; ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে মহাদেবজী আছেন। ৭ই শ্রাবণ সুদ্দিতে মেলা বসে।

সাগর বাদে-কুণ্ড। সাগর মন্দির ৬ মাইল দূরে। এখানেও মহাদেবজী বিদ্যমান আছেন। ৪ঠা আশ্বিন সুদ্দি হইতে মেলা বসে। এখানে রাজবাটীর শ্মশান আছে, স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ প্রস্তরের মূর্ত্তি ইত্যাদি আছে।

লক্ষ্মীনাথজী মন্দির। এখানে লক্ষ্মীনাথজী, বদরী-নারায়ণজী, মহাদেবজী, চতুর্ভুজজী, ভগবতী, সুরজ-নারায়ণজী এই সকল দেব-দেবী আছেন। ইহা সহরের মধ্যে অবস্থিত।

নাগনেজী মন্দির। ২ মাইল। অষ্টভুজা দেবী আছেন। ইহা কথিত আছে যে, যোধপুর হইতে যুদ্ধ করিয়া এই দেবীকে আনয়ন করা হয়।

কুডনদেশর মন্দির। ১৬ মাইল। ইহ একটী মহা তীর্থ-স্থান। ভগবান ভৈরুজী আছেন। ১২ই ভাদ্র সুদ্দি মেলা বসে, ২ দিন থাকে।

পুনরাওসরজী। ৩১ মাইল। এখানে হনুমানজী আছেন। ভাদ্র মাসে ৩ দিন মেলা বসে।

দাওজী মন্দির। সহরের মধ্যে গোঁসাই চকে অবস্থিত। এখানে কৃষ্ণ ভগবান আছেন। বাবু সদাসুখ গঙ্গাধরচন্দ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

রতনবেহারিজী মন্দির। সহরের মধ্যেই অবস্থিত। অতি সুন্দর এবং প্রকাণ্ড মন্দির।

দেড়িজী। দেশনুক গ্রামে অবস্থিত। ২০ মাইল। এখানে একটী গুম্ফা আছে।

কর্ণিজী। বিকানের জেলার মধ্যে এইটীই সর্ব্বপ্রধান জাগ্রত দেবতার মন্দির; ইহা দেশনুক গ্রামে অবস্থিত। এখানে কর্ণিমাতা বিদ্যমানা আছেন। মহা তীর্থস্থান। রেলে যাইতে হয়। মহারাজা বাহাদুরের নিজের একটী আবাস-স্থানও এখানে আছে। ইহা কথিত আছে যে, দেশনুকে কেহ ইটের বা পাথরের বাড়ী তৈয়ারী করিতে পারে না—করিলেই ভাঙ্গিয়া যায়। সেই কারণে এখানে সমস্তই মাটীর বাড়ী। মহারাজা বাহাদুরেরও মাটীর বাড়ী; কিন্তু অতি সুচারুরূপে তৈয়ারী। দেশনুকে অতি সুন্দর ধর্ম্মশালা আছে। ষ্টেসন হইতে মাতা কর্ণিজীর মন্দির দুই মিনিটের রাস্তা। দেবীর মাথায় স্বর্ণের মুকুট আছে। দেবমূর্ত্তি নানারূপ মূল্যবান অলঙ্কারে ও ছত্রাদিতে ভূষিত। এই মন্দিরের মধ্যে অসংখ্য ইঁদুর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; লোকে তাহাদের কত খাবার দিতেছে। অতি সুন্দর দৃশ্য। যাত্রিদের গায়ে উঠিতেছে। অতি সাবধানে চলিতে হয়; নচেৎ পায়ের তলায় পড়িয়া চাপে তাহাদের মারা যাইবার সম্ভাবনা।

স্পর্শমণি

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত

(সমালোচনা)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম্-এ]

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'দিদি'-সমালোচনা-প্রসঙ্গে, আমাদের অন্তঃপুরিকাগণ আখ্যায়িকা-রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন এবং সাহিত্যের এই বিভাগে কৃতিত্ব দেখাইতেছেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম। উক্ত সমালোচনা-উপলক্ষে যে কয়েকজন মহিলার নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম, বর্ত্তমান গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহাদিগের অন্যতমা। ইনি অনেকগুলি ছোট গল্প লিখিয়া সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিতা হইয়াছেন; বড় আখ্যায়িকা-রচনায় 'স্পর্শমণি' তাঁহার প্রথম উদ্যম বলা যাইতে পারে। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব, তিনি এ নূতন ক্ষেত্রে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আশাপ্রদ। গ্রন্থকর্ত্রী এই জন্য নিঃসন্দেহ আমাদের প্রশংসার পাত্রী; তাহার উপর তিনি মনস্বী ৺কুদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী ও 'সমাজচিত্র'-কার শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রী, সুতরাং তিনি আমাদের সবিশেষ প্রশংসার পাত্রী। 'আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ।' ভূদেব বাবু 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে করিয়া আখ্যায়িকা-রচনার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন (যদিও 'পারিবারিক প্রবন্ধ' 'সামাজিক প্রবন্ধ' 'আচার প্রবন্ধ' প্রভৃতি তাঁহার মনীষার প্রকৃত বিবর্ত্তন); তাঁহার পুত্র মুকুন্দদেব বাবু 'পারিবারিক প্রবন্ধ' প্রভৃতির ভাবে ভাবিত হইয়া 'অনাথবন্ধু' আখ্যায়িকায় আদর্শ পুরুপতি, আদর্শ গৃহিণী প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; আবার মুকুন্দদেব বাবুর কন্যারা (শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও শ্রীমতী অনুরূপা দেবী) ছোট গল্প ও বড় আখ্যায়িকা লিখিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। বংশ-পরম্পরায় কল্পনাশীলতার এই ক্রমিক বিকাশ বৈজ্ঞানিকের (evolution) বিবর্ত্তন-বাদের সুন্দর প্রমাণ।

'স্পর্শমণি' 'প্রবাসী' ও 'নব্যভারতে' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। যে সময়ে ইহা পড়িতে সাহস করি নাই; কেন না কিস্তিবন্দী নিয়মে প্রকাশিত গল্পের জন্য কিস্তিতে কিস্তিতে একবার ধরিয়া কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা সঞ্চিত রাখা বড় কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অবশ্য সব ক্ষেত্রে এইরূপ সাবধানতা রক্ষা করিতে পারি না, তবে এ ক্ষেত্রে পারিয়াছিলাম। তাহাতে লাভও হইয়াছে, কেন না এই আত্মসংযমের ফলে একখানি সুপাঠ্য পুস্তক একটানে পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই সুযোগ প্রদানের জন্য প্রথমেই উপহার-দাত্রী গ্রন্থকর্ত্রীর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এক হিসাবে দেখিলে পুস্তকখানিকে 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'অনাথবন্ধু', 'গৃহলক্ষ্মী' প্রভৃতি পুস্তকের ন্যায় উদ্দেশ্যমূলক, নীতিশিক্ষামূলক (didactic) বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। গ্রন্থকর্ত্রী পুস্তকের উদ্দেশ্য বা শিক্ষা-সম্বন্ধে অনুমান করিবার ভার সমালোচকের উপর রাখেন নাই, নিজেই প্রস্তাবনায় দেবভাষায় প্রচারিত মটো দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকের নামকরণ-রহস্যও বুঝাইয়াছেন।

যথা স্পর্শমণিস্পর্শাৎ দুর্ব্বর্ণাদেঃ সুবর্ণতা।
তথা সাধুবধূযোগাৎ কুটুম্বস্যাপি সাধুতা॥

আদর্শবধূ উমার গুণে পরিবারস্থ সকলেই তাহাকে সোণার চোখে দেখিয়াছে; এমন কি, অন্তঃসত্ত্বা উপেক্ষাশীলা স্বামী সতীনাথ এবং দুর্দ্দম-প্রকৃতি জ্যেষ্ঠশ্বশুর রুদ্রকান্তও তাহার সংস্পর্শে পেয়ে সোণাইয়াছেন। বরং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজ বউ' বা ৺যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'কনে বউ' দুই-একজনের দোষদৃষ্টিপরায়ণ প্রকৃতির সংশোধন করিতে পারেন নাই, কিন্তু উমা শেষ পর্য্যন্ত সকলের হৃদয়ই জয় করিয়াছেন, এবং সতীনাথ, মুরারি ও রুদ্রকান্তের চিত্তশুদ্ধি চরিত্র-শুদ্ধি ঘটাইয়াছেন, তিনি প্রকৃতই 'স্পর্শমণি'। শ্বশুর-পরিবারে কিরূপে বধূকে আপনার করিয়া লইতে হয়, এ সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্রীর বক্তব্যগুলি যদিও 'পারিবারিক প্রবন্ধ' ও 'অনাথবন্ধু'র অনুবৃত্তি, তথাপি এগুলি নারীর লেখনীমুখ হইতে বাহির হইয়াছে বলিয়া আরও আদরণীয়। কেন না বধূর বেদনার কথা, সাধনার কথা যখন পুরুষলেখনীও বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন আশা করা যাইতে পারে যে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের এই কলঙ্ক বিদূরিত হইতে পারে। ইহা আমাদের সমাজের কিরূপ মজ্জাগত হইয়াছে, তাহা একটু মন দিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত একএকটি পারিবারিক দুর্ঘটনার বিবরণ পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হয়। তবে এই পুস্তকে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি বধূ উমা শাশুড়ী-মনোরমার হস্তে নিগৃহীতা নহেন, বরং গ্রন্থকর্ত্রী স্নিগ্ধ-শাশুড়ীর স্নেহের পরিচয়ই পাওয়া যায়, (স্বামী ও) জ্যেষ্ঠশ্বশুরের হস্তে নিগৃহীতা, এই বিশিষ্টতা আছে। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, নারীর হস্তে তুলিকা, সুতরাং পুরুষের আচরণ মসীবর্ণে চিত্রিত, আর 'শাশুড়ী বাঘিনী' সবধী নাগিনীর চিত্র একেবারে বর্জ্জিত। বলা বাহুল্য, নবোঢ়াকে শ্বশুরালয়ে পাঠাবার সময়ে এবং তাহার তথায় বাস-কালে মা ও ঝিয়ের হৃদয়ের বেদনার চিত্র নারীহস্তে সুন্দর ফুটিয়াছে।

কিন্তু শুধু পাঠ্যপুস্তকরূপে এখানিকে দেখিলে ইহার উপর অবিচার করা হইবে। অধিকাংশ কাব্যের উপজীব্য প্রণয়; এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই প্রণয়কে আশ্রয় করিয়া আখ্যায়িকাটির কয়েক-জন পাঠকের হৃদয় আর্দ্র করে। ঘটনা যদি সাধারণ বাঙ্গালীজীবনের অনুযায়ী হইলেও, অর্থাৎ 'রীতিমত' রোমান্সের রস সন্নিবেশ না থাকিলেও, গল্পের আকর্ষণী শক্তির, প্রাণস্পর্শিনী শক্তির হ্রাস হয় নাই। লেখিকার বর্ণনা-শক্তি, ভাবাভিব্যক্তি, কলাকৌশল, রস-সঞ্চার-ক্ষমতা, সকলই প্রশংসনীয়। তিনি ঘটনা-সমাবেশ (plot) ও চরিত্র-বিকাশ (character) উভয় অঙ্গেই সমভাবে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অতি সুকৌশলে ক্রমিক রহস্যোদ্ভেদ সংসাধিত হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা আন্তরিকতাপূর্ণ ও মিষ্ট। শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'দিদি'তেও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ইহা বোধ হয় নারীজাতির নিজস্ব। পিসিমা, মাসিমা, ঠাকুমা, দিদিমার মুখে গল্পকথা যেমন মিষ্ট লাগে, পুরুষের মুখে তেমন মিষ্ট লাগে না। তাই বুঝি, নারীরচিত আখ্যায়িকা পুরুষের রচিত আখ্যায়িকা অপেক্ষা এত মিষ্ট লাগে। এই জন্যই কি প্রাচীন প্রাচ্য লেখক 'একাধিক সহস্র রজনীর' কেচ্ছা শাহরজাদীর মুখ দিয়া বাহির করিয়াছেন?

যাক্, এ সব উচ্ছ্বাস সংযত করিয়া এক্ষণে পুস্তকখানির মুখ পরিচয় দিই। পুস্তকের প্রথম চারিটি পরিচ্ছেদে গল্পের সমস্যাটি পাঠকের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে, প্রথম খণ্ডের বাকী কয়েকটি পরিচ্ছেদে পূর্ব্বকথাচ্ছলে সমস্যাটির সব দিক্ পাঠকের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই প্রথমখণ্ডে আখ্যায়িকার (Exposition) সূচনা। অবশিষ্ট তিন খণ্ড (solution) সমস্যাপূরণের ক্রমিক প্রয়াস; ৪র্থ খণ্ডের ১৪শ পরিচ্ছেদে ইহার চরম পরিণতি।

সংক্ষেপে গল্পের আখ্যানবস্তু এই :—নবীন প্রৌঢ় কুলকাত্তের একমাত্র স্নেহপাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র যুবা সতীনাথ গল্পের নায়ক; ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক ৺নবীনমাধবের কন্যা প্রতিবেশিনী কল্যাণীর সহিত নায়কের অন্যোন্যানুরাগ জন্মে। সতীনাথ তাহাকে বিবাহ করিতে ব্যগ্র, কিন্তু কুলকাত্তের তাহাতে অমত। তিনি কৌশলে তাহাকে মফস্বলে জমিদারী-পরিদর্শনে পাঠাইলেন,—উদ্দেশ্য, (১) দূরে গেলে তাহার প্রণয়বেগ প্রশমিত হইতে পারে। সতীনাথকে সরাইয়া কুলকান্ত অপর ভ্রাতুষ্পুত্র মুরারি দ্বারা কল্যাণীর মাতাকে জানাইলেন, এ বিবাহ হইতে পারে না। (২) সতীনাথ কল্যাণী বা তাহার মাতাকে কোন সংবাদ দিতে পারেন নাই, তাঁহারাও পাইলেন না। মাতা ও কন্যা ভগ্নহৃদয়ে অন্যত্র গেলেন। জমিদারি হইতে ফিরিবার পথে সতীনাথ সংবাদপত্রে দেখিলেন, ৺নবীনমাধবের কন্যা কল্যাণীর একজন ব্রাহ্মণ মিশনারির সহিত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সতীনাথ অভিমানে বন্ধু বন্ধুভূষণের প্রয়োচনায় অধ্যাপক ব্রাহ্মণ বিদ্যানাথের পৌত্রী উমাকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু সে বিবাহ কেবল নামমাত্র, সতীনাথ তখনও কল্যাণীকে ভুলিতে পারেন নাই। বন্ধুভূষণ পূর্ব্বরাগের ব্যাপার কিছুই জানিতেন না। উমার আত্মীয়েরাও বিস্তরকার কথা বিশেষ কিছু জানিলেন না। সতীনাথ বৎসরের পর বৎসর উমাকে অবহেলা করিতে লাগিলেন ও চণ্ডপ্রকৃতি কুলকান্ত উঠিতে বসিতে উমাকে অপমান করিতে লাগিলেন। বন্ধুর প্রতি স্বামী (ও শ্বশুরের) বিরাগ গল্পের সমস্যার ভিত্তি। কিরূপে এই বিরাগ ক্রমে প্রীতি-স্নেহে পরিণত হইল, ইহাই সমস্যা-পূরণ।

আখ্যানবস্তু সম্বন্ধে আর দুইটি কথা বলিবার প্রয়োজন। কল্যাণীর মাতা কন্যাসহ গুরুদেব বিদ্যানাথের চরণে শরণ লইলেন, কিন্তু সতীনাথের উমার সহিত বিবাহ হওয়াতে সতীনাথ-কল্যাণী ঘটিত ব্যাপার মাতা ও কন্যা গুরুদেব ও তাঁহার পরিবারস্থাদিগকে জানাইলেন না। আর সতীনাথ যে সংবাদটি জানিয়া উমাকে বিবাহ করিলেন, সে সংবাদে একটু ভুল ছিল—যে কল্যাণীর বিবাহ হইয়াছিল, সে কল্যাণী ৺নবীনমাধবের কন্যা নহে, হরনাথের কন্যা। সংবাদপত্রের এই ভুলটুকুতে সর্ব্বনাশ ঘটাইল। এ ব্যাপারে গোড়া হইতে মুরারি দুই একটা মিথ্যা কথা চালাইয়াছিল। এই মিথ্যা ও ভুলে জড়াইয়া বহু অনর্থ ঘটাইল। মুরারি, সতীনাথ, কল্যাণী ও তাঁহার মাতা, বিদ্যানাথ ও তাঁহার পরিবারস্থগণ এবং উমা—ইহাদিগের নিকট এই রহস্যের উদ্ভেদ অতি সুকৌশলে সংসাধিত হইয়াছে।

আকস্মিক ঘটনা (accident) অনেক স্থলে কাব্য-নাটকের আখ্যানবস্তুর বিবর্ত্তনে (evolution of the plot) অল্প সহায়তা করে না; তাহাতে মানুষের জীবনস্রোত অতর্কিত ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অথচ সেই পরিবর্ত্তনে মানুষের চরিত্রগত বিশিষ্টতার প্রভাবও বাদ যায় না। এই আখ্যানে অনেক কাল পরে সতীনাথের ছাত্রজীবনের বন্ধু বন্ধুভূষণের সহিত হৈবাৎ দেখা হওয়া ও তাঁহারই হস্তচ্যুত সংবাদপত্রে ভুল সংবাদ জানা (পরে তাঁহারই চেষ্টায় সতীনাথের বিবাহ ঘটে। 'দিদি'তে অবশ্যের বন্ধু যোগেনের অবতারণা স্মর্তব্য।) উল্লিখিত শ্রেণীর আকস্মিক ঘটনা। যাঁহারা এরূপ আকস্মিক ঘটনার অবতারণা পৌরাণিক মনে করেন, তাঁহাদিগকে শেক্‌স্‌পীয়রের বিখ্যাত সমালোচক ব্রাডলির নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যে মনঃসংযোগ করিতে অনুরোধ করি।

'Now this operation of accident is a fact, and a

(১) বঙ্কিমচন্দ্রের গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভুলিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মফস্বলে জমিদারি-পরিদর্শনে গিয়াছিলেন।

(২) নিকষ কুলীনের শ্রোত্রিয়ের মেয়ের সহিত বিবাহ হইতে পারে না (১০৬ পৃঃ) এ আপত্তি কিন্তু বিচারসহ নহে। নিকষ কুলীনের এইরূপ বিবাহই প্রেষ্ঠ। তবে কষ্টশ্রোত্রিয়ের কন্যা হইলে দোষের বিষয় বটে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহা অপেক্ষা সাঙ্ঘাতিক আপত্তি গ্রন্থকর্ত্রীকে একেবারে এড়াইয়াছে। সতীনাথ ৺হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র (৪৫ পৃঃ) আর কল্যাণী ৺নবীনমাধব মুখোপাধ্যায়ের কন্যা (৫১ পৃঃ)। সুতরাং সংগোত্রে বিবাহ চলিতেই পারে না।

prominent fact of human life. To exclude it wholly from tragedy, therefore, would be, we may say, to fail in truth. And besides, it is not merely a fact. That men may start a course of events, but can neither calculate nor control it, is a *tragic* fact. The dramatist may use accident, so as to make us feel this...It is, further, frequently easy to see the dramatic intention of an accident, and some things which look like accidents have really a connection with character.'
—*Shakespearian Tragedy, Lecture I.*

মনুষ্যত্বের অবতারণার উদ্দেশ্য ইহা হইতেই স্পষ্টীকৃত হইল। অমর বন্ধু অমরের সহিত (বিবাহের পরদিন) সতীনাথের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া উমার সিধি উমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইলেন। এই বন্ধুটি কতকটা 'বিষবৃক্ষে'র হরদেব ঘোষালের স্থলাভিষিক্ত। অনেক সময়ে নায়কের মনোভাব পাঠকের গোচর করিবার জন্য গ্রন্থকারের বর্ণনা বা নায়কের স্বগতোক্তি অপেক্ষা এইরূপ বন্ধুর সহিত কথালাপ ও পত্রালাপ দ্বারা উদ্দেশ্যটি সুচারুরূপে সিদ্ধ হয়। বর্ত্তমান আখ্যায়িকায় অমরের অবতারণায় এই উদ্দেশ্য। তবে পাঠক সব কথা তাহাকে অকপটে বলেন নাই।

অনেক কাব্য-নাটকেই নায়কের পার্শ্বে একজন প্রতিনায়ক থাকে—তাহাকে Villain of the story ও বলা যায়। অনেক সময়ে প্রতিনায়কের (antagonist) বিরোধিতায় (contrast) নায়কের (protagonist) চরিত্র-মাহাত্ম্য আরও ফুটিয়া উঠে। তবে পূর্ব্বে যেরূপ একটা প্রথা ছিল, নায়ক-মাত্রেই ভাল ও প্রতিনায়ক মাত্রেই কালা হইবে, (৩) এখন তাহা সব সময়ে ঠিক চলে না। নায়ক-প্রতিনায়ক উভয়েই মানুষ, মানুষ-মাত্রেই মাঝির বল, দুর্ব্বল-দুর্ব্বল, দোষে গুণে জড়াইয়া তাহার মধ্য দিয়াইয়াই মানুষ মানুষ। তবে কাহারও বা গুণের ভাগ বেশী, দোষের ভাগ কম, আর কাহারও বা দোষের ভাগ বেশী, গুণের ভাগ কম। এই নিমে নায়ক প্রতিনায়ক প্রভেদ হয়। নগেন্দ্র দত্ত দেবেন্দ্র দত্ত, সীতারাম গঙ্গারাম এই শ্রেণীর নায়ক-প্রতিনায়কের দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমান আখ্যায়িকায় সতীনাথ নায়ক, মুরারি প্রতিনায়ক। সতীনাথের চরিত্রে অনেক সদ্‌গুণ আছে, কিন্তু অসংযমের দোষে নগেন্দ্র দত্ত ও সীতারামের ন্যায় তাহার আদর্শচরিত্র হইতে চ্যুতি হইল, পরে আবার সে সামলাইয়া লইল। পক্ষান্তরে মুরারির চরিত্রে 'নৌকাডুবি'র অক্ষয়ের প্রকৃতিসিদ্ধ ঈর্ষ্যা-দ্বেষ প্রভৃতি দোষ আছে, কপটতা মিথ্যাচার আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গুণও আছে, মিষিড়কৃষ্ণ মেঘের আশে পাশে চাঁদের আলোর রূপালি রেখা (silver lining) আছে। শেষে উমার চরিত্র-প্রভাবে তাহার চরিত্র-সংশোধন হইয়াছে। এই হিসাবে মুরারিচরিত্র চিত্রণে বেশ মৌলিকতা আছে।

কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের আপত্তি আছে। যুবা-সম্প্রদায় যুবক দেবর মুরারির উমার প্রতি শ্রদ্ধা স্নেহ সমবেদনা যদি বালক দেবর দুখীরের মত হইত, তাহা হইলে আমাদের আপত্তি করিবার কিছু থাকিত না। তাহার 'মোহ' টুকুর কথা না থাকিলেই পুস্তকখানি নির্দ্দোষ হইত। অবশ্য গতিকে মুরারির হৃদয়ে এরূপ মোহের সঞ্চার হয় ও কতকটা স্বাভাবিক, কিন্তু এরূপ চিত্র সমাজের পক্ষে অনিষ্টের নহে কি? আমাদের সমাজে বৌদিদি পর্দ্দানশীন হইলেও যুবক দেবরের অন্তঃপুরে প্রবেশের বাধা নাই, উভয়ে বেশ একটু অসঙ্কোচে মেশেন, অনেক রঙ্গতামাসা চলে, আদর আব্দার মান অভিমান চলে, তাহা বড় মধুর। কিন্তু এই সম্পর্কে এরূপ কলুষের ছায়াও বাঞ্ছনীয় নহে, অন্ততঃ অন্তঃপুরিকার রচিত পুস্তকে। অবশ্য ইহাতে 'চোখের বালি'র মহেন্দ্র-বিনোদিনীর ব্যাপারের মত কোন বাড়াবাড়ি নাই। উমা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, মুরারিও যথেষ্ট সংযত ভাবে চলিয়াছে; এবং মোহ ভাঙ্গিলে নিজের নীচ স্বার্থপরতা প্রভৃতি উমার নিকট প্রকাশ পাইলে, আর উমার সম্মুখীন হইতে পারে নাই; সতীনাথের মারফত মাতৃস্বরূপা বৌঠাকুরাণীর ক্ষমা চাহিয়াছে,—তথাপি বলিব, 'নষ্টনীড়ে'র এই আভাসটুকু না থাকিলেই ভাল হইত। মুরারির উমার প্রতি সম্ভ্রম শ্রদ্ধা ও তীব্র সমবেদনা সতীনাথকে খোঁচা দিয়াছিল, সতীনাথের মনে একটা অমূলক সন্দেহ জাগাইয়া দিয়াছিল, এইটুকু বলিলেই ঘটনাসংঘাতে সতীনাথের চরিত্র-বিকাশের তরফ হইতে যথেষ্ট হইত না কি? ইংরেজের সাহিত্যে "বেকি শার্প রচন ক্রলিকে বিবাহ করিয়াও ঘোর বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষার জন্য হাবভাব ছলাকলা বিস্তার করিয়া আপন ভাতরের মনোহরণের চেষ্টা করে করুক; মেটার্লিঙ্কের পিলিয়াস্ ও মেলিস্যাণ্ডার,—দেবর ও বৌদিদির 'পবিত্র প্রণয়ে'র স্রোত ইউরোপীয় সাহিত্যে বহে বহুক; তাহাতে আমাদের সমাজের ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই; কিন্তু আমাদের সাহিত্যে মুরারির 'মোহ' হয় না পাইলেই মঙ্গল।

এই অপ্রিয় সত্যটুকু বলিব কি না তদ্বিষয়ে অনেক ইতস্ততঃ করিয়াছি, কিন্তু বলাই সমাজ, সাহিত্য ও গ্রন্থকর্ত্রীর পক্ষে মঙ্গলময় মনে করিয়া দুর্ম্মুখের কায করিলাম। যদি ইহাতে গ্রন্থকর্ত্রী ব্যথা পান, তজ্জন্য লজ্জিত ও দুঃখিত অন্তঃকরণে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। আর যদি আমাদেরই ভুল ধারণা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তজ্জন্য ক্ষমা চাহিতেছি। আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে যাহা ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

---

(৩) কোথাও কোথাও উল্টাও হয়। অর্থাৎ নায়ক কালা ও প্রতিনায়ক ভাল বলা হয়। যথা ম্যাক্‌বেথের প্রতিনায়ক ব্যাঙ্কো ও ম্যাকডফ্; 'চোখের বালি'তে মহেন্দ্রের প্রতিনায়ক বিহারী। তখন অবশ্য প্রতিনায়ককে Villain of the story বলা চলে না।

সাধারণতঃ ইংরেজী নভেল নায়ক-নায়িকার শুভবিবাহে শেষ হয়।

যে সমাজে যুবতী-বিবাহ প্রচলিত, ইহাই সে সমাজের উপযোগী। পক্ষান্তরে আমাদের সমাজে, অন্ততঃ একালে, বাল্যবিবাহ খুবই প্রচলিত, সুতরাং নভেলগুলিকে সমাজের প্রতিরূপ করিতে হইলে বাল্যবিবাহ ভিন্ন গতি নাই। আখ্যায়িকা-রাজ্যের সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র এ কথাটা বুঝিতেন, তাই তাঁহার চৌদ্দখানি আখ্যায়িকার মধ্যে চারিখানি (দুর্গেশনন্দিনী, রাধারাণী, রজনী, রাজসিংহ) ছাড়া আর সর্ব্বত্র বিবাহ আখ্যায়িকার প্রথম ভাগে, এমন কি কোথাও-কোথাও আরম্ভের পূর্ব্বেই, ঘটিয়া গিয়াছে। নতুবা 'আইবুড়ো মেয়ে' নায়িকার জন্য অনেক কৈফিয়ত দিতে হয়; বঙ্কিমচন্দ্রকে রাধারাণী প্রভৃতির বেলায় তাহা দিতেও হইয়াছে। কিন্তু এই প্রণালীর একটা বিষম অসুবিধা আছে,—যদি গোড়ায়ই নায়ক-নায়িকার বিবাহ হইয়া গেল, তবেত মুড়ামাগ্না হইল, পরে গল্পের আকর্ষণ থাকে না, রোম্যান্স জমে না। বঙ্কিমচন্দ্র এই অসুবিধার দুই প্রকারে প্রতিবিধান করিয়াছেন। (১) কোথাও কোথাও বিবাহ গোপন রাখিয়া, পতিপত্নীর মিলনের পথে বাধা ঘটাইয়া, শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের কৌতূহল ও গল্পের আকর্ষণ অটুট রাখিয়াছেন; যথা হেমচন্দ্র-মৃণালিনী, পশুপতি-মনোরমা ও পুরন্দর-হিরণ্ময়ীর ব্যাপার। ইন্দিরা ও যোগেন্দ্রবাবুর আত্ম-পরিচয়-গোপনও ইহারই প্রকারভেদ। (২) আবার কোথাও কোথাও অবৈধ প্রণয়ের, পরকীয়া-প্রীতির, এক একটি আখ্যান মূল গল্পে জুড়িয়া দিয়া ঘট ঘোরালো করিয়াছেন। 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম' ইহার দৃষ্টান্ত।

প্রথম প্রণালীর বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু দ্বিতীয় প্রণালী সুনীতিসম্মত নহে বলিয়া অনেক বিজ্ঞ সাময়িক আপত্তি করিবেন (যদিচ জগতের বহু উৎকৃষ্ট কাব্য এই অবৈধ প্রণয়ের, পরকীয়া-প্রীতির, বর্ণনায় মসগুল।) যাহা হউক, হালের লেখক-লেখিকাগণ একটা অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, একটা তৃতীয় পন্থা বাহির করিয়াছেন, তাহাতে সাপও মরে অথচ লাঠিও ভাঙ্গে না। তাহাতে প্রণয়ের কাহিনী আছে, অথচ তাহাতে আপত্তিজনক দুর্নীতিদূষক, কুরুচিব্যঞ্জক, কিছুই নাই। উপায়টি এই :—কোন কারণে স্বামী পত্নীর প্রতি বিরূপ, কিন্তু ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে, পত্নীর গুণগুণের আকর্ষণে, প্রকৃতির নিয়মের প্রভাবে, ক্রমে সে ভাব অপনোদিত হয়; দীর্ঘকালের অবহেলার পর স্বামী মহাশয় নিজের পত্নীর প্রেমে পড়েন, (In Love with his own wife!) প্রথমে তাহা 'অন্তঃশীলা' বহে, তাহার পর স্বরূপে বহিতে থাকে, তাহার পর দুই কূল প্লাবিত করিয়া উভয় হৃদয় ভাসাইয়া দেয়; তখন যথাপাত্র শেষরক্ষা হয়, নূতন করিয়া স্বামি-স্ত্রীর 'যথার্থ বিয়ে ও শুভদৃষ্টি' হয়, কৃতার্থম্মন্য স্বামী 'নবজীবন-দায়িনীকে জীবনের সঙ্গে অটুট বন্ধনে বাঁধিতে' চায়। পত্নী হিন্দু সংস্কারের প্রভাবে প্রথম হইতেই স্বামীর অনুরাগিণী, কিন্তু স্বামীর ব্যবহারে আত্মসম্মানবোধবশতঃ আত্মসংযমের অভেদ বর্ম্মে নিজেকে আবরণ করেন। শেষে স্বামীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া বিগলিত হৃদয়ে তিনি অন্তঃসঞ্চিত নাধুর্য্য-প্রীতি স্বামীর চরণে ঢালিয়া দেন। শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'দিদি,' শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি'র অধিকাংশ আখ্যান (মৃণাল ও অজয়ার ব্যাপার), এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধকারের সমালোচ্যমান আখ্যায়িকা, এই প্রণালীর সুন্দর দৃষ্টান্ত। ইহা অসম্ভব ও অস্বাভাবিকও নহে, বরং আমাদের বর্ত্তমান সমাজের অবস্থার সঙ্গে বেশ খাপ খায়। কেন না অভিভাবকদিগের অনুরোধে পড়িয়া ইয়ংবেঙ্গল একটা বালিকাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়েন, কিন্তু সেই কালিদাস-শেক্সপীয়ার ঘাঁটা যুবক একটা 'ঘানঘেনে পানপেশে' 'চেলির পুঁটুলি' ষোলক-পরা কচি খুকীর ভিতর কোনও রস পান না। (রবীন্দ্রনাথের 'নবরঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ' কবিতা দ্রষ্টব্য।) তাহার পর যৌবনের বিকাশে কতকটা নববধূর রূপে ও কতকটা তাহার অক্লান্ত সেবা 'অটল সহিষ্ণুতা, ধীরতা, নম্রতা, গৃহকর্ম্ম-নিপুণতা প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হইয়া, যুবক যুবতী পত্নীর প্রেমে পড়েন; ইহা প্রথম-যৌবনের উদ্দাম প্রণয় নহে, ইহা শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। হরদেব ঘোষালের ভাষায় বলা যায়,—"প্রথমে বুদ্ধি দ্বারা গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা, আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গফলে প্রণয়।...স্ত্রীপুরুষের ভালবাসা আমার বিবেচনায় এইরূপ।" আমরা সমাজে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখিয়াছি। অবশ্য এখন সেই সকল 'নায়ক' যুবক নহেন, বর্ত্তমান লেখকের ন্যায় প্রৌঢ়।

কোন কোন আখ্যায়িকায় ইহার উল্টা ব্যাপারও আছে, অর্থাৎ গোড়ায় পত্নী পতির প্রতি বিরূপ, ক্রমে পতির গুণের আকর্ষণে, প্রকৃতির নিয়মের প্রভাবে, পত্নীর সুমতি হয়, সে পতির মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া আত্মদানে কৃতার্থা হয়। তবে পত্নী পতির প্রতি বিরূপ, ইহা হিন্দুসমাজের চক্ষে নিতান্ত বিসদৃশ ঠেকে, সুতরাং হিন্দু লেখক-লেখিকাগণ এই কল্পনা লইয়া অধিক নাড়াচাড়া করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখরে' এবং শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি'র প্রধান আখ্যানে (অমরনাথ ও রাধারাণী বা বাণী) ইহার উদাহরণ মিলে। তবে 'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনীর পরপুরুষ প্রীতিই এই বিরোধের কারণ, সুতরাং ইহা ঠিক এই প্রণালীর নিদর্শন নহে। যাহা হউক, এই দুইটি স্থলেই পত্নীর অপরাধ যেমন গুরুতর, শাস্তিও তেমনি গুরুতর হইয়াছে, 'মন্ত্রশক্তি'র ভাষায়, 'প্রায়শ্চিত্ত পাপকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে'।

'দিদি,' 'মন্ত্রশক্তি'র প্রধান আখ্যান ও 'স্পর্শমণি'—এই তিনখানিতে উল্লিখিত প্রণালীসত দিল থাকিলেও, অর্থাৎ সাধারণ সাদৃশ্য থাকিলেও, তিনটি ক্ষেত্রে একই কারণে পত্নীর প্রতি পতির বিরাগ ঘটে নাই। 'দিদি' ও 'স্পর্শমণি'তে 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র মত পরস্ত্রী-প্রীতির জন্য নায়কের পত্নীর প্রতি বিতৃষ্ণা নাই; কিন্তু উভয়ত্রই নায়ক অন্তঃসক্ত হয়। 'দিদি'তে অবশ্য চারুর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া চারুকে বিবাহ করিয়া পূর্ব্বপত্নী সুরমার প্রতি বিরূপ, 'স্পর্শমণি'তে সতীনাথ উমার সহিত বিবাহের পূর্ব্বেই কল্যাণীর প্রতি বন্ধুরাগ হইয়া কল্যাণীকে হারাইয়া উমার প্রতি বিরূপ। মৃণালের বেলায় ('মন্ত্রশক্তি'তে) এরূপ কোন প্রবল বাধা নাই; সে শুধু বেয়াদবের বশে একটিকে তাহার ভাষা

অধিকার দিতে নারাজ—ইহাই বেঙ্গলের আসল নমুনা। সতীনাথ ও মৃণাল উভয়েই পড়ার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য চরিত্র-শোধনের জন্য ব্যগ্র হইল, অমর ও সতীনাথ উভয়েই ভিতরে-ভিতরে নিজের হৃদয়ের পরিবর্তন অনুভব করিয়া যেনতেনপ্রকারেণ পলায়নে আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইল, ইত্যাদি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সাদৃশ্য থাকিলেও, অমর, মৃণাল, সতীনাথ, হরা মৃণাল, অজয়, উমা, প্রত্যেকের ব্যক্তির স্বতন্ত্র। তবু এক প্রণালীর (Common type) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তিনখানি আখ্যায়িকার একত্র নাম করিয়াছি। কেহ যেন ধারণা না করেন যে, শেষে প্রকাশিত পুস্তকখানি পূর্ব্ব প্রকাশিত দুইখানির অনুকরণ-মাত্র। বাস্তবিক, ইহাতে যথেষ্ট মৌলিকতা আছে।

কাব্য-কৌশলের মনোহারিত্ব প্রণালী-সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। এক্ষণে আলোচ্যমান পুস্তকের চরিত্র-চিত্র প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। নায়িকা উমার বহু-জীবনের ইতিহাস বড় করুণ, বড় মর্ম্মস্পর্শী। তাহার অবিচলিত ধৈর্য্য, তাহার স্বামীজনোচিত তেজস্বিতা, সতীনাথের প্রতি কৃত্রিম বিদ্বিষ্টতার ভাব অথচ অন্তঃসঞ্চিত প্রীতি মাধুর্য্য—তাহার চরিত্রকে অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছে। নায়ক সতীনাথের অবজ্ঞা অবহেলা কিরূপে শ্রদ্ধা ও করুণা, প্রীতি ও স্নেহে পরিণত হইল, কিরূপে তাহার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ও পরিশোধন ঘটিল, আবার 'আত্মসংযমে চির অভ্যস্ত' উমাও কতদিন পাষাণীর মত উপেক্ষার ভাব দেখাইয়া (ইহা ভাণ-মাত্র) শেষে 'দিক'র দুরন্ত বাতীর কাছে ধরা দিল, তৎপাঠে হৃদয় বিগলিত হয়। হিন্দু কুলের বধূ সতীনাথ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা প্রতিনায়িকা চিরকুমারী কল্যাণীর জীবনকাব্য আরও করুণ, আরও মর্ম্মস্পর্শী। তাহার প্রথম একনিষ্ঠ প্রণয়, তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা, সংযম ও পবিত্রতা আদর্শস্থানীয়। কল্যাণীর মৃত্যুসম্পাপার্শ্বে সতীনাথ আর এক মুহূর্ত্ত আগে আসিলে অভাগিনীর আকুল হৃদয় শান্তি পাইত, তাহার শেষ সাধ মিটিত, জীবন সার্থক হইত। কল্যাণীর আন্তরিক ক্ষমার শান্তিবারি সেচনে সতীনাথের তীব্র অনুতাপের জ্বালাও প্রশমিত হইত। বোধ হয় সেই ব্যবস্থাই অধিকাংশ পাঠকের মনঃপূত; কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রী কল্যাণীর ত্যাগের, 'কামনাহীন অকলুষ প্রেমের' উচ্চতর, পবিত্রতর আদর্শ আমাদের চক্ষের সমক্ষে ধরিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, তাই একেবারে 'বিরহমের' পর সতীনাথকে সেই স্বর্গপ্রতিমার সম্মুখীন করিয়াছেন, কল্যাণীর জীবনকাব্য নিদারুণ বিয়োগান্ত (tragic) করিয়াছেন। 'তার সাধনার সিদ্ধি এমনতর সঙ্কীর্ণ পরিধির ভীরু নয় নয়—অনন্ত জীবনের। মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের মৃত্যু নাই—তবু রূপান্তর।' যাঁহারা এই ঘটনা অতিরিক্ত শোকাবহ বলিয়া দোষ দিতে উদ্যত হইবেন, তাঁহারা মনে রাখিবেন, শ্রেষ্ঠ কবি শেক্‌স্‌পীয়ারের কাব্যেও যদি এক মুহূর্ত্ত আগে জুলিয়েটের মোহাপগম হইত, যদি এক মুহূর্ত্ত আগে কোর্ডিলিয়ার প্রাণরক্ষার প্রত্যাদেশ পৌঁছিত, যদি ডেস্‌ডেমোনার প্রাণনাশের একটুকু আগে এমিলিয়া ওথেলোকে রুমাল-রহস্য জানাইবার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে এই অত্যাহিতগুলি ঘটিত না। কিন্তু এইরূপ অঘটনের পরিহারেই যে ঘটনার নিবারণ হইত। বিখ্যাত সমালোচক ব্র্যাড্‌লি বলিয়াছেন :—

"Tragedy would not be tragedy if it were not a painful mystery.....Sometimes from the very furnace of affliction a conviction seems borne to us that somehow if we could see it this agony counts for nothing against the heroism and love which appear in it and thrill our hearts."

—*Shakespearian Tragedy, Lecture I.*

উমার পিতামহ অধ্যাপক 'কবিভূষণ উদারচরিত মহাপুরুষ' বিদ্যানাথ ও তাঁহার পরিবারবর্গের চিত্র সুন্দর ও উজ্জ্বল। এই আদর্শ গৃহ ও গৃহপতিকে দেখিলে তবু যে 'অনাথবন্ধু'তে চিত্রিত আদর্শ গৃহ ও গৃহ পতিকে মনে পড়ে তাহা নহে, গ্রন্থকর্ত্রীর 'প্রাতঃস্মরণীয় পরমারাধ্য পূজ্যপাদ পিতামহদেব'কেও মনে পড়ে। (গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার উদ্দেশে পুস্তকখানি উৎসর্গ করিয়াছেন।) আমার গ্রন্থকর্ত্রীর পিতামহ স্বীয় পিতামহ ৺হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌমকে যেমন চক্ষে রাখিয়াই ৺পিতামহ ঠাকুর চিত্রটি 'পারিবারিক প্রবন্ধে' অঙ্কিত করিয়াছেন ;) গৃহিণীস্থানীয়া বিধবা পুত্রবধূ রাজলক্ষ্মী ও বিধবা শিষ্যা, গুরু ও জগদ্ধাত্রীর চরণে নিষ্ঠাশীলা ধর্ম্মপরায়ণা তারাসুন্দরী (কল্যাণীর মাতা, 'বৌকা-চুরি'র বলিনাথের মাতা সদৃশ্য) উভয়েই আদর্শ প্রবীণা জননী ; বালবিধবা জ্যেষ্ঠা পৌত্রী গুরুমন্ত্রে ভক্তিমতী সেবাতৎপরা স্নেহশীলা পুত্রদুহিতা অধিষীয়মানজীবিতা অন্নপূর্ণা—এ গৃহের সকল চিত্রগুলিই পবিত্র, উজ্জ্বল, মধুর। কমিটা কন্যা উমার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হিন্দু দেবীর মাঝে ইঁহাদিগের বাস, হিন্দুদেবীর ছায়ই ইঁহারা পবিত্র। বিদ্যানাথের 'অক্ষয়রোপিত বৃক্ষ' অনাথ বালক অনাথ এই পরিবারের ছায়ায় বর্দ্ধিত হইয়াছে ; আখ্যানে এই চরিত্রের যতটুকু স্থান আছে, তাহাতে তাহাকে বেশই মানাইয়াছে। তবে মনে হয়, গ্রন্থকর্ত্রী সংক্ষেপে সারিয়াছেন ; অনাথ 'অনাথবন্ধু'র সংসার, সত্যনিষ্ঠ ও সন্তোষের সাধুতপস্বিকার আদর্শে গঠিত ; এই চরিত্রের অধিকতর (development) বিকাশে 'মহাশক্তি'র অবতারণা হইতে পারিত। অনাথকে লইয়া আমাদের প্রথম-প্রথম একটু ভয় হইয়াছিল, কেন না এরূপ কুড়ান ছেলে কিরণময়ী-হিরণ্ময়ীর আসন হইতে পরিবারস্থা কুমারী কন্যার পূর্ব্বরাগের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যদিও প্রথমে উমার ও পরে কল্যাণীর সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব কর্ত্তৃপক্ষ এক-একবার তুলিয়াছেন, তথাপি পূর্ব্বরাগের কোনও আভাস কোথাও পাওয়া যায় না। উমার প্রতি তাহার স্নেহ আত্মজের মত আর কিছুই নহে। মানবিকপ্রকৃতি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে ইহাই শোভা পায়। ফলতঃ গ্রন্থকর্ত্রী যেন সাবধানে চলিয়াছেন, তাঁহাকে "বিবি-লিপি-রচয়িত্রীর ছায় বিব্রত হইতে হয় নাই।

বিদ্যানাথের আদর্শ পরিবারের antithesis হিসাবে নায়ক

সতীনাথের জ্যেঠা মহাশয় কৃষ্ণকান্তের পরিবার চিত্রিত হইয়াছে। তবে সেই উদ্ধত ধনি-পুত্রেও মেকেলে পিসিমা ও 'মেয়ের মতন' বালক সুধীরের চরিত্রমাধুর্য্য আছে। সতীনাথের চরিত্র-সম্বন্ধে পূর্ব্বেই দুই-এক কথা বলিয়াছি। সে প্রবল কৃষ্ণকান্ত ও প্রথমতার অদৃষ্টের ছন্দে বিড়ম্বিত হইয়া আমাদের সমবেদনাই উদ্রেক করে, তাহার অসংযম ও অবিবেচনার কথা আমরা ভুলিয়া যাই। উমার সংস্পর্শে ক্রমে তাহার চরিত্র কিরূপ প্রভাবিত হইয়াছে, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কৃষ্ণকান্তকে দেখিলে বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রিত জ্যেঠা মহাশয় কৃষ্ণকান্ত রায়ের ও রবীন্দ্রনাথের চিত্রিত 'জ্যেঠামশাই'এর ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি স্নেহশীলতার কথা মনে পড়ে বটে, কিন্তু প্রভাত বাবুর 'রমাসুন্দরী'র নায়কের পিতা ও 'দিদি'র নায়কের পিতার কঠোরে-কোমলে প্রকৃতির কথাই বেশী করিয়া মনে পড়ে। তথাপি এই চিত্রে মৌলিকতার অভাব নাই। কৃষ্ণকান্তের ইতর-সাধারণের প্রতি ব্যবহার উল্লিখিত দুইজন নায়কের পিতার অপেক্ষা ঢের বেশী রূঢ়। তাঁহার কৃষ্ণকান্ত নামে অবশ্য – কালিদাসের ভাষায় তিনি 'ভীম' অথচ 'কান্ত'। শুধু যে উমার চরিত্র-মাধুর্য্যের প্রভাবে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় কঠোর হইতে কোমল-প্রকৃতি হইয়া পড়িলেন তাহা নহে, শুধু যে অন্যের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিলেও সতীনাথের প্রতি নিয়তিসম স্নেহপ্রবণতা এবং শেষে উমা ও সুধীরের প্রতি সস্নেহ ব্যবহার তাঁহার শক্ত খোলার ভিতরকার সরস কোমলতার সাক্ষ্য দেয় তাহা নহে, যে অবস্থায় তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্রদ্বয় (৯) ও তাহাদিগের পিসিমাকে বিনা-অনুরোধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আশ্রয় দিলেন, তাহাতে বুঝা যায় তিনি রাশভারী রূঢ়প্রকৃতি হইলেও সম্পূর্ণ নিঃস্নেহ-হৃদয় নহেন। তাঁহার রূঢ়তার খাঁজের মধ্যেও এই 'নিস্নিগ্ধ বৃত্তি আসিয়াছিল'। তাই তাঁহার দোষ সত্ত্বেও তাঁহাকে উমার মত ভালবাসিতে আমাদেরও যে এক-একবার ঝোঁক হয় না তাহা নহে। তাঁহার পূর্ব্বজীবনের ইতিহাসই (কতকটা সাইলাস মার্ণারের ন্যায়) তাঁহার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কারণ।

কল-কব্জা, সকল চরিত্রই লেখিকার প্রতিভাগুণে সুন্দর ফুটিয়াছে। এমন কি ক্ষুদ্র চিত্র,—মেকেলে পিসিমা, মুরারির মাতা ক্ষীরোদমোহিনী (৮ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ), বিদ্যানাথের বাটীর ঝী যাতী, কৃষ্ণকান্তের অন্নদার মোহিনী ঝী, কল্যাণীদের বাটীর ভৃত্য তমহরি, এই বাস্তব চিত্র (realistic picture) গুলিও নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বাস্তব বর্ণনায় বেশ মুন্সীয়ানা আছে। গ্রন্থকর্ত্রীর নিজের মন্তব্যগুলি সহৃদয়তা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়। স্থানাভাবে নমুনা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

শ্রীমতী বিরূপমা দেবীর 'দিদি'র স্থানে স্থানে ৺কাশীধামের সুন্দর বর্ণনা আছে। আ-লাভ্যমান পুস্তকে আগ্রা, জয়পুর, চিতোর, 'অজাবীল-পুরী আজমীর' প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানের মনোরম বর্ণনা তাহার স্থান পূরণ করিয়াছে। সতীনাথ যখন উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্তে—

নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ-কারণ।
ভারতের নানাদেশ করি পর্য্যটন॥

বেড়াইতেছেন, সেই উপলক্ষে এই বর্ণনাগুলির সমাবেশ। যাঁহারা দেশভ্রমণের পক্ষপাতী, অথবা কবি কুপের ন্যায় তাঁহার অনুকরণে গৃহকোণ হইতে না নড়িয়া প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে কৌতূহলী, অর্থাৎ 'পিঁড়ের বসিয়া পেঁড়োর খবর' লইতে চাহেন, তাঁহারা এই পরিচ্ছেদগুলি (২য় খণ্ড, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম পরিচ্ছেদ) আগ্রহের সহিত পাঠ করিবেন, এইরূপ আশা করা যায়।

দোষ-পরিচ্ছেদ

পুস্তকখানিতে ছাপার ভুল বড়ই বেশী, গড়ে প্রতি পৃষ্ঠায় একটি বলিলেও কম করিয়া বলা হয়। তবে ইহা বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক নহে, সুতরাং এ সব ভুল মারাত্মক নহে। ব্যাকরণের ভুলও বিস্তর আছে। যে সকল পাঠক শুধু রস-গ্রহণ লোলুপ, ব্যাকরণের ভুচকচি ভালবাসেন না, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া সমালোচনার এই অংশটুকু বাদ দিবেন। বহুকাল গুরুমশায়গিরি করিয়া ভুলধরার বদ অভ্যাসটা আমাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে সুতরাং এদিকে দৃষ্টি না রাখিয়াই পারি না।

ছাপাখানার ভূতের উপদ্রবে, সমাস-স্থলে 'বাধ' একদিকে 'ছাল' অন্যদিকে ইয়ত প্রায় সর্ব্বত্র ঘটিয়াছে। 'স্বামীপ্রেম' 'স্বামীদৃষ্ট' 'ধনীসন্তান' প্রভৃতি দীর্ঘ ঈকারের ছড়াছড়ি—ভূতের উপদ্রব কি 'খাঁটী বাংলা'র বিরুদ্ধে হইয়াছে জানি না। কেন না 'খাঁটী বাংলা'র পক্ষপাতীরা বলেন, 'বাংলা'র স্বামী শব্দ ধনী শব্দ—স্বামিন্ ধনিন্ নহে। কিন্তু তাহা মানিলেও সংস্কৃত লোকে 'লক্ষ্মীরূপা' চলিবে কি? আর 'প্রতি-যোগীতা' 'উত্তরাধিকারীত্ব', 'একাকীত্ব' এই নিয়মে সমর্থিত হইবে কি? 'ঘীজ' 'আতী' ও কয়েকস্থলে 'মুরারী' অবশ্য ছাপার ভুল। পক্ষান্তরে 'অগ্নিপতিতে' ভগীর ঈকারের দুরবস্থা! সম্মুখে, সন্নিধান, আকাঙ্ক্ষা, ঘনিষ্ট, মুখস্থ, পক্ষান্তরে অন্যান্য বিধাগ্রস্থ প্রভৃতি বানান ত সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে। 'সম্যক্তা' না হয় হজম করিলাম, 'কৌমারীর' (৩৩ ও ৩৪ পৃঃ) হজম করা কঠিন ব্যাপার। 'চক্ষুষ্মান্তা' নিতান্তই ব্যাকরণে চক্ষুষ্মত্তার অভাব নহে কি? 'একচক্ষুতা'ও তথৈবচ। অহি বুঝি, বিষধর বুঝি, 'অহিধর' কীদৃশ জীব? মূল্যবান্ ফলবান্ সম্যক্ পূষক প্রভৃতি স্থলে হলন্তচিহ্নের অভাব, পক্ষান্তরে অন্যান্যস্থলে অতিসম্পাৎ, উচিৎ, হলন্ত, ইতপূর্ব্বে চক্ষুষ্মান সন্তপ্রস্ফুটিত প্রভৃতি স্থলে বিসর্গবিসর্জ্জন, বক্ষস্থলা বক্ষস্তাপ বক্ষনায় সচ্চরিত্র প্রভৃতি স্থলে ভুল সন্ধি (অথবা বিসর্গবিসর্জ্জন), বাক্‌বিতণ্ডা বণিক্‌দুহিতা দিক্‌নির্ণয় প্রভৃতি স্থলে সন্ধির অভাব, গোপন যৌন রোষাক্ত প্রভৃতি শব্দের বিশেষণভাবে ও দুরন্তি সুপন্তি প্রভৃতি শব্দের বিশেষ্যভাবে প্রয়োগ, শঙ্কেটা ভুলধরা প্রভৃতি স্থলে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শব্দের খিচুড়ি, কৌতূহলী দৃষ্টি, শঙ্কীর মূর্ত্তি, সর্ব্বময়ী পদ, নিয়ন্ত্রিতা স্ত্রীলোক, সর্ব্বং-

(৯) ভাইপো দুইটীকে অতর্কিতভাবে পাওয়া (happy accident) দুর্ঘটনার আকস্মিক ঘটনার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। (১ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।)

সন্ধ্যা নাতুরকাড়ে. উত্তরবাহিনী ভাগীরথীতে ইত্যাদি স্থলে পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গের বিচ্ছুরি. বল + অপেক্ষা = বলাপেক্ষা (১১৭ পৃঃ) অদ্ভুত সন্ধি, ইত্যাদি হে যাবকল-বিরোধিকা ও বাগান-সমস্যা পুরীভূত। নিঃশেষে উদাহরণ দিতে গেলে গ্রন্থিপত্রের স্থান লইতে হয়, সুতরাং এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

দুই এক স্থলে ইংরেজীর অনুকরণে বাক্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। 'মনোযোগ দিতে' 'মনোযোগ আকর্ষণ' ও খুবই চলিত হইয়াছে, প্রতিবাদ বৃথা; 'মনোযোগ পাই করা' (৩৪ পৃঃ), ও 'একটা বুদ্ধি তাহার থাকে পাইল' (১৭৪ পৃঃ), ইংরেজীর 'আক্ষরিক অনুবাদ' নহে কি? স্থানে স্থানে অনর্থক সাধুভাষার প্রয়োগে বাগাড়ম্বর হইয়াছে; যথা 'তমনিক্ষেপের ন্যায় স্তব্ধ' (১৩০ পৃঃ), 'মহীলতাযোগে ঘুরিকা-খননে ক্ষুব্ধ অধিবাসকে পাছে জাগাইয়া তুলেন' (৩৪০ পৃঃ)। 'আইবুড়ো মেয়ে পুতুলখেলা তাহাদের জীবনের মঙ্গলগ্রন্থি বাঁধিয়া দিবার বর্ষসূত্র' (৮৩ পৃঃ)—এখানে রূপক বিভ্রাট (Confusion of metaphors) ঘটিয়াছে। এই বিভ্রাটেই দোষ-পরিচ্ছেদ শেষ করিলাম।

দত্তা

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

নিদ্রাবিহীন রজনীর পরিপূর্ণ ক্লান্তি লইয়া বিজয়া সকালে নীচের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, জমিদারী সেরেস্তার গেরো-বাঁধানো খাতাগুলি টেবিলের উপর থাকে-থাকে সাজানো রহিয়াছে; এবং বৃদ্ধ গমস্তা অদূরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। সে সবিনয়ে কহিল, "মা, এগুলো আজ ফিরে চাই-ই।"

তাহাকে ঘণ্টা-দুই পরে ঘুরিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়া বিজয়া উপরের খাতাটা তুলিয়া লইয়া জানালা-সংলগ্ন কোচের উপর গিয়া উপবেশন করিল। আজ তাহার মনোযোগ দিবার শক্তিই ছিল না,—উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি বারম্বার হিসাবের অঙ্ক ছাড়িয়া জানালার বাহিরে এখানে-ওখানে পলায়ন করিতেছিল। হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল, বাগানের ধারে একটা গাছতলায় দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ রাসবিহারী পরেশকে কি সকল প্রশ্ন করিতেছেন। আঙুল তুলিয়া কখনো নীচের ঘর, কখনো বা ছাদের উপর নির্দেশ করিতেছেন। দু'জনের কাহারও একটা কথাও না শুনিয়া, বিজয়া চক্ষের নিমিষে বৃদ্ধের ক্রূর ইঙ্গিতের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইল।

খানিক পরে তিনি ছেলেটাকে ছাড়িয়া দিয়া কাছারি-ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। পরেশ বাড়ীর দিকে আসিতে-ছিল, বিজয়া জানালা দিয়া হাত নাড়িয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, "তোকে কি জিজ্ঞেসা করছিলেন রে?"

পরেশ কহিল, "আচ্ছা মা'ঠান, সরকার মহাশয়ের কাছে ট্যাকা নিয়ে আমি ঘুড়ি-নাটাই কিন্‌তে চলে গেনু না? ডাক্তারবাবুর ভাত খাবার বেলা কি আমি বাড়ী ছিনু মা'ঠান?" বিজয়া কহিল, "না।" পরেশ কহিল, "তবে? বড়বাবু বলে, 'কি কথা হচ্ছেছিল বল্ ব্যাটা, নইলে সেপাই দিয়ে তোকে বেঁধে জল-বিছুটি দেওয়াব।' আমি বনু, 'নতুন দারোগান তোমারে মিথ্যে-মিথ্যে লাগিয়েচে। মা'ঠান বল্‌লে পরেশ, ছুটে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন্, তোকে ভালো নাটাই কিনে দেবো—তাই না ছুটে গেনু? কিন্তু বড়বাবুকে বোলো না মা'ঠান। তোমাকে বল্‌তে তিনি মানা কোরে গেছে।"

জানাইবে না বলিয়া ভরসা দিয়া বিজয়া পরেশকে বিদায় করিল, এবং স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় খাতা খুলিয়া বসিল; কিন্তু এবার তাহার দৃষ্টির সম্মুখে খাতার লেখা একেবারে লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। শুধু রাত্রি-জাগরণে আরক্ত চক্ষু দুটি অসহ্য ক্রোধে আগুনের শিখার মত জ্বলিতে লাগিল। অনতিকাল পরেই রাসবিহারী দ্বারের বাহিরে লাঠির শব্দ করিয়া মৃদুমন্দ গতিতে প্রবেশ করিলেন; এবং বিজয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অল্প একটু কাশিয়া চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন।

বিজয়া খাতা হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, "আসুন। আজ এত সকালে যে?" রাসবিহারী তৎক্ষণাৎ সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার চোখ দুটি যে ভয়ানক রাঙা দেখাচ্ছে, মা। ঠাণ্ডা-

টাওা লাগেনি ত ?" বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না।" রাসবিহারী তাহা কাণে না তুলিয়া উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, "না বল্‌লে ত শুন্‌বো না মা। হয় রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি, নয় কোন রকম কিছু—" "না, আমার কিছুই হয় নি।" "কিন্তু ও রকম চোখ লাল হবার কারণ ত একটা কিছু—" বিজয়া আর প্রতিবাদ না করিয়া কাজে মন দিল দেখিয়া রাসবিহারী থামিয়া গেলেন। একটু মৌন থাকিয়া কহিলেন, "রোদের ভয়েই সকালে আস্‌তে হোলো মা। দলিল-পত্রগুলো একবার দেখ্‌তে হবে,—শুন্‌চি না কি চৌধুরীরা ঘোষপাড়ার সীমানা নিয়ে একটা মাম্‌লা রুজু করবে।"

জমিদারী-সংক্রান্ত অত্যাবশ্যক দলিলগুলি বনমালী নিজের কাছেই রাখিতেন। একে ত এ সকলের সচরাচর প্রয়োজন হয় না, তাহাতে অন্যত্র খোয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া তিনি কোন দিন কাছ-ছাড়া করেন নাই। কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিবার সময় বিজয়া এগুলি সঙ্গে আনিয়াছিল, এবং নিজের শোবার ঘরের লোহার আলমারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। বিজয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "তাঁরা মাম্‌লা করবেন কে বল্‌লে ?"

রাসবিহারী বিজ্ঞভাবে অল্প হাস্য করিয়া কহিলেন, "কেউ বলেনি মা, আমি বাতাসে খবর পাই। তা' না হ'লে কি এত বড় জমিদারীটা এতদিন চালাতে পারতাম।" বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁরা কতটা জমি দাবী করচেন ?" রাসবিহারী মনে-মনে হিসাব করিয়া বলিলেন, "তা হবে বৈ কি—খুব কম হলেও সেটা বিঘে দুই হবে।" বিজয়া তাচ্ছল্যের সহিত কহিল, "এই ! তা'হলে তাঁরাই নিন। এটুকু বায়গা নিয়ে মাম্‌লা-মোকদ্দমার দরকার নেই।"

রাসবিহারী অত্যধিক বিস্ময়ের ভান করিয়া ক্ষোভের সহিত কহিলেন, "এরকম কথা তোমার মত মেয়ের মুখে আমি আশা করিনি মা। আর বিনা বাধায় যদি দু'বিঘে ছেড়ে দিই, কাল যে আবার দু'শ বিঘে ছেড়ে দিতে হবে না, তাই বা কে বল্‌লে ?" কিন্তু আশ্চর্য্য, এত বড় তিরস্কারেও বিজয়া বিচলিত হইল না। সে সহজ ভাবে প্রত্যুত্তর করিল, "কিন্তু সত্যিই ত আর দু'শ বিঘে আমাদের ছাড়তে হচ্চে না। আমি বলি, সামান্য কারণে মাম্‌লা-মোকদ্দমার দরকার নেই।"

রাসবিহারী মর্ম্মাহত হইলেন। বারম্বার মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "কিছুতেই হতে পারে না মা, কিছুতেই হতে পারে না। তোমার বাবা যখন আমার উপর সমস্ত নির্ভর করে গেছেন, এবং যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি বিনা প্রতিবাদে দু' বিঘে কেন, দু' আঙুল বায়গা ছেড়ে দিলেও ঘোর অধর্ম্ম হবে। তাছাড়া আরও অনেক কারণ আছে, যার জন্যে পুরানো দলিলগুলো একবার ভাল করে দেখা দরকার। একবার কষ্ট কোরে ওঠো মা, বাক্সটা উপর থেকে আনিয়ে দাও।" বিজয়া উঠিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "আরও কারণ আছে ?" রাসবিহারী বলিলেন, "হাঁ।" বিজয়া কহিল, "কি কারণ ?" রাসবিহারী মনে-মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও আত্মসম্বরণ করিয়া জবাব দিলেন, "কারণ ত একটা নয়,—মুখে-মুখে তার কি কৈফিয়ৎ তোমাকে দেব, মা ?"

এই সময় সরকার মশায় তাঁহার খাতাপত্রের জন্য আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকিতেই, বিজয়া লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি কহিল, "এ বেলায় আর হয়ে উঠ্‌বে না, ওবেলা এসে নিয়ে যাবেন।" সরকার 'যে আজ্ঞে' বলিয়া ফিরিতেছিল,—বিজয়া ডাকিয়া বলিল, "একটা কাজ আছে কিন্তু। কাছারির ওই নূতন দরওয়ানটা কত দিন বাহাল হয়েছে জানেন ?" সরকার কহিল, "মাস-তিনেক হবে বোধ হয়।" বিজয়া কহিল, "তা' যতই হোক, ওকে আর দরকার নেই। এখনো এ মাসের প্রায় দিন-কুড়ি বাকি, এই ক'টা দিনের মাইনে বেশি দিয়ে আজই ওকে জবাব দেবেন।" সরকার বিস্ময়াপন্ন হইয়া চাহিয়া রহিল। ইচ্ছাটা তাহার অপরাধের কথা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু সাহস করিল না। বিজয়া তাহা বুঝিয়াই কহিল, "না, দোষের জন্যে নয়; তবে লোকটাকে আমার ভাল লাগে না বলেই ছাড়িয়ে দিচ্চি। কিন্তু মাইনেটা পুরো মাসের দেবেন।"

রাসবিহারীর মুখ পলকের জন্য রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু পলকের মধ্যেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া হাসিয়া কহিলেন, "তা'হলে বিনা দোষে কারো অন্ন মারাটা কি ভাল মা ?" বিজয়া তাহার জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া সরকার ভরসা পাইয়া কহিতে গেল—"তা'হলে তাকে"—"হাঁ, বিদায় করে দেবেন,—আজই।" বলিয়া বিজয়া খাতায় মন দিল। সরকার তবুও কিছু একটা

প্রত্যাশা করিয়া খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল, রাসবিহারী মিনিট-পাঁচেক স্তব্ধভাবে থাকিয়া তাঁহার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিলেন, "একটু কষ্ট স্বীকার করে না উঠ্‌লেই যে নয় মা। পুরোনো দলিলগুলো একবার আগাগোড়া বেশ করে পড়া যে চাই-ই।" বিজয়া মুখ না তুলিয়াই কহিল "কেন?"

রাসবিহারী গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "বল্‌লুম বিশেষ কারণ আছে। তবুও বারবার এক কথা বলবার ত আমার সময় নেই বিজয়া।"

বিজয়া তাহার খাতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই আস্তে আস্তে কহিল, "তা' বলেছেন সত্যি; কিন্তু কারণ ত একটাও দেখাননি।"

"না দেখালে কি তুমি উঠ্‌বে না?" বলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া এবার তিনি ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিলেন; কহিলেন, "তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না?" বিজয়া নিরুত্তর অধোমুখে কাজ করিতে লাগিল—কোন উত্তর দিল না। তাহার এই নীরবতার অর্থ এত সুস্পষ্ট, এত তীক্ষ্ণ যে, ক্রোধে রাসবিহারীর মুখ কালো হইয়া উঠিল। তিনি হাতের লাঠিটা মেজেতে ঠুকিয়া বলিলেন, "কিসের জন্যে আমাকে তুমি এতবড় অপমান করতে সাহস কর বিজয়া? কিসের জন্যে আমাকে তুমি অবিশ্বাস কর শুনি?"

বিজয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, "আমাকেও ত আপনি বিশ্বাস করেন না! আমার পরসায় আমারি উপর গোয়েন্দা নিযুক্ত করলে মনের ভাব কি হয়, সে আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারেন। এবং তার পর আমার সম্পত্তির মূল দলিল-পত্র হস্তগত করার তাৎপর্য্য যদি আমি আর-কিছু বলে সন্দেহ করি, সে কি অস্বাভাবিক? না, সে আপনাকে অপমান করা?" রাসবিহারী একেবারে নির্ব্বাক, হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তাঁহার এত বড় পাকা চাল কলিকাতার বিলাসিতার মধ্যে বয়-আদরে প্রতিপালিত একটা অনভিজ্ঞ বালিকার কাছে ধরা পড়িতে পারে, এ সম্ভাবনা তাঁহার পাকা মাথায় স্থান পায় নাই। এবং ইহাই সে মুখের উপর অসঙ্কোচে নালিশ করিবে,—সে তো স্বপ্নের অগোচর।

রাসবিহারী অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া থাকিয়া, আর একবার যুদ্ধের জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন। এবং এই প্রকৃতির লোকের যাহা চরম অস্ত্র তাহাই তূণীর হইতে বাহির করিয়া এই অসহায় বালিকার প্রতি নির্ম্মম ভাবে নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, "বনমালীর মুখ রাখবার জন্যেই এ কাজ করেছি। বন্ধুর কর্ত্তব্য বলেই তোমার চলা-ফেরার প্রতি আমাকে নজর রাখ্‌তে হয়েচে। একটা অজানা-অচেনা হতভাগাকে মাঠের মধ্যে থেকে ধরে এনে যে কাল সমস্ত বেলাটা কাটালে, তার মানে কি আমি বুঝতে পারিনে? শুধু কি তাই?-সেদিন দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত তার সঙ্গে হাসি-তামাসা গল্প করেও তোমার যথেষ্ট হলো না, সে রাত্রে কলকাতায় ফিরতে পারলে না ছল করে তাকে এইখানেই থাকতে হোলো। এতে তোমার লজ্জা হয় না বটে, কিন্তু আমাদের যে ঘরে-বাইরে মুখ পুড়ে গেল! সমাজে কারও সাম্‌নে যে মুখ তোলবার আর জো রইল না!" কথাটা এতবড় মর্ম্মান্তিক আঘাত না হইলে হয় ত বিজয়া অপমানে-ক্রোধে সঙ্গে-সঙ্গেই চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিত, কিন্তু এ যেন তাহাকে অসাড় করিয়া ফেলিল।

রাসবিহারী আড়-চোখে চাহিয়া, তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্রের প্রচণ্ড মহিমা বিজয়ার রক্তহীন মুখের উপর নিরীক্ষণ করিয়া, অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন; তার পরে বলিলেন, "তবে এ গুলো কি ভাল, না, এ সকল নিবারণ করার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়?"

বিজয়া স্তব্ধ হইয়া আছে দেখিয়া, তিনি পুনরায় জোর দিয়া কহিলেন, "না, চুপ করে থাকলে হবে না বিজয়া—তোমাকে জবাব দিতে হবে।"

তবুও যখন বিজয়া কথা কহিল না, তখন তিনি হাতের লাঠিটা পুনরায় মেজেতে ঠুকিয়া, তাড়া দিয়া কহিলেন, "না, চুপ করে থাকলে চল্‌বে না। এ সকল গুরুতর ব্যাপার—জবাব দেওয়া চাই।" এতক্ষণে বিজয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার পাংশু ওষ্ঠাধর একবার একটু কাঁপিয়া উঠিল; তার পর ধীরে-ধীরে কহিল, "ব্যাপার যত গুরুতরই হোক্, মিথ্যে কথার আমি কি উত্তর আপনাকে দিতে পারি?"

রাসবিহারী তেজের সঙ্গে প্রশ্ন করিলেন,—"তা'হলে একে তুমি মিথ্যে কথা বলে উড়োতে চাও না কি?" বিজয়া আবার একটুখানি মৌন থাকিয়া তেমনি মৃদুকণ্ঠে

প্রত্যুত্তর দিল,—"আমি উড়োতে কিছুই চাইনে কাকাবাবু; শুধু এ যে মিথ্যে, তাই আপনাকে বল্‌তে চাই। আর মিথ্যে বলে একে আপনি যে নিজেই সকলের চেয়ে বেশী জানেন, তাও এই সঙ্গে আপনাকে জানাতে চাই।"

রাসবিহারী একেবারে থতমত খাইয়া গেলেন। তিনি প্রথমটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন বটে, কিন্তু শেষেরটার জন্য আদৌ ছিলেন না। কোন অবস্থাতেই যে বিজয়া তাঁহাকে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যা দুর্নাম-প্রচারকারী বলিয়া তাঁহারি মুখের উপর অভিযোগ করিতে পারে, এ তাঁহার কল্পনারও অতীত ছিল। তাঁর নিজের কথা আর মুখে জোগাইল না,—শুধু বিজয়ার কথাটাই কলের পুতুলের মত আবৃত্তি করিলেন—"মিথ্যে কথা বলে আমি নিজেই সকলের চেয়ে বেশী জানি?"

বিজয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি গুরুজন,—আপনার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করবার আমার প্রবৃত্তি হয় না। দলিল-পত্র এখন থাক্, মামলা-মোকদ্দমার আবশ্যক বুঝলে তখন আপনাকে ডেকে পাঠাবো।" বলিয়া পাশের দরজা দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

বিজয়ার সর্ব্বাগ্রে মনে হইয়াছিল, কাল প্রভাতেই সে যেমন করিয়া হোক কলিকাতায় পলাইয়া এই ব্যাধের ফাঁদ হইতে আত্মরক্ষা করিবে। কিন্তু উত্তেজনার প্রথম ধাক্কাটা যখন কাটিয়া গেল, তখন দেখিতে পাইল, তাহাতে জালের ফাঁসি যে শুধু কেশী করিয়া চাপিয়া বসিবে তাহাই নয়, অপবাদের ধুঁয়া সঙ্গে-সঙ্গে বহিয়া সেখানকার আকাশ পর্য্যন্ত কলুষিত করিতে বাকী রাখিবে না। তখন কলিকাতার সমাজেই বা সে মুখ বাহির করিবে কি করিয়া? অথচ, এখানেও সে ঘরের বাহির হইতে পারিল না। যদিচ নিশ্চয় বুঝিতেছিল,—রাসবিহারী তাহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য নয়, বরঞ্চ গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়েই এই দুর্নামের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং একান্ত নিরাশ না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুই বাহিরে প্রচার করিবেন না,—তবুও দিন-দুই পরে কাছারির গমস্তা যখন হিসাব সই করাইতে বিজয়ার দর্শন প্রার্থনা করিল, তখন সে অসুস্থতার ছুতা করিয়া চাকরকে দিয়া খাতা-পত্র উপরে চাহিয়া আনাইল। নিজের কর্ম্মচারীকেও দেখা দিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল, পাছে কোনও ছিদ্র দিয়া এ কথা তাহার কাণে গিয়া থাকে, এবং তাহার চক্ষেও অবজ্ঞা ও উপহাসের দৃষ্টি লুকাইয়া থাকে।

একটা জিনিস সে যেমন ভয় করিতেছিল, তেমনি প্রাণ দিয়া কামনা করিতেছিল, তাহার পিতার পত্র লইয়া নরেন নিজেই উপস্থিত হইবে। কিন্তু দিন-পাঁচ-ছয় পরে সে সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল পিয়নের হাত দিয়া। চিঠি আসিল বটে, কিন্তু সে ডাকে। নরেন নিজে আসিল না। কেন যে সে আসিল না, তাহা অনুমান করিতে তাহার মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না। সে ঠিক এই আশঙ্কাই করিতেছিল, পাছে রাসবিহারী কোন ছলে এ কথা নরেন্দ্রের কর্ণগোচর করিয়া, তাহার এ বাটীর পথ রুদ্ধ করিয়া দেন। চিঠি হাতে করিয়া বিজয়া ভাবিতে লাগিল, কিন্তু তাই বলিয়া এত সহজেই যদি এ দিকের পথ তাহার রুদ্ধ হইয়া যায়, এমনই অনায়াসে সেও যদি এই মিথ্যা কলঙ্কের ডালি একাকী তাহারি মাথায় তুলিয়া দিয়া সভয়ে সরিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে এ দুর্নামের বোঝা যত বড় মিথ্যাই হউক, সে বহিয়া বেড়াইবে কোন্ অবলম্বনে? তখন এই মিথ্যা ভারই যে পরম সত্যের মত তাহাকে চক্ষের নিমেষে ধূলিসাৎ করিয়া দিবে!

এম্‌নি অভিভূতের মত স্থির হইয়া বসিয়া সে যে কত কি চিন্তা করিতে লাগিল, তাহার সীমা নাই। তাহার পরে বহুক্ষণ পরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং এইবার তাহার পরলোকগত পিতৃদেবের হাতের লেখা কাগজ দুটি মাথায় চাপিয়া ধরিয়া ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বারবার করিয়া চোখ মুছিয়া চিঠি দু'টি পড়িতে গেল, বারবার অশ্রুজলে দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গেল। অবশেষে অনেক বিলম্বে, অনেক যত্নে যখন পড়া শেষ করিল, তখন পিতার আন্তরিক বাসনা তাহার কাছে আর অবিদিত রহিল না। এক সময়ে তিনি যে শুধু তাহারি জন্য নরেন্দ্রকে মানুষ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, এ সত্য একেবারে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া গেল। এবং এ কথা আর যাহারি অগোচরে থাকুক, রাসবিহারীর যে ছিল না, তাহাও বুঝিতে অবশিষ্ট রহিল না।

আরও পাঁচ-ছয় দিন কাটিয়া গেলে, একদিন সকালে

বিজয়া ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দেখিল, বাড়ীতে রাজ-মজুর লাগিয়াছে। তাহারা ভারা বাঁধিয়া সমস্ত বাড়ীটা চুণ-কাম করিবার উদ্যোগ করিতেছে। কারণ ভাবিতে গিয়া তাহার অকস্মাৎ সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া মনে পড়িল, আগামী পূর্ণিমা তিথির আর সাত দিন মাত্র বাকী আছে। সারা দিন সতেজে কাজ চলিতে লাগিল; অথচ, সে একজন কাহাকেও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, ইহা কাহার আদেশে হইতেছে, কিম্বা কেন এ বিষয়ে তাহার একবারও মত লওয়া হইল না।

বিকাল বেলায় আজ অনেক দিনের পরে বিজয়া কানাই সিংকে সঙ্গে লইয়া নদীর তীরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। হঠাৎ দয়াল আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কহিলেন, "আমি তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্চি, মা!" বিজয়া আশ্চর্য্য হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, "মা, আর ত দেরি নেই; নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপাতে হবে, তোমার বন্ধু-বান্ধবদের সমাদরের সঙ্গে আনবার চেষ্টা করতে হবে,—তাই তাঁদের সব নাম-ধাম জানতে পারলে—"

বিজয়া শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নিমন্ত্রণ-পত্র বোধ হয় আমার নামেই ছাপানো হবে?"

এ বিবাহ যে সুখের নয়, দয়াল তাহা মনে মনে জানিতেন; সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, "না মা, তোমার নামে হবে কেন? রাসবিহারী বাবু বর-কন্যা উভয়েরই যখন অভিভাবক, তখন তাঁর নামেই নিমন্ত্রণ করা হবে স্থির হয়েছে।"

বিজয়া কহিল, "স্থির কি তিনিই করেছেন?" দয়াল ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন,—"হাঁ, তিনিই করেছেন বৈ কি।" বিজয়া কহিল,—"তা হলে এও তিনিই স্থির করুন। আমার বন্ধু-বান্ধব কেহ নেই।" দয়াল ইহার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। চলিতে-চলিতে কথা হইতেছিল। বিজয়া সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিল, "যে চিঠিগুলো আপনি নরেন্দ্রবাবুকে দিয়েছিলেন, সে কি আপনি পড়েছিলেন?"

দয়াল বলিলেন, "না মা, পরের চিঠি আমি পড়ব কেন। নরেনের পিতার নাম দেখেই আমি বুঝেছিলাম, এ যখন তাঁর দিনিস, তখন তাঁর ছেলের হাতে দেওয়া উচিত। একবার মনে হয়েছিল বটে তোমাকে জিজ্ঞেসা কোরব; কিন্তু—কোন দোষ হয়েছে কি মা?" বৃদ্ধকে লজ্জা পাইতে দেখিয়া বিজয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "তাঁর বাবার জিনিস তাঁকে দিয়েছেন, এ তো ঠিকই করেছেন। আচ্ছা, তিনি কি এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলেন নি?" দয়াল বলিলেন, "না, কোন কথাই না। কিন্তু, কিছু জানবার থাকলে তাঁকে জিজ্ঞেসা কোরে আমি কালই তোমাকে বলতে পারি।" বিজয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, "কালই বলতে পারবেন কেমন করে?" দয়াল কহিলেন, "তা' বোধ হয় পারি। আজকাল তিনি প্রত্যহই আমাদের ওখানে আসেন কি না।" বিজয়া শঙ্কিত হইয়া কহিল, "আপনার স্ত্রীর অসুখ আবার বেড়েচে, কৈ, সে কথা ত আপনি আমাকে বলেন নি।" দয়াল একটু হাসিয়া বলিলেন, "না, এখন তিনি বেশ ভালই আছেন। নরেনের চিকিৎসা, আর ভগবানের দয়া।" বলিয়া তিনি হাত যোড় করিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। এ কথা শুনিয়া বিজয়ার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কহিল, "তবে কেন তাঁকে আসতে হয়?" দয়াল প্রসন্ন মুখে কহিতে লাগিলেন, "আবশ্যক না থাকিলেও, জন্মভূমির মায়া কি সহজে কাটে মা? তা' ছাড়া, আজকাল নরেনের কাজ-কর্ম্মও কম, সেখানে বন্ধু-বান্ধবও বিশেষ কেউ নেই,—তাই সন্ধ্যে বেলাটা এখানেই কাটিয়ে যান। বিশেষ, আমার স্ত্রী ত তাঁকে একেবারে ছেলের মতই ভালবাসেন। ভালবাসায় ছেলেও বটে। কিন্তু কথায়-কথায় যদি এতদূরেই এসে পড়লে মা, একবার চল না কেন তোমার এ বাড়ীতে?" 'চলুন' বলিয়া বিজয়া সঙ্গে-সঙ্গে চলিতে লাগিল।

দয়াল কহিলেন, "আমি ত এমন নির্ম্মল, এমন স্বভাবতঃ ভদ্র লোক আমার এতটা বয়সে কখনো দেখতে পাইনি। নলিনীর ইচ্ছে, সে বি-এ পাশ কোরে ডাক্তারি পড়ে। এ বিষয়ে তাকে কত উৎসাহ, কত সাহায্য যে করেন, তার সীমা নেই।" বিজয়া চমকিয়া উঠিল। কলিকাতা হইতে প্রত্যহ এতদূরে আসিয়া সন্ধ্যা অতিবাহিত করিবার এই সন্দেহটাই এতক্ষণ তাহার বুকের ভিতরে বিষের মত কেনাইয়া উঠিতেছিল। দয়াল ফিরিয়া চাহিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, "তবে আর গিয়ে কাজ নেই মা,—তুমি শ্রান্ত হয়ে পড়েচ।" বিজয় কহিল, "না, চলুন।" তাহার গতির শিথিলতা লক্ষ্য করিয়াই দয়াল শ্রান্তির কথা তুলিয়াছিলেন: কিন্তু মুখের চেহারা দেখিতে পাইলে এ কথা মুখে আনিতেও পারিতেন না। তখন প্রতি পদক্ষেপে যে কঠিন ধরণী

তাহার পদতল হইতে সরিয়া যাইতেছিল, বৃদ্ধ তাহা জানিবেন কি করিয়া? তাই পুনরায় বলিলেন, "তাঁর সাহায্যে এর মধ্যেই নলিনী অনেকগুলো বই শেষ করে ফেলেচে। পড়াশুনায় দুজনেরই বড় অনুরাগ।" অনেকক্ষণ নিঃশব্দে চলার পরে, বিজয়া প্রাণপণ চেষ্টায় আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া ধীরে-ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আর কিছু সন্দেহ করেন না?" দয়াল বিশেষ কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না। সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের সন্দেহ মা?" এ প্রশ্নের জবাব বিজয়া তৎক্ষণাৎ দিতে পারিল না। তাহার বুক যেন ভাঙিয়া যাইতে লাগিল। আবার কিছুক্ষণে এই ব্যথা সম্বরণ করিয়া লইয়া কহিল, "আমার মনে হয়, নলিনীর সম্বন্ধে তাঁর মনের ভাব স্পষ্ট কোরে স্বীকার করা উচিত।" দয়াল সায় দিয়া কহিলেন, "ঠিক কথা। কিন্তু তার ত এখনো সময় যায়নি মা। বরঞ্চ আমার মনে হয়, দু'জনের পরিচয় আরও একটু ঘনিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত সহসা কিছু না বলাই উচিত।"

বিজয়া বুঝিল, এ প্রশ্ন অপরের মনেও উদয় হইয়াছে। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, "কিন্তু নলিনীর পক্ষে ত ক্ষতিকর হতে পারে। তাঁর মন স্থির করতে হয় ত সময় লাগতে পারে,কিন্তু ইতিমধ্যে নলিনীর—" সঙ্কোচ ও বেদনায় কথাটা আর তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কিন্তু দয়াল বোধ করি সমস্যার এই দিকটা তেমন চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। সন্দিগ্ধ স্বরে বলিলেন, "সত্যি কথা। কিন্তু আমার স্ত্রীর কাছে যতদূর শুনেচি, তাতে—কিন্তু তোমাকে ত বলেচি, নরেনকে আমরা খুব বিশ্বাস করি। তাঁর দ্বারা যে কারও কোন ক্ষতি হতে পারে, তিনি যে ভুলেও কারও প্রতি অন্যায় করতে পারেন, এতো আমি ভাবতেও পারিনে।" তিনি ভাবিতে নাই পারুন, কিন্তু তবুও ঠিক সেই সময়েই অন্যায় যে কোথায় এবং কতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছিল, সে শুধু অন্তর্যামীই জানিতেছিলেন।

উভয়ে যখন দয়ালের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। একটা টেবিলের দুইদিকে দু'খানা চেয়ারে বসিয়া নরেন্দ্র ও নলিনী সম্মুখের খোলা বইটার সম্বন্ধেই, খুব সম্ভব অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া উঠাতেই, পড়া ছাড়িয়া, ধীরে-ধীরে আলোচনা সুরু করিয়াছিল। নলিনী এই দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, সে-ই প্রথমে দেখিতে পাইয়া কলকণ্ঠে সম্বর্দ্ধনা করিল। কিন্তু বিজয়ার মুখ বেদনায় যে বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহা সন্ধ্যার ম্লান আলোকে তাহার চোখে পড়িল না। নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া, নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছেন?"

বিজয়া নমস্কারও ফিরাইয়া দিল না, প্রশ্নেরও উত্তর দিল না। যেন দেখিতেই পায় নাই এমনি ভাবে, তাহার প্রতি সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, নলিনীকে কহিল, "কৈ, আপনি ত আর একদিনও গেলেন না?" নরেন সুমুখে আসিয়া হাসিমুখে কহিল, "আর আমাকে বুঝি চিন্‌তেও পারলেন না?" বিজয়া শান্ত অবজ্ঞার সহিত জবাব দিল, "চিন্‌তে পারলেই চেনা দরকার না কি!" নলিনীকে কহিল, "চলুন, আপনার মামীমার সঙ্গে আলাপ কোরে আসি।" বলিয়া পলকমাত্র এ দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, তাহাকে একপ্রকার ঠেলিয়া লইয়া উপরে চলিয়া গেল। নলিনী সিঁড়ির কয়েক ধাপ উপরে হইতে ডাকিয়া কহিল, "কিন্তু চা না খেয়ে যেন পালাবেন না, নরেন বাবু!" নরেন ইহারও জবাব দিতে পারিল না,—বিস্ময়ে, অপমানে একেবারে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এবং বৃদ্ধ দয়াল তাহার এই অপ্রত্যাশিত লজ্জার অংশ লইবার জন্য বিরস মুখে সেইখানেই নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু তবুও কেমন করিয়া যেন তাঁহার কেবলি সন্দেহ হইতে লাগিল, যাহা বাহিরে প্রকাশ পাইল ইহা ঠিক তাই নয়;—এই অকারণ অপমানের আবরণের নীচে যে বস্তুটি দৃষ্টির আড়ালে রহিয়া গেল, তাহা আর যাহাই হোক, উপেক্ষা-অবহেলা নয়।

কিছু পরে চা'য়ের জন্য উপরে ডাক পড়িলে, আজ নরেন্দ্র দয়ালের অনুরোধ এড়াইয়া নীচেই রহিয়া গেল। কিন্তু তাহাকে একাকী ফেলিয়া দয়াল উপরে যাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ সহাস্যে কহিল, "আমি ঘরের লোক, আমার কথা ভাববেন্ না দয়ালবাবু। কিন্তু আপনার মান্য অতিথিটির সম্মান রাখা আবশ্যক। আপনি শীঘ্র যান।" দয়াল দুঃখিত এবং লজ্জিতভাবে উপরে যাইবার উপক্রম করিয়া কহিলেন, "তা'হলে তুমি কি একটু বস্‌বে?" ভৃত্য আলো দিয়া গিয়াছিল। নরেন খোলা বইটা কাছে টানিয়া লইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, বোস্‌ব বৈ কি!"

প্রায় আধঘণ্টা পরে আবার তিন জনে নীচে নামিয়া আসিলে, নরেন বই রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ না থাকিয়া চলিয়া গেলেই বোধ করি ইহারা আরাম অনুভব করিতেন, কারণ এই তাহার একাকী অপেক্ষা করাটাই সকলকে একসঙ্গে যেন লজ্জা ও কুণ্ঠার কশাঘাত করিল।

নলিনী সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আপনার চা নীচে আন্‌তে বলে দিয়েচি,—এলো বলে নরেনবাবু।" কিন্তু বিজয়া তাহাকে কোন প্রকার সম্ভাষণ না করিয়া, এমন কি দৃক্‌পাত পর্য্যন্ত না করিয়া, ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া গেল। কানাই সিঁড়ি দ্বারের কাছে বসিয়া ছিল, লাঠি হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, আকাশে মেঘের আভাস পর্য্যন্ত নাই,—নবমীর চাঁদ ঠিক সুমুখেই স্থির হইয়া আছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার পদতলের তৃণরাজি হইতে আরম্ভ করিয়া, কাছে, দূরে যাহা কিছু দেখা যায়—আকাশ, প্রান্তর, গ্রামান্তের বনরেখা, নদী, জল সমস্তই যেন এই নিঃশব্দ জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া কিম্‌-কিম্‌ করিতেছে। কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই, পরিচয় নাই, বন্ধন নাই ;—কে যেন তাহাদের ঘুমের মধ্যে স্বতন্ত্র জগৎ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া যেখানে-সেখানে ফেলিয়া গেছে—এখন তন্দ্রা ভাঙিয়া তাহারা পরস্পরের অজানা মুখের প্রতি অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিয়াছে। চলিতে-চলিতে তাহার চোখ দিয়া অবিরল জল পড়িতে লাগিল, এবং মুছিতে-মুছিতে বারবার বলিতে লাগিল, আমি আর পারি না, আমি আর পারি না!

বাড়ী আসিতেই খবর পাইল, রাসবিহারী কি জন্য সন্ধ্যা হইতে বাহিরের ঘরে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। শুনিতেই তাহার চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল, এবং কোন কথা না কহিয়া, পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কিন্তু ইহাও তাহার অবিদিত ছিল না যে, শত বিলম্বেও এই পরম সহিষ্ণু লোকটির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না। তিনি প্রতীক্ষা করিয়া যখন আছেন, তখন, রাত্রি যত বেশীই হোক, সাক্ষাৎ না করিয়া কোন মতেই নড়িবেন না।

অনতিকাল মধ্যেই দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া পরেশ জানাইয়া দিল যে, বড়বাবু আসিতেছে। এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহার চটিজুতার ও লাঠির শব্দ যুগপৎ শুনিতে পাওয়া গেল। বিজয়া কহিল "আসুন।" ঘরে প্রবেশ করিয়া রাসবিহারী চৌকিতে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "আমি তাই এতক্ষণ এদের বলছিলাম যে, এতগুলো চাকর-বাকরের মধ্যে এ হুঁস কাহারও হোলো না যে, বাড়ী থেকে দুটো লণ্ঠন নিয়ে যায়! দয়ালেরও এ ভয় হওয়া উচিত ছিল যে, মাঠের মধ্যে শুধু জ্যোৎস্নার আলোয় নির্ভয় না করে, সঙ্গে একটা আলো দেওয়া! তাই ভাবি, ভগবান! এ সংসারে আত্মীয়-পরে কি প্রভেদটাই তুমি কোরে রেখেচ!" বলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিলেন। কিন্তু, বিজয়া কিছুই কহিল না। তখন রাসবিহারী একবার কাশিয়া, একটু ইতস্তত: করিয়া, পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, "যা করবার সবই আমি কোরে রেখেচি ; শুধু তোমার নামটা একটু লিখে দিতে হবে মা, এটা আবার কালকেই পাঠিয়ে দেওয়া চাই।" বলিয়া কাগজখানা বিজয়ার হাতে গুঁজিয়া দিলেন। বিজয়া দৃষ্টিপাতমাত্রই বুঝিল, ইহা তাহাদের ব্রাহ্মবিবাহ আইন-মতে রেজেষ্ট্রি করিবার আবশ্যক দলিল। ছাপা এবং হাতের লেখা আগাগোড়া দুই-তিনবার করিয়া পাঠ করিয়া, অবশেষে সে মুখ তুলিল। বেশী সময় যায় নাই, কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই তাহার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। তাহার এতক্ষণের এতবড় বেদনা অকস্মাৎ কি একপ্রকার কঠিন ঔদাসীন্য ও নিদারুণ বিতৃষ্ণায় রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিল। তাহার মনে হইল, জগতের সমস্ত পুরুষই একছাঁচে ঢালা। রাসবিহারী, দয়াল, বিলাস, নরেন্দ্র—আসলে কাহারো সঙ্গে কাহারো প্রভেদ নাই। শুধু বুদ্ধি ও অবস্থার তারতম্যে যা কিছু প্রভেদ বাহিরে প্রকাশ পায়, এই মাত্র ; নহিলে নিজের সুখ ও সুবিধার কাছে নীচতায়, ক্রূরতায়, নির্ম্মম নিষ্ঠুরতায় নারীর পক্ষে ইঁহারা সকলেই সমান। আজ দয়ালের আচরণটাই তাহাকে সবচেয়ে বেশী বাজিয়াছিল। কারণ, কেমন করিয়া যেন তাহার অসংশয়ে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহার হৃদয়ের একাগ্র কামনার জিনিসটি ইনি জানিতেন। অথচ এই দয়ালের জন্য সে কি না করিয়াছে! সমস্ত প্রাণ দিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছে, ভালবাসিয়াছে, একান্ত আপনার ভাবিয়াছে। কিন্তু নিজের ভাগিনেয়ীর কল্যাণের পার্শ্বে, সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও, তিনি এই বিশ্বাসের কোন মর্য্যাদাই রাখিলেন না। তাঁহার

চোখের নীচেই যখন দিনের পর দিন এক অনাত্মীয়া রমণীর মর্ম্মান্তিক দুঃখের পথ প্রস্তুত হইতেছিল, তখন কতটুকু দ্বিধা, কতটুকু করুণা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল! তবে, রাসবিহারীর সহিত মূলতঃ তাঁহার পার্থক্য কোন্ খানে এবং কতটুকু? আর নরেন্দ্রের কথাটা সে গোড়া হইতেই চিন্তার বাহিরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল, এখনও তাহাকে বিচার করিবার ভান করিল না। শুধু এই কথাটাই এখন সে আপনাকে আপনি বারম্বার বলিতে লাগিল, যদি সকলেই সমান, তবে বিলাসকেই বা তাহার বিদ্বেষের চক্ষে দেখিবার অধিকার কি? বরঞ্চ সে-ই ত সকলের চেয়ে নির্দ্দোষ! সে-ই ত সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধ কম করিয়াছে! বস্তুতঃ, তাহারই ত শুধু বাক্যে এবং ব্যবহারে দমিবস্তু দেখা গিয়াছে! তাহার যা' কিছু অপরাধ, সে ত শুধু তাহারই জন্য। একটু স্থির থাকিয়া, বিজয়া আপনাকে আপনি পুনরায় বুঝাইল যে, বিলাসের ভালবাসা সত্য এবং সজীব বলিয়াই ত কেবল সে নীরবে সহিতে পারে নাই, বিরুদ্ধ শক্তিকে সর্ব্বাঙ্গে হাতিয়ার বাঁধিয়া বাধা দিতে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে,—কিন্তু যাও বলিতেই সস্তা ভদ্রতা বাঁচাইয়া অভিমানভরে চলিয়া যাইতে পারে নাই! এই যদি অপরাধ, তবে তাহাকে শাস্তি দিবার অধিকার আর যাহারই থাক্, তাহার ত নাই! তাহার আর একটা ব্যাপার মনে পড়িল, সে এই কঠিন বাস্তব সংসার। সে দিক দিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে, এই বিলাসের যোগ্যতাই ত সকলের অপেক্ষা বড় দেখা যায়। সেই অপদার্থটার তুলনায় তাহাকে ত তখন কোন মতেই উপেক্ষার বস্তু বলা সাজে না।

কিন্তু রাসবিহারী তাহার গম্ভীর, নির্ব্বাক মুখের প্রতি চাহিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "তা'হলে মা,—এ ঘরে কালি-কলম আছে, না, নীচে থেকে আন্‌তে বলে দেব?" বিজয়া চমকিয়া চাহিল। অতীতের কুৎসিত, কদাকার স্মৃতির উপরে তাহার চিন্তার ডোর ধীরে-ধীরে একখানি সূক্ষ্ম জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল; এই স্বার্থান্ধ বৃদ্ধের নিষ্ঠুর ব্যগ্রতা ছুরির মত পড়িয়া তাহাকে নিমিষে ছিন্নভিন্ন করিয়া আগাগোড়া অনাবৃত করিয়া দিল। এবং পরক্ষণেই বিজয়া একেবারে মরিয়ার মত নির্ভয় হইয়া উঠিল। কহিল, "আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি কাকাবাবু, আপনার কি এই মত যে, পাপ যত বড়ই হোক্, টাকার তলায় সমস্ত চাপা পড়ে যায়?" রাসবিহারী প্রশ্নের তাৎপর্য্য ঠিক ধরিতে না পারিয়া থতমত খাইয়া শুধু কহিলেন,—"কেন, কেন মা?" বিজয়া অবিচলিত দৃঢ়স্বরে বলিল, "নইলে, আমার অতবড় পাপটাকেও উপেক্ষা কোরে কি আপনি আমাকে গ্রহণ করতে চাইতেন?" রাসবিহারী লজ্জায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। হতবুদ্ধির মত বলিলেন, "সে তো মিথ্যে কথা। অতিবড় শত্রুও ত তোমাকে ও অপবাদ দিতে পারে না মা!" বিজয়া কহিল, "শত্রু হয় ত পারে না। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, বিলাস বাবু কি আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারবেন?"

রাসবিহারী কহিলেন, "শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারবে না? তোমাকে? বিলাস? আচ্ছা—" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, "বিলাস! বিলাস!" বিলাস নিকটে কোথাও বোধ করি প্রতীক্ষা করিতেছিল, ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। রাসবিহারী বলিয়া উঠিলেন, "শোন কথা বিলাস! আমার বিজয়া মা বল্‌চেন, তুমি কি তাঁকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারবে? শোন একবার—" কিন্তু বিলাস সহসা কোন উত্তরই দিতে পারিল না,—প্রশ্নটা যেন সে বুঝিতেই পারিল না, এমনি ভাবে শুধু চাহিয়া রহিল।

বিজয়া কহিল, "সেদিন কাকাবাবু বাড়ীর চাকর-বাকরদের জিজ্ঞেসা করে আমাকে এসে বলেছিলেন যে, আমি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নিভৃতে নরেন বাবুর সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করেও তৃপ্ত হইনি; অবশেষে তিনি ট্রেণ না পাবার অছিলায় সে রাত্রিটা এইখানে কাটিয়েই সকালবেলা চলে গিয়েছিলেন। এই অবস্থায়—"

কথাটা রাসবিহারীর উচ্চ কণ্ঠে চাপা পড়িয়া গেল। তিনি বারবার বলিতে লাগিলেন,—"কখ্খনো না! কখ্খনো না। এ যে অসম্ভব! এ যে ঘোর মিথ্যা—এ যে একেবারেই—" ইত্যাদি ইত্যাদি। বিলাসের মুখ কালো হইয়া উঠিল। সে কহিল, "না, আমি শুনিনি।" রাসবিহারী আবার চেঁচাইতে লাগিলেন, "কেমন কোরে শুন্‌বে বিলাস,—এ যে ভয়ানক মিথ্যে! এ যে দারুণ,—তাই আমি দরওয়ান বাটাকে—তুমি দেখো দিকি, পরেশ ছোঁড়াটাকে আমি কি রকম শাস্তি দিই!—আমি—"

বিলাস কহিল, "পৃথিবী-শুদ্ধ লোক যদি এ কথার সাক্ষী দিত, তবুও বিশ্বাস করতাম না।"

বিজয়া কঠিন হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেন করতেন না? সে কি আমার বিষয়ের জন্যে?" রাসবিহারী এই কথার সূত্র ধরিয়া পুনরায় বকিতে সুরু করিয়াছিলেন; কিন্তু ছেলের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা থামিয়া গেলেন।

বিলাসের দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে লেশমাত্র উষ্ণতা বা উগ্রতা প্রকাশ পাইল না। শুধু শান্ত, স্থির স্বরে জবাব দিল, "না। তোমার বিষয়ের ওপর আমার নিজের আর লোভ নেই।"

সমস্ত কক্ষটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; এবং এই নীরবতার ভিতর দিয়াই এতক্ষণে একই সঙ্গে সকলের যেন সমস্ত ব্যাপারটার কদর্য্য শ্রীহীনতা চোখে পড়িয়া গেল। এ যেন হাটের মধ্যে একটা বেচা-কেনার পণ্য লইয়া দুই পক্ষের তীব্র কঠোর দরদস্তুর চলিতেছিল। তাহাতে লজ্জা, সরম, শ্রী, শোভা কিছুমাত্র অবকাশ ছিল না,—শুধু দুটা মানুষ একটা উলঙ্গ স্বার্থের দুই দিক দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া পরস্পরের কাছে ছিনাইয়া লইবার জন্যে প্রাণপণে টানা-হেঁচড়া করিতেছিল।

রাসবিহারী তাঁহার বহু ক্লেশার্জ্জিত পরিণত বয়সের প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া যে ভাবে একটা ইতরের মত গণ্ড-গোল চেঁচা-মেচি করিতেছিলেন, বিলাসের ভাষা ও সংযমের সম্মুখে সে দৃশ্য তাঁহাকে যেমন বাজিল, বিজয়াও নিজের একান্ত লজ্জাহীন প্রগল্‌ভতার জন্য মর্ম্মে মরিয়া গেল। বিপদ যত গুরুতরই হোক, কোন ভদ্রমহিলাই যে এতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনার চরিত্রকে মীমাংসার বিরোধীভূত করিয়া পুরুষের সহিত এমন করিয়া মর্য্যাদা-হীন বাদ-বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতে পারে, ক্ষণকালের জন্য এ যেন একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া তাহার বোধ হইল। মনে হইল, দাম্পত্য-জীবনের যত কিছু মাধুর্য্য, যত কিছু পবিত্রতা আছে, সমস্তই যেন তাহার জন্য একেবারে উদ্‌ঘাটিত হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

ঘরের নিবিড় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিলাসই আবার কথা কহিল। বলিল, "বিজয়া, বাবা যাই করুন, যাই বলুন, আমার জীবনে একটা মস্ত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। হয় ত এ কথা বাবাও বিশ্বাস করতে পারবেন না, কিন্তু আমি সত্যই বল্‌চি, তুমি ছাড়া তোমার বিষয়-সম্পত্তির প্রতি আমার আর লেশমাত্র স্পৃহা নেই।"

বিজয়া তাহার পাংশু মুখ ও মলিন চোখ দুটি বিলাসের মুখের উপর ক্ষণকাল স্থাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি বল্‌চেন?" বিলাস নত হইয়া তাহার পিতার পদযুগল স্পর্শ করিল, এবং অগ্রসর হইয়া আসিয়া বিজয়ার ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, "আমার মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে বিজয়া, আজ তা'হলে আমি তোমাদের কাছে সত্য কথাই বল্‌চি; তোমাকে ছাড়া তোমার কিছুই আর আমি কামনা করিনে।"

শুধু মুহূর্ত্তকাল উভয়ে এই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, বিজয়া আস্তে-আস্তে নিজের হাতখানি মুক্ত করিয়া লইয়া টেবিলের কাছে আসিয়া কলম তুলিয়া লইল। পলকের জন্য হয় ত একবার দ্বিধা করিল, হয় ত করিল না,—কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না,—কিন্তু পরক্ষণেই বড় বড় অক্ষরে নিজের নাম সই করিয়া দিয়া কাগজখানি রাসবিহারীর হাতে আনিয়া দিয়া কহিল, "এই নিন।"

রাসবিহারী দলিলখানি ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিলেন, এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া বনমালীর শোকে অনেক অশ্রু ব্যয় করিয়া, এবং নিরাকার পরব্রহ্মের অসীম করুণার বিস্তর গুণগান করিয়া, রাত্রি হইতেছে বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

পিতৃদেব চলিয়া গেলে, বিলাস আর একবার আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিল, "আমি জানি, তুমি আমাকে ভাল-বাস না। কিন্তু আমার সে শক্তি, সে উদারতা নেই যে বলি, তুমি যাকে ভালবাস তাকেই বরণ কর;—আমার এই অপরাধ তুমি মার্জ্জনা কোরো।"

বোধ করি এম্‌নিই কিছু একটা ক্ষমা ভিক্ষা লইবার জন্য বিজয়ারও ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে তাহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল—মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। সে শুধু কেবল হাত দুটি কপালে তুলিয়া একটা নমস্কার করিয়াই পাশের দরজা দিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

(ক্রমশঃ)

মনোবিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম-এ]

মেধা

প্রত্যক্ষী ও স্মৃতি

টেবিলের উপর একটি লেবু আছে। এই লেবুটি যতক্ষণ দেখিতেছ, ততক্ষণ তোমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেছে। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে ফলজ্ঞান বলা যায়। লেবুটি যখন সরাইয়া লইলাম, তখনও তোমার লেবুর জ্ঞান থাকিল; কিন্তু এ জ্ঞান ফলজ্ঞান নহে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে—ইহা স্মৃতি মাত্র। প্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান স্বরূপ জ্ঞান; অপ্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান প্রতিরূপ জ্ঞান। স্বরূপ জ্ঞান অতি সুস্পষ্ট - এরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষ-বস্তু-সমুৎপন্ন। প্রতিরূপ জ্ঞান তত সুস্পষ্ট নহে—এরূপ জ্ঞান পরোক্ষ-বস্তু-সমুৎপন্ন। যতক্ষণ বাহ্যবস্তুর স্থিতি, স্বরূপ জ্ঞানেরও স্থিতি ততক্ষণ। বাহ্যবস্তু অন্তর্হিত হইলে, স্বরূপ জ্ঞানেরও অবসান হয়। কিন্তু প্রতিরূপ জ্ঞানের স্থিতি বাহ্যবস্তুর স্থিতির উপর নির্ভর করে না। স্বরূপ জ্ঞান বহু পরিমাণে আমাদের ইচ্ছার বশবর্তী নহে—লেবুটি দেখিব অথচ ইহার কথা ভাবিব না, এরূপ হইতে পারে না। ইচ্ছা করিয়া লেবুটি না দেখিতে পারি, কিন্তু লেবুটি দেখিব অথচ লেবুর বিষয় চিন্তা করিব না, এরূপ হওয়া অসম্ভব। মেঘ ডাকিলে, আমি ইচ্ছা করি বা না করি, ইহার শব্দ আমাকে শুনিতেই হইবে। প্রতিরূপ জ্ঞান অনেক পরিমাণে আমাদের ইচ্ছার অধীন বলিতে পারা যায়। অন্য বিষয়ের চিন্তা করিয়া লেবুর স্মৃতিকে আমরা বিস্মরণ করিতে পারি। মনকে এক বিষয়ের চিন্তা হইতে অন্য বিষয়ের চিন্তায় লইয়া যাইবার শক্তি আমাদের আছে; এবং যখন একটি বিষয়ের চিন্তা করি, তখন অপর বিষয়ের চিন্তা আমাদের মনে উদয় হয় না। স্বরূপ জ্ঞানের প্রকাশও যেমন আকস্মিক, তিরোভাবও তেমনি আকস্মিক। যখনই লেবুটি তোমার সম্মুখে ধরিলাম, তখনই ইহার ফলজ্ঞানের বিকাশ হইল; আবার যখনই লেবুটি সরাইয়া লইলাম, সেই মুহূর্তেই ফলজ্ঞানও অন্তর্হিত হইল। কিন্তু প্রতিরূপ জ্ঞানের আবির্ভাব বা তিরোভাব এরূপ আকস্মিক নহে—ইচ্ছা করিবামাত্রই লেবুর স্মৃতি অন্তর্হিত হয় না, ইহাতে সময় এবং চেষ্টার প্রয়োজন। এরূপ জ্ঞানের বিকাশ এবং বিলোপ ক্রমিক। স্বরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষ বস্তু এবং স্মৃত বস্তুর সময়য়মাত্র। লেবুর বর্ণ প্রত্যক্ষ বস্তু, এবং ইহার রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি স্মৃতবস্তু। কিন্তু প্রতিরূপ জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে স্মৃতবস্তু।

"করিয়াছি হৃদি-গৃহ স্মৃতিমাখা ঘর,
তোমা তরে পরবাসে কাঁদিছে অন্তর!
অরূপ স্বরূপ চিত্রে আত্ম-সমর্পিয়া
সেই ঘরে বাস করি শোক দুঃখ নিয়া।"

স্মৃতি	ফল
প্রতিরূপ	স্বরূপ
(লেবু—অবর্ত্তমান)	(লেবু—বর্ত্তমান)
১। নাতি সুস্পষ্ট	১। অতি সুস্পষ্ট
২। বাহ্যবস্তু-নিরপেক্ষ	২। বাহ্যবস্তু-সাপেক্ষ
৩। ইচ্ছাধীন	৩। অনিচ্ছাধীন
৪। বিকাশ এবং লয় ক্রমিক	৪। বিকাশ এবং লয় আকস্মিক
৫। মাত্র স্মৃতবস্তু।	৫। প্রত্যক্ষবস্তু স্মৃতবস্তু।

কোন একটি ফল বা ফলসমূহের চিচ্ছায়াকে স্মৃতি বলে; অথবা অন্তর্হিত ফলের মানস-প্রতিবিম্বের নাম স্মৃতি।

"ওঝরিয়া ওঝরিয়া গানটি গেল মরে'
রয়গো স্মৃতি জেগে তাহার অনুরণন হয়া।
ঝরিয়া ঝরিয়া কুসুম ঝরি' পড়ে,
গন্ধ তার বন্ধ থাকে পরাণ মন ভরা।"

মেধাশক্তির ক্রম

তুমি যতক্ষণ সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাক, ততক্ষণ তোমার ফলজ্ঞান হয়; কিন্তু তুমি যদি হঠাৎ চক্ষুর্দ্বয় বন্ধ কর, বা সূর্য্যকে পশ্চাতে রাখ, তথাপি ক্ষণকালের জন্য সূর্য্যালোক দেখিতে পাইবে—সূর্য্যের অভাব হইলেও অতি অল্প

সময়ের জন্য সূর্য্যরশ্মি দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যকে পশ্চাতে রাখিয়া কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তোমার ছায়ার প্রতি তাকাইয়া থাক; পরে মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর,—দেখিবে, যে ছায়া তুমি মাটিতে দেখিতেছিলে, সেই ছায়া মেঘের গায়ে রহিয়াছে;—তবে মাটিতে যে ছায়া দেখিয়াছিলে তাহা ছিল কাল, আর এখন মেঘের গায়ে যে ছায়া দেখিতেছ তাহা সাদা। এ জ্ঞানকে ফলজ্ঞান বলা যায় না, কারণ এখানে বাহ্যবস্তুর সম্পূর্ণ অভাব। এ জ্ঞানকে স্মৃতিও বলা যায় না; কারণ বাহ্যবস্তু-জনিত শরীর-স্পন্দন এখনও বর্ত্তমান। বাহ্যবস্তুর অভাব হইয়াছে সত্য, কিন্তু শরীরের উপর ইহার ক্রিয়া এখনও বর্ত্তমান; সূর্য্যরশ্মির অভাব হইলেও, সূর্য্যরশ্মিজনিত চক্ষুর স্নায়বীয় স্পন্দন এখনও বর্ত্তমান। অতএব এ জ্ঞান ফলও নহে, স্মৃতিও নহে। ইহাকে "অনুরণন ফলজ্ঞান" বলা যাইতে পারে। একজন গায়ক তোমাকে একখানি সুন্দর গান শুনাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তোমার বন্ধু আসিলে তুমি বলিলে যে গানটি এত সুন্দর এবং এমন সুন্দর ভাবে গাহিয়াছিল যে, ইহা যেন এখনও আমার "কাণে বাজিতেছে"।

———"দূর বীণা মত
এখনো বাজিছে হায়, শ্রবণে আমার,
সেই সরল সঙ্গীত।"

এখন যেমন "কাণে বাজিতেছে," কিছুদিন পরে আর তেমন বাজিবে না। গানটি অনেকক্ষণ পূর্ব্বে গীত হইয়াছে, কিন্তু এখনও আমার কাণে বাজিতেছে। কিন্তু এই "বাজা" নিশ্চয় কর্ণপটহের স্পন্দন-জনিত নহে, কারণ উত্তেজকের অবর্ত্তমানে শরীর-স্পন্দন এতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না। অতএব এ জ্ঞান "ফলজ্ঞান" নহে; কারণ, গীত অনেকক্ষণ পূর্ব্বে বন্ধ হইয়াছে; ইহা "অনুরণন ফলজ্ঞান"ও নহে, কারণ সঙ্গীতধ্বনি-জনিত শরীর-স্পন্দনও থামিয়া গিয়াছে। তবে কি ইহা স্মৃতি মাত্র? ইহা যখন শ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীতের মানসিক প্রতিধ্বনি মাত্র, তখন ইহাকে স্মৃতি বলিতে পারা যায়। কিন্তু এ স্মৃতিতে মনের কোন আধিপত্য নাই। ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে এ স্মৃতিকে স্মৃতিপটে আনয়ন করা হইতেছে না। ইহা আমরা স্মরণ করিতেছি না,—ইহা যেন আপনা-আপনি "গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া" উঠিতেছে।

"এত বলি কবি থামাইল গান
বসিয়া রহিল মুগ্ধ নয়ান,
বাজিতে লাগিল হৃদয় পরাণ
বীণাঝঙ্কার সম!"

এরূপ স্মৃতি বিনা যত্নে বিনা চেষ্টায় মনের মধ্যে আপনা-আপনি উদয় হয়। "অনুরণন ফলজ্ঞান" অপেক্ষা ইহার স্থিতি অধিক হইলেও ইহা ক্ষণস্থায়ী—এরূপ স্মৃতিকে নিশ্চেষ্ট স্মৃতি বলিতে পারা যায়। আর যে স্মরণ ইচ্ছা সাপেক্ষ, তাহা সচেষ্ট স্মৃতি।

শরীর—
১। ফল—বাহ্য-উদ্বোধক জনিত।
২। অনুরণন ফল—বাহ্য উদ্বোধকের অভাব সত্ত্বেও শরীর-স্পন্দন জনিত।

মানস—
১। নিশ্চেষ্ট স্মৃতি—অনিচ্ছাপ্রসূত।
২। সচেষ্ট স্মৃতি—ইচ্ছাপ্রসূত।

ফল, অনুরণন-ফল, নিশ্চেষ্ট স্মৃতি এবং সচেষ্ট স্মৃতি—এরূপ ক্রম সকল সময়ে সত্য নহে। শিক্ষক মহাশয় একটি পাত্রে অম্লজান নামক বাষ্প রাখিয়া তাহাতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। ছাত্রেরা দেখিল যে বাষ্প জ্বলিয়া উঠিল, এবং ইহার আলোক অতি তীব্র—(ফলজ্ঞান)। বাষ্প নির্ব্বাপিত হইল—তবু ক্ষণেকের জন্য ছাত্রেরা চক্ষে "অন্ধকার" দেখিল (অনুরণন ফলজ্ঞান)। পরদিন ছাত্রেরা শিক্ষকের নিকট উক্ত বিষয় বিবৃত করিল (সচেষ্ট স্মৃতি)। বালকেরা সন্ধ্যায় সময় পাঠাভ্যাস করে (ফলজ্ঞান) এবং পরদিন প্রাতে গুরুমহাশয়ের নিকট আবৃত্তি করে (সচেষ্ট স্মৃতি)।

মেধাশক্তির ক্রিয়া

উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তদ্বয় হইতে আরও দেখা যাইতেছে যে, মেধা শক্তির তিনটি ক্রিয়া- গ্রহণ, ধারণ, এবং স্মরণ। প্রথমতঃ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে (গ্রহণ); দ্বিতীয়তঃ—অর্জ্জিত জ্ঞানকে রক্ষা করিতে হইবে, মনে ধারণ করিতে হইবে (ধারণ)। জ্ঞান অর্জ্জনের সঙ্গে-সঙ্গেই যদি জ্ঞানের লোপ হয়, তবে সে জ্ঞান হইতে মানুষের কি উপকার হইতে পারে? সুতরাং অর্জ্জিত জ্ঞানের সংরক্ষণ প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ—আবশ্যক হইলে রক্ষিত জ্ঞানকে স্মরণ-পথে আনয়ন করিতে হইবে (স্মরণ)। তুমি যাহা জান

না, তোমার তাহার ধারণা হইতে পারে না; তোমার যাহার ধারণা নাই, তুমি তাহা স্মরণ করিতে পার না। অর্থ সঞ্চয় কর, সঞ্চিত অর্থ রক্ষা কর এবং রক্ষিত অর্থের সদ্ব্যবহার কর।

যে শক্তি প্রভাবে অতীত বিষয়গুলি অবিকৃত ভাবে মনন করিতে পারা যায়, তাহার নাম মেধা শক্তি।

সংজ্ঞা কাহাকে বলে

মেধা শক্তির ক্রিয়া ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, সংজ্ঞা সম্বন্ধেও আলোচনা করা কর্ত্তব্য। সংজ্ঞা কাহাকে বলে? ঐ দেখ, বালকটির মুখ বিবর্ণ হইল, মস্তক হেলিয়া পড়িল, আর সে বসিয়া থাকিতে পারিল না—ভূতলে পতিত হইল। বোধ হয় সে মূর্চ্ছিত হইতেছে। শ্বাস-প্রশ্বাস অসংযত হইল—বোধ হয় বন্ধ হইয়া গেল। সে মূর্চ্ছিত হইয়াছে—তুমি তাহার নিকটে গেলে। সে তোমাকে দেখিল না, তোমার কথা শুনিল না। তুমি তাহার চক্ষে জল নিক্ষেপ করিলে, সে তাহা অনুভব করিল না। যেন তাহার সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার লোপ হইয়াছে। সে সংজ্ঞাহীন হইয়াছে। ক্রমশঃ বিপদ কাটিয়া গেল, সে চক্ষু উন্মীলন করিল, মানস-ক্রিয়া আরম্ভ হইল। সুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সর্ব্বপ্রকার মানস ব্যাপারের সাধারণ নাম সংজ্ঞা।

> • • • হইল বামা
> সেই স্মৃতি সুখাবেশে মূর্চ্ছিতা আবার।
> হেলিয়া পড়িল শির, ধরিলেন ত্রস্তা করে;
> বর্ষিলেন মুখে চক্ষে; • • •
> • • • •
> ধীরে রমণীর জ্ঞান, ধীরে রমণীর স্মৃতি,
> আসিল ফিরিয়া।"

সংজ্ঞার দ্বিবিধ অবস্থা

আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাজমহল দেখিয়াছি; কিন্তু তাজমহলের কথা আমার সকল সময়েই মনে হয় না। আজ সে কথা হঠাৎ এখন মনে হইল কেন? এতদিন তাজমহলের ধারণা কোথায় ছিল? অবশ্য কোথাও ছিল না, এ কথা মনে করিতে পারি না। যদি কোথাও না থাকিবে, তবে কেমন করিয়া আবার মনোমধ্যে উদয় হইল? সুতরাং স্বীকার করিতে হইল যে, মনের মধ্যেই ছিল; কিন্তু ইহার সংজ্ঞা ছিল না।

> "এ কি! কাহার এ মোহন মূরতি?
> • • • •
> দূরাগত বেণুধ্বনি প্রায়,
> স্মৃতিমাঝে এক অস্ফুট আলোক সম,
> ভাসিছে এ মোহন মূরতি!
> বোধ হয় বালিকা বয়সে
> যেন আমি হেরেছি ইঁহায়,
> তার পর—তার পর আর দেখি নাই।"

অনেক বিষয়ই এখন আমার সংজ্ঞার বাহিরে; কিন্তু চেষ্টা করিলে আবার অনেক বিষয়ই আমি স্মরণ করিতে পারি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আমাদের অভিজ্ঞাত সকল বিষয়ই মনোরাজ্যে বর্ত্তমান—তবে কতকগুলি সংজ্ঞার অন্তর্গত এবং কতকগুলি সংজ্ঞাবহির্ভূত। অতএব সকল সময়েই মনের দুইটি অবস্থা—একটী জাগ্রত অবস্থা, আর একটি সুপ্ত অবস্থা। মনের জাগ্রত অবস্থাকে সংজ্ঞা, এবং সুপ্ত অবস্থাকে সুপ্ত-সংজ্ঞা নামে অভিহিত করিব। সুপ্তক্ষেত্রস্থিত বিষয়কে সংজ্ঞাক্ষেত্রে আনয়ন করার নাম স্মরণ। আমি একটি লোক দেখিলাম। লোকটি আমার পরিচিত, কিন্তু তাহার নাম আমার মনে আসিল না। এখানে "নামটি" সুপ্ত-সংজ্ঞায়। চেষ্টা এবং চিন্তার পর যখন নামটি স্মরণ হইল, তখন নাম সংজ্ঞাক্ষেত্রে।

> "কৃষ্ণপক্ষ অন্ধকারে ক্ষীণ চন্দ্রকর লেখা,
> যেইরূপে ধরাতলে ধীরে ধীরে দেয় দেখা,
> স্মৃতির আলোক ধীরে মনোরাজ্যে উত্তরায়
> ভাসিতে লাগিল, ভেদি আত্ম-ভ্রান্তি অন্ধকার।
> অনেক দিনের দূর বিস্মৃত সঙ্গীত মত
> পড়িতে লাগিল মনে জীবন-ঘটনা যত।"

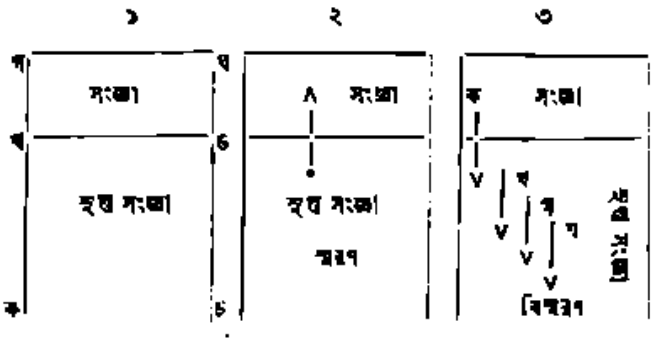

ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ = মন ; খ, গ, ঘ, ঙ = সংজ্ঞা ; ক, খ, ঙ, চ = সুপ্ত সংজ্ঞা। সংজ্ঞা অপেক্ষা সুপ্ত সংজ্ঞার ক্ষেত্র অধিক—অর্থাৎ অভিজ্ঞাত বিষয়ের অধিকাংশই সুপ্ত সংজ্ঞাক্ষেত্রে অবস্থিত। ক, চ, সংযুক্ত করিয়া কোন রেখা না থাকায় সুপ্তসংজ্ঞাক্ষেত্রের একদিকের অসীমত্ব বুঝাইতেছে। খ, ঙ, সংজ্ঞাক্ষেত্রের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। এই ক্ষেত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। যখন মানুষ তন্দ্রাভিভূত হয়, তখন ইহার সীমা কমিয়া যায়। গাঢ় নিদ্রার সময় খ ঙ, 'গ' 'ঘ'র সহিত মিলিত হইয়া যায়। কোন বিষয়কে সুপ্তসংজ্ঞাক্ষেত্র হইতে সংজ্ঞাক্ষেত্রে আনয়ন করাই স্মরণ (২)। বিস্মৃতির সময় স্মৃতি সংজ্ঞাক্ষেত্র হইতে সুপ্তসংজ্ঞাক্ষেত্রে গমন করে। স্মৃতি সুপ্তসংজ্ঞাক্ষেত্রের যত অধোগামী হয়, তাহার স্মরণও তত ক্লেশসাধ্য হয়। ঘ অপেক্ষা গকে, গ অপেক্ষা খকে এবং খ অপেক্ষা ককে অতি সহজে স্মরণ করা যায় (৩)।

মেধাশক্তির সহায় ঃ

আমি তিন দিন পূর্ব্বে কি কি ব্যঞ্জন দিয়া ভাত খাইয়াছি, তাহা আমার মনে নাই ; কিন্তু ঐ দিন একটি অল্পবয়স্কা বালিকার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে, তাহা আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে। মনের সহিত যাহার যত বেশী পরামর্শ হইবে, তাহার স্থায়িত্ব তত বেশী হইবে এবং স্মরণও তত সহজ হইবে। এক খণ্ড প্রস্তরফলকের উপর লৌহ-শলাকা দ্বারা দুইটি রেখা পাত কর। এই রেখাদ্বয় অঙ্কন করিবার সময় যেটিতে যত বেশী শক্তি প্রয়োগ করিবে, সেটি তত বেশী স্থায়ী হইবে। সেইরূপ যে মিনিটি যত বেশী মনে লাগিবে, তাহা তত বেশী স্থায়ী হইবে।

"তুলেছিলাম কুসুম তোমার
হে সংসার, হে লতা ;
পরতে মালা বিঁধল কাঁটা
বাজল বুকে ব্যথা।
হে সংসার, হে লতা।
বেলা যখন পড়ে' এল
আঁধার এল ছেয়ে,
দেখি তখন চেয়ে
তোমার গোলাপ গেছে, আছে
আমার বুকের ব্যথা
হে সংসার, হে লতা।"

যেমন কোন প্রস্তরখণ্ডের একই স্থানে অনবরত বারিবিন্দু পতিত হইলে, সেই স্থানে একটি স্থায়ী চিহ্ন পড়িয়া যায়, তেমনি কোন বিষয়ের পুনঃ পুনঃ এবং উপর্য্যুপরি আলোচনা করিলে, সেই বিষয়টি মনের মধ্যে স্থায়ী হয়, এবং উহাকে অতি সহজেই স্মরণ করা যায়। কেবল আলোচনার সংখ্যাধিক্য হইলেই যে স্মরণ-কার্য্য সহজ এবং স্থায়ী হইবে, এমত নহে। তুমি আজ একটি বিষয়ের আলোচনা করিলে, আবার এক মাস পরে আবার সেই বিষয়টি দেখিলে। আর একজন একমাস অন্তর আলোচনা না করিয়া একদিন অন্তর সেই বিষয়টিরই আলোচনা করিল। অবশ্য এই ব্যক্তি সহজে এবং শীঘ্র ঐ বিষয়টি আয়ত্ত করিয়া ফেলিবে। অতএব সময়ের অন্তর যত কম হইবে, স্মরণ-কার্য্যও তত সহজ হইবে। মনের স্ফূর্ত্তি এবং শক্তিও মেধাশক্তির সহায় ; মন যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন স্মরণ-শক্তিও ক্ষীণ হয়। অধিকক্ষণ মানসিক ক্রিয়ার পর কোন বিষয় শীঘ্র স্মরণ-পথে আইসে না। আবার কোন বিষয় অধিকদিন মনে রাখিতে হইলে, সেই বিষয়ে বিশেষ অভিনিবেশের প্রয়োজন ; এবং ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ব্যতীত অভিনিবেশ থাকিতে পারে না ; কিন্তু মন হীনবল হইলে ইচ্ছাশক্তিও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

পাথার-তীর্থে

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত]

(১)

আবার পুরী সমুদ্র-দৈকতে আসিয়াছি। প্রথম আসিয়াছিলাম সমুদ্রের আহ্বানে। এবার আসিয়াছি সমুদ্র হইতেও গভীর, সমুদ্রের চেয়েও মহান, অতল মনুষ্য-হৃদয়ের আহ্বানে। এই দুইয়ের মাঝখানের ইতিহাস না জানিলে, আবার কেন আসিয়াছি, ঠিক বুঝিবে না। আগে সেই কথাটা বলি।

(২)

"এ্যাঁ, সমুদ্র দেখেন নি! জীবনের আধখানাই বৃথা!" বালীগঞ্জে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া যখন এই গালিটুকু গৃহকর্ত্রীর নিকট হইতে দক্ষিণা স্বরূপ প্রাপ্ত হইলাম, তখনই ডান বাঁ না চাহিয়া পাল্টা জবাব করলুম, "আচ্ছা, কালই—আজকের রাত্রি ভোর হলেই সমুদ্র-যাত্রার উদ্যোগ করব।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বটে!—কোথায়? পুরী, না বম্বে, না বিলেত, না গঙ্গাসাগর?" 'গঙ্গাসাগরটা' হচ্ছে উপহাস এবং 'বিলেতটা' হচ্ছে পরিহাস। মনে হইল বলিয়া ফেলি—বিলেত। 'পরিহাস'টা আঁৎকে উঠুক। একমাত্র বর্ত্তমান অধমই এই পরিবারের বৃত্তিপরা বাবু অতিথি, অন্য সবাই মুখে-চুরুট, পাণ্টালুনের-পকেটে-হাত, মাথায়-হ্যাট মিষ্টার গেষ্ট (guest)। বছর কয়েক পরে একটা সিবিলিয়ন, নেহাৎ নিদেন পক্ষে একটা ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিতে পারিবই। বসুজ মহাশয় মিষ্টার বোস্ হয়ে ফিরে এসে মিস্ দত্তের পাণিপ্রার্থী হবেন। আর কথায়-কথায় মুচ্‌কি হাসিয়া ইংরেজিতে বলা যাবে—"তাই তো, মিস্ দত্ত, ভাগ্যে আপনার মা বলেছিলেন—সমুদ্র দেখার কথা। সত্যিই 'জীবনের আধখানাই বৃথা!' ঐ সমুদ্র দেখা হল বলেই তো আজ জীবনের আধখানা পূর্ণ হতে চল্‌ল।" বলিয়াই হো হো হো করিয়া হাসিয়া, চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়া, ধোঁয়াটাকে মুখ উঁচু করিয়া কুণ্ডলী (Ring) করে ছেড়ে দিয়ে, কথাটার কবিত্ব মিস্ দত্তের সদ্য-পাউডার-মাখা গণ্ডে কতটা কি করিল একবার আড়নয়নে দেখিয়া, "বাই দি বাই—" বলিয়া তদনুযায়ী কথার জের চালাইব। কিন্তু কি জানি কেন, ভ্যাবা-গঙ্গারামের মত বলিয়া ফেলিলাম, "আজ্ঞে, আপাততঃ পুরী যাওয়া যাক, তার পর বিলেতের স্বপ্ন দেখা যাবে।" "বেশ তো। তবে পুরীতে ঐ এক সি (Sea), আর সি-বীচ (Sea-Beach)।" "কেন, আর জগন্নাথের মন্দির?" কিন্তু অন্তরের কথা অন্তরেই রাখিয়া মুখে বলিলাম, "বেশী দিন তো আর নয়, এই দু'চার দিন।" "ফিরে এলে সমুদ্রের গল্প শোনা যাবে।" এই কথা গৃহকর্ত্রী মিসেস্ দত্ত বলিলেন। এবং "আর সমুদ্রের উপর একটা কবিতাও লিখে আনবেন।" এই কথা হাস্যবদনে, মিস্ দত্ত মাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন, বলিলেন। "আচ্ছা দেখা যাবে।" হাসিয়া কথার উত্তর দিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িলাম এবং যোড়-করে নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। তার পর-দিনের পর-দিন পুরী যাত্রা করিলাম।

(৩)

পুরী আসিয়াছি। খুঁজিয়া-খুঁজিয়া সমুদ্রতীরে বালুর উপর একখানি ছোটখাটো বাড়ীতে প্রবাস-আবাস ঠিক করিলাম। আমার বাড়ীর একটু দূরেই আর একটি বাড়ী ব্যতীত আশে-পাশে অন্য বাড়ী নাই। সম্মুখেই সমুদ্র, আর এ-পাশে, ও-পাশে উঁচুনীচু বালুর মাঠ। মাঠের পর আবার বাড়ী আরম্ভ হইয়াছে। সেই বালুর উপর গাছপালা কিছুই নাই, কেবল মাঝে-মাঝে কণীমনসা ও বেঁটেবেঁটে ঝাউয়ের ঝোপ। এমনি অবস্থায় দুইখানি পাশাপাশি বাড়ী সমুদ্রের দিকে মুখ-করা। আমাদের বাড়ীর পিছন দিয়া একটি কাল সুরকির রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। কিছু দূরে এসিয়া রাস্তার উপর একটি মরিচা-ধরা লোহার পুল। পুল পার হইয়া কিছুদূর গেলে দু'ধারে ছোট-বড় ঝাউগাছ। রাস্তার লাল সুরকি হাওয়ায় উড়িয়া ঝাউগাছগুলির পা হইতে কোমর পর্য্যন্ত যেন সেকেলে বাস পরাইয়া দিয়াছে। এই রাস্তাটি বেড়াবার পক্ষে অতি সুন্দর।—এইটিই

পুরীর সমুদ্রের কাছাকাছি রাস্তা। রাস্তার দুধারে কোথাও কাছে-কাছে, কোথাও দূরে-দূরে, ফাঁক-ফাঁক, ছোট-বড় সুন্দর বাড়ী। বাড়ীগুলির নামও অতি সুন্দর। 'সিন্ধু-পুরী' 'শতদলবাস' 'নীলিমা কুটীর' 'ললিতকুঞ্জ' 'বিজলি-নিলয়' 'পাথারপুরী'—এমনি কোনটা সাগরের নামে, কোনটা সৈকতের নামে, কোনটা মালিকের নিজ নামে, কোনটা আবার নিজের পরিবারের নামে বাড়ী-গুলির নামকরণ হইয়াছে।

আমাদের দুই পাশাপাশি কুঞ্জের মাঝখানে একটা বালুর ছোট ঢিপি। ঢিপির উপর ছোট-ছোট ঝাউগাছের ঝোপ। এই বালুর ঢিপির উপর দাঁড়াইলে, সমুদ্র একেবারে চোখের সাম্‌নে ভাস্‌তে থাকে। পুরীর Season আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। শীত কাটিয়া গিয়া বসন্তের উঁকি-ঝুঁকি চলিয়াছে। হাওয়াপাখী স্বাস্থ্যান্বেষীর দল বড় আসে নাই। সুতরাং প্রায় বাড়ীই দরজা-জানালা বন্ধ। নির্জ্জন—লোক-জনের মুখ বড় দেখা যায় না। কেবল উড়ে মালী দুই-একটি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। আর সৈকতে মৎস্যজীবি কৃষ্ণকায় দুনিয়া জাতি—স্ত্রী-পুরুষ। সমুদ্রতীরের প্রায় বাড়ীই এক-একজন উড়ে মালীর জিম্মায় থাকে। আসিয়া প্রথম দিনই সমুদ্র-সৈকতে ঘণ্টা-তিনেক বেড়াইলাম। সন্ধ্যায় মন্দিরে গেলাম। ক্লান্ত, অবসন্ন—ফিরিয়া কিছু জলযোগ করিয়াই বিছানায় ঢলিয়া পড়িলাম; এবং সমুদ্রের গর্জ্জন শুনিতে-শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। নিদ্রায় কত কি স্বপ্ন দেখিলাম। এই স্বপ্নের সহিত আমারও স্বপ্ন-জীবনের শেষ হইল। কিন্তু এত শীঘ্র, কে জানিত! কে জানিত, এই রাত্রির অবসানে, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে আমারও জীবনের নূতন প্রভাত, নূতন দিন, নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে?

(৪)

রাত্রির অবসান হইয়াছে। অন্ধকারের যবনিকা উত্তোলিত হইয়াছে। উষার স্নিগ্ধ কনকাভায় সাগর ও গগন সহসা ছবির মত প্রকাশিত হইল। অনন্ত সমুদ্র, অনন্ত আকাশ—মেশামিশি। সেই সাগর ও গগন-সঙ্গমে স্নান করিয়া, বালারুণ রক্তবাস পরিধান করিয়া ধীরে-ধীরে উঠিতেছেন। আকাশ, সমুদ্র, সমুদ্রের বেলাভূমি, আর সে বেলার কুটীর—মর্ত্ত্য-নরনারীর আবাস—আরক্তিম উজ্জ্বলো হাসিয়া উঠিল; যেন নববধূ প্রথম বাসর-মন্দিরে প্রথম স্বামি-সন্দর্শন করিতেছে। দুই কুটীর পাশাপাশি, দুইই হাসিতেছে—যেন পূর্ব্বরাগ। কুটীরের পাশে বালুকা-স্তূপের উপর ঝাউকুঞ্জের পাদমূলে বসিয়া তন্ময় হইয়া সূর্য্যোদয় দর্শন করিলাম। দর্শন করিয়া পশ্চাতে চাহিলাম। অতি কাছে,—বুঝি বা নিঃশ্বাসেরও শব্দ শোনা যায়,—একই বালুকা-স্তূপ-শিখরের অপর পার্শ্বে ঝাউকুঞ্জের কাছে দাঁড়াইয়া আরও একজন সূর্য্যোদয় দর্শন করিতেছেন। আমি আবার এক উষার অরুণ দর্শন করিলাম। ধীর, স্থির, শান্ত, স্নিগ্ধ, পবিত্র—ধ্যানমগ্ন—অনিমেষে সূর্য্যোদয় দর্শন করিতেছেন। আমিও অনিমেষে সে সূর্য্য দেখিলাম।

মধুর,—অতি মধুর,—মধুরতর সেই আরক্তিম কনকাভ মুখমণ্ডল ধীরে ঊর্দ্ধে চাহিল, যেন নিশার কমল এই তার প্রথম পাপ্‌ড়ি খুলিয়া দিল। কমলেরই ভাষার মত, সেও কথা কহিল—একটি ছোটোখাটো নিঃশ্বাস, তার পর করুণে-মধুরে—যেন শ্রবণের অগোচর ভাষায়, যেন প্রিয়তমের কাণে-কাণে—'হায়! মানুষের জীবনেও বুঝি এমনি সূর্য্যোদয় হয়ে থাকে।' দুটি কালো চোখ বুঝি বাহিরে তাহার নিদর্শন খুঁজিতে নত হইল। চারিচক্ষে মিলন হইল। কতক্ষণ?—মনে নাই। তখনকার কথা আমার মনে নাই। মনে নাই, সে নারী কি পুরুষ, সে সুন্দর কি কুৎসিত। মনে নাই, আমরা দুজন কি একজন, সে আমি,—না সে। নয়ন আরও নত করিল, যেন স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। শুভ মুহূর্ত্তের অবসান হইল। জাগিয়া উঠিলাম, মুহূর্ত্তে সমস্ত সংসার জাগিয়া উঠিল। এত সুখ, এত জ্বালা—এক সঙ্গে! যেন কে হাজার বাণ এক সঙ্গে বুকের উপর নিক্ষেপ করিয়াছে। ব্যথায় ও আনন্দে মাতালের মত আমার মাথা চলিয়া পড়িল। চোখ যেন আমার নেশায় চুলুচুলু। সাগরতীরে বেলাভূমিতে প্রথম প্রভাতে আমার জীবনে এইরূপ ঘটিল। সবেমাত্র প্রভাত—সূর্য্যোদয়! তার পর বেলা বাড়িবে, সূর্য্যের তেজ প্রখর হইবে, বাতাস জোরে বহিবে—ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে, ক্ষিপ্ত হইয়া তপ্ত বালু গায়ে মাখিবে। আরো কত কি হইবে! প্রভাতই মধুর—মধুরতর। হায়! এই প্রভাতেই যদি যবনিকা পড়িত! কে জানিত, প্রভাতই সন্ধ্যা, উদয়ই অস্ত!

(৫)

যতক্ষণ সমুদ্র দেখি নাই, কল্পনায় সে কত বড় ছিল,

কত ভীষণ ছিল, অনন্ত ছিল; কিন্তু যখনই দেখিলাম, মনে হইল—এই! এই কি সেই সমুদ্র! রূপ আর ভাব কত তফাৎ! কে বলে মানুষ সমুদ্রতীরের—বেলাভূমির ক্ষুদ্র বালুকাকণা! ওই সমুদ্র,—ওই বেলাভূমি তো আমায় তেমন আকর্ষণ করিতে পারে নাই,—সমস্ত প্রাণ ভরপুর করিয়া দিতে পারে নাই! যে দিয়াছে, সে তো আমার ঐ কণিকাই। অথবা কে জানে,—রত্নাকরে অগণিত রত্ন আছে,—এ-ও বুঝি তেমনি একটি রত্ন। আমি রত্নের আকরকে ভুলিয়া রত্নের পশ্চাতে ছুটিলাম—সমুদ্রের মায়ায় ভুলিলাম!

এত সুন্দর আমি জীবনে কখনো দেখিনি। রূপে নেশা হয় এতদিন শুনিয়াছি, আজ অনুভব করিলাম।

(৬)

দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। কিন্তু রৌদ্রের তত প্রখরতা নাই? সমুদ্রের দক্ষিণ হাওয়া বহিতেছে। কুটীর-সম্মুখে লাল টালির ছাদের ছায়ায় ইজি চেয়ারে কাৎ হইয়া পড়িয়া, আপনার কল্পনা লইয়া আপনি খেলিতেছি, রঞ্জিত করিয়া তুলিতেছি, আর সুখ-দুঃখের জাল বুনিতেছি। সাগরতীরে এই সময়টা বড়ই অলস, বড়ই ফাঁকা। চোখ চাহিলেই প্রতিবেশী-কুঞ্জের ছোট প্রাচীর, তার পর বাগানের ফুলগাছের কোনটার মাথা, কোনটার অনেকটা দেখা যায়। অনেকগুলি লাল করবী ফুটিয়া রহিয়াছে, হাওয়ায় দুলিতেছে। তার পর গৃহের উচ্চ অলিন্দ, বেশ প্রশস্ত ও লম্বা—পায়চারী করিবার ও হাওয়া খাইবার উপযুক্ত বটে। ঘরগুলির কোনটার কাচের জানালা,—কোনটায় একটা কোণ, কোনটার আধখানা, বেশ দেখা যায়। ঘরের মধ্যে দুই-চারিটা আসবাবও আবছা-আবছা দেখা যায়। সবই দেখিতেছি, কিন্তু যাহা দেখিতে চাহিতেছি,—দেখিতেছি কই? গোলাপী শাড়ীর আঁচলখানি যেন একবার দেখিলাম। না—ও মনের ভুল! ওই কুটীর হইতে আমাকেও দেখা যায়। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছে, কে যেন আমাকে দেখিতেছে—আড়াল হতে, কিন্তু দেখা দিতেছে না।

(৭)

আমার কুঞ্জের উড়ে মালীটির নাম মার্কণ্ড। "ওরে মারকণ্ড!" "বাবু!" "বলতে পারিস্—ঐ বাড়ীটা কাদের?" "খৃষ্টান আছে—মেম সাহেব আছে, বাবু!" "দূর বেটা! খৃষ্টান কিরে!" "আজ্ঞে হাঁ বাবু! অণ্ডা খায়—মুরগী খায়!" "তোমার মুণ্ড খায়। যাড়াটা কার জানিস্?" "আজ্ঞে, পাদরী সাহেব, বাবু!" "পালা ব্যাটা, পালা।" তাইতো ব্যাটা বলে কি।—খৃষ্টান, পাদরী! তা অণ্ডা-মুরগী আমিও তো খাই। তখনই চাহিয়া দেখি, কাঁচায়-পাকায় দীর্ঘ শ্মশ্রু, বেশ লম্বা, সাদা পাণ্টালুন; তার উপর একটা লম্বা কালো কোট—এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক কি একটা কাগজ হাতে—বোধ হয় খবরের কাগজ হবে—বেরিয়ে এসে অলিন্দে দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া যেন একবার আমার দিকে চাহিলেন। তার পর ডাকিলেন "বেয়ারা!" ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম। তাই তো, এঁরা খৃষ্টান না কি?—দেশীয় খ্রীষ্টান? খ্রীষ্টানরা কি অত বড় দাড়ি রাখে? তবে কি ব্রাহ্ম! কিন্তু তা হলে তো চলবে না। তিনি চলিয়া গেলেন। আমিও ভিতরে আসিলাম। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। চা পান করিয়া আবার গিয়া চেয়ারে বসিলাম। একক্রমে আধ ডজন সিগারেট টানিয়া উঠিয়া পড়িলাম। পায়চারি আরম্ভ করিলাম। চোখ দুটো লইয়া মহা মুস্কিলে পড়িলাম। বুকের ভেতরও ছট্‌ফটানির অন্ত নাই। একবার সমুদ্রতীরে যাই। সিঁড়িতে পা দেব-দেব, ঠিক এমনি সময়ে দেখি, পা আর বাড়ান হইল না। ঐ যে তিনি ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইলেন। বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভাতের সে আরক্তিম বেশে নয়, বেশ সাদাসিদে পোষাকে। মুক্ত চিকুর। আমার সমস্ত অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। ধপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। আমায় দেখিয়াছেন কি? তাতে ক্ষতি কি? এই যে আমার কুটীরের দিকে চাহিলেন। কোথাও কেহ নাই, আবার চাহিলেন। তখনই একটি স্ত্রীলোক আর একটা ঘর হইতে বাহির হইল। এত মিশমিশে কালো স্ত্রীলোক—আমি জীবনে আর কখনও দেখি নাই। ভদ্রমহিলার মতই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বেশ। মাঝে-মাঝে কলিকাতার ট্রামে এমনি বেশধারিণী দুই একটি মহিলা—খ্রীষ্টান, কি ব্রাহ্ম, কি হিন্দু জানি না—দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁরা তো এত মিশমিশে ন'ন। এ যে তেলকালি—চক্‌চকে—সাঁওতালী। রবীন্দ্রের ভাষায়—কালো, কালো, ঝড়ের মেঘের মত কালো। তাই তো, কবি ইঁহাকে দেখিয়াই কি কালোর কল্পনা করিয়াছিলেন?—ঐ যে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল।

যেন কয়লার খনির মধ্যে হীরক। বিধাতার কল্পনার বাহাদুরী আছে। এমন এক-সঙ্গে পাশাপাশি দুই বিপরীত দেখা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কিন্তু কেন জানি না, দেখিয়া আমার অন্তর জ্বলিয়া গেল। কে এ? আমি চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িলাম। আমি উঠিতেই তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। গিয়াই ডাকিলেন,—"আয়া!" "বাই" বলিয়া কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীলোকটি অন্তর্হিতা হইল। আমি চঞ্চল পদে আমাদের সেই পেছনের রাস্তায় আসিয়া উঠিলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া মরিচা-ধরা সেই লোহার পোলটির উপর বসিলাম। একটু পরেই দেখি, সেই ভদ্রলোকটি ঠিক তেমনি বেশে,—বেশীর মাত্রায় একগাছি লাঠি—ওদিক হইতে আসিতেছেন। অস্তগামী সূর্য্যের আলো তাঁহার মুখের উপর পড়িয়াছে। সেই আলোকে আমি তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম। হাঁ, দেখিলে শ্রদ্ধার উদয় হয় বটে। আমার পরিচিতার ইনি কে? না জানি,—তবু ইনি আমার শ্রদ্ধার পাত্র। সম্মুখে আসিলে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি নিবিষ্ট চিত্তে মাথা নীচু করিয়া কি যেন ভাবিতে-ভাবিতে আসিতেছিলেন। আমায় উঠিতে দেখিয়া, হঠাৎ যেন চিন্তাস্রোতে বাধা পাইয়া, চমকিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন; এবং আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি তখন কি আর করি, হাতযোড় করিয়া একটী নমস্কার করিয়া ফেলিলাম। তিনি একটু মৃদু হাসিয়া প্রতি-নমস্কার করিলেন। এখন দুই-একটা কথাবার্ত্তা না হইলে নেহাৎ ভদ্রতারও তো মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। তিনিই প্রথম কথা কহিলেন, "আপনাকে যেন দেখেছি-দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে।" "আজ্ঞে, তা দেখে থাকবেন। আমি আপনার পাশের বাড়ীতেই এসে উঠেছি।"

"ওঃ—তাই বটে! এইবার মনে পড়েছে। তা বেশ হয়েছে, দেখা-শোনা হবে এখন। আপনি একাই এসেছেন, না—" "আজ্ঞে, আমি একাই।" "বেড়াতে?" "আজ্ঞে হাঁ, বেড়াতে—দেখ্‌তেও—" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ—কেমন লাগ্‌ছে?" "সমুদ্র এই প্রথম দেখ্‌লুম, সুতরাং ভালই লাগল।" তিনি একটু হাসিলেন; বলিলেন, "সমুদ্র-স্নান করেন তো?" "আজ্ঞে, না—এখনো আরম্ভ করিনি। ঢেউ দেখেই ভয় করে।" তিনি আবার হাসিলেন; বলিলেন, "আচ্ছা, দেখা হবে আবার—পাশের বাড়ীতেই তো? এই সময়টি বেশ, হাওয়াটি চমৎকার!" "আজ্ঞে হাঁ, সকাল বেলাটিও চমৎকার!" তিনি হাসিলেন; বলিলেন, "আচ্ছা, একটু বেড়িয়ে আসুন।" সুতরাং বেড়াতে চলিলাম। সন্ধ্যার পর মিস দত্তকে এক পত্র লিখিলাম। সমুদ্রের বর্ণনা, বেলা-ভূমির বর্ণনা এমনি সাত-পাঁচ—যেমন এখানেও ফুল ফোটে, চাঁদ ওঠে, মানুষে-মানুষে দেখা-শোনা হয়,—ইত্যাদি, ইত্যাদি! একবার মনে হ'ল লিখি—"কিন্তু সকলই বৃথায়।" উহা আর লিখিলাম না। কেন না, এখন আর ঐ সব ন্যাকামি ভাল লাগে না। সভ্য-সমাজে চলিতে গেলে, এই নমুনার দুই-চারটে ভিট্‌লামি মাঝে-মাঝে না করিলে নিতান্তই অসভ্যতা হয়। তবে পরিশেষে একটা সংবাদ দিলুম—"এখানে আসিয়াই একটি বন্ধু পাইয়াছি। প্রথম দর্শনেই তিনি আমার চিরপরিচিতার স্থান অধিকার করিয়াছেন। 'সমুদ্রের কবিতা' যেন প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমতী।"

—•—

(৮)

আমার কাছে আমি নগণ্য বটে, কিন্তু বাংলাদেশের অনেকেরই নিকট আমি পরিচিত। কেন না, আমার রস-রচনা পাঠ করিয়া অনেকেই না কি মুগ্ধ। সুতরাং নাম-ধামের বিবরণ বিশেষ করিয়া আবার বলা নিষ্প্রয়োজন। বেটা বলা দরকার, তাহাই বলি। আমার যৌবনকাল, সুতরাং আমি যুবক। আমার কাছে আমি নিতান্তই সুপুরুষ, অন্যের কাছে কতটা জানি না। তবে নিতান্ত কাপুরুষ নই—এটা ঠিক; কেন না, পথ দিয়া চলিয়া গেলে, অনেকেই একটু তাকায়। বেশ শান্ত, শিষ্ট, বিনয়ী, বুদ্ধিমান। গোঁফদাড়ি কামানো। চোখে সোনার চশমা,—কেন না, উহা পরিলে না কি মুখখানা ভয়াট দেখায় এবং ভাল দেখায়। আর তিনি?—মিঃ মিত্র। কলিকাতার হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব এটর্ণি। ইনি বর্ত্তমান যুগের দার্শনিক-সমাজের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমি ইঁহার দর্শন-সম্বন্ধীয় রচনা এবং পুস্তক পাঠ করিয়াছি। বাংলা ভাষায় ইনি মাঝে-মাঝে মাসিক পত্রে ঐ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লেখেন। এতদিন তাঁহাকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। এবার দেখিলাম, দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। পত্নী-বিয়োগের পর এটর্ণিগিরি ছাড়িয়া দিয়াছেন। বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে; পূর্ব্বকালে এই বয়সে লোকে কাশী কিংবা বনে যাইত।

কিন্তু এখন দার্জ্জিলিং, পুরী, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানে লাটি হাতে করিয়া হাওয়া তাড়াইয়া বেড়ান। মাত্র ঐ এক কন্যা। কুমারী—বয়স একটু বেশী। কিছুদিন ধরিয়া পুরীতে নিজের আবাসে অবস্থান। সর্ব্বদাই চিন্তামগ্ন, অন্যমনস্ক, এবং বড় বিমর্ষ। যেন জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছেন, আরও পাইবার ভয়ে সদাই ভয়ে-ভয়ে আছেন। এই দুই দিনে বিকেল বেলা একসঙ্গে বেড়াইতে-বেড়াইতে এই পাঠোদ্ধার হইয়াছে। তবে আমার কথা আমি সবই বলিয়া ফেলিয়াছি। তবু ইহা পথের কথা,—ঘরের কথা নয়। এইবার সেই কথা বলছি।

(৮)

চাঁদ উঠিয়াছে। দুই-এক দিনের মধ্যেই পূর্ণিমা। জ্যোৎস্না রজনীতে সমুদ্রসৈকত যে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হয়, সে শ্রী, সে সৌন্দর্য্য বলিবার নয়,—আঁকিবার নয়,—বুঝি বা ইন্দ্রিয়েরও উপভোগের নয়। এ সৌন্দর্য্য যেন ধরি-ধরি ধরিতে পারি না। হাজার চোখ থাকলে এক নিমিষে যদি একটু ধরা যায়। দুটি বই চোখ্ নাই, তা আবার দেখে একই সময় একটিকে, তাই কা'কে ফেলে কা'কে দেখি! সমুদ্র না চাঁদ, সৈকত না আকাশ, না সৈকতের উপর প্রতিফলিত নিজের ছায়া, না নিজেকে। সমুদ্র ফেনিয়া-ফেনিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। ঝক্-ঝক্ ঝক্—যেন চাঁদ একসঙ্গে অনন্ত আরসিতে নিজের মুখ দেখিতেছে। চঞ্চল, চপল, তরল, পূর্ণ উচ্ছ্বাসময় সমুদ্রবক্ষ—নিম্নে, আর ঊর্দ্ধে ধীর,—স্থির, প্রশান্ত চন্দ্র—স্মিতহাস্য, সমুদ্রের দিকে চাহিয়া আছে। যেন বলিতেছে—আমি তোমারই, এত উতলা হইয়ো না। ধব্-ধব্-ধব্—বালুভূমি, উঁচু-নীচু,—দেখিলেই ইচ্ছা হয়, একবার মেষশিশুর মত উল্টাপাল্টা এদিক-সেদিক লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটাছুটি ক'রে হাঁপিয়ে পড়ে বালুর উপর শুয়ে পড়ি,—আর ঘরে ফিরে কাজ নাই। কিন্তু সে কথা মানব-শিশু শুনিবে কেন? তাহারা ঘর তৈরী করেছে, ঘরের কথাই হচ্ছে তাদের আসল কথা। সুতরাং সেই কথাই বলছি।

ভ্রমণ-শেষে মিঃ মিত্র আমাকে তাঁহার আবাসে লইয়া গেলেন। মনে হইল, যেন বহুদিবসের আকাঙ্ক্ষিত কোন নন্দনপুরীতে প্রবেশ করিলাম। এই কুঞ্জের তিনি রাণী। আর আমি আজ অতিথি। এত কাছে! যেন তাঁর অঞ্চলের মৃদুস্পর্শ আমার অঙ্গে বুলাইয়া দিতেছে। মুক্ত চিকুরের মৃদু সৌরভ যেন কোন সুখস্মৃতির মত ভাসিয়া আসিয়া বিজলির মত চমকিয়া দিয়া যাইতেছে। স্পন্দিত বক্ষে কুঞ্জের অলিন্দে দুইখানি চেয়ারে সমুদ্রের দিকে মুখ করিয়া মিঃ মিত্র আর আমি বসিলাম। চাঁদের আলোতে সব ভরিয়া গিয়াছে, বারান্দার থামের ছায়া কাৎ হইয়া পড়িয়াছে। সমুদ্রের হাওয়া রহিয়া-রহিয়া, বহিয়া-বহিয়া আসিতেছে। কাচের আবরণে, তবু ঘরের ভিতরকার আলো কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছে। আর আমার অঙ্গের সূক্ষ্ম, শুভ্র পাঞ্জাবী ফুর্ ফুর্ ফুর্ আছাড়ি-পাছাড়ি খাইতেছে। আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার বুকের ভেতর থাকিয়া-থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে।

"সমুদ্রতীরে জ্যোৎস্নাটি অতি চমৎকার,—এমন আর কোথাও নয়।" "আজ্ঞে, শরীর-মন জুড়িয়ে যায়।" "হুঁ" বলিয়াই হঠাৎ ডাকিলেন—"বেয়ারা!" চমকিয়া উঠিলাম। তার পর মৃদুস্বরে বলিলেন, "চুরুট-সিগারেট খান তো? পান অবশ্যই খান।—বেয়ারা।" "বেয়ারা মার্কেট হ'তে এখনো ফেরেনি। কেন বাবা?" বলিতে-বলিতে এসে হঠাৎ থম্‌কে মাথা নীচু করে 'ন যযৌ ন তস্থৌ'—একেবারে আমারই পার্শ্বে।—হা ভগবান্! চাঁদের আলো তার বসনে ভূষণে, চাঁদের চেয়েও সুন্দর মুখে পড়িয়াছে। মিঃ মিত্র কোমল স্বরে বলিলেন, "এইটি আমার মেয়ে।" আমি মৃদু হাসিয়া মাথা নত করিয়া ছোট্ট একটি নমস্কার করিলাম। তিনিও মাথা আরো নত করিয়া, দুটি হাত যোড় করিয়া আমায় প্রতিনমস্কার করিলেন। মিঃ মিত্র আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইনি আমাদের ঐ পাশের বাড়ীতেই এসে উঠেছেন। ইনি কবি, সাহিত্যিক।" বলিয়াই আমার নাম বলিলেন, "ওঁর লেখাটেখা মাসিকপত্রে পড়ে থাকবে বোধ হয়।" আমার দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, "দেখুন, আমার এই মেয়েটিরও বাংলা সাহিত্যের দিকে খুব ঝোঁক।" চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল সুন্দর মুখে ব্রীড়াবিজড়িত প্রথম মৃদুহাসি—আবার সে মুখ যদি প্রিয়-মুখ হয়—বল দেখি, তার তুলনা কি হইতে পারে? আমি একটু মৃদুহাস্যে বলিলাম, "বোধ হয় লেখেন-টেখেনও তবে।" মৌনং সম্মতি লক্ষণং। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই মৌনং মানে—'না না, আমার আবার লেখা!' তিনি দাঁড়াইয়া, আর আমি বসিয়া। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এইবার কথা ফুটিল। "আপনি

বসুন।" বসিয়া পড়িলাম। সহজ, সরল অথচ বিনয়ের সহিত বলিলেন, "আপনার লেখা প্রায়ই মাসিকপত্রে পড়ি। বিশেষতঃ আপনার ছোট গল্প। কবিতাও পড়ি। এইবার একসঙ্গে সব লেখা পড়ব। আপনার যে-যে বই বেরিয়েছে, সবগুলি আমাদের দেবেন।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমার বই! আচ্ছা।" মিঃ মিত্র হাসিয়া বলিলেন, 'লেখক হলেই ঐ দুর্ব্বলতা। যে কেউ লেখার একটু তারিফ করেছে, অমনি তার দক্ষিণা হাতে-হাতে।" আমিও সহাস্যে বলিলাম, "লিখিয়েদের পুরস্কার, আর কি! এইতেই তারা খুশী।" "এ্যাঃ—তুমি এখনো ছেলেমানুষ! ওতে যে লেখার কদর কমে যায়! সঙ্গে-সঙ্গে লিখিয়েদেরও দর কমে। এই তো হাতে-হাতে তার ফল—তুমি যে একটা লেখক, সে কথা ভুলেই গেছি!" বলিয়াই মিঃ মিত্র হাসিলেন। কি সরল! আমিও একটু হাসিয়া বলিলাম, "তা বেশ তো। আমি তো এখন লেখক নই। ধরুন না, আপনার লেখা বড়-বড় জটিল দার্শনিক তত্ত্ব যখন পড়েছি, তখন ভেবেছি—আপনি কোথায় আর আমি কোথায়! কিন্তু এখন সে কথা ভুলে আপনার পাশেই বসে আছি।" পার্শ্ববর্ত্তিনী বলিলেন, "তা খুব সত্যি।" আবার সেই হাসি। "আমাকে হারিয়ে দিলে—তর্কে।" "তা কেন বাবা! উনি তো তোমারই কথার প্রতিধ্বনি করলেন।" "বুঝলে, সিরীন বাবু, কদর কমলো কি না।" কিন্তু আমি বলিলাম, "কদর এত বাড়লো কেন?"—অবশ্য মনে-মনে।

বেয়ারা আসিয়া হাজির। "বাবা, বেয়ারাকে ডাকছিলে—" "এ্যাঁ—" কি যেন চিন্তা করিতেছিলেন। "হুঁ—সিরীন বাবুকে পান আর সিগারেট এনে দাও। আর আমাকে চুরুট।" তিন দিনে এক টিন সিগারেট উড়াই; তবু বলিতে হইল,—আর না বলিয়াই বা করি কি—একরূপ পিতার বয়সী,—কি করিয়া তাঁর সাম্‌নে এই কাজটা করি—বলিলাম—"সিগারেট বড় একটা—" "কেন? তাতে দোষ কি?" সুতরাং নিরুত্তর হইলাম। বেশ দেখিলাম, পার্শ্ববর্ত্তিনী একটু মুখ ফিরাইলেন,—বোধ হয় ছষ্ট হাসির রেখা সে মুখে ফুটিয়া উঠিয়া থাকিবে। অনুমান করিলাম, যখনই তিনি আমার কুটীরের দিকে চাহিয়াছেন, এবং যতবার চাহিয়াছেন, আমার মুখে সিগারেট দেখিয়াছেন। মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "আপনি চা খান তো? একটু চা করে এনে দিই?" আমি অম্লান বদনে বলিলাম, "আচ্ছা দিন।" যখন গৃহে ফিরিলাম, তখন একটু রাত হইয়াছে।

(৯)

এখানে দিনে একবার মাত্র—দশটা-এগারটার সময় চিঠি বিলি হয়। আমার চিঠির প্রত্যুত্তর পাইয়াছি। মিস্ দত্ত লিখিয়াছেন—তিনি আমার চিঠি পাইয়া অতীব আনন্দিতা হইয়াছেন। ধন্যবাদ এবং প্রীতি নমস্কার জানিতে বলিয়াছেন; এবং পরিশেষে আশা করিয়াছেন যে, আমার চিরনবপরিচিতা বন্ধুটি আমার পুরীর প্রবাস-জীবন মধুময় করিয়া তুলিবেন। উপসংহারে সংবাদ দিয়াছেন, তাঁহাদের একটি পরিচিত বন্ধু বিলেত হইতে ফিরিয়াছেন এবং তাঁহারা ভাল আছেন, এবং আশা করেন, আমিও ভাল আছি। ইতি।

আবশ্যক দুই-চারিখানা চিঠি লিখিয়া আমার এক-সেট পুস্তকে—কবিতার, গল্পের, বড় গল্পের (উপন্যাস), ভ্রমণ বৃত্তান্তের—মিঃ মিত্রের নামে উপহারের পাঠ লিখিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিলাম। তখনো ঠিক বিকেল হয় নাই। হাওয়াগাড়ীর দল সমুদ্রতীরে এখনো আসে নাই। লাল, কালো, সাদা, সাদার উপর কালো, ডোরা আটদাট গরির সমুদ্রস্নানের পোষাক (Swimming Costume) পরিয়া কচি, ধেড়ে, বুড়ো—মেয়ে মদ্দ—সাহেব-মেম—মেমের সংখ্যাই অধিক—এক সঙ্গে সমুদ্রস্নান করিয়া দলে-দলে ফিরিতেছে। এই সময়ে বাঙ্গালীরা বড় কেহ স্নান করেন না। তাঁহারা কেহ সকালে এবং অনেকেই দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে স্নান করিয়া থাকেন। দেশী ও বিদেশীরা স্নানের সময়টা যেন ভাগা-ভাগি করিয়া লইয়াছে। দেশীয় ভ্রাতা ভগিনীদের স্নানে বৈচিত্র্য কি আর। কিন্তু বিদেশীয়দের স্নানে বেশ একটু রকমসকম আছে।

পরচর্চ্চায় বেলা বয়ে যায়। কেতাব কয়খানি লইয়া প্রতিবেশী-কুঞ্জে উপনীত হইলাম। বারান্দায় এখনো রৌদ্র রহিয়াছে। এইটিই সবচেয়ে বড় ঘর—একরূপ বৈঠকখানা, তবে হাল ফ্যাসানের। কার্পেট, চেয়ার, কৌচ, টেবিল, আলমারি প্রভৃতি সরঞ্জামে সজ্জিত। ঘরের মধ্যে একখানা চেয়ারে বসিয়া মিঃ মিত্র কি একখানা বই পড়িতেছেন,

আর মিস্ মিত্র সেই কৃষ্ণবর্ণা আয়ার সহযোগে টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম লইয়া চা তৈরী করিতে ব্যস্ত। সিঁড়ির উপর হইতে এই সব দেখিলাম। আমায় দেখিয়াই বাহিরে আসিলেন। "আসুন।" "এই নিন বই।" সোণার চুড়ি-পরা সুন্দর হাতখানি বাড়াইয়া গ্রহণ করিলেন। একটু delicate—কি না রোগা। সৌন্দর্য্য তাহাতে বাড়ে, কিন্তু আমার বুকে বড় বাজিল। বই ক'খানি একবার একটু দেখিয়া বাঁ-হাতে—যেন নিজের ছেলেটির মত বুকের কাছে রাখিয়া—আমার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "চা বুঝি খেয়ে এসেছেন?" "তাই তো, আজ চা খেতে ভুলেই গেছি।" আমার মুখে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, একটু গম্ভীর হইয়া—যেন আমার উপর তাঁর অনন্ত অধিকার—বলিলেন, "তবে চায়ের উপর সে রকম টান নেই।—আসুন, চা সব তৈরী!" ভিতরে গেলাম। "বাবা, এই তোমার বই।" মিঃ মিত্র মুখ তুলিয়া চশমা আঁখিয়া, আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে-ব'স।—কার বই মা?—ও, তোমার বুঝি।—কই, দাও।"

কন্যার হাত হইতে পুস্তক গ্রহণ করিয়া আবার চশমা পরিয়া মিঃ মিত্র আমার উপহৃত পুস্তকগুলি দেখিতে লাগিলেন। আমি একটা চেয়ারে অদূরে বসিয়া পড়িলাম। মিস্ মিত্র পেয়ালায়-পেয়ালায় চা ঢালিতে লাগিলেন, আর সেই আয়া আমার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। "দাঁড়িয়ে কেন? কয়েকখানা রুটি ও মাখন নিয়ে এস।" তার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিছু খেতেও বুঝি ভুলে গেছেন?—না?" বলিয়াই এক পেয়ালা চা পিতার সম্মুখে রাখিলেন। তার পর আর এক পেয়ালা আমাকে দিলেন। মিঃ মিত্র নিবিষ্টমনে আমার কেতাব দেখিতেছেন ও মাঝে-মাঝে এক-এক চুমুক চা খাইতেছেন। তাঁহার অর্দ্ধ পেয়ালা শেষ না হইতেই আমার পেয়ালা শূন্য হইল। মিস্ মিত্র আমার কাছে আসিয়া আমার হাত হইতে শূন্য পেয়ালাটি লইয়া উহা আবার পূর্ণ করিয়া দিলেন। আমি হাঁ না কিছুই বলিলাম না। আয়া রুটি লইয়া আসিয়াছে। একখানা প্লেটে খানকয়েক রুটি মাখন মাখাইয়া আমাকে দিলেন। শেষ পেয়ালা চা ও রুটি নিঃশেষ করিয়াছি, তখন মিঃ মিত্রের পেয়ালা শূন্য হইল।

"বাবা, এক স্লেজ রুটি দেব?" "না—গিরীন বাবুকে দিয়েছ?" "উনি তো খেতে ভুলে গিয়েছিলেন।" "কেন? তুমি তো আর আমার মত ডিস্‌পেপ্‌টিক নও যে খেতে ভুলে যাবে!" মিস্ মিত্র আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি রাত্রে কখন খান?" "সন্ধ্যার পরই।" একটু ভাবিয়া তার পর হাসিয়া বলিলেন, "তবে আর রুটি দেব না। সকালে?" "এই একটু সমুদ্রতীর থেকে বেড়িয়ে এসে।" "কখন বেড়াতে যান?" "সূর্য্যোদয় হয়-হয় এই সময়।" বলিয়াই মাথা নত করিলাম। সেই দৃশ্য, সেই কথা—সেই সেদিনকার। দেখিলাম, সেও চোখ নত করিয়াছে। মুখ আরক্তিম, কে যেন কাণে কাণে বলিল—চুপ্, চুপ্, চুপ্। "ওহে, এ যে পড়েছি,—এই কাশ্মীর কথা।" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ, ওটা প্রথমে মাসিকপত্রে বের হয়েছিল।" "তাই হবে—পড়েছি।" মিঃ মিত্র আবার পাঠে মন দিলেন। "আয়া, এগুলি সরিয়ে নিয়ে যাও। বাবা, চুরুট দেবে?" "এঁ্যা—আচ্ছা, দাও একটা।—গিরীন বাবুকে দাও।" মিস্ মিত্র আমার দিকে চাহিলেন, মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। "আয়া, রেখে পান নিয়ে এস।" "হুঁ—পান?—গিরীনবাবুকে পান দিও।—হা—হা—হা কাশ্মীর পাওয়াটির বর্ণনা বেশ হয়েছে।—ছবি, তুই এটা পড়েছিস্?" স্নেহ-সম্বোধনে স্নেহের দেওয়া নামে স্নেহময় পিতার ডাকে হঠাৎ তিনি একটু লজ্জিত হইয়া মাথা নীচু করিয়া বলিলেন, "না, বাবা!" ছবি!—হাঁ, ছবিই বটে! আচ্ছা, আমি কি নামে ডাকিব?

(১০)

"আপনি অতদূরে চলে যান কেন?—ও কি, চম্‌কে উঠ্‌লেন—যে!—সমুদ্র-স্নানের কথা বল্‌ছি। ঢেউয়ের এদিক থেকেই স্নান করবেন। ঢেউ যখন ভাঙ্গে—উঃ, বড্ড ভয় করে,—আপনি আর যাবেন না। নিতান্তই যদি যান, একটা মুনিয়া সঙ্গে করে নেবেন। সমুদ্রই মুনিয়াদের ঘরবাড়ী,—ওরা সঙ্গে থাক্‌লে আর তত ভয় থাকে না।"

আমি বলিলাম, "একা একাই বেশ, একটা লোক সঙ্গে করে নিয়ে কি স্নান হয়?" "আপনার সব তাতেই একা।" "তা আপনি দেখ্‌লেন কি করে?" কথাটা না জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারিলাম না। একটু লজ্জিতা হইয়া, কিন্তু

তখনই সাম্‌লাইয়া লইয়া, বলিলেন, "ছাদের উপর থেকে বেশ দেখা যায়।" সুতরাং উক্ত কথার ঐখানেই ইতি করিয়া বলিলাম, "প্রথম-প্রথম আমারো ভয় হত। কিন্তু একবার স্নান কর্‌লে ভয় আর থাকে না।" "তা হোক্, বড় ঢেউ যেখানে ভাঙ্গে,—না হয় তার এদিক থেকেই স্নান কর্‌লেন,—তাতে সমুদ্র-স্নানের ফল কম হয় না।" "কিন্তু ঢেউয়ের কাছে বেশ মজা।" "একটু বেকায়দায় পড়লে না কি হাত-পা ভেঙ্গে যায়। দরকার কি?—মজা না-ই বা হ'ল।" "আচ্ছা, আর যাব না, এদিক থেকেই স্নান কর্‌ব।" "আমার কথায় বুঝি ভয় পেয়ে গেলেন?" আমি বলিলাম, "বাঙ্গালী মেয়েরা অনেকেই তো সমুদ্র-স্নান করেন—আপনি কেন করেন না?" "কে, আমি? বাবা বারণ করেন, তবু প্রথম এসে একদিন সমুদ্রে গিয়েছিলুম। বড্ড হাঁপিয়ে পড়লুম, তার পর আর যাই নে।" "আপনি বড্ড delicate—তাই দেখছি।" মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন, "তা আগে এতটা ছিলুম না। বছর খানেক ধরে কেমন একটা weakness মাঝে-মাঝে বোধ হয়। পুরীতে এত দিন থাকাও ঐ জন্যে।" "এসে কতকটা ভাল বোধ কচ্ছেন না?" "কই—আমার তো তেমন বোধ হচ্ছে না।" বলিয়াই তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া করুণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আপনি বড্ড কালো হয়ে গেছেন—এখানে এসে। তা হোক, শরীর তো বেশ ভাল হচ্ছে—দেখ্‌ছি।" তার পর মাথা নীচু করিয়া মুখ একটু বাঁকাইয়া বলিলেন, "মিস্ দত্ত হয় তো দেখে চম্‌কে উঠ্‌বেন।" মিস্ দত্ত চম্‌কে উঠ্‌বেন কি না জানি না, কিন্তু আমি চম্‌কে উঠিলাম। ষোলআনা দুষ্টামি নাখিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন, "একেবারে অবাক্ হয়ে গেলেন যে! চেনেন না না কি?" "চিনি বই কি; কিন্তু আপনি চিন্‌লেন কি করে?" "আপনি চিনতে পারেন, আর আমরা চিনতে পারি না?" "তা পারবেন না কেন? এই ধরুন, আপনার সঙ্গে আলাপ আছে, এমন কাউকে আমি হয় তো চিন্‌তে পারি। কিন্তু জানব কি করে যে আপনার সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে?" "আমি অত-শত জানিনে।" মনে হল বলি,—জান বই কি। এত সুন্দর এত দুষ্টু হয় কেন? বলিলাম, "সেইটেই তো জান্‌তে চাচ্ছি।" "বলুন দেখি, কি করে জানলুম?" "আমি তো আর গণৎকার নই যা অন্তর্যামী নই।" "ইস্, কত গম্ভীর!" দেখিলাম, আমার কথায় তাঁর চাহনিতে একটা ব্যাকুল করুণ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া গেল। কোমলস্বরে বলিলাম, "আপনার সঙ্গে বুঝি মিস্ দত্তের আলাপ-পরিচয় আছে, চিঠিপত্র লেখেন-টেখেন বুঝি?" হাসি ফুটিয়াছে। বলিলেন, "আমি তাঁকে চিনিই না। হঠাৎ তাঁহার চিঠি-খানি দেখে ফেলেছি!" বলিয়া মৃদু হাসিলেন। তার পর বলিলেন, "সেদিন বিকেলে আপনার বাড়ীতে গেছলুম না? আপনার টেবিলটা বিশ্রী হয়ে ছিল, একবার গুছিয়ে দিলুম। তখন আপনার রচনার খাতার মধ্য থেকে একখানা লেখা কাগজ পড়ে গেল। তাই তুলে রাখ্‌তে গিয়ে পড়ে ফেলেছি।" অধরে দুষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বলিলেন, "ভাবলুম, বুঝি একটা নতুন গল্পটল্প হবে। না—তার পর দেখি সত্যিকারই গল্প—চিঠি।" আমিও মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "তা একটা গল্প ফাঁদলে হয়।" "সে গল্প যদি তিনি পড়েন, পড়ে কি ভাববেন?" "ভাববেন মাথা আর মুণ্ডু। খুব খুসী হবেন, ভাববেন, ভাগ্যিস কোন সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচয় ছিল, তাই গল্পের অছিলায় লোকের মুখে মুখে ফিরছি।" "গল্প না লিখে কবিতা?" "পুরীর সমুদ্র দেখে একটা কবিতা লিখ্‌তে ফরমাস করেছিলেন। কিন্তু সে উপরোধ আর রাখ্‌তে পারলুম না।" "কেন?" "তা বলব না।" "আচ্ছা থাক, শুনব না। তবে বঙ্গসাহিত্য একটি কবিতারত্ন হতে বঞ্চিত হল,—যেন আমাদের অভিসম্পাত না দেয়।" "তা সমুদ্রের উপর না হয়ে, বিয়ের উপর না হয় লিখে পাঠাব। মিস্ দত্তের শীঘ্রই বিবাহ হচ্ছে—চিঠির সেই বিলেত-প্রত্যাগত বন্ধুটির সঙ্গে। এই দেখুন, নিমন্ত্রণ-পত্র।" নিমন্ত্রণপত্র পাঠ করিয়া মিস্ মিত্র বলিলেন, "কবিতা লিখেছেন?" "না।" পরন্তু বিয়ে, কবে লিখ্‌বেন আর?" "তা বিয়ের পরে লিখ্‌লেও চল্‌বে।" "হা—হা—হা—তাই লিখ্‌লে চলে না কি?" "কেন, তাতে দোষ কি? একটা বিয়ের অন্ততঃ একশো কবিতা ছাপা হয়—একটা না হয় পরে হবে।" "আপনি তাঁর একজন কবি-বন্ধু, আর তাঁর এই সময়ে তিনি একটা কবিতা আপনার হাত থেকে পাবেন না?" "তা বন্ধুর উপর তিনি নির্ভর করে নাই। আর কেউ লিখুক বা না লিখুক, স্বয়ং তিনি অন্ততঃ গোটাদশেক নিশ্চয়ই লিখেছেন।"

"বিয়ের ?" "হাঁ।" "নিজের ?" "তবে কি পরের ? তবে পরের জবানীতে। আজকাল মেয়েরা নিজের বিয়ের কবিতা নিজেরাই লেখেন।" "ছবি!" পিতা বাহির হইতে ডাকিলেন। "বাবা!" "অষুধ খেয়েছ ?" "এইবার খাব। তুমি বেড়াতে গেলে না, বাবা!" "তোমার অষুধ খাওয়া হলেই যাব। গিরীনবাবু, তুমি একটু ব'সো, আমা! অষুধের শিশি ও মেজার গেলাসটা নিয়ে এস!—বেয়ারা কোথায় গেল ?" "বাবা! আজ একটু বেড়িয়ে আসি ?" "বেশী দূর যেয়ো না।" "চলুন গিরীনবাবু, বেড়িয়ে আসি, আজ আর সমুদ্রের ধারে নয়, ঐ রাস্তাটিতে চলুন।—বেশ নিরিবিলি!"

---

(১১)

বসন্ত অতীত হইয়াছে। গ্রীষ্ম-গ্রীষ্মও অতীত হইতে চলিয়াছে। বর্ষার প্রথম। সমুদ্রের ওপার হইতে আকাশ ভরিয়া মেঘ ঢেউয়ের মত ভাসিয়া-ভাসিয়া আসিতেছে। কখনো বর্ষণ, কখনো রৌদ্র, কখনো রৌদ্র ও বর্ষণ একই সঙ্গে। আলো-ছায়ার এই বর্ষাপ্রকৃতি অনন্ত সাগরবক্ষে এক আধ-শ্রান্ত লীলা—যেন সেই প্রাচীন কাহিনী, অনাদি অনন্ত কালের, যুগযুগান্তের। হাওয়াপায়ী স্বাস্থ্যান্বেষীর দল সকলেই প্রায় একে-একে পুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাত্রে কুঞ্জে-কুঞ্জে আর প্রদীপ জ্বলে না। যেমনি অন্ধকার ছিল, তেমনি অন্ধকার হইয়াছে—আরও ঘনীভূত। এই বিশাল, অনন্ত সমুদ্র-সৈকতে দেশ-বিদেশ হইতে একদল মানবশিশু খানিকের জন্য খেলা করিতে আসিয়াছিল, আবার চলিয়া গিয়াছে! সমুদ্রের কি প্রাণ আছে ? এখনো তাহাদের পদচিহ্ন সৈকতে লেখা রহিয়াছে, এখনো তাহাদের কণ্ঠস্বর সৈকতবায়ুতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ছোট-ছোট বালুর স্তূপ তাহারা খেলাচ্ছলে তৈরী করিয়াছিল, এখনো সেগুলি রহিয়াছে। সবই আছে, কিন্তু তাহারা নাই। যেন স্বপ্ন—যেন মায়া! আমিও তাহাদের মত একজন আসিয়াছি, আমারও যাবার সময় হয়েছে। যাব—যাব—কই, কেউ তো আমায় ধরিয়া রাখিতেছে না। বন্ধন কোথায় ?—ঐ সমুদ্র, ঐ সৈকত, ঐ বেলাভূমি, ঐ কুঞ্জ—সবই তো মুক্ত, বন্ধনহীন। আমিই আমার বন্ধন, আমিই আমার বাধা। সাধ করিয়া বাঁধন পরিয়াছি, এ যে আর খুলিয়াও খুলিবে না। এ বন্ধনে গৃহ নাই—কিন্তু গৃহের শোভা আছে; এ বন্ধনের ভবিষ্যৎ নাই—কিন্তু আশা আছে। কিছুই নাই, অথচ যেন সকলই আছে। এই অনন্ত সমুদ্রতীরে প্রকৃতির অনন্ত বিস্তারের মধ্যে যাহা পাওয়া যায়, বুঝি তাহা পাওয়া হয় না। এ শুধু দেখিবার, ধ্যান করিবার—ভোগ করিবার নয়। তবুও মন বলছে চল, ঘরে চল।

"গিরীন বাবু!" ফিরিয়া দেখি, সেই হাসিমুখ। যেন সে মুখে আমার মনের প্রতিধ্বনি। আমি চমকিয়া তার মুখে চাহিলাম। "এত কি ভাবছিলেন বসে। ও কি! আপনার মুখ এত শুকনো কেন ?"—সুন্দর গ্রীবা বাঁকাইয়া মৃদু হাসিয়া আমার মুখে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "সকাল বেলাই এত শুকনো—এখনো তো সারা দিন পড়ে আছে,—আজকে কি এমনি মনমরা হয়ে থাকবেন ? ক'দিন ধরেই তাই দেখছি, সমুদ্র-স্নানের সময় যে বয়ে যাচ্ছে। তা' এখানে আজ মধ্যাহ্ন-ভোজনটা হোক না।—আয়া! গিরীনবাবু আজ এখানে খাবেন।" "ভাবছিলুম—" "আগে সেই কথাটার উত্তর দিন।" "কোন্-টার ?" "খাবেন যে এখানে!" "বলুম যে—খাব।" "ওমা! কখন বল্লেন ? মনে-মনে বুঝি ?" "তাই হবে। বলিনি ?—আচ্ছা খাব।" মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন, "এইবার কি ভাবছিলেন বলুন।" "ভাবছিলুম—" "আঃ—বলেই ফেলুন না।" "ভাবছিলুম—শীগ্‌গীরই যেতে হবে।" "সে তো আজ একমাস থেকে শুনছি।—কোথায় ?" "কলকাতায়।—যেখান হতে এসেছি।" "ভাবছিলুম—বুঝি বাড়ী যাবেন।" "বাড়ী!—সেখানে আর কে আছে, যে যাব ?" "কলকাতায় ?" "সবই সমান।—আপনারা তো আরও কিছুদিন থাকবেন ?—না ?" "আমি কিছুই জানিনে—বাবা জানেন। তিনি কিছুই আমায় বলেন না।—কিই বা বলবেন!" একটা গভীর বিষাদের ছায়া তাঁহার মুখে পড়িল; আমি চাহিতেই চোখ নত করিলেন। "আপনার শরীর—কিছুদিন ধরে ভাল দেখছি না। পুরী না থেকে অন্য কোথাও গেলে ভাল হয় না ?" চোখ তুলিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া তিনি বলিলেন, "এইবার স্নান করে আসুন। বেলা বালু তেতে উঠলে—আসতে কষ্ট হবে।" আমি উঠিয়া পড়িলাম। আহারান্তে

বড় ঘরে আসিয়া বসিয়াছি। আজ আর হাওয়া নাই; আকাশ পরিষ্কার; প্রচণ্ড রৌদ্র। কুঞ্জের সম্মুখের বালুভূমি উত্তপ্ত হইয়া জ্বলজ্বল করিতেছে;—যেন ছোট-খাটো মরুভূমি—আর তাতে মরীচিকার আভাস। আমি আর মিঃ মিত্র বসিয়া। মিঃ মিত্র তাম্রকূট সেবন করিতে-ছেন—করসিতে; আর আমি পান চিবাইতে-চিবাইতে সংবাদপত্রের এখানে-সেখানে চোখ বুলাইতেছি। "গিরীন, তুমি যাচ্ছ?" খবরের কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে, তাই ভাবছি।" "হাঁ,—এখন বর্ষাও আরম্ভ হয়েছে। বর্ষার সময়টা পুরী তত ভাল নয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা কি এখানেই থাকবেন?—না অন্য কোথাও যাবেন?" "ছবির স্বাস্থ্য এখানে এসে ক্রমশঃই ভাল হচ্ছিল; কিন্তু কিছুদিন ধরে যেন কেমন হচ্ছে। তাই ভাব্‌ছি—" "আমিও তাই দেখ্‌ছি।" আমার কণ্ঠস্বরে হঠাৎ মিঃ মিত্র আমার মুখের দিকে চাহিলেন, চাহিয়াই আবার ধূম্রপানে রত হইলেন। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল; তার পর ধীরে-ধীরে বলিলেন, "সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে আরও একটা কিছু কাজ চাই। এইবার কলকাতায় গিয়ে একটা প্রফেসারি নাও। Law টা পড়বে না কি?" "না!—আজ্ঞে না।" তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "কেন? ইংরেজদের বড়-বড় সাহিত্যিক কেউ-কেউ Lawyer ছিলেন। যদি দরকার হয় আমায় লিখো, আমার অনেক friends প্রাচীন প্রফেসর আছেন, তোমার তা'তে অনেকটা সুবিধে হবে। কলেজ এখনো সব খোলেনি—বোধ হয় গ্রীষ্মের ছুটি এখনো চল্‌ছে। এই বেলাই যাওয়া ঠিক।—আমরাও অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই এখান থেকে যাব। দেখি ডাক্তার কি বলেন।"

মিস্ মিত্র ঘরে ঢুকিলেন। মিঃ মিত্র কন্যার মুখের দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "গিরীন কলকাতায় যাচ্ছে, ছবি!" ছবি বলিলেন, "সে কথা তো আমিই তোমায় বল্‌লুম, বাবা!" যেমনি মেয়ে যেমনি বাপ। কন্যার মুখে পিতা কোনই ভাবান্তর দেখিতে পাইলেন না। এ মুখে সদাই হাসি। "গিরীন!" "আজ্ঞে।" "তোমার তো নিজের বাড়ী নেই কলকাতায়। না হয় আমাদের বাড়ীতেই থাকবে। সেখানে কেউ নেই, তুমি রইলে।" কন্যাটির যেন একটু গম্ভীর মুখ। কিন্তু হাসিয়া বলিল, "অবশ্য ওঁর যদি তাতে অসুবিধে না হয়।" আমি চট্‌পট্ বলিলাম, "অসুবিধা হলে তখন না থাকলেই হবে, ছেড়ে চলে গেলেই হবে।" মিঃ মিত্র হাসিলেন। এতদিনের মধ্যে একদিনও তাঁহাকে এমন হাসি হাসিতে দেখি নাই। সে হাসি হইতে স্নেহ বর্ষিত হইতেছে। বুঝিলাম, আমি তাঁহার স্নেহের অংশীদার হইয়াছি। হায়! কি করিয়া আমি ছেড়ে চলে যাব? ছবি বলিলেন, "ছেড়ে কোথায় যাবেন?" আমি বলিলাম "পুরী চলে আসব।" "তখন দেখ্‌বেন এসে হয় ত শূন্য পুরী,—আমরা আর কোথাও গেছি।"

(১২)

পুরী ত্যাগ করিয়া চলিলাম। কিন্তু আমার যথাসর্ব্বস্ব এই সমুদ্র-সৈকতে রাখিয়া গেলাম। গোপনে চোখের জল মুছিয়া মিঃ মিত্রের চরণধূলি গ্রহণ করিলাম। আমার মাথায় হাত দিয়া মনে-মনে তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, যেন সন্তান বিদেশে যাইতেছে;—যেন তাঁহারই কাজে, তাঁহারই নির্দ্দেশে।

(১৩)

কলিকাতায় আসিয়াই মিঃ মিত্রের বাড়ীতে আমার বাসস্থান উঠাইয়া লইয়া গেলাম। এই বিশাল শূন্য পুরীতে —আমি একা।

এই রাস্তা দিয়া আমি কতবার আসিয়াছি, গিয়াছি; কিন্তু কে জানিত, এই গৃহ আমার একদিন বাসগৃহ রূপে পরিণত হইবে? কে জানিত, এই গৃহ আমারই আপন জনের! ভবিষ্যৎ কত কথাই না লুকাইয়া রাখে। পরকে আপন করে, আবার আপনকে পর করে; শূন্যকে পূর্ণ করে, পূর্ণকে শূন্য করে! কি অন্ধকারের মধ্য দিয়াই না আমরা পথ চলিয়াছি! ঐ প্রাচীরে ঘেরা বাগান। বাগানে যুঁই, বেল, গন্ধরাজ, শিউলি, গোলাব,—সারি সারি ফুলগাছ। ঐ এক কোণে হাসনাহেনার ঝোপ, প্রাচীরের গায়ে মাধবীলতা। এই বাগানে সে কত ছুটা-ছুটি করে বেড়িয়েছে, কত ফুল ছিঁড়িয়াছে, ডাল ভাঙিয়াছে। এখনই এত দুষ্টু, না জানি যখন ছোট ছিল, তখন কত না দুষ্টু ছিল। অতীত ফিরিয়া আসে কি? যা একবার হয়, আবার তা হতে দোষ কি? কেনই বা হবে না? যদি না হয়, তবে এই জগৎ-রচনায় বাহাদুরী কোথায়?—তখন বুঝি আরো সুন্দর ছিল! এই পথ দিয়া আমি কলেজে

গিয়াছি ; কলেজ থেকে ফিরিয়াছি—সেও এই পথ ধরিয়া। একদিনও কি দেখিনি ?—একটি সুন্দর মেয়ে বাগানের মধ্যে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। দেখ্‌তে পারি—তা দেখা না দেখা তখন দুইই সমান। দুনিয়ার অনেক জিনিসই দেখ্‌ছি।—দেখ্‌ছি কি ? দুনিয়া আমার নয়, আমার না হইলে দেখ্‌ব কি ? এ দেখা তো জেগে স্বপ্ন দেখার মত ! সে যদি থাকতো, তবে আমায় সব দেখাতো। দেখাতো—এইটি আমার পড়ার ঘর। এই ঘরে আমার পুতুল, খেলনা, কত কি সব—এই দেখ, সব আলমারিতে সাজানো রয়েছে। একদিন মা বকেছিলেন, ঐ পেয়ারা গাছটায় উঠেছিলুম ব'লে। তখন আমি বাঙ্গালী মেয়েদের মত কাপড় পরতুম না,—সাহেবদের মেয়েদের মত পরতুম। তুমি যদি আমায় তখন দেখ্‌তে—আচ্ছা, তখন কি বোল্‌তে ? বড়-বড় থামওয়ালা বারান্দায় ইনি চেয়ারে চক্ষু বুজিয়া ভাব্‌ছি—ভাব্‌ছি আর যেন সত্যিই দেখ্‌ছি শুন্‌ছি। কি করিয়া প্রফেসরি করিব !

(১৪)

মিঃ মিত্রের চিঠি পাইলাম। লিখিয়াছেন—"তোমার দুখানি চিঠিই পাইয়াছি। ছবি বড্ড অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। আমি এতদিন যাহা আশঙ্কা করিতেছিলুম, শেষে বুঝি তাই গিয়ে দাঁড়াল ! এতদিন ঘরে গেল, একটা কাজটাজ নিলে না ! যে কোনো একটা কাজ করতে বল্‌ছি। তুমি আমার স্নেহের পাত্র, এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিয়ো। তোমার শরীর কেমন আছে—লিখো।"

(১৫)

দিন গেল, সন্ধ্যা হল ; কলিকাতার রাস্তায় গ্যাস জ্বলিল। ভিতরে ইলেক্‌ট্রীক জ্বালিয়া, কাচের পরদা টানিয়া, ভিমিতে-ভিমিতে ট্রাম আনাগোনা করিতেছে। এত জল, এত বৃষ্টি, তবু বিশ্রাম নাই। রাস্তার দুই ফুটপাথে অসংখ্য ছাতা আসিতেছে, যাইতেছে। দোতলার গাড়ী-বারান্দার ছাতে টবে-টবে বেল দুঁই কুড়ি ভিজিতে-ভিজিতে তবু ফুটিয়া উঠিতেছে। মাঝে-মাঝে দমকা হাওয়ায় হেলিতেছে, দুলিতেছে—আছাড়ি-পাছাড়ি খাইতেছে। বাড়ীর পিছনের ঐ খোলা জমিটায় জল দাঁড়াইয়া যেন একটা এবড়ো-খেবড়ো পুকুরের মত হইয়াছে। তাহাতে অসংখ্য ব্যাং থাকিয়া-থাকিয়া ডাকিতেছে। কোথায় এই কলিকাতা আর কোথায় পুরী। সেখানেও কি এমনি বাদল, এমনি ঝড় !—সমুদ্র ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। চারিদিক অন্ধকার ! সমুদ্রের ভৈরব গর্জ্জন, আর তার সঙ্গে ঝড়ের প্রচণ্ড হাওয়া। মহাকাল তাঁর সঙ্গিনীসহ উদ্দাম নৃত্য করিতেছেন। প্রলয়ে জীবন-মরণ দুইই সমান। তবু তিনি মাতা—স্তনে তাঁর দুগ্ধধারা। এই প্রলয়ের মাঝে তামসী ভৈরবী প্রকৃতির পদতলে—ঐ সৈকতে আমার ঘরটি কোথায় ? আঁধারে রত্ন জ্বলে। ঐ তো কুটীর—রুদ্ধদ্বার। মিটিমিটি আলো—ভিতরে। পর্য্যঙ্কে শায়িতা—পাণ্ডুর মুখকমল আলোর দিকে চাহিয়া। আর ঐ পার্শ্বে উপবিষ্টা—কে ঐ কৃষ্ণবর্ণা ? একদৃষ্টে আমার ছবির মুখের দিকে চাহিয়া আছে ?—কে যেন আমায় আঘাত করিল, যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিলাম। কিন্তু তখনো ব্যথা বুকে গুমরিয়া-গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িলাম।

* * * *

আমার পুরী আসিয়াছি। এই মহাতীর্থেই আছি। আর ফিরিবার ইচ্ছা নাই। কোথায় ফিরিব ?—আমার গৃহ কোথায় ? আমার কাজকর্ম্ম নাই—কিসের জন্য ফিরিব ? আমায় ফেরাবার কেহ নাই—কার জন্য ফিরিব ? আমার গৃহ ঐ বালুকা-সৈকত, আমার কাজ ঐ সৈকতে বসিয়া-বসিয়া পাহারা দেওয়া। আমার ধনরত্ন যে সব ঐ সৈকতে ! এই সৈকত-সমাধিতে তাঁহার পার্শ্বেই আমারও সমাধি হবে—মহাবেলায় দুটি রত্ন পাশাপাশি—আমার শেষ আশা, আমার একমাত্র কামনা !

কল্পতরু

চট্টগ্রামে জাহাজ-নির্ম্মাণ

[শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী]

অতি প্রাচীনকাল হইতে চট্টগ্রাম জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। আমরাও ছেলেবেলায় দুচারিখানা জাহাজ এ বন্দরে নির্ম্মিত হইতে দেখিয়াছি। প্রসিদ্ধ হাণ্টার সাহেবের মতে আমাদের জাহাজের কারখানা ১৮৭৪ সন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ঐ সময়ের কিছু পূর্ব্বে এ দেশের স্বনামখ্যাত হিন্দু সওদাগর শ্রীরামসুন্দর সেনের 'বাকলেণ্ড' নামক জাহাজ স্থানীয় মুসলমান মাঝি দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিলাতে সফর দিয়া আসিয়াছিল। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও এখানকার প্রসিদ্ধ মুসলমান ব্যবসায়ী ইব্রাহিম আলি সোভাবীর জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ইউরোপের প্রধান-প্রধান বন্দরগুলি স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে। প্রতীয়মান হইত। বৎসরে যে ঐ সমস্ত দ্বীপপুঞ্জে ইহারা কতবার সফর দিত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ব্রহ্মদেশ, চীন, মিসর প্রদেশের সহিত এ দেশের চিরবাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। নবম শতাব্দীতে আরবগণ এ দেশে বাণিজ্য করিতে আসেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনরাজ-দূতগণ ৩০খানি জাহাজে আরোহণ করিয়া এই বন্দর পরিদর্শন করেন। কনষ্টান্টিনোপলের সুলতান, আলেকজান্দ্রিয়া অপেক্ষা চট্টগ্রামে অল্পব্যয়ে জাহাজ তৈয়ারি হইতে পারে অবগত হইয়া, চট্টগ্রাম বন্দরেই জাহাজ নির্ম্মাণ করাইতে থাকেন। ১৪১৭ সনে পর্ত্তুগীজেরা এ সময়ে বাণিজ্য করিতে আসেন; এবং এ দেশের অবস্থান ও জাহাজ-নির্ম্মাণের সুবিধা

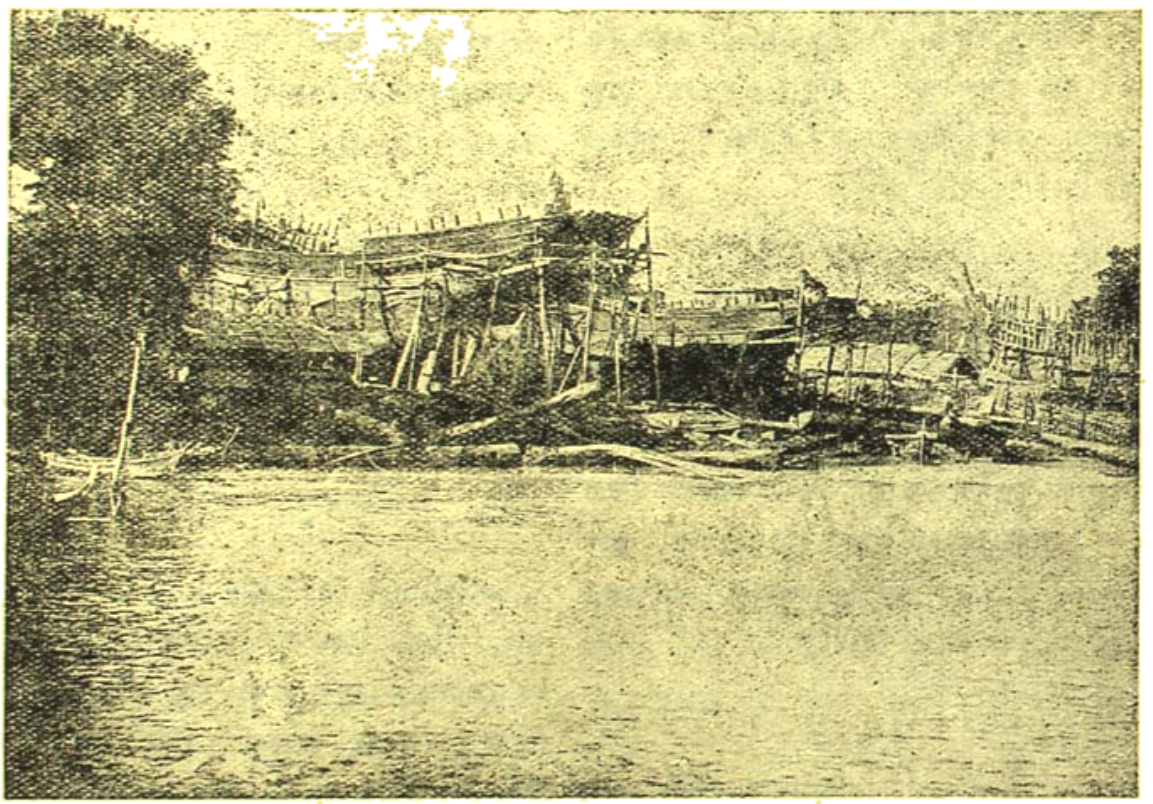

নূতন জাহাজ তৈয়ার হইতেছে

এক সময়ে এ দেশের এক-একজন হিন্দু ও মুসলমান সদাগরের শতাধিক জাহাজ বর্ত্তমান ছিল। এ দেশের সমুদ্র উপকূলের অশীতিপর বৃদ্ধ মুসলমান নাবিককে এখনও জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায়, এখানকার তৈয়ারি জাহাজ পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান-প্রধান বন্দর ঘুরিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারত-সমুদ্রের মালদীপ, লাক্ষদীপ, আণ্ডামান, নিকোবর, বাবা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ ও এ দেশের গড়ইঘাড়ীর ন্যায় পরিগণিত ছিল—জাহাজগুলি এখন যাইতেছে, এখন আসিতেছে এইরূপ দেখিয়া চট্টগ্রাম বন্দরকে লোকে গোটা প্রাণো অর্থাৎ প্রধান বন্দর আখ্যা প্রদান করেন। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও এখানকার কর্ণফুলী নদীবক্ষ কত ছোট-বড় জাহাজ দ্বারা অলঙ্কৃত হইত; সে দৃশ্য দেখিয়া আমাদের নবীনচন্দ্র গাহিয়াছিলেন—

"পত্রবিহীন একটী কানন
সিন্ধু-বক্ষে যেন ভাসিছে ধরি!"

আমাদের মধ্যে অনেকেই নদীবক্ষে সেই জাহাজ-মাস্তুলের পত্রবিহীন

কাণন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বাষ্পীয় পোত ও রেলওয়ের প্রভাবে এখানকার জাহাজ নির্ম্মাণের কার্য্য অন্তর্হিত হইয়া যায়। বর্ত্তমান কালে য়ুরোপীয় মহাসমরে অর্ণবপোতের অভাব হওয়ায়, বহুবর্ষ পরে আবার দেশীয় জাহাজ নির্ম্মাণের আবশ্যকতা অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন। তাই চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত আবদুল রহমান ঘোতাবী "আমিনা খাতুন", "আমিনা-খাতুন", "এ, জেং রহিমা খাতুন", "জে খাতুন", "আর, খাতুন,", শ্রীযুক্ত নীলমণি রায়, "নিত্যানন্দ", ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার রায়, "লক্ষ্মীনারায়ণ", নামক বৃহৎ জাহাজ প্রস্তুত করাইয়া ভারত-মহাসমুদ্রের প্রধান-প্রধান বন্দরগুলিতে

প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই ইহার আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন—অন্যের সে সৌভাগ্য কোথায়!

চট্টগ্রামের জাহাজ-নির্ম্মাণ-প্রণালী ঘুষ্টে মনসা-পুঁথির চাঁদ সদাগরের ডিঙ্গা গঠনের কথা মনে পড়ে। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের লোকেরা চাঁদ সদাগরকে নিছক কল্পিত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু চট্টগ্রামে বহু প্রাচীন কাল হইতে চাঁদ সদাগরের ডীঘি বিদ্যমান রহিয়াছে। চাঁদ সদাগরের বাসুকাময় ডিঙ্গা, ডিঙ্গাডাঙ্গা, নেতার ঘাট ইত্যাদি চট্টগ্রামে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এ দেশে মনসা পুঁথি বহু পরিমাণে দৃষ্ট হয়। শ্রাবণ মাসে প্রতি গৃহে মনসা দেবীর রীতিমত

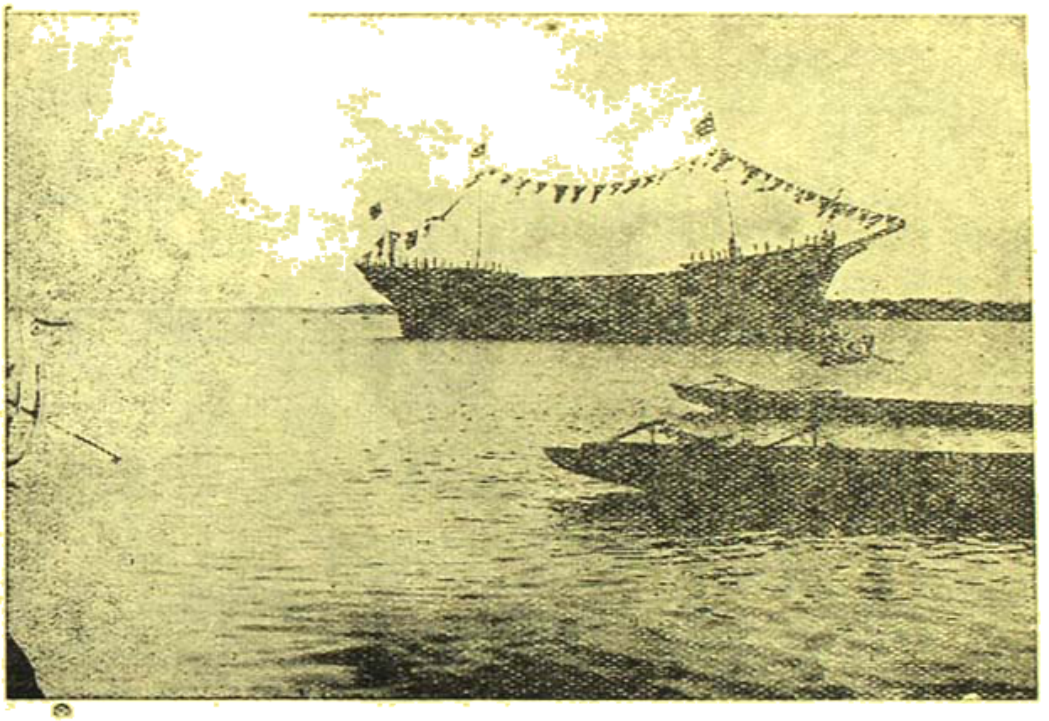

নদীবক্ষে ভাসমান নূতন জাহাজ

সম্বর দিতেছেন। ইঁহাদেরই কল্যাণে আবার চট্টগ্রামের সেই পুরাতন শক্তি নূতন ভাবে বিপুল উৎসাহে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত আবদুল রহমান ঘোতাবী সাহেব এযাবৎ Star of Calcutta, Star of Madras এবং Star of Chittagong নামে তিনখানা জাহাজ প্রস্তুত করাইয়াছেন। এই তিনখানি বৃহৎ জাহাজ নির্ম্মাণের ব্যয় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা পড়িবে, এইরূপ অবধারিত হইয়াছে। এখানকার হিন্দু মিস্ত্রী দ্বারাই এই সমস্ত জাহাজ প্রস্তুত হইতেছে; প্রধান মিস্ত্রী হিন্দু হইলেও, তাহাদের অধীনে অপরাপর অনেক হিন্দু-মুসলমান মিস্ত্রী কাজ করিতেছে। সুতার মিস্ত্রীদের হাতুড়ীর ঠকাঠক্ শব্দে দিবা-রাত্রি ঘোতাবী সাহেবের মনোহরখালী বন্দর মুখরিত। এই জাহাজ নির্ম্মাণ কার্য্যে বন্দরের কারখানায় কত লোক যে খাটিতেছে, কত ব্যস্ততার লক্ষণ যে চারিদিকে পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা যিনি একবার স্বচক্ষে

অঙ্কিত হইয়া থাকে; এবং মনসা পুঁথি খুব ধরিয়া প্রতিগৃহে প্রত্যহ পাঠ করা হয়। সেই মনসা পুঁথির সূত্রধর কর্ত্তৃক ডিঙ্গা-গঠন বাবলী পাঠ করিলে আমাদের চট্টগ্রামের জাহাজ-নির্ম্মাণ-প্রণালীর সঙ্গে তাহার অনেকটা যে মিল আছে, তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

"দেখি দিন শুভক্ষণ, ডিঙ্গা করিতে গঠন
আদেশ করিলা সদাগর।

* * * *

রাজার প্রসাদ পেয়ে, সূত্রধর চলে ধেয়ে
চিরিবারে লাগিল সত্বর।
পাটকর্ম্ম করি সারা, সুতার টানিয়া ধীরা
জানাইল চাঁদের গোচর।

সেই ইঙ্গার উপর, মিলি যত সূত্রধর
লাগাইল সিন্দুরের ফোঁটা।
দু পাশে লাগায়ে ঘাট, দিয়া মন পবন কাঠ
গড়ে ডিঙ্গা নাহি টুটা ফাটা।
নাড়ুর গাছ তুলিয়া, সোণা রূপা লাগাইল
গুড়া লাগাইল সারি সারি।
দু পাটি যে পাটি করি, পাট যোড়ে সারিসারি
বান্ধে কলে চন্দক নগরী।
ষোলশত সূত্রধর ডিঙ্গা গড়ে মনোহর
ডিঙ্গা ছাড়ি নাহি অবসর।

বাসীকে তদ্রূপ দেখা যায় না। আমাদের দেশের নৌবিদ্যায় পারদর্শী মুসলমানগণ জাহাজের বিভিন্ন বিভাগে কার্য্য করিয়া থাকে। প্রথমতঃ মাঝুল চাঁই, দিক্-নিরূপণ যন্ত্র ও মুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহারা যান, সময় ও দিক্-নিরূপণ করিয়া থাকে। দ্বিতীয় সারেং—জাহাজ চালাইবার সম্পূর্ণ ভার তাহার উপর ন্যস্ত থাকে। তৃতীয় তুরানি—ইহারা জাহাজ ধরিয়া মেরামত কার্য্য করে। চতুর্থ লস্কর বা খালাসী—জাহাজ সম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্যের ভার ইহাদের উপর থাকে। এই চতুর্ব্বিধ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া এখানকার মুসলমান নাবিকগণ দেশদেশান্তরে গমন পূর্ব্বক তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

এক্ষণে নূতন জাহাজ কর্ণফুলী নদীতে যে কিরূপ মহাসমারোহে

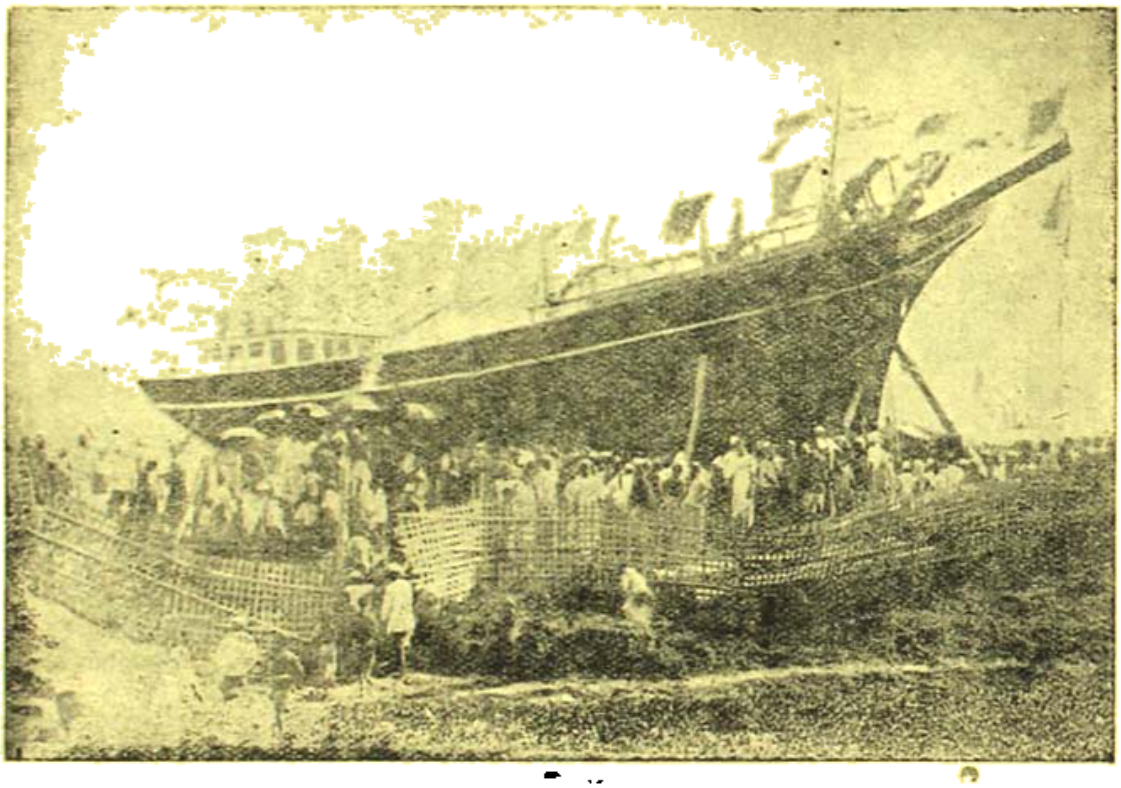

নূতন জাহাজ ভাসাইবার উৎসব

পেয়ে সবে পুরস্কার, চাষে করি নমস্কার
নিজ গৃহে চলিল সত্বর।"

চট্টগ্রাম পাহাড়ের জঙ্গল কাষ্ঠের দ্বারা এখানকার জাহাজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানকার হিন্দু সূত্রধরেরা জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে; এবং এখানকার মুসলমান নাবিকেরা সমুদ্র-পথে জাহাজ পরিচালনা করে। এই সহরের দক্ষিণদিকস্থ হালিসহর, সোসাইল-ডেঙ্গা, পতেঙ্গা প্রভৃতি স্থানে জাহাজের জন্য বৃহৎ-বৃহৎ রজ্জু তৈয়ারি হয়। এ দেশের অনেক সারেং-লস্কর পৃথিবীর বিভিন্ন বন্দরে জাহাজ চালনা করিতে এখনও যাইয়া থাকে। এ দেশের মুসলমান লস্করেরা নৌবিদ্যায় যেরূপ পারদর্শিতা দেখাইতে সমর্থ হয়, আর কোন দেশ-

তাদান হইয়া থাকে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। জাহাজ ভাসাইবার যে একটা সুন্দর পদ্ধতি আছে, তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। শুভদিনে, শুভক্ষণে, পূর্ণ জোয়ারের সময় কর্ণফুলী নদীতে জাহাজ ভাসান হইয়া থাকে। সেই দিন কাছারী, আফিস, স্কুল ও কলেজ ছুটী দেওয়া হয়। সহরবাসী সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে জাহাজ-ঘাটে ছুটিতে থাকে। নানারূপ বাজনা বাজিতেছে—ঢাক, ঢোল ও কাড়া ইত্যাদি দেশীয় বাজনা এবং ব্যাণ্ড, ব্যাগ্‌পাইপ প্রভৃতি ইংরেজী বাজনায় দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত হইতেছে। মধ্যে-মধ্যে বৃহৎ কামানের হুঙ্কারী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজে সমবেত দর্শকমণ্ডলী চমকিয়া উঠিতেছে। চারিদিকে মেলা বসিয়া

গিয়াছে। বহু সরকারী-সমাগমে স্থানটী মুখরিত হইয়াছে। একটী সুবৃহৎ চন্দ্রাতপের নিম্নে সাহেবদের প্রীতিভোজ হইতেছে। দেশের প্রধান-প্রধান ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যেও কেহ-কেহ জলযোগ করিতেছেন। জাহাজখানি পতাকা ও পুষ্পমালো সজ্জিত করা হইয়াছে। ডোমদের কুলবধূগণ কুলাতে আম্রপল্লব-সম্বলিত জলপূর্ণ ঘট সংস্থাপন-পূর্ব্বক প্রদীপ জ্বালাইয়া জাহাজের উভয় পার্শ্বে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং মধ-মধ হুলুধ্বনি দ্বারা জাহাজ অবতরণের শুভ-কামনা জ্ঞাপন করিতেছে। জাহাজস্বামী তাহাদের প্রত্যেকের কুলাতে এক এক গণ্ডা সিকি বক্সিস্ প্রদান করিলে, তাহারা জাহাজের মঙ্গল কামনা করিয়া বীর পরিক্ষেপে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিবার জন্য উদ্যোগী হইল। এদিকে হঠাৎ শুনা গেল, জাহাজ ভাসাইবার সময় উপস্থিত। উৎসাহী দর্শকবৃন্দের অনেকেই ভিড় ঠেলিয়া অতি কষ্টে জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল। প্রথমতঃ ঠকাঠক্ শব্দে কাঠের হাতুড়ীর আঘাতে জাহাজের নীচের একটি কাষ্ঠ ব্যতীত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড সমস্ত কাষ্ঠ একে একে সরাইয়া লওয়া হইল। তদনন্তর জাহাজের কর্ত্তা আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বড় মিস্ত্রী কাষ্ঠের হাতুড়ী হস্তে দাঁড়াইল। কতকগুলি বালক ও কয়েকজন যুবক, এবং অল্প কয়জন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ উভয় রেলওয়ের সজ্জিত হইয়া জাহাজের ডেকের উপর পূর্ব্বেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। স্থানীয় জজ, কালেক্টর কিম্বা কমিশনার সাহেব অথবা সদাগরি অফিসের কোন বড় সাহেব একটি সুদৃশ্য রৌপ্য হস্তে ধারণ করিয়া জাহাজখানির ঠিক পশ্চাৎভাগে গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। জাহাজের মাস্তুলের অগ্রভাগ হইতে উক্ত রৌপ্যের কণ্ঠদেশ রজ্জুদ্বারা লম্বিত ছিল। সমবেত দর্শকমণ্ডলী নীরব, নিস্পন্দ। এমতাবস্থায় জাহাজের মালিক সাহেবকে ইঙ্গিতে আদেশ দিলেন—জাহাজ নামাও। সাহেব গুরু গম্ভীর স্বরে মিস্ত্রীকে আদেশ দিল—তৈয়ার, তৈয়ার, তৈয়ার,—মুখ বলিবামাত্রই মিস্ত্রী হাতুড়ীর দ্বারা শেষ অবশিষ্ট কাষ্ঠ অর্থাৎ চাবিতে এক আঘাত দিল। জাহাজ অতি দ্রুতবেগে তীর হইতে নদী-বক্ষে ভাসিয়া পড়িল। এদিকে জাহাজ নামিবার সময় সাহেবের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া মূল্যবান রৌপ্যপাত্রটী জাহাজের পার্শ্বদেশে জোরে ঠকর লাগিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। জাহাজখানির একদেশ দুধের দ্বারা ধৌত হইয়া গেল। অপর দিকে কোন দুরদৃষ্ট ব্যক্তির হস্ত হইতে দুইটী শ্বেতবর্ণ পারাবত জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া নদীর দিকে ছুটিয়া

সমুদ্রে সফর দিবার জন্য প্রস্তুত

গেল। জাহাজ জলে নামিয়া পড়িল। নদীবক্ষে জাহাজখানি ভাসিতে দেখিয়া, বিশেষতঃ পতাকাগুলির পত্ পত্ শব্দে দর্শকবৃন্দের অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। এ দৃশ্যে মনসা পুঁথির চাঁদসদাগরের ডিঙ্গি নামাইবার কথা মনে পড়ে—

"পাব কথা দিয়া ধায়, নামাইতে সাধু যায়,
আসিয়া মিলিল প্রজাগণ।
দৃঢ়ী গীত কৌতুহলে, ডিঙ্গা নামাইল জলে,
নাগায়ণ দেব সুরচন।"

চট্টগ্রাম বন্দরে এই চিত্র আমরা বহুবার দর্শন করিয়াছি। যাঁহাদের এই সুন্দর চিত্র দর্শন করিবার সুযোগ বা সুবিধা নাই, তাঁহাদিগকে নূতন জাহাজের চারি অবস্থার চারিখানি আলোক-চিত্র উপহার প্রদান করিলাম।

চির-কুমার

[শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়]

চিরকুমার রইনু কেন ? কাজ কি শুনে সে সব কথা !
আজকে কি ওই নতুন বুকে সেই পুরাণো ব্যথা বাথা ?
আজকে যেন হচ্ছে মনে কত হাজার বছর পরে
সেই সে-কালের মতন মধু বইছে তোমার কণ্ঠস্বরে ।—
আজ্‌ল আগল ফুল-বাগানের রঙের রাঙা বসন্ত,
এক ঘোটাতেই মরিকে ঘুঁই বেল্‌-কুঁড়ি আধ্‌-ফুটন্ত ।

ঘুনিয়ে আছুল আশ্বিনাতে সিঙ্কিলে সেই আল্‌পনা
বেখনু তোমায়,—ভুল্‌ল না সেই কল্পনারি ফুল্‌ বোনা ।
ছিনিয়ে নিতে মনটি আমার বিনিয়েছিলে বিউনিটী :—
ক্ষেপিয়ে দিল আধেক-চেনা স্বপ্ন-চপল চাউনিটী ।
মিষ্টি তোমার দুষ্টু মিটী নিত্যি-নতুন কোথেকে ?
কন্‌ড়া হলেও লুকিয়ে তোমার সঙ্গ নিতাম দূর থেকে ।
উঁকত না মন পাঠশালে মোর, ঘুনিয়ে যেত 'নামতাতে,
আনমনে সেই নামটি তোমার লিখে যেতাম তাল-পাতে ।
কাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসে মিলতাম আমি তোমার সাথ,
আলের পথে বাড়িয়ে দিতে লিউলি-রাঙা ছোট হাত ।
ঘুন্নতে ঘতাম পাখীর বাসা, বাজত কাঁটায় অঙ্গুলি,—
টিউটিটে রঙ্ ঠিনটী ভিমে তা দিত সেই বুল্‌বুলি ;
পাতায় পাতায় সেলাই করে' বাঁধত বাসা টুনটুনি ;
ফুলের বৌএ নাতাল হয়ে বইত হাওয়া কাস্তুনি ।

বেলা-শেষের মেঘের ছায়া কাঁপত যখন পাহাড় গায়,
খানিক-আলো খানিক-কালো রঙ্-তামা এক আবছায়ায় ।
অদূর মাঠে বৃষ্টি-ঝরার শব্দ হঠাৎ কাছিয়ে আসে,
মোটা মোটা জলের ফোঁটা পড়ল এসে উত্তুরে বাসে ।
দুই জনারি মনটী খুসি—পশ্চিমে নীল মেঘের গায়
চোখ্-ঝলসা আলোর ঝিলিক্ চম্‌কে উঠেই মিলিয়ে যায় ।
রামের ধনু উঠ্‌লে ঘুরে ধরা মেঘের কোল্ ঘেঁসে,
কইতে প্রণয় দুহাত তুলে' কোন্ দেবতায় উদ্দেশে ?
দুজন মোরা দুইটী ধনু দেখতে পেতাম দু'জনায়,
অথচ ঠিক একটি বলেই ভুল করিতাম স্বপন-প্রায় ।
কই সে আলো ? নতুন রঙে আজকে মোদের চোখ্ ভরা ।
এই আমি আর সেই সে আমি উকাৎটুকু যায় ধরা ।
বুকের সাথি উঠ্‌লে বকে ডাকতে দিয়ে হাত-তালি,
"ফুল দিয়ে যা আমায় নখে, উল্টে যা তোর ফুল দামি ।"
দেখতে আমার মাটি-মেলা অবাক্ হ'তে-ছবির প্রায়,
ইচ্ছি ছুঁড়িলেও লাগত না যায়, টিকরে যেত মাটির গায় ।
লোহার মত বুকের পাটা, জোর ছিল এই কব্জিতে,
পাঞ্জা লড়াই, বাজের বাজী আস্‌তাম আমি সব জিতে ।
কিন্তু যে দিন বেরিয়ে যেতাম না দেখে ওই চোখ দুটি,
সে দিন আমার হারের পালা, শিথিল হ'ত এই মুঠি ।

একলাটি সেই ছিলাম বসে, চুপ্‌কাটি খেলার শেষে,
পাতাকাটা চুল্‌টি বেঁধে দাঁড়ালে মোর সাম্‌নে এসে ।
হাততালি দে' পায়রাগুলো উড়িয়ে দিলে মেঘের ভালে,
সন্ধ্যা তখন রঙ্ খেলিছে বাঁধলে মোরে অলক্-জালে ।
অঙ্গে তোমার নতুন জোয়ার আগ্‌লে রাখে আঁচল-বাস ;
অসঙ্কোচে বস্‌লে পাশে, কইলে কথা নাই তরাস ।
মোদের সনে কইত কথা প্রতিধ্বনির 'সুর-বাহার',
ফুল-ভরা ওই বাবলা-বনের আব্‌ডালে নীল নদীর পার ।

শুনতে তুমি বাস্‌তে ভালো রূপ-কথা সে মোর মুখে,
গাছ-চালানো ডাইনী বুড়ি, চুলগুলি লাল টুক্‌টুকে,
ঝিড়্‌ বিড়িয়ে মন্ত্র পড়ে' বাঁচিয়ে দিত পক্ষীর শব -
শিউরে তোমার উঠ্‌ত হিয়া, অশ্রুঘোটার কি উৎসব !
শুনতে সে কোন্ অচিন্ ঘাটে নামত এসে রাজার মেয়ে,
দুখের সুখুর কেনার তরে তরে তরে মৌকো বেয়ে ।

সে এক দূরন্ত ধোপুনিতে পাড়ার যত 'এয়ো' মিলে,
যাচ্ছিল মো জল সইতে—তুমি তাদের সঙ্গে ছিলে ।
হাস্‌ছিলে সো রাঙা ঠোঁটে চুন্ দিয়ে শাঁখের মুখে,
আধুখানু ফুল সাজে সেই তুলসে তুকান আমার বুকে ।
ঠোনা মেরে তোমার গালে কইল তোমার 'খোনাশ ফুল'
কি সব কথা—চুলোয় কাঁসে জড়িয়ে গেল কানের দুল ।
সেদিন থেকে কেমন যেন চোখ দুটী মোর এড়িয়ে যেতে,
চাপার গাছে উঠ্‌লে আমি রইতে না আর আঁচল পেতে ।
পরতে না আর ফুল-কাটা সেই শান্তিপুরে ডুরে শাড়ী,
জোৎস্নারাতে খেল্‌তে ঘুড়ি আস্‌তে না আর মোদের বাড়ী ।

মালা বদল্ হ'ল তোমার ফুল-ভরা এক ফাল্গুন-রাতে,
বাস্‌না হেরি আলোর সাথি চোখের জলের আয়নাতে ।
'ঘুন্‌লাতলা'র যখন তুমি পরাজিলে বরণ-হার,
আমার পানে করুণ আঁখি ফিরিয়েছিলে একটিবার ।

দুদিন পরেই খবর এল তোমার স্বামীর বিপদ ভারি,
সরিষি এক মাস্‌লা ঘেরে' মিলায় হ'ল জমীদারি ।

অপরা যত বলে' তুমি হলে' সবার লাঞ্ছিতা,
অবাঞ্ছিতা—উপেক্ষিতা—পতির সুখে বঞ্চিতা।

বিয়ের কথা উঠ্‌ল আমার, ভীষ্ম সমান করনু পণ ;
ঘুণাক্ষরেও জান্‌ল না কেউ কিসের ঘায়ে ভাঙ্‌ল মন।
খেলায় চলে' ছড়িয়ে ছিঁড়ে কিশোর-বেলার খেল্‌নাগুলো,
ঘর বাড়ী সব লাগ্‌ল ফাঁকা, তরল জীবন পথের ধুলো।
যৌবনেরি খেল্‌না তুমি, তোমায় যখন পাবার নয়,—
বেশ-পরবেশ সবই সমান,—কিসের ক্ষতি, কিসের ভয় ?
যেদিন আমি পালিয়ে গেলাম সেদিনও ঠিক এম্‌নি তালে
উড়িয়ে ধুলো ঘূর্ণি-হাওয়া ঘিরেছে খোলা শিউর ডালে।
তখন আমার মনের গতি আলোর চেয়েও চপল সে ;
ধাবোদেরের বানের চেয়েও আবেগ-তুফান প্রবল সে।
বল্গা ছিঁড়ে ছুট্‌ল আমার ক্ষিপ্ত প্রাণের তুরঙ্গ,
আছ্‌ড়ে পড়ে পাগ্‌লা-ঝোরার পাষাণ-ভাঙ্গা তরঙ্গ।—
কিছুতে আর মন বসে না, ছট্‌ফটিয়ে বেড়াই ঘুরে,—
তোমার চোখের রঙ্‌ দেখিলাম পুরীর সুনীল দুরদুরে'
জগন্নাথের রত্নবেদী করনু ঘিরে প্রদক্ষিণ ;
তোমার স্মৃতি চিত্ত জুড়ে ঘুচ্‌ই আমার কঙ্কণ ক্ষীণ।
চলে' গেলাম হরিদ্বারে, সেথায় যদি শান্তি পাই—
লুকায় হিমালয়ের শেখর, মোর বেদনার অন্ত নাই।
নেড়িয়ে ঘরু 'আয়াবলী' পড়ছিলাম সে পুষ্করে,
সেথাও তুমি সঙ্গ নিলে—এড়াই তোমায় কেমন করে ?
দাঁড়াইলাম ছায়াহারা কটা-রঙের পাহাড়-চূড়ে,
বুঝি আগুন তুবড়ি সমান উঠ্‌ছে বালির সাগর কুঁড়ে।
ঠিক আমারি বুকের মত ধক্ ধকায় ধূসর বেশ,
সেই আগুনের ছক্কা মাঝে সরস্বতীর সলিল শেষ।
আকাশকে সেই ধাক্কা দিয়ে ছুট্‌ছে 'আঁধি' কি খেয়ায়,—
হা ভগবান্, দুনিয়াখান তুল্‌লে এ কি ঘয়ণায় !

ছিলাম সে দিন বৃন্দাবনে, এলে স্বপন-বেলার ভেলে,
মাথায় তোমার ঘোম্‌টা শাদা, দাঁড়ালে মোর শিয়র হেঁসে।
ডাগর দুটি চোখের শাদায় রং ধরেছে কান্না-রঙে,
গাল দুখানি ক্ষয়ে' গেছে লবণ-চেউয়ের রসাঙ্গনে।
প্রভাত-শাদা থল-কমলের বৈজয়ন্তী-লাল আনুকূল্য—
অমৃতেরি বিদ্রূপেতে ভাঙ্‌ল হৃদয়, ভাঙ্‌ল মন।
চাইনু তোমার মুখের পানে—কে বলিল চাইতে নেই ?
সিঁদুরহারা তোমার সীঁথি—পড়্‌ল পলক চার চোখেই।
ঘর যখন দেখনু তখন জান্‌বে সেটা জান্‌ত কে ?
জাগত এই স্বপ্নটাকে সত্য বলে' মান্‌ত কে ?

সেলাম চলে' জবলপুরে নেহারিলাম সে 'ধুন্‌ধার',
নিম্নে শত ইন্দ্রচাপে মুক্তবেণী নর্ম্মদার।
পড়্‌ল হঠাৎ মনের চোখে ভৈরবী এক মূর্ত্তি ধরে'
আমার বুকের রক্ত-মাখা উড়িয়ে আঁচল ডাক্‌ল মোরে।
নিশ্বাসে তার পাহাড় হাসে—কণ্ঠে ঘোড়ুল অমার মালা,
সিঁদুর-ঢালা ত্রিশূল-কলায় রক্ত-উজল প্রদীপ জ্বালা।
কটাক্ষ তার চিরুয়ে ওঠে পাষাণ-কাটা সৈন্যে থেকে,
তর্জ্জনীতে তড়িৎ ছোটে—ওঠ কাঁপে আমায় দেখে।
শান্ত কণ্ঠার কণ্ঠ হতে বেগের আওয়াজ ঢুবিয়ে দিয়ে,
ছুট্‌ল আদেশ ঝড় বহারে—"যাও, ফিরে যাও আপন গৃহে।
কল্পনাতে ভাব্‌ছ তোমার বাধায় বেঁচল অভ্রভেদী,
ভাব্‌ছ বটে, মোটেই তা নয়, নয় গো কিছুই মর্ম্মভেদী।
দুঃখ সুখের দুইটা বেণী যুক্ত হ'য়ে এক-টানায়,
ছুট্‌ছে মহাকাল-সাগরে এক লহমার শ্রান্তি নাই।
যেখান থেকে বেরিয়ে আসে ইচ্ছাময়ের যত্নপ্রায়,
সেইখানে ফের যায় গো ফিরে, বুদ্‌বুদে সব মিলিয়ে যায়।
ভুলতে তারে পারবে কি এই উল্টো পথের পন্থী হ'তে ?
যাও গো ঘরে শান্তি-সুধা মিল্‌বে তোমার মায়ের কোলে।"

কাল্‌কে রাতে এইছি ফিরে সাতটী-গোটা বছর পরে,
লজ্জাতে মুখ তুল্‌তে নারি—বাজ্‌ল মাথায় চুম্‌তে ঘরে।
ডাক্‌নু—'দিদি',—কাঁদের মাতা—কিংশুকি কি রে পাগ্‌লা ছেলে !
দিদি যে তোর ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে, আমায় ফেলে।
নিলাম মায়ের পায়ের ধুলো, নেই সে জ্যোতি পিতার চোখে,
অশ্রুপাতের শব্দ শুনি' গল্‌ছে পাথর ঘাসও শোকে।
এক রাতে তাঁর চুল পেকেছে যে দিন আমি পর হেড়েছি—
পড়্‌ল মনে সেই চিঠিখান মনের ভুলে ফেলে গেছি।
বাপের পরে নাম্‌লী তোমার লিখেছিলাম কি কুক্ষণেই,—
ভালবাসার কবুল জবাব ছাপ্‌ছিল যা মনের কোণেই।
মন্দ ভালোর হিসাব নিতে চাইবে তুলাদণ্ড ধরে,'
ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে দিয়েই গঙ্গাধারা যায় সাগরে।
আজ কি আমি বুঝ্‌তে পারি ঘট্‌বে কি মোর কাল সকালে ?
সর্ব্ব আমার ডুবিয়ে রাখে অহমিকার অন্ধকারে।
আলোর পুঁথি সাম্‌নে খোলা, বুঝিনে এক বর্ণ তার,
চুকল শুধু কজ্জে কুঁড়ে' অতল-পরশ অন্ধকার।—
বালিকরার ঘাসগুলি সব পাগ্‌লা-গারদ রেওয়াল-গায়
দেখ্‌ছি আঁকা ছবির মত পুরাণো কোন্ আলোক-প্রায়।
রূপ দিয়ে সে রসের লীলায় অমৃত কোন্ কুম্ভকার
গড়্‌ছে সজীব মাটির পুতুল ঘুরিয়ে কুলাল-চক্র তার ?
ঘুম পরে ঘুম চল্‌ছে পড়ন, করছে বহু আপ্‌নারে
কোন্ অজানা রহস্যময় যবনিকার পর-পারে।

মৃত্যু-জীবন চলিবে বোক' এই মগজের সাথে নয়,
রাসায়নিক পায় না 'থিসিস্' পরাজয়েই ভাবছে জয়।
বৈজ্ঞানিকের উচ্চ গণিত ছুইতে মাথা কহনায়,
অচিহ্নিতে খোটাকেতক চিহ্ন দিয়েই চিন্‌তে চায়।
হচ্ছে জ্ঞানের জাহাজ-ডুবি, বল্‌ছে শেষে 'একটা কিছু'
এই জগতের খোড়ায় আছে,—মৃত্যু মলাট হয় যে নীচু।
আছেই আছে একজনা কেউ, এমন বিষয় এ শূন্যতা
আপনা হতে সম্ভবে না, ঠিক যে কি তা যায় না বলা।
এইখানে সে বুকে দাঁড়াচ—এইখানে সে ধের সো দাঁড়ি।
কিন্তু কাঁচা এই মোহানায় অপার-পারে দেয় রে পাড়ি?
বিশ্বাসে হাত দৃঢ় করে দূর অনন্ত রূপের কাছে
কম্পে তারা ঘুইয়ে ভাবু অথৈতেরি ধরণ যাচে।
চোখের জলে গল্‌ছে পরাণ, দাও সো যাহা ইচ্ছা যাব,—
ছাড়িয়ে ডাকা উঠ্‌ছে ধরার পীত দিবস, তিমির রাত।
উঠ্‌ছে তারা দাঁড়ের ছেলে ঐ আকাশের নীল বিষাদ,
পুণ্য-পাপের ঘাত-প্রতিঘাত পায় না নাগাল তাদের আর।
আজ্‌কে তুমি চিন্‌বে কি আর? বল্‌ছে সব লাভ বছরে,
সাতটী বছর ভুলতে তোমায় ঘুরছ যেন দেশান্তরে।
চোখের তুমার নও সাথীর আজ্‌কে তুমি রূপ-মতি,
দেহের ক্ষুধার খাদ্য নয়, নাই কামনা এক রতি।
মন্ত্র বিলাস চিন্তা তোমার—তোমার প্রেমেই মুক্তি মোর;
দানে আরো বিরাট্ ক'রে দিল তোমার প্রেম-সাগর।
ডুব দিয়ে ওই রূপের চেউয়ে অকূল খেয়ায় যাই ভেসে,
পৌঁছে কাণে জগৎ-প্রেমের ঘুমুর্‌ঘুরের ডাক এসে।
জগৎ ছুখের ধাক্কা লেগে ঘরছ-ব্যথায় তরল বুক,
দেখ্‌ছ রূপের ঘুমোর-ঘসা কান্ত তোমার দিব্য মুখ।—
সৃষ্টি-চাকা অগ্নি-অচল দিনান্তেরি আলোয় লাল—
উথলে ওঠে বুকের তলায় তপ্তনিখর ঢেউএর তাল।
ছড়িয়ে পল তোমারি প্রেম, ছড়িয়ে পল সকল ঠাঁই—
সেই অমিতার সাগর-স্রোতে সুধার বেখার সংখ্যা নাই।

বাঙ্গালার কথা

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

চাকুরিজীবীর দুঃখ :—

এই যুদ্ধের পূর্ব্বে যে টাকায় আমাদের সংসার চলিত, এখন প্রায় তাহার দ্বিগুণ অর্থ খরচ না করিলে সংসার চলে না।—সহরবাসী গরীব গৃহস্থের পক্ষে সংসার চালানো এখন বাস্তবিকই বিষম দায় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু একথা ভাবিতেছে কে?—কলিকাতার কয়েকটি রেল-অফিসে ও মার্চ্চেণ্ট্ অফিসে অস্থায়ভাবে কর্ম্মচারিগণকে যৎকিঞ্চিৎ দিবার ব্যবস্থা সম্প্রতি হইয়াছে বটে; কিন্তু বাঙ্গালা-গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কর্ম্মচারীদের জন্য কতটুকু কি করিয়াছেন?

এই কয় বৎসরকাল ক্রমাগত কলিকাতার মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা কেমন ভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহ জানেন বলিয়া মনে হয় না। প্রায় বৎসর তিন পূর্ব্বে স্যর আর, এন্, মুখার্জ্জি বলিয়াছিলেন যে, 'একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক স্ত্রী-পুত্র লইয়া কলিকাতা সহরে পঞ্চাশ টাকা আয়ে বেশ ভদ্রলোকের মত (Decently) বাস করিতে পারেন।'—মুখার্জ্জি সাহেবের এই কথাটা বাঙ্গালার আমলা-সম্প্রদায় সম্ভবতঃ নকীয় করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু উহা যে কতদূর অসত্য তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গালা-দেশে যদি সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী কেহ থাকে, তবে কলিকাতার এই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-সম্প্রদায়। সামাজিক মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য তাহাদের করিতে হয় সব,—কিন্তু প্রতি কার্য্যেই তাহাদের বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘ নিঃশ্বাস শুনিতে পাওয়া যায়। আধপেটা খাইয়া, কাপড়-জামার অভাব দূর করিয়া তাহারা যে ভাবে জীবন যাপন করে, তাহা মোটর-বিহারী বাবুরা কেমন করিয়া বুঝিবেন?—বিলাস-সাগরে যাঁহারা নিমগ্ন, কেমন করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, তাঁহাদেরই প্রত্যেক বিলাস অনুষ্ঠানের প্রতি অঙ্গে দরিদ্রের চোখের জল—ব্যথিতে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস জড়ানো-মাখানো আছে?

পূর্ব্বের তুলনায় এখনকার খরচ-পত্র যে অনেক বাড়িয়াছে, সে কথা যাহার চক্ষু আছে, সেই স্বীকার করিবে। খাদ্যদ্রব্য হইতে আরম্ভ করিয়া কাঠ-কয়লা-কেরোসিন পর্য্যন্ত প্রায় সকল নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যই অধিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর, বাটীভাড়া, জামা-কাপড়ের দাম প্রভৃতি ক্রমশঃই অসম্ভবরূপ বাড়িয়া যাইতেছে। কলিকাতায় বাস করিতে হইলে একটি ক্ষুদ্র পরিবারের পক্ষে পঁচিশ টাকা ভাড়ার কমে একটা বাসোপযোগী বাটী পাওয়া দুর্ঘট। একমাত্র ভৃত্য বা দাসী রাখিতে হইলে অন্ততঃ পাঁচ টাকা বেতন না দিলে তাহা জুটে না। বাকী কুড়ি টাকায় এখনকার দিনে তিন চারিজনের খোরাক চলে কি? ইহার উপর, কাপড় জামার খরচ আছে, ছেলেদের লেখা-পড়া শেখানোরও ব্যবস্থা করিতে হয়। স্যর আর, এন্, মুখার্জ্জি যে কি বিচার-বিবেচনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—পঞ্চাশ টাকা আয়ে একটা পরিবার বেশ ভদ্রলোকের মত সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট ঐ কথাটার উপর নির্ভর করিয়া একবার রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের এত

কথা বলিতে হইতেছে। আমরা উপরে যাহার যে একটি মোটামুটি তালিকা দিলাম, তাহার অযৌক্তিকতা কেহ প্রমাণ করিতে পারেন কি? যদি তাহা না পারেন, তবে গরীব কেরাণীকুলের চোখের জল মুছ করিবার জন্য কেহ একটিও কথা কহিতেছেন না কেন?—দেশীয় সংবাদপত্র সকল এ সম্বন্ধে নীরব কেন? ব্যবস্থা-পরিষদ বা হোমরুলের জন্য যত পার চীৎকার কর, বারণ করি না; কিন্তু জাতির যাহারা মেরুদণ্ড—দেশের যাহারা সর্ব্বস্ব, তাহারা যে আজ ধ্বংসের পথে ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতেছে, একথা কি কেহ একবার ভাবিয়া দেখিবেন না? এ বিষয়ে সমবেষ্টের চেতনা জাগ্রত করিবার জন্য কি বাঙ্গালার কোনও নেতা, কোনও স্বদেশ-প্রেমিক বন্ধুপরিকর হইবেন না?

গোঁড়ামি,—না ভীঁড়ামি?

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত কোনও কোনও হিন্দু যুবক বাঙ্গালার কোনও কোনও স্থানে সমাজ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইতেছে শুনিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। দেশের এ মহা দুর্দ্দিনে এমন দুর্বুদ্ধি যে কাহারও মনে জাগিতে পারে, তাহা আমাদের ধারণা ছিল না।

হিন্দুর পক্ষে সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ—এই ধুয়া ধরিয়া যাহারা বিদেশ-প্রত্যাগত বাঙ্গালী সৈনিককে সমাজের গণ্ডীর বাহিরে রাখিতে চায়, তাহাদের বুদ্ধির শুধু দোষ দিই না,—তাহাদিগকে দেশের ও জাতির মহাশত্রু বলিয়াও বিবেচনা করি। জাতিকে সকল রকমে বড় করিয়া তুলিতে হইলে তাহার সমর-শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সামরিক শিক্ষাই মানুষকে আত্ম সংযত করিয়া তুলে—যথার্থ মানুষ নামের যোগ্য করিতে পারে। ভাগ্যক্রমে সে শিক্ষা লাভের অবসর যখন অনেক সাধ্য-সাধনার পর আমাদের ঘটিয়াছে, তখন সে পথে যাহারা বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য কণ্টক রোপণ করিতে চায়, তাহাদিগকে দেশের ও জাতির শত্রু ভিন্ন কি বলিব?—এতগুলি তেজস্বী, বীর ও জাতির মুখোজ্জ্বলকারী যুবক যদি সমাজ হইতে বিতাড়িত হয়, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের কি মঙ্গল হইবে?

মনে পড়ে, প্রায় এগার বৎসর পূর্ব্বে, এই বাঙ্গালা দেশ হইতে একদল যুবক শিল্প শিক্ষার জন্য যখন জাপান ও আমেরিকা যাত্রা করে, তখনও দেশে ঐ হেঁদুয়ানীর হাওয়ার উঠিয়াছিল! তাহা দেখিয়া তখন শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"আমরা সকলে স্বদেশীর বিস্তারকে জাতির জীবন রক্ষার মুখ্য উপায় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, বিদেশ যাত্রা নিষিদ্ধ হইলে সেই বিস্তার হওয়া দুঃসাধ্য। যাঁহারা শিল্পশিক্ষার জন্য বিদেশে যাইবেন, তাঁহারা দেশের মঙ্গলার্থে এবং সমাজ পুষ্টার্থে বিদেশ-যাত্রা করিবেন,—পুণ্য কার্য্যে ধর্ম্ম কার্য্যে ব্রতী হইয়া যাইবেন। কোন্ মুখে সমাজ এই কার্য্যকে পাপ কার্য্য বা সমাজচ্যুতির উপযুক্ত কুকর্ম্ম বলিবেন? কোন্ মুখে উৎসাহী যুবকবৃন্দকে এই মহৎ চেষ্টায় নিযুক্ত করিয়া সেই আজ্ঞা পালনের পুরস্কার না দিয়া বিষম সামাজিক শাস্তিতে দণ্ডিত করিবেন? যুক্তির দিক দেখিতে গেলে বিদেশযাত্রা নিষেধের পক্ষে কোনও যুক্তি পাওয়া যায় না। শাস্ত্রের দিক হইতেও বিদেশ-যাত্রার কোনও অলঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধক হয় না। শাস্ত্রের দু একটি শ্লোকের দোহাই দিলে চলে না, শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও আর্য্য সমাজের পুরাতন প্রণালীও দেখিতে হয়। অতি অর্ব্বাচীনকাল পর্য্যন্ত বিদেশযাত্রা ও সমুদ্রযাত্রা বিনা আপত্তিতে চলিত, আর্য্য সাহিত্যে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন সমাজ রক্ষা ও আচার রক্ষা কঠিন হইয়া উঠে, তখন ব্রাহ্মণদের পরামর্শে সমুদ্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হয়। এইরূপ বিধান কালদুষ্ট, কালে নষ্ট হয়,—সনাতন প্রথা হইতে পারে না। যত দিন জাতি ও সমাজ তাহা দ্বারা উপকৃত ও রক্ষিত হয়, ততদিন সমযোপযোগী বিধান থাকে; যে দিন জাতির ও সমাজের বিকাশ ও উন্নতির অন্তরায় হইয়া যায়, সেদিন হইতে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।"—এই কথাই খাঁটি কথা। ইহার জবাব নাই। ব্রাহ্মণ যুগেরও সেখাতেও ঐ কথা দেখিতে পাই। ব্রাহ্মণ বঙ্কিমচন্দ্রও ঐ ধরণের কথা বলিয়া গিয়াছেন। এমন কি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথের লেখাতেও ঐ যুক্তিরই জের দেখিয়াছি। বাহুল্য ভয়ে, সে সব আর উদ্ধৃত করিলাম না। কাজেই বলিতে হয়, যাহারা বাঙ্গালী সৈনিককে সমুদ্র-যাত্রার জন্য সমাজ চ্যুতির ভয় দেখায়, তাহারা ভণ্ডমাত্র। তাহাদের এ অভিনয় গোঁড়ামির ফল নহে, ভীঁড়ামিরই ফল। সমাজের গণ্ডী হইতে যদি কাহাদিগকেও দূরে রাখিতে হয়, তবে এই ভণ্ডদিগকেই সে শাস্তি সর্ব্বাগ্রে দেওয়া কর্ত্তব্য। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—"সবার বড় শত্রু সে—যে ভয় করে সে ভণ্ডেরে।"

তবে সুখের কথা এই যে, ঐ ভণ্ডামির মূলে কুঠারাঘাত করিবার উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহে সম্প্রতি এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। সেই সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সঙ্কল্প গৃহীত হয়:—

"যে হেতু যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত কতিপয় হিন্দু যুবক সমাজ কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে নিগৃহীত হইতেছে এবং এবম্প্রকারের ব্যবহার সৈনিক সংগ্রহের পক্ষে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে, এবং যে হেতু হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হইতে অনেক যুবক সৈনিক বিভাগে যোগ দিয়াছেন এবং পরেও দিবেন—সেই হেতু এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, এই সকল সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনকারী যুবকগণ যখন এদেশে ফিরিয়া আসিবেন, তখন তাহাদিগকে অবাধে সমাজে গ্রহণ করা হইবে এবং তাহাদের সহিত পূর্ব্ববৎ আচরণ এবং ব্যবহার করা হইবে।"

বলা বাহুল্য, ময়মনসিংহ সহরের শিক্ষিত হিন্দু-সমাজ এই সঙ্কল্প সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। ঐ ভণ্ডামি-ব্যাধির ইহা একটা প্রতিষেধক ঔষধ বটে। বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে এই নীতির অনুসরণ হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব,—আশ্বস্ত হইব।

তুলা ও চরকা:—

বাঙ্গালার এমন একদিন ছিল, যখন বাঙ্গালার সকল অধিবাসীই—

উচ্চ-নীচ-ভেদে সকল বাঙ্গালী পরিবারই তুলা হইতে সূতা তৈয়ারী করিত, এবং কার্পাসের চাষের প্রয়োজনীয়তা বুঝিত।—তখন প্রত্যেক বাঙ্গালী সংসারেই একাধিক চরকাও থাকিত। স্ত্রীলোকেরা গৃহস্থালীর কাজ শেষ করিয়া চরকায় সূতা কাটিত, এবং সেই সূতা তাঁতীদিগকে বিক্রয় করিয়া টাকা অথবা সেই সূতার বদলে কাপড় তৈয়ারী করিয়া লইত। একটা নিয়ম ছিল যে, প্রত্যেক পরিবারকে অন্ততঃ সেই পরিবারের এক বৎসরের ব্যবহারোপযোগী কাপড়ের সূতা কাটিতে হইবে। এই নিয়ম জাতি-নির্বিশেষে প্রচলিত ছিল। এই নিয়ম ছিল বলিয়াই মনে হয় বাঙ্গালার বস্ত্র-শিল্প একদিন জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল। চরকা তখন এতটাই মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইত যে, বিবাহের সময় কন্যাকে উহা যৌতুকস্বরূপ দেওয়া হইত। বাঙ্গালার স্ত্রীলোকেরা এই মাতৃস্থানীয় সম্পত্তিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেন,—

চরকা আমার ভাতার-পুত,
চরকা আমার নাতি;
চরকায় দৌলতে মোর
ঘোরে বাঁধা হাতী।'

—কিন্তু এ সব কথা এখন গল্প-কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। সে বাঙ্গালীর মেয়েরাও নাই, সে বাঙ্গালা দেশও নাই! তখন যাহা স্বপ্নের অগোচর ছিল, তাহাই আজ ঘটিতেছে।—বস্ত্রের অভাবে যে এ দেশেই লোককে আজ লজ্জার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মৃত্যুর শরণাপন্ন হইতে হইবে, কে তখন ভাবিয়াছিল?

যাহা হউক, বিপদ ও নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারের মধ্য হইতেই মনে হয় মানুষের অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হয়। আমাদের চোখ ফুটিয়াছে কি না ঠিক বলিতে পারি না; তবে অভাব ও বিপদের বৃশ্চিক দংশন জ্বালা যে আমাদের মনে একটু চাঞ্চল্য—একটু সজীবতা আনিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। এই সজীবতার লক্ষণ বাঙ্গালার স্থানে স্থানে নানা আকারে দেখা দিতেছে। দেখিয়া সুখী হইলাম, খুলনা অধিবাসিদের মনে সূতা তৈয়ারী ও কার্পাস চাষের ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে। "খুলনাবাসী" খবর দিতেছেন,—

"খুলনার রেলওয়েবোর্ডের টেকনিকেল স্কুলে ছুতার-মিস্ত্রির কার্য্য উঠাইয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে বয়নবিদ্যা শিক্ষার ক্লাস খোলা হইবে। ইহার জন্য একটী শাখা কমিটি স্থাপিত হইয়াছে। ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট হৃষিকেশ লাহেব ময়মনসিংহ রেলের বন্দরঘাটের প্রতিকার-নির্ণয়ের জন্য ময়মনসিংহ রেলবোর্ডের সভাগৃহে এক সভা করিয়াছিলেন। সভায় স্থির হইয়াছে,—রেলের চাষীগণ যাহাতে উপযুক্ত জমি পাইলেই কার্পাস চাষ করে এবং সূতা কাটিবার জন্য চরকা ব্যবহার করে, তাহারই ব্যবস্থা এখন বিশেষ আবশ্যক। কার্পাস চাষ-ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে রেলবোর্ড কার্পাস বীজ বিতরণের জন্য অর্থব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রকাশ,—মধুপুরগড়ের বিস্তৃত জঙ্গলা জমি এবং উত্তরে পাহাড় অঞ্চলে প্রচুর কার্পাস জন্মিতে পারিবে। এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য বিস্তর কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য রেলবোর্ডেরও এক্ষণে এইরূপ ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক।"

এ দিকে এ অঞ্চলেও মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় দেশে তুলার চাষ ও চরকার প্রচলনের জন্য এক আবেদন পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে দেখিলাম, কলিকাতার 'বিদ্যাসাগর বাটীতে' তিনিও এক 'কার্পাস-কৃষি-কমিটি' স্থাপন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—

"দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মহোদয়গণ এই কমিটির অধিবাসক। তাঁহাদের অনুগ্রহে কমিটী দেশময় তুলার চাষের ও চরকায় সূতাকাটা পুনরুদ্ধারের পুনঃ প্রবর্ত্তন দ্বারা সূতা প্রস্তুত করিয়া কাপড় বুনাইয়া উচিত মূল্যে সরবরাহ করিয়া, দরিদ্র ও বস্ত্রবিহীন গৃহস্থদিগের কাপড়ের অভাব ও লাঞ্ছনা নিবারণ করিবার জন্য মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এবং ক্ষুদ্র আমি, আমার অকিঞ্চিৎকর জীবন এই লজ্জানিবারণ মহাব্রতের সফলতায় উৎসর্গ করিয়াছি। গত বৎসরের তুলা কিনিয়া চরকায় সূতা কাটাইতেছি। হয় মাসের মধ্যে, দরিদ্র ভাই ভগিনীদিগকে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পরাইয়া, আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ করিতে প্রাণপণ করিয়াছি।"

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দৃষ্টান্ত দেশে দেশে অনুসৃত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। নহিলে, এ, দারুণ বস্ত্র সঙ্কটের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর উপায় নাই।

অভিভাষণ

[শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ চৌধুরী এম-এ, নাইট]

(বাগেরহাট শিক্ষা-সম্মিলনীর সভাপতিরূপে)

সমবেত মহোদয়গণ,

আপনারা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া আহ্বান করিয়াছেন, আমি আনন্দ সহকারে আসিয়াছি। আপনারা যেরূপ আদর ও যত্ন করিতেছেন, তাহার জন্য আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি; কিন্তু তার সঙ্গে যেরূপ সম্মান করিয়াছেন, তাহাতে আমি লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়াছি। তাহা আমার পক্ষে অতি-সম্মান, বিশেষ যখন মনে করি যে, আমার পূর্ব্বে দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় আপনাদিগের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে আমার স্থান উপযুক্ত নহে। আজ আমাকে মাস্তবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার যশোহর-খুলনার মূল্যবান ইতিহাসখানি দান করিয়াছেন। তিনি রায় মহাশয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। তাহাই আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেছি।

"যিনি বিজ্ঞান-চর্চ্চায় ও পাণ্ডিত্য-গৌরবে সমগ্র সভ্য জগতে যশোভূষিত হইয়াছেন, যিনি বিদ্যোৎসাহিতায় ও দান-শৌণ্ডিকতায় বঙ্গদেশে অদ্বিতীয় দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর বলিয়া বরণীয় হইয়াছেন, যাঁহার বালসুলভ সরল প্রকৃতি, বীরোচিত মনস্বিতা, দরিদ্রতুল্য সামান্য জীবিকা এবং ঋষিতুল্য উচ্চ চিন্তা ভারতের প্রাচীন উচ্চ আদর্শের জীবন্ত দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছে, সেই চিরকুমার, তাপস-ব্রত, স্বজাতিকুল-তিলক যশোহর-খুলনার অকৃত্রিম বন্ধু ও খুলনার অধিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, D. Sc, Ph. D., C. I. E., F. C. S."

এইরূপ লোকের পার্শ্বে আমার স্থান নহে। আবার শিক্ষক-মণ্ডলীর সভাপতিত্ব আমার পক্ষে উপযুক্তও নহে। আমি শিক্ষক নহি—শিক্ষক হইবার শিক্ষাও কখন পাই নাই। তবে নিতান্ত, আমি আসিলাম কেন? তাহার দুইটী উত্তর আছে। প্রথম ও প্রধান কারণ, আমি আমাদের ছাত্রবৃন্দকে নিতান্ত আপনার মনে করি। তাহারা দেশের আশা, আমাদিগের গৌরবের পাত্র। তাহাদের জন্য যাহা কিছু করিতে পারি, তাহা একান্তই করা কর্ত্তব্য মনে করি, সেই জন্যই আসিয়াছি। আমাদের ছেলেরা বুদ্ধিমান সকলেই বলে; কিন্তু তাহারা যে সব বিষয়ে কত ভাল, তাহারা কত সদ্গুণ, স্নেহনম্রতাময়, পরের সেবা করিতে সতত প্রস্তুত, তাহা বাহিরের লোকে জানে না। তাহাদিগের এই সদ্ভাবগুলির সদ্ব্যবহার যাহাতে হয়, তাহা আমাদের করণীয়। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় কিছু জানি। অনেক ছাত্র দেশ-বিদেশে দেখিয়াছি। বাঙ্গালীর ছেলের মত সুন্দর চরিত্রবান ছাত্র অন্য স্থানে দেখি নাই। নিজের বলিয়া বোধ হয় তাহাদিগকে বিশেষ আদরের চক্ষে দেখি; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারা দেশকে গৌরবান্বিত করিবে। তাহাদের সাহায্য করা আমাদিগের ধর্ম্মের মত কর্ত্তব্য জ্ঞান করা উচিত। সেই জন্য আসিয়াছি। সকলেই কিছু না কিছু করিতে পারি; সেই সাহসের উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছি। তাহা ভিন্ন, আপনারা শিক্ষার বিষয় কি ভাবিতেছেন, তাহাও জানা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া আসিয়াছি।

আর কিছু বলিবার পূর্ব্বে, অন্য একটী কথার জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করি। আপনারা মার ভাষাতে কার্য্য চালাইবার নিয়ম করিয়াছেন, তাহারই জন্য ধন্যবাদ। ঘরের কথা পরের ঘরের ভাষায় কহা অন্যায় বলিয়া আমার মনে হয়। তাহাতে বাহিরে ঢাক পেটানর ভাব আসিয়া পড়ে। নিজের ঘরের কথা ঘরের ভাষায় করাই উচিত। House topsএর ভাষা, ঘরের চালের উপর দাঁড়াইয়া চীৎকার তাহার উপযোগী নহে। তবে আমাদের অনেকেই নিজের ভাষা আদর করিয়া শিক্ষা করেন নাই। নিজের মাকে মা বলিয়া ডাকিতে যে পারে না, সে মানুষই নহে। পিতাকে "গাডর্ণর" ও নাতাকে "মাম্ম" বলা ঘৃণা। তবে কোন-

কোন পরিবারে ইহাই এক কালে চলিয়াছিল। তখন নাম-বানানে বিদেশী চেহারা দিবার জন্যও অনেকে সচেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল সে ভাবটা চলিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য দেবতাকে প্রণাম করা উচিত। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা শিখি না। আজকাল বাঙ্গালাতে কিছু পরীক্ষা হইতেছে মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী বাটীতে বাঙ্গালা সম্বন্ধে প্রস্তরে খোদিত এই কয়টী কথা দেখিতে পাওয়া যায়—"মা সংমার ঘরে স্থান পাইয়াছেন" (in the step-mother's hall) মার ঘরে সংমার স্থান না হওয়াই উচিত। তবে যদি সংমা থাকেন, তাঁহার স্থান মার ঘরে হইলে তত দোষের হয় না। তবে মার স্থান সংমার ঘরে হইয়াছে মনে করিলে, মাথা নীচু হইয়া পড়ে। সেই জন্যই আমাদের মধ্যে অনেকেরই এইটা মনে হইয়াছে যে, বাঙ্গালার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাষা বাঙ্গালা হওয়াই উচিত। মার স্থান সর্ব্ব প্রথম—সংমার স্থান তাঁহার নীচে,—ইহা তোমার-আমার সর্ব্বদেশে, ঐ একই কথা। বিলাতে French কি German ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা করিবার কথা একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি। কখনও সম্ভব ছিল কি না। আমার ত মনে হয়, বাঙ্গলায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাষা বাঙ্গলা না হওয়া কলঙ্কের কথা। আমার মাকে মা বলিয়া ডাকিব, তাহাতে অপরের কি বলিবার থাকিতে পারে? তবে আমরা তাড়াতাড়ি খানিকটা ইংরেজী শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। করিয়া খাইবার জন্য চাকুরীর প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। বিশ্ব-বিদ্যালয়েও ইংরেজীর স্থান প্রধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু চিরদিনই তাহা থাকিবে কেন? দেশের মান চাও, গৌরব চাও, স্বায়ত্ত-শাসন চাও, আর নিজের ভাষাকে সংমার ঘরে স্থান দিবে, ইহা লজ্জার কথা। এইখানে একটী কথা মনে হইল; তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি। জাপানের বিখ্যাত লেখক "ওকাকুরা" (Okakura) কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিলেন; অনেকদিন এখানে ছিলেন। তাঁহার সহিত আমাদের জন-কয়েকের কতকটা ঘনিষ্ঠ ভাব হইয়াছিল। তাঁহাকে আমরা ইংরেজী কায়দায় সম্মান করিবার জন্য Dinner দিই। তাহাতে আমাদের কেহ-কেহ বড় বড়, সুন্দর ইংরেজী ভাষাতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ওকাকুরা একজন বড় লেখক। ইংরেজী ভাষার উপর তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। কিন্তু উত্তর দিবার সময় তিনি বলেন, "আমি ইংরেজিতে আপনাদের মত সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিব না। কিন্তু তাহার জন্য আমি লজ্জা অনুভব করি না। ইংরেজি আমার ভাষা নহে, আমার রাজার ভাষা নহে। ঈশ্বর করুন, আপনাদিগের মত পরের ভাষা অত সুন্দর শিখিতে আমাদের কখনও যেন প্রয়োজন না হয়।" তবে কথা এই যে, আমরা কতদূর পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা চালাইতে পারি। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বলেন যে, I. A., I. Sc., পর্য্যন্ত সব বিষয় বাঙ্গালাতে চলে। অন্য অনেকেরও সেই মত। আমারও তাহাই মনে হয়। ক্রমে বাঙ্গালাকেই শিক্ষার জন্য উপযোগী করা উচিত। কিরূপে তাহা হইতে পারে, আপনাদিগের আলোচনার সময় তাহা জানিতে পারিব আশা করি। ইংরেজী বিদ্যালয়ে French ও German text-book পড়িতে ক্রমান্বয়েই বলে। আমাদেরও ইংরাজী text-book পড়িতে কোন বাধা হইতে পারে না। Text-book ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় ও ইংরেজী শিক্ষকের উপদেশ বুঝিতে পারা যায়, তাহার জন্য যথেষ্ট ইংরাজী শিক্ষা করা উচিত। তাহা ইংরেজীকে Second Language করিলেও হইতে পারে।

ইংরেজী শিক্ষকের কথা বলিলাম; কিন্তু আমার মনে হয় যে, প্রধানতঃ আমাদের শিক্ষা আমাদের দেশের লোকের নিকট হইতে হওয়া উচিত। যাঁহারা আমাদের আপনার, তাঁহারাই শিক্ষকের উপযুক্ত। ডাক্তার রায়কে দেখুন। তিনি ভিন্ন অন্য অনেক উপযুক্ত লোক দেশে আছেন। তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা উচিত। না থাকিলে প্রস্তুত করা উচিত। যদি দেশকে সব বিষয়ে আপনার করিয়া তুলিতে চাও, তবে তাহাই করিতে হইবে। সেই জন্য জিজ্ঞাস্য, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য কি? উত্তর দেওয়া কঠিন। উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। University Commissionএর প্রথম প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছি, তাহাই আপনাদিগকে শুনাইতেছি। কলিকাতা ও অপর অঞ্চলের শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁহারা ভাল জানেন ও শিক্ষা কার্য্যে লিপ্ত আছেন,

তাঁহাদিগের অনেকেই আমার সহিত একমত বলিয়া আপনাদিগকে জানাইতেছি।

Q. Do you consider that the existing system of University Education affords to young Indians of ability full opportunity of obtaining the highest training? If not, in what main respects do you consider the existing system deficient from this point of view?

A. I do not. Training depends upon what one is being trained for; but the existing system is without an ideal, or a definite ultimate aim. The country wants education to enable the people to stand on their own legs in every respect, "to prepare them for complete living," to develop their work-power and character-power; to give them all round strength. A system originally meant for obtaining efficient clerks, and now, to a limited extent, for vocational works, is failing to meet the progressive needs of our people. Our University has failed to appreciate that it ought to help the process of nation-building. "It is not inspired by motives which answer to deeper things in human aspiration." It is not based upon things which lie close to the hearts of our people. It has little regard for our permanent environments. It is a make-shift and without a corporate life. It has not been allowed sufficient freedom of growth.

Its utility is doubted and it is viewed with suspicion, as tending to disloyalty. Educational institutions are now subjected to undue political surveillance. There is want of a sufficient number of proper teachers. In Govt. Colleges the foreign element is placed on an undeserved and undesirable basis of superiority. The Indian teacher occupies an inferior position. It is believed that benefaction which favour the employment of Indian teachers even of undoubted merit and ability are not adequately supplemented by Govt. grants. They are not sympathetically treated, and the work suffers in consequence. Most of the teachers are too poorly paid. It does not seem to have been realised that the teacher ought to be freed from pecuniary anxiety so as to be able to consecrate his life to his work.

আমাদের শিক্ষা উচ্চ লক্ষ্য-বিহীন। মানুষ করিয়া তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরূপ কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। আত্মনির্ভরতা—নিজের ভার সম্পূর্ণরূপে নিজে বহন করিতে হইবে—এই মহাশিক্ষার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। কার্য্যবল, চরিত্রবল, সর্ব্বাঙ্গীন বল যাহাতে পাওয়া যায়, তাহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কেরানী কিম্বা আইন-ব্যবসায়ী হইবার উপযুক্ত শিক্ষা উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে। দেশ দিন-দিন:অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, অনেক নূতন জিনিসের প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে; সে প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা চলিতেছে না। আমাদের জাতিকে জাতীয় ভাব শিক্ষা দেওয়া, আমাদিগকে nation করিয়া তোলা, শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মানব-প্রকৃতির যে গভীর ভাবগুলি আছে, তাহার বিকাশ করা, মানব-হৃদয়ের যাহা সর্ব্বোচ্চ আশা তাহাই পরিপূর্ণ করিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহা নিতান্ত আমাদের মর্ম্মের ভিতর, তাহারই প্রকাশ প্রয়োজন। দেশের অবস্থা, চারিদিকে আমাদিগকে যাহা ঘেরিয়া রাখিয়াছে, তাহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। যাহা চিরদিন আমাদিগের থাকিবে, যাহা ছাড়িয়া আমরা যাইতে পারিব না, যাহা আমরা কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিব না, তাহা বিবেচনা করিয়া শিক্ষা-প্রথা প্রচলিত হওয়া উচিত।' এই কথা আমার মনে হয়।

ছাড়া ছাড়া না হইয়া, আমাদের আশা ভরসা, যাহা কিছু সম্বল, আমাদের কাছে তাহা একীভূত হওয়া উচিত। তাহারই জন্য শিক্ষা করিতেছি—জীবনের শেষ কক্ষা কি তাহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেছি—ইহাই মনে রাখা উচিত।

Emerson এর কথায় "Education should be as broad as man"—মানব-জীবন যতটা প্রশস্ত, শিক্ষারও ততটা প্রসার হওয়া উচিত। মানব-জীবনের একটা চরম উদ্দেশ্য আছে, যাহাকে ধর্ম্ম বলা যায়। সে ধর্ম্মের ভাব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথায়? হিন্দুর হৃদয় ধর্ম্মভাবপূর্ণ, আমাদের শিক্ষায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায় কি? তাহার কোন বিকাশ হইয়াছে কি? তাহা প্রকাশ হইতে পায় কি? না, তাহা একেবারে প্রচ্ছন্ন ও লুক্কায়িত হইয়া পড়িয়াছে। আমার বিশ্বাস যে, দেশের ধর্ম্মভাব মরিয়া যায় নাই, তাহা নিদ্রিত অবস্থায় আছে। জাগাইয়া দিতে সময় লাগে না; তবে ঘুম পাড়ান কর্ত্তব্য নহে। কবি বলেন "বিষয় বালিসে অলস রেখো—সজাগ থেকো ঘুমায়ো না।" এ দেশে শিক্ষা-দীক্ষা কথা দুইটী পরস্পর সংলগ্ন। শিক্ষার উদ্দেশ্য আমাদের স্বরাজ্য সিদ্ধি—এখানে Home ruleএর কথা বলিতেছি না; একজন বন্ধু যাহাকে Spiritual autonomy বলিয়াছেন—তাহারই কথা বলিতেছি। নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে আনার শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা। এ বিষয়ে এখন আর বিস্তৃত ভাবে বলা প্রয়োজন মনে করি না। তবে আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও দৈন্য সংলগ্ন; দিনদিন ছাত্রেরা জীবনের ভার চালাইতে অসমর্থ হইতেছে। আমাদিগের জাতীয় ভাব থাকিতে পারে—Home rule ভাবে আত্মা অধিকৃত হইতে পারে; কিন্তু বয়স্ক ছেলের খাওয়া-পরা কিসে চলে, তাহার উপায় করিতে পারি না। বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ উচ্চ লক্ষ্য-বিহীন; সেইরূপ, জীবিকা-নির্ব্বাহ কিরূপে হইতে পারে, সে লক্ষ্যও বিশেষ কিছুই নাই। অধিকাংশ লোকই আইন-ব্যবসায়ী হইতেছে। ব্যবসায়ী আইনজ্ঞ প্রস্তুত করা মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। যখন Senateএ ছিলাম—সরস্বতীর অনুকম্পায় এখন তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন—তখন University Law Collegeএর প্রয়োজন নাই বলিয়াছিলাম। স্যার গুরুদাস, ডাক্তার রাসবিহারী প্রভৃতি ইহার পোষকতা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের কথা খাটিল না। এখন সে Law Collegeএ শুনিতে পাই ২৫০০ ছেলে। মেলায় মহকুমার দেখিতে পাই, শত-শত উকিল। তাঁহার সবাই যে করিয়া খাইতে পারেন না, তাহা সকলেই জানেন। তবুও দিন-দিন দল বাড়িতেছে; আর গৃহে-গৃহে দৈন্য বাড়িতেছে। মধ্যবিত্ত লোকের ঘর দুঃখ-সমাচ্ছন্ন। দেশ নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছে—আর আমাদিগের শিক্ষা—বড়, মধ্যবিত্ত, ছোট,—এক রকমে চলিয়াছে। অন্য কোন স্থানে এরূপ নাই। Cambridgeএ যখন ছিলাম—৩০০০ মাত্র ছাত্র সেখানে;—তার মধ্যে ২০০০ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল। ২য় Term পরেই Cricket, Boating প্রভৃতিতে সময় যাপন করিয়া Degree না লইয়াই চলিয়া যাইত। বিলাতে Oxford, Cambridgeএ অর্থশালী লোকের সন্তানরাই প্রধানতঃ আসিত। যাহার বাৎসরিক আয় ১০০০ পাউণ্ড, তাহার দুই পুত্র থাকিলে একজনকে মাত্র Universityতে পাঠায়, অন্যটিকে School হইতে বাহির করিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু আমরা সবাই এক রকম প্রণালীতে পড়ি। ইংরেজের ভিতর অতি অল্প বয়স হইতেই ছেলে কি করিবে, তাহা ঠিক করে। আমরা তাহা কখনও ঠিক করি না, কপালের উপর নির্ভর করি। ভাঙ্গা কপালে আর কত হইতে পারে? কাঙালের সংখ্যা দিন-দিন বাড়িতেছে; দৈন্য আমরা বাড়াইতেছি। অতএব আপনাদিগের নিকট এই আবেদন যে, শিক্ষার প্রথা এইরূপ করুন, যাহাতে সকলের আহারের উপায় হয়। প্রাথমিক শিক্ষা, মধ্যবর্ত্তী শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা—একই শিক্ষার প্রণালীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। তবে এক-একটি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হওয়া উচিত Complete in itself—হওয়া উচিত। কোন সময় পর্য্যন্ত কিরূপ শিক্ষা চলিবে, তাহা নিরূপণ করা প্রয়োজন। আপনারা এই বিষয়ে আলোচনা করিবেন, ইহাই আমার আশা।

আইনজ্ঞ বাড়িয়া চলিতেছে, কিন্তু Malaria-পীড়াক্রান্ত দেশে ডাক্তারের অভাব। দুইটি মাত্র কলেজ আছে। আজ কাল দুই-একটি ছোট School হইয়াছে; কিন্তু আরও অধিক Medical College, School হওয়া উচিত। এই Agricultural দেশে Agricultural School,

College বলিবার মত কিছুই নাই। Engineering অতি কম আছে ও technological শিক্ষার একেবারেই কোন আয়োজন নাই। এসব লজ্জার কথা।

আপনারা আমার কাছে একটি লিখিত অভিভাষণ আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু সময় ও স্বাস্থ্যের অভাবে লিখিতে পারি নাই। অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা বলিবার অবসর আপনাদিগের আলোচনার সময় পাইব আশা করি। সেই জন্য এইখানেই শেষ করিলাম। শেষ করিবার পূর্ব্বে, আপনারা যে, আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়াছেন, তাহার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।*

* 'জাগরণ' হইতে উদ্ধৃত।

মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতি-উৎসব

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মধুসূদনের সমাধি

বিগত ১৫ই আষাঢ় শনিবার কবিবর মধুসূদনের স্মৃতি-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন প্রাতঃকালে ভক্তমণ্ডলী লোয়ার সারকুলার রোডের সমাধি-স্থানে গমন করিয়া মাইকেলের সমাধি পুষ্প-ভূষিত করেন। অপরাহ্ণ-কালে রামমোহন লাইব্রেরী ভবনে একটি সভা হয়। মাননীয় শ্রীযুক্ত সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপ্রতিষ্ঠ বক্তাগণ বক্তৃতা করেন। সভায় যথেষ্ট জনসমাগম হইয়াছিল। মাইকেল স্মৃতি-সমিতির সভাপতি কবিবর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-নাথ বসু ও সম্পাদক, "মধুস্মৃতি"-লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়দ্বয়ের বিশেষ চেষ্টায় উৎসবের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

সম্রাটের জন্মদিনে উপাধিপ্রাপ্ত মহোদয়গণ

মহারাজা মহারাজ বাহাদুর
সার শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সিংহ, কে বি-ই, জি-সি আই-ই

মাদ্রাজের গবর্ণর
লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড, জি সি-এস-আই

সার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু, নাইট ও-বি-ই

বোম্বায়ের গবর্ণর লর্ড উইলিংডন, জি সি-এস-আই

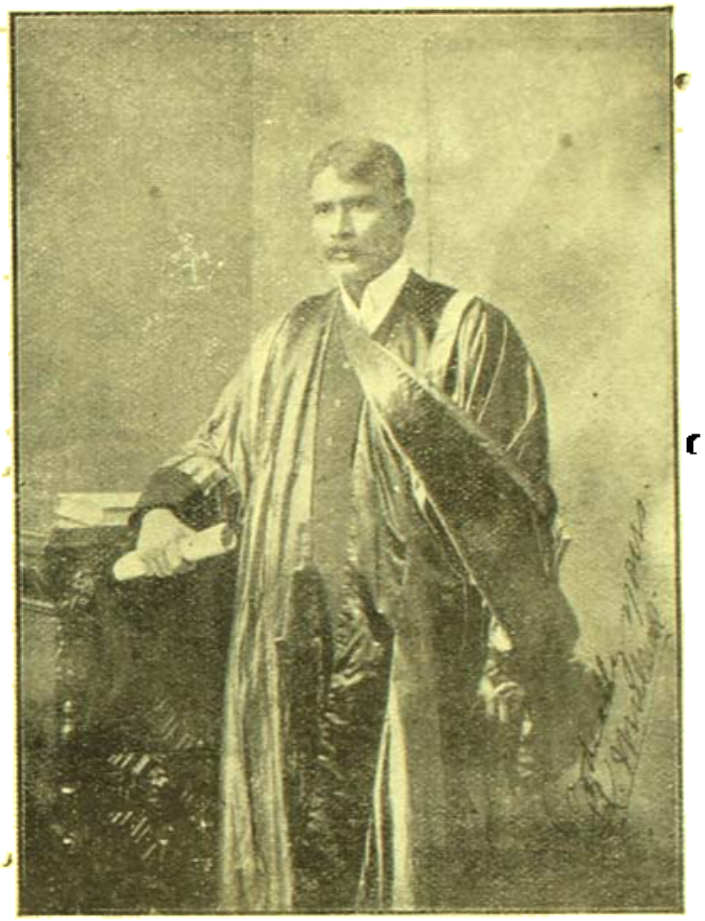

ডাক্তার শ্রীযুক্ত পরেশকুমার মল্লিক, সি·বি·ই, ও·বি·ই

ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বর
স্যার উইলিয়ম ডিউক, জি·সি·আই·ই

মধ্যভারতের রাজার
স্যার শেঠ হুকুমচাঁদ হুকুমচাঁদ, নাইট

মাননীয় ডাক্তার সার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, নাইট

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
নাইট, সি-আই-ই

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা]

ভারতবর্ষের পাঠক-পাঠিকার কাছে সুনিপুণ চিত্র-শিল্পী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আর বিশেষ কোন পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। কয়েক মাস ধরিয়া ভারতবর্ষে ইঁহার কতকগুলি ছবি প্রকাশিত হইতেছে। তাহা কেবল "ভাবের অভিব্যক্তি" নহে, ইহার মধ্য দিয়া নাট্য-কলার বিশেষ একটা দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। অঙ্গভঙ্গী ও ইঙ্গিতের দ্বারা ভাব প্রকাশ করা একটা আর্ট। সভ্যতার প্রথম স্তর হইতেই নাট্যকলার কথঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে গণতন্ত্রের (democracy) বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে নাটক যে স্থান অধিকার করিয়াছে আর কখনও এরূপ হয় নাই। এই জন্যই নাটক গণযুগের কলা।

নাটকের বিষয়কে ফুটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা না থাকিলে কেবল যে বিষয়টি মাঠে মারা যায় তাহা নহে, নাট্যকলার দিক্ দিয়াও ইহা নিষ্ফল হয়। এই কারণেই আমাদের দেশে নাট্যকলা এত পিছাইয়া পড়িয়াছে।

নাট্যকলা-শাস্ত্রে যাহাকে বলে characterization, ইহা আধুনিক নাটকের প্রাণস্বরূপ। ইহার উপরই নাট্যের সফলতা নির্ভর করে, বাহিরের সাজসজ্জা, বেশবিন্যাস বা সিনের আড়ম্বর কিছুই নাট্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক নহে —আসল বিষয় চরিত্রগুলি ফুটাইয়া তোলার নিপুণতা। আধুনিক সময়ের নাট্যকলার দৃষ্টি এই দিকেই পড়িয়াছে; বাহিরের আয়োজন সংক্ষেপে করিয়া নাটকের মর্ম্মবাণীকে প্রকাশ করার চেষ্টাই নাট্যকলার মুখ্য উদ্দেশ্য।

যিনি কোনো বিশেষ চরিত্র (character) ফুটাইয়া তুলিবেন, তিনি কেবলমাত্র তাল অনুকরণ করিতে পারিলেই নাট্যকলার পরিচয় দিলেন এমন নহে। "His task is to conceive a particular kind of man; acting

under the operation of particular circumstances" অর্থাৎ বিশেষ অবস্থা মধ্যে চরিত্রটি যেমন হওয়া উচিত, তেমন represent করাই তাহার কাজ নহে—বিশেষ চরিত্রকে সে নিজে গড়িয়া তুলিবে।

ধরুন, নেপোলিয়নের চরিত্র কেহ নাটো দেখাইতে ইচ্ছুক;—তিনি যতই সাজসজ্জা করুন, বীরত্ব দেখাইবার জন্য যতই হাঁকডাক করুন,—নেপোলিয়নের বাহ্য চিত্রই করা হইবে, তাঁহার চরিত্র দেখান হইবে না। নাট্যকলার একজন সমালোচক বলিয়াছেন —The mirror of a drama is not a photographic apparatus; and not even the most conscientional combination of science and art can bring back even a "phase" of the real Napoleon.

নিখুঁত characterization (অর্থাৎ চরিত্র-বিন্যাস)এর লক্ষণ কি, এ স্থলে সে আলোচনা উত্থাপন করিলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে। যতদূর দেখিয়াছি "ভাবের অভিব্যক্তি"র ছবিগুলির মধ্যে যথেষ্ট নিপুণতা ও প্রতিভার নিদর্শন আছে।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

তার পর দেখিলাম, সামাজিক deformities characterizationএর মধ্য দিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। জনসাধারণের চিত্তে সামাজিক বিকৃতাবস্থার characterization উপস্থিত করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে কিছুদিন ধরিয়া সাহিত্যের ও কলার মধ্য দিয়া ইহা করা হইতেছে। কাব্যের মধ্য দিয়া ৺দ্বিজেন্দ্রলাল, কার্টুনের মধ্য দিয়া শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। তার পর ৺দীনবন্ধু মিত্র, ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি নাট্যকার নাটকের মধ্যে সামাজিক অবস্থার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন; কিন্তু সেই সকল চরিত্র রঙ্গমঞ্চে ফুটাইয়া তোলার কাজ নাট্যকলার; এবং ইহার অভাবেই আমাদের রঙ্গমঞ্চে শিক্ষিত জনসাধারণের মন পড়িতে পারে নাই। যদি অন্যান্য সভ্যদেশের ন্যায় আমাদের রঙ্গমঞ্চ নাট্যকলার উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্র হইত, তবে "ভাবের অভিব্যক্তির" চরিত্রা তাঁহার শক্তি ও সামর্থ্যকে বিকশিত করিবার উপযুক্ত সুযোগ পাইতেন, সন্দেহ নাই।

আলোচনা

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের স্বাস্থ্য-বিভাগ হইতে ১৯১৮ অব্দের যে সকল স্বাস্থ্য-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইগুলি অবলম্বন করিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ বিভাগ ভারতের উক্ত অব্দের জন্ম-মৃত্যুর একটী তালিকা সঙ্কলন করিয়াছেন। এই তালিকায় জানিবার, শিখিবার এবং চিন্তা করিবার অনেক কথা আছে।

১৯১৮ অব্দে বৃটিশ-ভারতে ৮৮৫৬২০৩টি শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ১৯১৭ অব্দে ১০২১৮২০টি শিশু জন্মিয়াছিল। সুতরাং ১৯১৮ অব্দের জন্ম-সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কমিয়াছে। বৃটিশ ভারতের সমগ্র লোকসংখ্যার অনুপাতে জন্মের হার হাজার-করা ৩১.১০, প্রদেশ-সমূহের পরস্পরের তুলনায় দিল্লী প্রদেশের জন্ম সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—হাজার-করা ৪৯.৩৯; তাহার নীচেই পঞ্জাব ৪৪.৯; উৎকলে মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—৩৩.৪ এবং যুক্তপ্রদেশ ৩৩.১। অন্য সকল বড় প্রদেশের জন্মের হার হাজার করা ৩০.এর কম, কিন্তু ৩০.এর বেশী।

১৯১৮ অব্দে জন্মের সংখ্যা যেমন কম, মৃত্যুর সংখ্যাও সেইরূপ কম হইয়াছে। লোকের প্রজনন-শক্তি কমিয়াছে বলিয়া জন্মের সংখ্যা কমিয়াছে, এরূপ মনে করিলে, মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস হইতে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির কল্পনা করা যাইতে পারে। ১৯১৯ অব্দের মৃত্যু-সংখ্যা ৬৯৩০৩৩৬; আর ১৯১৮ অব্দে ১১৪২৪১২ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বোম্বাই প্রদেশ এবং বেরার ও মধ্যপ্রদেশের ১৯১৯ অব্দের মৃত্যু-সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে ১৯১৮ অব্দে মৃত্যুর হার হাজার-করা ৫৩.১২ ছিল; ১৯১৯ অব্দে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩.৩১ হইয়াছে। প্লেগকেই মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বলিয়া ধরা হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশে প্লেগ, ম্যালেরিয়া ও বিসূচিকা এই তিনটী রোগই প্রবল ছিল। ১৯১৮ অব্দে এই প্রদেশের মৃত্যুর হার ৩৪.৯১ ছিল; ১৯১৯ অব্দে ৩৯.৯৪ হইয়াছে। মৃত্যু-সংখ্যার হিসাবে বঙ্গদেশের অবস্থা অনেকটা ভাল; অর্থাৎ ১৯১৮ অব্দের মৃত্যুর হার ৫২.৮৯ এবং ১৯১৯ অব্দের ২৭.৩৭। পঞ্জাবেও মৃত্যু-সংখ্যা খুব কম; হাজার-করা ৩৪.৩ হইতে ৩০.৭। সমগ্র মৃত্যুসংখ্যা ৬৯৩০৩৩৬; ইহার মধ্যে জ্বরে ৫০৮৫৭৮৪, বিসূচিকায় ২৮৮০৪৭, হাঁপানি, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে ২৮৩২৪৭, আঘাত-ঘটিত পীড়ায় ২৪৮৩১, প্লেগে ২০৫৪২৭ এবং বসন্তে ৬০৩৫২ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

ভারতবাসী সর্ব্বসাধারণের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যা এইরূপ। কিন্তু এতদ্ভিন্ন শিশু-মৃত্যু-সংখ্যা বিষম সমস্যার বিষয়। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা কতকটা বুঝা যাইবে। আলোচ্য বর্ষে যতগুলি ছেলে জন্মিয়াছে, তাহার অনুপাতে হাজার-করা ২০৯.৮টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে; এবং মেয়ের জন্মের অনুপাতে মৃত্যু-সংখ্যা হাজার-করা ১৯৪.৭৭। উভয়ের জন্ম মৃত্যু একত্র করিলে অনুপাত এইরূপ দাঁড়ায়—জন্ম ১০০০, মৃত্যু ২০২.৮। ১৯১৮ অব্দে যথাক্রমে এই অনুপাত ছিল, ২০৮.৩, ১৯৪.২২ ও ২০১.২। গত ১০ বৎসরের (১৯০৭-১৯১৬) গড়-পড়তা হিসাবে শিশু-মৃত্যু হাজার-করা ২১০.৭। প্রাদেশিক হিসাবে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—২৮৪.৩। তার পর, যুক্তপ্রদেশ ২০৯.৭, ব্রহ্মদেশ ২০৮.৩, আসাম ২০২.৯, পঞ্জাব ২০০.২, বোম্বাই ১৯৯.৮, বঙ্গদেশ ১৯৪.৪, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ ১৯০.৭, এবং মাদ্রাজ ১৮২.৮। এই সঙ্গে ইউনাইটেড কিংডমের (ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ওয়েল্‌স ও আয়র্লণ্ডের) হিসাবটাও দেখুন। ১৯১৮ অব্দে ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে হাজারকরা ৭১, স্কটলণ্ডে ৯৭ এবং আয়র্লণ্ডে ৮৫টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছিল।

শিশুদিগের খাদ্যের একপ অবস্থা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। শিশু-মৃত্যুর এইরূপ অতি-প্রাবল্য অনেকপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই বিষম চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। শিশুদিগের অকালমৃত্যু নানা কারণে ঘটিতে পারে। পিতামাতার স্বাস্থ্যহীনতা, অপরাপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জীবন-সংগ্রামের শক্তিহীনতা (power of resistance), সামাজিক রীতিনীতি, সন্তান-পালন-প্রণালী, পিতামাতার উপজীবিকা প্রভৃতি বহু বিষয় শিশু-মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত ইউ, এন, মুখার্জ্জি এরূপ কতকগুলি কারণ প্রদর্শন করিয়া একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান এবং আলোচনা হওয়া আবশ্যক; তাহা হইলে ক্রমে প্রতিকারের পন্থাও নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে। নচেৎ, শিশুরাই যদি অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, জাতির বীজই যদি ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, তবে কাহাকে লইয়া জাতির অস্তিত্ব বজায় থাকিবে?

ওয়েলিংটন স্কোয়ার, সাউথ-ইষ্ট কর্ণার, ১০নং শাঁখারিটোলা লেন হইতে শ্রীযুক্ত পার্থচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী মহাশয় লিখিতেছেন,—আসাম অঞ্চলে শিলাএ একপ্রকার কাঠ প্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ কাঠ দহনক্ষম দাহ্য পদার্থ এবং উহার অগ্নি বহুক্ষণ স্থায়ী। দেশলাইয়ের কাঠির আকারে কাটিয়া জ্বালাইলে সাধারণ দেশলাই কাঠি অপেক্ষা উহা উজ্জ্বলতর আলোক দান করিয়া থাকে এবং উহা অপেক্ষা দেরীতে জ্বলিয়া থাকে। ঐ কাঠে দাহ্য পদার্থ বেশী পরিমাণে থাকায় উহা জ্বালিবামাত্র কিঞ্চিৎ ধূম নির্গত হয়। কিন্তু ঐ ধূম

কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংশোধন করিয়া লইতে পারিলে উহা দেশলাইয়ের কাঠিরূপে ব্যবহার করা যায় এবং তাহাতে দেশের যথেষ্ট কিছু পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। যদি কেহ উক্ত কাঠ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি আদর ও যত্নের সহিত উহা দেখাইতে প্রস্তুত আছেন।

এ দেশে দেশলাইয়ের কাঠির উপযোগী কাঠের অভাবই দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপন করার পক্ষে প্রধান অন্তরায় বলিয়া শুনা যায়। সুতরাং পত্র-লেখকের প্রস্তাবিত কাঠ দেশলাইয়ের উপযোগী হইতে পারে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐ কাঠ কেবল দেশলাইয়ের কাঠি হইবার উপযুক্ত কি না তাহা দেখিলেই চলিবে না। আমাদের জঙ্গল হইতে উহা কারখানায় আনয়ন করা সহজসাধ্য কি না, তাহাও দেখা দরকার। ভারতের জঙ্গলে, পাহাড় পর্ব্বতে দেশলাইয়ের কাঠির উপযোগী কাঠ যে একেবারেই পাওয়া যায় না, এমন কথা বলা যায় না। তবে সুদূর পর্ব্বত-প্রান্ত হইতে কাঠ সংগ্রহ করিয়া কারখানায় আনয়নের অসুবিধা এবং যাতায়াতের খরচই উহাদের ব্যবহারের পথে প্রধান অন্তরায় বলা যাইতে পারে। তার পর দেশলাইয়ের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, সরকারী বন বিভাগের আইন কানুনের কঠোরতা নিবন্ধন দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপন করা সুবিধাজনক নহে। সুতরাং কোন বিশেষ জাতীয় বৃক্ষের কাঠ দেশলাইয়ের কাঠির উপযোগী হইলেই যথেষ্ট হইবে না, সরকারের অনুগ্রহ এবং রেলওয়ে বোর্ডের সাহায্য ভিন্ন দেশলাইয়ের কারখানা চালানো কঠিন।

এই দেশলাইয়ের কাঠির প্রসঙ্গে আমাদের একটি পুরাতন কথা মনে পড়িয়া গেল। "বঙ্গবাসী" আপিস হইতে যখন "বসুমতি" মাসিক পত্র প্রথম বাহির হয়, তখন ব্রাহ্মের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (সুপ্রসিদ্ধ মিঃ টি, এন, মুখার্জ্জি, মিউজিয়মের তদানীন্তন curator) মহাশয় "বসুমতির" প্রথম বর্ষের কোন এক সংখ্যায় "বিলাতী দেশলাই" শীর্ষক একটী সুলিখিত এবং বহু তথ্য পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ঠিক সেই সময়েই শালকিয়া এবং উল্টাডিঙ্গীতে দুইটী দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছিল; এবং তাহাদেরই একটী কারখানার অধিকারীকে পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রবন্ধটি রচিত হইয়াছিল। তাহাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অন্যান্য কথার পর একস্থানে বলিয়াছিলেন, যদি ঝাঁটার কাঠিকে কোনরূপে জ্বালাইবার উপযোগী করিয়া লইতে পারা যায়, তাহা হইলে এক চালে বাজী মাৎ হয়।

তার পর, বার বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে, স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইলে, আমাদের একটী স্নেহভাজন লোহরোগম বন্ধু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ঐ ইঙ্গিতটি স্মরণ করিয়া ঝাঁটার কাঠি বা খাংরা কাঠি লইয়া পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং অল্প চেষ্টাতেই কৃতকার্য্য হন। তাঁহার পরীক্ষার ফল বেশ সন্তোষজনক হইয়াছিল; আমরা দেখিয়াছিলাম, তাঁহার প্রস্তুত কাঠিগুলি সুন্দর রূপে জ্বলিয়াছিল। তিনি ঐ কাঠি লইয়া তাঁহার মাথায় বাবরি মাথাইয়া কতকগুলি দেশলাইয়ের কাঠির নমুনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন; তাহাও বেশ জ্বালা যাইতে পারিত। যে যাহা হউক, ঝাঁটার কাঠি দেখিতে তেমন সুশ্রী না হওয়ায়, তিনি এ বিষয় লইয়া আর বেশীদূর অগ্রসর হন নাই।

আমাদের বন্ধুটি যে প্রণালীতে খাংরা-কাঠি জ্বালাইবার উপযোগী করিয়াছিলেন, তাহা অতি সহজ ও সুসাধ্য। তাহা প্রকাশ করিতে তাঁহার কোন আপত্তি না থাকায়, যদি কেহ খাংরা কাঠি হইতে দেশলাইয়ের কাঠি প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করেন, এই আশায়, আমরা এখানে তাহা প্রকাশ করিলাম। তিনি প্রথম পরীক্ষায় কাঠিগুলিকে গন্ধক জলে দুই তিনবার সিক্ত করিতেন। দ্বিতীয় পরীক্ষায় তিনি কাঠিগুলিকে দুই তিন দিন অন্তর জল বদলাইয়া কয়েক দিন ধরিয়া ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিয়াছিলেন। এইরূপে ঝাঁটার কাঠির মধ্যস্থ অবাঞ্ছ পদার্থগুলি জলে দ্রব হইয়া যাওয়ায় অবশিষ্ট অংশ শুকাইয়া লইলেই উহা উত্তমরূপে জ্বলিতে লাগিল। এতটা না করিয়াও অনেকেই আমাদের কথার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া লইতে পারিবেন। যে কেহ একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন, শুষ্ক অবস্থায় নূতন ঝাঁটার কাঠি অপেক্ষা পুরাতন ঝাঁটার কাঠি উত্তমরূপে জ্বলে। পুরাতন ঝাঁটার জল লাগিয়া উহার অবাঞ্ছ পদার্থ জলে দ্রব হইয়া বাহির হইয়া যাওয়ায় এইটি ঘটে।

এখন প্রশ্ন এই, ঝাঁটার কাঠি হইতে দেশলাই প্রস্তুত করা যায় কি না এবং তাহা বাজারে চলিতে পারিবে কি না। এটী অবশ্য বিবেচ্য। সুতরাং বিবেচনা করিয়াই দেখা যাউক। প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি যে, কাঠিগুলি তেমন সুদৃশ্য হইবে না বলিয়া, উহা সৌখিন বাবুদের হাতে দেওয়া চলিবে না। খাংরা-কাঠির দেশলাই যতই সুবিধাজনক এবং ঘরে যতই সস্তা হউক, বাবুরা উহা দেখিলেই নাক সিঁটকাইবেন, লইতে চাহিবেন না। কিন্তু আমাদের এই গরীবদের দেশের কোটি-কোটি লোকের দেশলাই ক্রয় করিবার জন্য মাসে একটি করিয়া পয়সা ব্যয় করিবার সামর্থ্য নাই। তাহারা সস্তায় পাইলে খাংরা-কাঠির দেশলাই মাথায় তুলিয়া লইতে পারে এবং এই দেশলাই যে সস্তা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ইহার manufacturing expenses প্রায় অর্দ্ধেক কিম্বা তার আনা কমিয়া যাইবে। খাংরা-কাঠির দেশলাই যদি সস্তা হয়, এবং ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক হয়, তাহা হইলে সুদৃশ্য না হইলেই বা ক্ষতি কি? বাক্সটি এবং প্যাকেটটি সাধারণ দেশলাইয়ের মতই

সুন্দর হইবে এবং কাটির কাজ হইয়া গেলেই কল ফেলিয়া দিতে হইবে। সুতরাং সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য না হইবারও ত কোন কারণ দেখি না। তবে কলিকাতায় এরূপ মেসলাইনের কারখানা স্থাপন করা সুবিবেচনার কার্য্য নহে। সমুদ্রোপকূলে যেখানে মেসলাইনের বাক্সের উপযোগী কাঠের জঙ্গল আছে এবং কাটির উপযোগী প্রচুর বাঁশ ও নারিকেল গাছ আছে, সেই সকল স্থানেই এইরূপ মেসলাইনের কারখানা স্থাপন করিলে চলিতে পারে।

অপরাধ নিবারণই দণ্ডদানের উদ্দেশ্য—প্রতিহিংসা-সাধন কখনও দণ্ডবিধানের উদ্দেশ্য হইতে পারে না—ইহা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত মত। কোন অপরাধে একজনকে দণ্ড দিয়া কেবল যে তাহাকেই ভবিষ্যতে সতর্ক হইয়া চলিবার উপদেশ দেওয়া হয় তাহা নহে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অন্য লোকেও সাবধান হইবে—ইহাও দণ্ড প্রদানের অন্যতম উদ্দেশ্য। সুতরাং যে ক্ষেত্রে দণ্ড দিয়াও অপরাধ নিবারণ করিতে পারা যায় না, সে ক্ষেত্রে দণ্ড প্রদানের উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এ স্থলে, আমাদের মনে হয়, আইনানুযায়ী দণ্ডবিধানই যথেষ্ট নহে; অপরাধ অনুষ্ঠানের মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতীকারে যত্নবান হওয়াই কর্ত্তব্য।

বস্ত্রাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া নিরুপায় দরিদ্র লোকেরা আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারিয়া মফস্বলের অনেক স্থানে হাট-বাজার হইতে বস্ত্র ও লবণ প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়াছে এবং অনেকে গ্রেপ্তার হইয়া বিচারে দণ্ডিত হইয়াছে,—এ সংবাদ পাঠকেরা অবশ্যই অবগত আছেন। কিন্তু কই, লুঠপাঠ ত এখনও বন্ধ হইল না। সঞ্জীবনী "মেদিনী-বান্ধব" লিখিয়াছেন, "মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পটাশপুর থানার এলাকাধীন চন্দনপুরের বস্ত্র-ব্যবসায়ী কেদারনাথ নন্দীর ৩০০৲ টাকা মূল্যের কাপড়ের গাঁট একারুণি হাট হইতে বাড়ীর দিকে আসিবার সময় পথে কয়েকজন লোক লুঠ করিয়া লইয়াছে।" এরূপ ঘটনা এই একটী নহে—আরও অনেক আছে; তবে দৃষ্টান্তস্থলে এই একটীই বোধ হয় যথেষ্ট। ইহা ছাড়া, চিচকে চোরে গৃহস্থকে অসাবধান পাইলেই কাপড় প্রভৃতি চুরি করিতেছে; পথে-ঘাটে দুই-একটী স্ত্রীলোককে অসহায়া অবস্থায় পাইলেই তাহাদের অঙ্গাচ্ছাদন-বস্ত্র কাড়িয়া লইতেছে—এরূপ ঘটনার সংখ্যা করা যায় না।

তবেই দেখা যাইতেছে দণ্ডবিধির পরিচালনে এখানে কোন ফলই ফলিতেছে না। অতএব বস্ত্র-সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে কেবল আইন অনুসারে অপরাধীদিগকে দণ্ড দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিতেছে না;—যাহাতে লোকে আর লুঠপাঠ না করে, তাহার জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করা, অর্থাৎ যথাসাধ্য বস্ত্রাভাব দূর করাই কর্ত্তৃপক্ষের এবং দেশবাসীর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে। সরকার বাহাদুর কলার দর বাঁধিয়া দেওয়ায় কলার ফেরিওয়ালারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অথবা বাধ্য হইয়া নির্দ্ধারিত মূল্যে কলা বিক্রয় করিতেছে—আর তাহাদের মুখে কোন আপত্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ পাইতেছে না। বস্ত্র-সমস্যার ব্যাপারেও সমস্ত বঙ্গদেশের অধিবাসী প্রার্থনা করিতেছে যে, সরকার বাহাদুর বস্ত্রের মূল্য বাঁধিয়া দিন—প্রজার বস্ত্রাভাব দূর হউক, লুঠপাঠ বন্ধ হউক, অশান্তি তিরোহিত হউক। বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া লোকের লুঠপাটে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব নহে। এই সকল কারণে, মনে হয়, কেবল দণ্ড প্রয়োগে লুঠপাট বন্ধ হইবে না—গবর্ণমেণ্টকে বস্ত্র-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিতেই হইবে; নচেৎ অশান্তি দূর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

সুখের বিষয়, ভারত-গবর্ণমেণ্ট এতদিনে এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের কাহার ভাণ্ডারে কত মাল মজুত আছে, ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে তাহার সন্ধান লইতে আদেশ দিয়াছেন। কেহ মজুত মাল গোপন করিতেছে এরূপ সন্দেহ হইলে খানাতল্লাস পর্য্যন্ত করিতে হইবে, এমন আদেশও প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, মজুত মালের তালিকা প্রস্তুত হইলে বস্ত্র-সমস্যার সমাধান কল্পে গবর্ণমেণ্ট একটা কিছু করিবার কল্পনা করিয়াছেন। ইহার ফলে বস্ত্রের মূল্য ন্যায়সঙ্গত ভাবে কমিলে লোকের সমূহ কষ্ট আপাততঃ কিঞ্চিৎ দূর হইবে।

বস্ত্র সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা ত সকলেই পুনঃপুনঃ প্রস্তাব করিতেছেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদেরও যথেষ্ট কর্ত্তব্য রহিয়াছে। যেখানে আমাদের শক্তিতে না কুলায়, সেই সকল স্থলে অসীম শক্তিশালী গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লওয়া আবশ্যক; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে নিজেদেরও কর্ত্তব্য পালন করা চাই,—সকল কাযই গবর্ণমেণ্টের উপর বরাত দিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আপাততঃ বস্ত্রের মূল্য বাঁধিয়া দিয়া বস্ত্র-ব্যবসায়ীদিগকে সংযত করিবার জন্য বস্ত্র-বাণিজ্যে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক। কিন্তু বস্ত্রের আমদানী বা উৎপাদনের কাজ অবশ্য গবর্ণমেণ্ট করিতে পারেন না। তাহা আমাদিগকেই করিতে হইবে। সুখের বিষয় এ দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে, এবং কিছু কিছু কাযও আরম্ভ হইয়াছে। মফস্বলে কি ভাবে কায চলিতেছে, তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল।

মৈমনসিংহের সহযোগী "চারুমিহির" লিখিয়াছেন,—"স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কর্তৃক কমিটি এই জেলায় তুলার চাষ ও চড়কার প্রচলন জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন। বহুলোক চড়কা ক্রয় করিবার জন্য আগ্রহও প্রকাশ করিতেছেন। এই স্থানের কোনও কোনও

মিষ্টী ইতিমধ্যেই কমিটীর অভিপ্রায় অনুসারে চড়কা প্রস্তুত করিয়াছে। তাহারা ১৯৲ মূল্যে এক-একটী চড়কা দিতে পারিবে বলিয়া পূর্ব্বে জ্ঞাপন করায় কমিটী ঐ কথা সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু লোহা ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হেতু মিস্ত্রীগণ ঐ মূল্যে চড়কা দিতে পারিবে না বলিতেছে। বোধ হয় এক একটী চড়কার জন্য ১৲ অপেক্ষাও কিছু বেশী মূল্য দিতে হইবে। আমরা অবগত হইলাম, নবদ্বীপের স্থানে স্থানে ইহা অপেক্ষাও কম মূল্যে চড়কা বিক্রয় হইতেছে।"

ইহার অপেক্ষাও ভাল কায হইতেছে ত্রিপুরা জেলায়। কলিকাতা, ৪নং ওল্ডপোষ্টঅফিস ষ্ট্রীটে ত্রিপুরা হিতসাধিনী কার্য্যালয় অবস্থিত। ঐ সভার অন্তর্গত রিলিফ (সাহায্য) বিভাগ এ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, "ত্রিপুরা হাইড" পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে: —"এই সভা বোধে হইতে ৫/ মণ কার্পাস তুলার বীজ আনাইয়া সভার প্রতিনিধি চাঁদপুরের শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ উকীল, কুমিল্লার শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাস উকীল, এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য মোক্তার মহাশয়গণের নিকট এক এক মণ করিয়া ঐ বীজ ও দুইশত করিয়া (সচিত্র) তুলা-চাষের নিয়মাবলী বিতরণ করিবার জন্য পাঠান হইয়াছে। যাঁহারা তুলার চাষ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আপন আপন সুবিধামত উপরোক্ত যে কোন প্রতিনিধি মহাশয়ের নিকট হইতে আবশ্যকীয় বীজ ও নিয়মাবলী লইতে পারেন। আর যদি অধিক দূরত্ব বিবায় তথা হইতে আনাইতে না পারেন, তবে অগ্রহায়ণে (বিলম্বে চাষের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে) বীজের পরিমাণ সহ সভায় লিখিলে তদনুযায়ী এখান হইতে পাঠান যাইবে। (প্রতি কাণী জমিতে ৵২। সের বীজ লাগে)। ইতঃপূর্ব্বে যাঁহারা সভায় লিখিয়াছেন তাঁহাদের নিকট বীজ ও নিয়মাবলী পাঠান হইল; সভা আশা করেন, যাহাতে বস্ত্রাভাব নিবারণ উদ্দেশ্যে সকলেই এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিবেন। অতঃপর সভা চড়কা বিতরণের ব্যবস্থাও করিবেন।"

এতদ্ব্যতীত বরিশাল, মেদিনীপুর এবং অন্যান্য দুই একটী জেলায় তুলার চাষ এবং তাঁতে বস্ত্র-বয়ন কার্য্য চলিতেছে। কলিকাতার ৺তাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার বাদুড়বাগানের বাটীতে একটী সমিতি স্থাপন করিয়া উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় মুদ্রিত একটী অনুষ্ঠানপত্র বিতরণ করিয়া বঙ্গদেশে তুলার চাষ ও বস্ত্র-বয়ন প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। ইহাই ত চাই! এইরূপেই ত স্বদেশে ফিরিয়া দেশের কায করিতে হয়।

কাঁথির সহযোগী "নীহারে" নিম্নলিখিত সুসংবাদটী প্রকাশিত হইয়াছে—"আজকাল আমাদের এ (কাঁথি) অঞ্চলের হাট বাজার সকল তাঁতের কাপড়ে ছাইয়া পড়িতেছে। তন্তুবায় ও তাঁতের বস্ত্র বয়নকারীরা এখন সকল প্রকারের অতি সুন্দর সুন্দর কাপড় বয়ন করিয়া প্রচুর আমদানী করিতেছে। আমরা পরীক্ষা করিয়া বাজারে দেখিয়াছি, দেশী কি বিলাতী মিলের প্রস্তুত কাপড়ের মূল্যাপেক্ষা তাঁতের কাপড়ের দর অপেক্ষাকৃত সস্তা। এ ছাড়া সুতা আনাইয়া দিয়া তন্তুবায়গণের নিকট হইতে যদি কাপড় বোনাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে দর আরও কতকটা সস্তা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে সুতা দিয়া কাপড় বুনাইয়া লইলে তন্তুবায়গণ হাত-প্রতি বুনিতে এক পয়সা বেড় পয়সা হিসাবে লইত, এখন তাহারা তৎস্থানে দুই পয়সা তিন পয়সা হাত লইতেছে; এ ছাড়া সুতার দামও এখন চড়িয়াছে, তবু তাঁতের কাপড় মিলের কাপড়ের অপেক্ষা সস্তা দরে পাওয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় এখন সকলেরই তাঁতের কাপড় ব্যবহার করা একান্তই উচিত। ইহাতে একদিকে নিজেদের যেমন উপকার হইবে, অন্য দিকে দেশের সেরূপ কল্যাণ করা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে দেশের একটী প্রাচীন মৃত শিল্প বাঁচিয়া উঠিবে এবং নিরন্ন ও দরিদ্র তন্তুবায়কুলের জীবিকার একটী স্থায়ী উপায় হইবে। ইহাতে দেশের অবস্থা বদলাইয়া যাইবে।"

এই ত কয়েক মাসের চেষ্টায় একটী স্থানের হাট বাজার সকল তাঁতের কাপড়ে ছাইয়া পড়িতেছে—বস্ত্রাভাব দূর হইয়াছে! এই মেদিনীপুর জেলা হইতেই বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যার সংবাদ সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি মহকুমাই সর্ব্বপ্রথমে বস্ত্রাভাব দূর করিতে সমর্থ হইলেন। নিজেকে যদি নিজে রক্ষা না করা যায়—আপনাকে রক্ষা করিবার ভার যদি অপরের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা যায়, তাহা হইলে সে কখনও বাঁচিতে পারে না। কিন্তু তাঁতের কাপড়ে কেবল হাট বাজার ছাইয়া ফেলে চলিবে না; তাঁতের কাপড় ব্যবহার করিয়া নিজেদের বস্ত্রাভাব দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গে, যে তাঁতিদের প্রসাদে আত্মরক্ষায় সমর্থ হওয়া যাইতেছে, মহা বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইতেছে, মান-ইজ্জত রক্ষার সম্ভাবনা হইতেছে, সেই তাঁতিগণকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে হইবে—বরাবরই তাঁতের কাপড়—যত দামই হউক,—ব্যবহার করিয়া তাহাদের উপজীবিকা রক্ষা করিতে হইবে। কাজের সময় যাহারা কাজী বলিয়া আদৃত, কাজ ফুরাইলেই পাজী বলিয়া তাহাদিগকে দূরে ঠেলিয়া দিলে চলিবে না। আজ কাঁথি মহকুমায় বস্ত্রের বাজারের অবস্থা যেরূপ আশাপ্রদ, দুই দিন পরে বাঙ্গালা দেশের সকল জেলায় সকল মহকুমায় কাপড়ের বাজারের অবস্থার এইরূপ উন্নতি হইলে, বিলাতী এবং দেশী মিলের বস্ত্রের মূল্য নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে; এমন কি, আশঙ্কা হয়, প্রতিযোগিতা-যুদ্ধে,—তাঁতের কাপড়ের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য এই দুর্দ্দিনেও বিলাতী বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা বিলাতী কাপড়ের দাম খুব কমাইয়া দিতে পারে।

তুলার চাষ করিয়া চড়কায় সুতা কাটিয়া তাঁতে কাপড় বুনিয়া দেশের বস্ত্রাভাব দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু বয়ের প্রতিযোগিতার বাজারে এই চেষ্টা কতদূর সাফল্য লাভ করিবে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। এক সময়ে ও এইরূপ ভাবেই দেশের বস্ত্রাভাব দূর হইত। তখন প্রায় প্রতি গৃহস্থের বাটীতে দুইএকটী করিয়া কাপাস গাছ থাকিত; এবং গৃহস্থ মহিলারা সেই গাছের তুলায় চড়কায় সুতা কাটিতেন। সেই সুতায় তাঁতে যে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া দেশের বস্ত্র সংস্থান ত হইতই, অধিকন্তু কিছু বস্ত্র বিদেশে চালানও দিতে পারা যাইত। সেই বস্ত্র-শিল্প লুপ্ত হইল কেন? বিদেশী কলজাত সস্তায় কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিল না বলিয়া। এবারও দায়ে পড়িয়া তাঁতে বস্ত্র বয়নের সমর্থন করিতেছি বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনার কথাও ভাবিয়া দেখিতে হইতেছে। যুদ্ধ কিছু চিরকাল চলিবে না; একদিন না একদিন পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইবেই। তখন অবশ্য আবার বিদেশ হইতে সস্তায় সুতা ও বস্ত্র আমদানী হইবে। তখন কি হইবে? তখন কি হাতের তাঁতের কাপড় কলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে? আমাদের মনে এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। সেই জন্য আমরা কেবল তাঁতের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছি না। হাতের তাঁতও চলুক, সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও কাপড়ের কল স্থাপিত হয়, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

বঙ্গদেশে যে কয়টি কাপড়ের বা সুতার কল আছে, তন্মধ্যে মাত্র দুইটি কি তিনটী দেশীয় ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত। সেই দুই তিনটির মধ্যে কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলস লিমিটেডের বস্ত্রের সুখ্যাতি শুনিয়া আমরা সে দিন স্বচক্ষে মিলের অবস্থা দেখিতে এবং তাহার সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতে কুষ্টিয়ায় গিয়াছিলাম। যাহা দেখিয়া আসিলাম, তাহা খুবই সন্তোষজনক। আমাদের পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের নাম শুনিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস হয় ত সকলে জানেন না। আমরা মিল দেখিয়া এবং মিলের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ইহার যতটুকু বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের সময় অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় একাকী নিজের অর্থে এবং তাঁহার দুই উপযুক্ত পুত্রের সাহায্যে কলটি স্থাপিত করেন। প্রথম হইতেই এই কলে প্রস্তুত নানাবিধ মনোহর পাড়ের ও উৎকৃষ্ট জমির কাপড় জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন সাধারণের আগ্রহে মোহিনী বাবু কলটিকে যৌথ-কারবারে পরিণত করেন। ইহার মূলধনের পরিমাণ দুইলক্ষ টাকা; তন্মধ্যে ১৮৮৮০ টাকার অংশ বিক্রীত হইয়াছে। এখন এই কলে ১০৭টি তাঁতে প্রত্যহ ৪০০ জোড়ার বেশী ধুতি ও সাড়ী প্রস্তুত হইতেছে। গত দুই বৎসর যাবিয়া কলের কর্তৃপক্ষ অংশীদিগকে শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দিতেছেন। এই কলের বিশেষত্ব এই যে, ইহা বাঙ্গালীর মূলধনে সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীদের দ্বারা পরিচালিত। এই কলে সুতা তৈয়ার হয় না; বাজার হইতে সুতা কিনিয়া কেবল কাপড় এখানে তৈয়ার করা হয়। এখনে কলের কর্তৃপক্ষ নিজেরাই সুতা প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত অংশ বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতেছেন। এই কলের কাপড় এমন সুন্দর এবং কলের অবস্থা এত ভাল যে আমাদের বিশ্বাস, কর্তৃপক্ষকে মূলধন সংগ্রহার্থ কিছু মাত্র বেগ পাইতে হইবে না।

গত মাসের "ভারতবর্ষে" "সাময়িকী" শুম্ভে লিখিত হইয়াছিল যে, সুভাষিণীর ন্যায় দুর্ভাগ্যবতী অথচ নিরপরাধা নারীদিগকে গ্রহণ করিতে পারেন—বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের নিকট হইতে এতটা উদারতার আশা করা যায় না। অতএব তাহাদিগকে কোন ভদ্র পরিবারে আশ্রয় দিবার ব্যবস্থা করা, কিম্বা অনাথা-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই আশ্রমে ইহাদিগকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইতিমধ্যে আমরা দেখিলাম, "বঙ্গবাসী" শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বসু মহাশয় কলিকাতা বালিগঞ্জের একটী এবং ঢাকায় একটী অনাথা-আশ্রমের সন্ধান দিয়াছেন। "সঞ্জীবনী"তে দেখিলাম, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সভাপতিত্বে বালীগঞ্জে আরও একটী অনাথা-আশ্রম আছে। অবশ্য সুভাষিণী যখন স্বামীর চরণে আশ্রয় পাইতেছেন;—তখন তাহার অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু যে সকল স্থলে বর্ষিতা ও নিগৃহীতা নারীদিগের—সমাজে ত নহেই—স্বামি-গৃহেও আশ্রয় পাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, সেই সকল স্থলে বালিগঞ্জের "ডক্কাশ্রমের" মত আশ্রমে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারিলেও কতকটা মঙ্গল হইতে পারে। এই শ্রেণীর আশ্রম যাহাতে এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে—জনসাধারণের সে বিষয়ে সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষ নদীবহুল দেশ। ভারতের অসংখ্য নদীর মধ্যে অনেক-গুলিই বড় বড়। এই সকল নদীতে স্রোতও প্রচণ্ড। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নদীর স্রোতের শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া বড় বড় নগর আলোকিত করা হয়; অনেক কলকারখানাও পরিচালন করা হয়। ভারতের নদীর-জল-স্রোতের শক্তির অত্যন্ত অপচয় ঘটিতেছে; এখানে এই শক্তির ব্যবহারের চেষ্টা অতি অল্প মাত্রায় হইয়াছে। সম্প্রতি বিলাতের রয়েল সোসাইটি অব আর্টস্ নামক সভায় শ্রীযুক্ত এডওয়ার্ড ডিকিন্‌সন "ভারতে জলের শক্তি" বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। লেখক একজন বিলাতী ইঞ্জিনীয়ার; ভারতবর্ষ তাঁহার

কর্ণধার নহে। যদিও তিনি এখানে একটি বড় রকমের কারখানা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তথাপি, স্থানীয় অবস্থাভিজ্ঞ মহেন বলিয়া, তিনি সরল ভাবে তাঁহার প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতে জলের শক্তি কি পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহা তিনি ভালরূপ জানেন না। তবে, বর্ত্তমান কালের প্রয়োজন বুঝিয়া, তিনি ছোট বড় সকল নদীতেই জলের স্রোতের শক্তি কাযে লাগাইবার প্রস্তাব করিতেছেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। অন্যান্য দেশে জমির উর্ব্বরতা সাধনের জন্য প্রচুর সার যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের জমি এই দোষশূন্য নামে বর্জ্জিত। ভারতবর্ষীয় কৃষকের ব্যবহারের জন্য সস্তায় প্রচুর সার সরবরাহের বন্দোবস্ত করা অতীব প্রয়োজনীয়। সস্তায় সার সরবরাহ করিতে হইলে, তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য সস্তা শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। নদীবহুল দেশে জল স্রোতের ন্যায় সস্তা শক্তি আর কোন রকমে উৎপাদন করা যায় না। এই কারণেই তিনি পূর্ব্বোক্ত রূপ প্রস্তাব করিয়াছেন।

মেসার্স টাটা এণ্ড সন্সের চেষ্টায় বোম্বাই প্রদেশে জলস্রোত হইতে শক্তি উৎপাদনের জন্য যে একটী প্রকাণ্ড কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, মিঃ এলফ্রেড ডিকিন্সন উহার নির্ম্মাণ-কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য বন্ধু ইঞ্জিনীয়ারেরা বিবেচনা করেন যে, এই কারখানাটি "a perfectly absurd engineering proposition" এবং তাঁহাকে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন উহার সহিত কোন সংস্রব না রাখেন। কারণ, উহা কোন কাযের হইবে না, এবং লেখকের তাহাতে দুর্নাম হইতে পারে। কিন্তু ভোটের উপর ইহার সাহায্যে অনেক কায হইতেছে; বোম্বায়ের তুলার কল-ওয়ালারা ইহার দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছেন; কলের উৎপাদন-শক্তি বাড়িয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক বলেন, "he had 'every reason' for believing that very considerable power can be accrued in many parts of India, and English investors would probably do well to give attention to his concluding words :—India possesses in abundance the necessary minerals for metallurgical development; the climate and land necessary for the cultivation of cotton, flax, jute and many other commercial commodities; and a vast and intelligent population which, if properly trained, will provide skilled workers in great numbers. In addition, its available capital is substantial."

আমাদের পাঠক-পাঠিকারা লক্ষ্য করিবেন, প্রবন্ধ-লেখক Mr. Alfred Dickinson যাহা বলিতেছেন, তাহার একটুও অতিরিক্ত নয়; চারিদিকে একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, য়ুরোপীয়েরা কি প্রকারে ভারতের কৃষিজ ও খনিজ-পদার্থের উৎপাদনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছেন। বস্তুতঃ, প্রবন্ধ-লেখক স্পষ্টই তাঁহার স্বদেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, "My view is that so far as the Captains of finance and industry of the West are concerned, they have not been altogether ignorant of the possibilities of industrial development in India, but hitherto they have not shown the necessary confidence by taking part in our helping forward rapid development. They had an opportunity to finance and construct the Tata Hydro-Electric scheme, but failed to appreciate its importance, and it was left to India to find the requisite capital, to the great advantage of the Indian investor."—এই কথাগুলির অন্তর্নিহিত মর্ম্ম অতি স্পষ্ট। Tata Hydro-Electric schemeটিকে absurd idea বলিয়া অবহেলা করিয়া, তাহাতে যুরোপীয় বিনিয়োগ না করায়, প্রবন্ধ-লেখকের মতে, য়ুরোপীয়ান capitalistরা এখন পস্তাইতেছেন; এবং ইহাতে টাকা খাটাইয়া ভারতীয় মহাজনেরাই লাভবান হইতেছেন। এ বিষয় লইয়া আমরা আর আলোচনা করিব না। আমরা কেবল আমাদের পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ইহার অবতারণা করিলাম। এ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি, তাহা বোধ করি কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এখন দেশবাসী তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এখন ত আর আমাদের গৃহস্থালীর কায-কর্ম্মের ভার অন্য লোকের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিবার দিন নাই: এখন দেশবাসী ঘরের মা হোমরুল চাহিতে শিখিয়াছেন; অথচ, হোমরুলের অর্থ,—এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। কেবল রাজনীতিক অধিকার লাভেই কি আমাদের হোমরুল লাভ বাসনার চূড়ান্ত তৃপ্তি সাধিত হইবে?

ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে এখন মহীশূর রাজ্যের অবস্থার শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি সাধিত হইতেছে। সম্প্রতি তথায় একটী "ইকনমিক্ কনফারেন্স" হইয়াছিল। তাহা হইতে রাজ্যের প্রধান ও অন্যান্য শিল্পের কিরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহার একটু পরিচয় পাওয়া যায়। মহীশূরের স্বর্ণখনি এবং চন্দন কাষ্ঠের জঙ্গল আজ সমগ্র পৃথিবী বিখ্যাত। তাহাড়া, এই উন্নতিশীল রাজ্যে দিন-দিন নূতন-নূতন কল-কারখানা স্থাপিত হইয়া নব-নব ব্যবসার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ইহাতে একদিকে যেমন রাজ্যের আয় বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্য দিকে তেমনি দেশের লোকের অন্ন-সংস্থানেরও ব্যবস্থা হইতেছে। সম্প্রতি তথায় সাবানের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং গালার বং ও বার্ণিস প্রস্তুত করিবার কারখানা নির্ম্মিত হইতেছে। ধাতু-দ্রব্যের একটী কারখানার কাজ ভালরূপ চলিতেছে। মহীশূর রাজবার ব্যক্তিগত

ব্যবসায়েও (private industrial enterprises) অর্থ-সাহায্য করিয়া থাকেন।

মহীপুর রাজ্য কেবল শিল্পোন্নতি সাধন করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। কৃষির উন্নতি সাধনের দিকেও তাঁহাদের প্রখর দৃষ্টি আছে। এতদর্থে তথায় একটী সরকারী কৃষি-সমিতি প্রতিষ্ঠিত আছে। কমিটি এখন কলের চাষ, রেশমের গুটির চাষ, গো-ছাগ-মেষের উন্নতি সাধন, সারের সুপ্রয়োগ, জঙ্গল উৎপাদন, আলানি কাঠের বাগান স্থাপন এবং গ্রাম্য কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটীর মত সমিতি গঠন প্রভৃতি কৃষির উন্নতিমূলক বিষয়সমূহের অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করিয়াছেন। প্রজাসাধারণ, বিশেষতঃ কৃষক সম্প্রদায়কে শিক্ষাদানার্থ মহা-হাজা পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও সংস্কার, কৃষি-খালের জলের উপযুক্ত ব্যবহার, কূপ খনন, পশুপালন প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশপূর্ণ পুস্তিকাদির প্রচার এবং বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইখানে মনে রাখিতে হইবে, মহীপুর রাজ্যে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা কিছু দিন হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; সুতরাং পুস্তিকাদির প্রচার ও বিতরণের দ্বারা লোকশিক্ষা বিলক্ষণ সহজ হইয়াছে। এমন কি, মহীপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ উচ্চ-শিক্ষার সহিত একটী কৃষি 'ফ্যাকাল্‌টী' গড়িয়া কৃষি সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষা দানের প্রস্তাব আলোচিত হইতেছে।

মহীপুর রাজ্যের পরিমাণফল ২৯০০০ বর্গমাইল এবং লোক-সংখ্যা ৬০ লক্ষ। এই রাজ্যের আপেক্ষিক মূল্য সর্ব্বপ্রকারে ২০০ কোটী টাকা। রাজ্যের কর্তৃপক্ষ উন্নত আদর্শে রাজ্যটিকে পরিচালন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইতেছে, তন্মধ্যে একটীর বিবরণ পাঠ করিলেই পাঠকেরা রাজ্যের উন্নত আদর্শের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন। সহরে যাহাতে অচিরে-ভবিষ্যতে লোকসংখ্যা শতকরা ৫০ জন হিসাবে বৃদ্ধি পায়, তদুদ্দেশ্যে তাহাদের বাসের জন্য ভূমি, কারখানার ও ব্যবসা বাণিজ্যের স্থান প্রভৃতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং ঐ সকল স্থানের মানচিত্র প্রভৃতিও প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। তা' ছাড়া, প্রত্যেক সহরে নিম্নলিখিত আয়োজন থাকিবে; যথা,—(১) একটী পুস্তকাগার ও একটী পাঠাগার; (২) একটী টাউন হল; (৩) একটী ভবন আপিস ও একটী মিউজিয়ম। এই মিউজিয়মে স্থানীয় কৃষির ও প্রসিদ্ধ শিল্পজাত দ্রব্যাদির নমুনা থাকিবে; (৪) একটী ব্যাঙ্ক বা মহীপুরের একটী শাখা ব্যাঙ্ক; (৫) একটী শাখা বাণিজ্য-সভা; (৬) বিশেষ বিশেষ ব্যবসায় ও অন্য শিল্পের উন্নতিকল্পে একটী করিয়া সমিতি; (৭) কো-অপারেটিভ সোসাইটী— ক্রেডিটও বটে, বন-ক্রেডিটও বটে; (৮) বীজ, সার, কৃষি-যন্ত্র প্রভৃতি গ্রাম্য কৃষকগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স; (৯) আগন্তুক, ভ্রমণকারী এবং সহরের বাহির হইতে আগত বালক-বালিকাগণের জন্য হোটেল ও বোর্ডিং হাউস, (১০) স্কুলে পড়িবার বয়স আছে, এমন গ্রাম্য বালকবালিকাগণের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে এমন—৮ম বিদ্যালয় হইতে প্রাইমারী স্কুল পর্য্যন্ত—সর্ব্বপ্রকার শিক্ষালয়; এবং (১১) বাণিজ্যোন্নতিতে লোকদিগকে নিযুক্ত রাখা ও উৎসাহ দেওয়ার নিমিত্ত ভিক্টিলাগ কমিটী বা সব-কমিটী। ইহা গেল সহরের ব্যবস্থা। তা' ছাড়া, প্রত্যেক গ্রামে একটী করিয়া সাধারণ সভার স্থান, একটী পাঠাগার, একটী পুস্তকাগার, কো-অপারেটিভ সোসাইটী, ভ্রমণকারীদের জন্য চটী এবং গ্রাম্য বিদ্যালয় প্রভৃতি থাকিবে। সকল কথা বিশদভাবে বর্ণনা করিবার স্থানাভাব। মোটের উপর ব্যাপারখানা এইরূপ। ইহাতে মনে হয়, মহীপুর রাজ্য ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি লাভ করিবে এবং ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

বঙ্গদেশের নানা স্থানে নানাবিধ শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু স্থানীয় লোক ভিন্ন অপর সাধারণ তাহাদের সংবাদ বড় একটা রাখেন না। এই সকল শিল্পদ্রব্য সাধারণের গোচর করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব সবর্ণর লর্ড কারমাইকেলের পত্নীর আগ্রহে ও উৎসাহে বঙ্গদেশের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বাঙ্গালী ও য়ুরোপীয়ান ভদ্রলোককে লইয়া হোম ইণ্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েসন নামে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, লেডী কারমাইকেল সাহেবার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে এই সভার আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে না। কেবল কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে একটী ক্ষুদ্র ষ্টল সভার অস্তিত্বের একটুখানি ক্ষীণ স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে মাত্র। কিন্তু, এই দুর্দ্দিনে, যখন বিদেশ হইতে সকল প্রকার শিল্পদ্রব্যের আমদানী রহিত হইয়াছে অথবা কমিয়া গিয়াছে, সেইহেতু সকল প্রকার দেশীয় শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এখন এই সকল শিল্পদ্রব্যের বিবরণ সাধারণের গোচর করিয়া শিল্পগুলির অবস্থার উন্নতিসাধনই আমাদের প্রধান কার্য্য। এই উদ্দেশ্যে আমরা পাবনার "সুহৃদ" হইতে কতকগুলি গৃহশিল্পের বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায় পাবনার গৃহশিল্প সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"১। পাবনাতে তাঁতী ও জোলা উভয় জাতির বাস। বহুদিন হইতেই এই জেলা বস্ত্রশিল্পের জন্য সুনাম অর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। বিলাতী 'পাবনা-পেড়ে' কাপড় বোধ হয় অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। পাবনার জোগাড়ী হইতে যে জোলার ধুতি কলিকাতার একজিবিসনে প্রেরিত হয়, ঐ বস্ত্রের পাড়ের অনুকরণেই পাবনা-পেড়ে নামের কাপড় হয়। এই জেলার জোগাড়ী, সাহজাদপুর, গুজানগর, চলনা, বিশ্বম্ভরপুরের জোলারা অতি সুন্দর পরিধেয় বস্ত্র, বিছানার চাদর, জামার ছিট, গামছা, তোলন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন সিরাজগঞ্জ মহকুমাতেও অনেক জোলা কারিকরের বাস। যদি ইহাদিগকে সুলভে উপযুক্ত পরিমাণে সুতা সরবরাহ করা যায়, তাহা হইলে ইহারা ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারে। আজকাল সুতার অভাবেই ইহারা বেশের অভাব

পূরণ করিতে পারিতেছে না এবং কারেও লাভবান হইতেছে না। পেটের দায়ে ইহাদের অনেকেই এখন কৃষিকার্য্য করিতেছে।

২। তাঁতিবন্দের ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের তাঁতির চাদর এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। লোকে জলে করিয়া ব্যবহার করিত। উৎসাহের অভাবে এবং সূতার দুর্ম্মূল্যতার জন্য এ কার্য্যে এখন আর তাহাদের সেরূপ আগ্রহ নাই। সিরাজগঞ্জের নিকটস্থ ছোট ঘুলের চাদর এখনও প্রসিদ্ধ। বাজারে অতি চড়া দরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

৩। পাবনার পূর্ব্বাঞ্চলে বাসুরিয়া হইতে মধুরা পর্য্যন্ত স্থানের ধরাতিরা সুন্দর-সুন্দর কাঠের বৈঠক, সিন্দুকের কৌটা, বোলা, চুবি কাটি ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সমুদয় জিনিষে লাল কালো ইত্যাদি রং ফলানও উল্লেখযোগ্য। ঐ রং যেরূপ সুদৃশ্য, সেইরূপই স্থায়ী। হস্ত-শিল্পগুলিও চিত্তাকর্ষক।

৪। সিরাজগঞ্জ টাউনের এক মাইল দক্ষিণে কালিকা কান্দাপাড়া নামক স্থানে মহাজনদিগের খাতার জন্য খুব ভাল কাগজ প্রস্তুত হয়। উহা বাজারে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। এই কাগজের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে লিখিবার সময় ব্লটিং কাগজের আবশ্যক হয় না। লিখিলমাত্র শুকাইয়া যায়। বাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীগণ ইহা খুব পছন্দ করেন। এই কাগজ-সমস্যার দিনে এই সমস্ত কাগজের গুণাগুণ পরীক্ষা হওয়া কর্ত্তব্য।

৫। এই জেলার উত্তর-পশ্চিমে কলম গ্রাম পর্য্যন্ত স্থানে-স্থানে কাঁসারীদিগের বাস। তাহারা সুন্দর-সুন্দর পিতল ও কাংস-নির্ম্মিত থালা, ঘটী, বাটি, কলসী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সমস্ত জিনিষ বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হয়।

৬। এই জেলার বহু স্থানের বৈরাগীরা কাঠের মালা প্রস্তুত করে। এই সমস্ত মালা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চালান হইয়া থাকে। নদীয়া জেলাতেই বেশীর ভাগ যায়। পাবনার পূর্ব্ব দক্ষিণে হরিতলা গ্রামে বৈরাগীদের বাটীতে বেলের মালা প্রস্তুত হয়। এই মালা প্রস্তুত-করণ দেখিবার বিষয়। সামান্য যন্ত্র-সাহায্যে এই মালা প্রস্তুত হয়, কাজও অতি দ্রুত হইয়া থাকে।

৭। স্বর্ণ ও রৌপ্যের গহনা নির্ম্মাণে পাবনার কর্ম্মকারেরা বহুদিন হইতেই বিখ্যাত। যাহার হাতের কাজে চাকা, সে স্থান এ শিল্পে অনুন্নত থাকিতে পারে না। এখনও এই জেলার কর্ম্মকারেরা উত্তর-বঙ্গের বহু জেলাতে এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

৮। এখন পর্য্যন্তও এই জেলার সূত্রধর, কুম্ভকার ও কর্ম্মকারেরা আমাদের সাধারণ অভাবগুলি পূরণ করিয়া আসিতেছে। উৎসাহ পাইলে পাশ্চাত্য জাতির বহু জিনিষের অনুকরণ ইহারা করিতে পারে। এই সমস্ত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি একটু চেষ্টা করিলেই আবার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ফিরিতে পারে। যে সব শিল্প নষ্ট হইয়াছে, তাহাও উদ্ধার পাইতে পারে। চড়কার সূতা কাটিতে পারে, এমন বৃদ্ধা এখনও এই জেলাতে বিরল নহে। তাহাদের নিকট শিক্ষা করিলে আবার চড়কায় সূতা কাটা আরম্ভ হইতে পারে। ইতিমধ্যেই পাবনা জেলার রাইপুর কেতুপাড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ পাটোয়ারি বি-এল মহোদয়ের যত্নে এ শিল্প আবার দেখা দিয়াছে।"

রায় মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন,—"বৈদেশিক যন্ত্র-শিল্পের অভ্যুদয়ে, আমাদের বহু হস্তশিল্প লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। আমরা বিদেশজাত সুলভ ও আশু প্রীতিকর দ্রব্যের প্রলোভনে এতদিন দেশজাত দ্রব্য অবহেলা করিয়াছি, তাই এ দুর্দ্দিনে বহু সমস্যা আমাদের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অভাবই লোকের শিক্ষক। দেশীয় হস্তশিল্পের অনাদরের কুফল এক্ষণে আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি। যতদিন বিলাতী বস্ত্র আমাদের দেশে না আসিয়াছিল, ততদিন বস্ত্রের জন্য আমরা কাহারও দ্বারস্থ হই নাই। আমাদের প্রস্তুত বস্ত্রাদিতে আমাদের লজ্জা-নিবারণ হইয়াও তখন বিদেশীর লজ্জাও নিবারিত হইত। লৌহ, তাম্র, পিত্তল, কাষ্ঠে নির্ম্মিত বহু দ্রব্য তখন গৃহে নির্ম্মিত হইত। সামান্য সূচ-সূতার জন্য আমরা পরমুখাপেক্ষী হইতাম না। আমাদের বহু শিল্প নষ্ট হইয়া গিয়াছে; যাহা কিছু আছে, তাহাও যায় যায় হইয়াছে। এক্ষণে উৎসাহ দিয়া রক্ষা করিতে পারিলে ভবিষ্যতে অনেক উপকারে আসিবে।

কেবল পাবনা কেন, অন্যান্য জেলাতেও হস্তশিল্পের অভাব নাই। "আওয়ার ডে" উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শিল্পোৎসাহিনী সমিতির চেষ্টায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে যে শিল্পপ্রদর্শনী বসিয়াছিল, "ত্রিপুরা হিতৈষী"তে তাহার পুরস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা ও পুরস্কারের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই তালিকায় বহু শিল্পদ্রব্যের নাম সন্নিবিষ্ট দেখা যাইতেছে; এবং অতি আনন্দের বিষয় যে বহু মহিলা পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে শিল্প-দ্রব্যের নামগুলি নিম্নে সঙ্কলন করিতেছি। তাহা হইতে পাঠকেরা দেখিবেন, বঙ্গদেশে শিল্পীর এখনও একেবারে অভাব হয় নাই; এবং এই সকল শিল্প-দ্রব্যের সমুচিত ব্যবহারে দেশের অনেক টাকা দেশেই থাকিয়া যাইতে পারে। ত্রিপুরা জেলায় নিম্নলিখিত শিল্পদ্রব্যগুলি পাওয়া যায়—বেতের ব্যাগ, বাস্কেট, সিন্দুকের বোতাম, বটল ফিল্টার, চড়কা কাটা সূতা, চড়কা সূতার কাপড়, বোতাম প্রস্তুত করার যন্ত্র, সিলাইমেশিন প্রস্তুত করার যন্ত্র, সূতার রীল প্রস্তুত করার যন্ত্র, সিলাইমেশিন, পটীর পালো, এরারুট, দুধুরের সার, হারমোনিয়াম, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত শিলমোহর, কালি, কাগজ রাখিবার বক্সেট, ফুলের সাজি, বেতের চেয়ার, বেতের মেট, বেতের টুপী, তালপাতার আঁসের টুপী, তালপাতার ছাট, খড়ের মেট, কাঠের থালা ও বাটি, বাঁশের আলমারি, পাখা, কারুকার্য্যবিশিষ্ট কাষ্ঠের জিনিস, লৌহের জিনিস, নিব, মাটির জিনিস, চিকন কাপড়, অঙ্গুরী, সেলসিল-চিত্র, মানচিত্র, পটীর কাষ, কাঁথা, বেতের কাষ, বুনিকাটার কাষ, কার্পেটের কাষ, কাগজকাটা চিত্র, প্রভৃতি। পাঠকেরা দেখুন, বঙ্গদেশের সুদূর এক প্রান্তে একটি মাত্র জেলাতে কত বিভিন্ন প্রকারের শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

ইহাদের মধ্যে গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় অপরিহার্য্য বস্তুর সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়।

ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের আমলে নগদ টাকার কারবার বেশী হইত না; সরকারী কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ লোককে ভূমি দান করা হইত; অথবা রাজস্ব মাপ করা হইত। কেবল সরকারী কার্য্য নহে, ধর্ম্মার্থ দেবত্র, ব্রহ্মত্র দেওয়া হইত। সেবা-বিভাগের লোকেরা প্রায় জায়গীর পাইত। সেনানীরা সৈন্য-পোষণের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ জায়গীর লাভ করিতেন। এইরূপে ভূমির দান-গ্রহণ তখনকার দিনে লোকের এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, কোন কোন মুসলমান বাদশাহ জায়গীর দেওয়ার পরিবর্ত্তে, সৈন্য-সংগ্রহ বা অন্য প্রকার রাজকার্য্যের পারিশ্রমিক স্বরূপ নগদ মুদ্রা প্রদানের প্রথার প্রবর্ত্তন করিতে গেলে, লোকে অসন্তোষ প্রকাশ করিত। ইংরেজের আমলে ভূমিদান প্রথা রহিত হইয়া যায় এবং সর্ব্ব প্রকার রাজকার্য্য নগদ মুদ্রায় সম্পন্ন হইতে থাকে। এ যাবৎ এই প্রণালীতেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধ উপলক্ষে ইংরেজও সেকালের মত মূল্য-বিশেষে ভূমিদান বা রাজস্ব হইতে অব্যাহতি দানের প্রথার প্রবর্ত্তন করিতেছেন। পঞ্জাবী সিপাহীরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাহাদের পুরস্কার দিবার জন্য পঞ্জাবের গবর্ণমেণ্ট কতকটা ভূমি খয়রত করিয়া রাখিয়াছেন। সম্প্রতি আসামের গবর্ণমেণ্টও এই প্রথার অনুসরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আসাম গবর্ণমেণ্টের এই ভূমিদান ও রাজস্ব রেহাইয়ের বিবরণ আমরা "খুলনা" হইতে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

"ফরাসী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত খাসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশের মজুরদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসামের চীফ কমিশনার সাহেব বাহাদুর মিঃ বিটসন বেল মহোদয় গত ১১ই জুন সিলংএ একটী দরবার করেন। উক্ত প্রদেশের সর্ব্বশ্রেণীর গণ্যমান্য লোকদিগের সমক্ষে চীফ কমিশনার সাহেব বাহাদুর ঐ দলটীকে সম্বোধন করিয়া যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা শুধু বাঙ্গালার কেন, সমগ্র ভারতের অধিবাসীদিগেরও চক্ষু নিশ্চয়ই উন্মীলিত করিবে। অনারেবল মিঃ বিটসনবেল বলেন:—শুধু গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে নহে, সাধারণতঃ আসামের, বিশেষতঃ সিলংএর লোকদিগের পক্ষ হইতেও তোমাদের স্বদেশ-প্রত্যাগমন উপলক্ষে আমি তোমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। তোমরা জলে ও স্থলে যত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছ। আমরা বরাবরই তোমাদিগকে পরিশ্রমী বলিয়া জানিতাম, জগৎ সমক্ষে তোমাদের সে সুনাম ত রক্ষা করিয়াছই, অধিকন্তু আপনাদিগকে নির্ভীক বলিয়াও প্রমাণ করিয়াছ। যাহাদের কেহই পূর্ব্বে কোন দিন সমুদ্র পার হয় নাই, যাহাদের কেহই জীবনে ব্রহ্মপুত্রও দেখে নাই, সেই প্রকার সরল পার্ব্বত্য লোকদিগের পক্ষে বহু বিপদসঙ্কুল সুদূর প্রান্তে যাত্রার উদ্যোগী হওয়া বড় সহজ কথা নহে। বিশেষতঃ তোমরা অর্থ ও যশের লোভে যুদ্ধ হইতে যাও নাই, তোমাদের স্বাভাবিক সরল কর্ত্তব্য-জ্ঞানই তোমাদিগকে পাঠাইয়াছিল। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। মহৎ এবং পবিত্র উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া নিঃসন্দেহে তাঁহারা আমাদের পূজ্য হইয়াছেন। তাঁহাদিগের স্মৃতি দেশ এই পার্ব্বত্য প্রদেশের লোক মাত্রেরই অন্তরে জীবনী-শক্তির সঞ্চার করে। যাহারা ফিরিয়া আসিয়াছ, আমার ইচ্ছা হইতেছে আমি নিজে তাহাদিগকে কোন অনুগ্রহ দান করিতে পারিতাম। বহুদিন পূর্ব্বে মাথা পিছু যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত তখাকার মজুরদিগের প্রত্যেককেই স্বীয় জীবনের অবশিষ্টাংশের জন্য খাজানা মকুব করা হইল বলিয়া আমি ঘোষণা করিয়াছিলাম। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ইংরেজের প্রজা, তাহাদিগেরও নিকট আজ আমি সেই একই কথা ঘোষণা করিতেছি। যাহারা ইংরেজের প্রজা নহে, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিজ্ঞা করিতে না পারিলেও, এরূপ প্রতিজ্ঞার কোন আবশ্যকতাও নাই। কারণ আমি জানি তাহারা এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বেই সুখী—কোন খাজনাই তাহাদিগকে দিতে হয় না। যাহা হউক, সকলকেই আমি ইহা বলিতে পারি যে, তোমাদিগের কাহারও নাম সরকার বাহাদুর কখনও ভুলিবেন না এবং সুযোগ উপস্থিত হইলেই আমরা দেখাইব যে, আমরা অকৃতজ্ঞ নহি। সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে আজ আমি ঘোষণা করিতেছি যে, অন্ততঃ যতদিন আমি চীফ কমিশনার থাকিব, ততদিনের মধ্যে যাহারা যুদ্ধে গিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে উপযুক্ত লোক একজনও বেকার বসিয়া থাকিতে, গবর্ণমেণ্টের কোনও চাকুরীই যাহারা বাড়ীতে বসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না। কোন পদ খালী হইলে সেই পদের উপযুক্ত লোক যদি তৎক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকে, আপাততঃ অস্থায়ীভাবে যে কোন একটা বন্দোবস্ত করিয়া ঐ ব্যক্তির জন্যই অপেক্ষা করা হইবে। একথা প্রকৃত যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত সৈনিক ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত অন্যান্য সাধারণ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি উভয়ের পক্ষেই সমভাবে বলা হইতেছে। এই প্রদেশের প্রত্যেক জেলার এসিষ্টাণ্ট কমিশনার হইতে সামান্য চাপরাসী পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তির জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিবে। এই প্রকার একজন লোকও বেকার থাকিতে অপর কাহাকেও চাকুরী দেওয়া হইবে না। গবর্ণমেণ্ট তাহার কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য যাহা করিতে পারেন ইহা মাত্র তাহারই কিঞ্চিৎ।"

গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করায়, ইহার ফল ভালই হইবে বলিয়া মনে হয়। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজের ভূমি ভোগ করিতে পাইবে বুঝিলে, অনেকেই যে সেনাদলে বা Labour corpsএ যোগ দিবে, স্বচ্ছন্দে এরূপ আশা করিতে পারা যায়।

বর্দ্ধমান, কাটোয়া হইতে প্রকাশিত "প্রহরী" লিখিয়াছেন,—"গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত পুকুরিয়া গ্রামে মহকুমার সুযোগ্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-

এ, বি-এল মহোদয়ের সভাপতিত্বে "খুলনিয়া হিতসাধনমণ্ডলীর" একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত মণ্ডলীর সেক্রেটারী ডাক্তার শ্রীঅরুণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কার্য্য-বিবরণীতে হিতসাধনমণ্ডলী কি ও তাহার উদ্দেশ্য কি ও ঐ সকল উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে কি উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। পরে মণ্ডলী যে যে কার্য্য করিয়াছে অর্থাৎ (১) গ্রাম্য রাস্তা সংস্কার, (২) গ্রামে দুষ্টিতিকার ভাঁড় দেওয়া, (৩) গ্রাম্য বিদ্যালয়টীর আয়বৃদ্ধি করা, (৪) গ্রাম্য বালকগণের নৈতিক শিক্ষার জন্য একটী শ্রেণী গঠন করা, (৫) শিবমন্দির সংস্কার জন্য অর্থসংগ্রহ করা—এতদ্বিষয় বিবৃত করেন। তৎপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উত্থাপিত ও সমর্থিত হয়।

(১) প্রত্যেক গ্রামে হিতসাধনমণ্ডলী স্থাপন, চৌকিদারী ইউনিয়ন অনুসারে কেন্দ্রসমিতি গঠন ও বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর সহিত সংযোগ ও তাহার হিতসাধন মণ্ডলী স্থাপন।

(২) হিতসাধনমণ্ডলীর বিন্দুমাত্র রাজনৈতিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট না থাকা ও প্রতি সভায় একজন রাজকর্ম্মচারীর সভাপতির আসন গ্রহণ ও সভার কার্য্য-বিবরণী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যানকে অবগত করা।

(৩) হিতসাধনমণ্ডলীর কার্য্যে মহামান্য ভারতসরকারের সহায়তা করা ও গ্রাম্য রাস্তাটীর অবশিষ্ট সংস্কার জন্য সাহায্য প্রার্থনা।

(৪) অন্যূন নয়ের জীবন রক্ষা হইতে বহুমূল্যবর্দ্ধক ৬০।৭০ খানি প্রাণ রক্ষা করা। টাদবালি, নাহেরা, ভাণ্ডারখড়ে, পপকুল বাঁধের প্রস্তাব।

(৫) নিকটবর্ত্তী ১৪।১৫ খানি গ্রামের জন্য একটী মধ্য ইংরাজী আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন।

উক্ত হিতসাধনমণ্ডলী যে "নূতন প্রতিষ্ঠানে" গ্রাম হইতে চাঁদা তুলিয়া গ্রাম্য রাস্তাটী প্রায় ১৫০৲ টাকা ব্যয়ে কিয়ৎপরিমাণে সংস্কার করাইয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত রাস্তাটী সমাধা করিতে আরও প্রায় ৭০০৲ টাকা আবশ্যক, তদ্বিষয়ে আবেদন করায় সভাপতি মহাশয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন ভরসা দিয়াছেন।

মহকুমার উচ্চপদীয় সুযোগ্য সার্কেল অফিসার শ্রীযুত নর্ম্মান বোস বি-এ মহোদয় সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে হিতসাধনমণ্ডলী ও অনারেবল সার এস, পি, সিংহ মহাশয় প্রবর্ত্তিত স্বায়ত্তশাসন বিলের উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ একই, তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন।

সভাপতি মহাশয় অবশেষে ঐ প্রস্তাবে উক্ত বাঁধ সম্বন্ধে স্থানীয় জমিদার ও তালুকদারদিগকে পত্র দিয়া একমত ও উদ্যোগী করিবার চেষ্টা করিতেছেন ও সরকার হইতে কিছু সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা তদ্বিষয় জ্ঞাপন করেন। সময়মত সম্বন্ধে সমর্থ ব্যক্তিমাত্রেরই সময়মত দেওয়া উচিত, ইহাতে লাভ বই লোকসান নাই, যখন ইচ্ছা টাকা তুলিয়া লইতে পারা যায়, টাকা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, ইত্যাদি বিষয় বেশ সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।" ইহাই প্রকৃত হোমরুল। ইহার জন্য কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হয় না; ইহাতে আইন কানুনের প্রয়োজন হয় না, কাহারও সাহায্যও দরকার হয় না। সকল বিষয়ে পরের উপর নির্ভর না করিয়া যতটা পারা যায়, নিজেরা কায করিবার চেষ্টা করিলে, বাঙ্গলার পল্লীগ্রামগুলির শ্রী অচিরে ফিরিয়া যাইতে পারে। বাঙ্গলার অন্যান্য পল্লীগ্রাম সকল কতদিনে এইরূপ মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে শিখিবেন?

এবার পাটের চাষীদিগের যেরূপ দুর্ব্বৎসর যাইতেছে, তাহাতে অনেকে আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও যদি চাষারা পূর্ণমাত্রায় পাটের চাষ করে, তাহা হইলে চাষাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না, এবং তাহাদের প্রতি দেশের লোকের সহানুভূতিও করিয়া যাইবে। সহযোগী "ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ" ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, এবারও চাষারা রীতিমত পাটের চাষ করিয়াছে। আবার, পক্ষান্তরে, অনেকে ইহাও মনে করিয়াছিলেন, চাষা হইলেও কৃষকেরা একেবারে নির্ব্বোধ নহে; পাটের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহারা শিক্ষালাভ করিবে। হয় এবার তাহারা পাটের চাষ আদৌ করিবে না; আর যদিই করে, তাহা হইলেও কম পরিমাণে করিবে। শুনিয়া কিন্তু আশ্বস্ত হওয়া গেল যে, কোন কোন জেলায় পাটের চাষ এবার যথার্থই কম হইয়াছে। সহযোগী "স্বরাজ" লিখিয়াছেন,—

"কোষ্টা—কোষ্টার আবাদ এবার কম। ঘর হইবে না মনে করিয়া কোষ্টা বেশী লোকে আবাদ করে নাই। যাহার ১০ বিঘা জমি আছে সে হয় ত এক বিঘা বুনিয়াছে। গত সনের কোষ্টা এখনও অনেকের ঘরে মজুত আছে। ২৲ টাকা ২৷৷০ টাকার বেশী কোষ্টার ঘর নাই, তাহাও কিনিবার লোক নাই। কোষ্টার বড়ই দাঙ্গাহিতেছে। এক মণ কোষ্টাতে কৃষক ২৲ টাকা ২৷৷০ টাকার বেশী পাইতেছে না। কিন্তু এই কোষ্টা কিনিয়া চটের কলওয়ালাগণ প্রভূত লাভ করিতেছে। তাহারা প্রতি মণে ১০৲ টাকা ১৭৲ টাকা আদায় করিতেছে। তাহারা এবার শতকরা ১৫০৲ টাকার উপর ডিভিডেণ্ড দিয়াছে। এই সমুদয় জানিতে পারিয়াই কৃষকগণ এবার কোষ্টার আবাদ ভালরূপ করে নাই।" আবার, অতিবৃষ্টির ফলে, কোন কোন স্থানে অল্প স্বল্প পাট যাহা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাও অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অবশ্য, পাটই হউক, আর অন্য যাহাই হউক, খরচপত্র এবং পরিশ্রম করিয়া যাহার চাষ করা যায়, তাহার খোল আনা ফসল না হইলে, দুঃখের কথা; কিন্তু পাটের সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, পাট কম উৎপন্ন হইলে, চাষার ঘরে মজুত পাট অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। সুতরাং একেবারে লোকসানের আশঙ্কা নাই, এক দিকে না হউক, আর এক দিকে লাভ হইতে পারে।

উৎকল-সাহিত্য

[শ্রীরমেশচন্দ্র দাস]

উৎকল-সাহিত্য—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

১। "পুরাতন পুঁথি" (১—লীলাবতী)—লেখক—শ্রীযুক্ত রাম, কাব্যতীর্থ। উৎকলে অনেক প্রাচীন পুঁথি আছে। তাহাদের প্রকাশ ত দূরের কথা, এখনও অনেক পুস্তক আবিষ্কৃত হয় নাই। যে সাধারণ পুস্তক যে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার আর প্রমাণের আবশ্যকতা কি? দেশের এই প্রাচীন তালপত্র পুঁথি সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত 'উৎকল-সাহিত্য-সমাজ' বহুকাল হইতে উদ্যোগী হইলেও, স্থায়ী ফলের অভাবে এ পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। তথাপি সংগ্রহ-কার্য্য অতি শীঘ্র আরম্ভ হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া উক্ত সমাজ এ বৎসর এক 'অনুসন্ধান সমিতি' গঠিত করিয়াছেন। উৎকলের প্রত্নতত্ত্বানুরাগী-সভ্যগণ গঠিত সমিতি দ্বারা সংকলন কার্য্য কিছুদূর অগ্রসর হইবার আশা করা যায়। আমাদের দেশে অনেকে এরূপ সংস্কারবদ্ধ যে, অন্যের হস্তে আপনার পুঁথি প্রদান করিতে বিশেষ অনিচ্ছুক; সেরূপ স্থলে পুঁথির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লাভ করিতে পারিলেও এক প্রকার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

উপরি-উক্ত পুঁথিখানি আমার প্রিয়বন্ধু, ও নবগঠিত সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত আর্ত্তত্রাণ মিশ্র মহাশয় তিনিয়া নিবাসী কোনও মুসলমানের গৃহ হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। 'লীলাবতী' নামক ছন্দোনিবদ্ধ অঙ্কশাস্ত্র বহুকাল হইতে উড়িষ্যায় প্রচলিত আছে। এইখানি তাহার উত্তরখণ্ড। পূর্ব্ব খণ্ড আমাদের হস্তগত হয় নাই।

কিতিবংশজ নারায়ণ দাস সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়া এই 'লীলাবতী' প্রকাশ করেন। কিতিবংশীয় গুরুমহাশয়গণের অঙ্কশাস্ত্র-চর্চ্চা এক প্রকার জাতীয় ব্যবসায়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে 'ওঝা' বা 'উপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত। কটকের স্বকর প্রদেশে অদ্যাপি দাস আখ্যাধারী গুরুমহাশয় দেখা যায়। তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহাদের কৌলিক উপাধি পট্টনায়ক, নায়ক ও মহান্তি; সম্ভবতঃ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিবার পরে দাস সংজ্ঞা পাইয়াছেন। কবির গ্রন্থলিখিত পরিচয় হইতে তাহা স্পষ্ট জানা যায়। এই গ্রন্থখানি ১৬৬৭ শকাব্দে (১৭৪৫ খৃঃ) লিখিত। পুস্তকখানি দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত, ও প্রত্যেক অধ্যায়ে ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দে রচিত। শেষ বা দ্বাদশ অধ্যায়ে তাঁহার বংশ-পরিচয়াদি রহিয়াছে।

গ্রন্থান্তর্গত দ্বাদশ অধ্যায়ের ছন্দ ও বর্ণিত বিষয় নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

প্রথম অধ্যায় মঙ্গল-গুজরী ছন্দে ১১১ পদে সমাপ্ত। ইহাতে রাশির বর্ণফল আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায় ১১ পদ গুজরী রাগে লিখিত। পরিক্রমা ব্যবহার ইহার বর্ণিত বিষয়। তৃতীয় অধ্যায় বঙ্গলশ্রী ছন্দে ৮৭ পদে সম্পূর্ণ এবং বিষয়—'ভাও প্রতিভাও'। চতুর্থ অধ্যায়ে ৯১ পদে মিশ্রাঙ্ক ব্যবহার মঙ্গলরাগে বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চমেও উক্ত বিষয় রাগ কেদার বা চক্রকেলীর ৭৩ পদে সম্পন্ন। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আষাঢ় শুক্ল বাণীতে রচিত ২৪ পদে 'প্রোড়ী ব্যবহার' অনুপালিত হইয়াছে। সপ্তম ও অষ্টম যথাক্রমে রাগ বসন্ত ও গোধিতে লিখিত। পদ-সংখ্যা ৫৫ ও ৫৪; বিষয়—ক্ষেত্র-পরিমাণ। ইহাতে নানা প্রকার ত্রিভুজ, বিষম চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজাদির ক্ষেত্রফল নিরূপিত হইয়াছে। নবম অধ্যায় মুনিবর বাণীতে ৫৭ পদে রচিত। তাহাতে বর্গক্ষেত্র ও বৃহত্তর ক্ষেত্রফল নিরূপণ বর্ণিত হইয়াছে। দশম অধ্যায়ে ত্রিকোণমিতির অঙ্কসাধন প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ২৬টী পদ কামোদীতে লিখিত। একাদশ ও দ্বাদশে 'ভূটক' ব্যবহার বর্ণিত। তন্মধ্যে প্রথমটী কল্যাণ আহারী ৫৭ পদে এবং শেষোক্তটী কেদার কামোদী ৩৪ পদে সমাপ্ত। উল্লিখিত প্রত্যেক অধ্যায়ে কঠিন অঙ্কের প্রশ্ন ও সমাধান পদ্যে রচিত হইয়াছে।

২। "উড়িষ্যা যাত্রার সংস্কার"—লেখক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী। গত ২০ বর্ষ হইতে আমরা উড়িষ্যা যাত্রার সংস্কার বিষয়ে লেখনী চালনা করিয়া আসিতেছি। নানা পত্রিকায় ও সভা-সমিতিতে নানা ভাবে আলোচনা করিয়াছি। শুধু তাহাই নহে; সংস্কার-প্রার্থী হইয়া কয়েকটী বিখ্যাত যাত্রাদলের নেতাদের সহিত পরামর্শ করিয়াছি এবং শক্তিশালী সংস্কারপ্রিয় বন্ধুদের বৈঠকে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়াছি। আমাদের আশা উচ্চ এবং সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় আমরাও আশার মোহিনীশক্তিতে মুগ্ধ; কিন্তু সকলের জীবনে সাফল্য উপভোগ ঘটিয়া উঠে না।

আমাদের ক্ষীণ প্রার্থনা সর্ব্বপ্রথমে নাট্যরথী শ্রীযুক্ত রামশঙ্করের প্রাণে আঘাত করিয়াছিল। তাহারই ফলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার "ঘড়-লোক" নামক নীতিনাট্যখানি আমরা উপহার প্রাপ্ত হই। কিন্তু তাহা রঙ্গমঞ্চের অধিক উপযোগী হইলেও, সম্পূর্ণরূপে যাত্রার অভাব পূরণ করিতে পারে নাই। ঐখানি আধুনিক সমাজের উদ্দেশে লিখিত। এদিকে আমাদের দেশ এখনও ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত,—সমাজ এখনও প্রাচীনতা ও রক্ষণশীলতার মোহ অতিক্রম করিতে অসমর্থ। সংস্কার-স্রোত অতি ধীর-গতিতে প্রবাহিত দেখিয়া, শিক্ষিত লেখক-দিগকে পৌরাণিক বিষয় যাত্রার রুচির অনুগামী করিয়া নাটকাদি রচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, সাহিত্য-

রসিক সঙ্গীতপ্রিয় শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ফেঞ্চীনায়—"মানভঞ্জন" ও "মাননীলা" নামক দুইখানি ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া অভিনয় করাইতেছেন। পরে "প্রেটেণ্ট মেট্রপলিটন"কে নাটক আকারে পরিণত করিয়া তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কেবল নাটিকা দুইখানি প্রণয়ন করিয়া তিনি ক্ষান্ত নহেন, অল্পকাল মধ্যে কেদারপাড়া সহরে এক নৌখীন দল গঠন করিয়া অভিনয় করাইতেছেন। এবং স্থানীয় বিখ্যাত সুরেন্দ্রবংশের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তা শ্রীযুক্ত মোহনচন্দ্র শ্রীকণ্ঠন এবং অন্যান্য যুবকবৃন্দের সহায়তা লাভ করিয়াছেন। কি সাজসজ্জা, কি দৃশ্যাবলী, কি একতানতা বাদ্যযন্ত্রের সুসমন্বয়, কি বাল-অভিনেতাদের উক্তি-প্রত্যুক্তি—সকল বিষয়ে নূতনত্ব ও সৌন্দর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যাত্রাদলের সাধারণ দোষগুলি তিনি সযত্নে পরিহার করিয়াছেন। সুরেন্দ্রবংশ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ও সঙ্গীতপ্রিয়। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা আমাদের দেশ প্রচলিত কুরুচিপূর্ণ যাত্রাভিনয় দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের যাত্রা অতি অল্প সময়ে সে পরিবারে বিশেষ পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। সময়ের ৫ ঘণ্টা লোক অভিনয় দর্শনে তৃপ্তি লাভ করিতেছেন; ইহা কবির কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়।

নাটিকা দুইখানি প্রকাশিত হইলে ব্যবসায়ী যাত্রাদল দ্বারা দেশে বিশেষরূপে পরিচিত হইতে পারে। এক সময়ে উড়িষ্যা কবি বাঙ্গালায় যাত্রাদল গঠন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; "গোপাল উড়ে"র যাত্রা বঙ্গবাসিগণ সাগ্রহে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু সত্যই পরিতাপের বিষয়, আমাদের নিজ দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সেদিকে দৃষ্টি নাই। আমাদের একান্ত আশা, গোবিন্দবাবু যে সুন্দর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর হইবেন। তিনি বৃন্দাবনলীলা গ্রহণ করিয়াছেন। অন্য কোনও কৃতি সন্তান কুরুক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইতে চেষ্টা করিবেন কি?

মুকুর—বৈশাখ, ১৩২৫

"ভক্ত কবি পীতাম্বর দাস"—লেখক শ্রীআনন্দ বেহেরা। উড়িষ্যার অন্যান্য প্রাচীন কবির ন্যায় ভক্তকবি পীতাম্বর দাসের জীবনী কালের অতীত অন্ধকারে লুকায়িত। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া কবির জীবনী উদ্ধার সহজসাধ্য নয়। তথাপি তাঁহার লিখিত পুরাণ অবলম্বনে কয়েকটি কথা বলা যাইতে পারে।

তাঁহার আবির্ভাব-কাল গড়পড়তা ১৭৮০ সালের নিকটবর্ত্তী। নানা কারণে তাঁহার জন্মস্থান নির্ণয় করা দুরূহ; তথাপি "কবিকুলা নদীতীরে নবর আখড়া, শিরীক্ষেত্র মণ্ডলস্থ বায় মূল গড়া" হইতে আমাদের অনুমান হয়, তাঁহার জন্মস্থান আধুনিক পুরীর জেলার অন্তর্গত। তিনি বসুমেধী ও কৌণ্ডিন্য গোত্রী ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতার নাম বাদুকেশব। পিতামহ লক্ষ্মীধর বাল বিশেষ ধার্ম্মিক ছিলেন এবং পরমহংস শ্রীকালাচাঁদ করিয়াছিলেন। বাদুকেশবের দ্বাদশ বিষ্ণুসেবাপরায়ণ ছিলেন। বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী পুরাণাদি রচনা করেন।

যতদূর জানা যায়, কোনও পাঠশালে তিনি প্রেরিত হন নাই। তাঁহার পিতা স্বগৃহে তাঁহাকে যৎসামান্য উড়িয়াভাষা শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু পীতাম্বর বীয় প্রতিভাগুণে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন, এবং পিতা ও বৈষ্ণবগণের নিকট ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া, আপন জ্ঞান ও রুচির অনেকাংশ মার্জ্জিত ও শ্রীসম্পন্ন করিয়াছিলেন। ক্রমে ধর্ম্মভাবও প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ভজন ও স্তব রচনা করিয়া দেবোদ্দেশে প্রত্যহ গান করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কবিতা-রচনার বীজ প্রথমে অঙ্কুরিত হয়। কথিত আছে, কাব্যদেবী তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া নৃসিংহ-পুরাণ রচনার আদেশ করেন।—

"এমন্ত নামন্তু মু করন্তে হৃদে ধান,
মাত্রে কাব্যদেবী মোতে হোইলে প্রসন্ন।
সিংহ গুরুপক্ষ যে পঞ্চমী গুরুবার,
শ্রীহরি কিশোর বেষ বহিল অন্তর।
আসরে সে উষা আসি হোইলে মোহর,
আজ্ঞা হেলে নৃসিংহ পুরাণ গ্রন্থ কর।"

—১ম রত্নাকর।

সেই উপদেশ ও আজ্ঞানুসারে কবি ২২ বৎসর বয়সে রচনা আরম্ভ করিয়া সাতখণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। ৬ষ্ঠ রত্নাকর শেষ করিতে তাঁহার জীবনের ৮৪ বৎসর অতীত হয়। সুতরাং অবশিষ্ট তিন খণ্ড শেষ করিতে তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং যথা শীঘ্র শেষ করিতে যত্নবান হন।

পীতাম্বরের সাংসারিক অবস্থা ভাল না থাকায় জীবিকা নির্ব্বাহ নিমিত্ত ভিক্ষাপাত্র হস্তে তাঁহাকে দেশ-ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অনেকে বলেন, বীরকিশোর দেবের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তিনি রাজসভায় অনেক অর্থ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সে যাই হউক, কবি আমাদিগকে এক বিরাট গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। পুরাণের দোষগুণ সমালোচনা আমাদের অভিমত না হইলেও, দুই এক কথা সে সম্বন্ধে বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। সমস্ত পুরাণ পাঠ করিলে রচনার বাহুল্য দেখা যায়। শেষ তিন খণ্ডের রচনা প্রথম চারি খণ্ডের মত সুখপাঠ্য নয়। তাঁহার রচনা সরল ও ভাববাঞ্জক। উপমা-প্রয়োগে ও চরিত্র-চিত্রণে তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু অতিরঞ্জন বা বর্ণনা-বাহুল্য তাঁহার স্বাভাবিক দোষ। তাঁহার ধর্ম্মমত নিতান্ত কুসংস্কার-সমাচ্ছন্ন নয়; তথাপি এরূপ গ্রাম্য-ভাবাপন্ন যে, আধুনিক পাঠকগণের বিরক্তিকর। যাহা হউক, তিনি যে ভক্ত কবিগণের মধ্যে উপযুক্ত আসন পাইবার অধিকারী, সে বিষয়ে আর দ্বিমত থাকিতে পারে না।

জ্যৈষ্ঠে নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব

[শ্রীজগদানন্দ রায়]

কবে ঠিক জানি না, সম্ভবতঃ গত ২৪শে বা ২৫শে জ্যৈষ্ঠ হইতে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আকাশে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড চলিতেছে। মহাকাশে আগুনের অভাব নাই। সূর্য্য লক্ষ-লক্ষ বৎসর ধরিয়া অবিরাম আগুনে পুড়িয়া মরিতেছেন। ছোট-বড় সকল নক্ষত্রই এক-একটি বৃহৎ অগ্নিগোলক। তাহারা যে কত বৎসর ধরিয়া পুড়িতেছে, তাহার হিসাবই হয় না। আমাদের পৃথিবী এবং অপর গ্রহ উপগ্রহেরা অগ্নিগর্ভ; ইহাদের অনেকেরই উপরকার আগুন নিবিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু ভিতরকার আগুন আজও প্রখর আছে। তা' ছাড়া ছোট বড় হাজার হাজার উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর টানে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া প্রতিদিনই ক্ষণে ক্ষণে অগ্নিকাণ্ড দেখাইতেছে। ২৪শে জ্যৈষ্ঠের ঘটনাটি এ প্রকার অগ্নিকাণ্ড নয়। সেদিন পৃথিবী হইতে বহুদূরে এক নক্ষত্রশূন্য স্থানে হঠাৎ লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়িয়া এক প্রকাণ্ড আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। দূরের জিনিস ছোটো দেখায়,—অগ্নিকাণ্ড কোটি কোটি মাইল দূরে ঘটিয়াছিল; তাই আমরা পৃথিবীতে বসিয়া সেই প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডকে একটা বড় নক্ষত্রের আকারে দেখিয়াছিলাম। শুক্রগ্রহ যখন শুকতারা বা সান্ধ্য-তারা হইয়া পূর্ব্ব বা পশ্চিমের আকাশে উদিত হয়, তখন তাহাকে কত বড় দেখায়, আমরা অনেকেই তাহা দেখিয়াছি। ২৪শে জ্যৈষ্ঠের ভীষণ অগ্নিকাণ্ডটিকে প্রথমে সেই রকম উজ্জ্বল নক্ষত্রের আকারে কয়েকদিন দেখা গিয়াছিল। অবৈজ্ঞানিক লোকে আকাশের গায়ে এত বড় নক্ষত্রটাকে হয় ত দেখিয়াও দেখেন নাই; সমজদার লোক দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, আকাশের এক অংশে কি ভয়ানক আগুনই জ্বলিতেছে!

ঘটনাটির কথা একটু খোলসা করিয়া বলা যাউক।

পৃথিবীর চারিদিকের আকাশে যতগুলি নক্ষত্র দেখা যায়, তাহাদের প্রত্যেকটিরই ছবি আকাশের মানচিত্রে অঙ্কিত আছে। এই মানচিত্র হাতে আঁকা হয় না; দূরবীণ্ দিয়া ফোটোগ্রাফে ছবি তোলা হয়। কাজেই আকাশের যেখানে যে নক্ষত্রটি আছে, চিত্রে তাহা আপনা হইতেই নির্ভুল ভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়। জ্যোতিষীরা চিত্রের নক্ষত্রগুলিকে লইয়া এক একটা রাশির কল্পনা করেন, এবং প্রত্যেক রাশির প্রত্যেক নক্ষত্রটিতে এক একটি নম্বর দিয়া রাখেন। যাঁহারা জ্যোতিষের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা আকাশের মানচিত্রের সহিত মিলাইয়া ছোটো বড় সকল নক্ষত্রেরই পরিচয় লইতে পারেন। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে এবং সূর্য্য যেমন গ্রহ-উপগ্রহ সঙ্গে লইয়া মহাকাশের এক দিক্ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলে, নক্ষত্রও সেই রকমে আকাশে চলা-ফেরা করে। কিন্তু কাছের জিনিস নড়াচড়া করিলে যেমন তাহা চোখে পড়ে, দূরের জিনিষের চলাফেরা সে রকমে নজরে পড়ে না। নক্ষত্রমাত্রেই পৃথিবী হইতে বহু কোটি ক্রোশ দূরে থাকে; কাজেই আকাশে দ্রুতবেগে ছুটাছুটি করিলেই তাহাদের অনেকেরই স্থানচ্যুতি দশহাজার বিশ হাজার বৎসরেও বুঝা যায় না। এই কারণে আকাশের মানচিত্রে নক্ষত্রদের যে ছবি থাকে, তাহা নির্ভুল বলিয়া বহুকাল ব্যবহার করা যায়। আকাশের কোন্ অংশে কোন্ বড় নক্ষত্র আছে, তাহা জানিবার জন্য মানচিত্রের প্রয়োজন হয় না, জ্যোতিষীরা ইহাদের কথা মুখে মুখে বলিয়া দিতে পারেন। সুতরাং আকাশের কোন স্থানে হঠাৎ বড় নক্ষত্রের উদয় হইলে, ঘটনাটি জ্যোতিষীদের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না।

জ্যৈষ্ঠের নূতন নক্ষত্র প্রথমে কোন্ জ্যোতিষীর নজরে পড়িয়াছিল, তাহা আজও জানা যায় নাই। ১২ই জুন তারিখে রয়টারের তারের খবরে নক্ষত্রের উদয়ের কথা ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল। আমরা সেই দিনই তাহার সন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলাম; কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। সেই সময়ে কয়েকদিন আকাশ এমন মেঘাচ্ছন্ন ছিল যে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও নূতন নক্ষত্রটিকে দেখা যায় নাই। ৪ঠা আষাঢ় প্রাতঃকাল হইতে বৃষ্টি বন্ধ ছিল, এবং রাত্রি এগারোটার সময়ে কয়েক মিনিটের জন্য পূর্ব্বের আকাশ একটু পরিষ্কার হইয়াছিল; সেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি আকাশ-চিত্রের সহিত মিলাইয়া নূতন

নক্ষত্রটিকে দেখিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু দূরবীণ্ দিয়া দেখিবার উপায় ছিল না। সেদিন আমরা নক্ষত্রটিকে লোহিতবর্ণবিশিষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীর তারার ন্যায় উজ্জ্বল দেখিয়াছিলাম।

৪ঠা আষাঢ়ের পর আজ দুই সপ্তাহ ধরিয়া প্রায় প্রত্যেক রাত্রিতেই নক্ষত্রটিকে দেখিতেছি; দিনে দিনে ইহার আলোক মৃদুতর হইয়া আসিতেছে। ১৯শে আষাঢ় রাত্রিতে ইহাকে তৃতীয় শ্রেণীর নক্ষত্রের ন্যায় অনুজ্জ্বল দেখিয়াছি। নূতন নক্ষত্র বেশিদিন উজ্জ্বল থাকে না। একদিন হঠাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া তাহারা দিনে দিনে ছোটো হইয়া আসে এবং শেষে তাহাদিগকে আর দেখা যায় না। জ্যৈষ্ঠের নূতন নক্ষত্রের অবস্থা প্রায় সেই রকম হইয়া আসিয়াছে; বোধ হয় আর দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে সেটি একবারে নিবিয়া যাইবে।

প্রথম অবস্থায় নক্ষত্রটির মূর্ত্তি কি প্রকার ছিল, মেঘের উপদ্রবে তাহা দেখিবার সুবিধা পাই নাই। যশোহর নিবাসী পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চন্দ্র মহাশয় নক্ষত্রের প্রথম অবস্থা দেখিয়া আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন, এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; পাঠক ইহা পাঠ করিলে বুঝিবেন, জ্যৈষ্ঠের নক্ষত্রটি আবির্ভাব-কালে নিতান্ত ছোটো ছিল না।

রাধাগোবিন্দ বাবু ৩রা আষাঢ় লিখিয়াছেন,—"প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে, ঠিক কোন্ তারিখে স্মরণ নাই, আমরা কয়েকটি বন্ধুর সহিত বাহিরে বসিয়া ছিলাম। তখন রাত্রি নয়টা। হঠাৎ মনে হইল চন্দ্রহীন রাত্রিতে যেমন অন্ধকার হওয়া উচিত, তাহা যেন হয় নাই; দিঙ্মণ্ডল যেন একটা মৃদু আলোকে আলোকিত হইয়া আছে। শুক্র-গ্রহ পৃথিবীর খুব নিকটে আসিলে যেমন আলো হয়, এই আলো যেন কতকটা সেই রকম। সেদিন আকাশে শুক্র, বৃহস্পতি বা চন্দ্র ছিলেন না। শনি, মঙ্গল এবং অভিজিৎ প্রতিদিনই উদিত থাকেন; তবে কেন এরূপ আলো হঠাৎ দেখা দিল, আমরা তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। কিন্তু, উহা যে কোন নূতন নক্ষত্রের আলোক, তখন মনেই হইল না। পরদিন সম্ভবতঃ ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, রাত্রি দশটার সময়ে হঠাৎ পূর্ব্বাকাশে নজর পড়িলে, একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতে পাইলাম। তখন নক্ষত্রটির উপরে বেশ মেঘ ছিল, তথাপি মেঘের অন্তরাল হইতে তাহার জ্যোতিঃ বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু নক্ষত্রটি যে নূতন, তাহা তখনো মনে স্থান পাইল না। স্থির করিলাম, আকুইলি (Aquilae) রাশির আল্‌টেয়ার (Altair) নামক নক্ষত্রটিই বুঝি মেঘাবৃত রহিয়াছে। কিন্তু শীঘ্রই ভ্রম ঘুচিয়া গেল;—মেঘ ক্ষণিকের জন্য সরিয়া গেলে দেখিলাম,—উহা আল্‌টেয়ার নহে। কিন্তু মেঘের অত্যাচারে আর সেই রাত্রিতে পর্য্যবেক্ষণ ঘটিল না;—পরের দুইদিনও এই প্রকারে কাটিয়া গেল; বর্ষার নিবিড় মেঘে আকাশ ঢাকা রহিল; কেবল সন্ধ্যাকালে পূর্ব্বাকাশ মৃদু আলোকে উদ্ভাসিত দেখিতে লাগিলাম। ইহার পরে ১২ই জুন তারিখের ষ্টেটস্‌ম্যান্ প্রভৃতির তারের সংবাদে জানা গেল, আকুইলি রাশিতে এক নূতন নক্ষত্রের উদয় হইয়াছে। ইহাতে বুঝা গেল, তিনদিন পূর্ব্ব হইতে যে নক্ষত্রটিকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহাই নূতন নক্ষত্র।"

পূর্ব্বোক্ত পত্রাংশ হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, সম্ভবতঃ রাধাগোবিন্দ বাবুই ভারতবর্ষে নক্ষত্রটিকে প্রথম দেখিয়াছেন। নূতন ধূমকেতু বা নূতন নক্ষত্র যাঁহারা প্রথমে দর্শন করেন, তাঁহারা জ্যোতির্বিদ্‌দিগের নিকটে বহু সম্মান প্রাপ্ত হন; কখন কখন আবিষ্কর্ত্তার নাম অনুসারে জ্যোতিষ্কগুলির নামকরণ করা হয়। আমরা রাধাগোবিন্দ বাবুকে অভিনন্দিত করিতেছি।

নূতন নক্ষত্রটি আজও ২০শে আষাঢ় সন্ধ্যার সময়ে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইতেছে। পাঠক যে কোনো আকাশ-চিত্রের সহিত মিলাইয়া যদি নক্ষত্রটির সন্ধান করেন, তাহা হইলে কখনই বিফল হইবেন না। আজকাল অভিজিৎ (Vega) নামক নক্ষত্রটিকে সন্ধ্যার পরেই আকাশের পূর্ব্ব-উত্তর দিকে দেখা যায়। অভিজিৎ প্রথম শ্রেণীর অনতি-উজ্জ্বল নক্ষত্র; সুতরাং দেখিলেই পাঠক ইহাকে চিনিতে পারিবেন। তারপরে প্রায় পূর্ব্বদিকে আল্‌টেয়ার্ নামক আর একটি বড় নক্ষত্রকে আজকাল দেখা যায়। একটু চেষ্টা করিলে ইহাকেও চিনিয়া লওয়া কঠিন হইবে না। এই নক্ষত্রটির সহিত আরও দুইটি মাঝারি রকমের নক্ষত্র কাছা-কাছি থাকিয়া প্রায় সমসূত্রে অবস্থান করে। ইহা দেখিয়া, পাঠক আল্‌টেয়ারকে চিনিয়া লইতে পারিবেন। ইহারই নিকটে নূতন নক্ষত্রের উদয় হইয়াছে। আল্‌টেয়ারের

তিনটি তারার যোগে যে সরলরেখা হইয়াছে, তাহার নিম্ন-প্রান্তের সহিত যদি একটি লম্ব-রেখা (Perpendicular) কল্পনা করা যায়, তবে তাহা একটি মাঝারি রকমের নক্ষত্রকে ভেদ করিয়া আর একটি লোহিতাভ তারায় গিয়া ঠেকিবে। এই লোহিত তারাটিই নূতন নক্ষত্র।

নূতন নক্ষত্রটির সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইল। পৃথিবী হইতে কত দূরে ইহার আবির্ভাব হইয়াছে, এবং তাহাতে কি কি পদার্থ পুড়িতেছে, এই সকল বিষয় আজও জানা যায় নাই। মান্দ্রাজের কোদাই-কানাল্ নামক স্থানে যে মান-মন্দির আছে, সেখানে নক্ষত্রটির অনেকগুলি ফোটোগ্রাফ ছবি উঠানো হইয়াছে এবং রশ্মিনির্ব্বচন যন্ত্র (Spectroscope) দিয়া রশ্মি-বিশ্লেষ করা হইতেছে। শুনিতেছি, ইহাতে হাইড্রোজেন বাষ্পের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

এখন কি প্রকারে এই শ্রেণীর নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব হয়, সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আজ পাঠকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

পাঠক বোধ হয় জানেন, অনন্ত মহাশূন্যে যে কেবল কতকগুলি বৃহৎ নক্ষত্র এবং গ্রহই আছে, তাহা নয়। তাপ ত্যাগ করিয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক আমাদের চন্দ্র ও পৃথিবীর ন্যায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছে, এ প্রকার মহাসূর্য্যের ন্যায় মৃত জ্যোতিষ্কও আকাশে অনেক রহিয়াছে। ইহারা আলোক দেয় না; কাজেই ইহাদিগকে চোখে দেখার উপায় নাই। অনন্ত মহাকাশের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রেতের ন্যায় ভ্রমণ করাই ইহাদের কাজ। তা' ছাড়া, ধূলিকণা অপেক্ষাও লঘুতর পদার্থ আকাশের স্থানে-স্থানে কোটি কোটি মাইল অংশ জুড়িয়া অবস্থান করে। এই ধূলিরাশিকে উজ্জ্বল এবং অনুজ্জ্বল উভয় অবস্থাতেই দেখা যায়। উজ্জ্বল হইলে এগুলিকে দূরবীণে ও ফোটোগ্রাফ্-চিত্রে নীহারিকার আকারে দেখা গিয়া থাকে; অনুজ্জ্বল হইলে চোখে দেখাই যায় না। জ্যোতিষীরা বলেন, দুইটি মৃত নক্ষত্র যখন দুই দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া পরস্পরকে ধাক্কা দেয়, তখন উভয়েই চূর্ণ হইয়া যায় এবং সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ানক অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। এই অগ্নিতে তাহাদের দেহের উপাদান জ্বলিয়া পুড়িয়া বাষ্প হইয়া পড়ে। দূর হইতে আমরা এই জলন্ত বাষ্পরাশিকেই নূতন নক্ষত্রের আকারে দেখি, কেবল ইহাই নূতন নক্ষত্রের উৎপত্তির কারণ নয়। কোনো মৃত নক্ষত্র ভীমবেগে চলিতে-চলিতে যখন কোন অনুজ্জ্বল নীহারিকা-স্তূপে ঠেকিয়া ধাক্কা দেয়, তখন সেই সংঘর্ষণে লঘু নীহারিকা জ্বলিয়া উঠিয়াও নূতন নক্ষত্রের সৃষ্টি করে। আমাদের আকাশে কতকগুলি নীহারিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই ছায়াপথের উপরে অবস্থিত। এইজন্য নূতন নক্ষত্র প্রায়ই ছায়াপথের নিকটে আবির্ভূত হয়। জ্যৈষ্ঠের নূতন নক্ষটিও ছায়াপথে উদিত হইয়াছে। এই কারণে মনে হয়, কোন অনুজ্জ্বল মৃত নক্ষত্র এক জ্যোতিঃহীন নীহারিকায় ধাক্কা দিয়া এই নূতন নক্ষত্রটির সৃষ্টি করিয়াছে।

নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব খুব সুলভ ঘটনা নয়। গত তিন শত বৎসরের মধ্যে জ্যোতিষীরা কেবলমাত্র উনত্রিশটি নূতন নক্ষত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। ১৯০১ সালে ইংরাজ জ্যোতিষী এণ্ডারসন সাহেব পারসিয়স্ রাশিতে যে নূতন তারার সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহার পরে বোধ হয় এই শ্রেণীর নক্ষত্র আর ধরা পড়ে নাই। ১৯০১ সালের নক্ষত্র স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ পাই নাই। দর্শকগণ তাহার অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখিয়াছেন। তাহা পড়িয়া মনে হয়, জ্যৈষ্ঠের নক্ষত্র পারসিয়সের নূতন তারা অপেক্ষাও উজ্জ্বলতর হইয়া আবির্ভূত হইয়াছে।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

নাটকের কথা :—

নাটক জিনিষটা কি, তাহা বুঝাইবার আগে নাটক এদেশে এ সময়ে হইতে পারে কি না,—বঙ্গভাষা প্রকৃত নাটক রচনার উপযোগী হইয়াছে কি না, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। কারণ, এদেশের অনেক মনীষীরই ধারণা যে, বঙ্গভাষায় খাঁটি নাটক একখানিও অদ্যাবধি রচিত হয় নাই। শুধু তাহাই নহে;—তাঁহাদের বিশ্বাস যে, বাঙ্গালা সমাজ ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা

এখন যেরূপ, তাহাতে খাঁটি নাটকের সৃষ্টি আদৌ সম্ভবপর নহে। মনে পড়ে, মনস্বী শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় একবার তাঁহার এক 'অভিভাষণে' স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালা নাটক সাধারণতঃ বলিতে গেলে নাট্য-জগতে উচ্চ স্থান পায় নাই। আমাদিগের সামাজিক অবস্থায় পাইতে পারে না। পৃথিবীর কোনও স্থানে পারে নাই।" —কিন্তু এ কথা কি সত্য?—এ কথার কি কোনও প্রমাণ আছে?

আমাদের প্রধান দোষ এই, বাঙ্গালা বহির আলোচনা-কালে আমরা বিদেশী লেখকগণের বাক্যকেই বেদবাক্য মনে করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া চলি। ফলে এই হয় যে, আমরা অনেক সময়েই সুবিচার করিতে পারি না;—আমাদের বিচারে কর্ম্মনাশা কখনও মন্দাকিনী হয়, আবার মন্দাকিনী কখনও বা কর্ম্মনাশা হয়। গুরু অনবরত অধ্যয়নীয় ও শিক্ষণীয়, একথা সর্ব্বান্তঃকরণেই স্বীকার করি; কিন্তু তাই বলিয়া শিষ্যকে যে গুরুর প্রতি-পদক্ষেপ অক্ষরে-অক্ষরে অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ করি না। তাহাতে স্বাধীন বিচারের পথ স্বভাবতঃই রুদ্ধ হইয়া যায়। আমাদের হইয়াছেও তাহাই। রবীন্দ্রনাথের বা বঙ্কিমচন্দ্রের যে কোনও লেখা যখনই আমরা আলোচনা করিতে বসি, তখনই বিলাতী সমালোচকের বাঁধা বুলি সকল আধ-আধ অস্পষ্ট বাঙ্গালায় কপ্‌চাইয়া যাই। কিন্তু বিলাতী রুচি ও বিলাতী নীতির মাপ্‌কাটিতে দেশীয় সাহিত্যকে মাপিতে গেলে যে অনেক সময় ভুল ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। পাছে বিলাতী সমালোচকের সিদ্ধান্তের সহিত অমিল ঘটে, এই ভয়েই আমরা সদা সশঙ্কিত। কাজেই বাঙ্গালা নাটক সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা বাঁধা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা নাটকের কথা কিছু কহিতে হইলেই সেক্সপীয়রের সময়কার কথা উত্থাপন করি। সে সময়কার সে দেশের ঘটনার সহিত এদেশের এখনকার ঘটনার কোনও মিল নাই,দেখিয়া আমরা বাঙ্গালা নাটক সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হইয়া পড়ি; এবং সেই সঙ্গে স্থির করিয়া বসি যে, বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় প্রকৃত নাটকের উৎপত্তি একেবারেই অসম্ভব। এই অন্ধ-ভক্তি আমাদের এতটাই অন্ধ করিয়াছে যে, অনেকেই বাঙ্গালা নাটক এক-আধটু পড়িয়া দেখাও আবশ্যক বোধ করেন না,—অনেকে পড়িলেও মুখ ফুটিয়া তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না,—অনেকের ভাল লাগিলেও সাহস করিয়া তাহা বলিতে পারেন না!—অথচ স্বাধীন-চিন্তার বড়াই আমরা প্রতি-নিয়তই করিয়া থাকি!

ইংলণ্ড যখন ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনের ভিতর দিয়া বিজয়-মাল্য আহরণ করিতেছিল, তখনই যে কবিকুল-গৌরব সেক্সপীয়রের আবির্ভাব, একথা সকলেই জানেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালার অবস্থাও যে অতীব শোচনীয়, একথাও কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু তাই বলিয়া যে বাঙ্গালার বর্ত্তমান সমাজে ঘাত-প্রতিঘাত নাই মনে করিতে হইবে, এমন কোনও কারণ দেখি না। আর, সেক্সপীয়র-যুগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, সমাজে ঘাত-প্রতিঘাত থাকিলেই নাটক হয়, নতুবা হয় না, এরূপ যে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, তাহাও মস্ত ভুল বলিয়া বিবেচনা করি।

আসল কথা, এক দেশের সাহিত্যের ইতিহাসের ধারাকে আদর্শ করিয়া অন্য দেশের সাহিত্যের গতি, উন্নতি ও পরিণতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই ভুল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। দেশভেদে, দেশের অবস্থা-ভেদে, কবির শক্তি-ভেদে, অসংখ্য কারণের বশবর্ত্তী হইয়া, সাহিত্য কখন্ কোথায় কিরূপ আকার ধারণ করে, তাহা নির্ণয় করা বাস্তবিকই বড় কঠিন। আমরা বিলাতী নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস দেখিয়া বলিতেছি, সভ্যসমাজে সজীবতা বা ঘাত-প্রতিঘাত থাকিলেই সাহিত্যে নাটক দেখা দেয়। কিন্তু এ নিয়ম কি সর্ব্বত্র খাটে? সভ্য মুসলমান জাতির স্বভাবে সজীবতা একদিন কম ছিল না, কিন্তু সে জাতির সাহিত্যে প্রকৃত নাটকের নিদর্শন কোথায়? যে জাতি জগতে এক সময় পাঁচশত বৎসর যাবৎ নিজের শক্তিকে দিগ্বিজয়-কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, যে জাতির মধ্যে বহু বহু উৎকৃষ্ট কবি জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, সেই জাতির সাহিত্যে নাটক কেন হয় নাই, কে বলিবে! বর্ত্তমান জাপান ও যুক্তরাজ্যের সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও ঐ কথা কেবল মনে জাগে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে এই দুই স্বাধীন দেশও আজ মহা উন্নত। এই দুইটী দেশই আজ জীবন্ত ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া উন্নতির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে; কিন্তু ইহাদের সাহিত্যে সে ঘাত-

প্রতিঘাতের ছায়া যাহা পড়িয়াছে, তাহা কি বর্ত্তব্য? জাপান ও আমেরিকার নাট্য-সাহিত্যের অবস্থা যে উন্নত, এমন কথা কাহাকেও তো আজ পর্য্যন্ত বলিতে শুনি নাই। কাজেই কেমন করিয়া বলি যে, সমাজে ঘাত-প্রতিঘাত থাকিলেই তাহার সাহিত্যে ঘাত-প্রতিঘাতময় নাটক হইবে, এ কথা ঠিক?

তবে কেহ কেহ বলেন, সভ্য-সমাজ সংঘাতপূর্ণ হইলেই যে সেখানে নাটক-সৃষ্টি নিশ্চয়ই হইবে, এমন নিয়ম না থাকিতে পারে, কিন্তু এ কথা ঠিক যে, সমাজে সংঘাত-সংঘর্ষ না থাকিলে তথায় নাটক সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। বলা বাহুল্য, এ যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধেও আমাদের সন্দেহ আছে। আমাদের মনে হয়, ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ সভ্যসমাজ অপেক্ষা কবির প্রতিভা বা শক্তির উপরই নাট্যসাহিত্যের সৃষ্টি বেশি নির্ভর করে। যিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন,—মানব-মনোবৃত্তির ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান যাঁহার নখ-দর্পণের উপর,—তিনি যে কেবল বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার ক্রীতদাস হইয়া থাকিবেন, ইহা সম্ভব নহে। বরং দেখা যায়, তাঁহার কার্য্য অধিকাংশ সময়েই দেশ-কালের উপযোগী না হইয়া তাহার অগ্রগামীই হয়।—অগ্রগামী হয় বলিয়াই সে কাজের আদর হইতে একটু বিলম্ব ঘটে। সেক্সপীয়ারের নাটক অনেক কালই ইংলণ্ডে অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা নাটককে যে আমরা অবজ্ঞা করি—ঘৃণা করি, তাহারও অন্যতম কারণ উহাই বটে।

বাঙ্গালা নাটকের আলোচনা করিতে গেলে আর একটি বড় কথা মনে রাখিতে হইবে। সে কথা—এই দেশ সম্বন্ধে। তর্কের খাতিরে যদি বা বঙ্গসমাজকে জড়সমাজ বলিয়া স্বীকার করা যায়, এবং বলা যায় যে, জড়সমাজে নাটক-সৃষ্টি সম্ভবপর নহে; তাহাহইলেও বলিব যে, বঙ্গসমাজে ও-নিয়ম খাটে না—খাটিতে পারে না। যে দেশের ঘাত-প্রতিঘাতময় অতীতের ইতিহাস আমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, সে দেশের কবি নাটক গড়িবার জন্য শুধু বর্ত্তমান সমাজের প্রতি কেন চাহিয়া থাকিবেন? যে দেশের চিত্ত চিরদিনই জড়ত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আসিয়াছে, যে দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ গীতা উপনিষদ প্রভৃতি সেই মহাযুদ্ধেরই অমরত্ব সামগ্রী, যে দেশের শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরামচন্দ্র মহা মহা যুদ্ধেরই অধিনায়ক, সে দেশে নাটকের উপাদানের জন্য ভাবনা?—বর্ত্তমানই কি আমাদের সব?—অতীতটা কি কিছু নহে? শিবাজী বা সিরাজের জন্য-মালা বর্ত্তমানে তোমার-আমার মধ্যে না থাকিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বদর্শী কবির হৃদয়ে তাহা নাই, এ কথা কে বলিল?

এখন প্রশ্ন এই যে, বঙ্গ-সমাজ কি যথার্থই জড়সমাজ?—এ কথার উত্তরে 'প্রবাসিনী' পত্রিকায় একদিন যাহা লিখিয়াছিলাম, এখনও আমাদের তাহাই বক্তব্য। বঙ্গদেশে 'Armada'র আয়োজন নাই—অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শ্রুত হয় না, এ কথা সত্য। কিন্তু বাঙ্গালার গৃহে-গৃহে যে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার কি উপায় আছে? এ সংগ্রাম অস্ত্রে-অস্ত্রে বা রাজায়-রাজায় নহে বটে, কিন্তু এ সংগ্রাম তাহার চেয়ে ভীষণতর।—এ সংগ্রাম চলিতেছে এক সভ্যতার কবল হইতে অপর সভ্যতার সংরক্ষণে; এ সংগ্রাম চলিতেছে দেশ-ভক্তির সহিত ইংরাজ-ভক্তির ঘোরতর বিরোধ। একদিকে প্রাচ্য সংস্কার, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা; একদিকে ভক্তিমতী স্ত্রীজাতি, অন্যদিকে অবজ্ঞাপরায়ণ ইংরেজীনবীশ বাবু;—এই দুই দিকের ঘাত-প্রতিঘাত প্রায় প্রতি সংসারে প্রতি-নিয়তই চলিতেছে। আমরা নিজেরাই এক-একজন এক-একখানা জীবন্ত নাটক। এমন আভ্যন্তরিক সংঘর্ষণ আর কোনও জাতির মধ্যে কখনও হইয়াছে কি না সন্দেহ।—আর, চক্ষু চাহিয়া দেখিলে ইহাও দেখিতে পাইব যে, সমাজের ঐ ঘাত-প্রতিঘাতের ছায়া আমাদের নাট্য-সাহিত্যেও বিলক্ষণ প্রতিফলিত হইয়াছে। 'প্রহ্লাদ' 'বলিদান' ও 'হারানিধি' প্রভৃতিকে কি আপনারা নাটক বলিতে অসম্মত?—কেন অসম্মত, অনুগ্রহ করিয়া তাহা কেহ বুঝাইয়া দিবেন কি? না, অবজ্ঞা দেখাইবেন? না,—পারিবেন না বলিয়া অবজ্ঞা দেখাইবেন?

শেষ কথা—ভাষার কথা। শুনিতে পাই, বঙ্কিম বাবু না কি বলিতেন, বঙ্গভাষা এখনও নাটক রচনার উপযুক্ত হয় নাই। এবং আরও শুনিতে পাই যে, গিরিশ বাবু না কি বঙ্কিম বাবুর ঐ কথার উত্তরে লিখিয়াছিলেন,—

"দেব ভাষা পৃষ্ঠে যার, কিসের অভাব তার,
কোন্ ভাবে বাক্য-ভাবে হেন সংযোজন?

মধুর গুঞ্জরে অলি, বিকাশে কমল-কলি,
কোন্ ভাবে কুঞ্জবনে কোকিল কুহরে?
কালের করাল হাসি, ঝলকে দামিনী রাশি,
নিবিড় জলদ-জাল ঢাকে বা অম্বরে?"

—এ কথা উপেক্ষার যোগ্য নহে। দেবভাষা যাহার পশ্চাতে, তাহার বাস্তবিকই দৈন্য থাকিতে পারে না। মাইকেলের পূর্ব্বে কে জানিত যে বঙ্গভাষার ভিতর হইতে 'ভ্রমের কর্ব্বর রব' বাহির করা যায়? কিন্তু-সে কিসের জোরে হইয়াছিল?—ঐ দেবভাষারই সহায়তায়। মহা প্রতিভাশালী কবি যাঁহারা, তাঁহাদের নিকট ভাষা ক্রীতদাসীর ন্যায় কাজ করে। সাহিত্যের কোনও অংশের অসম্পূর্ণতা ভাষার দোষের দোহাই দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিতে নাই। লেখায় যেখানে যাহা ত্রুটি ঘটে, তাহা অধিকাংশ সময়ে কবির অক্ষমতাপ্রযুক্তই ঘটে;—অন্য কারণে নহে। যে ভাষায় 'মেঘনাদবধ' "বৃত্রসংহার' 'কুরুক্ষেত্র' প্রভৃতি মহাকাব্য রচিত হইয়াছে, যে ভাষায় 'কপালকুণ্ডলা' 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস-কাব্য প্রসূত হইয়াছে, সে ভাষায় ঘাত-প্রতিঘাতের ছবি নাটকে প্রতিফলিত হইবে না কেন?—'বিল্বমঙ্গল', 'ভ্রান্তি', 'মেবার-পতন' ও 'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি নাট্যগ্রন্থে নাটক-অনুপযোগী ভাষা কি আছে, বুঝিতে পারি না।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "সফল-স্বপ্ন" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত নূতন উপন্যাস "কাঙালিনী" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য দেড় টাকা।

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার ২৭ সংখ্যক গ্রন্থ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ প্রণীত "নব্য বিজ্ঞান" প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ষতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ প্রণীত "তপস্যা" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আট আনা।

প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর "গণেশ জননী" নামে একখানি অতি সুন্দর সুবৃহৎ চিত্র অঙ্কিত করিয়া কনোলিথো প্রেসে পরিপাটিরূপে মুদ্রিত করাইয়াছেন। মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত "পরাজয়" উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য দেড় টাকা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ এম এ মহাশয় "ভারতবর্ষে" ধারাবাহিকরূপে "মনোবিজ্ঞান" শীর্ষক যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করিতেছেন, তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আনুমানিক কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারিবে। ভাস্করকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে। প্রোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট এবং সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। সাহায্যের টাকা পরিষৎ-সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।"

Publisher—Sudhanthusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

চারু শিল্প

(শ্রীযুক্তা চারুলতা দাস মহাশয়ার সৌজন্যে)

শ্রীহেমন্তকুমার মজুমদার মহাশয়ের গৃহীত ছায়া-চিত্র হইতে

Emerald Printing Works
CALCUTTA

ভাদ্র, ১৩২৫

প্রথম খণ্ড] ষষ্ঠ বর্ষ [তৃতীয় সংখ্যা

বাঙ্গালীর শিক্ষা (২)

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্-এম্-এস্]

ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, "শিক্ষা" বলিলে শুধু কণ্ঠস্থ করাকেই বলে না, একাঙ্গে এক-কালে দেহ, মন ও চিত্তবৃত্তির উন্নতিসাধন করাকে শিক্ষা বলে। কিন্তু, আমাদের দেশে, অল্পবয়স হইতেই যে রকম গুরু ভার শিশু-ছাত্রদিগের স্কন্ধে ন্যস্ত হয়; সেই গুরু ভারের উপর, তাহাদিগকে অবিশ্রান্ত ভাবে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় নিজগৃহে অভিভাবকের তাড়না, ও দুপুরে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের তাড়না সহ্য করিতে হয়। তাহার ফলে শিক্ষার্থীরা শুধু দাঁড়ের পাখীই হইতে শিখে; তাহাদের স্বাধীন চিন্তা, উদ্যম, অধ্যবসায়, ও নিজে কায করিবার শক্তি থাকে না; নয়ন-পথ হইতে জ্ঞানের দিব্যদৃষ্টি, মন হইতে মানসিক শক্তি ও দেহ হইতে স্বাস্থ্য চির-বিদায় গ্রহণ করে!

চিকিৎসা-ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকা অবধি, আমি একটি ব্যাপার বরাবরই লক্ষ্য করিতেছিলাম। আমি দেখিতেছিলাম যে, আমাদিগের তুলনায় একপক্ষে আমাদিগের পিতৃগণ ও অপরপক্ষে আমাদিগের নিজ-নিজ সন্তানগণ স্বাস্থ্যহিসাবে কিরূপ অবস্থাপন্ন! আমাদিগের সমবয়স্কদিগের পিতা, খুল্লতাত, মাতুল, মাতা প্রভৃতি কি সুন্দর স্বাস্থ্য, কি কষ্টসহিষ্ণুতা, ও আমাদিগের তুলনায় কি বলিষ্ঠ দেহ ও দীর্ঘ জীবন লইয়া আসিয়াছিলেন; আর আমাদিগের সন্তানেরা কি ব্যায়ামের আধার হইয়া, কি ক্ষুদ্রায়ত ও স্বল্পজীবী হইয়া জন্মিতেছে! এই সূত্রে আমি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় এক সহস্র ছাত্রকে রীতিমত পরীক্ষা করি। কলিকাতায় হিন্দুস্কুল, সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ সেণ্ট পল্‌স্ স্কুল, মুজাপুর ষ্ট্রীটস্থ মহম্মদ লায়েকের জুবিলি স্কুল—এই বিদ্যালয়-চতুষ্টয়ে প্রত্যহই তিন ঘণ্টাকাল পরিশ্রম করিয়া নিম্নশ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রেরই স্বাস্থ্য রীতিমত পরীক্ষা করি। সেই পরীক্ষা-কার্য্যে আমার সহপাঠী বন্ধুদ্বয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ডাক্তার

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষাল যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই স্বাস্থ্য-পরীক্ষার সূত্রপাতে শ্রদ্ধেয় সুহৃদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

সকলেই জানেন যে, ভারতবর্ষে একই খণ্ডে বাস করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা ভিন্ন-ভিন্ন সামাজিক আচারের ফলে, ভিন্ন-ভিন্ন রূপে স্বাস্থ্যবান। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, হিন্দু স্কুলে ও সংস্কৃত কলেজে খাঁটি হিন্দু ছাত্র, সেণ্ট পল্‌স্ স্কুলে দেশী খৃষ্টান ছাত্র ও মহম্মদ লায়েক ডুবিলি স্কুলে মুসলমান ছাত্র আছেন বলিয়াই, আমি ঐ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করি। পার্ক ষ্ট্রীটের সেণ্ট জেভিয়ার স্কুলের ও বহুবাজারস্থ সেণ্ট জোসেফ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে তাঁহাদিগের বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার দিলেন না; এবং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ জৈন-ছাত্রবহুল বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু স্বর্গীয় রামতনু ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে তাদৃশ উৎসাহ দিতে সাহসী হন নাই। এতদ্ব্যতীত, আমরা যে যে বিদ্যালয়ে অনুমতি পাইয়া পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলাম, সেখানেও যথোপযুক্ত সাহায্য পাই নাই—বিশেষতঃ উপযুক্ত পরীক্ষার স্থানাভাবে কষ্ট পাইয়াছি। সেই কারণে, অনেক বিষয়ে সন্ধান করিবার বাসনা থাকিলেও, কার্য্যে বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই। ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার আমার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল; প্রথমতঃ, আমার জানিবার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, আমাদের দেশের ছেলেদের স্বাস্থ্য কিরূপ; দ্বিতীয়তঃ, আমার উদ্দেশ্য এই যে, এই বিষয়ে আমার দেশবাসীর ও গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ছাত্র-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অপরদেশে কি কি হইয়াছে

"নন্দের দুলাল," "বংশধর" ইত্যাদি গালভরা, প্রেম-মাখান নামে এত বাঙ্গলা দেশেই ছেলেদিগকে ডাকা হয়; জগতের অপর কোথাও এত ভালবাসা-মাখান নামে ছেলেদিগকে অভিহিত করা হয় না। কিন্তু যেমন শুধু কথায় চিঁড়া ভিজে না, তেমনি শুধু নাম-বাহাদ্বো ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। এমন এক দিন ছিল, যখন বাঙ্গালাদেশে বালকমাত্রেই শুধু নিজ পিতামাতার বংশধর বলিয়া বিবেচিত হইত না; তাহারা সমস্ত দেশের ও দশের আদরের সামগ্রী ছিল। কিন্তু "তে হি নো দিবসা গতা।" বর্ত্তমান কালে, পৃথিবীতে যত জাতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, জার্ম্মাণ জাতি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এই জার্ম্মাণী, আজ যে অতি-কুরুক্ষেত্র মহারণে লিপ্ত, তাহার জন্য, নিঃসন্দেহ বিগত চল্লিশ বৎসর যাবৎ অপর যে কোনও উপকরণ সংগ্রহ করিতে থাকুক, অন্ততঃ মানুষ-গড়া কাজটা সে সকলেরই সমক্ষে করিয়াছে। বর্ত্তমান কালে, যুদ্ধের প্রধান উপকরণ—মানুষ নিজে। সেই মানুষকে মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে হয়। জার্ম্মাণী দিব্য-দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল যে, যদি বিশ্ববিজয়ে লিপ্ত হইতে হয়, তবে সমস্ত দেশটি প্রকৃত মানুষে পরিপূর্ণ করিতে হইবে। এই বুদ্ধির প্রেরণায় জার্ম্মাণী বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল যে, শৈশব হইতে যত্ন না করিলে যৌবনে বা বেশী বয়সে আর ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া কাহাকেও ঠিক মত মানুষ গড়া যায় না। এই সকল আন্তরিক বিশ্বাসের বশে, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণ রাজ্যে দুইটি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, যাহার অবশ্যম্ভাবী ফল—মানুষ তৈয়ারি করা। প্রথমটি, রাজ্যের প্রত্যেক স্কুল-বালকের রীতিমত স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করা; দ্বিতীয়টি, ছাত্রদিগকে ভাল করিয়া খাইতে দেওয়া। এই দুইটি জিনিসই অত্যাবশ্যক বলিয়া, এতদ্‌সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা এখানেই বিশদ করিয়া বলিব।

আমাদের দেশে, পিতামাতা মনে-মনে বিদ্যালয় স্থির করিয়া, নিজ-নিজ বালকগণকে সেই বিদ্যালয়ে লইয়া যাইয়া প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। প্রবেশ-কালে, বড় জোর একটা মৌখিক এবং লোক-দেখান বিদ্যার পরীক্ষা করা হয় মাত্র,—প্রায়শঃই অভিভাবক-নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতেই ছাত্রটিকে গ্রহণ করা হয়। তাহার পর, যথাক্রমে সেই ছাত্রটি পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষার স্রোতে গা ভাসাইয়া, পাশ দিয়া "কৃতবিদ্য" হইতে থাকে। একবার বায়স্কোপে একটি চিত্র দেখিয়াছিলাম; সেটি এই:—একটি বিরাট কলের পার্শ্বে তাহার একমাত্র কর্ণধার দাঁড়াইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে একটা চাকা ঘুরাইতেছেন; সেই কলটার পিছন দিকে জীবন্ত একটা বিড়াল পুরিয়া দেওয়া হইতেছে, এবং পর মুহূর্ত্তেই সেই কলটার সম্মুখদিক হইতে সেই বিড়ালটা সসেজ (sausage) নামক ইংরেজদিগের খাদ্য আকারে প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতেছে। আমাদের দেশে

বিদ্যাশিক্ষার পদ্ধতিটি ঠিক উহারই অনুরূপ। আমাদের দেশে, সকলেই ধরিয়া ল'ন যে, মস্তিষ্ক মানুষের সর্ব্বস্ব এবং সেই মস্তিষ্কের উৎকর্ষ-সাধন করাই প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া। জার্ম্মাণবাসীরাই সর্ব্বপ্রথমে জগতকে দেখাইয়া দেন যে, মস্তিষ্ক ভাল রাখিতে হইলে, দেহকে ভাল রাখিতে হয়; এবং দেহকে ভাল রাখিতে হইলে, রীতিমত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যে, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে জার্ম্মাণ রাজ্যে প্রত্যেক ছাত্র সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে:—ছাত্রগণ যখন প্রথমে বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী হইবে, তখনই তাহাদিগের স্বাস্থ্য রীতিমত পরীক্ষিত হইবে। ঐ পরীক্ষা-কালে, যে ছাত্রের কোনও অঙ্গ-বিশেষের বৈকল্য লক্ষিত হইবে, তদনুযায়ীক-বিদ্যালয়ে তাহাকে দেওয়া হইবে; যেমন, যে ছাত্রের দৃষ্টি অতীব ক্ষীণ, তাহাকে সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়িতে না দিয়া, কোনও স্থূল শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। এইরূপ করার ফলে, দেশে একাধারে শিল্পের উন্নতি সাধিত হয় এবং যে-যে ছাত্রের দেহের যে-যে অংশ দুষ্ট বা দুর্ব্বল, সেই-সেই অংশকে আরো দুষ্ট বা দুর্ব্বল হইতে দেওয়া হয় না। তাহার পর, যে ছাত্রটি সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়, সেটির ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক স্বাস্থ্য-পরীক্ষাও হইয়া থাকে। একখানি মোটা ও সুপ্রশস্ত কার্ডে ঐ সকল পরীক্ষার ফল লিখিত হয়—এবং ছাত্রটি বিদ্যালয় হইতে বিদ্যালয়ান্তরে গেলে, স্কুল হইতে কলেজে গেলে, এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে গেলে, ঐ কার্ডখানি ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করে। এইরূপ একখানি কার্ডে একই ছাত্রের পাঠারম্ভের সময় হইতে অধ্যয়ন সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত, তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় দোষগুণের উল্লেখ থাকার ফলে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যাহাতে সেই ছাত্রটির দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল কোনও কাজ না করা হয়, তদ্বিষয়ে খরদৃষ্টি রাখিতে পারেন; কোনও ছাত্রের শ্রবণ-শক্তি কম হইতেছে বুঝা গেলে, অমনি তাহাকে সকল ছাত্রের সম্মুখে, শিক্ষকের নিকটে বসিবার সুযোগ দেওয়া হয়। ক্ষীণদৃষ্টি ছাত্রগণকেও সকলের সম্মুখে বসিবার অনুমতি দেওয়া হয়। যে ছাত্রটির বুকের দোষ দাঁড়াইয়াছে বুঝা যায়, তাহাকে খোলা মাঠে গাছের তলায় বসাইয়া পাঠ দেওয়া হয়; অথবা, তাহাকে পাঠ হইতে বিরত করাইয়া, হাওয়া খাইতে পল্লীগ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ শুধু এইটুকু করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। প্রত্যেক ছাত্রকেই স্কুলের বাসে মাসে বা দুই মাস অন্তর একবার সমুদ্রের ধারে, পর্ব্বতের উপরে বা পল্লীগ্রামের মুক্ত প্রান্তরে লইয়া যাওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত, যে ছেলের শরীরে বিশেষ কোনও রোগ নাই, অথচ সে দুর্ব্বল, এবং যাহার পক্ষে নিয়তই মুক্ত বায়ু সেবন উপকারী—এমন ছাত্রকে ট্রামওয়ে বা রেলওয়ে বা ষ্টীমারের "ফ্রি পাশ" দেওয়া হয়—যাহাতে বিনাব্যয়ে সে প্রত্যহই কিছু কিছু হাওয়া খাইয়া বেড়াইতে পারে। শুধু বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্রদিগের চিকিৎসা-সৌকর্য্যার্থই স্বতন্ত্র চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও কণ্ঠ-নালীর রোগ-চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠিত আছে; বিদ্যালয় হইতে টিকিট দেওয়া হয়,—যাহাতে ছাত্রেরা তথায় বিনাব্যয়ে সুচিকিৎসিত হইতে পারে। যাহার পক্ষে হাসপাতালে থাকা প্রয়োজন, বিদ্যালয় হইতে তাহাকে একখানি টিকিট দেওয়ার ফলে, সে ছাত্রটি তথায় পরম সমাদরে গৃহীত হয়। যে-যে ছাত্র স্বল্প-স্বাস্থ্যের জন্য কয়েক মাস বা বৎসর আপাততঃ পাঠ বন্ধ করিতে বাধ্য হয়, তাহাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির ও নৈতিক উন্নতির সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে মধ্যে-মধ্যে রীতিমত তদন্ত করা হয়। এই তদন্ত গোয়েন্দার মত করা হয় না, এই তদন্ত পরমাত্মীয়ের মতই করা হয়। যে ছাত্রের শারীরিক যে দোষটুকু ঘটে, তৎক্ষণাৎ তাহার অভিভাবককে তাহা জ্ঞাপন করা হয়; এবং যদি সেই দোষের অপনোদন করা অভিভাবকের পক্ষে অর্থে বা সামর্থ্যে সম্ভবপর হয়, তবে অভিভাবককে ঐ দোষাপনোদনের জন্য কিছু সময় দেওয়া হয়; অভিভাবক অবহেলা করিলে, আইনানুসারে রাজদ্বারে দণ্ডিত হন। ফল কথা, এই স্বাস্থ্য-পরীক্ষা-ব্যপদেশে, ছাত্রের সর্ব্বাঙ্গীন্ দৈহিক উন্নতিকল্পে সমাজ, শিক্ষাবিভাগ, অভিভাবক ও নরপতি—সকলকেই সজাগ ও সচেষ্ট থাকিতে হয়।

কিন্তু শুধু স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেই সব করা হয় না; কথামালার ভাষায়, "ভাই হে, শুধু মার্জ্জন ও মর্দ্দন করিলেই সুশ্রী হইব না; দুইবেলা পেট ভরিয়া খাওয়াও চাই।" ছাত্রদিগের মধ্যে ধনী ও দরিদ্র উভয়বিধ ছাত্র আছে। ধনীর সন্তানেরা ভাল

খাইতে পায়, কিন্তু দরিদ্রের সন্তানেরা আদৌ ভাল খাইতে পায় না। বিদ্যালয়ে দুপুরবেলা ধনীর সন্তানেরা চর্ব-চর্ব খাইবে, আর দরিদ্রের সন্তানেরা তাহাদের মুখের দিকে ছল-ছল নেত্রে তাকাইয়া থাকিবে,—এই করুণার প্রেরণায় য়ুরোপে ছাত্রদিগের জন্য বাধ্যতামূলক টিফিন ভোজনের আয়োজন করা হয় নাই; সে দেশে আইন আছে যে, প্রত্যেক ছাত্রকেই টিফিন ভোজন করিতেই হইবে; যেহেতু, প্রথমতঃ, ছাত্রদিগের দেহ সদা বর্দ্ধমান এবং দ্বিতীয়তঃ, পাঠকালে শরীরের ক্ষয় হইতে থাকে। তাই আজ য়ুরোপে প্রায় সকল সভ্যদেশেই এই আইন হইয়াছে যে, ধনী-দরিদ্রনির্ব্বিশেষে, প্রত্যেক ছাত্রকেই বিদ্যালয় হইতে দুপুরবেলা বিনামূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করিতেই হইবে;—সে ব্যয় আংশিকভাবে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দিবেন, আংশিকভাবে মিউনিসিপালিটি বা বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ দিবেন। এই প্রবর্ত্তনার মূল আর্য্যাবর্ত্তে। বিদ্যাদানটা পণ্য-দ্রব্য হইলেও, য়ুরোপে আজ আবার তাহার মধ্যে দানের সূচনা করা হইয়াছে। আমাদের দেশে, সমাজের কর্ত্তব্য ছিল বিদ্যালয়, বিদ্যার্থী ও শিক্ষককুলকে প্রতিপালন করা। টোলের কর্তৃপক্ষ এতদর্থে সমাজ হইতে যে অর্থ গ্রহণ করিতেন, তাহা সুশিক্ষিত স্বাস্থ্যসম্পন্ন ছাত্রের আকারে সমাজকেই প্রতিদান করিতেন।—উভয় পক্ষের মধ্যে একটা কর্ত্তব্যের ঋণ-ধারা অবিচ্ছিন্ন থাকিত। আজ জড়বাদী প্রতীচ্যখণ্ডে বিদ্যাদানটা পণ্য-দ্রব্য হইলেও,—তাহারা প্রাচীর পুণ্য-আদর্শের মহিমময় ভাবটুকু গ্রহণে অক্ষম; তাই আজ তাহারা সমাজের স্বেচ্ছাদান না পাইলেও সমাজকে জোর করিয়া দানে প্রবৃত্তি দিতেছে। তাহারা আইনের বলে দান করাইয়া দেশের কাব করাইয়া লইতেছে; আর আজ শিক্ষিতাভিমানী হইয়া আমরা দেশের তৈরারী জিনিসটাকে (টোল) নষ্ট করিয়া, দেশাত্মবোধকে উপেক্ষা করিয়া, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে মূর্খ ও ভণ্ড আখ্যা দিয়া আহ্লাদে আটখানা হইতেছি,—গৌরবের স্পর্দ্ধা করিতেছি! হায় দেশ!

এই স্বাস্থ্য-পরীক্ষার মূল সূত্র আর্য্যাবর্ত্ত হইতে উদ্ভূত হয়। তাহাদের দেখাদেখি, অল্পকালের মধ্যেই সুইজরলণ্ড, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, সুদূর আমেরিকা ও জাপান রাজ্যও ঐ পন্থানুসরণ করেন। বিগত ১৯০৪, ১৯০৭ ও ১৯১০ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে ছাত্র-স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক সভা আহূত হইয়াছিল। ঐ সভায় ভিন্ন-ভিন্ন দেশের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় আলোচনা করা হইত। মোট কথা এই যে, যদি আজ যুদ্ধে পৃথিবী রুধিরাক্ত না হইত, তবে জগতের সকল সভ্যদেশেই ছাত্র-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা চলিত।

ভারতবর্ষে কি কায হইয়াছে

কিন্তু যে দেশে নন্দের দুলালের জন্ম, সে দেশের অবস্থা আজ কিরূপ? আমাদের দেশে আর ছেলের আদর নাই—এখন বংশধরের গৌরব অন্তর্হিত। এ দেশে ছেলে জন্মে দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিবার জন্য,—এদেশে অভাগা আসে কেরাণীকুল বৃদ্ধি করিবার জন্য। এদেশের রমণীরা সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রকাশ করিয়া থাকেন,—কিন্তু প্রকৃতরূপে সন্তান-পালনের গুরু কর্ত্তব্য পালন করিতে জানেন না। বাঙ্গালাদেশে পিতারা এখন আপিস লইয়া এত ব্যস্ত যে, সমস্ত দিনে একবার সন্তানের সন্ধান লওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু সারাদিন ছেলেরা "বই মুখে করিয়া" আছে কি না, সে সন্ধানটি খুবই রাখেন। আজ হিন্দুর সমাজ শব; তাই আজ তোমার-আমার ছেলে শুধু তোমারই বা আমারই—আজ দেশের বা দশের সে কেহই নহে। আজ রাজা বিদেশীয়; তাই আজ এদেশের ছেলেরা রাজার বিশেষ আত্মীয় নহে। যে নন্দের দুলাল বংশধর লইয়া সমগ্র হিন্দুসমাজ উল্লসিত হইত, আমরা দুপাতা ইংরাজী পড়িয়া, বিলাসিতায় হাবুডুবু খাইয়া, কর্ম্মান্ধ হইয়া তাহাদের অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু আজ পাশ্চাত্য মহা-কুরুক্ষেত্র man-power question (যোদ্ধৃ-সংখ্যা কিসে বেশী করা যায়) সেই দুর্ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পুনরায় হিন্দুর চক্ষে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করাইয়া দেখাইয়া দিতেছেন—ছেলে শুধু পিতামাতার নহে, সমগ্র দেশের ও সমাজের আদরের সামগ্রী; ছেলে মাত্রেই নন্দের দুলাল, বংশধর;—এবং বংশরক্ষা করা মহাপুণ্য, বংশ বৃদ্ধি করা দেশের মহোপকার সাধন করা! প্রাণীরাজ্যে প্রকৃতিরও ঐ একই নির্দ্দেশ—জীবের সৃষ্টির উদ্দেশ্য—জীব-সৃষ্টি করিবার জন্য, বংশরক্ষা করিবার জন্য।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে, বোম্বাই সহরের প্রধান স্বাস্থ্য-পরিদর্শক ডাক্তার টার্ণার সর্ব্বপ্রথমে ঐ সহরের দেশীয় বিদ্যালয়-গুলিতে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করান। জার্ম্মাণী ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যে কাষের অনুষ্ঠান করেন, ইংলণ্ডে যে কায ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়, কুম্ভকর্ণের জন্মভূমি ভারতবর্ষে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তাহার প্রথম আভাষ পাওয়া যায়। টার্ণার সাহেব কর্ত্তৃক যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বেসরকারী পরীক্ষা—মিউনিসিপ্যালিটির তাহাতে হাত ছিল না। তৎপরে, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ছয়জন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনকে তত্রত্য উচ্চ ও মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য-পরীক্ষায় নিযুক্ত করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দেই, বোম্বাই সহরের মিউনিসিপ্যালিটি দুইজন পুরুষ ও একটি মেয়ে ডাক্তারের সাহায্যে, তত্রত্য বালক ও বালিকা—উভয়বিধ বিদ্যালয়ের বহুসংখ্যক ছাত্রের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করান। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, মাদ্রাজ প্রদেশের চিকিৎসা-বিভাগের কর্ত্তা—একজন I. M. S. দলভুক্ত চিকিৎসক দ্বারা তত্রত্য কতকগুলি ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইয়া লন। ব্রহ্মদেশেও চিকিৎসা বিভাগের কর্ত্তা ঐ পন্থানুসরণ করেন। বাঙ্গালা দেশে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন মাদ্রাজী চিকিৎসক দুই-একটি কলেজের ছাত্রের দৃষ্টি-শক্তির পরীক্ষা করেন মাত্র। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে আমি কলিকাতার কয়েকটি বিদ্যালয়ে রীতিমত স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করি। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক এম্-এ মহোদয়ও এই কার্য্যে স্বতন্ত্র ভাবে কিছু-কালের জন্য ব্রতী হন।

আমরা দেখিলাম যে, যে কালে সমগ্র য়ুরোপে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা কার্য্য সাধারণ ভাবে চলিতেছিল, সেই সময়ে ভারতবর্ষে, খোস-খেয়ালের বশে এখানে-ওখানে কতকটা তামাসা দেখা বা লোক-দেখান হিসাবে, কতকটা কর্ত্তব্য-বোধে এলোমেলো ভাবে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা হইয়াছে মাত্র। কোথায় কত ছেলের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা হইয়াছে এবং তাহাতে কি পাওয়া গিয়াছে, সে সকল তথ্য আমার নিকটে না থাকিলেও, তাহার অধিকাংশ তথ্যই আমার নিকটে আছে; কিন্তু সে সকল কাগজপত্র "Confidential" বা "গোপনীয়" অঙ্কিত থাকায় আমি তাহা সাধারণে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। প্রকাশ করিবার আরো অন্তরায়—প্রত্যেক রিপোর্টই ভিন্নমুখী। কোথাও বা শুধু বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ ও বাটীখানি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করা হইয়াছে, ছাত্রদিগকে আদৌ পরীক্ষা করা হয় নাই; কোথাও ছাত্রদিগের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতারই উপরে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া শুধু সেই সম্বন্ধীয় তথ্যই সংগৃহীত হইয়াছে। কোথাও বা ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় আংশিক পরীক্ষা হইয়াছে মাত্র। এইরূপে, নানামুখী অনুসন্ধানের নানারকমের ফল হওয়ায়, সকলগুলির একত্র সমাবেশ করা শক্ত বলিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কিন্তু পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইলাম। অন্যদেশে শিক্ষা-বিভাগের মত কর্ম্মচারী-বহুল বিভাগ কমই আছে। মোটা বেতনের কর্ম্মচারীর ত অভাব নাই—স্বল্প বেতনের দেশীয় কর্ম্মচারিবৃন্দও অনেক। অথচ ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য বলিয়া যে একটা জিনিস আছে—সে খেয়াল কাহারো নাই! আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের অতি উচ্চপদস্থ কোনও রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে এই বিষয়ে কথোপকথন কালে জানিয়াছিলাম যে, সারা জগতে যে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হইতেছে, সে বিষয় তিনি ঘুণাক্ষরেও জানেন না! অথচ বাঙ্গালীর কলঙ্ক আছে যে, বাঙ্গালী পয়সা খরচ করিয়া পত্রিকা ক্রয় করে না এবং নিজ-নিজ ব্যবসা-সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহ করে না,—যেহেতু বাঙ্গালীর উৎসাহ নাই, কর্ম্মে স্পৃহা নাই, অনুপ্রাণতা নাই, অনুসন্ধিৎসা নাই! যে দেশের শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তারা এত উদাসীন, সে দেশে মঙ্গলের আশা কোথায়?

ভারতে কর্ত্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য

আমি যে অবান্তর কথা বলিতেছি না, তাহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি লোকের মতামত উদ্ধৃত করিলাম। আমি প্রত্যেক মহাত্মাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—(১) আপনি জানেন কি যে, আপনার বিভাগের দ্বারা ছাত্রগণের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা সম্বন্ধে কোনও রূপ কায পূর্ব্বে হইয়াছে কি না? (২) অথবা শীঘ্রই হইবে কি না? (৩) আপনার বিভাগের এ সম্বন্ধে দায়িত্ব কি কি? (৪) অদূর ভবিষ্যতে আপনার বিভাগের সম্পৃক্ত যদি কোনও আইন-কানুন হইবার কথা

থাকে, তবে এতৎ সম্বন্ধে আপনি কোনও রূপ বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে কিছু বলিতে প্রস্তুত আছেন কি না? আপনারা উত্তরগুলি শুনিলে "কাণে আঙুল দিবেন।" (১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মহোদয় বলিলেন:—"বিশ্ববিদ্যালয় আইনে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার নাম-গন্ধও নাই। ভবিষ্যতে যদি বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্পৃক্ত কোনও আইন পাশ হয়, তবে তাহাতেও ঐ সম্বন্ধে কোন কথা থাকিবে কি না, জানি না, অন্ততঃ বর্ত্তমানে বলিতে পারি না। আমাদিগের ঐ সম্বন্ধে আইনঘটিত দায়িত্ব না থাকিলেও, আমরা প্রত্যেক বিদ্যালয় সম্বন্ধে কতকগুলি অনুসন্ধান করিয়া তবে তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করি; সেগুলি এই—বিদ্যালয়ের বাটীটির চতুষ্পার্শ্ব স্বাস্থ্যকর কি না, বিদ্যালয়ে একস্থানে বহু ছাত্র পড়ে কি না, বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বিশুদ্ধ পানীয় পায় কি না এবং বিদ্যালয়ে দুপুর বেলা যে জলখাবার আসে, সেগুলি অস্বাস্থ্যকর কি না?" [পৃচ্ছা—মফস্বলে, যেখানে স্বাস্থ্যকর স্থান, পানীয় জল ও জলখাবার তিনেরই অবস্থা খারাপ, সত্যই কি সেখানে ঐ সম্বন্ধে রীতিমত তদন্ত করা হয় এবং সত্যই কি সেখানে ঐ সকল অস্বাস্থ্যকর জিনিসের পরিবর্ত্তে স্বাস্থ্যকর জিনিস সরবরাহ করা হয়? যদি যথার্থতঃ তাহা করা হইত, তাহা হইলে পল্লীস্বাস্থ্য, তথা বাঙ্গালার স্বাস্থ্য আজ যে অন্যরূপ হইত!]

(২) বঙ্গদেশের চিকিৎসা-বিভাগের কর্ত্তা সার্জ্জন-জেনারেল সাহেব লিখিয়াছেন:—"আমার বিভাগের দ্বারা কখনও ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষিত হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনাও আপাততঃ নাই।" [পৃচ্ছা—শুধু দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধারণ করা ও সফরে ভ্রমণ করা কি ঐ বিভাগের কর্ত্তার কায? ছাত্রগণ কি দেশের কেহ নহে? রোগের চিকিৎসা করা বড়, না রোগ নিবারণ করা বড়?]

(৩) বঙ্গদেশের শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর বাহাদুর লিখিয়াছেন:—"ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করান তাঁহার বিভাগের কাজ নয়। গবর্ণমেণ্ট এতদ্ সংক্রান্ত কোন-কোনও বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন বটে, তবে এতদ্ সম্বন্ধে কোনও আইন বিধিবদ্ধ হইবে কি না জানি না।" [মন্তব্য —বিলাতে ও এখানে, এ সম্বন্ধে দায়িত্ব-স্বীকার ও ঔদাসীন্য, কি অদ্ভুত রকমের! সকল বিভাগের কর্ত্তারাই যেন মোটা মাহিনা ভোগ, সফর সম্ভোগ ও এলাউয়েন্স বা যাতায়াতের ভাতা-ভোগ, দু' চারশত কেরাণীকুল চরান ও বাঁধাবাঁধি নিয়ম মত কায করা ব্যতীত অপর কিছুই করিতে চাহেন না! ভাষা কথায়—সকলেই চাহেন ঘি-ভাত, কিন্তু কেহ গা ঘামাইতে চাহেন না!]

(৪) কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ—যাঁহাদের অর্থে পুষ্ট, যাঁহাদের স্বার্থরক্ষার্থ নিযুক্ত ও যাঁহাদিগের ভদ্রতায় বিড়ম্বিত, তাঁহারা ভদ্রলোকের সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করা হয় ত অমর্য্যাদার কায বলিয়া মনে করেন—পত্রের উত্তরও দেন নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীরা লাঞ্ছিত হয় বটে, কিন্তু খাস কলিকাতা নগরে যে করদাতার অর্থে যাঁহারা পুষ্ট, সেই করদাতার ন্যায্য দাবী অগ্রাহ্য করা যে তাঁহাদের পক্ষে আজ বিংশ শতাব্দীতে সম্ভব, সে ব্যক্তিগণের উচ্চ পদের উপযোগিতা সম্বন্ধে আপ্‌কা-ওয়াস্তে কমিশনরগণের কোনও সন্দেহ না থাকিলেও, আমার ঘোর সন্দেহ আছে।

(৫) বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের যিনি, তিনিও সাধারণ ভদ্রতা রক্ষা করার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই!

আমি বৃথা কথা বলি নাই,—এ দেশে ছেলেরা কাহারো নহে! এ দেশে পিতামাতা সন্তানকে আশ্রয় ও আহার্য্য দেন, পাঠ-ব্যয় করেন, পাশও করান; কিন্তু যে প্রাণের টানে শিল্পী এক-একখানি করিয়া প্রস্তর বসাইয়া মন্দির নির্ম্মাণ করে ও সেই মন্দিরের প্রত্যেক প্রস্তর-কণার সঙ্গে নিজের নিপুণতা, নিজের ঐকান্তিকতা, নিজের প্রাণের ব্যথা মাখাইয়া রাখে—সেরূপ সাধনা কোন্ পিতামাতা করিয়া থাকেন? দেশের লোকে নিজ-নিজ সুখ ও স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত;—একাত্মবর্ত্তিতা, ভ্রাতৃভাব, পরার্থপরতা, সমস্তই ত্যাগ করিয়া আজ মুখে স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য শিখান বুলি বলেন মাত্র,—দেশের ভাবী বংশধরগণকে মানুষ করিয়া গড়িবার চেষ্টা দূরের কথা, চিন্তাও করেন না! রাজকর্ম্ম-চারীরা সংখ্যায় ও সমৃদ্ধিতে নিয়তই বর্দ্ধনশীল হইলেও, কোনও কায নূতন করিয়া চালিয়া সাজিতে রাজী নহেন। কাযেই, ভাগের মাতা যেমন গঙ্গা প্রাপ্ত হন না, তেমনি ছাত্রেরাও কাহারো ঐকান্তিক যত্ন না পাইয়া, কুসংসর্গে

যাইয়া পড়ে—তখন কেহ বিপ্লববাদী হয়, কেহ রাজদ্বেষী হয়—আর কর্ত্তারা তখন অনায়াসে C. I. D.'র দল তাহাদিগের পশ্চাতে ছাড়িয়া দিয়া দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন! ভোগ-লালসা, অর্থ-গৃধ্নুতা, উপেক্ষা একদিকে; স্বাস্থ্যহীনতা, পাঠ-বাহুল্য, ও দমন নীতি অপর দিকে;—এই বিপরীতমুখী বিরোধী-ভাবাপন্ন নানা স্রোতের তাড়নায় ছাত্রেরা ক্রমশঃই কর্ণধারশূন্য নৌকার অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে;—তাই আজ পিতামাতা হইতে লাটসাহেব পর্য্যন্ত সকলেই ছাত্রদিগের দুর্নীতির জন্য গগনভেদী আর্ত্তনাদ তুলিয়াছেন;—কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, কেহই নিরপেক্ষ ভাবে, সকল দিক তাকাইয়া একটা কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন নাই! ছাত্রেরা বয়স্কদিগের বীজবপনের ফল—ছাত্রদিগের দোষ দেখিবার কালে, বয়স্কদিগের নিজ-নিজ ত্রুটির অনুসন্ধান করা সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমরা তাহা করিতে প্রস্তুত আছি কি?

বিলাত ও ভারতবর্ষ

আমাদের দেশে ছাত্রদিগের দুর্নীতির সম্বন্ধে যেরূপ গগনস্পর্শী ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,—বিলাতী ছাত্রগণ যখন-তখন চেয়ার-বেঞ্চি ছুড়িয়া মারামারি করিলেও, এবং পরের দরজা-জানালা ভাঙ্গিলেও তাহাদিগের দুর্নীতির উল্লেখ পর্য্যন্ত শোনা যায় না। সেটা মাটির গুণে, কি অপর কোন কারণে—বলা যায় না। কিন্তু ছেলে যে, সে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ছেলে—ছেলেমানুষি তাহার স্বভাবজাত সংস্কার। আমাদের দেশে ছেলেরা ক্রমশঃ পুলিশ-বিমাতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে বসিয়াছে, আর বিলাতের ছেলেদের কিরূপ যত্ন হয়, একবার দেখুন:—যতদিন বুয়রযুদ্ধ না ঘটিয়াছিল, ততদিন ইংরাজেরা মনে-মনে গর্ব্ব করিতেন যে, ইংলণ্ডবাসীর দেহ বজ্রাদপি কঠিন, বাহু মত্তমাতঙ্গ বধ করিবার শক্তি ধরে। কিন্তু বুয়র-যুদ্ধ সমাপনান্তে, ইংলণ্ডে সাড়া পড়িয়া গেল—দেশের লোকের বীর্য্যের হ্রাস ঘটিয়াছে। তাহার ফলে একটি রয়েল কমিশন বসে, এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আইন করিয়া সমস্ত ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার আদেশ প্রচারিত হয়। বিলাতের বোর্ড অফ এডুকেশন নামক শিক্ষাবিধায়িনী সভা ঐ আইনের মতে কার্য্য করিতে অতীব উৎসাহ প্রদর্শন করেন; এবং প্রত্যেক সহরের ও মহকুমার সরকারী স্বাস্থ্য-পরিদর্শক তত্রত্য বিদ্যালয়সমূহের সরকারী স্বাস্থ্য পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ঐ আইনের বলে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে বাধ্য করা হইল, যাহাতে প্রত্যেক ছাত্রই বিনাব্যয়ে দুপুরবেলা পুষ্টিকর জলখাবার খাইতে পায়। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিগুলি স্কুলের এই ব্যয়ের আংশিক ভার বহন করিতে লাগিলেন। যে যে ছাত্রের যেমন-যেমন পীড়া লক্ষিত হয়, তেমনি-তেমনি তাহার অভিভাবককে জানান হয়; এবং ইচ্ছা করিয়া চিকিৎসা অবহেলা করিলে অভিভাবকগণ আইনানুসারে দণ্ডনীয় হ'ন। প্রত্যেক ছাত্রকে কিয়ৎকালের জন্য প্রত্যহই বিদ্যালয়ে ব্যায়াম করিতে হয় এবং রীতিমত খেলাধূলা বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। অতএব বিলাতে সমস্ত দেশ, সমস্ত সমাজ ও স্বয়ং রাজা ছেলেদের উন্নতিকল্পে জাগ্রত ও কর্ম্মে রত! তাই দেশের ছেলেরা এত স্বাস্থ্যবান, তাহাদের মানসিক স্ফূর্ত্তি এত বেশী, তাহাদের প্রাণ এত বড়, তাহাদের নৈতিক বল এত বেশী—তাই তাহারা পাড়ার দু'চারটা দরজা-জানালা ভাঙ্গিলেও, প্রতিবেশীগণ সেটাকে ছেলেমানুষি বলিয়া উড়াইয়া দেয়—আর আমাদের দেশে সুদূর দার্জ্জিলিং শৈলাবাসে বসিয়া শিক্ষাবীরবৃন্দ ইন্দ্রের বজ্র দেখাইয়া আমাদের ছেলেদের নৈতিক শিক্ষার পরিপোষণ করেন।

এদেশে, যে বিদ্যালয়ে যত পরীক্ষা-বাহুল্য, সেই বিদ্যালয়ের তত আদর। বিলাতে পরীক্ষার বালাই নাই বলিলেও চলে। এদেশে প্রত্যহই শিক্ষকেরা পাঠ গ্রহণ করেন, বিলাতে প্রত্যহই পাঠ দান করা হয়;—কাযেই প্রাইভেট শিক্ষকের বালাই কম। এদেশে সপ্তাহে, পক্ষান্তে, মাসান্তে ও ছয় মাসান্তে পরীক্ষা গৃহীত হয় বটে, কিন্তু সেগুলি সবই "ছেলে খেলার" মত;—বৎসরান্তে পরীক্ষার ফলাফলের উপর ছাত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। বিলাতে ওসব বালাই নাই। সেখানে সপ্তাহ বা পক্ষান্তে পরীক্ষা গৃহীত হয়; এবং সমগ্র বর্ষের ঐ সকল পরীক্ষার সমষ্টি-ফলের উপরে ছাত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এদেশের মত সেখানে পরীক্ষার জুয়াখেলা নাই। সেখানে বরাবর-ঠকান প্রশ্নের চাতুরী নাই; সেদেশে পরীক্ষায় লব্ধ সংখ্যার চুলচেরা বিচারের বিড়ম্বনা নাই। আমাদিগে আরো চমৎকার

ব্যবস্থা আছে ; সেখানে কোনও একটি ছাত্র কোনও শ্রেণী বা ক্লাস বিশেষে আবদ্ধ থাকে না—নিজ পরীক্ষানুসারে একই ছাত্র একাধিক শ্রেণীভুক্ত ; অর্থাৎ ইংরাজীতে ছাত্রটি হয় ত চতুর্থ শ্রেণীতে যাইয়া পড়ে ; ইতিহাসে কাঁচা হওয়া বিধায় হয় ত ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে ; অঙ্কে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে—এই ভাবে নিজ মেধা অনুসারে সে নিঃশঙ্কে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়—অনর্থক "Babu's Bench" বলিয়া উপহাসের বিড়ম্বনা তথায় নাই। এদেশে কোন ছাত্র পরীক্ষায় এক বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলে, তাহাকে পর বৎসরে সকল বিষয়ই পুনরায় অধ্যয়ন করিতে হয় ; বিলাতে প্রত্যেক ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় একটা-একটা বিষয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা হইয়া যায় ; এবং ছাত্র যে যে বিষয়ে অকৃতকার্য্য হয়, অপর বিষয়ের সঙ্গে-সঙ্গে, সেই বৎসরের মধ্যেই, তাহাকে সেই বিষয়ে একাধিকবার পরীক্ষা দিবার অবসর দেওয়া হয়। তদ্ব্যতীত, বিলাতে বিদ্যার্থীর ভাষায় সকল বিষয় অধ্যয়ন করিবার অভিশাপ নাই। একবার জিজ্ঞাসা করি—আমাদের দেশে, বিলাতের পরীক্ষা-প্রথা প্রবর্ত্তিত কি হয় না? বিলাতে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে কতকটা খোলা মাঠ থাকে ;—এখানে গৃহস্থের বাসোপযোগী ক্ষুদ্রায়তন ভবনে কত যে বিদ্যালয় আছে তাহা বলা যায় না! বিলাতে শারীরিক ও মানসিক চর্চ্চা এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়—আমাদের দেশে যথার্থই "আবৃত্তি সর্ব্ববিদ্যানাং বোধাদপি গরীয়সী" এই মূল মন্ত্রের অনুযায়ী কায করা হয় ; আর শরীরটা ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া আমাদের কর্ত্তাদের গ্রাহ্য নহে!

বাঙ্গালীর শিক্ষার মূল সূত্রগুলি ধরিয়া দুই-চারি কথা বলার পরে, সে শিক্ষার কি ফল ফলিয়াছে, তাহার একটু আভাষ দেওয়া আবশ্যক। যেমন ফলের দোষ-গুণানুসারে গাছের দোষ-গুণ বিচার করা যায়, তেমনি, তথা-কথিত শিক্ষার ফলে বঙ্গদেশে কি কি হইয়াছে, তাহা বিবৃত করিলে, সে শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ সাধন করা। মানসিক, দৈহিক ও নৈতিক—এই ত্রিবিধ বর্গ দ্বারা মানবতার পরিচয় পাওয়া যায়। নৈতিক দিক দিয়া দেখিলে, ধর্ম্মপ্রাণ ভারতভূমির উচ্চাদর্শের তুলনায়, ও আধ্যাত্মিকতার হিসাবে, বাঙ্গালীর ছেলেরা বর্ত্তমানকালে অনেকাংশে হীন হইলেও, প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর ছেলেরা এখনো নৈতিক পথভ্রষ্ট হয় নাই। এদেশে কঠোর দমন-নীতি প্রবর্ত্তনার যাঁহারা কর্ত্তারা বাঙ্গালীর ছেলেকে যতই দুর্বিনীত ও দুঃশাসিত বলিয়া পরিচয় দিন না কেন, ব্যবহার ক্ষেত্রে, বাঙ্গালীর ছেলেরা অপর দেশের ছেলেদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্তরে বসিয়া আছে। কিন্তু, তাই বলিয়া, সে আপেক্ষিক নৈতিক উৎকর্ষের জন্য বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীকে উচ্চাসন দিব না—তজ্জন্য বাঙ্গালীর সমাজকে, বাঙ্গালীর ধর্ম্মকে, বাঙ্গালীর দেশাচারকে ও বাঙ্গালীর ছেলের পিতৃপুণ্যকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। স্বার্থপরতা, ভোগলালসা ও অনুদারতা আজ কাল বঙ্গ-ছাত্র-সমাজের স্তরে-স্তরে প্রবেশ করিয়াছে—একদেশ-শিক্ষাই তাহার হেতু। সুখের বিষয়, এদিকে ছাত্রদিগের কতকটা যেন পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে—সেবা-ব্রতের ভিতর দিয়া তাহারা আবার মানুষ হইবার চেষ্টা করিতেছে।

নৈতিক ছাড়িয়া মানসিক উৎকর্ষের দিকে তাকাইলে, আমরা মুষ্টিমেয় মনীষাসম্পন্ন লোক দেখিতে পাইলেও, তদ্ব্যতীত জন-সংঘের মধ্যে তোতাপাখীর বাহুল্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠি। কত অর্থব্যয়, কত রাত্রি-জাগরণ, কত ত্যাগ-স্বীকার, কত অধ্যয়ন—তাহাদের ফল, অকিঞ্চিৎকর দু'চারিটা পড়ান বুলির অপপ্রয়োগ করিবার ক্ষমতা! আমরা ইংরেজী ভাষা শিখি না, মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করি, দর্শন-বিজ্ঞানে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিবার ক্ষণিক ক্ষমতার দাবী করিতে পারি মাত্র! ইহারই নাম কি শিক্ষা? হইতে পারে, আমরা ইতিহাস কতকটা আবৃত্তি করিতে পারি, কিম্বা সেক্সপীয়র-মিল্টনের কবিতা দু'দশ পাতা অনর্গল ব্যাখ্যা করিয়া যাইতে পারি ; কিন্তু, তাহাদের বিশ্লেষণ করিতে বলিলে, আমরা গলদ্ঘর্ম্ম হই ;—স্বাধীনভাবে কোনও বিষয়ে চিন্তা করিতে বলিলে চারিদিক শূন্যময় দেখি! এই ত আমাদের শিক্ষার অবস্থা! আমরা ঘরের ঠাকুর ফেলিয়া পরের কুকুরকে আশ্রয় দিতেছি—নিজস্ব স্বাধীনচিন্তা করিবার ক্ষমতাকে দমন করিয়া অধীত বিদ্যা আবৃত্তি করিবার ক্ষমতাকেই উচ্চাসন দিয়াছি!!

স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিলে, সত্যই ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিতে হয়—"বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!" যাঁহারা আজ মহাযুদ্ধের জন্য বাঙ্গালাদেশে সৈন্য-সংগ্রহকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, শতকরা চল্লিশ জন

সমৃদ্ধিজাত ভদ্রসন্তানকে সৈনিক কার্য্যের জন্য অনুপযুক্ত বলিয়া বাদ দিতে হয়! বাঙ্গালাদেশে ম্যালেরিয়া যথাতথা; বাঙ্গালাদেশে বিসূচিকা, বসন্ত প্রভৃতি ব্যাধিতে লোকে মাছির মত কাঁকে-কাঁকে মরিয়া থাকে; বাঙ্গালাদেশে সুপেয় জলের অভাব! এমন অবস্থায় বাঙ্গালীর ছেলেদের স্বাস্থ্য কিরূপ তাহা তুলনায় দেখুন।—

ছেলেদের দৈর্ঘ্য ও ওজন।

[বাঙ্গালী বালকদের ওজন ও দৈর্ঘ্য আমার স্বকীয় পরীক্ষার ফল]

বয়ঃক্রম	ইংরেজ-বালক		আমেরিকান-বালক		বাঙ্গালী-বালক		ইংরেজ-বালিকা	
	ওজন	দৈর্ঘ্য	ওজন	দৈর্ঘ্য	ওজন	দৈর্ঘ্য	ওজন	দৈর্ঘ্য
৫	৩৯·৯	৪১·০৩	৪৯·৬৮	৪৬·৭৩	—	—	৩৯·২	৪০·৫৫
৬	৪৪·৪	৪৪·০০	৫১·৭৫	৪৭·১৭	—	—	৪১·৭	৪২·৮৮
৭	৪৯·৭	৪৫·২৭	৫৪·৭২	৪৮·৭৩	৪৪·৪	৪৮·৭৫	৪৭·৫	৪৪·৪৫
৮	৫৪·২	৪৭·০৫	৬০·২১	৫৯·৬১	৪৮·১	৫০·০০	৫২·১	৪৬·৬০
৯	৬০·৪	৪৯·৭০	৬৪·৫৬	৫২·০৮	৫২·৭	৫১·১৩	৫৫·৫	৪৮·৭৩
১০	৬৭·৫	৫১·৮৪	৭১·৭৫	৫৪·০৯	৫৭·৯	৫৩·৫০	৬২·০	৫১·০৫
১১	৭২·০	৫৩·৫০	৭৩·৩০	৫৫·৫০	৬২·০	৫৫·১৭	৬৮·১	৫৩·১০
১২	৭৬·৭	৫৪·৯৯	৮৪·০০	৫৭·৫১	৬৯·৮	৫৬·৭৫	৭৬·৫	৫৫·৬৬
১৩	৮২·৬	৫৬·৯১	৯২·৪৮	৫৮·৭০	৮০·৮	৬০·০২	৮৭·২	৫৭·৭৭
১৪	৯২·০	৫৯·৩৩	১০২·৭৪	৬১·৪০	৮৯·৪	৬২·৭৫	৯৬·৭	৫৯·৮০
১৫	১০২·৭	৬২·২৪	১১৭·৪৬	৬৩·৯১	১০৩·৬	৬৩·৭৫	১০৬·৩	৬০·৯৩
১৬	১১৯·০	৬৪·৩১	১২১·৯৫	৬৪·৫২	১০৯·১	৬৫·৫০	১১৩·১	৬১·৭৫

ওজনগুলি পাউণ্ডে ও দৈর্ঘ্যগুলি ইঞ্চিতে দেওয়া হইয়াছে।

উপরের কোষ্টকে ওজনগুলি ইংরেজী পাউণ্ডে এবং দৈর্ঘ্যগুলি ইংরেজী ইঞ্চিতে দেওয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের যে ছেলেটি ষোল বৎসর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়, সে একটি ইংরেজ বালিকা অপেক্ষাও ওজনে কম !!!

বাঙ্গালী বালকদিগের বক্ষোপরিধি।

৪০ ইঞ্চির উপর মাপ..... শতকরা ৫৬ জনের
৩০—৪০ ইঞ্চি মাপের..... ,, ৩২·৮০ ,,
২৫—৩০ ,, ,, ... ,, ৪৫·০৯ ,,
২০—২৫ ,, ,, ... ,, ২১·৪০ ,,

বক্ষোস্ফীতি ক্ষমতা (বাঙ্গালী বালকদিগের)

১ হইতে ২ ইঞ্চি.....শতকরা ৬৯·৭০ জনের
২ ,, ৩ ,, ... ,, ২৪·৭৫ ,,
৩ ,, ৪ ,, ... ,, ৫·২৬ ,,
৪ ইঞ্চির বেশী..... ,, ৩·৪৪ ,,

বর্ত্তমান শিক্ষার ফল কি কি হইয়াছে তাহা নৈতিক, মানসিক ও দৈহিক দিক দিয়া দেখাইলাম। আমি স্বয়ং কিয়ৎকাল বেলগাছিয়া ডাক্তারি বিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ও ছাত্রদিগের মধ্যে চিকিৎসা-ব্যবসায় দ্বারা জানিয়াছি যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী নানা কারণে ও নানা বিষয়ে আমাদিগের অনুপযোগী।

আমাদিগের কর্ত্তব্য।

আমাদিগের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য—গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশের লোকের একমত হওয়া। শুধু গবর্ণমেণ্টের হাতে শিক্ষার ভার ছাড়িয়া দিলে, তাহার ফল কখনো নিরবচ্ছিন্ন ভাল হইতে পারে না। যদিও শিক্ষার প্রত্যেক বিভাগে উচ্চপদস্থ দেশীয় লোক আছেন, তথাপি সত্যের খাতিরে বলিতেই হইবে যে, তাঁহারা হিতসাধনে অক্ষম—যেহেতু গবর্ণমেণ্ট নিজ ইচ্ছামতই কায করিয়া থাকেন। দেশে ভিন্ন দেশীয় গবর্ণমেণ্ট বজায় থাকা কালে,

খাঁটি জাতীয় শিক্ষা প্রচলিত করার আশা আকাশ-কুসুম মাত্র। তাই বলিতেছিলাম যে, গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় লোকে একত্র সম্মিলিত হউন। সেরূপ সম্মিলন করিতে হইলে, ডাইরেক্টর পদের লোপ করিতে হয়; পুস্তক-নির্ব্বাচন-সমিতিরও লোপ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তৎপরিবর্ত্তে সমান-সমান সংখ্যক গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ও দেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ লইয়া একটি ব্যাবহারিক শিক্ষাসভা প্রতিষ্ঠিত হউক। ইহার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকা চাই। শিক্ষকদিগেরও পদমর্য্যাদা অতি অবশ্যই বাড়াইতে হইবে।

আমাদিগের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—যাবতীয় শিক্ষিত লোককে জাগরিত করা। দেশের শিক্ষিত লোক জাগিলেই সাধারণ লোক জাগিবে। অপর দেশে, উভয়কেই স্বতন্ত্রভাবে জাগাইতে হয়, কারণ উভয়ে উভয়ের উপরে সন্দিহান, উভয়ের স্বার্থ স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে অশিক্ষিতেরা শিক্ষিত-দিগের মুখ তাকাইয়া আছে এবং শিক্ষিতদিগের অনুষ্ঠানের উপরে সন্দিহান হওয়া দূরের কথা, নির্ভর করিয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম যে, আমাদের দেশে, শিক্ষিত লোক-দিগকে জাগাইতে হইবে। তাঁহাদিগকে অহর্নিশ শুনাইতে হইবে যে, তাঁহাদিগের নিজ-নিজ শিক্ষার প্রথম ফল—অশিক্ষিতদিগের শিক্ষার ভার লওয়া; তাঁহাদিগকে শুনাইতে হইবে যে, শিক্ষা কার্যটা অতীব গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য বলিয়া, রামা-শ্যামাকে শিক্ষক নিযুক্ত করা অনুচিত এবং সমগ্র দেশের লোকের এই ভাবে সর্ব্বদাই অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ থাকা আবশ্যক। এতদর্থে, অভিভাবকদিগের পক্ষে সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজনীয়। ব্যক্তিবিশেষকে স্কুল লইয়া ব্যবসায় করিতে না দেওয়া, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে জনসাধারণ লইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটি গঠন করা, প্রত্যেক পাড়ার ভদ্রলোকেরা মিলিয়া স্কুলের ছাত্রদিগের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে মিশিতে আরম্ভ করা—এ সকল নিতান্তই প্রয়োজনীয় হইয়াছে। ভাষা কথায়,—একোল-বেঁড়ে হইয়া থাকিও না, পরের উপরে মাতব্বরি দিও না; নিজের বোঝা নিজে বও, বাছাদিগকে আপনার কর।

আমাদের তৃতীয় কর্ত্তব্য—কয়েকটি রাজধানী নির্ব্বাচন করিতে হইবে—যথা কলিকাতা, ঢাকা, রাজসাহী ইত্যাদি। ঐ ঐ স্থলে, যত ছাত্র ও ছাত্রী আছে—পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজ ক্লাশ পর্য্যন্ত—প্রত্যেকেরই শারীরিক পরীক্ষা করান হউক। সে পরীক্ষা ধারাবাহিক ভাবে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর কাল ধরিয়া করা হইবে। পরীক্ষাটি সর্ব্বাঙ্গীন ও নিখুঁত হওয়া চাই; এবং দৃষ্টি-শক্তি, শারীরিক ওজন, বক্ষোস্ফীতি করণের সামর্থ্য ও স্পীহা—এইগুলির ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। পাঁচ বৎসরকাল এইরূপ পরীক্ষার সমষ্টিফল প্রকাশিত হইলে, বেশ ভাল করিয়া বুঝা যাইবে যে, বয়সের অনুপাতে আমাদের ছেলেদের গঠন, বৃদ্ধি প্রভৃতি কি হারে হইতে পারে বা হইয়া থাকে। ঐরূপ পরীক্ষা কার্য্যে বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত চিকিৎসকের আবশ্যক। দেশের লোকেরা, সরকার বাহাদুর, বিশ্ববিদ্যালয় ও মিউনি-সিপ্যালিটি-সকলে মিলিয়া এই কার্য্যের ব্যয় সরবরাহ করুন। এই পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে, এই নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ হওয়া চাই :—

(১) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ও হষ্টেলে (ছাত্রাবাসে) মাহিয়ানা-করা ডাক্তার থাকিবেন;—তিনি প্রত্যেক বালকের স্বাস্থ্য রীতিমত পরীক্ষা করিবেন; অভিভাবক-গণকে ছাত্রদিগের শারীরিক ত্রুটি সংশোধনে বাধ্য করিবেন; স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে ছাত্রদিগের প্রতি স্বাস্থ্যানুমোদিত কার্য্য করিতে বাধ্য করিবেন।

(২) ছাত্রদিগের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতি-কল্পে বিশ্ববিদ্যা-লয়, মিউনিসিপ্যালিটি ও গবর্ণমেণ্ট—সকলেই অর্থ-সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) শুধু বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের চিকিৎসাসৌকর্য্যার্থ স্বতন্ত্র চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, কণ্ঠনালী প্রভৃতির ব্যায়াম-চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠিত হউক।

(৪) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে Boy Scouts (বয় স্কাউট ও গার্ল গাইড) বিধা রীতিমত শিক্ষাদান করা হউক এবং আপাততঃ প্রত্যেক জেলায় মিলিটারী কলেজ স্থাপিত হউক।

(৫) প্রত্যেক শ্রেণীর পাঠ্য-তালিকার সঙ্গে-সঙ্গে স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধায়িনী ব্যায়ামের বা ক্রীড়ার তালিকা প্রস্তুত করা হউক;—এবং যে ছাত্র উভয়বিধ (শারীরিক ও মানসিক) পরীক্ষায় সমান পারদর্শী হইবে তাহাকে উচ্চ-শ্রেণীতে উন্নীত করা হউক। ছাত্রবিশেষের স্বাস্থ্যের বিশেষ

দোষ ব্যতীত. কাহাকেও ব্যায়াম পরীক্ষা হইতে রেহাই দেওয়া উচিত নহে।

আমাদিগের চতুর্থ কর্ত্তব্য—পথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা। পথ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে বায়ের, লোকাচারের, সামাজিক অবস্থার ও স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কথা বলা উচিত। আমাদিগের দেশ দরিদ্রের ও বিলাসবিহীন কর্ম্মীর দেশ। পথ্য সম্বন্ধে সন্ন্যাসির বিলাতী বিদ্যা চালাইলে চলিবে না। সাহেবদিগের মত—মাংস তিনবেলাই খাওয়া চাই, অথচ আমাদিগের শাকান্ন ভিন্ন গতি নাই। এমন অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য—পূর্ব্বোক্ত পাঁচ বৎসরকাল ছাত্র-স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে, একটী চিকিৎসক-বৈঠক বসান হউক। সে বৈঠকে এদেশীয় চিকিৎসক থাকিবেন এবং পাশ্চাত্য জগত হইতে খাদ্য সম্বন্ধে পণ্ডিত চিকিৎসকবৃন্দও থাকিবেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া কিছুকাল খাদ্য সম্বন্ধে রাসায়নিক প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া আদর্শ খাদ্যের পঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া দিন। সেই তালিকাগুলি প্রত্যেক ছাত্রাবাসে বিতরিত হউক,—ছাত্রেরা তদনুযায়ী চলিতে অনুরুদ্ধ হউক। এই কাযটি বহুকাল সাপেক্ষ বলিয়া, আমি আপাততঃ কতকগুলি অস্থায়ী বন্দোবস্তের মত ব্যবস্থা বলিয়া দিতেছি। আশা করি, আমার দেশবাসীরা এ বিষয়ে অবহিত হইবেন :—

(১) অপচয় নিবারণ কর। অতি-পাঠে, অথবা অত্যাচারে শরীরের অপচয় হয়; সেগুলি বন্ধ কর। তৎসঙ্গে, ভাতের ফেণ, আলুর খোলা, পাঁউরুটির উপরের ত্বক, দুধের সর, মাংসের অস্থি ও বসা, ভুক্তাবশিষ্ট ডাইল—এগুলি ফেলিয়া অপচয় করা বন্ধ করা উচিত। ভাতের সঙ্গে মাখিয়া খাইয়া যে ডাইলটুকু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা না ফেলিয়া চুমুক দিয়া খাইবে।

(২) সাধ্যমত—অন্ততঃ একবেলা রুটি লুচি খাইবার ব্যবস্থা কর। দুবেলা ভাত খাওয়া অপেক্ষা একবেলা ভাত অপর বেলা রুটি অথবা দুবেলাই অর্দ্ধেক ভাত অর্দ্ধেক রুটি খাইবে।

(৩) মুগের ডাইল, বড়ি, বড়া, পাঁপর, সীম, শুঁটি, মটর, চিনের বাদাম, ছোলা ক্রমশঃ সহ্য করিবার চেষ্টা কর। সকল ডালের অপেক্ষা মুগের ডাইলই শ্রেষ্ঠ ও সহজ-পাচ্য।

(৪) দোকানের জঘন্য জলখাবারের পরিবর্ত্তে, কাঁচা মুগের ডাল ভিজান, ছোলা ভাজা, চালকলাই ভাজা, চিনার বাদাম ভাজা, খেজুর, কিসমিস, মনক্কা, আখরোট, বাদাম, পেস্তা, সহস্রগুণে উপকারী।

(৫) প্রত্যেক ছেলেকে চপুর বেলা টিফিন খাইতে বাধ্য কর। সেই টিফিন প্রত্যেক স্কুল হইতে বিনামূল্যে দেওয়ান উচিত।

আমাদিগের পঞ্চম কর্ত্তব্য—খাঁটি দেশী আদর্শে বিদ্যাদান করা হউক। বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া, গুরু-শিষ্য একত্র বাস করিয়া, অধীতব্য বিষয়ের বৈচিত্র্য ঘটাইয়া, ধর্ম্মশিক্ষার সঙ্গে গার্হস্থ্য-জীবনের নীতি শিক্ষা করিয়া আমাদিগকে পুনরায় মানুষ গড়া হউক। যাহারা চাকুরী করিবে, তাহারা দু'চার পাতা চাকুরীর উপযোগী পাঠ্য পড়ুক; কিন্তু অপর প্রকৃত শিক্ষার্থীরা রীতিমত ও ঐকান্তিকতার সহিত বিদ্যাশিক্ষারূপ সাধনায় ব্রত হউক। বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, মীমাংসা, দর্শন ও ব্যাকরণ পুনরায় অধীত হউক,—আর ইংরেজী পাঠ্য বিষয়গুলি নির্ব্বাসিত হউক, এমন কথা আমি বলি না। সকল দেশের সকল বিদ্যারই যথাসম্ভব চর্চ্চা হউক। তবে বর্ত্তমানে যেমন ব্যাবহারিক প্রথা বর্জ্জন করিয়া মৌখিক শিক্ষার প্রাদুর্ভাব আছে, তাহা অচিরে বর্জ্জিত হউক। ব্যাবহারিক বিষয়গুলি হাতে-কলমেই শেখান হউক।

এক কথায়—আত্মাকে মাঝে রাখিয়া দেহ, মন ও চিত্ত-বৃত্তির সম্যক পরিস্ফুরণের চেষ্টা কার্য্যতঃই করা হউক! শুভমস্তু।

দত্তা

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

নিদারুণ সংশয়ের বেড়া-আগুনের মধ্যে বিজয়ার চিত্ত যে কতদূর পীড়িত এবং উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আপনাকে চূড়ান্ত ভাবে সমর্পণ করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত সে ঠিকমত বুঝিতে পারে নাই। আজ সকালে ঘুম ভাঙিয়াই বুঝিল, তাহার মন খুব শান্ত হইয়া গেছে। কারণ, মনের মধ্যে চাঞ্চল্যের আভাসটুকুও খুঁজিয়া পাইল না। বাহিরে চাহিতে মনে হইল, সমস্ত আকাশটা যেন শ্রাবণ-প্রভাতের মত ধূসর মেঘের ভারে পৃথিবীর উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। এমন দিনে শয্যা ত্যাগ করা-না-করা তাহার সমান বলিয়া বোধ হইল। এবং কেন যে অন্যান্য দিন সকালে ঘুম ভাঙিতে সামান্য বেলা হইলেও অন্তঃকরণ ব্যথিত, লজ্জিত হইয়া উঠিত,—মনে হইত অনেক সময় নষ্ট হইয়া গেছে,—আজ তাহা ভাবিয়াই পাইল না। তাহার এমন কি কাজ আছে যে দু' এক ঘণ্টা বিছানায় পড়িয়া থাকিলে চলে না! বাটীতে দাসদাসী ভরা, বৃহৎ জমিদারী সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে,—তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন যদি এম্‌নি আরামে, এম্‌নি শান্তিতে কাটিয়া যায়, ত তার চেয়ে আর ভাল জিনিষ কি আছে? জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল, গাছপালার সবুজ রঙটা পর্য্যন্ত আজ কি এক রকম বদ্‌লাইয়া গিয়া, তাহার পাতাগুলা পর্য্যন্ত সব স্থির গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। কলহ-বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক অশান্তি-উপদ্রব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও আর কিছু নাই—একটা রাত্রির মধ্যেই সমস্ত যেন একেবারে মুনি-ঋষির তপোবন হইয়া গেছে।

হৃদয়-যোড়া এই চরম অবসাদকে শান্তি কল্পনা করিয়া বিজয়া পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত হয় ত আরও বহুক্ষণ বিছানায় পড়িয়া থাকিতে পারিত; কিন্তু পরেশের মা আসিয়া দ্বার-প্রান্ত হইতে শান্তি ভঙ্গ করিয়া দিল। যে লোক প্রত্যূষেই শয্যা ত্যাগ করে, তাহার পক্ষে এতখানি বেলায়, সে উৎকণ্ঠিত চিত্তে বারম্বার ডাকাডাকি করিয়া কবাট খুলাইয়া তবে ছাড়িল।

হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া, বিজয়া নীচে নামিতেছিল; শুনিল, বাহিরে রাসবিহারী আজ স্বয়ং আসিয়া জন-মজুরদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। মাত্র দুটি দিন আর বাকী, এইটুকু সময়েই সমস্ত বাড়ীটাকে মাজিয়া-ঘষিয়া একেবারে নূতন করিয়া তুলিতে হইবে।

বিজয়া একটু পূর্ব্বেই ভাবিয়াছিল, গতরাত্রে যে দুরূহ সমস্যার শেষ এবং চরম নিষ্পত্তি হইয়া গেছে, কোনও কারণে কাহারও দ্বারা যাহার অন্যথা ঘটিতে পারে না, তাহার ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ লইয়া আর সে মনে-মনেও কখনো বিতর্ক করিবে না। তাহা মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে, এ বিশ্বাসে সন্দেহের ছায়াটুকুও আর পড়িতে দিবে না। কিন্তু সহসা দেখিতে পাইল তাহা সম্ভব নয়। রাসবিহারী নীচে আছেন, নামিলেই মুখোমুখী সাক্ষাৎ হইয়া যাইবে, ইহা মনে করিতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিমুখ হইয়া আপনিই সিঁড়ি হইতে ফিরিয়া আসিল। বহুক্ষণ ধরিয়া বারান্দায় পায়চারি করিয়াও যখন সময় কাটিতে চাহিল না, তখন অকস্মাৎ তাহার বাল্যবন্ধুদের কথা মনে পড়িল। বহুকাল কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ নাই, চিঠি-পত্রও বন্ধ ছিল, আজ তাহাদিগকেই স্মরণ করিয়া সে কয়েকখানা পত্র লিখিবার জন্য তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। মনের মধ্যে তাহার কত না বেদনা সঞ্চিত হইয়া ছিল। চিঠির মধ্যে দিয়া তাহাদিগকেই মুক্তি দিতে গিয়া সে-দেখিতে-দেখিতে একেবারে মগ্ন হইয়া গেল। কেমন করিয়া যে সময় কাটিল, কত যে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, তাহার কিছুই খেয়াল ছিল না। এমনি সময়ে পরেশের মা দ্বারের কাছে আসিয়া কহিল, "বেলা যে একটা বেজে গেল দিদিমণি, খাবে না?"

ঘড়ির প্রতি চাহিয়া পুনশ্চ লেখায় মনঃসংযোগ করিতে যাইতেছিল, পরেশের মা সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে কহিল, "ওমা, ডাক্তারবাবু আসচেন যে!" বলিয়াই তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল। বিজয়া চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ঠিক সোজা বারান্দার অপর প্রান্তে পরেশের পিছনে নরেন্দ্র আসিতেছে।

...

ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকবার সে উপরে আসিলেও নিজের ইচ্ছায় এমন বিনা সংবাদে উঠিয়া আসিতে পারে, ইহা বিজয়া ভাবিতেও পারিত না। তাহার মুখ শুষ্ক, বড় বড় রুক্ষ চুল এলো-মেলো; কিন্তু সে ঘরে পা দিয়াই যখন বলিয়া উঠিল, "সেদিন আমাকে চিন্‌তে চাননি কেন, বলুন ত?" বলিয়া একটা চৌকি অধিকার করিয়া বসিল, তখন তাহার মুখে, তাহার কণ্ঠস্বরে, তাহার সর্ব্বদেহে দুরন্ত-ভারাক্রান্ত ক্লান্তি এমন করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিল যে, বিজয়া কথার জবাব দিবে কি, দুর্ব্বিসহ বেদনায় একেবারে চমকিয়া গেল। উৎকণ্ঠিত ব্যগ্রতায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি হয়েছে নরেন বাবু? কোন অসুখ করেনি ত?" নরেন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, সেরে গেছে। হয়েও ছিল সামান্য একটু জ্বর, কিন্তু তাইতেই হঠাৎ এমন দুর্ব্বল করে ফেলেছিল যে, আগে আস্‌তে পারিনি—কিন্তু সেদিন দোষটা কি করেছিলাম, আজ বলুন ত?"

পরেশ দাঁড়াইয়া ছিল; বিজয়া তাহাকে কহিল, "তোর মাকে শীগ্‌গীর কিছু খাবার আন্‌তে বলগে যা পরেশ।" নরেনকে কহিল, "সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি বোধ করি?"

"না; কিন্তু তার জন্যে আমি ব্যস্ত হইনি।"

"কিন্তু, আমি ব্যস্ত হই," বলিয়া বিজয়া পরেশের পিছু-পিছু নিজেও নীচে চলিয়া গেল।

খানিক পরে সে খাবারের থালার উপর একবাটি গরম দুধ লইয়া নিজেই উপস্থিত হইল এবং নিঃশব্দে অতিথির সম্মুখে ধরিয়া দিল। আহারে মন দিয়া নরেন সহাস্যে কহিল, "আপনি একটি অদ্ভুত লোক। পরের বাড়ীতে চিন্‌তেও চান্ না, এবং নিজের বাড়ীতে এত বেশী চেনেন যে, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সে দিনের কাণ্ড দেখে ভাবলুম খবর দিলে হয় ত দেখাই করবেন না, তাই বিনা সংবাদেই পরেশের সঙ্গে এসে আপনাকে ধরেচি। এখন দেখ্‌চি তাতে ঠকিনি।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

বিজয়া কোন কথা কহিল না। নরেন্দ্র নিজেও একটু মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিল, "এই সামান্য জ্বর, কিন্তু এত নির্জ্জীব কোরে ফেলেচে যে, আমি আপনিই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। আপনাদের সঙ্গে আবার শীঘ্র দেখা হবার সম্ভাবনা থাক্‌লে আমি হয় ত আজ আসতাম না। এই পথটুকু আস্‌তে আমার সত্যিই ভারি কষ্ট হয়েচে।"

বিজয়া তেমনি নিঃশব্দে রহিল; বোধ করি সে কথাটা ঠিক বুঝিতেও পারিল না। নরেন দুধের বাটিটা নিঃশেষ করিয়া রাখিয়া দিয়া কহিল, "আপনারা বোধ করি শোনেন নি যে, আমি এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়েচি। আমার আজকে তাড়াতাড়ি আস্‌বার এও একটা বড় কারণ" বলিয়া পকেট হইতে একখানা লাল রঙের চিঠির কাগজ বাহির করিয়া কহিল, "আপনার বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র আমি পেয়েচি। কিন্তু, দেখে যাবার সৌভাগ্য আমার হবে না। সেই দিন সকালেই আমাদের জাহাজ করাচি থেকে ছাড়বে।"

বিজয়া ভীত হইয়া বলিল, "করাচি থেকে! আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" নরেন কহিল, "সাউথ আফ্‌রিকায়। পশ্চিমেও একটা যোগাড় হয়েছিল বটে; কিন্তু চাকরি যখন করতেই হবে, তখন বড় দেখে করাই ভাল। আমার পক্ষে পঞ্জাবও যা কেপকলোনিও ত তাই। কি বলেন? হয় ত, আমাদের আর কখনো দেখাই হবে না।" শেষের কথাগুলা বোধ করি বিজয়ার কাণেও গেল না। সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল,—"মলিনী কি রাজী হয়েছেন? চলেও যা আপনি এত শীঘ্র কি কোরে যেতে পারেন, আমি ত বুঝ্‌তে পারিনে? তাঁকে সমস্ত খুলে বলেছেন কি? আর এত দূরেই বা তিনি কেমন কোরে মত দিলেন?" নরেন হাসিমুখে বলিল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান। এখনো কাউকে সমস্ত বলা হয়নি বটে; কিন্তু—" কথাটা শেষ করিতে দিবার ধৈর্য্যও বিজয়ার রহিল না। সে মাঝখানেই একেবারে আগুন হইয়া বলিয়া উঠিল, "সে কোনমতেই হতে পারে না। আপনারা কি আমাদের বাক্স-বিছানার সমান মনে করেন, যে ইচ্ছে থাক্ না থাক্, দড়ি দিয়ে বেঁধে সাড়ীতে তুলে দিলেই সঙ্গে যেতে হবে? সে কিছুতেই হবে না। তাঁর অমতে কোন মতেই তাঁকে ততদূরে নিয়ে যেতে পারবেন না।"

নরেনের মুখ মলিন হইয়া গেল। হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল, "ব্যাপারটা কি, আমাকে বুঝিয়ে বলুন ত? এখানে আসবার পূর্ব্বেই দয়াল বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল; তিনিও শুনে, হঠাৎ চম্‌কে উঠে, এই

রকম কি একটা আপত্তি তুললেন, আমি বুঝতেই পারলাম না। এত লোকের মধ্যে নলিনীর মতামতের উপরেই বা আমার যাওয়া-না-যাওয়া কেন নির্ভর করে; আর তিনিই বা কিসের জন্যে বাধা দেবেন,—এ সব যে ক্রমেই হেঁয়ালি হয়ে উঠ্‌চে। কথাটা কি আমাকে খুলে বলুন দেখি?"

বিজয়া স্থির দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে-ধীরে কহিল, "তাঁর সঙ্গে একটা বিবাহের প্রস্তাব কি আপনি করেন নি?" নরেন একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল। কহিল, "না, কোন দিন নয়!" বিজয়ার মুখের উপর সহসা এক ঝলক্ রক্ত ছুটিয়া আসিয়া সমস্ত মুখ আরক্ত করিয়া দিল। কিন্তু চক্ষের পলকে আপনাকে সম্বরণ করিয়া কহিল, "না করলেও কি করা উচিত ছিল না? আপনার মনোভাব ত কারও কাছে গোপন নেই!"

নরেন অনেকক্ষণ স্তম্ভিতের মত বসিয়া থাকিয়া বলিল, "এ অনিষ্ট কার দ্বারা হয়েচে, আমি তাই শুধু ভাব্‌চি। তাঁর নিজের দ্বারা কদাচ ঘটেনি, কেন না তিনি প্রথম থেকেই জেনেছিলেন—এ অসম্ভব। কিন্তু—"

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অসম্ভব কেন?"

নরেন কহিল, "সে থাক্। তবে, একটা কারণ এই যে, আমি হিন্দু, এবং তিনি ব্রাহ্ম সমাজের। তা'ছাড়া, আমাদের জাতও এক নয়।" বিজয়া মলিন হইয়া কহিল, "আপনি কি জাত মানেন?" নরেন কহিল, "মানি বই কি। হিন্দু-সমাজে যে জাতি ভেদ আছে, একের সঙ্গে অপরের বিবাহ হয় না—এ কি আপনিও মানেন না?"

বিজয়া কহিল, "মানি, কিন্তু ভাল বলে মানিনে। আপনি শিক্ষিত হয়ে একে ভাল বলে মানেন কি কোরে?" নরেন হাসিতে লাগিল। কহিল, "ডাক্তারের বুদ্ধিটা সাধারণতঃ একটু খোলাটে ধরণের হয়। বিশেষ কোরে, আমার মত যারা মাইক্রস্কোপের মুখো দিয়ে তুচ্ছ জিনিস নিয়েই কাল কাটায়। তাই, এ ক্ষেত্রে আমাকে না হয় মাপ করেই নিন্ না।"

বিজয়া বুঝিল নরেন্দ্র এ প্রশ্নটা এড়াইয়া গেল। তাই রুষ্ট মুখে কহিল, "আচ্ছা, অন্তরাতের কথা থাক। কিন্তু যেখানে এক, সেখানেও কি শুধু আলাদা ধর্ম-মতের জন্যই বিবাহ অসম্ভব বলতে চান? আপনি কিসের হিন্দু? আপনি ত ব্রহ্মঘরে। আপনার কাছেও কি কোন ব্রাহ্ম-কুমারী বিবাহ-যোগ্যা নয় মনে করেন? এত অহঙ্কার আপনার কিসের জন্যে? আর, এই যদি সত্যিকার মত, তবে সে কথা গোড়াতেই বলে দেননি কেন?" বলিতে বলিতেই তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল, এবং তাহাই লুকাইবার জন্য সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু নরেন্দ্রের দৃষ্টিকে একেবারে ফাঁকি দিতে পারিল না। সে কিছু আশ্চর্য্য হইয়াই কহিল, "কিন্তু এ তো আমার মত নয়।" বিজয়া মুখ না ফিরাইয়াই অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "নিশ্চয় এই আপনার সত্যিকার মত।"

নরেন্দ্র কহিল, "না। আমাকে পরীক্ষা করলে টের পেতেন, এ আমার সত্যিকার কেন, মিথ্যেকার মতও নয়। তা ছাড়া, নলিনীর কথা নিয়ে আপনি মিথ্যে কেন কষ্ট পাচ্চেন? আমি জানি, তাঁর মন কোথায় বাঁধা আছে; এবং আমিও যে কেন পৃথিবীর আর এক প্রান্তে পালাচ্ছি, সে তিনিও ঠিক বুঝবেন। সুতরাং আমার যাওয়া নিয়ে আপনি নিরর্থক উদ্বিগ্ন হবেন না।" বিজয়া বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তাঁর অমত না হলেই আপনি যেখানে খুসি যেতে পারেন, মনে করেন?"

নরেনের বুকের মধ্যে কথাগুলা তড়িৎ-রেখার ন্যায় শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিও গিয়া টেবিলের উপরে সেই লাল রঙের নিমন্ত্রণ-পত্রের উপরে পড়িল। সে এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া আস্তে-আস্তে বলিল, "সে ঠিক, আমি আপনার অমতেও কিছু করতে পারিনে। কিন্তু আপনি ত আমার সমস্ত কথাই জানেন। আমার জীবনের সাধও আপনার অজ্ঞাত নেই। বিদেশে সে সাধ হয় ত এক দিন পূর্ণ হতেও পারে; কিন্তু এদেশে এত বড় নিষ্কর্ম্মা হীন দরিদ্রের থাকা-না-থাকায় কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আমাকে যেতে বাধা দেবেন না।"

বিজয়া আনত মুখে ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি হীন দরিদ্র ত নয়। আপনার সমস্তই আছে, ইচ্ছে করলেই ত সমস্ত ফিরে নিতে পারেন।"

নরেন কহিল, "ইচ্ছে করলেই পারিনে বটে, কিন্তু আপনি যে দিতে চেয়েছিলেন, সে আমার মনে আছে, এবং চিরদিন মনে থাকবে। কিন্তু দেখুন, নেবারও একটা অধিকার থাকা চাই,—সে অধিকার আমার ছিল না।" বিজয়া

তেম্‌নি অধোমুখে থাকিয়াই, প্রত্যুত্তর করিল, "ছিল বৈ কি! বিষয় আমার নয়, বাবার। নইলে সেদিন তাঁর যথাসর্ব্বস্ব দাবীর কথা আপনি পরিহাসচ্ছলেও মুখে আন্‌তে পারতেন না। আমি হলে কিন্তু ঐখানেই থামতুম না। তিনি যা' দিয়ে গেছেন, সমস্ত জোর করে দখল করতুম, তার এক তিল ছেড়ে দিতুম না।" নরেন কোন কথা কহিল না। বিজয়াও আর কিছু না বলিয়া-নত নেত্রে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মিনিট দুই এম্‌নি নীরবে কাটিবার পরে অকস্মাৎ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চকিত হইয়া বিজয়া মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, নরেনের সমস্ত চেহারাটা যেন কি এক রকম হইয়া গেছে। দুজনের চোখোচোখি হইবা-মাত্রই সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "নলিনী ঠিকই বুঝেছিল, বিজয়া, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি। আমার মত একটা অকেজো অপদার্থ লোককেও যে কারও কোন প্রয়োজন হতে পারে, এ আমি অসম্ভব বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সত্যিই যদি এই অসঙ্গত খেয়াল হয়েছিল, শুধু একবার হুকুম করনি কেন? আমার পক্ষে এর স্বপ্ন দেখাও যে পাপলামি বিজয়া।"

আজ এতদিন পরে তাহার মুখে নিজের নাম শুনিয়া বিজয়ার আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল; সে মুখের উপর সজোরে আঁচল চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত রোদন সম্বরণ করিতে লাগিল। নরেন পিছনে পদশব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, দয়াল ঘরে প্রবেশ করিতেছেন।

দয়াল দ্বারের উপরে দাঁড়াইয়া এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; তার পরে ধীরে ধীরে বিজয়ার কাছে গিয়া তাহার সোফার একান্তে বসিয়া মাথার উপর ডান হাতটি রাখিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন, "মা!"

সে তাঁহার আগমন অনুভব করিয়াছিল, এবং প্রাণপণে এই লজ্জাকর ক্রন্দন রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু, এই করুণ সুরের মাতৃ-সম্বোধনের ফল একেবারে বিপরীত হইল। কি জানি তাহার মৃত পিতাকে মনে পড়িয়াই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল কি না,—সে চক্ষের পলকে বৃদ্ধের দুই জানুর উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ক্রোড়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দয়ালের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। এ সংসারে একমাত্র তিনিই শুধু এই মর্ম্মান্তিক রোদনের আগাগোড়া ইতিহাসটা জানিতেন। মাথার উপর ধীরে-ধীরে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "শুধু আমার দোষেই এই ভয়ানক অন্যায় হ'ল মা,—শুধু আমিই এই দুর্ঘটনা ঘটালুম। নলিনীর সঙ্গে এতক্ষণ আমার এই কথাই হচ্ছিল, —সে সমস্তই জান্‌ত। কিন্তু কে জান্‌ত, নরেন মনে-মনে কেবল তোমাকেই,—কিন্তু নির্ব্বোধ আমি, সমস্ত ভুল বুঝে তোমাকে উল্টো খবর দিয়ে, শুধু এই দুঃখ ঘরে ডেকে আন্‌লুম। এখন বুঝি আর কোন প্রতিকার—"

দেয়ালের ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল। তিনজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার ক্রোড়ের মধ্যে বিজয়ার দুর্জ্জয় দুঃখের বেগ ক্রমশঃ প্রশমিত হইয়া আসিতেছে অনুভব করিয়া, দয়াল অনেকক্ষণ পরে আস্তে-আস্তে তাহার পিঠের উপর হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন, "এর কি আর কোন উপায় হতে পারে না মা?" বিজয়া তেমনি মুখ লুকাইয়া রাখিয়াই ভগ্ন-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"না—না, মরণ ছাড়া আর আমার কোন পথ নেই।" দয়াল কহিতে গেলেন "ছি, মা, কিন্তু—" বিজয়া প্রবল বেগে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, "না—না, এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই। আমি কথা দিয়েচি—বেঁচে থাক্‌তে সে আমি ভাঙ্‌তে পারব না দয়াল বাবু! মরতে না পারলে আমি—" বলিতে বলিতেই আবার তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। দয়ালের গলা দিয়াও আর কথা বাহির হইল না। তিনি নীরবে ধীরে ধীরে তাহার চুলের মধ্যে শুধু হাত বুলাইতে লাগিলেন।

পরেশের মা বাহির হইতে ছেলেকে দিয়া বলাইল—"মা ঠা'ন, বেলা তিনটে বেজে গেল যে!" সংবাদ শুনিয়া দয়াল অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; এবং স্নানাহারের জন্য নির্ব্বন্ধের সহিত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া তাহার মুখ-খানি তুলিয়া ধরিবার যত্ন করিতে লাগিলেন।

পরেশ পুনরায় কহিল, "তোমার জন্যে কেউ যে খেতে পারচিনে মাঠান।" তখন চোখ মুছিয়া বিজয়া উঠিয়া বসিল, এবং কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া ধীর পদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। দয়াল কহিলেন, "নরেন, তোমারও ত এখনো নাওয়া-খাওয়া হয়নি?" নরেন অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, মুখ তুলিয়া কহিল, "না।" "তবে আমার সঙ্গে বাড়ী চল।" "চলুন" বলিয়া সে দ্বিরুক্তি না করিয়া

উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং দয়ালের সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় আসন্ন বিবাহোৎসব উপলক্ষে কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তার পরে পিতা পুত্র রাস ও বিলাসবিহারী প্রস্থান করিলে, বিজয়া তাহার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। দয়াল এম্‌নি তন্ময় হইয়া বসিয়াছিলেন যে, কাহারও আগমন লক্ষ্যও করিলেন না। তিনি কখন আসিয়াছেন, কতক্ষণ বসিয়া আছেন, বিজয়া জানিত না; কিন্তু তাঁহার সেই তদ্গত ভাব দেখিয়া ধ্যান ভাঙিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না; সে যেমন আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে চলিয়া গেল। কিন্তু প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়াও যখন দেখিতে পাইল, তিনি একই ভাবে বসিয়া আছেন, তখন ধীরে-ধীরে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

দয়াল চকিত হইয়া কহিলেন, "তোমার জন্যেই অপেক্ষা করচি মা।" বিজয়া ম্লিষ্ট কণ্ঠে বলিল, "তা'হলে ডাকেন নি কেন?"

দয়াল কহিলেন, "তোমরা কথা কইছিলে বলে আর বিরক্ত করিনি। কাল চুপুরবেলা আমার ওখানে তোমার নিমন্ত্রণ রইল, মা। না মা, না, সে কিছুতেই হবে না। পাছে 'না' বলে বিদায় কর, সেই ভয়ে এই পথ হেঁটে আবার নিজে এসেচি। কিন্তু চুপুর রোদে হেঁটে যেতে পারবে না, তা' বলে দিচ্চি; আমি পাল্‌কি-বেহারা ঠিক করে রেখেচি, তারা এসে তোমাকে ঠিক সময়ে নিয়ে যাবে।" বৃদ্ধের সকরুণ কথায় বিজয়ার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল; কহিল, "একটা চিঠি লিখে পাঠালেও আমি 'না' বলতুম না। কেন অনর্থক আবার নিজে হেঁটে এলেন?"

দয়াল উঠিয়া আসিয়া বিজয়ার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "মনে থাকে যেন, বুড়ো ছেলেকে কথা দিচ্চ মা। না গেলে আবার আমাকে ছুটে আস্‌তে হবে—কোন মতেই ছাড়ব না।"

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা।" কিন্তু এই আগ্রহাতিশয্যে সে মনে মনে বিস্মিত হইল। একে ত ইতিপূর্ব্বে কোনদিনই তিনি নিমন্ত্রণ করেন নাই, তাহাতে সান্ধ্য-ভোজনের পরিবর্ত্তে এই মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা, এবং প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য এইরূপ বারংবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, কেমন যেন ঠিক সহজ এবং সাধারণ নয় বলিয়াই তাহার সন্দেহ হইল। আজ চুপুরবেলাও যে এই অকারণ নিমন্ত্রণের সঙ্কল্প তাঁহার মনের মধ্যে ছিল না, তাহা নিশ্চিত; অথচ, ইহারই মধ্যে যান-বাহনের বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত করিয়া আসিতে তিনি অবহেলা করেন নাই।

মনের অস্বস্তি গোপন করিয়া বিজয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কারণটা কি, শুন্‌তে পাইনে?"

দয়াল লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিলেন, "না না, সেটি তোমাকে পূর্ব্বাহ্ণে জানাতে পারব না।" বিজয়া কহিল, "তা' না বলেন, নিমন্ত্রিতদের নাম বলুন?" দয়াল কহিলেন, "তুমি ত সবাইকে চিন্‌বে না মা। তাঁরা আমার ঐ পাড়ারই বন্ধু। যাঁদের চিন্‌বে, তাঁদের একজনের নাম রাসবিহারী, অপরের নাম নরেন্দ্র।"

দয়াল চলিয়া গেলে বিজয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির হইয়া বসিয়া মনে-মনে ইহার হেতু অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু যতই ভাবিতে লাগিল,—কি একটা অদ্ভুত সংশয়ে মনের অন্ধকার নিরন্তর বাড়িয়াই চলিতে লাগিল।

কিন্তু পরদিন বেলা আড়াইটা পর্য্যন্ত যখন পাল্‌কি আসিয়া পৌঁছিল না, বিজয়া প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, তখন একদিকে যেমন তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না, অপর দিকে তেম্‌নি একটা আরাম বোধ করিতে লাগিল। পরেশের মা সঙ্গে যাইবে, এইরূপ একটা কথা ছিল। সে বোধ করি এইবার লইয়া দশবার আসিয়া কিছু খাইবার জন্য বিজয়াকে পীড়াপীড়ি করিল, এবং বৃদ্ধা দয়ালের ভীমরথী হইয়াছে কি না এবং নিমন্ত্রণের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিল। অথচ, লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইতেও বিজয়ার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল; কারণ, সত্যই যদি কোন অচিন্তনীয় কারণে তিনি নিমন্ত্রণ করার কথা বিস্মৃত হইয়া থাকেন, ত তাঁহাকে অপরিসীম লজ্জায় ফেলা হইবে। এই অভূতপূর্ব্ব অবস্থা-সঙ্কটের মধ্যে তাহার দ্বিধাগ্রস্ত মন কি করিবে, কিছুই যখন নিশ্চয় করিতে পারিতেছিল না, এমন সময়ে পরেশ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া খবর দিল, পাল্‌কি আসিতেছে।

বিজয়া যখন যাত্রা করিল, তখন বেলা প্রায় অপরাহ্ণ। রাসবিহারী তাঁহার জন-মজুর লইয়া অতিশয় ব্যস্ত, তাড়াতাড়ি পাল্‌কির পার্শ্বে আসিয়া সহাস্যে বলিলেন, "দয়ালের হঠাৎ এমন লোক খাওয়ানোর ধুম পড়ে গেল কেন, সে তো জানিনে। সন্ধ্যার পরে আমাকেও যেতে হবে, বিশেষ কোরে বলে গেছেন; কিন্তু পাল্‌কি পাঠাতে রাত্রি করলে যেতে পারবো না, সে কিন্তু বলে দিয়ো মা।"

দয়ালের বাটীর দ্বারের উপর আম্র-পল্লবের সারি দেওয়া, উভয় পার্শ্বে জলপূর্ণ কলস,—বিজয়া বিস্মিত হইল। ভিতরে পা দিতেই,—দয়াল গ্রামস্থ জনকয়েক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতেছিলেন,—ছুটিয়া আসিয়া মা বলিয়া তাহার হাত ধরিলেন।

সিঁড়িতে উঠিতে-উঠিতে বিজয়া রুষ্ট অভিমানের সুরে কহিল, "কিদের আমার প্রাণ বেরিয়ে গেল, এই বুঝি আপনার মধ্যাহ্ন-ভোজনের নেমন্তন্ন?" দয়াল স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আজ যে তোমাদের খেতে নেই মা। নরেন ত নির্জ্জীব হয়ে শুয়েই পড়েচে। আজ একটা দিনের জন্যে অন্ততঃ কানা ভট্‌চাযি মশায়ের শাসন মানতেই হবে।"

দ্বিতলের সম্মুখের হলে বিবাহের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত রহিয়াছে। এগুলা কি, ঠিক না বুঝিয়াও, বিজয়া নিভৃত অন্তরে কাঁপিয়া উঠিল,—সে মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পর্য্যন্ত সাহস করিল না।

দয়াল অত্যন্ত সহজ ভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, "সন্ধ্যার পরেই লগ্ন,—আজ যে তোমার বিবাহ বিজয়া। ভাগ্যক্রমে দিন-ক্ষণ সমস্তই পাওয়া গেছে,—না পেলেও আজই দিতে হ'ত, কিছুতেই অন্যথা করা যেত না;—তা' যাক্, সমস্তই ঠিক্‌ঠাক্ মিলে গেছে। তাই ত কানা ভট্‌চাযি মশাই হেসে বল্‌লেন, 'এ যেন তোমাদের জন্যই পাঁজিতে আজকের দিনটা সৃষ্টি হয়েছিল।'"

বিজয়ার মুখ ক্যাকাশে হইয়া গেল। কহিল, "আপনি আমার হিন্দু বিবাহ দেবেন?" দয়াল কহিলেন, "হিন্দু বিবাহ কি বিবাহ নয় মা? কিন্তু, সাম্প্রদায়িক মত মানুষকে এম্‌নি বোকা করে আনে যে, কাল সমস্ত বেলাটা ভেবে-ভেবেও এই তুচ্ছ কথাটার কোন কূল-কিনারা খুঁজে পাইনি। কিন্তু নলিনী আমাকে একটি মুহূর্ত্তে বুঝিয়ে দিলে। বল্‌লে, 'মামা, তাঁর বাবা তাঁকে যাঁর হাতে দিয়ে গেছেন, তোমরা তাঁর হাতেই তাঁকে দাও। নইলে ব্রাহ্ম-বিবাহের ছল করে যদি অপাত্রে দান কর, ত অধর্ম্মের সীমা থাকবে না। আর মনের মিলনই সত্যিকার বিবাহ। নইলে বিয়ের মন্তর বাংলা হবে কি সংস্কৃত হবে, ভট্‌চাযি মশাই পড়াবেন কিম্বা আচার্য্য মশাই পড়াবেন, তাতে কি আসে যায় মামা?' এতবড় জটিল সমস্যাটা যেন একেবারে জল হয়ে গেল বিজয়া। মনে মনে বল্‌লুম 'ভগবান! তোমার ত কিছু অগোচর নেই! এদের বিবাহ আমি যে কোন মতেই দিই-না, তোমার কাছে যে অপরাধী হব না সে নিশ্চয় জানি।' তবুও বল্‌লুম, 'কিন্তু, একটা কথা আছে যে নলিনী! বিজয়া যে তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন! তাঁরা যে তারই উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। এ সত্য ভাঙবে কি করে?'

"নলিনী বল্‌লে, 'মামা, তুমি ত জানো' বিজয়ার অন্তর্যামী কখনো সাড় দেন নি। তাঁর চেয়ে কি বিজয়ার বলাটাই বড় হ'ল? তার হৃদয়ের সত্যকে লঙ্ঘন কোরে কি তার মুখের কথাটাকেই বড় কোরে তুল্‌তে হবে?' আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লুম, 'তুই এ সব শিখ্‌লি কোথায় মা?' নলিনী বল্‌লে, 'আমি নরেন বাবুর কাছেই শিখেচি। তিনি বারবার বলেন, সত্যের স্থান বুকের মধ্যে, মুখের মধ্যে নয়। কেবল মুখ দিয়ে যার হয়েছে বলেই কোন জিনিস কখনো সত্য হয়ে উঠে না। তবুও তাকেই যারা সকলের অগ্রে, সকলের উর্দ্ধে স্থাপন করতে চায়, তারা সত্যকে ভালবাসে বলেই করে না, তারা সত্য-ভাষণের দম্ভকেই ভালবাসে বলে করে।'" একটুখানি চুপ করিয়া বলিলেন, "তুমি নরেনকে জান না, মা; সে যে তোমাকে কত ভালবাসে, তাও হয় ত ঠিক জান না। সে এমন ছেলে যে, অসত্যের বোঝা তোমার মাথায় তুলে দিয়ে তোমাকে গ্রহণ করতেও কিছুতে রাজী হোতো না। একবার আগাগোড়া তার কাজগুলো মনে করে দেখ দিকি বিজয়া।" বিজয়া কিছুই কহিল না। নিঃশব্দ নতমুখে কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

নলিনী ভিতরে কাজে ব্যস্ত ছিল। খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া বিজয়াকে জড়াইয়া ধরিল। কাণে-কাণে কহিল, "তোমাকে সাজাবার ভার আজ নরেন বাবু আমাকে দিয়েছেন। চল।" বলিয়া তাহাকে একপ্রকার জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

ঘণ্টা দুই পরে তাহাকে ফুল ও চন্দনে সজ্জিত করিয়া

নলিনী বধূর আসনে বসাইয়া সম্মুখের বড় জানালাটা খুলিয়া দিতেই, তাহার লজ্জিত মুখের উপর দক্ষিণের বাতাস এবং আকাশের জ্যোৎস্না যেন একই কালে তাহার স্বর্গগত মাতা-পিতার আশীর্ব্বাদের মত আসিয়া পড়িল।

যিনি সম্প্রদান করিতে বসিলেন, শোনা গেল, তিনি কোন্ এক সুদূর সম্পর্কে বিজয়ার পিসি। একচক্ষু ভট্টাচার্য্য মশায় মন্ত্র পড়াইতে বসিয়া দাবী করিলেন, দুই-তিন পুরুষ পূর্ব্বে তাঁরাই ছিলেন জমিদার-বাটীর কুল-পুরোহিত। এ সভা সপ্রমাণ করিবার ভার যাঁহাদের উপর,তাঁহারা সাহিত্য-পরিষদের রায়ে নিশ্চয়ই অচির-ভবিষ্যতে কোন্ এক গ্রামে তাম্রশাসন কিম্বা শিলালিপি আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গালার দুর্গতি মোচন করিবেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই সভা উদ্ঘাটনের প্রতি একান্ত উদাসীন দয়াল পিসিমার খরচার বাবদে এবং ভট্টাচার্য্যি মশায়ের দক্ষিণার হিসাবে যাহা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাকে কোনমতেই অকিঞ্চিৎকর বলা চলে না।

রাত্রির অনুষ্ঠান সমাধা হইয়া গেছে,—বর বধূকে তুলিবার আয়োজন হইতেছে, এমন সময়ে রাসবিহারী আসিয়া বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইলেন। দয়াল উঠিয়া দাঁড়াইয়া সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "এস ভাই, এস। শুভকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে শেষ হয়ে গেছে,—আজকের দিনে আর মনের মধ্যে কোন গ্লানি রেখো না ভাই,—এদের তুমি আশীর্ব্বাদ কর।"

রাসবিহারী ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া সহজ গলায় কহিলেন, "বনমালীর মেয়ের বিবাহটা কি শেষে হিঁদু মতেই দিলে দয়াল? আমাকে একটু জানালে ত এর প্রয়োজন হোতো না।"

দয়াল থতমত খাইয়া কহিল, "সমস্ত বিবাহই ত এক, ভাই।" রাসবিহারী কঠোর স্বরে কহিলেন, "না। কিন্তু বনমালীর মেয়ে কি তার বাপের গ্রাম থেকে আজীবন নির্ব্বাসন-দুঃখটাও একবার ভেবে দেখ্‌লে না!" বিজয়ার মুখ মলিন হইয়া গেল। নলিনী পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল,—সে কহিল, "তাঁর মেয়ে তার স্বর্গীয় পিতার সত্যিকার আজ্ঞাটাই পালন করেছে, অনুষ্ঠানের কথা ভাব্‌বার সময় পায়নি। আপনি নিজেও ত বনমালী বাবুর যথার্থ ইচ্ছাটা জান্‌তেন! তাতে ত ত্রুটি হয়নি।" রাসবিহারী এই দুর্ম্মুখ মেয়েটার প্রতি একটা ক্রুর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া শুধু বলিলেন, "হুঁ।" বলিয়া ফিরিতে উদ্যত হইতেছিলেন,—নলিনী আবদারের সুরে কহিল, "বাঃ—আপনি বুঝি বিয়ে-বাড়ী থেকে শুধু-শুধু চলে যাবেন? সে হবে না, আপনাকে খেয়ে যেতে হবে। আমি মামাকে দিয়ে কত কষ্ট করে আপনাকে নেমন্তন্ন করে আনিয়েচি।"

রাসবিহারী কথা কহিলেন না, শুধু আর একটা অগ্নি-দৃষ্টি তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। (সমাপ্ত।)

প্রতাপ-কাহিনী

[শ্রীহিরণকুমার রায়চৌধুরী এম-এ]

বহুকাল হইতে বঙ্গের শেষ উজ্জ্বল রত্ন অন্যতম বার ভূঁইঞা বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিরাট কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিবার একটা বলবতী আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগরূক ছিল। সুন্দরবন সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠে ঐ সকল ধ্বংসাবশেষ দর্শনে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া গত মাঘ মাসে সুন্দরবন যাত্রা করি।

সে আজ অনেক দিনের কথা, যখন সত্যই সুন্দরবন আজিকার ন্যায় শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ অরণ্যানীময় ছিল না। এই যে বহুবিস্তৃত দুর্ভেদ্য, অন্ধকার, চিরহরিৎপূর্ণ, স্নিগ্ধ, শ্যাম-সুচিক্কণ সুন্দর বৃক্ষ পরিশোভিত, সর্প, ব্যাঘ্র, মহিষাদি হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি—ইহা যে অন্যূন তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বহু জনাকীর্ণ স্থান ছিল, সে বিষয়ে ভূরি-ভূরি প্রমাণ আছে। সত্যই এমন একদিন ছিল, যখন স্বদেশী ও বিদেশী বাণিজ্য-তরী পণ্যদ্রব্যে পরিপূরিত হইয়া এই বিশাল ভূখণ্ডস্থিত বন্দরসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিত, এবং পণ্যদ্রব্য সকল গোলাজাত হইয়া বহুদূরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। এই সকল বাণিজ্যবহুল নগরীর নাম দূর-দূরান্তরে পরিকীর্ত্তিত হইত। কিন্তু কালসাহায্যে সেই সকল পণ্যবহুল নগরী ও গ্রাম তাহাদিগের অস্তিত্বের ধ্বংসাবশেষ নিদর্শন রাখিয়া চিরতরে ধরণী-পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

পাঠান সুলতান দাউদখাঁর ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের অদূর-সম্ভাবনা

দেখিয়া, সুচতুর ও বুদ্ধিমান ভ্রাতৃযুগল শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ —বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়—তাঁহার নিকট হইতে জমিদারীর সনন্দ লইয়া বহু অনুসন্ধানের পর এই নীল সমুদ্র-মেখলা, অসংখ্য নদ-নদীবিধৌতা স্থান বাসোপযোগী বলিয়া স্থির করিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় এবং রাজা বসন্তরায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে অত্যল্প দিনের মধ্যেই যশোর নগরী নির্ম্মিত হইল ;—সে আজ তিন শত বৎসরেরও বেশী দিনের কথা।

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর—সম্ভবতঃ ১৫৮২ খৃঃ অঃ—প্রতাপ যশোরের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে ধুমঘাট নগরের নির্ম্মাণ সমাধা করেন। এই ধুমঘাট ও যশোর লইয়া পঞ্চক্রোশ-ব্যাপী এক বিশাল নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। একণে ধুমঘাটে কোন প্রকার চিহ্ন বিদ্যমান নাই। প্রতাপের বিশাল কীর্ত্তির যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, তাহার অধিকাংশই যশোরে অবস্থিত। তাঁহার সময়ে যশোর ধান্যের ধনরত্ননিচয়ের জন্য অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হয় ও বহুবিস্তৃতি লাভ করে। উত্তর সীমায় বর্ত্তমান নদীয়া জেলার দক্ষিণাংশ ও চব্বিশ পরগণার উত্তরাংশ, দক্ষিণে অতলস্পর্শী বিশাল ফেনিল সমুদ্র, পূর্ব্বে খরস্রোতা মধুমতী ও পশ্চিমে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী। রাজধানী যশোর যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল। যমুনার অবস্থান দেখিয়া মনে হইল, এককালে ইহা বহুবিস্তীর্ণা ছিল এবং বর্ত্তমান কপোতাক্ষী নদী ইহার একটী অংশমাত্র। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য এই দুইটী নদীতে অসংখ্য বাঁধ দেওয়া হইয়াছে, এবং উহারা মজিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে।

রাজধানী যশোর এবং ইচ্ছামতী ও যমুনা নদীদ্বয়ের তাহার স্থিতি দৃষ্টে এই সহজ সিদ্ধান্ত হয় যে, নগরীর প্রস্থ দেড় মাইলের অধিক ছিল না ; এবং উহা তিন অংশে বিভক্ত ছিল, পশ্চিমাংশ মুসলমান, কেন্দ্রস্থল হিন্দু ও পূর্ব্বাংশ খ্রীষ্টানদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

কিছুদূর নৌকাপথে যাইয়া শীর্ণকায়া যমুনার ধার দিয়া পদব্রজে চলিলাম। ক্রমশঃ উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। তখন ধান কাটিবার সময়। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু পবনহিল্লোলিত সুপক্ক স্বর্ণাভ ধান্যরাশি। পল্লীজননীর এই অপূর্ব্ব নয়ন-লোভন বিরাট সুষমার সমাবেশ দেখিতে-দেখিতে আনন্দিত চিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যখন যশোর — ঈশ্বরীপুর পৌঁছিলাম, তখনও মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হয় নাই। প্রথমেই প্রতাপাদিত্যের কুলাধিষ্ঠাত্রী ৺শ্রীশ্রীদক্ষিণা কালিকার মন্দির দর্শনে গেলাম।

যশোর একটী প্রাচীন পীঠস্থান। এখানে সতীর বাহু ও পদ পতিত হয় ও মহাদেবী যশোরেশ্বরী নামে খ্যাতা হন। অনন্ত নামক কোন ব্রাহ্মণ বহুদিন পূর্ব্বে দেবীর সেবায়তযুক্ত এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কালক্রমে উহা জঙ্গল-সমাকীর্ণ হইয়া পড়ে ; এবং অবশেষে একটী স্তূপে পরিণত হইয়া যায়। তাহার বহুদিন পরে গোকর্ণ-কুলসম্ভূত ক্ষত্রিয়-রাজ ধেনুকর্ণ পশ্চিম হইতে আসিয়া, ঐ স্থান সতীর অঙ্গ-মাহাত্ম্যে পীঠস্থান জানিয়া, জঙ্গল ও স্তূপ দূরীভূত করিয়া এক ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির গঠন করেন; এবং বহুকাল পত্র-বল্লরীর অন্তরালে থাকিয়া পরিশেষে দেবীর মন্দিরচূড়া লোক-লোচনের পথবর্ত্তী হয়।

ইহার পর বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেন পুনরায় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া একটী গ্রাম স্থাপন করেন। তাহার নাম ছিল সেনের হাট। তিনি যশোরেশ্বরীর নিকট একটী শিবমন্দিরও স্থাপন করেন।

যশোরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমরা তন্ত্র চূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থে প্রমাণ পাই। যশোর ও যশোরেশ্বরী উভয়েই বহু প্রাচীন। কোন্ অখ্যাত দিবসে এই মন্দির সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সম্যক্ প্রমাণ কেহই দিতে পারেন না। আমরা প্রাচীন কাহিনী হইতে মন্দির ও দেবীর একটী অসম্পূর্ণ ইতিহাসের আভাষ পাই। আমাদের শুধুই মনে হয়, কোন এক দূর অতীতের অজ্ঞাত দিবসে, যখন হয় ত এই স্থান জনাকীর্ণ, অথবা জঙ্গলাবৃত ছিল, তখন কোন এক সাধক তাঁহার চরম সিদ্ধি ও পরম শান্তি লাভের নিমিত্ত এই দেবীর ও মন্দিরের স্থাপনা করেন ; এবং তাঁহার সমাধি-অন্তে যুগমাহাত্ম্যে এই মন্দির ও পূজার ভার বিভিন্ন হস্তে ন্যস্ত হইতেছে।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই সকল কাহিনী অবগত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন করিয়া মন্দির ও দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার ও প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে মন্দির-সীমা বহুবিস্তৃত ছিল। একণে উহার আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়াছে। প্রতাপের রাজ্যাবসানে যশোর ও তৎসংলগ্ন স্থান পুনর্ব্বার অরণ্যে পরিণত হয় এবং যশোরেশ্বরীও জঙ্গলে সমাহিতা হন।

আজ আমরা যে মন্দির দেখিতে পাই, উহা প্রতাপের নির্ম্মিত নহে; বঙ্গীয় ১২১৬ অব্দে অধিকারী মহাশয়েরা ইহার পুনর্গঠন সম্পাদন করেন, এবং অনুমান হয় সেই সময় ইহার আয়তনও হ্রাস হইয়া যায়। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শ্লোকে দুইখানি পিত্তল-ফলকে নাটমন্দিরমধ্যে তারিখ ও সংস্কার-কর্ত্তার নাম লিখিত আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এ সকল স্থান এরূপ ভীষণ জঙ্গলে পরিণত ছিল যে, অপরাহ্ণেও কেহ মন্দিরপার্শ্বে আসিতে সাহসী হইত না।

যশোরে প্রাপ্ত ইষ্টকখণ্ড

যশোরে প্রাপ্ত ইষ্টকখণ্ড

যশোরে দেবীর বারাহী মূর্ত্তি। কেবল কিরীটশোভিত শীর্ষদেশ একটী সুউচ্চ বেদীর উপরে সংস্থাপিত। বৎসরে দুইবার দেবীর অঙ্গরাগ সাধিত হয়। মন্দিরমধ্যে প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক উৎকল হইতে আনীত অষ্টধাতু-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ ও উৎকলেশ্বর শিব আছেন। দেবী পশ্চিম-বাহিনী। দুই চারিটী স্তম্ভ ও একটি অর্দ্ধভগ্ন তোরণদ্বার ব্যতীত মন্দিরে পূর্ব্বকালের আর কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই।

এই মন্দির ও যশোরেশ্বরী লইয়া বহুদিন হইতে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। যে স্থানে মন্দির স্থাপিত আছে, পূর্ব্বে উহা জঙ্গলময় ছিল। প্রতাপের কমল খোজা নামক একজন মহাবল-পরাক্রান্ত সেনাপতি ছিলেন। তিনি উপর্য্যুপরি কয়েকদিন নিশীথকালে ঐ জঙ্গলমধ্যে প্রচণ্ড অনল রশ্মি লক্ষ্য করেন। অনন্তর একদিন রাখাল-বালকেরা ক্রীড়াকালে একজন সঙ্গীকে একগাছি হোগলা দিয়া বলিদান দিবামাত্র ঐ বালকের মস্তক দেহচ্যুত হইয়া পড়ে। রাজা কমল খোজার নিকট এই কাহিনী শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐ দিন রাত্রিতে এই অশ্রুতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে প্রতিশ্রুত হন। নিশীথকালে যখন অনলরাশি দীপ্তিময়ী হইয়া গগন স্পর্শ করিল, তখন তিনি সাহসী খোজার সহিত অশ্বারোহণে মঙ্গল লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে কমল দীপ্তি-প্রভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং রাজার অশ্ব ভীত হইয়া পলায়ন করে। অসমসাহসিক প্রতাপ ইহাতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচবোধ না করিয়া নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, একটি অমানুষিক রূপলাবণ্যময়ী দেবীমূর্ত্তি সিংহাসনোপরি উপবিষ্টা আছেন এবং তাঁহার দেহ হইতে এই অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ দেখিবার পর প্রতাপের বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হয় এবং সেই সময়ে দৈববাণী শ্রবণ করেন যে, ঐ জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাঁহার ইষ্টদেবতা। দেবী তাঁহাকে ঐ জঙ্গলস্থিত স্তূপ খনন করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। কিছুদূর স্তূপ খনিত হইলে এক প্রস্তরময় মুণ্ড প্রকাশিত হইল এবং গলদেশ পর্য্যন্ত খোদিত

হইলে দেবীর অনুমত্যানুসারে ঐ খনন কার্য্য স্থগিত হইল। পরে প্রতাপ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

ঐতিহাসিক হিসাবে এ কাহিনীর সার্থকতা কিছুই নাই। প্রতাপ দেবীর পরম ভক্ত ছিলেন। প্রত্যূষে দেবীপূজা সমাধা না করিয়া তিনি রাজকার্য্য আলোচনা করিতেন না। দেবীর মন্দির হইতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত রাস্তাটী এরূপভাবে অবস্থিত ছিল যে, প্রতাপ সভাস্থলে সিংহাসনে উপবেশন করিয়া দেবী দর্শন করিতে পারিতেন। দেবীর প্রতি প্রতাপের অবিচলিত ভক্তি থাকাতে এবং তাঁহার রাজত্বকালে দেবীর মহিমা বিশেষভাবে চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হওয়ায়, মনে হয়, ঐ সকল কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে।

মন্দিরের দক্ষিণ ভাগে একটি বিলুপ্তপ্রায় রাজপথের চিহ্ন দৃষ্ট হইল। বোধ হয় ইহা রাজপ্রাসাদ-তোরণ অবধি বিস্তৃত ছিল এবং প্রভাতল হইতে দেবীর মন্দির সরল ভাবে দৃষ্টিগোচর হইত।

মানসিংহের সহিত জীবনমরণ সংগ্রামকালে দেবী যশোরেশ্বরী প্রতাপের প্রতি বিমুখ হন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে।* এই প্রবাদবাক্যের মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত নাই। দেবী সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি এই যে, মানসিংহ প্রতাপ-বিজয়ের পর তাঁহাকে অম্বরে লইয়া যান এবং তথায় তিনি শিলাদেবী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠাতা হন। ইহাও সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। অম্বরস্থিতা শিলাদেবী অষ্টভুজা দুর্গামূর্ত্তি এবং প্রতাপের প্রতিষ্ঠিতা দেবী বারাহীমূর্ত্তি ও শীর্ষদেশমাত্রসম্পন্না। সুতরাং ইহাও কল্পনা-প্রসূত বিষয় ব্যতীত অপর কিছুই নহে।

প্রতাপের পরাজয়ের পর মুসলমান সৈন্য যশোর ধ্বংস করিয়া বহু ধনরত্ন লুণ্ঠন করে। এজন্য আমরা বর্ত্তমানে ভগ্নাবশেষ-স্তূপ ব্যতীত বিশেষ কিছুই দেখিতে পাই না। মুসলমানগণের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও কালের করাল কবল হইতে মুক্ত সামান্য দুই-চারিটি নিদর্শন ব্যতীত পুরাকালের অপূর্ব্ব যশোর-পুরীর আর কিছুই নাই।

যেদিন যশোর দেখিতে গমন করি, তৎপর দিবস বিরাট আড়ম্বরের সহিত দেবীর পূজার ব্যবস্থা ছিল। শুনিলাম, প্রায় দেড়হাজার অতিথিকে প্রসাদ বিতরণের বন্দোবস্ত হইয়াছে। নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়াও সময়াভাবে আমরা এই আনন্দোৎসবে যোগদান করিতে পারিলাম না। প্রত্যহ অপরাহ্ণ তিন চারিটার সময় মায়ের অন্নপ্রসাদ সকলকে দেওয়া হয়। অধিকারী বাবুরা আমাদিগকে প্রসাদ গ্রহণের জন্য সাদরে আহ্বান করিলেন। আমরাও ভক্তি সহকারে পরম তৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিলাম।

মন্দির দর্শন করিয়া চৌষট্টি মসজীদ ও বারুদীখানা দেখিতে গেলাম। এই মসজীদটি প্রতাপের হিন্দু ও মুসলমান প্রজার প্রতি তুল্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। অতীতের এই বিশাল কীর্ত্তিস্তম্ভ আজি জঙ্গলাকীর্ণ ও সর্পাদির আবাসস্থল হইয়াছে। যে স্থল হইতে এক সময়ে

যশোরে প্রাপ্ত ইষ্টকখণ্ড

পবিত্র আজানের গুরুগম্ভীর ধ্বনি বহুদূর হইতে কর্ণগোচর হইত, আজি সেখানে বিভীষিকাময়ী নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। এক সময়ে যে স্থলে গমন করিলে হৃদয়ে প্রীতি ও ভক্তির সঞ্চার হইত, আজি সে স্থলে ভয়ের সঞ্চার হয়। সময়ে কি আমূল পরিবর্ত্তন হয়! নয়নাভিরাম জ্যোৎস্নালোকবৎ হাস্যবীথিময়ী উষার আগমনের সঙ্গে-

* প্রতাপ কোন এক স্ত্রীলোকের উপর ক্রোধ-পরবশ হইয়া তাহার অঙ্গহানি করিবার আজ্ঞা প্রদান করেন। এই স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে।

সঙ্গেই যে স্থল হইতে পবিত্র কোরাণ-ধ্বনি উত্থিত হইত, আজি সে স্থল যামঘোষ-রব-বুভুক্ষিত।

সমগ্র মসজীদটী তিন চারি হস্ত মাটীর নীচে বসিয়া গিয়াছে। ইহা পাঁচটি সুবৃহৎ গম্বুজ-সংযুক্ত এবং উচ্চতায় একশত হস্ত হইবে। মসজীদের চির-উন্মুক্ত দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। এই মসজীদটী অদ্যাপি প্রায় অভগ্ন অবস্থায় বর্ত্তমান। খিলানগুলি স্থানে-স্থানে কাটিয়া গেলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। মসজীদের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে দুইটি সুউচ্চ অষ্টকোণ-বিশিষ্ট মিনার অবস্থিত ছিল। দক্ষিণাংশেরটী একেবারে লুপ্ত হইয়াছে; উত্তরাংশের মিনারটীর নিম্নাংশ আজিও বর্ত্তমান। ইহার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ হাত হইবে। প্রবেশদ্বার ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে।

মসজীদের গঠন-নৈপুণ্য দর্শনে মুরশিদকুলি খাঁর সুবিখ্যাত কাটরার মসজীদের কথা মনে পড়িল। উহা আয়তনে টেঙ্গা মসজীদ অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও একই প্রণালীতে নির্ম্মিত। মহাদেবের মন্দির হইতে যে ইষ্টক-নির্ম্মিত রাজপথ প্রাসাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, উহারই একটি শাখা হাবসীখানা ও মসজীদের পার্শ্বদেশ দিয়া যমুনার সমান্তরালগামী মার্গের সহিত মিলিত হইয়াছিল। উহার চিহ্ন স্থানে-স্থানে আজিও বর্ত্তমান। মসজীদের পশ্চাৎভাগের ভূমি দেখিয়া একটি পুষ্করিণীর অস্তিত্ব অনুমান হয়।

জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ দরিদ্র মুসলমান বহুকষ্টে ভিক্ষালব্ধ অর্থে চতুর্থ গম্বুজটীর সংস্কার সাধন করিয়াছেন। মসজীদের উপরিভাগ বনলাঞ্ছন হইয়া রহিয়াছে। গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, প্রতাপের অসীম উদারতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন এই মসজীদ যদিও প্রকৃতির নির্ম্মম অত্যাচার সহ্য করিয়াও অটুটপ্রায় থাকিয়া অতীত মহিমার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে, তথাপি ইহার জীর্ণ সংস্কার সাধন করিবার পক্ষে যত্ন বা আগ্রহ কাহারও নাই। এই যে মসজীদ, ভগ্ন-দেউল বা স্তূপ সমগ্র বঙ্গদেশকে মহিমামণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, এ সকল ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি বা অধিকারভুক্ত নহে, ইহারা আমাদিগের জাতীয় সম্পত্তি। ইহাদের সহিত আমাদের কত সুখস্মৃতি, কত ব্যথা, কত আশাহীন সাধ, কত ভাষাহীন কথা বিজড়িত আছে, কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে? যতদিন আমরা পুরাতনের আদর করিতে না শিখিব, বর্ত্তমানকে অতীতের ভিত্তির উপর দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করিতে না পারিব, অতীত ও বর্ত্তমানের সংমিশ্রণে ভবিষ্যৎ অঙ্কিত না করিব, ততদিন আমাদিগের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। প্রত্যেক জেলাতে যদি একটী করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান সমিতি গঠিত হয়, তাহা হইলে এই সকল লুপ্ত-গৌরবের পুনরুদ্ধার হয় এবং আমাদিগের জাতীয় ইতিহাসও পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে।

মন্দির ও মসজীদের প্রায় মধ্যবর্ত্তী স্থানে হাবসীখানা অবস্থিত। নির্ম্মাণ কালে এই অট্টালিকাটী দ্বিতল ছিল। এক্ষণে প্রথম তল সম্পূর্ণরূপে মাটীর মধ্যে বসিয়া গিয়াছে। এই বিশাল অট্টালিকাটীর একটী মাত্র ঘর অদ্যাপি বর্ত্তমান। পশ্চাৎভাগের প্রাচীরগাত্রে তিনটী নল থাকায় কেহ-কেহ ইহাকে হামামখানা নামে অভিহিত করেন। কিন্তু তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাকে হাবসীখানা বলিয়াই বোধ হয়।

হাবসীখানার যে অংশটুকু বিদ্যমান আছে, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমাংশ সমচতুষ্কোণ। ঠিক মধ্যস্থলে ছাদের উপর একটী গোলাকার গহ্বর, গৃহতল সম্পূর্ণ ফাঁপা। দ্বিতীয়াংশ তিনটী ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত; প্রত্যেকটী একটী চৌবাচ্চার মত। তিনটীরই পশ্চাদ্‌ভাগের প্রাচীরে নল সংযুক্ত আছে এবং ছাদের উপর গহ্বর বিদ্যমান। যাঁহারা ইহাকে হামামখানা বলেন, তাঁহাদের বিশেষ প্রমাণ এই নল তিনটির অস্তিত্ব। বাহিরের দেওয়ালে পূর্ব্বদিকে একটী সুড়ঙ্গ দেখিলাম। ভগ্ন ইষ্টকরাশি পরিপূর্ণ থাকাতে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। সমকোণত্রয়ের প্রত্যেকটীর মধ্যস্থলে গহ্বর বিদ্যমান। প্রথমাংশের মধ্যস্থলেও একটী গহ্বরের অস্তিত্ব পরীক্ষা করিয়া জানা যায়।

এই বিশাল অট্টালিকার যে সামান্য অংশ বর্ত্তমান আছে, একটু ভাল করিয়া দেখিলে, তাহা হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহা কখনও স্নানাগারের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হয় নাই। ভগ্নাবস্থাতেও ইহাকে হাবসীখানা বলিয়া অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করা যায়। অনুমান হয় ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল কতকাংশে দিল্লীর হাবসীখানার অনুরূপ। গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে ছাদের উপরিস্থিত গহ্বর হইতে নিম্নতলে নিক্ষেপ করা হইত। প্রথম ও দ্বিতীয় তল অতিক্রম

করিয়া হতভাগ্যেরা নিম্ন গৃহতল আশ্রয় করিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইত। সম্ভবতঃ যমুনা বা ইচ্ছামতী নদীর সহিত আভ্যন্তরিণ পয়ঃপ্রণালীর দ্বারা ইহার সংযোগ ছিল এবং জোয়ারের সময় মৃতদেহ সকল স্রোতোবেগে বাহিত হইত। যদি এই গৃহটীর চতুর্দ্দিক খনন করা হয়, তাহা হইলে আশা করা যায়, অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে। গৃহটীর উচ্চতা দেখিয়া ধারণা হয়, সমগ্র যশোর নগর অনূন সাত-আট হস্ত পরিমাণ ভূগর্ভে নিহিত আছে।

ইহারই অনুরূপ অপর একটী হাবসীখানা যশোর অথবা ঈশ্বরীপুর হইতে ছয় মাইল দূরে কালীগঞ্জে জাহাজঘাটা নামক স্থানে প্রতাপের কীর্ত্তি-চিহ্নের ভগ্নাবশেষ বলিয়া কথিত হয়। ইহারও গঠন-প্রণালী এই হাবসীখানার অনুরূপ।

প্রতাপ পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবার পর, এক-দুই করিয়া ধীরে-ধীরে তিনশত বৎসর অনন্ত গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য স্থানের ভগ্নাবশেষের তুলনায় তাঁহার কীর্ত্তিচিহ্ন সামান্য ভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহার কারণানুসন্ধান করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই, কেবল যে মোগল সৈন্যপ্রবাহ বিশাল যশোর রাজ্যের ধ্বংস-সাধন করিয়াছে তাহা নহে,—ব্যাধি, মড়ক, জলপ্লাবন ও মগ দস্যুগণের অমানুষিক অত্যাচারও ইহার বহুবিস্তৃত কীর্ত্তিরাজি বিলোপের কারণ। যে কয়টী কীর্ত্তি অতীত গৌরবের সাক্ষী স্বরূপ আজিও দণ্ডায়মান আছে, সংস্কার অভাবে তাহারাও অদূর ভবিষ্যতে ধরণীপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে।

যশোরেশ্বরীর মন্দির হইতে কিছু দূরে ইচ্ছামতী নদীতটে প্রতাপ একটী গোলাবাড়ী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ আদেশ ছিল যে, দেবীদর্শনেচ্ছু অভ্যাগতবর্গের যাহার যত দিন আবশ্যক, রাজ-সরকারে আবেদন করিলে সে তত্তদিন বিনামূল্যে ডালি পাইবে। এই গোলা-বাড়ী এক্ষণে প্রায় সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। পশ্চিম দিকে তোরণ-দ্বারের চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান আছে; এবং কয়েকটী গোলার ভিত্তির ধ্বংসাবশেষ অতীত মহিমার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রতাপের এই উদারতা ও দানশীলতার কথা তৎকালে প্রতি গৃহে ধ্বনিত হইত। দেশ-দেশান্তর হইতে আগত দান-গ্রহণেচ্ছু ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতি প্রত্যহ রাজদরবারে উপস্থিত হইত। কথিত আছে, তিনি কোন সময়ে কণ্ঠতরু হইয়া এক ব্রাহ্মণের প্রার্থনানুযায়ী সালঙ্কারা রাজমহিষীকে প্রদানের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ প্রতাপের দানশক্তির পরিমাণ করিবার জন্য ঐরূপ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া যুগপৎ আনন্দিত ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণ দান গ্রহণে অসম্মত হওয়াতে, প্রতাপ তাঁহাকে মহিষীর হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি দান করেন।

তাঁহার রাজত্বকালে ফ্রান্সিস কার্ণাণ্ডেজ, ডমিনিক সোসা, মেসিওর ফনসেকা, ও এণ্ড্রু বাউয়েস নামক চারিজন জেসুইট পাদরী যশোরে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ আগমন করেন। প্রতাপ তাঁহাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং গীর্জ্জা সংস্থাপন ও ধর্ম্মপ্রচার করিবার নিয়োগপত্র প্রদান করেন। তখনকার দিনে এরূপ উদারতা যে বিশেষ প্রশংসার বিষয় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজ-অনুগ্রহ লাভ করিয়া ও অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যশোরে ইচ্ছামতী নদীকূলে গীর্জ্জা স্থাপন করেন। ইহাই সমগ্র বঙ্গদেশের প্রথম খ্রীষ্টীয় উপাসনা-মন্দির। ইহা যীশু খ্রীষ্টের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। এই গীর্জ্জার সংলগ্ন একটী সমাধিক্ষেত্র ছিল। গীর্জ্জার ভগ্নাবশেষ আজিও দেখা যায়। গোরস্থানে কতকগুলি সমাধির চিহ্ন দৃষ্ট হইল। এই গীর্জ্জা ও গোর-স্থান এক্ষণে একটী গোপজাতীয় ব্যক্তির বাগানের অংশ মাত্র। মৃত্তিকা-খননকালে যে সকল সমাধি গহ্বর হইতে সে কঙ্কালাবশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিল। সট্‌গীজ সেনাপতি কার্ভালোর মৃত্যুর পর পাদরীদিগের প্রতি সন্দেহ হওয়ায়, তাঁহারা রাজাদেশে যশোর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং গীর্জাও ভূমিসাৎ করা হয়।

এই গীর্জ্জা হইতে কিছু দূরে নদীকূলে তিনটী বুরুজ দেখিলাম। যাহাতে শত্রু সহজে জলপথে আসিতে না পারে, সে জন্য প্রতাপ ইচ্ছামতী ও যমুনাতীরে স্থানে-স্থানে বুরুজ ও দুর্গাদি গঠন করেন। তাঁহার রণতরী সকল চাঙ্গিকান ও কালীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে থাকিত। ঐ স্থান অদ্যাপি জাহাজঘাটা নামে অভিহিত।

ইহার পর আমরা সুবিখ্যাত চাঁদরায়ের দীঘি দেখিতে গেলাম। ইহা এক্ষণে শুষ্ক; এবং তথায় চাষ হইতেছে। দীঘির পাড় উচ্চতায় দ্বিতল অট্টালিকার ন্যায় হইবে। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দেখিয়া অনুমান হইল ইহা অন্ততঃ একশত বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া বিরাজ করিত। দীঘির শুষ্ক গর্ভ অতিক্রম করিয়া পশ্চিম পাড়ের জমিতে উপস্থিত হইলাম। তথায় মৃত্তিকা-খননকালে প্রাপ্ত তিনটী চত্বর দেখিলাম।

দীঘি হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটী অত্যুচ্চ স্থান দেখাইয়া আমাকে একটী ভদ্র লোক বলিলেন, ঐ স্থানে প্রতাপাদিত্যের কামান সংস্থাপিত ছিল। টীলাটী জঙ্গলবিহীন ছিল,—উপরে উঠিয়া একটী লুপ্তপ্রায় ভিত্তি ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।

এই দীঘিটিকে কেহ-কেহ প্রতাপের কেল্লা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং ঐ চত্বরগুলিকে কামান স্থাপনের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু উহার অবস্থান দৃষ্টে দীঘি ভিন্ন অপর কোন ধারণাই বদ্ধমূল হয় না এবং ঐ চত্বরগুলিকে দীঘিতটস্থ বেদী বা মঞ্চ বলিয়াই মনে হয়। ঐ স্থান খননকালে যে প্রকার ইষ্টক বাহির হইয়াছে, তাহাতেও উহা দীঘি বলিয়া প্রমাণিত হয়। ঐ সকল ইষ্টক বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত এবং দেবালয় অথবা বিলাস-ভবন নির্ম্মাণোপযোগী। চির প্রচলিত জনশ্রুতিও ইহাকে দীঘি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে।

এই সকল দেখিতে-দেখিতে সন্ধ্যাচ্ছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিল। তখন আমরা দিগন্তবিস্তৃত জনহীন প্রান্তরবাহিনী যমুনার ধার দিয়া দ্রুতপাদক্ষেপে প্রতাপের উড়িষ্যা-বিজয়-লব্ধ বিগ্রহ গোবিন্দদেবের মন্দির দেখিবার জন্য গোপালপুর অভিমুখে চলিলাম। প্রচণ্ড সলিল-স্রোতোময়ী যমুনা অতীত গরিমার স্মৃতি বুকে লইয়া মর্ম্মবেদনায় যেন নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিতেছে। এমন কতদিন গিয়াছে, যখন সুবৃহৎ অর্ণবযান সকল ঐ বহুবিস্তীর্ণ উত্তাল তরঙ্গময়ী যমুনাবক্ষে সঞ্চরণে অক্ষম হইয়াছে।

হায় যশোর! কোথায় তোমার সে ঐশ্বর্য্যময় দিন, যেদিন দুকূলপরিবেষ্টনময়ী যমুনা-বক্ষে বাণিজ্য-দ্রব্য-সম্ভারে পূর্ণ দেশান্তর হইতে আগত নৌশ্রেণী সর্ব্বদা যাতায়াত করিত। কোথায় সে সকল জনকোলাহল-সঙ্কুল বড় বড় গঞ্জ, হাট, বাজার ও কেল্লা? সে সুখ, সে ঐশ্বর্য্য আজ একেবারে মুছিয়া গিয়াছে—আছে কেবল বনজঙ্গলের মধ্যে অতীত ভগ্নাবশেষের চিত্তকরুণ স্মৃতি।

যখন মামুদপুর নামক গ্রামে উপস্থিত হইলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। নীরব ক্ষুদ্র গ্রামখানি অতি মনোরম গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল। অন্ধকার জমাট বাঁধিয়াছিল। আমার একটী সঙ্গীর পরিচিত কোন ভদ্র গৃহস্থের বাটীতে রাত্রিবাসের জন্য উপনীত হইলাম। আমাদের আগমন-বার্ত্তা পাইয়া দু' একটী গ্রাম্য বৃদ্ধ তথায় উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাদের সহিত প্রাচীন কথা আলোচনা করিতে লাগিলাম। প্রতাপের কীর্ত্তি-চিহ্ন দেখিতে আসিয়াছি জানিয়া একটী বৃদ্ধ প্রতাপের সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলেন। যখন তাঁহার সেই স্মৃতিস্নাত, করুণ, বহুবর্ষ-বিগত কাহিনী শ্রবণ করিতে লাগিলাম, তখন সত্যই প্রতাপের সোণার যশোরের বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া হৃদয় ভারাক্রান্ত হইল। হায়, শক্তিমন্ত কালের শাসন কি কঠোর!

অতি প্রত্যূষে গোপালপুর যাত্রা করিলাম। তখনও সমস্ত গ্রামখানি সুপ্ত। শীত-প্রভাতের মৃদুমন্দ পবনস্পর্শ আমাদের ভ্রমণজনিত শ্রান্তি দূর করিতে লাগিল। সুন্দর তরুরাজিপূর্ণ বক্র গ্রাম্যপথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা গ্রাম অতিক্রম করিয়া মাঠে আসিলাম। কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই গোবিন্দদেবের স্বর্ণমণ্ডিত পত্রাচ্ছাদিত মন্দির-চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল। এই মন্দিরটী সুউচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত এবং আয়তনেও বৃহৎ হওয়ায় ইহার চূড়া বহু দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইত। মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, উহা গভীর জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। একদিকের জঙ্গল ভাঙ্গিয়া আমরা মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। গোবিন্দদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে চারি দিকে চারিটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্বদিকের মন্দিরটী ব্যতীত অপর তিন দিকের মন্দির ভূ-পৃষ্ঠে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। মন্দির-গাত্র অতি সুন্দর কারুকার্য্যময় ইষ্টক-নির্ম্মিত।

আমার সঙ্গীরা ভাবাবেশে মধুর নাম-গান করিতে লাগিলেন। স্নিগ্ধ প্রভাতে সেই তান-লয়-বিহীন আবেগময় পবিত্র সঙ্গীত হৃদয়ে যে ভাবাবেশ আনিয়াছিল, তাহা কখনও ভুলিবার নহে। একটীর পর আর একটী কীর্ত্তন চলিতে

লাগিল। অবশেষে যখন সকলে ক্লান্ত হইলেন, তখন নীরবে সেই অর্দ্ধ ভগ্ন ইষ্টকরাশির উপরে বসিয়া পড়িলেন।

ধীরে-ধীরে কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল। যে সময়ে সুখের হিরণ্ময় প্রবাহে চিরলাবণ্যময়ী আশার শুভ্রকল দিগ্‌দিগন্তে ফুটন্ত পুষ্পসম হেলিত দুলিত, সেই দীপ্তোজ্জ্বল অতীতের ছবি মানস-চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, যেন চারিদিক নীরবতা-সুপ্তিময়। নীলাকাশ ও ধরণীতল জ্যোৎস্নায় উছলিয়া উঠিতেছে। দূরে বীচি-মালিনী যমুনা। আর চির নীরবতার মধ্যে দেবমহিমা-তলে হীন হীন চির তৃষাতুর আমরা নির্ব্বাক্ নিষ্পন্দ বিস্ময়ে উপবিষ্ট।

আমরা বহুক্ষণ সেই ভগ্ন মন্দিরে ভগ্ন মন লইয়া বসিয়া ছিলাম। পরে দোলমঞ্চ দেখিয়া দীঘি দেখিতে গেলাম। দোলমঞ্চ এক্ষণে একটী বৃহৎ মৃত্তিকা-স্তূপে পরিণত হইয়া পতিত আছে। এই দীঘিটী মন্দির হইতে নয় দশ রশি দূরে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে বারশত এবং প্রস্থে আটশত ফিট হইবে। চারি দিকের পাড় অত্যন্ত উচ্চ। পূর্ব্বে প্রশস্ত-সলিলা ছিল; কিন্তু এক্ষণে ইহার বহু অংশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ইহার গভীরতাও কি বিস্ময় উৎপাদন করে! আমরা সমস্ত দীঘিটী একবার প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় গোবিন্দদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম।

মন্দির-সন্নিকটে আর একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুষ্করিণী দেখিলাম। শুনিলাম, উহার নাম ছিল "ফুলপুকুর"। উহার চতুষ্পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান ছিল। একটী ভিটা দেখাইয়া একজন বলিল, ইহা রাজবাটী ছিল। দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে রাজা ও অন্তঃপুরচারিণীরা এখানে আসিয়া অবস্থান করিতেন।

প্রতাপের কীর্ত্তি-চিহ্নের মধ্যে এই পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত মন্দিরটী বিশেষ রূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার অবস্থান, গঠননৈপুণ্য এবং অতীত মহিমাশ্রী সকলই চিত্তাকর্ষক। শিল্পীর সুনিপুণ হস্ত কি মনোহর পত্রপুষ্প অঙ্কন করিয়াছে। কত বর্ষ চলিয়া গিয়াছে, তথাপি প্রকৃতির নির্ম্মম হস্ত ইহাকে শ্রীহীন করিতে পারে নাই। যতবারই দেখিয়াছি, মনে হইয়াছে যেন নূতন মহিমা-মণ্ডিত দেখিতেছি।

প্রতাপের বিরাট কীর্ত্তির নিদর্শন যশোর ব্যতীত আরও অনেক স্থানে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সে সকল স্থান ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ। বেতকাশী, খোলপেটুয়া, ভাঁওরকাটীর জঙ্গল প্রভৃতি স্থানে কীর্ত্তি-চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। তাহা কখনও সুধী-সমাজের আলোচ্য বিষয় হইবে কি না জানি না। যদিও প্রতাপের সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক চিত্র প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই, তথাপি মনে হয়, যিনি "ভবানীর বরপুত্র ও পৃথিবীর প্রিয়তম" ছিলেন, যাঁহার গৌরব-গীতি এক সময়ে গগনে-পবনে ধ্বনিত হইত, যাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী আসমুদ্র উড্ডীন ছিল, যিনি একজন বারভূঁইএর হইয়াও অমিতবল পরাক্রম "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"র চিরবিজয়িনী শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং শৌর্য্যে অসীম পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া রক্তাক্ত সমর-প্রাঙ্গণে ছিন্ন-বাহু হইয়া পরে প্রাণ ত্যাগ করেন, তাঁহার নাম বঙ্গবাসী কখনও ভুলিতে পারিবে না।

বিধিলিপি

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

কাত্যায়নী ক্রমে একেবারে পাথরের প্রতিমার মত স্তব্ধ হইয়া পড়িল। মহেন্দ্রের নিষেধ ঠেলিয়া সে এ কি করিল! তাহার ন্যস্ত বস্তু রক্ষা করা,—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ—সে সব কথা দূরেই থাক্—মেয়েটির কপালে না জানি কি আছে! সঙ্গে-সঙ্গে মহেন্দ্রের কথাগুলি উজ্জ্বল হইয়া আজ তাহার মনে আসিল—'নি-গাঁয়ের জমীদাররা তার প্রবল শত্রু।' তাদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই কমলাকে তাহার কাছে রাখা হইয়াছে। তারা সব রকমেই কমলার সর্ব্বনাশ করিতে পারে। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে সেই অধৈর্য্যে কাত্যায়নী এ কি করিয়া বসিল! মহেন্দ্রকে সে কি বলিবে? আর

কমলার মা! তিনি মুখে কিছু না বলিলেও, তাঁহার কৃতজ্ঞ চক্ষু যে কাত্যায়নীকে কত নির্ভরই দিয়া গিয়াছে!

ব্যাকুল হৃদয় বলিল, "বল, কি উপায় করব?" কাত্যায়নী তাহার এ কথার দু' একবার উত্তরও দিল না; শেষে নিরাশ ভাবে বলিল, "উপায় কি আছে?" "তাই বলে কি আগেই নিরাশ হব? বাবাকে বলি।" কাত্যায়নী রমার হাত চাপিয়া ধরিল, "না!" কাত্যায়নীর স্বরের দৃঢ়তায় রমা অবাক্ হইয়া বলিল, "সে কি! বাবা নৈলে এর কি কোন উপায় হবে?" "তাই ত বলেছি, কোন উপায় নেই!" "এ হতেই পারে না, বাবাকে না ধরে কি করে' খোঁজ করাব?" "কমলার কোন বিষয়ে তোমাদের সাহায্য নেব না প্রতিজ্ঞা করেই তাকে কাছে রাখতে পেরেছিলাম হর।" "কে এমন প্রতিজ্ঞা তোমায় করিয়েছিল?" "যে তাকে আমার কাছে রেখেছিল,—মহেন্দ্র!"

রমা একটু অবাক্ হইয়া শেষে আবার বলিল, "সে কি এই বিপদের সময়ও উপায় না দেখ্‌বার প্রতিজ্ঞা?" "প্রায় তাই। কমলার জন্ত অনেক বিপদ অপেক্ষা করে আছে—এর আভাস দিয়েই তবে মহেন্দ্র তাকে আমার কাছে রাখে।" "বল কি! কি করে তা'হ'লে তুমি সাহস করেছিলে?" "করেছিলাম তো।" রমা ক্রমেই অধিকতর বিস্মিত হইতেছিল। আবার বলিল—"ঘাটের ধারে সে গিয়েছিল, যদি জলেই—" "না, তাকে তার সেই শত্রুরাই নিশ্চয় চুরি করে' নিয়ে গেছে।" "কারা তার শত্রু?" "ন-গ্রামের জমীদার। তারা না কি কমলার সর্ব্বনাশ করতে পারে।" "কেন বলতে পার?" "মহেন্দ্র তা তো আমায় বলে নি, আমিও জিজ্ঞাসা করিনি।" "সে কথা এখন থাক্। সত্যি কি তবে এম্‌নি চুপ করেই থাকতে হবে? মেয়েটির সর্ব্বনাশ হতে পারে, এ কথা জেনেও চুপ করে থাকব আমরা?" কাত্যায়নী তীব্র বাঙ্গের স্বরে বলিল, "কেন, তোমার পাথরের গোবিন্দদেব হাত পা বার করে উপায় করবেন!"

রমা কাত্যায়নীর এই কথায় আহত হইয়া নিস্তব্ধ হইল; এবং দেখিতে-দেখিতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। কাত্যায়নীও বাধা বোধ করিয়া কিছু বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু রমা তাহাতে বাধা দিয়া উঠিয়া দাসীকে বলিল, "আমাদের কানাই কোথায় দেখ্‌ত।" দাসী চলিয়া গেল। কাত্যায়নী ভাবিতে-ভাবিতে বলিল "মহেন্দ্র কোথায় থাকে, সেই ঠিকানাটী জেনে আমায় বল, আর তার কাছে পাঠাবার জন্ত একটা লোক ঠিক করে দাও। আমি তার হাতে একটী পত্র লিখে মহেন্দ্রকে পাঠাই, এই এক মাত্র উপায় দেখতে পাচ্ছি।" রমা কেবল 'আচ্ছা' বলিয়া কানাইয়ের সন্ধানে মন্দিরের দ্বার-পথে চাহিয়া অগ্রসর হইল। কানাই বৈকালে একটা ছিপ্ হাতে লইয়া ঘাটের ধারেই মাছ ধরিবার সরঞ্জাম করিয়া বসিয়াছিল। তাহার মার নিত্য দর্শনের আশায় সে বৈকালে প্রত্যহই দেবালয়ের ঘাটের নিকটে মাছ ধরিতে বসে। এখন সন্ধ্যারতির পর ঠাকুরের নাট-মন্দিরের চাঁদনীরই এক কোণে ছিপগাছটি পার্শ্বে লইয়া শুইয়া পড়িয়া, অল্পদিন-শ্রুত যতিরায়ের যাত্রার দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পালার একটি গানের এক-এক কলি গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল,—

কোথায় সঙ্কোচের ওষধি।
আমি সর্ব্বত্রে শুনেছি ওহে গোপিকারঞ্জন,
হয় মধুসূদন নামে সব বিপদ ভঞ্জন।
তবে কেন ধন জন, সব দিয়ে বিসর্জ্জন
কাঁদে পঞ্চজন কৃষ্ণ বলে নিরবধি।
যত কষ্ট দিল এই পাপমতি,
ইহার উচিত ফল না দাও যদি,
ও-পায় সঁপিতে মতি কারও হবে না মতি
দুর্ম্মতি বলিবে তোমার ভক্ত বিরোধী।

জনহীন নাট-মন্দিরের নিস্তব্ধতায় মধ্যে বালকের মিষ্ট সুরের এই করুণ সঙ্গীতটি যেন কাঁদিয়া ফিরিতেছিল। ভক্তের অভিমান যেন মূর্ত্ত হইয়া তাহার প্রতি অক্ষরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। রমা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গানটুকু ক্ষণেক শুনিয়া লইল; কাত্যায়নীও বাধা দিল না। শেষে রমা ডাকিল—"কানাই"।

'মা' বলিয়া কানাই লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নিরঞ্জনের চিকিৎসায় তাহার পাখানি সম্পূর্ণই আরোগ্য হইয়াছিল। "কানাই, ব্লাকের-গাঁয়ে তোর সেই মামার বাড়ীর কাছের মেয়েমানুষটি—" "হ্যাঁ মা, যার ঘর তৈরীর জন্ত এনেছিলাম; তানাকে কি করব?" "তাকে গিয়ে আমার নাম করে বলবি যে, সে সেদিন যে ঠাকুরপটিকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল, তাঁর কাছে একবার যাবে।

গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে যে, তিনি ওঁর মেয়ের কথা কিছু জানেন কি-না। একথা কেবল তুই, আর তোর সেই মাসি না মামি, সেই জান্‌বে—আর কেউ না জান্‌তে পারে।"

"আর কাক-পক্ষীতেও জান্‌তে পারবে না। আমি তবে মা এখনি যাই?" "সুমুখ্ অন্ধকার রাত্রি—দু' তিন ক্রোশ রাস্তা একা যাবি কানাই?" "তাতে কি হবে, ও যে আমাবস্যার রাতেরও নির্ভয়ের পথ। খানিক পরেই চাঁদ উঠ্‌বে—তখন আর আমায় কে পায়।" "একটা আলো নিয়ে যা।" "কিছু দরকার হবে না মা, আমি কাল বেলা চার দণ্ড হ'তে না হতে আপনাকে এসে খবর দেব।" রমা বিষণ্ণমুখে বলিল—"না রে কানাই, তোর সে মাসিকেও আবার এ খবর আন্‌তে গ্রামান্তরে যেতে হবে হয় ত, কাল সন্ধ্যের ফির্‌তে পারিস্ তো ভাল।" কানাই তাহাতেও নিরুৎসাহ না হইয়া বলিল, "তাহলে বৈকেলা নাগাদ ফির্‌বই মা, সে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" "কিন্তু দেখিস্, তোর মাসি যেন সেই ঠাকরুণ ছাড়া অন্য কাউকে কিছু না বলে।" "সে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কাকে-বগেও টের পাবে না। আমি তবে চল্লাম।" বলিয়া কানাই পড় হইয়া রমার পায়ের নিকটে প্রণাম করিল ও মাথা তুলিয়া সেইখানের একটু মাটি লইয়া জিহ্বাগ্রে এবং মস্তকে দিল। রমা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল, "জয়ী হয়ে ফিরে এস।" কানাই চলিয়া গেলে কাত্যায়নী বলিল, "কমলার মা কি করে তার খবর জান্‌বে?" "জানা সম্ভব বলে মনে করছি। সেদিন কানাইয়ের মাসী বলেছিল শোননি, যে ন-গাঁয়ের জমিদাররা তাঁর কুটুম্ব না কি! আমার আন্দাজ হচ্ছে, ন-গাঁয়েই এমন কি হয় ত সেই জমীদারদের বাড়ীতেই তিনি থাকেন। তুমি তো বাবাকে জানাতে দেবে না, দেখি এতেই কোন উপায় হয় কি না। তুমি বাড়ী গিয়ে মহেন্দ্রকে চিঠি লিখে রাখ সে, আমি দেওয়ান দাদাকে বলিয়ে এখনি মহেন্দ্রের কাছে পাঠাবার লোক ঠিক করাচ্ছি।" কাত্যায়নী বলিল, "কিন্তু এর কারণ যেন কেউ জান্‌তে না পারে। তোমার কিকেও সাবধান করে দাও, আমার কাছে সে একরকম লুকোনো ভাবেই ছিল। এ নিয়ে ক্রমে একটা হৈ চৈ হয়, বা তোমার বাবার কাণে ওঠে, এ আমি পছন্দ করছি না।" "আচ্ছা তাই হবে।"

কাত্যায়নীর অশান্ত রাত্রি ও দিন এক রকমে কাটিয়া গেল। রমা সমস্ত দিনে তাহার কাছে আর আসিল না বটে, কিন্তু সে যে নিশ্চিন্ত নাই, তাহা কাত্যায়নী ভাল রকমেই জানিত। বৈকালে সে অন্যমনা হইয়া গৃহকোণে বসিয়া ছিল; সহসা চমকিয়া দেখিল, রমা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাত্যায়নী তাহার দিকে চাহিতেই সে একখানা কাগজ লইয়া তাহার হাতে দিল। কাত্যায়নী পড়িল—

"মা!

আমি নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছি। সেদিন যদি কমলাকে দেখিবার লোভ না করিতাম, তাহা হইলে সে কোথায় আছে এরা জানিতে পারিত না। কমলাকে আমার কাছেই আনিয়াছে বটে, কিন্তু আজ রাত্রে ইহারা তাহাকে "বলি" দিবে। যে বিবাহ হইবে তাহাকে "বলি" ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। আমার রক্ষা করিবার সাধ্য নাই। তোমরাই বা কি করিবে। তবে যদি মহেন্দ্রকে পাঠাইতে পার, এ অসাধ্যও বোধ হয় সে সাধন করিয়া কমাকে বাঁচাইতে পারে। এই ন-গাঁয়ের জমীদারবাড়ীর পেছন দিকে তাহাদের অন্দরের পশ্চাতে যে পাঁচির-ঘেরা আমের বাগান আছে, তাহার উত্তর দিকে আমি রাত্রির প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত মহেন্দ্রের প্রতীক্ষা করিব। তাহাকে প্রাচীর টপ্‌কাইয়া ভিতরে ঢুকিতে হইবে। প্রকাশ্যে এ ব্যাপারের কোনও উপায় করিতে পারিবে না, কেন না কমাকে আনা ইহারা স্বীকারও করিবে না এবং এই বিস্তৃত অট্টালিকার বহু রমণীগণের মধ্যে বাহিরের লোকে তাহাকে চিনিতেও পারিবে না। চোরের সঙ্গে চৌর্য্যবৃত্তিই এখানে একমাত্র উপায়। নহিলে আজ রাত্রের এ বিবাহ বন্ধ করার আর কোন উপায়ই নাই এবং এ বিবাহ হইয়া গেলে আর আমাদের জন্য কিছুই করিবারও থাকিবে না। যদি কমলাকে এই রাত্রিটা যে কোন উপায়ে এই বিবাহের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পার, তবেই তাহাকে রক্ষা করা হইবে। সময় বড় সংক্ষেপ; তবুও যখন এতখানি সন্ধান লইতে পারিয়াছ, তখন আমাদের মনে আশা হইতেছে, হয় ত ভগবান তোমাদের দ্বারাই কমাকে আবার বাঁচাইবেন। মহেন্দ্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি—

কমলার মাতা।

কাত্যায়নী ম্লান স্বরে বলিল "কানাই এরি মধ্যে আস্‌তে পেরেছে?" "আধমরা হয়েই বাছা এসেছে, কথা কইতে পারছে না, এমনি হাঁপাচ্ছে।"

"কিন্তু এ অকারণই হ'ল না কি রমা?" "অকারণ কিসে বলছ? বরং সার্থক হ'ল বল।" "মহেন্দ্রকে পাঠাতে বলেছেন; কিন্তু কোথায় মহেন্দ্র?" "তাই বলে তো নিশ্চেষ্ট থাকলে চলবে না। দাদাকে সব বলে ডেকে এনেছি, তাঁকেই পাঠাব।" কাত্যায়নী চমকিয়া উঠিল, "ডেকে এনেছ একেবারে? না—না, রমা—এ হ'তে পারে না—এ আমি পারব না—" "কেন পারবে না,—যা মহেন্দ্র পারতেন, তা দাদাও নিশ্চয় পারবেন। দাদাকে এ ভার দিতে কেন কুণ্ঠিত হচ্ছ? দাদা, এদিকে এসে শোন। তোমাকে এ কাজ করতে দিতে উনি রাজী হচ্ছেন না।" নিরঞ্জন গৃহের দ্বারে আসিয়া নত মস্তকে দাঁড়াইল; মৃদুস্বরে বলিল, "বেশী দেরী করলে সময়ে পৌঁছুতে পারা যাবে না রমা। পত্রে যে রকম স্থান ও সময় ঠিক্ করে দেওয়া আছে, খুব সম্ভব কাজটা বেশী শক্ত হবে না। ওঁকে ভয় করতে বারণ কর।" এই তরুণ যুবকের নিকটে কাত্যায়নী লজ্জা করিবে, কিম্বা সহজ ভাবে কথা কহিবে, তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। ইহাদের সঙ্গে মনে-মনে সে যে সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে ইহাদের অজ্ঞাতও নাই! সে কথাটা যেন আজ ইহাদের সম্মুখে কাত্যায়নীর মনে একান্ত বিসদৃশ—একটা অসঙ্গত প্রলাপ বলিয়াই করেক নিমেষের জন্য উদয় হইয়া লজ্জায় তাহাকে অভিভূত করিয়া তুলিল। ঠিক্ সেই সময়ে নিরঞ্জন বালকের মত সরল অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে একেবারে কাত্যায়নীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "আপনি একটুও ভয় পাবেন্ না—আমাকে অনুমতি দিন্—আমি যাই।" প্রগল্‌ভ ভাবে মুখে কোন কিছু বলিয়া সম্বোধন না করিলেও, এই যুবকের চোখে-মুখে এবং কণ্ঠস্বরে এতটা স্নিগ্ধ শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পাইল যে, কাত্যায়নী আর তাহাকে সঙ্কোচও করিতে পারিল না, বা নিজেকে তাহার সম্মুখে আর লজ্জা পাইবার পাত্রী বলিয়াও মনে করিল না। রমাও নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া কেবল বলিল, "আমি মহেন্দ্রের নিষেধের কথাও মনে করছি।" নিরঞ্জন উত্তর দিল, "রমা সেকথাও আমায় বলেছে; কিন্তু বাবাকে না জানিয়ে এ ছাড়া আর কোনও উপায় আমিও তো দেখতে পাই না। আর বাবা জানতে পারার যদি মহেন্দ্রবাবুর কোন বাধা থাকে, আমার জানায় সেটুকু থাকতে পারে না। আমি তাঁর বন্ধু, আমি তাঁর এ কর্ত্তব্য অনায়াসেই জোর করে মাথায় নিতে পারি। আপনি অমত করে আর দেরী করাবেন না। কাজটা আপাততঃ জটিল হলেও, কমলা যার সন্তান, তিনিই যখন এতে অনুমোদন করছেন, তখন আর কোন বিধা থাকতে পারে না। আমি কেবল আপনার অনুমতিরই অপেক্ষা করছি। আর দেরী করলে সবই পণ্ড হবে, নবগ্রাম এখান থেকে পাঁচ-ছ' ক্রোশ হবে বোধ হয়।" "কিসে যাবে? ঘোড়ায়?" "হাঁ,—আপনি বলুন মা, আমি যাই?" নিরঞ্জনের বালকের মত সরল স্নিগ্ধ ব্যবহারে আর কাত্যায়নী আপত্তি করিতে পারিল না। মাথা হেলাইয়া বলিল, "এস।" তৎক্ষণাৎ নত হইয়া চৌকাঠের উপর মাথা ঠেকাইয়াই নিরঞ্জন নিমেষে অন্তর্হিত হইল।

একটু পরে কাত্যায়নী বলিল, "এ কাজ কি ভাল হ'ল রমা?" "গোবিন্দদেব যা করালেন তাই করলাম—ভাল কি মন্দ তা জানি না। চল, ঠাকুর-বাড়ী যাবে?" "না, তুমি যাও। ঘোড়ার পায়ের শব্দ—কে এল?" "বোধ হয় দাদাই আবার কিছু বলতে আসছেন।" "না—না—তুমি ঘরে যাও—নিশ্চয় মহেন্দ্র।" রমা অন্তরালে গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গে কাত্যায়নী সেইখানে প্রায় বসিয়া পড়িল। কিসের একটা আশঙ্কা তাহাকে যেন প্রচণ্ড ভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিল। যে আসিয়াছিল সে মহেন্দ্রই বটে। মহেন্দ্র নিকটে আসিয়া ব্যস্ত স্বরে বলিল "কোন খবর পেয়েছ কি?" কাত্যায়নী নিঃশব্দে শুধু কমলার মাতার পত্রখানি তাহার হাতে দিল। পড়িয়া মহেন্দ্র বলিল "কোন ভয় ক'র না। আমি এখনি যাচ্ছি,—কিন্তু ঘোড়াটা বদলাতে হবে। এখানে নিরঞ্জন আছে কি বলতে পার?" "এতক্ষণ ছিল,—এই খানিক আগে তাকে আমিই—" "তুমিই—কি করেছ?—কমলাকে উদ্ধার করতে পাঠিয়েছ কাত্যায়নি?"—"হাঁ।" মহেন্দ্র একটু ক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া সহসা যেন চীৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিল "আমার ওপর তুমি এতটুকুও নির্ভর করতে পারলে না যে, নিজের দায়িত্ব আমি নিজেরই কাঁধে বইতে পারি?—নিজের বিপদ থেকে নিজেই মুক্ত হতে পারি? এখানেও ঐ

জমিদারেরই আমায় সাহায্য নিতে হবে? তাই তার ছেলেকেই তুমি পাঠিয়েছ?" কাত্যায়নী নীরবে রহিল। মহেন্দ্র আবার তেমনি ভাবে "জেনো, তুমিই এর জন্য দায়ী" বলিয়াই দ্রুতপদে চলিয়া গেল। মধ্যে যে কতখানি সময় কাটিয়া গিয়াছে, তাহা রমা জানিত না—এক সময়ে অনুভব করিল, কাত্যায়নী তাহার গা ঠেলিতেছে—"রমা, রমা।" রমা সজোরে নিশ্বাস ফেলিল, "গোবিন্দ! কি বলছ?" "তোমার বাবাকে শীগ্‌গির ডাকতে পাঠাও।" রমা একটু বিস্মিত ভাবে চাহিয়া বলিল, "আবার কেন? উনিও তো গেলেন।" সেই জন্যই তো আরও তাঁকে আনানোর দরকার।" "না—না—তাতে হয় ত উনি বেশী কষ্ট বোধ করবেন।" কাত্যায়নী কঠিন স্বরে বলিল, "সেটুকু ওঁকে বোধ করানরই দরকার।" কাত্যায়নীর পক্ষ মুখের দিকে চাহিয়া রমা চমকিয়া উঠিল; বলিল, "আহা, না;—প্রথমটা একটু রাগ করলেও নিশ্চয় ওটুকু যেতে-যেতেই ভাল হ'য়ে যাবে। দাদা ওঁর বন্ধু, দাদার উপর তো রাগ করতে পারবেন না। দুজন হয়েছেন ভালই, দু'জনে উপায় করে কাজটা উদ্ধার করে আসবেন। বাবাকে জানাতে যখন ওঁর এত আপত্তি, তখন তাঁকে আর এখন জানিয়ে কাজ নেই। দাদাই কেবল জান্‌লেন সেই ভাল—দাদার সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব আছে।" "এ বিশ্বাস আর তার ওপর রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারব না রমা,—তুমি তাঁকে খবর দাও,—না পার বল আমিই তোমার বুড়ো ঝিকে বলি।" কাত্যায়নীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখশ্রীকে রমা বিশেষই চিনিত; একটু নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল—"তবে তাই হোক্; যা তিনি করাবেন, তাই তো করতে হবে। আমি মন্দিরে যাই এবার। আরতির সময় হয়ে এল। ডাকতে পাঠাও তাঁকে।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

তখনো চাঁদ উঠে নাই। নবগ্রামের জমিদারদের সেকালের পক্ষেও পুরাতন প্রকাণ্ড প্রাসাদ অন্ধকারে দৈত্যের মতই দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাতে কমলার মার কথিত প্রাচীর-ঘেরা সেই আমবাগান এবং প্রাচীরের বাহিরে প্রায় গড়খাইয়ের মত করিয়া চারিদিকে বেড়া গভীর জোল্, এখন কালক্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলেই বুঝা যায়, সেকালের জমিদাররা পরস্পরের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যই এইরূপ গড়ের মত করিয়া প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেন; কেন না দেশের ডাকাইতের দলপতি প্রায় তাঁহারা নিজেই ছিলেন। এখন আর তাঁহাদের সে সব প্রতাপ নাই বটে, তবু দুর্ব্বলের উপর অত্যাচারের অভ্যাস যায় নাই।

রাত্রি প্রায় একপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, উদ্যানের পূর্ব্বসীমায় ক্রমে চন্দ্রোদয় হইতেছে। এই সময়ে প্রাসাদের একটা ক্ষুদ্র দ্বারপথে কমলাকে প্রায় টানিতে-টানিতে আনিয়া কমলার মাতা উত্তরসীমায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। হতাশ স্বরে বলিলেন, "কই, এখনো তো মহেন্দ্রের দেখা নেই। আর তো অপেক্ষা করতে পারি নে।" কমলা ভ্রান্ত স্বরে বলিল, "আমায় কেন নিয়ে এলে?—এখনি তারা আমায় না দেখ্‌তে পেলে খোঁজ করবে,—এখানে আমাদের দেখলে হয় ত তোমায় লাঞ্ছনা করবে—চল মা, ভেতরে যাই।"

"ওরে না—না, আর বেশী সময় নেই বলেই তোকে এনেছি। আমার দিকে কারও লক্ষ্য নেই। আমি তো সন্ধ্যা হতেই বাগানে বসে আছি। চল্ কমা, দেখি আমরাই যদি কোন উপায় পাই।" কমলা মৃদু-মৃদু বলিল, "কেন এত অসাধ্য চেষ্টা করছ মা, কেন এত উতলা হচ্ছ। আমায় তো মেরে ফেল্‌ছে না! এর হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় নেই যখন, তখন কেন এত কষ্ট বোধ কচ্ছ? চল ফিরে যাই—কেউ যদি এসে কিছু বলে তোমায়, সে আমি সহ্য করতে পারব না।"

মাতা অধীরভাবে কন্যার হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতে প্রাচীরের নিকটে লইয়া গেলেন; বলিলেন,—"তোকে আনার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি এই সব দেখে বেড়াচ্ছি। এই দ্যাখ, এই দিকের পাঁচীরের গা খানিক-খানিক ভাঙা-ভাঙা, দেখি যদি কোন উপায় থাকে—" কন্যা মাতাকে এইবার সকাতরে বাধা দিতে-দিতে বলিল, "ওমা ফিরে চল, কে কোথায় তোমায় কি বল্‌বে—ওমা—"

"ওরে, আজ তোর ঠাকুর্দ্দা থাক্‌লে কে আমায় কি বলে! আমাদের ত্যাগ করেছিলেন এতদিন সেও যে ভাল ছিল, তোকে এ কি বিষ দিয়ে গেলেন—যাতে আমার দুঃখিনীর ধনের জীবনটাই জন্মিয়ে দেবার জন্য লোভীরা এই ষড়যন্ত্র করছে। ভগবান, কেবল বিয়েটা বাঁচিয়ে

দাও ঠাকুর, আর আমি কিছু চাই না। গাছতলায় থাকব জামাই-মেয়ে নিয়ে আমি। আমার যে আজন্মের বড় সাধ একটী পরের ছেলে আমার হবে—" "মা—চুপ্ কর, চুপ্—কিসের শব্দ,—চল আমরা বাড়ীর মধ্যে যাই।" মাতাও পার্শ্বে পদশব্দ শুনিয়া কন্যাকে ধরিয়া প্রায় যেন নিশ্বাস বন্ধ করিয়াই রহিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহাদের সম্মুখে একটি যুবক আসিয়া দাঁড়াইল; মাতা ও কন্যাকে তদবস্থ দেখিয়া মৃদুস্বরে সে বলিল, "ভয় পাবেন না, কাত্যায়নী দেবীকে আপনিই কি পত্র দিয়েছিলেন?"

মহামায়া একটু যেন দম্ লইতে লইতে বলিলেন "হাঁ; কিন্তু তুমি তো মহেন্দ্র নও!" "না; কিন্তু আমার কাত্যায়নী দেবীই পাঠিয়েছেন—" "মহেন্দ্র এলেন না কেন?" "তিনি তো সেখানে নেই—খবর গেছে তাঁর কাছে,—কিন্তু যদি না এসে পৌঁছুতে পারেন, তাই তিনি আমারই পাঠালেন।" "তুমি কে বাবা? আমার এই বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে—এই রাত্রে—অপরিচিত যুবা তুমি—তোমার হাতে কি করে দেব? ভগবান্ এ কি করলে।" নিরঞ্জন মুখ তুলিয়া এইবার মাতা-পুত্রীর দিকে চাহিল। মাতা-পুত্রীও তাহার দিকে চাহিতেছিল। চন্দ্রের নবোদিত জ্যোৎস্না তখন দিকপ্রান্ত হইতে উদ্যানের মধ্যে অনেকটা আলোই পাঠাইতেছিল; তাহারই ছটার মধ্যে মহামায়া দেবী দেখিলেন, উদার, কমনীয় মুখশ্রী—স্কন্দোপম এক তরুণ যুবক তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যে কথা তিনি উচ্চারণ করিলেন, তাহার জন্য তাঁহার লজ্জিতই হওয়া উচিত; কেন না দেবশ্রীযুক্ত মহিমময় মূর্ত্তির অধিকারীকে একথা বোধ হয় এক অন্ধ ছাড়া কেহই বলিতে পারে না। মহামায়া ভাবিলেন, যুবক হয় ত না জানি কি বলিবে! অপমান বোধ করিয়া হয় ত এখনি চলিয়াই যাইবে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সে তাহার কিছুই করিল না। কেবল বধূবেশধারিণী রক্তাম্বরপরিহিতা কিশোরী কমলার অমন সুন্দর অথচ ভয়-চকিত মুখের দিকে সেই নবোদিত চন্দ্র-কিরণে চাহিয়া দেখিয়া যুবক মাথা নামাইল এবং যেন চিন্তিত ভাবে বলিল "সে কথাও ঠিক্। তাহলে কি মহেন্দ্রবাবুর প্রতীক্ষা করতে পারবেন কিছুক্ষণ! তাঁর কাছেও তো খবর গেছে—বহিই এসে পড়েন—আমি প্রাচীরের বাইরে গিয়ে দেখব কি?"

"সে সময়ও আমার হাতে কৈ বাবা? হয় ত এতক্ষণে তারা জানতেই পেরেছে। এখনি এসে পড়লে আর আমাদের কোনই উপায় থাকবে না।" "বলুন তবে কি করব আমি?" "আমিও তো ভেবে পাচ্ছি না বাবা—ঐ এক ছাড়া পথ নেই আর। মহেন্দ্র আমার ধর্ম্ম-ছেলে, তার হাতে তার বোন্‌কে অনেক দিনই দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলাম—" দূরে কি যেন আবার পদশব্দ হইল। কমলা চকিত হইয়া বলিল, "মা!" মহামায়া দেবীও ত্রস্তস্বরে বলিলেন, "আর দেরী করতে পারি না যে—এত চেষ্টা সবই যে এই সমস্যায় মিথ্যে হয়ে যায়। আমার কমার রক্ষার উপায় ভগবান্ কি দিয়েও আবার এমনি করে বঞ্চিত করলেন? কি করব আমি?" সঙ্গে-সঙ্গে ব্যথিত ত্রস্ত কণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল, "না, তা করতে দেওয়া হবে না। অনুমতি দেন তবে আমার,—আমি নিয়ে যাই আপনার কন্যাকে—" "একটীমাত্র পথ আছে মনে হল যে আমার,—কাত্যায়নী তোমায় পাঠিয়েছেন; মহেন্দ্রও তাঁর আত্মীয়ই। তবে তুমি—তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে?" "হাঁ।" "বোধ হয় আমাদের স্ব-শ্রেণীও হবে, কিম্বা তা হোক আর নাই হোক্ তাতেও আমার তেমন ক্ষতি নেই, বল বাবা তুমি আমার রমাকে বিয়ে করতে পার কি? যদি এই পার, তবেই আমাদের জীবন রক্ষা হয়।" নিরঞ্জন স্তব্ধ হইয়া গেল, সহসা এ কি সমস্যা! পিতা কি বলিবেন!—এই যে পল্লীর মত অলোকসামান্যা বালিকা দুর্ব্বাসার শাপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভাবে তাহারই হাতে উদ্ধার পাইবার জন্য ঘটনা-সূত্রে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; কে ইহারা তাহা না জানিলেও স্থান-সংস্থানে এবং আকৃতি-প্রকৃতিতে ইহাদের আভিজাত্য এবং জাতি শ্রেণী অনেকটাই বুঝা যাইতেছে বটে, তবু পিতার অজ্ঞাতে একথা স্বীকার করা যে কোনমতেই হইতে পারে না। কিন্তু তবে কেন সে কাত্যায়নীর কাছে এমন করিয়া এ কার্য্যের ভার লইয়া আসিল? এ কি কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইল! "সময় হয়ে এল বুঝি, এখনি ওরা হয় ত ঘরে যাবে, ঐ না পাঁখের শব্দ? বল শীগ্‌গীর বল—নয় ত—" আর মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ না করিয়া নিরঞ্জন একহস্তে কমলার একদিকের স্কন্ধ এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে আর একহস্তে বেড়িয়া দুই হাতের উপরে তুলিয়া লইয়া ত্বরিত স্বরে বলিল "যদি আমার বাপ-মার

অমত না হয়, জান্‌বেন, আপনার কন্যাকে যা বল্‌লেন তাই হবে। আর তা না হয় যদি, মহেন্দ্রের বন্ধু আমি—আমিও আপনার ছেলে, কমলা আমারও ভগ্নী। ধর্ম্ম সাক্ষী, ভগবান সাক্ষী।" সঙ্গে-সঙ্গে নিরঞ্জন প্রাচীরের পানে ছুটিয়া যাইতে-যাইতে শুনিতে পাইল মহামায়া দেবী বলিলেন "আমি তোমারই হাতে কমলাকে সমর্পণ কর্‌লাম, ধর্ম্ম সাক্ষী।"

যেখানে সুবিধা পাইয়া নিরঞ্জন প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াছিল, তাহার নিকটে কমলাকে মাটিতে নামাইয়া দিয়া নিরঞ্জন ত্বরিত স্বরে বলিল "লজ্জা পেয়ো না, সাহস কর, আমি মহেন্দ্রের বন্ধু।" বলিতে-বলিতে কমলার কটীদেশ নিজের উত্তরীয়ে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া ফেলিল এবং কমলার দুই হস্তে তাহার মধ্যভাগ গুঁজিয়া দিয়া শেষ অংশ নিজের পায়ে বাঁধিয়া তাহাকে প্রাচীরের একেবারে গা ঘেঁসিয়া দাঁড় করাইল। তার পরে নিজে ত্বরিত হস্তে পুরাতন ভগ্নগাত্র প্রাচীরের ইষ্টকের ফাঁকে-ফাঁকে পায়ের অঙ্গুলি চাপিয়া-চাপিয়া প্রাচীরের মাথায় উঠিয়া পড়িল। কমলাকে উদ্দেশ করিয়া আবার বলিল "সাবধান, দুই হাতে ভাল করে ধরে থাক, আমি তোমায় টেনে তুলব।"

কমলা যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তখন দেখিল, সে নিরঞ্জন দ্বারা প্রাচীর হইতেই প্রাচীরের বহির্দিকে একেবারে একটা অশ্বের পৃষ্ঠের উপরে রক্ষিত হইয়াছে। শিক্ষিত সুউচ্চ অশ্ব প্রাচীর ঘেঁসিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল, নিরঞ্জন অগ্রে নিজে তাহার পৃষ্ঠে নামিয়া শেষে কমলাকেও নামাইয়াছে। তাহার পরে, অশ্বটা যখন প্রাচীর-মূলের সেই উচ্চ স্থান হইতে সেই অনতি-গভীর খাতের মধ্যে নামিয়া আবার ধীরে-ধীরে অন্য দিকে উঠিতেছে, অমনি পার্শ্ব হইতে কে যেন ঘোড়ার রাশ্ চাপিয়া ধরিল। অম্লান চন্দ্রালোকে নিরঞ্জন দেখিল, সে মহেন্দ্র।

"মহেন্দ্র বাবু এসেছেন! ভগবানকে ধন্যবাদ!" উল্লাসে নিরঞ্জন প্রায় চেঁচাইয়া উঠিল, "আপনার ঘোড়া কই? দেরী করা নয়, চলুন—চলুন।"

মহেন্দ্র একভাবে ঘোড়ার রাশ্ চাপিয়া ধরিয়াই বলিল, "নাও তুমি ঘোড়া হ'তে, কিংবা কমলাকে নামিয়ে দাও।" নিরঞ্জন তাহার ভাবে ও কথায় ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না—না, আর দেরী করা চল্‌বে না। তা'হলে সব মিথ্যা হবে। বেরিয়ে চলুন, আর এখানে নামিয়ে কাজ নেই।"

"কমলাকে নামিয়ে দাও ঘোড়া হতে! কার হুকুমে তোমরা আমার সর্ব্ববিষয়ে হাত দিতে যাও? সমস্তেই অধিকার নিতে এস? কেন তোমরা আমার প্রত্যেক কাজের মধ্যেই এসে পড়? নামাও—"

স্তম্ভিত নিরঞ্জনের হস্ত হইতে ঘোড়ার লাগাম ও কমলাকে ধরিয়া রাখার চেষ্টা উভয়ই যেন শিথিল হইয়া আসিতেছিল। প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে সে কেবল বলিল, "আপনি এ কি বলছেন—? জানেন না কি—"

"কিছু জান্‌তে চাই না" বলিতে-বলিতে মহেন্দ্র নিরঞ্জনের শিথিল বাহুর মধ্য হইতে কমলাকে সজোরে টানিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া ফেলিল। সঙ্গে-সঙ্গে নিরঞ্জন শুনিল, উদ্যানের অভ্যন্তর হইতে এতক্ষণ যে দু' একটী তীব্র স্বর তাহার কর্ণে আসিতেছিল, তাহা থামিয়া গিয়াছে। দুই তিনটা লোক যে প্রাচীরের উপর হইতে বাহিরের দিকে নামিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাও সে দেখিতে পাইল। নিরঞ্জন ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কি করেন মহেন্দ্রবাবু, ওঁদের সর্ব্বনাশ কর্‌ছেন যে! দেন্, শীগ্‌গীর ওঁকে তুলে দেন্—" "চলে যাও তুমি, সকলকেই সর্ব্বনাশ থেকে বাঁচাতে তোমাদের কিসের অধিকার?" "আপনি কি হঠাৎ পাগল হয়ে গেলেন? মানুষ মাত্রেরই এ অধিকার আছে। বিশেষ আমি যখন আপনার বন্ধু। আমার মাতৃস্থানীয়া যিনি, তিনিই আমায় এ কাজের ভার দিয়েছেন।" "যাও, বলগে তাঁকে, আমার কাজের ভার সকলকে দেবার তাঁর কোনই অধিকার নেই। কে আমার বন্ধু? কেউ না। এদের যা হয় সে আমি দেখ্‌ব,—তোমরা দূর হও—" লোক কয়টা প্রাচীর হইতে নামিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল—"কিছুতেই আপনার এ খেয়ালে আপনাকে আমি চল্‌তে দেব না। এ অধিকার আছে আমার"—বলার সঙ্গে-সঙ্গে সে অশ্ব হইতে লাফাইয়া নামিবার ইচ্ছা করিয়াছে, অমনি সেই মুহূর্ত্তে অশ্বই সহসা লম্ফ দিয়া উঠিল এবং অপ্রস্তুত নিরঞ্জন ছিট্‌কাইয়া কয়েক হস্ত দূরে মাটিতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তাহার দেহ গড়াইয়া সেই অনতি গভীর খাতের মধ্যে গিয়া পড়িল। মহেন্দ্র চাহিয়া দেখিল, খাতের অপর দিক্ হইতে দুই তিনটা লোক তাহাদের পানে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহাদের কাহারো হস্তে যষ্টি, কাহারো হস্তে প্রস্তরখণ্ড।

মহেন্দ্র স্তব্ধভাবে নিজের কৃতকার্য্যের ফল দু' এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া দেখিল; এবং সঙ্গে-সঙ্গে অনুভব করিল, তাহার দৃঢ় মুষ্টির মধ্যে বাতাতাড়িত পত্রের মত কম্পিতা বালিকা লুকাইয়া কাঁদিতেছে "দাদা—ও দাদা!" মহেন্দ্র চাহিয়া দেখিল, ষণ্ডা লোকটা লাঠিটা উঠাইয়া ধরিয়া পতিত নিরঞ্জনের নিকটস্থ হইল, এবং বাকী দুইটা তাহাদেরই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। ইহার পরে আর যে কি ঘটিল, তাহা মহেন্দ্র নিজেই ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সমস্ত জগৎ তাহার কাছে কিছুক্ষণ হইতেই রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; এই সময়টায় সেই রক্ত-প্রবাহের মধ্যে বিষম একটা ঘূর্ণি উঠিয়া সমস্ত ব্যাপারটাকেই মহেন্দ্রের স্মৃতির মধ্যে উলট-পালট করিয়া দিয়া গেল। এক সময়ে সে হঠাৎ চাহিয়া দেখিল, নিরঞ্জনের পার্শ্বে একটা লোক নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে, একটা আহত হইয়া পড়িয়া-পড়িয়া চেঁচাইতেছে এবং বাকীটাও ছুটিয়া একদিকে পলাইয়াছে। তাহার নিজেরও হস্তে নিজের আগ্নেয়াস্ত্রটি! এটা যে মহেন্দ্র কখন ব্যবহার করিল, তাহা সে নিজেই মনে করিতে পারিল না। নিরঞ্জন যেন উঠিতে চেষ্টা করিতেছে—ইহা দেখিবামাত্র মহেন্দ্র গিয়া নিঃশব্দে তাহাকে সাহায্য করায় নিরঞ্জন উঠিয়া বসিল। মহেন্দ্র বলিল "উঠ্‌তে পার্‌বে?" "পারি বোধ হয়, ধরুন।" মহেন্দ্রের সাহায্যে নিরঞ্জন দাঁড়াইতে গেল, পারিল না—আবার বসিয়া পড়িল। মহেন্দ্র বলিল "পার্‌বে না, ব'স, আমি ঘোড়াটা কাছে নিয়ে আসি,—ও সাম্‌লেছে বোধ হয়।" এক দিকে পতিতা কমলার দিকে চাহিয়া নিরঞ্জন ক্ষীণস্বরে বলিল, "আগে ওঁকে দেখুন, অজ্ঞান হয়ে গেছেন বুঝি।" মহেন্দ্র সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, অশ্বের নিকটে গিয়া সান্ত্বনা ও অভয়ের সঙ্গে তাহার স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে কয়েক বার মৃদু করাঘাত করিল। মহেন্দ্র তাহাকে আরও একটু আদর করিয়া তাহার লাগাম ধরিয়া খাতের মধ্যে নামাইতে গেল; কিন্তু সে রাজী হইল না। বিদ্রোহী ভাবে ঘাড় ফিরিয়া ঘেবা রব করিয়া উঠিল। নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল "বড় ভয় পেয়ে গেছে, আর নাম্‌বে না; থাক্ দেখি, যদি উঠতে পারি। আপনি আগে ওঁকে দেখুন তো—"মহেন্দ্র কোন কথা না কহিয়া জ্ঞানশূন্য কমলাকে একেবারে দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া নিজের স্কন্ধের উপর ফেলিল, তার পরে অশ্বের নিকটে গিয়া সেই অচেতন বালিকা-দেহটি তাহার পীঠের উপরের জীনে স্থাপন করিতে-করিতে নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া বলিল, "শুন্‌তে পাচ্ছ? অনেক লোকই এসে পড়্‌ছে চার দিক থেকে,—জ্ঞান করবার সময় নেই? শীঘ্র এসো।" নিরঞ্জনও তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। চারি হাতে পায়ে ভর দিয়া কোন রকমে সে অশ্বের নিকটস্থ হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। "নিরঞ্জন, মহেন্দ্র—এ কি—!" নিরঞ্জন ও মহেন্দ্র সচকিতে চাহিয়া দেখিল—সম্মুখে কামাখ্যানাথ বাবু! নিমেষের মধ্যে মহেন্দ্র অশ্বের রেকাবে পা দিয়া লাফাইয়া তাহার পৃষ্ঠের উপরে উঠিয়া পড়িল এবং অচেতন কমলাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া আর দুই-এক নিমেষের মধ্যেই অশ্বকে সজোরে তাড়না করিয়া সবেগে কামাখ্যানাথ ও নিরঞ্জনের চক্ষের অন্তরালে চলিয়া গেল। কামাখ্যানাথ মূঢ়ের মত নিরঞ্জনের হাত ধরিয়া তুলিতে-তুলিতে প্রশ্ন করিলেন, "এ কি ব্যাপার, নিরু?"—নিরঞ্জনের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই নবগ্রামের থানার দারোগা স্বয়ং, তাঁহার চৌকীদার ও কনষ্টেবল্‌বর্গ লইয়া কামাখ্যানাথ, নিরঞ্জন ও পতিত ব্যক্তি-দ্বয়কে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের সঙ্গে নবগ্রামের জমীদার। কেহ কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই, আর একজন অশ্বারোহী আসিয়া কামাখ্যানাথের নিকটে দাঁড়াইল, এবং অশ্বপৃষ্ঠ হইতেই কামাখ্যানাথকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "খবর পেয়েই আমি ছুটে আস্‌ছি—তবু দেখ্‌ছি আপনি আগে পৌঁছেছেন!—নবগ্রামের থানায়ও চৌকীদার পাঠিয়েছি—এখানকার দারোগাকে খবর দিতে।—এই যে আপনারাও যে সব এসে উপস্থিত হয়েছেন। দেখছি—" নবগ্রামের দারোগা চিনিলেন, ইনিও একজন তাঁহারই সমপদস্থ ব্যক্তি, গ্রামান্তরের দারোগা!—ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া তিনিও কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ রহিলেন। জমীদার যখন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখুন—দেখুন, বোধ হচ্ছে আমার দরোয়ান লছমন সিং খুন হয়েছে।" তখন তিনি সচকিত হইয়া নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে মন দিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাকবি ভাস-প্রণীত

প্রতিমা *

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, সরস্বতী, এম-এ, বি-এল্]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(কাঞ্চুকীর প্রবেশ করিল)

কা। ওহে, ওহে প্রতিহারে ব্যাপৃত জনগণ! তোমরা নিজ-নিজ স্থানে সাবধানে থাক।

(প্রতীহারী প্রবেশ করিল)

প্র। আর্য্য, কি এ?

কা। সত্য-বাক্য-রক্ষা-কারী এই যে মহারাজ বনে গমনশীল রামকে ফিরাতে না পেরে পুত্রবিরহ-শোকানলে দগ্ধ-হৃদয় হ'য়ে, উন্মত্তের ন্যায় বহু বিলাপ ক'রে সমুদ্র-গৃহে শয়ন করে আছেন।

বিচলিত মেরু যেন আসিলে প্রলয়,
কিম্বা যেন শুষ্কপ্রায়, গভীর সাগর হায়;
কেবল মণ্ডলমাত্র যার দৃষ্ট হয়,
খসিয়াছে রবি যেন শোভিছে তেমন,
অতীব শিথিল শোকে নৃপ-দেহ-মন॥

প্র। হুঁ, মহারাজ এ রকম হয়েছেন?

কা। ওগো, যাও।

প্র। আচ্ছা, আর্য্য। (চলিয়া গেল)

কা। (চারিদিকে দেখিয়া) ওহো, রাম চ'লে যাবার পর থেকে অযোধ্যাকে যেন শূন্য দেখাচ্ছে। কেন না—

তৃণ গ্রাস নাহি করে যত গজগণ,
হ্রেষারববিহীন বাজী সজল-নয়ন।
বৃদ্ধ, স্ত্রী, বালক সহ যত পৌরজন,
ত্যজিয়া আহার, কথা, বিষণ্ণ-বদন,
পত্নী, ভ্রাতা সহ রাম যে দিকে গমন
করেছেন, চাহে তথা করিয়া রোদন।

আমিও এখন মহারাজের নিকটে থাকি। (পরিক্রমণ করিয়া দেখিয়া) আরে, এই যে মহারাজ মহাদেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রা কর্ত্তৃক সেবিত হয়ে রয়েছেন। এঁরা সুদুঃসহ পুত্র-বিরহ-শোক চেপে নিজেদের প্রকৃতিস্থ রেখেছেন। কি কষ্টকর অবস্থা উপস্থিত হয়েছে। এই যে, এই যে মহারাজ—

উঠি' উঠি' পড়িছেন বারবার 'হা, হা' বলি
বিলাপ করিয়া,
যে পথে গেছেন রাম সেই পথপানে সদা
আছেন চাহিয়া।

(নিষ্ক্রান্ত হইল)

মিশ্র-বিষম্ভক।

[তাহার পর পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্টভাবে রাজা (দশরথ) ও দেবীদ্বয় (কৌশল্যা ও সুমিত্রা) প্রবেশ করিলেন]

দ। হায় বৎস রাম জন-নয়নরঞ্জন,
হা বৎস লক্ষ্মণ সর্ব্বদেহে সুলক্ষণ,
হা সতী মৈথিলী চিত্ত পতিপরায়ণ
হায় হায়, সন্তানেরা গেছে আজি বন।

কি আশ্চর্য্য! ভ্রাতৃস্নেহে যে পিতার প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করেছে, সেই লক্ষ্মণকেও দেখ্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছি। বধূ বৈদেহি!

রাম করিয়াছে ত্যাগ,
নিন্দা মোরে করেছে লক্ষ্মণ
অবশভাজন লোকে
তুমিও যে ত্যজিলে এখন।

পুত্র রাম! বৎস লক্ষ্মণ! বধূ বৈদেহি! সন্তানেরা আমায় উত্তর দাও। ওঃ, চারিদিক শূন্য। কেউ আমার প্রত্যুত্তর দিচ্ছে না। কৌশল্যাপুত্র! কোথায় তুমি?

সত্যবাদী, জিতক্রোধ, ঈর্ষাহীন, প্রিয় এ ধরার,
গুরু-শুশ্রূষায় রত, প্রত্যুত্তর দাও না কথায়।

হা, কোথায় সেই সকলের হৃদয়ের ও নয়নের আনন্দদায়ক

* ইহার প্রথম অঙ্ক "ভারতবর্ষ" ৪র্থ বর্ষ, ২য় খণ্ড, বৈশাখ ১৩২৪, ৫৮২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

রাম! কোথায় সেই শুভ আমার প্রতি সেবাপরায়ণ? কোথায় সেই শোকার্ত্তের প্রতি অনুকম্পা-পরায়ণ? কোথায় সে, যে রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য তৃণের মত গণনার মধ্যে আনে নাই? পুত্র! রাম! বৃদ্ধ পিতা আমাকে পরিত্যাগ ক'রে অসম্বন্ধ ধর্ম্মেই তোমার কাজ? হা ধিক্! উঃ কি কষ্ট!

সূর্য্যসম রাম গেছে, দিন-সম পিছনেতে তার
গিয়াছে লক্ষ্মণ, সূর্য্য গেলে, শেষ হইলে দিবার,
নাহি থাকে ছায়া যথা
নাহি দেখি জানকীরে আর,
(উর্দ্ধে চাহিয়া) ওরে হত কৃতান্ত!
অস্তনৃপসুত রামে,
আর মোরে সন্তানবিহীন,
কৈকেয়ীরে বনে ব্যাঘ্রী,
কেন না করিলি এই তিন?

কৌ। (কাঁদিতে-কাঁদিতে) মহারাজ এখন অত্যন্ত সন্তপ্ত হ'য়ে নিজেকে শোকের অধীন করবেন না। সেই সীতা ও কুমার দুটিকে নির্দ্দিষ্ট কালের পর আবার দেখতে পাবেন।

দ। তুমি কে গো?

কৌ। আমি অগ্নিধ-পুত্র প্রসবিনী কৌশল্যা।

দ। কি! কি! সমস্ত লোকের হৃদয় ও নয়নের আনন্দদায়ক রামের জননী তুমি কৌশল্যা?

কৌ। মহারাজ, আমি সেই হতভাগিনী।

দ। কৌশল্যা! তুমি সারবতী। তুমি রামকে গর্ভে ধারণ করেছ।

অতি নিদারুণ ক্লেশ সহিবারে নাহি পারি
দহিতেছে যেন সে অনল,
উপশম করিবারে নাহি পারি এবে তারে,
হতবল ইন্দ্রিয়-সকল।
(সুমিত্রাকে দেখিয়া) এ আর একজন কে?

কৌ। মহারাজ! বৎস লক্ষ্মণ—

দ। (সহসা উঠিয়া)-কোথায় সে, কোথায় সে লক্ষ্মণ? দেখতে পাচ্ছি না। উঃ, কি কষ্ট!

[দেবীদ্বয় সসম্ভ্রমে উঠিয়া রাজাকে ধরিলেন]

কৌ। মহারাজ! "বৎস লক্ষ্মণের জননী সুমিত্রা" এই আমি বলতে যাচ্ছিলুম।

দ। সুমিত্রা!

সৎপুত্র তোমারই সে তনয় এখন,
রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রাম রাত্রিদিন পিছে তার
কাননেতে যায় যেই ছায়ার মতন।

[কাঞ্চুকীর প্রবেশ করিল]

কা। মহারাজের জয় হোক্। সুমন্ত্র মহাশয় এসেছেন।

দ। (সহসা উঠিয়া সহর্ষে) রামের সঙ্গে?

কা। না, রথ এনেছেন।

দ। কি? কি? কেবল রথ নিয়ে এসেছে?

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন)

দেবীদ্বয়। মহারাজ! আশ্বস্ত হোন্—আশ্বস্ত হোন্। (গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন)

কা। উঃ, কি কষ্ট! এই প্রকার মহাপুরুষেরাও এই রকম বিপদগ্রস্ত হন। বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়। মহারাজ! আশ্বস্ত হোন্, আশ্বস্ত হোন্।

দ। (কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া) বলা কি! সত্য কি সুমন্ত্র একলা এসেছে?

কা। হাঁ মহারাজ!

দ। উঃ, কি কষ্ট!

শূন্য রথ এবে যদি এসে থাকে, তবে মোর
মনোরথ ভগ্ন হ'ল হায়,
দশরথে লয়ে যেতে পাঠায়েছে তবে এবে
রথখানি যম সুনিশ্চয়।
শীঘ্র তাকে নিয়ে এস।

কা। যে আজ্ঞে মহারাজ। (নিষ্ক্রান্ত হইল)

দ। ধন্য বনবাসী সেই, বহে যারা ভাগ্য-সদন
যথেচ্ছ ছুঁইতে পারে
রাম যবে করে বিচরণ।

[তাহার পর সুমন্ত্র প্রবেশ করিলেন]

সুমন্ত্র। (চারিদিক দেখিয়া সকাতরে)
নিজ-নিজ কাজ ছাড়ি যত ভৃত্যগণ,
রাম-স্নেহে অশ্রুজলে ব্যাকুল নয়ন,
শোকে দগ্ধকায়, চিন্তাবিষণ্ণ-বদন
নৃপতিরে উচ্চে নিন্দা করিছে এখন।
(অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হোক্।

দ। ভাই সুমন্ত্র!
জ্যেষ্ঠ সুত কোথা মোর—
না' না, আমি ভুল বলুলুম,
জ্যেষ্ঠ সুত কোথা তব? ভালবাস সুতে তুমি,
গুরুজনে গাঢ়ভক্তি যার,
বিদেহপতির সুতা কোথা এবে? বল কোথা
লক্ষ্মণ সে? সকল জনার
শোকসাগরের হেতু হতভাগ্য এ পিতারে,
সন্নিকট যাহার মরণ,
কি বলেছে তাহারা এখন!

সু। মহারাজ! অমন অমঙ্গলের কথা মুখে আন্‌বেন না। শীঘ্রই এদের আবার দেখ্‌তে পাবেন।

রা। ঠিক্। আমি অন্যায় বলেছি। তপস্বীদের ত এ কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। তবে বল—তপস্বীদের তপস্যার বৃদ্ধি হচ্ছে ত? স্বাধীন ভাবে বনে বিচরণ কর্‌তে বৈদেহী ক্লিষ্ট হচ্ছে না ত?

সুমিত্রা। সুমন্ত্র! বহুবল্কলে অলঙ্কৃতদেহা, বালিকা হলেও চরিত্রে অবালিকা, স্বামীর সহধর্ম্মচারিণী সীতা আমাদের কি মহারাজকে কি কিছু বলে নাই?

সুমন্ত্র। সকলে মহারাজকে—

দ। না, না, কর্ণের তৃপ্তিকর, হৃদয়বিদারের ঔষধ-স্বরূপ তাদের নাম করেই ব'ল।

সুমন্ত্র। যে আজ্ঞে মহারাজ! আয়ুষ্মান্ রাম—

দ। রাম? এই রাম। সেই নাম শোনাতে আমায় যেন স্পর্শ কর্‌লে মনে হচ্ছে। তার পর? তার পর?

সু। অরিষ্টমান্ লক্ষ্মণ—

দ। এই লক্ষ্মণ, তার পর? তার পর?

সু। জনকরাজপুত্রী আয়ুষ্মতী সীতা—

দ। এই বৈদেহী। রাম লক্ষ্মণ বৈদেহী এই রকম পর-পর বলাটা ঠিক নয়।

সু। তবে কি রকম পর-পর বল্‌ব?

দ। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ এই ব'ল।
রাম লক্ষ্মণের মাঝে
সীতা যেন করে অবস্থান,
বহু দোষ কাননেতে
রক্ষা তার হইবে বিধান।

সু। যে আজ্ঞে মহারাজ। আয়ুষ্মান্ রাম।

দ। এই রাম।

সু। আয়ুষ্মতী জনকরাজপুত্রী।

দ। এই সীতা।

সু। আয়ুষ্মান্ লক্ষ্মণ—

দ। এই লক্ষ্মণ। রাম! সীতা! লক্ষ্মণ! বাহুদ্বারা আমায় আলিঙ্গন ক'র।
একবার স্পর্শ করি,
একবার দেখি রামে আর
অমৃতে মৃতের সম
বেঁচে উঠি বিশ্বাস আমার।

সু। শৃঙ্গিবেরপুরে রথ থেকে নেমে অযোধ্যার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে সকলে মহারাজকে শির নত ক'রে প্রণাম ক'রে বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে—
বহুক্ষণ ভাবি কিবা, বলিবার তরে
কেঁপেছিল তাহাদের সবার অধর,
বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠ কিছু না বলিয়া পরে
কাননেতে প্রবেশিল আমার গোচর।

দ। কি? কিছু না ব'লেই বনে চলে গেল। (দ্বিগুণতর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইলেন)

সু। (সসম্ভ্রমে) রাজর্ষি! অমাত্যদের ব'ল। মহারাজ এখন যে অবস্থায় আছেন, তার আর প্রতীকার নাই।

কা। আচ্ছা। (নিষ্ক্রান্ত হইল)

কৌশল্যা ও সুমিত্রা। মহারাজ আশ্বস্ত হোন্।

দ। (কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া)
স্পর্শ কর অঙ্গ মোর চক্ষে নাহি দেখি আমি
কৌশল্যা তোমায়।
রাম প্রতি মোর মন ধেয়ে গেছে, এখনও তা
ফিরেনি হেথায়।
পুত্র রাম! আমি সর্ব্বদা যা চিন্তা করেছি—
"রাজ্যে অভিষেক এবে করিয়া তোমায়,
সাধু-নৃপ-লাভে সুখী করিব প্রজায়
সমান বিভব সদা নিজ ভ্রাতৃগণে
ক'রো তুমি" এই বলি, "যাও তপোবনে"
এ কথা বলিতে হ'ল; কৈকেয়ী তখন
মুহূর্ত্তে অন্যথা ক'রে যত আকিঞ্চন।

সুমন্ত্র! কৈকেয়ীকে ব'ল—

গেছে রাম; গতপ্রাণ আমি; হোক প্রিয় তব
ইষ্ট সুতে কর আনয়ন,
পূর্ণ হোক পাপ অভিলাষ।

সু। যে আজ্ঞে মহারাজ।

দ। (উর্দ্ধে দেখিয়া) আরে, রাম কথা শুনে দণ্ডধর আমাকে আশ্বাস দিবার জন্ত পিতৃপুরুষগণ এসেছেন। কে আছ?

[কাঞ্চুকীর প্রবেশ করিল]

কা। মহারাজের জয় হোক্।

দ। জল আন।

কা। যে আজ্ঞে মহারাজ। (বাহির হইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল) মহারাজের জয় হোক্, এই জল।

দ। (আচমন করিয়া ও দেখিয়া)

এই যে ইন্দ্রের সখা দিলীপ হেথায়,
এই রঘু, এই অজ জনক আমার
কেন এসেছেন হেথা? একত্র তথায়,
এসেছে কি কাল মোর বাদ করিবার?

রাম! সীতা! লক্ষ্মণ! আমি এখান থেকে পিতৃপুরুষদের কাছে যাই। পিতৃপুরুষগণ! এই যে আমি যাচ্ছি।*

(মূর্চ্ছিত হইলেন)

[কাঞ্চুকীর যবনিকা দিয়া ঢাকিয়া দিল]

সকলে। হা হা মহারাজ! হা হা মহারাজ!

(সকলে নিষ্ক্রান্ত হইল)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

---

* ভাস যেখানে মৃত্যু বর্ণনা করিয়াছেন, সেইখানেই মূর্চ্ছার সহিত পূর্ব্বপুরুষগণের সাক্ষাৎ করাইয়াছেন। 'উরুভঙ্গ' নাটকের শেষে ('ভারতবর্ষে' ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে) ও 'অভিষেক' নাটকের প্রথম অঙ্কে বালীর মৃত্যুর সময় অনুরূপ বর্ণনা আছে। তৎকালীন রঙ্গমঞ্চে পশ্চাতে একখানি যবনিকা থাকিত। তাহা সময়-সময় টানিয়া দেওয়া হইত। 'উরুভঙ্গ' ও এই স্থলের 'যবনিকা টানিয়া দিল' এই বাক্য হইতে তাহা অনুমান করা যায়।

তৃতীয় অঙ্ক।

[সুধাকার প্রবেশ করিল]

সু। (ঝাঁট দিয়া ও অন্যান্য কার্য্য করিয়া) আচ্ছা, এখন আর্য্য সংভবক এখানে যা করতে আদেশ করেছিলেন তা ত' কর্‌লুম। এখন একটু ঘুমুই। (নিদ্রা গেল)

[ভট প্রবেশ করিল]

ভ। (চেটের নিকট গিয়া তাড়না করিয়া) আরে দাসীর বেটা! এখন কাজ কচ্ছিস্ না যে বড়? (তাড়না করিল)।

সু। (জাগিয়া) মার আমায়, মার আমায়।

ভ। মারলে তুই কর্‌বি কি?

সু। আমি অভাগা, আমার ত কার্ত্তবীর্য্যের মত হাজারটা হাত নেই।

ভ। হাজারটা হাতে কি কর্‌তিস্?

সু। তোমায় মেরে ফেল্‌তুম।

ভ। আর দাসীর বেটা। খুন করে তবে ছাড়্‌ব। (পুনর্ব্বার তাড়না করিতে লাগিল)।

সু। ম'শায়, আমার অপরাধটা কি জান্‌তে পারি কি?

ভ। না, অপরাধ কিছু নেই বটে। ভর্ত্তৃদারক রাম রাজ্যভ্রষ্ট হ'লে সন্তাপে স্বর্গগত মহারাজ দশরথের প্রতিমাগৃহ দেখ্‌বার জন্ত আজ কৌশল্যাকে অগ্রবর্ত্তিনী ক'রে সমস্ত পুরনারী এখানে আসবেন, তা আমি জানিয়েছি। তুই এখানে কি করেছিস্?

সু। দেখুন না মশাই, ভিতরের ঘর থেকে কপোত-সন্ধানক সরিয়ে দিয়েছি। দেওয়াল-গুলিতে সৌধের বর্ণের মত চন্দন ও পঞ্চাঙ্গুল দিয়েছি। দরজায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে সাজিয়েছি। বালুকা ছড়িয়েছি। এখন এখানে আমি না করেছি কি?

ভ। তাই যদি, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে যা'। আমিও এখন অমাত্যকে জানাই যে, সব করা হয়ে গেছে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইল]

প্রবেশক।

[তাহার পর রথে ভরত ও সূত (সারথি) প্রবেশ করিল]

ভ। (আবেগের সহিত) সূত! অনেকদিন মাতুলালয়ে ছিলুম, এখানকার বৃত্তান্ত জানি না। শুনেছি মহারাজের দেহ অত্যন্ত পীড়িত। বল—

কোন রোগ জনকের?

সূ। অন্তরের খেদ নিদারুণ,

ভ। কিবা বলে বৈদ্যগণ?

সূ। বৈদ্য নহে ইহাতে নিপুণ।

ভ। আর্য্যার, শয়ন আছে?

সূ। নিরাহার আছেন ভূমিতে।

ভ। আশা আছে?

সূ। দৈব শুধু।

ভ। হৃদি কাঁপে, চালাও এ রথে।

সূ। যে আজ্ঞে আয়ুষ্মন্। [রথ চালাইল]।

ভ। [রথবেগ দেখিয়া] ওঃ কি রথের বেগ! এই সেই—

দ্রুত রথগতি হেতু
বৃক্ষ হেরি ক্ষীণ, ধাবমান,
জলহীন নদী সম
নেমীরন্ধ্রে মহী শোভমান;
অর নাহি দৃষ্ট হয়,
বেগে চক্র যেন সুনিশ্চল,
অশ্বপুরোত্থিত ধূলি
উঠিতেছে সম্মুখে কেবল।

সূ। আয়ুষ্মন্, নিকটে গাছ দেখে মনে হচ্ছে অযোধ্যা কাছেই।

ভ। ওহো, স্বজন দর্শনের জন্য উৎসুক আমার মনের কি ভুল? এখন দেখ্‌ছি—

পতিত আমার শির পিতার চরণে,
স্নেহে উত্তোলন রাজা করেন আমারে।
দ্রুত আসে ভ্রাতৃগণ; অশ্রুবরিষণে
আর্দ্র করে মাতৃগণ; আসে সৌধদ্বারে
ভৃত্য, দেহ-প্রশংসায় করে উচ্চারণ
"বেশ ত, বিশাল বীর্য": আসিয়া লক্ষ্মণ
বেশ, তাহা মোর যেন পরিহাস ক'রে।

সূ। (স্বগতঃ) উঃ, কি কষ্ট! মহারাজের মৃত্যু না জেনে নিষ্ফল ভবিষ্যৎ আশা বহন করে কুমার অযোধ্যায় প্রবেশ করছেন। জেনেও আমরা বল্‌ছি না। কেন না—

মাতার ঐশ্বর্য্যে লোভ,
জনকের প্রাণ-বিসর্জ্জন,
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ বনবাস,
তিন দোষ বলে কোন্ জন?

(ভট প্রবেশ করিল।)

ভট। কুমারের জয় হোক্।

ভ। ভদ্র, শত্রুঘ্ন আমার কাছে এল না কি?

ভট। কুমার এলেন ব'লে। উপাধ্যায়েরা আপনাকে বল্‌লেন—

ভ। কি? কি?

ভট। কৃত্তিকা নক্ষত্রের আর এক নাড়িকা মাত্র আছে। সুতরাং রোহিণী নক্ষত্র প্রাপ্ত হ'লে কুমার অযোধ্যায় প্রবেশ করবেন।

ভ। আচ্ছা, তাই হবে। আমি পূর্ব্বে কখনও গুরুর বাক্য লঙ্ঘন করি নি। যাও তুমি।

ভট। যে আজ্ঞে কুমার। [চলিয়া গেল।

ভ। এখন কোন্ জায়গায় বিশ্রাম করব? আচ্ছা, ঠিক করেছি। এই যে গাছের ফাঁক দিয়ে দেবমন্দির দেখা যাচ্ছে, এইখানে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করি। তা হ'লে দেবতার পূজা ও বিশ্রাম দুই-ই হ'বে। তা ছাড়া, নিকটে উপবেশন ক'রে নগরে প্রবেশ করবে ইহাই সাধুদের আচার। সুতরাং রথ রাখ।

সূ। যে আজ্ঞে আয়ুষ্মন্। [রথ দাঁড় করাইল]।

ভ। [রথ হইতে নামিয়া] সূত! একান্তে অশ্বগুলিকে বিশ্রাম করাও।

সূ। যে আজ্ঞে আয়ুষ্মন্। [চলিয়া গেল।

ভ। [কিছু দূর গিয়া দেখিয়া] বেশ ফুল ও লাজ ছড়িয়ে উপহার দিয়েছে, দেওয়ালগুলিতে চন্দন ও পঞ্চাঙ্গুল দিয়েছে, দরজাগুলি ঝোলান মালায় শোভা পাচ্ছে। বালুকা ছড়িয়েছে। এটা কি কোনও বিশেষ পার্ব্বণ না কি? না নৈমিত্তিক পূজা? এটা কোন্ দেবতার মন্দির? বাহিরে চিহ্নস্বরূপ কোনও অস্ত্র বা ধ্বজ দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, ভিতরে ঢুকে জানি। [প্রবেশ করিয়া দেখিয়া]

বাঃ, পাথরের বেশ কাজ করেছে ত। আকৃতির ভাব কি অদ্ভুত। দেবতার উদ্দেশে নির্ম্মিত হ'লেও এ প্রতিমাগুলি দেখে মানুষ বলে বিশ্বাস জন্মে। এই চারিটি কোন্ দেবতা? কিংবা যে দেবতাই হোন্ না, আমার মনে অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে।

দেবতা বলিয়া, শির নত করা উচিত এখন,
কেবল প্রণাম হোক্, পূজামন্ত্রে না করি অর্চ্চন।

(দেবকুলিক প্রবেশ করিল।)

দে। আরে, নৈত্যকের পর আমি প্রাণিধর্ম্মের অনুষ্ঠান করতে গেছি, এমন সময় আকৃতিতে এই প্রতিমা-গুলির সহিত অল্পমাত্র বিভিন্ন কে এ প্রতিমা-গৃহে প্রবেশ করেছে। আচ্ছা, ভিতরে গিয়ে জানি। (প্রবেশ করিল)।

ভ। নমস্কার।

দে। না, না, প্রণাম করবেন না।

ভ। ওহে, নিষেধ করো না।

বলিবে কি কিছু মোরে?
বিশেষ কি আছে আচরণ?
কি জন্য নিষেধ? কোন
নিয়ম কি উচিত পালন?

দে। এসব কারণে জানি আপনাকে নিষেধ করছি না। কিন্তু দেবতা মনে ক'রে ব্রাহ্মণ হয়ে পাছে প্রণাম করেন তাই নিষেধ করছি। এঁরা ক্ষত্রিয়।

ভ। বটে এঁরা ক্ষত্রিয়। এঁদের নাম কি?

দে। এঁরা ইক্ষ্বাকুবংশীয়।

ভ। [সহর্ষে] এঁরা ইক্ষ্বাকুবংশীয়। এঁরা সেই অযোধ্যার রাজা।

অসুরগণের বধে দেবের সহায় এঁরা,
নিজপুণ্যে ইন্দ্রপুরে করেন গমন,
পৌরজানপদসহ, সমস্ত ধরণীতল
নিজ ভুজবলে এঁরা করেন অর্জ্জন।
দীর্ঘকাল অন্বিলাষ করি অন্বেষণ
পারে না ক নাশিবারে এঁদের শমন।

যদৃচ্ছাক্রমে আমি আজ মহা ফল পেয়েছি। বল, ইনি কে?

দে। যাহাতে সমস্ত রত্ন সন্নিহিত, সেই বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞের প্রবর্ত্তক প্রজ্বলিত ধর্ম্মপ্রদীপ ইনি সেই দিলীপ।

ভ। ধর্ম্মপরায়ণকে নমস্কার। বল, ইনি কে?

দে। উঠ্‌তে বস্‌তে অনেক সহস্র ব্রাহ্মণের মুখে যাঁর পুণ্যাহশব্দ উচ্চারিত হ'ত, ইনি সেই রঘু।

ভ। ওঃ, বলবান্ মৃত্যু এঁর রক্ষাকেও অতিক্রমণ করেছে। ব্রাহ্মণদিগকে যিনি রাজ্যফল নিবেদন করেছিলেন তাঁকে নমস্কার। বল, ইনি কে?

দে। পত্নীর মরণ খেয়ে যিনি রাজ্যভার পরিত্যাগ করেছিলেন, নিত্য যজ্ঞদীক্ষা-দানে যাঁর কলুষ দূর হয়েছিল, ইনি সেই অজ।

ভ। যাঁর খেদ শ্লাঘনীয় তাঁকে নমস্কার। [দশরথের প্রতিমা দেখিয়া পর্য্যাকুল হইয়া] বহু সম্মানে বিচলিত চিত্ত হয়ে ভাল অবধারণ করতে পারি নি, বল, ইনি কে?

দে। ইনি দিলীপ।

ভ। মহারাজের প্রপিতামহ। তার পর? তার পর?

দে। পূজনীয় রঘু।

ভ। মহারাজের পিতামহ। তার পর? তার পর?

দে। পূজনীয় অজ।

ভ। পিতার জনক। কি? কি?

দে। এই দিলীপ, এই রঘু, এই অজ।

ভ। আমি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদেরও কি প্রতিমা স্থাপন করা হয়?

দে। না, মৃতদিগেরই প্রতিমা রাখা হয়।

ভ। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করি—

দে। থামুন—

নিজ প্রাণ, রাজ্য আর
বণিতার শুদ্ধ তরে
বিসর্জ্জন করিল যে জন,
এই সেই দশরথ-
প্রতিমা, ইহার কথা
প্রশ্ন কেন না কর এখন?

ভ। হা পিতঃ! (মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন, পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করিয়া) হৃদয়! পুরেছে আশা, শঙ্কিত যাহার তরে

শোন তব পিতার নিধন,
ধৈর্য্য এবে করুক গমন;
এই নীচ 'শুদ্ধ'-শব্দ স্পর্শ করে মোরে যদি
কিম্বা যদি সত্য ইহা হয়,
শোধনীয় দেহ সুনিশ্চয়।
আর্য্য!

দে। আর্য্য? এ যে ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের সম্বোধন। আপনি কি কৈকেয়ী-পুত্র ভরত?

ভ। হাঁ, মা। আমি দশরথ-পুত্র ভরত, কৈকেয়ী-পুত্র নই।

দে। তবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—

ভ। থাম, আগে বাকীটা বল।

দে। না ব'লে আর উপায় কি? শুনুন, পূজনীয় দশরথ প্রাণত্যাগ করেছেন। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামের বন গমনের কারণ আমি জানি না।

ভ। কি? কি? আর্য্যও বনে গেছেন? (দ্বিগুণতর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইলেন)।

দে। কুমার! আশ্বস্ত হোন্, আশ্বস্ত হোন্।

ভ। (আশ্বস্ত হইয়া)
পিতৃ ভ্রাতৃহীন এবে
অযোধ্যা সে অরণ্যের প্রায়,
ক্ষীণজল নদীপানে
ধেয়ে যাই আজি পিপাসায়।
আর্য্য! বিস্তারিত শ্রবণ করলে আমার মন স্থির হবে। সুতরাং কিছু বাকী না রেখে সমস্ত ব'ল।

দে। শুনুন, সেই রাজা যখন রামকে অভিষেক করতে গেলেন, তখন আপনার জননী বললেন—

ভ। থামুন—
সেই শুভদোষ স্মরি, "সুত মোর রাজা হোক্"
এই বাণী বলেছে যেমন,
ধৈর্য্যে আশ্বাসিয়া তারে বলেছেন পিতা মোর
"যাও পুত্র কাননে এখন।"
হেরি রামে চীরধারী সুনিশ্চয় সেই কালে
নৃপতির হয়েছে মরণ,
হায়, ধিক্, সমুচিত তিরস্কার করিতেছে
অবশিষ্ট যত প্রজাগণ। [মূর্চ্ছিত হইলেন]

[নেপথ্যে—"আর্য্যেরা সরিয়া যান, সরিয়া যান।"]

দে। (দেখিয়া) আরে—
উপযুক্ত সময়েতে
এসেছেন এই দেবীগণ,
তনয় মূর্চ্ছিত হ'লে
করস্পর্শ মাতার যেমন
জলহীনে সলিল অর্পণ।

[তাহার পর দেবীগণ (কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা) প্রবেশ করিলেন।]

সু। এই দিকে, এই দিকে আসুন আপনারা।
এই সেই আমাদের প্রতিমা, নৃপের
ভবন, উচ্চতা যার দুর্লভ দর্শন,
অবাধে পথিক রক্ষীহীন এ স্থলের
প্রণাম না করি করে কেবল পূজন।
(প্রবেশ করিয়া দেখিয়া) আপনারা প্রবেশ করবেন না, করবেন না।
বহুক নৃপতি সম
নিপতিত দেখা কোন্ জন?

দে। করো না ত অন্য শঙ্ক,
ভরত এ, করহ গ্রহণ।

[নিষ্ক্রান্ত হইল]

দেবীগণ। (সহসা অগ্রসর হইয়া) হা পুত্র ভরত!

ভ। (কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া) আর্য্য!

সু। জয় হোক্ মহা—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া সবিষাদে) কি আশ্চর্য্য স্বরসাদৃশ্য। মনে হচ্ছে যেন প্রতিমাস্থিত মহারাজ কথা কচ্ছেন।

ভ। জননীদের এখন কি অবস্থা?

দেবীগণ। বাছা! এই আমাদের অবস্থা।

(অবগুণ্ঠন মোচন করিলেন)

সু। আপনারা উৎকণ্ঠা দমন করুন।

ভ। (সুমন্ত্রকে দেখিয়া) সমস্ত আজ্ঞা এখন পালন করা দরকার তা বুঝতে পাচ্ছি। তাত! আপনি কি সত্যই সুমন্ত্র?

সু। হাঁ কুমার, আমি সুমন্ত্র।

জীবনের দোষে বাঁচি এখনও যে রহিয়াছি
বিড়ম্বিত, কুতঘ্ন এ জন ;
নৃপতি সে এবে মৃত, তার শূন্যরথ মৃত
করি আমি জীবন ধারণ।

ভ। হা তাত! (উঠিয়া) জননীদের কার পর কাকে অভিবাদন কর্‌তে হবে আমায় উপদেশ দিন।

সু। আচ্ছা। এই সেই রামের জননী দেবী কৌশল্যা।

ভ। না! আমি অপরাধী নই, অভিবাদন করছি।

কৌ। বাছা, সন্তাপহীন হও।

ভ। (স্বগত) আমি যেন ইহাঁর দ্বারা তিরস্কৃত হলুম। (প্রকাশ্যে) অনুগৃহীত হলুম। (সুমন্ত্রের প্রতি) তার পর?

সুমন্ত্র। তার পর? এই সেই লক্ষ্মণের জননী দেবী সুমিত্রা।

ভ। না! লক্ষ্মণ আমার কী কি দিয়েছে, আমি অভিবাদন করছি।

সুমিত্রা। বাছা, তার যশোভাগী হও।

ভ। না! তা চেষ্টা করব। অনুগৃহীত হলুম। (সুমন্ত্রের প্রতি) তার পর? তার পর?

সুমন্ত্র। এই তোমার জননী।

ভ। (সক্রোধে উঠিয়া) আঃ পাপিষ্ঠা—
আমার জননী হই,
তার মাঝে নহ ত' শোভন,
গঙ্গা যমুনার মাঝে
সংস্থাপিত কু-নদী মতন।

কৈ। বাছা, আমি কি করেছি?

ভ। কি করেছ বলছ?
অবশে আনায়, আর্য্যে বন্ধলেতে, আর নৃপে
মরণেতে, সারা অযোধ্যায়
অবিরাম রোদনেতে, নৃপসহ লক্ষ্মণেরে,
প্রিয়সুত মাতৃগণে হায়
শোকেতে, বধূরে আর পথশ্রমে নিম্ন-পর
অতিতীব্র ধিক্কার বচন,
করিয়াছ তুমি সংযোজন।

কৌ। বাছা, সমস্ত উচিত আচারের মধ্যবর্ত্তী হ'য়ে মাকে বন্দনা কর্‌ছ না কেন?

ভ। মা কে? মা! তুমিই আমার মা! মা, অভিবাদন করি।

কৌ। না, না। এই তোমার মা।

ভ। আগে ছিলেন। এখন নন। দেখুন,
ত্যজি দেহ, শীলে যাহা সংক্রামিত হয়
সেই দোষে করিয়াছে সুতে অতনয় ;
এ জগতে পূর্ব্বধর্ম্ম করি সংস্থাপন
পতিদ্রোহে মাতা হোক্ অমাতা এখন।

কৈ। বাছা, মহারাজের সত্য রক্ষা কর্‌বার জন্য আমি ওরকম বলেছি।

ভ। কি? কি বলেছ?

কৈ। আমার পুত্র রাজা হোক্।

ভ। কেন? সেই আর্য্য তোমার কে?
পিতার ঔরস পুত্র সে কি নয়? জ্যেষ্ঠক্রমে
হয় নি কি অভিষেক তাঁর?
ভ্রাতারা কি প্রিয় তার ছিল না ক? প্রজাগণ
চাহেনি কি তার অধিকার?

কৈ। বাছা, পণবন্ধ ভেবে বুঝে জিজ্ঞাসা কর।

ভ। বন্ধল পরায়ে তারে
রাজলক্ষ্মী করিলে হরণ,
পথব্রজে পত্নীসহ
আদেশিলে যাইতে কানন
পণবন্ধ বলিতেছ,
এ সবও কি ছিল তব পণ?

কৈ। বাছা, উপযুক্ত স্থলে উপযুক্ত সময়ে বলব।

ভ। অবশে যদ্যপি লোভ,
কিবা কাজ নিবেদি আমায়?
নৃপফলে স্পৃহা যদি
কি না দিত নৃপতি তোমায়?
'রাজমাতা' এ পদবী
লভিবারে ছিল যদি কাম,
সত্য করি বল ওগো
পুত্র তব নহে কি সে রাম?
কি কষ্টকর কাজ করেছ!
রাজ্যলোভে নৃপপ্রাণ করনি গণনা
'বনে যাও' এই বলি', জ্যেষ্ঠ যে জনয়

পাঠায়েছ বনে তারে ; যতন-বসনা
জনক সুতারে হেরি' ভাঙ্গেনি হৃদয়,
বজ্রদৃঢ় হৃদি বিধি করেছে নিশ্চয়।

সুমন্ত্র। কুমার! প্রজাদের সঙ্গে অভিষেক-সম্ভার নিয়ে এই বশিষ্ঠ ও বামদেব তোমার প্রত্যুদ্গমন করে জানাচ্ছেন—

গোপহীন গাভী যথা,
অপালিত সভয়ে বিলয়,
নৃপহীন প্রজা তথা
ধ্বংস হয় জেন সুনিশ্চয়।

ভ। প্রজারা আমার পিছু পিছু আসুক।

রু। অভিষেক ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে?

ভ। অভিষেক? (কৈকেয়ীকে দেখাইয়া) এই এঁকে কর।

রু। তুমি কোথায় যাবে?

লক্ষ্মণ যাঁহার প্রিয় রাম যথা, যাই তথা
সে বিনা অযোধ্যা নহে অযোধ্যানগরী
অযোধ্যা ত সেইখানে যথা রামে হেরি।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত হইল]

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

গৃহবিচ্ছেদ

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়]

(১)

নিত্যানন্দপুরের তিন ক্রোশ দক্ষিণে পুরন্দরপুর গ্রামে হরিচরণের পৈত্রিক ভিটা ছিল। বাল্যকালেই তাহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। তাহার পর দেনার দায়ে তাহার পৈত্রিক মেটে বাড়ীখানিও বিক্রয় হইয়া যায়। অগত্যা হরিচরণ কলিকাতায় তাহার মাতুলের আশ্রয়ে থাকিয়া ধনঞ্জয় দত্তের বেণে-মসলার দোকানে শিক্ষানবিসীতে প্রবৃত্ত হয়। সে অনেক দিনের কথা।

কিছুদিন শিক্ষানবিসী করিয়া ক্রয়-বিক্রয় কার্য্যে সুদক্ষ হইয়া উঠিলে, হরিচরণ কলিকাতার পটলডাঙ্গায় একখানি ক্ষুদ্র মসলার দোকান খুলিয়া বসে। অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে এবং ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতায় কিছু দিনের মধ্যেই তাহার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইয়া উঠিল। তখন তাহার আগ্রহ হইল, সে দেশে গিয়া একটা বিবাহ করিয়া আসিবে।

হরিচরণের দোকান বেশ চলিতেছে এবং তাহার হাতে দু'টাকার সংস্থান হইয়াছে শুনিয়া, নিত্যানন্দপুরের দুই-তিনটি কন্যাদায়গ্রস্ত গৃহস্থ হরিচরণের হস্তে কন্যা সম্প্রদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। নিত্যানন্দপুরেই হরিচরণের মাতুলালয়, তাহার মাতুলানী অনেক বিবেচনার পর চিন্তামণি দের কনিষ্ঠা কন্যা দামিনীর সহিত তাহার বিবাহ দিল।

চিন্তামণির দুই কন্যা। অনেক দিন পূর্ব্বেই সে তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ভামিনীকে একটি প্রতিবেশী যুবকের হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিল। ভামিনীর স্বামী ভজহরি পাল স্থানীয় মুন্সেফী আদালতে পেয়াদাগিরি করিত। মফস্বল আদালতের পেয়াদাদের মান-সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি সদরের হাকিমদের অপেক্ষা অল্প নহে। পেয়াদাগিরি করিলেও ভজহরি তাহার উপরওয়ালা দিগম্বর নাজিরের পাদুকা অপেক্ষা অধিক মূল্যের বিলাতী জুতা পায়ে দিত; এবং এব্রাহিম খাঁ কাবুলীর নিকট হইতে মাসিক দু'টাকা কিস্তী-বন্দীতে যে হাঁসিয়াদার শালখানি কিনিয়াছিল, তাহা ভাঁজ করিয়া কোটের উপর ফেলিয়া, টেরি কাটিয়া, জুতার মস্-মস শব্দে নির্জ্জন পল্লীপথ ধ্বনিত করিয়া, যখন সে তাহার শ্বশুরবাড়ীর পাশ দিয়া রসিক পোদ্দারের বাড়ী সখের যাত্রার দলের আড্ডায় বেহালা বাজাইতে যাইত, তখন তাহার শাশুড়ী মনে করিত বিস্তর তপস্যা করিয়াছিল বলিয়াই ভামিনী এমন স্বামীর গলায় মালা দিতে পারিয়াছে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শ্বশুর-শাশুড়ীর সহিত ভজহরির

বিরোধ উপস্থিত হইল। কোন কাজকর্ম না থাকায়, চিন্তামণি অনেক দিন হইতে বাড়ীতে বেকার বসিয়া ছিল। পরিবারের গহনা, বাগানের গাছ এবং জমিজমা কতক বন্ধক দিয়া, কতক বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া কায়ক্লেশে তাহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছিল। পিতামাতার সাংসারিক অসচ্ছলতা দেখিলে সচ্ছল অবস্থাপন্না কন্যা নানাভাবে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে; ভামিনীও গোপনে এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম করিত না।

ইহাই বিরোধের কারণ। ভামিনী অনেক দিন হইতেই এক জোড়া সোণার বালার জন্য স্বামীর নিকট উমেদারী করিতেছিল; কিন্তু ভজহরি পেয়াদাগিরি কার্য্যে বিলক্ষণ দুই পয়সা উপরি পাইলেও একেবারে 'নবলক্ষ টাকা' খরচ করিয়া গিনি কিনিয়া যে স্বর্ণবলয় প্রস্তুত করাইয়া দিবে—তাহার সেরূপ সামর্থ্য ছিল না। অথচ স্ত্রীকে খুশী করিতে না পারিলেও সংসার চলে না। অগত্যা সে প্রতি মাসে স্ত্রীর নিকট তিন টাকা করিয়া জমা করিতে লাগিল। চিন্তামণি এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, গিনি কিনিবার আশা দিয়া কন্যার নিকট হইতে ষাট টাকা লইয়া গেল। ভামিনী বিস্তর তাগিদ দিয়াও পিতার নিকট গিনি বা টাকা কিছুই আদায় করিতে পারিল না।

ভামিনী স্বামীর নিকট এ কথা প্রকাশ না করিলেও, কথাটা শীঘ্রই ভজহরির শ্রবণ-গোচর হইল। সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও শ্বশুরের নিকট হইতে সে টাকা আদায় করিতে পারিল না। তখন সে ভামিনীর চুলের মুটি ধরিয়া তাহাকে 'উত্তম-মধ্যম' দান করিল। শ্বশুর-শাশুড়ীর সহিত সে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিল। স্ত্রীকে বলিল, যদি সে কোনদিন বাপের বাড়ীর দিকে যায়—তাহা হইলে তাহার পিঠের চামড়া থাকিবে না।

(২)

হরিচরণের শ্বশুর বৃদ্ধ হইয়াছিল। ম্যালেরিয়ায় কিছু দিন ভুগিয়া এক ঘনঘটাচ্ছন্ন বর্ষার রাত্রে সে পরলোকে প্রস্থান করিল। তাহার পীড়া কঠিন শুনিয়া, হরিচরণ তাহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিতে বাড়ী আসিয়াছিল। সংসারে তাহার মাতুল ভিন্ন অন্য আত্মীয় না থাকায়, তাহার স্ত্রী পিত্রালয়েই বাস করিত। শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতিপালন-ভারও তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। শ্বশুর-শাশুড়ী অন্নদাতা জামাতার পক্ষপাতী বলিয়া, ভজহরি তাঁহাদের প্রতি অধিকতর বিরূপ হইয়াছিল। শ্বশুরের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াও সে শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিল না, তাহার স্ত্রীকেও যাইতে দিল না। ভামিনী পিতৃশোকে ব্যাকুল হইয়া ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

হরিচরণ সেই রাত্রে কয়েকজন কুটুম্ব ডাকিয়া শ্বশুরের মৃতদেহের সংকার করিয়া আসিল। ভজহরি তাহার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া পাঁচু ঘরামী, নিমাই পোদ্দার, নফর সেকরা প্রভৃতি মাতব্বর প্রতিবেশীদের ডাকিয়া মজ্‌লিস করিতে লাগিল, এবং তামাকের সদ্ব্যবহার করিতে-করিতে বলিল, "ছোটলোক বেটারা খেতে পায় না, ছরাদ্দে দু'খানা লুচি পাবে, এই লোভে মড়া ফেল্‌তে গিয়েছে।"

ভজহরি শ্বশুরের শ্রাদ্ধে দলাদলি পাকাইয়া শ্রাদ্ধ পণ্ড করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কারণ চক্ষুলজ্জা নামক জিনিসটার সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। সে সগর্ব্বে বলিত, চক্ষুলজ্জা থাকিলে দেওয়ানী আদালতের পেয়াদাগিরি করা চলে না। যাহা হউক, গ্রামের পাঁচজন মাতব্বর কুটুম্বের অনুরোধে ভজহরির সাধু চেষ্টা সফল হইল না। কিন্তু হরিচরণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ভজহরিকে শ্বশুরের শ্রাদ্ধে লইয়া যাইতে পারিল না; ভজহরি স্ত্রী-পুত্রকেও যাইতে দিল না। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া হুঁকা টানিতে-টানিতে নিমন্ত্রিত কুটুম্বগণকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল, "লুচি ভাজার ঘিয়ের গন্ধে যে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে পড়বার যো হয়েছে! এ কি ঘি, না মরা কুকুর শিয়ালের চর্ব্বি?—এ ত লুচির কলার দেওয়া নয়, চালাকি ক'রে কুটুম্বের জাত মারা! সমাজে মণিস্থি থাক্‌লে হরেটাকে আজ একঘরে হ'তে হতো। আমার মেয়ের বিয়ের সময় পাওয়া ঘিয়ে লুচি ভাজিয়ে দশ ঠাকুরকে খাওয়াব, ঘি কাকে বলে তা যেন সকলে দেখে যায়।"

ভজহরির প্রতিকূলতা সত্ত্বেও চিন্তামণির শ্রাদ্ধ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল। চিন্তামণির পুত্র ছিল না,—হরিচরণের স্ত্রী 'তেরাত্রি' করিয়া পিণ্ডদান করিয়াছিল; চিন্তামণির জ্ঞাতি ভ্রাতার এক পুত্রকে দিয়া হরিচরণ যথারীতি আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করাইল। শ্বশুরের শ্রাদ্ধে হরিচরণের শতাধিক টাকা ব্যয় হইল,—গ্রামের দশজনে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল; সেই সকল প্রশংসা উত্তপ্ত লৌহশলাকার ন্যায়

ভজহরির কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। হরিচরণের প্রতি তাহার ক্রোধ সমধিক বর্দ্ধিত হইল।

ইহার কিছুদিন পরে ভজহরির দ্বিতীয়া কন্যা মনোরমার বিবাহ উপস্থিত। ভজহরির বড় মেয়ে জ্ঞানদার বিবাহ হইয়াছিল—খাগড়ায়। জামাইটি খাগড়ার এক বাসনের দোকানে মুহুরিগিরি করিত। ভজহরির ছোট ভাই রামহরি গ্রামের জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী করিত। ভজহরির বিশ্বাস ছিল, রামহরি জমিদারের চাকরী করিয়া গোপনে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। সে বিবাহের অধিকাংশ ব্যয় রামহরির স্কন্ধে চাপাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল; কিন্তু রামহরি স্বীয় অসামর্থ্যের কথা জানাইয়া, তাহার সঞ্চিত পঞ্চাশটি টাকা দাদার হাতে প্রদান করিল। বিবাহের তিন দিন পূর্ব্বে ভজহরি তাহার ভ্রাতাকে বলিল, "আমি জ্ঞানদাকে আন্‌তে খাগড়ায় যাচ্ছি। বিয়ের দিন এক সময় বাড়ী এসে পড়ব। তুই সমস্ত আয়োজন ঠিক করে রাখিস্।"

হরিচরণের এক মাসতুতো ভাইয়ের সহিত মনোরমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও হরিচরণকে বরযাত্রী হইয়া আসিতে হইল। বর ও বরযাত্রী-দের জন্য বাসার সন্ধান করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়ায়, হরিচরণ অগত্যা তাহার শ্বশুরবাড়ীতেই তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিল। বিবাহের দিন প্রভাতে বর, বরযাত্রী ও নাপিত-পুরুত সঙ্গে লইয়া হরিচরণ নিত্যানন্দপুরে আসিয়া শুনিল, ভজহরি মেয়ে আনিতে খাগড়ায় গিয়াছে,—আজও গিয়াছে, কালও গিয়াছে!

রামহরি উৎকণ্ঠিত চিত্তে দাদার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যে দাদার সাক্ষাৎ নাই। রামহরি হতাশভাবে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। বরকনের চেলির কাপড়, দানের বাসন—সমস্তই খাগড়া হইতে তাহার দাদার সঙ্গে আসিবার কথা। দাদার দেখা নাই! দানের লিষ্টিপত্রও আসিল না। রামহরি রাগ করিয়া বলিল, "দাদার যেমন আক্কেল! কার ঘাড়ে যে সব ফেলে গেলেন, তার ঠিক নেই। বিয়ে বন্ধ থাক, দাদা ফিরে এলে যেন বিয়ে দেন।"

এই সময় হরিচরণ যদি ভজহরির দুর্ব্ব্যবহার স্মরণ করিয়া একটু বাঁকিয়া বসিত, তাহা হইলে বিবাহ পণ্ড হইত। তাহাতে বর-পক্ষের কিছু ক্ষতি ও অসুবিধা হইলেও, ভজহরির ক্ষতিই অধিক; ইহাতে তাহার জাতি যাইবার কথা। কিন্তু হরিচরণ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার এ সুযোগ ত্যাগ করাই মানুষের কাজ বলিয়া মনে করিল। ভজহরির উপর তাহার রাগ ছিল বটে, কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিয়া উপেক্ষিত বরযাত্রীগণকে অনুনয় বিনয়ে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার পর সন্ধ্যাকালে রামহরি আসিয়া হরিচরণের দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "দাদা ত এলেন না, আমাদের যে জাত যায়! তুমি রক্ষে না করলে আর উপায় নেই। কোন রকমে সাতপাকটা ঘুরিয়ে দাও।"—এই কথা শুনিয়া হরিচরণ একেবারে জল হইয়া গেল। সে হাসিয়া বলিল, "তোমার দাদা তোমাকে গাছে তুলে দিয়ে মই নিয়ে পালিয়েছে। খুব মজার লোক! যা'হোক, তুমি ভেব না ভাই,—আমি থাকতে বিয়ে পণ্ড হতে দেব না।"—হরিচরণ কোমরে গামছা জড়াইয়া বিবাহের আয়োজনে লাগিয়া গেল; এবং তাহার আন্তরিক চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমে কোন রকমে বিবাহটা শেষ হইল। কুটুম্ব-স্বজন ভজহরির দম্ভের কথা স্মরণ করিয়া, পাওয়া ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচির প্রত্যাশায় বিবাহের আসরে নীলের চাদরের নীচে দল বাঁধিয়া বসিয়া কুধা সঞ্চয় করিতে-ছিল; কিন্তু বরকর্ত্তা পলাতক; কে তাহাদিগকে লুচির কলার দিবে? রাত্রিশেষে তাহারা টোকো মাতগুড় ও জলো ঘৈয়ের সাহায্যে আউশ ধানের গুমো চিঁড়া উদরস্থ করিয়া ভজহরিকে আশীর্ব্বাদ করিতে-করিতে বাড়ী ফিরিল। বরযাত্রীরা কন্যার সুব্যবস্থা দেখিয়া রাগ করিয়া অনাহারে চলিয়া যাইতেছিল;—হরিচরণ তাহাদের হাতে-পায়ে ধরিয়া কোন রকমে ঠাণ্ডা করিয়া একবার পাতের কাছে বসাইল। তাহার স্ত্রী দামিনীও তাহার বিপদের সময় ভগিনীপতির অসদাচরণ বিস্মৃত হইয়া বিবাহের সকল কার্য্যে তাহার দিদির সাহায্য করিল। দামিনী কৃতজ্ঞ চিত্তে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল, "দামিনী, তুই যদি রাগ করে না আস্‌তি, তা হ'লে আমি মনোরমার বিয়ে দিতে পারতাম না।"

দামিনী বলিল, "আমাদের দোষ কি দিদি? পাল মশায় যে আমাদের নাম সইতে পারে না! তা এই শ্রাবণ মাসেই ত আমার ক্ষেন্তির বিয়ে, তুমি যেন পালিয়ে থেকো না। পাল মশায়কে পায়ে ধরে নিয়ে যাব।"

(৩)

শ্রাবণ মাসের প্রথমেই হরিচরণের কন্যা কান্তমণির বিবাহ। হরিচরণের স্ত্রী সাম্মিনীর ইচ্ছা ছিল, জামাইটি পাশ-করা হয়। মেয়ের বিবাহের কথা উঠিলেই সে বলিত, "আমার পাঁচ নয় সাত নয়, ঐ একটী মেয়ে, দশটাকা খরচ হয় 'ক্ষেন্তি' নেই, কান্তোর বিয়ে পাশ-করা জামাই দেখেই দেব।"—এ কথা শুনিয়া বামার দাসী, রামীর পিসি, আকালের মা প্রভৃতি প্রতিবেশিনীবর্গ বলিত, "তা' দেবে বৈ কি মা, পাশ-করা জামাই দেখেই মেয়ের বিয়ে দিও; পাশ-করা জামাইয়ের কত মান! কথায় বলে যেমন-তেমন চাকরী—দুধ-ভাত।' পাশ করলে সে জামাই চাকরী করে দশটাকা আন্‌তে পারবে; মেয়ে কোন দিন কষ্ট পাবে না।"

কিন্তু হরিচরণ এ প্রস্তাবের সমর্থন করিল না। সে স্ত্রীর কথা শুনিয়া চটিয়া-মটিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "তুমি কি ক্ষেপেচো না কি? পাশ-করা ছেলের সঙ্গে ক্ষেন্তির বিয়ে দিতে হবে,—এ খেয়াল কে তোমার মাথায় ঢুকোলে? আমি দোকানদার মানুষ, দোকানদারের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব। চাকরীতে ত ভারি সুখ! দোকানপাট করবে, খাসা সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে—কারও 'এক্তাজারি' করতে হবে না। মনিবের মুখ-নাড়া সহ্য করতে হবে না। স্বাধীন ব্যবসার চেয়ে কি আর মজা আছে? না,—আমার পাশ-করা জামাইতে কাজ নেই, চাকুরে জামাইতেও কাজ নেই।"

হরিচরণ অনেক অনুসন্ধানে বাচামারির রামগতি হালদারের পুত্র দুখীরাম হালদারের সহিত কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য একদিন অপরাহ্ণকালে পদব্রজে বাচামারি গ্রামে উপস্থিত হইল। বাচামারিতে তাহার শ্বশুরের মামাতো ভাই নিবারণ মণ্ডলের বাড়ী। নিবারণ হরিচরণকে সঙ্গে লইয়া রামগতি হালদারের বাড়ী ঘটকালী করিতে চলিল। এ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা বৈদ্যের বিবাহ নহে যে, বরের পিতা খাঁড়ার শান দিয়া বসিয়া থাকিবে এবং ক'নের পিতার ঘাড়ে খাঁড়ার ধার পরীক্ষা করিবে। রামগতি হালদার সহজেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। যে ক্রয়-বিক্রয়ের শেষে রাত্রিকালে দোকানের তহবিল মিলাইতে গিয়া আধ পয়সার গরমিল হইলে ভ্রম সংশোধনের জন্য দেড় পয়সার তেল পোড়াইতে কুণ্ঠিত হয় না, সে তাহার 'নায়েক' পুত্রের বিবাহের প্রস্তাবে একখানি অলঙ্কারেরও দাবি করিল না! কেবল বলিল, "বিশ্বাস মশায় অতি সজ্জন লোক, বংশও ভাল, ও বংশে ছেলের বিয়ে দিতে আর আপত্তি কি? তবে আমার ঐ একটি ছেলে—বউটিকে দেখে কেউ নিন্দে না করতে পারে—এ রকম মেয়ে হওয়া চাই। বউ কালো কুচ্ছিত হ'লে পাঁচজনের কাছে দশ কথা শুনতে হবে,—আর বাড়ীর গিন্নীটিও মুখ বাঁকা করবেন, সে আমি সহ্য করতে পারবো না।—মেয়েটি দেখে পছন্দ হ'লে আর কোন আপত্তি নেই।"

বাচামারিতে হরিচরণের কুটুম্ব যে কয় ঘর ছিল, তন্মধ্যে রামগতি হালদারের আর্থিক অবস্থাই বেশ সচ্ছল। তাহার একখানি দোকান ছিল;—সেই দোকানে চাল, ধান, তেল, তেল, নুন, ঘি, মসলা, ময়দা, গুড়, চিনি প্রভৃতি গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রীই বিক্রীত হইত; এবং বাচা-মারির চতুর্দ্দিকস্থ চারি-পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে ক্রেতার দল আসিয়া জিনিসপত্র কিনিয়া লইয়া যাইত। রামগতির দুই-দশ বিঘা চাষ-আবাদও ছিল; চাষ-আবাদের কাজ স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ না করিলে, বা ক্ষেতে-খামারে উপস্থিত থাকিয়া কৃষকগণকে পরিচালিত না করিলে চাষে লাভ হয় না। রামগতি ইহা জানিত; এজন্য সে জমাজমি ও ক্ষেত-খামার লইয়াই থাকিত, দোকানের কাজে বড় মন দিতে পারিত না। দোকানের সমস্ত ভার সে তাহার পুত্র দুঃখীরামের উপর ন্যস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল। দুঃখীরামের বয়স তখন উনিশ-কুড়ি বৎসরের অধিক না হইলেও, দোকানদারীতে সে বিলক্ষণ পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছিল; এজন্য তাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে দোকানের উন্নতিই হইতেছিল।—এ সকল কথা জানিত বলিয়াই হরিচরণ দুঃখীরামের হস্তে কন্যা-সম্প্রদানের জন্য এতদূর উৎসুক হইয়াছিল। হরিচরণ রামগতিকে বলিয়া আসিল, যেদিন ইচ্ছা নিত্যানন্দপুরে গিয়া তাহার কন্যা কান্তমণিকে দেখিয়া আসিতে পারেন। পছন্দ-অপছন্দ পরের কথা।

(৪)

হরিচরণ বুঝিয়াছিল—তাহার কন্যাকে দেখিলে রামগতির পছন্দ হইবেই। কান্তমণি উপন্যাসের নায়িকার মত রূপবতী না হইলেও, তাহার চেহারায় কোন খুঁত ছিল না, রঙও ময়লা নহে। দোষের মধ্যে দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া তাহার মাথার চুল কতক-কতক

উঠিয়া গিয়া কিছু পাতলা হইয়াছিল ; শরীরও একটু কৃশ। কিন্তু দামিনীর ভয়না ছিল, 'বিয়ের জল' গায়ে পড়িলেই মেয়ে হাঁকালো হইবে। বিশেষতঃ গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মে সে যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। অতটুকু মেয়ে সংসারের অর্দ্ধেক কাজ নিজেই করিত। তাহার কোন ভাই-ভগিনী ছিল না, তাহার মাসীর ছেলে পটলা তাহার খেলিবার সঙ্গী। কিন্তু পিতার শাসনে পটলা সর্ব্বদা তাহাদের বাড়ী যাইতে সাহস করিত না। তবে ভজহরি শমনজারি করিতে গ্রামান্তরে যাইলে, সে লুকাইয়া ক্ষান্তর সহিত খেলা করিতে যাইত। এক-একদিন ধরা পড়িয়া পিতার নিকট প্রহার লাভ করিত। তথাপি ক্ষান্তর সহিত খেলা করিবার লোভ সে সংবরণ করিতে পারিত না।

শ্রাবণের মেঘ-মণ্ডিত অপরাহ্নে হরিচরণের বাহিরের চালাঘরে যখন পাড়ার ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে একত্র হইয়া লুকোচুরি খেলা করিত, এবং ধরা পড়িবার ভয়ে সমস্ত বাড়ীময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, সে সময় শিশু-কণ্ঠের হাস্য-কল্লোল অদূরবর্ত্তী গৃহস্থিত পটলার কর্ণগোচর হইলে, আর তাহার আত্মসংবরণ করা কঠিন হইত। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া, চোরের মত চারিদিকে চাহিতে-চাহিতে, তাহার মাসীমার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইত। এমন সময় যদি তাহার ছোট ভাই ঘটা বলিয়া উঠিত, 'দাদা কুতা যাচ্ছ, বাবাকে বলে দেব।' তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া ঘরে আসিয়া চৌকীর উপর শুইয়া পড়িত। তাহার পিতার সহিত মাসীমাদের শত্রুতার কারণ কি, তাহা সে বুঝিতে পারিত না।

শ্রাবণ মাসের প্রথমেই রামগতি প্রামাণিক হরিচরণের মেয়ে দেখিতে আসিল। হরিচরণ সেদিন তাহাকে বাড়ী যাইতে দিল না,—ষোড়শোপচারে তাহার পূজা করিয়া মেয়ে দেখাইল। মেয়ের যা কিছু ত্রুটি—খাটো চুল আর ক্ষীণ দেহ—তাহা দেখিয়াও রামগতি অসন্তোষ প্রকাশ করিল না, সে মেয়ে পছন্দ করিয়া বাড়ী ফিরিল।

ইহার কয়েকদিন পরে একটি শমন-জারি উপলক্ষে ভজহরি বাচামারিতে গিয়া রামগতির আতিথ্য গ্রহণ করিল। আদালতের পেয়াদারা মফস্বলে গিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়—তাহারা হাকিমের প্রতিনিধি। সে সময় তাহাদের চাল যেরূপ লম্বা হইয়া উঠে, তাহা দেখিলে হাকিমদেরই চমক্ লাগিয়া যাইতে পারে ; তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন না,—তাঁহারা বড়, না তাঁহাদের পেয়াদা বড়! ভজহরির শ্যালির কন্যার সহিত রামগতির পুত্রের বিবাহ তখন স্থির হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং রামগতি তাহাকে যথাযোগ্য আদর-যত্নে পরিতুষ্ট করিল। রামগতির গুরুদেব আসিলেও তিনি তত আদর যত্ন লাভ করিতে পারিতেন না।

আহারান্তে তামাকু সেবন করিতে-করিতে ভজহরি বলিল, "আপনার সঙ্গে নূতন কুটুম্বিতা হ'চ্ছে বটে, কিন্তু এ কাজে সুখ হবে কি না সন্দেহ।" রামগতি বলিল, "কেন? হরিচরণ ত খাসা সজ্জন, আর মেয়েটিও দেখ্‌তে মন্দ নয়।" ভজহরি বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলিল, "হাঁ, একেবারে পরী!" রামগতি গম্ভীর হইয়া বলিল, "পরীতে দরকারই বা কি? গেরস্তর ঘি-বৌ সাদামাটা গড়নই ভাল। কানা-খোঁড়া না হলেই হ'ল।" ভজহরি বলিল, "পুরো না হোক, আধা-আধি বটে ; আর—" রামগতি বলিল, "আধা-আধি কি রকম?" ভজহরি বলিল, "রাত-কানা, আর ঠগ্।" রামগতি বলিল, "বলেন কি? সে যে বড় মুস্কিলের কথা!" ভজহরি বলিল, "বলব কি মশায় ; ঐ হরিচরণটার তিন পুরুষ ধরে রাতকানা। পাছে বলেন, 'পাল মশায়, আপনি থাকৃতে এ রকম অন্যায় কাজটা হলো!' তাই সময় থাকৃতে সতর্ক করচি।"

রামগতি কিছু দ্বিধায় পড়িল। ভজহরি হরিচরণের পরমাত্মীয় হইয়া একটা মিথ্যা কথা বলিয়া বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিবে, ইহা সে সম্ভব মনে করিতে পারিল না ; অথচ সত্য হইলেও ত এ বিবাহ দেওয়া চলে না।

রামগতি গোপনে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিল, ভজহরির কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। হরিচরণের সহিত ভজহরির শত্রুতা আছে, তাহাও সে জানিতে পারিল। সুতরাং বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

(৫)

রামগতি প্রামাণিক বিবাহের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে দশখানি গরুর গাড়ীতে ত্রিশজন বরযাত্রী ও একখানি ভাঙ্গা পাল্কীতে বর লইয়া নিত্যানন্দপুরে উপস্থিত হইল। বাচামারির জমিদার গাঙ্গুলী বাবুদের একটা বুড়ো বকেয়া হাতী ছিল। রামগতি বিবাহের গৌরব সম্পাদনের জন্য জমীদার মহাশয়কে ধরিয়া সেই হাতীটাও লইয়া আসিল।

পুরোহিত নিতাইচৈতন্য চক্রবর্ত্তী মহাশয় হস্তীপৃষ্ঠে সমাসীন হইয়া যজমান-পুত্রের বিবাহ দিতে আসিলেন।

রামপতি প্রামাণিক অত্যন্ত কৃপণ বলিয়া স্বগ্রামে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সে এই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিবাহে বাহুল্যভাও কিছুই করিল না; কিন্তু এক হাতীতেই সকল ত্রুটি ঢাকিয়া গেল! হরিচরণের কন্যার বিবাহে হাতী আসিয়াছে শুনিয়া গ্রামের ছেলে-বুড়ো সকলে হাতী দেখিতে ছুটিল। হরিচরণের স্ত্রী যামিনী সগর্ব্বে বলিল, "দিদির মেয়ের বিয়েতে বাজনা হোলে কি হবে, হাতী আসেনি ত!"—পল্লীবাসিনী রমণীগণ বলাবলি করিতে লাগিল, "ছেলেটি বেশ ভাল, বিয়েতে হাতী এনেছে; মেয়েটা যে ঘরে পড়লো, খাওয়া-পরায় কষ্ট পাবে না।"

ভজহরি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও বিবাহ বন্ধ করিতে পারিল না; তাহার উপর রামপতি হাতী লইয়া ছেলের বিবাহ দিতে আসিয়াছে, এবং সেই হাতী তাহার ঘরের পাশে দাঁড়াইয়া বটগাছের ডাল ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ করিতেছে,—ইহা দেখিয়া তাহার ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।—বিবাহের দিন প্রভাতে সে ছেঁড়া চটিজোড়াটা পায়ে দিয়া, কাঁধে একখানা ময়লা চাদর ফেলিয়া, কুটুম্বদের বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, 'আপনারা হরিচরণের বাড়ীতে কুটুম্বিতা করিতে যাইবেন না। সে কুটুম্বদের বড় অপমান করিয়াছে; বলিয়াছে, যে শালার ইচ্ছা হয় আমার বাড়ী কলার করতে আসবে; আমি কারেও খোসামোদ করে আন্‌তে যাব না! লুচি দেখ্‌লে সবাই ছুটে আসবে।" এ কথা শুনিয়া কুটুম্বরা বলিল, "এত্তা বড়ি বাৎ! নেহি জায়েঙ্গা।"

হরিচরণ কুটুম্ব মহাশয়দের যথারীতি নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। সময়াভাবে স্বয়ং নিমন্ত্রণ করিতে যাইতে পারে নাই, অন্য লোককে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাইয়াছিল। অপরাহ্নে সে শুনিতে পাইল, ভজহরি কুটুম্বদের মন বিগ্‌ড়াইয়া দিয়াছে,—একটা ছেলেও তাহার বাড়ী কলার করিতে আসিবে না! সে তখন সকল কাজ ফেলিয়া প্রত্যেক কুটুম্বের গৃহে উপস্থিত হইল, এবং সকলকেই তাহার গৃহে পদধূলি দিতে সবিনয় অনুরোধ করিল। সে কাহার সাক্ষাতে কুটুম্বদের মানহানি করিয়াছে—তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না।

ভজহরি গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কেন, তুমি আমাকে শুনিয়ে বলেছ—কোন শালার খোসামোদ করবো না। এখন কথা উল্টাও কেন?" হরিচরণ বলিল, "আমি কক্ষণ এ কথা বলিনি। তুমি গোড়াগুড়ি আমার মেয়ের বিয়েতে বাগ্‌ড়া দিচ্ছ। কেন, আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি? আমার মেয়ে রাতকানা, ঠন্দা,—এই সব মিথ্যা কথা রটিয়ে বেড়িয়েছ! তাতেও যখন বিয়ে বন্ধ করতে পারলে না, তখন কুটুম্বদের মন চটিয়ে দিবার জন্যে মিথ্যা অপবাদ রটাতে লাগ্‌লে। অথচ তোমার মেয়ের বিয়ের সময় তুমি কোথায় পালিয়ে থাকলে তার ঠিক নেই, আমি পাঁচজনের হাতে পায় ধরে সাত পাক ঘুরিয়ে দিলাম। আর তুমি আমাকে দশজনের কাছে অপ্রস্তুত করতে চেষ্টা করচো! ধর্ম্মে বরদাস্ত হবে ত?" ভজহরি হরিচরণকে মারিতে উদ্যত হইল; দুই-তিনজন প্রতিবেশী উভয়কে সরাইয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় দলপতি বৃদ্ধ বিশ্বাস মহাশয় আসিয়া হরিচরণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তোমার মেয়ের বিয়ে; কন্যাদায় বড় দায়; তোমাকে বাপু একটু নরম হতে হয়।"

হরিচরণ বলিল, "আমি ত নরম হয়েই আছি, আমার অপরাধ কি? আমাকে যা হুকুম করবেন, তাই করব।"

বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন, "ভজহরি তোমার বড় ভায়রা-ভাই; যদি সে কোন কারণে তোমার উপর রুষ্ট হয়েই থাকে, তার হাতে-পায় ধরে তাকে ঠাণ্ডা কর, আর তোমার স্ত্রীকে তার বাড়ী পাঠিয়ে দাও, সে তার দিদির হাত ধরে বাড়ী নিয়ে আসুক। এতেও যদি ভজহরি ঠাণ্ডা না হয়, তা হ'লে বুঝ্‌বো তারই দোষ; সে ক্ষেত্রে যা উচিত আমরা করবো।"

হরিচরণ তাহাই করিল। কিন্তু ভজহরির ক্রোধ দূর হইল না। যামিনীর অনুনয়-বিনয়েও কোন ফল হইল না; ভজহরি তাহার স্ত্রী বা পুত্র-কন্যাগণকে হরিচরণের বাড়ী পাঠাইল না।

কিন্তু ইহাতে বিবাহ বন্ধ হইল না। কুটুম্বগণ ভজহরির অপেক্ষা না করিয়া হরিচরণের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিল। ভজহরির বাড়ীর সম্মুখ দিয়াই হরিচরণের বাড়ী যাইবার পথ। একে-একে সকলেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছে দেখিয়া, ভজহরি সকলকে শুনাইয়া

বলিতে লাগিল, "হায় রে লুচি! লুচির লোভে সকলেই ছুটে চলেছে। এমন লোভের মুখে আগুন; আমার বাড়ীর এক ছেলেও ফলার করতে যাবে না।"

যথাসময়ে শঙ্খ বাজাইয়া ও হুলুধ্বনি দিয়া এয়োরা স্ত্রীআচার শেষ করিল। গ্রামের কয়েকজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের আহার শেষ হইলে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীরা আহারে বসিল। কুটুম্বদের মধ্যে কে-কে ফলার করিয়া ফিরিয়া যায়—দেখিবার জন্য ভজহরি একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত তাহার বাহিরের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া রহিল। শ্রাবণের আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ভজহরি আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, "বৃষ্টিটা একটু জোরে আসুক না; ফলারের দফারফা হোক।"

কিন্তু বৃষ্টি থামিয়া গেল। কুটুম্বেরা সামিয়ানার নীচে বসিয়া ফলার শেষ করিয়া উঠিল।

কুটুম্বেরা পান চিবাইতে-চিবাইতে ভজহরির ঘরের সম্মুখ দিয়া দলে-দলে গৃহে ফিরিল। কেহ বলিল, "হরিচরণের ভক্তি আছে, খাসা খাইয়েছে।"—কেহ বলিল, "গরিব হলে কি হবে? হরিচরণের মন ভারি উঁচু। ঘিটুকু ভালই পেয়েছিল, গাওয়া ঘিয়ে ভাজা তোফা গরম লুচি, ভজহরির অদেষ্টে নেই।"—এ কথা শুনিয়া আর একজন বলিল, "ভজহরির মেয়ের বিয়েতে কি ফলারই দিয়েছিল! ওমো চিঁড়ে, জলো দৈ, আর মাতগুড়।—টাকা খরচের ভয়ে মেয়ের বিয়ের সময় পালিয়ে থাকলো হে! আবার সে চায় হরিচরণকে একঘরে করতে? ভারি হিংসুটে মানুষ!"

স্বরূপ সা বলিল, "অতি অর্ব্বাচীন।—কিন্তু এবার খুব জব্দ হয়েছে।"

এই সকল আলোচনা শুনিয়া ভজহরি রাগে ফুলিতে লাগিল। হঠাৎ সে দেখিতে পাইল—দুইজন লোক সন্তর্পণে পা ফেলিয়া তাহার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেছে। ভজহরি ক্রুদ্ধ স্বরে হাঁকিল, "কে যায়?" উত্তর হইল, "আমি রামহরি।" ভজহরি বলিল, "সঙ্গে কে?" রামহরি বলিল, "পটলা।"

রামহরি ভজহরির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এবং পটলা ভজহরির জ্যেষ্ঠ পুত্র। ভজহরি বলিল, "এই ত খানিক আগেও তোরা বাড়ী ছিলি; এরই মধ্যে কোথায় গিয়েছিলি?" রামহরি নির্ব্বিকার চিত্তে বলিল, "হরিচরণের বাড়ী ফলার কর্ত্তে।" ভজহরি মুখ ভ্যাঙ্‌চাইয়া বলিল, "ফলার কর্ত্তে! বাড়ীতে গিল্‌তে পাও না?—আমার যে অপমান করে, তার বাড়ীতে পাত্‌ড়া মারতে যেতে লজ্জা হয় না? গেলি, গেলি—ছোঁড়াটাকে নিয়ে গেলি কেন? ওতে যে আমারই যাওয়া হয়েছে।"

রামহরি, বলিল, "যাব না কেন? তুমি ক্ষেপেছ বলে কি আমরাও ক্ষেপব? দশজনাকে ফেলে একঘরে হয়ে থাকবো? হরিচরণের অপরাধ কি? সে তোমার হাতে-পায়ে পর্য্যন্ত ধরেছে। তোমার মেয়ের বিয়ের সময় তুমি ত আমাকে গাছে তুলে দিয়ে মৈ নিয়ে পালালে, জাত রক্ষে হয় না; ঐ হরিচরণই কোমর বেঁধে না লাগ্‌লে কি তোমার মেয়ের বিয়ে হোত? সে তোমার জাত রক্ষে করেছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করেছে; আর তুমি তার মেয়ের বিয়ে ভাঙ্গাবার চেষ্টায় ছিলে; তার জাত মারতে গিয়েছিলে! দশ ঠাকুর ত তোমারই দোষ দিচ্ছে। তাদের কথা শুনব, না, তোমার কথা শুনব? দশজনাকে আমি ছাড়তে পারবো না। পটলা বল্লে 'কাকা, আমিও যাব।'—তাই তাকেও নিয়ে গিয়েছি।—এ জন্যে ফাঁসি দেবে না কি?"

ভজহরি বলিল, "আমার চেয়ে দশজনই তোর বেশী আপনার হলো? আমি আর তোর মুখ দর্শন কর্‌তে চাইনে। আমার সঙ্গে তোর আর একারে থাকা চল্‌বে না। আজ থেকে আমি তোর সঙ্গে পৃথক হচ্ছি। আলাদা হাঁড়ি কাড়।" রামহরি বলিল, "বেশ কথা। কিন্তু তোমার এখনও একটা মেয়ের বিয়ে দিতে বাকি আছে—তার বিয়ের সময় আবার যেন আমাকে গাছে তুলে দিয়ে মৈ নিয়ে পালিও না।"

নিমাই

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ]

শ্রাবণ মাসের শেষে
সেবার ভারি বন্যা এল দেশে।
বাগান বাড়ী ব্যারগা নদীর ধারে যাদের,
দুর্গতির আর সীমাটি নাই তাদের!
বাবুলাবোনার চরে
হালদারদের ঘরে
এমনি অভাব ঘনিয়ে এল চারিধারে—
দিন চলেনা তাদের একেবারে!
তিনটি ভায়ের বড় দুটি,
গাঁয়ের পাশেই সাহেবদের যে রেসম কুঠী—
নায়েবকে তার কেঁদে কেটে ধরে'
কোনমতে চাকরী যাহোক নিলে যোগাড় করে';
কিন্তু দেখ্‌লে, এমনি চাক্‌রী তা',
পেটে খেতে পরনে কুলোয় না!
এদিকে ত—বাসের জন্য গোটাদুয়েক ঘরও
না তুল্লে নয়, এম্‌নি গুরুতর
বাড়ীর অবস্থাটা!
জমীটা জমাটা
যা ছিল সব ভেসে গেছে বানে,
বেচে-কিনে করবে কিছু উপায় তারো নাইক কোনখানে।

নিমাই বলে' ছোট বেটি ভাই,
ঘরেই বসে' থাকে তবু বেরাল তাহার নাই
কেমন করে' ঘরের খরচ চলে!
বল্লে' শুধু বলে—
আমায় দিয়ে হবেনা ক কিছু;
কাজেই তখন কথা উঠে' পড়ে কথার পিছু;
বড় দু-ভাই একই সঙ্গে যখন উঠে হাঁকি',
গণ্ডগোলের কোন কিছুই থাকেনা আর বাকী!
মাঝে মাঝে এম্‌নি কথার জ্বালায়
বাড়ী হ'তে নিমাই সরে' পালায়,
দিনেক দুদিন কাটায় একা-একা—
এমনও যায় দেখা।
তবু কাজের কোটে
ভিড়্‌বে না সে মোটে।

বৌটি তাহার বছর দশের সবে—
নিতান্ত নীরবে
শ্বশুর-ঘরের খুঁটিনাটি খাটুনি চলে খেটে';
ছোট্ট বুকটি যায় যে তাহার ফেটে'
দিনে-দিনে মা-এর খোঁটা খেয়ে;
এদিকে এই স্বামীর দশা, ওদিকে সে কাঙাল ঘরের মেয়ে।
মস্ত বড় কলসী করে' জল আনে সে সুদূর নদী হ'তে;
কোমরটি তার ধরে' এলেও পথে
দাঁড়ায়না ক ভুলে';
ছোট্ট কোলে তুলে'
মেজ-জা-এর তিন বছরের ছেলে,
নায়েরনা ক ভয়ে তা'রে হাজার বাধা পেলে!
এত করেও তবু কারো পায়না সে যে মন,
কপালটা এমন।

নিমাই ছোক্‌রাটি
স্বভাবটা তা'র নয়ও বড় খাঁটি—
বলে' রাখি সে কথা এইখানে।
নানান রকম সখ ছিল তার প্রাণে;
সকল রকম লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা,
একটু-আধটু করতও সে নেশা।
কিন্তু তাহার মনটা ছিল ভারি সাদা;
সবাই তারে বাস্‌ত ভালো; পাড়ায় ত সে
ছোকরাদলের দাদা!

অনঙ্গলের ঘরে
কান্না-কাটি ঝগড়া ঝাঁটি চিরদিনের তরে
বন্ধ কোথায় থাকে !
তাই বলে' যে কিছু হলেই তা'কে
মনের মধ্যে পুষে' রাখ্‌তে হবে—
এমন কথা কে বলেছে কবে ?
সেদিন কিন্তু বিধির পাকে এমনি কেলেঙ্কারী
হালদারদের বাড়ী
ঘট্‌ল চোখের জলে ;
যাহার ফলে
নিমাইকে তার ছাড়্‌তে হ'ল বাড়ী—
শুধু তা নয়, কার কাছে কি কর্ম্মী পেয়ে একেবারে পাড়ি
লাগালে সে
সুদূর আসাম দেশে—
চা-বাগানের কর্ম্ম নিয়ে শেষে।
চাকরি করতে চিরকালটা আতঙ্ক যাহার,
কথখনো যে বাড়ী থেকে চায় না হ'তে বা'র—
দেশান্তরী হল সে জন, এম্‌নি নাকি ব্যাপার সেদিনকার !
যাবার সময়, এমন কি, বৌটাকে
কিছু বলে' গেলনা ক ; কোথায় বা সে থাকে !
পরের দিনই ছোট ভায়ের স্ত্রীকে
কি এক চিঠি লিখে'—
ভাসুর দুটি মিলে'
বাপের বাড়ী চালান করে দিলে।
চোখের জলের ছড়া দিতে-দিতে
বেচারীকে হ'ল বিদায় নিতে !

চাল্‌তে-তলায় থাম্‌ল এসে গাড়ী ;
সেই খানেতে বৌএর বাপের বাড়ী।
বিধবা মা তার
একা থাকে দারুণ কষ্টে ; জনপ্রাণী নাইক ঘরে আর।
সুতো কেটে' হাটে বেচে' কোনমতে পেটটি সে যে চালায়,
এমনি সময় মেয়েটি তা'র পড়ল এসে গলায় !
পেটের মেয়ে, ফেল্‌তে কি আর পারে—
চোখের জলে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল তা'রে,
কি আর করবে—চরকা কাটে ভোরের আলোয়
সাঁঝের অন্ধকারে !
নেহাৎ যেদিন পারেনা ক আর,
সেই দিনেতে যায়
কঠিন কথা মুখের আগে ফুটে—
নিধু ভাবে—কোথাও তখন পালিয়ে যায় সে ছুটে' !

তিনটি বছর চয় হ'তে, ফিরল না নিমাই—
কোথায় গেছে, কেমন আছে—কোন খবর নাই।
বাব্‌লাবোনার চরে
হালদারদের ঘরে
তেমন করে' দিন চলে' যায় দিনে-দিনে ;
সবাই আছে শুধু নিমাই বিনে।
মাঝে-মাঝে মেয়েকে তার পাঠাতে চায় মায়ে
চিঠি লিখে ধরে' হাতে-পায়ে,
কখন বা ভয় দেখিয়ে নানান্ কথা তুলে' ;
সে সব চিঠি খুলে'
পড়া হ'লেই সকল কথা শেষ ;
কে আর শোনে—তাই-ই নিরুদ্দেশ !

চাল্‌তেতলায় বাপের ঘরে
মেয়ে উঠে ডাগর হয়ে বছরে-বছরে—
মায়ের মনে ভয় জাগিয়ে তত ;
—নিধুও যেন নাই আগেকার মত !
ক্রমেই তাহার বিরল বেশবাসে
বয়স কালের রংটি ধরে' আসে ;
একটা যেন জ্বরের মতন নেশা
সকল অঙ্গে মেশা,
পথে-ঘাটে প্রচার করতে চায় সে আপনারে ;
আন্‌চানানির চমক যেন ঠিক্‌রে পড়ে আপনি চারিধারে।
একে-একে পরে-পরে
চিঠি এবং লোক পাঠিয়ে শ্বশুরঘরে
মা যে তাহার মাথার দিব্যি দিয়ে
মাথা খুঁড়ল বৌকে যেতে নিয়ে—
ভাসুররা তার দিলই না ক আমল মোটে ;

এদিক কিন্তু একটা কথা উঠ্‌ল ক্রমে রটে'
সিধুর নামে ;
সারাগ্রামে
সেই কথাটাই নিয়ে ভারি তোলাপাড়া—
সুদূর কোন্ এক জাতির সঙ্গে সৌদামিনীর
অখ্যাতির ইসারা !

একে গরীব অভিভাবকহীন,
তা'তে বছর তিন
নেয়না স্বামী ; থাকে বাপের ঘরে ;
তার উপরে বয়স মন্দ ; কথা সে ত বল্‌তে পারেই পরে !
কিম্বা হয় ত সত্যি কিছু আছে
কারণ, মায়ের কাছে
তাই নিয়ে আবার
হয়ে গেছে সেদিন নাকি অনেক শাস্তি, অনেক তিরস্কার !
চোদ্দবছর বয়স কালের চন্‌চনে সে তরুণ চঞ্চলতা—
বল্‌তে পারে কে তা'র তত্ত্বকথা !

যাহোক্ সে ত গেছেই চুকে-বুকে ;
তারো পরে বছর খানেক বয়ে গেছে নানান কষ্টে দুখে
মা ও মেয়ের মাথার উপর দিয়ে ;
তেঁতিয়ে চরকা কেটে' বেচে-কিনে' নিয়ে
চল্‌ছে চুপে চুপে
দিন ত কোনরূপে !
ক'দিন হল হালদারদের পরিবারে
হকের টাকা তুলেছে কে, এম্‌নি কথা রাষ্ট্র চারিধারে !
খবর নেবে, সঙ্গতি তার নাই ;
তিনদিন হ'তে মায়ে-ঝিয়ে ঠেকেছে যে এম্‌নি দুর্দ্দশায় !
এমন সময় একদা এক সন্ধ্যারাতে
চাল্‌তেতলায় ভাঙা দুয়ার উঠ্‌ল কেঁপে কাহার করাঘাতে !
তাড়াতাড়ি পিদিম জেলে'
বাহির হয়ে বল্লে মায়ে—এম্‌নি তুমি ছেলে !
স্বামীর কণ্ঠ হঠাৎ কানে পেয়ে
বৌএর বুক ত উঠ্‌ল কেঁপে, রোমাঞ্চ তার জাগল সারা
দেহে।
হা ভগবান ! ভাকুল বধূ—বাড়ী এলেন স্বামী—
কেমন করে' কি করে' আজ সাম্‌নে যাব আমি !
কোথায় ছিল কেমন ছিল, কথায় কথায় রাত্রি হ'ল ঢের ;
জামাই কিছু খাবেনা ক ; শশাটি তার বিছিয়ে বিশ্রামের
বাহির ঘরে ডেকে'
শাশুড়ী তার বল্লে ধীরে হাতটি মাথায় রেখে
নিমাই,
আজকে তুমি নও ক কেবল শুধু আমার জামাই,
তুমি আমার বাবা—আমার ছেলে ;
ভালো-মন্দ ভাবনা যত তোমার হাতে দিলাম
আজকে ফেলে।
একটা কথা সত্যি বল্‌ব আজ,
নাই ক আমার শঙ্কা-সরম নাই ক কোন লাজ
আজকে তোমার কাছে ;
নইলে ধর্ম্ম বিরূপ হবে পাছে।
আমার মেয়ের—তোমার বধূর সতীনামের 'পরে—
নারীর যাহা কলঙ্ক—তা' ঘটেছে বাপ একটি দিনের তরে।
বিধির লেখা কে খণ্ডাবে কোথা !
তাই তারে আজ বলে' পতিব্রতা
তোমার হাতে পারছিনা ক দিতে ;
ছাড়্‌লে তারে ছাড়তে পার, ইচ্ছা করলে পারও
টেনে নিতে।
কারণ, তাহার মনের নাই ক দোষ ;
কলঙ্ক তার দেহের মাঝে—জানিয়ে দেছে দারুণ অসন্তোষ !
যেদিন থেকে ফেলে গেছ তারে,
সেদিন থেকেই এম্‌নি পথের ধারে
ভাসিয়ে দিয়ে গেছে তোমার ভাই—
সে সব কথা চাপা কিছুই নাই।
চারিটি বছর ধরে'
যেমন করে' ভয়ে-ভয়ে মরে'
আগ্‌লে আছি মায়ে পড়ে' ;
ধর্ম্ম তাহা জানেন ভাল করে'।
তোমার জিনিষ আজকে তোমায় দিলাম ফিরে' ;
যা হয় করো তোমার বধূটিরে।
কোন খেদ আর নাই আজ আমার মনে ;
এর পরেতে বাঁচি-মরি—খালাস তবু হ'লাম এ জীবনে।
কথা শুনে' ভাঙা-গলায় নিমাই বল্লে মা'—
তোমার মত মায়ের মেয়ে কলঙ্কিনী হতেই পারে না !

আজকে তুমি দাঁড়িয়ে নিজের গ্রামে
যে কথাটি বল্লে মুখে পেটের মেয়ের নামে—
সত্য কথার সেই সাহসের যদি একটি কণা
মেয়ে তোমার পায় যদি মা, গুণের তাহার মিল্‌বেনা তুলনা!
তোমার আশীষ সাথে
নূতন করে' দান কর তা'র আজকে আমার হাতে।
দোষ যদি তার ঘটেও থাকে ভুলে',
তোমার মত সতী-হাতের দান বলে' আজ মাথায়
নিলাম তুলে'।

এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘরে
কিসের ভারি শব্দ হল কি যেন বা পড়ল ভুঁয়ের পরে!

তাড়াতাড়ি ছুটে' গিয়ে দু'জনাতে—
দেখ্‌লে চেয়ে, সৌদামিনী অসাড় হয়ে লুটায় ধূলার সাথে!

রুদ্ধকণ্ঠে বল্লে নিমাই—কালই আমি বাড়ী ফিরব তোরে,
বৌকে আমি নিয়েই যাব, তারই কোলাড় দাও মা
আমার করে'।

বিবিধ প্রসঙ্গ

রস-সাগর

স্বর্গীয় কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী

[কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভট-সাগর বি-এ]

(পূর্ব্ব দুইবার প্রকাশের পর)

(৬)

একবার মহারাজ শিরীষ-চন্দ্রের সভায় সমস্যা উঠিল :—"পদ্মে পদ্ম ফুটে,—ইহা অসম্ভব নয়!" রস-সাগর অবিলম্বেই ইহা এইরূপে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"পদ্মে পদ্ম ফুটে,—ইহা অসম্ভব নয়!"

রণ-রঙ্গে মত্ত কালী দানব-সমরে,
পদভরে ধরাতল টল্‌মল্ করে।
সর্ব্বনাশ হ'লো আজ,—ভাবিয়া শঙ্কর
শব-রূপে নিপতিত পৃথিবী উপর।
ব্যাকুলা হইয়া কালী হরহৃদি উঠে,
হৃৎপদ্মে পাদপদ্ম অপরূপ ফুটে।
এ রস-সাগর কহে হইয়া তন্ময়,—
'পদ্মে পদ্ম ফুটে,—ইহা অসম্ভব নয়!'

(৭)

জীবনের শেষ দশায় মহারাজ শিরীষ-চন্দ্রের শরীর নিতান্ত জীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। তিনি একদিন দুঃখ করিয়া রস-সাগরকে বলিলেন :—"নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন্ কি ঘটে!" রস-সাগর এই সমস্যাটি শুনিবামাত্র তখনই ইহা পূরণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন্ কি ঘটে!"

এই দেহ খানি তব পরম সুন্দর,
ব্যাধির মন্দির কিন্তু জেনো ওহে নর!
যে ব্যাধি অসাধ্য, তাহা কার সাধ্য সারে,
বিধাতার কাছে বৈদ্য কি করিতে পারে?
এ দেহ পিঞ্জর! তাহে রহে নব-দ্বার,
প্রাণ-পক্ষী তার মধ্যে করিছে বিহার!
কখন্ সুবিধা পেয়ে কোন্ দ্বার দিয়া
পলাইয়া যাবে,—তাহা না পারে ভাবিয়া।
ওরে মন! কবে যম লবে তুটে পুটে,
'নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন্ কি ঘটে!'

(৮)

একদিন মহারাজ শিরীষ-চন্দ্র, রস-সাগর ও আর কয়েকটী ভদ্র-লোককে লইয়া প্রাক্তন কর্ম্মের ফল সম্বন্ধে কথা কহিতে ছিলেন। তখন কোনও ভদ্রলোক রস-সাগরকে কহিলেন "রস-সাগর মহাশয়! আপনি ভাগ্যবান্ লোকের আশ্রয়ে আছেন; অতএব আপনিও ভাগ্যবান্ পুরুষ।" ইহা শুনিবামাত্র রস-সাগর কহিলেন, "যা আছে অদৃষ্টে যার, তাই ঘটে তার।" তখন মহারাজ কহিলেন, "আপনার এই সমস্যাটি আপনাকেই পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে।" রস-সাগর প্রকারান্তরে আপনাকেই লক্ষ্য করিয়া এই সমস্যাটি এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"যা আছে অদৃষ্টে যার, তাই ঘটে তার!"

গমন করেন ব্রহ্মা হংসের উপরে,
হংস কিন্তু চিরদিন কাদা খেঁটে মরে।

গরুড় বিহনে লঙ্কে যুঝে রামগণ,
কিন্তু গরুড়ের ভাগ্যে সর্পই কেবল।
চড়েন বৃষের কান্ধে শিব যাযাবর,
বৃষের অদৃষ্টে কিন্তু একমাত্র ঘাস।
যে কেহই মহতের লউক আশ্রয়,
প্রাক্তন কর্ম্মের ফল ঘুচিবার নয়।
এ রস-সাগর তাই বুঝিয়াছে সার,—
'যা আছে অদৃষ্টে যার, তাই ঘটে তার!'

(৯)

নবদ্বীপ-নিবাসী কোন এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয় কৃষ্ণনগরে মহারাজ শিরীশ-চন্দ্রের সহিত দেখা করিতে গিয়া রস-সাগরকে এই সমস্যাটি পূর্ণ করিতে বলিয়াছিলেন:—"পবনের আয়োজন পবনের ঘরে!" রস-সাগরও হাসিতে হাসিতে ইহা পূরণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"পবনের আয়োজন পবনের ঘরে!"

শুন রে অবোধ মন! করি নিবেদন,—
দিন দিন এ দেহের হ'তেছে পতন।
করেতে লাঠির ছড়ি ঠাঁলিতে লাগিল,
দন্তগুলি একে একে খসিয়া পড়িল।
মস্তক-উপরে দেখা দিল পক্ক কেশ,
বুঝা গেল হইতেছে জীবনের শেষ।
জরা এ'ল, দেখা গেল মৃত্যুর প্রকাশ,
আর কেন ওরে মন! বাড়াও জঞ্জাল!
মুদিলে নয়ন দুটী খুলিবে না আর,
বারেক শুইলে হায় উঠে বসা ভার।
কলসীর জলটুকু গড়াতে গড়াতে
ক্রমশই ক্ষয় হয়,—না পায় বাড়িতে।
কিবা ভ্রাতা, পুত্র, কন্যা, অন্য পরিবার,
কেবা তুমি, কেবা আমি,—ভাব একবার।
ব্রহ্মপদ নিরাপদ,—সংসার সাপদ,
আর কেন পদে পদে বাড়াও বিপদ?
কেন বা বিলম্ব আর কর এ সময়,
এখনই ব্রহ্মপদে লও রে আশ্রয়।
প্রস্তুত হও রে মন! যাইবার তরে,
'পবনের আয়োজন পবনের ঘরে!'

(১০)

একদিন মহারাজ শিরীশ-চন্দ্র তাঁহার ভৃত্যকে কহিলেন, "আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বৈঠকখানা সাফ্ করিয়া রাখিস্।" ভৃত্য তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া অলস-ভাবে এদিক্ সেদিক্ যাইয়া সময় নষ্ট করিতে লাগিল। মহারাজ তাহার অবাধ্যতা দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, "হেলা ক'রে বেলা টুকু কাটায়ো না আর!" এবং হাসিতে হাসিতে রস-সাগরের দিকে চাহিয়া এই সমস্যাটী পূরণ করিতে বলিলেন। তখন রস-সাগর এইভাবে ইহা পূরণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"হেলা ক'রে বেলা টুকু কাটায়ো না আর!"

নিবেদন করি আমি, শুন ওহে নর!
জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে তব কলেবর।
তুমি কার, কে তোমার, এ'লে কোথা হ'তে,
কোথায় যাইবে তুমি,—বুঝ বিধিমতে।
কে তোমার ভার বহে, তুমি বহ কার,
আমার আমার বুলি ভুল একবার।
দারা সুত কন্যা আর অন্য পরিজন,—
এ'রা কেবা না করিলে যাবেক স্মরণ!
নিজেই নিজের পথ ক'রে দিলে রোধ,
অন্ধাবধি না হইল তব আত্মবোধ।
তিন গাছি সূত্র দিয়া আপনার গলে,
'ব্রাহ্মণ' বলিয়া গর্ব্বে উঠ তুমি ফুলে।
এই তিন গাছি সূত্র করিয়া গ্রহণ
বন্ধন করিতে চাও এই ত্রিভুবন!
এ ভব-সাগরে নিত্যে না পাও নিস্তার,
অপরে করিতে যাও কিন্তু তাহা পার!
বারেন্দ্র-সন্তান আমি,—রাঢ়ী বৈদিকেরে
আমার অপেক্ষা লঘু বলি গর্ব্ব-ভরে!
তুমি আমি, আমি তুমি,—ভেদ কেন ভাই!
তুমি আমি এক হ'লে চিন্তা আর নাই।
রেখে যাও ব্রহ্মপদে মন অনিবার,
'হেলা ক'রে বেলা টুকু কাটায়ো না আর!' (ক)

(১১)

কলিকাতার অন্তর্গত শিবতলা-নিবাসী লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস একজন প্রসিদ্ধ 'কবি-ওয়ালা' ছিলেন। তাঁহার একটী চক্ষু ছিল না বলিয়া সাধারণ লোকে তাঁহাকে 'কাণা কবি' বলিয়া ডাকিত। তিনি প্রায় প্রত্যেক বৎসরেই কৃষ্ণনগরে বারোয়ারী-তলায় কবি-গান করিতে যাইতেন, এবং বাড়ীতে আসিবার সময় মহারাজ শিরীশ-চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আসিতেন। মহারাজের সভায় রস-সাগরের সহিত দেখা হইলেই বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার সহিত বাগ্ যুদ্ধ করিতেন। লক্ষ্মীকান্ত কহিলেন "মহারাজ! এইবারে আরও ভাল গায়ক ও বাঁধনদার আনিয়া আমার কবির দল পরিপুষ্ট করিব। রস-সাগর নিকটে বসিয়া এই সব কথা শুনিতেছিলেন। তিনি কহিলেন, "যেমিতে যেমিতে তোর জীবনের ভোর।" তখন শিরীশচন্দ্র রস-

(ক) কবিবর স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও এইভাবে একটী কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষ

"কার পথ চাহি, এ জনম বাহি
কার দরশন যাচি রে" —(রবীন্দ্রনাথ)

শিল্পী—শ্রীঅনিলকুমার সরকাধিকারী

Emerald Printing Works
CALCUTTA

সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে বলায় তিনি ইহা লক্ষ্মীকান্তের সম্মুখেই পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা :—"দেখিতে দেখিতে তোর জীবনের ভোর!"

(লক্ষ্মীকান্ত কবি-ওয়ালার প্রতি রস-সাগরের উক্তি)

মল-মূত্র-ত্যাগে প্রাতঃকাল নষ্ট হয়,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নষ্ট মধ্যাহ্ন সময়।
নিদ্রা গল্প মৃত্যু গীত ভ্রমণ করিতে
সন্ধ্যাকাল কেটে যায় দেখিতে দেখিতে।
নিদ্রা গিয়া কিংবা আর বিহার করিয়া
রাত্রিকাল নষ্ট হয়,—দেখ রে ভাবিয়া।
কবির লড়াতে তোর বড়ই উল্লাস,
বিবাদে বিবাদ নাই,—শোন্ রে বিশ্বাস!
যার কাল কণ্ঠ-রোধ করিবে যখন
তার প্রতীকার তুই কর্ রে এখন।
দলাদলি গালাগালি আছে তোর জানা,
উপদেশ দিই তোরে,—শোন্ মন্ত্র কাণা।
শ্যামা মার পদে মন করিয়া অর্পণ
মনের মলিনা যত কর্ প্রক্ষালন।
বিফলে সময় গেল, কি হইবে তোর,
'দেখিতে দেখিতে তোর জীবনের ভোর।'

(১২)

মহারাজ শিরীশ-চন্দ্রের কোনও বৈবাহিক সভায় বসিয়া মহারাজের সহিত রসালাপ করিতেছিলেন। রস-সাগরও সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত থাকায় মহারাজ হাসিতে হাসিতে রস-সাগরকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "যত কিছু দোষ দেখি মানুষের বেলা!" রস-সাগর মহারাজের প্রাণের কথা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"যত কিছু দোষ দেখি মানুষের বেলা!"

লক্ষ্মীরে রাখেন ব্রহ্মা বুকের ভিতরে,
লক্ষ্মীরে রাখেন বিষ্ণু বক্ষের উপরে।
দুর্গারে রাখেন শিব বামাঙ্গে ধরিয়া,
মদনের শক্তি কত,—দেখ না বুঝিয়া!
দেবতার যত কিছু সব লীলা-খেলা,
'যত কিছু দোষ দেখি মানুষের বেলা!'

(১৩)

একদিন মহারাজ শিরীশচন্দ্র রস-সাগরকে এই ঘটনা সমস্যাটী পূর্ণ করিতে বলেন :—"সূর্য্যসম পত্নিনীর শত্রু কেহ নাই!" রস-সাগরের কবিত্ব-শক্তি অগাধ। তিনি এইভাবে ইহা তৎক্ষণাৎ পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"সূর্য্যসম পত্নিনীর শত্রু কেহ নাই!"

(পত্নিনীর আক্ষেপোক্তি)

আমার জীবন-রূপ জীবন নাশিতে
আকাশেতে উঠে সূর্য্য হাসিতে হাসিতে।
সহস্র-করের করে বাঁধিয়া বেড়াই
চারিদিকে ধরগুলি দিই ছড়াইয়া।
হাড়ে মাসে জ্বালাইয়া মোরে সারাদিন
সূর্য্য চলে যায়,—আমি হ'য়ে পড়ি ক্ষীণ।
নয়ন মুদিয়া তাই বসিয়া বিরলে
বিশ্রাম করিয়া থাকি সন্ধ্যাকাল হ'লে।
এ রস-সাগর আজ বলিতেছে তাই,—
'সূর্য্যসম পত্নিনীর শত্রু কেহ নাই।'

(১৪)

একদিন মহারাজ শিরীশ-চন্দ্র কহিলেন "রস-সাগর মহাশয়! কিরূপ লোক কবিতা ভাল বাসে?" তখন রস-সাগর কহিলেন, "যে ব্যক্তি পণ্ডিত অথচ রসিক, তিনিই কবিতা ভাল বাসেন। অন্যে ইহা ভাল বাসে না।" ইহা শুনিয়াই মহারাজ এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে বলিলেন :—"সুরসিক সুপণ্ডিত মজে কবিতায়!" রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"সুরসিক সুপণ্ডিত মজে কবিতায়!"

কবিতায় রস-পান করে যেই জন,
শোক দুঃখ যত তার করে পলায়ন।
পণ্ডিত না মজে যদি কবিতার রসে,
প্রেমিক রসিক বলি' কে তারে সম্ভাষে?
অতি পুরাতন এই সৃষ্টি-বিধাতার,
কবি কত নব সৃষ্টি করে অনিবার।
থাকে হয় রস-সৃষ্টি বিধির বিধান,
কবির কাব্যেতে নয় রস বিদ্যমান।
যেই কবিতায় মন নাহি মজে যার,
সে জন অরণ্যে গিয়া করুক বিহার,—
তখন করুক তথা বিদ্যা ঘাস পাতা,
পশু সনে সেই জন করুক মিত্রতা।
অরসিক মূর্খ জন কবিতা না চায়,
'সুরসিক সুপণ্ডিত মজে কবিতায়!'

(১৫)

মহারাজ শিরীশ-চন্দ্রের সভায় একজন 'খোসামোদে' ছিল। সে ব্যক্তি এত 'খোসামোদ' করিতে পটু ছিল যে, মহারাজ তাহার মুখে "জল উঁচু, জল নীচু" শুনিয়া হাস্য ও পরিহাস করিবার জন্যই তাহাকে বেতন ভোগী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই খোসামোদে রস-সাগরের প্রতি বিষম বিদ্বেষ প্রকাশ করিত। একদিন এই ব্যক্তি সভায় বসিয়া অসঙ্গত খোসামোদ আরম্ভ করিলে মহারাজ হাসিতে হাসিতে রস-সাগরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন :—"এ সংসারে খোসামুদে

বিসর্গের মত !" রস সাগরও প্রায় খুলিয়া সমস্যাটী তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"এ সংসারে খোষামুদে বিসর্গের মত !"

যে ঘর আশ্রয় করে বিসর্গ যখন,
সে ঘরের মত তার হয় উচ্চারণ।
বড় লোক ভাল মন্দ যাহা কিছু বলে,
খোষামুদে সে কথায় 'সাই' দিয়া চলে !
বড় দুঃখে বলে তাই এ রস-সাগর,—
বড় লোক যত দেখ, সকলেই খর।
খোষামুদে ব্যাটাদের গুণ কব কত,
'এ সংসারে খোষামুদে বিসর্গের মত !'

(১১)

নবদ্বীপ-নিবাসী কোনও এক পৌরাণিক পণ্ডিত কৃষ্ণনগর-রাজসভায় গিয়া রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দেন, "পুণ্যময় রাম-নাম বিচিত্র ব্যাপার।" রস সাগরও তৎক্ষণাৎ ইহা ভক্তিভাবে পূর্ণ করিয়া সভায় সকল লোককেই স্তম্ভিত করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"পুণ্যময় রাম নাম বিচিত্র ব্যাপার।"

'রা' অক্ষর উচ্চারিলে যাইবে মুখটী খুলে
হৃদয়ে সঞ্চিত পাপ পলাবে সত্বর।
পাছে তাহা পুনরায় হৃদয়ে আসিতে চায়
এই ভয় হয় যদি, রে অবোধ নর !
তৎপর হইয়া তবে 'ম' অক্ষর উচ্চারিবে
অমনি মুদিয়ে যাবে মুখটী তোমার।
হেন নাম লও মুখে সবাই থাকিবে সুখে
'পুণ্যময় রাম-নাম বিচিত্র ব্যাপার।'

(১২)

একদা নবদ্বীপ-নিবাসী একটী পণ্ডিত রাজ সভায় গিয়া রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন :—"নাহি লয় কড়ি।" রস সাগর, পণ্ডিত মহাশয়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সমস্যাটী এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"নাহি লয় কড়ি।"

(যখন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে লইয়া মিথিলা-গমন-কালে বিশ্বামিত্র নদী-পারে যাইতে ছিলেন, তখন পারের মূল্য দিবার নিমিত্ত রামচন্দ্র অর্থাভাবে ইতস্ততঃ করায় তাঁহার প্রতি মাঝির বিদ্রূপোক্তি)

এ ভব-সাগর সদা পার কর তুমি,
এই ক্ষুদ্র নদী হায় পার করি আমি।
দু-জনাই এক ব্যবসা ক'রে কর্ম্ম খাই,
তবে কেন দাম লব,—কহ মোরে ভাই !
তখনই কাণাইয়া নাপিতের বাড়ি
অপর নাপিত হায় 'নাহি লয় কড়ি।' (ক)

(১৩)

একদা রাজ-সভায় সমস্যা উঠিল :—"যখন যেমন হায় তখন তেমন !" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"যখন যেমন হায় তখন তেমন !"

অনন্ত-শয্যায় যিনি করেন শয়ন,
কমলা করেন যাঁর চরণ-সেবন,
গোপ-রমণীর পদ ধরি' সেই হরি
সমাদরে রাখিলেন মাথার উপরি।
একদিন যিনি বস্ত্র করিয়া অর্পণ
করিলেন দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ,
সেই হরি গোপিকার বস্ত্র চুরি করি'
লুকাইয়া রক্ষা পান বৃক্ষের উপরি।
এ রস সাগর তাই বুঝেছে এখন,—
'যখন যেমন হায় তখন তেমন !'

(১৪)

শান্তিপুরে কোন এক ব্রাহ্মণের বাটীতে রস সাগর নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। গৃহস্বামী রস-সাগরকে বলিলেন, "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ; যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, কৃপা করিয়া তাহাই সেবা করুন।" তখন রস সাগর হাসিতে হাসিতে কহিলেন "ব্রাহ্মণের প্রতি চিরকালই লক্ষ্মীর বিষদৃষ্টি।" গৃহস্বামী কহিলেন "ব্রাহ্মণের বাড়ী বাড়ি করি পলায়ন !" রস-সাগরও তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সমস্যাটী পূরণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"ব্রাহ্মণের বাড়ী বাড়ি করি পলায়ন !"

(নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মীর আক্ষেপোক্তি)

পিতা মোর রত্নাকর পিতা মোর রত্নাকর
অসহ্য পূরিল তাঁরে পেটের ভিতর।
তুমি পতি চির সাথি তুমি পতি চির সাথি
ভৃগু-মুনি বুকে তব মেরে দিল লাথি।
মোর ভারতী সতীন মোর ভারতী সতীন
ব্রাহ্মণেরা তার গুণ গায় প্রতিদিন।
পূজিবারে উমাপতি পূজিবারে উমাপতি
পশুবন ছিঁড়ি' মোর বাড়ায় দুর্গতি।
মনে কষ্ট অহর্নিশ মনে কষ্ট অহর্নিশ
ব্রাহ্মণ সকল মোর দু-চক্ষের বিষ।

(ক) মৎ প্রণীত "উদ্ভট-সাগর"-নামক সংস্কৃত গ্রন্থে নিম্ন লিখিত উদ্ভট-শ্লোকে এই ভাবটী দেখিতে পাওয়া যায় :—

"নাপিতস্যোপিতো নাম তারকাদপি তারকঃ।
কর্ণমূলাং ন মৃত্যুর্যস্য স ধন্যঃ সমাকৃতঃ।"

তাই ওহে নারায়ণ তাই ওহে নারায়ণ
'ব্রাহ্মণের বাড়ী নাহি করি পদার্পণ'। (ক)

(২০)

শান্তিপুর-নিবাসী কোন এক গোস্বামী মহাশয় একদা রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূরণ করিতে দেন। "বাহিরে সরল কিন্তু ভিতরে গরল।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ তাহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"বাহিরে সরল, কিন্তু ভিতরে গরল!"

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকার উক্তি)

ওন প্রাণের কানাই ওন প্রাণের কানাই
শ্যামচাঁদে কহিছেন রসময়ী রাই।
বনমাঝে বাঁকার হাট বনমাঝে বাঁকার হাট
কত রঙ্গ কর হরি! একি তব ঠাট!
ললাটে অলকা-চয় ললাটে অলকা-চয়
বাঁকা-ভাবে আঁকা তব ওহে রসময়!
চরণে নূপুর বাজে চরণে নূপুর বাজে
বাঁকা হ'য়ে ধ'রে আছ চরণ সরোজে!
শিখি-পুচ্ছ কি সুন্দর শিখি পুচ্ছ কি সুন্দর
তাও হরি! বাঁকা করি' রয় নিরন্তর!
বাঁকা আঁখি, বাঁকা ঠাম বাঁকা আঁখি বাঁকা ঠাম
সকলি তোমার বাঁকা, ওন ওহে শ্যাম!
বাঁকা প্রাণ, বাঁকা মন বাঁকা প্রাণ, বাঁকা মন
অবলার প্রতি তব বাঁকা আচরণ!
শুধু বাঁশীটী সরল শুধু বাঁশীটী সরল
'বাহিরে সরল কিন্তু ভিতরে গরল!'

(২১)

শান্তিপুরে কোন এক ধনাঢ্য লোকের বাটীতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়দিগকে বিদায় দেওয়া হইতেছিল। রস-সাগরও সেখানে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। অন্যান্য মহাশয় তাঁহাকে কহিলেন "যদি আপনি এই সভায় বসিয়া একটী করুণ-রসাত্মক সমস্যা পূর্ণ করিতে পারেন, তাহা হইলে কৃতী মহাশয় আপনাকে ইহার জন্য ভালরূপ পৃথক্ বিদায় দিবেন।" ইহা বলিয়া অন্যান্য মহাশয় এই সমস্যাটী দিলেন :—"আত্মীয়ও পর হয় বিপৎ-সময়!" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া বিলক্ষণ বিদায় আদায় করিয়া আনিলেন।

(ক) এই কবিতার ভাব মৎ-প্রণীত "উদ্ভট-সাগর"-নামক সংস্কৃত গ্রন্থস্থ উদ্ভট-শ্লোকেও দেখিতে পাওয়া যায় :—

শীতোষ্ণসত্ত্বেন ভাতস্তন্নাশতদ্রহতো বহতোঽভেদ রোষা-
দাবাল্যাদ্ বিশ্রবর্ণৈঃ স্ববধনধিয়রে ধারিতা বৈরিণী যে।
গেহং যে ছেদয়ন্তি প্রতিদিবসমুষাকাঙ্ক্ষয়া পুত্রাঙ্কলেন
তস্মাৎ মিত্রা সদাঽহং দ্বিজগণভবনং নাথ মিত্যাঃ ত্যজামি।

সমস্যা—"আত্মীয়ও পর হয় বিপৎ-সময়!"

(রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সহিত বন গমন-কালে পথি-মধ্যে সীতার কাতরোক্তি।

পথ-কুল-বধূ আমি,—ইহাও জানিয়া
রহিছেন মোরে পথ তীক্ষ্ণ তাপ দিয়া :
পৃথিবী আমার মাতা,—হায় আজ তিনি
করিছেন কণ্টকেতে বিদ্ধ পা দুখানি!
কহিছেন মোর পতি স্বয়ং শ্রীরাম,—
"দ্রুত-বেগে চল সীতে! না করি বিশ্রাম!"
"অদূরে আশ্রম"—বলি' দেবর লক্ষ্মণ
দিতেছে আমায় মিথ্যা আশ্বাস-বচন!
এ রস-সাগর তাই মনোদুঃখে কয়,—
'আত্মীয়ও পর হয় বিপৎ-সময়!'

(২২)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র কতিপয় বন্ধু লইয়া সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় রস-সাগর গিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, "পণ্ডিতের শোভা হয় পণ্ডিত-সভায়!" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

(ক) সমস্যা—"পণ্ডিতের শোভা হয় পণ্ডিত-সভায়।"

হংস শোভা পায় পদ্ম বনের ভিতরে,
সিংহ অতি শোভা পায় পর্ব্বত-গহ্বরে।
রণ-স্থলে গিয়া অশ্ব মহাশোভা পায়,
"পণ্ডিতের শোভা হয় পণ্ডিত-সভায়!

যখন রস-সাগর এই সমস্যাটী পূরণ করিয়া দিলেন, তখন আর এক জন প্রশ্ন করিলেন, "পণ্ডিতের শোভা নাই মূর্খের সভায়।" রস-সাগরের রসের ভাণ্ডার অসীম ও অপার। তিনি তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পুনর্ব্বার পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

(খ) সমস্যা—"পণ্ডিতের শোভা নাই মূর্খের সভায়।"

সিংহের না শোভা হয় শৃগালের দলে,
হংস নাহি শোভে কাক-বলেতে মিশিলে।
গর্দ্দভের দলে অশ্ব শোভা নাহি পায়,
"পণ্ডিতের শোভা নাই মূর্খের সভায়।"

জড়ের রূপান্তর

[অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় এম-এস্ সি]

আকাশটা * যে একটা অসীম অনন্ত বিশ্বব্যাপী, কিন্তু অমূর্ত্ত নিরাকার পদার্থ, একথা কাব্যকারেরা তাঁহাদের পুঁথি পত্রে নানা-

* আকাশ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ১৩২৪ সাল পৌষ মাসের 'ভারতবর্ষে' "জড়-পরিচয়" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

ভাবে বর্ণনা করিলেও, বৈজ্ঞানিকেরা এই আকাশ জিনিসটার একটা নূতন অর্থ দিয়াছেন: সে আকাশ সীমাবদ্ধ, আর তাহার অসীমতা আমাদের মনের ভ্রান্তির পরিচায়ক। এই সীমাবদ্ধ আকাশ বৈজ্ঞানিকদের মতে ব্যাবহারিক আকাশ। তাঁহারা আর এক প্রকার আকাশের কথা বলিয়াছেন; তাহা সাধারণের কোন উপকারে লাগে না,—তাহা বাস্তবিক অসীম, অনন্ত। এই অনন্ত যোজনব্যাপী আকাশে কোন চিহ্ন নাই; এক অংশ আর এক অংশ হইতে চিনিয়া লইবার কোন উপায় নাই। এই কারণে তাঁহারা এই আকাশের স্থানে-স্থানে অন্তরীক্ষে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, মর্ত্যে বৃক্ষ-লতা, ঘর বাড়ী এবং পাতালে সোণা-লোহা প্রভৃতি নানাপ্রকার ধাতব পদার্থের কল্পনা করিয়া সেই সমাকার আকাশকে বিষমাকার করিয়া ফেলিলেন। এইরূপ ভাবে চিহ্নিত আকাশই আমাদের জড়-জগৎ। জড় জগতে জড়-বস্তুর স্থান নির্দ্দেশ করা হইল। তাহাদের রূপ এবং কার্য্য ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিকদের চোখের উপর ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এই শুভ অবসরে Newton তাঁহার mechanical scienceএর ভিত্তি পত্তন করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, আপেল ফল গাছ হইতে আপনা-আপনি বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িল, শূন্যে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ড ধরিত্রীর বক্ষে লুটাইয়া পড়িল। এই সামান্য ব্যাপারের মধ্যে যে এত বড় একটা বিজ্ঞানের বীজ লুকায়িত ছিল, Newton তাহা প্রথমে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। চিন্তা এবং গভীর পর্য্যবেক্ষণের ফলে তাঁহার জ্ঞানের চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি মানস-চক্ষে দেখিতে লাগিলেন যে, জগতের প্রত্যেক বস্তু, এমন কি, অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া চক্ষুর অগোচর ধূলিকণা পর্য্যন্ত পরস্পরকে টানিতেছে। সেই টানের বিরাম নাই। কি এক অনির্দ্দিষ্ট মহাশক্তি জগতের অন্তরে লুক্কায়িত থাকিয়া পার্থিব বস্তুর উপর তাহার লীলা প্রকাশ করিতেছে! Newton শুধু এইরূপ কল্পনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; জটিল গণিতের সাহায্যে এবং পরীক্ষার ফলে জগতকে দেখাইলেন যে এই আকর্ষণী শক্তি বস্তু সকলের মধ্যে বর্ত্তমান আছে, এবং এই আকর্ষণের ফলেই প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলা। জগৎবাসী বিস্ময়ে মুক হইয়া রহিল এবং সেই মহাপুরুষের প্রতি গভীর ভক্তিতে তাহাদের অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। প্রকৃতির চাঞ্চল্য, তাহার নিত্য-নূতন বৈচিত্র্য এই আকর্ষণের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর-ধ্বনি জল-প্রপাতের অবিরাম গুঞ্জন, সাগরের ডাক, তাহার আন্দোলন-প্রসারণ—সবই এই আকর্ষণের ফল। এই আকর্ষণী শক্তি আছে বলিয়াই প্রকৃতি এত মনোরম, এত শোভাময়ী। জড়-বস্তুর এই আকর্ষণ-শক্তির তারতম্য লক্ষ্য করিয়া Newton প্রত্যেকের জড়ত্বের একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। প্রত্যেকে নিজ-নিজ চিহ্ন ধারণ করিয়া প্রকৃতির বক্ষে চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছে, কখনও বা পরস্পরের নিকটে আসিতেছে, আবার কখনও বা দূর-সুদূরান্তে চলিয়া যাইতেছে। এখন একটা কথা উঠিতে পারে, জড়-বস্তু কি নিজের সমস্ত শরীর লইয়া চলিয়া বেড়াইতেছে, না, তাহার অভ্যন্তরস্থ অণু-পরমাণুগুলিও ছুটাছুটি করিতেছে; এই ব্যাপারটি বুঝাইবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। এইটী সম্যকরূপে না বুঝিলে জড়ের অবস্থা বুঝা কঠিন হইয়া উঠিবে। হইতে পারে, আমি ঘরের মধ্যে স্থির হইয়া বসিয়া আছি, ঘরের দেওয়ালের তুলনায় আমার কোন গতি নাই; কিন্তু বাস্তবিক কি আমি স্থিরত্বের প্রতিমূর্ত্তি? ইহা যে একেবারে অসম্ভব। আমি পৃথিবীর জীব। আমি স্থির থাকিতে পারি কতক্ষণ? না, যতক্ষণ পৃথিবী স্থির থাকিবে। কিন্তু পৃথিবী এক মুহূর্ত্ত স্থির নাই, প্রতিনিয়ত সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এই ঘূর্ণনের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। যে দিন তাহা হইবে, সে দিন জগতের লয় হইবে; বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যে একটা তুমুলকাণ্ড বাধিয়া উঠিবে। সে ভয়ের কারণ নাই, কখনও যে হইবে সে ভরসাও অল্প। পৃথিবী নিজের কার্য্য করিয়া যাইবে, সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণই যখন তাহার কাজ, তখন সে ঘুরিয়াই চলিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে। দিনের জমাট বরফ গলাইয়া জল করিয়া দিবে, লতা-পাতা, ফুল-ফলে ভূষিত হইয়া মনোরম বেশ গ্রহণ করিবে। ইহাই প্রকৃতির খেলা। এত বিচিত্রতা, এরূপ সৌন্দর্য্য, পৃথিবী না ঘুরিলে চলে না। তাই যেন সে আপন মনে ঘুরিয়া চলিতেছে। তাহা হইলে দেখা গেল, বাহ্য-দৃষ্টিতে কোন বস্তুকে স্থির দেখিলেও, পৃথিবীর তুলনায় তাহা গতিশীল। এই হিসাবে জগতের মধ্যে কোন বস্তুই স্থির থাকিতে পারে না। সকলেই অস্থির, সকলেই চঞ্চল - দুষ্ট বালকের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে।

এইখানে একটা বিষম তর্ক উঠিবে। জড়ের ধর্ম্ম স্থিরতা কি গতি বলা। বাহ্য-দৃষ্টিতে স্থিরতাকে জড়ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিলেও, সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে গতিময়তাকে প্রকৃত জড়ধর্ম্ম না বলিলে যেন কিছু বলা হইল না। গতিময়তা যদি জড়ধর্ম্ম হইল, তবে জড়-বস্তুর অভ্যন্তরস্থ অণু-পরমাণুগুলির ধর্ম্মও গতিময়তা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। কেন না, জড়ের অংশধর অণু-পরমাণুও জড়। এই হিসাবে অণু (molecule), পরমাণু (atom)গুলিকে গতিশীল না বলিলে উপায় নাই। এ শুধু কল্পনা নহে, প্রত্যক্ষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। পণ্ডিতেরা এই সকল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর কার্য্য দেখিয়া ঠিক করিয়াছেন যে, তাহারা সকলেই গতিশীল; একটী অপরকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জড়-বস্তুর অন্তর্গত molecule-গুলির মধ্যে যে অবকাশ আছে, তাহার মধ্যে তাহারা ভীষণ বেগে ছুটাছুটি করিতেছে। কখনও বা পরস্পরের নিকটে আসিতেছে, আবার কখনও বা দূরে চলিয়া যাইতেছে, আবার কখনও হয় ত প্রাণপণে আর একটী moleculeএর সংঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুতে পরিণত হইতেছে। এই পরমাণুগুলি আবার কয়েকটীতে যোড় বাঁধিয়া একটী moleculeএর সৃষ্টি করিতেছে। এই প্রকার সৃষ্টি এবং লয়ের খেলা প্রতিনিয়ত চলিতেছে। এই সৃষ্টি এবং লয়ের ফলেই জড়বস্তু রূপান্তর গ্রহণ করিয়া জগতের সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে। পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, জড়বস্তু পরমাণুর দ্বারা গঠিত; এবং এই পরমাণুগুলি জড়বস্তুর অভ্যন্তরে থাকিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাই জড়-জগতের

নৃত্য। এখন দেখা যাউক, এই যে অনন্তকালব্যাপী নৃত্য, ইহার পরিণাম কি? জড়বস্তু যখন এই অণু বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র পরমাণুর দ্বারা নির্ম্মিত, তখন এই অণুর (molecule) মধ্যেও পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বিদ্যমান আছে, যাহার ফলে একটী পরমাণু আর একটী পরমাণুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ছুটিয়া যাইতেছে। ইংরেজীতে এই আণবিক আকর্ষণকে molecular attraction বলে। এই আকর্ষণ ব্যতীত আর একটী শক্তি জড়-বস্তুর অভ্যন্তরে কাজ করিতেছে। তাহার ফলে বস্তুটী গরম হইয়া উঠিতেছে। জড়বস্তুর অভ্যন্তরস্থ এই শক্তিটীর সম্যক পরিচয় না পাইলেও, তাহার কার্য্য-কলাপের ফল লক্ষ্য করিলে, তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। গরম জলে, উত্তপ্ত লৌহশলাকায় বা মরুভূমির বালুতে এই শক্তির প্রভাব বিশেষরূপে বর্ত্তমান আছে। আবার বরফ জলে, মাটীর পুতুলে বা কাঠের খোদাইয়ে সেই শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করা কঠিন হইয়া উঠে। এখানে হয় ত অনেকে জড়ের অভ্যন্তরে এই নূতন শক্তির কথা বাতুলের প্রলাপ বলিয়া বিবেচনা করিবেন। ইহাই কি সত্য? সাধারণ ভাবে তাপের পরিমাণ না করা গেলেও বৈজ্ঞানিকেরা জীবনব্যাপী সাধনার ফলে ঠাণ্ডা বরফ হইতেও তাপের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই সব পরীক্ষা এবং সিদ্ধান্তের ফলে জড়বস্তুর অভ্যন্তরে একটী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে উপায়ান্তর নাই। তাঁহারা এই শক্তির নাম দিয়াছেন "তাপ-শক্তি"।* তাহা হইলে দেখিতেছি যে, জড়বস্তুর অভ্যন্তরে "তাপ-শক্তি" এবং আকর্ষণ শক্তি,—এই দুই জাতীয় শক্তির খেলা অনবরত চলিতেছে। তাপশক্তির ফলে একটী molecule বা atom আর একটী molecule বা atomএর নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাই অণু বা পরমাণুর বিকর্ষণ। আবার ঐ দুইটী molecule বা আণুকের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের ফলে নিকটে আসিবার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রকার টানাটানি বা ছাড়াছাড়ি ব্যাপার ক্রমাগত চলিতেছে। একটী শক্তি আর একটী শক্তিকে জয় করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। যে ক্ষেত্রে একটী আর একটীর নিকট পরাভূত হইতেছে, সেইখানেই জড়বস্তু রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। এই যে আমাদের পৃথিবী ইহা একটী প্রকাণ্ড জড়-পদার্থ। সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া ভীষণ বেগে ঘুরিতেছে। এই ঘূর্ণনের ফলে পৃথিবী সূর্য্য হইতে দূরে যাইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সূর্য্যও আবার পৃথিবীকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এই দুই প্রকার বিপরীত শক্তির সামঞ্জস্যেই পৃথিবী ধরকে থাকিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু যদি কোন অনিবার্য্য নিয়তির পরিণাম-ফলে পৃথিবী কক্ষচ্যুত হয় তাহা হইলে প্রকৃতির মধ্যে একটা বিপ্লব বাধিয়া উঠিবে, পৃথিবী সূর্য্যের দিকে ভীষণ বেগে ছুটিয়া আসিয়া তাহাতে লীন হইয়া যাইবে, পৃথিবীর মৃত্যু হইবে। এ মৃত্যু অনন্তকাল-স্থায়ী মহামৃত্যু। ইহার আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। তবে যদি কখনও প্রকৃতির কোনও মহাশক্তি এই আলোড়িত প্রকৃতিকে "সোণার কাঠি" স্পর্শ করাইয়া সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করেন, তবে আবার অন্য মানের পৃথিবী "ধন ধান্যে, পুষ্পে ভরা" হইয়া সৌরজগতে নিজের কোঠায় পৌঁছিবে।

জড় আণুকের মধ্যে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ ঠিক এই প্রকারে কাজ না করিলেও, কিয়ৎ পরিমাণে এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। এই দুই জাতীয় শক্তির সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্যের ফলেই জড় রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। কঠিন (solid) হইতে তরল (liquid) এবং তরল হইতে বাষ্পীয় (gaseous) আকার গ্রহণ করিতেছে। জল একটী জড় পদার্থ। ইহার রূপ কি? ইহা কঠিন, না তরল, না বায়বীয়? এ কথাটীর উত্তর হঠাৎ দেওয়া কঠিন। আমরা ভারতবাসী, জল বলিলেই একটা তরল পদার্থের ধারণা করিয়া থাকি। আমরা জল খাইতেছি, জল পান করিতেছি। সব সময়ে জলেই এই অবস্থার সহিত পরিচিত হইতেছি। কাজে-কাজেই জলকে আমরা তরল পদার্থ বলিতেছি। আবার উত্তর কি দক্ষিণ মেরুতে যে দ্রব্যকে জল বলা হয়, তাহা তরল নহে, একটী সাদা কঠিন পদার্থ। আবার সময়-বিশেষে স্থানে-স্থানে এই জলকে বায়বীয় আকারেও পাওয়া যায়। এ এক বিষম প্রহেলিকা। আমার আজন্ম কালের ধারণা স্থান-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। উত্তর মেরু হইতে আমাকে জল খুঁজিয়া আনিতে বলিলে, আমি যে কি করিব, তাহার স্থিরতা নাই। আমি জানি জল একটী তরল পদার্থ; কিন্তু সেখানে জল বলিয়া ত কোন তরল পদার্থ পাওয়া যায় না। অবশ্য একেবারে পাওয়া যায় না বলিলে ঠিক হইবে না। এখানে যেমন কঠিন জল 'বরফ' ফেরিওয়ালারা চারি বা পাঁচ আনা সের দরে বিক্রয় করে, সেখানে হয় ত তরল জলও বিক্রীত হইয়া থাকে। এখন দেখা যাইতেছে যে, একই জড় দ্রব্য স্থান এবং অবস্থা ভেদে বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইতেছে। কখন কঠিন, কখন তরল, আবার কখনও বায়বীয় আকার প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, জড়-বস্তুর অভ্যন্তরে জড় আণুক বা পরমাণু নাচিয়া বেড়াইতেছে। জড়-বস্তুর তিন প্রকার অবস্থাতেই এই এক প্রকার নৃত্য বর্ত্তমান। তবে যতটুকু স্থান ব্যাপিয়া নৃত্য করে, তাহা সকল অবস্থার সমান নহে। কঠিন অবস্থায় অণু-পরমাণুগুলি অল্প স্থান ব্যাপিয়া নৃত্য করে; তরল অবস্থায় স্থান কিছু বৃহৎ; আবার বায়বীয় অবস্থায় নৃত্যের স্থান সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণ এবং তাপ—এই দুই জাতীয় শক্তির সংগ্রাম ফলেই অণু-পরমাণুর নৃত্যের উৎপত্তি। জড়-বস্তুর অভ্যন্তরস্থ তাপ-শক্তির জন্য একটী অণু অপরটীর নিকট হইতে সরিয়া যাইতেছে; আবার আকর্ষণ-শক্তির ফলে তাহারা পরস্পর নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছে। কঠিন অবস্থায় তাপ-শক্তির পরিমাণ কম। কাজে-কাজেই উত্তাপ-সঞ্জাত বিকর্ষণ-

* বস্তুর অভ্যন্তরস্থ তাপ বা উত্তাপকে একটী শক্তি বলা যায় কি না তাহা ভবিষ্যতে বিচার করা যাইবে।

শক্তির পরিমাণও কম। তাহা হইলে জড়বস্তুর কঠিন অবস্থায় আকর্ষণ-শক্তি বিকর্ষণ-শক্তিকে পরাভূত করিতেছে এবং আকর্ষণ শক্তির আধিক্য হেতু তাহার প্রভাব কিছু বাকিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে অণু পরমাণুগুলি পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের ফলে একটী সঙ্কীর্ণ স্থানে নৃত্য করিতেছে। যখন তাপের তারতম্যে বিকর্ষণ শক্তির তারতম্য হইয়া থাকে, তখন তাপের পরিমাণ একটুকু বৃদ্ধি হইলে বিকর্ষণ শক্তিরও বৃদ্ধি হইবে। বস্তুর তরল অবস্থায় উত্তাপের মাত্রা কঠিন অবস্থাপেক্ষা একটু পাতলা। তরল অবস্থায় তাপের পরিমাণ যে বেশী, তাহা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে। কঠিন লোহা বা সোণায় উত্তাপ দিলে গলিয়া তরল হইয়া যায়। যে উত্তাপটুকু কঠিন স্বর্ণ বা লোহাকে তরল করিল তাহা ঐ তরল লৌহ বা স্বর্ণতে থাকিয়া যায়। এই উত্তাপের ফলে তরল অবস্থায় অণু পরমাণুর বিকর্ষণ-শক্তি বাড়িয়া যায়; এবং এরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে, বিকর্ষণের ফলে অণু-পরমাণুগুলি পরস্পর হইতে যতটুকু ছাড়াছাড়ি হয়, আবার আকর্ষণ শক্তির ফলে ঠিক ততটুকু নিকটে আসে। এই দুই শক্তির সামঞ্জস্যের ফলই পদার্থের তরলাবস্থা। এই অবস্থায় অণু-পরমাণুগুলি পরস্পরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট নয়, অথচ পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে না; এবং সেই কারণেই তরল বস্তুর এক অংশ হইতে অন্য অংশ সহজে বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায়; এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালা যায়। কিন্তু কঠিন অবস্থায় আপেক্ষিক আকর্ষণ বিকর্ষণ অপেক্ষা বেশী হওয়াতে এক অংশ অন্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে বেশ জোরের প্রয়োজন হয়। তরল অবস্থার পর বায়বীয় অবস্থা। জড়-বস্তুর এই অবস্থাকে বায়বীয় অবস্থা বলা ঠিক হইবে কি না তাহা বিচার-সাপেক্ষ। ইংরাজীতে এই অবস্থাকে gaseous অবস্থা বলে। এই বায়বীয় অবস্থায় উত্তাপের পরিমাণ তরল অবস্থা হইতেও অধিক। আমরা দেখিয়াছি যে, তরল জলে উত্তাপ দিলেই, তাহা বাষ্পীয় বা বায়বীয় আকার ধারণ করে। আবার বাষ্প হইতে উত্তাপ বাহির করিয়া লইলে, তাহা তরল জল হইয়া পড়ে। বস্তুর এই অবস্থাটী অনেকটা সাধারণ বায়ুর আকার বলিয়াই ইহাকে 'বায়বীয়' বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তরল পদার্থের উত্তাপ বেশী হইলেই বায়বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বায়বীয় অবস্থায় উত্তাপের মাত্রা যখন বেশী, তখন তাহাতে বিকর্ষণ শক্তিও বেশী। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, তরল পদার্থের আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ-শক্তি পরস্পরকে পরাভব করিতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু কেহ কাহাকেও জয় করিতে পারিতেছে না। এই দুই শক্তির সামঞ্জস্যের ফলেই জড়বস্তু তরলাকার প্রাপ্ত হইতেছে। আবার বায়বীয় অবস্থায় সর্ব্বাধিক বিকর্ষণ-শক্তির ফলে অণু পরমাণুগুলি বেগে ছুটিয়া চলিতে থাকে। আকর্ষণ-শক্তি তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। এই প্রকার অবস্থায় আকর্ষণ-শক্তি বিকর্ষণ শক্তির নিকট পরাভূত হয়। কাজেকাজেই জড়বস্তুর অভ্যন্তরস্থ অণু-পরমাণুগুলি ঘুরিতে-ঘুরিতে বিকর্ষণ শক্তির ফলে অভ্যন্তর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া অবকাশ পানে ধাবিত হয়। ইহাই বস্তুর বায়বীয় অবস্থা। এ শুধু বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন নয়, প্রত্যক্ষ এর সত্য। একটী পাত্রে তরল জল রাখিয়া দিলে জল উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়া বায়বীয় আকার ধারণ করে। অর্থাৎ পাত্রের জল উড়িয়া যায়, পাত্রটী খালি পড়িয়া থাকে। তাহা হইলে আমরা দেখিলাম, জড় বস্তুর কোন অবস্থা নিত্য নহে। স্থান কাল ভেদে কঠিন, তরল এবং বায়বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলাম যে, জড়ের অভ্যন্তরে দুইটী ভিন্ন জাতীয় শক্তির অবিরত সংগ্রাম চলিতেছে; তাহার ফলেই জড় বস্তুটী ক্রমান্বয়ে দুই-তিন প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। জড়-বস্তুর বিভিন্ন প্রকার রূপ পরিগ্রহ করার নামই তাহার রূপান্তর। এই প্রকার রূপ-পরিবর্ত্তন প্রতি-নিয়ত চলিতেছে। কখনও সাগরের জলরাশি ভরিয়া বরফ হইতেছে; আবার কখনও বাষ্পাকারে ঊর্দ্ধে উঠিয়া ঘন মেঘের সঞ্চার করিতেছে। এ পরিবর্ত্তন চিরস্থায়ী নহে, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে রূপের পরিবর্ত্তন হইতেছে। এ শুধু জড়-বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তির খেলা মাত্র। এ রূপান্তর আকস্মিক নহে। যেখানে জড়বস্তু, সেইখানেই তাহার অভ্যন্তরস্থ পরমাণুর নৃত্য এবং সেই নৃত্যের ফলেই তাহার রূপান্তর।

শৈলপথে হাতীখেদা অভিযান

[শ্রীযোগেশচন্দ্র লাহা এম-এ, বি-এল্]

সকলেই 'হাতীখেদা'র নাম শুনিয়াছেন; বোধ হয়, অনেকেই তাহা স্বচক্ষে দেখেন নাই। খেদাকাহিনী যদি কৌতূহলোদ্দীপক হইলেও, সহৃদয় ব্যক্তির নিকট তাহা অপেক্ষাকৃত লোমহর্ষণ বলিয়াই অনুমিত হয়। যাক্, সে কথা পরে বলিব।

কিছুদিন পূর্ব্বে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পটিয়া থানার অন্তঃপাতী 'বকাইরি' মৌজার পার্ব্বত্য প্রদেশে হাতীখেদার প্রায় ৪০।৫০টী হাতী অবরুদ্ধ করা হইয়াছে। চট্টগ্রামের খ্যাতনামা প্রেমী ও রসিকবর শ্রীযুক্ত নীলকৃষ্ণ—রায় মহাশয়ের সহায়তায় হাটহাজারী থানার বিখ্যাত জমাদার মুন্সী আফিজুল্লা সরকার বাহাদুরের অনুমতিক্রমে এই বিরাট খেদার আয়োজন করিয়াছিলেন। সহরের, পল্লীর অনেক লোক—বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ পর্য্যন্ত হাতীখেদা দেখিয়া আসিয়া বাহিরে নানা গল্প জুড়িয়া বেড়াইতেছিল। এই সকল কথা শুনিয়া আমারও খেদা দেখিবার সাধ হইল।

গত শনিবারের রাত্রে মঙ্গলবারে প্রাতে বেলা ৯।০ টার সময় ৮ জন সঙ্গীসহ বাড়ী হইতে হাতীখেদা অভিমুখে রওনা হই। যখন পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী হইতেছি, তখনই খেদাযাত্রীর সংখ্যা উত্তরোত্তর আমাদের বলপুষ্টি করিতেছে। আমাদের পশ্চাতে যাহারা আসিতেছে তাহারাও আমাদিগকে খেদাযাত্রী মনে করিয়া দ্রুত পদ-সঞ্চালনে

আমাদের সঙ্গ লইতেছে। অনুসন্ধানে জানিলাম, কারও বাড়ী 'শিকল ভাঙ্গা', কারও বাড়ী 'মহীক্ষ' ইত্যাদি ইত্যাদি। ত্রিশ বৎসরেরও অধিক বয়স্ক জনৈক মুসলমান আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'বাবু, হাতীর কয়টা পা'? বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তাহার বাড়ী কোথায় এবং সে কি কখনও হাতী দেখে নাই। সরল কথাবার্ত্তায় প্রতীতি হইল যে, সে বস্তুতঃই হাতী দেখে নাই—নিবাস তাহার ক্ষিয়াপচর গ্রামে। আমি বলিলাম, হাতীর সিং নাই (সঙ্গীরা সকলেই হাসিয়া উঠিল); অন্যান্য জন্তুর মতই হস্তীও চতুষ্পদ, তাহার কাণ কুলার মতন ও দাঁত দেশের সূর্য্যমেলার বড় বড় মূলার মতন। সে বলিল—তবে ত বাবু, আপনি হাতী দেখিয়াছেন; এত আয়াস স্বীকার করিয়া খেদায় চলিয়াছেন কেন? আমি বলিলাম, হাতী দেখিতে যাইতেছি না; কি উপায়ে হাতীকে খেদায় অবরুদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা দেখিবার জন্যই যাইতেছি। এরূপ নানাবিধ অবান্তর আলাপ পরিচয় করিতে-করিতে আমরা 'কড়লডেঙ্গা' নোঁয়ার পাহাড়ের সানুদেশে উপনীত হইলাম।

উপর হইতে 'ঘুর'(২) নামিয়া আসিয়াছে। সঙ্গী একজন বলিল, ইহাই হাটুভাঙ্গা 'ঢালা' যাওয়ার সড়ক এবং এ পথেই আমাদিগকে যাইতে হইবে। বাঁশ, কাঠ প্রভৃতি কাটিবার জন্য সে পূর্ব্বে বহুবার পাহাড়ে আসিয়াছে। আমি বলিলাম, তোমার জানা পথে তুমিই আমাদের অগ্রণী হও। তাহাকে সকলের পুরোবর্ত্তী করিয়া আমরা একে-একে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে সকলে পাহাড়ে আরোহণ করিলাম। ক্রমে 'ঢালা' সরু, সরুতর, সরুতম হইতে-হইতে অদৃশ্যপ্রায় হইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমাদের বামে ও ডাইনে ভীষণ জঙ্গলময় পাহাড় প্রাচীর—মাঝে সরু কাঁচা রাস্তা—পরিসর বড় জোর ১৫০ হাত—ইহাকেই নাম 'ঢালা'। এ পথে একজন একজনের পশ্চাতে আস্তে-আস্তে অতি সন্তর্পণে স্থানে-স্থানে শৈলগাত্রে হাত দিয়া চলিতে হয়। পাহাড়ের পর পাহাড়—ঢালার পর ঢালা। একবার ঊর্দ্ধে ও একবার অধঃ অবরোহণ করিতে করিতে আমরা অতি কষ্টে ঢালার কুটিল ও বন্ধুর পথে চলিয়াছি (হাঁটু ভাঙ্গা নামের যাথার্থ্যও প্রতি মুহূর্ত্তেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছি)। বীরেশ্বর পণ্ডিত মহাশয় আমার সম্মুখে—তাঁহার জন্য আমি ভাল দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহাকে বলিয়া আমি তাঁহার আগে গেলাম। অবশেষে আতপক্লান্ত,

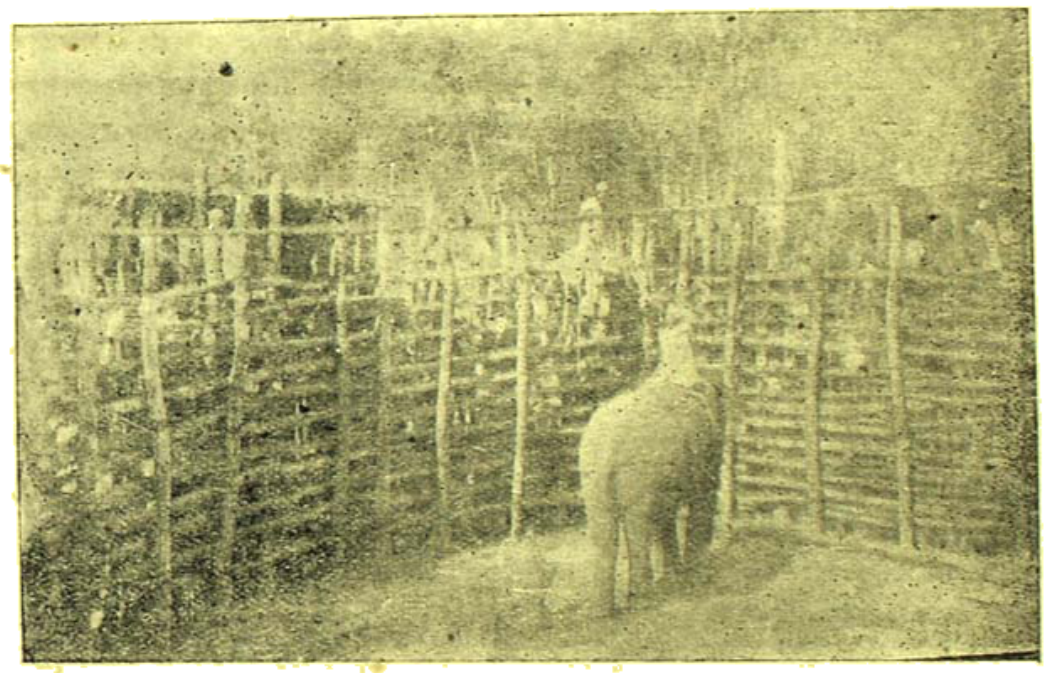

হাতীখেদার বেরা

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে)

ক্লান্ত, শ্রান্ত আমি উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শিখরে—পূর্ব্বাশার দেখিলাম, অদ্রির উপরে অদ্রি, পাহাড়ের কোলে পাহাড় বিশ্রান্ত ভাবে শায়িত হইয়া রহিয়াছে—অঙ্গে-অঙ্গে, প্রতি অঙ্গে বিচিত্র তরুলতাগুল্মময়ী প্রকৃতির বিলাসলীলা। স্থানে-স্থানে কাশ-কুসুমশয্যায় ও 'অর্জ্জুনসর' বিকশিত হইয়া যেন বনদেবীর অর্ঘ্য রচনা করিয়াছে। আর কোথাও বা উচ্চ শৈলশৃঙ্গে বিরাট বনস্পতি তাহার কম্বু সবল দেহ ঊর্দ্ধাদপি ঊর্দ্ধে উত্তোলন করতঃ তুষার-শুভ্র অভ্র পুষ্প চুম্বন করিবার প্রয়াস পাইতেছে! মনে পড়ে, বহু পূর্ব্বে ইহার খানিকটা ছবি 'ধাড়বকুণ্ডে'র পথে একবার দেখিয়াছিলাম। পণ্ডিত বন্ধু বলিলেন—আহা! যদি ইহার একটা ফটো উঠাইতে পারিতাম! পশ্চাৎ হইতে সঙ্গীরা আসিয়া বলিল, এখানে অপেক্ষা করা সমীচীন নয়, কারণ আমাদের গন্তব্যস্থান এখনও বহুদূরে।

(২) একপথে বারবার চলিতে-চলিতে পদচিহ্নের যে একটা রেখা পড়িয়া যায়, স্থানীয় গ্রাম্য ভাষায় তাহাকে 'ঘুর' কহে।

এই উর্দ্ধ হইতে এ অপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দর্শন করিবার সুখ ও সৌভাগ্য আর কবে হইবে এই মনে করিয়া আরও অল্প সময় তাহাদের কাছে চাহিয়া লইলাম। ইত্যবসরে আমাদের নেতা 'ঢালা'র কুটিল পথে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—ডাকিয়া তাহাকে থামাইবার জন্য সঙ্গীগণকে বলিলাম। সঙ্গীর শব্দ শুনিয়া প্রতিশব্দে সেও প্রত্যুত্তর জানাইল। সঙ্গী একজনকে পাঠাইয়া আমাদের না পৌঁছান পর্য্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিলাম। নিশ্চিন্ত হইয়া আরও কতক্ষণ ঐ সুষমাময় অবলোকন করতঃ আবার ঢালাপথে চলিতে আরম্ভ করিলাম। পরে ঢালা পার হইয়া সকলেই নীচে "ভাণ্ডার ঝুড়ি"(৩) ছড়ার নামিলাম।

নামিবার আগেই অগ্রণী আমাদিগকে ভক্তি সহকারে ঐ পুণ্যতোয়া ছড়াকে প্রণতি করিয়া উহার জল মাথায় দিতে বলিল এবং ভ্রমেও যেন কেহ ছড়ার শৌচকর্ম্ম না করে তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিল। হিন্দু-মুসলমান আমরা সকলেই ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া উহার জল মাথায় দিলাম। ছড়ার পরিসর ১০।১২ হাত—একটানা স্রোত—জল অতি কম হইলেও খুব পরিষ্কার—নীচে বালু বালি। ছড়ার চলিতে আমাদের পায়ের পাতাটি মাত্র সিক্ত হয়—স্থানে স্থানে বড়-জোর হাঁটু পর্য্যন্ত জল উঠে। উহা অবিরাম ঝিরঝির গতিতে পাহাড়ের ভিতর আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে দু' একটি খঞ্জন আমাদের চরণ-পতন-শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়া উড়িয়া দূরে সরিয়া যাইতেছে। এখন আমাদের একমাত্র পথ এই ছড়া। পাহাড় হইতে শাল, বাঁশ প্রভৃতি লইয়া যাহারা আসিতেছে তাহারা বলিল ছড়ার চলিতে-চলিতে আমরা খেয়ায় গিয়া উপনীত হইব। ছড়ার দু ধারে পাহাড়—পাহাড়ে নানারকমের বাঁশ, বিচিত্র বন্যলতা-কণ্টকীতরু গুল্ম-ঝোপ বনাকীর্ণ; স্থানে-স্থানে বন্য মহীরুহ।

বেশ দূর অগ্রসর হইতে-না হইতে সঙ্গী একজন উপকথার মতন একটি করুণ সত্য ঘটনার বিবৃতি করিল। সে বলিল, বড় বেশী দিন হয় নাই—লোকজন এখনও দয়ের আছে। এই 'ছড়া' দিয়া একদা প্রদোষ বেলায় জনৈক মুসলমান যুবক একাকী পাহাড় হইতে ইন্ধনভার সংগ্রহ করিয়া ধীরে-ধীরে ঘরে ফিরিতেছিল। একজন শিকারী বন্দুক হস্তে ঝোপের আড়ালে শিকারের প্রতীক্ষায় লুকায়িত ছিল। আস্তে-আস্তে পা ফেলিয়া নিরীহ যুবক একমনে একাকী গৃহ পানে চলিয়াছে। শিকারী মনে করিল, বুঝি বা কোন আরণ্য দৃপ্ত সম্ভার-সমাগমে ছড়ার নামিয়া আস্তে-আস্তে জল পান করিতেছে। লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িল—অকস্মাৎ বিজন বনভূমি বিকম্পিত করিয়া বিকট আর্ত্তনাদ ও হাহাকার! পাহাড়ের কাঠুরিয়া যে যেখায় ছিল সকলে আসিয়া তথায় মিলিত হইল; শিকারী বেচারীও কৃত কর্ম্মের অপ্রত্যাশিত নির্জ্জন জন দর্শনে অবাক ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। শুষ্ক কাষ্ঠভার জলে ভিজিতেছে—তারবাহীও জলমগ্ন হইতেছে—পদযুগলের কলকব্জা সলিল তখনও বুঝিয়া দিতে পারে নাই। সে আরও বলিল, গরীবের বাছাটি রাজকুমারের মতন সৌম্যকান্ত ও সুন্দর ছিল;—এখনও সে বাঁচিয়া আছে—কিন্তু তার যে পায়ে গুলি লাগিয়াছিল, হাসপাতালে সেই পা-টি ছিন্ন করিয়া দেওয়ায়, চিরসুন্দর চিরখঞ্জ হইয়া গিয়াছে। এবম্বিধ নানা কথাবার্ত্তা আলাপ করিয়া চলিয়াছি—হঠাৎ একজন সঙ্গী ছড়ার প্রস্তরে বালির উপর হস্তী-পদ-চিহ্নের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে-না-হইতেই দেখি, অন্য ঢালা পার হইয়া আর একদল লোক আমাদের সঙ্গে একত্র হইল। সঙ্গী একজন বলিল, আমরা ঐ ঢালায় না আসিয়া এই ঢালায় আসিলে এতক্ষণে অনেক দূর এগিয়া যাইতে পারিতাম। আমি বলিলাম, ফিরিবার সময় আমরা এই ঢালা দিয়া যাইব। নানাস্থানের লোক নানারকমের লোক বালক, যুবক, বৃদ্ধ, অন্ধ, বিজ্ঞ সকলে মিলিয়া কৌতূহলের সহিত হাতীখেদায় চলিয়াছে। যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই হস্তী-পদচিহ্ন ক্রমশঃ বেশী লক্ষ্য করিতেছি। পাহাড়ের তরু-লতা-গুল্ম দলিত-বিদলিত করিয়া হাতী সদলবলে কখন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ছড়ার মাঝে-মাঝে জলপাক থাকায়, আমাদের সময় সময় হস্তী-চলন-পথ বাহিয়াই চলিতে হইতেছে। কখন জলে, কখন স্থলে চলিতে চলিতে আমরা এখন খেদা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকারী দু'চারজন লোকের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে লাগিলাম। 'খেদা আর কত দূর' জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলে ৭ মাইল ব্যবধানে আছে।

ছড়ায় চলার একটা সুবিধা এই, আমরা বিশেষ ক্লান্তি অনুভব করিতেছি না, বরঞ্চ বালির উপর দিয়া অল্প অল্প জলে আমরা যেন আরামের সহিত চলিয়াছি। জল অতি পরিষ্কার, কাদা একেবারে নাই—স্থানে স্থানে দু' এক খণ্ড বড়-বড় প্রস্তর দেখা যায়—সময়ে-সময়ে শৈত্য মিশ্রিত, সময়ে-সময়ে ঈষৎ। প্রায়শঃ বিস্তীর্ণ ঐকতান ও কচিৎ ঘুঘুর ডাক গহন কাননের গুরুতা ভঙ্গ করিতেছে। যে ছড়া দিয়া আমরা এত সহজে আরামের সহিত চলিয়াছি, বর্ষাকালে সেই ছড়া অতি ভয়ঙ্কর হয়;—তখন উহার উদ্দাম দুর্ব্বার স্রোত পাহাড় পর্ব্বত ভাঙিয়া গাছপালা উপাড়িয়া লইয়া যায়। প্রতি বৎসর বর্ষায় এ ছড়া দু'একটা নরহত্যা করিয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী অধিবাসীরা ও যাহারা পাহাড় হইতে শণ, গাছ, বাঁশ প্রভৃতি আনিয়া থাকে, তাহারা প্রতি বৎসর ছড়াকে নানা অর্ঘ্য উপচারে পূজা করিয়া থাকে। আমরা কেবল চলিতেই আছি, কিন্তু খেদার পথ যেন ফুরায় না। প্রত্যাবর্ত্তনকারীদের মধ্যে কেহ বলে খেদা আরও ৭ মাইল, কেহ বলে ৩ মাইল, কেহ বলে ৬ মাইল, আর কেহ-কেহ বা বলে আরও ২ মাইল ব্যবধানে আছে। বুঝিলাম, ইহা ও তাহাদের মাইলের ধারণা নাই, অজ্ঞতা বা ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা কথা বলিতেছে। ক্রমে-ক্রমে দেখিলাম, জল ঘোলা ও ছড়ার স্থানে-স্থানে কাটা বাঁশ ও বাঁশপাতা প্রভৃতি স্রোতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। বোধ হইল, 'ছড়া' হইতে ফিরিবার সময় যাত্রীরা পাহাড়ের নিম্নদেশ যাহা পায় তাহাই ঘরে লইয়া গিয়াছে ও তাহার অনাবশ্যক অংশ যথা-তথা রাখিয়া গিয়াছে। আমাদের

(৩) সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার ঝুড়িয়া আছে বলিয়াই কি কেহ উহার "ভাণ্ডার ঝুড়ি" নামকরণ করিয়াছেন?

অরণী বলিয়া উঠিল, যখন জল পড়িল হইয়াছে, তখন নিশ্চিতই আমরা খেদার নিকটে আসিয়াছি—ছয়ার জল অপরিষ্কার হওয়ার অন্য কোন কারণ হইতে পারে না। আমাদের সম্মুখে আরও কয়টি জলপাক থাকায়, ছয়া ছাড়িয়া পাহাড়-গাত্রে যে 'ঘুর' আছে, তাহা বাহিয়া উপরে উঠিলাম; দেখিলাম, অনেক গাছ ও গাছের ডালপালা ছিন্ন করা হইয়াছে। আরও কিয়দ্দূর যাইতে-না-যাইতেই বৃক্ষান্তরে (৪) 'টঙ্গি' দেখিতে পাইলাম। তখনই বুঝিতে পারিলাম যে, খেদা আর বেশী দূর নহে। আরও কয়েক পা অগ্রসর হইলে বৃক্ষশিরে আর একটা 'টঙ্গি' দেখিতে পাইলাম। সম্ভবতঃ রাত্রে এ সব টঙ্গিতে বসিয়াই হস্তী-যাতায়াতের পথ স্থির করা হইয়াছিল। তার পর জলবেষ্টিত

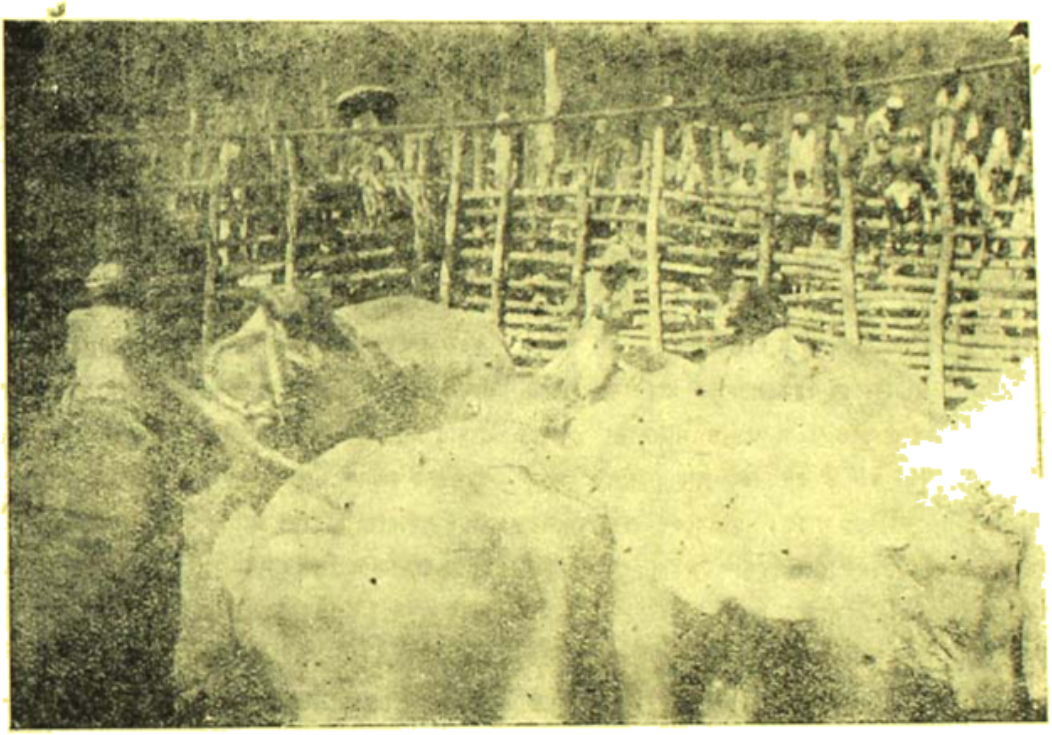

পোষা হস্তী দ্বারা বন্য হস্তী বন্ধন

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে)

খেদার প্রকাণ্ড বেড়া আমাদের সকৌতুক দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বেলা ১টার সময় হাতীখেদায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

খেদার বাহিরে দোকানপাট বসিয়াছে। মুড়ি, চিড়া, শশা, ইক্ষু, কলা, পান চুরট ইত্যাদিও তথায় বিক্রীত হইতেছে। পাহাড়ের দেশে কিছুই মিলিবে না মনে করিয়া বাড়ী হইতে সামান্য কলমূল লইয়া আসিয়াছিলাম। ৩২ বৎসর বয়স্ক মুসলমান সঙ্গীটিকে (যে জীবনে কোন দিন হাতী দেখে নাই) অঙ্গুলী সঙ্কেতে খেদার ভিতর অতিকায় কৃষ্ণ জানোয়ারগুলিকে দেখাইয়া বলিলাম, ঐ হাতী। হস্তী-সংহতি সে

খেদা ভাঙ্গিতে না পারে। এই খেদাও হাতী অনায়াসে ভাঙ্গিতে পারিত—গড়ের জন্যই হাতী খেদা ধরিতে কি ভাঙ্গিতে পারিতেছে না। গড়টা এমনভাবে তৈয়ারী যে হাতী খেদা ভাঙ্গিতে গেলে গড়ে নামিতে হয়; এবং গড়ে নামিলে হাতীর সামনের পা-নীচে থাকে ও পেছনের পা উপরে থাকে। সুতরাং হাতী খেদা ধরিবার কি ভাঙ্গিবার সুযোগ পায় না। যদিই বা কোন বড় হাতী দীর্ঘ শুঁড় দিয়া খেদা ধরিবার প্রয়াস পায়, তাহা হইলে তপ্ত লৌহশলাকা ও বাঁশের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ দ্বারা তাহাদিগকে এমনই নির্দ্দয়ভাবে আঘাত করা হয় যে, হাতীকে বাধ্য হইয়া পশ্চাৎপদ হইতে হয়। দেখিলাম, বড়-বড় হাতীর কাণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। খেদার দুটি দ্বার—একটি পূর্ব্বে, অন্যটি পশ্চিমে। উভয় দ্বার উভয় দিকে পাহাড়ের ভিতর প্রায় আধ

(৪) জন্তুকে লুকাইয়া অবস্থান করিবার জন্য ক্ষুদ্র মাচা তৈয়ারী করা হয়—তাহাকে 'টঙ্গি' বলে।

মাইল পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে—বহির্মুখে বিস্তৃত দরজা অন্তর্মুখে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া খেদায় আসিয়াছে। দরজা পথের খেরাও খেদার খেরার অনুরূপই বটে। হাতী স্বভাবতঃ দলবদ্ধ হইয়া চলে এবং যে পথে যায়, সে পথেই ফিরিয়া আসে। কিন্তু জনমানবের কোন সাড়া শব্দ পাইলে হাতী আর আসে না, অন্য পথ খোঁজে। হাতীর গন্তব্য পথেই খেদার দরজা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে বিলম্বিত হইয়াছিল এবং আজ যেখানে বারগণের interned বা অবরুদ্ধ হইয়াছে, তাহাই ছিল না কি তাহাদের গন্তব্যপথের বিশ্রাম নিকেতন—দুঃখের মুক্ত নিলয়-স্থান কিন্তু আজ তাহারা বন্ধন-কারাগার! ১৫।২০ দিন অন্তর হাতীর দল রাত্রে ওপথে যায়, আবার ১৫।২০ দিন অন্তর রাত্রে তাহারা ওপথে ফিরিয়া আসে—কোথা হইতে কোথায় যায় তাহা কেহ বলিতে পারে না। "From the great deep to the great deep they go". তাহাদের গন্তব্যস্থানের আদি ও অন্ত কোন্ দুর্গম গহন কাননে প্রবেশে তাহা খেদার লোকেরা জানিত না—বোধ হয়, পাহাড়ের অধিবাসীরাও জানে না। মধ্যপথে হাতীর দল যায় আসে মাত্র, এই খবর তাহারা পাহাড়ের জনৈক অধিবাসীর কাছে পাইয়াছিল। হাতীর দল ওপথে পূর্ব্বমুখে চলিয়া গেলে তাহারা প্রায় ৩০০।৪০০ লোক প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া ১০।১২ দিনের মধ্যে তথায় পূর্ব্বোক্ত খেদা নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিল। হাতী পূর্ব্বদিকে যাওয়ায় খেদার পশ্চিমের দরজা বন্ধ করিয়া ও পূর্ব্ব দরজা খোলা রাখিয়া খেদার লোকেরা গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। খেদার আশ্রয়স্থলীন গাছ ও ডালপালা, খেদার দরজাপথের গাছ ও ডালপালা কর্ত্তিত হয় নাই—পাহাড়ী-পথের কোন ব্যতিক্রম হইলে হাতী নাও আসিতে পারে! হস্তীযূথের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে-করিতে বিলম্বে তাহারা হতাশ হইয়া পড়িল—কি জানি কেন, এবার হাতী আর ফিরিতেছে না।

হাতী আসিতেছে না—এ পথ ছাড়িয়া অন্য পথেও চলিয়া যাইতে পারে—এই আশঙ্কায় তথাকার পার্ব্বত্য প্রদেশের খাটনাবা আদুকদার নব 'থইনচি'র সহায়তা যাচ্ঞা করিল। অর্থ পুরস্কারে লোভে সেও জমাদারের যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। উভয়ে রজনী-যোগে বৃক্ষাগ্রে 'উদ্দি'তে অবস্থান করতঃ হস্তী-চলাচল লক্ষ্য করিতে লাগিল—অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে হাতীর সন্ধান পাইল। হাতী ফিরিয়া আসিয়া রহিয়াছে—এপথে আসিতেছে না—হয় ত মানবের কোন সন্ধান পাইয়া থাকিবে। পরে তাহারা হাতীকে খেদাইয়া খেদায় আনিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল—সুদূর পশ্চাত হইতে গোলা ও বন্দুকের শব্দের আওয়াজ করাতে গজসমূহ পথ ছাড়িয়া পাহাড়ের গাছপালা জঙ্গলাদি ভাঙ্গিয়া একেবারে পশ্চিমে চলিয়া আসিল; কিন্তু কোথায় লুকাইয়া রহিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। আবার বহু অনুসন্ধানের পর 'থইনচি' টের পাইল। হাতী সদলে চিরিঙ্গার মুখে অবস্থান করিতেছে। এবার পশ্চিম দরজায় হাতীকে খেদায় আনিবার আরও বিশেষ উদ্যোগ আরম্ভ হইল। পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে হাতী চলিয়া আসায় পূর্ব্ব দরজা অবোনত হইল এবং পশ্চিম দরজা উত্তোলিত হইল। রাত্রিতে পাহাড়ের দিকে-দিকে দাবাগ্নির মতন হুতাশন প্রজ্বলিত হইল ও হাতীর দলে প্রচণ্ড গোলা নিক্ষিপ্ত হইল। এবার হাতীর দল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল—দিকে দিকে অগ্নিদৃষ্ট থাকায় যে দেখিতে পায়, সে সেদিকে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিবার প্রয়াস পাইল। বলিতে ভুলিয়াছি, আগুনকে হাতী বড় ভয় করে। আর একদল খেদার পশ্চিম-দরজা-পথে প্রবেশ করিল। ওপথে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই পথের অনতিদূরে পশ্চাতে আবার 'হু হু' করিয়া অনল জ্বলিয়া উঠিল—হাতীকে ভয় দেখাইবার জন্য পথের দুধারে বাহিরে বৃক্ষাগ্রে ও 'উদ্দি'তে খেদার লোকগণ বন্দুক, গোলা ও 'টাগ' (৩) প্রভৃতির অবিশ্রান্ত আওয়াজ করিতে লাগিল—পশ্চাতে আগুন ও বামে ডাইনে অনবরত শব্দের শব্দ—হাতীর দল ভীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পশ্চিমের খোলা দরজায় খেদায় প্রবেশ করিল। সকলে খেদায় প্রবিষ্ট হইলে পশ্চিম দরজাও বন্ধ করা হইল—এই দলে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই আবদ্ধ হইল। দরজার অব্যবহিত পরে গড় কাটা ছিল না বলিয়া, হাতী আসিয়া প্রচণ্ডবেগে দরজায় ভীষণ ধাক্কা দিতে লাগিল—কিন্তু দরজার লৌহ-কণ্টকে হতোদ্যম হইয়া তাহারা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। বিশেষ দুঃখের বিষয়, এই গোলযোগে মাতৃহারা ২।১টা শুনশুর করভ এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মাতারা স্ব স্ব শিশুর জন্য উন্মত্ত হইয়া রাত্রে বাহির হইতে খেদা ভাঙ্গিবার জন্য আসিত; কিন্তু খেদার লোকেরা খেদার চারিধারে অগ্নি-কুণ্ড স্থাপিত করায় ও বন্দুকাদির আওয়াজ করাতে ভীত হইয়া পুনঃ চলিয়া যাইত। সন্তানবাৎসল্যে রাত্রে হস্তীমাতা বারবার আসিত—একবার রাত্রে 'থইনচি' তাহার বাড়ী হইতে খেদায় আসিবার সময় পথে হাতী দ্বারা নিহত হয়। বড় একটা হাতী বারবার উপদ্রব করিতে থাকায় বন্দুকের গুলিতে তাহাকে হত করা হইয়াছে।

খেদার ভিতর যে যে বৃক্ষ ছিল, হাতী তাহাদের ডালপালা সব ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এখন তথায় দুচারটি বড় গাছ ব্যতীত কয়টা খুঁটি মাত্র অবশেষে রহিয়াছে। গাছপালা নষ্ট হওয়ায় প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে বারণগণ উত্তপ্ত হইয়া শুঁড় দিয়া খেদার ভিতর হইতে ধূলিরাশি বারবার পৃষ্ঠে দিতেছে ও মাঝে মাঝে বিকট বৃংহণ করতঃ আগন্তুকগণের মনে ভীতি উৎপাদন করিতেছে। হস্তীশিশুরা তাহাদের মাতৃবক্ষস্থলে ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছে; আর কেহ-কেহ বা বড়-বড় হাতীর ঠ্যাঙ্গার ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে। মাতৃহীন করভ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সময় সময় অন্য মাতার স্তন্যপান করিতে যায়—আহা! তখন উহারা তাহাদিগকে পদাঘাত করিয়া দূরে ফেলিয়া দেয়। সব হাতীরই মুখে কেমন একটা বিষাদ-ছায়া! অবশ্য বিপদ্যস্থলে, ক্ষুধায় চিন্তায় তাহারা যেন কাতর ও অবসন্ন হইয়া গিয়াছে। বনপতি এককোণে একাকী দণ্ডায়মান। তাহার

(৩) বাঁশের এক রকমের যন্ত্র—ঠক্ ঠক্ করে বলিয়া, সম্ভবতঃ উহাকে "টাগ" বলা হয়।

পৃষ্ঠবক্ লোম হইয়া পড়িয়াছে। তাহার নেত্র হইতে কপোল বাহিয়া অশ্রান্ত জলধারা—কর কর শুণ্ড অশ্রুর সিক্ত রেখা মুছিয়া দিতে পারে নাই। বামনেত্রে বামশুণ্ডে ধূলির আস্তরণ। উহার কর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন—ইতস্ততঃ সকালনে যেন বিজ্ঞাপন করিতেছে, কত আঘাত তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে! তাহার বয়স প্রায় পোয়াহাত দীর্ঘ এবং সে প্রায় ৭।৮ হাত উচ্চ হইবে;—আজ সে ক্ষুধাতুর হইয়া মানব পানে আর্তচক্ষে চাহিয়া আছে! অনুকম্পাবশতঃ কেহ কেহ আহার্যস্বরূপ তাহাকে দূর হইতে কাঁসপাতা দিতেছে দেখিলাম। দলে ৩।৪টা হস্তী আছে দেখা গেল। দুটী হাতীর দাঁত বড়; বাকী ৩।৪ টার দাঁত ছোট—এই সবে মাত্র দেখা দিয়াছে। এহলে আর একটু বলিয়া রাখি যে, হস্তিনীর শুণ্ড অনেকটা মানবীর স্তনেরই অনুরূপ এবং তাহারই মতন উহারা দুইটী ও উহাদের স্থান বক্ষের অগ্রভাগে; অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুর আপীনের মত বক্ষের অধোদেশে নয়।

এখন আমাদের কৌতূহল হইল, কয়টা হাতী খেদায় অবরুদ্ধ হইয়াছে তাহা গণনা করা; একসঙ্গে এত বেশী হাতী খেদায় পড়িতে পূর্ব্বে আর বড় একটা দেখা যায় নাই। অনেকবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু হাতীর দল অধিকাংশ সময়ই এমনই করিয়া ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে যে, আমাদের সব গণনাই দিগ্বিদিগ হইয়া যায়—একদিকে হাতীর দল গণিতে আরম্ভ করিলে অন্য দিক হইতে অন্যদল আসিয়া ঐ দলের সঙ্গে মিলিত হয় এবং গোলমালে সব গোলযোগ হইয়া যায়। যাহাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে ঐ একই কথা—গোলমালে গণিতে পারি না। (৭)

গজসমূহ আহারের জন্য এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে—কৌতূহলবশতঃ ২।৩ জন সাহেব কলাগাছের টুক্‌রা হাতে লইয়া দূর হইতে তাহাদিগকে দেখাইতেছে। ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হইয়া তাহারা আসে—গড়ের ভিতর-পার হইতে শুঁড় বাড়াইয়া দিয়া করপুটস্থাপিত ঐ টুক্‌রা আঁকড়িয়া ধরিবার প্রয়াস পায়—কতবারে ধরিতে চায়, কোন বার ধরিতে পারে, কোনবার ধরিতে পারে না; আর কোনবারে ধরিতে না ধরিতেই উহা গড়ে পড়িয়া যায়। প্রাণে-প্রাণে কি তাহারা বলিতেছে না—"What is sport to you is death to us." পাহাড়ের অঙ্কুরন্ত ভাণ্ডারে যাহারা যথেচ্ছ ভোজন করতঃ মনের সুখে

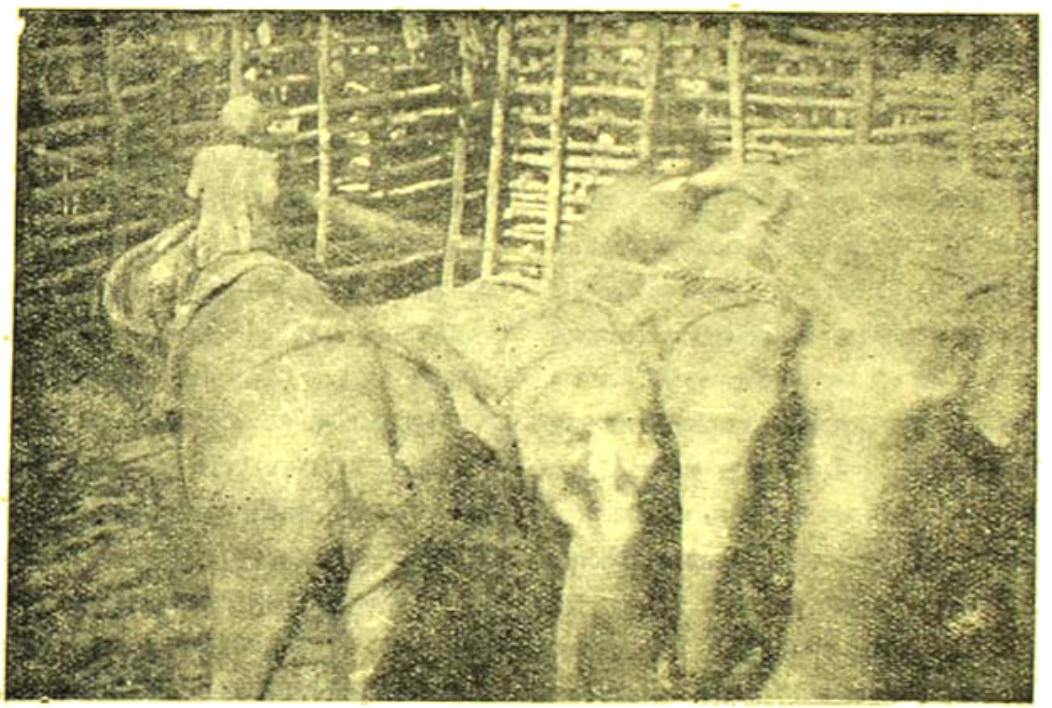

পোষা হস্তী দ্বারা বন্য হস্তী বন্ধন—খেদার অপর অংশ
(ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে)

বিচরণ করিতেছে, তাহাদের সহিত ইহাদের কি সম্বন্ধ? ইহারা কি বুঝিবে, কেন ইহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে? ইহারা কি বুঝিবে, কেন ইহাদিগকে অনশন ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত করা হয়—কেন না শক্তি থাকিতে

(৭) এখন জানিতে পারিলাম সর্ব্বশুদ্ধ মোট ৩২টা হাতী খেদায় অবরুদ্ধ হইয়াছিল।

হস্তীকে ধরা বড় শক্ত। পোষা হাতী আনিয়া যখন ইহাদিগকে একে-একে শিক্ষিতাবস্থ করিবে, তখন ইহারা হীনবল না হইয়া সবল হইলে পোষা হাতীরও প্রাণনাশ করিতে পারে।

যে উপায়ে আমরা বন্য হস্তী ধৃত হয়, তাহার বৃত্ত আরও কিছুবহুল। খেদার পশ্চিম দরজাসংলগ্ন খানিকটা খেদা ছাড়িয়া, উহার পূর্বভাগে আর একটি ছোট খেদা তৈয়ারী করা হইয়াছে—তাহার ভিতর পর্যাপ্ত পরিমাণে কলাগাছ, বাঁশপাতা প্রভৃতি রাখা হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, উপবাসে খেদার গজসমূহ একেবারে অবসন্ন হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম দরজা উদ্ঘাটিত হইলে ক্ষুধাতুর হাতী খাবার লোভে আকৃষ্ট হইয়া একে-একে (দরজার সংকীর্ণ পথে একসঙ্গে একটার বেশী আসিতে পারে না) বড় খেদা হইতে ছোট খেদায় আসে। ২।৩টি হাতী নূতন খেদায় প্রবিষ্ট হইলে, আবার ঐ দরজা বন্ধ করা হয়। তার পর ওস্তাদ মাহুতেরা পোষা হাতী ও বড়-বড় দড়ি লইয়া ঐ খেদায় ঢুকে। প্রায় ১৫।১৬টা বড়-বড় সবল পোষা হাতী বন্য গজসমূহকে বন্ধন করিবার জন্য আনা হইয়াছে। পোষা হাতী সব এমনই শিক্ষিত যে, মাহুতের ইঙ্গিতমাত্রে ৩।৪টী পোষা হাতী ধৃত বন্য গজকে খেদার কোণ-ঠাসা করিয়া রাখে। ৪।৫টি পোষা হাতী সন্তরণীর মত অল্প জলে অতিদ্রুতবেগে ফিরিয়া ধরে। তার পর একটী, বা প্রয়োজন হইলে দুইটী পোষা হাতী শুঁড় জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া বিমর্দ্দী করিয়া রাখে। আর ২টী পোষা হাতী তাহাদের পীবর নিতম্ব দরবেগে বন্যগজের অংসদেশে বামে ও দক্ষিণে জোরে ঠেলিয়া ধরে—অতিকায় পোষা হস্তীটি তাহার তীক্ষ্ণ দন্তযুগ দ্বারা বন্য গজের গলদেশ ঠেলিয়া রাখে। আতঙ্কে ও রাগে আহত গজ বিকট বৃংহণ করতঃ যেদিনী গগন কাঁপাইয়া তুলে; কিন্তু একেবারে নড়িতে পারে না। তখন মাহুতেরা নামিয়া তাহাদের ইচ্ছা-মত উহার পেছনের দুইপা ঐ দড়িতে জোরে বাঁধিয়া দেয়। গলদেশও দড়িতে সংবদ্ধ করিয়া উহার দুইপ্রান্ত দুই পোষা হাতীর কটিতে আবদ্ধ করা হয়। তার পর উহারা টানিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া যায়। স্পষ্ট হইয়া চলিতে না চাহিলে, পোষা হস্তীটি তাহার বক্ষসঙ্গে উহার পশ্চাতে আঘাত করে এবং মাহুতও তাহার নির্মম অঙ্কুশের দ্বারা উহার অসহায় বন্যকে সবেগে যথেচ্ছ প্রহার করিয়া থাকে। এমন পাষাণ-হৃদয় কেহ নাই যে, তখন বন্য জানোয়ারের কষ্ট ও মর্মভেদী চীৎকারে ব্যথিত না হয়! এমনই ভাবে শৃঙ্খলিত করিয়া তার পর তাহাকে আস্তে-আস্তে পোষ মানাইবার চেষ্টা করা হয়। শুনিয়াছি, হস্তী বড়ই ভাবপ্রবণ ও স্বাধীনতাপ্রিয় জন্তু—শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলে কোন কোন হাতী মর্মাহত হইয়া আহার্য কিছুই স্পর্শ করে না ও নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে-করিতে তাহার দুঃসহ জীবনের অবসান করিয়া দেয়।

খেদা প্রদক্ষিণ করতঃ খেদার জনৈক মুসলমানকে উহার ইতিবৃত্ত বলিতে অনুরোধ করায়, সে আমাকে যাহা বলিয়াছিল, এবং আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলাম, ও পরে যাহাতে অবগত হইয়াছি, তাহা বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

এক ঘণ্টা কাল তথায় অবস্থান করিয়া আনীত ফলমূলাদি ক্ষুন্নিবৃত্তি করতঃ বিশ্রামান্তে আমরা সকলে আবার প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলাম। যে দরা-পথে গিয়াছিলাম, সে দরা-পথেই ফিরিয়া আসিলাম—আসিবার সময় পাহাড়গাত্র হইতে কতক "কালা"র মূল লইয়া আসিলাম। আমরা ফিরিয়া আসিতেছি—তখনও লোকে খেদায় যাইতেছে। সম্ভবতঃ তাহারা তথায় রজনী অতিবাহিত করিবে।

অবশেষে দরা অতিক্রম করিয়া চালার কাছে আসিলাম। আনন্দে প্রাণটা আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম,—এবার অল্প চালা দিয়া যাইব—সকলে তাহাতে সায় দিল। অগ্রণীকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম—বহু উর্দ্ধ হইতে চালার 'ঘুর' নামিয়া আসিয়াছে। উহা বাহিয়া একে-একে উচ্চে অধিরোহণ করিলাম। সম্ভবতঃ তখন আমরা মাঠের সমতলভূমি হইতে প্রায় ২০০ হাত উর্দ্ধে উঠিয়াছি। ঐ উর্দ্ধ হইতে আবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম—সেই শৈলমেলা! সেই শৈলখেলা! সেই শৈলশোভা! উত্তরে, পূর্বে, দক্ষিণে যেদিকে চাই, নয়ন জুড়াইয়া যায়। বসন্তের রাণী সকলকেই আপনার বিলাস-হস্তে বিচিত্র বনমালাবিভূষিত করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন—দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া চিত্রপটের মতন মধু ঘন-শ্যাম-বন-সৃষ্টি তরঙ্গায়িত হইয়া রহিয়াছে—কোথাও বা তাম্রকরোজ্জ্বল বেণু-মঞ্জরী ধবল চামরের মত বায়ুন বীজন করিতেছে—আর কোথাও বা সহস্র-সহস্র 'অর্জুনশর' পুষ্প-গুচ্ছের মোহন চুম্বন সমীরে কাঁপিয়া-কাঁপিয়া দুলিতেছে—ঊর্দ্ধ দৃষ্টির এ যে ঊর্দ্ধ সৃষ্টি! নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, সুন্দর! পিপাসু লোচনের ছবি ছাড়িয়া সরিয়া আসিতে মোটেই ইচ্ছা হইতেছে না। দূরে নীচে ঘুর বহিয়া সরু জলরেখা ক্রমশঃ বিলম্বিত হইয়া চালায় আসিতেছে—আরও দূরে দরা আঁকিয়া-বাঁকিয়া পাহাড়ের ভিতর পলাইয়া গিয়াছে। কতক্ষণ ঐ ঊর্দ্ধ রাজ্যের আনন্দ হাওয়ায় অবস্থান করতঃ আবার সঙ্গী সহ চালা পথে নিম্নাভিমুখে প্রয়াণ করিলাম। তপনদেব তখন পশ্চিমে চলিয়াছেন—খর-করজালে আমাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যেন যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছেন। নীচে আসিয়া ফিরিয়া চাহিলাম, ব্যাকুল নয়নে বারবার ফিরিয়া চাহিলাম—আর সে দৃশ্যপট নাই—অধোগামী মানব সে দৃশ্য দেখিতে পায় না।

চালা পার হইয়াই তুঙ্গের পাদমূলে সমীকৃত বালুকাময় অনেক পাহাড়ভূমি। প্রায় আধক্রোশ মাইল অবতরণ করিয়া তবে আমরা বিস্তীর্ণ পল্লীর মাঠে আসিয়া পড়িলাম—দীর্ঘ ভ্রমণে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছি—এখন আবার সেই কঠিন চৈত্রমাসের মাঠের উপর দিয়া নগ্নপদে চলিতে হইতেছে। অল্প চালায় আসিতে এবার আমরা বাড়ী হইতে প্রায় ৩০ মাইল ঘুরে আসিয়া পড়িয়াছি—আমাদের ক্লেশের যেন শেষ হইতেছে না। তবে মাঝে-মাঝে পল্লী-আবাস দৃষ্টিগোচর হইতেছে এবং তথা হইতে মুহুর্মুহু কোকিলের কুহু স্বর শ্রবণে মধু বর্ষণ করিতেছে। একটা আশ্চর্যের বিষয় এই, সহস্র পাহাড়ের বিজন বিপিনে বসন্তের বিলাস-বিমুগ্ধে বসন্ত-সখার আনন্দ কলার একটিবারও শোনা যায় নাই। বুঝি বা ঋতুরাজ সহরে ঋতুরাজের আগমন চতুরস্রে

প্রচার করিবার জন্যই পল্লীর পথে-পথে আসিয়া মধুকণ্ঠে মধুর পঞ্চম তান তুলিয়া থাকে। ঐ পাখিদের পাখিকরা স্বরধারা পান করিতে-করিতে গোধূলিবেলায় মুক্ত মাঠের মুক্ত পথে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। যাতায়াতে সর্ব্বসমেত ২২ মাইলের কম হইবে না—একদিন এতদূর পথ আর কখনও পদব্রজে ভ্রমণ করি নাই।

যাত্রার পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, শৈলপথ বড় ক্লেশবহুল—যাত্রাকালে তাহার আতিশয্যও কম উপলব্ধি করি নাই। কিন্তু আজি শুধু মনে পড়ে, ঐ হাতী-ঘোড়া নয়, ঘোড়ার ভ্রমণ কাহিনী নয়, ভ্রমণের দুর্ব্বিসহ কষ্ট নয়—আজি শুধু মনে পড়ে চালার পাঁচে চালার পার্শ্বে—সেই শৈলমেলা; সেই শৈলমেলা; সেই শৈলশোভা! যে সুখের স্মৃতিতে আজিও প্রাণ পুলকিত হয়। কেন শৈলপথে গিয়াছিলাম তাহার এই কৈফিয়ৎ!

ভাব-চালনা

(Telepathy)

[শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]

আমাদের মনে যে নানা প্রকার সুখ-দুঃখ, উল্লাস-অবসাদের ভাব উদিত হইয়া থাকে, তাহা আমরা অপরের মনে চালনা করিতে পারি,—

(ক) মুখ কথা বলিয়া পারি

(খ) লিখিয়া পড়িয়া পারি, এবং

(গ) অঙ্গভঙ্গি করিয়া পারি।

মনের ভাব চালনা করিবার এই তিনটি প্রশস্ত পথ; এতদ্ভিন্ন একজনের মনের ভাব অপরের মনে চালনা করিবার অন্য পথও আছে।

আমাদের চিত্ত সর্ব্বগামী; কিন্তু এ জড়-শরীরে আবদ্ধ থাকায় তাহার চিত্তের গতি রোধ হইয়া আছে। সংযম দ্বারা এই চিত্ত যখন রুদ্ধ করিতে পারিবে, তখন চিত্তের গতি অপ্রতিহত হইয়া থাকে। এজন্য যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ নিজের মনের ভাব অনায়াসে অপরের মনে চালনা করিতে পারেন, এবং অপরের মনের ভাব মানস চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

সংযত চিত্তে ভাব চালনা করা সহজ হয়। হিপ্নটাইজ (hypnotise) করিলে যে যোগনিদ্রার আবির্ভাব হয়, সেই কৃত্রিম যোগনিদ্রায় চিত্ত অনেক পরিমাণে সংযত হয়, এবং সে অবস্থায় মনের ভাব প্রত্যক্ষ করা সহজ হইয়া দাঁড়ায়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন ব্যক্তিকে হিপ্নটাইজ করিয়া এবং তাহার চক্ষু বাঁধিয়া—

(১) কোন জীবজন্তু কি ফলফুল, লতাপাতার চিত্র বা ত্রিভুজ, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি ক্ষেত্র আঁকিয়া অনক্ষিতে নিজের সম্মুখে ধরিলে সেই কৃত্রিম যোগযুক্ত ব্যক্তি তাহা আঁকিয়া দিয়াছে।

(২) ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি কোন একটি দুইটি অক্ষর বা কোন একটী কথা লিখিয়া আপনার সম্মুখে ধরিলে, সে অক্ষরটী বা কথাটী পড়িয়া দিয়াছে।

(৩) বড় বড় অঙ্কের অঙ্ক লিখিয়া নিজের সম্মুখে ধরিলে সে সেই অঙ্কটী লিখিয়া দিয়াছে।

(৪) নিজের চক্ষের সম্মুখে লাল, কাল সবুজ, পীত প্রভৃতি যে কোন বর্ণের দ্রব্য ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে সেই বর্ণ দেখিতে পাইয়াছে।

কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন "We think in pictures." অর্থাৎ আমরা যাহা ভাবি, মানসচক্ষে তাহার ছবি দেখিতে পাই; কুকুর ভাবিলে কুকুরের ছবি,—বৃক্ষ, লতা, পাতা, ফল, ফুল, যাহাই ভাবি, তাহারই ছবি আমাদের চক্ষের সাম্নে ফুটিতে থাকে এবং হিপ্নটাইজ করিলে সেই ছবি তদ্ভাবাবিষ্ট ব্যক্তির মনে চালিত হইয়া থাকে।

রাম হরিকে হিপ্নটাইজ করিয়া মনে-মনে ভাবিল, একটী বালক খেলিবার একটী বল হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

হরিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সে কি দেখিতেছে?

উত্তর—একটী ছেলে দাঁড়াইয়া আছে।

প্রশ্ন—তাহার হাতে কি আছে?

উত্তর—তাহার হাতে গোলাকার বলের মত দেখিতেছি।

রাম আবার ভাবিলেন,—

একজন মাথায় কুড়ি করিয়া মৎস্য লইয়া যাইতেছে, হরিকে প্রশ্ন করা হইল "কি দেখিতেছ?"

উত্তর—একজন মাথায় কুড়ি লইয়া যাইতেছে।

প্রশ্ন—সেই কুড়ির মধ্যে কি আছে?

উত্তর—অনেক রকম মৎস্য দেখিতেছি।

যে ঘরে হরিকে হিপ্নটাইজ করা হইয়াছে, তাহার পার্শ্বের ঘরে নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে একটি কাঠের পুতুল ছিল; রাম সেই পুতুলটীর বিষয় চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি যাহা ভাবিতেছি, তাহা লইয়া আইস?"

আদেশমাত্র হরি সেই ঘরে প্রবেশ করতঃ কাঠের পুতুলটী আনিয়া দিল।

সেই ঘরে সেল্‌ফের উপর দেশালায়ের একটী বাক্স ছিল; রাম সেই দেশালায়ের বাক্সটীর বিষয় চিন্তা করিয়া, এবার তিনি যাহা ভাবিয়াছেন, তাহাই আনিয়া দেওয়ার জন্য আদেশ করিলে, হরি তৎক্ষণাৎ সেই বাক্সটী আনিয়া হাজির করিল।

সেই ঘরে জানালার পাশে একটী ব্যাগ ঝুলিতেছিল; রাম প্রথমতঃ সেই ব্যাগটী আনিতে বলিবে ভাবিয়া পরক্ষণেই টেবিলের উপর রাখা-করা পুস্তকরাশির মধ্যে কোন একখানি পুস্তকের বিষয় চিন্তা করতঃ বলিল, "আমি যাহা ভাবিতেছি, তাহাই আনিয়া দেও।"

হরি ঘরের মধ্যে যাইয়া টেবিলের উপরিস্থিত পুস্তকরাশির মধ্যে হইতে ঠিক সেই পুস্তকখানি বাহির করিল কিন্তু কি ভাবিয়া পুস্তক-খানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিল এবং জানালার নিকট যাইয়া

ব্যাগটী গ্রহণ করতঃ পুস্তকের টেবিলের নিকট আসিয়া পুস্তকখানি লইল এবং ব্যাগ ও পুস্তক আনিয়া উপস্থিত করিল।

Dr. Blair Thaw' experiments.

অনেক দিন হইল একজন সাধুভাবাপন্ন লোকের সহিত দেখা হইয়াছিল। একদিন প্রাতঃকালে তিনি কোন ভদ্রলোকের বাড়ীর আঙ্গিনায় বসিয়া আছেন। অনেক লোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে এবং ধর্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা হইতেছে; এমন সময় সাধু বলিলেন, "এ বাড়ীতে মা কালীর ভর হইয়াছে, আজ এইখানে তাঁহার পূজা হইবে।"

তাঁহার কথা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন? মা কালীর ভর হবে—এ কথার অর্থ কি?"

সাধু। পাড়া হইতে যে-কোন একটী বালককে ডাকিয়া আন। ব্রাহ্মণ-বালক হইলে ভাল হয়, সেই আমার কথার অর্থ বুঝাইয়া দিবে।

একজন যাইয়া ৮।৯ বৎসরের একটি ছেলেকে ডাকিয়া আনিল। তাহার নাম যাদব।

সাধু ছেলেটীকে কাছে বসাইয়া তাহার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন; অল্পক্ষণের মধ্যেই ছেলেটী চক্ষু মুদিয়া ঢুলিতে লাগিল।

সাধু তখন একটু দূরে যাইয়া পদ্মাসন করিয়া বসিলেন, নিজেও চক্ষু মুদিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সাধু মুদিতনেত্র বালকটীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাদব, কিছু দেখতে পাচ্ছ?"

যাদব। হাঁ—একজন কাঁচা হাতে করে এসে উঠান কাঁট দিচ্ছে।

সাধু। তার পর—

যাদব। "একজন জল ছিটিয়ে দিচ্ছে, একটী বউ একখানা থালা ক'রে ফুল নিয়ে এল। যাঃ! ও কি, মা কালী এসেছেন; হাতে খাঁড়া, গলায় মুণ্ডমালা,—" এই বলিয়া বালক ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

যাদবের কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই অবাক্ হইয়া গেল এবং সাধুকে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল।

"এ বাড়ীতে কালীর ভর হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া পাড়া হইতে সরলমতি, ভয়প্রকৃতি একটি বালককে ডাকিয়া আনিয়া সাধু কোন্ অলৌকিক শক্তিবলে তাহাকে কালী দেখাইলেন এবং তাহার মুখ দিয়া এই সকল কথা বলাইলেন, তখন আমরা তাহা বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু এখন মনে হয়, সাধু বালকের গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া, তাহাকে হিপ্‌নটাইজ্ করিয়া, তাহার মনে যে ভাব-চালনা করিয়াছেন, সে তাহাই দেখিয়াছে এবং তাহাই প্রকাশ করিয়াছে।

সাধুর দৃষ্টান্তে বুঝা যায়, হিপ্‌নটাইজ্ করিয়া ভাব-চালনা করিবার মিশন-পদ্ধতি আমাদের দেশেও ছিল, কালে তাহা লোপ পাইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে একজন তাহার মনের ভাব অপরের মনে চালনা করিতেছে দেখিয়া,—আমাদের দুর্ভাগ্য—নিজের পথ ভুলিয়া সেই পরের পথ আমাদের অনুসরণ করিতে হইয়াছে!

হিপ্‌নটাইজ্ করিলে যে কেবল মনের ভাব চালনা করা যায়, তাহা নহে, ঘোর-নিদ্রায় অভিভূত করিয়া নিজের শরীরে হাতে-পায়ে-পিঠে যে কোন অঙ্গে চিম্‌টি কাটিলে, তদভিভূত ব্যক্তি তাহার শরীরের সেই অঙ্গে সেই প্রকার বেদনা অনুভব করিয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে গুর্নে (Edmund Gourney) সাহেবের পরীক্ষার ফল নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

ওয়েল্‌স (Wells) নামক কোন ব্যক্তিকে ইস্মিথ (G. A. Smith) সাহেব হিপ্‌নটাইজ্ করতঃ তাহার চক্ষু বাঁধিয়া দিলেন।

এক ঘরে ওয়েলস এবং পার্শ্বের অন্য এক ঘরে ইস্মিথ যাইয়া বসিলেন; সেখানে গুর্নে, পড্‌মোর (Frank Podmore) এবং আরও কয়েকজন কৃতবিদ্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

(১) ইস্মিথ সাহেবের বাম কর্ণে চিম্‌টি কাটা হইল। ওয়েলস চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমাকে চিম্‌টি কাট্‌লে কে?" এই বলিয়া ওয়েল্‌স তাহার বাম কর্ণ রগ্‌ড়াইতে লাগিল।

(২) ইস্মিথ সাহেবের বাম বাহুর উপরে চিম্‌টি কাটা হইল। ওয়েল্‌স তৎক্ষণাৎ তাহার বাম বাহুর ঠিক্ সেই স্থানে হাত দিয়া বেদনা লাগার কথা প্রকাশ করিল।

(৩) ইস্মিথ সাহেবের দক্ষিণ কর্ণে চিম্‌টি কাটা হইল। ওয়েল্‌স তাহার ডান কাণে হাত দিয়া "মাছিতে কামড়াইতেছে" জানিয়া মাছি তাড়াইবার জন্য হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিল।

(৪) ইস্মিথের দক্ষিণ স্কন্ধে চাপড়াঘাত করা হইল। ওয়েল্‌স তাহার ডান কাঁধে বেদনা অনুভব করতঃ সেখানে হাত বুলাইতে লাগিল।

(৫) ইস্মিথের শরীরে নানা স্থানে কাঁটা ফুটাইয়া দেওয়া হইল। ওয়েল্‌স তাহার শরীরের ঠিক্ সেই স্থানে বেদনা অনুভব করিল।

Apparitions and thought transference, page 6.

হিপ্‌নটাইজ্ করিয়া নিজের মুখে চিনি, লবণ, কটু, তিক্ত, বা কষায় রসযুক্ত কোন দ্রব্য দিলে, তদভিভূত ব্যক্তি সেই সেই রস আস্বাদন করিয়া থাকে।

ডাক্তার আজাম (Dr. Azam the veteran historian of Feledar) বলিতেছেন, তাঁহার তত্ত্বাবধানে একজন হিষ্টিরিয়া রোগী ছিল; একদিন উক্ত রোগীকে ঘুম পাড়াইয়া তিনি তাহার পার্শ্বে বসিয়া আছেন—রোগী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে; এই অবস্থায় ডাক্তার আজাম পকেট হইতে খানিকটা লবণ বাহির করিয়া নিজের মুখে দিলেন। রোগীর মুখ তৎক্ষণাৎ যেন কেমন বিকৃত ভাব ধারণ করিল এবং রোগী তাহার মুখ কেমন করিতে লাগিল। রোগী বলিয়া উঠিল "কি বিষাদ—আমার মুখে নুন দিলে কেন?"

ডাক্তার ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে তাঁহার নিজের মুখে ভিন্ন-ভিন্ন রসযুক্ত নানা প্রকার দ্রব্য দিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার সেই রোগী সেই রস আস্বাদন করার কথা প্রকাশ করিয়াছে।

এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশে বড়-বড় মনীষিগণ বিশেষ সতর্কতার সহিত যে সকল পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে হিপ্‌নটাইজ করিয়া তদ্রাবিষ্ট ব্যক্তির মনে যে রূপ আঘাতের ভাব পরিচালনা করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। Thought Transfrence—Chapter III, page 58-59.

হিপ্‌নটাইজ করিয়া যে ভাব-চালনা করা যায়, তাহা অনেক সময়েই অযথার্থ হয়; তদ্রাবিষ্ট ব্যক্তি সে ভাব মন হইতে সহজে দূর করিতে পারে না।

রাম হরিকে হিপ্‌নটাইজ করিয়া মনে মনে বলিল, "তুমি জাগরিত হইয়া এক গ্লাস জলে কয়েক ফোঁটা ওষধিরস দিয়া আমার নিকট লইয়া আসিবে।"

জাগরিত হইবার পর হরিকে যেন কেমন অন্যমনস্ক দেখা গেল; সে স্থির হইয়া থাকিতে না পারিয়া, রামের নিকট আসিয়া কহিল "আমার মাথায় কি তুমি ভাব চালাইয়া দিলে?"

রাম উত্তর করিল, "কেন আমাকে তুমি একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?"

হরি। তুমিই ইহা ঘটাইয়াছ! এ ভাব তুমিই চালনা করিয়া দিয়াছ! কিন্তু তোমার কথা আমার শুনিবার ইচ্ছা নাই।

রাম। আচ্ছা, না হয় শুনিও না, কিন্তু তোমার মনে কি ভাব ঘুরিতেছে, শুনিতে পাই না?

হরি। তুমি কি তা জান না? আমাকে এখন একটা গ্লাসের সন্ধান করিয়া আনিতে হইবে এবং তাহাতে জল পুরিয়া ও কয়েক ফোঁটা ওষধিরস দিয়া তোমার নিকট লইয়া আসিতে হইবে;—এ কি রকম কথা?

রাম মনে-মনে যে আদেশ করিয়াছিল, তাহা যথাযথভাবে হরির মনে প্রবেশ করিয়াছিল।

রাম হরিকে ঘুম পাড়াইয়া মনে-মনে তাহার প্রতি আদেশ করিল, কাঁচের আলমারির ভিতর পুস্তকের তলায় তাহার একটা বড়াচ ঘড়ি লুকান আছে, সেই ঘড়িটী আনিয়া দিতে হইবে।

ঘড়িটী যে সেখানে লুকান ছিল, তাহা হরি বা অন্য কেহই জানিত না। রাম মনে মনে আদেশ করা মাত্র, হরি হঠাৎ জাগিয়া উঠিল, এবং অন্য কোন দিকে না চাহিয়া, একেবারে আলমারির নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল, ও আলমারির দরজা খুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

রাম যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে হরির দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া একখানি আরাম-চেয়ারে বসিয়া ছিলেন; এবং আলমারির দরজা খুলিবার জন্য হরি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইল না দেখিয়া, রাম কোন কথা না বলিয়া, দরজাটী খুলিয়া দিয়া আবার চেয়ারে আসিয়া বসিলেন।

"এইখানেই আছে—এইখানেই আছে" এই কথা বলিতে বলিতে হরি পুস্তকগুলি একে-একে সরাইল এবং অবশেষে ঘড়িটী পাইয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিল। Expriments by I. H. P. Thought Transference page, 89 90.

হিপ্‌নটাইজ করিলে একজনের মনের ভাব অপরের মনে পরিচালিত হয়; হিপ্‌নটাইজ না করিলেও হয়।

সমান ওজনে বাঁধা দুইটী তারপুরা বা অন্য যন্ত্রযন্ত্র রাখিয়া একটীতে ঘা দিলে যেমন অন্যটী বাজিয়া উঠে, দুই খণ্ড চুম্বক-পাথর যত দূরেই হউক সমানভাবে ঝুলাইয়া রাখিয়া একটীতে আঘাত করিলে যেমন অপরটী নড়িয়া উঠে, সেইরূপ একজনের মনে প্রগাঢ় কোন ভাবের উদয় হইলে, তাহা সমান ওজনে বাঁধা অপর কোন মনে তৎক্ষণাৎ পরিচালিত হইয়া থাকে। দূর-দূরান্তরে ছেলের অসুখ বা কোন আপদ-বিপদ হইলে, মা তাহা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারেন, এবং ছেলের কাতরতার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের প্রাণ কাতর হইয়া উঠে।

(১) ফ্রান্সদেশে বর্ষার-যুদ্ধে রাজকুমারের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার জননী আমেরিকার বর্ণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাজ-প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। মৃত্যু-যন্ত্রণায় পুত্র যখন সেই দূরদেশে অত্যন্ত কাতর হইয়া "মা—মা" বলিয়া ডাকিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার সেই প্রাণের যন্ত্রণার ভাব গর্ভধারিণীর চিত্তে সঞ্চালিত হইয়া তাঁহাকেও কাতর করিয়া তুলিয়াছিল। মা বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রধনে বঞ্চিত হইয়াছেন।

(২) সন্ধ্যার সময় দুই ভগিনী তাঁহাদের জননীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। মা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত গল্প করিলেন; তাঁহাদের ঘর-সংসারের কত কথা শুনিলেন। তার পর তাঁহারা আপন-আপন বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। মেয়েরা যখন বাড়ী ফিরিয়া আসেন, তখন পর্য্যন্ত মায়ের কোন রকম অসুখের কথা শুনিতে পাইলেন না। অনেক রাত্রিতে প্রথমা ভগিনী হাসিয়া উঠিয়া স্বামীকে বলিলেন, তাঁহার মায়ের হঠাৎ কঠিন ব্যারাম হইয়াছে, তিনি তাঁহাকে দেখিতে যাইবেন। কালবিলম্ব না করিয়া কিন্তু তাঁহার জন্য একখানি গাড়ি আনিয়া দেওয়া হউক। স্বামী স্ত্রীকে অনেক বুঝাইলেন, এবং হয় ত তিনি স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু স্ত্রীর মন বুঝিল না। তিনি অত্যন্ত কাতর হইতে লাগিলেন দেখিয়া সেই রাত্রিতে তাঁহার জন্য একখানা গাড়ি আনিয়া দেওয়া হইল।

প্রথমা ভগিনী মায়ের বাড়ী যাইয়া দেখেন, তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত রাত্রে তাঁহারা এখানে কেন আসিয়াছেন? উভয়ের সেই একই উত্তর—মায়ের হঠাৎ ব্যারাম হইয়াছে ভাবিয়া খুব ভয় হইল মা, তাই তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। এইরূপ কথা বলিতে-বলিতে দুই ভগিনী যখন বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেছিলেন, সেই সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, কর্ত্রীর হঠাৎ অত্যন্ত অসুখ করিয়াছে এবং তিনি তাঁহাদের উভয় ভগিনীকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

দুই ঘণ্টা সন্ধ্যার পর যখন মা বাসায় বাড়ী ফিরিয়া যায়, তখন মাকে কোন রকম অসুখ দেখিয়া ছেলে, মনোরাজ্যে পুনরায় তাহাকে দেখিবার জন্য তাহাদের উভয়ের মনে এ রকম একটী ইচ্ছার উদয় হওয়া সম্ভব বা সঙ্গত হইলেও হইতে পারিত ; কিন্তু মাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিয়া আসিয়া হঠাৎ দুজনেরই মনে ঠিক একই সময়ে তাঁর অসুখ হওয়ার ভাব উদয় হইল কেন ?

মায়ের মনে ছেলেকে দেখিবার জন্য যে ব্যাকুলতা ও উদ্বিগ্নতার ভাব জন্মিয়াছিল, সেই ভাব যুগপৎ দুই জনিনীর মনে সঞ্চালিত হইয়া তাঁহাদিগকেও ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল।

Thought-Reading, page 78-79.

(৩) কোন ভদ্র মহিলা অন্যত্রে নিদ্রা যাইতেছেন, হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ; তাঁহার ওষ্ঠে যাতনা বোধ হইল এবং তাঁহার মনে হইল তাঁহার মুখে হঠাৎ গুরুতর আঘাত লাগিয়া তাঁহার ওষ্ঠ কাটিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং রক্ত বন্ধ করিবার জন্য একখানি রুমাল লইয়া মুখের উপর চাপিয়া ধরিলেন। কিছুক্ষণ পরে রুমালখানি উঠাইয়া দেখেন, তাহাতে রক্তের দাগ মাত্র নাই। রাত্রি তখন প্রভাত হইয়াছে, পার্শ্বস্থ শয্যার দিকে চাহিয়া দেখেন স্বামী নাই। তখন বসিয়া থাকিবেন ভাবিয়া আবার শয়ন করিলেন এবং ঘুমাইয়া পড়িলেন। অনেক বেলা হইলে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল ; স্বামী তখনও বাড়ী ফিরিয়া আসেন নাই। প্রাতঃ ভোজন (Breakfast) করে স্বামীর অপেক্ষায় বসিয়া রহেন, এমন সময় স্বামী ফিরিলেন এবং মুখে একখানি ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া বসিলেন। স্ত্রী দেখিলেন, স্বামী একখানি রুমাল দিয়া নিজের মুখ চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন।

স্বামীর মুখে যাতনা আঘাত লাগিয়াছে, ইহা স্ত্রীর বুঝিতে বাকী রহিল না। তাড়াতাড়ি তিনি স্বামীর নিকট যাইয়া তাঁহার মুখের রুমালখানি খুলিয়া দেখেন তাঁহার ওষ্ঠ কাটিয়া গিয়াছে।

স্ত্রী তখন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, ভোরের সময় যখন তিনি তাঁহার ওষ্ঠ কাটিয়া গিয়াছে ভাবিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময় তাঁহার স্বামী এই আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

Phantoms of the Living, p 189

(৪) জেলখানার একজন করেদীর স্ত্রী একটি ছেলে সঙ্গে করিয়া মধ্যে-মধ্যে তাহার সহিত দেখা করিতে আসিত। করেদী তাহার এই ছেলেটিকে বড় ভাল বাসিত, এবং ছেলেটিকে পাইলে তাহাকে কোলে করিয়া সোহাগ করিত, আদর করিত ; বিদায়কালে ছেলেটীর জন্য তাহার মন প্রাণ বড় কাতর হইত এবং তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িত।

একদিন জেল-দারোগা করেদীর স্ত্রীর নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন যে, তাহার ছেলেটী জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে ; স্ত্রী তাহার স্বামীকে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য বলিয়া পাঠাইয়াছিল ; এজন্য করেদিকে জেলখানার ভিতর হইতে বাহিরে আনা হইল। করেদি বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সহিত অল্প দুই এক কথা আলাপের পর জেল দারোগা বলিলেন—

"তোমার বাড়ী হইতে একটা খারাপ সংবাদ আসিয়াছে।"

করেদি উত্তর করিল—"তাহা আমি জানি, আমার ছেলেটি মারা গিয়াছে—" এই বলিয়া করেদি কাঁদিয়া ফেলিল।

জেল-দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ সংবাদ তুমি কোথায় পাইলে ?"

করেদি বলিল—"গত রবিবারে বৈকালে হঠাৎ আমার মনে হইল যেন আমার ছেলেটি জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। এই কথা মনে হওয়ার পর হইতে আমার প্রাণ বড়ই কাতর হইয়াছে। আপনি যখন আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তখন মনে হইল আমার ছেলের মৃত্যু-সংবাদ শুনিতে আসিতেছি।" বাস্তবিক করেদির ছেলে ঠিক সেই রবিবারে বৈকালে জলে ডুবিয়া মরিয়াছিল।

Thought Transference p. 170

(৫) অষ্ট্রেলিয়া দেশের অন্তর্গত মেলার্ণ নগরে Harbinger of Light নামে একখানি সাময়িকপত্র বাহির হইত। উক্ত পত্রের সম্পাদক টেরি সাহেবের সহিত টটল নামক আর একজন সাহেবের কোন সময়ে বিশেষ হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। —এই দীর্ঘকাল মধ্যে তাঁহাদের পরস্পরের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া দূরের কথা, তাঁহাদের মধ্যে কখন পত্রাদিও লেখালেখি হয় নাই।

একদিন টটল সাহেব আপন ঘরে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ Harbinger of Light নামক পত্রে তাঁহার কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা হইল এবং সে ইচ্ছা ক্রমে এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, সকল কাজ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সেই প্রবন্ধ লিখিবার জন্য কাগজ কলম লইয়া বসিতে হইল। প্রবন্ধ লেখা শেষ হইলে তাহা তিনি ডাকে পাঠাইয়া দিলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে টটল সাহেব সম্পাদক টেরি সাহেবের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন।—টটল সাহেব যে বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, টেরি সাহেব তাঁহাকে ঠিক ঐ বিষয়ের উপর প্রবন্ধ লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন ; টেরি সাহেবের পত্রের তারিখ এবং টটল সাহেবের প্রবন্ধ লেখার তারিখ এক। টেরি সাহেব যখন টটল সাহেবকে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য অনুরোধ-পত্র লিখিতে বসেন, তখন তাঁহার মনের ভাব নিশ্চয়ই টটল সাহেবের মনে পরিচালিত হইয়াছিল।

(৬) এক রাত্রে শিব সাহেব একা আপন মনে পড়াশুনা করিতেছেন, এমন সময় কে যেন তাঁহার কাণে-কাণে বলিয়া গেল—"জেন্স-পত্নীকে একখানা ছবি পাঠাইয়া দেও।"

শিব সাহেব সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু আবার সেই কথা—জেন্স-পত্নীকে একখানি ছবি পাঠাইয়া দেওয়ার কথা আবার তাঁহার মনে উদিত হইল। তিনি আর

থাকিতে পারিলেন না; আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং থালার হইতে একখানি রুটি খরিদ করিয়া আনাইয়া জেন্‌স-পত্নীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

জেন্‌স-পত্নী একজন দুর্ভাগিনী, অতি দরিদ্র অবস্থাপন্না; তাহার ছোট-ছোট দুইটি ছেলে, তাহার অভিভাবক কেহই ছিল না।

আমরা যে রাত্রির কথা বলিতেছি, সে রাত্রে কোথায় খাবার পাইবেন, তাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তিনি ছেলেদের ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাদের ঘুম হইল না; তাহারা "বড় ক্ষিধে—কিছু খেতে দেও মা" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মার প্রাণ অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিল; মা উপায়ান্তর না দেখিয়া অন্তরিক্ষ স্থিত ভগবানের নিকট তাঁহার ছেলেদের জন্য কাতরভাবে একখানি রুটি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

জেন্‌স পত্নী যখন ভগবানের নিকট করযোড়ে ভক্তিভাবে একখানি রুটি ভিক্ষা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় তাঁহাকে একখানি রুটি পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য স্মিথ সাহেবের মন ব্যাকুল হইয়াছিল এবং রুটি খরিদ করিবার জন্য তাঁহাকে বাজারে লোক পাঠাইতে হইয়াছিল। ভগবানের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে পারিলে তাহার সফল হয়। কোন কোন কবি গাহিয়াছেন—

Moer things are wrought by prayer
Than this world dreams of.

ভক্তাধীন ভগবান চিরকালই ভক্তের অভাব পূরণ করিতেছেন। কি উপায়ে কি করেন, তাহা তিনিই জানেন। একজনের অভাব অপরের মনে চালনা করতঃ তাহার দ্বারা সে অভাব পূরণ করিয়া দিবেন, সর্ব্বশক্তিমানের পক্ষে ইহা কিছুই অসম্ভব নয়।

(৭) সন ১৮৮০ সালের মে মাসে একদিন ডাক্তার ডিউপার (Dr. G. Dupre) কোন একটি রোগী দেখিয়া উপরতালা হইতে নামিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ মনে হইল যেন তাঁহার চারি বৎসর বয়সের মেয়েটী সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গেল ও তাহার অত্যন্ত আঘাত লাগিল। ডাক্তার-সাহেবের চক্ষুর উপর হইতে যেন একখানি পর্দ্দা সরিয়া গেল। তিনি স্পষ্ট দেখিলেন তাঁহার মেয়েটী সিঁড়ির নীচে পড়িয়া আছে ও তাহার খুতনি দিয়া রক্ত পড়িতেছে। ডাক্তার ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, তখন বেলা ১০½ হইয়াছে। সেদিন তাঁহার অনেক রোগী দেখিতে ছিল; তিনি সেই কাযে চলিয়া গেলেন। অবেলায় বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীর সহিত দেখা হওয়া মাত্র ডাক্তার মেয়ের নাম করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"লুলু পড়ে গিয়েছে—তার বেশী রকম আঘাত লাগেনি তো?"

স্ত্রী। লুলু পড়ে গিয়েছে, তোমাকে কে বলে?

ডাক্তার। কেউ বলে নি, আমি যেন স্পষ্ট দেখ্‌লেম সে পড়ে গেল।

তারপর ডাক্তার মেয়েটীর আঘাত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া; যে সময় যে অবস্থায় তাহাকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন, তদ্বৃত্তান্ত স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিলেন। মেয়েটী ঠিক বেলা ১০½টার সময় সিঁড়ি হইতে নীচে পড়িয়া গিয়াছিল ও তাহার খুতনি কাটিয়া রক্ত পড়িয়াছিল।

(৮) মা কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। সমস্ত দিন কাযে ব্যস্ত থাকিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিলে তাঁহার মেয়েরা আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল; তাঁহার ৭। বছরের মেয়েটীকে কোলে করিয়া মার মনে হইল, সেইদিন সকালে তিনি খুব বড় রকমের কাল রঙ্গের একটী কুকুর দেখিয়াছিলেন, সেই কুকুরের গল্পটী মেয়ের নিকট বলিবেন। তিনি বলিলেন,—

"আমি আজ একটা মজা দেখে এসেছি।"

মেয়ে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল,—"তা আমি জানি—একটা দোকানের সম্মুখে তুমি একটা খুব বড় কুকুর দেখে এসেছ।"

মা। হাঁ তাই বটে; কিন্তু তুমি তা কি করে জান্‌লে?" বালিকা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "কুকুরের গায়ের লোমগুলি কত সুন্দর—" এই সময় বালিকার দাদা জিজ্ঞাসা করিল "কি রঙ্গের কুকুর রে?"

বালিকা। মিস্‌মিসে কাল রঙ্গের; তার লোম কোঁকড়া, কোঁকড়া-কোঁকড়া।

মা বাস্তবিক একটী দোকানের সম্মুখে সেই কুকুর দেখিয়াছিলেন এবং কুকুরের লোম কোঁকড়া-কোঁকড়া ছিল। আড়াই বছরের মেয়ের এই আশ্চর্য্য অবস্থার কথা শুনিয়া পড্‌মোর (Frank Podmore M. A.) সাহেব স্বয়ং তাহাদের বাড়ী গিয়াছিলেন এবং মা তাঁহার এই মেয়ের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে যে সকল বিষয় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা হইতে পড্‌মোর সাহেব নিম্নলিখিত আর একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এই মেয়ের কোন আত্মীয় এক সময়ে লণ্ডনে যাইয়া কোন সরাইয়ে আহার করিতে বসিলে তিনি দেখিতে পান, তাঁহার জাকিটে একটী আরশুলা আসিতেছে। উহা ফেলিয়া দিয়া তিনি যেমন কাফি পান করিবেন, অমনি আর একটী তাঁহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিল। পরদিন সেই আত্মীয় বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া সকাল-বেলায় যখন আহার করিতে বসিয়াছেন, সেই সময় তিনি প্রকাশ করিলেন—"কাল আহার করিতে বসিয়া আমার কি বিপদই গিয়াছে,—আহারের সময় কি এমন বিপদও হয়—" বালিকা তাঁহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"কাল তোমার কাফিতে আরশুলা পড়িয়াছিল।"

(৯) সন ১৮৮৮ সালের ২রা জুলাই তারিখে প্রফেসার রিচেট্ (Richet) সাহেব নুনিকে ছিপটাইয়া করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"লক্ষ্মণের কি হয়েছে?"

নুনি উত্তর করিল "তাহার বাম হাত পুড়িয়া গিয়াছে, আঙ্গুল পোড়ে নাই। তোমাদের কি একটা মিশিন চালিতে তাহার হাতে পড়িয়া গিয়াছে। সারবানে চালে না কেন?"

রিচেট। সে মিশিনটার রঙ কি?

পুরি। লাল রং,—সিঙ্গল বর্ণ; তার হাতখানা বড় পুড়েছে, ফোস্কা উঠেছে—"

রিডেট সাহেব একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি; তিনি বলেন লঙ্গফুলের যে হাত পুড়িয়াছিল, তাহা কেবল তিনিই জানিতেন এবং সে কথা কাহারও নিকট তিনি প্রকাশ করেন নাই। তুমি সেই তন্দ্রাবিষ্ট অবস্থায় লঙ্গফুলের হাত পোড়া সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার ঠিক মিলিয়া গিয়াছিল। সেই দিন বৈকালে লঙ্গফুল বোতলে ব্রমিন (Bromine) ঢালিতেছিল, তাহার কতক অংশ তাহার হাতে পড়ায়, হাত পুড়িয়া ফোস্কা উঠিয়াছিল।

(১০) সন ১৮৮৮ সালের ২১ শে মার্চ্চ তারিখে হ্যামিলটন (E. W. Hamilton C. E.) সাহেব স্বপ্ন দেখিলেন, ১২ বৎসর পরে যেন তাঁহার ভাই অষ্ট্রেলিয়া হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই দীর্ঘ-কাল পূর্ব্বে ভাইকে যেমন দেখিয়াছিলেন, এখনও তেমনই দেখিতেছেন; তাহার চেহারার বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই, কেবল এক হাতের কনুই ভয়ানক লাল হইয়াছে ও ফুলিয়া গিয়াছে এবং হাতখানি যেন বাঁকিয়া পড়িয়াছে। ২৮শে মার্চ্চ তারিখে হ্যামিলটন সাহেব তাঁহার মাতার নিকট হইতে ২১ মার্চ্চ তারিখে লিখিত একখানি পত্র পাইলেন। ভাই বাড়ী আসিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার হাতে বাত-বেদনা উপস্থিত হওয়ায় তিনি বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। হ্যামিলটন সাহেব স্বপ্ন বিশ্বাস করিতেন না; কিন্তু অনেক দিন পরে ভাইকে স্বপ্ন দেখিতে পাইয়া তাঁহার মন বড় চঞ্চল হইয়াছিল। ভাইয়ের এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত তিনি লিখিয়া রাখেন। ২৮শে মার্চ্চ তারিখে ভাই বাড়ী আসিলে দেখা গিয়াছিল, তাহার বাম হাতের কনুই ভয়ানক ফুলিয়াছে ও লাল হইয়াছে। ডাক্তারের ডাক্তার মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার কনুইতে বাতের সূত্রপাত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে একটী বড় রকম কারবঙ্কল ফোড়া দেখা দিয়াছে।

হ্যামিলটন সাহেব, তাঁহার স্বপ্ন অক্ষরে-অক্ষরে ফলিয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, এবং ভাইকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, যখন তিনি হাতের যন্ত্রণায় কাতর হইয়া উপরিউক্ত পত্রখানি লিখিতে বসেন, হ্যামিলটন সাহেব ঠিক সেই সময় স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

Thought Transference p 202.

ভাব-চালনা সম্বন্ধে আমরা যে দৃষ্টান্তগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, মুখে কোন কথা না বলিয়া বা কাগজে-কলমে কিছু লেখাপড়া না করিয়া এক জনের মনের ভাব অন্যের মনে চালনা করিবার সোপনীয় কোন গুরুতর পথ আছে। সে পথ কি, তাহা নিশ্চিত আমরা জানি না ও বা বুঝিতে পারি না, কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে, কোন অবাক্ত শক্তি-প্রভাবে মানব-চক্ষুর অগোচর পথ দিয়া একজনের মনের ভাব তাঁহার অজ্ঞাতসারে অপরের মনে চালিত হইতেছে। এই শক্তি এই জড়-শরীরের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নয়, এ শক্তি আমাদের আত্মার।

আমাদের আত্মা এই জড় শরীরে আবদ্ধ থাকিয়া তাহার চিত্তের ভাব যদি অপর চিত্তে চালনা করিতে পারে, তাহাহইলে পরলোকগত আত্মীয়েরা জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় আমাদের মনে চালনা করিয়া দিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

নিদ্রিত অবস্থায় আত্মিকগণ আমাদের মনে যে ভাব চালনা করিয়া থাকেন, তাহাই স্বপ্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

মোগল সম্রাট্ আক্‌বর

পরিবারবর্গ

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

সম্রাট্ আক্‌বরের বহুসংখ্যক মহিষী ও রক্ষিতা স্ত্রীলোক (concubine) ছিল; তন্মধ্যে কতকগুলির একটী তালিকা আবুল্‌ফজলের গ্রন্থে পাওয়া যায় (*Ain.*, 309, 618)। সম্রাটের প্রথম বিবাহিতা পত্নী তাঁহার পিতৃব্য হিন্দাল মীর্জ্জার কন্যা —রুকয়া সুলতান বেগম। ভারতে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে অপ্রাপ্তবয়স্ক আক্‌বরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রুকয়া নিঃসন্তান ছিলেন; ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে জহাঙ্গীর-পুত্র সাহ্‌জহান্ জন্মগ্রহণ করিলে, আক্‌বর শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার রুকয়ার হস্তে অর্পণ করেন। ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ৮৪ (চান্দ্র) বৎসর বয়সে রুকয়ার মৃত্যু হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, তিনি ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বামী অপেক্ষা দুই বৎসর বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি সম্রাটের 'জান্-ই-কলান্' অর্থাৎ প্রধানা পত্নী ছিলেন।

আক্‌বরের পরবর্ত্তী পত্নী—আব্‌দুল্লা খাঁ মোগলের কন্যা। ইনি পরম সৌন্দর্য্যশালিনী ছিলেন বলিয়াই মনে

হয়; কারণ ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে অভিভাবক বয়রাম্ খাঁর মতের বিরুদ্ধে আক্‌বর এই বিবাহে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; রাজ্যাঙ্কের দ্বিতীয় বর্ষে এই বিবাহ সঙ্ঘটিত হয়।

আক্‌বরের তৃতীয়া পত্নী একজন হিন্দুরমণী *—রাজা বিহারী মল্-দুহিতা ও ভগবান্ দাসের ভগিনী। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুতানার সম্ভ্রমে আক্‌বর তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইঁহার গর্ভে জহাঙ্গীরের জন্ম হয়। স্বামীর মৃত্যুর পরও ইনি জীবিতা ছিলেন। ইনি জাতিতে রাজপুত, কিন্তু মনে হয়, মোগল শুদ্ধান্তে প্রবেশকালে, তিনি নামেমাত্র মুসলমান হইয়াছিলেন। 'সৈয়র মুতাক্ষরীণ'-অনুবাদকের মতে, 'হিন্দুরমণীদের মুসলমান হইতে হইলে, তাঁহাদিগকে প্রথমে 'কল্‌মা' পড়িয়া, মুসলমানী পরিচ্ছদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হইত।' মোগল-রাজত্বের পতনকালে রাজা অজিৎ সিংহ স্বীয় কন্যাকে ফর্‌রুখ্‌সীয়ারের হস্তে সমর্পণ করেন। কিন্তু ফর্‌রুখ্‌সীয়ারের মৃত্যুর পর, অজিৎ কন্যাকে পুনরায় হিন্দুরমণীর বেশে স্বীয় পরিবারে স্থান দান করিয়াছিলেন!

আক্‌বর যে সমস্ত রমণীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশমর্য্যাদা বিষয়ে (parentage) তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন বলিয়া মনে হয়। একবার কাশ্মীর-রাজ হুসেন্ শাহ্, স্বীয় কন্যাকে সম্রাটের অন্তঃপুরচারিণী হইবার জন্য ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু হুসেনের অন্যায় আচরণের জন্য আক্‌বর তাঁহার কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আর একবার সম্রাট্ সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা, মুহম্মদ্ বাকীর কন্যা, সিন্ধী বেগমকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হ'ন নাই। See Malet 143—T. Masumi)। আক্‌বরের এই বিবাহে অমতের কারণ স্বরূপ Elliot (I, 283) বলেন, 'Sindhi was not of a good disposition.' আমাদের মনে হয়, ইহার যথার্থ কারণ অন্যরূপ;—মুহম্মদ্ বাকী একজন 'শূনী' ছিলেন; এই জন্য আক্‌বর তাঁহার কন্যাকে স্বীয় অন্তঃপুরিকা করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

আক্‌বরের বহুসংখ্যক ভার্য্যার মধ্যে একমাত্র সলীমা সুলতান বেগমের, স্বামীর উপর বিশেষ প্রভুত্ব ছিল। ইনি হুমায়ূনের বৈমাত্রের ভগিনী গুলরুখের (?) কন্যা। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে আক্‌বর তাঁহাকে বিবাহ করেন। স্বামী অপেক্ষা সলীমা ৩½ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন। আক্‌বর-জননী ও গুলবদনের সহিত সলীমার বিশেষ বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্দ ছিল; তিনি গুলবদনের সহিত দুই তিন বৎসরের জন্য মক্কা গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত হইবার পর রাজ-দরবারে সলীমার প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়; তিনি আক্‌বর ও কুমার সলীমের মধ্যে মিলন-সাধনকার্য্যে উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এলাহাবাদে গমন করিয়া তথা হইতে সলীমাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্য, বাক্‌পটুতা ও সুশিক্ষার জন্য সলীমার বিশেষ খ্যাতি ছিল। সাময়িক রীতির বশবর্ত্তী হইয়া তিনি 'মখ্‌ফী' বা 'গুপ্তবাক্তি' নাম দিয়া বহু ফার্সী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার একটী কবিতা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল; খাফি খাঁর গ্রন্থে (I. 276) ইহা উদ্ধৃত আছে;—

"কাকুলৎ রা মন্ জেমস্তী দিব্‌তা-ই-আন্ গোফ্‌তা আম্।
মস্ত্ বুদম্ বী সবব্ হর্ফ-ই পরেশান্ গোফ্‌তা আম্।"

অর্থাৎ,—'মোহবশে তোমার চাঁচর কেশকে 'জীবন-সূত্র' বলিয়াছি—ইহা উন্মত্ত প্রলাপ।'

সলীমার গর্ভে আক্‌বরের কোন সন্তান-সন্ততি জন্মে নাই।† আক্‌বরের সহিত বিবাহিত হইবার পূর্ব্বে

* ইতিহাসে ইনি 'মরিয়ম্-উজ্-যমানী' নামে খ্যাত। অনেকে ইঁহার নামের সহিত আক্‌বর-জননী মরিয়ম্ মকানীর (হামীদা বানু) নাম মিশাইয়া গোল করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, মরিয়ম্-যমানী—পর্ত্তুগীজ-খ্রীষ্টান। এই উক্তির কোনই সার্থকতা নাই: কারণ আক্‌বরের বহুসংখ্যক পত্নীর মধ্যে কেহ যে পর্ত্তুগীজ বা খ্রীষ্টান ছিলেন, ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণ নাই। মুসলমানেরা কুমারী মেরীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, এবং সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের মৃত্যু হইলে তাঁহাদের নামের সহিত 'মেরী' নাম সংযোজন করিয়া দেন। [অনেকের মতে যোধবাই-এর গর্ভে জহাঙ্গীরের জন্ম; জহাঙ্গীরের মাতা কে, এ বিষয়ে যাঁহারা বিস্তৃত আলোচনা পাঠ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিবেন:—*J. A. S. B.* (1887-88);—*Encyclopædia of Islam*. Djehangir; Ain-i Akbari.

† V. A. Smith লিখিয়াছেন যে, সলীমার গর্ভে মুরাদের জন্ম হয় (See Akbar 102-3) কিন্তু এই উক্তির সপক্ষে তিনি কোন প্রমাণই উদ্ধৃত করেন নাই।

সলীমা বয়রাম্ খাঁর অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন। জহাঙ্গীর 'তুজুকে' লিখিয়াছেন যে, ন্যূনাধিক ১০ জীকদ ১০২১ হিজ্‌রায় (২রা জানুয়ারী, ১৬১৩) মৃত্যুকালে বেগমের বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর ছিল। ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে দেখা যায় যে, সলীমা ন্যূনাধিক পাঁচ বৎসর বয়সে, (১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বা ১৪৫৮র প্রারম্ভে) বয়রামের সহিত বিবাহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু একজন বয়স্ক লোকের সহিত ৫ বৎসর বয়স্কা কন্যার বিবাহ একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সুখের বিষয়, অনুসন্ধানের ফলে সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, মৃত্যুকালে বেগমের বয়ঃক্রম ৭৬ ছিল; অর্থাৎ ৪ শওয়াল ২৩৪ হিজ্‌রায় (২৩এ ফেব্রুয়ারী, ১৪৩৯) তাঁহার জন্ম হয় (See *J. A. S. B.* 1906; *Tuzuk*, 232*n*)। সলীমার জন্মের Chronogram—'খুশ্-হল্'; ইহা হইতে ২৩৪ পাওয়া যায়।

আকবরের অন্যান্য পত্নীর মধ্যে বীবী দৌলৎ শাহ্‌র নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে;—ইঁহার গর্ভে সম্রাটের দুই কন্যার জন্ম হয়। মুরাদ ও দানিয়ালের মাতার নাম অজ্ঞাত; Price সাহেব অনূদিত, তথাকথিত, জহাঙ্গীরের কৃত্রিম আত্ম-কাহিনীতে আকবরের কয়েকজন পত্নীর নাম পাওয়া যায়;—যথা রংরাই (ভ্রমক্রমে Price ইহাকে 'পংরাই' পাঠ করিয়াছেন!), বীবী আরাম্ বখ্‌শ্; বীবী সেলীমা, বীবী হইরা এবং মিহ্‌র সমা।

আকবরের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা ছিল বলিয়া জানা যায়। প্রথম দুই যমজ পুত্র হসন ও হুসেনের শৈশবেই মৃত্যু হয়। অপর তিন পুত্র,—জহাঙ্গীর, মুরাদ ও দানিয়াল্। পিতার জীবদ্দশাতেই মুরাদ ও দানিয়ালের মৃত্যু হয়; অতিরিক্ত মদ্যপানই তাঁহাদের অকালমৃত্যুর কারণ। আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার অযোগ্য বংশধররূপে জহাঙ্গীরই সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন; ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে ৫৮ বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আকবরের কন্যাত্রয়ের মধ্যে শাহ্‌জাদা খানুম্‌ই * সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ছিলেন; তিনি জহাঙ্গীরের জন্মের তিন মাস পরে (১৫৬৯ নভেম্বর বা ডিসেম্বর) জন্মগ্রহণ করেন। শাহ্‌জাদা খানুম্ সম্রাট-জননী মরিয়ম্ মকানী কর্ত্তৃক পালিতা হ'ন; তিনি জহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও জীবিত ছিলেন। আকবর, ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহী ইব্রাহীম্ হুসেন মীর্জার পুত্র—মুজাফর হুসেনের সহিত তাঁহার বিবাহ প্রদান করেন; বিবাহকালে শাহ্‌জাদার বয়স ২৪ বৎসর ছিল।

আকবরের অপর দুই কন্যা—শকর্-নিসা (শকর্-উন্নিসা?) ও আরাম্ বানু—বীবী দৌলৎ শাহ্‌র গর্ভজাত। শকর্-উন্নিসা ও তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জহাঙ্গীরের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। জহাঙ্গীর 'তুজুকে' লিখিয়াছেন:—'From infancy and childhood she has been extremely fond of me, and there can be few such relationships between brother and sister. (*Tuzuk-Jahangiri*, i, 36)। শকর্-উন্নিসার সহিত, ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, বদখ্‌শান্-রাজ সুলেমানের পৌত্র, মীর্জা শাহ্‌রুখের বিবাহ হয়। এই দিনে শাহ্‌জাদা খানুমেরও বিবাহ সম্পন্ন হয়। শকর্-উন্নিসা বহুদিন জীবিত ছিলেন; কারণ শাহ্‌জহানের রাজত্বকালে ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দেও আমরা তাঁহাকে জীবিত থাকিতে দেখিতে পাই (Khafi-Khan II, 646)। এই বর্ষে তিনি আগ্রা হইতে, ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ্‌জহানের বদখ্‌শ-বিজয়ে আনন্দপ্রকাশ করিতে দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে শাহ্‌জহান পিতৃষ্বসার নিকট হইতে ৪০ সহস্র মুদ্রা মূল্যের এক প্রস্তরখণ্ড উপহার লাভ করিয়াছিলেন, এবং বিনিময়ে তাঁহাকে লক্ষ মুদ্রা উপঢৌকন দিয়াছিলেন। সিকান্দ্রায়, পিতার সমাধির সন্নিকটে, শাহ্‌জাদা খানুম্ ও শকর্-উন্নিসা চিরনিদ্রিত।

আরাম্ বানু পিতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্রী ছিলেন; তিনি পিতার শেষ সন্তান; কারণ শকর্-উন্নিসা ও তিনি উভয়ে দানিয়ালের (সেপ্টেম্বর ১৫৭২) পরে জন্মগ্রহণ করেন। বোধ হয় পিতার অত্যধিক আদরই তাঁহাকে 'আবদারে' করিয়াছিল। কারণ, জহাঙ্গীরের মতে 'She hardly lived up to her name which means Lady of Peace, but was hot-tempered and disagreable.' আরাম্ বানু চিরকুমারী ছিলেন;

---

* Price অনূদিত জহাঙ্গীরের আত্ম-কাহিনীতে (p. 46) প্রকাশ যে, ইনি এক বীবী সেলীমার গর্ভজাত। এই সেলীমা যে সলীমা সুলতান নহেন, ইহা নিশ্চিত।

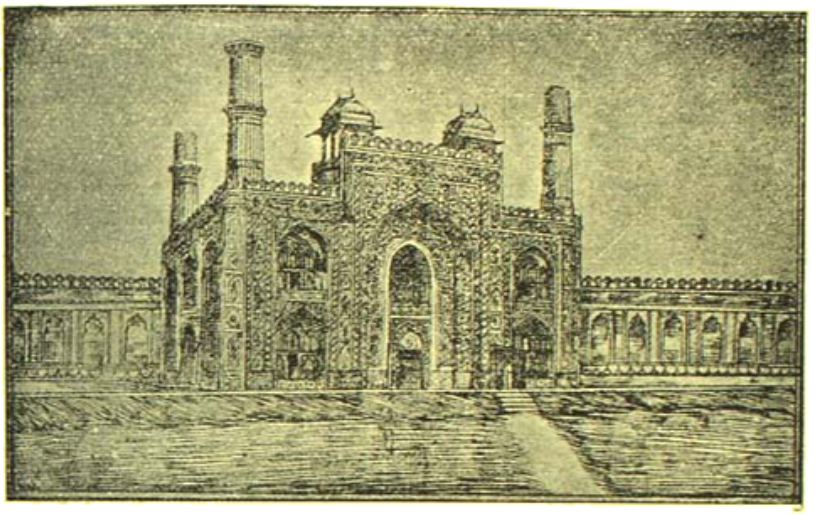

আকবরের সমাধি—সিকান্দ্রা

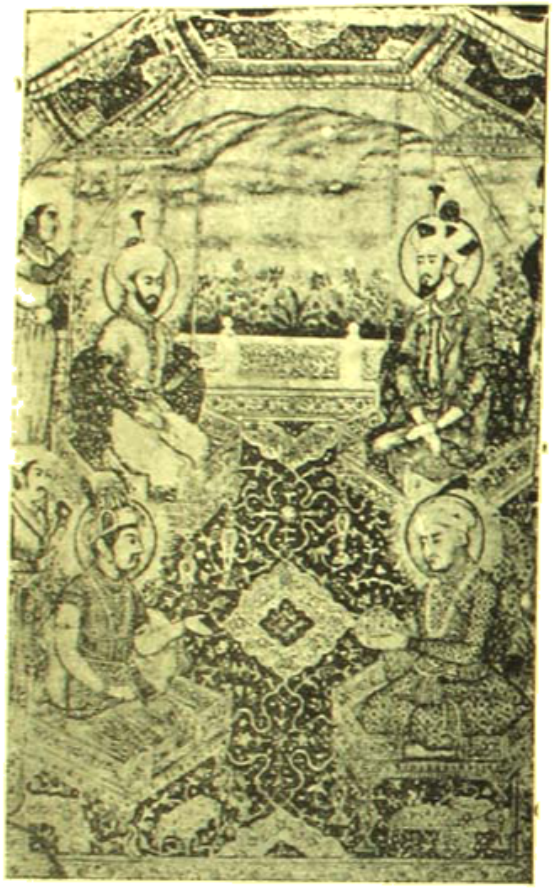

সম্রাট বাবর ;—বাবর, হুমায়ুন, আকবর ও জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীর

শাহ্ জহান্

জহাঙ্গীর-মহিষী যোধবাঈ

৪০ বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। 'তুজুকে' উল্লিখিত আছে যে, 'তিনি যে ভাবে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই ধরাধাম ত্যাগ করেন।' ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কুমারী অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

Price সাহেব অনূদিত জহাঙ্গীরের আত্ম কাহিনীতে (p. 46) প্রকাশ যে, আকবরের প্রথম সন্তান ফতেহা বানু বেগম নামে এক কন্যা; জন্মের একবর্ষ পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। আকবরের অপর এক পুত্র ও এক কন্যার শৈশবে মৃত্যু হয়।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

[শ্রীঅনাথনাথ বসু]

[যে মহাত্মার জীবন কথা নিম্নলিখিত প্রবন্ধে আরম্ভ হইল, তিনি সর্ব্বজন-পরিচিত বলিলেও বেশী বলা হয় না। তিনি সর্ব্বদা নীরবে কার্য্য করিতেন, আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রচারের তিনি বিরোধী ছিলেন; তাই তিনি কখনও নিজের কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই। লোকমান্য শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের সহিত যখন শিশির বাবুর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি শিশির বাবুকে, তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর অন্ততঃ সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত তিলক মহোদয়ের এই অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া শিশির বাবু কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া যান। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক মহাশয় এই জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিবার সময় শিশির বাবুর সেই লেখা এবং শিশির বাবুর বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে সংগৃহীত বিবরণ হইতে বিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াছেন। শিশির বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, শিশির বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র (হেমন্ত বাবুর পুত্র) শ্রীযুক্ত সুধাংশুকান্ত ঘোষ ও শিশির বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত শীতলকান্ত ঘোষ মহাশয়গণ এই জীবন-কথা সংগ্রহে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।—ভারতবর্ষ-সম্পাদক]

(১)

বহু নির্ভীক ও তেজস্বী সন্তানের জন্মভূমি বলিয়া যশোহর দীর্ঘকাল হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মুসলমান-শাসনকালের শেষাবস্থায় যিনি স্বীয় বাহুবলে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যাঁহার কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, বঙ্গের সেই তেজস্বী ও নির্ভীক জমিদার, বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠাতা, রাজা সীতারাম রায় যশোহরে জন্মগ্রহণ করেন। যে তেজোদীপ্ত কবির কবিতা বঙ্গবাসীর কর্ণে দুন্দুভিনাদে এখনও প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যশোহর সেই মধুসূদন দত্তের জন্মভূমি। ইঁহাদিগের উভয়ের ন্যায় যশোহর আরও একটী তেজস্বী পুত্ররত্ন প্রসব করিয়াছিলেন; সে রত্নটী মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ। এ দেশের অধিবাসিগণ যখন দেশাত্মবোধে অন্ধ ছিল, রাজনৈতিক-চর্চ্চা কাহাকে বলে, তাহার

শিশিরকুমার ঘোষ (যৌবন বয়সে)

হেমন্তকুমার ঘোষ

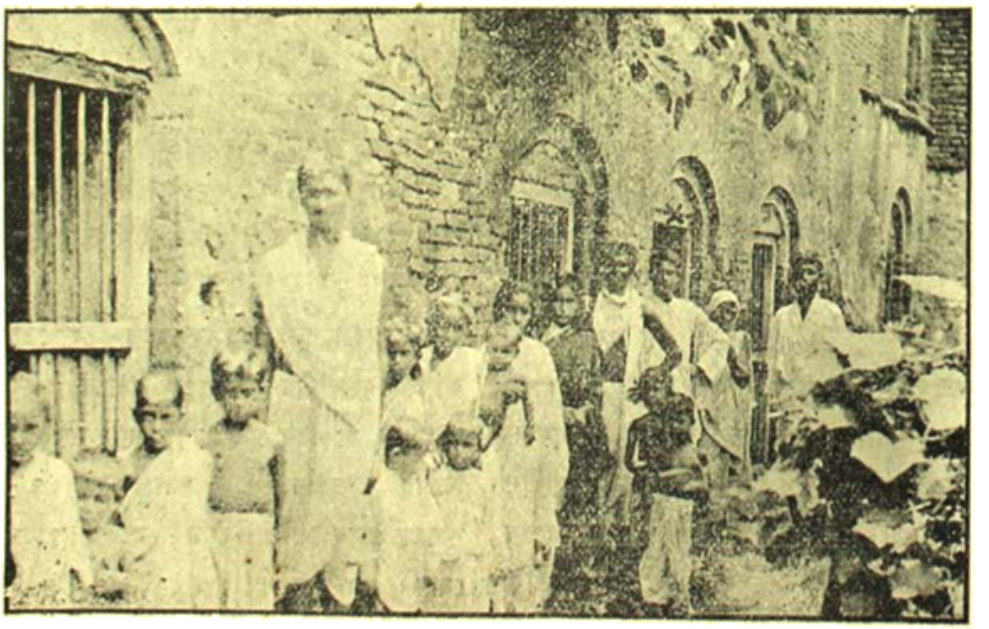

শিশিরকুমারের সূতিকাগৃহ (১ চিহ্নিত কক্ষ)

কিছুই অবগত ছিল না, অত্যাচার উৎপীড়ন অপ্রতিবাদে সহ্য করাই পরম সাধন বলিয়া মনে করিত, সেই সময় যশোহরের অন্তর্গত পলুয়া-মাগুরা নামক একখানি অতি নগণ্য পল্লীতে কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর ও তেজস্বী সংবাদপত্র-পরিচালক শিশিরকুমার জন্মগ্রহণ করেন।

শিশিরকুমার সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। যশোহরের অন্তর্গত কোট-চাঁদপুরের নিকটবর্ত্তী অয়দে নামক পল্লী শিশিরকুমারের পূর্ব্বপুরুষদিগের আদি বাসস্থান ছিল। সে সময় ঘোষ পরিবারের অবস্থা উন্নত ছিল না। শিশিরকুমারের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ রামরাম ঘোষ মহাশয় মাগুরার মজুমদার-দিগের বাটীতে বিবাহ করিয়াছিলেন। শ্বশুরকুলের একান্ত যত্নে ও আগ্রহে তিনি স্বীয় আদি বাসস্থান অয়দে পরিত্যাগ করিয়া মাগুরায় আসিয়া বাস করেন। রাম-রাম হইতে ঘোষ-পরিবারের একটী বংশতালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

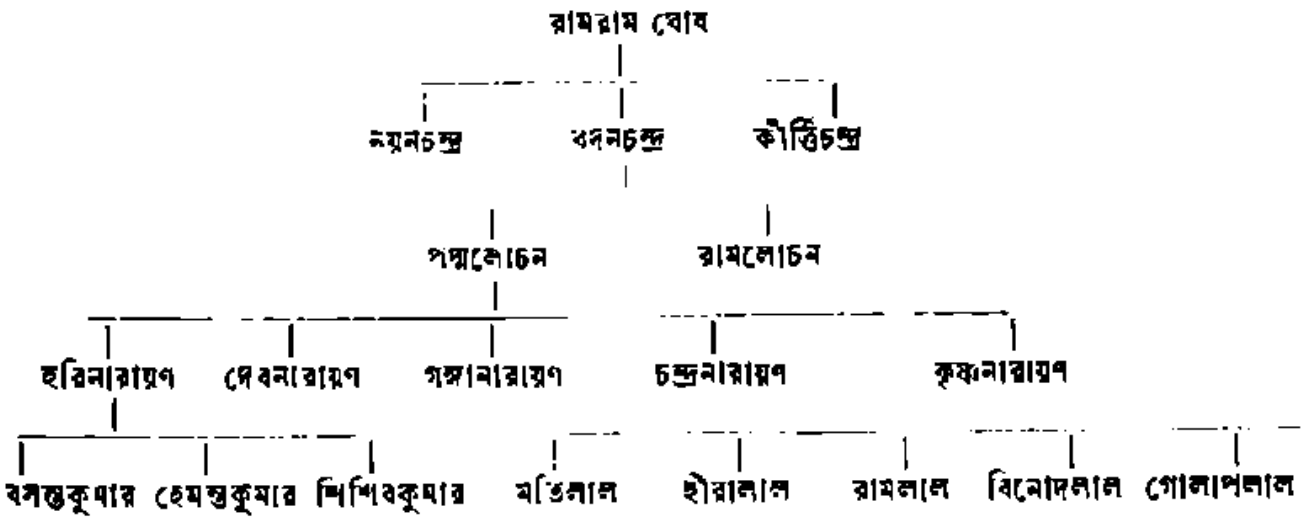

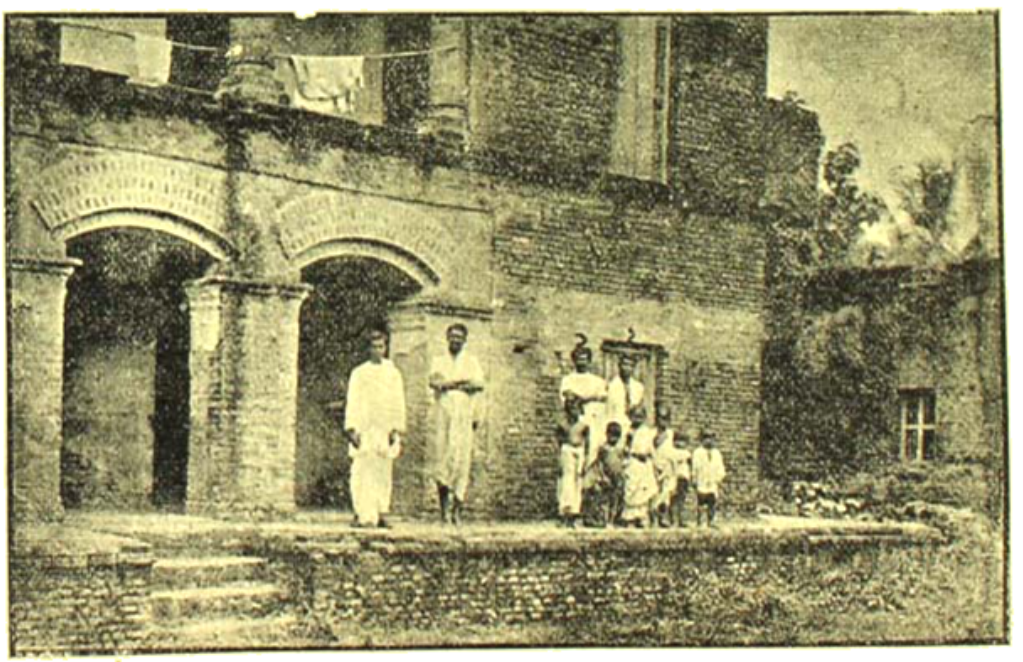

শিশিরকুমারের আবাস-ভবন

শিশিরকুমারের পিতামহ পদ্মলোচন হইতেই তাঁহাদিগের পারিবারিক বিশিষ্টতা সম্যক পরিস্ফুট হয়। ষোড়শবর্ষ হইতেই পদ্মলোচনকে অবস্থার উন্নতির জন্য কঠোর জীবন সংগ্রামে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত সালিখার মিত্র-মহাশয়দিগের বাটীতে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি কিছুকাল শ্বশুরালয়ে বাস করিয়াছিলেন। একদিন শ্বশুরবাড়ীর কাহারও সহিত কোনও বিষয়ে বাদানুবাদ হওয়ায়, তিনি আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া, সেই দিনই অষ্টমবর্ষবয়স্ক পুত্র হরিনারায়ণকে স্কন্ধে লইয়া সালিখা হইতে যশোহরের পথে অগ্রসর হন। পত্নী ও পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া পদ্মলোচনের হৃদয় উৎকণ্ঠিত ছিল। পিতা ও পুত্র বিশ্রাম করিবার জন্য একটী বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছিলেন। বালক হরিনারায়ণ দেখিলেন যে, তাঁহার পিতার নয়নদ্বয় হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তুমি কাঁদছ কেন?" পদ্মলোচন চক্ষু মুছিয়া পুত্রকে বলিলেন, "বাবা, আমার মনে বড় কষ্ট; তুই কি আমার দুঃখ দূর করিতে পারিবি?" অষ্টম বর্ষীয় বালক হরিনারায়ণ বলিলেন, "কেঁদো না বাবা, আমি তোমার দুঃখ দূর করবো।" পিতা ও পুত্রের এইরূপ কথোপকথন হইতেই তাঁহাদিগের বংশের উন্নতির বীজ উপ্ত হইয়াছিল। পাঠক দেখিতে পাইবেন, পিতার আশীর্ব্বাদে ও চেষ্টায় হরিনারায়ণ যথার্থই আপনার উক্তি সফল করিয়াছিলেন। পুত্রের কথায় পিতা হৃদয়ে অসীম বল লাভ করিলেন। আর্থিক অবস্থা উন্নত না থাকিলেও পদ্মলোচনের মানসিক ভাব অতিশয় উচ্চ ছিল। কোনও রূপ নীচ প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না; প্রত্যুত পরোপকারিতা ও মহানুভবতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ তাঁহার চরিত্রকে মধুর ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, তখন আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলিত হয় নাই। ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। সে সময় ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা অপেক্ষা পারসী ভাষা শিক্ষার প্রতি দেশবাসিগণের অধিকতর যত্ন ও আগ্রহ ছিল। বিচারালয়ে কিম্বা সরকারী কার্য্যালয়সমূহে কার্য্য করিতে হইলে কর্ম্মপ্রার্থিগণকে পারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইত। পদ্মলোচন প্রাণপণ যত্ন স্বীয় পুত্রদিগকে তৎকাল-প্রচলিত শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিনারায়ণ ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন না বটে, কিন্তু আরবী ও পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ভাষা-শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে হরিনারায়ণ সঙ্গীতশাস্ত্রও আলোচনা

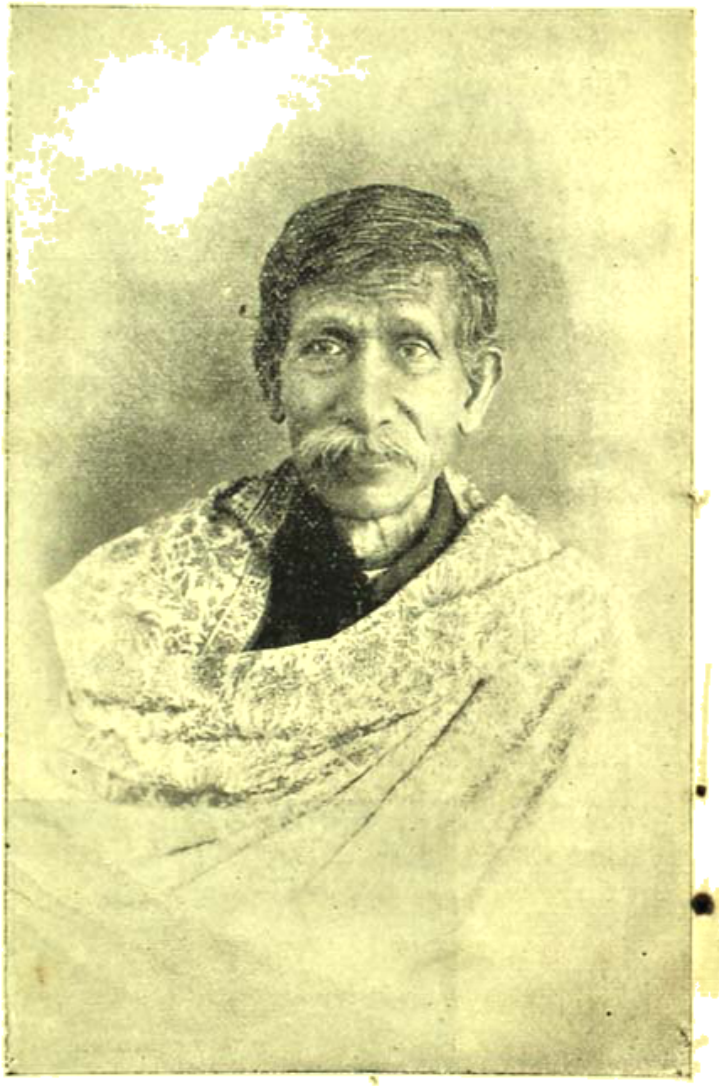

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ

করিয়াছিলেন। তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন, এবং শেষে একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। পদ্মলোচন ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। পুস্তক অধ্যয়নের সঙ্গে-সঙ্গে পুত্রগণের হৃদয়ে যাহাতে ধর্ম্মভাব অঙ্কুরিত হয়, তৎপ্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল; এবং তাহারই ফলে হরিনারায়ণ সনাতন হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছিলেন। সপ্তদশ

বর্ষ বয়সে পাঠ সমাধা করিয়া হরিনারায়ণ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনি যশোহরের আদালতে নকলনবীশের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎকালীন জেলার জজ সাহেব হরিনারায়ণের কার্য্যকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সব্ জজের সেরেস্তাদারের পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। কিন্তু হরিনারায়ণ দীর্ঘকাল এই কার্য্য করেন নাই। সেরেস্তাদারের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি আইন-ব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্যে তিনি শীঘ্রই যশোহরের একজন প্রধান উকিল হইয়াছিলেন। উকিল হওয়ার পর তিনি কিছুদিনের জন্য অস্থায়ী মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আইন-ব্যবসায়ে হরিনারায়ণ যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারই উপার্জ্জন-লব্ধ অর্থে বিষয়-সম্পত্তি ক্রয় ও মাগুরায় বাসভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল। যশোহরের অন্যতম প্রধান উকিল হইয়াও হরিনারায়ণ নিরহঙ্কার ও বিলাসিতা-বর্জ্জিত ছিলেন; উপার্জ্জনের অধিকাংশই তিনি পরের অভাব মোচনে ব্যয় করিতেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। শিশিরকুমার তাঁহার 'নরোত্তম-চরিত' নামক গ্রন্থ পিতৃদেবের চরণে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছেন,—"শিশু-বেলায় লোকে আমাদিগকে বলিত, 'তোমাদের পিতা বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়। তিনি মহাপুরুষ, তোমরা তাঁহার উপযুক্ত পুত্র কেহ হইতে পারিবে না।' পিতা, তোমার উপযুক্ত পুত্র আমরা কিরূপে হইব? তোমার মত লোক শ্রীভগবান সর্ব্বদা সৃষ্টি করেন না; আমাদের দোষ কি? তোমার কাঞ্চনবরণ, সুবলিত অঙ্গ, কুন্দনকৃত বদন, লাবণ্যময় গতি, মধুর হাস্য, কমল নয়ন যে দেখিত, সেই চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় চাহিয়া থাকিত। তোমার শক্তি কত ছিল, তাহা তখন আমাদের বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু লোকে বলিত, তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান ভারতবর্ষে নাই। তবে তোমার হৃদয় কিরূপ ছিল, তাহা কিছু-কিছু চক্ষে দেখিয়াছি। অন্যের দুঃখ শুনিলে তোমার নয়ন হইতে ধারা বহিত। তুমি যখন পূজা করিতে, তখন তোমাকে যে দেখিত, সেই ভক্তিরসে আর্দ্র হইত। সঙ্গীতজ্ঞ বহুতর লোকের গীত শুনিয়াছি, কিন্তু তোমার মুখে যে সঙ্গীত শুনিয়াছি, সেরূপ কোথাও শুনি নাই, শুনিবার আশাও নাই।"

নলডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী তেলেন নামক গ্রামের প্রসিদ্ধ বসুবংশে হরিনারায়ণ বিবাহ করেন। নবরঙ্গ কুলীন বলিয়া সমাজে বসুবংশের যথেষ্ট সম্মান ছিল। ভরতচন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যা অমৃতময়ীর সহিত হরিনারায়ণের

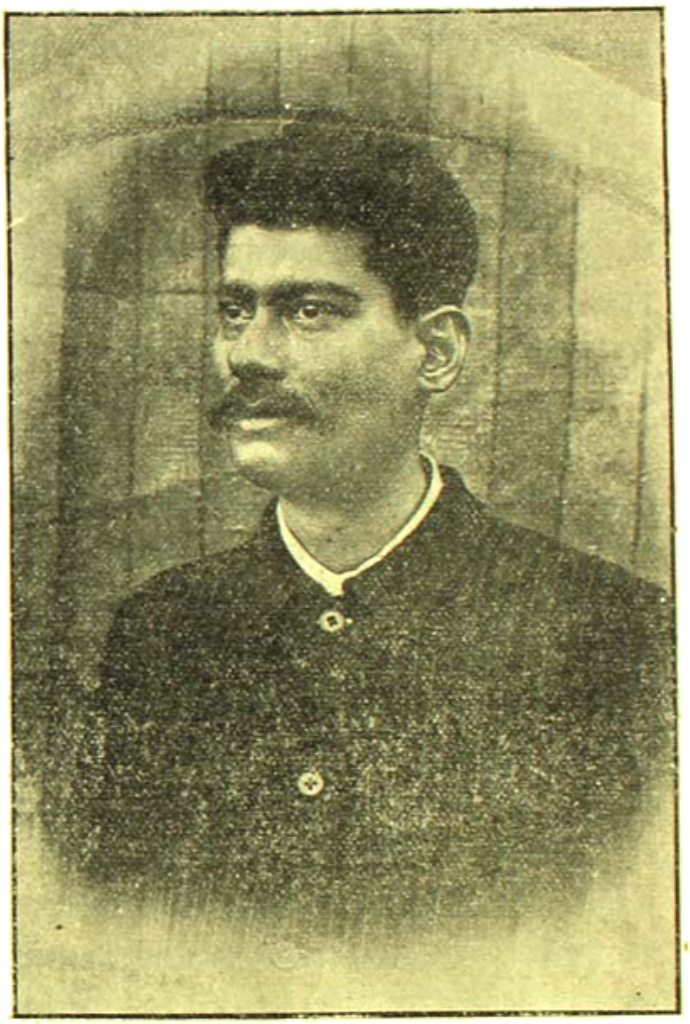

শ্রীযুক্ত পঁচুগোপাল ঘোষ

বিবাহ হয়। অমৃতময়ী বাস্তবিকই অমৃতময়ী ছিলেন। পল্লীর মধ্যে কাহারও কোন বিপদ ঘটিয়াছে শুনিলে তিনি স্বীয় সংসারের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিপন্নের সহায়তায় অগ্রসর হইতেন। অভাবগ্রস্ত নরনারীগণকে তিনি অন্নপূর্ণার ন্যায় মুক্তহস্তে অন্ন বিতরণ করিতেন। হরিনারায়ণের গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে দেবীর ন্যায় ভক্তি করিত। স্বহস্তে আপনার সুবৃহৎ পরিবারের রন্ধন-

কার্য্যে ও প্রতিবাসিগণের নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও, তিনি তাঁহার দৈনন্দিন পূজা-আহ্নিকে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করিতেন না। যাঁহারা তাঁহার পূজাদি ব্যাপারে একাগ্রতা লক্ষ্য করিতেন, তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। পুত্র কন্যা যে জনক-জননীর সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়া থাকে, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। হরিনারায়ণের ন্যায় জনক ও অমৃতময়ীর ন্যায় জননীর সন্তানগণ যে সংসারে প্রকৃত মানুষ বলিয়া পরিচিত হইবেন, তাহা অস্বাভাবিক নহে। বাল্যবিবাহ বহু দোষের আকর, বিশেষতঃ নারীর স্বাস্থ্য-ভঙ্গের মূল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু পাঠক! শুনিলে বিস্মিত হইবেন যে, হরিনারায়ণের যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর ও অমৃতময়ীর বয়স আড়াই বৎসর মাত্র। অমৃতময়ী বহু সন্তানের জননী হইয়াও, সুস্থ শরীরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, ত্রিসপ্ততি-বর্ষ বয়সে পরলোকগমন করেন।

আমরা যাঁহার জীবন-চরিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি হরিনারায়ণের তৃতীয় পুত্র। বাঙ্গালা ১২৪৭ সালে, ইংরাজী ১৮৪০ খৃঃ অঃ আষাঢ় মাসে শিশির-কুমার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে সময় ভূমিষ্ঠ হন, ঠিক সেই সময়, গ্রামের কতকগুলি স্ত্রীলোক, একটী বিবাহ উপলক্ষ্যে, 'জলসইবার' জন্য শঙ্খ, বাদ্য ও উলুধ্বনি করিতে-করিতে হরিনারায়ণের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মগ্রহণের সময় চন্দ্রগ্রহণ হইতেছিল এবং নবদ্বীপবাসিগণের হরিসংকীর্ত্তনে ও মাঙ্গলিক বাদ্যে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ হইয়াছিল। হরিনারায়ণ সে কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার নবজাত পুত্রের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ছেলে যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে সে একজন অদ্বিতীয় পুরুষ হইবে সন্দেহ নাই।"

যাঁহারা কর্ম্মজীবনে আপন-আপন প্রতিভাবলে সমাজে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন, বাল্যাবস্থাতেই তাঁহাদের চরিত্রে একটা না একটা বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছে। পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে শিশিরকুমার যে দিন গুরুমহাশয়ের নিকট বিদ্যারম্ভ করেন, সেইদিনই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। গুরুমহাশয় শুভদিন দেখিয়া শিশিরকুমারের হাতে-খড়ি দেন। একখণ্ড খড়ির দ্বারা তিনি ক, খ, গ, ঘ, ইত্যাদি বর্ণমালা লিখিয়া দিলেন; ছাত্র শিশিরকুমার সেই লেখা

জীবনী-লেখক

দেখিয়াই বর্ণলিখন-শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছিলেন *। অনেকেরই নিকট ইহা হয় ত অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে; কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের কার্য্য যে অনেক সময় সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। শিশিরকুমার যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, তখন দেশে শিক্ষা-বিস্তারের পথ একরূপ রুদ্ধ ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। গ্রামে বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা না থাকায় শিশিরকুমার

* বঙ্কিম বাবুর সম্বন্ধেও এইরূপ একটী গল্প প্রচলিত আছে। উভয়েরই পক্ষে ইহা যে সম্ভাব্য, উত্তরকালে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা বসন্তকুমার ও হেমন্তকুমারের সহিত যশোহরে পিতৃদেবের নিকট থাকিয়া জেলা-স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁহাদের কোনও গৃহশিক্ষক ছিলেন না। বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষায় তৃপ্ত হইতে না পারিয়া ভ্রাতৃদ্বয় গৃহে নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমার অসাধারণ ধীসম্পন্ন ছিলেন। গৃহে অধ্যয়ন করিয়া তিনি দর্শন, বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র এবং সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দশ অঙ্কে দশ অঙ্কে মনে-মনে গুণ করিতে পারিতেন। রসায়নশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য তিনি ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। শেষে তিনি জন ষ্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থের টিপ্পনী ও নূতন পদ্ধতিতে একখানি ইংরাজী ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বসন্তকুমার বাটীতে অধ্যয়ন করিয়াই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হেমন্তকুমার মেডিকেল কলেজে পাঠ করিতেন। শিশিরকুমার হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে ছাত্রগণ যেমন ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষা দিতে পারে না, পূর্ব্বেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। শিশিরকুমার সপ্তদশ বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎকালে প্রবেশিকা পরীক্ষার পর ছাত্রগণ বি-এ পরীক্ষা দিতে পারিত। বাড়ীতে অধ্যয়ন করিয়া শিশিরকুমার বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। পূর্ব্বে সিবিল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিশিরকুমার কিছুদিন এঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি এক মুহূর্ত্তও বৃথা কার্য্যে অপব্যয় করিতেন না। কোনও পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার আর জ্ঞান থাকিত না। শুনা গিয়াছে, অনেক সময় পাঠ আরম্ভ করিয়া তিনি সমস্ত রাত্রিই অধ্যয়নে অতিবাহিত করিয়াছেন, পরদিন প্রাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে তাঁহার চৈতন্য হইয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালী একেবারেই তাঁহার মনোমত ছিল না। তিনি বলিতেন, যে শিক্ষায় মনুষ্যত্বের উন্মেষ হয় না, যে শিক্ষায় মানুষকে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তায় সহায়তা করে না, যে শিক্ষায় ছাত্রগণের হৃদয়ে জীবনী-শক্তি সঞ্চার করিতে পারে না, সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে।

জ্যেষ্ঠ সহোদর বসন্তকুমারের অসামান্য জ্ঞানে, গুণে ও ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহোদর ও সহোদরাগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। বাল্যকাল হইতেই শিশিরকুমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্মুখে আদর্শ স্বরূপ রাখিয়াই তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যতদিন বসন্তকুমার জীবিত ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ ও তাঁহার উপদেশ ব্যতীত শিশিরকুমার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি তাঁহার শ্রীযমিয় নিমাই চরিতের দ্বিতীয় খণ্ড জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছেন, "যেমন কাদা মিশা পুতুল গড়ে, তিনি আমাকে গড়িয়াছিলেন।" বড়ই দুঃখের বিষয়, বসন্তকুমারের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না; দুরারোগ্য শ্বাসকাশিতে অতি অল্প বয়সেই তাঁহার শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি জীবিত থাকিয়া শিশিরকুমারের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে পারিলে, এ দেশের উন্নতির পথ আরও সুগম হইত। দেশের দুর্ভাগ্য, তাই মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে বসন্তকুমার ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রুগ্ন ও অল্পায়ু হইলেও বসন্তকুমার দেশের জন্য যাহা করিয়াছিলেন, পাঠক তাহা শিশিরকুমারের চরিত হইতে অবগত হইতে পারিবেন। যে শিশিরকুমার ভবিষ্য জীবনে কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, বাল্যকালে তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া মানবজীবনের কর্ত্তব্য শিক্ষা করিয়াছিলেন।

শিশিরকুমারের বাল্যজীবনের কার্য্যাবলী নিবিষ্ট মনে পর্য্যালোচনা করিলে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়। নিরীহ প্রকৃতির বালককে পাঠক যদি "ভাল ছেলে" বলিতে চান, তাহা হইলে শিশিরকুমারের ন্যায় "মন্দছেলে" তাঁহার সময়ে তাঁহাদের দেশে ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। রৌদ্রের ভয়ে মানুষ যখন গৃহের বাহির হইতে সাহস করিত না, সেই সময় শিশিরকুমার মাঠে ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেন। গ্রামের মধ্যে যে সকল বৃক্ষ অতিশয় উচ্চ, কৃষকেরাও যাহাতে আরোহণ করিতে সাহস করিত না, শিশিরকুমার সেই সকল বৃক্ষের শিরোদেশে বসিয়া থাকিতেন। অশ্বারোহণে তিনি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। সমবয়স্কদিগের সহিত অশ্বারোহণে বহির্গত হইবার সময় তিনি সর্ব্বাপেক্ষা দুরন্ত অশ্বটী

আপনার জন্ত নির্ব্বাচন করিতেন। একবার একটি দুর্দান্ত অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি এরূপ সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহার জীবনসংশয় হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে, সুচিকিৎসার ফলে তিনি আরোগ্য লাভ করেন। অস্ত্র-সঞ্চালনে ও ব্যায়ামে তাঁহার সময়, যশোহরে তাঁহার সমকক্ষ লোক অতি অল্পই ছিল। সন্তরণে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। যশোহরে ভোলাপুকুর নামে একটী প্রশস্ত পুষ্করিণী আছে। সুপরিচিতনামা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় বাবু রামচরণ বসু যশোহর বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ছিলেন। তিনি একদিন শিশির-কুমারকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যদি মৃত্তিকা স্পর্শ না করিয়া পঞ্চাশবার ভোলাপুকুর পারাপার হইতে পার, তাহা হইলে আমরা সকল ছাত্র মিলিয়া তোমাকে একটী পদক পুরস্কার দিব।" শিশিরকুমারের নিকট কার্য্যটী অতি সামান্ত বলিয়া মনে হইল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে তিনি প্রাতে আট ঘটিকার সময় আরম্ভ করিয়া বেলা এগারটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে মৃত্তিকাস্পর্শ না করিয়া পঞ্চাশবার ভোলাপুকুর পারাপার হন *। বালকের অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ও যশোহরের জন-সাধারণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। ভয় কাহাকে বলে, শিশিরকুমার তাহা আদৌ জানিতেন না।

শিশিরকুমার দেখিতে কখনই সুলকায় ছিলেন না। শৈশবকালে তাঁহাকে দেখিলে কৃশ ও দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু যৌবনে তাঁহার ক্ষীণ শরীর অসাধারণ বল ধারণ করিত। কুস্তী সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি কৌশল অবগত ছিলেন, এবং সেই সকল কৌশল অবলম্বন করিয়া তিনি মল্লযুদ্ধের সময় তাঁহার অপেক্ষা বলবান ও বৃহৎকায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনায়াসে পরাজিত করিতে পারিতেন। তাঁহার অসম-সাহসিকতা, মানসিক তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার দুই একটী উদাহরণ দিতেছি। শিশিরকুমার তখন যশোহরের স্কুলে পাঠ করিতেন। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভীষণ ঝটিকা উত্থিত হইল, গাঢ় তিমির মেদিনীকে গ্রাস করিল। এমন সময়ে শিশিরকুমারের হৃদয়ে এক অদ্ভুত বাসনা জাগিয়া উঠিল। তিনি হেমন্তকুমারকে বলিলেন, "মেজদাদা, ঝঞ্ঝাবাতের ভীষণতা ত কখনও পরীক্ষা করা হয় নাই; আজ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখি।" হেমন্তকুমার তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন। এবং উভয় সহোদর লাঠী ঘাড়ে করিয়া সূচীভেদ্য অন্ধকার ও ঝটিকার মধ্য দিয়া পদুয়া মাগুরার দিকে ছুটিতে লাগিলেন। যশোহর ও মাগুরার মধ্যে ব্যবধান বারো মাইলের কম নহে। পথে জনমানব নাই; এইরূপ সময় হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমার মাগুরার পথে ছুটিতেছেন। রাত্রি এগার ঘটিকার সময় তাঁহারা বাড়ীতে পৌঁছিলেন। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন ও পল্লীবাসিগণ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

যশোহরের নিকটবর্ত্তী ঝিকরগাছা নামক স্থানে নীলকর সাহেবদিগের একটী আড্ডা ছিল। উক্ত কুঠীর সাহেবের সহিত শিশিরকুমারের পিতা হরিনারায়ণের একবার একটী মোকদ্দমা হইয়াছিল। বিচারে হরিনারায়ণ জয়লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে নীলকর সাহেবদিগের কিরূপ প্রতাপ ছিল, এই জীবন-চরিতে পাঠক যথাস্থানে তাহার কতকটা আভাস পাইবেন। মোকদ্দমায় পরাজিত হইয়া সাহেব দুঃখ, লজ্জা ও ঘৃণায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সাহেব হরিনারায়ণের বাটী লুণ্ঠন করিবেন, স্থির করিলেন। হরিনারায়ণ এই সংবাদে বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বাড়ীর মেয়েদের লইয়া অন্তত্র যাও, সাহেবের লোক বাড়ী লুণ্ঠন করিতে আসিলে অপমানের সীমা থাকিবে না।" পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া বালক শিশিরকুমার ক্রোধে থরথর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। বসন্ত ও হেমন্ত তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলেন। শিশিরকুমার একটু সংযত হইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "বাবা, দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ আমরা এবাটী পরিত্যাগ করিয়া যাইব না।

* He was one of the best swimmers in the District and he made his reputation in this respect by crossing and re-crossing fifty times without touching land, a big tank in the town of Jessore, called "Dhola Pukhar", having thus been in water for nearly four hours—Hindu Spiritual Magazine, January 1911, vol. v. No 11, page 392.

কাহার সাধ্য আমাদের বাড়ী লুণ্ঠন করে? সাহেবের ভয়ে আমরা যদি বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করি, তাহা হইলে লোকে আমাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা ও উপহাস করিবে। বাবা, আপনি বিন্দুমাত্র চিন্তিত হইবেন না। সাহেবের লাঠিয়ালগণ যদি আমাদের বাড়ী লুণ্ঠন করিতে আসে, তাহাদিগকে রীতিমত শিক্ষা না দিয়া ছাড়িব না।" শিশিরকুমারের তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা হরিনারায়ণের হৃদয়ে যুগপৎ সাহস ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। দাদা ও মেজদাদার সহিত শিশিরকুমার ছাদের উপর প্রচুর ইষ্টকখণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি কয়েকজন লাঠিয়ালও সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। সাহেব সকল কথা অবগত হইয়া হরিনারায়ণের বাড়ী লুণ্ঠন করিতে সাহস করেন নাই।

বাল্য হইতেই শিশিরকুমার সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি পাখোয়াজ বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে, প্রসিদ্ধ ওস্তাদগণ যখন ধ্রুপদ আলাপ করিতেন, তাঁহাদের সহিত তিনি সুন্দররূপ সঙ্গীত করিতে পারিতেন। শিশিরকুমারের খুল্লতাত চন্দ্রনারায়ণ একজন প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গবাদক ছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি ওস্তাদ রাখিয়া সেতারও শিক্ষা করিয়াছিলেন। বৈঠকখানায় বসিয়া তিনি যখন সেতার ও পাখোয়াজ বাজাইতেন, শিশিরকুমার অন্তরালে থাকিয়া নিবিষ্ট মনে তাঁহার বাদ্য শ্রবণ করিতেন। এইরূপে তিনি পাখোয়াজ ও সেতার বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি বাঁশী, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রও বাজাইতে পারিতেন। এই সকল শিক্ষার জন্য তাঁহাকে কোনও ওস্তাদের শরণাপন্ন হইতে হয় নাই। শিশিরকুমার ভগবদ্দত্ত শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে অল্প বয়সে সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করা বিচিত্র নহে। একদিন শিশিরকুমারের পিতৃদেব হরিনারায়ণ যশোহর হইতে বাড়ী গিয়াছেন। সন্ধ্যার পর গ্রামের বহু ভদ্রলোক তাঁহার বৈঠকখানা-গৃহে সমবেত হইয়াছেন; এমন সময় হরিনারায়ণ বলিলেন, "চন্দ্র, তুমি কেমন সেতার শিখেছ, একটু শোনাও দেখি।" চন্দ্রনারায়ণ সেতার লইয়া একটী রাগিণী আলাপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু এক স্থানে কেমন গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি দুই-তিনবার আলাপ করিয়াও আপনার ভ্রম সংশোধন করিতে পারিলেন না। বৈঠকখানা-গৃহের বাহিরে আসিয়া শিশিরকুমার ও বসন্তকুমার কাকার রাগিণীর আলাপ শুনিতেছিলেন। শিশির বসন্তকে বলিলেন, "দাদা, ছোট কাকার একটা ভুল হচ্ছে; ছোটকাকা সেটা ঠিক করে বাজাতে পারছেন না। আমি ঠিক করে রাগিণী আলাপ করতে পারি।" বসন্তকুমারের বড় আনন্দ হইল; তিনি ধীরে-ধীরে পিতার নিকটে গিয়া বলিলেন, "বাবা, শিশির বলছে, ছোট কাকার যে ভুল হচ্ছে, সে তা ঠিক করে বাজাতে পারে।" উপস্থিত সকলে শুনিয়া অবাক্ হইলেন। চন্দ্রনারায়ণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "শিশির লেখাপড়া ছেড়ে এখন বুঝি গান-বাজনা শিখ্‌ছে। ওর আর লেখাপড়া হ'বে না দেখ্‌ছি।" বৈঠকখানা গৃহে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেরই কেমন একটা কৌতূহল হইল। সকলের অভিপ্রায় অনুসারে ও হরিনারায়ণের আদেশে শিশিরকুমার সেতার লইয়া তাঁহার পিতৃব্য যে রাগিণী আলাপ করিতেছিলেন, তাহা অতি সুন্দর ভাবে আলাপ করিলেন। চন্দ্রনারায়ণের যেখানে ভ্রম হইতেছিল, শিশির সেইস্থানটী বিশেষ করিয়া তিন চার বার বাজাইলেন। উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হইলেন। শিশিরকুমার সঙ্গীত-শাস্ত্রে এতদূর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্য জীবনে তিনি স্বয়ং "অমৃত বেলোয়ার" নামে একটী রাগিণী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানগণ এই রাগিণী অবগত আছেন। শিশিরকুমার 'সঙ্গীত-শাস্ত্র' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎকালে এই শ্রেণীর পুস্তক দেশে ছিল কি না, তাহা আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না।

কলিকাতার বামাপুকুরের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয় ধ্রুপদ শুনিতে ভালবাসিতেন না। যৌবনে শিশিরকুমার সপরিবারে যখন কলিকাতায় অবস্থান করেন, সেই সময় রাজা একদিন তাঁহার সঙ্গীত শুনিবার জন্য তাঁহাকে আপনার বাটীতে আহ্বান করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার, সহোদর মতিলালকে সঙ্গে লইয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা যে ধ্রুপদ শুনিতে ভালবাসিতেন না, শিশিরকুমার তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। মতিলালের সহিত তিনি প্রথমেই ধ্রুপদ আলাপ করিতে

আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের গান শুনিয়া রাজা মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার নয়নে আনন্দাশ্রু উদ্গত হইল। এই সময় হইতেই রাজা ধ্রুপদ শুনিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও বড় ধ্রুপদ-বিদ্বেষী ছিলেন; কিন্তু তিনিও শিশিরকুমারের গান শুনিয়া স্বীয় মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

যে বিষয়েই শিশিরকুমার হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। একদিন তিনি বৃক্ষ হইতে একটী করবী পুষ্প চয়ন করিয়া তাহা আপনার সম্মুখে রাখিয়া অঙ্কন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই অঙ্কিত করবী পুষ্পটী দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। শিশিরকুমারের স্বহস্তের অঙ্কিত কোনও চিত্র এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার অঙ্কিত চিত্র দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, চর্চ্চা রাখিলে তিনি একজন সুনিপুণ চিত্রকর হইতে পারিতেন। শিশিরকুমারের শৈশবের আর একটী গুণ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ ঘোষ মহাশয় আইন-ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেন। শিশিরকুমার ধনীর সন্তান হইয়াও বিলাসী কিম্বা ধনাভিমানী ছিলেন না। পরের জন্য তিনি সামান্য শ্রমজীবীর কার্য্য করিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। মাওরায় অভয়চরণ গাঙ্গুলী নামক জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ঘোষ-পরিবারের অনুগত ও আশ্রিত ছিলেন। একবার তাঁহার একখানি বাসগৃহ নির্ম্মাণের সময় শিশিরকুমার স্বহস্তে ঘরের দেওয়াল হইতে আরম্ভ করিয়া চাল প্রস্তুত ও ছাওয়া পর্য্যন্ত শেষ করিয়াছিলেন। অনেকেরই নিকট এই কার্য্য অতিশয় সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে; কিন্তু সামান্য-সামান্য কার্য্য হইতেই মানবের চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার অধিকতর সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পাশ্চাত্য রীতি, নীতি ও শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের দেশে এক নূতন বাতাস প্রবাহিত হইয়াছিল। ধর্ম্ম ও-সমাজ-সংস্কার-বাসনা প্রবল বন্যার ন্যায় বঙ্গদেশকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। এই সময়ে বহু ইংরেজী-শিক্ষিত যুবক সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের পূর্ব্বপুরুষগণ শক্তি-উপাসক ছিলেন। হরিনারায়ণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পুত্র বসন্ত, হেমন্ত ও শিশির পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রীতি-নীতির আলোক প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের অবলম্বিত ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ প্রসার ও প্রতিপত্তি লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু তখন ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করা নিন্দাজনক ও ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া বিশেষ গৌরবজনক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সে সময়ের অবস্থা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। পুত্রগণের ধর্ম্মান্তর গ্রহণে পিতা হরিনারায়ণ হৃদয়ে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃত্রয়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের ব্যাপার লইয়া তাঁহাদের দেশমধ্যে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। শেষে তাঁহারা নেতৃগণ কর্ত্তৃক সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মানুরাগ ও সৎকার্য্য দ্বারা বংশের যে গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আজ তাহা পুত্রগণের ব্যবহারে লুপ্ত হইতে চলিল, এই চিন্তা হরিনারায়ণের হৃদয়কে শান্তিহীন করিয়া তুলিয়াছিল। একদিন তিনি বসন্ত, হেমন্ত ও শিশিরকুমারকে সঙ্গে লইয়া দেবালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক দেবমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম করিতে আদেশ করিলে, বসন্তকুমার নয়নজলে জনকের চরণযুগল ধৌত করিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "বাবা, আমাকে ক্ষমা করুন। যে ভাবে ভগবানকে পূজা করিলে আমরা হৃদয়ে আনন্দ ও প্রীতি প্রাপ্ত হই, আপনি কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে সেই ভাবেই তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে দিন। অনুগ্রহ করিয়া আপনি আপনার পুত্রগণের স্বাধীন ধর্ম্মচিন্তায় হস্তক্ষেপ করিবেন না।" ভাবোন্মত্ত পুত্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া পিতা হরিনারায়ণ নীরবে অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ইহার পর হইতে পিতা ও পুত্রগণের মধ্যে ধর্ম্মমত লইয়া আর কখনও আলোচনা হইত না।

শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ যখন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হন, সেই সময় দেশের অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সামাজিক তাড়নার আশঙ্কায় অন্তরে ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইলেও প্রকাশ্যভাবে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সাহসী হন নাই। বসন্ত ও তাঁহার সহোদরগণ কিন্তু সামাজিক তাড়না উপেক্ষা

করিয়া প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হইত, বলদ ও তাঁহার ভ্রাতারা তাহা করিতে কোনও বাধা-বিঘ্ন গ্রাহ্য করিতেন না। বঙ্গদেশে চারি শ্রেণীর কায়স্থ আছেন,—দক্ষিণ রাঢ়ী, উত্তর রাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র। বর্ত্তমানে বহুল প্রচলন না হইলেও, এই চারি শ্রেণীর মধ্যে ক্রমে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই প্রথার প্রচলন ছিল না। শিশিরকুমারের তিনটী ভগিনীর মধ্যে দুইটীর বিবাহ হরিনারায়ণের জীবদ্দশায় সম্পন্ন হইয়াছিল। শিশিরকুমার কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ দিয়াছিলেন। শিশির ও তাঁহার সহোদরগণ দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ; কিন্তু সমাজের তাড়নার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর সহিত সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কারই শিশিরকুমারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পাবনা জেলা নিবাসী হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল সরকার মহাশয়ের সহিত তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হয়। উত্তরকালে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে শিশিরকুমারের মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। যখন তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মধুর ধর্ম্মের রসাস্বাদন করিয়াছিলেন, সেই সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুরাগী হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের জন্য শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ সমাজচ্যুত হইলেও, তাঁহারা যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহাদের পারিবারিক শান্তি সামাজিক শাসনে হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। পল্লীবাসিগণ তাঁহাদের সংস্রবে না আসিলেও, শিশিরকুমার স্বীয় ভ্রাতা-ভগিনীগণের সহিত আনন্দে দিনযাপন করিতেন। সহোদর ও সহোদরাগণের পরস্পরের প্রতি স্নেহ অতুলনীয় ছিল। কেহ কাহারও বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিতেন না। পারিবারিক উপাসনাকালে ভ্রাতা-ভগিনীগণ একত্র হইয়া কেহ গান করিতেন, কেহ বা বাজাইতেন। স্নেহময়ী জননী অমৃতময়ীকে মধ্যস্থলে বসাইয়া শিশিরকুমার যখন সহোদরগণের সহিত স্বরচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী আলাপ করিতেন, সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের পরিবারস্থ অনেকে এখনও আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করেন। সঙ্গীতটি এখনও ব্রাহ্মসমাজে আদরের সহিত গীত হইয়া থাকে। সে সঙ্গীতটী এই—

"মা যার আনন্দময়ী তার কিবা নিরানন্দ।
তবে পাপী তাপী শোকী, মিছা তুমি কেন কান্দ॥
মাঝখানে জননী বসে,
সন্তানগণ চারি পাশে,
ভাসাইছেন প্রেমময়ী প্রেম-নীরে।
পাপ তাপ দূরে গেল,
আনন্দরস উথলিল,
বাহু তুলে মা মা বলে, নৃত্য কর সন্তানবৃন্দ।"

দ্বিতীয় পক্ষ

[শ্রী———]

(১)

রামবাবু সদরালা; তাঁর পুরা নাম রামসর্ব্বস্ব চক্রবর্ত্তী। আদালতের কাগজ-পত্র সহী করিতে-করিতে যখন তাঁর হাত অবশ হইয়া আসিত, তখন অনেক সময় তিনি, নাম ও উপাধি নির্ব্বাচন বিষয়ে পিতামাতার অপরিণামদর্শিতার কথা স্মরণ করিয়া, আফ্‌শোষ করিতেন।

তাঁহার স্ত্রী নয়নতারা দ্বিতীয় পক্ষ, তবে বেশ পাকা—পুরাতন দ্বিতীয় পক্ষ। তাঁহার গর্ভের সন্তান এখন বি-এল্ পাশ করিয়া মুন্সেফীর উমেদারী করিতেছে। প্রথম পক্ষের একমাত্র ওয়ারিশ কন্যা ঘরণী-গৃহিণী রায় বাহাদুর ডেপুটীর পত্নী। সুতরাং নিজের ঘরে নয়নতারাকে দ্বিতীয় পক্ষ সাব্যস্ত করিবার কোনও আইন-সঙ্গত প্রমাণই বর্ত্তমান ছিল না।

রামবাবু সদরালা; কর্ম্মদোষে এবং সহচরগুণে নিতান্তই হিসাবী হইবার তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু নয়নতারা বেথুন স্কুলে পড়া মেয়ে; তার দ্বিতীয় পক্ষ। কাজেই সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করার সুযোগ রামবাবুর বড় ঘটিয়া উঠে নাই।

তাঁহার বাড়ীঘর বেশ গোছান, আসবাবও দু'চার খান বেশ আছে। তিনি স্ত্রী-প্রসাধিত হইয়া যখন আদালতে যাইতেন, তখন তাঁহার পালিশ-করা সাম্মিত, কলার এবং চোস্ত পোষাক দেখিয়া লোকে হাকী ডেপুটী বলিয়া ভ্রম করিত, সদরালা তো ভাবিতই না।

রামবাবুর মেয়ে রমা;—রামবাবু নামকরণ বিষয়ে স্ত্রীর সন্নিবেচনার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেন—শুধু রমা, 'সুন্দরী' 'অসুন্দরী' কিছুই নহে। রমাদেবী ঢাকার ইডেন হাইস্কুলে পড়ে, এবার ম্যাট্রিকুলেশন দিবে। নয়নতারা মেম সাহেব এবং উন্নত ব্রাহ্ম মহিলাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং নিজের হৃদয়ের যত অপূর্ণ সাধ তাহা মেয়েকে দিয়া পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেন। রমা সুন্দর ইংরাজী বলে, পিয়ানো বাজায়, চমৎকার ছবি আঁকে; এ ছাড়া সে পড়াশুনায়ও খুব ভাল। তাহার কৃতিত্বে নয়নতারা নিজেকে খুব কৃতী মনে করিতেন।

মেয়ের বিবাহের জন্য পিতামাতা অপেক্ষা আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের আগ্রহ অত্যন্ত বেশী হইয়া উঠিয়াছে। নানা স্থান হইতে কুটুম্বিনীরা নানারকম ভালমন্দ পাত্রের সন্ধান দিতেছেন। পিতা মাতা দুজনেই কোনও পাত্রকেই ঠিক পছন্দ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। একটি ছেলে অন্যান্য বিষয়ে অনেকটা পছন্দ হইয়াছিল; কিন্তু তার নাম ভবিভূতি, উপাধি মজুমদার। রামসর্ব্বস্ব নিজের নামের বোঝা স্মরণ করিয়া এ পাত্রটিকে একেবারে মন হইতে বরখাস্ত করিয়াছিলেন।

ভবিভূতির আর একটা গুরুতর দোষ ছিল, যেটার জন্য নয়নতারার আপত্তি ছিল; সে আপত্তির কথা কিন্তু বলিবার উপায় ছিল না,—সে বিপত্নীক। বিবাহের দুই বৎসর পরে তাহার পত্নীবিয়োগ ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যেই গুণবতী স্ত্রী একটি কন্যারত্ন রাখিয়া গিয়াছেন;—মেয়েটী মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইতেছে।

ভবিভূতি সরকারী ডাক্তার—বয়স বছর ত্রিশেক। দিব্য সুপুরুষ, পৈত্রিক দুপয়সাও বেশ আছে।

(২)

রামবাবু সকাল-বেলায় বাজার করিয়া ফিরিতেছেন,—অপবাদ সত্ত্বেও তিনি এ কাজ নিজেই করিতেন—পথে দেখিলেন, তাঁহার পাশের বাড়ী, যেটা খালি পড়িয়াছিল, ধোয়া হইতেছে। তিনি থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাড়ীতে কে এল?" বাড়ীর একটি লোক উত্তর করিল, "হাঁসপাতালের নূতন ডাক্তারবাবু।" "কি নাম তাঁর?" "ভবিভূতি বাবু।" "ভবিভূতি! মজুমদার?" "আজ্ঞে হাঁ।"

রামবাবু থমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে মনে বলিলেন "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!" তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিলেন; মোটের উপর তাঁর রক্তের গতি একটু বাড়িয়াই গিয়াছিল—কেন না নামটা মন্দ হইলেও ভবিভূতি পাত্র ভাল।

গিন্নীকে বলিলেন, "দেখ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ! ভবিভূতি ছোঁড়া বদলি হ'য়ে এই ঢাকায়ই এয়েছে; আর নিবি তো নে,—পাশের বাড়ীটাই ভাড়া নিয়েছে।"

গিন্নী বলিলেন, "তাই না কি? তা' বেশ, মন্দ কি?" কিন্তু মনের ভিতর তাঁর মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। তাঁর সমস্ত জীবনটা তিনি নিজেকে একটা অমূল্য সম্পদে বঞ্চিত মনে করিতেন। তাঁহার প্রতি স্বামীর যত্নের ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তবু, কি জানি কেন, তাঁর মনে একটা দারুণ অভাব থাকিয়া গিয়াছিল। তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল অল্প বয়সে—রামসর্ব্বস্ব বাবুর তখন ৩৬ বছর বয়স। যৌবন আসিতে-আসিতে তাঁহার চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছিল—আর মুন্সেফী জীবনে চল্লিশ বছরকে ঠিক যৌবনের অবস্থা বলা চলে না। রামসর্ব্বস্ব বাবু অবশ্য নূতন বৌ লইয়া মাতামাতি কম করেন নাই; কিন্তু কি জানি কেন, তাঁহার মাতামাতিতে নয়নতারার মনটা তাতাইয়া উঠে নাই। তিনি মোটের উপর সুখেই ছিলেন—বিশেষ কোনও অভাবও অনুভব করেন নাই, কিন্তু স্বামীপ্রেমে পাগল হইতে পারেন নাই।

যখন যৌবন অতীত হইয়া গেল, তখন একদিন নয়নতারা প্রাণের ভিতর একটু তাপ অনুভব করিলেন—সে অনেক কথা। কিন্তু তখন তিনি গতযৌবনা, হৃদয়ের উত্তাপ কেবল একটী দীর্ঘশ্বাসে উপিয়া গেল। সেই অবধি তিনি তাঁহার বঞ্চিত যৌবনের অনুশোচনায় প্রাণের কোণে একটা ধিকার জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার হাস্যময় প্রচুর জীবনের ভিতর এই হতাশা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত হইতেছিল।

একমাত্র আদরিণী মেয়েকে জীবনের ব্যর্থতার হাতে

বিসর্জ্জন দিতে তাঁ'র মন সরিতেছিল না। তবে নয়ন-তারার বয়স হইয়াছে, বিষয়বুদ্ধিতে তিনি রীতিমত পাকিয়া উঠিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন যে, নিছক প্রেমের হাওয়া খাইয়া প্রাণও বাঁচে না, বেশ স্থায়ী রকমের সুখ-স্বচ্ছন্দতাও হয় না। তাই কেবল প্রেমের খাতিরে এমন স্বামীলাভের সর্ব্বাঙ্গীন সৌভাগ্য হইতে কন্যাকে বঞ্চিত রাখিতেও তাঁহার বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল। তাই তিনি যখন বলিলেন "বেশ, মন্দ কি ?" তখন তাঁ'র মনের তলায় সঙ্গে-সঙ্গে ধ্বনিত হইল, "মন্দ নয় কি ?"

(—৩—)

ভববিভূতি পাড়া জমাইয়া বসিল। এমন এক-একজন লোক আছে, যারা আসে-যায়, তাতে কারো কিছু আসে-যায় না। ভববিভূতি সে দরের লোক নয়। সে যেখানে যায়, সেখানে সবাই প্রসন্নভাবে তা'র আগমন অনুভব করে। যেমন সূর্য্য যখন দেখা দেন, তখন অত্যন্ত মরা যে গাছপালা, তারও অঙ্গে যেন একটা পুলকের ঢেউ বহিয়া যায়, সে পুলক যেন শুধু চোখে দেখা যায়। ভববিভূতির জাঁকজমক না ছিল, তা নয়; তাঁর গাড়ী ঘোড়া, আসবাব, চাকরবাকর সবই একটু সাধারণের চেয়ে বড় রকমের; কিন্তু সে জাঁক-জমক কারো চোখে লাগিত না, সবাই সেটাকে নিতান্ত সহজভাবে গ্রহণ করিত। চোখে লাগিত কেবল মানুষটি। কোন-কোনও মানুষের ভিতর এমন একটা বৈদ্যুতিক শক্তি আছে, যাতে তা'রা সকলকে কাছে টানিয়া আনে, মরা প্রাণে সাড়া বাহির করে, আর সবাইকে ডিঙ্গাইয়া নিজের মাথা খাড়া করিয়া থাকে। ভববিভূতি সেই রকমের লোক।

অল্পদিনের মধ্যেই তা'র বেশ পসার জমিয়া উঠিল। কিন্তু তার চেয়ে বেশী জমিল তার বাড়ীতে আড্ডা। সন্ধ্যার পর হইতে তা'র অবসরের সময়,—তখন বাড়ী বন্ধুবান্ধবের হাস্যে মুখরিত থাকিত। চায়ের পেয়ালার ঠুন্ ঠুন্, পাশার হুড়হুড়ানি, আর তাসের চট্‌পট্ শব্দ শান্ত মৃত পাড়াটার ভিতর একটা জীবনের ঢেউ খেলাইয়া দিত। কিন্তু সব চেয়ে উঁচু দরের ছিল আলাপ। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের খুব উচ্চ অঙ্গের আলোচনা হইত ভববিভূতির মজলিসে; আর তা'র প্রধান বক্তা ছিল ভববিভূতি। যেই যাহা বকুক বা বলুক, প্রত্যেক বিষয়েই ভববিভূতির কথা না শুনিয়া কাহারও উপায় ছিল না। আর তার কথায় সর্ব্বদাই এমন একটা দৃঢ়তা ও স্পষ্টতা থাকিত, এমন তার ক্ষমতা ছিল সব বিষয়ে নূতন কিছু জোর করিয়া বলিবার যে, যে শুনিত, তাহাকেই মনে-মনে নিজের খর্ব্বতা অনুভব করিতে হইত, তা সে তার মত স্বীকার করুক বা নাই করুক।

পাশের ঘরে তাস চলিতেছে। এ ঘরে বসিয়া ভব-বিভূতি অন্যমনস্ক হইয়া পিয়ানোর উপর হাল্কা ভাবে অঙ্গুলি চালাইতেছে। ইংরেজীর প্রফেসার যোগেনবাবু ও দর্শনের প্রফেসার অমৃতবাবু রবি বাবুর "ঘরে বাইরে" লইয়া ঘোর তর্ক লাগাইয়াছেন। যোগেশ বাবুর মত যে, "ঘরে বাইরে" উপন্যাস হিসাবে কিছু নয়, কিন্তু "fine literature"—বেশ সরল সাহিত্য। অমৃত বাবু বলেন, যেটা যা' হতে চায় সেটা যদি তা' না হয়, তবে সেটাকে একটা ভাল জিনিস বলে গ্রাহ্য করা চলে না। খানিকক্ষণ তর্ক চলিবার পর ভববিভূতি পিয়ানো হইতে ঘুরিয়া বসিয়া বলিল, "দেখ অমৃত, তোমাদের কথা শুনে হাসি পায়। একজন বড় পণ্ডিত বলেছেন যে, প্রত্যেক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একটা-একটা লোক আছে, যারা নিজ-নিজ ব্যবসার চারধারে একটা খুব বড় আর খুব গভীর খাদ গড়ে ফেলায়। তাই গড়া হ'লে তাদের আর সেই গণ্ডী পেরবার জো থাকে না। তোমাদের হয়েছে তাই। সাহিত্য ব্যবসায়ীদের Rhetoric, অলঙ্কার প্রভৃতির নিয়ম হচ্ছে সেই প্রকাণ্ড খাদ। তোমরা যদি কাউকে সে খাদ ডিঙ্গাতে দেখ, তবে অস্থির হ'য়ে ওঠ, অচলায়তনের মহাপঞ্চকের মত তোমরা তোমাদের তন্ত্র-মন্ত্র প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে তার বিচার করতে বসো। কিন্তু যে প্রকৃত প্রতিভার অধিকারী, সে তোমাদের শাসন মানবে কেন? গড়বার জন্য যাকে ভগবান পাঠিয়েছেন, সে কেবল পুতুল সাজিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে কেন? হোমার যখন ইলিয়ড্ লিখেছিলেন, তখন কি তিনি নূতন জিনিষ সৃষ্টি করেছিলেন, না তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও আরিষ্টট্‌লের অনুশাসনের সীমা স্বীকার ক'রেছিলেন। রবি বাবুর সেই প্রতিভা আছে, যা'তে নূতন গড়তে পারে। উপন্যাস বলতে যদি তোমার বাঁধি গতের জিনিসটিকেই বোঝ, তবে উপন্যাস তিনি গড়েন নি ঠিক,—গড়েছেন এমন একটা

নূতন জিনিস, যেটা তা'র চেয়ে ঢের উঁচু ধরের। সেটা ভাল কি মন্দ, তার বিচার করতে গেলে, তোমাদের চির-দিনের মাপকাটী ফেলে দিয়ে criticismএর একটা খুব উঁচু ধাপে উঠতে হবে। আর্ট হিসাবে জিনিস ভাল হয়েছে কি মন্দ হ'য়েছে, সেটা বিচার করতে হবে,—সমস্ত বাঁধা formula, সব নিয়মতন্ত্র পিছনে রেখে, কেবলমাত্র আর্টের মূলসূত্র দিয়ে দেখ্‌তে হবে। সাধারণ মাপকাঠী এ সব জিনিসের নাগাল পায় না।"

তর্ক চলিল। ক্রমে দেখা গেল, অমৃত বাবুর প্রধান আপত্তি "ঘরে বাইরে"র মত বাইরের সামাজিক অনুষ্ঠানিকতা লইয়া। বিমলার মত কোন স্ত্রীলোকের মনের উপর ইহা ঠিক কি রকম প্রভাব বিস্তার করিবে, তা'র একটা বেশ সম্পূর্ণ হিসাব করিয়া অমৃত বাবু সাব্যস্ত করিলেন যে, রবি বাবুর ঘাড়ে অনেক পাপ চিরদিন চাপিয়া রহিবে।

যোগেশ বলিলেন, "সমাজের মনের নামে অনেক কুটা মাল চলিয়া যায়; কিন্তু তুমি সমাজের কটা লোকের মনের খবর রাখ? তুমি যা ব'লছ, তা' হ'লে এই ধরতে হয় যে, সমাজের ষোল আনা লোক গণ্ডমূর্খ, তা'রা রবিবাবুর গল্পের প্রতিপাদ্যটা বুঝবে না, কেন না সেটা সূক্ষ্ম; বুঝবে বেশ স্পষ্টভাবে সন্দীপের বক্তৃতা আর বিমলার চাঞ্চল্য; আর অম্লানবদনে সব মেয়েছেলে পরকীয়া চর্চ্চা ক'রবে।"

অমৃত বলিলেন "সমাজের পনেরো আনা লোক যে মোটা বুদ্ধির, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।"

ভবিভূতি বলিলেন, "কিন্তু সেই মোটা বুদ্ধির দিকে নজর রেখে যদি সবাই বই লিখতে বসে, তবে বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয়ের চেয়ে উঁচু ধরের সাহিত্য কারো কখনও লেখা উচিত হবে না। মিথ্যাকথা কহা বড় দোষ, এই সহজ সত্যটা যদি আর একটু ঘুরিয়ে বল্লেই পাপ হয়, তবে বাল্মীকির আমল থেকে এ পর্য্যন্ত যত সাহিত্য রচনা হইয়াছে, সব অতল জলে বিসর্জ্জন ক'রতে হয়। তাই যদি হ'ত, আর সেই সনাতন কাল থেকে যদি তোমার মত censorরা ব'সে এই রকম সাহিত্যের নাম কাটতে বসতেন, তবে আজ আমাদের ধর্ম্ম ও নীতি Fen Commandmentsএর গণ্ডী ছাড়িয়ে যেত কি না সন্দেহ।"

আবার তুমুল তর্ক আরম্ভ হইল। "ঘরে বাইরে"র নানা অঙ্গ, নানা দিক লইয়া নানা সমালোচনার পর তর্কটা আসিয়া পৌঁছিল বিমলা চরিত্রের স্বাভাবিকতার আলোচনায়। অমৃত বলিলেন, "একজন সাধ্বী পতিব্রতা হিন্দু রমণী যে হঠাৎ একটা লোকের মোহে পড়িয়া একেবারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল, ইহা একান্ত অস্বাভাবিক। রবিবাবু, হিন্দু-সমাজের ভিতর ধর্ম্মের যে গুপ্ত subconscious অনুভূতি আছে, সেটা একেবারেই অগ্রাহ্য করেছেন।"

যোগেশবাবু বলিলেন, "ধর্ম্মের এই অন্তঃসলিলা ধারার কথা শান্তি নিকেতনে রবিবাবুর লেখা পড়েই কি শেখ নি দাদা?"

অমৃত। কখনো না, এ কথা বহুদিন থেকেই চলে আসছে। স্বামী বিবেকানন্দ এটা যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমন কেউ করে নি।

যোগেশ। অন্ততঃ রবিবাবু যে সে কথা জানেন, তা'তে আর সন্দেহ নাই।

অমৃত। তিনি জানেন, কি না জানেন, সে কথা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক; আমি বলি তিনি এ জিনিসটার শক্তি যদি ভাল ক'রে বুঝতেন, তবে এমন অসম্ভব কথা কখনো লিখতে যেতেন না।

ভবিভূতি বলিল, "কোন্‌টা সম্ভব, কোন্‌টা অসম্ভব, সেটা তো শাস্ত্রের বা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে হিসাব করা চলে না; তার একমাত্র প্রমাণ মানব-চরিত্রের জ্ঞান। আমরা হিন্দু বলে' আমাদের কতকগুলা বিশেষত্ব আছে বটে, কিন্তু আমরা মানুষও বটে। আমাদের ভিতর হিন্দুত্বের চাইতে খুব বেশী প্রবল শক্তি আছে, তা' না স্বীকার ক'রে উপায় নাই। তা' ছাড়া এই যে চুম্বক-শক্তি, যাকে আমরা ভালবাসা বলি, সেটা তো আমাদের শিশু পিতৃগণের স্বভাবের উপর একটু improvement বই তো নয়। রক্তের জোর ধর্ম্মের জোরের চেয়ে খুব বেশী।"

অমৃত। কিন্তু, তুমি কি এই বলতে চাও যে, কোনও মানুষেরই এটা সম্ভব? রবিবাবু দাঁড় করাতে চান যে, বিমলা সত্যসত্যই নিখিলকে ভালবাসতো। তার পক্ষে সন্দীপকে দেখবামাত্রই একটা ভাবান্তর হওয়া, আর একদম ভালবাসায় উল্টা-পাল্টা হইয়া যাওয়া যদি সম্ভব হয়, তবে ভালবাসাটাসা কিছু নয় ব'লতে হয়।

ভব। তুমি কাব্যের চোখে মানুষকে দেখ্‌ছো,

মানুষের ভিতরকার অনুভূতির চোখে নয়। কাব্যের পক্ষ অতি সোজা। তাতে সাব্যস্ত করা হ'য়েছে যে, একজন কেবল একজনকেই সত্যি ক'রে ভাল বাসতে পারে;—অতএব যেখানে একজন ছেড়ে দু' জন দেখবে, সেখানেই বলবে, এই দ্বিতীয়ের প্রতি অনুরক্তি ভালবাসা নয়, একটা শারীর ব্যাপার; অথচ জগতের আদি থেকে মানুষ একাধিক লোককে ভাল বাসছে। অগ্নিমিত্র দুই স্ত্রীর পর আবার মালবিকাকে ভাল বাসলেন, আর কবি অম্লানবদনে সেটাকে ভাল বাসার জয় ব'লে কীর্ত্তন ক'রে গেলেন। আর রোজই পুরুষেরা দ্বিতীয় পক্ষ বিবাহ ক'রছে। Shaw যে বলেছেন Man is a polygamous animal সে কথা যে সত্য, তা' অস্বীকার করবার উপায় নাই।

যোগেশ এ কথায় বাঁকিয়া দাঁড়াইল, সে বলিল, "এ কথা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে খাটে না।"

কথায় কথায় কথা "ঘরে বাইরে" ছাড়াইয়া দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ সম্বন্ধে তর্কে পর্য্যবসিত হইল। ক্রমে কথা উঠিল রামসর্ব্বস্ব বাবু তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষকে ভাল বাসেন কি না, এবং যদি বাসেন, তবে প্রথম পক্ষকে ভাল বাসিতেন কি না; এবং নয়নতারা রামবাবুকে ভাল বাসিতে পারেন কি না। অমৃত ও যোগেশ এ সম্বন্ধে তুমুল তর্ক লাগাইয়া দিল।

ভবিভূতি বলিল, "ভালবাসাটা মনের জিনিষ। বাইরের লক্ষণ দেখে সেটার সম্বন্ধে যখন নিঃসংশয়ে কিছুই বলা যায় না, তখন এ নিয়ে তর্ক বৃথা। বাস্তবিক তাঁরা পরস্পরকে ভালবাসেন কি না, তা কেবল তাঁরাই বলতে পারেন। কিন্তু তাঁরাও জানেন কি না সন্দেহ, কারণ ভাল বাসা ব্যাপারটা স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর নির্ভর ও সেবার ভিতর এমন ক'রে মিশে যায় যে, তা'র সমগ্র সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাল বাসার বিচার করবার ক্ষমতা খুব উচ্চ অঙ্গের সূক্ষ্মদর্শিতা ছাড়া হয় না।"

এমন সময় বাহিরে রামবাবুর আওয়াজ শুনা গেল। যোগেশ হাসিয়া বলিল "Talk of the"—অমৃত বলিল "সদরালা গিন্নীর এয়োস্ত্রীর জোর আছে যে, বুড়ো এখনো কিছুদিন বাঁচবে।"

রামবাবু খুব ব্যস্তভাবে ঘরে চুকিয়া বলিলেন "ডাক্তার বাবু, আমার স্ত্রী যেন কেমনধারা হ'য়ে গেছেন, একবার আসুন।"

ভবিভূতি তৎক্ষণাৎ সদরালার সঙ্গে চলিয়া গেলেন। নড়ুলিস চলিতে লাগিল।

নয়নতারার খুব বেশী জ্বর হইয়া হঠাৎ তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। তিন দিন হইল সামান্য জ্বর; আজ সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ বিকার হইয়া ক্রমে একেবারে অসাড় হইয়া পড়িয়াছেন। ভবিভূতি আজ সকালে দেখিয়া টাইফয়েড সাব্যস্ত করিয়া ঔষধ দিয়াছিল। এখন দেখিল, খুব খারাপ রকমের টাইফয়েড হইয়া রোগিণীর coma হইয়াছে।

ঘরে চুকিয়াই রোগিণীর অবস্থা দেখিয়া সে শঙ্কিত হইয়া পড়িল। নয়নতারা স্থির-বদ্ধদৃষ্টি হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছেন, আর তাঁর শিয়রের কাছে সমস্ত পরিবার ব্যস্ত হইয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার মাথা কোলে করিয়া বসিয়া আছে দেবাপরায়ণা, অশ্রুমুখী রমা। তাঁহাকে দেখিয়া ভবিভূতির প্রাণের ভিতর ছাঁৎ করিয়া একটা আঘাত লাগিল। পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার বলিষ্ঠ মন সেটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া রোগিণীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

সমস্ত রাত্রি সে বিনিদ্র অবস্থায় রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিল। রামবাবু ও অন্য সকলে তাহাকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন; সকল অনুরোধ অবহেলা করিয়া সে রোগিণীর পরিচর্য্যা করিল।

পরদিন প্রত্যূষে সে রমাকে বিশেষ উপদেশ দিয়া বাড়ী গেল। দ্বিপ্রহরে হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়াই আবার আসিয়া বসিল। সেদিনও সমস্ত রাত্রি শুশ্রূষা চলিল।

রামবাবু বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, আপনি যা' ক'রছেন, তা' আমার ছেলেও ক'রতে পারতো না; কিন্তু আমি তো আমাদের জন্য আপনার শরীর নষ্ট ক'রতে দিতে পারি না।" ভবিভূতি হাসিয়া বলিল, "আমাদের মেডিক্যাল কলেজে থেকে-থেকে দিনরাত্রি সমান হইয়া গেছে; আপনি চিন্তা ক'রবেন না। আপনার স্ত্রীর যে অবস্থা, এতে সর্ব্বদা খুব অভিজ্ঞ লোকের দৃষ্টি রাখা দরকার। এখানে শিক্ষিত নার্স ভাল নেই, কাজেই আমার এ কাজ ক'রতেই হবে। আমি তো আর রুগী মেরে ফেলে অপযশ কিন্‌তে পারি না।" বলিয়া সে হাসিল।

রামবাবু শুনিয়াছিলেন, এ অদ্ভুত ডাক্তারটার এমনি

স্বভাব। আরও দু-এক জায়গায় সে এমনি করিয়াছে। তৃতীয় দিনে রামবাবুর বড় ছেলে আসিয়া পৌঁছিল। সেদিন ভবভূতি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল। পরদিন জ্বরের বেগ কমিয়া আসিল, বিকারটাও কাটিয়া গেল। ভবভূতি বলিল, "এখন খুব সাবধান থাকা দরকার; এই ভাব যদি চলে, তবে আর চিন্তা নাই।"

পঞ্চম দিনে অন্ন ত্যাগ হইল, কিন্তু তারপর আবার অন্ন জ্বর হইয়া আরও সাতদিন ভোগের পর নয়নতারা নিরাময় হইলেন।

তাঁর অসুখের সময় এই সুন্দর ছেলেটীর শুশ্রূষায় একাগ্র-নিষ্ঠা দেখিয়া নয়নতারা মনের ভিতর কত কথার তোলাপাড়া করিলেন। ভাবিলেন, এমন স্বামীর হাতে পড়া রমার সৌভাগ্য। আবার তখনি মনে হইল "দ্বিতীয় পক্ষ"; মনে হইল তাঁর নিজের বঞ্চিত যৌবনের কথা। শেষে মনে স্থির করিলেন, ইহারই হাতে রমাকে তুলিয়া দিবেন। ভাবিতে মন আবার কালিতে ভরিয়া উঠিল।

হিসাবী রামবাবু তখন ভাবিতে লাগিলেন, ভবভূতির প্রণামীর কথা; শঙ্কা হইল যে, বুঝি বা ডাক্তার-বিদায় করিতে তাঁহার পাঁজরের হাড় বিক্রী হয়। ৫০০৲ টাকার নোট পকেটে করিয়া তিনি ভবভূতির বাড়ী গেলেন; স্থির করিলেন, সামনা-সামনি দেওয়াই ভাল, বেশী কিছু চাহিতে চক্ষুলজ্জায় ঠেকিবে।

২০০৲ টাকার নোট হাতে করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনি যা ক'রেছেন, তার দাম দি, এমন শক্তি আমার নেই। যদি অনুগ্রহ ক'রে এই কটা টাকা নেন, তো কৃতার্থ—"

ভবভূতি হাসিয়া বৃদ্ধার হাত চাপিয়া বলিলেন "আরে রাম! বলেন কি রামবাবু!" নোটের তাড়া তৎক্ষণাৎ পকেটে গুঁজিয়া সে প্রসঙ্গও তুলিল না, রোগিণীর বিষয়ে নানা কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। রামবাবু নিজেকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত বোধ করিলেন; একবার মনে হইল বাকী ৩০০৲ টাকার নোট ডাক্তারের পায় ফেলিয়া দিয়া তাহাকে প্রণাম করেন। লজ্জায় বাধিল, তাহা আর পারিলেন না। ঘরে ফিরিয়া কেবলি ভাবিতে লাগিলেন, বেকুব, গণ্ডমূর্খ আমি, মানুষ চিনিতে পারি নাই।"

কিছুদিন পরে ভবভূতির মা ও বড় ভাই ভবরঞ্জন আসিয়া পৌঁছিলেন। স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া অবশেষে রামবাবু ভবরঞ্জনের কাছে বিবাহের কথা পুনরুত্থাপন করাইলেন। বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার মেয়ে বড়, সাজিয়ে গুজিয়ে দেখাতে আমি ইচ্ছা করি না, তবে তাঁরা যখন খুসী এসে তাকে দেখে যাবেন—শুধু মেয়ে যেন টের না পায়।"

একদিন ভবরঞ্জনের মা মেয়ে দেখিয়া গেলেন, ভবরঞ্জন আর একদিন আসিয়া রমার সঙ্গে আলাপ করিয়া গেলেন। আট-দশদিন পর ভবরঞ্জন কলিকাতায় চলিয়া গেলেন, বিবাহের কথা কিছু বলিয়া গেলেন না।

(৫)

কয়েকদিন চলিয়া গেলে রামবাবু ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। ভবভূতির হাতে কন্যাদান করাটা তিনি স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন,—আর এটা মেয়ের পক্ষে পরম সৌভাগ্য বিবেচনা করিতেছিলেন। তাঁর মেয়েকে যে ভবভূতি বিবাহ করিতে পাইলে আনন্দিত হইবে, সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। যখন ভবরঞ্জন মেয়ে দেখিয়া বেশ খুসী হইয়া তার সঙ্গে গল্পগল্প করিয়া গেলেন, তখন তিনি কেবল মনে মনে বিবাহের খরচের হিসাব করিতে লাগিলেন; কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করিবেন; কোন্ কোন্ কুটুম্ব আনাইবেন; কি রকম ঘটা করিবেন; এই সব ভাবিতে লাগিলেন। ঘটা করিবার বেশ একটু ইচ্ছা হইল, কিন্তু তখন মনে হইল যে ভবভূতির দ্বিতীয় পক্ষ, সে হয় তো বেশী ঘটা করিলে লজ্জা পাইবে; কথাটায় তাঁরও মনে একটু ক্লেশ হইল।

কিন্তু যখন দশ বারো দিন চলিয়া গেল, আর যখন ভবরঞ্জন কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন, তখন রামবাবু মহা গোলে পড়িলেন, বেশ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তবে কি এ বিবাহ হইবে না?

নয়নতারা মনে-মনে সম্পূর্ণ উল্টা দুই রকমের চিন্তা লইয়া হাবুডুবু খাইতেছিলেন। মেয়ের সর্ব্বাঙ্গীন সৌভাগ্যের কথা যখন মনের ভিতর আনন্দের ঢেউ তুলিয়া আসে, তখনি আবার উল্টা দিক হইতে দ্বিতীয় পক্ষের কথাটা তাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দেয়; এই রকম আলো-

ছায়ার ঢেউয়ে তাঁর মন ভরিয়া উঠিয়াছিল, এ কয়দিন সেই চিন্তা ছাড়া তিনি আর কিছুই ভাবেন নাই।

নয়নতারা কুটনা কুটিতেছে, মেয়ে উপরে পড়িবার ঘরে পড়িতেছে, এমন সময় রামবাবু আসিয়া একটা মোড়া টানিয়া গিন্নীর সামনে বসিলেন। বিরলকেশ মস্তকে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "ওগো, ভবরঞ্জন তো চলে গেল কলকাতায়, কিছু ব'লে তো গেল না।"

গিন্নী একটা আলু দ্বিখণ্ডিত করিতেছিলেন। দুইখণ্ড দুই হাতে ধরিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "চলে গেল? কিছু ব'লে গেল না? কি অভদ্র!"

স্বামী-স্ত্রী কেহ যে সম্ভাবনাটার কল্পনাও করেন নাই, ও পক্ষ হইতে বিবাহে অমতের সেই সম্ভাবনাটা নয়নতারাকে এই প্রথম আঘাত করিল। এতক্ষণ তিনি যে মত এবং অমতের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া দোল খাইতেছিলেন, এর ধাক্কায় তাঁহাকে ঠেলিয়া সেই স্থান হইতে সম্পূর্ণরূপে এ বিষয়ে সম্মতির ভিতর ফেলিয়া দিল। সঙ্গে-সঙ্গে মনে বড় অভিমান হইল।

রামবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন "অভদ্র কিসে বলি, হয় তো চক্ষুলজ্জা। জান তো ওরা কি ভালমানুষ!"

"কিন্তু এটা ওরা অবশ্য জানে যে, এতে আমাদের কত বড় অপমান করা হ'বে।" "দেখ গিন্নী, আমাদের যা' খেয়ে মনে হচ্ছে তাই, কিন্তু তোমার ছেলের বিয়ের কথায় তুমিও তো কত লোকের মেয়ে দেখেছ, কারু সঙ্গে তো এখনো শচীর বিয়ে হয় নি। দশটা মেয়ে দেখে বিয়ে দিতে হ'লে নটাকে তো নাপছন্দ ক'রতেই হ'বে।"

"কিন্তু নাপছন্দ করে কি বলে? হাজার হ'লেও দোজবরে ছেলে; তা'র সঙ্গে আমার এ চাঁদের মত মেয়ে, লেখাপড়ায়, কাজ-কর্ম্মে এমন মেয়ে দিচ্ছি এই ঢের। এ যে বাপু তা'দের আশ্চর্য্য দেমাক্।"

"দেমাক্ কি বল? দশটা দেখে যেটা পছন্দ হ'বে সেইটি নেবে। এর ভিতর দেমাক্ আসে না। আর, হ'ক দোজবরে, তবু আমরা যে আগ্রহ করে' দিতে যাচ্ছি এতেই তো বোঝা যাচ্ছে যে ছেলের গুণ তার দোজবরে' দোষকে ঢের ছাপিয়ে উঠেছে।"

"তাতো বটেই—তা নইলে এ কথা তোলেই বা কে? কিন্তু তবুও বলি, এতটা করা ভাল হয় নি। তোমার বুদ্ধিতেই তো এই নাহক অপমানটা হ'ল। তুমি যেন একেবারে খেপেই গেলে এই ছেলে ব'লে!"

রামবাবু হাসিলেন, "খেপেছিলুম তো আমি একা নয় খেপী?" "নিশ্চয়; আমি তো বরাবরই ব'লেছি, একটু ভাল ক'রে ভেবে-চিন্তে দেখ; খপ করে' কথাটা তুলে শেষে পস্তাতে না হয়।" কথাটা অনেকখানি সত্য। দোলায়মান চিত্তে নয়নতারা যখন স্বামীকে বিবাহের প্রস্তাব করিবার কথায় মত দিয়াছিলেন, তখন তাঁর মনে এই রকম হইয়াছিল। কিন্তু এ কথা ঠিক নয় যে, তিনি মুখ ফুটিয়া এ সন্দেহের কথা কখনো বলিয়াছিলেন।

রামবাবু বলিলেন, "যা'ক, সে সব কথা তুলে আর কি হ'বে। যা' হবার হ'য়েছে। কিন্তু ওদের মনের কথাটা কি একবার জানা দরকার নয়? তারা যে একেবারে, অপছন্দই ক'রেছে, তা'রই বা নিশ্চয়তা কি? হয় তো বা আরও মেয়ে দেখতে বাকী আছে; সে সব না দেখে একটা কোনও কথা ব'লতে চায় না।"

"তোমার মাথা আর মুণ্ডু! এতো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এ মেয়েতে তাদের মন নেই। না হ'লে তবু হাতে রাখবার মত একটা কথা তো ব'লে যেতে পারতো।"

রামবাবুর মনে পড়িল, ভবরঞ্জন তার এক জেঠামশায়ের কথা একবার তুলিয়াছিল, বলিলেন "হয় তো বা তার জেঠা-মশায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে মতামত জানাবে।" নয়নতারা মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন "হবে।" বলিয়া মুলতবী আলু-কাটা শেষ করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া রামবাবু বলিলেন, "আমি বলি, তুমি একবার ওর মার সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর মনটা বোঝ।"

নয়নতারা বলিলেন, "আমি যাবু, আমার মেয়ে নিয়ে অমন ফিরি ক'রে বেড়াতে পারবো না। আমার মেয়ের বিয়ে না হয় না হ'বে, তাতে তো ওর জীবনটা মিথ্যে হ'য়ে যাবে না। পড়ছে পড়ুক, ওই নিয়েই থাক।"

রামবাবুর মনের ভিতর সেকেলে ভাব ছিল, কিন্তু তিনি সে কথাটা বরাবরই চাপিয়া আসিয়াছিলেন, পাছে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কাছে কোনও মতে প্রাচীন সাব্যস্ত হইয়া পড়েন। তাই অশন-বসন, ধরণ-ধারণ তাঁর সম্পূর্ণ আধুনিক; কিন্তু মেয়ে যে চিরকাল আইবুড়

থাকিবে, এ কল্পনাটা তাঁর কাছে কিছুতেই ভাল লাগিল না। অনেক কথাবার্ত্তার পর সাব্যস্ত হইল যে, আজ দুপুর বেলায় নয়নতারা ডাক্তারের বাড়ী যাইবেন।

কিন্তু স্বামীকে কাছারীতে বিদায় করিয়া দিয়া স্নানাহার শেষ করিতে করিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল; তারপর তিনি সবে একখানা কৌচের উপর শুইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় মজুমদার-গৃহিণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"মেঘ না চাইতেই জল" দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আশান্বিত হইয়া উঠিল। তিনি একগাল হাসিয়া প্রতিবেশিনীকে সম্ভাষণ করিলেন।

ভববিভূতির মা অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প-সল্প করিলেন, কিন্তু আসল কথা কিছুই হইল না। নয়নতারারও জিজ্ঞাসা করিতে কিম্বা খুব পরোক্ষভাবেও কথাটা পাড়িতে বড় লজ্জা হইল। জগদম্বা ঠাকুরাণী চলিয়া গেলে নয়নতারা তাঁর কথাগুলি লইয়া তোলপাড় করিতে লাগিলেন। কয়েকটি কথা লইয়া তাঁহার যুক্তি তর্কের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

প্রথম কথা, গিন্নী বলিয়াছিলেন যে, ছেলে তাঁকে রোজ রোজ এ বাড়ীতে এসে নয়নতারার সঙ্গে আলাপ করিতে বলে। ইহা ভববিভূতির এ বিবাহে আগ্রহের পরিচায়ক।

দ্বিতীয় কথা, ভববিভূতির জননী মেয়েদের বেশী লেখা-পড়া শেখা অকর্ত্তব্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার নিজের এ বিবাহে আপত্তির সূচক।

তৃতীয় কথা, বিবাহে দেওয়া-থোয়ার কথা সম্বন্ধে গৃহিণীর মত এই যে, টাকার ওজনে আজকাল যে মেয়ের বিয়ে হয়, সেটা ভয়ানক অসঙ্গত; মেয়েটাই হ'ল আসল জিনিষ, অথচ সেইটাই লোকে ভাল ক'রে দেখা ভুলে গেছে।

চতুর্থ কথা, মেয়েদের স্থলক্ষণ-অলক্ষণের কথা; এই উপলক্ষে মেয়েদের বুট-পায়ে খট্ খট্ করিয়া মেমসাহেবদের মত লাফাইয়া চলার নিন্দা হইয়াছিল।

পঞ্চম কথা, ভববিভূতির প্রথমা স্ত্রীর রান্নার সুখ্যাতি।

ষষ্ঠ কথা, ছেলের সুখ্যাতি। সে তার মায়ের কথার ওঠ-বসে।

এ কথাগুলি নয়নতারা একসঙ্গে করিয়া তার ভিতর হইতে অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু জগদম্বা যে ভাবে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহাতে যে এগুলির এ রকম কোন অর্থ থাকিবেই, নিরপেক্ষ লোকে এ কথা হলপ করিয়া বলিতে পারে না। কথাগুলি একসঙ্গে বলা হয় নাই, এক-এক কথার প্রসঙ্গক্রমে এক-এক কথা উঠিয়া পড়িয়াছিল। নয়নতারা কিন্তু সাব্যস্ত করিলেন, ভববিভূতির এ বিবাহে সম্মতি আছে, কিন্তু গৃহিণীর অসম্মতি। মাতৃভক্ত পুত্র মায়ের কথাই মানিবে।

স্বামী ফিরিয়া আসিলে আবার এ কথা লইয়া আলোচনা হইল, কিন্তু কিছুই স্থির হইল না।

(৮)

ঘরে ফিরিয়া জগদম্বা দেখিলেন ভববিভূতি বাড়ীতে আসিয়াছে, তা'র মুখ অত্যন্ত অপ্রসন্ন। সে একটা মুমূর্ষু রোগিণীর চিকিৎসা করিতে গিয়াছিল, সে মারা গিয়াছে।

জগদম্বা বলিলেন, "কি বাবা, কি হ'ল।" "মারা গেছে। আমি বরাবরই জানি মেয়েটা বাঁচবে না, তবু শেষের দিকে বড্ড আশা হ'য়েছিল।" বলিয়া ভববিভূতি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

জগদম্বা বলিলেন, "হাঁ রে, তুই হলি ডাক্তার, তোর কি রুগীর ভালমন্দে অতটা মন খারাপ ক'রলে চলে?"

"কি ক'রবো মা? আমি তো পয়সা করবো ব'লে ডাক্তার হইনি; লোকের রোগ-শোক দেখে একেবারে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে না থেকে কিছু উপকার ক'রতে পারবো, সেই আশায় ডাক্তারী শিখেছি। আর সে বাড়ীর অবস্থা দেখে কার না কান্না পায়। ছেলেমানুষ মেয়েটি, তার স্বামী কলেজে পড়ে, তার একটি ছোট ছেলে আছে। মেয়েটা মরে' গেল, তা'র স্বামী ছেলেটাকে বুকে ক'রে যে রকমে ছট্‌ফটাতে লাগলো, দেখে ভারি কষ্ট হ'ল। আহা বেচারা কতবার জিজ্ঞাসা করেছে 'ডাক্তারবাবু, বাঁচবে কি?' কত আশা ক'রে আমার কাছে বারবার ঘুরেছে, অথচ আমি বরাবর জানি যে কিছুই ক'রতে পারবো না।" ডাক্তারের চোখ ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল।

জগদম্বা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন "ভগবানের হাত বাবা, তুমি কি ক'রবে। চল এখন খাবার খাবে চল।"

ভবভূতি নীরবে খাইতে খাইতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল "অথচ দেখ, দুদিন বাদেই হয় তো ওই ছেলেটা বিয়ে করে বসবে।"

মায়ের প্রাণ ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, তিনি সে প্রসঙ্গ চাপা দিলেন।

দুইদিন পরে মাতা ছেলের কাছে কথা তুলিলেন "বাবা, রঞ্জন লিখেছে, সুশীল ভট্‌চাযের মেয়েটি পরমা সুন্দরী, আর খুব সুলক্ষণা; বল তো সেখানেই কথা দিই।"

ভবভূতি একখানা বই পড়িতেছিল, মুখ তুলিয়া একদৃষ্টে মায়ের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, শেষে বলিল "না, মা, আমি বিয়ে ক'র্‌বো না, সেই ঠিক।"

"বিয়ে করবি নে কি রে? তোর বয়সে কি চিরদিন সন্ন্যাসী হ'য়ে থাকা শোভা পায়?"

ভবভূতি হাসিয়া বলিল, "সন্ন্যাসীর কি সাজটা দেখ্‌লে মা। আমার মত বাবুয়ানী ঢাকা সহরে কটা লোকে করে?"

"ওর মানেই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী কি সাজে করে, সন্ন্যাসী হয় মনে। বাড়ী ঘর দোর খাঁ খাঁ ক'রছে; একটা ছেলেপিলের আওয়াজ নাই, ঘরের লক্ষ্মী নাই, আমি তো বাছা, এ আর চোখে দেখতে পারি না।"

"আমিও তাই ভাবছিলুম মা! আমি বলি রেণুকে এবারে নিয়ে আসি। মেয়ে তো তিন বছরে পা দিয়েছে, আর সেখানে রাখ্‌বার কি দরকার?"

"তা আনবি বই কি? কিন্তু সেই একরোখা মেয়ে হলেই কি ঘরের ছিরি ফেরে? এমন পাগ্‌লামী করিস নে বাবা, আমার কথা রাখ, বিয়ে কর্। সুশীল ভট্‌চাযের মেয়ে ঘরে এলে তোর ঘর আলো হ'য়ে যাবে।"

এই সুশীল ভট্‌চাযের মেয়ের নামটা যেন কেবলই ভবভূতির মনে ঝঙ্কার তুলিতেছিল। সে বলিল "ঘর তো একবার আলো হ'য়েছিল মা, ভগবানের সইল না। আবার কেন? অদৃষ্ট কি তোমার কথায় ফিরবে মা?"

জগদম্বা আকাশ হইতে পড়িলেন। আজ এক বৎসর যাবৎ তিনি ছেলের বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন। ছেলের মত যদিচ কখনও জিজ্ঞাসা করেন নাই, তবু তার যে বিবাহে এমন একটা প্রচণ্ড আপত্তি আছে, একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তবু তিনি হাল ছাড়িবার পাত্র নন; তিনি বলিলেন "সে কি কথা, বাবা, একবার ঘর পুড়ে গেলে আর কি ঘর হয় না। এমন তো লোকের হোচ্ছে। এই তো পাশের বাড়ীতেই দেখ না; রামবাবু তাঁর দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে ক'রে না হ'য়েছে কি? তাঁর সংসার দেখলে চক্ষু জুড়ায়,—এমন সুখ-শান্তির সংসার, এমন স্ত্রী, এমন ছেলে, এমন মেয়ে সাত জন্মের পুণ্যের ফল।"

ভবভূতি বেশ একটু উদ্‌গ্রীব হইয়া কথাটা শুনিয়া গেল। কথাটা শেষ হইতেই সে যেন একটু হতাশ হইয়া মুখ ফিরাইল। মা অতটা লক্ষ্য করিলেন না।

একটু হাসিয়া ভবভূতি বলিল, "তা, ঠিক মা, রাম বাবুর বাড়ী দেখলে বিয়ে ক'রতে লোভ হয় বটে, কিন্তু যেটার লোভ হয়, সেইটাই যে ক'রতে হ'বে তা'র কোনও মানে নেই।" ভবভূতি বোধ হয় সরল ভাবেই কথাটা বলিয়াছিল, কিন্তু বলিয়া মনে হইল এ কথার একটা দ্বিতীয় অর্থ হইতে পারে। মাতা বলিলেন শোন ছেলের কথা! বিয়ে ক'রতে লোভ হয় যদি তবে বিয়ে করবি না কেন?"

"বিয়ে ক'রতে যেমন লোভ হয় তেমনি আরও দশটা ভাল মন্দ কাজ ক'রতেও তো লোভ হয়। আমার লোভটা বেশী প'ড়েছে অন্যদিকে,—তা'তে এত কাজ আর এত দায় যে, একটা সংসার হ'লে আমি তা কিছুতেই পেরে উঠবো না। বিয়ের স্বাদ তো একবার পাওয়া গেছে; এখন, এই নূতন জিনিষটা একবার পরখ করে দেখবো', স্থির ক'রেছি!"

মাতা একটু শঙ্কিত হইলেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সে কাজ?"

"কাজটা প্রকাণ্ড, কিন্তু আমার শক্তি ছোট; তাই সে কথা মুখ ফুটে কাউকে বলি না। সমস্ত জীবন সেই কাজে সমর্পণ করে যদি কিছু একটু সার্থকতা লাভ করি, তবেই ব'লতে পারবো লোককে। তবে এক কথায় ব'লতে পারি যে, কাজটা দীন-দুঃখীর সেবা।"

"সে কি আর বিয়ে ক'রলে হয় না? তোর বাপ যত দীন-দরিদ্রের সেবা ক'রেছেন, তেমন কটা লোক ক'রতে পারে?"

"তিনি ক'রেছেন ঠিক, কিন্তু যদি তোমার আমার চিন্তা তাঁ'র না থাকতো, তবে তিনি আরও কত বেশী কাজ ক'রতে পারতেন। তাঁর যতটা আকাঙ্ক্ষা ছিল, তার সিকির সিকিও তিনি ক'রতে পারেন নি। যদি তিনি

নিজেকে নিঃশেষ ভাবে দীন-দরিদ্রের সেবায় নিযুক্ত ক'রতে পারতেন, তবে তিনি জীবনটাকে কত বেশী সার্থক মনে ক'রতে পারতেন, সে কথা তিনি নিজেই তো কতবার ব'লেছেন। তুমি কি জান না মা, জীবনের ব্যর্থতা নিয়ে বাবা কত দিন কত ভাবে দুঃখ ক'রেছেন।"

মাতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। স্বামীর এ আত্ম-গ্লানির কথা তাঁর অজানা ছিল না। জগদম্বা নিজে কতদিন তাহাতে রাগ করিয়াছেন, অভিমান করিয়া বলিয়াছেন, "আমিই তো তোমার সকল পথের কাঁটা, আমি ম'লেই দুঃখ যায়।" তাহাতে স্বামী কত ক্লেশ পাইয়া গিয়াছেন—সে কথা ভাবিতে বিধবার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। শেষে তিনি বলিলেন, "আমি বাবা, অত-শত বুঝি না। সুশীল ভট্টাচাযের মেয়ে পছন্দ না হয়, তো যা'কে তোর পছন্দ হয়, একটা বিয়ে কর। বৌ আবার বিয়ে তুই নিজে যা খুসী কর্।"

ভবিভূতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন "মা, আমি কি তোমার সঙ্গে তামাসা করছি? আমি কি তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলছি? সুশীল ভট্টাচাযের মেয়ে পছন্দ হয় নি, তাই অন্য কথা বলে শুধু ভাঁড়াচ্ছি, এ কথা তুমি কি ব'লে মনে করলে?"

(৭)

ইহার দু'একদিন পর সন্ধ্যাবেলায় মহলিদে দু-এক কথার পরই অমৃত বলিয়া বসিল "হাঁ হে বিভূতি,তুমি না কি বিয়ে ক'রতে চাও না?"

ভবিভূতি সন্দিগ্ধ চিত্তে তাহার দিকে চাহিল; তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে এরা মায়ের চর।

যোগেশ বলিল, "এ বিষয়ে আমাদের সংবাদপত্রের মতে Great dissatisfaction prevails" 'আমাদের চা টা' গৃহলক্ষ্মীর হস্তস্পর্শ না থাকায় যেন কেমন লক্ষ্মীছাড়া মত খেতে লাগে। Ergo, তোমার বিয়ে করা আমাদের Unanimous resolution। যাঁহারা এ প্রস্তাবের সপক্ষে, তাঁহারা হাত তুলুন! All, All! বন্দেমাতরম্। Carried unanimously." বলিয়া যোগেশ একাই সভার সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া করতালি-ধ্বনি করিল। অমৃত বলিল, "তামাসা নয়, আমি তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে বিচার করতে চাই। তোমার কি বল্বার আছে বল।"

ভবিভূতি শান্ত ভাবে বলিল "তুমিই না সে দিন ব'লছিলে যে, একজনকে ভাল বাসলে তারপর আর একজনকে ভাল বাসা অসম্ভব? আমি আমার স্ত্রীকে সত্যসত্যই ভাল বাসতাম?"

যোগেশ বলিল,"সেই জন্যই তোমার বিয়ে করা দরকার; বিজ্ঞানের খাতিরে, Experimentএর জন্য। যদি তুমি বিয়ে ক'রে তোমার দ্বিতীয় পক্ষকে ভাল বাস, তবেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে, তোমার কথাই ঠিক, Man is a polygamous animal."

ভব। সে প্রমাণ আমি বিয়ে না ক'রলেই যে হ'বে না, তার কি মানে আছে। লক্ষ-লক্ষ লোক যে রোজ বিয়ে ক'রে দ্বিতীয়ার প্রেমে মসগুল হ'য়ে যাচ্ছে, তাতেই তো সে কথা প্রমাণ হ'য়ে গেছে। শুধু তাই নয়, পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের বেলাই যে এই ব্যাপার স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর অপেক্ষা রাখে না, তা'র ও তো ঢের প্রমাণ র'য়ে গেছে। Divorce Courtএর নথি দেখলে এমন লক্ষ-লক্ষ নজীর পাওয়া যাবে।"

অমৃত বলিল "তাই যদি হয়, তবে তোমার বিয়ে ক'রতে আপত্তি কি?"

ভব। বাঃ, আমিও তো তা হ'লে জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি যে, তোমরাই বা বিয়ে ক'রবে না কেন। এই ধর না অমৃত, তোমার গৃহিণীর তো এখন তিরিশের কাছাকাছি বয়স; তিনি ছেলে-পিলে নিয়ে বিব্রত, তোমার প্রেমের পরিতৃপ্তি সাধন করবার ক্ষমতা তাঁর নেই। তুমি কেন না বিয়ে ক'রবে?

যোগেশ। আমাকে যদি বল, তবে আমি বলি Barckis is willing, কিন্তু শতমুখীর ভয় এবং দুই স্ত্রী পালন করবার অক্ষমতাই আমার একমাত্র বাধা।

অমৃত। একমাত্র নয়, দুইমাত্র বল।

যোগেশ। তাই হ'ল।

ভব। আর একটা "তিন মাত্র" আছে,—লোকমতের শাসন। সেটা বড় তুচ্ছ কথা নয়।

যোগেশ। ঠাট্টা apart, তোমার বেলায় সে বাধা নেই। তা ছাড়া দ্বিতীয় বিবাহে কতকগুলা গোলযোগ ও অশান্তির সৃষ্টি হয় এবং মোটের উপর সুখ হয় না; তোমার সে ঝঞ্ঝাট নাই।

ভব। বিবাহের বিরুদ্ধে যদি কেবল এই দুইটি আপত্তিই থাকে, তবে ত' অন্ত লোকের বেলায় খণ্ডন করা অসম্ভব নয়। বেশীর ভাগ লোকের বিয়ের ১৫।২০ বছর পর আর প্রেম থাকে না, বরঞ্চ অনেকটা বিরাগের ভাবই এসে পড়ে। আর মনটাও অপরের প্রতি বেশ আকৃষ্ট হ'তে পারে। সুতরাং আইন অনুসারে যদি এ অবস্থায় পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়—তবেই তো লেঠা চুকে যায়। সংসারে ঝঞ্ঝাটও থাকে না, লোকমতও তৈয়ার হ'তে বেশী দিন লাগে না।

যোগেশ বলিল, "তার পর ছেলেপিলেগুলোর কি উপায় হ'বে?"

ভব। সেটা ভাববার কথা। কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থা দিয়ে তারও একটা বন্দোবস্ত করা যায়। এই ধর, যদি ছেলেপিলের ভার ষ্টেট গ্রহণ করে এবং ষ্টেটের নার্সরি, স্কুল, কারখানা প্রভৃতি থাকে, যেমন সোস্যালিষ্টদের কেউ কেউ বলে।

অমূল্য। সে রকম ভাবে একটা সমাজ চলতেই পারে না। Communismএর বিরুদ্ধে আরিষ্টট্‌লের যুক্তি এ পর্য্যন্ত খণ্ডন হয় নি।

ভব। অনেকটা হয়েছে বৈ কি? আরিষ্টট্‌লের আমলে মানুষের পরসেবার শক্তি এবং সমবেত কার্য্যের শক্তি যতটা ছিল, এখন তার চেয়ে অনেকটা বেড়ে গেছে, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই।

যোগেশ। তুমি এ থেকে বলতে চাও কি?

ভব। আমি ব'লতে চাই এই যে, কেবল প্রবৃত্তির দিক থেকে দেখতে গেলে এ সব যুক্তির কোনও উত্তর নেই। পৃথিবীর পরিণতির ইতিহাসের হিসাবে দেখতে গেলে সে বড় বেশী দিন নয়, যখন মানুষের পূর্ব্বপুরুষ পশু ছিল। মানুষের সমাজের ইতিহাসে এই তো সেদিন নারী ছিল প্রবৃত্তির দাসী। এই তো সবে আমরা আরম্ভ ক'রেছি প্রবৃত্তিকে লাগাম পরিয়ে একটা সমাজ গড়ে তুলতে। আজও সে পশু-পূর্ব্বপুরুষদের রক্ত আমাদের ভিতর বেশ গরম আছে। আমাদের যৌন-নির্ব্বাচনটা হয় প্রধানতঃ সেই পশুর রক্তের জোরে। কিন্তু সমাজের অষ্ট বন্ধনে তার উদ্দাম ভাবটাকে আটকে রাখা হয়। সেই রক্ত প্রায়ই ছুটে বেরিয়ে পড়ে, আর সব বন্ধন ভেঙে-চুরে দেয়। প্রবৃত্তি হিসাবে আমরা কখনই monogamous হ'তে পারি না। কিন্তু সমগ্র evolutionএর ফলে দেখা গেছে যে, এই যে প্রবৃত্তিমার্গ, এতে সুখ নেই, কেন না এর পরিতৃপ্তি নেই। চিরস্থায়ী বিবাহ বন্দোবস্তে আপত্তি হচ্ছে এই যে, এতে ধরে-বেঁধে পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের সঙ্গে আটকে রাখে, যখন তাদের পরস্পরের আকর্ষণ মোটেই থাকে না। কিন্তু তা' যদি না রাখে, কেবল আকর্ষণটাই যদি যৌন-সম্বন্ধের একমাত্র নিয়ামক হয়, তবে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের একেবারে অবাধ promiscuityতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তা'র চেয়ে কম কিছুতেই প্রবৃত্তির এ দুঃখ দূর হবে না। অথচ, আমরা যে যাই বলি না কেন, এই যে বিবাহের স্থায়ী বন্ধন, এর ফলে খুব বেশী লোক যে খুব বেশী কষ্ট বোধ করছে তা নয়। এ বিষয়ে ইতিহাসের সাক্ষ্য হচ্ছে এই যে "নিবৃত্তির মহাকলা।"

যোগেশ। এ কথা ষোল আনা মেনে নিলেও স্বামী-স্ত্রীর একজনের মৃত্যুর পর অপরের বিবাহে কোনও আপত্তি চলে না।

ভব। সে স্থলে আপত্তিটা কম প্রবল হ'লেও নেহাত কম নয়। এ রকম বিয়েও তো প্রবৃত্তিরই ফল। এ প্রবৃত্তিটা যত দমন ক'রে রাখা যায়, ততই ভাল।

অমৃত। তোমার মতে তবে ভালবাসাটা কিছু নয়? কেবল একটা শারীর প্রবৃত্তি?

ভব। সে কথা এখানে ওঠে না। ভাল বাসাটাকে আমি বেশ ভাল জিনিষ ব'লেই মনে করি। সেটা হ'চ্ছে নিয়ত প্রবৃত্তি। সমাজের অভিজ্ঞতা যে গণ্ডীতে প্রবৃত্তিকে আবদ্ধ ক'রেছে, তার ভিতর প্রবৃত্তিটা ভালই ব'লতে হবে। কিন্তু একটা কথা ভুলে যাচ্ছ ভাই, বিয়ে জিনিষটা কেবল ভাল বাসাবাসির ব্যাপার নয়। দুইটা জীবন যখন নিয়ত সংঘর্ষে আসে, তখন তাদের ভিতর যে বন্ধনটা তৈয়ারী হয়, সেটা কেবল ভাল বাসার বন্ধন নয়। সেটা একটা প্রকাণ্ড complex ব্যাপার। একটা মানুষের জীবন যত জটিল, এ সম্বন্ধ তার চেয়ে ঢের বেশী জটিল। কারণ, এ দুইটা জীবনের যতগুলি বহির্মুখী শক্তি আছে, সবার পরস্পর মিশ্রণ থেকে উদ্ভূত এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। সংসারে স্বামী স্ত্রী কেবল প্রেমিকা নয়—তাদের সমস্ত জীবন পর-

পরের সঙ্গে এক হ'য়ে একটা প্রকাণ্ড জটিল সম্পর্কের সৃষ্টি করে, শুধু ভাল বাসাবাসির ওজনে তা'র ভাঙ্গাগড়া চলে না।

আশ্চর্য্য মানুষের মন! ভববিভূতি অন্তরের সহিত সদন্ত কথা বলিতেছিল। যে কথা সে বলিতেছিল, সেই গুলি তাহার মনের ভিতর দিয়া আবার একটা নিভৃত চিন্তা-স্রোতের সৃষ্টি করিতেছিল। প্রত্যেকটি কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে তার মনের মধ্যে তাহা লইয়া তর্কবিতর্ক, বিচার চলিতেছিল। আবার এই যে নিভৃত চিন্তাস্রোত, তাহারও নীচে আর একটি স্রোত বহিতেছিল; তাহার প্রতি ক্ষুদ্র তরঙ্গে একটি ছোট অশ্রুভরা মুখ প্রতিফলিত ছিল। সেটি অশ্রুমুখী, সেবানিরতা রমার। সে দিন ভববিভূতি নয়নতারার ঘরে গিয়া প্রাণের ভিতর যে প্রথম ধাক্কাটা খাইয়াছিল, তাহা বিষাক্ত বীজাণুর ন্যায় প্রাণের ভিতর ক্রমশঃ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছিল। তাঁহার মনোময় জীবনের নানা ধারার সহিত যুদ্ধ করিয়া সে বীজ বাড়িয়া চলিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ সমান তীব্র-ভাবে চলিতেছিল।

* * * *

কয়েক দিন বাদে রামবাবু ভবরঞ্জনের কাছে পত্র লিখিয়া জানিলেন যে, ছেলের বিবাহ করিতে মোটেই মত নাই; তাই ভবরঞ্জন এ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেন নাই। রামবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন; নয়নতারা হাসিল; কিন্তু সকলেই স্থির করিয়া বসিল যে, এ বিবাহ হইল না।

(৮)

ভববিভূতি রেণুকে লইয়া আসিল। রেণু খাসা মেয়েটি। মোটা-সোটা, গোলগাল, একেবারে যেন মেলিন্স ফুডের একখানা ছবি। তার জন্য একটা আয়া ছিল, সে প্রায়ই রামবাবুর বাড়ীতে তাহাকে লইয়া যাইত।

রমার এই মেয়েটাকে দেখিলে কাণ্ডজ্ঞান থাকিত না। হাতের সব কাজ ফেলিয়া এই মেয়েটিকে কোলে করিয়া তাহার বেড়ান চাই-ই চাই। আর দিনরাত সেই মেয়ের কথা, তার ভাবভঙ্গী, কার্য্যকলাপের আলোচনা। আয়া দেখিল, এখানে আসিলে তা'র পরিশ্রমের লাঘব হয়; কাজেই দুবেলা খুব বেশী সময় রেণু রামবাবুর বাড়ীতে রমার কাছেই কাটাইত।

রেণুর কি খেয়াল হইল, সে প্রথম হইতেই নয়নতারাকে "দিদিমা" (দিদিমা) বলিয়া ডাকিতে সুরু করিল এবং তাঁহার কোল জুড়িয়া বসিল। নয়নতারা একটু বিষাদের হাসি হাসিলেন, কিন্তু বালিকাকে কোলে টানিয়া লইলেন।

এখন রেণুকে বাড়ীতে রাখা ভার। সে সর্ব্বদাই "ওমা" (রমা) ও দিদিমার কাছে যাইবার জন্য অস্থির। রমাও এই মাতৃহীনা কন্যাটীর জন্য অসীম স্নেহ লইয়া তাহার জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত।

পরীক্ষার পূর্ব্বে স্কুলের ছুটী হইলে সে রোজ তার মাকে টানিয়া ডাক্তার বাবুর বাড়ী লইয়া যাইত, এবং সেখানে রেণুকে কোলে করিয়া তাহার সঙ্গে খেলিতে-খেলিতে পরীক্ষার পড়া করিত। শেষে নয়নতারা না গেলেও সে নিজে রোজ যাইত।

একদিন দুপুর-বেলায় রমা উঠানে রোদে বসিয়া চুল শুকাইতেছে, আর বই পড়িতেছে, রেণু তার চারপাশে ফিরিয়া ধূলা ও মাটি লইয়া খেলা করিতেছে। মাঝে-মাঝে ছুটিয়া গিয়া রমার চিবুক ধরিয়া কত সম্ভব-অসম্ভব প্রশ্ন করিতেছে এবং সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া এমন ইঙ্গিত দিতেছে যে, তাহার ইচ্ছামত উত্তর দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। রমা বইয়ের ভিতর ডুবিয়া আছে; তবু রেণু যখনি কাছে আসিতেছে, তখনই হাসিমুখে দু-হাতে তার মুখখানা ধরিয়া কথা কহিতেছে।

দাওয়ার উপর আয়া বসিয়া হাই তুলিতেছে। জগদম্বা আঁচল বিছাইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এমন সময় ভববিভূতি বাড়ী ফিরিলেন। সম্মুখে ধ্যানমগ্না যোড়শীর মূর্ত্তি দেখিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। রমা গৌরাঙ্গী নহে, কিন্তু তাহার রংটি বড় মিঠে; আর, সমস্ত শরীর অপূর্ব্ব লাবণ্যে মণ্ডিত; সমস্ত মুখ ও চক্ষু আরত প্রতিভার আলোকে উজ্জ্বল। তাহার বেশভূষার মধ্যে এমন একটা সহজ সৌন্দর্য্য ছিল এবং তাহা তাহাকে এমন সুন্দর মানাইত যে, অত্যন্ত সামান্য পরিচ্ছদেও তাহাকে খুব সুসজ্জিত মনে হইত। তাই, সে যখন একটা ছোট মোড়ায় বসিয়া হাঁটুর উপর বই রাখিয়া, পালে হাত দিয়া উপুড় হইয়া বই পড়িতেছিল, এবং তাহার ঘন চিকণ কেশদাম সমস্ত পিঠ ছাইয়া পিছনে

খুলিয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহার মূর্ত্তিটি যে একবার চোখ ফিরাইয়া দেখিবার যোগ্য হইয়াছিল, এ কথা না বলিয়া উপায় নাই। ভবভূতি একবার স্থিরদৃষ্টে চাহিলেন। পরমুহূর্ত্তে মুখ ফিরাইলে তাঁহার হৃদয় অন্ধকার হইয়া উঠিল।

এমন সময় রেণু ডাকিল "ওম্মা"! ডাক শুনিয়া ভবভূতি চমকিয়া উঠিলেন। এ ডাকের মধ্যে ওকারটা চাপা থাকে, জোর পড়ে "ম্মা"র উপর; তাই ভবভূতি চমকিত হইলেন। চোখ ফিরাইয়া দেখিলেন, রেণু রমার পাশে দাঁড়াইয়া একহাতে এক গোছা চুল ধরিয়াছে, আর এক হাতে চিবুক ধরিয়া মহা গম্ভীর ভাবে, খুব ঘাড় নাড়িয়া, চোক দুটা বড়-বড় করিয়া কি একটা কথা বলিতেছে। রমা হাস্য-প্রফুল্ল মুখ ও উৎসুক লোচন তাহার মুখের দিকে ফিরাইয়া তাহার সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া সব কথায় সম্মতি দিতেছে। কথা বলা শেষ হইয়া গেলে রমা খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, দুই হাতে রেণুর সেই মোটা-মোটা গাল দুটা চাপিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। ভবভূতি বুঝিল যে, রমা তাহার অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া রেণুর মাতৃত্ব পদবী অনায়াসে অধিকার করিয়াছে। কথাটা ভাবিতে তাহার মনের ভিতর একটা ধাক্কা লাগিল,—সেটা আনন্দের না দুঃখের, ঠিক বুঝা গেল না।

ভবভূতি ডাকিলেন "রেণু।" সমস্ত উঠানটায় বিদ্যুতের মত যেন একটা চমক খেলিয়া গেল। আয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বসন সংবৃত করিল। রেণু তাহার বড়-বড় চোখ দুটা ফিরাইয়া হাসিয়া উঠিল। রমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কি জানি কেন কাঁপিয়া উঠিল; সেও উঠিয়া দাঁড়াইল। জগদম্বার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি বলিলেন, "এলি বাবা? এত বেলা হ'ল?"

"হাঁসপাতাল হইতে ফিরবার সময় আজ ৮টা রুগী দেখতে হ'য়েছে" বলিয়া ভবভূতি পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া আয়াকে দিল, মাকে দিবার জন্য; এবং নিজে রেণুর দিকে অগ্রসর হইল। রেণু ধূলামাখা হাত লইয়াই বাপের কোলে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইল। রমা, তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ধূলা ঝাড়িয়া দিল। ভবভূতি কন্যাকে কোলে তুলিয়া চুম্বন করিলেন।

বাপের আদর পাওয়া হইয়া গেলে রেণু তাড়াতাড়ি কোল হইতে নামিতে চেষ্টা করিল। বাবা বলিল, "কেন রে, কোথা যাবি?"

"ওম্মা আগ কোরে" বলিয়া নামিয়া আসিয়া রমার কোলে উঠিয়া, তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "তোমা ভাল বাছি।" রমা তাহার মুখচুম্বন করিল। রেণু আবার বাপের দিকে ফিরিয়া বলিল "তোমা ভাল বাছি, ওম্মা ভাল বাছি।" তারপর—ছেলেমানুষ—রমার গালে আঙ্গুল দিয়া বাবাকে বলিল "বাবা, "ওম্মা চুমু খা।" রমা ও ভবভূতি দুজনেই এ কথায় লাল হইয়া উঠিল।

বিষম লজ্জায় ভবভূতি অন্য কথা বলিয়া লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করিল, "কি পড়ছো রমা?"

রমা বা নয়নতারা ডাক্তারের কাছে কোনও দিন কোনও সঙ্কোচ করে না। নয়নতারার চিকিৎসার সময় হইতেই সে তাহাদের আপনার লোক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আজ এই বোকা মেয়েটার কাছেও রমার যেন লজ্জার কথা বাহির হইল না; সে মাথা নীচু করিয়া আড়ষ্টভাবে বলিল, "হিষ্টরি।"

"কার বই?" "Rapson এর Ancient India" "বইখানা খুব ভাল। তুমি দেখ্‌ছি খুব বাইরের বই পড়! Matriculation এ তো এটা পাঠ্য নয়?" "না।" "কোন্ বিষয় পড়তে তোমার খুব ভাল লাগে?" এখন সঙ্কোচটা অনেকটা কাটিয়া আসিয়াছে। রমা বলিল "হিষ্টরীর বই আমি খুব বেশী ভালবাসি।"

"তুমি Vincent Smith এর Early History of India পড়েছ?"

"শুধু Alexander এর Campaign টুকু, তা ছাড়া বাকীটা সব বুঝতে পারি না।"

হঠাৎ ভবভূতির মাথায় কি খেয়াল চাপিল, জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এত পড়বার ইচ্ছা, তা' তোমার বাবা তো তোমার বিয়ের চেষ্টা ক'রছেন। বিয়ে হ'লে কি তোমার পড়া হবে?"

এ বিষয়ে রমার মোটে লজ্জা ছিল না; সেজন্য লোকে তাকে নিন্দাও করিত। সে অম্লানবদনে বলিল, "আমি বিয়ে ক'রবো না।"

"বিয়ে না করলে সারাজীবন কি ক'রবে? মেয়ে-

ছেলেদের তো চাকরী-বাকরীর বেশী সুবিধা নেই। তোমার ইচ্ছা কি করা?"

রমা বলিতে একটু কুণ্ঠিত হইল, আমতা-আমতা করিয়া বলিল, "আমার ইচ্ছে' ডাক্তার হ'তে।"

"কেন? ডাক্তারীতে কি বিশেষ আকর্ষণ আছে? Practice যোগাড় করা তো বড় সহজ কাজ নয়, বিশেষতঃ মেয়েছেলেদের পক্ষে।" সঙ্কুচিতভাবে রমা উত্তর করিল, "আমাদের দেশে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে মেয়ে-ছেলেদের উপযুক্ত রকম চিকিৎসা শুশ্রূষা কিছুই হয় না। আমি যদি ডাক্তারী ভাল ক'রে শিখতে পারি, তবে আমার ইচ্ছা যে চিরকাল এই গরীব-দুঃখীদের শুশ্রূষা করবো, পয়সা নিয়ে Practice করবো না।"

ভবভূতি অবাক্ হইল। বিধাতা কি সব বিষয়ে ইহাকে তাহারই সহধর্ম্মিণী করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়া-ছেন! তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। সে শুধু বলিল, "বেশ কথা, এ খুব ভাল সঙ্কল্প!" বলিয়া সে ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। রেণু বলিল "বাবা, ও বাবা, ওমাকে চুমু খা—"

রমা তাহাকে তাড়াতাড়ি বলিল "রেণু, যাও তো মা, ওই লাল ফুলটা নিয়ে এস গিয়ে।" রেণু ছুটিল। মাও পিছু-পিছু ঘরে গেলেন।

(৯)

ভবরঞ্জন আবার আসিলেন। এবার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তিনি সদরালা বাবুর বাড়ী গিয়া নিজেই ভবভূতির সহিত রমার বিবাহের সম্বন্ধ উত্থাপন করিলেন। ভবভূতি কিছুই জানিল না। রামবাবু উৎফুল্ল হইলেন। দেনা-পাওনার কথা তুলিতে ভবরঞ্জন বলিলেন, "ঈশ্বর আশীর্ব্বাদে আমাদের কিছুরই অভাব নাই। আপনার মেয়েকে আপনার যাহা ইচ্ছা দিবেন।"

কেহ সেখানে না থাকিলে রামবাবু নাচিয়া উঠিতেন।

তিনি অবিলম্বে গৃহিণীকে সুসংবাদ দিতে গেলেন। নয়নতারাও উৎফুল্ল হইলেন। দিন স্থির হইল, পরীক্ষার পরই বিবাহ হইবে।

আশীর্ব্বাদের পূর্ব্বে জগদম্বা ভবভূতিকে বলিলেন "বাবা, আমি কাল রমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রতে যাব, তোর পছন্দমত যা' হয় কিছু কিনে দে।"

ভবভূতি চমকাইয়া উঠিল। রমার সঙ্গে সেই সাক্ষাতের দিন হইতে রমার কথা লইয়া সে আকাশ-পাতাল ভাবিয়াছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিয়াছে যে, রমার কথাবার্ত্তায় তাহার মন যে রমার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেটা একটা দুষ্ট প্রবৃত্তি বই আর কিছুই নয়। বিবাহ করিলে সে আদর্শ হইতে স্খলিত হইবে। তাহার মন তাহাকে বুঝাইল, যে, রমার মত প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইলে তাহার আদর্শলাভ সহজ ও মনোরম হইবে। সে বলিল, তাহা সত্য নহে। আদর্শের সহজ সিদ্ধির প্রলোভন দেখাইয়া কেবল তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে ঠকাইতেছে। এই প্রলোভন হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সে পণ করিয়া বসিল। তাই মা যখন আসিয়া তাহাকে বলিলেন যে, সব ঠিকঠাক হইয়াছে, কাল তিনি আশীর্ব্বাদ করিতে যাইবেন, তাহাতে সে চমকিয়া উঠিল।

সে বলিল, "সে কি মা? আমি তো তোমাকে বলেছি বিয়ে ক'রবো না।"

মা বলিলেন, "আমি তোর মা, আমি বল্‌ছি তোর এই মেয়ে বিয়ে ক'রতেই হ'বে। রামবাবুকে আমি কথা দিয়েছি, তোর জন্যে কি আমি মিথ্যাবাদী হব।"

ভবভূতি একেবারে দুইয়া পড়িল। খানিক ভাবিয়া সে মাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, তোমার সব আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, এইটি আমায় মাপ ক'রতে হ'বে। আমি রামবাবুর পায়ে ধরে তোমার সত্য ফিরিয়ে আনবো, আমায় ক্ষমা কর।" তা'র চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

জগদম্বা তাহার মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া লইলেন, বলিলেন, "আমি তোর তেমন মা নই বাবা, তোর মনের কথা আমার কাছে লুকুতে পারবি নে। তোর মন খুব চাচ্ছে রমাকে বিয়ে করতে, কেবল দুই এক দুর্দ্দান্ত প্রতিজ্ঞা দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখছিস্। কিসের জন্য মনের সঙ্গে এ যুদ্ধ বাবা? কি তোর লোকসান হবে? দুঃখীর সেবা? রমার মতন স্ত্রী পেয়ে যদি তোর দুঃখীর সেবা না হয়, তবে কি হ'বে একটা কাঠখোট্টা বেটাছেলের একার চেষ্টায়। তা ছাড়া, তুই তো তেমন নির্ব্বাট ন'স যে সন্ন্যাসী হ'য়ে এই কাজে লেগে পড়বি। তোর মেয়ে তো আছে। তাকে মানুষ করে কে? আমি বুড়োমানুষ,

আমি কি অত পারি, না অত জানি? ওই ছুঁড়ীটাকে ভগবান পাঠিয়েছেন তোর মেয়েকে মানুষ ক'রতে!"

এ কথায় ভববিভূতি চমকিয়া গেল। রমা যে মাতৃত্ব পদবী স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইতে সে তাহাকে ও রেণুকে কেমন করিয়া বঞ্চিত করিবে? সে বেশ বুঝিয়াছে যে, রমা ছাড়া রেণুর জীবন ঠিক পূর্ণ হইতে পারিবে না।

এমন সময় রেণু আসিয়া কাঁদিয়া নালিশ করিল যে "আয়া ওমা বাড়ী যায় না।"

ভববিভূতি তাহাকে কোলে করিয়া মুখচুম্বন করিল, তারপর আয়াকে ডাকিয়া রমার কাছে রেণুকে লইয়া যাইতে বলিল। যাইবার সময় হাসিয়া জগদম্বা বলিলেন, "ওকে 'ওমা' বলিস না, ও তোর মা।"

রেণু হাসিয়া উঠিল, বলিল, "ওমা না? মা? কি মজা!" সে রমার কাছে ছুটিল।

এদিকে রামবাবুর বাড়ীতে মহা বিভ্রাট। জগদম্বা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিতেছে শুনিয়া রমা কাঁদিয়া একখানা করিয়া বলিল। মাকে বলিল "আমি বিয়ে করবো না।"

মা বলিল, "বিয়ে করবি নে কি রে? মেয়েছেলের কি বিবাহ না হ'লে চলে? পাগল মেয়ে দেখ না।"

রমা কাঁদিয়া বলিল, "আমি বিয়ে ক'রবো না, আমি ডাক্তার হ'ব।"

মা কিছুতেই বুঝাইতে পারিলেন না। তখন বাবুর ডাক পড়িল।

রামবাবু মেয়েকে উপরের ঘরে লইয়া নির্জ্জনে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। নারীজীবনের আদর্শ, মাতৃত্বে নারীত্বের সার্থকতা, আমাদের শাস্ত্রকারদের কথা, ইউরোপের পণ্ডিতদের কথা, কত কথা বলিলেন। কিছুতেই রমা বুঝিল না। বলিল, "এত মেয়েছেলে ডাক্তারী ক'রছে, আমি কেন পারবো না।" রামবাবু বলিলেন, "এখনো সে দেশ বা কাল আসেনি, যাতে স্ত্রীলোক স্বচ্ছন্দে নিরুপদ্রবে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন ক'রতে পারে। তাদের একটা আশ্রয় দরকার। ভববিভূতির মত এমন আশ্রয়, তোমার সকল আদর্শের অনুকূল এমন একটা সহায় তুমি কোথায় পাবে মা?"

তবু রমা বুঝিল না। রামবাবু বলিলেন, "আমি তোমাকে একখানা বই পড়তে দেবো। সে বই তোমাকে পড়তে দিতাম না; কিন্তু তোমার মনে যে সব প্রশ্ন উঠেছে, তার একটা সদুত্তর এতে পাবে ব'লে দিলাম। তুমি এই বইখানা পড়ে তার পর মত স্থির কর।" বলিয়া তিনি H. G. Wells এর নব-প্রকাশিত উপন্যাস Ann Veronica রমাকে দিলেন।

রমা বইখানা পড়িতে লাগিল। যতই সে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাহার আগ্রহ বাড়িয়া চলিল। সমস্ত বইখানা সে একদিনের মধ্যে শেষ করিয়া ফেলিল। তারপর সে ভাবিতে লাগিল; ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইল না। পিতার কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল; কিন্তু বুঝিয়াও তাহার মন বুঝিল না।

বই শেষ করিয়া সে মায়ের কাছে গিয়া বসিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু রামবাবু তখনো ফেরেন নাই। সে Ann Veronicaর জীবনের ঘটনাগুলি মনে-মনে তন্ন-তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

নয়নতারা সস্নেহে বলিলেন, "কি মা, কি ব'লবো বাবুকে?"

রমা বলিল, "বাবার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, তিনি আসুন।" Ann Veronicaর আলোচনা করিয়া সে সাব্যস্ত করিয়াছিল যে, বিবাহ হয় তো তাহাকে করিতে হইবে; কিন্তু এখন সে কথার দরকার নাই, তার মেডিক্যাল কলেজে পড়া শেষ হইলে, পরে বিবাহের চেষ্টা করা যাইবে।

নয়নতারা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের দিকে তাকাইলেন, কিছুই বুঝিলেন না। তারপর মেয়েকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "মা, সত্যি ক'রে বল আমার কাছে; লজ্জা করিস নে, ভববিভূতি দোজবার ব'লে তোর আপত্তি আছে কি?"

"দোজবারে!" সে কথা তো তাহার মনেই হয় নাই। যখন ভববিভূতির দীর্ঘ প্রশান্ত সৌর মূর্ত্তিতে মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের আতিশয্য দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল, তখন তো তা'র একবারও মনে পড়ে নাই যে সে বিপত্নীক! রেণু তাহার আপনার মেয়ে! কথাটা মনে উঠিয়া যেমন মনে একটু খট্‌কা বাধিল, তেমনি আবার রেণুর কথা স্মরণ

করিতে তার বাধা ভাসিয়া গেল। সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "না।"

"তবে কি তাকে অন্য কোনও কারণে অপছন্দ হচ্ছে?"

"যাও, অপছন্দ কে ব'লছে? আমি বিয়ে ক'রবো না, তাই।"

মায়ের এই সব প্রশ্ন তাহার মনকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল, ভবিষ্যতের পক্ষে সে মনে-মনে ওকালতি করিতে লাগিল। এমন যে মহাপুরুষ, তাকে স্বামীরূপে পাওয়া যে নারীমাত্রেরই সৌভাগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? এই কথা সে মনে-মনে বলিল। স্থির করিল, বিবাহ যদি করিতেই হয়, তবে এমন স্বামীই যেন তাহার হয়। কিন্তু এমন যে দুটী হয় না, সেটা তাহার মনে স্পষ্ট করিয়া জাগিল না। আমরা যাকে দেখি, বা যা'র কথা ভাবি, তার কতখানি যে আমাদের মনের গড়া, সেটা রমা জানিত না। তাই তার মনগড়া এই ভবিষ্যতি, তার প্রেমে রক্ষিত এই যে মানুষের মূর্ত্তি, এর যে আর জোড়া পাওয়া যাইবে না, সে কথা সে বুঝিল না।

এমন সময় হাসিতে হাসিতে রেণু ছুটিয়া আসিল, বলিল, "ওমা, তুমি ওমা না, মা। থাকুমা বোলেছে।" সটান রমার কোল জুড়িয়া বসিয়া সে হাসিতে হাসিতে রমার গাল ধরিয়া বলিতে লাগিল, "মা! কি মজা!"

রমা হাসিয়া উঠিল, তাহার সমস্ত হৃদয় স্নেহধারায় আপ্লুত হইল, কিন্তু লজ্জায় সে লাল হইয়া গেল।

নয়নতারা হাসিয়া বলিল, "এই নে, আমরা তো হার মেনে গেলাম, তোর মেয়েকে তুই কি ব'লে বোকাবি বোঝা।" তারপর বলিলেন, "হাঁ রমা, বিয়ে যে করবিনে, তো রেণুকে ছেড়ে থাকবি কি ক'রে?"

রমা চুপ করিয়া রহিল। কেবল সে রেণুকে বক্ষে চাপিয়া চুম্বন করিল।

রামবাবু আফিস হইতে আসিলেন, কিন্তু রমার আর তাঁর সঙ্গে কোনও কথা বলার দরকার হইল না।

পরদিন জগদম্বা রমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন।

উদ্ভট-সাগর

[কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভট-সাগর বি-এ]

(১)

কোনও কবি কৌশল-ক্রমে "ক" বর্ণের অনুবন্ধ দিয়া নিম্ন লিখিত শ্লোকে দেবাধিদেব মহাদেবের আশীর্ব্বাদ-বিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক মঙ্গলাচরণ করিতেছেন :—

কল্পান্তক্রূরকেলিঃ ক্রতুকদনকরঃ কুন্দকর্পূরকান্তিঃ
ক্রীড়ন্ কৈলাসকূটে কলিতকুমুদিনীকামুকঃ কান্তকায়ঃ।
কঙ্কালক্রীড়নোৎকঃ কলিতকলকলঃ কালকালীকলত্রঃ
কালিন্দীকালকণ্ঠঃ কলয়তু কুশলং কোঽপি কাপালিকঃ কৌ॥

কল্পান্ত-কালেও কত ক্রূর কেলি,
ক্রতু-কালে কত কাণ্ড করেন কপালী।
কুন্দ-কর্পূরের কান্তি কিবা কলেবরে,
করেন কতই ক্রীড়া কৈলাস-কন্দরে।
কুমুদিনী-কান্তে কৃপা,—কি কব কাহার,
কিবা কান্ত কমনীয় কপালীর কায়।
করিতে কঙ্কাল-কেলি কতই কুশল,
কল্লোলিনী করিতেছে কিবা কল কল।
কপালীর-কাল কণ্ঠে কালিন্দী-কালিমা,
কামিনী কালীর কিবা কহিব কান্তিমা।
কপালীর কৃপাময় কটাক্ষ কেবল
কল্যাণ-কামীর কুলে করুন কুশল!

(২)

উদ্ভট-কবিতা সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন কি, তাহাই কোনও মহাকবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

খিন্নং স্বেন সমুদ্ভটেন রমতে স্বীয়ং মনঃ সর্ব্বদা
ক্রুদ্ধাহংকৃত সমুদ্ভটং খলু মনঃ শ্রোতুং পুনর্বাঞ্ছতি।

অজ্ঞান্ জ্ঞানবতোঽপানেন হি বশীকর্ত্তুং সমর্থো জনঃ
কর্ত্তব্যো হি সদুদ্ভটস্য মধুরৈরাবর্জকঃ সংগ্রহঃ ॥

(বল্লভদেবস্য)

দগ্ধ করিতেছে যারে দুশ্চিন্তা-অনল,
উদ্ভট রচিলে তার হৃদয় শীতল।
পরের উদ্ভট-শ্লোক কেহ যদি শুনে,
পুনশ্চ শুনিতে তাহা ইচ্ছা হয় মনে।
হউক অজ্ঞান লোক, কিংবা জ্ঞানযুত,
উদ্ভট-শ্লোকের কাছে সবে বশীভূত।
এ হেন উদ্ভট-শ্লোক-সংগ্রহ-করণে
থাকে যেন বাঞ্ছা সদা সকলেরি মনে!

(৩)

সরস্বতীর পরম-প্রিয় পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষ, সুধা-নিন্দিনী দেবতা-প্রিয়া সংস্কৃত-ভাষা, সুবিদ্বান্ ও সুকবি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়-গণ এবং তাঁহাদিগের রচিত উদ্ভট-কবিতার উৎকর্ষ বর্ণন করাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় :—

ধন্যং ভারতভূতলং প্রিয়তমং সারস্বতং মন্দিরং
ধন্যা সংস্কৃতবাক্ সুধাপরতরা গীর্ব্বাণসংসেবিতা।
ধন্যা ব্রাহ্মণপণ্ডিতাঃ সুকবিতাপাণ্ডিত্যসংমণ্ডিতা-
স্তেষামুদ্ভটভাবিতং ক্ষিতিতলে জীয়াৎ সমাঃ শাশ্বতীঃ।

(উদ্ভটসাগরস্য)

ধন্য হে ভারত-ভূমি! অদৃষ্ট তোমার,
অদৃষ্টের কথা তব কি কহিব আর!
সর্ব্বদেশ পরিহরি' দেবী সরস্বতী
তোমাতেই চিরকাল করেন বসতি।
ধন্য সংস্কৃত-ভাষা! কি রস তোমার,
সুধাও তাহার কাছে অতি তুচ্ছ ছার।
যদি তাহা না হইবে, তবে কি কারণ
তাহা পান করি' মত্ত রন্ দেবগণ!
ধন্য ধন্য ভারতের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত,
সুকবিতা-সুপাণ্ডিত্যে যাঁরা বিমণ্ডিত;
ধন্য ধন্য তাঁহাদের উদ্ভট-নিচয়,
জয় জয় জয় তার চিরদিন জয়!

(৪)

কৃষ্ণনগরাধিপতি প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় সভা-পণ্ডিত কবিবর বাণেশ্বর-বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ কেশ-বন্ধন-প্রিয় হইলেও কালী কি কারণে কেশ-বন্ধন না করিয়া 'এলোকেশী' মূর্ত্তি ধারণ করিলেন?" বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সভায় বসিয়া তৎক্ষণাৎ এই মহা-ভাব-পূর্ণ কবিতাটি রচনা করিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন :—

দেব্যাঃ কেশচয়ো নিরীক্ষ্য পতিতান্ দেবান্ মুনীন্ পাদয়োঃ
সর্ব্বারাধ্যতয়া চ তত্র পরমোৎকর্ষং বিদিত্বাঽপতৎ।
সা কালী চরণং গতস্য শরণং নো বন্ধনং সম্ভবে-
দিত্যাবেদয়িতুং ববন্ধ নহি তং তস্মুক্তকেশী বভৌ॥

(বাণেশ্বর-বিদ্যালঙ্কারস্য)

দেব-ঋষি-আদি যত যে আছে বথায়,
সবাই আসিয়া মার পড়ে রাঙা পায়;
মাথা হ'তে দেখি' কেশ করিল বিচার,—
চরণ দুখানি মার একমাত্র সার!
কি ফল হইবে আর থাকিয়া মাথায়,
তাই কেশ ছুটে এসে চরণে লুটায়।
যে জন আশ্রয় লয় শ্রীপদে মাতার,
এ ভব-বন্ধন আর নাহি রয় তার,—
ত্রিজগতে এ কথাটী জানাতে সবাই,
কেশ না বাঁধেন মাতা,—"এলোকেশী" তাই!

(৫)

কথিত আছে, একদিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় সভা-পণ্ডিত ভট্টপাড়া-নিবাসী বাণেশ্বর-বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে লইয়া এক সরোবরের তীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সে স্থানে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম দেখিয়া মহারাজ কহিলেন, "বিদ্যালঙ্কার মহাশয়! এমন দুইটি শ্লোক বলুন, যাহাদের একটিতে পদ্ম-পত্রের প্রশংসা ও অন্যটীতে পদ্ম-পত্রের নিন্দা থাকে।" বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তৎক্ষণাৎ এই দুইটি শ্লোক তাঁহাকে শুনাইয়া দিলেন :—

(ক) পদ্ম-পত্রের প্রশংসা :—

হে পদ্মিনীপত্র ভবচ্চরিত্রং
চিত্রং প্রতীমো বয়মত্র কিঞ্চিৎ।

ত্বং পঙ্কজন্মাপি যদচ্ছভাবা-
দসি স্পৃশস্তম্ ন পঙ্কসঙ্গি ॥

(বাণেশ্বর-বিদ্যালঙ্কারস্য)

শুন হে পদ্মিনী-পত্র! চরিত্র তোমার
রম্য বলি' সবে মোরা করিব স্বীকার।
পঙ্ক হইতেও জন্ম করিয়া গ্রহণ
যেরূপ ভাবেই তুমি থাকহ যখন,
পঙ্কের সংসর্গে জল থাকে অনিবার,—
তাই নাহি স্পর্শ কর তারে একবার!

(খ) পদ্ম-পত্রের নিন্দা :—

হে পদ্মিনীদল তবাত্র ময়া চরিত্রং
দৃষ্টং বিচিত্রমিব যদ্ বিদিতং ধ্রুবং তৎ।
যৈরেব শুদ্ধসলিলৈঃ পরিপালিতত্বং
তেভ্যঃ পৃথগ্ ভবসি পঙ্কভবোঽপি যস্মাৎ ॥

(শার্ঙ্গধরস্য)

শুন ওরে পদ্ম-পত্র! তোমার চরিত্র
যা শুনিনু, যা দেখিনু,—সকলি বিচিত্র!
আজন্ম ধরিয়া তুমি যে নির্ম্মল জলে
পালিত হইয়া নিজ কার্য্য উদ্ধারিলে,
সে নির্ম্মল জলে,—আজ সময় পাইয়া,—
পৃথক্ করিয়া দাও,—কিছু না ভাবিয়া!
পঙ্কে জন্ম হইয়াছে যখন তোমার,
তোমাতেই সাজে হেন বিচিত্র ব্যাপার!

(৬)

কোনও আম্র-ভক্ত কবি এই শ্লোকে অন্যান্য ফলের নিন্দা করিয়া কেবল রসরাজ আম্র-ফলেরই প্রশংসা করিতেছেন :—

ত্রপাস্তানা জম্বূঃ স্ফুটিততরং দাড়িমফলং
সশূলং সন্ধত্তে হৃদয়মভিমানেন পনসঃ।
অভূদন্তস্তোয়ং তরুশিখরজং নাঙ্গলিফলং
সমায়াতে চূতে জগতি ফলরাজে রসময়ে ॥

রসরাজ ফলরাজ আম্রের উদয়ে
দুর্গতি ঘটিল কত ফলের হৃদয়ে,—
জামের লজ্জার কথা কি কহিব আর,
কালবর্ণ হ'য়ে গেল দেহখানা তার!
দাড়িমের মনে মনে যত গর্ব্ব ছিল,
বুক্ ফেটে গর্ব্ব তার খর্ব্ব হ'য়ে গেল!
কাঁঠালের মনে মনে হ'লো অভিমান,
শূল-রোগ বুকে তার হ'লো বিদ্যমান!
নারিকেল থাকিলেও বৃক্ষের আগায়,
যাইয়া উদরী রোগ ধরিল তথায়!

(৭)

কোনও কবি এই কবিতায় নিন্দাচ্ছলে কোনও রাজার প্রশংসা করিতেছেন :—

আসীন্নাথ পিতামহী তব মহী মাতা ততোঽনন্তরং
সম্প্রত্যেব হি সাম্বুরাশিরসনা ধাত্রী ধরোদ্ভূতয়ে।
পূর্ণে বর্ষশতে ভবিষ্যতি পুনঃ সৈবাঽমবস্থা স্নুষা
যুক্তং নাম সমস্তশাস্ত্রবিদুষাং লোকেশ্বরাণামিদম্ ॥

(মাতঙ্গদিবাকরস্য)

হে রাজন্! নিবেদন করি,—এই মহী
ছিলেন তোমার পূর্ব্বে পূজ্যা পিতামহী।
তার পরে হইলেন তোমার জননী,
আজকাল দেখিতেছি তোমার গৃহিণী।
শতবর্ষ পরে হায় তিনিই আবার
গুণবতী পুত্রবধূ হবেন তোমার।
পরম পণ্ডিত যাঁরা, যাঁরা মহারাজ,
তাঁহাদেরি সাজে হেন অপরূপ কাজ!

(৮)

সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে কাহারাই বা বিরহ-দুঃখে দুঃখী এবং মিলন-সুখে সুখী হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন :—

ঈষন্মুদ্রিতমধুরং কুমুদিনী কিঞ্চিৎ সমুল্লাসিনী
চক্রী চক্রবিরোধিনী পতিভয়াদ্ বালাবধূত্রাসিনী।
ঘূনী বেশবিধায়িনী বিরহিণী নেত্রাম্বুসংবাহিনী
ভানৌ যাতি নগেন্দ্রকোপকুহরে পশ্চাদি চেতাদ্ভুতম্ ॥

দিনমণি চ'লে যায় কে আর রাখিবে তায়
মনোদুখে কমলিনী মুদিছে নয়ন।
বহু বিচ্ছেদের পর আসিতেছে নিশাকর
মহানন্দে কুমুদিনী খুলিছে বদন॥

দিবসের সুখ যত এখনি হইবে হত
এই ভয়ে চক্রবাকী প্রাণে ম'রে রয়।
যেতে হবে পতিপাশে কি ঘটিবে সহবাসে
বালিকা বধূর মনে হইতেছে ভয়॥
সাজ সজ্জা নানা মত করিছে যুবতী যত
সহবাসে ভুলাইতে যুবকের মন।
এ পোড়া কপালে হায় নাহি আর পাব তায়
এই ভেবে বিহরিণী করিছে রোদন॥
সন্ধ্যাকাল যবে আসে কেহ কাঁদে, কেহ হাসে
বিধির বিচিত্র লীলা কে বুঝিতে পারে।
কারো ভাগ্যে মহাসুখ কারো ভাগ্যে মহাদুখ
সুখ-দুঃখ এ সংসারে চক্রবৎ ফিরে॥

(৯)

নব-বিবাহিতা বালিকা বধূ পতিকে দেখিয়া যেরূপ অসন্তুষ্ট হয়, ধনবান্ লোকও ভিক্ষুককে দেখিয়া সেইরূপ অসন্তুষ্ট হন। ইহাই কবি এই শ্লোকে উভয়ের সাদৃশ্য দেখাইয়া কহিতেছেন :—

আনম্রাননমাগতে বিতনুতে নো তাদৃশে তাদৃশে
স্থানাদ্ গন্তমপীহতে ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং ক্বচিৎ।
রুদ্ধে বর্ত্মনি বক্তি নিষ্ঠুরতরং গুপ্তাক্ষরং জল্পতি
ভিক্ষুং বীক্ষ্য ধনী ধ্রুবং নববধূলোকো যথা চেষ্টতে॥

মুখ খানি নীচু করে সম্মুখে পড়িলে,
কথা কহিলেও কোন কথা নাহি বলে।
বিধিমতে চেষ্টা করে সরিয়া পড়িতে,
দুটা মিষ্ট কথা বলি' না চায় ডুবিতে।
পথ রোধ করিলেই কটু কথা কয়,
বিড়্ বিড়্ শব্দ কত করে সে সময়।
নব-বধূ করে যাহা পতি-দরশনে,
ভিক্ষুকে দেখিয়া তাহা করে ধনী জনে!

(১০)

স্ত্রীর প্রতি পবিত্র প্রেম ও প্রগাঢ় অনুরাগ না থাকিলে গৃহীর মঙ্গল হয় না; কিন্তু তাহা বলিয়া পরম-পবিত্র ধর্ম্ম-কর্ম্মে ও পরম-হিতকর গৃহস্থাশ্রমের বহুবিধ কার্য্যে একবারে জলাঞ্জলি দিয়া ও স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া স্ত্রৈণ হইয়া গৃহে বসিয়া থাকা গৃহীর কর্ত্তব্য নহে। যে গৃহী গৃহিণীর কথায় মরেন ও বাঁচেন, যে গৃহীর গৃহিণী স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া সেই গৃহীর উপরেই কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন, সেই স্ত্রৈণ গৃহী যদি গৃহের মঙ্গল কামনা করেন, তাহা হইলে তিনি যেন এই নিম্ন-লিখিত মহাজন-বাক্য গুলি প্রণিধান-পূর্ব্বক পাঠ করেন : —

(ক—খ)

আলোকী গুপ্তবক্তা চ বন্দী ক্ষিতিবিদারকঃ।
গ্রামনিন্দী সভাকারী প্রবাসী বিত্তরক্ষকঃ॥
ধর্ম্মদ্বেষ্যুপবাসী চ স্বয়ং পক্তাঽন্নঘাতকঃ।
এতানি মাসচিহ্নানি স্ত্রৈণানাং হি প্রচক্ষতে॥

শুধু সেই মুখ খানি দেখিছে সতত,
কাণে কাণে কুস্-ফাস্ করে অবিরত।
বন্দিভাবে যোড়হাতে সদাই দাঁড়ায়,
কথায় কথায় যেন মেদিনী ফাটায়।
গ্রামে লোক নাই বলি' কত নিন্দা করে,
লোক ডেকে সভা করে বাড়ীর ভিতরে।
আছে আছে ব'লে উঠে 'যাব দেশ ছেড়ে,'
টাকা কড়ি দেছে যাহা নিতে যায় কেড়ে।
শুধু বলে পৃথিবীতে ধর্ম্ম নাই আর,
অনাহারে কত দিন কেটে যায় তার।
কখনো স্বয়ং অন্ন পাক করি' খায়,
আত্মঘাতী হ'তে যায়, কথায় কথায়।
হায় রে সংসারে স্ত্রৈণ হয় যেই জন,
থাকিবে তাহার এই বারটী লক্ষণ!

উৎকল-সাহিত্য

[শ্রীরমেশচন্দ্র দাস]

উৎকল-সাহিত্য—আষাঢ়, ১৩২৫

১। "প্রাচীন কবি বিশ্বনাথ"—লেখক শ্রীনারায়ণ সাহু বি-এ, বিদ্যারত্ন। প্রাচীন উৎকলে অনেক কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নামে আমরা ক্রমে ক্রমে পরিচিত হইতেছি। তাহাতে আমাদের জাতীয় গৌরব ও সাহিত্য দীনতা হ্রাস হইতেছে।

কবি বিশ্বনাথ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে উড়িষ্যা ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম চন্দ্রশেখর। তিনিও সুকবি ও পণ্ডিত ছিলেন। 'পুষ্পমালা' ও 'ভাষার্ণব' তাঁহারই রচনা। পিতামহ নারায়ণ অলঙ্কার-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সে সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ যে উড়িষ্যার অধিবাসী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি 'কাব্য-প্রকাশে'র সমালোচনায় অনেক সংস্কৃত শব্দের তদর্থাত্মক উড়িয়া শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছেন। সম্ভবতঃ রাজ-সরকারে তিনি কোন বিশিষ্ট পদ লাভ করিয়াছিলেন। "সন্ধি-বিগ্রহিক-মহাপাত্র"—তাঁহার রাজদত্ত উপাধি ছিল। তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; 'সাহিত্য-দর্পণের' প্রতি অধ্যায়ের শেষে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সংস্কৃত পণ্ডিত-মণ্ডলী-মধ্যে বিশ্বনাথ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আনন্দবর্দ্ধন, মাম্মাট এবং জগন্নাথের নিকটে তাঁহার প্রতিভা ক্ষুদ্র হইলেও 'সাহিত্য-দর্পণে' যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ভরত প্রভৃতি কেহই সাহিত্য আলোচনা কালে নাটকের উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু বিশ্বনাথই নাটকের সমস্ত লক্ষণ, নাটকীয় নামের অর্থ, ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। অতি সহজ এবং সরল ভাষাই 'সাহিত্য-দর্পণের' আরও একটী বিশেষত্ব। 'সাহিত্য দর্পণ' ভিন্ন তিনি আরও অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

(১) "রাঘব বিলাস"—সংস্কৃত মহাকাব্য।

(২) "কুবলয়াশ্ব চরিত"—প্রাকৃত মহাকাব্য।

(৩) "প্রভাবতী"—নাটিকা।

(৪) "চন্দ্রকলা"—নাটিকা।

(৫) "প্রশস্তি রত্নাবলী"—ষোড়শ ভাষায় 'কদম্বক'।

(৬) "নরসিংহ বিজয়"—কাব্য।

(৭) "কাব্য প্রকাশ দর্পন"—কাব্য প্রকাশের সমালোচনা।

কি অমূল্য রত্ন উড়িষ্যায় প্রসূত হইয়াছিল! কোথায়—কিরূপে তাহারা লোপ পাইল? এখন যাহা লোপ পায় নাই, কেবল অজ্ঞাতভাবে রহিয়াছে, তাহাদের উদ্ধার বাঞ্ছনীয়। ঐ সমস্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়া সাধারণে প্রকাশিত না হইলে উৎকল-সাহিত্যে নব যুগের সঞ্চার এবং উড়িষ্যাবাসীর জাতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে না। ইহার জন্য কেহ কি "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন" প্রতিজ্ঞা করিবেন না?

২। "রক্তাক্ষ" (উড়িষ্যার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা)—লেখক—শ্রীযুক্তপ্রসাদ চৌধুরী। ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন। নানা কারণে আজিও তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত হয় নাই। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আসিবার পূর্ব্বে এদেশে ইতিহাস সঙ্কলন বিষয়ে কোনও চেষ্টা হয় নাই। ব্রিটীশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে নানা স্থানে প্রত্নতত্ত্ব-অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্যারম্ভ হয়। কলিকাতার "এসিয়াটিক সোসাইটি" তাহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এই সমিতির অধীনে কার্য্য করিয়া অনেকগুলি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত গঠিত হইয়াছেন। প্রধান-প্রধান প্রাদেশিক রাজধানীতে উক্ত সমিতির অধীনে 'মিউজিয়ম', চিড়িয়াখানা ও 'বোটানিক্যাল গার্ডেন' স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের এই নব-গঠিত প্রদেশের পাটনা নগরীতেও একটী "রিসার্চ সোসাইটি" স্থাপিত হইয়া কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। উড়িষ্যা আধুনিক দেশ নয়। ইহাতে শুধু উড়িষ্যার কেন, ভারত-সভ্যতার অনেক উপাদান অনুসন্ধান দ্বারা পাওয়া যাইতে পারে। অনেকে বলেন, কোনার্ক এবং ভুবনেশ্বর মন্দিরে গ্রীসদেশীয় শিল্পী কার্য্য করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত হাণ্টার সাহেব সর্ব্বপ্রথমে 'জিলা গেজেটিয়ারে' এ দেশের নানা ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। পরে তিনি এদেশের যে বৃহৎ ইতিহাস প্রণয়ন করেন, তাহাতে বহু গবেষণাপূর্ণ তত্ত্বাদি প্রকাশ পায়। তাঁহার পরে রিসলি, টার্ণিং প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারী এ প্রদেশের কিছু-কিছু প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিয়া পুস্তকাদি প্রকাশ করেন। সর্ব্বোপরি কলিকাতার বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, এদেশের বৌদ্ধ ও অন্যান্য যুগের নানা লুপ্ত তত্ত্বের উদ্ধার করিয়া, যে প্রকাণ্ড সচিত্র পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহা আজিও প্রামাণিক গ্রন্থ-রূপে পরিগণিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত "এসিয়াটিক সোসাইটির" অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বৌদ্ধ, কেশরী, চৈতন্য এবং অন্যান্য যুগের কতক তথ্য উক্ত সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। বহুকাল পর্য্যন্ত আর উল্লেখযোগ্য কোন কার্য্য হয় নাই। কয়েক বর্ষ হইল, "উৎকল-সাহিত্য-সমাজ" এ বিষয়ে শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করায়, কয়েকটী বয়োবৎসল কৃতী যুবক ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের গবেষণার ফল পত্রিকাদিতে প্রকাশ করিতেছেন।

উড়িষ্যায় কি এক স্বতন্ত্র বৃহৎ তত্ত্বানুসন্ধান সমিতি গঠিত হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই ?

সরকারী কার্য্যে আমাদিগকে নানা গ্রাম ও পল্লী ভ্রমণ করিতে হয়। কটক জেলায় কেন্দ্রাপাড়ার অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র গ্রামের বিবরণ প্রকাশ করিতে এত দীর্ঘ ভূমিকার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কোনও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বন্ধু এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন কি ?

কেন্দ্রাপাড়া খাল-পার্শ্ববর্ত্তী ধনেশ্বর একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ইহারই সন্নিকটে রঙ্গাঙ্গ, মোহনী, কেশবপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি অবস্থিত। মধ্যে মহানদীর শাখা 'চিত্রোৎপলা' ও 'পুনী' প্রবাহিতা। রঙ্গাঙ্গ ব্রাহ্মণ-প্রধান ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের মধ্যে অনেকগুলি প্রাচীন কূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে ব্যবহৃত মৃত্তিকার "নিম্বা" গুলির বেধ ও পরিধির যথাক্রমে ৩ ও ৯ ইঞ্চি এবং সেগুলি রক্তবর্ণ বিশিষ্ট। কোথাও-কোথাও মৃত্তিকাসর্ত্তে ইষ্টক-গ্রথিত প্রাচীর দেখা যাইতেছে। লাল ও কাল রঙ্গের নানা আকৃতির মাটির পাত্র পাওয়া যাইতেছে। অনতিদূরে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী। ইহার তীরে "ওক্রেশ্বর" মহাদেব প্রতিষ্ঠিত। এই পুষ্করিণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, ওক্রবল নামে এক ব্যক্তি কৌর-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া রাজসভায় গমনের পথ অবরোধ করে এবং স্থান পরিত্যাগ করিতে দূত কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াও সম্মত বলিয়াছিল "না। উঠিলে রাজা কি আমার বাস্তুতে পুষ্করিণী খনন করিবেন ?" রাজার আদেশে ওক্রবলের অনুরবর্ত্তী গৃহ ও সন্নিহিত ভূমি পরিমিত হইয়া "যার মান তার কুট তার বিঘা" জানা যায় এবং তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে পুষ্করিণী-খনন কার্য্য আরম্ভ হয়। ওক্রবল সেই পরিমাণ ভূমি ও গৃহাদির মূল্য রাজার নিকট প্রাপ্ত হয়। খনন সময়ে এক মহাদেব উত্থিত হন। তিনি এক পার্শ্বে 'ওক্রেশ্বর' নামে স্থাপিত হইলেন, এবং তাঁহার সেবা-পূজার সুবন্দোবস্ত হইল।

মুকুর—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫

"প্রাচীন উৎকল" (গঙ্গাবংশ)—লেখক—শ্রীযদুবন্ধু সিংহ। গঙ্গাবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত দেখা যায়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত দেবানন্দ ভারতী তাঁহার "তাম্রলিপ্ত ইতিহাসে" লিখিয়াছেন—উড়িষ্যার গঙ্গপতি সম্রাটগণ বাঙ্গালী মাহিষ্য ক্ষত্রিয়। ইঁহাদের আদি বাসস্থান তাম্রলিপ্ত বা তমলুক। পৃথিবীর ইতিহাস লেখকও উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য উইলসন সাহেব বলেন—অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহল প্রথমে কলিঙ্গে উপস্থিত হন। তিনি গঙ্গারাড়ীর অর্থাৎ গঙ্গা-সন্নিহিত তমলুক ও মেদিনীপুরের অধিপতি ছিলেন। হাণ্টার সাহেব, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম বাবু, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতির মতে তাঁহারা গঙ্গারাড়ী। পণ্ডিত নীলমোহন বিদ্যানিধি "সম্বন্ধ নির্ণয়ে" ও মহিমচন্দ্র মজুমদার "গৌড় ব্রাহ্মণে" স্পষ্ট বলিয়াছেন—বাঙ্গালী মাহিষ্যজাতি পরাক্রান্ত হইয়া অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি ও ছত্রপতি—এই চারি শাখায় বিভক্ত হন এবং গজপতিগণ উড়িষ্যায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। আমরা আজ তাহার একটু আলোচনা করিব।

মাহিষ্য কে ? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, বৃদ্ধ হারিত, বন্ধুক, পরশুরাম প্রভৃতির মতে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান মাহিষ্য নামে পরিচিত। পদ্ম পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, উশন সংহিতা, চণ্ড কৌশিক ও কুণ্ডাটক শাস্ত্রে উক্ত সন্তানের নাম কৈবর্ত্ত। উড়িষ্যায় কেওটেরা অতি নীচ জাতি ও ইহাদের জল অস্পৃশ্য। নৌচালন ও মৎস্য বিক্রয় ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। সুতরাং গঙ্গপতি বংশের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ অতি হাস্যাস্পদ কথা !

নরসিংহ তাম্রশাসনে লিখিত আছে, গঙ্গাবংশীয়েরা চন্দ্রবংশ-সম্ভূত। চোড়গঙ্গ বা চূড়ঙ্গ দেবের মাতার নাম গঙ্গা। তাঁহার নামানুসারে উক্ত বংশ গঙ্গা নামে পরিচিত। অনন্তবর্ম্মাও ঐ চন্দ্রবংশীয়। তাঁহার রাজধানী ও বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

ধনঞ্জনক সম্ভূতো গঙ্গবাড়িঃ প্রসিদ্ধঃ
সকল বিষয়কৃতঃ স্বর্গবর্গোপভোগ্য
তদধিপতি রযাস্তোনন্ত বর্ম্মা নৃপেন্দ্রঃ
সন কবধিতি রূপগঙ্গ নামা তদাজ্ঞাঃ।

তাহা হইতে জানা যায়, গঙ্গাবাড়ি তাঁহার রাজধানী এবং তাঁহার বংশ 'রূপগঙ্গ' নামে খ্যাত। অনন্তবর্ম্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র নরসিংহ। এঁর রাজা কামার্ণব এ বংশের আদিপুরুষ। তিনি কেবল কলিঙ্গ নয়, উৎকল বা উড়িষ্যাও আক্রমণ করিয়াছিলেন। গঙ্গবংশীয় রাজগণের যুদ্ধ-প্রশংসা কি করিতে পারা যায় ? গোকর্ণের মহাদেব প্রভৃতি এ বিষয়ের সাক্ষী। সেই কামার্ণবের পুত্র-পৌত্রগণ বিক্রমশালী রাজা ছিলেন।

চারি পাঁচ শত বর্ষ পূর্ব্বে রাজগুরু বাসুদেব রথ কর্ত্তৃক সংস্কৃতে রচিত চম্পূকাব্য "গঙ্গবংশানুচরিতে" দেখিতে পাওয়া যায়—

"ত্রিদেশ কটকে রাজধানী মধ্যাসা গঙ্গাধরে প্রথমতোঽবনিদেব ষট্‌কং সমক্ষিপ্তে চরণদণ্ড ষট্ কলি তোনৃসিংহাঃ দেবেষুচ হীরস্তব প্রথমং চূড়ঙ্গে যং গৌড়নথ ইতি কেচিদিদন্তি। ধীমানসৌ সকল বুদ্ধিবলো-দয়েন সিংহাসনং গজপতেঃ স্বয়মধ্যুবাস। অসৌ গৌড় শব্দস্য বংশো গঙ্গস্য বংশ ইতি কিঞ্চো ক্ষিতি মাসৎ। পরে বিধবায়া গঙ্গাদিত্যেরা কন্যাস্থিত্ ব্রাহ্মণ্যা মহাদেব বর প্রসাদাৎ পুত্রোঽভূত বংশো গঙ্গবংশ। তথাস্যোতি গঙ্গবংশঃ প্রতিদিনমত বর্দ্ধান্ প্রভূয়ন্ চতুঃসমুদ্রাখান সমজনি চূড়ঙ্গো নরপতিঃ চূড়ঙ্গদেবাখ্যো রাজরাজেশ্বরোপ নববর্ষাণি কেবলং সশাস।" রাজরাজেশ্বরের পুত্র অতিরথ দেব "এক সপ্ততি বৎসরান্" অর্থাৎ ৭১ বর্ষ রাজত্ব করিলেন। তাঁহার পুত্র একরটী কামদেব জগন্নাথের মন্দির-নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন এবং তদীয় পুত্র অনঙ্গ ভীমদেবের রাজত্ব সময়ে মন্দির-নির্ম্মাণ শেষ হয়।—

অঙ্ক ক্ষৌণী শশাঙ্কেন্দু সম্মিতে শাক বৎসরে
অনঙ্গ ভীমদেবেন প্রাসাদ শ্রীপতেঃ কৃতঃ।

বাঙ্গলা পত্রিকায় গঙ্গবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে, তাঁহার জন্মস্থান দক্ষিণে ও তাঁহার বাসস্থানে "গোকর্ণের মহাদেব" ছিলেন। তাম্রশাসনেও সেই পরিচয় পাওয়া যায়।

"গঙ্গাবাড়ি" শব্দকে কেহ কেহ "গঙ্গরাড়ী" বলিয়া অনুমান

করেন। তাঁহাদের মতে তাহা গঙ্গা-কূলে অবস্থিত এবং সেখান অবশ্য জনবহুল ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। সুতরাং গঙ্গবংশীয়গণ গঙ্গারাঢ়ীয়। পৃথিবীর ইতিহাস-লেখক বলেন—"জনশ্রুতিতে জানা যায় যে, তোষ গঙ্গা বঙ্গদেশ হইতে উড়িষ্যায় আগমন করেন এবং অনেকে অনুমান করেন গঙ্গবংশের আদি বাসস্থান হয়ত।" তারতী মহাশয় বলিতেছেন, "যে গঙ্গবংশের প্রতাপ গোদাবরী তট হইতে সুবর্ণরেখা তিলিঙ্গ এবং ত্রিবেণী হইতে বঙ্গ-সাগর-বিধৌত বিশাল জনপদ-ভূমিতে উচ্চ্ছল পাষাণ-শক্তিকে তুচ্ছ করতঃ সাম্রাজ্য গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাঁহারাও বাঙ্গালী।" এখন দেখা যাউক, 'সঙ্গবাড়ি' শব্দ কি গঙ্গা-সন্নিকটবর্ত্তী স্থান-বোধক? গঙ্গা-কূলে না থাকিলে যে কোন স্থান গঙ্গা শব্দ-বিশিষ্ট হইতে পারে না, তাহাও নয়। গঙ্গা হইতে বহু শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী পুরীঃবলায় "গঙ্গানারায়ণপুর", "গঙ্গাপাড়া", "গঙ্গাগোবিন্দপুর" প্রভৃতি এবং কটকেও "গঙ্গামন্দির" বলিয়া এক স্থান আছে। সুতরাং ইহারা কি গঙ্গা-কূলে অবস্থিত বলিতে হইবে? আবার দক্ষিণে গোদাবরীর নিকটে "গঙ্গালাকুর", ছত্রপুরের নিকটস্থ "গঙ্গা" এবং বম্বে কুণ্ডার সন্নিকটে "গঙ্গাপুরম্" প্রভৃতি স্থানও দেখা যায়।

সুতরাং বলা যাইতে পারে, গঙ্গাবংশীয়গণ "মাহিষ্য" কি বাঙ্গালী ছিলেন না। তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় ও উড়িষ্যা। তাঁহাদের হস্তে দীর্ঘকাল শাসন-দণ্ড পরিচালিত হইয়াছিল, তথাপি উড়িষ্যায় বঙ্গভাষার প্রচলন কিংবা পুস্তকাদি বঙ্গভাষায় রচিত হয় নাই। এখনও গঙ্গাবংশের নরপতিগণ দক্ষিণ গঞ্জাম জেলায় বাস করিতেছেন। বড় খেমড়ি, ছোট খেমড়ি ও পারলা খেমড়ির রাজগণ গজপতি বা গঙ্গবংশীয়। উড়িয়া তাঁহাদের মাতৃভাষা। এই প্রদেশে কবিগণ উড়িয়া ভাষার বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। গঙ্গাবাড়ী গ্রাম পারলা খেমড়ির অন্তর্গত এবং পূর্ব্বে সমৃদ্ধিশালী ছিল। ইহার মধ্য দিয়া পারলা খেমড়ির রেল-লাইন গমন করিয়াছে এবং তাহাদের একটী ষ্টেশনের নামও "গঙ্গবালা"। তাহা নউপাড়া ষ্টেশন হইতে ১৩ মাইল এবং পারলা হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। বড় খেমড়ির ২ মাইল দূরে সোমেশ্বর মহাদেব। তিনটী খেমড়ি পূর্ব্বে এক রাজার অধীন ছিল। অনন্তবর্ম্মা এই গঙ্গবাড়িতে রাজধানী করিয়াছিলেন।

পরিচারিকা—বৈশাখ, ১৩২৫

"লীলাবতী"—মেবিকা—ইহাতে সত্যভাষা দেবী। প্রায় ৮০০ বর্ষ পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৮৮ বৎসর হইল তৎপ্রণীত জগদ্বিখ্যাত "সিদ্ধান্ত-শিরোমণি" "লীলাবতী" এবং "লীলাবতী" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিদ্বীষর আজবরের জনৈক বন্ধু সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিয়া অনেকগুলি সংস্কৃত শাস্ত্রের পারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। 'লীলাবতী' তাহাদের অন্যতম। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—ভাস্করাচার্য্য বিজয় সহর-নিবাসী ছিলেন। লীলাবতী তাঁহার একমাত্র কন্যা। কিন্তু তাহার জন্মকোষ্ঠী ও সাঙ্কেতিক গণনায় বৈধব্য ও অপুত্রিক দশা বর্ত্তমান দেখিয়া তিনি বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

ক্রমে লীলাবতীর বিবাহ সময় উপস্থিত হইল। তিনি স্বীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভাবে এরূপ লগ্ন স্থির করিলেন যে, তাহাতে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইলে কন্যা বিধবা কিংবা অপুত্রিক হইবে না। বিবাহ-সভায় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে বর-কন্যা আনীত হইল। লগ্ন-নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে এক জলপূর্ণ পাত্রের উপর অন্য এক সচ্ছিদ্র পাত্র স্থাপিত হইয়াছে। ঐ ছিদ্র-পথে জল উত্থিত হইয়া পাত্রটী পূর্ণ করিলে—সেই মুহূর্ত্তে—কন্যা প্রথম হইবে। সময়ের সূক্ষ্ম বিচার নিমিত্ত বহু বিজ্ঞ পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ দৈবজ্ঞ সমাগত। কিন্তু বিধাতার বিধান বিচিত্র! লীলাবতী বাল-সুলভ প্রমুক্ত উক্ত যন্ত্রের অলোকদর্শন দেখিতেছিলেন। তাঁহার মস্তকের মুকুট হইতে অকস্মাৎ একটি ক্ষুদ্র মুক্তা জলবিন্দু আকারে অলক্ষ্যে পাত্র মধ্যে পতিত হইয়া ছিদ্র মুখ রুদ্ধ করিল। পাত্রটী জলপূর্ণ হইতে বিলম্ব দেখিয়া সকলেই অধীর হইয়া উঠিলেন এবং কারণ অনুসন্ধান করিতে-করিতে উক্ত মুক্তা আবিষ্কার করিলেন। কিন্তু হায়, তখন শুভলগ্ন উত্তীর্ণ হইয়াছে! ভাস্করাচার্য্য বৃথা আশা পরিত্যাগ করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিধির বিধান কে রোধ করিবে? অল্প দিন পরেই লীলাবতী বিধবা হইলেন।

ভাস্করাচার্য্য কন্যার দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহাকে গণিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় এক-খানি পুস্তক রচনা করিয়া কন্যার বীজানুসারে তাহার নাম 'লীলাবতী' রাখিলেন। পিতাপুত্রীর প্রশ্নোত্তর-ক্রমে উক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহার অঙ্ক-সাধন-প্রণালী অতি সুন্দর। প্রথমে পরিভাষা-ক্রমে সঙ্কলন, ব্যবকলন, পূরণ, হরণ, বর্গ, ঘন প্রভৃতির সুন্দর ও উত্তম উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। লীলাবতী অঙ্ক শাস্ত্রে যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাহা অনেক পুরুষের পক্ষে কঠিন। কথিত আছে—বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া তিনি অল্প সময়ে উক্ত বৃক্ষের শাখা-পত্রাদির সংখ্যা নিরূপণ করিতে পারিতেন। ভারত-মাতার কোলে আজ এরূপ বিদ্যাবতী রমণীর সংখ্যা অতি বিরল।

পুস্তক-পরিচয়

অনুপমা

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন প্রণীত, মূল্য দুই টাকা]

সূচনায় লেখক মহাশয় বলিয়াছেন "আমার উপন্যাসখানি ঘোর বস্তু তন্ত্র উপন্যাস। ইহাতে ম্যালেরিয়া আছে, বন্যা আছে, পল্লীগ্রামের উন্নতির কথা আছে, নিম্নজাতির উদ্ধারের কথা আছে, হিন্দুধর্মের উপদেশ আছে, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য আছে—কিন্তু 'প্রেমে পড়া' নাই।" না থাকিল প্রেমে পড়া; কিন্তু তা ছাড়া আর যা আছে এবং যে কথা লেখক প্রাণ খুলিয়া বলিয়াছেন, তাহা আজকাল দুর্লভ; সেটী অকৃত্রিম সহানুভূতি। লেখক যতীন্দ্র বাবু প্রাণ ঢালিয়া দিয়া উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন; 'ধ্রুব-তারা' ও 'উড়িষ্যার চিত্র'-লেখকের নিকট ইহাই আমরা আশা করি। এই উপন্যাসখানি পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না; অথচ ইহাতে প্রেম নাই, আধুনিক আর্ট নাই, লুকোচুরি নাই। যতীন্দ্রবাবুর ন্যায় কৃতী ও বয়স্কী লেখকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল এই উপন্যাসে সরল ও সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা এই উপন্যাসের বহুল প্রচার কামনা করি।

চিতোরোদ্ধার

[শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য একটাকা মাত্র]

সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ এই নাটকখানি লিখিয়াছেন এবং ইহা কতকদিন হইতে মহালয়ারোহে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, নাটকখানি বঙ্গীয় জনসাধারণ কর্তৃক আদৃত হইয়াছে। রাজপুত-কুলতিলক হাম্বিরের ঘটনা লইয়া নাটকখানি লিখিত। হাম্বিরের চরিত্রের মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য সর্ব্বত্র সমভাবে রক্ষিত হইয়াছে। কবিবর যে উদ্দেশ্যে নাটকখানি লিখিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য কোন দিন সফল হইবে কি না, হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃভাবে কোন দিন মিলিত হইবে কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু কবি সেই কথাই বলিতেছেন এবং সেই আশার উৎফুল্ল হইয়াই তিনি নাটকখানি লিখিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধই নাটকের বক্তব্য বিষয়; কিন্তু কবি হাম্বিরের মাতা দেবী হায়াবতীকে যখন-তখনই ঘটনাস্থলে উপস্থিত করিয়া শান্তির মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। হাম্বির ও হায়াবতী, মাতা ও পুত্র—এই দুইটী চরিত্রই অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

কমণ্ডলু

[শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ছয় আনা]

এখানি কবিতা-পুস্তক। কিন্তু ইহাতে সেই মামুলী কবিতার ছড়া-ছড়ি নাই। লেখক যে ভাবুক ও কবিপ্রাণ, তাহা এই 'কমণ্ডলু' অনেক কবিতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। কবিতা হিসাবেও এই কমণ্ডলু ব্যর্থ হয় নাই; লেখক মহাশয় ভবিষ্যতে যে অধিকতর যশস্বী হইবেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ এই কমণ্ডলুতে বর্ত্তমান। আমরা এই কবিতা-পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি;—বেশ সহজ, সরল ভাষায় লিখিত অনেক ভাবকণা এই পুস্তকে আছে।

ভারতবর্ষের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন

[শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাস এম, এ, প্রণীত। মূল্য ৸৹ আনা]

আমরা 'ভারতবর্ষের ভাগ্য-পরিবর্ত্তন' নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। বাজারে সচরাচর যে সকল ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে ছুরি-ছুরি নাম, ঘটনাবলী ও সন তারিখের সমাবেশ থাকাতে ইতিহাস পাঠ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ভারতবর্ষের সমুদয় ঐতিহাসিক তথ্যগুলি একত্রীভূত করিলে গ্রন্থ বৃহদাকার হইয়া যায় এবং তাহা পাঠ করিবার অবকাশ পাওয়া যায় না; কিন্তু এই পুস্তকে গ্রন্থকার এরূপ ভাবে ঐতিহাসিক তথ্যগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছেন যে, পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যতদিন না ভারতবাসী আপনাদিগের দেশের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন এবং আপনাদিগের দোষ-গুণের কারণগুলি নির্ণয় করিতে পারিবেন, ততদিন স্বরাজ-শাসন বিষয়ে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিবেন না। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিলে যে সকল ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা পুনরাবৃত্তি হওয়া কিছু আশ্চর্য্যজনক নহে। আমরা যখন বুঝিতে পারিব, সেইরূপ অবস্থায় পড়িলে আমরা এক্ষণে কৃতকার্য্য হইব, তখনই কেবল স্বরাজ্য শাসনের অধিকারী হইব। বঙ্গদেশে প্রত্যেক বয়স্কারী এরূপ ইতিহাস পাঠ করিলে উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারিবেন, সুকুমারমতি বালক বালিকাগণও অনায়াসে এই ইতিহাস পাঠ করিলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। আমরা জনসাধারণকে এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

রসীর ডায়ারী

[শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী প্রণীত, মূল্য আট আনা]

ইহা কয়েকটী ছোটগল্পের সমষ্টি, প্রথম গল্পানুসারে বইখানির নাম-করণ হইয়াছে। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেই ডায়ারি রাখিয়া থাকে, কিন্তু এখন দেখিতেছি শ্রীমতী কাঞ্চনমালার স্নিগ্ধ কর-টেবিলের রসিও ডায়ারী রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে। পোষা স্নিগ্ধ কুকুরের পৃষ্ঠদেশের বাড়ীর সর্ব্বত্র অবাধিত-যায়; তাহার পর সে খাতির রাখিতে জানে না; সুতরাং তাহার ডায়ারীতে সব গুপ্তকথা, ঘরের খুটিনাটি ঠিক-ঠিক চিত্রিত হইয়া থাকে। যদি এই রসির ডায়ারি গল্পটী পড়িবার জন্যই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকানির এই গ্রন্থখানি আট আনা দিয়া

কিনিলে পয়সার অপব্যয় হইবে না। অন্ত গল্পগুলি কাঁচা। কিন্তু পড়িলে বুঝিতে পারা যায়, এই কাঁচাগুলির মধ্যেও খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে; নমুনা স্বরূপ আমরা 'ওষ্ঠাধর' 'ওষ্ঠধর' প্রভৃতির নাম করিতে পারি। ছোটগল্প লেখিকাগণের মধ্যে শ্রীমতী কাঞ্চনমালার যে প্রতিষ্ঠা আছে, এই ডায়ারিতে তাহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

রামগড়

[শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত, মূল্য দুই টাকা]

শ্রীমতী অনুরূপা সামাজিক উপন্যাস রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠি লাভ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার চেষ্টা তাঁহার পক্ষে এই প্রথম। বৌদ্ধ আমলের ঘটনা লইয়া উপন্যাস রচনা করিতে হইলে যতখানি সাবধানতার আবশ্যক, তাহা এই পুস্তকে দৃষ্ট হয়। তবে এই উপন্যাসে ঐতিহাসিকতা কতদূর রক্ষিত হইয়াছে, তাহা যাঁহারা বৌদ্ধ-যুগের ইতিহাসে বিশেষ অভিজ্ঞ, তাঁহারাই বলিতে পারেন।

মধুপর্ক

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত, মূল্য আট আনা]

এই 'মধুপর্ক' গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ প্রকাশিত আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার একবিংশ গ্রন্থ। লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্য পাঠকগণের শুধু পরিচিত নহেন, বিশেষ প্রিয়। তাঁহার এই 'মধুপর্কে' যে কয়েকটি মধুচক্র স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার রসাস্বাদন করিয়া সকলেই তৃপ্তিলাভ করিবেন। প্রথম গল্প 'উমার' যখন মাসিক পত্রিকার প্রকাশিত হয়, তখন আমরা ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলাম। 'অভিশপ্তা' নামক গল্পটী অতি মনোহর। 'মধুপর্কের' পাত্রটী ছোট হইলেও মধুতে পরিপূর্ণ। হেমেন্দ্রবাবুর গল্প বলিবার ভঙ্গী বড়ই সুন্দর।

গুরু গোবিন্দসিং

[শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা]

এখানি শিখদিগের দশম গুরু গোবিন্দসিংহের জীবন-চরিত। ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এই পুস্তকে শিখ-জাতির উৎপত্তি হইতে দশ জন গুরুর অলৌকিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে; তন্মধ্যে দশম গুরু গোবিন্দসিংহের জীবন-কথাই বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুলেখক শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে সর্ব্বাংশে এই কার্য্যের উপযুক্ত, তাহা এই সুবৃহৎ পুস্তকেই প্রকাশ। গুরু গোবিন্দসিং সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণই এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থের আর একটী গুণ এই যে, তিনকড়িবাবু ইতিহাস লিখিয়াছেন, তিনি অন্তভাবে এই গ্রন্থের নায়কের গুণবর্ণনা করেন নাই। বাঙ্গালী পাঠক-মাত্রেই এই গ্রন্থের আদর করিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হাতে চাঁদ কপালে সূর্য্যি

[শ্রীনরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দশ আনা]

এখানি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত গল্পের বই। যেমন ভাষা, তেমনই বলিবার ভঙ্গী, তেমনই গল্পগুলি, আর তেমনই ছাপা বাঁধাই; বইখানি ছেলেদের হাতে দিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। লেখক একেবারে ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া গল্প কয়টী বলিয়াছেন। ছবি খুব বেশী নাই, কিন্তু গল্পগুলি পড়িতে-পড়িতে ছেলেমেয়েদের চক্ষের সম্মুখে ছবি আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমরা, ছেলেদের অভিভাবকেরা যখন বইখানি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিলাম, তখন ছেলেরা যে খুবই খুসী হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

দরিদ্র নারায়ণ

[শ্রীমধুসূদন আচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ প্রণীত, মূল্য দশ আনা]

অনেকদিন পরে একখানি সুন্দর পুস্তক দেখিলাম। 'দরিদ্র নারায়ণের' সেবা কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং ইহাতে স্বামী বিবেকানন্দের কথাই অনেক আছে। লেখক মহাশয় প্রকৃত সেবকের ন্যায় দরিদ্র-নারায়ণ, প্রাচ্য-ধর্ম্ম ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা, পাশ্চাত্য সেবাধর্ম্ম, বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও দরিদ্র সেবা ও দরিদ্র-নারায়ণ সেবার প্রণালী অতি 'ধর্ম্মস্পর্শী' ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"দরিদ্র, আতুর, অন্ধ, খঞ্জ, বধির, ও বিকলেন্দ্রিয় প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিও না, ইহারা নরনারী নারায়ণ; ইহাদের সেবাই সকল ধর্ম্মের সার, এবং ইহাদের সেবাই যথার্থ ভগবৎ সেবা।" পণ্ডিত মহাশয় এই সার সত্যই প্রচার করিয়াছেন। পুস্তকখানি সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

ফুলের তোড়া

[শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রণীত, মূল্য আট আনা]

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর 'ফুলের তোড়া' সত্য-সত্যই ফুলের তোড়া; ইহার সকল গুলি ফুলই সুগন্ধে পরিপূর্ণ, ইহাতে শুধু বাহিরের চটক দেখাইবার জন্য একটীও পাতাবাহার সন্নিবিষ্ট হয় নাই। ফুলের তোড়া, নিয়তি, বড়ের রাত্রি, খেজুরওয়ালা, রহস্যের জাল, রাজ বিচার ও ঘরোয়া, এই কয়টী সুন্দর ফুল এই তোড়ায় সাজান হইয়াছে। আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারি, এই তোড়া পাঠকগণের টেবিলের শোভা বর্দ্ধন করিবে এবং ইহার গন্ধে গৃহ আমোদিত হইবে।'

শ্রীকান্তর ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

শ্রীমান বন্ধুকে কেন যে বাধা হইয়া আমাদের জন্য একটা স্বতন্ত্র গাড়ী রিজার্ভ করিতে হইয়াছিল, এই খবরটা যখন তাহার কাছে আমি লইতেছিলাম, তখন রাজলক্ষ্মী কান পাতিয়া শুনিতেছিল। এখন, সে একটু অন্যত্র যাইতেই রাজলক্ষ্মী নিতান্ত গায়ে পড়িয়াই আমাকে শুনাইয়া দিল যে, নিজের জন্য বাজে-খরচ করিতে সে যত নারাজ, তত্তই তাহার ভাগ্যে এই সকল বিড়ম্বনা ঘটে। সে কহিল "সেকেণ্ড ক্লাস ফাষ্ট ক্লাসে গেলেই যদি ওদের তৃপ্তি হয়, বেশ ত, তাও ত আমাদের জন্য মেয়েদের গাড়ী ছিল! কেন রেল কোম্পানিকে মিছে এতগুলো টাকা বেশি দেওয়া!"

বন্ধুর কৈফিয়তের সঙ্গে তাহার মায়ের এই মিতব্যয়-নিষ্ঠার বিশেষ কোন সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু সে কথা মেয়েদের বলিতে গেলেই কলহ বাধে। অতএব চুপ করিয়া শুধু শুনিয়া গেলাম, কিছুই বলিলাম না।

প্লাটফর্মের একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া সেই ভদ্রলোকটি ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুমুখ দিয়া যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় যাবেন?"

লোকটি কহিলেন, "বর্দ্ধমান।"

একটু অগ্রসর হইতেই রাজলক্ষ্মী আমাকে চুপি-চুপি বলিল, "তা'হলে ত উনি অনায়াসে আমাদের গাড়ীতে যেতে পারেন? ভাড়াও লাগ্‌বে না—তাই কেন ওঁকে বল না?"

বলিলাম, "টিকিট নিশ্চয়ই কেনা হয়ে গেছে,—ভাড়ার টাকা ওঁর বাঁচবে না।"

রাজলক্ষ্মী কহিল, "তা' হোক্ না কেনা, ভিড়ের কষ্টটা ত' বাঁচবে।"

কহিলাম, "ওঁদের অভ্যাস আছে,—ভিড়ের কষ্ট গ্রাহ্য করেন না।"

রাজলক্ষ্মী তখন জিদ্ করিয়া বলিল, "না না, তুমি ওঁকে বল। আমরা তিনজনে কথাবার্ত্তায় এতটা পথ বেশ যেতে পারব।"

বুঝিলাম, এতক্ষণে সে নিজের ভুলটা টের পাইয়াছে। বন্ধু এবং নিজের চাকর-বাকরদের চোখের উপর আমার সঙ্গে একাকী একটা আলাদা গাড়ীতে উঠার দুষ্টিকটুত্বটা এখন সে কোনমতে একটুখানি ফিকা করিয়া লইতে চায়। তথাপি, ইহাকেই আরও একটু চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবার জন্য তাচ্ছল্যের ভঙ্গীতে কহিলাম, "কাজ কি একটা বাজে লোককে গাড়ীতে ঢুকিয়ে। তুমি যত পার আমার সঙ্গে কথা কোরো,—বেশ সময় কেটে যাবে।"

রাজলক্ষ্মী আমার প্রতি একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "সে আমি জানি। আমাকে জব্দ করবার এতবড় সুযোগ হাতে পেয়ে কি তুমি ছাড়তে পারো!" এই বলিয়া সে চুপ করিল।

কিন্তু ট্রেন ষ্টেশনে লাগিতেই আমি তাঁকে গিয়া কহিলাম, "আপনি কেন আমাদের গাড়ীতেই আসুন না। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই,—ভিড়ের দুঃখটা আপনার বাঁচবে।"

বলা বাহুল্য তাঁহাকে রাজী করাইতে বেশ পাইতে হইল না, অনুরোধ মাত্রই তিনি তাঁহার পুঁটুলি লইয়া আমাদের গাড়ীতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন।

ট্রেণ দোটাদুই ষ্টেশন পার না হইতেই রাজলক্ষ্মী তাঁহার সহিত চমৎকার কথাবার্ত্তা জুড়িয়া দিল, এবং আরও কয়েকটা ষ্টেশন উত্তীর্ণ হইবার মধ্যেই তাঁহার ঘরের খবর, পাড়ার খবর, এমন কি আশ-পাশের গ্রামগুলার খবর পর্য্যন্ত সে খুঁটিয়া জানিয়া লইল।

তাহার গুরুদেব কাশীতে দৌহিত্র-দৌহিত্রী লইয়া বাস করেন, তাহাদের জন্য সে কলিকাতা হইতে অনেক জিনিস-পত্র লইয়া যাইতেছিল। বর্দ্ধমানের কাছাকাছি আসিয়া তোরঙ্গ খুলিয়া সে তাহারই মধ্যে হইতে বাছিয়া একখানি সবুজ রঙের রেশমের শাড়ী বাহির করিয়া বলিল, "সরলাকে তার পুতুলের বদলে এই কাপড়খানি দেবেন।"

ভদ্রলোক প্রথমে অবাক্ হইলেন, পরে সলজ্জভাবে

তাড়াতাড়ি করিলেন, "না না, না, সরলাকে আমি আসছে বারে পুতুল কিনে দেব,—আপনি কাপড় রেখে দিন। তা'ছাড়া এ যে বড্ড দামী কাপড় মা!"

রাজলক্ষ্মী বস্ত্রখানি তাঁহার পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, "বেশি দাম নয়। আর দাম যাই হোক্, এখানি তার হাতে দিয়ে বল্‌বেন, তার মাসি তাকে ভাল হয়ে পরতে দিয়েছে।"

ভদ্রলোকের চোখ ছল-ছল করিয়া আসিল। আধ ঘণ্টার আলাপে একজন অপরিচিত লোকের পীড়িত কন্যাকে এমন একখানি মূল্যবান বস্ত্র উপহার দেওয়া জীবনে বোধ করি তিনি আর কখনো দেখেন নাই। কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন, সে ভাল হয়ে উঠুক, কিন্তু গরীবের ঘরে এত দামী কাপড় নিয়ে সে কি করবে মা? আপনি তুলে রেখে দিন।" বলিয়া তিনি আমার প্রতিও একবার চাহিলেন। আমি কহিলাম, "তার মাসি যখন তাকে পরতে দিচ্ছে, তখন নিয়ে গিয়ে তাকে আপনার দেওয়াই উচিত।" বলিয়া হাসিয়া কহিলাম, "সরলার ভাগ্য ভাল। আমাদের এমন একটা মাসি-পিসি থাকলে যে বেঁচে যেতুম মশাই! এইবার কিন্তু আপনার মেয়েটি চট্‌পট্ সেরে উঠ্‌বে দেখ্‌বেন।"

ভদ্রলোকের সমস্ত মুখে কৃতজ্ঞতা যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল; তিনি আর আপত্তি না করিয়া কাপড়খানি গ্রহণ করিলেন। আবার দুজনের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। সংসারের কথা, সমাজের কথা,—সুখ-দুঃখের কথা,—কত কি। আমি শুধু জানালার বাহিরে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। এবং যে প্রশ্ন নিজেকে নিজে বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এই ক্ষুদ্র ঘটনার সূত্র ধরিয়া আবার সেই প্রশ্ন মনে উঠিল,—এ যাত্রার সমাপ্তি কোথায়?

একখানা ১০।১২ টাকা মূল্যের বস্ত্র দান করা রাজলক্ষ্মীর পক্ষে কঠিনও নয়, নূতনও নয়। তাহার দাসী-চাকরেরা হয়ত এ কথা লইয়া একবার চিন্তা পর্য্যন্তও করিত না। কিন্তু আমার চিন্তা আলাদা। এই দেওয়া জিনিষটা যে দান করার হিসাবে তাহার কাছে কিছুই নয়,—সে আমিও জানি, এবং কাহারও চেয়ে কম জানি না; কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম, তাহার হৃদয়ের ধারাটা যে দিক লক্ষ্য করিয়া আপনাকে নিঃশেষ করিতে উদ্দাম হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহার অবসান হইবে কোথায় এবং কি করিয়া? সমস্ত রমণীর অন্তরেই নারী বাস করে কি না, তাহা জোর করিয়া বলা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ। কিন্তু নারীর চরম সার্থকতা যে মাতৃত্বে, এ কথা বোধ করি গলা বড় করিয়াই প্রচার করা যায়।

রাজলক্ষ্মীকে আমি চিনিয়াছিলাম। তাহার পিয়ারী বাইজী যে তাহার অপরিণত যৌবনের সমস্ত দুর্দ্দাম আক্ষেপ লইয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই মরিতেছিল, সে আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলাম। আজ সে নামটা উচ্চারণ করিলেও সে কেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে থাকে। আমার সমস্যাও হইয়াছিল ইহাই।

সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সংসার উপভোগ করিবার সেই উত্তপ্ত আবেগ আর রাজলক্ষ্মীর মধ্যে নাই;—আজ সে শান্ত, স্থির। তাহার কামনা বাসনা আজ তাহারই মধ্যে এমন ডুব মারিয়াছে যে, বাহির হইতে হঠাৎ সন্দেহ হয় তাহারা আছে, কি নাই। তাহাই এই সমস্ত ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাকে আবার স্মরণ করাইয়া দিল, এই তাহার পরিণত যৌবনের সুগভীর তলদেশ হইতে যে মাতৃত্ব সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, সদ্য নিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের মত তাহার বিরাট ক্ষুধার আহার মিলিবে কোথায়? তাহার নিজের সন্তান থাকিলে যাহা সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারিত, তাহারই অভাবে সমস্যা আজ একান্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন পাটনায় তাহার মধ্যে যে মাতৃরূপ দেখিয়া মুগ্ধ, অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম, আজ তাহার সেই মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া আমার অত্যন্ত ব্যথার সহিত কেবলি মনে হইতে লাগিল,—অত বড় আগুনকে ফুঁ দিয়া নিভানো যায় না বলিয়াই আজ পরের ছেলেকে ছেলে করনা করার ছেলেখেলা দিয়া রাজলক্ষ্মীর বুকের তৃষ্ণা কিছুতেই মিটিতেছে না। তাই আজ একমাত্র বহুই তাহার কাছে পর্য্যাপ্ত নয়,—আজ দুনিয়ায় যেখানে যত ছেলে আছে, সকলের সুখ-দুঃখই তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে।

বর্ত্তমানে ভদ্রলোক নামিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী অনেকক্ষণ ধরিয়া চোখ মুছিয়া কথঞ্চিৎ স্থির হইয়া বসিলে, আমি জানালা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই কান্নাটা কার কল্যাণে হোলো? সরলা, না তার মায়ের?"

রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া কহিল, "তুমি বুঝি এতক্ষণ আমাদের কথা শুনছিলে?"

বলিলাম, "কাজে কাজেই। মানুষে নিজে কথা না কইলেই পরের কথা তার কানে এসে ঢোকে। সংসারের কম-কথার লোকের জন্যে ভগবান এই শাস্তির সৃষ্টি করে রেখেছেন। ফাঁকি দেবার জো নেই। সে যাক্, কিন্তু চোখের জল কার জন্যে ঝরছিল শুনতে পাই নে?"

রাজলক্ষ্মী কহিল, "আমার চোখের জল কার জন্যে ঝরে, সে শুনে তোমার লাভ নেই।"

কহিলাম, "লাভের আশা করি নে,—শুধু লোকসান বাঁচিয়ে চলতে পারলেই বাঁচি। সরলা কিম্বা তার মায়ের জন্যে যত ইচ্ছে চোখের জল ঝরুক, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার বাপের জন্যে ঝরাটা আমি পছন্দ করি নে।"

রাজলক্ষ্মী শুধু একটা 'হুঁ' বলিয়াই জানালার বাহিরে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

মনে করিয়াছিলাম এমন একটা রসিকতা নিষ্ফল হইবে না, ইহা অনেক নিরুদ্ধ উৎসের বাধা মুক্ত করিয়া দিবে। কিন্তু, সে ত হইলই না, বরঞ্চ, যদি বা সে এতক্ষণ এই দিকেই চাহিয়াছিল, রসিকতা শুনিয়া আর-একদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

কিন্তু, বহুক্ষণ মৌন ছিলাম,—কথা কহিবার জন্য ভিতরে-ভিতরে একটা আবেগ উপস্থিত হইয়াছিল; তাই, বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, আবার কথা কহিলাম। বলিলাম, "বর্দ্ধমান থেকে কিছু খাবার কিনে নিলে হোতো।"

রাজলক্ষ্মী কোন উত্তরই দিল না,—তেম্‌নি চুপ করিয়া রহিল।

বলিলাম, "পরের শোকে এতক্ষণ কেঁদে ভাসিয়ে দিলে, আর ঘরের লোকের দুঃখে যে কানই দেও না! এ বিলেত-ফেরতের বিদ্যে শিখলে কোথায়?"

রাজলক্ষ্মী এবার ধীরে ধীরে কহিল, "বিলেত-ফেরতের ওপর যে তোমার ভারি ভক্তি দেখি।"

বলিলাম, "হাঁ, তারা ভক্তির পাত্র যে!"

"কেন, তারা তোমাদের করলে কি?"

"এখনো কিছু করেনি, কিন্তু পাছে কিছু করে, এই ভয়েই আগে থেকে ভক্তি করি।"

রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "এ তোমাদের অন্যায়। তোমরা তাদের দল থেকে, জাত থেকে, সমাজ থেকে, সব দিক থেকেই বার করে দিয়েচ। তবু যদি তারা তোমাদের জন্যে এতটুকুও করে, তাতেই তোমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

কহিলাম, "আমরা ঢের বেশি কৃতজ্ঞ হতুম, যদি তারা সেই রাগে পুরাপুরি মুসলমান কিম্বা খৃষ্টান হয়ে যেত। ওদের মধ্যে যারা নিজেদের ব্রাহ্ম বলে, তারা ব্রাহ্ম-সমাজটাকে নষ্ট করচে, যারা নিজেদের হিন্দু বলে মনে করে, তারা হিন্দু-সমাজকে ত্যক্ত করে মারচে। ওরা নিজেরা যে কি, যদি তাই আগে ঠিক করে নিয়ে পরের জন্যে কাঁদতে বসতো, তাতে হয় ত ওদের নিজেদেরও মঙ্গল হোতো, যাদের জন্যে কাঁদে তাদেরও হয় ত একটু উপকার হোতো।"

রাজলক্ষ্মী কহিল, "কিন্তু আমার ত তা' মনে হয় না।"

বলিলাম, "না হলেও তেমন ক্ষতি নেই, কিন্তু যে জন্যে সম্প্রতি আটকাচ্চে, সে অন্য কথা। কই তার ত কোন জবাব দেও না।"

এবার রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, "ওগো, সে জন্যেও আটকাবে না। আগে তোমার খিদে পাক্, তার পরে চিন্তা করে দেখা যাবে।"

বলিলাম, "তখন চিন্তা কোরে যে কোন ষ্টেশন থেকে যা মেলে খাবার কিনে গিলতে দেবে,—এই ত? কিন্তু সে হবে না, তা বলে রাখ্‌চি।"

জবাব শুনিয়া সে আমার মুখের প্রতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া, আবার একটু হাসিয়া বলিল, "এ আমি পারি, তোমার বিশ্বাস হয়?"

বলিলাম, "বেশ, এতটুকু বিশ্বাসও তোমার ওপর থাকবে না?"

"তা বটে!" বলিয়া সে পুনরায় তাহার জানালার বাহিরে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

পরের ষ্টেশনে রাজলক্ষ্মী রতনকে ডাকিয়া খাবারের ঝাড়গাটা চাহিয়া লইল, এবং তাহাকে তামাক দিতে হুকুম করিয়া, থালায় করিয়া সমস্ত খাদ্য-সামগ্রী সাজাইয়া সম্মুখে ধরিয়া দিল। দেখিলাম, এ বিষয়ে এক-বিন্দু ভুল-চুক

কোথাও নাই,—আমি যাহা কিছু ভালবাসি, সমস্ত খুঁটাইয়া সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে।

বেঞ্চের উপর রতন বিছানা পাতিয়া দিল। পরিপাটী ভোজন সমাধা করিয়া গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া আরামে চোখ বুজিবার উপক্রম করিতেছি, রাজলক্ষ্মী কহিল, "খাবারগুলো সরিয়ে নিয়ে যা' রতন। যা' পারিস খেগে যা',—আর তোদের গাড়ীতে অন্য কেউ যদি থাকে দিস্।"

কিন্তু রতনের অত্যন্ত লজ্জা এবং সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কই, তুমি খেলে না?"

রাজলক্ষ্মী তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিল, "না, আমার ক্ষিদে নেই,—যা না রতন, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, গাড়ী ছেড়ে দেবে যে।"

রতন লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। কহিল, "আমার অন্যায় হয়ে গেছে বাবু,—মোচলমান কুলিতে খাবারটা ছুঁয়ে ফেলেছে। কত বল্‌চি, মা, ইষ্টিশান থেকে কিছু কিনে এনে দিই,—কিন্তু কিছুতেই না।" বলিয়া সে আমার মুখের প্রতি সকাতর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ঠিক যেন আমারই অনুমতি ভিক্ষা করিল।

কিন্তু আমার কথা কহিবার পূর্ব্বেই রাজলক্ষ্মী তাহাকে একটা তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "তুই যাবি, না, দাঁড়িয়ে তর্ক করবি?"

রতন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া খাবারের পাত্রটা হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

ট্রেণ ছাড়িলে রাজলক্ষ্মী আমার শিয়রে আসিয়া বসিল। মাথার চুলের মধ্যে ধীরে-ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিতে-করিতে কহিল "আচ্ছা দেখ—"

বাধা দিয়া কহিলাম, "পরে দেখ্‌ব অখন। কিন্তু—"

সেও আমাকে তৎক্ষণাৎ থামাইয়া দিয়া বলিল,—"তোমার 'কিন্তু' দিয়ে লেক্‌চার দিতে হবে না, আমি বুঝেচি। আমি মুসলমানকে ঘৃণাও করিনে, সে ছুঁলে খাবার নষ্ট হয়ে যায়, তাও মনে করিনে। করলে, নিজের হাতে তোমাকে খেতে দিতুম না।"

"কিন্তু নিজে খেলে না কেন?"

"মেয়েমানুষের খেতে নেই।"

"কেন?"

"কেন আবার কি? মেয়েমানুষের খাওয়া নিষেধ।"

"কিন্তু পুরুষ-মানুষের নিষেধ নেই?"

রাজলক্ষ্মী আমার মাথাটা নাড়িয়া দিয়া বলিল, "না। পুরুষ-মানুষের জন্যে আবার অত বাঁধা-বাঁধি আইন-কানুন কিসের জন্যে? তারা যা ইচ্ছে খাক্, যা ইচ্ছে পরুক, যেমন করে হোক সুখে থাক্, আমরা আচার পালন করে গেলেই হোলো। আমরা শত কষ্ট সইতে পারি, কিন্তু তোমরা পার কি? এই যে সন্ধ্যা হতে-না-হতেই ক্ষিদের অন্ধকার দেখ্‌ছিলে?"

বলিলাম, "তা, হতে পারে, কিন্তু কষ্ট সইতে না পারাটা আমাদেরও গৌরবের কথা নয়।"

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল "না, এতে তোমাদের এতটুকু অগৌরব নেই। তোমরা ত আমাদের মত দাসীর জাত নয় যে, কষ্ট সহ্য করতে যাবে! লজ্জার কথা আমাদেরই, যদি না পারি।"

কহিলাম, "এ ন্যায়-শাস্ত্র তোমাকে শেখালে কে? কাশীর গুরুদেব?"

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের অত্যন্ত সন্নিকটে ঝুঁকিয়া ক্ষণকাল স্থির হইয়া রহিল, পরে মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার যা' কিছু শিক্ষা, সে তোমারই কাছে। তোমার চেয়ে বড় গুরু আর আমার নেই।"

বলিলাম, "তা'হলে গুরুর কাছে ঠিক উল্টোটিই শিখে রেখেচ। আমি কোন দিন বলিনে যে, তোমরা দাসীর জাত। বরঞ্চ এই কথাই চিরদিন মনে করি যে, তোমরা তা নও। তোমরা কোন দিক থেকে আমাদের চেয়ে এক তিল ছোট নও।"

রাজলক্ষ্মীর চোখ দুটি সহসা ছল্-ছল্ করিয়া উঠিল। বলিল, "সে আমি জানি। আর জানি বলেই ত এ কথা তোমার কাছে শিখ্‌তে পেরেচি। তোমার মত সবাই যদি এম্‌নি কোরে ভাবতে পারতো; তা'হলে পৃথিবী শুদ্ধ সমস্ত মেয়ের মুখেই এ কথা শুন্‌তে পেতে। কে বড়, কে ছোট, এ সমস্যাই কখন উঠ্‌ত না।"

"অর্থাৎ, এ সত্য নির্ব্বিচারে সবাই মেনে নিত?"

রাজলক্ষ্মী কহিল, "হাঁ।"

আমি তখন হাসিয়া কহিলাম, "ভাগ্যে পৃথিবী শুদ্ধ মেয়েরা তোমার সঙ্গে একমত নয়, তাই রক্ষা। কিন্তু

আপনাদের এত হীন মনে করতে তোমার লজ্জা করে না ?"

আমার উপহাস রাজলক্ষ্মী লক্ষ্য করিল কি না সন্দেহ ; অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, "কিন্তু এর মধ্যে ত কোন হীনতা নেই।"

আমি কহিলাম, "তা' বটে। আমরা প্রভু, তোমরা দাসী, এই সংস্কারটাই এ দেশের মেয়েদের মনে এম্‌নি বদ্ধমূল, যে এর হীনতাটাও আর তোমাদের চোখে পড়ে না। বোধ করি এই পাপেই পৃথিবীর সকল দেশের মেয়ের চেয়ে তোমরাই আজ সত্যি-সত্যি ছোট হয়ে গেছ।"

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ শক্ত হইয়া বসিয়া, দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া বলিল, "না, সে জন্যে নয়। তোমাদের দেশের মেয়েরা নিজেদের ছোট মনে ক'রে ছোট হয়ে যায়নি, তোমরাই তাদের ছোট মনে করে ছোট করে দিয়েচ, নিজেরাও ছোট হয়ে গেছ। এই সত্যি কথা।"

কথাটা অকস্মাৎ যেন নূতন করিয়া বাজিল। ইহার মধ্যে হেঁয়ালি যে টুকু ছিল, তাহা ধীরে-ধীরে সুস্পষ্ট হইয়া মনে হইতে লাগিল, বাস্তবিকই অনেকখানি সত্য ইহাতে লুকাইয়া আছে, যাহা আজ পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, "তুমি সেই ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে তামাসা করছিলে। কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার কতখানি চোখ খুলে গেছে, সে তো জানো না ?"

'জানি না' তাহা স্বীকার করিতেই সে কহিতে লাগিল, "জানো না তার কারণ আছে। কোন জিনিস জান্‌বার জন্যে যতক্ষণ না মানুষের বুকের ভেতর থেকে একটা ব্যাকুলতা ওঠে, ততক্ষণ সবই তার চোখে ঝাপ্‌সা হয়ে থাকে। এতদিন তোমার মুখে শুনে ভাবতুম, সত্যিই যদি আমাদের দেশের লোকের দুঃখ এত বেশি, সত্যিই যদি আমাদের সমাজ এমন ভয়ানক অন্ধ, তবে তার মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকেই বা কি কোরে, তাকে মেনে চলেই বা কি কোরে !"

আমি চুপ করিয়া শুনিতেছি দেখিয়া সে আস্তে-আস্তে বলিল, "আর তুমিই বা এত বুঝবে কি করে ? কখনো এদের মধ্যে থাকোনি, কখনো এদের সুখ-দুঃখ ভোগ করোনি ; তাই বাইরে থেকে বাইরের সমাজের সঙ্গে তুলনা করে ভাব্‌তে, এদের বুঝি কষ্টের আর অবধি নেই। যে বড়লোক জমিদার পোলাও খেয়ে থাকে, সে তার কোন দরিদ্র প্রজাকে পান্তা ভাত খেতে দেখে যদি ভাবে, এর দুঃখের আর সীমা নেই—তার যেমন ভুল হয়, তোমারও তেম্‌নি ভুল হয়েচে।"

বলিলাম, "তোমার তর্কটা যদিচ ন্যায়শাস্ত্রের আইনে হচ্চে না, তবুও জিজ্ঞাসা করি, কি করে জান্‌লে দেশের সম্বন্ধে আমার এর চেয়ে বেশি জ্ঞান নেই ?"

রাজলক্ষ্মী কহিল, "কি করে থাক্‌বে ? তোমার মত স্বার্থপর লোক আর সংসারে আছে না কি ? যে কেবল নিজের আরামের জন্যে পালিয়ে বেড়ায়, সে ঘরের খবর জান্‌বে কোথা থেকে ! তোমাদের মত লোকই সমাজের বেশি নিন্দে করে বেড়ায়, যারা সমাজের কোন ধারই ধারে না। তোমরা না জানো ভাল করে পরের সমাজ, না জানো ভাল করে নিজেদের সমাজ।"

বলিলাম, "তার পরে ?"

রাজলক্ষ্মী কহিল, "তার পরে এই যেমন বাইরে থেকে বাইরের সামাজিক ব্যবস্থা দেখে তোমরা ভেবে মরে যাও, আমাদের মেয়েরা বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে দিনরাত কাজ করে বলে তাদের মত দুঃখী, তাদের মত পীড়িত, তাদের মত হীন আর বুঝি কোন দেশের মেয়ে নেই। কিন্তু দিনকতক আমাদের ভাব্‌না ছেড়ে দিয়ে নিজেদের চিন্তা কর দেখি ! নিজেদের একটু উঁচু করবার চেষ্টা করো—যদি কোথাও কিছু সত্যিকার গলদ থাকে, সে শুধু তখনই চোখে পড়বে,—কিন্তু তার আগে নয়।"

কহিলাম, "তার পরে ?"

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিল, "তুমি আমাকে তামাসা করচ, তা জানি। কিন্তু তামাসা করবার কথা আমি বলিনি। বাড়ীর গিন্নী সকলের চেয়ে কম, সকলের চেয়ে খারাপ খায়। অনেক সময়ে চাকরের চেয়েও। অনেক সময়ে চাকরদের চেয়েও বেশি খাটতে হয়। কিন্তু তার দুঃখে আকুল হয়ে কেঁদে না বেড়িয়ে আমাদের অম্‌নি দাসীর মতই থাক্‌তে দাও, কিন্তু, অন্য দেশের রাণী করে তোলবার চেষ্টা কোরো না, আমি এই কথাটাই তোমাকে বল্‌চি।"

বলিলাম, "তর্ক-শাস্ত্রের মাথায় পা দিয়ে তোবাবার যো

করে তুলেচ বটে, কিন্তু আমিও যে শাস্ত্রমতে তর্ক করবার ঠিক বাগ পাচ্চিনে, তা মান্‌চি।"

সে কহিল, "তর্ক করবার কিচ্ছু নেই।"

বলিলাম, "থাক্‌লেও, সে শক্তি নেই, ভয়ানক ঘুম পাচ্চে। কিন্তু তোমার কথাটা একরকম বুঝতে পেরেচি।"

রাজলক্ষ্মী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমাদের দেশে যে জন্যেই হোক্, ছোট-বড়, উঁচু-নীচ সকলের মধ্যেই টাকার লোভটা ভয়ানক বেড়ে গেছে। কেউ আর অল্পে সন্তুষ্ট হতে জানে না,—চায়ও না। এতে যে কত অনিষ্ট হয়েচে, সে আমিই টের পেয়েচি।"

কহিলাম, "কথাটা সত্যি, কিন্তু তুমি টের পেলে কেমন করে?"

রাজলক্ষ্মী কহিল, "টাকার লোভেই ত আমার এই দশা। কিন্তু আগেকার কালে বোধ হয় এত লোভ ছিল না।"

বলিলাম, "এ ইতিহাসটা ঠিক জানিনে।"

সে কহিতে লাগিল, "কখ্খনো ছিল না। সেকালে কখ্খনো মায়ে টাকার লোভে মেয়েকে এ পথে পাঠাতো না। তখন ধর্ম্মভয় ছিল। আজ ত আমার টাকার অভাব নেই, কিন্তু আমার মত দুঃখী কি কেউ আছে? পথের ভিক্ষুক যে, সেও বোধ হয় আজ আমার চেয়ে ঢের বেশি সুখী।"

তাহার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "তোমার কি সত্যিই এত কষ্ট?"

রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া, আঁচল দিয়া চোখদুটি একবার মুছিয়া লইয়া বলিল, "আমার কথা আমার অন্তর্যামীই জানেন।"

অতঃপর উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। গাড়ীর গতি মন্দীভূত হইয়া ক্রমশঃ একটা ছোট ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। খানিক পরে আবার চলিতে সুরু করিলে বলিলাম, "কি করলে তোমার বাকি জীবনটা সুখে কাটে, আমাকে বল্‌তে পারো?"

রাজলক্ষ্মী কহিল, "সে আমি ভেবে দেখেচি। আমার সমস্ত টাকাকড়ি যদি কোন রকমে চলে যায়, কিছু না থাকে,—একেবারে নিরাশ্রয়, তা হলেই—"

আবার দুজনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। তাহার কথাটা এতই স্পষ্ট যে, সবাই বুঝিতে পারে, আমারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কথা তোমার কবে থেকে মনে হয়েচে?"

রাজলক্ষ্মী কহিল, "যেদিন অভয়ার কথা শুনেচি, সেই দিন থেকে।"

বলিলাম, "কিন্তু, তাদের জীবন-যাত্রা ত এর মধ্যেই শেষ হয়ে যায়নি। ভবিষ্যতে তারা যে কত দুঃখ পেতে পারে, এ তো তুমি জানো না!"

সে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, জানিনে সত্যি; কিন্তু যত দুঃখই তারা পাক্, আমার মত দুঃখ যে তারা কোনদিন পাবে না, এ আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি।"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, "লক্ষ্মী, তোমার জন্যে আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু সম্ভ্রম ত্যাগ করি কি কোরে?"

রাজলক্ষ্মী কহিল, "আমি কি তোমাকে তাই বল্‌চি? আর সম্ভ্রমই ত মানুষের আসল জিনিষ। সেই যদি ত্যাগ করতে পারো না, তবে ত্যাগের কথা মুখে আন্‌চো কেন? তোমাকে ত আমি কিছুই ত্যাগ করতে বলিনি।"

বলিলাম, "বলনি বটে, কিন্তু পারি। সম্ভ্রম যাওয়ার পরে পুরুষমানুষের বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। শুধু সেই সম্ভ্রম ছাড়া তোমার জন্যে আর সমস্তই আমি বিসর্জ্জন দিতে পারি।"

রাজলক্ষ্মী সহসা হাতটা টানিয়া লইয়া কহিল, "আমার জন্যে তোমাকে কিছুই বিসর্জ্জন দিতে হবে না। কিন্তু, তুমি কি মনে কর শুধু তোমাদেরই সম্ভ্রম আছে, আমাদের নেই? আমাদের পক্ষে সেটা ত্যাগ করা এতই সহজ? তবু তোমাদের জন্যেই কত শত-সহস্র মেয়েমানুষ যে এটাকে ধূলোর মত ফেলে দিয়েচে, সে কথা তুমি জানো না বটে, কিন্তু আমি জানি।"

আমি কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই সে আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, "থাক্, আর কথায় কাজ নেই। তোমাকে আমি এতদিন যা ভেবেছিলুম, তা' ভুল। তুমি ঘুমোও,—এ সম্বন্ধে আর আমিও কোনদিন কথা কইব না, তুমিও কোয়ো না।" বলিয়া সে উঠিয়া গিয়া তাহার নিজের বেঞ্চিতে গিয়া বসিয়া পড়িল।

পরদিন যথাসময়ে কাশী আসিয়া পৌঁছিলাম, এবং

পিয়ারীর বাটীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। উপরের দুইখানি ঘর ভিন্ন প্রায় সমস্ত বাড়ীটাই নানা বয়সের বিধবা স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ।

পিয়ারী কহিল, "এঁরা সব আমার ভাড়াটে।" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল।

বলিলাম, "হাস্‌লে যে? ভাড়া আদায় হয় না বুঝি?"

পিয়ারী কহিল, "না। বরঞ্চ কিছু-কিছু দিতে হয়।"

"তার মানে?"

পিয়ারী এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "তার মানে ভবিষ্যতের আশায় আমাকেই খাওয়া-পরা দিয়ে এঁদের বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হয়। বেঁচে থাক্‌লে তবে ত পরে দেবে। এটা আর বুঝ্‌তে পারো না?"

আমিও হাসিয়া বলিলাম, "পারি বই কি। এমনি ধারা ভবিষ্যতের আশায় কত লোককেই যে তোমাকে নিঃশব্দে অন্ন-বস্ত্র যোগাতে হয়, আমি তাই শুধু ভাবি।"

"তা' ছাড়া দু'এক জন আমার কুটুম্বও আছেন।"

"তাই না কি? কিন্তু জান্‌লে কি করে?"

পিয়ারী একটুখানি শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, "মায়ের সঙ্গে এসে এই কাশীতেই যে আমার মরণ হয়েছিল, সে বুঝি তোমার মনে নেই? তখন যাঁরা আমার সদ্গতি করেছিলেন, তাঁদের অসময়ে সে উপকার ত প্রাণ থাক্‌তে ভোলা যায় না কি না!"

চুপ করিয়া রহিলাম। পিয়ারী বলিতে লাগিল, "বড় দয়ার শরীর এঁদের। তাই কাছে এনে একটু কড়া নজর রেখেচি, লোকের আর বেশি উপকার করবার সুযোগ না পান।"

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "তোমার বুকের ভেতরটায় কি আছে আমার মাঝে মাঝে চিরে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে রাজলক্ষ্মী!"

"ম'লে দেখো। আচ্ছা, ঘরে গিয়ে একটুখানি শোওগে যাও। আমার খাবার তৈরি হলে তোমাকে তুল্‌ব এখন" বলিয়া সে হাত দিয়া ঘরটা দেখাইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আমি অনেকক্ষণ সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার হৃদয়ের আজ যে বিশেষ কোন নূতন পরিচয় পাইলাম তাহা নহে, কিন্তু আমার নিজের হৃদয়ে এই সামান্য কাহিনীটা একটা নূতন আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া দিয়া গেল।

রাত্রে পিয়ারী কহিল, "তোমাকে বৃথা কষ্ট দিয়ে এতদূর নিয়ে এলুম। গুরুদেব তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়ে গেছেন, তাঁকে তোমাকে দেখাতে পার্‌লুম না।"

বলিলাম, "সে জন্যে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। আবার কলকাতায় ফিরে যাবে ত?"

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"হাঁ।"

কহিলাম, "আমার সঙ্গে যাবার কি কোন আবশ্যক আছে? না থাকে ত আমি আর একটু পশ্চিম থেকে ঘুরে আস্‌তে চাই।"

পিয়ারী বলিল, "বহুর বিয়ের ত এখনো কিছু দেরি আছে, চল না, আমিও প্রয়াগে একবার স্নান করে আসি।"

একটু মুস্কিলে পড়িলাম। আমার জ্ঞাতি-সম্পর্কের এক খুড়া সেখানে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেন; মনে করিয়াছিলাম, তাঁর বাসায় গিয়াই উঠিব। তা'ছাড়া আরও কয়েকটি পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুও সেখানেই থাকিতেন।

পিয়ারী চক্ষের নিমেষে আমার মনের ভাব উপলব্ধি করিয়া বলিল, "আমি সঙ্গে থাক্‌লে হয় ত কেউ দেখে ফেল্‌তেও পারে, না?"

অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, "বাস্তবিক, দুর্নাম জিনিসটা এম্‌নি যে, লোকে মিথ্যে দুর্নামেরও ভয় না করে পারে না।"

পিয়ারী জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "তা বটে। আর বছর আরাতে ত তোমাকে একরকম কোলে নিয়েই আমার দিন-রাত কাটত। ভাগ্যি সে কেউ দেখে ফেলে নি। সেখানে বুঝি তোমার কেউ চেনা-শোনা বন্ধু-টন্ধু ছিল না?"

অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিলাম, "আমাকে খোঁটা দেওয়া বৃথা। মানুষ হিসেবে তোমার চেয়ে যে আমি অনেক ছোট, সে কথা ত অস্বীকার করিনে।"

পিয়ারী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "খোঁটা। তোমাকে খোঁটা দিতে পারবো বলেই বুঝি তখন গিয়েছিলুম? দেখো, মানুষকে ব্যথা দেবারও একটা সীমা আছে,—সেটা ডিঙিয়ে যেয়ো না।"

একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "কলঙ্কই বটে! কিন্তু আমি হলে এ কলঙ্ক মাথায় নিয়ে লোককে বরঞ্চ ডেকে

দেখাতুম, কিন্তু, এমন কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারতুম না।"

বলিলাম, "তুমি আমার প্রাণ দিয়েচ,—কিন্তু আমি যে অত্যন্ত ছোট মানুষ রাজলক্ষ্মী। তোমার সঙ্গে যে আমার তুলনাই হয় না।"

রাজলক্ষ্মী দৃপ্ত স্বরে কহিল, "প্রাণ যদি দিয়ে থাকি ত সে নিজের গরজে দিয়েচি, তোমার গরজে দিইনি। সে জন্যে তোমাকে একবিন্দু কৃতজ্ঞ হতে হবে না। কিন্তু ছোট মানুষ বলে যে তোমাকে ভাবতে পারিনে। তা'হলে ত বাঁচতুম, গলায় দড়ি দিয়ে সব জ্বালা জুড়োতে পারতুম।" বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা মাত্র না করিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালে রাজলক্ষ্মী চা' দিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেছিল, ডাকিয়া বলিলাম, "কথাবার্ত্তা বন্ধ না কি?"

সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "না, কিছু বলবে?"

বলিলাম, "চল, প্রয়াগ থেকে একবার ঘুরে আসিগে।"

"বেশ ত যাও না।"

"তুমিও চল।"

"অনুগ্রহ না কি?"

"চাও না?"

"না। যদি সময় হয় চেয়ে নেব, এখন না।" বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

আমার মুখ দিয়া শুধু একটা মস্ত নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, কিন্তু কথা বাহির হইল না।

দুপুর-বেলা খাবার সময় হাসিয়া কহিলাম, "আচ্ছা লক্ষ্মী, আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে কি তুমি থাকতে পারো যে, এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা কোরচ।"

রাজলক্ষ্মী শান্ত গম্ভীর মুখে বলিল, "সামনে থাকলে কেউ পারে না, আমিও পারব না। তা ছাড়া, সে আমার ইচ্ছেও নয়।"

"তবে ইচ্ছেটা কি?"

রাজলক্ষ্মী কহিল, "আমি কাল থেকেই ভাবচি, এই টানা-হেঁচড়া আর না থামালেই নয়। তুমিও এক রকম স্পষ্টই জানিয়েচ, আমিও এক রকম করে তা' বুঝেচি। ভুল আমারই হয়েচে, সে নিজের কাছেও আমি স্বীকার করচি। কিন্তু—"

তাহাকে সহসা থামিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু কি?"

রাজলক্ষ্মী কহিল, "কিন্তু কিছুই না। কি যে নির্লজ্জ বাচালের মত যেচে-যেচে তোমার পিছনে-পিছনে ঘুরে মরচি—" বলিয়া সে হঠাৎ মুখখানা যেন ঘৃণায় কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "ছেলেই বা কি ভাবচে, চাকর-বাকরেরাই বা কি মনে করচে! ছি ছি, এ যেন একটা হাসির ব্যাপার করে তুলেচি।"

একটুখানি থামিয়া বলিল, "বুড়ো বয়সে এ সব কি আমার সাজে! তুমি এলাহাবাদে যেতে চাইছিলে, তাই যাও। তবে পারো যদি, বর্ম্মা যাবার আগে একবার দেখা করে যেয়ো।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষুধাও অন্তর্ধান করিল। তাহার মুখ দেখিয়া আজ আমার প্রথম জ্ঞান হইল, এ সব মান-অভিমানের ব্যাপার নয়। সে সত্য-সত্যই কি একটা ভাবিয়া স্থির করিয়াছে।

বিকাল-বেলায় আজ হিন্দুস্থানী দাসী জল-খাবার প্রভৃতি লইয়া আসিলে একটু আশ্চর্য্য হইয়াই পিয়ারীর সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। এবং প্রত্যুত্তরে অধিকতর বিস্মিত হইয়া অবগত হইলাম, পিয়ারী বাড়ী নাই, সাজ-সজ্জা করিয়া, ছুড়িগাড়ী চড়িয়া কোথায় গিয়াছে। ছুড়িগাড়ীই বা কোথা হইতে আসিল, বেশভূষা করিয়াই বা তাহার কোথায় যাইবার প্রয়োজন হইল, কিছুই বুঝিলাম না। তবে তাহার নিজের মুখের কথাটাই মনে পড়িল বটে যে, সে এই কাশীতেই একদিন মরিয়াছিল।

কিছুই বুঝিলাম না সত্য, তবুও সমস্ত মনটাই যেন এই সম্বাদে বিকল হইয়া গেল।

সন্ধ্যা হইল, ঘরে-ঘরে আলো জ্বলিল, কিন্তু রাজলক্ষ্মী ফিরিল না।

চাদর কাঁধে ফেলিয়া একটু বেড়াইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে-পথে ঘুরিয়া কত কি দেখিয়া-শুনিয়া রাত্রি দশটার পর বাড়ী আসিয়া শুনিলাম পিয়ারী তখনও ফিরে নাই। ব্যাপার কি? কেমন যেন একটা ভয় করিতে লাগিল। রতনকে ডাকিয়া সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া এ সম্বন্ধে তত্ত্ব লইব কি না ভাবিতেছি, একটা ভারি জুড়ির শব্দে জানালা দিয়া চাহিয়া দেখি প্রকাণ্ড ফিটন আমাদের বাড়ীর সম্মুখেই থামিয়াছে।

পিয়ারী নামিয়া আসিল। জ্যোৎস্নার আলোকে তাহার সর্ব্বাঙ্গের জড়োয়া অলঙ্কার ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। যে দুইজন ভদ্রলোক গাড়ীতে বসিয়া ছিলেন, তাঁহারা মৃদুকণ্ঠে বোধ করি পিয়ারীকে সম্ভাষণ করিয়া থাকিবেন,—শুনিতে পাইলাম না। তাঁহারা বাঙ্গালী কি বিহারী, তাহাও চিনিতে পারিলাম না—চাবুক খাইয়া জুড়ী ঘোড়া চক্ষের পলকে দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

"পৃথ্বীরাজ"

[শ্রীজলধর সেন]

পৃথ্বীরাজ—ঐতিহাসিক মহাকাব্য। কবিভূষণ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি-এ, বিরচিত। মূল্য আড়াই টাকা।

উৎসর্গপত্রে কবি জননী ভারত-ভূমিকে নিবেদন করিতেছেন :—

"ত্রিংশ বর্ষকাল, দেবী!
যায় চিত্র তব
রাখিয়াছি চোকে চোকে;
পূজেছি গোপনে;
জানে না অপর কেহ,
কিন্তু জানো তুমি।"

এই 'ত্রিংশবর্ষব্যাপী সাধনার অক্ষয় ফলস্বরূপ বাঙ্গালী এই উপাদেয় কাব্যগ্রন্থ লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালী বলিতেছি এই জন্য যে, গ্রন্থ বাঙ্গালা-ভাষায় রচিত; নহিলে ইহার বর্ণিত বিষয় সমগ্র হিন্দু-জাতির গর্বকথা। কবি তাঁহার কাব্যের করুণ অবসানে সূত্রাকারে যে নীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার রচনার প্রতিপাদ্য বিষয় :—

'হিন্দুর দুর্মতি-মূলে দুর্মতি হিন্দুর;
প্রায়শ্চিত্ত অন্তে দুঃখ, যৈক্য হবে দূর।'

এক কথায় বলিতে গেলে, এই কাব্য হিন্দুর জাতীয় অধঃপতন সঙ্গীত।

মহাকবি মিল্টন্ (Paradise Lost) প্যারাডাইস্ লষ্ট্ কাব্যে অবিদ্যা-কলুষ মানবের স্বর্গ হইতে অধঃপতন গানের পর (Paradise Regained) পুনরুত্থান সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। প্রথমে মানবীয় প্রলোভনে মানবের অন্ধত্ব, অপরিমেয় ভোগ-বাসনা ও স্বার্থসঙ্কিলবিত পাপাচার; পরে লোক-কল্যাণ-সাধনে দেব-প্রকৃতি নরের অলৌকিক আত্ম-বলিদান ও বিশ্ব নিষ্পাপ শোণিতে মানবের কৃতাপরাধ-ক্ষালন। কিন্তু হিন্দু কবির এখনও সে দিন দূর ভবিষ্যতে; তাই তিনি ইঙ্গিত-মাত্র করিয়াছেন :—

"যাবে চলি' বহু দূর;
বহু অন্তর্দাহ, বহু মর্মনিষ্কৃন্তন
ঘটিবে; উঠিবে বহু আহি-আহি রবি।
তবে, জানে ভারতের শ্রেষ্ঠ নরনারী,
যুগে-যুগে, বলিরূপে দিবে নিজ পাতি'
তবে হবে প্রায়শ্চিত্ত।" (১৭শ সর্গ।)

কবির নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক নায়ক এই প্রায়শ্চিত্তের প্রথম বলি। পৃথ্বীরাজ এক স্থানে বলিতেছেন :—

"সংযুক্তারে যোগ্যা পত্নী লভি', অবশেষে,
ভেবেছিনু, ধৌতে মিলি', প্রজার কল্যাণে
সমর্পিব দেহ, মন; না পূরিল আশা;
অসমাপ্ত রাখি কর্ম ত্যজিনু পৃথিবী।
সাক্ষী অন্তর্যামী, কিন্তু, পরিণাম এই
নহে রণ-কণ্ডূয়নে, পররাজ্য লোভে।
ধর্মের, অধর্ম ভয়ে ত্যজিতেছি প্রাণ,
রাখি পূর্ণ ভক্তি, প্রেম উভয়ের প্রতি।" (১৯শ সর্গ।)

গ্রন্থকর্তা পুস্তকের উপক্রমণিকায় এক স্থলে লিখিয়াছেন—"পৃথ্বীরাজ স্বয়ং বীর ও বিক্রম-চরিত্র হইলেও, যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বলি অর্পিত হইয়াছিলেন।" (উপ—৬ পৃঃ) 'রত্নপরীক্ষা' এবং

"প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ যত দিন, দেব!
রেখেছিলে অন্ধ করি'; বীরত্বাভিমান,
ভগ্নকৃত্য রাজধর্মে দিয়াছিল বাধা।"

এই কয়েকটী ত্রুটি ভিন্ন গ্রন্থে কোথাও কথায় বা আচরণে দিল্লীপতির অন্য কোন দোষ লক্ষিত হয় নাই। বাস্তবিক, পৃথ্বীরাজকে অন্যের কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল, যা তাঁহার নিজের চরিত্রগত কোন দোষের জন্য তাঁহার অধঃপতন ঘটিয়াছিল, সে কথা এ স্থলে বিচার্য নহে। তবে, এ সম্বন্ধে কর্ণেল্ টড্ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠকের গোচরার্থ লিপিবদ্ধ করিলাম :—

"The Prince of Chitore (Samarsi) was again constrained to use his buckler in defence of Delhi and its prince, whose arrogance, and successful ambition, followed by disgraceful inactivity invited invasion with every presage of success.—Annals of Mewer. Ch. 5.

পুনশ্চ :—"Samarsi reads his brother in-law an indignant lecture on his unprincely inactivity." Ibid.

গ্রন্থের প্রথমেই গ্রন্থত্যাগ। সপ্তর্ষিমণ্ডল আর্যভূমির অধঃপতনে ব্যথিত। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিতেছেন :—

'ইচ্ছা হয় মনে,
অবতরি, মর্ত্যলোকে, প্রচারি আবার
ভারতে সে মহাধর্ম, আদর্শ যাহার,

পুত্র, পতি, ভ্রাতা, সখা, রাজা, প্রভুরূপে,
পরিষ্কৃট রামচন্দ্রে। যে ধর্ম্মের গুণে
ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, রক্ষ, রাক্ষস, বানর
বন্ধু হ'ল সমভাবে।'

দেবী অরুন্ধতী কহিলেন :—

'যাব মর্ত্ত্যলোকে,
শিখাব' আবার যত ভারত-নারীরে
কি সাধনা, কিবা ব্রত সহধর্ম্মিণীর।'

এই সাধু উদ্দেশ্যে সপ্তর্ষি একমত হইলেন। কিন্তু তখনই দৈববাণী হইল :—

'নহে কাল অনুকূল ভারত-উদ্ধারে ;
প্রায়শ্চিত্ত বিনা পাপ না হয় মোচন।'

তারপর অশরীরী বাণী বলিল :—

'সমাগতপ্রায় কাল। ঘনীভূত অই
পশ্চিমে অঘোর মেঘ ; আসিছে কটিকা ;
মেঘ মর্ত্ত্য-পানে সবে।'

ইহার পর পৃথ্বীরাজের যাতায়হ-রাজ্যপ্রাপ্তি। অপুত্রক অনঙ্গপাল বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা সুন্দরীর পুত্র জয়চন্দ্র—কনৌজের অধিপতি। কনিষ্ঠা কমলার পুত্র পৃথ্বীরাজ আজমীরের অধীশ্বর। দিল্লীশ্বর অনঙ্গ কনিষ্ঠ দৌহিত্র পৃথ্বীকে দিল্লীরাজ্যে অভিষেক করিয়া বাণপ্রস্থ গ্রহণ করিবেন। সবে মাত্র অভিষেক-ক্রিয়া সমাধা হইয়াছে। সেই সময় জ্যেষ্ঠা কন্যা সুন্দরী সহসা সভাস্থলে আসিয়া জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের অধিকার লঙ্ঘন করিবার নিমিত্ত অনঙ্গপালকে ভর্ৎসনা করিলেন। দিল্লীশ্বর তাঁহার সঙ্কিত সমস্ত ধনি-মুক্তাদি দান করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তেজস্বিনী রাজবালা বলিয়া গেলেন :—

'পুত্র সব রাজরাজেশ্বর
স্বতন্ত্রকুলে জন্ম তাঁর থাকে যদি তরবার
লবে রাজ্য নিজ ভুজ-বলে।'

দ্বিতীয় সর্গে গজনী নগরী ও মহম্মদ ঘোরীর বসন্তাগার। এখানে ভারতবর্ষের লোভা-সম্পদ, ভারতবাসীর ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, তাহাদিগের প্রকৃতি, যুদ্ধনৈপুণ্য প্রভৃতি, শুনিয়া ঘোরী স্থির করিলেন :—

'আমি পেয়েছি সংবাদ,
বিবাদের বিষ-বীজ হয়েছে রোপিত
দিল্লীরাজ্যে। বৃদ্ধ রাজা গেলে তীর্থবাসে
বাধিবে বিবাদ ঘোর ভ্রাতায় ভ্রাতায় ;
একে করি হস্তগত নাশিব অপরে।
দিল্লী যদি একবার হয় অধিকৃত
ইস্‌লাম-প্রভুত্ব হবে স্থাপিত ভারতে।'

তৃতীয় সর্গে জয়চন্দ্র-দুহিতা সংযুক্তার পরিচয়। ইতঃপূর্ব্বেই পৃথ্বীরাজের সহিত বাল্য ঘনিষ্ঠতায় কিশোরীর মনে অনুরাগ জন্মিয়াছে। সেই পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে পিতা যুদ্ধায়োজন করিতেছেন। কন্যার মন তাহাতে নিরতিশয় বিষণ্ণ। দুহিতাকে প্রফুল্লিত করিবার জন্য কন্যার মনোভাব-অনভিজ্ঞ জয়চন্দ্র ভাট পাঠাইয়া দিলেন। ভাট পৃথ্বীরাজের গুণগান করিয়া সংযুক্তার অনুরাগ-বহ্নিতে ফুৎকার দিয়া গেল।

চতুর্থ সর্গে কৌশলে পৃথ্বীরাজকে অপমান করিবার উদ্দেশ্যে কনৌজ নগরীতে রাজসূয় ও স্বয়ংবর-উদ্যোগ। যজ্ঞে পৃথ্বীরাজের অনুপস্থিতিতে তাঁহার স্বর্ণময় কুৎসিৎ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া জয়চন্দ্র কর্ত্তৃক দ্বারপালরূপে সভার দ্বারদেশে স্থাপন। পঞ্চম সর্গে পৃথ্বীরাজের সংযুক্তা-স্বয়ম্বরে গমন-সঙ্কল্প এবং ষষ্ঠে পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক সংযুক্তা হরণ।

সপ্তম সর্গে গজনীর গুপ্ত মন্ত্রণাগারে পুনরায় আমরা ঘোরীর দর্শন পাই। ঘোরী হিন্দুর জাতীয় ত্রুটীসকলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিতেছেন।—হিন্দুস্থানে জনকতক মাত্র উচ্চবর্ণ, বাকী সব 'অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য শূদ্র'। ইহারা 'দলিত, লাঞ্ছিত, বুদ্ধিহীন, বীর্য্যহীন'। ইহারা 'পদাঘাত-ভয়ে' যুদ্ধে অসি ধারণ করে। ইহারা কখনই মুসলমানগণের সমকক্ষ যোদ্ধা হইতে পারে না। হিন্দুগণের সমাজ-গঠনে এই মহা ত্রুটি :—

'শাস্ত্র, বিধি হিন্দুগণ রচিয়াছে যত ;
কিন্তু এই মূল তত্ত্ব ভাবে নাই তা'রা ;
দেহের প্রত্যঙ্গ যদি সবল না রয়
সে দেহ বলিষ্ঠ, বৃদ্ধ কখন (ও) কি হয় ?'

এইখানেই হিন্দু-মুসলমানে বিশিষ্ট প্রভেদ। বীর্য্য ও বুদ্ধিবলে নীচকুলোদ্ভব মুসলমানও উচ্চ হয়, কিন্তু—

"হিন্দুর যে নীচ, রহি' নীচ চিরদিন,
হতমান, বন্ধনাগারে হইবে অধীন।"

ইতঃপরে ভারতাক্রমণ, হিন্দুস্থানে মুসলমান-রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প স্থির হইল। প্রথমে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য পৃথ্বীরাজকে অনুরোধ বা আদেশ করিয়া দূত পাঠাইতে হইবে। দিল্লীপতি সে আদেশ অবহেলা করিলে কুতব, হাসনুদ্দী, বক্তিয়ার তিনজনে সমস্বরে বলিল :—

"আইসনা হিন্দুস্থান লইব নিশ্চিত।"

অষ্টম সর্গে পৃথ্বীরাজ-প্রণয়িনী সংযুক্তার হর্ষে বিষাদ। পৃথ্বীরাজ বলিতেছেন—"কৃতার্থ কৃতার্থ আমি তোমারে লভিয়া, প্রিয়ে!" তদুত্তরে সংযুক্তা বলিলেন—"হাসিতে উথলি, প্রিয়ে! হইয়াছে আঁখিজল।"—কি সুন্দর! কি চমৎকার! কিন্তু সংযুক্তার 'ভয় হ'য়ে আছে প্রাণ, মিটে নাই অভিলাষ।' তিনি কহিলেন :—

"মিটিয়াছে আর আশা, আর আশা মিটে নাই,
লভিয়াছি পতিপ্রেম, পিতৃস্নেহ বিসর্জ্জনে ;
দিবানিশি প্রাণ মোর কেঁদে-কেঁদে উঠে তাই,
পুণ্যে করিয়াছি পাপ, শান্তি তাই নাহি মনে।"

পতির শত্রু পিতা! স্বামী-বিদ্বেষে যে জাতি উৎসন্ন গিয়াছে, সেই জাতির দুহিতার পক্ষে এরূপ অবস্থা-সঙ্কটে পতিত হওয়া বিচিত্র

নহে। অনুরূপ অবস্থাগত হইয়া, কিন্তু, ডেস্‌ডিমোনা (Desdemona) বলিয়াছিলেন :—

"If haply you my father do suspect
An instrument of this your calling back,
Lay not your blame on me : if you have lost him,
Why, I have lost him too" Oth. act IV. Sc. 2.

নবম সর্গে প্রতিহিংসা-লোলুপা, ভীষণা মেবার আবির্ভাব। আল্‌হ ও উমাস নামে ইহার দুই বীর-পুত্র ছিল। কোন সময় পৃথ্বীরাজ তাহাদিগকে হত্যা করেন, কিন্তু মেবার বিষাদ কপট যুদ্ধে। মেবা পিশাচ-সাধিকা, তান্ত্রাগণনা-নিপুণা। নিয়ত দিল্লীশ্বরের অকল্যাণ কামনা ভিন্ন ইহার অন্য কার্য্য নাই। দশমে হাম্বর-বীর যোদ্ধা। পৃথ্বীর সম্মুখে কোরাণ ও তরবারি রাখিয়া বলিলেন, মহারাজ, পত্নীপতির অনুরোধ এই দুইয়ের মধ্যে, যাহা অভিরুচি আপনি গ্রহণ করুন। দিল্লীশ্বর তরবারি গ্রহণ করিলেন। একাদশ সর্গে আজমীরে যৌবরাজ্য পর্ব্ব। দ্বাদশে যুদ্ধোদ্যোগ এবং যুদ্ধ হেতু রাজ্যে অনুপস্থিতিকালে পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক সংযুক্তার উপর রাজ্য-ভারার্পণ। তৎপরে ত্রয়োদশ সর্গে তরায়ণের প্রথম যুদ্ধ, মহম্মদ ঘোরীর পরাজয় ও দিল্লীতে বিজয়োৎসব। এই উৎসব-জনতার বর্ণনা অংশে অতি সুন্দর :—

"জনপূর্ণ রাজপথ,
নারীপূর্ণ বাতায়ন,
জয়নাদে পূর্ণিত অম্বর।"

এই সর্গে বর্ণিত সংযুক্তার সপত্নী-প্রীতিও অতি মনোহর। বিজয়ী দিল্লীশ্বর রাজ্যে ফিরিতেছেন। পুরীদ্বারে কুলাঙ্গনা সহ মহিষীগণ রমণীয় সাজে রাজাধিরাজকে বরণ করিবার জন্য উপস্থিত। কেবল প্রধানা, প্রধানা মহিষী ইঙ্গিনী তথায় নাই। সুখের দিনে সংযুক্তা ব্যতীত আর কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। অভিমানিনী ইঙ্গিনী তখন বিজয়নে সাশ্রুনয়নে আপনার অতীত-গৌরব, বিগত যৌবন এবং বর্ত্তমান-দুর্ভাগ্য চিন্তা করিতেছিলেন। সংযুক্তা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে টানিয়া বেণে সাজাইলেন। আপনার কণ্ঠহার খুলিয়া সপত্নীর গলায় দিয়া বলিলেন—দিদি "বরণ করিতে চল, অন্তঃপুর দ্বারে মহারাজ।"

অভিমানে জড়িত, অশ্রুপ্লুত কণ্ঠে তখন ইঙ্গিনী কহিলেন :—

"যোন্! কেন অকারণে
সাজাইছ তুমি হেন?
আমি প্রৌঢ়া এবে; মোরে
প্রসাধনে আছে কি সাজনে?"

সংযুক্তা উত্তর দিলেন :—

"হ'ক না অপর কেহ,
ক্রীড়ায়, কৌতুকে, রঙ্গে,
ক্ষণিক ভোগের সঙ্গিনী;
কিন্তু, দিদি! ধর্ম্মে, কর্ম্মে
তোমারই(ই) প্রথম স্থান"

নারী হৃদয়ের এ অযাচিত সম্মান ব্যর্থ হইল না।

"তনি হর্ষে উঠিলা ইঙ্গিনী।"

তাহার পর, অতি দীনা পুত্রহারা এক রাজকুটুম্বিনীকে দিল্লীশ্বরের সান্ত্বনা দান—"আজ হ'তে পুত্র আমি তোর"—অতুলনীয়। অবশেষে এই সর্গের অন্তে কবির আক্ষেপোক্তি :—

"ভারতের কবিগণ
গাইছেন অন্য গান,
বীর-কীর্ত্তি গেয় কারও নয়।
শয্যা এবে রণক্ষেত্র,
নূপুরে দুন্দুভি-ধ্বনি,
অবিরাম ছুটে কুলবাণ;
* * * *
কে শুনিবে আমার এ গান?"

বড়ই প্রাণস্পর্শী, বড়ই মধুর!

চতুর্দ্দশ সর্গে বিজিত ঘোরীর আবার রণসজ্জা—ভারত-বিজয়-সঙ্কল্প। পঞ্চদশ সর্গে জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজ উভয়ের কুলগুরু তুঙ্গাচার্য্য তাঁহার প্রধান শিষ্যের সহিত দেশের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন। কি মহান্, মর্ম্মভেদী তাঁহার আক্ষেপোক্তি—

"যা পারি বুঝিতে, বৎস! শিরোদেশে যার
দাঁড়াইয়া হিমাচল মহারুদ্ররূপী,
পদপ্রান্তে গর্জ্জে সিন্ধু তাণ্ডব লীলায়,
যে দেশে জনমে সিংহ, শার্দ্দূল, গণ্ডার,
যে দেশে জনমে শাল, তাল বজ্রবপু,
সে দেশে জনম লভি' কেন আর্য্যসুত
হেন লঘুচেতা, ধৈর্য্য দৃঢ়তা-বিহীন!"

সত্য! বিবিলিপি ব্যতীত আর ইহার উত্তর কি? তারপর নিতান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মর্ম্মাহত সন্ন্যাসী পর্য্যটন-প্রত্যাগত শিষ্যকে সমগ্র হিন্দুস্থানের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। শিষ্য বলিল, ঘোরীর আক্রমণ আসন্ন। এবার হিন্দুর বিজয়াশা সুদূরপরাহত, কেন না, তুর্কের সেনা সঙ্ঘটে-বিপদে সমর-ক্লেশ-সহিষ্ণু।

"কিন্তু আমাদের সেনা নহে যুদ্ধজীবী,
হালিক, তৈলিক, গোপ। রাজার আদেশে
ধরে আসি' অস্ত্র; নহে বীরত্বে, সাহসে
ন্যূন তুর্ক হ'তে; কিন্তু কি শক্তি তাদের
যুঝে দীর্ঘকাল যুদ্ধ-ব্যবসায়ী সনে?"

তুঙ্গাচার্য্যের মুক্তরূপে শিষ্য অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়াছেন, নানাস্থানে নানা জাতিকে স্বদেশের আসন্ন-সঙ্কটে আত্মবলি দিতে উত্তেজিত করিয়াছেন; কিন্তু সকলেরই মুখে সেই এক কথা—

"আসিবে তুরুষ্ক সেনা কি ক্ষতি মোদের ?"
হতাশের বিষাদ ফেলিয়া তুঙ্গাচার্য্য বলিলেন :—
"যবনের আরোহনে নাহি ছিল ভয় ;
ভয় এই দেশব্যাপী ঔদাস্য হিন্দুর।

এই সর্গের শেষে সংযুক্তা-চরিত্রের একটী রমণীয় বিশেষত্ব অতি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। কোষাধ্যক্ষ একদিন আসিয়া বলিল :—

'হতাহত তরে
এত অর্থব্যয় কভু নাহি ছিল রীতি।'

শুনিয়া সংযুক্তা নিজের গাত্রালঙ্কার খুলিয়া কোষাধ্যক্ষকে দিয়া আদেশ করিলেন :—

"রাজস্বী ভাণ্ডারে মোর নাহি অধিকার ;
কিন্তু অধিকার আছে নিজের শরীরে :
যতদিন কণামাত্র রহিবে ইহার,
ত্রুটী যেন নাহি হয় আহত-সেবায়।"

ষোড়শ সর্গে জয়চন্দ্র যোগীর পক্ষ অবলম্বন করিতে কৃতসঙ্কল্প। তুঙ্গাচার্য্য বুঝাইবার বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে তুঙ্গাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইলে সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজের উপর তাহার ক্রোধের শান্তি হয় ? জয়চন্দ্র উত্তর দিলেন—

"রোষ ঘুচিবে তখন,
সংযুক্তা বিধবা আমি হইব যখন।"

সপ্তদশ সর্গে স্বপ্নে তুঙ্গাচার্য্যের অনন্ত-দর্শন। ঋষির কৃপায় সন্ন্যাসী হিন্দুস্থানের তাৎকালিক সামাজিক অবস্থা বায়স্কোপ-চিত্রের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিলেন। অবশেষে ঋষি ভবিষ্যৎবাণী করিলেন :—

"বিধির বিধান-বলে নব হিন্দুজাতি,
উদার, স্বধর্ম্ম-প্রেমী, স্বদেশ-বৎসল,
মনোৎসাহে দীপ্ত, নব যন্ত্রে সুশিক্ষিত
হবে দেখা সমুদ্ভূত।"

অষ্টাদশ সর্গে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ, অতর্কিত ভাবে যোগীর আক্রমণ ও দিল্লীশ্বরের পতন। ইহার পর উনবিংশ সর্গে পৃথ্বীরাজের মৃত্যু এবং সংযুক্তার চিতারোহণ।

এই উনবিংশ সর্গে গ্রন্থের অবসান। ইহার সূচনা সপ্তর্ষি-মণ্ডলে, সমাপ্তি যমুনাতটবর্ত্তী শ্মশানে ;—আরম্ভ আশার বটিকায়, অবসান মৃত্যুর নির্ব্বিকার শান্তিতে। পাপে ইহার প্রতিষ্ঠা, প্রায়শ্চিত্তে বিসর্জ্জন। বহু যুগ পূর্ব্বে এই ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া অপর এক ঐতিহাসিক মহাকাব্য লিখিত হইয়াছিল। সে মহাভারত ভারতের গৌরব। যে উদার কল্পনা, আকাশের ন্যায় ব্যাপকতা, অতলস্পর্শের গভীরতা মহাকাব্যের অঙ্গ ; মানবের অন্তর্নিহিত রিপুনিচয়ের পৈশাচিক উৎপাত, হৃদয়ের ক্ষুদ্র তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত উন্মাদনার তাণ্ডব নৃত্য, এবং সর্ব্বোপরি ত্যাগে, নিষ্ঠায়, ধৈর্য্যে, দৃঢ়তায় যে বিরাট আদর্শ ও চিরন্তন সত্যের প্রতিষ্ঠা মহাকাব্যের প্রাণ, এ গ্রন্থে তাহা সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পায় নাই। যাহা নাই, তাহা লইয়া আলোচনা চলে না। এ গ্রন্থে জাতীয় অবঃপতনের মূল তথ্যসকল সবিশেষ ভাবে চরিত্রের ভিতর দিয়া ভাবের উত্তেজনায়, রসের ভাণ্ডার ব্যক্ত করা হইয়াছে।

কাব্যের প্রধান চরিত্রসকলের কথা আমি উল্লেখ করিয়াছি, কেবল হেমসিংহ ও গোবিন্দের উল্লেখ করা হয় নাই। গ্রন্থে অল্পস্থান অধিকার করিলেও বীরত্ব-মহিমায় ইঁহারা উভয়েই অমর-স্মৃতি-মণ্ডিত এবং ইঁহাদের চরিত্রও উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। কাব্যের সকল চরিত্রই সুপরিস্ফুট, তবে কোথাও-কোথাও যেন একটু বাঙ্গালী-বাঙ্গালী গন্ধ আছে। জয়চন্দ্র রাজ্ঞীকে তিরস্কার করিতেছেন :—

"কিন্তু, রাজ্ঞী ! ত্যক্ত যদি কর বার বার,
পাঠাইব পিত্রালয়ে, আনিব না আর।"

এই কাব্যের ভাষা সরল, প্রাঞ্জল, সরস, হৃদয়গ্রাহী এবং ঘটোপযোগী। তবে, স্থানে-স্থানে যে—onomatopoetic—ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতে কোথাও-কোথাও শ্রুতিকটু বোধ হয়। যথা—

"ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ 'গঙ্গা গঙ্গা' ! ! !
! ! ! রব শিঙা তুলে তীব্রস্বর।"
"গাঁ গাঁ গাঁ গাঁ তীব্রস্বরে ডাকে অবিরাম।"
"ডাকিছে শৃগাল দল খ্যাক্ খ্যাক্ খ্যাক্।"

রসাত্মক রচনায়, ভাবসৌষ্ঠবে এবং বিষয়-গৌরবে এ কাব্য 'মহাকাব্য' আখ্যা পাইতে পারে কি না, তাহা আমা হইতে যোগ্যতর ব্যক্তিগণ বিচার করিবেন। আমি সমালোচকের আসনে বসি নাই, বসিবার যোগ্য বলিয়াও আপনাকে মনে করি না। এই উপাদেয় কাব্য পাঠ করিয়া আমি যে আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি, যে নির্ম্মল কবিত্বরস উপভোগ করিয়াছি এবং সময়ে সময়ে আমার মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম এবং কাব্যখানির সামান্য একটু পরিচয় দিলাম।

ঠিকে ভুল

[শ্রীদেববালা দেবী]

১

ফাইল ক্লিয়ার করিতে-করিতে শরীরটা কিছু অপটু হইয়া পড়িল, সেইজন্য মাস-দু'এর ছুটি লইয়া দার্জ্জিলিঙ্গে গেলাম। ছুটি যেদিন শেষ হইবে, তাহার পরদিন কাছারী হইয়া পূজার ছুটি আরম্ভ হইবে, এমনি হিসাব করিয়া ছুটি লইয়াছিলাম। ছুটির শেষাশেষি সংবাদ পাইলাম, বাঁকিপুরে বদ্‌লি হইয়াছি। বাঁকিপুরে বন্ধুবর নরেশচন্দ্র কলেজের প্রফেসার;—সে দু'দিন তাঁহারই বাসায় কাটাইব স্থির করিলাম। নরেশও মহা আগ্রহ করিয়া চিঠি লিখিল। আমার শ্বশুর-মহাশয় তখন আরার অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছিলেন। কল্পনা ছিল, বাঁকিপুর হইতে সরাসরি আরায় গিয়া ছুটিটা কাটাইব; কারণ শ্বশুর-মহাশয়ের কন্যা তখন তাঁহারই নিকটে। একেবারে দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে আরায় এ পরিবর্ত্তনটা শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমোদন করিতেন কি না জানি না, কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ খুবই অনুমোদন করিয়াছিলেন।

২

কলিকাতা হইয়া প্রাতঃকালে বাঁকিপুর ষ্টেশনে নামিলাম। নামিয়া দেখিলাম, পুলিশের ভিড়। নরেশও আমাকে লইতে ষ্টেশনে আসিয়াছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, একজন রাজদ্রোহীর তখন বাঁকিপুরে থাকার সংবাদ পুলিশে পাইয়াছে, এবং পাছে সে পলাইয়া যায়, তাই সম্ভব-অসম্ভব স্থানে কড়া পাহারা বসিয়াছে। সেও না কি শীঘ্রই এ স্থান ত্যাগ করিবে, এমন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। নরেশের বাসায় গিয়া উঠিলাম। সমস্ত সকালটা তাহার সহিত নানাবিধ খোস-গল্পে কাটিয়া গেল। দার্জ্জিলিঙ্গে সে কখনও যায় নাই, সুতরাং দার্জ্জিলিঙ্গের অপূর্ব্ব রেলের কাহিনী হইতে ভ্যানিটেরিয়মের জলবৎ চা এবং ঘাসবৎ বৈচিত্র্যহীন তরকারীর গল্প সে যথেষ্ট আনন্দের সহিত উপভোগ করিতে লাগিল। তাহার পর দার্জ্জিলিঙ্গের দৃশ্যাবলী দেখাইবার জন্য এল্‌বাম বাহির করিলাম। তাহার প্রথম পৃষ্ঠায় আমার ছবি, দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আমার স্ত্রীর, এবং বাকী দার্জ্জিলিঙ্গের দৃশ্যাবলীর। এই দ্বিতীয় চিত্রটির উদ্দেশে যথেষ্ট কৌতুক-বিদ্রূপের পর তাড়াতাড়ি অন্য চিত্রগুলি দেখা যখন সে শেষ করিল, তখন ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলাম, কাছারীর বেলা যথেষ্ট হইয়াছে, এবং আমাদের তৎপূর্ব্বেই ওঠা উচিত ছিল। এলবাম সেইখানেই অনাদৃত পড়িয়া রহিল এবং আমরা দ্রুত নাওয়া-খাওয়া সারিতে গেলাম। সেদিন শেষ হইল; এবং তাহার পরদিনও কাছারী শেষ করিলাম। তাহার পর দিন হইতে পূজার ছুটি আরম্ভ; সুতরাং কাছারীর পরে সন্ধ্যা সাতটার ট্রেণে আরায় যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। নরেশদের সেই সময়ে একটা পার্টি ছিল বলিয়া, সে আমার সঙ্গে ষ্টেশনে যাইতে না পারায় বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিল; এবং বারবার অনুরোধ করিল, ছুটির শেষে যেন সস্ত্রীক আমি তাহার বাসায় আসিয়া অন্ততঃ দু'-একদিন থাকি। তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

৩

ষ্টেশনে যখন আসিলাম, তখন গাড়ী আসিতে বড় বেশী দেরী নাই। তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানা টিকিট কিনিয়া প্ল্যাটফরমে আসিতেই গাড়ী আসিয়া পড়িল। একখানা একেবারে খালি কামরা দেখিয়া উঠিয়া বসিলাম। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, ষ্টেশন আলোকিত, এবং সুন্দর সুশীতল বাতাস বহিতেছে। দীর্ঘ প্রবাস যাপনের পর প্রিয়জনের সহিত মিলন-সূচক এমন মনোরম সন্ধ্যা বুঝি আর কখনও হয় নাই!

কিন্তু ওই দু'টা লোক কে! এমনি করিয়া ক্রমাগত আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, যে, তাহাদের দৃষ্টি আমার এই আনন্দের মধ্যেও আমাকে যেন কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। ট্রেণ ছাড়িলে যে বাঁচা যায়! হুইশেল দিয়া ট্রেণ নড়িয়া উঠিল, এবং সেই মুহূর্ত্তেই যেমন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া ভাল করিয়া বসিতে গেলাম, অমনি সেই দুটা লোক টপ্ টপ্ করিয়া আমার গাড়ীতে উঠিয়া আমার পাশে বসিয়া পড়িল! মনে সন্দেহ যে না হইল তাহা নয়; কিন্তু ভদ্র-

বেশধারী দুইজনকে ত হঠাৎ চোর বলা যায় না! সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে খানিকটা দূরে অন্য একটা বেঞ্চে গিয়া বসিলাম।

একজনের চোখে চশমা এবং আর একজন চশমা-হীন। কিন্তু হইলে কি হয়, চশমা-হীন এবং চশমা-ময় চারিটি চক্ষুই আমার দিকে সমান নিবদ্ধ! আমার পরণে একখানি দেশী ধুতি, গায়ে একটা পিরাণ এবং উড়ানি, এবং চেহারাও অত্যন্ত সাধাসিধা; সুতরাং আমার মধ্যে কি এমন দৃষ্টি-মধুর আছে বুঝিতে না পারিয়া, ট্রেণ হইতে গলা বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম! কিন্তু তাহাতেও পরিত্রাণ কৈ? চশমা-ধারী মোটা-গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়ের নাম?" প্রশ্ন শুনিয়া ভিতর হইতে অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তবু মনে করিলাম, প্রয়োজন কি অভদ্রতা করিয়া। যতটা সংক্ষেপে পারি উত্তর করিলাম, "নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।" তাহার পর প্রশ্ন হইল, "নিবাস?" আর পারিলাম না। উত্তর করিলাম, "বলতে বাধা নই।" তখন চশমা-হীন তীব্র-কণ্ঠে কহিল, "তা হবে কেন? সে ভাল রকমই বোঝা গেছে! বলে দেব তা হ'লে? নিবাস শ্রীঘর!" আমি বলিলাম "মশায়! ভদ্রতার একটা সীমা আছে ত! আমি কি চোর, না ডাকাত, যে—" চশমাধারী চীৎকার করিয়া কহিল, "তার চেয়ে বেশী! তুমি—" আমি কহিলাম, "খবরদার! মুখ সাম্‌লে—" বলিয়া চেন টানিবার জন্য যেমন উঠিতে যাইব, অমনি দুই-জনে ক্ষিপ্র-প্রতিতে দুইটা রিভলভার বাহির করিয়া আমার কপালের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "বাস্, ওইখানে! নড়েছ কি গেছ!" বজ্রপাত হইলেও এত বিস্মিত হইতাম না। সেইখানেই স্থির হইয়া বসিয়া পড়িলাম। তখন সেই চশমাধারী আসিয়া আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিল, "সম্রাটের নামে তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম!" এবং চশমাহীন ব্যক্তি একটা হাতকড়ি লইয়া আমার হাতে দিল! সুন্দর সন্ধ্যা তখন সুন্দরতর হইয়া দেখা দিয়াছে! কিন্তু হায় ভাগ্য! আমি কহিলাম, "অপরাধ?" চশমাধারী উত্তর দিল, "রাজদ্রোহিতা!" আমি কহিলাম, "মশায়, ভুল ক'রেছেন! আমি ও-সব নই। আমি পাটনার মুন্সেফ।" চশমাহীন তীব্র হাসি হাসিয়া কহিল, "নবাবের নাতি! এই কম্ম করে'-করে' আমরা বুল ধ'রে গেছি হে, ও-সব আর চলবে না! এখানে কে-কে মুন্সেফ আছেন, ব'লে দিতে পারি! সুরেন বাবু, হরিপ্রসাদ বাবু আর দেবনাথ বাবু! আমাদের সঙ্গে চালাকি!"

আমি বুঝিতে পারিলাম যে উপায় নাই। তবু কহিলাম, "আমি কাল জয়েন ক'রেছি!" চশমাহীন কহিল, "ধড়িবাজ ত কম নয়! এখনও যে জয়েন করনি হে! এইবার করবে বোধ হয়!" তখন স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। ভগবান্! এতও অদৃষ্টে ছিল! শুনিলাম, আমাকে আরায় লইয়া যাইবে। সেই কথা শুনিয়া কহিলাম, "সেখানকার উপস্থিত ম্যাজিষ্ট্রেট আমার শ্বশুর।" চশমাহীন কহিল, "হাঁ, তোমার শ্বশুরালয় শ্রীঘর তাঁরই জুরিসডিক্‌সনে বটে! ঠিক বলেছ—বাঃ! বাঃ!" মাঝের ষ্টেশনে তাহারা একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিল। কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিই যে, তাহারা ভুল করিতেছে। তাহাদের মনের ধারণা এত দৃঢ় যে, কোন কথাই তাহাদের কাণে উঠে না! সুতরাং ভাগ্য যেখানে লইয়া যাইবে, সেইখানেই যাইতে হইবে! আরা ষ্টেশনে যখন গাড়ী আসিয়া থামিল, তখন বন্দুক-ধারী সিপাহীতে তাহা পূর্ণ! তাহারই মধ্যে কঠিন হাত-কড়ায় বদ্ধ আমি নামিলাম। রাত্রি তখন নয়টা হইয়া গিয়াছে। এত রাত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে আমাকে 'প্রডিউস্' করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে কাহারও সাহস হইল না! সুতরাং প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া জেলের এক নির্জ্জন গৃহে আমাকে রাত্রিবাস করিতে হইল! শুনিয়াছি, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকেও একবার নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। কঠিন মেঝের উপর মশা এবং ছারপোকার কামড়ে বিনিদ্র রজনী কাটাইতে-কাটাইতে, এই কথাটা মনে করিয়া সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিতেছিলাম যে, আমরা ত কোন ছার! হয় ত বা কোন অজ্ঞাত পাপের এটা প্রায়শ্চিত্ত! কিন্তু ভাগ্যের কি অপূর্ব্ব খেলা! কোথায় আজ রাত্রের কল্পিত প্রিয়জন-মিলন এবং কোথায় এই সুনিশ্চিত অপ্রিয়জন-তাড়ন!

(৮)

সকালে চা খাইয়া ডিটেক্‌টিভদ্বয়—(সেই রাত্রে জানিয়া-ছিলাম তাঁহারা ডিটেক্‌টিভ)—আমাকে সেই হাত-কড়া-বাঁধা অবস্থায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে "প্রডিউস্" করিবার জন্য লইয়া চলিল। রাত্রে এবং ভোরের ট্রেণে

পর্য্যন্ত জামাতার আগমন অভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন কুঠির সম্মুখে চিন্তিত ভাবে পদচারণা করিতেছিলেন; এমন সময়ে সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত আমাকে লইয়া তাহারা সেখানে উপস্থিত হইয়া সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া দাঁড়াইল! এমন অবস্থায় যে আমি আসিতে পারি, এ তাঁহার কল্পনার অতীত; সুতরাং কয়েকবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "এ কি?" আবার স্যালিউট্ করিয়া চশমা-ধারী কহিল, "পাটনার সেই রাজদ্রোহী!"

ব্যস্ত হইয়া শ্বশুর-মহাশয় কহিলেন, "নির্ম্মল?" তাহাদের দিকে ফিরিয়া অত্যন্ত রুক্ষভাবে কহিলেন, "একে কেন গ্রেপ্তার ক'রেছ তোমরা? এখনি খুলে দেও! কি হয়েছে নির্ম্মল?" আমি কহিলাম, "আমিও জানি না! বোধ হয় ডিটেক্‌টিভির বাহাদুরী! কাল সন্ধ্যার যখন এখানে আস্‌ছিলাম, তখন গাড়ীতে এরা গ্রেপ্তার ক'রেছে। কত আপত্তি ক'রেছি, তবুও শোনেনি। খুন পর্য্যন্ত করতে গিয়েছিল।" ততক্ষণে মুক্ত হয়েছি! ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন সপ্তমে চড়িয়াছেন, এবং তাঁহার ক্রোধ দর্শনে সেই দুর্দ্ধর্ষ লোকগুলা তালপত্রের মত কাঁপিতেছিল! স্থান-মাহাত্ম্য! অবশেষে সেই চশমাধারী কম্পিত-হস্তে একখানি চিঠি ও ফটো বাহির করিয়া শ্বশুর-মহাশয়ের হস্তে দিল। চিঠিতে সংক্ষেপে লেখা আছে যে "আজ সন্ধ্যার সময় আরার ট্রেণে রাজদ্রোহী পলাইবে। এই তাহার ফটো।" ফটোটা আমারই বটে; আমার সেই ফটো! শ্বশুর-মহাশয় বলিলেন, "এ কি?" তখন ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাড়াতাড়িতে অনাদৃত ফেলিয়া-রাখা আমার এলবাম হইতে ফটোটা সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং পুলিসের চক্ষে এমনি করিয়া ধূলা দিয়া বোধ হয় সেই সময়েই বিপরীত-গামী ট্রেণে রাজদ্রোহী পলায়ন করিয়াছে! সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া চশমাধারী শ্বশুর-মহাশয়ের এবং চশমাহীন আমার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। এও ভাগ্য-চক্র! শ্বশুর-মহাশয় কহিলেন, "যাও; চমৎকার ডিটেক্‌টিভি ক'রেছ! কিছুদিন এ রকম করলে, এই হাতকড়া তোমাদের হাতে পড়বে! উপস্থিত ঘরে যাও, এ বাহাদুরীটা যথাসময়েই তোমাদের সাহেবের কর্ণগোচর হবে! আসল লোকটা গেল পালিয়ে, আর একজন সম্ভ্রান্ত গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীকে কষ্ট দেখিয়ে বাহাদুরী!" তাহাদের অবস্থা তখন বর্ণনির বাহিরে গিয়াছে—দেখিয়া আমারও দয়া হইতেছিল! তাহার পর ভিতরে গেলাম! সেখানকার বিবিধ সম্ভাষণ অনুমেয়, বর্ণনীয় নহে!

আলোচনা

গত মাসে আমরা "ত্রিপুরা-হিতসাধিনী সভার" উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটী শিল্প-প্রদর্শনীর সংবাদ পত্রস্থ করিয়াছিলাম। তাহাতে দেশালাইয়ের কল, বোতাম প্রস্তুত করিবার কল, সুতার গুলি প্রস্তুত করিবার কল প্রভৃতি বাঙ্গালীর উদ্ভাবিত কয়েকটী কলের উল্লেখ ছিল। সহযোগিনী "সম্মিলনী"তে দেখিলাম, কলগুলির উদ্ভাবনকর্ত্তার নাম ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। তাঁহার দেশালাইয়ের কলের কথা অনেক দিন পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল এবং তাহা যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ডাক্তার নন্দী মহাশয় পায়ে-চালানো একটী নূতন ধরণের চরকাও প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া জানা যাইতেছে।, সহযোগী "দর্শক"ও এইরূপ একটী পায়ে-চালানো চরকার সংবাদ দিয়াছিলেন। তাহার মূল্য দশ টাকা। ইহাতে দুই হাত অ-যোড়া থাকে বলিয়া বেশী পরিমাণে সূতা কাটা যায়। বস্তুতঃ, এখন এইরূপ সহজ-সাধ্য অল্প মূল্যের কলকব্জার উদ্ভাবন করিয়া দেশের গৃহশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও তাহাদের উন্নতি-সাধনের আবশ্যকতা তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বাঙ্গালী উদ্ভাবনী শক্তিতে একেবারে বঞ্চিত নহেন; কেবল উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাঁহারা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কোন ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোক একটী নূতন ধরণের তাঁত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে তাঁত আমরা দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পরে সে সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য শুনি নাই—সমস্ত উৎসাহ একেবারে জল হইয়া গিয়াছে। এ রকম অবস্থা ত আর বাঞ্ছনীয় নহে: আমাদের নিজেদের কাজ আমরা নিজেরা না করিলে কে আর আমাদের হইয়া করিয়া দিবে? আজ আমাদিগকে সমগ্র জগতের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে। কিন্তু সমস্ত জগৎ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি-পথে ধাবিত হইতেছে; আর আমরা তাহাদের অপেক্ষা কতই না পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি! এ রকম অবস্থা আর কতদিন চলিতে পারে?

শিক্ষা "দান" এদেশের চিরন্তন প্রথা। বিদ্যালিক্ষা দিয়া তাহার

জন্য পারিশ্রমিক বা মূল্য গ্রহণ করা শাস্ত্রানুসারে পাপ বলিয়া গণ্য। সেই দেশে শিক্ষা আজ-কাল পণ্যদ্রব্যে পরিণত। কাশীধামে এখন দেশে শিক্ষার রীতিমত ক্রয়-বিক্রয় চলিতেছে, ইহা আমাদের চিরন্তন রীতি-নীতির বিরোধী। তাহার উপর, অন্যান্য জিনিসের ন্যায় শিক্ষার মূল্যও যদি দিন-দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে, "বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা?" সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছিল যে, ঢাকা কলেজের ছাত্র-বেতন মাসে ছয় টাকার পরিবর্ত্তে নয় টাকা করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। ঢাকা জেলা সমিতি এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদ সফল হইয়াছে, মহাশয় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তবে শুনা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই কতকগুলি ছাত্রের নিকট হইতে নয় টাকা হিসাবেই বেতন লওয়া হইয়াছে। বেতন বৃদ্ধি যখন হইল না, তখন আশা করি, অতিরিক্ত টাকাটা ছাত্রগণকে প্রত্যর্পণ করা হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নোত্তরে, বাঙ্গলার গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশে কৃষির উন্নতির কিরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহার সম্বন্ধে কিছু বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হইতে তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। "কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য বহুদিন হইতে চেষ্টা করা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন:—১। গবর্ণমেণ্ট এযাবৎ প্রতি বৎসর ৩০০ একর পরিমাণ ভূমিতে সিন্‌কোনার চাষ করিতেন। সম্প্রতি ৭০০ একরের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ২। চা-ব্যবসায়িগণের জন্য কাষ্ঠের বাক্স নির্ম্মাণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে বনবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। ৩। বনজ দ্রব্যাদির প্রয়োজনীয়তা ও সরবরাহ করার সুবিধা আছে কি না তাহার নির্ণয়কল্পে ডেপুটী কমিশনার অব ফরেষ্ট মিঃ, এইচ, এস, হিবসন্‌কে শিল্পবিভাগের ডিরেক্টরের অফিসে প্রেরণ করা হইয়াছে। ৪। ৮০০০ মণ উৎকৃষ্ট ধান্যের বীজ ও ১০০০ মণ উৎকৃষ্ট পাটের বীজ বিতরণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ৫। পাঁচজন নূতন ডিষ্ট্রিক্ট এগ্রিকালচারেল অফিসার (জিলার কৃষিবিষয়ক কর্ম্মচারী) নিযুক্ত করা হইয়াছে। ৬। কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারিগণের মতানুসারে ধানে সার বিতরণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ৭। বঙ্গদেশে রবিশস্যের অধিক পরিমাণে চাষের সুবিধা আছে কি না, অনুসন্ধান করা হইয়াছে। প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ মণ মসুর ও ছোলা এদেশে আমীত হয়। শীতকালে বঙ্গদেশের ভূমিতে অধিক পরিমাণে ছোলা ও মসুর উৎপন্ন করার চেষ্টা হইতেছে। ৮। সার, বীজ ও কৃষির যন্ত্রাদি সরবরাহের জন্য উন্নত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ৯। কার্পাসের চাষের বিস্তারের জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। ১০। অধিকতর পরিমাণে আক সরবরাহ করা হইতেছে। ১১। সমবায়ের প্রচলনকল্পে ১৬ জন নূতন সমবায়-সমিতির পরিদর্শক নিযুক্ত করা হইয়াছে। ১২। সমবায়বিভাগ তন্তুবায় শ্রেণীর মধ্যে সমবায়ের প্রতিষ্ঠা এবং সূতা সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। ১৩। মৎস্য, ঘৃত, ঘি, বাখর ইত্যাদি সরবরাহের জন্য রেলওয়ের সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

সহযোগী "হিতবাদী" লিখিয়াছেন,—"কলিকাতায় কাষ্ঠাভাব। কলিকাতায় একটীর পর একটী করিয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হইতেছে। সংপ্রতি জ্বালানি কাষ্ঠের অভাব আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানের কলকারখানার প্রজ্বলীবীদিগের মধ্যে অনেকেই এবং মায়েরোড়ী দপ্তরের অধিকাংশই এখন কালে কয়লার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ ব্যবহার করে। ঐ কাষ্ঠ প্রায় শতাধিক মাইল দূরবর্ত্তী জঙ্গলময় প্রদেশ হইতে আমদানী হয়। এখন রেল কোম্পানী যথেষ্ট সংখ্যায় গাড়ী দিতে না পারাতে কলিকাতায় কাষ্ঠের আমদানী অনেক কমিয়া গিয়াছে। যে স্থান হইতে কাষ্ঠ আমদানী হয়, সেই সকল স্থানে রেল ষ্টেশনে প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠ জমিয়া গিয়াছে। যদি রেল কোম্পানী গাড়ী দিতে পারেন, তাহা হইলে কলিকাতায় কাষ্ঠাভাব আর থাকিবে না। রেল কর্ত্তৃপক্ষ তাহার ব্যবস্থা করিবেন কি?"

ইহা ত ঠিক কথা নয়। রেল কোম্পানীর যত দোষই থাকুক, এই জ্বালানী কাষ্ঠের ব্যাপারে অন্ততঃ রেল কোম্পানীকে দোষী করা চলে না। এমন ভাবে রেলওয়ে নন্দ ঘোষের ঘাড়ে সকল অপরাধের বোঝা চাপাইয়া দরিদ্র খরিদ্দারদিগকে (consumers) তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য করিলে চলিবে কেন? আমাদের শৈশবে এবং যৌবনে আমাদের বাড়ীতে কাষ্ঠের জ্বালে রান্না হইত। বাড়ীর কোন মহিলা সন্তান প্রসব করিলে বড়-বড় মুঁদ্‌রী কাষ্ঠের গুঁড়ি পোড়াইয়া তাপ-সেক দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বাড়ীতে কোন ক্রিয়াকর্ম্ম উপস্থিত হইলে বড়-বড় উনানে মোটা-মোটা মুঁদ্‌রী কাষ্ঠ পোড়ানো হইত। আমাদের বোধ হয়, হিন্দু মুসলমান সকল গৃহস্থের ঘরেই তখন অল্পাধিক পরিমাণে জ্বালানি কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত। সেই জ্বালানি কাষ্ঠ আমরা নারিকেলডাঙ্গার খালের ধারের কাষ্ঠগোলা হইতে কিনিয়া আনিতাম। সে কাষ্ঠের মণ তখন পাঁচ আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত ছিল। কোক কয়লা তদপেক্ষা সুলভ এবং ব্যবহারে সুবিধাজনক হওয়ায় বোধ হয় ক্রমে কাষ্ঠের ব্যবহার কমিয়া গিয়া কয়লার ব্যবহার বাড়িয়া যায়। তখন খালের এপারে এবং ওপারে বড়-বড় কাষ্ঠের গোলায় পাহাড়ের সমান উঁচু মুঁদ্‌রী কাষ্ঠ স্তূপাকারে সজ্জিত থাকিত। আর খালের যে অংশের উপর দিয়া রেল লাইন গিয়াছে, সেইখান হইতে নারিকেল-ডাঙ্গার পোল পর্য্যন্ত খালের পূর্ব্বধারে বড়-বড় ঘাসের গোলা ছিল। পরে আগুন লাগিয়া ঘাসের গোলা সকল পুড়িয়া যাওয়ায় আর সেখানে ঘাসের গোলা স্থাপিত হয় নাই।

কিন্তু মুঁদ্‌রী কাষ্ঠের গোলা ত এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মুঁদ্‌রী কাষ্ঠই ত কলিকাতায় সর্ব্বপ্রকার জ্বালানী কার্য্যে, এমন কি,

নিমতলা ও কার্বলিয়েটের ঘাট-খরচার কাযেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ত রেলপথে আসে না; সুন্দরবন হইতে নদী ও খালের পথে হাজার হইতে বার হাজার মুনি নৌকে চড়িয়া ইহা কলিকাতায় আগমন করে। বাল্যে ও যৌবনে আমরা বন্ধুবান্ধব মিলিয়া নারিকেলডাঙ্গা হইতে এই সকল প্রকাণ্ড নৌকার লেজুড় ছোট-ছোট ডোঙ্গা করিয়া বিনোদ হাল ধরিয়া ও দাঁড় টানিয়া বেলিয়াঘাটা দিয়া নূতন খাল দিয়া উল্টাডিঙ্গি হইয়া নারিকেলডাঙ্গায় ফিরিয়া আসিতাম। মান্ধাতার আমল হইতে যে আলানী কাঠ জলপথে নৌকাযোগে আমদানী হইতেছে, তাহার জন্য রেল কোম্পানীর দোষাই দিলে চলিবে কেন? তাহাড়া, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে, ভারতবর্ষে রেলপথে মাল আনাইতে যে খরচ পড়ে, জলপথে তদপেক্ষা অনেক কম খরচ পড়ে। ব্যবসায়ীরা যে এ কথা জানেন না, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। সুতরাং আলানী কাঠের গুরু অল্প মূল্যের জিনিস, জলপথে আনাইবার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, কেন যে বেশী মাশুল দিয়া রেলপথে আনাইতে হইবে, ইহারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই জন্য আমাদের মনে হয়, আলানী কাঠের মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারে, কোথাও-না-কোথাও কাহারও-না কাহারও, কোন না-কোন রকম চুরোমি আছে। এবং চুরোর দমন অচিরে প্রার্থনীয়।

বাঙ্গলার পল্লীগ্রামবাসীদিগকে নানা বিপদ-আপদ ও অসুবিধার মধ্যে বাস করিতে হয়। সহরে এত বিপদ আপদ নাই, এবং সহরবাসীদিগের সুবিধাও বিস্তর। এই কারণে একটু অবস্থাপন্ন ব্যক্তি-মাত্রেই পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া সহরে বাস করিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়েন। কিন্তু পল্লীই বাঙ্গালার শ্রী। বাঙ্গালার শ্রী বজায় রাখিতে হইলে পল্লী-লক্ষ্মীর সমুচিত আদর করিতে হইবে। পল্লীগ্রামের রাস্তা-ঘাটের অসুবিধা, ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা-বসন্তের উপদ্রব, ডাক্তার-কবিরাজের অভাব, বাঘ-ভাল্লুকের ভয়, সর্প-ভীতি—এমন কত না বিপদ ও অসুবিধা রহিয়াছে। এই সকল অসুবিধা ও বিপদ হইতে পল্লী-লক্ষ্মীকে মুক্তি-দান করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত কি না এবং সাধ্যায়ত্ত হইলে কত দিনে তাহা সম্ভবপর, সে কথা কেবল ভবিতব্যতাই বলিতে পারেন। অন্যান্য বিষয় ছাড়িয়া দিয়া আজ আমরা কেবল সর্প-ভীতির কথারই উল্লেখ করিতেছি। একে ত সাপে-কামড়ানোর চিকিৎসা নাই বলিলেই হয়। সহরে যদিও পার্মাঙ্গানেট অব পটাশ ব্যবহার করিবার কিঞ্চিৎ সুযোগ পাওয়া যায়, পল্লীগ্রামে ও-সকল বালাই আদৌ নাই। তথায় রোজার ঝাড়া ফুঁক ছাড়া অপর কোনরূপ চিকিৎসার উপায় নাই। সর্প যদি বিষধর না হয়, তাহা হইলেই রোজার বাহাদুরী দেখা যায়। কিন্তু বিষধর সর্প দংশন করিলে রোজা ডাকিবারও অবসর পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় কেহ যদি সর্প-দংশনের কোন ফলপ্রদ ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সর্বসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। সেই জন্য আমরা সর্প-দংশনের নিম্নলিখিত ঔষধের বার্তা সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—"কেলেকোঁড়া (কালিয়াট সংস্কৃত নাম) গাছের শিকড়ের সাপের বিষনাশক ক্ষমতা অধিতীয়। জলপাইগুড়ির রাজপরিবারের পুরোহিত শ্রীযুক্ত পরিবারে যে মহাশয় স্বয়ং পরীক্ষা করিয়াছেন। ব্যবহারের বিধান—কেলেকোঁড়া গাছের পূর্ব্বদিকের শিকড় এক ইঞ্চি আন্দাজ লইয়া ২০টি গোলমরিচ সহ একত্র বাঁটিয়া রোগীর মস্তকের তালুদেশের ছাল অল্প চিরিয়া উক্ত বাঁটা তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। রোগী পচিয়া না গেলে এই উপায় অবলম্বীয়। যে মহাশয় বলেন, পচিবার পূর্ব্বে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগী নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। আমাদের মফস্বলবাসী পাঠক-পাঠিকাগণ সর্পদষ্ট রোগীর প্রতি এই ঔষধটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল যে, কলিকাতা, হাবড়া ও অন্যান্য স্থানে যত বস্ত্র মজুত আছে, ৭ই জুলাই তারিখের মধ্যে তাহার একটা হিসাব ডিরেক্টার-অব-সিভিল-সাপ্লাইয়ের নিকট দাখিল করিতে হইবে। যদি কাহারও হিসাবে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার দোকানে বা গুদামে খানাতল্লাস পর্য্যন্ত করা চলিবে, এরূপ আদেশও প্রচারিত হইয়াছিল। সে ৭ই জুলাই অনেক দিন হইল উত্তীর্ণ হইয়াছে। কে কি হিসাব দাখিল করিয়াছেন, বাজারে এখন কত মাল মজুত—এ সব বিবরণ এখনও সাধারণে প্রকাশিত হয় নাই। কাপড়ের হিসাব ঠিক না হওয়া উপলক্ষে কোথাও খানাতল্লাসীর সংবাদও পাওয়া যায় নাই। গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ প্রচারিত হওয়ায় অনেকে আশা করিয়াছিলেন, হয় ত গবর্ণমেণ্ট কাপড়ের দর বাঁধিয়া দিবেন। কিন্তু পরে ব্যবস্থাপক সভায় বস্ত্র সমস্যা সম্বন্ধে যেরূপ প্রশ্নোত্তর হইয়াছে, তাহাতে এরূপ আশা করিবার আর অবকাশ পাওয়া যায় না। অতএব চরকার পূজা কাটিয়া তাতে কাপড় বুনিয়া যতটা বস্ত্রাভাব দূর হইতে পারে—তাহা ছাড়া আপাততঃ অন্য উপায় দেখা যায় না।

তাঁতের কাপড়ে বস্ত্রাভাব দূর করিবার আশা যেমন অনেকে করিতেছেন, তেমনি আবার কাহার-কাহারও মুখে বৈরাগ্যের আর্ত্তনাদও শুনা যাইতেছে। মেদিনীপুর—কাঁথির সহযোগী 'নীহার' যে সংবাদ দিয়াছেন যে, সে অঞ্চলে হাট-বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে তাঁতের বস্ত্রের আমদানী হইতেছে এবং তাহা মিলের বস্ত্রের অপেক্ষা সুলভতর মূল্যে বিক্রীত হইতেছে, ইহা আশার কথা। সকল জেলা ও মহকুমা হইতে এইরূপ আশার বাণী শুনিতে পাইলে অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিতে পারা যাইত। কিন্তু সহযোগী 'দর্পণ' সম্পাদকীয় স্তম্ভে এবং সহযোগী 'খুলনাবাসী'তে একজন লোক এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁতের বস্ত্রে দেশের অভাব মিটিবার কোন আশা নাই। ইঁহারা বলেন, বড় বড় কলকারখানা ব্যতীত এত বড় দেশের কোটী-কোটী লোকের বস্ত্রাভাব দূর হইতেই পারে না। আমরা কিন্তু

নিরাশ হই নাই। কারণ ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র আমদানী হইবার পূর্ব্বে এ দেশের বয়নারী উলঙ্গ থাকিত না,—মেয়েরা হাতে চরকায় কাটা সূতায় সাহায্যে তাঁতিরা তাঁতের কাপড় বুনিয়া দেশের আপামর সাধারণের বস্ত্রাভাব দূর করিত এবং উদ্বৃত্ত বস্ত্র বিদেশে চালান দিত। যাহা এক সময়ে সম্ভবপর ছিল, তাহা এখন অসম্ভব কিসে, তাহা 'খুলনাবাসী'র লেখক বা 'বর্ষক' কেহই যুক্তির দ্বারা দেখাইয়া দিতে পারেন নাই। আমাদের বিশ্বাস, সুব্যবস্থা হইলে হাতে-কাটা সূতায় তাঁতে বোনা কাপড়েই আমাদের বস্ত্রাভাব দূর হওয়া সম্ভব; তবে সুব্যবস্থা চাই।

এইখানে আমরা হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথার সার্থকতা দেখিতে পাই। ব্যবসায় মূলক জাতিভেদ প্রথা সমাজে প্রবর্ত্তিত থাকাতেই আমাদের দেশে পূর্ব্বে কখনও বস্ত্রাভাব হয় নাই। যে দিন হইতে সমাজের এই বন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ হইল, যে দিন হইতে তাঁতী তাঁত ছাড়িয়া ছেলে পড় কিনিতা বাটে যাইতে সুরু করিল, সেই দিন হইতেই আমাদের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। অবশ্য সস্তায় বিলাতী বস্ত্রের আমদানী এদেশের বস্ত্র-শিল্পের ধ্বংসের অন্যতম কারণ বটে, কিন্তু তাহাই মূল বা প্রধান কারণ বলা যায় না। আমাদের সমাজের বন্ধন দৃঢ় থাকিলে এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের বস্ত্রশিল্পের এতটা অধঃপতন হইতে পারিত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। তাঁর সাক্ষী এখনও তন্তু-তাঁবায়ে যেসী তাঁতের বস্ত্রই দিতে হয়; যাগযজ্ঞ, পূজার্চ্চনা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানে এবং বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক শুভকর্ম্মে এখনও নিষ্ঠাবান হিন্দু যেসী তাঁতের কাপড়েরই আদর করিয়া থাকেন। আমাদের মনে হয়, জাতিভেদ প্রথা বাণিজ্যক্ষেত্রে অনেকটা protective measure স্বরূপ ছিল। তবে এখন যখন সামাজিক বন্ধনের দৃঢ়তা নাই, তখন এ বিষয়ে আর আক্ষেপ করিয়া কি হইবে?

য়ুরোপীয় সভ্যতার হাওয়া প্রথমে বোম্বায়ের গায়ে আসিয়া লাগে বলিয়াই, বোধ হয়, ভারতের অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা বোম্বাই নগর সর্ব্বাগ্রে য়ুরোপীয় রীতি-নীতি গ্রহণে তৎপরতা প্রকাশ করিয়া থাকে। বিলাতের সাফ্রেজিষ্ট নারীদের কথা আমাদের পাঠকপাঠিকারা বোধ হয় অবগত আছেন। তাঁহারা রাজনীতিক অধিকারের প্রার্থনা করেন। সম্প্রতি আমেদাবাদ নগরে বোম্বায়ের হোমরুল লীগের মহিলা শাখার একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় সমবেত মহিলারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সম্প্রতি ভারত সচিব মহোদয় এবং বড়লাট বাহাদুর যে শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে পুরুষগণকে যে সকল অধিকার দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, রমণীগণকেও সেই সকল অধিকার দেওয়া হউক। তাঁহারা আরও বলেন, মিউনিসিপ্যালিটী, লোক্যাল বোর্ড, প্রাদেশিক এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি যে যে স্থলে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ আসন পাইয়া থাকেন, সেই সকল স্থলে মহিলাগণকেও আসন গ্রহণের অধিকার দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সভা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতিদ্বয়কে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যখন মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের উপর নিজ-নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিবেন, তখন যেন মহিলাগণের প্রার্থনানুযায়ী শাসন-সংস্কারের পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন। বোম্বাই যেরূপ শনৈঃ-শনৈঃ য়ুরোপীয় সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে বোম্বাই প্রদেশের অধিবাসিনী নারীগণের পক্ষে এরূপ প্রার্থনা করায় বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু ইহার ফল সমাজের পক্ষে হিতকর হইবে কি না, তাহাই বিবেচ্য। মনুষ্য-সমাজে নারী জাতির যে একটী বিশেষ অধিকার আছে, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পৃথিবীর তাবৎ নারীই যদি পুরুষের সকল অধিকারের দাবী করেন, তাহা হইলে সমাজে মস্ত একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে। পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে যে একটা প্রাকৃতিক বৈষম্য রহিয়াছে, পুরুষ ও নারী জাতির অধিকারের তারতম্যও তদনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সেই তারতম্য রহিত করিয়া নারীজাতি পুরুষের সমস্ত অধিকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলে, প্রাকৃতিক নিয়মেরও বিপর্য্যয় ঘটাইতে হয়। কিন্তু তাহা যখন সম্ভব নয়, তখন সমাজ-বিশৃঙ্খলা উৎপাদন ছাড়া ইহার আর কোন সার্থকতা দেখা যায় না। আমাদের পাঠিকারা কি বলেন?

লর্ড মণ্টেগু অব বিউলিউ (ইনি আমাদের ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু নহেন) লণ্ডন টাইম্‌সে একখানি পত্র লিখিয়া এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতে শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন অপেক্ষা তাহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন (economic development) অধিকতর প্রয়োজনীয়। কেবলমাত্র রাজনীতিক উন্নতি সাধনে—তাহাতেই হউক অন্যেরই হউক—মানব-সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পক্ষে কোন সহায়তা লাভ করা যায় না। ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কল-কারখানার উন্নতি সাধন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ভারতের বড়-বড় নদীর সমস্ত শক্তির অপচয় ঘটিতেছে। ভারত-গবর্ণমেণ্ট দেশের কৃষির উন্নতির জন্য তেমন চেষ্টা করেন না। ভারত-গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য এবং উৎসাহহীনতা ভারতীয় বাণিজ্যের অনুন্নত অবস্থার একমাত্র কারণ। জনসাধারণ যে এই বিষয়ে কিছু চেষ্টা করিবে, সে পক্ষেও মান্ধাতার আমল হইতে নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন বর্ত্তমান। তবে এ কথাও সত্য যে, এত বড় বিরাট রাজ্যের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করাও বড় সোজা কাজ নয়, এবং ইহাতেই ভারত-গবর্ণমেণ্টের সমস্ত শক্তি ও সময় ব্যয়িত হইয়া যায়; গবর্ণমেণ্ট সেই জন্য কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতি-সাধনে শক্তি বা সময় প্রয়োগ করিতে পারেন না। সুতরাং ভারতের কৃষি শিল্প-বাণিজ্যের অনুন্নত অবস্থার জন্য ভারতগবর্ণমেণ্টকে দোষ দেওয়া সঙ্গত নহে। ভারতের শিল্পবাণিজ্যোন্নতির জন্য নূতন ব্যবস্থা করিতে হইবে;—য়ুরোপ ও আমেরিকার ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের পদ্ধতির সহিত পরিচিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী দল গঠন করিয়া তাঁহাদের উপর ভারতের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি-সাধনের ভারার্পণ করিতে হইবে।

কেবল দুশাসন ও ডায়ার্কি শাসনের প্রবর্ত্তন করিলেই ভারতে বৃটিশ শাসনের সকল কর্ত্তব্য পালন করা হইবে না। এমন এক সময় আসিবে, যখন আমাদের নিজেদের, এবং ভারতেরও বটে, সুবিধার জন্য ভারতীয় কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতেই হইবে।

লর্ড মর্লেও এই যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সাধারণতঃ য়ুরোপীয় মাত্রেরই ধারণা এইরূপ। কিন্তু ভারতীয় জননেতৃবৃন্দ—যাঁহারা অধিকতর রাজনীতিক অধিকার বা হোমরুলের প্রার্থী—তাঁহাদের ধারণা কতকটা বিভিন্ন প্রকারের; তাঁহারা বলেন, দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন রাজনীতিক অধিকারসাপেক্ষ। একটাকে ছাড়িয়া আর-একটাকে ধরিয়া আগাইয়া যেওয়া সম্ভবপর নহে। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন করিয়া প্রজাবর্গের আর্থিক অবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে না পারিলে রাজ্য সুশৃঙ্খলে শাসন করা যায় না, এবং রাজনীতিক উন্নতি লাভ করিতে না পারিলে ঐ সকল বিষয়েও কোন কিছু করিতে পারা যায় না। দুইটাই এক সঙ্গে চাই। লর্ড মর্লেও নিজেই বলিয়াছেন, ভারত-গবর্ণমেণ্টকে দেশ-শাসনেই সমস্ত শক্তি ও সময় খরচ করিতে হয়, শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি-সাধনের জন্য গবর্ণমেণ্টের হাতে শক্তি ও সময় বড় বেশী উদ্বৃত্ত থাকে না। ভারতীয় রাজনীতিকেরা বলেন, দেশের শাসনভার কতকটা দেশের লোকের হাতে দিয়া, গবর্ণমেণ্টের ভার কতকটা কমাইয়া দিলে, তাঁহারা শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি-সাধনে মনোনিবেশ করিতে পারেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা বলেন, দেশের লোকের শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কিন্তু অর্থাভাবে, যথেষ্ট লোকবলের অভাবে গবর্ণমেণ্ট এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে, ইচ্ছা থাকিলেও, বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। দেশের লোকে শাসন-ভার কিয়দংশ হাতে পাইলে, অচিরে জনসাধারণের শিক্ষালাভের সু-ব্যবস্থা করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্টও এ কথা বুঝেন। সেই জন্যই দেশের লোকের হাতে শাসন-ভার কিয়দংশ অর্পণ করিবার জন্য বর্ত্তমান শাসন-সংস্কার প্রস্তাব হইয়াছে। বস্তুতঃ, বেদরকারী য়ুরোপীয় ভদ্রলোকগণ এবং ভারতীয় জননেতৃবৃন্দ যখন নিজ-নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন, তখন তাঁহাদের উভয় পক্ষের কথাগুলাই যথার্থ বলিয়াই বোধ হয়। অথচ উভয় পক্ষের মতামত পরস্পর বিরোধী। সেই জন্য আমরা মনে করি যে, দুই পক্ষের কথা কতকটা করিয়া রাখিয়া একটা মধ্য পন্থা অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। তাহা হইলে অনেকটা গোলযোগ মিটিয়া যায়, এবং প্রকৃত কাযও কিছু-কিছু হইতে পারে। নচেৎ, দুই পক্ষই নিজ নিজ জেদ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলে, তর্কের কোন কালেই মীমাংসা হইবে না; ফলে, প্রকৃত কায করিবার অবসর পাওয়া যাইবে না—তর্ক-বিতর্ক করিয়াই দিন কাটাইতে হইবে।

প্রকৃতি দেবীকে জয় করিবার জন্য মানুষের চেষ্টার বিরাম নাই। এই চেষ্টার যেটুকু ফল ফলিয়াছে, মানুষ তাহার নাম দিয়াছে, বিজ্ঞান। প্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তির আবিষ্কার করিয়া তাহাকে মানুষের বাগদে নিযুক্ত করা, তাহার দুই প্রভাব হইতে মানুষকে রক্ষা করা বিজ্ঞানের কার্য্য। মানুষের বিজ্ঞান প্রকৃতির শক্তিকে কতখানি জয় করিয়াছে, তাহা স্থির করা দুরূহ; কারণ প্রকৃতির শক্তির কতখানি এখনও আমাদের অজ্ঞাত, তাহার পরিমাণ কিরূপ, তাহা আমরা জানি না। সে যাহাই হউক, মধ্যে-মধ্যে প্রকৃতি দেবী তাঁহার গুপ্ত শক্তির যতটুকু প্রকাশ করেন, তাহাতেই মানুষের চমক লাগিয়া যায়। সম্প্রতি পৃথিবীতে একপ্রকার নূতন জ্বর রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। স্পেন দেশে প্রথমে ইহা উদ্ভূত হইয়া পরে সমস্ত পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষও ইহার আক্রমণ হইতে নিস্তার পায় নাই। এই রোগের প্রকৃতি, কারণ, ও নিদান এখনও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অবায়ত্ত এবং অজ্ঞাত রহিয়াছে। এই জ্বর অনেকটা ইনফ্লুয়েঞ্জার মত। কেহ-কেহ ইহাকে ডেঙ্গুজ্বরও বলিতেছেন। কিন্তু ইহা যে ঠিক কি জ্বর, তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই। প্রথম আক্রমণে এই জ্বর তেমন প্রবল হয় না। ইহার ভোগের সময়ও দুই-তিন দিনের বেশী নহে। কিন্তু ইহাতে শরীরকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। তার পর যাহারা দ্বিতীয়বার ইহার দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহাদের পক্ষে ইহা প্রায় মারাত্মক হইয়া পড়ে। ইহা দেশ-বিশেষে এত বেশী বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, এত বেশী লোকে এক সময়ে এই জ্বরের দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে যে, মানুষের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম্মে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। চিকিৎসকেরা এখন এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব রোগের উৎপত্তির কারণ ও চিকিৎসার প্রণালী নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এবং তাহা দেখিয়া প্রকৃতি দেবী বোধ হয় অন্তরালে বসিয়া থাকিয়া, মুখ টিপিয়া-টিপিয়া হাসিতেছেন।

সহযোগী 'বাঙ্গালী' বলেন:—"বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত যে সকল পুস্তক সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন, তাহা সাধারণের, বিশেষ এতদ্দেশীয় সাধারণ লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষমাত্রেরই জানিয়া রাখা আবশ্যক; তন্নিমিত্ত নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের 'ট্রাবাউন্ড এাক্ট অনুসারে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আপত্তিকর:—১। সিরাজদ্দৌলা, ২। মীরকাসিম, ৩। ছত্রপতি শিবাজী (স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত), ৪। পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, ৫। কর্ম্মফল, ৬। নন্দকুমার (ক্ষীরোদ বাবু প্রণীত), ৭। দুরন্ত-উদ্ধার পীতাভিনয়, ৮। রণজিতের জীবন-যজ্ঞ, ৯। মীরা উদ্ধার, ১০। দুর্গাদুর, ১১। মাতৃপূজা (কুঞ্জবিহারী প্রণীত), ১২। শিবাজী, ১৩। সংসার, ১৪। আশা কুহকিনী, ১৫। হলো কি? ১৬। আহা মরি, চন্দ্রশেখর, ১৮। হরিশ্চন্দ্র। ১৯১০ অব্দের প্রেস এাক্ট অনুসারে বাজেয়াপ্ত—১। সিরাজদ্দৌলা, ২। মীরকাসিম, ৩। ছত্রপতি শিবাজী ৪। পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, ৫। কর্ম্মফল, ৬। নন্দকুমার, ৭। দুরন্ত-উদ্ধার-পীতাভিনয়, ৮। রণজিতের জীবন যজ্ঞ, ৯। মীরা-উদ্ধার, ১০। দুর্গাদুর, ১১। মাতৃপূজা, ১২। আশা কুহকিনী ১৩। চন্দ্রশেখর। বঙ্গ হওয়ার

যোদ্ধা—১। বাবা ও বিবি, ২। দুর্গাদাস, মেবার-পতন, ৩। নীরজপর্ণ, ৪। পদ্মিনী, ৫। প্রতাপাদিত্য, ৬। প্রতাপসিংহ বা রাণা প্রতাপ, ৭। পৃথ্বিরাজ, ৮। রাজারাম বা বীরমুকুল, ৯। রোশেনারা বা নিবাহী।

পুরুষুষের (octopus) মত দুর্ভাগ্য তাহার সহস্র বাহু দিয়া আমাদিগকে এমন আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে, যে, কোনদিকেই আমাদের নিস্তার নাই। অন্যান্য প্রসঙ্গের উল্লেখ না করিয়া, একটী মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিলেই, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশে শস্য উৎপাদনের জন্য কৃষককে বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হয়। ক্ষেত্রে নাঙ্গল দিয়া কৃষক বৃষ্টির প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। সময়ে পরিমিত বৃষ্টি হইলে, কোনরূপ দৈব দুর্ঘটনায় ইহার ব্যতিক্রম না ঘটিলে, কৃষক ষোলআনা ফসল ঘরে তুলিতে পারে। কিন্তু বৃষ্টি হইতে যদি দুই দশ দিন বিলম্ব হয়, কিম্বা যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি না হয়, অথবা অতিরিক্ত পরিমাণে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে কৃষকের সমস্ত ফসল হয় শুকাইয়া যায়, না হয় পুষ্ট ফসল হয় না, অথবা হাসিয়া-খসিয়া পস্তনাশ হয়। আর দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে এই তিনটীর একটী না একটী ঘটিবেই ঘটিবে। এবার মফস্বলের অধিকাংশ স্থান হইতেই জলপ্লাবনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এ জলপ্লাবন কিরূপ অতিবৃষ্টির ফলে ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। গত একমাস দেড় মাসের মধ্যে বঙ্গদেশে কয়েকবার ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। আসাম অঞ্চলে ভূমিকম্পে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। এই জলপ্লাবনের জন্য অনেকে ভূমিকম্পকেই দায়ী করিতেছেন। এবারকার জলপ্লাবনের পরিমাণ অতি ভয়ানক। গ্রাম এবং রাজঘাটের কথা ত ছাড়িয়াই দিতে হয়; মুর্শীদাবাদ, বিক্রমপুর, নেত্রকোণা, মনমনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, রঙ্গপুর, চট্টগ্রাম, দারভঙ্গ প্রভৃতি নগরগুলিতেও অতিবৃষ্টি ও জলপ্লাবন উপস্থিত হইয়াছে। মোট কথা, দুর্ভাগ্যের আমাদের অন্ত নাই। বৃষ্টি না হইলেও যে ক্ষতি, একটু বেশী বৃষ্টি হইলেও সেই ক্ষতি। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে এরূপ কষ্ট ও বিপদ সহ্য করিতে হইলে বিধাতা অদৃষ্টের উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিলে চলে না। ইহাতে আমাদের নিজেদের দোষও কম নয়। এই যে সকল অসুবিধার উল্লেখ করা হইল, ইহারা একেবারে অনিবার্য্য নহে, বিজ্ঞানের সহায়তায় ইহাদের কতকটা দূর করা যাইতে পারে। অনাবৃষ্টির সময় চাষের জন্য জল সংগ্রহ করা একেবারেই অসম্ভব নহে। আমাদের মধ্যযুগীয় দেশে দশ হাত মাটী খুঁড়িলেই জল পাওয়া যায়। সাহায্যে সেই জল তুলিয়া ক্ষেত্রে সেচন করা কি একেবারেই অসাধ্য? আবার অতিবৃষ্টির প্রকোপ সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে না পারা গেলেও, কতকটা যে পারা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালীর অভাবেই অনেক স্থলে বৃষ্টির জল জমিয়া অনাবৃষ্টির সৃষ্টি করে। সমবেত ভাবে চেষ্টা করিলে, অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও আমরা আমাদের নিজেদের দুঃখ দূর করিতে নিশ্চয়ই পারি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলার মাননীয় শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে অধিক সংখ্যক ছাত্র প্রতিবৎসরে উত্তীর্ণ হয়, তাহারা অনেকে কলেজে স্থান পায় না। কলেজসমূহে স্থানের সঙ্কীর্ণতাই ইহার কারণ। এই অসুবিধা নিবারণের জন্য শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে, মফস্বলে যদি অধিক সংখ্যক দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হয়, এবং বড়-বড় উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে দুইটী শ্রেণী খুলিয়া যদি ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য ছাত্র প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের কলেজে পড়িবার কোন অসুবিধাই হয় না, কলিকাতায় এত ছাত্র আসিবার প্রয়োজন হয় না; ছাত্রেরা অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে মফস্বলেই ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে।

মাননীয় শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুরের এই কথার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য একটী কমিটী গঠিত করেন। কলিকাতা সিটি-কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় সেই কমিটীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কিছুদিন পূর্ব্বে কমিটী তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কমিটী বলিয়াছেন যে, মফস্বলে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়; তবে সেই সকল কলেজ যাহাতে উপযুক্তরূপে পরিচালিত হয়, তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রয়োজন পড়িয়াছে, সুতরাং যেমন-তেমন করিয়া একটা কলেজ খাড়া করিলেই হইবে না। পূর্ব্বে এই শ্রেণীর কলেজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে যে প্রকার পরিদর্শন করিতে হইত, যে সকল আয়োজন করিতে হইত, তাহার কোন প্রকার শৈথিল্য হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু উচ্চ ইংরেজী-বিদ্যালয়ে দুইটী শ্রেণী খুলিয়া ইণ্টারমিডিয়েট পাঠের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কমিটী আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মফস্বলে অনেক স্থানে অনেক ভাল ইংরেজী স্কুল আছে; তাহাদের আর্থিক অবস্থাও ভাল; তাহাদের দুই-চারিটিতে কলেজের দুইটী শ্রেণী খুলিবার মত স্থানও হয় ত আছে; কিন্তু সেই সকল বিদ্যালয়ের স্কন্ধে এ ভার পড়িলে কলেজের পড়াও ভাল হইবে না, স্কুলেরও উন্নতিতে বাধা পড়িবে। যে সকল স্কুলে এখন কিছু-কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত হইতেছে, তাহা যদি কলেজের কল্যাণে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে স্কুলের ক্ষতি হইবে; কারণ সেই অর্থ স্কুলের অধিকতর উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইলেই ভাল হয়। সেজন্য কমিটী বলিয়াছেন, কোন স্থানেই যেন স্কুলের সহিত কলেজের কোন সম্বন্ধ না থাকে,—স্কুল পৃথক থাকিবে, কলেজ পৃথক থাকিবে।

কমিটীর এই প্রস্তাব আমরা অনুমোদন করি। মফস্বলে কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়; কিন্তু স্কুলের পথে কলেজ চাপাইয়া দেওয়া কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। অল্পদিন হইল মফস্বলে দুইটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হইয়াছে,—একটী বাসেরহাটে, অপরটী ফরিদপুরে। এই দুইটী কলেজই স্বাধীনভাবে পরিচালিত হইবে। পাবনা ও রঙ্গপুর কলেজও এইভাবে চলিতেছে। যদি হাবড়া, যশোহর, দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শীদাবাদ, কাঁথী, কুষ্টিয়া বালুরঘাট, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গোয়ালন্দ, সিউড়ি, প্রভৃতি স্থানে এই প্রকার কলেজ স্থাপিত হয়, তাহা হইলে ছাত্রদিগকে এমন করিয়া কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের কলেজসমূহে ভিড় করিয়া অবশেষে শুষ্ক মুখে ঘরে ফিরিয়া যাইতে হয় না। আমরা উপরে যে সকল স্থানের কথা বলিলাম, একটু চেষ্টা করিলেই সেই সকল স্থানে অনায়াসে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ আপাততঃ স্থাপিত হইতে পারে।

বিগত বৈশাখ মাসের 'ভারতবর্ষে' 'বেত্রাপাশনী' নামে একটী ছোট গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখকের নাম শ্রীহরপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। আমরা লেখক মহাশয়কে চিনি না। তাঁহার গল্পটী মনোনীত হওয়ায় আমরা বৈশাখ মাসের কাগজে ছাপি। সম্প্রতি আমাদের বন্ধুবর সুলেখক শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায় মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, ঐ গল্পটী অনেকদিন পূর্ব্বে 'নির্ম্মাল্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং গল্পটী শ্রীযুক্ত সরোজবাবুর রচিত। এই সংবাদ পাওয়ার পর আমরা 'নির্ম্মাল্য' পত্রের ফাইল দেখিয়া সত্য সত্যই বিস্মিত হইলাম। তাহাতে গল্পটীর নাম 'ঊষাদিনী' আছে। হরপ্রসন্ন বাবুও গল্পের নাম 'ঊষাদিনী' লিখিয়াই আমাদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন; আমরাই ঐ নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'বেত্রাপাশনী' নামকরণ করি। এমন করিয়া পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া যে কি লাভ হয়, তাহা ত আমরা বুঝি না! বহুদিন পূর্ব্বে কোন পত্রিকায় কোন গল্প বা কবিতা প্রকাশিত হইয়া থাকিলে, তাহা মনে করিয়া রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে; সুতরাং লেখকগণ যে বলিয়িত গল্প বা কবিতাই প্রেরণ করিয়াছেন, ইহাই আমরা মনে করিয়া লই। বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে যদি এমন কাণ্ড হইতে থাকে, তাহা হইলে ত বড়ই মুস্কিলের কথা। পরের লেখা বেমালুম আত্মসাৎ করিয়া লেখক বলিয়া পরিচিত হইবার এ বাসনা যে কেন লোকের মনে হয়, তাহা ত বুঝিতে পারি না।

ফরিদার লর্ড মিণ্টো দ্বিতীয় নিকোলাসের অপঘাত-মৃত্যু ঘটিল। আততায়ীর রিভলভারের গুলিতে তাঁহাকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। ফ্রান্সে এবং ইংলণ্ডে একবার করিয়া রাজ-রক্তপাত হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডরাজ দ্বিতীয় চার্লস ও ফ্রান্সরাজ ষোড়শ লুইয়ের হত্যার সময়ে যা' হোক একটা করিয়া বিচার হইয়াছিল; কিন্তু রুষ সম্রাটের বেলা তাও নয়। শুনা যায়, ইনি লোক মন্দ ছিলেন না; প্রজাবর্গের প্রতি একেবারে স্নেহশূন্য ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের রহস্যাবৃত-লক্ষিত পুঞ্জীভূত অত্যাচার-জনিত পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত উত্তরাধিকার-সূত্রে তাঁহাকেই করিতে হইল। অন্ধ পৃথিবীর অবিচারের পরিণাম এই!

সহযোগী নীহার লিখিয়াছেন,—"হাসি সহরের হাটে বাজারে আজ-কাল স্বদেশী মুচীরা তাহাদের হাতে প্রস্তুত চটি, বুট অনেক জুতারই আমদানী করিতেছে, এমন কি সহরে লোকের বাড়ীতে-বাড়ীতে বিক্রয় করও লইয়া আসিতেছে। এই জুতায় চর্ব্বিরঞ্জন ও পালিশ আদি সবই উহারা স্বহস্তে করিয়াছে। এই জুতা সস্তা দরে বিক্রয় হওয়ায় অনেকের সুবিধা হইয়াছে। চটির জোড়া ।৵০ আনা হইতে ৸০ আনা, বুটের জোড়া ১৲ টাকা হইতে ১৷৹ দরে বিক্রীত হইতেছে। বর্ত্তমান জুতার যে রকম বাড়িয়াছে, তাহাতে এই জুতা ব্যবহার করিয়া দেশীয় মুচীদের উৎসাহিত করা সকলের উচিত। এখন আনাজের ব্যবস্থার অভাব আমরা ঠেলেই নিবারণের উপায় না করিলে আমাদের আর গত্যন্তর নাই।" কথাটা ঠিক; আমরাও রাজী আছি। কিন্তু হিন্দু হইয়া গো হত্যা পাপের ভাগ লইতে পারিব না। কারণ, এই 'নীহারেই' এবং 'মেদিনীবান্ধব' 'মেদিনীপুর হিতৈষী' প্রভৃতি সংবাদ-পত্রেই পাঠ করা যায় যে, বঙ্গের অন্য সকল স্থান অপেক্ষা মেদিনীপুর জেলাতেই বিষ-প্রয়োগে গোহত্যার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক এবং চামড়ার লোভে, মুচিরাই বিষ-প্রয়োগে গো-বধ করিয়া থাকে। "মুচীদের উৎসাহিত" করিতে গেলে বিষ-প্রয়োগে গো হত্যার পরিমাণ আবার বাড়িয়া যাইবে না ত?

পূর্ব্বে আমরা অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির কথাই আলোচনা করিয়াছি; এক্ষণে, এই একই সংখ্যার জলাভাবে হাহাকারের সংবাদও পাঠকদের শুনাইতে হইল। সহযোগী "নীহার" লিখিয়াছেন,—"জলাভাবে হাহাকার,—আষাঢ়ের শেষভাগ হইতে বৃষ্টি একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু এমন গরম পড়িয়াছে যে, শ্রাবণ মাসে এরূপ গরম পড়িতে দেখা যায় নাই। কৃষিকর্ম্মের দিন হইতেই এখানে এরূপ দুঃসহ গরম পড়িয়াছে। এই গরমে দিনে রাত্রে তিষ্ঠান দায় হইয়াছে। কয়েক দিন এখানে তাপমান যন্ত্রে পারদ প্রায় ১০০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। গত ১৮৮৭ সালে একবার এখানে ঐরূপ তাপ-বৃদ্ধি হইয়াছিল। তদবধি আর কখনও এখানে এমন গরম পড়িতে দেখা যায় নাই। আষাঢ়ের প্রথম হইতে যেরূপ বৃষ্টি নামিয়াছিল, সেইরূপ বৃষ্টি হইতে থাকিলে এতদিনে লোকে আবাদের কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিত। কিন্তু বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় চাষের

কাজ ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অধিকন্তু ধান্য-চারাসমূহ,—শুধু ধান্য-চারা কেন—আলু বেগুন, কচু পাট, শন আদি ফসলও প্রচণ্ড রৌদ্রে ঝলসিয়া-পুড়িয়া নষ্ট হইতেছে। সুন্দরবন এবং বাদেরের প্রভৃতি স্থানেও জলাভাবে ধান্যচারাগুলি ঝলসিয়া-পুড়িয়া যাওয়ায় কৃষকদের মধ্যে হাহাকার উঠিয়াছে। উড়িষ্যার বালেশ্বর, কটক পুরী প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টির অভাবে চাষের মালুম ও গবাদির খাদ্য জলকষ্ট উপস্থিত হইবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কেমন আমাদের সৌভাগ্যের ভরা পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে না কি?

বাঙ্গালার জন্য সরকারের যে একটী মৎস্য-বিভাগ আছে, প্রতি বৎসর জুন মাসের শেষে তাহার একটী রিপোর্ট বাহির হয়। তাহাতে ঐ বিভাগের এক বৎসরের কার্য-বিবরণ জানা যায়। এবার রিপোর্টের দিন আগাইয়া দেওয়া হইয়াছে; অর্থাৎ ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত নয় মাসের রিপোর্ট বাহির করা হইয়াছে। ইহার কারণ ৩০এ জুন তারিখটী fishery seasonএর মাঝখানে পড়ে। যাহা হউক, এবার নয় মাসের রিপোর্ট বাহির হইল বটে, আগামী বছর হইতে পূরা বছরের রিপোর্টই বাহির হইবে।

সরকারী মৎস্য-বিভাগ কয়েক বৎসর যাবৎ ইলিশ-ডিম্ব নির্দ্ধারণে নিযুক্ত আছেন, বাদুষের একারের মধ্যে ইলিশ মাছের চাষ করা সম্ভবপর কি না, তাহারই অনুসন্ধান করিতেছেন। কিন্তু এখনও কৃতকার্য্য হন নাই। তা' ছাড়া, মৎস্য-বিভাগ বিশুদ্ধ 'পোনা' সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রিপোর্টে দেখা যায়, আলোচ্য সময়ে অর্থাৎ ঐ নয় মাসের মধ্যে কলিকাতায় ৩০১২৫৩ মণ মাছ আমদানী হইয়াছিল। তৎপূর্ব্ব বৎসর আমদানীর পরিমাণ ৩১৭১৪৭ মণ। মৎস্য-বিভাগ আর একটী কাজে হাত দিয়াছেন, অর্থাৎ জেলেদের মধ্যে-কো অপারেটিভ সোসাইটী স্থাপন করিতেছেন। গত বৎসর পাবনা জেলায় তিনটী নূতন সোসাইটী স্থাপিত হইয়াছে এবং সোসাইটীসমূহের মোট সংখ্যা ১৫ দাঁড়াইয়াছে।

সরকারের অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নাই। মৎস্য-বিভাগ নামে একটী স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে; তাহার ডাইরেক্টার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, অন্যান্য লোকজন এবং পরীক্ষাকেন্দ্র এ সবই আছে। মাছের আমদানীও প্রতি বৎসর বাড়িতেছে। অথচ আমাদিগকে চৌদ্দআনা সের ঘরে যায় কিনিয়া খাইতে হইতেছে! লীলাময়ের এ কি লীলা, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যার-তার থেকে বাঙ্গালী আমরা —দুই টাকা মণ ঘরে চাউল এবং ছেড়আনা বা ঐ আনা সের ঘরে মাছ কিনিতে পাইলে আর আমরা কিছুই চাই না। মৎস্য-বিভাগের চেষ্টায় বাঙ্গালীর এই সাধ কোন কালে মিটিবার আশা আছে কি?

গত ২৯শে জুলাই ঢাকা নগরে ঢাকা জেলার পঞ্চায়েত সমূহের প্রেসিডেণ্টগণ এবং ইউনিয়ন-কমিটিসকলের চেয়ারম্যানবৃন্দের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে প্রথমে ঢাকার গবর্ণমেণ্ট-কার্ম্মে লইয়া গিয়া তাহার কার্য্যপ্রণালী সমস্ত দেখাইয়া দেওয়া হয়। তথায় কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা হয়। সভায় একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়া স্থির হয় যে, প্রত্যেক গ্রামে "কচুরী" লতা হইতে ছাই প্রস্তুত করিয়া পাটের সার রূপে উহা অন্ততঃ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে। পরে গ্রাম্য-শাসনসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারও সভার আলোচ্য বিষয় ছিল। তাহা ছাড়া, গ্রাম্য শিল্প এবং বাঙ্গালী পল্টনে সৈন্য শ্রেণীর কথারও আলোচনা হইয়াছিল। বেলা ৪টার সময় লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুর সভায় আসেন। তিনি প্রথমে উপযুক্ত প্রেসিডেণ্ট ও চেয়ারম্যানগণকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করেন। একজন প্রেসিডেণ্ট একটী ষ্ট্রীচলোডিং বন্দুক উপহার পাইয়াছেন। অনন্তর লর্ড রোণাল্ডশে একটী বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি ইউনিয়ন কমিটীসমূহের কার্য্য-প্রণালীর প্রশংসা করেন। গবর্ণর বাহাদুর অতঃপর বলেন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত যে আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছে, পঞ্চায়েত প্রেসিডেণ্ট ও ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যানদের জন্য তিনি বাঙ্গালায় তাহার অনুবাদ করাইয়াছেন। ইহাতে সকলেই উহার আলোচনার সুযোগ পাইয়াছেন। ইহার পর লাটবাহাদুর সৈন্য সংগ্রহে সাহায্যের জন্য পঞ্চায়েত প্রেসিডেণ্টগণের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন, এবং ঢাকায় একটী রেজিমেণ্ট গঠনের কল্পনার সাফল্য কামনা করেন।

লুপ্ত-রত্ন

[শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ রায়]

স্বর্গীয় ঠাকুরদাস বাবু একবার বলিয়াছিলেন,—"কাপির অভাবে অনর্থক আপনাদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি না করিয়া, কুলেখকের কদর্য্য রুচি ও জঘন্য রচনা না ছাপাইয়া, বরং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, নাটক, নভেল—নিদেন পাঁচালী, পীরের গান ছেপে দেওয়াই শ্রেয়। তাহাতে পুরাতন গ্রাহক রক্ষা ও নূতন গ্রাহকও কিছু কিছু আমদানী হইতে পারে।" —এ কথা কয়টি নিতান্ত হাসিয়া উড়াইবার নহে। আমাদের সাহিত্যের পুরাতন ও লুপ্তপ্রায় রত্নগুলি মাসিকপত্রে পুনরায় ছাপাইতে পারিলে নূতন গ্রাহকের আমদানী হয় কি না, জানি না, তবে তাহাতে পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব যে বৃদ্ধি পায়, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। সেকালের এমন লেখা অনেক আছে, যাহা আধুনিক পাঠকের সম্মুখে ধরিতে পারিলে পাঠক তাহাতে শুধু পরিতৃপ্ত হইবেন, এমন নহে;—সে সকল লেখা অনেক পাঠকের নিকট নূতন বলিয়াও মনে হইবে, এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।—এই বিশ্বাসে 'ভারতবর্ষের' পাঠকবর্গের জন্য আমরা এই 'লুপ্ত-রত্ন' নামক অধ্যায়ের ব্যবস্থা করিলাম। মাসে-মাসে 'ভারতবর্ষে' ইহা প্রকাশিত হইবে।

নিধুবাবুর গান

নিম্নে যে কয়টি গান আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা অধুনা-লুপ্ত নিধুবাবুর গানের পুস্তকেও নাই। নিধুবাবুর নামে উহা গায়কের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে।—

(১)

পিরীতি কি হয় লো সখি
পরের কথায় ভর করিলে!
মণি কোথা পাওয়া যায় সই
ফণির শিরে হাত না দিলে!
কত লোকে কত বলে, কত কথা কত ছলে,
প্রেম সুখে হয় সে সুখী কলঙ্ক ভূষণ করিলে॥

(২)

যতন করিতে তারে বাকি কি রেখেছি আমি।
আপন করম-দোষে সে হলো বিপথগামী॥
সে যে আমার প্রিয়জন, মন জানে, প্রাণ জানে,
আর জানে সেই জন—যে জন অন্তরযামী॥

(৩)

যে মনেতে মন নিলে, সে মন তোমার
গেল কোথা?
আসিতে-যাইতে তখন কোরে কত ছুতা-নতা।
কলঙ্ক-গুরু-গঞ্জনা, ঘরে-পরে কি লাঞ্ছনা॥
ডুমুরের ফুল হোলে এখন দেখা পাওয়া
কঠিন কথা॥

(৪)

ভালবেসে ভাল কাঁদালে, ভাল ভালবাসা জানালে!
তুমি যে পরেরি সোনা, আগে ত ছিল না জানা,—
জান্‌তাম যদি পরের সোনা, পরিতাম না কর্ণমূলে।
তুমি যে পরেরি চিত, পাষাণেতে নিরমিত,
দিলে সাজা অনুচিত—পরাণ সঁপেছি বলে॥

(৫)

প্রেম-সাগরে উজান ব'য়ে
সই লো আমার যাওয়া হ'লো না।
আসার আশে দিন ফুরাল—
পাড়ি তো কৈ জমিল না।
না পারি কূলে ফিরিতে, না পারি পারে যাইতে,
পড়ে প্রেমের একটানাতে কোথা যাই
তার নাই ঠিকানা॥

(৬)

অনেকেরই প্রাণ তুমি প্রাণ,—দেখো রেখো মান!
তোমারও লাগিয়ে কুল-শীল তেজিয়ে তোমাতে
সঁপেছি প্রাণ।

লাজ ভয় তেয়াগিব, তব প্রেমে মজিব,
তুমি আমার মান-অপমান, —দেখো রেখো মান!

(৭)

প্রেম কোরে প্রাণ সখি, আমি পড়েছি বিষম দায়।
পরেরে আপন কোরে এখন আপনারি প্রাণ যায়।
গেল কুল-শীল-মান, সঁপে তারে মন-প্রাণ,
ওগো এত করে অপমান—তবু তারে প্রাণ চায়।

[কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেনের এবং ৺আজু গোঁসাঞীর পরস্পর কাব্য-কৌতুক।]

কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন বিদ্যাসুন্দর, কালীকীর্ত্তন ও পদাবলীর প্রভাবে অনেকের নিকট পরিচিত রহিয়াছেন, এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়েরাও উক্তোপায়ে তাঁহার পরিচয় লাভে অসমর্থ হইবেন না। কিন্তু উক্ত কবির সমকালজাত ৺আজু-গোঁসাঞীর রচিত কোন কাব্য কি পদাবলীর অভাবে তদীয় কবিত্বশক্তির পরিচয়, অধুনা যেরূপ বিরল, বোধ হয় ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাঁহার নাম গন্ধও জানিতে পারিবেন না। অতএব অবিশেষজ্ঞ-পাঠকগণের জ্ঞাপনার্থ প্রথমতঃ ৺আজুগোসাঞীর পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। ইনি কবিরঞ্জনের সমকালজাত একব্যক্তি; কোন্ জাতীয়, কাহার পুত্র, কি ব্যবসায়ী, তাহার কিছুমাত্র প্রকাশ নাই। এইমাত্র জানা যায় যে, ইনি একজন বৈষ্ণবধর্ম্মালম্বী ছিলেন। নবদ্বীপাধিপতি কবিবন্ধু কাব্যপ্রিয় ৺কৃষ্ণচন্দ্র রায় যে সময় কুমারহট্টে বায়ু-সেবনার্থ সমাগত হইতেন, সেই সময় প্রোক্ত রাজকর্ত্তৃক উপাধি এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন তাঁহার সমীপস্থ থাকিয়া নিয়ত কাব্যের আলোচনা এবং নব-নব পদাবলীদ্বারা তাঁহাকে প্রীত করিতেন। এই সময় ৺আজুগোসাঞী নবদ্বীপাধিপতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কবিরঞ্জনের সহিত মিলিত হইতেন। ইহাতে বোধ হয় গোসাঞী কুমারহট্টেই বসবাস করিতেন।

কথিত আছে, গোসাঞীর কিঞ্চিৎ উন্মত্ত-ভাব ছিল। কিন্তু উপস্থিত রচনাবিষয়ে ইহার যেরূপ অসামান্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে, গোসাঞীর উন্মত্ততা প্রতিপন্ন হয় না। কবিরঞ্জন রাজসদনে যে সকল ভাবের পদাবলী গান করিতেন, ৺আজু গোসাঞী প্রায়ই সেই সকল সংগীতের উপর লক্ষ্য করিয়া পরিহাসচ্ছলে কবিতা রচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ মহারাজকে উপহার দিতেন। কবিরঞ্জন শাক্ত, গোসাঞী বৈষ্ণব, তদ্বশতঃ পরস্পর পরস্পরকে ব্যঙ্গ করিতে ত্রুটি করিতেন না। কবিরঞ্জন যে সকল কবিতাদ্বারা গোসাঞীকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, এবং গোসাঞী কবিরঞ্জনের পদাবলীর উপর পরিহাস পূর্ব্বক যে সকল কবিতা উপস্থিত রচনা করতঃ আশু কবিত্বশক্তির অনন্যসুলভ পরিচয় দিয়াছেন, সেইগুলি সঙ্কলন করা যাইতেছে। কিন্তু সেইগুলি বঙ্গীয়সাহিত্য অনুশীলনকারী কাব্যামোদি পাঠকবর্গের তাদৃশ প্রীতিকর না হইয়া ক্ষোভের কারণ হইবে, যেহেতু উহা এত অল্প যে, সেগুলি পাঠ দ্বারা অর্দ্ধদণ্ড কালও অবকাশরঞ্জন করা যায় না। এই নিমিত্ত প্রোক্ত কবিদ্বয়ের ব্যঙ্গবাক্য বিন্যাসগুলির সহিত, আমাদিগের রচিত কতকগুলি ব্যঙ্গবাক্য মিশাল দেওয়া গেল। যেমন অমিশ্র সুবর্ণ অলঙ্কার প্রভৃতি গঠনে সম্যক উপযোগী হয় না বলিয়া বঙ্গীয়সমাজ তাহাতে কখন কখন তাম্রাদি ইতরধাতুর মিশাল দিয়া ব্যবহার উপযোগী করিয়া লইয়া থাকেন, বিখ্যাত প্রোক্ত কবিদ্বয়ের রচনার সহিত আমাদিগের রচনার মিশ্রণ দিয়া, তদ্রূপ পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইল মাত্র। পাঠকগণ পাঠমাত্র আমাদিগের রচনা বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই, তথাচ সে গুলির নিম্নে (স) এই চিহ্ন দেওয়া হইল। এই চিহ্নে চিহ্নিত রহস্যগুলির দোষগুণ সম্বন্ধে আমরাই দায়ী, প্রোক্ত কবিদ্বয়ের তদ্বিষয়ে কোন সংস্রব নাই। অবশিষ্টগুলির ৺প্রসাদ এবং ৺গোসাঞী কবির রচিত বলিয়া প্রবাদিত।

আমাদিগের এই স্বেচ্ছাচার দ্বারা অপরাধ উৎপন্ন হইলে, অনুগ্রাহক গ্রাহক এবং পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

কবিরঞ্জন।

এই সংসার ধোঁকার টাটি,
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি॥
ওরে ক্ষিতি, বহ্নি, বায়ু, জল, শূন্যে, অতি পরিপাটি॥
প্রথমে প্রকৃতি ভূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটী।
যেমন শরার জলে সূর্য্যছায়া, অভাবেতে স্বভাব মিটি॥

গর্ভে যখন, যোগ তখন, ভূমে পোড়ে খেলেম মাটী।
ওরে, ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, দড়ীর বেড়ী কি সে কাটি॥
রমণীবচনে সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে ইচ্ছাসুখে পান কোরে, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে আদি পুরুষের আদি মেয়েটি।
ওমা, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, মা তুমি পাষাণের বেটী॥

আজুগোঁসাই।—

এই সংসার রসের কুটি।
খাই দাই রাজকুমে বসে মজা লুটি॥
ওহে সেন! নাহি জ্ঞান, বুঝ তুমি মোটামুটি।
ওরে ভাই, বন্ধু, দারা, সুত পিঁড়ি পেতে দুধের বাটি।

কবিরঞ্জন।—

এ সংসারে তোমার সুখের কুটি,
ত দিন বটে, যদিন সমন, এসে নাহি ধরে ঝুঁটি।
ওহে গোসাঞি, সার জ্ঞান নাই,
মিছে কর খুঁটো খুঁটি।
ভাইবন্ধু দারা সুত, কোথায় বুজলে নয়ন দুটি?

১ (স)

কবিরঞ্জন—

আয়, মন! বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরুতলে রে, চারিফল কুড়ায়ে খাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র তত্ত্বকথা তায় সুধাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয় ধৈর্য্য খুঁটা ধোরে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে হোতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধজ্ঞান-সিন্ধু-মাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হলে কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মতন্ মন হবি।

আজুগোঁসাই।—

বোলেছে রামপ্রসাদ কবি
আয়, মন! বেড়াতে যাবি,
তার কথায় কোথাও যেওনা রে!
সাধকের মনের ভাব সে কি জানে রে? ২

কবিরঞ্জন।—

শ্যামা ভাব-সাগরে ডোব না রে মন!
কেন আর বেড়াও ভেসে?—"

আজুগোঁসাই।—

একে তোমার কোকো নাড়ী,
ডুব দিও না বাড়াবাড়ি,
হলে পরে জ্বর আরি,
যেতে হবে যমের বাড়ী। ৩

কবিরঞ্জন 'কালীকীর্ত্তনে' বর্ণন করেন—

'গিরীশগৃহিণী, গৌরী গোপবধূ-বেশ,
কবিতকাঞ্চনকান্তি, প্রথমবয়স॥
সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে শুনি মার বেণু॥

আজুগোঁসাই—

না জানে পরমতত্ত্ব, কাঁটালের আমসত্ত্ব,
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে!
তা যদি হইত, যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায় রে? ৪

কবিরঞ্জন।—

কর্ম্মের ঘাট, তেলের কাইট, আর গাগলের ছাট,
মোলেও যায় না।

আজুগোঁসাই।—

কর্ম্ম-ভোর, স্বভাব-চোর, আর মদের ঘোর, মোলেও যায় না। ৫

কবিরঞ্জন একদা নবদ্বীপাধিপতির নিকট এই পদ গান করিয়াছিলেন—

"আমায় দেও মা তবিলদারী,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি।
পদরত্নভাণ্ডার সবাই লুটে ইহা আমি সইতে নারি॥

তাঁহার লিখা আছে যার, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা তবু লিখা রাখ তাঁরি॥
অর্দ্ধ-অঙ্গ জায়গির্ তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনার চাকর্ কেবল্ চরণ-ধূলার অধিকারী॥

যদি তোমার বাপের ধরা ধর তোমার তবে বটে আমি হারি। যদি আমার বাপের ধরা ধর, তবে মা পেতে পারি।

প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ওপদের মত পদ পাইতো সে পদ লোয়ে বিপদ সাধি॥

গোসাঞী এই ভাবের প্রতি অবজ্ঞা পূর্ব্বক বিদ্রূপ করতঃ যে পদ রচনা করিয়া শুনাইয়াছিলেন, তাহা এই—

কেনে চাস্ ভাই তবিল্দারী?
ওকাজে আছে ঝুঁকি ভারি।
দুদিনকার মুহরী হয়ে তাইতে এত বাড়াবাড়ি?
পেলে তবিল, ভাঙ্গতে একদিন, তোমার আর সবে না দেরি।
পদ রত্নভাণ্ডার সবাই লোটে তাইতে কেন হিংসে আড়ি?
"দাতা যে বিলাচ্ছে সে ধন, পেট ফুলে মরে ভাঁড়ারি॥"
কর্ম্ম অনুসারে পদ হামার সরকার সুবিচারী।
বাপ দাদার নজির এখানে, হবে না হে কার্য্যকারী॥

হেথা যে যেমন লায়েক, সেই মোতাবেক পদের বিচার হয় হে ভারি। তোমার যেমন কর্ম্ম, তেমন কর্ম্ম, পদ পেলে কর্ম্ম অনুসারী॥

অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর আর, সাধে কি শিবের মাইনে ভারি? সে সকল ছেড়ে ঐ পদে যে, বিকিয়েছে হয়ে ভিকারী। আগে, বিনা মাইনে কাজ শেখে সবাই, হয়ে পদের আশাধারী। যদি পদ পেতে চাও, কর্ম্ম শেখ, শেষে হবে মাইনে ভারি।

(স)

কবিরঞ্জন একদা এইপদ গান করেন—

মনরে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়াপাখী হও, করি স্তুতি॥
অবু তবু গিরিসুতা, পড়লে শুনলে ছুটি ভাতি।
ওরে জান না কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি॥
কালী কালী, কালী পড় মন, কালীপদে রাখ প্রীতি।
ওরে, পড় বারা আত্মারাম, আত্মজনার কর গতি॥
উড়ে উড়ে, বেড়ে বেড়ে, বেড়ায়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে, গাছের ফলে, কদিন চলে, কর্ রে চারফলের স্থিতি॥
রামপ্রসাদ বলে, ফলগাছে, ফল্ পাবি মন শোন যুকতি।
ওরে, বোসে মূলে, কালী বোলে, নাড়া দে নিতি নিতি॥

আছুগোঁসাই বাঙ্গ করিয়া এই পদ শুনান—

প্রসাদ করো স্তুতি নতি যতনে পড়াচ্ছো কাকে?
বিনে গুরু সালিখ কি কালী কৃষ্ণ পড়ালে পর পড়ে কাকে?

তোমার মন এখনো কাক রয়েছে, সেই স্বভাব তার কর্ম্মপাকে। তুমি বল, পোড়্তে আত্মারাম, সে স্বভাবে কা কা হাঁকে।

ওহে চোরেথেকো পাখীকে কেউ যদিও পিঞ্জরে রাখে। তাতে, তার মন্ ভোলে না, পোষ মানে না, খাঁচার কাটী কাট্তে থাকে।

ওহে গুরুর প্রকৃতি কখন্ বল্লেই কি তা ধরে কাকে? পিটলে পড়ে গাধা কখন, ঘোড়া কি হে হয়ে থাকে?

(মিত্র প্রকাশ, ১সংখ্যা, ১২৭৭ সাল।)

ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ কবি স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয় মিত্র-প্রকাশের সম্পাদক ছিলেন। এ মাসিকপত্রখানি এখন দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতার বহু লাইব্রেরী অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু ইহার দর্শন পাই নাই। ভাগ্যক্রমে সম্প্রতি দুই-তিন সংখ্যার মিত্র-প্রকাশ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

বেশ করেছো

তাল—কাহারবা।

রাজা। কালিচরণ ক'র্ত্ত বড় বীরত্বেরই বড়াই,
পারিষদবর্গ। বুঝি গাঁজায় দিয়ে দম—
রাজা। দেখ্‌লে সে দিন আমার সঙ্গে ক'র্ত্তে এল লড়াই;
পারিষদবর্গ। বেটার আস্পর্দ্ধা নয় কম।
রাজা। আমি বল্লাম তবে রে বেটা, আয় না দেখি
তবে রে বেটা
—পরে যখন ধ'রে আমায় ক'রে দিল ছুতোপেটা;
দেখ্‌লাম, বেটা আমার হাতে মরে বুঝি এবার
যোগাড় ক'রেও তুলেছিলাম দুই এক ঘা সেবার।
বেটা ত সে খোঁজ রাখে না,
রাগ্‌লে আমার জ্ঞান থাকে না,
কিন্তু রাগটা সাম্‌লে গেলাম অনেক কষ্টে সেবার।
পারিষদবর্গ। বেশ ক'রেছো, বেশ ক'রেছো, নহিলে অন্ততঃ
একটা খুন খারাপি হ'ত, একটা খুন খারাপি হ'ত।
রাজা। কেদার বেটা সাধু ব'লে সহরে চাক সেটায়,
পারিষদবর্গ। হেঁ হেঁ বেটা আদত চোর।
রাজা। নিইছিলাম তার হাজার টাকা চাইতে এল সেটায়;
পারিষদবর্গ। বেটা বোধ হয় গুলিখোর।
রাজা। আমি বল্লাম তবে রে বেটা, আয় না দেখি
তবে রে বেটা;
কে কে কে তোর টাকা জানে,
তো তো তো তোর সাক্ষী কেটা?
কর না গিয়ে মকর্দ্দমা - I do not care a feather.
মুখখানি ত চুণটি ক'রে ফিরে গেল কেদার।
টাকা নিয়ে ক'র্ব্বে সে কি? টাকাগুলো সব দেবে কি
গাঁজা গুলি খেয়ে, বেটা উড়িয়ে দেবে কেদার?
পারিষদবর্গ। বেশ ক'রেছো, বেশ ক'রেছো,
সে টাকা নিশ্চিত,
বেটা সব উড়িয়ে দিত, বেটা সব উড়িয়ে দিত।
রাজা। নিত্যানন্দ, বিদ্বান্ ব'লে কর্ত্তে চায় সে প্রমাণ;
পারিষদবর্গ। সে কি আবার একটা লোক!
রাজা। ক'র্ত্তে এল তর্ক সে দিন আমার সঙ্গে সমান,
পারিষদবর্গ। বেটা নিরেট আহাম্মক।
রাজা। আমি বল্লাম তবে রে বেটা, আয় না দেখি
তবে রে বেটা,
আমি একটা philosopher, গাধা গুরোর জানিস্ সেটা,
ব'লে দু'ঘা পীঠে লাঠি বসিয়ে দিলাম চটাং,
লাঠি খেয়ে প'ড়ে গেল বেটা ত চিৎপটাং।
আমার সঙ্গে সে পারে কি,
তর্কের বেটা ধার ধারে কি,
তখন তর্কে হার মেনে সে পালিয়ে গেল সটাং।
পারিষদবর্গ। বেশ ক'রেছো, বেশ ক'রেছো, তর্কেতে বস্তুত
সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো, সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো।

স্বরলিপি

কথা ও সুর—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়] [স্বরলিপি—শ্রীদীলিপকুমার রায়, বি-এস্‌সি

সা রা সা রা সা রা সা রা গা পা গা রা মা গা
কা লি চ রণ্ ক র্ত্ত ব ড় বী র ত্বের ই ব ড়াই
কে দার্ বে টা সা ধু ব লে স হ রে চাক্ পে টায়্
নি ত্যা ন ন্দ বি দ্যান্ ব লে ক র্ত্তে চায়্ সে প্র মাণ্

সা সা সা সা রা গা রা -া সা সা সা সা রা গা রা -া -া -া
বু ঝি গাঁ জায়্ দি য়ে দ ম্ বু ঝি গাঁ জায়্ দি য়ে দ ম্
বে টার্ আ স্প র্দ্ধা নয়্ ক ম্ বে টার আ স্প র্দ্ধা নয়্ ক ম্
হেঁ হেঁ বে টা আ দহ্ চো র্ হেঁ হেঁ বে টা আ দহ্ চো র্
বে টা বোধ্ হয়্ গু লি খো র্ বে টা বোধ্ হয়্ গু লি খো র্
সে কি আ বার্ এক্ টা লো ক্ সে কি আ বার্ এক্ টা লো ক্
বে টা নি রেট্ আ হা ম্ম ক্ বে টা নি রেট্ আ হা ম্ম ক্

সা সা সা সা না না ধা পা না না ধা ধা পা পা
দেখ্ লে সে দিন্ আ মার্ স ঙ্গে ক র্ত্তে এ ল ল ড়াই
নিই ছি লাম্ তার্ হা তার্ টা কা চাই তে এ ল সে টায়্
ক র্ত্তে এ ল ত র্ক সে দিন্ আ মার্ স ঙ্গে স মান্

সা সা সা সা ধ্সা সা সা সা সা সা সা সা ধ্সা সা সা সা
আ মি ব লাম্ তবে রে বে টা আয়্ না দে খি তবে রে বে টা
" " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " "

গা গা গা গা গা গা মা গা রা রা গা মা পা পা পা পা
প রে ষ খন ধ রে আ ন্‌য়্ ক' রে দি ল জু তো পে টা
কে কে কে তোর্ টা কা জা নে তো তো তো তোর্ সা ক্ষী কে টা
আ মি এক্ টা কি ল জ ক্কার্ গা ধা শু তোর্ জা নিস্ সে টা

+ . + .
সা সা সা সা না না ধা পা না না ধা পা মা মা -। -।
দেখ্ লাম্ বে টা আ মার্ হা তে ম রে বু ঝি এ বার্ ·
কর্ না গি য়ে ম ক র্দ্দ মা আই ডোন্ ট্ কেয়া রে কে দার্ ·
ব' লে দু ঘা পি ঠে লা ঠি বসি য়ে দি লাম্ চ টাং

+ . + .
গা গা গা মগা রা রা পা পা গা রা গা মা গা রা -। -।
যো গাড়্ ক রেও তু লে ছি লাম্ দুই এ ক্ ঘা দে বার্ ·
মুখ্ খা নি ত চুণ্ টি ক রে কি রে গে ল কে দার্
লা ঠি খে য়ে বে টা প ড়ে গে ল ত চিৎ প টাং ·

+ . + . .
ধ্া ধ্সা সা সা সা সা সা সা ধ্া সা সা রা রা রা রা রা
বে টা তো সে খোঁজ্ রা খে না রাগ্ লে আ মার্ জ্ঞান্ খা কে না
টা কা নি য়ে ক র্ব্বে সে কি টা কা গু লো সব্ শে ষে কি
আ মার্ স ঙ্গে সে পা রে কি ত র্কের বে টা ধার্ ধা রে কি

+ . + . .
সা সা ধা ধা পা পা গা পা গা রা গা মা গা রা -। -।
কি স্তু রাগ্ টা সাম্ লে গে লাম্ অ নেক্ ক ষ্টে সে বার্
গাঁ জ্ঞা গু লি খে য়ে বে টা উ ড়িয়ে দে বে দে দার্
ত খন্ ত র্কে হার্ মে নে সে পা লিয়ে গে ল স টাং

+ . + . .
সা সা সা সা সা সা সা সা ধ্া সা সা রা রা রা -। -।
বেশ্ ক রে ছো বেশ্ ক রে ছো ন হি লে অ স্তু তঃ এক্ টা
" " " " " " " " সে টা কা নি শ্চি ত বে টা
" " " " " " " " ত র্কে তে ব স্তু তঃ সে রা

+ . + . .
সা সা ধা ধা পা পা গা পা গা রা গা মা গা রা -। -।
খুন্ খা রা পি হ' ত এক্ টা খুন্ খা রা পি হ' ত
সব্ উ ড়ি য়ে দি ত বে টা সব্ উ ড়ি য়ে দি ত
প্র মাণ্ লা ঠির্ গুঁ তো সে রা প্র মাণ্ লা ঠির্ গুঁ তো

"এই বেলা নে ঘর ছেয়ে"

[শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা]

নব্য-বঙ্গে শিক্ষিত সমাজে, কে এমন কবি আছেন, যিনি এমন সহজ কথায়, এমন গভীর ভাবপূর্ণ প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত লিখিতে পারেন ?

গানটীর যতটুকু মনে আছে, তাহা এই,—

(তোলা মন) এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।
এবারে বর্ষা বড়, যোগাড় কর,
লাগ্ রে আদা-জল খেয়ে।
সমুখে আস্‌ছে শ্রাবণ,
সময় থাক্‌তে যোগাড় হলো না,
যখন, আস্‌বে বট্‌কা, উড়্‌বে মট্‌কা,
তখন, ভিজে মর্‌বি অঝোরে।

গো-মূর্খ হইতে সুপণ্ডিত, দরিদ্র হইতে রাজা-মহারাজা, —এই সঙ্গীতে কাহার মন না বিমুগ্ধ হয় ? কাহাকে চঞ্চল করিয়া না তোলে ? কোন্ তোলা মনকে সজাগ না করে ? কোন্ আত্ম-বিস্মৃতের চমক ভাঙ্গিয়া না দেয় ? কি সহজ কথা, কি সরল কথা, কি কঠিন কথা ! কি জটিল কথা !

গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান বলদের ল্যাজ মোচ্‌ড়াইতে-মোচ্‌ড়াইতে গাহিতেছে, "এই বেলা নে ঘর ছে'য়ে।" ডিঙ্গি নৌকায় মাঝি উজান ঠেলিয়া বৈঠা টানিতে-টানিতে গাহিতেছে, "এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।" এই মন্ত্র, আকাশে বাতাসে ভর করিয়া পল্লীবালীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া, তাহাদের কাণের কাছে কহিতেছে, "এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।" ধনী-দিগের প্রাসাদে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, "এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।" সকল অসাবধানকে সাবধান করিয়া দিতেছে, সকলের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করিতেছে, অলসকে কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে ধাবিত করিতেছে ; কেন না আর সময় নাই—"এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।"

যিনি মোক্ষার্থী হিন্দু, যিনি সংসারের মোহবন্ধন ছেদন করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, জীবন যাঁহার নিকট পদ্মপত্রে জল-বিন্দুর মতন একান্ত ক্ষণভঙ্গুর, সমুখে যাঁহার ভব-সাগর, একপল পশ্চাতে থাকিলে আবার যাঁহাকে ভববন্ধনে পড়িতে হইবে, পাড়ি যাঁহার দীর্ঘ, সময় যাঁহার অল্প, তিনি নিরন্তর আপনার মনকে বলিতেছেন, "ভোলা মন, এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।"

আবার যে মাঝি সত্য সত্যই পদ্মা-নদীতে পাড়ি ধরিয়াছে, সমুখে সন্ধ্যা, বায়ুকোণে কাল-বৈশাখীর কাল-মেঘ ;- অবিলম্বে কূল না ধরিলে যাহাকে অকূলে ডুবিতে হইবে, তাহার প্রাণের মধ্যেও সেই সঙ্গীত, "এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।" যাহা করিতে হয় এখনই কর, ইহার পরে আর সুযোগ পাইবে না।

ঐ যে বাঙ্গালী স্কুলের ছেলে পরীক্ষা পাশের জন্ত আধপেটা খাইয়া কেরোসিন তেলের বাতির কাছে বসিয়া পড়িতে-পড়িতে কোটর-প্রবিষ্ট-চক্ষু ও জরাজীর্ণ-বপু হইয়া পড়া মুখস্থ করিতেছে, সেও ইহাই ভাবিতেছে, আর সময় নাই, পরীক্ষা পাশ না করিলে উপায় নাই,—এখন প্রাণ থাকুক আর যাউক,—"এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।"

গরীব মাষ্টার,—বেতনের টাকায় বাবা যে টাকা খরচ করিয়া পড়াইয়াছেন, তাহার সুদ উঠে না,—অথচ পরিবারের গয়না চাই,—কন্যার বিবাহের জন্ত তাহার জন্মদিন হইতেই টাকা সংগ্রহ করা চাই,—বেচারী ইহার-উহার পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া, কাটিয়া, ছাঁটিয়া, বদলাইয়া একখানা অর্থ-পুস্তক সংগ্রহ করিতেছে।—আশার কথা এই যে, পাঠ্য-নির্ব্বাচকদিগের মধ্যে একজনকে খোসামুদীতে বশীভূত করিয়াছে,—এখন কেতাব সমাপ্ত হইলেই কিছু পাইতে পারে,—বিলম্বে কার্য্য নষ্ট। তাহার প্রাণ-মনও নিরন্তর গাহিতেছে, "ভোলা মন, এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।"

শ্বশুর-শাশুড়ী দেশে আছেন,—নব-যুবতী চারুবালা স্বামীর সঙ্গে সহরে আসিয়াছে,—স্বামীর রোজগার হইতে কিছু-কিছু জমাইয়া সে একখানি ভাল গয়না গড়াইবার চেষ্টা করিতেছে,—পূজার ছুটিতে বাড়ী গেলে শীঘ্র আর স্বামীর সঙ্গে আসিতে পারিবে কি না সন্দেহ,—নিতাই সেকরাকে তাড়া দিতেছে,—নিতাই ছোট ভাইটীকে তাহার নিকট পাঠাইতেছে,—এই সুযোগে না হইলে আর হইবে

না। একান্নবর্ত্তী পরিবার; নন্দ, যা' অনেক আছে। তাদের কাছে থাকিয়া শুধু নিজের জন্য গয়না করা অসম্ভব,—এ সুযোগ গেলে আর হবে না, তাই নবীনা রসিকার মন সদাই গাহিতেছে, "এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।"

আর সত্য-সত্যই যাহাদের চালায় খড় নাই,—সম্মুখে বর্ষাকাল,—অল্পদিন পরেই শ্রবণা নক্ষত্র পড়িবে,—এখন না ছাইলে সারা বর্ষা জলে ভিজিতে হইবে,—তাহারা ত সত্য-সত্যই ব্যস্ত হইয়াছে,—"এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।"

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীর পর চোর-ডাকাতরা সদাই ভাবিতেছে, "এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।" ইহার পরে শুক্ল-পক্ষ আসিলে আর সুবিধা হবে না।

যাঁহারা স্বভাব-সাধু তাঁহারা যথাসাধ্য নানারূপে পরোপকার করিয়া ভাবিতেছেন, এই দেহ থাকিতে থাকিতে ওপারের সম্বল করিয়া লও। সঙ্গে এক পয়সাও যাইবে না। সৎকার্য্যের দ্বারা যাহা উপার্জ্জিত হইবে, তাহাই সাথের সাথী, চিরসঙ্গী। আর সবই ফক্কিকার। অতএব এই অনিত্য বস্তু দ্বারা কিছু নিত্য বস্তু সংগ্রহ কর—"এই বেলা নেও ঘর ছেয়ে।"

আজ ইংরেজ-রাজ্যের এই বিষম সঙ্কটের দিনে অনেকে ভাবিতেছে, "এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।" আয়র্লণ্ডবাসীরা ইংরেজের গায়ে-ঠেকা প্রতিবেশী, এক বর্ণ, এক জাতি, এক ধর্ম্ম,—এক পাতে খাওয়া, এক "বাথে" নাওয়া, "সাদীগমী" সকলই একসঙ্গে। তবে ইংরেজ কি না খাঁটি ব্রাহ্মণ,—বোধ হয় রাঢ়ীশ্রেণী এবং আইরিসরা বোধ হয় সাকল-দ্বীপি,—তাই তাহাদিগকে ইংরেজ ষোল-আনা কোল দেয় নাই; বেচারীরা বহুকাল হইতে কোলাকুলি করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু সফলকাম হয় নাই। তাই আজ বিপন্ন প্রতিবেশীকে আরও বিপন্ন করিয়া, গলা টিপিয়া কোলাকুলি লইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যত ধর্ম্মের কথা; কর্ম্মের কথা, আশার কথা, আশঙ্কার কথা বল না কেন, সকলই অগ্রাহ্য। আইরিস্‌দিগের প্রাণ হইতে একবাক্যে এই সঙ্গীত উঠিতেছে,—

"এই বেলা নে ঘর ছে'য়ে,
এবারে বর্ষা বড়, জোগাড় কর
লাগ্ রে আদা-জল খেয়ে।"

তুরস্ক ইংরেজের ছিল বড়ই বন্ধু; কিন্তু য়ুরোপের প্রতি তার মোটেই বিশ্বাস নাই,—অষ্ট্রিয়া-জার্ম্মাণীর উপরও নাই; বুলগেরিয়া-রুমানিয়ার উপর ত একেবারেই নাই। সে মনে করিয়াছে, "রাম মারে কি রাবণ মারে, দুই-ই সমান অরি," এখন তাহার একা থাকিবার সময় নয়,—অতএব যেরূপেই হউক, "এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।"

জাপান ভাবিয়াছে, জার্ম্মাণীর বাণিজ্য-মহিষ হাড়ি-কাঠে পড়িয়াছে, অতএব শিল্পে-বাণিজ্যে ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়া, "এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।"

যাহারা ইংরেজ-রাজত্বের উপর দৃঢ়বিশ্বাসী,—হিমালয় উড়িবে তবু ইংরেজ-শক্তি টলিবে না,—ইংরেজের কপাল বড় কপাল,—কত-কত দেশ বিনা-যুদ্ধে যৌতুকের মতন ইংরেজের পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে, ইংরেজ-রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যায় না; সূর্য্য থাকিতে ইংরেজ-রাজ্যও অস্তে যাইবে না,—এই যাহারা বিশ্বাস করে,—তাহারা প্রাণপণে সস্তা দামে কোম্পানীর কাগজ ও যুদ্ধ-ঋণ কিনিতেছে,—পাছে সুযোগটা চলিয়া যায়, এই ভয়ে ভীত হইয়া তাহারা গাহিতেছে, "ভোলা মন, এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।"

যাহারা উপাধি-পাগলা, তাহারা দেখিতেছে যে, এ বেলা উপাধিগুলিও কোম্পানীর কাগজের মতন বড়ই সস্তায় বিকাইতেছে; তাই তাহারা নানা ভাবে, নানা বেশে, নানা কৌশলে উপাধি লুটিতেছে, আর ভাবিতেছে, "এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।"

দুর্ভাগা গ্রীসের রাজা ও সুবিধার জার বুঝিল না যে, অবিলম্বে তাহাদের ঘর ছাইয়া লওয়া উচিত ছিল। সম্মুখে শ্রবণা লাগিবে, তখন আর ঘর মেরামতের কাজ চলিবে না,—তাহা বুঝিল না; তাই যখন ঝট্‌কা আসিল, তাহাদের "মট্‌কা" উড়িয়া গেল, "অপেরেরা" ভিজিয়া মরিল।

ইংরেজ বোধ হয় বঙ্গদেশের এই মেঠো গান শুনিয়াছিল; তাই শ্রবণা লাগিবার পূর্ব্বেই, ঝটিকা আসিবার আগেই, কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া কাজে নামিল,—ঘর ছাইতে লাগিয়া গেল; তাই, এত বড় ঝট্‌কার মধ্যেও তাহার ঘরের মট্‌কা উড়িতে পায় নাই। বেলজিয়মও ঘর ছাইতে লাগিয়া গিয়াছিল; কিন্তু সেটা একেবারে শ্রবণার মধ্যে;—কাজেই ঝট্‌কা আসিয়া তাহার মট্‌কা উড়াইয়া লইয়াছে।

"এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।" এই সাদাসিদে কথা কয়টী, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলিতে, ইহকালে-পরকালে, অশনে-বসনে-ভূষণে, কালে-কোণে-অম্বরে, জীবনে-মরণে, জাগ্রতে-স্বপনে, সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, লাভে-লোভে, শোকে-ক্ষোভে, বাল্যে-কৈশোরে-যৌবনে, প্রৌঢ়ে-বার্দ্ধক্যে, বিবাদে-ঐক্যে, মিত্রতাতে-সুহৃদ্‌ভেদে বিগ্রহে-সন্ধিতে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, দানে-ভিক্ষায়, ভোগে-বিরাগে, ত্যাগে-অনুরাগে, বনে-ভবনে, শয়নে-স্বপনে, সর্ব্বত্র সর্ব্ব ব্যাপারেই জয়লাভের, সিদ্ধিলাভের, মুক্তি-লাভের সিদ্ধ মন্ত্র। "এই বেলা নে ঘর ছেয়ে"—যে ইহাতে অবহেলা করে তাহার জয় নাই, সিদ্ধি নাই, মুক্তি নাই।

কি শব্দ গো, কি শব্দ! কেমন সাদা কথা, কেমন সত্য কথা! এসো ত তোমরা বঙ্গদেশের কবিকুল,—এই কথাটীর পরিবর্ত্তে আর একটী কথা বসাইয়া এই ভাবটী রক্ষা কর দেখি!

বাঙ্গালী কবি এ ভাষা একেবারেই হারাইয়াছে। এমন বিশ্বব্যাপী ভাব প্রকাশ করিতে তাহার একেবারেই শক্তি নাই। মেঠো সুরে এখনকার বড়-বড় কবিগণ যে সকল গান রচনা করিয়াছেন, তাহা চর্ব্বিত, উচ্ছিষ্ট,—তাহাতে রস নাই; সে নৈসর্গিকতা, সে স্বাভাবিকতা নাই,—কাজেই তাহা লোকের প্রাণ স্পর্শ করে না।

ঋষি যেমন বৈদিক বাক্যে "উত্তিষ্ঠত: জাগ্রত:" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, বাঙ্গালার কোন এক অজ্ঞাতনামা কবি তাহা অপেক্ষাও জোরে ঠেলা দিয়া বলিয়াছেন, "ভোলা মন, এই বেলা নে ঘর ছেয়ে"। এইরূপ কথাই ত বাঙ্গালার ঋষিবাক্য। বাঙ্গালাকে কিছু বলিতে হইলে, বুঝাইতে হইলে ইহাই তাহার বৈদিক ভাষা।

বাঙ্গালীর কি আছে? আছে শুধু পর্ণকুটীর। নির্জ্জিত, তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত, অপমানিত বাঙ্গালীর আছে শুধু পর্ণকুটীর। ঐখানে মাথা রাখিয়া সে ঘুমায়,—সহস্র দুঃখের মধ্যে ঐ কুটীরে তার শান্তি। ঐ কুটীরে স্নেহময়ী জননী, কল্যাণময়ী সহধর্ম্মিণী, স্নেহের পুত্তলী পুত্র-কন্যা লইয়া বাঙ্গালী সকল দুঃখ ভুলিয়া যায়। যাহার মাথা রাখিবার একটী কুটীর নাই, এমন বাঙ্গালী নাই। ঘরের উপর বাঙ্গালীর মমতা অত্যন্ত প্রবল। সে হোটেলে অট্টালিকায় থাকা অপেক্ষা নিজের পর্ণকুটীরকে ঢের বেশী ভালবাসে। যেখানে যাহার মমতা, সেইখানে আঘাত করিয়া তাহাকে জাগাইতে হয়। বাঙ্গালী যদি কুম্ভকর্ণ হইয়া নিদ্রা যায়, তাহাকে জাগাইতে হইলে, "ওরে, তোর মটকা উড়ে গেল, ঘর পুড়ে গেল" বলিতে হয়;—সে কথা শুনিয়া সে তখনই লাফাইয়া উঠিবে। কোনও জাতিকে জাগাইতে হইলে তাহার প্রাণ-বস্তু কোথায়, সর্ব্বাগ্রে তাহাই দেখিতে হয়। যে কার্য্যে-বাক্যে, যে কাব্যে-সঙ্গীতে, সেই প্রাণ-বস্তুকে স্পর্শ না করে, উহা ব্যর্থ আড়ম্বর, কৃত্রিম ঝঙ্কার। তুমি ডাকিতে জান না, তাই মনে কর কেহই তোমার ডাক শুনিল না,—সুতরাং দেশশুদ্ধ লোক সবাই কালা।

ঘর ছে'য়ে নেওয়ার কথা না বলিয়া অন্য কোনও দৃষ্টান্ত দিলে, সঙ্গীতটী এমন করিয়া আমাদের প্রাণ স্পর্শ করিত না। "এই বেলা নে গাড়ী ক'রে" "এই বেলা নে হাতী চড়ে", "এই বেলা নে রাজা হয়ে" "ভোলামন, এই বেলা হও রায় বাহাদুর";—কৈ ইহার কোনও কথাই ত তেমন করিয়া প্রাণকে স্পর্শ করে না,—মাতাইয়া তুলে না,—আকুল করে না; এমন কি "এই বেলা নে ঘর ক'রে" বলিলেও ত সে ব্যস্ততা আসে না,—তেমন ভাবে সজাগ করিয়া তুলে না। এই যে, "ঝটকা" আসিয়া "মটকা" উড়াইলে ভিজে মরিতে হইবে, ঘর তুলিবার উৎসাহের মধ্যে সে বিপন্নভাব কোথায়? সে সর্ব্বনাশের ভয় কোথায়? বর্ষাকালে ঝড় আসিয়া কুটীরবাসী বাঙ্গালীর চালাখানা উড়াইয়া লইলে, বাচ্চাকাচ্চা লইয়া কি দশা হয়, শতকরা নব্বই জন বাঙ্গালী তা জানে; বাকী দশজনও তাহা বুঝে। তাই এটী জাতীয় বেদনার কথা,—এরূপ সঙ্গীতের নামই জাতীয় সঙ্গীত। যাঁহারা মানবের মর্ম্মান্তিক দুঃখ বা সুখের তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া জাতিকে সজাগ করিয়া তুলিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত কবি, তাঁহারাই পতিত জাতির উদ্ধারকর্ত্তা, বন্দীর মুক্তিদাতা।

যে বিদ্যার্থি, মুক্তি চাও, ভক্তি চাও,—যাহাই চাও না কেন, সর্ব্বদাই মনে রাখিও,—

(ভোলা মন) এই বেলা নে ঘর ছে'য়ে।
এবারে বর্ষা বড় জোগাড় কর
লাগ্ রে আদা-জল খেয়ে।
সম্মুখে আসছে শ্রাবণ,
সময় থাকতে জোগাড় হলো না,
(যখন) আস্‌বে ঝটকা, উড়্‌বে মটকা
(তখন) ভিজে মর্‌বি অঝোরে।
এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।

দু'টি কথা

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

বসন্তের পিকধ্বনি শুনিয়াছি ; শুনিয়াছি
মকরন্দ-মত্ত মধুপের প্রমোদ-গুঞ্জন ;
জ্যোৎস্নাময়, অর্দ্ধ-রাতে, পরাণ-পাগল-করা
শুনিয়াছি দূর বাঁশরীর ললিত নিঃস্বন ;
শৈলে শৈলে শুনিয়াছি পুঞ্জীভূত পাষাণের
রন্ধ্রে-রন্ধ্রে জল-কলসের নর্ম্ম-নৃত্যরোল,
সিন্ধুপ্রেম-পাগলিনী আত্মহারা তটিনীর
শুনিয়াছি শ্রবণ-নন্দন আকুল কল্লোল।
হরি-প্রিয়া-পদপ্রিয় কুল্ল ইন্দীবর-মুখে
শুনিয়াছি রসিক অলির চুম্বনের ধ্বনি,
প্রভাত-বিহগ-কণ্ঠে, নবোদিত অরুণের
শুনিয়াছি চির-প্রাণারাম মঞ্জু আগমনী ;
শুনিয়াছি মধুমাসে, মলয়ের বাহুস্পর্শে
বিকশিত নব পল্লবের মৃদুল মর্ম্মর,
কলাবতী ষোড়শীর সুকুমার বাহুলীলা
শুনিয়াছি মোহিনী-বীণার তরল সুস্বর।
কল্পনায় শুনিয়াছি, মন্দার-সুরভি-পূত
নন্দন-নিকুঞ্জে, কিন্নরীর কলকণ্ঠ-রব,
অবিরাম বেলাবক্ষে সোহাগ-আশ্লেষ-রত
শুনিয়াছি দৃপ্ত সাগরের গর্জ্জন ভৈরব ;
বিল্লীমন্ত্রমুখরিত বিজন আষাঢ়-রাতে
শুনিয়াছি সজল জলদে, গুরু-গরজন,
সম্ভোগৃহ-সীমা-মুক্তা নব অভিসারিকার
অশিক্ষিত ত্রস্ত নূপুরের চকিত শিঞ্জন।
শিশুমুখে শুনিয়াছি মধুময়ী আধভাষা
শুনেছি ভক্তের মুক্তকণ্ঠে ইষ্ট-গুণগান,
শুনিয়াছি ত্রিলোকের মিষ্টতম সব ধ্বনি
ছয়রাগ-সহ ষড়ত্রিংশ রাগিণীর তান ;
কিন্তু আমি শুনি নাই এত মধুময় কিছু,
বুঝি নাই মুগ্ধ শ্রুতি ভরি' এত সুধারাশি,
নিহিত যা ক্ষুদ্রতম দুটী মিষ্ট কথা মাঝে
শ্রেষ্ঠতম কথা এ বিশ্বের—"আমি ভালবাসি।"

বাঙ্গালার কথা

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

বর্ষার পল্লী :—

ভাদ্রমাস সমাগত।—এ সময় হে স্বাস্থ্যত-শাসন-আকাঙ্ক্ষী স্বদেশ-প্রেমিক সহরে বাবু, তোমার এই বিলাসোপকরণ-সজ্জিত রাজধানী ত্যাগ করিয়া একবার ঐ হত-শ্রী পল্লী-প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইতে পারিবে কি ?—অন্তরাজি-শোভিত সৌধশ্রেণী হইতে দৃষ্টি নিবর্ত্তিত করিয়া দীন-দরিদ্রের অধ্যুষিত ঐ ভগ্ন-কুটীরশ্রেণীর প্রতি—ঐ জল-প্লাবিত, কর্দ্দমিত পল্লীপথের প্রতি—ঐ সংস্কার-সম্পর্কশূন্য শৈবালাবৃত পঙ্কিল জলাশয়ের প্রতি, একবার সহানুভূতিপূর্ণ লোচনে চাহিয়া দেখিবে কি ? মুখে তো পল্লীগ্রামকে বহুকাল হইতেই তোমরা ভালবাসিয়া আসিতেছ ;—পল্লীগ্রাম যে তোমাদের 'সর্ব্বস্ব', এ কথা তোমাদেরই মুখে বহুবার শুনিয়াছি ; কিন্তু তোমাদের সেই 'সর্ব্বস্বে'র দশা এ সময় কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়, তাহা একবার স্বচক্ষে দেখিবে না ?

তুমি এখানে এখন রাজপথ দিয়া মোটরে চড়িয়া ভাবিতে-ভাবিতে চলিয়াছ যে, কেমন করিয়া যশের 'ল্যাডারে ল্যাডারে' উঠিয়া 'লীডারে'র আসন পর্য্যন্ত পৌঁছিব ! আর, তোমার তাহারা—যাহাদের উদ্দেশে তুমি বক্তৃতার-মঞ্চে দাঁড়াইয়া যখন-তখন বলিয়া থাক—

"ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই,
তোমার রাখাল তোমার চাষী॥"

—সেই রাখাল-চাষী তোমার ভাইসকল এখন কেমন ভাবে দিনযাপন করিতেছে, জান ?—ঐ দেখ, প্রতিপদক্ষেপে তাহারা আহি মধুসূদন ডাক ছাড়িয়া পথ বাহিয়া চলিয়াছে !

পথ?—পথই বা কোথায়! কাদা ও জলে চারিদিক পূর্ণ! পথ বলিয়া যে কখনও কিছু ছিল, এখন দেখিলে তাহা মনেই হয় না। পথ, ঘাট ও মাঠ সমস্তই একাকার হইয়া গিয়াছে! যেখানে হাট বসিত, সেখানে এখন আর হাট বসে না। যেখানে গাড়ী চলিত, সেখানে এখন গাড়ী চলে না। নিত্য-ব্যবহার্য্য সামগ্রী আহরণের জন্য পল্লীবাসীকে এখন বাধ্য হইয়া দূরে যাইতে হয়। এদিকে জল-প্লাবন ও জল-বর্ষণের জন্য যে জল-কষ্ট কিছু কমিয়াছে, তাহাও নহে। বরং পূর্ব্বের চেয়ে এখন পানীয় জলের কষ্ট বাড়িয়াছে বলা যায়। যে দীঘি বা পুকুরে যাইয়া পল্লীবধূকে জল আনিতে হইত, দুর্গম পথের জন্য সেখানে এখন আর তাহাদের যাইবার উপায় নাই। ঘরের ছায়ায় যে ডোবা ও গর্ত্ত ছিল, তাহাতে কর্দ্দমপূর্ণ জল জমিয়াছে; তাহাই পল্লীবাসীর এখন পানীয় জল!

কলিকাতার কবুনি কবির দল এখানে বসিয়া ধানের ক্ষেতের শোভা দেখিতেছেন, আর সে সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়া মাসিকে পাঠাইতেছেন; কিন্তু বাস্তবের সহিত সে কবিতার কোনও সম্বন্ধই নাই। সেখানে বায়ুহিল্লোলে শ্যাম শস্যরাজি তরঙ্গিত হইতেছে না; সেখানে এখন বর্ষার ও বন্যার লাল জলের উপর তরঙ্গ উঠিতেছে পড়িতেছে। সেই তরঙ্গের নীচে কৃষকের একমাত্র আশা-ভরসা নবরোপিত শস্য গলিয়া-পচিয়া তরঙ্গের উত্থান-পতনে ভাসিয়া যাইতেছে। আর, আশাহীন, উৎসাহহীন দরিদ্র কৃষক সেই তরঙ্গের দিকে চাহিয়া, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। তাহার ঘরে অন্ন নাই, দেহে শক্তি নাই, প্রাণে উৎসাহ নাই; তাহার চালে খড় নাই, পরণে বস্ত্র নাই, রোগে ঔষধ নাই।—তাহার গিয়াছে সব, আছে কেবল অভাবের শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা।

সম্মুখে আশ্বিন মাস। জমিদারের পূজার কিস্তী আধা-তলবের খাজনা শোধ করিতে হইবে। ভরসা—মহাজন। কিন্তু ক্ষেত্রে ফসল নাই, মহাজন কি দেখিয়া টাকা দিবে? যখন আনন্দময়ীর আগমনে বঙ্গদেশ হাসিয়া উঠিবে, চারিদিকে উৎসব-বাদ্য বাজিতে থাকিবে, তখন এই হতভাগা কৃষক জমিদারের পাইকের জোর তাগাদা হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাইবে, তাহাই ভাবিয়া সে আজ আকুল হইয়া পড়িয়াছে। তার পর, পৌষমাসে মহাজনের তাগাদা আছে, সারাবৎসর ছেলে পিলের মুখে কি দিবে, সে ভাবনাও আছে।—তাহার ভাবনার আজ অন্ত নাই।

উহা গেল বর্ত্তমান পল্লীর একটা দৃশ্য। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখ—বন্যা-প্রবাহ অন্তর্হিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পচা জঙ্গল, গাছ-পাতা হইতে কি বিকট দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে! সে দুর্গন্ধের মধ্য হইতে ম্যালেরিয়ার বিষ উত্থিত হইয়া পল্লীর ঘরে-ঘরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সেই বিষে জর্জ্জরিত হইয়া দরিদ্র পল্লীবাসী দিনে-দিনে জীবনী-শক্তি হারাইতে বসিয়াছে। ইহার প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা নাই। অর্থের অভাব, সুতরাং ঔষধ নাই, পথ্যও নাই। দশ-বিশখানা গ্রাম লইয়া একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। সূর্য্যোদয় হইলেই দলে-দলে রোগী শীর্ণহস্তে ডাক্তারখানার টিকিট ও ঔষধের শিশি লইয়া—আঁচলে একমুঠা মুড়ি বাঁধিয়া, তিন-চারি ক্রোশ দূর হইতে ডাক্তারখানার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। বেলা ৮টা না বাজিতেই ডাক্তারখানার প্রাঙ্গণ জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। তার পর ডাক্তারবাবু আসিয়া বসিলেন। এদিকে কম্পাউণ্ডার ঔষধ প্রস্তুত করিয়া বৃহৎ 'জার' পূর্ণ করিতে লাগিল। ডাক্তারবাবু এক-একজনের টিকিট দেখিয়াই ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন। নাড়ী টিপিবার বা রোগের অবস্থা শুনিবার তাঁহার অবসর নাই; দশটার মধ্যে এই দেড়শত দুইশত রোগীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যবস্থা হইতে কেহ বঞ্চিত না হয়, ইহাই নিয়ম। সুতরাং তিনি দর্শন মাত্রেই ঔষধের ব্যবস্থা দিতে বাধ্য হইলেন; আর কম্পাউণ্ডার পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত সর্ব্ব-রোগের একমেবাদ্বিতীয়ং ঔষধে শিশি ভরিয়া দিতে লাগিল। রোগীর দল শিশি-ভরা ঔষধ লইয়া হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাবৃত্ত হইল। এবং অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত তাহাই একটু একটু গলায় ঢালিয়া ম্যালেরিয়াকে ভয় দেখাইতে লাগিল। ম্যালেরিয়া তাহাতে ভয় পাওয়া দূরে থাকুক—আরও জোরে চাপিয়া ধরিতে লাগিল!

বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীরই এই দুরবস্থা। বাঙ্গালার জমীদারবর্গ, যাঁহারা একটু ইচ্ছা করিলেই পল্লীর ঐ দুরবস্থা অনেকটা মোচন করিতে পারেন—তাঁহারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। খেতাব খরিদ করিবার সময় তাঁহারা মুক্তহস্ত। 'কাণ্ডেনী' করিবার সময়ও তাঁহাদের অর্থের অভাব হয় না। কিন্তু দীন-দুঃখী প্রজার দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁহাদের কাণে গিয়া

পৌঁছায় না। প্রজার শুষ্কদেহের কঙ্কাল নিঙড়াইয়া কেমন করিয়া মজ্জা বাহির করিতে হয় তাহাই তাঁহারা জানেন। কাজেই পল্লীর অবস্থা যে ফিরিবে, এমন ভরসা হয় না। এ দেশের জমীদারেরা যেমন সহানুভূতিশূন্য, নেতারাও তেমনি সহানুভূতিশূন্য। কাজেই পল্লীবাসীর রোদন কেবল অরণ্যে রোদন হইতেছে মাত্র। এ রোদনের পরিসমাপ্তি কখনও ঘটিবে কি না, কে বলিবে!

রাজনীতির চর্চ্চা,—না দলাদলির চর্চ্চা?

১২৮১ সালের শ্রাবণ-সংখ্যার বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছিলেন,—"যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে। এই চারিটি বাঙ্গালীর কোন কালে নাই, এজন্য বাঙ্গালীর বাহুবল কোন কালে নাই। কিন্তু সামাজিক গতির বলে, এ চারিটি বাঙ্গালীর চরিত্রে সমবেত হওয়ার অসম্ভাবনা কিছুই নাই।"—আমাদের মনে হয়, বঙ্কিমবাবু আজ জীবিত থাকিলে তাঁহার ঐ লেখাটুকুর মধ্যে যেখানে 'অসম্ভাবনা' কথাটি আছে, খুব সম্ভব তাহা কাটিয়া তিনি তৎ-পরিবর্ত্তে 'সম্ভাবনা' শব্দটি বসাইয়া দিতেন। কারণ, যখন তিনি উহা লিখিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালী-চরিত্রে যতটুকু ঐক্য-উদ্যম প্রভৃতি গুণ ছিল, এখন তাহাও নাই। এখন থাকিবার মধ্যে আছে কেবল—উৎকট দলাদলি। বাঙ্গালাদেশ ভারতবর্ষের অন্য সকল বিভাগ অপেক্ষা যদি কোনও বিষয়ে এখন বড় হয়, তবে তাহা দলাদলি-ব্যাপারে! বাস্তবিক, এত রেষারেষি—এত আড়াআড়ির প্রকোপ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় কি না সন্দেহ!

কেবল ঐ দোষেই আমরা মরিতে বসিয়াছি। আমাদের যত প্রকার ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্তই ঐ বিরোধ-প্রবণতা হইতে সমুদ্ভূত। রত্ন-প্রসবা জন্মভূমির ক্রোড়ে থাকিয়াও আমরা দরিদ্র; শ্রমশীল হইয়াও আমরা উদরান্নে বঞ্চিত; বুদ্ধিমান হইয়াও আমরা পদে-পদে পরমুখাপেক্ষী; মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিলেও কাপুরুষ বলিয়া আমরা পরিচিত। ইহার কারণ কি? কারণ হইতেছে, যে শক্তি সকল শক্তির মূল, সেই সম্মিলন-শক্তি আমাদের একেবারেই নাই। জাতি লইয়া আমরা যে লড়ালড়ি করি, তাহার কথা এখানে বলিতেছি না। সাহিত্য-ক্ষেত্রের দলাদলির কথাও এখানে তুলিতে চাহি না। কারণ, সে সব কথা এতই জীর্ণ—এতই বস্তাপচা পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপন করিতেই বিরক্তি বোধ হয়। তা' ছাড়া, সে সব দলাদলির দ্বন্দ্ব এখন অনেকটা গা-সহাও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি, বাঙ্গালার রাজনীতি-ক্ষেত্রেও ঐ পাপের বহ্নি ধূ ধূ জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন সত্যসত্যই হৃদয় নিরাশায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সুরেন্দ্রনাথ দেশবাসীকে বরাবর মিলন-মন্ত্র শুনাইয়া আসিতেছেন; যে ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া চিত্তরঞ্জন বলিতেছেন—"এস ভাই, তুমি মুসলমান হও, খ্রীষ্টিয়ান হও, শূদ্র হও, চণ্ডাল হও; তোমাকে আলিঙ্গন করি; এ যে আমার কাজ—এ যে তোমার কাজ, এ যে মায়ের কাজ।"—যে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া স্যার রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করিতেছেন—"বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন—এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান্!"—সেই ক্ষেত্রে অহরহঃ আজ মেড়ার লড়াই চলিতেছে! যাঁহারা উপদেষ্টা, তাঁহারাই রীতিমত তাল ঠুকিতেছেন; যাঁহারা "একতা একতা" করিয়া অনবরত উচ্চ চীৎকার করেন, তাঁহারাই ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-বীজ ছড়াইয়া 'একতা'র কণ্ঠে ছুরি চালাইতেছেন! বিগত কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশন হইতে এই দৃষ্টান্তই আমরা অনবরত দেখিয়া আসিতেছি! হোম-রুলারের দল সুরেন্দ্রনাথের দলের উপর গালি পাড়েন; সুরেন্দ্রনাথের দল হোমরুলার দেখিলে তৈলে বার্ত্তাকুবৎ চটিয়া উঠেন! উভয় দল উভয় দলের উপরই প্রতিনিয়ত গালাগালির গোলা-গুলি নিক্ষেপ করিতেছেন! ইহা আমাদের মন-গড়া কথা নহে,—অত্যুক্তিও নহে।—যে কোনও একদিনের 'বেঙ্গলী' ও 'অমৃত বাজার পত্রিকা' খুলিয়া দেখিলেই উভয় পক্ষের আক্রোশ-আক্রমণের পরিচয় পাওয়া যাইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় 'কবির লড়াই'এর নাম শুনিলেই ঘৃণায় নাসিকা সিকায় তোলেন, কিন্তু 'বেঙ্গলীর' ও 'পত্রিকার' লড়াই কবির লড়াইকেও হার মানাইয়াছে! 'কবির লড়াই'এ যেটুকু ছিল না, ইহাঁদের লড়াইএ তাহাও যোগ হইয়াছে। ইহাঁরা গালাগালির সঙ্গে বিদ্বেষ-বিষের 'মিকশ্চার' করিয়া পাঠক-সমাজে তাহা বিতরণ করিতেছেন! শিক্ষিত সম্প্রদায়ও তাহা অম্লানবদনে গলাধঃকরণ করিতেছেন!—কেন না, এ যে ইংরেজীতে লেখা!

আরও একটা হাসির কথা এই যে, যাহারা এই দুর্জ্জয় দলাদলি-ব্যাপারে প্রমত্ত, তাঁহাদের মুখে দলাদলির প্রশংসা প্রায়ই শুনা যায়। তাঁহারা বলেন, স্বাধীনতার লীলাভূমি ইয়োরোপে যখন এ ব্যাপার সদা সংঘটিত হয়, তখন এদেশের দলাদলি দেখিয়াই বা ভীত হইবার কারণ কি? পাশ্চাত্য দেশে দলাদলি যে নাই, এ কথা অবশ্য অস্বীকার করি না। কিন্তু সে দলাদলির সহিত এ দলাদলির তুলনা হয় না।—উভয়ে স্বর্গ-নরক তফাৎ। সে দেশে দলাদলি হয়—মত লইয়া। আর এদেশে দলাদলি হয়—মানুষ লইয়া। সেদেশে জাতীয় মঙ্গল-চিন্তার ফলে মতান্তর ঘটে; আর এদেশে আত্ম-স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টার ফলে মতান্তর ঘটে। কাজেই এদেশে মতান্তর কেবল মনান্তরেই গড়াইয়া চলিয়াছে। একখানি গ্রন্থে আছে, একদিন কোনও এক বিষয় লইয়া হেষ্টিংস ও ব্যাটসনে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে,—উভয়ে উভয়কে মারিতে উদ্যত; এমন সময়ে সংবাদ আসিল আমিয়ট সাহেব হত হইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহাদের গৃহ-বিবাদ অন্তর্হিত হইল। উভয়েই চীৎকার করিয়া উঠিলেন "war—war—war!" ব্যাটসন্ বলিলেন—"Mr. Hastings, will you pardon me?" হেষ্টিংস্ তখনই হাত বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন,—"I give you my hands Mr. Batson and my heart with it."—জাতীয়তার এ অপূর্ব্ব চিত্র কি আমাদের দেশে দৃষ্টিগোচর হয়?

এই সব দেখিয়া শুনিয়া কাজেই বলিতে হয়, 'পেট্রিয়টিজম্' বাবুদের ব্যবসায়—পেশা; দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ প্রাণের কথা নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে এই দারুণ বস্ত্র-সঙ্কটের হস্ত হইতে দরিদ্র দেশবাসীকে উদ্ধার করিবার জন্য আজ মতিলাল-বৈকুণ্ঠনাথ অস্থির হইয়া উঠিতেন; যদি তাহা হইত তাহা হইলে পল্লীর দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবন্মৃত কৃষকগণের দুর্দ্দশা মোচনের চেষ্টা-চিন্তায় আজ যোগকেশ-চিত্তরঞ্জনকে ব্যাকুল হইয়া উঠিতে দেখিতাম। কিন্তু সেরূপ দেশাত্মবোধদগ্ধ পুরুষ বাঙ্গালার রাজনীতি-ক্ষেত্রে একটিও নাই। গান্ধির মত লোক বাঙ্গালাদেশে দেখিতে পাই না। বাঙ্গালার রাজনীতি-চর্চ্চা এখন দলাদলির চর্চ্চায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভগবান জানেন, এ পাপ-পঙ্ক হইতে বাঙ্গালী কখনও উদ্ধার লাভ করিবে কি না! যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি, তাহাতে প্রাণ শুকাইয়াই আসে,—আশার কথা বলিতে আর প্রবৃত্তি হয় না।

সাহিত্য-সংবাদ

অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ মহাশয়ের লিখিত, বাঙ্গালা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দম্পতি 'শব্দ-কথা' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১।০।

আট-আনা সংস্করণের ২৮ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, চৌধুরাণী বি-এ প্রণীত "নবযুগের স্বপ্ন" প্রকাশিত হইয়াছে।

আট-আনা সংস্করণের ২৯ সংখ্যক গ্রন্থ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন প্রণীত "নীলনাথিক" প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "রূপসী রণরঙ্গিনী" মূল্য ৸০ আনা।

শ্রীমতী কমলতা দেবী প্রণীত "চরখলিয়" মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত জীবানন্দ মল্লিক প্রণীত "রামসুন্দর-জীবনী" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত "কল্পকথা" ও "মহাত্মা ময়দীন" প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেকখানির মূল্য অর্দ্ধ মুদ্রা। যোগেনবাবুর "তমদুরে" ধনুর।

শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায় চৌধুরী প্রণীত "নিয়তি" নাটক প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১।০।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "মহাবাক্য রত্নাবলী" বা ভৈলঙ্গ স্বামীর উপদেশ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষের "কাল-বৈশাখী" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত প্রণীত "সতীর মালা" মূল্য ১০।

মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলালের ৩১ খানি হাসির গানের স্বরলিপি কবির পুত্র শ্রীমান্ দিলীপকুমার রায় বি-এস্‌সি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইল। মূল্য ২৲।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস "দত্তা" ভারতের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে। মূল্য ১।০।

আগামী ১২ই ভাদ্র হইতে তিনদিন জলপাইগুড়িতে উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works.
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

কিরাত ও অর্জ্জুন

[শিল্পী—শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

Emerald Printing Works
CALCUTTA

আশ্বিন, ১৩২৮

প্রথম খণ্ড] অষ্টম বর্ষ [চতুর্থ সংখ্যা

মনোবিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম-এ]

মেধা (২)

সমাজের প্রত্যেকেই বড় হইবার জন্য যুদ্ধ করিতেছে। এই যুদ্ধে দুর্ব্বলের পরাজয় এবং সবলের জয় হইতেছে। সকলেই "আগে চল, আগে চল ভাই" মন্ত্রের উপাসক। কেহ পশ্চাতে থাকিতে চায় না। যে যত বড় হইতেছে, সে তত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে; যে যত ছোট হইতেছে, সে তত নগণ্য হইতেছে। মানুষের মনের মধ্যেও এইরূপ সংগ্রাম চলিতেছে। মানুষের মন নানা চিন্তা, নানা ভাব, নানা ধারণার লীলাক্ষেত্র। ইহারা কেহই গুপ্ত থাকিতে চাহে না, প্রত্যেকেই প্রকাশিত হইতে চাহে। প্রত্যেকেই উচ্চ স্থান অধিকার করিতে চাহে—কেহ নীচে থাকিতে চাহে না। এখানেও সবলের জয় এবং দুর্ব্বলের পরাজয়। এখানেও যে যত উচ্চ স্থান অধিকার করিবে, সে তত স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে; এবং যে যত নিম্নে থাকিবে, সে তত অপ্রকটিত থাকিবে। ক, খ, গ সংজ্ঞাক্ষেত্র। ক গ সংজ্ঞাক্ষেত্রের সীমা। এই সীমার নিম্নভাগ সুপ্ত-

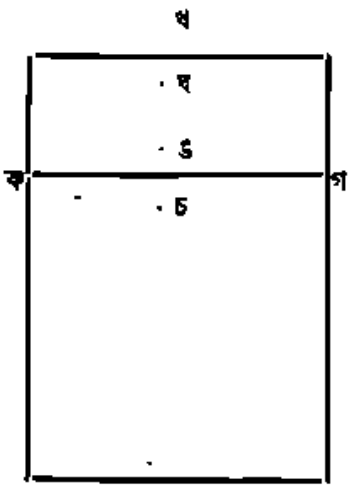

সংজ্ঞাক্ষেত্র। ঘ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ইহা অতি সুস্পষ্ট। ঙ কেবলমাত্র সীমা অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং ইহাও কথঞ্চিৎ স্পষ্ট। কিন্তু চ মনের ভিতর থাকিলেও সুপ্ত-সংজ্ঞাক্ষেত্রে বলিয়া ইহার উপলব্ধি হইতেছে না। তুমি বঙ্কিমচন্দ্রের

"চন্দ্রশেখর" পড়িতেছ। সেখানে দলনী বেগম আপন মনে বলিতেছে, "তা আমাকে মনে পড়িবে কেন? আমি হাজার দাসীর মধ্যে একজন বৈ ত নই" তুমি এখন সেই স্থানটি পড়িতেছ। এখন এই কথাগুলি, এই বিষয়গুলি তোমার মনের তুঙ্গ স্থান অধিকার করিয়াছে। যে স্থানে ম, সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। সুতরাং এই কথাগুলি এখন অতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু শৈবলিনীর কথা, প্রতাপের কথা, শৈবলিনী এবং প্রতাপের সন্তরণ, প্রতাপের জলে নিমজ্জন, শৈবলিনীর তীরে পলায়ন, চন্দ্রশেখর কর্তৃক প্রতাপের জীবন-রক্ষা, চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর বিবাহ ইত্যাদি বিষয় তুমি একেবারে বিস্মৃত হও নাই; ইহারা তোমার সংজ্ঞাক্ষেত্রের তুঙ্গ স্থানে না থাকিলেও, সংজ্ঞাক্ষেত্রের বহির্ভাগে সুপ্ত-সংজ্ঞাক্ষেত্রে অবস্থিত। ইহারা ম-এর মত তত সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত না হইলেও, চ-এর মত অস্পষ্ট নহে। ইহারা চ-র স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই বিষয়গুলির সংস্রবেই দলনী বেগমের কথা বোধগম্য। তুমি যদি প্রথমেই দলনীবেগমের ঐ কথাগুলি পড়িতে, যদি পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাসমূহের জ্ঞান তোমার না থাকিত, তবে দলনীর কথা তোমার নিকট অত সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হইত না।

"আগে দেখিনি, শেষ দেখিনি,
দেখেছি শুধু মাঝ,
অশ্রু পিছল মনে করে'
বুকিনু তারে আজ।"

তুমি পূর্ব্বে ভূগোল পড়িয়াছ, ইতিহাস পড়িয়াছ এবং এ সমস্ত বিষয় তোমার মনোমধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু তুমি যখন "চন্দ্রশেখর" পড়িতেছ, তখন ভূগোল এবং ইতিহাসের বিষয় তোমার সংজ্ঞাক্ষেত্রের বাহিরে—ইহারা সুপ্ত-সংজ্ঞাক্ষেত্রে চ-এর স্থানে অবস্থিত।

সংজ্ঞাক্ষেত্রে কত ভাবের, কত চিন্তার উদয় হইতেছে এবং লয় হইতেছে; কত ভাব কতবার আসিতেছে, যাইতেছে এবং ফিরিতেছে। কেহ বা একবার আসিয়া আর ফিরিতেছে না। যদি কোন ভাব নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় সংজ্ঞাক্ষেত্রে প্রবেশ করে, যদি ইহা অন্য কোন ভাবের সহিত একেবারে সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত হয়, যদি ইহা অন্য ভাবের সেহকর্ষণে বঞ্চিত হয়, তবে অধিকক্ষণ এখানে তিষ্ঠিতে পারিবে না—শীঘ্রই এস্থান ত্যাগ করিয়া তাহাকে পলাইতে হইবে। যদি ইহা পুনরায় প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে সময় থাকিতে ইহাকে এখানকার ভাবসমূহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে; অপরিচিতের ন্যায় আসিয়া অপরিচিতের মত চলিয়া গেলে হইবে না। অপরের সহিত মিশিতে-মিশিতে হইবে, আলাপ-পরিচয় করিতে হইবে। মনে কর, একজন লোক ইংরেজী জানে না, জানিলেও রসায়ন-শাস্ত্র সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ। তাহাকে তুমি—"হাইড্রোজিন ইজ এ কাইণ্ড অব গ্যাস—" এই ছত্রটি পড়িতে দিলে। সে হয় ত চেষ্টা করিয়া ছত্রটি মুখস্থ করিতে সমর্থ হইল—কিছুক্ষণের জন্য হয় ত ইহা তাহার সংজ্ঞাক্ষেত্রের তুঙ্গ স্থান অধিকার করিল; কিন্তু ইহার স্থিতি এখানে কতক্ষণ? শীঘ্রই ইহার পতন হইবে। অচিরাৎ ইহাকে সুপ্ত-সংজ্ঞাক্ষেত্রে সমাধি লইতে হইবে। ভবিষ্যতেও ইহার পুনরুত্থান অসম্ভব। কেহই ইহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা পাইবে না; কারণ ইহার সহিত কাহারও পরিচয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ কাল, কোকিল কাল, তমাল কাল, যমুনার জল কাল। সুতরাং এই সকল জিনিসের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য-সম্বন্ধ আছে। অতএব ইহাদের যে কোনটিকে দেখিলেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ মনে পড়িতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ আমার নিকট অপরিচিত নহে—ইহার বর্ণ তমালের মত, কোকিলের মত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে একবারে বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। এক সময়ে হয় ত শ্রীকৃষ্ণের রূপ তোমার বিস্মৃতির গর্ভে—সুপ্ত-সংজ্ঞাক্ষেত্রে নিহিত। আবার অন্য সময়ে হয় ত কোকিলের কাল বরণ দেখিলে, তোমার শ্রীকৃষ্ণের রূপ স্মরণ হইলে। এখানে একটী ভাব অন্য ভাবের সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ; সুতরাং একটীর পতন হইলে অপরে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। মনের যে ভাবটি একবারে সম্বন্ধ—সুতরাং সহানুভূতি-বিবর্জ্জিত, সেইটিই একবারে নির্ব্বাসিত হয়। কিন্তু কোন ভাবটিই একবারে গুপ্ত থাকিতে চাহে না—একবারে অপরিজ্ঞাত থাকিতে চাহে না। প্রত্যেকেই তুঙ্গ স্থানে যাইবার জন্য ব্যস্ত। যে ভাবটির শক্তি অধিক, যে ভাবটির সহিত অপরাপর ভাবের সম্বন্ধ এবং সংস্রবও অধিক, সেই ভাবটিই এ সংগ্রামে জয়ী হইয়া তুঙ্গ স্থান অধিকারে সমর্থ হইবে। যমুনার জল দেখিলে, বা কোকিলের

স্বর শুনিলে শ্রীরাধিকার স্মরণে বা পরম ভক্তের মনে শ্রীকৃষ্ণের রূপ উদিত হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া কি সকলের মনেই সে ভাবের উদয় হইবে? প্রত্যেক ভাবই সংজ্ঞাক্ষেত্রের অত্যুচ্চ স্থান লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে; দুর্ব্বলকে পদাঘাত করিয়া আত্মোন্নতির পথ পরিষ্কার করিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ স্বার্থপর বা কাপুরুষ নহে। যেই জয়ী হইতেছে, যেই সংজ্ঞারূপ আলোকের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সেই তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে লইয়া যাইতেছে—স্বার্থপরের ন্যায় একা যাইতেছে না। ভক্তের মনে শ্রীকৃষ্ণের কথার উদয় হইল—সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার গোচারণ, গোবর্দ্ধন-ধারণ, কালীয়দমন ইত্যাদি লীলার কথা মনে হইল।

'ক' বলিলে 'খ' মনে পড়ে, কারণ দুইটিই এক কালে মনের প্রতিবেশী ছিল—দুইটিরই চিত্র একসঙ্গে চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়াছিলাম, একসঙ্গে বাস হেতু দু'এর মধ্যে সখ্যভাব জন্মিয়াছে। যখন ক মনে হইতেছে, তখন ইহা ইহার সহচর খ-কেও সঙ্গে করিয়া লইতেছে। বালক একটী জন্তু দেখিল এবং জন্তুটিকে "কুকুর" বলিতে শুনিল। এই নাম এবং কুকুরের প্রতিকৃতি এক সঙ্গে তাহার চিত্ত মধ্যে স্থান পাইল। সুতরাং একটী মনে হইলে আর একটী মনে হয়। লেবু দেখিলে লেবুর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ইত্যাদি মনে হয়। কারণ একই বস্তুতে এই সকলের একত্র সমাবেশ দেখিয়াছি। একত্র বা এক সময়ে সহবাস হেতু সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়। (স্থান বা সময়গত) এরূপ সম্বন্ধকে "যৌগপদ্য" সঙ্গ বলে। যুগপৎ অভিজ্ঞাত বিষয়সমূহের মধ্যে একটী উপস্থিত হইলেই, অপর অনুপস্থিত বিষয়গুলিও স্মৃতিপটে উদয় হয়। লোল মাংস, কম্পিত কলেবর এবং দীর্ঘকায় একজন অশীতিপর বৃদ্ধকে দেখিয়া আমার পিতামহকে কেন মনে পড়িল? এই বৃদ্ধকে এবং আমার পিতামহকে আমি কখনও একস্থানে দেখি নাই। ইহাদের উভয়ের কথাও আমি কখনও ভাবি নাই। বৃদ্ধকে এই আমি প্রথম দেখিলাম। তবে কেন একজনকে দেখিয়া আর-একজনকে মনে পড়িল। উপস্থিত হইতে অনুপস্থিতের স্মৃতি কিরূপে সম্ভব হইল? এই বৃদ্ধের আকার-প্রকারের সহিত আমার পিতামহের আকার-প্রকারের অনেক সাদৃশ্য আছে। সদৃশ বস্তুর পরিণয় অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেক বস্তুই সদৃশ বস্তুর সহিত মিলিত হইতে চায়। এরূপ মিলনকে সাদৃশ্য সঙ্গ বলে। সাদৃশ্য সঙ্গ হেতু এই বৃদ্ধকে দেখিয়া আমার পিতামহকে মনে পড়িতেছে। একটী লোককে দেখিয়া অপর লোকের কথা অনেক সময়েই মনে হয়—তাহার কারণ, ইহাদের মধ্যে আকৃতি বা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে।

"হেরি তোমা মনে হয় লো অপরিচিতে
কোথা যেন দেখেছি ও মুখানি তোমার।

* * * *

মোর অন্তরের নাকে এত কাল বুঝি
লুকায়ে আছিলে বসি নিভৃতে নিবাসে
যুগ যুগান্তর পর অকস্মাৎ আজি
ধরিয়া মানসী মূর্ত্তি বাহিরিয়া এলে।"

আবার অনেক সময়ে একটি বিষয় হইতে বিপরীত ধর্ম্ম-বিশিষ্ট অপর বিষয়েরও স্মরণ হইয়া থাকে। ধনী বলিলে দরিদ্র, পাপ বলিলে পুণ্য, পূর্ব্ব বলিলে পশ্চিম, জীবন বলিলে মরণ, আশা বলিলে ভয়, দিবস বলিলে রজনী, আলোক বলিলে ছায়া, সীমা বলিলে অসীম মনে হয়। এখানে একটী আর-একটীর সঙ্গ লইতেছে—কিন্তু ইহা সাদৃশ্য সঙ্গ নহে—ইহা বৈসাদৃশ্য সঙ্গ।

"জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে
আশার পশ্চাতে ভয়,
ডাকিনীর মত রজনী ভ্রমিছে
চিরদিন ধরে' দিবসের পিছে
সমস্ত ধরণীময়।
যেথায় আলোক সেইখানে ছায়া
এই ত নিয়ম ভবে,
ও রূপের কাছে চিরদিন তাই
এ ক্ষুধা জাগিয়া রবে।

অতএব এই কথাটি স্মরণ-ক্রিয়ার সহায়ক—:—

১। পরামর্শাভিলাষ।
২। পৌনঃপুন্য।
৩। মনের স্ফূর্ত্তি এবং
৪। সঙ্গ—

(ক) যৌগপদ্য
(খ) সাদৃশ্য এবং
(গ) বৈসাদৃশ্য।

সঙ্গত্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ।

যৌগপদ্য এবং সাদৃশ্য এই দুইটি সঙ্গ পরস্পর পরস্পরের সহায়। একটী ব্যতীত অপরটির ক্রিয়া অসম্ভব। ক খ গ ইহাদের সঙ্গ যৌগপদ্য সঙ্গ; কারণ, ইহাদিগকে এক সঙ্গে অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এবং ক খ গ-কে যখন যতবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তখন ততবার তাহাদের প্রতিরূপগুলিকেও যথাক্রমে মনোমধ্যে ধারণ করিয়াছি। ক খ গ যেন ক খ গ-এর প্রতিরূপ। এখন, ক দেখিলে খ মনে হয় কেন? ক-এর প্রতিরূপ ক মনের মধ্যে আছে; সুতরাং স্বরূপ ক হইতে প্রতিরূপ ক-এর কথা মনে হইতেছে; কারণ স্বরূপ ক-এর এবং প্রতিরূপ ক-এর সাদৃশ্য-সম্বন্ধ আছে। এইরূপে সাদৃশ্য সঙ্গ হইতে যখন ক-এর স্মৃতি উদয় হইল, তখন ক হইতে খ গ-এর বিষয় যৌগপদ্য সঙ্গ-বলে মনে হইল। ক হইতে ক মনে না হইলে খ গ মনে হইত না। অতএব সাদৃশ্য সঙ্গ যৌগপদ্য সঙ্গের সহায়। তোমার কুকুর দেখিলে আমার কুকুরের কথা মনে হয়; কারণ, ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য সঙ্গ আছে। কিন্তু তোমার কুকুর এবং আমার কুকুরে ত সম্পূর্ণরূপ সাদৃশ্য নাই; তবে কেমন করিয়া এরূপ স্মৃতিকে সাদৃশ্য-সঙ্গ-সম্ভূত বলা যায়? মনে কর, তোমার কুকুর কখ এবং আমার কুকুর কগ। এখানে কখ-এ —এবং কগ-এ সাদৃশ্যও আছে, আবার বৈসাদৃশ্যও আছে। যখন ক খ দেখি, তখন সাদৃশ্য সঙ্গ হেতু 'ক' মনে আসে এবং যৌগপদ্য সঙ্গ হেতু গ মনে হয়; কারণ, কগ-এর সঙ্গ যৌগপদ্য সঙ্গ। অতএব এরূপ স্থলে যৌগপদ্য সঙ্গ সাদৃশ্য সঙ্গের সহায়। আরও দেখা যায় যে, পাপ বলিলে পুণ্যের কথাই মনে হয়, চিনির কথা ত মনে হয় না। অন্ধকার বলিলে আলোকের কথাই মনে হয়, কিন্তু কমলা লেবুর কথা ত মনে হয়—না। পাপ-পুণ্য উভয়ই চরিত্র-বিষয়ক; আলো-অন্ধকার উভয়ই দৃষ্টিবিষয়ক। সুতরাং ইহারা বিপরীত হইলেও, ইহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। অতএব সম্পূর্ণ বিসদৃশ বস্তুর সঙ্গ অসম্ভব।

সঙ্গ স্মরণ-ক্রিয়ার সহায়ও বটে, আবার অন্তরায়ও বটে। মনে কর, কোনও নগরে যাইবার অনেকগুলি পথ আছে। এরূপ নগরে প্রবেশ করা অতি সহজ—যে পথই অবলম্বন কর না কেন, তুমি তোমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবে। কিন্তু ঐ নগরের ভিতর হইতে বাহিরের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিতে একটু বেগ পাইতে হইবে—যে কোন পথ অবলম্বন করিলে চলিবে না। তখন ভাবিবে, "এ পথ গেছে কোনখানে? কে জানে ভাই কে জানে!"

এখানে বহু পথ সহায়ও বটে, অন্তরায়ও বটে। যখন সকল পথেরই লক্ষ্য একদিকে, তখন সহায়; আর যখন সকলেরই লক্ষ্য বিপরীত দিকে, তখন অন্তরায়। তেমনি যখন বহু সঙ্গের লক্ষ্য এক, তখন স্মৃতির সহায়; নচেৎ অন্তরায়। বহু সঙ্গের লক্ষ্য এক হইলে আভিমুখী সঙ্গ এবং পৃথক হইলে বৈমুখী সঙ্গ বলে। মনে কর, আমি ক, খ, গ, এই তিনটি একসঙ্গে অনেক সময়ে ম-এর সহিত দেখিয়াছি; কিন্তু এখন যদি আমি কেবলমাত্র ক দেখি, তবে ম-এর কথা মনে না হইতে পারে; অথবা যদি খ কিংবা গ দেখি, তথাপি ম স্মরণ-পথে না আসিতে পারে। কিন্তু যদি ক খ গ এই তিনটিকে একসঙ্গে দেখি, অথবা কোন একটিকে দেখিয়া অপর দুইটির কথা চিন্তা করিতে পারি, তবে ম সহজেই মনে উদয় হইবে। এখানে তিনটির সমবেত চেষ্টা একদেশাভিমুখী। গায়ক যখন গীত গায়, তখন সুর, লয়, তাল, মান প্রভৃতি নানা বিষয় তাহার আবৃত্তি-কার্য্যে সহায়তা করে। আবার এমনও হইতে পারে যে ক হইতে খ, খ হইতে গ, গ হইতে ঘ এবং ঘ হইতে ঙ এর কথা স্মরণ হয়; এবং প হইতে ফ, ফ হইতে ব, ব হইতে ভ এবং ভ হইতে ম এর কথা মনে হয়। সুতরাং ক এবং প একসঙ্গে উপস্থিত হইলে অতি সহজেই ম-এর কথা মনে হয়। এখানে ক এবং প-এর গতি একদেশাভিমুখী। কখন-কখন এমনও দেখা যায় যে, 'ক'-এর সঙ্গ 'খ'-এর সহিত, খ—গ-এর সহিত, গ—ঘ-এর সহিত এবং ঘ-এর সঙ্গ ঙ-এর সহিত। কিন্তু ক-এর সঙ্গ প-এর সহিত প—ফ-এর সহিত, ফ—ব-এর সহিত, এবং ব-এর সঙ্গ ভ-এর সহিতও থাকিতে পারে। এরূপ স্থলে ক বা ক উপস্থিত হইলে খ এর কথা মনে আসিতে পারে; আবার প-এর কথাও মনে আসিতে পারে। এখানে ক-এর গতি ম-এর দিকেও বটে, আবার ভ-এর দিকেও বটে। কিন্তু

একসঙ্গেই ম এবং ত স্মরণ-পথে আসিতে পারে না। ক দুইটি বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। এখানে ক-এর সঙ্গ বৈমুখী সঙ্গ। 'ক'-এর আসক্তি যে দিকে প্রবল হইবে, সে দিকেই ধাবিত হইবে। বালক একটি কবিতা আবৃত্তি করিতে-করিতে সুরের সাদৃশ্য হেতু অন্য কবিতা আবৃত্তি করিয়া থাকে।

বালক তাহার মাকে দুধের সহিত জল মিশাইতে দেখে। এইরূপ কয়েকবার দেখিতে-দেখিতে দুইটি ধারণা এমন ভাবে সংযুক্ত হয় যে, একটী ব্যতীত আর একটী থাকে না। দুধ দেখিলেই বালকের জল মনে পড়ে। এরূপ সংযোগ যৌগপদ্য সঙ্গ। এখানে বিশেষ কোন মানসিক ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই। একটী ধারণা যেন আর একটীতে "লাগিয়া" যাইতেছে। এরূপ সংস্রবের কোন প্রকৃত অর্থ নাই। এরূপ সংস্রবের কোন বস্তুগত কারণ নাই। জল এবং দুধ বারংবার একস্থানে দেখিতেছি বলিয়া, একটী দেখিলে আর-একটী মনে হয়। জল এবং দুধের মধ্যে বালক এমন কিছু দেখিতেছে না, যাহা পরস্পর পরস্পরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতেছে। কিন্তু পরে বালক দেখিল যে, জল প্রবাহিত হয়, দুগ্ধও প্রবাহিত হয়; জলকে যে পাত্রে রাখা যায়, সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করে; দুগ্ধও তদ্রূপ। এইপ্রকারে এই দুইটি পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিতে পাইল। দুগ্ধ তরল পদার্থ, জলও তরল পদার্থ। অতএব সাদৃশ্য সঙ্গ হেতুই এখন একটী দেখিলে আর একটী মনে হয়। সাদৃশ্যই দুইটি ধারণার মিলন-রজ্জু। এখন ইহাদের সম্মিলনের যথার্থ অর্থ নিরূপিত হইল—ইহাদের প্রকৃতিগত কারণ নির্ণীত হইল। এইরূপ কারণ নির্ণয়ে বালককে পর্য্যবেক্ষণ, স্মরণ এবং যুক্তির আশ্রয় লইতে হইয়াছে। বালক এখন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জল এবং দুধের মত অন্য কোন তরল পদার্থ আছে কি না—অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেও পারে। অতএব যৌগপদ্য সম্বন্ধ অপেক্ষা সাদৃশ্য সম্বন্ধ স্থাপন শ্রেয়ঃ।—যৌগপদ্য সঙ্গ অপেক্ষা সাদৃশ্য-সঙ্গ-লব্ধ স্মৃতি অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। একজন শিক্ষক তাঁহার ছাত্রকে বলিলেন, পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল এবং ইহার পরিধি ২৫০০০ মাইল। ছাত্র এই দুইটি তথ্য "মুখস্থ" করিয়া লইল। এখানে বালকের ধারণা যৌগপদ্য সঙ্গ-সম্ভূত। আর একজন শিক্ষক তাঁহার ছাত্রকে বলিলেন যে, পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত। পরে একটি কমলা দিয়া তাহার পরিধি মাপিতে দিলেন; পরে কমলাটি কাটিয়া তাহার ব্যাসটিও মাপিতে বলিলেন। পরে লেবুর পরিধি এবং ব্যাসের কি সম্বন্ধ স্থির করিতে বলিলেন। বালক দেখিল যে, ব্যাস অপেক্ষা পরিধি তিনগুণের কিছু বেশী। আবার আর-একটি গোলাকার পদার্থ দিয়া পুনরায় ঐরূপ করিতে বলিলেন। এবারেও ছাত্র দেখিলে যে, ব্যাস অপেক্ষা পরিধি তিনগুণের কিঞ্চিদধিক। শিক্ষক এখন বলিলেন যে, পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল। বালক তৎক্ষণাৎ বলিল, তবে পৃথিবীর পরিধি চব্বিশ হাজারের কিছু বেশী। এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, প্রথম ছাত্র অপেক্ষা দ্বিতীয় ছাত্রের ধারণা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে। আরও, প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় উপায়ে বুদ্ধিবৃত্তিরও অধিকতর উৎকর্ষ সাধন হয়।

তিন বৎসর বয়সের পূর্ব্বে মানব-জীবনের ঘটনাবলি কাহারও স্মরণ থাকে না; এই জন্য অনেকেই মনে করেন যে, ঐ সময়ের পূর্ব্বে কাহারও স্মৃতিশক্তির বিকাশ হয় না। কিন্তু তিন বৎসরের শিশু ত অনেক পরিমাণে তাহার মাতৃভাষা আয়ত্ত করিয়া থাকে, এবং কোন ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে নিশ্চয়ই মেধাশক্তি আবশ্যক। আরও, জ্ঞানের প্রারম্ভের সঙ্গে-সঙ্গেই মানুষ বর্ত্তমানের সহিত অতীতের তুলনা করিতে সমর্থ হয়, বর্ত্তমানের সহিত অতীতের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য নিরূপণে সমর্থ হয়। অতীতের জ্ঞান ব্যতীত বর্ত্তমানের সহিত অতীতের তুলনা হইতে পারে না। এবং মেধাশক্তি ব্যতীত অতীতের জ্ঞানও অসম্ভব। অতএব জীবনের প্রথম সূচনা হইতেই মেধাশক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয়। চতুর্থ হইতে নবম বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত মানুষের মন যেন একবারে নির্মুক্ত; ইন্দ্রিয়গণ সতত জ্ঞান অর্জ্জনে সচেষ্ট, আর, মেধাশক্তি অর্জিত জ্ঞানকে সংরক্ষণে তৎপর। এই সময় মনের গ্রাহিকা-শক্তি অত্যন্ত প্রবল। যাহা যেমন ভাবে গ্রহণ করিতেছে, তাহার তেমনি প্রতিবিম্ব মনোমধ্যে থাকিয়া যাইতেছে। মন যেন এখন একপ্রকার নিশ্চেষ্ট। বাহিরের বস্তু সকল ইন্দ্রিয়-গ্রামের ভিতর দিয়া আপনা-আপনি মনোরাজ্য-মধ্যে প্রবেশ করে এবং আপনার স্থান আপনি করিয়া লয়। এই সময়ের ভাবসমূহ প্রায়ই যৌগপদ্য সঙ্গ-সংবদ্ধ। পরে দশম হইতে ষোড়শ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত যুক্তি-

তর্ক-শক্তির বিকাশ হইতে থাকে। এখন হইতে অর্থহীন ভাষা বা বিষয় "মুখস্থ" করিবার স্পৃহা ক্রমশঃই কমিয়া যায়। মন এখন বিষয়সমূহের মধ্যে সাদৃশ্য-বন্ধন অনুসন্ধানে তৎপর। এখন যৌগপদ্য সঙ্গ অপেক্ষা সাদৃশ্য সঙ্গের প্রাধান্য অধিক।

গ্রহণ, ধারণ এবং স্মরণ এই তিনটি মেধাশক্তির উপকরণ। মেধাশক্তি সকল মানুষের একরকম নহে। কেহ অতি সহজেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়,—যাহা গ্রহণ করে, তাহা বহুক্ষণ চিত্তমধ্যে ধারণ করিতে পারে, এবং যেমনটি গ্রহণ করিয়াছে, তেমনটি অবিকল স্মরণ করিতে পারে। কেহ-কেহ অতি শীঘ্রই গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের ধারণাশক্তি অতি কম। শীঘ্র গ্রহণ করে কিন্তু শীঘ্রই ভুলিয়া যায়। আবার কাহাকে-কাহাকেও গ্রহণ করিতে বেগ পাইতে হয়; কিন্তু যাহা একবার গ্রহণ করিয়াছে, তাহা আর শীঘ্র ভুলিয়া যায় না, এবং ইহাদের স্মরণ-ক্রিয়া মন্থর হইলেও প্রমাদ-শূন্য। আর একদল লোক আছে, যাহারা বহু কষ্টে কোন বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেও ধারণাশক্তির একান্ত অভাব হেতু, স্মরণ করিতে সমর্থ হয় না।

বিধিলিপি

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

একবিংশ পরিচ্ছেদ

উদ্বেগপূর্ণ দিন-রাত্রি শীঘ্র কাটে না; তবুও কাত্যায়নীর সে রাত্রি কাটিয়া গেল। কিন্তু সেও মহেন্দ্র প্রভৃতির আর কোন খবর পাইল না, বা রমাও তাহাকে কোন সংবাদ দিল না। প্রভাতটা কোন রূপে অপেক্ষা করিয়া দ্বিপ্রহরে কাত্যায়নী রমার বৃদ্ধা ঝিকে রমার নিকটে পাঠাইয়া দিল। সে নিজে আর তাহার কাছে যাইতে পারিতেছিল না। ঝি ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, রমা সকালেই ঠাকুরবাড়ী গিয়াছে, এখনো ফিরিয়া আসে নাই। কাত্যায়নী তাহার সহিত যাইতে ইচ্ছা করে তো চলুক, সে এখনি রমার নিকটে যাইবে। জমিদার না কি সপুত্র কন্যা কোথায় গিয়াছেন, এবং আজ দেওয়ান মহাশয়ও অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। গ্রামের মধ্যে কি একটা গুজবও অল্পে-অল্পে মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। কে না কি থানা হইতে শুনিয়াছে যে, জমিদার না কি কি একটা বিপদে পড়িয়াছেন। জমিদার-বাড়ীতে অবশ্য একথার কোন প্রসঙ্গ নাই,—বাহিরের খবর এখনো বোধ হয় সেখানে পৌঁছে নাই; কিন্তু রমা যে এই অসময়ে ঠাকুরবাড়ী গিয়াছে, ইহাতেই তাহার মন অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। সে আর কাত্যায়নীর নিকটে থাকিতে পারিবে না, খবরটা মাত্র দিতে আসিয়াছে। বলিতে-বলিতে বৃদ্ধা অজ্ঞাত আশঙ্কায় যেন ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

কাত্যায়নী তাহার সহিত ঠাকুরবাড়ীর নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গিয়া দেখিল, রমা ঠাকুরের বৈকালিক আরতির দ্রব্যাদি লইয়া গুছাইবার চেষ্টা করিতেছে। ঠাকুরবাড়ীর সেবক-সেবিকারা সকলেই নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রাসুখে নিমগ্ন। ঠাকুরের ও মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। কেবল রমাই সে কক্ষে একা বিশ্রামহীন ভাবে কার্য্যের সন্ধানে উৎসুক। তাহার সঙ্গী ঠাকুরাণীটিও মন্দিরের গর্ভ-গৃহের সম্মুখস্থ বারান্দায় শীতল, শ্বেত মর্ম্মর-শয্যায় আঁচল পাতিয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছেন।

কাত্যায়নীকে দেখিয়া রমা বলিল, "এলো।" তার পরে ঝিয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "এত রোদ্দুরে তুমি যে বড় শোওনি মাসি?" ঝি সে কথার উত্তর না দিয়া দ্বারের নিকটে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "তুমি এখনো কি খাওনি?"

"খেয়েছি বৈ কি, ঠাকুরের প্রসাদ খেতে আজ ইচ্ছে হয়েছিল বেশ। আর এই রোদ্দুরে যেতে ইচ্ছে করল না; বসে-বসে আরতির বাসনগুলো দেখ্‌ছি। ধূপদানটাতে কি এমন ময়লা পড়েছে! মাসি, একটু জিরিয়ে নিয়ে,

এই প্রদীপের বাড়টা ভাল করে মেজে দিস্ তো। এরও ফাঁকে-ফাঁকে ময়লা ধরেছে। চাটি শল্‌তে পাকাও তো।" বলিয়া রমা খানিকটা তুলা কাত্যায়নীর দিকে ফেলিয়া দিল। কাত্যায়নী সেটা হাতে তুলিয়া লইয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া পড়িল। বৃদ্ধা কি এইবারে যেন একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "আর বাছা, আমার কি চোখের সেই 'ঘুং' আছে যে, ঐ সব ফাঁকে-ফাঁকের ময়লা আমার চোখে পড়বে? ছুঁড়িটে গেল কোথায়? শুয়েছে বুঝি? দেখি তাকে দিয়ে ঐগুলো তুলিয়ে নি।" বৃদ্ধা তাহার নাতিনীর সন্ধানে উঠিয়া গেল।

কাত্যায়নী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, একেবারে রমার কাঁধে হাত দিয়া নিকটে টানিয়া লইল; রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "বল আমায়, কি খবর।" রমা তাহার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া যেন সাম্‌লাইয়া লইল; তার পরে ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করিল, "বাবা, দাদা পুলিসের হাতে পড়েছেন। ন-গাঁয়ের জমিদারের বাড়ীর দুটি লোক—একটা একেবারে খুন (বলিতে-বলিতে রমা কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল), একটা আধখুন হয়ে তাদের বাগানের বাইরে পড়েছিল—তাদেরই কাছে বাবা, দাদা দাঁড়িয়েছিলেন—এই রকম অবস্থায় ন-গাঁয়ের জমিদার পুলিস দিয়ে তাঁদের ধরিয়েছে। যদিও বাবার সঙ্গে আমাদের এদিকের দারোগাও ছিল, কিন্তু সামনে দুটো খুন, আর বাবারই নাম-লেখা পিস্তল সেখানে পড়ে,—ওদের বাড়ীর মেয়েও একটি চুরি গেছে! এমন ব্যাপারে তাঁরা তো ছাড়া পেতে পারেন না। তিনিই যেন মেয়েটিকে লোক দিয়ে চুরি করিয়েছেন, লোক দুটিও সেই সূত্রে খুন জখম হয়েছে,—কাণ্ড এইই দাঁড়াচ্ছে।"

"আর মহেন্দ্র? সে কোথায়?"

"তাঁর কোন খবর শুনিনি। তাঁকে বোধ হয় কেউ ওখানে দেখেনি!"

"কেউ দেখেনি? নিশ্চয় দেখেছে। সে নৈলে এ কাণ্ড কে বাধালে? নিশ্চয়,—নিশ্চয় সেই! কমলাকেই বা কে চুরি করে নিয়ে গেল?" রমা এতক্ষণ চোখ বুজিয়া কথাগুলা কহিতেছিল,—কাত্যায়নীর তীব্র স্বরে চোখ মেলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিল; এবং হস্ত দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিল, "ঠাণ্ডা হও, আস্তে কথা বল। বাবা এ ব্যাপার বাইরের কাকপক্ষীকে জানাতে নিষেধ করেছেন।"

"কি আশ্চর্য্য! তাঁদের এই বিপদ—এ কি কারও অজানিত থাকবে?" "না। কিন্তু মহেন্দ্রের নাম মুখেও এনো না। আমাদের কেউ যখন তার নাম করছে না, তখন হয় ত তাকে কেউ সেখানে দেখেনি। আর কমলাকে তো আমরাই চুরি করতে সত্যই পাঠিয়েছিলাম,—মহেন্দ্রবাবু যে তাকে শুদ্ধ নিয়ে ওর মধ্যে ধরা পড়েন নি, সে একটু ভালই হয়েছে।"

"ভালই হয়েছে? সে কেন তবে কমলাকে নিয়ে আমাদের কাছে এল না? কার কাছে নিরঞ্জনকে আমরা পাঠিয়েছিলাম? সে কেন এমন সময়ে লুকুলো? সে কি বুঝতে পারছে না যে, তার এই পালানো বা লুকিয়ে থাকার ফলে কি দাঁড়াতে পারে?" আবার কাত্যায়নীর আর্ত্ত কণ্ঠস্বরকে সংযত করিবার জন্য রমা তাহার মুখে আচ্ছাদন করিয়া বলিল, "বিপদে তাঁর মতিভ্রম হয়েছে হয় ত; কি করা উচিত ঠিক্ করতে পারছেন না। যখন পারবেন, তখন হয় ত আসবেন।"

আবার কাত্যায়নী অধীর কণ্ঠে বলিল, "তা আসবে কি? তার কাছেই যে এ ব্যাপারের সমস্ত প্রমাণ আছে। সে যদি আর না আসে, কি হবে তা'হলে?"

রমা আবার চোখ্ বুজিয়া চুপি-চুপি যেন নিজ মনে বলিল, "যা' করবে তুমি।"

"কে? তোমার গোবিন্দদেব? তিনি ছাড়া মানুষের আর কোন কিছু সাধ্য নেই তা'হলে?"

"না।" "কোন উপায় নেই? কিচ্ছু না?" "আছে ঐ,—তাঁর যা ইচ্ছা।" কাত্যায়নী কিছুক্ষণ নিঃশব্দ ও নিস্পন্দভাবে বসিয়া থাকিয়া, সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল্লাম।"

"কোথায়?" বলিয়া রমা সচকিতে তাহার হস্ত ধরিল। নিকটে টানিয়া বসাইয়া, সজোরে তাহার দুই হাত দুই হাতে ধরিয়া দৃঢ় স্বরে বলিল, "কোথায় যাবে? মানুষের জন্য কোথাও আশ্রয় নেই। যদি কিছু থাকে তো এই দুয়োরেই আছে। বাবা, দাদার জামিনের জন্য দেওয়ানজী টাকা নিয়ে ছুটেছেন—আরও যত যা মানুষের করবার, কিছুরই ত্রুটি হবে না—কিন্তু আসল কথাটা কি ভুলে যাচ্ছ? খুন হয়ে গেছে একটা। সত্য-স্বরূপের রাজ্যে এর সত্য কি লুকিয়ে থাকবে বেশী দিন মনে করছ? এখন

না হয় বাবা, দাদার ঘাড়েই এর ধার পড়েছে;—তবু সত্য যা' তা' কি একদিন আত্মপ্রকাশ করবে না? একটা প্রাণ গেছে,—সেই প্রাণের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মানুষ যখন তার বিচারের দাবী করবে তখন—তখন কি হবে? সে দিনের জন্ত কার কাছে আশ্রয় নেবে? কোথায় তার সান্ত্বনা?—একমাত্র এইখানেই আত্ম-সমর্পণ নয় কি?" "না,—না"—কাত্যায়নী আর্ত্ত কণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল,—"কিসের আশ্রয়?—কিসের সান্ত্বনা? কে তা চায়? মানুষ নিজের কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করবে, তাতে কিসের ভয়? বরং তা' না পেলেই বল্‌তে হবে যে, জগতে ন্যায়—ধর্ম্ম—সত্য, এসবই মানুষের মনগড়া নীতি। জগতের আগাগোড়া সবই মিথ্যে।"

"থাম,—ওগো থাম।" "না,—না—" কাত্যায়নী ছুটিয়া মন্দিরের বাহির হইয়া নিজের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল, কাহারও অপেক্ষা করিল না। রমা একবার উঠিতে গেল, আবার তখনই বসিয়া পড়িয়া নিঃশব্দে মন্দির-তলে মাথা নোয়াইয়া পড়িয়া রহিল।

• • •

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে কাত্যায়নীর অঙ্গনটুকু ছাইয়া ফেলিল। তাহার মাতার তুলসী-মঞ্চে সেদিন আর প্রদীপ পড়ে নাই। বৃদ্ধা দাসীও তখন পর্য্যন্ত জমিদার-বাড়ী হইতে ফিরে নাই। অন্ধকার কক্ষে পড়িয়া-পড়িয়াই কাত্যায়নী শুনিল, গোবিন্দদেবের আরতির বাদ্য বাজিয়া-বাজিয়া থামিয়া গেল। কাত্যায়নীর মনে হইল, সে শব্দটার যেন অন্য দিনের সঙ্গে কিছু প্রভেদ আছে। যেন একটা অব্যক্ত রোদন—কিন্তু কেন? কিসের জন্ত? মানুষকে নিজ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে—তাহাতে কিসের কাতরতা? কেবল সত্যের, ন্যায়ের, দয়ার, ধর্ম্মের জয় হউক,—কাত্যায়নীর দৃঢ়দৃষ্টে যেন আর তাদের উপরও আস্থা না হারাইতে হয়। "কাত্যায়নি!" সচকিতে কাত্যায়নী উঠিয়া বসিল, "কে?"

"আমি, কামাখ্যানাথ। বাইরে এসো।"

একটু পরে কাত্যায়নী ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখনো তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। একটা আসনের জন্ত সে চারিদিকে চাহিতেই, কামাখ্যানাথ বলিলেন, "আসন থাক্, একা আছ তো? রমার কি তো ঐখানেই আছে, কিন্তু তোমার কি?"

কাত্যায়নী ক্ষীণ স্বরে বলিল "কি জানি,—বেড়াতে গেছে বুঝি। কখন এলেন?"

"খানিকক্ষণ হল এসেছি। কাত্যায়নি, মহেন্দ্রের কোন খবর জান?"

"না।" "মেয়েটিকে সে তোমার কাছে রাখ্‌তে আসেনি?" "না।" কামাখ্যানাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন, "যদি তার কোন সংবাদ পাও, যদি সে তোমার কাছে আসে, আমাকে জানাতে ভুলো না। নিজে গিয়ে, কিম্বা রমাকে দিয়ে তখনি খবর দিও। আমি না জান্‌তেই যেন সে চলে না যায়।" কাত্যায়নী এইবারে চোখ তুলিয়া কামাখ্যানাথের পানে চাহিল। ঈষৎ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "বুঝতে পারছি, তার দ্বারাই আপনার এ বিপদ ঘটেছে, তাকে পেলেই এ বিভ্রাট কেটে যায়। কিন্তু আমারও কি আপনি বলেন যে, বোন্ হয়ে তাকে আমি ধরিয়ে দেব?" বিস্মিত হইয়া কামাখ্যানাথ বলিলেন, "ধরিয়ে দেবে? সে কি?" "আপনার কাছে তাকে দেওয়া অর্থে তাকে ধরিয়ে দেওয়াই নয় কি? আমি কি বুঝ্‌ছি না এই ব্যাপারে আদত দোষী কে?—কার হঠকারিতায় এত বড় কাণ্ড ঘটেছে? কিন্তু বুদ্ধি ও ভাগ্যের দোষে সে আপনার এতখানি হানি কর্‌লেও, আমাকে—" "কাত্যায়নি, আমার হানি করার চেয়ে সে নিজের হানিই অনেক বেশী করেছে। তাকে না পাওয়া গেলে,—আমিই না হয় আমার লোক দিয়ে মেয়েটা চুরি করার জন্ত এই খুনোখুনি বাধিয়েছি,—এই প্রমাণে, বড় জোর আমার কিছুদিন জেল হবে। কিন্তু যদি সে ধরা প'ড়ে—থাক্ এসব কথা, তাকে রক্ষা করার জন্তই তার খবর আমায় দিতে বল্‌ছি; ধরিয়ে দেবার জন্ত যে নয়, একথা তুমি অনায়াসে বিশ্বাস কর্‌তে পার।"

কাত্যায়নী মাথা হেঁট করিল। এ অবিশ্বাস তাহার অন্তরে আজ যে কোথা হইতে আসিল, তাহা নিজেই যেন সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া কামাখ্যানাথ আবার বলিলেন, "এখনো যদি সে আমার কাছে আসে, এখনো যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে তাকে সঙ্গে করে সাক্ষী সাবুদ সমস্ত নিয়ে উপস্থিত হতে পারি, হয় ত কিছু উপায় হয়। ঐ মেয়েটি যে নবগ্রামের জমিদারের সম্পত্তির

অর্দ্ধাংশের অধিকারিণী, এ কথা যে ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় মহেন্দ্রও জান্‌ত না, আর অত্যাচারের হাত হ'তে মেয়েটিকে বাঁচাবার জন্যই যে সে এই পথ নিয়েছিল, সে সব উপযুক্ত প্রমাণের সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দাখিল কর্‌লে, খুব সম্ভব তার এই অতর্কিতের অপরাধটার ভারও কিছু লঘু হয়ে যেত।" কাত্যায়নী একটু লজ্জিত মৃদুস্বরে বলিল, "বুঝ্‌লাম। কিন্তু আপনারও সে তো বড় কম ক্ষতি করে নি। যার কৃত কার্য্যে আপনার এতখানি বিপদ আর এমন সম্ভ্রমহানি হয়েছে, তার দোষের ভার লঘু করবার জন্য আপনি কেন এত ব্যস্ত হচ্ছেন? তাকে রক্ষা করার আপনার কি দরকার? বরং সে ধরা পড়্‌লেই তো আপনি সকল বিপদ্ হ'তে মুক্তি পান্।" "কাত্যায়নি, সেই মহাবিপদের ভয়েই যে আমি অস্থির হয়েছি। সে যদি একেবারে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, সেই আমার সবচেয়ে বড় বিপদ। তুমি তাকে বুঝিয়ো—"

"আগে আপনিই আমায় বোঝান্। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, ও পক্ষ থেকে প্রমাণ হয়েছে যে, আপনারা খুন করেন নি, সেই করেছে। কেবল আপনারা তার চুরির সাহায্য কর্‌তে যাওয়ায়, এই পর্য্যন্ত প্রমাণ হ'তে পারে যে, মেয়েটির বিষয়ের লোভে আপনিও তাকে চুরি করাতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু যখন আপনি এর মধ্যে এত সন্ধান পেয়েছেন যে, সেই মেয়েটিকে নিয়ে এত ষড়যন্ত্রের মূল কারণ এই, তখন কি এটুকুও প্রমাণ করাতে পার্‌বেন না যে, তাদেরই চুরির আর অন্যায়ের প্রতিরোধ করবার জন্যেই আপনি গিয়েছিলেন?" "খুব সম্ভব তাও পার্‌ব; কেন না তোমার মুখে ব্যাপার শুনে, আর নিরঞ্জন-মহেন্দ্রের হঠকারিতার আশঙ্কায়,—বিশেষ, এমন জটিল পথে অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে যাওয়ার বিষময় ফলের সন্দেহে আমি,—যিনি আমাদের এ দিকের দারোগা, ভাগ্যক্রমে তিনি তখন এই গ্রামেই উপস্থিত ছিলেন,—তাঁকে এ ব্যাপারের কতক খবর দিয়ে যাই। আমি সেখানে উপস্থিত হওয়ার একটু পরেই তিনিও সেখানে উপস্থিত হন। আমি যে মন্দ উদ্দেশ্যে যাইনি, এর এই একটা মস্ত প্রমাণই আছে।"

"তবে আর কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন? মহেন্দ্রের যা হবার হোক্, আপনি নিজে নিরাপদ হবার চেষ্টা করুন।" কামাখ্যানাথ একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "তুমি তা'হলে সবই ভুলে গেছ কাত্যায়নি! তোমার বাবা—তোমার মা—সেই মুমূর্ষু ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী মহেন্দ্রকে কি করে আমার হাতে সমর্পণ করে যান, তা কি তোমার মনে নেই? তাকে সর্ব্ব বিপদ থেকে প্রাণপণ করেও রক্ষা কর্‌তে আমি বাধ্য। আজ যদি নিরঞ্জনের কোন বিপদে আমি নিশ্চেষ্ট থাকি, তাতে আমি ধর্ম্মে পতিত হব না; কিন্তু মহেন্দ্রের অনিষ্ট নিবারণ কর্‌তে চেষ্টা না কর্‌লে, আমার সর্ব্বনাশ হবে।" কাত্যায়নী নিঃশব্দে রহিল, কেবল দেখিতে-দেখিতে তাহার জ্বালাময় উজ্জ্বল চক্ষু অশ্রুর আভাষে নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আপনার ছেলে নিরঞ্জন,—সে এখন কোথায়?"

"ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে। আমাদের ভাগ্যক্রমে এবারও তিনি শিকারে বেরিয়ে নবগ্রামের জমিদারদেরই বাঙ্‌লায় ছিলেন। ব্যাপার একেবারে তাঁর কাছেই পৌঁছেছে। গতবার শোণপুরের হাঙ্গামায় তিনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হ'য়ে আছেন; তার ওপরে এত বড় অপরাধে এমন বিচলিত হয়ে উঠেছেন যে, নিজে তখনি সমস্ত তদন্ত ও বিচারের ব্যবস্থা করেছেন। তাই এর নিষ্পত্তি হ'তে বেশী দেরীও হবে না। কালই আমায় সহরে যেতে হবে, এবং তার পরেই বিচার আরম্ভ হবে। ম্যাজিষ্ট্রেট আজই মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়ে দেবেন। নিরঞ্জন এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হ'তে পারেনি।" "কি হয়েছিল তার?" "ঘোড়া থেকে প'ড়ে গিয়েছিল।" "আমি আপনাকে পাঠানতেই কি কিছু গণ্ডগোল ঘটে গেল?" "আদত ব্যাপারটা আগেই ঘটে গিয়েছিল; তবে মহেন্দ্র, নিরঞ্জন আর কমলাকে নিয়ে বোধ হয় আমাদের কাছেই আস্‌ত; আমি গিয়ে পড়ায় সেইটাই গণ্ডগোল হ'য়ে গেল। সে অতর্কিত লজ্জায় কিম্বা ভয়ে কমলাকে নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।" কাত্যায়নী মৃদুস্বরে বলিল, "সেই আদত ব্যাপারটা সেই তো করেছে?" "নিরঞ্জন তখন অজ্ঞান, তবে এইই সম্ভব বটে। কেন না আমারই কাছারীর পিস্তল সেখানে পড়ে ছিল,—খুব সম্ভব মহেন্দ্রই সেটা হাতে করে এনেছে এবং তার দ্বারাই—"

"কেন নিরঞ্জন অজ্ঞান হয়েছিল, তা কিছু জানেন?" "শুনলাম, তাকে কমলাকে উদ্ধার করতে দেখে মহেন্দ্র খুব অসন্তুষ্ট হয়; সেই বাক্-বিতণ্ডায় দেরী হ'য়ে যাওয়ায়,

ও-পক্ষের লোকও এসে পড়ে; আর ঘোড়াকে আঘাত করায় নিরঞ্জন প'ড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়। তার পরে খুব সম্ভব নিজেরা বিপদ হ'তে ত্রাণ পাবার জন্য মহেন্দ্র অতর্কিতে এই বিষম কাণ্ড ক'রে বসেছে।" কাত্যায়নী খানিকক্ষণ কামাখ্যানাথের পানে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, শেষে বলিল, "আপনি বল্‌ছেন, সবই সে অতর্কিতে করে ফেলেছে; কিন্তু সব কথাই কি আপনি ঠিক জানেন? শোণপুরের ব্যাপার আপনার কাছে পিপড়ের কামড়ের মতও বোধ হয়নি দেখে, সে যদি আপনার ওপরে কোন বিকৃত ভাব পোষণ করে থাকে, যার জন্য আপনাদের সাহায্য নেওয়ার বা তার বন্ধু নিরঞ্জনের কাছেও তার সেই মনোভাব বেড়েই গিয়ে থাকে, তা'হলেও কি বল্‌তে চান্ যে, সে এসব কাজ অতর্কিতেই করে ফেলেছে?" "পরের মনের ভাবের কথা কেউ সম্পূর্ণ ঠিক্ ক'রে না বল্‌তে পারলেও, কাজগুলো যে তার অতর্কিতেই করা হয়ে যাচ্ছে, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। শোণপুরের ব্যাপারের কথা বল্‌ছ—আমার ওপর তার কোন বিদ্বেষ ভাব থাক্‌লেও কাজটা হঠকারিতারই ফল মাত্র।" "আপনার কথার ভাবে বোধ হচ্ছে, মহেন্দ্রের এখনকার মনের এই ভাবের কথা আপনি বুঝতে পেরেছিলেন।" কামাখ্যানাথ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ।"

কাত্যায়নী ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া সহসা উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "এ জেনেও তার হাতে আপনি এত ক্ষমতা তবে কেন রেখেছিলেন? সে আপনার পিস্তলও ব্যবহার করতে পারে—এমন অধিকার তাকে তবে কেন আপনি দিয়েছিলেন? কেন এমন কাজ করলেন?"

কামাখ্যানাথ তেমনি ভাবেই বলিলেন—"ভেবেছিলাম, তার ওপর আমার এই বিশ্বাসে সে আপনিই লজ্জিত হ'য়ে ফিরে আস্‌বে। শোণপুরের ব্যাপারে তার হঠকারিতার প্রমাণ হয়ে গেলেও, তার হাতে এই উদ্দেশ্যেই এত ক্ষমতা রেখেছিলাম যে, বিশ্বাস ক'রে যার হাতে মাথা রাখা যায়, সে বিবেকের বশেও অন্ততঃ সৎপথে আসে।" "এতখানি মনুষ্যত্বও তাতে আছে, এও কি বিশ্বাস করেন আপনি?" "করি কাত্যায়নি। এমন কি, এখনো ভাবি যে, সে আমায় এতখানি বিপদে যে ফেল্‌ছায় ফেলেছে, এ কখনই নয়। হঠাৎ এত বড় একটা সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাওয়ায়, লজ্জায় ও ভয়ের বিমূঢ়তাতেই সে লুকিয়ে আছে। হয় ত এর যা' ফল ফলবে, তা' তার কাণে গেলে—কিন্তু সেই আমার সবচেয়ে ভয়, কাত্যায়নি! তার এই অনুপস্থিতিতে—কমলাকে না পাওয়া যাওয়াতে—আমিই এ কাণ্ডের মূল নায়ক ভেবে, আমার ওপরে যত দ্বেষই বা'হোক্, তাতে আমি কাতর নই। কেবল, সে একেবারে পুলিশের হাতে না ধরা পড়ে। তা'হলে আর তাকে কিছুতেই বাঁচাতে পারব না। তাই তোমায় বল্‌তে এসেছি—তার দিতে এসেছি—দেখো, মহেন্দ্র কোন কাণ্ড করে না বসে। তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই সে দেখা কর্‌তে আস্‌বে,—ব'লো তাকে—যেন সে দেওয়ানের কাছে যায়। তার যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের সাম্‌নে যেতে একান্তই অনিচ্ছা হয়, দেওয়ান তাকে সেই রকম ভাবেই নিরাপদে রাখ্‌বে,—আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করে রেখে যাচ্ছি।"

কাত্যায়নী সত্রাসে বলিয়া উঠিল, "আপনি,—আপনি আবার কোথায় যাবেন?" "নিরঞ্জনকে কোথায় রেখে এসেছি, তা কি ভুলে যাচ্ছ? কেবল মহেন্দ্রের ভাবনাতেই এমনি ক'রে এসেছি। এখন তার আর আমার ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তেই যেতে হচ্ছে, ফলাফল পরের কথা; রমাকে তুমি দেখো।" "একটু দাঁড়ান, আর একটু—" কামাখ্যানাথ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "ভগবানে নির্ভর কর। রমার কাছে থেক একটু-একটু। আর, মহেন্দ্রকে ভাল করে বুঝিও। যা হয়ে গেছে তার আর উপায় নেই; কিন্তু এখনো যেন আর সে নিজের মনের বেগে না চলে; যেন দেওয়ানের কাছে যায়—" কাত্যায়নী সবেগে বলিয়া উঠিল—"আপনি এখনো তারই কথা ভাব্‌ছেন? যে এমন করে সকলের সর্ব্বনাশ কর্‌লে, তার জন্য আর আপনি নিজের মন্দ কর্‌বেন না। তার ভাগ্যে যা ঘট্‌বার ঘট্‌ক, কেবল আপনি, নিজেদের যাতে মঙ্গল হয়, সেই উপায় দেখুন।" কামাখ্যানাথ ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তা যে আর হয় না কাত্যায়নি! তোমার আর মহেন্দ্রের চিন্তা ত্যাগ করার আমার উপায় কই? আগে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা ক'রে তার পরে অন্য কথা।" "না—না, তা আপনি আর করতে পাবেন না। যাদের জন্য আপনি এত করছেন, তারা কতখানি অকৃতজ্ঞ, তা কি আপনি জানেন? মহেন্দ্র যে আপনার ওপর কতখানি—" কামাখ্যানাথ হস্ত তুলিয়া কাত্যায়নীকে বাধা দিলেন, "থাক্, এখন আর ওকথা নয় কাত্যায়নি, আমি

সবই জানি। আর এ অসঙ্গতও নয়। তার ভাগ্য-চালিত হয়ে তুমি আর তোমার পিতা দুজনেই সে হতভাগাকে এই পথে চালিয়েছ! নৈলে ভগবান-দত্ত সৎ বস্তু তার মধ্যে যথেষ্টই ছিল। আমারও মস্তিভ্রম—তার হাতে এতখানি স্বাধীন শক্তি দিয়েছিলাম। তাগোর ওপর তার সদ্‌বুদ্ধি কাজ ক'রে উঠ্‌তে পারছে না দেখেও কেন এ ভুল করলাম! ভুলে গেলাম যে, অধঃপতনের পথ বড় পিছল। একবার সে পথে নাম্‌লে, সেই দিকেই গতির বেগ বাড়্‌তে থাকে। আবার এই মারাত্মক ভুলেই বুঝি তার এত সর্ব্বনাশ হ'য়ে দাঁড়াল। আমি এখন চল্লাম তবে; সাবধানে থেক', হয় ত আবার দেখা হবে।"

কাত্যায়নী নিঃশব্দে প্রস্তর-প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিল; প্রণাম পর্য্যন্ত করিল না,—কেবল স্থিরদৃষ্টিতে সে কামাখ্যানাথের দিকে চাহিয়া রহিল।

অঙ্গনে নামিয়া কামাখ্যানাথ বলিলেন,—"এতখানি রাত্রি পর্য্যন্ত একা আছ, কৈ তোমার ঝি এখনো আসেনি? দেওয়ানকে বলে যাব, যেন অন্য ভাল লোকের ব্যবস্থা করে।" কাত্যায়নী কষ্টে উচ্চারণ করিল, "না, সেই ঝিই যেন থাকে।" "আচ্ছা, তাকেই বিশেষ করে সাবধানে থাক্‌তে বলে দেওয়াব। ভাল কথা, এসব বিষয়ে রমা ছাড়া আর কারও কাছে কোন প্রসঙ্গ তুল না। মহেন্দ্রের পালানোর বিষয়ে তো একেবারেই না।" কামাখ্যানাথ চলিয়া গেলেন। কাত্যায়নীর ঝি এতক্ষণ দ্বারের পার্শ্বে কাঠের মত দাঁড়াইয়া ছিল,—কামাখ্যানাথ চলিয়া গেলেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে পারিল না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রাবণের আকাশ অবিচ্ছেদ মেঘে ঢাকা, বৃষ্টিও মুষল-ধারে চলিতেছে। একা বিধুর-মা মাত্র কয়েক দিন হইতে কাত্যায়নীর সঙ্গী রহিয়াছে। রমার ঝি সেদিন সন্ধ্যাকালে, সেই যে "জ্বর আসিল" বলিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর আসে নাই। তাহার মুখ-ভাবে কাত্যায়নীর আশঙ্কা হইয়াছিল যে, বৃদ্ধা কিছু-কিছু বুঝিতে পারিয়াছে। তাহার প্রভু-পরিবার যাহার জন্য বিপন্ন, তাহার সঙ্গ বোধ হয় সে বেচারা আর সহিতে পারিতেছিল না; তাই জ্বরের অছিলায় পলাইয়াছে। কাত্যায়নীও ইহাতে অনেকটা বাঁচিয়া গিয়াছিল। বৃষ্টির দায়ে রমার সঙ্গে তাহার সাক্ষাতের পথ ছিল না,—তাহার কাছে মুখ দেখাইতে হইতেছে না। সংসারের আর কাহারো সহিতও তাহার কোন দিন কোন সম্পর্ক ছিল না। বাকী কেবল রমার ঝি,—সেও তাহাকে মুক্তি দিয়া বাঁচাইয়াছে।

বর্ষার সায়াহ্নকে দ্বিগুণ আঁধারে ঢাকিয়া সন্ধ্যা নামিল। বৃষ্টি একটু মন্দ বেগে পড়িতেছে দেখিয়া, বিধুর-মা গঙ্গা হইতে জল আনিতে বাহির হইল। কাত্যায়নী এই অবসরেও শুইয়া ছিল। এই কয়দিন সে পীড়িতার মত শয্যার আশ্রয় লইয়া আছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন চক্ষে তাহার শৈশবের জীবন যেন ছায়াবাজীর মত এক দৃশ্যের পরে আর একটা দৃশ্য আনিয়া হাজির করিতেছিল। ক্রমে একটু ঘুম আসিল, তাহাও স্বপ্নে ভরা। সে দেখিতেছিল, যেন তাহার পিতা একটা উজ্জ্বল তারকাকে অঙ্গুলীর দ্বারা টিপিয়া ধরিয়া আকাশে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "আর ভয় নেই, কাত্যায়নি! দেখেছ, কাকে ধরেছি? এই তোমার সর্ব্ব অশুভের মূল! কিন্তু সাবধান!—"

"কাত্যায়নি!" কাত্যায়নীর ঘুম ভাঙিয়া গেলেও, সে পিতার অসমাপ্ত বাক্য শুনিতে পাইবার আশায় চোখ বুজিয়াই পড়িয়া রহিল। আবার কে ডাকিল, "কাত্যায়নি, ওঠো, কিছু কথা আছে।" এ তো পিতার কণ্ঠস্বর নয়! বিস্ময়ে কাত্যায়নী চাহিয়া দেখিল, মহেন্দ্র। সে উঠিয়া বসিল। মহেন্দ্র নিকটস্থ একখানা চৌকীর উপরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "বিধুর-মা জল আন্‌তে গেল দেখে একটু ঝিরুতে এলাম,—নৈলে অমনি-অমনি চলে যেতাম। আমার সঙ্গে দু'চারটে কথা কৈতে আশা করি তোমার কোন আপত্তি নাই?"

কাত্যায়নী স্তব্ধ ভাবে শুধু চাহিয়া রহিল। মহেন্দ্র একটু থামিয়া আবার বলিল, "কিম্বা খুনে ফেরারী আসামীর সঙ্গে কথা কৈতে তোমার ঘৃণা হতেও পারে। কিন্তু যাই হোক্, আশা করি, আমায় ধরিয়ে অন্ততঃ দেবে না?" মহেন্দ্রের এই ভাবের কথায় যে মন সে এত দিন উত্তপ্ত হইয়া উঠিত, এখনো তেমনি হইতে চাহিল; কিন্তু আজ আর সে নিস্তেজ মন কিছুতেই মাথা তুলিতে চাহিল না। ক্রোধ আসিবার মত সজীবতা আজ তাহাতে কোথায়! সে দৃষ্টি নত করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কেবল বলিল, "না।" "তবে একটু

বস্‌তে পারি?" "বোস।" মহেন্দ্র একটু নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া সজোরে দুই তিনটি নিশ্বাস ফেলিল; তার পর মৃদুস্বরে বলিল, "একটা গুজোব শুন্‌ছি—সেটা কি সত্য?"

"কিসের গুজোব?"

"যে কর্মচারী মহেন্দ্র খুন করে ফেরায় হওয়ায়, তার দায়ে জমিদারকে না কি হাজতে যেতে হয়েছে?"

এই সুতিকটু শব্দগুলা কয়েকবার শুনিতে-শুনিতে কাত্যায়নীর অবসন্ন, নিস্তেজ মন গ্লানি, বিরক্তি ও বেদনায় পূর্ণ হইয়া ক্রমে পূর্ব্বের মত উগ্র হইয়া উঠিতেছিল। মহেন্দ্রের কথায় একটা "হুঁ" মাত্র উত্তর দিয়া সে মনোভাব সংবরণ করিতে অন্য দিকে চাহিয়া রহিল। মহেন্দ্র বুঝিল, —একটু চুপ্ করিয়া থাকিয়া, অসংবরণীয় তীব্র ভাবায় সহসা বলিয়া উঠিল, "অথচ সেই মহেন্দ্রই নিরাপদে স্বাধীন ভাবে রয়েছে,—বড়ই রাগ হচ্ছে তোমার, না কাত্যায়নি?" কাত্যায়নীর মুখ এইবার ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; মহেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া কঠিন স্বরে সে বলিল, "নিশ্চয়ই;—যতক্ষণ না মহেন্দ্র তার নিজের প্রাপ্য অংশটা ফিরিয়ে নেবে, ততক্ষণ এ রাগ যাবে না।" মহেন্দ্র উচ্চ হাস্যে বলিল, "তা জানি; কিন্তু তুমি কি ভেবেছ, আমি ধরা দিতেই এসেছি? আমি জান্‌তে এসেছি যে, কথাটা সত্য কি না। তোমাদের মত মহাপ্রাণ তো এখনো আমি হতে পার্‌ছি না, যে, নিজের বাঁচবার কোন উপায় নেই দেখে, সকলকে বুঝিয়ে যাব, পরহিতার্থেই কেবল আমি আত্ম-বিসর্জ্জন দিচ্ছি! মহেন্দ্রকে বাঁচাবার জন্যই আমার এ চেষ্টা, নৈলে আমার আবার কিসের বিপদ?"

কাত্যায়নী সবিস্ময়ে বলিল, "কে এ কথা বুঝিয়েছে সকলকে? জমিদার?" "কেন, গ্রামের সকলে, আর তার যত প্রজা ঐ বলেই তো হাহাকার কর্‌ছে, আর সহরে ছুটছে। মহেন্দ্রের মাথার জন্য সকলে যে বিষম ব্যগ্র হয়ে উঠেছে, তা কি জান না?" কাত্যায়নী একটু যেন দম্ লইয়া বলিল, "না, আমি এ ক'দিন একাই আছি।" তার পর খানিক থামিয়া, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কিন্তু এমন কথা তিনি বা তাঁর আত্মীয়-স্বজন প্রচার করেছে, ভেবো না। এ তাঁর ভক্ত প্রজা আর গ্রামের লোকেরাই বল্‌ছে নিশ্চয়। সত্যই যে তাঁরা তোমায় বাঁচাবার জন্যই ব্যগ্র, তা' আমি ভালরকমই জানি।" মহেন্দ্র বিগুণ হাস্যের সহিত বলিল, "তুমিও তা' জানো? বাস, এইবার আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। বল দেখি, বিপদটা কার বেশী? তাঁর, না আমার?" কাত্যায়নীর ক্ষণেকের সে উদ্যত ক্রোধ আবার নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। সে ধীর স্বরে বলিল, "বিপদটা তাঁরই বেশী মহেন্দ্র; কেন না, তোমাকে যেমন করেই হোক তাঁকে রক্ষা করতেই হবে। ধনপ্রাণ যা দিয়েই হোক্ তোমাকে তাঁর বাঁচানো চাই। তিনি আমায় তোমার ভার দিয়ে গেছেন। তুমি যে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌বেই, এ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন; তাই তোমাকে সুপরামর্শ দিতে আমায় বলে গেছেন। তুমি এমন করে বেড়িও না, তা'হলে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। দেওয়ানের কাছে যাও, তুমি যেমন ভাবে নিরাপদে থাকতে চাও, তেমনি ভাবে সে তোমায় রাখ্‌বে। কিন্তু সবচেয়ে ভাল হয়, যদি তুমি একেবারে জমিদারের কাছেই যাও। তিনি তোমায় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে নিজে হতে নিয়ে গিয়ে—" মহেন্দ্র বাধা দিয়া তেমনি ভাবেই বলিল, "থাম, এইবার থাম কাত্যায়নি, এতক্ষণে এ কথাগুলোর অর্থ বুঝতে পার্‌লাম।—নৈলে তোমার কথায় আমারও ধাঁধা লেগে যাচ্ছিল একটু। এই ব্যাপারে তাঁর মাথায় কতখানি দায় পড়েছে তা জান কি? কমলা বলে সেই মেয়েটি কে জান? নবগ্রামের জমিদারের সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধেকের অধিকারিণী! তিনি তাঁর ছেলে আর কর্ম্মচারী দিয়ে সেই মেয়েটিকে চুরি করিয়েছেন, এবং সেই সময়ে দুটো খুন-জখমও হয়ে গেছে,—এর দায়ীও একমাত্র তিনিই। এর সমস্ত রহস্য আমি নৈলে উদ্ঘাটন হবে না। কমলার মার সেই চুরি কর্‌বার জন্য অনুরোধের চিঠি থেকে তাদের পক্ষের সমস্ত প্রমাণ, যার দ্বারা এ হাঙ্গামের অর্দ্ধেক দোষ কেটে যেতে পারে, তা যে সমস্তই আমার হাতে। তার পরে এই অবিমৃষ্যকারিতার খুনী,—সেও সেই আমিই। কাজেই আমাকে যে ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে দেওয়া তাঁর বিশেষ দরকার! তাই এই মহাপ্রাণতার ভানে আমায় বাঁচাবার ছলে এ কৌশল তাঁর।" ঘৃণায় ধীরে-ধীরে কাত্যায়নীর মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল। সে সরোষে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তোমার কৃত কর্ম্মের ফল পাওয়াই উচিত মহেন্দ্র,—মিছে তিনি এত অস্থির হয়েছেন। না,—তুমি তাঁদের আশ্রয় নিও না। যেপথে চলেছ, সেই পথেই চল। কিন্তু জেনো, জগতে

ন্যায়ধর্ম্মেরই জয় চিরদিন হয়ে আস্‌ছে, এখনো তাই হবে। যিনি তোমার এই অধঃপতন, এই দুর্ম্মতি জেনেও—বিবেকের বশে তুমি ফিরবে বলে তোমারই হাতে তাঁর নিজের মাথা সঁপে দিয়েছিলেন, এখনো তুমি হঠকারিতার বশে, অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে, এই বিষম কাণ্ডগুলো করে ফেল্‌ছ বলেই তাঁর বিশ্বাস। পাছে তুমি অনুতপ্ত হয়ে আবার কি ক'রে ব'স, এই ভয়ে যিনি এখনো বিষম ভীত, তাঁর ওপরে তোমার এই ভাব, এ তো তোমার জীবন্তেই নরকে নিয়ে গেছে মহেন্দ্র! এর চেয়ে আর কি হতে পারে মানুষের? আরো যা হবার হোক্, তাতে আর ভয় করছিনে।"

"ভয়? আমার জন্য তোমার কিসের আর ভয় কাত্যায়নি? হাঁ আমি জীবন্তেই নরকে গেছি সত্যই,—তাতে আর বিন্দুমাত্র ভুল নেই। যে কথাগুলো কামাখ্যা বাবুর নাম দিয়ে বল্‌লে,—তিনি আমার সম্বন্ধে এখনো যে মতগুলো পোষণ করেন বলছ,—তিনি করুন বা না করুন,—কিন্তু তোমায় জিজ্ঞাসা করি কাত্যায়নি, তুমি কি ঐ গুলোর এক বিন্দুও নিজে বিশ্বাস কর?" কাত্যায়নী সজোরে বলিয়া উঠিল "না, এক বিন্দুও না।"

"জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, কেন? যাঁর আমি—স্বীকার করি, আজ শত্রু বই মিত্র নই, তিনি যদি একথা ভাবতে পেরে থাকেন—বুঝতে পেরে থাকেন—কিন্তু তুমি পারনি, অথচ তুমি আমার আপৈশব যত জান, এত আমায় কে জানে! আমার ওপর কিসে তোমার এ বিশ্বাস নষ্ট হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?" "তুমিই করিয়েছ। ছোটবেলায় যাকে জান্‌তাম, তুমি কি সেই মহেন্দ্র?" "সেই আমিই। একদিন বলেছিলাম না কাত্যায়নি,—অবস্থাই মানুষকে দেবতা করে, আবার অবস্থাই তাকে পিশাচ করে তোলে? বলেছিলাম না যে, এর পরে আরও কি হব কি জানি! সেইদিনই এখন আমার এসেছিল। তোমারই বীতশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস আর ঘৃণাই যে ক্রমে আমায় এমন ক'রে তুলেছে, এ কি তুমি জান না? আমার ওপরে,—সামান্য একটা মানুষের ওপরে মানুষে যেটুকু নির্ভর রাখে, তাও তুমি রাখনি, আমারই কাজে আমারই শত্রুদের সাহায্য নিয়ে আমায় এমন ক'রে উপহাস যদি না করতে—একটু নির্ভরও যদি রাখতে—হয় ত আজ আমি খুনে হয়ে দাঁড়াতাম না—" "শত্রুর সাহায্য নিতে হ'ল বলে কি খুনই করতে হবে মহেন্দ্র! এই মনুষ্যত্বের গর্ব্ব তুমি আবার করছ!" "না, গর্ব্বের আমার আজ আর কিছুই নেই কাত্যায়নি! কিন্তু হাঁ, তবুও আমি মানুষ! সেই মানুষ বলেই, নিরঞ্জনকে আঘাত করতে তারা পাথর তুল্‌ছে দেখে, আমার সেই অপ্রকৃতিস্থ মাথা,—যে তার একটু আগে তাকেই শত্রু বলে' প্রলাপ বক্‌ছিল—সে-ই অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে, কি যে ক'রে বস্‌ল;—যাক্ সেকথাও। তবে তোমারই প্রত্যেক বিষয়ে আমার ওপর আস্থাশূন্য ভাবই আমায় প্রথমে তেমন উন্মত্ত করে তোল্‌বার কারণ, এও জেনো। এই থেকেই, তুমি যে আবার অন্তরের কাকে অবিশ্বাস ক'রে থাক, সেই কথাই আমার মনে জাগে কাত্যায়নি, আর আমি উন্মাদ হয়ে যাই! এখনো,—আমার এত দুর্দ্দশারও, তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না হয় ত, যে, কি আমার এত—" "মহেন্দ্র, চুপ কর, আর না। আর তো' তোমার মুখে ভাল শোনায় না। জগতের লোকে তাতে ঘৃণাই করবে।" "আজ আমার মুখে সত্যই তার নামে জগৎ ঘৃণা করতে পারে বটে;—আজ আমি এমনি জায়গারই দাঁড়িয়েছি! কিন্তু সেদিন তা' ছিলাম না, যেদিন এ ভালবাসা পূজার ফুলের মতই পবিত্র ছিল। তাকেও এই রকম অশ্রদ্ধা আর অবহেলা দিয়ে, তা থেকে এই পূতিগন্ধ কীটকে তুমিই সৃষ্টি করেছ। যদি তত ঘৃণা না করতে—" "আমি তোমায় ঘৃণা করিনি। আমি তোমার পথে না গেলেও, স্নেহ কি আমি তোমায়—" মহেন্দ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "কি করেছ? কি দিয়েছ আমায় তুমি? একটু করুণা? একটু সহানুভূতি? এক ফোঁটা চোখের জলও কি কোন দিন আমার ব্যর্থ জীবনের জন্য ফেলেছ? আমার সে প্রচণ্ড ভালবাসাকে কোন দিন একবার বিশ্বাসের চোখেও দেখেছ কি? তোমার কণামাত্র সহানুভূতি পেলে, জগতে এমন কিছু ছিল না, যা আমি করতে না পারতাম! তোমার আদেশে—তুমি যা বল্‌তে, হয় ত সবই করতে পারতাম। তোমায় যা বিশ্বাস—তোমার বাপ তোমায় যাঁর উদ্দেশে সম্প্রদান ক'রে যান, তাঁরই হাতে তোমায় তুলে দিয়ে তোমাদের দাসানুদাস হয়েই জীবন কাটাতাম। কেবল আমার এই অসহ্য বেদনা, আমার এই ভালবাসার ওপরে তোমার একবিন্দু বিশ্বাস, একফোঁটা শ্রদ্ধা—এইমাত্র চেয়েছি। কিন্তু এটুকুও কি দিয়েছিলে কোন দিন? বাপের নিষেধে আমায় বিয়ে করতে চাওনি—ভালবাসনি; কিন্তু

আমার এই অহরহ অনন্ত ভালবাসার মুখে কেন এত অগ্রাহ্যের বিষ ঢেলে তাকে জর্জ্জরিত ক'রেছ? করুণার এক ফোঁটা চোখের জলে এ বিষ যে ধুয়ে যেত! কেন তা একদিনও দাওনি? আজ আমি পতনের শেষ সীমায় দাঁড়িয়েছি, তাই কি আমায় ঘৃণা করছ? তা তো নয়। আমি তোমায় ভালবাসি এই অপরাধেই, তুমি আমার ওপরে এই দণ্ড চিরদিনই দিয়ে আসছ। এই ঘৃণার ফলে আমার যে এমনি একটা কিছু পরিণাম হবে, তা যেন আমার মনেও আসত এক-একবার; কিন্তু তবুও কিছুতেই কিছু হল না।" সনিশ্বাসে মহেন্দ্র থামিল। তাহার একটা কথারও বাধা দিতে কাত্যায়নীর সাধ্য হইল না। কেবল কিছুক্ষণ পরে অস্পষ্ট স্বরে একবার বলিল, "ঘৃণা—ঘৃণা—!" "হাঁ কাত্যায়নি, শুধু ঘৃণা! তোমার হাত হ'তে এই সম্বল মাত্র নিয়েই আমি চল্‌লাম।" আবার কিছুক্ষণ পরে কাত্যায়নী চেষ্টার সহিত বলিল, "তোমার জীবন যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে, আমিও তো—" "তুমিও সংসারী হওনি, এই কথা বল্‌ছ? আমার সঙ্গে তোমার জীবনের তুলনা করছ, কাত্যায়নি! মুখ তোল—আমার দিকে চাও একবার।" কাত্যায়নী মুখ তুলিল না। মহেন্দ্র একবার অনিমেষ চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া লইয়া বলিল, "জানি আমি, তা নয়। তোমার জীবন যদি আমার মত হ'ত, সে ক্ষেত্রে হয় ত আমি পাগল হয়ে যেতাম। জানি না, তোমরা দুজনে দুজনকে কতখানি ভালবাসতে পেরেছ; কিন্তু তবু শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তির যতটা বিনিময় করতে পেরেছ, তাতে তোমরা দেবতার মতই দুজনে দুজনের কাছে পূজা পেয়ে থাক—এ আমিও বুঝতে পারি। জান কি কাত্যায়নি, এই জিনিসটার কতখানি ক্ষমতা? এতে মানুষকে ক্রমে ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধে তোলে। তাই তোমরা হ'য়েছ। বিশ্বাস করছি, তিনি আমায় রক্ষা করতে চান্,—সম্ভব এ তাঁতে। কিন্তু আমার মত পাপিষ্ঠের পক্ষেও এতখানি কি সম্ভব যে, তাঁর সর্ব্বনাশ ক'রে আবার তাঁরই আশ্রয়ে প্রাণ বাঁচাব? আজ সব পাপগুলোই তোমার কাছে বলে যাই; তোমার সঙ্গে তাঁর এই সম্বন্ধে হিংসায় জর্জ্জর হয়ে নিজের অজ্ঞাতেও আমি যে তাঁর ক্ষতির ইচ্ছা করেছি, চেষ্টা করেছি, সেটা আজ বুঝছি। আর একদিনও বুঝেছিলাম, যেদিন শোণপুরের দাঙ্গা হয়। কিন্তু তার পরেও—তিনি যে আমার দ্বারা তাঁর সে সুনামের ক্ষতিকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌লেন না, এতে আমার আরও রোখ্ চ'ড়ে গেল। তিনি যদি তখন আমায় তাড়িয়ে দিতেন,—তাঁরও ভাল হত, আমারও হত। তিনি তা' গ্রাহ্য কর্‌লেন না"—কাত্যায়নী মৃদুস্বরে বলিল, "গ্রাহ্য না করা নয়—তিনি বুঝেছিলেন। তিনি না কি সবই জেনেছিলেন,—তবু তোমার ওপরে তাঁর বিশ্বাস নষ্ট হয়নি।" মহেন্দ্র অধর দংশন করিল। মৃদুস্বরে বলিল, "জান্‌তেন? তবুও সেই আমারই হাতে এত ক্ষমতা আবার দিয়েছিলেন?"

"তিনি ভাব্‌তেন, তুমি আপনিই এ পথ হ'তে ফিরবে।" মহেন্দ্র নত মস্তকে নিঃশব্দে রহিল। কাত্যায়নী কিছুক্ষণ পরে বলিল, "যাবে কি তাঁদের কাছে?" "হাঁ, যাব বটে, তবে তাঁদের কাছে নয়। ফির্‌তে হ'ল বটে, কিন্তু বড় দেরীতে। তার পরে শোন,—সবটুকুই বলে যাই। বোলো তুমি তাঁকে, এত বড় কাণ্ডও সত্যই আমি ভেবে-চিন্তে করিনি। তুমি আমার বারণ সত্ত্বেও কমলাকে উদ্ধার কর্‌তে ওঁদের সাহায্য নিয়েছ, এতেই যে মাথা আগুন হয়ে গেল, সেই আগুনে ক্রমে নিজেকেই আহুতি দিয়ে বস্‌লাম; কিন্তু খুন যে করেছি, সে কেবল—কেবল আমার নিরঞ্জনের রক্ষার্থে! নিরঞ্জন এ কথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে। তিনিও হয় ত করবেন, কেবল করবে না তুমি। তাই তোমারই বলে যাচ্ছি, এখনো বিশ্বাস করো—আমি—" "যা হবার হয়ে গেছে—" "হাঁ, যা হবার হয়ে গেছে, আর না।" প্রচণ্ড নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। "কাত্যায়নি, ভিক্ষা আমার এত দোষের প্রবাহের মধ্যেও যে বিশ্বাসটুকু রেখেছেন, তা' আর প্রাণ ধরে আমি নষ্ট করতে পারব না। আর তুমি? তোমারও বলি, এখনো এ আশা আমি ছাড়্‌তে পারছি না কাত্যায়নি, যে তুমি আমায় একটু শ্রদ্ধা করবে, আমার এ ভালবাসাকে একটু বিশ্বাস করবে। আমি তোমায় আমার জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলাবই। ভুল করেছি, তাই এতদিন ভুলপথে গিয়েছিলাম। আজ সে পথ চোখে পড়েছে কাত্যায়নি, আর দেরী নয়।" "কি বলছ—কোথায় যাচ্ছ—শোন—" "আর না, দেখি কাত্যায়নি—তোমায় আমি এ বিশ্বাসটুকু করাতে পারি কি না।" "বিশ্বাস? দাঁড়াও মহেন্দ্র, একটু দাঁড়াও—" "না।" মহেন্দ্র উল্কার মত অন্তর্হিত হইল,

আর কাত্যায়নী প্রায় সংজ্ঞাহীন দেহে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। বিধুর-না বেচারাও এতদিন লজ্জায় বাড়ীর বাহির হইত না। জ্যোতিষ্কর মহাশয়ের বাড়ী হইতেই যে জমিদারের এই বিপদের উৎপত্তি, তাহা কতকটা বুঝিতে পারিয়া, গ্রামের লোকে তাহাদের যে তেমন প্রীতির চক্ষে দেখিতেছে না, তাহা সেও বেশ বুঝিতে পারিত। কিন্তু অন্ত কয়দিন হইতে, মহেন্দ্রকে পাওয়া গিয়াছে, এইরকম একটা সংবাদে, সকলে এমন উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে যে, বিধুর-মাকে আর গ্রামের বাহির হইয়া সেরূপ ঘৃণার দৃষ্টিতে সঙ্কুচিত হইতে হয় নাই। মহেন্দ্রের বিচার দেখিতে গ্রামের লোক দলে-দলে প্রায় প্রত্যহই সহরে ছুটিতেছিল; সেজন্ত বিধুর-মাকে মহেন্দ্রের ও অন্যান্য সংবাদের জন্ত জমিদার-বাড়ী যাইতে হইত না। পথে বাহির হইলেই সে সমস্ত সংবাদ পাইত। তাহাকে শুনাইতে গ্রামের লোকেরও বিশেষ একটু ঝোঁক ছিল।

সন্ধ্যা,—কাত্যায়নী আজ সহসা গৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। গঙ্গার সেই ঘাট,—যেখানে তাহার পিতা বসিয়া সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেন—সেইখানে একবার যাইবার জন্ত তাহার অন্তর অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। লোকের চক্ষে পড়িবার ছুর্নিবার লজ্জাও আজ তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। কিন্তু ঘাটে না পৌঁছিতেই জমিদারের বিগ্রহ-মন্দিরের সম্মুখে গিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সন্ধ্যার আকাশে সেই যুগল মন্দিরের চূড়া—বহুদিন পূর্ব্বে একদিন পিতার অনুগমন করিতে গিয়া এমনি সন্ধ্যায়, নিজ গৃহের অঙ্গনে—সে এই চূড়া দুইটিকে এমনি রহস্যাবৃত ভাবে ঊর্দ্ধে কাহার যুগ্ম অঙ্গুলি-সঙ্কেতের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। সেদিনের অপেক্ষাও আজ যেন তাহাতে আরও এমন একটা কি ছিল, যাহাতে কাত্যায়নীর অজ্ঞাতেই তাহাকে সেই মন্দিরের দিকেই টানিয়া লইয়া গেল।

তখনো আরতির সময় হয় নাই। মন্দিরে রমা,—আর তাহার কাছে বসিয়া ও কে? কমলা না? কাত্যায়নী বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইতেই কমলা উঠিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। কাত্যায়নী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া, রমা মৃদুস্বরে বলিল, "প্রণাম কর।" কাত্যায়নী যেন মূঢ়ের মত বলিল "কাকে?" রমা আর উত্তর দিল না—কেবল নির্ব্বাক্ ভাবে তাহার পানে চাহিয়া রহিল মাত্র। কাত্যায়নী তখন একটু যেন চেতনায় ফিরিয়া, অথচ বিদ্রোহ-উত্তেজিত ভাবেই বলিল, "তোমার গোবিন্দদেবকে? কিন্তু কেন?" "আজ যে মহেন্দ্রের বিচারের শেষ দিন!" "তার জন্তে ওঁকে প্রণাম করতে হবে কেন? তার কাযের ফল সে পাবে, তার জন্ত ভয়-ভাবনাই বা কিসের?"

"ভয়-ভাবনার অতীত দা, সেই শান্তি তার আসুক—সেই প্রার্থনা কর আজ।"

"আমি? তার শান্তির জন্ত আমিই প্রার্থনা করব!" বলিতে-বলিতে কাত্যায়নী এমন একটা হাসি হাসিল, যাহাতে রমা অন্তরে ভয় পাইয়া তাহার দিকে হাত বাড়াইল। বলিল "বোস একটু আমাদের কাছে, তাঁর কাজের ফল তিনি আজ যাই পান্, কিন্তু যিনি আমাদের সে সব ফলকেও তুচ্ছ করিয়ে দিয়ে অন্তরের মধ্যে শান্তি আর স্বস্তি বিধান করিয়ে আসছেন, তিনি নিশ্চয়ই মহেন্দ্রকেও তা দিয়েছেন। আমার কাছে কে,—দেখ্‌ছ না? কমলাকে মহেন্দ্রই নিজের হ'তে হাতে-হাতে দাদাকে সমর্পণ করে দিয়েছেন। আবার তিনি দাদার গলা ধরে' বন্ধুর মত—" বলিতে-বলিতে রুদ্ধকণ্ঠে রমা থামিল, আর কমলা উচ্ছ্বসিত অশ্রু রোধ করিতে দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

কাত্যায়নী স্তব্ধ নেত্রে কিছুক্ষণ দুইজনকে দেখিল। তার পরে সহসা যেন অতি অস্বাভাবিক শান্ত স্বরে বলিল, "হ্যাঁ দেখ্‌ছি—এই বিষের সমুদ্র মন্থন ক'রে তোমাদের ঘরে কমলা উঠে এসেছে, শান্তির বাতাস ব'য়েছে তবে জগতে। কিন্তু আমি একটু গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসি, জান তো আমারও শান্তি সেইখানে ধরা আছে।"

"যাও তবে—তুমিও তাই পাও। কিন্তু শীগ্‌গির এস।"

"সে কথা তোমার গোবিন্দদেবকে বলো।"

"কি বল্‌ব, শান্তির কথা? আমি একা বল্‌ব না—তোমারও চাইতে হবে।"

"কি চাইব?"

"তাঁর ক্ষমা, আর শান্তি।"

"ক্ষমা চাইবার আমার অধিকার নেই। কার কাজের জন্ত ক্ষমা চাইব। ক্ষমা প্রার্থনার মত আমার কিছুই তো নেই।

"তবে শাস্তি, সান্ত্বনা ?"

"সেও এ জন্মের নয়—পর জন্মের জন্ত থাক্।" কাত্যায়নী আবার তেমনি একটু হাসিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। রমা দুই হাতে চোখ ঢাকিল।

কতদিন পরে কাত্যায়নী এই ঘাটে আসিয়া বসিল! মনে করিয়া দেখিল, পিতার মৃত্যুর পরও তো কতদিন সে কত সন্ধ্যায় জ্যোৎস্না রাত্রে দুর্যোগ নিশীথে এই জলে পা ডুবাইয়া এই সোপানে বসিয়া থাকিয়াছে। মনে পড়িল, কেবল কামাখ্যানাথের সঙ্গে সেই রাত্রির কথাবার্ত্তা। সেই পর্য্যন্ত আর সে এমন করিয়া ঘাটে আসিয়া বসে নাই। সেই রাত্রি হইতেই তাহার জীবন যেন উলটি-পালটি খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কাত্যায়নী আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, সেখানে গম্ভীর মেঘরাশি, দিগন্তে কোথাও কখনো একটু-একটু বিদ্যুতেরও আভাব। ভাদ্রের গঙ্গা ফুলে-ফুলে ভরিয়া উঠিয়া খর বেগে অবশিষ্ট সোপান কয়টির বুকে আঘাত করিয়া বহিয়া যাইতেছে। এমন দৃশ্য তো সে কতবার কতদিন দেখিয়াছে; কিন্তু আজিকার মত সমস্ত দৃশ্যই একটা রহস্যাবৃতের মত তো আর কোন দিন বোধ হয় নাই! চরাচরে যেন আজ আর অন্ত কিছুই নাই,—কেবল মাথার উপরে ঐ ভাঙিয়া পড়া মেঘ, আর সম্মুখে এই পূর্ণতোয়া গঙ্গা। আকাশে একটা নক্ষত্র দেখিতে পাইলেও যেন আজ তার একটু সাহস হয়—সে একটু অন্তমনা হয়; কিন্তু না—কোথাও কিছু নাই। স্বপ্নের কথা মনে হইল,—পিতা বলিয়াছেন, "আর ভয় নাই; কিন্তু সাবধান!"—কিসের সে সাবধানতা? গঙ্গার বেগশালী গম্ভীর জল আবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইয়া গম্ভীর শব্দ করিয়া উঠিল। কাত্যায়নী বিস্মিতা হইয়া সেই দিকে চাহিল। তাহার মনে হইল, সেও যেন ডাকিয়া বলিল "সাবধান!" দিগন্তে কোথায় মেঘ ডাকিয়া উঠিল। তাহারও গম্ভীর স্বনন গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষে গড়াইয়া আসিয়া সোপানের গায়ে বাধিয়া যেন সেই রকম কি একটা সঙ্কেত করিল। কি এ সব? কাত্যায়নীর শরীর অকারণেও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। চং চং চং বর্ষার নিস্তব্ধ সন্ধ্যাকে মথিত করিয়া আরতির বাদ্য বাজিয়া উঠিল। কাত্যায়নী আবার শিহরিল। পশ্চাতে কে যেন আসিয়া সোপানের উপরে বসিল। সচকিতে কাত্যায়নী ফিরিতেই সঙ্গে-সঙ্গে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "কে? কাত্যায়নী?" কাত্যায়নীও চিনিল, কামাখ্যানাথ। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কাত্যায়নী সোপান বাহিয়া এক পদ উঠিতেই কামাখ্যানাথও যেন নষ্ট বুদ্ধি ফিরিয়া পাইয়া বলিলেন, "যেও না কাত্যায়নি,—দাঁড়াও, শোন—সব শেষ।"

"সব শেষ?" কাত্যায়নীর আর্ত্তকণ্ঠে কামাখ্যানাথও চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "মহেন্দ্রকে বিসর্জ্জনে দিয়ে এলাম।" সেই গম্ভীর শোকবিদ্ধ স্বর কাত্যায়নীকে একটু যেন দৃঢ়তা আনিয়া দিল; সে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল "কি হল, ফাঁসী?"

"ফাঁসী?—হাঁ—চোদ্দ বৎসর দ্বীপান্তর।"

"ফাঁসী নয় তবে দ্বীপান্তর বলুন? চোদ্দ বৎসর?"

"হাঁ।" কিছুক্ষণ পরে কাত্যায়নী বলিল, "সে ধরা না দিলে আমাদের এই কৃত কর্ম্মের ফলে আপনাদেরই হয় ত এই শাস্তির ভাগ নিতে হত। যাদের পাপ তাদেরই প্রায়শ্চিত্ত হোক্—আপনারা এর জন্ত শোক করবেন না।" কামাখ্যানাথের কর্ণে সে কথা বোধ হয় প্রবেশ করিল না। তিনি আপন মনে যেন সহসা শিহরিয়া উঠিলেন,—"কি করলে—উঃ—কি করলে! অনিচ্ছার মনের উত্তেজনায় হঠাৎ যা করে ফেলেছে, তাকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত—আমাকে বিপদে ফেল্‌বার জন্তই করেছে বলে বললো। সেই শোণপুরের ঘটনায় নিজের যত মহত্ত্ব—সব কালো কালিতে মাখিয়ে এমন ভাবে ধরলে—ওঃ—শত চেষ্টায়ও তার নিজের মুখের স্বীকারোক্তিকে মিথ্যা করাতে পারলাম না! একদিন নিরঞ্জনের হাতে কমলাকে তুলে দিয়ে নিজে গিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ধরা দিলে—তার পর থেকে একবার দেখা করতে এত চেষ্টা করলাম—কিছুতেই দেখা করলে না।—নিজের মহত্ত্ব লুকিয়ে অথচ সুস্পষ্ট প্রমাণে মেয়েটিকে নিজের অধিকারে অধিষ্ঠিত ক'রে—আমাদেরও পায়ে কাঁটা ফুটতে না দিয়ে—নিজের মাথায় সমস্ত অপরাধ—সমস্ত কলঙ্ক নিয়ে—" বলিতে-বলিতে কাত্যায়নীর পানে ফিরিয়া আর্ত্ত, উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "কি সে মুখ, কাত্যায়নি—হাসিতে, মহত্ত্বের মহিমায় উজ্জ্বল সে কি মুখ! ওঃ—আমরণ—আজীবন বুঝি সে দৃষ্টি, সে মুখ বুকে আঁকা থাকবে। কখন আমার পানে ফিরে চাইলে জান? নিজের দণ্ডের আজ্ঞা শুনে—তার পরে। কখন আমার কাছে এল জান? জেলে

নিয়ে যাবার সময়! প্রণাম ক'রে দুই হাতে পায়ের ধুলা নিয়ে হাসি মুখে—" বলিতে-বলিতে কামাখ্যানাথের কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণের চেষ্টায় আবার উচ্চারণ করিলেন, "হাসি মুখে বল্‌লে—'আমি ভুল পথে গিয়েছিলাম। আশীর্ব্বাদ করুন—তার প্রায়শ্চিত্ত হোক্। কাত্যায়নীকে বল্‌বেন'—সাবধান—সাবধান কাত্যায়নি!"

কামাখ্যানাথ ত্রস্তে উঠিয়া দুই হস্তে কম্পিতা পতনোন্মুখী কাত্যায়নীকে ধরিয়া সোপানের উপর বসাইয়া দিলেন। কাত্যায়নী একটু প্রকৃতিস্থা হইলে বলিলেন, "এখান থেকে একটু উঠে বস, বড় জলের ধার—দু'চার সিঁড়ি উঠে বসো।" কামাখ্যানাথের হস্ত নিজের বাহু-পার্শ্ব হইতে সরাইয়া দিয়া কাত্যায়নী শান্ত স্বরে বলিল "বেশ আছি,—আমি জলের ধারে বস্‌লেই ভাল থাকি।" কামাখ্যানাথ আর কিছু বলিলেন না, এক সিঁড়ি ব্যবধানে নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। কাত্যায়নী একটু পরে বলিল, "আপনি কি আমার প্রতীক্ষা করছেন? আমি একটু পরেই যাব,—আপনি যান্—" কামাখ্যানাথ সেই ভাবেই বসিয়া রহিলেন। তখন কাত্যায়নী মৃদুস্বরে বলিল, "মহেন্দ্র আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আপনার ইচ্ছামত প্রথমে তাকে বোঝাতেও গিয়েছিলাম—" "তার পরে?" "বোঝাতে যে পারিনি, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। পরন্তু—আঘাতই দিয়েছি তাকে হয় ত।" কামাখ্যানাথ সনিঃশ্বাসে বলিলেন, "তার মধ্যে যে একটা অতি মহাপ্রাণ আছে, তা আমি অনেকদিনই জান্‌তাম, তারই ওপর বিশ্বাসেই বুঝি তার নিজের সর্ব্বনাশ করার এই পথ আমিই মুক্ত করে দিয়েছি। শুধু এই না,—সে যে এ কাণ্ডেরও শেষে হয় ত এমনি করে আত্মনাশ করতে কাঁপিয়ে পড়্‌বে, এ ভয়ও বরাবর ছিল আমার। যা ভয় করেছিলাম, তাই-ই করলে সে শেষে।"

উত্তরের মধ্যে কিছুক্ষণব্যাপী নীরবতার যুগ বহিয়া গেল। কামাখ্যানাথেরই অশান্ত কণ্ঠ আবার সেই স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিল, "সব ভুল! আমি যা করেছি—ভুল, তুমি যা কর্‌লে—ভুল, আর সবচেয়ে ভুল করে গেছেন—তোমাদের পিতা যিনি তিনিই। মহেন্দ্রের যে কুগ্রহের ভয়ে তিনি তোমাকে তার হাতে দেন্‌নি, তাঁর কাজেই সেই কুগ্রহকে পরিপুষ্ট করে গেছেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত তোমার আর তার ভাগ্য-লিপির সঙ্গে যুদ্ধ করতে-করতে গেলেন, তবু ভুল পথেই গিয়ে নিজের অজ্ঞাতে বিধি-নির্দ্দেশকে অনুসরণ করলেন। মানুষের শক্তি এতই সামান্য। চির-দিনই এ কথা আমার মূলমন্ত্র ছিল। কিন্তু, তোমাদের সাহচর্য্যে সেই কথাই আমি যে ভুলে গেলাম, এই পরম আশ্চর্য্য।" গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া কামাখ্যানাথ চুপ করিলেন। কাত্যায়নী মৃদুস্বরে বলিল, "অনেক কষ্ট আপনাদের ওপর দিয়ে গেল—শ্রান্ত হয়েছেন—বিশ্রাম করুন গে,—আমি একটু পরেই যাব।" "গোটাকতক কথা শেষ করে যাই,—তোমার সঙ্গে আমার তো সর্ব্বদা দেখা হয় না। এইবার আমার নিজের জন্যও একটু ভাবনা এসেছে কাত্যায়নি; আমার শেষ অবস্থার কথা,—নষ্ট-সংজ্ঞ হ'য়ে আমায় না কি থাকতে হবে। এত দিন এর জন্য এক বিন্দুও ভাবিনি। কিন্তু আজ একটা ঘোর ভয় ঐ মেঘের মতনই মনকে ছেয়ে ফেল্‌ছে। যে বয়সে সংসার হতে স'রে শান্ত প্রবুদ্ধ ভাবে কালের প্রতীক্ষা করা মাত্রই ব্যবস্থা—সে বয়সে আমি এ কি করছি? এত কর্ত্তব্য-কর্ত্তব্যের দ্বান্দ্বিক, এত অহঙ্কার—এ কোন্ পথে ক্রমে চলেছি আমি? বিধিলিপি সফল হোক্—নিয়তিকে খণ্ডন করতে চাই না। কেবল যতদিন আমার সে শেষাবস্থা না উপস্থিত হয়, ততদিন একটু শান্ত ভাবে থাকতে চাই। আমি তীর্থে যাব ইচ্ছা করেছি। নিরঞ্জন উপযুক্ত হয়েছে—তার বিবাহ দিয়ে আমি অতি স্বচ্ছন্দ-মনেই তীর্থবাস কর্ত্তে পার্‌ব,—রমাও আমার সঙ্গে যাবে। মহেন্দ্র আমায় মুক্তি দিয়ে গেল,—বাকী তুমি,—তুমি কি করবে? যাবে আমাদের সঙ্গে?"

"না, আমি এইখানেই থাক্‌ব। আপনি আমার সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হোন্।" "কার ভার কে নেয়? এত দিন যে মহেন্দ্র আর তোমার সমস্ত ভারই আমার ওপরে আছে, এই অহঙ্কার করেছি—তোমাদের শুভাশুভের জন্য ব্যস্ত হয়েছি—এও আমার সেই মহৎ ভ্রমেরই এক অংশ। আর না, তা'হলে তাই থাক কাত্যায়নি,—আশীর্ব্বাদ করি—শান্তি পাও।" কামাখ্যানাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কণ্ঠস্বর ঈষৎ যেন উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল। এইবার প্রশান্ত ভাবে বলিলেন, "তবু তোমায় এমন ভাবে এখানে রেখে যেতে পারব না—ওঠো তুমি।" কাত্যায়নী উঠিল না, বা নড়িল না। তাহার সংজ্ঞার কোন লক্ষণ না দেখিয়া

কামাখ্যানাথ ভীত ভাবে তাহার মস্তক স্পর্শ করিলেন, "কাত্যায়নি?" কাত্যায়নী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বসুন আমারও কিছু কথা আছে।" "বল।" "বেশী দূরে যাবেন না, এইখানেই বসুন।" কামাখ্যানাথ নিঃশব্দে কাত্যায়নীর নিকটে উপবেশন করিলেন। কাত্যায়নী সেই অন্ধকারের মধ্যেও কামাখ্যানাথের পানে স্থির চক্ষে চাহিয়া বলিল, 'পারবেন?" "কি পারব, কাত্যায়নি?" "যা বলব এখন, পারবেন করতে?" "না শুনে কি করে' বলব। প্রতিজ্ঞার লঙ্ঘা আর রাখি না।" "মহেন্দ্রের এ কথা আমি আপনাকে কোন দিন বলিনি, সেও কখনই বলেনি—তবু আপনি যখন তার সবই বুঝতে পেরেছিলেন, তখন আপনি নিশ্চয়ই খুব সূক্ষ্মদর্শী। আমার কথা আমি আজ আপনাকে প্রশ্ন করব। আমার কিছু বুঝতে পেরেছিলেন কি?" "কি প্রশ্ন করছ, আর একটু বুঝিয়ে বল?" "বুঝিয়ে বলার আমার সাধ্য নেই—নেই,—আপনাকেই বুঝে বলতে হবে—বুঝিয়ে দিতে হবে আমার—আমি কি করেছি?—আমি জানি আপনিই আমার স্বামী, আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছে। মহেন্দ্রকে—আমি—এক নিমেষের জন্যও কখনো—বাবার অমত জেনে পর্য্যন্ত—কখনো মনেও তাকে আনিনি বলেই জানি। তবে আজ এ কি? এ কি করেছি তবে আমি?—বলুন, আমায় বুঝিয়ে দিন।" "কাত্যায়নি—এ প্রশ্ন কেন করছ আজ?—এতদিন কেন একবারও করনি? আজ আর—" "না আমি আজই শুনব,—এতদিন তো এ প্রশ্ন আমার মনে জাগেনি; ক'দিন চক্ষে জেগেছে বলেই শুনতে চাচ্ছি. বলুন,—আমি কি এমনি? আপনি যে আমার স্বামী তাতে সন্দেহই নেই আমার; কিন্তু, আমি কি এতদিন—নিঃশব্দে এই মহা-পাপই পোষণ করে চলেছি!—বলুন—বলুন—আমায়।" সোপানের উপর লুণ্ঠিত মস্তকটা সস্নেহে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া কামাখ্যানাথ আর্দ্র স্বরে বলিলেন, "এই জন্যই আজ এ কথার আলোচনা করতে বারণ করছি,—আজ হয় ত সহ্য করতে পারবে না।" কাত্যায়নী উঠিয়া বসিয়া বলিল, "পারব—পারব—আজ আমি সব পারব—" "আমাকে স্বামী বলে জেনে পর্য্যন্ত এ তুমি পোষণ করছ কি না?—না, হয় ত তা ঠিক নয়, কিন্তু তারও অনেকদিন আগের কথা—যখন মায়ের ইচ্ছায় তুমি জেনেছিলে যে মহেন্দ্র তোমায়—সেই তখনকার কথা—।"

"সেও তো আমি বেশী দিন শুনিনি। মায়ের ইচ্ছার সঙ্গে-সঙ্গেই বাবার ইচ্ছাও তো জেনেছিলাম।" "তবু সেই হয় ত কয়েকের বীজও এই হৃদ্যের মধ্যে কোথায় হয় ত লুকানো ছিল কাত্যায়নি! তাও যদি না হত, মহেন্দ্রের এই আত্মনাশী তীব্র ভালবাসা—যা আজন্ম এই রকমে তোমাকে ঘিরে বসে এসে-শেষে এইভাবে আত্মনাশ করলে, এর কি কিছুই ক্ষমতা নেই মনে কর? মহেন্দ্রের এই অনন্ত প্রেমই আজ হয় ত তোমায় এমন অস্থির করেছে; জীবনে যা পারেনি, যে বীজ তোমার মধ্যে সুপ্ত ছিল, তার ব্যবহারে সে বীজ ক্রমশঃ শুষ্ক হয়েই আসছিল। কিন্তু আজ তারই এই আত্ম বিসর্জ্জনে—এই মহত্বে" বলিতে বলিতে রুদ্ধকণ্ঠে কামাখ্যানাথ থামিলেন। এইবার কাত্যায়নীর চক্ষেও অশ্রু দেখা দিল। কিন্তু ত্বরিত হস্তে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "কিন্তু আপনি যদি আজ আমায় এইভাবে রেখে যান্—আমার পরিণাম কি হবে তা কি একবার ভাবছেন না?" "কি করতে বল আমায়? বল, কি করব?" "একদিন আমায় বিবাহ করতে চেয়েছিলেন—কিন্তু আজ কি তা পারেন? ভেবে দেখবেন, সেদিনের চেয়েও আজ এ কত শক্ত কাজ! কিন্তু পারেন কি তা? বলুন।" "এ কি এত কঠিন কাজ কাত্যায়নি? যদি তাতেই তুমি শান্তি পাও, তাই হবে।"

কাত্যায়নী ধীরে-ধীরে কামাখ্যানাথের পায়ের উপরে মাথা রাখিল, কামাখ্যানাথ তাহার হাত ধরিয়া তুলিতে গেলেন। কাত্যায়নী উঠিল না, মুখখানাকে পা-দুটীর মধ্যে আরও নিবিড় ভাবে প্রবেশ করাইয়া দিল। কামাখ্যানাথ নিঃশব্দে তাহার হাতখানি ধরিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে কামাখ্যানাথ বলিলেন, "রাত্রি অনেক হ'ল, এইবার ওঠো।" কাত্যায়নী সেইভাবেই উত্তর দিল, "সত্যি আপনি পারবেন? সত্যি?" "হ্যাঁ। কিন্তু কাত্যায়নি, এই কাযটা যদি তুমিও কিছুদিন আগে করতে পারতে, তা'হলে হয় ত মহেন্দ্রের এতখানি দুরবস্থা হত না। তোমায় সত্যই বিবাহিতা দেখলে সে নিশ্চয়ই আর ওপথে চলত না।"

"চুপ্ করুন, আর না—আর তার কথা না—আর

আমায় এখনো পাপে ডুবাবেন না। কেবল বলুন, আপনি এখনো আমায় নিতে পারেন? আমার মত এমন পতিতাকেও?—" "তুমিও চুপ কর কাত্যায়নি, আর ওকথা না" বলিতে-বলিতে কামাখ্যানাথ কাত্যায়নীর মস্তকটা বক্ষের উপরে টানিয়া লইয়া তাহাতে ওষ্ঠ স্পর্শ করাইলেন।

কাত্যায়নী সেই ভাবে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সনিঃশ্বাসে মাথা তুলিল। গদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "আর না—আমি এর যোগ্য নই। সেই আমার জন্ত আপনাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট আর লোকের কাছে এমন হাস্যাস্পদ করব না।" "সুস্থ হও কাত্যায়নি, দু'দিন পরে যাহা কর্ত্তব্য স্থির করো।" কামাখ্যানাথের পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া কাত্যায়নী বলিল, "আজই কর্ত্তব্য স্থির করছি। ভরসা করতে পারছি না যে নিজের ওপরে। যা তুমি আমায় দিচ্ছ, আমি কি এর যোগ্য? যে মনে আমার এমন পাপ লুকানো ছিল—এমন বিষও যে জীবনে দু'দিনের জন্তও জেগে উঠতে পারল, সে কি তোমার মতন দেবতার পায়ে দেবার যোগ্য! এখনো বিশ্বাস কি যে, আবারও কোনদিন এ জ্বালা আমাতে জাগবে না? না—না, সে আমি সহ্য করতে পারব না।"

"কাত্যায়নি, যদি আমার ওপর তোমার কোন শ্রদ্ধা, কোন স্নেহ থাকে, তারই দিব্য—" "শ্রদ্ধা করেছি, পূজা করেছি—কিন্তু আজকের এ দ্বন্দ্বের মধ্যে যা করছি, ওগো তা বুঝি কোনদিনই করিনি! এই নিয়েই আমি চল্লাম—জেনো, কোন পাপ, কোন তাপ এখন আর আমার মধ্যে নেই,—তবু এ অপবিত্র মন, এ দেহ আর আমি রাখব না—"

মেঘ বহুক্ষণ গর্জ্জন করিয়া ফিরিতেছিল, সহসা বিকট শব্দে তাহার সেই বক্ষোদ্ভূত উগ্রশক্তি বহু জ্বালায় জ্বলিয়া নদীর অপরপারে একটী তালবৃক্ষের মস্তকে পড়িল। সে ভীষণ শব্দে চরাচর যেন সংজ্ঞাশূন্য হইয়া গেল। কামাখ্যানাথও কিছুক্ষণ বিবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যখন তাঁহার চক্ষের সম্মুখের সেই রুদ্র জ্বালা নিভিয়া গিয়া সমস্ত চরাচর অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল, তখন তাঁহার চক্ষেও দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে সচেতন করিল। চাহিয়া দেখিলেন, নিকটে কেহই নাই। তখনি বিদ্যুৎ-বিকাশ হইল;—তাহার দীপ্ত আলোকে গঙ্গার বক্ষ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে;—কোথাও একটু শব্দ মাত্র নাই,—কেবল অদূরে কি একটা যেন একবার ভাসিয়া উঠিয়া তখনি ডুবিয়া গেল। জলে-স্থলে কোথাও কাত্যায়নীর চিহ্নমাত্র নাই। "কাত্যায়নি—কাত্যায়নি"—উচ্চ চীৎকারে জলস্থল কাঁপাইয়া কামাখ্যানাথ সবেগে সোপান দুইটা অতিক্রম করিলেন। জলে পা দিবামাত্র কে সবেগে ছুটিয়া আসিয়া একটী কঠিন বাহুপাশে তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। পরমুহূর্ত্তে একটা কেমন স্নেহ-পাশ সম্মুখদিকে আসিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিল। পশ্চাতে নিরঞ্জন, সম্মুখে রমা উচ্চ আর্ত্ত কণ্ঠে ডাকিল "বাবা, বাবা!"

মুহুর্বিদ্যুতোদ্ভাসিত গঙ্গার সিক্ত বক্ষের পানে চাহিতে-চাহিতে সংজ্ঞাহীন কামাখ্যানাথ জলময় সোপানের উপর পড়িয়া যাইতেছিলেন। রমা ও নিরঞ্জন তাঁহাকে জোরে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া ফেলিল।

সমাপ্ত

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

(২)

[শ্রীঅনাথনাথ বসু]

হরিনারায়ণের পুত্রকন্যাগণের সকলেরই প্রকৃতি অতি মধুর, স্নেহপ্রবণ ছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে শিশিরকুমার সকলেরই অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। ভ্রাতাভগিনীদিগকে তিনি প্রকৃতই প্রাণাধিক ভালবাসিতেন। তাঁহাদিগের জন্ত কোন ক্লেশ কিম্বা কোন অসুবিধা ভোগ করিতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তাঁহার মধ্যম সহোদর হেমন্তকুমার কলিকাতায় থাকিয়া মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। শিশিরকুমার একদিন শুনিলেন যে, তাঁহার মেজদাদা বাড়ী

আসিতেছেন ; আনন্দে তাঁহার প্রাণ নৃত্য করিতে লাগিল। মেজদাদাকে কতদিন পরে দেখিবেন, তাঁহার সহিত প্রাণ ভরিয়া কথা কহিবেন, এই আনন্দে তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। ক্রমে বেলা অবসান হইতে লাগিল ; কিন্তু কই, মেজদাদা ত আসিলেন না ; শিশিরকুমার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বসন্তকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, "দাদা, আজ মেজদাদার বাড়ীতে আসিবার কথা, কিন্তু কই, এখনও ত আসিলেন না।" বসন্তকুমার বলিলেন, "চল না, একটু এগিয়ে দেখি।" সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটী লণ্ঠন লইয়া বসন্ত শিশিরকুমারের সহিত কলিকাতার পথে অগ্রসর হইলেন। বেশভূষা করিতে হইলে বিলম্ব হইবে ; সে বিলম্ব যে সহোদরদ্বয়ের নিকট অসহ্য। তাঁহারা যে বস্ত্র পরিধান করিয়া ছিলেন, তাহা পরিবর্ত্তন না করিয়া, জুতা, জামা, চাদর কিছুই না লইয়া চলিতে-চলিতে চৌদ্দ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেন। সমস্ত রাত্রি পথ অতিবাহিত করিয়া উভয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা রসুলপুরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। রজনীর অন্ধকার তখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই, এমন সময় একটী বাঘ তাঁহাদের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। বাঘ দেখিয়া দুই সহোদর পরস্পরকে বাহু দ্বারা আবদ্ধ করিলেন এবং ক্রমে রসুলপুরে তাঁহাদের ভগিনীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। এদিকে হেমন্তকুমার বিভিন্ন পথে বাড়ী আসিয়াছিলেন ; বসন্ত ও শিশির তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। ভগিনীর গৃহে একদিন অবস্থান করিয়া বসন্ত ও শিশিরকুমার মাগুরায় ফিরিয়া আসিলেন, দেখিলেন হেমন্তকুমার আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শিশিরের আনন্দের সীমা রহিল না। মেজদাদার সহিত কথার আর শেষ হয় না ; বসন্তকুমারও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। সকলেরই পরম আনন্দে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

শিশিরকুমারের স্নেহপরায়ণতা সম্বন্ধে আর একটী গল্প বলিতেছি। একদিন শিশিরকুমারের এক ভগিনীর শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে আসিবার কথা ছিল। শিশিরকুমার আহার করিতে বসিয়া দেখিলেন যে, বাইন মৎস্যের ব্যঞ্জন হইয়াছে। তাঁহার সেই ভগিনী বাইন মৎস্য বড় ভালবাসিতেন। শিশিরকুমারের মৎস্য ভক্ষণ করা হইল না ; তিনি বলিলেন, "দামিনী আসছে, সে বাইন মাছ বড় ভালবাসে; তার জন্য রেখে দাও *।" যদিও ইহাতে বিস্ময়কর কিছুই নাই, কিন্তু মহৎ ঘটনা অপেক্ষা এইরূপ সাধারণ ঘটনা দ্বারাই লোকের প্রকৃতি বুঝিবার সুবিধা হয় বলিয়াই ইহা উল্লেখ করিলাম।

সমাজচ্যুত হইলেও শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ সমাজের কল্যাণ সাধনে বিরত ছিলেন না। বসন্তকুমারের পরামর্শ অনুসারে শিশিরকুমার "ভ্রাতৃ-সমাজ" নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনটী প্রাণী লইয়া উক্ত সভা গঠিত হইয়াছিল। বসন্তকুমার প্রেসিডেণ্ট, হেমন্তকুমার সভ্য ও শিশিরকুমার সম্পাদক হইলেন। মতিলাল অল্পবয়স্ক হইলেও জ্যেষ্ঠ সহোদরগণের কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। যে স্বদেশ প্রেম শিশিরকুমারকে ভারত-বাসীর নিকট বরেণ্য করিয়াছিল, তাহা প্রথম যৌবনেই তাঁহার চরিত্রে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া শিশিরকুমার "ভ্রাতৃ-সমাজ" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে যে তাহা সফলতা লাভ করিয়াছিল, পাঠক তাহা ক্রমশঃই অবগত হইবেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পল্লীগ্রামে পাশ্চাত্য-শিক্ষার ক্ষীণ আলোক-রশ্মি পতিত হইয়াছিল মাত্র। অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার, ব্যাধিগ্রস্ত দরিদ্র পল্লীবাসিগণের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন, প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যের ইচ্ছা তখন দেশবাসিগণের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে নাই। যুবক হইলেও শিশিরকুমারের হৃদয় প্রশস্ত ছিল। দেশের উল্লিখিত অভাবগুলি মোচনের অভিপ্রায়ে তিনি জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমারের পরামর্শ অনুসারে "ভ্রাতৃ-সমাজ" প্রতিষ্ঠা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মাগুরা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর মধ্যে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইলে, শিশির, দাদা ও মেজদাদার সহিত

* এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-কবিদিগের সখ্য প্রেমের একটী কবিতা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। শ্রীকৃষ্ণকে সখ্য করিয়া কবি কোনও রাখাল-বালকের মুখে এই কথা বলাইয়াছিলেন—

"সারা বন বুলে বুলে,
ফলফল এনেছি তুলে,
রেখেছি ঘড়ার অকলে,
মিঠা বলে খাইনে।"

ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সহায়তার নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। ভ্রাতৃত্রয় পর্য্যায়ক্রমে কত রুগ্ন ব্যক্তির শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সুকঠিন।

একদিন অপরাহ্ণকালে শিশিরকুমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ বসন্ত-কুমারের সহিত বাড়ী হইতে যশোহরাভিমুখে রওনা হন। সন্ধ্যার পর পল্লীগ্রামের রাস্তায় লোক-চলাচল বড় দেখা যায় না। নানা কথাবার্ত্তায় পথ অতিবাহিত করিতেছেন, এমন সময় দুই সহোদর কয়েকটী শৃগালের খ্যাক্-খ্যাক্ শব্দের সহিত একটী মনুষ্যের ক্ষীণ ও কাতর কণ্ঠস্বর শিশিরকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কৌতূহল বশতঃ শিশিরকুমার বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইলে শিয়ালগুলি পলায়ন করিল; কিন্তু সেখানে যে দৃশ্য তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল, তাহাতে তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তিনি দাদাকে ডাকিলেন; বসন্ত-কুমারও তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া লোকটী অতি ক্ষীণ ও কাতর কণ্ঠে জল প্রার্থনা করিল। শিশির ছুটিয়া গিয়া নিকটের একটী পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া তাহাকে পান করাইলেন। লোকটী একটু সুস্থ হইয়া বলিল, "আমি যশোরে মোকদ্দমা করতে যাচ্ছিলাম, রাস্তায় কলেরা হয়েছে। এক পাও চল্‌বার সামর্থ্য আমার নাই। বাবা, আমি যদি এখানে একলা পড়ে থাকি, তাহ'লে নিশ্চয়ই আমাকে শিয়ালে ছিঁড়ে খাবে।" শিশির-কুমারের প্রাণ কিরূপে স্থির থাকিবে? তিনি বলিলেন, "ভয় কি? আমি তোমাকে যশোরে নিয়ে যাচ্ছি।" বসন্ত বলিলেন, "কি করে নিয়ে যাবে শিশির?" দৃঢ়কায় না হইলেও শিশিরকুমারের শরীরে যথেষ্ট শক্তি ছিল। তাহার উপর, অসহায় বিপন্নের উপকার করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে জাগরূক হওয়ায়, সঙ্গে-সঙ্গে যেন তিনি শরীরে অমানুষিক বল লাভ করিলেন। শিশিরকুমার বলিলেন, "দাদা, আমি লোকটীকে ঘাড়ে করে নিয়ে যাচ্ছি, তুমি মাঝে-মাঝে সাহায্য কোরো।" আর বিলম্ব না করিয়া শিশির বিসূচিকা-রোগগ্রস্ত পথিককে স্কন্ধে লইয়া যশোহরের পথে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীরে মল মূত্র লাগিয়া গেল, কিন্তু সেদিকে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি নাই। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহারা যশোহরে উপস্থিত হইলেন। হরিনারায়ণ শিশিরের কার্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন; পুত্রের মহাপ্রাণতা লক্ষ্য করিয়া তিনি হৃদয়ে নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিলেন। রোগীর জন্য একটী স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দ্দিষ্ট এবং তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইল। শিশিরকুমার রোগীর শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। রোগী রোগমুক্ত হইল। সেবা ব্যতীত ধর্ম্মলাভ হইতে পারে না; সেবা ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেব সত্যই বলিয়া-ছিলেন,—

"যারেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে।"

সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির শুশ্রূষা করিতে গিয়া অনেক সময় শুশ্রূষাকারীও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ তাহা জানিয়াও বসন্ত ও কলেরা প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের সেবা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। একবার গ্রামে গাঙ্গুলীবাড়ীর একটি চাকরের কলেরা হয়। মনিবের বাড়ী হইতে চাকরটি অতি কষ্টে একটি বৃক্ষতলে গিয়া শয়ন করিল। সংবাদটি বসন্তকুমারের শ্রবণগোচর হইলে তিনি সহোদরগণের সহিত সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে চাকরটি বলিয়াছিল, "বাবা, আমি ত মরিবই, কিন্তু মৃত্যুর পর আমার দেহের যাহাতে যথাবিধি সৎকার হয়, তাহার একটা ব্যবস্থা করিও।" বসন্ত-কুমার সহোদরগণের সহিত সেই নীচজাতীয় ভৃত্যকে স্কন্ধে করিয়া শ্মশানে লইয়া গিয়া তাহার সৎকার করিলেন। তাঁহাদের এই কার্য্য লক্ষ্য করিয়া গ্রামবাসিগণ বিরক্ত হইলেও তাঁহারা কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। অগ্রজ-দিগের ন্যায় মতিলালও একবার তাঁহাদের বাড়ীর একটি চাকরের কলেরার সময় স্বহস্তে তাহার মলমূত্র পরিষ্কার ও তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বসন্তকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ মানবজীবনের কর্ত্তব্য পালন করিতেন বলিয়াই যেন বিধাতার মঙ্গল হস্ত সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে বিপদের গ্রাস হইতে রক্ষা করিত। তাঁহাদের হৃদয়ে প্রতিহিংসা-বৃত্তির স্থান ছিল না। যাঁহারা তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিয়া-ছিলেন, যাঁহারা তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে ত্রুটী করেন নাই, তাঁহাদিগের কাহারও বাটিতে কোনও বিপদ উপস্থিত

হইলে ভ্রাতৃবৃন্দ প্রাণপণে তাঁহাদের সহায়তা করিতেন। মিত্রতা দ্বারা শত্রুকে পরাজয় করাই তাঁহাদের ধর্ম্ম ছিল। যাঁহারা অনেক দুঃখ কষ্ট দিয়াছেন, তাঁহাদের কোনও উপকার করিব না, এ ভাব শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণের মনে কখনও উদয় হইত না। বিশ্বজনীন প্রেম যে হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে, সেখানে প্রতিহিংসা-বৃত্তির স্থান কিরূপে হইবে? নিত্যানন্দ মাধাইএর হস্তে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

"ওরে মেরেছিস্ কলসীর কানা,
তাই বলে কি প্রেম দিব না?"

শিক্ষা-বিস্তার ব্যতীত দেশের প্রকৃত মঙ্গল ও উন্নতি হওয়া অসম্ভব, এ কথা যৌবনের প্রথম হইতেই শিশির-কুমারের মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। কোনও সদনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি হৃদয়ে জাগরূক হইলে ভগবান্ নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে উদ্যোগী পুরুষের সহায়তা করিয়া থাকেন। 'ভ্রাতৃ-সমাজে'র অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে মাওরা গ্রামে উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বালিকা-বিদ্যালয়ের সঙ্গে বয়ঃপ্রাপ্ত মহিলারাও যাহাতে শিক্ষালাভ করিতে পারে, সেজন্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছিল। উৎসবের জন্য সারাদিন পরিশ্রম করিবার পর, কৃষকমণ্ডলী যাহাতে কিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করিতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন পল্লীতে নৈশ-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বসন্ত, হেমন্ত ও শিশির এই সকল বিদ্যালয়ে প্রয়োজনমত, বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করিতেন। অসহায় পল্লীবাসিগণের চিকিৎসার জন্য তাঁহারা একটী চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সমাগত রোগীদিগকে কেবল ঔষধ প্রদান করা হইত না, আবশ্যকমত তাহাদের থাকিবার স্থান ও পথ্যাদিও দেওয়া হইত। মাওরায় বাজার না থাকায় তত্রত্য অধিবাসিগণকে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বসন্তকুমার সহোদরগণের সহায়তায় ক্রমে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বাজারে গৃহস্থের নিত্য-ব্যবহার্য্য সমস্ত জিনিসই পাওয়া যাইত। মাছ, তরকারি হইতে জুতা, জামা, কাপড়, বাসন, সৌখিন দ্রব্য সমস্তই বিক্রয়ার্থ এই বাজারে প্রস্তুত থাকিত। স্নেহময়ী জননী অমৃতময়ীর নামানুসারে বসন্ত ও শিশির-কুমার বাজারটীর "অমৃতবাজার" নাম দিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে মাওরা 'অমৃতবাজার' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণের যত্নে ও চেষ্টায় গ্রামে একটি ডাকঘরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

অমৃতবাজার শীঘ্রই একটি আদর্শ পল্লী হইয়া উঠিল। পল্লীর যুবকগণকে বিদ্যোৎসাহী করিবার জন্য শিশিরকুমার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। তিনি জেলার তাৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার মন্‌রোকে একবার স্বীয় গ্রাম পরিদর্শনের জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। যথাস্থানে আমরা এই মন্‌রোর পরিচয় প্রদান করিব। তিনটি যুবকের চেষ্টায় একটি পল্লীর অসম্ভব উন্নতি লক্ষ্য করিয়া সাহেব বিস্মিত হইয়া-ছিলেন। শিশিরকুমার যশোহরের পরিবর্ত্তে অমৃতবাজারটিকে জেলা করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মিষ্টার মন্‌রো প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, পল্লীখানি যশোহর হইতে সর্ব্বাংশেই উন্নত, কিন্তু শিশির-কুমারের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব নহে। যাহা হউক, তিনি সরকারী কার্য্য-বিবরণীতে 'ভ্রাতৃ-সমাজের' কার্য্যাবলীর যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। যুবকগণের উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য তিনি উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে ও চিকিৎসালয়ে সরকার হইতে সাহায্য-দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শারীরিক ও মানসিক শক্তির সংমিশ্রণেই মানবের পূর্ণাঙ্গতা; সুতরাং বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে বালকগণ যাহাতে স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে শিশিরকুমার আমাদের দেশের বিলুপ্ত ব্যায়ামগুলি পুনঃ-প্রবর্ত্তনে যত্নবান হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে কোয়াদ (ড্রিল) শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীজাতিকে শক্তিশালী করিবার জন্য তিনি নানা স্থানে ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শিশির তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমাগ্রজের সহিত একবার কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া, কি উপায়ে কৃশ বাঙ্গালীজাতি বলবীর্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কলেজ-গৃহে রামতনু লাহিড়ী ও উমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়দ্বয়ের নেতৃত্বাধীনে এক মহতী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহারা কলিকাতায় আগমন করেন, এবং তাঁহাদের চেষ্টা ও যত্নের ফলে নব-গোপাল মিত্রের "জাতীয় মেলা"র প্রতিষ্ঠা হয়।

বসন্তকুমারের সকল দিকেই লক্ষ্য ছিল। দেশে

যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে গালা ও তসর উৎপন্ন হয়, তিনি তাঁহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। জাতীয় শিল্প ও কৃষি শিক্ষার জন্য তিনি শিশিরকুমারের সহযোগে কৃষি ও শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্থান হইতে উচ্চশ্রেণীর কারিকর আনাইয়া তিনি গ্রামবাসিগণের কৃষি ও শিল্প-শিক্ষার পথ সুগম করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল। বসন্তকুমারের শিল্পবিদ্যার পরিচায়ক একটি টেবিল এখনও অমৃতবাজার-পত্রিকা অফিসে ব্যবহৃত হইতেছে।

গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে না পারিলে জগতে উন্নতি লাভ করা অসম্ভব, এই ধারণাটি শিশিরকুমার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজের হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই বদ্ধমূল হইয়াছিল। দুই সহোদর সাহিত্য-চর্চ্চা অপেক্ষা বিজ্ঞান ও গণিত-চর্চ্চায় অধিক সময় ব্যয় করিতেন। শিক্ষকের বিনা-সাহায্যে শিশির বাটীতেই হুস্বমান ও সদাহার-গণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ বসন্তকুমার দুই একটি নূতন তথ্যও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে শিশিরকুমার যখন বৈদ্যনাথ দেওঘরে অবস্থান করিতেন, সেই সময় লেখকের জনৈক আত্মীয় তাঁহার সহিত একদিন সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তখন মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউসনে বি-এ ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেন। শিশিরকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি বি-এতে কোন্-কোন্ বিষয় লইয়াছ?" যখন শুনিলেন যে, তিনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও দর্শন লইয়াছেন, তখন শিশিরকুমার বলিয়াছিলেন, "তুমি গণিত লও নাই কেন? গণিত শিক্ষা না করিলে প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় না। তুমি যাহা কিছু বলিবে, তাহা ভাল ইংরাজীতে বল কিম্বা মন্দ ইংরাজীতে বল, তাহা কেহই লক্ষ্য করিবে না; কিন্তু যাহা কিছু বলিবে, তাহা সারগর্ভ হওয়া আবশ্যক। এই সারগর্ভ কথা বলিতে হইলে গণিত শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন।" বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য শিশির ও বসন্ত সময়ে-সময়ে গৃহে যন্ত্রাদিও নির্ম্মাণ করিয়া লইতেন। বসন্ত-কুমার স্বহস্তে একবার একটি বয়নযন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে বয়ন-কার্য্য বড় সন্তোষজনক হইত না। অকৃতকার্য্য হইলেও, তাঁহার এই উদ্যমের জন্য তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত, হেমন্ত ও শিশিরের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি ছিল। নানা প্রলোভন ও পাপের আবাসভূমি এই সংসারে মানব যত দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবে, ততই তাহাদিগকে দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে, এই ধারণা তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বসন্তকুমার বলিতেন যে, যত শীঘ্র এ জগত হইতে চলিয়া যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল; কারণ তাহাতে পাপ ও প্রলোভনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া শিশিরকুমারের পঞ্চম সহোদর হীরালাল আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "জীবিত থাকিয়া দেশের কোনও কার্য্য করিতে পারিব না, অথচ প্রত্যহই পাপের পথে অগ্রসর হইব, ইহা অপেক্ষা সংসার হইতে শীঘ্রই অপসৃত হওয়া ভাল।" জীবনের মধ্যাহ্নে শিশিরকুমার কিন্তু এই মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে, ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত মানব দীর্ঘ-জীবন লাভ করিতে পারে না। দীর্ঘায়ু না হইলে মানব প্রাণ ভরিয়া ভগবানের পূজা করিবার অবসর পায় না। হীরালালের মৃত্যুতে তাঁহার ভ্রাতা-ভগিনীগণ অন্তরে যে কি ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না। বিশেষতঃ জননী অমৃতময়ী ও সহোদর মতিলাল পাগলের ন্যায় হইয়াছিলেন। মৃত্যুর একঘণ্টা পূর্ব্বে হীরালাল মতিলালকে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করেন, "এ সংসারে জীবের উপায় কি হইবে?" মতিলাল তাঁহাকে সাধ্যমত বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। জননী ও মতিলালের ভাব লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমার তাঁহাদের হৃদয়ের যন্ত্রণা প্রশমিত করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। তিনিও বলিতেন, "হীরালাল ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব। ইচ্ছামত যদি হীরালালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারি, তাহা হইলে আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিব।" শিশিরকুমার দিবা-রাত্রই চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে মৃত্যু প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মানব-জীবনকে শান্তিহীন করিয়া তুলে, তাহাকে জয় করা কি সাধ্যাতীত? এই কথা হৃদয়মধ্যে আন্দোলন করিতে

লাগিলেন। শেষে যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, প্রকৃত অধ্যাত্মবাদ (Spiritualism) দ্বারা মৃত্যুকে জয় করা যাইতে পারে, তখন তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য শিশিরকুমার আমেরিকা যাত্রা করিবেন কৃতসংকল্প হইয়া বাড়ী হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে আমেরিকায় গমন করিতে হয় নাই। কলিকাতায় তখন স্বনামধন্য পুরুষ প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় একজন অধ্যাত্মবাদী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। শিশিরকুমার তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বীয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমদিন চক্র (circle) করিয়া বসিলে মতিলালের চৈতন্যলোপ হয় এবং হীরালালের ভাব তাঁহার শরীরে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। চক্র করিয়া বসিলে অধিকাংশ সময় হেমন্তকুমারের শরীরে বিভিন্নের প্রভাব লক্ষিত হইত। প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় স্বয়ং অধ্যাত্মবাদী হইলেও অধ্যাত্মবাদ প্রচারে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। শিশিরকুমার ও তাঁহার সহোদরগণ দেশে অধ্যাত্মবাদ প্রচারে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার শেষ-জীবনে Spiritual Magazine নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাখানি অদ্যাপি তাঁহার উপযুক্ত সহোদর শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের ও শিশিরকুমারের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু নীহারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইতেছে। আমরা যথাস্থানে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

হৃদয়বান পুরুষেরাই একাগ্রমনে দেশের মঙ্গল চিন্তা করিতে সমর্থ হন। শিশিরকুমারের হৃদয় অতি প্রশস্ত ছিল; তিনি কিরূপভাবে দেশের মঙ্গল চিন্তা করিতেন, তাহা তাঁহার প্রথম যৌবনের নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে পাঠকবর্গ সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন। শিশিরকুমার একদিন দেখিলেন যে, একটী লোককে সর্পদংশন করিয়াছে। লোকটীর আত্মীয়-স্বজনগণ তাহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে। সর্পদষ্ট ব্যক্তি স্বীয় জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া অন্তরে যে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিল, তাহা তাহার বদনে প্রতিভাত হইয়াছে। বহু চেষ্টায় তাহার জীবনরক্ষা হইল না, আত্মীয় স্বজনগণের সম্মুখে তাহার জীবনদীপ নির্ব্বাণ হইল; সঙ্গে-সঙ্গে বিলাপ-ধ্বনি আকাশ বিদীর্ণ করিল। এই শোচনীয় মৃত্যু দর্শন করিয়া শিশিরকুমারের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। সর্প-দংশনে দেশের কত লোক প্রতিবৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অথচ তাহার কোনও প্রতিকার নাই, এই চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। কি উপায়ে সর্পদষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, শিশির সেই চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। মানব-জাতিকে সৃজন করিয়া যিনি পালন করিতেছেন, তিনি কখনও নিষ্ঠুর হইতে পারেন না, শিশিরকুমারের মনে বাল্যকাল হইতে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল। যিনি যন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যে তাহার উপশমেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান যে দেশে বিষধর সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দেশে সর্পাঘাতের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায়ও করিয়া রাখিয়াছেন, শিশিরের মনে এ বিশ্বাস ছিল। তিনি একজন মাল-বৈদ্যকে মাসিক বেতন দিয়া নিজের বাড়ীতে রাখিয়া সর্প-দংশনের চিকিৎসা শিক্ষা করিয়াছিলেন। শেষে মধ্যবয়সে তিনি সর্পদংশন ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই গ্রন্থখানি ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। যে বিষয়েই শিশির-কুমার হস্তক্ষেপ করিতেন, তিনি তাহার চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়িতেন না। গ্রন্থখানি লিখিবার সময় তিনি সর্প-সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ই বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচনা করিতেন। বিভিন্ন জাতীয় সর্প ও তাঁহাদের প্রকৃতি লক্ষ্য করিবার জন্য তিনি একবার তাঁহার জীবন কিরূপ বিপন্নাপন্ন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠকবর্গকে অবগত করাইব।

১৮৭৮ সালের ভীষণ বন্যার পর শিশিরকুমার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত গোপালনগরের পুলিশ-সব্‌ইন্‌স্‌পেক্টর ও কয়েকজন মাল-বৈদ্যের সহিত চৈতালের জলাভূমিতে সর্প দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। শিশিরকুমারের ইংরাজী গ্রন্থ হইতে আমরা চিত্রটীর বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করিলাম। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায়, আমরা সেই চিত্রটী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত না করিয়া তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিলাম।

"জলাভূমি অতিক্রম করিতে করিতে আমরা কতকগুলি খর্জ্জুরবৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইলাম। দূর হইতে যে দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা আজীবন হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। সঙ্গীয় মালবৈদ্যগণ সর্প ধরিবার জন্য নৌকাখানি খর্জ্জুর বৃক্ষগুলির অতি নিকটে লইয়া গেল। অসংখ্য সর্প বৃক্ষগুলির ডালে আশ্রয় গ্রহণ করায় তাহাদের পত্রগুলি একরূপ অদৃশ্য হইয়াছিল। একজন মাল-বৈদ্য বৃক্ষের একটী ডাল ধরিয়া টানিবামাত্র সহস্র সহস্র সর্প জলে পতিত হইয়া আশ্রয় লইবার জন্য নৌকার চারিধারে আসিয়া বেড়াইতে লাগিল। মাল বৈদ্যরা গাছের ডাল ধরিয়া যতই টানিতে লাগিল, নৌকাখানি ততই খর্জ্জুর বৃক্ষের ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সঙ্গে-সঙ্গে বৃক্ষের ডালগুলি হইতে সর্প নৌকায় আসিবার উপক্রম করিল। অসংখ্য সর্প যখন খর্জ্জুরবৃক্ষের ডাল এবং জল হইতে আমাদের নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল, তখন আমাদের মনে যে বিপদভাবের উদয় হইয়াছিল, সকলেই তাহা অনুমান করিতে পারেন। সর্পগুলির অধিকাংশই কেউটে জাতীয়। মাছের ঝাঁকের ন্যায় অসংখ্য বিষধর আমাদের ক্ষুদ্র নৌকাখানির চারিদিকে আসিয়া বেড়াইতে লাগিল, আর আমরা এক-একখণ্ড বংশদণ্ড লইয়া জলে আঘাত করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইতে লাগিলাম। * * * * আমরা শেষে একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইলাম। বৃক্ষটীকে যেন সর্পের চন্দ্রাতপ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন বর্ণের সর্পে যে অতুলনীয় শোভা সম্পাদন করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। প্রকাণ্ড বটবৃক্ষটীর কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখায় বোধ হয় লক্ষাধিক সর্প আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।"

শিশিরকুমার পরদিনই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগের কমিশনার ও বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর, প্রত্যেকেরই নিকট এই মর্ম্মে এক-একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট চৈতালের জলাভূমিতে অতি অল্পব্যয়ে লক্ষ লক্ষ সর্প বিনষ্ট করিতে পারেন; এবং এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ তৎপর হওয়াও কর্ত্তব্য। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্ট তলব করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব রিপোর্ট দাখিল করিলে গভর্ণমেণ্ট সর্পগুলিকে বিনষ্ট করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু এই সকল পত্র ও রিপোর্ট আদান-প্রদানে কয়েক দিবস অতিবাহিত হইল; ইতিমধ্যে বন্যার জল কমিয়া যাওয়ায় সর্পগুলিও নির্ব্বিবাদে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিল।

সখী

বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি-অবলম্বনে

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম-এ]

তৃতীয় শ্রেণী।

শ্রাবণ-সংখ্যায় সখী-সম্প্রদায়কে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছি। এক্ষণে এই তিন শ্রেণীর আলোচনা-কালে উচ্চ হইতে ক্রমিক-ভাবে নিম্ন ও নিম্নতর শ্রেণীতে না নামিয়া নিম্ন হইতে উচ্চে উঠিব, কেননা ইহাই বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী। এই জন্য প্রথমে তৃতীয় শ্রেণী ধরিব।

(১) 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ক্ষীরি

'বিষবৃক্ষে'র হীরা-সম্বন্ধে (ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৫, পৃঃ ৩২) বুঝাইয়াছি যে, কুন্দর প্রতি তাহার আদর-যত্ন কপটতা-মাত্র, সে প্রকৃতপক্ষে কুন্দর দুঃখ দেখিয়া, সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া, সুখী হইত; সুতরাং তাহাকে এ শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমরের খাস বী 'ক্ষীরোদা—ওরফে ক্ষীরোদমণি—ওরফে ক্ষীরাব্ধিতনয়া—ওরফে শুধু ক্ষীরি' একেবারে পরিত্যাজ্য নহে। (তাহার 'মোটাসোটা গাটাগোটা—জল পারে গোট-পরা—হাসি-চাহনিতে ভরা-ভরা' চেহারায় ভারতচন্দ্রের তথা বঙ্কিমচন্দ্রের হীরার কথা এক একবার মনে পড়ে।) যদিও ভ্রমর নিজের হৃদয়বেদনা ক্ষীরিকে জানান নাই, এবং

তাহাকে বুঝিতে দেন নাই যে, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ের এক কোণে অঙ্কুরিত হইবার উপক্রম হইয়াছে (১ম খণ্ড, ২১শ পরিচ্ছেদ), তথাপি বলিতে হয় যে, ক্ষীরি ভ্রমরের কতকটা 'বিশ্বাসবিধ্বংসকারিণী' ; আর 'পার্শ্বচারিণী' ত বটেই। তাই ভ্রমর গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর আসক্তির কথা গোবিন্দলালের মুখে শুনিয়া, ক্ষীরিকে রোহিণীর কাছে দূতী করিয়া পাঠাইলেন ; এবং তাহাকে 'বারুণী পুকুরে—সন্ধ্যাবেলায়—কলসী গলায় দিয়ে' ডুবিয়া মরিতে বলিয়া দিলেন (এ যেন শ্রীরাধার চন্দ্রাবলীর নিকট দূতী পাঠান !)। ক্ষীরি সানন্দে সে আদেশ পালন করিল (১ম খণ্ড, ১৪শ পরিচ্ছেদ)। তাহার পর গোবিন্দলাল 'দেহাতে' গেলে, ক্ষীরোদা ভ্রমরের 'প্রোষিতভর্তৃকা' অবস্থার বাড়াবাড়ি সহ্য করিতে না পারিয়া, তাঁহার ব্যথায় প্রলেপ দিবার ব্যর্থ প্রয়াসে, তিনি যে 'খণ্ডিতা' তাঁহাকে সেই কথা বুঝাইল ; অর্থাৎ রোহিণী-ঘটিত ব্যাপার একটু রঙ্গ চড়াইয়া বলিল। ফলে হিতে বিপরীত হইল ; ক্ষীরি পতিপক্ষপাতিনী ভ্রমরের হস্তে 'উত্তম-মধ্যম ভোজন' করিল। (১ম খণ্ড, ২০শ পরিচ্ছেদ)। কিন্তু ইহা ভালবাসার মার, বঙ্কিমচন্দ্র সেটুকু বুঝাইতে ছাড়েন নাই। 'ভ্রমর ক্ষীরোদাকে ভালবাসিত, সেই জন্য তাহাকে মারপিট করিয়াছিল' (১ম খণ্ড, ২২শ পরিচ্ছেদ)। আবার ক্ষীরি মার খাইয়া অভিমানে গোবিন্দলালের কলঙ্ক-কথা হরিদ্রাগ্রাম-ময় রাষ্ট্র করিল বটে, কিন্তু তথাপি সে ভ্রমরকে ভালবাসিত। 'ক্ষীরোদার সরল অন্তঃকরণে ভ্রমরের উপর রাগ-দ্বেষাদি কিছুই নাই, সে ভ্রমরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী বটে, তাহার অমঙ্গল চাহে না ; তবে ভ্রমর, যে তাহার ঠকামি কাণে তুলিল না, সেটা অসহ্য' (১ম খণ্ড, ২১শ পরিচ্ছেদ)।

যাহা হউক, গোবিন্দলালের সচ্চরিত্রে সন্দেহ করিয়া ভ্রমর বলুক, গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিতেছেন শুনিয়া, পিত্রালয়ে যাওয়া স্থির করিলেন, তখন তিনি আবার সেই ক্ষীরিরই শরণ লইলেন, যাহাকে 'পত্র লিখিয়া গোপনে ক্ষীরি চাকরাণীর দ্বারা লোক ঠিক করিয়া, ভ্রমর তাহা পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল' (১ম খণ্ড, ২৪শ পরিচ্ছেদ)। এক্ষেত্রেও ক্ষীরি বিশ্বাস বিধ্বংস-কারিণী, সাহায্যকারিণী পত্রহারী (তবে আদিরসের ব্যাপারের মত প্রেমপত্রী নহে)।

ইহা হইতে বুঝা গেল, ক্ষীরির দাসী একেবারে দুর্ব্বল নহে। তবে এই বাস্তবচিত্রে (realistic picture) চমৎকারিত্ব অর্থাৎ রোমান্টিক ভাব কিছুমাত্র নাই বলিয়া, পাঠকবর্গ তাহার নাম এই ফর্দ্দ হইতে খারিজ করিতে চাহিলে, তাহাতে আমার প্রবল আপত্তি নাই।

(২) 'রাজসিংহে' দেবী চাকরাণী

'পুনঃ-প্রকাশিত' 'রাজসিংহে' যোধপুরী বেগমের প্রসঙ্গে আছে :—'দেবী নামে তাঁহার একজন পরিচারিকা ছিল। সে বড় বিশ্বাসী।' তাহাকে যথেষ্ট আর চিরকালের জন্য মুক্তির লোভ দেখাইয়া যোধপুরী তাহা দ্বারা রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীকে দিল্লী আসিতে বারণ করিয়া ও রাণা রাজসিংহের শরণ লইতে বলিয়া পাঠাইলেন (২য় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। দেবীও মতিওয়ালী সাজিয়া কৌশলে রূপনগরের রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যোধপুরীর শিক্ষামত সকল কথা তাঁহাকে বলিল (৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)। এক্ষেত্রেও (ক্ষীরির ন্যায়) দেবী 'বিশ্বাসবিধ্বংসকারিণী' বটে, দৌত্য-কার্য্যও করিয়াছে ; তবে প্রেমের সহায়তার জন্য নহে। সখীর বা দূতীর অন্যান্য লক্ষণও মিলে না। অতএব ইহাকে খারিজ করিলে আমার কোন আপত্তি নাই।

(৩) 'সীতারামে' পাঁচকড়ির মা

'সীতারামে' শ্রীর প্রসঙ্গে আছে :—'পাঁচকড়ির মা নামে তাহার এক বর্ষীয়সী প্রতিবাসিনী ছিল। ঐ প্রতিবাসিনীর সঙ্গে ইহাদিগের বিলক্ষণ আত্মীয়তা ছিল ; সে শ্রীর মার অনেক কাজকর্ম্ম করিয়া দিত' (১ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ)। ['দেবী চৌধুরাণী'তে প্রফুল্লর প্রসঙ্গে কুলমণি নাপিতানী ও 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' হিরণ্ময়ীর প্রসঙ্গে অমলা স্মর্ত্তব্য।]

শ্রী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ভ্রাতা গঙ্গারামের উদ্ধারের জন্য স্বামী সীতারামের নিকট যাইতে উদ্‌যোগী হইয়া এই পাঁচকড়ির মাকে সঙ্গে লইল। পাঁচকড়ির মা দরওয়ান পাঁড়েঠাকুর—শ্রীবিষ্ণু :—মিশর ঠাকুরের সাহায্যে জীবন ভাণ্ডারীর নাগাল পাইয়া তাহাকে তোয়াজ করিয়া তাহার মারফত শ্রীকে সীতারামের সমীপে পৌঁছাইয়া দিল। পাঁচকড়ির মা শ্রীর স্বামিসম্ভাষণে সহায়তা করিয়া সখীর কাজ করিয়াছে, তবে এ বাসকসজ্জা অভিসার প্রভৃতি আদিরসের ব্যাপার নহে, 'ভারি বিপদে' পড়িয়া শ্রী সীতারামের শরণ

লইয়াছিল। অতএব এ ক্ষেত্রেও বোধ হয় দাসী দুর্বল। পাঠকবর্গ ইচ্ছা করিলে এ নামটিও ফর্দ্দ হইতে খারিজ করিতে পারেন।

(৪) 'সীতারামে' মুরলা

'সীতারামে' মুরলা 'রাজবাটীর পরিচারিকা,' ছোটরাণী রমার খাস বী। সে শুধু চতুরা, প্রগল্‌ভা, সাহসিকা নহে, রাজান্তঃপুরের খিড়কির প্রহরী পাঁড়ে ঠাকুরের সহিত তাহার কথাবার্ত্তা (২য় খণ্ড, ৫র্থ ও ৭ম পরিচ্ছেদ), গঙ্গারামের প্রতি তাহার বিদ্রূপ ('আবার আসিবে বোধ হইতেছে' ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ), দরওয়ানকে দিয়া গঙ্গারামের নিকট হইতে তাহার টাকা আদায় করিবার চেষ্টা (২য় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ), এবং গ্রন্থকার তাহার মনোভাব সম্বন্ধে যে একটু-আধটু ইঙ্গিত করিয়াছেন,—এই সমস্ত হইতে বেশ বুঝা যায় যে, সে দুশ্চরিত্রা, 'বিষবৃক্ষে'র মালতী গোয়ালিনী, 'দেবী চৌধুরাণী'র ফুলমণি নাপিতানী, ও ভারতচন্দ্রের মালিনীর শ্রেণীর লোক। 'ইন্দিরা'র হারাণীর চরিত্রে যে দৃঢ় নীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, মুরলার চরিত্রে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। এই শ্রেণীর লোকই গুপ্ত-প্রণয়ের 'দূতী' হয়; তবে তাহাকে যে দূতীর কার্য্য করিতে হয় নাই, সে তাহার গুণে নহে, রমার গুণে। 'রমার মন বড় পরিষ্কার, পবিত্র' (২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ), তাহার উদ্দেশ্য গুপ্ত-প্রণয় নহে। রমা দায়ে পড়িয়া সন্তানের রক্ষার জন্য স্ত্রী-বুদ্ধিতে গঙ্গারামকে ডাকাইয়াছিল; পরে মুরলার একদিনকার কথায়, এ কার্য্য অন্যে কি চক্ষে দেখিতে পারে, রমা তাহা বুঝিল। গঙ্গারাম তাহার দ্বারা দূতীর কাজ করাইতেই ইচ্ছুক ছিল। শেষে তাহার অদর্শনে 'নিজে এক দূতী খাড়া করিয়া মুরলার কাছে পাঠাইলেন—তাকে ডাকিতে।' (২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ)। মুরলা এই ব্যাপারকে গুপ্ত-প্রণয় বলিয়া বুঝিতেই প্রস্তুত ছিল। 'যে অপবিত্র, সে পবিত্রকেও আপনার মত বিবেচনা করিয়া কাজ করে।' যাহা হউক, তাহার ও পাঁড়ে ঠাকুরের দোষে রমার কলঙ্ক রটিল (৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।) রমার বিচার-কালে সে নন্দার উপদেশে সত্যের মর্য্যাদা রাখিয়া নিজ দোষের কতকটা কালন করিয়াছিল। (৩য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ)। তাহার পর, ভারতচন্দ্রের মালিনীর মত, যখন 'কালাধুণীকে' 'মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, নগরের বাহির করিয়া' দেওয়া হইল, তখন তাহার উপযুক্ত শাস্তিই হইল (৩য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)।

কল কথা, মুরলা রমার 'বিশ্বাসবিশ্রামকারিণী পার্শ্বচারিণী' বটে; আবার 'দৌত্যব্যাপারপারঙ্গমা'ও বটে; সে গুপ্ত-প্রণয়ের সহায়তা করিতেছে মনে করিয়াই উৎসাহের সহিত এই কার্য্য করিয়াছিল (যদিও রমার উদ্দেশ্য ভাল ছিল)। এ অবস্থায় মুরলাকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

পরে 'মুরলার বদলে, যমুনা নাম্নী একজন পরিচারিকা রাণীর প্রধানা দাসী হইয়াছিল।' (৩য় খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ)। তাহার সম্বন্ধে গ্রন্থকার যেটুকু ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, সে প্রাচীনা হইলেও, তাহার চরিত্র মুরলারই এপিঠ ওপিঠ। সে যদিও 'রমাকে বিলক্ষণ যত্ন করিত,' তথাপি রমা তাহার সঙ্গে ঔষধ-বেচার যে বন্দোবস্ত করিল, তাহাতে বুঝা যায়, তাহার ভালবাসা কৃত্রিম। সুতরাং তাহাকে এ শ্রেণীতে ধরিবার কোনও কারণ নাই।

(৫) 'রাধারাণী'তে চিত্রা

রাধারাণীর দাসী চিত্রা-সম্বন্ধে পূর্ব্বে (ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৫, পৃঃ ৩২) যাহা বলিয়াছি, তাহার অধিক বিশেষ কিছু বলিবার নাই। রাধারাণী ও কৃষ্ণকুমার যে মুহূর্ত্তে মালা বদল করিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে 'পোঁ করিয়া শাঁক বাজিল। রাধারাণী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শাঁক বাজাইল কে?" তাহার একজন দাসী, চিত্রা, উত্তর করিল, "আজ্ঞে আমি।" রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাজাইলি?" চিত্রা বলিল, "কিছু পাইব বলিয়া।" বলা বাহুল্য যে চিত্রা পুরস্কৃত হইল। কিন্তু তাহার কথাটা মিথ্যা। রাধারাণী তাহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া দ্বারের নিকট বসাইয়া আসিয়াছিল।' (৮ম পরিচ্ছেদ)। ইহার পূর্ব্বে বা পরে চিত্রার আর কোন প্রসঙ্গ নাই। এটুকু কাষ সে রাধারাণীর শিক্ষামত করিল, স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া নহে। তথাপি ইহাতে একটু মাধুর্য্য, একটু চমৎকারিত্ব আছে, অতএব চিত্রাকেও এই শ্রেণীতে ফেলিতে দোষ কি? (চিত্রা নামটি শ্রীরাধার অষ্টসখীর অন্যতমার

নাম হইতে গৃহীত, এ কথাটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা ভাল।)

(৬) 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' অমলা

'যুগলাঙ্গুরীয়ে' হিরণ্ময়ীর বাল্যকাল হইতেই পুরন্দরের সহিত সাহচর্য্যে অনুরাগ জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহার বাল্যসখী নাই। পুরন্দর চলিয়া গেলেও কোনও বাল্য-সখীর নিকট তাহার মনোবেদনা প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা নাই; পত্রাদি পাঠ করিয়া তাহার কোনও বিশ্বাসপাত্রীর সহিত এ বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা নাই; মা-বাপ মরিলেও কুন্দর মত তাহার ব্যথা জুড়াইবার স্থান নাই; যাহা হউক, পুরন্দর শ্রেষ্ঠী সিংহল হইতে ফিরিবার সম-সময়কালে অমলার অবতারণা হইয়াছে। রাত্রে যুবতী হিরণ্ময়ীর একা থাকা উচিত নহে বলিয়া, হিরণ্ময়ী রাত্রিতে 'অমলার গৃহে শয়ন করিতেন।' ('দেবী চৌধুরাণী'তে একটু প্রভেদ, ফুলমণি প্রফুল্লর বাড়ীতে রাত্রিতে শয়ন করিত।) 'অমলা নামে এক গোপকন্যা হিরণ্ময়ীর প্রতিবাসিনী ছিল।—সচ্চরিত্রা বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল।' (৫ম পরিচ্ছেদ।) সে মুরলা-যমুনা-মালতী-ফুলমণির মত দুশ্চরিত্রা নহে, হারাণী ও পাঁচকড়ির মার সহিত তুলনীয়া। অমলা পুরন্দরের প্রত্যাগমনের সংবাদ হিরণ্ময়ীকে দিল; হিরণ্ময়ী শুধু 'চিনি' বলিয়া সায় দিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শ্রেষ্ঠিপুত্রের কি বিবাহ হইয়াছে'; কিন্তু নিজের মনের কথা তাহাকে বলিলেন না। অমলা যখন পুরন্দরের প্রেরিত উপহার বলিয়া মহা-মূল্য হীরার হার তাঁহাকে দিল, তখনও হিরণ্ময়ী, পুরন্দর তাঁহার হৃদয়ের কতখানি জুড়িয়া আছে, তাহা অমলাকে বলিলেন না। হিরণ্ময়ীর বাসের জন্য পুরন্দর-কর্তৃক ক্রীত গৃহে যখন হিরণ্ময়ী অমলার সহিত বাস করিতে লাগিলেন, তখন তিনি অমলাকে পুরন্দরের গৃহে যাইতে নিষেধ করিলেন, কারণ জানাইলেন না। আবার অমলা বলিল, "রাজবাড়ী আমার কার্য্য হইয়াছে।—আমি সংসার চালাইব।" (৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) উভয় পক্ষেই লুকোচুরি চলিল। তাহা হইলে বুঝা গেল, অমলা হিরণ্ময়ীর 'পার্শ্ব-চারিণী' হইলেও 'বিশ্বাসবিশ্রামকারিণী' নহে। যাহা হউক, রাজবাড়ী হইতে হিরণ্ময়ীর জন্য শিবিকা আসিলে সে-ই তাঁহাকে সংবাদ দিল, হিরণ্ময়ী সখী বা দাসী হিসাবে তাহাকে সঙ্গেও লইলেন (৭ম পরিচ্ছেদ), এই জন্যও বটে এবং অমলা তাঁহাকে যত্ন আত্তি করিত, ভালবাসিত বলিয়াও বটে, তাহাকে এই শ্রেণীভুক্ত করিয়াছি। রাজা মদনদেব যে তাহাকে হিরণ্ময়ীর 'দাসী' বলিয়া কান্ত না হইয়া 'দূতী'ও বলিয়াছেন, সেটা অবশ্য তাঁহার ধাপ্পা দেওয়া কথা। (৯ম পরিচ্ছেদ)। বরং শেষ পরিচ্ছেদে যে রহস্যো-দ্ঘাটন হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায়, রাজাই অমলা দ্বারা (হিরণ্ময়ীকে হার পাঠাইয়া) কতকটা দূতীর কার্য্য করাইয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু সে অবশ্য সদুদ্দেশ্যে।

(৭) 'ইন্দিরা'র হারাণী

'ইন্দিরা'র হারাণী একটিবার ইন্দিরার প্রণয়ব্যাপারে পত্রহারী দূতীর কার্য্য করিয়াছে ও 'অভিসার'-কালে নায়িকার অনুরোধে তাহাকে নায়কের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছে। ছোট 'ইন্দিরা'র ব্যাপারটা তেমন নির্দ্দোষ নহে। মনে রাখিতে হইবে, ছোট 'ইন্দিরা'র ইন্দিরার সুভাষিণী সখী নাই, সুতরাং ইন্দিরাকে মামলা তদ্বিরের সব ভারই নিজে লইতে হইয়াছে, কেবল 'রামকাম দত্তের পরিচারিকা' হারাণী একটু দূতীর কাজ করিয়াছে। ইন্দিরা বলিল, "ঝি, আমার জন্মের শোধ একবার উপকার কর। ঐ বাবুটি কখন যাইবেন, আমাকে শীঘ্র খবর আনিয়া দে।" 'হারাণী মহ হাসিল,' 'একটু গুরুমহাশয়-গিরি' করিল, একবার 'ছি' বলিল, কিন্তু শেষে রাজি হইল। "তোমার জন্য এ কাজ আমি করিব, কিন্তু আর কারও জন্য হইলে করিতাম না।" 'হারাণীর নীতি-শিক্ষা এইরূপ।' (৪র্থ পরিচ্ছেদ।) সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিলে ইন্দিরা আবার তাঁহার কাছে হারাণীকে পাঠাইল, 'হারাণী আবার হাসিয়া বলিল, "ছি," কিন্তু দৌত্যে স্বীকৃত হইয়া গেল।' (৪র্থ পরিচ্ছেদ)

কিন্তু গৃহস্থবাড়ী এরূপ দূতীগিরিতে রাজি হওয়া বড় দোষের বিষয়, এইটুকু বুঝিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পুনর্লিখিত ও পরিবর্দ্ধিত 'ইন্দিরা'র হারাণীর চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়াছেন। বড় 'ইন্দিরা'র সে সুভাষিণীর 'খাস ঝি,' সুভাষিণী প্রয়োজন হইলেই তাহাকে দিয়া রমণবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। গৃহস্থঘরে দূতীগিরি এই পর্য্যন্তই চলে। (৭ম পরিচ্ছেদ)। ছোট 'ইন্দিরা'র

হারাণী সামান্য আপত্তির পরই বাবুটির সংবাদ আনিতে, দূতীগিরিতে, রাজি হইয়াছিল, বড় 'ইন্দিরা'র যদিও সে ভারতচন্দ্রের মালিনীর মত, 'চাল্লিশ পার, হাসি মুখে ধরে না, সকল তাতেই হাসি, একটু ভিরবিরে,' কিন্তু ইন্দিরা সংবাদ আনিবার কথা তাহাকে বলিবামাত্র 'হারাণী একেবারে হাসি বন্ধ করিল। এত হাসি, যেন ধুঁয়ার অন্ধকারে আগুন ঢাকা পড়িল।' (পক্ষান্তরে, সে ছোট 'ইন্দিরা'র প্রস্তাব শুনিয়া মৃদু হাসিয়াছিল।) সে ইন্দিরাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিল, 'কেলেঙ্কারী' হইবে বলিয়া ইন্দিরার মুখ চাহিয়া টাকা কয়টা ছুড়িয়া ফেলিল না, কিন্তু কথাটা একেবারেই ঝাড়িয়া ফেলিল, দৃঢ়স্বরে বলিল, "কিছুতেই আমা হতে এ কাজ হইবে না।" শেষে ইন্দিরার নির্ব্বন্ধাতিশয় ও তাহার কান্না দেখিয়া, 'বৌ-ঠাকুরাণী যদি হুকুম দেন' তবে কাযটি করিতে স্বীকৃতা হইল, কিন্তু ঘুষের টাকা কিছুতেই লইল না। (১২শ পরিচ্ছেদ।) তাহার পর সে যখন 'বৌ ঠাকুরাণী কাঁটা মেরেছে, বারণ ত করেনি' বলিয়া যাইতে রাজি হইল ও পত্রহারী দূতী সাজিল, তখন সে কতকটা বুঝিয়াছে 'কিছু দোষ নাই', 'উনি আর জন্মে আমার স্বামী ছিলেন' ইন্দিরার এই কথার উত্তরে বলিয়াছে, 'আর জন্মে, কি এ জন্মে, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না'; তাই সে হাসিয়া বলিল, "যদি এ জন্মের হন, তবে আমি পাঁচশত টাকা বখ্‌শিশ নিব; নহিলে আমার কাঁটার ঘা ভাল হইবে না।" (১) (১৩শ পরিচ্ছেদ)। তাহার পর অভিসার-লীলা। 'হারাণী হাসিতে হাসিতে গেল। পরে আলো সব নিবিলে, সবাই শুইলে, হারাণী আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ঘর দেখাইয়া দিয়া আসিল।' (১৪শ পরিচ্ছেদ।)

হারাণী 'বিশ্বাসী', ইন্দিরার কান্না দেখিয়া তাহার 'দয়া হইল'; অতএব সে 'বিশ্বাসবিশ্রামকারিণী' ও 'সমদুঃখসুখা' উভয়ই কতকটা বটে; তবে সকল কথা শুনিলে সে বিশ্বাস করিবে না বলিয়া ইন্দিরা তাহাকে সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিল না। (১২শ পরিচ্ছেদ)। ফলতঃ হারাণীর এই শ্রেণীভুক্ত হইবার দাবী আছে।

(৮) 'কপালকুণ্ডলা'র পেষ্‌মন্

পেষ্‌মন্ 'কপালকুণ্ডলা'র মতিবিবি ওরফে লুৎফউন্নিসার দাসী বা বাঁদী। ২য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে আমরা মতিবিবির প্রথম দেখা পাই, এবং উক্ত খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে আমরা তাঁহার দাসী পেষ্‌মনের প্রথম দেখা পাই। মতিবিবি (পূর্ব্বনাম পদ্মাবতী) বহুকাল পরে স্বামীকে দেখিলেন, চিনিলেন; আবার স্বামীর নবপরিণীতা অদ্বিতীয়া রূপসীকে দেখিলেন। এই সময়ে তাঁহার হৃদয় উদ্‌বেল হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং একজন সখীর প্রয়োজন, তাহার নিকট মুখ ফুটিয়া দুই এক কথা বলিলেও হৃদয়ের ভার লঘু হয়। তাই ঠিক এই সময়ে পেষ্‌মনের অবতারণা। মতিবিবি দাসী-সঙ্গে নবকুমারের নব-পরিণীতাকে দেখিয়া আসিলেন, আপনার গা হইতে খুলিয়া সমস্ত গহনা দিয়া তাহাকে সাজাইলেন। ফিরিয়া আসিলে পেষ্‌মন্ মতিবিবিকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিবিজান! এ ব্যক্তি কে?" যবনবালা উত্তর করিলেন, "মেরা শৌহর।" (২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।) পেষ্‌মন্ 'যবনবালা'র পূর্ব্ব ইতিহাস জানিত না, সুতরাং কথাটা বুঝিতে পারিল না, মতিবিবিও ইহার অধিক তখন ভাঙ্গিলেন না। যেটুকু বলিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের ভার একটু লঘু হইল, ইহাই তখনকার মত যথেষ্ট। মতিবিবির মত আত্মনির্ভরক্ষমার তিলোত্তমা-মৃণালিনীর মত সখীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই। আমরাও এইটুকু হইতে মতিবিবির পূর্ব্বজীবন-সম্বন্ধে সামান্য একটু ইঙ্গিত পাইলাম। তবে ইহাতে কেবল কৌতূহলের উদ্রেক হইল। (পরবর্ত্তী ৩য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদের সহিত ১ম খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদ মিলাইয়া পড়িলে তবে আমরা মতিবিবির পূর্ণপরিচয় পাইব।)

ইহার পরে আবার ৩য় খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে আমরা মতিবিবি ও পেষ্‌মনকে নবকুমার-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেখি।(২) "পেষ্‌মন্, আমার স্বামীকে কেমন দেখিলে?"

(১) আখ্যায়িকার শেষ অংশে গ্রন্থকার হারাণীর দোষকালনের জন্য আবার হৃতাধিনীর মারফত আমাদের সোচর করিয়াছেন:—"হারাণী প্রথমে কিছুতেই টাকা লইবে না। বলে, আমার লোভে বাড়িয়া যাইবে। এটা যেন ভাল কাজই করিয়াছিলাম, কিন্তু এ রকম কাজ ত মন্দই হয়। আমি যদি লোভে পড়িয়া মজেই রাজি হই!" (উপসংহার, ২য় পরিচ্ছেদ।) দীয়া, মালতী গোয়ালিনী, ফুলমণি বাসিতানী, ঘুঘলা প্রভৃতির সহিত তাহার চরিত্রের সুস্পষ্ট প্রভেদ লক্ষণীয়।

(২) যাঁহারা ২য় খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে পেষ্‌মনকে শিবিকারোহণে আসিতে দেখিয়া তাহাকে নির্ম্মলকুমারীর মত দ্বিতীয় শ্রেণীর সখী

ইত্যাদি আলোচনায় মতিবিবির মনোভাব-সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টতর জ্ঞান লাভ করা যায়; এরূপ কথাবার্ত্তায় তাঁহার মনের ভারও একটু লঘু হইল। তাহার পর রাজনীতি-সম্বন্ধে উভয়ের যে আলোচনা হইল, তাহা হইতে বুঝা গেল, পেখ্‌মন্ মতিবিবির বিশ্বাসপাত্রী বটে। তিনি যে মেহেরউন্নিসার মন জানিতে বর্দ্ধমানে যাইতেছেন, সে কথাও পেখ্‌মনকে তিনি অসঙ্কোচে বলিলেন। তবে রাজনীতির ব্যাপারে বিফলমনোরথ হওয়াতে তাঁহার মনে যে 'নূতন ভাবে'র উদয় হইল, ইতি আপাততঃ 'তাহা পেখ্‌মনকে বলিলেন না।...পশ্চাৎ প্রকাশ পাইবে।' ইহা একটা কাব্য-কৌশল, অথচ মতিবিবির চরিত্রের ক্রমিক বিকাশ-প্রদর্শনের জন্যও প্রয়োজনীয়।

৩য় খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে আবার যখন উভয়ের দেখা পাই, তখন সেই কথাটা প্রকাশ পাইল। ইহার মধ্যে মতিবিবির রাজনীতিক্ষেত্রে নৈরাশ্য ত ঘটিয়াছিলই, তাঁহার মনোরাজ্যেও একটা বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। 'পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।' তিনি আগ্রা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালাদেশে বাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তবে 'সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না।' 'অনেকদিন আগ্রায় বেড়াইলাম, কি ফললাভ হইল?' ইত্যাদি আক্ষেপের বাক্যগুলি তিনি মনের আবেগে পেখ্‌মনকে বলিয়া হৃদয়ের জ্বালা কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিলেন। পেখ্‌মনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও তাঁহার তীব্র অনুতাপ ও 'নূতন ভাবে'র পরিচয় পাইলেন।

ইহার পর, আর একবারমাত্র আমরা পেখ্‌মনের দেখা পাই। ৩য় খণ্ডের ৭ম পরিচ্ছেদে সপ্তগ্রামের 'উপনগর-প্রান্তে' আমরা উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাই। নুৎফ-উন্নিসা 'পেখ্‌মনের সাহায্যে পুরুষবেশ ধারণ করিতেছেন ও নিজের উদ্দেশ্যের কথা অকপটে তাহাকে বলিতেছেন। তবে তিনি পেখ্‌মনকে নেরিসার কথা তাঁহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন না। (তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সুবিধাও হইত না), বরং পেখ্‌মন্ তাঁহাকে 'সে নিবিড় বন-মধ্যে রাত্রিকালে একাকিনী যাইতে নিষেধ করিল। অবশ্য অতিসাহসিকা নুৎফউন্নিসা সে নিষেধ গ্রাহ্য করিলেন না, তাহার 'কথার কোন উত্তর না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।' তিনি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরক্ষম। যাহা হউক, পেখ্‌মন্ পূর্ব্ববর্ণিত কয়েকটি স্থলে যে সখীর স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি কাব্য-কৌশলের কথা না তুলিলে পেখ্‌মনের অবতারণার উদ্দেশ্য-বিচার অসম্পূর্ণ থাকিবে। কাব্যে তিন প্রকারে পাত্রপাত্রীদিগের মনোভাব পাঠকের গোচর করা যায়। ১ম, লেখকের সরাসরিভাবে বর্ণনায়; কিন্তু ইহা অপেক্ষাকৃত (inartistic) কাঁচা; ২য়, পাত্রপাত্রীদিগের কার্য্য ও বাক্য দ্বারা, বিশেষতঃ স্বগতোক্তি দ্বারা; কিন্তু স্বগতোক্তি অপরত্যা, অর্থাৎ অন্য উপায় না থাকিলে, ব্যবহর্ত্তব্য। ৩য়, পাত্র বা পাত্রীর কোন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা বা পত্র-ব্যবহার দ্বারা। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে (এবং অপর অনেক ক্ষেত্রে) সখীর অবতারণায় ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য, অর্থাৎ মতিবিবির পেখ্‌মনের সহিত কথাবার্ত্তা হইতে আমরা উক্ত প্রতি-নায়িকার মনোভাব-পরিবর্ত্তনের ইতিহাস বুঝিতে পারি। অথচ বেশ স্বাভাবিক ভাবে ইহার অবতারণা হইয়াছে।

(৯) 'চন্দ্রশেখরে' কুল্‌সম্

'চন্দ্রশেখরে' কুল্‌সম্ দলনী বেগমের দাসী বা বান্দী। সে আস্‌মানি-পেখ্‌মনের উন্নত সংস্করণ, অধিকতর পূর্ণতা ও নিপুণতার সহিত চিত্রিত, আখ্যায়িকা-কারের কলা-কৌশলের ক্রমোন্নতির পরিচায়ক।

আমরা ১ম খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে দলনীর প্রথম দেখা পাই (এই খণ্ডে আর দলনীর প্রসঙ্গ নাই), তাহার পর ২য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে কুল্‌সম্‌কে দলনীর পার্শ্বে প্রথম দেখি। কুল্‌সম্ দলনীকে রাজনীতির সংবাদ দিতেছে; পূর্ব্বে নবাবের সহিত রাজনীতি-সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল দলনী তাহার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন, এক্ষণে কুল্‌সমের মুখে সংবাদ শুনিয়া দুশ্চিন্তা আরও বাড়িল; তিনি পূর্ব্ব হইতেই এ সম্বন্ধে গুরগন্ খাঁকে পত্র পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এক্ষণে আরও দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন।

বলিয়া মনে করিয়া বসিবেন, তাঁহারা ৩য় খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে মতিবিবির পরিত্যক্ত অলঙ্কারের প্রতি পেখ্‌মনের লোভের কথা এবং ৩য় খণ্ডের ৪র্থ পরিচ্ছেদে মতিবিবির পরিত্যক্ত পোষাক-লাভের কথা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন, সে নিরলঙ্কারের দাসী বই আর কিছুই নহে।

এই গোপনীয় ও বিপজ্জনক কার্য্যে তাঁহার একজন 'বিশ্বাস-বিশ্রামকারিণী' 'নায়িকা-সহায়িনী'র প্রয়োজন, তাই এই সন্ধিক্ষণে কুল্‌সমের অবতারণা। প্রথমে উভয়ে একটু রঙ্গতামাসা হইল (অলঙ্কারশাস্ত্রের 'পরিহাস' বা 'নর্ম্ম'), তাহার পর যখন দলনী গুরগন্‌ খাঁর কাছে গোপনে পত্র পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন, তখন কুল্‌সম্‌ অসম্মত হইল,—হারাণীর মত নীতিজ্ঞানের জন্য নহে, ধরা পড়িয়া শাস্তি পাইবার ভয়ে। কিছুক্ষণ পরে সে স্বীকৃতা হইল। কাব্য-নাটকে 'লেখ্য-প্রস্থাপন' নায়িকার কার্য্য, পত্রহারী দূতী যথাস্থানে লিপি পৌঁছাইয়া দেয়। কুল্‌সম্‌ গুরগন্‌-দলনীর ভ্রাতা-ভগিনী-সম্বন্ধ জানিত না (পাঠকও এখন পর্য্যন্ত জানেন না), সুতরাং সে বুঝিল, কাব্যের সাধারণ নিয়মে ইহা মদন-লিপি। সে 'ইতস্ততঃ'র পর দূতীর কার্য্যে সম্মত হইল।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আমরা (গুরগন্‌ ও দলনীর সম্পর্কের পরিচয় পাই এবং) দলনীকে কুল্‌সমকে সঙ্গে লইয়া 'রাত্রে গোপনে একাকিনী চুরি করিয়া' গুরগনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেখি। গুরগন্‌ যখন কূটরাজনীতির প্রয়োজনে দলনীর 'দাঁড়াইবার স্থান রাখিলে'ন না, তখন দলনী আকুলহৃদয়ে কাঁদিয়া বলিল, "কুল্‌সম্‌!" কুল্‌সম্‌ও সমবেদনাময়ী সখীর ন্যায় তাঁহাকে সান্ত্বনা দিল, পরামর্শ দিল, কিন্তু দলনীর সে পরামর্শ ভাল লাগিল না। (এই তাঁহাদের প্রথম মতভেদ। ইহা সূচনা-মাত্র। পরে তাঁহাদের আরও বিষম মতভেদ হইবে।) যাহা হউক, আপাততঃ তাঁহারা 'দীর্ঘাকার পুরুষের' নিকট অভয় ও আশ্রয় পাইলেন। (২য় খণ্ড, ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ)।

তাহার পর, অনেক বিচিত্র ঘটনার পর উভয়েই ইংরেজের হাতে বন্দী হইলেন। (২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।) আখ্যায়িকা-কার প্রধান আখ্যান (চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবালিনী-ঘটিত) লইয়া ব্যস্ত থাকায় আবার বহু পরে (৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদে) আমরা ইহাদিগের সাক্ষাৎ পাই। এক্ষণে 'মুক্তি নিকট' ভাবিয়া দলনী আহ্লাদিতা, কিন্তু কুল্‌সম্‌ নবাবের হাতে পড়িলে শাস্তি পাইবে ভাবিয়া আতঙ্কিতা। এই প্রসঙ্গে উভয়ের কথাবার্ত্তায় মতভেদের পরিচয় থাকিলেও স্নেহের, আব্‌দারেরও পরিচয় আছে। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উভয়ের মতভেদ আরও প্রবল হইল, দলনী মুসলমানের হাতে পড়িবার জন্য ইংরেজের নৌকা হইতে নামিল, 'কুল্‌সম্‌ কিছুতেই নামিতে রাজি হইল না। দলনী তাহাকে অনেক বিনয় করিল—সে কিছুতেই শুনিল না।' সে জীবনে এই প্রথম (ও শেষ) দলনীর প্রতি দৃঢ়তার অভাব দেখাইল। আমরা পরে দেখাইব, ভবিষ্যতে সে এ দোষের জন্য চূড়ান্ত প্রায়শ্চিত্ত (amende honorable) করিবে।

'অবতরণিকায়' বলিয়াছি (ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৪, পৃঃ ২৬) যে কাব্যনাটকে 'সখীদিগের প্রেমে পড়িবার অবসর নাই, নায়িকার উত্তর-সাধিকার কার্য্য-সাধনেই তাঁহাদিগের কার্য্য পর্য্যবসিত'—ইহাই হইল সাধারণ বিধি। কিন্তু কুল্‌সম্‌ এই বিধি লঙ্ঘন করিয়াই দলনীর সঙ্গত্যাগ-রূপ অপকার্য্য করিল। কেননা, সে নবাবের হাতে শাস্তি পাইবার ভয়ে নৌকা হইতে নামিল না, আপাততঃ সে এই অজুহত দিয়াছে বটে, কিন্তু পরে সে আসল কারণ প্রকাশ করিয়াছে,—"আদি সেই পাপিষ্ঠ ফিরিঙ্গীর দুঃখ দেখিয়া তাহার প্রতি—" (ষষ্ঠ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ)। তবে আমরা পাঠকমহাশয়কে কাণে কাণে বলিতে পারি, ইহাও আসল কারণ নহে। আখ্যায়িকা-কার দলনীর জীবনকাব্য নিদারুণ বিয়োগান্ত করিবেন বলিয়াই এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন।

'সে কথা যাউক।' শেষে কুল্‌সম্‌ এই বিষম ত্রুটির কিরূপে সংশোধন করিল (যদিও তখন দলনী ডেস্‌ডেমোনার মত মানবের বিচারের অতীত), এক্ষণে সেই কথা বলি। তাহার নিজের উক্তিই উদ্ধৃত করিতেছি -"আমার স্কন্ধে সেই সময় শয়তান চাপিয়াছিল সন্দেহ নাই,—কিন্তু তাহার ঘোর শাস্তি আমি পাইয়াছি—বেগমকে পশ্চাৎ করিয়াই আমি কাতর হইয়া ফষ্টরকে সাধিয়াছি যে, আমাকেও নামাইয়া দাও। কলিকাতায় গিয়া যাহাকে দেখিয়াছি—তাহাকেই সাধিয়াছি যে,আমাকে পাঠাইয়া দেও। এখন তোমরা আমার বধের উদ্যোগ কর— আমার আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই।" কিন্তু এই তীব্র অনুতাপ প্রকাশ করিয়াই সে ক্ষান্ত হয় নাই, সে দলনীর জন্য সমবেদনায় এমন আত্মহারা হইয়াছিল যে অকুতোভয়ে মীরকাসেমকে 'মূর্খ' নবাব বলিল। তাহার সাহস, তাহার দৃঢ়তা, তাহার সত্যনিষ্ঠা, তাহার ন্যায়ানুরাগ, তাহার সমবেদনা, 'বাঁদী' কুল্‌সম্‌কে শেক্‌স্‌পীয়রের এমিলিয়া-পলিনার

গৌরবান্বিত আসনে স্থান দেয়। ফল কথা, কুলসম্ সর্ব্বসমক্ষে দলনীর সমস্ত ইতিহাস বর্ণনা করিল (৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ), জন্ ষ্টীলকার্টকে লরেন্স ফষ্টার বলিয়া চিনাইয়া দিল (৪র্থ পরিচ্ছেদ), এবং 'যোড় হস্তে, সজল নয়নে, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—"জাঁহাপনা! আমি এই আমদরবারে, এই পাপিষ্ঠ, স্ত্রীঘাতক মহম্মদ তকির নামে নালিশ করিতেছি, গ্রহণ করুন। সে আমার প্রভুপত্নীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া, আমার প্রভুকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া, সংসারের স্ত্রীরত্নসার দলনীবেগমকে পিপীলিকাবৎ অকাতরে হত্যা করিয়াছে—জাঁহাপনা! পিপীলিকাবৎ এই নরাধমকে অকাতরে হত্যা করুন।" (৭ম পরিচ্ছেদ)। ইহাই বাঙ্গী কুলসমের অকৃত্রিম সখিত্বের জাজ্বল্যমান নিদর্শন।

(১০) 'মৃণালিনী'তে গিরিজায়া

'মৃণালিনী'তে গিরিজায়া দাসীশ্রেণীর সখিত্বের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। তবে সে প্রথম হইতেই নায়িকার দাসী, দূতী বা সখীর ভূমিকা লইয়া আসরে নামে নাই। প্রথমে আমরা যখন তিলোত্তমার দর্শন পাই, তখন সে নায়কের দূতী, গৌড় দেশে হৃষীকেশ ব্রাহ্মণের বাটীতে হেমচন্দ্রের গুরুদেব মাধবাচার্য্য কর্ত্তৃক লুক্কায়িতা নায়িকা মৃণালিনীর সন্ধানে নায়ক হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক নিযুক্তা। (১ম খণ্ড, ৩য় ৪র্থ ও ৫ম পরিচ্ছেদ।) [শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, নায়ক পুরুষ হইলেও তাহার স্ত্রী-দূতী থাকিতে পারে—নায়কানামপি দূত্যো ভবন্তি (সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ)। পদ্যাবলী-সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতীর উল্লেখ আছে।] তাহার পর যেদিন প্রাতে গিরিজায়া মৃণালিনীর সন্ধান পাইল ও তাঁহার সহিত গোপনে প্রেমের মহাধন-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিল, সেইদিন রাত্রে আবার সে হেমচন্দ্রের পত্রহারী দূতী হইয়া আসিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই রাত্রি হইতেই সে মৃণালিনীর 'বিশ্বাস-বিশ্রামকারিণী পার্শ্বচারিণী সখী'র পদে উন্নীত হইল। সে ব্যোমকেশের আক্রমণ হইতে মৃণালিনীকে রক্ষা করিল এবং হৃষীকেশ মৃণালিনীকে বৈরিণী-জ্ঞানে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলে, সে-ই মৃণালিনীকে তাহার সহিত পলাইয়া আসিতে বলিল, মৃণালিনীর আশ্রয়স্থল হইল, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিল, হেমচন্দ্রের অনুসরণে নবদ্বীপে যাইতে পরামর্শ দিল এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মৃণালিনীর সঙ্গে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইল, এক দিনের পরিচয়েই মৃণালিনীর প্রতি যে মমতা হইয়াছে তাহা গোপন করিয়া নিজের নবদ্বীপ-যাত্রার অনুচিত দিল, 'আমার সর্ব্বত্র সমান। রাজধানীতে ভিক্ষা বিস্তর'। মৃণালিনীও তাহাকে হিতৈষিণী বলিয়া বুঝিলেন। (১ম খণ্ড, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) ফল কথা, আখ্যায়িকার প্রথম খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদেই সে নায়িকার পুরাবৃত্তের সখী হইল।

তাহার পর, ২য় খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে উভয়ের দর্শন পাওয়া যায়। 'নৌকাযানে' তাহারা নবদ্বীপের নিকটে পৌঁছিয়াছে। 'নির্ব্বাসিতা, পরপীড়িতা, সহায়হীনা মৃণালিনী'র একমাত্র সহায় গিরিজায়া। সে মৃণালিনীর গভীর বিষাদ দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে, দিবানিশি চিন্তা করিতে নিষেধ করিতেছে; মৃণালিনীও প্রায় সকল কথা তাহাকে জানাইয়াছেন, উভয়ে ইতিকর্ত্তব্য-সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছেন, বিষাদের মধ্যেও গিরিজায়ার বাক্‌চাতুরীতে মৃণালিনীর ম্লানমুখে একবার হাসির রেখা ফুটিল; মৃণালিনীকে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়া গিরিজায়া 'সাধের তরণী' গীত গাহিল, মৃণালিনী তাহার উপর টিপ্পনী করিলেন। বুঝা গেল, উভয়ের সখিত্ব নিবিড়তর হইয়াছে।

৩য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে আবার উভয়ের দর্শন পাই। তখন উভয়ে এক পাটনীর কুটীরে আশ্রয় পাইয়াছেন। মৃণালিনী তেমনই গভীর-বিষাদগ্রস্ত, গিরিজায়ার কথা হইতে জানা যায় সে হেমচন্দ্রের সন্ধানের চেষ্টা করিতেছে, মৃণালিনী নিজ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া রোদন সম্বল করিয়াছেন। 'মৃণালিনী উপাধানে মুখ লুকাইলেন। গিরিজায়ারও গণ্ডে নীরবক্রত অশ্রু বহিতে লাগিল।' সমবেদনাময়ী সখীর কি সুন্দর চিত্র! পরক্ষণেই এই গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে আশার আলোক ফুটিল। উভয়ে কুটীরদ্বারে আসিয়া বৃক্ষতলে (বটতলায়—বকুলতলায় নহে!) নিদ্রিত হেমচন্দ্রকে দেখিলেন। 'সাগর একেবারে উছলিয়া উঠিল। মৃণালিনী গিরিজায়াকে আলিঙ্গন করিলেন।' উভয়ে নিদ্রোত্থিত আহত গৃহাভিমুখী হেমচন্দ্রের 'অনুসরণার্থ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।'

পর-পরিচ্ছেদে গৃহাগত হেমচন্দ্রের প্রতি মনোরমার মমতা দেখিয়া উভয়ে চিন্তিত হইলেন, এ সম্বন্ধে একটু

আলোচনা করিলেন, তাহার পর মৃণালিনী গিরিজায়াকে সংবাদ লইবার জন্ত তথায় রাখিয়া কর্ত্তব্যবোধে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। "গিরিজায়া, আমি গৃহে চলিলাম, আমার আর থাকা উচিত নহে। তুমি এই পল্লীতে থাক, হেমচন্দ্র কেমন থাকেন সংবাদ লইয়া যাইও।" গিরিজায়া মৃণালিনীর কার্য্যে প্রাণ সঁপিয়া দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া হেমচন্দ্র ও মনোরমাকে লক্ষ্য করিল, সে কতকগুলি ব্যাপার প্রেমের লক্ষণ মনে করিয়া মৃণালিনীর জন্ত শঙ্কিত হইল। মৃণালিনীর জন্ত তাহার দরদ রঙ্গতামাসার মধ্য হইতেও ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'পাখিটীর জন্তে মৃণালিনী প্রতি রাত্রে কত লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে—আজি না জানি কতই কাঁদ্‌বে।' (৩য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ।)

এই দরদের জন্ত সে মৃণালিনীর আদেশ-মত শুধু হেমচন্দ্রের সুস্থতার সংবাদ লইয়াই ক্ষান্ত থাকিল না, সে চিরাভ্যস্ত ভিখারিণীর সাজে গান গাহিতে গাহিতে হেমচন্দ্রের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল. ইচ্ছা বিরহিণীর সংবাদ দিয়া হেমচন্দ্রের মনোভাব বুঝিয়া লয়। কিন্তু সে স্ত্রী-বুদ্ধিতে হেমচন্দ্রকে মিথ্যা সংবাদ দিল ('মৃণালিনীর বিবাহ দিতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন'), আবার স্ত্রী-বুদ্ধিতে হেমচন্দ্রের উক্তি "গিরিজায়া, তোমার সংবাদ শুভ। উত্তম হইয়াছে।"—শুনিয়াও ভুল বুঝিল। 'গিরিজায়া ভিখারিণী বৈ ত নয়—কি বুঝিবে?' সে নির্ম্মল-কুমারীর মত নির্ম্মল উজ্জ্বল বুদ্ধি কোথায় পাইবে? যাহা হউক, বুদ্ধির দোষ হইলেও তাহার হৃদয় মৃণালিনীর জন্ত কাতর হইল। (৩য় খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।)

কিন্তু গিরিজায়া মৃণালিনীর বেদনাবৃদ্ধির ভয়ে এসব কথা গোপন করিল, শেষে মৃণালিনীর ভাব দেখিয়া সব কথা খুলিয়া বলিতে বাধ্য হইল (৩য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ)। মৃণালিনী বুঝিলেন, ইহা হেমচন্দ্রের ক্রোধের, অভিমানের কথা। তখন মৃণালিনী গিরিজায়াকে পত্র দিয়া হেমচন্দ্রের কাছে পাঠাইলেন। অনেক দিন পরে আবার সে পত্রহারী দূতী - তবে এবার নায়কের নহে, নায়িকার। হেমচন্দ্র ইত্যবসরে গুরুদেবের মুখে মৃণালিনীর (মিথ্যা) অপরাধের কথা শুনিয়াছিলেন, সুতরাং 'কুলটার' দূতী গিরিজায়াকে বেত্রাঘাতের ভয় প্রদর্শন করিলেন। 'গিরিজায়ার আর সহ্য হইল না। ধীরে ধীরে বলিল, "বীরপুরুষ বটে! এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নবদ্বীপায় এসেছ?···মৃণালিনী দূরে থাক্, তুমি আমারও যোগ্য নও।" এই বলিয়া গিরিজায়া সদর্পে গজেন্দ্রগমনে চলিয়া গেল।' তাহার এই সাহস, তেজস্বিতা, মৃণালিনীর প্রতি হেমচন্দ্রের অন্যায় আচরণের জন্ত প্রতিবাদ, সখী-প্রীতিই ইহার মূল। তাহার এই সাহস ও তেজ কুলসমের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পদাবলী-সাহিত্যে বৃন্দাদূতীও 'নিঠুর কপট শ্যাম'কে এমনি দু'কথা শুনাইয়া দিয়াছে। ইহা গিরিজায়ার চরিত্রের বিশিষ্টতা। (৩য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ)।

গিরিজায়ার মুখে সব কথা শুনিয়া মৃণালিনী 'কোন উত্তর করিলেন না। রোদনও করিলেন না।···দেখিয়া গিরিজায়া শঙ্কান্বিত হইল—তখন মৃণালিনীর কথোপকথনের সময় নহে বুঝিয়া তথা হইতে সরিয়া গেল।' কিন্তু সরিয়া গিয়া সে নিশ্চিন্ত থাকিল না। সে বিষাদ-সঙ্গীত গাহিতে লাগিল, তাহার প্রভাবে মৃণালিনীর হৃদয় গলিল, মৃণালিনী কাঁদিলেন। গিরিজায়ার কৌশল সার্থক হইল। 'গিরিজায়া দেখিয়া হর্ষান্বিত হইলেন;—তিনি বুঝিতে পারিলেন যে যখন মৃণালিনীর চক্ষুতে জল আসিয়াছে—তখন তাঁহার ক্লেশের কিছু শমতা হইয়াছে।' মৃণালিনী কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া গিরিজায়াকে সঙ্গে লইয়া হেমচন্দ্রের নিকট যাইবার প্রস্তাব করিলেন। সে প্রস্তাবে যে গিরিজায়া জ্বলিয়া উঠিল, তাহা নিজের অবমাননার কথা স্মরণ করিয়া নহে, মৃণালিনীর প্রতি অবিচার স্মরণ করিয়া। ইহা তাহার সখীপ্রীতিরই নিদর্শন। মৃণালিনীর উক্তি হইতে বুঝা যায়, মৃণালিনী তাহার গভীর স্নেহের উপলব্ধি করিয়াছেন। 'তুমি আমাকে ভগিনীর অধিক স্নেহ কর—তুমি আমার জন্ত না করিয়াছ কি?' 'মৃণালিনী গিরিজায়ার স্কন্ধে বাহু স্থাপন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গিরিজায়াও রোদন করিল।' (৩য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ)। গিরিজায়ার গভীর সমবেদনার কি সুন্দর চিত্র!

পর-পরিচ্ছেদে গিরিজায়া মৃণালিনীকে বাপীতীরে রাখিয়া হেমচন্দ্রকে সংবাদ দিতে আসিল। বড় করুণ কাহিনী, তাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় শ্রীমতীর অভিসারের সহিত তুলনা দিব না। গিরিজায়া দৃঢ়তার সহিত, অনুযোগের সুরে, অথচ মৃণালিনীর প্রতি গভীর সমবেদনা-

পূর্ণহৃদয়ে হেমচন্দ্রকে বলিল, "আমাকে বেত্রাঘাত করিতে সাধ থাকে, করুন। ঠাকুরাণীর জন্য এবার তাহা সহিব স্থির সঙ্কল্প করিয়াছি।" প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের সমুখীন হইল, 'গিরিজায়া অন্তরে গেল।' আর কৃষ্ণলীলার নজির তুলিব না।

তাহার পর মৃণালিনীর মুখে তাঁহার হৃষীকেশের গৃহ-ত্যাগের কথা শুনিয়া হেমচন্দ্রের পূর্ব্ব ধারণা দৃঢ় হইল, মৃণালিনীর মস্তক বক্ষচ্যুত করিয়া তিনি দূতী গিরিজায়াকে 'পদাঘাতে পথ হইতে অপসৃতা করিলেন।" প্রাণ উৎসর্গ করিয়া 'ঠাকুরাণী'র কার্য্যউদ্ধারের চেষ্টার উপযুক্ত পুরস্কার বটে। যাহা হউক, গিরিজায়া নিজের আঘাত তুচ্ছ করিয়া মৃণালিনীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরাণী, আঘাত কি গুরুতর বোধ হইতেছে?" (২য় খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ)।

তাহার পর ৩য় খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে আবার আমরা উভয়ের দর্শন পাই। মৃণালিনী এখনও সে বাপীতীরে প্রস্তর-সোপানে আহতা ও বাধিতা। গিরিজায়া সেই অবধি শুশ্রূষা ও সান্ত্বনা করিতেছে। পরদিন 'নিকটস্থ বন হইতে কিঞ্চিৎ ফলমূল সংগ্রহ করিয়া ভোজন জন্য মৃণালিনীকে দিল।—প্রসাদ গিরিজায়া ভোজন করিল,—ক্ষুধার অনুরোধে মৃণালিনীকে ত্যাগ করিল না।' রাত্রি হইল, মৃণালিনী উঠিবেন না বুঝিয়া সেইখানেই পত্রশয্যা রচনা করিল। কিছুতেই মৃণালিনীর অনুরোধে ঘরে ফিরিল না। মৃণালিনীকে তখন হেমচন্দ্রের অনুরাগিণী দেখিয়া সে মৃণালিনীকে ধমক দিল, হেমচন্দ্রকে গালি দিল, চলিয়া যাইব বলিয়া ভয় দেখাইল, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে ছাড়িল না।

পর-পরিচ্ছেদে আবার সে মৃণালিনীকে গৃহে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কোন ফল হইল না। মৃণালিনী হেমচন্দ্রের বিপদের ভয়ে উৎকণ্ঠিতা হইলেন, গিরিজায়ার নিকট সে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু 'গিরিজায়া কোন উত্তর করিতে পারিল না। তাহার নিদ্রা আসিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মৃণালিনী দেখিলেন যে, গিরিজায়া ঘুমাইতেছে।' নারীর দুর্ব্বল দেহ অনিদ্রা-অনশনের কষ্ট আর কত সহিবে? ইহাতে যদি পাঠক হৃদয়হীনা বলিয়া গিরিজায়ার নিন্দা করেন, তাহা হইলে তাঁহার আশঙ্কার জন্য জানাইতেছি, অচিরে মৃণালিনীরও তন্দ্রা আসিল। নিদ্রার আবেশে, স্বপ্নের ঘোরে, নায়ক-নায়িকার মধুর-মিলন হইল, তখন সন্দেহের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। যাক্, সে সব অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া আর পুঁথি বাড়াইব না। 'গিরিজায়া মৃণালিনীর দুঃখের ভাগিনী হইয়াছিল, সহৃদয় হইয়া দুঃখের সময় কাহিনী সকল শুনিয়াছিল। আজি সুখের দিনে সে কেন সুখের ভাগিনী না হইবে? আজি সেইরূপ সহৃদয়তার সহিত সুখের কথা কেন না শুনিবে? গিরিজায়া ভিখারিণী, মৃণালিনী মহাধনীর কন্যা—উভয়ে এতদূর সামাজিক প্রভেদ। কিন্তু দুঃখের দিনে গিরিজায়া মৃণালিনীর একমাত্র সুহৃৎ, সে সময়ে ভিখারিণী আর রাজপুরবধূতে প্রভেদ থাকে না; আজি সেই বলে গিরিজায়া মৃণালিনীর হৃদয়ের সুখের অংশাধিকারিণী হইল।' প্রকৃত সমদুঃখসুখ সখীজনের চিত্র বটে। আর মৃণালিনী যে এতদিন সব কথা তাহাকে বলেন নাই, সে বিশ্বাসের অভাববশতঃ নহে, 'রাজপুত্রের নিষেধ ছিল বলিয়া।' এখন সে তারাইয়া তারাইয়া সব কথা শুনিল। এইখানেই এই অপূর্ব্ব সখিত্বের শেষ। (৪র্থ খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ।) শেষই বা বলি কেন? মৃণালিনী রাজরাণী হইলে, 'গিরিজায়া মৃণালিনীর পরিচর্য্যায় নিযুক্তা হইলেন,' নিজস্ব স্বামী পাইয়াই স্বামিনীর প্রতি তাহার প্রীতির কর্ত্তব্য শেষ হইল না। (পরিশিষ্ট)।

আর একটা কথা বলিয়া বিদায় লইব। সখী গিরিজায়ার, কাব্যশাস্ত্রের সাধারণ নিয়মে, নায়িকার উত্তর-সাধিকার কার্য্যেই সমস্ত পর্য্যবসিত নহে, অর্থাৎ সে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' নহে,—কবি দিগ্‌বিজয়ের সহিত তাহার শুভ (?) পরিণয় ঘটাইয়াছেন। তবে মৃণালিনীর যখন আর সখী বা দূতীর প্রয়োজন নাই, তখনই ইহা ঘটিয়াছে, নির্ম্মলকুমারীর বিবাহের ন্যায় পূর্ব্বাহ্নে ঘটে নাই; আর দিগ্‌বিজয়কে গিরিজায়া গ্রহণ করিল, দিগ্‌বিজয়ের প্রতি প্রেমে টানের জন্য যতটা না হউক, দিগ্‌বিজয় যে হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রণয়-ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছিল, সেই খাতিরে; অতএব ইহাও সখীপ্রীতির অন্যতম নিদর্শন। (৪র্থ খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ)। শেক্‌স্‌পীয়ারের এ্যাসিয়ানো-নেরিদার কথা ও ১৮শ শতাব্দীর ইংরেজী কমেডির খানসামা-চাকরাণীর কথা অবতরণিকায় (ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৫, পৃঃ ২৬) বলিয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মৃণালিনীর প্রতি গিরিবালার স্নেহ-মমতা এত গভীর ও অকৃত্রিম, এই সখিত্বের চিত্র এত উজ্জ্বল, এত সুন্দর, এত পূর্ণায়তন, যে তাহাকে তৃতীয় শ্রেণী হইতে প্রোমোশন দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে নির্ম্মলকুমারীর পার্শ্বে, এমন কি, তদপেক্ষা প্রোমোশন দিয়া প্রথম শ্রেণীতে বসন্তকুমারীর পার্শ্বে বসাইতে ইচ্ছা করে। গ্রন্থকার ঠিকই বলিয়াছেন :—গিরিবালা 'ভিখারিণী, মৃণালিনী মহাধনীর কন্যা—উভয়ে এতদূর সামাজিক প্রভেদ। কিন্তু দুঃখের দিনে...ভিখারিণী আর রাজপুরবধূতে প্রভেদ থাকে না।' 'জামাইবারিকে' মহারাণিমি শিষ্টশ্রেণীর হইলেও কি ধনিকন্যা কাদিনীর সমদুঃখসুখী নহে? [আর দুর্দ্দশায় পড়িয়া মৃণালিনী যে গিরিবালাকে মাসের মাস বেতন যোগাইতে পারিয়াছিলেন, ইহাও বোধ হয় না। (২য় খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)]। তথাপি গিরিবালা যখন পুনঃ পুনঃ মৃণালিনীর দাসী(৩) বলিয়া আপন মুখে কবুল করিয়াছে এবং শেষেও সে মৃণালিনীর 'পরিচর্য্যায় নিযুক্তা', তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে দাসী-শ্রেণীতেই ধরিলাম।

(৩) 'আমি তোমার দাসী হইয়াছি (২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ), 'আমি মৃণালিনীর দাসী' (৩য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ), 'আমি ত মৃণালিনীর দাসী' (৪র্থ খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ)।

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(১)

প্রতিবেশী ঘোষেদের বাড়ী হইতে নিতান্ত অসময়ে বাড়ী ফিরিয়া সে-দিন মিত্র-গৃহিণী দুর্গাসুন্দরী মেয়েকে ডাকিলেন; "মনু, মনু, একবার এদে শুনে যা দেখি!" কন্যা মনোরমা উপরে কি একটা কাজ করিতেছিল, মায়ের ডাক কাণে ঢুকিতেই, হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া, সসম্ভ্রমে নীচে নামিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল—"আমায় ডাক্‌চো কেন মা?" "শুনেছিস্, তোর শ্বশুর মিন্‌বে যে মারা গ্যালো!" "সত্যি! কে তোমায় বল্লে মা? চিঠি এসেছে?" মাতা উপেক্ষাসূচক শব্দোচ্চারণ করিয়া উত্তর করিলেন, "পোড়া! তারা আবার চিঠি লিখবে! তেমনিই বটে!—নিতাই আজ সকালের গাড়িতে বাড়ী এসেছে কি না,—সেই তার মাকে এসে বলেছে; ওদের বাড়ী শুনে এলুম।" মনোরমা বিবর্ণ মুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, পরে একটী নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "কবে গ্যাছেন? কি হয়েছিল, তা' কিছু বল্লে?" "আজ এই তিন দিন হয় আর কি! কি হয়েছিল, তা' কিছু বল্‌তে পারলে না। যাদো না কি অনেক দিন ধরেই হয়েছিল।"

মাতা-পুত্রী উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব থাকিলেন। দুজনেই হয় ত এক সঙ্গে এই এক ঘটনায় একই কথা—অনেক দিনের পুরানো কথা ভাবিতেছিলেন। কিছু পরে মৌন ভঙ্গ করিয়া মাতা কহিলেন, "পাতান না, গা সম্পর্ক নয়—নিজের শ্বশুর—সাক্ষাৎ আপনার পিতেমো,—ওদের আক্কেল যাই হোক্, তোমাদের কাজ তোমাদের করতে হবে। অজিতকে আর এ অবেলায় চান করিয়ে কাজ নেই, গা-হাত ধুয়ে গঙ্গাজল দিয়ে দাও,—আর নিজে তুমি 'চান' করে এসোগে। আজ আর কিছু না, শুধু দুধ-গঙ্গাজল,—কাল থেকে বালসা পোড়াতেও হবে। তাদের ব্যাভার মন্দ বলে, তুমি তোমার ধর্ম্ম ছাড়বে কেন,—যাও আর বেলা কাটিও না।" "যাই" বলিয়া মনোরমা খোঁপা খোলার অছিলায় আরও কিছুক্ষণ সচিন্তিত চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন কতকটা আত্মগতই কহিল,—"আমার শাশুড়ীর এই বয়সে কত কষ্টই হবে! আমার শ্বশুর এদিকে লোক মন্দ ছিলেন না, না মা?" "হ্যাঁ ভাল ছিলেন বই কি! ভাল নইলে আর তোমায় এমন দশা করে রেখেচেন! ভাল কত!"

মা কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন, মেয়ে লজ্জিত সঙ্কোচে নত মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আত্ম-সম্বরণ করিয়া লইল।

(২)

মৃত্যুঞ্জয় বসু ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। চির-দিন সেইখানেই কাটাইয়া, শেষ বয়সে হাবড়া রামকৃষ্ণপুরে নিজের পৈত্রিক বাড়ীতে ফিরিয়া এই সবে কয় দিন মাত্র তাঁহার ৺গঙ্গালাভ হইয়াছে। বসু মহাশয় ওকালতী কার্য্যে উপার্জ্জন মন্দ করেন নাই। দুই পুত্রের মধ্যে একটি তাঁহার জীবদ্দশাতেই গতাসু হয়। সেইটি কনিষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র অরবিন্দের দুই সংসার। সে বারকয়েক 'ল'এতে ফেল করিয়া, এখন কলিকাতায় বেশ বড় রকম মোটা মাহিনায় চাকরী করিতেছে। পদ ও প্রতিষ্ঠা তাহার মন্দ নয়। উন্নতির আশা যথেষ্ট। বয়স এই বৎসর-ত্রিশ—এমনি হইবে। আজকালকার কালে কোন শিক্ষিত যুবকের যে দুই সংসার হইতে পারে, এ কথা বিশ্বাসযোগ্যই নয়। হয় ত ইতঃমধ্যেই কেহ-কেহ এই কথা শুনিয়া চমকিয়াও উঠিয়া-ছেন। কিন্তু কি করা যাইবে—সে বেচারার এইরূপই ললাটলিপি। বিশেষ কৌলীন্য ভূষণে বিভূষিত না হইয়াও, তাহাকে দুইটি নারীরত্নের দ্বারা কণ্ঠ বিভূষিত করিতে হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় বসুর মৃত্যুর পর দুই দিন অতিবাহিত হইয়াছে। মৃতের জন্য শোকে মৃতব্যক্তির গৃহ সমাচ্ছন্ন থাকিলেও, বড়লোকের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে বড় রকমের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদনার্থ সে শোক বাধাহীন হইয়া শোকাচ্ছন্নদের অধিক কাল অভিভূত থাকিতে দেয় না। কাল চতুর্থ শ্রাদ্ধের দিন, পিতৃবিয়োগ-ব্যাকুলা কন্যাদ্বয় শরৎশশী ও উষাবতী, পাঁচজনের সান্ত্বনা উপদেশে ধৈর্য্যাবলম্বনের চেষ্টা করিয়া, পিতৃকৃত্যের বন্দোবস্তে মনোযোগী হইয়াছে। বড় মেয়ে শরৎ ধনবতী-গৃহিণী ভাগর মেয়ে,—সেই সংসারের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম জানিয়া যথাসাধ্য শান্ত থাকিয়া পিতৃঋণ মোচনের চেষ্টা করিতেছিল। উষা সবার ছোট—বাপের বড় আদরের মেয়ে, বয়সেও সে বালিকা। কেহ তাহাকে শান্ত করিতে পারিতেছিল না।

মৃত্যুঞ্জয় বোস এই নামেই তাঁহার প্রসিদ্ধি,—তা তিনি এতটা বয়সে মরিয়াও একটা বিধবা না রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বৃদ্ধা গৃহিণীর চিরদিনের সিঁদুর-পরা টাকের রক্তিমা এখনও নিজের প্রাচীনত্ব জানাইয়া দর্শকদের সমবেদনা আকর্ষণ করিতেছিল। হাত-ভরা স্বর্ণালঙ্কার, কস্তা-পাড় সাড়ী—সে-সব যাঁর কল্যাণে, তাঁহারই সঙ্গে দিয়া, অপরিচিত বিধবা মূর্ত্তিতে, তিনি দৌহিত্র দলের বিস্ময় উৎপাদন পূর্ব্বক, একটি পাশে পড়িয়া আছেন। পাঁচজনের সান্ত্বনার সঙ্গে তাঁহার নিজেরও মনে নিজের এই প্রাচীন বয়সের বৈধব্যকে বিচারের দিক হইতে খুব অসহনীয় বোধ না হইলেও, বুকের মধ্যে যে একটা দীর্ঘকালের অভ্যাস-ভঙ্গের মহা শূন্যতা পড়ো-বাড়ীর মত খাঁ-খাঁ করিতেছিল, তাহা যেন আর কিছুতেই পূর্ণ হইবার নয়। হায়! কালাকালের বিচার-বিতর্ক কি বিয়োগবিধুর চিত্ত কখনও মানিতে চায়! পুত্র আসিয়া বলিল, "মা, তুমি যদি এমন করে পড়ে থাক, তবে আমি কি করি?" বলিয়া মায়ের শ্রীহীন মূর্ত্তি দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। মাকে তাহার 'পাক-মাথা'র সিঁদুরে, কস্তাপাড়ের সাড়ীতে যে লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি দেখাইত! ক্ষণকাল পুত্রের সহিত অশ্রুজলের বিনিময়ে গুরু হৃদয়ভার কথঞ্চিৎ লঘু করিয়া মাতা কহিলেন, "আমার কি বলছিস্ বাবা, আমার হয়ে গ্যাছে, তোরা যা পারিস কর; শরৎকে বল্।" ছেলে বলিল, "মা, বাবা নেই, তুমি কিছু দেখবে না, শরৎই বলো, আমিই বলো, আমরা কবে কি করেছি? মানটা তো রাখতে হবে দশের কাছে। তুমি ওঠো মা, না হলে কিছুই হবে না। আমার বড় ভয় হচ্ছে।" সন্তানের এই নৈরাশ্যজনক উক্তি ও হতাশা-ব্যঞ্জক মুখ,—আপনার যত দুঃখই থাক,—মা কখনও উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভগ্ন দেহ-মনে যথাসাধ্য বল সংগ্রহ করিয়া, কর্ণধারহীন তরণীর কাণ্ডারীরূপে গৃহ-স্বামিনী আবার স্বীয় গৃহরাজ্যের অধিকার গ্রহণ করিলেন; কিন্তু বুঝি ঠিক আর তেমনটি হইল না। সে মন, সে আগ্রহ, সে সব, সেই যে একজনের সঙ্গেই চলিয়া যায়, আর তাহাকে শত আরাধনায়ও ফেরান যায় না। এখন শুধু থাকিতে হয় তাই থাকা,—করিতে হয় তাই করা।

নৌকাযোগে রাশিকৃত জালা, ভাঁড়, খুরি মাটির থালা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জিনিষপত্র রক্ষার জন্য বড়-বড় 'ওড়া' চাঙ্গারি, সিদা সাজাইবার মাঝারি ছোট ডালা প্রভৃতির বোঝাইও পৌঁছিল। সেই সব তোলাপাড়া করিতে-করিতে শরৎশশী এক আত্মীয়ার প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে

নিজেরই হৃদ্‌গত ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া কহিল, "বড়বৌ আস্‌বে বই কি,—আস্‌বে না, এত বড় কাজ!" "তাই তো বল্‌চি মা, হাজার হোক সেই তো বড়, সর্ব্বেসর্ব্বা ঘরণী-গিন্নি, বেটার মা,—তা সে না এলে কি মানায়, না ভাল দেখায়? পাঁচজনেই বা বল্‌বে কি? আন্‌বে বই কি।"

উষা গায়ে কাপড় মুড়ি দিয়া এক পাশে শুইয়া ছিল, কোন কাজে-কর্ম্মেই সে ধরা দেয় না। কথাটা কেমন করিয়া কাণে পৌঁছিতেই সে ফোঁস করিয়া উঠিয়া বসিল,—"দিদি! বড় বউ আসবে, এ কেমন ধারা কথা? জান না কি, যে, বাবার নিষেধ আছে, বড় বউ বাবার এ বাড়ীতে আসবে না?" শরৎ উত্তর করিল, "তার কি অপরাধ যে, আসবে না?" "বাবার বারণ।" "বাবা যদি একটা ভুলই করে যান, সেইটেকেই কি চিরদিন মান্‌তে হবে?" "হ্যাঁ হবে,—তাঁর বাড়ীতে, তাঁর ভাত খেয়ে, তাঁর ভুল-ত্রুটি সব মান্‌তে হবে। যে না মান্‌বে সে—" "কি? বল্ না, থাম্‌লি কেন?" উষা জিহ্বাগ্রে সমাগত বড় কঠিন কথাটাই কোনমতে সংযত করিয়া ফেলিয়া আবার মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িল। গভীর শোকাচ্ছন্ন কোপের মধ্য হইতে শুধু কহিল, "কখ্‌খনো সে আস্‌তে পাবে না,—বাবা বেঁচে-না-বেঁচেই বাবাকে যে এমন করে তুচ্ছ করা হবে, সে আমার কোন মতেই সহ্য হবে না।"—এই বলিয়াই সে ফোঁস্-ফোঁস্ করিয়া কান্না আরম্ভ করিয়া দিল। শরৎ কিছু লজ্জিত, কিছু বিরক্ত হইয়া "তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি বাবু" এই কথা বলিতে-বলিতে সে ঘর হইতে এক রকম পলাইয়া গেলেন। এই ছোট বোনটির জন্ম হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত বরাবরই ইহার নিকটে তাঁহার পরাজয় ঘটিয়াই আসিতেছে। যেহেতু এই অভিমানিনী মেয়েটী তাহার বাপের বড় আদরের। শরৎশশী মায়ের সো; বাপের কাছে তাঁহার তেমন আদর-সোহাগ ছিল না।

অরবিন্দ চারিদিকের বিশৃঙ্খলায় তিক্ত-বিরক্ত হইয়া, এক সময় স্ত্রীর খোঁজে আসিয়া দেখিল, পত্নী ব্রজরাণী ঘটাজালসংবদ্ধ রাশি-রাশি রুক্ষ চুল বিছানায় ছড়াইয়া দিয়া একখানা নভেল পড়িতেছেন। দেখিয়া তাহার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। স্বভাবের বিপরীত ঈষৎ রুক্ষ স্বরেই কহিয়া উঠিল—"এখন কি বই মুখে দিয়ে শুয়ে থাকবার সময়? শরৎ একা কত দিক সাম্‌লাবে বলো দেখি।" "কেন, একা কেন? আর একজন যাঁর আসবার কথা ছিল, তিনি এলেই তো ওঁর ঘোসর হতে পার্ব্বেন।" "কে? কার আবার আসবার কথা ছিল? তা সে যেই হক আসুক, তোমার ঘর-সংসার, তুমি এমন নির্লিপ্ত হয়ে শুয়ে থাকলে কি চলে বাপি?" "আমার ঘর-সংসার কি রকম? সর্ব্বে-সর্ব্বা ঘরণী গৃহিণী বেটার মা যিনি, তিনিই যখন আস্‌ছেন, তখন মাঝখান থেকে আমায় নিয়ে আর টানাটানি কেন? আমি যেমন আছি, একটী পাশে পড়ে থাকি না,—তায় কার কি ক্ষতি!—" ইহাই বলিয়া পঠিত গ্রন্থের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া ব্রজরাণী সেই ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস-খানির উপর গভীর মনোযোগ প্রদান করিলেন। সেখানে তাঁহার নিজের সমস্যার চেয়ে বড় সমস্যা চলিতেছে। এই খোঁচাটা খাইয়া স্বামীর মুখের ভাবখানা কি প্রকার হইল, তাহা পর্য্যবেক্ষণের ইচ্ছা সত্ত্বেও চাহিয়া দেখিবার সাহস হইল না। যদি সে দৃষ্টি ধরা পড়িয়া যায়! এই অনুযোগে অরবিন্দর মুখের ভাব কিরূপ হইল, তাহা আমরাও দেখি নাই; তবে গলার স্বরে অনেকখানি বিরক্তি ভরিয়াই যে সে প্রত্যুত্তর দিয়াছিল, তাহা শুনা আছে। সে কহিল, "কে তোমায় এ খবর দিয়েছে শুনি?" ব্রজরাণী বই হইতে মুখ তুলিল না, পঠনশীল মেধাবী ছাত্রের ন্যায় পুস্তকের পৃষ্ঠায় অখণ্ড মনোযোগ রাখিয়াই উত্তর দিল, "খবরটা তার আমায় হঠাৎ দেওয়াই অন্যায় হয়ে গাছে না?" "এসব কথা নিয়ে যারা ঘোঁট করে বেড়ায় তাদের—" "ওগো, তাদের মিথ্যে শাপ-শাপান্ত করো না, আমায় কেউ খবর দেবার জন্য বার্ত্তাবহ আসেনি, বাড়ীর মধ্যে রয়েছি, সবই তো কাণে যায়, আমিও তো আর নেহাৎ ধান খাইনে।" "না,—ধান তুমি খাবে কেন, আমিই খাই। তা যাক্ এখন ওসব, বাজে কল্পনা নিয়ে শুয়ে না থেকে, সংসারের কাজ-কর্ম্ম একটু দেখ-শোনগে। মার কোমরে এখন এত বল নেই যে, এই বিরোধ ব্যাপার তিনি ঘটিয়ে তুলবেন। শরতের নিজের কাচ্চা-বাচ্চা আছে, সে-ই বা কত পারে।" "ওঃ, তিনি তা'হলে এসব চুকে গেলে আসবেন? তার কি দরকার ছিল? আসচেন যখন, তখন আগে এলেই ত হোত।—আমার কি?—"

এইবার হাতের বই খানা সশব্দে বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া ব্রজরাণী উঠিয়া বসিল।—"আমি বাবা কি দাদা কারুকে লিখলেই, কেউ এসে সেই দিনেই আমায় নিয়ে যাবে।" নিজের অশেষবিধ ভয়-ভাবনায় অস্থির অরবিন্দ আর একটা নূতন বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, আর দ্বিরুক্তি-মাত্র না করিয়াই প্রস্থান করিল। বঙ্গীয় কায়স্থ-কুল নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত; এদিকে এই কায়স্থকুলতিলক বহুসন্তান যত্রতত্রই রণে ভঙ্গ দিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন দ্বারা ইহার বিপরীত প্রমাণ দেখাইতে এতটুকুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হইতেছিলেন না। তবে এর মধ্যে ভীষ্মের মত বোধ করি কোন পণ থাকিলেও থাকিতে পারে। হয় ত নারীর সহিত যুদ্ধে ইঁহার কিছু আপত্তি থাকিবে।

(৩)

সন্ধ্যার পর ছাদের উপরের সান কিরেরা ধুইয়া দিয়া আসিয়াছিল। আলিসার ধারে-ধারে পাতা-বাহার ও মল্লিকা ও বেল দুঁই হজনীগন্ধার মাটির টব সারি-সারি সাজান। কুলের গাছ কতকগুলি করিয়া কুল ফুটিয়া বেশ একটা সুগন্ধ উত্থিত হইতেছিল। সেই ছাদের এক-ধারে মেঝের উপর শয়ন করিয়া নব-বিধবা আজিও সকলের অজ্ঞাতে বালিকার ন্যায় শোকাশ্রুপাত করিতে-করিতে দূর অতীতের সুদীর্ঘকাল-বিস্মৃত কতই ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। নাতি-নাতিনী-গণ—শরতের পুত্রকন্যা,—পূর্ব্বের ন্যায় গল্প বলিবার জন্য 'ঘিন্নিমণি'কে কিছুক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করিয়া, ভালরূপ কৃত-কার্য্য না হওয়াতে, ক্ষুণ্ণচিত্তে ফিরের সহিত নীচে নামিয়া গিয়াছে। বাহিরে ধৈর্য্যাবলম্বনের অশেষবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও ভিতরের ভাঙ্গাটা লইয়া ঠিক সেই চিরাভ্যস্ত স্থানে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া বেলা এখন পর্য্যন্ত সমর্থ হইতেছিল না। তা' হউক, কালে আবার সকলই ঠিক হইয়া যাইবে। দু'দিন সময়ের প্রয়োজন। ছেলেরা নামিয়া গেলে পুরাতন দাসী কমল আসিয়া পা লইয়া বসিল, বারণ করিলেও সে মানিল না। অগত্যাই তাহার এ স্নেহের অত্যাচার সহিয়া লইতে বাধ্য হইয়াই গৃহিণী চুপ করিয়া গেলেন। তা ভিন্ন, চিরদিনের অভ্যাসটাও ঠিক মোতাতের মত। সময় হইলে আপনি আসিয়া খোঁচা দেয়।

"মা! মা কোথায় গা?"—ডাক দিয়া অরবিন্দ উপরে উঠিয়া আসিল। ছাত অন্ধকার, আলো হইতে আসিয়া প্রথমটা সে কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। মাতা সস্নেহে ডাক দিয়া বলিলেন, "এই যে বাবা, আয়।" মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া—যে পা-খানা খালি ছিল, সেইখানাকে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া পুত্র জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছ মা?" "ভাল আছি বাবা। তোমার আজ কতদূর অবধি সারা হ'লো? কোথায় কোথায় যাবার হওয়া বাকী?"

দুইহাতে মায়ের পা টিপিতে-টিপিতে ছেলে একটা ক্লান্তিসূচক নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিল, "বাকী এখনও ঢের মা, এখনও কল্‌কাতার বাইরের প্রায় সবই বাকী। ভবানীপুর, সাল্‌কে, কাশীপুর এই ক'জায়গা শুধু সেরে ফেলেছি।" "শরতের শাশুড়ীর ওখানে গেছলে? উদ্বাদের বাড়ী?" "হ্যাঁ মা, ও দুটো হয়ে গ্যাছে। শরতের শাশুড়ী অনেক দুঃখ করলেন, কাঁদলেন,—বলেছেন আসবেন।" "উষার শ্বশুর কি বল্লেন-টল্লেন?" "উনি যেমন সুবিধা পেলে দু' কথা শোনাতে চান, তেমনি দু' একটা কথা অবশ্য না বল্লেন তা নয়। তবে মণিন্ ছেলেটা ভাল, সে একরকম কেঁদে কেল্লে। দেখা হয়নি বলে অনেক দুঃখ কর্‌লে। এখানে ছিল না, এই পরশু এসেছে। আসবে একদিন।" "তা ওদের এখন কথা শোনাবার কি ঘটলো শুনি?" "কথা আর এমন কি, এই বাবা মেয়েদের মোটে পাঁচ হাজার টাকা করে দিয়েছেন, সেইটি তেমন ভাল লাগেনি, এই আর কি।—যাক্, ও কথা যেতে দাও।—ও অমন একটু-আধটু কুটুমের কাছে শুন্‌তেই হয়।"

গৃহিণী উপযুক্ত সন্তানের এই সদ্‌যুক্তি মানিয়া লইয়া এইখানেই ও আলোচনার ইতি করিলেন। কুটুমের নিকট যে কতখানি শুনিতে ও সহিতে হয়, তাহা তাঁহার বোধ করি সকল দিক দিয়াই বেশ ভাল রকম একটু অভিজ্ঞতা জন্মিয়া থাকিবে! কিছুক্ষণ মাতা-পুত্র উভয়েই নীরব, অন্যমনস্ক হইয়া থাকিবার পর, একসঙ্গে উভয়ের অধিকার হইতে দুই পা টানিয়া লইয়া গৃহিণী কহিলেন—"আর কাজ নেই, হয়েছে। কাছ দুই নীচে যা, দেখ্‌গে ছেলেরা কি কর্‌চে। অরু, আয় বাবা, পায়ের তলায় কেন,—কাছে এসে বোস। জল খেয়েছিস?" "না মা, খাইনি,—আর একটু পরে

তোমার সঙ্গে একসঙ্গে খাব।" "সে কি রে, সারাদিন কত জায়গায় ঘুরেছিস্—খিধে-তেষ্টায় প্রাণ টা-টা করচে, এখনও তোকে খেতে দেয়নি। যা তো কাছু, শরিকে, বউমাকে বল্‌গে তো। কেমন ধারা আক্কেল তাদের?—" "ওদের দোষ নেই মা, শরৎ আমায় খেতে ডাকছিল, আমিই তোমার সঙ্গে খাব বলে খেলুম না।" "আমার যে মোটেই খিধে-তেষ্টা নেই। তুই যা বাবা, একটু জল মুখে দিয়ে আয়। যাও, গোপাল আমার যাও।"

মাতা উঠিয়া বসিয়া, পুত্রের শুষ্ক মুখে, ললাটে সস্নেহে বারম্বার হাত বুলাইয়া, সেই হস্তের অঙ্গুলী কয়টি চুম্বন করিলেন। "না মা, কাল আবার একাদশী, আজ তোমার কিছু খেতেই হবে।" "আমার যে গলা বুজে আছে বাবা, তুই আর মিথ্যে দেরী করিস্‌নে অরু, কথা শোন্, ওঠ্—" "আমারও আজ খেতে ইচ্ছে করচে না মা, তার চেয়ে এইখানে একটু শুয়ে পড়ি।—কাছু, আমার বিছানাটা একটু ঠিক করে দি'গে তো।" এই বলিয়া অরবিন্দ মায়ের কোল ঘেঁসিয়া মেঝের উপরেই শুইয়া পড়িল। কাছু চেঁচামেচি করিয়া বলিতে লাগিল,—"ওমা, ও কি গো! শুলে কি গো দাদাবাবু! সেই সকালে কখন দুটো মাদ্‌সা-পোড়া কাঁচকলা-ভাতে ভাত মুখে দিয়েছ। সেই কি ভাল করে খেতে পেরেছিলে। তা'পর সারাদিন এই ঘুরাঘুরি পোড়াপুরি,—ছাও, ছাও ~ ওঠো, জলটল খেয়ে তখন আবার মায়ের কাছে এসে বস্‌তে হয় বসো। না হয় মা তুমিই উঠে এসো না বাবু! মা নৈলে যখন খাবে না।" মাতাকে আর এত কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল না। মাতৃবৎসল পুত্রের এ স্নেহের অত্যাচারে তাঁহার সন্তপ্ত শোকক্ষত অন্তর যেন শীতল প্রলেপে জুড়াইয়া আসিতেছিল। পুনশ্চ স্নেহহস্ত তাহার মাথায় মুখে মর্ষণ করিয়া তিনি তখন হাসি-কান্নায় মিশাইয়া স্নেহগভীর কণ্ঠে কহিলেন, "তবে চল বাবা, তুমি শুনবে না যখন, তখন যাই। কাছু, যা' দিতে বল্‌গে যা।" আহারে বসিয়া মাতা নিজের বাটির ঘন দুধ ও অর্দ্ধেকগুলি ফলমূল, ছেলের বারংবার উত্তেজনাপূর্ণ আপত্তি সত্ত্বেও, তাহার পাতে তুলিয়া দিয়া, আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। অরবিন্দ শরৎকে মধ্যস্থ মানিয়া বলিল "এই শরীর-মনে কাল আবার নির্জ্জলা উপোস করতে হবে, দেখ দেখি মায়ের কাণ্ড!"

মা কহিলেন—"তুই অত করে ভাবছিস্ কেন অরু, উপোসে আমার কিছুই করতে পারবে না দেখিস্। কত কচি-কচি মেয়ে এই কাজ করে জন্ম গোঙাচ্চে আমাদের ত এ বুড়ো হাড়।" শরৎ কহিল, "বয়েসের জোরে অনেকখানি কষ্ট সহ্য হয়ে যায়—তোমাদেরই বেশি লাগবার কথা।" "না রে না, আমার ওতে কিছুই হবে না; শরীর আমার কি ঠিক আছে যে, উপোস কি খাওয়া কিছু বোঝাবে। হাঁরে অরু, তোর শ্বশুরবাড়ী গেছ্‌লি তো?" "গেছলুম বই কি,—কাল সেখানে আর ভবানীপুরের সব সেরে এসেছি।" "বর্দ্ধমানে গেছ্‌লে দাদা?" "শরৎ! মাকে খাবার জল দিলিনে?" "দিয়েছি বই কি, ওই যে মার খাটিতে জল আছে?—হাঁ দাদা, বর্দ্ধমানে যাওনি?" "জিনিস যা আস্‌ছে, ফর্দ্দ মিলিয়ে তুল্‌ছিস ত? এর পর যেন বল্‌তে বসো না—এ এলো না,—তা এলো না।" "না সে-সব ঠিক হচ্চে।—তোমায় যা জিজ্ঞেস করচি, তাই বলো না?" অরবিন্দ আখের চিবুলি চর্ব্বণে বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়া ক্ষণ-কাল চুপ করিয়া থাকিল। তার পর মাতাকে শুদ্ধ জিজ্ঞাসু দেখিয়া, কি ভাবিয়া উত্তর করিল, "না।" "না যাওয়াটা কি ভাল হয়েছে? হাঁ মা, তুমিই বলো দেখি,—দাদার তাঁদের বলতে যাওয়া কি উচিত নয়?" মায়ের চিত্তেও বোধ করি এ সম্বন্ধে চিন্তার স্রোত কয়দিন হইতেই বহিতেছিল; প্রকাশ করিতে হয় ত সাহস হইতেছিল না। এখন মেয়ের কথায় জোর পাইয়া ঈষৎ যেন আগ্রহের সহিতই কহিয়া উঠিলেন, "উচিত বই কি। তা' যাবেই তো। ওদের আন্‌তে হবে,—অমনি সঙ্গে করেই নিয়ে আসিস্ না, বাবা!" "কাদের মা?" "বউমা আর আমার খোকা-ধনকে।" "সে কি! তুমি এ কি বল্‌চো মা?" "কিছু অন্যায় তো বলিনি বাবা! এত বড় বৃহৎ ব্যাপার, দেশ-বিদেশের সবাই আস্‌বে—শুধু তারাই আসবে না? তা ছাড়া এতে সবাইকে একসঙ্গে এক ঘাট করতে হয়।"

অরবিন্দ হাতে নজির থাকা সত্ত্বেও মায়ের বিরুদ্ধে বেশি কথা কহিল না সংক্ষেপে কেবলমাত্র উত্তর করিল, "সে হয় না মা।" "কেন হয় না বাবা; এ হতেই হবে। নৈলে দশের চক্ষে যাহাকে যিনি অপরাধে যে চিরদিনের মতই কালো করে রাখা হয়। তা'ছাড়া বংশধর ছেলে রয়েছে।" "মা, বাবা এই ক'দিন গেছেন—আজ আমায় তুমি শুদ্ধ তাঁর

বিদ্রোহী হ'তে বল্‌চো? বাবা বেঁচে থাকতে একদিনের জন্য যা বলতে পারনি, আজ তিনি সাম্‌নে নেই বলে কি হিসেবে সে কাজ করতে বলো?" "তিনি ঝোঁকের মাথায় একটা অনুচিত কাজ করে গেছেন। তুমি যোগ্য সন্তান, তাঁর ভুল থাকলে, তোমার শুধ্‌রে নেওয়া উচিত। তাতে তাঁর পরলোকের ভালই হবে অরু! আমার মন এই কথা চিরদিনই বলে এসেছে—শুধু ভয়ে কখন দু' ঠোঁট এক করিনি।" "তবে আজও কোরো না মা। যা' তাঁর সাম্‌নে করিনি, তুমিও সাহস করে বলোনি, আজও তুমি তা বোলো না। আমিও পার্ব্বো না। আমার এই ছুটো দিন পরে তাঁর কাজ করতে হবে। তাঁকে আহ্বান করে এনে তৃপ্ত করতে হবে। তাঁর এতবড় অপ্রিয় সাধন করে' কোন্ মুখে তাঁর কাছে মুখ তুলে দাঁড়াব? আমার হাতের জল ত্বরান্বিত যদি তিনি না নিয়েই ফিরে যান! কাজ নেই মা!"

যে আবেগ-গাঢ় অকুণ্ঠিত স্বরে এই কথা উচ্চারিত হইল, ইহার বিরুদ্ধে তর্ক করা অসম্ভব! মাতা-পুত্রী উভয়েই এই সুদৃঢ় যুক্তির অখণ্ডনীয়তা অনুভব করিয়া স্তব্ধ হইয়া থামিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা না কহিয়া, নীরবে আহার সমাধা করিয়া উঠিলে পর, আচমনান্তে অরবিন্দ চলিয়া যায়,—কন্যার ইঙ্গিতে জননী তাহাকে পুনরাহ্বান করিয়া, আবার একবার অনুরোধ-অনুজ্ঞা-মিশ্রিত কণ্ঠে আরম্ভ করিলেন, "কোন অপরাধে অপরাধী নয়, কোন পাপে পাপী নয়; একজনের দোষে আর একজনকে শাস্তি দেওয়া, এই কি ধর্ম্ম-সঙ্গত বাবা? আচ্ছা, তাও যদি হলো, এখন আমিই তো তোমার গুরু, আমি বল্‌ছি আমার আদেশ মেনেও তুমি তাদের নিয়ে এসো। এতে যা পাপ অর্শায়, আমার অর্শাবে। সতী লক্ষ্মীর চোখের জল চিরদিন ধরে ঈশ্বর বরদাস্ত করতে পার্ব্বেন কেন?"

"সে হয় না মা! বাবা ভবানীপুরের ওদের কথা দিয়ে ছিলেন; তার পর তাঁর শেষ মুহূর্ত্তেও তো শরৎ একবার চেষ্টা করেছিল; সে বলেছিল, 'বাবা আপনি বলে যান, বড় বউদিদিকে আনবার অনুমতি দিয়ে যান'—তাতে কি উত্তর দিয়েছিলেন, তা কি এরই মধ্যে ভুলে গেছিস্ শরৎ?" গৃহিণী এ সংবাদ জানিতেন না। কন্যার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলেছিলেন রে?" অপ্রসন্ন মুখে শরৎশশী উত্তর দিল, "যা' বরাবর বলেছেন, অনুমতি দেবেন না।"—"তবে আর আমায় তোমরা কি বল্‌চো মা?" অরবিন্দ প্রস্থানোদ্যত হইয়া মার মুখের দিকে চাহিল। "তবে আর কি বল্‌বো বাবা, যা ধর্ম্ম হয়, তোমারই করো। তবে সে নিতান্তই ভালমানুষ, নিরপরাধ,—জানিনে, বাছা আমার কোন্ জন্মে কার কি মর্ম্মান্তিক করেছিলেন, তাই এই এতবড় অভিশাপ নিয়ে ভারতে এসে জন্মেছেন।"—গৃহিণী সুদীর্ঘ-সঞ্চিত সমবেদনার উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। অরবিন্দ মুখ ফিরাইয়া লইয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। শরৎশশী প্রস্থানশীল জ্যেষ্ঠের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, পরে চক্ষু ফিরাইয়া আনিয়া, মাতার দিকে চাহিয়া, কণ্ঠস্বর নত করিয়া কহিল, "ও আর কি কর্‌বে মা, যত না বাবার—তার চেয়ে বউএর ভয় বেশি। বউটি তো তোমার বড় কম মেয়ে ন'ন।" মাতার বেদনাতাতুর চিত্তমধ্য হইতে আবার একটা গভীর নিঃশ্বাস উত্থিত হইল। তিনি নিজের শুষ্ক ললাটে হস্ত প্রদান করিয়া সবচেয়ে যে উপায় অবলম্বনে মানুষ পরের উপর বিদ্বিষ্ট হওয়ার পাপ মুক্ত হইয়া মনের মধ্যে সান্ত্বনা, এমন কি শান্তি অবধি লাভ করিতে পারে, সেই নিরীহ পথাশ্রয় করিয়াই আপনাকে এবং কন্যাকেও শান্ত করিতে চাহিলেন, "সবই বরাত মা, না হলে এমনটাই বা ঘটবে কেন? ছেলে নিজে দেখে-শুনে মনের মত যে করলে, ছেলের ইচ্ছে বুঝে তখন কর্ত্তাও একরকম করে মত দিলেন। তার পর কোথা থেকে কি?—দশভরি সোণার জন্যে একটা বছর বউ আটকে রাখলেন। তা আছে না হয় থাক, সুখে বই মেয়ে কিছু দুঃখে নেই। তা হলো না, মা মাগির মেয়ের হুজ্জে রস অমনি টদিয়ে পড়লো। বাবা মিন্‌সে ভালমানুষ—আনাগোনা করে পায়ের ধড়ি ছিঁড়ে ফেলে। শেষে ছুই-বেয়ারে ঝগড়া লাগিয়ে জন্মের মত ঘরের লক্ষ্মী আমার ঘরের বার হলেন।" শরতের চিত্ত আজ বলিয়া নয়—সেই প্রথম যে দিন তাহার প্রথম কৈশোর-সঙ্গিনী অকস্মাৎ তাহাদের উভয়ের নিবিড় প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া মমতাবিহীন নিষ্ঠুর অকাল-বিসর্জ্জনে বিসর্জ্জিতা হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই এই দীর্ঘকাল ধরিয়া এই অবিচারের বিরুদ্ধে জ্বলিয়া আসিয়াছে। আজ আবার শেষ আশাভঙ্গে সে জ্বালা বর্দ্ধিতবেগ হইয়া উঠিয়াছিল। সে ঘায়ের মত অদৃষ্টের ঘাড়ে

দায়িত্ব চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। বরং ঈষৎ ঝঙ্কার করিয়াই বলিল, "তা তাতেও তাদের চেয়ে আমাদেরই দোষ ছিল। মুখের উপর চোদ্দ পুরুষ তুলে গাল দিলে, কোন্ ভদ্রলোকের ছেলে সইতে পারে বা? হলেই বা মেয়ের বাপ। বড়ঘরে মেয়ে দিয়েছে, না হয় সে ই অপরাধী, তার বাপ-পিতামহ কি করেছে, বল তো? তা' সে যা'হোক, দাদারও আবার সবই বাড়াবাড়ি। যাদের মধ্যে ও সব ঘটেছিল, তাঁরা দুজনেই তো আর এখন বর্ত্তমান নেই; তোমার সঙ্গে তো কিছু হয় নি। তোমার অত ভয় কেন বাবু? তা তো নয়—ঐ যা বলেছি।" এই বলিয়া বিশিষ্ট বিরক্তি ভরে শরৎশশী বিশেষ একটা ইঙ্গিত দ্বারা কোন ব্যক্তিবিশেষকে পূরাপুরি দায়ী করিয়া, পাশের ঘর হইতে ঘুমন্ত খোকার সহসা জাগিয়া উঠিবার সাড়া পাইয়া, ব্যস্ত হইয়া ওঘরে চলিয়া গেল। তখন রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া গৃহিণীও উঠিয়া পড়িলেন।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

রস-সাগর

স্বর্গীয় কবি বৃন্দকান্ত ভাদুড়ী

[কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন, উদ্ভটসাগর, বি-এ]

(২৩)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র হাসিতে-হাসিতে রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন:—"মহাপাপ যায়, তার বৈকুণ্ঠে গমন।" বাঙ্গালার ইতিহাস-সম্বন্ধে রস-সাগরের বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি যুবরাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া হাসিতে-হাসিতে সমস্যাটী পূরণ করিয়া দিলেন।

(প্রস্তাব। মুরশিদকুলী খাঁর শাসন-সময়ে তাঁহার দৌহিত্রী-পতি সাইদ্ রজী খাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান ছিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, রজী খাঁ কোনও এক নিভৃত স্থানে একটা খাত প্রস্তুত করিয়া তাহা মল-মূত্রাদিতে পূর্ণ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। হিন্দু-গণের চরম-লক্ষ্য স্বর্গ বৈকুণ্ঠ-নামের উপহাসচ্ছলে তিনি এই নরক-কুণ্ডের নাম "বৈকুণ্ঠ" দিয়াছিলেন। যে সকল জমীদার যথা-সময়ে নবাব-সরকারে রাজস্ব দিতে অসমর্থ হইতেন, তাঁহাদিগকে সেই "বৈকুণ্ঠে" নিক্ষেপ করিয়া টানিয়া আনা হইত। এই প্রবাদ কতদূর সত্য, তাহা বলা যায় না।)

সমস্যা—"মহাপাপ যায়, তার বৈকুণ্ঠে গমন!"

মুরশিদকুলী খাঁর দৌহিত্রীর পতি
সাইদ্ রজী খাঁর আছে এক খ্যাতি।
বাঙ্গালা-দেশের তিনি ছিলেন দেওয়ান,
দ্বিতীয় "বৈকুণ্ঠ" তিনি করেন নির্ম্মাণ।
"বৈকুণ্ঠ" নরক-কণ্ড,—দূর দূরে যায়,
দুর্গন্ধ হয় পূর্ণ শ্রবিলে তাহায়।
জমীদার গণে শাস্তি দিবার ছলে
যমুনা-সমান খাত রচিয়া কৌশলে,
মল-মূত্র যাহা কিছু দুর্গন্ধময়,
শুনিলে যাদের নাম হৃৎকম্প হয়,
সে সব দুর্গন্ধ বস্তু একত্র করিয়া
রাখিয়া দিতেন সেই খাতেই পূরিয়া।
যে সকল জমীদার যথাকালে কর
দিতে নাহি পারিতেন হইয়া তৎপর,
খাঁ সাহেব সেই সবে লইয়া তখন
করিতেন সমাদরে "বৈকুণ্ঠে" প্রেরণ।
এ হেন "বৈকুণ্ঠ" হতে টানিয়া আনিয়া
রাখিয়া দিতেন পুনঃ তীরে বাঁড়াইয়া।
অসমান অত্যাচার তাঁদের উপরে
করিতেন খাঁ সাহেব বিবিধ প্রকারে।
ধিক্ ওরে জমীদারী! ধিক্ ওরে ধন!
"মহাপাপ যায়, তার বৈকুণ্ঠে গমন।"

(২৪)

মহারাজ শিরীশ চন্দ্রের বিষম আর্থিক কষ্ট উপস্থিত হওয়ায় রস-সাগর কয়েক মাসের বেতন প্রাপ্ত হন নাই। এই হেতু তিনি একদিন মহারাজ শিরীশ চন্দ্রের নিকটে দুঃখ জানাইয়া পরিশেষে পরিহাস-ছলে কহিলেন, "মহারাজ! আমার সংসারে যেরূপ কষ্ট হইয়াছে, তাহাতে ভয় হয় যে, কোন্ দিন বা ব্রাহ্মণী এই অধম-ব্রাহ্মণকে

পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।" ইহা শুনিয়া মহারাজ হাসিতে-হাসিতে রস-সাগরকে কহিলেন, "দরিদ্র পণ্ডিতকে পত্নী ফেলে চ'লে যায়।" রস সাগরও ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া সমস্যাটি পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"দরিদ্র পণ্ডিতে পত্নী ফেলে চ'লে যায়।"

ভস্মরাশি অঙ্গে মাখে দেব দিগম্বর,
গরলে কুলের সঙ্গে ঘুরে নিরন্তর ;
নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গী দুটী পিছে পিছে আসে,
একমাত্র গরু,—সেটা লাঙ্গল না টানে।
ফোঁস্-ফোঁস্ করে সর্প অঙ্গে সর্ব্বক্ষণ,
নিত্তি খেয়ে বুড়িটুকু মোটা বিলক্ষণ।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে পেটের জ্বালায়,
বয়সের কথা তার বলা নাহি যায়।
কেবা পিতা, কেবা মাতা, জন্ম কোন্ কালে,—
বলিতে না পারে কেহ এই ভূমণ্ডলে।
থাকিলে পণ্ডিত ঘরে পত্নী পায় সুখ,
নহেত তাহার প্রতি বিধি বিমুখ।
তাই গঙ্গা মনোদুখে থাকি' নিরন্তর
শিবেরে ছাড়িয়া গেছে ভরে রত্নাকর।
সংসারে অর্থই এক পরমার্থ হায়,
"দরিদ্র পণ্ডিতে পত্নী ফেলে চ'লে যায়।

(২৫)

সন ১২৩০ সালে বাঙ্গালা-প্রদেশে যে ভীষণ বন্যা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ শুনিলে অদ্যাপি লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই বন্যার সময়ে মহারাজ শিরীশ-চন্দ্রের বয়ঃক্রম ৩৭ বৎসর এবং রস-সাগরের বয়ঃক্রম ৩২ বৎসর। বন্যার কয়েক বৎসর পরে মহারাজ সভায় বসিয়া রস-সাগর ও অন্যান্য সভাসদ্-বর্গের সহিত বন্যা-সম্বন্ধে নানা গল্প করিতেছিলেন। রস-সাগর মনের আবেগে বলিয়া ফেলিলেন, "তিরিশ সালের বন্যা শুনে কান্না পায়।" ইহা শুনিয়া মহারাজ হাসিতে-হাসিতে রস সাগরকে কহিলেন, "আপনার সমস্যা আপনাকেই পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে।" মহারাজের আদেশে রস-সাগর তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"তিরিশ সালের বন্যা শুনে কান্না পায়!"

বার'শ তিরিশ সাল যাত্ত যাদ্যালায়,
এ সালের বন্যা শুনি প্রাণ ফেটে যায়।
দেখিতে দেখিতে জল হইল উন্নত,
দেখা যেন চারি দিক্ সাগরের মত।
কিবা মেটে বাড়ী, আর কিবা পাকা-বাড়ী,
যাইতে লাগিল জলে পড়ি' গড়াগড়ি।
বাড়িতে লাগিল জল দীঘু দিকে যত,
উপরে মুষল-ধারে বৃষ্টি হ'লো তত।
গাছে পালা চালা চুলো যাহা যার ছিল,
প্রবল জলের স্রোতে ভাসিয়া চলিল।
পিতা মাতা পুত্র কন্যা ভাই বন্ধু আর,
কেহই না রাখে হায় কারো সমাচার!
প্রাণ ভয়ে ছেলে ফেলে পোয়াতি পলায়,
বোধ হ'লো বর্ষা এলো যেন বাঙ্গালায়।
এক ঘর থেকে যেতে হ'লে অন্য ঘরে,
বাদ্যারে যাইতে হয়, কিংবা নৌকা ক'রে।
পথ ঘাট বন্ধ হ'লো দোকান পসারি,
হাহারব শুনি শুধু মুখে সকলেরি।
কিবা বড় লোক, কিবা ছোট লোক আর,
সবাকার এক দশা,—মুখে হাহাকার!
আট দশ দিন কারো অন্ন নাই পেটে,
যে যা পায় তাই খায়, যা ছোটে নিকটে।
সুখার জ্বালায় ঘাস চিবাইয়া খায়,
মরিতে লাগিল লোক পেটের পীড়ায়।
পাখী সাপ বসে আছে একই শাখায়,
'তিরিশ সালের' বন্যা শুনে কান্না পায়!'

(২৬)

মহারাজ শিরীশ-চন্দ্রের সবিশেষ আর্থিক কষ্ট হওয়ায় রস সাগর কয়েক মাস বেতন পান নাই। একদিন মহারাজের দেওয়ান রাজমোহন মজুমদারের নিকট বেতন আনিতে গিয়া তিনি বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তৎপরে ক্রোধ-ভরে তিনি স্বয়ং মহারাজের সভায় গিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "খেটে খেটে জান গেল, মাহিনা না পাই!" মহারাজ হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "আপনার সমস্যাটী আপনি পূর্ণ করিয়া না দিলে ছাড়িব না।" ইহা শুনিয়া রস-সাগর সমস্যাটী এই ভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"খেটে খেটে জান গেল,—মাহিনা না পাই!"

শুন হে শিরীশ-চন্দ্র নিবেদন করি,—
তোমার আশ্রয়ে আছি বহু দিন ধরি'।
কেবল তোমারি আমি নাম-সুধা গাই,
কেবল তোমারি আমি যশোগান গাই।
কেবল তোমারি আমি মুখ পানে চাই,
কেবল তোমারি আমি প্রেম-পথে যাই।
মজুমদারের পিছে নিরন্তর ধাই,
কেবল তাহার মুখে শুনি "নাই, নাই"।
টাকা চাহিলেই তার মুখে ইঠে যাই,
কুড়ুক্ কুড়ুক্ টাকে তত্ত্বক্ সদাই।
কি করি, পেটের দুখে আক্ষেপ ইহাই,—
'খেটে খেটে জান গেল,—মাহিনা না পাই!'

(২৭)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র সভায় বসিয়া কলিকাল সম্বন্ধে গল্প করিতে-করিতে রস-সাগরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "মেকী হ'লো সাচ্চা, আর সাচ্চা হ'লো মেকী।" রস-সাগরও মহারাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"মেকী হ'লো সাচ্চা, আর সাচ্চা হ'লো মেকী।

(কলিকাল-বর্ণন।)

এক মুটো অন্ন নাই পণ্ডিতের পেটে,
খানা খানা খাস ছোটে মুখের নিকটে।
শাস্ত্রালাপে নাহি যায় পণ্ডিতের মতি,
গীতায় যেখানে সূত্র সুপণ্ডিত অতি।
স্ত্রীর ভাগ্যে নাহি জোটে একখানি সাড়ী,
বেশ্যার বাড়ীতে সাচ্চা সাড়ী গাড়ী-গাড়ী।
চুলির ভাগ্যে শাল-দোশালা, ছেলের ভাগ্যে কাশি,
খাস্টা-ওয়ালীর ভাগ্যে হীরা-মুক্তা-মণি।
ঠাকুরের যোঁচা মোণ্ডা, আর ছোটে কলা,
খাসা গন্ধ মহিচুর ইয়ারের বেলা।
ধন্য কলি! তোরে বলি,—কি রাখিলি বাকী,
'মেকী হ'ল সাচ্চা, আর সাচ্চা হ'লো মেকী।'

(২৮)

একদা রাজ-সভায় সমস্যা উঠিল:—"অমুখি উখি, অঙি বনখি বারিখি।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা এই ভাবে পূরণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"অমুখি উখি অঙি বনখি বারিখি।"

(সমুদ্রের প্রতি রাবণের তিরস্কার-বাক্য।)

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে, ওরে রে সাগর!
কুম্ভ পুত্র পুরে তোরে পেটের ভিতর!
লক্ষ লক্ষ দেবাসুর মিলিত হইয়া,
লণ্ড ভণ্ড করে তোরে মন্থন করিয়া।
বুঝো রাম-বাণে ছেঁড়া এত দিন পরে।
সেতু বেঁধে রাখে তোর বুকের উপরে!
পাথর পরম ভারী সকলেই বলে,
তাহাও ভাসিয়ে আজ দেখি তোর জলে!
যে সব বানর সদা ডালে ডালে ঘুরে,
তাহারাও এক লাফে যেল তোর পারে!
রে সমুদ্র! তোর কথা কি কব অধিক,
কল মুখে তোর কল নামে দিই ধিক্,—
পঞ্চোখি পঞ্চোখি বাখি জলখি জোজখি
'অমুখি উখি অঙি বনখি বারিখি।'

(২৯)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের একজন পরম প্রিয় মো-সাহেব রস-সাগরের প্রতি সর্ব্বদাই ঈর্ষা প্রকাশ করিত। এক দিন এই তিন জনেই রাজ-সভায় বসিয়াছেন, এমন সময় মহারাজ স্বয়ং বলের নিন্দা করিতে লাগিলেন। তখন রস-সাগর কহিলেন "তবু বল কিছুতেই না না হয় সরল।" ইহা শুনিয়া মহারাজ হাসিতে-হাসিতে রস-সাগরকে কহিলেন "আপনার সমস্যাটী আপনিই পূর্ণ করিয়া দিন।" তখন রস-সাগর এই ভাবে ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"তবু বল কিছুতেই না হয় সরল।"

রস-সাগরের রহু যদি হয় শালা,
অমৃতের মত যদি মিষ্টি লাগে কালা;
অশুচি মুচির চুচি যদি হয় শুচি,
শুকনো গাছে জন্মে যদি পাতা কচি কচি;
আলো যদি ভাল লাগে পাঁচার বয়নে,
না করে চুরির চিন্তা চোর যদি মনে;
মাসী যদি মাতা হয়, মাতা হয় মাসী,
খাদি যদি পাটা হয়, পাটা হয় খাসি;
কাণ যদি চক্ষু হয়, চক্ষু হয় কাণ,
ঘ্রাণ যদি জিহ্বা হয়, জিহ্বা হয় ঘ্রাণ;
মুক্ত-হস্ত হয় যদি পরম-কৃপণ,
ব্যাঙ্ যদি বশে আনে পক্ষিনীর মন;
দিন যদি রাত্রি হয়, রাত্রি হয় দিন,
বৃদ্ধলোক যদি হয় বয়সে নবীন;
গণ্ডূষ করিলে যদি সাগর শুকায়,
সাগরের জল যদি গোষ্পদে ফুরায়;
কালো যদি শাদা হয়, শাদা হয় কালো,
আলো যদি অন্ধকার, অন্ধকার আলো,
আমলা যদি আমলা-কালে নাহি দেয় ঘুস,
চাউল ফেলিয়া যদি লোকে চায় তুঁষ;
কুকুরের ঘোঁকা ল্যাজ সোজা হয় যদি,
শান্ত-ভাবে ব'সে থাকে যদি পদ্মাবতী;
অবসন্ন দ্রুতবেগে যদি যায় গাধা,
অলসীর চিত্তে যদি কেহ দেয় বাধা;
মায়ের কাণের সোণা স্যাকরা যদি ছাড়ে,
আহাম্মুখের বুদ্ধি কভু যদি বাড়ে;
ভেক যদি সর্প খায়, করী খায় হরি,
অরি যদি মিত্র হয়, মিত্র হয় অরি;
ভূলিয়াও মো-সাহেব যদি সত্য কয়,
খোদামুদে কভু যদি ভদ্রলোক হয়;
বায়ুবেগে টলে পড়ে যদি হিমাচল,
'তবু বল কিছুতেই না হয় সরল।'

(৩১)

একদিন কৃষ্ণনগরের রাজবৈদ্য রাজ-সভায় বসিয়া কুবৈদ্যের নিন্দা করিতে-করিতে বলিলেন, "কুবৈদ্য যমের দাদা,—বুঝিলাম সার।" ইহা শুনিয়া শিরীশ-চন্দ্র হাসিতে-হাসিতে রস-সাগরকে ইঙ্গিত করিয়া ইহা পূরণ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে রস-সাগরও ইহা পূরণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"কুবৈদ্য যমের দাদা, বুঝিলাম সার।"

হে কুবৈদ্য! নমস্কার চরণে তোমার,
তোমার গুণের কথা কি কহিব আর!
যিনি যম দেব, তুমি তাঁর বড় ভাই,
তোমার অশেষ গুণ ভাবিয়া না পাই।
রোগীর প্রাণটী তবু যম-দেব হরে,
যম প্রাণ, দুটী তুমি হর কৃপা ক'রে।
না আছে তোমার হাতে কাহারো নিস্তার,
"কুবৈদ্য যমের দাদা, বুঝিলাম সার।"

(৩২)

রস-সাগরের এক বন্ধু তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "মদনের মত কিন্তু নাই ধনুর্দ্ধর।" রস-সাগরের মনের ভাণ্ডার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। তিনিও সরস-ভাবে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"মদনের মত নাহি আছে ধনুর্দ্ধর!"

পাইয়া পিনাক ধনুঃ ওহে ত্রিলোচন!
সেহের "পিনাকী" নাম, জানে ত্রিভুবন।
ধরিয়া গাণ্ডীব ধনুঃ হে অর্জ্জুন! বীর,
ধরেছ "গাণ্ডীবী" নাম,—বুঝিয়াছি স্থির।
তোমাদের ধনুর্ব্বাণ ভারী অতিশয়,
সহজে তুলিবে তাহা,—শক্তি কার হয়?
এক খানা বস্ত্র কেটে করে দুই খানা,—
এই ত বাপের গুণ,—আছে যেন জানা!
মদনের ফুল-ধনু, ফুল-বাণ আর,
অতিশয় লঘু, সঙ্গে যাতে ত্রিসংসার।
মদন-বাপের গুণ মনে যেন জানি,—
দুই খানি কাটা বস্ত্র করে এক খানি।
তাই বলে কুতুহলে এ রস সাগর,
'মদনের মত নাহি আছে ধনুর্দ্ধর!'

(৩৩)

একদিন মহারাজ শিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে বামিনীর মান-ভঞ্জন-সম্বন্ধে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন :—"পান খেয়ের মত তোমায় আমায়।" রস-সাগরও কাল-বিলম্ব না করিয়া তাহা পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"পান খেয়ের মত তোমায় আমায়।"

(যামিনীর প্রতি নায়কের উক্তি)

এস এস এস প্রিয়ে বস এই খানে,
"কাল আমি,"—বল মুখে, তাই তুমি কাদে।
যামিনী কামিনী তুমি, ছাড় তব মান,
মান ছাড়ি' প্রণয়ের বাড়াও সম্মান।
রাগারাগি ভাগাভাগি কেন কর আর,
মানের মাথায় বাজ পড়ুক এবার।
বিরাম অশেষ সুখ, মাঝে কিন্তু বাকী,
তুমি ভাল থাকিলেই আমি ভাল থাকি।
হেসে হেসে খেলে খেলে বসি আমি যদি,
বোধ হয়, ঠিক তুমি কর্ণফুলী নদী।
আমি কৃষ্ণ, তুমি রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী,
আমি হর, তুমি গৌরী পরম সুন্দরী।
আমি সূর্য্য, আর তুমি সেই কমলিনী,
আমি চন্দ্র, আর তুমি সেই কুমুদিনী।
হাসি হাসি মুখ খানি তুল একবার,
জুড়াইয়া যাক্ পোড়া হৃদয় আমার।
যামিনী চলিয়া যায়,—নাহি আর শেষ,
আলিঙ্গন দাও মোরে,—ঘুচে যাক্ ক্লেশ।
আজ হইতে মহাসুখে থাকিব ধরায়
'পান-খেয়ের মত তোমায় আমায়!'

(৩৪)

একদিন শিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন "যত লীলা-খেলা।" তিনি আরও আদেশ করিলেন যে, পলাশীর যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া আপনাকে ইহা পূর্ণ করিতে হইবে। রস-সাগর হাসিতে-হাসিতে ইহা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"যত লীলা-খেলা।"

(মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি কবির উক্তি)

প্রসিদ্ধ পলাশী-গ্রাম প্রসিদ্ধ পলাশী-গ্রাম
ধরাধামে কে না তার নাহি জানে নাম?
সিরাজের যত গর্ব্ব সিরাজের যত গর্ব্ব
করিলা ইংরাজ-রাজ আজি তাহা খর্ব্ব।
জয় ইংরাজের জয় জয় ইংরাজের জয়
গাইবের নাম আজ তারতে অক্ষয়।
হিন্দু-অবলার জাতি হিন্দু অবলার জাতি
অত্যাচার হতে আজ পাইল নিষ্কৃতি।
তুমি পলাশীর পতি তুমি পলাশীর পতি
তাই কৃষ্ণচন্দ্র! এই তোমার সুখ্যাতি।

করি' ভাইর সন্মান করি' ভাইর সন্মান
পলাশীর যুদ্ধে দিলা পাঁচটি কামান।
বৃহস্পতি-বারবেলা বৃহস্পতি-বারবেলা
ফুরাইল সিরাজের 'যত লীলা-খেলা।'"

(৩৪)

একদা যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "সিরাজের পরিজন কে কোথায় গেল?" রস-সাগর মহাশয়ও তৎক্ষণাৎ এইভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দান করিয়াছিলেন:—

সমস্যা—"সিরাজের পরিজন কে কোথায় গেল!"
মহম্মদী বেগ যবে হ'য়ে আগুয়ান
হরণ করিয়াছিল সিরাজের প্রাণ,
তখন কে কোথা গেল পরিজন তাঁর,
বুক ফেটে যায়, যদি শুনি একবার!
'আমিনা' সিরাজ-মাতা পরম রূপসী,
'ঘেসেটি' বেগম যেই সিরাজের বাসী।
মীরণের আজ্ঞা ল'য়ে দুরন্ত বর্বর
ডুবাইল দুই জনে পদ্মার ভিতর।
সিরাজের যত সব বেগম আছিল,
এক এক ওমরার গৃহিণী হইল।
লুৎফ্-উন্নিসার মত না ছিল রূপসী,
চিরদিন সিরাজের প্রেয়সী মহিষী।
"কার ঘরে গিয়া বর করিবে এখন,
সিরাজ-মহিষি! বলে তুষ্ট তব মন?"
মীরণ বর্বর এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিল,
সিরাজ-মহিষী এই কথাটি বলিল,—
"করি-পৃষ্ঠে চিরদিন বিরাজ যাঁহার,
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে রুচি হয় কি তাঁহার?"
তিনি ও তাঁহার শিশু কন্যা কষ্ট স'য়ে
রহিলেন ইংরাজের বৃত্তিভোগী হ'য়ে।
বন জন যান যত সকলি ফুরাল,
'সিরাজের পরিজন কে কোথায় গেল।'

(৩৫)

শুনিতে পাওয়া যায়, শান্তিপুরের রস সাগরের এক শ্যালিকা ছিলেন। তিনি সুরসিকা; কিন্তু স্বামীর সহিত কখনও কখনও কলহ করিতেও ক্ষান্ত হইতেন না। মধ্যে মধ্যে তিনি ভগিনীকে দেখিতে আসিয়া রস-সাগরের বাটীতে কিছুদিন অবস্থিতি করিতেন। একদিন রস-সাগর তাঁহাকে বলিলেন "আপনারা অবলা জাতি; তবে কর্ত্তার সহিত মধ্যে মধ্যে প্রবল ভাব ধারণ করেন কেন?" ইহা শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন "রমণী অবলা নয়, পরম প্রবলা!" এই কথা শুনিবা-মাত্র রস-সাগরের রস উথলিয়া উঠিল। তখন তিনি আর থাকিতে না পারিয়া রমণী-গণের স্বরূপ-বর্ণন-পূর্ব্বক সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"রমণী অবলা নয়, পরম প্রবলা!"
পুরুষ যতই হোক্ মহা বলবান্,
সে জন নারীর কাছে বেঁচোর সমান।
যত পায়, তত চায় রমণী সকল,
তাদের আকাঙ্ক্ষা-বৃদ্ধি হয় অবিরল।
পুরুষ শুকায়ে যায় নারীর নিশ্বাসে,
বিশ্বাস করিলে তায় সর্ব্বনাশ শেষে।
দ্বিগুণ আহার তার, বুদ্ধি চতুর্গুণ,
রয় শুণ বুদ্ধি তার, কাম অষ্টগুণ।
গোপনীয় কথা তার নাহি থাকে পেটে,
তাহাই রটায়, যাহা ব্রহ্মাণ্ডে না ঘটে।
পুরুষে ভেড়ুয়া করি' রাখে নারী যত,
ঘুরাইয়া মারে তারে বলদের মত।
বিধিও বুঝিতে নারে রমণীর লীলা,
'রমণী অবলা নয়, পরম প্রবলা।'

(ক্রমশঃ)

জাপানের শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতের উপযোগী কি না?

[শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-টি]

(সাধারণ শিক্ষা)

জাপানের বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অনুরূপ শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশের উপযোগী কি না, তাহা জানিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। জাপান গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে, এবং আজ জাপান য়ুরোপীয় সুসভ্য জাতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই সকল উন্নতির মূলে তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থা। জাপানের শিক্ষা-ব্যবস্থা অনেকটা আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণে গঠিত। বিদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা অবিকল নকল না করিয়া, উহা দেশের অবস্থার উপযোগী করিবার জন্য জাপান যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছে। জাপানের দেশহিতৈষী জননায়কগণ তাঁহাদের শিক্ষাপদ্ধতিকে সময়োপযোগী করিবার জন্য যথেষ্ট চিন্তাশীলতা ও উদার ভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমাদের দেশের উপযোগী শিক্ষাপদ্ধতি এখনও ভারতে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। আশা করি, দেশের চিন্তাশীল ও উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ জাপানের শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনা করিয়া, উহার কতটা আমাদের দেশের উপযোগী, তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন।

কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক শিক্ষা বাদ দিলে, সাধারণ শিক্ষা-প্রদানের জন্য জাপানে সাত প্রকার বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়।

জাপানের সাত প্রকার বিদ্যালয়

প্রথম প্রকারের বিদ্যালয় সাধারণতঃ তিন বৎসর হইতে ছয় বৎসর বয়স শিশুর জন্য প্রতিষ্ঠিত, এবং "কুমার-কানন" (Kindergarten) পাঠশালা বলিয়া পরিচিত। দ্বিতীয় প্রকার বিদ্যালয়ে প্রবেশের বয়স ছয় বৎসর, এবং সেখানে চারি বৎসর পাঠ করিতে হয়। এই বিদ্যালয়কে নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। তার পর উচ্চপ্রাথমিক পাঠশালা। এখানে সাধারণতঃ চারি বৎসর পাঠ করিতে হয়। কিন্তু এখানে দুই বৎসর পাঠ করিয়া যার বৎসর বয়সেও ছাত্রগণ ইচ্ছানুসারে মধ্যবিদ্যালয়ে (Middle School) প্রবেশ করিতে পারে। এই মধ্যবিদ্যালয়ে পাঁচ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিতে হয়। সুতরাং ১৭ বৎসরের পূর্ব্বে কিছুতেই শিক্ষার দ্বিতীয় স্তর (Secondary Education) অতিক্রম করা যায় না। এই সকল মধ্যবিদ্যালয় আমাদের দেশের উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ের সমশ্রেণীভুক্ত। কিন্তু এই সকল মধ্যবিদ্যালয় হইতে সোজাসুজি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার লাভ করিবার পূর্ব্বে শিক্ষার্থীকে উচ্চবিদ্যালয় বলিয়া এক প্রকার বিদ্যালয়ে, তিন বৎসরকাল, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের উপযোগী শিক্ষা লাভ করিতে হয়। যুবকগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত করাই এই সকল উচ্চবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এই সকল উচ্চবিদ্যালয়কে আমাদের দেশের (Second Grade College) দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। এই উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। সেখানে বিষয়ের তারতম্য অনুসারে তিন বৎসর বা চারি বৎসর অধ্যয়ন করিয়া যুবকগণ আমাদের দেশের এম-এ-র ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করে। গ্রাজুয়েট হওয়ার পর শিক্ষার্থিগণ কোনও উচ্চ বিষয়ের অধ্যয়ন, অনুশীলন ও আলোচনায় নিযুক্ত থাকে। এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে নানাবিষয়ক মৌলিক গবেষণাই তাহাদের প্রধান কার্য্যরূপে পরিগণিত হয়। যদি তাহারা আমাদের দেশের পিএইচ-ডি (Ph.D) এর সমতুল্য হাকুশি (Hakushi) উপাধি লাভ করিতে বাসনা করে, তবে তাহাদিগকে এ বৎসর পরে একটি প্রবন্ধ (Thesis) লিখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইতে হয়।

কুমার-কানন বিদ্যালয়।

Kindergarten School

তিন বৎসর হইতে ছয় বৎসর বয়স শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য জাপানে অনেকগুলি "কুমার-কানন" বিদ্যালয় (Kindergarten School) আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি সরকারী ও কতকগুলি বেসরকারী। চৌকিও নগরে শিক্ষয়িত্রীর উপযোগী শিক্ষা প্রদানের জন্য যে বহুবাল স্কুল আছে, সেই স্কুলের সহিত "কুমার-কানন" (Kindergarten) বিদ্যালয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক প্রথম স্থাপিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ে পাঠের উপর বেশী জোর দেওয়া হয় না, কিন্তু কোমল-মতি শিশুগণকে আনন্দ-কাননে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। এই সকল বিদ্যালয়ে সঙ্গীত, কথোপকথন, ক্রীড়াকৌতুক, এবং কিণ্ডারগার্টেন ক্রীড়নক সাহায্যে হস্তকৌশল প্রভৃতি বিষয় প্রত্যক্ষ ভাবে শিখান হয়। ইংলণ্ডেও 'শিশু-বিদ্যালয়ে' (Infant Schools) এইরূপ অপোগণ্ড শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে ৫।৬ বৎসরে বয়স্ক শিশুগণ যে পরিমাণ শিক্ষালাভ করে, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাহারা সহজ-সহজ বাক্য বেশ তাড়াতাড়ি করিয়া পড়িতে পারে, তাহাদের হাতের লেখা বেশ সুগঠিত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাহারা অনায়াসে ও অতি সহজ ছোট-ছোট মানসাঙ্কের উত্তর দিতে পারে। (যেমন চারিটি ঘোড়া ও তাহাদের চালকের কয়টি পা ?) ফ্রোবেলের কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী সম্পূর্ণরূপে 'শিশুবিদ্যালয়ে' অনুসৃত হয় না, কিন্তু উহার অনুকরণে মোটামুটিভাবে শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়; কারণ তিন চার বৎসর বয়সের ৫০ হইতে ৮০ জন চঞ্চল-স্বভাব শিশুকে একজন শিক্ষিকার পক্ষে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। ছাত্রসংখ্যা অল্প হইলে এবং শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী সুশিক্ষিত ও ট্রেনিং প্রাপ্ত হইলে, কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী অবলম্বনে সুফল লাভের আশা করা যায়।

এই সকল শিক্ষা-সমুন্নত দেশের শিশুদিগের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা আছে, তাহা ভারতের উপযোগী করিয়া গ্রহণ করিলে আমাদের দেশের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। আশা করি, দেশের সুশিক্ষিত ও অর্থশালী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়।

Ordinary Primary School.

নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারিটি শ্রেণী আছে। ছয় বৎসর বয়সে সেখানে বালকগণ সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়। এই বিদ্যালয়ে ৪ বৎসর অধ্যয়নের পর ছাত্রগণ উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। কোন-কোন স্থানে এই উভয় বিদ্যালয় একত্র মিলিত (Combined) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে, আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায়, লিখন, পঠন ও অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া হয়। জাপানের বিশেষত্বসূচক নীতিশিক্ষা ও শারীরিক ব্যায়াম অবশ্য-গ্রহণীয় (compulsory)। ইহা ব্যতীত চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, হাতের কাজ এবং সেলাই অতিরিক্ত (optional) বিষয়রূপে শিক্ষা দেওয়া হয়।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।

জাপানের প্রত্যেক বালক এই বিদ্যালয়ে চারি বৎসরকাল পাঠ করিতে বাধ্য। কোনও বালক এই বিদ্যালয়ে প্রেরিত না হইলে, তাহার পিতামাতা বা অভিভাবককে তজ্জন্য জবাবদিহি হইতে হয়। কিন্তু স্থানীয় শাসনকর্ত্তার অনুমতি লইয়া পিতামাতা গৃহে সন্তানের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারে। স্থানীয় শাসনকর্ত্তা (Local

Mayor) জন্ম-রেজেষ্ট্রারী হইতে কতগুলি বালক বা বালিকা নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশযোগ্য বয়স লাভ করিয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া এক বিস্তৃত তালিকা প্রতি বৎসর প্রস্তুত করেন। এই তালিকা প্রস্তুত হইলে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশযোগ্য বালক-বালিকার পিতামাতাকে নিকটবর্ত্তী বিদ্যালয়ে তাহাদের পুত্রকন্যাকে পাঠাইতে আদেশ করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষককেও তাহাদের নামধাম জানান হয়। যদি এক সপ্তাহ মধ্যে এই সকল বালক-বালিকা বিদ্যালয়ে প্রেরিত না হয়, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক 'মেয়রে'র নিকট এ বিষয়ের সংবাদ প্রেরণ করেন। মেয়র যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করেন। কিন্তু কোন পিতামাতাকেই এজন্য অভিযুক্ত করা অথবা জরিমানা দিতে বাধ্য করা হয় না। তাহাদিগকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া (persuasion) পুত্র-কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে বাধ্য করা হয়। এই সকল কার্য্যে মেয়রকে সাহায্য করিবার জন্য স্থানীয় লোক দ্বারা একটি কমিটি গঠন করা হয়। প্রত্যেক কমিটিতে অন্ততঃ ১০ জন মেম্বর থাকে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষক এবং অন্যান্য স্থানীয় লোক থাকে। এইরূপ স্কুল-কমিটির সমবেত চেষ্টায়, পরিদর্শকবর্গের উৎসাহ ও সহানুভূতিতে, এবং সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য-পরায়ণ শিক্ষকবর্গের অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নে, এই সকল বিদ্যালয়ে উপস্থিতি-সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এখন শিক্ষাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই এই চারি বৎসরকাল বাধ্যতামূলক শিক্ষা যথেষ্ট নয় বলিয়া মনে করেন, এবং এই শিক্ষাকাল অন্ততঃ ছয় বৎসর করা সমীচীন বোধ করেন।

নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য অতিরিক্ত ক্লাস।

এই নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া যাহারা উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাইতে অক্ষম, তাহাদের জন্য অনেক সময় অতিরিক্ত ক্লাস খোলা হয়, এবং সেখানে স্থানীয় শিল্প সম্বন্ধে কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদান করা হয়। যদি উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় নিকটবর্ত্তী গ্রামে না থাকে, অথবা অল্পবয়স্ক বালকবালিকাগণের তথায় গমন করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে অতিরিক্ত ক্লাস খুলিয়া তথায় তাহাদিগকে উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক পড়ান হয়। এজন্য শিক্ষকগণ অনেক সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন। যেখানে বিদ্যালয়গৃহ সুপ্রশস্ত ও সঙ্কীর্ণ, অথবা শিক্ষক-সংখ্যা অল্প, সেখানে ছাত্রগণকে দুই ভাগ করিয়া, বিদ্যালয়ের দিনমানের অর্দ্ধ সময় একভাগকে এবং অপরার্দ্ধ সময় অন্যভাগকে পড়াইবার অনুমতি দেওয়া হয়। এইরূপ বিদ্যালয়কে অর্দ্ধসময়ের বিদ্যালয় (Half-time school) আখ্যা প্রদান করা হয়। এতদ্ব্যতীত নৈশবিদ্যালয় (Night School) আছে। সেখানে, যখন কৃষকগণের কাজ কম থাকে, (সাধারণতঃ শীতকালে) তখন, তাহাদের পুত্রকন্যাগণের শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপে নানা উপায়ে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচার করিতে জাপান ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এই অতি অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপান যে এত দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার মূল কারণ জাপানের সার্ব্বজনীন শিক্ষা এবং জাপানের কৃষি শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক সুবিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থা।

অবৈতনিক শিক্ষা।

পূর্ব্বে এই সকল নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রবেতন আদায় করা হইত। কিন্তু এখন যতদূর সম্ভব এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে বেতন হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কোনও বিশেষ কারণ থাকিলে সময়-সময় ছাত্রবেতন আদায় করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল বিশেষ-বিশেষ স্থলেও বেতনের হার সহরে ৫ পেন্স (5 Pence) এবং গ্রামে ২½ পেন্সের (2½ Pence) বেশী হইতে পারে না।

বালকবালিকার মিলিত শিক্ষা।

(Co-education)

বালক ও বালিকাগণকে এক বিদ্যালয়ে নিম্নশ্রেণীতে একত্র পড়াই-বার প্রথা জাপানে প্রচলিত হইয়াছে। কন্‌ফিউসিয়াসের মীতিমতে যদিও সাত বৎসর বয়সের পর বালক-বালিকাগণকে এক-গৃহে একত্র বসিতে দেওয়া নিষিদ্ধ, তথাপি জাপানে নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালকবালিকা-গণকে সাধারণতঃ একত্র পড়ান হয়। যখন বালিকার সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে, তাহাদের দ্বারা একটি নিয়মিত ক্লাশ গঠিত হইতে পারে, তখন তাহাদিগকে পৃথক্ করা হয়। অবশ্য সহরে বালক-বালিকাগণের জন্য সমস্ত ক্লাশেই স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু গ্রামে সমস্ত ক্লাশেই বালকবালিকাগণকে একত্র পড়ান হয়। আমাদের দেশে এ কথাটাও একটু ভাবিবার বিষয়। বালকবালিকার শিক্ষা নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে অর্থাৎ দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, গ্রামে এক সঙ্গে প্রচলিত হইলে, বোধ হয় কোনও আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। গ্রামের বালকবালিকাগণ সাধারণতঃ একে অন্যের পরিচিত এবং বিদ্যালয়ের বাহিরে প্রায়ই মিলিয়া-মিশিয়া বালোচিত ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদ করে। অনেক সময় ছোট-ছোট বালকগণ তাহাদের ভগিনীর সঙ্গে বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠে; কিন্তু তাহাদের বড় ভাইয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ে যাইতে তত আগ্রহ প্রদর্শন করে না। বিশেষতঃ যে সকল বালিকাবিদ্যালয় শিক্ষয়িত্রীকর্ত্তৃক পরিচালিত, তথায় বালকগণ যেন স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। সুতরাং গ্রামের সমস্ত নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়, সম্ভব হইলে, স্ত্রী শিক্ষকের হস্তে প্রদান করিয়া, বালক-বালিকার একত্র পড়িবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, বোধ হয়, সুশিক্ষার দিক দিয়া দেখিতে গেলেও ভাল হয়, এবং অর্থব্যয়ের পরিমাণও অনেকটা হ্রাস হয়।

উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়।

(Higher Primary School)

শিক্ষার বিষয়।

উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ দশ বৎসর বয়সে প্রবেশ করিয়া চারি বৎসর পড়িতে হয়। নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় যে সকল

বিষয় পড়িতে হয়, তাহা ব্যতীত এখানে প্রধানতঃ জাপানের ইতিহাস, জাপানের ভূগোল, বিজ্ঞান, চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীত বিষয়ে শিক্ষা প্রদত্ত হয়। হস্ত-শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য এবং ইংরেজী ভাষা এই সকল পাঠ্য বিষয় বিদ্যালয়ে ইচ্ছানুসারে গৃহীত বা পরিত্যক্ত হইতে পারে।

কৃষি শিক্ষা সম্বন্ধে স্থানীয় অবস্থা অনুসারে উপযোগী বিষয় নির্ব্বাচিত হয়।

কৃষি ও শিল্প বিষয়ক শিক্ষা।

ভূমির উপাদান, জলসেচন (irrigation), ক্ষেত্রের সার, চাষের যন্ত্র, বীজবপন প্রভৃতি শিক্ষার বিষয় রূপে গৃহীত হয়। দরিদ্রতা-বহুল প্রদেশে যে স্থানে বস্ত্রজীবী লোকের বাস, সেখানে সামুদ্রিক শিল্প বা বৈ-কাষ্য শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাও থাকে। শিক্ষকের ব্যবহারের জন্য এ বিষয়ে পুস্তক নির্দ্দিষ্ট আছে। বালকগণ কোনরূপ পুস্তক ব্যবহার করে না; শিক্ষক ক্লাশে যাহা শিখাইয়া দেন, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। হস্তশিল্প সম্বন্ধে কাগজ, মাটি, খড়-কুটা, বাঁশ ও ধাতুবিশেষের সাহায্যে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করণ-কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। যদিও এই শিক্ষা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে প্রদত্ত হইতেছে না, এবং প্রকৃত কার্য্যকরী শিক্ষার অভাব এই সকল বিদ্যালয়ে লক্ষিত হইতেছে, তথাপি ইহা একটী বিশেষ সুফল প্রদান করিয়াছে। জাপানে বালকগণ কিছুমাত্র শিক্ষা লাভ করিলেই, আমাদের দেশের বালকগণের ন্যায় পিতৃপিতামহের কৃষি প্রভৃতি জাতিগত ব্যবসায়ের প্রতি একটা ঘৃণার ভাব পোষণ করিত। এখন উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে কৃষি একটী পাঠ্য বিষয় রূপে নির্ব্বাচিত করিয়া সেই ঘৃণার ভাব দূর করিয়া, এ বিষয়ে বালকগণের কৌতূহল ও আগ্রহ জন্মাইতে চেষ্টা করা হইতেছে।

বাণিজ্যবিষয়ক শিক্ষা।

সহরের অনেক উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাণিজ্যবিষয়ক পাঠ প্রদান করা হয়। ক্রয়-বিক্রয়, আমদানী-রপ্তানি প্রভৃতি বিষয়ে এবং বাণিজ্যবিষয়ক হিসাবপত্র রক্ষা সম্বন্ধে নানাপ্রকার শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষকের ব্যবহারের জন্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট আছে। সেই সকল পুস্তক অবলম্বনে শিক্ষক এই সকল বিষয় বাল কাল হইতে ছাত্রের হৃদয়ে বদ্ধমূল করাইয়া দিতে চেষ্টা করেন।

ইংরেজী-ভাষা শিক্ষা।

কোন-কোন উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারি ক্লাশেই ইংরেজী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে। কোন-কোন বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র শেষ দুই শ্রেণীতে ইংরেজী শিখান হয়, কোথাও বা ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা একেবারেই নাই। জাপানে ইংরেজী শিখিবার আগ্রহ ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এমন কি, যে সকল গ্রাম্য পাঠশালায় ইংরেজী শিখিবার ব্যবস্থা নাই, সেখানেও অনেক ছাত্র সুবিধা পাইলে, বিদ্যালয়ের বাহিরে ইংরেজী শিখিবার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করে। আমাদের দেশে ইংরেজী শিখিবার আগ্রহ জাপান হইতেও অধিক। বিশেষতঃ ইংরেজী আমাদের রাজভাষা এবং কার্য্যের জীবনে ইহার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়। সুতরাং আমাদের দেশের মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয়ে ইংরেজী ইচ্ছাধীন বিষয় রূপে (Optional subject) গৃহীত হইলে, এবং ছাত্রগণ সেই বিদ্যালয় হইতে মধ্য ইংরেজী বৃত্তি পরীক্ষার অধিকার প্রাপ্ত হইলে, সেই সকল বিদ্যালয়ে ছাত্র-সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত না হইয়া দিন-দিন বর্দ্ধিত হইবে।

আমাদের গ্রামদেশে আমরা দুই প্রকারের মধ্যবিদ্যালয় দেখিতে পাই মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয় ও মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়। মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয়ের অবস্থা বর্ত্তমানে অতি শোচনীয়; কিন্তু মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ের অবস্থা দিন দিন উন্নত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা পরে উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে চায়, তাহারা মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয়ে একেবারেই পড়িতে চায় না। কারণ মধ্যবাঙ্গালা ও মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিতে (প্রায়) সমান সময়ই অতিবাহিত হয়, কিন্তু মধ্যইংরেজী বৃত্তি পরীক্ষা পাশ করিয়া উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ে তিনশ্রেণী উপরে ভর্ত্তি হওয়া যায়। তার পর মধ্যবাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করিলে, ছাত্রগণের ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবনের উন্নতির পথ কিছুমাত্র প্রশস্ত হয় না। তাহারা নর্ম্মাল স্কুল ভিন্ন অন্য কোনও বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভের অধিকার পায় না। পক্ষান্তরে এইরূপ নর্ম্মাল স্কুল এক-এক বিভাগে মাত্র এক একটি; এবং সার্ভে স্কুলের সংখ্যা আরও অল্প। মধ্যবাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাশ করিয়া যদি ছাত্রগণ মেডিক্যাল স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল, ও কৃষিবিদ্যালয় প্রভৃতিতে প্রবেশের অধিকার পাইত, তাহা হইলে মধ্যবাঙ্গলা বিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নতি হইত। তদভাবে মধ্যবাঙ্গলা বিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্রই মধ্যইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলে মন্দ হয় না। যাহারা ইংরেজী পড়িতে চায় না, তাহারা মধ্যবাঙ্গলা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবে। মধ্যবাঙ্গলা বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সঙ্গে ইংরেজী শিখাইবার জন্য ভিন্ন শিক্ষক নিযুক্ত করিলে, এক গৃহে অল্প ব্যয়ে উভয় প্রকারের শিক্ষা প্রদত্ত হইতে পারে।

জাপানের মধ্যবিদ্যালয়।

Middle School.

মধ্যবিদ্যালয় বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, জাপানের মধ্যবিদ্যালয় তাহা হইতে স্বতন্ত্র। জাপানের মধ্যবিদ্যালয়কে আমাদের দেশের উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ের শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে ছাত্রগণ এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে এবং এখানে ৫ বৎসর কাল অধ্যয়ন করে। উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম দুই বৎসরের পাঠ শেষ করিয়াই, বার বৎসর বয়সে বালকগণ এই মধ্য-বিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার লাভ করে। সুতরাং যাহারা প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে চায় না,

তাহারা সেখানেই ১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া পাঠ সমাপন করে। আর যাহারা মধ্যবিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভে ইচ্ছুক, তাহারা সাধারণতঃ ১২ বৎসর বয়সেই মধ্যবিদ্যালয়ে প্রবেশ করে।

মধ্যবিদ্যালয়ে শিক্ষার বিষয়।

এই মধ্যবিদ্যালয়ে জাপানী ভাষা, চীনের ভাষা, বিদেশীয় ভাষা, (সাধারণতঃ শুধু ইংরেজী) ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, প্রাকৃতিক ইতিহাস, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, চিত্রাঙ্কন, এবং নীতিশিক্ষা ও ব্যায়াম শিক্ষা বিষয়ে পাঠ প্রদত্ত হয়। সঙ্গীত এবং আইন ও অর্থশাস্ত্র ছাত্রগণ ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করিতে পারে। আমাদের দেশের উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা হইতে ইহা অধিকতর বিস্তৃত।

শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা।

আমাদের দেশের উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে ইহাদের উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এই যে, সকল বিষয়ই এখানে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরেজী ভাষা এখানে দ্বিতীয় ভাষারূপে (Second language) পঠিত হয়। পূর্ব্বে, আমাদের দেশের উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ন্যায়, এখানেও ইংরেজী ভাষার সাহায্যে এবং ইংরেজী ভাষায় লিখিত পুস্তক অবলম্বনে শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহাতে ইংরেজী ভাষার একটু অধিকতর শব্দ-জ্ঞান জন্মিত সত্য, কিন্তু বিষয়-জ্ঞান ছাত্রদের মধ্যে খুব কমই পরিলক্ষিত হইত। পুস্তকগুলি তোতাপাখীর ন্যায় মুখস্থ করা এবং ক্লাসে শিক্ষকের নিকট সেগুলি যথাযথ আবৃত্তি করাই ছাত্রগণ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিত। কিন্তু এই শিক্ষাপ্রণালীর ঘোর উপলব্ধি করিতে পারিয়া, জাপান এক্ষণে সকল বিষয়ই মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিতেছে। এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া জাপান আশাতীত ফল লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে ইংরেজী ভাষার সাহায্যে ছাত্রগণ এক বৎসরের মধ্যে যে বিষয় শিখিতে পারিত, এক্ষণে মাতৃ-ভাষার সাহায্যে তাহারা সেই সময়ের মধ্যে তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ বা তিনগুণ পরিমাণ বিষয় শিখিতে সমর্থ হইতেছে। এমন কি, খৃষ্টান মিশনারীগণের পরিচালিত বিদ্যালয়েও মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে। কারণ ছাত্রগণ স্পষ্টভাবে বলিতেছে যে, ইংরেজিতে শিক্ষা দিলে তাহারা বিষয়গুলি ঠিকভাবে বুঝিতে পারে না এবং সেগুলি বুঝিতে তাহাদের অনেক সময় ও শক্তি অথথা ব্যয়িত হয়। জাপানের ন্যায় ভারতে অন্ততঃ উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, প্রকৃত শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হইবে, পুঁথিগত ও মুখস্থ বিদ্যার দিন অপসারিত হইয়া হৃদয় ও মনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইবে, এবং শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে।

জাপানের মধ্য-বিদ্যালয়ের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, আমাদের উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে যেরূপ কতকগুলি ইচ্ছাধীন বিষয় (Optional subjects) আছে, এবং ইতিহাস বা ভূগোল একেবারে বাদ দিয়াও পাঠ সমাপ্ত হইতে পারে, সেখানে সেরূপ হইতে পারে না। জাপানের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের মত এই যে, মধ্যবিদ্যালয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়গুলির একটিও বাদ দিলে শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না।

ইংরেজীভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

জাপানে মধ্যবিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ইংরেজীভাষার জ্ঞান অতি সামান্য। তাহারা ইংরেজীতে তাহাদের মনের ভাব মুখে অথবা লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। ইংরেজী শিখাইবার ভাল শিক্ষক নাই বলিয়াই এরূপ হইতেছে, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। বঙ্গদেশেও ইংরেজীশিক্ষা ভাল হইতেছে না বলিয়া শুনা যায়। তবে কি ইংলণ্ড হইতে লোক আনিয়া তাহাদের হস্তে ইংরেজী শিক্ষার ভার দেওয়া হইবে? না, অন্য কোনও প্রতীকারের উপায় আছে? ইহা চিন্তনীয় বিষয়। আমার বিশ্বাস, বিদেশের নিকট ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদান বিষয়ে ট্রেনিং প্রাপ্ত হইলে ভারতীয় শিক্ষক বিদেশীয় শিক্ষক অপেক্ষা ছাত্রগণকে ভাল শিক্ষা দিতে পারিবে। ট্রেনিং কলেজে এরূপ কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। বিদেশ হইতে ৩০০।৪০০ টাকা বেতনে যে সকল শিক্ষক আনা যাইতে পারে, তাহারা সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

জাপানের উচ্চবিদ্যালয়।

জাপানের উচ্চবিদ্যালয়গুলিকে (Higher School) আমাদের দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। এখানে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়। এই সকল বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছাত্রদিগকে প্রস্তুত করে। উচ্চবিদ্যালয়ের ত্রিবর্ষ-ব্যাপী পাঠ (Course) বিষয়-বিভাগ অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত—

উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষার বিভাগ।

(১) যাহারা বিদ্যালয়ের আইন ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যয়ন করে; (২) যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং বা কৃষিবিভাগে প্রবেশ করিতে চায়, তাহারা দ্বিতীয় বিভাগ গ্রহণ করে। (৩) যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগে প্রবেশ করিতে চায়, তাহারা তৃতীয় বিভাগ গ্রহণ করে।

আইন ও সাহিত্য বিভাগ।

প্রথম বিভাগের পাঠ্য বিষয়—জাপানী ভাষা, চীনের ভাষা, বৈদেশিক ভাষা, ইতিহাস, তর্কবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান, আইন-শাস্ত্রের প্রাথমিক সূত্র, অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক সূত্র এবং নীতিশিক্ষা। ইংরেজী, জর্ম্মণ ও ফরাসী এই তিন বৈদেশিক ভাষার যে কোন দুই ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে। ল্যাটিন ভাষাও ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি বিভাগ।

দ্বিতীয় বিভাগের প্রধান-প্রধান বিষয়গুলি এই—জাপানী, ইংরেজী, জর্ম্মণ অথবা ফরাসী ভাষা, অঙ্ক, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, খনি-বিজ্ঞান, চিত্রাঙ্কন, নীতি ও ব্যায়াম শিক্ষা; কোন-কোন ক্লাসে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, অথবা সার্ভেইং অবশ্য গ্রহণীয়।

চিকিৎসা-বিভাগ।

তৃতীয় বিভাগের পাঠ্য বিষয় জাপানী, চীনা, ইংরেজী বা ফরাসী ভাষা, লাটিন, অঙ্ক, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, নীতি ও ব্যায়াম শিক্ষা।

উচ্চবিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রতিযোগিতা পরীক্ষা।

মধ্যবিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া সকল ছাত্রই এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। উচ্চবিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য ছাত্রদলের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিয়া থাকে, এবং যাহারা প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারে তাহারাই উচ্চবিদ্যালয়ে অন্যূন ১৭ বৎসর বয়সে প্রবেশ করিতে অনুমতি পায়। উচ্চবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মধ্যবিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অনুরূপ প্রতিযোগিতা পরীক্ষা গ্রহণ করেন, মধ্যবিদ্যালয়ের উপর উচ্চবিদ্যালয়ের কোনরূপ প্রভাব নাই বলিলেই চলে। আমাদের দেশের উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়গুলির কোনরূপ স্বাধীনতা নাই; তাহারা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়-নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় ছাত্রগণকে পাশ করাইবার যন্ত্রস্বরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু জাপানে মধ্যবিদ্যালয় সকল তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে।

ভারতের উচ্চশিক্ষা-সমস্যা ও তাহার সমাধান-চিন্তা।

আমাদের দেশেও এখন কলেজে প্রবেশ-প্রার্থী ছাত্র-সংখ্যা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে যতগুলি কলেজ আছে, তাহাতে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। এই সমস্যার সমাধান-চিন্তায় ভারত-গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারত-গবর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছেন, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সম্পূর্ণ সময়োপযোগী হইয়াছে, এবং ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা বর্ত্তমান সময়ে হইতে পারে না। কিন্তু এই ব্যবস্থা আপাততঃ এই বিষম শিক্ষা-সমস্যার মীমাংসা সাধনে সমর্থ হইলেও, স্থায়ী ফল প্রসব করিবে কি না সন্দেহ। আবার কতক বৎসর পরে সেই শিক্ষা-সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইবে। জাপান যে ভাবে এই শিক্ষা-সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে, ভারতে সেই পন্থা অনুসরণ করা যায় কি না, তাহা বিবেচ্য।

জাপানের মধ্যবিদ্যালয়ের (আমাদের উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ের সমশ্রেণীভুক্ত) পাঠ্য সমাপন করিয়া শিক্ষার্থী তাহার সম্মুখে কতিপয় শিক্ষাপথ উন্মুক্ত দেখিতে পায়।

(১) সে উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে,

(২) চিকিৎসা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে,

(৩) উচ্চ নরম্যাল স্কুলে প্রবেশ করিতে পারে,

(৪) উচ্চ শিল্প-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে,

(৫) উচ্চ কৃষি-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে,

(৬) উচ্চ বাণিজ্য-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে।

জাপানের ন্যায় যদি ভারতেও কৃষি-বিদ্যালয়, শিল্প-বিদ্যালয়, বাণিজ্য-বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পাশ করিয়া ছাত্রগণ সে সকল বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পায়, তাহা হইলে, আশা করা যায়, ধীরে-ধীরে কলেজে প্রবেশ-প্রার্থী ছাত্রের সংখ্যা হ্রাস পাইবে। আর যদি হ্রাস না পায়, তাহা হইলেও জাপানের ন্যায় প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা-প্রথার সৃষ্টি করিয়া অনেক ছাত্রের প্রবেশ-প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা যাইতে পারে। তখন আমাদের অন্য কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়েরও যথেষ্ট উন্মুক্ত থাকিবে, সুতরাং যুক্তিসঙ্গত গ্রহণযোগ্য আপত্তি উত্থাপনের পথ রুদ্ধ হইবে; কারণ বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সকলেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে, ইহা সুস্থ সমাজের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়।*

চর্ম্ম-প্রস্তুতি

[শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী]

কথাইখানা হইতে যে চর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। সংযুক্ত-প্রদেশের মধ্যে কানপুরেই চর্ম্মের কারবার অধিক হইয়া থাকে। এখন দেখা যাউক যে, কানপুর উক্ত চর্ম্ম কোথা হইতে প্রাপ্ত হয়। সংযুক্ত-প্রদেশের উত্তরে যে সকল দেশ অবস্থিত, তথা হইতে কানপুরে চর্ম্মের আমদানী হইয়া থাকে। পঞ্জাবও কানপুরকে চর্ম্ম যোগাইয়া থাকে। বঙ্গদেশ ও মধ্য-প্রদেশ হইতে যুক্ত প্রদেশে অতি অল্পমাত্রায় চর্ম্ম আইসে। কলিকাতা হইতে য়ুরোপ এবং আমেরিকায় বহু পরিমাণে চর্ম্মের রপ্তানি হয়। অতএব ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, চর্ম্মের ব্যবসায়ে বিলক্ষণ লাভ আছে।

যে সকল স্থানে চর্ম্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে, তথায় গো এবং মহিষের চামড়া নিম্নলিখিত প্রকারে তৈয়ার করা হয়; যথা :—

(১) সাধারণতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া,

(২) পাটনাই লবণ রক্ষিত করিয়া,

(৩) নাদেরী লবণ লাগাইয়া এবং

(৪) সেঁকো বিষ মাখাইয়া।

চর্ম্মকে প্রথমে ছায়ায় শুষ্ক করিয়া সেঁকো বিষে ধৌত করা হয়। চর্ম্মের উত্তমতা এবং ওজন অনুসারে তাহার মূল্য হইয়া থাকে।

লবণ দ্বারা সংরক্ষিত গো এবং মহিষের ২০টী খালের দাম ৪০ হইতে ১২৫ টাকা। মৃত পশুর খালের দাম ৬ হইতে ৩৬ টাকা।

সেঁকো বিষ-বিধৌত ১০ পাউণ্ড ওজনের চর্ম্মের মূল্য তের টাকা হইতে সাড়ে চৌদ্দ টাকা। ভেড়ার চর্ম্মের টুকরা দাম ।০ হইতে ৸০ আনা; ছাগ-চর্ম্মের ৸০ আনা হইতে ১।০; গাভী এবং বলদের ২।০ হইতে ৪ টাকা, মহিষের ৩ টাকা হইতে ৯ টাকা, গাধার ৸০ হইতে ।০ আনা; ঘোড়ার ১।০ হইতে ২৲ টাকা এবং হরিণের প্রায় ১৲ টাকা।

পশুর খাল খুলিয়া লইলে লোকাগুলি সরিয়া যায় এবং তাহারা বাহ্য চর্ম্মের দিক হইতে অন্তর্বকে প্রবেশ করিয়া বৃক্ক ভক্ষণ করতঃ

---

* ভারত-গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'Education in Japan' নামক পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কীটগুলি হইতে একপ্রকার রস নিঃসৃত হইয়া চর্ম্মকে পচাইয়া দেয় এবং চামড়ার উপাদানগুলিকে একপ্রকার যৌগিক পদার্থে পরিণত করে। চর্ম্মকে এরূপ উপায়ে রক্ষা করিতে হইবে, যেন তাহাতে পোকা না পড়ে; এবং চর্ম্ম হইতে রস এরূপ প্রকারে বাহির করিতে হইবে, যেন কীটগুলি জীবিত না থাকে। চর্ম্ম আর্দ্র থাকিলেই কীটাকুলিত হইবে।

রৌদ্র-শুষ্ক চর্ম্ম চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার দোষ এই যে, তাহা শীঘ্র কোমল হয় না। যত অধিক গরমে শুষ্ক করা হইবে, ততই কোমল করিতে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। লবণ চর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারে না, পরন্তু রসকে শোষণ করিয়া লয়।

ভারতবর্ষে লবণ-সংরক্ষিত চর্ম্ম লবণাক্ত করার পর শুষ্ক করা হয়। চর্ম্মের থাক এরূপে করা হয়, যেন দুইটী স্তরের অভ্যন্তরে লবণের থাক থাকে। লবণ দ্বারা রস শোষিত হইলে চর্ম্মে চূণ লাগাইয়া শুষ্ক করা হয়। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, বর্ষাকালে লবণ দ্বারা আর্দ্রতা শোষিত হইলেও পচিয়া যাইবার ভয় নিরাকৃত হয় না। গ্রীষ্মকালে যদি লবণ অধিক পরিমাণে লাগান হয়, তবে শুষ্ক করিয়া চর্ম্মকে কোমল করিতে অধিক বিলম্ব লাগে। লবণ যতই অধিক হইবে, ততই চূণ লাগাইবার অবসর বিলম্বে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে; এবং চর্ম্ম স্ফীত হইতে অধিক সময় লাগিবে।

কাঁচা খাল খুলিয়া যদি সোডা দিয়া চর্ম্মকে ধৌত করা হয়, তবে সকলেই সেই চর্ম্ম পছন্দ করে; কিন্তু ইহাতে অধিক খরচ পড়ে বলিয়া সাধারণতঃ এরূপ প্রথা অবলম্বিত হয় না।

চর্ম্ম প্রস্তুত করিবার প্রণালী

পশু চর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত যথা; (১) উপত্বক এবং (২) আসল চর্ম্ম। প্রথমটী কোষ (cell) দ্বারা নির্ম্মিত হয়। এই কোষের অবভাগ সোল এবং কোমল এবং মাঝভাগ কঠিন এবং চওড়া। আসল চামড়ার যে দিকটী সূত্রবৎ মোটা, ঢিলা এবং বাহ্য ভাগ পাতলা, সেই দিক হইতেই তাহাকে নির্ম্মিত করিতে হয়। অতএব চর্ম্ম প্রস্তুত করিতে হইলে খালের দিক হইতে প্রস্তুত হওয়া চাই।

কানপুরের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কারখানার ইংরেজি প্রণালীতে যে চর্ম্ম প্রস্তুত করা হয়, তাহার বিবরণ নীচে লিখিত হইতেছে :—

চর্ম্ম প্রায়ই লবণ-সংযুক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কারণে চর্ম্মকে শুষ্ক করিয়া কোমল করিবার জন্য stock drumএ রক্ষিত হয়। যতক্ষণ না কোমল হয়, ততক্ষণ চর্ম্ম সেই ভাণ্ডে থাকে।

ড্রাম (drum) ৪টি ওজনে। প্রত্যেক ওজনে ভিতর দুই ইঞ্চ খাদ থাকে। একটী গর্ত্তে জল করা থাকে। তাহাতে drumটি ঘুরিতে থাকে এবং ইহার ভিতর কাঠের বড়-বড় পেরেক লাগান থাকে।

অবভক্ত চর্ম্মকে drum হইতে বাহির করিয়া ধৌত করা হয়। ইহা দ্বারা লবণ দূর হইয়া যায় এবং চর্ম্ম কোমল হয়। লবণ সংযুক্ত থাকিলে চর্ম্ম স্ফীত হয় না।

ধৌত করণানন্তর চর্ম্মকে চূণের গর্ত্তে রাখা হয়। এরূপ গর্ত্তের সংখ্যা ছয়টী এবং তাহাদিগের উচ্চতাও সমান। চূণের জলটী পাতলা চূণ হইতে প্রস্তুত করা হয়। চর্ম্মে চূণ লাগাইবার সময় এরূপ সতর্ক হইয়া লাগাইতে হয়, যেন তাহা জমিয়া না যায়। কারণ চূণের শক্তি, যে প্রকারে চর্ম্ম প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক চর্ম্ম চূণের গর্ত্তে ১০ বা ১৫ দিন পর্য্যন্ত রক্ষিত হয়। যদি ছয়টী গর্ত্ত আছে, এবং তাহাদিগের অবয়ব এক হইতে হয়। প্রথমটী সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ। ইহাতেই তাজা চামড়া দুই দিন পর্য্যন্ত নিমজ্জিত থাকে। অনন্তর চর্ম্মকে তথা হইতে বিনাষিত করিয়া ৩ নম্বরের গর্ত্ত খালি হইলেই তাহাতে রাখা হয়। তখন ১নং গর্ত্তটীর উপাদান নূতন করিয়া প্রস্তুত করা হয় এবং সেই গর্ত্তে ৫ নম্বরের গর্ত্ত হইতে চর্ম্ম উঠাইয়া নিমজ্জিত করিতে হয়।

সমুচিত চর্ম্মে চূণ লাগাইলে চামড়া স্ফীত হইয়া যায় এবং তাহা হইতে লোম বাহির করিয়া পড়ে। অতঃপর চর্ম্মকে এক কাষ্ঠের উপর রাখিয়া ধারহীন ছুরিকা দ্বারা লোমগুলি বিচ্যুত করা হয়। এবং তাহাকে উঠাইয়া ছুরিকা দ্বারা ঠিক করা হয়। এইরূপে শুষ্ক বা লঘু চর্ম্ম নির্ব্বাচিত করিয়া পৃথক করিতে হয় এবং অন্য হইতে চর্ম্ম পৃথক করতঃ প্রস্তুত করিতে হয়।

চর্ম্মে চূণ লাগান হইলে, তাহাকে বাহির করিয়া drumএর উপর রাখা হয়। এই drumটী লোকের (ফুটি) এবং জলপূর্ণ একটী গর্ত্তে ঘুরিতে থাকে। এই অবস্থায় চর্ম্ম drumএর উপর ৩ বা ৪ ঘণ্টা থাকে। অবভক্ত চর্ম্মকে পৃথক করিয়া Tan-pit (চর্ম্ম-প্রস্তুতির গর্ত্ত) না থাকিলে Bate-pitএ (ক্ষারপূর্ণ গর্ত্তে) রাখা হয়।

যে চর্ম্ম দ্বারা জুতার তলা প্রস্তুত হয়, তাহাকে উপর্য্যুক্ত ক্রিয়ার অধীন করিতে হয় না। যে যে বস্তু কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগের নাম সোহাগী ক্ষেত্রা (Boracic acid) এবং ল্যাকটিক এসিড। শেষোক্তটী সর্ব্বোত্তম বলিয়া পরিগণিত।

ক্রোকরে উৎসেচন আরম্ভ হইলে, এ্যামোনিয়ার (ammonia) উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ত্বকের ছিদ্র হইতে চূণ বাহির হইয়া যায়, ধূলি পরিষ্কৃত হয় এবং চর্ম্মের সূত্রগুলি বর্দ্ধিত হয়। অনন্তর ভোতা ছুরি বা প্রস্তর দ্বারা ত্বককে ঘসিলে রোমাগুলি দূর হইয়া যায়। এরূপ ধরণে চর্ম্মিত থাকিতে পায় না। সুতরাং চর্ম্ম প্রস্তুত হইবার উপযোগী হয়। এখন তাহাকে Tan-pitএ (চর্ম্ম-প্রস্তুতি গর্ত্তে) রাখা হয়।

চর্ম্মকে প্রথমে রং করিবার গর্ত্তে রাখা হয়। গর্ত্তটী নিম্নেহ বা ঘৃত Tan-liquor (চর্ম্ম প্রস্তুতের সরাপ) দ্বারা পূর্ণ থাকে। উক্ত লিকারটী স্নেহহীন হওয়া আবশ্যক, নতুবা লোমকূপগুলি বন্ধ হইয়া যায়। প্রত্যেক গর্ত্তে যে বাঁশ থাকে, তদুপরি থাক রক্ষান হইয়া থাকে। এই গর্ত্তে চর্ম্ম প্রায় ছয় দিন থাকে এবং তাহাকে বার-বার নাড়িতে হয়। অবভক্ত

চর্ম্মকে ইংরেজী প্রণালীতে ৪ বা ৫ মাস পর্য্যন্ত duster এবং duster-এ রাখা হয়। পরে তাহাকে পালা করিয়া রাখা হয়।

পূর্ব্বপুরুষদিগের রীত্যনুসারে যেই মুচি চর্ম্মকে শুষ্ক করণানন্তর চূণ লাগাইয়া ৮ দিন পর্য্যন্ত চৌপ্রে এবং ২৫ দিন পর্য্যন্ত হাওয়ায় রাখিয়া দেয়। চর্ম্মের প্রত্যেক এক সের চূণে এক সের সাজিমাটী মিশ্রিত করা হয়। গ্রীষ্মকালে ৩ বা ৪ দিন-অন্তর এবং শীতকালে ৭ বা ৮ দিন অন্তর চর্ম্মকে বাহির করিয়া খুলি দ্বারা রোঁয়া উঠান হয়; এবং পুনরায় চর্ম্মে পূর্ব্বকথিত রীত্যনুসারে চূণ লাগান হয়; পরন্তু সাজিমাটী লাগান হয় না। কিছুদিন পরে যখন বুঝিতে পারা যায় যে, চর্ম্ম যথেষ্ট স্ফীত হইয়াছে, তখন তাহাকে বাহির করিয়া একটা প্রস্তরের উপর "রাঁপি" দ্বারা ঘষা হইয়া থাকে। রাঁপি এক প্রকার ছুরিবিশেষ। চর্ম্মকে ছয় ঘণ্টা নির্ম্মল জলে আভিষিক্ত করিয়া "ইস্না" (খার সংযুক্ত) করা হয়। প্রথাটী নিম্নে লিখিতেছি:—

(১) দশ ঘড়া পুরাতন Tan-liquor (যাহা তিন বা চার ডিগ্রি বাকোমিটরের শক্তি বিশিষ্ট হওয়া চাই)।

(২) দশ ঘড়া বহু পুরাতন Tan-liquor (যাহা প্রায় ১৫ ডিগ্রি শক্তির হওয়া আবশ্যক)।

(৩) এক সের চুণ, একটী বৃহৎ পাত্রে মিশ্রিত করিলে উৎসেচন আরম্ভ হইবে। এক সপ্তাহ বাদে তাহা কার্য্যের উপযোগী হয়। পাত্রটী এত বড় হওয়া চাই, যেন সম্পূর্ণ চর্ম্মটী তাহাতে রাখা যায়। এই ক্রিয়াটী প্রায় ৪ দিন পর্য্যন্ত করা হয়। দ্বিতীয় প্রথাতে জল, গুড়, মহুয়া পুষ্পচূর্ণ অথবা পচা মহুয়া থাকা চাই এবং তৃতীয় প্রথাতে প্রথম "ইস্নার" সমস্ত উপকরণগুলি থাকিবে বটে, কিন্তু খানের চূণের পরিবর্ত্তে ছোলা চামড়ার টুকরা রক্ষিত হয়। ফরাসি জাতিরা শেষোক্ত ক্রিয়াটী পছন্দ করে।

মোরক্কোতে চর্ম্ম-প্রস্তুতির অন্য রীতি দেখা যায়। চূণ লাগান, রোঁয়া ছাড়ান এবং ধৌত করার পর চর্ম্মকে সমতল স্থানে রাখিয়া তদুপরি খোঁটা প্রোথিত করা হয়। অনন্তর ২ বা ৩ দিন পর্য্যন্ত চর্ম্মকে আর্দ্র করিয়া অবশেষে "তেলা" (এক প্রকার তেঁতুলের ন্যায় পদার্থ) চূর্ণ, হরিতকী অথবা আমলকীর পাতা দ্বারা লেপন করা হয় এবং পুনরায় ৩ বা ৪ দিন পর্য্যন্ত জলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে আলোড়িত করা হয়।

ক্ষার সংযুক্ত করার পর চর্ম্মকে প্রস্তরের উপর রাখিয়া ছোলার পর নিংড়াইয়া শুষ্ক করা হয়। চর্ম্মের শেষ প্রান্ত একটী কঠিন খুঁটির উপর থাকে। তিন ফিট লম্বা বাঁশের মধ্যে পালা রাখিয়া চর্ম্মটির ন্যায় ঘুরান হয়। এই প্রথায় চূণ ছাড়ান হইলে, পুরাতন Tan-liquor-এ ধৌত করিয়া টেনা ও পরে সেদ্ধা করা হয়। উক্ত ক্রিয়াগুলি হইয়া গেলে, চর্ম্মকে নিংড়াইয়া পুনরায় খুঁটির উপর শুষ্ক করা হয়। ইহার পর চর্ম্মকে ২০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তেজ Tan-liquor-এ অভিষিক্ত করিতে হইবে।

অনন্তর চর্ম্মকে চুঁয়া নির্ম্মিত একটী থলির মধ্যে রাখিয়া তাহাতে Tan-mixture ভরিয়া দিয়া আবৃত করিতে হইবে। নিম্নলিখিত উপকরণ দ্বারা Tan-mixture প্রস্তুত হয়:—

(১) ১৫ সের নূতন এবং ১০ সের পুরাতন বাবলার ছাল, জল এবং তেজহীন Tan-liquor মিশ্রিত করিতে হইবে।

(২) দুই হইতে চার পর্য্যন্ত "ধাওরা" (ইহা আমবৃক্ষে হইয়া থাকে) নবীন পত্র পিশিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করা চাই। ইহা ব্যতীত বাবলার ছাল, সালের ছাল এবং হরিতকী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত বস্তুগুলি একত্রিত করিয়া চামড়ার থলির ভিতর বন্ধ করিয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত ত্রিপদের উপর হইতে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। ইহার নিম্নে একটী নাদ থাকিবে।

যে সকল তরল পদার্থ চামড়ার থলির ভিতর আছে তাহা রোম-কূপ দিয়া চোয়াইয়া নাদে পতিত হয়। সেই চোয়াইয়া পতিত পদার্থ টীকে পুনরায় থলিতে ভরিতে হইবে। অতঃপর থলিকে নীচে রাখিয়া থলাটী সেলাই করা হয় এবং নীচের দিকে খুলিয়া দেওয়া হয়। এরূপ ক্রিয়া ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত করার পর চর্ম্মকে খুলিয়া রাখা হয়। প্রত্যেক চর্ম্মে ৪ আউন্স খাড়ি লবণ এবং ৪ আউন্স বকল চূর্ণ উত্তমরূপে লাগাইয়া খুব ঘষা হয়।

দেশী চর্ম্ম প্রস্তুত করিবার অন্য রীতি এই যে, পশু কাটিয়া তাহার তাজা খাল জমিতে রাখিয়া চর্ম্মের দিকে চূণ লাগাইয়া তাঁজ করা হয়। চূণ এ প্রকারে লাগাইতে হইবে যে, মহিষের চর্ম্মে ৮ সের, বলদের বা গাভীর চর্ম্মে ৫ সের এবং একটা ছাগলের চর্ম্মে অর্দ্ধ সের লাগে। প্রত্যেক চর্ম্মের দুই দিক রাখিয়া একটী নাদে রাখিতে হইবে। এই নাদটীতে ২ হইতে ৪ সের চূণ এবং যথেষ্ট জল (প্রায় ২০ সের) থাকিবে। ইহাতেই চর্ম্মকে নিমজ্জিত করিয়া প্রস্তর দ্বারা চাপিতে হইবে। তিন দিন পরে চর্ম্মকে নিষ্কাষিত করিয়া চূণ লাগানর পর নাদে ৪ বা ৫ দিন পুনরায় রাখিতে হইবে; এবং চর্ম্ম বাহির করিয়া ঘষার পর ছিলিয়া পরিষ্কার করণানন্তর জলে ধৌত করিতে হইবে। চর্ম্মের লোম যদি সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যায়, তবে চর্ম্ম প্রস্তুত হইল বলিয়া বুঝিতে হয়; নতুবা ক্রিয়াগুলি পুনরায় করিতে হইবে। বৃহৎ এবং মোটা চর্ম্ম প্রস্তুত করিতে ১৫ দিনের অধিক সময় লাগে না।

এক মুষ্টি বাবলা ছাল চূর্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে পরিষ্কৃত চর্ম্মকে দুই দিন পর্য্যন্ত অভিষিক্ত করিতে হইবে। চর্ম্মের মস্তক হইতে লাঙ্গ পর্য্যন্ত উত্তমরূপে তাঁজ করিয়া একটী কাষ্ঠের খুটায় উপর রাখিয়া ১২ ফুট লম্বা দ্বিতীয় খুঁটাটি এরূপ মজবুত করিয়া বাঁধিয়া দেয়, যেন খারাপ জল বহিষ্কৃত হইয়া যায়। অনন্তর চর্ম্মকে আর্দ্র করণানন্তর উঁচাইয়া বাঁধিতে হয়।

এখন চর্ম্ম রং করিবার উপযোগী হয়। এইজন্য অনেক বৃক্ষের ফল এবং বল্কল আবশ্যক হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে সকল বস্তুর উল্লেখ করিয়াছি, তদ্ব্যতীত ধাওরার পাতা এবং ঘণ্ট ফুল শুষ্ক করিয়া পেষণ করিতে হয়। কারণ ইহা দ্বারা রং তৈয়ার হয়। চামড়ার থলি প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতর রসটী ভরিয়া দিয়া সেলাই করিয়া দিতে হয়। এই কার্য্য শেষ হইলে চর্ম্মে লবণ সংযুক্ত দধি এবং অনাবিল মাখন মাখাইতে হয়।

শ্যামা-মা

[শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার বি-এ]

শ্যামা নাপতিনীকে আমাদের গ্রামের ছেলেরা কেহ-বা 'শ্যামা-মা' কেহ-বা 'শ্যামা-পিসি' বলিয়া ডাকিত; এবং বয়স্কেরা তাহাকে 'শ্যামা-দিদি' বলিতেন। শ্যামা ছিল আমাদেরই গাঁয়ের মেয়ে। বৃদ্ধেরা বলিতেন যে, তিন বছর বয়সে তার বিবাহ হয় এবং সাত বৎসর বয়সে সে বিধবা হইয়াছিল। শ্যামার ভাই ছিল শ্রীনাথ; তার ও শ্যামার একই ঘরে 'পরিবর্ত্ত' করিয়া বিবাহ হইয়াছিল; এবং সে বংশে আর কেহ না থাকায়, গ্রামের জমীদারের প্রদত্ত চল্লিশ বিঘা 'চাকরাণ' জমী, পুকুর, বাগান এবং 'যজমান', শ্রীনাথ ও শ্যামা দুই ভাই-বোনে পাইয়াছিল। অধিক বয়সে শ্রীনাথের স্ত্রীও একটি কন্যা প্রসব করিয়া সূতিকা-গৃহেই পরলোক গমন করে। কাজেই তাহারা দুই ভাই-বোনেই গৃহস্থালী চালাইত। শ্রীনাথ ছিল উদাসীন প্রকৃতির লোক; শ্যামা ছিল তার অভিভাবিকা।

শ্যামা না কি যৌবনে বড় সুন্দরী ছিল। বর্ণে যদিও শ্যামা তার নামসার্থক করিয়াছিল, তথাপি তার নিটোল গঠন, সুন্দর মুখশ্রী, বন্য হরিণীর মত তার স্বাধীন ভাব, গ্রামের অনেক যুবককেই উদ্ভ্রান্ত করিয়াছিল। দু'একজন একটু বেশী অগ্রসর হইয়াছিল,—কিন্তু কেন যে তাহারা মধ্যপথেই থামিয়া গিয়াছিল, তাহার বিস্তারিত ইতিহাস কেহ জানে না। কেবল গ্রামের একটি বাবুর সম্মার্জ্জনী-লাঞ্ছিত পৃষ্ঠদেশ দেখিয়া অনেকে ব্যাপারটা কতক অনুমান করিয়া লইয়াছিল। সেই অবধি শ্যামা নিষ্কণ্টকে আপনার কাজ-কর্ম্ম করিত। লোকে তাহার সহিত হাসিয়া কথা কহিত বটে, কিন্তু তাকে বেশ একটু 'সমীহ' করিয়া চলিত।

গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সকলেই এই দুই ভাই-বোনের 'যজমান'; কাজেই তাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। শ্যামা স্ত্রীলোকদের আলতা পরাইত এবং পূজা-পার্ব্বণে, আনন্দে-উৎসবে সকলের কাজ-কর্ম্ম করিত। তার স্বভাব ও কার্য্য-নৈপুণ্যে সে সকলের প্রিয় ছিল। শ্রীনাথ পুরুষদের কামাইত এবং দুর্গোৎসব, বিবাহ প্রভৃতিতে পুরোহিতের সাহায্য করিত। পূজা-পার্ব্বণে ফল-মিষ্টান্নের যে ভাগ পাইত, শ্যামা তাহা গ্রামের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিতরণ করিত। কাজেই আমরা দেখিতাম যে, এই বালকদিগের দল 'শ্যামা-মা'র একান্ত বশীভূত ছিল; এবং এমন সময় ছিল না, যখন দু'চারজন মিষ্টান্নলুব্ধ শিশু শ্যামার পিছে-পিছে না ফিরিত।

শ্যামা, শ্রীনাথের মাতৃহীনা কন্যার মাতার স্থান অধিকার করিয়াছিল। সে যে সেই ক্ষুদ্র শিশুটিকে কতটা স্নেহ দিয়া, কত কষ্টে পালন-পালন করিত, তাহা শ্যামাই জানে। সেই ক্ষুদ্র বালিকা যেদিন প্রথম তাকে 'মা' বলিয়া ডাকিল, সে দিন শ্যামার চিরসুপ্ত তৃষিত মাতৃ-হৃদয়ে যে কি অমৃত বর্ষিত হইয়াছিল, তাহা তার হৃদয়ই জানে। বালিকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কেন যে অকারণ অশ্রুজলে তার চক্ষু ভরিয়া উঠিল—তাহা কিন্তু সে বুঝিল না।

ভ্রাতার গৃহস্থালী চালাইয়া, তার মেয়েটিকে 'মানুষ' করিয়া, আর যজমানদের কাজ করিয়া শ্যামার দিন বেশ একরকম সুখেই কাটিতেছিল। কিন্তু যেদিন বিধাতার বিধানে শ্রীনাথের মেয়েটি ক'দিনের জ্বরে তাহাকে ছাড়িয়া তার মা'র কাছে চলিয়া গেল—সেদিন শ্যামার হৃদয় আর ধৈর্য্য মানিতে চাহিল না। শ্রীনাথ ত চুপ্‌চাপ্ আপনার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিত; কিন্তু শ্যামার দিন ত আর কাটে না। সে কেবল ভাবিত, এমন কেন হইল; তার কি পাপে ভগবান তার সেই ক্ষুদ্র স্নেহের ধনটি কাড়িয়া লইলেন? যদিও শ্যামার স্বভাবগুণে গ্রামের ছেলের দল তাকে 'মা' বলিয়া, 'পিসি' বলিয়া তার স্নেহ পাইবার জন্য লালায়িত হইত,—কিন্তু এ মিষ্ট সম্বোধনে কিছুতেই যেন তার মন ভরিত না। বরং সে মাতৃ-সম্বোধনে তার খুকীর কথা আরো বেশী করিয়া মনে পড়িত।

(২)

মনের এই অবস্থায় শ্যামা এক জায়গায় শান্তি পাইত। গ্রামের জমীদারের ছোটবাবুর স্ত্রী শ্যামাকে দিদি বলিতেন। একটি ছেলে হওয়ার পর 'গাঙ্গা-বৌ' সেই অল্প বয়সেই

চিরকগ্না হইয়া পড়িয়াছিলেন। চিকিৎসকেরা যে তাঁর জীবনের আশা করেন না, তাহা তিনি জানিতেন। ছোটবাবু বিদেশে,—কাজেই রোগশয্যায় তাঁর বিশেষ কোন যত্ন হইত না। পাঁচটার ঘরে কে দিনরাত্রি রোগী লইয়া পড়িয়া থাকিবে! খোকাকে লইবার জন্ত একটা দাসী ছিল—এই যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হইত। তা'ছাড়া 'রাঙ্গা-বৌ'র কতকগুলি অমার্জ্জনীয় অপরাধ ছিল, যার জন্ত তিনি বাড়ীর লোকের বেশ প্রিয় ছিলেন না। ছোটবাবু তাঁকে কলিকাতায় মিসনারী মেমের কাছে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। মেমের সাহায্যের ফলে তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসিতেন এবং নিজের পোষাক সম্বন্ধে তিনি পাড়াগাঁয়ের মতে চলিতেন না,—তিনি কাপড়ের নিম্নে সেমিজ পরিতেন এবং মধ্যে-মধ্যে, বিশেষতঃ বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে জ্যাকেট ব্যবহার করিতেন। এই সেমিজ-জ্যাকেট পরাটা সেকালে পল্লীগ্রামে যে কত বড় অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা এখনকার মেয়েরা বুঝিবেন না। লোকে 'রাঙ্গাবৌ'কে 'খৃষ্টান' বলিত। তার উপর রাঙ্গাবৌ সকলের সঙ্গে বসিয়া তাস-কড়ি খেলিতে এবং পরচর্চ্চা করিতে পারিতেন না এবং তিনি অন্ত বিষয়ে অত্যন্ত ভালমানুষ হইলেও, তাঁর মনের বল অনন্তসাধারণ ছিল—কাহারো অন্যায় তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না—তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিতেন। এমন বৌ'কে কর্ত্তৃপক্ষের ভাল লাগিবার কথা নহে।

রোগ-শয্যায় 'রাঙ্গাবৌ'র একমাত্র অবলম্বন ছিল তাঁর বইগুলি এবং একমাত্র সঙ্গিনী ছিল শ্যামা। শ্রীনাথের মেয়েটি মারা যাওয়ার পর হইতে শ্যামা দ্বিপ্রহরে 'রাঙ্গাবৌ'র কাছে আসিয়া বসিত। তখন 'অবোধ বন্ধু'র যুগ—রাঙ্গাবৌ তাহার নিয়মিত গ্রাহিকা ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে শ্যামাকে 'অবোধ বন্ধু' হইতে গল্প পড়িয়া শুনাইতেন—কলিকাতার কত গল্প বলিতেন—মিসনারী মেমেদের কত কথা বলিতেন। এই অক্ষর-জ্ঞান-শূন্যা পল্লীগ্রামের নাপিতের মেয়ের মধ্যে রাঙ্গাবৌ যে কি দেখিয়াছিলেন জানি না,—তবে শ্যামার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিনগুলি একরকম করিয়া কাটিয়া যাইত। কিন্তু শ্যামা যে কেবলমাত্র তাঁর কাছে গল্প শুনিতেই আসিত না, সে তাঁর খোকাকে আদর করিয়া তার ক্ষুধিত মাতৃ-হৃদয় পূর্ণ করিবার জন্ত সমস্তদিন তাঁর কাছে থাকিত, তাহা তিনি ক্রমে বুঝিতে পারিলেন। খোকার দাসীর কাজ করিয়া গেল—সে দিবা-নিদ্রা দিয়া, পরনিন্দা বিশেষতঃ 'রাঙ্গাবৌ'র নিন্দা করিয়া বেশ আরামে দিন কাটাইতে লাগিল। এদিকে খোকাও যত শ্যামার 'ন্যাওটা' হইতে লাগিল, রাঙ্গাবৌ যেন তত খোকার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে লাগিলেন। যেদিন খোকার মুখে প্রথম 'মা' বাহির হইল, সেদিন এই দুই সঙ্গিনীর অন্তর বাধা মানিল না। সে শুভ মুহূর্ত্তে দুজনেই ভুলিয়া গেল যে, একজন ধনী জমিদারের শিক্ষিতা বধূ, অপরা গরীব নাপিতের মেয়ে। তাহারা যে তখন উভয়েই 'মা'। তারা তখন যেখানে পৌঁছিয়াছে—সেখানে সামাজিক কোন ভেদ নাই—খোকা তাহাদিগকে স্নেহের বন্ধনে এক করিয়া দিয়াছে। মনের আবেগে রাঙ্গাবৌ শ্যামার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"শ্যামাদিদি, অনেকদিন হ'তে একটা কথা বলবো-বলবো মনে করছিলাম—আজ বলচি শ্যামাদিদি। আমার দিন সংক্ষেপ হয়ে এসেছে—কেবল যেন খোকার টানে আমাকে আটকে রেখেছিল। আজ আমার মন বলছে যে, খোকা আর একটি মা পেয়েছে—তার জন্তে আমার আর কোন ভাবনা নেই। তুই তাকে মানুষ করিস—আমি খোকাকে তোকে দিয়ে গেলাম।" শ্যামার মুখে কোন কথা বাহির হইল না—অশ্রু-বাষ্পে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু এমন দুঃখের সময়ে না জানি কি এক সুদূর সুখের আশা তার মধ্যে উঁকি দিতেছিল। মাতৃহীন খোকা তার একলার হইবে, এ চিন্তাটা অত্যন্ত স্বার্থপরের মত হইলেও, সে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

যেদিন সাধ্বী রাঙ্গাবৌ স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া সমস্ত রোগ-যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন, সেদিন তিনি স্বামীকে বলিয়া গেলেন—"দেখ, আমার খোকাকে শ্যামা দিদি মানুষ করবে। তোমরা তাকে শ্যামার কাছ থেকে কেড়ে নিও না; আর শ্যামাকে আপনার লোকের মত বর করো—সে যেন কখনও অভাবে না পড়ে।"

রাঙ্গাবৌর মৃত্যুর পর খোকাকে লইয়া বেশ একটু অশান্তি আরম্ভ হইল। বাড়ীর গৃহিণীরা একবাক্যে বলিলেন যে, আঁতুর-বিধবা শ্যামা,—ছেলে 'মানুষ' করা কি তার কাজ! 'রাঙ্গাবৌ'র সব ছিল 'আধিক্যেতা'—আর ছোটবাবুও তেমনি! এত বড় বাড়ীতে কি একটা ছেলেকে

দেখবার লোক নাই যে, বৌ'র কথা শুনে ছোটবাবু এত সাধের "বংশধর" ছেলেকে শ্যামার হাতে সঁপে দিলেন! সে ছোটলোকের মেয়ে,—'ভদ্দর' লোকের ছেলে মানুষ করার কি জানে? মা-মাসি গেল পর ঘরে—আপনার হ'ল একটা নাপিতের মেয়ে—কলিকাল আর কি! ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু খোকা এ সমস্ত সমালোচনা একদিনেই বন্ধ করিয়া দিল—যেদিন তাকে শ্যামার নিকট হইতে পৃথক করিয়া রাখা হইল, সেদিন সে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পাড়ার লোককে অস্থির করিয়া দিল। কাজেই শ্যামাকে ডাকিতে হইল। ইহার পর হইতে শ্যামা প্রাতে আপনার কাজ-কর্ম করিত দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় খোকাকে লইয়া থাকিত। প্রথম-প্রথম এ ব্যবস্থায় শ্রীনাথের বড় অসুবিধা হইত; কিন্তু খোকা একটু বড় হইলে, সে দিনের বেলায় শ্যামার বাড়ীতেই থাকিত। শ্যামা যখন রন্ধন করিত, তখন শ্রীনাথ তাকে কোলে করিয়া বেড়াইত। সন্ধ্যার পর ঘুমাইলে শ্যামা তাকে বাড়ী রাখিয়া আসিত। খোকার অসুখ-বিসুখ করিলে শ্যামাকেও সেখানেই থাকিতে হইত।

(৩)

এমনি করিয়া খোকা ওরফে বিনোদচন্দ্র ওরফে বিনুবাবু 'মানুষ' হইতে লাগিলেন। বিনোদের পিতা দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিয়া নূতন সংসার পাতাইলেন। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু বিনু তার 'নতুন-মা'র বশ মানিল না। সে শ্যামা ছাড়া আর কাহাকেও মা বলিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিল।

এদিকে বিনোদের বয়স বাড়িতেছে দেখিয়া, তার লেখাপড়ার ব্যবস্থার জন্য বাড়ীর কর্তৃপক্ষেরা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আট বছরের শুভ্র ঘরের ছেলে যে কেবল শ্যামার আঁচল ধরিয়া তার সঙ্গে বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়, পড়াশুনার নাম নাই—ইহা অভিভাবকগণের ভাল লাগিবার কথা নহে। শেষে তাহাকে গ্রামের গুরুমহাশয়ের পাঠশালে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। তাহাতেও সে বিনোদের সহিত মা-সরস্বতীর বিশেষ পরিচয় হইল, তাহা নহে। সে কোন না কোনও একটা 'ওজুহাত' দেখাইয়া পাঠশালা হইতে পলাইয়া কেবল বাগানে-বাগানে ফল পাড়িয়া, পাখীর ছানা সংগ্রহ করিয়া কাটাইত। তাহাকে গুরু-মহাশয়ের শাসন হইতে বাঁচাইতে শ্যামাকে যে পরিমাণ 'সিধা' গুরুমহাশয়কে ঘুস দিতে হইত—তাহা নীতি-শাস্ত্রজ্ঞেরা কিছুতেই অনুমোদন করিবেন না। কিন্তু যখন তাহার দুষ্টামীর মাত্রাধিক্য হইত, তখন গুরুমহাশয় দণ্ডনীতি অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। বিনোদ তখন দু'চার দিন শ্যামা-মার অভেদ্য দুর্গে আশ্রয় লইত। এই উপলক্ষে পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত শ্যামার যে কলহ হইত,—তাহাতে পণ্ডিত মহাশয়ের পাণ্ডিত্য যে অনাবৃত করিত তা' বলা যায় না। তার পর আবার নানাপ্রকার কৌশলে শ্যামা বিনোদকে পাঠশালে রাখিয়া আসিত। গ্রামের ছেলেরাও দুর্দ্দান্ত বিনোদের অত্যাচারে শ্যামার নিকট নালিশ করিত—তাহাতে যে তাহারা সুবিচার পাইত তাহা নহে; তবে শ্যামা-মার 'কুলের আচার' 'কামরাঙ্গা' 'আমচুর' এবং মধ্যে-মধ্যে মিষ্টান্ন লাভ করিত বটে। শ্যামার ভয়ে গ্রামের লোকে বিনোদের নানাবিধ অত্যাচার নীরবে সহ্য করিত,—বিনোদকে গালি দিলে কি আর কাহারও রক্ষা ছিল! এমনি করিয়া বিনোদচন্দ্র শ্যামার "নন্দ দুলাল" এবং গ্রামের ছেলেদের সর্দ্দারী করিয়া কাটাইতে লাগিল।

(৪)

সে-বার শারদীয়া পূজার ছুটিতে কয়েক বৎসর পরে ছোটবাবু দেশে আসিলেন। আসিয়াই তাঁর চোখে পড়িল, বিনোদচন্দ্রের দুরন্তপনা, তার আবদার এবং পড়া-শুনায় অমনোযোগ। পূজার ক'দিন গোলমালে কাটিয়া গেল—তার পর একদিন তিনি বিনোদ সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠদের সহিত পরামর্শ করিলেন। তাঁহারা একবাক্যে বলিলেন যে, ছেলেকে শ্যামার কাছ হ'তে সরাইতে না পারিলে, আর সংশোধনের কোন আশা নাই। কিন্তু কথাটা বলা যত সহজ—কাজে তত নহে,—সে যামিনীর নিকট হইতে তার শাবক কে কাড়িতে যাইবে! শ্যামাকে বুঝাইবার ভার ছোটবাবু নিজে লইলেন।

একদিন ছোটবাবু শ্যামাকে ডাকাইয়া এই প্রস্তাব করিবামাত্র, শ্যামার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল—তার মুখ দিয়া একটীও কথা বাহির হইল না। ছোটবাবুর চক্ষুও অশ্রুহীন ছিল না। তিনি ধীরে-ধীরে শ্যামাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিলেন;—ভদ্রঘরের ছেলের লেখা-পড়া শেখা ভিন্ন অন্য উপায় নাই,—গ্রামে থাকিলে তার

শিক্ষা হওয়া একবারে অসম্ভব; তার নূতন-মা'র এক ভগিনীপতি কলিকাতায় সপরিবারে থাকেন;—সেখানে বিনোদকে রাখিয়া পড়াশুনার ব্যবস্থা করিয়া দিলে তার কোন অহর হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বৎসরে দুইবার প্রায় দু'মাস আড়াই মাস স্কুলের ছুটি থাকে—সে সময় বিনু শ্যামার কাছে থাকিবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্যামা যে সব কথা বুঝিল, তাহা নহে। ছোটবাবুর কথা শুনিতে-শুনিতে তার স্বর্গীয়া 'রাঙ্গাবৌ'র অন্তিম অনুরোধ মনে পড়িতেছিল। সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল,—"ছোটবাবু, তোমার ছেলে—যা' ভাল বোঝ, তাই করো—আমি আর কি বলবো—আর আমি বুঝিই বা কি?" মুখরা শ্যামার এই ভাব দেখিয়া বাড়ীর লোক অবাক্ হইয়া গেল! এ কি সেই শ্যামা—যা'র বাক্যবাণে গ্রামের বড়-বড় বাক্‌যোদ্ধৃগণ রণে ভঙ্গ দিয়া থাকে! আজ তার এ কি পরিবর্ত্তন! স্নেহমন্ত্র-মুগ্ধ শ্যামার মনে যে কি হইতেছিল, তাহা লোকে কি বুঝিবে! ছোটগিন্নী কর্ত্তার সহিত শ্যামার কথাবার্ত্তা অন্তরাল হইতে শুনিয়াছিলেন;—তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ নাসিকাগ্রভাগ ঈষৎ উত্তোলন করিয়া বলিলেন—"শ্যামাকে কি ছেলে পুষ্যি দিয়েছেন না কি, তাই এত খোসামোদ!"

শেষে ছোটবাবুর কথাই রহিল;—তাঁর ছুটি ফুরাইলে—একদিন বিনোদ 'শ্যামা মা'র আজন্ম-পরিচিত কোল ছাড়িয়া, তার অপরিচিত পিতা এবং ততোঽধিক অপরিচিত 'নতুন-মা'র সহিত কলিকাতায় চলিয়া গেল। বিনুকে নৌকায় উঠাইয়া দিয়া শ্যামা যে ঘরে গিয়া শুইল—চার-পাঁচ দিন আর কেহ তার দর্শন পাইল না। শ্রীনাথ এ ক'দিন নিজ হাতে রাঁধিয়া খাইল—শ্যামাকেও খাওয়াইল। মিষ্টান্ন-লোলুপ ছেলের দল বৃথায় তার দ্বারে বসিয়া বসিয়া ফিরিয়া গেল;—তারা মনে করিল, শ্যামা-মা'র অসুখ করেছে।

শ্যামার রকম দেখিয়া জমীদার বাড়ীর বিনোদের জ্যেঠি-পিসির দল অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন;—এমন 'অলুক্ষুণে কাণ্ড' তাঁরা না কি 'বাপের জন্মে'ও দেখেন নাই। তাঁরা সব আপনার জন থাকিতে বিনুর জন্ত কষ্ট হইল—কোথাকার শ্যামা-নাপ্‌তিনীর! একেই বলে—'মা'র চেয়ে টান করে, তারে বলে ডা'ন।'

(৫)

বিনোদকে কলিকাতায় স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া ছোটবাবু সস্ত্রীক কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন। আজন্ম পল্লীগ্রামবাসী বিনোদ কলিকাতার লোকারণ্যের মধ্যে পড়িয়া হাঁফাইয়া উঠিল। কোথায় তাদের সেই ছায়াশীতল শান্ত গ্রাম, কোথায় সে উদার মাঠ,—সে পথ-ঘাট,—কোথায় সে শ্যামা-মা'র স্নেহময় ক্রোড়—আর কোথায় এই কুৎসিত, দুর্গন্ধময়, হৃদয়হীন কলিকাতা! বিনোদ এত কথা ভাবিত কি না জানি না;—তার কেবল নিজেদের গ্রামখানি, সেখানকার খেলার সাথীর দল,—সর্ব্বোপরি তার শ্যামা-মার জন্ত বড় মন-কেমন করিত।

স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া সে পড়াশুনা ভালই করিতে লাগিল। কোথায় গেল তার সেই চাপল্য, তার আবদার, তার জেদ,—সে বিনোদ আর নাই। তার মাসীদের অবস্থা ভাল নয়—অনেকগুলি ছেলে-পুলে। ছোটবাবু বিনোদের জন্ত মাসিক যে খরচ দিতেন, তাহাতে তাঁহাদের কিছু সাহায্য হইত; তবু কিন্তু বিনোদের মাসী তাকে একটা উপদ্রবের মতই মনে করিতেন। যা' একটু যত্ন সে পাইত—মেসোর কাছে! তিনি নিজের ছেলেদের সঙ্গে তাকেও বেশ যত্ন করিয়া পড়াইতেন। পড়ার সময় ছাড়া বিনোদ একলাটি ছাদের এক কোণে চুপচাপ বসিয়া থাকিত—খেলিত না—কাহারও সঙ্গে মিশিত না। স্কুলেও তার কোন সঙ্গী জোটে নাই—সকলেই তাকে 'পাড়াগেঁয়ে ভূত' বলিয়া ক্ষেপাইত।

এমনি করিয়া কোন প্রকারে পাঁচ-ছয় মাস কাটাইয়া গ্রীষ্মাবকাশে বিনু দেশে গেল। সেথায় তার এক জ্যেঠতুত ভাইয়ের বিবাহে তার পিতামাতা দেশে আসিলেন। ছোটবাবু আসিয়া বিনোদের অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বড় খুসী হইলেন। বিজ্ঞেরা মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"দেখ, আমরা ত আগেই বলেছিলাম, শ্যামের কাছ থেকে সরাইলেই সে ভাল হইবে।" কিন্তু এ কথা শ্যামার সাক্ষাতে বলিতে কেহ সাহস করিল না। সে ছোটবাবুকে একদিন স্পষ্টই শুনাইয়া দিল,—"না খেতে পেয়ে বাছার শরীর আদ্‌খানা হয়ে গেছে।" ছোটবাবুও যে সেটা লক্ষ্য না করিয়াছিলেন তাহা নহে,—তবে স্ত্রীর খাতিরে সে কথা মুখে আনিতে পারেন নাই। শ্যামাকেও তিনি এ সব কথার আলোচনা করিতে বারণ করিলেন।

শ্যামার এই স্পষ্টবাদিতার ফল হইল,—ছোটগিন্নী শ্যামার উপর জাতক্রোধ হইলেন—কেন না, এ কথাটা তিনি তাঁর ভগিনীর নিন্দা বলিয়াই মনে করিলেন। তাঁর সে রাগ আরো কয়েকটা কারণে ক্রমশঃ বাড়িয়া গেল। বিনোদ বাড়ী আসার পর, শ্যামা তার জন্ত ক্ষীর, সন্দেশ প্রভৃতি আনিয়া লুকাইয়া তাহাকে খাওয়াইত। তা'ছাড়া, একবেলা বিনোদ প্রায়ই শ্যামার বাড়ীতে খাইত। ব্রাহ্মণের ঘরের এত বড় ছেলে যে নাপিতের বাড়ী খায়, তাহা ছোটগিন্নীর পছন্দ হওয়ার কথা নহে। তার উপর, শ্যামা যে খাবার আনিত, তাহার অংশ পাইবার জন্ত কাঁদিয়া-কাটিয়াও ছোটগিন্নীর ছেলেরা পাইত না। তিনি একদিন স্বচক্ষে দেখিলেন যে, আদ্‌খানা সন্দেশ চাওয়ায় শ্যামা'তার বড় ছেলের কাণ মলিয়া দিল। সেই দিন আগুন জ্বলিল। ছোটগিন্নী নিজেই শ্যামাকে শাসন করিবার ভার লইয়া, তাকে ডাকাইয়া বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিলেন। তার ফলে শ্যামা অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিল—সে সকলের সাক্ষাতেই স্পষ্ট বলিয়া দিল যে, তাঁর ছেলেরা মা-বাপের আদরে রাজার হালে থাকে; আর তার 'বাছা' কোথায় কোন্ পরের ঘরে "পাত-কুড়ান ভাত" খাইয়া বিদেশে পড়িয়া থাকে! সে দু'দিন একটু ভালমন্দ খাইতেই তার জন্ত এত হিংসা! ছোট মুখে এত বড় কথা সহ্য করা জমীদার-বধূর সাধ্য নাই;—তিনি হুকুম দিলেন, শ্যামা যেন তখনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়—আর যেন কখনও এ বাড়ীমুখো না হয়। অভিমানিনী শ্যামা তৎক্ষণাৎ জমীদার-বাড়ী ত্যাগ করিল। বিনোদও কাঁদিতে-কাঁদিতে তার সঙ্গে যাইতেছিল—কিন্তু নতুন-মা'র ধমক খাইয়া, ফিরিয়া গিয়া ঘরের মধ্যে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ছোটবাবু গৃহে পৌঁছিবামাত্র এ ঘটনা সালঙ্কারে তাঁর কাণে উঠিল—শ্যামা না কি আজ ছোটগিন্নীকে কাঁটা মারিবে বলিয়াছিল। রোরুদ্যমানা পত্নীকে অনেক সাধ্য-সাধনায় শান্ত করিয়া, তিনি গিন্নীর হুকুমই বাহাল রাখিলেন। সেই দিন হইতে শ্যামার সে বাড়ী আসা-বন্ধ হইল বটে, কিন্তু বিনোদের শ্যামা-মার বাড়ী যাওয়া কেহ বন্ধ করিতে পারিলেন না। সে রাত্রেও শ্যামা-মা'র কাছেই শুইতে আরম্ভ করিল, এবং বাড়ীর-সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিল। নতুন-মা'র তীব্র ভর্ৎসনা এবং পিতার অনুযোগ কিছুই ফলদায়ক হইল না।

এদিকে ছোটবাবুর ছুটি ফুরাইল—তিনি এবারও বিনোদকে কলিকাতায় রাখিয়া কর্ম্মস্থলে গেলেন।

(৮)

এবার কলিকাতায় আসিয়া বিনোদের দুঃখের মাত্রা বাড়িল! একে ত বিদায়-কালে তার শ্যামা মার অশ্রুসিক্ত মুখ মনে পড়িলে তার বুক ফাটিয়া কান্না আসিত—তার উপর মাসীমা'র শাসন যেন এবার কঠোরতর হইতেছিল। তিনি উঠিতে-বসিতে বিনোদের দোষ দেখিতে পাইতেন—গালাগালি ও প্রহারে বিনোদের একটা নিত্য প্রাপ্যের মধ্যে হইয়া উঠিল। স্কুলেও এবার তার দুর্গতি হইতে লাগিল। যে বিনোদ পড়ার জন্ত কখনও শাস্তি পায় নাই—এবার সে যেন কি হইয়া গিয়াছে—প্রতিদিনই সে পড়া বলিতে পারে না—সে-জন্ত শাসন করিলে সে কোন জবাব দেয় না—কেবল কাঁদে। এমন ছেলেকে লইয়া মাষ্টার মহাশয়েরা বিপদে পড়িলেন; শেষে তার মেসো মহাশয়কে রিপোর্ট করিলেন—সে রিপোর্ট যথাসময়ে বিনোদের পিতার নিকট পৌঁছিল।

আবার শারদীয়া পূজা আসিয়া পড়িল। কিছুদিন হইতে বিনোদের অল্প-অল্প আমাশয় হইয়াছিল—কিন্তু ভয়ে সে কোন কথা কাহাকেও জানায় নাই। তার উপর, আহারাদির অনিয়মে যখন তাহা রক্ত-আমাশয়ে দাঁড়াইয়া তাহাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া দিল—তখন ছোটবাবুকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি টাকা পাঠাইয়া বিনোদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার জন্ত লিখিলেন। বিনোদের মেসো পাড়ার একজন 'সহস্রমারি' কবিরাজকে ডাকিয়া আনিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোনই উপকার হইল না। বরং রোগী ক্রমশঃ উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া তার মাসী ছোট-বধূকে পত্র দিলেন। তখন পূজার ছুটি সন্নিকট। কাজেই স্থির হইল যে, বাবুর ছুটি হইলে, তাঁহারা কলিকাতা হইতে বিনোদকে দেশে লইয়া যাইবেন; স্থান-পরিবর্ত্তনে তার শরীর সারিয়া যাইবে। এ ব্যবস্থা ছোটবাবুর মনোমত ছিল না—কিন্তু তাঁকে বুঝান হইল যে, অসুখ-বিসুখ বিশেষ কিছু নয়—বোধ হয় শ্যামার জন্ত মন-কেমন করিয়া এমনটা হইয়াছে—দেশে গেলেই সারিয়া যাইবে। উপায়ান্তর না দেখিয়া ছোটবাবু তাহাই বুঝিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া ছোটবাবু বিনোদের চেহারা

দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। সেই সদা-প্রফুল্ল, সদা-চঞ্চল সুস্থ সবল ছেলের এ কি অবস্থা হইয়াছে! অশান্তির ভয়ে তিনি কোন কথা বলিলেন না। সেই দিনই তিনি একজন বিচক্ষণ চিকিৎসককে আনিয়া বিনোদকে দেখাইলেন; এবং তাঁর পরামর্শমত একমাসের উপযুক্ত ঔষধ-পত্র লইয়া তাহাকে দেশে লইয়া গেলেন। যাইবার সময় বিনোদের মাসী বিনাইয়া-বিনাইয়া বিনোদের নামে অনেক দোষারোপ করিলেন; এবং সে যে কেবল তাঁকে নিন্দার ভাগী করিবার জন্যই নিজে ইচ্ছা করিয়া অসুখে পড়িয়াছে, এ কথা নানারকমে প্রকাশ করিলেন। এখন 'যার ধন তাকে দিয়ে' তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

(৭)

স্থান-পরিবর্ত্তনেই হউক, আর ঔষধের গুণেই হউক, বাড়ী আসিয়া বিনোদ কয়েকদিন একটু ভাল রহিল। কিন্তু এত কাছে আসিয়াও সে তার শ্যামা-মাকে দেখিতে না পাইয়া অস্থির হইয়া পড়িল। এদিকে বিনু অসুস্থ হইয়া বাড়ী আসিয়াছে জানিয়া, তাকে দেখিবার জন্য শ্যামার প্রাণ 'আকুলি-বিকুলি' করিতেছিল। সে জমীদার-বাড়ী গেল না। কিন্তু চাকর-দাসীদের কাছে বিনোদের অবস্থা শুনিয়া তার ধৈর্য্য ধরা শক্ত হইয়া উঠিল। সে কি করিবে? বিনু যে তার কত কষ্টের ধন;—যত্নের অভাবে যদি না বাঁচে—তবে? কথাটা ভাবিতেও তার বুক কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু আবার যখন ছোটগিন্নীর কথা মনে পড়িত, তখন সে বিনুদের বাড়ী যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা মন হইতে দূর করিয়া দিত। এদিকে ছোটবাবু দেখিতেন যে, ছেলের ঠিক যত্ন হইতেছে না—শ্যামার কাছে থাকিলে বিনু হয়ত শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া উঠিত। কিন্তু তিনি সাহস করিয়া শ্যামাকে ডাকিয়া আনিতে পারিলেন না।

পূজার ক'দিন গোলমালে বিনোদ ঔষধ ত পাইলই না—পথ্যের বদলে জ্যেঠি-পিসিদের ঘরার কুপথ্য পাইল। আহা, বছরকার দিনে বাছা একটু কিছু মুখে দিবে না। ফলে অসুখ হঠাৎ বাড়িয়া উঠিল; এবং 'কোজাগর' পূর্ণিমার দিন তাহার অবস্থা অত্যন্ত ভীতি-জনক হইল।

সে রাত্রিতে মেয়েরা সব লক্ষ্মী-পূজা ও অন্যান্য কল্যাণ-কর্ম্মে ব্যস্ত—বাড়ীর পুরুষরা বৈঠকখানায় তাস-পাশা খেলিয়া রাত্রি জাগরণের চেষ্টা করিতেছেন। কেবল ছোটবাবু বিনোদের কাছে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছিলেন। বিনোদ চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। হঠাৎ পিতার দিকে চাহিয়া, সেখানে আর কেহ নাই দেখিয়া, বিনোদ বলিল—"বাবা, আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে! আমি শ্যামা-মা'র কাছে যাব!" বিনোদের কাতর আবেদনে ছোটবাবুর চক্ষে জল আসিল—তাঁর স্বর্গীয়া স্ত্রীর অন্তিম অনুরোধ মনে পড়িয়া গেল। তিনি যে বিনুকে শ্যামাকেই দিয়া গিয়াছেন! শ্যামার কোল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তিনি আজ কত আদরের বিনুকে হারাইতে বসিয়াছেন! এমন অসুখ বিনোদের আগেও ত হইয়াছিল, তখন শ্যামাই ত প্রাণপণে সেবা করিয়া তাকে বাঁচাইয়াছে। একবারের কথা মনে পড়িল, যখন নিমোনিয়া হইয়া বিনুর অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছিল যে, ডাক্তারেরাও জবাব দিয়াছিল—কিন্তু শ্যামা সাতদিন-সাতরাত্রি তাকে একবারও কোল হইতে নামায় নাই;—শেষে শ্যামার স্নেহই ত মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছিল। সেই শ্যামাকে আজ তাঁরা বিনোদের কাছে আসিবার অধিকার হইতেও বঞ্চিত করিয়াছেন। ছোটবাবু আর ইতস্ততঃ না করিয়া শ্যামাকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন।

বিনোদের অসুস্থ হইয়া দেশে আসার পর হইতে শ্যামার রাত্রিতে ঘুম হইত না। সে রাত্রির অধিকাংশ সময়ই নিজের দাওয়ায় চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিত—আর 'আকাশ-পাতাল' কত কি ভাবিত। 'রাঙ্গাবৌ'র কথা, বিনুর ছেলেবেলার কথা, তার বাল্যকালের অসুখের কথা, এবার কলিকাতায় যাওয়ার আগে বিনোদের কাতরতা—এই সব মনে পড়িয়া তাহাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিত—তার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত। সে তৎক্ষণাৎ আবার 'বাছার অকল্যাণ' হইবে বলিয়া চোখ মুছিয়া মনকে দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিত।

আজ এতরাত্রিতে ছোটবাবু শ্যামাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন শুনিয়া, কি এক অনির্দ্দিষ্ট অমঙ্গল-আশঙ্কায় তার হৃদয় মথিত হইতে লাগিল। তখন কোথায় গেল তার অপমানের জ্বালা, কোথায় গেল তার মান-অভিমান,—সে যেন কেবল তার বিনুর কাতর আহ্বান শুনিতে পাইতেছিল। আর দেরীমাত্র না করিয়া, সে পাগলের মত বাবুদের বাড়ীর দিকে ছুটিল।

তখনও রোগীর কাছে ছোটবাবু একাই বসিয়া ছিলেন।

শ্যামা ঘরে ঢুকিতেই, বিনু 'মা'—বলিয়া তার কোলে যাইবার জন্য তার শীর্ণ হাত দু'খানি বাড়াইয়া দিল! শ্যামা তাহাকে তার বহুদিনের বুভুক্ষিত ক্রোড়ে টানিয়া লইল। ছোটবাবু কেবল বলিলেন,—'শ্যামা দিদি, তোর বিনুকে এবারও বাঁচা।' তাঁর মুখে আর কোন কথা বাহির হইল না। ছোটবাবু ও শ্যামা দু'জনে সমস্ত রাত্রি বসিয়া রোগীর সেবা করিতে লাগিলেন। প্রাতে ছোটগিন্নী যখন দেখিলেন যে, বিনুর ঘরে শ্যামা—তখন তিনি বুঝ তার করিয়া সে ঘর ত্যাগ করিলেন।

* * *

আরও এক সপ্তাহ ধরিয়া যমে-মানুষে টানাটানি করিয়া, যে-দিন বিনু তার শ্যামা-মা'র কোল শূন্য করিয়া তার মা'র কাছে চলিয়া গেল—সেদিন শ্যামাও জন্মের মত জমীদার-বাড়ী ত্যাগ করিল।

* * * *

বিনুকে হারাইয়া বহুদিন শয্যাগত থাকিয়া যে দিন শ্যামা প্রথম আপনার যজমানের কাজে বাহির হইল—সেদিন যেন তার কাছে জগতের সব আলো নিভিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোকে সকলেই শ্যামার করুণ কাহিনী জানিত। সে তাদের বাড়ী গেলে, তারা আপনাদের ছেলে-পুলে তার কোলে দিত। ছেলেরাও শ্যামার কোল পাইলে আর কাহারো কাছে যাইত না।

এমনি করিয়া শ্যামা তার বিনুকে হারাইয়া গ্রামশুদ্ধ 'বিনুর' মা হইল—কিন্তু তাহাতে তাহার হৃদয়ের শূন্যতা ভরিত কি না, তাহা অন্তর্যামীই জানেন।

পাখী-পোষা

(২)

[শ্রীসত্যচরণ লাহা এম-এ, বি-এল]

(মেম্বর, ন্যাচারেল্ হিষ্ট্রি সোসাইটি—বোম্বাই)

পক্ষিপালকের কৃত্রিম গৃহমধ্যে বিভিন্ন জাতীয়, ভিন্নরুচি, বহুবিধ বিহঙ্গ সুচারুরূপে একত্র সংরক্ষিত হইলেই যে তাঁহার কর্ত্তব্য নিঃশেষে সম্পন্ন হইল, এরূপ মনে করিলে চলিবে না। রক্ষিত পক্ষী বা পক্ষিমিথুনগুলিকে সযত্নে পালন করিয়া না হয় কিছু দিন বাঁচাইয়াই রাখা গেল; কিন্তু যাহাতে পক্ষিভবনে অসঙ্কোচে উহারা নীড়নির্ম্মাণ, অণ্ডপ্রসব, শাবকোৎপাদন এবং সন্তান-প্রতিপালনরূপ গার্হস্থ্য ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারে, পালক যদি তাহার বিধি ব্যবস্থা না করেন, তবে তাঁহার এত সাধের পালন-ক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল। সমবেত পাখিগণ যদি কিয়ৎকাল জীবিত থাকিয়া জীবনাবসানকালে আপনাদিগের স্থান অধিকার করিবার জন্য কতকগুলি শাবক রাখিয়া না যাইতে পারিল, তাহা হইলে পালকের এত যত্ন, এত ক্লেশ-স্বীকার কি নিমিত্ত? আবার কি সে নূতন করিয়া পক্ষিমিথুন সংগ্রহ করিয়া নূতন উদ্যমে তাহাদিগের ঘরকন্না সাজাইতে থাকিবে? তাহাদিগের নয়নাভিরাম লাস্যলীলা তাঁহার হৃদয়ের উপর রেখাপাত করিতে না করিতেই হয় ত তাহাদেরও জীবনলীলা ফুরাইয়া আসিবে। এ ত গেল একদিককার কথা। এত কষ্ট করিয়া যে পালক পক্ষী নির্ব্বাচন করিলেন, তাহার সুজননপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা যদি তাঁহার না থাকে তবে পক্ষিজীবনের Scientific Study অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। অতএব কি উপায়ে কৃত্রিম পক্ষিগৃহমধ্যে পক্ষিমিথুনের শাবকোৎপাদন সম্ভাবিত হইতে পারে এই নূতন সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে পালক প্রকৃতির যে গোপন রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে তাঁহার আনন্দ ও বিস্ময়ের অন্ত থাকিবে না। পক্ষিজাতির বিচিত্র যৌনসম্মিলন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃতির লীলাকুঞ্জে পুংপক্ষী স্বশ্রেণীস্থ পক্ষিণীকেই যে বাছিয়া লয় তাহা নহে; অনেক সময়ে সে আপন জাতির অন্তর্গত, কিন্তু ভিন্ন শ্রেণীর পক্ষিণীর সহিত স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া থাকে। বিহঙ্গ-দম্পতির পরস্পর শ্রেণীভেদ সত্ত্বেও এই প্রকার মিলন উভয়ের আকারগত সৌসাদৃশ্য থাকিলেই যে সঙ্ঘটিত হয় এরূপ নহে; অনেক

সময়ে উভয়ের অবয়ব বা আয়তনের পার্থক্যে কিছুই আসে-যায় না। একদিকে যেরূপ তুল্যাবয়ব এবং সমান আয়তন বুলবুল জাতীয় বিহঙ্গগণের বিবিধ শ্রেণীর মধ্যে এরূপ অসবর্ণ বিবাহ প্রায়ই লক্ষিত হয়, তদ্রূপ আবার গ্রাউস্ (grouse) জাতীয় ভূচর বিহঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পক্ষিমিথুনের আকার-বৈষম্য সত্ত্বেও উভয়ের মিলন অবাধে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। শ্রেণীবহুল হংসজাতির (Duck family) মধ্যে এই বিধিই সচরাচর দৃষ্ট হয়। এই নিমিত্ত বোধ হয় যে, য়ুরোপীয় পক্ষিপালকগণ বর্ণ সঙ্কর পক্ষীর উদ্ভাবনকল্পে তাহাদিগের কৃত্রিম গৃহমধ্যে আবদ্ধাবস্থায় পক্ষিমিথুনের একত্র সংরক্ষণকালে উভয়ের আকার, আয়তন বা বর্ণের সামঞ্জস্যের প্রতি অল্পই দৃষ্টিপাত করেন। বাস্তবিক বনে জঙ্গলে বর্ণসঙ্কর পক্ষী অতিশয় বিরল হইলেও যে উহা সর্ব্বদা উৎপন্ন হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মিঃ ফ্রাঙ্ক ফিন্ লিখিয়াছেন —"Wild hybrids are indeed rare; but they are of much more frequent occurrence than is generally supposed."

এই বর্ণসঙ্কর তাহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল হইতে কোন কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; অনেক স্থলে ইহা বন্ধ্যাত্বও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতিশয় ক্ষুদ্রাবয়ব স্বাধীন বিহঙ্গগণের মধ্যে কিন্তু বর্ণসঙ্কর আদৌ দেখা যায় না বলিলেও চলে; যদিও ইহারা য়ুরোপীয় পালকগণের কৃত্রিম গৃহমধ্যে বিজাতীয় পক্ষিণীর সহবাস করিতে বাধ্য হইয়া অনেক সময়ে একটা নূতন জাতির সৃষ্টি করে। যথাক্রমে আমরা পক্ষিজীবনের এই রহস্য যবনিকা উদ্ঘাটিত করিতে প্রয়াস পাইব।

বিহঙ্গতত্ত্ববিদ্ মনীষিগণ আপনাদিগের পর্য্যবেক্ষণের ফলে সাব্যস্ত করিয়াছেন, যে পক্ষিগণের প্রকৃতি ও জাতিগত পার্থক্য অনুযায়ী উহাদিগের জননকালের (breeding time) বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়; অর্থাৎ যদিও বসন্ত ঋতু কতকগুলি বিহঙ্গের নির্দ্দিষ্ট শাবকজননকাল, গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালেও কতিপয় পক্ষী নীড়নির্ম্মাণ ও সন্তানোৎপাদনাদি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। হেমন্ত ও শীত ঋতুতে গৃধ্র প্রভৃতি কতিপয় পাখী আবার ঐরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকে। পালকগণের কৃত্রিম পক্ষিগৃহে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ও মাঝে-মাঝে পরিলক্ষিত হয়। এমন কতক প্রকার বিহঙ্গ দেখা যায়, যাহাদের সন্তান জনমকালের কোনরূপ বাধাবাঁধি নাই; তাহারা ঋতুনির্ব্বিশেষে শাবকোৎপাদনাদি গার্হস্থ্য ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। পক্ষিজাতির এই যৌনসম্মিলন-কালে পুংপক্ষিগণের নৃত্যগীত, অঙ্গলাবণ্যভঙ্গিমা, তীব্র মধুর কণ্ঠস্বর প্রভৃতি গুণরাশির বিকাশ-প্রাচুর্য্য দেখিয়া সহজে অনুমান করা যায় যে, এই সকল বৈভব-বিস্তারের গূঢ় অভিপ্রায় কেবল মাত্র মনোমত সঙ্গিনীর চিত্তাকর্ষণ নিমিত্ত; গৃহরক্ষিত আবদ্ধ পাখীগুলির মধ্যে কিন্তু উক্ত প্রকার বৈভব-বিস্তার সত্ত্বেও "জোর যার মুলুক তার" এই প্রাচীন নীতি অনেক সময়ে বলবতী হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে, অল্পপরিসর পক্ষিভবনে অবরুদ্ধ কোনও এক পুংপক্ষী স্বীয় বৈভব-বিস্তার সাহায্যে মনোমত পক্ষিণীর চিত্ত হরণ করিতে সমর্থ হইলেও স্বজাতীয় অপর এক অধিক বলশালী পক্ষী প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উপস্থিত হইয়া উভয়ের মিলনসুখে বাধা প্রদান করে। নিরাপদ স্থানে উড়িয়া গিয়া স্বেচ্ছায় উভয়ের মিলিত হইবার সুযোগ না থাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী বলশালী পক্ষীটি পক্ষিণীকে আয়ত্ত করিয়া থাকে। সহজে উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, যদ্যপি পক্ষিভবনে উক্ত পক্ষিণীর সঙ্গাভিলাষী পুংপক্ষিগণের সংখ্যা অধিক থাকে, তাহা হইলে উহাদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিভাব জাগিয়া উঠিয়া তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়; ফলে হীনবল পক্ষিগণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে; এবং কলহ অধিককালস্থায়ী হইলে যে পক্ষিণীকে লইয়া বিবাদের সূত্রপাত, তাহার মনোমত পতিলাভ, উভয়ের মিলন এবং গার্হস্থ্য জীবনলীলার পরিদর্শন পক্ষিপালকের পক্ষে ত দূরের কথা, এমন কি অপর জাতীয় একত্র-সংরক্ষিত বিহঙ্গদম্পতিগুলির সুখময় জীবনলীলা পর্য্যবেক্ষণের সুযোগও তাঁহার ঘটিয়া উঠিবে না। এই নিমিত্ত যাহাতে পক্ষিগণের মধ্যে কোনরূপ বাদ-বিসম্বাদ না হয়, তন্নিমিত্ত কোন এক বিশিষ্ট শ্রেণীর এক-জোড়া পক্ষী (একটি পুং অপরটি স্ত্রী) ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণীর এক এক জোড়া পাখির সহিত গৃহমধ্যে একত্র রাখা সঙ্গত; নতুবা যদি একই শ্রেণীর পুং পক্ষী দুইটি এবং স্ত্রী পক্ষী একটি একত্র রক্ষিত হয়, তাহাদিগের মধ্যে উক্তরূপ কলহ নিশ্চয়ই ঘটিয়া উঠিবে। বস্তুতঃ একত্র সংরক্ষণের নিমিত্ত নির্ব্বাচিত সকল পাখীগুলিই তুল্যাবয়ব এবং সমপ্রকৃতি হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক পক্ষিমিথুন সুস্থ ও সবল হওয়া চাই। শুধু স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই চলিবে

না ; সঙ্গে-সঙ্গে বয়স, বংশানুক্রম, জাতিত্ব, বর্ণ এবং কণ্ঠস্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহাদিগকে নির্ব্বাচন করিতে হইবে। জনক জননীর সুনির্ব্বাচনের উপরই শাবকগণের ভাবী শুভাশুভ অনেকটা নির্ভর করে। উভয়ের বয়সের খুব বেশী পার্থক্য থাকা ভাল নহে।(১) একটা প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধ, অপরটা অপরিপক্ক বয়সের হইলে শুভ ফল

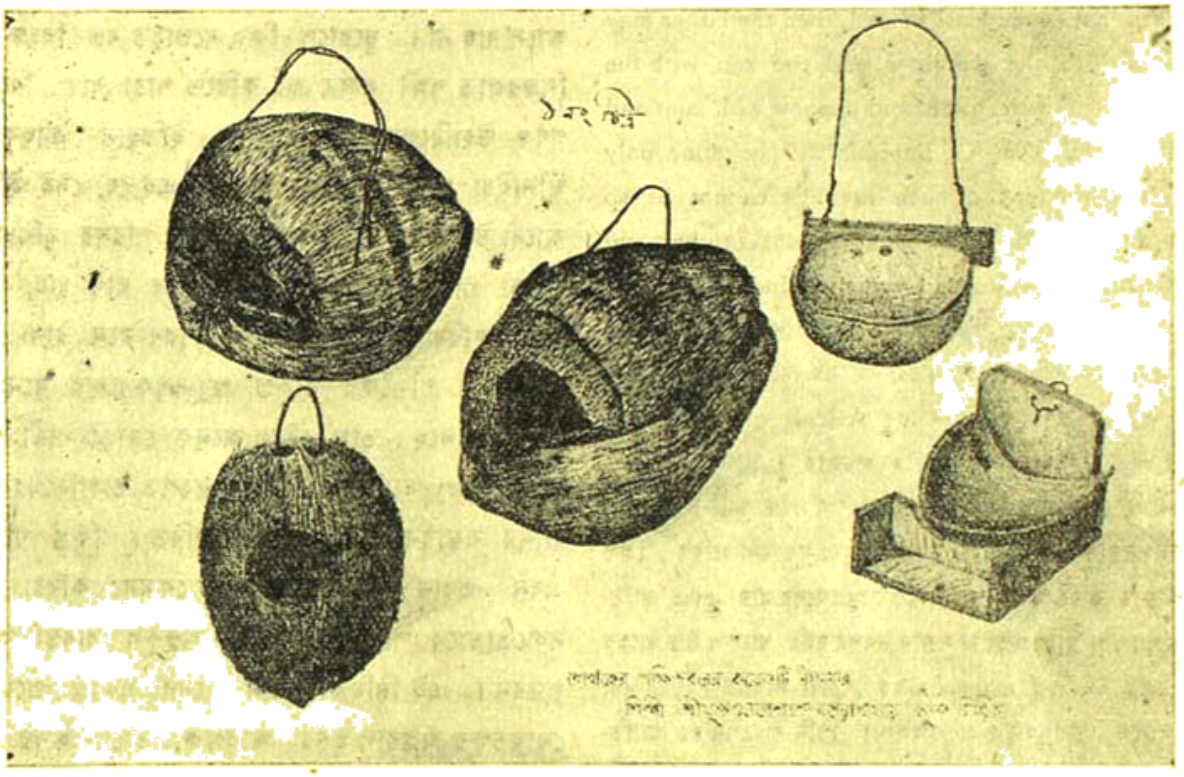

পাওয়া যাইবে না। ভাল রকম করিয়া জানা আবশ্যক যে উভয়েই সুস্থ ও সদ্‌গুণসম্পন্ন পিতৃপিতামহের কুলে উৎপন্ন ; অত্যন্ত-নিকট জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় দাম্পত্যে সুসন্তানের আশা করা যায় না,—এই সাধারণ জৈব সত্য (biological fact) পক্ষিজগতেও সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হইতে দেখা যায়।(২)

এ স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য রাখিয়া কিরূপে প্রত্যেক পক্ষিমিথুন সুনির্ব্বাচিত হইতে পারে। কারণ, পক্ষীসংগ্রহ করিতে হইলে পালককে পক্ষিব্যবসায়িগণের নিকট হইতে

১। শ্রীমতী ইসা টুইড (Isa Tweed) তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, কেনেরি (Canary) পক্ষিমিথুন হইতে সুসন্তানের আশা করিতে হইলে উভয়ের বয়সের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পক্ষী-পক্ষিণীর মধ্যে এক বৎসরের তারতম্য থাকিলেই যথেষ্ট হইল ; পুং পক্ষীটি দুই বা তিন বৎসরের এবং পক্ষিণীটি এক বা দুই বৎসরের, অথবা পক্ষিণীটি দুই কিম্বা তিন বৎসর বয়সের এবং পক্ষীটি এক বা দুই বৎসরের হইলে সুসন্তানের সম্ভাবনা অধিক। যদিও দশবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কেনেরি (Canary) পক্ষীকে সন্তানোৎপাদন করিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু প্রায়ই ষষ্ঠবৎসরের পর আর সুসন্তানের আশা করা যায় না।—Canary Keeping in India, p. 53.

২। পক্ষিগণের মধ্যে জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় দাম্পত্য ক্রমাগত এবং বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতে থাকিলে, সন্তান দুর্ব্বল, বর্ণাকৃতি এবং অনেক সময়ে বন্ধ্যাত্বদোষযুক্ত হইয়া পড়ে। পিতৃপিতামহের দোষগুলি ইহাদিগের মধ্যে অধিকতর প্রকট হইয়া উঠে এবং দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত উহাদের সহজেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। শ্রীমতী ইসা টুইড্ (Isa Tweed) তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, কোনও এক কেনেরি (Canary)-দম্পতির মধ্যে কোন প্রকার জ্ঞাতি-সম্পর্ক না থাকিলেও, উহাদের সন্তানসন্ততির মধ্যে অন্তর্জনে বা inbreeding এ ধারা দেওয়া উচিত ; তবে, বংশমধ্যে অত্যন্ত অল্পমাত্রায় promiscuity চলিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে, কি পরিমাণে চলিতে

ক্রয় করিতে হইবে; পক্ষিব্যবসায়িগণ হয় ত অনেক সময়ে নিজেরাই বনভূমি হইতে পক্ষী ধৃত করিয়া থাকে, অথবা শিকারিগণের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া স্বয় দোকানে অধিক লাভে পুনর্বিক্রয়ের নিমিত্ত সাজাইয়া রাখে। তাহারা অবশ্যই পাখীগুলির ইতিবৃত্ত অবগত নহে; ইহারা যখন নিজেই অজ্ঞ, তখন ক্রেতাদিগকে কেমন করিয়া পক্ষিমিথুনের বয়স, বংশ, জাতিত্ব প্রভৃতির দোষগুণ জানাইয়া দিবে? বাস্তবিক এরূপ স্থানে কোন ইতিহাস পাওয়া না যাইলেও পক্ষিমিথুন নির্ব্বাচনকালে পালক উভয়ের শারীরিক সুস্থতা, বর্ণ এবং কণ্ঠস্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে ভুলিবেন না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সদ্যোধৃত বন্য পাখীগুলি অত্যন্ত সজীব; ইহাদিগের সহিত খাঁচার পাখীর যৌনসম্পর্ক সুফলদায়ক হইবারই সম্ভাবনা। পালকের অজ্ঞাতসারে জ্ঞাতি-সম্পর্ক সত্ত্বেও দাম্পত্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে এক্ষেত্রে কিছু আসে যায় না। য়ুরোপে কিন্তু সদ্যোধৃত বন্য বিহঙ্গ ছাড়া পিঞ্জরজাত পক্ষী সর্ব্বত্র ক্রয় করিতে পাওয়া যায়; বিক্রেতাগণও উহাদিগের ধারাবাহিক ইতিহাস গ্রাহকগণকে জানাইয়া থাকে। এখন বক্তব্য এই যে, সেই ইতিহাস আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। পক্ষিভবনের পরিসর বুঝিয়া কয় জোড়া পাখী উহার মধ্যে স্বচ্ছন্দভাবে রাখা যায়, তাহার বিচার করিয়া দেখিতে হইবে;—কারণ মনে রাখা উচিত যে, এস্থলে পালকের উদ্দেশ্য শুধু দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জনে পর্য্যবসিত নহে; তাহা হইলে অনেক জোড়া পাখী হয় ত সেই aviary মধ্যে রাখা চলিত, তাহাতে তাহাদিগের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা না থাকিতেও পারিত। কিন্তু পালকের এখন প্রধান লক্ষ্য এই যে, কেমন করিয়া তিনি সর্ব্বতোভাবে পক্ষিজননব্যাপারে অনুকূল ব্যবস্থা করিতে পারেন। এই নিমিত্ত নির্জ্জন স্থানের একান্ত প্রয়োজন; লোকচক্ষুর অন্তরাল হওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ অপর পক্ষীর উপদ্রব-বর্জ্জিত হওয়া চাই। পাখীগুলির সংখ্যা কমাইয়া না দিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া অসম্ভব। অনেক পক্ষিমিথুন এরূপ আছে, যাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থানে না রাখিলে উহাদিগের সন্তানজনন-প্রয়াস মোটেই দৃষ্ট হয় না। কতক পক্ষী আবার এরূপ আছে, যাহারা মিথুনাবস্থায় উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে; এবং নায়ক-নায়িকার মধ্যে এরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়, যাহার দ্বারা অপর মিথুনগণের সন্তানজনন-প্রয়াসে বাধা জন্মে। ফিঞ্চ জাতীয় "ক্রস্‌বিল" (cross-bill) পক্ষী স্বভাবতঃ এই ধরণের। পক্ষিভবনে এক এক শ্রেণীর এক এক জোড়া পাখী রাখিবার কথা আমরা বলিয়াছি। কিন্তু অনেক সময়ে এক শ্রেণীর দুই কিংবা তিন জোড়া পাখী অবাধে একত্র রাখা যায়; তাহাতে তাহাদিগের নীড়-নির্ম্মাণের অসঙ্কোচ উদ্যমে

পারে তাহার তিনি এইরূপ ভাষায় বিবরণ:—"If the parent birds are not in the least related, then the father may be mated with the daughter and the son with the mother, uncle with niece and nephew with aunt and also cousin with cousin. But this can be done only once. The progeny of such matings cannot be so mated again. On no account should brother and sister be mated."—Canary Keeping in India, page 54.

Aviary-তে ছাড়া পক্ষীর মধ্যে ভাই-ভগিনীর দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে কি অনিষ্ট হইতে পারে, এই প্রশ্ন মি: জো: (Mr Geo. E. Low) বিগত ফেব্রুয়ারি মাসের Avicultural magazine-এ উত্থাপিত করায় পক্ষিতত্ত্ববিৎ ডাক্তার বাটলার (A. G. Butler) উত্তর দেন যে, বহুদূর সম্বন্ধ জ্ঞাতিসম্পর্কীয় যৌন সম্বন্ধ বর্জ্জনীয়, যেহেতু এরূপস্থলে সন্ততিবর্গের রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইবার সম্ভাবনা অধিক; কিন্তু তিনি স্বীকার করিলেন যে, স্বাধীন বন্য বিহঙ্গগণের মধ্যে প্রায়ই জ্ঞাতিসম্পর্কীয় দাম্পত্য স্থাপিত হইয়া সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর উল্লিখিত magazine-এর April সংখ্যায় Tavistock নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল। তিনি বলিলেন যে, জ্ঞাতিসম্পর্কীয় দাম্পত্য হেতু বিপদের আশঙ্কা অনেক সময়ে অতিরঞ্জিত হইয়া থাকে; স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একবার পক্ষিমিথুন সুনির্ব্বাচিত হইলে উহাদিগের সন্তানসন্ততির মধ্যে পরস্পর জ্ঞাতি সম্পর্ক সত্ত্বেও দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে তিন চার পুরুষ ধরিয়া বিপদের আশঙ্কা নাই বলিলেও চলে। কিন্তু পক্ষিমিথুনের মধ্যে কোন প্রকার দোষ বর্ত্তমান থাকিলে, সন্তানে উহা অধিক মাত্রায় পরিস্ফুটরূপে সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, এই প্রকার অত্যন্ত নিকট জ্ঞাতি সম্পর্কীয় দাম্পত্য সারস বিহঙ্গগণের (cranes) মধ্যে এত অধিক প্রচলিত দেখা যায় যে, ইহা একরূপ উহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। সহজ অবস্থায় এক জোড়া সারস পক্ষী প্রায় দুইটি সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে—একটি পুং অপরটি স্ত্রী; এই দুইটি পক্ষিশাবক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পরস্পর আজীবন মিলিত হইয়া থাকে। তবে উহাদের মধ্যে হঠাৎ যদি একটির মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে অপরটিকে আর এক বিহঙ্গের সহিত কদাচিৎ মিলিত হইতে দেখা যায়।

কোনও বাধা উপস্থিত হয় না। কোন্ স্থলে এরূপ রাখা সঙ্গত, তাহা পাখীগুলির প্রকৃতি এবং পালকের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। কতিপয় পক্ষী আছে, যাহারা স্বশ্রেণীয় পক্ষিমিথুনের সহিত রক্ষিত হইলে কখনই শাবকজননে প্রয়াসী হয় না; কিন্তু যদ্যপি তাহাদিগকে অপর জাতীয় বিহগদম্পতির সহিত রাখা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগের শাবকজনন প্রয়াসে কোনও বাধা লক্ষিত হয় না। পালকের পক্ষিভবনস্থ "কঠিন চঞ্চু" (Zebra finch) পক্ষীর দুই, তিন বা বহু জোড়া একত্র সংরক্ষিত হইলেও অবাধে সন্তানজননাদি গার্হস্থ্যক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া থাকে; কিন্তু জাভা চড়াই বা রামগোরা পক্ষী ঐ প্রকারে রক্ষিত হইলে সুফল লাভের আদৌ সম্ভাবনা নাই। এই জাতীয় এক জোড়া পাখীই এই নিমিত্ত অপর জাতীয় পক্ষিমিথুন-গুলির সহিত একত্র রাখা বিধেয়।

পক্ষিগৃহমধ্যে একত্র সংরক্ষিত বিহগমিথুনগুলির অবিমৃষ্ট নির্ব্বাচনের ফলে উহাদিগের নীড়-নির্ম্মাণাদি ব্যাপারে যে সকল অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে, তাহার একরূপ আভাস দিলাম। এখন, আর দুইটি জিনিসের উল্লেখ আবশ্যক, যেগুলির অভাবে পক্ষিদম্পতির আপন আপন ঘরকন্না সাজাইবার পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিবে। প্রথমতঃ aviary মধ্যে প্রত্যেক পক্ষিমিথুনের নীড়-নির্ম্মাণের অনুকূল স্থান থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ বাসা প্রস্তুত করণের অত্যাবশ্যক উপকরণগুলি উহাদিগের আয়ত্তের ভিতর রাখিতে হইবে। বাসা প্রস্তুত ব্যাপারে পাখীদিগের প্রকৃতি বাস্তবিকই বিচিত্র; কারণ একই জাতির অন্তর্গত বিহঙ্গ-গণের মধ্যে শ্রেণী ভেদে যে রূপ উহাদিগের নীড় প্রস্তুত প্রণালীর পার্থক্য লক্ষিত হয় তদ্রূপ নীড় রাখিবার অনুকূল স্থান নির্ব্বাচনেও প্রত্যেক শ্রেণীর পতত্রিমিথুনের একটা বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়। মোটামুটি সকলেই প্রায় দেখিয়া-ছেন যে, কোন-কোন পাখী বৃক্ষশাখায় নীড় বিলম্বিত করিয়া দেয়, এমন কি অনেক সময়ে মনে হয় যেন পাতার গায়ে পিপীলিকার বাসা জমাট হইয়া ঝুলিতেছে; কেহ বা বৃক্ষ-শাখার ঘন পত্রান্তরালে নীড়টি সযত্নে রক্ষিত করে; কেহ বা তরুকোটরে গৃহস্থলী করিতে ভালবাসে; আবার কেহ কেহ অসঙ্কোচে মাতা বসুন্ধরার অঙ্কে আশ্রয় লইয়া দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করিতে চেষ্টা করে। পুরাতন অট্টালিকার ভগ্ন প্রাচীরের কোন ফাঁকের মধ্যে পাখীর বাসা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন; কিন্তু খোলা মাঠের উপর অনুচ্চ মাটির ঢিবিতে পাখীর বাসা দেখিয়াছেন কি?

উচ্চল দিবাকরোদ্ভাসিত তালগাছের শিরোদেশে দোদুল্য-মান নীড়ের প্রতি পথিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না কি? পাখীর এই অত্যন্ত বিচিত্র স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া

মানুষকে তাহার বাসা-নির্ম্মাণের জন্য অনুকূল আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। এই নিমিত্ত পক্ষি-গৃহমধ্যে শাখাপ্রশাখা-সমন্বিত বিটপীর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোঁপের, স্থানে স্থানে অনুচ্চ মাটির ঢিবির এবং প্রাচীর-গাত্রে নাতিগভীর গর্ত্তসমূহের আবশ্যকতা সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে যদ্যপি নানারকমের কৃত্রিম নীড়াধার গৃহের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া

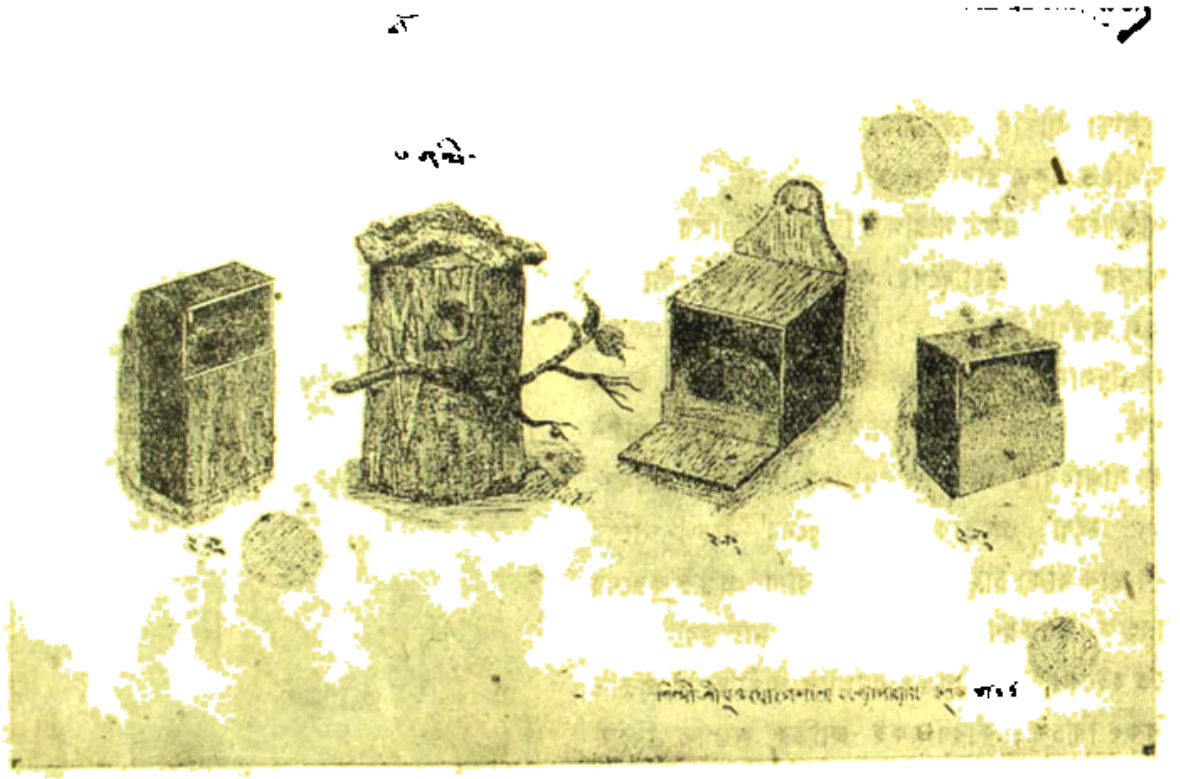

হয়, তাহা হইলে অনেক পক্ষী উহাদিগকে আশ্রয় করিয়া আপন-আপন বাসা তৈয়ার করিয়া থাকে। এই প্রকার যে সমস্ত নীড়াধার সচরাচর ব্যবহার করিয়া সহজেই সুফল পাওয়া যায়, তাহাদিগের কয়েকটি চিত্র প্রদর্শিত হইল।

১নং চিত্রে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, শুষ্ক ঝুনো নারিকেলে কেমন সুন্দর নীড়াধার প্রস্তুত করা হইয়াছে। নারিকেলটিকে প্রথমতঃ চিরিয়া দুইভাগে বিভক্ত করিতে হইবে; তৎপরে অভ্যন্তরস্থ কঠিন মালা বাহির করিয়া ফেলিয়া পুনরায় নারিকেল-ছোবড়ার দুটি অংশ লৌহের সূক্ষ্ম তারযোগে একত্র সংবদ্ধ করিয়া উহার একপ্রান্তে একটি ছিদ্র রাখিতে হইবে। এই প্রকার ছোব্‌ড়ার বাসা রচনা করিতে রামগোরা (আভা-চড়াই) এবং টিয়াজাতীয় ক্ষুদ্রকায় পক্ষিগণ পছন্দ করে। অনেক সময়ে নারিকেলটি চিরিয়া আভ্যন্তরীণ মালাটি নিষ্কাসিত করিবার প্রয়োজনও হয় না; কেবলমাত্র নারিকেলের একপ্রান্তে ছিদ্র করিয়া মালার ভিতরের শাঁস বাহির করিয়া ফেলিয়া শুকাইয়া লইলেই উহাতে অনেক পক্ষিমিথুন অসঙ্কোচে আশ্রয় লইয়া থাকে। কখন-কখন আবার সমস্ত ছোব্‌ড়াটা বাদ দিয়া শুধু মালাটার উর্দ্ধদেশে একটি ছিদ্র করিয়া দিলেই, ইহা মুনিয়া এবং দিক জাতীয় ক্ষুদ্র পক্ষিগণের নীড় রচনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়; অবশ্য মালার অভ্যন্তরস্থ শাঁস নিষ্কাসিত করিয়া দিয়া

মালাটিকে শুকাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। মালাটির অর্দ্ধাংশ আবার বাটির মত চিৎ করিয়া একটি অপ্রশস্ত তক্তার উত্তমরূপে সংলগ্ন করিলেই কেনেরি (canary) পক্ষীর নীড়-রচনার বড়ই অনুকূল হইয়া থাকে।

২ নম্বর চিত্রে নানাপ্রকার বাক্সের সাহায্যে নীড়াধার নির্ম্মাণ-কৌশল প্রদর্শিত হইল। সাধারণতঃ চুরটের বাক্সে খুব অল্প খরচে অতি সহজে এই নীড়াধারগুলি তৈয়ার করিতে পারা যায়। অপেক্ষাকৃত গভীর কাঠের বাক্সে শালিক জাতীয় পক্ষী বাসা করিতে খুব পছন্দ করে। ছোট ছোট বাক্স মুনিয়াজাতীয় ক্ষুদ্রকায় পক্ষীদিগের কুলায়-সঙ্কলনের বড়ই অনুকূল।

৩ নম্বর চিত্রে দেখিতে পাইবেন যে, গাছের গুঁড়ির সাহায্যে কিরূপ নীড়াধার প্রস্তুত হইতে পারে। যে সকল পক্ষী মুক্ত স্বাধীন অবস্থায় তরুকোটরে বাসা নির্ম্মাণ করিতে ভালবাসে, তাহাদিগের জন্য পক্ষিগৃহ মধ্যে স্থাপিত ঈষদুচ্চ গাছের গুঁড়ির গায়ে একটা নাতিগভীর গহ্বর করিয়া দেওয়া হয়।

পাঠক-পাঠিকাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি যে, উপরে বর্ণিত নারিকেলমালা অথবা কাঠের বাক্সগুলি পক্ষীর নীড়ের আধারমাত্র; উহাদিগের মধ্যে খড়কুটা প্রভৃতি উপকরণ সাহায্যে পাখীরা আপন-আপন বাসা তৈয়ার করিয়া থাকে। কোন-কোন স্থানে নীড়াধারই নীড়রূপে ব্যবহৃত হয়। পায়রা, ঘুঘু জাতীয় পাখী নীড়াধারের মেজের উপরে স্বস্ব ডিম রক্ষা করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না।

অতঃপর নীড়-রচনার নিমিত্ত পাখীদিগের আবশ্যকমত উপকরণাদি যোগাইয়া দিয়া পক্ষিপালককে ইহাদিগের আপন-আপন ঘরকন্না সাজাইবার নিমিত্ত অনেক সময়ে সাহায্য করিতে হইবে। শুধু খড়-কুটা, শুষ্ক ঘাস, পাট বা পশমের টুকরা, তূলা প্রভৃতি উপাদানগুলি গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিলেই চলিবে না; নীড়াধার-গুলির মধ্যে ইহাদিগের কিছু কিছু সজ্জিত করিয়া দিলে পাখীর বাসা করা সহজ হইয়া যায়। অনেক পক্ষী আছে যাহাদিগের বাসা-রচনায় এত ভুলভ্রান্তি দেখা যায় যে, সেগুলি পালক যদি যত্নসহকারে খড়কুটা সাজাইয়া পরিমার্জ্জিত করিয়া না দেন, তাহা হইলে ডিম্বের অনিষ্ট বশতঃ শাবকোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। এইখানে একটি কূট-সমস্যা আসিয়া পড়ে। যদি নীড়-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিহঙ্গজাতির প্রকৃতি-প্রদত্ত সহজ-সংস্কার মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে নিজ-নিজ উপযোগী বাসা-রচনায় কখনই তাহাদের ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা হওয়া উচিত নহে। তবে কেন অনুকূল ব্যবস্থা সত্ত্বেও কেনেরি (canary) পক্ষী বাসা করিতে বিষম ভুল করিয়া বসে? এই ভুল-ভ্রান্তির জন্য তাহার আবদ্ধ অবস্থাই যে দায়ী, তাহা নহে। তাহাদের অপটুতা স্বাধীন অবস্থাতেও বড় বেশী চোখে পড়ে। পাখীদিগের বিচার-বুদ্ধি (Reason) আছে কি না, অথবা কেবলমাত্র সহজসংস্কার তাহাদিগকে পরিচালিত করে, এই প্রশ্ন পাশ্চাত্য বিহঙ্গ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত-মণ্ডলী বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন। একদল অবশ্যই Instinct ব্যতীত অন্য কিছুই মানেন না এবং মানিতেও সহজে প্রস্তুত নহেন। ইঁহাদিগের বিশ্বাস যে, পক্ষিশাবক নীড় নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে; সময় আসিলে তাহারা তাহাদিগের সেই পুরুষ-পরম্পরাগত ক্ষমতার পরিচয় দিয়া থাকে। পক্ষিতত্ত্ববিদ্ চার্লস্ ডিক্সন্ (Charles Dixon) বলেন—একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, যদিও প্রায় সমস্ত পক্ষিপালক এই মত পোষণ করেন। আল্‌ফ্রেড রসেল্ ওয়ালেস্ (Alfred Russel Wallace) প্রমুখ একদল প্রাণিতত্ত্ব-বিদ্ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, Reasonকে স্বীকার করিয়া লইলে, পাখীর বাসা তৈয়ার করা ব্যাপারটা সন্তোষজনকরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। ইহাঁদিগের আলোচনার ধারা এইরূপ :—

(ক) পাখীর Instinct অর্থাৎ সহজসংস্কার পুরুষ-পরম্পরাগত অভ্যাস মাত্র।

(খ) এই Instinct কখনই পক্ষিশাবকের প্রথম কুলায়-রচনা-ক্রিয়ার একমাত্র কার্য্যকরী শক্তি বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। (৩)

৩। তরুণ বয়স্ক পক্ষিমিথুনের সর্ব্বপ্রথম নীড়রচনার চেষ্টা যে অনেক সময়ে খড়কুটার কদাকার স্তূপে পরিণত হয়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; এমন কি দুইবার, তিনবার চেষ্টা করিয়াও নীড়গুলি উহাদের মনোমত হয় নাই বলিয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় উহা-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া পক্ষিমিথুনকে অপর স্থানে নূতন উদ্যমে

(গ) যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে যে পক্ষিশাবক অপর পক্ষীর বাসায় রক্ষিত ডিম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে, সেও কালক্রমে স্বজাতীয় পক্ষীগণের বাসার অনুরূপ নীড় (অর্থাৎ তাহারা যে সকল উপকরণের সাহায্যে যে প্রকার বাসা তৈয়ার করিয়া থাকে সেই সকল মালমসলা লইয়া ঠিক সেই রকম বাসা) অনায়াসে রচনা করিতে পারিত।

(ঘ) পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত ক্ষমতার উত্তরাধিকারসূত্রে পক্ষিজাতি যদি এত বড় একটা জটিল কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহারা স্বশ্রেণীর উপযোগী বাসা-নির্ম্মাণ ব্যাপারে মানবজাতি অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ; কারণ, মানুষকে যদি নিজের tribe অথবা raceএর অনুরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা হইলে সে না দেখিয়া, শুনিয়া বা শিখিয়া কখনই তাহা করিতে পারিবে না।

(ঙ) সহস্রসংস্কারজাত পাখীর বাসা চিরকালই এবং সর্ব্বত্রই সম্পূর্ণভাবে এক ধরণের হইত।

(চ) কিন্তু তাহা হয় না; সাধারণতঃ বাসা রচনার জন্য পাখীরা শ্রেণীভেদে যে প্রকার স্থান পছন্দ করিয়া থাকে, অনেক সময়ে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায়। কালপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন আবহাওয়া নূতন পরিবেষ্টনীর মধ্যে রচিত নীড় পক্ষি-জীবনের পক্ষে কোন বিষয়েই হানিকর হয় না। (৪)

(ছ) অনেক পক্ষীর নীড়রচনার অভ্যাস ও পরিবর্ত্তিত হয়ই, কোন কোন স্থলে আবার বাসার আকৃতি ও ধাঁজ সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়। (৫)

নীড়রচনায় ব্রতী হইতে দেখা যায়। অনভিজ্ঞতাই যে এ ক্ষেত্রে নিষ্ফলতার হেতু, তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়। অতি শৈশবে এক জোড়া chaffinch পক্ষীকে New Zealandএ লইয়া গিয়া মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তথায় এই জাতীয় পক্ষী আদৌ ছিল না। ইংলণ্ডই ইহাদিগের একমাত্র বাসস্থান। জাতিবিহীন এই নূতন দেশে নূতন পরিবেষ্টনীর মধ্যে পক্ষীমিথুনকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডবাসী জাতিধর্ম্মের অনুকরণে নীড়-রচনা করিবার অভিজ্ঞতা ইহাদের তখন জন্মায় নাই। কাজে কাজেই ইহাদিগের নীড়-রচনার সময় আসন্ন হইলে New Zealand দেশীয় একপ্রকার পক্ষীর অনুকরণে বাসা করিয়াছিল মাত্র।—Vide Seebohm's British Birds, Vol. II, p. 102.

সহজ-সংস্কার অথবা Instinct এ ক্ষেত্রে কিন্তু ইহাদিগের স্বজাতিধর্ম্মের অনুরূপ নীড় নির্ম্মাণে সাহায্য প্রদান করিল না; New Zealand দেশীয় পক্ষীর বাসার অনুকরণ করিয়া তাহারা যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়াছিল তাহাতেই তাহাদের নীড়রচনার কার্য্য সম্পাদিত হইল। Instinct যদি একমাত্র কার্য্যকরী শক্তি হইত, তাহা হইলে অনভিজ্ঞ বিহঙ্গদম্পতির সর্ব্বপ্রথম নীড় তাহার পরবর্ত্তী নীড়গুলির ন্যায় নিপুণ ও নিখুঁতভাবে রচিত হইত; নীড়গুলিও সর্ব্বত্রই স্বজাতির অনুরূপ মামুলী উপকরণ সাহায্যে সুবিন্যস্ত মামুলী ধাঁজের হইত, বিদেশীয় পাখীর বাসা অনুকরণ করিবার কোন প্রয়োজনই থাকিত না।

মিঃ চার্লস্ ডিক্সন লিখিয়াছেন যে, উনবিংশ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার আপন উদ্যানে একজোড়া হলদে অনভিজ্ঞ ম্যাদ্ (Thrush) পক্ষীর নীড়রচনার বিফল উদ্যম তিনবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন; তৎকালে কিন্তু তাঁহার উদ্যানের আর এক প্রান্তে আর এক জোড়া পরিণত বয়স্ক ঐ জাতীয় পক্ষী নাগাল চেষ্টায় প্রথম উদ্যমেই তাহার নীড় পরিপাটিভাবে রচনা করিয়া পার্হস্থ্য জীবনের সুখানুভব করিতেছিল। তরুণবয়স্ক অনভিজ্ঞ পক্ষিদম্পতির শেষ উদ্যম শুষ্ক ঘাসের এক কদাকার স্তূপে পর্য্যবসিত হইয়া তিনটি ডিমের আশ্রয়স্থল হইলেও পক্ষিমিথুন সন্তান উৎপাদনে বিফলপ্রযত্ন হইয়া তথা হইতে যে অবশেষে পলায়ন করিয়াছিল, তাহা ডিক্সন (Dixon) মহোদয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। Vide Bird's Nests by Charles Dixon, Chapter I. p. 17.

৫। অতি প্রাচীনকালে যখন মানুষ ইষ্টক প্রস্তরাদির সাহায্যে বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে শিখে নাই, তখন হইতে মার্টিন (martin) বা তালচটু পক্ষী জনপদ অথবা সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ব্বতগাত্রে আপন নীড় সংলগ্ন করিয়া আসিতেছিল। মানব-শিল্পের উদ্ভাবনা এবং বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উহারা ইষ্টক-প্রস্তরাদি বিনির্ম্মিত অট্টালিকা-গাত্রে নীড় রচনার সুবিধা বোধে আপনাদের চিরন্তন অভ্যাস পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল। চামচিকা (Swift)ও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। ভারতবর্ষের ন্যায়, ইংলণ্ডেও শালিক এবং অন্যান্য কয়েকটি পাখী প্রাসাদসহরে সুবিধামত নীড়রচনায় ব্রতী হইল। পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানে চড়াই পক্ষী দলে দলে মানব আবাসে আশ্রয় লইল। ইহা যে তাহাদের নিকট বিশেষ নিরাপদ স্থানে এবং স্ব স্ব নীড় রচনায় এবং সন্তান প্রতিপালনের পক্ষে সুবিধাজনক, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি; নতুবা পাখী কি সহজে তাহার চিরন্তন অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হয়? মানব-আবাসে আশ্রয় লইয়া চড়াই পাখী যে দিনে দিনে সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা সকলেই প্রায় বিরক্তির সহিত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

৬। প্রয়োজন হইলে পাখী যে অনেক সময়ে তাহার নীড়রচনার মামুলী ধাঁজ বদলাইয়া বর্ষাদি অবস্থার সহিত মিলাইয়া বাসা প্রস্তুত

(ঙ) সঙ্গে-সঙ্গে কুলায়-রচনার মামুলী উপকরণগুলির পরিবর্ত্তনও সময়ে-সময়ে লক্ষিত হয়; অর্থাৎ সচরাচর ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণীর পাখীদিগের নীড় প্রস্তুতের নিমিত্ত আবহমান কাল হইতে যে সমস্ত মালমসলা নির্দ্দিষ্টরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে, সেই মামুলী মালমসলার পরিবর্ত্তে নূতন উপকরণের সাহায্যে রচিত পাখীর বাসা অনেক সময়ে দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত পরিবর্ত্তন পরম্পরাগত অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিরোধী। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মিলাইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত পাখীকে বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা করিতে হয়। অতএব কেমন করিয়া পাখী তাহার প্রথম বাসা রচনা করে, এই প্রশ্নের সদুত্তর Instinct বা সহজ-সংস্কারের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে না। এই শ্রেণীর পক্ষিতত্ত্ববিদ্ বলেন যে, পাখীর প্রবল অনুকরণ-প্রিয়তা, তাহার স্মৃতিশক্তি, বিচারশক্তি এবং বংশপরম্পরাগত অভ্যাস, এই সমস্ত মিলিয়া তাহাকে নীড়-রচনায় প্রণোদিত করে। মানুষের মত পাখীরও reason অথবা বিচারশক্তি আছে, যদিও অপেক্ষাকৃত ন্যূন পরিমাণে। আবদ্ধ অবস্থায় সকল পক্ষী স্বশ্রেণীর উপযোগী নীড় প্রস্তুত করিতে পারে না। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, কেনেরি (canary) পক্ষী বাসা রচনা করিতে গিয়া সমস্ত উপকরণগুলিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া এলোমেলোভাবে স্তূপীকৃত করিয়া রাখে মাত্র; অবশ্য তাহার উপর ডিমগুলি রাখা যাইতে পারে, কিন্তু মোটের উপর সেটাকে পাখীর বাসা কিছুতেই বলা যায় না। অধিক স্থলে ডিমের অনিষ্টও ঘটিতে দেখা যায়; হয় ইহা বাসা হইতে পড়িয়া যায়, অথবা উপযুক্ত আশ্রয় অভাবে ক্রমাগত নড়িয়া-চড়িয়া ইহাতে আঘাত লাগিয়া থাকে। এইজন্যই পক্ষিপালক পক্ষিগৃহমধ্যে শুধু যে উপকরণগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন তাহা নহে; অনেক সময়ে তাঁহাকে স্বহস্তে সেই-খড়-কুটাগুলি সেই শ্রেণীর পক্ষিকুলায়ের অনুকরণে সাজাইয়া দিতে হইবে। তখন সামান্য চেষ্টায় আবদ্ধ পক্ষিমিথুন উপযুক্ত বাসা প্রস্তুত করিয়া ফেলিবে। পাশ্চাত্য পক্ষি-পালক কেনেরি পক্ষীর বাসা তৈয়ার করিবার জন্য এক প্রকার কাঠের ছাঁচ (mould) প্রস্তুত করিয়াছেন। উহাকে উত্তপ্ত করিয়া খড়-কুটাগুলি উহার গাত্রে চারিপার্শ্বে কিছুক্ষণ চাপিয়া ধরিলেই কেনেরি পক্ষীর বাসা সহজেই নির্ম্মিত হইয়া যায়; তখন তপ্ত কাষ্ঠখণ্ডটাকে বাহির করিয়া লইতে হইবে। এস্থলে মানুষের সাহায্য ব্যতীত পাখী যে তাহার বাসা রচনা করিতে পারিল না, তাহার সমস্ত চেষ্টা যে কেবলমাত্র খড়কুটার স্তূপে পরিণত হইল, ইহার প্রধান কারণ এই যে, এই কৃত্রিম গৃহমধ্যে সে অনুকরণ করিবার কিছুই পাইল না। শুধু Instinct বা সহজ-সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যদি সে নীড়নির্ম্মাণে সম্যকরূপ সফলপ্রযত্ন হইত, তাহা হইলে এই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উপকরণ-স্তূপের উপর অযত্নরক্ষিত ডিমগুলি পালকের দৃষ্টিপথে পতিত হইত না; পালককে সেই ডিম রক্ষার জন্য সযত্ন-বিন্যস্ত খড়কুটার বাসা তৈয়ার করিয়া দিতে হইত না।

স্বাধীন অবস্থায় পাখীরা অনুকরণ করিবার অনেক সুবিধা পায়। অতি শৈশবে পক্ষিশাবক তাহার বাসাটিকে ভাল করিয়া দেখিবার যথেষ্ট অবসর পায়;—আবার এক বৎসর দেড়বৎসর পরে যখন সে নিজের বাসা নির্ম্মাণ করিতে চায়, তখন প্রায়ই সে তাহার জন্মস্থানে (৬) প্রত্যাবর্ত্তন

করিতে বাধ্য হয়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ডল মোরগ বা বিলমোরগ (Moorhen) ভূমিতে বাসা নির্ম্মাণ করিতে অভ্যস্ত; কিন্তু অবস্থাবিশেষে ইহাকে বৃক্ষশাখায় নীড় রচনা করিতে দেখা গিয়াছে। যে সকল প্রদেশে বন্যার সম্ভাবনা অধিক, সেখানে অগত্যা তাহারা আপনাদিগের চিরন্তন অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে; ঐরূপ স্থলে বৃক্ষশাখাই তাহাদের নীড়নির্ম্মাণের অনুকূল আশ্রয়স্থল। Tristan d' Acunha দ্বীপপুঞ্জে বহুকাল হইতে Penguin পক্ষী ভূমিতে অনাচ্ছাদিত বাসা করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু যেদিন হইতে তথায় শূকরের আমদানি আরম্ভ হইয়াছে, সেইদিন হইতে তাহারা বাসা আবৃত করিয়া রচনা করিতে শিখিয়াছে।—C. Dixon's Bird's Nests, p. 13.

৬। এই যে জন্মস্থানে ফিরিয়া আসা,—পাখীর স্বল্পপরিসর জীবন-কাহিনীর মধ্যে ইহা একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাপার। শুধু যে পক্ষি-শাবকের জন্মস্থানের দিকে একটা টান আছে তাহা নহে; প্রৌঢ়-বয়সেও পক্ষিদম্পতি তাহাদিগের প্রথম রচিত নীড়ের সন্ধানে ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। যে ঋতুতে তাহারা সাধারণতঃ বাসা তৈয়ার করে, ঠিক সেই ঋতুতেই এই যে যৌবনের অবসানেও তাহাদের প্রথম যৌবনের প্রথম রচিত প্রমোদভবনের স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা,—এমন বিস্ময়কর ব্যাপার মানবজীবনেও বিরল। মিঃ চার্লস্

করে এবং তথায় হয় ত সে পরিত্যক্ত নীড়গুলি দেখিবার সুযোগ পাইয়া অনুকূল পরিবেষ্টনীর মধ্যে ঐ সমস্ত নীড়ের অনুকরণে বাসা প্রস্তুত করে। প্রায়ই সে স্বশ্রেণীর অধিক-বয়স্ক পাখীকে বাসা নির্ম্মাণ করিতে দেখে এবং তাহার অভিজ্ঞতা হইতে অবশ্যই কিছু জ্ঞান লাভ করে। কোন কোন পাখীর এমন অভ্যাস যে, তাহারা দল বাঁধিয়া বাসা তৈয়ার করে; এ অবস্থায় অবশ্যই বয়স ও অভিজ্ঞতার তারতম্য সত্ত্বেও সকলেই প্রয়োজনোপযোগী বাসা সুচারুরূপে নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয়। পক্ষিমিথুনের মধ্যে বয়সের খুব তারতম্য থাকিলে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক অভিজ্ঞ পক্ষীটি তাহার স্বল্পবয়স্ক অনভিজ্ঞ সঙ্গীটির যত কিছু ত্রুটি পরি-মার্জ্জিত করিয়া লইতে পারে।

পাখীপোষার কথায় অবতারণা করিয়া সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণকে এতক্ষণে পাখীর বাসায় লইয়া আসিলাম। সেখানে তাহার সামান্য গৃহস্থালীর উপকরণগুলির প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিলাম। সেই সযত্নরচিত অথবা অযত্নবিন্যস্ত পক্ষিকুলায় মধ্যে তাহার সমস্ত যৌবনোচ্ছ্বাস রূপে, গানে ও ভঙ্গিমাধুর্য্যে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিবে। জানি না পাঠকপাঠিকাবর্গ আমার এই রচনাগুলিকে সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিবেন কি না; কিন্তু আমার বিনীত নিবেদন এই যে, পাখীর জীবন-কাহিনী মানুষের নিকটে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সাহিত্য-সেবীদিগের নিকটে নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার হইতে পারে না; কারণ ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য ক্রৌঞ্চ-বিরহ-ব্যথার সকরুণ বেদনায় স্বতঃ-উৎসারিত হইয়াছিল।

পাখীর বাসা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এখনও ফুরায় নাই। এই নূতন কৃত্রিম পরিবেষ্টনের মধ্যে পক্ষিমিথুনের পরিণয়কাহিনী বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল; সঙ্গে সঙ্গে বর্ণসঙ্করসমস্যা (hybridism) ও পরভৃৎ-রহস্যের (parasitism) আলোচনা করিবার সুযোগ পাইব।

ডিক্‌সন তাঁহার Bird's Nests নামক গ্রন্থে পক্ষীর জন্মস্থান-প্রিয়তার উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই; এমন কি কয়েকটি পক্ষী যে বাসা করিবার সময় আসিলে, ঠিক যে স্থানে তাহাদের প্রথম নীড় রচিত হইয়াছিল, সেই স্থানে নিশ্চয়ই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, মিঃ পাইক্রাফট (W. P. Pycraft) তাঁহার Bird Life নামক গ্রন্থে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। Puffin, Swift এবং Swallow পক্ষী ঘড়ির কাঁটার মত যথাসময়ে কড়ায়গণ্ডায় উপস্থিত হইয়া আপনাদের পুরাতন পরিত্যক্ত বাসায় ফিরিয়া আইসে।

শুক্‌নো মালঞ্চ

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ]

১

হঠাৎ অত্যধিক গরম পড়াতে, দুই মাসের ছুটি লইয়া দার্জ্জিলিঙ্গের পথে কলিকাতায় দিন কয়েক থাকিয়া যাইতে হইল। শ্রীমতীর পিত্রালয় এখানে। পশ্চিমের কড়া রৌদ্র এবং ধূলা হইতে আসিয়া বাঙ্গলা দেশটা স্নিগ্ধ সজল বলিয়া বোধ হইল। দ্বিপ্রহরটা ঘেঁসাঘেঁসি বাড়ীর গুমট গরমে অস্থির হইতাম; কিন্তু সন্ধ্যার পর দক্ষিণ দিকের মলয়ানিল অতি শীতল। সুখ এবং দুঃখকে যখন কাছাকাছি এবং পাশা-পাশি পাওয়া যায়, তখন জীবনটা আর কিছু না হউক, উপভোগ্য হইয়া উঠে। বিধাতা যদি দিন-রাত্রির নিয়মের মত সুখ-দুঃখের একটা বাঁধা-বাঁধি সময় করিয়া দিতেন, তাহা হইলে মোটের উপর ব্যবস্থা কি ভাল হইত না?

সেদিন দ্বিপ্রহরে নীচের তলার ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া, ফ্যান্ খুলিয়া দিয়া, তাহার বোঁ-বোঁ শব্দে উত্ত্যক্ত হইয়া পড়িতেছিলাম, এমন সময় একটা লোক বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিল—"বাবু, চিঠ্‌ঠি-ই-ই-ই-ই....."—ঠিক যেমন জাহাজের বাঁশীর শব্দ দিগন্তে মিলাইয়াও মিলাইতে চাহে না, সেইকালে মনে হয়, যেন শব্দ আছে কি নাই, —যেটা শুনা যায়, সেটা মনেরই ভুল।

মুরলী-শিক্ষা।

[শিল্পী—শ্রীসত্যচরণ ঘোষ।

Emerald Printing Works
CALCUTTA

একখানা পোষ্টকার্ড পাইলাম। লেখাটা নেহাৎ অপরিচিত না হইলেও, ফস্ করিয়া চিনিতে পারিলাম না। লাইনগুলা ঠিক সোজা নয়। অক্ষরগুলা পাকা হাতের হইলেও ভীষণ টেড়া-বেঁকা। তলায় নাম নাই। "ইতি আপনার অনুগত" পর্য্যন্ত লেখা।

হয় ত নাম থাকিলে তখন আর চিঠিখানা পড়িয়া দেখা হইত না; নাম না থাকাতেই পড়িবার ইচ্ছা যেন জাগ্রত হইয়া উঠিল। বিষয় জিনিসটা এমনি মজার! বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া আলোর কাঠিটা টানিয়া দিতেই চিঠিখানা পড়া গেল; চিঠিতে লেখা ছিল:—

"শ্রীশ্রীহরি শরণং

১৩৮নং সার্কুলার রোড

শুক্রবার।

বহুমানভাজনেষু,—

এখানে আসিয়া একাও বিপদগ্রস্ত আছি; শরীর অপটু বিধায়, উত্থান-শক্তি রহিত। টাকা যাহা ছিল ফুরাইয়াছে। টাকা-দশেক না পাইলে বড়ই কষ্টে পড়িব। পত্র পাঠ ফেরত ডাকে একটা বন্দোবস্ত করিতে আজ্ঞা হয়। কিমধিক মিতি—

"আপনার অনুগত"

পত্রখানি —পুর হইতে রিডাইরেক্ট হইয়া আসিয়াছে। পিঠে একরাশি পোষ্টাফিসের ছাপ এবং কাল-কালিতে পুরাতন ঠিকানা কাটা এবং কলিকাতার ঠিকানা লেখা। হাতের লেখা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, লেখক অসুস্থ। কিন্তু তিনি যে কে, তাহার কোনই ঠাহর করিতে পারিলাম না। অগত্যা এক গ্লাস ডাবের সরবৎ পান করিয়া, চক্ষে নীল চশমাটা আঁটিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। অচিরে শেয়ালদার ট্রাম আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহাতে চড়িয়া বসিলাম।

২

বিচিত্র সহর কলিকাতা; এবং বিচিত্রতর পদ্ধতি মিউনিসিপ্যালিটির বাড়ীতে নম্বর দিবার! যখন স্কুল-কলেজে ছিলাম, তখন প্রায়ই শুনিতাম যে, গণিতের গুণ—তাহার ধ্রুবত্ব। ১এর পর দুই আসিতে বাধ্য; এবং ২+২=৪ হইবেই হইবে। ইহার পরিবর্ত্তন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও ক্ষমতা-সাপেক্ষ নয়। ইহার নিকট বিশ্বের সমস্ত স্বেচ্ছাচারিতা মস্তক অবনত করিয়া আছে! মানুষ ক্রমেই বিস্তৃতর হয়। আমাদের অধ্যাপকগণ যদি একদিন কলিকাতার বাড়ীর নম্বরগুলির বিষয় তদন্ত করিতেন, তাহা হইলে গণিতের উপর তাঁহাদের আস্থাটুকু অনেক নরম হইয়া পড়িত। ১৩০ নম্বরের পর যখন আশা-ভরে পরের বাড়ীতে ১৩১এর খোঁজ করিলাম, তখনো বিশ্বাস ছিল, পরে ১ হয়; কিন্তু দেখিলাম, ১৩৫ নম্বরের বাড়ী বিরাজ করিতেছে। মাঝের নম্বরের খোঁজ-খবরের ভার হয় ত শীঘ্রই 'সাহিত্য-পরিষদের' শাখাবিশেষের হাতে আসিবে।

দুইদিকের মিঠাইওয়ালার দোকানের মাঝে ১৩৮এর সরু সোজা সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গিয়াছে। দোরের উপরে বড়-বড় অক্ষরে লেখা, "দি রয়েল হোটেল।" সাইনবোর্ডের অক্ষরগুলি এত বড় যে, দেখিয়াই বিস্মিত হইয়া পড়িতে হয়; তত্তোহধিক বিস্ময় জাগে সিঁড়িতে উঠিতে। একজন লোক অতি কষ্টে তাহাতে উঠিতে পারে। কয়েকটা সিঁড়ি উঠিয়া পিঠের উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান বেশ পরিষ্কার অনুভব করিতে লাগিলাম। সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠিয়া উপলব্ধি ঘটিল যে, কেন শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন,—উত্থানাৎ হি পতনায়।

কষ্টে-সৃষ্টে উঠিয়া দেখি, একখানি ছোট টেবিলের পাশে একটী বৃহদাকার মনুষ্য, একখানি ছয়-আনা দামের কাঠ এবং লৌহ-মিশ্রিত হাতাহীন চেয়ারে বসিয়া, অবিরত ঘর্ম্ম ত্যাগ করিতেছেন। টেবিলখানির উপর দুইটি মোটা কাল-কাল হাতে টেবিলের বিস্তৃতি প্রায় সর্ব্বগ্রাস করিয়া আছে। বাবুটির বয়স অনুমান বত্রিশ। বয়সের চেয়ে অধিক স্থূল হওয়াতে, বক্ষঃস্থলে মাংসপিণ্ডের অতিরিক্ত সমাবেশ হইয়াছে। যথাসময়ে নোটিশ না দিয়া মেদবৃদ্ধি হওয়াতে, স্থলে-স্থলে চামড়া ফাটা-ফাটা আকার ধরিয়াছে; সেখানকার রং অপেক্ষাকৃত শুভ্র; সূর্য্যাস্তের পর রবি-রশ্মিমালা যেমন করিয়া নীল আকাশময় ছড়াইয়া পড়ে—তাহারই ক্ষুদ্র অনুকরণ।

সহসা আমাকে দেখিয়া তাঁহার মুখে প্রফুল্লতার ভাব চমকিয়া গেল। "কি চাই আপনার?"—স্বর অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং কর্কশ; কিন্তু মোলায়েম করিবার তাহাতে বিলক্ষণ চেষ্টা ছিল। আমি ঠিক কি চাহিতেছিলাম, তাহা তখন পর্য্যন্ত ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার প্রথমে আবশ্যক

হইয়াছিল একটু বসিবার স্থান। পার্শ্বে একখানি ছয় ইঞ্চি চওড়া এবং সাড়ে তিন ফিট লম্বা বেঞ্চি ছিল—তাহার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম,—"বসিতে পারি কি?" ঈষৎ গ্রীবা-ভঙ্গি এবং চক্ষের ইসারায় অনুমতি পাইয়া সেখানে বসিলাম। সম্মুখের জানালা দিয়া দূরে শিয়ালদা ষ্টেশন দেখিতে পাইলাম। উপরের আকাশ কালো ধূমে সমাচ্ছন্ন, নীচের মাটি কয়লার গুঁড়াতে কৃষ্ণবর্ণ।

পকেট হইতে পোষ্টকার্ডখানা বাহির করিয়া বলিলাম, "মহাশয়, এ বাড়ীতে কি কেহ পীড়িত আছেন?" ম্যানেজার ডান কাঁধের নিকটস্থ কুলুঙ্গি হইতে একখানা খাতা বাহির করিয়া বলিলেন, "রুম নম্বর ৩; নাম শ্রীবীরসিংহ পাঁড়ে।" কিছুক্ষণ পূর্ব্বে একখানা ট্রামগাড়ী সশব্দে চলিয়া যাওয়াতে, চারিদিক একটু নিস্তব্ধ বোধ হইল। তখন যেন আমার কর্ণে কাহার অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। কে যেন প্রেতলোক হইতে ডাকিতেছে, 'এই ঘরে আসুন।' বীরসিংহ পাঁড়েকে আমি ত চিনি। ইনি আমাদের বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক। তবে তিনিই কি পীড়িত? ম্যানেজার মহোদয়কে বলিলাম,—"কি অসুখ তাঁর?" চক্ষের তারা ছুটো নাসিকার দিকে আকর্ষণ করিয়া তিনি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিলেন—"সে খবর ডাক্তার জানেন।" বুঝিলাম, ম্যানেজার আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইতেছেন। কারণ সহজেই অনুমান করিলাম—রয়েল হোটেলের আতিথ্য গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, ইহা তিনি সহজেই অনুমান করিয়াছিলেন। "অনুগ্রহ করে ৩নং ঘরটা যদি দেখিয়ে দিতেন।" "ঘরে নম্বর আঁটা আছে; বাঁ-হাতি বারাণ্ডায় যান।" বলিয়া ম্যানেজার জানালার ভিতর দিয়া ষ্টেশনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

বারাণ্ডা বাহিয়া ৩নং ঘরের সম্মুখে গিয়া দেখিলাম, একটী জীর্ণ খাটের উপর পণ্ডিত মহাশয় পড়িয়া আছেন। তাঁহার মুখের উপর মৃত্যুর কালো ছায়া অনেকখানি প্রতিফলিত। ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি লম্বে ছয় ফিট, এবং প্রস্থে চার-পাঁচ ফিট হইবে। খাটখানির পাশে একটু সঙ্কীর্ণ স্থান ছিল, তাহাতে এক-রাশি শিশি বোতল ছড়ান। খাটের অপর দিকে একটী জানালা—সেখান হইতেও শিয়ালদা ষ্টেশন দেখিতে পাওয়া যায়। জানালার পাশে খুব বড় অক্ষরে লালকালিতে লেখা দেখিলাম—"কুলকুচা করিও না।"

৩

বীরসিংহ পাঁড়ের বাড়ী মেদিনীপুর জেলায়, সমুদ্রের তীরে একখানি গ্রামে। মেদিনীপুর হইতে উটের গাড়ীতে যাইতে হয়। পাঁড়ের বয়স অনুমান সাতাইশ। শরীরে কোন দ্রুত নাই। যৌবনে তিনি কবিরাজী ও হেকিমী পুস্তকাদি পাঠ করিয়া তাঁহার ব্যাধি নির্ণয় করিয়া ফেলিয়া-ছিলেন, এবং তদবধি মাসে মাসে কবিরাজ মহাশয়দিগের গৃহে কিছু-কিছু টাকা জমা করিয়া আসিতেছেন। বিবাহ এ যাবৎ করেন নাই।

"অভয়া বটিকা" তাঁহার প্রিয় আহার্য্য; 'অমৃতাদি কষায়' তাঁহার নিত্য পেয়! এলোপ্যাথিদের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অভক্তি, এবং হোমিওপ্যাথি অবিশ্বাস করেন। প্রাতে উঠিয়া সদ্য-দোহনোক্ত ছাগ-দুগ্ধ পান করেন। দ্বিপ্রহরে 'কুকারে' সিদ্ধ অন্নাহার করিয়া স্কুলে যান। রাত্রে দুধে পাউরুটি সিদ্ধ করিয়া খান। খাটখানির উপর অতি সন্তর্পণে বসিতেই, পণ্ডিতমশায় বলিলেন, "বড়ই বিপদে পড়েচি।" "তা' ত দেখতেই পাচ্ছি—বিপদ না হলে এমন স্থানে কেউ সহজে, স্বেচ্ছায় বোধ হয় আস্‌তে চায় না।" পণ্ডিত মহাশয় একটু শুষ্ক হাস্য করিলেন। "কি অসুখ আপনার?" "আজ দিন দশেক হ'ল—কোমরের নীচে একটা প্রকাণ্ড ফোড়া হয়েছে।" "কে দেখচেন?"

"ডাঃ ঘোষ, এম-এ, এম-ডি। "বটে! "ফোড়াটার অবস্থা এখন কেমন?—অস্ত্র হয়েছে?" "না:!" "তবে?" "ডাক্তার বাবু বলেছিলেন অস্ত্র করবেন,—কিন্তু আমার মত হয়নি। ফোড়া কেটে সারানটা আমি ডাক্তারদের একটা ফাঁকি মনে করি। তাঁকে বসিয়ে দিতে বলেছি।" "যদি না বসে?" পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, "তা কি হয়? ওকে বস্‌তেই হবে। সাধে এম্-এ, এম-ডিকে ডেকেছি!" আমি স্তম্ভিত হইয়া "কুলকুচা করিও না"র প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। মনে হইল, পণ্ডিতদিগের সবই গুণ—কেবল যদি একটীমাত্র মারাত্মক দোষ না থাকিত! "পণ্ডিত মশাই, ফোড়াটা কি স্কুলের ছাত্র? বস্‌তে বল্লেই সে বসে যাবে?" "ছাত্র হলে একটা ভয় ছিল যে, সে কথা

নাও শুন্‌তে পারে; কিন্তু—দেখুন না" বলিয়া জোড়াটা বাহির করিলেন—সে এক প্রকাণ্ড কাণ্ড!

"ইস্—ঢেকে ফেলুন—"

পাড়ে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "এর ডবল বড় হয়েছিল—অনেকটা বসে গেছে।" ঠিক এই সময়ে কয়েকটা লোক আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "কোথায় বাবু, টাকা দিয়ে দাও।" পণ্ডিত মহাশয় সকরুণ চক্ষে আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "টাকা এনেছেন কি? আমি ভারি মুস্কিলে পড়েছি এদের নিয়ে।" "ব্যাপার কি? —তুমলোগ্ কেয়া মাংতে হো?" একজন অগ্রসর হইয়া বলিল, "হুজুর, ইয়ে বাবু হামলোগ্ কা জলখাই কা উপর কুছ্না করকে তামাম্ বরবাদ্ কর দিইন্ হ্যায়—" তখন পণ্ডিত মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "সেদিন সন্ধ্যার সময় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করচি—খুব জ্বর—তেমনি জল-পিপাসা —প্রাণ আইঢাই করচে। জল খেতে গিয়ে দেখি জল ভাল লাগে না। ঐ জান্‌লা দিয়ে যেমন ফেলে দিয়েছি, আর বাইরে একটা হৈ-হৈ শব্দ উঠ্‌ল।" বলিতে-বলিতে পণ্ডিত-প্রবর ক্লান্ত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিলেন। "তারপর?" "এই লোকগুলো শেষে লাঠি হাতে করে এসে বলে যে, 'আমাদের জলখাবার নষ্ট করেছ—দাম দাও।'—আমি ত অবাক। ম্যানেজার বাবুকে ডেকে বল্লাম—'কি মশাই, এ কেমন ঘরে আমায় থাক্‌তে দিয়েছেন?' তিনি গোড়ায় ঘোষটা আমার কাঁধেই চাপাচ্ছিলেন। পরে কথায়-কথায় জান্‌লাম যে, এমন ঘটনা ইতিপূর্ব্বে দু-একবার ঘটে গেছে। তখন আমি বল্লাম—আপনার উচিত ছিল এখানে লিখে রাখা। —তা' যখন লেখেন নি, তখন দাম আমি এক কিছুতেই দেব না—তা রাজি আছি আদালত পর্য্যন্ত এর জন্যে যেতে। তখন ম্যানেজার নরমে গেলেন;—গিয়ে রফা হল—আমি আড়াই টাকা দেব, আর তিনি আড়াই টাকা দেবেন। খাবারগুলো সব আনিয়ে নেওয়া গেল। বাসার চাকর-বাকর খেলে। এদের আড়াইটা টাকা কিন্তু এখনি দিলে ভাল হয়।" তাহারা টাকা পাইয়া চলিয়া গেল।

জানালার পার্শ্বের নিষেধ-বাক্যগুলির উপর পণ্ডিত মশাই কিছুক্ষণ দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া রাখিয়া, একটা অনুচ্চ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"হয় ত পূর্ব্বজন্মের ঋণ ছিল।" বলিলাম, "বাড়ীতে সংবাদ দিয়েছেন?" "না: —কে আছে আর বাড়ীতে—যেন দাদাকে উত্যক্ত করতে চাইনে—তাঁর বয়স হয়েছে।" "কি তাঁর নাম?"

"অভয়রাম।" "আপনাদের বাড়ী বুঝি মেদিনীপুরে—নিজ সহরে?"—"না:—অনেক দূরে—শ্রীপতিনগর, কাছে নয়।" "একটা চিঠি দেন না?" "দিয়েছি টাকার জন্যে।" "একটা তার দিলে কি হয়?" "গ্রামে টেলিগ্রাফ আপিস নেই—৪ মাইল দূরে - বিলাসপুরে আছে।" আমি মনে-মনে অভয়রামকে তার দেওয়া স্থির করিলাম। এমন সময় ম্যানেজার আসিয়া বলিলেন, "আপনার টাকা এসেছে কি?" পণ্ডিত মহাশয় আমার মুখের প্রতি কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"পাঁচটা টাকা ওঁকে দিন।" টাকা লইয়া ম্যানেজার চলিয়া গেলেন। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "এ হোটেলের দিনে একটাকা চার্জ্জ। আমি খাইনে বলে আট আনা লাগে।" বালিসের নীচে হইতে ঘড়িটা বাহির করিয়া বলিলেন, "ডাক্তার আস্‌বার সময় হলো।—এক-বার ওষুধটা খাই।" কিছুক্ষণ পরে একটা মোটরের শব্দ হইল। ডাক্তার ঘোষ আসিলেন। লোকটার বেঁটে-খাট চেহারা, কাঁচাপাকা ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি, রং কর্সা। একটু তাড়াতাড়ি কথা কহেন। আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইলাম। কারণ ঘরের মধ্যে একান্ত স্থানাভাব। জোড়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ডাক্তার ঘোষ সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "বোধ হয় বসেই যাবে—কেটে দিলে এতদিন সেরে যেত।" আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"আপনি কে? আত্মীয়?" "আজ্ঞে না—জানাশুনা আছে।" পণ্ডিত মহাশয় আস্তে-আস্তে বলিতে লাগিলেন,—"আজও দাদার চিঠির উত্তর পাইনি—টাকাটা আজও দিতে পাচ্ছিনে।" ডাঃ ঘোষ—"সে পরে হবে—সেরে উঠুন ত' আপনি।" ডাক্তার ঘোষের সহিত রাস্তায় গিয়া কথা কহিলাম।

"কেমন বুঝচেন?"

"সেরে যাবে—তবে কেটে দিলেই সেটা মিটে যেত।" "তাই দিলেন না কেন?" "রুগীর অমতে আমি তা করতে ভরসা পেলুম না।—আচ্ছা নমস্কার আসি—" বলিয়া তিনি মোটর চালাইবার ইঙ্গিত দিতেই—গাড়ীখানা শব্দ করিয়া উঠিল। আমি সোজা শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়া বীরসিংহের দাদা অভয়রামকে তার দিলাম—

"Birsinha dangerously ill. Start at once."

ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, পাঁড়ে বালিশের উপর পিঠ দিয়া চোখ বুজিয়া নিদ্রিত। পাশে একটি স্ত্রীলোক বসিয়া ধীরে-ধীরে তাহার মাথায় বাতাস দিতেছে। এই রমণীটি তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাপড় দিয়া সুন্দর ভাবে আবৃত করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার মুখের উপর সামান্য ঘোমটা টানা। দেখিয়া বোধ হইল, তিনি বাঙ্গালি নন। পণ্ডিত মহাশয়ের ঘরে এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে স্ত্রীলোক দেখিয়া, আমি বারাণ্ডা হইতে ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় রমণীটি বলিলেন—"আমি কিছুক্ষণ আছি! আপনি বেড়িয়ে আসুন। ছোট ঘরে অনেকক্ষণ থাকলে আপনার অসুখ হবে।" আমি বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে ধীরে-ধীরে রাস্তায় নামিয়া গেলাম।

৪

কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সমাগম হওয়াতে পরদিন প্রাতে যাইতে পারিলাম না। বৈকালে রয়েল-হোটেলের সম্মুখে গিয়া দেখিলাম, দোরে একটা প্রকাণ্ড তালা ঝুলিতেছে, এবং বড়-বড় অক্ষরে লেখা, "এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে।" স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল এ কোন যাদুবিদ্যার জালে আসিয়া জড়াইয়া পড়িতেছি। একটা মিঠাইওয়ালার দোকানের সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ওহে, এ হোটেল কোথায় গেল?" প্রকাণ্ড লোহার কড়ায় রসের পাক দিতে দিতে একটা লোক বলিল;—"জহন্নমে!" লোকটা আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল। তাহার পিছনে একটা দরজা। ধীরে-ধীরে সেই দরজাটী খুলিয়া গেল। সেই রমণীটি আমাকে বাড়ীর পিছন দিকে যাইতে ইসারা করিল। একটী ছোট গলি অতিক্রম করিয়া বাড়ীর পিছনে গিয়া দেখিলাম, রমণী আমার জন্য তথায় অপেক্ষা করিতেছে। তাহার দুই চক্ষু জবাফুলের মত রক্তবর্ণ এবং ফুলিয়াছে। মনে হইল, সে এইমাত্র ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া বাহিরে আসিয়াছে। আমাকে দেখিয়া আবার তাহার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল—সে কষ্টে তাহা রোধ করিল। বলিলাম—"হোটেল কোথায় গেল? সেই বাবুটিই বা কোথায়?" কপালে করাঘাত করিয়া সে ছিন্নিতে বলিল—"সবই তাহার কপালের দোষ।" কপালের দোষে এতবড় একটা জোলবাজি হইয়া যাইতে পারে, তাহা আমার বিশ্বাস ছিল না। আমি একটু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—দয়া করে' একটু পরিষ্কার করে বল।" সে হিন্দি এবং বাঙ্গলা ভাষাকে অদ্ভুত ভাবে মিশ্রিত করিয়া বলিতে লাগিল,—"কনোজে আমার বাড়ী; আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ। অল্প বয়সে বিধবা হই। যখন বয়স হইল, তখন সংসারে আমার বুড়া বাপ ছাড়া আর কেহই ছিল না। বাপের মৃত্যু হইলে আমি নিরাশ্রয় হইলাম। কিছুদিন ঘটি-বাটি বেচিয়া দিন কাটিল। অবশেষে বাড়ী-খানাও গেল! আমি পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। পেটের দায় বড় বিষম,—আমি তাহারই চেষ্টায় একজন আত্মীয়ের সঙ্গে পাটনায় আসিলাম। পাটনা বড় সহর, এক বাঙ্গালী-বাবুর বাড়ীতে রসুয়ের কাজ পাইলাম। বাবু বড় ভাল লোক। গোল বাধিল মাইজীর সঙ্গে। সে আমার রূপ-যৌবন লইয়া। মাইজীর কড়া পাহারা আমার ভাল লাগিত না। তিনি উঠিতে বসিতে আমাকে দূর-দূর করিতেন। কয়েকমাস চাকুরি করিয়া হাতে কিছু টাকা জমিল। আমার আর পাটনা সহর ভাল লাগিল না। শুনিলাম, তার চেয়ে এক ভারি সহর আছে,—সে কল্‌কাতা। বাবুজীর বাড়ীর নীচের তলায় রাস্তার দিকে হালওয়াইএর দোকানে এই হালওয়াই কাজ করিত। মধ্যে-মধ্যে এর সঙ্গে দেখা হত আমার। রাত্রে যখন সকলে ঘুমাইয়া পড়িত, তখন আমি তামাক খাইবার জন্য এর দোকান-ঘরে আসিতাম। একদিন শুনিলাম, সে কল্‌কাতায় আসিবে। আমার মন নাচিয়া উঠিল। বাবুজির কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে' একরাত্রে রওনা হলাম। তার পর দু-বছর এর কাছেই আছি। দোকানে কাজ করি। দু-বেলা দুটি খেতে দেয়। এ ভারি সয়তান। বাবু এর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। আমি বড় কষ্টে আছি।" বলিয়া রমণী চোখে-মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। রমণী আবার আরম্ভ করিল,—"সেদিন রাতে বাবুজি, ওই উপরতলার ঘর থেকে কে 'মা মা' বলে এমন কাঁদতে লাগল যে, আমার বুক ধড়-ফড় করতে লাগল,—আমি রাস্তায় বেরিয়ে এসে, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গিয়ে দেখ্‌লাম, একটা বাবু বিছানায় পড়ে ছটফট করে কাঁদচে আর কাৎরাচ্ছে। সমস্ত রাত ধরে'

পাখা করলাম, আর কাঁদলাম। সে বাবু আমাকে "মা" বলেছে। তার পরদিন গোবিন্দ যখন জান্‌লে যে, আমি বাবুর কাছে গিয়েছিলাম, তখন সে আমাকে খুব মারলে, আর বল্‌লে যে, তার হুকুম বিনা আমি কোথাও যেতে পারব না। এ কি জুলুম তার—আমি কি তার কেনা বাঁদী? সে কথা না শুনে, আমি তার পরদিন বিকেলে আবার গেলাম। তাই নিয়ে বাড়ী-ওয়ালার সঙ্গে আর গোবিন্দের সঙ্গে ঝগড়া থেকে মারামারি হয়ে গেল। শেষ-কালে রাত্রে গুণ্ডা লাগিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে এই শয়তান। বাবুজি, দোহাই তোমার, এই বদমায়েসের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর। আমি আমার ছেলের মুখ না দেখলে আর বাঁচব না।" রমণী আবার কাঁদিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "তাদের কোথায় নিয়ে গেছে?" "ও" কি আমাকে জান্‌তে দিয়েছে?" "তবে উপায়?" "বাবু, পুলিশে খবর দেও।" আমি চুপ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। অবশেষে বলিলাম, "তুমি ঘরে ফিরে যাও। আমি সব বন্দোবস্ত করচি।"

রমণী কহিল—"বাবুজি, দয়া করে আমার কথা ভুলে যেয়ো না। ভগবান তোমার ভাল করবেন।" আমি ধীরে-ধীরে সম্মুখের পথে আসিয়া, দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, সেই লোকটা তখনও রসে পাক দিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি জান না, এই হোটেল কোথায় উঠিয়া গেছে?" সে রুক্ষ স্বরে বলিল,—"দুনিয়ার সব খবর জানা কি আমার কাজ?" "বটে! গোবিন্দ তোমারই নাম?" "নাম-সে কেয়া হোগা বাবু?—নাম হামারা হাজারো হো সক্‌তা।" "আচ্ছা।" বলিয়া আমি ক্রুদ্ধভাবে তাহার দোকান হইতে চলিয়া আসিলাম। বেহারে থাকিয়া ছোটলোকের ঔদ্ধত্য সহ্য করা আমাদের অভ্যাস নাই। লোকটার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর রাগে সির্‌-সির্‌ করিতে লাগিল।

৫

৫নং দাদু হালদারের গলিতে পুলিশ ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র রায় বাস করিতেন। ইনি আমার সহপাঠী। তখন রাস্তায় আলো জ্বালিয়াছে এবং অবাক্ জলপান এবং কুলপি-বরফ একত্র চীৎকার করিয়া চলিয়াছে। আমি ৫নং দাদু হালদারের লেনের বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। ঢুকিতেই একজন কনেষ্টবল সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। "বাবু হ্যায়?" "হুজুর!" উপর হইতে নারায়ণ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে, এস এস, অনেক দিনের পর দেখা হলো!" বহুক্ষণ আনন্দের পর আমি কাজের কথা পাড়িতেই, বন্ধু উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। "বটে-বটে, বেটা ত পাকা বদমায়েস দেখ্‌চি।" টেবিলের উপর হইতে একটা চোঙা তুলিয়া লইয়া বন্ধু ডি-এল রায়ের চাণক্যের মত আলাপ আরম্ভ করিলেন। তাঁর কথাটা শুনা যায়, কিন্তু উত্তর শুনিবার উপায় নাই; কেবল মুখের ভাবের ব্যঞ্জনা বুঝিয়া একটা আন্দাজ করিয়া লইতে হয়। মোটের উপর বুঝিলাম যে, গোবিন্দকে পুলিশের নজরে রাখা হইবে, এবং স্ত্রীলোকটিকে তাহার হাত হইতে পুলিশ অবিলম্বে উদ্ধার করিবে। কিন্তু বীরসিংহের সংবাদের কি হইবে? নারায়ণ মুখটা একটু লম্বা করিয়া বলিল, "পুলিশের কাজে তাড়া-হুড়া দিবার উপায় নাই। Slow but sure." আমি দেখিলাম, মানুষ লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়া নারায়ণ একটু অতিরিক্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বীরসিংহের জন্য আমার চিত্তের যে ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল, তাহা সে কল্পনাতেও আনিতে পারে না। আমি বলিলাম, "কিন্তু তার যদি শীঘ্র কোন খোঁজ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে নিশ্চয় মরিয়া যাইবে।" "কত হাজার-হাজার লোক মরচে—তার কচ্ছি কি ভাই!" বলিয়া বন্ধু সট্‌কা টানিতে লাগিলেন।

আমি কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিয়া পড়িলাম; বলিলাম, "তবে এখন আসি—রাত হচ্ছে—যেমন-যেমন খবর পাও, আমাকে জানাইয়ো। এই ফ্যাসাদ থেকে উত্তীর্ণ না হলে, আর দার্জ্জিলিং যেতে পাচ্চিনে।" "বেশ।"

বাহিরে আসিয়া ধীরে-ধীরে গন্তব্য পথে চলিলাম। কিন্তু মনটা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনের একটা ক্ষমতার কথা আমি বড় বিশ্বাস করি। চক্ষের অগোচরে যাহা ঘটিতেছে, তাহার কিছু-কিছু যেন মন জানিতে পারে। সুদূর দেশে পুত্রের মৃত্যু ঘটিলে, অনেক সময়ে মায়ের মন তাহা কেমন করিয়া জানিতে পারে। আমার মনের এই চাঞ্চল্যের জন্য আমি একান্ত ভীত হইয়া পড়িলাম। মনে হইল, যদি এই মুহূর্ত্তে একটা উপায় না

করিতে পারি, তাহা হইলে হয় ত পাঁড়ের সহিত ইহজীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে না। আকাশ কাঁপাইয়া সাড়ে ন'টার তোপ পড়িয়া গেল। বাড়ী ফেরা উচিত মনে হইল। কিন্তু কে যেন জোর করিয়া বাধা দিতে লাগিল। সেটা কি উচিত হইবে?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িল,—বীরসিংহের সংবাদ হয় ত ডাক্তার ঘোষ জানিতে পারেন। একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে হয় না? ডাক্তার ঘোষের বাড়ীর অভিমুখে চলিলাম।

প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ী; বড় রাস্তার উপরে। উপরে-নীচে বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছে। দোতলা হইতে বাম-কণ্ঠের গীতধ্বনি শুনা যাইতেছে। রাস্তার অপর পারে ফুটপাথের উপর কয়েকজন সমজদার জুটিয়া জানালার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে—দেখিলে মনে হয়, তাহারা গীত ভক্ষণ করিয়া থাকে। এক-একবার গান থামিতেছে; কিন্তু বাজনা থামিতেছে না। বাদকের আঙুল চাবির উপর দিয়া ক্ষিপ্রভাবে নাচিয়া-নাচিয়া কন্‌-কন্‌ শব্দ তুলিতেছে। ঘরে কয়েকজন পুরুষ ও রমণী আছেন বলিয়া আন্দাজ করিলাম। নীচের ঘরে একটি বেঞ্চ পাতা। তাহাতে গিয়া বসিতেই, ভিতরের ঘরে একটা ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং আমার মাথার উপরে আলোটা ধপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আলোর নীচে একখানা বোর্ড—তাহাতে অনেক প্রকার নোটিশ দেখিতে পাইলাম। তাহার মধ্যে একটি বড় কড়া নোটিশ দেখিলাম; সেটি—রাত্রি দশটার পর ডাক্তার ঘোষ সহজে নীচে নামেন না; এবং যদি কেহ নামান, তাহা হইলে তাঁহাকে দশটাকা দিতে হয়। ঘড়িতে দেখিলাম, দশটা বাজিতে মাত্র তিন মিনিট। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় একজন বাবু আসিয়া বলিলেন, "আপনার কি প্রয়োজন?" "ডাক্তার ঘোষের সহিত দেখা করব।" "ব্যায়রাম কি গুরুতর?" আমি হাঁ-না করিয়া ঠিক উত্তর দিতে পারিলাম না। বাবুটি আমার প্রতি একটু সন্দেহের চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, "রাত্রে দেখা হবে না। সকালে ৮টার সময় আসবেন।" আমি আস্তে-আস্তে বাহিরে আসিতেছি, এমন সময় একটা দরওয়ান আসিয়া বলিল যে, বোস সাহেবের মেয়ের বড় দরদ উঠিয়াছে—ঘোষ সাহেবকে যাইতে হইবে। বাবুটি দেয়ালের গায়ে একটা কাটি টিপিয়া দিতেই, উপরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডাক্তার ঘোষ তাঁহার লিফ্‌টের মধ্যে চেয়ারে বসিয়া একটা কাগজ পড়িতে-পড়িতে নামিয়া আসিলেন। এদিকে মোটরও তৈরি। আমি নির্ব্বাক ভাবে ডাক্তার ঘোষের প্রতি করুণ নেত্রে চাহিয়া রহিলাম।

ডাক্তার ঘোষ নামিয়া বলিলেন, "আপনার কি চাই?" বাবুটি বলিলেন, "ওঁর বিশেষ কিছু নয়।" আমার মুখটা হয় ত ডাক্তার ঘোষের কাছে নিতান্ত অপরিচিত বলিয়া মনে হইল না; তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবু।" আমি বলিলাম, "একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?" একটু হাসিয়া ভ্রূ-দু'টা তুলিয়া ঘোষ বলিলেন, "কি?" "শিয়ালদার কাছে রয়েল হোটেলের সেই রুগী—যার কোড়াটা বসিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলেন—তার কোন সংবাদ পেয়েছেন?" "হাঁ—সে ভাল আছে—সে ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে জায়গা পেয়েছে।" বলিয়াই ডাক্তার ঘোষ গিয়া মোটরে চড়িয়া বসিলেন। আমি ধীরে-ধীরে কতকটা নিশ্চিন্ত মনে গৃহের দিকে ফিরিলাম। তখন সমস্ত শরীর ঘুমে অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। এতক্ষণ মনের উদ্বেগে এটা বুঝিতেই পারি নাই।

৬

ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে গিয়া দেখিলাম, বীরসিংহ পাঁড়ের শিয়রের দিকে একজন আধা-বয়সের রোগা-ধরণের লোক বসিয়া আছেন। চুলগুলি খুব বেশী পাকিয়াছে—গোঁফ একদম কালো। অনুমানে বুঝিলাম, ইনি অভয়রাম পাঁড়ে। বীরসিংহ আমাকে দেখিয়া, তাহার সাম্‌নের দুইটা উঁচু দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "দাদা এসেচেন।" পাশে একটা টুল ছিল, তাহাতে বসিলাম। "কবে এসেছেন আপনার দাদা?" "সেইদিনই সন্ধ্যার ট্রেণে। না হ'লে কি বিপদটা হ'তো! আপনি চলে যাবার পরই, মিঠাইওয়ালা এসে দাঙ্গা বাধিয়ে দিলে। শেষকালে ম্যানেজারের অসহ্য হয়ে পড়ল। সে চটে-মটে তার দুই গালে দুই চড় বসিয়ে দিলে। তার পর থেকে বেটা যেন ক্ষেপে গেল! নীচে থেকে শাসাতে লাগল, 'যদি ভাল চাও, শীঘ্র সরে পড়; নইলে

মেয়ে হাড়গুঁড়ো করে দেব।' ম্যানেজার লোকটা ভীতু, ভালমানুষ গোছের; সে ত তাই শুনে—টাকাকড়ি নিয়ে সেই আটটার ট্রেণে সরে পড়ল। তখন আমাদের বিপদ! লোকটার রাগটা সব চেয়ে বেশী ছিল আমার উপরেই। কারণ, তার বাড়ীর সেই বামুনের মেয়েটি আমাকে ছেলে বলেছিল। তাকে সে আস্‌তে দেবে না—সেও আস্‌বে। এই হ'লো ভিতরের কথা।" বীরসিংহ 'আহা!' বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল,—তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অভয়রাম চাদর দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "কি মিছামিছি কাঁদচিস্!" আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "দেখুন ত মশায়, কোথাকার কে মাগী—তার জন্যে সেই সেদিন থেকে কেঁদে-কেঁদে সারা হলো।" আমি বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

বিচিত্র পদ্ধতি ভালবাসার! কোথা হইতে কে আসিয়া পথের উপরে মিলিল—তাহার পর আর সে মিলন ভাঙ্গা শক্ত। আমি জানি, সেই রমণীটিরও হৃদয় কি বেদনায় পীড়িত হইতেছিল। পাঁড়ে বলিল, "আমার অসুখটা সারিয়া গেলেই, আমি তাঁর খোঁজ-খবর করিয়া, তাঁহাকে ঐ ব্যাটা পাষণ্ডের হাত থেকে উদ্ধার করিবই করিব।" কথাটা উড়াইয়া দিবার জন্য আমি বলিলাম—"ফোড়াটা কেমন?" "প্রায় সেরে গেছে। হাঁ—হাঁ, আপনি কি করে' আমাদের সন্ধান পেলেন?" "সে অনেক কথা—" বলিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম। বীরসিংহ উৎসুক নেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। আমি সেই রমণীটির কোন কথা আর বলা উচিত মনে করিলাম না। তাই প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলাম, "আপনাদের কি এখানে কেউ চেনা লোক ছিল?" অভয়রাম ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "আমার ছোট সম্বন্ধী এই স্কুলে পড়ে। তাই সেই বিষম বিপদের সময় চট্ করে আমরা সরে আস্‌তে পেরেছিলুম। নইলে সেই গুণ্ডা বেটা হয় ত বা রাতের মধ্যে আমাদের কেটেই রাখ্‌ত। চাকর-বাকর যে যেখানে ছিল, সব পালিয়ে গেল—রইলাম শুধু আমরা দুটিতে। রাস্তায় ভিড় জমে গেল। ভিড়ের মধ্যে দেখি আমার সম্বন্ধী। সে তখ্‌খুনি আমাদের নিয়ে এল।" বীরসিংহ বলিল, "কিন্তু আপনার ঠিকানা জানা ছিল না—তাই কোন খবর দেওয়া গেল না। মনে চলো, হয় ত আপনি কত খোঁজা-খুঁজি করবেন। কি করে জান্‌লেন?" "ডাক্তার ঘোষের কাছে।" "ঠিক্—ঠিক, এটা আর আমাদের মনে আস্‌ছিল না—এতো সহজ উপায় ছিল।" বীরসিংহ চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। ছোট ঘরখানির মধ্যে সকলেই এক সময়ে নিস্তব্ধ হওয়াতে, অনুভব করিলাম, যেন কোন একটি প্রসঙ্গ জোর করিয়া চাপা দেওয়াতে, সকলেরই কথার ভাণ্ডার একসঙ্গে নিঃশেষে ফুরাইয়া গিয়াছে। ঠিক সেই সময়ে সেই ব্রাহ্মণ-কন্যার কথা আমার মনে অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া জাগিতেছিল। বীরসিংহের সজল চক্ষু দেখিয়া সহজেই তাহার চিন্তার বিষয় অনুমান করা যায়। অভয়রাম একটু উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার ভ্রাতার ভাবগতিক লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, বীরুর চক্ষু দিয়া আবার বুঝি ধারা গড়াইয়া পড়ে। নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া বীরু আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, "কবে আমি উঠ্‌তে-হাঁট্‌তে পারব!" আমরা চুপ করিয়া রহিলাম। "ফোড়াটা গেছে,—কিন্তু ব্যথাটা যে যেতে চায় না।"—তাহার চক্ষে আবার যেন অশ্রুর জোয়ার উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অভয়রামের প্রতি চাহিয়া বলিলাম, "বড় গরম আজকে।" "বোধ হয় আজ বৃষ্টি হবে—দক্ষিণে মেঘ সঞ্চার হচ্ছে।" "বাঁচা যায় তা'হলে।"

অভয়রাম ধীরে-ধীরে বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইলেন। বীরু আমার একখানা হাত টানিয়া লইয়া আঙুলের নখ খুঁটিয়া দিতে লাগিল। "পণ্ডিত মশাই, এ কি বাঙ্গালী আপনার আবার জুটল? আপনার পাথরের মত শক্ত প্রাণ দেখ্‌চি চিড় খেয়েচে—তা দিয়ে রসের উৎস উছলে উঠবে বলেই ত মনে হয়।" পাঁড়ে উঁচু দু'টি দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। কি করুণ সে হাস্য! আমার মনে ধরা হইল। বলিলাম, "যদি তাকে খুঁজে দিতে পারি—তা'হলে কি বকশিস্ দেবেন?" "কেনা গোলাম হয়ে থাকব। আমার ছ-বছর বয়সে মা মারা গেছেন। মা যে কি জিনিস, তা জান্‌তুম না,—কিন্তু সে রাত্রে জেনেচি। যদি তাঁকে ঐ রাক্ষসটার কবল থেকে না উদ্ধার করতে পারি ত বিষ খেয়ে মরা উচিত আমার।" আমি হাসিতে লাগিলাম। বীরসিংহ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "সত্যি বলচি, হাসি-ঠাট্টা নয়। একটা কিনারা করতেই হবে।" অভয়রাম ঘরের ভিতর

আসিয়া বলিলেন, "আবার এক নূতন মুস্কিল! বিনোদ,—আমার সম্বন্ধী, বল্‌চে যে, তিন দিনের কড়ারে ঘরটা পাওয়া গিয়াছিল। সাহেব বল্‌চেন, কাল ঘর ছেড়ে দিতে হবে। —কোথায় যাই! চল বীরু, আমরা বাড়ী চলে যাই।" "নাঃ—সে হ'তেই পারে না।" "তোর বাপু অন্যায় জেদ!" আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ও চিরটা কাল এমনি একগুঁয়ে। পালিয়ে এসে কল্‌কাতায় নর্ম্মাল পাশ করলে। আমরা ত কিছুদিন ওর আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তার পর আজ সাত বছর বাড়ী যায়নি। বে থা করবে না।" বীরু চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিল—তাহার গাল দু'টা লাল হইয়া উঠিল।

আমি বলিলাম,—"চট্ করিয়া দেখে যাওয়াটা বোধ হয় ঠিক হবে না। দিনকয়েক আমার ওখানে থেকে—বেশ সেরে গেলে বাড়ী নিয়ে যাবেন।" অভয়রাম চুপ করিয়া রহিল। বীরু বলিল,—"আমার কোন আপত্তি নেই। দাদা না হয় বাড়ী যান।" অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সেই পরামর্শই স্থির হইল।

৭

পাঁড়েকে আমার শ্বশুরালয়ে আনিলাম। অভয়রাম বাড়ী চলিয়া গেলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু উপায় কি? যাইবার সময় ভাইটিকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া বাড়ী যাইতে বলিয়া গেলেন। বীরু কিছুতেই কথা দিল না; বলিল 'চেষ্টা করিব।' তাহার হাতে ভগবান সম্প্রতি যে কর্ত্তব্যের পতাকা দিয়াছেন—তাহা বহন করিবার শক্তির যেন কিঞ্চিৎ অভাব ছিল। সে উঠিতে-হাঁটিতে পারিত; কিন্তু বাড়ীর বাহির হইত না। হাড়ের মজ্জার ভিতর ব্যথাটা ছিল। কিন্তু তাহার হৃদয়ের নিভৃততম স্থলে যে বেদনাটি ছিল, সেইটিই তাহাকে বেশী কাতর করিয়াছিল। আমি একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলাম না। গোবিন্দ হালওয়াই-এর হাত হইতে সেই রমণীটিকে যাহাতে উদ্ধার করা যায়, পুলিশ সে চেষ্টা করিতেছিল।

গোবিন্দকে কোন সময়েই ঘরে পাওয়া যাইত না। দুয়ারে তালা দিয়া সে কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। কেহ-কেহ বলে যে, অনেক রাত্রে গোবিন্দ আসে এবং শেষ রাত্রে চলিয়া যায়। আসল কথা, গোবিন্দ কলিকাতায় আসিয়া কিছু সঙ্গতি করিয়াছিল। তাহারই বলে সে পুলিশের চক্ষে ধূলা দিতেছিল। কিন্তু এ কথা আমার বন্ধু বিশ্বাস করিতেন না; তিনি বলিতেন যে, পুলিশের বদনাম সর্ব্বৈব মিথ্যা—লোকে বদমায়েসি করিবে, আর পুলিশের ঘাড়ে দোষ চাপাইবে। শাসন করা যাহার কাজ, সে লোকের কাছে সুখ্যাতি পায় না; নিন্দাই তাহার প্রাপ্য বক্‌শিস।

সেদিন রাত্রে ঘরের ভিতর অত্যন্ত গুমট ছিল; তাই ছাদের উপরে একখানা মাদুর পাতিয়া শুইয়াছিলাম। ঊর্দ্ধে ত্রয়োদশীর চাঁদ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। দু' একটা পেঁজা-তুলার মত মেঘ দক্ষিণ দিক হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল।

গৃহিণী পাশে বসিয়া ছেলে-মেয়েদের জামা-কাপড়ের ফর্দ্দ আবৃত্তি করিতেছিলেন। উপরে কাবা এবং নিম্নে সংসার,—তাহার মধ্যে আমার মন পৌরীর মত 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় ছিল। গোক্ষুরা সাপের ফণার মত সে একবার ফর্দ্দের দিকে চলিতেছিল; আবার পরক্ষণে সাদা মেঘের পিঠে গিয়া চড়িয়া বসিতেছিল।

এমন সময়ে আপিস-ঘরে টেলিফোন ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে আমার ছোট শালী আসিয়া সংবাদ দিল "জামাই বাবু, তোমায় কলে ডাক্‌চে—দাদা বল্লে।" গৃহিণী বিরক্ত হইলেন—"পোড়া লোকের আর কামাই নেই—কি ছাই এত কথা আছে জানিও নে।" কলে কাণ দিতেই শুনিলাম, বন্ধু নারায়ণচন্দ্র স্বয়ং বক্তা। "কি হে?" "একবার শীঘ্র আস্‌তে হচ্চে।" "তুমি কোথায়?" "থানায়।" "এত রাত্রে?" "থানায় আস্‌তে হবে না—সোজাসুজি হাওড়া ষ্টেশনে এস—সেই বেটা আজ পঞ্জাব মেলে সরে পড়চে।" "তার পর?" "তাকে চিনিয়ে দিতে হবে—আইডেন্‌টিফাই করতে হবে।" "আচ্ছা, তুমি পুলের মাথায় থেক।" "বেশ—বেশ—চট-পট—সময় বেশী নেই।" বীরসিংহকে লইয়া একখানা গাড়ীতে মিনিট-দশেকের মধ্যেই রওনা হইয়া পড়িলাম। গাড়ীতে অন্ধকারের মধ্যে পাঁড়ের চক্ষু দু'টা যেন উত্তেজনায় জ্বলিতেছিল। হেলান দিয়া, এদিকে ফিরিয়া, ওদিকে ফিরিয়া কিছুতেই যেন সে স্বস্তি পায় না! গাড়ী-খানা হাওড়ার পুলের মাথায় আসিয়া দাঁড়াইতেই, আমি ডাকিলাম "নারাণ!"—একজন পুলিশ আসিয়া দীর্ঘ সেলাম দিয়া দাঁড়াইল। "বাবু?" "রাটকরমে!" "আচ্ছা, চল হামারা সাথ।" গাড়ী গিয়া গাড়ী-বারান্দায় থামিল। আমরা

চটপট নামিয়া পড়িয়া তাহাকে বিদায় করিলাম। পঞ্জাব মেলে সিমলা-যাত্রী সাহেব-মেমের অতিরিক্ত ভিড়। দিগ্‌গজ বড় কেরাণী-বাবুরাও আপিস তুলিয়া পাহাড়ে চলিয়াছেন। সঙ্গে আণ্ডা বাচ্চার দল এবং পিছনে পুঁটলি-রূপিণী গৃহিণী হংস-গমনে চলিয়াছেন। প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক-মাথায় কুলি তাগিদ দিতেছে, "মাইজি, জলদি চলিয়ে—টেইন ছুট্ যাগা।". কিন্তু তখনো ট্রেণ ছাড়িতে আধ ঘণ্টা দেরী।

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই দেখিলাম, লম্বা দাড়ি, মাথায় টক্‌টকে লাল ফেজ—একজন মৌলবি সাহেব আমার দিকে বেগে ধাবিত হইতেছেন। আমার হাত দুখানা ধরিয়া বলিলেন, "বাবুসাব, আপ্‌ভি যাতেহেঁ?" আমি লোকটাকে এ জীবনে দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। একটু থত-মত খাইয়া বলিলাম, "নেহি—হামারা এক দোস্ত যারেঙ্গে—আপকা—হাম—"

লোকটা খুব্ ছিট্‌কাইয়া বলিল—"তাজ্জব—তাজ্জব—" তাহার চিনা জামার পকেট হইতে একখানা কার্ড বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিল, "আব্?" আমি উৎকট বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিলাম,—"তুমি!" দুই বন্ধুতে খানিকটা হাসা গেল। পাঁড়ের প্রতি বক্র দৃষ্টি করিয়া নারায়ণ বলিল, "এ লোকটা কে হে—তোমাকে ছায়ার মত অনুসরণ কচ্ছে?" "ওরি কথা ত তোমাকে বলেচি—বীরসিংহ পাঁড়ে।" "বটে? লোকটা ভারি কাহিল,—কি হয়েছিল ওর? খাইসিস্?" "নাঃ!" গাড়ীর সম্মুখে আমরা পায়চারি করিতে লাগিলাম। মধ্যে-মধ্যে এক-একটা লোক আসিয়া সংবাদ দিয়া যাইতে লাগিল। ট্রেণ ছাড়িবার দশ মিনিট আগে সংবাদ পাওয়া গেল যে, গোবিন্দ একটা গাড়ীর মধ্যে উঠিয়াছে; এবং সঙ্গে সেই স্ত্রীলোকটিও আছে। নারায়ণ আমাকে বলিল, "চল, এইবার তুমি চিনিয়ে দিবে—তাহা হইলে আমি তাহাকে এরেষ্টের অর্ডার দিব।"

চিহ্নিত গাড়ীর কাছে গিয়া আমি কোন লোককেই চিনিতে পারিলাম না। গাড়ীতে ছোট-লোকের ভীষণ ভিড়। আমি বলিলাম—পাঁড়ে ভিতরে গিয়া যাত্রীর মত বসিবার স্থান করিয়া চিনুক—নইলে ভুল হ'তে পারে। পাঁড়েকে গাড়ীর ভিতর পুরিয়া দিয়া আমরা দূরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রথম ঘণ্টা পড়িয়া গেল—লোকের ঠেলা-ঠেলি অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। হঠাৎ সেই গাড়ীখানার ভিতর হইতে একটা গোলমাল উঠিল। সব লোক সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। আমরা গিয়া দেখিলাম, পাঁড়ে একটী রমণীর কোলের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে এবং রমণীটি উচ্চ ক্রন্দন করিয়া বলিতেছে—"হা ভগবান, দিয়ে কেড়ে নিলে?" আমি পরিষ্কার চিনিতে পারিলাম—সেই রমণীই ব্রাহ্মণ-কন্যা। নারায়ণের কাণে-কাণে বলিলাম—"আর ভুল নেই—এই সে।" "কিন্তু সে-বেটা?" ঠিক এই সময় পিছনের কপাট খুলিয়া একটা লোক লাফাইয়া নীচে লাইনের উপর পড়িল—আর গাড়ীশুদ্ধ লোক চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওহি ভাগা—ওহি ভাগা—শালা জবর চোর হায়।" আমি দেখিলাম, গোবিন্দ তখন লাইন হইতে অন্য একটা প্ল্যাটফরমে চড়িতেছে। তখনো তাহার পিছনে কেহ ছুটে নাই। ঠিক সেই সময়ে একখানা ট্রেণ আসিয়া পড়িল এবং গোবিন্দ ভিড়ে মিশিয়া গেল। পুলিশ যথেষ্ট ক্ষুণ্ন হইল। শিকারিরা জানেন, হাতের কাছে আসিয়া শিকার পলাইলে, আপসোসটা কত-খানি মর্ম্মভেদী হয়। মৌলবি সাহেব কিন্তু দমিবার পাত্র নহেন,—বলিলেন, "বেটা যাবে কোথায়? একদিন-না একদিন আমাদের হাতে পড়তেই হবে তাকে।" আমি কিন্তু মনে-মনে খুসীই হইলাম। পাঁড়েকে ধরা-ধরি করিয়া প্ল্যাটফরমে নামাইয়া গোবিন্দের জিনিসপত্র নামাইতেই ট্রেণ ছাড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ-কন্যা পাঁড়ের মাথায় জল দিয়া কিছুক্ষণ বাতাস করিতেই তাহার জ্ঞান হইল। চোখ চাহিবার পূর্ব্বে পাঁড়ে গভীর যন্ত্রণায় বার-দুই 'মা মা' করিয়া ডাকাতেই, রমণী ব্যাকুল হইয়া তাহার মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "এই যে আমি,—বাবা, তোমার আর কোন ভয় নেই।" পাঁড়ে ধীরে-ধীরে চোখ চাহিল;—চোখের দুই কোণ বাহিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে। সে আনন্দ-দৃশ্য দেখিয়া দর্শকবৃন্দের সর্ব্বশরীর হর্ষ-পুলকিত হইয়া উঠিল। নারায়ণ বলিল, "চল, বাড়ী যাই—সমস্ত রাত কি এখানে কাটাবে?—রহিম, ওকে থানায় রাখ্‌গে।" রমণী আস্তে-আস্তে পাঁড়ের মাথা প্ল্যাটফরমে রাখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কি অপরাধ আমি করেছি যে, আমাকে জেলে দিতে যাচ্ছ, মহারাজ?" তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল—আহুতিঃ পাইয়া হোমাগ্নি-শিখার মত। নারায়ণ আমার কাণে-কাণে বলিল, "উঃ! মাগীর ভীষণ তেজ,—

বাবুদের মেয়ে—হাজার হ'ক।" আমি হাস্য করিলাম। পাঁড়ে আমার দিকে চাহিয়া অনুচ্চ স্বরে বলিল, "আমাকেও তা'হলে থানায় পাঠিয়ে দিন।" নারায়ণ, খুব সাদা-মাটা লোক, সে সেণ্টিমেণ্টের ধার ধারে না;—বলিল, "আপনার হাসপাতালে গেলে হয় না?" "এতদিন সেখানেই ছিলুম।" "বটে? সম্প্রতি কোথায় থাকা হচ্চে?" পাঁড়ে চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম—"আমার কাছে।" "তবে ত সব গোল মিটে গেছে—তুমিই নিয়ে যাও দু'জনকে।" "বেশ।" "গুডনাইট চাই।" বন্ধু প্রস্থান করিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া একটু ঝিমাইবার সাধ হইল; কিন্তু অন্তর উৎকণ্ঠার নিদ্রা-দেবীর শুভাগমন হইল না। স্তব্ধ ভাবে তিন জনে গাড়ীর মধ্যে বসিয়া রহিলাম। গ্যাসের আলো পাঁড়ের মার মুখের উপর পড়াতে তাহা দেখিবার অবসর ঘটিতেছিল। তপ্ত কাঞ্চনের মত রং, তাহাতে কালো-কালো বড়-বড় দুইটি চক্ষু—তাহার উপর যেন জগতের সমস্ত প্রশান্তি আসিয়া নিবিড় হইয়া আছে। খাওয়া-দাওয়া করিয়া শুইতে অনেক রাত্রি হইল। নিদ্রার পূর্ব্বে স্ত্রীর সহিত নিম্নলিখিত ভাবে কথোপকথন হইল। "দার্জ্জিলিং কবে যাবে?" "শীগ্‌গিরই।" "আর যাবার দরকার হবে কি?" "কেন?" প্রেয়সী পাশ ফিরিয়া শুইয়া নিদ্রার ভান করিলেন। মনে-মনে স্ত্রীজাতির উপর গালিবর্ষণ করিতে-করিতে নিদ্রাকৃষ্ট হইলাম। প্রাতে উঠিয়া পাঁড়ে ও তাহার মাকে—অজিরপুরে রওনা করিয়া দিলাম। স্ত্রী আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আজ আর দার্জ্জিলিং যেয়ো না—রমেশ আসচে। পরশু যেয়ো। মাথা খাও।" রমেশ আমার ছোট ভাই! হুকুম তামিল করিয়া অবশেষে কিছুদিনের জন্য বিদেশ যাত্রা করিলাম।

* * * *

অজিরপুরে ফিরিয়া আসিয়া যাহা শুনিলাম, তাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা যায় না। অগত্যা সন্ধ্যার প্রাক্কালে পাঁড়ের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। এক বাড়ী লোক ফিস্‌ফিস্ করিতেছে। ঘোর-গোড়ায় রসুন-চৌকি! সাহানার কোমল সুর যেন বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া দম বন্ধ করিয়া দেয় আর কি! ব্যাপার কি হে? পাঁড়ে উঁচু দাঁত দুটি বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "মার অনুরোধ এড়াতে পারলাম না।" তার শুক্‌নো গাল-দুটি লজ্জায় লাল টক্‌টকে হয়ে উঠেছিল। "তবু?" "আজ ফুলশয্যা!" "বটে? কই, মা কোথায়?" ভিতর হইতে ডাক পড়িল। এক থাল সন্দেশের পাশে একটী ছোট্ট কনে'—মেড় হাত লম্বা ঘোমটা! ছোট্ট-খাট্ট, মেয়েটি—পরমা সুন্দরী। সন্দেশ খাইতে-খাইতে বলিলাম, "মা, আপনি অসম্ভব সম্ভব করলেন,—এ যে দেখচি শুক্‌নো ডালকে ফুল ফুট্‌ল!"

পিথৌরা কিল্লা

[শ্রীনিখিলনাথ রায় বি-এল]

ভারতের শেষ স্বাধীন হিন্দু নরপতি, চৌহানকুলতিলক পৃথ্বীরাজ অনেক দিন হইল এ জগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তি-কথা আজিও উত্তর-ভারতবর্ষে লোক-মুখে গীত হইতেছে। তাঁহার গৌরবে কত পুস্তক অলঙ্কৃত হইয়া আছে। কিন্তু তাঁহার সে কীর্ত্তি বা গৌরবের নিদর্শন কোথায়? সামান্য দুই-চারিখানি প্রস্তরখণ্ড ভিন্ন তাঁহার গৌরবের কোনই চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। পিথৌরা কিল্লা সেই সকল প্রস্তরখণ্ড লইয়া আজিও তাঁহার নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে, এবং তাহাই তাঁহার গৌরবের একমাত্র নিদর্শন। এক্ষণে যাহাকে পুরান দিল্লী বলে, পিথৌরা কিল্লা বা কিল্লা রায় পিথৌরা তথায় অবস্থিত। মুসলমান বিজয়ের পর হইতে এই পিথৌরা কিল্লাকে পুরান দিল্লী বলিত। পরে কিল্লা সিরি ও জাহানপানা প্রভৃতি তাহার সহিত যুক্ত হইয়া পুরান দিল্লীর আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছে। আমরা এক্ষণে যাহাকে পিথৌরা কিল্লা বলিতেছি, তাহার মধ্যে প্রাচীন দুর্গ ও নগর অবস্থিত ছিল। পৃথ্বীরাজের দুর্গ চতুর্দ্দিকে প্রায় ক্রোশব্যাপী প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্রাকার ৪০ হস্ত উচ্চ ও প্রস্থে ২০ হস্ত হইবে। প্রাকারের নিম্নস্থ পরিখা প্রস্থে ১২ হইতে প্রায় ২৪ হস্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার উত্তর দিকের ফতে বুরুজ ও সোহান বুরুজ

তোরণদ্বয় তাহাদের ভীষণ গঠনের পরিচয় দিয়া থাকে। পশ্চিম পার্শ্বে রণথিৎ বা গজনী তোরণও তাহাই জানাইয়া দিতেছে। এই গজনী তোরণের সম্মুখস্থ এক ইদ্‌গায় তৈমুরলঙ্গ দিল্লী আক্রমণের পূর্ব্বে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। দুর্গের পূর্ব্ব পার্শ্বের প্রাচীর সম্ভবতঃ কুতুবউদ্দীন ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহার মস্‌জীদে গমনাগমনের সুবিধা করিয়াছিলেন। সোহান বুরুজ হইতে আদম খাঁর সমাধি পর্য্যন্ত স্থানে আজিও তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথ্বীরাজের সময়ে দিল্লীনগরীর পশ্চিম পার্শ্বেই এই দুর্গ অবস্থিত ছিল। অনঙ্গপালের সময় কোনও দুর্গ ছিল কি না বুঝা যায় না। পৃথ্বীরাজের দুর্গের পূর্ব্বপার্শ্বে বিস্তৃত একটি প্রাকারকে কনিংহাম প্রভৃতি অনঙ্গপালের লালকোট বা তাঁহার দুর্গ-প্রাচীর বলিয়াছেন; কিন্তু তাহা আলাউদ্দীন্ খিল্‌জীর সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া স্থির হয়। টীফেন বলেন যে, অনঙ্গপালের লালকোট রক্ত-প্রস্তর নির্ম্মিত কোন প্রাসাদ হইবে, চৌহানেরা তাহার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহাদের সময়ে উহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াও থাকিবে। যেখানে অনঙ্গপালের কীলক ঢিল হইয়াছিল, তথায় পৃথ্বীরাজের প্রাসাদ ছিল বলিয়া চাঁদ কবি উল্লেখ করিয়াছেন,—

"ধুরি ঘুস্সিয় এংব নিদান ঘুরং।
পুরহৈ প্রথিরাজ কি ইংদ্র পুরং॥
প্রথমং দিল্লিয়ং কিল্লিয়ং কহনং।
গ্রহ পৌরি প্রসাদথনা সতনং॥

(পৃথ্বীরাজ রাসো)

তাঁহার গ্রন্থে অনেক স্থলে পৃথ্বীরাজের সময় দিল্লী দুর্গেরও উল্লেখ দেখা যায়। অনঙ্গপালের দিল্লী-পুনরুদ্ধার চেষ্টার সময়, জয়চন্দ্রের সৈন্যগণের দিল্লী আক্রমণ কালে, এবং পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রেণু সিংহের হস্ত হইতে মুসলমানগণের দিল্লী অধিকারের সময় 'পৃথ্বীরাজ রাসো' গ্রন্থে দিল্লী দুর্গের উল্লেখ আছে। রেণু সিংহের সহিত যুদ্ধে দুর্গের পশ্চিম দ্বার ভঙ্গ করিয়া মুসলমানগণের দুর্গ প্রবেশের কথাও দেখিতে পাওয়া যায়। *

* "অনংগ পাল বলবাড়ি। গুরুর চিল্লী গঢ় লগ্গয়া।"

(অনঙ্গপাল সময়)

কোন্ সময়ে পিথৌরা কিল্লা নির্ম্মিত হয়, তাহা স্থির করা কঠিন। সৈয়দ্ আহম্মদ খাঁ বলেন যে, উহা ১১৪৩ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। কনিংহাম ১১৮০ হইতে ১১৮৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উহার সময় নির্দ্দেশ করেন। চাঁদকবি ১১৩৮ অনঙ্গ সংবৎ বা ১১৭২—১১৭৩ খৃঃ অব্দে পৃথ্বীরাজের দিল্লী প্রাপ্তির কথার উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ উহার পর ১১৮৫—১১৮৬ খৃঃ অব্দের মধ্যে ইহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

মুসলমান বিজয়ের পর কুতুব-উদ্দীন্ হইতে বলবন্ পর্য্যন্ত এইখানেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন্ খিলজীর সময় মোগলেরা দিল্লী আক্রমণে অগ্রসর হইলে নগরবাসীরা দুর্গ ও নগর-প্রাকারের দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। আলাউদ্দীন্ প্রাচীরের সংস্কার-সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে পৃথ্বীরাজের দুর্গ-প্রাচীর সোহান্ বুরুজ হইতে পূর্ব্বদিকে বাড়াইয়া নগরের দক্ষিণ প্রাচীরে সংলগ্ন করার ব্যবস্থা করা হয়। পুরাতন দুর্গের প্রাচীর লইয়া ইহা চারি দিকে প্রায় দেড় ক্রোশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইয়া উঠে। কুতুব মস্‌জীদ, কুতুব মিনার প্রভৃতি এই বিস্তৃত প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত হয়। আমীর খসরু বলেন যে, মোবারক খিলজী ১৩১৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার পিতা আলাউদ্দীন্ খিলজীর অসম্পূর্ণ দুর্গ ও নগর-প্রাকার সম্পূর্ণ করার জন্য আদেশ দেন। ইবন বাটুটা যখন ১৩৩৩ খৃঃ অব্দে দিল্লীতে উপস্থিত হন, তখন তিনি তাঁহার প্রাচীরের উপরিভাগ ইষ্টক ও নিম্নভাগ প্রস্তর-নির্ম্মিত দেখিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, নিম্নভাগ পৃথ্বীরাজের সময়ের চিহ্ন, এবং উপরিভাগ মুসলমান রাজত্ব সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুরান দিল্লীর নগর-প্রাচীর কুতুব বুরুজ হইতে পূর্ব্বদিকে ও দক্ষিণ দিকে প্রায় দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বর্দ্ধিত দুর্গ-প্রাকারের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে গিয়া মিশিয়াছে। পৃথ্বীরাজের পুরাতন দুর্গ লইয়া সমস্ত নগর-প্রাচীর প্রায় আড়াই ক্রোশ

"সরল সরল চিত্ত বিষাদ থাবহি, কহৈ রাজ চিল্লী গঢ় চাবহি।"

(সামন্ত পঞ্চ যুদ্ধ)

"চিল্লী গঢ় গহুচো রহৈং। তৌ হম জুঝৈং সার।
গঢ় ঘেরুচো চিহ্ন কোর। এথৈ জমুনের দুবোরৈ।
যিদি পঞ্জিয় সুলতান। বান দুঁথা হবি দুচির।
পর কোট ভরি পাথান উড়ি। নর সমেট বড় উড়ি চলির।"

(রাজা বরবসী—প্রস্তাব)

হইবে। ইহাতে ১০ খানি তোরণ ছিল বলিয়া জানা যায়। তন্মধ্যে রণথিং বা গজনী ও বদাউন তোরণের অবস্থান স্থির হইয়া থাকে। বড়কা ও ছাউলরাণী তোরণের অবস্থান কোনরূপে নির্ণয় করিতে পারা যায়, কিন্তু মৌজী, বস্বর খান, হাউজ খাস এবং বাগ্‌দাদ প্রভৃতি তোরণের অবস্থান অনুমান করিয়া লইতে হয়। ইবন্ বাটুটা বদাউন্ তোরণকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এইখানে আলাউদ্দীন্ খিলজী বিজিত যোগলগণের মস্তক লইয়া দুইবার বিজয়স্তম্ভ উত্তোলন করিয়াছিলেন, এবং রাজকীয় সুরায় তাহার ভূমি বর্ষাকালের ন্যায় কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বাগ্‌দাদ তোরণে সুলতান ইব্রাহিম লোদী গোয়ালিয়র হইতে আনীত একটি পিত্তল-নির্ম্মিত বৃষ স্থাপন করিয়াছিলেন। পিথৌরা কিল্লা ও পুরান দিল্লীতে যে সমস্ত ঐতিহাসিক স্থান আছে, আমরা ক্রমে তাহাদের পরিচয় দিব।

মহাদেব

[শ্রীনীহারবালা দেবী]

১

মাঘ মাস, সন্ধ্যা সমাগত। পশ্চিম-আকাশে উজ্জ্বলিত লোহিত তরঙ্গরাশির উর্দ্ধে সমুজ্জ্বল একটীমাত্র নক্ষত্র ঝলমল করিতেছে, আর পূর্ব্বাকাশে নির্দ্দোষ, স্নিগ্ধ নীলিমায় ত্রয়োদশীর চন্দ্র। শীতের ঘন কুয়াসা-জড়িত জ্যোৎস্না নির্জ্জন নদীতটে বিছাইয়া পড়িয়াছে। নদীর তীরে নিবিড় কাশবনে উথলিত দুধের ঢেউ। তীরে একটা ভাঙ্গিয়া-পড়া বৃক্ষকাণ্ডে উপবিষ্ট একজন পথশ্রান্ত, সুকুমার, তরুণ যুবক। বোধ হয় নদীর শীতল বায়ুতে সে ক্লান্তি দূর করিতেছিল। সেই সময় একজন ব্রাহ্মণ একটা সুবৃহৎ পিত্তলের কলসী হাতে করিয়া আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইবা-মাত্র পথিকের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দৃষ্টিপাতমাত্র অত্যন্ত বিস্ময়ে একটু চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "এ কি, মহাদেব তুমি কখন্ এলে?" পথিক সচকিতে উঠিয়া নমস্কার করিল। অত্যন্ত ক্লান্তিজনিত শুষ্ক মুখে একটু হাসিয়া বলিল, "এই প্রায় আধঘণ্টা। তা ঠাকুর, চিন্‌তে তো পেরেছেন।" "হাঁ, আন্দাজে-আন্দাজে চিন্‌লাম,—একেবারে ঠিক চিন্‌তে পারিনি। তা' তুমি বাড়ী যাওনি কেন?" নতমুখে কি একটু চিন্তা করিয়া মহাদেব একটু মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তাই তো ভাবছি ঠাকুর, বাড়ী যাবো,—কেউ কিছু ব'ল্‌বেন না তো?" ঠাকুর বলিল, "তবে কোথায় আর যাবে!" মহাদেব অত্যন্ত অন্যমনে ধীরে-ধীরে বলিল, "তবে বাড়ীই যাই।" বাড়ীর কাহারো কিছু বলিবার সম্ভাবনা আছে কি না, সম্ভবতঃ ঠাকুরের তাহা জানা ছিল না; ঠাকুর কলসীটি জলপূর্ণ করিয়া বলিল, "তবে এসো।" মহাদেব উঠিয়া ঠাকুরের অনুসরণ করিল।

বাড়ীতে পৌঁছিলে, তাহাদের দেখিয়া একটী বালিকা নিতান্ত কৌতুকভরে ক্ষণেক চাহিয়া, অপরিচিতকে চিনিবার চেষ্টা করিল; তার পর কলকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, "বড়মা, শীগ্‌গীর এসো, দেখে যাও কে এসেছে।" দ্বিতলের উপর হইতে বড়মা বলিলেন, "জিজ্ঞেস কর, কে এসেছে?" ঠাকুর বলিল, "ধুকুমণি, বল মহাদেব এসেছে।" বড়মা নামিয়া আসিলেন; সস্নেহে একটু হাসিয়া প্রণত মহাদেবকে বলিলেন, "কত বড় হ'য়ে গেচিস্ যে!"

যখন এই বাড়ীতে মহাদেব প্রথম আসে, তখন এই বড়মা করুণা নয় বৎসরের বালিকা বধূ; সেই সময় মহাদেব সাত বৎসরের বালক। সে তাহার বিমাতার সহিত এই বাড়ীতে আসে। তখন মহাদেব করুণার পরম বন্ধু ছিল। করুণার সর্ব্বকনিষ্ঠ দেবর বিকাশ তখন নিতান্ত শিশু। শাশুড়ী কম্মা হওয়ায় করুণাই শিশুটির সমস্ত কাজ করিত। মহাদেব আসাতে সে সেই ভার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিয়াছিল। মহাদেব স্কুলে ও বাড়ীতে ছেলেদের নিকট লেখাপড়া শিখিত ও বিকাশকে খেলা দিত। ক্রমে বড় হইলে বিমাতার সহিত তাহার মনান্তর হয়। তখন সে বিমাতার পেঁটরা হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়া প্রস্থান করে।

বিমাতার দেওয়া যন্ত্রণাও তাহার অপরিসীম ছিল। আবাল্য এই যন্ত্রণার কষ্ট ভোগ করিয়াও মুখ ফুটিয়া কিছু বলে নাই, বা কাঁদিয়া পরাজয় মানে নাই। তার কারণ, এক-একজন মানুষের প্রকৃতি হাতঘড়ি থাকে,—রোদন জিনিসটা তাহাদের নিকট নিদারুণ লজ্জাজনক, অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার। তুষার-স্তূপের মত বুক ব্যাপিয়া থাকিলেও, তাহা গলাইবার মত বাষ্প তাহাদের অন্তরে থাকে না, হাসি হইয়াই সব বাহির হইয়া যায়। মহাদেবের অন্তর চিরদিনই তেমনি ছিল।

বিমাতার মিত্র-পক্ষদিগের কপোল-কল্পিতই হউক, অথবা আংশিক সত্যই হউক, তখন মহাদেবের অনেক রকম দুর্নামও শুনা যাইত, যাহা অত্যন্ত হীন, ও ঘৃণিত। তার পর সে সুদূর বর্ম্মায় চাকরী করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহার তৃতীয়াংশ প্রতি মাসেই বিমাতাকে মণি-অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে। সেই সময় একবার এই বাড়ীতে আসিয়া সে দুশ্চরিত্রতার অপবাদে বিতাড়িত হইয়াছিল; এবং সেই জন্যই প্রথমতঃ গৃহ-প্রবেশে সে ভীত হইতেছিল। তথাপি সে প্রাণ ভরিয়া জানে, এই বাড়ীই তার বাড়ী। প্রবাস ত্যাগ করিয়া, দ্বারে দাঁড়াইয়া সে যখন নিরতিশয় তৃপ্তির সহিত বলিয়াছিল, "আঃ, বাড়ী চললাম।" তখন বাড়ীর কর্ত্তা দক্ষিণাবাবুর রুক্ষ মূর্ত্তি ও কঠোর স্বভাব কিছুই তাহার মনে পড়ে নাই।

এখন এ বাড়ীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। গৃহিণী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তৎপরিবর্ত্তে মহাদেব যাহাকে বালিকা বধূ দেখিয়াছে, সেই বধূ এখন গৃহিণী। করুণার ছোট দেবর-ননদগুলি এখন কত বড় বড় হইয়াছে। মধ্যম দেবর ললিতের সন্তানও হইয়াছে। ললিতের স্ত্রী শুভা ও মৃতা ননদের মাতৃহীনা কন্যা মলিনা—মহাদেবের সম্পূর্ণ অপরিচিত। চিরপরিচিত বাড়ীকে যেন নিতান্ত নূতন মনে করিয়া সে কুণ্ঠিতভাবে বাহিরে-বাহিরে রহিল।

প্রভাতে নবোদিত রশ্মিজালে উজ্জ্বল সুমিষ্ট রৌদ্র বাড়ীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। স্নানান্তে করুণা অনেকগুলি ক্ষুধিত শিশুর কলরোলের মধ্যে অতি ব্যস্ততার দ্রুত হস্তে তাঁড়ার ঘরের কাজ সারিতেছিল। দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া মহাদেব ডাকিল, "দিদি।" দ্বারের মুখ তুলিয়া করুণা বলিল, "কেন বাবা, আয়।" অতি তরুণ বয়সে করুণাকে সংসারের সকল ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সে বয়সে তাহাকে একেবারেই পরিপূর্ণা মাতা হইতে হইয়াছিল। সে কেহ যাহা বলিয়া সম্বোধন করুক, প্রথমটা সে "বাবা" বলিয়াই উত্তর দিত। চরুণ শিশুর দলকে আহার দিয়া শান্ত করিয়া করুণা হাসি মুখে বলিল, "হাঁ, কি বল্‌ছিলি বাবা?" মহাদেব জানিত, এ বাড়ীতে তাহার পূর্ব্ব অপবাদের জন্য অনেকেই তাহাকে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করে। তাই অপ্রতিভ ভাবে নতমুখে মৃদুস্বরে বলিল, "না, এমনিই।" করুণা সস্নেহে বলিল, "ওঃ বোকাছেলে, তোর ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি?" মহাদেবের উত্তর অগ্রাহ্য করিয়া কক্ষান্তরস্থিতা ছোট বোন শুভাকে লক্ষ্য করিয়া করুণা বলিল, "শুভামণি, মলিনার হাতে কিছু খাবার পাঠিয়ে দে তো, এটাকে দিয়ে যাক্।" মলিনার হাত হইতে খাবার লইয়া মহাদেবকে দিতে না দিতেই সেজবাবু সুরেশের জরুরি আহ্বানে করুণা দ্রুত প্রস্থান করিল। প্রাতেই আহারের জন্য মহাদেব আসে নাই। আহার্য্য তাহাকে লোকের নিকট হইতে অনেক ঘর-কসাকসি, অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াই সংগ্রহ করিতে হয়। কেহ যে না চাহিতেই খাবার দিতে পারে, এতটা উদারতা তাহার অজ্ঞাত ছিল। সে প্রাপ্ত আহার্য্যগুলি নিঃশেষ করিয়া প্রস্থান করিল।

শীতের দ্বিপ্রহরের সংক্ষিপ্ত সময়টুকু মুক্ত জানালার সুমিষ্ট রৌদ্রটুকু উপভোগ করিতে করিতে করুণা ও শুভা, শুভার ছোট শিশুটীর জন্য জামা সেলাই করিতেছিল। মহাদেবের আহ্বানে হাতের কাজ স্থগিত রাখিয়া করুণা বলিল, "ঘরে আয়।" কক্ষে প্রবেশ করিয়া মহাদেব বলিল, "কি ক'রছেন আপনি?" "দেখ্‌তেই পাচ্ছ, খোকার ফ্রক ক'টা সার্‌ছি।" শুভা কর্ত্তৃক দ্রুত চালিত কলটার পানে খানিকক্ষণ নির্নিমেষে চাহিয়া মহাদেব টেবিলের উপরকার ভাঁজ-করা জামাগুলা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এগুলি কি কাটা রয়েছে দিদি?" করুণা বলিল, "হাঁ, কাটা ত রয়েছে; কিন্তু কবে যে হবে তা জানিনে;—সময়ই হয় না।" "আচ্ছা, আপনি উঠুন—আমিই এ কটা সেরে ফেল্‌ছি।" "পার্‌বি? এ বিদ্যে আছে?" করুণা কাজ ছাড়িয়া দিলে, মহাদেব নীরবে কাযটা তুলিয়া লইল। নিকটস্থ অসমাপ্ত দৈনিক হিসাবের খাতা-খানা তুলিয়া করুণা সেটাকে সমাপ্ত করিয়া রাখিয়া দিল, এবং নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া বলিল, "হাঁরে, তুই সেখানে মাসে

পঞ্চাশ টাকা খুবই পেতিস্?" টাকার কথা উত্থাপনমাত্র মহাদেব সন্ত্রস্ত হইয়া নতমুখে বলিল, "হুঁ।" করুণা স্থির চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "কত জমালি?" অত্যন্ত মৃদুস্বরে মহাদেব বলিল, "কই, জমাইনি তো!" "জমাস্‌নি? পেটে কি রাক্ষস ঢুকেছিল? মাসে পঞ্চাশ টাকা খেয়েছিস্?" মহাদেব ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল; বলিল, "অনেক খেতাম যে!" "কেন, তারা টাকা দিত না?" "তা আমি তো আর চাইনি।" "চাস্‌নি? আচ্ছা বোকা তুই!" করুণা ভাবিতেছিল, সংসারজ্ঞানলেশ-মাত্রহীন নিষ্কলঙ্ক এই জীবনটাকে কর্দ্দমাক্ত করা যায় না কি? একটু পরে আবার বলিল, "হ্যাঁরে, যদি ঘর-সংসার থাকতো, কি ক'রে চালাতিস্?" আরক্ত মুখে মহাদেব বলিল, "ভেবে-চিন্তে তো টাকা খরচ করিনি।" করুণা চুপ করিয়া কিছুক্ষণ মহাদেবের অভ্যস্ত হস্তের সেলাই দেখিতেছিল। তার পর বলিল, "তোর হঠাৎ এখানে আসবার মন গেল কিসে?" মহাদেব একটু হাসিল, "কি জানি! অনেক দিন থেকে খাটুনির জন্যে অনেক দেশে যেতে হয়। সেদিন বরিশালে এসে কেমন একবার এই পুরোনো দেশ দেখতে ইচ্ছে হ'লো।" "দেশ দেখতে, না দেশের মানুষ দেখতে?"—তেমনি হাসিমুখে মহাদেব বলিল, "মানুষ তো সে দেশেও আছে; তা এ দেশই বা কি, সে দেশই বা কি? নিজের শরীর অপটু হলে, একটু কিছু এনে খাওয়ার জন্যে এখানেও পড়ে কাঁদতে হয়, সেখানেও তাই।" করুণা জানিত, মহাদেব জীবনে কাহারো স্নেহচ্ছায়া পায় নাই। একজনের জীবনে অপর কোনও হৃদয় হইতে বিন্দুমাত্রও বেদনার টান সম্ভব, ইহা তাহার নিকট নবাবিষ্কৃত বোধ হইত। দুঃখে, কষ্টে, মনের দুর্ব্বলতায় অন্তর একটী স্নেহ-কোমল হৃদয়ের সহানুভূতি লাভ যে কি পদার্থ, তাহা সে কখনও অনুভবও করে নাই। তেমনি আবার সুশৃঙ্খলায় নিজের জীবনকে কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট সৎপথেও পরিচালিত করিতে পারে নাই। যখন যাহা সম্মুখে পড়ে, সংসর্গের ও প্রবৃত্তির দোষ-গুণে তাহাতেই নিবিষ্ট হয়। নিকৃষ্ট কর্ম্ম করিয়াও লজ্জিত বা কুণ্ঠিত নহে; এবং উৎকৃষ্ট কর্ম্ম করিয়াও কখনও শ্লাঘা বোধ করে নাই। তথাপি অপরিপক যৌবনের উষ্ণ শোণিতোচ্ছ্বাসে স্বাভাবিক ক্ষণিক তৃপ্তিলিপ্সু-চিত্ত মহাদেবকে কুসংসর্গ ক্রমেই অধঃ হইতে অধোমুখে নিপাতিত করিতেছিল। তাহার সহিত ক্ষণিক আলোচনায় করুণাও তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছিল। করুণা ভাবিতেছিল, এই যৌবন-মদান্ধ তরুণ জীবনটাকে কেহ যদি সামান্য স্নেহ-মমতা দেখাইয়া উদ্ধার করে, তবে হয় তো সে নরকের শেষ দ্বার পর্য্যন্ত নাও পৌঁছিতে পারে। এই কার্য্য সে নিজেই চেষ্টা করিবে মনস্থ করিল।

২

প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে একটা সজিনা গাছের নীচে দাঁড়াইয়া করুণা চাকরদের দিয়া ডাঁটা পাড়াইতেছিল। চাকররা পরস্পর বিবাদ করিতেছিল। সুবৃহৎ গাছটায় উঠিবার উপযুক্ত সাহস কাহারো নাই; বিশেষ, দিন দুই আগে কয়েক পশলা বৃষ্টিপাতে গাছটা পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছে। করুণা চাকরদের উৎসাহ দিলেও, নিজে বিব্রত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে পত্রপল্লবসমাত্রহীন গাছটার লম্বিত কোমল ডাঁটাগুলার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

জিনিষটা কর্ত্তার অত্যন্ত প্রিয়-বস্তু। যে যাহা ভালবাসে, তাহাকে তাহাই খাওয়াইয়া, ভোক্তার প্রসন্ন তৃপ্তি দেখা করুণার বড় সুখ। তাই সে আগ্রহ-ভরে নিজে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই সময়ে করুণার দেবর-পুত্র মণিকে স্কন্ধের উপর বসাইয়া, ঊর্দ্ধমুখে তাহার সহিত মিষ্টালাপ করিতে-করিতে সদা-প্রসন্ন-মুখ মহাদেব আসিয়া দাঁড়াইল। মণিকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া বুকের উপর জড়াইয়া ধরিয়া মহাদেব সবিস্ময়ে বলিল, "এ কি, আপনি নিজে গাছতলায় কি করছেন দিদি?" "এই গাছ থেকে গোটা-কতক ডাঁটা পাড়তে ব'লছি; তা'—" মুখ ফিরাইয়া মহাদেব চাকরদের নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "তা' এরা বুঝি পারছে না? তা নাও তোমরা মণিকে, আচ্ছা, আমি দেখি একবার।" করুণা নিজেই মণিকে কোলে লইল। চাকররা অপ্রতিভ হইয়া সেই উজ্জ্বল, গৌরকান্তি, ব্যায়ামদৃঢ় অথচ সুকুমার, নবযৌবনশ্রীমণ্ডিত দেহখানির লঘু ক্ষিপ্র গতিতে বৃক্ষারোহণ দেখিতেছিল। কর্ম্ম শেষে মহাদেব নীচে অবতরণ করিলে, ভৃত্যদ্বয় বলিল, "ওর কি এটা কম দুঃসাহস! আপন ব'লতে ভাব্‌বার-চিন্তার কেউ তো নেই,—অসাধ্যও কিছুই নেই!" নবোদ্গত, সূক্ষ্ম, কোমল রোমরাজির নিম্নে ওষ্ঠে মৃদু হাসি ফুটিয়া মিলাইয়া গেল। কেহ যার নাই, বড় দুঃখী কি সে? মহাদেব করুণাকে বলিল, "দেখুন তো দিদি,

আপনার ব'লতে অনেকগুলো লোক থাকলেই বুঝি বিশ্বের সব কাজ অসাধ্য হয়ে যায়, আর পর্ব্বতের মত বড় বিরাট অস্তিত্বসংস্কৃপ হয়ে থাকতে হয়।" করুণা প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিল। সে বলিল, "না বাবা, মানুষ যে, তার অসাধ্য কিছুই নেই। ভগবান করুন, তুমি মানুষ হও।" "আমি কি এখন পশু আছি?" বলিয়া হাত বাড়াইতে মণি তাহার সুবিশাল বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

অপরাহ্ণে গুড়া কতকটা ময়দা বাহির করিয়া বিহারী চাকরকে মাখিতে বলিয়াছিল। বিহারী আজ্ঞা পাইয়া নিতান্ত বিরক্ত ও ক্ষুণ্ণচিত্তে বাহিরে গিয়া বলিল "আঃ! ভাব্‌ছিলাম যে, কাজকর্ম্ম সব সারা হয়ে গেছে,—রামলীলা হচ্ছে, একবার গিয়ে দেখে আস্‌বো,—তা আবার ময়দা মাখ্‌তে হুকুম হ'ল,—তবে আর যাবো কখন?" খানসামা প্রয়াগ গম্ভীর মুখে বলিল, "তা' কাজ থাকলে কাজ ছেড়ে কি আর কোথাও কিছু দেখবার শুন্‌বার সময় থাকে ভাই!" নিরুপায় দুঃখে বিহারী বলিল, "তা বৈ কি—পরের চাকরী। তবু লালু যদি এখনকার ময়দাটা মেখে দিত, তবু আধঘণ্টা ঘুরে আস্‌তে পার্‌তাম্।" একটা তুচ্ছ কারণে বিহারীর অতি ব্যগ্র আগ্রহ দেখিয়া মহাদেব সকৌতুকে হাসিতেছিল। তার পর হতাশ বিহারীকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "আমি তোমার কাজ ক'রে দেব, তুমি যেও বিহারী।" অকস্মাৎ অকূলে কূল পাইয়া বিহারী বলিল "দেবে? তুমি খুব কাজের লোক দাদা। দেখ, কেউ এ ভারটুকু নিচ্ছিল না।" স্কুলের আসন্ন ছুটীর সময়ে করুণা মলিনাকে পাঠাইয়া দিল, "দেখে আয় সব যোগাড় ক'রে রেখেছে কি না—ছেলেদের আস্‌বার সময় হ'ল।" মহাদেব মলিনাকে বলিল, "জিজ্ঞেস্ করে এস, ষ্টোভ জ্বল্‌ছে, আমি—খাবার তৈরী কোর্‌ব কি না?" করুণা আসিয়া আশাতীত পরিচ্ছন্ন কাজ দেখিয়া সহাস্যে বলিল, "হ্যাঁরে মহাদেব, বিহারী তোকে কিছু ঘুষ দিয়েচে বুঝি?" লজ্জিত হইয়া মহাদেব বলিল, "আমি তাকে রামলীলা দেখ্‌তে যাবার ছুটী দিয়েচি। আর কোনও কাজ আছে?" "না, হয়ে গেছে—যাঃ।"

বাহিরের ঘরে পশ্চিমদ্বারী একটা সুসজ্জিত, আশির রক্ত, নীল, পীত, হরিৎ প্রভৃতি বর্ণচ্ছটার রঙ্গীন কক্ষে বসিয়া মেজবাবু ললিত হারমোনিয়ম্ লইয়া আপন মনে বাজাইতেছিলেন। সম্মুখের বারান্দায় টবে-সাজানো বিচিত্র বর্ণের বিলাতী ফুলগুলিতে গোটাকতক প্রজাপতি ও ভ্রমর মৃদু গুঞ্জনে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া উড়িতেছিল। পিতার নিকটস্থ একটা চেয়ারে বসিয়া মণি তাহার ছোটকাকা বিকাশের সংগৃহীত একখানি ক্যাটালগের পাতা ছিঁড়িয়া আহার করিবার চেষ্টা করিতেছিল, এবং মধ্যে-মধ্যে উৎকর্ণ হইয়া বাজনা শুনিতেছিল। করুণার আজ্ঞামত মণিকে দুগ্ধ-পানের নিমন্ত্রণ করিতে মহাদেব আসিয়া দাঁড়াইল। হারমোনিয়মটা দেখিয়া বলিল, "এটা নূতন বোধ হচ্ছে।" "হাঁ, আগেকারটা আরও একটু ছোট ছিল।" "আমারটা প্রায় এত বড়ই ছিল।" "তোর আবার একটা ছিল না কি? বাজাতিস্?" "হাঁ।" "আচ্ছা, বাজা তো খানিক।" মহাদেব সসঙ্কোচে ইতস্ততঃ করিয়া নতমুখে বলিল, "না দাদাবাবু, দিদি এসে পড়বেন।" কিন্তু ললিতের আগ্রহের সহিত সুদৃঢ় আজ্ঞা পাইয়া সে কুণ্ঠিত ভাবে হারমোনিয়মে হাত দিল। একটু পরেই মণির জন্য করুণা নিজেই আসিয়া দাঁড়াইল। তখন মহাদেব মুক্ত-কণ্ঠে গাহিতেছিল, "নীল সিন্ধুজল-ধৌত-চরণতল, অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল, অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল, শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী।" কি চমৎকার, কোমল সুললিত কণ্ঠ! করুণা জানিত, তাহার আগমন জানিতে পারিলে গায়ক নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে; তাই দ্বার-প্রান্তে গতি স্থগিত রাখিয়াছিল। মধুর মূর্চ্ছনা কক্ষময় প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছিল।

"জাহ্নবী যমুনা, বিগলিত করুণা, পুণ্যপীযূষ-স্তন্যবাহিনী"—সহসা করুণার প্রতি দৃষ্টি পড়াতে মহাদেব সসম্ভ্রমে বাজনা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। করুণা বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে মণিকে লইয়া চলিয়া গেলে পর, মহাদেব কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "দিদি নিজে মণিকে নিয়ে গেলেন!" "তা কি হয়েছে রে!" অপরাধের লজ্জায় মহাদেবের কণ্ঠ সিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। বিবর্ণ মুখে সে বলিল, "আমায় ব'লেছিলেন যে নিয়ে যেতে!" ললিত বলিল, "দিদি অপরাধ না পেলে রাগ করেন না।" কতকটা আশ্বস্ত হইয়া মহাদেব বলিল, "দিদি সবাইকেই তো ভালবাসেন—আমাকেও ভালবাসবেন।"

সেদিনকার উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ মহাদেবের উপর অতি তুষ্টিতে বিহারী নিজেদের যে সিদ্ধি বাটিতেছিল,

তাহারই মাত্রা বেশী করিয়া লইল এবং বিন্দুমাত্র অনুরোধ না করিতেই মহাদেব তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লইয়া বসিয়া খাইতেছিল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে শিক্ষকের কাছে পড়া শেষ করিয়া মলিনা করুণার নিকট যাইতেছিল। মলিনা মহাদেবকে সিদ্ধি খাইতে দেখিয়া বলিল, "মহাদেব, তুমি ভাঙ্গ খাচ্ছো; আমি বড়মাকে ব'লে দোব।" মুখ হইতে পাত্র নামাইয়া, বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মহাদেব বলিল, "কেন? সিদ্ধি খেলে কি হয়?" মলিনা হাসিতে-হাসিতে বলিল, "মদও যা, ভাঙ্গও তাই; তুমি নেশা খাচ্ছো, আমি বড়মাকে ব'লে দোব।" মহাদেব বলিল, "যাও গে! মদ খাওয়া কি খুব দোষ? মদ কি কেউ খায় না?" বিহারী সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, "চুপ—চুপ, ও সব কথা বড়-মাকে ব'লে ছায়!"

মুক্ত ছাদের উপর বসিয়া করুণা মালা করিতেছিল। চৈত্রের মুকুলিত লতা-পাদপের মধুভারাকুল গন্ধ বাতাস ছাদে বহিয়া আনিতেছিল। মাথার উপর গগন-চন্দ্রাতপে উৎসবের দেউটীর মত অসংখ্য নক্ষত্র ধপ্‌ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সম্মুখেই সমুজ্জ্বল সপ্তর্ষিপুঞ্জ। কৃষ্ণপক্ষ হইলেও অন্ধকার অত্যন্ত তরল। করুণা মালাটী শেষ করিয়া তাহা মস্তকে স্পর্শ করাইল। সকল জ্যোতিঃর আদি জ্যোতিঃকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "ঘৃণাতত্ত্বোর্দ্ধস্ত ধীক্ষং—"হং জ্যোতিষাবি তনো ব্রহ্ম।" নত মস্তক উত্তোলন করিবামাত্র তাহার গলা জড়াইয়া পিঠের উপর পড়িয়া মলিনা তাহার বক্তব্য শেষ করিল। করুণা একটু কি ভাবিয়া বলিল, "এইখানে থেকে ঐ ছাদের রেলিং ধরে তুই ডাক্ মহাদেবকে।" মলিনার আহ্বানে মহাদেব নতমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। করুণা দীপ্ত উজ্জ্বল চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া বলিল "তুই রান্নাঘরে ছিলি?" মহাদেব মাথা নাড়িল। "ভাঙ্গ খাচ্ছিলি?" মহাদেব নীরবে শুধু চাহিয়া রহিল। অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও তীব্র কণ্ঠে করুণা বলিল, "ছি—ছি, ও কেন খেতে গেলি তুই,—ওতে নেশা হয় যে!" সেই সুতীক্ষ্ণ তিরস্কারে ভীতিপাণ্ডু মুখে মহাদেব ভূমি-বদ্ধ নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল। করুণা স্থির করিয়াছিল, এই সতেজ বিপথগামী জীবনটীকে এমনি সতেজ সুন্দর রাখিয়া সুপথে ফিরাইবে। তাই দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "সত্যি কথা বলিস্, তুই মদ খাস্?" মৃদু অস্ফুট স্বরে মহাদেব বলিল, "সেখানে থাকতে খেতাম্; এখানে খাইনে।" করুণা ঘৃণায়, ক্ষোভে বলিয়া উঠিল, "মদ খেতিস? ছি—ছি, নিজের শরীর, নিজের চৈতন্যকে ওই বিষাক্ত জিনিসের অধীন ক'রে নিজের চৈতন্যকে বিনাশ করা মহাপাপ।" মহাদেবের ইহার বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিবার ছিল; যে জিনিসকে করুণা স্ত্রীলোক হইয়া ঘৃণা করে, সেই জিনিসেরই যাহারা ভক্ত, বিপক্ষবাদীর অনুযোগের প্রত্যুত্তর তাহারা সর্ব্বদাই সঞ্চয় করিয়া রাখে,—মহাদেবও রাখিত। কিন্তু সে উত্তর প্রদানের মত সাহস তাহার তখন একেবারেই ছিল না; করুণার প্রগাঢ় স্নেহে, অবাধ উদারতায় করুণার উপর অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা মহাদেবের জীবন অধিকার করিয়াছিল। করুণা অনেক বিষয় জানে,—সে যে মহাদেব-শ্রেণী হইতে কত উচ্চ, তাহার উক্তি যে ভ্রান্ত হইবে—ইহাতে মহাদেবের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাহার মহা উৎসাহে কৃত কর্ম্ম তাহাকে অপরাধের বেদনায় বাথা দিতে লাগিল। করুণা ঈষৎ কোমল স্বরে বলিল, "আর কখনো খাস্‌নে।" মহাদেব আর্ত্তস্বরে বলিল, "আমায় কেউ ব'লে দেয়নি।" "কি ব'লে দেয়নি?" "যারা শিখিয়েছিল, তারা বল্‌তো না যে পাপ হয়; ব'ল্‌তো যে খেলে ফূর্ত্তি হয়।" "হাঁ, ফূর্ত্তি হয় বৈ কি; কিন্তু সে ইতরোচিত ফূর্ত্তি। আমি চাইনে যে সবাই ইতর হবে। তুই যা। আমি বারণ করচি, আর খাস্‌নে।" করুণার দৃষ্টির বাহিরে আসিয়া মহাদেব ভাবিতেছিল, "কেন সে এমন দুষ্ট যাহা, তাহাতেই দোষী হইল? ভাল-মন্দর নিক্তির মাপে সে যেন পুরাপুরি তাহার মন্দ দিকটাই পাইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সে কতবার সোল্লাসে এমন কাজ করিয়াছে যে, এই কয়দিন এখানে থাকিয়া দেখিতেছে, সংসার সমাজ দুইটীতেই সে অপরাধ অমার্জ্জনীয়। যে ক্ষোভের দুঃখের ঋণ তাহার কোনও কালেই ছিল না, সেই অনুশোচনা যেন আজ রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিয়া-ফুলিয়া তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। দিন দুই পরে তাহার সে-দিনকার তৃপ্তি দেখিয়াই, বিহারী তাহাকে আবার সিদ্ধির নিমন্ত্রণ করিল। অকস্মাৎ উৎক্ষিপ্ত ভাবে মহাদেব বলিল, "আমি আর ও-সব ছাইভস্ম খাবো না।" বিহারী একটু থতমত খাইয়া বলিল, "কেন মহাদেবজী, ওটা কি ছাইভস্ম হ'ল?" কণ্ঠস্বরটা একটু নামাইয়া বলিল, "বড়মা বলেছেন কি না? তা ওদের কাছে ছাই-ভস্ম হ'ল ব'লেই কি"—

মহাদেব কুণ্ঠিত ভাবে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "তা' তোমরা খাওগে,—দিদি কখনও মিথ্যে কথা বলেন না। আর তারী তো জিনিস, তাই আবার খাব? যাও, তোমরা খাওগে।" বিহারী ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল।

(৩)

ছুটীর অবসানে করুণা মহাদেবকে সেই দূরদেশে কুসংসর্গে ফিরিয়া পাঠাইতে চাহিল না; সে সেই বেতনেই বাজারের একটা বিশেষ উন্নতিশীল আড়তে মহাদেবের একটা চাকুরী সংগ্রহ করিয়া দিল। আহার ও বাসস্থান সেইখানেই পাইবে। স্বভাবতঃ কর্ম্মপ্রিয়, উৎসাহী মহাদেব খুব দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করিয়া প্রথম-প্রথম দিনকতক সকলেরই মন আকর্ষণ করিল।

রীতিমত বর্ষা নামিয়া গিয়াছে। অবিশ্রান্ত জলধারা কখনো বা ক্ষীণ, কখনো বা পুষ্ট ভাবে ঝরিতেছে। আকাশের একদিক যদি বা তরল মেঘে পাংশু হইয়া আসে, অন্য দিক হইতে আবার কজ্জলঘন গাঢ় মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া স্তূপে-স্তূপে আসিয়া সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এমনি বর্ষার আড়তের ঘোড়ার গাড়ীর সোসাদ কোচম্যানটীর জীর্ণ কুটীরে রুগ্না স্ত্রীটীর সময়ের মেয়াদ আসন্ন হইয়া উঠিল। মাসিক বেতন হস্তগত হইবামাত্র কোচম্যানটী দারুণ দোকানে তাহা শেষ করিয়া আসিয়াছে। ঘরে আসিয়া মুমূর্ষু স্ত্রী ও ক্ষুধাতুরা শিশু কন্যার অবস্থা দেখিয়া অকস্মাৎ তাহার নেশা চমকিয়া ছুটিয়া গেল। তাহার মুখে ব্যাপার শুনিয়া মহাদেব রোগিকে দেখিতে তাহার ঘরে ছুটিয়া গেল, এবং সেই মুষলধার বৃষ্টিতে অন্ধকারে কর্দ্দমাক্ত-রাস্তায় ডাক্তার আনিতে যাওয়া ইত্যাদিতে তাহার যথেষ্ট বিলম্ব হইয়া গেল। আড়তের ম্যানেজার সেই সময়ে একটা বিশেষ প্রয়োজনে মহাদেবের অনুসন্ধানে আসিয়া ফিরিয়া গেলেন। মহাদেব কোচ-ম্যানের ঘরে গিয়া তাহার স্ত্রীর জন্য ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছে শুনিয়া সবিস্ময়ে মনে-মনে বলিলেন, 'একটা পাগল দেখ্‌ছি!' অত্যন্ত প্রয়োজনে মহাদেবকে অনুপস্থিত দেখিয়া ম্যানেজার নিতান্ত বিরক্ত হইয়া গেলেন, এবং এ ধরণের লোক দিয়া যে কোনও কাজ চলিতে পারিবে না, ইহা তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়া গেল।

মহাদেব কিন্তু অনেক রকম চেষ্টা করিয়াও সেই মরণাপন্নাকে বাঁচাইতে পারিল না। পরন্তু তাহার সেই শিশু কন্যাটীর গতিও প্রায় মাতার অনুরূপ দেখিয়া, সেই মেয়েটীকে কোলে করিয়া মহাদেব করুণার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। করুণা মহাদেবের অনাবৃত, শুভ্র, সুন্দর, প্রশস্ত বক্ষে সেই ঘোর কৃষ্ণবর্ণা, এক-মাথা কৃষ্ণ পিঙ্গল-বর্ণ কাঁকড়া চুল সমেত জীর্ণ-শীর্ণ শিশুটীকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তখন রাত্রি নয়টা; করুণা অত্যন্ত ব্যস্ত। সে সবিস্ময়ে বলিল, "এ আবার কি রে?" মহাদেব আর্দ্র কণ্ঠে মেয়েটীর পরিচয় দিয়া, অত্যন্ত মিনতি জানাইয়া করুণাকে বলিল, "আমি জানি, আপনি নিশ্চয় এটাকে রাখ্‌বেন। আহা এর মা ম'রে গেছে—আপনার কাছে থাকলে বেঁচে যাবে।" বলিয়া মেয়েটীকে নামাইয়া দিয়া বলিল, "যা, ওই যে মা!" সুরেশ আহারে বসিয়াছিল; সে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হাসিতে লাগিল। করুণা সসঙ্কোচে দুই পদ পশ্চাতে হটিল। চিরদিনকার যাহা সংস্কার, তাহা মুহূর্ত্তে মুছিবার নহে। ওই হতভাগ্য মেয়েটা যে হীন ঘৃণ্য দোসাদের মেয়ে—তা হউক না সে জ্ঞানহীন অজ্ঞান শিশু! আর করুণা সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের কন্যা—তাহা অতটা অহঙ্কারের সহিত না ভাবিলেও, সহসা হীন জাতির স্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্যই করুণা হটিয়া গেল। রোরুদ্যমানা মেয়েটা আকুল হইয়া মহাদেবকে জড়াইয়া ধরিল। মহাদেব সজল চক্ষে বলিল, "আপনিও তবে নেবেন না একে?" "হ্যাঁরে, ওই দোসাদের মেয়েটাকে ঘরকন্নার মধ্যে কি ক'রে রাখি বল্ তো?" মহাদেব হতাশ আকুল স্বরে বলিল, "কি হবে? এ যে কাঁদ্‌বে!" করুণা মহাদেবের এই উদার মহত্বে মুগ্ধ হইয়া মনে-মনে বলিল, "আবাদ করলে ফল্‌তো সোণা।" তার পর বাড়ীর সহিসদের ঘরে মেয়েটীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মহাদেবকে নিশ্চিন্ত করিয়া দিল।

কয়েক মাস আড়তে চাকুরী করার পর মহাদেব বুঝিল, জীবন শুধুই এই ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। তাহার মন ইহার অপেক্ষা বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রের অন্বেষণে তৎপর হইয়া রহিল। একদিন সন্ধ্যায় আড়তের স্তূপীকৃত বস্তা-বেষ্টিত অন্ধকার কর্ম্মস্থান হইতে উঠিয়া মহাদেব সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়া শুনিল, জনকয়েক বাঙ্গালী সেই দিন সুপ্ত-গৌরব দীপ্ত তেজে মাতাইয়া মহা উৎসাহে যুদ্ধ-যাত্রা করিতেছে।

(৪)

নবীন আশার উল্লাসে মহাদেবের তরুণ বক্ষ নাচিয়া উঠিল। সে এই তো চাহিতেছিল। এই না তুচ্ছ মানব-জন্মের সার্থক শুভক্ষণ! তাহার সুগঠিত, সুদৃঢ়, বলিষ্ঠ, সুন্দর বপু,—উজ্জ্বল বিশালায়ত চক্ষু। প্রশস্ত বক্ষে যে বীরোচিত প্রবৃত্তি সুপ্ত ছিল, তাহা ঘন স্পন্দনে সচেতন হইয়া উঠিল। তাহা যশোলাভ বা অর্থলাভ আকাঙ্ক্ষায় নহে—তাহার জন্ম ভারতের চিরপরিচিত ক্ষত্রিয়রক্তে। জন্মগত উষ্ণ শোণিত তাহার ধমনীতে উদ্দাম নৃত্যে নাচিয়া উঠিল। সে নিজের এই আনন্দের সংবাদ করুণাকে জানাইতে চলিল। সে যে সেখানে কত স্ফূর্তিতে কাজ করিবে, ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া করুণার অনুমতি চাহিল। করুণা নিজের চেষ্টার সার্থকতা দেখিতে পাইয়া একদিকে যেমন পুলকিত হইয়া উঠিল, অপর দিকে তেমনি তাহার প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিল। সে স্নেহের অভিনয় করিয়া কাছে টানিয়া এই অপদার্থকে পদার্থে পরিণত করিবে, ইহাই ভাবিয়াছিল। সেই অপদার্থ যে কতখানি পদার্থে আসিয়াছে,—সে যে ভস্মাবৃত রত্নখণ্ডকে স্নেহ-নিষেকে ধুইয়া তুলিয়াছে, তাহার উজ্জ্বলো সে নিজেই মুগ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার অধঃপতিত জীবন আজ মহাসমর-যজ্ঞে আহুতি হইতে যাইতেছে, সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর যাহার অন্তরে থাকিয়া আহ্বান করিতেছেন, সে কি তাহাকে এই পরম সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারে? মহাদেব যে করুণার পরম স্নেহাস্পদ। সে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "চিরদিনই আমি প্রার্থনা ক'রে আস্‌ছি, তুমি মানুষ হও। তবু নিজের মুখ দিয়ে। যাও 'বলা শক্ত' কিন্তু শক্ত কাজই চিরদিন শক্ত। ভগবান এই কঠিন কর্ত্তব্যের উপযুক্ত সাহস আর শক্তি দিন তোমায়।"

বোম্বাই হইতে যখন আরো কতকগুলি সঙ্গীর সহিত মহাদেব জাহাজে উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মন আত্ম-সাফল্যে পরিপূর্ণ। করুণার স্নেহাশীষ্-ভরা স্বচ্ছ সজল চক্ষের স্নিগ্ধ দৃষ্টি তাহাকে ঘিরিয়া-ঘিরিয়া একটী মর্ম্মস্পর্শী তৃপ্তি দিতেছিল। একবার মনে হইল, 'আবার ফিরিয়া আসিব কি?' সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল, করুণার পদপ্রান্তে বসিয়া সে ভগবানোক্তি আবৃত্তি করিয়াছে—

"মযি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্নযস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগত জ্বরঃ॥"

সাগর

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

গম্ভীর চির এ কি গরজন আলোড়ি বিশ্ব-চিত্ত,
বিরামবিহীন সারা নিশিদিন এ কি চঞ্চল নৃত্য!
বিধাতার কোন্ অভিশাপে হায়
নীল বিষবায় করিছে হিয়ায়,
কোন্ সে বিরহ-বহ্নি-ধারায় অন্তর পরিসিক্ত!

উদ্ভ্রান্ত ভীম মত্ত পাগল—হে ভয়াল পারাবার,
মর্ম্মকারার বন্ধন টুটি এ কি ঘোর হাহাকার!
ইন্দ্রের মত হরে শচীহারা,
বিরহ-বিধুর উন্মাদপারা,
অনন্ত কাল ঘুর দিশেহারা সন্ধানে ওগো কার?

বন্দি তোমায়, হে চির প্রেমিক—হে বিশাল পারাবার,
নিশিদিন ধরি খুঁজেছ যাহায়, পেয়েছ কি দেখা তার!
বক্ষের মত রক্ষা করিয়া,
মণি-মঞ্জুষা বক্ষে ভরিয়া—
মানসীর খোঁজে চলিছ ছুটিয়া দিতে প্রেম উপহার!

ওগো প্রকৃতির আদুরে দুলাল,—এ কি গম্ভীর ছন্দে—
জাগৃহি বলি আহ্বান কারে—কোন্ সে অভাগাবৃন্দে?
সে মহামন্ত্র লক্ষ ধারায়
পশিবে কি কভু সুপ্ত হিয়ায়,
নবালোক লভি কোন্ সে উষায় জাগিব পুলকানন্দে?

নদীয়া ও কলিকাতার কতকগুলি চলিত কথা

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার বি-এ]

বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রধানতঃ কলিকাতা অঞ্চলের ভাষার সহিত নদীয়ার চলিত ভাষার প্রভেদ দেখাইবার চেষ্টা করা যাইবে। নদীয়ার ভাষা বলিতে এস্থলে নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর এবং শান্তিপুরের ভাষাকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ১৩১৯ সালের পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার প্রচলিত কতকগুলি শব্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ১৩১৬ সালের পত্রিকায় আমার স্বগ্রামবাসী শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নদীয়ার দক্ষিণ অঞ্চলের গ্রাম্য শব্দের একটী সুনিপুণ তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে ঐ তালিকার বহির্ভূত কতকগুলি শব্দ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কতকগুলি বিশিষ্ট কথার উচ্চারণ-ভেদ, কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ শব্দ ও শব্দ-সমষ্টির ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইবে। প্রাকৃত বাংলার ব্যাকরণ লিখিতে হইলে, প্রত্যেক জেলা এবং মহকুমার প্রচলিত শব্দ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তাই আমি আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত কিছু উপকরণ যোগাইতে প্রস্তুত হইয়াছি। সব স্থলে ঠিক লিখিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না ;—এ কাজ দশের, আমি আমার কাঠ বিড়ালীর কাজটুকু করিতে পারিলেই কৃতার্থ হইব।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রথমে লিখিত শব্দটি নদীয়ার প্রচলিত, এবং পরে লিখিত শব্দটি কলিকাতা অঞ্চলে প্রচলিত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

একারের উচ্চারণ নদীয়াবাসী সাধারণতঃ এ (ɛ) রূপে করেন, কিন্তু কলিকাতাবাসিগণ 'য়্যা' রূপে করিয়া থাকেন। একারের পর রা থাকিলে উভয়ের স্থানে য়্যা করেন, যথা—পেয়াজ = প্যাঁজ ; দেয়াল = দ্যাল, শেয়াল = শ্যাল, মেয়াদ = ম্যাদ ইত্যাদি। কিন্তু শব্দটি আকারান্ত হইলে অ্যা হইয়া যায়, যথা—পেয়ারা = প্যারদা, পেয়ারা = প্যারদা, বেয়ারা = ব্যারদা। অনুরূপ উদাহরণ গেয়ালা গয়লা, গিয়েছে = গ্যাছে, ইত্যাদি। ক্রিয়ার উচ্চারণে আকার স্থানে উকার—গেলাম = গেলুম, শুনতাম = শুনতুম ইত্যাদি। ই কার ও 'ইয়ে' স্থানে এ কার—গিছল = গেছ্‌ল, ছিল = ছেলো, গিইচি = গেচি, দিয়েছে = দেছে, নিয়েছে = নেছে। একার স্থানে ইকার—দেন = দিন, দেক = দিক, নেক = নিক, নেগা = নিগে, (এদিক = ইদিক)। একার স্থানে ওকার—নেওয়া = নোওয়া, দেওয়া = দোওয়া (শুধু এই দুই ক্রিয়ার)। ওকার স্থানে একার—নোবো = নেবো, দোবো = দেবো (শুধু এই দুই ক্রিয়ার)। উকার স্থানে ওকার ও আকার—ঘুমুচ্চে = ঘুমোচ্চে, শুনলে = শোনালে, ভুলুলে = ভোলালে। ওকার স্থানে একার —করোচো = করেচো, খেয়োচো = খেয়েচো, নিয়োচো = নিয়েচো ইত্যাদি। একার স্থানে য়্যা উচ্চারণ কলিকাতার যত বেশী নদীয়ার তত নয়। বেটা = ব্যাটা, কেদার = ক্যাদার, গেলেন = গ্যালেন, দেন = স্যান, গেলা = গ্যালা ইত্যাদি। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিতে উভয় স্থলেই একপ্রকার উচ্চারণ হয়—খ্যাপা, ম্যাক, খ্যালা, ক্যামন, ব্যামন, ভ্যামন, ক্যানো, স্যাখ, স্যার,, গ্যালো ইত্যাদি। নদীয়ার নিম্নের শব্দগুলিতে আকার স্থানে য়্যা উচ্চারণ হয়—হ্যাঁ, ক্যাঁটা, ছ্যানা, ক্যাঁকড়া, গ্যান (জ্ঞান), ট্যাকা ইত্যাদি। নিম্নলিখিত স্থলে পদের মধ্যস্থ কিম্বা অন্তস্থ 'য়া' 'য়ে' অথবা 'য়ো'র লোপ কলিকাতা অঞ্চলে হয়—পোয়া = পো, দোয়াত = দোত, বিয়ে-থাওয়া = বে-থা, দিয়েশালাই = দেশ্‌লাই, জুয়োচুরি = জোচ্চোরি, দুয়োর = দোর, পাৎকুয়ো— পাৎকো। নদীয়ার উচ্চারণেও স্থলে-স্থলে এইরূপ সংক্ষেপ-করণের পরিচয় পাওয়া যায়—যথা, ক'টা বাজল ? স' ছ'টা।

বিলাতী, শিকারী, ইংরাজী, বিচালি, বেটী, দেশী প্রভৃতি শব্দ নদীয়ায় আসিয়া বিলিতি, শিকিরি, ইংরিজি, বিচিলি, বিটি, দিশিতে পরিণত হইয়াছে। বিলাত এবং শিকারী শব্দ অবিকৃত ভাবেও উচ্চারিত হইতে শোনা যায়।

প্রথম পুরুষ একবচনে অতীত কালে ক্রিয়ার শেষে একটা একার যোগ করা কলিকাতা অঞ্চলে প্রচলিত— খেলে (খাইল), করলে, শুনলে, শিখলে, মারলে, বললে,

দিলে ইত্যাদি। গাইচি, চাইচি, নাইচি, প্রভৃতি স্থলে গাচ্ছি, চাচ্ছি, নাচ্ছি প্রভৃতি নদীয়ায় প্রচলিত,—কিন্তু আমরা গায়ককে 'গেতে' না বলিয়া 'গাইতে' বলি, ঘাটে 'নাইতে', খাবার 'চাইতে' বলি, কিন্তু কষ্ট 'সতে' বলি।

নিম্নলিখিত স্থলগুলিতে স্বরবর্ণের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, —বুন = বোন, বিলাত — বিলেত, হেঁটো = হাটু, (কেনে = কেন) ধড়িয়ে = দৌড়ে, (যাবা = যাবে), করগা = করগে; করোনো = করোনি, করিসনে = করিসনি, ইত্যাদি (বন্ধনী-স্থিত কথাগুলি তত চলিত নয়)। জানালা (জান্‌লা), অল্‌না, কাল্‌না, ডাল্‌না প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত হইয়া নদীয়ায় জাঁল্লা, আঁল্লা, কাঁল্লা ডাঁল্লা রূপে পরিণত হয়। 'ল' 'ন' এর মিশিয়া যাওয়ার মত 'র' 'ল' ও 'ন্ন' হইয়া যায়, যথা— করলা (উৎকে)—কল্লা উক্‌কে, পারলাম, পাল্লাম, মরলাম = মল্লাম = মলাম, পড়ল্‌ = পল্ল পল, করল্‌ = কল্ল ইত্যাদি। আবার নবাব = লবাব।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বীরভূম জেলার অনুনাসিকতার ভয় পাইয়া লিখিয়াছিলেন—"আমাদের বীরভূম জেলার অধিবাসিগণ বাঙ্গালা ক্রিয়া পদগুলি এরূপ নাকি সুরে উচ্চারণ করেন যে, নিম্নোত্থিত কলিকাতাবাসী বা বরিশালবাসী অন্ধকার স্থলে তাহা শুনিলে, অপদেবতার উৎপাত আশঙ্কায় বিহ্বল হইবার কথা।" (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৯)

এই অনুনাসিকতা-প্রিয়তা হইতে অপদেবতার ভয় ঘরের নিকটেই আছে—এজন্য কলিকাতাবাসি বা নদীয়াবাসি-গণকে বীরভূম যাইতে হইবে না। বোধ হয় কলিকাতার খোপ হইতে ভূতে ঢিল ছুঁড়িলে ভয়ে কেহ খুঁজিতেও বাহির হন না। কলিকাতায় কুঁড়েদের জীবন-সংগ্রামে টিঁকে থাকা বড় সোজা নয়—তবে দু-একজন ফাঁকি দিয়ে বেশ আছে। আগা গোড়া হাৎড়াইয়া একখানা ইঁট ও একখানি কাঁচ পেয়ে খোকা-খুকীর হাসি দেখে মা-বাপের দুঃখ ঘুচে গেল। খোঁড়া ছুড়ি ছেলে চড়বে—তাহলে সুখের আর বাকী থাকল কি?

নদীয়ায় শিব, শিকল, স্নান, মটরশুটি প্রভৃতি—ছিব, ছেকল, ছ্যান, মটরের ছুটিতে পরিণত হয়। নিম্নলিখিত স্থলে হসন্ত উচ্চারণ কলিকাতায় দেখা যায়—

বরগা = বর্গা, দরজা = দর্জা, ইত্যাদি।

টা প্রত্যয় স্থানে নদীয়ায় অনেক সময় তা দেখা যায় —কতা বাজল? কাঁদ্‌তে, রাঁধতে নদীয়ায় কান্‌তে রান্‌তে বলিয়া উচ্চারিত হয়। বুঝেছ, এসেছ—শব্দঘরের মাকের বাঞ্জনবর্ণ নদীয়ায় উঠিয়া গিয়াছে বুঝ্‌ছ, এয়েছ, (তাড়াতাড়ি কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত হয়।)

কলিকাতা অঞ্চলে নিম্নলিখিত স্থলে সপ্তমী বিভক্তির লোপ দেখা যায়—গায়ে দেওয়া = গায় দেওয়া, পায়ে ধরা = পায় ধরা, দেশে যাওয়া = দেশ যাওয়া ইত্যাদি।

কিন্তু কান ধরিয়া = কানে ধরিয়া, হাত ধরিয়া = হাতে ধরিয়া ইত্যাদি অবচ্ছেদে সপ্তমীর প্রয়োগ দেখা যায়। ষষ্ঠীস্থানে দ্বিতীয়ার প্রয়োগ—আমার ভাল লাগে = আমাকে ভাল লাগে, এ কথা তার সাজায় না = এ কথা তাকে সাজায় না ইত্যাদি।

নিম্নের শব্দ-সমষ্টিগুলিও তুলনা করা যাইতে পারে।

আমার থেকে বড় = আমা হতে বড়
কপ্পুর উড়ে যাওয়া = কপ্পুর উবে যাওয়া
খিদে (ক্ষুধা) লাগা = খিদে পাওয়া
গাল দেওয়া = গাল পাড়া
ভাত চড়ানো = ভাত চাপানো
জল পড়ছে = বৃষ্টি পড়ছে
দিব্বি পাড়া = দিব্বি গালা
পাত্রে ধরবে না = পাত্রে আঁটবে না
পার হয়ে = পেরিয়ে
বের হয়ে, বেরিয়ে } = বেরিয়ে
বোধ করি = বোধ হয়
বাড়ী যাওয়া = দেশ যাওয়া
বাতাস করা = পাখা করা
রায় আসে না = এসে যায় না
ভয় লাগা = ভয় পাওয়া
মাথার ওপর = মাথার পর

খাঁটী নদীয়ার লোক 'গিয়ে' ভিন্ন কখনো গেয়ে বলেন না।

চিতোর

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ]

বেদনার পীঠ তুমি, গৌরবের পাট,
সতীর অনন্ত চিতা, মহত্ত্বের ঘাট।
দেবতা মনুষ্য হেথা, পুণ্য পেলে রূপ,
মৃত্যু অমরতা হ'ল, ধ্বংস যশোধূপ।
মরণে বেখানে তুমি প্রাণের গৌরব,
অনলেতে পদ্মিনীর ছোটালে সৌরভ।
বিস্মিত করিলে বিশ্ব, নিঃস্ব হয়ে তুমি,
ত্যাগে অনুরাগে হলে ধন্য তপোভূমি।
বিজিত হইয়ে তুমি জিনিলে জেতায়,
শ্মশানে কুসুম-শয্যা তোমারি হেতায়।
গৌর্য্যের অলকা তুমি, সাবিত্রী ধরার,
নিকটে আসিবে কাল সাধ্য কি গো তার।
তুমি নহ ভস্মস্তূপ, তুমি নহ চিতা,
কালানলে হাসিতেছ দীপ্তিমতী সীতা!

সুখ-স্মৃতি

[শ্রীমতীন্দ্রমোহন বসু]

সে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। কিন্তু আজিও যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি, সাঁওতাল-বালিকা ফুলিয়া আমার পাশে বসে আছে। সদা হাস্যময়ী; যেন একটি ফোটা বন্য ফুলের মতন। মাথার চুলগুলি কোঁকড়ান, ঘনো-ঘনো; টানা চোখ-দুটী ভাসা-ভাসা, চোখের তারা-দুটী কালো। চাহনীতে বাঁকা ভাব নাই—যেন স্বভাব-শিশু।

আমরা কিশোর-কিশোরী। সাঁওতালদের সঙ্গে, পাহাড়ে ঘেরা এই বিচিত্র দেশের জল-হাওয়ায় আমি মানুষ। আমার তিনকূলে কেহই ছিল না—কিছুই ছিল না। সাঁওতালের ঘরে চিরদিন প্রতিপালিত। শুধু শুনেছিলাম, আমার বাবা না কি মায়ের মৃত্যুর পরে, জ্ঞাতিদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে ক্লান্ত বিপন্ন হয়ে, আমাকে নিয়ে গয়া থেকে পালিয়ে এসে, এই গ্রামে বাস করেছিলেন। তার পরে একটা বৎসরও যায় নাই—অকস্মাৎ একদিন সকালে বিসূচিকা রোগে তিনি যখন ও-পারে চলে গেলেন, তখন এদের হাতেই আমাকে না কি রেখে গিয়েছিলেন।

সেদিন গোলাবাড়ীর ছোট কোপের পাশে একটা বড় অশত্থ-গাছের তলায় বসে আছি—আমি আর ফুলিয়া। আকাশে চাঁদ উঠ্‌ছে—চাঁদের কিরণ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আমাদের গায়ের তলায় লুটোপুটি করছে। আমাদের সরল প্রাণে লজ্জা-সরম ত ছিলই না; তাই এই নিরি-বিলিতেও কোন দ্বিধা নেই, কোন বাধা নেই। সারা বিশ্বের মধ্যে যেন সে আর আমি—আর কেউ নেই। দিগন্ত ব্যাপ্ত জোছনার মাঝে এই অন্ধকার ছায়াটুকুর মধ্যে আপনা-দিগকে মিলিয়ে দিয়ে জোছনার অঙ্গে-অঙ্গে মিশিয়ে আছি।

ঝির্‌ঝির্ কোরে বাতাস বইছে। সেই বাতাসে তার কোঁকড়া চুল উড়ছে। আঁচলটা থেকে-থেকে দুলে-দুলে উঠ্‌ছে। সে শোভার যেন প্রকৃতি নির্ব্বাক্—সবারই যেন কথা ফুরিয়ে গেছে—সবাই যেন অবাক্—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভরে' মহা নিস্তব্ধতা।

হঠাৎ তার চুলগুলো মুঠো করে নিয়ে বল্লাম—"ফুলি, তোর চুলগুলো ভারি সুন্দর কিন্তু।" ফুলিয়া খিল্‌খিল্ করে একগাল হেসে বল্লে—"সত্যি না কি?—ও তোর মনের ভুল।" "মিথ্যা নয় ফুলি—বড় সুন্দর।"

ফুলি আস্তে-আস্তে তার হাত দুখানা দিয়ে আমার হাতদুটো চেপে ধর্‌লে। তার হাত থেকে, আমার হাত দিয়ে সর্ব্বাঙ্গে যেন কিসের প্রবাহ সমস্ত শরীরে বয়ে গেল! আমি যেন স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌লাম যে, ফুলি তার ডাগর-ডাগর দুটো চোখ দিয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে। আমি দূরে পাহাড়ের দিকে চোখ ফেরালাম। চারিদিক স্তব্ধ!

আর কথা নেই। চাঁদ ধীরে-ধীরে আরও—আরও

উপরে উঠলো। চাঁদের আলো একেবারে আমাদের পথের উপর এসে পড়্‌ল। চাঁদের আলোতে শিশিরের বিন্দুগুলো মাঝে-মাঝে ঝকমক্ করে উঠচে!

হঠাৎ কুলিয়া হেসে উঠলো। সে যেন জ্যোৎস্না-নিশীথে পাপিয়ার ডাকের মত লহরের পর লহর! সে লহর জ্যোৎস্নার মাঝ দিয়ে—নিস্তব্ধতার ভেতর দিয়ে পাহাড়ে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লো। চারিদিকে তার মধুর প্রতিধ্বনি হলো।

আমি বল্লাম "কেন হাসছিস্ কুলিয়া?" "ও কিছু না—কিছু না।"

যেমন প্রশ্ন তেমনি জবাব। আমি অভিমানের ভান কোরে বোল্লাম, "আচ্ছা, আমি চাইনে শুন্‌তে। আমাকে তুই বলবি কেন?"

তার বাঁ হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে সে বল্লে—"আচ্ছা বলছি ভাই, রাগ করিস্‌নে। কেন হাসছিলেম জানিস? আমার পায়ের তলায় সুড় সুড় কোরছে।"

আমি আগ্রহ করে তার পায়ের তলা দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। কি হোয়েছে সেখানে? তার খালি পা দুটো কাদা মাখা। কুলিয়া পা টেনে নিয়ে আমার মুখটা তার বুকের মধ্যে টেনে নিলে। বুকের উপরে কাণ রেখে আমি যেন তার মনের কথা শুন্‌তে পেলাম। হঠাৎ সাহস বেড়ে গেল। বোল্লাম—"কুলিয়া, তুই আমায় বিবি?"

কুলি আবার উচ্চ হাস্য কোরে বল্লে, "তুই বড় বোকা,—আমাকে খাওয়াবি কি?" আমি চুপ করে ঘাড় গুঁজে রইলুম। কুলিয়া আমার ভাব দেখে যেন সেধে সেধে বল্লে—"বল্ না ভাই?" আমি রুক্ষ স্বরে বললাম, "যা খুসী তাই।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বল্লাম,—"কুলি, তোর জন্যে আমি জান দিতে পারি। আমার ঘোড়াটা বেচ্‌বো। তাকে বেচে যে দাম হবে, তাতে আমাদের দু'জনের বেশ চলে যাবে। তা ছাড়া, আমি জমীদারের চাকর হোয়ে খাটবো।"

কুলিয়া অবাক হয়ে গেল। মুখে কেন একরাশ চাঁদের আলো মেখে—আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে, "আমার জন্যে তোর ঘোড়া বেচ্‌বি?"

আবার উভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম। চাঁদ আকাশ থেকে আমাদের সরল প্রাণের সরল প্রেমাভিনয় দেখে যেন আবিষ্টের মত হয়ে গেছে। প্রকৃতির অবস্থাও তদ্রূপ! চাঁদের উপর দিয়ে মেঘেরা যেন অতি সন্তর্পণে চলে যাচ্ছে। আলো বাঁচিয়ে ছায়া সামলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আর যেন অমল-ধবল জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজানা ভাবে কোন্ অজানা রাজ্যে চলেছি।

তার পর!—কুলিয়া আস্তে-আস্তে আমার হাত তুলে নিয়ে তার ঠোঁট দুখানায় বার-বার ঠেকাতে লাগ্‌লো। কাণের কাছে মুখ দিয়ে বল্লে,—"মতিয়া, আমি তোর হোলাম।"

বীণার ঝঙ্কারের মত আমার সমস্ত হৃদয়তন্ত্রী বেজে উঠলো—পুলকে সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠলো! কি আনন্দ! —আমাদের চারি দিকে সমস্ত বিশ্ব যেন দুলে-দুলে নাচতে লাগলো। আকাশে মেঘেরা ছুটোছুটি করতে লাগলো। গাছের অন্ধকার ডাল থেকে পাখীরা পাখা ঝেড়ে একবার কলরব কোরে উঠলো। অনেকক্ষণ এমনি চুপ করে বসে থেকে আমরা অবশেষে বাড়ী চলে এলাম।

* * * *

সকালে আমার ডাক পড়লো—সর্দ্দার ডেকেচে। হাত জোড় করে—মাথা নীচু করে গিয়ে দাঁড়ালুম। কি খবর!

"মতিয়া—বেটা—তীর-ধনুক তৈরী করে নে—লড়ায়ে যেতে হবে।" তখনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়িয়ে গেলাম।

* * * *

সর্দ্দার মারা পড়ল—আমরা হারতে গেলাম। কত দিনে বিচার শেষ হোল—আমরা মুক্তি পেলাম। দেশে ফিরে গিয়ে দেখি—আমাদের সেই গাঁ নেই—সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কারুর পাত্তা নেই। তিন গাঁয়ের লোকেরা কেউ কিছু বল্‌তে পারলে না।

তার পর কত দিন, কত মাস, কত বছর চলে গেছে—এখনও মনে হচ্ছে যেন সে কাল্‌কের কথা! কুলিয়া কোথায়!—তার ভাগ্যে কি ঘটেছে ভগবানই জানেন। কোথায় গেল সে এক নিমেষে! শুধু আমার লোহার মত মনটাকে সোণা করে সে ফেলে রেখে গেল!

ফুল শুকিয়ে গেছে কি?

তাতে কি আসে-যায়! তার গন্ধে আজও যে আমি মাতোয়ারা!

উদ্ভট-সাগর

[কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন, উদ্ভটসাগর, বি-এ]

(পূর্ব্ব প্রকাশের পর)

(১১)

"দ"-বর্ণের অনুবন্ধ দিয়া এই শ্লোকে ত্রিভুবন-তারিণী দুর্গা দেবীকে প্রণাম করিয়া মঙ্গলাচরণ করা হইতেছে :—

দীর্ঘাক্ষী দীপ্রদন্তা দনুজদলদলা দেবতাদুঃখদাত্রী
দিব্যাস্ত্রৈর্দিব্যদেহা দরদবদমনা দীপ্যমানা দুকূলৈঃ।
দৃপ্তানাং দর্পদাত্ত্যৈ দশদিশি দশকং দৃপ্তদোর্যাং দধানা
দেবী দুর্গা দুরন্তং দলয়তু দুরিতং দুর্গতিদ্রাবদক্ষা ॥

(উদ্ভটসাগরস্য)

সুদীর্ঘ-নয়না যিনি সুদীপ্ত-দশনা,
অতি নীচ দৈত্যে যিনি ক্রোধ-পরায়ণা ;
দেবতার দুঃখ যিনি করেন বিনাশ,
দিব্যাস্ত্র ধরিয়া যাঁর শোভার বিকাশ ;
ভয়-দাবানল যিনি করেন নির্ব্বাণ,
সুশোভন কৌম-বস্ত্র যাঁর পরিধান ;
দলিতে দুষ্টের দর্প দশদিকে যাঁর
বিস্তৃত প্রচণ্ড বাহু রহে অনিবার ;
দুর্গতি নাশিতে যিনি দক্ষ বিলক্ষণ,
ভক্তিভরে ভজি সেই দুর্গার চরণ !

(১২)

একদিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, কবিবর বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের চূড়া কি কারণে বামদিকে নিরন্তর হেলিয়া থাকে ?" তদুত্তরে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় নিম্ন-লিখিত শ্লোকে মহারাজের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন :—

যদ্ ধ্যায়েৎ সততং বিধিঃ পদযুগং নাভ্যম্বুজে সংস্থিতো
গঙ্গায়াঃ যৎপদসম্ভবায়াঃ স্মরহরিমূর্দ্ধস্থে হি শীর্ষে সদা।
যদ্বিত্তাং কমলা চ সেবতি সুখং বামে স্থিতা সন্ততং
তদ্ দ্রষ্টুং কমলাপতেঃ সুকুটিলা বামা চ চূড়া চিরম্ ॥

(বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারস্য)

বসতি করিয়া নাভি-পদ্মের উপর
যে পদ করেন চিন্তা ব্রহ্মা নিরন্তর ;
যে পদ হইতে জাত গঙ্গারে লইয়া
সাদরে রাখেন শিব মাথায় তুলিয়া ;
যে পদ স্বয়ং লক্ষ্মী বামদিকে বসি'
সমাদরে সেবিছেন দেখি দিবানিশি ;
সে পদ দর্শন যদি করি একবার,
সার্থক হইবে এই জীবন আমার,—
হায় রে কৃষ্ণের চূড়া ইহাই ভাবিয়া
বামদিকে নিরন্তর র'য়েছে হেলিয়া !

(১৩)

পাষাণময়ী অহল্যার বক্ষঃস্থলে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পদধূলি পড়িলে তিনি তৎক্ষণাৎ মানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভগবানের নিকট ভিক্ষা করিতেছেন :—

ভূমৌ দত্ত্বা পদমিহ সমাধেহি চেলাঞ্চলেঽস্মিন্
নাথাপ্রাপ্যাঃ ত্রিজগতি রজঃ পাদপদ্মদ্বয়স্য।
যোষা দোষাস্পদমনুদিনং নিত্যরোষস্তপস্বী
যস্য স্পর্শাদ্ রঘুবর পুনর্নেদৃশী স্যাং কদাপি ॥

ওহে রামচন্দ্র ! তুমি দেব নারায়ণ,
এতদিনে হ'লো মোর শাপ-বিমোচন।
তোমার চরণ-ধূলি পাইয়া দুঃখিনী
মানবী হইল আজ অহল্যা পাষাণী।
তোমার চরণ-ধূলি অমূল্য রতন,
সহজে না পায় ভবে কেহ কোন জন।
এ সংসারে রমণীর পদে পদে দোষ,
তাহাতে আমার পতি সদা করে রোষ।
যদ্যপি কখনো মোর হয় কোন ত্রুটি,
দেখান্ প্রচণ্ড কোপ,—করেন ভ্রূকুটি।
তাই আমি ওহে দেব ! যাচি বার বার,—
একটুকু পদ-ধূলি দেহ পুনর্ব্বার।

অকালে বাঁধিয়া রাখি করিয়া যতন,
এরূপ দুর্গতি আর না হবে কখন।

(১৪)

এক চাতক-পক্ষী মৃতপ্রায় হইয়া উর্দ্ধমুখে গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়া যাইতেছিল। তদ্দর্শনে কোন কবি সেই চাতককে এক-বিন্দু গঙ্গাজল পান করিয়া জীবন সার্থক করিতে অনুরোধ করিলে চাতক-পক্ষী তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করে। নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কবি ও চাতকের সেই উক্তি ও প্রত্যুক্তি বর্ণিত হইয়াছে। বংশের সুনাম রক্ষা করাই সন্তানের উচিত,—ইহাই এই শ্লোকের কবিতার্থ :—

রে রে চাতক পাতিতোঽসি মকতা গঙ্গাজলে চেত্তদা
পেয়ং নীরমশেষপাতকহরং কাশা সুনজীবনে।
নৈবং ব্রূহি লঘীয়সো যমভয়াদুদ্গ্রীবতামুদ্ধতা
গঙ্গাম্ভঃ পিবতা ময়া নিজকুলে কিং স্থাপ্যতে দুর্যশঃ॥

কবি—রে চাতক! পড়িয়াছ যদি গঙ্গাজলে,
বিন্দুমাত্র কর পান মরিবার কালে।
পাপ তাপ যমভয় না থাকিবে আর,
পক্ষি-জন্ম নাহি হবে,—পাইবে উদ্ধার!
চাতক—বার বার এ কথাটা ব'লো না আমায়,
গঙ্গাজল খাই যদি,—ফল কিবা তায়?
মাথা হেঁট কেবা কোথা বংশে মোর করে?
তাই বলি কেন তুচ্ছ যমভয় তরে
গঙ্গাজল পান হেতু মাথা করি হেঁট
ভরাইতে যাব আমি এই পোড়া পেট?
যে কুলে কলঙ্ক নাই,—সদাই সুনাম,
সে কুলে রাখিয়া যাব কেন বা দুর্নাম?

(১৫)

কিরূপ ছাত্র উত্তম, মধ্যম বা অধম, এবং কিরূপ ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া উচিত বা অনুচিত, তাহাই কোন কবি এই শ্লোকে নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

যশ্চাত্রঃ শ্রুতমাত্রমর্থমখিলং গৃহ্লাতি স শ্রাব্যতাং
যো বেত্তি দ্বিরুদাহৃতং কৃতফলং তত্রাপি বক্তুর্বচঃ।
যস্ত স্পষ্টমনেকশোঽপ্যভিহিতাং নাবৈতি লেখ্যার্থতাং
ধিক্ তং তৎপিতরৌ ধিগেব নিতরাং ধিক্ তদ্গুরুং
গর্দ্দভম্॥
(ভল্লটস্য)

যে ছাত্র শুনিবামাত্র অর্থ বুঝে মনে,
তাহাকেই শিক্ষা দিবে পরম যতনে।
যে ছাত্র দুবার শুনি' অর্থ বুঝে পরে,
তাহাকেও শিক্ষা দেওয়া উচিত নিশ্চয়।
বার বার স্পষ্ট স্পষ্ট ক'রেও শ্রবণ
যে ছাত্র প্রকৃত অর্থ না বুঝে কখন,
ধিক্ সেই ছাত্র, ধিক্ মাতাপিতা তার,
আর শত ধিক্ তার গর্দ্দভ মাষ্টার!

(১৬)

কোন এক সঙ্গতিপন্ন কবি পরম-দারিদ্র্য-গ্রস্ত হইয়া মানের ভয়ে কাহারও দ্বারস্থ হইতে পারেন নাই। পরিশেষ প্রার্থনা করা যখন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল, তখন তিনি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকটে গিয়া নিম্ন-লিখিত শ্লোকে স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন :—

(ক)

নবীনদীনভাবস্থ যাচমানস্য মানিনঃ।
বচোজীবিতয়োরাসীৎ পুরো নিঃসরণে রণঃ॥

হইয়াছে ধনহীন সংসারে যে জন,
অথচ মানের ভয়ে ভীত যার মন,
সে জন কাহারো কাছে ভিক্ষা যদি চায়,
প্রাণে আর বাক্যে তার যুদ্ধ বেধে যায়,—
বাক্য বলে, "থাক প্রাণ! আমি আগে যাই!"
প্রাণ বলে, "থাক বাক্য! আমি আগে ধাই'!"

পূর্ব্বোক্ত কবি যাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে গিয়া উল্লিখিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তিনিও সম্প্রতি দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন; এই হেতু তিনি কৌশল-সহকারে শ্লোকটীর ঈষৎ পরিবর্ত্তন-কল্পনা করিয়া কহিলেন, "আপনার শ্লোকটী অতি সুন্দর হইয়াছে, কেবল ইহার দ্বিতীয় চরণে একটু দোষ আছে, অর্থাৎ ইহাতে একটী 'ব'-ফলা পড়িয়া গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। 'যাচমানস্য' পদের দ্বিতীয় বর্ণে একটী 'ব'-ফলা যোগ করিলেই আমার অভিপ্রায় আপনি বুঝিতে পারিবেন।" এই কথা বলিয়াই তিনি নিম্ন-লিখিত আকারে শ্লোকটীর আবৃত্তি করিলেন :—

(খ)

নবীনদীনভাবস্থ যাচ্যমানস্য মানিনঃ।
বচোজীবিতয়োরাসীৎ পুরো নিঃসরণে রণঃ॥

ধনহীন হইয়াছে যে জন সম্প্রতি,
অথচ মানের ভয়ে ভীত যার মতি,
তার কাছে ভিক্ষা চায় যদি কোন জন,
প্রাণে আর বাক্যে তার বেধে যায় রণ,—
বাক্য বলে "থাক প্রাণ! আগে যাই আমি,"
প্রাণ বলে "আমি আগে যাই, থাক তুমি।"

(১৭)

কোন এক শুষ্ক শ্রীহীন সরোবর এই শ্লোকে মেঘের নিকটে আপনার দুঃখ জানাইতেছে :—

নিষ্পঙ্কং শিশিরেণ ধীবরগণৈর্নিমীলনিষ্কূর্ম্মকং
ব্যাধৈর্নির্বিহগং নিরম্বু রবিণা নির্নালকং দন্তিভিঃ।
নিঃশালূকমকারি শূকরগণৈর্নাম্নৈকমাত্রং সরো
হে জীমূত পুরোপকারকপয়োদানেন মাং পূরয়॥

(বকস্ত)

শিশির ক'রেছে নষ্ট পদ্ম-সমুদয়,
মৎস্য কূর্ম্ম ল'য়ে গেছে ধীবর-নিচয়,
পক্ষি-হীন করিয়াছে যত ব্যাধগণ,
সূর্য্যদেব করিয়াছে সলিল শোষণ,
নালগুলি খেয়ে গেছে যত করিবর,
শালূক খাইয়া গেছে যতেক শূকর;
যত কিছু সার বস্তু সমস্তই গেছে,—
"সরোবর" নাম শুধু পড়িয়া র'য়েছে।
পর-হিত-কর জল করিয়া বর্ষণ
হে মেঘ! আমায় দেহ করহ পূরণ!

(১৮)

কোন বিরহিণী মদনের শরে বিদ্ধ হইয়া মদনকে অনুনয় করিয়া কহিতেছে, "হে মদন! মহাদেব তোমার পরম শত্রু, এই হেতু তুমি আমাকে মহাদেব মনে করিয়াই কি শর-বিদ্ধ করিতেছ? মহাদেবের সহিত আমার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকিলেও আমি মহাদেব নহি।" কবি এই ভাবটী নিম্ন-লিখিত শ্লোকে বিশেষ কৌশল-সহকারে প্রকাশ করিয়াছেন :—

ফণী নায়ং বেণীকৃতকচকলাপো ন গরলং
গলে কস্তূরীয়ং শিরসি শশিলেখা ন কুসুমম্।
ইয়ং ভূতির্নাঙ্গে প্রিয়বিরহজন্মা ধবলিমা
পুরারাতিভ্রান্ত্যা কুসুমশর কিং মাং ব্যথয়সি॥

মাথায় যা দেখিতেছ, তাহা নয় ফণী,
কেশগুলি জড়াইয়া বাঁধিয়াছি বেণী।
গলায় গরল নয়,—কস্তূরী-লেপন,
শিরে নয় শশি-লেখা,—কুসুম শোভন।
অঙ্গে যাহা দেখিতেছ, তাহা ভস্ম নয়,
বিরহ-চিন্তায় দেহ ধবলিমময়।
হর নই, বিরহিণী,—আমি রে মদন!
তবে কেন এত মোরে করিছ পীড়ন?

(১৯)

ভারতবর্ষে কোন্ স্থানের রমণী-গণের কোন্ অঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর, তাহাই কবি এই শ্লোকে নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

হস্তে গৌড়াঙ্গনানাং সুললিতজঘনে চোৎকলপ্রেয়সীনাং
তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে সুঘনবনরুচৌ কেরলীকেশপাশে।
কর্ণাটীনাং কটৌ চ স্ফুরতি রতিপতির্গুর্জ্জরীণাং স্তনেঽসৌ
বাচি শ্রীমাথুরীণাং জনকজনপদদ্বারিনীনাং কটাক্ষে॥

(অর্থটস্ত)

কোথায় কি মদনের অতি প্রিয় স্থান,
এই কবিতায় মিলে তাহার প্রমাণ;—
গৌড়-দেশ-নিবাসিনী নারীর হস্তন,
উড়িষ্যার রমণীর সুঘন জঘন,
তৈলঙ্গ-নারীর রম্য নিতম্ব-প্রদেশ,
কেরল-নারীর নব-ঘন-স্নান কেশ,
কর্ণাট-নারীর কটি পরম শোভন,
গুর্জ্জর-নারীর ঘন পীনোন্নত স্তন,
মথুরার রমণীর বাক্য মনোহর,
মিথিলার রমণীর কটাক্ষ সুন্দর।

(২০)

মানুষ মাতাল হইলে তাহার কিরূপ অবস্থা হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। মাতাল বাবুর প্রতি কটাক্ষ-পাত করাই এই শ্লোকে কবির উদ্দেশ্য :—

পাদ্ভ্যাং পতন্ পতত্যপি হসন্ দোর্ভ্যাং ভজন্নধরং
ভ্রষ্টশ্লেষনিবন্ধনায় বিকলো ন স্যাৎ সমাশ্লিষ্যন্নঃ।
হস্তভ্রান্তমিতস্ততোঽপি মৃগয়ন্নগ্রে স্থিতং চাষকং
জীয়াদ্ ঘূর্ণদপূর্ণভানুনয়নো মাধ্বীকমত্তো জনঃ॥

(কবিচন্দ্রস্ত)

যেতে যেতে পড়িতেছে মাটীর উপরে,
পড়িতেছে,—তবু মুখে হাসি নাহি ধরে!
খাড়া হ'য়ে আর নাহি দাঁড়াতে পারিয়া
আকাশ ধরিতে যায় দুই হাত দিয়া!
কাপড় খসিছে,—চেষ্টা পরিতে বিশেষ,
তথাপি কাপড় পরা নাহি হয় শেষ!
হাত হ'তে পড়িয়াছে সম্মুখে বোতল,
খুঁজিতে খুঁজিতে তবু হইবে পাগল!
সন্ধ্যা বা প্রভাত-কালে সূর্য্যের মতন
লাল লাল চক্ষু দুটী ঘুরে অনুক্ষণ!
এ হেন মাতাল বাবু সকল সময়
থাকুন নেশায় মত্ত,—জয় তাঁর জয়! (ক্রমশঃ)

গমনী *

[শ্রী———]

আজ কয় দিন হইল জামাইয়ের চিঠি আসিয়াছে যে, তিনি এই পূজার ছুটি উপলক্ষে আসিয়া আমার কন্যাকে আপনার কর্ম্মক্ষেত্রে বাসায় লইয়া যাইবেন। আজ তিন বৎসর তিনি অতি অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া চাকুরী করিতেছেন; কিন্তু আমাদের বলার দরকার হয় নাই—তিনি স্বেচ্ছায় আসিয়া আমার কন্যা ও দৌহিত্রগণকে আমার কাছে রাখিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী-পুত্রের শরীর খারাপ যাহাতে না হয়, সে দিকে দৃষ্টি বরাবরই। এবার অনেক চেষ্টা-চরিত্র করিয়া একটু ভাল যায়গা পাইয়াছেন,—সুতরাং ছেলেদের লইয়া যাইবার ইচ্ছা। যে এত বিবেচনা করিয়া কায করিতেছে, তাহার প্রস্তাবে অমত করা যুক্তিযুক্ত নহে ভাবিয়া, আমি সম্মতি জানাইয়া যাবাজীবনকে পত্র লিখিয়াছি। আমি যখন চিঠির উত্তর লিখি, তখন আমার "শরীরের আধখানিকে" এ সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে করি নাই। কেন না, আমার ধারণা, কোন্ মায়ে মেয়ে ঘরে রাখে চিরকাল? আর, 'যে দিন হয়েছে মেয়ে জানি সেই দিন, পরঘরে যাবে মাতা হয়-সুখহীন!' ঐ চিঠি লেখার দু'এক দিন বাদে আহারে বসিলে, গৃহিণী বলিলেন, 'জামাইকে লিখিয়া দাও যে, এখন এত তাড়াতাড়ি মেয়েকে লইয়া যাইবার আবশ্যকতা নাই। এই ছুটীতে আর আর সকলে আসিবে, এই সময়ে—মেয়ে এতদিন রহিল,—এখন চলিয়া যাইবে?' আমি তাঁহার এই মতবাদের খণ্ডন করিতে যাইয়া দেখি, আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীর মনের অবস্থাটা ঠিক যেন এই রকম :—

গিরি, এবার জামাই নিতে এলে
আর উমা পাঠাব না,
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌বো না।
যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার, মারে ঝিয়ে করবো ঝগড়া,
জামাই ব'লে মান্‌ব না।
গিন্নী আমার কেঁদে কয় এ দুঃখ কি প্রাণে সয়
জামাই ম্যালেরিয়ার দেশে দেশে ফিরে
ঘরের ভাবনা ভাবে না।

আমার কথাবার্ত্তার ধরণ দেখিয়া, গিন্নীর যদি জানা থাকিত, ত আমার এই দুই ছত্র শুনাইয়া দিতেন নিশ্চয় :—

তব দেহ হে পাষাণ এ দেহে পাষাণ প্রাণ
এই হেতু এতক্ষণ না হ'ল বিদায়।

তা বলিলেও আমি অটল থাকিতাম; কেন না, আমি একজন দার্শনিক; তায় আবার প্রথম বিভাগে দর্শন-শাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমি গুণ-গুণ করিয়া এই রকম ভাবে philosophise করিতাম :—

তনয়া পরের ধন বুঝিয়া না বুঝে মন
হায় হায় এ কি বিড়ম্বনা বিধাতার।

তা যাই মনে করি, এ কথাটা আমারও মনে হইল,—সকলে এ সময়ে আসিবে, আর, শোভনা এ সময়ে চলিয়া যাইবে। আমি, যাহাদের-যাহাদের আসিবার কথা আছে, তাহাদের

* একটা নূতন কিছু করা হইয়াছে। সকলেই ত আগমনী লেখেন, তাই আমি গমনী লিখিলাম।

ছুটীর প্রথম দিনে আসিয়া পহুঁছিতে লিখিয়া দিলাম। আর আমার পুত্রকে একখানি একটাকার 'তার' পাঠাইলাম যে, অবস্থা এই রকম;—শোভনার সহিত দেখা করিতে চাও ত শীঘ্র আসিবে। এ ছেলেটী উকিল, ছুটীর দরখাস্ত করিতে হইবে না। তবে হাতের কায না ছাড়িয়া, লোকসান করিয়া না আসেন; কেন না যদিও এতখানি বয়স হইল, তবুও 'যার যার গণিপাখি আপনার ধন'; আর ৺দ্বিজেন্দ্রলালের একটা কথা আমার বেদবাক্য বলিয়া বিশ্বাস—'টাকাই হ'চ্ছে কলিকালের পরব্রহ্ম সাকার।' আর এও ঠিক করিয়া রাখিয়াছি যে, যদি কাহারও আসিয়া পহুঁছিতে দেরী হয় ত জামাই বাবাজীকে মাত্র একদিন ও একরাত্রি অধিক থাকিয়া যাইতে বলিব।* জামাই ত আমার তেমন নয়,—অবশ্য আমার এ অনুরোধ রক্ষিত হইবে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস। এক দিনের অধিক থাকিতে বলিতে পারিব না এই জন্য যে, বাবাজীবন ছেলেমেয়েদের লইয়া ৺বারাণসী ধামে পূজনীয়া বেয়ানঠাকুরাণীর শ্রীচরণ বন্দনা করিতে যাইবেন। প্রতি বৎসর তিনি এমন গিয়া থাকেন। তার পর ছুটীর ১২ দিন পথশ্রম সারিয়া, বাড়ীতে দু'দিন থাকিয়া, আবার কর্ম্মস্থানে যাইবেন। যাওয়া-আসার পথও তত সুবিধার নহে। তবে আমার ছোট দৌহিত্র বালসুলভ কল্পনাবলে যে সমুদয় যন্ত্রপাতি তৈয়ার করে, সে সবের সাহায্য পাইলে মিনিটে যাওয়া ও মিনিটে আসা চলে। আর সেই বালক সেই সব যন্ত্র তৈয়ার করিয়া, তৎসাহায্যে মাকে লইয়া বাপের কাছে যাইবে বলিয়া যদি গোঁ ধরিয়া বসে, তাহা হইলে আমার গৃহিণীর মনস্কামনা পূর্ণ হয়। মাও মেয়েকে যখন-তখন দেখিতে পায়।

আজ সকলের আসিবার কথা। আমি সকাল-সকাল উঠিয়া সব কায সারিয়া লইয়াছি। গাড়ী আসিবে বেলা নয়টায়। তখন বড় রোদ। আমি সেই জন্য ষ্টেশনে গেলাম না। যাইতে খুবই ইচ্ছা হইতেছিল। কেন না my affections outwent my haste, and hovered round my little ones with all the rapture of expectation. I already felt my daughter's sons (bowing down to embrace me) and smiled at the joy of my little ones. আমার ছোট দুই ছেলে দাদা ও দিদিদের আনিবার জন্য দু'চাকার গাড়ী করিয়া ষ্টেশনে গিয়াছিল। একজন আগে দৌড়ে গাড়ী চালাইয়া আসিয়া খবর দিল যে, আমার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা মাত্র আসিয়াছে। জামাই আসিয়াছেন। এদের আসা সম্বন্ধে আমি একটু সন্দেহযুক্ত ছিলাম। যেটা আশা করা যায় না, সেটা ঘটিলে মনে যে কত আশার আনন্দ হয়, তা বলা যায় না। আমি আমার একটী নাতীকে বলিলাম গাও ত—

'আজ শুভ নিশি পোহাইল তোমার;
এই যে নন্দিনী আইল
বরণ করিয়া আন ঘরে;
মুখশশী দেখ আসি দূরে যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি সুধারাশি ক্ষরে।

যে ঘরে আমি নাতীকে দিয়া এই গান গাওয়াইতেছিলাম, গৃহিণী তাহার পাশের ঘরেই ছিলেন। 'শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো চুলে ধায় রাণী, বসন না সম্বরে।' আমি বলিলাম "শুন্‌লে ত, উমা এসেছে।" ইহার অল্পক্ষণ পরে গাড়ী আসিয়া আমাদের বাড়ীতে ঢুকিল। জামাতা বাবাজী ও কন্যা আসিয়া আমাদের পাদবন্দনা করিলেন। আমরা আশীর্ব্বাদ করিয়া আদর করিয়া তাহাদিগকে ঘরে বরণ করিয়া লইলাম। আমার গৃহিণীর অবস্থা—

গদ গদ ভাবভরে ঝর-ঝর আঁখি করে,
পাছে করি (আমারে) অমনি কাঁদে গলা ধ'রে।
পুনঃ কোলে বসাইয়া চারু মুখ নিরখিয়া
চুমে অরুণ অধরে।

* * *

তার পর—যত সহচরীগণ, হ'য়ে আনন্দিত মন
হেসে-হেসে এসে ধ'রে করে।
কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে,
এত প্রেম কোথা ভুলে,
কথা কহ মুখ তুলে প্রাণ মরে মরে॥

আমি নবাগত নাতীদের লইয়া আমোদ ও আদর করিতে লাগিলাম। তাহাদের পড়া-শুনা মন্দ হইতেছে না বুঝিতে পারা গেল। অনেকটা পড়া-শুনায় আগাইয়াছে। মুখে-মুখে অনেক অঙ্ক কসিতে পারে। একটীর ইংরেজী সাহিত্যের উপর বড় ঝোঁক; অপরটীর তেমনই ঝোঁক বাংলা ও সংস্কৃতের উপর। আমায় আজ পাইয়া, দাদা

বলিয়া আমার কোলে বসিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া, আমার সঙ্গে কত কথা কহিয়া—আমার আর এরা হর্ষ বর্দ্ধন করিতেছে। ইহাদের জল খাওয়া হইল। চা আগে খাইত। এবারে নূতন এই দেখিলাম যে, জামাই বাবাজীবন ও ইহারা সকলেই চা ছাড়িয়াছেন। আমার কন্যাকে লইয়া তাহার সহচরীগণ কত আনন্দ করিতে লাগিল। তাহাকে খাওয়ান-দাওয়ানর ভার সহচরীগণ লইতে চাহিলেন। তাহাতে কি মার মন শান্ত হয়! গৃহিণী আজ মেয়ের সব নিজ হাতে করিবেন। পাড়ার সকলে আমাদের বেশ একটু স্নেহ করেন; বিশেষ উনাকে। উনা আসিয়াছে, এ কথা শুনিবামাত্র, উমার সমবয়সী যে যেখানে ছিল, সকলে সব কাজ ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

ক্রমে বেলা ১টা হইতে চলিল। ছোট-ছোট ছেলেদের খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। আমিও তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া, আজ শিং ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে ঢোকার মত, তাহাদের সহিত খাইতে বসিয়াছি। জামাইকে আমার সহিত বসিতে দেওয়া হইল না—মেয়েরা তাহার আদর-যত্ন করিবেন। এখনও জামাইয়ের খাওয়া হয় নাই শুনিয়া (উমার সহচরীরা একে-একে যাইয়া, আপনাদের গৃহস্থালীর কাযকর্ম সারিয়া আসিয়া, আবার তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে) আমি একটু অসন্তোষ প্রকাশ করায়, শুনিতে পাইলাম, জামাইকে খাইতে বলা হইয়াছিল—সে বিষয়ে কোনও ত্রুটী হয় নাই। একখানি টেলিগ্রামে ১২।০ টার গাড়ীতে আমার জামাই শোভনাকে লইতে আসিতেছেন জানানোয় তিনি তাঁহার ভায়রাভাইকে আনিবার জন্য গাড়ী তৈয়ার করাইয়া ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছেন।

গাড়ী আসিতে দেরী হইয়াছে। প্রায় তিনটার সময় তিনখানি গাড়ী সারিবন্দী হইয়া আমাদের বাড়ীর ফটক দিয়া প্রবেশ করিল। পুত্র ও জামাতা আসিয়া আমায় প্রণাম করিলেন। আর আসিলেন আমার পুত্রবধূ ও কন্যা। তৃতীয় গাড়ীখানির দরজা তখনও বন্ধ,—ও গাড়ীতে কে আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করায়, কেহ কোনও উত্তর দিল না। আমি দেখিবার জন্য গাড়ীর পাদানির কাছে গিয়া, হাতলে হাত দিয়া দরজা খুলিব, এমন সময় আমার পশ্চাৎ দিক হইতে সজোরে পা ধরিয়া পাদবন্দনা। চাহিয়া দেখি, আমার ভগিনীপতি মহাশয়। সে কি উচ্ছ্বাস! আজ কতদিন বাদে দেখা! কতবার ভগিনীকে আনিবার জন্য লিখিয়াছি—তখন একবারও অনুরোধ রক্ষা করা হয় নাই। এখন উপযাচক হইয়া আসিয়াছেন দেখিয়া বড় আহ্লাদ হইল। আর দেরি সহিল না। দরজা খুলিতেই ভগিনী আসিয়া প্রণাম করিলেন। মার পেটের বোন! এর চেয়ে ভালবাসার, স্নেহের সামগ্রী আছে? তার কত দিন বাদে দেখা। ভগিনী বলিলেন, "দাদা, বউ বেশ করিয়াছ যাহা হউক।" আমি বলিলাম "কেন?" "কাল গাড়ী যখন হাবড়ায় থামিল, তোমার বউ গাড়ীতে উঠিয়াই আমায় প্রণাম করিল। বউ আমাকে চিনিতে পারিয়াছিল—আমি পারি নাই, তা' বউ আর পরিচয় দিল না। আমাদের সঙ্গে খাবার ছিল না—তা' ছেলেদের খাওয়াইল। বলিল, 'আমরাও বামুণের মেয়ে, আমাদের হাতে খেতে কোনও দোষ নাই।' আমি বড় [illegible]র বৌমাকে (তখন কি জানি আমাদের নিজের ঘরের বউ?) খাইতে বলায় বলিলেন, 'আমি গাড়ীতে খাই না।' কোথায় যাইবে কতবার জিজ্ঞাসা করিলাম, তার উত্তর দিলে না। তবে শাশুড়ীর যত্ন বেশ করিয়াছে। আমাদের গাড়ীতে নীচে বিছানা পাতিয়া শুয়াইয়া আনিয়াছে। তা আমার বেশ ভাল করিয়া ঘারপা করিয়া দিয়াছিল। তা' সুরিও একবার আমাদের গাড়ীতে ত এল না, তা' হইলেও বুঝিতাম। আবার সব বিছানাপত্র তুলিয়া বাঁধিয়া, সকালে ছেলেদের খাওয়াইয়া, গাড়ীতে চা তৈয়ার করিয়া দিয়া, চাকরের হাতে পাঠাইয়া দিয়া;—বেশ চালাক চতুর সেয়ানা বউ করিয়াছ। ওঁদের গাড়ীতে খাবারদাবার পাঠাইয়া এমন গোছগাছ করিয়া দিল, যেন ঘরে বসিয়া সব করিতেছে [আমাদের এ গল্প আমার ঘরে বসিয়া হইতেছে; সকলে স্নান করিতে গিয়াছে]; ওঁদের এদিকে আসিবার দরকার হইল না।' [এই সময়ে আমার গৃহিণী ঘরে আসিয়া প্রবেশ করায় ভগিনী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন; গৃহিণী বলিলেন, 'তা' যেন বুঝিলাম—তা ভাইবোনে গল্প করিলে ত হইবে না—একটু দেখাশুনা করিতে হইবে ত?' আমি বলিলাম, 'আমার বোন আসিয়াছে, আমি তার সঙ্গে গল্প করিতেছি—তোমার জামাই, ছেলে, মেয়ে আসিয়াছে দেখগে না। আমি কিছু করিতে পারিব না।' গৃহিণী বলিলেন, 'আর ঠাকুর-জামাইটী কার?') বস্তুতঃ

এত আপনার লোকের আগমনে উল্লসিত পরিজনে
দিবানিশি নাহি জানে
আনন্দে সাগরে।

খাওয়া-দাওয়া সব আমার ভগিনী দেখিলেন। গৃহিণী সাহায্য করিলেন। ভগিনীপতিদের লইয়া শালীরা অনেক কথাবার্ত্তা কহিলেন। আমার কথায় জামাই আজ না যাইয়া একদিন থাকিতে রাজী হইলেন।

রাত্রে গৃহিণী বলিলেন, "সকলে আসিয়াছে, মেয়ে-জামাই আরও দুই দিন থাকুন না।" আমি প্রস্তাবের অযৌক্তিকতা দেখাইয়া দিলাম। বাংলা করিয়া বুঝাইয়া দিলাম—

Hope springs eternal in the human breast.
Man never is but always to be blest.

আরও বলিলাম, আজ যে এত সুখ হইবে তাহা ভাবি নাই। ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা বেশীর আকাঙ্ক্ষা করিতে নাই। আপনার অবস্থায় যে সুখী, তাহার মন প্রশান্ত ও নির্ম্মল।

আজ সকালে পৌত্র পৌত্রী, নাতী নাত্‌নী, ভাগ্নে ভাগ্নীরা সকলে উঠিয়া যেমন সুমধুর স্বরে সানাই বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে, অনেকদিন এমন সুন্দর পোঁ আমাদের বাড়ীতে শুনা যায় নাই। সকলে আমার ঘরে আসিয়া শান্ত হইয়া বসিলে, একে-একে মামী মামী পিসী কাহার জন্য কি আনিয়াছেন, তাহার হিসাব-নিকাস হইতে লাগিল। সকলের চেয়ে যে ছোট, তারই আদর বেশী—তাহার প্রাপ্য বেশী,—সে সকলের চেয়ে বেশী লোকের কোলে চড়িবার অধিকারী। তার সব তাতেই সকলের চেয়ে বেশী হাসি—তার দায়িত্ব আদৌ নাই। আর, যে সকলের চেয়ে বড়, তার অধিকার ও প্রভুত্ব যেমন বেশী, তেমনই তার দায়িত্ব, জবাবদিহি সকলের চেয়ে অধিক। তাহার আদরবত্ন, তাহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা [অবশ্য যদি তিনি ন্যায়ানুযায়ী চলেন] লোকের তত বেশী। এই দুইটী অবস্থা অসমঞ্জস না সমঞ্জস? উপহার দ্রব্য যেমন-যেমন দর্শিত, সঙ্গে-সঙ্গে দত্ত, গৃহীত, অধিকৃত, পরিহিত, ভক্ষিত, ভগ্ন, চূর্ণীকৃত, ছিন্ন হইতে লাগিল। পরে পরস্পরের হাত হইতে কাড়াকাড়ি, মারামারি হইবারও উপক্রম হইলে মধ্যস্থ হইয়া থামাইয়া দিতে হইতে লাগিল। আমি ও গৃহিণীও কিছু-কিছু উপহার-দ্রব্য পাইলাম। ভগিনী আসিবেন—এ খবর ত দেন নাই—সুতরাং তিনি "নবচন্দ্র" (ছেলেরা বলিতে লাগিল) পাইতে লাগিলেন। গৃহিণী নিজের প্রাপ্ত দ্রব্য তাঁহাকে দিতে গেলে আমার ভগিনী তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে লাগিলেন। পরে উপরোধে ঢেঁকি-গেলা গোছ করিয়া যৎসামান্য গ্রহণ করিয়া সকলকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন।

দেখিয়া বড় সুখ হইল যে, আমার পুত্র এবার বড় গোছাল হইয়াছে। তাহাকে যাহা যাহা আনিতে বলা হইয়াছিল তাহা আনিয়াছে। অধিকন্তু না দেখার বলিয়া বেশী কিছু দ্রব্যাদি আনিয়াছে। সে যেখানে ওকালতী করে, সেখানে এক রকম লাল-পাড় কালো খোলের কাপড় তৈয়ার হয়। এ কাপড় লোপ পাইবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া, সে এবারে অনেক জোড়া কাপড় তৈয়ার করাইয়া আনিয়াছে। কাপড়গুলি সুশ্রী, সুন্দর, মোটা, টেকসই। একটু মোটা কাপড় মেয়েরা পরে, এই মত ছেলে পোষণ করে। আজকালকার ফ্যাসানে অতি সূক্ষ্ম-বস্ত্র ও ভাল সেমিজ, সারা সে পছন্দ করে না। বলে যে,—কাপড় পরিলাম, আবার শীতের আবরণও হইল—এই রকম কাপড় পরা চাই। লজ্জা-সরম মেয়েদের যাইতে দিতে নাই। বাড়ীর জন্য খানকয়েক রাখিয়া, বাকী সে পাড়ার সম্পর্কীয় ভগিনীদের মধ্যে বিতরণের জন্য তাহার মাকে দিবে বলিয়া আনিয়াছে। তার ধার জন্য অতি চমৎকার একখানি তসরের কাপড় আনিয়াছে। ভাইদের জুতা জামা কোনও জিনিস আইসে নাই বলিবার যো নাই।

এই এত আনন্দ—এর মধ্যে আজ বৈকালে বিচ্ছেদের কথা ভাবিয়া গৃহিণী ম্রিয়মানা। অথচ এরই সঙ্গে হাসিতেছেন, আমোদ করিতেছেন, সমুদয় তত্ত্বাবধান করিতেছেন—উমা, ছেলেদের দুধ খাওয়া হইল কি না দেখ,—বলিতেছেন; জামাইদের ও ছেলেকে ও নন্দাইকে জল-খাবার দিতেছেন। তাহাদের বাড়ীর (অবশ্য ছেলের বাসার) সব খবর লইতেছেন; কাহারও কথা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন; কাহারও ভাল হওয়ায়,—তা আর হবে না, অমন লোক তার ভাল হবে না ত কি—ইত্যাদি মন্তব্য করিতেছেন। কিন্তু তাঁ যাই করুন, "বিধের হৃদয়ং তস্তা দুঃখি তস্তা ভবস্তদা।" এর মধ্য হইতে একটী মেয়েকে যে আজ পাঠাইয়া দিতে হইবে, এই কথা মনে-মনে তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়া দিতেছে।

অথচ সে ভাব গোপন রাখিয়া কায করিতে হইতেছে। সেই জন্যই না মনে হয়, এ কথা ঠিক—আমি এই আমার এই, এ ভাব ভাবে মূর্খ যেই ;—মনরে ওরে মিছামিছি সার ভেবে।

আমরা আজ সকলে একত্র বসিয়া আহার করিলাম। রান্না চমৎকার হইয়াছিল। তাহার প্রথম প্রমাণ এই যে, কাহারও পাতে কিছু পড়িয়া রহিল না। আজ যদি শ্রীশ্রীকৃষ্ণ আসিয়া 'হাঁড়িতে কি আছে তাই আন' বলিতেন, তাহা হইলে সেই যে সেই এক কণা শস্য, যাহা মুখে দিয়া ও পরে উদর পূরিয়া জলপান করিয়া তিনি মহা ক্রোধী স-শিষ্য মুনির উদর-আধ্মান উৎপাদন করিয়াছিলেন, সে শস্যকণাও পাইতেন না। দ্বিতীয়তঃ আমার মত বুড়াও অনেকবার চাহিয়া খাইলাম। তৃতীয়তঃ ছেলেদের আজ কাল লাগিল না, অথচ সেই অতি কাল জিনিস সহজে কণ্ঠ-নালী দিয়া উদর-গহ্বরে অনায়াসে চলিয়া গেল। ছেলেরা হুস-হাস করিল বটে, চোখে জলও আসিল, তথাপি খাইতে ছাড়িল না। চতুর্থতঃ পাত এমন চাটিয়া-পুটিয়া খাইল যে শুধু জল বুলাইয়া বাসন-কুসান তুলিয়া রাখিলেও চলে, মাজিবার আবশ্যক নাই—এমন পরিষ্কার রহিল।

গৃহিণীর বিরাম নাই। শোভনার সব গুছাইয়া দিতেছেন; তাহার ছেলেমেয়েদের আদর করিতেছেন; মেয়েকে সাজাইতেছেন। অন্যান্য মেয়েরা মায়ের সাহায্য করিতেছে। সকলের মনে আনন্দ, অথচ এই শোভনা চলিয়া যাইবে, তার জন্য কেমন একটা কষ্ট-কষ্ট ভাব। আজ সকলে শোভনার কাছে-কাছে থাকিতেছে; তাহার ছেলেকে কোলে লইয়া নাচাইতেছে। ভগিনীরা, ভাইরা তাহার জন্য কত কি ছোট-খাট উপহার-দ্রব্য আনিয়া দিতেছে। আজ সেই যেন cynosure of neighbouring eyes; পাড়ার মেয়েরা আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিল। তখন ছেলেরা বাহিরে আসিয়া অন্য এক কাযে নিযুক্ত হইল।

একটী ক্যামেরা যথাস্থানে রাখা হইয়াছে। যে কয় জন এবারে একত্র হইয়াছে, তাহাদের ফটোগ্রাফ লওয়া হইবে। দূরে থাকিলেও, অন্ততঃ ছবিতেও আত্মীয়-স্বজনদের মুখ দেখা যাইবে, এই উদ্দেশ্যে ফটো তুলিয়া রাখা। আমাদের সকলের ফটো লওয়া হইল।

তার পর সন্ধ্যার সময় [আমি এই 'তার পর' লিখিয়াছি দেখিয়া আমার গৃহিণী অদ্য, এই প্রবন্ধ লিখিবার দিন, বলিলেন, তোমার প্রবন্ধের কি এই শেষ প্যারা? তা' যদি হয় ত এই 'তার পর' কাটিয়া দাও। আমি বলিলাম, কেন? গৃহিণী বলিলেন—শেষ প্যারায় 'তার পর' দেখিলে আমার মাননীয় শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের লেখা বলিয়া মনে হয়] যাইবার সময় হইল। শোভনা, জামাই ও তাহার ছেলেরা খাইয়া লইয়া কাপড়-চোপড় পরিল। সকলে আসিয়া আমার কাছে দাঁড়াইল—প্রণাম করিল।

আর বৎসর এ-দিনকার কথা মনে পড়িল। সেই স্নেহময় প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা আজ কোথায়! গত বৎসর এই পূজার সময় তোমার পায়ে নত হইয়া পায়ের ধূলা লইয়া, আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইয়া কত না আনন্দে পুলকিত হইয়াছিলাম। মাস ছয় যাইতে না যাইতে মা চলিয়া গেলেন। দুই মামাত ভাই একে-একে অদৃশ্য! তার পর আরও কত স্নেহাস্পদ ও স্নেহাধার আত্মীয়ের বিয়োগ। গত বৎসর বিজয়ার আগে সকলে আসিয়াছিল, কেহ বিজয়া-দশমীর আগে প্রস্থান করে নাই। এবারে শোভনা সকলের আগে ছুটী আরম্ভ হইতে না হইতেই চলিল। গৃহিণী শোভনাকে বিদায় দিতে গিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাহাকে ছাড়িয়াও ছাড়িয়া দিতে চাহেন না। মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন :—

চিরদিন সুখে থাক স্বামীর সদনে,
হাতের নোয়া থাক্ পাল দশ জনে।
রাজরাণী হও মাতা স্বামীর আলয়ে,
জামাই সোণার চক্ষে দেখুক তোমায়
অক্ষয় সিন্দুর মাতা পর পাকা চুলে।

আমার গাড়ী বারান্দার কোলে আসিয়া দাঁড়াইল। সকালে যে নাতীকে গান গাওয়াইয়াছিলাম—জিনিস-পত্র গাড়ীতে উঠাইবার সময় সে আসিয়া আর একজনকে বলিতেছে, দেখ,—দেখ, আজ যদুর চেহারাটা কেমন দেখাইতেছে দেখ, বলিয়া বিজয়ার যে ছবি আছে, তাহাই দেখাইল। একজন একটা যোচকা তুলিতেছে যদু যেন সেই। দেখিয়া সকলে যেমন হাসিল, অমনই তাহার ভারি লজ্জা হওয়ায় সে মুখ নত করিয়া আপনার মায়ের কোলের মধ্যে যাইয়া মুখ লুকাইল। আর এই জন্যই এ-প্রবন্ধের শীর্ষদেশে এই অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দটী সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আলোচনা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

ইংলণ্ডের জাতীয় ধন

(The Nineteenth Century, May, 1918.)

অন্যান্য বহু বিষয়ের ন্যায় যুদ্ধেরও একটা আর্থিক হাতাহাতের দিক আছে। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে যাঁহারা লিপ্ত রহিয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইলে পরচা পোষাইবে কি না,—লাভ হইবে, কি লোকসান হইবে—এ কথাও মধ্যে-মধ্যে তাঁহাদিগকে (অর্থাৎ সেই সকল দেশের রাজনীতিবিৎ ব্যক্তিগণকে) ভাবিতে হইতেছে। এই-রূপ লাভ-ক্ষতির কথা ভাবিয়া মর্ড ল্যান্সডাউন্ এবং তাঁহার ন্যায় অন্যান্য শান্তিবাদীরা ইংলণ্ডকে জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিতে পরামর্শ দিতেছেন।

মিঃ জে, এলিস বার্কার "ম্যাঞ্চেষ্টর গার্ডিয়ান" পত্রে (মে, ১৯১৮) শান্তিবাদিগণের যুক্তি খণ্ডন করিয়া ইংলণ্ডের জাতীয় ধন এবং জাতীয় ঋণের সমালোচনা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, মিঃ বোনার ল পার্লামেণ্টে বাজেট প্রস্তাব উত্থাপন করিবার সময় বলিয়াছিলেন, ১৯১৯ অব্দের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ইংলণ্ডের জাতীয় ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৭৯৮০০০০০০০ পাউণ্ড। যুদ্ধের খরচ এখন বৎসরে ২০০০০০০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইতেছে; পরে আরও বাড়িবার সম্ভাবনা।' যুদ্ধ আরও দুই-এক বৎসর কিম্বা তাহারও অধিক কাল চলিতে পারে। যুদ্ধের পূর্ব্বে হিসাব হইয়াছিল যে, ইংলণ্ডের জাতীয় ধনের পরিমাণ ১৪০০০০০০০০ পাউণ্ড। এইরূপে হিসাবের অঙ্কপাত করিয়া শান্তিবাদীরা আশঙ্কা করিতেছেন যে, শীঘ্র সন্ধি করিয়া না ফেলিলে, ইংলণ্ডকে শেষ কালে দেউলিয়া হইয়া পড়িতে হইবে।

মিঃ বার্কার বলেন, এই জাতীয় ধন ও জাতীয় ঋণের হিসাবের গোড়ার গলদ রহিয়াছে। তাঁহার মতে, জাতীয় ধনের পরিমাণ নির্দ্ধারিত বা নিত্য নহে, উহার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যে সকল লোক লইয়া একটা জাতি গঠিত হয়, তাহাদের প্রত্যেকের সঞ্চিত সম্পত্তি একত্র করিলেই জাতীয় ধনের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় না। ব্যক্তি-বিশেষের ন্যায় একটা জাতির জীবন ক্ষণস্থায়ী হয় না; উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও বটেই; এমন কি, চিরস্থায়ী হইতেও পারে। ("Man's span of life is short. A nation's life is long and it may last for ever. One cannot therefore ascertain the true wealth of a nation by adding up the property of all the short-lived citizens of the present. The wealth of a nation is not fixed. It is not stationary. On the contrary, it is subject to growth and decline as is the nation itself.")

যুদ্ধ চালাইবার জন্য ইংলণ্ডকে অনেক টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আবার অন্য মিত্র রাজ্যসকলকে ঋণ দিয়া সাহায্যও করিতে হইতেছে। রুসিয়াকে এইরূপে অনেক টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল। রুসিয়ার গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন হওয়ায় এবং সেখানে সাম্যবাদ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, এই টাকা আদায় হইবে কি না, সে সম্বন্ধে একটু গোলযোগ চলিতেছে। তবে অন্য রাজ্যগুলির নিকট হইতে বোধ হয় সমস্ত টাকা আদায় হইতে পারে। মিঃ বার্কার বলেন, জাতীয় ঋণ দুই রকম। ঘরের লোকের নিকট হইতে যে টাকা ধার লওয়া হয়, তাহা এক জিনিস; আর বাহিরের লোকের কাছে ঋণী থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। সুখের বিষয়, ইংলণ্ডের অধিকাংশ ঋণ ঘরের লোকের কাছে। সুতরাং মোটামুটি ইংলণ্ডের 'কাগুজে' ধন ও 'কাগুজে' ঋণ (paper money and paper debt) প্রায় সমান। কিন্তু আসল ধন ও আসল ঋণ (real wealth and real debt) আলাদা জিনিস। প্রবন্ধ লেখক ধন উৎপাদক বিষয়-গুলিকেই প্রকৃত ধন বলিয়া গণ্য করিতেছেন ("the real wealth of the country which consists in the great wealth-creating resources such as fields, factories, mines etc.) কতটা যতদিন ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে, এবং যতদিন ধনোৎপাদক যন্ত্রগুলি বজায় থাকিবে, ততদিন কোন আশঙ্কা নাই। যে সকল স্থলে এই সকল ধনোৎপাদক যন্ত্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, কিম্বা তাহাদের কার্য্য বন্ধ রাখিতে হইয়াছে,—তা কি শান্তির সময়, কি যুদ্ধবিগ্রহের সময়—সেই সকল স্থলে জাতির বা দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। লেখক এইখানে কয়েকটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "Great Britain cannot be ruined by her paper debt, however large it may ultimately be, but she may be ruined by the loss of her wealth-creating resources."

একটা জাতির প্রকৃত ধন কি তাহা জার্ম্মাণরা জানে। সেই জন্য যুদ্ধ ঘোষিত হইতে-না-হইতে তাহারা অগ্রসর হইয়া বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের এবং রুসিয়ার কয়লা ও লৌহ-উৎপাদক প্রদেশগুলি দখল করিয়া লইয়াছে এবং সহজে তাহা ছাড়িবেও না। রুমানিয়ার তৈলের খনিগুলি দখল

করিবার তাহাদের উদ্দেশ্যও তাই। যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে গ্রেট-বৃটেনকে তাহার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। তাহা হইলে যুদ্ধ-ব্যয় সরবরাহ করা খুব সহজ হইয়া পড়িবে। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ড যদি পরাজিত হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করে, তাহা হইলে জার্ম্মাণী ফ্রান্সের যে দশা করিয়াছে, ইংলণ্ডেরও সেই দশা করিবে। তাহারা সম্ভবতঃ সমস্ত ইউনাইটেড কিংডম এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া কেলিবে, আয়র্লণ্ড দখল করিবে; আর বৃটিশ কয়লার খনিগুলি ত তাহারা সর্ব্বাগ্রেই অধিকার করিয়া বসিবে। এই একটীমাত্র খনির সম্পত্তির মূল্য, প্রতি টন ১০ শিলিং হিসাবে; ১০০,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত তথাকথিত জাতীয় সম্পত্তির ছয় গুণ। যুদ্ধে গ্রেট-বৃটেনের জয়লাভ হইলে, খরচ যতই হউক না কেন, এবং যত টাকাই ঋণ গ্রহণ করিতে হউক না কেন, প্রকৃত জাতীয় ধন বজায় থাকিলে, সমস্ত খরচ পোষাইয়া ঋণ পরিশোধ করা যাইবে। ("If the war should end in Britain's victory, the cost of the struggle, however great, will appear small to future generations for the wealth of nations tends to increase at an ever-growing rate. That seems to be an economic law.")

পূর্ব্বাপর যেমন হইয়া আসিতেছে, তদনুসারে, লেখক বলেন, প্রত্যেক জাতিরই লোকসংখ্যা দিন-দিন বাড়িয়া যাইতেছে; এবং তাহার ফলে, তাহাদের ধন-সৃষ্টির শক্তিও বাড়িতেছে; আর পক্ষান্তরে, টাকার মূল্য দিন-দিন কমিয়া যাইতেছে। যত দিন সভ্যতা বজায় থাকিবে, তত দিন এই দুইটি জিনিসও বজায় থাকিবে। টাকার মূল্য কমিয়া যাওয়ার ফলে, বৃটেনের সমর ঋণের পরিশোধ বৎসর-কতকের মধ্যে অর্দ্ধেক,—হয় ত বা বারআনা ভাগ কমিয়া যাইতে পারে। এই কথাটি লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে না বলিয়া, লেখক তাহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে, কয়েক শতাব্দী ধরিয়া টাকার মূল্য ক্রমাগত কমিতেছে। তাহার প্রমাণ স্বরূপ লেখক প্রফেসর থোরোল্ড রোজার্সের (Prof Thorold Rogers) *History of Agriculture and Prices in England* নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে। শ্রমজীবীদের পারিশ্রমিকও সেই হারে বাড়িতেছে। সেই মধ্য যুগ হইতে টাকার মূল্য কমিতেছে, এখনও তাহার নিবৃত্তি নাই।

অর্থশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন যে, খনি হইতে অধিক পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য উত্তোলিত হওয়ায়, বাজারে সোণা-রূপার আমদানী বেশী হইয়া টাকার মূল্য কমিতেছে। লেখকের মতে তাহা একটা কারণ হইতে পারে, কিন্তু প্রধান বা একমাত্র কারণ নহে। তাঁহার মতে, মূল্য-বৃদ্ধির প্রধান কারণ, পৃথিবী-ভুক্ত লোকের অর্থপ্রিয়তা। ব্যবসায়ীরা তাহাদের দ্রব্যাদির দাম বাড়াইয়া দিয়া, এবং শ্রমজীবীরা অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের দাবী করিয়া টাকার মূল্য কমাইয়া দিতেছে। এরূপ অবস্থা চলিতে থাকিবেই; এবং তাহার ফলে সমর-ঋণের পরিমাণ অর্দ্ধেক বা সিকিতে পরিণত হইবে।

উন্নতিশীল জাতির জাতীয় ধনের পরিমাণ অপরিমিত। জাতীয় ধনের পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল তাঁহাদের সময়ের ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমষ্টি নির্ণয় করিয়াছেন মাত্র,—প্রকৃত জাতীয় সম্পত্তি (যাহার পরিমাণ করা যায় না) তাহা স্পর্শ করিতেও পারেন নাই। মুলহলের (Mulhall's) *Dictionary of Statistics* গ্রন্থে ইউনাইটেড কিংডমের জাতীয় ধনের পরিমাণ এইরূপ দেখা যায়—

ইংলণ্ডের জাতীয় ধন।

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে Pettyর হিসাব অনুসারে	ইংলণ্ড ও ওয়েলসের জাতীয় সম্পত্তির মূল্য	২৫০০০০০০০ পাঃ,
১৭০৩ খৃঃ Davenantএর হিসাবে		৪৯০০০০০০০ পাঃ,
১৭৭৪ খৃঃ Youngএর হিসাবে		১১০০০০০০০০ পাঃ,
১৮০০ খৃঃ Beeke & Edenএর হিসাবে	গ্রেটবৃটেনের	১৭৫০০০০০০০ পাঃ,
১৮১৪ খৃঃ Colquhounএর হিসাবে	ইউনাইটেড কিংডমের	২১৯০০০০০০০ পাঃ,
১৮২২ খৃঃ Lord Liverpoolএর হিসাবে		২৮০০০০০০০০ পাঃ,
১৮৩০ খৃঃ Pablo Pebrerএর হিসাবে		৩৭৫০০০০০০০ পাঃ,
১৮৪১ খৃঃ Porterএর হিসাবে		৪১০০০০০০০০ পাঃ,
১৮৪৫ খৃঃ Giffenএর হিসাবে		৪১১৩০০০০০০ পাঃ,
১৮৭৫ খৃঃ	ঐ	৮৪৪৮০০০০০০ পাঃ,
১৮৮৫ খৃঃ	ঐ	১০০৩১০০০ ০০ পাঃ,
১৯০০ খৃঃ	ঐ	১৫০০০০০০০০ পাঃ,
১৯০৩ খৃঃ ঐ বৃটিশ এম্পায়ারের জাতীয় ধন		২২৪৫০০০০০০ পাঃ,

অর্থাৎ ১৬৬০ খৃঃ ইংলণ্ডের জাতীয় সম্পত্তির মূল্য যত ছিল, ১৯০৩ খৃঃ উহার মূল্য তাহার ৬০ গুণ। ১৮০০ হইতে ১৯০৩ অব্দের মধ্যেই উহা ৮ গুণ বাড়িয়াছে।

Mulhall ফ্রান্সের জাতীয় ধনের পরিমাণ এইরূপ অনুমান করেন—

১৭৮৮ খৃঃ	Lavoisierএর হিসাবে	১৫২০০০০০০০ পাঃ,
১৮১৪ খৃঃ	Chaptalএর হিসাবে	১৮০ ০০০০০০ পাঃ,
১৮৪০ খৃঃ	Girardinএর হিসাবে	৪ ০০০০০০০০ পাঃ,
১৮৭১ খৃঃ	Wolowskiর হিসাবে	৭০০০০০০০০ পাঃ,
১৮৭৮ খৃঃ	Leroy Beaulieuএর হিসাবে	৭৫২০০০০০০০ পাঃ,
১৮৮৪ খৃঃ	Guyotএর হিসাবে	৮৪৮০০০০০০০ পাঃ,

১৮১৪ হইতে ১৮৮৪ খৃঃ মধ্যে ফরাসী নাগরিকদিগের জাতীয় ধনের পরিমাণ ৫ গুণ বাড়িয়াছে।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয়ই জাতীয় সম্পত্তির মূল্য-বৃদ্ধি দুই কারণে ঘটিয়াছে—লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত ধন-সৃষ্টির শক্তি-বৃদ্ধি এবং টাকার মূল্য হ্রাস। ১৮১৪ খৃঃ ১০ শিলিং দিলে যে জিনিস মিলিত, এখন

তাহার জন্য এক পাউণ্ড দিতে হয়; অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে টাকার মূল্য অর্দ্ধেক কমিয়াছে। নেপোলিয়নের সময়ে ইংলণ্ডের যুদ্ধ-ঋণের পরিমাণ ৮৪০৮৪০৪৯১ পাউণ্ড ছিল। টাকার মূল্য হ্রাস নিবন্ধন এখন তাহার পরিমাণ ৪২০৪২০২৪৫ পাউণ্ড মাত্র। এই হিসাবে ১৯১৮ অব্দের সমর-ঋণের পরিমাণও ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের আমলে কমিয়া যাইবে।

এই যে জাতীয় ধন, ইহা কেবল লোকের 'সঞ্চিত' ধনের সমষ্টি মাত্র; —তাহাদের আয় স্বতন্ত্র। সঞ্চিত ধনের ন্যায় লোকের উপার্জ্জনও ক্রমবর্দ্ধনশীল।

ইউনাইটেড কিংডমের অধিবাসীদের আয়ের সমষ্টি।

১৮৮৪ অব্দে Sir Louis Malletএর হিসাবে	১২৮৯০০০,০০০ পাঃ,
১৮৮৪ অব্দে Prof. Leone Levi'র হিসাবে	১২৭৪০০০০০০ পাঃ,
১৮৮৪ অব্দে Prof. Arthur Marshallএর হিঃ	১১২৪০০০০০০ পাঃ,
১৯০৪ অব্দে Chiozza Moneyর হিসাবে	১৭১০০০০০০ পাঃ,
১৯০৬ অব্দে A. L. Bowleyর হিঃ	১৮০০০০০০০ পাঃ,
১৯০৭ অব্দে উৎপন্ন দ্রব্যের লেক্সাস অনুসারে	২০০০০০০০০ পাঃ,
১৯১৩-১৪ অব্দে সম্ভবতঃ ২৪০০০০০০০ পাঃ দাঁড়াইয়াছিল।	

এই হিসাব হইতে দেখা গেল, লোকের সঞ্চিত ধন এবং আয় বাড়িয়া চলিয়াছে, এবং টাকার মূল্যও কমিতেছে। সুতরাং সমর ঋণ পরিশোধ করা কিছুমাত্র কষ্টকর হইবে না। তাহার আর একটা প্রমাণ, বৃটিশ জাতির টাক্স দিবার ক্ষমতা বাড়িতেছে। ১৮১৫ অব্দে টাক্স হইতে ৭২১১০৫১২ পাউণ্ড পাওয়া গিয়াছিল; ১৯১৭-১৮ অব্দে ৭০৭২৩৪৫৬৫ পাউণ্ড পাওয়া গিয়াছে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে যাহা টাক্স আদায় হইয়াছিল, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তাহার তিনগুণের অধিক টাক্স আদায় হয়; এবং ১৯১৭-১৮ অব্দের টাক্সের পরিমাণ ১৮১৫ অব্দের ১০ গুণ। অর্থাৎ শতবর্ষে বৃটেনের অর্থবল দশগুণ বাড়িয়াছে।

আগামী শতবর্ষেও কোন্ না এইরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইবে? তাহা হইলে, লেখক আশা করিতেছেন, ২০১৭ অব্দে ইউনাইটেড কিংডমের জাতীয় ধনের পরিমাণ ১৫০০০০০০০০০ পাউণ্ড, বাৎসরিক আয় ৯৪০০০০০০০০ পাউণ্ড এবং প্রয়োজন হইলে বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ ৭০০০০০০০০ পাউণ্ড হইতে পারে। বর্ত্তমান যুদ্ধের ব্যয় যতই হউক, বর্ত্তমান লোকদিগের পৌত্র-প্রপৌত্রাদির আমলে ইহা নগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

মিঃ মার্কার বাইনহিল সেকুরীর পূর্ব্ববর্ত্তী এক সংখ্যায়, প্রবন্ধান্তরে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বৃটিশ শ্রমজীবীদের দ্বারা—ইঞ্জিনের শক্তি বাড়াইয়া—উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ তিনগুণ বাড়াইতে পারা যায়। তাহার ফলে জাতীয় ধনের পরিমাণ ১৪০০০০০০০০ পাউণ্ডের স্থলে ৪৪০০০০০০০০ পাউণ্ড এবং আয়ের পরিমাণ ২৪০০০০০০০০ পাউণ্ডের স্থলে ৭৪০০০০০০০০ পাউণ্ডে পরিণত করা যায়।

ঐ জাতীয় ধন—১৪০০০০০০০০ পাউণ্ডের উল্লেখ করিয়া, এবং যুদ্ধ-ঋণের সঙ্গে তাহার তুলনা করিয়া, যুদ্ধের বেসাতিতে লোকসানের সম্ভাবনায় যাঁহারা হতাশ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া লেখক বলিতেছেন, ইংলণ্ডের খনিতে ১০০০০০০০০০০ টন কয়লা আছে; তাহার মূল্যই ১০০০০০০০০০০ পাউণ্ড। এই কয়লা বিক্রয় না করিয়া কল-কারখানার ইঞ্জিনে পোড়াইলে, ইহার আপেক্ষিক মূল্য যতগুণ বাড়িয়া যাইতে পারে। মূল্যহীন মৃত্তিকা হইতে এ্যালুমিনিয়ম, ক্লোরিন, জাহাজ অথবা খুব মূল্যবান পোসিলেন প্রস্তুত হইতে পারে। তার পর লেখক আশার বাণীর প্রচার করিয়াছেন—

আমরা এই সবে বুবেরের ভাণ্ডারে হাত দিয়াছি ("We have only begun to exploit the riches of the world. We may soon succeed in harnessing the tides. The economic possibilities of the future are unlimited")

জাতীয় সম্পদ-ই চারিটী বিষয়ের উপর নির্ভর করে—রাজ্যের বিস্তৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, লোক সংখ্যা এবং তাহাদের কার্য্যক্ষমতা। ইউনাইটেড কিংডমের পরিমাণ সীমাবদ্ধ হইলেও, তাহার উপনিবেশগুলি তাহার অপেক্ষা শতগুণ বড়। তাহাদের প্রাকৃতিক সম্পদ এখনও কেহ সন্ধান করিয়া দেখে নাই। এই সকল উপনিবেশে শ্বেতকায় অধিবাসীদিগের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তত্রত্যস্থানের প্রাকৃতিক সম্পদ সংগৃহীত হইবে, এবং উপনিবেশগুলি কালে সমর-ঋণের বৃহত্তম অংশ গ্রহণ করিবে।

ইউনাইটেড ষ্টেটসের লোক-সংখ্যা এবং জাতীয় ধনবৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া লেখক বলিতেছেন, দুই শতাব্দীর মধ্যে কানাডার লোক সংখ্যা ফ্রান্সের অপেক্ষা অধিক হইবে। কানাডায় যে কয়লার ভাণ্ডার আছে, তাহা ফ্রান্সের অপেক্ষা ৭০ গুণ বড়, এবং সমগ্র ইউরোপের কয়লার খনিসমূহে যত কয়লা আছে, একা কানাডায় তদপেক্ষা বেশী কয়লা আছে।

লেখক আমেরিকার উন্নতির কথায় মুক্তকণ্ঠ—"The wonderful growth of the United States in population and wealth is largely due to the energy of the American people and to the solid common-sense and enterprise of their rulers. The American Governments have surveyed, mapped and classified with the greatest care the natural resources of the country. * * * * In matters economic the Americans have not followed the British policy of drift and neglect, * * but a far-sighted policy of wise and energetic action." "British economic policy .... is unnational, cosmopolitan."

আমেরিকার ন্যায় বৃটেনের কেন ধন-বৃদ্ধি হইতেছে না, তাহার উল্লেখ করিয়া লেখক দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, In the sacred name of economic liberty they (the capitalist, the

middlemen and the speculators) were allowed to exploit and to destroy the productive industries and the strength of the country." এই শ্রেণীর লোকদের প্রতি লেখক অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি, ইহাদিগকে swindlers of every kindএর দলে ফেলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই সঙ্গে, লেখক যাহাদের পক্ষ লইয়া এতক্ষণ ওকালতী করিতেছিলেন, এইবার তাহাদিগকেও আক্রমণ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না—"The British manufacturers and their workers, acting like greedy middlemen and scheming speculators, have consistently followed the disastrous policy of creating an artificial scarcity, of restricting output to the utmost, in the hope of obtaining illegitimate profits."

তার পর আবার আমেরিকার নানা ঐশ্বর্য্যের উল্লেখ করিয়া লেখক বলেন, ২০০০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার আয়ের মূল্য ১০০,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড এবং ২১০০ খৃষ্টাব্দে ১৮০ ০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড হইতে পারে।

ইহা হইতে লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য যখন চারিটী মহাদেশে বিস্তৃত এবং তাহার পরিমাণ যখন পৃথিবীর চতুর্থাংশ, তখন লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধিতে উৎসাহ দান করিলে এবং শিল্প ও কৃষির দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করিলে, এক শতাব্দী বা দুই শতাব্দী পরে ইহার লোক-সংখ্যা, পণ্য এবং সম্পত্তি ইউনাইটেড ষ্টেটসের সমান হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তাহা হইলে এই সমর-ঋণের টাকা পরিশোধ আসিবে না। এমন কি, তাহা বর্ত্তমান জাতীয় ঋণের অপেক্ষা বেশী হইলেও আশঙ্কার কারণ নাই। "It can easily be borne by future generation. It will scarcely be felt in a decade or two, if the Empire emerges victorious from the struggle, and if its boundless resources are utilised to the full by the policy of encouraging the increase of population and of production."

কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইতে পারে, তাহা পরবর্ত্তী একটী প্রবন্ধে দেখাইবেন বলিয়া লেখক পাঠকগণকে আশ্বাসিত করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের রাজস্ব এতই ক্রমবর্দ্ধনশীল যে, তাহার সীমা-নির্দ্দেশ করা কঠিন। সে যে কিরূপ, তাহা লেখক Sir John Sinclair's *The History of the Public Revenue* নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—

British Government Revenue

রাণী এলিজাবেথের সময়ে	৬০০০০০ পাউণ্ড
প্রথম জেম্‌স	৬০০০০০ পাঃ,
,, চার্লস	৮১৪৮১৯ পাঃ,
কমনওয়েল্‌থ	১৪১৭২৪৭ পাঃ,
২য় চার্লস	১৮০০০০০ পাঃ,
২য় জেম্‌স	২০০১৮৫৫ পাঃ
৩য় উইলিয়ম	৩৮১১, ৫ পাঃ,
রাণী এ্যানী	৫৩৯১৮০৩ পাঃ,
প্রথম জর্জ্জ	৮১৬২৬৪০ পাঃ,
দ্বিতীয় জর্জ্জ	৮৫২২৪৪০ পাঃ,
৩য় জর্জ্জ (১৭৬০)	১৪৪৭২৯৭১ পাঃ,
৩য় জর্জ্জ (১৮০০)	৩৮৭২৮০০০ পাঃ,

১৯/৩-১৪ অব্দে বৃটিশ রাজস্ব ১৯৯০১১০০০ পাউণ্ড ছিল। ১৯১৭-১৮ অব্দে ছিল ৭০৭৫০৫০৫ পাঃ। ১৯১৮-১৯ অব্দে ডিঃ বোনার মন্ত্রীত্বে এষ্টিমেটে ইহার পরিমাণ ৮৫২০০০০০ পাঃ দেখা যাইতেছে।

জার্ম্মাণীর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য

Fortnightly Review, June, 1918.

বর্ত্তমান যুদ্ধ বাধিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৯১৪ অব্দের গ্রীষ্মকালে যখন য়ুরোপীয় রাজ্যসমূহের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী জল্প-কল্পনা চলিতেছিল, তখন অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, যুদ্ধ বাধিবে না; কারণ, জার্ম্মাণীর আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। একটা য়ুরোপীয় যুদ্ধ অনেক টাকার খেলা। অসবলের সঙ্গে প্রচুর বলবল না থাকিলে কোন বুদ্ধিমান রাজাই যুদ্ধে নামিতে ভরসা করেন না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান যুদ্ধের পর জার্ম্মাণী যখন ফ্রান্সের উপর জয়লাভ করিল, তখন তাহার আর্থিক অবস্থা এত হীন ছিল যে, কিছু টাকা ধার করিবার জন্য সে সময়ে জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টকে শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে সুদ দিবার লোভ দেখাইতে হইয়াছিল। তথাপি জার্ম্মাণী সুদে টাকা ধার পায় নাই, আশার অতিরিক্ত পাইয়াছিল। এরূপ স্থলে লোকে যে মনে করিবে যে, জার্ম্মাণী যুদ্ধে নামিতে ভরসা করিবে না, ইহা বিচিত্র নহে।

কিন্তু সেই জার্ম্মাণী পুরা চারি বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চালাইতেছে, এখনও তেমন কাবু হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে না। জার্ম্মাণী এই কয় বৎসর ধরিয়া এত বড় একটা যুদ্ধে কেবল যে নিজের খরচ চালাইয়া আসিতেছে তাহা নয়, তাহার গরীব মিত্রগণ—অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক, বুলগেরিয়াকে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিতেছে। তাহা ছাড়া জার্ম্মাণীর আরও অতিরিক্ত খরচ আছে। এই কয় বৎসর ধরিয়া নিরপেক্ষ রাজ্যগুলিকে ঘুষ দিবার জন্য জার্ম্মাণীকে গোপনে অনেক টাকা খরচ করিতে হইতেছে।

যে জার্ম্মাণীর আর্থিক অবস্থা ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এতটা হীন ছিল, সেই জার্ম্মাণী এত বড় যুদ্ধের খরচের টাকা কোথা হইতে যোগাইতেছে? "পোলিটিকাস্" এই ছদ্ম নামে একজন লেখক বর্ত্তমান বর্ষের Fortnightly Review নামক সাময়িক পত্রের জুন সংখ্যায় এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহাতে বলাবলি আর নাই বলিলেও চলে। এই সুযোগে Politicus মহাশয় নিরপেক্ষ ভাবে

এই বিষয়ের আলোচনায় আশা করিতেছেন ("Hence the moment seems favourable for making a brief and impartial inquiry into the nature and causes of the wealth of Germany.")। লেখকের মতে বর্ত্তমান সময়টি এই অনুসন্ধানের পক্ষে খুবই উপযুক্ত; কেন না, "it is frequently but rather rashly, asserted, and very widely believed, that Germany will be ruined if she should lose the war," এবং জার্ম্মাণীর অবস্থা এমন দাঁড়াইবে যে, "no indemnity, and certainly no adequate indemnity, can be expected from her even if the Allies should gain a complete victory."

নানা মুনির নানা মতের সমালোচনা করিয়া লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই সকল মত অন্ধের 'হস্তী-দর্শনের' ন্যায়। বস্তুতঃ, জার্ম্মাণীর আধিক সমৃদ্ধির কারণ একটা নহে, অনেকগুলি কারণের সমবায়ে ইহা ঘটিয়াছে ("As a rule, great economic phenomena are due, not to a single cause, but to a number of causes.")। সে কারণগুলি কি? না,—"Expert Government, an able, well-organised and conscientious administration, good railways and canals, a fiscal policy designed not for vote-catching purposes, but for purely economic ends, and a good education have all powerfully contributed to making Germany efficient and prosperous.")। কেবল ইহাই যথেষ্ট নয়। জার্ম্মাণীর প্রাকৃতিক ধনভাণ্ডারও অফুরন্ত। সেই সকল প্রাকৃতিক সম্পত্তির মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়টিই উল্লেখযোগ্য।—

১। য়ুরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কয়লা, পটাশ ও লৌহের খনিগুলি জার্ম্মাণীতে অবস্থিত।

২। "A geographical configuration most favourable development of agriculture and industry," জার্ম্মাণীর ভৌগোলিক অবস্থান কৃষি ও শিল্পের উন্নতির পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

৩। জার্ম্মাণীর স্বাভাবিক জলপথগুলি অতুলনীয়; এই পথ দিয়া সকল দিকে বাহির হওয়া যায়।

৪। য়ুরোপের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত বলিয়া সামরিক অভিযান চালাইবার পক্ষে জার্ম্মাণীর যেমন সুবিধা আছে, বাণিজ্য চালাইবার পক্ষেও ইহার অবস্থান তেমনি সুবিধাজনক ("An invaluable strategical position in the centre of the continent which is as helpful for commercial conquest as for military aggression.")। এই সকল প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও জার্ম্মাণী লোকদিগকে কাযে লাগাইতে পারিত না, যদি না সে পরিশ্রম-বাঁচানো কলকব্জার উদ্ভাবন করিতে পারিত, এবং সেই সকল কল-কব্জা চালাইবার জন্য প্রচুর শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিত। শক্তি উৎপাদন করিতে হয় বা বিদ্যুৎ চাই। বিদ্যুৎ কয়লা হইতেও উৎপন্ন হয়, নদীগর্ভে জলপ্রপাত হইতেও উৎপাদিত হইতে পারে। জার্ম্মাণীতে কিন্তু জলপ্রপাতের সংখ্যা অত্যন্ত কম। সেইজন্য তাহাকে প্রধানতঃ কয়লার উপর নির্ভর করিতে হয়। এ বিষয়ে জার্ম্মাণীর খুবই সুবিধা। জার্ম্মাণীতে য়ুরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম কয়লার খনি আছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ওটাওয়া (Ottawa) নগরে যে International Geological Congress বসিয়াছিল, তাহাতে পৃথিবীর কোন্ দেশে কত কয়লা উৎপন্ন হয়, তাহার একটা হিসাব প্রদত্ত হইয়াছিল। তদনুসারে য়ুরোপের কোন্ দেশে কত কয়লা পাওয়া যায় তাহার তালিকা এইরূপ—

জার্ম্মাণী	৪২০০৫৩০০০০০০ টন
গ্রেটবৃটেন ও আয়র্লণ্ড	২৮৯৪৫৮০০০০০০ "
রুষিয়া	৩০১০৩০০০০০০ "
অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী	৪৯২৩৯০০ ০০০ "
ফ্রান্স	১৭৪৮৩০০০০০০ "
বেলজিয়ম	২২০০০০০০০০০ "
স্পেন	৮৭৩৮০০০০০০ "
পীডমর্ব্বেন	৮৭৪০০০০০০০ "
হলণ্ড	৭৭০২০০০০০০ "
বলকান রাজ্য সকল	১১৪০০০০০০ "
ইটালী	২৪৩০০০০০০ "
সুইডেন, ডেনমার্ক ও পর্টুগাল	১৮৪০০০০০০ "
মোট—	৭৮৪১৯২০০০০০০ "

ইহার অর্থ এই যে, ১৯১৩ অব্দে (যুদ্ধের পূর্ব্বে) জার্ম্মাণ রাজ্যের সীমার মধ্যে, য়ুরোপের সমস্ত কয়লার অর্দ্ধেকেরও অধিক কয়লা উৎপন্ন হইত।

বর্ত্তমান সভ্য জগতে কয়লার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী, তাহা না বলিলেও চলে। বস্তুতঃ, খনিজ পদার্থ সকলের মধ্যে কয়লা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ—সোণা, রূপা, হীরা, মাণিক কোনটাই ইহার সমান নহে। সেই কয়লার ভাণ্ডার য়ুরোপের মধ্যে জার্ম্মাণীরই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এই কয়লার মূল্য, খনির মুখে, খুব কম করিয়া ধরিলেও, প্রতিটন ১০ শিলিং হিসাবে ২১১৪৭৮০০০,০০০ পাউণ্ড। অর্থাৎ, ১৯১৩ অব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের যুদ্ধ ব্যয় যাহা হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে, তাহার ত্রিশ গুণ। ইংলণ্ডের জাতীয় ধন বলিয়া যাহার উল্লেখ করা হয়, জার্ম্মাণীর এই কয়লার মূল্য তাহার চৌদ্দ গুণ ("and about fourteen times as large as what is usually called the National Wealth of the United Kingdom.") ইহা হইতে লেখক সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, লোকে যে বলে জার্ম্মাণী গরীব দেশ, বাস্তবিক সে তত গরীব নয়। ইহার পর লেখক জার্ম্মাণীর কয়লার ভাণ্ডারের তুলনা করিয়া তাহার আপেক্ষিক মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য অনেক কালি, কলম, কাগজ খরচ করিয়াছেন; এবং তাহা

হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কেবল শক্তি-উৎপাদন করিয়াই জার্মাণীর কয়লার কাজ শেষ হইয়া যায় না। এই কয়লা প্রধানতঃ bituminous শ্রেণীর, আলকাতরা, পিচ, তৈল, এ্যামোনিয়া, বিস্ফোরক, রং, ঔষধ প্রভৃতি ইহার byproductsএর মূল্য মোটের উপর বড় অল্প নয়।

কয়লার পরই লৌহ উল্লেখযোগ্য। শক্তি উৎপাদনে যেমন কয়লার প্রয়োজন, কলকব্জা, কারখানা, জাহাজ, প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে সেইরূপ লৌহের প্রয়োজন। সেই লৌহের খনিও জার্ম্মাণীরই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ১৯১০ অব্দে ষ্টকহোম (Stockholm) নগরে International Geological Congressএর যে অধিবেশন হয়, তাহাতে Iron Ore Resources of the World বলিয়া যে তালিকা প্রদর্শিত হয়, তাহাতে য়ুরোপের লৌহখনির অবস্থা এইরূপ ছিল—

Resources of Metallic Iron Contained in Iron Ore.

Iron Resources of Europe.

	Actual Reserves	Potential Reserves
	টন	টন
জার্ম্মাণী	১৭৭০০ ০০০০	
ফ্রান্স	১১৪০০০০০০০	
সুইডেন	৭৪০০০০০০০	
ইউনাইটেড কিংডম	৪৫০০০০০০০	
রুষিয়া	৩৮৭২০০০০০	
স্পেন	৩৪৯০০০০০০	
নরওয়ে	১২৪০০০০০০	
অষ্ট্রিয়া	৯০৪০০০০০	
লাক্সেম্বার্গ	৮০০০০০০০	
গ্রীস	৪৫০০০০০০	
বেলজিয়ম	২৪০০০০০০	
হাঙ্গেরী	১৩১০০০০০	৩৪১০০০০০
ইটালী	৩৪০০০০০	১০০০০০০
ফিনল্যাণ্ড	...	১৪০০০০০০
বলকিয়া ও হারজেগোভিনা		১১৫০০০০০
বুলগেরিয়া	... ...	৭০০০০০
সুইজারল্যাণ্ড	৮৫০০০০	৮০০০০০
পোর্টুগাল	... ...	৩৯০০০০০০
মোট	৪৭৩২৮০০০০০	১২০৮৪৬০০০০০

অর্থাৎ জার্ম্মাণীর লৌহ-খনির পরিমাণ ইংলণ্ডের তিনগুণ। ইহার মূল্য প্রতি টন ৫ শিলিং হিসাবে (অবশ্য ইহার সঙ্গে লৌহ মল [Iron Ore] ধরা হইয়াছে) ১০০০০০০০০০ পাউণ্ড। তবে জার্ম্মাণীতে যে লৌহ উৎপন্ন হয়, তাহাতে তাহার সকল অভাব মিটে না। সেই জন্য বিদেশ হইতে তাহাকে শতকরা ২০ ভাগ ক্রয় করিতে হয়।

জার্ম্মাণীর খনিজ লবণের (mineral salts) অভাবও কখনও নহে। তদ্ভিন্ন পটাশ-ঘটিত লবণ (potash salts) না কি পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ("They are so vast that it is impossible to measure them and to estimate their contents. From year to year the known area of her subterranean deposits of salt and potash has been increasing.") এমন কি, ৯০০০ ফিট গভীর ভূগর্ভ খনন করিয়াও কেবল salitই উঠিয়াছে, তাহার তলার মাটীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই সকল লবণ হইতে জার্ম্মাণীর শিল্প, কৃষিকার্য্য ও জমির সারের অনেক সুবিধা হয়। এই পটাশের জোরেই জার্ম্মাণী অনেক প্রকার শস্য উৎপাদন করিয়া লয়। Encyclopaedia Britannica জার্ম্মাণীর এই স্বাভাবিক সারের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন ("Potash manures with few exceptions, are natural products from the potash mines of Stassfurt [Prussia]")। জার্ম্মাণী কেবল যে নিজের ক্ষেত্রে এই সার ব্যবহার করে তাহা নহে—ইহা বিক্রয় করিয়া বিদেশ হইতেও যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। কৃষিক্ষেত্র ছাড়া, কাচের কারখানায়, চকচকে মৃৎপাত্রের কারখানায়, লোহা গালাইবার জন্য, সাবান তৈয়ার করিতে, বিস্ফোরক, সোডা, আলকাতরার রং (coal tar dyes), ক্লোরাইড অব পটাশ, নাইট্রেট অব পটাশ, পার্ম্মাঙ্গানেট অব পটাশ, হাইড্রোব্রোমিক এসিড, অক্সালিক এসিড ইত্যাদি নানা দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পটাশ-ঘটিত লবণ ব্যবহৃত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এই খনিজ লবণ সর্ব্বপ্রথম পাওয়া যায়। সে বৎসর ২১৯০ টন এই জিনিসটি ব্যবহৃত হইয়াছিল। আর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ১৪০৩৯০০ টন মাত্র পটাশ ব্যবহৃত হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণী হইতে এই ধরণের ১০০০০০০০ পাউণ্ড মূল্যের লবণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বিশ্বাস, জার্ম্মাণী যদি সমস্ত পৃথিবীকে ৫০০০ বৎসর ধরিয়া এই লবণ সরবরাহ করে, তবু তাহার ভাণ্ডার শূন্য হইবে না। এইখানে লেখককে কাযেই অনুমানের সাহায্য লইতে হইয়াছে। সে অনুমানের নমুনা এইরূপ—জার্ম্মাণীর খনিতে ৫০০০০০০০০০ টন পটাশ সহজেই পাওয়া যাইতে পারে। প্রতি টন ১০ শিলিং হিসাবে ইহার মূল্য হয় ২৫০০০০০০০০০ পাউণ্ড। ইহা ফ্রান্সের জাতীয় ঋণের দ্বিগুণ।

এই পর্য্যন্ত হিসাব, অনুমান ও সিদ্ধান্তের পর, লেখক হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিতেছেন, ভগবান জার্ম্মাণীর উপর অত্যন্ত পক্ষপাত করিয়াছেন ("Providence has been very kind to Germany. It has endowed the Germans not only with vast and most valuable mineral resources, which have enabled them to create great and exceedingly prosperous manufacturing industries, but it has given them at the same time extremely favourable geographical conditions. The configuration of

Germany is eminently favourable to the development of agriculture and of all the industries. × × × No other country possesses similarly favourable conditions for the development of inland transport by land and especially by water."

উপসংহারে লেখক এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীর প্রাকৃতিক সম্পত্তি—

জমী	২১১৬৭৮০০০০০০
লৌহ	১০০০০০০০০০
পটাশ	২৫০০০০০০০০০
মোট	২৩২৬৭৮০০০০০০

এবং বলিয়াছেন,—

"The figures given indicate that Germany's natural riches are far greater than is believed by those who tell us that Germany's National Wealth comes only to £150000000000, that the country will be ruined if defeated and that she cannot pay a war indemnity and certainly not an adequate one even if the Allies should gain a complete victory."

আমরা দুইখানি সুপ্রসিদ্ধ প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী সাময়িক পত্র হইতে দুইজন বিভিন্ন ইংরেজ লেখক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ৫টী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীর অর্থবলের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলাম। প্রথম প্রবন্ধটি মে মাসের নাইনটীন সেঞ্চুরীতে এবং দ্বিতীয়টি জুন মাসের ফর্টনাইটলী রিভিউতে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং মনে হয়, দ্বিতীয়টি প্রথমটির ভাবের রিসাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়, প্রবন্ধ ৫টীই বলাবলির দুর্গন্ধে পূর্ণ; এক-একটী প্রবন্ধ এক-একটী বলের মতামতের অতিব্যক্তি। একজন যুদ্ধ চালাইবার পক্ষপাতী, অপর জন শান্তিবাদী। সুতরাং এই ধরণের মতামত নির্ব্বিকারে ও বিনা বিচারে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। বলাবলির দুই প্রভাবের বহির্ভূত নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, ইংলণ্ড বা জার্ম্মাণীর ধনবল যেমনই হউক না কেন, বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলাফল ঠিক মত এই দুই রাজ্যের অর্থবলের উপর নির্ভর করিতেছে না। তাল গাছের মত মোটা বুদ্ধি না হইলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের পক্ষ পক্ষে যেমন জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া ও তুরস্ক আছে, মিত্র পক্ষে তেমনি ১৮টি রাজ্য আছে এবং সম্প্রতি আমেরিকা ডনার্ডন মিত্র পক্ষে যোগ দিয়াছেন!

বিজাপুর

[শ্রীজলধর সেন]

এই প্রবন্ধে বিজাপুরের বিস্তৃত ইতিহাসও বিবৃত হইবে না, বা উক্ত রাজ্যের প্রত্নতত্ত্বের গবেষণাও করা হইবে না: কারণ খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সে কার্য্য এমন সুসম্পন্ন করিয়াছেন যে, বিজাপুর সম্বন্ধে নূতন করিয়া আর কিছু বলিবার যে যো আছে, তাহা ত মনে হয় না; বিশেষতঃ লেখক ঐতিহাসিক নহেন; প্রত্নতত্ত্ব ত তাঁহার নিকট ভীষণ-দর্শন। তবে, এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া প্রারম্ভেই বলা ভাল। বোম্বাইয়ের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত হেনরী কুজেন্স বিজাপুর সম্বন্ধে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এবং উক্ত বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা সেই গ্রন্থের একখণ্ড উপহার পাইয়াছি। এই গ্রন্থখানিতে বিজাপুরের অনেকগুলি সুন্দর চিত্র আছে। 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণকে সেই চিত্রাবলির সহিত পরিচিত করাই আমাদের প্রধান বা একমাত্র উদ্দেশ্য। চিত্রগুলি দর্শন করিয়া যদি কাহারও বিজাপুর রাজ্য সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ অবগত হইবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মে, তাহা হইলেই আমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে। চিত্রগুলি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রকাশিত পুস্তক হইতে গৃহীত হইল; এ জন্য বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

এ কথা ঠিক জানি যে, 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে এমন ব্যক্তি অতি কমই আছেন, যাঁহাকে বিজাপুর রাজ্যের চৌহদ্দী বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে। যাঁহারা বিদ্যালয়ের পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসও পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, বিজাপুরের আদিলশাহী বংশীয় মুসলমান অধিনায়কগণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অনেক দিন অভিনয় করিয়াছিলেন,—তাহার পর 'যদুপতেঃ ক গতা' ইত্যাদি!

বিজাপুরের আদিলশাহী বংশের স্থাপয়িতার নাম

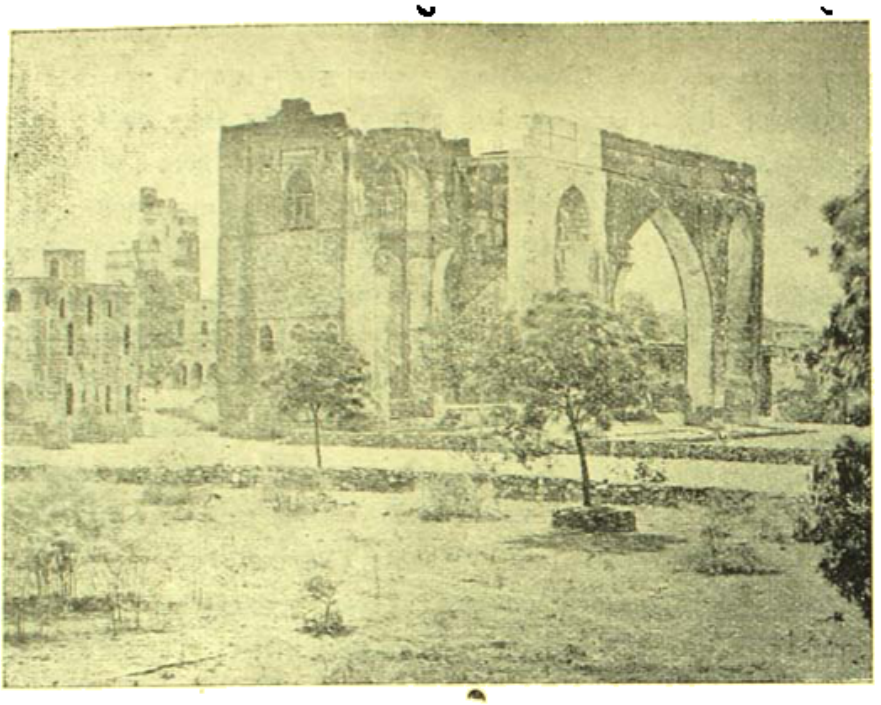

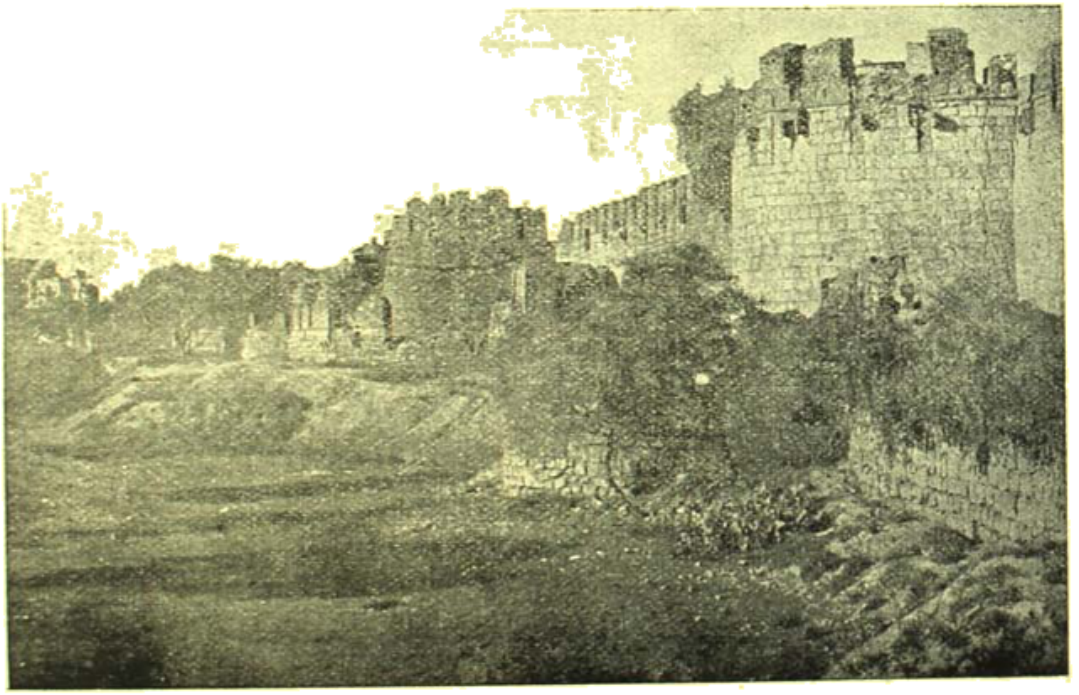

দুর্গ-প্রাচীর

ইউসুফ বেগ। এই ইউসুফ বেগের জন্ম ও বাল্যজীবন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, অটোমান রাজ্যের অধীশ্বর দ্বিতীয় সুলতান মুরাদ পরলোকগমন করিলে (১৪৫১ খৃঃ) সেই রাজ্যের নিয়ম অনুসারে রাজ্যের উত্তরাধিকারী জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতীত অন্য পুত্রগণের বিনাশ-সাধন সময়ে কোন রাজকর্ম্মচারীর চক্রান্তে একটী পুত্রকে গোপনে স্থানান্তরিত করা হয়; এবং সেই শিশুকে একেবারে ভারতবর্ষে চালান করা হয়। এ দেশে আসিয়া নানা

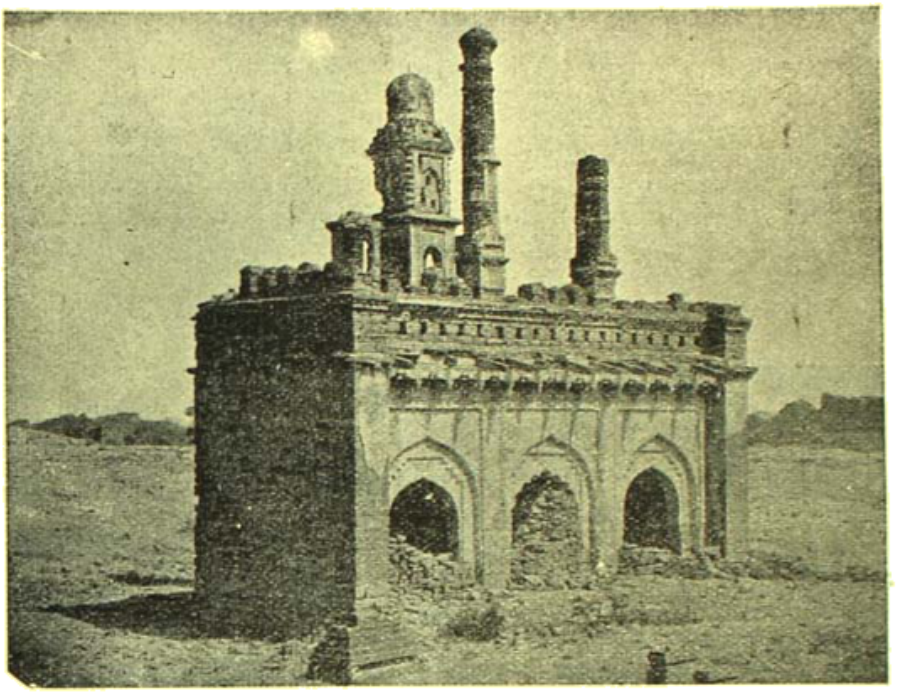

ইখ্‌লাস খাঁর মসজিদ

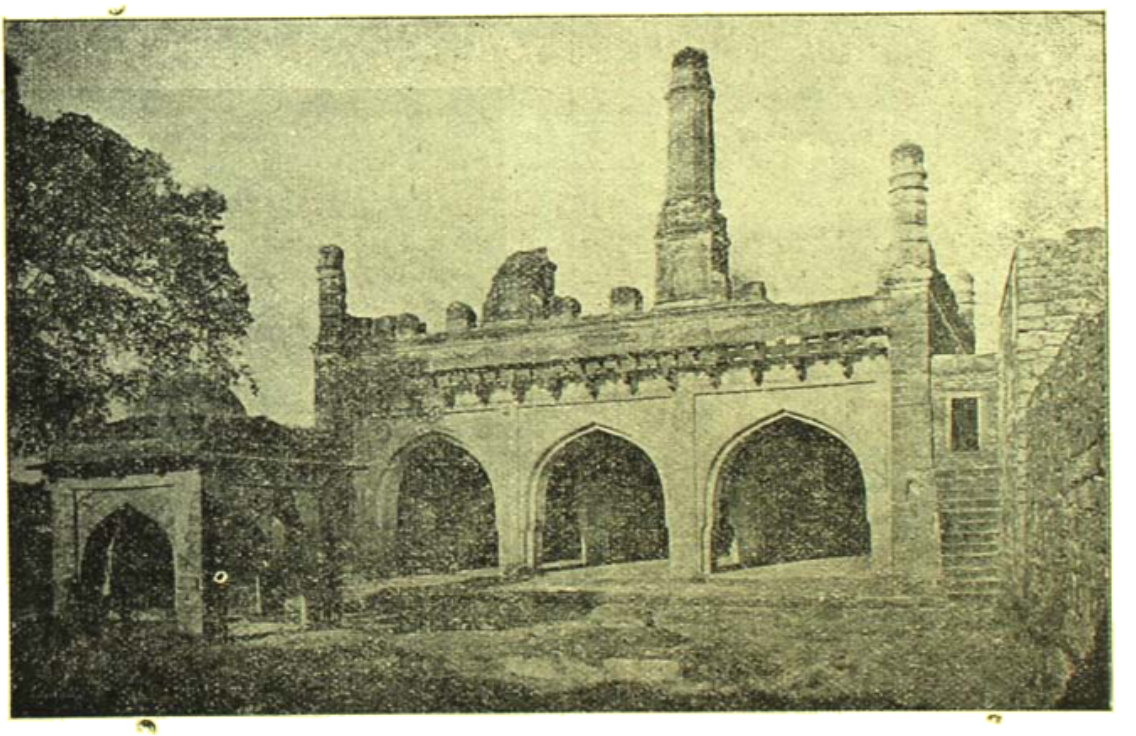

ইব্রাহিমের পুরাতন দুল্লা মসজিদ

অবস্থা-বিপর্য্যয়ের পর সে দাক্ষিণাত্যে বিদর রাজ্যে উপস্থিত হয় এবং রাজার অধীনে সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হয়; ক্রমে কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিয়া সে রাজার প্রিয়পাত্র হয় এবং অবশেষে বিজাপুর প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং কিছুদিন পরে প্রভুর আনুগত্য অস্বীকার করিয়া ইউসুফ স্বাধীন রাজা হয়।

আবার কেহ বলেন, ইউসুফ সাভা প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা মামুদ বেগের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তিচ্যুত

ইব্রাহিমপুর মসজিদ

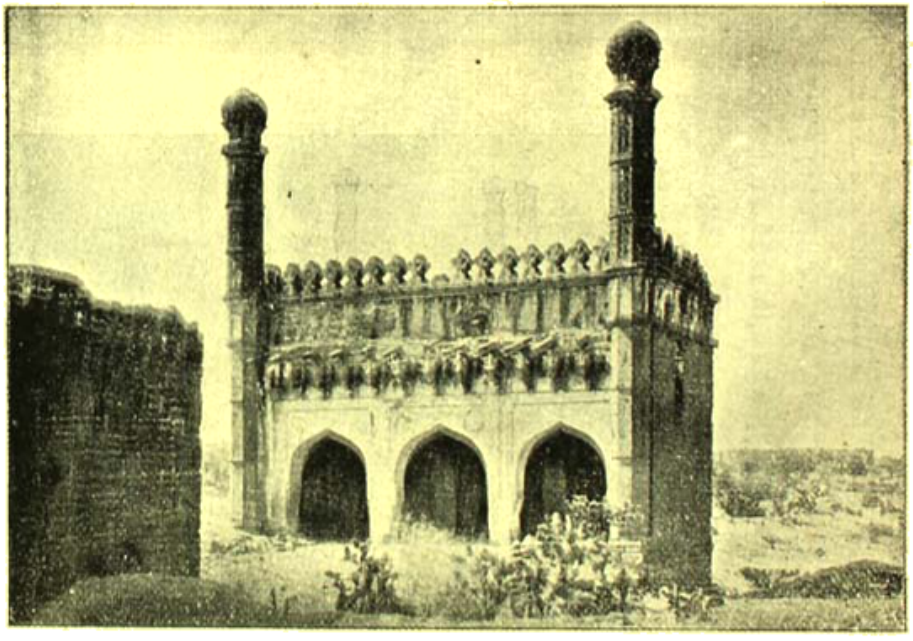

রঙ্গীন মসজিদ

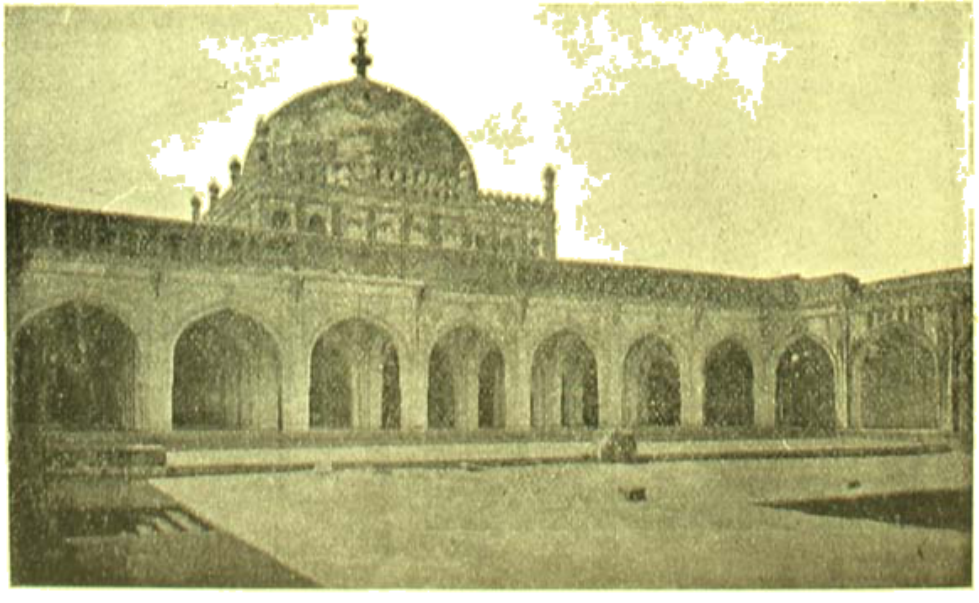

মাইবিবী মসজিদ

জামি মসজিদ পশ্চাৎ দৃশ্য

জামি মসজিদ পশ্চিম দৃশ্য

জামি মসজিদ

আইন-উল্-মুল্কের সমাধি ও মস্‌জিদ

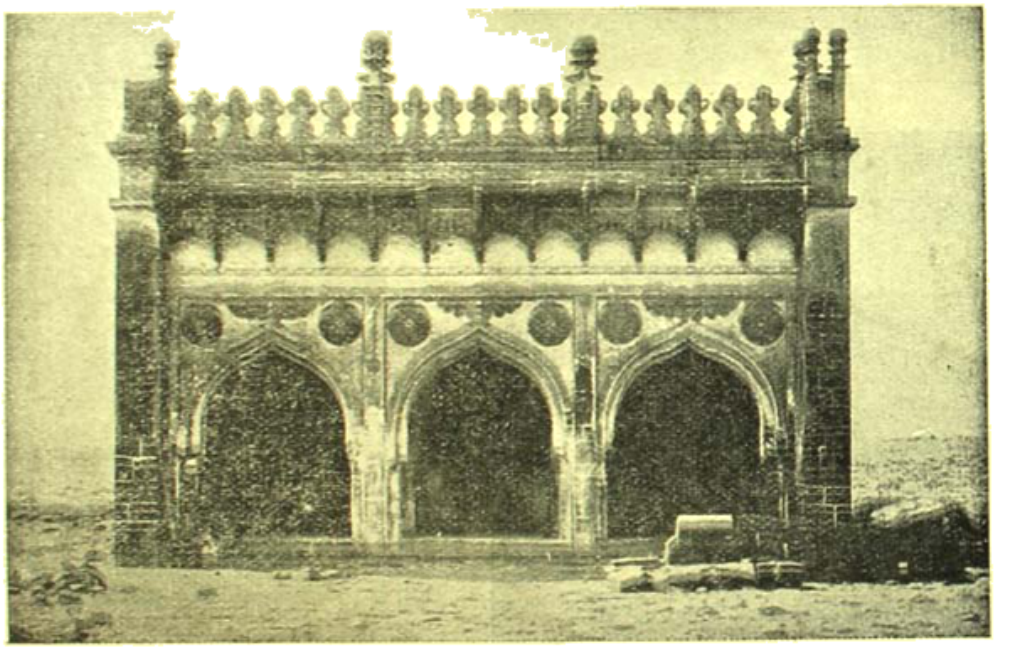

আইনাপুরে আইন উল্ মুল্কের মস্‌জিদ

হইয়া বালক ইস্পাহান দেশে চলিয়া যায়; তাহার পর পুনরায় ভারতবর্ষে আসিয়াছিল।

সে যাহাই হউক, ইউসুফ যে বিদরের রাজার প্রসাদে বিজাপুরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন এবং বিদররাজই তাঁহাকে 'আদিল খাঁ' উপাধি প্রদান করেন। তাহার পর তিনি যখন স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন (১৪৮৯ খৃঃ), তখন হইতে এই বংশের নাম আদিলশাহী বংশ হয়।

এই আদিলশাহী রাজগণের সহিত আহমদনগরের নিজামশাহী ও গোলকুণ্ডার কুতবশাহী রাজগণের আবহমান কাল যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছিল; আবার গৃহবিচ্ছেদ-জনিতও অনেক মারামারি-কাটাকাটি হইয়াছিল; তাহার বিবরণ

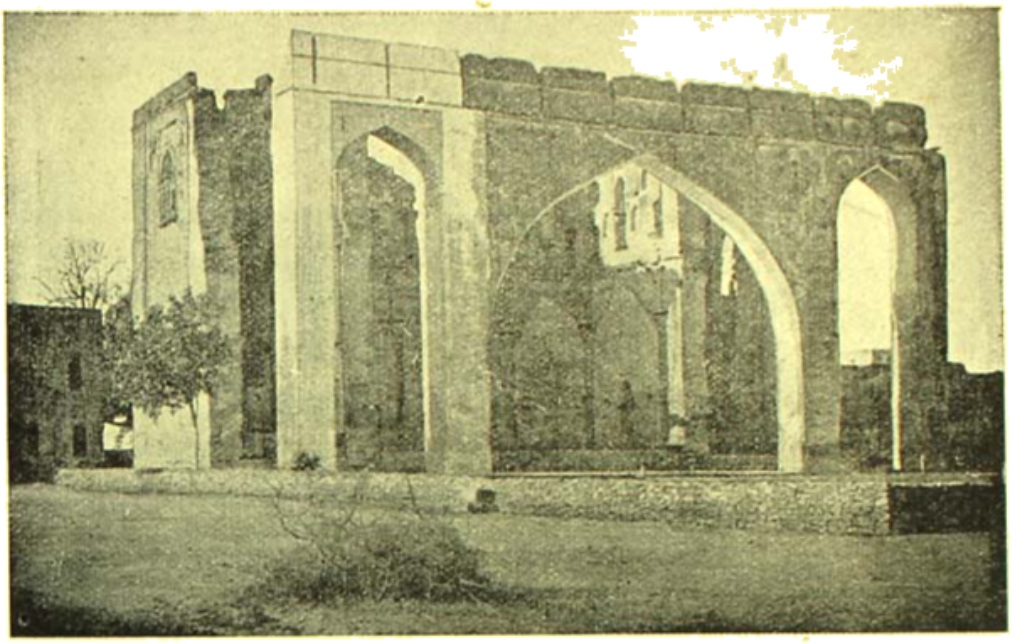

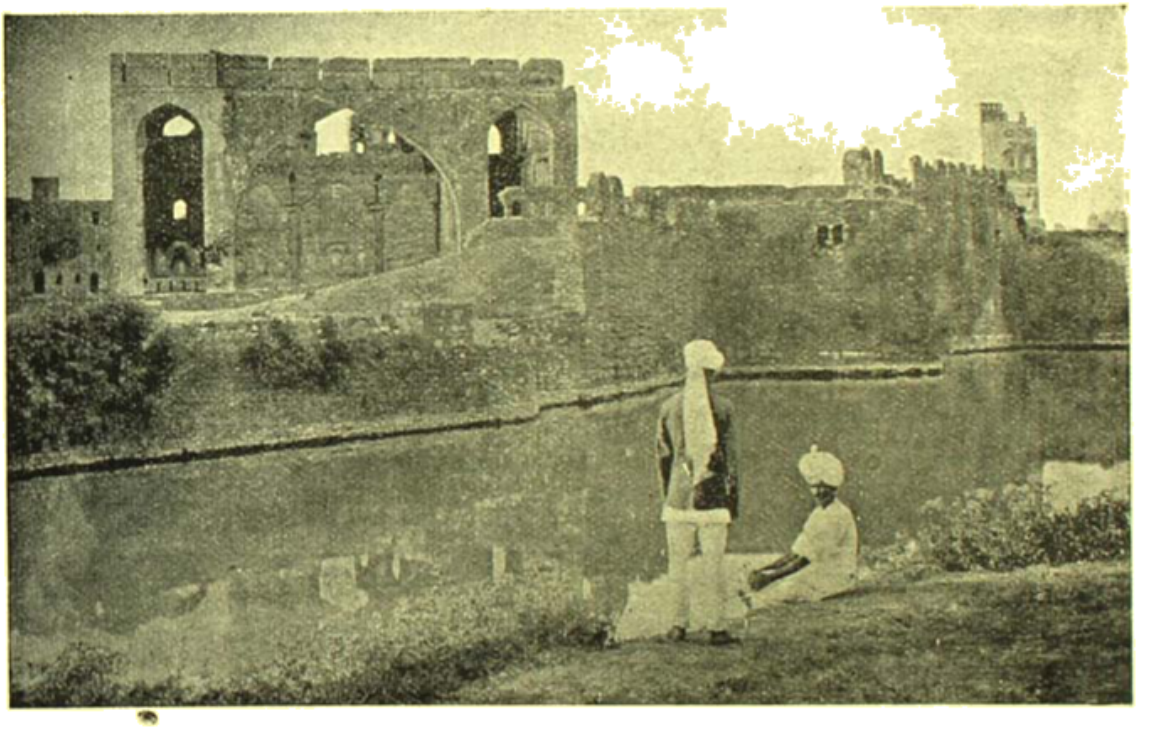

গগনমহল ও গড়বাই

দিতে গেলে আর একটা প্রবন্ধে কুলায় না; সুতরাং সে ভার ইতিহাসের উপরই ন্যস্ত করা গেল।

এই বিজাপুর রাজ্য মুসলমান আমলেই স্থাপিত হয় নাই; তাহার পূর্ব্বে হিন্দু আমলেও এ রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। চালুক্যবংশের একখানি শিলালিপিতে বিজয়পুরা নাম আছে। কে কাহাকে জয় করিয়া এ স্থানের নাম বিজয়পুরা রাখিয়াছিল, তাহার বিবরণ আমরা জানি না। সেই বিজয়পুরা হইতেই মুসলমান আমলে এই রাজ্যের নাম বিজাপুর হইয়াছে।

ইউসুফ আদিল শাহের পর তাঁহার পুত্র ইস্‌মাইল

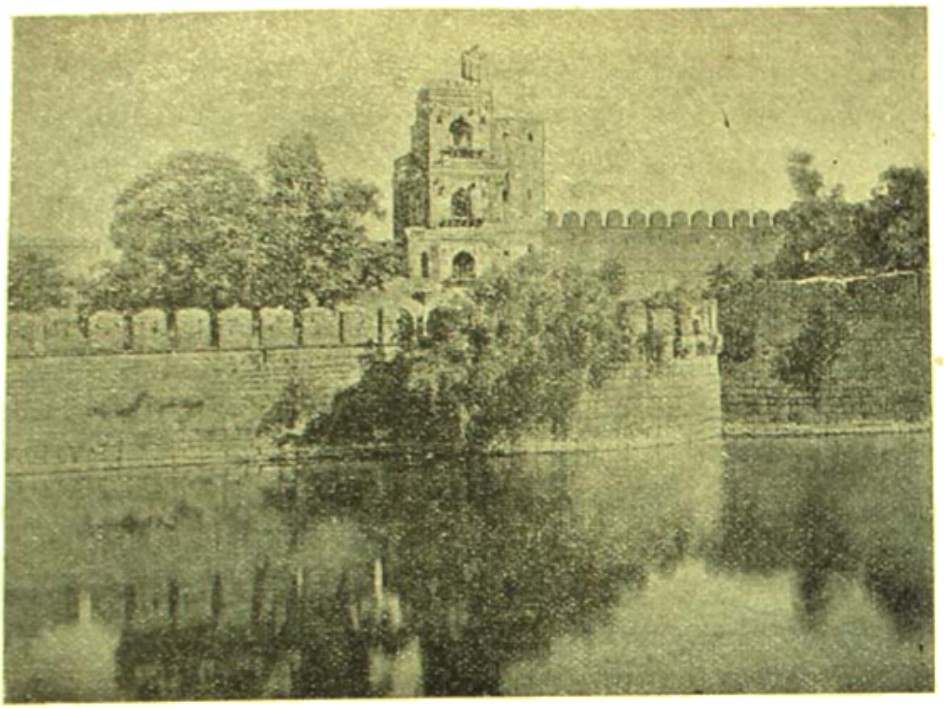

১০ হাসের পুকুরের দক্ষিণ মসজিদ ও গড়খাই

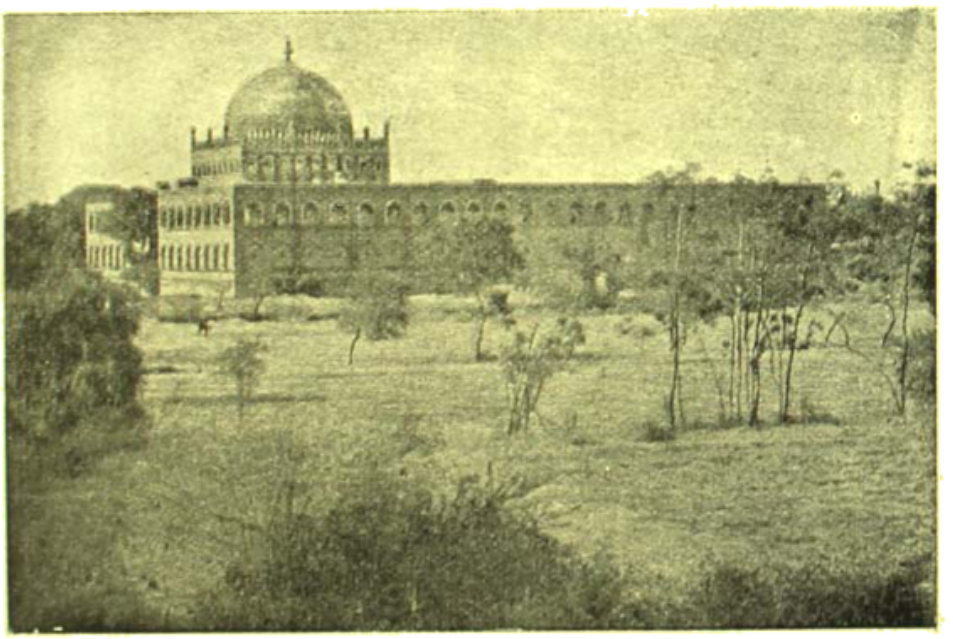

দক্ষিণ পশ্চিমদিক হইতে জুম্মা মস্‌জিদ

আদিল শাহ রাজা হন; তাঁহার পর মাল্লু আদিল, তাঁহার পর ইব্রাহিম আদিল শাহ, তাঁহার পর আলি আদিল শাহ রাজা হন। ইঁহাদের আমলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করাও এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। তবে আলি আদিল শাহ সম্বন্ধে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। এই আলি আদিল শাহই ইতিহাস-বিখ্যাতা বীররমণী চাঁদ সুলতানার স্বামী। চাঁদ সুলতানা অহমদনগরের রাজা হুসেনের কন্যা। আলি আদিল শাহের সহিত অহমদনগর রাজের যখন মিত্রতা হয়, সেই সময় চাঁদ সুলতানার সহিত আলির বিবাহ হয়। এই বীররমণী অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকিতেন না; কি

যুদ্ধ-বিগ্রহে, কি রাজ-কার্য্য পরিচালনে, সকল সময়েই তিনি স্বামীর পার্শ্বে থাকিতেন; এবং আলি সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। চাঁদ সুলতানার ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, তিনি অনেক সময় অসি-হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে পর্য্যন্ত অবতীর্ণা হইয়াছেন। তাঁহার বীরত্বকাহিনী, তাঁহার কার্য্যকুশলতা, মোগলদিগের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ এবং গুপ্তশত্রুর অস্ত্রাঘাতে তাঁহার জীবনাবসানের ইতিহাস সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। ঔরঙ্গজেব বাদশাহ বিজাপুর রাজ্য জয় করিবার জন্য পূর্ব্বে অনেক সেনানায়ক প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। অবশেষে ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর তাঁহার করতলগত হয়, আদিলশাহী রাজ্যের শেষ নরপতি সিকন্দার বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে নীত হন, এবং বিজাপুরের আদিল শাহী বংশের রাজত্ব লোপ হয়,—বিজাপুর মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আর একটা কথা বলিলেই বিজাপুর রাজ্যের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় শেষ হয়। বিজাপুর কিছুদিন মোগলদিগের হস্তগতই থাকে। তাহার পর নিজাম-উল্-মুল্‌ক যখন স্বাধীন হন, তখন তিনি বিজাপুরে আধিপত্য বিস্তার করেন (১৭২৯)। তাহার পর ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য পেশোয়ার হাতে যায় এবং এই সময়েই বিজাপুরের অতুলনীয় সৌধরাজি শ্রীহীন হইতে থাকে; মারাঠাগণ বিজাপুরের মনোরম প্রাসাদ, মস্‌জিদ প্রভৃতি শ্রীভ্রষ্ট করিতে থাকেন। এখন তাহার ভগ্নাবশেষ যাহা আছে, তাহারই চিত্র প্রদর্শিত হইতেছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর রাজ্য সেতারার রাজার অধিকার-ভুক্ত হয়। তাহার পর এই প্রদেশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। এখন বিজাপুর বোম্বাই প্রেসিডেন্সির একটী জেলা। বিজাপুর নগরই এই জেলার প্রধান স্থান। এখানে ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ আছেন; এবং অন্যান্য সরকারী আফিসও আছে। আর আছে এখনও আদিল-শাহী বংশের কীর্ত্তিচিহ্ন বহু প্রাসাদরাজি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে Madows Tailor সাহেব এই বিজাপুর নগর দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"Mournful as it is, the picturesque beauty of the combinations of the buildings, the fine old tamarind and peepul trees, the hoary ruins, and distant views of the more perfect edifices, combine to produce an ever-changing and impressive series of landscapes."

তাহার পর আর একজনের কথা তুলিয়া দিতেছি। James Douglas নামক একজন সদাশয় ইংরেজ ১৮৮৯ অব্দে বিজাপুর ভ্রমণ করিয়া গাইওনিয়র পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"The Bijapur which we see to-day is not the Bijapur which Ferishta saw in 1589, exactly three hundred years ago. We now see its ghost."

অর্থাৎ ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে ফেরিস্তা যে বিজাপুর দেখিয়াছিলেন, আর আজ আমরা যে বিজাপুর দেখিতেছি, তাহা এক নহে; আমরা এখন সেই বিজাপুরের প্রেতমূর্ত্তি দেখিতেছি।

কিন্তু এখনও বিজাপুরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া ভ্রমণকারী বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে চাহিয়া থাকেন এবং যখন এই নগরী সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তখন ইহার কি শ্রী ছিল, তাহাই মানস চক্ষে দেখিতে থাকেন।

আমরা এই প্রবন্ধের সহিত আদিলশাহী আমলের আর কয়েকটী প্রাসাদের চিত্র দিলাম। ভবিষ্যতে বিজাপুরের অন্যান্য চিত্রও প্রকাশিত করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীকান্তর ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

রাজলক্ষ্মী আমার ওষুধ লইতে সেই সাজেই আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমি লাফাইয়া উঠিয়া, তাহার প্রতি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া, থিয়েটারী গলায় কহিলাম, "ওরে পাষণ্ড রোহিণি! তুই গোবিন্দলালকে চিনিস্ না? আহা! আজ যদি আমার একটা পিস্তল থাকিত! কিম্বা একখানা তলোয়ার!"

রাজলক্ষ্মী শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, "তা'হলে কি করতে? শুন?"

হাসিয়া বলিলাম, "না ভাই পিয়ারি, আমার অতবড় নবাবী সখ নেই। তা-ছাড়া, এই বিংশ শতাব্দীতে এমন নিষ্ঠুর রাক্ষসাধম কে আছে যে, সংসারের এই এতবড় একটা আনন্দের খনি পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেবে! বরঞ্চ আশীর্বাদ করি, হে বাইজীকুলরাণি! তুমি দীর্ঘজীবিনী হও,—তোমার রূপ ত্রিলোক-জয়ী হোক্, তোমার কণ্ঠ বীণা নিন্দিত এবং ঐ দুটি চরণ-কমলের নৃত্য উর্ব্বশী-তিলোত্তমার গর্ব্ব খর্ব্ব করুক্,—আমি দূর হইতে তোমার জয় গান করিয়া ধন্য হই!"

পিয়ারী কহিল, "এ সকল কথার অর্থ?"

বলিলাম, "অর্থমনর্থং! সে যাক্। আমি এই একটার ট্রেণে বিদায় হলুম। সম্প্রতি প্রয়াগ, পরে বাঙালীর পরম তীর্থ চাকুরি-স্থান—অর্থাৎ বর্ম্মা। যদি সময় এবং সুযোগ হয়, দেখা করে যাবো।"

"আমি কোথায় গিয়েছিলুম তাও শোনা তুমি আবশ্যক মনে করো না?"

"কিছু না, কিছু না।"

পিয়ারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি কি আমার ওপর যা ইচ্ছে তাই অত্যাচার করতে পারো?"

কহিলাম, "যা ইচ্ছে? একেবারেই না। বরঞ্চ, জ্ঞানে-অজ্ঞানে অত্যাচার যদি বিন্দুমাত্রও কখনো করে থাকি, তার জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্চি।"

"তার মানে আজ রাত্রেই তুমি চলে যাবে?"

"হাঁ।"

"আমাকে বিনা অপরাধে শাস্তি দেবার তোমার অধিকার আছে?"

"না, তিলমাত্র নেই। কিন্তু আমার যাওয়াকেই যদি শাস্তি দেওয়া মনে কর, তা'হলে অধিকার নিশ্চয়ই আছে।"

পিয়ারী হঠাৎ জবাব দিল না। আমার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমি কোথায় গিয়েছিলুম, কেন গিয়েছিলুম শুনবে না?"

"না। আমার মত নিয়ে যাওনি, যে, ফিরে এসে তার কাহিনী শোনাবে। তা' ছাড়া, আমার সে সময়ও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।"

পিয়ারী আহতা ফণিনীর ন্যায় সহসা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "আমারও শোনাবার প্রবৃত্তি নেই। আমি কারও কেনা বাঁদী নই যে, কোথায় যাবো, না যাবো তারও অনুমতি নিতে হবে। যাবে, যাও।" বলিয়া রূপ ও অলঙ্কারের একটা তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গাড়ী ডাকিতে গিয়াছিল। ঘণ্টাখানেক পরে সদর দরজায় একখানা থামিবার আওয়াজ পাইয়া ব্যাগটা হাতে লইতে যাইতেছি, পিয়ারী আসিয়া পিছনে দাঁড়াইল!

কহিল, "এ কি তুমি ছেলেখেলা মনে কর? আমাকে একলা ফেলে রেখে চলে যাবে, চাকর-বাকরেরাই বা কি ভাববে? তুমি কি এদের কাছেও আমার মুখ রাখবে না?"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, "তোমার চাকরদের সঙ্গে তুমি বোঝা-পড়া কোরো,—আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই।"

"তা' না হয় হোলো; কিন্তু ফিরে গিয়ে বহুকেই বা আমি কি জবাব দেব?"

"এই জবাব দেবে যে, তিনি পশ্চিমে বেড়াতে গেছেন।"

"এ কি কেউ কখনো বিশ্বাস করে?"

"যাতে বিশ্বাস করে, সেই রকম কিছু একটা বানিয়ে বোলো।"

পিয়ারী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, "যদি অন্যায়ই একটা করে থাকি, তার কি মাপ নেই? তুমি ক্ষমা না কর্‌লে আমাকে আর কে কর্‌বে?"

বলিলাম, "পিয়ারি, এগুলো যে দাসী-বাঁদীদের মত কথা হচ্চে; তোমার মুখে ত মানাচ্চে না।"

এই বিদ্রূপের পিয়ারী সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না, অধোমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে যে প্রাণপণে আপনাকে সাম্‌লাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বাহির হইতে গাড়োয়ান উচ্চৈঃস্বরে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি নিঃশব্দে ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইতেই, এবার পিয়ারী ধপ্ করিয়া আমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া, রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি যে সত্যিকার অপরাধ কখনো কর্‌তেই পারিনে, তা' জেনেও যদি শাস্তি দিতে চাও, নিজের হাতে দাও,—কিন্তু এই একবাড়ী লোকের কাছে আমার মাথা হেঁট করে দিয়ো না। আজ এমন ক'রে তুমি চলে গেলে, আমি কারও কাছে আর মুখ তুলে দাঁড়াতে পার্‌বো না।"

হাতের ব্যাগ্‌টা রাখিয়া দিয়া, একটা চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া কহিলাম, "আচ্ছা, আজ তোমার-আমার একটা শেষ বোঝা-পড়া হয়ে যাক্। তোমার আজকের আচরণ আমি মাপ কর্‌লুম। কিন্তু আমি অনেক ভেবে দেখেচি, দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া আর চল্‌বে না।"

পিয়ারী তাহার একান্ত উৎকণ্ঠিত মুখ আমার মুখের প্রতি তুলিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, "কেন?"

কহিলাম, "অপ্রিয় সত্য সহ্য কর্‌তে পার্‌বে?"

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া অস্ফুটে বলিল, "পার্‌বো।"

কিন্তু, ব্যথা একজন সহিতে স্বীকার করিলেই কিছু ব্যথা দেওয়ার কাজটা সহজ হইয়া উঠে না। আমাকে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে হইল। কিন্তু আজ যে কোনমতেই আমি সঙ্কল্প ত্যাগ করিব না, তাহা স্থির করিয়াছিলাম। তাই, অবশেষে ধীরে-ধীরে বলিলাম, "লক্ষ্মী, তোমার আজকের ব্যবহার ক্ষমা করা যত কঠিনই হোক্, আমি কর্‌লুম। কিন্তু নিজে তুমি এ লোভ কিছুতেই ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বে না। তোমার অনেক টাকা, অনেক রূপ-গুণ। অনেকের উপর তোমার অসীম প্রভুত্ব। সংসারে এর চেয়ে বড় লোভের জিনিস আর নেই। তুমি আমাকে ভালবাস্‌তে পারো, শ্রদ্ধা কর্‌তে পারো, আমার জন্যে অনেক দুঃখ সইতেও পারো, কিন্তু এ মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌বে না।"

রাজলক্ষ্মী মৃদু কণ্ঠে কহিল, "অর্থাৎ, এ রকম কাজ আমি মাঝে-মাঝে কর্‌বই!"

প্রত্যুত্তরে আমি শুধু মৌন হইয়া রহিলাম। সে নিজেও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "তার পরে?"

কহিলাম, "তার পরে একদিন খেলাঘরের মত সমস্ত ভেঙে পড়বে। সে দিনের সেই হীনতা থেকে আজ তুমি আমাকে চিরদিনের মত রেহাই দাও,—তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।"

পিয়ারী বহুক্ষণ নতমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। তার পরে যখন মুখ তুলিল, দেখিলাম, তাহার দু'চোখ বাহিয়া জল পড়িতেছে। আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে কি কখনো কোন ছোট কাজে আমি প্রবৃত্তি দিয়েছি?"

এই বিগলিত অশ্রুধারা আমার সংযমের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিল। কিন্তু বাহিরে তাহার কিছুই প্রকাশ পাইতে দিলাম না। শান্ত দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, "না, কোন দিন নয়। তুমি নিজে ছোট নও,—ছোট কাজ তুমি নিজেও কখনো কর্‌তে পারো না, অপরকেও কর্‌তে দিতে পারো না।"

একটু থামিয়া কহিলাম, "কিন্তু লোকে ত মন্‌সা পণ্ডিতের পাঠশালার সেই রাজলক্ষ্মীটিকে চিন্‌বে না, তারা চিন্‌বে শুধু পাটনার প্রসিদ্ধ পিয়ারী বাইজীকে। তখন সংসারের চোখে যে কত ছোট হয়ে যাবো, সে কি তুমি দেখ্‌তে পাচ্চো না? সে তুমি কেমন কোরে বাধা দেবে বল ত?"

রাজলক্ষ্মী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কিন্তু তাকে ত সত্যিকারের ছোট হওয়া বলে না।"

বলিলাম, "ভগবানের চক্ষে না হতে পারে; কিন্তু সংসারের চক্ষুও ত উপেক্ষা কর্‌বার বস্তু নয় লক্ষ্মী!"

রাজলক্ষ্মী কহিল, "কিন্তু তাঁর চক্ষুকেই ত সকলের আগে মানা উচিত!"

কহিলাম, "এক হিসেবে সে কথা সত্যি। কিন্তু তাঁর চক্ষু ত সর্ব্বদা দেখা যায় না। যে দৃষ্টি সংসারে দশজনের

ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়, সেও ত তাঁরই চক্ষের দৃষ্টি, রাজলক্ষ্মী! তাকেও ত অস্বীকার করা অন্যায়!"

"সেই ভয়ে আমাকে তুমি জন্মের মত ত্যাগ করে চলে যাবে?"

কহিলাম, "আবার দেখা হবে। তুমি যেখানেই থাকো না কেন, বর্ম্মা যাবার পূর্ব্বে আমি আর একবার দেখা ক'রে যাবো।"

রাজলক্ষ্মী প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া অশ্রু-বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "যাবে যাও। কিন্তু আমি যত অপরাধই করে থাকিনে কেন, আমার চেয়ে আপনার লোক তোমার আর নেই। সেই আমাকেই ত্যাগ করে যাওয়া দশের চক্ষে ধর্ম্ম, এ কথা আমি কখনো মান্‌বো না।" বলিয়া দ্রুতবেগে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, এখনো সময় আছে—এখনো হয় ত একটার ট্রেণ ধরিতে পারি। নিঃশব্দে ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া ধীরে-ধীরে নামিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম।

বক্‌সিসের লোভে গাড়ী প্রাণপণে ছুটিয়া ষ্টেসনে পৌঁছাইয়া দিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই পশ্চিমের ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্ম ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। খবর লইয়া জানিলাম, আধ ঘণ্টা পরেই একটা ট্রেণ কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইবে। ভাবিলাম, সেই ভাল,—গ্রামের মুখ বহুদিন দেখি নাই,—সেই জঙ্গলের মধ্যে গিয়াই বাকী দিন কয়টা কাটাইয়া দিব। সুতরাং, পশ্চিমের পরিবর্ত্তে পূবের টিকিট কিনিয়াই অর্দ্ধঘণ্টা পরে এক বিপরীতগামী বাষ্পীয় শকটে উঠিয়া কাশী পরিত্যাগ করিয়া গেলাম।

বহুকাল পরে আবার একদিন অপরাহ্ণ-বেলায় গ্রামে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। আমার বাড়ীটা তখন আমাদের আত্মীয়-আত্মীয়া ও তাঁহাদের আত্মীয়-আত্মীয়ার পরিপূর্ণ। সমস্ত ঘর-দুয়ার জুড়িয়া তাঁহারা আরামে সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন, ছুঁচটি রাখিবার স্থান নাই।

আমার আকস্মিক আগমন ও বাস করিবার সঙ্কল্প শুনিয়া তাঁহারা আনন্দে মুখ কালি করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আহা! এ তো সুখের কথা, আহ্লাদের কথা! এইবার একটি বিয়ে থা' কোরে সংসারী হ' শ্রীকান্ত, আমরা দেখে চক্ষু জুড়োই।"

বলিলাম, "সেই জন্যেই ত এসেচি। এখন আপাততঃ আমার মায়ের ঘরটা ছেড়ে দাও, আমি হাত-পা ছড়িয়ে একটু শুই।"

আমার বাবার এক মাতুল-কন্যা তথায় স্বামি-পুত্র লইয়া কিছুদিন হইতে বাস করিতেছিলেন, তিনি আসিয়া বলিলেন, "তাই ত!"

বলিলাম, "আচ্ছা, আচ্ছা, আমি বাইরের ঘরেই না হয় থাক্‌ব।"

সে ঘরে ঢুকিয়া দেখি, এক কোণে চুণ এবং এক কোণে সুরকি গাদা করা আছে। তাহারও মালিক বলিলেন, "তাই ত! এগুলো দেখে-শুনে কোথাও একটু দয়াতে হবে দেখ্‌চি। তা' ঘরটা ত আর ছোট নয়,—ততক্ষণ না হয় এই ধারে একটা তক্তাপোষ পেতে—কি বলিস্ শ্রীকান্ত?"

বলিলাম, "আচ্ছা, রাত্রির মত না হয় তাই হোক্।"

বস্তুতঃ এমনি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, যেখানে হোক একটু শুইতে পাইলেই যেন বাঁচি, এমনি মনে হইতেছিল। বর্ম্মার সেই অসুখ হইতে শরীর আমার কোন দিনই সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইতে পারে নাই, ভিতরে-ভিতরে একটা গ্লানি প্রায়ই অনুভব করিতাম। তাই সন্ধ্যার পর হইতে মাথাটা যখন টিপ্-টিপ্ করিতে লাগিল, তখন বিশেষ আশ্চর্য্য হইলাম না। রাঙাদিদি আসিয়া বলিলেন, "ওটা গরম। ভাত খেয়ে ঘুমোলেই সেরে যাবে।"

তথাস্তু! তাই হইল। গুরুজনের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গরম কাটাইতে অল্প আহার করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলাম। সকালে ঘুম ভাঙিল বেশ একটু জ্বর লইয়া।

রাঙাদিদি আসিয়া গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, "কিছু না। ওটা ম্যালোয়ারি। ওতে ভাত খাওয়া চলে।"

কিন্তু আজ আর সায় দিতে পারিলাম না। বলিলাম, "না রাঙাদি, আমি এখনো তোমাদের ম্যালোয়ারী রাজার প্রজা নই। তাঁর দোহাই পেড়ে অত্যাচার হয় ত আমার সইবে না। আজ আমার একাদশী।"

সমস্ত দিন-রাত্রি গেল, পরদিন গেল, তাহার পরের দিনও কাটিয়া গেল, কিন্তু জ্বর ছাড়িল না। বরঞ্চ, উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে দেখিয়া মনে-মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। গোবিন্দ ডাক্তার এবেলা-ওবেলা আসিতে লাগিলেন,—নাড়ি টিপিয়া, জিভ দেখিয়া, পেট ঠুকিয়া, ভাল-ভাল মুখরোচক সুস্বাদু ঔষধ যোগাইয়া মাত্র 'কেনা দাম'টুকু

গ্রহণ করিতে লাগিলেন ;. কিন্তু দিনের পর দিন করিয়া সপ্তাহ গড়াইয়া গেল। বাবার মাতুল আমার ঠাকুর্দ্দাদা আসিয়া বলিলেন, "তাই ত ভায়া, আমি বলি কি সেখানে খবর দেওয়া যাক্—তোমার পিসিমা আসুক। জ্বরটা কেমন যেন—" কথাটা সম্পূর্ণ না করিলেও বুঝিলাম, ঠাকুর্দ্দা একটু মুস্কিলে পড়িয়াছেন। এম্‌নি ভাবে আরও চার-পাঁচ দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু জ্বরের কিছুই হইল না।

সে দিন সকালে গোবিন্দ ডাক্তার আসিয়া যথারীতি ঔষধ দিয়া তিন দিনের বক্রী 'কেনা দাম'টুকু প্রার্থনা করিলেন। সন্ধ্যা হইতে কোন মতে হাত বাড়াইয়া ব্যাগ খুলিলাম, —মণি-ব্যাগ নাই। শরীর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলাম। ব্যাগ উপুড় করিয়া ফেলিয়া তন্ন-তন্ন করিয়া সমস্ত অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু যাহা নাই তাহা পাওয়া গেল না।

গোবিন্দ ডাক্তার ব্যাপারটা অনুমান করিয়া ব্যস্ত হইয়া বার-বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিছু গিয়াছে কি না।

বলিলাম, "আজ্ঞে না, যায় নি কিছুই।"

কিন্তু তাঁহার ঔষধের মূল্য যখন দিতে পারিলাম না, তখন তিনি সমস্তই বুঝিলেন। স্তম্ভিতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছিল কত?"

"যৎসামান্য।"

"চাবিটা একটু সাবধানে রাখ্‌তে হয় বাবাজী। যাক্, তুমি আমার পর নয়, দামের জন্যে ভেবো না, ভাল হও, তার পরে যখন সুবিধে হবে পাঠিয়ে দিয়ো, চিকিৎসার ত্রুটি হবে না।" এই বলিয়া ডাক্তারবাবু পর হইয়াও পরমাত্মীয়ের অধিক সান্ত্বনা দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বলিলাম, "এ কথা কেউ যেন না শোনে।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা সে বোঝা যাবে।"

পাড়াগাঁয়ে বিশ্বাসের উপর টাকা ধার দেওয়ার প্রথা নাই। টাকা কেন, শুধু হাতে একটা সিকি ধার চাহিলেও সবাই বুঝিবে, লোকটা নিছক তামাসা করিতেছে। কারণ, সংসারে এমন নির্ব্বোধও কেহ আছে,—শুধু হাতে ধার চায় —এ কথা পাড়াগাঁয়ের লোক ভাবিতেই পারে না। সুতরাং আমি সে চেষ্টাও করিলাম না। প্রথম হইতেই স্থির করিয়াছিলাম, এ কথা রাজলক্ষ্মীকে জানাইব না। একটু সুস্থ হইলে যাহা হয় করিব। সম্ভবতঃ, অভয়াকে লিখিয়া টাকা আনাইব, মনের মধ্যে এই সঙ্কল্পই ছিল। কিন্তু সে সময় মিলিল না। সহসা যন্ত্রের সুর তারা হইতে উদারায় নামিয়া পড়িতেই বুঝিলাম, যেমন করিয়াই হোক, আমার বিপদটা বাটীর ভিতরে আর অবিদিত নাই।

অবস্থাটা সংক্ষেপে জানাইয়া রাজলক্ষ্মীকে একখানা চিঠি লিখিলাম বটে, কিন্তু নিজেকে এত হীন, এত অপমানিত মনে হইতে লাগিল যে, কোন মতেই পাঠাইতে পারিলাম না, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। পরদিন এম্‌নি কাটিল। কিন্তু তাহার পরে আর কিছুতেই কাটিতে চাহিল না। সে দিন কোন দিকে চাহিয়া আর কোন পথ দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে একপ্রকার মরিয়া হইয়াই, কিছু টাকার জন্য রাজলক্ষ্মীকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া খান দুই পত্র লিখিয়া পাটনা ও কলিকাতার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলাম।

সে যে টাকা পাঠাইবেই তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না ; তথাপি সে দিন সকাল হইতেই কেমন যেন উৎকণ্ঠিত সংশয়ে ডাক-পিয়নের অপেক্ষায় সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া পথের দিকে দৃষ্টি পাতিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম।

সময় বহিয়া গেল। আজ আর তাহার আশা নাই মনে করিয়া, পাশ ফিরিয়া শুইবার উপক্রম করিতেছি, এম্‌নি সময়ে দূরে একখানা গাড়ীর শব্দে চকিত হইয়া বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী আসিয়া ঠিক সুমুখেই থামিল। দেখি কোচম্যানের পার্শ্বে বসিয়া রতন। সে নীচে নামিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিতেই যাহা চোখে পড়িল, তাহা সত্য বলিয়া প্রত্যয় করা কঠিন।

প্রকাণ্ড দিনের বেলায় এই গ্রামের পথের উপর রাজলক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা চিন্তার অতীত।

রতন কহিল, "ঐ যে বাবু।"

রাজলক্ষ্মী শুধু একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র।

গাড়োয়ান কহিল, "মা, দেরি হবে ত? ঘোড়া খুলে দিই?"

"একটু দাঁড়াও" বলিয়া সে অবিচলিত ধীর পদক্ষেপে আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া হাত দিয়া আমার কপালের, বুকের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, "এখন আর জ্বর নেই। ও-বেলায় সাতটার গাড়ীতে যাওয়া চল্‌বে কি? ঘোড়া খুলে দিতে বোল্‌ব?"

আমি অভিভূতের ন্যায় তাহার মুখের পানে চাহিয়াই ছিলাম। কহিলাম, "এই দু' দিন অসুখটা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু আমাকে কি আজই নিয়ে যেতে চাও?"

রাজলক্ষ্মী বলিল, "না হয় আজ থাক্। রাত্তিরে আর গিয়ে কাজ নেই, হিম লাগ্‌তে পারে, কাল সকালেই যাবো।"

এতক্ষণে যেন আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। বলিলাম, "এ গ্রামে, এ পাড়ার মধ্যে তুমি চুকলে কোন্ সাহসে? তুমি কি মনে কর তোমাকে কেউ চিন্‌তে পারবে না?"

রাজলক্ষ্মী সহজেই কহিল, "বেশ যা'হোক্। এইখানে মানুষ হোলাম, আর এখানে আমাকে চিন্‌তে পারবে না? যে দেখ্‌বে সেই ত চিন্‌বে।"

"তবে?"

"কি কোরব বল? আমার কপাল, নইলে তুমি এসে এখানে অসুখে পড়বে কেন?"

"এলে কেন? টাকা চেয়েছিলাম, টাকা পাঠিয়ে দিলেই ত হোতো।"

"তা কি কখনো হয়? এত অসুখ শুনে কি শুধু টাকা পাঠিয়েই স্থির থাক্‌তে পারি?"

"কিন্তু আমাকে যে ভয়ানক অস্থির করে তুলেচ। এখনি সবাই এসে পড়বে, তখন মুখ দেখাবেই বা কি কোরে, জবাব দেবেই বা কি?"

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে শুধু আর একবার ললাট স্পর্শ করিয়া কহিল, "জবাব আর কি দেব, আমার অদৃষ্ট।"

নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া বলিলাম, "অদৃষ্টই বটে, কিন্তু লজ্জা-সরমের মাথা কি একেবারে খেয়ে বসে আছো? এখানে মুখ দেখাতেও তোমার বাধ্‌লো না?"

রাজলক্ষ্মী উদাস কণ্ঠে উত্তর দিল,—"লজ্জা-সরম আমার যা' কিছু, এখন সব তুমি।"

ইহার পরে আর বলিবই বা কি! শুনিবই বা কি! চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম।

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বহুর বিয়ে নির্ব্বিঘ্নে হয়ে গেছে?" রাজলক্ষ্মী কহিল, "হাঁ।"

"এখন কোথা থেকে আস্‌চো? কলকাতা থেকে?"

"না, পাটনা থেকে। সেইখানেই তোমার চিঠি পেয়েচি।"

"আমাকে নিয়ে যাবে কোথায়? পাটনায়?"

রাজলক্ষ্মী একটু ভাবিয়া কহিল, "একবার সেখানে ত তোমাকে যেতেই হবে। আগে কলকাতায় যাই চল, সেখানে দেখিয়ে-শুনিয়ে ভাল হলে,—তার পরে—"

প্রশ্ন করিলাম, "কিন্তু তার পরেই বা আমাকে পাটনায় যেতে হবে কেন শুনি?"

রাজলক্ষ্মী কহিল, "দানপত্র ত সেখানেই রেজেষ্ট্রী করতে হবে। লেখা-পড়া সব একরকম করে রেখেই এসেচি বটে, কিন্তু তোমার হুকুম ছাড়া ত হতে পারবে না।"

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিসের দান-পত্র? কাকে কি দিলে?"

রাজলক্ষ্মী কহিল, "বাড়ী দুটো ত বন্ধুকেই দিয়েচি। শুধু কাশীর বাড়ীটা গুরুদেবকে দেব ভেবেচি। আর কোম্পানির কাগজ, গয়নাটয়নাগুলো ত আমার বুদ্ধি-বিবেচনা মত এক রকম ভাগ করে এসেচি; এখন শুধু তুমি বললেই—"

বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। কহিলাম, "তা হ'লে তোমার নিজের রইল কি? বহু যদি তোমার ভার না নেয়? এখন তার নিজের সংসার হোলো, যদি সে সেবে তোমাকেই খেতে না দেয়?"

"আমি কি তাই চাইচি না কি? নিজের সমস্ত দান করে কি অবশেষে তারই হাত-তোলা খেয়ে থাক্‌বো? তুমি ত বেশ।"

অধৈর্য্য আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিয়া রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলাম, "হরিশ্চন্দ্রের মত এ দুর্বুদ্ধি তোমাকে দিলে কে? খাবে কি? বুড়ো বয়সে কার গলগ্রহ হতে যাবে?"

রাজলক্ষ্মী বলিল, "তোমাকে রাগ করতে হবে না, তুমি শোও। আমাকে এ বুদ্ধি যে দিয়েচে, সে-ই আমাকে খেতে দেবে। আমি হাজার বুড়ো হলেও সে কখনো আমাকে গলগ্রহ ভাব্‌বে না। তুমি মিথ্যে মাথা গরম কোরো না—স্থির হয়ে শোও।"

স্থির হইয়াই শুইয়া পড়িলাম। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া অস্তোন্মুখ সূর্য্য-কর-রঞ্জিত বিচিত্র আকাশ চোখে পড়িল। স্বপ্নাবিষ্টের মত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া-চাহিয়া মনে হইতে লাগিল,—এম্‌নি অপরূপ

শোভায়-সৌন্দর্য্যে যেন বিশ্ব-ভুবন ভাসিয়া যাইতেছে। ত্রিসংসারের মধ্যে রোগ-শোক, অভাব-অভিযোগ, হিংসা-বিদ্বেষ কোথাও যেন আর কিছু নাই।

এই নির্ব্বাক নিস্তব্ধতার মগ্ন হইয়া যে উভয়ের কতক্ষণ কাটিয়াছিল, বোধ করি কেহই হিসাব করি নাই; সহসা দ্বারের বাহিরে মানুষের গলা শুনিয়া দু'জনেই চমকিয়া উঠিলাম। এবং রাজলক্ষ্মী শয্যা ছাড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বেই ডাক্তার বাবু প্রসন্ন ঠাকুদ্দাকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু সহসা তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্রই উভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুদ্দা যখন দিবানিদ্রা দিতেছিলেন, তখন তন্দ্রার ঘোরে তাঁহার কাণে গিয়াছিল বটে, কে একজন বন্ধু কলিকাতা হইতে গাড়ী করিয়া আমার কাছে আসিয়াছে; কিন্তু সে যে স্ত্রীলোক হইতে পারে, তাহা বোধ করি কাহারও কল্পনায়ও আসে নাই। সেই জন্যই বোধ হয় এখন পর্য্যন্ত বাড়ীর মেয়েরা কেহ বাহিরে আসে নাই।

ঠাকুদ্দা অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক। তিনি কিছুক্ষণ এক-দৃষ্টে রাজলক্ষ্মীর আনত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মেয়েটি কে শ্রীকান্ত? যেন চিনি-চিনি মনে হচ্ছে।"

ডাক্তার বাবুও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন, "ছোট খুড়ো, আমারও যেন মনে হচ্ছে, এঁকে কোথায় দেখেচি।"

আমি আড় চোখে চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মীর সমস্ত মুখ যেন মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। সেই নিমিষেই কে যেন আমার বুকের মধ্যে বলিয়া উঠিল, 'শ্রীকান্ত, এই সর্ব্বত্যাগী মেয়েটি শুধু তোমার জন্যই এই দুঃখ স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইয়াছে।' একবার আমার সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল; পরক্ষণেই তাহার হাতের উপর একটু চাপ দিয়া কহিলাম, "তুমি স্বামীর সেবা করতে এসেচ, তোমার লজ্জা কি রাজলক্ষ্মী! ঠাকুদ্দা, ডাক্তার বাবু—এঁদের প্রণাম কর।"

পলকের জন্য দু'জনের চোখোচোখি হইল;—তাহার পরে সে উঠিয়া গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া উভয়কে প্রণাম করিল।

(সমাপ্ত।)

রাধাশ্যাম

ঝিঝোট্-খাম্বাজ—যৎ

সোহাগে মৃণাল-ভুজে বাঁধিল শ্রীরাধাশ্যামে,
চপলা অচলা হ'ল, নীলাচলে মিশাইল,
শোভিল কদম্বমূল শ্রীমতী-শ্যাম-সমাগমে।
গোপনে গোপিনীকুল সে মাধুরী নেহারিল,
পুঞ্জে-পুঞ্জে অলিকুল, কুঞ্জে আসি গুঞ্জরিল,
কালায় ভাবি কালজল, রাধায় কমলিনী ভ্রমে॥

সঙ্গীতানুরাগী, বিবিধগুণালঙ্কৃত
শ্রীল শ্রীযুত লালগোলাধিপতির গায়ক
শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক স্বরলিপি

স্বরলিপি

(অস্থায়ী) ৩ ১ ২ ৩

সা সা II রগা মপা ধণা পধপা | র্সা -া -া ণা | ধা পা মা গা | -া -া -া গা | গা ম্‌ধা ধপা মগা |

সো হা গে• • • • • • • • • ম্‌ ণা ল ভু জে • • • বাঁ ধি ল• • • •

০ ১ ২ ৩ ০
রা গা মা পা | পা পা -। -। | পমা গগা মঃ পঃ -। | -। মা গা -। | -। -। -। গা |
• শ্রী রা ধা ক্তা মে • • • • • • • • • • • • • • • • • চ

১ ২ ০ ১
মা পধা ণঃ র্সঃ -। | -। ণা ধা ণা | ধা ধা -। -। | -। -। -। পা | পা ধা পধা ণা |
প লা • • • • • অ চ লা হ ল • • • • • নী লা চ লে • •

২ ৩ ০ ১ ২
-। -। -। ধা | ণা ধা পা পা | -। -। মা গা | -। -। -। গা | মা পা পা -। |
• • • মি শা ই ল • • • • • • • • • শো ভি ল ক •

৩ ০ ১ ২ ৩
পা ধা পা ধা | র্রা র্সা ণা ধা | পা মা গা মা | রগা রা -। রা | গা গা গমা পধা |
দ ধ • • • • ন্ ল শ্রী ম তী ক্তা • • ম • স মা গ মে • • •

০ ১ ২
ণর্সা ণধা পমা পধা | পমা গপা মগা রমা | গরা সস | "সা সা" ॥
• "সো হা"

(অন্তরা) ৩ ০ ১ ২ ৩
মা পা ॥ না র্সর্সা ননা ধপা | ধনা র্সধা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সনর্রা | র্সর্সা -। -। র্সা | র্সা র্স না -। |
গো প নে • • • • • • • • • • • • গো পি নী কু ল • • • • • মে মা ধু রী •

০ ১ ২ ৩
র্সর্সা নধা না না | ধনা র্সর্রা র্রর্সা ননা | র্সা না ধপঃ পা ক্ষঃ | পা গা ম গা |
• • • • নে হা • • • • • • • • রি ল • • • • • •

০ ১ ২ ৩
-। -। -। গা | মা ধা -। নর্রনা | র্সা ণা ধা ণা | ধা ধা -। -। | -। -। -। পা |
• • • কু ঞ্জে কু • • • • • ঞ্জে অ লি কু ল • • • • • কু

১ ২ ৩ ০ ১
পা ধা পধা ণা | -। -। -। ধা | ণা ধা পা -। | -। মাগা গা | মা পা পা -। |
ঞ্জে আ সি • • • • • • ও র রি ল • • • • কা নাই ভা বি

২ ৩ ০ ১ ২
পা ধা পা ধা | -। ণর্সা র্সা ণা | ধা পধা মা ধপঃ | -। মা গা মপা | পমা গঃরগঃ রা |
বা ল • • • • • ম ল রা ধা • • • য় • ক ম • • • • • • লি

৩ ০ ১ ২
পা গা গমা পর্সা | ণধা পমা পর্সা নর্সা | ণধা পমা গরা সসা | -। -। "সা সা" ॥ ॥
নী ত মে • "সো হা"

লুপ্ত-রত্ন

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

কীর্ত্তন

ও কে পাগলের পারা হয়ে দিশেহারা
সুরধুনী কূল দিয়ে যায় !
আয় আয় বলি দিয়ে করতালি,
বলে—'যত বোকা আছে নিয়ে আয় !'
কেঁদে কেঁদে বুঝি আঁখি রাঙা রাঙা,
ডেকে ডেকে বুঝি গলা ভাঙা ভাঙা,
'গোরা' 'গোরা' বলে নাচে বাহু তুলে,
*ক্ষণেকে চেতনা ক্ষণে হারায়।
ধূলি মাখা গায় যেই যেই নাচে,
হাসে কভু. কভু কেঁদে প্রেম যাচে,
বলে—"ভর নাই এল রে কানাই
বলায়ের সাথে নদীয়ায়।
সুধাব না কা'রেও জাতি-নাম-ধাম,
লব পাপ তাপ, দিব হরি নাম,
গোলকের ধন তোদেরই কারণ
বিলাতে এনেছি নদীয়ায়।"
আয় আয় তোরা চোখে দেখিবি রে,
জগন্নাথ আজ ফেরে দ্বারে দ্বারে,
আয় হরি বলে' ফেরাবি রে তাঁরে,
—হরি হরি হরি বল সবাই।

—এ কীর্ত্তনের রচয়িতা কে, জানি না। বৎসর দুই পূর্ব্বে একেবার যখন নবদ্বীপে গিয়াছিলাম, তখন সেখানে বৈষ্ণবের মুখে এই কীর্ত্তনটি শুনিয়াছিলাম—শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, এবং তখনই উহা লিখিয়া লইয়াছিলাম। কীর্ত্তনীয়ারাও এ সঙ্গীত-রচয়িতার নাম বলিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মুখে শুধু এইটুকু শুনিলাম যে, এ গান নবদ্বীপবাসী বহুকাল হইতেই গাহিয়া আসিতেছেন। এ গানের সহিত কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের—"ও কে গান গেয়ে গেয়ে যায়" ইতি শীর্ষক প্রসিদ্ধ গানের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়।

স্বর্গীয় প্রেমানন্দের গান

ওহে মন! কি শুনান তনু-নায়ে চড়ি? কি সুখে তুলিছ নিজ, বিচারিয়া দেখ পিছ, ভব-সিন্ধু দিতে হবে পাড়ী।

দেখ না মায়ার পাক, নৌকা ফিরে যেন চাক, ইহা কি বুঝিতে নাহো ভাই। কুবাসনা-কুবাতাসে, লহর তুলে আকাশে, ধন জন ডুবে রক্ষা নাই॥

কামাদিরা মাতোয়াল, তারা সৈয়া কেরয়াল পাকাইয়া ফিরাইছে তরি। যে বেটা কুবুদ্ধি পাজি, তারে করিয়াছ মাজি, কি জানি কখন ডুবে মরি॥

ভবার্ণবে পার চাহ, সুবুদ্ধি-কাণ্ডারী লহ, দশেন্দ্রিয় কেরয়াল করি। গাত্রা কৃষ্ণ-গুণ সারি, বাইছ দিয়া মে রে পাড়ী, মাঝে২ বোল্ হরি হরি॥

জীর্ণ না হইতে নাও, এ সময় পাড়ী দেও, পার হয়ে কর ঠাকুরাল। আগে না হইলে পার, পিছে কি করিবি আর, নাও বা রহিবে কতকাল?

বহুদূর পারাবার, বিলম্ব না কর আর, দাঁড়ী মাঝি হইবে দুর্ব্বল! প্রেমানন্দ কহে মন! তবে কিবা প্রয়োজন? যদি নাও ঘাটে হয় তল।"

এই কবিতায় তনুকে তরি, সংসারকে সিন্ধু, মায়াকে আবর্ত্ত, দুরাশাকে কুবাতাস, কামাদি অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি ষটকে কেরয়াল এবং কুবুদ্ধিকে কর্ণধাররূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

—মিত্র-প্রকাশ, ১২৭৭

তৈল-মাহাত্ম্য

তৈল যে কি পদার্থ তাহা সংস্কৃত কবিরা কতক বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতে তৈলের অপর নাম স্নেহ—বাস্তবিক স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ, আমি তোমায় স্নেহ করি, তুমি আমায় স্নেহ কর; অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কি? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা করে তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর কিসে পারে!

সংস্কৃত কবিরা ঠিক বুঝিয়াছিলেন। যে হেতু তাঁহারা সকল মানুষকেই সমান রূপ স্নেহ করিতে বা তৈল প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বাস্তবিকই তৈল সর্ব্বশক্তিমান্, যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যে সর্ব্বশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে সে সর্ব্বশক্তিমান্। তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা, তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না—উকিলিতে পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না—বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না, কোন কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না।

যে তৈল দিতে পারিবে তাহার বিদ্যা না থাকিলেও সে প্রফেসার হইতে পারে, আহাম্মুক হইলেও মাজিষ্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্দ্দভবান হইয়াও উড়িষ্যার গবর্ণর হইতে পারে।

তৈলের মহিমা অতি অপরূপ, তৈল নহিলে জগতের কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। তৈল নহিলে কল চলে না, প্রদীপ জ্বলে না, ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, চেহারা খোলে না, হাজার গুণ থাকুক তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। তৈল থাকিলে তাহার কিছুরই অভাব থাকে না।

সর্ব্বশক্তিময় তৈল নানা রূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তৈলের যে মূর্ত্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম ভক্তি, যাহাতে গৃহিণীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম প্রণয়, যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম মৈত্রী, যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম শিষ্টাচার সৌজন্য ও "ফিলনথ্রপি।" যাহা দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম লয়েলটি, যাহা দ্বারা বড়লোককে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম নম্রতা বা মডেষ্টি, চাকর বাকর প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া থাকি, তাহার পরিবর্ত্তে ভক্তি বা যত্ন পাই। অনেকের নিকট তৈল দিয়া তৈল বাহির করি।

পরস্পর ঘর্ষিত হইলে সকল বস্তুতেই অগ্নুদ্গম হয়, সেই অগ্নুদ্গম নিবারণের এক মাত্র উপায় তৈল। এই জন্যই রেলের চাকায় তৈলের অনুকল্প চর্ব্বি দিয়া থাকে। এই জন্যই যখন দুই জনে, ঘোরতর বিবাদে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তখন রফা নামক তৈল আনিয়া উভয়কে ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। তৈলের যদি অগ্নিনিবারণী শক্তি না থাকিত তবে গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে পিতা পুত্রে স্বামী স্ত্রীতে রাজায় প্রজায় বিবাদ বিসম্বাদে নিরন্তর অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে তৈল দিতে পারে সে সর্ব্বশক্তিমান্। কিন্তু তৈল দিলেই হয় না। দিবার পাত্র আছে, সময় আছে, কৌশল আছে।

তৈল দ্বারা অগ্নি পর্য্যন্ত বশতাপন্ন হয়। অগ্নিতে অল্প তৈল দিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে আবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু সে তৈল মূর্ত্তিমান্।

কে যে তৈল দিবার পাত্র নয় তাহা বলা যায় না। পুঁটে তেলি হইতে লাট সাহেব পর্য্যন্ত সকলেই তৈল দিবার পাত্র। তৈল এমন জিনিস নয় যে নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন ফল ফলিবে। কিন্তু তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত কাজ আদায় করিতে হইবে সেই তৈলনিষেকের প্রধান পাত্র।

সময়—যে সময়েই হউক তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে অল্প তৈলে অধিক কাজ হয়।

কৌশল—পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যে রূপেই হউক তৈল দিলে কিছু না কিছু উপকার হইবে। যে হেতু তৈল নষ্ট হয় না, তথাপি দিবার কৌশল আছে। তাহার প্রমাণ, ভট্টাচার্য্যেরা সমস্তদিন বকিয়াও যাহার নিকট ১।০ পাঁচ সিকা বই আদায় করিতে পারিল না—একজন ইংরেজীওয়ালা তাহার নিকট অনায়াসে ৫০ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া একবিন্দু দিলে যত কার্য্য হয়, বিনা কৌশলে কলস কলস ঢালিলেও তত হয় না।

ব্যক্তিবিশেষে তৈলের গুণতারতম্য অনেক আছে। নিকৃত্রিম তৈল পাওয়া অতি দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটী আশ্চর্য্য সম্মিলনী শক্তি আছে যে তাহাতে উহা অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে তাহার তৈল আমার তৈল অপেক্ষা মূল্যবান্। তাহার উপর যদি ধন থাকে তবে তাহার প্রতি বিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার হাজার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক কেহই টের পায় না।

তৈল দিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ প্রবৃত্তি সকলেরই

আছে এবং সুবিধা মতে আপন গৃহে ও আপন দলে সকলেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর যে বাহিরের লোককে তৈল দিতে পারে না। তৈলদান-প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও উহাতে কৃতকার্য্য হওয়া অদৃষ্ট-সাপেক্ষ।

আজ কাল বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নানা-বিধ চেষ্টা হইতেছে। যাহাতে বঙ্গের লোক প্রাক্টিকল অর্থাৎ কাজের লোক হইতে পারে তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট। কিন্তু কাজের লোক হইতে হইলে তৈলদান সকলের আগে দরকার—অতএব তৈলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রস্তাব করি যাহিয়া যাহিয়া কোন রায়বাহাদুর অথবা খাঁ বাহাদুরকে প্রিন্সিপাল করিয়া শীঘ্র একটি মেহশিষেকের কলেজ খোলা হয়। অন্ততঃ উকিলি শিক্ষার নিমিত্ত লা কলেজে একজন তৈল অধ্যাপক নিযুক্ত করা আবশ্যক। কালেজ খুলিতে পারিলে ভালই হয়।

কিন্তু এরূপ কালেজ খুলিতে হইলে প্রথমতই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তৈল সবাই দিয়া থাকেন—কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না যে আমি দিই। সুতরাং এ বিদ্যার অধ্যাপক জোটা ভার, এ বিদ্যা শিখিতে হইলে দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়। রীতিমত লেকচার পাওয়া যায় না। যদিও কোন রীতিমত কলেজ নাই তথাপি যাঁহার নিকট চাকরীর বা প্রোমোশনের শুপারিস নিলে তাদৃশ লোকের বাড়ী সদাসর্ব্বদা গেলে উত্তম স্বরূপ শিক্ষা করা যাইতে পারে। বাঙ্গালীর বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্যাও নাই, বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙ্গালীর একমাত্র ভরসা তৈল—বাঙ্গালায় যে কেহ কিছু করিয়াছেন সকলই তৈলের জোরে। বাঙ্গালিদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়। এবং কি কৌশলে সেই তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেবা হয়, তাহাও অতি অল্প লোক জানে। যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিই। তাঁহারাই আমাদের দেশের বড় লোক, তাঁহারাই আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।

তৈল বিধাতৃ পুরুষদিগের সুখসেবা হইবে ইচ্ছা করিলে সে শিক্ষা এ দেশে হওয়া কঠিন। তজ্জন্য বিলাত যাওয়া আবশ্যক। তত্রত্য রমণীরা এ বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক, তাহাদের পু হইলে তৈল শীঘ্র কাজে আইসে।

শেষ মনে রাখা উচিত, এক তৈলে চাকা ঘোরে আর তৈলে মন ফেরে!

—বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১২৮৪]

গত শ্রাবণ সংখ্যার 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে "তৈল-বন্দনা" প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সঞ্জীবের বঙ্গদর্শনও একবার এই তৈলের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিল। আমরা সেই লেখাটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উভয় রচনার বিষয় এক, কিন্তু লিখন-ভঙ্গীর অনেক প্রভেদ।

আনন্দময়ী

[শ্রীজলধর সেন]

(১)

গ্রামের লোকে ঠিক নাম করিত না—বলিত ঠাণ্ডা মল্লিক; নাম করিলে সেদিন না কি অদৃষ্টে অন্ন মিলিত না। যুবকেরা তাস খেলিতে বসিয়া চারিখানি কাগজের পরের খেলায় এক পক্ষে ছক্কার হাত থাকিলে প্রতিপক্ষ যদি ঠাণ্ডা মল্লিকের আসল নাম উচ্চারণ করিয়া কাগজ কয়খানি স্পর্শ করিত, তাহা হইলে জয়-নিশ্চিত পক্ষের ছক্কা ত হইতই না, কাগজ চারিখানিও উঠিয়া যাইত;—এমনই নামের গুণ ছিল। নামটা বলিয়াই ফেলি; ঠাণ্ডা মল্লিকের প্রকৃত নাম শীতল মল্লিক। সেকালের মেয়েরা যেমন ভাসুরের নাম হরিদাস থাকিলে 'হরিদাস' বলে, তেমনই শীতল মল্লিকও ঠাণ্ডা মল্লিক নামেই সে অঞ্চলে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল।

মল্লিক মহাশয় জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, কিন্তু ব্যবহার ছিল একেবারে চামারের মত। ধর্ম্ম, চক্ষুলজ্জা বলিয়া জিনিসটা তাঁহার মধ্যে মোটেই ছিল না বলিয়া সকলেই

জানিত। তাঁহার কিছু অর্থ ছিল। এই অর্থই তাঁহাকে একেবারে পাইয়া বসিয়াছিল। টাকা ধার দেওয়াই তাঁহার ব্যবসায় ছিল।

মল্লিকের সংসারে এক বিধবা ভগিনী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। ভগিনীটির যদি ছেলে মেয়ে থাকিত, তাহা হইলে মল্লিক নিশ্চয়ই তাহাকে আশ্রয় দিতেন না; নিজেই ঘর-গৃহস্থালীর কাজ করিতেন। তাঁহার স্ত্রী যখন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান, তখন মল্লিকের বয়স ৪২ বৎসর। অবশ্য দ্বিতীয়বার বিবাহের সময় তখনও অতীত হয় নাই; অনেকেই তাঁহাকে কন্যাদানের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু মল্লিক হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, মা গঙ্গা যখন অপব্যয় হইতে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দানের জন্যই তাঁহার গৃহিণীকে কোলে টানিয়া লইয়াছেন, তখন দেবীর অভিপ্রায় কি ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করা উচিত? মল্লিক কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তাঁহার নিঃসন্তান বিধবা ভগিনীকে বাড়ীতে আনিলেন। ভগিনীটিও দরিদ্র শ্বশুরালয়ে দাসীবৃত্তি করিয়া, অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া, দেবর-পত্নীর বাক্য-যন্ত্রণা পরিপাক করিয়া কোন প্রকারে দিন কাটাইতেছিল; এখন দাদার সাদর আহ্বানে সে চলিয়া আসিল। দাদার পরিচয় সে জানিত; কিন্তু সে বিধবা,—তাহার একবেলা এক পোয়া চাউল, একটু লবণ আর একটা কাঁচা লঙ্কার দরকার;—হাজার কৃপণ হইলেও তাহার দাদা এই সামান্য বিষয়ে কৃপণতা করিবে না, এ বিশ্বাস তাহার ছিল। আর, হাজারও হউক, এক মায়ের পেটের ভাই ত! সেই ভাই একেলা কষ্ট পাইবে, এ কি কখন ভগিনী সহ্য করিতে পারে?

মল্লিক মহাশয় বিশেষ বিবেচনা করিয়াই ভগিনীকে বাড়ী আনিয়াছিলেন। এতদিন অর্থাৎ স্ত্রীর মৃত্যুর পরও তিনি দুবেলাই আহার করিতেন। এখন ভগিনীকে বাড়ীতে আনিয়া মল্লিক বলিলেন "দেখ্ নেত্য, তুই আমার ছোট বোন, তোকে কোলে ক'রে মানুষ করেছি। তুই একবেলা হবিষ্যি করবি, আর আমি তোর বড় ভাই, আমি দুবেলা মাছ-ভাত, এটা-ওটা-সেটা খাব, এ আমি কিছুতেই পারব না। আজ থেকে আমিও একবেলা তোর সঙ্গে হবিষ্যিই করব। তাই বোন কি পৃথক রে।" মল্লিক অনেক হিসাব করিয়াই এ কথা বলিয়াছিলেন। একটী মানুষের খোরাক—হোক্ না সে বিধবা—তারও ত চা'ল ডা'ল লাগে, নবণ লাগে, তেল লাগে, কিঞ্চিৎ তরিতরকারী লাগে। তা যেমন করিয়াই হোক, একটা বিধবার একবেলা খোরাক যোগাইতে হইলে এই আক্রা-গণ্ডার দিনে আড়াই টাকার কমে আর হয় না। মাসে আড়াই টাকা,—তা হ'লে বৎসরে হইল—বার দুগুণে চব্বিশ, আর ধর বার আধে ছয়—হোল কি না ত্রিশ টাকা। একটা মানুষের জন্য বছরে তি—রি—শ টাকা? না:—এত টাকা কোথায় পাব? গিন্নীর মৃত্যুর পর মাসে যা খরচ হচ্ছিল, তার এক আধেলা বেশী বার করা যেতে পারে না।—তবে আর গিন্নী গেল কেন? শেষে অনেক হিসাব করিয়া—অনেক জমা-খরচ খতাইয়া ভগিনী নেত্যর সঙ্গে একবেলা হবিষ্যি করাই মল্লিক স্থির করিলেন। মাসান্তে হিসাব করিয়া দেখিলেন—এই অন্দোবস্তে তাঁহার ১৮/১০ আনা ব্যয়-সংক্ষেপ হইয়াছে। তখন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মল্লিক বলিলেন "হবে না! হাজারও হোক কায়েতের ছেলে! হিসাবে কেউ ঠকাতে পারবে না!"

নেত্য অনেক প্রতিবাদ করিয়া, অনেক কাঁদাকাটি করিয়াও দাদাকে এই মহৎ সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না। দাদা রাত্রিতে কিছুই আহার করেন না দেখিয়া নেত্য এক দিন আধপোয়াটাক চাউল ভাজিয়া, লবণ-তৈল মাখিয়া, দাদাকে খাইতে দিতে গিয়াছিল। দাদা চাউল-ভাজা দেখিয়া একেবারে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন; উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "নেত্য, তুই কি শেষে আমাকে ফতুর করবি! আধ পোয়া চালের দাম কত জানিস্?" দাদা এখনই কড়াক্রান্তি হিসাব আরম্ভ করিবে, বুঝিতে পারিয়া নেত্য বলিল "দাদা, মহাপ্রাণীকে এত কষ্ট দিতে নেই; ওতে লক্ষ্মী নারাজ হন।"

দাদা রাগ করিয়া কহিলেন "লক্ষ্মী, লক্ষ্মী,—লক্ষ্মী রাজীই বা কবে হলেন। যা, যা, তোর সঙ্গে আর কথা-কাটাকাটি করতে পারিনে। সাবধান, আর কখনও জিনিসপত্র এমন নষ্ট করিস্‌নে। জানিস্, আধপো চেলের দাম একটি পয়সা; "তা'হলে হলো গিয়ে—"

"না, না, তোমাকে আর হিসাব করতে হবে না; আমি এই নাকে-কাণে খত দিচ্ছি, আর যদি কখন এমন কাজ করি।" এই বলিয়া নেত্য বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

দাদা তখন কোমল স্বরে নেত্যকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ্ নেত্য, তোরই ভালোর জন্ত বলি। আমি আর ক'দিন আছি। এখন যদি সব উড়িয়ে দিস্, তা'হলে আমি মরে গেলে কি করবি।"

"তখন তোমার ঐ বকের ধন, ঐ লোহার সিন্দুক আগ্‌লে বসে থাক্‌ব। কথায় বলি দেখ!" নেত্য আর সেখানে দাঁড়াইল না, চাল-ভাজার বাটীটা সেখানে ফেলিয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল।

"দেখ্‌লে আক্কেলটা! এই এক-রা'শ চালভাজা কেলে চ'লে গেল! এমন না হ'লে কি আর কপালে ওর এত দুঃখ হয়!" এই বলিয়া তিনি যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। একটু পরেই বলিলেন "যাক্, কা'ল একাদশী। মনে করেছিলাম, এবার থেকে নির্জ্জলা একাদশীই করব; দেখ্‌ছি হতভাগী তা করতে দিল না; কা'ল এই চা'লভাজা করটী দিয়েই একাদশী করা যাবে।" আধ পোয়া চাউলের একটা গতি হওয়ায় ঠাণ্ডা মল্লিক আশ্বস্ত হইয়া বাটীটা অতি সন্তর্পণে বাক্সের মধ্যে এক পার্শ্বে তুলিয়া রাখিলেন।

নিজেদের সম্বন্ধে যাই করুন, পরের দেনা-পাওনা সম্বন্ধে ঠাণ্ডা মল্লিক খুব ঠিক, কখনও কাহারও এক পয়সা ঠকান না। যাহার নিকট যাহা পাওনা, তার একটী আধেলাও তিনি ছাড়িয়া দেন না; আবার তাঁহার কাছে অন্তে যাহা পাইবে, তাহা কড়া-ক্রান্তি হিসাব করিয়া তিনি পরিশোধ করেন; কোন দিন কাহারও নিকট সিকি পয়সা মাপের জন্ত প্রার্থনা করেন না। সকলেই ঠাণ্ডা মল্লিককে ঘৃণা করে, নিন্দা করে, কিন্তু টাকার দরকার পড়িলে ঐ ঠাণ্ডা মল্লিকের কাছেই যাইতে হয় এবং অতিরিক্ত সুদ স্বীকার করিয়াই টাকা ধার করিতে হয়। সকলেই বলে, ঠাণ্ডা মল্লিকের অনেক টাকা;—কেহ অনুমান করে পঞ্চাশ হাজার, কেহ কেহ বলে ত্রিশ হাজার; গল্প-লেখক সর্ব্বজ্ঞ হইলেও পরের ধনের কথা প্রকাশ করিবেন কেন?

এই ভাবে তের-চোদ্দ বৎসর কাটিয়া গেল; ঠাণ্ডা মল্লিকের ধনার্জ্জন-স্পৃহা বাড়িলও না, কমিলও না; লোকের নিন্দা, ঘৃণা, উপেক্ষা সমস্ত অম্লানবদনে হজম করিয়া ঠাণ্ডা মল্লিক তাঁহার লোহার সিন্দুক পূর্ণ করিতে লাগিলেন। বিগত বৎসর পূজার সময় একটা বিষম গোলযোগে তাঁহাকে একেবারে উলট্-পালট্ করিয়া গেল।

গ্রামের নিষ্কর্ম্মা যুবকেরা অনেক দিন হইতেই মল্লিককে বিপন্ন করিবার জন্ত নানা ফন্দী আঁটিয়া আসিতেছিল; কিন্তু মুরুব্বীদিগের ভয়ে তাহারা এত দিন কিছুই কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই। পূজার সময় কর্ত্তাদের অগোচরে, অতি গোপনে তাহারা এক কাজ করিয়া বসিল।

(২)

ষষ্ঠীর দিন অতি প্রত্যূষে অন্যান্ত দিনের মত নেত্য যখন বাহিরের বৈঠকখানা-ঘর ঝাঁট দিতে আসিল, তখন সে সবিস্ময়ে দেখিল, বৈঠকখানার বারান্দায় একখানি অনতি-বৃহৎ দুর্গাপ্রতিমা রহিয়াছে। এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল; কি করিবে, কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াই সে সেখান হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "ও দাদা, শীগ্‌গির এস, দেখে যাও; কে আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে গো!"

ঠাণ্ডা মল্লিকের তখন সবে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে; উঠি-উঠি করিয়াও এ-পাশ ও-পাশ করিতেছিলেন, এমন সময় ভগিনীর চীৎকার শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরের দিকে দৌড়াইয়া আসিলেন। দাদাকে দেখিয়াই নেত্য বলিয়া উঠিল, "এই দেখ, পোড়াকপালীর বেটারা আমাদের বারান্দায় মা দুর্গার প্রতিমা রেখে গিয়েছে।"

"বলিস্ কি নেত্য!" বলিয়া দাদা বারান্দার নিকটে আসিয়া দেখিলেন সত্যসত্যই একখানি দুর্গাপ্রতিমা বৈঠক-খানার বারান্দায় রহিয়াছে। তখন তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইল; যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া গ্রামের পাজী, বজ্জাত, বদমায়েস লোকদিগের উপর অজস্রধারে ব্যাকরণ-বহির্ভূত ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া প্রতিবেশী স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিকায় বাহিরের অঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়া গেল; বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বলিতে লাগিলেন, "তাই ত, এ ত ভারি অন্যায় ব্যাপার। এমন কাজ কে করলে? ভদ্রলোককে এমন বিপদে ফেলা কিছুতেই উচিত হয় নাই।" যুবকেরা বড় কেহ আসে নাই; যে দুই একজন আসিয়াছিল, তাহারাও অতি গম্ভীর ভাবে বলিল, "এ কি অন্যায়! এমন ব্যাপার ত এ গ্রামে কখন দেখি নাই।"

মল্লিক তখন আরো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ কাজ এই হতভাগা ছোঁড়াদের, একথা আমি তামা-তুলসী-গঙ্গাজল হাতে ক'রে বলতে পারি। ঐ পুরুতঠাকুরের বাড়ী গাঁয়ের যে সব শালারা নাটকের আড্ডা ক'রেছে, এ সেই শালাদেরই কাজ। পাজীরা মনে করেছে বাড়ীর ওপর ঠাকুর ফেলে গেলেই আমি অম্‌নি পূজো ক'রব। শীতল মল্লিক গলায় ছুরি দিয়ে মরবে, তবু পূজা ক'রবে না। বেটারা এসে দেখে যাক্, এখনি তাদের ঠাকুরের কি দশা করি। নিয়ে আয় ত নেতা, আমার লাঠিখানা।"

প্রতিবেশী বৃদ্ধ গদাধর লাহিড়ী এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মল্লিক তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "এই দেখ ত গদা কাকা, কি অত্যাচার! তুমিই এর বিচার কর!" লাহিড়ী মহাশয় অতি ধীর স্বরে বলিলেন, "তাই ত, কাজটা অত্যন্তই গর্হিত হ'য়েছে; এ রকম অত্যাচার এ গ্রামে ত পূর্ব্বে কখন দেখিনি।"

মল্লিক বলিয়া উঠিলেন "আপনারাই ত ছোঁড়াদের আস্পর্দ্ধা দিয়ে মাথায় তুলে দিয়েছেন; এ তাদেরই কাজ। হয় আপনারা এখনি প্রতিমা সরিয়ে নিয়ে যান, তা না হয় ত আমি রাস্তায়—"

"শীতল, রাগে জ্ঞানহারা হয়ো না। যারা এ কাজ ক'রেছে—গ্রামের দশজনকে ডেকে তার অনুসন্ধান ক'রে তাদের শাস্তি দিতে হবে; তার জন্যে তুমি ভেবো না। কিন্তু আজ বল্লি। যে ক'রেই হোক্ আজ তোমার বাড়ীতে যখন মায়ের আগমন হয়েছে তখন হিঁদু হ'য়ে আর কায়স্থের ছেলে হ'য়ে তুমি বাপু মাকে টেনে রাস্তায় ফেলতে পারছ না। তাতে তোমারও অধর্ম্ম, গ্রামেরও অপযশ। আমরা দশজন থাকতে এমন অধর্ম্মের কাজটা কেমন ক'রে হ'তে দিই, তুমিই বল দেখি?"

"তা'হলে আপনি কি ক'রতে বলেন?"

"আমি বলি, যে করেই হোক, কোন রকমে মায়ের পূজাটা তোমাকে ক'রতেই হবে।"

"আপনি ত করতেই হবে বলে খালাস। পূজা করা কি ছেলে-খেলা! বলতে গেলে বৃষোৎসর্গের ব্যাপার। আমার সাধ্যি কি এ ভার আমি সামলাই;—সে আমি কিছুতেই পারব না। আমি গরীব মানুষ, কোনরকমে কায়ক্লেশে বেঁচে আছি। আমি কি করে পূজো করব? আপনার ইচ্ছে হয়, আপনার বাড়ীতে প্রতিমাখানি নিয়ে যান্, পূজো করুনগে।"

বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "শীতল, মায়ের কাছে সেই প্রার্থনাই কর, আমার যেন মায়ের পূজো করবার মত অবস্থা হয়। তখন তোমরা না বললেও আমি মাকে বাড়ীতে আন্‌বো। কিন্তু তুমি ত জান, আমার কি অবস্থা। আমি বলি কি মহেশকে ডেকে আনি। সে তোমার পুরোহিত। যাতে কোন রকম বাহুল্য না করে মায়ের পূজোটা হ'য়ে যায়, তারই মত ব্যবস্থা করে দিই। এই ধর—একশ টাকা হলেই তিন দিনের পূজো অমনি নয়ো-নয়ো করে সেরে দেওয়া যেতে পারে।"

"এক—শ' টাকা! আপনি বলেন কি গদা কাকা? আমার কি একশ' টাকা খরচ করবার অবস্থা? আমি সোজা কথা বলছি, আমি এক পয়সাও খরচ করতে পারব না।"

"তা হলে যা ভাল বোঝ কর বাপু। আমরা তোমার হিতৈষী, এ ক্ষেত্রে যা সৎপরামর্শ তাই তোমাকে দিলাম।" এই বলিয়া লাহিড়ী মহাশয় ধীরে-ধীরে চলিয়া গেলেন।

মল্লিক এতক্ষণ উঠানে দাঁড়াইয়াই কথা বলিতেছিলেন; এখন বারান্দায় উঠিয়া প্রতিমার সম্মুখে চাপিয়া বসিলেন। তখন নেতা বলিল, "বসে বসে ভাবলে কি হবে দাদা, যা হয় একটা ঠিক করে ফেল। ষষ্ঠীর দিন—মা যখন বাড়ীর ওপর এসেছেন, তখন বিদায় কর কি বলে?"

"বিদায় করব না ত কি ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পূজো ক'রতে হবে? সে আমার দ্বারা হচ্ছে না; থাক্ যেমন আছে ঠাকুর, তেমনি থাক্। আমি পূজোও কচ্ছিনে, ফেলেও দিচ্ছিনে। একশ' টাকা গাছের ফল আর কি! কুড়িয়ে আনলেই হল? সব বেটারাই ভাবে, আমার না জানি কত টাকাই আছে। যাক গে, আর বকতে পারিনে" এই বলিয়া মল্লিক বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই পুরোহিত মহেশ ভট্টাচার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া দেখেন, মল্লিক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, "ও মল্লিক-দা, বসে ভাবলে কি হবে? একটা ব্যবস্থা ত করতে হবে।"

"যাও হে যাও, তোমায় আর মুরুব্বিগিরি কর্‌তে হবে না। পুজো কর্‌তে হয় আমিই ক'রবো। তোমায় কিছু কর্‌তে হবে না। তুমি নিজের পথ দেখ।"

"তুমি পুজো কর্‌বে? পুজো কর্‌বার তোমার অধিকার কি?"

"অধিকার-টধিকার বুঝিনে ঠাকুর; যা করতে হয় আমি করব এখন; আমি রামুণও ডাক্‌ব না, পুরুতও ডাক্‌ব না।"

"তুমি পাগল হ'লে না কি? এমন অনাছিষ্টি কথাও ত কখন শুনিনি। তুমি কায়েতের ছেলে, তুমি পুজো করবে কি? এখনো ত কলির শেষ হয় নি; পাগলের মত কথা বলো না; এখন যাতে যা হয়, এস তাই স্থির করি।"

"তোমায় কিছু স্থির করতে হবে না মহেশ! তুমি বাড়ী যাও। আমাকে আর জ্বালিও না।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, এখানে কথা বলা নিতান্তই নিরর্থক,—হয় ত বা অপমানই হইতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি নেতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "পুজো যদি না করাই স্থির হয়, তাহ'লে প্রতিমাখানি রাস্তায় ফেলে দিয়ে আস্‌তে বোলো।"

"ফেলে দিই আর ঘরে তুলে রাখি, সে আমি বুঝব; সে পরামর্শ কারুর কাছে নিতে যাব না।"

(৩)

বেলা আটটা পর্য্যন্ত মল্লিক চুপ করিয়া বসিয়া কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন। নেতা তখন উঠানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। সে বেশ শুনিতে পাইল, তাহার দাদা লোহার সিন্দুক খুলিলেন এবং একটু পরেই বন্ধ করিলেন। তাহার পর চাদরখানি কোমরে জড়াইয়া, পুরাতন জীর্ণ ছাতাটী হাতে করিয়া বাহিরের উঠানে আসিয়া নেতাকে বলিলেন "আমি ফুলতলার হাটে চল্লাম। আমার আস্‌তে দেরী হবে। তুই আর আমার জন্য বসে থাকিস্‌নে; তোর মত দুটো রেঁধে খাস্; আমি জল-টল খেয়েই আস্‌ব। আর দেখ্, আমি কেষ্টা, বিপিন আর পাঁচুকে পাঠিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। যা-যা করতে হবে, তাদের বলে যাচ্ছি। তারা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ দেখিস্ যেন লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়ারা ঠাকুরখানি ভেঙ্গে না ফেলে।"

"কি ঠিক করলে দাদা?"

"ঠিক আবার কি করবো—পুজোটুজো আমার দিয়ে হচ্চে না।"

"তবে আর সাত-তাড়াতাড়ি ফুলতলায় যাওয়া কেন? খেয়ে-দেয়ে হাটে গেলেই হোতো!"

মল্লিক সে কথার কোন উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন। একটু পরেই চারি পাঁচ জন মজুর আসিয়া নেতাকে বলিল "দিদিঠাক্‌রুণ, কর্ত্তা ব'লে গেলেন বাইরের আর ভিতরের উঠোনের পাশে দক্ষিণ-মুখো করে একটা চালা বাঁধতে হবে। সেইখানেই না কি প্রতিমা রাখা হবে। ঘরে যে কখানা টিন আছে, তাই দিয়ে চালা বাঁধতে হবে!"

নেতা তখন বুঝিতে পারিল, তাহার দাদা পূজার জিনিসপত্র কিনিবার জন্যই এত তাড়াতাড়ি ফুলতলায় গেলেন। এ অঞ্চলের মধ্যে ফুলতলার বাজার ও হাট প্রসিদ্ধ—এত বড় বাজার, আর শনি মঙ্গলবারে এত বড় হাট সে অঞ্চলে আর কোথাও হয় না। সে দিন মঙ্গলবার ষষ্ঠী—সে দিনের হাটে অনেক দ্রব্য আসিবে। অনেক দূর হইতে অনেক ক্রেতা এই মঙ্গলবারের হাটে পূজার জিনিসপত্র কিনিবে। নেতার মনে বড়ই আনন্দ হইল,—তাহার দাদার নিশ্চয়ই সুমতি হইয়াছে। সে তখন মহা উৎসাহে কাজে লাগিয়া গেল;—কোথায় কি করিতে হইবে, তাহা মজুরদিগকে বলিয়া দিতে লাগিল,—মজুরেরা কিন্তু কর্ত্তা যাহা বলিয়া গিয়াছিল, তাহাই করিতে আরম্ভ করিল।

এ দিকে ঠাণ্ডা মল্লিক ফুলতলার হাটে যাইয়া দেখিলেন, তখন জিনিসপত্র আমদানি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তিনি প্রথমেই ময়রাদের দোকানে গেলেন। বাজারে সাত-আট খানি ময়রার দোকান। যে দোকানে যত চিঁড়ে মুড়কি ছিল তাহা সমস্ত তিনি কিনিয়া ফেলিলেন এবং দোকানদার-দিগকে বলিলেন যে, পূজার তিনদিন যে যত নারিকেলের সন্দেশ দিতে পারিবে, তিনি তাহাই লইবেন। দোকান-দারেরা সকলেই মল্লিকের এই কার্য্যে অবাক্ হইয়া গেল। মল্লিক তাহাদিগকে বলিলেন "কি করি, শালারা আজ ষষ্ঠীর দিন প্রতিমা বাড়ীর উপর ফেলে গেছে। মাকে পুজো করি আর না করি, না খাইয়ে ত রাখ্‌তে পারিনে; তাই চাটুটে

চিঁড়ে মুড়কি নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা সবাই প্রসাদ পেতে যেও।"

কথাটা হাটময় রাষ্ট্র হইয়া গেল; সকলেই এই কথা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। মল্লিক তখন হাটে যত চিঁড়া মুড়কি বাতাসা আমদানি হইল, সমস্ত কিনিয়া ফেলিলেন। পঁচিশ ত্রিশখানি গ্রামের পূজা-বাড়ীর লোকেরা এই হাটে চিঁড়া মুড়কি প্রভৃতি কিনিবে বলিয়া আসিয়াছিল; তাহারা কেহই এক সের দ্রব্যও পাইল না। মল্লিক হাটে সমাগত গোয়ালাদিগকে দধির কথা বলিলেন; কিন্তু কেহই এত অল্প সময়ের মধ্যে দধি সরবরাহ করিতে সাহসী হইল না। মল্লিক বলিলেন "যাক্, বেটীকে এবার শুক্‌নো চিঁড়েই চিবুতে হবে—আমি কি করবো।"

চিঁড়া মুড়কি বাতাসা, গাতা, হাঁড়ি, কলসী, প্রভৃতি কিনিয়া ঠাণ্ডা মল্লিক স্তূপাকার করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর কয়েকখানি গরুর গাড়ীতে সেই সকল দ্রব্য বোঝাই হইতে লাগিল। বোঝাই শেষ হইলে গাড়ীগুলি বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া, তিনি মজুরদিগকে নারিকেলের সন্দেশের জন্য যাহার যাহা প্রয়োজন, সেই পরিমাণ টাকা বায়না করিলেন। তাহার পর হাটের মধ্যে নিধে চুলীর সহিত তাঁহার দেখা হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন "দেখ্ নিমচাঁদ, তোকে একটা কাজ করতে হবে। আজ এই হাটে এখনই ঢোল-সহরত দে, যে, কাল থেকে তিনদিন আমার বাড়ীতে মায়ের পূজা হবে; সব দুঃখী কাঙ্গালীর নিমন্ত্রণ। শুধু হাটেই সহরত দিলে হবে না; গাঁয়ে-গাঁয়ে বলে দিতে হবে। আজ এই টাকাটা নে, তার পর তোর যা পাওনা হবে, পূজোর পর মিটিয়ে দেব। সব দুঃখী-কাঙ্গালী—বুঝলি ত!"

বেলা প্রায় আড়াইটার সময় মল্লিক হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন; দেখিলেন মজুরেরা চণ্ডীমণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে এবং বাহিরের প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিতেছে। একটু পরেই জিনিসপত্র বোঝাই পাঁচখানা গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। মল্লিক মজুরদিগকে বলিলেন, "ওরে ও সব এখন থাক্; আগে জিনিসগুলো নামিয়ে ঘরে তোল্।"

নেতা তখন তাড়াতাড়ি আসিয়া জিনিসগুলি ঘরে তুলিতে-তুলিতে বলিল "পূজোর জিনিস কৈ দাদা!"

দাদা রুক্ষস্বরে বলিল, "এই ত সব পূজোর জিনিস। আবার কি লাগবে?"

নেতা বলিল "এ সব ত চিঁড়ে-মুড়কি। পূজোর জন্য যে সব জিনিস লাগবে, তা ত দেখ্‌ছি নে। সে সব বুঝি আস্‌ছে।"

"না, মা, আর কিছু আসবে না। দই ত পাওয়া গেল না; কেউ দিতে স্বীকার হোলোই না। আর নারিকেলের সন্দেশ,—তা কাল থেকে আসতে আরম্ভ হবে। আমি সব ঠিক করে এসেছি। বেটীর যেমন অদেষ্ট, শুকনো চিঁড়ে খাক্—আমি কি করব।"

"তা ত বুঝলাম দাদা, কিন্তু মায়ের পূজো ত করতে হবে? তার জিনিস কৈ?"

"যা - যা, আর বকাবকি করতে পারিনে। পূজো,—পূজো আবার কি? ও সব ঘণ্টা-নাড়া আর ফুল-বেলপাতা দেওয়া—সে সব হচ্চে না।"

নেতা অবাক্ হইয়া দাদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; এমন অনাসৃষ্টি ত সে কখনও দেখেও নাই, শোনেও নাই।

"বেলা যে তিন পহর হয়ে গেল, একটু তেল্ দে, স্নানটা সেরে নিই। আজ আর খাওয়া-দাওয়ার সময় নেই—এখনও আমার অনেক কায বাকী।"

(৪)

তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করিয়া ঠাণ্ডা মল্লিক গ্রামের মধ্যে বাহির হইলেন। সকলে শুনিল যে, মল্লিক দুঃখী-কাঙ্গালী ভোজনের বিপুল আয়োজন করিতেছেন। মল্লিক প্রথমেই লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন, এবং তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কাকাবাবু, এক রকম ত জোরে ফেল্‌লাম। তোমার ও পূজো-টুজো আমি করব না; সে তোমাকে যা বলেছি, তাই হবে। বেটী যখন বাড়ীতে এসেছে, তখন না খাইয়ে ত আর রাখতে পারিনে, তাই দুটো চিঁড়ে মুড়কির আয়োজন করেছি। সব কাঙ্গাল-দুঃখীকে নিমন্ত্রণ করতে পাঠিয়েছি। মায়ের নাম করে তারা তিনদিন খাবে—সেই আমার পূজো। তোমরা সবাই গিয়ে দেখবে। যাতে মায়ের একটী কাঙ্গাল ছেলেও না খেয়ে চলে যেতে না পারে, তাই তোমাকে দেখতে হবে কাকা।"

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, "সে বেশ করেছ শীতল,

কিন্তু শাস্ত্রানুসারে পূজা-অর্চ্চনাও ত করা চাই ; নইলে যে মহা অপরাধ হবে।"

"মায়ের কাঙ্গাল ছেলে-মেয়েরা পেট ভরে খাবে, এতে যদি মায়ের পূজো না হয়, এতে যদি মা খুসী না হন,—তা হলে অমন মায়ের পূজো আমি করি নে।"

লাহিড়ী মহাশয় আর কথা বলিলেন না। মল্লিক গ্রামের প্রত্যেকের বাড়ী যাইয়া সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যথারীতি পূজা হইবে না শুনিয়া যদিও সকলেই আপত্তি করিলেন, কিন্তু মল্লিককে দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া সকলেই কাঙ্গালী-ভোজনের সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় গ্রামের মুরুব্বীরা মল্লিকের বাড়ী আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহারা পূজার ব্যবস্থা করিবার জন্য মল্লিককে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই এক কথা—"আমি যা ব্যবস্থা করেছি, তাতে যদি মায়ের পূজো না হয়, না হবে।"

ইতঃপূর্ব্বেই কয়েকজন লোকের সাহায্যে প্রতিমাকে নবনির্ম্মিত মণ্ডপে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। পূজার আসন দেওয়া হয় নাই, ডাকের সাজ দিয়া প্রতিমাকে সাজান হয় নাই, এমন কি নবনির্ম্মিত মণ্ডপে গোবর-ছড়া পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। মণ্ডপের মধ্যে প্রতিমার সম্মুখে একটী মৃৎপ্রদীপ মিট্‌মিট করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহাতে অন্ধকার দূর না হইয়া আরও বেশী অন্ধকার বোধ হইতেছিল। সকলেই মল্লিকের এই অদ্ভুত ব্যবস্থার কথা লইয়া আলোচনা-আন্দোলন করিতেছিল। এমন সময় একজন অপরিচিত ভিখারী আসিয়া-মায়ের মণ্ডপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, একতারা বাজাইয়া গান ধরিল—

"শক্তিপূজা কথার কথা না।
যদি কথার কথা হোতো, চিরদিন ভারত
শক্তি পুজে শক্তিহীন হোত না।
কেবল ডাকের গহনায়, ঢাকের বাজনায়
শক্তিপূজা হয় না ;
এক মনোবিষদলে, ভক্তি-গঙ্গাজলে,
শতদল দিলে হয় সাধনা। (হৃদয়)
দিলে আতপান্ন, কি মিষ্টান্ন, মা যে তাতে তোলেন না ;
কেবল জ্ঞান-দীপ জ্বেলে, একান্ত ধূপ দিলে
ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা।
বনের মহিষ অজা, মায়ের বাছা, মা সে বলি লন না ;
যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ,
বলিদান কর বিলাস-বাসনা।
কাঙ্গাল কর কাতরে, জাত-বিচারে শক্তিপূজা হয় না ;
সকল 'বর্ণ' এক হ'য়ে, ডাক মা বলিয়ে,
নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না।"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া ভিখারীর এই গান শুনিল। গান শেষ হইলে মল্লিক বলিলেন "শুন্‌লে তোমরা, মা নিজে গান শুনিয়ে গেলেন। আরে, শীতল মল্লিক কি আর শাস্ত্র জানে না।" তাহার পরই প্রতিমার সম্মুখে যাইয়া গলদশ্রীকৃতবাসে করযোড়ে বলিলেন "মা, তোর কাঙ্গাল ছেলেরা তোর পূজো করবে, সেই পূজোই তোকে নিতে হবে। বল্ মা, পুরুতের পূজো নিবিনে—কাঙ্গাল ছেলেদেরই পূজো নিবি?" এই বলিয়া মল্লিক মায়ের মুখের দিকে চাহিলেন। কি দেখিলেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। একটু পরেই বলিয়া উঠিলেন "ওরে, আমি কি আর তা বুঝি নেই। ঐ দেখ্, মা হাস্‌ছেন। ঐ দেখ্, মা বল্‌ছেন—শীতল, আমি তোর পূজোই নেব।" শীতল মায়ের সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রণাম করিলেন।

(৫)

গ্রামের লোকেরা মনে করিয়াছিল, মল্লিক যাহাই বলুক না কেন, পূজা তাহাকে করিতেই হইবে। কিন্তু অপরাহ্নে মল্লিক যখন ফুলতলার হাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দ্রব্যাদি দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল ঠাণ্ডা মল্লিকের যে কথা সেই কাষ। তখন মহেশ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে থিয়েটারের যুবকদল মিলিত হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শ মত অতি গোপনে সেই বাড়ীতেই পূজার দ্রব্যাদি আহরণ করিতে লাগিল। থিয়েটারের ফণ্ড হইতে টাকা লইয়া যুবকদল হাটে, বাজারে, নানাদিকে ছুটিল ; রাত্রি আটটা-নটার মধ্যেই পূজার দ্রব্যাদি যথাসম্ভব সংগৃহীত হইল। ঠাণ্ডা মল্লিক এ ব্যাপার ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না।

সপ্তমীর দিন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়াই মল্লিক তাঁহার ভগিনীকে বলিলেন, "আমাকে এখনি একবার ফুলতলায়

বাজারে যেতে হচ্ছে। মজুরদের বিশ্বাস নেই, তারা যদি সময়মত সন্দেশ না নিয়ে আসে, তাহলে বড়ই মুস্কিল হবে। আমি একবার গিয়ে দেখে আসি; এই ঘণ্টা-দুইয়ের মধ্যেই ফিরে আস্‌বো।" এই বলিয়া মল্লিক ফুলতলায় চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া দুষ্কৃতগণ সপ্তমী পূজার দ্রব্যাদি আনিয়া উপস্থিত করিল। সাতটা বাজিতে না বাজিতেই পুরোহিত মহেশ ভট্টাচার্য্য সমস্ত দ্রব্য গুছাইয়া লইয়া পূজায় বসিলেন; ব্রাহ্মণ বুকুগণ আয়োজন করিয়া দিতে লাগিল।

একটু পরেই ঠাণ্ডা মল্লিক বাড়ীতে আসিয়া দেখেন, তাঁহার পুরোহিত মহেশ ভট্টাচার্য্য যথারীতি পূজা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন; পূজার দ্রব্য-সম্ভারে চণ্ডীমণ্ডপ পূর্ণ রহিয়াছে; সামান্ত একটুও ত্রুটী হয় নাই।

এই দৃশ্য দেখিয়া মল্লিক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তিনি যে কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; সহসা তাঁহার দৃষ্টি দুর্গা ঠাকুরাণীর দিকে আকৃষ্ট হইল; তিনি স্পষ্ট দেখিলেন, মা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হাস্য করিতেছেন। এমন মনোহর মূর্ত্তি, এমন সহাস্য বদন তিনি ত জীবনে কখন দেখেন নাই! তাঁহার তখন মনে হইল, পূজার যে আয়োজন তিনি করিয়াছেন, তাহা হয় ত মায়ের মনের মত হয় নাই; তাঁহার মনে হইল পূর্ব্বদিন তিনি মায়ের যে হাসিমুখ দেখিয়াছিলেন, সে হাসিমুখ নহে—ভ্রূকুটি—তাঁহারই দৃষ্টিবিভ্রম হইয়াছিল।

আবার তিনি মায়ের মুখের দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন সত্যসত্যই মায়ের বদন প্রফুল্ল। গভীর মর্ম্মবেদনায় তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবে কি মা, আমার পূজা তুই নিবি না? আমি যে তোর নাম করে, তোর গরীব-দুঃখী ছেলেদের পূজো ক'রতে চেয়েছিলাম, তাতে কি তোর পূজো হ'ত না মা? তবে কি তোর গরীব-দুঃখী-ছেলেমেয়েদের আজ ফিরিয়ে দেব? তাদের কি ব'লব, তোরা সব চলে যা; তোদের পূজো করলে মায়ের পূজো হবে না?" তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; তিনি আর একটী কথাও বলিতে পারিলেন না; তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে সমস্ত জগৎ অন্ধকার হইয়া গেল;—ক্ষণকালের জন্ত তাঁহার চেতনা লুপ্ত হইল।

পরক্ষণেই তাঁহার লুপ্ত-সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মহেশ, ভাল ক'রে পূজো কর ভাই! মা বল্‌ছেন, তোমার পূজোও নেবেন, আমার পূজাও নেবেন। এই যে মা ব'লে গেলেন 'ওরে, সবাই আমার ছেলে। যে যেভাবে আমার পূজো করে, প্রাণ দিয়ে করলে আমি তাই গ্রহণ করি। মা দুর্গে, আমার কি শক্তি যে তোর পূজো করি মা! আমি ত তোকে একদিনও ডাকিনি; আমি ত তোকে একদিনও চাইনি। আমি চেয়েছি টাকা,—তা তুই আমাকে ঢের দিয়েছিস্। এখন তোর জিনিস তুই বুঝে নে,—তোর টাকা তোর পূজোয় তুই লাগা, আমায় ছুটি দে।" এই বলিয়া শীতল মল্লিক বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন. ভক্তের অশ্রুবিন্দুতে মহামায়ার মহাপূজা সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

তাহার পর তিনদিন ধরিয়া মল্লিকের অঙ্গনে শত-শত দীন-দরিদ্র, অনাথ-অনাথা মায়ের প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গেল। শীতল মল্লিক চারিদিকে দৌড়িয়া বেড়ান, আর এক-একবার চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া করযোড়ে বলেন,—

"জয় মা আনন্দময়ী।"

বাঙ্গালার কথা

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

বিবাহের বাজার :—

কাগজে-কলমে ও বক্তৃতার মুখে আমরা অহরহঃই 'হা-জন্মভূমি' 'হা-বাঙ্গালী' বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকি, অথচ আমাদেরই ঘরে কন্যাদানে পণ-প্রথার জ্বালা ক্রমে তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। সহযোগী 'কাশীপুর নিবাসী' লিখিতেছেন—"বর্ত্তমানে ইংরেজী বিদ্যার প্রভাবস্থান কন্যাদাতার বাড়ী। যখন দেখা যায়, একটী যুবক ইংরেজী স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তখন, তাহার মূল্য (বিবাহের বাজারে) নগদ ১০০০৲ টাকা; অথচ কলেজে ভর্ত্তি হইতে গেলে বলে যে, তোমার ডিভিসন খাট। যদি বা কলেজের একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল তখন (বিবাহের বাজারে) তাহার মূল্য ২০০০৲; কোন রাজকার্য্যের প্রার্থী হইলে বলে, তুমি অর্দ্ধশিক্ষিত; অতএব ২০৲ টাকার যোগ্য পণ তোমার জন্য প্রস্তুত, তাহাও স্কুলে। যদি বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তিনি ত বিশেষ শিক্ষিত, (বিবাহের বাজারে) তাঁহার মূল্য ৫০০০৲; চাকুরীর বেলায় ৩৫—৪০৲ মাষ্টারী অথবা পোষ্টাফিসের কেরাণী। তবে কি ইংরেজী বিদ্যাটা কেবল শ্বশুর মহাশয়ের স্কন্ধেই চাপিয়া থাকিবে? তাই বলি চাকুরির বাজারেই বি-এ সস্তা। বিয়ের বেলা নয়।"—এ বাজার-দর মিথ্যা নহে। বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজ কিরূপ উন্নত, ঐ সংক্ষিপ্ত বাজার-দরেই তাহা সুপ্রকট!

অথচ, যাহাদের আমরা অশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা করি, যাহাদিগকে 'ছোটজাতি' বলিয়া দূরে রাখিবার চেষ্টা করি, তাহাদের মধ্যে এ মহাপাপ এখনও তেমন প্রবেশ করিতে পারে নাই। বিবাহ-ব্যাপারে বণিক-বৃত্তি আমাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহারা এ কাজটাকে অন্তরের সহিতই ঘৃণা করে। ছেলে বিক্রয়ের কথা শুনিলে এখনও তাহারা ঘৃণায় কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করে। শিক্ষিত পিতা ও শিক্ষিত পুত্র, দুইজনেই যাহা হাসিমুখে সগৌরবে করিয়া থাকে, অশিক্ষিত সমাজ তাহা দূর হইতে দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। ইহা অতিরঞ্জন নহে। কন্যা পক্ষের দাস-দাসীরা কন্যার শ্বশুর-গৃহে 'তত্ত্ব' লইয়া গিয়া দেখিয়া শুনিয়া আসিয়া যাহা বলে, তাহা ঘৃণা, লজ্জা ও আশঙ্কারই অভিব্যক্তি! 'ভদ্রলোকের ঘরে' আসিয়া তাহারা যাহা দেখিয়া যায়, তাহাতে তাহারা আমাদের চেয়ে নিজেদেরই অধিকতর সুখী মনে করে!

এ নির্লজ্জ নিষ্ঠুর—এ অবৈধ ঘৃণ্য ব্যবসায় বাঙ্গালা হইতে দূর করিবার জন্য চেষ্টা যে একেবারেই হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। এ সামাজিক ব্যাধি দূর করিবার জন্য বঙ্গীয় কবি সতেজে চাবুক চালাইয়াছেন,—বাগ্মী বহু বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন,—শ্রোতারাও তাহাতে করতালি দিয়াছেন,—রঙ্গমঞ্চে দর্শকগণও কন্যার বাপ-মায়ের দুঃখ দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন; কিন্তু তবু আমাদের চৈতন্য উদয় হইল না! যে অন্ধকারে ছিলাম, সেই অন্ধকারেই আছি। যাহারা সভায় দাঁড়াইয়া পণ-প্রথার বিরুদ্ধে 'তীব্র ও ওজস্বিনী ভাষায়' বক্তৃতা দান করেন, তাঁহারাই ঘরে আসিয়া ছেলেকে 'হায়েষ্ট-বিডারে' বিক্রয় করিতে সদা ব্যস্ত! যাঁহাদের ঘরে বাপ-মায়ের মলিন-মুখ দেখিয়া কুমারী কন্যা কেরোসিনের অনলে আত্ম-সমর্পণ করে, তাঁহাদেরই ঘরে পুত্রের বিবাহের সময় আবার পুত্র-নিলামের সাংঘাতিক দৃশ্য দেখিতে পাই! শুনিতে পাই, ব্যাপারটা নাকি অর্থনীতির বিধানীভূত। কিন্তু উহার অর্থ আদৌ বুঝিতে পারি না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অন্য কোনও সমাজে এ নির্ম্মম দৃশ্য দেখিতে পাই না কেন?—অশিক্ষিত দীন-দুঃখীরা তবে এ প্রথাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে কেন? ইহাতে পুলিশের হাত নাই, কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহাকে উঠাইবার জন্য ব্যবস্থাপক-সভায় আবেদন-আলোচনও করিতে হয় না; তবু ইহাকে তাড়াইতে পারিলাম না। ইহা কাহার দোষ?—আমাদের মনুষ্যত্বের নয় কি? কথাটা আমাদের লজ্জার ও কলঙ্কের পরিচায়ক বটে, কিন্তু উহা না বলিয়াও যে থাকা যায় না। আমরা

যে সত্যই মরিতে বসিয়াছি। যাহাকে আত্মহত্যা বলে, ইহা তাহাই। গত বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত যতগুলি বিবাহের সংবাদ আমরা শুনিয়াছি, তাহার মধ্যে একটিও 'দেনা-পাওনা' সম্পর্কচ্যুত নহে। অতএব, কেমন করিয়া বলিব যে, আমরা স্বজাতিকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি?—কেমন করিয়া বলিব, আমাদের স্বজাতি-প্রেম অকপট ও বিশুদ্ধ?

অনেকে বলেন, কন্যা-দানের পণের মূলে নারীর আপার-অভিলাষই উৎকট হলাহলরূপে বিরাজ করিতেছে। ছেলে দুই একটি পাশ করিলেই বাড়ীর গৃহিণীরা অমনি আব্দার ধরিয়া বসেন যে, আমার বকুল-কুলের পাশ-করা ছেলে যখন অত পাইয়াছে, তখন আমরাই বা ছেলের বিবাহে সোণার ঘুঘু পাইব না কেন?—আমার ছেলেই বা কম কিসে?—এ সব কথা নিতান্ত মিথ্যা নহে; কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কাহারা? বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে—যাহারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্তই স্বামী পুত্র সমর্পণ করিয়া সংসারকে স্বর্গ করিয়া তুলিবার জন্য সদা সচেষ্ট,—তাহারা অমন আব্দার করে কেন?—তোমাদেরই মুখ দেখিয়া নয় কি? শিক্ষিত স্বামী ও শিক্ষিত পুত্র যাহা করিতে সুখ অনুভব করে, তাহারা তাহা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিবে কেন? তাহারা আব্দার করে আমাদেরই দোষে। ইংরাজী শিখিয়া যাহারা বিবাহকে সংস্কার বলিয়া গ্রাহ্য করে না,—পত্নীকে সহধর্ম্মিণী বলিয়া জ্ঞান করে না, তাহাদের ঘরের মেয়েদের কাছে কতটুকু আশা করা যায়? পতি-পুত্রের টাকার পিপাসা দেখিয়াই তাহারা ছেলের বিবাহে সোণার ঘুঘুর দাবী করে;—অন্য কারণে নহে।

এ ব্যাপারে কন্যার অভিভাবকবর্গও যে একেবারে দোষমুক্ত, এমনও বলিতে পারি না। পাশ-করা ছেলের উপর তাঁহাদের যেরূপ ঝোঁক, তাহাতে পণ-প্রথার জ্বালা তো বাড়িবারই কথা। পাশ-করা ছেলে দেখিলেই তাঁহারা তাহার উপর পিয়া চিলের মতন ছোঁ দিয়া পড়েন;—ছেলের স্বভাব-চরিত্রের সন্ধান করেন না,—ছেলে সবল-সুস্থকায় কি না তাহা দেখেন না,—ছেলের অন্নের সংস্থান আছে কি না, তাহাও দেখেন না। তাঁহাদের দৃষ্টি কেবল পাশের দিকে। কাজেই ছেলের অভিভাবকবর্গ কন্যার অভিভাবকদিগের নিকট মধুমোড়া বিষ কিছু আদায় করিয়া লইবার সুবিধা পান। কন্যার অভিভাবকগণ যদি একটু জবরদস্ত হন,—পাত্রের বংশ দেখিয়া, তাহার পরিবারের পরিচয় লইয়া কন্যাদান করেন, তাহা হইলে মনে হয় এ পাপ কতকটা কমিতে পারে। কিন্তু তাহা করিবে কে? পাশের মোহ কেমন যে আমাদের পাইয়া বসিয়াছে, চাকুরীর বাজারে তাহার অশেষ দুর্গতি দেখিয়াও সে মোহ আজিও কাটাইতে পারিলাম না!

কৃষকের ব্যথা :—

পল্লীর কথা, ম্যালেরিয়ার কথা বা কৃষকের কথা লিখিলেই সহরের সুরসিক সাহিত্যিকেরা একটু গোঁফ কুলাইয়া হাসিয়া থাকেন। সে হাসির ভাবখানা এই যে, ম্যালেরিয়া ও চাষা কি সাহিত্যের সামগ্রী?

উহা সাহিত্যের সামগ্রী কি না, জানি না। তবে উহাদের কথা যে আমাদের জীবন-মরণের কথা, তাহা নিঃসঙ্কোচেই বলিতেছি। শুধু তাহাই নহে; ঐ সকল কথাই আমাদের সব চেয়ে বড় কথা মনে করি। আমাদের মতে, দেবর-ভাজের কেচ্ছার কথা সাহিত্যে আমদানী না করিয়া এখন কেবল ঐ সকল কথাই বলিতে পারিলে ভাল হয়। বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে, গৃহস্থ যতদিন জাগরিত না হয়, ততদিন যেন আমরা ঐ সকল কথা ধরিয়াই চীৎকার করিতে পারি। বঙ্কিমের এ বাণী যেন আমরা জীবনে বিস্মৃত না হই যে,—"যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক! যে লেখনী আর্ত্তের উপকারার্থে না লিখিল সে লেখনী নিষ্ফলা হউক।"

গত মাসের 'ভারতবর্ষে' আমরা কৃষকের দুঃখের কথা কিছু বলিয়াছি, এবারেও আর একটু বলিতেছি। পত্রান্তরে জনৈক পল্লীবাসী সম্প্রতি লিখিয়াছেন,—

"বঙ্গের কৃষকজাতি সারা বৎসর হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া দেশের আহার যোগায়, কিন্তু তাহারা পেট ভরিয়া দুইটী দিন খাইতে পায় না। পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, তিন মাসের মধ্যেই অনেকের আহার্য্য নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন তাহাদের জীবিকা কুসীদজীবী ধনী সন্তানের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। তখন দরিদ্র পল্লিবাসী তাহার যথাসর্ব্বস্ব মহাজনের ঘরে বাঁধা রাখিয়া মাসিক প্রতি টাকায় এক আনা সুদে, কখন ততোধিক সুদে অর্থ

সংগ্রহ করে। সেই অর্থের কতকাংশ দ্বারা পরিবারবর্গের আধপেটা আহারে জঠরানল কিঞ্চিৎ উপশমিত হয়, আর কিছু তাহার কৃষিকার্য্যে ব্যয়িত হয়। যদি দেবতা প্রসন্ন হন, যদি ভাদ্র আশ্বিনে বিদেশী বণিকগণের কৃপায় পাট উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়, তবেই এ দরিদ্র জাতি মহাজনের দেনা, রাজার খাজনা পরিশোধ করিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয় তদ্দ্বারা পুত্র কন্যার জন্য দুই এক খানা মোটা কাপড় (যাহা ভদ্র সমাজে ঘৃণিত) খরিদ করিয়া সারা বছরের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম সার্থক মনে করিয়া আনন্দ লাভ করে। আর যদি বিদেশী বণিকের পাটে অরুচি জন্মে, তবে সেবার বাংলায় বিষম কান্নার রোলে গগন পবন আলোড়িত হইতে থাকে। রাজস্ব ও উত্তমর্ণের সুদ-আসলের জন্য আদালতের আইনের হুমকীতে দরিদ্র জাতির হাল গরু, শেষে ঘর বাড়ী, ভিটা মাটী, সকলই ধনীর করতলগত হয়। কৃষককুলের সর্ব্বনাশ হইলেও বাংলার কুসীদজীবী মহাজন নামক ভদ্র শ্রেণীর ইহা সুবর্ণ সুযোগ। বাংলার জমিদারও এই মহা সুযোগে প্রজার বিঘতটুকু খাজনার দায়ে নিলামে উঠাইয়া নিজ খাস অধিকারে ভুক্ত করিয়া, পরে সুবিধামত অপরের কাছে অধিক নজরে অধিক জমায় বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার বার্ষিক আয় বৃদ্ধি পাইল ও এককালীন কিছু মোটা লাভ হইল। এবম্প্রকারে বাঙ্গালার ধনী সমাজে মণি-মাণিক্য-খচিত ত্রিতল চৌতল প্রাণমনবিমোহন সৌধের ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে।"

"সুদূর ইউরোপে পাঁচ বৎসর যাবৎ কুরুক্ষেত্র অভিনয় চলিতেছে। তথা হইতে সে মহা সমরের তরঙ্গ আসিয়া আমাদের দরিদ্র পল্লীতে আঘাত করিতেছে। কৃষকের পাটের মূল্য নাই, আর তাহারা চারি দিকে অন্ধকার দেখিতেছে। রাজার খাজনা, মহাজনের দেনা শোধ করিতে পারিতেছে না। অনেকে হাল গরু বেচিতেছে, শেষে জমি জমা বেচিতেছে, তারপর কুলী মুজরী করিতে বাড়ী বাড়ী ঘুরিতেছে। তথাপি জঠরানল নির্ব্বাপিত হয় না, তাহার উপর বস্ত্রের মূল্য অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহা নিবারণের উপায় না পাইয়া আত্মহত্যায় দুর্ব্বহ জীবনের অবসান করিতেছে।"

"একটী হৃদয় বিদারক করুণ দৃশ্য শিক্ষিত সমাজকে দেখাইব। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের সঙ্কটে কোন দরিদ্র কৃষক, অভাবের তীব্র তাড়নায় বিদ্য-বিদ্যালয়ের শিক্ষিত কোন এক ধনী মহাজনের নিকট মাত্র দশটী মুদ্রা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া গ্রহণ করে। তাহার কিছুদিন পরেই হতভাগা তাহার দুঃখময় জীবনের খেলাধূলা শেষ করিয়া কোন এক অজানা দেশে শান্তিময় জীবন যাপন করিতে আদরের শিশু সন্তানগণকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কৃষক-পত্নী তখন নাবালক পুত্র-কন্যাগণ সহ অন্ধকার দেখিল। তারপর কিছুকাল কৃষক-পত্নী কোন দিন অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে কাটাইল, কিন্তু স্বামীর ঋণ পরিশোধের কোন উপায় হইল না। সুদ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে কৃষক-পত্নী শিশু সন্তান কয়টীকে সঙ্গে করিয়া দাসী-বৃত্তির উদ্দেশ্যে বাটীর বাহির হইল। উত্তমর্ণ এই সুযোগে লভ্য লাভবান হইলেন। তিনি দশ টাকাতেই চারি বিঘা জমীর বাড়ীখানি অধিকার করিয়া বসিলেন। অধমর্ণের বাস্তু-ভিটাতে তিনি এখন বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা আয় করিতেছেন। এইরূপ কত শত শত নর্ম্মান্তিক করুণ অভিনয় দরিদ্র পল্লীর বুকের উপর অভিনীত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে? কত প্রকারের পৈশাচিক অত্যাচারে দরিদ্র পল্লীবাসীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কত অভাবের তাড়নায়—পল্লীবাসী গৃহহারা হইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়া পথে পথে ঘুরিতেছে, কে তার খোঁজ করে।" —বাস্তবিক, এ করুণ দৃশ্য বাঙ্গালার পল্লীতে-পল্লীতে দৃষ্টি-গোচর হয়। কিন্তু ইহার প্রতীকার-কল্পে আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও একটি কড়ে আঙ্গুলও তুলিতে দেখিলাম না। দেশের নেতারা এ সব কাজকে একটা কাজ বলিয়াই মনে করেন না। তাঁহাদের কেহ ম্যাট্‌সিনি কেহ বা মার্ক্স হইতে চাহেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এ কথা খুবই সত্য যে, "ম্যাটসীনি, গারিবাল্ডি, হ্যাম্পডেন্, ক্রমোয়েল হইয়া উঠাই যে একমাত্র বড় কাজ, তাহা নহে; তাহার পূর্ব্বে গ্রামের মোড়ল, পাঠশালার গুরুমশায়, পাড়ার মুরুব্বি, চাষাভুষার সর্দ্দার হইতে না পারিলে বিদেশের ইতিবৃত্তকে ব্যঙ্গ করিবার চেষ্টা একান্তই প্রহসনে পরিণত হইবে। আগে দেশকে স্বদেশ করিতে হইবে, তার পরে রাজ্যকে স্বরাজ্য করিবার কথা মুখে আনিতে পারিব।"

শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ হইতে বিদায়

[৺রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর]

১

যাই যাই যাই, তোমায় ছেড়ে যাই
আনন্দ-নিলয় নদীয়া আমার!
ভুবন-মোহন মূরতি তোমার,
বুঝি এ জীবনে দেখিব না আর।

২

মায়াপুরে তব যেন মায়ের কোলে
কত সুখে তুমি আমায় রেখেছিলে,
সে সব স্মরণে আজি দুনয়নে,
দর দর ধারা বহে অনিবার।

৩

তোমার তরুরাজি, লতার বিতান,
নিকুঞ্জনিচয় অঙ্গন, উদ্যান,
এই বনরেখা প্রাণে র'ল লেখা,
এই শেষ দেখা জীবনে এবার।

৪

ধূলায় প'ড়ে আমি ভাসি অশ্রুজলে,
কত কাঁদিয়াছি হরিবোল ব'লে,
তোমার এই ধূলায়, প্রেমের খেলায়,
উথলিত মম প্রেম-পারাবার।

৫

প্রেমাবেশে কেহ আবার কখন,
এই ধূলায় প'ড়ে করিলে রোদন,
কহিও তাহারে ডাকিলে আমারে,
দেখিতে সে পাবে হৃদয়ে তাহার।

৬

দেখিতে পাইবে এই গঙ্গাজলে,
মৃদু কলকলে কীর্ত্তনের ছলে,
তরল তরঙ্গে, প্রেমের প্রসঙ্গে
ভাসিছে কাঙ্গাল নিমাই তোমার।

আন্দামান-ভ্রমণ

[শ্রী———]

আমার অদৃষ্টে একবার আন্দামান-দ্বীপ দর্শন ঘটিয়াছিল। আমি নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে যাই নাই, ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্তই আজ বলিব।

এ, এস, এন, "মহারাজা" নামক জাহাজ বিলাতী মেলের জন্য অপেক্ষা করিয়া মার্চ্চ মাসে এক মঙ্গলবারে ভাগীরথীর জল-কল্লোল মথিত করিতে-করিতে বঙ্গোপ-সাগরের সুনীল বারিরাশির মধ্যে আমাদিগকে লইয়া উপনীত হইল। সমুদ্র সসম্ভ্রমে 'মহারাজা'র সম্মাননা করিবার জন্য চন্দ্রালোক-মণ্ডিত, ফেণ-রাজি-প্রস্থিত, বিশাল বীচিমালা তাহার গলদেশে পরাইবার জন্য পুনঃ-পুনঃ ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে সমুদ্রের অবস্থা তৎকালে অপেক্ষাকৃত অনেক শান্ত ছিল দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, যেন বিশাল-বপু "মহারাজার" আকস্মিক আবির্ভাবে উদ্ভ্রান্ত প্রবল তরঙ্গরাজি সসম্ভ্রমে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় লইল। রঙ্গে-ভঙ্গে নিস্তরঙ্গ জলরাশির উপর নৃত্য করিতে করিতে সেই অতিকায় বাষ্পীয় পোত আন্দামানের সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর অনতিদূরে একটী বেলা-ভূমি নয়নপথে পতিত হইল। আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নাবিকদলকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, উহা "নারকলডান" দ্বীপ। সমুদ্র-যাত্রার প্রথম হইতে এই দ্বীপ ব্যতীত আমাদের আর স্থলভাগের দর্শন লাভ

হয় নাই। বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে আমরা পোর্ট ব্লেয়ার দেখিতে পাইলাম। সাহেবদের মধ্যে অনেকেই বুধবারের মধ্যরাত্রে চন্দ্র-কিরণোজ্জ্বল বন্দরের অপরূপ শোভা দর্শনে প্রভাত হইয়াছে মনে করিয়া ছোট-হাজিরীর জন্তে চীৎকার জুড়িয়াছিলেন।

নয়ন উন্মীলন করিবামাত্র যে অপরূপ সৌন্দর্য্য সম্মুখে প্রতিভাত হইল, তাহা কল্পনার অতীত। বামে ক্ষুদ্র বিচিত্র দ্বীপ, অগণিত তালতমালমণ্ডিত অপূর্ব্ব বনরাজি ও সম্মুখে সুন্দর শিল্পরচিত গৃহ ও কুটীরসকল অপরূপ শোভায় যেন ঝলমল করিতেছে। ইহাই রস দ্বীপ নামে

ক্রমে সকলেই সুখশয্যা ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বাকাশে স্নিগ্ধ, তরুণ, অরুণ-কিরণ-রশ্মি জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইল। অমনি চারিদিকে একটা সজীবতার সাড়া পড়িয়া গেল। বন্দরের দুই ধার হইতে ছোট ছোট "ডঙ্গি" আসিয়া কয়েদী-বোঝাই নৌকাগুলিকে টানিয়া অতি দ্রুতবেগে গন্তব্য পথে চলিয়াছে। কয়েদীরাও সেদিনকার মত খাটিতে চলিল। সর্ব্ব প্রকারের ব্যবসায়ী আসিয়া আমাদের "মহারাজা"কে ঘেরিয়া ফেলিল; বন্দরও মনুষ্য-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল।

এই স্থানে আমাদের একটু গরম অনুভূত হইতেছিল।

বঙ্গোপসাগরে "কোকো" দ্বীপ

আখ্যাত বলিয়া পরে অবগত হইলাম। বন্দরের অপর পার্শ্বে প্রধান দ্বীপভূমি পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। উর্দ্ধদেশে অদূরে এক উন্নত স্তূপের উপর একটি তারকাকার অভিনব দুর্গ মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান;—ইহাই বিখ্যাত "সেলুলার জেল"। দক্ষিণে সীমাশূন্য বিস্তৃত অরণ্যানী, পশ্চাতে হ্যারিয়েট পর্ব্বতের অধরোহ ভাগ পীত বর্ণে নয়ন স্নিগ্ধ করিতেছে। মধ্যে এবং চতুর্দ্দিকে দ্বীপপুঞ্জ বেষ্টন করিয়া মহার্ণব ভীম গর্জ্জনে অবিশ্রান্ত উত্তাল তরঙ্গ তুলিতেছে।

পরে অবগত হইলাম, এই স্থান হইতে কোন ঋতুতেই গরম একেবারে যায় না। গ্রীষ্ম যেন এ স্থানে মৌরসী মোকররি স্বত্বে কায়েমী বখলিকার হইয়া রহিয়াছে। যাহারা সব সময় এই স্থানে বাস করে, তাহারা বিশেষ স্ফূর্ত্তি অনুভব করে বলিয়া বোধ হইল না।

আন্দামানের জেলখানা দেখিবার জিনিস বটে। যাহাদের সহিত দেখা হইয়াছে, তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়া, তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা তুলিয়া, তাহাদের

আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গের নিকট সে সব কাহিনী বলিয়া তাহাদের দগ্ধ অন্তঃকরণে পুনর্ব্বার ইন্ধন দিতে ইচ্ছা নাই বলিয়া সে সব কথা লিখিতে ক্ষান্ত রহিলাম। এখানে প্রায় ৭৮ শত কয়েদী রহিয়াছে। সেগ্রিগেসন ক্যাম্পে কিছুদিন অবস্থান করিবার পর, সকল কয়েদীকেই ছয় মাসের জন্য এই জেলখানায় বাস করিতে হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য কতকটা শাস্তি দেওয়া, আর কতকটা তাহাদিগকে সন্ধ্যাইয়া দেওয়া যে, তাহারা আন্দামানে প্রমোদ-কাননে ভ্রমণ করিতে আইসে নাই—দণ্ড ভোগ করিতে আসিয়াছে।

ভাল রূপে থাকিতে পারে, তবেই বিবাহ করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। আর যে-কোন স্ত্রী-কয়েদী যদি পাঁচ বৎসর বেশ সচ্চরিত্রতার সহিত কাটাইতে পারে, তবে বর নির্ব্বাচনের উপযুক্ততা লাভ করিয়া থাকে। বিবাহ-যোগ্য পুরুষ অপেক্ষা মেয়েরই সংখ্যা বেশী। তা ত হইবারই কথা। প্রায় একযুগ বাঁচিয়া না থাকিলে ত এ শুভ বিবাহের অবসর পায় না! কিন্তু যাহারা এতদিন বাঁচিয়া থাকে, তাহাদিগকে প্রায়ই একা ফিরিতে দেখা যায় না।

বর নির্ব্বাচনের জন্য মেয়ে কয়েদীদিগকে ছুটী দেওয়া

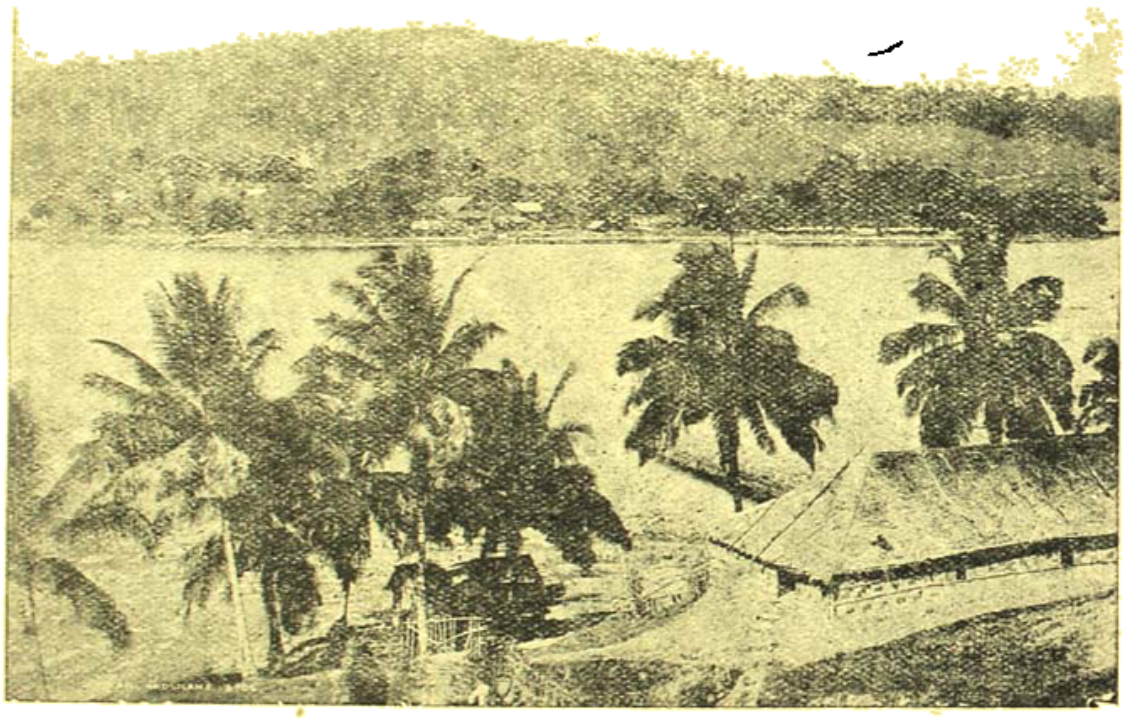

আন্দামান "হোম"

আন্দামানে শুভ-বিবাহেরও বিধান আছে। তবে সে বিবাহে গৌরীদানের ফল ভোগের জন্য পিতা-মাতাকে উপবাসী হইয়া থাকিতেও হয় না, অথবা পুরোহিত মহাশয়কেও বিবাহসভায় বসিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া কণ্ঠ পাইতে হয় না, কিম্বা "নিষ্টান্নমিতরে জনা"ও নাই। এ বিবাহে ঢাক-ঢোলের রবে কর্ণ বধির হয় না; অথবা মধুর শানাইর রব মন প্রাণ হরে না। আছে শুধু বিবাহ। যে-কোন পুরুষ-কয়েদী যদি সচ্চরিত্রতার সহিত দশ বৎসর

হইয়াছে। তাহারা নানা রং বে-রংএ সজ্জিত হইয়া দল বাঁধিয়া একত্র বর-নির্ব্বাচনে চলিয়াছে। সে দৃশ্য অতি সুন্দর। সুদূর ভীষণ আন্দামান তখন সত্য-সত্যই তাহাদের নিত্য আনন্দ-ধামে পরিণত হয়। সেই পুরা-কালের স্বয়ম্বর-প্রথার কথা মনে জাগিয়া উঠে। একদল মেয়ে কয়েদী বর-নির্ব্বাচনস্থানে বসিয়াছে, সকলেরই মন সাগর-তরঙ্গবৎ চঞ্চল,—কাহার অদৃষ্টে কিরূপ বর জুটিবে সেই চিন্তায় বিভোর। যে মনোমত বর পাইল, সে সুখে

নূতন ঘর বাঁধিতে চলিল। যে না পাইল, সে বিষণ্ণ মুখে ফিরিল; তাহাকে আবার কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইল।

আমরা 'রস' দ্বীপ হইতে উপসাগর পার হইয়া এবারডিন নগরে হেঁটিতে নামিয়া জেলখানার দিকে অগ্রসর হইলাম। একটী অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপর উঠিয়া আমরা জেলখানার ভয়াবহ ফটক দেখিয়াই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। সে দৃশ্য কি ভয়ানক! প্রথম ফটক খোলা ছিল; তাহার পরের ফটক বন্ধ; হেড্ জেলার মিঃ "বারি"র খোঁজ করা হইল। একটু পরেই তিনি

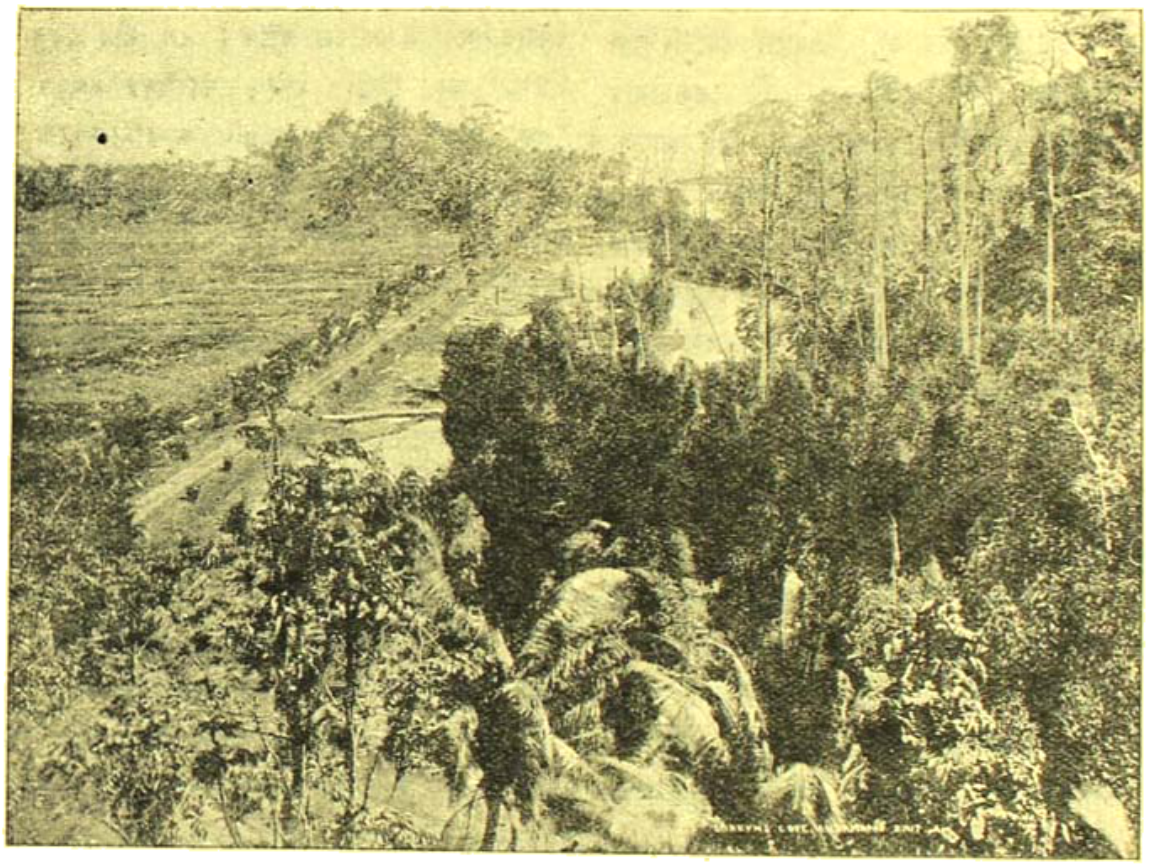

আন্দামান "করবীজের বৃক্ষ"

আসিলেন। যদিও তিনি সেদিনকার মত জেলখানা পরিদর্শনের কার্য্য শেষ করিয়াছিলেন, তথাপি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া জেলখানার ব্যাপার দেখাইতে পুনরায় চলিলেন। জেলখানাটী চক্রাকারে নির্ম্মিত, তথায় প্রচুর পরিমাণে নারিকেলের চাষ হইয়া থাকে। নারিকেলের পাহাড় দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কোন-কোন কয়েদী ঘূর্ণ্যমান চিরুনীর দ্বারা নারিকেলের ছোবড়া হইতে আঁশ বাহির করিতেছে; আবার কতকগুলি কয়েদী সেই আঁশ পাকাইয়া দড়ি প্রস্তুত করিতেছে। কোন-কোন কয়েদী নারিকেলের ভিতর হইতে শাঁস বাহির করিতেছে। এখানে নারিকেলের মালাকে একেবারে কাটাইয়া ফেলা হয় না। এক স্থানে ছিদ্র করিয়া সমস্ত শাঁস অতি সাবধানতার সহিত খণ্ড খণ্ড করিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়। মালা হুঁকার জন্য বিক্রী হয় ও শাঁস হইতে তৈল প্রস্তুত করা হয়। তৈল তৈয়ারী হইলেই শাঁসের নিস্তার হইল না। তৈল তৈয়ারীর পর শাঁস গরুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। সব কার্য্যই তড়িতবৎ চলিতেছে, কোন সাড়া-শব্দ নাই, কাহারও মুখে কোন কথাটী নাই। এমন কি, আমাদের দিকে চাহিবার তাহাদের অবসরও নাই। জেলখানার অন্য দিকে সুন্দর-সুন্দর চুবড়ী তৈয়ার হইতেছে। আমাদের সঙ্গীরা কাজ দেখিয়া কিনিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। আর একদিকে বেতের টেবিলও তৈয়ারী হইতেছে। কেহ-কেহ খেলানাও প্রস্তুত করিতেছে; আবার আসবাবপত্রও তৈয়ার করা চলিতেছে। সঙ্গীরা অনেক জিনিসপত্র

কিনিয়া ফেলিলেন। আমিও আমার ছোট মেয়ের জন্ত খান-কয়েক বেতের চেয়ার ও টেবিল কিনিয়া লইলাম।

"রিক্‌শ" যানে চড়িয়া জেলখানা হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর আসিয়াই আমরা স্ত্রীলোকদিগের জেলখানার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। স্ত্রীলোকদিগকে দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তাহারা কাতর দৃষ্টিতে আমাদের পানে বারে-বারে চাহিতে লাগিল, ও তাহাদের কৃত-কর্ম্মের কথা ভাবিয়া মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল। কতকগুলি স্ত্রীলোকের অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখিয়া ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক বলিয়া মনে হইল। এ জেলখানা দেখিলে পুরুষদের জেলখানার মত ভয় করে না। এখানে মেয়েদিগকে অনেকটা স্বাধীনতা দেওয়া আছে। এই জেলখানায় কয়েদীদিগের জন্ত পোষাক তৈয়ারী করা হইয়া থাকে, সূতা চাঁড়া ও চরকা কাটা ইহাদের প্রধান কাজ।

আন্দামানের আদিমবাসীদিগকে দেখিবার জন্ত আমাদের মধ্যে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরদিন আমরা তাহাদিগকে দেখিবার কল্পনা করিয়া চিফ্ কমিসনার মহাশয়কে আমাদের অভিপ্রায় জানাইলাম। তাঁহার অনুগ্রহ আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। পরদিন একটী "লঞ্চ" যোগাড় করিয়া তিনিও আমাদের সহিত চলিলেন। আমরা পরমানন্দে "হোম" দেখিতে রওনা হইলাম। আন্দামানিরা যেখানে থাকে, তাহা আন্দামানিজ্ "হোম" নামে আখ্যাত। মধুর মলয় পবন সেবন করিতে-করিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এ "হোম" কথাটা শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম, না জানি কি বিরাট ব্যাপারই তাহার ভিতর আছে। কিন্তু যখন "হোমে" আসিয়া পড়িলাম, তখন সে ভ্রম দূর হইল। "হোম"-এর অর্থ হচ্ছে একটা প্রাচীর-ঘেরা স্থান, আর তাহার ভিতর কতকগুলি ছোট-ছোট ঘর। আন্দামানিজদের যখন মর্জ্জি হয়, তখন তাহারা তাহার ভিতর আসিয়া বাস করে; এবং যে কয়েক দিন তাহারা সেখানে থাকে, সে কয়দিন গভর্ণমেণ্ট তাহাদের রসদ্ যোগাইয়া থাকেন। তৎবিনিময়ে তাহারাও সমুদ্রের মূল্যবান শামুক ইত্যাদি কুড়াইয়া গবর্ণমেণ্টকে দিয়া থাকে। যদি কোন কয়েদী কোন প্রকারে পলায়, তাহা হইলে আন্দামানিরা তাহাকে ধরাইয়া দেয়। আন্দামানিজরা দেখিতে কালো ও বেঁটে, অনেকটা নিগ্রোর মত চেহারা-বিশিষ্ট। চুল কোঁকড়ান ও নাক খাবড়া। তাহাদের মুখে দুঃখ-কষ্টের লেশ মাত্র নাই। ইহাদের বুদ্ধি-বৃত্তি ছোট-ছোট বালকের ন্যায় অপরিপক্ক। অধিকাংশ আন্দামানিজই ইংরেজের সহিত কোনরূপ শত্রুতা করে না। কিন্তু "জোবরাজ" নামক জাতি ইংরেজের সহিত অদ্যাবধি সখ্যতা স্থাপন করে নাই। তাহারা সুযোগ পাইলেই অনিষ্ট করিয়া থাকে। যদি কোন কয়েদী কাঠ কাটিতে-কাটিতে অনেক দূর জঙ্গলের ভিতর গিয়া পড়ে, তাহা হইলে "জোবরাজেরা" প্রায়ই তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহার সব যন্ত্রণার অবসান করিয়া থাকে। সে তীর একবার গায়ে লাগিলে আর নিস্তার নাই; তাহাদের লক্ষ্যও অব্যর্থ। "লঞ্চ" হইতে আমরা কতকগুলি আন্দামানিজকে দেখিতে পাইলাম। আমাদের "লঞ্চ" ঘাটের নিকটবর্ত্তী হইতেছে দেখিয়া তাহারা দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। পরে আমাদের সহিত তাহাদের চিরপরিচিত জেলার সাহেবকে দেখিয়া হাসিতে-হাসিতে ও কত রকমের অঙ্গভঙ্গী করিতে-করিতে আমাদের নিকট আসিয়া জুটিল। আমি একজনকে একটা সিগারেট দিলাম। সে খুব আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিল এবং দুই টানেই শেষ করিয়া দিল।

চিফ্ কমিসনার সাহেব তাহাদিগকে "যুদ্ধ" নাচ নাচিবার আদেশ করিলে অনেকগুলি স্ত্রীলোক সারি-সারি বসিয়া তাল দিতে আরম্ভ করিল; আর পুরুষেরা নাচিতে লাগিল। নাচ নিতান্ত মন্দ নহে। জেলার সাহেব বলিলেন, "এই প্রাতে ৮টার সময় ভাল নাচের আশা করা যুক্তিসঙ্গত নহে,—এমন সময় কে নাচিতে পারে?" তিনি আরও বলিলেন, "ইহাদিগকে দেখিলে আমার বড় ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। আমি যতদিন এখানে আসিয়াছি, হাসি ছাড়া একদিনের তরেও ইহাদিগকে দুঃখে কাতর হইতে দেখিলাম না।" যুদ্ধের নাচ হইয়া যাইবার পর তাহারা তাহাদের তীরে লক্ষ্য-বেধ দেখাইল। সত্য-সত্যই তাহা অতি চমৎকার। এরূপ তীরন্দাজ ইতিপূর্ব্বে কখনই দেখি নাই। প্রথমে একে-একে লক্ষ্য-বেধ করিল। তাহার পর এক সঙ্গে লক্ষ্য বেধ করিল। কি আশ্চর্য্য! এক জনেরও তীর নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যতীত এক তিলও তফাতে লাগে নাই। চিফ্ কমিসনারও তাহাদের লক্ষ্য-বেধের যথেষ্ট প্রশংসা

করিলেন, এবং বলিলেন "ইহাদের সমকক্ষ তীরন্দাজ জাতি অতি অল্পই আছে। অব্যর্থ সন্ধানী হইতে না পারিলে ইহাদের পেট চলাও ভার; কারণ, শিকারই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা।" ইহারা কোনও প্রকার কৃষিকর্ম্ম করে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে, কমিসনার সাহেব আমাদের কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "গরু, মহিষ, দেখিলেই যখন ইহাদের জিহ্বা হইতে লালা ঝরে, তখন ইহাদের চাষ করিবার অবসর কোথা? ইহারা তীর দ্বারা জল হইতে মৎস্য ধরিয়া আহার করে। বাঘ ভল্লুকেরও ইহাদের নিকট নিস্তার নাই। বাঘের ধারণা ছিল, তিনিই বনের রাজা,—তিনিই সকলকে খাইবেন; কিন্তু বাঘের সে ধারণা যে ভুল, ইহারা তাহা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। কারণ বাঘও ইহাদের খাদ্য। বাঘের মাংস ইহাদের নিকট বড়ই রুচিকর ও বলকারক; কারণ, বাঘ যখন শুধু রক্ত ও মাংস খায়, তখন তাহার মাংস যে নিশ্চিত বলকারক, তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে?" তাহাদের শিকারের অভিনয়টী আমাদিগের বেশ ভাল লাগিয়াছিল। "হোমে"র মধ্যে একটী দোকান আছে, তাহাতে বিবিধ প্রকারের তীর ধনুক ও আন্দামানের বহুবিধ আশ্চর্য্য জিনিসপত্র রহিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের ছোট-ছোট পোষাকও বিস্তর রহিয়াছে। সে পোষাকগুলি এতই ছোট যে, সেগুলিকে সিগারেটের কেসের মধ্যে অনায়াসে পুরিয়া আনিতে পারা যায়। সে গুলি কোন্ ব্যবহারে লাগে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ছোট-ছোট নৌকাও বিস্তর সাজান রহিয়াছে।

আমাদের দেখা শেষ হইলে, আমরা লঞ্চে চড়িয়া কিনিস্বের দিকে চলিলাম। 'কিনিস্বের' ধারেই জেলখানার কারখানা। এই স্থানে যে কত রকমের চেয়ার টেবিল পর্দ্দা তৈয়ারী হইতেছে, তাহার সংখ্যা কে করে? মুক্তার উপর কারুকার্য্যও করা হইতেছে; তাহা দেখিতে অতি রমণীয়। আমরা "সেল্-রুমে" ঢুকিলাম। সেখানে অসংখ্য প্রকারের ঝিনুকের ও মুক্তার জিনিস স্তরে-স্তরে সাজান রহিয়াছে। সেই সব ঝিনুকের উপর নানা প্রকারের নাম লিখিত আছে। যদি কেহ ইচ্ছা করেন, ফরমাইশ করিলে, সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের মনোনত নাম লিখিয়া দেওয়া হয়। সেখানে কারু-বিস্তারও অভাব দেখিলাম না। নারিকেলের মালা কাটিয়া দিব্য মানুষের মাথা তৈয়ারী হইতেছে। মুখ, চোক, ঠোঁট, ভ্রু, সবই অতি আশ্চর্য্য রকমে তৈয়ারী করা হইতেছে। হঠাৎ দূর হইতে দেখিলেই মানুষের কাটা মুণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়। বহু প্রকারের ছড়িরও অভাব নাই।

রসদ্বীপে সাহেবদের জন্য সুন্দর মেস্ ও ক্লাব রহিয়াছে। মধুর মলয় সেবন করিতে করিতে ইংরাজি খবরের কাগজ পড়িবার বেশ সুবন্দোবস্ত আছে। টেনিস খেলিবার ঘাসের কোর্টও আছে। সাহেবদের মধ্যে যাহাদের ছিপে মাছ ধরিবার সখ্ আছে, তাহারা অবাধে মাছ ধরিতে পারে। যাহারা শিকার-প্রিয়, তাহাদের জন্য অজস্র শিকারও রহিয়াছে। এখানে প্রকাণ্ড কাঁকড়া প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সে সব কাঁকড়া আনিবার সুবিধা থাকিলে বন্ধু-বান্ধবদিগের জন্য আনিতাম। কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। আমাদের আর বেশী সময় ছিল না। তাই তাড়াতাড়ি করিয়া যে স্থানে আমাদের জন্য আমাদের 'মহারাজা' অপেক্ষা করিতেছিল, আমরা লঞ্চে চড়িয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম।

আমাদের সাধ মিটিল না। কিন্তু উপায় নাই। 'মহারাজা' আমাদিগকে লইয়া পুনরায় ফিরিল। হিংস্র-জন্তু-সমাকীর্ণ, বহুযোজনব্যাপী, নিবিড় অরণ্য রস-দ্বীপের শ্যামল বৃক্ষরাজি, অসভ্য আন্দামাননিবাসীদের পর্ণকুটীর ও এবার্ডিনের শেষ ক্রমে-ক্রমে অদৃশ্য হইল; আমরাও অকূল সমুদ্রে পড়িলাম। দিক দিশা নাই, কিনারা নাই; কেবল নীল জলরাশি আকাশ-পাতাল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। বিশালকায় বাষ্পীয় পোতখানি আমাদিগকে লইয়া উল্লম্ফবৎ উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিল। আমাদের আন্দামান-দ্বীপ-দর্শন শেষ হইল।

বস্ত্র-সমস্যা

[শ্রীবৈকুণ্ঠচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

আজ পল্লীগ্রামের প্রায় সর্ব্বত্রই বস্ত্রাভাবে যে দুরবস্থা উপস্থিত, তাহা সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই বিদিত আছেন। বস্ত্রাভাবে আহারেচ্ছা, প্রবৃত্তি ও চেষ্টা বাধ দিলে, বাস্তবিক সুস্থ পরিবারদের দুর্দ্দশা চরমে উঠিলে, চরকার মর্য্যাদা হইতে অন্ধ ইংরেজ আপনিই প্রবাহিত হবে। দেশের এই চরম-দুর্দ্দিনে, যে বস্ত্রবাসিগণ! একবার সুস্থ পরিবারের জননী ও ভগিনীগণের মনোদুঃখের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। মনবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের ন্যায় ক্রমিক ছাত্রি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। গড়পড়তায় প্রত্যেক ভারতবাসীর আয় বার্ষিক ২১৲ টাকার অধিক নয়; অথচ এই অতি সামান্য আয় দ্বারা আমাদের অন্নবস্ত্র ও জীবনধারণের অত্যাবশ্যক উপকরণগুলি সংগ্রহ করিতে হয়। বার্ষিক একজন লোকের অন্ততঃ পক্ষে ২ জোড়া কাপড়ের কম কিছুতেই চলিতে পারে না; সুতরাং বর্ত্তমান বাজারে ২ জোড়া কাপড়ের মূল্য ১০৲১০৲ টাকা লাগিলে, জীবন-সংগ্রামে একমাত্র বস্ত্রের অভাব নিবারণের জন্যই আয়ের অর্দ্ধেকেরও বেশী ব্যয়িত হয়। সুতরাং পেটের জ্বালা, রোগের জ্বালা নিবারণের উপায় কি? যে কালে ঢি শাস, চকাই বসুনিয়া ও বেনারস এবং মুর্শিদাবাদের সিল্ক পৃথিবীর ধনকুবেরদের নিকট বিলাসের সামগ্রী ছিল, আর সেই দেশের সন্তানগণ বস্ত্রাভাবে চারি আঙ্গুল চওড়া, ১ হাত লম্বা ছিন্নবস্ত্র (নেংটী) পরিধান করিয়া পশুর মত জীবন যাপন করিতেছে। বাস্তবিকই বুঝি আফ্রিকার নিগ্রোর মত বাঙ্গালার পল্লীতে এমন দুর্দ্দিন আর কখনও আসে নাই। আমরা এমন বিপন্ন আর কখনও হই নাই। যে বাঙ্গালা যেন একদিন পৃথিবীকে বিলাসিতার উপকরণ যোগাইত—সেই দেশের ললনা আজ সামান্য একখণ্ড বস্ত্রের অভাবে আবক্ষ জলে নিমজ্জিত থাকিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছেন। যথার্থই বঙ্গদেশে এমন ঘোরতর বিপদ কখনও ঘটে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীব্যাপী যে মহা সাধারণ প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহাতে ইন্ধন হইবে অবিলম্বে হইবে, বাঙ্গালীকে ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করিতে হইবে। বাঙ্গালী ইতঃপূর্ব্বে দুর্ভিক্ষে ও রোগমারীর জলপ্লাবনে যথার্থ মনুষ্যত্ব দেখাইয়াছিলেন। এডুকেশন (Pioneer and Englishman) পাইওনিয়ার ও ইংলিশম্যান পর্য্যন্ত এই মহাপ্রাণ মুষ্টিমেয়ের পক্ষপুটে প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, জগতের ইতিহাসে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। বিপদ অনেক সময় সম্পদের জনক। যাবলম্বনহীন জাতিকে বিধাতা এই কঠোর শিক্ষা দিয়া হয় ত তাঁহাদের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত করিবেন। ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতিকুলের উপর নির্ভর করিয়া বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া আজ আমরা বিপন্ন ও দিশেহারা হইতে চলিয়াছি। কিন্তু ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বেও পল্লীগ্রামে ঘরে-ঘরে চরকায় সূতা কাটিয়া দুঃস্থগণ নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি অতি সামান্য পারিশ্রমিক দিয়া দেশের তাঁতিকুল দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া লইতে সমর্থ ছিল। শুধু সূতা কাটিয়া অনেক অবাধ্য বিধবা রমণী স্বাধীনভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন।

চরকা আমার ভাতার পুত, চরকা আমার নাতি,
চরকায় দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতী।
ছেলের দোলায় পা, চরকাতে হাত,
এই ছেন তুমি ভাল শিল্পির ধাত।

তখন এই সব ছড়া প্রতি গৃহে প্রচলিত ছিল।

সহরবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ হয় ত পল্লীগ্রামের অবস্থা, বর্ণনে বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন নাও হইতে পারেন; কিন্তু বঙ্গদেশের প্রাণ ও অধিষ্ঠান বঙ্গের পল্লীতে, সহরে নয়। সমস্ত বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামের সংখ্যা ২০৩৫৫; কিন্তু সহরের সংখ্যা খুব জোর ১৯০। বঙ্গবাসী নরনারী-বৃন্দের শতকরা ৯৫ জন এখনও পল্লীগ্রামে এবং কেবল মাত্র ৫ জন হয় ত সহরে বসবাস করিতেছেন। যদি বঙ্গদেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগের অবস্থা বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের কঠোর সমস্যা "বস্ত্র"; কিন্তু যদি বঙ্গবাসী নরনারী ইহার প্রতিকার-কল্পে বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে বোধ হয় অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা এই গুরু অভাব অন্ততঃ কতকটা নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। সর্ব্বসুখদে আমাদের সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিতে যথেষ্ট পরিমাণে তুলার চাষ করিতে হইবে; এবং সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেক বাড়ীতে কার্পাস-বীজ বপন করিতে হইবে। ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক গৃহস্থই অনায়াসে তাঁহার বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বের উঁচু জমিতে ৮।১০টী কার্পাসের গাছ রোপণ করিতে পারেন। সাধারণতঃ যজ্ঞোপবীত প্রস্তুতের জন্য যে সকল ছোট কার্পাসের গাছ বঙ্গের ঘরে পল্লীতে পুষ্ট হয়, উহার একটী গাছে বাৎসরিক ১।০ সের পরিমাণ তুলা জন্মিতে পারে। আরও একপ্রকার ছোট কার্পাস আছে, যাহার প্রত্যেক গাছে ৸০ সের তুলা হইতে পারে। এই গাছগুলি পূর্ব্বোক্ত গাছ হইতে বড় হয়, এবং ৭।৮ বৎসর জীবিত থাকে। যে কোন মধ্যম রকম গৃহস্থের বাড়ীতে উহার ৮।১০টী গাছ থাকিলে, তাহাদের বার্ষিক ব্যবহার্য্য বস্ত্র হইয়া অবশিষ্ট তুলা বিক্রী হইতে পারে। মুক্তাগাছার জমিদার বিদ্যোৎসাহী বাবু ও তাহার বাবু তাঁহাদের প্রজাদের ভিতর তুলার চাষ প্রচলন-কল্পে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, এবং সঙ্গে-সঙ্গে তুলার বীজ বিতরণ করিতেছেন। যদি বঙ্গের অপরাপর স্থানে

এইরূপ চেষ্টা হইত, তবে তুলার সমস্যা বহুদূর হইত। আমি এই সব বিষয়ের বিশেষ সংবাদ জানিবার জন্য বিনায়ক বাবুর কক্ষে দেখা করিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারিলাম, তুলার বীজ পেষণ করিয়া যে তৈল পাওয়া যায়, তাহা প্রায় ঘৃতের ন্যায় সুখাদ্য। বিশেষতঃ, উহার খইল গবাদি পশুকে খাওয়াইতে পারিলে দুগ্ধের দুগ্ধও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং এক তুলার দ্বারা আমাদের বহুবিধ অভাব দূর হইতে পারে। বলা বাহুল্য, তুলার সমস্যা দূর হইলেই, আবার মান্ধাতার আমলের সেই চরকার অনুসরণ করিতে হইবে। বিষয়টা একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, চরকার কথায় সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তার শ্যামাচরণ সরকারের কথা মনে হইল। একবার আমরা তাঁহার নিকট বিজ্ঞান ও রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করিতে-ছিলাম এবং নিজেরা প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-গরিমায় স্ফীত হইতে-ছিলাম। তখন তিনি আমাদিগকে ও সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে ধিক্কার দিয়া ক্ষোভে ও দুঃখে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তোমাদের মান্ধাতার আমলে যে চরকা ছিল, তোমরা হাজার-হাজার বৎসরেও তাহার কিছু উন্নতি করিতে পারিয়াছ কি? উন্নতি করা দূরে থাকুক, সেই মান্ধাতার আমলের চরকা প্রস্তুত এবং সূতা কাটার পদ্ধতি পর্য্যন্তও আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। তবে আজও প্রতি পল্লীতে অনুসন্ধান করিলে ২।৩টী বৃদ্ধা রমণী পাওয়া যায়, যাঁহারা এখনও চরকায় সূতা কাটিতে সমর্থ। চেষ্টা করিলে নবীনা রমণীরা ইহাদের নিকট হইতে অনায়াসে সূতা কাটা শিখিতে পারেন। ময়মনসিংহ সহরে জনৈক ভদ্রমহিলা সংপ্রতি একটী বিদ্যালয় খুলিয়া ২০।২৫টী ছাত্রীকে চরকায় সূতা কাটা শিখাইতেছেন। বঙ্গদেশে আরও এরূপ মহিলা অনেক আছেন, যদি তাঁহারা ইঁহার পদ অনুসরণ করেন, তবে বাঙ্গালী জাতির চিরদুরবস্থা-মোচন হইবে।

পৃথিবীতে যে সকল জাতি সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের রমণীবৃন্দ বর্ত্তমানে নানা বিষয়ে পুরুষের সাহায্য করিতেছেন। আজ য়ুরোপের কৃষিক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া রেলওয়ে, ট্রাম, আফিস প্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য রমণীবৃন্দের দ্বারা সুচারুরূপে সাধিত হইতেছে। সুতরাং জীবন-সংগ্রামের এমন কঠোর দিনে যদি আমাদের মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর ললনাগণ অন্নত ব-ব পরিবারের বস্ত্রাদির অভাব নিবারণ কল্পে যত্ন করেন, তবে বর্ত্তমান সমস্যা অনেকটা সহজ হয়। একসের (বিচিবিহীন) তুলায় ১৫ হইতে ১৬ টাকে সূতা হয়। একজন লোক দুই তিনদিনে একসের তুলার সূতা কাটিতে পারে এবং সাধারণতঃ ১০ হাত লম্বা ও ২।০ হাত প্রস্থ একখানি মোটা কাপড় প্রস্তুত করিতে ৮।১০ হইতে বেশী সূতার আবশ্যক হয় না। বলা বাহুল্য বিলাতী কাপড় হইতে এই কাপড় বেশী টেঁকসই হয়। বিলাতী কাপড় এক জোড়ার কম একজনের এক বৎসর কিছুতেই চলিতে পারে না। কিন্তু ইহার এক জোড়া কাপড় হইলেই একজন লোক এক বৎসর কাটাইতে পারে। হে বঙ্গবাসী বীরর, কর্ম্মী বীর যুবকগণ, আজ দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে প্রাণপণ বলে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউন। জাতীয় পরীক্ষার পৃথিবীব্যাপী মহাদাবানলে আপনাদের বিশুদ্ধি পরীক্ষিত হইবে।

উৎকল-সাহিত্য।

[শ্রীরমেশচন্দ্র দাস]

উৎকল-সাহিত্য—শ্রাবণ, ১৩২৫

"কেউঞ্জর প্রজাবিদ্রোহ"—(স্বর্গীয় কবীন্দ্রমোহন সেনা-পতির আত্ম-জীবনীর একাংশ)

রাজ্য-শাসনের জন্য কেউঞ্জর দুই ভাগে বিভক্ত—পূর্ব্বে আনন্দপুর ও পশ্চিমে গড় (রাজধানী) বিভাগ। আনন্দপুর বিভাগে কৃষক, ব্যবসায়ী ও মহাজনগণের নিবাস। মধ্য-প্রদেশে বৈতরণী প্রবাহিতা। ভূমি উর্ব্বর ও অপেক্ষাকৃত বন-পর্ব্বত বিরল। পশ্চিমভাগে ভূঞা ও কৃষকশ্রেণীর লোকের বসতি। আমি আনন্দপুর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলাম। আরও একজন সহকারী আমার অধীনে ছিলেন। আমার কর্ম্ম গ্রহণের দ্বিতীয় বর্ষে—১৮৯১ সালে কেউঞ্জরে ভয়ঙ্কর প্রজা-বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। ইহার সহিত আনন্দপুরের প্রজাবর্গের কোনও সংস্রব নাই।

কার্য্যোপলক্ষে আনন্দপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী বৈতরণী-তীরে আম্রকাননে শিবির স্থাপন করিয়াছি। রাত্রি প্রায় ১১টা। আহারাদি সমাপন করিয়া শিবির-বারান্দায় নবীন শীতল সমীরণ সেবন করিতেছি। এমন সময়ে কেউঞ্জর 'গড়' হইতে দুইজন 'দৌড় পাইক' মহারাজার একখানি মোসনীয় পত্র লইয়া উপনীত হইল। তাহাতে প্রজা-বিদ্রোহের বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ শিবির তুলিয়া আনন্দপুরে চলিয়া আসিলাম। পরদিন প্রাতঃকাল হইতে মহারাজার ২।৩ খানি করিয়া পত্র আসিতে লাগিল। প্রতি পত্রে অন্যান্য সংবাদের সহিত আনন্দপুর হইতে বহু পরিমাণে পদাতিক সেনা রাজধানীতে পাঠাইবার আদেশ রহিয়াছে। নানারূপে সংবাদ সংগ্রহ ও রাজধানীতে সৈন্য প্রেরণ আমার এখন প্রধান কার্য্য। এদিকে আবার ডাক-চলাচল বন্ধ। বিদ্রোহীরা একদিনের ডাক লুটিয়াও লইয়াছে, এবং পথের বহু স্থানে

তাহাদের লোক বাঁচাইবার বলিয়া আছে; কোন মতে অতি গোপন ভাবে বন পথে পরাহিক দ্বারা সংবাদ আসিতেছে।

তৃতীয় দিবস রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় কার্য্যাদি শেষ করিয়া ভোজন করিতে যাইতেছি, এমন সময়ে স্বয়ং মহারাজ ও সহকারী ম্যাজেষ্টার বিভিন্নানন্দ রায় কতকগুলি বিশ্বাসী লোকের সহিত হিনউ হাটীতে আনন্দপুরে উপস্থিত হইলেন। পাল্কীগুলি সকাল হইতে ৩।৪টী আরোহী লইয়া ঘণ্টায় চতুর্দ্দশ ৪১ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ঘর্ম্মাক্ত-প্রায়; আরোহীগণের অবস্থাও তদ্রোপ শোচনীয়। শ্রীমকাল; সমস্ত দিন বিন্দুমাত্র জলস্পর্শ নাই; মাথার উপর প্রচণ্ড রৌদ্র ও হণ্টার কশাঘাতে সমস্ত শরীর শিথিল। আরোহীগণ অবতরণ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষায় অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল। প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জনে সঙ্গীগুলি একরূপ ভোজন কার্য্য শেষ করিলেন। মহারাজার জন্ম রন্ধনের সমস্ত আয়োজন হইল। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্ম মহারাজার সহিত আমরা আলোচনা করিতে লাগিলাম। স্থির হইল, মহারাজা আনন্দপুরে থাকিবেন এবং আমি কটকে গমন করিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিব। তদনুসারে পরদিন প্রত্যূষে হস্তি-পৃষ্ঠে কটকে যাত্রা করিলাম। যাত্রার পিউন দিন ইহারে আরোহণ করিয়া তৃতীয় দিবস সকালে কটকে উপস্থিত হইলাম। প্রথমে আসিষ্টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর নন্দকিশোর দাস মহাশয়কে সকল কথা বলিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট টমনবী সাহেবের সহিত দেখা করিতে চলিলাম।

সাহেব আমার কথাগুলি শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অস্থির হইলেন; এবং অধীরভাবে আসন পরিত্যাগ করিয়া কক্ষমধ্যে ইতস্ততঃ সবেগে পাদ-চারণ করিতে-করিতে বলিতে লাগিলেন—"বেশ হইয়াছে, রাজা যেরূপ অত্যাচারী, সেইরূপ ফলভোগ করিবেন, আমরা কোনও সাহায্য করিতে পারিব না।" আমি খুব ধীরভাবে বিনয় সহকারে বলিলাম—"বর্ত্তমান বিদ্রোহে সাধারণ প্রজার কোনও সম্বন্ধ নাই। কেবল তুণ্ডা জাতীয় প্রজারা গোলমাল আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা দুষ্ট প্রকৃতির লোক; সময়-সময় বিদ্রোহ আচরণ করা তাহাদের স্বভাব। আর বিদ্রোহীদের সংখ্যা অতি অল্প। মহারাজা অনায়াসে তাহাদের দমন করিতে সমর্থ; কিন্তু আপনার আদেশ ভিন্ন তিনি কিছুই করিতে পারিতেছেন না। বিশেষতঃ তুণ্ডা জাতি নিতান্ত বন্য প্রকৃতির—সামান্য উত্তেজনায় তাহারা তরবারি চালাইতে অভ্যস্ত। কোনরূপে রক্তপাত মহারাজার ইচ্ছা নয়। এক শত পুলিস যাইলে তাহারা ভয়ে পলায়ন করিবে ও সমস্ত বিদ্রোহের শান্তি হইবে।" টমনবী সাহেব কিয়ৎক্ষণ স্থির ভাবে উপবেশন করিয়া কি চিন্তা করিলেন; অবশেষে বলিলেন—"হাঁ, বালেশ্বরের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গাইল সাহেবকে লিখিতেছি। তিনি পুলিস দিয়া সাহায্য করিবেন।" আমি ধন্যবাদ সহকারে সুদীর্ঘ সেলাম দিয়া প্রস্থান করিলাম।

টমনবী সাহেবের সহিত যাহা কিছু কথোপকথন ও বন্দোবস্ত হইয়াছিল, নন্দকিশোর বাবুকে তাহা জানাইয়া আমি কটক পরিত্যাগ করি। পরদিন সন্ধ্যাকালে 'চাঙ্গিতে' পৌঁছিয়াছি মাত্র, ঠিক সেই সময়ে মহারাজা কয়েকটী ভৃত্য সহ আনন্দপুর হইতে আসিয়া তথায় উপনীত হইলেন। আমার নিকট সমুদয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনিও একবার কটক যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে কটকে নন্দকিশোর বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া কমেশ্যাণ্ট গবর্ণর ও চীফ সেক্রেটারী কটন সাহেবের নিকট টেলিগ্রামে বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রেরণ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করা হইল। তাহার পরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহিত দেখা করিতে যাইবার কথা। কিন্তু মহারাজার ত উপযুক্ত পোষাক সঙ্গে নাই। তিনি মাত্র ধুতি ও সামান্য জামা পরিধান করিয়া আসিয়াছেন। অগত্যা নন্দকিশোর বাবু দরজী ডাকাইয়া তাড়াতাড়ি পোষাকের ব্যবস্থা করিলেন। প্রাতঃকালে মহারাজা ও আমি টমনবী সাহেবের কুঠীতে যাইলে, খাস কামরায় আমাদের ডাক হইল। আমরা বসিবা মাত্র সাহেব বলিলেন—"রাজা সাহেব, বড় রাণী সাহেবা, অন্যান্য স্ত্রীলোক ও শিশুসন্তানকে বিদ্রোহীদের হস্তে অর্পণ করিয়া আপনি ভয়ে কটকে পলাইয়া আসিয়াছেন; এ কিরূপ কথা?" মহারাজা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আমি বলিয়া ফেলিলাম, "না মহাশয়, উপযুক্ত প্রহরীর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, বিদ্রোহীরা সেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে সমর্থ নয়।" সাহেব ক্রুদ্ধ নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিদ্রোহ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হইল। ইতিমধ্যে চীফ সেক্রেটারীর টেলিগ্রাম পাইলাম। কথা হইল ২০০ জন্মী-পুলিস সহ ডাউসন সাহেব চাইবাসার পথে যাইয়া নদীর রক্ষা করিবেন।

আমরা আনন্দপুরে প্রত্যাগমন করিয়া পাইক সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। শনিবার, সকালে পূর্ব্ব বারবেলায় তিন শত পদাতিক লইয়া মহারাজা রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। চারি ক্রোশ দূরে এক 'জোর' বা গিরিনদী; তাহার দুই কূল জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও অগভীর প্রায়। পূর্ব্বাদেশ অনুসারে নদীতীরে জঙ্গল কাটিয়া খানিক স্থান পরিষ্কৃত ও দুইটী পর্ণকুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামের সর্দ্দারগণ রসদ সংগ্রহ করিয়াছিল। সেইখানেই পূর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বেলা ২টার সময় মহারাজার দরবার বসিল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সর্দ্দার, প্রধান-প্রধান প্রজা, ও মফঃস্বল কর্ম্মচারী সকলেই উপস্থিত। বিদ্রোহিগণের কার্য্য-কলাপের তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার পরে মহারাজার আদেশ হইল—"সন্ধ্যা আসন্ন হইলে যাত্রা করিতে হইবে।" রাত্রিতে যাত্রা বন্ধ রাখিবার জন্য নানারূপ কারণ প্রদর্শন করিলাম; কিন্তু আপত্তি বা প্রস্তাব সমস্তই অগ্রাহ্য হইল।

সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিল, আমরাও যাত্রারম্ভ করিলাম। সম্মুখে মহারাজার হাতী, তাহার পরে আমার ও কর্ম্মচারীদের হাতী; হাতী-গুলির পশ্চাতে তিনশত শ্রেণীবদ্ধ পাইক-সৈন্য। অন্ধকার রাত্রি—অধিকাংশ পথ বন্ধুর,—বহু স্থানে পার্শ্বস্থ বৃক্ষের শাখা অবনত হইয়া পথ রুদ্ধ করিয়াছে। পাইকগুলি বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত—কি জানি, অর্দ্ধেক বা রাতকানা! রাজার বেগার খাটিতে কোন্ সবল ব্যক্তি আসিবে?

যাহারা বুড়া, রোগা, যুদ্ধ-কর্ম্মে অনুপযুক্ত—তাহারাই বেগারে আনিয়াছে। তাহার উপর আজ আবার প্রজাবিদ্রোহ—হানাহানি কাটাকাটির কথা—ঘরের যোগ্য পুরুষটাকে কে দিবে? যাবে—বুড়াই যাক! বুড়ার মাথায় পাট-করা ছেঁড়া ধুতি বা গামছা; কাঁধের উপর বাঁশ বেয়া ওজনের সাড়ে তিন হাত লম্বা গাদা বন্দুক; কোমরে ওষধের; হাতে ঘুন ধরা—পৃষ্ঠদেশে ১০।১৫ দিনের আহারের উপযোগী চাউল, রন্ধনের পিতল পাত্র ও পোটার বৃহৎ বোঝা।

এই বেশে বীর পদাতিকগণ সেই অন্ধকার পথে লাঠিতে ভর দিয়া 'ঠাওরে ঠাওরে' চলিতেছে। কোথাও একটী পাইক হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল, পশ্চাতের পদাতিকেরা তাহার উত্থান পর্য্যন্ত পাঁচ মিনিট কাল স্থির ভাবে সেইখানে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। হস্তিগুলি দুইশত হাত আগে চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু পাইকগণ শত দুই পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। অমনি হাতীর উপর হইতে চাপ আসিল—"জল্দি চল, শীঘ্র চল।" পাইকদিগকে তাড়া দিয়া লইবার জন্য ৪।৫ জন জল্দি নিযুক্ত ছিল। হোঁচট খাইয়া হস্তিগুলিকে ৩০।৪০টী স্থানে নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইতে হইয়াছে। এরূপ ভাবে চলিলে পথ কি আর শেষ হইবে? পরামর্শ হইল, হাতীকে পশ্চাতে রাখিয়া পদাতিকগণ সম্মুখে চলিবে। তাহাই হইল। বোঝা-পৃষ্ঠে পদাতিকেরা অবনত হইয়া ধীরে-ধীরে চলিতেছে,—হস্তিগুলির সহজ ভাবে চলিবার পথ কোথায়? হস্তী বেগে চলিলে পাইকগণ ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া একে অন্যের উপর যাইয়া পড়ে ও উভয়ে জড়াজড়ি করিয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়। চলিবার পক্ষে ইহাও সুবিধার হইল না। অবশেষে স্থির হইল সম্মুখভাগে মহারাজা ও কর্ম্মচারীর হাতী, মধ্যে পাইক-শ্রেণী এবং সকলের শেষে ম্যানেজারের হাতী থাকিবে। অবশ্য ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুবিধা হইল। এইরূপ "সবরদ চালে" অর্দ্ধ রাত্রি অতিবাহিত হইল। দেখিলাম, পাইকগণ প্রায় অর্দ্ধমৃত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদেরই বা দোষ কি? পূর্ব্বেই তাহারা ৩০ ক্রোশ হাঁটিয়া আসিয়াছিল। সন্ধ্যার গুরু ভোজনের পরে ভারি বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া অন্ধকার অজানা পথে চলিতেছে। হোঁচটে বেচারীদের পায়ের অঙ্গুলী ছিন্ন হইয়া রক্ত বহিতেছে। বিশ্রামের জন্য মহারাজার নিকট প্রার্থনা করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার সময় পাইলাম। পদাতিকগণ অনুমতি প্রাপ্তি মাত্র যে যেখানে ছিল, সেই স্থানে শুইয়া পড়িল। যথাকালে আবার পূর্ব্ব বিক্রমে চলিতে লাগিলাম। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। আমরাও অন্ধকারময় অনুসরণ রজনীর অধিকার হইতে মুক্তি পাইলাম।

রবিবার সকাল ৮টার সময় আমরা 'খট' গ্রামে আসিয়াছি। সর্দ্দার গণ রসদ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর রন্ধন আরম্ভ হইল। মহারাজা ১১টার সময় যেবার্চ্চনাদি শেষ করিয়া ভোজন করিতে যাইতেছেন। ঠিক সেই সময় দুই জন 'ঘাউড়ি পাইক' সমস্ত রজনী বন-পর্ব্বত ছুটিয়া গড় হইতে একখানি পত্র আনিয়া মহারাজার নিকট উপস্থিত। চিঠিখানি পাঠ করিয়া মহারাজাকে শুনাইলাম। তাহার মর্ম্মার্থ এই—"কল্য রবিবার সকাল ১০ প্রহর সময় প্রায় ৩ শত মুরুঙ্গা 'গড়' অবরোধ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করায় আমরা প্রাচীর হইতে বন্দুক ছুড়ি। তাহারা ভয়ে পলায়ন করিয়া ঘাইওয়ার নিকট অপেক্ষা করিতেছে।" মহারাজা পত্র শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে আজ্ঞা দিলেন,—"মাহুত, হাতী কর—হাতী কর।" আহার্য্য সামগ্রী সেই ভাবে পড়িয়া রহিল। মহারাজা পোষাক পরিধান করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং আমার প্রস্তুত হইতে বিলম্ব দেখিয়া চকিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি সবিনয়ে নিবেদন করিলাম—"রাণী, রাজকন্যা ও শিশু রাজকুমারকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা কিরূপে পলায়ন করিব? আপনি আনন্দপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, আমি রাজধানীতে যাইতেছি। আর বিদ্রোহীরা আক্রমণ করিলে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া, আবশ্যক হইলে, হত্যা করিতে পারিব—তাহার লিখিত আদেশ আমায় দেওয়া হউক।" লিখিত আদেশ প্রয়োজন, কিন্তু কাগজ কলম প্রভৃতি কোথায়? একখানি তালপত্রে লিখিয়া দিলেন—"ভূঞাগণ যুদ্ধ করিতে আসিলে তাহাদিগকে হত্যা করিতে পারিবে।" মহারাজা সেই অদ্ভুত অবস্থায় চকল ভাবে হস্তী আরোহণ করিয়া আনন্দপুরে ফিরিয়া গেলেন।

যুদ্ধ উপস্থিত। পদাতিকগণকে সময়োচিত কার্য্য প্রণালী শিক্ষা প্রদান ও অস্ত্র-শস্ত্র পরীক্ষার জন্য তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড় করাইলাম। দেখিলাম, তাহাদের সংখ্যা প্রায় তিন শত। অস্ত্রাদি পরীক্ষা করিতে গেলাম। হা অদৃষ্ট! এ কি! তিন শতের ভিতর প্রায় দুই শত বন্দুক ফাটা, ভাঙ্গা; কোনটার অর্দ্ধেক, কোনটার চতুর্থাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট অংশের ভিতরে-বাহিরে অর্দ্ধ অঙ্গুলী মরিচা'। গুলির ছিদ্রগুলি মরিচায় একেবারে বন্ধ। গুলি বারুদের অবস্থাও তদ্রোপ। বারুদদানী অর্থাৎ নারিকেল-খোল কোমরের পশ্চাদ্ভাগে ঝুলিতেছে। তাহাতে তিন চার বারের অধিক বারুদ নাই। দুই, তিন, খুব বেশী চারিটী সীসা। গুলি কোমরে বা পাগের খুঁটিয়ায় রহিয়াছে। অধিকাংশ ব্যক্তির বন্দুকেও গুলিতা দেখা যাইতেছে না। তরবারিগুলিও ভাঙ্গা, মরিচা-পড়া। প্রশ্ন করিলে তাহাদের একই উত্তর—সবর চলিয়া আসিবার আদেশ হওয়ায় যথেষ্ট যুদ্ধ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। গুলি প্রস্তুত করিবার আর সময় কোথায়?" পরন্তু ঐ বন্দুক ধরিয়া কাহার পিতামহ কি প্রপিতামহ মারাঠার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, কিংবা পাঠানদিগকে সমরে পরাজিত করিয়াছিল—সে কথা এখনও মনে আছে—একটু গর্ব্বও আছে। রক্তের তাপাগুণ অনেক অবগুন পুরুষ পর্য্যন্ত নিজ ধর্ম্ম বিস্তার করিয়া থাকে! সাহসী পদাতিকদ্বয় অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিল "অনুমতি প্রদান করুন,—দেখিবেন, এই ভাঙ্গা তরবারি ও বন্দুকে ভূঞাদের 'কাটিয়া পিটিয়া' শেষ করিয়া দিব।" সত্য-সত্যই তাহাদের মধ্যে সাহসী ও বুদ্ধিমান্ পদাতিক ছিল। তাহারা উপযুক্ত শিক্ষা ও অস্ত্র পাইলে যুদ্ধক্ষেত্রে বহির্ব প্রদর্শন করিতে পারিত। (ক্রমশঃ)

পরিচারিকা—বৈশাখ, ১৩২৪।

"হিন্দু বিধবা ট্রেনিং স্কুল"—সম্পাদিকা—শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী দেবী।

আমাদের দেশে প্রায় অধিকাংশ জাতি স্ত্রী শিক্ষার অনুরাগী। সহর ও মফস্বলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কিছুদিনের জন্য বালিকারা তথায় প্রেরিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফললাভ হইতেছে না। হিন্দুদের, বিশেষতঃ কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ বালিকারা বার তের বর্ষ বয়সের পরে আর বিদ্যালয়ে যাইতে পায় না। বাড়ীতে পড়াইতে ইচ্ছা থাকিলেও, স্ত্রী শিক্ষয়িত্রীর একান্ত অভাবে তাহা হইয়া উঠে না। ইতিপূর্ব্বে 'বেথুন বালিকা-বিদ্যালয়' স্থাপিত হইলেও, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে আমাদের সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে নাই।

আমাদের সুপরিচিতা লেখিকা শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষ ঐ সকল অভাব দূর করিতে অতি যত্নশীলা হইয়া এক নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, তাহা সফল হওয়ায় এই "হিন্দু বিধবা-ট্রেনিং স্কুল" স্থাপিত হইয়াছে। হিন্দু ভদ্রঘরের যে সকল বিধবা অন্ততঃ পক্ষে নিম্ন প্রাথমিক পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, তাঁহারা ইহাতে প্রবেশ করিয়া মাসিক ১০ টাকা বৃত্তিলাভ করিবেন। সম্পূর্ণরূপ অবরোধ প্রথায় ও হিন্দু নিয়মে থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পুরুষের কোনরূপ সম্পর্ক থাকিবে না। ইচ্ছানুসারে ঘরের রন্ধন করিয়া কিংবা ব্রাহ্মণী পাচিকার রন্ধনে যাইতে পারিবেন। ইহা এক প্রকার বিধবা আশ্রম বলিলে চলে।

বালিকাদের জন্যও উক্ত নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে। কেবল ভদ্রঘরের বালিকারা গৃহীত হইতে পারিবে। বিদ্যাশিক্ষার সহিত যাবতীয় কার-কার্য্য, প্রয়োজনীয় সেলাই ও রন্ধনাদি যাবতীয় গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইবে। আমরা অন্তরের সহিত শ্রীযুক্তা শৈলবালার সাধু-উদ্যমের অনুমোদন করিতেছি এবং তাহাতে সহানুভূতি ও যোগদান করিতে সকলকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি। ইহা দ্বারা উৎকলের একটী প্রধান অভাব দূর হইবে।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বড়দা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ২।০।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রীকান্ত" দ্বিতীয় পর্ব্ব আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে; মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ সেনের নূতন গল্পের বই "এক পেয়ালা চা" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১।০। এ গল্পগুলি পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নূতন পৌরাণিক "বিল্বমঙ্গল" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲।

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বসু রায় প্রণীত "দেবলা দেবী" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲।

বিগত ৮ই ভাদ্র রবিবার সন্ধ্যা ৬। ঘটিকার সময় পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সমাজের উদ্যোগে ঢাকা বার-লাইব্রেরী হলে পরলোকগত রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, মহোদয়ের স্মৃতি সভা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত সভায় স্বর্গগত ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের একটী কবিতা; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এম-এ এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়দ্বয়ের দুইটী প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "মৃদঙ্গ দর্পণ" প্রকাশিত প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ২।০।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি-এল প্রণীত "আটআনা সংস্করণের" ত্রিংশ গ্রন্থ "হিসাব নিকাশ" প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ প্রণীত গল্প পুস্তক "বালি ও অঙ্ক" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲।

মল্লিকার সম্পাদিত "রহস্য পিরামিড সিরিজের" দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার নাম যথাক্রমে "পরিণয় প্রহেলিকা" ও "ভ্রান্তি কুহেলিকা।" মূল্য প্রতি গ্রন্থ কাপড়ের বাঁধাই ১।০, কাগজের মলাট ১৲।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons.
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA

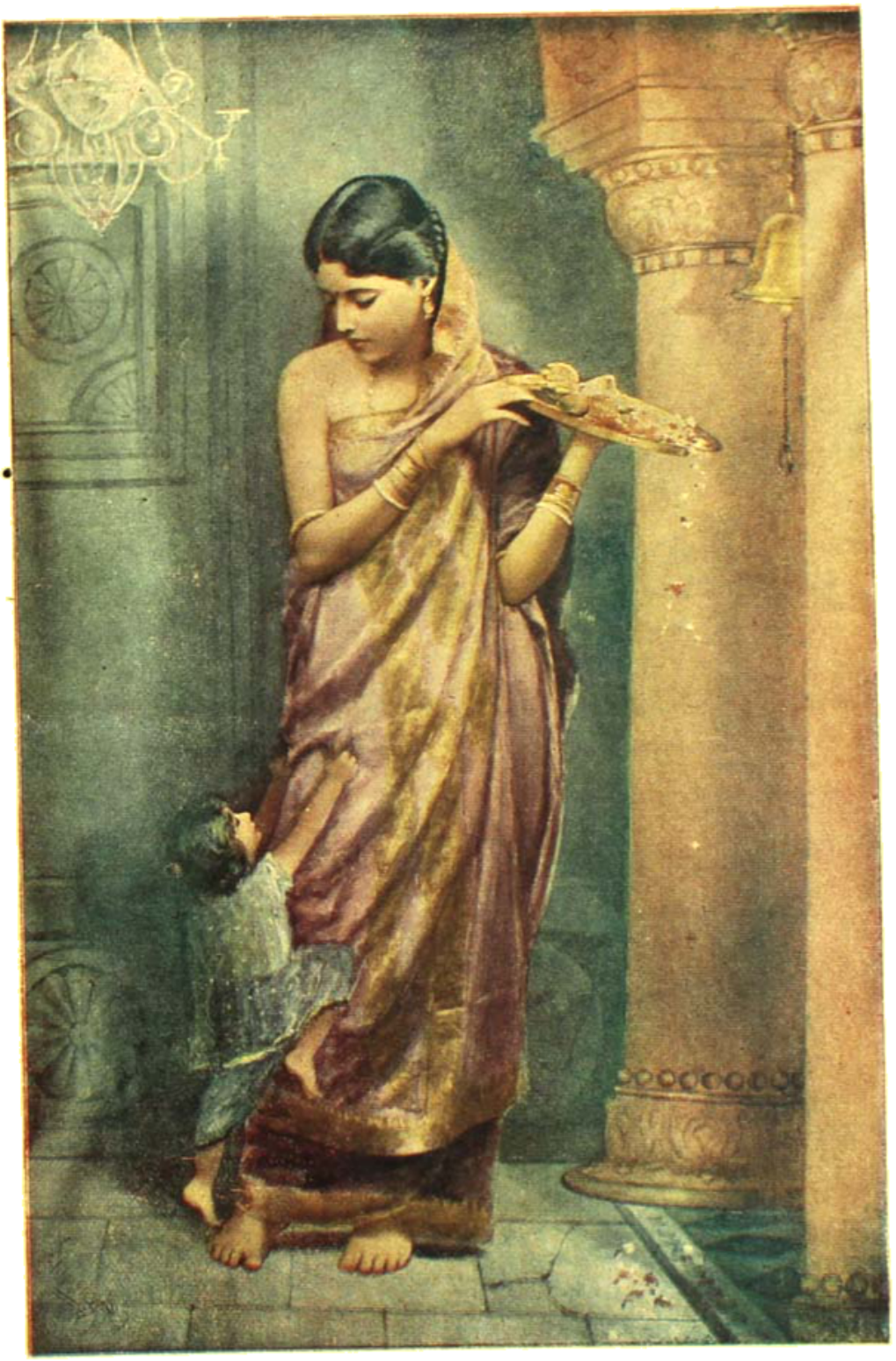

সংসার-বন্ধন

[শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

(শ্রীমতী সুধারাণী মজুমদার মহাশয়ার সৌজন্যে)

The Emerald Printing Works

কার্ত্তিক, ১৩২৫

প্রথম খণ্ড] ষষ্ঠ বর্ষ [পঞ্চম সংখ্যা

বিশ্বমাতার আবাহন

[শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

আজি, জ্যোৎস্না-ধৌত-রাত্তি-নন্দিত ধরাতল ধীর-সমীর মৃদুমন্দ ;
আজি, ফুল্ল-শেফালি-ফুল-মণ্ডিত-দ্রুমদল আকুল-পুলকিত-গন্ধ।
কুঞ্জে কুঞ্জে ভরা অলিকুল গুঞ্জন মুখরিত ঘন বন-বীথি,
গৃহে গৃহে উত্থিত উৎসব মধুময় হর্ষ-প্লাবন-সুখগীতি,
এস, ধরা করি' নন্দিতা ত্রিভুবন-বন্দিতা ঝঙ্কৃত শ্লোকরাশি ছন্দে ;
এস, শোভাসারা-সরসাং বরাভয়-দরশাং সন্তান কোটী প্রাণ বন্দে।

কবে, নন্দনপুরে তব অভিষেক-বন্দনে নাদিল ঘন ঘোর শঙ্খ ;
কবে, তন্ময়-দেবকুল-ধ্যান-মাঝে চিন্ময়ী মূর্ত্তি ধরিলে অকলঙ্ক।
অশিব-শান্তিতরে সেই হ'তে দশকরে অভয়ঃ দিয়াছ স্নেহ ঢালি,
লোকে লোকান্তরে মাতৃ-করুণা ঝরে বিশ্ব দিতেছে প্রাণ ডালি,
এস, জন্ম-মরণ-জয়ী শক্তি করুণাময়ী, সৃষ্টি মগন পাপ-পঙ্কে ;
এস, হে জীবন-শরণীং ত্রাণময়ী-তরণীং লহ লহ তুলি স্নেহ-অঙ্কে।

তুমি, সর্ব্ব ভুবন আজি মগ্ন কর মা রসে, দুঃখীরে দেহ প্রেমানন্দ ;
আজি, দৈন্য-দহন-স্মৃতি বিস্মৃত হ'তে চাহে হর্ষ-লোলুপ প্রাণ অন্ধ।
সর্ব্বদেশ ভরি' নিঃসৃত প্রাণে প্রাণে তৃপ্তিপুলক শতধারা,
এ মহানন্দ আজি পূর্ণ কর মা যেন কেহ নাহি রহে সুখহারা,
এস, সম্পদে ধনে ধানে বিত্তে ভুবন ভরি রূপে দেহ মা নব কান্তি ;
এস, দুর্গতি-হারিণীং যমভয়-বারিণীং তাপিত জনে দিতে শান্তি।

তুমি, স্বাগত আজি দেবী রৌদ্র জ্যোছনা মাখি প্রোজ্জ্বল দিবা মধুরাত্রি ;
তুমি, স্বাস্থ্য শকতি আশা কণ্ঠেরি মহাভাষা অমৃত-পরমায়ু দাত্রী।
ছিন্নকন্থাসার নগ্নবসনহীন বস্ত্র লভিবে প্রতি দীনে,
আত্মশক্তিভরা বিরাটমন্ত্র কাণে অর্পিবে আজি বলহীনে,
এস, নিখিল-তত্ত্বজ্ঞান-পান-পাত্র ধরি' কর্ম্ম মুখর কর মর্ম্মে ;
এস, অণিমাং লঘিমাং রূপরস-প্রতিমাং বিশ্বমানব-মহাধর্ম্মে।

দেবি ! দুর্গতি নাশিতে দুর্গা রূপ ধরি, রক্ষিছ ভারতবর্ষে ;
তব, অভয়া মূর্ত্তি মাগো বিঘ্ননাশ-তরে ত্রাসিতে বরাভয় বর্ষে।
মোদের কিসেরি ডরে কম্পিত হৃদি আর অন্নপূর্ণা যার মাতা,
জন্ম জন্ম ধরি সর্ব্ব কর্ম্ম 'পরি বক্ষ রয়েছে তারি পাতা,
এস, নবীন বিশ্বে মহামানব সৃষ্টি করি পূর্ণ কর মা তার শিক্ষা ;
এস, শারদাং বরদাং শুভদাং সুখদাং সর্ব্বভুবন মাগে দীক্ষা।

দেবি ! তোমারি পুণ্যপীঠ পুনঃ মা ধন্য হবে মানব-মিলনেরি ক্ষেত্রে ;
তব, ব্রাহ্মণ-তেজ-রবি-গৌরব জ্বলি' পুনঃ সৃষ্টি রাখিবে স্নেহ-নেত্রে।
ইন্দ্র-মুকুট-মণি-ভূষিত-পদতলে সুরাসুর লোটে শির মাতি' ;
নিম্নে ধরণী তব আঁখিযুগ ছলছল চাহিছে অঞ্চল পাতি,
এস, বীণা-বেণু-কণ্ঠ আজি রাগে সঙ্গীতে শ্লোকে শ্লোকে ভরি' দিক ছন্দে ;
এস, হরষাং সরসাং ত্রিভুবন-ভরসাং সন্তান কোটী প্রাণ বন্দে।

চণ্ডী-মাহাত্ম্য

[শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু এম-এ, বি-এল]

সমগ্র পুরাণ মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত 'চণ্ডী'ই শক্তিবাদ ও শাক্তধর্ম্মের মূল-গ্রন্থ। অন্য পুরাণে শক্তিবাদ বা শাক্ত-ধর্ম্মের কথা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মূল এই চণ্ডী। অতএব এই চণ্ডী যে শাক্তধর্ম্মের মূল ও মজ্জাস্বরূপ, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যেমন গীতা বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল গ্রন্থ, সেইরূপ চণ্ডীও শাক্তধর্ম্মের মূল গ্রন্থ। চণ্ডীর উপরেই শাক্তধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য চণ্ডী হিন্দুর—বিশেষতঃ শাক্ত-সম্প্রদায়ের নিকট এত আদৃত। হিন্দুর প্রায় সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মে পূজা-পার্ব্বণে চণ্ডীপাঠ বিহিত। চণ্ডীতেই উক্ত হইয়াছে :—

"বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকার্য্যে মহোৎসবে।
সর্ব্বং মমৈতচ্চরিতমুচ্চার্য্যং শ্রাব্যমেব তৎ॥
• • • •
শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ॥
• • • •
শান্তিকর্ম্মণি সর্ব্বত্র তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।
গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম॥

শুধু বিশেষ ধর্ম্ম-কর্ম্মে শান্তি-স্বস্ত্যয়নে চণ্ডীপাঠ বিহিত হয় নাই। প্রতি অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে চণ্ডীপাঠ বিহিত :—

"অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চৈকচেতসঃ।
শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমম্॥

ইহা ব্যতীত প্রতিদিন চণ্ডীপাঠের বিধান আছে :—

"এতৈরুতং পঠ্যতে সম্যক্ নিত্যমায়তনে মম।
সদা ন তদ্বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং তত্র যে স্থিতম্॥"

অতএব চণ্ডী হিন্দুর প্রত্যেক ধর্ম্ম-কর্ম্মে, পূজা-পার্ব্বণে, শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি কর্ম্মে যে কেবল পঠিত ও শ্রুত হয় তাহা নহে; অনেক হিন্দু আছেন, যাঁহারা প্রতি অষ্টমী আদি তিথিতে, এমন কি প্রতিদিন চণ্ডী নিয়মিত ভাবে পাঠ করিয়া থাকেন। ভারতে হিন্দুর মধ্যে শাক্তের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, জগতে এমন কোন ধর্ম্মগ্রন্থ নাই, যাহা সমগ্র এতবার পঠিত হইয়াছে।

চণ্ডী মন্ত্ররূপে পঠিত হইয়া থাকে। ইহাতে সাতশত মন্ত্র আছে। এই জন্য ইহার নাম সপ্তশতী।

"মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্তঃ স্তবঃ সপ্তশতাভিধঃ।"
ইতি চিদম্বরতন্ত্রঃ।

"তস্মিন্ দেব্যাঃ স্তবে পুণ্যে মন্ত্রাঃ সপ্তশতং শিবে।"

এই সপ্তশত মন্ত্রযুক্ত চণ্ডী পাঠকে জপ বলে।

"জপেৎ সপ্তশতীং।"—ইতি চিদম্বরতন্ত্র।

দেবী-ধামল তন্ত্রেও এই কথা আছে।*

অতএব পূর্ব্বে যেমন বেদমন্ত্র যজ্ঞে উচ্চারিত হইত, এক্ষণে চণ্ডীও সেইরূপ মন্ত্র রূপে, স্তুতি রূপে উচ্চারিত হয়, এবং তাহার জপ হয়। বেদপাঠে এক্ষণে অল্প লোকেই সমর্থ। কারণ ভারতের যজ্ঞ-যুগ চলিয়া গিয়াছে। বেদ আর মন্ত্র রূপে যজ্ঞে উচ্চারিত হয় না। অধুনা বেদমন্ত্রের পরিবর্ত্তে হিন্দুগণ, বিশেষতঃ শাক্তগণ চণ্ডীপাঠই করিয়া থাকেন। বৈদিক যজ্ঞ ইদানীং তান্ত্রিক বা পৌরাণিক পূজাদিতে পরিণত হইয়াছে। বৈদিক ভারত এক্ষণে তান্ত্রিক হইয়াছে। তাই বেদমন্ত্রের পরিবর্ত্তে এক্ষণে চণ্ডী-পাঠ বিহিত হইয়াছে। বেদ-প্রধান ভারতবর্ষ বুঝি "চণ্ডী-প্রধান"ই হইয়াছে।

এই চণ্ডীপাঠের ফলও অসীম। যাঁহারা অষ্টমী প্রভৃতি তিথিতে চণ্ডীপাঠ করেন—

"ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ।
ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্॥
শত্রুতো ন ভয়ং তস্য দস্যুতো বা ন রাজতঃ।
ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি॥

কেন না, এই চণ্ডীপাঠই "পরম স্বস্ত্যয়ন।" যেখানে চণ্ডী-পাঠ হয়, দেবী চণ্ডিকা স্বয়ং সেখানে থাকেন।

---

* জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং, নিয়মেন সমাহিতঃ। ইতি দুর্গাতন্ত্রিণী ধৃত বচন।

"সর্ব্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্।"

যিনি চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করেন—

"পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্।
রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে॥"

চণ্ডীপাঠে উপসর্গ সব দূর হয়, গ্রহ-পীড়ার শান্তি হয়, দুঃস্বপ্নজনিত ভয় নষ্ট হয়, বাল-গ্রহের শান্তি হয়, রাক্ষোভূত পিশাচ-ভয় নষ্ট হয়, পাপ ক্ষয় হয়, রোগ নষ্ট হয়, বৈরি-ভয় দূর হয়, সকল সঙ্কট হইতে মুক্ত হওয়া যায়; এক কথায়, সকল বাধা, সকল ভয় দূর হয়। আর, চণ্ডীতে উক্ত স্তব সমাহিত হইয়া পাঠ করিলে, শুভ মতি হয়—তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়—

"যুদ্ধাদিঃ স্তবতো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ।
ব্রহ্মণা চ কৃতাস্তাস্তু প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্।"

যাবাহী তন্ত্রে চণ্ডী একবার আবৃত্তি, দুইবার আবৃত্তি প্রভৃতির ফল উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে আছে—

চণ্ডাঃ শতাবৃত্তিপাঠাৎ সর্ব্বাঃ সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ।

এইরূপ ফলশ্রুতি-হেতুই চণ্ডীপাঠের এত আদর, এত প্রচার। আর যে গ্রন্থ পাঠে এত অধিক ফল হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, সে গ্রন্থ পাঠের বিধান সম্বন্ধেও বড় বাঁধা-বাঁধি নিয়ম আছে। যাঁহারা ফল-উদ্দেশ্যে চণ্ডীপাঠ করান, তাঁহারা তাহা জ্ঞাত আছেন। এ স্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, চণ্ডী গ্রন্থ হিন্দুর নিকট কিরূপ পূজিত। খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট বাইবেল যেমন পূজিত, মুসলমানের নিকট কোরাণ যেমন পূজিত, পারসীকের নিকট অবস্তা যেমন পূজিত, শিখের নিকট গ্রন্থ-সাহেব যেরূপ পূজিত, শাক্তের নিকট চণ্ডী তাহা অপেক্ষাও অধিক পূজিত ও আদৃত বোধ হয়। ইহা হইতে ধর্ম্ম-জগতে চণ্ডীর স্থান কত উর্দ্ধে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

চণ্ডী মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত,—মার্কণ্ডেয় পুরাণের এক অংশ মাত্র। মার্কণ্ডেয় পুরাণ মূল অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে একখানি প্রধান পুরাণ। সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভেদে পুরাণ ত্রিবিধ। মার্কণ্ডেয় পুরাণ সাত্ত্বিক পুরাণ। এই পুরাণের মূল বক্তা মার্কণ্ডেয় ঋষি। মার্কণ্ডেয় ঋষি পিতৃ-শাপে পক্ষিরূপ প্রাপ্ত দ্রোণ-পুত্র ক্রৌষ্টুকী বা ভাগুরী নামক পক্ষীদের এই পুরাণ শ্রবণ করাইয়াছিলেন। এই পক্ষিগণ তাহা ঋষি জৈমিনিকে শ্রবণ করান। এইরূপে এই পুরাণের উৎপত্তি। এই পুরাণের মূল বক্তা ঋষি মার্কণ্ডেয় ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন। সপ্তকল্প পরিমিত তাঁহার আয়ু। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের শেষ কয় অধ্যায় হইতে জানা যায় যে, তিনি আদ্যাশক্তির উপাসক ছিলেন—যাহা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনিই এই পুরাণ-বর্ণনা প্রসঙ্গে—চণ্ডী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। এই জন্য ইহার নাম মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

এই মার্কণ্ডেয় পুরাণ মহাভারতের পরে রচিত। এ কথা এই পুরাণ হইতেই পাওয়া যায়। ইহার প্রথমেই আছে :—

"তদিদং ভারতাখ্যানং বহ্বর্থং শ্রুতিবিস্তরং।
তত্ত্বতো জ্ঞাতুকামোঽহং ভগবন্ ত্বমুপস্থিতঃ॥"

মহাভারত সম্বন্ধে চারি প্রশ্ন উপলক্ষ্য করিয়া মার্কণ্ডেয় পুরাণের উৎপত্তি। মহাভারত-রচনা-কাল কলির প্রারম্ভে। কালতত্ত্বরহস্যবিদ্ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কলির প্রারম্ভে, অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ মহাভারতের পরে রচিত। কত পরে রচিত, তাহা বলা যায় না। তবে অধিককাল পরে রচিত নহে, ইহাই অনুমান হয়,—কেন না, ব্যাসের শিষ্য ঋষি জৈমিনিই এই পুরাণের শ্রোতা।

এই মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীর প্রসঙ্গ কিরূপে অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা এ স্থলে উল্লেখের প্রয়োজন। মন্বন্তর-বর্ণনা পুরাণের প্রধান অঙ্গ। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও মন্বন্তর বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মার একদিনে এক কল্প। এক কল্পে চতুর্দ্দশ মন্বন্তর হয়। বর্ত্তমান কল্পে ছয় মন্বন্তর অতীত হইয়াছে। এক্ষণে সপ্তম মন্বন্তর। ইহাকে বৈবস্বত মন্বন্তর বলে। ইহার পরে যে অষ্টম মন্বন্তর হইবে, তাহার মনু হইবেন—সাবর্ণি। মার্কণ্ডেয় পুরাণে, পূর্ব্ববর্ত্তী সাত মনুর উৎপত্তি বিবৃতির পর, অষ্টম মনু সাবর্ণি কিরূপে উৎপন্ন হইবেন, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গেই চণ্ডীর অবতারণা। ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে, দ্বিতীয় অর্থাৎ স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ নামে চৈত্রবংশীয় একজন রাজচক্রবর্ত্তী রাজা এই ভারতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি শত্রুকর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া মেধস ঋষির আশ্রমে গমন

করেন। সেখানে পুত্র কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব সমাধি নামে এক বৈশ্যও আগমন করেন। এ অবস্থায় উভয়ে রাজা ও ধনের প্রতি মমতা দূর করিতে না পারিয়া, তাহার কারণ-জিজ্ঞাসু হইয়া মেধস মুনির নিকট গমন করেন। মেধস মুনির নিকট দেবী-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, এবং দেবীপূজা-তত্ত্ব জানিয়া উভয়ে দেবী মহাশক্তির পূজা করেন। সেই পূজার ফলে উভয়ে দেবীর নিকট হইতে অভিলষিত বর লাভ করেন। সেই বর লাভ করিয়াই রাজা সুরথ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়া সাবর্ণি নামে অষ্টম মনু হইবেন। এবং বৈশ্য সমাধি জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হইবেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণি নামক অষ্টম মনুর এইরূপ উৎপত্তি-বিবরণ আছে। এই বিবরণ উপলক্ষ্যেই চণ্ডী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, এই কল্পের দ্বিতীয় মন্বন্তরের কোন সময়ে ঋষি মেধস, শক্তিতত্ত্ব ও শক্তি-পূজাতত্ত্ব প্রথমে সুরথ ও সমাধির নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহার পর সুরথ ও সমাধি কর্ত্তৃক দেবী পূজাই এ কল্পে দেবীর প্রথম পূজা। সে আজ অনেক দিনের কথা। এক মন্বন্তরে ৭১ চতুর্যুগ। এক মন্বন্তরে ৩৩ লক্ষ বিশ হাজার মানুষ বৎসর। এ কল্পে ছয় মন্বন্তর ও সপ্তম মন্বন্তরের ২৭ চতুর্যুগ অতীত হইয়াছে। এক্ষণে অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের কলির প্রারম্ভ। পুরাণের এই কাল-পরিমাণ গণনা অনুসারে এই শক্তিবাদ ও শক্তি-পূজা প্রথম প্রচারের পরে প্রায় এক শত পঁয়ত্রিশ কোটী বৎসর অতীত হইয়াছে। আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের অনুমান অনুসারে ২০ হইতে ৫০ কোটী বৎসর পূর্ব্বে এ পৃথিবীর সৃষ্টি। পুরাণ অনুসারে ১৯৬ কোটী বৎসর পূর্ব্বে এ পৃথিবীর সৃষ্টি বা এ কল্পের আরম্ভ। আমাদের শাস্ত্রে যাঁহারা বিশ্বাসবান্, তাঁহারা আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্‌দের অনুমান অপেক্ষা, 'অহোরাত্রবিদ্‌গণের' সিদ্ধান্তে অধিকতর আস্থাবান্ হইবেন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, এই মেধস ঋষি কর্ত্তৃক দেবীর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন যে শক্তিবাদের প্রথম প্রচার, এবং সুরথ ও সমাধি কর্ত্তৃক দেবী-পূজা যে প্রথম শক্তি-পূজা, তাহা পুরাণে ও তন্ত্রে—যেখানে শক্তিবাদ ও শক্তি-পূজা বিবৃত হইয়াছে, সেইখানেই উল্লিখিত আছে। মহাপুরাণ মধ্যে দেবী ভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই শক্তিপূজার উল্লেখ আছে। * উপপুরাণ মধ্যে দেবী পুরাণে ও কালিকা পুরাণে মার্কণ্ডের চণ্ডী অনুসারে এই শক্তিবাদ ও শক্তি-পূজা বিবৃত হইয়াছে। তাহার পর তন্ত্রে সর্ব্বত্র এই শক্তিবাদ ও শক্তিপূজা বিবৃত ও বিস্তারিত হইয়াছে। মার্কণ্ডের চণ্ডীই

* দেবী-ভাগবত—১৮ খানি প্রধান পুরাণের অন্তর্গত কি না,—সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ভাগবত দুইখানি,—একখানি শ্রীমদ্ভাগবত, আর একখানি দেবী-ভাগবত। ১৮খানি প্রধান পুরাণ মধ্যে একখানি ভাগবতের উল্লেখ আছে। সুতরাং উক্ত দুইখানি ভাগবতের মধ্যে কোন্‌খানি মহাপুরাণ তাহা বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণবগণের মতে শ্রীমদ্ভাগবত মূল পুরাণ। নারদ, সূর্য্য, গরুড় ও পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুর মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক—তদনুসারে দেবী-ভাগবত উপপুরাণ। কিন্তু শৈব ও বঙ্গীয় পুরাণানুসারে, দেবী-ভাগবত মহাপুরাণ। শিব-পুরাণে দেবী-ভাগবতকে মহাপুরাণ মধ্যে পঞ্চম স্থান দেওয়া হইয়াছে। দেবী ভাগবতেও আছে—"তত্র ভাগবতং পুণ্যং পঞ্চমং বেদসম্মিতম্।" দেবীভাগবত ব্যাসের উক্ত। দেবী ভাগবত হইতে কালিকাপুরাণ (উপপুরাণ) দেবীপুরাণ (উপপুরাণ) সংগৃহীত। দেবী-ভাগবতের বৃত্রাসুর-বধ আদি উপাখ্যান দেবী-ভাগবত হইতে আদিত্য-পুরাণে গৃহীত। সুতরাং দেবী-ভাগবতও মূল পুরাণ। এই সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়া মহাভারত ও পুরাণের শ্রেষ্ঠ টীকাকার নীলকণ্ঠ দেবী-ভাগবতকে মূল পুরাণ মধ্যে গ্রহণ করিয়া, তাহার টীকা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত যে মূল পুরাণের অন্তর্গত নহে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই পাওয়া যায়। ইহাতে আছে যে, বেদব্যাস বেদ বিভাগ করিয়া এবং পুরাণ সকল, বেদান্ত ও মহাভারত লিখিয়াও মোহমুক্ত হইতে পারেন নাই। তিনি পরে মোহমুক্তির জন্য শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন।—

"বেদশাখা পুরাণানি বেদান্তং ভারতস্তথা।
কৃত্বা সংমোহসংমুক্তোঽভবং রাজন্ মনস্তপি।"

বঙ্গ-পুরাণেও আছে—ব্যাস ১৮খানি পুরাণ ও তৎপরে মহাভারত রচনার পরে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। পদ্মপুরাণেও এই কথা আছে,—

.....পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতী সুতঃ।
নাপ্যবান্ মানসস্তোষং ভারতে মাপি ভাষিনি।
চকার সংহিতামেতাং শ্রীমদ্ভাগবতীং পরাং।

ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, বেদব্যাস দেবী-ভাগবত সমেত ১৮ পুরাণ রচনার পরে ভারত রচনা করেন, এবং তাহার পরে শ্রীমদ্ভাগবত লিখেন।

যাহা হউক, এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ বৌদ্ধযুগে একরূপ লোপ হইয়াছিল। বোপদেব ইহার উদ্ধার করেন। বৈষ্ণবগণও একথা স্বীকার করেন। কোন-কোন শাক্ত পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্যাসের

যে এই শক্তিবাদের মূল, তাহা তন্ত্রে সর্ব্বত্র উল্লিখিত হইয়াছে। 'চিন্নমস্তা' 'বারাহী' প্রভৃতি তন্ত্রে মন্ত্ররূপে চণ্ডীপাঠের নিয়ম-পদ্ধতি এবং ফল প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

অতএব মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী-মাহাত্ম্যই যে শক্তিবাদ ও শক্তি-পূজার মূল, তাহাই যে শাক্তদের মূল গ্রন্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেবীভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে যে 'চণ্ডী-উপাখ্যান' আছে, তাহাও যে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে গৃহীত, তাহা আমরা আরও বিস্তারিত রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। মূল মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৮০ শ্লোক আছে। ইহার মধ্যে সুরথ, সমাধি ও মেধস-সংবাদে ৪৭ শ্লোক, মধুকৈটভ-বধে ৩১ শ্লোক, মহিষাসুর-বধে ১৪৫ শ্লোক, শুম্ভনিশুম্ভ-বধে ২৪৮ শ্লোক, দেবী-মাহাত্ম্যে ৮৭ শ্লোক এবং সুরথ-সমাধির দেবী-পূজা ও বরলাভে ২২ শ্লোক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর এই উপাখ্যান দেবী-ভাগবতে গৃহীত হইয়াছে। তবে তাহাতে এই উপাখ্যান বিস্তারিত এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়াছে। দেবী-ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে ৬ হইতে ৯ অধ্যায়—মধুকৈটভ বধ বিবরণ; ইহার শ্লোক সংখ্যা—২৩২। এই স্কন্ধের ২ হইতে ২০ অধ্যায় পর্য্যন্ত মহিষাসুর-যুদ্ধ-বর্ণনা—শ্লোক সংখ্যা ১০৯০। ২১ অধ্যায় হইতে ৩১ অধ্যায় পর্য্যন্ত শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ-বর্ণনা; শ্লোক-সংখ্যা ৬৮৮। ৩২ হইতে ৩৪ অধ্যায় পর্য্যন্ত সুরথ-সমাধির বিবরণ; শ্লোক-সংখ্যা ২৩৮। অতএব দেবী-ভাগবতে দেবী-মাহাত্ম্য বিবরণে মোট শ্লোক সংখ্যা ২২৪৮। সুতরাং মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অপেক্ষা দেবী-ভাগবতের চণ্ডীর শ্লোক-সংখ্যা চারিগুণেরও অধিক। ইহার মধ্যে দেবী-ভাগবতে (৭ স্কন্ধে ২৮ অধ্যায়ে) চণ্ডীর উল্লেখমাত্র হইতে দেবীর যে শতাক্ষী, শাকম্ভরী, দুর্গা, ভীমা প্রভৃতি অবতারের উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে, তাহা এই গণনা মধ্যে গৃহীত হয় নাই। ইহা ব্যতীত দেবী-ভাগবতের দশম স্কন্ধে ১০ হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে আবার সংক্ষেপে দেবী-মাহাত্ম্য, সুরথ-সমাধির বিবরণ, মধুকৈটভ-বধ, মহিষাসুর-যুদ্ধ এবং শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার শ্লোক-সংখ্যা ১৪৩। দেবী-ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে দেবী-মাহাত্ম্য-বক্তা—ব্যাস। কিন্তু দশম স্কন্ধে দেবী-মাহাত্ম্য-বক্তা স্বয়ং নারায়ণ, এবং শ্রোতা নারদ। পঞ্চম স্কন্ধের অনেক স্থলের বর্ণনা মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে গৃহীত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৬ অধ্যায়ের ৬২—৭৩ শ্লোক, ৯ অধ্যায়ের সমুদায়, প্রভৃতি গ্রহণ করা যাইতে পারে। *

দেবী-ভাগবতে চণ্ডীমাহাত্ম্য মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে গৃহীত হইলেও, তাহাতে অনেক নূতন ও অদ্ভুত কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। মহিষাসুর রম্ভের পৌত্র, রম্ভ (বা রক্তবীজের) পুত্র। সে ব্রহ্মা হইতে বরলাভ করিয়াছিল যে, সে কেবল নারীর বধ্য হইবে—

"তস্মাৎ মে মরণং নূনং কামিন্যাঃ কুরু পদ্মজ।"

সেই জন্য মহিষাসুর বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য দেবগণকে

রচিত, তাহা স্বীকার করিতে চাহি না। তাঁহাদের মতে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসের রচিত নহে। বোপদেবই বর্ত্তমান শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন। কিন্তু উল্লিখিত পুরাণের বচন মৌলিক ধরিলে, এ কথা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত—বেদান্তের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ। তাহার রচনায় ব্যাসের ন্যায় পরম জ্ঞানী ও ভক্ত কবির নিষ্ঠ হস্ত সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। তথাপি শ্রীমদ্ভাগবতে পুরাণের প্রচলিত পন্থা অবলম্বিত হয় নাই। সৃষ্টি, মন্বন্তর প্রভৃতি পুরাণের বর্ণনীয় বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে সেরূপ বিবৃত হয় নাই। সুতরাং দেবী-ভাগবতই মূল পুরাণ।

* এখানে একটী মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল :—

"এবং স্তুতা তদা দেবী দেবৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ।
ধনশরীরাৎ পদ্মং রূপং প্রাদুর্ভূতং চকার হ।
পার্ব্বত্যাশ্চ শরীরাৎ বৈ নিঃসৃতা চাম্বিকা যদা।
কৌশিকী তু সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে।
নিঃসৃতায়াস্তু তস্যা সা পার্ব্বতী তনু বভূবাহ।
কৃষ্ণরূপাং সমাখ্যাতা কালিকা সা প্রকীর্ত্তিতা।"

দেবী ভাগবত, ৫ স্কন্ধ, ১৩৩-৬।

"এবং স্তুবাদিযুক্তায়াঃ দেবানাং তত্র পার্ব্বতী।

* * * *

শরীরকোষতশ্চাতাঃ সমুদ্ভূতাম্বরীষিণা।

* * * *

শরীরকোষাৎ যদ্ভূতা পার্ব্বত্যানিঃসৃতাম্বিকা।
কৌশিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে।
তস্যাং বিনির্গতায়াস্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচল কৃতাশ্রয়া।"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, ৫ অধ্যায় ৮৪-৮৮।

যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিল। তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর (মহাবিষ্ণুর) নিকটে ও কৈলাসে শিবের (সদাশিবের) নিকট গিয়া নিজ-নিজ পরাজয়-বার্ত্তা জ্ঞাপন করেন। তখন সেই বিষ্ণু, শিব ও দেবগণের শরীর হইতে তেজ বাহির হইয়া এক নারীরূপে পরিণত হ'ন। তিনি মহালক্ষ্মী ভুবনেশ্বরী। তিনিই মহিষাসুরকে বধ করেন। তখন দেবগণ অযোধ্যায় মহিষাসুরের সিংহাসনে শত্রুঘ্নকে অভিষিক্ত করেন।" এই উপাখ্যানে সুতরাং অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে, স্পষ্ট অনুমিত হয়। শত্রুঘ্নকে মহিষাসুরের রাজ্যার্পণ, নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক বোধ হয়। যাহা হউক, ইহা হইতে সহজে বুঝা যায় যে, "চণ্ডী"র মূল উপাখ্যান মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত। তাহা হইতেই সে উপাখ্যান দেবী-ভাগবতে বিস্তারিত করিয়া ও কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া গৃহীত হইয়াছে।

দেবী-ভাগবত ব্যতীত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও দেবী-মাহাত্ম্য-বিবরণ আছে। এই পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে ৫৭ হইতে ৬১ অধ্যায়ে সুরথ-সমাধির উপাখ্যান ও দেবী-মাহাত্ম্য বিবৃত হইয়াছে। এ উপাখ্যানও মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে গৃহীত, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তবে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এ উপাখ্যান সংক্ষিপ্ত। ইহাতে সুরথ ও সমাধির বিবরণ বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে মহিষাসুর-যুদ্ধ বা শুম্ভনিশুম্ভ-যুদ্ধ এবং তদুপলক্ষে দেবীর আবির্ভাবের বিষয় বর্ণিত হয় নাই। ইহাতে মেধস ঋষি, সুরথ ও সমাধির জন্মবৃত্তান্ত প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে মাত্র। হৃতরাজ্য সুরথ রাজা ও হৃতধন বৈশ্য সমাধি মেধস ঋষির নিকট গিয়া সুরথ কেমন করিয়া রাজ্য পুনর্লাভ করিবেন, এবং সমাধি কেমন করিয়া মুক্ত হইবেন তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। মেধস ঋষি বলিলেন, সেই আদ্যাশক্তি মানুষকে দুই রূপ বুদ্ধি দেন। এক আবরণী বুদ্ধি, আর এক বিবেচনা বুদ্ধি। সুরথ আবরণী বুদ্ধি বশে রাজ্যকামী, আর সমাধি বিবেচনা বুদ্ধি বশে মুক্তিকামী। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত মুক্তি হয় না। বৈষ্ণবী-শক্তির আরাধনা করিলে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। এই বলিয়া মেধস ঋষি উভয়কে শারদীয় দুর্গা পূজা করিবার উপদেশ দিলেন, এবং পূজার বিধি মন্ত্র প্রভৃতি শিখাইয়া দিলেন। তদনুসারে সুরথ ও সমাধি উভয়ে দুর্গাদেবীর উপরুক্ত পূজা করিয়া অভিলষিত বর লাভ করিলেন। সংক্ষেপে ইহাই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের দেবী-মাহাত্ম্য-বর্ণনা। ইহাতে মধুকৈটভ ও রক্তবীজাদি বধের কথা ইঙ্গিতে উল্লিখিত আছে মাত্র। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ —বৈষ্ণব পুরাণ। এজন্য এই উপাখ্যানেও বিষ্ণু-ভক্তির প্রাধান্য উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা হইলেও ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণকার মায়া বা প্রকৃতি শক্তিকে 'নিত্যা' ব্রহ্মরূপা 'সনাতনী' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। (প্রঃ ১। ১,৮ – ১০ দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীই যে এই পুরাণের সুরথ-সমাধি-সংবাদের মূল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ইহা ব্যতীত অন্য কোন মূল পুরাণে সুরথ-সমাধি-সংবাদ বা এই দেবী-মাহাত্ম্য বিবৃত হয় নাই। মৎস্য ও মার্কণ্ডেয় পুরাণানুসারে মূল ১৮খানি পুরাণ-মধ্যে শাক্ত পুরাণ বা শক্তির মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক পুরাণ মাত্র একখানি; আর সেই পুরাণ দেবী-ভাগবত। কিন্তু দেবী-ভাগবতেও 'চণ্ডী উপাখ্যান' মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে গৃহীত, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রধানতঃ বৈষ্ণব পুরাণ হইলেও, তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে বৈষ্ণবী-শক্তিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণও বৈষ্ণব পুরাণ। তাহাতে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবী শক্তি—শ্রীরাধার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই জন্য তাহাতে এই চণ্ডী উপাখ্যান সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। মূল পুরাণ-মধ্যে শৈব পুরাণের সংখ্যাই অধিক। প্রায় দশখানি মূল পুরাণ শৈব পুরাণ। প্রত্যেক শৈব পুরাণেই শিবশক্তির প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং এক অর্থে সমুদায় শৈব ও বৈষ্ণব পুরাণে আদ্যাশক্তি স্বীকৃত ও শক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত। কিন্তু এই সকল পুরাণে—আর এই সকল পুরাণের সংখ্যাও ১৪ খানি—এই শক্তিবাদ স্বীকৃত হইলেও, তাহাতে শক্তিমান পরমেশ্বরের (সম্প্রদায় অনুসারে শিবের বা বিষ্ণুর) মহিমা প্রধানতঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ন্যায় চণ্ডী-উপাখ্যান উক্ত দেবী-ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ব্যতীত আর কোথাও বিবৃত হয় নাই। অন্য পুরাণে শক্তিবাদের সেরূপ প্রাধান্যও স্থাপিত হয় নাই। সুতরাং মার্কণ্ডেয় চণ্ডীই যে শক্তিবাদের ও শাক্ত ধর্ম্মের মূল গ্রন্থ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

শক্তিবাদ সম্বন্ধে উপপুরাণ মধ্যে কালিকাপুরাণ এবং

দেবীপুরাণই প্রধান। উপপুরাণ মাত্রেই কোন-না-কোন মূল পুরাণ অবলম্বনে রচিত। যেমন বৈষ্ণব উপপুরাণগুলি বিষ্ণুপুরাণ হইতে গৃহীত, শৈব উপপুরাণগুলি মূল শিব-পুরাণ অবলম্বনে রচিত, সেইরূপ উক্ত উপপুরাণ অর্থাৎ কালিকাপুরাণ ও দেবীপুরাণ মূল দেবীভাগবত অবলম্বনে রচিত। কালিকাপুরাণেই আছে,—

"যদিদং কালিকাখ্যং তন্মূলং ভাগবতং স্মৃতং।"

কালিকাপুরাণে ও দেবীপুরাণে এই আদ্যাশক্তির মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক অনেক নূতন উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়াছে। দুর্গা পূজার বিধি ও বিবরণ লিখিত হইয়াছে। তাহা হইলেও ইহা শক্তিবাদের ও শাক্তধর্ম্মের মূল গ্রন্থ নহে। কিন্তু এই উপপুরাণে শক্তিবাদ সম্বন্ধে অনেক মূলতত্ত্ব পাওয়া যায়। আর দেবীভাগবতের অন্তর্গত ভগবতী গীতায় ও দেবীগীতায় শক্তিবাদ সম্বন্ধে অনেক গূঢ়তত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝান আছে। শক্তিবাদ বুঝিতে হইলে তাহা জানা আবশ্যক।

এইরূপে পুরাণ দ্বারাই প্রধানতঃ শক্তিবাদ ও শাক্তধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। শাক্তধর্ম্ম পৌরাণিক। এবং তাহার মূল গ্রন্থ মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পুরাণ অপেক্ষাও তন্ত্রের দ্বারা সেই শাক্ত ধর্ম্ম বিশেষরূপে বিস্তারিত হইয়াছে। বর্ত্তমান শাক্তধর্ম্ম এই তন্ত্রশাস্ত্রের উপরই স্থাপিত। তন্ত্রের বক্তা শিব—শ্রোতা স্বয়ং শক্তি। শিবই তন্ত্রে শক্তিমাহাত্ম্য বিবৃত করিয়াছেন। তন্ত্রকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। কতকগুলি শৈব তন্ত্র, আর কতকগুলি শাক্ত তন্ত্র। শাক্ত তন্ত্রে এবং শৈব তন্ত্রে এই আদ্যাশক্তির তত্ত্বও নানা ভাবে, নানা রূপে পূজার ও উপাসনার বিধান বিস্তারিত হইয়াছে। যাহা হউক তন্ত্রেও যে শক্তিবাদের ও শক্তি-পূজার মূল মার্কণ্ডের চণ্ডী, তাহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব প্রধানতঃ মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতেই আমরা এই শক্তিবাদ বুঝিতে চেষ্টা করিব। তন্ত্র হইতে আমরা শক্তি-পূজার বিস্তার বুঝিতে চেষ্টা করিব না। সুতরাং এস্থলে তন্ত্রের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য তন্ত্রমধ্যে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র বিশেষ প্রামাণ্য ও আদৃত। সারদাতিলক প্রভৃতি তন্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব অতি সুন্দররূপে বিবৃত আছে। সুতরাং শক্তিবাদ বুঝিতে হইলে প্রয়োজন মত এই সকল মূল ও প্রামাণ্য তন্ত্র বুঝিতে হয়। তন্ত্র অনেক—এরূপ অসংখ্য। এই জন্য তন্ত্রের সংগ্রহ গ্রন্থই প্রচলিত আছে। মূল তন্ত্র অনেক লোপ হইয়াছে। এক্ষণে কয়েকখানি মাত্র প্রধান তন্ত্র মুদ্রিত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র অসীম। বেদ-পুরাণাদি অপেক্ষাও তন্ত্র অধিক রহস্যময়। ইহার গূঢ়ার্থ মধ্যে প্রবেশ করা নিতান্ত কঠিন। শিববাক্য বলিয়া এবং কলিতে তন্ত্রের শাসনই প্রবল বলিয়া শৈব ও শাক্ত পণ্ডিতগণ তন্ত্রের বিশেষ শ্রদ্ধা করেন এবং তন্ত্রকেই বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং শাক্তধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে তন্ত্রশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা এস্থলে শক্তিবাদ ও তাহার দার্শনিক ভিত্তি মাত্র বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। তাহার জন্য এই অনন্ত তন্ত্রশাস্ত্র-সমুদ্র মন্থনের বিশেষ প্রয়োজন নাই।

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(৪)

বর্দ্ধমানেরই প্রান্তভাগে দীননাথ মিত্রের একতালা কোটা-বাড়ীখানি ইদানীং বহুদিন সংস্কারাভাবে জীর্ণাবস্থ হইলেও, অতীতে একদিন গৃহস্বামীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না;—তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন এই অর্দ্ধভগ্ন গৃহে আজিও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। গৃহ-সংলগ্ন বড়-বড় ছড়ওয়ালা স্তম্ভযুক্ত চণ্ডী-মণ্ডপ এবং মোটা-মোটা লোহার শুল-বসান প্রবেশ-দ্বার এখনও ইঁহাদের পূর্ব্ব সমৃদ্ধাবস্থার সাক্ষ্য দেওয়া ভিন্ন আর কোন উপকারে লাগিতেছিল, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া

না গেলেও, দারিদ্র্যে পতিত ধনি-বংশীয়গণের পক্ষে সেই গত-গৌরবের অস্তোন্মুখ স্মৃতিটুকুর মূল্য কোন ভাগ্যবানের সুসজ্জ প্রাসাদাপেক্ষা অল্প নয়, বরং বেশী।

গৃহস্বামী একণে স্বর্গীয়। গৃহস্বামিনী দুর্গাসুন্দরী প্রতিনিধিত্বে এই পতনোন্মুখ গৃহরাজ্য পরিচালন করিতেছেন। কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি ও গৃহসংলগ্ন ফল-পাকড়ের সামান্য একখানি বাগান এই অনাথ পরিবারের সম্বল। জমিগুলিতে উৎপন্ন ধান নিতান্ত অল্প হয় না, অন্নাভাব ঘটে না,—মোটা ভাত-কাপড় এক রকম চলিয়া যায়। গৃহে পোষ্যের সংখ্যাও বেশী নহে। বিধবা নিজে, শ্বশুর-পরিত্যক্তা একমাত্র যুবতী কন্যা এবং বালক দৌহিত্র; তদ্ভিন্ন রাখু কৃষাণ, মুড়লি গাই এবং সোহাগী নাম্নী তন্ত কন্যা, এই কয়টি অনন্যসহায় প্রাণী,—মানব-মানবী এবং পশু।

বর্দ্ধমানের এই অংশ লোকবিরল, প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ। সামান্য একটু দূরে অনেক উচ্চ জাতীয়ের নিবাস থাকিলেও খুব নিকটে বড় একটা লোকালয় ছিল না।

এই নিরভিভাবক ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতিবেশী-সংখ্যাও সেই হেতু বড় কম। ছিদাম মুচি, হাড়ি বউ, অঘোর পোদ, আদুরি গয়লানি এই প্রকার দু'-পাঁচঘর দরিদ্রের দু'-পাঁচখানা মেটে ঘর ব্যতীত আর দুই-তিনখানি পাকা বাড়ীমাত্র সেই বনাকীর্ণ ফল ও আগাছাপূর্ণ বাগান-বাগিচার মধ্য হইতে দৃষ্ট হইত। এই বাড়ী তিনখানির মধ্যে একখানি ইঁহাদেরই স্বজাতীয়ের,—একখানি চাটুয্যে পরিবারের, এবং তৃতীয়খানিতে একটী মুসলমান পরিবার বাস করিয়া থাকেন। শেষোক্ত পরিবার অতি সম্ভ্রান্তবংশীয়; —শুনা যায়, সুপ্রসিদ্ধ টিপু সুলতানের অতি নিকট আত্মীয়ের বংশোৎপন্ন, ইদানীং হীনাবস্থ।

যে সময়ের কথা হইতেছিল, তখন জ্যৈষ্ঠ মাস। দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রে পৃথিবী ফাটিতেছে। কলিকাতার রাস্তায় এ সময় অনেক প্রকার বরফ সরবতের হাঁক শুনা যায়; এখানে সে পাঠ নাই—তাহার পরিবর্ত্তে বরং আকাশে উধাও একটা পাখী আকুল স্বরে 'ফটিক্ জল' হাঁকিতেছিল। মিত্রদের একতালার ঘেরা দালানে ঘটা-বাঁধা রুক্ষ চুলের রাশি জড়াইয়া মনোরমা হবিষ্য সারিয়া, বাসন মাজিয়া সবেমাত্র হাত পা ধুইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় তাহার বাল্য-সখী রাবেয়া আসিয়া চারি হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মনো, কি হচ্ছে?"

নসিরউদ্দীনের দুই স্ত্রী; রাবেয়া প্রথমা বড়বিবির ছোটা কন্যা, মনোরমারই সমবয়স্কা। আজ এই অনাদৃতার রূপ-যৌবন সকলি বেষ্টনীর অন্ধকারে বসীমর হইয়া গেলেও একদিন সৌন্দর্য্যের বলেই অভাগিনী অসংযত ধনি-গৃহের বধূরূপে মহা দুঃখ ক্রয় করিয়াছিল। আজও সে সৌন্দর্য্যের সমস্তটাই হয় ত নিঃশেষ হইয়া যাও নিয়া থাকিবে, —মেঘ-ঢাকা চাঁদের মত তাহার কতকটা আভাস তৈল-সম্বন্ধ-বিহীন চিকুরজালের মধ্য দিয়া, অযত্ন-রক্ষিত দেহকান্তি হইতে ছুরিত হইয়া আজিও সহসা দর্শকের বিস্মিত দৃষ্টিতে বেদনা ফুটাইয়া তুলে। কিন্তু সেই মনোরমা প্রতিমাও এই বনালয়বাসিনী সুলতানবংশীয়ার নিকটে দীপের নিকট খদ্যোতিকার মতই মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল। চন্দ্রকরের মতই স্নিগ্ধ, লতার মতই কোমল-স্থির, বিদ্যুৎলেখার ন্যায় উজ্জ্বল-দর্শনা এই নারীটি বাস্তবিকই বিধাতার সৃজন-কলার অপূর্ব্ব গৌরব!

মনোরমা ঈষৎ হাসির সহিত সখীকে সম্বর্দ্ধনা করিল, "এই যেয়ে উঠ্‌লুম, ক'দিন এদোনি কেন ভাই রাবেয়া?"

"ছোটমার শরীরটা বড় ভাল ছিল না, খুকিরও বড় অসুখ গেল, এই সব ঝঞ্ঝাটে আস্‌তে পারিনি। তোমার না কি শ্বশুর মারা গাছেন?"

"হাঁ, ভাই।" "তাহলে এইবার বোধ করি বেহেস্তের পত্নী খাপাস্ত হয়ে বেহেস্তে প্রতিগমন কর্ব্বেন?"

মনোরমা এই কাঙ্ক্ষিত পরিহাসে মুখ নত করিয়া, সলজ্জ মৃদুহাস্যে সেই নত মুখ ঈষৎ রঞ্জিত করিয়া, অস্ফুট কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল, "কি জানি ভাই।" কথা শেষে মৃদু সংশয়-শঙ্কিত ধড়িমা তাহার কণ্ঠ কম্পিত করিল। এই একটী মাত্র চিন্তা; এই সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এই মিত্র-পরিবারের অন্ন কয়টি প্রাণীই যেন এ কয়দিন তলাইয়া রহিয়াছে। কৃষাণ রাখু এক-মুখ হাসি ভরিয়া আনিয়া, যখন পাঠশালা-প্রত্যাগত অজিতকে দুই হাতে ধরিয়া নাড়া দিতে-দিতে, শিশুর মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া বলিতেছিল, "এইবেরে আমার দাদাঠাকুর নিজের রাজ্যিপাটে বস্‌তে যাবেন; আমি আর লাঙ্গল ঘাড়ে কর্‌বো না তো, দাদুর কাছে গিয়ে দাদুর কিটিন্ হাঁকাবো।"—তখন অত্যন্ত

শৈশবাবস্থা হইতে অনির্দ্দেশ্য পিতৃগৃহের অজস্র সুখ-সৌভাগ্যের সহিত বিশেষ করিয়া ইহারই মুখে-মুখে পরিচয় থাকা প্রযুক্ত, বালক অজিতকুমারের এইরূপ আকস্মিক আনন্দোচ্ছ্বাসকে কিছুমাত্র অসঙ্গত বা অসম্ভব না ঠেকিলেও, এবং পুত্রের উদ্দেশে আগতা মনোরমার কর্ণেও প্রগল্‌ভ বৃদ্ধের এই সরল বিশ্বাসের সহজ অভিব্যক্তিটুকু নিশ্চিত সত্য বলিয়া অনুভূত হইলেও, সংসারের কূটতত্ত্বে একান্ত অভিজ্ঞা বুদ্ধিমতী দুর্গাসুন্দরী ঈষৎ বিকৃত মুখে অবিশ্বাসের রেখা আঁকিয়া সরিয়া গেলেন। যখন জামাতার পিতৃ-বিয়োগের সংবাদ পত্রের মুখে শুনিতে হইয়াছে, তখনি তাঁহার অন্তরস্থ ক্ষীণ আশা-দীপটুকু চিরতিমিরগর্ভশায়ী হইয়াছে। পুত্র পিতার পথানুসরণ করিবেন। পিতার শাসনে পত্নীত্যাগ করিলেও, পিতা অবর্ত্তমানেও আর তিনি পরিত্যক্তাকে ফিরিয়া গ্রহণ করিবেন না। বিষম ক্রোধে ও অপমানের আগুনে দুর্গাসুন্দরী বাজপড়া তালবৃক্ষের মত ভিতরে-ভিতরে জ্বলিয়া পুড়িতে লাগিলেন। বৈবাহিকের অপেক্ষা শতগুণ ক্রোধে জামাতার প্রতি মন তাঁহার এতদিন পরে অকস্মাৎ এক নিমেষ মধ্যে অতিশয় তিক্ত হইয়া উঠিল। বেহায়ে-বেহারে ঝগড়া হইয়াছিল, তাহার সহিত তো কিছুই হয় নাই। সে কি বলিয়া বিবাহিতা, সন্তান-জননী পত্নীর আজ স্বেচ্ছায় এই অবমাননা করে? অপাঙ্গে চাহিতে-চাহিতে কন্যার শুষ্ক মুখে নবীন আশার বড় উজ্জ্বল দীপ্তি চোখে পড়িল; নিজের জিহ্বাগত অবজ্ঞাসূচক কথা-কয়টা অমনি সংবৃত করিয়া ফেলিলেন। সংসারের একটীমাত্র অবলম্বন এই মুখখানিতে এতটুকু আশার আলোও আজ সুদীর্ঘ সাতটি বৎসর ধরিয়া তাঁহার এই দুইটী অশ্রু-অন্ধ নেত্র দর্শন করিতে পায় নাই। তিনি বুঝিলেন, কন্যা আশা করিতেছে। দীর্ঘশ্বাস গোপনেই মোচন করিলেন, —মনে-মনেই বলিলেন, আশা পূর্ণ হইবে না।

এখন সখীর প্রশ্নে মনোরমা যে এমন অর্দ্ধ অবিশ্বাসে উত্তর দিয়াছিল, ইহার কারণ—তাহারও নিশ্চয়তা এক্ষণে কতকটা অনিশ্চিতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। মাস পূর্ণ হয়, অশৌচান্তকাল নিকটবর্ত্তী; এ পর্য্যন্ত শ্বশুরবাড়ীর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। যে ছেলেটি বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েটে অরবিন্দের সহিত চাকরি করে, তাহার মুখে শুনিয়া ধর-গৃহিণী একদিন খবর দিয়া গিয়াছেন যে, বসু মহাশয়ের শ্রাদ্ধে বড় ঘটা, দানসাগর হইবে; আরও কি-কি হইবে, সে সব খবর জানা যায় নাই। এই ছেলেটির সঙ্গে বন্ধুত্ব হইতেই, অরবিন্দ একটি সহপাঠীর জন্য এই গরীব গৃহস্থের কন্যাটিকে 'কনে' দেখিতে আসিয়া, নিজের জন্য পছন্দ করিয়া যায়, এবং ইহারি সহায়তায় পিতার অর্দ্ধ-সম্মতি আদায় করিয়া মনোরমার পাণিগ্রহণ করে। পিতার মনে পুত্রকৃত কর্ত্তৃত্ব-খর্ব্বতাজনিত ক্রোধ স্ফুলিঙ্গ রূপ হইতে কোন্ সহায়ক পবন-স্পর্শে জলন্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহার পিতৃত্ব-শক্তিকে জয়যুক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা বলা গিয়াছে। পুত্রকে যখন উত্তমরূপেই বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে, গ্রহণ করায় তাঁহার ইচ্ছা কিছু কার্য্য করিলেও, সেই গৃহীত পণ্য গৃহে রাখা-না-রাখা সম্বন্ধে তাহার পিতার ইচ্ছাই একমাত্র কার্য্যকারক; তখন কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম বুঝিয়াই, নিরীহ অরবিন্দ যে বন্ধনে নিজেকে বদ্ধ করিয়াছিল, তাহা অতি সহজেই নিজের জীবন হইতে খুলিয়া ফেলিয়া দিল। পিতৃত্বের অবমাননার ক্ষোভ শান্ত হইল। এই পিতৃ-কর্ত্তৃত্ব লঙ্ঘনরূপ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তার্থে যাহাকে উৎসর্গ করা হইল, তাহার কথা?—কে ভাবিবে? অনেক নিরীহ পশুই যূপকাষ্ঠে সমর্পিত হইয়া থাকে, তাহাদের কথা কে ভাবিয়া থাকে?

রাবেয়া প্রখর বুদ্ধিশালিনী, কৃত-বিদ্যাগার সেই ক্ষুদ্র সংশয়-কণ্টকে তাহার সন্দেহ-কুণ্ঠিত চিত্ত বিদ্ধ হইল। কিন্তু সে তাহা অপ্রকাশ রাখিয়া পূর্ব্ববৎ অসংশয়ের স্বরে পুনরায় প্রশ্ন করিল, "অজুর বাবা এসেছিলেন?" মনোরমাও তেমনি সলজ্জ-স্মিত হাস্যে উত্তর দিল, "না ভাই, এখনও আসেন নি। বোধ করি কাজের ভিড়ে পারেন নি।" "চিঠি-পত্র লিখেছেন?"

"ন্-না।"—এবার রাবেয়ার সদা-হাস্য-বিমণ্ডিত সদ্য-ফোটা পদ্মের মত সুন্দর মুখ গম্ভীর হইল। চলিতে-চলিতে বসন্ত-কানন-প্রচ্ছাদিনী নির্ঝরিণীর চলন্ত স্রোত রুদ্ধ হইয়া গেল; পুষ্পলতার পরিক্রমণশীল বসন্ত-মন্দ-মারুত অকস্মাৎ রুদ্ধগতি হইল। আকস্মিক বিস্ময়ের সংশয়ে স্তম্ভিত হইয়া সখী শুধু বাধাভরা মৌন চোখে সখীর দিকে চাহিল।

এ দিকে মনোরমা মেয়েটি বড়ই সরলা। সন্দেহের ঘোর তাহার চোখে লাগাইয়া দিলেও লাগে না। বিশ্বাস-ভক্তিতে প্রাণটি তাহার নিটোল শুভ্র মুক্তাটির মতই

আপন গৌরব-নির্ম্মলতায় আপনি টলটল করিতেছে। সে বাল্যসখীর এই সুস্পষ্ট সন্দেহ-বিদ্বেষকে আপন বিচ্ছেদ-বেদনা বলিয়া ভুল করিয়া, তাহার জন্য অনেকখানি সহানুভূতি-জড়িত বাথা-বোধের সহিত অনুচ্চ মৃদুকণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—"তোর আমাদের কথা খুব মনে পড়বে, না রেবা? আমারও খুব মন কেমন করবে। এতখানি বয়েসের মধ্যে ক'দিনই বা আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। সেই বিয়ের পরে যখন বছরখানেক শ্বশুরবাড়ী গেছলুম, সেই যা।"

রাবেয়ার গাম্ভীর্য্যময় বদনে ঈষৎ হাসির বিদ্যুৎ ক্রীড়া করিয়া গেল। শ্যামসুন্দরের বর্ণসম্পদে গৌরবান্বিত অলঙ্কার-বিনম্র কাদম্বিনী মধ্যে বিজলী-চমৎকার ন্যায় তাহাতে আভার নূতন সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হইল। সে কহিল, "আর সেই যখন আমরা আজমীর যাই। তা' তার জন্য ভাবছিনে মনো। বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক বলে গেছেন, বিচ্ছেদেই প্রেমের পরিণতি। তা আমাদের প্রেমও না হয় এবার বিচ্ছেদের আগুনে গলে খাদ-শূন্য সোণার মত খাঁটি হয়ে দাঁড়াবে। অজু! তুমি আজ এর মধ্যে এলে?"

স্লেট ও পাতাছেঁড়া দু'তিনখানি বই বগলে করিয়া একটী সাত বৎসরের বালক দুই-পা ধূলা লইয়া ঘর্ম্মাক্ত শরীরে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছেলেটি দেখিতে বড় সুন্দর। রূপগৌর তনু, কুঞ্চিতালক, মুখশ্রী বড়ই পরিষ্কার। বালক আসিয়াই বই-খাতা প্রভৃতি নিকটস্থ কুলুঙ্গির মধ্যে বেগে নিক্ষেপ করিল। তার পর মায়ের উদ্দেশে ছুটিয়া আসিতে আসিতে উত্তর দিল, "ছুটী হয়ে গেল।" "ওঃ, আজ যে শনিবার। হামিদও তো তা'হলে এতক্ষণ এসে থাকবে। আজ তাহলে আসি মনো! অজু, তোমার বাবা তোমাদের নিয়ে গেলে, তুমি সেখান থেকে হামিদকে চিঠি লিখ।" "বাবা এসেছেন মাসিমা?" "না আসেন নি, আসবেন তো শীগ্‌গীরই।" "কবে আসবেন মাসিমা?" বালক মাতার হাত ছাড়াইয়া শুভ-সংবাদদাত্রীর নিকট ছুটিয়া গেল। মনোরমা আঁচল দিয়া পুত্রের অজস্র ঘর্ম্মস্রুতি মুছাইয়া দিতেছিল; ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া থাকিয়া নিম্নস্বরে কহিয়া উঠিল, "কত ঘেমেছিস্ অজু! আয় মুছিয়ে দিই।"

"থাকগে—" বলিয়া অজিত মাতৃ-সখীর মুখের উপর বড়-বড় আগ্রহ-ভরা দুই চোখ সংস্থাপন পূর্ব্বক এক নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, "বাবা কবে আসবেন মাসিমা?"

রাবেয়া পিতৃস্নেহে বঞ্চিত বালকের মুখের এই একান্ত ব্যগ্রতা-পূর্ণ পিতৃ-মিলনের আকাঙ্ক্ষার পরিচয়ে অন্তস্তলে সহসা একটা বেদনা অনুভব করিল। কি জানি সে নির্ম্মম জনক যদি নাই আসে। না:—এমন কি ঘটিতে পারে? আসিবে বই কি! এই পতিপ্রাণা সাধ্বীর একনিষ্ঠ একাগ্র সাধনার কি কোনই মূল্য নাই? নিরপরাধ, নিষ্পাপ এই শিশু—ইহাকে আল্লা কেন চিরদুঃখী করিয়া রাখিবেন? মানুষ নিষ্ঠুর হইতে চাহিলেও, তিনি চিরদিনই তাহার সমর্থন করিবেন কেন? প্রকাশ্যে বালকের ঘর্ম্ম-বিজড়িত কেশ-গুলি ললাট হইতে সরাইয়া দিয়া, স্নেহপূর্ণ নেত্রে নিতান্তই সেই ভালবাসিবার মত সুন্দর কোমল মুখখানি দেখিতে-দেখিতে উত্তর করিল, "কবে আসবেন, তা তো ঠিক জানি নে অজু,—তবে আজ-কালের মধ্যেই আসবেন তিনি। তুমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে আমাদের ভুলে যাবে না ত অজুমণি?" "নাঃ, কক্ষণো ভুলবো না,—দেখবেন, রোজ একটা করে চিঠি লিখবো 'খন।" "রোজ পারবে না, মধ্যে-মধ্যে লিখ।" "নিশ্চয় লিখবো। হ্যাঁ মা! কবে যাব মা। যাই দিদিমণিকে বলে আসিগে।"

বলিতে-বলিতে উৎসাহ ভরে লাফাইয়া উঠিয়া হর্ষধ্বনি সহকারে বালক সুসংবাদ প্রদান করিতে মাতামহীর উদ্দেশে তীরের মত ছুটিল। অকস্মাৎ মনোরমার অন্তর্মধ্যস্থ গোপন আনন্দের অন্তঃসলিলা নদী-স্রোতে বিরুদ্ধ বায়ুর স্রোত সবেগে আঘাত করিল। মাতার নামে তাহার অধরপ্রান্ত-স্থিত মৃদুমন্দ হাসিবিন্দু চকিতে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে চমকিয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "অজি! অজিত, শুনে যা।"

ততক্ষণে অজিত অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। দ্বিতলের সিঁড়িস্থ দুপ্‌দুপ্ পায়ের শব্দ এবং 'দিদিমণি! দিদিমণি!' উচ্চ চীৎকারে বৈপ্রহরী নিস্তব্ধতাকে সে তখন ভাঙ্গিয়া খান-খান করিতেছিল।

(৫)

মনোরমা যে ভয় করিতেছিল, ঠিক সেরূপ না ঘটায়, সে কিছু বিস্ময়ানুভব করিলেও, মনে-মনে অবশ্য খুসীই হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে এই শিশুটি সংসারের যাবতীয় নিঃসম্পর্ক লোকের মতই, অপরিচিত পিতার সম্বন্ধে মায়ের মুখে শোনা কথা যদি কখনও বড় উৎসাহে

তাহার এ জগতের মধ্যে এই দ্বিতীয় আপনার জনকে জানাইতে গিয়াছে, তখনই সেখান হইতে প্রতিদানে হয় নীরব ঔদাসীন্য, অথবা ঈষৎ বিরক্ত হাস্য—এবং ইহারই পরে মনোরমা একটুখানি অতি তীক্ষ্ণ তিরস্কার-লাভ করিয়া লজ্জায় মরিয়া গিয়াছে। অবশ্য তিরস্কারটায় একটা কোন ছুতা ধরা হইত; কিন্তু সে ছলটুকু দিয়া প্রকৃত গূঢ় কারণ অব্যক্ত থাকিত না। জামাই বা জামাই-বাড়ীর নামটাই যেন দুর্গাদেবীর দেহে বিষ-জ্বালা মাখাইয়া দিতে থাকে,—এ জিনিসটা তিনি একেবারেই সহিতে পারেন না। মায়ের ভিতরের এই দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া মনোরমাও ধোসাধা এ বিষয়ে মাতাকে সহায়তা করিয়াই চলিত,—এই নিতান্ত অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা সহজে সে ঘটিতে দিত না। তবে বিষয়টা তো এমন নয় যে, মুখে না ফুটিলেই মাতার পক্ষে ভুলিয়া যাওয়া, অথবা অন্যের দ্বারা উত্থাপিত না হওয়া সম্ভব! আজ যখন মনোরমা ছেলের জলখাবার লইয়া মায়ের নিকটে সশঙ্ক চিত্তে গিয়া দাঁড়াইল, তখন সেখান হইতে কোন বিদ্বেষ-কষায় আঘাত আসিয়া তাহার উপর পতিত হইল না, বরং জলখাবারের রেকাব টানিয়া লইয়া তাহার উপর প্রসন্ন দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "একটু সন্দেশ করে দিয়েছিস্? বেশ করেছিস্। বাজারের খাবার খাবে না, না দিলে খায় কি! লোকেদের ছেলের মত তো নয়, যে কতকগুলো কল-পাকড় যা পেলে হাস্-হাস্ করে খেলে। নে,—হাত-মুখ ধুয়ে এসে খেতে বোস্ অজিত।"

অজিতের মন তখন খাবারের উপর ছিল না, সে সেই বয়ের বেওয়ালে-টাঙ্গান রঙ্গিন নাটাই ও ঘুড়ি পাড়িবার জন্য একখানা টুল টানিয়া আনিতেছিল; আহত হইয়া সবেগে মস্তক আন্দোলন করিয়া আহারে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিল; কহিল, "এখন থাক্, আগে আমার জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নিই। দিদিমণি! তুমি আমার ব্যাগটায় সব গুছিয়ে দেবে? না-মণি! যাও তো,—আমার কাপড়-চোপড় সব আন তো।"

দিদিমা ঈষৎ হাসিয়া ফেলিয়া সেই মুহূর্ত্তে সমাগতা প্রতিবেশিনী শ্যামের পিসিকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "দেখেচ দিদি! এত দিন ধরে মানুষ করার ফলটা দেখ! কেমন ঘরের ছেলে!"

শ্যামের পিসি সহানুভূতির সহিত কহিলেন, "ওতো কথাই আছে বোন। বলে,—'ঘরের ছেলে খায়, ঘর পানে চায়; পরের বেটা খায়, বন পানে চায়'" এই বলিয়া নিজের কথার হাস্যরসে মাতিয়া উঠিয়া নিজেই হাসিতে লাগিলেন; কিন্তু অপর কেহই হাসিল না।

অজিতের সেদিন টিকি দেখাই ভার হইল। সে নিজের যেখানকার যা জিনিষপত্র টানিয়া আনিয়া দিদিমা ও মাকে বাঁধাছাঁদা করিতে দিয়া, এবং ত্বরা করিবার জন্য পুনঃ-পুনঃ অনুরোধ জানাইয়া সেই যে বাহির হইয়া গেল, সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘোরালো না হওয়া পর্য্যন্ত আর বাড়ী ফিরিল না। রাখু যেখানে স্তূপীকৃত খড়ের গাদায় খড় কুচাইতেছিল, সেইখানে গিয়া সর্ব্বপ্রথম সে দর্শন দিল। দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়াই, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিয়া, চীৎকার শব্দে ডাকাডাকি করিয়া বলিতে লাগিল, "রাখুদা'—রাখুদা', আমি ভাগলপুর যাব।"

"যাবি দাদা! পত্তর এয়েচে?" বৃদ্ধের কুঞ্চিত মুখ অকৃত্রিম আনন্দের স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"উঁহুঃ, বাবা আস্‌বেন।" "আস্‌বেন বই কি দাদা, বাবা এসে তোমাদের নে' যাবেন। আমায়ও নে' যাবি তো ভাই?"

"হুঁ-উঁ; তুমি যাবে, আমি যাব, মা যাবেন, দিদিমা—"

রাখাল আনন্দাতিশয্যে শিশুর মতই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে মুক্তকণ্ঠে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বাধা দিল, "দিদিমা যাবে কি রে পাগ্‌লা? দিদিমা কি যায়?—মা যাবে, তুমি যাবে, আর আমি তোমার চাকর কি না—তাই ঘাড়ে লাঠি নিয়ে পিছু-পিছু যাবো।" এই কথা বলিতে-বলিতে উৎসাহভরে বিচালি কর্ত্তন রহিত করিয়া রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং দেওয়ালের কোণ হইতে নিজের মোটা লাঠিগাছা টানিয়া লইয়া, কাঁধে তুলিয়া, কেমন করিয়া লাঠি ঘাড়ে লইয়া সঙ্গে যাইবে—তৎক্ষণাৎ তাহারই রিহার্শেল দিয়া দেখাইয়া দিল। অজিতের ইহাতে আমোদ ধরিতেছিল না। সে কলকণ্ঠে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া বলিয়া উঠিল, "রাখুদা' ঠিক যেন রাজ-বাড়ীর সিপাই হয়ে গেছে!"

"সিপাইর মত আমায় দেখাচ্চে দাদা? তবু ভাই, আর কাঁকাল সোজা করে দাঁড়াতে পারি নে, তা হলে

আরও কত—" এই কথা আনন্দ-দ্বিত মুখে বলিতে-বলিতে "আরও কত"র পর সেই কি যে এক অপূর্ব্ব দর্শন ঘটিতে পারিত, সে কথাটা উহ্য রাখিয়াই বৃদ্ধ রাখাল, শিশু অজিতকে কোলে টানিয়া তুলিয়া লইয়া, মনের আনন্দ-আবেগে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল।

"আঃ, কি পাগলামি করচো রাখুদা? থাম, আমায় নামতে দাও। বাবা এসে যদি কোলে চড়েচি দেখে ফেলেন, বকবেন কি বল দেখি? বলবেন যে, অজিত এখনও ছোট আছে। হয় ত খোকা বলেই ডাকবেন। হাঁ, বেশ কথা রাখুদা, বাবার সাম্‌নে খবরদার আমায় যেন খোকা বলে ডেকে ফেলো না,—তা হলেই সব মাটি করবে। মনে থাকে যেন। মুঙ্‌লি! মুঙ্‌লি! মাপা নেড়ে-নেড়ে দেখছিস্ কি? আর তো আমরা চল্লুম। হাঁ রাখুদা! আমরা চলে গেলে মুঙ্‌লিকে কে খেতে দেবে—কে দুধ দুইবে, দুধ কে খাবে?"

রাখাল নিজের আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িয়া এ সকল অবশ্য-চিন্তনীয় ব্যাপারের বিষয় কিছুমাত্রও চিন্তা করিয়া দেখে নাই। এক্ষণে শিশুর এই দূর-দর্শন শক্তিতে একদিকে যেমনি বিস্মিত অপর দিকে তেমনি বিব্রত হইয়া পড়িল। তাই তো! তাহারা দুজনে চলিয়া গেলে মুঙ্‌লিদের কি হইবে? তার পর মনে-মনে ভাবিয়া স্থির করিল, 'তা বলিয়া কি আমি যাইব না? আর একজন কৃষাণ দুধ দুইয়া দিবে, খোল-বিচালি খাওয়াইবে। কিন্তু দুধ খাইবার লোক কই?' অজিতও নূতন কৃষাণের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়া, ভোক্তার অভাবে কিছু বিপন্ন হইয়া পড়িল। "তবে কি হবে রাখুদা? দিদিমা তো দুধ বেশী খায় না। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? হামিদদের গোরু তো বেশী দুধ দেয় না—ওদের দিলেই ত হয়?"

দুগ্ধ দান সম্বন্ধে অজিতের ন্যায় রাখালের মত যদিও কোন দিন যথেষ্ট উদার দেখা যায় নাই, তথাপি আজ অপর কোন পন্থা না দেখিতে পাইয়া, সে এই প্রস্তাবই অনুমোদন করিয়া লইল। অজিত বলিল, "মুঙ্‌লি, বুঝেছিস্, বাবা আস্‌বেন রে! আমরা বাবার সঙ্গে এখান থেকে চলে যাব, তুই জানিস্‌নে ত? রাখুদা, তোমার কাপড়-চোপড় সব ঠিক করে রেখ। আমি হামিদকে, আর ছোট্টুকে, আর বিশুদাকে, বিশুদা'দের খুকুমণিকে—সব্বাইকে বলে আসতে যাচ্ছি যে, বাবা আমাকে নিতে আস্‌বেন। আর কেউ আমাকে একদিনও দেখ্‌তে পাবে না।" "আমি যাব সে কথাটাও বলিস ভাই!" "ঠিক বল্‌বো!" বলিয়া বালক লাফাইতে-লাফাইতে, বাগানের বেড়া ডিঙাইয়া ঝড়ের গতিতে চলিয়া গেল। রাখু সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসি-হাসি মুখে স্নেহ-বিস্ফারিত নেত্রে তাহার উৎসাহপূর্ণ, দ্রুত-অদৃশ্য সুঠাম ক্ষুদ্র মূর্ত্তিখানি দেখিতে-দেখিতে—ইহার আসন্ন সুখের চিত্র মনে-মনে আঁকিয়া ফেলিয়া, সুখে অধীর হইয়া উঠিল; মনে-মনে বলিতে লাগিল, "আহা, আমার সোণার কুঁদ এবার অযুধ্যের রাজা হবেন! মা জানুকী আমার অরণ্য ত্যাজ্য করে নিজের রাজ্যিপাটে ফিরে যাবেন। মধুসূদন, তুমিই সত্যের!"

সেদিন বর্দ্ধমানের সেই পাড়াটিতে এমন কোন মানুষ, এমন কোন জীব ছিল না,—অজিতের পিতা আসার বার্ত্তা যাহার অজ্ঞাত রহিয়া গেল। হামিদদের গাভী, তাহাদের হীরামন পাখী, ঘোষেদের পুঁটি নাম্নী দেড় বৎসরের বালিকা, চাটুয্যেদের বৈরভী ঝি, মুড়িওয়ালি অন্ধ গফারের মা, অঘোর পোদের দিদি-শাশুড়ী, ছিদাম মুদির নাতবৌ,—সকলকেই এই সুসংবাদের অংশভাগী করিয়া অভুক্ত বালক যখন ঘরে ফিরিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। জল-খাবারের রেকাব হাতে করিয়া মনোরমা ক্রমাগত ঘর বা'র করিতে-করিতে উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া, এইবার রাখালকে ডাকিয়া ছেলের তল্লাসে পাঠাইবে স্থির করিতেছিল। দুর্গাসুন্দরী জপে বসিয়াও বেশ সুস্থ হইতে না পারিয়া, উঠি-উঠি মন হইলেও, মনকে টানিয়া থামাইতে চাহিতে-ছিলেন; জোর করিয়া মনশ্চাঞ্চল্য রোধের চেষ্টা করিতে-ছিলেন; জপ ভাঙ্গিয়া শিশুকে প্রত্যবায়ভাগী করিয়া ফেলার ভয় করিতেছিলেন। এমন সময় পরিচিত পদ-ধ্বনির সহিত বড় জানা-শুনা গলার সাড়া কাণে আসিল। চিত্ত-দ্বার অমনি রুদ্ধ হইয়া গেল। জপের অধিষ্ঠাতা হৃদয়াসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। মনোরমা ছুটিয়া আসিয়া দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা! কি ছেলেই তুই হয়েছিস্!"

অজিত সে কথায় কাণ দিল না;—সে তখন তাহাদের বহির্দ্বারের উভয় পার্শ্বস্থিত কদম্ব ও চাঁপা গাছের একতম, বোধ করি চাঁপা গাছেরই মধ্যে লুক্কায়িত, অনবরত রবকারী

কোকিলটাকে গায়ে-পড়া হইয়া ডাকিয়া বলিতেছিল, "ওরে কু-কু-কু! আমার বাবা আস্‌বেন রে, বাবা আস্‌বেন। আমরা যখন চলে যাব, তখন তুই কাকে কু-কু-কু করে ডাকবি, বল দেখি রে কালো ভূত?"

মনোরমা এতক্ষণকার উদ্বেগের পরিশোধে পুত্রকে কিছু ভর্ৎসনা করিবে মনে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু তাহার কণ্ঠ শব্দ হারাইয়া ফেলিল। দুই চোখ মাটীর দিকে করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সহসা সেই মৃদু অন্ধকারের মধ্যে সর্ব্বশরীর কণ্টকিতকারী চঞ্চলস্পর্শ সহিত ঈষৎ বিস্মিত সুপ্রচুর আনন্দব্যক্ত কণ্ঠে মধুর 'মা' নামে সম্বোধন করিয়া শিশু আসিয়া যখন তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, তখন কোন কথাটি না কহিয়া, সে ক্ষণকাল সেই স্পর্শে, সেই আদরে নিজেকে মগ্ন করিয়া রাখিয়া, পরক্ষণে তাহার মুখখানা দুই বাম্র করতলে টানিয়া তুলিয়া, তাহাতে প্রগাঢ় চুম্বন আঁকিয়া দিয়া, তার পর কোলে তুলিয়া লইল। (ক্রমশঃ)

ভারতীয় ধনবিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ, পি-আর-এস্]

ভারতবর্ষের সম্পাদক মহাশয় আমার পঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ে "ভারতবর্ষীয় ধনবিজ্ঞান" বিষয়ক বক্তৃতা সম্বন্ধে কিছু লিখিতে বলিয়া আমায় অনুগৃহীত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বৈষয়িক জীবনের মূল ভিত্তি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধের মধ্যে আলোচনা করা কঠিন। দুই একটি মূল কথা মাত্র এস্থলে উত্থাপন করিব।

পাশ্চাত্য ও ভারতবর্ষীয় বৈষয়িক জীবনের ক্রম-বিকাশের মূল সূত্র ধরিতে পারিলে, তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা ভারতীয় বৈষয়িক জীবনের বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইবে, একটা স্বাধীন ভারতীয় ধনবিজ্ঞানের আলোচনা-পদ্ধতির আবশ্যকতা অনুভূত হইবে, এবং দেশের ইতিহাসের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভবিষ্যৎ বৈষয়িক জীবন গঠনের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থা; বিচিত্র জাতির বিচিত্র মানসিক প্রবৃত্তি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংঘটনের ফলে বৈষয়িক জীবনের প্রকৃতি ও ধারা বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। প্রত্যেক জাতির ও সভ্যতার সামাজিক ও বৈষয়িক অনুষ্ঠান, এইরূপে বিভিন্ন আকার গ্রহণ করিয়া মানব ইতিহাসের বৈচিত্র্য রক্ষা ও ভগবানের মহিমা জ্ঞাপন করিতেছে। দুই-একটী মাত্র উদাহরণ এই স্থলে দেওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষের ভূমিস্বত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ব্যক্তির স্বত্ব অপেক্ষা সমূহের স্বত্বের উপর ভারতীয় সমাজ অধিক ঝোঁক দিয়াছে। একান্নবর্ত্তী পরিবার অথবা গ্রাম্য-সমাজের একত্র ভূমি-স্বত্ব ভোগ, গ্রামের গোচারণ ও অন্যান্য সাধারণ ভূমি, গ্রাম্য সমাজ কর্তৃক ভ্রমজীবী শিল্পীর একত্র নিয়োগ প্রভৃতিতে আমরা ভারতীয় জনসমাজের প্রবল সাহচর্য্য ও সমূহের সহিত সহানুভূতির নিদর্শন দেখিতে পাই। গ্রাম্য-সমাজের দান ও পুণ্যের খাতে সঞ্চিত শস্য হইতে অগ্রে মন্দির, ধর্ম্মশালা, মসজিদ, ভাগবত ঘর অথবা হরিসভা তাহাদের প্রাপ্য পাইয়া থাকে; পরে সেই শস্যের বাকী অংশ কৃষক, জমিদার অথবা শিল্পী ও মজুরের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হয়। ভারতবর্ষের সেই স্বভাবজাত প্রবল সমূহ-বোধ, বৃত্তি ও মুষ্টি-ভিক্ষা, দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর, ডোলি, ও পুণ্যাবাৎ প্রভৃতি বিচিত্র অনুষ্ঠানের সৃষ্টি ও বিকাশ-সাধন করিয়াছে। এই সমূহ-বোধ ভারতবর্ষের বৈষয়িক জীবনকে সত্য-সত্যই গঠন ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে ও করিবে। কৃষক ও জমিদার, কৃষক ও মহাজন, মজুর ও প্রধান শিল্পী, শিল্পী ও পাইকার প্রভৃতির মধ্যে বৈষয়িক সম্বন্ধগুলি নীতি-বর্জ্জিত হয় নাই, বরং তাহার মধ্যে মধুর ও প্রিয় এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহাতে এক দিকে বৈষয়িক জীবন আচার ও নীতিকে লঙ্ঘন না করিয়া যেমন কাহারও ব্যক্তিত্ব-বিকাশের প্রতিকূল হয় নাই,

অপর দিকে তেমনি সমাজের শান্তি ও সুসামঞ্জস্য রক্ষার কারণও হইয়াছে। এই দুই দিক হইতেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বৈষয়িক জীবনের বিভিন্নতা সহজেই প্রতীয়মান হয়।

পাশ্চাত্য সমাজে ব্যক্তিত্ব-বোধ খুব প্রবল। প্রকৃতিকে জয় করিয়া আমি প্রভু হইব, প্রকৃতিকে দাসরূপে নিয়োগ করিয়া, আমার যতই অভাব বাড়িতেছে ততই তাহাকে খাটাইয়া, তাহার দ্বারা আমার অভাব মোচন করাইব,—পরস্পরের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়া আমার আমিত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে-তুলিতে সমাজ ও সভ্যতাকে আমিত্বের বিলাস-ভূমি করিব—এই হইল পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশের মূল মন্ত্র। ভারতবর্ষে যেমন সকলে মিলিয়া সৃষ্টি ও ভোগ, আত্মদানে আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিশেষ পরিমাণে অর্থ-বিভাগ ও অর্থ-ভোগ ব্যাপারে লক্ষিত হয়, সেইরূপ পাশ্চাত্য সমাজে আত্মপ্রসারে আত্মপ্রতিষ্ঠা, একক ও স্বতন্ত্র ভোগ প্রভৃতি প্রবল মানসিক বৃত্তি উহার অর্থ-বিভাগ ব্যাপারকে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। পাশ্চাত্য বৈষয়িক জীবনের মূলভিত্তি দুইটী—অর্থ ভোগ ও বিভাগ ব্যাপারে স্বৈরাচার ও ব্যক্তি-সর্ব্বস্বতা, এবং সমাজ-ব্যাপারে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির অবাধ প্রতিযোগিতা। ইহার ফলে, এক দিকে যেমন পাশ্চাত্য সমাজ প্রকৃতির উপর জয়ী হইয়া, যন্ত্র পরিচালনে সিদ্ধহস্ত হইয়া, মর্ত্ত্য ও পাতালের অধীশ্বর হইয়াছে; আর এক দিকে তেমনি মানবসমূহের অন্তঃ-জীবনের সার সত্য হইতে বঞ্চিত হইয়া, যন্ত্র ও নিয়মের অধীন হইয়া আপনাকে ও স্বর্গকে হারাইয়াছে।

শুধু প্রবলতম মানসিক বৃত্তির বিভিন্নতা হেতু যে বিভিন্ন সভ্যতার বৈষয়িক জীবন গঠনের ও ধারার বিভিন্নতা সৃষ্ট হয়, তাহা নয়। প্রকৃতি বিশেষ-বিশেষ জাতির ও সভ্যতার কেন্দ্রকে বিশেষ-বিশেষ দান করিয়া থাকেন;—আর সেই বিচিত্র দান অনুসারে সমাজের ও বৈষয়িক জীবনের বিচিত্র ধারা লক্ষিত হয়। ভৌগোলিক কারণে, পর্ব্বত অথবা মরুভূমি, সমতলক্ষেত্র অথবা সমুদ্র-তীরবর্ত্তী জনসমাজের মানসিক ভাব, দেহের শক্তি ও চরিত্রের বৃত্তি বিভিন্ন হয়। কিন্তু বিশেষ অনুধাবনের বিষয় আরও এই যে, ভৌগোলিক শক্তিপুঞ্জ বৈষয়িক অনুষ্ঠানেরও প্রকার ও আকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে।

আমরা মাত্র দুই-একটি উদাহরণ দিতেছি। যেখানে অধিক সংখ্যক লোক সুবিস্তৃত ও উর্ব্বর সমতলক্ষেত্রে বাস করে, সেখানে জনমণ্ডলীর কোন বিশেষ স্থানে পুঞ্জীভূত না হইয়া সমভাবে সমগ্র দেশময় ব্যাপ্ত হইবার সুবিধা আছে; এইরূপ ক্ষেত্রে চীন ও ভারতবর্ষের মতন দেশে শিল্প, ব্যবসায় ও অর্থের সমীকরণের দিকে সুবিধা হয়। শিল্প-ব্যবসায় সেখানে অর্থের তারতম্য সৃষ্টি করে না; সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ আনয়ন করে না। সেখানে সমূহ-তন্ত্রের বিশেষ প্রতিপত্তি; আর এই সমূহ-তন্ত্রের প্রধান পরিচয় এই যে, সমাজের সকল ক্ষেত্রে, বৈষয়িক জীবনেও সে প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে সহযোগিতার, সংঘর্ষের পরিবর্ত্তে শান্তির, যন্ত্রের পরিবর্ত্তে মানুষের প্রভাবে আপনাকে চালাইয়া প্রকৃতি ও সভ্যতার মধ্যে—একটা বিরোধ নয়,—একটা সুসামঞ্জস্য আনয়ন করে।

অন্যত্র যেখানে ভৌগোলিক শক্তিপুঞ্জ বিপরীত ভাবে ক্রিয়াশীল, যেখানে সুবিস্তীর্ণ উর্ব্বর ভূমির পরিমাণ অল্প ও খনিজ পদার্থের প্রাচুর্য্য হেতু কলকারখানা কৃষি অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভের সুবিধা পায়, সেখানে লোক-সংখ্যা এক স্থানে ও এক কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত হয়; অর্থের তারতম্য সৃষ্ট হয় এবং সমূহ-তন্ত্র না হইয়া প্রতিযোগিতা ও শ্রেণী-সংঘর্ষের ভিত্তিতে শ্রেণীতন্ত্র বিকাশ লাভ করে।

ভূম্যধিকারী, শ্রমজীবী ও ধনী এক-এক শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইয়া পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে সমাজে অশান্তি আনিয়া দেয়। যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আদর্শ শিল্প-ব্যবসায়ের দ্বারা প্রভূত অর্থ উৎপাদনের সহায় হয়, যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আদর্শ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সুযোগ দান করিয়া রাষ্ট্রকে মহীয়ান্ করিয়া তুলে, সেই আত্মপ্রতিষ্ঠা জাতির আত্মম্ভরিতায় প্রকাশ লাভ করিয়া সমগ্র বিশ্বকে ক্রমে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। সমাজের অন্তস্তলে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে সংঘর্ষ, আর বিশ্ব-সভ্যতার অন্তস্তলে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ, সেই এক নীতিরই অনুধাবনের ফল, যাহা পাশ্চাত্য বৈষয়িক জীবনে অর্থ ও সুযোগের তারতম্য সৃষ্টি ও স্বৈরাচার ও বিলাসের প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, যাহা বৈশ্য-শক্তি-চালিত রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-শক্তি-চালিত বৈশ্য সমাজের অন্তরে থাকিয়া বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার তাড়নায় আজ জগতে তাণ্ডব নৃত্যের আয়োজন করিয়াছে।

পাশ্চাত্য বৈষয়িক জীবনের শ্রেণী-তন্ত্র ও চীন ভারতের

সমূহ-তত্ত্বের ভাবে, আদর্শে, প্রক্রিয়ায় ও অভিব্যক্তিতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। পাশ্চাত্যের অর্থবিজ্ঞান কেবল মাত্র পাশ্চাত্য শ্রেণী-তত্ত্বকেই জানে ও তাহাকেই আশ্রয় করিয়া তথ্য ও তত্ত্ব নির্ণয় ও বৈষয়িক অনুষ্ঠান সমূহের গঠন ও বিকাশের প্রণালী অবধারণ করিয়াছে। ঐ সব তথ্য অথবা তত্ত্ব আমাদের বৈষয়িক জীবন সম্বন্ধে খাটে না। আমাদের দেশে ঐ সব তত্ত্বের প্রয়োগ করিতে যাওয়া ইংরাজী ভাষার আইনকানুন দ্বারা বাংলা প্রবন্ধ সংশোধন করার মত মিথ্যা ও হাস্যাস্পদ হয়।

তাই, ভারতের সমূহ-তত্ত্বের বিচার ও বিশ্লেষণের জন্য এক স্বাধীন ভারতীয় ধনবিজ্ঞান চাই। তাহা সৃষ্টিছাড়া হইবে না; বরং সৃষ্টির বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করিয়া ও তাহার পরিচায়ক রূপে উহার বিকাশ সাধন করিবে। জগতের যাবতীয় সভ্যতা-কেন্দ্রের বিশেষ-বিশেষ বৈষয়িক জীবন ও তাহার ধারার অনুযায়ী বিচিত্র তত্ত্ব সংগৃহীত না হইলে, ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি সর্ব্বদেশে প্রয়োগের উপযোগী হইবে না। বিভিন্ন বৈষয়িক কেন্দ্রের বৈষয়িক তথ্য ও তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারাই সার্ব্বজনীন তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়; ইহা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

ভারতীয় ধনবিজ্ঞান এইরূপে শুধু যে বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসারের সুবিধা বিধান করিবে, তাহা নয়; পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সংঘর্ষের ফলে আমাদের বৈষয়িক জীবন যে বিপর্য্যস্ত ও বিশৃঙ্খল হইয়াছে, এই বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে গঠন ও বিকাশ-সাধনের পন্থা নির্দ্দেশ করিবার ভার ভারতীয় ধনবিজ্ঞানের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। বিশ্বগ্রাসী সভ্যতার কবল হইতে রক্ষা করিয়া, অতীত ভারতবর্ষকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ গঠনের দায়িত্ব ভারতীয় ধনবিজ্ঞান সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। অভাব-ক্লিষ্ট, নষ্ট-শিল্প ভারতবর্ষ কখনই তাহার দান বিশ্ব-সভ্যতাকে দিতে পারিবে না। তাই ভারতীয় সভ্যতার ভবিষ্যতের সহিত ভারতীয় ধনবিজ্ঞানের অধুনাতন সৃষ্টির বিশেষ সম্পর্ক।

কি উপায়ে নষ্ট শিল্পের উদ্ধার, ব্যবসায়ের উন্নতি, কৃষির উদ্বোধন, গ্রাম্য সমাজের পুনরুত্থান হয়,—অথচ ভারতীয় সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট আত্মবিক্রয় না করিয়া তাহার প্রতিযোগী হইতে পারে—এই সকল বিষয় সম্বন্ধে পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ব্যবধান

[শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ]

(১)

দূর হইতে পর্ব্বতের শ্যামলশ্রী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া, নিকটে গেলে যেমন তাহার কঠিন কর্কশ অঙ্গই সর্ব্বাগ্রে চক্ষে পড়ে, হেমলতার রূপে-গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া অবধি বিনয়কৃষ্ণের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছিল। হেমলতার অটুট স্বাস্থ্য, প্রস্ফুট শতদলের মত শতধারে বিচ্ছুরিত অনবদ্য সৌন্দর্য্য,—সর্ব্বোপরি তাহার পরিপূর্ণ যৌবনশ্রী—কিছুই বিনয়কৃষ্ণের চিত্তে শান্তি আনিয়া দিতে পারিতেছিল না। সমস্ত পরিপূর্ণ সম্পদ ত্যাগ করিয়া কোথায় যে তাহার হৃদয়টী অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছিল, শুধু তাহারি দুঃখে তাহার ভাবপ্রবণ চিত্ত নিষ্ফল রোদনে দিন কাটাইতেছিল।

এমন অনেক নর-নারী আছেন যাঁহারা শুধু তাঁহাদের যাহা প্রাপ্য তাহাই মনে করিয়া রাখেন,—যাহা দেয় তাহার কোন সংবাদই রাখেন না। অবশ্য পুরুষের ভিতর এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অধিক। ধনবান্ সম্ভ্রান্ত পিতার গৃহে সযত্নে ও অত্যন্ত আদরে পালিতা হেমলতা স্বামি-গৃহেও নিরবচ্ছিন্ন আদর-যত্নেরই প্রত্যাশা করিয়া আসিয়াছিল! বিলাস-বাহুল্য-বর্জ্জিত স্বামি-গৃহ তাহার বিলাসিতায় অভ্যস্ত নয়নে প্রথমে বড়ই বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল। হেমলতার পিতা কলিকাতার একজন বিশেষ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি;—তাঁহার পিতার ব্যবসায়-লব্ধ অর্থে উপার্জ্জিত বিস্তীর্ণ জমিদারীর একমাত্র অধিকারী। তাহাতে, স্বামী বিনয়কৃষ্ণের বিশেষভাবে

কৃতবিদ্য হইয়াও, অতিরিক্ত অর্থাগমের পথে না গিয়া অধ্যাপনা কার্য্য বাছিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে হেমলতা আদৌ প্রীতা হয় নাই। যখন তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল, সে সময়ে বিনয়কুমার কলিকাতার কোন বে-সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। বিবাহের অনতিকাল পরেই বাঁকিপুরে সরকারী কলেজের অধ্যাপকের পদ পাইয়া চলিয়া আসেন। কলিকাতা ত্যাগ করিতে হেমলতা অত্যন্ত ক্ষুব্ধা হইয়াছিল। হেমলতার পিতা রাজপুরুষদিগের দ্বারা যথেষ্ট সম্মানিত ছিলেন। চেষ্টা করিয়া তিনি জামাতার জন্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ যোগাড় করিয়াছিলেন; কিন্তু বিনয়-কুমার স্বয়ং যে কার্য্য মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহা ত্যাগ করিতে সম্মত না হওয়ায় হেমলতা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া-ছিল। এই অসন্তুষ্টি ও মর্ম্মদাহ তাহার স্বামি-প্রেমকে সর্ব্বদা খর্ব্ব করিয়া রাখিত। স্বামীর অযাচিত প্রাণভরা ভালবাসা পাইয়াও হেমলতা তাহা বিস্মৃত হইতে পারে নাই। দাস-দাসীদিগের প্রতি সামান্য কারণে হেমলতার ক্রোধ প্রকাশ এবং সময়ে-সময়ে হৃদয়-হীনতা-ব্যঞ্জক আচরণ, স্বামীর প্রতি অকারণে প্রচণ্ড অভিমান—বিনয়কুমারের পুষ্পকোমল হৃদয়কে কণ্টকের মত অবিরত বিদ্ধ করিত। সেই ক্ষতমুখে বিন্দু-বিন্দু করিয়া যে রক্ত ঝরিত, তাহার পানে হেমলতা ফিরিয়াও চাহিত না, বুঝি সে দেখিতেই পাইত না।

এমন সময়ে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে মিলনের সেতুর মত তাহাদের সংসারে নন্দন-ভ্রষ্ট একটী অনিন্দ্য পারিজাত আসিয়া পড়িল। মাতৃত্বে হেমলতার নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ হইল। চন্দ্র কিরণের মত অন্ধকার দূর করিয়া আসিল একটী কন্যা। বিনয়কুমার তাহার নাম রাখিলেন সীতা। হেমলতা বলিল—"সীতা নাম যে রাখিতে নাই, শেষটা সীতার মত দুর্ভাগিনী হইবে।" বিনয়কুমার বলিলেন—"সর্ব্বপ্রকারে সীতার মত হইয়াও যদি দুর্ভাগিনী হয়, সেও ভাল। সেই দুর্ভাগ্যেই কন্যার সৌভাগ্য, বংশের গৌরব ও দেশের মঙ্গল বৃদ্ধি পাইবে।"

দুটী হৃদয় এক হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে এক অন্তরায় ঘটিল। অন্ধকার দূর হইতে-না-হইতে চন্দ্র-কিরণ মেঘের অন্তরালে মিলাইয়া গেল। কন্যা সীতার বয়স যখন দেড় বৎসর, সেই সময়ে এক দারুণ রোগে মৃতপ্রায় হইয়াও সে বাঁচিয়া উঠিল; কিন্তু তাহার একখানি পা বিকল রহিয়া গেল। সীতা দাঁড়াইতে ও চলিতে শিখিয়া-ছিল; কিন্তু ইহার পরেই তাহার চলিবার শক্তি লুপ্ত হইল। বিকলাঙ্গী কন্যার প্রতি চাহিয়া হেমলতার মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ বিতৃষ্ণায় পরিণত হইল। ঠিক এই সময়ে সে আর একটী সন্তানের জননী হইল। এইবারে জন্মিল পুত্র। নবজাত পুত্রের দিকে চাহিয়া অবধি তাহার ক্ষোভ ও দুঃখ অনেক পরিমাণে নিবৃত্ত হইয়াছিল; কিন্তু প্রথম-জাতা তনয়ার প্রতি বিতৃষ্ণায় তাহাতে একটুও উপশম হইল না। নিরপরাধা কন্যার প্রতি মাতার এই বিতৃষ্ণাই বিনয়কুমারকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পীড়া দিতে লাগিল। ক্ষত শুকাইতে-না-শুকাইতে আঘাত পাইয়া তাহাতে আরও রক্ত ছুটিল।

চারি বৎসর বয়সে সীতা নূতন করিয়া হাঁটিতে শিখিল। হাঁটিলেই তাহার পায়ের দোষ বেশী করিয়া ধরা পড়িত। একটু জোরে চলিতে গেলেই বা বন্ধুর স্থানে হাঁটিলেই, সে দুই-একবার পড়িয়া যাইত, আবার উঠিত। ইহা দেখিয়া কন্যার প্রতি ঘৃণায় মাতার হৃদয় সঙ্কুচিত হইত। প্রাণপূর্ণ স্নেহে এবং অক্ষমের প্রতি করুণা ও মমতায় পিতার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

(২)

সীতা এখন আট বৎসরের। অপরাহ্ণে বিনয়কুমার কলেজ হইতে আসিয়া জলযোগান্তে একটু বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় সীতা ধীর-গতিতে আসিয়া বলিল—"বাবা, এবার আমি মায়ের সঙ্গে মামার বাড়ী যাব।" বিনয়কুমার কন্যাকে কোলের কাছে আনিয়া, তাহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চুলগুলিকে সংযত করিয়া দিয়া সস্নেহে বলিলেন,—"তাহ'লে যে আমি একা থাকব মা, আমার জন্যে মন কেমন করবে না?" সীতা পিতার প্রতি করুণ-নেত্রে চাহিয়া বলিল—"আমায় তো অন্যবার মা নিয়ে যান না,—এবারটী আমি যাব, তুমি আবার আমাকে নিয়ে এস।"

এতটুকু মেয়ে—এও অনাদর বোঝে! মা যে তাহাকে ইচ্ছা করিয়া লইয়া যান না, এ দুঃখ তাহাকেও বাজিয়াছে! তবে বড় হইলে সে অভিমান করিয়া থাকিত, সাধিলেও যাইত না; কিন্তু শিশুদিগের অভিমান ক্ষণস্থায়ী।

অবজ্ঞাতা তনয়ার করুণ মুখের পানে চাহিয়া বিনয়-

কুমারের হৃদয় বেদনায় কাতর হইয়া উঠিল। স্নেহ-বিগলিত স্বরে তিনি বলিলেন—"আচ্ছা মা, তাই যেও।" সীতা পিতার স্কন্ধে ভর দিয়া বলিল—"তুমি মাকে বলে দেবে? যদি মা না নিয়ে যান?"

মায়ের কাছে সন্তানের এটুকু দাবীও নাই মনে করিয়া বিনয়কুমারের ক্ষোভ ও দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা মা, আমি তোমার মাকে বল্‌ব'খন্, তোমায় নিয়ে যাবেন।" সীতা আর একবার জিজ্ঞাসা করিল—"মাকে ডেকে নিয়ে আস্‌ব?" সীতার অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া বিনয়কুমার ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন —"আচ্ছা যাও, ডেকে আন।"

সন্তুষ্ট চিত্তে সীতা মাকে ডাকিতে গেল। কন্যার গমনশীল শীর্ণ পা-দুখানির পানে চাহিয়া বিনয়কুমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। একটু পরেই হেমলতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমায় ডাক্‌ছ?" সঙ্গে সঙ্গে সীতাও আসিয়া মাতার পার্শ্বে দাঁড়াইল। বিনয়কুমার পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"হাঁ, বল্‌ছিলাম কি, তোমাদের তো এবার প্রায় বছরখানেক কল্‌কাতায় থাক্‌তে হবে? কোলেরটী চার পাঁচমাসের না ক'রে তো আস্‌তে পারবে না।" হেমলতা লজ্জিত হাস্যের সহিত মুখ নামাইয়া বলিল—"হাঁ, তা' বই কি!" স্ত্রীর পরিপূর্ণ গণ্ডস্থলের লজ্জা-রঞ্জিত রক্তিম আভা দুটীর পানে মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া বিনয়কুমার বলিলেন—"তা', এবার কেন সীতাকে সঙ্গে নিয়ে যাও না? আমার কাছে একটি থাক্‌বে!" হেমলতা বলিল—"আমিও তাই ভাবছি। খোকাকে ও খুব ভালবাসে,—ও গেলে খোকাকে বেশ দেখ্‌তে পারবে। চাকর-বাকরের কাছে সব সময় ছেলে দিতে আমার ভাল লাগে না। এবার ওকে নিয়ে যাব।"

অর্দ্ধস্ফুট কুসুমের মত সীতার মুখখানি শুভ্র হাসিতে ভরিয়া গেল। "আমি খোকাকে বলি গে—আমিও যাব।" বলিয়া সীতা আনন্দে চঞ্চল পদে সেখান হইতে উঠিয়া গেল। বেগে চলিতে গিয়া সীতার শীর্ণ পা-দুটীর দোষ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া হেমলতা তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল—"আহা, মেয়ের চল্‌বার ছিরি দেখ একবার!" একটু-একটু করিয়া বিনয়কুমারের মনে স্ত্রীর প্রতি যে পূর্ব্ব-অনুরাগের ভাব উদিত হইতেছিল, মুহূর্ত্তে তাহা দূরে গিয়া তাহার স্থলে ঘৃণার উদয় হইল। মুখমণ্ডলে সে ভাব প্রকাশিত হইতে না দিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে বিনয়কুমার তৎক্ষণাৎ সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

(৩)

ইহার মধ্যেই বিনয়কুমার বিশেষ চেষ্টা করিয়া সীতাকে মোটামুটি রকম লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। সে পত্র লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিল। ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, জলধর বাবুর সীতা, ঠাকুরদাদার ঝুলি, ইত্যাদি সহজ বাংলা বই চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারিত।

হেমলতার এক ভ্রাতা হেমলতাদের লইতে আসিলেন। কলিকাতা যাইবার পূর্ব্ব-রাত্রে সীতা পিতার গায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, আমার জন্য তোমার মন কেমন কর্‌বে, নয়?"

বিনয়কুমার বলিলেন,—"তা' আমি একাটী পড়ে থাক্‌ব, মন কেমন কর্‌বে না?"

তার পর সীতা সান্ত্বনার স্বরে পিতাকে বলিল—"আচ্ছা বাবা, আমি রোজ-রোজ তোমাকে চিঠি লিখব।" "আচ্ছা মা, তাই লিখো" বলিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—একটুতে এর কত অভিমান! এ কি সেখানে মায়ের অনাদর সহিয়া থাকিতে পারিবে?

পরদিন তিনি সকলকে ট্রেণে উঠাইয়া দিতে ষ্টেশনে আসিলেন। সকলে গাড়ীতে উঠিলে বালককে খুব সতর্ক থাকিতে বলিয়া, তিনি মেয়েদের গাড়ীর নিকট আসিলেন। পুত্রকে একটু কোলে করিয়া, চুমু দিয়া তাহাকে পুনরায় হেমলতার কোলে দিলেন। পরে সীতার মাথায় হাত দিয়া আদর করিলেন ও তাহাকে সস্নেহে চুম্বন করিলেন।

হেমলতা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"বুড়ো মেয়েকে আবার চুমো খাওয়া কেন?" বালিকার মুখের হাসিটুকু ক্ষুদ্র ফুৎকারে দীপ-শিখাটির মত নিবিয়া গেল। চোখের কোণে-কোণে জল ভরিয়া আসিল। "ছিঃ!"—বলিয়া করুণ ভর্ৎসনাপূর্ণ নেত্রে স্ত্রীর পানে একবার মাত্র চাহিয়া, বিনয়কুমার জোর করিয়া মুখে হাসি আনিয়া, স্নেহ-স্বরে সীতার অভিমান-নত মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন। ট্রেণ ধীরে-ধীরে ছাড়িয়া দিল এবং ক্রমশঃ দৃষ্টি-পথের অতীত হইয়া গেল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অশ্রু নিবারণ পূর্ব্বক বিনয়কুমার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

(৪)

বড়দিনের ছুটী পাইয়া বিনয়কুমার কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইল সীতার।

একদিন আহারান্তে অন্তঃপুরের একটী কক্ষে বিশ্রাম করিতে-করিতে বিনয়কুমারের অল্প নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। পাশের ঘরের সামান্য একটা শব্দে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল।

তাঁহার শাশুড়ী বলিতেছিলেন—"তা নিয়ে যাও মা, ছেলেমানুষ সেজেগুজে এয়েছে,—না নিয়ে গেলে মনে বড় কষ্ট পাবে।" হেমলতা বলিল—"তা হোক্ মা, সবাই সেখানে খোঁড়া মেয়ে, খোঁড়া মেয়ে বল্‌বে,—আমি নিয়ে যেতে পার্‌ব না।"

শাশুড়ী। তা পেটে জন্মেছে, কি করবি মা,—ফেল্‌বার ত' নয়।

হেমলতা। সেখানে কত লোক আস্‌বে; কত জনে কত কথা বল্‌বে। তাহ'লে আমি যাব না।

শাশুড়ী। তা যা তুই—খোকাকে নিয়েই যা। আয় ত সীতা, আমরা আবার আর একদিন যাব'খন্।

হেমলতা। আহা, মেয়ের চোখের জল একেবারে আজ্ঞাকারী!

বিনয়কুমার অত্যন্ত আহত হৃদয়ে নিঃশব্দে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া বহির্বাটীতে আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘরের গাড়ী প্রস্তুত হইয়া আসিল এবং তাহাতে খোকাকে লইয়া হেমলতা আর দুই-একজন অন্তঃপুরিকার সহিত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল।

কল্পনায় অনাদৃতা কন্যাটীর মুখভাব মনে করিয়া বিনয়-কুমার অস্থির হইয়া উঠিলেন। একটু পরেই বাড়ীর ভিতর আসিয়া সীতাকে সঙ্গে করিয়া বাহিরে আসিলেন। সীতা মুখখানি ম্রিয়মান করিয়া বসিয়া ছিল। চোখের জলের দাগটী তখন সবেমাত্র শুকাইয়া আসিতেছে। "চল মা, আমরা বেড়িয়ে আসি!" বলিতেই শিশির-ভরা ফুলের মত সীতার চক্ষু-দুটী সজল হইয়া উঠিল। বিনয়কুমার সীতার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া পরম স্নেহে তাহার কপোল চুম্বন করিয়া, তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

সীতাকে সমস্ত দিন ধরিয়া যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, চিত্র-শালা ইত্যাদি কলিকাতার যাবতীয় দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইয়াও বিনয়কুমারের তৃপ্তি হইল না। তাঁহার মনে কেবলই জাগিতেছিল—মাতার সঙ্গে না যাইতে পারার যে অভাব, তাহা এখনও সীতার পূরণ হয় নাই,—সে বেদনা এখনও এই অবজ্ঞাতা তনয়াটী ভুলিতে পারে নাই। সন্ধ্যার সময় বিনয়কুমার তাহাকে কিছুক্ষণের জন্য বায়স্কোপ, কিছুক্ষণ সার্কাস ইত্যাদি দেখাইলেন। শেষে একখানি মোটর ভাড়া করিয়া তাহাকে নানা স্থানে ঘুরাইয়া রাত্রি এগারটার সময় গৃহে ফিরিলেন।

হেমলতা অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় নিমন্ত্রণ সারিয়া গৃহে ফিরিল। সীতাকে দুটী মিষ্ট কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে গিয়া শুনিল, সে বহুক্ষণ হইল বাপের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। সীতাকে না লইয়া যাওয়ার জন্য হেমলতার মনে যেটুকু অনুশোচনা জাগিয়াছিল, ইহা জানিয়াই তাহা তৎক্ষণাৎ অপসৃত হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, তাহাকে কেবল আঘাত করিবার জন্যই স্বামী কন্যাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। তাহার মন আবার কন্যার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল।

অনেক রাত্রি হইলে বাড়ীর সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। হেমলতার মাতা বলিলেন—"হাঁ হেম, জামাই রাগ করে সীতাকে নিয়ে একেবারে বাঁকীপুরে চলে যাননি ত?" স্বামী যে তাহার উপর রাগ করিয়া এতখানি করিতে পারেন, ইহা যে কাহারও মনে হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া হেমলতার আত্মগরিমা আহত হইল। সে শুধু বলিল—"কেমন করে জান্‌ব?"

এমন সময় সকলের উদ্বেগ অপসারিত করিয়া সীতা পিতার সহিত হাসি মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বিমল আনন্দে তাহার ক্ষুদ্র বক্ষ ভরিয়া উঠিয়াছিল। আজিকার দিন যে তাহার সার্থক হইয়াছে, তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল মুখশ্রীতে তাহা সুপ্রকাশ!

তাহার পরদিনই বিনয়কুমার সীতাকে সঙ্গে লইয়া বাঁকীপুরে চলিয়া গেলেন।

(৫)

তাহার পর চার-পাঁচ মাস কাটিয়া গিয়াছে। হেমলতা শুভ্র পুষ্প-কলিকার মত একটী কন্যা প্রসব করিয়াছে। তাহার বয়স দুই মাস হইয়াছে।

এই সময়ে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যের ব্যবধান একটু অধিক

দূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পত্র-বিনিময় যথানিয়মেই হইতেছে; কিন্তু তাহার মধ্যে সে গাঢ় অনুরাগের ভাব আর নাই। বিনয়কুমার হেমলতাকে পত্রে সমস্ত সংবাদ দিতেছেন, কেবল সীতার সম্বন্ধে কিছুই লেখেন না।

শেষে হেমলতা স্বামীকে অনুযোগ করিয়া এক পত্র লিখিল—"সীতার সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেও তুমি লেখ না কেন? সীতা কি আমার মেয়ে নয়?"

তাহার দিন কয়েক পরে বিনয়কুমার লিখিলেন:—"সীতা যদি তোমার মেয়ে হইত, তাহা হইলে ত আমার কোন দুঃখই থাকিত না। সে যে তোমার গর্ভে জন্মিবার সর্ব্বপ্রথম অধিকার লাভ করিয়াও, এতটুকু স্নেহের অধিকার রাখিতে পারে নাই, এই আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ।

"সীতার কথা আর কখন তোমাকে লিখিব না ইচ্ছা ছিল। যে অনাদৃত শুভ্র পুষ্পটী তুমি আবর্জ্জনা বলিয়া ঘরের বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিলে, তাহার একটা পাঁপড়িও আর তোমার সম্মুখে ধরিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাহা পারিলাম না। যে বৃন্ত পুষ্পটীকে অবজ্ঞা করিয়া দূরে ফেলিয়াছিল, সে ভুল যে আজিও সেই নিচুর বৃন্তটীর পানে চাহিয়া থাকিবে, তাহা ত ভাবি নাই। তাই সেই দিনের পর আজ এই প্রথম ও এই শেষ তোমাকে সীতার কথা লিখিতেছি।

"গোড়া হইতে কথাটা না বলিলে তুমি সব বুঝিবে না, তাই পত্রখানি একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। তুমি বিরক্ত হইও না।

"সেদিন তাহাকে যখন লইয়া আসি, তখন ভাবিয়াছিলাম, আমার কাছে, আমার স্নেহে সে সব অনাদর ভুলিয়া থাকিবে। কিন্তু সে যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনাদরের মধ্য হইতে স্নেহের আশা করিয়া, মেঘলেশশূন্য আকাশের পানে জলের প্রত্যাশায় উন্মুখ হইয়া থাকিবে, তাহা ত আগে বুঝি নাই।

"প্রথম দুই-একদিন তাহাকে একটু প্রফুল্ল দেখিয়াছিলাম। তাহার পর হইতে একটু-একটু করিয়া তাহার সে প্রফুল্লতা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল: মাঠে অযত্নের মধ্যেও যে গাছ বাড়িয়া উঠিত, গৃহ-মধ্যে আসিয়া অতি যত্নেও তাহা শুষ্ক হইয়া উঠিল।

"সীতাকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। কলেজের সময়টুকু ছাড়া সমস্ত সময় তাহারই সঙ্গে কাটাইতাম। অসংখ্য গল্পের বই, ছবির বই, খেলানা, পাখী তাহার জন্য জড়ো করিয়াছি, তবু তাহার মুখের সুপ্ত হাসিটি কিছুতে ফুটাইতে পারি নাই। ছুটী পাইলেই তাহাকে লইয়া নানা স্থানে বেড়াইতে বাহির হইতাম,—কত নূতন জিনিস দেখাইতাম,—কত গল্প করিতাম; তাহার মন কিন্তু যাহা পাইবে না, তাহারি অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইত।

"বুঝিতাম, তোমাকেই সে পাইতে চায়। তুমি অনাদর কর, তাচ্ছিল্য কর,—তবু তোমার কোলে মাথাটি রাখিয়া সে ঘুমাইতে চায়।

"একদিন সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—'দাদা, এবার মার কাছে যাবে?' কি জানি, সে দিন হঠাৎ কেন রাগ হইল। বলিলাম,—'তুমি গেলে তোমার মা রাগ করেন, তোমায় দেখে লোকের কাছে লজ্জা বোধ করেন, তবু কেন তার কাছে কেবল যেতে চাও? তোমার কি এটুকু বুদ্ধিও হয়নি?'

"এত কঠিন তিরস্কার তাহাকে আর কখন করি নাই, বা এখন করিবও না।

"মা আমার বুদ্ধিমতী। ইহার পর সে আর একদিনও তোমার কাছে যাইবার কথা বলে নাই। কিন্তু তাহার মনটী কম্পাসের কাঁটার মত কেবল তোমার দিকেই মুখ নেড়ে তাকাইয়া থাকিত। তাহার লক্ষ্যহীন দৃষ্টি দেখিয়া তাহা আমি বুঝিতাম।

"একদিন কলেজ হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বে ফিরিয়াছি। আমার পড়িবার ঘরের দিকে যাইতেই দেখি, যে দেরাজে তোমার চিঠিগুলি থাকিত—সেদিন দৈবাৎ তাহা খোলা ছিল—তাহার মধ্য হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া সীতা নিবিষ্ট মনে তাহার পানে চাহিয়া আছে, আর এক-এক ফোঁটা করিয়া চোখের জল সেই পত্রের উপর পড়িতেছে।

"হতভাগিনীর এ কি স্নেহের বুভুক্ষা! স্নেহহীন মাতৃহৃদয়ের প্রতি এ কি তাহার উন্মত্ত অনুরাগ—এ কি পূজারিণীর অন্ধ উপাসনা!

"তবু তাহার এ ধ্যান ভঙ্গ করিতে আমার সাহস হইল না। নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করিলাম। সেদিন তোমাদের দুজনের জন্যই চোখে জল আসিয়াছিল। কিসের মূল্য

আশার এ মুকুলটী নষ্ট হইতে বসিয়াছে! কি দারুণ মোহে তুমি এমন প্রাণপূর্ণ পূজার অর্ঘ্য পায়ে ঠেলিয়াছ!

"তার পর হইতে তোমার চিঠিগুলি আমি টেবিলের উপর রাখিতাম।

"মাস তিনেকের পর সীতার জ্বর হইল; সঙ্গে সামান্য কাশি। সে জ্বর আর কিছুতে ছাড়িতে চাহে না,—কাশিও গেল না। নির্জ্জীব হইয়া শীর্ণ পুষ্পটীর মত সে বিছানাটীতে পড়িয়া থাকিত, একটী যন্ত্রণার শব্দও করিত না। বুঝিতাম, তাহার মনটী তোমার কাছেই পড়িয়া থাকিত। কিন্তু সেই ভর্ৎসনার পর হইতে সে আর একদিনও তোমার কাছে যাইবার কথা বলে নাই।

"ছুটী লইয়া দিন-রাত তাহার কাছে বসিয়া থাকিতাম। সে-ই ডাকিয়া দিত—'বাবা খাওগে, বেলা গিয়াছে,—মা থাকলে কত রাগ কর্‌তেন।'

"শত কলা ডাক্তার বজ্রাঘাতের মত শুনাইয়া গিয়াছে—সীতা আর বাঁচ্‌বে না; বড় জোর আর এক সপ্তাহ। কা'ল হইতে পৃথিবীর সবখানি আমার নিকট শূন্য হইয়া গিয়াছে। এই সীতা যে আমার এই মরু হৃদয়কে পল্লবিত শীতল করিয়া রাখিয়াছে; সে-ই চলিয়া যাইবে আর একটীবারের জন্যও ফিরিয়া আসিবে না!

"কিন্তু সে থাকিয়া কি করিত? আমার তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়ের সে পিপাসার বারি। তাহার তাহাতে লাভ কি? কদাকার, অঙ্গহীন নিতান্ত নীচের সন্তানও যাহা না চাহিতে পায়, সে কুন্দ ফুলটীর মত শুভ্র, নির্ম্মল, সুন্দর হইয়াও সেই ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত।

"তাহার জন্য আমি ত শোক করিতে পারিব না। প্রাণপণ স্নেহ দিয়া তাহাকে বড় করিয়া হয় ত তাহাকে সৎপাত্রে দিতে পারিতাম না। যদিও তাহা সম্ভব হইত, জামাই হয় ত সে অভাগীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত,—তাহার সমস্ত নারীজীবনটা একটা প্রকাণ্ড ধিক্কারে পরিণত হইত। যাহাকে——, যাক্ সে কথা আর বলিব না।

"ভগবান্ যে তাহাকে মুক্তি দিতেছেন, তাঁহার চরণতলে ডাকিয়া লইতেছেন, এই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল। সে আমাকে যাহা দিয়াছে, তাহা ফিরাইয়া লইতে পারিবে না। এতগুলি বৎসর সে যে আমার বক্ষের বৃন্তচ্যুত নীড়টুকু তাহার কোমল পক্ষ-স্পর্শে উত্তপ্ত রাখিয়াছে, এই আমার পরম লাভ। তাহাকে যে ভালবাসিয়াছি, এই স্মৃতিটুকুই আমার ক্ষুদ্র তবু অমূল্য রত্ন।

"মরণ তাহার চারি পার্শ্বে ঘনাইয়া আসিয়াছে। ফুলটী শুখাইয়া গিয়াছে, শুধু ঝরিতে বাকী। তাই আজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'সীতা মাকে দেখ্‌বে?' বর্ষার শেষ বিদ্যুতের মত তাহার মুখে একটীবার হাসি ফুটিয়া উঠিল;—আবার কি ভাবিয়া চকিতে তাহা মিলাইয়া গেল। দুটী চক্ষে জল ভরিয়া আমার পানে চাহিয়া ভীরু পাখীটীর মত সীতা জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি রাগ্ করবে না?'

"হায় মা, তোর অতটুকু বুকে এত ব্যথা, এত অভিমান! সেদিনকার সেই তিরস্কার মরণের কূলে দাঁড়াইয়াও মনে করিয়া রাখিয়াছিস্!

"অতি কষ্টে অশ্রু রুদ্ধ করিয়া তাহাকে বলিলাম,—'না মা, রাগ করব না। আমি এখনি তোমার মাকে আন্‌তে লিখ্‌ছি।'

"কিন্তু ভাবিতেছি, তুমি কি আসিবে?

"তবুও লিখিতেছি,—যদি একটীবার সীতাকে দেখিতে চাও, একবার এস। চিরদিন অনাদর করিয়া আসিয়াছ, একবার আসিয়া অভাগীকে আদর করিয়া যাও। মুমূর্ষুর ম্লানমুখে একটীবারের জন্য হাসি ফুটাইয়া যাও। যে তোমার অম্লান পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের কলঙ্কস্বরূপ ছিল, এইবার সে তোমার সমস্ত কলঙ্ক দূর করিয়া চিরদিনের মত চলিয়া যাইবে। এবার আসিতে আর ভয় করিও না।"

যে স্নেহ এতদিন সৌন্দর্য্য-গর্ব্বের অন্তরালে সুপ্ত ছিল, এই পত্র পড়িয়া তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে জাগরিত হইয়া উঠিল। যাহাকে এতদিন শুধু অবহেলাই করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে একটীবার দেখিবার জন্য হেমলতার মাতৃ-হৃদয় অনুতপ্ত আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া হেমলতা তাহার পরদিনই প্রথম ট্রেণে বাঁকীপুর যাত্রা করিল।

বাঁকীপুরের বাসায় পৌঁছিয়া হেমলতা, বিনয়কুমার বা সীতা কাহাকেও দেখিতে পাইল না। বারান্দায় তাহাদের পুরাতন ভৃত্য সাধু ম্লান মুখে বসিয়া ছিল। হেমলতাকে দেখিয়াই সে চুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া হেমলতা কাঁপিতে-কাঁপিতে সেখানে বসিয়া পড়িল।

সাধু কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল,—"পরশু রাতে সীতা মারা গিয়াছে।"

হেমলতার ভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু কোথায়?" ভৃত্য উত্তর দিল—"তিনি এক বছরের ছুটী নিয়ে বেড়াতে গেছেন।"

হেমলতার ভ্রাতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় গেছেন?"

ভৃত্য বলিল, "তা ত বলে যান্‌নি। বলেছেন, এক বৎসর শেষ হলে তবে ফিরবেন। এই চাবী-টাবী সব মার হাতে দেবার জন্য রেখে গেছেন।"

চুট্‌কী

(পূজার বাজারের জন্য)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম-এ]

(১) ব্যাকরণে সমাজ-তত্ত্ব

ইংরেজী ভাষার ধাতুরূপ I am এ আরম্ভ, thou art, he is তাহার পরে; অর্থাৎ আমির বড়াই সর্ব্বাগ্রে। পক্ষান্তরে, সংস্কৃত ভাষার ধাতুরূপে 'অস্তি'র পর 'অসি', তাহার পর 'অস্মি', অর্থাৎ আমির স্থান সকলের পশ্চাতে (যেমন হিন্দু গৃহিণী সর্ব্বশেষে আহার করেন)। ধাতুরূপের এই প্রভেদ হইতে এক জাতির দর্প-দম্ভ ও অপর জাতির বিনয়-সৌজন্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আরও দেখুন, ইংরেজীতে 'আমি' প্রথম পুরুষ, ব্যাকরণে সর্ব্বাগ্রে উল্লিখিত, 'তুমি' 'সে' দ্বিতীয়-তৃতীয়-স্থানীয়—অহমিকার চরম। পক্ষান্তরে, সংস্কৃত ভাষায় 'তিনি' প্রথম পুরুষ, 'তুমি' মধ্যম পুরুষ আর 'আমি' উত্তম পুরুষ অর্থাৎ শেষ পুরুষ। (এ 'উত্তম' পুরুষ শ্রেষ্ঠ পুরুষ বুঝায় না, পাঠক এটুকু মনে রাখিবেন।) এমন নিজেকে ছোট করিয়া পরকে বড় করা, এমন বৈষ্ণব বিনয়, এমন (self-effacement) নিজেকে মুছিয়া ফেলা, জাতীয় চরিত্রের বিশিষ্টতার লক্ষণ নহে কি?

আর এক কথা। ইংরেজী ভাষার ধাতুরূপে 'love' আদর্শ ধাতু, আর ইংরেজী সাহিত্যে তথা ইংরেজ-সমাজেও নভেলী প্রেমের ছড়াছড়ি! (হয়ত গোরার গৌড়ারা বলিবেন, ইহা ব্রিটিশ জাতির বিশ্বপ্রেমের বিবৃতি!)

(২) নারী-পূজা

ইংরেজেরা Ladies & Gentlemen বলিয়া সভায় স্ত্রী-পুরুষকে সম্বোধন করিয়া লেডির মান রাখেন, এই গুমর করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠ কবির নাটকে—Romeo & Juliet, Antony & Cleopatra, Troilus & Cressida প্রভৃতি গাঁটছড়া-বাঁধা নামে ও চলিত কথা Jack & Gill যুগল-মূর্ত্তিতে ত কই নারীর নাম পূর্ব্বে বসে নাই। পক্ষান্তরে, আমাদের 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' ও 'মালতীমাধবে' নারীর নামকেই প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। ('বিক্রমোর্ব্বশী'তে ব্যতিক্রম দেখা যায়; উর্ব্বশী স্বর্গেচ্ছা, তাই বলিয়া বুঝি কবি তাঁহাকে সম্মানযোগ্যা মনে করেন নাই।) কালিদাস 'পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ'এর বন্দনা করিয়া নারী-দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিয়াছেন। বৈষ্ণব 'রাধাকৃষ্ণ' না বলিয়া কদাচ 'কৃষ্ণরাধা' বলেন না। শুধু 'স্ত্রী-পুরুষে' কেন, গ্রাম্য ভাষার 'মেয়েমর্দ্দ' প্রভৃতিতেও 'বন্দ্রে নার্য্যন্ত পূজ্যন্তে' ইত্যাদি মনুবাক্যের অনুবৃত্তি। (হাল বাঙ্গালায় 'নর-নারী' 'বর-বধূ' 'পিতামাতা' লেখে বটে, কিন্তু 'নারী-নরৌ', 'বধূ-বরৌ' 'মাতা-পিতরৌ' সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ-সম্মত।)

সেদিন দেখিলাম, একজন ইংরেজ সমালোচক বুঝাইয়াছেন যে, সমাজে ক্রমেই নারীর অধিকার-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে নারীর নামে আখ্যায়িকার নামকরণ হইতেছে, এমনটি সাহিত্যের প্রথম আমলে ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে Pamela, Clarissa Harlowe, Amelia প্রভৃতি নভেলের নামকরণ ইহার নিদর্শন। (শেক্‌স্‌পীয়ারের আমলেও Lodgeএর Rosalind আখ্যায়িকা ছিল।) যাহা হউক, এক্ষেত্রেও আমাদের জিত। কেন না, ইহার বহু পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় 'কাদম্বরী' ও 'বাসবদত্তা' প্রণীত

হইয়াছে। শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' ও ভাসকবির নবাবিষ্কৃত 'বসন্তসেনা'ও দৃশ্যকাব্যের তরফ হইতে সাক্ষ্য দিতেছে।

(৩) অহমিকা

অনেকের অহমিকার মাত্রা এত বেশী যে, তাহাদিগের বিকথনায় লোকের গায়ে জ্বর আসে। শাস্ত্রে অবশ্য 'আত্মপ্রশংসাং পরগর্হামিব বর্জ্জয়েৎ' উপদেশ আছে, কিন্তু কলির উল্টা বিচারে দুইটি নিষেধই বিধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে! যাহা হউক, একটু দার্শনিক ভাবে দেখিলে এই অহমিকার জন্য দাম্ভিক ব্যক্তির উপর আমাদের বিতৃষ্ণা হওয়া উচিত নহে। বৈজ্ঞানিক বলেন, অনেক কীট-পতঙ্গের, এমন কি অনেক উদ্ভিদের দেহে এমন একটা রস বা গন্ধ থাকে যে, তাহার তীব্রতার জন্য কোন শত্রু তাহাদিগের কাছে ঘেঁসিতে পারে না। ইহাই তাহাদিগের আত্মরক্ষার প্রকৃতি-দত্ত অস্ত্র। অনেক মানুষও সেইরূপ তাহাদিগের অহমিকার তীব্রতায় আত্মরক্ষা করে। নতুবা যে-সে তাহাদিগকে দু' পায়ে মাড়াইত, জীবন-সংগ্রামে তাহারা একদিনও টিকিতে পারিত না।

(৪) সাঙ্কেতিক চিহ্ন

রচনায় বিরাম প্রভৃতি বুঝাইতে কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এইগুলিকে অন্য ভাবেও ব্যবহার করা যায় না কি? যথা, আস্তিক ব্যক্তির মনোভাব বিস্ময়-চিহ্ন (!) দ্বারা প্রকাশ করা যায়, কেননা—আস্তিক ব্যক্তি বিশ্বে সৃষ্টিকর্ত্তার নির্ম্মাণ-কৌশল ও বিশ্বপালনী নীতির পরিচয় পাইয়া বিস্ময় ও ভক্তিতে অভিভূত হয়েন। পক্ষান্তরে, সন্দেহবাদীর (sceptic) মনোভাব জিজ্ঞাসার চিহ্ন (?) দ্বারা প্রকাশ করা যায়, কেননা তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহার সারাজীবনে এই খট্‌কার মীমাংসা হইল না। * আর নাস্তিকের মনোভাব বা সিদ্ধান্ত সংখ্যাতত্ত্বের 'শূন্য' (০) দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এইরূপ, যিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মানেন, তিনি সংখ্যাশাস্ত্রের 'এক' (১) সংখ্যা দ্বারা তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিবেন; যিনি Ormuzd ও Ahriman, খোদা ও শয়তান, দুইটি বিপরীত শক্তি মানেন, তিনি 'দুই' (২) সংখ্যা দ্বারা নিজের মনোভাব প্রকাশ করিবেন; 'নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যম্', Triad, Trinity, 'ত্রিরত্ন', যাঁহার বিশ্বাসের বস্তু, তিনি 'তিন' (৩) সংখ্যা দ্বারা নিজের মনোভাব প্রকাশ করিবেন। আবার যাঁহারা পরকাল পরলোক পরজন্ম মানেন, তাঁহারা মানব-জীবনের শেষে একটা কমা, কোলন বা সেমিকোলন বসাইবেন; আর যাঁহারা ইহকালেই সব শেষ মনে করেন, তাঁহারা মানব-জীবনের শেষে একটা পূর্ণচ্ছেদ (Full stop বা লম্বা দাঁড়ি) বসাইবেন, সব লেঠা চুকিয়া যাইবে। তাঁহাদের গুরুজি চার্ব্বাক বলিয়া গিয়াছেন—

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

(৫) কলমবাজ বনাম বক্তৃতাবাজ

অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের সহিত আলাপ করিলে দেখা যায়, তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তা নিতান্ত সাধারণ ধরণের, প্রতিভার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, অনেক সময় (Common-sense) কাণ্ডজ্ঞানেরও কিঞ্চিৎ অভাব আছে বলিয়া সন্দেহ হয়। অথচ ইঁহাদিগের রচনা পড়িলে মুগ্ধ হইতে হয়। শুনা যায়, ইংরেজ লেখক এডিসন, গোল্ড-স্মিথ ও কূপর অপরিচিত লোকের সম্মুখে নিতান্ত মুখচোরা ছিলেন, অথচ তাঁহাদিগের রচনা কেমন সরস ও সরল! ইঁহাদিগের মুখ চেয়ে হাত চলে ভাল! এই প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া এডিসন বলিয়াছিলেন, 'আমি নগদ এক পয়সাও বাহির করিতে পারি না, কিন্তু ইচ্ছামাত্র লাখ টাকার চেক কাটিতে পারি!' আবার অনেক লোকের কথাবার্ত্তা সরসতা ও (ready wit) উপস্থিত-বুদ্ধির গুণে বড়ই প্রীতিপ্রদ; অনেকের অনর্গল বক্তৃতায় বাগ্মিতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়, অথচ তাঁহারা এক কলম লিখিতে গেলে চক্ষে অন্ধকার দেখেন। ইঁহাদিগের হাত চেয়ে মুখ চলে ভাল!

এই অসামঞ্জস্যের কারণ,—লেখকগণের লেখাটাই স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে, অনুশীলনে এই শক্তিরই বিকাশ হইয়াছে, লিখিতে বসিলে তাঁহাদিগের আপনা হইতেই ভাব ও ভাষা যোগায়, কথাবার্ত্তায় অনভ্যাসের দোষে একটা জড়তা আসে, কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে। পক্ষান্তরে,

* মার্কিন লেখক হোয়্যট্-প্রণীত Over the Tea-cups নামক উপাদেয় পুস্তকের পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে এই আলোচনার একটু ইঙ্গিত পাইয়াছি।

সম্মুখে পাঁচজন দেখিলেই মজলিসী লোকের রসিকতার ফোয়ারা খুলিয়া যায়, ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে তড়িৎ ছুটিতে থাকে। কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ডেস্কের উপর খাতা খুলিয়া বসিলে তাঁহাদের ভাবের দরজাও বন্ধ হইয়া যায়। সমজনার শ্রোতার উপস্থিতিতে যে একটা উদ্দাম উত্তেজনার আবির্ভাব হয়, একলা ঘরে থাকিলে সেটা জন্মিতে পায় না। অন্যে পরে কা কথা, অনেক শিক্ষক ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন, তাহার অর্দ্ধেকও পূর্ব্বাহ্নে ঘরে বসিয়া যোটাইতে পারেন না, সময়ে সময়ে কঠিন সমস্যার মীমাংসা পাঠনা-গৃহে চকিতের মত মাথায় আসিয়া যোগায়, অথচ ঘরে বসিয়া মাথাযুড় খুঁড়িলেও তাহা যোগায় না।

আবার এমন লোকও আছেন যাঁহার হাত মুখ সমান চলে। ইংরেজী সাহিত্যে জন্‌সন্, মেকলে, সিড্‌নি স্মিথ্, কার্লাইল্ এই শ্রেণীর। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর।

(৬) সাহিত্য বনাম গণিত

একজন গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপককে টিটকারী দিয়াছিলেন,—'দেখুন, আপনাদের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা আমরাও স্বচ্ছন্দে চালাইতে পারি, কিন্তু আপনারা একদিন গণিত বা বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করুন দেখি।' ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক উত্তর করিলেন,—'দেখুন, নৈবে-নৈবে ভাত রাঁধিতে সকলেই পারে, কিন্তু ভূতা মেরামত করিতে সকলে পারে না। সেটা শিক্ষা-সাপেক্ষ। সাহিত্য সার্ব্বজনীন সার্ব্বভৌম পদার্থ, ইহাতে সকলেরই অধিকার আছে, কিন্তু গণিত ও বিজ্ঞান technical জিনিশ, রীতিমত তালিম (special training) না হইলে রপ্ত হয় না।'

টিপ্পনী :—তবে ভাত রাঁধারও তারিফ আছে, যেমন তেমন করিয়া চাউল কয়টা সিদ্ধ করিতে সকলেই পারেন, কিন্তু উপর-নীচে সব ভাতগুলি সমান সুসিদ্ধ করিতে সকলে পারেন না। সাহিত্যপাঠনা-সম্বন্ধেও সে কথাটা খাটে।

(৭) মূল ও ফল (Root & Fruit.)

এক শ্রেণীর বিলাতী টীকাব্যাখ্যায় শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ইতিহাস লইয়া পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অবথা ভারাক্রান্ত, কাব্যের সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ, কলাকৌশল-প্রদর্শন, অতি অল্প স্থান অধিকার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াগণ জানেন, শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের বিখ্যাত ক্লারেণ্ডন প্রেস্ সংস্করণ এই শ্রেণীর। আজকাল এই ত্রুটি-সংশোধনের জন্য পিট্ প্রেস্, রাগ্‌বি, ওয়ারউইক প্রভৃতি সংস্করণের আবির্ভাব হইয়াছে, সেগুলিতে সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ প্রাধান্য পাইয়াছে। কলেজের অধ্যাপকদিগের মধ্যেও উক্ত দ্বিবিধ শ্রেণীর লোক দেখা যায়। একবার এক কলেজে প্রথমোক্ত শ্রেণীর একজন অধ্যাপক প্রশংসার সহিত বহুদিন অধ্যাপনা করিয়া অন্যত্র কর্ম্ম গ্রহণ করিলে, দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর একজন অধ্যাপক তাঁহার স্থান পূরণ করেন। ইঁহার অধ্যাপনায় প্রথম প্রথম ছাত্রগণ শব্দের ব্যুৎপত্তি-বিচারের অভাব দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলে ইনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন,—"গাছের শিকড় ধরিয়া টানাহিচড়া না করিয়া বাছিয়া বাছিয়া পাকা ফলের রস আস্বাদ ও কৃষ্ণ ফুলের সুঘ্রাণ উপভোগ করিলে বুদ্ধিমানের কায হয় না কি ?"

(৮) মহৎলোক ও পর্ব্বত

কবিগণ পর্ব্বতের সহিত মহৎ লোকের উপমা দেন। কালিদাস বুঝাইয়াছেন, দুঃখ-দুর্দ্দিনে বিপদ্‌বাত্যায় পর্ব্বতের ন্যায় মহৎ লোকও অটল অচল। 'ক্রমসাদুমতাং কিমন্তরং যদি বায়ো স্থিতরেঽপি তে চলাঃ।' মহীধর যেমন পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, মহৎ লোকও সেইরূপ সমাজকে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহাদিগের মহত্ব পর্ব্বতচূড়ার ন্যায়, সমাজের চূড়াস্থানীয়। নগাধিরাজ হিমালয়ের ন্যায় তাঁহারা অনন্তরত্নপ্রভব। আরও একটু সূক্ষ্মভাবে ভাবিলে পর্ব্বতের সহিত মহৎলোকের আরও সাদৃশ্য পরিদৃশ্যমান হয়।

পর্ব্বত হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, খুব কাছে আছে ; একটু আগাইয়া গেলেই পর্ব্বতের পাদদেশে পৌঁছিব। কিন্তু হাঁটিয়া হাঁটিয়া যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ি, তখনও দেখি পর্ব্বত যেমন দূরে ছিল তেমনি দূরে আছে। আবার পর্ব্বতে উঠিবার সময় মনে হয়, আর খানিকটা উঠিলেই চূড়ায় আরোহণ করিব, কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা যায়, অনেকদূর উঠিয়াও চূড়ার নাগাল পাওয়া যায় না। মহৎলোকের চরিত্র-সমালোচনা করিতে গেলেও দেখা যায়, যত শীঘ্র তাঁহার

সমগ্র মহত্ব আয়ত্ত করিতে পারিব ভাবিয়াছিলাম, তত শীঘ্র পারি না। সেক্‌স্‌পীয়ারের অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিবার জন্য রাশি রাশি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও কি কেহ বলিতে পারেন যে কবির সমগ্র প্রতিভা আমাদের বুদ্ধিগম্য হইয়াছে? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একাধিক জীবন-চরিত লিখিত হইয়াছে, বৎসর বৎসর স্মৃতিসভায় তাঁহার মহত্ত্ব-বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত হয়, বক্তৃতা প্রদত্ত হয়, কিন্তু আমরা কি তথাপি এই বিরাট্ ব্যক্তিত্বের (grand personality) সম্পূর্ণ প্রণিধান করিতে পারিয়াছি?

আর এক কথা, পর্ব্বত দূর হইতেই দেখি আর নিকট হইতেই দেখি, তাহার গায়ে কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া দেখিতে পাওয়া যায়। খুব কাছে গেলে নীচের দিকে আর ধোঁয়া ধোঁয়া দেখায় না বটে, কিন্তু উপর পানে চাহিলে ঠিক তেমনিই ধোঁয়া ধোঁয়া দেখায়। মহৎ লোকের চরিত্রেও যে (mysterious something) কেমন একটা রহস্য থাকে, তাহা হাজার কাছে গিয়া তাঁহার জীবন-চরিত অনুসন্ধান করি, তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ করি, কিছুতেই ধরা পড়ে না।

(৯) নামকরণ

ঔরস-সন্তানের নামকরণ ও মানস সন্তানের নামকরণ উভয়ই বিষম সমস্যা। সন্তানের নাম স্থির করিতে মাতা-পিতা কত বিনিদ্র রজনী কাটান, কতশত নাম ওলট পালট করেন, তবু সহজে নাম পছন্দ হয় না। গ্রন্থের নাম স্থির করিতেও গ্রন্থকারদিগের চক্ষুঃ স্থির হয়। প্রথম প্রথম ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ দেবদেবীর নামে পুত্রকন্যার, তথা পুস্তক-পুস্তিকার নাম রাখা হইত। যথা, হরিনারায়ণ, শিবরাম, লক্ষ্মী, ভগবতী; শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডী। তাহার পর, শাদাসিধে নাম। যথা রাখাল, মতিলাল, কামিনী, যামিনী; বর্ণপরিচয়, শিশুশিক্ষা, কথামালা, নীতি-বোধ। তাহার পর, পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষ-পরিচায়ক নাম। যথা, যজ্ঞপূর্ণ, ইলাবন্ত, হীনাক্ষশশী, প্রভঞ্জনসখা; প্রহসনন্দিনী, অভেদী, শব্দসংজ্ঞাবিজোলি, মজুষা, করণ্ড। তাহার পর, কবিত্বে মাধুর্য্যে মণ্ডিত মোলায়েম রসসিক্ত নাম। যথা, প্রভাতকুসুম, প্রেমকুসুম, নীহারবিন্দু, অমিয়া, সুধা;* আঙুর, আপেল, ফুলের কলম, মধুমন্ত্রী। তাহার পর লোকের চোখে ধূলা দিবার জন্য কাণা ছেলের নাম পদ্ম-লোচন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছেলের নাম কার্ত্তিক; তথা ব্যাকরণের গ্রন্থের নাম মনোরমা, দর্শনের গ্রন্থের নাম কুসুমাঞ্জলি ও পঞ্চদশী! ইহা ছাড়া, যমকে ফাঁকি দিবার জন্য হেলাফেলা নাম। যথা, কেলারাম, কেনারাম, বেচারাম, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি। তথা, সমালোচককে ফাঁকি দিবার জন্য—ছাইভস্ম, মশলাবাঁধা কাগজ, পাগলের প্রলাপ।

* শুভবিবাহে। বিবাহ-পত্রে মেরিগোল্ড হাসিনী নাম পাইয়াছি, আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে মিষ্টরেজ্‌বাসিনী ভায়োলেট্-ভামিনী ও মার্শাল্ নীল্-নাশিনী নামও দেখিতে পাইব আশা করি।

দীনবন্ধু

[শ্রীবিধুভূষণ বসু]

(১)

দীনবন্ধু রায় বনিয়াদী গাঁতিদার। ধানে, চা'লে, খামার-গোলায় বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। বাহিরের সম্পদের চেয়ে দীনবন্ধুর ভিতরের সম্পদ আরও বড়। দীনবন্ধু নিষ্ঠাবান হিন্দু। ভাগ্যবলে তিনি সদ্‌গুরুর সন্ধান পাইয়াছিলেন; তাই শিখিয়াছেন,—ত্যাগেই সুখ, ত্যাগেই মনুষ্যত্ব, ত্যাগেই ধর্ম্ম,—ভোগে নয়। এ শিক্ষা তাঁহার বাক্যগত নয়, কার্য্যগত।

দীনবন্ধু লেখাপড়া তেমন জানিতেন না। তাঁহার যখন ছাত্রজীবন, তখন বর্ত্তমান ধরণের শিক্ষা-পদ্ধতির প্রচলন হয় নাই; গ্রামে-গ্রামে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দীনবন্ধু গুরুমহাশয়ের পাঠশালে কিস্তাবতি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তার পর স্বগৃহে পিতার প্রতিষ্ঠিত টোলে তর্করত্নের কাছে মুগ্ধবোধখানি সারিয়া, নিজে-নিজে দুই-একখানি কাব্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া-

ছিলেন। কর্ম্মজীবনে বিষয়-কর্ম্মের অবসরে, শাস্ত্র, পুরাণ ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহার একজন সদ্‌গুরুর সঙ্গতি ঘটিয়াছিল,—তাঁহারই স্নেহ-যত্নে ধর্ম্মবারি সিঞ্চিত হইয়া দীনবন্ধুর জীবন-বৃক্ষ বড় সুন্দর সাজিয়াছিল।

প্রৌঢ় বয়সে দীনবন্ধু বিপত্নীক হইলেন,—সংসারে বড় গোলযোগ ঘটিল। একটী মাত্র পুত্র; আর সন্তানাদি হয় নাই। পত্নী-বিয়োগের সময়ে পুত্র সুধীরের বয়স আঠার বৎসর। আত্মীয়-কুটুম্ব ও বাড়ীর মেয়েদের সাহায্যে দীনবন্ধু সংসারধর্ম্ম রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরের সাহায্য সব সময়ে পাওয়া যায় না। সংসারে বড় বিশৃঙ্খলা ঘটিল। অতিথি-সেবা, দেব সেবায় ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। তখন তিনি অপ্রাপ্ত-বয়স্ক সুধীরের বিবাহ দেওয়া ভিন্ন পত্যন্তর দেখিলেন না। এক দরিদ্রের ঘর হইতে কর্ম্মঠ সুশীলা পুত্রবধূ বরণ করিয়া আনিলেন। দুই-একজন ধনবান কন্যাদানের প্রার্থনা জানাইয়াও প্রত্যাখ্যাত হইলেন।

দীনবন্ধুর সংসার বেশ চলিতেছে,—গৃহে লক্ষ্মীর মতন পুত্রবধূ সংসারটী বেশ সাজাইয়া তুলিয়াছে। বাহিরে পুরাতন ভৃত্য কালাচাঁদ তেমনি বিশ্বস্ত ভাবে দলিলের মর্য্যাদা রাখিয়া কাজ করিতেছে। সুধীর সুশিক্ষিত হইয়া বিষয়-কর্ম্ম দেখিতেছেন। সুধীর আজকালকার ধরণে লেখাপড়া ভালই শিখিয়াছিলেন। তাঁহার মত শিক্ষিত যুবক সহরে অন্ততঃ শ'টাকা বেতনে সানন্দে সপরিবারে বাস করিতে পারিতেন। কিন্তু সুধীর তেমন বাপের ছেলে ন'ন; বৃদ্ধ, ধর্ম্ম-প্রাণ পিতাকে বিষয়-কর্ম্মের জঞ্জালে আবদ্ধ রাখিয়া দাসত্বের আরাম-গৌরবের প্রতি তাঁহার মন উঠিল না। অন্নবস্ত্রের পক্ষে যাহা আছে যথেষ্ট, আর কাজ কি?

এমন সময়ে সেই গ্রামের জমিদার সম্প্রতি রায়বাহাদুর উপাধিলব্ধ বাবু ব্রজেশ্বর, তাঁহার কলিকাতার প্রাসাদের তাড়িত পাখার হাওয়া-ভরা ও তাড়িতালোকে আলো-করা বারেন্দের বৈঠকখানা ছাড়িয়া পরগণার ভর কাছারী বাড়ীতে শুভাগমন করিলেন। বিশ বছরের মধ্যে তাঁহাকে কেহ পরগণায় আসিতে দেখে নাই। প্রজারা রাজদর্শন পাইয়া আনন্দিত হইল। এই অজন্মার দুর্ব্বৎসরে ভূস্বামী প্রজাদিগের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া, নিশ্চয়ই অন্ততঃ এ বৎসরের অর্দ্ধেক কর রেহাই দিয়া যাইবেন, ইহা ভাবিয়া প্রজারা উৎসাহিত হইল। যাহারা একটু প্রবীণ ও রহস্যজ্ঞ, তাহারা বুঝিল,—প্রজাদিগের হিত-কামনায় পরগণায় আসার মত জমিদার ব্রজেশ্বর বাবু ন'ন।

জমিদার সকলের আগে মাতব্বর প্রজা দীনবন্ধুকেই ডাকিলেন। দীনবন্ধু চারি মুদ্রা দর্শনী লইয়া রাজদর্শন করিলেন। স্বাগত সম্ভাষণাদি সাঙ্গ হইলে, বাবু দীনবন্ধুকে বলিলেন, "দীনবন্ধু, বড় দায়ে পড়িয়াছি; ছেলেটীর বিবাহ দিতে হইবে। বাড়ীটা তৈরি করতে প্রায় পাঁচ লাখ টাকা গেল। ছেলের বিবাহে নিতান্ত পক্ষে লাখ খানেক টাকা খরচ না করলে ত আর মান থাকে না। আজকাল আবার রায়বাহাদুর উপাধিটাও পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে তোমরাই ভরসা।"

দীনবন্ধু করযোড়ে বলিলেন, "হুজুর, এবার বড় দুর্ব্বৎসর। প্রজাদের কারুর ঘরে অন্ন নাই। যা' কিছু ফসল পেয়েছিল, বেচে মনিব মহাজনকে দিয়েছে।"

ভূস্বামী কৈফিয়ৎ শুনিবার মানুষ ন'ন। আর একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "এড়াবার ওজর ত কতই আছে! এ ত বাজে খরচে দিচ্ছ না,—তোমাদের রাজ-পুত্রের বিবাহ, বরকন্যাকে যৌতুক দেবে না?"

দীনবন্ধু তেমনি স্থির স্বরে বলিলেন, "আজ্ঞে, যা'র আছে সে যথাসাধ্য প্রণামী দেবে, যার নাই সে ত পারবে না। সাধারণ প্রজার অবস্থা বড়ই মন্দ।"

জমিদার। ও-সব বাজে কথা রাখ। টাকা-প্রতি টাকা মাগন তুলে দিতে হবে। তুমি মাতব্বর প্রজা, তোমারই উপর ভার দিচ্ছি।

দীনবন্ধু শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "গত বৎসরের আগের বৎসর বাড়ী তৈরীর জন্য প্রজারা টাকা প্রতি আট আনা মাগন দিয়াছে; আবার টাকা প্রতি টাকা! অসম্ভব!"

জমিদার। একবার দিয়েছ বলে আর দিতে হবে না? তা' হলে খাজনাও বছর-বছর দিও না।

দীন। মাগন কি খাজনার সামিল করে নিতে চান?

জমিদারের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সম্মুখে বসিয়া প্রজার এত বড় গোস্তাকির কথা! অবসরজ্ঞ বিচক্ষণ নায়েব মহাশয় বলিলেন, "রায় মহাশয়, আপনি আপত্তি কচ্ছেন কেন? আপনার ত লাভ বই ক্ষতির কথা হচ্ছে

না। আপনার গাঁতিতে একশ' ঘর প্রজা, তাদের কাছ থেকে মুনফা সমেত টাকার উপর মাগন তুলে নেবেন, সরকারে তার অর্দ্ধেক টাকাও দিতে হবে না। কিন্তু আপনি যদি রাজি হন, আর কেউ আপত্তি করতে পারবে না।"

যুক্ত-করে দীনবন্ধু দৃঢ়স্বরে কহিলেন,"মাপ করুন, নায়েব মশাই,—আমি প্রজার কাছ থেকে খাজনার উপর এক পয়সা কখনও আদায় করি না, করতে পারবও না। রাজ-পুত্রের বিবাহের যৌতুক আমি এক শত টাকা দিয়ে যাচ্ছি। গরীব প্রজাদিগকে এবার মাপ করুন। শুভ-কর্ম্মে দরিদ্র-দিগের চোখের জল ফেলাইয়া আড়ম্বর করার চেয়ে, সহজে যা হয় তাই করাই ভাল।"

নায়েব মহাশয় মুখ ভার করিলেন। ভূস্বামীর মুখ বৈশাখী কাল-মেঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর দেখাইল। তিনি মুখ ফিরাইয়াই বলিলেন, 'আচ্ছা যাও।" দীনবন্ধু ইষ্টনাম স্মরিয়া উঠিয়া গেলেন।

মাগন উঠিল না। নিরুপায় হইলে অতি দুর্ব্বলও মরিয়া হইয়া উঠে। এ দুর্ব্বৎসরে প্রজারা স্ত্রীপুত্রের পেটের অন্ন জুটাইতে পারিতেছে না,—সব গোলা, মরাই শূন্য। তাহারা ভূ-স্বামীর পায়ে পড়িয়া অনেক কাঁদিল; ফলে কিন্তু পদাঘাত খাইয়া সরিয়া আসিল। অগত্যা তাহারা মনিবের বরকন্দাজের লাঠির উপর লাঠি ধরিল। রায় বাহাদুর বুঝিলেন, দুর্ব্বৃত্ত দীনবন্ধুই প্রজাদিগকে রোখাইয়া দিয়াছে। তাহাকে জব্দ করিতেই হইবে। দীনবন্ধুকে উৎসন্ন করিতে না হয় লাখ টাকা যাইবে! ব্রজেশ্বর পুরুষ-সিংহ,—তাঁহার প্রজার এত গোস্তাকি!

(২)

পর-বৎসর মরসুমের প্রথমেই দু'শ লাঠিয়াল সঙ্গে লইয়া নূতন পত্তনিদার আসিয়া দীনবন্ধুর গাঁতিতে হাল দিল। প্রজারা আসিয়া ব্যস্ত হইয়া খবর দিল, এবং লাঠির উপর লাঠি ধরিবার হুকুম চাহিল। দীনবন্ধু সব বুঝিলেন; প্রজাদিগকে বিসম্বাদে নিরস্ত করিলেন। স্বয়ং নায়েব মহাশয়ের কাছে হাজির হইয়া বলিলেন, "আমার গাঁতি যদি ভূস্বামী খাস করে নিতে চান, আমি আপত্তি করিব না। কিন্তু প্রজাদিগের স্বত্ব কেন লোপ করেন? তাদের কাছ থেকে কবুলতি লইয়া কর আদায় করুন,—তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবেন না। চাষাদের সাতপুরুষের জমি অপরকে বন্দোবস্ত করবেন না।"

নায়েব দীনবন্ধুকে কাণ ধরিয়া বাহির করিয়া দিলেন না,—এতটুকু ক্ষমা করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অন্যত্র জিটা অনুসন্ধান করিবার সৎপরামর্শ দিয়া দিলেন। মনিবের সঙ্গে বড়াই? প্রজাদিগের মুখ চাহিয়া দীনবন্ধুকে আদালতের আশ্রয় লইতে হইল। কিন্তু প্রবল-প্রতাপ জমিদারের সহিত মামলায় প্রজা কি জয়লাভ করিতে পারে? দীনবন্ধুর পরাজয় হইল। তাঁহার সাতপুরুষের গাঁতি জমিদারের খাস বলিয়া সাব্যস্ত হইল। দীনবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, "মা, আনন্দময়ি!"

কুদীদ-জীবি রাজীব দত্ত আসিয়া বলিল, "রায় মহাশয়! আপনার সাতপুরুষের চকটা জমিদার খাস করে নিলে!"

দীনবন্ধু বলিলেন "হয় ত এই সাতপুরুষের বেয়াদেই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।"

রাজীব। তবে আপীল করলে আপনার ভাল হ'তে পারে,—এটা ত আপনারই হক্ মামলা।

দীন। না, আপীলে আর কাজ নাই। প্রথম আদালতেই মোকদ্দমা করা উচিত হয় নাই। জমিদারের সঙ্গে মামলা করা কি আমার কাজ?

রাজীব। তবে জমিদারের সঙ্গে একটা রফা নিষ্পত্তি করলেই ত হ'ত?

দীন। আবার রফা কি? আদালতেই ত নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।

রাজীব। আপনি হাইকোর্টটা করুন,—নিশ্চয়ই আপনার জিত হবে। টাকার জন্যে ভাবতে হবে না, যত টাকা লাগে আমি দিচ্ছি।

দীন। টাকাগুলো আমাকে দয়া করে দান করতে চাচ্ছেন?

রাজীব। তা—তা—দান করবার শক্তি কি আমার আছে? গরীব মানুষ,—আপনি ধনিরাদি বংশের লোক, মহাধার্ম্মিক,—আপনার উপকার কর্ত্তে পারলেই মহাপুণ্য।

দীন। তবে হাওলাত স্বরূপ দিচ্ছেন, সুদ চান্ না?

রাজীব। সুদ?—তা দেখুন, যৎকিঞ্চিৎ না পেলেই বা আমার চলে কিসে! আপনি বাজার-দর চেয়ে, দু' আনা কম দেবেন।

দীন। দলিল কিরূপ হবে? হাণ্ডনোট? না মর্গেজ?

রাজীব। তা, আপনাকে টাকা দেওয়া,—তার আর দলিলই বা কি? তবে কি না, বাপে ব্যাটায় কাজ হ'লেও একটা আ'ল রাখ্‌তে হয়। আপনার খামার জমি ক'খানা মর্গেজ রাখ্‌লে আমি দু' হাজার টাকা দিতে পারি।

দীনবন্ধু হাসিলেন। চাকর ডাকিয়া দত্ত মশাইকে আর একবার তাগাদা দিলেন। তার পর করযোড়ে বলিলেন, "মাপ করবেন দত্ত মশাই; আমি আপনার অনুগ্রহ নিতে পারলাম না। আমি মামলা করব না, টাকাও চাই না। আপনি বৃথা কষ্ট ক'রে এ পর্য্যন্ত এসেছেন।"

দত্ত মহাশয় কাল মুখ লইয়া ফিরিয়া পড়িলেন। তখন দীনবন্ধুর সম্মুখে এক বৃদ্ধা বিধবা আসিয়া দাঁড়াইল। বিধবা দীনবন্ধুর পুরাতন হালদার রামলোচন দাসের পত্নী। তাহার ছিন্ন বসন, মলিন বদন। দীনবন্ধুর কাছে দুঃখের কথা বলিতে আসিয়াছে। তাহার ছেলেটি চাকুরে হইয়া বউ লইয়া সহরে বাসা করিয়াছে। বাড়ীতে এক পয়সাও খরচ দেয় না। ঘরে একটি বিধবা মেয়ে আছে, তাকে নিয়ে বৃদ্ধা উপবাস করিতেছে।

দীনবন্ধু জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি ছেলের বাসায় যাও না কেন? তোমাকে বাসায় নিতে চায় না?"

বৃদ্ধা চক্ষু মুছিয়া বলিল, "আমাকে নিতে চায়। কিন্তু পোড়াকপালী মেয়েটাকে কোথা ফেলে যাব? সে নচ্ছারটা বলে, অত পরের বোঝা সে বইতে পারে না।"

দীনবন্ধু বড় দুঃখিত হইলেন। রামলোচন দাস তাঁহার বাবার আমলের হালদার। তিনি বালককালে রামলোচন দাদার কোলে-পিঠে অনেক চ'ড়েছেন। সত্যই রামলোচন তাঁহাকে বড় ভালবাসিত। তাহার স্ত্রী-কন্যা অন্নবস্ত্রের কষ্ট পাইতেছে! বড় অন্যায় কথা; এতদিন কেন তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানেন নাই? দীনবন্ধু যেন লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। আহা! বিধবার পরণে এমন ছেঁড়া কাপড়! দীনবন্ধু আদর-স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "যাও, বউ ঠাকুরুণ, ভিতরে যাও। আমার বউমাকে দেখেছ ত? বউমার রান্না দুটি ভাত তুমি খাবে না? আমার বউমা বালিকা, কিন্তু ঘরকন্না খুব ভাল করেন।" পার্শ্বে সুধীরকে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন, "সুধীর! তোর জ্যেঠাইমাকে ভিতরে নিয়ে যা,—ওঁকে রেখে আবার আসিস্ ত!"

সুধীর বৃদ্ধাকে ভিতরে দিয়া আবার আসিল। দীনবন্ধু বলিলেন, "কাল একজোড়া সাদা ধুতি এনেছিলাম, নিজে পরব বলে। তোমার এই জ্যেঠাইমাকে তা দিয়ে দেবে। রামলোচন দাদা আমাদের কাজেই জীবন ক্ষয়িয়ে গেছেন; তাঁর স্ত্রী অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট পাচ্ছে! আমাদের খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। দেখ, কাপড় জোড়াটি যে দেবে, তা গরীব ব'লে দান কচ্ছ, এমন ভাবে দিও না। বউমা যেন তাঁকে লৌকুতা কচ্ছেন, এমনি ভাবে যৌতুক স্বরূপ দিও।"

সুধীর যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, "তাই ত! ওর ছেলে মতিদাস আমাদের মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল।"

দীনবন্ধু বাধা দিয়া বলিলেন, "ছি! ও কি মনে কর্ত্তে আছে? যে উপার্জ্জন করে' মা-বোন্‌কে খেতে দিতে পারে না, সে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেছে, তার আর কথাই বা কি?"

অতঃপর দীনবন্ধু ভৃত্য কালাচাঁদকে ডাকিলেন। কালাচাঁদ আসিলে বলিলেন, "কালাচাঁদ, গোলা থেকে এক মাঠ ধান বার করে রামলোচন দাসের বাড়ীতে দিয়ে আস্‌বি,—আজই।" কালাচাঁদ শুনিয়া গরম হইয়া উঠিল। "মতে দাসের বাড়ী? সে ভারি কুটুম্ব কি না? আমি পার্‌ব না কত্তা।" দীনবন্ধু কালাচাঁদকে বুঝাইলেন, "রামলোচন দাস আমার দাদা হতেন। সারা জীবনটা আমাদের বাড়ীতেই কাটিয়ে গিয়েছেন। তাঁর পরিবার খেতে পায় না। আমার গোলায় ধান থাক্‌তে, যারা স্বজন তারা যদি খেতে না পায়, তবে মা-লক্ষ্মী যে কুপিতা হবেন। ধান কটা দিয়ে আসিস্ যাবা!"

(৩)

দীনবন্ধুর দিন পূর্ব্বমতই চলিতে লাগিল। গাড়িটা যাওয়াতে বার্ষিক পাঁচশত টাকা আয়ের ব্যাঘাত ঘটিল বটে, কিন্তু তাহার জন্য দীনবন্ধু ভিতরে-বাহিরে তেমন একটা ছোট হইলেন বলিয়া বোধ হইল না। পূর্ব্বের মতই শরতে মণ্ডপে প্রতিমা উঠিতে লাগিল, নাটমন্দিরে ঢোল চলিতে লাগিল; পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধে সামাজিকগণ নিমন্ত্রণ

পাইতে লাগিলেন; অতিথি-অভ্যাগতের সেবা চলিতে লাগিল, চাকর-বাকর বজায় রহিল; যাহার যে বার্ষিক বৃত্তি, সে তাহা নিয়মিত ভাবেই পাইতে লাগিল।

লোকে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা হইল না। কুসীদজীবী ভাবিয়াছিলেন, এইবার দীনবন্ধুকে জালে ফেলিবেন; উকীলবাবুরা ভাবিয়াছিলেন, এইবার দীনবন্ধুকে তাঁহাদের দোরে আনাগোনা করিতে হইবে; আমলা-মুহুরীরা লোলুপ নেত্রে চাহিয়া ছিলেন, এইবার দীনবন্ধুর কাছ থেকে দু'-চার সিকি অলপানি মিলিবে; প্রতিবেশীরা ভাবিয়াছিল, এইবার দীনবন্ধু সাক্ষী সংগ্রহের জন্ত তাহাদের কিছু তোয়াকা রাখিয়া চলিবেন। কিন্তু সকলেই মর্ম্মাহত হইল, দীনবন্ধু কাহারও কাছে ঘেঁসিলেন না। পুত্র সুধীরের মুখ মলিন দেখিয়া দীনবন্ধু বলিলেন, "বাবা! দুঃখিত হইও না। বিষয়-সম্পদ চিরদিন থাকে না। আইনের বলে জমিদার বিষয় কেড়ে নিয়েছেন, শরীরের বলও কেড়ে নিতে পারবেন না। শরীর খাটিয়ে ভাত-কাপড়ের যোগাড় করিও। তুমিও অসমর্থ নও। সংসারের অধিকাংশ লোকই ত শরীর খাটিয়ে খায়।"

দীনবন্ধুর গেল কি? বাস্তবিক তাঁহার কিছুই যায় নাই। গাঁতির পাঁচশত টাকা আয় কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু সে পাঁচশত টাকা ত দীনবন্ধুর সংসার-খরচে লাগিত না! প্রজা ছিল,—প্রজাদিগের পালনের ভারও ছিল। তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইত; জল-পানের জন্ত পুকুর কাটাইয়া দিতে হইত; প্রতিবৎসর বাস্তুপূজায় উৎসব করিতে হইত; তাহাতে প্রজাদিগকে পরিতোষ-পূর্ব্বক ভোজ দিতে হইত; প্রজাদিগের অভাব-অনাটনে সাহায্য করিতে হইত; যাহা আয় হইত, তাহাই ব্যয় হইত। আজ প্রজাও নাই, প্রজাদিগের জন্ত কোনও কর্ত্তব্যও নাই। দীনবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, "মা সন্তানকে বৃদ্ধ অসমর্থ দেখিয়া, তার উপর থেকে কাজের ভার নামিয়ে নিলেন। মা আমার অনন্ত করুণাময়ী!"

দীনবন্ধুর খরচ চলিত খামার-জমি আর বাগানবাড়ী হইতে। সে সব যতক্ষণ আছে, দীনবন্ধুর সকলই ততক্ষণ আছে। দীনবন্ধু অন্তরে-বাহিরে একটুও আহত হইলেন না। শত্রুর মন তৃপ্ত হইল না। দীনবন্ধুকে উৎসন্ন দিতেই হইবে। ব্রজেশ্বর বাবুর প্রজাকুল প্রায় উৎসন্নই গিয়াছে —এমনিই তাঁহার শাসনের শক্তি। প্রজারা আর সালিয়ানা কর আদায় দিতে পারে না। জমিদার জরিপ বসাইয়াছেন; কোথাও জবরদস্তি, কোথাও বা আইনের বলে করবৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রজারাও নাচার হইয়া আদালতের আশ্রয় লইয়াছে। যে হারিয়াছে সেও গিয়াছে, যে জিতিয়াছে সেও গিয়াছে। এখন প্রজারা জমির ফসলে পেট বাঁচাইয়া জমিদার-মহাজনের পেট পুরাইতে পারিতেছে না। কাজেই কেহ ভিটা ছাড়িতেছে, কেহ জমিদারের দারোয়ানের মাথায় লাঠি তুলিয়া জেলে যাইতেছে: ইহাতে তিল-তিল করিয়া, জমিদারবাবু বড় হইতেছেন, কি ছোট হইতেছেন, তাহার খোঁজ কে লইতে যায়? রায় বাহাদুরের কিন্তু দীনবন্ধুর উপরই আক্রোশ বাড়িতেছে। প্রজারা নিশ্চয়ই তাঁহারই পরামর্শে এমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। দীনবন্ধু সকলই শুনেন, সকলই বুঝেন, কিন্তু কোনও বিষয়ের তথ্য লইতে যান না।

একদিন অকস্মাৎ শমন-জারি হইল।—দীনবন্ধুর নামে পাঁচহাজার টাকার হাণ্ডনোটের নালিশ,—মহাজন রাজীব দত্ত। দীনবন্ধু শিহরিয়া উঠিলেন না; বুঝিলেন, এইবার রাস্তায় বসিতে হইবে। সুধীরকে বলিলেন, "একটা চাকরীর অনুসন্ধান কর, রোজগার করে খেতে হবে।" সুধীর সরোষেই বলিলেন, "এমন একটা মিথ্যা সত্য হয়ে যাবে?" সুধীর যাহাই বলুক, মিথ্যাই সত্য হইল। দীনবন্ধুর বিরুদ্ধে মায় সুদ ছয় হাজার টাকার ডিক্রী হইল।

দীনবন্ধুর নগদ টাকা নাই,—বাস্তুভিটা, খামার-জমি বিক্রয় করিলেও বুঝি এত টাকা হয় না। অন্তত্রই ভিটা দেখিতে হইল। দীনবন্ধু সুধীরকে বলিলেন, "শুভ দিন দেখিয়া উপার্জ্জনের চেষ্টায় বাহির হও। বৃদ্ধ পিতা ও পত্নীর অন্ন-বস্ত্র তোমাকেই যোগাইতে হইবে।" কালাচাঁদকে বলিলেন, "তুমি অন্তত্র চাকরী দেখ। আমার চাকরের আবশ্যক নাই।" কালাচাঁদ ভ্রূভঙ্গী করিল মাত্র,—কথাটীও বলিল না।

দীনবন্ধু শাস্ত্রপাঠে মনোনিবেশ করিলেন। সান্তে-অনান্তে, জয়ে-পরাজয়ে তুষ্ট থাকিতে শেখাই সুখের সোপান। তাঁহার গুরু-দত্ত শিক্ষার ইহাই মূল সূত্র। সারা জীবন ভরিয়া এই শিক্ষার অনুরূপ করিয়া জীবনটী গড়িয়া তুলিবার জন্ত তিনি কতই সাধনা করিয়াছেন! কিন্তু মন যে কেমন-

কেমন করে! এই যে গোয়াল-ভরা গরু;—পুরুষ-পরম্পরায় এই গোধনের সেবা করিয়া দুঃখ-ভাতের কুলান হইয়াছে। এখন ত আর থাকে না। গোচারণের ভূমি মহাজনে বেচিয়া লইবে, বুঝি গাভী-বৎস-বলদ সকলই নিলাম করিবে! খামার, বাগান সকলই গেল;—রাখাল হালিয়ার খোরাক-মাহিনাই বা কোথা হইতে আসিবে? ভাবিতে দীনবন্ধুর বুক দুর-দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! এই যে এমন সুন্দর সরোবর,—স্বচ্ছ, নির্ম্মল,—লহরী-লীলায় সদা ক্রীড়াশীল; মৎস্যগুলি কত আনন্দে খেলিতেছে! এ সব আর এক জনের হইবে। ঐ ত বাগানে আম, কাঁঠাল, আতা, সেয়ারা, নারিকেল, সুপারির গাছ,—কত ফল যোগায়! কত তৃপ্তি বিলায়! যিনি ইহার নূতন মালিক হইবেন, তিনি কি তেমন যত্নে পালন করিবেন? হয় ত কত গাছ অযত্নে মরিয়া যাইবে। হয় ত কেহ এ বাগান কাটিয়া বাড়ী করিবে! হায়! হায়! দীনবন্ধুর বুক কাটিয়া যাইতে লাগিল। হায়! দীনবন্ধু কি শিখিয়াছেন? গুরুদেব যে কত ব্যাখ্যা করিয়া কত সরল করিয়া, কত ঋষিবাক্য আবৃত্তি করিয়া শিখাইয়াছিলেন, "তাক্তেন ভুঞ্জিথাঃ"—বিষয়-সম্পদ, ধন-পরিজন ভোগ কর, কিন্তু কাহারও প্রতি আসক্তি রাখিবে না। কোথায় সে শিক্ষা? দীনবন্ধুর স্নেহোক্ত, সুখ-দুঃখে মনসহিষ্ণুতা চূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তগতি মর্ম্মপীড়িত বৃদ্ধ আর্ত্ত প্রাণে ডাকিলেন, 'কোথায় তুমি গুরুদেব! অযোগ্য শিষ্যকে কি শিখাইয়াছিলে? বুঝি তোমার সাক্ষাৎ পাইলে, এ অকূলে কূল পাইতাম!"

দীনবন্ধু এখন আর গৃহবাসে স্বস্তি পান না। সেবারও শরতে পূজা হইল,—পূর্ব্বের মত আড়ম্বরেই উৎসব-অর্চ্চনা হইয়া গেল। দীনবন্ধু বুঝিলেন, এ মণ্ডপে দশভুজার এই শেষ পদার্পণ!

কার্ত্তিকের প্রভাত বড় সুন্দর ফুটিয়াছে! দীনবন্ধু তাঁহার বাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী শস্যশ্যামল ক্ষেত্রের সীমায় বটবৃক্ষমূলে একাকী বসিয়া তাঁহার বড় সাধের গানটী গাহিতেছেন,—

মা আমার বিশ্ব-রাণী, আমি তার আদরের ছেলে;
হীরা মাণিক রতন সোণা আমার মায়ের পদতলে।
মা সবায় দেছে কোঠাবাড়ী গাড়ী ঘোড়া রথ,
ভালবেসে দেছে আমায় গাছতলা আর পথ।
এখন ভাঙ্গবে না ক, টুটবে না ক,
ক্ষয় হবে না কোনও কালে।
সাঁঝের বেলায় তারার মালা ঘরে আলবে বাতি,
রোদ বাদলে গাছের ডালে মাথায় ধরবে ছাতি।
মা আঁচল নেড়ে বাতাস ক'রে ঘুম পাড়াবেন কোলে।

পশ্চাৎ হইতে কালাচাঁদ আসিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল, "কর্ত্তা! সকালে এসে এখানে বসেছ? আমি খুঁজে-খুঁজে হয়রান হয়েছি। এদিকে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত!"

"খবর কি কালাচাঁদ?"

"রাজীব দত্ত মাল ক্রোক করতে বাড়ী এসে পড়েছে। আমরা সবুর কর্ত্তে বল্লাম, তা শুন্লে না।"

"বেশ, মালপত্র সব বার ক'রে নিয়েছে?"

"ব্যাটারা আগেই ঘরে ঢুক্তে গেল,—সে ঘরে বউমা ছিলেন। আমরা নিষেধ কর্লাম,—বল্লাম, মেয়েছেলেরা বার হয়ে যাক, তার পর যা করবে কর। জমিদারের দারওয়ান সাথে ছিল,—তারা নিষেধ মান্লে না, ঘরে ঢুকে পড়্ল। আমরা স্ত্রীলোকের ইজ্জত, ভদ্রলোকের পরিবারের ইজ্জতের দোহাই দিলাম; ব্যাটারা কিছুই মান্লে না। রাই রাই করে ঘরে ঢুক্লো। তাই দেখে, সোণার লক্ষ্মী বৌমা ভয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলেন। আর সহ্য কর্ত্তে পার্লাম না। রক্ত-মাংসের শরীর ত! সুধীর বাবু ছিলেন, দেখে-শুনে তিনিও যেন অজ্ঞান হয়ে গেলেন,—আমি সইতে পার্লাম না। একটা বরকন্দাজের পিঠে এই লাঠির এক ঘা পাড়্লাম। কর্ত্তা! বুড়ো হয়েছি, কিন্তু তোমার ধর্ম্মের সেবকের বল এ গায়ে; ব্যাটারা কুকুরের দল,—দুটো একটা ঘা খেয়েই চম্পট দিয়েছে। শীঘ্র চল, বউমার এখনও জ্ঞান হয় নি, দেখে এসেছি।"

দীনবন্ধু শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ছি! ছি! কালাচাঁদ! কি করেছ? আদালতের চাপরাশী ক্রোকের পরওয়ানা নিয়ে এসেছিল, অমান্য করা ভাল হয় নাই।"

ফল ফলিতেও বিলম্ব হইল না। সুধীরের নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা আসিল,—সে পুলিসের কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে। কালাচাঁদকে এ ব্যাপারে কেহ জড়ায় নাই। যথাসময়ে বিচার হইল—সুধীর ছয় মাসের জন্য কারাগারে গেল।

এ দিকে, দীনবন্ধুর পুত্র-বধূ অন্তর্বত্নী ছিল। তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না—সেই মূর্চ্ছা কাল-নিদ্রায় পরিণত হইল।

(৫)

আবার আশ্বিন-মাস,—পূজার সময় আসিল। শরতের রৌদ্র পল্লী-পথের কাদা শুকাইয়া বৃক্ষবীথির উপরে বড় সুন্দর ফুটিল! শেফালিগুলি মধুর গন্ধে বাঙ্গালীর প্রাণ উৎসাহে মাতাইয়া, তলা ছাইয়া ঝরিয়া পড়িল। যার বাড়ী পূজা হইবে, সে পূজা করিবার আয়োজন করিতে লাগিল; যার বাড়ী পূজা হয় না, সে পূজা-বাড়ীতে পূজা দেখিবার জন্ত উল্লসিত হইল। যার ঘরে পূজা হইয়া থাকে, কিন্তু এবার হইবে না, সে নিরানন্দ, নিশ্চেষ্ট রহিল। দীনবন্ধুর বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল! সাতপুরুষের মধ্যে এ বাড়ীতে পূজা বন্ধ হয় নাই,—আজ বন্ধ হইল। ঐ ত চারিদিকে বোধনের কাঁসর-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল,—ঢাকীরা ঢাকে 'শান' দিল। দীনবন্ধু অস্থির হইয়া উঠিলেন।

দীনবন্ধুর সেদিন নিদ্রা আসিল না। অনেক রাত্রি হইল, তবু দীনবন্ধুর নিদ্রা আসিল না। কতকালের পুরান স্মৃতি তাঁহার প্রাণে জাগিতে লাগিল। শয্যা কণ্টকময় বোধ হইল। গভীর আশ্বিনী অমাবস্যার রাত্রিতে দীনবন্ধু শয্যা ছাড়িয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। সে বহির্ব্বাটী বহুদিন অসংস্কৃত; সর্ব্বত্র জঙ্গল জন্মিয়াছে, চারিধারে বন্ত লতাগুল্ম জড়াইয়া তাহা মনুষ্য-প্রবেশের অযোগ্য করিয়াছে। মণ্ডপ, নাকারী, নাটমন্দিরের ছাউনি খসিয়া পড়িয়াছে। কোথাও মেঝে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, খুঁটি নড়িয়া পড়িয়াছে। এ বৎসর বহির্ব্বাটীর কোন সংস্কারই হয় নাই; সংস্কার নিষ্প্রয়োজন ও অসাধ্য। দীনবন্ধু রায়ের বড় আদরের বহির্ব্বাটী, মণ্ডপ, নাকারী, নাটমন্দির,—আজ তাহা শৃগালের আবাস। দীনবন্ধু সেই অন্ধকারে, সেই আবর্জ্জনাময় নাটমন্দিরের সম্মুখভাগে মণ্ডপে দেবীর পাদপীঠ সম্মুখ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—আজ যেন অকস্মাৎ তিনি বড় শোকার্ত্ত! বড় মর্ম্মাহত! এই ত সেই শরৎকাল; এমনি দিনে মা আনন্দময়ী দশভুজা আনন্দ বিলাইতে আইসেন। এই ত শেফালী, মল্লিকা, যুঁই বেলার গন্ধে জগৎ মাতিয়া উঠিয়াছে। আকাশের ভাঙ্গা-ভাঙ্গা মেঘগুলি ধীরে-ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে। এমনি দিনে মা দশভুজা আমারও ঘরে আনন্দ বিলাইতে আসিতেন। আহা! সে কি আনন্দ! চতুর্দ্দিক আনন্দ-রোলে ভাসিয়া যাইত। শত-শত ভক্ত আনন্দে বিভোর হইয়া, মণ্ডপ-দুয়ারে মায়ের পায়ে প্রণাম করিত। কত প্রাণের প্রার্থনা মায়ের চরণে নিবেদন করিত!—আহা! এ কি বাঙ্গালীর বৃথা পুতুল-পূজা! কি আনন্দ যাত্রা! মৃগেন্দ্র-বাহিনী, অসুর-মর্দ্দিনী দশভুজা, সঙ্গে ধনদেবী লক্ষ্মী, বিদ্যাদেবী সরস্বতী, সিদ্ধিদেব গণেশ, রূপের দেবতা কার্ত্তিক—এ কি মূর্খ পৌত্তলিকের কল্পনার প্রতিমা! ইষ্টের এমন মহিমময়ী বিরাট মূর্ত্তির কল্পনা ভক্ত ভিন্ন কে করিতে পারে? জীবনে ধন জন ভাগ্য লাভ অনেক হইয়াছে; অনেক আনন্দ পাইয়াছি,—কিন্তু বৎসরান্তে শরতের শিশিরে তিন রাত্রি জাগিয়া যে আনন্দ, তাহার তুলনা ত কাহারও সহিত হইতে পারে না! সেই ত কয়েকজন দরিদ্রকে এক-একখানি নূতন বস্ত্র দান করিতাম; তাহারা কাপড় লইয়া হাস্যমুখে প্রণাম করিত; তাহাদের চক্ষু দিয়া যেন আনন্দের ধারা বহিয়া যাইত। সেই ত ডাল-ভাতের ভোজ, চিরে-মুড়কির জলপান;—বালক বৃদ্ধ কত আদরে কত উৎসাহে গৃহ আমোদিত করিত! আহা! সে আনন্দ আর দেখিব না। উঃ! বুক ভাঙ্গিয়া যে কান্না আসে! এত সহ্য করিয়াছি, আজ যে অসহ্য হল! গুরুদেব! আমায় কি শিখাইয়াছ? "সম শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু"—অসম্ভব,—গৃহীর হৃদয়ে এ শিক্ষা অসম্ভব। আমার শিক্ষা, সংযম, দম্ভ সব চূর্ণ হইল। এইবার বুঝিলাম, রায়বাহাদুর ব্রজেশ্বর বাবু যথার্থই আমাকে শাসন করিয়াছেন।

দীনবন্ধু সেই নির্জ্জন অন্ধকারে কত কাঁদিলেন, কত মশক, কীট, পতঙ্গ তাঁহাকে দংশন করিল। দীনবন্ধু বোধশূন্য! তাঁহার প্রাণের জ্বালা তিনি কাহাকে বুঝাইবেন? তন্দ্রাবিষ্ট, অবসন্ন দেহে বৃদ্ধ সেইখানেই—সেই দুর্গন্ধ আবর্জ্জনাময় মৃত্তিকাসনেই শুইয়া পড়িলেন। তন্দ্রাবেশে দীনবন্ধু স্বপ্ন দেখিলেন,—বড় সুন্দরী একটী বালিকা,—করে, কণ্ঠে, শিরে, বক্ষে, সুগন্ধি-পুষ্পের অলঙ্কার পরিয়া, পুষ্পময়ী মূর্ত্তিতে হাস্যমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আঁচল-ভরা সদ্য-প্রস্ফুট পুষ্পরাশি; বালিকা বড় সুন্দর হাসি হাসিয়া বলিল, "কই, ঠাকুর কই? কোথায় ফুল দেব?" দীনবন্ধু বলিলেন, "এবার ত এ বাড়ীতে পূজো হবে না।"

বালিকা যেন আরও হাসিল; বলিল, "ইস? তবে পূজো দেখ্‌বে কোথায়?" দীনবন্ধু বলিলেন, "পূজা করিব কি দিয়া? আমার কিছুই নাই।"

বালিকা আরও হাসিয়া বলিল, "নাই কি? সবই ত আছে। বাগান-ভরা ফুল আছে, কুড়িয়ে আন না; কুমোর-বাড়ী ঠাকুর গড়া রয়েছে, নিয়ে এস; পূজা কর্ত্তে আবার লাগে কি?" দীনবন্ধু বালিকার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন,—তাহাকে যেন চিনিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। ঠিক চিনিতে পারিতেছেন না; তবে মনে হইতেছিল, এ যেন তাঁহার মৃতা পুত্রবধূরই মুখ।—না, তা' ত নয়,—যেন আর কোথাও এমনি একটী সুন্দরী বালিকা তিনি কবে দেখিয়াছেন। না, এমন একটী কি ছবি তিনি দেখিয়াছিলেন। তাঁহার বহুদিনগতা মায়ের মুখচ্ছটাও যেন এমনি ছিল। নিমাই কুমোর যে মায়ের প্রতিমা গড়িয়া থাকে,—নীলাম্বরী-পরা; —এ গৌরী যেন সেই গৌরী! বড় সুন্দর ত!

স্বপ্নের বালিকা অন্তর্হিতা হইলেন, দীনবন্ধুর স্বপ্নও অন্তর্হিত হইল। দীনবন্ধু চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, ভোর হইয়াছে। তিনি উঠিয়া বসিলেন,—বসিয়া সেই স্বপ্নদৃষ্টা বালিকার মুখখানিই ভাবিতে লাগিলেন। আহা, এমন সুন্দর কি বাস্তব জগতে সম্ভব?

কালাচাঁদ আসিয়া ডাকিল, "এ কি কর্ত্তা, এত সকালে এখানে কেন?"

দীনবন্ধু বলিলেন, "কালাচাঁদ! সবাই ত আমায় ছেড়ে গেছে, তুই ছাড়ছিস্ না কেন?"

কালাচাঁদ বলিল, "আমিও তাই ভাবি। অনেকবার ভেবেছি ছেড়ে যাই; কিন্তু কেন যেতে পারি না, তা বুঝি না। তবে এত দিনে এই বুঝেছি, তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি হবে সে দিন, যে দিন হয় তুমি মরবে, না হয় আমি মরব।" কালাচাঁদ কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে-কাঁদিতে আরও বলিল, "কালাচাঁদ যাবে না। দীনবন্ধু রায়ের ধর্ম্মের শেষ কি হয়, তা না দেখে কালাচাঁদ মরতেও পারবে না; এর আগে যম এলেও তাকে তাড়িয়ে দেবে।"

এমন সময়ে সে দেশের কুমোর নিমাই উপস্থিত। নিমাই যেন বড় বিস্ময়ে বলিল, "এ কি? বাড়ী-ঘর সাফাই হয় নাই? ঠাকুর আন্‌তে লোক পাঠাওনি,—খবর কি কর্ত্তা?"

কালাচাঁদই নিমাইএর কথার উত্তর দিল; "দেখ্‌ছিস কি ব্যাটা? এ বাড়ীতে কি এবার পূজো হবে? আর কি সে দিন আছে? সে পাষাণের বেটী যা কর্‌বার, তা করেছে!"

নিমাই বিরক্ত হইয়া বলিল, "যা রে! গড়া ঠাকুর এখন আমি কি করি? আমি যে ঠাকুরের অঙ্গরাগ পর্য্যন্ত করে ফেলেছি!"

দীনবন্ধু বলিলেন, "বায়না না পেয়ে ঠাকুর গড়্‌লে কেন?"

নিমাই। বায়না না পেয়ে কি? তুমি বায়না কর নি?

দীন। আমি বায়না করেছি?

নিমাই। তুমি নিজে যেতে পার নাই,—মেয়ে পাঠিয়েছিলে।

দীন। আমার মেয়ে? কত টাকা বায়না পেয়েছ?

নিমাই। টাকা নাই পেলাম,—সাতপুরুষ তোমার ঠাকুর গড়্‌ছি,—একবার আগাম বায়না না পেলে কি গড়্‌বো না? তোমার মেয়ে বল্‌লে, বাবা এবার রোগা, আস্‌তে পারবে না—ঠাকুর গড়ে রেখো।

নিমাই তাহারপর বলিল, "তোমার মেয়েটী ত বড় সুন্দর! অমন সুন্দর প্রতিমা আমরা গড়্‌তে পারি না।" দীনবন্ধুর চক্ষে ধারা ছুটিতেছিল! উচ্ছলিত হৃদয়াবেগ কষ্টে রুদ্ধ করিয়া দীনবন্ধু বলিলেন, "নিমাই! দুষ্ট মেয়েটী কাণ্ড ঘটিয়েছে ত বেশ! বেটীর এত কারসাজি? আগাম বায়না না নিয়ে ঠাকুর গড়েছ! লোকসান ত হবেই! আমি ত মূল্য দিতে পারব না!"

নিমাই। নিতান্ত না পারলে আর কি হবে? না হয় দু'মাস পরে নেব। অনেক টাকা তোমার বেরেছি,—একবার না পেলেই বা কি? তুমি ঠাকুর এনে পূজো কর।

"আচ্ছা, যাও নিমাই,—আমি ঠাকুর আন্‌তে লোক পাঠাচ্ছি। লোক পাঠাবই বা কি,—আমার মাকে আমি আপনি বরণ ক'রে আন্‌তে যাব।" বলিয়া নিমাইকে বিদায় করিলেন। কালাচাঁদকে বলিলেন, "কালাচাঁদ! আমার মা আমায় ত্যাগ করে নাই,—আমি ত্যাগ করেছিলাম। আমি ভক্তি ছেড়ে জ্ঞানের সাধনা কচ্ছিলাম। কালাচাঁদ! মায়ের মণ্ডপ ঝাঁট দাও, মা আস্‌ছেন।"

(৬)

দীনবন্ধুর ধন-বল গিয়াছে, জন-বল যায় নাই। দীনবন্ধু ডাকিলে, গ্রামের শত দীন-দরিদ্র বুক দিয়া তাহার কাজ

করে। রায়বাড়ী পূজা হইবে না শুনিয়া সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছিল। এখন পূজা হইবে শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিল। সেই দিনের মধ্যে মণ্ডপ, নাকারী, নাটমন্দির মার্জ্জিত হইল। ঠাকুরও আসিল। দীনবন্ধু এবার পুরোহিত ডাকিলেন না,—দক্ষিণা দিবার সঙ্গতি নাই। নিজেই বোধন করিলেন, নিজেই অধিবাস করিলেন। পূজার দ্রব্য আর কিছুই নাই,—কেবল পুষ্প, তুলসী, বিল্বপত্র দেবীর পাদপীঠে রাশিরাশি সজ্জিত হইল। দীনবন্ধু কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিলেন না। অথচ বিনা নিমন্ত্রণেই গ্রামের নরনারী, বালক-বালিকা সকলেই আসিল,—তাহারা আপন ইচ্ছায় মণ্ডপ, নাটমন্দির সাজাইল। আপনারা যোগাড় করিয়া আলোকমালায় দীনবন্ধু রায়ের ভাঙ্গা বাড়ী আলোকিত করিল। পাড়ার যুবকেরা সখের দল বাঁধিয়া, নাটমন্দিরে যাত্রার আসর বসাইল। বালক-বালিকারা সাজি-সাজি ফুল কুড়াইয়া, আগমনী গাহিতে লাগিল। ঢুলী-ঢাকী এবার আসিবে না,—দীনবন্ধু কাহাকেও ডাকেন নাই। বালকেরা কাঁসর-ঘণ্টা বাজাইয়া অধিবাসের আরতি করিল।

সহসা বিশু চুলী তাহার দলবল লইয়া ঢাক, ঢোল, টিকারা, নাগারা, সানাই, কাঁসীর জয়-ঝঙ্কারে সকলেরই শ্রুতি স্তম্ভিত করিয়া দিল। দু'দণ্ডের মধ্যে কেহ কাহারও কথা শুনিল না।

বাজনা থামিলে, দীনবন্ধু বলিলেন, "বিশু! তোকে কে আস্‌তে বল্লে?"

বিশু বলিল, "কেন? তোমার বুড়ী মা। অমন বুড়ীকে তুমি এই পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটিয়ে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত পাঠিয়েছ! এ তোমার কি হয়েছে কর্ত্তা?"

দীনবন্ধুর নয়ন অশ্রুজলে ভাসিল,—রুদ্ধ-প্রায় কণ্ঠে বলিলেন, "আমার মা তোকে কি বল্লেন বিশু?"

বিশু কিছু চমৎকৃত হইয়াছে। বলিল, "বল্লেন, আমার দীনবন্ধু বড় রোগা, তাই আমি এসেছি।"

দীনবন্ধু চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "মা! মা! তুমি আমার মেয়ে, তুমি আমার মা, মাগো! আমি দুঃখের ভার সহ্য কর্ত্তে পেরেছিলাম, এ সুখের ভার যে সহ্য করতে পারি না।" দীনবন্ধু স্থির-নেত্রে, নিশ্চল-দেহে সেই মাটীর প্রতিমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

পিছন হইতে কে ডাকিল "দীনবন্ধু!"

এ যে গুরুদেব! দীনবন্ধুর কথা বলিবার শক্তি নাই।

"কি দেখিতেছ দীনবন্ধু?"

দীনবন্ধু উত্তর করিলেন, "আনন্দ! আনন্দ!"

গুরুদেব শিষ্যের হাত ধরিলেন। বলিলেন, "চল, সন্ন্যাস করিতে চাহিয়াছিলে,—সময় হইয়াছে, আমার সঙ্গে এস।"

দীনবন্ধু অপরাধীর মত বলিলেন, "ক্ষমা করুন গুরুদেব! আমি সন্ন্যাস চাহি না।"

"তবে কি চাও?"

"এই গৃহে বাস।"

"গৃহবাসের সামগ্রী তোমার ত কিছুই নাই।"

"আবার অর্জ্জন করিয়া আনিব।"

"কিসের জন্য?"

"মায়ের জন্য। আমার মা আছেন।"

"এই দেখ, তোমার পুত্র কারামুক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগত!"

সুধীর কারামুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে পিতা ও পিতৃগুরুর পদে প্রণাম করিল। দীনবন্ধু বলিলেন, "মায়ের আশীর্ব্বাদ!"

"পুত্র লইয়া এখন কি করিবে?"

"মায়ের সেবা!"

সুখী

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

ভাগ্যবন্ত চৌধুরীরা—লক্ষ্মী বাঁধা ঘরটীতে ;
তাদের কাছে নাইক প্রভেদ আপন এবং পরটীতে।
গোলাতে আর ধান ধরে না, নেয় না কসল বস্তাতে,
ভবন-ভরা ফুল্ল কমল, পুত্র এবং কন্যাতে।
পুষ্ট তাদের গোধনগুলি, তুষ্ট তাদের দাস-দাসী,
বাগ্দেবী ন'ন বিমুখ, তবু অধিক প্রিয় চাষবাসই।
শোকের ছায়া ক্বচিৎ পড়ে, পলায় যে রোগ সত্বরে,
শান্তি এবং সুখটা যেন তাদের নিয়েই ব্যস্ত রে।
কর্ত্তা থাকেন শিশুর মত, চিন্তা নাহি তাঁর মনে,
ভাণ্ডার তাঁর মুক্ত থাকে নিত্য পূজা-পার্ব্বণে।
গ্রামের গরীব-দুঃখীরা সব তাঁহার পরম আত্মীয়,
কেউ বা খুড়া, কেউ বা দাদা,—সবাই সুহৃদ্, সব প্রিয়।
বাস্ত-ভিটায় তীর্থ ভাবেন,—বলেন করে জাঁক ভারি,
"লক্ষ ঋষির চরণ-ধূলা পড়েছিল মোর বাড়ী।
যখন দেখি এই মাদুলী সেই রজেতে পূর্ণিত,
গর্ব্ব এবং গৌরবে হয় সব দীনতা চূর্ণিত।"

গ্রামে অনেক আত্মীয় তাঁর, কপট এবং হিংসুটে,
অন্তরে তাঁর শত্রু চির, সম্মুখেতে কয় মিঠে।
রাত্রি ধরে নিত্য ভাবে, "চঞ্চলা কয় লক্ষ্মীরে ;
ওই বাড়ীতে অচল যেন ছেড়ে পেচক পক্ষীরে।
দেহে ওদের রোগ নাহিক, অশ্রু নাহি চক্ষেতে ;
সাতটা পুরুষ আমরা আছি দারিদ্র্য ও দুঃখেতে।
সুখের উপর সুখ দিতে যান, দুখীর কেহ ন'ন হরি ;
পুষ্প-ভরা ওদের তরু, আমার শুকায় মঞ্জরী।
বিধাতারে দেখ্‌তে পেলে বারেক তাঁরে জিজ্ঞাসি,
কেমনতর বিধান তাঁহার, বিচার তাঁহার কোন্ দেশী ?"

রাতের আঁধার যায় নি তখন,—একটী দিবস প্রত্যূষে,
রক্তবরণ সন্ন্যাসী এক স্বপ্নে তারে ক'ন রুষে।
"বুঝ্‌বি কি তুই চৌধুরীদের গৃহস্বামীর পুণ্য রে,
হিংসা করে' রে পাতকী, হস্ বা কেন ক্ষুণ্ণ রে।
অনেক জন্ম-জন্ম ধরে পুণ্য আছে সঞ্চিত,
সাধ্য কি যে করবে বিধি ভোগে উহায় বঞ্চিত।
শৈশবে সে ক্ষুদ্র কীটও চরণ দিয়ে দল্‌তো না ;
কাহার প্রতি কঠোর কঠিন ভীতির বাণী বল্‌তো না।
কর্দ্দমেতে মগ্ন-পদ ভ্রমরটীতে প্রাণ দিত,
বৎসে আনি গাভীর কাছে করতো তারে নন্দিত।
লতার ছোট পত্রটীও তুলতো না সে হস্তেতে,
শীতার্ত্ত হায় কুকুর বিড়াল আচ্ছাদিত বস্ত্রেতে।
কৌতুকেও করতো না সে বালকটীকেও শঙ্কিত,
চিহ্নটীও তরুর গায়ে করতো না কো অঙ্কিত।
পতিত ভীত পাখীর ছানায় ধরতো তুলে বক্ষেতে,
নীড়ে তাদের আসতো রেখে অপার স্নেহ সৌখ্যেতে।
ক্ষুদ্র তাহার গোপন দানের জান্‌ত খবর ঈশ্বরই,
মত্ত হ'ত হরির নামে সকল বেদন বিস্মরি।
নিজের দুখও ভুলতো সে যে দুখীর দুখ-চিন্তাতে,
বিমুখ ছিল জীবন সারা হিংসা, পরনিন্দাতে।
ব্যথা সে যে দেয় নি কভু, ব্যথা পাবে কার লাগি ?
বৃথায় তাহার হিংসা করে' হ'লি ভীষণ পাপ-ভাগী।
দুর্ব্বলেরি বন্ধু যে জন জীবে যাহার রয় রে
কুবের আনে মাথায় করে' তাহার লাগি রত্ন রে।
রক্ষী তাহার মধুসূদন, লক্ষ্মী তাহার ভাণ্ডারী,
লগ্ন ঘাটে মুক্তি-তরী, স্বয়ং হরি কাণ্ডারী।"

পুষ্পাঞ্জলি

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু]

আজ আবার শরতের শুক্ল ষষ্ঠীর শুভ্র প্রভাতে শিশির-ধোয়া ফুলটীর মত সে আসিয়াছিল। তখন উষারাগ উজ্জ্বল হইয়াছে, কিন্তু অরুণোদয় হয় নাই। আমাদের বাড়ীর গেটের উপরে করুণ প্রভাতী সুরে আসন্ন মিলনোৎসুক্যের উচ্ছ্বাস তুলিয়া সানাই বাজিতেছিল, আর সেই মিলনাকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দান করিয়া কে গাইতেছিল,—

প্রভাতী শর্ব্বরী, উষারাগ হেরি,
রাণী ঘন-ঘন পথপানে চায়।
পরাণ-পুতলি ওমা উমা বলি,
আকুলি বিকুলি কাঁদে উভরায়॥
ঝরঝর বারি মুছি বারবার,
বলে কৈ উমা, কোথা মা আমার,
নয়নেরি তারা হয়ে আছি হারা,
মা বলে মা তারা, একবার কোলে আয়॥

সানাই আর সঙ্গীতের ব্যথিত স্বরে আমার ঔদাস্যভরা অন্তরে যেন একটা বিরাট অভাব গুমরিয়া উঠিতেছিল। আকাশ ভরিয়া উষার রক্তরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বন ভরিয়া ফুল ফুটিয়াছে। আর আমাদের বহু প্রাচীন শুভ্র দালান ভরিয়া প্রতিমা হাসিতেছে। এই পূর্ণতার মাঝে আমার অন্তরে আজ শূন্যতা কেন? তখন আমার কাঁচা বয়সে সবে সোণালি রং ধরিতে সুরু হইয়াছে। যে সময় কেবল আত্মদান করিয়া প্রাণ চরিতার্থ হয়, আমি সেই বয়সের কথা বলিতেছি। আমার মনে হইতেছিল যেন কাহাকে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য আমার প্রাণ আজ সদ্য চন্দনসিক্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কোথায় সে?

আমি পূজার দালানে দাঁড়াইয়া প্রতিমা দেখিতেছিলাম। দৈবাৎ আমার মুগ্ধ-দৃষ্টি একটী জীবন্ত প্রতিমার উপর পড়িল। আমার মনে হইল যেন যাহাকে দেখিবার জন্য আমি কত ভ্রম ঘুরিতেছি, এই ত সে আসিয়াছে! আমি পুষ্পাঞ্জলি দিলাম।

বোধ করি, সেও প্রতিমা দেখিতে আসিয়াছিল, কিন্তু দেখিতেছিল—আমাকে! আমাতে যে দেখিবার মত কিছু আছে, তাহা পূর্ব্বে কখন ভাবি নাই। কিন্তু আজ আমার মনে হইল, আমি সুন্দর। যদি কখন কিশোরীর চক্ষুতে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া থাক, বুঝিবে, আমার এ গর্ব্ব—অহঙ্কার নয়, আত্মপ্রসাদ। আগে আমি ফুলের ভাষা বুঝিতাম না, আজ বুঝিলাম। পাতার অবগুণ্ঠন ঈষৎ সরাইয়া যখন সে নির্নিমেষ নয়নে মুখের পানে চাহিয়া থাকে, বুঝিলাম, কি কথা সে বলিতে চায়। সেই প্রীতিপ্রফুল্ল, প্রেম-পুলকিত দৃষ্টির স্নিগ্ধ কিরণধারায় স্নান করিয়া মনে হইল, আমার জীবন সার্থক হইয়াছে। ইহ-জগতে আর আমার কাম্যবস্তু কিছুই নাই। আমার অন্তরের সে বিপুল শূন্যতা মুহূর্ত্তে যেন কানায়-কানায় ভরিয়া উঠিল।

আমার সহিত চোখো-চোখি হইতেই শরশঙ্কিতা হরিণীর ন্যায় সে ত্রস্ত হইয়া চলিয়া গেল,—কোথায় তাহা জানি না। আজ আমার জীবনে এই প্রথম সুপ্রভাত। বাহিরে আসিয়া আমার মনে হইল, সেই মূক শরৎ-প্রকৃতি আজ অত্যন্ত মুখরা হইয়া উঠিয়াছে। তরুলতায়, পাতায়-পাতায় কি একটা বিশ্রম্ভালাপ চলিতেছে। পাখীগুলা হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করিয়া অনর্থক ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ভ্রমরের সঙ্গে ফুলগুলার নিতান্ত নির্লজ্জ ব্যবহার দেখিয়া কলিগুলি ত হাসিয়াই আকুল; আর শরতের রৌদ্র যে অমন নির্জ্জীব, সেও আজ হাসিমুখে সকলের সঙ্গে কোলাকুলি মাখামাখি করিতেছে।

আমি ইংরাজি পড়ি। গত বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় কলেজে পড়িতেছি। বিবাহে শুভদৃষ্টিতে যে প্রাণ বিনিময় হয়, তাহা বিশ্বাস করিতাম না। একবার চোখো-চোখিতে এত হয়? একজন নীরবে আত্মসমর্পণ করে, আর একজন নিঃশব্দে তাহা গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হয়, ইহা কি সম্ভব? এই যে যাবজ্জীবনের জন্য একটা বিষয় হস্তান্তর করা হয়, তার সাক্ষী-সাবুদ থাকে না! পরস্পর কেনে-বেচে, মুখে তার কোন কথাবার্ত্তা, দর-দস্তুর হয় না। কেবল চারটে চোখে নিঃশব্দে, নিভৃতে, ইসারায়

ইঙ্গিতে যে এত বড় ব্যাপারটা সম্পন্ন করিতে পারে, সংসারের হাটে যাঁহার ভাগ্যে এ কারবার কখন ঘটে নাই, তাঁহাকে সে কথা বুঝান দুষ্কর। ঢাক বাজিয়ে বিয়ে হয়, প্রাণ বিনিময় হয় না। যাঁহার মহা সৌভাগ্যে এ ঘটনা ঘটে, তিনিই জানেন, প্রাণ তাঁর কথার অপেক্ষা রাখে নাই, লাভ-লোকসান, ক্ষতিবৃদ্ধি গণনা করে নাই, শুধু চোখের দেখাতেই আত্ম-বিনিময় করিয়াছে। যিনি শরতের এই বিমল প্রভাতে আমার হৃদয়কমলে আসন পাতিয়া বসিলেন, তাঁর কি নাম, কি জাতি, কোথায় বসতি, কিছুই জানি না। চিরপদ্ধতিমত মায়ের পায় অঞ্জলি দিবার নির্দ্দিষ্ট পূজার অবকাশে বাটী আসিয়াছিলাম। মৃণ্ময়ীর সম্মুখে চিন্ময়ী প্রতিমাকে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম।

গোপনে আমাদের গ্রামের গৃহে-গৃহে খোঁজ লইলাম, সে সুরসুন্দরীর কোন সন্ধান পাইলাম না। এদিকে পূজার ছুটিও ক্রমে ফুরাইয়া আসিল, আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। কিন্তু পড়াশুনা, ব'য়ের বোকা বহিয়া কলেজ যাওয়া, বাবার ঐকান্তিক ইচ্ছামত উকীল্ হওয়া, উচ্চাভিলাষ, প্রতিষ্ঠালাভ, এ সব এখন আমার ছেলেখেলা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই যে নয় দশ বর্ষ বয়সে কপাটি খেলিতাম, বিপক্ষদলের একজনকে মোড়্ করিতে পারিলে বিজয়ী বীরের গর্ব্ব অনুভব করিতাম, এখন মনে করিয়া হাসি পায় না কি? যদি বল, এখনই বা তোমার বয়স কি, যে বৃদ্ধের মত বৈরাগ্যের কথা কহিতেছ? সত্য! কিন্তু আমি যে সত্য-সত্যই বৃদ্ধ হইয়াছি। আমার জীবনের পরম মুহূর্ত্তে সুধার সঙ্গে-সঙ্গে গরল পান করিয়া আমি যে ত্রিকাল-বৃদ্ধ মহাদেবের বয়স পাইয়াছি। আমার কপালে আর একটা চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। সেই বিরূপাক্ষের চক্ষুতে সমস্ত সংসার আমি বিরূপ দেখিতেছি। ইহার আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম, উৎসাহ, উন্নতি, সবই আমার অসার বলিয়া মনে হইতেছে। এ সকলের পরিণাম কি? আবার ত সেই মাতৃগর্ভ, অশেষ যন্ত্রণা, সেই গুরুমহাশয়ের তাড়না—সেই 'লালফুল, তালজল, নূতনবাটী, পুরানঘটি, ছেঁড়াকাপড়, বাসিভাত!' কেবলই পুরান-পড়া মুখস্থ করিতে-করিতে প্রাণান্ত। এই যে এত পণ্ডশ্রম করিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা সত্ত্বেও বিজাতীয় ভাষা, বিজাতীয় বিদ্যা অর্জ্জন করিতেছি, কিসের জন্য? আমি মনুষ্যজন্ম প্রবল করিয়াছি, মনুষ্যত্ব লাভ আমার উদ্দেশ্য। সাহারার কত বালু, আটলাণ্টিকের কত গভীরতা, পৃথিবীর কত ব্যাস, কত পরিধি জানিয়া আমার কি হইবে? একখানি কুটীর বাঁধিবার মত স্থান, ঐ 'বাসিভাত' একমুঠা, একখান 'ছেঁড়া কাপড়', আর তাহাকে পাইলে, আমি স্বর্গ হাতে পাই। আমি আমার ব্যাপারী, জাহাজের খোঁজে আমার প্রয়োজন? তুমি মনে করিতেছ, তাহাকে পাইলেই কি মনুষ্যত্ব লাভ হইল? বলিতে পারি না। আমার মনে হয়, শুধু মনুষ্যত্ব বলিলে প্রেমকে ক্ষুণ্ণ করা হয়, প্রেম—দেবত্ব। এমন নিঃশেষে আত্ম-বিসর্জ্জন কি মানুষে সম্ভবে? যাক্, এসব আলোচনার প্রয়োজন নাই। আমি স্থির করিয়াছি, দূর ভবিষ্যতে 'শামলা' আর মামলার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া চিত্রবিদ্যা শিখিব। যে নিজের সত্তা হারাইয়াছে, তার পরের স্বত্ব-সাব্যস্ত করিতে যাওয়া বিলদৃশ নয় কি?

চিত্রবিদ্যা শিক্ষার কথা পিতাকে বলিলে তিনি প্রথম বিস্মিত হইলেন। তার পর আমার সঙ্কল্প অটল বুঝিয়া তাঁহার বিস্ময় ক্রোধে পরিণত হইল। আমার মা নাই। বিমাতা তাঁহার নিজ পুত্রের ইষ্ট কামনায় রুষ্ট পিতাকে অধিকতর উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কলেজ খুলিবার পূর্ব্ব দিন বাবা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'কাল তোমার কলেজ খুলিবে।' আমি দৃঢ় অথচ নম্রস্বরে বলিলাম, 'আমি আর পড়িব না।' পিতাও অবিচলিত শান্ত স্বরে বলিলেন, 'যে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করে, সে আমার পুত্র নয়, কুপুত্র, শত্রু। আমি তার মুখ দেখতে চাই না। তুমি যেখানে থাক, যা ইচ্ছা কর, আমার সঙ্গে আর তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তবে, পৈত্রিক বিষয়, একেবারে তোমাকে বঞ্চিত করব না। তোমার মাসে ত্রিশ টাকা-করে মাসহারা দিব।' সেইরূপই উইল্ হইল। সমস্ত সম্পত্তি আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার। আমার কেবল ঐ ত্রিশ টাকা মাসহারা। আমি উইলে সাক্ষী হইলাম। তার পর একদিন পিতার পদধূলি লইয়া কোন্ এক অনির্দ্দিষ্ট কূলের উদ্দেশে অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম।

ইহাই আমার অভিনব জীবনের সূচনা। আমি এখন চিত্রবিদ্যা শিখিয়াছি। কিন্তু যে প্রতিমূর্ত্তি আঁকিবার নিমিত্ত এত শ্রম করিলাম, তাহা এখনও আঁকিতে পারি নাই। তাহার অবয়বের সে মুগ্ধরিত মাধুরী, সে লীলায়িত

লাবণ্য ; সে কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ—সরল, সূক্ষ্ম, শুভ্র সীমন্ত রেখায় বিচক্ষ ; সেই লজ্জারুণ-রঞ্জিত তরুণ কপোল ; নীরব সোহাগ-ভরা সেই ঈষৎ স্ফুরিত অধর, সবই তুলিতে তুলিতে পারি। কিন্তু সে বাহ্যর বিহ্বল চক্ষু দুটী চিত্রকরের দুরাশা। সে কল্পনার কামনা, কবির ধ্যান, অতীতের বিলাস, অতল-স্পর্শের গভীরতাকে মূর্ত্তিদান করিব কেমন করিয়া ? সে স্বপ্নময় রহস্য কোন্ বর্ণে চিত্রিত করিব ? দুরাশা, দুরাশা ! কিন্তু তবু নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না। সে চক্ষু আমি যতই ধ্যান করি, ততই সে আমাকে আকর্ষণ করে।

আমি প্রতিবৎসর পূজার সময় আমাদের গ্রামে যাই, যদি আর একবার তাহার দেখা পাই। কিন্তু প্রতি বৎসর শরৎ আসে, মাঠে হরিৎ হিল্লোলে আলোছায়া খেলা করে, জলে কমল ভাসে, কাননে কাশফুল হাসে,—সে আর আসে না। সেই যে ক্ষণিকের তরে দেখা দিয়া, অনন্ত সময়-সাগরে বুদ্‌বুদের মত ফুটিয়া, আমায় চিরবিরহী করিয়া চির দিনের জন্য অন্তর্হিত হইল, কোথায় গেল সে ? বোধ করি, ইহজীবনে আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। তাহার নাম জানি না। জানিবার ইচ্ছাও নাই। শুনিয়াছি, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোত ভাবে পূর্ণ হইয়া আছেন, তিনি নাম-রূপের অতীত। আমার কাছে আমার সে—শুধু 'সে' এবং তাহাতেই সম্পূর্ণ। আমি তাহাকে আমার অস্থি-মজ্জা এবং সমস্ত চেতনা দিয়া অনুভব করি। সারাদিনের নিরুদ্দেশ ভ্রমণের পর সায়াহ্নে যখন শঙ্খ-কোলাহল-মুখরিত সহরের পথ দিয়া আমার শ্রান্তপদ মন্থর-গমনে গৃহাভিমুখী হয়, তখন মানস-নেত্রে দেখিতে পাই, যেন আমার ক্ষুদ্র গৃহকোণে সন্ধ্যাদীপ প্রজ্বলিত হইয়াছে, আর দুটী উৎসুক চক্ষু প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া আছে। সারা রজনীর বিরহশয়ন যখন স্বপ্নরচনায় নিবিড় মোহময় হইয়া উঠে, আমার তন্দ্রাতুর নেত্র অলসে ডুবিয়া যায়, সে সময় দেখি, সেই অব্যক্ত প্রীতিপূর্ণ চক্ষু দুটী স্থিরদৃষ্টিতে আমায় দেখিতেছে। গৃহ-কর্ম্মের ব্যস্ততায় যখন সে আমার বিজনভবনের কক্ষে-কক্ষে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার নিঃশব্দ চরণপাতের নূপুরনিক্কণ আমার কাণে বাজিতে থাকে। কর্ম্মের অবকাশে যখন সে আমার পাশে আসিয়া বসে, আমি মানসকানন উজাড় করিয়া তাহার অঞ্চল ভরিয়া আকাশকুসুম চয়ন করিয়া দি ; সে আমার জন্য মালা গাঁথে। কিন্তু বড় বিপদ হয়, যখন তাহাকে কাছে বসাইয়া ছবি আঁকি। তার সে আকুল আবেশভরা দৃষ্টি মনে মোহসঞ্চার করিয়া আমার সংযত হস্তকে এমনি শিথিল করিয়া দেয় যে, ছবি আর আঁকা হয় না। আমি কেবল বিহ্বল, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকি।

ঐ শারদাকাশে ছিন্ন-ভিন্ন শুভ্র মেঘগুলি যেমন আনা-গোনা করিতেছে, তেমনি ভাঙাগোরা সোণার স্বপনে আমার দিনগুলিও বহিয়া যায়। কিন্তু এই সময় আমার মন বড় ব্যাকুল হয়। যখন সানা'য়ে আগমনীর সুর বাজিতে থাকে এবং শরৎ প্রকৃতির বিধুর হৃদয়ে মিলনাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, তখন আমারও নিভৃত অন্তস্তলে যেন বহুদিনের একটা বঞ্চিত বাসনার সঞ্চিত বেদনা লুটাইয়া-লুটাইয়া কাঁদে, আমি কাণ পাতিলেই তাহা শুনিতে পাই ; এবং শুনিলে স্থির থাকিতে পারি না। এ বৎসর সে ক্রন্দন আরও ঘনীভূত হইয়াছে। কোথায় সে ? কোথায় সে ? কোথায় তুমি রহস্যময়ি ! কোন্ সুদূর আকাশে বসিয়া আমার জীবন-প্রভাতে প্রথম উষারাগ জাগাইয়াছিলে ? কল্পনার কোন্ কল্পলোক হইতে আসিয়া আমার আঁধার ঘরে সোণার দীপ জ্বালিয়াছিলে ? কোন্ কাম্যলোক হইতে অভিসার করিয়া ভিখারীর হৃদয়দ্বারে অতিথি হইয়াছিলে, প্রেয়সি ? জন্ম-জন্মান্তরের পর দেখা দিলে, মনের কথা অধরের অন্তরালে লুকাইয়া রহিল, তুমি মৌন মুখে চলিয়া গেলে। আমার দেহের প্রতি লোমকূপ যে পুলকিত দৃষ্টিতে তোমার পানে চাহিয়াছিল, প্রতি শোণিতবিন্দু যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় চীৎকার করিতেছিল, তুমি একবারও ফিরিয়া দেখিলে না, নিষ্ঠুর !

নিষ্ফল রোদনে পূজার কয়দিন কাটিয়া গেল। আজ বিজয়া। মন্দির শূন্য করিয়া সোণার প্রতিমা বিদায় দিতে হইবে। বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিয়াছে। চারিদিক হইতে একটা করুণ বিলাপের সুর ভাসিয়া আসিতেছে, যেন নিদারুণ মর্ম্মব্যথায় কে গুমরিয়া-গুমরিয়া কাঁদিতেছে ! আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। বাহির হইলাম। আমার যেন কে অলক্ষ্যে বন্ধন করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া চলিল। সূর্য্য তখন অস্তগামী। আকাশে রক্তচন্দ্রাতপ, গঙ্গা-অঙ্গে রক্ত-পট্টবাস। সেই লোহিত গগনতলে, রক্তা-ম্বরা জাহ্নবীর কোলে অন্তিম শয়নে কে অনন্ত-পথগামিনী ?

কেমন একটা দুঃসহ কৌতূহলের আবেগ আমাকে পীড়া দিতে লাগিল। আমি ধীরে-ধীরে সেই শ্মশান-শায়িনীর সন্নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম—চিনিলাম, আমারই হৃদয়লক্ষ্মী। প্রথম দর্শনে যে সিন্দূররাগ দেখি নাই, আজ দেখিলাম, অগ্নিশিখার মত তাহার সীমন্তে জ্বলিতেছে। একবার মনে হইল, ছুটিয়া গিয়া ঐ শ্মশানশয্যা হইতে তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লই; কিন্তু তখনই আমার পদ নিশ্চল হইল। ঐ এক বিন্দু সিন্দূর আমাদের উভয়ের মধ্যে ইহলোকে দুর্ভেদ্য ব্যবধান সৃজন করিয়াছে।

যাহারা ইহাকে বিসর্জ্জন দিতে লইয়া আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক জন কহিল, 'আরও কতক্ষণ ভোগাবে, বে? আপনিও ডুগবে? এত জ্বালা-যন্ত্রণা পেয়েছে, তবু যে শীগ্‌গির যেতে চায় না।' আর একজন উত্তর দিল, 'হয় ত কাউকে শেষ দেখা দেখ্‌বার জন্যে প্রাণ বেরুচ্ছে না।' বোধ করি, এই অকরুণ আলোচনা শুনিয়া একজন আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, 'আহা এমন সোণার প্রতিমা! মেয়েটী কে মশায়?' উত্তর হইল, 'আমাদের কেউ নয়, মশায়!' 'সধবা দেখ্‌ছি?'—'হাঁ। কপালে সিঁদুর রয়েছে, কাজেই সধবা। এর স্বামী এক জন বড়মানুষ। আমাদের মনিব। কি করি মশায়, পেটের দায়, নইলে অমন সাবিত্তের অঙ্গ মুখে দিলে পাপ হয়।' আর একজন বলিল, 'মেয়েটীর, মশায়, যেমন লক্ষ্মীর মতন রূপ, কাজেও তেমনি লক্ষ্মী ছিল। এর স্বামী একে যে যন্ত্রণা দিয়েছে, মনে হলে গা কর্-কর্ করে! এর গা-ময় তার অত্যাচারের চিহ্ন। ভাল করে খেতে-পরতে দিত না। অন্য কেউ হলে আপ্তঘাতী হত, নয় কুলে কালি দিত। কিন্তু মেয়েটী এমনি লক্ষ্মী, সব মুখ বুজে সয়েছে।' এর স্বামী যে শ্মশানঘাটে উপস্থিত ছিল না, তার মহা সৌভাগ্য, আর আমারও পরম কল্যাণ। নরহত্যা মহাপাতক অদৃষ্টে নাই।

ধনীর অন্তঃপুরের এই পৈশাচিক কাহিনী শুনিয়া আমি বসিয়া পড়িলাম। আমার মানস-চক্ষের সমক্ষে একটা অনন্ত মরুভূমির চিত্র ফুটিয়া উঠিল। সেই জনশূন্য ভীষণ স্থান, তাহার নিঃশব্দ দাহন, দুঃসহ জ্বালা, প্রাণান্তিক পিপাসা, আর তাহার দানবীয় কবলে কলিত যৌবন, দলিত জীবন। একদিকে অত্যাচারের অট্টহাস, অন্যদিকে মূক সহিষ্ণুতা, আর হতাশে মন্থরগামী মৃত্যুর জন্য নিষ্ফল প্রতীক্ষা। কিন্তু কেন এমন হয়? যার বাঞ্ছিত চরণক্ষেপে আমার জীবন-পথ পুষ্পিত হইতে পারিত; আমার সে কামনার কুসুম, ধ্যানের প্রতিমা, জন্মান্তরীণ সাধনার প্রত্যক্ষ ফল; আমার সেই অন্তরলক্ষ্মী কার অন্তঃপুরবাসিনী হইয়া আজ ধূলায় লুটাইতেছে! কেন এমন হয়, তুমি বলিতে পার? যে যাহাকে পাইলে সুখী হয়, সে তাহাকে পায় না কেন? এই হতভাগিনীর মর্ম্মব্যথার ব্যথী কেহ ছিল না। বিধাতা ইহাকে যাহার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সে ত তাঁহার দান আদরে গ্রহণ করে নাই। ইহার তৃষিত চিত্ত তাহার কাছে কখন এক বিন্দু স্নেহ পায় নাই। কিন্তু যেখানে ইহার জন্য স্বর্গসুধা সঞ্চিত ছিল, সেখান হইতে কেন এ বঞ্চিত হইল? এই যে দুঃস্বপ্নের মত ইহার জীবন অবসান হইল, ইহাই কি ইহার নারী-জীবনের সার্থকতা?

তাহার মুখ দেখিয়া আমার মর্ম্মের ভিতর একটা বুকফাটা রোদন রুদ্ধপিঞ্জর বিহঙ্গের মত মুক্তি পাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কিন্তু আমি নীরস নেত্রে সে মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। এই পরম সময়েও এ আত্মীয়-স্বজন সকলেরই দ্বারা পরিত্যক্ত। এমন কেহ নাই যে ইহার শুষ্ক কণ্ঠে একবিন্দু জল দেয়, যে ইহার উপাধানচ্যুত মস্তকটী ধরে ক্রোড়ে লইয়া বসে! একটী করুণ সম্ভাষণ, একটী স্নেহ-কোমল স্পর্শ, অন্তিম বিদায়ের এক বিন্দু অশ্রুজল শেষ সম্বল করিয়া, একখানি ব্যথিত মুখের উপর শেষ দৃষ্টি রাখিয়া এ অভাগিনী জীবনের শেষ পথে যাত্রা করিতে পারিল না! অন্তিম সময় ইহার তৃষিত শ্রবণে করুণাময়ী জাহ্নবী কেবল অনন্তনিদ্রাকর্ষণী সঙ্গীত-ধারা ঢালিতে লাগিলেন; মুখ চাহিয়া রহিল কেবল শূন্য আকাশ, আর সে—যে ইহার চিরপ্রতীক্ষায় শূন্য হৃদয় পাতিয়া রাখিয়াছে! হায়, আমার চিরশুষ্ক হৃদয়ের একটী কথা যদি ইহাকে শুনাইতে পারিতাম! কিন্তু এতদিন কি আমাকে ইহার মনে আছে? সেই দশ বৎসর পূর্ব্বে ক্ষণিকের দেখা, আমার জীবনের সেই অনন্ত মুহূর্ত্ত, তাহার কোন স্মৃতি কি ইহার জীবনের কোনখানে লুকাইয়া আছে? কে বলিতে পারে! হয় ত সেই স্মৃতি মুছিবার জন্য এ কত নিষ্ফল অশ্রু ঢালিয়াছে!

মুমূর্ষুর মুখ চাহিতে-চাহিতে আমার মনে হইল, যেন তাহার শীর্ণ, শুষ্ক ঠোঁট দুটী ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। বোধ

হইল, পিপাসায় গলা শুকাইয়াছে। ইহার শ্মশানবান্ধবগণ দূরে বসিয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতেছে। এখানে কেহ নাই; আছি কেবল আমি আর সে। দীর্ঘ দশ বৎসরের পর আজি আমরা আবার বৈতরণীর বেলাভূমে, মৃত্যুর মহাতীর্থে মিলিত হইয়াছি—চিরবিদায় লইতে। এখানে সকল সংসার-সম্বন্ধ শেষ হয়। আজ এই শ্মশানশায়িনী কাহারও মাতা নহে, দুহিতা নহে, ভগ্নী নহে, স্ত্রী নহে। এখানে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সকলেরই অবসান। 'পর-পুরুষের স্পর্শে পতিব্রতা, হায়রে, না ক সতী সতীধর্ম্ম রেখা'—আমি ইতস্ততঃ না করিয়া ভাগীরথী-জলে বস্ত্র ভিজাইয়া আনিলাম এবং ধীরে ধীরে তাহার অধরে সিঞ্চিত করিতে লাগিলাম। সে চক্ষু মেলিয়া আমার মুখের পানে চাহিল এবং চাহিতে-চাহিতে তাহার ম্লান অধরপ্রান্তে হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল। সেই হাসিটুকু শেষ সম্বল করিয়া সে অনন্ত-যাত্রা করিল।

কিন্তু এই হাসিটুকুতে সে আমার কাছে ধরা দিয়া গেল। তাহার এই শেষ হাসিটুকু আমার পুষ্পাঞ্জলির প্রতিদান স্বরূপ আমিও অনন্ত পথের সম্বল করিয়া রাখিলাম। চারিদিকে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতে লাগিল, আর সানা'য়ের ব্যাকুল বিলাপের সঙ্গে-সঙ্গে আমার গভীর মর্ম্মস্থল হইতে আপনা-আপনি একটা বাধিত উচ্ছ্বাস উঠিতে লাগিল—'সোণার প্রতিমাখানি কোথা ফেলে এলে গো!' —কোথায়! কোথায়? সংসার মহারণ্যে এই পথহারা আত্মা, এই দিগ্‌ভ্রান্ত পান্থ, কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত কোথায় চলিয়া গেল! আজ অকাল-বার্দ্ধক্যে আমার সম্মুখদৃষ্টি শমনের সিংহদ্বার-সংলগ্ন, পশ্চাদ্‌দৃষ্টি অতীতের প্রেতভূমে। আজিও সানা'য়ের সেই সকরুণ সুর বিনিদ্র বেদনায় আমার অন্তরে বাজিতেছে—কোথায়! কোথায়! জন্ম মৃত্যুর অনন্তপ্রবাহে, অনন্ত বিচ্ছেদ-মিলনে আর কি আমার প্রাণ-প্রতিমার সাক্ষাৎ পাইব, না, এই দেখাই শেষ?

শরতে পূর্ব্ববঙ্গ

[শ্রীঅশ্বিনীকুমার মণ্ডল]

সাঁঝের আঁধার সরিয়ে দিয়ে চাঁদ উঠেছে হেসে,
আকাশ-ভরা তারাগুলি ছাদ্‌ছে পাশে বসে'।
নদীর বুকে বান লেগেছে যাচ্ছে সাগর পানে,
কল্ কল্ কল্ জল চলেছে মৃদু মধুর তানে।
খেয়াল গেয়ে বাঙ্গাল নেয়ে যাচ্ছে তরী বেয়ে,
দুইএর মাঝে খাতা নিয়ে মেজ কর্ত্তা ও'রে।
ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্ ব'টে গুলি পড়্‌ছে তালে তালে,
জলের ঘায়ে চাঁদের ছবি যাচ্ছে ভেঙ্গে জলে।
গন্ধবাহী মন্দ পবন গন্ধ নিয়ে এসে,
পরাণ-পুলে দিচ্ছে ঢেলে নদী তীরে বসে'।
যেদিকে চাও, দেখ্‌বে খালি মাঠ্‌টী ভরা জল,
ধানের আগা বুকে নিয়ে হাস্‌ছে খল খল।
বাতাস এসে শ্যামল মাঠে ঢেউ খেলিয়ে যায়,
সোণার ফসল পড়্‌বে ঝরে দু'দিন পরে তায়।

ক্লান্তকায়া কৃষক ভায়া কাঁথার তলে শুয়ে,
সোণার স্বপ্নে জেগে বসে গুড়্‌ক সেজে নিয়ে।
হুকার রবে উঠে বলে হাঁস্‌লি-পরা বিবি,
'দু'মণ পাটে দিতে হ'বে সোণার নাকছাবি।'
কৃষক বলে, 'যাহা চাও, দিব তোমায় তাই,
মহাজনের হাত থেকে যদি রক্ষা পাই।'
'ভয় কি তাকে', বিবি কহে, নথে দিয়ে নাড়া,
'আমার কাছে পাঠিয়ে দিও, কেঠিয়ে করবো তাড়া।'
এমন কালে গভীর স্বরে ডাক্‌লো কালুমিঞা,
'পাট বিকিয়ে বসে আছ, এস টাকা নিয়া।'
কালু বলে, 'দেখ্‌লে বিবি, কজর না হ'তে
ঘোষের পো ডাক্‌ছে দোরে, যাও ঝাঁটা হাতে!'
বিবি কয়, 'যাও না তুমি হেঁসেলের কোণে,
বল্‌বো আমি—কাল্‌কে তুমি গেছে ম্যাজবানে।'

আসার আশায়

[শ্রীনিশিকান্ত সেন]

পর-পর আমার চারটি ভাই-বোন হয়ে মারা গেল ; তারপর বিনু ;—বড় স্নেহের, বড় আদরের। বিধবা হ'য়ে আমাকে যখন বাপের বাড়ীর আশ্রয় নিতে হয়, তখন বাবা মারা গেছেন,—মা মর-মর। তিনিও তাঁর কোলের মেয়েটিকে আমার কোলে সঁপে দিয়ে চোখ বুজ্‌লেন। আমিও বিনুকে ইতল, স্নিগ্ধ প্রলেপের মত বুকে তুলে নিলুম। তার পর তাকে বুকের রক্ত দিয়ে, কোলে-পিঠে করে মানুষ করি,—বে দিয়ে কাছে রাখি। ভেবেছিলুম, বাপের ভিটের প্রদীপ জ্বলবে, আর বিনুর মুখের সরল শুভ্র হাসিটি আমার অন্ধকার ইহজীবনের পথে যে স্নিগ্ধ রশ্মিপাত করবে, তাতে আমার পরকালের পথও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। হায় রে ভ্রান্তি! মানুষ পদে-পদে দেখে, তার সাধের বাঁধা বাঁধগুলি পদ্মার পাড়ের মত কেবল ধস্ ভেঙে-ভেঙেই পড়ে, তবু তারি ওপর বাসা বাঁধবার চেষ্টা!

বিনু নিজে যেমন সুখী হয়েছিল, সতুকেও তেমনি সুখী করেছিল। সংসারে স্বামি-স্ত্রীতে ভালবাসা থাকলে আর দুঃখ কিসের? সেই ভালবাসায় দু'জনে এরা গলায়-গলায় ডুবেছিল। এত তিল ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকতে হলেই এদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ত। সতুকে কোন একটা কাজে কোথাও যেতে বলেছি—মোটে দিন-দুচ্চার সেখানে থাকতে হবে,—অমনি বিনু মুখ ভার করে এসে হাজির! "দিদি, ও—দিদি, ও ঐ ত মানুষ,—কেমন করে সেখানে গিয়ে থাকবে? কাছে বসে না খাওয়ালে খায় না, হাওয়া না-করলে, গায়ে মাথায় হাত না বুললে ঘুমোয় না—।" কথা শুনে অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকি ;—নিতান্তই বাড়াবাড়ি নয় কি? এক-একবার মনে হয়, হাসতে-হাসতে বলি, "তুই যা ওকে বসে-বসে খাওয়াস, তা আর বলে' কাজ নেই। কেবল তো ঐ হিঃ-হিঃ-হিঃ আর হাঃ-হাঃ-হাঃ—ওর নাম বুঝি বসে-বসে খাওয়ানো! আর পাখার হাওয়া,—তা কে কাকে করে, তা বুঝি কখনো আমার চোখে পড়েনি! কিন্তু বলতে পারি কই? বললে যে এখনি মাথা-খোঁড়া-খুঁড়ি সুরু হবে। অগত্যা আমাকে বলতে হয়, "তুই কি ক্ষেপেছিস বিনু? সতুকে কখনো আমি একলা বিদেশে পাঠাই? আমি শুধু ওর মন বুঝছিলুম। সে দরকার হয়, বুড়ো গোমস্তাই যাবে এখন।" কথা শুনে বিনুর চোখে যে কৃতজ্ঞতা উথ্‌লে ওঠে, ফুলের মত ঠোঁট দুটিতে যে হাসির রেখা দেখা দেয়, তা দেখে মনে হয়, এই আমার ইহকালের আনন্দ, পরকালের পথের আলো।

আবার বিনুকে কোথাও কোন বে-থা উপলক্ষে নিয়ে যেতে চাইলেও ঠিক অমনি। সতু এসে সুর টান্‌তে সুরু করে, "দেখুন, ও কেমন করে যাবে, দিদি?—" ইচ্ছে হয় বলি, এই যেমন করে আর দশজনে যায়, আমি যেমন করে যাব। কিন্তু মুখ দেখে কিছু বলতে পারিনে। সতু বলতে থাকে, "ওর যে অনিয়ম আদপে সহ্য হয় না—বেশি খেলেই পেট ফোলে, অম্বল হয়। তার পর যদি একটু রাত বেশি জাগে, তা'হলে কি আর রক্ষা আছে!" মনে-মনে বলি,—উঁহু, রাত তো মোটে জাগেই না, তবু যদি রাতভোর হাসি ফিস্‌ফিস্ না শুন্‌তুম! কিন্তু সে কি বলা যায়? বলি, "তুমি পাগল হলে না কি, সতু? ঐ অমন পেটরোগাকে কখনো কেউ নেমন্তন্নে নিয়ে যায়?" কিন্তু এতটা কি ভাল? এই এতটুকু একটু ঘা সয় না। সংসারে কত বড়-বড় আঘাত,—কথাটা শেষ পর্য্যন্ত ভাবতেও আমার বুকের ভেতর কেমন করে ওঠে। আপনার অদৃষ্ট ভেবে শিউরে উঠি।

একদিন হঠাৎ শুনি, সতু বিদেশে যাবে। ব্যাপার কি? তবে কি ঝগড়াঝাটি হল না কি! যদিও এদের সংসারে তা একেবারেই নূতন, তবুও খবর নিলুম। নিয়ে জান্‌লুম যে, তা নয়—সতু চাকরি করবে, সংসারের উন্নতি করবে, নিজের উন্নতি করবে।—ভালই তো। বিনুকে জিজ্ঞাসা করলুম, "সতুকে ছেড়ে তুই থাকতে পারবি তো?" সে হাস্‌লে না,—কেমন মনমরা হয়ে বল্‌লে, "তা কি করব দিদি?—পারব না বললে যে, ওর মনে কষ্ট হবে। বলে—

ওর কত আলাপী বন্ধু বিদেশে গিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মানুষ হয়ে গেল, আর ও কিছুই করে উঠ্‌তে পার্‌লে না!" কথাটা যে মিথ্যে, তা নয়। পুরুষমানুষ কি চিরকাল মেয়েমানুষের আঁচল ধরে ঘুরঘুর্ করে ঘুরে বেড়াতে পারে? তবু সতুর বিদেশে যাওয়ার প্রস্তাবটা আমার কাছে কেমন অদ্ভুত খাম্‌খেয়ালি বলেই মনে হল।

তার পর একদিন সকালবেলা দেখি, না, সত্যসত্যই সতু সাজগোজ করে এসে হাজির! সঙ্গে-সঙ্গে বিনু সে আঁচলে চোখ মুছ্‌ছে। ব্যাপারটা যে তলে-তলে এতদূর এগিয়ে এসেছে, তা আমি ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পারিনি। বোধ হয়, সেদিনকার নিমন্ত্রণ উপলক্ষে আমি যা বলেছিলুম, তার মধ্যে থেকে ওরা একটু বিদ্রূপের ভাব লক্ষ্য করে থাক্‌বে। যাই হোক সতু আমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বল্‌লে, "চল্‌লুম দিদি! বিনুর সম্বন্ধে তোমাকে আর কি বল্‌ব, তোমার কাছেই তাকে গচ্ছিত—" কথাটা আর সে শেষ কর্‌তে পার্‌লে না; চোখ দুটো টস্‌টস্ করতে লাগল, আর সেই জলভরা চক্ষু দুটি দিয়ে সে এমন করুণ, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে বিনুর দিকে চাইলে যে, বিনু একেবারে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল। জিজ্ঞেস করলুম, "কোথায় যাওয়া হবে, সতু?" "কাজের চেষ্টায়।" "সে তো জানি,—কোথায়?" "কোথায় সে তো বল্‌তে পাচ্ছিনে। আগে অবিশ্যি কল্‌কাতায়ই যাব। সুবিধে না হয়, অন্যত্র।" শুভ সংকল্প করে বেরিয়েছে, বাধা দিতে নেই, দিলুম না। কিন্তু আজ মনে হয়, যদি দিতুম, যদি তাকে জোর করে ধরে রাখতুম, তা'হলে বুঝি এমনটা হত না। আবার ভাবি, জোর করে ধরে রাখবার আমি কে? যে লোক বিনুকে ছেড়ে এক পা কোথাও নড়ে না,—নড়তে হলে চারদিকে অকূল পাথার দেখে,—সে অনায়াসে অনিশ্চিতের উদ্দেশে বিদেশ-বিভুঁয়ে রওনা হল! আর অমন যে স্বামিগতপ্রাণ বিনু, সেও তাকে ছেড়ে দিলে!—কোন্ যাদুকরের এ ভোজবাজি? এর ভেতর আমার বাধা দেবার কি আছে?

সতু চলে গেল। বিনু আর আমি পুকুরপাড়ের কদম্ব-তলায় গিয়ে দাঁড়ালুম। যত দূর দেখা যায়, সে ফ্যাকাসে চোখে, কাঠের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে, চেয়ে রইল। তার পর যখন সতু পথের বাঁকে চোখের আড়াল হল, তখন বিনু কেঁদে, আমার গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌লে, "ও আর কখনো বিদেশে যায় নি, দিদি, কখনো যায় নি।"

২

সতু পশ্চিমে গিয়ে খবর দিলে · মোটে সেই একখানা চিঠি। তার পর আর চিঠিপত্র নেই। বিনুকে আর কিছুতে বুঝিয়ে স্থির রাখতে পারিনে। বই-পড়ায়, গল্পের, হাসি-ঠাট্টায় কোলাহলে যে বাড়ীতে রাত দুপুর অবধি চোখের পলক ফেল্‌বার যো ছিল না, সেই বাড়ী হঠাৎ একেবারে স্তব্ধ—যেন জনমানবহীন মায়াপুরী। আমারি প্রাণ যে হাঁপিয়ে ওঠে! হপ্তা দুই বাদে এলাহাবাদ থেকে বিনুর নামে এক কার্ড এল। সতুর লেখা চিঠি মনে করে' কৌতূহলবশতঃ পড়ে দেখতে গেলুম।—কি সর্ব্বনেশে চিঠি! পড়তে-পড়তে লেখাগুলো যেন সব কাপসা হয়ে ধোঁয়ার মত শূন্যে উঠে মিলিয়ে গেল। আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে পড়লুম! জ্ঞান হলে, তাড়াতাড়ি উঠে চিঠিখানি জলন্ত উনানে ফেলে দিলুম। খবর এই যে, সতু নেই—প্লেগ হয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তার মৃত্যু হয়েছে। সতুর আত্মীয়-স্বজন নেই বল্‌লেই হয়। দূর সম্পর্কের যে দুচার জন আছে, তারাও ঠাঁই-নাড়া হয়ে এখানে-ওখানে। সতুর এই রকম এক আত্মীয় এলাহাবাদে থাকে,—চিঠিখানি তারি লেখা। চিঠির এই নিদারুণ সংবাদ জান্‌তে পারলে, বিনু কি এক মুহূর্ত্ত বেঁচে থাকত? ঐ চিঠিখানির মত চক্ষের নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যেত-না? চিঠি যে তার হাতে পড়েনি—ভালই। এলাহাবাদের এই খবর, এই চিঠির সূত্রে আমি যা জান্‌লুম, আর কেউ তা জান্‌বে না। আমি বিনুকে বাঁচিয়ে রাখব। পাষাণে বুক বেঁধে আমি তার সঙ্গে ছলনা করতে প্রবৃত্ত হলুম।

"দিদি, ও দিদি, চিঠি পাইনে কেন?" "কি করে বল্‌ব বল্?—তুইও যেখানে, আমিও সেখানে।" "আমায় বলেছিল, রোজই লিখ্‌বে—কই সে চিঠি?" "বোধ হয় কাল আস্‌বে।" "কাল!—আবার কাল! বল্ না—আজই।" "আজ কি আর চিঠির সময় আছে, বিনু? তুই দেখিস্, কাল ঠিক আস্‌বে।" দিন কতক একটু ধৈর্য্য ধরে থাকে, তার পর আবার ছট্‌ফট্ করতে-করতে আসে।—"দিদি! ও দিদি!" রাগের ভান করে বলি, "তুই অমন করিস কেন বল্ দেখি?" "কি কর্‌ব, আমি যে কিছুতেই স্থির থাকতে

পারি নে।" "কেন পারিসনে তুই? সে পারছে কেমন করে? সেও তো তোকে মুহূর্ত্ত না দেখে থাকতে পারত না!" ভয়, দুর্ব্বল, কাতর কণ্ঠে বিনু বলে, "তারও তো পারবার কথা নয়—কেমন করে যে আছে, তা তো বলতে পারি নে! আচ্ছা, তুই না বলেছিলি,—তোতে-আমাতে পশ্চিম যাব,—চল্ না তবে।" "ও মা! তুই যে অবাক্ করলি! শোন একবার অনাছিষ্টি কথা! পশ্চিম কি অমনি মুঠোর ভেতর! কাজের চেষ্টায় কত জায়গায় সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পশ্চিমে তাকে আমরা কোথায় খুঁজব বল্?" "তা হলে কি হবে দিদি?" উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাসকে চেপে নিয়ে কাজের ভান করে চলে যাই,—বিনুর কথার জবাব দিতে পারিনে।

যা ভেবেছিলুম, তা হল না। মন্দ খবর বাতাসের আগে আগে ধায়। কথাটা কিছু দিনের মধ্যেই গাঁয়ে ধেয়ে এসেছে বুঝতে পারলুম। কিন্তু সবাই বলে, 'শুনলুম।' কে যে শোনালে, তা কেউ বলতে পারে না। একটু সুবিধা হল। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলি,—মিছে কথা,—কেউ শত্রুতা করে রটাচ্ছে। বিনু কিছু শুনতে পায়নি। সে বাড়ীর বা'র হয় না। তার পর সতুর বিদেশ যাওয়ার পর থেকে একেবারেই কোণঠেসা হয়েছে। কিন্তু, তবু, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে যে মানুষের আনন্দ! তাই ভয় হয়, পাছে দেখ্-না-দেখ্ কেউ বিনুর কাছে কথাটা পেড়ে বসে।

এদিকে সধবার সমস্ত আচারের ওপর বিনুর শ্রদ্ধা যেন হাজারগুণ বেড়ে গেল। আগে মাছের ওপর ঝোঁক তার বড়-একটা ছিল না। এখন আর মাছ না হলে চলে না। খায় যে বেশি তা নয়, কিন্তু পাতে চাই। অভাগী বুঝি মনে করে, এমনি করলেই যমের পথে কাঁটা পড়বে! বিকালটি হতে-না-হতেই কাপড়খানা কেচে, আর্দি, চিরুণী, সিঁদুর আলতা নিয়ে এসে হাজির! আমিও দ্বিধাহীন চিত্তে চুল বেঁধে, সিঁদুর আলতা পরিয়ে, টিপ কেটে দিই। পাপ?—যদি হয়, সে তো আমার, তার জন্যে আমি ভাবিনে। হাতের নোয়া খুলতে, সিঁথের সিঁদুর পুঁছতে যে কি হয়, সে তো আমি জানি! বিনুর বুকে আমি সে কুল কাঠের আগুন কেমন করে জেলে দি!

অন্যান্য দিনের মত সেদিনও অপরাহ্নে বিনুর চুলটা বেঁধে দিয়ে, সিঁথায় সিঁদুর পরাতে যাচ্ছি।—"ওমা, তোর কি আক্কেল না!" পেছনের দিকে একটা ভাঙ্গা, খানখেনে কাঁসরের মত আওয়াজ শুনে, আঁৎকে উঠে চেয়ে দেখি, গাঁয়ের সেই দক্ষিণা পিসী একেবারে আমার পিঠের ওপর! তিনি গালে হাত দিয়ে, অবাক্ হয়ে, একবার আমার দিকে, আর একবার বিনুর দিকে তাকাচ্ছেন! আমি ত্রস্ত হয়ে চোখের ইসারায় তাকে চুপ করে যাবার জন্যে কাতর মিনতি জানালুম। কিন্তু কাজীর দোরে ভিক্ষের পিত্তেশ মিছে। তিনি কোঁস-কোঁস করে গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে বললেন, "বলিস কি লো! পরকাল বলে যে একটা কথা আছে, তাও কি তোরা মানিস্ নে?" তৎক্ষণাৎ ঠোঁটের আগায় এই কথাটা এল যে, পরকালের সঙ্গে সম্পর্ক তো তোমার ঐ পান কাপড়ে আর সিঁদুর আলতা ঘুচিয়ে;—তা-ছাড়া আর যা-কিছু—সবই তো তোমার বাক্সবন্দী। কিন্তু সে আর বললুম না; বললুম যে, "তুমি ঘরে গিয়ে তোমার পরকালের চরকায় তেল দাওগে। বাড়াবাড়ি করলে এখানে সুবিধে হবে না, পিসী!" ঝগড়া করা স্বভাব আমার নয়—পারত-পক্ষে কারো সঙ্গে আমি ঝগড়া করিনে; কিন্তু রাগ হলে যে চুপ করে যাব,—উচিত কথা বলব না, এমন বাপের বেটী আমি নই। সর্ব্বংসহাপহারীর কৃপায় কাকেও আমার ভয় করে চলবার কারণ ঘটেনি। সেই জন্যেই বোধ হয়, দক্ষিণা পিসীর মত পাড়াকুঁদুলীরাও আমাকে কখনো ঘাঁটাতে সাহস করত না। পিসী বেগতিক দেখে রাগে সস্‌গস্ করতে-করতে চলে গেল।

তার পর বিনুর মুখের দিকে চেয়ে দেখি, তার চোখ কপালে উঠেছে। এক হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে, আর এক হাতে তার চোখে-মুখে জলের ছিটে দিতে লাগলুম। একটু সুস্থ হয়ে ক্ষীণ, কাতর কণ্ঠে বিনু বললে, "আমাকে আবার কেন জাগালে, দিদি? আমি যে এতক্ষণ বেশ ছিলুম।" অন্তরের কথা অন্তর্যামী জানেন,—মুখে কঠোরতার ছল করে আমি বললুম, "কেন, কি হয়েছে তোর? পোড়ারমুখীরা সবাইকে নিজেদের মত দেখতে চায়! ওদের চোখে এয়োতির সিঁথার সিঁদুর, পায়ের আলতা আগুনের জ্বালা জেলে দেয়,—তাই একটা ছুঁতো পেলেই ওরা অমনি ছট্‌ফট্ করতে-করতে আসে।" "না দিদি, সত্যি বল্, আমার কি হয়েছে।"—বলতে-বলতে বিনুর গলার স্বর রুদ্ধ, চোখের জল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

আর কোনো মেয়ে হলে সে কিছুতে আপনাকে সামলাতে পারত না। ক্রন্দনের পাথর-চাপা স্রোতকে উন্মুক্ত করে দিয়ে আকাশ-পাতাল-পৃথিবী ভাসিয়ে দিত। কিন্তু আমি পাষাণী; বিধাতা আমাকে স্বতন্ত্র ধাতুতে গড়েছিলেন। বুকে দুঃখের আগুন পুষে রেখেও বাইরে আমাকে স্নিগ্ধ হাওয়া বিলুতে হয়। শুনলে সবাই আশ্চর্য্য হবে,—আমি চিতার আগুনে আমার নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে আহুতি দিয়ে এসেও, এক দিনের তরে এতটুকু চোখের জল ফেলিনি। আমি অবিচলিত কণ্ঠে বললুম, "অনেক দিন খবর নেই, তাই নানা লোকে নানা কথা রটাচ্ছে। তুই ও-সব কথায় কাণ দিস্‌নে বিনু!" "তুই কিছুই শুনিস নি?" "না লো, না; শুনলে কি তোকে আমি মাছ-ভাত খেতে দি? তোর দিদির কি পরকাল নেই?" বিনুকে যে আমি এমন করে ঠকাব, সে কখনো স্বপ্নেও ভাবে নি। তার পর সে আস্তে-আস্তে প্রকৃতিস্থ হল। ধীরে-ধীরে, যেন নিজেকে প্রশ্ন করছে এমন ভাবে, বললে, "তা'হলে চিঠি নেই, খবর নেই...এরই বা মানে কি?" "মানে কত হতে পারে। হয় ত চাকরি হয়নি, শীগ্‌গীর চলে আসবে; নয়ত চাকরি হয়েছে, মনে ক'রছে আগে টাকা জমুক...তার পর বাড়ী গিয়ে হঠাৎ সবাইকে চমকে দেবে...তারা কত খুশী হবে।" "খুশী হবে! সে কি জানে না দিদি, যে, টাকার আশায় মানুষ বাঁচতে পারে না? তুমি কি মনে কর, আমি আর বেশী দিন বাঁচব?" অজ্ঞাতসারে চোখের কোণ ভিজে উঠেছিল; আর্দ্র কণ্ঠে বললুম, "বিনু, তুই কি আমায় না ক্ষেপিয়ে নিশ্চিন্তি হবি নে।" কিন্তু বিনুর মুখ দেখে মনে হল, আমার কথা তার কাণেই যায় নি।

৩

তার পর সে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। চিঠির জন্যে আর তেমন ব্যস্ততা বা সতুর না আসার কারণ নিয়ে তার প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছিল না। ঘরের একটী পাশে, জানালার ধারটিতে শুয়ে-বসে সে তার একঘেয়ে দিনগুলি কোন মতে কাটিয়ে দিত। দেহ ক্রমশঃ জীর্ণ হয়ে-হয়ে সলতের মত শীর্ণ হয়ে এল। অবস্থা দেখে মাঝে-মাঝে আশঙ্কা হ'ত, বুঝি এমনি মিটমিট করে জ্বলতে-জ্বলতে, একদিন কবে খপ্‌ করে নিবে যাবে!

"দিদি! দিদি!"—বহুদিন পরে বিনুর কণ্ঠে আবার সেই আনন্দ-চাঞ্চল্য! ঘরের ভিতর ছুটে গিয়ে দেখি, সে জানালার ভিতর দিয়ে একদৃষ্টে কি দেখ্‌ছে—দৃষ্টিটুকুর মধ্যে যেন তার দেহমনের সমস্ত আবেগ কেন্দ্রীভূত! "কি রে বিনু, কি?" "ঐ দেখ্‌ দিদি, কে আস্‌ছে।" সম্মুখে মাঠ ধূ ধূ করছে,—তার মধ্যে দিয়ে একটা লোক এইদিকে চলে আস্‌ছিল। বিনু দেখিয়ে দিয়ে বললে, "ঠিক তেমনি চলন, নয় দিদি?—নিশ্চয় সে।" কি আর দেখব। জানিই তো, সে নেই; তবু যে ছলনার অভিনয় আরম্ভ করা গেছে, সেটাকে তো কোন রকমে বজায় রাখতে হবে! কাজেই দেখতে হ'ল। কাছে দাঁড়াতেই, তার বুকের ভিতর যে হাতুড়ী পিটছে, সে শব্দ আমার কাণে স্পষ্ট আসতে লাগল। লোকটা মাঠের ভিতর দিয়ে আমাদের পুকুরপাড়ের কদমতলায় উঠল। আমি দেখলুম —সতু নয়, অপরিচিত আর কেউ। কিন্তু বিনুর চোখ স্পন্দহীন, সে যেন অজ্ঞান, অচেতন হয়ে তাকে দেখ্‌ছে। "কি দেখ্‌ছিস?" "সে নয় কি দিদি?" "না না সে নয়—দেখছিস্‌ নে?" "না-না সেই—নিশ্চয় সেই।" "পাগল হলি না কি?" লোকটা এতক্ষণে আমাদের জানালার গোড়ায় এসে পড়েছিল। একবার বিস্মিত দৃষ্টি মেলে আমাদের দিকে চাহিল,—কি মনে করলে কে জানে! তার পর ধীরে ধীরে গাঁয়ের পথ ধরে চলে গেল। একটা গভীর মর্ম্মান্তিক হাহাকার ধ্বনি তুলে বিনু বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ল। এ শয্যা ছেড়ে সে আর ওঠেনি।

৪

আগমনীর করুণ সুর ভেসে আস্‌ছে। প্রভাত—সুন্দর প্রভাত। ঘন ঘোর বর্ষার অবসানে প্রকৃতির মুখ হাসির কিরণে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। মাঠের বুকে মুক্তার মালা, সরোবরের বুকে সোণার কমল।

কিন্তু আমার এই সৃষ্টিছাড়া জীবনে আগমনীর সুর নেই; আনন্দের কিরণ নেই, ফুলের শয্যা নেই—শুধু বিসর্জ্জন আর বিসর্জ্জন। যাকে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরি, বুকের আগুন নিবুতে চাই, সেই যে দেখতে-দেখতে জলে পুড়ে খাক্‌ হয়ে যায়! এমন অপয়া অলক্ষুণে জীবন যেন কারও না হয়। এত যত্নে গড়া দেহ যে এত দ্রুত ক্ষয় হতে পারে, তা না দেখ্‌লে কে বিশ্বাস করত? ডাক্তার

বলে গেছে, বিনুর রোগ যেন ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। পাষাণে বুক বেঁধে, পাথর চোখে আমি তাই দেখ্‌ছি। না—না, এখন কাঁদব না; কিন্তু দেরি নেই, কাঁদবার দিনও যে ঐ ঘোড়া ছুটিয়ে চলে আস্‌ছে। আমার উথ্‌লে-ওঠা চোখের জলকে আমি জোর করে বুকের ভেতর ঠেলে দি। সবুর, সবুর—আগে আমার স্নেহের প্রতিমার বিসর্জ্জন হোক; তার পর একা লুটিয়ে নিঃসঙ্গ এই শূন্য পুরীতে বুকের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করে দিয়ে পড়্‌ব। তখন 'দিদি' ব'লে বাধা দেবার আর কেউ থাক্‌বে না। আমার যে দেনা-পাওনা অনেক—সতুর ঋণ আছে, তার পাওনা চোখের জল জমে অনেক—অনেক হয়েছে। তার পর হতভাগিনীর ঋণ, আমি যে দেউলে হব—চোখের জলে দেউলে হব।

বিনুর স্বরভঙ্গ হয়েছে। সে গম্ভীর ভাঙ্গা গলায় ডাক্‌লে, "দিদি!" "কি দিদি?" "আর দেরি নেই।"—আমার বুকটা হ্যাঁৎ করে উঠ্‌ল! তখনই আবার আপনাকে সামলে নিয়ে বল্‌লুম, "কিসের দেরি নেই, বিনু?" "কিসের আবার!—তার আসার।" "কেমন করে জান্‌লি?" "আমার মন বল্‌ছে, দিদি।" তার পর নিজের শীর্ণ দুর্ব্বল হাতখানি চোখের কাছে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে বল্‌লে, "আমাকে এত রোগা দেখ্‌লে সে কি বল্‌বে, দিদি?" এত ক্ষীণ, দুর্ব্বল যে, একেবারে বেশী কথা কইতে পারে না। কথায় কথা বাড়্‌বে বলে আমি আর কোন কথা কইলুম না। সারা দুপুর সে কেমন আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল। বিকেলবেলার দিকে মুখের পানে চেয়ে দেখি,—অসামান্য প্রফুল্লতা—চোখে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলা। সকালের চেয়েও ধরা, ভাঙ্গা গলায় আমাকে ডেকে বল্‌লে, "তোর কি আক্কেল দিদি! বেলা যায়, আর কখন্ আমার চুল বেঁধে দিবি?" আমি বেশ বুঝ্‌লুম, সতুর চিন্তাই এখন তার একমাত্র আনন্দ। তাই ইদানীং চুল বাঁধতে চাইলেই ঝগড়া করত। তাতে যে ধ্যান ভঙ্গ হয়! আর আজ সে চুল-বাঁধা নিয়ে রাগ করছে। আমার মুখের পানে চেয়ে, একটু হেসে—সে হাসি কি ভয়ানক!—বল্‌লে, "আর বসে থাকিস্ নে দিদি, ওঠ্! উঠে, চুল বেঁধে আমায় বেশ ক'রে সিঁদুর-আল্‌তা পরিয়ে দে। একখানা ভাল কর্ষা কাপড় না হলে আজ আমার চল্‌বে না। সে এসে আমাকে এমন সাজে দেখ্‌লে কি মনে করবে?"—ব'লে সে যেন একেবারে নেতিয়ে পড়্‌ল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার যেন চম্‌কে উঠে বল্‌লে, "ফুল তুলে আন্ দিদি,—এ-বেলার টাট্‌কা ফোটা ফুল। আমার তেমনি করে বাসর সাজা। সে আজ অনেক দিনের পর আসবে। অমন করে চেয়ে রইলি কেন?—ওঠ! রাগ করেছিস? আমার মাথা খাস,—রাগ করিস নে, আমায় মাপ কর। আমি কি চিরকাল এমনি করে পড়ে থাক্‌ব? এবার ভাল হয়ে উঠে, আমি তোকে একটী আঙুলও নাড়্‌তে দেব না। মাপ কর্, শুধু আজকের জন্যে নয়,—তোর কোলে আমি এত বড়টি হয়েছি—কতদিনের কত অপরাধ, সব মাপ করে আশীর্ব্বাদ কর্ দিদি! আশীর্ব্বাদ কর্, যেন সে এসে আমার হাত ধরে নিয়ে যায়!" "আমায় ছেড়ে তুই কোথায় যাবি, বিনু?" "তার সঙ্গে, বিদেশে। সে একলাটি পড়ে থাকে, সে কি ভাল?" "তোরা কেউ আমার মুখ চাইছিস নে। আমি কেমন করে একলা থাক্‌ব, বিনু?" "একলা কেন? দাঁড়া, আগে আমরা গিয়ে সোহাই-গাছাই—তুই একেবারে পাকা সংসারে যাবি।" মর্ম্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস ছাড়া এর আর কোন জবাব ছিল না। আমি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। একটু তন্দ্রা আস্‌তেই চম্‌কে উঠে বল্‌লে, "কই দিদি, সিঁদুর কই?—তুই এখনও আমায় সিঁদুর পরিয়ে দিস্ নি?"

মনে-মনে ভগবান্‌কে ডেকে বল্‌লুম, 'হে ভগবান্, হে অন্তর্যামী, এর যদি সময় হয়ে থাকে—বিধবা হয়ে সধবার ছদ্মবেশে যদি তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়,—তুমি এর কোনো অপরাধ নিও না, প্রভু!—এর সব অপরাধ আমার মাথায় তুলে দিও। জন্মে-জন্মে আমি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব।' বিনুর শুষ্ক সীমন্তে বেশ করে সিঁদুর পরিয়ে দিলুম। ওদিকে সন্ধ্যারাণী ললাটে লাল জ্বলজ্বলে সিঁদুর পরে অস্তাচলে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়্‌লেন। বিনু বল্‌লে, "দিদি, সেই ছেলেবেলায় তোর কোলে মাথা রেখে যেমন করে ঘুমুতুম, আজ আমার তেমনি করে ঘুমুতে ইচ্ছে কর্‌ছে। কাছে আয়, আমি তেমনি করে শুই, সে এলেই আমায় ডেকে দিস।" আমি তার মাথাটি কোলে নিয়ে বস্‌লুম। বাইরে অন্ধকার ভীষণ কালি হয়ে জমে উঠ্‌ল। ঘরের দীপশিখা অন্ধকারের স্রোতকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে প্রাণপণে যুঝ্‌তে লাগল। একটু শুয়েই চঞ্চল হয়ে বিনু

বল্‌লে, "ঐ কার গলার শব্দ,—আমায় কেউ ডাক্‌লে, না দিদি? দেখ্—দেখ্, কে এল!—" ব'লেই সে দরজার দিকে চাইতে-চাইতে আমার কোল থেকে উঠ্‌তে গেল; কিন্তু পারলে না—তৎক্ষণাৎ আবার কোলের উপর লুটিয়ে পড়্‌ল। তার পর সব স্থির। কি হল, আমি বুঝ্‌লুম; কিন্তু কাঁদতে পার্‌লুম না,—চেঁচিয়ে কাকেও ডাক্‌তে পারলুম না। প্রাণহীন স্নেহের পুত্তলিকে কোলে করে, পাষাণ-প্রতিমার মত স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম।

কিছুক্ষণ পরে খস্‌খস্ ক'রে পায়ের শব্দ, তার পর একটা অস্ফুট ধ্বনি! দরজার দিকে চাইলুম—এ কি! এ কি! প্রেতের মূর্ত্তি যে! নিশ্চয় আমার বিনুকে নিয়ে যেতে এসেছে!—"দূর হ! দূর হ!" মূর্ত্তি আমার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে বল্‌লে, "চিন্‌তে পারলে না? আমি সতু!" তার পর সব অন্ধকার! যখন জ্ঞান হল, দেখ্‌লুম, বুড়ো গোমস্তা সতুর চোখে মুখে জলের ছিটে দিচ্ছে। সতু উঠে বস্‌ল। তার পর বিনুর কাছে এসে উন্মাদ কণ্ঠে চীৎকার ক'রে বল্‌লে, "বিনু, ও-বিনু, আমার বিনু! আমি এসেছি—একবার চেয়ে দেখো! রাগ করেছ কি? এই দেখ, আমার শরীর—কি হয়ে গেছে,—তাই একবার তুমি চেয়ে দেখো। যমের বাড়ী থেকে আমি ফিরে এসেছি।" চেয়ে দেখলুম সত্যই তাই। সতুকে আর চেন্‌বার যো নেই—মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখী করে না এলে মানুষের চেহারা এমন হয় না। চিঠির কথা মনে হল। অমন সর্ব্বনেশে খবর কেন এসেছিল, তার আভাস পেলাম।

সতু বল্‌তে লাগ্‌ল, "পশ্চিমে আমার জ্বরবিকার হয়। কিন্তু ভুল করে আমাকে প্লেগ্ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তারপর প্লেগ্ নয় বলে সেখান থেকে সরকারী হাস্‌পাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে মাসের পর মাস, দিনের পর দিন রোগশয্যায় শুয়ে যমের সঙ্গে যুঝেছি। ভাল হয়েই দেশের পানে ছুট্‌লুম। এসে শুনি, আমার মৃত্যুসংবাদ রটেছে। কিন্তু আমি মরিনি—বিনুকে দেখ্‌ব ব'লে আমি মৃত্যুকে পরাজয় করে চলে এসেছি। হাস্‌পাতালে আমার নামে আর একজন মরেছিল, তাই আমি মরেছি মনে করে, কেউ এই নিদারুণ ভুল সংবাদ দিয়েছে। গাড়ী পাইনি, দশক্রোশ রাস্তা আমি উন্মাদের মত ছুটেছুটে এসেছি—শুধু বিনুকে দেখ্‌ব ব'লে।"

আগমনী-সঙ্গীত

[শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

দোষ কি উমা, আসিস্ যদি—মায়ের কাছে দু'দিন আগে?
দিন-গুণে দিন বরষ হ'ল,—মনে কি পড়ে না মাকে!
গগন-থালে ছড়িয়ে রজত,—
হাসি-মুখে ফিরল শরৎ,—
শ্যামল-বাসে সাজলো জগৎ,—
(তোর) মুখ চেয়ে সেকালী জাগে।

ফল-পুষ্প-শস্য-ভরা—
অর্ঘ্য লয়ে ডাকে ধরা,
আরো কি বিলম্ব করা—তোর প্রাণে মা ভাল লাগে?
আমারে দুঃখিনী জেনে,
নভো-নিখিল সম্মিলনে,—
জেগেছে তোর আবাহনে,—ঐ, ব্যাকুলি বিহঙ্গ ডাকে।

দুর্য্যোগে

[শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল]

(১)

রেলগাড়ীতে এক-একজনের সঙ্গে হঠাৎ এমনি আলাপ হয়ে যায় যে, মনে হয়, যেন কত-দিনকার পরিচয়। আর এ আলাপ যেন চিরদিন থাকিবে। অথচ প্রায়ই তা সেই গাড়ী-টুকু পর্য্যন্তই স্থায়ী হয়।

দার্জ্জিলিং থেকে ফেরবার পথে এমনি একজন ভদ্র-লোকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গেল। তিনি তাঁর সতরঞ্চিটি দোভাঁজ করে আমার বসবার জায়গা করে দিলেন, এবং আমার বিস্তর আপত্তি সত্ত্বেও জোর করে আমাকে তার ওপর বসিয়ে দিলেন। ট্রেণ দার্জ্জিলিং ছাড়বার আগেই, স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে তাঁর সমস্ত পরিচয় দিয়ে দিলেন। তাঁর নাম কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ, নিবাস বাঘনাপাড়া গ্রাম, পিতার নাম ৺হরিমচন্দ্র ঘোষ। কার্ত্তিকবাবুর দুই পুত্রের মধ্যে একজন কলিকাতায় কাষ্টম হাউসে এসিটাণ্ট কলেক্টরের কেরাণী, আর একজন বঙ্গবাসী কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ে। মেয়েগুলির কোথায় বিয়ে হ'য়েছিল এবং জামাতারা কি করেন, তাও বলেছিলেন; কিন্তু ধৈর্য্য সকলেরই সমান হওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং তার আর আমি পুনরাবৃত্তি করলাম না। এই সকল কথা বলতে-বলতে তিনি তাঁর ব্যাগের ভেতর থেকে খেলো হুঁকোটি বার ক'রে, তামাক সেজে ফেল্লেন, আর আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্লেন,"ইচ্ছে করুন।" আমি সঙ্কুচিত ভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে বললেন, "ওটা ব্রাহ্মণেরই হুঁকো,—এই দেখুন আমারটা।" তার পর অত্যন্ত সন্তোষের হাসি হেসে বল্লেন, "আমার কাছে চু' সেটই থাকে, নিজে ব'সে-ব'সে তামাক খাব, আর ব্রাহ্মণরা বসে থাকবেন, তা হ'তে পারে না।" আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে জানালাম যে, আমি তামাক খাই না। তাতে তিনি একটুও নিরুৎসাহ না হয়ে, তামাকের গুণ বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। সম্রাট ঔরঙ্গজীব বিলাসের কোন জিনিসই স্পর্শ করিতেন না; কিন্তু তবু তিনি তামাকের মোহ ত্যাগ করিতে পারেন নি। মক্কট, বসরা এবং সিরাট থেকে অদ্ভুত মসলা সব এনে তিনি যে আশ্চর্য্য তামাক তৈরী ক'রেছিলেন, তার আস্বাদ যদি একবার আমি পেতাম, ত কোথায় থাকৃত আমার নিষ্ঠা! বলে ভয়ানক হাসতে লাগলেন।

এমন সময়ে গাড়ী কার্সিয়ংএ এসে পড়ল! তিনি টপ্ ক'রে নেমে পড়ে, গোটাকতক কেক কিনে নিয়ে এসে, বল্লেন, "খান।" আমি বললাম, "না, ও সব আমি খাইনে।" অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে, মিনিটখানেক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "কেক খাবেন না? তামাক না হয় না খেলেন—তা বলে কেক খাবেন না?" আমি হেসে যখন বললাম, "ও-জিনিসটা খেতে আমার শ্রদ্ধা হয় না;" তখন শ্রদ্ধা সম্বন্ধে এমন সব প্রসঙ্গ অবতারণা করলেন, যা এখানে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে।

বাঘনাপাড়ার এই শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষকে নিয়ে যে আমি বিশেষ সুখ ঘোষ করছিলাম না, তা' আমার অবস্থায় যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা বেশ বুঝতে পারেন। বাইরে প্রকৃতি তখন তার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিঃশেষে ছড়িয়ে দিয়েছে। একদিকে আকাশ-ভেদী পাহাড়, আর এক-দিকে গভীর নিম্নভূমি, কোথাও বিরাট কটাহোত্থিত নিবিড় ধোঁয়ার মত ঘন কুজ্ঝটিকা, কোথাও হীরার মত স্বচ্ছ দিগন্ত! পাহাড়ের গায়ে-গায়ে বিচিত্র শ্যামল বৃক্ষ-শ্রেণী, কোথাও চঞ্চল ঝোরা বহু উর্দ্ধ থেকে অপরূপ নৃত্যে পাহাড় থেকে পাহাড়ে পড়ে বহু নিম্নে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে! বাইরে যখন এই, ভেতরে তখন খেলো হুকো, আর কেক!

(২)

সন্ধ্যা হয়ে গেছে,—মেঘ করে একটু বৃষ্টিও সুরু হয়েছে। গরম কাপড়ে বেশ করে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে, অন্ধকারে পাহাড়ের অস্পষ্ট বিরাট-শ্রী দেখ্‌ছিলাম। সমস্ত দিন বকুনির পর কার্ত্তিকবাবু একটা জানালায় মাথা দিয়া তন্দ্রাগত।

এমন সময় একটা সঙ্কীর্ণ বাঁকের মুখে এসে হঠাৎ গাড়ীটা দাঁড়িয়ে পড়লো! আমার ঝাঁকানিতে উঠে পড়ে, কার্ত্তিকবাবু অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ব'লে উঠলেন, "এই যে সেই জায়গা! দেখুন ত, দেখুন ত—দূরে কোন লাল আলো দেখতে পাচ্ছেন কি না! বেশ ক'রে মাথা বাড়িয়ে দেখুন—" ব'লে তিনি আমার দেখার অপেক্ষা না করে, নিজেই সমস্ত মাথা আর দেহের অর্দ্ধাংশ বার করে দিয়ে, অনেকক্ষণ দেখার পর বসে বললেন, "ঠিক বোঝা গেল না, বোধ হয় একটা লাল আলো ছিল। মনে হ'ল ত তাই।"

আমি বললাম, "কেন, এখানে কি আছে?"

তিনি মুখটা খানিকক্ষণ গম্ভীর করে বসে রইলেন। তার পর বললেন, "বড় করুণ! রসুন, আগে তামাকটা খেয়ে নিই।"

যাত্রার আগে এঞ্জিন যেমন ক'রে ষ্টিম সঞ্চয় করে নেয়, তেমনি করে তাম্রকূট থেকে নিঃশেষে শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে, সঙ্কীর্ণ বেঞ্চের উপরে দুই পা উঠিয়ে, শীত-বস্ত্রাদি বেশ ক'রে জড়িয়ে কার্ত্তিকবাবু সুরু করলেন:—

"দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেল তখন সবেমাত্র খুলেছে। প্রতিদিন লোক-চলাচল করে এখন এটা যতখানি সুগম হয়েছে, তখন তা ছিল না। তখনও লোকের ভয় বেশ ভাঙ্গেনি। তার ওপর, যখন এক-একটা দুর্য্যোগের দিন আসত, তখন ত কথাই ছিল না! তখন যেন মানুষে দৈত্যে বোঝাবুঝির দিন পড়ে যেত। অনবরত বৃষ্টিতে মাটির দেওয়ালের মত ঝুপ ক'রে কোন্ পাহাড়টা ভেঙ্গে পড়ে' কখন যে কটি মানুষ-বোঝাই গাড়ীটাকে পুঁতেই ফেল্‌বে, কি ওই পাতালের মত অতল-তলে ঠিক্‌রে ফেলে দেবে, তার ঠিকানাই নেই! এমনি এক-একটা দিনে রেলের লাইন খাংরা-কাটির মত ভেঙ্গে ধ'সে কোথায় চলে যেত, আর টেলিগ্রাফের তার, সুতোর মত ছিঁড়ে গড়াগড়ি যেত। প্রকৃতি যখন ক্ষ্যাপে, তখন মানুষ তার কাছে একটা পিঁপড়ে মতও নয়!

(৩)

"ওই যেখানটায় গাড়ী থেমেছিল, ঠিক তার ওপরে, একটু দূরে, এক পাহাড়িয়া পরিবার থাকত। পাহাড়িয়াদের নাম আমার ঠিক মনে থাকে না। মনে করুন বুড়ো পাহাড়িটার নাম ছিল হারু, আর তার ছেলের নাম ছিল পারু। হারু, তার স্ত্রী, আর পারু, পরিবারে এই তিনজন লোক। যখন রেল খুলল, তখন হারু তাতে একটা চাকরি পেলে। তার কাজ ছিল, এইখান থেকে আধক্রোশ-টাক দূরে একটা জায়গায় দিনের বেলায় নীল পতাকা আর রাত্রে নীল আলো দেখান। লাল আলো দেখাবার মত দুর্য্যোগ কমই হত, কিন্তু একেবারে যে হোত না, তাও বলা যায় না।

"বুড়ো এই চাকরিটি পেয়ে খুব খুসী ছিল। তাদের পারিবারিক স্বচ্ছলতা ত বেড়েই ছিল, কিন্তু আরও বেড়েছিল তার অহঙ্কার! তার নিশানের বা আলোর ওপর সরকার বাহাদুরের এতবড় একটা কারখানা যে অনেক সময় নির্ভর ক'রে, এই কথা সে প্রায়ই তার বন্ধু প্রতিবেশীদের কাছে নানা রকম রং ফলিয়ে গল্প করত! একদিন গাড়ী যখন সশোরে আসছিল, তখন তার লাল আলো দেখে, তাকে ধাঁ ক'রে থেমে যেতে হলো, আর সেই গাড়ীতে স্বয়ং লাট সাহেব! এই বাহাদুরীর কথা সে যে কতদিন গল্প ক'রেছে, তার ঠিকানা নাই।

"এই সব গল্পের তার আর এক মুগ্ধ শ্রোতা ছিল,—সে তার ছেলে পারু। এই রেলগাড়ী যে দিনের পর দিন যথাসময়ে ধোঁয়া উড়িয়ে বাঁশী বাজিয়ে চলে যায়, সেই কি একটা কম কথা! তাকে কে আট্‌কাতে পারে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এই এতবড় একটা দুর্দ্দান্ত জিনিস, একটা লাল আলোর জোরে থেমে যায়,—আবার নীল আলোর জোরে চলে! অত্যন্ত আশ্চর্য্য রেল-কাহিনীর মধ্যে তার এইটেই সব-চেয়ে বিস্ময়কর বোধ হত।

(৪)

বছর দু'য়েক কাজ করে তার বাপ হারু মরে গেল। তখন পারুর এক আকাঙ্ক্ষা এই হোল যে, সে তার বাপের চাকরিটি পেয়ে আলো দেখায়! কিন্তু কেমন করে যে সে চাকরি পাওয়া যায়, তার সন্ধান ঠিকমত কেউ তাকে বলে দিতে পারলে না। সে কিন্তু হতাশ হয় নি। একদিন ইষ্টিশানে গিয়ে সে বাবুদের ব'লে দেখ্‌বে; সাঁহেব যদি থাকে, তাকেও বলবে।

বাপের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ভেতর একটী লাল-নীল কাঁচের ভাঙ্গা লণ্ঠনও ছিল। এই লণ্ঠনটিকে বেড়ে—পুঁছে সে পরিষ্কার ক'রে রাখত, আর কতদিন কল্পনার চোখে

দেখত যে, একটী প্রকাণ্ড চলন্ত গাড়ীকে একটী মাত্র লাল আলোর ঝিলিকে সে একেবারে থামিয়ে দিচ্ছে।

"এমন সময় এমন একটা দুর্যোগের দিন এল, যা সচরাচর আসে না। তিন দিন ধরে অনবরত বৃষ্টি আর বজ্রপাতের পর পাহাড়ের ধস্ ভাঙতে সুরু করলে। এত বড় কঠিন পাহাড়, সে যেন মাটির চেয়ে তুলো! প্রকাণ্ড উন্নত প্রকৃতির কাছে পাহাড় যেন যোড়-হাত করে রইল!

"পারুর যেখানে বাড়ী, তার কাছ থেকে একটা প্রকাণ্ড ধস্ ভেঙ্গে কোথায় যে চলে গেল, তার ঠিকানাই পাওয়া গেল না। সে তার সঙ্গে অনেকখানি রেলের লাইনও নিয়ে নেমে গেল।

"তাই দেখে পারুর হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মনে হলো। একটু পরেই ত এখান দিয়ে গাড়ী যায়,—আজও যদি সেই সময় গাড়ী আসে, ত এই অন্ধকারে ত কিছুই দেখতে পাবে না! মানুষ-শুদ্ধ, গাড়ী শুদ্ধ কোথায় যে চলে যাবে, তার ত ঠিক নেই! তখন তার বাপের কথা মনে হলো; মনে হলো তার গর্ব্ব-পুলকিত মুখ—যখন সে গল্প করতো এক বর্ষার দিনে সে কেমন করে লাল আলো দেখিয়ে এক গাড়ী লোক বাঁচিয়েছিল,—আর তার পর সরকারে তার কত খোস-নাম হ'য়েছিল! সেই বাপের ছেলে হয়ে সে আজ চুপ করে ঘরে থাকবে কি করে? না—না, তা হতে পারে না। তখন তার সেই লাল-নীল কাচের বিচিত্র লণ্ঠনের কথা মনে হল। এই ত সুযোগ এসেছে। লাল আলো দেখিয়ে সে আজ চলন্ত গাড়ী থামিয়ে দেবে, আর তার সঙ্গে একগাড়ী লোককে বাঁচাবে!

"ক্ষিপ্র-হস্তে সে তার লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিলে। তাই দেখে তার মা বললে, 'কি রে পারু, এত দুর্যোগে কোথায় যাস্?'

"পারু বললে, 'মা, এইবার ত গাড়ী আসবে! না জেনে যদি এইখান দিয়ে যায়, তা হ'লে ত নীচে প'ড়ে যাবে। তাই লাল আলো দেখাতে যাচ্ছি।'

"তার মা বল্লে, 'কাজ নেই বাপু গিয়ে, এত ঝড়-বৃষ্টিতে গাড়ী আসবে না।'

"পারু বল্লে, 'না মা, ধস্ ত মোটে এখনই হ'ল, তারা জানবে কি ক'রে? আমি চল্লাম মা!'

"পারু যায় দেখে, তার মা বল্লে, 'তবে দাঁড়া, আমিও সঙ্গে যাব, একলা যাসনে।'

(৫)

"কুটীর থেকে বেরিয়ে তারা খানিকটা উৎরাই নেমে এসেছে, এমন সময় গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। পারুর বুক দুরদুর করে উঠ্‌ল; বললে, 'মা তুমি এসো, আমি চট্‌পট নেমে যাই, তা নইলে গাড়ী বাঁচে না।'

"তার মা আপত্তি করবার আগেই হরিণ-শিশুর মত দ্রুত নেমে এসে পারু ধসের মুখে পৌছল। এইখান থেকে লাইন ভেঙেছে,—গাড়ী ঐ অদূরে!

"তখন সে দুই হাতে উঁচু করে ধরে লাল আলোটা গাড়ীর দিকে মেলে দাঁড়িয়ে রইল!

"দেখ্‌তে-দেখ্‌তে গাড়ীর গতি মন্দ হ'য়ে এল। তার পর তার কাছ থেকে হাত-ত্রিবেক মাত্র দূরে এসে অতবড় চলন্ত গাড়ীটা দাঁড়িয়ে গেল! আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য!

"আনন্দে পারুর সমস্ত গা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল,—আর গাড়ীর লোকেরা কোলাহল করতে লাগলো। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই একটা ভীষণ বজ্রগর্জ্জনে পাহাড়টা কেঁপে উঠ্‌ল, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে, পারুকে নিয়ে খানিকটা পাহাড় নীচে নেমে গেল।

"সেই দেবদুর্লভ বীর-শিশুকে গ্রাস করে মুহূর্ত্তে আবার সব স্থির! তখন সেই অন্ধকার আর সেই ধারাবর্ষণের মাঝখানে পারুর মা, আর গাড়ীর লোকেরা পারুর জন্যে সমান হাহাকার করতে লাগল! বাতাস যেন তাকে খুঁজে-খুঁজে আর্ত্তনাদ করে ছুটতে লাগ্‌লো!"

তার পর খানিকটা চুপ করে থেকে কার্ত্তিকবাবু তাঁর চোখের জল মুছলেন,—আর সেই মুহূর্ত্তে তাঁর শুদ্ধ শ্রোতৃ-মণ্ডলীরও চোখ জলে ভ'রে উঠ্‌ল।

গলাটা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করে কার্ত্তিকবাবু বল্লেন, "তার পর সব বন্দোবস্তই হ'ল। পারুর মার জন্যে কোম্পানী যাবজ্জীবন পেন্সনের ব্যবস্থা করলেন। রাস্তা দু'দিনের মধ্যে তৈরী হ'য়ে গেল। কিন্তু যে মহাপ্রাণ এক নিমেষে চলে গেল, সে আর ফিরে এলো না।

"সেই দিন থেকে মাঝে-মাঝে এই সময়ে ঠিক ওই-খানটিতে কে যেন লাল আলো দেখায়, আর প্রত্যহ ওই জায়গায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে মৃত আত্মার উদ্দেশে সম্মান দেখান হয়।"

আমার প্রিয়া

[শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী]

রুক্ষ মূর্ত্তি, শুষ্ক বাণী, বেলায় বাড়ে চোখ-রাঙ্গানি
আদরে তায় ডাকি যখন—প্রিয়ে!
কাটে আমার কর্ণরন্ধ্র, ভাবি—আমার কপাল মন্দ!
পাগল ছাড়া করে কি কেউ বিয়ে?
গৃহকর্ম্মে ভারী স্ফূর্ত্তি, প্রেমের চর্চ্চায় অগ্নিমূর্ত্তি,
চাচা-ছোলা সম্ভাষণটী তার;
রোমান্সের নাই লেশও প্রাণে, প্রাণের ব্যবসা নাহি জানে,
রঙ্গরসের নাহি ধারে ধার!
আশে-পাশে দেখ্‌ছি যত দাম্পত্য প্রেম অবিরত,
ভাবি—আহা মিলেছে কি ঘুড়ি!
আমি যেমন বেঞ্জায় পস্ত, তিনি তেমনই নিছক্ গস্ত,
যৌবনেই আমরা বুড়া-বুড়ী!
বঙ্কিম মেনে গেছে হার, রবি, দ্বিজেন কোথায় আর!
শিখলে না সে—'বড়ই ভালবাসি।'
সংসার ত নয় বন্দীশালা, বল্‌লাম,—ও মন, কাশী পালা;
নাটক নভেল করেম ভস্মরাশি!

যাত্রার দিনে পড়্‌লেম রোগে—'সন্নিপাতের' বিষম ভোগে,
শয্যাপাশে দেখ্‌তাম্,—ব্যাকুল স্নেহে
বিষাদিনী একটী নারী চোখে রুধি অশ্রুবারি,
সেবার হাত বুলায় আমার দেহে।
হচ্ছে বমন, হচ্ছে ভেদ, সাফ্ করছে সেই মরলা ক্লেদ,
খোস্‌খেয়ালে তার হচ্ছে যেন নাওয়া!
বসে' পাশে সেবার ছবি, —আহার নিদ্রা গেছে সবি,
হাত বুলুচ্ছে গায়ে, করছে হাওয়া!
বেশ ভূষা গেছে কোথায়, সিঁদুরটি রোজ শুধু সীঁথায়,
ছোট্ট টিপ্ ক্রমেই বেড়ে যায়;
হাতের লোহা শাঁখা দুটি শীর্ণ হাতে আছে কুটি
অর্গল হয়ে যমের দরজায়!
মনে-প্রেমে দেখে লড়াই বুঝ্‌লেম সেদিন সতীর বড়াই,
ভাব্‌লাম তারে—দেবী, রোগের ঘোরে,
বার নিতে পায়ের ধূলি— আমার হাত তার হাতে তুলি
'দাসী আমি'—বল্‌লে স্নেহে মোরে!

খোস-গল্প

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

(রঙ্গ)

পল্লীগ্রামের পুকুরঘাটে মেয়েদের নিত্য-নৈমিত্তিক মজলিশ্ বসেছে;—সুর্ষ্যির মা,—ক্ষান্তর পিসী, নিমাইয়ের মাসী, গোবিন্দর খুড়ি—অনেকেই সমবেত হয়েছে। সেদিনকার আলোচনার বিষয় হচ্ছে 'বেলায় ওঠা'—গাঁয়ের মধ্যে কে-কে বেলায় ওঠে? একজন রসিকা পল্লীবধূ রঙ্গচ্ছলে বললেন, "যে যখনই উঠুক্ ভাই, সুর্ষ্যি কিন্তু নিত্যি ভোরে ওঠে; ঠিক যেন ঘড়ির কাঁটা-ধরা! এতখানি বয়স হল বটে, কিন্তু একদিনের তরেও তাকে বেলায় উঠ্‌তে দেখিনি!" সে কথা শুনেই সুর্ষ্যির মা ফোঁস্ করে বলে উঠ্‌লেন, "ওমা, কি মিথ্যাবাদী মেয়ে লা তুই?—হলই বা সে আমার পেটের ছেলে—তা বলে মিথ্যা বলবো না। সুর্ষ্যি আমার বেলা দশটার আগে একদিনও ওঠে না!" পুকুরঘাটে একটা হাসির ঢেউ খেলে গেল!

একজন বন্ধু নতুন দার্জ্জিলিং বেড়িয়ে এসে গল্প কচ্ছেন, "আমরা একদিন স্যানিটেরিয়ম থেকে খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা'র ওপর বেড়াতে গিছলাম—ওঃ! পাহাড়টা যে কি চমৎকার, সে আর কি বল্‌বো! আগা-গোড়া সোণালী বরফে ঢাকা;—আর কি উঁচু রে—যেন একেবারে স্বর্গের কাছে গিয়ে ঠেকেছে!" এই পর্য্যন্ত

শুনেই একজন শ্রোতা বন্ধু বলে উঠলেন, "হায় হায়, তুমি কি না সেখান থেকে আবার ফিরে এলে? কি আহাম্মুকিই করেছ! স্বর্গের অত কাছে কি এ জন্মে আর কখনও যেতে পাবে?"

বারোয়ারী-তলায় সে-বছর 'রামলীলা' ঠাকুর হয়েছিল। একদিন মেয়েরা ঠাকুর দেখতে গিয়ে রাম-সীতার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলে। সেখানে রাবণের মূর্ত্তিও ছিল। একজন অল্পবয়সী স্ত্রীলোক রাবণের গলায়ও একছড়া মালা ঝুলিয়ে দিলে। তখন তার বৌদিদি তাকে ঠাট্টা করে বল্‌লেন, "রাবণের গলায় কোন্ লজ্জায় মালা দিলি ঠাকুর-ঝি?" ঠাকুর-ঝি এক গাল হেসে বল্লেন, "কি জান ভাই বৌদি! ওসব মন্দ লোককে চটা'ন ঠিক নয়। আমি তাই সবাইকেই খুসি করে দিলুম!"

এক ভদ্রলোকের মাথার সমস্ত চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে—কিন্তু গোঁফ দাড়ি এখনও কাঁচা রয়েছে দেখে, একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"হ্যাঁ মশাই! আপনার চুল ত' দেখ্‌ছি সব সাদা হয়ে গিয়েছে,—কিন্তু দাড়ি-গোঁফ এখনও অমন কাল রয়েছে কি করে?" তিনি একটু হেসে বল্লেন, "এটা আর বুঝতে পারে না বাবু!—চুলটা যে সেই মায়ের পেট থেকেই নিয়ে পড়িছি—আর গোঁফ দাড়ী বেরিয়েছে যে তার বিশ বছর পরে! চুলের বয়েসের তুলনায় গোঁফ-দাড়ীটি যে ঢের ছেলেমানুষ হে! এর মধ্যে পাকবে কি বল?" এমন সুসঙ্গত কারণ প্রদর্শনের পর আমি আর তাঁকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলেম না!

একজন ভদ্রলোকের একটি 'মণিব্যাগ' হারিয়েছিল। তার মধ্যে খুচ্‌রো ও নোটে ১০০৲ টাকা ছিল। ভদ্রলোকটি বড়-বড় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন, "যে ব্যক্তি আমার ব্যাগটি অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে নগদ ২৫৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।" ইহারই একদিন পরে তিনি একখানি বেনামী পত্র পাইলেন—"মহাশয়ের ব্যাগটী পাইয়াছি; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, উহা ফেরত দিতে পারিলাম না। কারণ হিসাব করিয়া দেখিলাম—উক্ত ব্যাগটী আপনাকে প্রত্যর্পণ করিলে আমার নগদ ৭৫৲ টাকা লোক্‌সান হয় জানিবেন!"

হলধর মাতালকে যখন ইন্সপেক্টার—ক্ষেত্রপাল বাবু থানায় টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন মাতাল হলধর বল্‌ছে, "দেখুন ক্ষেত্রপাল বাবু! আমাকে ধরাটা আপনার উচিত হয় নি! জানেন, আপনাতে আমাতে কত নিকট সম্পর্ক?" ইন্সপেক্টার ক্ষেত্রপাল বাবু ধমক্ দিয়ে বলিলেন, "থাম্, থাম্—মাতালের সঙ্গে আমার সম্পর্ক!" হলধর প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িতে-নাড়িতে বলিতে লাগিল,—"আজ্ঞে, আছে বৈ কি! ও ধম্‌কে ওড়ালে ত চল্‌বে না!—আমি যে বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি—বিলক্ষণ সম্বন্ধ রয়েছে! একটু ভেবে দেখুন না—ধর্ম্মময়! আপনি যদি ক্ষেত্র পালন না করতেন, তা' হলে এ গরীব এতদিন কোথায় হল ধারণ করতো বলুন তো? আপনাতে-আমাতে যে অতি নিকট সম্পর্ক!"

(ব্যঙ্গ)

একবার মাঘোৎসবের দিন আদি-ব্রাহ্ম সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনা করছিলেন। সে উপাসনা সেদিন এমন করুণ, এমন মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী হচ্ছিল যে, উপস্থিত পুরুষ ও মহিলাবৃন্দ সকলেরই ঝর্‌ঝর্ করে চোখের জল ঝরে পড়ছিল! কেবল আমার পাশের একটী ভদ্রলোকের চোখে কিন্তু এক ফোঁটাও জল দেখ্‌তে পেলুম না। তখন আশ্চর্য্য হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম "হ্যাঁ মশাই! এমন উপাসনা শুনে এত লোক কেঁদে ফেললে—আর আপনার চোখে যে একবিন্দুও জল এল না—এর মানে কি?" —ভদ্রলোকটি তার উত্তরে বল্‌লেন, "কি করে আস্‌বে বলুন! আমরা ত আর এ আদি-সমাজভুক্ত নই! আমরা যে অন্য দলের!"

একজন নবীন সাহিত্যিক কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-রথীকে জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা দাদা, তোমার মত ক'খানি দিয়ে চট্ করে বিশ্ব-সাহিত্যিক হওয়া যায় কিসে, বলতে পার?" সাহিত্য-রথী তাঁর মুণ্ডিত অধরোষ্ঠের ঈশান কোণে একটু ঈষৎ হাসির আভা রেখা ফুটিয়ে বল্‌লেন, "এই মুহূর্ত্তে সে

গুপ্ত রহস্য তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারি, যদি জীবনে কখন তা প্রকাশ না কর!" নবীন সাহিত্যিক তৎক্ষণাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত হইল। তখন সাহিত্য রথী আস্তে-আস্তে পকেট থেকে একখানি লম্বা ফর্দ্দ বার করে শিষ্যের হাতে দিলেন, আর বিশেষ করে বলে দিলেন যে, "এখন থেকে যখনই যে কোনও বিষয়ে যা কিছু প্রবন্ধ যাতেই লিখ্‌বে—তারই মধ্যে এই ফর্দ্দে লিখিত যতগুলো নাম পার, যথাসাধ্য প্রবেশ করিয়ে দিও। তা'হলেই অচিরে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।" শিষ্যটী তৎক্ষণাৎ ফর্দ্দ খুলিয়া মুখস্থ করিতে লাগিল—"হা'য়েইন্" "ইব্‌সেন" "মেটারলিঙ্ক্" "ষ্ট্রাইণ্ডবার্গ" "বার্নার্ড-শ" "গোটে" "ষ্টিট্‌স্কে" "নীট্‌স্কে" "হপ্‌ট্‌ম্যান্" "ওয়াইল্ডম্যান" "জুথারম্যান" "ক্রপট্‌কিন" "টুর্গেনিফ্" "গোর্কি" "টলষ্টয়" "ডষ্টয়ভ্‌স্কী" "এনড্রেফ্" "ডি এনাজিও" "অগস্ত কোঁৎ" স্যাঁৎ বুভে" "জোলা" "রোঁলা" "আনাতোল্ ফ্রাঁসে" "রক্কো" "ব্রীয়ে" "লরা হ্যাসন্" "ওয়েষ্টারমার্ক" "ফ্রয়ো" "ব্যালজ্যাক্" "হিউগো" "হেকেল্" "শোপেনহয়ের" "হ্যাম্সেন্" "ওয়াগ্‌নার" "শেক্‌স্পীয়ার" "স্পেন্সার" "হক্সলী" "মিল" "ডারউইন্" "ব্রাইডেন্" "চেষ্টার্টন" "এইচ জি ওয়েলস্" "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর!"

অনৈক মাসিকপত্রের সম্পাদক তাঁর এক সাহিত্যিক বন্ধুকে দুঃখ করে বলছিলেন, "কাগজের গ্রাহক সংখ্যা যে ক্রমেই কমে আসছে দাদা! কি করি ব'ল ত? আসছে বছর হয় ত কাগজ বন্ধ করে দিতে হবে!" সাহিত্যিক বন্ধুটি উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি কাগজ চালাতে বসেছ? কিসে গ্রাহক বাড়তে পারে তা জান না?" সম্পাদক মহাশয় নত মস্তকে তাঁহার জ্ঞানের অল্পতা স্বীকার করিলেন; এবং গ্রাহক-সংখ্যা কিসে বাড়ে, তাহা সবিনয়ে জানিতে চাহিলেন। তখন সেই বিজ্ঞ সাহিত্যিক বন্ধুটী গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "কাগজে এইবার দিন-কতক খুব গালিগালাজ সুরু করে দাও। কোনও বড় গোছের 'আমেচার' আর্টিষ্ট্ ধরে সম্প্রদায়-বিশেষের সামাজিক রীতিনীতির 'রঙ্গীন ব্যঙ্গ-চিত্র' প্রকাশ করতে আরম্ভ কর—কিম্বা—কোনও গুপ্ত লেখক ধরে প্রতি মাসে এমন সব অশ্লীল গল্প বাহির করে যাও যে, চারিদিক থেকে লোক সব মার্ মার্-করে উঠুক্। তা হ'লেই দেখ্‌বে, 'হু হু' করে গ্রাহক-সংখ্যা বেড়ে যাবে!"

একজন এল্-এম-এস্ ডাক্তার এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ হোমিওপ্যাথিক সুরু করে দিলেন দেখে, তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু গোপনে, এর কারণটা কি—জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। এল্-এম-এস্ মহাশয় চাপা গলায় আস্তে-আস্তে বল্লেন "কি জান ভাই! 'প্রেসক্রিপ্‌সন' লিখ্‌তে যে সব ভুল করে ফেল্‌তুম, তা চট্ করে পাঁচজনের চোখে ধরা পড়ে যেত!—কিন্তু এখন বেশ নিরাপদ হয়েছি! 'প্রেসক্রিপ্‌সন' কর্ব্বার আর কোনও হাঙ্গাম নেই,—নিজেই বাক্স থেকে ওষুধ বার করে দিচ্ছি—এখন যদি দেদার ভুল করি, তা' হলেও আর চট্ করে ধরা পড়ছিনি,—বুঝলে?"

এক আর্টিষ্ট বন্ধু আমাদের বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁর একখানি ছবি দেখাতে নিয়ে গেলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ছবিখানি দেখে আমরা তার কোন মর্ম্ম বুঝতে পারলেম না! দেখ্‌লেম, তার অর্দ্ধেকটা নীল, আর অর্দ্ধেকটা সবুজ! আর সেই সবুজ অংশটার মাঝামাঝি একটা মোটা কাল লাইন টানা—সেই লাইনের উপরে গোটাকতক গাছের পাতা আর একটা বাঁশের ডগা আঁকা আছে; আর লাইনের বাইরে নীচের দিকে গোটাকতক ছেঁড়া পাখীর পালক আর একটী স্ত্রীলোকের পদচ্যুত চরণাভরণ! ব্যস্ এই পর্য্যন্ত! তখন অগত্যা আর্টিষ্টকে ডেকে বলতে হ'ল, "ভাই! যদিও তোমার এ ছবিখানি আমরা কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি, কিন্তু বড় চমৎকার এঁকেছ!" আর্টিষ্ট বন্ধুটি গম্ভীরভাবে বল্লেন, "এ ত শুধু চোখে দেখে বুঝতে পার্ব্বে না ভাই! এ যে 'ওরিয়েণ্টাল স্কুল অফ্ আর্টের' একখানি আদর্শ ছবি! এর 'চিত্র-পরিচয়' না দেওয়া থাক্‌লে কিছুই বোঝা যায় না! ঐটুকুই হচ্ছে এর ভেতরকার 'আর্ট'! আমি এর পরিচয় দিই শুন; তা হলেই বুঝতে পার্ব্বে যে, এ ছবিখানি ভাব-চিত্র ও শিল্পকলার একেবারে চরমোৎকর্ষ! এ চিত্রের বিষয়টি বড় করুণ! মহাভারতোক্ত 'সীতাহরণ' উপাখ্যানটী বর্ণ ও তুলিকার সাহায্য অবলম্বনে এতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে! ঐ যে সুনীল উদার আকাশ তরুণ সবুজ ভূমিকে যেখানে এসে চুম্বন কর্চ্ছে, তারই সন্নিকটে ঐ যে

কতিপয় বৃক্ষপত্র অঙ্কিত দেখ্‌ছ,—উহা সুগভীর দণ্ডকারণ্যের সূচনা কর্চ্ছে! আর ঐ যে বংশখণ্ড—উহাই বিজন বনস্থলে প্রণয়ী সীতারামের একমাত্র আশ্রম-কুটীরের অতীন্দ্রিয় আলেখ্য। মুদিত নেত্রে মানসক্ষেত্রে অনুভব করে দেখলে এখনি চক্ষের সম্মুখে দণ্ডকারণ্যের সেই পরিচ্ছন্ন স্তব্ধ কুটীরখানি সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে। আর তাহারই সম্মুখে ঐ যে কৃষ্ণবর্ণ উজ্জ্বল রেখা,—উহা অন্য কিছুই নহে—দেবর লক্ষ্মণের মন্ত্রপূত 'গণ্ডীদানের' সুগভীর চিহ্নমাত্র! ঐ মন্ত্রপূত গণ্ডীরেখাটি উত্তীর্ণ হইবামাত্র অভাগিনী জানকী দেবী লঙ্কাধিপতি রাবণ রাজা কর্ত্তৃক অপহৃতা হয়েছেন; সুতরাং এ চিত্রমধ্যে তাঁহারা কেহই উপস্থিত নাই। তাঁহাদের মূর্ত্তি অঙ্কিত নাই বটে, কিন্তু সেই পৌরাণিক অপহরণের সমস্ত 'অনবস্থ' ভাব এই চিত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট বিদ্যমান। কারণ, ঐ যে গণ্ডী-রেখার বাহিরে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পদ্মপুট অঙ্কিত দেখ্‌ছ, উহা শ্রীরামচন্দ্রের চিরানুগত জটায়ু পক্ষীর সহিত দশানন রাবণের দ্বন্দ্বযুদ্ধের ভীম পরিচয় প্রদান কর্চ্ছে! আর ঐ যে আর একপার্শ্বে অঙ্কিত 'মণিময় চারু চরণ মঞ্জীরটি!' উহার বিষয় কি আর হিন্দুকে বলিয়া দিতে হইবে? দুরাত্মা রাবণের লঙ্কাভিমুখে উড্ডীয়মান পুষ্পকরথ হইতে সীতাদেবী যখন স্বীয় অঙ্গের অলঙ্কার সকল উন্মোচন করিয়া ফেলিতেছিলেন, সেই সময় উহাও এই পাপ ধরণীতলে আসিয়া পড়িয়াছিল! আরও একটু লক্ষ্য করিলে, ঐ সুনীল আকাশের নিবিড় জলদ-গায় লঙ্কাভিমুখী কতিপয় বিসর্পিত সূক্ষ্মরেখা দেখিতে পাওয়া যাইবে; উহা আর কিছুই নহে,—রাবণের সেই প্রচণ্ড বেগগামী খ'দ্যোত পুষ্পক-যানের আকাশের বক্ষ বিদীর্ণ করে চলে যাওয়ার অদৃশ্য চক্র-চিহ্ন!"

আনন্দ-মিলন

[শ্রীহিরণকুমার রায়চৌধুরী বি-এ]

নলিনীর নৌকা যখন গ্রামের ঘাটে পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শরতের অম্লান চন্দ্র নদীবক্ষ ও ক্ষুদ্র গ্রামখানিকে বিচিত্র সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। অনতিদূরে বাউশ্রেণীর অন্তরালে তাহাদের সুবৃহৎ অট্টালিকা বিশ্বজননীর উদ্বোধনে মুখরিত। দিকে-দিকে যেন অসীম আনন্দ-প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে।

সম্বৎসর পরে ধরাময়ীর আগমনে সমগ্র বঙ্গ যেন জীর্ণ অবসাদ দূরে রাখিয়া নবশক্তি লাভ করিয়াছে। শস্য-শ্যামলা পল্লী-জননী আজি যেন আনন্দ-প্রতিমা। প্রবাসী দীর্ঘ প্রবাস-যাপনের পর শত আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া গৃহে ফিরিতেছে। কত নিহিত মর্ম্মবেদনায়, কত সুদীর্ঘ বিরহের অবসানে কত সুখ, কত আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

অলস চরণে নলিনী নৌকা হইতে অবতরণ করিল। বহু দিন পরে গৃহে প্রত্যাগত হইলেও, এই আনন্দ-হিল্লোল যেন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না। কোথায়, হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রী ছিন্ন হইয়া যেন অখণ্ড ঝঙ্কারে প্রতিবন্ধক ঘটাইতেছিল। মৃদু পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া নলিনী একটী বৃহৎকায় বট-মূলে ক্ষণেকের জন্য দণ্ডায়মান হইল। সহসা তাহার মর্ম্মস্থল হইতে একটী তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন কত ব্যথা বহন করিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল।

সে আজ কতদিনের কথা! তখনও গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পাঠ পরিসমাপ্ত হয় নাই। কৈশোর-চাপল্য সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া আছে। অর্দ্ধ-বিকশিত যৌবন তখনও দূরে। সেই কৈশোর-যৌবনের মিলন-ক্ষণে সহসা এক আবেশময়ী মধু যামিনীতে দূর পল্লীবাসিনী এক ক্ষুদ্রা বালিকার সহিত তাহার সীমাবদ্ধ জীবনের পরিণয়-গ্রন্থি-বন্ধন হইয়া গেল।

সে রজনী আজিকার মতই জ্যোৎস্নাময়ী ছিল। অলস, মন্থর পবনে তরুলতা সোণালী জ্যোৎস্নালোকে মৃদুমৃদু কাঁপিতেছিল। সমগ্র বিশ্ব সঙ্গীত ও সুগন্ধে ব্যাকুল। এই বিশাল বট-মূলেই তাহারা শোভা-যাত্রার জন্য সমবেত হইয়াছিল। সে আজ কত দীর্ঘ বয়সের কথা!

উন্মেষিত নব আনন্দ ও সুখ-হিল্লোল তাহার তরুণ হৃদয়কে অভিভূত না করিতেই, এক অভাবনীয় ঘটনা এই

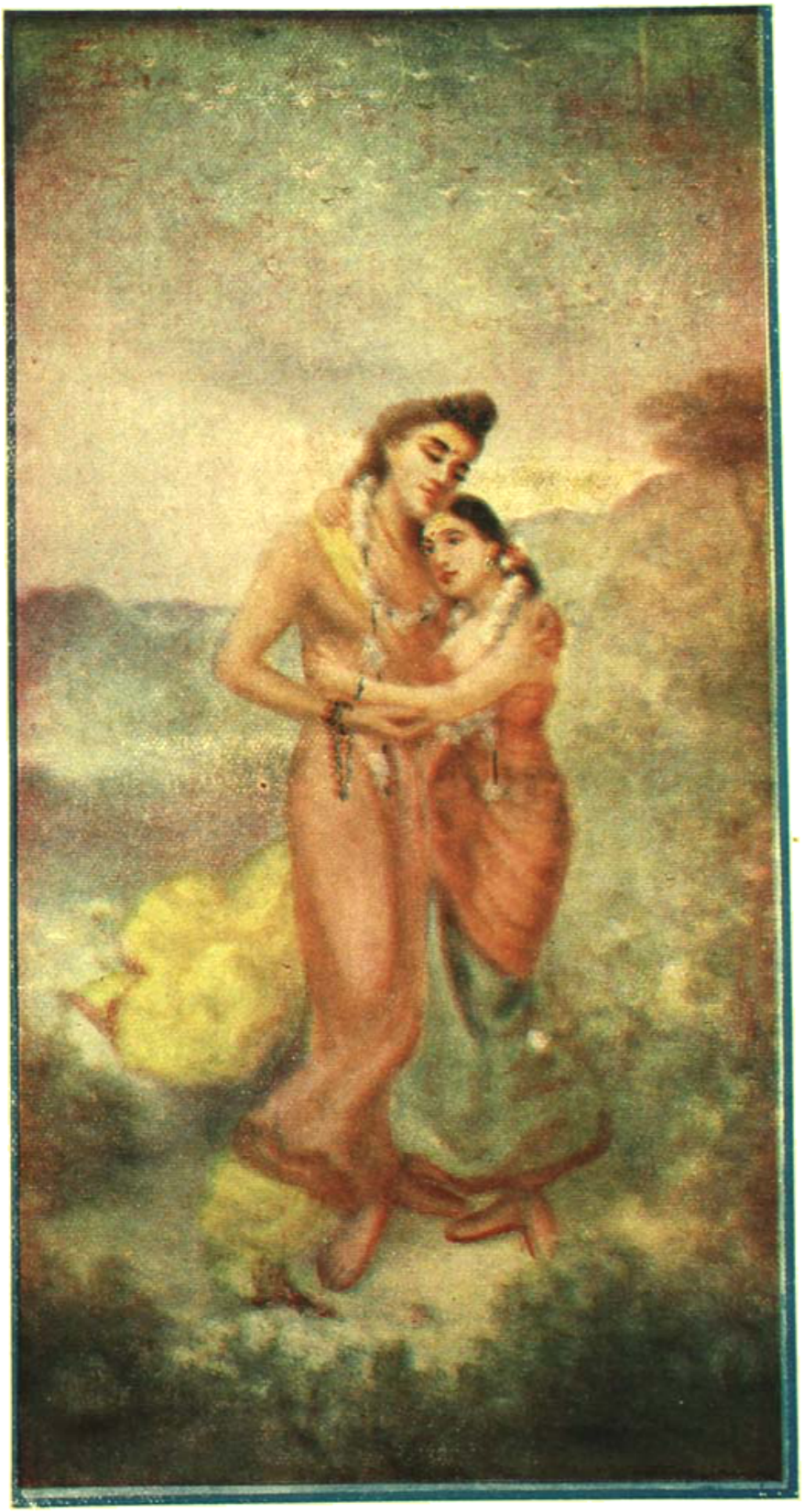

যক্ষ-দম্পতী

[শিল্প—শ্রীননীগোপাল গোস্বামী, চিত্রকলাবিনোদ

Emerald Printing Works

নবীন প্রেমবন্ধন শিথিল করিয়া দিল। নলিনীর পিতা কমলার অজস্র করুণা লাভ করিলেও, অত্যন্ত কৃপণ-স্বভাব ছিলেন। বিবাহের দান-সামগ্রী লইয়া যে মনো-মালিন্য সূচিত হয়, তাহা ক্রমশঃ দারুণ কলহে পরিণত হইল। নলিনীর শ্বশুর অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থ হইলেও, অত্যন্ত অভিমানী ও তেজস্বী ছিলেন। বৈবাহিকের সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা তাঁহাকে বিশেষরূপে ক্ষুব্ধ করিল। কিন্তু একমাত্র কন্যার জন্যও তিনি সে সকল অন্যায় দাবী পূরণ করিতে সম্মত হইলেন না। পত্নীর অশ্রুজল ও মিনতি এবং জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গের একান্ত অনুরোধও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। কন্যার ভবিষ্যৎ ভগবানের উপর সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত রহিলেন।

কন্যাপক্ষ দুর্ব্বল হইয়াও যখন তাঁহার অভিলাষ-পূরণের কোন প্রকার আয়োজন করিল না, তখন নলিনীর পিতার সমস্ত আক্রোশ ও বিদ্বেষের লক্ষ্য হইলেন—তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রবধূ। ভ্রাতৃজায়ার বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। কন্যার মাতা সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনী হইতেন। নলিনীর পিতার অন্যায় আকাঙ্ক্ষার প্রতি কটাক্ষপাত করায়, এই আক্রোশ অবশেষে সরিকী বিবাদে পরিণত হইল। বহুকাল পরে একটী তুচ্ছ বিষয় লইয়া আষাঢ়্য-সঞ্চিত সুমধুর ভ্রাতৃস্নেহ বিলুপ্ত হইল, এবং সেই অজ্ঞাত শিশুর ন্যায় নির্দ্দোষ সরলা বালিকার পক্ষে শ্বশুর-গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

তাহার পর এক-এক করিয়া সুদীর্ঘ তিনটী বৎসর অতীতে মিশাইয়া গিয়াছে। পিতার সুকঠোর শাসন ও শিক্ষা নলিনীর চিত্তকে বিদ্রোহী করিয়া না তুলিলেও, অতীতের সেই একটী দিনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ শত স্মৃতি তাহাকে সর্ব্বদা ব্যথিত করিত।

যৌবনের সেই প্রথম প্রভাত,—তখন কত আশা ও উৎসাহ হৃদয়-উপকূলে উচ্ছলিত হইয়া পড়িত! সুনীল আকাশ ও শ্যাম-তৃণাবৃতা ধরণী নব রাগে অনুরঞ্জিত বোধ হইত। বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতি দিবসে ও রজনীতে মর্ম্মরিত পত্রকুঞ্জে ও সলিল মধ্যে শত মধুর রাগিণী ঝঙ্কৃত করিত। আজি যেন সে সমস্তই প্রাণহীন,—সে স্পন্দন, সে কম্পন আজি অনুভূতিবিহীন!

মৌন-প্রকৃতি নলিনী তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদনে কখনও অবহেলা করিত না। স্মৃতির শুষ্ক বেদনা বক্ষে বহন করিয়াও, সে সর্ব্বদা হাসিমুখে সমস্ত কর্ম্ম সাধন করিত; এবং সর্ব্বদা কর্ম্মস্রোতে নিমগ্ন থাকিবার প্রয়াসী হইত। তাহার এ অন্তরুদ্ধ মর্ম্মবেদনা বুঝিবার বা নিবারণ করিবার কেহই ছিল না। মাঝে-মাঝে উদাম পবন-তাড়িত বাষ্পের বিচ্ছিন্ন কৃষ্ণ মেঘখণ্ডের ন্যায় ক্ষণিক ঔদাস্য তাহার মনকে বিকল করিত; কিন্তু কর্ত্তব্যের কঠোর আহ্বান পুনরায় নবীন শক্তির সঞ্চার করিত।

বিশেষ করিয়া অর্থপ্রিয় হইলেও, নলিনীর প্রতি তাহার পিতার বুকভরা গভীর স্নেহ ছিল। প্রিয়দর্শন নলিনী একমাত্র সন্তান বলিয়া, কেবল যে পিতার স্নেহের দুলাল ছিল, তাহা নহে; তাহার পিতৃব্য ও পিতৃব্য-পত্নীরও প্রগাঢ় স্নেহ সে লাভ করিয়াছিল। তাহার স্নিগ্ধ, সরল, অমায়িক ব্যবহারে কেহ তাহাকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারিত না।

দারুণ নির্ব্বন্ধের বশীভূত হইয়া পুত্র ও ভ্রাতার প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়া নলিনীর পিতা পরিশেষে অত্যন্ত সন্তপ্ত হন। প্রতিশোধ-বাসনা যখন মানুষকে উন্মত্ত করিয়া তুলে, তখন সে বেগময়ী পার্ব্বত্যা তরঙ্গিনীর ন্যায় শত বাধা ও বন্ধন দীর্ণ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হয়। কত সুখময়ী স্মৃতি, কত স্নিগ্ধ, মধুর স্নেহ একেবারে মুছিয়া দেয়। তখন আর তাহাকে নিবৃত্ত করা যায় না। অবশেষে এই ধ্বংস-সাধনার মধ্যে এমন একটি সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন সহসা সে অতীতের পানে তাকাইয়া দেখে, এবং সুপ্ত স্নেহ ও প্রীতি তাহার কঠোর হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলে। তখন অন্তরে বিদ্রোহ-বাণী আর উচ্চারিত না হইলেও, ফিরিবার অবকাশ উপস্থিত হয় না; এবং অন্ধ, গর্ব্বিত মানব ইতিকর্ত্তব্যবিহীন হইয়া পড়ে।

নলিনীর জননীর সকরুণ মিনতি ও পিতৃব্যের একান্ত অনুরোধে নলিনীর পিতা মুহূর্ত্তের জন্যও কর্ণপাত করেন নাই; বরং যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পূজা করিত, সেই ভ্রাতাকে, ক্রূরতার বশীভূত হইয়া, চিরদিনের জন্য বিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। নলিনীর মৌন মর্ম্মবেদনাও তাঁহার নিকট সম্প্রতি অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু তীক্ষ্ণ আত্মাভিমানের নিকট স্নেহ ও বিবেকের সকল বাণী অস্ফুট হইয়া যাইত। মান-গর্ব্বিত শির নত করিবার পক্ষে শুষ্ক

অন্তরায় ছিল—বিরাট আত্মাভিমান। তাঁহার ব্যথিত ও অনুতপ্ত চিত্ত শুধু সুযোগ অন্বেষণ করিত—যদি কখনও সেই পুণ্য-লগ্ন উপস্থিত হয়, যখন বিপুল মর্য্যাদা অটুট রাখিয়া মিলন-মঙ্গল সাধিত হয়।

নলিনীর পিতৃব্য যদিও অগ্রজের হৃদয়হীনতায় মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছিলেন, তথাপি বিগত দিবসের সুখ-দুঃখ-অঙ্কিত শত কাহিনী স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি রুষ্ট হন নাই; অথবা নলিনীর প্রতি তাঁহার গভীর স্নেহের তিলার্দ্ধও ব্যতিক্রম হয় নাই। অব্যবস্থিত চিত্ত সহসা গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, পরিশেষে বহু স্বার্থ বিসর্জ্জনে তাহার প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করে। এই চিরন্তন সত্য বহুবার জ্যেষ্ঠের-কার্য্য কলাপে প্রতিভাত হইয়াছে।

সতত তাঁহার মনে এই কথা উদিত হইত যে, এমন দিন আসিবে যে, দারুণ অনুশোচনা জ্যেষ্ঠের হৃদয়কে প্রবল-বেগে নিষ্পেষিত করিয়া সমস্ত ত্রুটীর সংশোধন করিবে। কিন্তু এক-এক করিয়া কত সুদীর্ঘ বর্ষ অনন্তে মিশাইয়া গেল, তথাপি ভ্রাতার মত অটল রহিল। তাঁহার বাক্য বা ব্যবহার বিদ্বেষ-প্রসূত না হইলেও, তিনি ভ্রাতা ও নববধূ সম্বন্ধে নীরব রহিলেন। এই অচিন্তনীয় আচরণ নলিনীর পিতৃব্যকে মাঝে-মাঝে হতাশ-ম্লান করিয়া তুলিত।

অগ্রজের অটল গাম্ভীর্য্যের নিকট তাঁহার মিলনের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া গেল। বহুকাল ধরিয়া বৈবাহিককে স্নেহ-স্নিগ্ধ সান্ত্বনা ও আশার মধুর বাণী শুনাইয়াছিলেন; এবং তিনিও মনে করিতেন, জগতে এরূপ প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ বিরহ দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। সুনিপুণ বৈদ্যের ন্যায় কাল সমগ্র ব্যবধান বিলুপ্ত করিয়া সুখ ও শান্তি আনয়ন করিবে। কিন্তু এক্ষণে নিরাশা ধীরে-ধীরে তাঁহার মনের উপরে একটা গভীর কৃষ্ণ-যবনিকা টানিয়া দিতে লাগিল। আর সেই ক্ষুদ্রা কুলবালা, বাল্যক্রীড়া অবসানের সহিত যাহার নিভৃত হৃদয়-মন্দিরে কত মুকুলিতা আশা সান্ধ্য তারকার ন্যায় ফুটিয়া উঠিতেছিল, যাহার উচ্ছ্বসিত বাসনা-তরঙ্গ দীপ্ত হর্ষে মর্ম্মের তটে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, যেন আলোক ও বাতাসবিহীন হইয়া আপনার মধ্যে আপনি হারাইয়া গেল। প্রথম প্রভাতের কনক-আলোকে যে রূপবিভা ফুটিতেছিল, তাহা যেন মেঘ-মেদুর অম্বর-তলে ম্লান হইয়া গেল। প্রেম-দেবতার আশীর্ব্বাদ-কিরণ এই নিরপরাধা সমস্ত লোক-চক্ষুর অন্তরালে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিত। সমস্ত ত্রুটী, সমস্ত অপরাধ যেন তাহারই! কবে, কোন্ পুণ্যহীন লগ্নে, কোন্ অভিশপ্ত দিবসে জন্মগ্রহণ করিয়া, সে যেন নিয়তির কঠোর বজ্র আত্মবর্গের উপর পাতিত করিয়াছে!

শান্ত, মৌন, করুণ তাহার মুখচ্ছবি প্রতি নিমেষে জনক-জননীর গভীর স্নেহকে আমূল পীড়িত করিত। কিন্তু একান্ত অসহায় তাঁহারা। এক-এক করিয়া সমস্ত মিলন-প্রয়াস নিষ্ফল ক্রন্দনে পরিণত হইয়াছে। হায়, কেন সে দাবী, তাহা ন্যায় হউক কি অন্যায় হউক, পূর্ণ করা হয় নাই! তাহা হইলে ত তাহাকে এ দুঃসহ অন্তর্ব্বেদনা আজ সহ্য করিতে হইত না,—সমস্ত হৃদয় ভরিয়া এ উন্মাদ হাহাকার উঠিত না!

মূঢ় মানুষ যে পর্য্যন্ত অবলম্বনবিহীন না হয়, ততক্ষণ সে প্রতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যাপারে স্বীয় অস্তিত্ব অনুভব করে, এবং অদৃষ্ট-লেখা মুছিয়া দিতে প্রয়াসী হয়; কিন্তু যখন কোন উপায়ই থাকে না, মিথ্যা আশা সমস্ত শক্তি শোষণ করিয়া অবসাদ ও দুর্ব্বলতা আনিয়া দেয়, তখন সংসার-সংগ্রাম-বিধ্বস্ত নিরাশা-সর্ব্বস্ব অশান্ত অতৃপ্ত-হৃদয় সে সেই বিধাতার কোমল কঠোর বিধান ভক্তি-নম্র হৃদয়ে বহন করে, এবং অদৃষ্টে বিশ্বাসপরায়ণ হইয়া উঠে। তখন ভগবানের করুণা প্রভাতের মৃদু পবন-স্পর্শের মত সমস্ত জ্বালা স্নিগ্ধ করিয়া দেয় এবং অবিশ্বাসী বিরুদ্ধ প্রকৃতিকে তাঁহার স্বর্ণ-সিংহাসন-তলে সম্মিলিত করিয়া সমস্ত বৈষম্যের অবসান করে।

নলিনীর পিতা যেমন প্রতি প্রভাত আলোকে মিলনের সুযোগ প্রার্থনা করিতেন, তাহার শ্বশুর ও খুল্লতাত তেমনিই সেই দুর্ভাগা বালিকার সমস্ত দণ্ডের অবসান ও পূর্ব্বপ্রণয়ের কামনা করিতেন। সম্মিলিত হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা ও সরলার অশ্রুজলে বিশ্ব-জননীর স্নেহ-উন্মুক্ত হৃদয় আকুল হইল; নয়ন-কোণে অপার করুণা উছলিয়া উঠিল; এবং একটী অচিন্তনীয় ঘটনায় এই সুদীর্ঘ বিরহ-ব্যথার অবসান হইয়া গেল।

বিজয়ার দিন অপরাহ্নে নদীবক্ষে বহু দূর হইতে প্রতিমার সমাগম হইত। নদীর কূলে-কূলে অসংখ্য নৌশ্রেণী পণ্যভার লইয়া অপেক্ষা করিত। চতুষ্পার্শ্ব

গ্রামের যুবক ও বালকবৃন্দ নৌবিহারে বহির্গত হইত। জলে-স্থলে সর্ব্বত্রই গীতবাদ্য ও নৌচালন-প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটা উল্লাস-হিল্লোল বহিয়া যাইত। আনন্দ যখন সর্ব্বব্যাপক হয়, তখন সকলেরই হৃদয়-তন্ত্রী কি এক ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠে। নলিনী যদিও কোনও উৎসবে প্রাণ খুলিয়া যোগদান করিত না, তথাপি আজিকার এই আনন্দ-তরঙ্গ তাহার সুপ্ত হৃদয়ে একটু উচ্ছ্বাস আনিয়া দিয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে একাকী একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় এ আনন্দ-উৎসব দেখিতে বাহির হইল। দশমীর চন্দ্র যখন হসিত আলোকে সমস্ত জগৎ উন্মাদনায় ভরিয়া দিল, হর্ষ ও মিলনের উচ্ছ্বাস যখন প্রতি হৃদয়-তট প্লাবিত করিল, তখন নলিনীর তাপিত চিত্তে সহসা অতীতের একটী স্মরণীয় পবিত্র দিনের কথা উদিত হইল। আবিষ্ট চিত্তে মন্ত্রমুগ্ধের মত নলিনী সে ধ্যানে ধীরে-ধীরে মগ্ন হইয়া পড়িল। একখানি বাইচের নৌকা অতি দ্রুত আসিতেছিল; নলিনী অথবা তাহার মাঝি কেহই তাহা লক্ষ্য করে নাই। মাঝির অসাবধানতায় দুইখানি নৌকার ভীষণ সংঘর্ষ হইল; এবং নিজেকে স্থির রাখিতে না পারিয়া নলিনী নৌকা দুইটীর মধ্যস্থলে অদৃশ্য হইয়া গেল। নিমেষমধ্যে এই শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইল। চারি-দিকে একটা আর্ত্ত স্বর সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। নলিনীর পিতৃব্য অপর একখানি নৌকায় ছিলেন। কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি নদীবক্ষে লম্ফ প্রদান করিলেন; এবং বহু কষ্টে নলিনীর স্পন্দনরহিত দেহ বক্ষে লইয়া কূলে পৌঁছিলেন।

নলিনী জলমধ্যে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। বিশেষ কোনও প্রকার আঘাত পায় নাই, সুতরাং জ্ঞান সঞ্চারে বিলম্ব হইল না। জনতা ভেদ করিয়া যখন তাহার পিতা ও শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সে চেতনা লাভ করিয়াছে। তাহার খুল্লতাত তাহাকে মমতাময়ী জননীর ন্যায় ক্রোড়ে লইয়া স্নেহ-মধুর বাণীতে আশ্বাস ও সান্ত্বনা প্রদান করিতেছিলেন। এ দৃশ্য দেখিয়া, তাহার পিতা আনন্দে আত্মহারা হইয়া, কনিষ্ঠকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, গুমরিয়া-গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বহুকাল-সঞ্চিত রুদ্ধ হৃদয়-প্রবাহ আজ অজস্র ধারায় কূল প্লাবিত করিয়া দিল। সমস্ত দুঃখ, ব্যথার অবসান হইয়া গেল। কুহু চন্দ্রালোকে উৎসবের দিনে পরমাত্মীয়বর্গের আনন্দ-মিলনের মধ্যে বিশ্বমাতার করুণা ও বাণী যেন পরিপূর্ণ ছন্দে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

মুসলমান কবির বিদ্যাসুন্দর

[শ্রীআবদুল করিম, সাহিত্য-বিশারদ]

পরাধীনতায় মানসিক বৃত্তি-নিচয় স্বচ্ছন্দভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ না পাইয়া ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া যায়। ইহা স্বভাবের নিয়ম। সকলেই দেখিয়াছেন, একটী বড় গাছের নীচে ছোট কোন গাছ থাকিলে, ছোট গাছটি মোটেই বাড়িতে পারে না; ফলে তাহা দিন-দিনই মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রাণি-জগতের সর্ব্বত্র এই একই নিয়ম অনুস্যূত দেখিতে পাওয়া যায়। জাতীয় সাহিত্যের সহিত জাতীয় জীবন ওতপ্রোত ভাবে সম্বদ্ধ বলিয়া, জাতীয় সাহিত্যে জাতীয় জীবনের ছায়া সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়া যায়। বাঙ্গালী পরাধীন জাতি। বাঙ্গালীর পরাধীন জীবনের ছায়া তাহাদের জাতীয় সাহিত্যে পদে-পদে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে অনুকরণপ্রিয়তার বাহুল্য সম্বন্ধে এখানে কোন কথা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে। প্রাচীন বাঙ্গালী কবির পুষ্পগ্রাহিতা দেখিলে, বিস্ময়ে হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া যায়। প্রাচীন সাহিত্যানভিজ্ঞ পাঠকগণ জানেন, কোন নূতন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া, তাহাতে প্রতিভার ভাস্বর আলোক-সম্পাত করিবার জন্য আগ্রহ-প্রকাশের পরিবর্ত্তে, আমাদের সমস্ত প্রাচীন কবিগণ একের পর একে একই বিষয়কে চর্ব্বণ-প্রতিচর্ব্বণ করিতে-করিতে, অবশেষে উহাকে অস্থি-চর্ম্ম-সার করিয়া তুলিয়াছেন। পরিশেষে বিষয়টি এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাতে কবি-প্রতিভার কিছু স্বাধীন স্ফূরণ থাকিলেও, পাঠকের অভ্যস্ত মন ও নয়ন আপনিই তাহাতে বীতস্পৃহ হইয়া পড়ে। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে একই নামের ও একই বিষয়ের বহু গ্রন্থের জন্ম এই পুষ্পগ্রাহিতারই ফল। স্বাধীন জাতির কবি স্বাধীনতার পথে ধাবিত হইবেন, পরাধীন জাতির কবি পরাধীনতার পঙ্কিল প্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়া পর-পদানুসরণে উৎসুক হইবেন, ইহা কিছু বিচিত্র কথা নহে। সুতরাং এই অনুকরণপ্রিয়তার জন্য বাঙ্গালী কবির দোষ দেওয়া বৃথা। তাঁহাদের এই পুষ্পগ্রাহিতা প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের কতটুকু স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাহার বর্ণনা করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সুপরিচিত 'বিদ্যাসুন্দরে'র কাহিনী লইয়া এ পর্য্যন্ত কতজন কবি লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন,

সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া, বর্ধমানবিজড়িত জনৈক মুসলমান কবি-রচিত একখানি বিদ্যাসুন্দর কাব্যের পরিচয় দেওয়াই আজ এই প্রবন্ধের অবতারণা।

বররুচি নামক কবি সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান রচনা করেন। তাহা বঙ্গীয় বিদ্যাসুন্দরের মূল ভিত্তি না হইলেও, তাহার একটা ছায়া যে বঙ্গীয় বিদ্যাসুন্দরে পতিত হইয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই ছায়াবলম্বনে রচিত বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনীও সম্ভবতঃ অন্যান্য পল্লী-গাথার ন্যায় বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই দেশমধ্যে প্রচলিত ছিল। সেই পল্লী-গাথাই পরে কবিগণের প্রতিভা চেষ্টার ফলে বিকাশ লাভ করিয়া, কাব্যাকার ধারণ করিয়াছিবে, সন্দেহ নাই। অন্যান্য কবির মধ্যে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্য বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে উদিত হইয়া, ভাব ও রুচি হিসাবে উহাকে কিরূপ নবিনশ্রী করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা বিজ্ঞ পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী শুধু কুরুচি-কলুষিত নহে, উহা দ্বারা হিন্দু সাহিত্যে বিজাতীয় ভাব ও আদর্শেরও আমদানী হয়। সেই ভাব ও আদর্শ বহুদিন পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যের উপর কেবল প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া বসিয়াছিল, এমন নহে; বঙ্গভাষার গায়ে তাহার একটা মসী-মাখা দাগ চিরদিনের জন্য অঙ্কিত রহিয়া গিয়াছে।

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান এক সময়ে যেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে মনে হয়, বঙ্গভাষায় অনেকেই এই বিষয় লইয়া কাব্যাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের মত এই গ্রন্থেরও অনেকগুলি পুথি কালপ্রভাবে বা লোকের অনাদরে বিস্মৃতির অতল জলধিতলে নিমগ্ন হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। এ পর্য্যন্ত যে কয়জন কবির গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের নাম এই :—

১। কৃষ্ণরাম দাস।
২। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।
৩। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
৪। প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী।
৫। নিধিরাম কবিরত্ন।
৬। গোবিন্দ দাস।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র পাঠকগণ কেবল প্রথম চারিজন কবির বিষয় অবগত আছেন। নিধিরাম ও গোবিন্দ দাসের গ্রন্থদ্বয় এই দীন লেখকেরই আবিষ্কৃত। তাঁহাদের বিষয় অনেক দিন পূর্ব্বেই সাময়িক পত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়া গিয়াছে।* সম্প্রতি আর একখানি নূতন বিদ্যাসুন্দরের একটী মাত্র জীর্ণ পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, দ্বিজ শ্রীধর নামক কোন কবি নৃপতি নসরত শাহের আদেশে এই বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন। নসরত শাহের নাম বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে আমেই সুপ্রতিষ্ঠিত আছে; কিন্তু তৎপুত্র ফিরোজ শাহের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ছিল, সাহিত্যে আর কখন তাহা গিয়াছে কি না, জানি না। সেই পত্রটির বিবরণ এই :

"আমি যদি এড়ে কালকূট বিষ হরে।
কূর্ম্ম পিঠে ধরণীর হএ গুরুতরে।
বাড়বা অনলে মহোদধি নহি ছাড়ে।
সুকৃতি জনের বাক্য কভু নহি লড়ে।
মোহাজন বাক্য জেন গজেন্দ্র বন্ধন।
হীনজন বাক্য যুক্ত যুগের লক্ষণ।
জামাতা বলিলা মোরে এই সত্য বাক।
আর কেনে কোপ মোরে কর মোহারাজ।
মোহর মরণে বিদ্যার জীবন সংশয়।
আপনার বাক্য নৃপ রাখ মহাশয়।
নৃপতি বসির সাহ তনয় সুন্দর।
সর্ব্বকলা বলিনী ভূষিত মধুকর।
রাজা শ্রীফিরোজ সাহা বিনোদ সুজান।
দ্বিজ শ্রীধর কবি রাজ পরমাণ।"

দুর্ভাগ্যের কথা যে, বাঙ্গালার কোন বৃহৎ ইতিহাস নিকটে না থাকায়, আমি সুলতান ফিরোজ শাহের সময় নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না। সাধারণ ইতিহাসে দেখিতে পাই, হুসেনশাহী নৃপতি সের শাঁ সুলতান হোসেন সাহের বংশীয় নৃপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া বাঙ্গালা অধিকার করেন। এই ঘটনা ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ঘটে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, এই বিদ্যাসুন্দর ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। এতদিন কৃষ্ণরামই বিদ্যাসুন্দরের প্রথম রচয়িতা বলিয়া বিবেচিত হইতেন। সম্ভবতঃ ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেলঘরিয়া ঐসনের আধক্রোশ পূর্ব্বে নিমতা গ্রামে কায়স্থ কুলে তাঁহার জন্ম হয়। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি 'রায়মঙ্গল' রচনা করেন। এই কাব্য রচনার পর তাঁহার বিদ্যাসুন্দর রচিত হয়। সম্ভবতঃ ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের দুই-এক বৎসর পরে, এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিদ্যাসুন্দর বিরচিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, শ্রীধরের বিদ্যাসুন্দর আবিষ্কৃত হওয়ায় পর কৃষ্ণরামকে বিদ্যাসুন্দরের প্রথম কবি বলিয়া আর স্বীকার করা যাইতে পারে না। অতঃপর কবি শ্রীধরকেই এই কাহিনীর প্রথম কবি এবং কৃষ্ণরামকে দ্বিতীয় কবি বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

বিদ্যাসুন্দরের তৃতীয় কবি কে, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা কঠিন। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনকে ইহার তৃতীয় কবি মনে করা যাইতে পারিত; কিন্তু কবি গোবিন্দ দাস আসরে অবতীর্ণ হইয়া সে বিষয়ে একটা বিষম গোল বাধাইয়াছেন। রামপ্রসাদের গ্রন্থখানি ১৭৫০ ও ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে কোন এক সময়ে বিরচিত হইয়াছিল। কবি গোবিন্দ দাসের গ্রন্থখানি কখন বিরচিত হইয়াছিল, জানা যায় নাই; কিন্তু

* নিধিরামের 'বিদ্যাসুন্দর' সম্বন্ধে ৯ম বর্ষের 'পূর্ণিমা'—১০ম ও ১১শ সংখ্যায় এবং গোবিন্দ দাসের 'বিদ্যাসুন্দর' সম্বন্ধে ৬ষ্ঠ বর্ষের 'প্রবাসী'—৯ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

তাঁহার গ্রন্থের যে প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ১১১৬ মঘী সনের বা ১৭৩৪-৫৫ খৃষ্টাব্দের লিখিত বলিয়া দেখা যায়। গ্রন্থের রচনা যে ইহার অন্ততঃ কিছু পূর্ব্বে হইয়াছিল, তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। তিনি যে কবি রামপ্রসাদের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন, সে কথাও একরূপ নিশ্চিত। এ অবস্থায় রামপ্রসাদ ও গোবিন্দ দাসের মধ্যে কে বিদ্যাসুন্দরের তৃতীয় কবি, তাহার নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে। তবে অনুমানে এ কথা মাত্র বলা যাইতে পারে যে, উভয়ের গ্রন্থ প্রায় সম-সময়েই রচিত হইয়াছিল। তাঁহাদের কাব্যগুলি ঠিক কোন্ কোন্ সনে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা জানা না গেলে, এ সম্বন্ধে সন্তোষজনক একরূপ অসম্ভব।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে বিরচিত হয়। নিধিরাম কবিরত্ন তাঁহার কাব্যখানি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বা ভারতের বিদ্যাসুন্দর রচনার পাঁচ বৎসর পরে ও পলাশী যুদ্ধের বৎসরে রচনা করেন। কবি প্রাণরামের গ্রন্থখানি যে ভারতচন্দ্র প্রভৃতির পরে লিখিত হইয়াছিল, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; যথা :—

"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ।
বিরচিল কৃষ্ণরাম মিবতা যার বাস।
তাঁহার রচিত পুঁথি আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই।
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে।"

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, আর উক্ত তিনজনের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া প্রাণরাম তাঁহার কাব্যখানি প্রণয়ন করেন। সেযোক্ত গ্রন্থখানি ভারতচন্দ্রের পরে রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কত বৎসর পরে, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দ্বিজ শ্রীধর ও কৃষ্ণরাম ভিন্ন বিদ্যাসুন্দরের আর সকল কবিই প্রায় এক সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আমরা উপরে তাঁহাদের গ্রন্থ-রচনার যে সময় প্রদর্শন করিয়াছি, পাঠকগণ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমাদের এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রাণরামের গ্রন্থ-রচনার কাল জানা যায় নাই বলিয়া কেবল তাঁহারই সম্বন্ধে কোন কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

বঙ্গভাষায় ও এই কয়খানি বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কথা আমরা জানি। পারসী ও উর্দ্দু ভাষাতেও বিদ্যাসুন্দর কথা রচিত হইয়াছিল না। বহু প্রাচীন পারসীতে রচিত একখানি বিদ্যাসুন্দর প্রথিসম্প্রতি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট সংগৃহীত আছে। উহা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অনেক পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের উর্দ্দু ভাষায় বিরচিত অনুবাদের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। কবি মেজারতউল্লা-কৃত আর একখানি পারসী বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কথা সম্প্রতি জানা গিয়াছে। * উহা হিজরী ১২০০ অব্দে (১৮২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে) বিরচিত হইয়াছিল। এরূপ আরও কত দিকে কত বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করিয়াছিল, আজ কে তাহার হিসাব করিবে? বাগানে কত ফুল ফুটে, কিন্তু সবগুলি ত আর দেবপূজায় আসে না! কত ফুল আপনিই ফুটে, আর আপনিই অনাঘ্রাত ভাবে ঝরিয়া পড়ে,—কেহ তাহার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলে না। সম্প্রতি আমরা যে প্রাচীন বিদ্যাসুন্দর প্রাপ্ত হইয়াছি, এখন তাহারই আলোচনা করা যাউক।

কালিকা দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারোদ্দেশ্যেই হিন্দু কবিগণ বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাই প্রায় সকল কবির কাব্যেরই এক নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশবাসী কবিগণের মধ্যে গ্রন্থের নামকরণ বিষয়ে এরূপ ঐকমত্য একটু বিস্ময়কর বটে। কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ, নিধিরাম ও গোবিন্দ দাস—এই কবি চতুষ্টয়েরই গ্রন্থের নাম 'কালিকামঙ্গল।' দ্বিজ শ্রীধর ও প্রাণরামের গ্রন্থেরও সম্ভবতঃ ঐরূপ একটা নাম ছিল। কেবল ভারতচন্দ্রের গ্রন্থখানি তদীয় 'অন্নদামঙ্গলের' অন্তর্গত। আমাদের এই কাব্যখানি জনৈক মুসলমান কবির লেখনী-প্রসূত। দুঃখের বিষয়, পাণ্ডুলিপিখানি আদ্যন্ত খণ্ডিত বলিয়া উহার কি নাম ছিল, জানিবার উপায় নাই। তবে একথা ঠিক যে, মুসলমান কবি নিশ্চয়ই কোন দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ইহার প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাই তাঁহার গ্রন্থের নাম 'বিদ্যাসুন্দর' ভিন্ন আর কিছু ছিল বলিয়া কল্পনা করাও অন্যায়। পুথিখানির মোট ৮৮ পত্র বিদ্যমান আছে। অবশিষ্ট পত্রগুলি কালীকের গর্ভে লয় হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন তুলট কাগজের দুই পিঠ লেখা। কাগজের আকার ১২×৭।০ ইঞ্চি পরিমিত। পত্রাঙ্ক না থাকায় উভয় দিকে গ্রন্থের কত পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং উহার প্রতিলিপিকাল বা লিপিকরের নামধামই বা কি, কিছুই জানিবার উপায় নাই। কাগজের অবস্থা দেখিয়া উহাকে শতেক বৎসরের অধিক প্রাচীন বলিয়া অনুমান করা যায় না। পুথিখানি চট্টগ্রাম নগরের নিকটবর্ত্তী চাদপাঁও গ্রামে জনৈক মুসলমানের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে।

ইহার রচয়িতার নাম সাবিরিদখান। গ্রন্থের এক স্থলে তাঁহার এ সামান্য পরিচয়টুকু আছে :—

"পীতার মল্লিক সুত দ্বিজবর পাত্র দূত
উজীরাম মল্লিক প্রধান।
তান পুত্র দ্বি ঠাকুর ভিন দিক সরকার
অনুজ মল্লিক মুখা খান।
বলেত রসিক অতি রূপে জিনি রতিপতি
ভাতা অগ্রগণ্য অতি সুত।

* এই গ্রন্থের বিবরণ 'নোয়াখালী' পত্রিকা—১ম বর্ষ—৪র্থ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

বৈদ্যবংশ যেন যেন ব্রাহ্মণের বাসব গুরু
মানে মুক্ত ধর্ম্মে ধর্ম্মযুত।
তান সুত গুণাধিক বাসু রাজা মহাত্মিক
জগত প্রচার যশ খ্যাতি।
তান সুত অল্প জান হিন সাবিত্রিক খান
পদ রচে রচিত ভারতি।"

প্রাগুদ্ধৃত পদটির হইতে কবির যে বংশ-তালিকা পাওয়া যায় তাহা এই :—

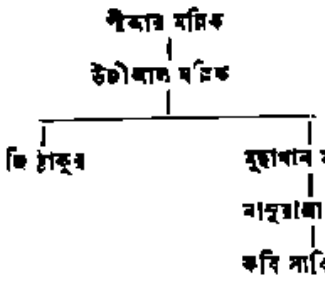

কবির প্রদত্ত বংশ-পরিচয়ে দেখা যাইতেছে, কবি এক অতি প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশের উপাধি ছিল 'খান মল্লিক'। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কবি কোথাও তাঁহার বাসস্থানের উল্লেখ করেন নাই। ঐরূপ উপাধিযুক্ত কোন মুসলমান বংশ চট্টগ্রামে আছে বলিয়া আমরা জানি না। চট্টগ্রামের একটী থানার 'মল্লিক-ডোয়াঙ্গ' নামে এক গ্রাম আছে। সেই গ্রামের নামের সহিত এই মল্লিকবংশের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, কে বলিবে? এরূপ উপাধিও মুসলমানের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া বোধ হয় না। সম্ভবতঃ কবির বংশ আদৌ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল—পরে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। 'জি ঠাকুর' কিরূপ নাম, ঠিক বলিতে পারি না বটে, কিন্তু মুসলমানের নামের সহিত 'ঠাকুর' উপাধির সংযোগ এই নূতন নহে। কবি আলাওলের রচিত 'পদ্মাবতী' কাব্যের আদেষ্টা 'মাগন ঠাকুর' একজন বৈদ্যবংশীয় লোক ছিলেন। এখানে মুসলমান নামের সহিত 'ঠাকুর' শব্দের সংযোগে হিন্দু অপেক্ষা যবের সম্ভ্রবই বেশী সূচিত হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কারণ, চট্টগ্রাম বহুদিন যবের শাসনাধীন ছিল, বলিয়া যবনের মতন মুসলমানেরাও তাহাদের অনেক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছিল। মাগনের 'ঠাকুর' উপাধি লাভও যবরাজার সহিত সম্ভ্রবের ফল। যবনের অনুকরণে বৃদ্ধ পিতামহ প্রভৃতিকে আমরা এখনও 'বুড়া ঠাকুর' নামে ডাকিয়া থাকি। সম্ভ্রমের বাচকরূপে ত্রিপুরা রাজ্যে অদ্যাপি ব্রাহ্মণদের 'ছোট ঠাকুর,' 'বড় ঠাকুর' উপাধি প্রচলিত আছে। ত্রিপুরা রাজ্য এখন পূর্ণমাত্রায় হিন্দু রাজ্য হইলেও, উহার অঙ্গ হইতে যব-সংস্রবের চিহ্ন আজও সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে, সত্যের অনুরোধে আমরা এ কথাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে, কোন-কোন স্থলে মুসলমান-নামের সহিত 'ঠাকুর' উপাধির সংযোগে, তাঁহারা যে পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন, এরূপও সূচিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেইরূপ স্থলে ঐ উপাধিটী কৌলিক উপাধি রূপে ব্যবহৃত হয়,—কেবল বংশের ব্যক্তিবিশেষে ব্যবহার করে না,—হিন্দুদের মত বংশের সকলেই তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে। এরূপ 'ঠাকুর'-উপাধিধারী একঘর সম্ভ্রান্ত মুসলমান ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মুরাদনগর থানায় অবস্থিত আছেন বলিয়া জানা যায়। যাহা হউক, বক্ষ্যমান স্থলে 'ঠাকুর' উপাধিটী যে ব্যক্তি-বিশেষের উপাধি মাত্র, তাহা বলা বাহুল্য। দেখা যাইতেছে যে, উক্ত 'জি ঠাকুর' মহাশয় 'তিন সিকের সরকার' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'সিক' নামে দেশ-বিভাগ চট্টগ্রামে কখন ছিল বলিয়া আমরা শুনি নাই। দক্ষিণ সিক, উত্তর সিক প্রভৃতি নামক পরগণা যেন নোয়াখালী জেলাতেই আছে বা ছিল বলিয়া কোথায় শুনিয়াছি। যদি আমাদের এ অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, কবি সাবিত্রিক খানের জন্মস্থান নোয়াখালী জেলার কোন গ্রামে ছিল। গ্রন্থখানি সমগ্র পাওয়া গেলে হয় ত তাঁহার বাসস্থানের কোন কিনারা হইতে পারিত। যে পর্য্যন্ত তাহা না পাওয়া যাইতেছে, আপাততঃ সে পর্য্যন্ত আমাদিগকে অন্ধের মত এ সকল উদ্ভট অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে।

এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, এরূপ খণ্ডিত পুথির সাহায্যে গ্রন্থকার কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনি অন্যান্য বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতৃগণের আগের কি পরের লোক, তাহার বিনির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। কবির ভাষা হইতে আমরা এ ক্ষেত্রে কতকটা সহায়তা পাইতে পারি বটে, কিন্তু অনেক সময় কেবল ভাষালোচনা দ্বারাও সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। যাহা হউক, আমরা এ বিষয়ে নাচার। রচনার নমুনা স্বরূপ আমরা নিম্নে গ্রন্থের যে সমস্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহা হইতে বিজ্ঞ পাঠকগণ নিজেরাই তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান যতগুলি কৃত গ্রন্থে উজ্জয়িনী নগরে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। কৃষ্ণরামও ঘটনাস্থান বর্দ্ধমান বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। রামপ্রসাদ বীরসিংহকে বর্দ্ধমানের রাজা করিয়াছেন। ভৎপরাবলম্বী ভারতচন্দ্রও বর্দ্ধমান স্থির রাখিয়াছেন। তাঁহাদের এরূপ স্থান নির্দ্দেশে প্রতারিত হইয়া অনেকে বিশ্বাস করেন যে, বিদ্যার সুরঙ্গ বর্দ্ধমানেই ছিল। সে-যাহা সাহিত্য-সম্মিলনে গিয়া আমরাও বর্দ্ধমানে ঐ সুরঙ্গ দেখিয়া আসিয়াছি। বর্দ্ধমানে বিদ্যার সুরঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী দেশে প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। কারণ প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে আমরা কবি আলাওলকে এই সুরঙ্গের নাম উল্লেখ করিতে দেখিতেছি; যথা—

'বিদ্যার সুরঙ্গ আদি
দিনু জগন্নাথ নদী
একে একে সব বিচারিল।"
(হয়ফল মুলুক—বদিউজ্জামাল।)

এখানে কবি বর্দ্ধমানের কোন উল্লেখ করেন নাই। এ উপাখ্যানের

মূল ঘটনা ঠিক থাকিলেও, কবিগণের মধ্যে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিষয়ে অনেক অনৈক্য আছে। সে সমস্ত প্রদর্শন এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে।

এই গ্রন্থে সুন্দরের জন্মস্থানের নাম রত্নাবতী নগরী, পিতার নাম গুণসার ও মাতার নাম কলাবতী; এবং বিদ্যার জন্মস্থানের নাম উজানী নগর—কাঞ্চিপুর ও পিতার নাম বীর সিংহ। এ গ্রন্থ রচনা করিতে যাইয়া কবি কাহার অনুসরণ করিয়াছেন, বলিতে পারি না। তিনি প্রথমে সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণিতব্য বিষয়ের আভাস দিয়া পরে বাঙ্গালায় তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন; যথা :—

(শ্লোক—অধিকাংশ উদ্ধৃত।)

"অত্যোত্তরে গুজদেশ সর্ব্ব লোকে সবাধিত।
পুরী রত্নাবতি নামি বহু রত্ন বিভূসিত।
গুণসার নৃপপুত্র নীতিধর্ম্মপরায়ণ।
তস্য কলাবতী নামি ভার্য্যাশ্চ গুণশালিনী।
তস্যা গর্ভে সুত কালিকাত্মা প্রসাবেত।
সুন্দরেতি সমখ্যাত সর্ব্ব লোকে বিদারয়।"

অত্যন্ত উত্তর দেস বিজয় নগরি।
অধিক উত্তম রত্নাবতি নাম পুরি।
সে দেসের বরপতি নাম গুণসার।
সকল ভূপতি জিনি জস সুপ্রচার।
প্রজার পালন নৃপ স্নেহেন পিতার।
পুত্র এ অতিথি নিত্য ধর্ম্মেত তৎপর।
দানে ধর্ম্মে অনুপাম জেন কল্পতরু।
দারিদ্র সন্তোষে যান জানে সুরগুরু। ইত্যাদি।

মধ্যে মধ্যে সর্ব্বত্রই এরূপ শ্লোক পরিদৃষ্ট হয়।

কবির ও ভাষার নমুনা স্বরূপ এখন আমরা কয়েক স্থান হইতে কিছু-কিছু উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি :—

সুন্দরের জন্মলাভে—

সূতিকা ভুবনে হৈল হরিস কল্লোল।
শুনি গুণসার রাজা আনন্দ বহুল।
বিবিধ বাদিত্র ধ্বনি জেন রামধনু।
বহুবিধ উৎসব করিলা নরেশ্বর।
পরম প্রমোদে পুত্র বক্ত্র আলোকিল।
প্রথম নরক হোতে মুকুতি পাইল।
গুণসারে সুতমুখ দেখি মনোহর।
সৌরবে তাহান নাম থুইল সোন্দর।
বত্রিস লক্ষণে সিশু বাড়ে দিসি দিসি।
বিদ্যাশশি পথে জেন বাড়ে নব সসি।

বিদ্যার রূপ বর্ণন—

মুখ বিম্ব পূর্ণ ইন্দু কিএ অরবিন্দ।
মৃগ বৎস নেত্র কিবা নীল মত ভৃঙ্গ।
বালেন্দু জিনিআ ভাল সীমন্ত (সীমন্ত) উজ্জ্বল।
বান্ধুলি প্রসূন নিন্দি অধর যুগল।
রূপসীতি মূর্ত্তি জ্যোতি বাচি সুবদুরে।
ভুরুভঙ্গে কামশর নিবসে প্রচুর।
কণ্ঠরেখা ত্রিধি (বলি) কম্বু জলধি বর্জ্জিল।
কমল কলিকা কুচ হৃদএ উসিল।
ইসত উন্নত কুচ হেম বিম্বরঙ্গ।
অঙ্গের লাবণ্য দেখি অতনু অনঙ্গ।
নাভা তিল ফুল খগরাজ চঞ্চু জিত।
নিতম্ব পীবর রম্ভা উরু সুবলিত।
কাঞ্চন মৃণাল জিনি ভুজ ভরি থও।
করতল লোহিত রঞ্জন অনুবন্ধ।
তনী কটি ক্ষীণ দেখি পায়িল উদাস।
তেকারণে পর্ব্বত কুহরে করে বাস।
পাদপদ্ম রক্ত স্থল কমল পূজিল।
পাদনখে নবচন্দ্র শ্রেণী উপর্জ্জিল।

মাধব ভট্টের বর্ণনে সুন্দরের উত্তর—

সুনরে মাধব ভট্ট না করিহ রোস।
সাস্ত্রবাদে ধনী জিনি কোন পরিতোস।
রোসিতা হইলে বীর সুর গুরুকুল।
ধরি আন্তি জাই তথি দর্প হৈব চুর।
অধীর চপলা বালা জিনি কোন কাজ।
অবহেলে তুহ গুরু জিনি দিমু লাজ।
জে দেসে নিবসে বিদগ্ধ বর নারী।
জাইমু সোপত্ত দেসে কদবে তোহারি।
বিজ্ঞান কুমার বোলে তুষ্ট হেল ভাট।
বুলি জলে জেহেন পবিত্র হএ বাট।

বিদ্যার উদ্দেশে যাত্রাকালে সুন্দরের গুরুদর্শন—

শব সিবা বামে শঙ্খ চিল ডানে
জোগান তুরগ পাতি।
দক্ষিণে ভুজঙ্গ উত্তরে খঞ্জন
দেখত করিতে গতি।
ঘট ঘট ভরি যুবতী সুন্দরী
সমুখে মিলিল আসি।
ধরি লই মাথে সোপনারী কথে
অগ্রতে চলত হাসি।
জেবালয় পুরী ধ্বনি মধু করি
সমযুক্ত বৎস বেদু।
দেখি সুযাত্রিক আনন্দ অধিক
পুলকে পুরল তনু।

সুচরিতা নারী মালিনীর নিকট সুন্দরের বাসা জিজ্ঞাসা—

আজা জান বৈদেসি বিদিত।
বিজবর তনয় পণ্ডিত।
পাঠ পড়ি অনিএ নগর।
পণ্ডিতসভী করিতে বিচার।
বেলি মেসে অস্ত জাএ সূর।
বাসাবাসি বাধি তোজা পুর।
পালহ বচন সুবয়নি।
প্রেম চিহ্নে দেহ বাসাবাসি।
অমূল্য রতন এক দেও।
আনিআ রতন সঙ্গা দেও।
তবি সুচরিতা সুবয়নি।
তব গৃহে বসি এ রজনী।

মালিনীর উত্তর।—

মবে আর ভিন্ন দেসী পাই।
ভয় করি তাহক রহাই।
মনে ভিত বাসি তোজা দেখি।
মোহরোজ সুত হেন লখি।

সুন্দরের উত্তর—

অবেলাএ অতিথি পাইআ।
অসাবু বহএ উপেখিআ।
আএ ধনি বুঝাই তোজাএ।
উপেক্ষিতে আজা না জুআএ।

মালিনীর উত্তর—

* * *
* * *

বিদেসি কুমার হের তোজাক বুঝাই।
নৃপতি দুর্গারে বাসা বিষারে তরাই।
নাগরত্ব নাম সে এয়ারা কোতোআল।
নিতি প্রতি প্রজা ঘর করএ বিচার।
ভিন্ন দেসি সুহৃদ মন্দিরে আর পাএ।
আগে সান্তি করি পাছু রাজাক জানাএ।
তবু কান্তি মুলক্ষণ অতিন্ন বরন (বরন ?)
তোজার তুলনা রূপ নাহিক ভুবন।
কোতোআলে দেখে তোজা মোর গৃহে।
কি বুলি জানিআ তাক রাখিবার তোহে।

অতঃপর গ্রন্থ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। অনেকটা উদ্ধৃত করিলাম বটে, কিন্তু তাহাতেও যে গ্রন্থের স্বরূপ বা কবির ভাল-নির্ণয়ে কোন সুবিধা হইবে, এমন বলিতে পারি না। গ্রন্থের উৎকৃষ্টাংশ পাওয়া যায় নাই; সুতরাং ইহার অধিক আমরাও আর কোন কথা বলিতে অক্ষম।

কবি সংস্কৃত জানিতেন, তাহা সংস্কৃত শ্লোকাবলী দৃষ্টে সহজেই বুঝা যায়। বাঙ্গালায় যে তাঁহার খুব অধিকার ছিল, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অধিকন্তু তাঁহার বাঙ্গালা পণ্ডিতসমের ভাষার মত সংস্কৃতানুসারী ছিল বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার রচনায় নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যবহার প্রণিধান যোগ্য :—

লখি—লক্ষ্য করিয়া; যথা—পতির বিলাপ লখি কহে কলাবতী।
বিহাসিআ—হাসিয়া; যথা—কিন্তু বিহাসিআ এবমস্তু বলি দেবী।
ভেল—হইল; যথা—বিবিধ বাদিত্রধ্বনি ভেল রাজঘর।
পেখি—দেখি; যথা—ওপসারে সুতমুখ পেখি মনোহর।
বএ—কহে; যথা—মধুভাষে নিবেদন বএ পার্ব্বতী।
তহু—তাহার; যথা—তহু তরে সুন্দরে সঙ্কেত জিজ্ঞাসিল।
বালি—বালিকা, যথা—নব অঙ্গ পূর্ণ বালি।
মোহোর—মোর; যথা—প্রতিজ্ঞা মোহোর হৃদে।
কৈছন—কেমন; যথা—কৈছন বদন রুচি হরএ ললাট।

এতদ্ভিন্ন করন্তি, খণ্ট (খণ্ডটক), বিদুঁ, গুনন্ত, কিরসি, জানাজন্ত বোলোঁ (বোলয়), পুহুম, হামারি (আমার), কুঞর (কুমার) প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ও শব্দের কোন দৃষ্টান্ত মিলায় না।

দ্বিতীয়া বিভক্তির 'কে' স্থলে 'ক' প্রয়োগের বহুল দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে কয়েকটি যথা—

'বিদ্যাএ বিদ্যাক্ত মেন দিবে।'
'সেই যোগ্য পত্তিক্ত ভণিবু।'
"বচনে তর্কিল ভাক্ত রাজসুত তথী।
বিদ্যাক্ত ভোসাএ বালা এইসে মালিনী।"

গৌড়ীয় যুগে বা চৈতন্য দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যেই সাধারণতঃ এরূপ বিভক্তি ও ক্রিয়া প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এই খণ্ডিত গ্রন্থের যেরূপ কয়েকটি লক্ষণ দেখিয়াই আমরা ইহাকে কোন নির্দ্দিষ্ট সুন্দর গ্রন্থ বলিয়া অবধারণ করিতে প্রস্তুত নহি। সাহিত্য-জগতে এই নূতন বিদ্যাসুন্দরের অস্তিত্ব-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াই আজ আমরা ক্ষান্ত হইতেছি। একদিন ইহার ফলে কোন অনুসন্ধিৎসু সেবকের হস্তে কালের গ্রাস-স্তূপ হইতে এই কবি-কীর্ত্তির পূর্ণোদ্ধার হইলেও হইতে পারে।

ভবানী-স্তোত্রম্

(শঙ্করাচার্য্য-বিরচিতম্)

[কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন, উল্টাডাঙ্গা, বি-এ]

(১)

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

পিতা নাই, মাতা নাই, নাই বন্ধু-গণ,
পুত্র নাই, কন্যা নাই, নাই দাতা জন।
ভৃত্য নাই, ভর্ত্তা নাই, ভার্য্যাও না তার,
বিদ্যা নাই, নাই কোন জীবিকা-উপায়!
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

(২)

ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরে
পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
কুসংসারপাশপ্রবদ্ধঃ সদাঽহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

মহাদুঃখ-জল-পূর্ণ অগাধ অপার
পরম-ভীষণ এই ভব-পারাবার।
কামী লোভী মত্ত হ'য়ে পড়েছি তথায়,
নিজ পাপ-জালে বদ্ধ,—না রহে উপায়!
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
এক মাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

(৩)

ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

কিছুমাত্র নাহি জানি কারে বলে দান,
কিছুমাত্র নাহি জানি কারে বলে ধ্যান;
তন্ত্র মন্ত্র স্তুতি মোর কিছু নাই জানা,
নাহি জানি ন্যাস, যাগ অথবা অর্চ্চনা।
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

(৪)

ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং
ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাত-
র্গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

কিবা পুণ্য, কিবা তীর্থ, তাও জানা নাই,
কিবা মুক্তি, কিবা লয়, বুঝিয়া না পাই।
কাহারে বা ব্রত বলে, কারে বা ভকতি,
তাহাও বুঝিতে মাগো! না আছে শকতি!
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

(৫)

কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ
কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবন্ধঃ সদাঽহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

কুকর্ম্মী কুসঙ্গী পুনঃ কুলাচার-হীন,
কুবুদ্ধি কুদাস পুনঃ কদাচার-লীন;
কুদৃষ্টি সদাই আছে আমার নয়নে,
কুবাক্য সদাই আছে আমার বদনে।
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

(৬)

প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং
দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

কিবা ব্রহ্মা, কিবা বিষ্ণু, কিবা মহেশ্বর,
কিবা ইন্দ্র, কিবা সূর্য্য, কিবা নিশাচর,
কাহারেও কিছুমাত্র কভু নাহি জানি,
তুমিই আশ্রয় মোর,—এই সদা মানি।
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

(৭)

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

বিবাদে বিষাদে কিংবা প্রবাসে অনলে,
প্রমাদে পর্ব্বতে শত্রু-মধ্যে কিংবা জলে,
কিংবা অরণ্যেও যদি পড়ি গো জননি!
উদ্ধার করিও মোরে উদ্ধার-কারিণি!
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

(৮)

অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো
মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রনষ্টঃ সদাহং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

পরম অনাথ আমি, পরম নির্ধন,
ব্যাধি ও বার্দ্ধক্য মোরে ধ'রেছে এখন;
জড়তা বদনে মোর, আমি দীন ক্ষীণ,
বিপদে বিপদে মোর নষ্ট হ'লো দিন।
তোমা বিনা নাহি মোর কেহই জননি!
একমাত্র গতি তাই তুমিই ভবানি!

(৯)

বদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥

ওমা দুর্গে! যদি এই স্তবের ভিতর
ভ্রষ্ট হয় কোন মাত্রা অথবা অক্ষর,
তাহা হ'লে যেন মাগো! তোমারি কৃপায়
অপূর্ণ হ'লেও তাহা পূর্ণ হ'য়ে যায়!

কাশ্মীরের কথা

[শ্রীবিমলা দাসগুপ্তা]

কাশ্মীর—শ্রীনগরের কাছে কিনারার বিবরণ 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণকে পূর্ব্বে দিয়াছি। এইবার একটু দূরে যাইবার সঙ্কল্প। মার্ত্তণ্ড, আচ্ছাবল ইত্যাদি স্থান শ্রীনগর হইতে দিনেক, দুইদিনের পথ। আজকাল মোটর গাড়ীতে যাওয়ার বন্দোবস্ত আছে; তাহাতে সহজে ও সুবিধায় যাওয়া যায়। আমরা দুইখানি মোটর ভাড়া করিয়া প্রায় ৮।৯ জন একত্র রওনা হইলাম। কিছুদূর যাইতে-না-যাইতেই রৌদ্ররাশি আমাদের সহযাত্রী হইয়া চলিল, কোন নিষেধ মানিল না। ক্রমে সে পায়ের যোগ্য জন মাথায় চড়িতে আরম্ভ করিল, দেখিয়া ধৈর্য্য ধারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। তখন শুরু আচ্ছাদনে মস্তক আবৃত করিতে গিয়া আরো বিপাকে পড়িলাম। আমাদের মুখ ভালে, কপোলে, নাসাগ্রে সে নির্লজ্জ রেণুকা আপনার রং ধরাইতে বসিয়া গেল। দেখিয়া ভীত আঁখিযুগল পক্ষ-পংক্তির শরণাগত হইল। নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শনে আর তার মতি নাই।

কিছু দূর গিয়া প্রথমেই এক অতি প্রাচীন ভগ্নাবশেষের নিকটে আসিয়া আমাদের বাষ্পীয় শকট থামিল। নামিয়া দেখিলাম, কত-কত কালের কীর্ত্তির মধ্যে এ কি চমৎকার কলাকৌশল! প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড মর্ম্মর-স্তম্ভ সকল

ভূমিসাৎ হইয়া আছে। মনে হইল, এ সকলি কোন রাজ-প্রাসাদের পরিণাম। মনে হইল তখনকার ভারতের সমৃদ্ধির কথা! মনে হইল, তখনকার ভারতবাসীর আশা ও উদ্যমের কথা! আর মনে হইল আজকার দুঃখ-দৈন্যের কথা!

সেখান হইতে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে এক প্রবীণ চুণার বৃক্ষমূলে মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন হইল। পর্য্যটকের সময়োপযোগী সংক্ষিপ্ত আয়োজন না হইয়া, ইহা রাজোচিত এক বিরাট ব্যাপার হইয়া পড়িল। তখন ইঙ্গ-বঙ্গ সমন্বয়ে আহার-বিধি সমাধা করিয়া বিশ্রাম ব্যতিরেকেই বাষ্পীয়-যানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। মার্ত্তণ্ড পৌঁছিতে বেলা তিনটা হইল। নির্ব্বিঘ্নে এতাবৎ পথ আসিয়াছিলাম, এমন কথা বলিতে পারি না। উপর্য্যুপরি ঘূর্ণন-বিঘূর্ণন ব্যাপারে আমাদের রথচক্রের পুরাতন কলেবরের পুনঃ-পুনঃ জীর্ণ-সংস্কার করিতে হইয়াছিল। ইহাতে আমরা ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং খুসীই হইয়াছিলাম। কেন না, ক্রমাগত ধূলির ঘোরান্ধ্য হইতে ফাঁকতালে একটু রেহাই পাওয়ার এই একমাত্র উপায় ছিল। এখানে প্রকৃতি-দেবী যোগিনী-বেশধারিণী, গৈরিক-বসনা, শিরে জটাজূট। দর্শনে চিত্ত আপনি নম্র হইয়া আসে, আর ভাবে, আহা! কার প্রেমে উচ্ছ্বসিত প্রাণের এ তন্ময় ভাব? যুগ-যুগান্তর ধরিয়া একই ধ্যানে, একেরি ধ্যানে নিমগ্না? এ কি বাঞ্ছিত জনের মিলন? না চিরবিরহের নিদর্শন? কিছুই বুঝিলাম না; কেবল দেখিলাম এই ত নির্ব্বাণ, এই ত মুক্তির পথ।

মার্ত্তণ্ড পাহাড়ে উঠিবার আগে আমরা এক প্রস্রবণের খেলা দেখিতে গেলাম। সে প্রস্রবণের ধারা বাঁধিয়া এক সরোবর সংরক্ষিত হইয়াছে,—অতিরিক্ত জল সে সরোবর ছাপিয়া বহিয়া চলিয়াছে। এই বাঁধা জলে অসংখ্য মৎস্যের ক্রীড়া এক দর্শনীয় দৃশ্য। এ সলিল এতই স্বচ্ছ যে, তন্মধ্যে যে-যে ভাবে মৎস্যগণ বিচরণ করে, তাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায়। সেখানকার দুর্দ্দান্ত পাণ্ডাগণ কিঞ্চিৎ লাভের আশায় ভ্রমণকারীদের হস্তে এই মৎস্যগণের উপযোগী আহার্য্য দ্রব্য গছাইয়া দিয়া, আগন্তুকদিগের সঙ্গ অনুসরণ করতঃ একেবারে তাহাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তুলে। জলচর জীবদিগের স্বেচ্ছা-সন্তরণ, ভক্ষ্য-ভোজন ছলে নানা ক্রীড়া-কৌতুক দর্শনে দর্শকদিগের মনে যে অসীম আনন্দের উদ্রেক হয়, তাহা এই ভূচর জন্তুদিগের অত্যাচারে একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহাদের নাছোড়বান্দা হস্তে অনিচ্ছায়, অবজ্ঞস চিত্তে কিছু দান করিয়া তবে নিস্তার।

সেখান হইতে পদব্রজেই অগ্রসর হইয়া মার্ত্তণ্ডের পাহাড়ে উঠিলাম। দূর হইতে ইহা একটী সুবৃহৎ প্রাচীরের মত দেখায়। ইহার গায়ে বৃক্ষ-লতাদি নাই, ইহা কেবলি পাষাণে গঠিত। এখান হইতে সূর্য্যাস্তের শোভা বড়ই হৃদয়-স্পর্শী,—আলোক-আঁধারের মিলনে মনের সকল ধাঁন্দা ঘুচাইয়া দেয়। এক দিব্যজ্যোতিঃর প্রভাবে অন্তর-বাহির আলোকিত পুলকিত হইয়া উঠে। তখন দেখি, এই বিশ্ব-চরাচরের সঙ্গে আমি একই সূত্রে গাঁথা।

মার্ত্তণ্ড পাহাড় হইতে নামিয়া "আচ্ছাবনের" দিকে রওনা হইলাম। পথে যাইতে-যাইতে দেখিলাম, চির-পুরাতনকে ঘেরিয়া নূতনের নব-নব বিকাশ চলিয়াছে! শৈলরাজির সৌম্য শোভায়, সেই যাদুকরীর চারুল্যের সংমিশ্রণে এক অভিনব রস প্রকটিত হইয়াছে। এই রসের টানে প্রাণ-মন পুলকিত, বিস্মিত হইয়া গেল। কা'কে ছেড়ে কা'কে ধরি, বুঝিয়া পাই না। উভয়েই যে মনোমোহন, নয়নলোভন! তখন শুনি, দিনমণির অস্তর্ধানে নিষিক্ত দিগবধূগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আর তদ্বিরক্ষন মায়াময়ীর রঙ্গভরা কৌতুক! সন্ধ্যা সমাগমের প্রাক্কালেই তিনি নিশানাথকে নীলাকাশে তুলিয়া ধরিলেন; কিন্তু সেই তেজোময়ের প্রকাশে হিমকর হীনপ্রভ হইয়া রহিলেন দেখিয়া, সন্ধ্যা-সুন্দরী চুপি-চুপি আসিয়া, সকল দিবালোককে দুই হাতে সরাইয়া দিয়া আপন সখার স্বরূপের বিকাশ দেখাইয়া দিলেন; আর অমনি দিগ্‌বধূগণের ত্বরিৎ অপসারণ। এ যেন রঙ্গভূমির অভিনয় চলিয়াছে। আচ্ছাবনে পৌঁছিয়া আমরা ডাক-বাঙ্গলার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু সে আশ্রয়-স্থানের প্রসারতা অল্প ছিল বলিয়া, আমাদিগের দলবলকে তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট কিছু বেগ পাইতে হইয়াছিল। সঙ্গের সরঞ্জাম সকলের বিহিত বিধান করিয়া, সেই সর্ব্বশ্রান্তিহর চা-রস পানে সকলেরি মতি গেল। কিন্তু তপ্ত সলিল সহযোগে সে রস নিঙড়াইয়া লইতে সহৃদয় মাত্রেরই দ্বিধা বোধ হইবার কথা। কিন্তু তাপ ছাড়া ত দুনিয়ায় রস-সম্ভোগ সম্ভবে না। কি করা! এ যেন বিষে বিষক্ষয়। পানকালে উত্তাপের মাত্রা যত বেশী হইবে, তত সহজে দেহের শ্রান্তি দূর হইবে।

অতঃপর চাঁদনি রাত্রের মায়াজালে পড়িয়া গেলাম—ঘরে আর কে রহিতে পারে? নিকটে এক কলনিনাদিনী নির্ঝরিণীর টানে প্রাণকে বাহির করিয়া দিল,—দেহ তখন নাচার। ছুটিয়া কাছে গিয়া দেখি, সে উন্মাদিনী আলোকের মালা বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক ঝিকিমিকি জ্বলিতে-জ্বলিতে আনন্দে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। সে নৃত্য-ভঙ্গে নিশিকান্ত বাঁধা পড়িয়া ঐ রাঙ্গা পায় লুটপুটী খাইতেছে। ভাবিলাম, এ সংসারে ছোট-বড় প্রভেদে প্রতাপের তারতম্য হয় না; অতি ক্ষুদ্রও মহান্‌কে টানিবার শক্তি ধরে। তাই ক্ষুদ্রেরও বুকভরা আশা! ক্ষুদ্রেরও অনন্ত পিপাসা! এভাবে অনেকক্ষণ বাহিরকে লইয়া থাকিয়া ঘরে ফিরিলাম। প্রভাতে এখানকার দৃশ্য সমুদয় আরম্ভ করিয়া আজ্ঞাবনের হুকুমমত "আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় লইয়া মোটরে চড়িলাম। সুদূর পথের যাত্রায় আমাদের যান দু'খানির জ্বান প্রায় বেজাহান হইয়া পড়িয়াছিল। এবারে পথ চলিলাম বড় ভয়ে-ভয়ে। মাঝে-মাঝে পথের ধারে তৎস্থানবাসিনীরা পথ আলো করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভাবিলাম, যদি নৈসর্গিক দৃশ্য দেখা চুকিয়া গিয়াছে, তবে এই দৈব চিত্র দেখিয়া লই না কেন! দৃষ্টি ত আমার অকুরন্ত! সে ত যত পারে, মনের দুয়ারে আনিয়া বোঝাই করে; কিন্তু মনের মরজি বোঝাই যে নুস্কিল।

এভাবে চলিতে-চলিতে, কি মনে করিয়া, আমাদের রথের এক চক্র একেবারে হাঁটু গাড়িয়া বসিল,—আর সে চলিতে অক্ষম। তার দেখাদেখি আর একখানিও মিনতি করিতে লাগিল। এখন উপায়! চতুষ্পদের ত দ্বিপদে চলা সম্ভবপর নয়! এখনও যে কত পথ বাকী, ভাবিয়া সারথিরা এই হিমের দেশেও ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া উঠিল। বেলা চারিটার সময় যখন একখানা মোটরের প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা, তখন আমরা সাতটী কোমলাঙ্গী আর একখানাতে বোঝাই হইয়া বলিলাম,—আবশ্যক হইলে সবলাঙ্গেরা হাঁটিয়া বাকী পথ যাইবে বলিয়া। তখন আমাদের আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক অবস্থা বলা অপেক্ষা বোঝা সহজ! দিবাকরের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ধৈর্য্যও অস্তমিতপ্রায়। তখন ধূলার মূর্ত্তীপনা যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত বোধ হইতেছিল। এর যেন রসিকতার আর সময়-অসময় নাই। কারু দেখিলে আরো পাইয়া বসে। ক্রমে আলোক ঠেলিয়া অন্ধকারের আবির্ভাব হইল। কৈ, সহরের সাক্ষাৎ ত এখনও মিলিল না, কি হবে? উপরওয়ালাতে বিশ্বাস তখন দোদুল্যমান। জগন্নাথের পথ ভাবিতে জগন্নাথেই ধীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলাম। ইত্যবসরে স্বপ্নাবেশের ন্যায় কয়েকটী আলোর রেখা পাওয়া গেল,—আর অমনি অমঙ্গল আশঙ্কা সকল যে যাঁর ছুট দিল। পথে পাইয়া রাজার-কি কুশল জিজ্ঞাসা করিল এবং আমাদের এই দুর্ভোগের কথা শুনিয়া, একটু যেন রসান দিয়াই বলিল যে, আপন পায়ে চলিতে না পারিলে পরের পায়ে কে কবে নির্ব্বিবাদে সকল পথ অতিক্রম করিতে পারিয়াছে বল? কথাটা যে কত ঠিক, পরে চিন্তা করিয়া বুঝিলাম। আমরা ত আসিয়া কার-ক্লেশে ঘাটে পৌঁছিলাম; কিন্তু পরবর্ত্তীদের ভাবনায় সুস্থির হইতে পারিলাম না। প্রায় ঘণ্টা-খানেক পরে বহুদূর হইতে সেই বিকলাঙ্গের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। সেই বিপদভঞ্জনের আশীর্ব্বাদে সকলেই গোটা শরীরে আসিয়া হাজির হইল। তখন নিশ্চিন্ত মনে ঘরের মধ্যে বসিয়া তাবৎ দিনের ভ্রমণ-কাহিনীর আবৃত্তি হইতে লাগিল। আর আমাদের আমোদ দেখে কে? বস্তুতঃ, বিপদ-আপদ একবার সামাল করিয়া লইতে পারিলে, তারা আমাদের আনন্দেরই কারণ হইয়া পড়ে।

এবারে বিশ্ব-শিল্পীর হাত ছাড়াইয়া, কয়েকদিন পরে কারিগরদের কারুকার্য্য সন্দর্শনে অভিলাষী হইলাম। কাশ্মীরী শাল, কার্পেট চিরপ্রসিদ্ধ। এ সকলের বুনন-পদ্ধতির না কি তুলনা নাই। প্রথমে কার্পেটের কারখানা দেখিতে গেলাম। এক বিরাট আয়োজন চলিয়াছে; প্রায় সহস্র কার্পেট এক সময়ে বুনট হইতেছে। এক-একখানাতে ১০।১৫ জন করিয়া খাটিতেছে—আবাল-বৃদ্ধ-যুবা নির্ব্বিশেষে। ইহারা প্রাতে ৭টায় কাজ আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা ৭টায় ছুটী পায়। এই ১২ ঘণ্টা অবিশ্রান্ত খাটিয়া কেহ চারি আনার বেশী রোজগার করে না। শ্রমিকের হার যে দেশে এত সুলভ, সে দেশ যে সমৃদ্ধিশালী হইতে পারে না, তা ত বোঝাই যায়। কাশ্মীরীরা স্বভাবতঃই বুদ্ধিমান; এজন্য সকল নিপুণ কার্য্যই ইহারা বিচক্ষণতার সহিত করিতে সমর্থ। এই কার্পেট বুনট যে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, তাহা চক্ষে না দেখিলে অনুমান করা অসম্ভব। রঙ্-বেরঙের সূতার গুটি সকল উপর হইতে ঝোলান রহিয়াছে; আর কারিগর সকল নীচে বেঞ্চের

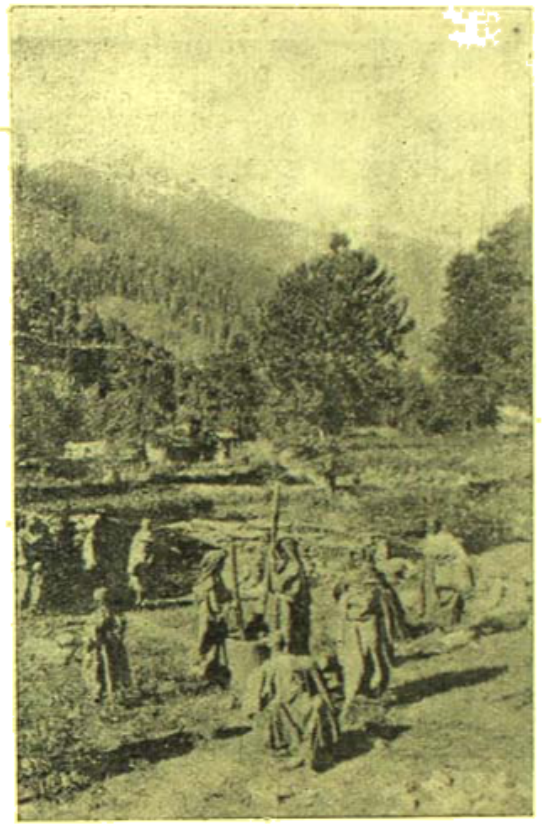

কাশ্মীর গ্রাম্যজীবন

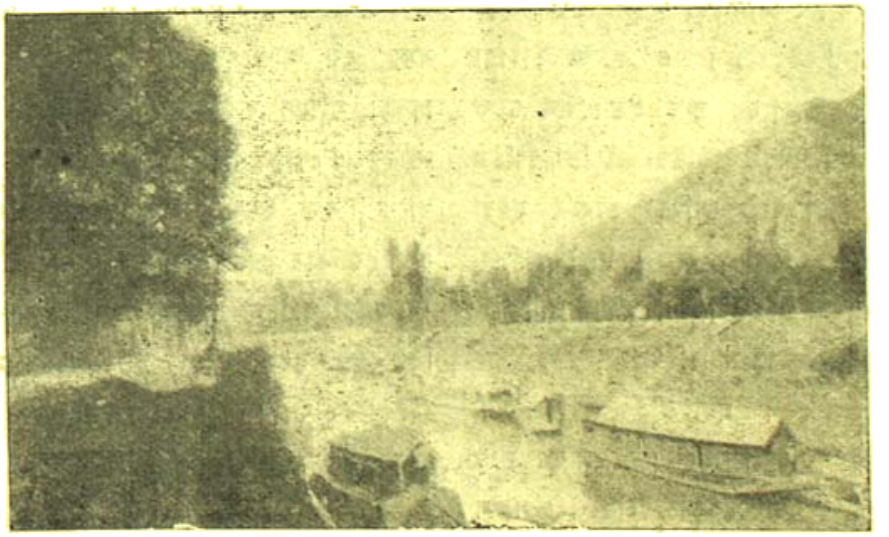

চাল হ্রদ ও নদীর মধ্যস্থ খাল

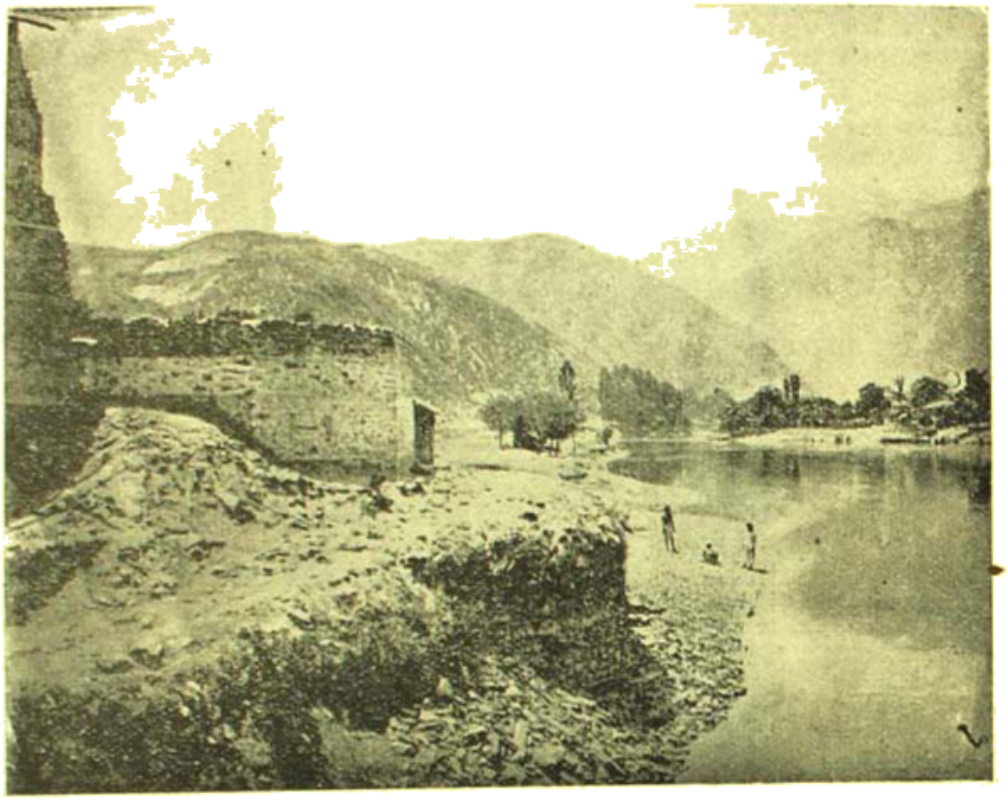

নদীতীরে বরাহমূলার দৃশ্য

উপর বসিয়া রহিয়াছে। পাশে দাঁড়াইয়া একব্যক্তি চারি আঙুল প্রস্থ পরিমিত একখণ্ড কাগজের লেখা হইতে উচ্চৈঃস্বরে রঙের ভাগ সকল উচ্চারণ করিয়া যাইতেছে, আর তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নানাবিধ নমুনা সেই দুতা সকল দিয়া গাঁথিয়া তোলা হইতেছে। এ কাজে তাহারা এত অভ্যস্ত হইয়াছে যে, তাহাদের দ্রুত হস্ত-চালন চক্ষে লক্ষ্য করা শক্ত। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া এই চিত্র-বিচিত্র কার্পেট সকলের কিছু অংশ বুনট দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কোথাও ভুলচুক নাই; যেন এক দৈবশক্তি-বলে কাজ হইতেছে। এক-একটী ঘরের আশে-পাশে তৈয়ারী অনেক কার্পেট মোড়ান রহিয়াছে; ক্রয়ার্থীকে সে সকল খুলিয়া দেখান হয়। ইহাতে কি বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাস! কি অসাধারণ কলাকৌশল! কেবল দুঃখ এই যে, যে রকম বিশেষ-বিশেষ ঘরে, দেশ-বিদেশে এ সকল কার্পেটের রপ্তানি হয়, তদনুসারে এই সব দুঃখী শ্রম-জীবীদের পারিশ্রমিকের বিচার হয় না। সেই সে-কাল হইতে যে বাঁধা দস্তুর চলিয়া আসিয়াছে, আজও তার কোন পরিবর্তন নাই। বেশী শীতের সময় এ সকল কারখানার কাঠের ঘরে আগুণ ভিন্ন বসা যায় না। তখন এই সকল দীন-দুঃখী এক-একটা মাটির ভাণ্ডে কয়লা জ্বালাইয়া তাহা পেটের উপর ঝুলাইয়া রাখে। কাজের ধাঁধায় কত সময় এই আগুণের তাপে ইহাদের পেটের ও বুকের চামড়া পুড়িয়া যায়, খেয়াল থাকে না। কত-শত দরিদ্র না কি এ পোড়া ঘায়ের চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালে পড়িয়া থাকে; কত জনের বা ইহা হইতে ভবলীলা সাঙ্গ হইয়া যায়, কে তার খবর রাখে!

তার পরদিন গেলাম কাশ্মীরী এক শাল-ব্যবসায়ীর বিপণিতে। সে মহা ধনী লোক শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম, দোকানের বাহ্যিক আড়ম্বর তদুপযুক্তই হইবে। কিন্তু যখন একটী ক্ষুদ্র দুয়ার দিয়া প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ করিলাম, তখন আমাদের সকল অনুমান ব্যর্থ হইয়া গেল। যেন এক নরককুণ্ডে আসিয়া পড়িলাম,—বাহির হইতে পারিলে বাঁচি। কিন্তু সে কলাবিদ্যা পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া আসি, এমত সাহসে কুলাইল না। কি করি, সঙ্গীদের সঙ্গে

শীতকালে—মুরীর দৃশ্য

মুরী—চাম পাহাড় হইতে খাগানের দৃশ্য

মুঘল বাগ্—কাশ্মীর

হাসি-গল্পে যোগ দিয়া কোন প্রকারে তথাকার বাহ্যিক দৃশ্যে উদাসীন হইতে চেষ্টা করিলাম। এখানে বৃদ্ধের সংখ্যাই বেশী; তাহারা চস্‌মা নাকে আঁটিয়া সূক্ষ্ম কাজে লাগিয়া গিয়াছে। যে কাশ্মীরী দোরোখা শাল পাঁচ-সাত শত টাকায় অন্যত্র বিক্রীত হয়, তাহার এক-একখানা ১২ জন নিপুণ কারিগর দৈনিক বার ঘণ্টা খাটিয়া আট মাসে শেষ করিতে পারে; এবং তাহাদের পারিশ্রমিক, শালের কাপড় এবং সুতা বাবদ মহাজনের দেড়শত টাকার বেশী ব্যয় হয় না;—বাদবাকী সব লাভ। এই প্রবীণদের চক্ষুকে বাহাদুরী; আর ইহাদের ধৈর্য্যকে বলিহারি! দিনের পর দিন একই ভাবে খাটিয়া, জীবনের সকল অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া, দারিদ্র্যকে বক্ষে লইয়া ইহারা এ সংসার হইতে চলিয়া যায়। তবে এ দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে কতখানি সুখ-শান্তি মিশিয়া আছে, তাহা ইহাদের জীবন বলিয়া যায়। কাশ্মীরীরা স্বভাবতঃই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান; কিন্তু বিদ্যা-শিক্ষার প্রসারতা না থাকাতে ইহাদের বুদ্ধিমত্তা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া ইহাদের চরিত্রকে বড় শঠ করিয়া তুলিয়াছে। দিনান্তে আপন সহোদরকে ঠকাইতে পারিলে, সে দিনটা ভাল গেল মনে করে। বস্তুতঃ বন্ধুত্ব কি, ইহারা জানে না। বেতনভোগী ভৃত্যগণ এক প্রভুর কাছে বেশী দিন টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। সে জন্য পর্য্যটকদিগকে ইহারা বড় খাতির করে। ইহারা উত্তম পাচক; বেয়ারার কাজে ইহাদের সমকক্ষ নাই বলিলেই হয়। যদিও ইহারা অলস, তথাপি বুদ্ধি খরচ করিয়া কাজ করিতে জানে বলিয়া ত্রুটী বড় ধরা পড়ে না। ইহারা মন-যোগান মিষ্ট কথা জানে, তাহার সাক্ষী আমাদের একাক্কী ভাময়। তাকে যাহাই হুকুম কর, তাহাই সে "আচ্ছি বাৎ" বলিয়া মাথায় পাতিয়া লয়। কেবল দাম-বস্তুরের বেলায় উসুলের দিকটা একটু টানিয়া যায়। তবে আমরাও জাতে বাঙ্গালী! চোখে ধূলি দিয়া সহজে কেহ সারিয়া যাইবে, সাধ্য কি?

মুরী—হোটেল ও গির্জা

ইহারা আমাদেরই মত ভাতের ভক্ত, দুই বেলা অন্নের সংস্থান চাই। শীতপ্রধান দেশ হইলেও, সকল শ্রমজীবীই পূর্ব্ব রাত্রির সঞ্চিত অন্ন প্রত্যূষে ভক্ষণ করিয়া আপন-আপন কার্য্যে চলিয়া যায়। ইহারা মাটীর পাত্রে আহার করিয়া থাকে, এবং আহারান্তে আবার তাহা তুলিয়া রাখিয়া দেয়; তাহাতে শুচি-বিরুদ্ধ হয় না। বস্তুতঃ ইহাদের শুচি-সংস্কার এক অদ্ভুত ব্যাপার। হাতের চামড়ায় অম্লিপক কিছু লাগাইতে নাই। যদি কখনও অসাবধানতা বশতঃ লাগিয়া যায়, তবে তাহা ধৌত এবং বিশুদ্ধ করিয়া লইতে ঝিলমের জল নিঃশেষ হইবার উপক্রম। এজন্য কাশ্মীরীরা, অম্লিপক কোন বস্তু ধরিতে হইলে, গায়ের জামার আস্তিন টানিয়া তাহার উপরে খাদ্যদ্রব্য রাখে। অথবা পকেট হইতে আহারের ইতিবৃত্ত অঙ্কিত একখানি রুমাল বাহির করিয়া তদুপরি স্থাপন করে। সে রুমালখানির বাহ্যিক অবস্থার প্রতি নজর পড়িলে, আমাদের মত শুচি-সঙ্গত জাতির আর আহারে প্রবৃত্তি থাকে না। তবে বিধির মঙ্গল বিধানেই এই জাতিগত রুচির পার্থক্য রহিয়াছে; নতুবা তাহাদের জীবনটা বুঝি বা একঘেয়ে হইয়া যাইত। কাশ্মীরীরা উচ্ছিষ্ট বস্তু সন্তর্পণে তুলিয়া রাখিয়া দেয়। সেজন্য ইহাদের ভুক্তাবশেষের সর্ব্বথাই সদ্গতি হইয়া থাকে, আমাদের মত বৃথা নষ্ট হয় না। ইহা সুপ্রথা কি কুপ্রথা, আমরা তার বিচারক নই। ইহারা ছোট-বড়-অভেদে এক পাত্রে অনেকে একত্র ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদের জাতি-বিচার বুঝা ভার। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির প্রায় প্রত্যেকেরই পাক স্বতন্ত্র; এমন কি বংশগত কুলশীলের কিছুমাত্র পার্থক্য থাকিলে, স্বামি-স্ত্রী পর্য্যন্ত একে অন্যের পক্ক অন্ন আহার করে না। অথচ একখানি কম্বল বিছাইয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-নির্ব্বিশেষে তদুপরি অন্নপাত্র রাখিয়া ভোজন করিতে কোন দ্বিধা করে না, এবং আহারান্তে তাহা ঝাড়িয়া লইয়া অবাধে গাত্রে ধারণ করে। বস্তুতঃ দেশ বিদেশের এ সকল আচার-পদ্ধতির নূতনত্ব লক্ষ্য করিবার না থাকিলে বুঝি বা দেশ-পর্য্যটন এত আমোদজনক হইত না। এই রুচি-রহস্যেই মানবের প্রকৃতি-রহস্য উদ্ঘাটিত, সামাজিক রীতি-নীতি উদ্ভাবিত এবং সেই লীলাময়ের অনন্ত লীলাক্ষেত্র প্রকটিত মনে হয়।

ভূ-পর্য্যটন

[শ্রীমনোজমোহন বসু বি-এল্]

১। সাহিত্যে অমরতা

দীর্ঘিতকালে অতুল যশঃ এবং মৃত্যুর পর অমর কীর্ত্তি লাভের আশায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুদিন যা বীণাপাণির কমল-কাননে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নিরঙ্কুশভাবে বিচরণ করিবার পর দেখা গেল যে, যশের সুবর্ণ সৌধ বহু উচ্চ গিরিচূড়ার উপর সংস্থিত এবং তথায় পৌঁছিবার পথটাও নিতান্ত দুর্গম। নিরাশ-কাতর হৃদয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় আশা-দেউটির ক্ষীণ রশ্মি নয়নপথে প্রতিভাত হইল।

কিছুকাল হইল বিলাতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লর্ড রোজবেরী তাঁহাদের জাতীয় সাহিত্যের বিশ্লেষণ ও বিভাগ করিয়া, অসার ও ক্ষণস্থায়ী সাহিত্য হইতে সারবান ও চিরস্থায়ী অংশ পৃথক করিতেছিলেন। এতদুপলক্ষে তিনি বলেন—

"There is no department of any Library, in which books are so rarely dead, as the department of Travel.....Books of travel, if that can be said of any prose books, are almost immortal."

অর্থাৎ ভ্রমণ সম্বন্ধীয় পুস্তকের একরূপ মৃত্যু নাই বলিলেও চলে। সুতরাং যদি সস্তায় সাহিত্যিক অমরতা লাভ করিতে হয়, তবে একখানি ভ্রমণ বৃত্তান্ত মাত্র লেখা দরকার। কবি হয় ত একদিন মরিবে, ছোটগল্প-লেখক কালস্রোতে অণুবিম্বের ন্যায় উঠিয়া অণু-মুখেই সদ্যঃ মিলাইবে, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিকও বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবিয়া যাইবে; কিন্তু ভ্রমণ-কাহিনী-লেখক ভৌতিক দেহ-বিনাশের পরও কীর্ত্তির সমুচ্চ শিখরে বসিয়া চিরদিন অবিনশ্বরতার শুভ্রোজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত থাকিবে! যশোমন্দিরের এরূপ সুগম রাস্তা (short cut) আবিষ্কার করিয়া লাট বাহাদুর সাহিত্য-জগতকে বাস্তবিকই চির-কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

আরও সুবিধা এই যে লেখা ভাল হউক বা মন্দ হউক, তাহাতেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না। কারণ লাট বাহাদুর বলেন—

"I have never been able to put away a book of travel, however poor it may be, or however apparently jejune its subject."

অর্থাৎ তাঁহার মতে ভ্রমণ-কাহিনী যতই নীরস হউক না, তাহা অপাঠ্য হইবে না।

যিনি একদিন সমগ্র ইংরাজ-রাজত্বের, অর্থাৎ ভূমণ্ডলের প্রায় এক চতুর্থাংশের ভাগ্যবিধাতা ছিলেন, তাঁহার মত ত অগ্রাহ্য করিবার নহে। সুতরাং আর ভাবনা কি আছে?

কলমের মরিচাপড়া নিব বদ্‌লাইয়া, শুষ্কপ্রায় মসীপাত্র পূর্ণ করিয়া, লাট বাহাদুরকে উদ্দেশে সেলাম করতঃ, নবোৎসাহে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম।

২। উপায় চিন্তা ও বিবেক-দংশন

আরম্ভের মুখেই এক অন্তরায় উপস্থিত হইল। সহসা স্মরণ হইল যে, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে সাধারণতঃ তৎপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ভ্রমণ করার প্রয়োজন হয়। তাহাও ত অনেক আয়াস, সময়, ও অর্থব্যয় সাপেক্ষ। সুতরাং উপায় কি?

এমন সময় আমাদের এক বন্ধুর কথা মনে হইল। তিনি একজন বিরাট পর্য্যটক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সুবিশাল ভূমণ্ডলের প্রায় সর্ব্বস্থানেরই তিনি ভ্রমণের গল্প করেন। আজ ইটালীর ভিসিস নগরে "গণ্ডোলা" আরোহণে বিচরণ, কাল সাইবিরিয়ার তুষার-প্রান্তরে "স্কাই" (ski) যোগে পরিভ্রমণ, কখনও পারস্য দেশে ঈরাণী সুন্দরীগণের সহিত প্রেমালাপ, আবার কখনও প্রতীচ্য বিলাসিতার কেন্দ্র প্যারী নগরীর সুরম্য হোটেলে বাস, ইত্যাদি নানা বিষয় বর্ণনে তিনি সর্ব্বদাই মুক্তকণ্ঠ। আর লোকেও তাঁহার অপূর্ব্ব ভ্রমণ-কাহিনী খুব সাগ্রহেই শুনিত।

কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে সুলোক কুলোক দুইই আছে; তাই বন্ধুবরকে মাঝে মাঝে কিছু বিপন্ন হইতে হইত। হয় ত তিনি অনন্ত তাবার মেসোপটেমিয়া প্রদেশে উদ্ভুক শিকারের গল্প করিতেছেন, এমন সময় এক ধৃষ্ট ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "সে কি হে, তুমি যে তারিখের কথা বল্‌ছ, তার আগের দিন বিকেল বেলা যে তোমায় শাঁখারিটোলার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছি!"

এরূপ কথায় বন্ধুবরের মুখে মুহূর্ত্তেকের জন্য একটু অপ্রতিভ ভাবের ছায়া পড়িত বটে। কিন্তু পরক্ষণেই, বিভিন্ন মানবের আকারগত সৌসাদৃশ্য, এবং লোকের ভ্রমাত্মিকা দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে একটা তুমুল কোলাহলময় বিতণ্ডার সৃষ্টি হইত।

অবশেষে দুষ্টলোকে বলিতে আরম্ভ করিল যে, তাঁহার সমস্ত কাহিনী আগাগোড়াই অমূলক; ঘরে বসিয়া নানা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কল্পনার সাহায্যে সে গুলা সৃষ্ট হয়।

তখন বন্ধুবর আর এক উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি পৃথিবীর নানা স্থানের দৃশ্যের ছবি-সংযুক্ত পিক্‌চার পোষ্টকার্ড ক্রয় করিলেন। কোন বিখ্যাত জাহাজ-কোম্পানীর এক কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। তিনি সেই কর্ম্মচারীর সাহায্যে সেই পোষ্টকার্ড-গুলা নানা সুদূর দেশের উপযুক্ত স্থানে ডাকে দিয়া বন্ধুবর্গের উপর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। হয় ত তাঁহার এক পরিচিত ব্যক্তি "চৈনিক প্রাচীরের" ছবি ও শ্যাংহাই (Shanghai) সহরের পোষ্ট-মার্কযুক্ত বন্ধুবরের সহি করা এক পোষ্টকার্ড পাইল। এরূপ "লিখিত প্রমাণের" (Documentary Evidence) উপর আর কথা চলে না। কাজেই তাঁহার পর্য্যটকের খ্যাতি অনতিবিলম্বেই অতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইল।

মনে মনে স্থির করিলাম যে, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে এই পন্থাই সমীচীন। বিশেষ কোন কষ্ট বা অর্থব্যয় নাই। গৃহকোণে বসিয়া কেবল কয়েকখানি ভ্রমণ সম্বন্ধীয় পুস্তক যোগাড়ের অপেক্ষা মাত্র।

কয়েকটি লাইব্রেরী ঘুরিয়া ও পুরাতন পুস্তকের দোকানে কিছু অর্থব্যয় করিয়া শীঘ্রই প্রয়োজন মত পুস্তক সংগৃহীত হইল। তারপর প্রচলিত প্রথা মত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিবার পদ্ধতিটাও একরূপ আয়ত্ত করিয়া লইলাম। কয়েকখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রে প্রকাশিত—"চুঁচুড়ার পথে", "আঁড়িয়াদহে আড়াই দিন", "রাণাঘাট যাত্রীর ডায়ারি" ইত্যাদি সুবিখ্যাত লেখকদিগের অনেক-গুলি ভ্রমণ-কাহিনী পাঠে বুঝিলাম যে, রাস্তায় বাহির হইয়া বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত কি রসিকতা করিলাম, রেল গাড়ীতে কয় ছিলিম তামাকু খাইলাম, ভ্রমণকালে কত লোকে আমায় একজন দেশমান্য মহৎ ব্যক্তি বলিয়া চিনিতে পারিল ইত্যাদি কথা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতে পারিলেই তাহা উচ্চ শ্রেণীর ভ্রমণবৃত্তান্ত বলিয়া গণ্য হয়। তাহার উপর যদি দুই চারিখানা স্থানীয় ফটোগ্রাফ যোজনা করিয়া দেওয়া হয় এবং স্থানে অস্থানে দুই এক লাইন ইংরাজি, সংস্কৃত, বাংলা বা ফারসী কবিতা উদ্ধৃত করা যায়, তবে ত সে সোণায় সোহাগা।

পঞ্জিকায় শুভ দিন দেখিয়া, কাগজের শিরোভাগে '৺৺দুর্গা" নাম লিখিয়া, মহোৎসাহে গ্রন্থারম্ভ করিতেছি, এমন সময় অকস্মাৎ সুপ্তপ্রায় বিবেকশক্তি জাগিয়া উঠিল। সহসা মনে হইল, তাই ত, এত বড় যে একটা মহাকার্য্য—অনন্ত জীবন লাভ যাহার ফল—সেটা কি একটা জুয়াচুরীর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে?

বিবেক বলিল "কখনই না।"

তখন সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম "অগ্রে ভ্রমণ, পরে লেখনী ধারণ।"

৩। ভ্রমণ সঙ্গী

আমি দেশ-ভ্রমণে বাহির হইব, এ কথাটা বন্ধু-সমাজে শীঘ্রই প্রচারিত হইল। ভ্রমণের দুইজন সঙ্গীও জুটিল। একজন আমাদের পাড়ার উদীয়মান কবি (দুষ্ট ছেলেরা বলিত উচ্চীয়মান কবি) গয়ারাম, আর একজন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মিষ্টার গিউহো। উভয়েরই কিছু পরিচয় আবশ্যক।

গয়ারাম পল্লীস্থ সম্ভ্রান্ত ভাদুড়ী বংশের ছেলে। বেশ সভ্য ভব্য নব্য। উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, ভাসা ভাসা দুইটা ডাগর চক্ষু, ক্লারিওনেট-বিনিন্দিত নাসিকা এবং কাক-পুচ্ছের ন্যায় ঘনকৃষ্ণোজ্জ্বল বাবরী-কাটা চুল। দেখিলে কবি বলিয়া চিনিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না।

বাল্যকালে পিতার অবিশ্রান্ত তাড়না ও পাঁচ ছয়জন গৃহ-শিক্ষকের সমবেত চেষ্টা সত্ত্বেও, গয়ারাম প্রথমটা

প্রবেশিকা-পরীক্ষা-সাগরও লঙ্ঘন করিতে পারে নাই। অবশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "সদয়-হৃদয়-দর্শিত শিশুঘাতং" বুদ্ধদেবরূপী এক পরাহ্রতিত বাইসক্যান্‌সেলারের আবির্ভাব হইল, ও সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যা-মন্দিরের দ্বারও অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও অবারিতপ্রায় হইল; এবং সেই সুযোগে পরাণরামও কোন গতিকে প্রথম গণ্ডী পার হইয়া গেল। কিন্তু প্রথম দ্বার অতিক্রম করিবার পরই, সে জম্বা ঘোড়ার (Jibbing Horse) ন্যায় এমন বাড় বেঁকাইয়া দাঁড়াইল যে, মা সরস্বতী বিস্তর টানা-হেঁচড়া সত্ত্বেও তাহাকে আর একপদও অগ্রসর করাইতে পারিলেন না। পৌনঃ-পুনিক দশমিক (Recurring Decimal) যেমন যতবার ভাগ দেওয়া যাউক, ক্রমাগত কেবল একই অঙ্ক ভাগফল হয়, সেই প্রকার পরাণরাম যতবার পরীক্ষা দেয়, ফল সেই একই প্রকার হইতে লাগিল।

কঠোর-হৃদয় বৃদ্ধ পিতা কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত না হইয়া ঘোর হুঙ্কার করিলেন "বাপু হে, তুমি যতবারই ফেল হও না কেন, পরীক্ষা তোমায় দিতেই হইবে।" হতভাগা পরাণরাম ছয়জন গৃহশিক্ষক ও পিতা কর্ত্তৃক বিষম অনুপীড়িত হইয়া, সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায়, কেবল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চক্রব্যূহের মধ্যে ঘুরপাক খাইতে লাগিল।

তবে করুণাময় বিধাতার রাজ্যে কাহারও দুঃখ চিরস্থায়ী হয় না। ইণ্টারমিডিয়েট সাগরে বার পাঁচ ছয় ডুব দিয়া যখন পরাণরাম বেচারার দম বন্ধ হইবার যোগাড় হইয়াছে, সেই সময় বৃদ্ধ একদিন সহসা নিজেই একটা কঠিনতর পরীক্ষা দিবার জন্য কোন এক অজ্ঞাত পরীক্ষা-মন্দিরে রওনা হইলেন।

পিতৃহীন পরাণরাম হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল বটে, কিন্তু মা সরস্বতীর পূর্ব্ব অত্যাচার সে কিছুতেই ভুলিতে না পারিয়া, তাঁহার উপর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাধনে তৎপর হইল। কোথাও কিছু নাই, একদিন সে বীণাপাণির বীণাটা কাড়িয়া লইয়া বেসুরে ও উচ্চরবে বাজাইয়া কমলবন মুখরিত করিয়া তুলিল। অর্থাৎ হঠাৎ কবি হইয়া সে উৎকট কবিত্বভারে সাহিত্য-জগতে একটা মহা সোরগোল তুলিয়া ফেলিল। ধনী পিতার মৃত্যুতে তাহার হাতে যথেষ্ট অর্থাগম হইয়াছিল; সুতরাং তাহার বলে অনেক মাসিকপত্রিকা ও সংবাদপত্রই তাহার কবিতাগুলি সাদরে ছাপাইতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত সে নগদ ৫৮/০ চারি টাকা দশ আনা খরচ করিয়া কোথা হইতে "কাব্য-দিক্‌পাল" নামে এক উপাধি সংগ্রহ করিল।

ইহার উপর পরাণরাম সাহিত্যক্ষেত্রে আরও এক উপদ্রব আরম্ভ করিল। যেখানেই কোন সভা-সমিতি বা সাহিত্যিক সম্মেলন হইত, সেখানেই সে কোন প্রসিদ্ধ লেখকের অনুকরণ করিয়া একটি গান লিখিয়া পাঠাইত। লোকে তাহার রচনা ও অনুকৃতি-ভঙ্গিমা দেখিয়া আতঙ্কিত হইত বটে; কিন্তু অর্থশালী ও চাঁদা প্রদানে সদামুক্তহস্ত পরাণরামকে কেহ অসন্তুষ্ট করিতেও সাহসী হইত না। সুতরাং প্রায় প্রত্যেক সভাতেই সভ্যবৃন্দকে তাহার রচিত একখানি সঙ্গীত পরাধঃকরণ করিয়া তবে কার্য্যারম্ভ করিতে হইত।

আমার দ্বিতীয় সঙ্গী মিষ্টার সিউহোও একজন বড় কম অসাধারণ লোক নহেন। দিব্য ফিট্‌ফাট চেহারা, খোঁচা-খোঁচা গোঁফ জোড়াটির বহির্দ্দিকে অর্দ্ধভাগ কামান (tooth brush moustaches), সদা সুচক্ষুস চক্ষুদ্বয় পিন্‌-নে (pince-nez) শোভিত। মুখমণ্ডলে কেমন একটা সপ্রতিভ ভাব অহর্নিশ পরিস্ফুট। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দশ আনা ভাগ সময় দন্ত-পংক্তি সংলগ্ন একটি পরিপুষ্ট "সিগার"। হাবে ভাবে ইংরাজিয়ানা পূর্ণ মাত্রায় প্রকটমান।

আবার গুণও ঢের। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন বিদ্যা নাই, যাহাতে তিনি ঠোকর মারিতে অপারক। ষটচক্রভেদ ও মহামুদ্রাপ্রকরণ হইতে রাজনৈতিক জগতের খবর ও ঘোড়দৌড়ের "টিপ" (tips) পর্য্যন্ত সমস্তই তাঁহার নখাগ্রে।

মিঃ সিউহো আমাদের ভূতপূর্ব্ব প্রতিবেশী ৺ব্রজগোবিন্দ গুহের একমাত্র বংশধর। ৺গুহ মহাশয় তুষিবালের কারবারে বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত অপুত্রক থাকিয়া, অবশেষে গুহ-গৃহিণী চিচিঙ্গেপুর গ্রামের ৺বিকটাদেবীর "দোর ধরিয়া" এই পুত্ররত্ন লাভ করেন। সুতরাং স্নেহময় আত্মীয়-স্বজনের বিস্তর আপত্তি সত্ত্বেও নবকুমারের নাম রাখিতে হইল "বিকটচন্দ্র"। তবে এরূপ উৎকট নাম ধরিয়া সদাসর্ব্বদা ছেলেকে ডাকা সম্ভবপর নহে। তাই সকলে সংক্ষিপ্ত ভাবে শুধু "চন্দ্র" বলিয়াই ডাকিত।

ছেলেবেলায় তাহার চেহারাটা লক্ষ্মী-শ্রীমান বাঙ্গালী বালকের মত দিব্য "তেল-চুকচুকে" ছিল, আর মেজাজ, ধরণ-ধারণও ছিল পুরামাত্রায় দেশী। কিন্তু একবার এক সুলতা জমিদার-নন্দিনীর সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া, কন্যাপক্ষ হইতে তাহাকে বিবাহান্তে বিলাত পাঠাইবার প্রস্তাব হয়। কথাটা পাকাপাকি হইবার কয়েকদিনের মধ্যেই চন্দ্র তাহার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। নব বিকশিত গোঁফের অর্দ্ধ ভাগ অন্তর্হিত হইল ও অবিরত সাবান ঘর্ষণে গাত্রে সর্ষপ তৈলের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র রহিল না। চক্ষুদ্বয় সম্বন্ধে ইতোপূর্ব্বে কোন প্রকার রোগের কথা শুনা না গেলেও, নাসিকার উপর দিয়া এক জোড়া শার্শী বসিল ও ইংরাজ দর্জ্জীর বাড়ী হইতে এককালীন এক ডজন সাহেবী পরিচ্ছদের সুট প্রস্তুত হইয়া আসিল। সাবেক বিকটচন্দ্র বা সংক্ষিপ্ত চন্দ্র নামটা ঘুচিয়া জনসমাজে নাম প্রচারিত হইল "মিষ্টার গিউহো"।

বিবাহদিনের অব্যবহিত পূর্ব্বে কি একটা অন্তরায় ঘটায় বিবাহটা ভাঙ্গিয়া গেল, এবং জমিদার-নন্দিনী অন্যত্র পাত্রস্থা হইলেন। সুতরাং মিষ্টার গিউহোরও আর বিলাত যাওয়া হইল না। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তিত চালগুলা যথাযথ বজায় রহিয়া গেল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোন শাস্ত্রই মিঃ গিউহোর অজ্ঞাত ছিল না। পুস্তকাদি বিশেষ কিছু পাঠ করা না থাকিলেও, সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার কেমন একটা দৈববিদ্যা গজাইয়াছিল। ডারউইনের নাম কখনও শ্রুতি-গোচর না হইয়া থাকিলেও, সে অভিব্যক্তিবাদ (Evolution theory) সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল ধারাবাহিকরূপে বক্তৃতা করিতে পারিত, এবং যদিও কখন বেদান্তশাস্ত্রের পাতা উল্টাইবার সুবিধা ঘটে নাই, তথাপি দ্বৈত ও অদ্বৈত-বাদ সম্বন্ধে বাদানুবাদ হইলে কেহই তাহাকে তর্কে হটাইতে পারিত না। আর তর্কের সময় তাহার একটা অত্যন্ত প্রবল যুক্তি ছিল। কোন কথার সোষকতার প্রমাণ বা যুক্তির প্রয়োজন হইলে, গিউহো জোর গলায় বলিত "আরে আমি বলছি—Take it from me"। অবশ্য এরূপ অকাট্য যুক্তির খণ্ডন নিতান্তই শক্ত, কাজেই তাহাকে তর্কে কখনও পরাস্ত হইতে হইত না।

এই দুইটি অমূল্য সম্পদ পাইয়া ভ্রমণের উৎসাহটা আরও বর্দ্ধিত হইল। ভগবানের ইচ্ছায় ও কারুণিক পূর্ব্বপুরুষ-দিগের অনুকম্পায় আমাদের তিনজনের কাহারও অর্থ বা সময়ের অপ্রতুল ছিল না। সুতরাং সংঘটনটা হইল ভাল।

৪। উদ্যোগ পর্ব্ব

কবে, কখন, কোন্ দিকে, কি ভাবে যাত্রা করিতে হইবে, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য আমাদের পর্য্যটন-সমিতির একটা মিটিং করা হইল।

গিউহো বলিল যে, সাধারণ লোকের ন্যায় শুধু দেশ দেখিবার অভিপ্রায়ে ভ্রমণ করা সম্পূর্ণই নিরর্থক। সব দেশেই মানুষ, পশু, গাছপালা, বাড়ী, বাগান প্রভৃতি আছে। তাহা দেখিবার জন্য ভিন্ন দেশে যাইবার প্রয়োজন নাই। যাহাতে মানবজাতির জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে পারে, এইরূপ উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিতে হইবে। এই বিশাল ভূমণ্ডলের মধ্যে যে সমস্ত স্থান এখনও সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত হয় নাই, বা যে সব দেশের সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ, এইরূপ স্থানসমূহে ভ্রমণ করাই প্রকৃষ্ট।

গয়ারাম ও আমি উভয়েই এ মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করিলাম। সুতরাং এখন ভ্রমণের উপযুক্ত দেশ নির্ণয়ই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইল।

পরম্পরায় শুনা গিয়াছিল যে, কলিকাতা সহর হইতে দক্ষিণ দিকে ভবানীপুর নামে এক সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ আছে। তাহার সঠিক ইতিবৃত্ত কোন প্রচলিত ইতিহাসে বা ভূগোলে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। স্থির করা গেল যে, প্রথমেই ভবানীপুর আবিষ্কার ও সেখানকার ইতিবৃত্ত সংগ্রহের উদ্দেশে যাত্রা করা যাইবে; তারপর সেখান হইতে পৃথিবীর অন্যান্য গন্তব্য স্থানে যাওয়া হইবে।

গিউহো বলিল, "এক কাজ করা যাউক। অনাবিষ্কৃত দেশ আবিষ্কার করিয়া মানবের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্যই যখন আমাদের বিদেশ-যাত্রা, তখন এ বিষয়ে প্রথমে বিলাতের Royal Geographical Society নামক সভাকে জানান হউক। তাহা হইলে আমাদের কার্য্যটা জ্ঞানিত (recognized) হবে, আর সম্ভবতঃ Society আমাদের ভ্রমণের সমস্ত খরচপত্রও দিতে পারে।

কথাটা বেশ যুক্তি-যুক্ত বোধ হইল। বিশেষতঃ খরচ

পত্রটা যদি পরের স্কন্ধে চলে, তাহা নিতান্ত মন্দটাই বা কি? সুতরাং পরামর্শ মত Royal Geographical Society'র সম্পাদককে নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখা হইল:—

"প্রিয় মহাশয়,

আপনাদের সমিতির অবগতির জন্য লিখিতেছি যে, কলিকাতা সহরের দক্ষিণ দিকে ভবানীপুর নামে এক প্রদেশ আছে। কোনও প্রচলিত ভূগোল বা আপনাদের সভা কর্তৃক প্রকাশিত মানচিত্রে তাহার কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। ভূগোলবিদ্যার এই উন্নতির দিনে কোন প্রদেশ অনাবিষ্কৃত (undiscovered and unexplored) থাকে, ইহা অবশ্য আপনাদের সমিতির পক্ষে গৌরবজনক নহে। আমরা নিম্ন-স্বাক্ষরকারী তিন জন যুবক মানবজাতির জ্ঞানপ্রসারের অভিপ্রায়ে উক্ত প্রদেশ সম্যক ভাবে আবিষ্কার ও তথাকার অধিবাসীদিগের বিবরণ সংগ্রহ করিতে বাসনা করিয়াছি। আপনাদের মাননীয় সমিতি আমাদের ভ্রমণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলে, আমাদের পরিদর্শনের রিপোর্ট যথাসময়ে আপনাদের সমিতিতে প্রেরিত হইবে। এতৎসহ ব্যয়ের একটা এষ্টিমেট পাঠান হইল। চেক পাইলেই যাত্রা করা যাইবে।

আপনাদের বিশ্বস্তরূপে
গয়ারাম সাহিত্য-দিক্‌পাল
বি, সি, সিউহো
অরবিন্দ কাঞ্জিলাল"

পত্রের সঙ্গে ১৩৫২৸১০ তেরশত বাহান্ন টাকা সাড়ে বার আনার একটা আনুমানিক ব্যয়ের হিসাবও পাঠান হইল।

প্রায় দেড় মাস অপেক্ষার পর লণ্ডনের পোষ্টমার্ক যুক্ত একখানি প্রকাণ্ড খামে আমাদের চিঠির জবাব আসিল। লেফাফা ছিঁড়িতে গিয়া পাছে অভ্যন্তরস্থ চেকখানি নষ্ট হয়, তাই অতি সন্তর্পণে তীক্ষ্ণ ছুরিকার সাহায্যে পত্রখানি খোলা হইল। সবিস্ময়ে দেখিলাম ভিতরে চেকের চিহ্ন মাত্র নাই—শুধু একখানি চিঠি।

"প্রিয় মহাশয়গণ,

আপনাদের পত্রখানি আমাদের সমিতির অধিবেশনে যথারূপে পেশ করা হইয়াছিল। আপনাদের কথিত প্রদেশের নাম সমিতি অবগত না থাকিলেও, কলিকাতার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত কোনও স্থান অনাবিষ্কৃত আছে, ইহা সমিতি বিশ্বাস করেন না। এমত অবস্থায় সমিতি আপনাদের কোন অর্থ সাহায্য করিতে অক্ষম।

আপনাদের বিশ্বস্তরূপে
(সহি অপাঠ্য)
সম্পাদক—Royal Geographical Society.

সোসাইটির মূর্খতা ও নীচতা দেখিয়া তাহার উদ্দেশে বিস্তর নিষ্ফল গালিবর্ষণ করা গেল। অবশেষে স্থির হইল যে, এত বড় একটা মহৎ কার্য্যসাধনে পরমুখাপেক্ষী হইয়া কাজ নাই, আত্মনির্ভরতাই ভাল। সমস্ত বিষয় ব্যবস্থা করিবার জন্য পর্য্যটন সমিতির পুনশ্চ একটা রীতিমত মিটিং (meeting) আহ্বান করা হইল।

গয়ারাম প্রথম প্রস্তাব করিল যে "মিষ্টার এ, কাঞ্জিলাল M. S. A. D. C. (অর্থাৎ Member of the Simla Amateur Dramatic Club অর্থাৎ আমি স্বয়ং) ভ্রমণ-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হউন।"

সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে করতালির সহিত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

মিষ্টার সিউহো দ্বিতীয় প্রস্তাব করিল যে, "ভ্রমণের সমস্ত ব্যয় আপাততঃ সভাপতি নিজের তহবিল হইতেই নির্ব্বাহ করুন। ভ্রমণ শেষ হইলে পরিশেষে পরস্পরের অংশের খরচ হিসাব করিয়া যথাবিহিত কার্য্য করা হইবে।"

প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট লওয়ায় নিম্নলিখিত ফল হইল—

প্রস্তাবের পক্ষে—২
বিপক্ষে—১ (স্বয়ং)

অনুকূল ভোট সংখ্যা অধিক হওয়ায় প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অবশেষে সভাপতিকে ব্যয়ভার গ্রহণের জন্য "আন্তরিক ধন্যবাদ" প্রস্তাবিত ও গৃহীত হইয়া, সভাভঙ্গ হইল।

তার পরে, সিমুলিয়া হইতে ভবানীপুর যাইতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করা বিধেয়, তৎসম্বন্ধে বিস্তর পরামর্শ চলিতে লাগিল।

অনেক চেষ্টা ও অনুসন্ধানের পর তিনটি পথের সন্ধান পাওয়া গেল।

(১) ঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া উত্তরমুখে দমদমা বা ঘুষুড়াঙ্গা ষ্টেশনে গমন। তথা হইতে রেলযোগে শিয়ালদহ

ষ্টেশন। সেখানে ট্রেণ বদল করিয়া বেলেঘাটা ষ্টেশন হইতে কালিঘাট ষ্টেশন। তথা হইতে পুনরায় ঘোড়াগাড়ী যোগে ভবানীপুর।

(২) সিমুলিয়া হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে নিমতলা ঘাট, তথায় নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া শালকিয়া। তথা হইতে কতক ট্রামে কতক হাঁটিয়া, তেলকল ঘাট। পুনর্ব্বার গঙ্গা পার হইলেই হাইকোর্টের নিকট বাবুঘাট। তার পর কালিঘাটের ট্রামে চড়িয়া ভবানীপুর।

(৩) ঘোড়ার গাড়ীর সাহায্যে বাগবাজার রথতলার ঘাট পর্য্যন্ত গমন। তথা হইতে ষ্টীমার যোগে ক্ষিদিরপুর, সেখান হইতে পুনরায় গাড়ী করিয়া ভবানীপুর।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর কাগজে নানা প্রকার চার্ট আঁকিয়া, তৃতীয় পথটি অবলম্বন করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক মনে হইল। তদনুসারে বাগবাজার হইতে ক্ষিদিরপুর পর্য্যন্ত যাইবার জন্য কোনও এক ইংরাজ সওদাগরী আফিস হইতে দৈনিক এক শত টাকা ভাড়ায় একখানি ষ্টীমার ভাড়া (charter) করা হইল। ঠিক করা গেল যে, ষ্টীমারখানি ক্ষিদিরপুর পৌঁছিবার পর ঘাটেই থাকিবে, আমরা লোকজন মালপত্র তথায় রাখিয়া পদব্রজে মার্চ করিয়া ভবানীপুর আবিষ্কার করিতে যাইব।

ইতোমধ্যে আবার গণারাম এক গোল বাধাইল। সে একদিন বাগবাজারে তাহার পিসির বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়া, তথাকার Unofficial News Bureau হইতে এক গোপনীয় সংবাদ পাইল যে, তথাকার বিচালী-ঘাটে তিনখানি অশ্বপাণ সবমেরিণ বিচালী চাপা দিয়া চুপি চুপি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সংবাদটা খাঁটি বাগবাজারের, সুতরাং অবিশ্বাসের জো নাই। কাজেই আমাদের মনে একটু খট্‌কা বাধিল।

অবশেষে মিষ্টার সিউহো বলিল যে, সবমেরিণের জন্য তত আশঙ্কার কারণ নাই। আমরা তিনজন আছি, এক-একজন করিয়া দূরবীক্ষণ সাহায্যে সবমেরিণের পেরিস্কোপ লক্ষ্য করিলেই চলিবে। তাহা ছাড়া, যখন মানব-সমাজের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করা হইয়াছে, তখন অত প্রাণের ভয় করিলেও চলিবে না।

কথাটা শুনিয়া আমাদের হৃদয়েও উৎসাহ আসিল। আর সাত পাঁচ না ভাবিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিলাম।

৫। নিরুদ্দেশ যাত্রা

খনার শাস্ত্রে বলে—

"মঙ্গলে উষা বুধে পা।
যথা ইচ্ছা তথা যা॥"

১৩ই মাঘ বুধবার প্রত্যূষে বাটী হইতে শুভযাত্রা করা গেল।

বাস্তবিক এই তারিখটা বঙ্গের ভাগ্যগগনে চিরদিনের মত অক্ষয় তারকার ন্যায় দেদীপ্যমান থাকিবে। এই দিন তিনজন বাঙ্গালী যুবক সংসারের মায়া-মমতা ঘুচাইয়া, অমূল্য জীবন পণ করিয়া, শুধু মানবজাতির জ্ঞান প্রসারের জন্য আত্মোৎসর্গ করিল। পৌরাণিক যুগ হইলে হয় ত আজ স্বর্গে দুন্দুভি বাজিত, এবং বিদ্যাধরীগণ শীর্ষে পুষ্প-বৃষ্টি করিত; নিতান্তপক্ষে পৌরাঙ্গনাগণ বাতায়ন-পথ হইতে মস্তকোপরি লাজ বর্ষণ করিত সন্দেহ নাই। আজ কিন্তু একটা শঙ্খধ্বনি পর্য্যন্ত হইল না। জানি না আমাদের এ কাহিনী একদিন ভবিষ্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবে কি না!

প্রথমেই এক অশ্বশকটে আমরা তিন অসমসাহসিক বন্ধু, তৎপশ্চাতে এক গাড়ীতে অপেক্ষাকৃত মূল্যবান্ দ্রব্যাদি লইয়া চাকরের দল, এবং তাহার পিছনে দুইখানি মহিষের গাড়ীতে বোঝাই বিছানা-পত্র, বাক্স-তোরঙ্গ ইত্যাদি যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্য।

সন্তোষাগরিত পল্লীবাসিগণ বিস্ফারিতলোচনে আমাদের এই শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিল।

পাড়ার বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা গামছা হাতে, নামাবলী কাঁধে ৺গঙ্গাস্নানে বাহির হইতেছিলেন। ব্যাপার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চলেছ কোথায় হে সব, এত মাল-পত্র নিয়ে?"

সগর্ব্বে উত্তর দিলাম "ভূ-পর্য্যটনে।"

বিস্ফারিত চক্ষে ঠাকুরদাদা বলিলেন, "বটে?"

৬। পথে

অগাধ স্ফূর্ত্তিপূর্ণ হৃদয়ে চলিলাম।

গলির ভিতর হইতে বড়রাস্তা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই এক গোল বাধিল। কি কারণে জানি না, সহসা কবি গণারামের হৃদয়ে ভাবলহরী উথলিয়া উঠিল। যাত্রার প্রাক্কালে কবিবর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, দেশ-

ভ্রমণের সময় যখনই কিছু দেখিয়া তাঁহার কবিত্ব-ভাবসাগর উদ্বেলিত হইবে, তখনই সেই সম্বন্ধে তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিবেন। তজ্জন্য সঙ্গে দুই রীম কাগজ ও আড়াই ডজন পেন্‌সিলও লইয়াছিলেন। কিন্তু ঘর হইতে বাহির হইতে না হইতেই যে এই বিপদ হইবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও আশঙ্কা করি নাই। তাঁরা তাড়াতাড়ি কাগজ পেনসিল বাহির করিয়া কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ সম্বন্ধে এক কবিতা লিখিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

বিরক্ত হইয়া গিউহো কহিল, "চলন্ত গাড়ীর ভিতর আবার ও-সব কি হাঙ্গামা করছ? কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ দিয়ে ত সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা যাতায়াত করছ, আজ হঠাৎ ভাব লেগে গেল না কি?"

প্রশান্তস্বরে গঙ্গারাম উত্তর করিল, "আরে মহামূর্খ, কবি-হৃদয়ের বিচিত্র কারখানা তোমার মত দ্বিপদ-বিশিষ্ট জানোয়ারে কি বুঝবে? নিদ্রিত আগ্নেয়গিরির গহ্বর থেকে কখন যে অগ্ন্যুদ্গম আরম্ভ হয়, তা' কি কেউ হিসাব করে কখন ঠিক করতে পেরেছে? একবার লর্ড বায়রণের কি হয়েছিল তার খবর রাখ?"

কথায় বাধা দিয়া উগ্রস্বরে গিউহো বলিল, "লজ্জা করে না ঐ রকম লম্বা-লম্বা কথা কইতে? কোথায় মহাকবি বায়রণ, আর কোথায় একটা অতি তুচ্ছ নগণ্য গঙ্গারাম!"

অবশেষে তর্ক হইতে হাতাহাতির উপক্রম। আমি সমিতির প্রেসিডেণ্ট, কাজেই নিজের শরীরটাকে বিপদ-গ্রস্ত করিয়া কোন গতিকে উভয়ের মাঝে পড়িয়া ঝগড়া মিটাইলাম। বিস্তর গোলমালের পর শেষে এই মর্ম্মে peace (রফা) হইল যে, গঙ্গারাম আপাততঃ লেখা বন্ধ রাখিয়া তাহার কবিতার মালমসলাগুলা মনের মধ্যে গুছাইয়া রাখুক, তার পর ষ্টীমারে উঠিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করা হইবে। সুখের বিষয়, এই বন্দোবস্তের পর আর গাড়ীতে কোন গোলযোগ ঘটে নাই।

বাগবাজারের রথতলার ঘাটের কাছে জেটিতে ষ্টীমার লাগিয়াছিল। আমরা পৌঁছিবামাত্র সারেং প্রভৃতি সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া আমাদের জাহাজে উঠাইল।

কিছুক্ষণ পরেই আমাদের মালপত্র সহ লোকজনেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তত্ত্বাবধারণ করিয়া জিনিস-গুলি ষ্টীমারে উঠাইতে লাগিলাম; মিষ্টার গিউহো ডেকের উপর দাঁড়াইয়া পেণ্টুলানের দুই পকেটে দুই হাত পুরিয়া চুরোটিকা ফুঁকিতে-ফুঁকিতে মাঝে-মাঝে জিনিসপত্রগুলি গোছান সম্বন্ধে নানারূপ বাচনিক উপদেশ দিয়া আমাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। গঙ্গারাম ষ্টীমারে পদার্পণ করা অবধি একমনে তাহার সেই কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের কবিতাই লিখিতে সুরু করিয়াছিল।

বিস্তর লোক-লস্করের সাহায্যে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই মাল-পত্র ষ্টীমারে বোঝাই হইল। তিনজন মাত্র মনুষ্যের সহিত এত লোকজন ও জিনিসপত্রের রাশি দেখিয়া জাহাজের লোকেরা বিস্ময়-বিমূঢ় হইল। সারেং বেচারী কিছু বোকা-রকম—তাই একবার আমার কাছে আসিয়া আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "হুজুরদের কি কিদিরপুরে বাস্ন-তোরঙ্গের কারবার আছে, তাই কলকাতা থেকে মাল চালান দিচ্ছেন?" তার পর যখন শুনিল যে বাক্সগুলির মধ্যে কেবল আমাদের পথে ব্যবহার্য্য জিনিসপত্রগুলি মাত্র আছে, তখন বেচারা একেবারে হতভম্ব।

বেলা দশটার মধ্যেই বিস্তর ধূম উদ্গীরণ করিতে-করিতে ষ্টীমার ছাড়িল। মিষ্টার গিউহো একখানি বেতের চেয়ার ডেকের উপর টানিয়া লইয়া, পার্শ্বস্থ একটি টি-পয়ের উপর রক্ষিত চা ও তাহার আনুষঙ্গিক ভোজ্য দ্রব্যগুলির সদ্ব্যবহার করিতে করিতে এবং একটি বিশাল চুরোট ওষ্ঠসংলগ্ন করতঃ ইতস্ততঃ চাহিয়া কোন সবমেরিণের পেরিস্কোপ দেখিতে পাওয়া যায় কি না, তৎ-প্রতি লক্ষ্য রাখিতে লাগিল। আমারও গা'টা কেমন ছমছম করিতেছিল। বাস্তবিক সেই আটলাণ্টিক মহা-সাগরে তুষারপর্ব্বতের ধাক্কা লাগিয়া "টাইটানিক" জাহাজ ডুবিয়া যাওয়া অবধি, আমার জলপথে ভ্রমণ করিতে গেলেই প্রাণে কেমন একটা আতঙ্ক হয়। যদিও কলিকাতার গঙ্গায় "আইস্‌বার্গ" ভাসিয়া আসার কথা বড় একটা শুনা যায় না বটে, তথাপি দৈবের কথা কে বলিতে পারে? তবে না কি জীবন পণ করিয়া একটা মহাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তাই বুকে সাহস বাঁধিয়া চলিলাম।

গঙ্গারাম এখন আর এ পার্থিব জগতে নাই। সে কাগজ পেন্‌সিল লইয়া ধ্যানস্তিমিত লোচনে একাগ্রভাবে তাহার সেই কবিতাই লিখিতেছিল।

মহানন্দে ষ্টীমার চলিল। ডুধারে ঘাটে বিস্তর নরনারীর সমাগম হইয়াছে। অদ্য সকালে খবরের কাগজ পড়িবার পূর্ব্বেই রওয়ানা হইয়াছিলাম। মনে হইল আজ কাগজে হয় ত আমাদের এই ভূপর্য্যটন যাত্রা সম্বন্ধে কিছু লেখা হইয়াছে; তাই বোধ হয় আমাদের দেখিতে এই বিপুল জনসঙ্ঘের সমাবেশ। ঠিক বুঝিতে না পারিয়া একজন খালাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আজ ঘাটে এত ভিড় কেন জান?" খালাসী বলিল-"আজ যে হেঁদুদের মাঘী-পুন্নিমে, তাই এত নাগী জাইতেছে।" তখন মনে হইল আজ মাঘীপূর্ণিমাই বটে।

যাহা হউক, ষ্টীমার ত আপনমনে চলিতেই লাগিল। ক্রোকোডাইলনার ঘাট, আহিরীটোলা ঘাট, এমন কি নিম তলার ঘাট পর্য্যন্ত পার হইলাম। এখনও কিন্তু (আমাদের অসাধারণ সৌভাগ্য বশতঃ) আরব্য উপন্যাস ও অন্যান্য গল্পপুস্তকে জলপথে ভ্রমণকারীদিগের সম্বন্ধে যে সমস্ত দুর্ঘটনার কথা শুনা যায়, তাহার কোনটিই ঘটিল না। জাহাজ পাহাড়ের গায়ে ঠেকিয়া চূর্ণীকৃত হইল না, বা জলমধ্যস্থ চুম্বক পাথরের আকর্ষণে জাহাজের লৌহখণ্ডগুলি খসিল না, এমন কি "প্রবল বাত্যাভিহত" হইয়া জাহাজ বিপথগামী পর্য্যন্ত হইল না! সারেঙ্গের নিকট জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে পথে জলদস্যুরও বিশেষ ভয় নাই।

৭। পীড়া ও চিকিৎসা।

নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় সহসা মিষ্টার গিউহো নানাবিধ কাতরোক্তি করিতে-করিতে ষ্টীমারের মাঝখানে ডেকে বিস্তৃত বিছানার উপর আসিয়া ধড়াস করিয়া শুইয়া পড়িল। "কি হইল, কি হইল" বলিয়া সকলে ছুটিয়া আসিলাম। গয়ারামও তাহার কবিতা ফেলিয়া দেখিতে আসিল।

যন্ত্রণাব্যঞ্জক স্বরে মিউহো কহিতে লাগিল "ওঃ প্রাণ যায়, সি-সিক্‌নেস, দারুণ সি-সিক্‌নেস।"

ব্যস্ত হইয়া কেহ বাতাস করিতে লাগিল, কেহ বা মুখে জলের ঝাপটা দিল। আমি তাড়াতাড়ি ভৃত্যগণের সাহায্যে ঔষধের সিন্দুকটি টানিয়া বাহির করিলাম। পথে প্রয়োজন হইতে পারে বিবেচনায়, ডাক্তারি, কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি, অবধৌতিক ইত্যাদি নানাবিধ ঔষধ সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন হোমিওপ্যাথি এলোপ্যাথি, চক্রদত্ত, চরকসংহিতা ইত্যাদি নানা পুস্তকও ছিল। কিন্তু বিস্তর অনুসন্ধান সত্ত্বেও সামুদ্রিক পীড়ার কোনও ঔষধের কথা খুঁজিয়া পাইলাম না।

অবশেষে রোগী নিজেই তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়া মৃদুস্বরে মিউহো বলিল "ভাই, ও আর কেতাবে কি দেখ্‌বে? সি-সিক্‌নেসের চিকিৎসা আমি যা বলি, তাই কর। তিন আউন্স ভাইনাম্ গ্যালিপাই, এক আউন্স সিরাপ অফ রোজ, একটুখানি বরফজলের সঙ্গে মিশিয়ে, চামচে করে মুখে একটু-একটু করে ঢালতে থাক, তাইতেই যদি কিছু উপশম হয়।"

"বাস্তবিকই দেখা গেল যে, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, মিষ্টার গিউহোর চিকিৎসা-বিদ্যার জ্ঞানও অসাধারণ বটে। আশ্চর্য্যের কথা বলিব কি, ব্যবস্থামত কার্য্য হইবার পনর মিনিটের মধ্যেই সেই মরণোন্মুখ রোগী দিব্য সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল।

দারুণ দুশ্চিন্তার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সকলে আবার প্রফুল্লচিত্তে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। গয়ারামের কবিতাটা লইয়া সকলে পাঠ করা গেল। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

১

কর্ণওয়ালিস কর্ণওয়ালিস পাষণবর্ত্মে শ্রেষ্ঠা তুমি
নগরবাসীর গর্ব্বের নিধি সারা সহরের পুণ্যভূমি।
কত সুরম্য বিশাল হর্ম্ম তোমারি দুপাশে দাঁড়ায়ে স্থির—
বিপুল গর্ব্বে তুলেছে সর্ব্বে গগন ভেদিয়া উচ্চশির।
বাগ্‌বাদিনীর কমলকানন বিদ্যা-আগার শোভিছে কত,
বিবাদ ভুলিয়া ভারতী কমলা তব কোলে যেন ক্রীড়ায় রত।
কর্ণওয়ালিস জননী আমার বন্দিগো তব চরণ দুটি।
সহরের তুমি বুকচেরা ধন তোমারি শ্রীপদে পড়িগো লুটি।

২

প্রসারিত তব বিশাল বক্ষে চলে কত যান দিবস-রাত্রি।
কত জুড়ীগাড়ী ল্যাণ্ডো ফেটন চলেছে গর্ব্বে ফুলায়ে ছাতি।
গড় গড় গড় চলে হুকড় তুলি অবিরাম বিষম ধ্বনি
বিকট নিনাদে বাজায়ে শঙ্খ ধাইছে মোটর পবন জিনি।

ঘোর ঘর্ঘরে ধায় সদা ট্রাম কেরাণীর দল ধরিয়া বুকে।
পাঁচটি পয়সা করিয়া খরচ চলেছে আফিসে মনের সুখে।
তুমি গো জননী না থাকিতে যদি যেতে হ'ত গলি ঘুঁজির পথে,
বৃষ্টির দিনে কষ্ট করিয়া চড়িয়া সেয়ারে হাকনী রথে।
কর্ণওয়ালিস জননী আমার ইত্যাদি—

৩

আপণ বিপণী শোভে শত শত সাজারে মোহন পণ্য পাঁতি।
চপলা আলোকে ধাঁধিয়া নয়ন লাঞ্ছিত করি অমরাবতী।
ব্যবসার ফাঁদ বিছায়ে যতনে কত মহাজন বসেছে যেথি।
নিরীহজনার ছেদিতে কণ্ঠ হস্তে ধরিয়া শাণিত ছুরি।
নব বিধানে শতেক বৈশ্য সাজায়ে দোকান দিয়াছে সারি।
বিরাট বোতলে রাঙ্গা জল ভরি শোভে ডাক্তার লক্ষহারী।
মাঝে ভারতীর প্রধান পাণ্ডা চাটুয্যেদের হরিদাস।
বাণীর প্রসাদ বিলায়ে বঙ্গে লুটিছে অর্থ বারমাস।
কর্ণওয়ালিস জননী আমার ইত্যাদি—

৮। দেশ আবিষ্কার

বৈকালে প্রায় ৩টার সময় কিদিরপুর ছেটাতে টীমার লাগিল। পথশ্রমে ক্লান্ত থাকায় সে রাত্রি টীমারেই কাটাইলাম। পরদিন প্রাতে কিঞ্চিৎ জলযোগাদির পর ভৃত্যবর্গকে জাহাজে জিনিষপত্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া তিন বন্ধুতে শ্রীদুর্গা স্মরণ পূর্ব্বক ডাঙ্গায় উঠিলাম। সঙ্গে নোটবুক, যৎকিঞ্চিৎ অর্থ এবং ভ্রমণকারীর আবশ্যকীয় দুই একটি জিনিষ ব্যতীত আর কিছুই লইলাম না। কিছুদূর আসিয়া একজন পথিককে ভবানীপুরে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করায় সে অঙ্গুলী সঙ্কেতে একটা রাস্তা দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কম্পাস বাহির করিয়া Bearing লইয়া দেখিলাম যে, সে দিকটা East-North East অর্থাৎ পূর্ব্বদিক ও ঈশান কোণের মাঝামাঝি। দূরবীক্ষণ দিয়া পথটি দেখিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিয়ৎদূরে রাস্তার একটি বাঁক থাকাতে বেশী কিছু দেখা গেল না। যাহা হউক নির্দ্দেশমত পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম।

প্রায় দুই মাইল অতিক্রম করিবার পর একটা চৌমাথায় উপস্থিত হইলাম। সমস্যা হইল কোন্ দিকে যাওয়া যাইবে। এক পথিক ভদ্রলোককে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়, বলতে পারেন ভবানীপুরে কোন্ দিক দিয়ে যাব —উত্তর, না পূর্ব্ব, না—"

একটু তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন "উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম কোন দিকেই যাবার প্রয়োজন নেই।"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম "সে কি মহাশয়?"

ভদ্রলোক প্রশান্ত ভাবে উত্তর করিলেন "যেখানে আছেন, সেইখানেই থাকতে পারেন।"

কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া সিউহো জিজ্ঞাসা করিল "তার মানে কি?"

ভদ্রলোক বলিলেন "এই জায়গার নামই ভবানীপুর।"

ও হরি! তবে কি আমরা রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্যাপা সন্ন্যাসীর পরেশপাথর বাহির করার ন্যায় কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে অন্যমনস্কে ভবানীপুর আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছি? গদগদ কণ্ঠে গঙ্গারাম কহিল "ভাই, বিশ্বের যত মহাকার্য্য এইরূপ নীরবেই সংসাধিত হয়। বাস্তবিক, যে কার্য্য আমাদের এ নশ্বর জগতে অমর করিয়া রাখিবে, তাহা আমরা অজ্ঞাতসারে কখন করিলাম, তাহা নিজেরাই বুঝিতে পারিলাম না!"

ভগবানকে সকলেই ধন্যবাদ দিলাম।

৯। অবিকৃত দেশ

প্রথমেই একটা ভারি বিস্ময়কর ব্যাপার দেখা গেল। আশ্চর্য্য এই যে, অন্যান্য পাঁচ জায়গাও যেমন, ভবানীপুরও প্রায় সেই রকমই। আবিষ্কৃত দেশ বলিয়া ইহার কিছুমাত্র বিশেষত্ব দেখিলাম না! কোথায় বা তরঙ্গায়িতা বেগবতী স্রোতস্বতী, কোথায় বা শুভ্রতুষার-কিরীটী তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, কোথায় বা নিবিড় দ্রুমদল-শোভিত উপত্যকা, আর কোথায় বা সিংহশার্দ্দূল-বিরাজিত ভীষণ অরণ্যানী;—যে সমস্ত জিনিষ দেখিব বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, তাহার কোনটিরই চিহ্নমাত্র নয়নগোচর হইল না।

যাহা হউক, চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু দেখিতে পাইলাম, নোটবুকে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ টুঁকিয়া রাখিতে লাগিলাম। তদ্ভিন্ন স্থানীয় লোকদিগের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও অনেক পুরাতন ও নূতন তথ্য সংগ্রহ করা গেল।

শুনিলাম যে, অতীত যুগে এখানে ইষ্টক, লৌহ, কাষ্ঠ ইত্যাদি বিনির্ম্মিত সৌধাবলীর স্থানে বৃক্ষলতাসরোবর

শোভিত পল্লী ছিল। তারপর পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও আদিম অধিবাসিগণ (Aborigines) পরাক্রান্ত বহির্দ্দেশ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত হইয়াছে। ভারতবর্ষে আর্য্যগণের, আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গগণের বা প্রাচীন ইংলণ্ডে নানা বহির্জ্জাতির আক্রমণের ন্যায়, এখানে "উকিল" নামক এক অতি দুর্দ্দান্ত ও কূটবুদ্ধি জাতি কোথা হইতে আসিয়া বিগত শতাব্দীর অগ্রভাগে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। ক্রমে তাহারা ছলে বলে কৌশলে আদিম অধিবাসিগণের উচ্ছেদ সাধন করিয়া এখন সমগ্র ভবানীপুরেই একরকম সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিয়াছে।

ভবানীপুরের বর্ত্তমান অধিবাসিগণ সাধারণতঃ তিন জাতিতে বিভক্ত :—যথা, ভদ্রলোক, ছোটলোক এবং উকিল।

(১) ভদ্রলোক :—যাহাদের বস্ত্রাদি অপেক্ষাকৃত শুভ্র ও পরিষ্কার, বাটির বাহির হইলে যাহাদের অঙ্গে পিরিহান, পঞ্জাবী বা কোট ও তদুপরি বিকল্পে চাদর শোভা পায় এবং যাহাদের ভাষা ইংরাজীর বুকনী মিশ্রিত, তাহাদিগকে "ভদ্রলোক" বলে। ইহাদের আদিম জাতি ব্রাহ্মণ বা বাগদী, বৈদ্য বা রজক, সে সকল কথা সম্পূর্ণ নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজন (irrellevant)। উপরিলিখিত গুণগুলি থাকিলেই সে ভদ্রপদবাচ্য।

(২) ছোটলোক :—যাহাদের অবস্থা হীন, পরিচ্ছদ মলিন, এবং ইংরাজি ভাষায় অধিকার নাই, তাহাদের নাম "ছোটলোক।" মলিন বসন-পরিহিত, অনাবৃত-দেহ ব্রাহ্মণও ছোটলোক পদবাচ্য।

(৩) উকিল :—ইহাদের কতকগুলি ভদ্রোচিত গুণ থাকিলেও ভদ্রলোক বলা চলে না ; পরন্তু অনেকগুলি ছোটলোকের উপযুক্ত গুণ দেখা গেলেও, ঠিক ছোটলোকও বলা যায় না—(অন্ততঃ বলা নিরাপদ নহে)। বস্তুতঃ ইহাদের সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ শোনা গেল, তাহাতে বোধ হইল ইহারা বিধাতার সৃষ্ট এক অপরূপ জীব। শুনিলাম ইহাদের জাতিবিভাগ লইয়া সরকার বাহাদুরকেও কিছু বিপন্ন হইতে হইয়াছে। প্রত্যক্ষভাবে ইহাদের ছোটলোক বলিতে পারেন না—পক্ষান্তরে ভদ্রলোক বলিতেও ইচ্ছুক নহেন। শোনা গেল যে, এই ভবানীপুরেরই নিকটবর্ত্তী এক আদালত-ভবনের একপ্রান্তে একটী সরকারী water-closet (শৌচাগার) আছে। তাহার গায়ে সরকারী নোটিশ আছে "উকিল ও ভদ্রলোকদিগের জন্য।" সুতরাং বুঝা যায় যে, সরকার বাহাদুরও উকিলকে ভদ্রশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না।

উকিলজাতি সম্বন্ধে এইরূপ নানা কথা শুনিয়া ইহাদের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হইল। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী শুনা গেল। কেহ কেহ বলিলেন যে, ভারতবর্ষে ইংরাজ আসিবার পর হইতেই এই জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। একজন ঘূর্ণায়মানশুষ্কাগ্র, রক্তচক্ষু ভদ্রলোক আমাদের প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন, "Two of the sublimest products of the British civilization—বিলিতি সভ্যতার দুটি সেরা ফল—উকিল আর ব্রাণ্ডির বোতল।" অনেকের মতে কিন্তু তাহার পূর্ব্ব কাল হইতেই উকিল জাতির অস্তিত্বের বিবরণ পাওয়া যায়। অবশ্য প্রাচীন যুগের মৃত্তিকাস্তর মধ্যে প্রোথিত কোন উকিলের প্রস্তরীভূত অংশ (Fossil) পাওয়া গিয়াছে কি না, সে কথা ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতে পারেন। তবে দুই শতাব্দী পূর্ব্বেও বঙ্গ সাহিত্যে ইহাদের উল্লেখ দেখা যায়। ভারতচন্দ্র তাঁহার বিদ্যাসুন্দর নামধেয় কাব্যে লিখিয়াছেন :—

"উকিল আছিল যারা, কিল খেয়ে গৈল সারা"।

পুনশ্চ, এক দুষ্টা রমণী বলিতেছে,

"উকিল আমার পতি কিল খেতে দড়।
স্ত্রীলোকের মত পড়ি মার খেতে পারে।
সবে গুণ যত দোষ মিথ্যা করে সারে।"

এসব কথায় বোধ হয়, যেন তখনকার উকিলদের কিল খাওয়াটা একটা কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল। এখনকার উকিলের অবশ্য সে সব নিগ্রহ নাই। কিন্তু শেষের পংক্তিটির বর্ণনা বর্ত্তমান উকিল সম্বন্ধেও বেশ খাটে। তবেই মনে হয়, তখনকার উকিল ও এখনকার উকিলের Genus একই, speciesএর মাত্র পার্থক্য!

অধিবাসীদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান শেষ করিয়া ভবানীপুরের জীবজন্তু ও বৃক্ষলতাদি (Fauna and Flora) সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। বৃক্ষলতাদি বিষয়ে আপাততঃ বেশী কিছু জানা গেল না। মাঝে মাঝে

গাছ দেখিলাম বটে, কিন্তু তাহাদের জাতি নির্ণয় সম্বন্ধে আমাদের পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত মতভেদ হইতে লাগিল। আমি হয় ত যে গাছটাকে বলিলাম দেবদারু, গিউহো সেটাকে বলিল কিংবা গাছ, এবং গঙ্গারাম স্থির করিল চালতাগাছ। এমন কি একটা গাছে কতকগুলা নাতি-বৃহৎ কণ্টকময় ফল ফলিয়াছিল; গঙ্গারাম সেটাকে বলিল কাঁটাল গাছ, কিন্তু গিউহো মহা তর্ক করিয়া বলিল, "না, এটা এঁচোড় গাছ।" এইরূপ প্রত্যেক কথায় মতদ্বৈধ হইলে বিজ্ঞানানুশীলন চলে না। কাজেই ঠিক করিলাম, বিভিন্ন বৃক্ষ হইতে দুই একটি করিয়া পাতা সংগ্রহ করা যাউক। তার পর ভবিষ্যতে সেগুলা Botanical Garden-এর Curatorএর নিকট রীতিমত ফি দিয়া পরীক্ষা করাইয়া লইলেই চলিবে। সেইমতই কার্য্য করা গেল।

তার পর Fauna বা জন্তুদিগের কথা। দেখা গেল এখানে চতুষ্পদদিগের মধ্যে বিড়াল কুকুর গরু ঘোড়া ও মহিষ, এবং দ্বিপদদিগের মধ্যে কাক ও চড়াই প্রধান। কলিকাতার Faunaও এই জাতীয়। এতদ্বারা প্রমাণ হইল যে, কলিকাতা ও ভবানীপুরের ভূস্তর একই যুগের (of the same geological age)। কিন্তু একটা পার্থক্য অনুভূত হইল; কলিকাতায় যত গাড়ীটানা গরু বা মহিষ দেখা যায়, এখানে তত দেখা যায় না। ইহার কারণ কি? প্রতিভাশালী মিষ্টার গিউহো অনেক গবেষণার পর ইহার প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কারণ নির্ণয়ে সমর্থ হইল। প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিৎ কুভেয়ার ইত্যাদির মতে শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলি অধিক-তর প্রাণীসঙ্কুল হয়। কারণ উত্তাপই প্রাণীজননের প্রধান উপাদান। ভবানীপুর প্রদেশ কলিকাতার দক্ষিণে, সুতরাং দক্ষিণমেরু বা South Poleএর বেশী নিকটে। অতএব এখানকার উষ্ণতা কলিকাতা হইতে কম হইবেই, এবং তৎকারণে প্রাণীসংখ্যাও অপেক্ষাকৃত বিরল হওয়াই স্বাভাবিক। তজ্জন্যই কলিকাতার ন্যায় এখানে অত গরু বা মহিষের গাড়ী দেখা যায় না।

নানা বিষয় পরিদর্শন করিতে-করিতে ও তাহার নোট লইতে লইতে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইল। ঈশারে না ফিরিয়া, একজায়গায় "ভদ্রলোকের আহারের স্থান" দেখা দেখিয়া সেইখানেই ক্ষুন্নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিলাম। মাথাপিছু সাড়ে তিন আনা পয়সা দিয়া যে "ভদ্রলোকের আহার" পাওয়া গেল, তাহা হইতেই এখানকার ভদ্রলোক-দিগের একটা চিত্র মনে-মনে অঙ্কিত করিয়া লইলাম। খাদ্যাদির মূর্ত্তি দেখিয়া এক পুরাতন গল্প মনে পড়িল। দূরগ্রামে বরযাত্র গিয়া একজনেরা শুনিল যে কন্যার বাটির একটি লোকের নাম "গোরাচাঁদ"। গায়ের রংটি কিন্তু তার একেবারে মসীবিনিন্দিত। একজন বরযাত্রী থাকিতে না পারিয়া কন্যাপক্ষের একজনকে মিনতিস্বরে বলিল, "ভাই রে, এই যদি তোমাদের গাঁয়ের গোরাচাঁদ হয়, তবে তোমাদের কালাচাঁদটি কি রকম একবার দেখাতে হবে।" আমাদেরও এই আহারের অবস্থা দেখিয়া মনে কৌতূহল হইল যে, এখানে "ভদ্রলোকের" আহার যদি এবম্বিধ হয়, তবে "ছোটলোকের" আহার না জানি কিম্বিধ হইবে? এই কৌতূহল কিন্তু মিটাইবার কোন সুযোগ মিলিল না। কারণ রাস্তায় অনেক ঘুরা সত্ত্বেও "ছোটলোকের আহারের স্থান" বলিয়া কোথাও লেখা দেখিলাম না।

আহারান্তে পুনরায় বাহির হইয়া হাট-বাজারে স্থানীয় শ্রমজাত দ্রব্যাদি (Local Industry) পরিদর্শন করিতে চলিলাম। দোকানে নানাবিধ ত্রিনিষপত্র দেখিলাম বটে, কিন্তু সে সব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা গেল না। দোকানদারগণ তাহাদের তুচ্ছ ক্রয়-বিক্রয় কার্য্যেই ব্যস্ত; কোন দ্রব্য সম্বন্ধে বেশী প্রশ্ন করিলে, অজ্ঞতার জন্যই হউক বা অশিষ্টতাবশতঃই হউক, কেহই সদুত্তর দিতে পারে না। একটা উদাহরণ দিতেছি। রাস্তায় ঘুরিবার সময় দেখে কোথাও কলাগাছ দেখিলাম না, অথচ একটা দোকানে দেখি কাঁদি-কাঁদি কলা সাজান। বিস্মিত হইয়া দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম "হাঁ বাপু, তোমাদের এখানে ত একটিও কলাগাছ দেখলুম না, অথচ এত কলা ফল্‌ল কোথায়?" দোকানী প্রশ্নটা আমাদের খরিদদার ভাবিয়া সাগ্রহে আমাদের দিকে চাহিয়াছিল, কিন্তু প্রশ্নটা শুনিয়াই মুখ ফিরাইয়া সংক্ষেপে কহিল "আকাশে।" বলিয়াই অন্য খরিদদারদিগের দিকে মন দিল। উত্তরটা নোটবুকে লিখিয়া লইলাম বটে, কিন্তু বড়ই অবিশ্বাস্য ও অবৈজ্ঞানিক কথা বলিয়া মনে হইল।

বাজারের দিকে দেখাশুনা করিয়া ভ্রমণ করিতে-করিতে

এক বিস্তীর্ণকায়া নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বিষম কর্দ্দমাক্ত জল; দুই চারিখানা নৌকাও ভাসিতেছে। কম্পাস মিলাইয়া দেখিলাম ইহার স্রোত পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে চলিয়াছে। অনেকের মতে ইহা বরাবর পশ্চিমদিকে গিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। কিন্তু নদীটির উৎপত্তি স্থান (Source) সম্বন্ধে কেহই স্থান নির্ণয় করিয়া বলিতে পারিল না। গিউহো বলিল, প্রচলিত মানচিত্রে পূর্ব্বদিকে দুইটা বড় নদী দেখা যায়, এক ব্রহ্মপুত্র আর ইরাওয়াডী। যখন স্রোত পূর্ব্বদিক হইতে আসিতেছে, তখন সম্ভবতঃ এই দুইটি নদীর একটি হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে। কথাটা আমারও সম্ভবপর বলিয়া মনে হইল বটে, কিন্তু এত বড় একটা ভৌগোলিক তথ্য শুধু আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া নির্ণয় করা চলে না। তাই এ বিষয়ে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলাম না।

নদীটির নাম শুনিলাম "আদিগঙ্গা"। এ নামটির কোথা হইতে উৎপত্তি হইল, সে সম্বন্ধেও অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণা হইল। গিউহো অনুমান করিল, বোধ হয় ভগীরথ গঙ্গা আনিবার পূর্ব্বেও এ নদীটির নাম গঙ্গা ছিল। তাই ভগীরথ আনীত নূতন নদী হইতে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ইহার নাম হইয়াছে আদি বা original গঙ্গা। গঙ্গারাম কিন্তু এ মতের পোষকতা করিল না। সে বলিল, অনেকে বলিতেছে ইহা কাটা খাল। সম্ভবতঃ এই খাল কাটিয়া রাজা আদিশূরের জন্য গঙ্গাজল লইয়া যাওয়া হইত। তাই তাঁহার নামানুসারে লোকে এ নদীটিকে আদিগঙ্গা বলে।

পাঁচজনকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দেখিলাম, নদীর তীরে একজন লোক অনাবৃত দেহে উবু হইয়া বসিয়া, বাম করতলে একটা বর্ত্তুলাকার পদার্থ রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহা নিষ্পীড়িত করিতেছে। তাহাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করায়, লোকটি অর্দ্ধ-নিমিলিত চক্ষুদ্বয় কষ্টে একটু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "বাবা সকল, এ বিষয়ে যদি সঠিক খবর জানতে চাও, ত একটু তাল হয়ে বস (জ্ঞান সঞ্চয়ের খাতিরে কল্সা কাপড়ের মায়া ত্যাগ করিয়া মাটিতেই বসিলাম।) তবে কিন্তু কিঞ্চিৎ ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যে জ্ঞান বিনামূল্যে লাভ হয়, সে জ্ঞান জানবে মূল্যহীন।" যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া বিনা আপত্তিতে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পাঁচটি টাকা প্রদান করিলাম, এবং এত অল্প মূল্যে, এক রকম ফাঁকি দিয়াই—যে একটা এতবড় মূল্যবান পৌরাতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তজ্জন্য বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম।

শুনিলাম যে, ইংরেজজাতি কলিকাতা সহর দখল করিবার কিছুদিন পরে একদিন দুইজন গোরা সৈনিক কেল্লা হইতে বাহির হইয়া পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। দুপুর রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পিপাসাতুর হইয়া জলের সন্ধানে এইদিকে আসিতেছিল। দূর হইতে এ নদীটিকে দেখিয়া গঙ্গাভ্রমে একজন তৃষ্ণার্ত্ত সৈনিক সোল্লাসে বলিয়া উঠিল "Ah! the Ganga!" সেই হইতেই ইহার নাম হইয়াছে 'আদিগঙ্গা'।

১০। তাম্রলিপি প্রাপ্তি ও তাহার ফলাফল

অনেক ঘুরাঘুরি করিয়া সকলেই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাই নদীতীরে এক জায়গায় তিনজনে বসিয়া পকেট হইতে বিস্কুট বাহির করিয়া ভক্ষণ ও শ্রান্তি অপনোদন করিতে লাগিলাম। এমন সময় এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। আমি গল্প করিতে-করিতে অন্যমনস্কে আমার ছড়ির অগ্রভাগ দিয়া সম্মুখস্থ জলসিক্ত নরম মৃত্তিকা খনন করিতেছিলাম। দুই এক ইঞ্চি খননের পরেই ছড়িতে একটা কঠিন পদার্থ ঠেকায় কৌতূহল বশতঃ কুড়াইয়া লইয়া দেখিলাম একটি কর্দ্দমাক্ত গোলাকার তাম্রখণ্ড। ভাল করিয়া দেখিয়া মনে হইল, যেন তাহাতে কি লেখা আছে।

সহসা ভূ-মধ্য হইতে এই তাম্রলিপিখানি প্রাপ্ত হইয়া সকলেরই মহা আনন্দ। তাম্রখণ্ড সযত্নে পরিষ্কার করিয়া ম্যাগ্নিফাইং কাচের সাহায্যে লেখাগুলি পড়িতে চেষ্টা করিলাম। "East India Company" ও "1854" এই কয়টি কথামাত্র কষ্টে পড়িতে পারা যায়। যাহা হউক, এই কয়টি কথাতেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সিদ্ধান্ত হইল।

(ক) ভবানীপুর সহর ১৮৫৪ সালেও বিদ্যমান ছিল।

(খ) এক কালে এ স্থান পর্য্যন্তও East India Company'র প্রভুত্ব বিস্তৃত ছিল।

(গ) ১৮২৪ সাল হইতে এখানকার ভূ-স্তর ১½ ইঞ্চি মাত্র উত্থিত হইয়াছে। (কারণ মাপিয়া দেখা গেল যে, ভূমিতলের অতটা নীচেই তাম্রখণ্ডটি বর্ত্তমান ছিল)।

(ঘ) ৮৯ বৎসরে ভবানীপুরের ভূমিতল যদি ১½ ইঞ্চি উঠিয়া থাকে, তবে আর ১৯২০০ বৎসরে ভবানীপুর সহর সম্পূর্ণরূপে মাটির নীচে চাপা পড়িবে।

তাম্রলিপি লইয়া বাদানুবাদ করিতেছি, এমন সময় একটি ৮।৯ বর্ষ বয়স্কা মলিন বস্ত্রখণ্ড পরিহিতা বালিকা কোথা হইতে আসিয়া ক্রন্দনের স্বরে বলিল "আমার ঘষা পয়সা, পয়সা ঐখেনে হারিয়ে গেছল, দাও আমাকে।" বলিয়া হাত পাতিল। এই অভিনব বিপদ দেখিয়া আমরা কিছু হতবুদ্ধি হইলাম। কিন্তু এ অমূল্য তাম্রলিপিখানি অত সহজে ত্যাগ করিতেও পারি না। সুতরাং বুদ্ধি করিয়া বালিকাকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে তৎক্ষণাৎ একটা টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। বালিকা টাকাটি পাইবামাত্র ক্রন্দনটা মুহূর্ত্তেকে সম্বরণ করিয়া একবার আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে আমাদের মুখের দিকে চাহিল, তারপর দ্রুতপদে পলাইয়া গেল। আমরাও আবার গবেষণায় মনোনিবেশ করিলাম।

বালিকাটি কিয়ৎদূরে গিয়া একটি ১৮।১৯ বৎসরের বালকের হাতে টাকাটা দিয়া কি বলিল। বালক মহা সন্দিগ্ধভাবে টাকাটা একটু পরীক্ষা করিয়া খুব আস্ফালন করিতে-করিতে দ্রুতভাবে আমাদিগের কাছে আসিয়া বলিল "কোথাকার জোচ্চোর লোক গো তোমরা? মেকী টাকা দিয়ে ছেলেমানুষের পয়সা ভুগিয়ে নিচ্ছ? শিগ্‌গির পয়সা বের কর, নইলে পাহারওলা ডাকব।"

তাম্রলিপিখানি হাতছাড়া অবশ্য কখনই করা যায় না। তবে আমাদের প্রদত্ত টাকাটা সত্যই একটু কাল ছিল দেখিয়া আমি গোলযোগ মিটাইবার অভিপ্রায়ে টাকাটি বদলাইয়া অন্য একটি টাকা দিতে উদ্যত হইলাম। গিউহো কিন্তু এই অন্যায় অপবাদে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। সে টাকাটি বদলাইতে না দিয়া বালককে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। বালকটিও "পাহারওলা, পাহারওলা" শব্দে দিগন্ত মুখরিত করিল।

যে সমস্ত বিশ্বনিন্দুক বলে যে, কার্য্যকালে পুলিশ ডাকিলে তাহাদিগের দেখা পাওয়া যায় না, তাহারা নিতান্তই মিথ্যাবাদী, সন্দেহ নাই। কারণ, ঠিক এই সময়ে দেখা গেল যে নদীকূলের অনতিদূরে, একটি পানের দোকানের খুঁটিতে হেলান দিয়া এক পাহারওয়ালা-সুন্দর দোকানের অধিকারিণীর সহিত অভিনিবেশ পূর্ব্বক বোধ হয় কি আইন-কানুনের কথা কহিতেছিলেন। ডাক শুনিয়া মন্থরগতিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। আমরা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই বালকটি জোর গলায় তাড়াতাড়ি তাহার অভিযোগ বলিয়া গেল, এবং পুলিশ প্রভুও অনেক বিচারকের ন্যায় একতরফা শুনিয়াই আমাদের বিরুদ্ধে রায় দিলেন। টাকাটি লইয়া দুই চারিবার নাড়িয়া-চাড়িয়া মহাগম্ভীর ভাবে বলিলেন "আরে ইয়ে ত বড়া ভারি কেস হুয়া ভইলো। বহুৎ ভারি কেস।" মেকী টাকা চালানর চেষ্টা বাস্তবিকই আইনের চক্ষে বড় গুরুতর অপরাধ। সুতরাং এত বড় একটা মামলার কিনারা করিতে পারিয়া পাহারওয়ালা সাহেব অদূর-ভবিষ্যতে জমাদারি প্রাপ্তির আশায় উৎফুল্ল হইয়া মহোৎসাহে আমাদিগকে থানায় লইয়া চলিলেন। আমাদের কোন আপত্তিই টিঁকিল না।

থানায় যাইয়া একটি বাঙ্গালী বাবুর সম্মুখে পেশ হইলাম। মোকদ্দমার বিবরণ শুনিয়া তিনিও খুব গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িলেন, ও আমাদিগের দেহ তল্লাসী লইতে বলিলেন। তল্লাসীতে আমার কাছ হইতে আর একটি এবং গিউহোর কাছ হইতে দুইটি সন্দেহজনক টাকা বাহির হইল। পুলিশ-কর্ম্মচারীর মুখ আরও গম্ভীর হইল। আমাদের নাম ধাম লিখিয়া লইয়া বলিলেন, "কলিকাতা থেকে মেকী টাকা চালাতে এয়েছ ভবানীপুর? ভারি বদমায়েস সব। টাকাগুলো কি নিজেরা তৈরি কর, না অন্যের হয়ে চালাও, ঠিক সত্যি কথা বল।" আমরা এ সমস্ত অমূলক অভিযোগের ঘোরতর প্রতিবাদ করিলে, কর্ম্মচারী সংক্ষেপে বলিলেন, "আচ্ছা আজ না বল, দুএকদিন পরে বলবে।" এই বলিয়াই আমাদিগকে হাজতে দিবার হুকুম দিলেন এবং একজন সহকারীকে মেকীটাকাগুলি অবিলম্বে টাঁকশালের ধাতু পরীক্ষকের (Assay-Master of the Mint) নিকট পরীক্ষার্থ পাঠাইতে বলিলেন।

সে রাত্রিটা অনাহারে ও অনিদ্রায় হাজতেই কাটিল। দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কায় আমার ও গঙ্গারামের প্রাণ ত অর্দ্ধেক উড়িয়া গিয়াছিল। গিউহোর কিন্তু চির-সম্প্রভিত ভাবের

কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। সে বলে দেশভ্রমণটা এতক্ষণে জমিতেছে ভাল। দুই একটা এড্‌ভেঞ্চর না থাকিলে, মধ্যে-মধ্যে আপদ বিপদ না ঘটিলে ভবিষ্যতে ভ্রমণকাহিনীতে লিখিবে কি? আমাদের কিন্তু সে সময় সাহিত্যিক যশোলাভের স্পৃহাটা সুদূরাপগত হইয়া, ভালয়-ভালয় মুক্তি লাভের জন্য অন্তরাত্মাটা খাবি খাইতেছিল।

পরদিবস বৈকালে পুলিসের বড়সাহেব থানায় আসিয়া আমাদের ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমরা অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলে, লোকে একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন জানোয়ারকে যে ভাবে দেখে, সেইভাবে কৌতূহলব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আমাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। তারপর জানাইলেন যে, আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ টাকাগুলি পরীক্ষায় খাঁটি বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে।*

বড় সাহেব বলিলেন "আর একটা কথা আছে। লোকে যদি একটা পয়সার বদলে একটা টাকা দেয়, তাহাতে সিদ্ধান্ত হয় যে, হয় টাকাটা খারাপ, নয় প্রদাতার মাথাটা খারাপ। টাকা ত খাঁটি বলিয়া জানা গেল। এখন তোমাদের মাথাগুলো একবার পুলিসের ডাক্তারের (Police Surgeon) কাছে পরীক্ষার জন্য পাঠান দরকার।"

কপালে আরও কি নিগ্রহ আছে ভাবিয়া আমতা-আমতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তাহলে কি আমাদের পুলিশসার্জ্জেনের কাছে আজ যেতে হবে?"

বড়সাহেব বলিলেন "মাথাগুলোই পাঠান প্রয়োজন, সঙ্গে যাওয়া না যাওয়া তোমাদের ইচ্ছা।"

তখন বুঝিলাম কথাটা রহস্য।

বড়সাহেব আবার বলিলেন "কিন্তু বাবু, তোমাদের কেসের রহস্য ত কিছুই বুঝতে পারলুম না। আমার বিশ বছরের পুলিসের কাজের মধ্যে ত এমন ব্যাপার কখন দেখিনি। দয়া করে আমায় কাণ্ডটা কি খুলে বলবে?"

গিউহো তখন অনর্গল ভাষায় আমাদের সুমহান উদ্দেশ্য, মানব-হিতার্থ জীবন পণ, নূতন দেশ আবিষ্কার, ইত্যাদি সমস্ত কথা সাহেবকে বুঝাইয়া বলিল। কিন্তু চিরদিন পুলিসের কাজ করিয়া আমাদের সে সব উচ্চভাবের কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা বোধ হয় তাঁহার ছিল না। তাই তিনি সকল কাহিনী শুনিয়া স্তম্ভিতভাবে দুই মিনিটকাল আমাদের মুখের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। তারপর আস্তে-আস্তে বলিলেন "রক্ষক সঙ্গে না দিয়ে এদের বাটীর বাহির হইতে দেওয়া কোন মতেই নিরাপদ নহে।" এবং হুকুম করিলেন, যেন তৎক্ষণাৎ গাড়ী ডাকাইয়া আমাদিগকে সরাসরি বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

১১। বাকীটুকু

সন্ধ্যার প্রাক্কালে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া তিন বন্ধুতে ঘরে ফিরিলাম।

গাড়ী হইতে নামিতেছি, এমন সময় পাড়ার ঠাকুরদাদার সহিত আবার সাক্ষাৎ। আমাদের ফিরিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হে, এর মধ্যেই ভূ-পর্য্যটন শেষ হয়ে গেল না কি! এই দু'তিন দিনের মধ্যেই দুনিয়াটা ঘোরা হয়ে গেল?"

অবিচলিত মুখে গিউহো বলিল "পৃথিবীর সব জায়গাগুলো হয়ে উঠলো না। এবারটা ভবানীপুর পর্য্যন্ত হ'ল। আসছে বারে বাকীটুকু সেরে ফেলা যাবে।"

বিস্ফারিত লোচনে ঠাকুরদাদা কহিলেন "বটে!"

---

* আমাদের এ ব্যাপারে বিস্ময়ের কথা কিছু নাই, কারণ পরে জানিয়াছিলাম যে এরূপ কেস পূর্ব্বে অনেক হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন ভদ্রলোক কোন পোষ্টাপিসে একটি সিকা টাকা লইয়া পোষ্টকার্ড কিনিতে গিয়াছিলেন। টাকাটি ভাল কি না, তৎসম্বন্ধে বলা হওয়ায় পোষ্ট বাবু ভদ্রলোকটিকে পুলিশে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বেচারার ২।৩ দিন হাজতে বাসের পর পরীক্ষায় স্থির হয় টাকাটি খাঁটি। আর একবার এক ভদ্রলোক ট্রামগাড়ীতে কাল টাকা দিয়া টিকিট কিনিতে গিয়া এইরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন।

ক্ষমা

[শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়]

(১)

মৃত্যুর বেদনা হৃদয়ে বহন করিয়া মণি কলিকাতার বাসায় আসিয়া খুড়ী-মাকে সকল কথা বলিলে, তিনি কাঁদিয়া তাহাকে আরও অস্থির করিয়া তুলিলেন। মণি কোন মতে মনকে বুঝাইতে পারিল না, লোকে কেমন করিয়া এত দূর নির্ম্মম হইতে পারে! যারা আত্মীয়ের দুঃসময়ে তাহাদের দুঃখ বেদনা এত অবহেলায় চক্ষে দেখিতে পারে, তাহাদিগকে স্বজন বলিয়া স্বীকার করিতেও তাহার মনে ধিক্কার আসিতেছিল।

নিজের স্ত্রীর উপর তাহার যে কোনই অধিকার নাই, ইহা ভাবিতেও দুঃসহ বেদনায় তাহার মন দগ্ধ হইতে লাগিল। মাতার মৃত্যু-শয্যায় সে স্ত্রীকে একটী-বারের জন্যও ত আনাইয়া দেখাইতে পারিল না। মনের কষ্টে বৃদ্ধার যখন শেষ বিদায়ের ডাক আসিল, তখন তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্রবধূকে প্রতি মুহূর্ত্তে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াও, যখন হতাশ হৃদয়ে শেষ দীর্ঘশ্বাসটুকু একটু জোরে ফেলিয়া, ঘন নিরাশার অন্ধকারে আপনাকে মিলাইয়া দিলেন, মণির মনটাও তখন—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পর নিকটবর্ত্তী স্থানের যে অবস্থা হয়, সেইরূপ আকার ধারণ করিল। তার সারা প্রাণটা যেন অনুতাপের আগুনে জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেল। শুধু শ্মশান-বন্ধুদিগকেই আজ তাহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয় বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

মণি দরিদ্রের সন্তান হইলেও, অদৃষ্টের বলে উইল-সূত্রে তাহার খুড়ী-মার পিতামহের সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়া, সহসা ধনীর স্তরে উন্নীত হইল। বহুদিনের দারিদ্র্যের জ্বালা একেবারে ভুলিয়া যাইবার জন্য, প্রলোভনের অগাধ সাগরে নিজেকে স্রোতের ফুলের মত ভাসাইয়া দিল, এবং অল্প দিনের মধ্যেই উচ্ছৃঙ্খলতার চরম সীমায় উপস্থিত হইল।

পুত্র খুড়ীমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেও, মাতা তাঁহার শ্বশুরের জীর্ণ অথচ গৌরবময় কুটীরখানাকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। যে পবিত্র ধূলির মধ্যে তাঁহার স্বামীর পিতৃ-পুরুষের শত স্মৃতি সঞ্চিত রহিয়াছে, সেই পবিত্র স্থানকে পৃথিবীর প্রধানতম পবিত্র তীর্থ মনে করিয়া, সতী লক্ষ্মী সেই ধূলির সহিত নিজের দেহ-খানিকেও মিশাইয়া দিলেন।

এ আঘাত মণির হৃদয়ের সমস্ত দুর্ব্বলতাকে চূর্ণ করিয়া, তাহাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে পবিত্রতার সুন্দর পথ দেখাইয়া দিল।

(২)

মণির শ্বশুর জমিদার। তিনি যে মণির সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, ইহাই তাঁহার পক্ষে দরিদ্রের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখান হইয়াছে। কন্যাকে দরিদ্র শ্বশুরের জীর্ণ কুটীরে পাঠাইলে যে তাঁর জমিদার-নামের কলঙ্ক হইবে—সবাই যে তাহা হইলে তাঁহাকে উপহাস করিবে! মণি, স্ত্রীকে কয়েকদিনের জন্য পাঠাইয়া দিতে তাঁহার শ্বশুরকে যথেষ্ট অনুরোধ করিল; এমন কি স্ত্রী আনিবার জন্য নিজেই শ্বশুরালয়ে গিয়া শ্বশুরকে কতই না অনুনয় করিল; কিন্তু তথাপি যখন তিনি মেয়েকে কয়েকদিনের জন্য শ্বশুরবাড়ী যাইতে অনুমতি দিলেন না, তখন মণির সমস্ত হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং অন্যায় দম্ভের প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

দুঃখিনী মাতার শ্মশান-চিতার তপ্ত আগুনে শ্বশুরবাড়ীর সকল সম্পর্ককে আহুতি দিয়া, মণি শূন্য হৃদয়ে কলিকাতায় খুড়ী-মার নিকট ফিরিয়া আসিল।

* * *

খুড়ীমা করুণাকে কলিকাতার বাসায় আনাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও যখন মণির সম্মতি পাইলেন না, তখন অগত্যা ছেলের আর একটী বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি ছেলেকে সর্ব্বদাই বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন,—"বৌয়ের বাপের অন্যায় হতে পারে, তা'বলে

কি করুণা সে ফল ভোগ করবে? না—তাকে আন্‌তে লোক পাঠিয়ে দি। কি বলিস্? তার ত আর কোন দোষ নেই!"

প্রত্যহ এ সকল যুক্তি শুনিয়া একদিন মণি বড়ই উত্তপ্ত হইয়া উত্তর দিল,—"খুড়ীমা, তুমি যা আমায় বুঝাচ্ছ, তা' অনেক পূর্ব্বেই আমি ভেবে রেখেছি। এসব কথা বলে আর আমায় জ্বালা দিও না। কেন?—তোমাদের হুকুমের চেয়েও কি তার বাপের হুকুম বেশী হল? কর্ত্তব্য-জ্ঞান কি তার আদৌ নেই? সে যদি আস্‌তেই চাইত, তার বাপ কি আর তাকে বাধা দিয়ে রাখতে পার্‌তো? এখন তাদের নাম শুন্‌লেও আমার গায়ে জ্বালা দিয়ে উঠে।"

ইহার পর আর মণিকে এ বিষয়ে কিছু বলিতে খুড়ীমার সাহস হইল না।

(৩)

কলিকাতার কোলাহলে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া মণি খুড়ী-মাকে লইয়া কিছুদিনের জন্য দেশ-ভ্রমণে বাহির হইল। অনেক জায়গা ঘুরিয়া, আজ মাসাবধি তাহারা গিরিডিতে আছে। খুড়ী-মার ইচ্ছা কিছুদিন এখানে বাস করেন; মণিরও তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না। সে রীতিমত এখানে তাহার ডাক্তারী ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

সে-দিন রাত্রিতে সবেমাত্র বন্ধুর বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ফিরিয়াছে, এমন সময় চাকর আসিয়া বলিল, "একটী ঝি এসে আপনাকে তাদের বাসায় এক রোগী দেখ্‌তে ডাক্‌ছে। তারা এখানে একেবারে নূতন—কাউকে চেনে না।" মণি তাড়াতাড়ি ঝির সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

রোগিনীর ঘরে যাইয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এ যে তারই করুণা—স্বামী-স্নেহ-বঞ্চিতা করুণা! বিধাতার এ কি পরিহাস! সে তার দুর্ব্বলতাকে কোন রকমে দমন করিয়া, তাড়াতাড়ি করুণাকে দেখিয়া, বাসায় আসিয়া খুড়ী-মাকে সমস্ত বিবরণ খুলিয়া বলিল।

করুণার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া খুড়ী-মা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিজেই যাইয়া করুণাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া আসিলেন, মণির সম্মতি লওয়ার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন না। মণি শুধু স্তম্ভিত হইয়া খুড়ী-মার এ সকল কার্য্য দেখিতেছিল।

করুণা এখন অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। স্বামী তাহাকে বিরক্তির চক্ষে দেখিলেও, সে যে বহু দিন পরে আবার স্বামীর কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে—প্রাণ ভরিয়া যে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে, এ আনন্দেই তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ।

সেদিন যখন খুড়ী-মা ও করুণা আলাপ করিতেছিলেন, এমন সময় একটা দমকা বাতাসের মত মণি সেখানে উপস্থিত হইয়া, তীব্র কণ্ঠে কহিল,—"খুড়ী-মা, এতদিন নির্ব্বাক্ হ'য়ে তোমার কাণ্ডগুলি দেখে আস্‌ছিলুম; কিন্তু আজ আর কিছু না বলে থাক্‌তে পার্‌লুম না। যে অপমানের ব্যথায় আমি ওদের সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করেছি, আজ কি না তুমিই সেই অপমানকে আদর করে ঘরে বরণ করে নিলে! তুমি শুধু নূতন করে আমার প্রাণে শ্মশান জ্বালিয়ে দাওনি—তুমি আমাদের বংশের পবিত্র বলে পর্য্যন্ত কালি ঢেলে দিলে! এ অপমান ভুলবার নয়—কখনই না। তুমি ভেবেছ, সম্পত্তির লোভে আমি এ অপমান অকাতরে সহ্য করে যাব? না—আমার প্রাণ থাক্‌তে তা' হবে না। এক বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এম্‌নি দিনে আমার দুঃখিনী মা বুকভরা বেদনা নিয়ে দূরে—অনেক দূরে চলে গেছেন; আজ ঠিক সেই দিনে তাঁর দুঃখী পুত্র চিরদিনের সঞ্চিত বেদনার বোঝা নিয়ে তোমাদের সকলের আড়ালে চলল। দেখি, এই নিখিল বিশ্বে আমার মত নিরাশ্রয়ের একটু ঠাঁই হয় কি না!" উন্মাদের মত চঞ্চল পদে মণি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

(৪)

করুণার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মণি আবার ফিরিয়া আসিবে; কিন্তু দীর্ঘ একটী বৎসরের মধ্যেও তাহার কোন খোঁজ-খবর না পাওয়ায়, করুণার সমস্ত আশা-ভরসা চিরদিনের জন্য অন্ধকারের অতল সাগরে ডুবিয়া গেল—কোথাও যেন সে একটু আশার আলোক খুঁজিয়া পাইল না। কলিকাতার কোলাহলে তার নীরব প্রাণটা এতই বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল যে, এ স্থানের ছায়াও যেন তাহার নিকট বিষাক্ত বলিয়া মনে হইল। এ ব্যথা আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া, সে খুড়ী-মাকে বলিল,—"চল খুড়ী-মা, এ গোলমাল

ছেড়ে পল্লীর নীরবতায় চলিয়া যাই। সে স্থানই আমার স্বর্গ; যে কয়দিন বাঁচি সেখানেই থাকব।" করুণার বুকে যে কি দুষানল জ্বলিতেছে, তাহা খুড়ী-মা তাঁহার নিজের হৃদয়ের জ্বালা দিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি কোন আপত্তি না করিয়া, কলিকাতার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া, করুণাকে লইয়া তাঁহাদের পল্লীর সেই নিভৃত জীর্ণ কুটীরে আশ্রয় লইলেন। এখানেও করুণা তার হৃদয়ের জ্বালা ভুলিতে পারিল না। দীর্ঘকাল যাতনা ভোগ করিয়া, স্বামী-স্নেহবঞ্চিতা করুণা অবশেষে নিতান্ত পীড়িতা হইয়া শয্যা গ্রহণ করিল। চিকিৎসক নাই—ঔষধ নাই। শেষ-কালে কি বিনা চিকিৎসায় করুণা মারা যাইবে? ইহা ভাবিয়া খুড়ী-মা বড়ই অস্থির হইয়া উঠিলেন। কিন্তু করুণা কিছুতেই তার স্বামীর কুটীর, সেই দেবনিকেতন ছাড়িয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় যাইতে স্বীকৃত হইল না।

(৫)

বহু স্থানে ঘুরিয়াও যখন মণি কোথাও এক বিন্দু শান্তি পাইল না, তখন আবার পল্লীর সেই জীর্ণ কুটীরেই ফিরিয়া যাইবার জন্য মন আকুল হইয়া উঠিল।

মলিন-বদন, রুক্ষ-কেশ ও একরাশি দুঃখের স্মৃতি লইয়া, সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল—একবার স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই যে, এ নিদারুণ দৃশ্য তাহাকে একদিন দেখিতে হইবে!

নিশ্চল দেহে জীর্ণ শীর্ণ করুণা পড়িয়া রহিয়াছে; এবং তাহারই পাশে শোকাতুরা খুড়ী-মা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছেন।

উন্মাদের মত মণি করুণার সেই মৃতপ্রায় দেহটাকে আবেগের সহিত জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"করুণা,—করুণা—তবে তুমিও চল্লে?"

করুণা বহুদিন পরে সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর, সেই বড় আদরের, বড় সোহাগের 'করুণা' সম্বোধন শুনিয়া স্নেহের সমস্ত শক্তি নয়নে কেন্দ্রীভূত করিয়া একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল "ক্ষমা—" আর একটীও কথা বলিতে পারিল না—তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়া গেল। মণি করুণার দিকে চাহিয়া পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

পূজার ছুটী

[শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায়, বি-এল্]

আমার ফ্রান্সের সকলই ভাল লাগে—কেবল এই বৃষ্টিছাড়া বৃষ্টি বড়ই বিরক্ত করিয়া তুলে। আকাশ সূর্য্যহীন, চারিদিকে অন্ধকার—আর বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি! মনটাকে যে সজাগ করিয়া, প্রখর করিয়া রাখিব, তাহা পারি না। কাল সমস্ত দিন, সমস্ত রাত্রির মধ্যে এক মুহূর্ত্ত বৃষ্টির বিরাম যায় নাই। তবে আমাদের ট্রেঞ্চের নীচে আর এখন জল দাঁড়ায় না—জলপ্রণালী বেশ পরিষ্কার এবং জলপ্রবাহ অব্যাহত।

আজ সকাল থেকে আকাশ কতকটা পরিষ্কার গিয়াছে—অল্প অল্প বৃষ্টি সে ত আছেই। আজ আমাদের অনেক-গুলি সৈন্যের ছুটী ছিল; আমি, বসন্ত, রূপেন ও বিক্রম, আর কতকগুলি ফরাসী সৈন্য রোঁয়া (Rouen) বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে বাঙ্গালী কেরাণীদের আফিস আছে; ইংরেজ সেনাদের হাসপাতাল আছে; ফরাসী সেনাদের, ক্যানেডিয়ান সৈন্যদের এবং ভারতবর্ষীয় সৈন্যদেরও হাস-পাতাল আছে। সহরটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—সীন নদীর উপরে—দোকান-পশার অনেক আছে,—অনেক গৃহস্থের বাটী আছে। ট্রামে সৈন্যদের ভাড়া কিছু কম। মধ্যে-মধ্যে ট্রামে গিয়া নদীর ধারে বেড়াইয়া আসিতাম। আজ ট্রামে গিয়া আমাদের পরিচিত একটী দোকানে প্রবেশ করিলাম। রাস্তায়, ঘরে, ট্রামে স্ত্রীলোকেরই জনতা; পুরুষ প্রায় সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে! দোকানে দোকানের কর্ত্রী ছিলেন। তাঁহার অবস্থা বেশ ভাল। কিন্তু তিনি কালো পোষাক পরিহিতা—তাঁহার স্বামী যুদ্ধে জীবন দান করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র সন্তান একটী নয় বৎসরের বালিকা—ঘৃত গোলাপের মত সুন্দর—তাহারও কালো পোষাক। মেয়েটি বসন্তর প্রিয়

পাত্রী—মেরীও বসন্তকে দেখিলে বড় খুসী হয়। আমরা দোকানে প্রবেশ করিলে চা, বিস্কুট, কেক প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে লাগিল। মেরী একটী গোলাপ ফুল আনিয়া বসন্তকে দিল এবং তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—"মহাশয়, ফুলটি কেমন?" "তোমার মত সুন্দর।" বলিয়া বসন্ত মেরীর মাথায় সোণালি কেশরাশি দোলাইয়া দিল এবং মেরীর জন্ত যে একটী ছোট বন্দুক ও বাঁশী কিনিয়া আনিয়াছিল, তাহা পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহাকে দিল। মেরী বন্দুক ও বাঁশী লইয়া দৌড়াইয়া তাহার মাতার নিকট গেল। মেরীর মাতা এমন সহজ সুন্দরভাবে তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন যে, তাহা কেবল ফরাসী রমণীর পক্ষেই সম্ভব। মেরীর মাতা মেরীকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া, যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"এ কাল যুদ্ধ আর কতদিন চলিবে?"

বসন্ত। "আর বেশী দিন নহে - তবে নেহাৎ কম দিনও নহে। তবে এখন হইতে প্রত্যহই জার্ম্মাণীর পরাজয়ের কথা শুনিতে পাইবেন।"

মেরী সহসা তাহার ছোট বন্দুকটি বন্দুক ছুড়িবার ভাবে ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি এইবার জার্ম্মাণীকে বিনাশ করিব।" সকলেই হাসিয়া উঠিল।

বসন্ত মেরীকে ডাকিল—বলিল, "এস, আমার কাছে এস।"

মেরী। কেন?

বসন্ত। আমি তোমাকে ভালবাসি যে।

মেরী। তুমি আমার ফ্রান্সকে ভালবাস না?

মেরীর মা। তা ভালবাসেন না! তা না হলে অতদূর ভারতবর্ষ থেকে ফ্রান্সের জন্ত জীবন পণে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন?

মেরী তখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশ্নের গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল; বসন্ত ও আমি যথাসাধ্য তাহার উত্তর দিতে লাগিলাম। তাহার পর মেরী আবার বসন্তকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ভারতবর্ষে তোমার কে আছে? তোমার মেয়ে আছে? তোমার স্ত্রী আছেন? তোমার মা আছেন?"

মেরীর মাতাও এই প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্ত উৎসুক হইলেন।

বসন্ত। আমার একটী মেয়ে আছে। সে তোমারি বয়সের, তোমারই মত সুন্দর; তবে তার চোখ ও চুল কালো।

মেরী। তার কি নাম মেরী?

বসন্ত। না, তার নাম মেরী নয়—তার নাম মেহলতা।

মেরী সেই নাম উচ্চারণ করিবার অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই পারিল না। সে হাসিয়া অস্থির! অমন একটা নাম কোন সুন্দর মেয়ের হইতে পারে—সে তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না।

মেরীর মাতা। আপনার মাতা আছেন কি?

বসন্ত। হাঁ, আমার মাতা আছেন; কিন্তু আমার স্ত্রী নাই—আমার কন্যাটিকে দুই বৎসরের রাখিয়া মারা গিয়াছে; সে আজ সাত বৎসর হইল।

মেরীর মাতা। আপনি আর বিবাহ করেন নাই?

বসন্ত। না।

মেরীর মাতা। সে কি রকম? আপনারা শুনিতে পাই, এক স্ত্রী জীবিত থাকিতেই ৫।৭।১০টা বিবাহ করেন; স্ত্রী মরিয়া গেলেও বিবাহ করেন নাই, কিরূপ বুঝিতে পারিতেছি না।

বসন্ত। আমরা যে মানুষ, সে কথা আপনাদিগকে বুঝাইবার কোন প্রয়োজন কেহ আজ পর্য্যন্ত অনুভব করে নাই। ভারতবর্ষীয়েরা অশিক্ষিত, কাপুরুষ, আত্মরক্ষায় অসমর্থ পশুবিশেষ—এই কথাই য়ুরোপে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু আমরা যে সত্য-সত্যই পশু নহি—আমরা যে মানুষ, তাহা কি আমার এই টুপী ফ্রান্সকে বলিবে না?"

বসন্তর গলার স্বর একটু উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কথা শুনিতে-শুনিতে মেরী তাহার মাতার নিকট হইতে অজ্ঞাতসারে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আমাদের অপর বন্ধুগণ একটু দূরে তাস খেলিতেছিলেন; তাঁহারাও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা সকলেই সহরের অপর স্থানে বেড়াইবার জন্ত উঠিলেন, বসন্তও উঠিল; কিন্তু মেরী তাহাকে যাইতে দিবে না,—তাহার নিকট ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ তাহার মেয়ের আরও অনেক কথা শুনিবে। আমি বলিলাম যে, আমাদের ত এইখান হইতেই ট্রামে উঠিতে হইবে—আমরা ফিরিয়া ট্রামে উঠিবার সময় বসন্তকে ডাকিয়া লইব;

এই বলিয়া বসন্তকে সেইখানে রাখিয়া আমরা সহরে বাহির হইলাম।

সহরে গিয়া বায়স্কোপ দেখিলাম। যদিও রমণী দর্শকই প্রায় ষোলআনা, তথাপি এরূপ কুৎসিত ছবি কিরূপে দেখায়, বুঝিতে পারিলাম না। লড়ায়ের কয়েকটী ছবি দেখাইল। একটি দৃশ্যে ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট ও ইংলণ্ডের রাজা shake-hand করিতেছেন; দেখিয়া আমরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপী খুলিলাম।

বেড়াইয়া ফিরিবার সময় আমি দোকানে প্রবেশ করিলাম। দেখি যে, মেরীকে বসন্ত কোলে লইয়াছে; মেরীর মাথাটি বসন্তর বুকের ভিতর—মেরী নিদ্রালু। বসন্ত জীবনের সুখ দুঃখের কথা, স্ত্রীর ভালবাসার কথা বলিতেছে—মেরীর মাতা সমস্ত প্রাণ দিয়া সকল কথা শুনিতেছেন। দুজনেরই চক্ষু ছলছল। বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে—বৃষ্টিরও বিরাম নাই।

বসন্ত মেরীকে আদর করিয়া ডাকিল। মেরী উঠিয়াই বলিল, "তোমাকে যাইতে দিব না।"

বসন্ত "আমি সৈন্য—ফ্রান্সের সৈন্য।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমরা বাহির হইলাম। সঙ্গে-সঙ্গে মেরী ও তাহার মাতা, যেখানে আমাদিগকে ট্রামে উঠিতে হইবে সেই পর্য্যন্ত আসিলেন।

"আবার কবে আসিবে?" মেরীর এই প্রশ্ন পুনঃ-পুনঃ শুনিতে পাওয়া গেল। মেরীর মাতা নীরবে আসিতেছিলেন। ট্রামে উঠিবার সময় আসিলে, তিনি বসন্তকে বলিলেন, "ছুটী হইলেই আসিতে ভুলিবেন না।"—আমাদিগকে বলিলেন, "আপনারাও দয়া করিয়া আসিবেন।" ট্রাম হইতে যতক্ষণ দেখা যায় দেখিলাম, মেরী ও তাহার মাতা সেইখানে দাঁড়াইয়া।

ট্রেঞ্চে যখন পৌঁছিলাম, তখন প্রায় রাত্রি ৮টা। বুঝিলাম, আগামী কল্য আমাদের আরও কিছু অগ্রসর হইতে হইবে। স্রোত সত্য-সত্যই ফিরিয়াছে। রাত দশটা বাজিয়াছে—আজ এই পর্য্যন্ত।

২৪এ জুলাই।—কাল যখন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছি, তখন কিছুকাল বাঁচিব। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা।

সকালে আমার চা খাওয়া হইয়াছে, এমন সময় বসন্ত ও রুসো নামক জনৈক ফরাসী সৈন্য আমার নিকট উপস্থিত।

আমি। কিগো, লড়ায়ে বড় সুখ না কি?

বসন্ত। তা নয়? এমন সুখ—এমন তীব্র সুখ জীবনে আর কিছুতেই নাই।

রুসো। যদিও তোমাদের ফরাসী ভাষার উচ্চারণ ইংরেজদের চেয়ে ভাল, তথাপি আমি বলিতে বাধ্য যে, বসন্তর সকল বিষয়ে একটু বাড়াবাড়ি আছে। যুদ্ধে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের একটা সুখ আছে নিশ্চয়; কিন্তু একটা ভয়ানক আনন্দ—নীচে এই ট্রেঞ্চ আর উপরে শেল—মাঝখানে বুকের মধ্যে অত আনন্দ হয় কি?

আমি। আমার ত আনন্দের চেয়ে বেদনাটা, শুধু বুকে কেন, সর্ব্বাঙ্গেই বেশী বোধ হচ্ছে।

বসন্ত। রুসো, তুমি অবনীর কথা শুনো না—ও যা বুকে অনুভব করে, তা মুখে কিছুতেই বলিবে না। দেখ ভাই, আমাদের যে সুখ, যে আনন্দ, তাহা কেহই মুখে প্রকাশ করিতে পারে না। আমাদের শুধু কর্ত্তব্যের আনন্দ নয়—আমাদের একটা মুক্তির আনন্দ আছে। আমরা অনেক দিন চিড়িয়াখানার মধ্যে খাচায় বাঁধা ছিলাম; আজ মুক্তি পাইয়াছি—মানুষের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি—মরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। প্রত্যেক কণ্ঠে আনন্দ পাই—প্রত্যেক মরিবার সুবিধায় যেন স্বর্গের দুন্দুভি-নিনাদ শুনিতে পাই।

রুসো। তোমাদের দেশে কল্পনার গতি বড়ই প্রখর। তোমাদের দেশ দার্শনিকের দেশ। লড়াই শেষ হলে আমি নিশ্চয় ভারতবর্ষে যাব। তোমাদের অমন সুন্দর দেশ আমার বড়ই দেখ্‌তে ইচ্ছা করে।

বসন্ত। আমার দেশের মত সুন্দর দেশ পৃথিবীতে আর নাই; এমন দেশে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি বলে আমাদের মনে গর্ব্বের সঞ্চার হয়।

বসন্ত যেন কি বলিতে যাইতেছিল; আমি তাহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিলাম। তখন রুসো তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা লড়াই করিতে আসিয়াছ কেন, ঠিক বুঝিতে পারি না।"

বসন্ত। কেন লড়াই করিতে আসিয়াছি শুনিবে?

যদি একজন বাঙ্গালীর একবিন্দু রক্ত বৃটীশরাজের গৌরব-প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে, সেই রক্ত-বিন্দু বৃথা যাইবে না—এই ভরসায়।

আমি। বসন্ত, বাড়ীর কোনও চিঠি পেয়েছ?

বসন্ত। হাঁ, ভাল কথা—তোমাকে সেই চিঠি দেখাইবার জন্যই আসিয়াছি।

বসন্ত পকেট হইতে চিঠি বাহির করিয়া দিল—আমি পড়িলাম।

শ্রীশ্রীদুর্গার চরণে

সহায়।

"বাবা, তুমি কত দিন গ্যাছো, এখনও এলে না। আমার মোন কামন করে। আচ্ছা, ঠাকুমা অত কাঁদে কানো? তুমি কবে আসবে? পূজোর ছুটি হলেই তোমাকে আসতে হবে—একটী দিন দেরী হলে আমি শুনবো না। আসবার সোময় আমার জন্ত ওখান থেকে ঢাকার শাড়ি আনবে, আনবে আনবে—তিন সত্যি। বাবা বেশী লিখিতে পারিনি তবে আসি।

স্নেহ

বসন্ত আমার নিকট হইতে পত্রখানি লইয়া আবার পড়িল—চক্ষু আর চিঠি হইতে ফিরিতে চাহে না।

রুসো। এ কার চিঠি গো—প্রেমময়ীর প্রেমলিপি বুঝি?

বসন্ত। গাধা—এ চিঠি আমার মেয়ের।

রুসো। আমাকে ক্ষমা কর—দেখি চিঠিখানি।

রুসো হাতে করিয়া চিঠিখানি লইয়া দেখিল; জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাতে কি আছে?"

বসন্ত। ইহাতে কি আছে, তোমাকে কি করিয়া বুঝাইব? তোমার মা নাই, তুমি বিবাহ কর নাই—তোমার জীবন কত আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ—তুমি বাঙ্গালী-হৃদয়ের সুখ দুঃখ কি বুঝিবে? এই নয় বৎসরের বালিকার এই কয় ছত্র পত্রের মধ্যে বাঙ্গালী-জীবনের সকল সুখ-দুঃখের কথা লেখা আছে।

রুসো। চিঠিখানি আমাকে অনুবাদ করে শুনাও।

বসন্ত। এর অনুবাদ হয় না। আমার মা—বাঙ্গালীর মা কেমন, তা অনুবাদ করে বুঝান যায় না। সেই মা তার একমাত্র পুত্রকে মৃত্যু-সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে কেমন করে দিন কাটায়, তার অনুবাদ হয় না। আমার মা-মরা মেয়ে—আমার জীবন-সর্ব্বস্বের স্মৃতিচিহ্ন, আমার দিনের আলো, রাত্রির সুষুপ্তি, চিন্তার সার, জীবনের অবলম্বন, আমার বুকের পাঁজর—আমি কি করিয়া, কোন্ ভাষায় তাহা তোমাকে বুঝাইব? কিন্তু এ সকল বুঝাইলেও, আমার পূজা তোমাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিব না। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত, অন্নবস্ত্রাভাবে ম্রিয়মান, রোগে শোকে জর্জ্জর আমার হতভাগ্য বাঙ্গালার বৎসরে এমন তিনটী দিন আসে যে, বাঙ্গালী তাহার সকল দুঃখ ভুলিয়া যায়। বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে এমন আনন্দ-স্রোত উচ্ছলিত হইয়া উঠে যে, তাহাতে সমগ্র ফ্রান্স দেশ ভাসাইয়া দিতে পারে। সেই "পূজার ছুটীর" মধ্যে যে কবিতা আছে, ফরাসী-সাহিত্য-রত্নাকরের সমুদয় রত্ন একত্র করিলেও তাহার তুলনা হয় না। পূজার ছুটীর মধ্যে যে মাতৃ-স্নেহ, দাম্পত্য-প্রেম, অপত্য-বাৎসল্য, বন্ধুতা নিহিত আছে—সারা বৎসরের হৃদয়ের অন্তস্তলের যে আশা, নিরাশা, ভয়, সন্দেহ, সুখ-দুঃখের ছবি আঁকা আছে, তাহা পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যাইবে না,—তাহার অনুবাদ কি করিয়া করিব রুসো?

বসন্ত চিঠিখানি আবার পড়িতে লাগিল। হঠাৎ ভেরী বাজিয়া উঠিল;—মুহূর্ত্ত মধ্যে আমরা ট্রেঞ্চের মধ্যে আপন-আপন স্থান অধিকার করিলাম। দূরবীণধারীরা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, অল্পসংখ্যক জার্ম্মাণ সৈন্য—১০।১২ জন হইবে, একটী প্রকাণ্ড নল লইয়া আমাদের দিকে আসিতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য এই যে, আমাদিগের উপর তরল অনল-স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিবে। তাহাদের ঐ উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য আমাদের মধ্যে কুড়ি জনের উপর আদেশ হইল। কুড়ি জনের মধ্যে ১৭ জন ফরাসী সৈন্য আর বসন্ত, বিক্রম ও আমি। আমরা "বন্দে মাতরম্" বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি, তাহা যুদ্ধক্ষেত্রে উচ্চারিত না হইলে ঠিক বুঝা যায় না। বসন্তর মুখে যখন "বন্দে মাতরম্" শুনি, তখন প্রাণের মধ্যে কি উৎসাহ, কি তেজ, কি আশা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? জীবন মরণ খেলার সামগ্রী কি না, তাহাও ভাবিবার অবসর পাই না,—জীবন বলি দিবার গরিমায় আপাদমস্তক আভান্বিত হইয়া উঠে। "বন্দে মাতরম্" বলিয়া আমরা বাহির হইলাম। কোথাও উচ্চ,

কোথাও নিম্ন, কোথাও জল-স্রোত, কোন স্থানে জঙ্গল—আমরা চলিয়াছি। দূরবীণ দিয়া শত্রুপক্ষের গতি লক্ষ্য করিতেছি, আর অগ্রসর হইতেছি। কিছুক্ষণ পরে আমরা শত্রুপক্ষের দৃষ্টিগোচর হইলাম। একটী শেল আমাদের নিকট আসিয়া পড়িল,—কিন্তু তাহা কাহারও কিছু ক্ষতি করিল না। আমরা যথাসম্ভব আত্মগোপন করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু, আমরা যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছি, ততই গুলির সংখ্যা অধিক হইতে লাগিল। ক্রমে যখন নলবাহী জার্ম্মাণ সৈন্য ও আমরা পরস্পরের সম্মুখীন হইলাম, তখন নলটী মাটীতে রাখিয়া জার্ম্মাণগণ বন্দুক লইয়া আমাদের সহিত সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হইল। আমরাও বন্দুক চালাইতে লাগিলাম। ক্রমে আমাদের মধ্যে ৫ জন একেবারে জীবন ত্যাগ করিল, ৫।৬ জন আহত হইল। আমিও আমার দক্ষিণ পায়ে হাঁটুর একটু উপরে এমন আঘাত পাইলাম যে, আমার পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইল। আমি অতি কষ্টে একটু উচ্চ ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইলাম। দেখি, জার্ম্মাণদের মধ্যে কেবল তিন জন ব্যক্তি অতি ভীষণ ভাবে সংগ্রাম করিতেছে—অবশিষ্ট হত বা আহত হইয়াছে। আমাদের মধ্যে বসন্তকে দেখিতে পাইলাম না। আমার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। দেখি, উভয় পক্ষের গোলাগুলি নিঃশেষিত হইয়াছে। বিক্রম ও পাঁচজন ফরাসী সৈন্য এক দিকে ও তিনজন জার্ম্মাণ সৈন্য অপর দিকে তরবারি হস্তে অগ্রসর হইতেছে। এমন সময়ে দেখি যে, দূর হইতে অপর এক-জন জার্ম্মাণ সৈন্য বিকট চীৎকার করিয়া, রিভলভার হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতেছে। বড়ই আশঙ্কা হইল। কিন্তু, হঠাৎ সেই লোকটী অলক্ষিত কোনও বাক্তির বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া পড়িয়া গেল। তিনজন জার্ম্মাণ সৈন্য ও আমাদের সৈন্যরা পরস্পর তরবারী চালনা করিতেছে। এমন সময় বন্দুক হস্তে "বন্দে মাতরম্" বলিয়া বসন্ত সেখানে উপস্থিত। তাহার গুলির আঘাতে জার্ম্মাণ সৈনা-দ্বয় ধরাশায়ী হইল। আমাদের উল্লাসের অবধি রহিল না। বসন্ত, বিক্রম ও অপর সকল সৈনাগণ নলটীকে ফিরাইয়া লইয়া জার্ম্মাণ ট্রেঞ্চ অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমাদের পশ্চাতে বিপুল ফরাসী ও বেলজ্ সৈন্য-বাহিনী উপস্থিত। মহা উল্লাসে সকলে অগ্রসর হইতে লাগিল। তরল অনলবাহী নলটী যে সকল সৈন্য ধরিয়াছিল, বসন্ত তাহাদের সকলের অগ্রবর্ত্তী ছিল। হঠাৎ নলটী ছাড়িয়া বসন্ত দাঁড়াইয়া পড়িল; তার পর মূর্চ্ছিতের ন্যায় পড়িয়া গেল। সৈন্যবাহিনী অগ্রগামী হইতে লাগিল; কিন্তু বসন্ত, আমি ও অন্যান্য আহত সৈনিক রোঁয়া হাসপাতালে আনীত হইলাম।

রাত্রি আটটার সময় বসন্তর প্রথম সংজ্ঞা লাভ হইল। বসন্ত আমার মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা কোথায়?"

আমি। হাসপাতালে।

বসন্ত। নিজেদের না শত্রুদের?

আমি। নিজেদের।

বসন্ত। তবে শত্রুদের হাসপাতালে কিরূপ বন্দ, কিরূপ চিকিৎসা হয়, তাহা দেখিবার সুযোগ পাইলাম [redacted]

আমি। নিরাশ হও কেন? বরাতে থাকিলে এক দিন দেখিতে পাইবে। আচ্ছা, তোমার কি হইয়াছে বল দেখি।

বসন্ত। তাহা ত ঠিক জানি না। নলটী হাতে করিয়া যাইতেছি, এমন সময় মনে হইল, আগুনের একটা দমকা হাওয়া আমাকে পুড়াইয়া ফেলিল—অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। তার পর এই জ্ঞান হইয়াছে। কিন্তু আমার বড়ই ঘুম পাইতেছে।

বসন্ত একটু পথ্য ও ঔষধ সেবন করিয়া পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িল।

২৫এ জুলাই।—আজ সকালে উঠিয়া দেখি, আমার ক্ষত স্থানের বেদনা অনেক কমিয়াছে।

অনেক বেলায় বসন্তর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহার যেন নিদ্রায় ও অজ্ঞানতায় কেমন একটা অড়ান ভাব। মাঝে-মাঝে চক্ষু মেলিতেছে—আবার চক্ষু মুদিয়া ঘুমাইয়া পড়িতেছে। কথার মধ্যে কেবল চারিটী—"মা" "স্নেহ" "মেরী" ও "বন্দেমাতরম্"। আজ কাহাকেও চিনিতে পারিতেছে না, বা কাহারও কথার জবাব দিতেছে না। বড়ই ভয় করিতেছে। হাসপাতাল হইতে মেরীর বাটী খুব বেশী দূর নহে। তাহাদিগকে সংবাদ দিয়াছিলাম। অপরাহ্ণ ৫টার সময় মেরীকে লইয়া তাহার মাতা উপস্থিত হইলেন। মেরীর মাতা ও মেরী বসন্তর ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া যে কিরূপ শোকাচ্ছন্ন হইলেন, তাহা বর্ণনাতীত। বসন্তর মাথার

নিকট মেরীর মাতা জানু দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া উর্দ্ধনেত্রে বসন্তের আরোগ্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মেরীও তাঁহারই পাশে সেইরূপে প্রার্থনা করিতে লাগিল। সে ছবি আমি ইহজীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। বসন্তর সেবার ভার মেরীর মাতা নিজহস্তে লইলেন—যেন তাহাতে তাঁহার অবাধ অধিকার। মেরী আজ বড় শান্ত মেয়ে—এদিক-ওদিক চাহিতেছে, আর আসিয়া বসন্তর মুখের দিকে তাকাইয়া, অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেছে।

২৬এ জুলাই।—রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই। ভোর বেলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম; ৯টার পর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে।

বসন্তর কাছে গিয়া দেখি—আঃ বাঁচিলাম! বেশ জ্ঞান হইয়াছে।...সম্মুখে চেয়ারে মেরীর মাতা। মেরী বসন্তর খাটেই বসিয়া। মেরীর কথার স্রোত বহিতেছে। আমাকে দেখিতে পাইয়াই বসন্তর মুখে একটী হাসি ভাসিয়া উঠিল।

বসন্ত। তোমার কি ঘুম ভাঙ্গে না? আমার স্বপ্নটি বলিবার জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু তোমাকে না পাইলে বলা হইতে পারে না বলিয়া, এতক্ষণ বলি নাই।

তার পর বসন্ত তাহার স্বপ্নের কথা বলিতে লাগিল,—"পূজার ছুটীতে চন্দননগর হইতে দেশে চলিয়াছি। বেশ চাকা জেলায়—নৌকায় যাইতেছি। শরতের আকাশ—নীল আকাশে সাদা-সাদা মেঘ। নদীর জল ছলছল, কলকল করিয়া চলিয়াছে। দুইধারে যতদূর আঁখি যায়, সবুজ ধানের ক্ষেত—সৌন্দর্য্যের শেষ সীমা দেখাইতেছে। নদীর ধারে ঘাটে ঘাটে আমার দেশের নরনারী—দারিদ্র্যের, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি। কোথাও ক্রীড়াচঞ্চল বালক-বালিকা, কোথাও রূপার পৈছা হাতে, কলসী কাঁকে কৃষকবনিতা, কোথাও বা বৃক্ষতলে যুবকের দল। নৌকা চলিয়াছে। প্রভাতে সূর্য্যোদয়, সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্ত, রাত্রে শারদ-জ্যোৎস্না-বন্যায় প্লাবিত পৃথিবী—কি সুন্দর! কি সুন্দর শীতল মলয়ানিল! কি সুন্দর আমার সোণার বাঙ্গালা! কি সুন্দর আমার মা—আমার সুফলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা, শস্ত শ্যামলা মা! 'বন্দে মাতরম্'!"

আমি। দেখ, তুমি এখন আর অতো বোকো না। তুমি এখন বড় দুর্ব্বল।

বসন্ত। শোনো, তার পর শোনো—সংক্ষেপ করে বলি। বাড়ী পৌঁছিলাম। বাড়ীতে পূজার হট্টগোল। যেন পৃথিবীর সকল আনন্দ পলাইয়া আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে। সকলের মুখে হাসি, সকলেরই আনন্দ। যেন গৃহপালিত পশুপক্ষীগুলি, এমন কি বাগানের গাছ-গুলিরও আনন্দ ধরে না। গ্রামের সকলেই আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত; ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধোপা, নাপিত, কুম্ভকার স্বর্ণকার, নমঃশূদ্র, মুসলমানেরা পর্য্যন্ত উপস্থিত। সকলেই পূজার আনন্দে বিভোর—নূতন কাপড় পরা, নূতন আনন্দে পরিপূর্ণ! আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে নাটমন্দির। চণ্ডীমণ্ডপে আমার মাতা, আমার স্ত্রী—তাঁর নাম ইন্দিরা—বসিয়া সেখান হইতে বালকবালিকাদিগকে মিষ্টান্ন দিতেছেন। নাটমন্দিরে বালকবালিকার মেলা—আনন্দ-উৎসব। সেখানে স্নেহ আর মেরী যেন হাত-ধরাধরি করিয়া নাচিতেছে—মেরীর মাতাও নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া। ইন্দিরা মেরীর মাতাকে চণ্ডীমণ্ডপে যাইবার জন্ত ডাকিলেন। মেরীর মাতা আনন্দে অধীর হইয়া দ্রুতপদে সেখানে যাইতেছিলেন—আমার মাতা সহসা তারস্বরে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন; বলিলেন, 'এখানে ঠাকুর, এখানে কি আসিতে আছে?' মেরীর মাতা ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি মেরীর মাতার ম্লান মুখ দেখিয়া, দ্রুতপদে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে যাইতেছিলাম—হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলাম। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, মেরীর মাতা সত্য-সত্যই ম্লান মুখে বসিয়া আছেন—সমস্ত রাত্রি ঘুমান নাই।

আমি মেরীর মাতাকে বলিলাম—"আপনার এ স্নেহ-ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না।"

মেরীর মাতা। কি বলেন আপনারা! আপনারা আমাদের ফ্রান্সের জন্ত যাহা করিতেছেন, তাহা ফ্রান্স কখনও ভুলিবে না। আচ্ছা! আমরা কি আপনাদের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি না? আপনাদের দেশে গেলে, আমরা কি আপনাদের ঘরের বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়াইব?

বসন্ত। দেখ বোন্, আমি এই কথাটাই নিজে ভাল করিয়া বুঝিতে চাই, ও পৃথিবীর সকলকে বুঝাইতে চাই যে, মানুষ সর্ব্বত্রই মানুষ। মানুষের মধ্যে অসংখ্য গণ্ডী করিয়া কেবল ভেদ-বিস্তার আমার ভাল লাগে না।

মেরীর মাতা। মানুষে মানুষে প্রভেদ এক তোমাদের দেশেই 'জাতিভেদ' করিয়া প্রবল রাখিয়াছ।

বসন্ত। মিথ্যা কথা। আমাদের দেশের জাতিভেদ একটা গণ্ডী সৃষ্টি করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে অন্তরের ভেদ তত নাই। কিন্তু অর্থে ও অহঙ্কারে যে জাতিভেদ সৃষ্টি করে, তাহার প্রখরতা বড় অধিক। ভারতবর্ষে রাজার জাতি আর বিজিতের জাতি বলিয়া যে দুইটী জাতি আছে, তাহাদের মধ্যে যে কিরূপ প্রভেদ, তাহা তুমি কল্পনা করিতে পারিবে না বোন্।

বসন্ত তাহার পর আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আর দেখ ভাই, আমাদের দেশে যাহারা জ্ঞানে, অর্থে শক্তিসম্পন্ন, তাহারা একটা জাতি—আর বিজন পল্লীর রোগে শোকে কাতর নরনারী আর একটা জাতি। আমরা যদি সব ভাই-ভাই ইহা ভাল করিয়া বুঝিতাম, তাহা হইলে দেশের এমন দশা হইত না।

বসন্তর কথা শেষ না হইতেই ডাক্তার আসিলেন। তিনি বসন্তকে বেশী কথা বলিতে নিষেধ করিলেন। হঠাৎ একটা আগুনের উত্তাপ লাগিয়া, বসন্তর দেহের সকল যন্ত্রই বিশেষতঃ হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিশেষ দুর্ব্বল হইয়াছে। বিশ্রাম এবং বলকারক পথ্য ও ঔষধ প্রয়োজন। মেরীর মাতার স্নেহ যত্নে রোগী আশার অতীত সুস্থতা লাভ করিয়াছে।

বসন্ত সমস্ত দিন ভালই ছিল। মেরীর মাতা যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য দিয়াছেন। মেরীর মাতা আজ আর বসন্তকে বড় কথাবার্ত্তা বলিতে দেন নাই। মেরীও বেশী কথা বলে নাই। সন্ধ্যার পর বসন্ত পায়ে হাঁটুর উপরে এক স্থানে বড় বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। মেরীর মাতা যথাসাধ্য বেদনা দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

২৭এ জুলাই।—আজ সকালে উঠিয়া দেখি, এ কি। বসন্ত বেদনায় ছটফট করিতেছে—মেরীর মাতা ব্যাকুল হইয়া বেদনা প্রশমনের চেষ্টা করিতেছেন। মেরী কাঁদিয়া আকুল। বসন্ত এক-একবার "মেরী কই" বলিলে মেরী প্রসারিত বাহু-যুগের মধ্যে আশ্রয় লইতেছে,—বসন্ত একটু চুপ করিতেছে; আবার কিছুক্ষণ পরে তেমনি অশান্তি। বসন্তর জ্বরও হইয়াছে। ডাক্তার আসিয়া বেদনার স্থান পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, বেদনার স্থানে একটী গুলি প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এটীকে প্রথম দিনই বাহির করিয়া ফেলা উচিত ছিল; কিন্তু এ বিষয় কেহ কিছুমাত্র লক্ষ্য বা উল্লেখ করেন নাই। বসন্ত আগুনের ঝাপটা লাগিয়া মুমূর্ষু হইয়াছিল,—তাহারই চিকিৎসা হইতেছিল। বসন্ত নিজেও এ বিষয়ে কিছুমাত্র লক্ষ্য করে নাই। বড় সার্জ্জন আসিলেন। তিনি বলিলেন যে, পা কাটিয়া ফেলিতে হইবে; কিন্তু তাহাতেও রোগী বাঁচিবে কি না, বলা যায় না; দূষিত রক্ত হয় ও সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি প্রথম ডাক্তারকে সকল ব্যবস্থা করিতে বলিলেন; এক ঘণ্টা পরে তিনি আসিয়া অস্ত্র করিবেন। বসন্ত আমাকে ডাকিয়া বলিল,—"দেখ, আমি যদি মরি—"

আমি। আচ্ছা, তুমি পাগল না কি—হাত—আমি, পা কাটায় কি মানুষ মরে?

বসন্ত। তা জানি। কিন্তু আমার পা গেলে, আমি আর শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না। বড় সাধ ছিল, বার্লিনে গিয়া উৎসব করিব। যুদ্ধ করিতে না পারিলে আমার জীবন-মরণ দুইই সমান। শোন একটা কথা—আমি মরিলে আমাকে পোড়াইও। আমি আমার বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালী, ফ্রান্সেও বাঙ্গালী; আমি জীবনে বাঙ্গালী, মরণেও বাঙ্গালী—

মেরীর মাতা বসন্তর কণ্ঠস্বর শুনিয়া, তাহার নিকটে গিয়া, অতি মৃদু ভাবে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিতেছ ভাই?" বসন্ত বলিল "বলিতে-ছিলাম যে, আমি মরিলে আমাকে পোড়াইতে হইবে; কেন না, আমি বাঙ্গালী"। উচ্ছ্বসিত অশ্রু-উৎস সবলে সম্বরণ করিয়া মেরীর মাতা বলিলেন—"ও সব কথা কেন বলিতেছ ভাই?"

বসন্ত। উঃ বড় বেদনা! যাহা হইবার তাহা হইবে; কিন্তু আমার দেহকে যদি তোমার মত স্নেহময়ীর ক্রোড়ে দিয়া যাইতে পারিতাম, তবে বোধ হয় আমার এত কষ্ট হইত না। কই, মেরী কই—" বলিতে-বলিতে সার্জ্জন আসিয়া উপস্থিত। ক্লোরোফরম করিয়া দক্ষিণ পদের হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলা হইল। বসন্ত সমস্ত দিন নিদ্রিতের মত ছিল। সন্ধ্যাকালে জ্বর খুবই কম। সন্ধ্যা-কাল হইতে বসন্ত কখনও বা নিদ্রিত হইয়া পড়িতেছে—কখনও বা জ্ঞানলাভ করিতেছে। মূর্ত্তিমতী সেবা ও করুণা মেরীর মাতা তিলার্দ্ধ স্থানান্তরে যান নাই।

২৮এ জুলাই।—সকালে বসন্তের বেশ জ্ঞান হইয়াছে—জ্বরও খুব কম; কিন্তু সার্জ্জন এমন কোনও কথা কোনও মতেই বলিতে চাহিলেন না যে, আমরা সম্পূর্ণ আশঙ্কাহীন হইতে পারি। বসন্তর দেহের চারি ভাগের এক ভাগের অধিক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে বসন্তের ভ্রূক্ষেপ নাই; কিন্তু সে যে আর অস্ত্র-হস্তে শত্রুর পশ্চাতে দৌড়াইতে পারিবে না—বালিনে বিজয়-উৎসবে যোগদান করিতে পারিবে না—এই দুঃখে, এই মর্ম্মবেদনায় ব্যাকুল। বাঁচিয়া উঠিয় বসন্ত ফ্রান্সের ও স্বদেশের কত কাজ করিতে পারিবে বলিয়া মেরীর মাতা কত সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। নারী-হৃদয় কি দেবতার—কল্পিত এই রমণী অকাতরে এক বিদেশী যুবককে মাতার ন্যায় স্নেহ ও ভগিনীর ন্যায় যত্ন করিতেছেন।

বৈকালে বসন্তের জ্বর বাড়িল—রাত্রে ভয়ানক জ্বর।

২৯এ জুলাই।—বসন্তর জ্বর অতি ভীষণ। আজ সে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন, বিকারগ্রস্ত। আজ আর কাহারও সহিত আলাপ নাই—কেবল প্রলাপ। দিবসের প্রথম ভাগে বসন্তর মুখে যে সকল কথা উচ্চারিত হইতেছিল, তাহা হইতে অনুমিত হয় যে, সে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতেছে—তাহার মস্তিষ্কে এই ভাব ছিল। বৈকালে তাহার উচ্চারিত কথার মধ্যে "স্নেহ" "মেরী" "পূজা" ও "পূজার ছুটী"ই প্রধান। রাত্রেও জ্বর কমে নাই।

ধন্য মেরীর মাতা! ভগবান কি আমাদের সকলেরই উপর এত নির্দ্দয় হইলেন!

৩০এ জুলাই।—আজ সকালে বসন্তর জ্বর একটু-একটু করিয়া কমিতেছিল। তাহার অজ্ঞানতার সহিত জ্ঞান মিশিয়া কি এক রকম হইতেছিল। আমাকে দেখিয়া বেশ চিনিতে পারিল, ডাকিল—"অবনী!" কিন্তু আমি নিকটে গেলে বলিতে লাগিল, "নাটমন্দিরটী বেশ পরিষ্কার রাখিবে—আর দীন-দুঃখী, কাঙ্গাল-বৈষ্ণব কাহারও যেন যত্নের ত্রুটী না হয়।" মেরীর মাতাকে বলিতেছে, "বোন্, পূজার রান্নাটা তোমাকেই করিতে হইবে।" হঠাৎ একবার বসন্ত "স্নেহ" "আমার স্নেহ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—তার পরেই বলিতে লাগিল, "আমি চাকাই শাড়ী নিয়ে যাব, যাব, যাব—পূজার ছুটী হলেই যাব।" মেরীকে নিকটে পাইয়া, বসন্ত দুই হাতে তাহার মুখখানি ধরিয়া, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "পাপীয়সী! রাক্ষসী! পূজার ছুটীতে আমাকে স্নেহর কাছে যাইতে দিবে না বলিয়া এই মোহিনী রূপ ধরিয়াছ? তাহা হইবে না—আমি চাকাই শাড়ী লইয়া যাব যাব যাব।" মেরী বসন্তর চীৎকারে, হয় ত বা নিষ্পীড়নেও কাঁদিয়া উঠিল। বসন্ত তাড়াতাড়ি "মায়াকান্না—তা হচ্ছে না" বলিয়া শিয়রের বালিসের নীচে হইতে একটী রিভল্‌ভার লইয়া অকস্মাৎ দারুণ বেগে মেরীর মাথায় আঘাত করিল। মেরীর গত-প্রাণ স্বর্ণদেহলতা মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তে কি যে ঘটিল, ঠিক করিতে পারিলাম না; কিছুক্ষণ হতজ্ঞান হইয়া রহিলাম। চাহিয়া দেখি, মেরীর মাতাও মেরীর পার্শ্বে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। লোকজন ধরাধরি করিয়া মেরীর মাতাকে গৃহান্তরে লইয়া গেল—মেরীর দেহও স্থানান্তরিত হইল। বসন্ত বিছানার উপর একবার উঠিয়া বসিল—মেরীর ও মেরীর মাতার দেহ স্থানান্তরিত হওয়া চাহিয়া-চাহিয়া দেখিল; তাহার পর "কি করিলাম" বলিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার পর ঘাম—অনবরত ঘাম—সে ঘাম আর থামে না। ডাক্তার নিকটে বসিয়া, অনেক চেষ্টা করিয়া, কিছুতেই ঘাম থামাইতে পারিলেন না। ক্রমে হাত-পা অবশ হইয়া পড়িল—কথা বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল—শ্বাসে কষ্ট হইতে লাগিল—শেষ কথা দুইটী "পূজার ছুটী" বলিতে-বলিতে সব শেষ হইয়া গেল।

মেরীর পিতার যেখানে সমাধি ছিল, তাহারই পাশে চিতা সাজাইয়া বসন্তর নশ্বর দেহের সৎকার করিলাম। আমরা যেন কলের মানুষ;—বাঁচিতে শক্তি নাই, দেহে যেন প্রাণ নাই। হায়, বসন্তকে হারাইলাম! তাহার অপেক্ষাও মর্ম্মন্তুদ যাতনা—মেরীর মাতার কি দশা!

৪ঠা আগষ্ট।—আমরা বাঙ্গালী সৈন্যগণ অদ্য ট্রেঞ্চে "বন্দে মাতরম্" গান করিলাম। কুসো গানটীর আদ্যোপান্ত ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া লইয়াছে। তাহার মতে, এমন সুন্দর প্রাণ-মাতান জাতীয় সঙ্গীত পৃথিবীর আর কোনও ভাষায় নাই। বসন্তর মুখে "বন্দে মাতরম্" না শুনিলে, আমাদের তৃপ্তি হইত না,—সেই কথাই বারবার মনে হইতে লাগিল। জার্ম্মাণ-বাহিনী ধীরে-ধীরে পিছাইয়া যাইতেছে। উহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইল।

১৫ই আগষ্ট।—আজ আমাদের ছুটী। অপরাহ্নে বেড়াতে যাইব ও সমাধি-ক্ষেত্রে যাইব—প্রাতেই স্থির হইল।

অপরাহ্নে সমাধি-ক্ষেত্রে গিয়া দেখি,—যেখানে বসন্তর সৎকার হইয়াছিল, সেখানে তিনটি সুন্দর মন্দির গঠিত হইয়াছে। দুই পাশে দুইটী বড়, মাঝখানে একটী ছোট। একটী মন্দিরের গায়ে লিখিত—

আমার জীবন-সর্ব্বস্ব
হৃদয়-দেবতা
মেরীর একমাত্র আশ্রয় স্থল
ফ্রান্সের অকৃত্রিম বন্ধু
(Claude) ক্লড
মৃত্যু-তারিখ—১৫ই আগষ্ট, ১৯১৭।

অপর মন্দিরের গায়ে লিখিত—

আমার সহোদরাধিক
মেরীর ও ফ্রান্সের
বাঙ্গালী বন্ধু
বসন্ত
মৃত্যু-তারিখ—৩০এ জুলাই, ১৯১৮

মধ্যস্থলের মন্দিরটীর গায়ে লিখিত

আমার মেরী—

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে; অল্প-অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রমণ্ডিতা একটী স্ত্রীলোক ধীরপদে সমাধিস্থলে আসিলেন। হায়! হায়! এই কি মেরীর মাতা? কেশরাশি শুক্ল হইয়া গিয়াছে; মুখের চেহারা দেখিলে চিনিতে পারা যায় না। প্রথমে স্বামীর স্মৃতি-মন্দিরে ফুলের মালা দোলাইয়া দিয়া, তাহার পাশে জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিলেন। চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পরে বসন্তর সমাধি-মন্দিরে তেমনি ফুলের মালা দোলাইয়া, তেমনি প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে মেরীর মন্দিরের নিকট গিয়া, দুই হাতে মন্দির বেষ্টন করিয়া, নিমীলিত নেত্রে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমাদের ট্রেণে ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল।

ঝি

[অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ]

তার নাম ছিল মতি। পুরা নাম ছিল, হরিমতি বা এমনই একটা কিছু। কিন্তু সকলে তাহাকে 'মতি' বলিয়াই ডাকিত। সে গরীবের মেয়ে; কিন্তু যার হাতে পড়িয়াছিল, তার সংসারে কোনও দিন মোটা ভাত মোটা কাপড়ের কষ্ট ছিল না। বিবাহিত জীবনের দশটি বছর তার পক্ষে সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটিয়া গিয়াছিল; কিন্তু বিধাতা একদিন নিমেষের ফুৎকারে সে তাসের বাড়ী ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিলেন—মতি বিধবা হইল।

তার স্বামী কলিকাতায় এক তেল-কলে চাকরী করিত। মাসে মাসে যে কয়েকটি টাকা বাড়ীতে পাঠাইত, তাহাতেই তাহার ও তাহার শাশুড়ীর স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। এ ছাড়া তাদের ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ ও বাগানের সব্জী সবই ছিল। কিন্তু মতি দেখিল যে ভাঁটার টানে নদীর জল যেমন করিয়া দেখিতে দেখিতে সরিয়া যায়, তেমনি তাহাদের ছোট সংসারটির লক্ষ্মী-শ্রী ক্রমশঃই চলিয়া যাইতে লাগিল—কোনও চেষ্টায় কিছু করিতে পারা গেল না। প্রথমে গেল গহনা ক'খানি, তারপরে গেল জমিটুকু। সব্জীর বাগান জঙ্গলে ভরিয়া গেল—গোয়ালে মরিল গরু! শাশুড়ী কাশ-রোগে ক্ষয় পাইতে লাগিলেন। মতি ভাবিয়া স্থির করিল যে, ভাবিয়া কোন ফল নাই; সকলই যাইতে বসিয়াছে।

সে একটি বিষয়ে কিছু নূতনত্ব লক্ষ্য করিল—প্রতিবেশীরা তাহার প্রতি কিছু অতিমাত্রায় স্নেহপরবশ হইয়া পড়িল। সকালে সায়াহ্নে, দিবা দ্বিপ্রহরে হিত-কামীরা নানা ছলে তাহাদের খোঁজ করিতে আসে এবং কি উপায়ে তাহাদের একটু উপকার করিবে, তাহারই চেষ্টায় তৎপর। অর্থের দরকার, অমনি পুঁটুলি করিয়া টাকা সিকি দুআনী আসিয়া উপস্থিত। তবে পাছে অরক্ষিত অবস্থায় মতির

মূল্যবান গহনাগুলি যায়, এজন্ত উপকারী মহাশয় আবার সেই পুঁটুলিতে বাঁধিয়া গহনাগুলি নিজ গৃহে লইয়া সাবধান করিতে ভুলিলেন না! অপর এক বন্ধু কৃপা করিয়া খামার জমিটুকু বন্ধক রাখিলেন—পাছে আর কেহ তাহাদের অসময় বুঝিয়া ঠকাইয়া লয়! মতি এই সকল বন্ধুর উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। মতির বয়স ২২ বৎসর; তাহার শাশুড়ী মনে মনে বলিলেন, "পোড়ারমুখীর রূপই কাল হইয়াছে।"

শাশুড়ীকে বেশী দিন ভাবিতে হইল না। বর্ষায় তিনি রসে ভুলিয়া পড়িলেন, এবং শীতকালের প্রথমেই অগ্রসর হইলেন। মতি একদিন দেখিল, সে সেই ভাঙ্গা সংসারের মাঝখানে নিতান্তই খাপছাড়া রকমে একা হইয়া পড়িয়াছে। বন্ধুরা সকলেই শ্রাদ্ধের দিবার জন্ত ব্যস্ত, কিন্তু সে যে কাহাকে বাছিয়া লইবে, তাহা স্থির করিয়াই উঠিতে পারিল না। আগ্রহ কাহারও কম নহে; কেহ কেহ কথায় ও কাজে সামঞ্জস্ত দেখাইবার জন্ত অর্থ ও অলঙ্কার লইয়া হাজির।

মতি গৃহকোণে গিয়া তার পুরাতন আরসীখানিকে হাই দিয়া, আঁচলে ঘসিয়া একবার সম্মুখে ধরিল; একটু-খানি হাসিয়া দেখিল কেমন দেখায়; তার পরেই আরসী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইল। আরসীখানি কপাটে লাগিয়া ছাতু-ছাতু হইয়া গেল।

যে সকল প্রতিবেশী সময়ে অসময়ে আত্মীয়তার আব্দারে মতিকে বিব্রত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার নাম প্রহ্লাদ সা। তিনি গ্রামের জমিদার মুখুয্যে বাবুদের মুচ্ছুদ্দি। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহাকে পঁয়ত্রিশে আনিয়া দাঁড় করাইতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার আকৃতি ছিল কিঞ্চিৎ খর্ব্ব; স্থূলোদর, ক্ষুদ্র মস্তক ও গ্রীবা-লোপ হেতু তাঁহাকে একটি পরিপুষ্ট ঘটের মত দেখাইত। কিন্তু কেহ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে পারিত না; কেন না তিনি ধনী এবং কূটনীতিতে অদ্বিতীয়। মতি তাঁহার উপদেশ ও অনুশাসন প্রতিদিন শ্রবণাধঃকরণ করিতে বাধ্য হইত।

শাশুড়ী যেদিন মারা গেলেন, তার পরদিনই শশী নাপিতানী তাহার তিন চারিটি শিশু শাবক লইয়া মতির গৃহে আবির্ভূত হইল—"সা মহাশয় তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সোমত্ত বিধবা একলা কি থাকে? ছিঃ।" সংক্ষেপে এই কৈফিয়ৎ দিয়া সে মতির শয়ন-গৃহের এক পার্শ্বে বিছানা বিছাইয়া লইল। যাহা হউক একটি সঙ্গী তবু ত জুটিল, এই মনে করিয়া মতি একটু আশ্বস্ত হইল। মতির আর আর প্রতিবেশীরা ভ্রূকুটী করিল, কিন্তু মতি কি 'সরকার' বাবুর অমতে কোনও কিছু করিতে পারে?

নাপিত বৌও মতিকে বিধিমত ভাবে সেই কথাই বুঝাইল,—"সরকার বাবুর অমতে কাজ করিয়া কি কেহ কখনও জিনিতে পারে—না, এ পর্য্যন্ত পারিয়াছে?" সে যে কত বড় হুকুমের বলে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই দাসেদের সংসারে আসিয়াছে, তাহা প্রতিদিন শতবার করিয়া মতিকে বুঝাইয়া দিতে ছাড়িত না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তার কাজ ছিল—কারণে অকারণে সন্তানগুলিকে প্রহার ও জ্ঞাত-অজ্ঞাত ব্যক্তির উদ্দেশে গালি বর্ষণ করা। শশীর আগমনের একটি ফল হইল এই যে, কিছুদিনের মধ্যেই হিতৈষী প্রতিবেশিগণের অনেককেই ভিন্ন রাস্তা দেখিতে হইল।

শশী দিন কতকের মধ্যেই বেশ জমাইয়া লইল। মতি দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইল। ঠিক কোন্ দিন কেমন করিয়া যে শশী গৃহিণীর পদ গ্রহণ করিয়া মতিকে একেবারে দাসীত্ব প্রদান করিয়া ফেলিল, তাহা মতি কোনও মতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। মতি দেখিল যে শশীর ছেলে মেয়েকে পালন করাও তাহার একটি কাজের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে, এবং সেটি সে অবহেলা করিলে যথেষ্ট গঞ্জনা ভোগ করে।

অন্তান্ত লোকের গতায়াত যেমন কমিয়া আসিতে লাগিল, প্রহ্লাদ সা তেমনই ঘন-ঘন খোঁজ লইতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৯টা ১০টা পর্য্যন্ত তাঁহার উপদেশ চলিতে লাগিল। তাঁহার প্রধান শ্রোতা অবশ্ত শশী। মতি জগৎসংসারের গতিক ভাবিয়া-ভাবিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িত; সরকার বাবুর বিরক্তির ভয়ে কিছু বলিতে পারিত না। কিন্তু তিনি যখন তাঁহার উপদেশের ফল-শ্রুতি স্বরূপ বামহস্তে কিঞ্চিৎ মুদ্রা লইয়া, দক্ষিণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ও বাম চক্ষু ও ভ্রূ ঊর্দ্ধে উঠাইয়া মতিকে দিতে আসিতেন, তখন মতি নিতান্ত জড়সড় হইয়া সরিয়া পড়িত

এবং শশীকেই অগত্যা সে মুদ্রার ভার গ্রহণ করিতে হইত। খরচ তাহাতেই চলিয়া যাইত।

মতি আর একটি বিষয়ের জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিল; সেটি কিন্তু বিলম্বে ঘটিল। শশী যখন সরকার বাবুর গুণ ব্যাখ্যান আরম্ভ করিত, তখনই চট্ করিয়া মতির মাথা ধরিত, আর সে পুকুর ঘাটে চলিয়া যাইত অথবা শুইয়া পড়িত। কাজেই শশী কথা ছাড়িয়া কাঁটা ধরিত—সেটা অবশ্য তার ছেলে মেয়ের পিঠেই পড়িত। একদিন কিন্তু সে বলিয়া ফেলিল,

"দেখ, ওগো ভাল মানুষের মেয়ে, দিন ত বেশ চলে যাচ্ছে; দুই হাত পেতে টাকাও নেওয়া হচ্ছে। দু'বেলা রাশ রাশ ভাতও উঠ্‌ছে। কিন্তু যে মানুষটা এত কচ্ছে, তার পানে একবার তাকাতে হয় গা? সে কি শুধু তোমার ঐ ছাকনি ঠাট্ দেখ্‌বার জন্ত এতগুলো করে' টাকা গুণে দিচ্ছে? তুমি ত কচি খুকীটী নও বাছা।"

মতি একটু হাসিল, বলিল, "তাই নাকি, নাপ্‌তে-বৌ। আমি ভেবেছিলাম তোমার জন্তে টাকা আস্‌চে।"

নাপিত-বৌ রাগিয়া গেল। বলিল "আস্‌চে ত। এক শ'বার আস্‌চে। তাও বলি, লোকে যে কি দেখে ভোলে, তা বোঝা ভার! এক দিন দিন ছিল গো, দিন ছিল, তখন ঐ সরকার বাবুই—"

সে ইতিহাস আর মতির শুনা হইল না। সরকার বাবু স্বয়ং আসিয়া পড়িলেন। উপদেশের পালা আরম্ভ হইল। মতি দরজার এক কোণে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন চাকরের মাথায় একটি ডালা শাক তরকারী পান ইত্যাদি লইয়া যখন প্রহ্লাদ দা দ্বিপ্রহরে মতির বাড়ীতে আসিলেন, তখন সেখানে সন্তানগণ পরিবৃতা শশী ব্যতীত আর দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না। শশী বেশ নিশ্চিন্ত মনে রন্ধন করিতেছিল, সরকার বাবুর ঘরের কোনও ত্রুটী হইল না; কেবল অভাব ও অভিযোগের মধ্যে শুনিতে পাইলেন যে, মতি রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিয়াছে।

সরকার বাবু অবশ্য বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শশী একটু সলাজ হাসি হাসিয়া, বাম হাতের পৃষ্ঠ দিয়া ঘোমটা একটু টানিয়া বলিল, "যাবে কোথায়? বাছাধনকে আসতেই হবে! শশী নাপিতানী তেমন মেয়ে নয়!"

শশীর কথা ফলিয়াছিল; কিন্তু বড় বিলম্বে।

মতি রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে কলিকাতার রাস্তা ধরিয়াছিল। তাহাদের গ্রাম হইতে কলিকাতা ১৫ মাইলের বেশী নয়, কিন্তু তাহার আসিতে অপরাহ্ণ হইয়া গেল। কখনও ত হাঁটা অভ্যাস নাই; তারপর পৌষের বেলা, দেখিতে দেখিতে হেলিয়া পড়িল। মতি এক যুক্তি করিয়াছিল—সে এক-কাপড়ে গৃহত্যাগ করিয়াছিল এবং সে কাপড়খানিও ময়লা। ঘোমটা একেবারে বর্জ্জন করিতে না পারিলেও, তাহার দ্বারা শুধু খোঁপাটি ঢাকিয়াছিল। পল্লীবধূর সলাজ ভাবকেও সেই সঙ্গে সে বিদায় দিয়াছিল। নিতান্ত স-প্রতিভের মতই সে পথ চলিতে লাগিল, এবং পথটি যেন তাহার চিরাভ্যস্ত, এমনই ভাবে সে চলিল। সংকোচের কোনও চিহ্নমাত্র তাহার মধ্যে ছিল না। পথবাহীরা অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে ইতস্ততঃ না করিয়াই তাহার জবাব সংক্ষেপে দিয়া দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিত। পরক্ষণেই হয় ত তাহার সমস্ত শরীর মথিত করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইত। অভাগী নিজেই ভাল করিয়া জানিত না সে কোথায় যাইতেছে, তার অপরকে বুঝাইবে কি? সে একটি বিষয় স্থির বুঝিয়াছিল যে, প্রহ্লাদ সার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে একমাত্র উপায় হইতেছে—কুইনগর ত্যাগ; এবং অতি দুঃখেই তাই সে স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে।

মতি পূর্ব্বে দু'চারিবার কলিকাতায় আসিয়াছে এবং কালীঘাটে বাসা ভাড়া করিয়া বাস করিয়াছে। এখন সে কালীঘাট লক্ষ্য করিয়াই আসিতেছিল। কালীবাড়ীতে পৌঁছিতে তাহার বেশী বেগ পাইতে হয় নাই, কেন না কালীঘাটের কাছাকাছি আসিয়া সে আরও যাত্রী দেখিতে পাইয়াছিল এবং তাহাদেরই সঙ্গে জুটিয়া কালীবাড়ীর মধ্যে আসিয়া পড়িল।

নাটমন্দিরের ভিতরে গিয়া সে গলায় অঞ্চল দিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করিল। এতক্ষণ সে যে একটা কৃত্রিম বাঁধ দিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া চোখের জল ছুটিল। সে তাহার স্বামীর কথা স্মরণ করিয়া মায়ের উদ্দেশে হুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িল যে, সেখানে আরও লোক রহিয়াছে, সে আপনাকে

অতি কষ্টে সামলাইয়া লইল। সেই সময়ে নাটমন্দিরে একজন বর্ষীয়সী মালা ফিরাইতেছিলেন, তিনি মালাটি পাঁচ-সাতবার মাথায় ঠেকাইয়া উঠিলেন এবং মতির নিকটে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েচে? কপাল ভেঙ্গেচে বুঝি?"

মতি মাথার কাপড় টানিয়া মাথা হেলাইয়া জবাব দিল।

"কে আছে?"

"কেউ নেই, মা।"

"কেউ নেই? কোথায় যাবে তবে?"

"চাকরি করবো।"

"কি জাত তোমরা বাছা?"

"আমরা কৈবর্ত্ত।"

"কি থাকবে? মন ঠিক করে থাকতে পারবে? তোমার যে বয়েস দেখচি বাছা, চেহারাটাও মন্দ নয়—কিছু মনে কর না বাছা! এ কালীঘাট বড় কঠিন ঠাঁই। দুদিনের মধ্যে কু-লোকের পরামর্শে হয় ত কত খেয়াল ঘাড়ে চাপবে এখন। তখন কি আর তিন টাকায় পোষাবে, বাপু?"

মতি একবার দেবীমূর্ত্তির দিকে চাহিল। যেন মনে বল পাইবার জন্য দেবতাকে স্মরণ করিল। সে শুধু বলিল "না; আমি চাকরিই করব। তিন টাকাতেই আমার চলবে।"

অপরিচিতা তখন পুনরায় বলিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা-আরতি যখন শেষ হইল, তখন তিনি প্রণাম করিয়া উঠিলেন এবং মতিকে সঙ্গে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। অনেক গলি অতিক্রম করিয়া তিনি একটি বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন ও তাঁহার ভগিনীকে ডাকিয়া বলিলেন "নিস্তার, ঝি রাখবি? তিন টাকা আর খোরাক-পোষাক, আর জলখাবার চার আনা। রাখবি?"

নিস্তারিণী দোতলা হইতে জবাব দিলেন, "রাখব দিদি! উপরে নিয়ে এস। এই পটলা, আলো ধর রে, আলো ধর।"

দ্বিতলে উঠিয়া মতি নিস্তারিণীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। নিস্তারিণী কিছুক্ষণের মধ্যে কথা কহিতে পারিলেন না; শেষে বলিলেন "হাঁ গা, তুমি ঝি থাকবে?"

মতি কথা কহিবার পূর্ব্বেই নিস্তারিণীর দিদি বুঝাইয়া দিলেন—"অল্প দিন হইল বেচারার কপাল ভেঙ্গেচে। ত্রি-কূলে কেউ নেই কি না; সেরস্তর বউ; অবস্থা ভাল ছিল, তা দেখলেই বোধ হয়, সীঁথের সিন্দূরের সঙ্গে সঙ্গে মা-লক্ষ্মী অন্তর্ধান হয়েচেন। বাড়ী-ভাড়া দিতে পাচ্চে না, দিন চলে না; তাই কালীবাড়ীতে এসে আমার কাছে কেঁদে পড়েচে। আমি ভাবলুম্ নিস্তারের ত ঝি চাই। তাই নিয়ে এলুম।"

নিস্তারিণী বলিলেন "তা বেশ করেচ দিদি। তা বাছা তুমি স্থির হয়ে থাকতে পারবে ত?"

এবারেও জবাব দিলেন তাঁহার দিদি; "সে আমি খুব বুঝিয়ে বলেচি। দেখ বাপু, যদি ভাল হয়ে' থাকবে ত এমন যায়গা কলিকাতা সহরে আর পাবে না। চিরকাল কাটাতে পারবে; শেষকালে গঙ্গালাভ হবে, গতি হবে—" "নারায়ণ, নারায়ণ", বলিয়া তিনি তাঁহার নিজের শেষকালের গতির চিন্তায় কিছু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন।

নিস্তারিণীর দিদির ওকালতীর গুণেই হউক, বা 'গরজ বড় বালাই' বলিয়াই হউক, মতি চাকরী পাইল। কিন্তু নিস্তারিণী যে খুব প্রসন্ন হইলেন না তাহা বেশ বুঝা গেল। নিস্তারিণী একটু বেশী রকমের মোটা, তাঁহার স্বামীটি একটু বেশী রকমের রোগা। কিন্তু বুদ্ধি ছিল ঠিক ইহার বিপরীত অনুপাতে; অর্থাৎ নিস্তারিণী ছিলেন চতুরা এবং তাঁহার স্বামী জনার্দ্দন ছিলেন—বেজায় ভাল মানুষ। এই সকল কারণে তাঁহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের বড় সম্ভাব ছিল না।

দিন-কতক যাইতে না যাইতে নিস্তারিণী মতির প্রতি অযথা শাসন এবং স্বামীর প্রতি অতিরিক্ত সতর্কতার ব্যবস্থা করিলেন। মতি বুঝিল; বুঝিয়া হাসিল। একদিন নিস্তারিণী মতিকে স্পষ্টই বলিয়া ফেলিলেন—"দেখ বাপু, ঝি-বৃত্তি করতে এসেছ। ঝিয়ের মতই থাকবে। অমন বেহায়াপনা আমার বাড়ীতে চলবে না। আমি বসে বসে সব দেখতে পাই।"

মতি শুনিল। পরদিন গৃহকর্ম্ম সারিয়া সে গঙ্গাস্নানে গেল; আর ফিরিল না।

আবার আর এক বাড়ীতে তাহার চাকরী জুটিল। সেখানেও তাহাকে লোকে শান্তিতে থাকিতে দিল না। সে জানিত যে রূপ যৌবন লইয়া সে যেখানে যাইবে, সেখানেই তাহাকে কিছু-কিঞ্চিৎ উপদ্রব সহিতে হইবে। কিন্তু একান্ত বাড়াবাড়ি না হইলে, সে কোনও মতে ,মাথা গুঁজিয়া

থাকিতে পারিবে, এই ছিল তাহার বিশ্বাস। সে একটু আধটু গোলযোগে বিচলিত হইত না।

সে এবারে যে বাড়ীতে চাকরী পাইয়াছিল, সে বাড়ীর কর্ত্তা বলরাম চাটুয্যে যাকে চাকুরী করিতেন, যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। সংসারে অনেকগুলি লোক খাইত। মতি সকলের বাসন মাজিত। কোনও রূপে আপনাকে ছাই-ভস্ম আবর্জ্জনারাশির মধ্যে দিবারাত্র নিমজ্জিত রাখিয়াও সে লোকের দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। মনিব ও তাঁহার ভ্রাতাটি মতির প্রতি পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। বলাইবাবু কৃষ্ণনগরের মুখুয্যেদিগের কুটুম্ব এই পরিচয় প্রদান করিয়া মতির সহিত ঘনিষ্ঠতা জমাইতে চেষ্টা করিলেন। মতি এখানেও প্রমাদ গণিল; সুতরাং আবার সে পলাইল।

সেই গলির মোড়ে একখানি বাড়ীতে সে দ্বিপ্রহরের বিজনতা খুঁজিয়া প্রবেশ করিল। গৃহিণী ছাতে বসিয়া রোদে চুল শুকাইতেছিলেন। মতি আস্তে আস্তে গিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইল।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "কি চাও, বাছা তুমি? কোথা হতে আস্‌ছ?" মতি বিনা আড়ম্বরে বলিল, "আপনি কি রাখ্‌বেন মা?"

"তুমি কি থাক্‌বে?"

"হাঁ মা, আমি সতর ঘেটেই খাই।"

এই সরল উত্তরে গৃহিণীর চোখের কোণ একটু স্বচ্ছ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আমার ঝিয়ের দরকার আছে বটে; কিন্তু তোমার বয়েসটা বড় কাঁচা। তুমি আগে কোন্ বাড়ীতে ছিলে?"

মতি নিঃসঙ্কোচে বলিল "এই গলিতেই চাটুয্যেবাবুদের বাড়ীতে ছিলাম।"

"কেন ছেড়ে এলে?"

"মা, ঐ বয়েসটা কাঁচা বলেই আমার কোথাও গিয়ে সোয়াস্তি নেই।"

"তা এ বাড়ীতেই কি সোয়াস্তি হবে?"

"তুমিই বুঝে দেখ, মা। যদি সোয়াস্তি না হয়, তবে আর কোথাও গিয়ে ভাগ্য-পরীক্ষে করে' দেখ্‌তে হবে।"

মতি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল। গৃহিণী একটু ভাবিলেন। তিনি বুঝিলেন যে হতভাগিনীর জীবনের অন্তঃস্রোত কি দারুণ ব্যথা ও বাধার মধ্য দিয়া বহিতেছে। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা থাক ত। তারপর তিনি আসুন, জিজ্ঞাসা করে' বল্‌ব তখন।"

গৃহস্বামীর নাম সুচারু গাঙ্গুলী; ইনি কারবার করেন। সকালে দুপ'রে বিকালে সন্ধ্যায় সর্ব্বদাই ইনি বাহিরে বাহিরে ঘুরেন। স্ত্রীর সহিত রাত্রে যখন দেখা হয়, তখন কাহারও বড় ঘুমাইতে বাকী থাকে না। মতি সারাদিন ঘর ধুইয়া, কাপড় কাচিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িত। বাবুর খাবার ঢাকিয়া রাখিয়া বামুন ঠাকুর যখন প্রস্থান করিত, তখন মতি ঘুম-চোখে তাহার কাজ সারিয়া শুইয়া পড়িত। এ বন্দোবস্ত তাহার মন্দ লাগিল না।

সুচারু সংসারের কোনও খোঁজই রাখিতেন না। সকল কাজই তাঁহার পত্নী সরলা নির্ব্বাহ করিতেন। মতির সম্বন্ধে পতির নিকট তিনি কিছুই বলিতে পারেন নাই। প্রথম-প্রথম সুযোগ হয় নাই, তারপরে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

একদিন একটু গোল হইল। সুচারু অধিকরাত্রে বাড়ী ফিরিয়াছেন। চাকর অসুস্থ। গাড়ী দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতেই সরলা মতিকে ডাকিয়া বলিলেন "মতি, দোরটা খুলে দিয়ে এস।"

মতি একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি দেব মা?"

সরলা বলিলেন, "হাঁ মা, তুই-ই খুলে দিয়ে আয়।" মতি দরজা খুলিয়া দিয়াও তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিতেছিল। সিঁড়িতে আলো ছিল। সুচারু মতির দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলেন; "কি বাবা, বাড়ী ভুল করিনি ত? তুমি কে বট সুন্দরী?"

মতি লজ্জায় দেয়ালের গায়ে মিশিয়া যাইতে চাহিল। সরলা সিঁড়ির উপর হইতে বলিলেন, "আচ্ছা, হয়েচে। উঠে এস এখন। ঝিয়ের সঙ্গে কথা কইতে যান না?" সুচারু অপ্রতিভ হইয়া টলিতে-টলিতে উপরে উঠিলেন।

সরলা কণ্ঠস্বরে বুঝিয়াছিলেন যে, আজ পানীয়ের মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে। মতি ভাবিল, "এ কোথায় এলাম!"

উপরে উঠিয়া সুচারু অপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কে গা?"

গৃহিণী বলিলেন "ওর নাম মতি।"

"খুটো না দাচ্চা ?"

সরলা বলিলেন "খুব দাচ্চা। দেখে নিও এখন।" সুচারু পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, মতি জড়সড় হইয়া উপরে উঠিতেছে। তারপরে অকম্পিত গম্ভীর স্বরে বলিলেন "আমার ঘাট হয়েচে, মা। আজ আমার মাথাটা ঠিক নেই কি না, কিছু মনে করিস্‌নি যেন। আমাদের জাত দাসীকে দাসী বলে না কি বলে ; কি অর্থাৎ মেয়ে। তুই আমার মেয়ের মতই থাক্। যা শুয়ে পড়্‌গে ; অনেক রাত হয়ে গেছে।"

সরলা খুসী হইলেন এবং স্বামীর জামা জুতা ছাড়াইতে ব্যাপৃত হইলেন। মতি চিন্তা করিতে করিতে চলিয়া গেল। তাহার বিশ্বাস থাকুকা খাইয়া খাইয়া শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। মানুষকে অবিশ্বাস করাই তাহার স্বভাব হইয়াছিল। সে তাহার নূতন মনিবকে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

কিন্তু মানুষ না ঠেকিয়া শিখে না। সে এ বাড়ীতে আসিবার কিছুদিন পরে, একদিন পুলিশ আসিয়া হাজির — চাটুয্যে বাবুরা মতির নামে চুরির অভিযোগ আনিয়াছেন। সে ছেলের গলার হার চুরি করিয়া পলাইয়াছে, এই অভিযোগ। সুচারু বাড়ীতে ছিলেন না। পুলিশ মতিকে ডাকিয়া অনেক জেরা ও খানাতল্লাস করিল। তাহারা মতিকে থানায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সুচারুর একজন সোমত্তা জামিন হইয়া তাহাকে ছাড়াইয়া রাখিল। পরদিন আদালতে হাজির হইবে। সুচারু আশ্রিতা অনাথার জন্য সহস্র কার্য্য ত্যাগ করিয়া আদালতে হাজির হইলেন।

মোকদ্দমার ডাক হইলে, মুখুয্যে বাবুদের সোমত্তা প্রহ্লাদ সাই মতির বিরুদ্ধে সাক্ষী দিল। মতি তাহার নিকট হার বিক্রয় করিয়াছিল, এই কথা সে কোর্টে ধর্ম্ম-সাক্ষী করিয়া অনর্গল বলিয়া গেল। সুচারু লোকটিকে বেশ লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার অর্থে নিযুক্ত কৌঁসুলীর জেরাতে মোকদ্দমা টিকিল না। মতি বাড়ী ফিরিয়া ভক্তিভরে সরলার পদধূলি লইল।

ইহার পরে ছয় মাস যাইতে না যাইতে, আবার প্রহ্লাদ সা আদালতের চাপরাসী লইয়া সুচারুর গৃহে আবির্ভূত হইল। সে মতির বিরুদ্ধে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া ডিক্রী করিয়া লইয়াছিল। মতি তাহার স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যেন প্রহ্লাদ সার নিকট হইতে উচ্চ সুদে তিন শত টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল। সে টাকা সে না দিয়া পলায়ন করিয়াছে। দলিলে সর্ত্ত ছিল, অন্য উপায়ে আদায় না হইলে শরীরের দ্বারা টাকা আদায় করিয়া লওয়া যাইবে। অবশ্য ব্যাপারটি আগাগোড়াই কল্পিত। কিন্তু অর্থ ও কূটবুদ্ধির বলে প্রহ্লাদ সা অভীষ্ট-সিদ্ধি করিয়া লইয়াছিল। সে চাটুয্যে বাবুদের নিকট যেদিন সন্ধান পাইল যে সে কলিকাতায় রহিয়াছে, সেই দিন হইতে সে ফন্দি আঁটিয়া এই ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে।

এবারেও সুচারু মতিকে বাঁচাইলেন। কিন্তু টাকা দিতে হইল। এতগুলি টাকা জলে গেল ভাবিয়া তিনি কিছু বিরক্ত যে না হইলেন, এমন নহে। কিন্তু স্ত্রীর ভয়ে কিছু বলিতে পারিলেন না।

একদিন সুচারু কতকগুলি কাগজ উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, একবার জিজ্ঞাসা কর ত মতির বাড়ীটা কোথায়।"

সরলা মতিকে আনিয়া হাজির করিলেন। মতি বলিল "আমার বাড়ী কৃষ্ণনগরে, বাবা।"

"কৃষ্ণনগর—কৃষ্ণনগর, আচ্ছা সেখানকার সকলকে তুমি চেন ?"

মতি বলিল, "না বাবা, আমি সেখানকার বউ ; সকলকে কেমন করে চিনব ?"

"আচ্ছা, রাধামাধব দাস কেউ ছিল ?"

মতির মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে মুখ নত করিয়া কাপড়ের খুঁট খুঁটিতে লাগিল।

সরলা জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার স্বামী ?"

সুচারু চমকিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "তোমার স্বামী ? রাধামাধব দাসের কথা বল্‌ছি—সে তোমার স্বামী ?"

সরলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন গা ? তার কি হয়েচে ?" সে কথা লক্ষ্য না করিয়া সুচারু জিজ্ঞাসিলেন, "মতি, তোমার স্বামী বুঝি বরাবর কৃষ্ণনগরেই থাকতেন ; না ?"

মতি বলিল, "না ; তিনি গোয়াবাগানের এক তেলকলে চাকরী করতেন।"

"কোথায়? তেল-কলে?"

"হাঁ, বাবা, তেলকলে। সে কলের নাম ছিল বাঙ্গাল অয়েল মিল"।

"বল কি? তার পর?"

"৩ বছর হল তিনি এখানেই কলেরা হয়ে মারা যান।"

সুচারু কলমের অগ্রভাগ দংশন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, "আচ্ছা যাও।"

সরলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো, কি হয়েছে বল না।"

"সে পরে সমূব এখন" বলিয়া সুচারু কাঁধে চাদর ফেলিয়া পদব্রজে বাহির হইয়া গেলেন।

মতি অনেক দিন দেশে যায় নাই। তাহার বড় ইচ্ছা করিত একবার দেশে গিয়া স্বামীর গৃহ দেখিয়া আসে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা সে কোনও দিন বলিতে পারিত না। তাহার কারণ প্রথমতঃ প্রহ্লাদ সার প্রতি; দ্বিতীয় কারণ সে তাহার মনিবের অনেক টাকা দণ্ড করিয়াছে। সরলার সস্নেহ ব্যবহারেও তাহার মন বাঁধা পড়িয়াছিল।

কিন্তু একদিন সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। তাহার একজন প্রতিবেশী চিঠি লিখিয়াছে যে মতির গৃহ-দাহ হইয়া গিয়াছে; সে প্রতিবেশীর গৃহও সেই সঙ্গে ভস্ম হইয়া গিয়াছে। প্রহ্লাদ সা'র দ্বারাই যে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, লেখক সে কথাও লিখিয়াছে এবং প্রহ্লাদ সার উদ্দেশে যথেষ্ট গালিবর্ষণ করিতেও ছাড়ে নাই। মতি গালি দিল না, কিন্তু কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু ফুলিয়া গেল।

সরলা, তাহার স্বামী বাড়ীতে ফিরিলে, সেই চিঠিখানি তাঁহার হস্তে দিয়া মতির দুঃখ-কাহিনী বিবৃত করিলেন। সুচারু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিঠিখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন এবং মতিকে কাছে ডাকিয়া সে চিঠির লেখক সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন। তারপর বলিলেন, "মেয়ে, এই লোকটাই তোমার সর্ব্বনাশ করেছে। এই নফর যে-ই প্রহ্লাদ সার প্রধান সাক্ষী ছিল। এই বলেছিল যে, তোমারই কথা অনুসারে সে দলিল লিখেছিল এবং টাকা তোমাকে দিতে দেখেছিল। যা হোক, ধর্ম্ম আছেন দেখ্‌ছি—তার ঘরও পুড়েছে।"

মতি বলিল "বাবা, আমি বাড়ী যাব।"

সুচারু বলিলেন, "বেশ কথা। গিয়ে কোথা থাকবে?"

"তা' জানিনে!"

"আচ্ছা, তুমি যদি কিছু টাকা পাও, তবে কি করবে বল ত?"

"আর আপনাদের অর্থ দণ্ড করতে চাই নে বাবা। যে ঋণ হয়েছে, তা আর আমার জীবনে শোধ হবে না।"

"সে থাক্, যদি কিছু টাকা সেই কলে পাও যে কলে তোমার স্বামী চাকরী করতেন?"

মতি ভাবিল, হয় ত বা তাহার স্বামীর মৃত্যুকালে কিছু মাহিয়ানা বাকী ছিল। সে সরলার দিকে কাতর ভাবে চাহিয়া বলিল, "শ্বশুরের ভিটেটায় সন্ধ্যাদীপ দিবার কোনও উপায় যদি হয়, মা।" কথার শেষভাগে তাহার কণ্ঠস্বর কম্পিত ও বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল।

সে ব্যথা সরলার মনে বাজিল—তিনি বলিলেন "যেমন ক'রে হো'ক আমি তোর ভিটেয় ঘর করে দেব।"

কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মতি বলিল, "মা, তুমি মানুষ নও, দেবতা। কিন্তু আমার সে ভিটেও যে নাই। প্রহ্লাদ সা যখন চাপরাশী নিয়ে ধরতে এসেছিল, তখন ত সে স্পষ্ট বলে গিয়েছিল যে, সে আমার বাড়ী-ঘর সব বেচে নিয়েছে।"

সুচারু বলিলেন 'আচ্ছা সে আমি দেখে নেবো এখন! শোন মেয়ে, তেল-কলে তোমার কিছু টাকা আছে। রাধামাধবের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তেল-কলের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। তখন সে কলের শেয়ার ২৫।৩০ টাকায় বিক্রী হয়েছিল, রাধামাধব সেই সময়ে কতকগুলি শেয়ার কিনে ফেলেছিল। কলটা যে সময় ফেল্ হবার মত হয়, সেই সময় আমাদের কোম্পানী ঐ কল কিনে নিয়ে চালাতে আরম্ভ করে; এখন সে কলে অনেক লাভ হচ্ছে। রাধামাধবের অংশগুলি সে বেচারী আর নিয়ে যেতে পারে নি; কোম্পানীর কাছেই মজুত আছে, তার সুদও মজুত হচ্ছে, রাধামাধবের কোনও খোঁজখবর পাওয়া যায় নি বলে'। আমি সে টাকা তোমাকে পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি।"

সরলা উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কত টাকা হবে?"

সুচারু মতিকে বলিলেন, "সে টাকা পেলে, মেয়ে, তোকে আর চাকরী করতে হবে না! এখন টাকা দিয়ে তোর কি করতে ইচ্ছে করে, তাই বল্।"

মতি বলিল "আমার যতটুকু যাতে বজায় থাকে, তাই কর, বাবা! আর তোমাদের টাকা যাতে শোধ হয়!"

সুচারু বলিলেন "আচ্ছা তাই হবে। আমার এক বন্ধু আলিপুরের উকীল আছেন, আমি তাঁকে বলে দেব এখন, তোমার স্বামীর সম্পত্তি উদ্ধার করবার জন্ত এবং তথানে যদি অন্ত সম্পত্তি কিছু পাওয়া যায়, তবে তাও তোমার জন্ত কিন্‌বার চেষ্টা করতে বলে দেব।"

সুচারু "বেঙ্গল ফার্ণিচার এণ্ড অয়েল মিল্‌স" কোম্পানীর একজন ডিরেক্টার। তিনি সেই সূত্রে রাধামাধবের কেনা শেয়ার সম্বন্ধে অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়া ঐ কোম্পানী অত্যন্ত লাভ করিতেছিল, এবং তাহার ফলে যে একশত টাকার অংশ একদিন দুর্দ্দিনে ২৫।৩০ টাকায় বিকাইয়াছিল, এক্ষণে তাহার মূল্য হইয়াছে হাজার টাকারও উপর। রাধামাধব তাহার সমস্ত জীবনের উপার্জ্জন দিয়া ১৫ খানি অংশ কিনিয়াছিল। সুতরাং সেই অংশগুলি বিক্রয় করিয়া ও তাহাতে লাভের অর্থ যোগ করিয়া মতির প্রায় ১৭।১৮ হাজার টাকায় দাঁড়াইল।

অল্পদিনের মধ্যেই সুচারু বাবুর উপদেশমত দশ হাজার টাকায় রুইনগরের তালুক কিনিয়া ফেলা হইল। মুখুয্যে বাবুদের অবস্থা দ্রুতবেগে অবনতির দিকে যাইতেছিল। তাহাতে প্রহ্লাদ সার মত কর্ম্মচারী প্রাচীন সৌধে বটবৃক্ষের ন্যায় শিকড় গজাইয়া ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছিল। রাজস্বের দায়ে রুইনগর বিক্রয় হইয়া গেল।

মতি মুখুয্যে-বাবুদের তালুক কিনিয়াছে, এ সংবাদ যখন রুইনগর পৌঁছিল, তখন প্রহ্লাদের মস্তকের অবশিষ্ট চুলগুলি উঠিয়া গেল—ভাবনায়। মতির সহিত সে যে ব্যবহার করিয়াছে, এইবারে তাহার দেনা পাওনা চুকাইতে হইবে—এ চিন্তা তাহাকে কিছুতেই স্থির হইতে দিল না। শশী নাপিতানীও তাহাকে কোন বুদ্ধি দিতে পারিল না। তখন অবশেষে প্রহ্লাদ সা একদিন হঠাৎ দীনবেশে সুচারু বাবুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং নানাবিধ শাক-সব্জীর ভেট দিয়া মতির নিকট চাকরীর উমেদারী করিল। সে যে দুর্দ্দিনে অর্থ দিয়া মতির কত উপকার করিয়াছে, তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেও ভুলিল না। পরিশেষে একটি মুদ্রা মতির পায়ের কাছে রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। মতি শুধু হাসিল।

প্রহ্লাদ রুইনগরের মুচ্ছুদ্দিগিরিতে কায়েমী হইতে পারিল না। সুচারুর উকীল বন্ধুটি রুইনগরে আসিয়া প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া প্রহ্লাদ সার বিরুদ্ধে জালের মোকদ্দমা রুজু করিয়া দিলেন। মতির পক্ষে প্রমাণ দিল সেই লেখক সাক্ষী নফর দে। প্রহ্লাদ সার জেল হইলে, রুইনগরের লোক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। মতি অতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সে কি করিবে?

মতি তাহার স্বামীর ভিটা ফিরিয়া পাইল এবং সেখানে রাধামাধব-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারই সেবায় জীবন কাটাইল।

আমার গর্ব্ব

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

তোমারে বেসেছি ভাল', শুধু এইটুকু
একমাত্র মোর নহে অহঙ্কার।
আমার পরম গর্ব্ব, আমারে যে তুমি
ভাল' বাসিবার দেছ অধিকার॥

জাপানের যৎকিঞ্চিৎ

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

জাপানের সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতা দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; আমাদের এই দুঃসময়ে ক্ষুদ্রকায় জাপান নিজের অসুবিধা ঘটাইয়াও আমাদিগের প্রয়োজনীয় বহু জিনিস সরবরাহ করিয়া আমাদিগের মহোপকার সাধন করিতেছেন। সেই জাপানের সহিত আমাদের যত বেশী পরিচয় ঘটে, ততই ভাল বলিয়া মনে হয়। তাই মনে করিয়াই জাপান সম্বন্ধে দুই-চারিটী কথা এবং খানকয়েক চিত্র Customs of the World নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

জাপানীরা একটী অখণ্ড জাতি নহে। জাপানে এখন 'নেশন' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা কয়েকটি জাতির (race) সংমিশ্রণে গঠিত। জাপানী ভাষায় কোরিয়ান, চীনা, এবং আইনু ভাষার শব্দ-প্রাচুর্য্য ইহার একটী নিদর্শন; তা'-ছাড়া, জাপানীদের মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন গঠনের লোকও আছে। তবে, জাপানীরা 'নেশন' হিসাবে প্রধানতঃ অভিজাত এবং সাধারণ এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহারা দুইটী বিভিন্ন নরজাতির পরিচায়ক; প্রথমটী মঙ্গোলীয় ও এবং দ্বিতীয়টি মালয়ান। ইহারা ছাড়া আইনু জাতীয় লোকও জাপানীদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়।

জাপান প্রাচ্য-জগতের গৌরব। জাপান বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর শক্তি সমূহের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইলেও, পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়ে নাই। রাজকর্ম্মচারীরা এবং যাঁহারা পাব্‌লিক-ম্যান বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা বাহিরে ইউরোপীয় পোষাক পরিহিত থাকিলেও, গৃহে ফিরিয়াই তাহা ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের নিজস্ব জাতীয় পোষাক পরিধান করিয়া থাকেন, এবং তাহাতেই যাহা কিছু আরাম অনুভব করেন। জাপানী মহিলারা তাঁহাদের জাতীয় পোষাক "কিমোনো" ছাড়িয়া এখনও মেম সাহেব সাজেন নাই। এই "কিমোনো" পরিহিতা জাপানী মহিলাগণকে ঠিক যেন পরীর মতন দেখায়। জাপানীরা আমাদের মত মাদুর-সতরঞ্চি-কয়াসে আসনপিঁড়ি হইয়া বসেন; কাযেই, বাড়ীতে কোট পেণ্টালুন পরিয়া থাকিলে তাঁহাদের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। জাপানীরা বৎসরে তিন বার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক বারের উপযোগী স্বতন্ত্র রকমের "কিমোনো" আছে। জাপানী মেয়ে পুরুষের পোষাক একই ধরণের, এমন কি ছেলেমেয়েরাও বয়স্ক ব্যক্তিদিগের মত পোষাক ব্যবহার করে; তবে কেবল তাহার আকার ছোট। "কিমোনো" একখানি কাপড়ে প্রস্তুত হয় এবং গলা হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বমান থাকে। ঋতুভেদে ব্যবহৃত কিমোনোর নামও বিভিন্ন প্রকার; এবং বাড়ীতে 'আটপৌরে' ও বাহিরে যাইবার সময় পোষাকী—এই দুইটী প্রভেদও আছে। এক প্রকার কোমরবন্ধ দ্বারা কিমোনো দেহের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হয়। এই কোমরবন্ধের নাম 'ওবি'। এই জিনিসটি মেয়েদের পোষাকের অপরিহার্য্য অঙ্গ। ইহার বন্ধন-প্রণালী বিচিত্র, এবং বন্ধনে কোন খুঁত থাকিবার যো নাই। স্ত্রীজাতির 'ওবি' বহুমূল্য—স্বর্ণ-মণি-রত্নাদি খচিত।

নিম্নশ্রেণীর জাপানীরা সর্ব্বাঙ্গে উল্কী পরিত। এখন গবর্ণমেণ্টের আদেশে এই প্রথা উঠিয়া যাইতেছে। ঘোড়ার সইস, পাল্কী-বেহারা প্রভৃতিকে তাহাদের প্রভুর সমক্ষে খালি গায়ে থাকিতে হইত বলিয়া দেহের অনাবৃত অংশ তাহারা উল্কীদ্বারা আচ্ছাদিত করিত। বুকে, পিঠে, উরুতে, স্কন্ধে, পক্ষী, ড্রাগন, পুষ্প ও সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগের মূর্ত্তি চিত্রিত করা হইত।

জাপানী শিশু, বিশেষতঃ মেয়ের পোষাক প্রজাপতির মত বিচিত্র ও উজ্জ্বল।

জাপানে শিশুর আদর খুব। এ সম্বন্ধে ছেলেমেয়ের মধ্যে কোনরূপ বাছবিচার করা হয় না। জাপানী শিশুর জন্মগ্রহণ কালে বাড়ীতে এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে মহা মহোৎসব পড়িয়া যায়। শিশুর জন্মগ্রহণ সংবাদ বিঘোষিত হইবামাত্র আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবেরা বিবিধ উপহার সহ শিশুর মুখ দেখিতে গমন করেন।

আমাদের দেশে যেমন বংশরক্ষা করা লোকের জীবনের

একটা প্রধান কার্য্য, জাপানেও ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা। সেখানে আবার জ্যেষ্ঠাধিকার ও পূর্ব্বপুরুষ-পূজার প্রথা বর্ত্তমান। এই কারণে সেখানে বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এই জন্য আমাদেরই মত, জাপানেও লোকে পুত্র-সন্তানের কামনা করে এবং পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে অনেক অনুষ্ঠান করা হয়।

জাপানী শিশুর জীবনের সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান—"মুজা মাইরী" বা মন্দির দর্শন। পুত্রের বয়স ৩১ দিন এবং কন্যার বয়স ৩৩ দিন হইলে তাহাকে স্থানীয় দেবমন্দিরে লইয়া গিয়া, দেবতার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করা হয়। এই সময়ে শিশুকে তাহার পিতামাতা নিজেদের সাধ্যমত সুন্দর পোষাক পরাইয়া দেন। শিশুর জননী দেবতার কাছে প্রার্থনা করেন, যেন শিশুর কোন অমঙ্গল বা রোগ না হয়। পুরোহিত শিশুর কোমরে রক্ষাকবচ বাঁধিয়া দেন। এই দিনে উৎসব হয়। শিশুর জন্মকালে যাঁহারা তাহাকে উপহার দিয়াছিলেন, এই দিন শিশুকে কোলে করিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহারা আবার উপহার দেন। প্রধানতঃ একটী জমানো কাগজের (papier mache) কুকুর উপহার দেওয়া হয়। জাপানীদের বিশ্বাস, কুকুর শিশুর দেহে শক্তি সঞ্চার করে এবং উহা শিশুর শিয়রে রাখিয়া দিলে উপদেবতার উৎপাতের আশঙ্কা থাকে না।

জাপানী শিশুর বয়স একশত নয় দিন পূর্ণ হইলে, শুভ দিন দেখিয়া তাহার অন্নপ্রাশন হয়। শিশুর মুখে প্রথম অন্নদান প্রথা অনেকটা আমাদেরই মত। এই দিন উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে ভোজ দেওয়া হয়। একটী নূতন ক্ষুদ্র পাত্র ক্রয় করিয়া অন্ন, ঝোল ও মৎস্য—সমস্তই গোটা তাহাতে রক্ষা করা হয় এবং একটু ঝোল লইয়া শিশুর ওষ্ঠে স্পর্শ করানো হয়।

জাপানে শিশুদিগের অনেকগুলি উৎসবের দিন আছে। তাহাদের বয়স তিন, পাঁচ ও সাত বৎসর পূর্ণ হইলে, যথাক্রমে তিনটী উৎসব হয়। প্রথমটি বালক ও বালিকা উভয়েরই উৎসব। এই সময়ে তাহাদের শৈশবের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া বয়স্ক ব্যক্তির উপযোগী 'ওবি' (ক্ষুদ্রাকারের) পরাইয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়টী কেবল বালকদিগের উৎসব। এই সময় হইতে তাহারা 'হাকামা' নামক পরিচ্ছদ পরিধান করিতে আরম্ভ করে। তৃতীয়টী 'চুল রাখা' উৎসব। শিশুকালে শিশুর মস্তক মুণ্ডিত করিয়া দেওয়া হয়; এই তৃতীয় উৎসবের পর হইতে তাহার চুল ক্রমাগত বাড়িতে দেওয়া হয়। তিনটী উৎসবের সময়েই শিশুদিগকে দেব-মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়।

শিশু ও যুবকদের আরও দুইটী প্রধান উৎসব আছে। প্রতি বৎসর তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিনে 'পুতুল-উৎসব' হয়। ইহার নাম 'ওহিনা মাট্‌সুরি'। ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই এই উৎসব পালন করিয়া থাকে। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত পুতুলসকল একটী কক্ষে সজ্জিত হয়; ক্ষেত্রবিশেষে শত-শত হইতে সহস্র-সহস্র পুত্তলিকা এই উপলক্ষে বাহির করা হয়। সুদক্ষ শিল্পীরা পুরুষানুক্রমে অতি যত্নে ও বহু পরিশ্রমে এই সকল পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। প্রধানতঃ রাজা-রাণী এবং রাজপ্রাসাদ সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনাই ক্রীড়নক রূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, বিবাহোৎসব 'কনে'র পোষাক প্রভৃতিরও পুতুল ও খেলানা নির্ম্মিত হয়। এতদুপলক্ষে চাউলের গুড়ার সহিত এক প্রকার বৃক্ষের পত্র ও 'সাকে' মদ্য মিশ্রিত করিয়া নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গকে ভোজন করিতে দেওয়া হয়। এই উৎসবটি চীনাদের নিকট হইতে গৃহীত।

বৎসরের পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে বালকদিগের 'টাঙ্গো-নো সেক্কু' উৎসব হয়। বৎসর আরম্ভ হইবার পর এবং উৎসবের পূর্ব্বে যে সকল বাড়ীতে পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছে, সেই সকল বাড়ীতে কাগজের 'কার্প' মৎস্য গড়িয়া আকাশে উড়াইয়া দেওয়া হয়। এইগুলি একটা করিয়া বংশদণ্ডের সহিত আটকানো থাকে। ইহারা ফাঁপা, হাওয়াতে ফুলিয়া উঠে, এবং হাওয়া বাহির হইয়া গেলে চুপ্‌সিয়া যায়। বংশদণ্ডগুলি বিচিত্র বর্ণের পতাকা ও কাগজের ফাঁপা গোলকে সজ্জিত থাকে। বালক যাহাতে অধ্যবসায়ী ও সাহসী হয়, এই উৎসবের ইহাই উদ্দেশ্য। কারণ, জাপানীদের বিশ্বাস, 'কার্প' মৎস্যের এই সকল গুণ আছে। মৎস্যকুলের মধ্যে ইহারাই ক্ষত্রিয়।

পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহ প্রধানতঃ নর-নারীর সম্বন্ধ, উহাতে সামাজিকতা অল্প, সমাজের সহিত উহাদের সম্বন্ধও কম। জাপানে নর-নারীর মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ, প্রাচ্য-দেশসুলভ পারিবারিক ব্যাপার। ইহার সহিত প্রেমের কোনও

সম্বন্ধ নাই। বংশ-রক্ষাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। জাপানে পূর্ব্বপুরুষ-পূজা প্রচলিত থাকায়, পূর্ব্বপুরুষদের জল-পিণ্ড বজায় রাখিবার জন্য বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা দরকার।

জ্যেষ্ঠ পুত্র বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইলে, জাপানী পিতা তাহার জন্য 'কন্যা'র অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে ঘটক নিযুক্ত হয়। এই ঘটক আইবুড়ো বা বিপত্নীক হইলে চলিবে না। ঘটক তাহার বন্ধুবান্ধবগণের মধ্য হইতে উপযুক্ত পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া দিলে, উভয় পক্ষের যথাক্রমে পাত্র ও কন্যা দেখিবার বন্দোবস্ত হয়। এই সময়ে পাত্র-পাত্রীর মধ্যেও শুভদৃষ্টি হইয়া যায়; অর্থাৎ পাত্র ও পাত্রী, তাহাদের নিজ-নিজ পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন ঘটকের নির্ব্বাচিত একটি স্থানে সমবেত হইয়া পরস্পরের সহিত দেখাশুনা ও আলাপ করে; ঘটকদম্পতিও এখানে উপস্থিত থাকে।

দেখাশুনার পর উভয় পক্ষের পাত্র-পাত্রী ও কুটুম্ব পছন্দ হইলে কথাবার্ত্তা অগ্রসর হয় এবং ঘটক উভয় পক্ষের কাছে বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করে। তাহার পর তত্ত্ব-তাবাস আরম্ভ হয়। ইহা আমাদের বাগ্‌দানের মত। জাপানে প্রথম তত্ত্বতাবাস বিবাহের মতই পবিত্র অনুষ্ঠান এবং ইহাতেই বিবাহের অর্দ্ধেক কাজ হইয়া যায়। জাপানী ভাষায় ইহার নাম 'য়ুইনো'। বর ও কন্যা উভয়েরই বাড়ী হইতে একই সময়ে মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি প্রেরিত হয় এবং বাহকেরা মধ্যপথে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করে। এই সাক্ষাৎ অতি শুভ লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। আজকাল জিনিসপত্রের পরিবর্ত্তে প্রত্যেক জিনিসের আনুমানিক মূল্য ধরিয়া নগদ টাকার আদান-প্রদান চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পর একজন দৈবজ্ঞের বাড়ী গিয়া পাঁজী-পুঁথি দেখিয়া শুভ-বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত হয়।

বিবাহের দিনের তিনদিন পূর্ব্বে, বরকন্যা বিবাহের পর যে বাড়ীতে বাস করিবে, কন্যার পোষাক এবং গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি সেই বাড়ীতে প্রেরিত হয়। এই সকল দ্রব্য কন্যাপক্ষের দেয়। (কন্যাদায় জাপানেও বড় কম দায় নহে!) কন্যার যাবতীয় পোষাক ছাড়া, বরকন্যার গৃহস্থালীতে যে কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইতে পারে, যথা খাট-বিছানা, রন্ধনশালার বাসনকোসন, বরের লেখা-পড়ার সরঞ্জাম, ঘর সাজাইবার আসবাব, প্রভৃতি সমস্ত জিনিসই এই সময়ে মেয়ের বাপ বরকে প্রদান করিয়া থাকে।

বিবাহের দিন ভোরবেলা কেশ-রচনাকারী আসিয়া কন্যার কেশবিন্যাসে প্রবৃত্ত হয়। জাপানে অনূঢ়া কন্যার কেশবিন্যাস এবং বিবাহের পর কেশবিন্যাস বিভিন্ন প্রকারের। এই দিনে কন্যা তাহার কুমারীজীবনের শেষ কেশবিন্যাস করিয়া থাকে। জাপানে রমণীগণের কেশরচনা বিশেষ পরিশ্রম ও কলাকৌশল সাপেক্ষ। কন্যার বিবাহের পোষাকও বহুমূল্য এবং বিশেষ ধরণের।

আমাদের দেশে বর কন্যার বাড়ীতে গিয়া বিবাহ করিয়া কন্যা লইয়া পরদিন ঘরে ফিরিয়া আসে। জাপানের প্রথা অন্য রকম। সেখানে বিবাহের দিন কন্যা তাহার পিতামাতা এবং পিত্রালয়ের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া পতিগৃহে আগমন করিলে তথায় বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হয়। এই সময়ে কন্যার পিতা কন্যাকে একখানি ক্ষুদ্র তরবারি উপহার দিয়া থাকেন, এবং সতীত্ব রক্ষার্থে বা সম্মান-রক্ষার্থে অথবা আত্মরক্ষার্থে প্রয়োজন হইলে এই তরবারি ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। (আজকাল আমাদের দেশে পথে ঘাটে নারীমর্য্যাদার যেরূপ অপমান হইয়া থাকে, তাহাতে, আমাদের মনে হয়, আমাদের সমাজেও নারীর মর্য্যাদা-রক্ষার্থে এইরূপ কোন প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত।)

সন্ধ্যাকালে কন্যাযাত্রা হয়; কন্যার পিতামাতাও কন্যা-যাত্রীস্বরূপ তাহার সঙ্গে গমন করিয়া থাকে। বরের পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন সদর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, বধূ, বৈবাহিক-বৈবাহিকা ও অন্যান্য কন্যা-যাত্রীদের অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। একটি কক্ষে বর কন্যার প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন। ঘটক-পত্নী কন্যার হাত ধরিয়া তাহাকে সেই ঘরে লইয়া গিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে বসাইয়া দেয়। এই ঘরে বেশী লোককে আসিতে দেওয়া হয় না—বর, কন্যা, তাহাদের পিতামাতারা, সস্ত্রীক ঘটক এবং কন্যার দুইটি সহচরী মাত্র এখানে থাকেন। ভাবী দম্পতির দীর্ঘজীবন, এবং উভয়ের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন প্রেম, পত্নীর পাতিব্রত্য, দাম্পত্য সুখ ও শান্তি প্রভৃতির কামনা সূচক বহুবিধ দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া থাকে এবং অনেক প্রকার অনুষ্ঠান করা হয়।

বড় ঘরানার বিবাহ-বেশ

জাপানী বিবাহ মধ্য শ্রেণীর (১)

জাপানী বিবাহ— মধ্য শ্রেণীর (২)

জাপানী বিবাহ-উৎসব

জাপানী শিশুদের খেলাধূলা

জাপানী শিশুর খেলনা উৎসব

জাপানী শিশুর উৎসব

বিবাহের যৌতুক

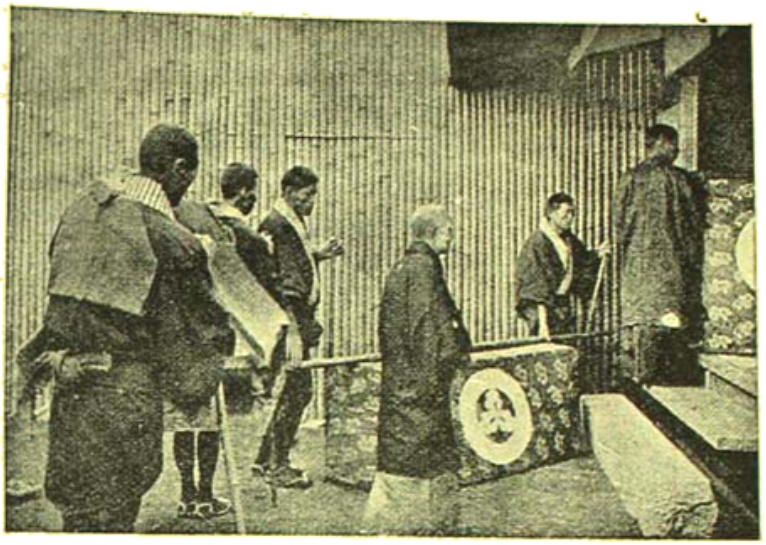

জাপানী কনের বিবাহের যৌতুক

জাপানী অভিবাদন-প্রথা

বর এবং কন্যা পরস্পরের সম্মুখে উপবেশন করিয়া থাকে। তৎপরে "তিন তিরিকে নয় বার" (সান্-সান্-কু-ডো) সাকে মদ্যপান করা হয়। পরে আবার একটি ক্ষুদ্র শ্বেত-কাষ্ঠনির্ম্মিত টেবিলের উপর ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি তিনটি মদ্যের পেয়ালা উপরি-উপরি রক্ষিত হয় এবং দুইটি কুমারী যথাক্রমে বর ও কন্যাকে এই মদ্য পরিবেশন করে। এইটিই বিবাহের সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান। ইহার পর বর-কন্যা যথাক্রমে পত্নী ও পতির আত্মীয়গণের সহিত পরিচিত হয়। অতঃপর বিবাহ-ভোজ। ভোজের সময় কন্যাকে অনেকবার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

জাপানী বিবাহে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান নাই। তবে আইনানুসারে পত্নী ও পতির পরিবার রাজসরকারে এই বৈবাহিক সম্বন্ধ রেজিষ্ট্রী করিতে বাধ্য, এবং পত্নীর নাম তাহার পিতৃগৃহের পরিবারবর্গের নামের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হয়, এবং পতির পরিবারবর্গের নামের তালিকাভুক্ত হয়। রেজিষ্ট্রী না হইলে কোন বিবাহই আইনসঙ্গত হয় না।

আজকাল "সিন্টো" বিবাহ নামে এক প্রকার বিবাহ-প্রথা জাপানে প্রচলিত হইতেছে। ইহাতে বর-কন্যা এবং তাহাদের আত্মীয়-স্বজনেরা টোকিও নগরের সূর্য্য-

জাপানী মহিলার পরিচ্ছদ

জাপানী স্বয়ংবীরের ছবি

দেবীর মন্দিরে সমবেত হয় এবং শ্বেতাম্বর পুরোহিতগণকে সাক্ষী রাখিয়া "তিন তিরিক্ষে নয় বার" মদ্য পান করা হয়। সেই সময়ে পুরোহিতেরা সূর্য্যদেবী এবং জাপানী সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টি-কর্ত্রী ইজানাগি এবং ইজানামির উপাসনা করেন।

জাপানী বিবাহে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়—বিবাহের যৌতুক। বরকন্যার প্রয়োজনীয় সমস্ত পোষাক যৌতুক স্বরূপ প্রদত্ত হয়। প্রথমে শ্বেতবস্ত্রাদিই সংগৃহীত হয়। তৎপরে বরকন্যা নিজের নিজের পছন্দমত ঐ সকল বস্ত্র বিভিন্ন রংয়ে রঞ্জিত করিয়া লয়। এই উপহার-গুলি বাঁধিবার প্রথাও অতি বিচিত্র ও অদ্ভুত। বন্ধনের জন্য এক শ্রেণীর পেশাদার লোক আছে। যে সে লোকে এই বিবাহের উপহার-দ্রব্য সাজাইতে বা বন্ধন করিতে ভরসা করে না এবং অনুমতিও পায় না।

ভাবের অভিব্যক্তি

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]

পতি পরম গুরু

প্রথম অঙ্ক

স্বামিন্! তুমি যাইবে—যাও, কা'র সাধ্য তোমায় বাধা দেয় !! তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিবে—আমি সকলই সহ্য করিব।
'পতি পরম গুরু' ইহা কি আমরা ভুলিতে পারি ?

দ্বিতীয় অঙ্ক

এমনি করিয়াই একদিন তোমায় হারাইব ! গত রাত্রে কখন আসিয়া পড়িয়া আছ, তাহাও জানিতে পারি নাই। পোড়া অদৃষ্টে প্রাণ ভরিয়া সেবা করিবার ও অদৃষ্ট করি নাই। এস স্বামিন্!
তোমার সেবা করিয়া নারী-জন্ম সার্থক করি।

তৃতীয় অঙ্ক

গতরাত্রে অনিয়ম করিয়াছ ; আজ চারটি ভাত খাও, আমি বাতাস করি।
কি, বিরক্ত হইতেছ ? তা' হও, কিন্তু আমার মাথা খাও, আর
চারিটি ভাত খাও। নোয়া-সিন্দুর নষ্ট করিয়া আমার
সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করিও না স্বামিন্ !

চতুর্থ অঙ্ক

গহনা লইতে আসিয়াছ ? স্বামীকে স্ত্রীর অদেয় কি আর আছে ?
তোমার সাধে বাধা দিয়া কেন নরকে যাইব ? এই লও স্বামিন্ !
আমার যথাসর্ব্বস্ব লও। 'পতি পরম গুরু'
ইহা কি আমরা ভুলিতে পারি !!

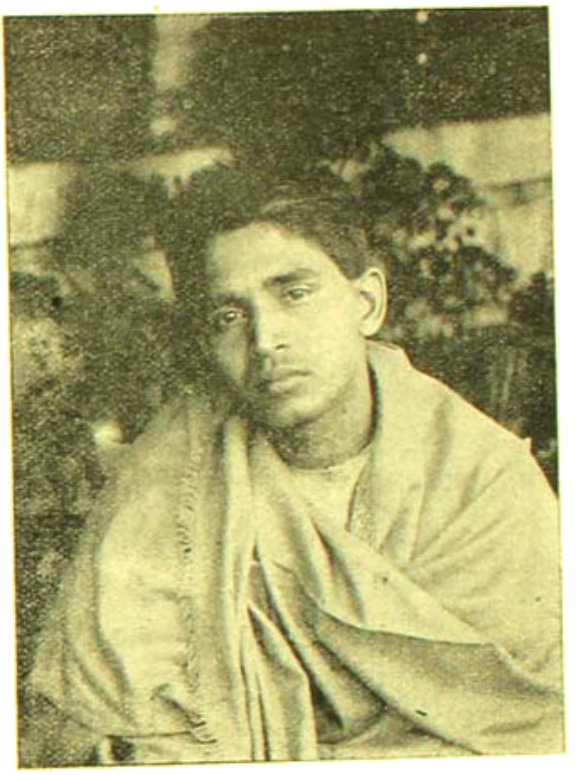

কুটিলাভিনতি

লোলুপ দৃষ্টি

যাব

[মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর]

কত, শ্রাবণ-নিশার নিবিড় আঁধারে
যেতে অভিসার পথে,
চল চপলার চকিত আলোকে
চলিয়াছি কোন মতে ;
পদে পদে পথ বেড়িয়া রয়েছে
কাল বিষধর ফণী,
আকুল চরণে চলিয়াছি, তারে
মণি মঞ্জীর গণি।

আজি, এসেছে শরৎ, ঝরিয়া পড়িছে
চাঁদের অমিয়রাশি,
যমুনার কূলে নীপতরুমূলে
বাজিয়া উঠেছে বাঁশী ;
নিধু নিকুঞ্জে পুষ্পে পুষ্পে
ফুটিয়া উঠেছে দুল,
মধুর পিয়াসে দলে দলে আসে
মাতাল মধুপ কুল ;
সুচির আশার রাসের রজনী
এসে বুঝি বয়ে যায়,
ঐ শুন সখি কানুর মুরলী
সাধা রাধা নাম গায়।

তোমরা না যাও নাই যাবে, শুধু,
একাকিনী আমি যাব,
গোকুলের কুল যায় যদি, সখি,
অকূলে ত কূল পাব।

বুদ্ধিমান্

(জাতীয় গৌরব-গীতি)

[কাশীর কিঞ্চিৎ'কার প্রণীত]

আমরা (এক) বুদ্ধিমানের দল্ ;—
অবতীর্ণ বসুধামে, ধ'রাতে লোকের দোষ আর ছল্।
তোমার—গুণ থাকুক না হাজার,
তাতে—হই বরং বেজায় ব্যাজার,
ছুঁচের মত ছিদ্র পেলেই, বাড়াতে তায় চালাই কল্।

যদি, নাও থাকে তোমার দোষ,—আমরা করি সেটা সৃষ্টি,
সে কষ্টটা নিয়েই থাকি, যদি করলুমই কৃপাদৃষ্টি,
আমাদের রাখতে তুষ্ট,
অন্ততঃ খোসামোদ ঘুষ্‌টো—
যে না দেয়,—সে দেখতে পায় তার হাতে হাতে ফল্!

এত বড় কাজটা—কেবল পরের তরেই করি,
নিজের দিকে ভুলেও না চাই,—পরের তরেই মরি!
কার্ কি দোষ—কার্ কি খুঁৎ
কার কি ছিদ্র—কার্ কি ছুঁৎ,—
বুদ্ধির জোরে ধ'রে ধ'রে,—বাইয়েদি সাতঘাটের জল্।

দেখ না, ঐ মধুঘোষটা—ক'রতে গেল কি না ইস্কুল!
আমরা থাকতে সে কস্থতে যায়,—এমনি সেটার বুদ্ধিটা স্থূল;
আমরা যা না ক'রে থাকি,—
অন্যে করবে,—সইব না কি?
এমন কুনাম্ রটিয়ে দিলুম,—গেল মধু রসাতল্!

কন্যাদায়ে পাগল্ হ'য়ে দেখ্‌ছিল' শিবু অন্ধকার,
কাতর হ'য়ে, পুত্র দিতে সাধটা হল সারধার ;
এমন উড়িয়ে দিলুম কুচ্ছ,—
ফিরতে হ'ল গুটিয়ে পুচ্ছ!
উচিত কি ছিল না শিবুর,—না হয় একবার মোদের বল্?
আমাদের না-ব'লে কি ক'রছিল বাপের শ্রাদ্ধ!

কর্ম্মবাড়ীর নাই টুঁ শব্দ,—
এমনি করেছিলুম জব্দ!
অর্দ্ধ পথেই বরে সবাই,—জাত দেব কি?— ফিরে চল্।

কাকুকে কেউ বলে, বড়—বড়ই বাজে প্রাণে,—
তার ওপর তার গুণ গাইলে,—বিষ ঢালে যেন কাণে ;
কাঁটা যেন ফোটে দেহে,—
আমরা থাকতে—বড়টা কে হে?
ব'ল ত দাদা,—
পরের ভাল শুনলে, কার না—জ্বলে ওঠে ঈর্ষানল?
আমরা যে বুদ্ধিমানের দল।

বস্ত্র-সঙ্কট হইতে উদ্ধার

[রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম-এ]

১। অভাব কিসের ? বস্ত্রের না সূত্রের ?

বর্ত্তমান বস্ত্র-সঙ্কট সকলেই অনুভব করিতেছেন। সংবাদ-পত্রে পড়িয়াছি, এই হেতু আত্মহত্যা হইতে হাটের কাপড় লুট হইয়া গিয়াছে। আরও লোমহর্ষণ কাণ্ড হইয়াছে, যাহা অতিশয় দরিদ্র দেশেই সম্ভবে। এরূপ ঘটনা আর যে না ঘটিবে, এমন বলিতে পারা যায় না ; কারণ, যুদ্ধ এখনই থামিতেছে না। থামিলেও, বিলাতী কাপড় সস্তা হইবে না। এদিকে শীতকাল আসিতেছে। গ্রীষ্মে কেবল লজ্জা-নিবারণ ; শীতে শীত-নিবারণও করিতে হইবে। লোকের কষ্টের অবধি থাকিবে না।

বস্ত্র-সঙ্কট হেতু আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কারণ আকস্মিক নহে। যেখানে কার্য্য-কারণ স্পষ্ট দেখা যায়, সেখানে আশ্চর্য্য কি থাকে ? আশ্চর্য্য এই যে, বঙ্গদেশে এমন কেহ নাই, যিনি পূর্ব্ব হইতে দেশকে সাবধান করিয়া দিতে পারিতেন। বিলাতের ইংরেজ মন্ত্রী পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, যুদ্ধ কবে থামিবে, কেহ বলিতে পারে না। যুদ্ধ-হেতু আমাদের কোথায় কোন্ বিষয়ে টান বা অভাব পড়িবে, তাহা ভাবিবার গণিবার কেহ ছিল না। অর্থনীতি-শাস্ত্রে বাঙ্গালীর বুদ্ধি খেলে না। বাণিজ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ও অন্তরায় বুঝিতে গেলে বণিক হইতে হইবে, এমন কথাও নাই। অবশ্য বস্ত্র-বণিক যত সহজে এই বিষয় কার্য্য-গতিকে বুঝিতে পারে, অন্যে তত সহজে পারে না। শুনিতে পাই, এক-একজন পূর্ব্ব সঞ্চয় হেতু, বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। তথাপি সাধারণে বস্ত্রের অনাটন বুঝিতে পারে নাই। পারিলে এখন যে সব উদ্‌যোগ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে হইত, বস্ত্রের অত্যন্তাভাব ঘটিত না। উদ্‌যোগের মধ্যেও দেখিতেছি, কাপাস-চাষ সুরু হইয়াছে, চরকা গড়া হইতেছে, কোন কোন জেলা-বোর্ড এবং অন্য সদাশয় সজ্জ কাপাস-বীজ বিতরণ করাইয়াছেন, কেহ বা সস্তায় চরকা বিক্রয় করাইতেছেন। ইহা মন্দের ভাল বটে, কিন্তু প্রচুর কি ? বাস্তবিক কিসের অভাব, কাপড়ের না সূতার ? বঙ্গ ছাড়া অন্য প্রদেশে কাপড়ের জন্য এত কষ্ট হয় নাই কেন ?

সকলেই জানেন, দেশে কাপড় বোনার লোকের অভাব নাই। তাঁতী ও জোলা এত আছে যে, কাপড় বুনিবার সূতা পাইলে অন্ততঃ মোটা কাপড় যোগাইতে পারিত। মানভূম ও ওড়িষ্যায় দেখিতেছি, কাপড়ের দাম পূর্ব্বাপেক্ষা চড়িয়াছে বটে, কিন্তু আত্মহত্যা করাইতে পারে এত চড়ে নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধানে বুঝিয়াছি, সাধারণ লোকে বিশেষতঃ দরিদ্রে দেশী তাঁতে বোনা মোটা কাপড় ছাড়ে নাই। মোটা কাপড় বেশী টেকে, বেশী দাম দিয়াও কিনিলে মোটের উপর বেশী পড়ে না।

বাঙ্গালাদেশ সৌখীন হইয়া পাতলা কাপড় পরিবার অভ্যাস করিয়া কষ্টে পড়িয়াছে।

পূর্ব্বকালে, বিলাতী কাপড় চলিবার পূর্ব্বে, দেশে কাপড় যে সস্তা ছিল, তাহা নহে। বিলাতী কাপড়ে যুগান্তর আনিয়াছে। সরু সূতার লম্বা লম্বা ধুতি শাড়ী সকলকে পরাইবার প্রলোভনে ফেলিয়াছে। কোনও পুরুষ খাদী পরিতে চায় না, কোনও মেয়ে দরিদ্র হইলেও ঠেঁটী পরিবে না। কিন্তু খাদী ও ঠেঁটী পরাই পূর্ব্বকার রীতি ছিল। সে কারণে কেহ লজ্জা অনুভব করিত না। এখন যেমন জামা ও জোড়া নইলে 'ভদ্র' লোকের মান থাকে না, পূর্ব্বকালে তেমন ছিল না। এই যে বড়মানুষি চাল, ইহাতেই আমাদিগকে কষ্টে ফেলিয়াছে।

এখন আড়াই হাত বহরের দশহাতী ধুতি শাড়ী, তাও সরু পাতলা, পরিতে অভ্যাস করিয়া সম্প্রতি এত ক্লেশ পাইতেছি। আশ্চর্য্য এই, আমরা যাহারা মোটা ধুতি পরিতে পারি না, কারণ সে কাপড় কর্কশ ও ভারী, তাহারাই মোটা কাপড়ের কোট পেণ্টুলেন অক্লেশে পরিতে পারি। গ্রীষ্মের গলদ্‌ঘর্ম্মে কিছু মাত্র অস্বাস্থ্য বোধ করি না।

পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি, বস্তুতঃ কাপড়ের অভাব নয়, অভাব সুতার। দেশে সুতা কই? সুতায় পাওয়া যায় কই? কাপড়ের উপাদান সুতা। সুতার উপাদান অংশু। অতএব যিনি 'স্বদেশী', তিনি প্রথমে অংশুর, পরে সুতার, পরে কাপড়ের চিন্তা ও আয়োজন করিবেন। ইহাই ত স্বাভাবিক প্রকরণ। বঙ্গদেশে 'বঙ্গলক্ষ্মী' কাপড়ের কল বসিল। একটী মাত্র কল, তাহাও উল্টা দিক দেখিয়া বসিল। কেবল সুতা না কাটিয়া কাপড়ও বুনিতে লাগিল, যেন দেশে তাঁতী ছিল না। সুতা কাটিতে লাগিল বটে, কিন্তু তুলার জোগাড় করিল না। শুধু বঙ্গে নহে। বলি, সে 'স্বদেশী' কাপড় কেমন, যাহার সুতা বিদেশী, তুলা বিদেশী। একটা বিপুল ব্যবসায়ের গোড়া ছাড়িয়া আগায় হাত দিয়া আমরা ধন্য হইতেছি।

কেহ কেহ বলিবেন, গতস্য অনুশোচনায় ফল নাই। আমি বলি ফল আছে। বর্ত্তমানে গোড়া এমন পত্তন করিতে হইবে, যাহাতে ভবিষ্যতে অনুশোচনা করিতে না হয়। সকলেরই স্মরণ কর্ত্তব্য যে, অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, এই তিনের একটীর অভাব হইলে দেশের বিপদ। যাহাতে দেশ এই তিন বিষয়ে আত্মবশ হইতে পারে, তাহাতে মন দেওয়া কর্ত্তব্য।

আত্মনিন্দাও প্রচুর হইল। এখন অংশু ও সুতা ও কাপড়ের জোগাড় দেখা যাউক। অংশু সংগ্রহ বার্ত্তার বিষয়। সূত্র-নির্ম্মাণ ও বস্ত্রবয়ন দুইটী কলা। এই তিনের যোগে বস্ত্রের ব্যবসায় (industry)। বস্ত্রশিল্প দূরে থাক্, এই দুর্দ্দিনে যেমন-তেমন কাপড় পাইলেও রক্ষা।

২। সূত্রোপযোগী অংশু

এখন লোকে কাপাস-সুতাই জানে। এই হেতু কাপাস-চাষ করিতে বলা হইতেছে। কিন্তু কাপাস-সুতা ছাড়া পরিধেয় বস্ত্রোপযোগী অন্য সুতাও আছে। দুর্ভিক্ষের সময় যেমন 'ধান' 'ধান' না করিয়া গম, যব, আলু প্রভৃতি অন্য খাদ্য-শস্যেরও আয়োজন কর্ত্তব্য, সূত্রাভাবের সময় কেবল কাপাস-সুতার প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টি না করিয়া, অন্য সুতা সংগ্রহের চেষ্টা আবশ্যক। কবে কাপাস জন্মিবে, ভাল জন্মিবে কি না, কে জানে? যত চাষ হইতেছে, তাহাও ত পর্য্যাপ্ত হইবে না। সংবাদপত্রে দেখিতেছিলাম, বিদেশী তুলা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরে যত আসিয়াছিল, এখন তাহার বার আনা আসিতেছে। পরেও যে এই পরিমাণে আসিতে থাকিবে, তাহাও ত কেহ জানে না। তা ছাড়া, দেশের তুলা হউক, বিদেশেরই হউক, দেশের কাপাস-সুতার কল বন্ধ হইলেও বিপদ। যে তুলা কলে কাটা হইত, তাহা চরকায় কাটিতে গেলে লাভ কি? অতএব কাপাস-তুলা ছাড়া অন্য অংশুর যোগাড়ও কর্ত্তব্য। বরং এমন অংশু যাহা কাটিবার কল নাই। তেমন অংশু পাইলে, চরকা দ্বারা সুতা কাটাইতে পারিলে, দেশের মোটা সুতা বাড়িতে পারিবে।

নূতন কিছু করিবার পূর্ব্বে এ দেশের বস্ত্রের ইতিহাস অবলোকন কর্ত্তব্য। * কারণ, এককালে যাহা ছিল, তাহার পুনরুদ্ধার সহজ হইতে পারে। অমরকোষাদি গ্রন্থে দেখা যায়, পূর্ব্বকালে অজিন (চর্ম্ম) ব্যতীত চারি প্রকার উপাদানে বস্ত্র নির্ম্মিত হইত। যথা, (১) রোম, যেমন কম্বল, শাল; (২) কোষকীট, যেমন পাট ও তসর; (৩) বল্কল, যেমন শণ; (৪) ফল, যেমন কাপাস। আজিকালি অজিন চলিবে না, কেহ পরিতে চাহিলেও তাহার দাম কম হইবে না। উক্ত চতুর্বিধ উৎপত্তি ধরিয়া অংশু বলিতেছি।

(১) লোমজ বস্ত্র। বস্ত্রোপযোগী রোমের নাম ঊর্ণা। বঙ্গদেশ ঊর্ণার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না। গ্রীষ্মদেশ ঊর্ণা উৎপাদনের অনুকূল নহে। তথাপি যখন শীত নিবারণের জন্য কম্বলাদি, লোমজ বস্ত্র বিশেষ উপযোগী, এবং শীতকাল আগত-প্রায়, তখন কম্বলের দিকেও দৃষ্টি আবশ্যক। যাহাতে উৎপন্ন মেষলোমের কিছুমাত্র অপচয় না হয়, তৎবিষয়ে চেষ্টা কর্ত্তব্য। কারণ, আবার বলি, এক কাপাস কাপড়ের দিকে তাকাইয়া থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে না।

(২) কৃমিজ বস্ত্র। বন্য কীট হইতে জন্মিলে কৌষেয় বা তসর, পালিত কীট হইতে জন্মিলে পট্ট বা রেশম। এরণ্ডী, সামান্য তসর, কাটা গুটি হইতে কাটিয়া বা কেটো,

* যাহারা প্রাচীন কালের বস্ত্র জানিতে চাহেন, তাঁহারা আমার লিখিত *Textile Industry in ancient India* in the Journal of the Bihar and Orissa Research Society, 1917, পড়িতে পারেন।

এবং আসামের এণ্ডী ও মুগা—এ-সকলের যাহাতে প্রচুর উৎপাদন হয়, তাহা দেখা নিতান্ত আবশ্যক। সকলেই জানেন, তসরের মতন টেকসই কাপড় আর নাই। লোকে বলে,

পরে তসর খায় ঘি
তা'র আর খরচ কি।

তসর কাপড়ের দাম অবশ্য বাড়িয়াছে, কিন্তু বোধ হয় কার্পাস কাপড়ের তুল্য বাড়ে নাই। বাড়ুক আর নাই বাড়ুক, যাঁহারা পারেন, তাঁহারা কার্পাস কাপড় কম করিয়া, কিছু দিন-তসর কাপড় পরুন। ইহাতে যাহাদের টাকা নাই, তাহাদের পক্ষে কার্পাস কাপড় সুলভ হইবে। গরদের দাম চিরদিনই অধিক। তথাপি ধনবানেরা তসর ছাড়িয়া কিছু দিন গরদ পরিলে, অপরের পক্ষে তসর সুলভ হইবে। তসরের কাটিয়া এবং পাটের মটকা ব্রাহ্মণ ও হিন্দু বিধবা পরিয়া থাকেন। অন্যে পরিলে নূতন কিছু করা হইবে না।

(৩) গাছের বাকল বা বল্কাংশু। গাছের বাকল হইতে অংশু বাহির করিয়া পরিধেয় বস্ত্র হইত। ইদানী আমরা শণ এবং জুট, মাত্র এই দুই গাছের অংশু বাহির করিতেছি। যে প্রাচীন কালের কথা বলিতেছি, সে কালে জুটের অংশু প্রসিদ্ধ ছিল না; অন্ততঃ ইহার অংশু হইতে কোনও প্রকার বস্ত্র হইত না। আমার বিশ্বাস জুটের চাষ বেশী দিনের নয়। কিন্তু শণের চাষ বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইদানী জুটের বাহুল্যে শণের চাষ কমিয়া আসিতেছে। সে যাহা হউক, কোন কালে কেহ শণের কাপড় পরিত কি? সে কালে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী যে শণের বস্ত্র পরিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অদ্যাপি ওড়িষ্যায় উপনয়ন সময়ে ব্রাহ্মণকুমার শণ-বস্ত্র পরিয়া থাকেন। এই বস্ত্র গুণ-চট নহে, সরু বাটিয়া বা বেটো দিয়া বোনা জালের তুল্য কাপড়। এ কালে এমন কাপড় চলিবে না। সে কালেও চলিত না। সেকালে অপর দুই গাছের ছালের অংশুর কাপড় বহু প্রচলিত ছিল। একটি অতসীর কাপড়, অপরটি ভাঙ্গ গাছের অংশুর কাপড়। প্রথমটি ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়টি লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। ইই দুই সম্বন্ধে একটু বিস্তার করিতে হইতেছে।

(ক) অতসীর কাপড়। অতসী গাছের চলিত নাম তিসী। ইহার বীজ মস্থণ বলিয়া, মসিনা নামে খ্যাত। ভারতবর্ষে মসিনার চাষ বিস্তর আছে, কিন্তু সব তেলের জন্য চাষ। বিহারের মধ্যে চম্পারণ জেলায়, এবং বঙ্গের মধ্যে নদীয়া জেলায় মসিনার চাষ প্রসিদ্ধ। অতসীর হিন্দী নাম অলসী। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্জাবে "অলসীকা কাপড়া" নামটি মাত্র আছে। বস্ত্রটি নাই। অতসী গাছের এক সংস্কৃত নাম ক্ষুমা। ক্ষুমাজাত বস্ত্রের নাম ক্ষৌম। এই শব্দের অপভ্রংশে বাঙ্গলা খুঞা নামের উৎপত্তি হইয়াছিল। পশ্চিম-বঙ্গের কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে এবং পূর্ব্ব-বঙ্গের পদ্মাপুরাণে খুঞার উল্লেখ আছে। সে তিনশত বৎসরের পূর্ব্বের কথা। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের ভারত-চন্দ্রেও খুঁয়া তাঁতী নাম আছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ক্ষৌম বস্ত্র প্রসিদ্ধ ছিল। সেকালে কার্পাস বস্ত্র তত ছিল না। সূক্ষ্ম ক্ষৌম-বস্ত্রের নাম ছিল দুকূল।

সংস্কৃত পণ্ডিতের নিকট এই দুই শব্দ সুজ্ঞাত আছে। কিন্তু উত্তর কালে এই দুই বস্ত্র অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছিল। আমার বোধ হয়, কার্পাস বস্ত্রের বাহুল্যে সেকালের "ক্ষৌম" ও "দুকূল" লুপ্ত হইয়াছিল। লোকে এই দুয়ের উৎপত্তি ভুলিয়া গেল। যা-নয় তাই কল্পনা করিয়া ক্ষৌম হইয়া গেল, শণ, এবং দুকূল হইয়া গেল, পট্ট! বঙ্গদেশে অতসী গাছটাও শণের তুল্য এক গাছ হইয়া দাঁড়াইল! এখন অতসী কাপড় কেহ জানে না, শোনেও নাই। অতএব দুই একটা ইংরেজী শব্দ ও ইউরোপের অতসীর কাপড় বলিতে হইতেছে। অতসী গাছের ইংরেজী নাম Flax, ইহার ছালের সূতার নাম Line এবং কাপড়ের নাম Linen। আয়র্লাণ্ড ও বেলজিয়ম দেশে উত্তম বস্ত্রোপযোগী অতসীর চাষ হয়। ফ্রান্স, হলণ্ড, রুষিয়া, জর্ম্মণী ও অষ্ট্রীয়ায় অতসীর চাষ হয়, কিন্তু তত উত্তম নহে। ভারতে যাহা ঘটিয়াছিল, ইউরোপেও তাহা ঘটিতেছে। কার্পাস তুলার প্রাচুর্য্য হেতু অতসী চাষ ও কাপড় কমিয়া আসিতেছে।

চাণক্যে দেখা যায়, খ্রীষ্টের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের দুকূল শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইত। বঙ্গের দুকূল কোথায় গেল! ক্ষৌমই বা কোথায় গেল! সেকালে পট্ট (রেশম) ও ক্ষৌমের (তসর, এণ্ডী, মুগা) জন্য বঙ্গ প্রসিদ্ধ ছিল, এবং অদ্যাপি আছে। কিন্তু সে ক্ষৌম নাই, কার্পাসও নাই। অতসী নামেই প্রকাশ, ইহার অংশু সহজে ছেঁড়ে না।

(সংস্কৃত তস্ ধাতু অর্থে উপক্ষয়, বস্ত্রহানি)। অতসীর কাপড় ছিঁড়িয়াও ছেঁড়ে না। দুকূলকে পট্ট ভ্রম করাতেই প্রকাশ, অতসীর কাপড় কত সূক্ষ্ম হইতে পারে।

এখন উপস্থিত কাজের কথা হউক। দেশে মসিনার চাষ হইতেছে, অংশুর নিমিত্ত নহে। যে গাছে মসিনা ভাল জন্মে, সে গাছে উত্তম অংশু জন্মে না। প্রকৃতির বিধানই এই। মসিনার নিমিত্ত চাষ করিতে হইলে বীজ পাতলা বুনিতে হয়, নতুবা ডাল বেশী হয় না, ফলও বেশী হয় না। অংশুর নিমিত্ত চাষ করিতে হইলে বীজ ঘন বুনিতে হইবে। তাহাতে গাছ লম্বা হয়, গাছে ডালও বেশী হয়। তিসী বুনিবার সময় হইয়াছে। আমি বলি, অংশুর নিমিত্ত তিসীর চাষ করিলে, দেশের বর্ত্তমান দুর্দিনে কিছু হিত হইতে পারে। যে বীজ পাওয়া যায়, এ বৎসর তাহাতেই চলিতে পারে। আমি বাজারের মসিনা নিকৃষ্ট জমিতে—বেলে মাটিতে বুনিয়া দেখিয়াছি, অংশু মন্দ হয় নাই। গাছ এক হাতের অধিক উচ্চ হয় নাই বটে, কিন্তু সেটা মাটির দোষ। শণ এবং জুট গাছের যেমন ফল ধরিবার পূর্বেই গাছ না কাটিলে ভাল অংশু পাওয়া যায় না, অতসী গাছেরও তেমন। যখন গাছের নীচের পাতা হলুদা হইয়া ঝরিতে আরম্ভ করে, সেই সময়েই না কি অতসী কাটিবার উত্তম কাল। আমি ফুল ধরিবার পূর্বে ও বীজ হইবার পরে অতসীর অংশু দেখিয়াছি। পূর্বের অংশু যত সূক্ষ্ম, পরের অংশু তত সূক্ষ্ম হয় নাই। অন্যান্য গুণে দুই সমান। অতএব তিসী কাটিবার সময়ের একটু ইতর-বিশেষে অধিক যায় আসে না। গাছ কাটিবার পর শণ ও জুটের মতন স্থির জলে পচাইয়া জলে আছড়াইয়া কাচিয়া অংশু পৃথক করিতে হইবে। এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য। তথাপি সামান্য ভাবে দুই এক কথা লেখা আবশ্যক।

শণ, জুট, অতসী, মেস্তা, ভাং, বিছাটী প্রভৃতি অংশুদ গাছ কাটিলে পাঁচটি অংশ দেখা যায়। (১) বাহিরে একটা পাতলা ত্বক্ (২) ভিতরে অংশুময় অংশ (৩) ভিতরে একটা কোমল অংশ (৪) ভিতরে কাষ্ঠ (৫) সকলের মধ্যে কোমল মজ্জা। এই পাঁচ অংশের মধ্যে আমরা চাই দ্বিতীয় অংশ। সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম অন্তর্বল্কল ছিল। নাম যাহাই হউক, এই অংশটি পৃথক্ করা প্রথম কাজ। জলে পচাইলে সন্ধান-ক্রিয়া (Fermentation) হেতু উক্ত তৃতীয় কোমল অংশ পচিয়া যায়। এই হেতু অংশুময় অংশ কাষ্ঠ হইতে পৃথক করিতে পারা যায়। অংশু পৃথক হইলেও কর্ত্তনোপযোগী হয় না। কারণ তখনও দুইটি দোষ থাকে। (১) ত্বক সব দূর হয় না। (২) অংশুগুলি পরস্পর পৃথক না হইয়া, গাছে যেমন পটীর আকারে থাকে, প্রায় তেমনই থাকে। কাষ্ঠির টুক্‌রা, ধূলামাটি কাদাও লাগিয়া থাকে। কাষ্ঠি হইতে অংশু পৃথক করা হইলে, তাহাকে মুগুরে পিটিয়া, ঝাড়িয়া, মুড়িয়া, আবর্জনাহীন করিতে হইবে।

ইহার অংশুর সূক্ষ্মতার একটা পরিমাণ দিই,—একখাই রেশম যত সূক্ষ্ম—অতসীর একখাইও তত সূক্ষ্ম। একটা আঠার মত দ্রব্য থাকাতে অংশগুলি পরস্পর সংলগ্ন থাকে। জলে পচাইলে এই আঠা কিঞ্চিৎ গলিয়া যায়,—কিন্তু সব যায় না। খরচায় পোষাইবে কি না জানি না। ক্ষার জলে লতা পাতা ভস্মের অংশুর পটী ফুটাইলে আঠাটা দূর হয়। কিন্তু বেশী ক্ষার দেওয়া উচিত হইবে না। ইদানী কাপাস কাপড় সোডা দিয়া কাচাতে জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। বেশী সোডা দেওয়াতে সময়ের লাঘব হয় বটে, কিন্তু কাপড়ের পরকালেরও লাঘব হয়।

(খ) ভাঙ্গের কাপড়। বলা বাহুল্য ভাং গাছের সংস্কৃত নাম ভঙ্গা, অপর নাম সিদ্ধি। পূর্বকালে ইহার কাপড়ের নাম ভাঙ্গ বস্ত্র ছিল। এই বস্ত্রের প্রমাণের নিমিত্ত বেশী দূর যাইতে হইবে না। অদ্যাপি কুমায়ুন, গড়বাল প্রভৃতি অঞ্চলে কিছু কিছু হইতেছে। রাট্ সাহেব লিখিয়াছেন, সে সব অঞ্চলে পাঁচ আনা লোকে ভাঙ্গের কাপড় পরে। যদিও অনেকে "আল্‌মোরা কাপড়া" বলিয়া কৌম সম্বন্ধে পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই কাপড় ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। ভাঙ্গ সম্বন্ধে অধিক লিখিয়া ফল নাই, কারণ ভাং ও গাঁজার চাষ সরকারের হাতে। যদি সরকার বাহাদুর অংশুর নিমিত্ত কিছু গাছ ছাড়িয়া দেন, সে স্বতন্ত্র কথা। আমি বাজারের ভাঙ্গের বীজ হইতে গাছ করিয়া অংশু দেখিয়াছি। সূত্র মন্দ হয় নাই। ইহার অংশু অতসী অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ও দৃঢ়। ফল ধরিবার পরে গাছ কাটিলে অংশুর সূক্ষ্মতা ও দৃঢ়তার হ্রাস হয়। সকলে জানেন ভাঙ্গের গাছ দ্বিবিধ। বিলাতে নর গাছের অংশুতে চাদর হয়, নারী গাছের অংশুতে দোড়ী হয়। ইটালী স্পেন প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্ম দেশে গাছ বড় হয়, বুঝিয়া জর্মনী অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি

শীত দেশে তত বড় হয় না। তাই কাপড় জলে শীঘ্র নষ্ট হয় না। ইহা এই কাপড়ের বিশেষ গুণ। এই হেতু তাই চাদর দিয়া আহাজের পাইল করা হইয়া থাকে।

(খ) এ দেশের প্রাচীন কালের বাস্ত বস্ত্রের মধ্যে ক্ষৌম ও তাঙ্গ-বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। একালে আরও কয়েকটা বাস্ত বস্ত্র প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে বিছাটী বস্ত্র প্রসিদ্ধ। বঙ্গদেশে লাল বিছাটী ও সাদা বিছাটী নামে দুই জাতি (জাত নহে) আছে। লাল বিছাটীর গাছ সোজা উঠে। ইহার ডাঁটা লালচা, ফল তে-আঁটিয়া। সাদা বিছাটীর গাছ লতাইয়া পড়ে। ইহার ডাঁটা সাদা, ফল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। এই বিছাটীর অংশু দিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র হয়। অংশুর নিমিত্ত চাষ করিতে হইলে, বীজ ঘন বুনিতে হইবে। রঙ্গপুরে কাঞ্চুরা নামে একটা গাছ জন্মে। ইহার আসামী নাম রিহা। এই গাছ সাদা বিছাটীর জাতি। ইহার অংশু ও চাষ সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে। আমি ইহার অংশু দেখি নাই। আমার গাছটি মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু বহিতে দেখিতেছি, ইহার ও বিছাটীর কাপড় উত্তম হইলে, সাদা গরদের মতন দেখায়, যেমন মসৃণ তেমন টেকসই।

(ঙ) আর এক গাছ সবাই জানি। আরও জানি, ইহার অংশুর তুল্য টানসহ দ্বিতীয় যোড়া নাই। ইহা সকলের জানা আকন্দ গাছ। ইহার অংশু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; ইহাতে পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতির সূত্র হইতে পারে। বীজ ঘন ঘন বুনিয়া গাছের ডাল কমানা যাইতে পারে। তখন অংশু পৃথক্ করা যেমন সহজ হইবে, অংশুও তেমন সূক্ষ্ম হইবে। বড় বড় গাছের অংশু একটু মোটা হয়। বোধ হয় আকন্দের অংশুর কাপড় অদ্যাপি অজ্ঞাত আছে।

(চ,ছ) পত্রাংশু। বল্কাংশু ব্যতীত পত্রাংশু আছে, যাহা দিয়া পরিবার কাপড় করিতে পারা যায়। কলা গাছের বাসনার অংশু হইতে কাপড় হইতে পারে, এ কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। আমি সে কাপড় দেখিয়াছি, হঠাৎ ক্ষৌম (Linen) বলিয়া ভ্রম হয়। তথাপি আমার বিবেচনায় কলার অংশু নিকৃষ্ট। ইহার কারণ পরে বলিতেছি। যদি উৎকৃষ্ট পত্রাংশু পাইতে হয়, তাহা হইলে বলিব আনারসের পাতার অংশু সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই অংশু দৃঢ়, অথচ অতিশয় সূক্ষ্ম। ৺নিত্যগোপাল মুখার্জি লিখিয়াছেন, দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রাম হইতে আনারসের অংশু রপ্তানি হইত, ধুতি চাদর বোনা হইত। কাপাস উহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু যখন কাপাসের অনাটন, তখন উহাকে পুনরুদ্ধার করিলে লাভ হইতে পারে। তিনি যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে দেখিতেছি আট নয় শত পাতায় একসণ হয়, এবং একমণ পাতা হইতে একসের পরিষ্কৃত অংশু পাওয়া যায়। আসাম প্রদেশ আনারসের দেশ। সেখানে আনারসী কাপড় করাইলে, আসামের অংশু-গৌরব বাড়িয়া যাইবে।

বল্কাংশু পৃথক করিতে যে উপায়, পত্রাংশু করিতে সে উপায় চলিবে না। কারণ পত্রের অংশু পটীর আকারে না থাকিয়া, কোমল মাংসে পৃথক পৃথক থাকে। অতএব পত্রের উপরের ত্বক ও ভিতরের মাংস দূর করিতে হইবে। এদেশ এখনও লোহার কল গড়িতে শেখে নাই। নাই শিখুক, হাতে খাটিবার মানুষ পাওয়া যায়। মুগুরে পিটিয়া পিটিয়া, জলে ধুইয়া, লোহার কুরণী দিয়া কুরিয়া অংশু বাহির করিতে পারা যায়। আখমাড়া লোহার কল সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। উহাতে পিষিয়া, মুড়িয়া নিষিয়া লইলে কাজ সংক্ষেপ হয়।

ভগবান ভারতভূমিতে এত অংশুর গাছ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদের একটু বুদ্ধি ও উদ্যোগ থাকিলে, অংশু বেচিয়া বড়লোক হইতে পারিতাম। জুট বেচিয়া পয়সা না করিতেছি এমন নহে, কিন্তু বিদেশে উহার আদর যতই হউক, আমাদের কাজের পক্ষে কিছুই নহে। জুটের অংশু স্থায়ী নহে, টানসহও নহে, রোদ-জলে পচিয়া যায়। জুট অপেক্ষা শণ বহুগুণে ভাল। কিন্তু এমনই দুর্দৈব, নিজেদের কাজের নিমিত্ত আবশ্যক শণ চাষ হেলা করিতেছি। কাপড়ের চিন্তার সময়েও বরং শণের কাপড় হইতে পারে, জুটের পারে না। পরিধানের কাপড়ের কতকগুলি গুণ থাকা চাই। যথা, ইহা কোমল, নমনীয়, মসৃণ, স্থায়ী, স্থিতিস্থাপক, ও সরু হইবে। দীপ্তিশালী ও শুক্লবর্ণ হইলে আরও উত্তম। কি উপাদান হেতু উল্লিখিত সাতটা অংশু বস্ত্রোপযোগী হইয়াছে, তাহার একটু আভাষ দিতেছি। কাপাস তুলাই ধরি। সবাই দেখিয়াছেন, নূতন কাপাস তুলা জলে শীঘ্র ভিজে না। উহার গায়ে একটা সূক্ষ্ম চর্ম্মবৎ বস্তু থাকে। কয়েকদিন জলে ভিজাইলে কিংবা

কার জলে ফুটাইলে সেটা দূর হয়। তখন যে তুলা হয়, তাহার উপাদানের নাম তু-লী-ন (Cellulose)। এই তুলীন হেতু কাপাস তুলার সূক্ষ্ম সূতা ও কাপড় হইতে পারে। বল্কাংশু ও পত্রাংশু, প্রথম উৎপত্তি সময়ে তুলীনে নির্ম্মিত হয়; কিন্তু পরে তাহার বিকারে কাষ্ঠ জন্মিয়া থাকে। কাষ্ঠের যে বিশেষ উপাদান হেতু তাহা কাষ্ঠ, তাহাকে কা-ষ্ঠ-ন বলা যাউক। অধিকাংশ অংশুতে কাষ্ঠীন জন্মে। সে অংশুর দোড়ী হইতে পারে, কিন্তু কাপড় করিলে কাপড়ের দোষ ঘটে। কতকগুলি অংশুতে কাষ্ঠীন অল্প, তুলীন অধিক। এ সকল অংশু বস্ত্রের পক্ষে মধ্যম। অপর কতকগুলির প্রায় সব তুলীন, সেগুলি উত্তম। কারণ কাপাস তুলার আকারে না থাকিলেও উপাদানে এক। তুলীনের ভাগ অনুসারে কাগজও উত্তম বা অধম হয়। অংশু বুনিয়া কাপড়, আঠা দিয়া জমাইয়া কাগজ। নিকৃষ্ট কাগজ টান সয় না, তাঁজ সয় না, আলো ও ভিজা বায়ু সয় না।

(৪) কাপাস তুলা কাপাস বীজের রোম। এই হেতু এক এক গাছি তুলার বাঙ্গালা নাম রোআ, এবং তুলার হিন্দী নাম রুই। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রোআ একটা লম্বা কোষ। অংশুও কোষে রচিত। কতকগুলি কোষ লম্বা-লম্বি জুড়িয়া অংশু। কোষগুলি বিচ্ছিন্ন হইলে তুলা হইয়া যাইত। 'কাপাস তুলা,' 'কাপাস তুলা'—রব উঠিয়াছে বলিয়াই অংশু সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত লিখিত হইল।

এখন উল্লিখিত সাতপ্রকার অংশুর তুলনা করি। টানসহতা দেখিলে কাপাস তুলা অপেক্ষা অতসী, অতসী অপেক্ষা ভঙ্গা, আনারস, বিছাটী ও কলার অংশু দৃঢ়। আকন্দের অংশু সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়। সূক্ষ্মতা দেখিলে আনারস প্রথম (এক ইঞ্চির চারি হাজার ভাগের এক ভাগ, এক খাই রেশমের প্রায় অর্দ্ধেক)। তার পর অতসী, ভঙ্গা ও কলা দ্বিতীয়, বিছাটী তৃতীয়, আকন্দ চতুর্থ। (এখানে বলা আবশ্যক, আমি চাষের গাছ পাই নাই। বন্য গাছের অংশু স্থূল হইয়া থাকে। ফল ধরিবার পূর্ব্বের গাছও দেখা হয় নাই।) তুলীন দেখিলে অতসী ও আনারসের অংশু প্রথম, ভঙ্গা ও আকন্দ দ্বিতীয়, বিছাটী ও কলা তৃতীয়। (চাষ করিলে তুলীনের ভাগ বেশী হয়)। মোটের উপর, অতসী আনারস, ভঙ্গা, আকন্দ ও বিছাটী এক বলা চলে। কলার অংশু নিকৃষ্ট। কাশ্মরীর অংশু দেখি নাই, এই হেতু তুলনার মধ্যে আনিলাম না। দীপ্তি ও অন্য দুই একটা গুণ আলোচনা অনাবশ্যক।

কোন্ গাছ হইতে কত অংশু পাওয়া যায়, তাহারও একটা মোটামুটি আভাষ দিতেছি। বল্কাংশুর কাঁচা ডাঁটা ও পত্রাংশু গাছের কাঁচা পাতা ওজন করিয়া বহিষ্কৃত অংশু ওজন করা হইয়াছিল। সকল স্থলে সব অংশু বাহির করা হয় নাই। তথাপি আনারসের কাঁচা পাতা হইতে মণপ্রতি আধসের, কলার প্রায় তিন ছটাক, অতসীর একসের, ভঙ্গার তের ছটাক, আকন্দেরও প্রায় তত, বিছাটীর প্রায় আধসের। এই হিসাবে এক মণ শণ ডাঁটা হইতে প্রায় এক সের অংশু পাওয়া যায়। বুড়া গাছ হইতে বেশী পাওয়া যায়; কিন্তু সে অংশুতে কাষ্ঠীন জন্মে। ধোবার ক্ষারে অল্প-স্বল্প কাষ্ঠীন দূর হয়, কিন্তু ওজনে অংশু কমিয়া যায়।

বস্ত্রের চতুর্থ উপাদান কাপাস তুলা। এ সম্বন্ধে কিছু লেখা বাহুল্য। লোকে ছোট ও বড় রোআ বোঝে। কিন্তু রোআ লম্বা হইলেই সূতা ভাল হইবে না। রোআ স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম হইতে পারে। সূক্ষ্ম রোআ হইতে সরু সূতা, মোটা রোআ হইতে মোটা সূতা জন্মে। আর এক গুণও দেখা উচিত। সব তুলার রোআ সমান টানসহ নহে। রোআ সরু, অথচ পুট করিয়া ছিঁড়িয়া যায় না, তবেই সে রোআ উত্তম। তার উপর যদি অন্ততঃ এক ইঞ্চি লম্বা হয়, আরও উত্তম। বৃক্ষাংশু হইতে কাপাস তুলার রোআর আকারে প্রভেদ আছে। বৃক্ষাংশু প্রায় গোল, যেন তার। কাপাস রোআ চেপটা, যেন পটী। পটীও সমান না থাকিয়া পাকানা হইয়া থাকে। যে রোআর যত পাক থাকে সে রোআ তত ভাল। বীজ ভাল জাতির হইলেই রোআ ভাল হয় না। জল বায়ু মৃত্তিকা ও কৃষিকর্ম্ম ভেদে তুলার নানা ভেদ ঘটে। সম্প্রতি নূতন নূতন জাতির চাষ না করিয়া দেশের আনা বুড়ী কাপাসের চাষ করা উচিত। দেব কাপাস বা রায় কাপাস গাছ বড় হয়, প্রায় বার মাস ফলে। কিন্তু এই কাপাসের চাষ হইতে দেখি না। লোকে প্রায়ই বেড়ার ধারে করে। ব্রাহ্মণ বিধবাকে পইতার সূতার নিমিত্ত এই গাছ বুইতে পালিতে দেখি। ইহার রোআ লম্বা, প্রায় এক ইঞ্চি, ও

সহজ। বীজ হইতে সহজে খদাইতে পারা যায়। অল্প দিন হইল রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর সংবাদপত্রে এই কাপাসের গুণ গাইয়াছেন। তিনি প্রতি গাছ হইতে বৎসরে ন্যূনকল্পে এক পোয়া তুলা ধরিয়াছেন। আমারও বোধ হয়, হারাহারি এই রূপ দাঁড়ায়। দুইবার পর বৎসরে ফল ধরে। সে বৎসর ভাল ফলে না। গাছ বুড়া হইয়া গেলেও ভাল ফলে না। গাছ ভাল জন্মিলে দুই-তিন বৎসর প্রতি গাছ হইতে একখানা ধুতির তুলা পাওয়া যাইতে পারে। সবই ভাল; কিন্তু এখনই পাই কই?

যে কাপাসই হউক, কাঁচা ফলের ও অতিপাকা ফলের তুলা ভাল নহে। খাটাই দিয়া বীজ ও তুলা পৃথক করিবার সময় অন্ততঃ কাঁচা ফল গুলা পৃথক রাখা উচিত। একমণ কাপাস হইতে বার-তের সের তুলা পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস, চরকা গিয়াছে বলিয়া বাঙ্গালায় কাপাস গিয়াছে, এবং কাপাস গিয়াছে বলিয়া চরকাও গিয়াছে।

৩। সূত্র-কর্ত্তন।

বঙ্গদেশ হইতে চারি-পাঁচখান পত্র পাইয়াছি। এক জমিদার তাঁহার প্রজাপুঞ্জের দুর্দ্দশা বর্ণন করিয়া বস্ত্র-সঙ্কট হইতে উদ্ধারের উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কেহ আমার উদ্ভাবিত চরকার রূপ গুণ জানিতে চাহিয়াছেন; কেহ বা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সে চরকা অবিলম্বে দিতে পারি কি না এবং কত দামে দিতে পারি। ইহাঁদের জ্ঞাতার্থে লিখি, চরকা গড়া বা বেচা আমার ব্যবসায় নহে, আমি অংশু, সূত্র কিংবা বস্ত্র-প্রাজ্ঞও নই।

চরকায় হাত দিবার ইতিহাস লিখি। আজিকালি কেহ কেহ তাহা হইতে কিছু শিখিতে পারিবেন। বার বৎসর পূর্ব্বে যখন "স্বদেশীর" প্রবল বন্যা দেশে বহিতেছিল, তখন আমার এক পুরাতন ছাত্র ও উকীল বন্ধু এখানে ঠক্‌ঠকী তাঁত বসাইয়া "স্বদেশী" বস্ত্র উৎপাদনে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন! দুই-পাঁচখানা তাঁত বসান হইলে, একদিন আমায় তাঁহার তাঁতশালা দেখাইতে লইয়া যান। তাঁত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলাম, সূতা কই। উত্তর পাইলাম, বাজারে। কিন্তু সে ত বিদেশী সূতা! যেটার উপাদান বিদেশী, সেটা কি রকম স্বদেশী? এ যে বিলাতী এঞ্জেল বিলাতী শিশিতে পুরিয়া স্বদেশী নামে বিক্রি করা! আমার বন্ধু কথাটা বুঝিলেন, সূতা পাইবার উপায় চিন্তা করিতে অনুরোধ করিলেন।

কিন্তু কাজটা সোজা নয়। কলের কাছে হাত পরাস্ত হইবেই। শিল্পে হাত অবশ্য শ্রেষ্ঠ; কারণ, শিল্পীর মন সেখানে অপূর্ব্ব রচনা করে। কিন্তু কলায় যেখানে একজনের বুদ্ধি শতজনের বুদ্ধির নায়ক হয়, সেখানে কলের কাছে হাত দাঁড়াইতে পারে না। মানুষের মাত্র দুইখানা হাত; মানুষের বলও অল্প। কলের হাত ও বল অনেক। তথাপি চরকা খুঁজিতে বসিলাম।

সহরের ভাল ছুতার আসিল। কিন্তু জন্মে চরকা দেখে নাই, গড়িবে কি। আমাদের বাড়ীতে চরকা ছিল। আমার এক পিসী সূতা কাটিতেন। মনে পড়ে, তাঁহার কাটা সূতায় গ্রামের এক তাঁতী আমার নিমিত্ত একখানি ধুতি বুনিয়া দিয়াছিল। সেখানি পরিয়া কি আহ্লাদ হইয়াছিল! আমার আহ্লাদ অপেক্ষাও পিসীর আহ্লাদ অধিক হইয়াছিল। আমি তখন শিশু। পিসীর সব ভাল ছিল, একটী দোষ কিন্তু আমার শিশু চোখে এড়ায় নাই। আমাকে চরকা ছুঁইতে দিতেন না! এমন কি, তুলার পাঁইজেও হাত দিতে দিতেন না!

কিন্তু সে শৈশবের লুপ্তপ্রায় স্মৃতি ধরিয়া চরকা গড়া সাধ্য হইল না। গ্রাম হইতে ছুতার আসিয়া একটা মোটা রকমের চরকা গড়িয়া দিয়া গেল। শুনিয়াছিলাম এবং বোধও হইল, লম্বা রোআর তুলা না হইলে ভাল সূতা কাটিতে পারা যায় না। কোথায় সম্বলপুর, কোথায় সরকারী কৃষিক্ষেত্র, লম্বা রোআ কোথাও পাইলাম না। অগত্যা বাজারের তুলা লইয়া বসিলাম; পিঞ্জাইয়া ধুনাইয়া পাঁইজ করিলাম; কিন্তু আশ্চর্য্য, চরকায় সূতা বাহির হয় না, পাঁইজটা পাকানা হইয়া যায়! যতবার চেষ্টা করি ততবারই সেই দশা। হতাশ হইয়া শেষে বহু কষ্টে গ্রাম হইতে এক অভিজ্ঞা নারী আনাইলাম। সহর জায়গায় অনাত্মীয় পুরুষের কাছে আসিবে কেন। সে আসিয়া একবার পাঁইজ দেখিল। তার পর চরকা একবার ঘুরাইতেই বলিলাম "হইয়াছে আমাকে দাও।" সে অবাক্ হইয়া রহিল। বোধ হয় মনে করিল এ কি রহস্য!

বাস্তবিক রহস্যই বটে। যন্ত্র চরকার উদ্ভাবয়িতা! এমন লঘু যন্ত্র, সূতা কাটার এমন উপযুক্ত যন্ত্র, এক সময়ে

কিংবা এক জনের মাথা হইতে বাহির হয় নাই। এক কথায় ইহার প্রশংসা শেষ করিতে পারা যায়। সূতাকাটার সে কলই শ্রেষ্ঠ, যে কল চরকার অনুকরণ।

১৩১৩ সালের শ্রাবণের প্রবাসীতে (৬ষ্ঠ ভাগ চতুর্থ সংখ্যা) আমার পরীক্ষা প্রকাশিত হইয়াছিল। যাঁহারা চরকা গড়াইতেছেন, তাঁহারা তাহাতে দুই একটা কাজের কথা পাইবেন। এখানে আবশ্যক একটু উদ্ধৃত হইতেছে। "সূত্র করিবার পূর্বে তূল প্রস্তুত করিতে হইবে। (১) প্রথমে কার্পাস রৌদ্রে দিয়া তাহার অপক্ক বা 'মরা' কার্পাস ও অপর আবর্জনা বাছিয়া ফেলিতে হইবে। (২) ধামই দ্বারা বীজ হইতে তূল পৃথক করিতে হইবে। (৩) তূলের রোঙ্গা গুলি পৃথক্ পৃথক্ করিতে হইবে। ধুনিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ধুনিবার পূর্বে হাতে করিয়া তূল পেঁজা হয়। * * (৪) পেঁজা তূলের পাঁইজ (পঞ্জি) করিতে হয়। রোঙ্গাগুলির শিথিল গোল ও শূন্যগর্ভ সলিতার নাম পঞ্জি, অর্থাৎ তূল নালিকা।"

ইহার পর চরকা। সেখানে তিনটি কাজ হয়। "(১) পঞ্জি হইতে রোঙ্গা টানিয়া ও অল্প পাক দিয়া তাহাকে দীর্ঘ করিতে হয়। (২) ঐ দীর্ঘ সূত্রে পাক দিতে হয়। (৩) পাক দেওয়া সূতা কোন আধারে (টেকোতে) জড়াইতে হয়।" আমার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল, কারণ হাত ও চরকার প্রথম কাজটা মনে হয় নাই। পাঁইজের রোঙ্গা টানিয়া টানিয়া দীর্ঘ করিতে হয়। এইখানেই অভ্যাস ও দক্ষতা আবশ্যক, অন্য দুই কাজ যে-সে পারে।

এই তিন কাজের জন্য চরকার গতি প্রথমে অনুলোম, তার পর ক্ষণমাত্র বিরাম, তার পর অল্পক্ষণ বিলোম-গতি, পরে আবার অনুলোম গতি আবশ্যক হয়। এই উলটা-পালটা গতি হেতু সূতা অধিক কাটিতে পারা যায় না। অথচ নইলেও নয়। এই হেতু একটা টেকোর স্থানে দুইটা বসাইয়াছিলাম। এই চরকা চালাইতে আরও অভ্যাস চাই। এক হাতেই দুইটা টেকোর সূতা কাটার যেমন অভ্যাস, পায়ে চরকা ঘুরাইয়া দুই হাতে দুইটা টেকোয় কাটিতেও তেমন অভ্যাস চাই। কলা মাত্রেই অভ্যাস চাই, নতুবা দক্ষতা আসে না। আটটা টেকো বসাইয়া দেখিলাম, টেকো বাড়িল বটে, আনুষঙ্গিক অসুবিধাও বাড়িল। একটা টেকোর সূতা ছিঁড়িলে আটটাই বন্ধ হয়। তার পর চরকা গড়ার নৈপুণ্য চাই, পাঁইজ ভাল চাই। এই সব দেখিয়া বুঝিলাম, চরকায় দুইটা টেকো দিয়াই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। যে বৎসর এই সব পরীক্ষা করি, তখন কলের সূতা সস্তা। সস্তার বাজারে আক্রা জিনিষ বিকায় না।

তখন পোষাইত না, এখন পোষাইবে কি? হিসাব করা যাউক। চরকায় সূতা কাটার প্রথম অভ্যাসের সময় সূতায় কোন স্থান সরু, কোন স্থান মোটা হইবে, পরে প্রায় সমান মোটা বা সরু সূতা হইবে। দক্ষতা জন্মিলে এবং একটু বুদ্ধি থাকিলে সূতা সরু হইবে। মোটা কাটিতে সময় কম, মিহি কাটিতে সময় বেশী লাগে। মনে করি যেন ১০ নম্বরের * সূতা হইতেছে। এক এক বারে ২৭ ইঞ্চি হইতে ৩০ ইঞ্চি লম্বা সূতা, এবং সাধারণতঃ মিনিটে দুইবার ধরা যাইতে পারে। অর্থাৎ ঘণ্টায় ৯০ হইতে ১০০ গজ। তিন ঘণ্টায় ২৭০ হইতে ৩০০ গজ। ১০ নম্বরের সূতার ২১৬ গজে ১ তোলা। অতএব দিনে ১।০-১৷৷০ তোলা সূতা হইবে। মাসে হারাহারি আধসের। একখানা পাঁচগজী ধুতি বা শাড়ীর সূতা।

গ্রামে নারীকে ঘরকন্নার কাজ করিতে হয়। সূতা কাটিতে বাঁ হাত তুলিতে নামাইতে শ্রমও অল্প হয় না। যাহার হাত লম্বা ও ক্ষিপ্র, সেও প্রতিবারে এক গজ এবং মিনিটে তিনবারের অধিক পারিবে না। এইরূপে তিন ঘণ্টায় ২ তোলা সূতা পাওয়া যাইবে। * সরু সূতা কাটিতে হইলে মিনিটে তিনবার হইবে না। ৩০।৪০ নম্বরের কাটিতে বোধ হয়, মিনিটে দুই গজ, তিন ঘণ্টায় ৩৬০ গজ হইবে। মাসে ১০৮০০ গজ। ৩০ নম্বর হইলে ওজনে ১৬।১৭ তোলা, ৪৬ নম্বরের হইলে ১২।১৩ তোলা মাত্র। একখানা প্রধান ধুতি বা শাড়ীর সূতা।

* যেখিয়া সূতার নম্বর ঠিক করিতে অভ্যাস চাই। প্রথম প্রথম সূতা মাপিয়া ও ওজন করিয়া নম্বরের জ্ঞান জন্মানো কর্ত্তব্য। সূতার সূক্ষ্মতা নম্বর দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে ৮৪০ গজ সূতার এক পৌণ্ড হইলে নম্বর ১। ইহাকে বাঙ্গালায় আশিসে ২১০ গজে এক তোলা বা ২৭ গজে এক ছয়ানির ওজন হইলে নম্বর ১। অতএব ১০ নম্বরের ২৭ গজ সূতা ওজনে এক ছয়ানির সমান হইবে।

* এখানে একটা কথা মনে পড়িল। যাঁহারা চরকা গড়াইতেছেন, তাঁহারা দেখিবেন যেন টেকো ও চক্র কাছে কাছে না হয়। কাছে কাছে হইলে বাঁ হাতকে আড়ষ্ট হইয়া তুলিতে নামিতে হইবে, কাজও কম হইবে, হাত অনর্থক শ্রান্ত হইবে।

এখানকার বাজারে আধসের (১ পাউণ্ড) ১০ নম্বরের সূতার বর্ত্তমান দর ১৸৵০। বাজারে কাপাস তুলা নাই! যদি ১।০ সিকা সের ধরা যায়, তাহা হইলে সূতা ৸০ থাকিবে। যার বৎসর পূর্ব্বে আধসের কাপাস তুলার দাম ।১০ ছিল আর ১০ নম্বরের সূতা পাওয়া যাইত ।/০ আনায়! কোন কোন বৎসর তুলা ও সূতার দাম নামিত উঠিত বটে, কিন্তু সেটা বৎসামান্য। এত অল্প যে তাঁতীরা মনে করিত রেলের টিকিটের মত সূতার দাম বাঁধা আছে।

সেকালে চরকা কাটা কিছুতেই পোষাইত না। আজি-কালিকার সূতার বাজারে পোষাইতে পারে। মুনিষের পোষাইবে না, 'কামিন' নারীরও পোষাইবে না। পোষাইবে সে সব নারীর, যাহারা বাহিরে যায় না, যাহারা কায়িক গুরু শ্রম করিতে পারে না, এবং যাহাদের সময় আছে কিন্তু কর্ম্ম নাই। চব্বিশ শত বৎসর পূর্ব্বে চাণক্য রাজাদের তাঁতশালার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে দেখি ঠিক এই এই শ্রেণীর নারী সূতা জোগাইত। সেকালে রাজাদের খামার ছিল, চাষ ছিল, তাঁতশালা ছিল। তিনি লিখিয়া-ছেন, "সূত্রাধ্যক্ষ সূত্র বস্ত্র রজ্জু করাইবেন। ঊর্ণা, বল্ক, কার্পাস তুল, শণ, কৌম (অতসী) প্রভৃতির সূত্র করাইবেন। বিধবা, পঙ্গু ('ল্যাঙ্গা') কুমারী, সন্ন্যাসিনী বা ভিক্ষুণী, রাজদণ্ড-প্রতিকারিণী (যেমন জেলখানার আবদ্ধ নারী) বেশ্যার মাতা, বৃদ্ধ রাজদাসী, কর্ম্মচ্যুত দেব-দাসী দ্বারা সূত্র কাটাইবেন। সূক্ষ্ম, স্থূল, মধ্যম ভেদে সূত্র দেখিয়া বেতন ধার্য্য করিবেন। বহু সূত্র কাটিলে তেল আবাটা দিয়া নারীকে অনুগৃহীত করাইবেন। ... যে সব নারী বাড়ীর বাহির হন না, গ্রামের বিধবা বধূ, বিকলাঙ্গী, কুমারী এবং যাহারা নিজেদের ভরণ পোষণ নিজেরাই করে, তাহাদিগের নিকট সূত্রাধ্যক্ষ দাসী ও বেতন পাঠাইয়া কর্ম্ম করাইবেন। যাহারা সূত্রশালায় আসিতে পারে, তাহারা প্রত্যূষে আসিয়া সূত্র দিয়া বেতন লইয়া যাইবে। মাত্র সূত্র পরীক্ষার যোগ্য প্রদীপ থাকিবে। (অর্থাৎ অধিক আলো থাকিবে না।) স্ত্রীদিগের মুখ সন্দর্শন করিলে কিংবা অন্য কার্য্যের সম্ভাষা করিলে, সূত্রাধ্যক্ষের অবিমানা হইবে।" ইত্যাদি।

এইরূপ ব্যবস্থা উত্তর কালেও ছিল। মহাজন তুলা জোগাইয়া গ্রাম-গ্রামান্তরের নারীকে বাড়ি দিয়া সূতা লইতেন। গৃহস্থ নারী সূতা কাটিয়া নিজেদের পরিবারের কাপড়ের জোগাড় করিতে লজ্জা বোধ করিত না। সূতা-বেচা নিন্দার বিষয় ছিল। কারণ কায়িক শ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন সকল দেশেই হেয় গণ্য হইয়া থাকে।

সম্প্রতি কাপাস তুলা ও সূতার যে দাম, তাহাতে বহু অনাথা অধীরা সূতা কাটিয়া দৈনিক দুই তোলেরও উপায় করিতে পারে। অন্ততঃ নিজের কাপড়ের জোগাড় করিতে পারে। নিজের রান্না নিজে করার মতন নিজের কাপড়ের সূতা নিজে কাটিলে নিন্দা হয় না। বস্তুতঃ যখন ধনী গৃহিণী স্বহস্তে পাক করিয়া পতি পুত্রকে ভোজন করান, তখন তিনি বেতন গণনা করেন না। বাজারে ভাল ভাল আম পাওয়া গেলেও নিজের হাতের গাছটির মতন কখনও মেলে না। এইখানে অর্থনীতি হারি মানে।

আপৎকালে অসম্ভবও সম্ভব হয়। এখন চরকা ধরিতে ধরাইতে অধিক ক্লেশ পাইতে হইবে না। কিন্তু পরে কি হইবে, যখন সূতার বাজার আবার নরম হইবে? তখন চরকার সূতা কেনা-বেচা চলিবে না। কিন্তু নিজের পরণের কাপড়ের সূতা হইবে না কেন? শাগ পাতাও বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। তবু ত লোকে, বিশেষতঃ বিধবা, উঠানে একটু ফাঁক পাইলেই শাগ বুনিয়া থাকে। দেশে বহু অনাথা অধীরা আছে, যাহাদের অবসর আছে, কর্ম্ম নাই। যদি কোনও উপায়ে সূতা কাটা একটা নিত্য কর্ম্মের মধ্যে দাঁড়ায়, তাহা হইলে ইহাদের মঙ্গল হইবে।

একটী উপায় আছে। বড়র পৃষ্ঠে ছোট চলে। বড় ঘরে যদি চরকা চলে, ছোট ঘরে অবশ্য চলিবে। দাসী প্রস্তুত, দেবী পথ দেখাইলে হয়। ধনী ও বিভবশালিনী পুর-নারী নানা রীতি বা "ফেশন" চালাইতেছেন। চরকা চালাইতে দোষ কি? কাপড় সেলাই করা, মোজা বোনা, উলের কত কি করা, এসব 'ফেশন' বই আর কি? বাজারে দর্জী আছে, মোজাও পাওয়া যায়। চরকায় সূতাকাটা কলা বটে শিল্প নহে, কিন্তু জামা সেলাই উল বোনায় শিল্প কই? সূতাকাটায় কলা-নৈপুণ্য আছে, সুন্দর বহুমূল্য চরকাও গড়িতে পারা যায়। টেবিলে বসাইয়া পায়ে চক্র চালাইয়া যে চরকায় সূক্ষ্ম সূতা কাটা, তাহে কাপড় সেলাই করা অপেক্ষা হীন হইবে না। সমাজে এক এক কর্ম্ম হেয় গণ্য হইয়া থাকে। নির্ব্বোধ ইহার মর্ম্ম না বুঝিয়া বলে সব

কর্মই সমান। ভিতরের কথা, সকলের নিকট সমান নহে, কর্মী-ভেদে ইতরবিশেষ হয়। এই হেতু ধনী নারীকে পথ দেখাইতে বলিতেছি।

এখন অংশুর সূতাকাটা দেখা যাউক। প্রথমে বলি, আমি চরকায় অংশুর সূতা কাটি নাই। তাকুড়ে ও চেরায় কাটিয়াছি। কিন্তু মোটা সূতা। ইহা হইতে যে জ্ঞান হইয়াছে, তাহা ধরিয়া লিখিতেছি।

একটা পলার নীচে ভারী করিয়া তাকুড় হয়। সূতা কাটার পক্ষে ইহাই সহজ যন্ত্র। কিন্তু দোষ, মন্দ গতি। চেরার গুণ, উহা দ্রুত ঘুরাইতে পারা যায়, কারণ ধরিবার চারিটা বাহু থাকে। উভয়ের দোষ, একটু ভারী হওয়া চাই, নতুবা বেগ থাকে না, অথচ সে ভারে সূতা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। মোটের উপর, তাকুড়ে সরু, চেরায় মোটা সূতা কাটা যায়। সেকালে তাকুড়ে সূক্ষ্ম সূতা কাটা হইত, এত সূক্ষ্ম যে চরকার টান সহিত না।

কাপাস তুলার রোঁআগুলি স্বভাবতঃ পৃথক থাকে। চাপে সেগুলি জড়াইয়া যায়। ধুনিলে আবার পৃথক হয়। তার পর যথাসাধ্য সোজা সোজা সাজাইয়া পাঁইজ করিতে পারিলেই চরকায় কাটার যোগ্য হয়। অংশুর দোষ স্বভাবতঃ দুইটি। (১) কাটি, কাড়ি আছড়াই; কাঠির ও ত্বকের টুকরা অংশুতে লাগিয়া থাকে। (২) অংশুগুলি পৃথক্ পৃথক্ না থাকিয়া পটী বা জটার আকারে থাকে। এই দুই দোষ দূর করিতে স্নানের পর নারীর কেশ মার্জনা অনুকরণ আবশ্যক। গাছের অংশু লম্বা। এক প্রান্ত ধরিয়া ছোট ছড়ী দিয়া পুনঃপুনঃ পিটিলে কাঠি ও ত্বক ঝরিয়া পড়ে। (নারী যেমন গামছার দোড়ী করিয়া ভিজা চুল ঝাড়ে)। চিরিলে দ্বিতীয় দোষ যায়। একখান কাঠে সারি সারি ঘন ঘন সূচ আঁটিয়া চিরণীর মতন করিতে হইবে। দাঁতগুলি উঁচা রাখিতে হইবে। এখন ঝাড়া অংশু এক মোড়া ডাইন হাতে লইয়া বাঁ হাত দিয়া বিছাইয়া চিরণীর উপর জোরে ফেলিয়া কোলের দিকে টানিতে হইবে। জটা চিরিয়া অংশু পৃথক্ পৃথক্ করিতে হইবে। সরু, মোটা, ঝাঁকারী ইত্যাদি দাঁতের তিন চারিটা চিরণী দিয়া আঁচড়াইলে অংশুগুলি মিহি হইয়া দাঁড়াইবে। খানিকটা অংশ অবশ্য চিরণীতে জড়াইয়া 'গদড়া পুটলী' হইবে। ইহা অনিবার্য। কিন্তু এই গদড়া ফেলিবার সামগ্রী নয়। ইহার অংশুগুলি খুব মিহি কিন্তু ছোট-ছোট। সাবধানে সোজা করিয়া লইতে পারিলে তাহাতে মিহি সূতা হইবে।

অংশু স্বভাবতঃ লম্বা। তাকুড়ে কাটিতে হইলে লম্বা মন্দ নহে। কিন্তু চরকায় অত লম্বা আঁশ চলিবে না। লম্বাকে কাটিয়া কাটিয়া তুলার পাঁইজের মতন ছোট ছোট করিয়া লইতে হইবে। তথাপি তুলার সূতা কাটার অপেক্ষা কম সময় লাগিবে। উর্ণার সূতা কাটা হইতেছে, তসরের কাটিবার হইতেছে, আঁশের না হইবে কেন? 'প্রবাসী'র প্রবন্ধে আমি যে নলী-টেকো চরকা বর্ণনা করিয়াছি, বোধ হয় সে চরকা আঁসের সূতা কাটিবার বিশেষ উপযোগী। আমি উর্ণার সূতা কাটিয়া দেখিয়াছি। অনভ্যাস হেতু সে সূতা যদিও মোটা হইয়াছিল, আভাষে বুঝিতেছি অভ্যাস দাঁড়াইলে সে টেকো দিয়া মিহি সূতা কাটিতে পারা যায়। নলী-টেকোর গুণ এই, চরকা থামাইতে হয় না, সূতায় পাক লাগিবার সঙ্গে সঙ্গে টেকোর নলীতে গুটানা হইয়া যায়। সময়ের উপচয় কম লাভ নহে। প্রথমে অংশুর গুছি করিয়া লইতে হইবে। রাত্রে শিশিরে দিলে, অভাবে জল প্রক্ষেপ করিলে, অংশুগুলি কোমল হইবে। নলী-টেকোর চরকায় সূতা কাটিতে বাঁ হাত তুলিতে নামাইতে হয় না। অতএব টেকোর সমান উঁচা একটা চৌকীতে গুছিগুলি সাজাইয়া লইলে কাজের সুবিধা হইবে। আর এক কথা, কাপাস তুলার সূতা কাটিতে যত পাক লাগে, লম্বা আঁসের কাটিতে তত লাগে না। অতএব নানা বিষয়ে সুবিধা।

ধুতি উড়ানী ও জামার কাপড় ছাড়া সব কাপড়ই মোটা। দো-সূতী, তে-সূতী, এমন কি চৌ-সূতী কাপড়েরও প্রয়োজন আছে। গামছা, শীতের চাদর, বিছানার চাদর, বালিশের ও তোষকের খোল, কোট পেণ্টুলেনের খান ও অন্য নানা কাজে মোটা সূতার মোটা কাপড় দরকার হয়।

একটা কথা রহিল। পাড়ের সূতা রং করা। কিন্তু সেও একটা বিপুল ব্যবসায়, রং করা একটা বড় কলা।

৪। বস্ত্র-বয়ন

অংশু সংগ্রহ হইলে প্রথম কলা সূতা কাটা, দ্বিতীয় কলা কাপড় বোনা। বোনা সম্বন্ধে নূতন কিছু জানাইবার নাই। আগের দেশী তাঁত অপেক্ষা যে ঠক্-ঠকী তাঁতে

বেশী বুনিতে পারা যায়, তাহা সকলেই শুনিয়াছেন। দক্ষ তাঁতী এই তাঁতে ১০ ঘণ্টায় এক জোড়া ধুতি (অর্থাৎ ১০ গজ কাপড়) বুনিতে পারে। অলস ও অদক্ষ ৫।৬ গজের অধিক পারে না।

স্বদেশীর সময় কেহ কেহ তাঁত-শাল বসাইয়াছিলেন। বোধ হয়, শেষে কেহই কূল দেখিতে পান নাই। গ্রাম্য কলা গ্রামেই পোষায়; সেখানে একা তাঁতী নহে, তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা, পরিবারের সবাই সুতার পাইট, কেরানা, পুরণী, নলী প্রভৃতি কোন কোন কাজ করিয়া তাঁতে বোনা সম্পূর্ণ করে। এত জনে খাটিয়াও পরিবারের ভরণ পোষণ স্বচ্ছন্দে চলে না। ইহার কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যহ অন্ততঃ একসের চালের কমে একজন লোক বাঁচিয়া কাজ করিতে পারে না। ত্রিশ সের চালের দাম ধরাইলেই বুঝি গুনাকি মাসে চারিটা টাকা চাই। ইহার উপর কাপড় আছে, পর্ব আছে, ঘর দুয়ার আছে। চারিটি পোষ্য হইলে মাসে যেমন করিয়া হউক কুড়িটি টাকা চাই। প্রত্যহ দশ আনা। কিন্তু প্রত্যহ তাঁত সমান চলে না। তাঁতীকেই সুতা কিনিতে হাটে যাইতে হইবে, বোনা কাপড় বেচিতে হইবে। শরীরের ক্লান্তি আছে, অসুখ-বিসুখ আছে, বার্ধক্য আছে। সমাজেরও অধিকার অভিমান আছে। কাজের দিনে বার আনা এক টাকা কামাইতে না পারিলে কলাজীবীর অবস্থা সচ্ছল হইতে পারে না।

পূর্বে আমার যে বন্ধুর তাঁত-শাল উল্লেখ করিয়াছি, তাহার পরিণাম শুনিলে কেহ গ্রাম্য কলাকে নগরের কলা করিতে চাহিবেন না। আমার বন্ধু গ্রাম হইতে তাঁতী আনাইয়া তাঁতশালে বাসা দিয়া ঠক্‌ঠকী তাঁতে লাগাইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম এক জোড়া ধুতি প্রতি বার আনা বানি ধার্য্য হইল। পরে একটু অভ্যাস হইয়া গেলে দশ আনা করা হইল। যে অলস ও মূঢ় সেও মাসে ১২।১৫ টাকা পাইতে লাগিল। গ্রামে একবারে এত টাকার মুখ কখনও দেখিতে পাইত না। যুবা তাঁতী সহরের পাপে পড়িল, তিন চারি মাসের মধ্যে কুৎসিৎ রোগে আক্রান্ত হইল। আমার উদ্‌যোগী বন্ধু নূতন নূতন তাঁতী আনাইয়া ষষ্ঠ করিয়া ছয় মাস তাঁতশালা চালাইলেন। তার পর বন্ধ করিতে হইল। শিক্ষা ও সংযমহীন গ্রাম্যজনকে সহরের বিলাসে ফেলার সময় কলা-স্বামীর বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। দেশে "কল" "কল" করিতেছি বটে, কিন্তু কলে যে পাপের কলও টানিয়া আনে, তাহার প্রতিবিধান কই?

এখন বাজারে সুতা কিনিয়া কাপড় বুনিলে কত পড়তা পড়ে, একটু খতাই। ৪০ নম্বরের সুতায় ৪৫-ইঞ্চি বহরের ৫ গজী ধুতি বুনিতে, ৪৮ এর শানায় * প্রায় ২৫৬০০ গজ সুতা চাই। ইহার ওজন ৩০ তোলা বা ¾ পৌণ্ড। (যদিও এক এক হেঁটীতে ৮৪০ গজ থাকিবার কথা, তাঁতীদের মুখে শুনি, অত থাকে না। বোম্বাইএর কলের সুতায় এই দুর্নাম আছে। কোন-কোন কলের সুতার নম্বরও ঠিক নহে। সম্প্রতি বাজার হইতে ২০ নম্বরের সুতা আনাইয়াছিলাম। দেখিলাম তাহা ১৮ নম্বরের। কোন-কোন কলে ওজনও কম দেয়।) এখানকার বাজারে এই সুতার দাম ২৷০। বানি অন্ততঃ ।/০। একখান ধুতির খরচ পড়িল ২৷৵০। ইহার পর ব্যাপারীর লাভ আছে। যত হাত ফিরিবে, দামও তত চড়িবে। রঙ্গিন পাড় দিলে খরচ আরও বাড়িবে।

৪০ এর শানা করিয়া ২০ নম্বরের ৪০ ইঞ্চি বহর ৫।০ গজী ধুতি বুনিতে ১¼ পৌণ্ড সুতা লাগিবে। এখানকার বর্ত্তমান বাজারে ইহার দাম ১৷৵৫। বানি ।৹ আনা ধরিলে ধুতি খানার পড়তা ১৮/৫ পড়িবে। বোধ হয় ২৲ টাকায় বিক্রি হইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে সুতার দর না নামিলে কাপড় সস্তা হইবে না। কাপাস সস্তা ও কলের প্রতিযোগিতা না হইলে সুতার দর নামিবে না। অল্প কয়েকদিন হইল দেশী ব্যবসায় সমিতির (Home Industries Association) বার্ষিক রিপোর্টে দেখিলাম, সমিতি আশা করেন, ২ টাকা ২।০ দামে ধুতি বেচিতে পারিবেন। কেমন করিয়া পারিবেন বুঝিলাম না। কারণ রিপোর্টেই আছে, সুতার বাজার এত গরম যে যাইতে পারা যায় না। অন্যে কেহ বলিলে কথাটা অগ্রাহ্য করিতাম। কিন্তু আসল কথা প্রকাশ নাই, ধুতির প্রমাণ দেওয়া হয় নাই। সুতার নম্বর, তাঁতের শানা ও কাপড়ের লম্বা চওড়া

* এক ইঞ্চিতে টানার যত খাই সুতা দেওয়া হয়, তত খাইর সংখ্যার নাম শানা। শানা বেশী হইলে কাপড় ঘন, কম হইলে পাতলা হয়।

না বলিলে কিছুই বলা হইল না। অল্পেই বুঝিতে পারা যায়, ১০ হাতী ধুতি অপেক্ষা ৬ হাতী ধুতি বুনিতে খরচ বেশী পড়িতে পারে।

"বঙ্গীয় ধনভাণ্ডার" (National Fund Society) হইতে এক বস্ত্রপ্রাজ্ঞ কয়েক স্থলে ঘুরিয়া এক রিপোর্ট দিয়াছেন। তাহাতে কাজের কথা দুইটি আছে। (১) যদি স্বচ্ছন্দজাত দেবকাপাস ও ঘরের চরকার যোগ ঘটে, তাহা হইলে পরনের কাপড় সস্তায়—বুনিবার বাবদমাত্র দিয়া—জুটিবে। রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরের উপদেশও তাই। অর্থাৎ কাপাস জন্মাও, সুতা কাট, তাঁতীকে দেও। প্রত্যেক পরিবার এইরূপ কর। শূন্য-পুরাণে পার্ব্বতীও একদিন ভোলানাথকে বলিয়াছিলেন,

ঘরে ধান থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুখ পাব॥
কাপাস চরহ পরভু পরিব কাপড়।
কত না পরিব পরভু কেওরা বাঘর ছড়॥

কিংবা যখন আদম নাট কোদলাইতেন, এবং হবা সুতা কাটিতেন, তখন সুখের দিন ছিল। কিন্তু সে দিন আর নাই। অর্থনীতি আর সে দিন ফিরিতে দিবে, এমনও বোধ হয় না। যাহারা গ্রামে বাস করে, এবং যাহাদের তেমন জায়গা আছে, তাহাদের পক্ষে এই উপায় প্রশস্ত। কিন্তু এখন উপায় কি? (২) বস্ত্রপ্রাজ্ঞ আর একটা কথা বলিয়াছেন। সেটী তাঁতীর সমবায় স্থাপন। তাঁতীর পয়সা নাই, সুতা কিনিতে পারে না। পয়সা পাইলেও তাহাকেই তাঁত কামাই করিয়া হাটে সুতা কিনিতে, কাপড় বেচিতে যাইতে হয়। যাহার পয়সাও নাই, তাহাকে মহাজনের কাছে ধারে সুতা আনিতে হয়, পরকে অত্যন্ত লাভে বেচিতে হয়। যদি তাঁতীরা এক জোট হইয়া পরস্পরকে সাহায্য করে—তাহা হইলে দরিদ্র তাঁতির দুর্দ্দশার লাঘব হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বের জাতি-বন্ধন, যাহা এখন শিথিল হইয়াছে, তাহা দৃঢ় করা। যাঁহারা গুণকর্ম্ম অনুসারে জাতির উৎপত্তি অবগত আছেন, তাঁহারা প্রাচীন কালের জাতি সমবায়ের উদ্দেশও অবগত আছেন। বর্ত্তমান কালেও সমবায় ব্যতীত ভরসা নাই। তাঁতী সমবায় দ্বারা দুইটী ফল হইবে। (১) দরিদ্র তাঁতীর দুরবস্থা ঘুচিবে (২) বাজারে কাপড় পাওয়া যাইবে। কিন্তু কাপড় সস্তা হইবে কি? আমরা যে সস্তায় কাপড় চাই।

যে দিকেই যাই, কাপড়ের উপাদানে গিয়া ঠেকিতেছি। সস্তায় অংশু, সস্তায় কাটা, সস্তায় বোনা,—শেষে সস্তায় বেচা। শুনিতে পাই তুলার মহাজন, সুতা-কাটা কলের মহাজন, কাপড়-বোনা মহাজন, এবং কাপড়-বেচা মহাজন, এই চারি মহাজনের অন্তরে জন-সাধারণ ক্লেশ পাইতেছে। কিন্তু ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ নাই। কারণ কেহ কাহাকেও জোর করিয়া কিছু কেনায় না। তথাপি যে দ্রব্য নহিলে প্রজার দুর্দ্দশা হয়, মহাজন দ্বারা সে দ্রব্য অগ্নিমূল্য হইলে রাজা সে মহাজনকে দমন না করিলে কে রুখিতে পারিবে? তুলা, সুতা, কাপড়,—এই তিনের বর্ত্তমান দর দেখিলে বুঝি সুতা-কাটার বাবদ, কাপড়-বোনার বাবদ, কিংবা কাপড়-বেচা মহাজনের লভ্য অধিক থাকিতেছে। জাহাজের অল্পতা হেতু বিদেশী তুলার আমদানি কম হইয়াছে, হয় ত কাপাসও কম জন্মিতেছে। এ কারণটা বুঝি। কিন্তু যেখানে তুলার দর পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ মাত্র, সেখানে সুতার দর চারিগুণ বাড়িবে কেন? আমানী ও বিলাতী সুতার দর চড়ার কারণ বুঝিতে পারি। কিন্তু দেশী কলের সুতার দামও চতুর্গুণ বাড়িবার কারণ কি? দেশী কলের কাপড়ের দামই বা এত চড়ে কেন? কাপড়-ব্যাপারী যে একাই দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা কি প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে? বাজারের অগ্নিমূল্য সুতা কিনিয়া হাত-তাঁতে বোনাইয়া সে কাপড়ের পড়তা ২৮/০ পড়ে, সেখানায় মতন কাপড় দোকানে ৩৲ টাকায় পাওয়া যাইতে পারে। বস্ত্র-ব্যাপারী অবশ্য লাভ রাখিয়া বেচিবে। আমার বোধ হয় দেশে সুতার কল ও কাপড়ের কল অত্যধিক লাভ রাখিতেছে। দেশের লোকই যখন দেশকে মারে, তখন রাজদ্বারে পোহারি ভিন্ন গতি কি? শুনিতেছি, সরকার বাহাদুর দেশের কলের কাপড়ের দাম ধার্য্য করিয়া দিবেন। বোধ হয় মোটা ছোট ধুতি শাড়ীর প্রমাণ বাঁধিয়া দর করিয়া দিবেন। কিন্তু সে ধুতি শাড়ী সকলে পরিতে পারিবে না; পরিতে পারিলেও দেশকে বুলাইবে না। ইহাতেও ত কেবল এক মহাজনের অত্যাচার নিবারিত হইবে। অন্য তিনের হইবে

কি? অবশ্য আপৎ কালে কি না সম্ভব হয়। ইংলণ্ডে ও অন্যান্য যুদ্ধরত দেশে ভোজ্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন, সপ্তাহে লোকে কি পরিমাণে কি খাইতে পাইবে তাহার বিধান হইয়াছে। আমরাই বা মোটা কাপড় পরিতে পারিব না কেন?

কেহ কেহ বলিতেছেন, মাস কয়েক চালাইয়া দেও, মর্থণীকে আর বেশী দিন আস্ফালন করিতে হইবে না। তখন কাপড় সস্তা হইতে পারিবে। আমি অর্থনীতি জানি না। সামান্য বুদ্ধিতে মনে হয়, যদি দুই এক মাসের মধ্যেও যুদ্ধ থামিয়া যায়, ব্যবসায়ের দুর্দ্দশার জের তিন চারি পাঁচ ছয় বৎসর চলিবে। কারণ, (১) জাহাজ অল্প (২) যুদ্ধে বহু কারু হত হইয়াছে, বিকলাঙ্গ ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, (৩) বিবিধ দ্রব্যের ক্রেতা দলে দলে হাঁ করিয়া বসিয়া আছে। এই তিনটির একটাই একশ, সংযোগে তিনশ নহে, নয় কি হাজার। এই তিন কারণ সত্তে কোনও দ্রব্য অচিরে পূর্বের মতন সস্তা হইবে না।

৫। উপায় কি?

সম্প্রতি কোনও উপায় নাই। ছয় মাস এক বছর আগে কেহ চিন্তা করিলে এখন কিছু ফল ফলিত। সময় বহিয়া গিয়া এখন বঙ্গদেশের ঘুম হঠাৎ ভাঙ্গিয়াছে। এখনও কি করিবার আছে, তাহা একত্র করিতেছি। সকলের মূল সেই সনাতন নীতি, আত্মবশ হও।

(১) পাট ও তসর, কাপাস ও অংশুর গাছের চাষ কর। কোন্‌টায় সুবিধা হইবে, তাহা করিয়া দেখ। কোন্‌টা কতদিন চলিবে, তাহাও বলিবার জো নাই। আমার বোধ হয়, কাপাস সস্তা হইলেও কোন কোন অংশুর সূতার কাটতি থাকিবে। ইতিমধ্যে রঙ্কাংশু ও পত্রাংশু বাহির করিবার সুলভ ও সহজসাধ্য যন্ত্রও উদ্ভাবিত হউক, বিলাতী যন্ত্রের অনুসন্ধান চলুক।

(২) যতদিন না কলের সূতা সস্তা হয়, ততদিন চরকা চলুক। কারণ ইহাই একমাত্র গতি। কলের সূতা সস্তা হইলেও অনেক নারীর পক্ষে চরকা পরণের সূতা যোগাইবে। চরকায় সূতা কাটা নিন্দনীয় নহে, এই ভাব ভদ্র ও ধনী ঘরের গৃহিণীরা জাগাইয়া রাখুন। তাঁহারা কলা ও শিল্পের নিমিত্ত সচেষ্ট আছেন, কাটা সূতার নিমিত্তও থাকুন। ইতিমধ্যে সূতা-কাটা কল, কাপাস সূতার কল, অংশুর সূতার কল বসাইবার উদ্যোগ চলুক। চরকায় সূতা কাটাইতে কর্ম্মবিভাগ আবশ্যক। কাপাস কেনা হইয়া কোথাও তুলা পৃথক করা হউক। এই তুলা পেঁজা ধোনা হইয়া পাঁইজের আকারে সূতা-কাটনীর নিকট উপস্থিত হউক। যদি তাহাকেই পিলিতে ধুনিতে হয়, তাহা হইলে সূতা কাটায় অশ্রদ্ধা জন্মিবে। গ্রামে গ্রামে ধুনারী নাই। ঘরে ঘরে তুলা লইয়া এত চর্চা করিতে বলা, আর মেষের উর্ণা লইয়া নারীকে ঊল বুনিতে বলা এক কথা। সেলাই করিবার সূতা, মোজা বুনিবার সূতা ইত্যাদি পাওয়া যায় বলিয়াই সেলাই ও বোনা এত সহজসাধ্য হইয়াছে।

(৩) তাঁতীকে বাঁচাইলে সে আমাদিগকে বাঁচাইবে, এ কথা এখন সবাই বুঝিয়াছি। তাহাকে বাঁচাইবার এক উপায়, তাহার জাতীয়ত্ব রক্ষা করা। তাঁতীদিগের মধ্যে যদি সদ্‌ভাব থাকে, পরস্পরের সংযোগিতায় তাহারা অনেককাল কলের সহিত লড়িতে পারিবে। যদি সদ্‌ভাব না জন্মে, তাহা হইলে অনেকে তাহাদের মহাজন হইবে। লোকে বলে, হাতের তাঁতের কাপড় বড় টেকে, কলের কাপড় তত টেকে না। কথাটা সত্য কি না, জানি না। সকলকার ধারণা এই। যদি ধারণা সত্য হয়, যদি তাঁতের কাপড় বাস্তবিকই বেশী টেকে, তাহা হইলে তাঁতীর বাঁচিবার ভরসা আছে। যদিও বহুকাল নয়। অবশ্য বস্ত্রশিল্পের কথা স্বতন্ত্র। তাহাকে কোনও কল কখনও পরাস্ত করিতে পারিবে না। এই সময় হইতে কাপড়ের কল বসাইবার চিন্তাও আবশ্যক। সম্প্রতি যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা যেন আর না ঘটে। তবে দুঃখ এই, বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়েরও দর চড়িয়াছে। বোম্বাই কলের কাপড়ের তুলনায় এই দর কিরূপ, তাহা জানিবার বিষয় বটে। যাহাই হউক, আরও কয়েকটা কল হইলে সকলকেই সাবধান হইতে হইবে।

(৪) মহকুমায় মহকুমায়, জেলায় জেলায় যাহাতে কাপড় জন্মে, ও বেচা-কেনা হয়, তাহার উপায় ভাবিতে হইবে। অল্প কয়েক মহাজনের হাতে কাপড় থাকিলে তাহারা ইচ্ছা করিলেই ক্রেতাকে মারিতে পারে। অবশ্য সবই টাকার খেলা। ধনী মহাজনের শ্যেন-দৃষ্টি পড়িলে কে রক্ষা করিতে পারে? তথাপি বোধ হয় ক্রেতা

কতকটা পারে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সৌহার্দ্য থাকিলে উভয়ের হিত। তাঁতীর সমিতি ক্রেতা ও বিক্রেতার সমিতি স্থাপিত হইলে সকলেই লাভবান্ হয়। দেশে যে সব "উদ্ধার-সমবায়" হইয়াছে, তাহারা মন করিলে কত কি করিতে পারেন। জেলা-বোর্ড, কি অন্য কোনও সমিতি টাকা কি সূতা কি কাপড় বিলাইতে পারেন না। কি সকলে একযোগে ব্যবস্থা অনুসারে কর্ম করিলে দেশকে অন্ন-বস্ত্রের সঙ্কটে অধিক পড়িতে হইবে না। আর, সত্য ও সংযম, স্বরাজ-শাসনের মূল নহে কি?

(৫) বাঙ্গালী বস্ত্র-বণিক হও। বাঙ্গালী বস্ত্র-বণিক বাঙ্গালীকে হঠাৎ কষ্টে ফেলিতে পারিবে না। কারণ কষ্টে ফেলিলে তাহাকেই সে কষ্ট দূর করিতে হইবে। তাহাকেই তাহার প্রতিবেশীর লজ্জা সম্ভ্রম রক্ষা করিতে হইবে। অর্দ্ধগৃহ হইলেও করিতে হইবে। ইতি

উত্তর বঙ্গের কৃষির কান্না

[শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য]

১

ভাই রে আমার নাই তো কিছুই, হায় রে এ কি দায়!
ঘর বাড়ী সব ভাইসা গেছে, ডুব্‌লো সমুদায়!
পাই না খুঁইজে মহিষ গোরু, কাঁদতেছে রে ছাওয়াল জোরু,
রেল-সড়কে পইড়া আছি, পাই না মুঠেক ভাত!
রাতের পরে দিন কাটিছে, দিনের পরে রাত!

২

সেদিন কখন্ ভাইসা গেল হামার বুড়া চাচি!
বানের পানি কম্‌লো না রে, কেমন কইরা বাঁচি!
নাই রে চাউল—নাই রে কাঁথা, বুঝ্‌বে কে আজ
বুকের ব্যথা!
সোণা চইসা ধান সরিষা ভাইসা গেছে ভাই!
ক্ষেতের ফসল উদ্ধল করার মোটেই আশা নাই!

৩

কাটা কাপড়, টুটা ঘটি যা ছিল মোর ঘরে,
মুই কি একা আন্‌তে পারি!—কাঁপ্‌তেছিলাম জ্বরে!
মাথার উপর বিষ্টি পড়ে, কোলের ছুঁড়ি কাঁইদা মরে,
রোগা বৌয়ের বুকের দুধে জান্ বাঁচে না তার!
কেমন কইরা এসব দেইখা ঠিক থাকি রে আর!

৪

আউস গেল, পাটও গেল, ডুব্‌লো আমন ধান!
জমিদারের পড়্‌বে তলব, কর্‌বে অপমান।
প্রাণের দরদ্ কেউ বোঝে না, চল্‌বে ভীষণ দেনা-দেনা,-
হাম্‌রা খোদা, এমনি কইরা মর্‌বো একে একে!
তুমিই যদি হও রে নারাজ, আর কে আইসা তাখে!

৫

দু'মুঠ্ চিড়া সব ফুরাইলো, কল্‌জা বুঝি ফাটে!—
আর কি খোদা, মানুষ আছি—চামড়া সব কাঠে!
কোঠি বাব—কেবা দিবে, কেবা আইসা ডাইকা নিবে,
পাথার-ভরা সাঁতার পানি, সাঁতের বিষম টান!
ধড়ে বুঝি জান্ থাকে না, আর থাকে না জান্!

৬

দেশের মানুষ কই বাবুরা, বাবারা আজ কই!
তোম্‌রা আইসা তাখো বাবা, হাম্‌রা কত সই!
জুয়ান বিটি বৌয়ের এবার, নাই রে তেনা লজ্জা ঢাকার,
ভাত-কাপড়ে লজ্জা রাখে, বাঁচাও আইসা প্রাণ!
আর বাঁচি না—আর পারি না—আর থাকে না মান!

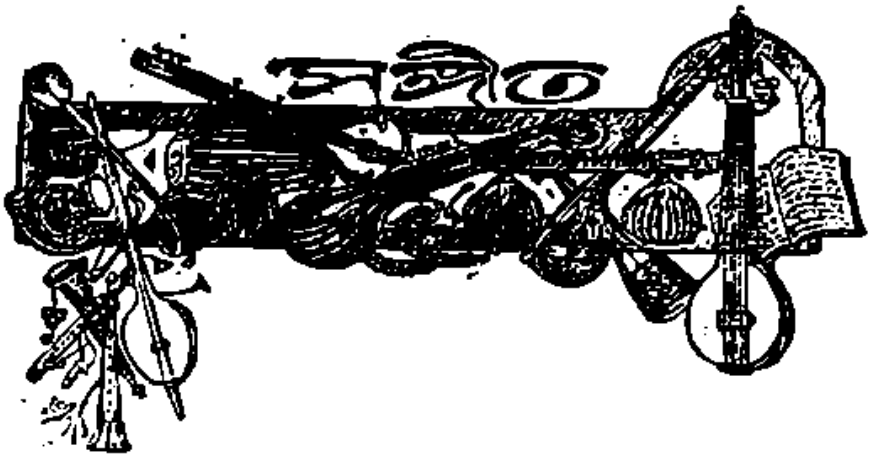

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—দাদরা

সাঁঝের প্রদীপ দিনু জ্বালায়ে তোমারি ঘরে
প্রীতির আগুন-শিখা জ্বলিল আরতি তরে।
পূজা দিব চরণেতে নমি আমি বারবার,
অন্তরের আলো তুমি, লহ এই অর্ঘ্যভার।
কত আয়োজন হয় আজি এ সোণার সাঁঝে,
হৃদয়ে হৃদয়ে শুভ ভকতির শঙ্খ বাজে,
আলোকিত চারিদিক কিরণে কিরণ ছায়,
উজ্জ্বল মূরতি তব যেন সবে দেখে যায়।
খুলে দাও তব দ্বার, দেখি শুধু একবার
তোমারে নয়ন ভরে দেখি, নমি শতবার।
নিমেষে নিমেষে দেখা দিয়ে কেন সরে যাও,
আমারে ধাঁধার মাঝে ফেলে কোথায় লুকাও ?
কেমনে তোমার পূজা দিব গো জানি না আমি,
তোমার অর্চ্চনা গান করিব দিবসযামী। *

[কথা ও সুর—শ্রীমতী প্রতিভা দেবী

II সর্ণা ধা | পা মা গা | মা ধা পা | ণা ধা -া | ধা ণা র্সা | ণা ধা -া | মপা ধণা র্সর্রা |
সাঁ ঝে র্ প্র দী প দি নু আ লা য়ে | তো মা রি ঘ রে • • • • • • • •

গর্রা র্সণা ধপা | র্সা -া না | র্সা র্সা -া | না র্সা -া | না র্সা র্রা | মা পা র্সা | ণা ধা -া |
• • • • • • • • শ্রী • তির আ গু ন্ শি খা • অ লি ল আ র তি ত রে •

র্মগা র্রর্সা ণধা | ণর্সর্রা র্সর্গা র্রগর্মা | ধা র্সা ণা | ধা পা ধা | মা গা মা | ধা পা ধা |
• • • • • • • • • • • • • • • • পূ জা দি ব চ র ণে • তে ন মি •

* রামমোহন-লাইব্রেরীতে 'সঙ্গীত-সঙ্ঘে'র বার্ষিক উৎসবে বালকবালিকাগণ কর্তৃক গীত।

১ . ১ . ১ . ১
পা ধা পা | ধপা র্সা পা ‖ ধা -া -া | র্সা র্সা র্রা ‖ না র্সা -া | না র্সা -া ‖ না র্সা র্রা |
আ মি • বা • • র বার • • অ ন্ত রের আ লো • ছ ড়ি • ল ই এই

. ১ . ১ .
মা পা র্সা ‖ পা ধা -া | র্রসর্ণধা ণধপমা পধণসা ‖ ধণসর্রা ণসর্রর্গা সর্রর্গমা | মা গা সা ‖
অ • ন্ধ কা র • ••••••••••••• ••••••••••••• ক ত আ

১ . ১ . ১ . ১ .
রা গা মা | পা -া -া ‖ ক্ষা পা -া | ক্ষা পা ধা ‖ ক্ষা পা -া | মা গা মা ‖ পা ধা -া |
মো হ ন হয় • • আ মি এ লো পা র খাঁ চা য় ছ ন্দ রে ছ ন্দ রে

. ১ . ১ . ১ .
ধা ধা পা ‖ পা ধা -া | পা ধা র্সা ‖ পা ধা -া | র্সা র্রা র্সা ‖ পা ধা পা | মা -া -া ‖
শু ভ ভ ক ত্তি র শ • অ বা জে • আ লো কি ত চা রি দিক্ • •

১ . ১ . ১ . ১
পা ধা পা | ধা পা র্সা ‖ ধা -া -া | র্সা র্মা র্গা ‖ র্রা র্সা র্রা | পা সা পা ‖ ধা পা ধা |
কি র ণে কি র ণ ছায় • • উ জ্জ্বল মূ র ত্তি ত ব • যে ন •

. ১ . ১ . ১ .
পা ধা -া ‖ পা র্সা পা | ধা -া -া ‖ মা গা সা | রা গা মা ‖ পা -া -া | ক্ষা পা -া ‖
স বে • দে • খে যায় • • খু লে দা ও ত ব দ্বা • র দে খি •

১ . ১ . ১ .
ক্ষা ধা পা | ক্ষা পা -া ‖ গা মা পা | ধা ধা ধা ‖ ধা ধা পা | পা ধা -া ‖
শু ধু এ ক বা র তো মা রে ন য় ন ভ রে • দে খি •

১ . ১ . ১ . ১
পা র্সা পা | পা ধা -া ‖ র্সা র্সা না | র্সা র্সা র্সা ‖ না র্সা া | না র্সা -া ‖ পা র্রা র্সা |
ন মি শ ত বা র নি মে ষে নি মে ষে দে খা • দি য়ে • কে ন স

. ১ . ১ . ১ .
না র্সা -া ‖ মা গা রা | সা র্রা গা ‖ মা পা -া | ক্ষা পা -া ‖ ক্ষা ধা পা | ক্ষা পা -া ‖
রে খা ও আ মা রে খাঁ ধা র মা ঝে • হে লে • কো থা য় লু কা ও

১ . ১ . ১ . ১
সা রা পা | রা গা মা ‖ গা মা পা | মা পা ধা ‖ পা ধা র্সা | পা ধা -া ‖ র্সা র্মা -া ‖
কে ম নে তো মা র পূ জা • দি ব গো জা নি না আ মি • তো মা র

. ১ . ১ . ১ .
পা -া র্মা ‖ রা র্সা -া | না র্সা র্রা ‖ মা পা র্সা | পা ধা -া ‖ র্সপা ধপা মপা | রসা রগা মপা
অ • র্চ্চ না গা ন্ ক রি ব দি ব স যা মী • • • • • • • • • • • • • • • • • •

১ .
মপা ধপা পধা | র্সপা ধপা ধপা ‖‖
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

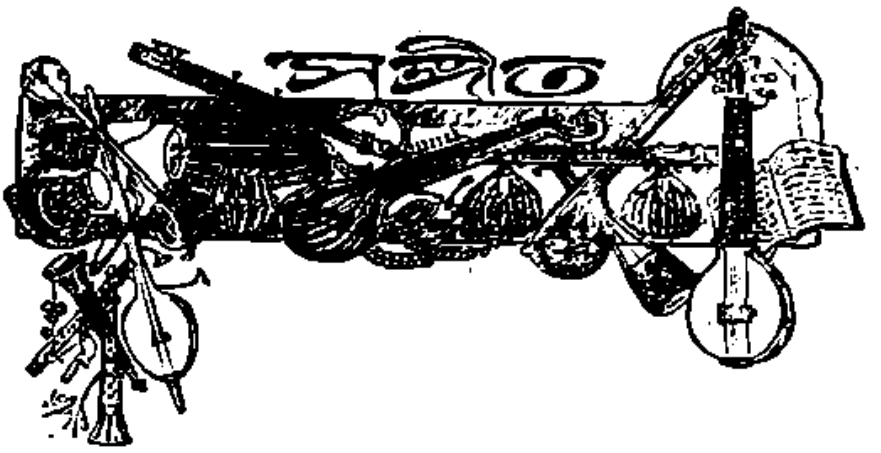

মিশ্র ইমন—সুরফাঁকতাল

আজি শুভ-দিনে এসো গাহি মোরা সমস্বরে
সে গান উঠিবে জাগি গগনের স্তরে স্তরে।
অগণ্য নক্ষত্র তারা
বাজাইয়া একতারা
এক মন্ত্রে গাহিবে গো, সে গান আনন্দ ভরে।
গাব আজি মিলে সবে,
শত কণ্ঠ এক হবে,
মোদের মায়ের ঘরে কেহ না রহিবে বাকী।
হৃদয়েতে এক ধ্যান
সত্যবলে বলীয়ান
ছলনা চাতুরী ছাড় মুছাইতে মা'র আঁখি।
আন শক্তি মহীয়সী
দেখিবে গো রবিশশী
দাঁড়াও গো এক প্রাণ সুদৃঢ় বন্ধন রাখি'।

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর] [স্বরলিপি—শ্রীঅরুণা দেবী

১ ২ ৩ ২
II { পা পা ধা -া | না ধা | না র্সর্সা নর্সা -া] না ধনা ক্ষা -া | ধপা ক্ষপা |
আ জি শু • শু • দিনে • • • • এ • • • • সো • • •

৩ ১ ২ ৩ ১
ক্ষা পা -া মা] -া গা -া রা | গা রা | সন্া রা সা -া] } গা গা পা -া |
গা হি • মো • রা • স ম • স্ব • • রে • সে গা ন্ •

২ ৩ ১ ২ ৩
পা পা | পা ক্ষপা ক্ষপধা ধা | -া -া -া -া | ধা ধা | পধা না -া -া |
উ ঠি বে মা • • • • গি • • • • গ গ নে • র • •

১ ২ ৩
না না র্সা া- | ধা না | সা -া -া -া ||
ত রে • • ত • রে • • •

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
II পা পা -া -া | ধা -া | না র্সা -া র্গর্রা | র্সনা না র্সা -া | র্সা র্রা | র্রা র্রা -া র্রা |
অ ন্ত • • গ্য • ন ক • ত্র • • তা রা • বা জা ই য়া • এ

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
র্রসা না নর্রা র্সর্গা | র্গা -া | র্গা র্পা র্গা -া | র্রা -া র্সা র্রা | র্সা -া | না -া পা ক্ষা |
ক • • তা • • য়া • এ ক ম • ত্রে • গা হি বে • গো • সে গা

১ ২ ৩
গরা রা রগা ক্ষপা | পা ক্ষা | পা -া -া -া ||
• ন্ আ ন • • • ল ভ রে • • •

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
II গা গা গা পা | পা পা | পা পা ক্ষা পা | পা পা ধা -া | না ধা | র্রা র্রা র্রা -া |
গা ব আ • জি মি লে স • বে শ ত ক • ঠ এক্ • হ বে •

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
র্সা র্সা র্গা র্রা | র্রা -া | র্সনা র্সা -া -া | না র্সা না ধা | পা ক্ষা | পা ধা না -া ||
মো দে র মা রে র ঘ • রে • • কে হ না র হি বে বা • কী •

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
II { সা সা রা পা | পা মা | মা গা রগা -া | রা -া রা রা | গা রসা | সা গা রগা না |
হৃ দ য়ে • তে এ ক থা • • ন্ স • ভা ব লে • • ব লী য়া • ন

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
মা মা মা -া | মা পা | মা গা -া পা | রা গা রসনা সা | রা -া | রা পমা গরা গা |}
ছ ল না • চা তু রী ছা • ড় মু ছা ই • • তে মা র আঁ • • • খি

১ ২ ৩ ১ ২
পা পা ধা -া | না র্সা | র্গর্রা র্সনা না র্সা | র্সা র্রা র্রা র্রা | র্রা র্রসা |
আ ন ন • কি ম য়ী • • র মী দে খি বে গো র বি •

৩ ১ ২ ৩ ১
না নর্রা র্সর্গা র্গা | র্গা র্পা র্গা -া | র্রা -া | র্সা র্রা র্সা না | পা পা ক্ষা গরা |
• শ • • শি শি • ড়া ও • গো • এ ক প্রা ণ্ মু গ্ধ • •

২ ৩
রা রগা | ক্ষপা পা ক্ষা পা ||
ব ন্ধ • • ন রা খি

বিরহের এ-পিঠ ও-পিঠ

[শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার বি-এ]

এ-পিঠ

(১)

প্রাতঃকালে চা'-পান শেষ করিয়া চুরোটটি ধরাইয়াছি—এমন সময় হাস্য-মুখে গৃহিণী আসিয়া ডাকিলেন—"ওগো।" তাঁর রকম দেখিয়া অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না যে, আজ তাঁর একটা বিশেষ কোন অনুরোধ আছে,—হয় ছেলেদের অতিরিক্ত টাকা পাঠাইতে হইবে,—নয় জামাইয়ের তত্ত্ব করিতে হইবে। গৃহিণী বেশ জানেন যে, অনুরোধ যেমনই হউক না কেন—এই প্রাতে চা'-পানের পর ধরখাস্ত পেশ করিলে সফল হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। এ সময়ে বর-প্রার্থনা করিলে 'না' বলিতে পারা আমার পক্ষে শক্ত। যিনি আজ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া আমার সকল প্রকার দুর্ব্বলতা ফেল করিয়া লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন—তাঁর কাছে এ দুর্ব্বলতাটুকু অজ্ঞাত থাকা সম্ভব নহে।

যাহা হউক, আমি বেশী কথা না বলিয়া কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি ?"

"এ সময়ে তোমার ছেলেরা সব বিদেশে, মেয়েও শ্বশুর-বাড়ী ;—আমি মনে করছি, একবার দিন-কতকের জন্য কেষ্টনগর গিয়ে মা'র কাছে থাকি,—কি বল ?"

"বেশ ত !"

"বড় যে খুসী ! এখন আর অনুমতি দিতে দেরী হয় না। আগে কত কাঁদা-কাটা করেও ছুটি মিলত না—এখন আর বলতে ভয় সয় না।"

এ কথার উত্তর নাই ;—আর উত্তর যাহা ছিল—তাহা প্রকাশ করিলে বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়। অতএব, বোঝার শক্র নাই। আমি বেশ জানি যে, যদি আমি গৃহিণীর প্রস্তাব অস্বীকার করিতাম, তাহা হইলে প্রাতঃকালেই বিনা-মেঘে এক পস্‌লা অশ্রুবর্ষণ হইয়া যাইত। এ দিকে বিনা আপত্তিতে স্বীকার করিয়াও এই ভিত্তিহীন অভিযোগ শুনিতে হইল। কিন্তু গৃহে শান্তিরক্ষা করিতে হইলে এ বিষয়ে বেশী আলোচনা না করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কোন বিখ্যাত লেখক চর্ম্মের দুর্ভেদ্যতা বিষয়ে গণ্ডারের সহিত উমেদারের তুলনা করিয়াছেন ;—আমার বিশ্বাস তিনি প্রাণী পর্য্যায়ে প্রৌঢ়া পত্নীর স্বামী নামক জীবের অবস্থা ভাল করিয়া জানিতেন না।

আমি যতক্ষণ চুরুট টানিতে-টানিতে এই দাম্পত্য-বিজ্ঞান ভাবিতেছিলাম, কেহ যেন মনে না করেন যে গৃহিণী ততক্ষণ নীরবে ছিলেন। তিনি এই অবসরে—তাঁকে কে সঙ্গে করিয়া কৃষ্ণনগর লইয়া যাইবে—চাকর চাকরাণী কে কে সঙ্গে যাইবে,—আমার কাছে কে কে থাকিবে,—তাঁর অনুপস্থিতি সময়ে গৃহস্থালীর ব্যবস্থা কি হইবে, ইত্যাদি বিষয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিতেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ কথা আমার কাণে না ঢুকিলেও আমি এটুকু বুঝিতেছিলাম যে, আমার অনুমতি লওয়াটা কতকটা 'দেরেস্তাই' (formal) ব্যাপার মাত্র ; আমার মঞ্জুরীর পূর্ব্বেই তিনি প্রায় সবই ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। এতকাল সরকারী চাকরী করিয়া এ জিনিষটা আমার গা-সওয়া,—কাজেই ইহাতে আমি বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্য হইলাম না। তথাপি গৃহিণীকে খুসী করিবার জন্য একটু করুণ স্বরে বলিলাম—

"হাঁগা, তুমি ত যাচ্ছ, আমার কি করে যাচ্ছ ? তোমার বাক্যবাণ আমার সয়ে গেছে, কিন্তু বিরহটা আমার একেবারে অভ্যাস নেই। এ বয়সে তার ধাক্কা সাম্‌লাতে পারলে বুঝি ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যখন ডি, এল্ রায় তাঁর বিরহের গান লিখিয়াছিলেন—তখন তাঁর অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর বয়স। 'যখন, রজক আসিয়া বলে কাপড় গণিয়া লও, তখন কাতর কণ্ঠে তোমারে ডাকি, বিরহ জিনিসটা কি, নাইরে নাইরে নাইরে আমার বুঝিতে বাকি।' —তা' বাপের বাড়ী যাচ্ছ—এসব কথা ভেবেছ কি ?"

গৃহিণী গালে হাত দিয়া আমার এই অসম্ভাবিত সুদীর্ঘ বক্তৃতা এতক্ষণ শুনিতেছিলেন। আমি পরিশ্রান্ত হইয়া চুরুট ধরাইবার অবকাশে তিনি বলিলেন—"হ্যাগো, তুমি বুড়ো-বয়সে ক্ষেপ্‌লে না কি! এত আলাভ্-পালাভ্ বকছ কেন? আর তোমাকে কি আমি জানিনে;—তোমার সব ব্যবস্থা না করে দিয়ে কি আমি যাচ্ছি! আমি এতক্ষণ যে সব কথা বল্লাম, তার কি একটাও তোমার কাণে পৌঁছুল না।"—বলিয়া তিনি তাঁর পূর্ব্ব বক্তৃতার পুনরুক্তি করিলেন।

আমি এবার একমনে তাঁর ব্যবস্থাবলির সুদীর্ঘ তালিকা শুনিয়া বুঝিলাম যে, নাবালক জমীদারদের সম্বন্ধে যদি গভর্ণমেণ্ট এমনি বিস্তারিত নিয়মাবলি প্রত্যেক ম্যানেজারকে দেন, তবে সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত এই সকল নাবালকের কোন প্রকার অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা-মাত্র থাকে না। যাহা হউক, গৃহিণীর স্বরে একটু করুণ-রসের আভাস পাইয়া আমি আশ্বস্ত হইলাম, এবং যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাকে মনে-মনে স্বীকার করিয়া লইয়া খবরের কাগজে মন দিলাম। গৃহিণীও তাঁর প্ল্যান কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন।

(২)

পরদিন ছিল শনিবার;—আফিস হইতে আসিয়া দেখি গৃহিণীর ভ্রাতুষ্পুত্র গাড়ী ডাকাইয়া তাহাতে দ্রব্যাদি বোঝাই করাইতেছেন, আর গৃহিণী বৈঠকখানার জানালায় দাঁড়াইয়া তদারক করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে ভাড়াটে গাড়ীর ছাদ এবং ভিতরটা বাক্স, প্যাটরা, পুটলীতে আকণ্ঠ ভরিয়া গেল। ইহা গরুর গাড়ী নহে বলিয়া গাড়োয়ান দুই একবার ক্ষীণ আপত্তি করিল,—তাহা কিন্তু কাহারও কাণে প্রবেশ করিল না। অবশেষে ভৃত্য দুখীরাম কোচবাক্সে ও রামের মা দাসী পিছনে গিয়া বসিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমার উপর হুকুম হইল—শীঘ্র-শীঘ্র কাপড় বদলাইয়া, চা' খাইয়া লইতে হইবে। বরণী (গৃহিণীর ভ্রাতুষ্পুত্র) ছেলে-মানুষ, (তাহার বয়স ২৩ এবং সে এম-এ, পড়ে) সে কি এ সব রেলের হাঙ্গাম সোহাইতে পারিবে। আমি তথাস্তু বলিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া লইলাম। পথে যাইতে-যাইতে গৃহিণী আমাকে জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে যে সকল অমূল্য উপদেশ দিতেছিলেন, তাহা লিখিয়া রাখিয়া ছাপাইতে পারিলে নিশ্চয়ই চৈতন্যবুক কমিটি তাহা পাঠ্য-পুস্তক-শ্রেণীভুক্ত করিতেন।

সত্য কথা বলিলে বিপদ আছে জানি, তবু না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যদিও গৃহিণী না থাকিলে আমার অনেক বিষয়ে অসুবিধা হইবে বেশ জানিতাম,—কিন্তু তথাপি তাঁহার অনুপস্থিতিকালে যে স্বাধীনতা উপভোগ করিব আশা করিতেছিলাম, তাহা কল্পনা করিয়া এই আসন্ন বিরহেও আমার মনটা বেশ একটু খুসী হইতেছিল। (দোহাই পাঠকবর্গ—এ সংবাদটা আমার গৃহিণীকে দিবেন না;—আর সম্পাদক মহাশয় এ সংখ্যার কাগজ আমার ক্লাবের ঠিকানায় পাঠাইবেন—বাড়ীতে পাঠাইবেন না)।

যাহা হউক, বক্তৃতা শুনিতে-শুনিতে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া গৃহিণী ও তাঁহার দলকে গাড়ীতে বসাইয়া দিলাম। গৃহিণী এক-এক করিয়া পোঁটলা-পুঁটলী গণিয়া লইতে লইতেও আমাকে অনেক বিষয়ে সাবধান করিয়া দিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে—জানি না বিরহের দুঃখে অথবা ভাবী স্বাধীনতা-সুখের কল্পনায়, আমার অজ্ঞাতে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল, কিন্তু ভাবের বিশ্লেষণে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া আমি ষ্টেশনের রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুমে চা'-পান করিতে প্রবেশ করিলাম।

* * *
* *

ষ্টেশন হইতে বরাবর ক্লাবে গিয়া এবং সেখানে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কাটাইয়া যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন বাস্তবিক একটু ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিতেছিল। বাড়ীর গৃহিণী চলিয়া যাওয়ার দিন হইতেই আমার এই দেরী করিয়া বাড়ী আসায় চাকর-বামুনের মধ্যে যে বেশ একটু সরস সমালোচনা হইয়াছিল, তাহা তাহাদের ভাব-ভঙ্গীতে বুঝিলাম। ক্লাবেও দু' এক জন বন্ধু, আমি বেশ নিশ্চিন্ত মনে তাস খেলিতেছি এবং অন্য দিনের মত মুহুর্মুহুঃ ঘড়ি দেখিতেছি না—'বাঁধা গরু ছাড়া পাওয়া'র সহিত আমার অবস্থার তুলনা করিতে ছাড়েন নাই।

যাহা হউক, আহারাদির পর ইজি চেয়ারে বসিয়া যখন চুরুট টানিতেছিলাম, তখন গৃহিণীর অভাবটা সত্যই অনুভব করিতেছিলাম। এই সময় তাঁহার বক্তৃতা শোনা আমার

একটা দৌত্যতের মত হইয়াছিল ;—কাজেই এতকালের অভ্যস্ত বস্তুর অভাবে নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

এমনি করিয়া সুদীর্ঘ বিশ বৎসরের পর আমার গৃহিণীর সহিত প্রথম দীর্ঘ বিরহ আরম্ভ হইল। যুবক-যুবতীর বিরহ চিরদিন কবিদের কাব্যের খোরাক যোগাইয়াছে,—কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে যে বিচ্ছেদ, তাহার মধ্যে এক বাসা ছাড়া যে অন্য রস আছে, তাহা কবিরা কেহ দেখিতে চান নাই,—অথবা আমার বিশ্বাস, অনেক কবিই পরিণত বিরহের গান গাহিয়া থাকিবেন। ইহার একটা কারণ আমার মনে হয় যে, আমাদের এই যে বিরহ-যন্ত্রণা, ইহা বহুদিনের অভ্যস্ত নিয়মিত জীবনযাত্রার অভাব-বোধের ফল,—আর যৌবনের বিরহ—যাক্ সে কথার আর কাজ নাই—আমার পক্ষে তাহা এখন অনধিকার-চর্চ্চা!

গৃহিণী চলিয়া যাওয়ার পর সপ্তাহ-খানেক আমার গৃহ-স্থালীর কাজকর্ম্ম কতকটা চিরক্ষুণ্ণ পথেই চলিয়াছিল, তারপর ধীরে-ধীরে তাহার ব্যতিক্রম আরম্ভ হইল। আমার প্রিয় ভৃত্য শ্রীমান ঝগড়ু বেহারার সহিত দ্রৌপদীর পুং-সংস্করণ শ্রীমান মধুসূদন চক্রবর্ত্তীর বিবাদ সুরু হইল।—তাহার ফলে সময়ে রান্না হইয়া উঠে না—রোজই আফিসে দেরী হইতে লাগিল। আর মধুসূদন যাহা রাঁধিয়া দেন, তাহা ক্রমশঃ কবিরাজী "বার্ত্তাকাদ্যি" পাচনে পরিণত হইল। জিজ্ঞাসা করিলে মধু বলে, ঝগড়ু আজকাল বাজারের পয়সা খুব চুরী করে,—ঘি—তেল দোকানে বিক্রয় করে। ঝগড়ু পাচকের উপর দোষারোপ করে,—ফলে কিন্তু "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু খড়ের প্রাণ যায়।"

এদিকে গৃহের অবস্থা দেখিলে আমারই কান্না আসে ;—অধিকাংশ ঘরেই আর ঝাঁট পড়ে না ; বারান্দার কোণে-কোণে ময়লা স্তূপাকার হইয়া উঠিতে লাগিল। আমার শয়ন-কক্ষে ঝাঁট পড়িত বটে ; কিন্তু বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় আর বদলান হয় না। জিজ্ঞাসা করিলে ঝগড়ু বলে, সে একটা মানুষ, কোন্ দিক সামলাইবে। একদিন একটা দরকারী কাগজ হারাইয়া যাওয়াতে আমি তাড়না করায়, ভৃত্যবর তারপর দিন হইতে আমার বসিবার ঘর পরিষ্কার করা বন্ধ করিল—অথচ দ্বিপ্রহরে সে যে সেখানে সবান্ধবে আড্ডা দিত, তাহার চিহ্ন পাইতাম।

যাইবার সময় গৃহিণী আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, যেন প্রতিদিন ঝগড়ুর নিকট বাজারের হিসাব লই। আমিও প্রতিদিন প্রাতে চা-পানের পর হিসাব লইতে বসিতাম ;—কিন্তু কোন দিনই আমার সহিত খরচের মিল হইত না,—শেষে হতাশ হইয়া আমি ভৃত্যবরের ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া, সে যাহা বলিত নির্ব্বিচারে লিখিয়া লইতাম ; অথচ দেখিতাম যে, সে যে সব জিনিষের নাম লেখাইত, তাহার অনেক জিনিষই আমি চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাইতাম না। এমনি করিয়া সংসার চলিতে লাগিল। খরচ হইত দ্বিগুণ—আর আমার কাজে লাগিত তাহার দশমাংশ।

অতএব "স্বারং স্বারং স্বগৃহং চরিতং"—আমি গৃহ অপেক্ষা ক্লাবই বেশী পছন্দ করিতে আরম্ভ করিলাম। আফিস হইতে সোজা ক্লাবে যাইতাম এবং রাত্রির আহারাদি সেখানেই শেষ করিয়া রাত্রি এগারটার পর গৃহে ফিরিতাম —কখন বা তাস-দাবা খেলিতে খেলিতে আরো বেশী রাত্রি হইত। ক্রমে ক্লাব-জীবনের দু'একটা দোষও আমাকে এ প্রৌঢ় বয়সে পাইয়া বসিল। সেখানে নানা শ্রেণীর বন্ধু-বান্ধবের 'অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া'—আমার যৌবনের 'পান-দোষ' ক্রমে মাত্রা ছাড়াইতে লাগিল ; দেখিয়া আমার প্রৌঢ় বন্ধুরা হাসিয়া বলিতেন যে, অতিরিক্ত শাসনের দোষই এই যে শাসন ঢিলা হইলেই আর মাত্রা রক্ষা করা শক্ত হইয়া পড়ে, ইত্যাদি। যাহা হউক, সেই একমাসে ক্লাবে যে বিল হইয়াছিল গত ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে কোন পূর্ণ এক বৎসরেও তাহা হয় নাই।

এমনি করিয়া আমি যখন ধীরে-ধীরে অধঃপতনের দিকে চলিতেছিলাম—সেই সময় হঠাৎ একদিন আমার চির-জীবনের উদ্ধারকর্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যে বিনা 'এত্তেলায়' হঠাৎ কেন আসিলেন, তাহা ঠিক বুঝিলাম না। যাহা হউক সে সব কথা পাঠকবর্গ তাঁহার মুখেই শুনিবেন—অলমিতি বিস্তরেণ।

* * * *

*

ও-পিঠ

(১)

মা গো! পুরুষগুলো সব যেন বুড়ো খোকা! নিজেদের যদি কোন যোগ্যতা আছে! আজ কত বছর পরে বল্লাম যে, এখন ছেলেরা বাড়ী নেই—মেয়েও শ্বশুরবাড়ী, আমি —আমি একবার মা'কে দেখতে যা'ব—তা' বলা হ'ল কি না—আমার কি উপায় হবে? কেন? আমি আর নিজে হাতে তোমার কি করি! চাকর বাকরই ত সব করে! মাস-খানেকের জন্যে কি আর তুমি চালাতে পারবে না? মুখে বল্লাম বটে, কিন্তু আমি বেশ জানি যে, আমি না থাক্‌লে সেরস্তালি সব নয়-ছয়ে যাবে। ঘরে কাঁটও পড়বে না। যা' হোক, চাকরদের কাজ ভাগ করে—সব কাজকর্ম্ম বেশ করে বুঝিয়ে দিয়ে আমি ত কেষ্টনগর রওনা হ'লাম। এতকাল পরে মা'কে দেখ্‌তে যাচ্ছি—ছেলে-বেলাকার আমাদের সেই বাড়ী—সে পাড়া,—সে সব মনে করে কোথায় আহ্লাদ হবে—তা নয় ওঁর ভাবনাই মনে আসতে লাগ্‌ল! কেবলই মনে হ'তে লাগল—ওঁর কষ্ট হবে, অসুবিধে হ'বে! তা' কি করবো—চিরকাল একঘেয়ে খাটুনী খেটে যাচ্ছি—মনে কি কোনো সাধ যায় না!

গাড়ীতে উঠে মনে হ'ল—আমি যেন মুক্তি পেলাম,—এই ইঁট-কাঠের রাজ্যি হ'তে আমাদের সেই সোণার কেষ্টনগরে গিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচবো। আমাদের সেই দীঘি, যেখানে আমরা কত সাঁতার কেটেচি—সেই আম-বাগান, সেই ছেলে-বেলাকার সঙ্গিনীর দল,—মনে করিতে এ বুড়ো বয়সেও যেন মন ভরে উঠ্‌লো! সঙ্গে-সঙ্গে মনে একটু ভয়ও হচ্ছিল,—কেষ্টনগরকে কি আর তেমন দেখ্‌তে পাব! এখন রেল হয়েচে—কত নতুন-নতুন লোকজন এসেচে—আমাদের সে দল কি আছে? তারাও ত সব আপনার ঘর-গেরস্তালি করছে! সবই হয় ত বদ্‌লে গেছে! আর আমাদের যে সুখের বাড়ী—তাই কি আর তেমন আছে! বাবা নেই; ভাইয়েরা, ভাজেরা সব বড় হয়েছে;—তারাই এখন বাড়ীর গিন্নী;—মা বুড়ো হয়েছেন, তিনি আপনার আহ্নিক-পুজো নিয়েই থাকেন;—বড়বৌ শুনেছি, তেমন মিশুক নয়—আমার ছোট বো'ন তার ছেলেটি মারা যাওয়ার পর বাপের বাড়ী গিয়ে একমাসও থাক্‌তে পারে নি! না জানি আমার সঙ্গে কি রকম ব্যাভার করবে! এ সব জেনেও আমি কেন কেষ্টনগর আসতে চাইলাম! মনে-মনে একটু ভয় হ'তে লাগল—সে সোণার বাড়ীতে, যেখানে অত আদরে মানুষ হয়েছি, সেখানে গিয়ে যদি কষ্ট পাই;—না—ও সব বাজে ভাবনা ভাববো না! মনটা অন্য দিকে দিবার জন্যে তাইপো ধরণীর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলাম;—তার কথায় মনটার একটু ভার কমে গেল—সে যা' বলছিল তাতে মনে হচ্ছিল যে আমাদের সেই ছেলে-বেলাকার কেষ্টনগরই আছে! তখুনি আবার মনে-মনে সন্দেহ হচ্ছিল যে, কুড়ি বাইশ বছর বয়েসের লোকে হয় ত তেমনিই আছে,—আমাদের এ বয়সে কি তেমন রঙ্গীন দেখাবে। যা' হোক, অনেক দিন পরে মা'কে দেখবো, এই আহ্লাদেই এক-একবার মন ভরে উঠ্‌ছিল।

(২)

বাড়ী পৌঁছে দিনকতক বেশ আমোদেই কাটলো—পাড়ায়-পাড়ায় লোকের সঙ্গে দেখা-শুনো করে, মা'র সঙ্গে গল্প করে, দাদার খোকা-খুকীদের আদর করেই দিন কেটে যেত। কিন্তু এত আমোদের মধ্যেও যখন কর্ত্তার কথাটা মনে পড়ত, তখন যেন হাতে ছোট কাঁটা ফুটলে যেমন দেখা যায় না অথচ খচ্ খচ্ করে, বেদনা দেয়—তেমনি মনে হ'ত। না জানি তাঁর কত কষ্ট হচ্ছে,—সময়ে হয়, চা' পান্ না, খাবার ঠিক সময়ে তোয়ের হয়ে উঠে না—কাছারীর দেরী হয়ে যায়,—এই সব ভাবনা। তা কি করবো—আমি কি দু দশ দিনের জন্যেও ছুটি পাব না। আপিসের চাকরী করলেও ত লোকে ছুটি পায়,—আর আমাদের এ পোড়া চাকরীর কি ছুটি নেই! মা-গো-মা,—আমাদের এই জন্মে যদি কোন সুখ আছে! তা' দোষই বা দেবো কায়—ছুটি পেয়েও ত স্বোয়াস্তি পাচ্ছিনে! আচ্ছা, পুরুষগুলো কি ছুটিতেও আপিসের ভাবনা—এমনি করে ভাবে? দেখে ত তা' মনে হয় না! তবে আমরা কেন অমন নিশ্চিন্ত হতে পারি নে! কে জানে?

কেষ্টনগরে আসার হপ্তা-খানেক পরে একদিন কথায়-কথায় বড়বৌ বল্লে—"হ্যাঁ বড়দি, তুমি এলে বাপের বাড়ী—তা' চাকর-চাকরাণী সঙ্গে কেন? ওরা না থাকলে কি তোমার একটা মানুষের কাজ কেউ করে দিত না;—আর ওরা করেই বা কি, কেবল বসে-বসে গিল্‌চে আর গাল-গল্প

যায়চে!" কথাটা শুনে মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। তারপর মা'ও একদিন ইসারায় এই কথাটাই বল্লেন। আমি সেই দিনই রাধের মা ও দুখীরামকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলাম।

নতুন-নতুন এসে বাড়ীর অবস্থা ঠিক বুঝতে পারি নি; —ক্রমে-ক্রমে বড়-বৌ'র পালিস একটু-একটু করে উঠে যেতে লাগল। ক্রমে মায়ের অবস্থাও বুঝতে পারলাম। প্রথমে মনে করতাম যে, তিনি নিজে হ'তে গেরস্তালির কাজ-কর্ম্ম বৌ'দের দিয়ে "পুজো-আচ্চা" নিয়ে আছেন;—ক্রমে বুঝলাম তিনি বড় বৌ'র "হাত-তোলায়" আছেন; কোন বিষয়ে তাঁর কোন কথা বল্‌বার অধিকার নেই—কোন কাজে কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসাও করে না!

আমার স্বামীর অবস্থা ভাল, কাজেই আমাকে বড়-বৌ' দিন-কতক একটু আদর-যত্ন দেখিয়েছিল,—আমার ছোট বোনের সঙ্গে মা'র কথা নিয়েই গোড়া হতেই 'খুটি-নাটী' আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু স্বভাব কি শুধু ওপরকার পালিসে ঢাকে?—বড় বৌ যে দিন শুনলেন যে আমি মাসখানেক থাকবো বলে এসেছি, সেই দিন হ'তেই আমার খাতির কমতে লাগলো! কলকাতায় থেকে, বিশেষ কর্ত্তাদির জেদাজিদিতে আমার সকাল-বেলায় চা' খাওয়া অভ্যাস হয়েছিল। চা'য়ের সব জিনিষ আমার সঙ্গেই ছিল। প্রথম-প্রথম সব ছেলেপুলে আমার সঙ্গে 'চা' খেত—দুখীরাম চা করে দিত। দুখীরাম যাওয়ার পর আমি নিজেই চা করতাম;—কিন্তু ক্রমে দুধ পাই ত চিনি নেই—চিনি থাকে ত দুধ জোটে না—এমনি হ'তে লাগল। আমি শেষে বিরক্ত হয়ে চা খাওয়াই ছেড়ে দিলাম। চা ছেড়ে দিয়ে যে কষ্ট—আমার বাপের বাড়ী—যেখানে আমাদের দুই বোনের কত আদর ছিল—সেখানকার এই অনাদরটুকু তার চেয়ে ঢের বেশী বুকে বাজল। তার পর আরো অনেক ছোট-খাট অসুবিধা আরম্ভ হ'ল। তা সে সব আমি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলাম না;—কিন্তু শ্বশুর-বাড়ীতে যে সব হলে মনে অভিমান হ'ত না, নিজের বাপের বাড়ীতে তাতেই বুক ফেটে কান্না আসত,—আর ছেলে-বেলার কথা মনে পড়ত; মনে হত—সবই ত জানতাম—তবে কেন—কোন্ সুখের আশায় নিজের ঘর ছেড়ে এখানে এলাম। জীবনের সকাল-বেলায় যে গাছের নীচে ব'সে আরামে, শান্তিতে, সুখে কাটিয়েছি,—এখন এই অপরাহ্ণে সেখানে কি তেমন সুখ পাইব; যে স্নেহ-নীড়ে মা-বাপের বুকে মানুষ হয়েছি—সে কি আর আছে;—এখন এখানে অন্যরা আসিয়া সে বাসা জুড়ে বসেছে। এখন নিজের ঘরে যে সুখ, তা' কি শুধু এখানে বাড়ীতে জন্মেছি বলেই এখানে পাবার আশা করা উচিত।

যা'ক সে কথা—কিন্তু এ হ'ল ভাল,—ঈশ্বর এমনি করে আমার ভুলটা ভেঙ্গে দিলেন! সব বুঝলাম, তবু মন যে মানে না! এ যে আমার বাপের বাড়ী! 'বাপের বাড়ী'—বল্লে যে কতটা বোঝায়—তা' পুরুষরা বুঝতে পারবে না—মেয়েরা তা' বেশ বুঝবে!

আমার চাকর-চাকরাণী চলে যাওয়ার পর আর কিছু দিন এমনি করে চল্লো,—তারপর একদিন ব্যাপারটা একটু বেশী তিক্ত হয়ে গেল। আমি নিজে বড় খুঁতখুঁতে মানুষ, —অপরিচ্ছিন্ন যন্ত্রণা মোটে দেখতে পারিনে। রাধের মা ও দুখী যতদিন ছিল—ততদিন তাদের দিয়ে ঘর বাড়ী পরিষ্কার করিয়া নিতাম। তারা চ'লে গেলে কতক আমি নিজে করতাম, আর কতক বাড়ীর চাকরদের দিয়ে করাতাম—। আমার কাছে টাকাটা—সিকেটা পেত বলে তারাও আমার কথা খুসী হয়েই শুনত। এটা বোধ হয় বড়-বৌ'র পছন্দ হচ্ছিল না।

একদিন আমি চাকর দিয়ে বাড়ীর পিছনের তরকারীর বাগানটা পরিষ্কার করাচ্ছিলুম, বড়-বৌ তাকে ডেকে বল্লেন বাজার যেতে। সে উত্তর দিল—"আর একটু বাকী আছে, এটা সেরে যাচ্ছি।" আর যাবে কোথায়? বড়-বৌ তাকে খুব বকতে লাগল। বকাটা যদিও চাকরকে হচ্ছিল, কিন্তু তার আঘাতটা লাগ্‌ছিল আমাকে!

আমি চাকরটাকে পাঠিয়ে দিয়ে—বড়-বৌকে বল্লাম— "বৌ, এ কাজও তোমার,—বাগানটা ভাল হলে ত আমি নিয়ে যাব না।" তার উত্তরে বড়-বৌ যা বল্লে, তাতে আমি বেশ বুঝলাম যে কথাটা বাগান নিয়ে নয়—সে হচ্ছে বাড়ীর কর্ত্তৃত্ব নিয়ে! তাঁর চাকর—তাঁরই হুকুম শুনবে, এই তাঁর অভিপ্রায়। ঠিক্! আমি চুপ করে রইলাম, কাজেই ব্যাপারটা প্রকারান্তরে আর বেশী গড়াল না। মা আমার হয়ে বলতে গিয়ে বড়-বৌ'র কাছে ধমক খেলেন;—তাঁরও অবস্থাও বেশ বুঝলাম—তিনি 'নিজ গৃহে পরবাসী মাত্র।'

নানা কারণে আমি বেশ বুঝ্‌ছিলাম, যে আশা করে আমি এবার বাপের বাড়ী এসেছিলাম, তা'র সব উল্টো হচ্ছিল। আমার সে ছেলেবেলাকার বাপের বাড়ী আর নেই,—কেষ্টনগর যেন সব বদলে গেছে,—আর আমার সে সঙ্গিনীর দল,—তাদের অনেকেরই অন্য যায়গায় বিয়ে হয়েছে, তারা সব সেখানে নিজেদের ঘর গেরস্তালি করছে—দু'একজন আছে—তারা সব বদলে গেছে! কেউ বা বিধবা হয়ে ভাইয়েদের কাছে আছে, তাদের ছেলেপুলে মানুষ করছে, তাদের দাসীবৃত্তি করছে, আর বৌদের 'মুখনাড়া' খাচ্ছে। বাকী যাদের কৃষ্টনগরেই বিয়ে হয়েছে, তারা সব নিজেদের সুখ-দুঃখ নিয়ে ব্যস্ত;—ছেলেবেলাকার মত মন খুলে আর কেউ মিশতে পারে না;—আমার সখীরা আর নেই—এরা সব নূতন মানুষ। ভগবান জানেন—এমন কেন হয়!

মনের যখন এমনি অবস্থা, এমন সময় একদিন কোন খবর দেওয়া নেই—হঠাৎ রামের মা এসে উপস্থিত! আমি ত ভয়েই সারা—না জানি কি একটা বিপদ হয়েছে! জিজ্ঞাসা করলাম—সব ভাল ত। সে সংক্ষেপে বল্‌লে হ্যাঁ। মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। আমি তার রকম দেখে বুঝলাম যে, একটা কথা সে লুকুচ্ছে—সকলের সামনে বলতে চায় না। তাকে ডেকে নিয়ে আমার ঘরে গেলাম। সে তখন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এক মস্ত কাহিনী বলে গেল—তার ভালপালা বাদ দিলে দাঁড়ায় এই যে—কর্ত্তাটি আমার চলে আসার পর হতে যে ভাবে চলচেন, তাতে লোকে অনেক কথা বল্‌চে। এখন না কি তিনি রাত্তির বারটার আগে বাড়ী আসেন না;—আর যে অবস্থায় আসেন, তাকে ঠিক ভদ্র অবস্থা বলা যায় না, ইত্যাদি। সব শেষে রামের মা বল্লে—"মা, তুমি শীগ্‌গীর বাড়ী না ফিরলে—একটা কেলেঙ্কারী হ'বে।" তার কথা শুনে আমার যেন পেটের মধ্যে হাত পা' ঢুকে গেল। কি করি! শেষে ভেবে-চিন্তে মা'কে গিয়ে বল্লাম—যে কর্ত্তার শরীর ভাল নেই—একা সেখানে তাঁর যত্ন হচ্ছে না,—আমাকে কালই কলকাতায় ফিরতে হবে।

তার পরদিন ভাল দিন ছিল,—আমি, রামের মা ও একটা চাকরকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা ফিরলাম—তখন রাত্তির প্রায় এগারটা।

• • •

মিলন।—(কর্ত্তার জবানী)

সেদিন ছিল অফিসের ছুটি;—সমস্ত দিন বাড়ীতে চা' খেয়ে, খবরের কাগজ পড়ে, ঘুমিয়ে—দিন যেন আর কাটতে চাচ্ছিল না। শেষে বিরক্ত হয়ে বৈকালে দু'এক জন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করে—সন্ধ্যার সময় যথারীতি ক্লাবে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে গিয়ে দেখি ধুমধাম ব্যাপার! আমাদের একটি বন্ধু মেজিস্‌লেটিস্ কৌন্সিলের মেম্বর নির্ব্বাচিত হয়েছেন, সেই উপলক্ষে 'ডিনার' হবে। আমার নামের নিমন্ত্রণ-কার্ডটাও সেই-খানেই পেলাম—সেটা অফিস হ'তে ফিরে এসেছে!

এই মেম্বর-নির্ব্বাচন ব্যাপারে আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলাম, কাজেই আমাদের দলের আনন্দের আর সীমা নাই। গল্প, হাসি, অভিনন্দন প্রভৃতিতে সন্ধ্যাটা বেশ আমোদেই কাটিল। তারপর 'ডিনার',—তার আর বর্ণনা কি করিব,—পেলিটির "কেটারিং"—কাজেই বেশ উপভোগ করা গেল। ডিনারের পর—আমাদের নব-নির্ব্বাচিত "অনারেবেলের" স্বাস্থ্য-পান। আমরা সকলেই কিছু কিছু বক্তৃতা দিলাম—ছোট বড় কেহই বাদ গেলেম না। এই অতিরিক্ত স্বাস্থ্য-পানের' ফল হইল যে, সভাভঙ্গের পর গাড়ীতে উঠিবার সময় ক্লাবের সকল মেম্বরেরই মনে হইতেছিল ভূমিকম্প হইয়া পৃথিবীটা টলটলায়মান—আর সিঁড়িটার ধাপ্‌গুলো যেন অতিরিক্ত পিচ্ছিল হয়ে গেছে,—যেখানে পা' রাখা যায়—সেখান হ'তেই দুতিন ধাপ্ নীচে পা পিছলে পড়ে। যাহা হউক, বাড়ী আসিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন প্রায় এগারটা। নীচেকার ঘরে কাপড় ছাড়বো মনে করে ঢুকে দেখি অন্ধকার,—বগড়ুটা "মুল্‌কা" খেয়ে বারান্দায় পড়ে ঘুমুচ্ছে;—বামুনটা সামনের মুদির দোকানে বসে রামায়ণ পড়ছে,—আমি যে এসেছি তার হুঁস্ নেই। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ইলেক্‌ট্রিক সুইচ্‌টা খুঁজতে গিয়ে হুড়্‌মুড়্ করে একটা চেয়ারের উপর গিয়ে পড়লাম;—এমন সময় দরজায় একখান গাড়ী দাঁড়ানর শব্দ পেলাম—এবং সঙ্গে-সঙ্গে গৃহিণী এসে ঢুকলেন। তিনি সুইচ্ টিপে আলো জ্বালতেই যে দৃশ্য দেখলেন—তাহাতে আমার উপর যে তাঁর শ্রদ্ধা বাড়ল তা' বোধ হয় না। গৃহিণীর আকস্মিক আগমনে আমার ও বগড়ুর একলহমে নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল;—আমরা দু'জনে, চোরের মত এক পাশে দাঁড়াইয়া—তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

রামবসুর 'আগমনী'

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

যাঁহাদের সপ্তমীর গান ভাল বলিয়া বরাবর বিখ্যাত, রামবসু তাঁহাদেরই একজন। তাঁহার বিরহ-সঙ্গীতে তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, সে কৃতিত্ব তাঁহার আগমনীতেও সুপ্রকট। এই দুই প্রকার গীতের খ্যাতির বিস্তারও প্রায় সমতুল্য। গায়কের মুখে তাঁহার বিরহ-সঙ্গীত বেশী শুনিতে পাওয়া যায় কি তাঁহার আগমনী বেশী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা ঠিক করিয়া বলা সুকঠিন।

তবে একথা জোর করিয়া বলা যায় যে, আগমনীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা সকল কবিওয়ালার চেয়ে বেশী। তাঁহার বিরহ সঙ্গীত অত্যুৎকৃষ্ট হইলেও তাহার সহিত একাসনে বসিতে পারে, এমন বিরহ-সঙ্গীত অনেক কবিওয়ালারই কলম হইতে বাহির হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার আগমনীর তুল্য আগমনী কোনও কবিওয়ালাই রচিয়া যাইতে পারেন নাই। রামপ্রসাদ, দাশরথি ও গিরিশচন্দ্রের আগমনীর পর বোধ হয় তাঁহার আগমনীই ভিক্ষুকের মুখে গীত হইতে শুনা যায়। কোনও গুণ না থাকিলে কোনও গানের এতটা প্রসার-প্রতিপত্তি হয় না। ফাঁকি দিয়া দু'দিন লোকের মন ভুলাইয়া রাখা চলে,—বরাবর চলে না। রামবসুর আগমনী যে প্রায় একশত বৎসর কাল একই ভাবে আমাদের চিত্তবিনোদন করিয়া আসিতেছে, ইহা তাহার গুণেরই পরিচায়ক।

কিন্তু সে গুণটা কি? কোন্ গুণের জোরে তাঁহার আগমনী অমরত্বের তরণীতে স্থানলাভ করিয়াছে? যে গুণ নহিলে প্রকৃত গান হয় না, ইহাও সেই গুণ,—আন্তরিকতা-গুণ। মাতৃ ভাবে এমনই মগ্ন হইয়া রামবসু সপ্তমীর গান রচিয়াছেন যে তাহা পড়িবার বা শুনিবার সময় তোমার-আমার মায়ের কথাই কেবল মনে পড়ে। মনে হয়, যেন আমাদেরই গৃহ-জননীর স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর সেই সকল সঙ্গীতের মধ্যে শুনিতে পাইতেছি। রামবসুর মেনকা বলিতেছেন,—

"মা হওয়া বড় জ্বালা—
যাদের মা বল্‌বার আছে, তারাই জানে।"

—যাদের মা বলিবার আছে, তাহারা "মা হওয়ার বড় জ্বালা," তাহা তো জানিবেই; কিন্তু সে সব জ্বালাকে ভাষার মধ্য দিয়া গোচর করানোটাই বড় কঠিন কাজ। বিশেষতঃ, পুরুষের পক্ষে এটা আরও কঠিন কাজ। রামবসু তাহাই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সপ্তমীর গানের অনেক স্থল এমন আছে, যাহা পড়িলে বা শুনিলেই মনে হয়, তিনি যেন মা হইয়া 'মা হওয়ার জ্বালা' অনেকটা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই হইতেছে—তাঁহার গানের গুণ। এই গুণেই তাঁহার আগমনী এতকাল ধরিয়া আমাদের হৃদয়-দরবার অধিকার করিয়া আছে।

গৌরী গিরিপুরে আসিয়াছেন, মেনকারাণী গিরিরাজকে বলিতেছেন—

"তবে নাকি উমার তত্ত্ব কোরে ছিলে।
গিরিরাজ! ওহে শুন শুন, তোমার মেয়ে কি বলে॥
নারী প্রবোধিয়ে যেতে কে, কৈলাসে যাই বোলে,
এসে বল্‌তে মেনকা, তোমার দুঃখের কথা,
উমা সব শুনেছে।
তোমায় দেখ্‌তে পাষাণী, আপনি ঈশানী,
আস্‌তে চেয়েছে।
তুমি গিয়েছিলে কই, উমা বলে ঐ যে,
আমি আপনি এসেছি জননী বলে।"

গানটির মধ্যে কোনও বড় ভাব নাই, দার্শনিক কোনও তত্ত্ব নাই, মহত্ত্বের কোনও আদর্শ নাই,—আছে কেবল সরল প্রাণের সরল কথা। সম্বৎসর পরে দুহিতা পিতৃগৃহে আসিয়াছেন, মাতাকে বলিতেছেন—'আমি আপনা হইতেই আসিয়াছি—তোমাকে দেখিব বলিয়া আসিয়াছি। আমাকে কেহ আনিতে যায় নাই।'—কথা কয়টির মধ্যে বেশ একটু অভিমানের আঘাত আছে। এই আঘাত মাতৃ-হৃদয় চঞ্চল করিয়া তুলিল। —সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রতিঘাতও হইল। সে প্রতিঘাত কিন্তু কন্যার উপর নহে,—কন্যার পিতার উপর গিয়া পড়িল। গিরিরাণী মেনকা গিরিরাজকে কহিলেন—

"তবে নাকি তুমি উমার তত্ত্ব করিয়াছিলে? যাই আমি নারী, তাই আমায় ছলনা করিয়া, মিথ্যা প্রবোধ দিয়া, "কৈলাসে যাই" বলিয়া যাইতে; আবার আসিয়া বলিতে মেনকা, আমি সব বলিয়াছি। উমা তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া তোমায় দেখিবার জন্য আপনিই আসিতে চাহিয়াছেন।' কিন্তু কৈ গিরি! তুমি গিয়াছিলে কৈ!" গিরিরাজের অবস্থা এখন যেমনই হউক, মেনকা কিন্তু মেয়ের অভিমানের উপর বেশ শীতল প্রলেপ দিয়া দিলেন। মেনকা উমার অদর্শনে কিরূপ কাতর হইয়াছিলেন, সে কথা তিনি উমাকে কিছু বলিলেন না। তিনি উমার কথার উত্তরে উমাকে কিছু না বলিয়াও গিরিরাজকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই কন্যা-বিরহ-কাতর মাতৃ-হৃদয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। গানটির আগাগোড়া সুসংবদ্ধ। গানের কোন একটি ছত্র ধরিয়া 'আহামরি' বলিবার তেমন কিছু নাই বটে, কিন্তু সমগ্র গানটিতে মেনকা এমন সমগ্ররসে আমাদের কাছে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা আমাদের মনকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

যাঁহাদের ভাষা ভারে কাটে, তাঁহাদের গান ভাল হয় না। যাঁহারা কেলাইতে ভালবাসেন, তাঁহারাও খাঁটি গান লিখিতে পারেন না। ভাষা যাঁহাদের ধারে কাটে ও রস-সংযমে যাঁহারা সুপটু, তাঁহাদেরই হাতে গান জিনিষটা সাধারণতঃ সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, রামবসুর অধিকাংশ আগমনী ও বিরহ-সঙ্গীতেই ঐ দুই গুণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার ভাষার ন্যায় ধারালো ভাষা অল্প কবিরই দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে যে গানটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার ভাষার দিকে লক্ষ্য করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, আমাদের কথা সত্য কি না! আরও একটি নমুনা এখানে দিতেছি।—

"ভাল হোক্ হোক্ ওহে গিরি!
যাই আমি নারী তাই ভুলি বচনে।
তোমারো কি মনে, হোতো না হে সাধ,
হেরিতে উমার চন্দ্রাননে।"

গানটিতে মেনকা গিরিরাজকে যে আঘাত দিয়াছেন, ভাষার গুণেই তাহা মর্ম্মান্তিক হইয়াছে। গানটির কোথাও কোনও বাক্যকে পল্লবিত করিবার চেষ্টা নাই। গানের সূত্রপাতেই এমন স্নেহের সুর বিদ্যমান যে তাহা সটান গিয়া চিত্তকে সজাগ করিয়া তোলে। এ তিরস্কারের ভঙ্গী রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত বা দাশরথি কাহারও আগমনীতে নাই। কমলাকান্তের মেনকা গিরিরাজকে বলিতেছেন—

"গিরি! প্রাণ-গৌরী আন আমার।
উমা বিধিমুখ, না দেখি বারেক, এ ঘর লাগে আঁধার।
আজি কালি করি দিবস যাবে, প্রাণের উমারে
আনিবে কবে;
প্রতিদিন কি হে আমারে ভুলাবে, একি তব অবিচার।"

ইহাতে দুঃখ আছে, ব্যাকুলতা আছে, একটু তিরস্কারও আছে; কিন্তু রামবসুর মেনকার কথার বাঁধুনি ইহাতে নাই। দাশরথির মেনকাও রামবসুর মেনকার কাছে কথায় দাঁড়াইতে পারেন না। তাঁহার মেনকা গিরিরাজকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন—

"জানি হে পাষাণ! তোমায় জানি চিরদিন!
স্বভাব-গুণে তব কারা দয়া মায়া-হীন॥"

রামবসুর "তোমারো কি মনে, হোত না হে সাধ হেরিতে উমার চন্দ্রাননে" কথা কয়টির কাছে দাশরথির উপরি-উদ্ধৃত ছত্র দুইটি ম্লান হইয়া যায়। রামবসুর মেনকার বাক্যে যে দাহিকাশক্তি আছে, সে দাহিকা-শক্তি অন্য কোনও কবির মেনকার বাক্যে দেখিতে পাই না।

রামবসুর আগমনীতে আর একটি চিত্র আছে, সেটিও অতুলনীয়।—অন্য কাহারও আগমনীতে ঠিক সে রকম ছবি দেখিতে পাই না। সে চিত্রটি এই—

"তারা হারা হোয়ে, নয়নের তারা হারা হোয়ে রই।
সদা কই, উমা কৈ, আমার প্রাণ-উমা কৈ!
আমার সেই হারা-হারা, ত্রিজগতের সারা,
বিধি এনে মিলালে।
উমা চন্দ্রবদনে, ডাক্‌ছে সঘনে, মা মা মা বোলে।
উমা যত হেসে কয়, ওতো হাসি নয় হে,
যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে।"

উমাকে কাছে পাইয়া, উমার চাঁদ মুখে 'মা' বলিয়া ডাকা শুনিয়া, উমার মুখে মধুর হাসি দেখিয়া, মেনকার কোথায় আনন্দ হইবে, তাহা না হইয়া তাঁহার হৃদয় বিষাদ-ভারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে! প্রথমেই উমাকে পাইয়া সুখ, তাহার পরেই দুঃখের উচ্ছ্বাস, ইহার মধ্যে শৃঙ্খলটি কোথায়? এ শৃঙ্খল পাঠককে গড়িয়া লইতে হয়।—তারা হারা

হইয়া মেনকা নয়নের তারা হারার ন্যায় হইয়া ছিলেন। বিধাতা তাঁহার সেই হারা-তারা আজ মিলাইয়া দিয়াছেন, বটে, কিন্তু সে মিলন কয়দিনের জন্য?—তিন দিনের জন্য বৈ ত নয়! তাই ভাবিয়া মেনকা ছাড়া আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তাই উমা যত হাসিয়া কথা কহে, সে হাসি তাঁহার কাছে হাসি বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার মনে হয়, তাঁহার কপালে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে। মাতৃ-হৃদয়ের এমন তরঙ্গ-ভঙ্গ, এমন উত্থান-পতন এত অল্প কথায় ব্যক্ত হইতে আর কাহারও সপ্তমীর গানে দেখি নাই।

অধিকাংশ কবিরই আগমনী গানে মেনকার স্বপ্ন-দেখার কথা আছে। সে সমস্ত স্বপ্নই প্রায় এক ছাঁচে ঢালা। কিন্তু রাম বসুর মেনকার স্বপ্নে বেশ একটু অভিনবত্ব আছে। তাঁহার মেনকা অন্য কবির মেনকার মত 'কুস্বপ্ন' দেখেন নাই। তিনি বলিতেছেন—

"গত নিশিযোগে আমি হে, দেখেছি যে সুস্বপন।
এলো হে, সেই আমার তারাধন॥
দাঁড়ায়ে দুয়ারে—
বলে মা কৈ, মা কৈ, মা কৈ আমার,
দেও দেখা দুখিনীরে!
অমনি দু'বাহু পশারি, উমা কোলে করি,
আনন্দেতে আমি—আমি নই।"

—হৃদয়ের আনন্দাবেগ গানটির ছত্রে ছত্রে অনুভূত হয়। শেষ ছত্রে সে আবেগের ভাষা চরমে গিয়া উঠিয়াছে। "আনন্দেতে আমি—আমি নই।"—ইহার উর্দ্ধে ভাষা উঠিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। গানটিতে বিশেষত্ব যেমন আছে, মনোহারিত্বও তেমনই আছে। শুনিতে পাই, রাম বসু যখন আগমনী গাহিতেন, তখন নাকি শ্রোতৃবর্গের বক্ষ চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইত। এ কথায় সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। তাঁহার এক একটি গান এক একটি আমাদের গৃহচিত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ গানে ছন্দের কারসাজি নাই, ধর্ম্মনেতৃ কচ্‌কচি নাই,—কেবল জীবন এবং সত্য আছে। যাহা কিছু আছে, তাহাই প্রত্যক্ষ। তাই এ গান জনসাধারণকে এতটা মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এখনকার অনেক কবিই আগমনী লেখেন, কিন্তু একমাত্র গিরিশচন্দ্র ছাড়া একালের কোনও কবিই আগমনীর ঠিক সুরটি ধরিতে পারেন নাই। 'বিশ্বসাহিত্যে'র মোহ না কাটিলে বোধ হয় তাহা ধরিতেও পারিবেন না। সে মোহ অনেক সমালোচক ও পাঠককেও ইতিমধ্যে পাইয়া বসিয়াছে। রাম বসুর আগমনী আলোচনা করিলে সে মোহ কাহারও কাহারও কাটিতে পারে, এই আশায় 'ভারতবর্ষে'র শারদীয় সংখ্যায় রাম বসুর সপ্তমীর গানের সৌন্দর্য্য পাঠকের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিলাম।

মায়ের কোলে

[শ্রীজলধর সেন]

আই এ পরীক্ষা দিয়া নফর, দীর্ঘ অবকাশ পিতামাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত আনন্দে যাপন করিবার জন্য বাড়ী যাইয়া দেখে তাহার পিতা জ্বরে শয্যাগত।

"মা, এতদিন বাবার জ্বর, আমাকে খবর দেও নাই কেন?"

"উনি বারণ করেছিলেন, তোমার পরীক্ষার ক্ষতি হবে, তাই খবর দিই নাই, আজ তের দিন জ্বর ছাড়ে না। ডাক্তার কত ওষুধ দিচ্ছে, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না; দিনে-দিনেই দুর্ব্বল হয়ে পড়ছেন।"

নফর একটুও বিশ্রাম না করিয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের বাড়ী যাইবার জন্য উঠিল; মাতা বলিলেন, "উনি ঘুমুচ্ছেন, উঠুন; কেমন আছেন না আছেন, শুনে তার পর ডাক্তারের কাছে যেও। এখন একটু বিশ্রাম কর।"

নফর সে কথা শুনিল না; সে তখনই ডাক্তারের বাড়ী উপস্থিত হইল। ডাক্তার যাহা বলিলেন, তাহাতে নফর বুঝিতে পারিল, তাহার পিতার জীবন-রক্ষার আর উপায় নাই—এ বয়সে ডবল নিউমোনিয়া হ'লে প্রায়ই রোগী বাঁচে না।

তাহাই হইল; নফরের বাড়ী পৌঁছিবার পরদিনই তাহার পিতা বিশ্বনাথ ঘোষ স্ত্রী পুত্র কন্যাকে সত্যসত্যই অকূল সাগরে ভাসাইয়া লোকান্তরে চলিয়া গেলেন; সনাতনপুর স্কুলের বাইশ বৎসরের হেডপণ্ডিত মহাশয়, গ্রামের সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন বিশ্বনাথ-পণ্ডিতের পরলোক গমনে সকলেই শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন; —আহা, এমন নির্ব্বিরোধ লোক এ অঞ্চলে ছিল না!

পণ্ডিত মহাশয়ের বেতন এই বাইশ বৎসরে আঠারো টাকা হইতে চব্বিশ টাকায় পৌঁছিয়াছিল। ইহাতেই এই কয়টি প্রাণীর ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইত; তবে এই শেষ দুই বৎসর নফরের কলিকাতায় পড়ার খরচ মাসে দশটা করিয়া টাকা পাঠাইতে হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের একটু বেশী টানাটানি পড়িয়াছিল; শুধু টানাটানি কেন, অনেক সময় বিশেষ অভাবই অনুভূত হইত। কিন্তু তা বলিয়া ত নফরের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা যায় না। মেয়েটির জন্য পণ্ডিত মহাশয় মোটেই ভাবিতেন না; বলিতেন, "চপলা সবে ছয় বছরে পড়েছে, ওর যখন বিয়ের বয়স হবে, তখন নফর উপযুক্ত হয়ে উঠ্‌বে; ওর বিয়ের ভাবনা নফরই ভাব্‌বে।"

কিন্তু শুধু চপলার বিবাহের ভাবনা নহে, তাহারও অপেক্ষা অধিক গুরুতর ভার উনিশ বৎসর বয়সের ছেলের উপর অর্পণ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় সর্ব্বভারহারীর কাছে চলিয়া গেলেন; নফর অন্ধকার দেখিল!

পণ্ডিত মহাশয় কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই; থাকিবার মধ্যে সামান্য মেটে বাড়ীখানি। নফরের মাতা যখন তাঁহাদের কষ্টের কথা, অনাটনের কথা, অনেকদিন একাহারের কথা তাহাকে এই প্রথম জানাইলেন, তখন নফর কাঁদিয়া আকুল হইল। সে ত এত কথা জানিত না। লেখাপড়া শিখিবার জন্য সে পিতামাতা ভগিনীকে এত কষ্ট দিয়াছে; তাঁহারা একাহারে থাকিয়া তাহার কলিকাতার খরচ চালাইয়াছেন। নফর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা, এ কথা এত দিনের মধ্যে আমাকে বল নাই কেন? আমি জানতাম বাবার হাতে কিছু টাকা আছে; তাই থেকে তিনি আমাকে মাসে দশ টাকা করে দিতেন। এ কথা জান্‌লে আমি পড়তে যেতাম না মা! এত কষ্ট করেই বাবার শরীর ভেঙ্গে গিয়েছিল! আমিই তাঁর মৃত্যুর কারণ! এ কষ্ট, এ দুঃখ, মা, আমি জীবনে ভুলতে পারব না।"

মাতা পুত্রের মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "তিনি তাঁর কর্ত্তব্য করেছেন; ছেলেকে মানুষ করা, তাকে লেখাপড়া শিখান বাপ মায়ের প্রধান কাজ। তিনি তা প্রাণপণে করেছেন। কিন্তু, আমি ভাবছি, এখন কি হবে?"

"কিসের কি হবে মা?"

"এই তোমার পড়ারই বা কি হবে, আর এই দুইটী প্রাণীরই বা কি হবে?"

"কেন? তুমি কি মনে কর মা, আমরা না খেয়ে মরব। কিছুতেই না। আমি লেখাপড়া শিখ্‌তে পারলাম না সত্য, কিন্তু আমি কার ছেলে, তা ভুলে যাচ্ছ কেন মা? কার বুকের রক্তে আমি বেড়েছি, তা জান? তোমার শিবপূজা কি ব্যর্থ হবে? তুমি লেখাপড়া জান, মা, তুমি ভগবানে বিশ্বাস হারিও না। আমি মূর্খ হই আর যাই হই, তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমি তোমাদের ভরণ-পোষণ করতেই পারব। তবে, বাবার বড় ইচ্ছা ছিল আমাকে লেখাপড়া শেখান,—আমি অনেক পাশ করি। তা আর হোল না। কিন্তু লেখাপড়া শিখ্‌বো, সংসারে উন্নতি কর্‌বো, বাবার মহান্ স্বার্থত্যাগের পুণ্যে আমার পথে কোনও বাধা-বিঘ্ন দাঁড়াতে পারবে না, তা তুমি ঠিক জেনো।"

পুত্রের এই আশার বাণী—এই আত্ম-নির্ভরতা জননীর হৃদয়ে গভীর আশ্বাসের সঞ্চার করিল। তিনি নফরকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"বাবা, আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তোমার কামনা পূর্ণ হবে। চিরজীবন এমনই করে ভগবানে বিশ্বাস রেখো—এমনই করে তোমার স্বর্গীয় জনকের কথা মনে রেখো। তোমার উন্নতি হবে।"

(২)

পিতার শ্রাদ্ধাদি শেষ করিয়া নফর পরীক্ষার ফলের অপেক্ষা না করিয়াই কলিকাতায় চলিয়া গেল। পরীক্ষার ফল জানিবার তাহার আর কোনই প্রয়োজন নাই। পাশ হইলেও সে পড়িবে না, ফেল হইলেও সে পড়িবে না। পূজনীয়া মাতা ও স্নেহময়ী ভগিনীর ভরণপোষণ এখন হইতে তাহাকেই করিতে হইবে।

কলিকাতায় যে ভদ্রলোক দয়া করিয়া নফরকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাহার কলিকাতায় অবস্থানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি নফরের পিতৃবিয়োগের সংবাদ শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। দুঃখ করিয়া বলিলেন, "নফর, পড়া-শুনার কোন ব্যবস্থাই হতে পারে না কি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এবার তুমি পাশ হবে; আর যদি পড়তে পার, তবে তুমি সব কটি পরীক্ষাই উত্তীর্ণ হবে।" নফর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা আর হয় না, হতে পারে না। এখন আমার উপার্জ্জনের উপরই আমার মা বোনের ভরণ-পোষণ নির্ভর করছে। আমি ভগবানের উপর নির্ভর করে আপনার কাছে ফিরে এসেছি। আমি জানি আপনি আমার যেমন-তেমন একটা চাকরী জুটিয়ে দিবেনই।"

জীবন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমার উপর তোমার এতটা নির্ভর।"

নফর কহিল, "আজ দু'বছর আপনাকে দেখে আস্‌ছি, আপনি আমাকে ফেল্‌তে পার্‌বেন না। কে যেন আমাকে বল্‌ছে, আপনাকে ধরেই আমার সব হবে।"

জীবনবাবু এই নবীন যুবকের এতখানি দৃঢ়তা দেখিয়া বলিলেন, "বেশ, তাই হবে। আমি তোমায় বল্‌ছি নফর, যেমন করে হ'ক, আমি তোমার একটা চাকরী করে দেবোই।"

দুই-তিন দিন পরেই তিনি একটি সওদাগরী আফিসে নফরের একটা চাকরী করিয়া দিলেন। বেতন মাসিক পঁচিশ টাকা। নফরকে এই সুসংবাদ দিয়া জীবনবাবু বলিলেন, "নফর, তোমাকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে। যতদিন তুমি এখানে থাক্‌বে, যতদিন তোমার মা-ভগিনীকে এখানে এনে স্বতন্ত্র বাসা করতে না পারবে, ততদিন তোমাকে আমার এখানেই থাকতে হবে। এই প্রতিজ্ঞা তোমাকে করতে হবে। তোমার মত ছেলের পায়ের ধুলাতেও আমার বাড়ী পবিত্র হবে।"

নফর অশ্রুপূর্ণ নয়নে জীবন বাবুর পদধূলি গ্রহণ করিল, একটি কথাও বলিতে পারিল না।

(৩)

যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইল; নফর প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সংবাদ পাইয়া নফর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। জীবন বাবু এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন,—"দেখ নফর, তুমি চাকরী ছাড়িয়া দাও। আমি তোমার পড়ার, খরচ চালাব; আর তোমার বাড়ীর খরচ আমিই মাসে দশ টাকা করে দেব।"

জীবনবাবুর কথা শুনিয়া নফর কাঁদিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আপনার ঋণ আমি এ জীবনে শোধ করতে পারব না; কিন্তু আমি আর ও-পথে যাব না। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি পাশ না করিয়াও আপনার আশ্রয়ে থেকে লেখা-পড়া শিখ্‌তে পারব।" জীবনবাবু আর অনুরোধ করিলেন না; যাহাতে নফরের চাকুরীর উন্নতি হয়, তাহারই চেষ্টা তিনি করিতে লাগিলেন।

নফর পঁচিশ টাকা বেতন পায়, তাহার কুড়ি টাকাই সে প্রতি মাসে বাড়ীতে পাঠাইয়া দেয়, অবশিষ্ট পাঁচ টাকা নিজের কাছে রাখে। চৈত্র মাসে চাকুরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে; পূজার সময় বাড়ীতে যাইতে হইবে, সে সময় চপলা ও মায়ের জন্য কাপড় কিনিতে হইবে, চপলার জন্য আরও কত কি কিনিতে হইবে; তাই সে পাঁচ টাকার একটী পয়সাও নিজের জন্য ব্যয় করিত না। প্রতিদিন পদব্রজে শ্যামবাজার হইতে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে অফিসে যাতায়াত করিত; ক্ষুধা পাইলে এক পয়সার কিছু কিনিয়াও সে খাইত না। তাহার মনে হইত, তাহাকে লেখা-পড়া শিখাইবার জন্য তাহার পিতা অর্দ্ধাশনে কত দিন কাটাইয়াছেন। সে মর্ম্মভেদী কথা কি সে ভুলিতে পারে?

প্রতি সপ্তাহে নফর মায়ের নিকট হইতে পত্র পায়; চপলাও তাহার সেই ভাঙ্গা-ভাঙ্গা অক্ষরে, তাহার সেই দেবভাষায় দাদাকে পত্র লেখে। সে পত্রে বালিকা কত কথা লেখে; বাড়ী যাইবার সময় দাদা তাহার জন্য কি কি দ্রব্য লইয়া যাইবে, তাহার ফর্দ্দ পাঠায়। নফর প্রতি মাসেই এটা-ওটা কিনিয়া সংগ্রহ করিতে লাগিল—পূজার ছুটীতে বাড়ী যাইয়া চপলাকে দিবে। চপলা এই সকল দ্রব্য পাইয়া কত আনন্দ করিবে, তাহার মুখে কেমন হাসি ফুটিয়া উঠিবে; শ্যামবাজারের এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া নফর চক্ষের সম্মুখে সেই মনোমোহন দৃশ্য দেখিতে থাকে, তাহার হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়।

পূজার তিন চারি দিন পূর্ব্বে আফিসে নোটীশ বাহির

[redacted] কাজের বড় ভিড়, এবার কর্ম্মচারীদিগকে মোটেই ছুটি দেওয়া হইবে না, বিজয়ার দিন মাত্র আফিসের বন্ধ থাকিবে। তবে সকল কর্ম্মচারীই পূজার খরচ বলিয়া এক মাসের বেতন অতিরিক্ত পাইবে।

এই সংবাদ পাইয়া নফর অধীর হইয়া উঠিল। পূজার সময় বাড়ী যাইতে পাইবে না; মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিবে না, চপলার হাসিমুখ দেখিতে পাইবে, না। সে কি করিয়া হইবে? সে যে এই কয়মাস ধরিয়া চপলার জন্ত কত কি সংগ্রহ করিয়াছে, মায়ের জন্ত কাপড় কিনিয়াছে, সংসারের জন্ত কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য গোছাইয়াছে। বাড়ী যাইতে পাইবে না! হিন্দুর ছেলে—বিধবার সন্তান,—বিজয়ার দিন সাক্ষাৎ দেবীরূপিণী মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিতে পাইবে না। সে কি কথা?

নফর সামান্ত কর্ম্মচারী; বড় সাহেবের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছুই করিতে হয় না; তাহার মাথার উপর প্রায় কুড়ি জন বাবু। নফর প্রথমেই তাহার ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবুর কাছে গেল এবং ছুটীর প্রার্থনা করিল। বড়বাবু রাশভারি লোক, মেজাজও খুব উঁচু। তিনি কর্কশস্বরে বলিলেন "না হে বাবু, ছুটি মিল্‌বে না। আমি সাহেবকে বল্‌তে পারব না। তিন দিন মাত্র কাজে এসেছ, এরই মধ্যে ছুটী। ও-সব হবে না, যাও। আগে চাকরী, তারপর বাপ-মা।"

বড়বাবুর নিকট কোন আশাই নাই, দেখিয়া নফর মলিন মুখে চলিয়া আসিল। দুইদিন পর্য্যন্ত সে ভাবিল, কিন্তু কোন পথই সে পাইল না। চাকুরী ত্যাগ! সে কথা নফর মনেও আনিতে পারিল না; চাকুরী ত্যাগ করিলে যে মা-বোনের অন্নাভাব। কিন্তু, বাড়ীতে না গেলে মা যে বিজয়ার দিন চক্ষের জল ফেলিবেন, চপলা যে দাদাকে না দেখিয়া মলিন মুখে দিন কাটাইবে! নফর কাতর হৃদয়ে আফিস যাইতে লাগিল।

সপ্তমী গেল, অষ্টমী গেল,—নফর আফিসে যাতায়াত করিতে লাগিল। বাড়ীতে কোন সংবাদ দিল না, মিনিঅর্ডারগুলি পাঠাইবারও লোক পাইল না। নবমীর দিন পাঁচটার সময় আফিস বন্ধ হইলে নফর চিৎপুর রোড দিয়া শ্যামবাজারের দিকে আসিতেছিল, ছোড়াসাঁকোর নিকট একটি বাড়ীতে পূজা দেখিবার জন্ত অনেক লোক প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া নফর দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইল। একটু পরেই দেখিল, একটী বিধবা রমণী ছয় বৎসরের একটী মেয়েকে ঠাকুর দেখাইবার জন্ত সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছে। নফর দেখিল, মেয়েটি ঠিক তার ভগিনী চপলার মত;—তেমনই সুন্দর মুখ; তেমনই ভাব ভঙ্গী। নফরের বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল; সে আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না।

তাহার মনে হইল, এই মেয়েটি চপলার রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছে;—আর ঐ অবগুণ্ঠনাবৃতা বিধবা রমণী যেন তাহারই জননী।

নফর বাসায় আসিয়া দেখিল, জীবনবাবু নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে কোথায় গিয়াছেন। তখন আর তাহার অপেক্ষা করিবার সময় নাই। সে মন স্থির করিয়াছে। যা থাকে অদৃষ্টে—যায় চাকুরী যাইবে—সে এই সাড়ে সাতটার ট্রেণে বাড়ী যাইবে। এ ট্রেণে গেলেও পরদিন অপরাহ্ণ চারিটার মধ্যে সে বাড়ী পৌঁছিতে পারিবে। সে তখন তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গোছাইয়া ফেলিল; আহার করিবার আর সময় ছিল না। আফিসের বড়বাবুর নামে একখানি চিঠি লিখিয়া রাস্তার ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে শিয়ালদহ ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। বড়বাবুকে সে অকপটে সমস্ত কথা লিখিয়া গিয়াছিল।

পরদিন প্রাতঃকালে যখন সে গোয়ালন্দে নামিয়া ষ্টীমারে উঠিল, তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। নফর বড়ই ভীত হইল,—মেঘ দেখিয়া নহে; যদি ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ষ্টীমার হইতে নামিয়া পাঁচ ক্রোশ পথ সে কেমন করিয়া যাইবে;—বাড়ীর কাছেই আর একটা নদী পার হইতে হইবে।

বেলা একটার সময় নফর ষ্টীমার হইতে নামিল। ঘাটে মুটে মিলিল না, বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। সে তাহার বোচ্‌কা মাথায় করিয়া যাত্রা করিল; আকাশে তখনও খুব মেঘ; কিন্তু বৃষ্টি আসে নাই। নফর দ্রুতবেগে পথ চলিতে লাগিল। পাঁচ ক্রোশ পথ—সে তিন ঘণ্টায় নিশ্চয়ই যাইতে পারিবে, তাহার পর নদী পার হইয়াই ত তাহার বাড়ী।

ক্রোশ দুই পথ যাইবার পরই বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

মাঠের মধ্যে আইলের উপর দিয়া পথ; তাহার পর এই বৃষ্টি। কিন্তু সে তাহার গতি সংযত করিল না; জুতা জামা চাদর তাহার বোচকায় বাঁধিয়া লইয়া সে প্রাণপণ বেগে চলিতে লাগিল। সঙ্গে ছাতা ছিল না; সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টিতে ভিজিয়া গেল; কাদায় দেহ বিভূষিত হইয়া গেল। কোন দিকেই দৃকপাত নাই।

যখন সে নদীতীরে উপস্থিত হইল, তখন ভয়ানক ঝড় উঠিয়া আসিল; যেমন ঝড় তেমনই বৃষ্টি। বেলাও তখন প্রায় শেষ। সে মনে করিয়াছিল, তিন ঘণ্টায় বাড়ী পৌঁছিবে; কিন্তু বৃষ্টির জন্য সে প্রায় ছয়টার সময় নদীতীরে পৌঁছিল। তাহার পর বিপদ,—খেয়া-নৌকা এ-পারে নাই; ঝড়ের একটু পূর্ব্বে নৌকা ও-পারে গিয়াছে, আর ফিরিতে পারে নাই। পাটনীর ঘরে একটী ছেলে বলিয়া আছে, পাটনীরই ভ্রাতুষ্পুত্র। নফর পাটনীর সেই ঘরে আধঘণ্টা অপেক্ষা করিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল; ঝড় আর থামে না। নফর ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

সে আর অপেক্ষা করিতে ত পারে না। তাহার মায়ের মুখ তখন মনে পড়িল। সে ছেলেটিকে বলিল, "দেখ, আমার এই বোচ্‌কাটি তোমাদের এখানে রেখে যাই; কাল এসে নিয়ে যাব।"

ছেলেটি বলিল, "তুমি যাবে কোথায়?"

"পারে।"

"পারে!—খেয়া-নৌকা ত নেই। এ ঝড়ে কি করে যাবে?"

"আমি সাঁতার দিয়ে যাব ভাই! আমার মা যে আমার পথ চেয়ে বসে আছে।"

ছেলেটা হা করিয়া চাহিয়া রহিল। নফর তখন পাগলের মত নদীতীরে উপস্থিত হইল এবং একটুও শঙ্কা না করিয়া 'মা, মা' বলিয়া জলে ঝাঁপ দিল। তাহার পর সেই উন্মত্ত নদী-তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে-করিতে সেই অন্ধকারে সাঁতার কাটিতে লাগিল।

* * * *

নফরের মাতা ও ভগিনী বিষণ্ণ মনে ঘরের দ্বারের সম্মুখে বসিয়া ছিল। এমন সময় কম্পিত-কলেবরে শ্রান্ত ক্লান্ত নফর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সমস্ত শক্তি কণ্ঠে কেন্দ্রীভূত করিয়া ডাকিল, "মা।"

মাতা এই শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া পুত্রকে জড়াইয়া ধরিলেন;—নফর অতি কাতর স্বরে বলিল, "মা, বিজয়ার প্রণাম করতে—" সে আর কথা বলিতে পারিল না, মাতৃক্রোড়ে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

আগমনী

[শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ]

ওগো তোরা গান গা'।
পাপিয়া কোকিল, নীলিমা, সরিৎ
সকলে মিলিয়া গা।
শরৎ এসেছে, শেফালি এসেছে,
এসেছে আমার মা!
জীবন এসেছে, মিলন এসেছে
মিলনে এসেছে মা!
ওগো মরতে এসেছে মা,
ওগো মরমে এসেছে মা,
স্নেহে আনন্দে, ভকতি বেদনে,
ভুবনে এসেছে গো!
প্রকৃতি রাণীর মূরতি-খানিকে
কে ভাল বেসেছে গো?
তাঁরি মাঝে আজ গোপন-প্রকাশে
জননী হেসেছে গো।
আলো ঝলমল নবীন প্রভাতে,
শারদ রাতের শুভ্র শোভাতে,

ভানল শব্দে ; কোমল পুষ্পে
কূজন-মুখর কুঞ্জে ;
নব-মঞ্জরী-গন্ধ-মত্ত,
মন্দ ভ্রমর গুঞ্জে,
এসেছে গো।
বিকশিত কাশ কুসুমমালায়,
পূজার পুণ্য বরণ ডালায়,
আকাশে, বাতাসে, বেহাগে, বিভাসে,
এসেছে গো।
অম্বরব্যাপী অসীম আসনে
প্রতিমা এসেছে গো।
সারা বিশ্বের পূজা-আয়োজনে
প্রতিভা এসেছে গো।
দিগ্‌দিগন্তে বোধন বেজেছে,
বীণা-সীনাস্তে সে সাড়া পেয়েছে
আকুল-কণ্ঠে, গভীর ছন্দে
সিন্ধু পড়িছে মন্ত্র ;
তাহার সঙ্গে সঙ্গীত তানে
ধ্বনিত জলধ-মন্ত্র
এ-ধারে কাঁপিছে আকুল বেদনা,
ও-ধারে কাঁপিছে সুখের চেতনা,
বুকের মধ্যে সে কোন কাজ্জা
কলিত—গো।
কি গান শুনায় দিবস-নিশীথ
ললিত গো।
এসেছে মা !
মধুর কোমল চাঁদের আলোকে
মধুর কোমল প্রভাত পুলকে
ভূলোক দ্যুলোক উজল করিয়া
এসেছে, এসেছে, এসেছে মা !

সাহিত্য-সংবাদ

কবি রজনীকান্তের "অভয়ার" দ্বিতীয় সংস্করণ বহুদিন পরে প্রকাশিত হইল ; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত "নবরত্ন" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ১৷০।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষ এল, এম, এস প্রণীত "প্রাক্‌টীশনার" তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য ১৷০।

৺বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত "যুবক যুবতীর" ৭ম সংস্করণ বাহির হইল ; বাঁধাই ১৷০।

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "মহরদ্বিপী" ও "স্বর্গচূর্ণ" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য পর্য্যায়ক্রমে ২৲ ও ১৷০

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "গৌরী" ও "ঠাকুরমার ঝোলা" প্রকাশিত হইল ; মূল্য ১৷০ ও ১৲।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত "আটমাসা সংস্করণে"র একত্রিংশ গ্রন্থ "মায়ের প্রসাদ" কার্ত্তিক মাসে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ঐতিহাসিক উপন্যাস "রাণী ব্রজসুন্দরী" প্রকাশিত হইল ; মূল্য ২৲ টাকা রাজসংস্করণ ২৷০।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

বীণাপাণি

শ্রীযুক্ত আর্যকুমার চৌধুরীর গৃহীত আলোকচিত্র হইতে] [শ্রীযুক্ত শিবকুমার চৌধুরী মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রকাশিত

Emerald Printing Works
CALCUTTA

অগ্রহায়ণ, ১৩২৫

প্রথম খণ্ড] অষ্ট বর্ষ [ষষ্ঠ সংখ্যা

ঋগ্বেদে সূর্য্য-গ্রহণ

[অধ্যাপক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, এম-এ]

ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের চত্বারিংশৎ সূক্তে সূর্য্য-গ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে। অত্রি নামক এক ঋষি এই গ্রহণ দর্শন করিয়াছিলেন। ইহা যে সূর্য্য-গ্রহণ, তাহা তাঁহার বর্ণনা হইতে বুঝা যায়। তখন সম্ভবতঃ প্রাতঃকাল। ঋষি দেখিলেন, সূর্য্য অন্ধকার দ্বারা আবৃত হইয়া গেল। প্রাণিগণ পথ দেখিতে না পাইয়া, মূঢ়ের মত অবস্থান করিতে লাগিল। সূর্য্যের এই অবস্থা অবলোকন করিয়া ঋষি স্থির করিলেন, এই অন্ধকার স্বর্ভানুনামক অসুরের মায়া। (১) তিনি আরো মনে করিলেন, অসুর সূর্য্যকে গিলিয়া ফেলিতেছে।

বোধ হয় অত্রি ঋষি এই সময়ে কোন যজ্ঞ করিতে বসিয়াছিলেন; ইন্দ্রকে প্রাতঃ-সবনের সোমরস তখনও প্রদান করা হয় নাই। ঋষি মহা বিপদ আশঙ্কা করিয়া, ঋত্বিকদিগকে পাষাণ-মুষল দ্বারা সোমলতা প্রচণ্ড রবে ছেঁচিতে বলিলেন; তখনই তিনটী ঋক্ রচনা করিয়া নিজে উচ্চৈঃস্বরে ইন্দ্র ও মরুৎগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। (২)

(১) যং। ত্বা। সূর্য্য। স্বর্ভানু
তমসা। অবিধ্যৎ। আসুরঃ।
অক্ষেত্রবিৎ। যথা। মুগাঃ
ভুবনানি। অদীধয়ুঃ। ৫। ৪০। ৫

হে সূর্য্য! তোমাকে যখন অসুরবংশীয় স্বর্ভানু অন্ধকার দ্বারা বিদ্ধ (অর্থাৎ আবৃত) করিয়াছিল, সকল প্রাণী পথজ্ঞানশূন্য মূঢ়ের মত হইয়াছিল।

(২) আ। যাহি। আদ্রিভিঃ। সুতঃ
সোমম্। সোমপাতে। পিব।
বৃষন্। ইন্দ্র। বৃষভিঃ। বৃত্রহন্তম। ৫। ৪০। ১
বৃষা। গ্রাবা। বৃষা। মদঃ
বৃষা। সোমঃ। অয়ং। সুতঃ।
বৃষন্। ইন্দ্র। বৃষভিঃ। বৃত্রহন্তম। ২
বৃষা। ত্বা। বৃষণঃ। হুবে
বৃষন্। চিত্রাভিঃ। ঊতিভিঃ।
বৃষন্। ইন্দ্র। বৃষভিঃ। বৃত্রহন্তম। ৩

এস হে সোমপতে! পাষাণ-মুষল-পিষ্ট সোম পান কর। হে বৃষ,

ঋষি এই তিন ঋক্ উচ্চারণ করিয়া, সোমরস আহুতি প্রদান করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল, ইন্দ্র ও তাঁহার মরুৎ সৈন্যগণ তৎপ্রদত্ত সোমপানে বলিষ্ঠ ও মত্ত হইয়া স্বর্ভানুকে আক্রমণ করিতে অন্তরীক্ষে গমন করিলেন। তখন ঋষিগণ দেবাসুরের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন ও মাধ্যন্দিন সবনের জন্য প্রস্তর দ্বারা সোম পেষণ করিতে লাগিলেন। বোধ হয় ইন্দ্র ও মরুৎগণের প্রীতিকর স্তোত্রও উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

যখন দেবগণ সূর্য্য-উদ্ধারে গমন করেন, তখন সম্ভবতঃ সূর্য্যের পূর্ণ গ্রাস হইয়াছিল। মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তখনও সূর্য্যের সম্পূর্ণ মুক্তি হইল না। ঋষি তখন চতুর্থ ঋক্ উচ্চারণ করিয়া, পুনরায় ইন্দ্রকে সোম পান করাইলেন। (৩)

গ্রহণ কালে সূর্য্য অত্রি ঋষিকে বলিয়াছিলেন, "হে ঋষে! তোমার শত্রুতার ভয়ে স্বর্ভানু অত্যন্ত ভীত হইয়াছে; সেই জন্য আমাকে নিঃশেষে উদরসাৎ করিতে পারে নাই। এক্ষণে ইন্দ্র ও বরুণ আসিয়া আমাকে উদ্ধার করুন। তুমি আমার পরম মিত্র।" (৪)

অত্রিগণই সূর্য্যকে অসুরের মায়া হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, অত্রিবংশীয় ঋষিগণ এই ধারণা পোষণ করিতেন। (৫) অত্রিগণ ইহাও মনে করিতেন যে, অপর কোন ঋষি এই কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হন নাই। (৬) বোধ হয়, তাঁহারাই প্রথমে সূর্য্য-গ্রহণের কারণ নির্দ্ধারণ করতঃ, মুষল যোগে সোমরস নিষ্কাশিত করিয়া দেবগণকে পান করান। সোমপানে দেবগণ বলিষ্ঠ ও মত্ত হইয়া স্বর্ভানুর কবল হইতে সূর্য্যকে উদ্ধার করেন। অতএব অত্রিদিগের দ্বারাই সূর্য্যমণ্ডল পুনরায় দিব্যলোকে স্থাপিত ও স্বর্ভানুর মায়া দূর হইয়াছিল, এই মত সেকালে গৃহীত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান যুগেও আমরা কোন কার্য্যের বা ঘটনার

বৃত্রহন্তা শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র! বৃষ সকলের সহিত (অর্থাৎ মরুৎগণের সহিত) এস! ১

পাষাণ-মুষল (সোমরস) বর্ষক, মদ বর্ষক, সোম বর্ষক। এই যে হরি (সোম); হে বৃষ, বৃত্রহন্তা শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র! বৃষ সকলের সহিত এস! ২

হে বজ্রধারী! বৃষ (যে তুমি সেই) তোমাকে বিচিত্র রক্ষা সকলের সহিত (আহ্বান করিতে) বৃষ (আমি) আহ্বান করিতেছি। হে বৃষ, বৃত্রহন্তা শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্র! বৃষ সকলের সহিত এস!

(১) ঋজীষী। বজ্রী। বৃষভঃ। তুরাষাট্
তমী। রাজা। বৃত্রহা। সোমপাবা।
যুক্তা। হরিভ্যাং। উপ। যাসৎ। অর্বাঙ্
মাধ্যন্দিনে। সবনে। মৎসৎ। ইন্দ্রঃ। ৫। ৩০। ৪
স্বর্ভানোঃ। অধ। যৎ। ইন্দ্র। মায়াঃ
অবঃ। দিবঃ। বর্ত্তমানাঃ। আবায়ন্।
গূঢ়ং। সূর্য্যং। তমসা। অপব্রতেন
তুরীয়েণ। ব্রহ্মণা। অবিন্দৎ। অত্রিঃ। ৫। ৩০।৬

ঋজীষী, বজ্রবান্, শত্রু সহিত যুদ্ধকারী, বলবান্, রাজা, বৃত্রহন্তা, সোমপাতা, বৃষভ ইন্দ্র অশ্বদ্বয় (রথে) যুড়িয়া আমাদের অভিমুখে আগমন করুন, মাধ্যন্দিন সবনে (সোমপান করিয়া) মত্ত হউন।

হে ইন্দ্র! অনন্তর যখন স্বর্ভানু হইতে উৎপন্না, নিত্য বর্ত্তমানা মায়া সকলকে দিব্যলোক হইতে (তুমি ও মরুৎগণ) দূর করিয়াছিলে, ব্রতনষ্টকারী অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত সূর্য্যকে চতুর্থ মন্ত্রদ্বারা অত্রি লাভ করিয়াছিলেন।

(৩) মা। বাং। ইমম্। তব। সন্তঃ। অত্রে
ইষন্তা। তুজাঃ। জিহ্রা। নি। গাম্যৈৎ।
ত্বং। মিত্রঃ। অসি। সত্যরাধাঃ। তৌ
বা। ইহ। অবস্তম্। মরুতঃ। চ। রাজা। ৫। ৩০। ৭

হে অত্রে! তোমার শত্রুতার ভয় দ্বারা দ্রোহকারী (স্বর্ভানু) এই অবস্থা প্রাপ্ত আমাকে নিঃশেষে গ্রাস করে নাই। তুমি আমার মিত্র হইতেছ। সত্যরাধ (ইন্দ্র) ও রাজা মরুৎ দুইজনে আমাকে এই স্থানে রক্ষা করুন।

(৪) গ্রাবৃঃ। ব্রহ্মা। যুযুজানঃ। সপর্যন্
কীরিণা। দেবান্। নমসা। উপশিক্ষন্।
অত্রিঃ। সূর্য্যস্য। দিবি। চক্ষুঃ। আ। অধাৎ
স্বর্ভানোঃ। অপ। মায়াঃ। অঘুক্ষৎ। ৫। ৩০। ৮

(যজ্ঞের) ব্রহ্মা (অত্রি) মুষল সকল নিয়োগ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন; দেবঋষিকে নমস্কার ও (সোমরস) নিক্ষেপ দ্বারা তুষ্ট করিয়াছিলেন; অত্রি সূর্য্যের চক্ষুকে (বা তেজকে) দিব্যলোকে স্থাপন করিয়াছিলেন ও স্বর্ভানুর মায়া দূর করিয়াছিলেন।

(৫) যং। বৈ। সূর্য্যং। স্বর্ভানুঃ
তমসা। অবিধ্যৎ। আসুরঃ।
অত্রয়ঃ। তং। অন্বৈ। অবিন্দন্
নহি। অন্যে। অশক্নুবন্। ৫। ৩০। ৯

অসুরবংশীয় স্বর্ভানু অন্ধকার দ্বারা যে সূর্য্যকে বিদ্ধ (বা আবৃত) করিয়াছিল, অত্রিগণ তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন। অন্য কেহই সমর্থ হয় নাই।

কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করি। সেকালেও তাহাই হইয়াছিল। সেকালে ও একালে প্রভেদ এই যে, সেকালে এই প্রকার নৈসর্গিক ঘটনাবলী জীবিত প্রাণীর দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে, মনে করা হইত; আর একালে উহাদিগকে ছায়া, আলোক প্রভৃতি দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা হয়। মানবজাতির মনের এইরূপ পরিবর্ত্তন হইতে বহু সহস্র বৎসর লাগিয়াছে। এখনও মানবসমাজে সেকালের মনবিশিষ্ট লোকের সংখ্যা কম নহে। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার বিস্তার দ্বারা এইরূপ বিশ্বাস মানবজাতির মন হইতে কালে অন্তর্হিত হইবে।

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(৬)

এই ঘটনার পর তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে। অজিতের পিতৃ-গৃহ গমনের আর কত বিলম্ব, এ সংবাদ লইতে নেহাত অপারগ বলিয়াই, নসিরুদ্দিন সাহেবের কন্যা স্ত্রী বড়-বিবি, পিঞ্জরাবদ্ধ হীরামন পাখীটা এবং এই জাতীয় আরও দু'চারিটি প্রাণীই মিত্র বাড়ী আসিয়া পৌঁছে নাই; তা ভিন্ন আর সকলেই একে-একে বা দুইয়ে তিনে আসিয়া দুর্গাসুন্দরীর ঔদাসীন্যপূর্ণ অনিশ্চিত উত্তরে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া গিয়াছে। ইতঃমধ্যে 'বাবাঠাকুর'টির জন্য দু-এক স্থান হইতে বিদায়-ভোজের ব্যবস্থাও হইয়া গিয়াছিল। বাগ্দী-বৌ একপোণ কই মাছ, গয়ারের মা গরম মুড়ী, মটর তাজা এবং হামিদ নিজেদের গাছের চারিটা কাঁচা আনারস দিয়া গিয়াছে। পাকাইয়া দিবার ভরসা সহে নাই, যেহেতু তৎপূর্ব্বে অজিতের পিতা আসিয়া তাহাকে লইয়া গেলে, এই অপূর্ব্ব বস্তু আর তো তাহাকে খাওয়ান হইবে না। আর, তা' না হইলে, হামিদের নিজ মুখে সেই পাকা ফল কেমন করিয়া রুচিবে? বিশেষতঃ হামিদ জানে অজিত এই জিনিসটা বড় ভালবাসে।

ঘোষ-গৃহিণী ও চাটুয্যে-গৃহিণী একসঙ্গে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এমন সময় যাওয়া যে, মেয়েটাকে একটা দিন দুটো মাছ-ভাত খাইয়ে পাঠাব, তার যো'টি হলো না। আহা, বাছা এতদিন পরে নিজের ঘরে যাবে,—তা না একটু সিঁদুর ছোঁয়ান, না একটু আল্তা ছোঁয়ান,—যেন মা ভগবতীর তপিস্তে করা বেশ কুয়ে যেতে হবে। যাগীর উচিত ছিল, মিন্‌ষের অন্তর্জলের সময়ও অন্ততঃ বউ নিয়ে যাওয়া; তা' হলে ত আর এমন সন্নিসি-বেশে মেয়ে পাঠাতে হতো না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুর্গাসুন্দরী এ সমস্ত আলোচনায় প্রায়ই যোগ দেন না; অন্ততঃ যতটা সম্ভব সংক্ষেপেই সারিতে চেষ্টা করেন। আজও নীরব ঔদাসীন্যে পাশ কাটাইতে চাহিয়া, অবান্তর কথা পাড়িলেন। এক-তরফা আলোচনায় সুখ হয় না,—অগত্যাই এমন মুখরোচক কুটুম্ব-নিন্দার সুযোগ ত্যাগ করিয়াই, উক্তা গৃহিণীদ্বয় ক্ষুণ্ণ চিত্তে নীরব হইলেন। ইহা বুঝিয়া দুর্গাসুন্দরী সখীদ্বয়কে অন্যমনা করিয়া দিবার ইচ্ছায় আর একটা মুখরোচক আলোচনার অবতারণা করিয়া বসিলেন। তিনি চাটুয্যে-গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরঝির তো আজ রান্নার পাঠ নেই;—তোমার কি রান্না হ'ল দিদি?" "আমার?" বলিয়া কাণের মাকড়ি দুটি ঠিক করিয়া দিয়া, মাথার কাপড় অপ্রয়োজনেও একটু টানিয়া দিয়া, দিদি উত্তর করিলেন, "আর ভাই রান্না! যে গরম পড়েছে—রাঁদ্‌তেও ইচ্ছে করে না, খেতেও ইচ্ছে করে না, কোন মতে দুটো গর্ত্ত বুজানো। আজ আর বেশী কিছু রাঁধিনি,—এই বেশ করে হাত-বাছা করে নিয়ে, চারটি মোগামুগের ডাল রাঁধলুম, আর উচ্ছে দিয়ে আলু দিয়ে ছোলা ভিজে দিয়ে ভাজা-ভাজা করে চচ্চড়ি, কুমড়ো, ডেঙ্গো-ডাঁটা আর বিঙ্গে দিয়ে একটা ডালনা—হ্যাঁ, তাতে দুটো কাঁটাল-বীচিও দিয়েছিলুম ভাই। আর দেখ, একমালা নারকোল ছিল, তাই একটু কুরে দিলুম; আর খানিকটা ভেঙ্গে বেশ বড়-বড় করে ভাজলুম। তা খেতে বড় মন্দ হয়

নি। বেশ মাখা-মাখা ঝোল-ঝোল হয়েছিল। কুমড়ো-টুকুও দিব্যি মিষ্টি ছিল কি না—তার হয়েছিল। হ্যাঁ, তা'পর কি বলছিলুম? হ্যাঁ, এই তো গেল নিরিমিষ। মাছের হলো গে চিঁড়িমাছ দিয়ে আলু পটল দিয়ে একটা ডালনা; আর বড়-বড় বাটা এনেছিল, তারই কাল। আর জানই তো,—কর্ত্তার আমাদের মাছের টক-টুকুন নৈলে ভাতের গরাস মুখেই উঠে না। কি করি, চুনোচানা মাছের মিষ্টি দিয়ে অম্বল একটু করতেই হয়। হ্যাঁ, আমাদের সবার জন্যে আমের গুড়-অম্বল একটা খোরা রেঁধেছিলুম। বউ-মা পোয়াতি মানুষ, তাঁর আবার মাছের জিনিস মুখে ভাল লাগে না। ঐ অম্বলটুকুন দিয়েই যা দুটি ভাত খায়। সতীশ কাঁটামাছ খেতে পারে না; দুখানা পোনা মাছ এ-বেলার থেকে নিয়ে তার জন্যে আলাদা করে রেঁধে দিই। এই সব টুকটুক করতে-করতেই বেলা হয়ে যায়। এক রকম সমান রান্না তো আমার বাড়ী হবার যো নেই।"

"পাকা আমও তো বেশ হয়েছে, না?" "হাঁ, পেকেছে বই কি। কালই ন'টুই হবে কলমের গাছের আম পাড়ান হলো। হলে কি হবে ভাই, আম দিয়ে দুধ দিয়ে কি কেউ ভাত খাবে। সে সব অমনি মুখে। লোকের বাড়ীর ছেলেপুলের মতন কি আমার ঘরের ছেলেপুলে!"

দুর্গাসুন্দরী তখন ঘোষ গৃহিণীর দিকে ফিরিলেন "তোমার বউমারেরা কি রান্না-বান্না করলেন গা শ্যামের মা?"

"আজ আর বড়-কিছু রাঁধি নি ভাই"—এই বলিয়া শ্যামসুন্দরের জননী-ঠাকুরাণীও একে একে একটা বড় রকম ফিরিস্তি দাখিল করিয়া দিলেন; এবং শেষে পেষ করিলেন, "নিজেদের খাওয়া না থাকলেই কি—ভাই দুটী আছে, ওদের সবখানি তো যোগাড় করে দোব,—ওরা বলে না হয় চালে-ডালেই এক করবে। নৈলে নিজেদের আর ছাটা কি? পোড়া বিধবাদের আবার খাওয়া! একটা শাক চচ্চড়ি, দুখানা ভাজা, একটু ডাল, এক ফোটা অম্বল, আর হ'ল তো একটা ঘোচার ঘন্টই হোক, নাউএর ঘন্টই হোক, নয় তো একটু সুক্তুনিই হোক, এই হলেই ভেসে গেল।"

অপরাহ্নে সখীদের বিদায় লইলে, কাপড় কাচিয়া আসিয়া দুর্গাসুন্দরী ভিতর-বাটীর রোয়াকের একধারে একখানি কুশাসন পাতিয়া মালা জপিতেছিলেন। মনোরমারও কর্ম্ম-কাজ সারা হইয়াছে। সে গামছা দিয়া অজিতের গা মুছাইয়া তাহাকে ধোয়া কাপড় পরাইয়া দিতেছিল,—অমনি মাতা-পুত্রে কথোপকথন চলিতেছিল।

পুত্র প্রশ্ন করিল,—এ প্রশ্ন আজি কয়দিনে সে অনেক-বারই করিয়াছে—"বাবার নিতে আসতে এত দেরি কেন হচ্ছে, মা? কখন বাবা আস্‌বে?"

ত্রস্তে মাতা পুত্রের মুখে হাত-চাপা দিল "'আস্‌বে' কিরে পাগল! 'আসবে' কি বল্‌তে আছে?—'আসবেন' বলতে হয়। তিনি এলে তাঁর সাম্‌নে যেন ও রকম করে বলে ফেলো না।"

অজিত অপ্রতিভ লজ্জায় ভয়কণ্ঠে সংশোধিত করিয়া উচ্চারণ করিল। "আসবেন, আসবেন। কখন আসবেন মা?" "শীঘ্রই একদিন আসবেন। তাঁর এখন অনেক কাজ কি না; একলা মানুষ, সময় পাচ্ছেন না। তিনি এলে তুমি তাঁকে কি বল্‌বে অজিত?"

"আমি।"—এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছু ভাবিয়া রাখা হয় নাই; এবং মাতৃ-উপদেশও কিছু পাওয়া গিয়াছে, এমন কথাও স্মরণে না আসায়, উৎসাহিত বালক কথঞ্চিৎ নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়া, নিম্নস্বরে উত্তর করিল—"'বাবা' বল্‌বো।" ঈষৎ হাস্য করিয়া মনোরমা মুখ নত করিয়া পুত্রের ললাট চুম্বন করিল। তারপর প্রসন্ন-স্মিত মুখে কহিল, "ওঁকে দেখে তুমি যেন লজ্জা করো না অজু! করবে না তো? কাছে গিয়ে পড় হয়ে প্রণাম করো। যদি নাম জিজ্ঞেসা করেন তো—" "নাম বল্‌বো।" "কি বল্‌বে বল দেখি?" "বল্‌বো? বল্‌বো—আমার নাম শ্রীঅজিতকুমার বসু, বাবার নাম শ্রীযুক্ত বাবু অরবিন্দ বসু মহাশয়, দাদামশাইএর নাম—" হাসিয়া ফেলিয়া মনোরমা কহিয়া উঠিল, "অত সব বল্‌তে হবে না রে, শুধু তোর নিজের নামটাই বলিস্। আর কি বল্‌বি বল?" "আর বল্‌বো—মার নাম শ্রীমতী মনোরমা দাসী। আর দিদিমণির নাম শ্রীমতী দিদিমা-মণি। হাঁ মা, দিদিমণির কি নাম?" "ধাঃ পাগলা কোথাকার! ওসব কিছু বলিস্‌নে।" "তবে বল্‌বো—'বাবা আমাদের কখন নিয়ে যাবেন?' কেমন?" মনোরমা পুত্রের এই অতি লোভনীয় প্রশ্নে ঈষৎ চিন্তান্বিত মুখে ক্ষণকাল কি যেন ভাবিল। তারপর জোর করিয়া প্রলোভন ঠেলিয়া ফেলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিয়া গেল, "না বাবা, ও-কথা বল্‌তে

নেই। যদি তিনি নিয়ে যান, আপনিই যাবেন। যদি নিয়ে যাবার উপায় না থাকে, অনর্থক ওঁর মনে আমরা কষ্ট দেবো কেন? কি বল অজু! তাঁর মনে তো তোমায় কষ্ট দিতে নেই।" বালক মায়ের কথায় কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়াই, সঙ্গীত-মধুর স্বরে আবৃত্তি করিয়া গেল, "পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতা হি পরমন্তপঃ পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা।" "অজু! বাপ আমার!" মনোরমা পুত্রকে দুই হস্তে জড়াইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিল। তাহার প্রাণান্ত শিক্ষা ব্যর্থ হয় নাই। সে তাহার দেবতা চিনিয়াছে!

(৭)

তুলসী-মূলে সন্ধ্যাদীপটী জ্বালিয়া দিয়া, গৃহের সর্ব্বত্র দেখাইয়া, মনোরমা অজিতের পড়া শুনিবার উদ্দেশ্যে প্রদীপটি লইয়া জপশীলা জননীর অনতিদূরে আসিয়া বসিল। গ্রীষ্ম-সায়াহ্ন, পৃথিবী বায়ুলেশহীন,—ঘরের মধ্যে তিষ্ঠান যায় না। "মামণি! দেখুন তো, মুখস্ত হয়েচে কি না,—এই নিন্, বইটা ধরুন—

"ছিল তব পুণ্যবল, ফলেছে তাহার ফল, বল রে বিহঙ্গবর
সোণাকাপি ময়না!
হেরিয়া তোমার সুখ, মনে হয় কত দুঃখ, খেদে মরি
এ যাতনা প্রাণে আর সয় না।
সোণার পিঞ্জরে—"

"ছোট খুড়িমা! চেয়ে দেখুন কে এসেছে।"—অতর্কিত পুরুষ-কণ্ঠের এই আকস্মিক সম্বোধনে জপপরায়ণা এবং পাঠ-পঠনশীল দুই ব্যক্তিই চমকিত বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া ফিরিয়া দেখিল, দালানের খিলানের সম্মুখে তাহাদেরই প্রতিবেশী ঘোষ-গৃহিণীর জ্যেষ্ঠপুত্র নিতাই ঘোষের সহিত আর একজন কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কে সেই একজন? সন্ধ্যার স্বল্পান্ধকারে সেই প্রায়-অপরিচিত মূর্ত্তি চিনিবার পক্ষে কিছু বাধা জন্মিলেও, তাহার অনন্যসাধারণ দৈর্ঘ্য এবং তদপেক্ষাও সেই নূতন আগন্তুকের স্তব্ধ বেশ নিজের সকরুণ পরিচয় স্বমুখে ব্যক্ত করিয়া জানাইয়া দিতেছিল যে—ভাগ্যহীনস্য অরবিন্দ বসু। দুর্গাসুন্দরী পাদুকাহীন পদ ও তদূর্দ্ধে পাড়-শূন্য ধবলধবের শুভ্রতা অপাঙ্গে নিরীক্ষণ করিয়াই, জপের মালায় অতিশয় নিবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ-ভাবে—তিনি যে আগন্তুকদ্বয়কে দেখিতে পাইয়াছেন—এমনও কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না।

অজিত সহসা এই সান্ধ্য অন্ধকারে এইরূপ এক অপূর্ব্ব-দর্শন মূর্ত্তি দর্শনে কেমন যেন ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িল। সে নিতাই মামাকেই একটু সমীহ করিত; যেহেতু, নিতাই কলিকাতার চাকুরে বলিয়া সর্ব্বদা বাড়ী থাকে না। এখন এই শ্বেতবসনাবৃত দীর্ঘ মূর্ত্তি, ইহার নগ্ন পদ, রুক্ষ এবং বড়-বড় চুল, মুখখানাও দাড়ির পোঁচায় বিচিত্র—ইহার দিকে চাহিতেই শিশু-চিত্ত চমকিত হইল। কিছুদিন পূর্ব্বে এই নিতাই ঘোষেদেরই গৃহে স্থানীয় সখের থিয়েটার নরমেধ-যজ্ঞ অভিনয় করিয়াছিল। ইহার উপর চোখের দৃষ্টি পড়িবা-মাত্রই অজিতের সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া স্মরণে আসিল,—'নহুষের প্রেতাত্মা কাঁদিছে।'—অমনি সেই ব্যাকুল, বদ্ধ-দৃষ্টি নির্নিমেষে তাহারি উপরে নিবদ্ধ রাখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। নিতাই মামা সেদিনকার নহুষের প্রেতাত্মাকে যে সঙ্গে করিয়া কেন আনিয়াছেন, এ কথা সে বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

এদিকে যত কিছু বিপদে পড়িল মনোরমা। এই মাসাধিকাল ধরিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত ধরিয়া চুনিয়া-চুনিয়া সে যে নিজের প্রফুল্ল কল্পনা-পুষ্পগুলি দ্বারা মালাগাছি সুগ্রথিত করিয়াছিল, এই একটী মাত্র নিমেষেই তাহার সমুদায়টাই যে ঝলসিয়া শুখাইয়া যাইতে বসিয়াছে! এই দীর্ঘ যুগান্তের অবসানে একান্ত প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎ আজ অতর্কিতে এমন অসময়ে ঘটিয়া গেল! যে দুখানি নগ্ন পায়ের তলায় এই মুহূর্ত্তে লুটাইয়া পড়িয়া মনোরমার এই অভিশপ্ত নারী-জীবন এতক্ষণে সম্পূর্ণ সার্থক হইয়া যাইতে পারিত, এই সুদীর্ঘকালের সঞ্চিত রাশিরাশি অকথ্য বেদনার ভার জুড়াইয়া শীতল হইয়া যাইত, সেই দুখানি নিথর-অচল চরণের পানে তৃষাতুর অশ্রুনেত্রে চাহিয়া, সে গুণ্ঠনাবৃত মুখে শুধু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল; উঠিতে পারিল না,—মুখের দিকে একটীবার ভাল করিয়া চোখ তুলিয়া চাহিতেও সাহস করিল না। বাহিরে তাহাকে স্থির রাখিয়া শুধু বুকের মধ্যে উন্মত্ত কল্লোলে ঝড়ের হাওয়া তোলপাড় করিতে লাগিল।

অরবিন্দ নিজেও বেশীক্ষণ ধরিয়া এই ভীষণ বাহ্য স্তব্ধতা সহ্য করিতে পারিতেছিল না। অদূরবর্ত্তিনী

অবগুণ্ঠিতার পানে একবারও সে নিজের দৃষ্টি ফিরাইতে পারে নাই; কিন্তু দীপ-সমুজ্জ্বল সেই যে একখানি ক্ষুদ্র মুখের উজ্জ্বলায়ত বৃহত্তারক নক্ষত্র-দীপ্ত দুইটি চক্ষু বিস্ফারিত বিস্ময়-কৌতূহলে তাহাকে দেখিতেছিল, তাহার দিকে না চাহিয়া সে কোন মতেই যেন পারিল না। হত্যাকারী যে দৃষ্টিতে স্বহস্ত-বিদ্ধ আহতের পানে চাহে, তেমনি করিয়া শুধু একটীবারমাত্র সেই এতটুকু ক্ষুদ্র মুখের পানে চাহিতেই, তাহার গুরু অপরাধী ভারাতুর দুই চোখের তারা আপনা হইতে ভূমির পানে নামিয়া আসিল। আরও একটী মুহূর্ত্ত নীরব, নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর, সে ঈষৎ মাত্র অগ্রসর হইয়াই দুর্গাসুন্দরীর চরণ-উদ্দেশ্যে মাটিতে মাথা দিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই অত্যন্ত দ্রুত কণ্ঠে এক নিঃশ্বাসে কহিয়া গেল, "আমার পিতৃদেবের ১৯শে বৈশাখ চন্দননগরে হয়েছে, আপনাকে জানাতে এসেছি। যাহাতে ধার হতে উদ্ধার হই, করুন"—এইটুকু বলা শেষ হইয়া গেলেই, আর একবারও কোন দিকে না চাহিয়া, পূর্ব্ব-পরিচিত প্রায়-অন্ধকার বহির্দ্বার অতিক্রম পূর্ব্বক একেবারে সে বহির্দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

রাস্তায় তখন জনপ্রাণীও ছিল না। চাঁপাগাছে সেই কালোভূত আধাঢ়ধারী কোকিলটা বোধ করি কাহার উদ্দেশে বাঙ্গস্বরেই বেশ একটু চড়া গলায় ডাকাডাকি করিয়া বলিতেছিল, 'কু কু কু'। এই কুহু রবের মধ্যে আর কোন্ কথা উহ্য ছিল, সে খবর ঠিক বলিতে পারি না। তবে কিছু একটা যেন ছিল। সামনে রাস্তার ওপারে বৃহৎ উদ্যানের গাছে-গাছে অন্ধকার জড়াইয়া গিয়া ইহারই মধ্যে নিবিড় হইয়া গিয়াছে। সেখান হইতে একদল শৃগাল পরমোল্লাসে ঘোর কোলাহল করিয়া উঠিল। অরবিন্দ সেইদিকে মুখ করিয়া, একটুখানি থমকিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, পরক্ষণে আবার মুখ ফিরাইয়া লইয়া দ্বারের দিকে চাহিল। তার পর ধীরে-ধীরে যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই ষ্টেসনের এবং সহরের পথ ধরিয়াই সে একা ফিরিয়া চলিল; নিতাইয়ের জন্য অপেক্ষাও করিল না। শৃগালের চীৎকারে আট বৎসর পূর্ব্বের আর একটা রাত্রের কথা স্মরণে আসিতেছিল। সে রাত্রেও এই দ্বারের সম্মুখে সে যখন চৌবুড়ি হইতে অবতরণ করে, তখন ঐ বাগানের সামনে একদল রসনচৌকিওয়ালা রসনচৌকি বাজাইতেছিল। চৌকাট পার হইতে গিয়া পায়ে একটা হোঁচট লাগিল। সে দিন এই স্তব্ধ নিরালোক অর্দ্ধভগ্ন গৃহেও কত লোক, কত আলো, কত সাজ-সজ্জা! আর আজ ইহার ভিতরে বাহিরে কি অন্ধকার,—কি অন্ধকার!

অরবিন্দের কাণ্ডে বন্ধু নিতাইচরণের বহুক্ষণাবধিই বাঙ্‌নিষ্পত্তির ক্ষমতা ছিল না। কলিকাতা হইতে দুজনে এক ট্রেণে আসিলেও, বর্দ্ধমান ষ্টেসনে নামিবার পূর্ব্বে কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। প্লাটফর্ম্মে নামিবার পর ভৃত্য-সমভিব্যাহারী অরবিন্দের সহিত নিতাইয়ের সহসা সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেলে, সে অতিশয় তুষ্ট হইয়াই আপনা হইতে তাহার সঙ্গ লইয়াছিল; এজন্য সে-পক্ষ হইতে কোনই আবেদন সে পায় নাই; এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে, সে অবসরটুকুর প্রতীক্ষাও সে করে নাই। দু'একটি পরিচিত স্থানে নিমন্ত্রণ সারিয়া, খাজা-মতিচুর প্রভৃতির বায়নাপত্র চুকাইয়া, বিস্তর গড়িমসি করিয়াই অরবিন্দ সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই সহরতলীর পথের পানে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "চল।" নিতাইও কহিল, "চল। কিন্তু আজ ত আর তা'হলে ওদের নিয়ে যাওয়া হচ্চে না দেখ্‌ছি। একে বলা-কহা নেই, তায় ভরা সন্ধ্যে হয়ে গেল। সেই জন্যই তো সেই অবধি তাগিদ দিচ্চি। তুমি যে চেতোর শেষ হয়ে গ্যাছ।"

কোন কথা না কহিয়া অরবিন্দ শুধু পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। চাকরটাকে পূর্ব্বেই ট্রেণে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেও অনেক দিনের লোক—এরূপ অসঙ্গত আদেশ নিঃশব্দে পালন করিতে পারে নাই, কহিয়াছিল—"খোকাবাবুকে নিয়ে এক সঙ্গেই যাব'খন, আগে থাকতে গিয়ে কি হবে?" নূতন মনীব অটল ভাবে একটু মাথা নাড়িলেন। প্রভুপুত্রের এই দৃঢ় ভাবটুকু বড় পরিচিত থাকায়, ঘোর অনিচ্ছা-বিরক্তি-ভরেও কার্ত্তিককে ফিরিতে হইল। নিতাই বলিল, "আজ তাহ'লে ওদের যাওয়া হচ্চে না। তা বল তো আমিই ওদের কাল নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিতে পারি। বরং তোমার ঐ চাকরটাকে রেখে যাও না।" অরবিন্দ উত্তর দিয়াছিল, "চল তো।"

ইহার মধ্যে যে এতখানি ছিল, তাহা এই পল্লীবাসী সরল যুবক কল্পনাও করিতে পারে নাই। ইহার অর্থ কি এই নিরভিভাবক, অসহায় পরিবারকে মুখ ভেঙ্গাইয়া উপহাস করা নয়? এর চেয়ে আর বেশী করিয়া কোন্ অপমান সে করিতে পারিত? নিতান্ত সহিষ্ণু প্রকৃতির জীব হইলেও, আজিকার এ ব্যবহার নিতাইও আর সহিতে রাজি হইল না। বারে-বারে একটা বাহিরের লোক আসিয়া নিজের ধন মান ও পদ-গর্ব্বে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ মদ-গর্ব্বেই যে তাহাদের একান্ত আশ্রিত এই নিরপরাধ নিরীহ ভদ্র নারীদিগকে নির্য্যাতন ও অবমাননা করিয়া যাইবে, ইহা সহ্য করিয়া লইয়া তাহার প্রশ্রয় বাড়ান আর উচিত হয় না। বিশেষ করিয়া নিতাইয়ের পক্ষে এ কার্য্য আরও অনুচিত। দরিদ্র পরিবার তাহাদের স্পর্শাতীত এই মহার্ঘ রত্নের প্রতি তো কোন দিনই লোভদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই; প্রতিবেশী নিতাইকে একটি চলনসই যোগ্য পাত্রের খোঁজ লইতেই বলিয়াছিলেন। নিতাই নিজেই মনোরমার অনন্যসাধারণ রূপটুকু স্মরণ করিয়া, তাহারই বলে সহপাঠী ধনী-পুত্রের উপর কেমন করিয়া সহসা লুব্ধ হইয়া উঠে; এবং অপর একটী বন্ধুর জন্য 'কনে' দেখার ছলে, এই কুমার-প্রতিম এন্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্রটিকে এক ছুটীর দিনে সঙ্গে করিয়া আনিয়া, বর্দ্ধমান সহরের বহুবিধ দ্রষ্টব্য সহিত সহরপ্রান্তস্থিত দরিদ্র-গৃহের গৌরী-প্রতিমা কুমারীটীকেও দর্শন করাইয়া দেয়। সে দিন কি ক্ষণ, কি তিথি ছিল মনে নাই; তবে এমন কোন যোগ নিশ্চয়ই ছিল, যাহার প্রারম্ভ শুভ হইলেও, সমাপ্তি নিতান্তই অকল্যাণকর। কিশোরী মনোরমার চম্পক-গৌর কান্তি এবং অতুলনীয় মুখশোভা তরুণ বক্ষে আঁকিয়া লইয়া, অরবিন্দ সেদিন ঘরে ফিরিবার পথে, নিজের নব-যৌবনের সমস্ত অর্ঘ্য-সম্ভার ইহারই ছোট ছোট দুখানি আল্‌তা-পরা, মল-বাজান পায়ের তলায় ধরিয়া দিয়া ফিরিয়া গেল। তার পর নিতাইয়ের ঘটকালীতেই অনিচ্ছা-কুণ্ঠিত উভয় পক্ষ কোন-মতে এ বিবাহে সম্মতি দান করিয়াছিল, এবং বিবাহও ঘটিয়াছিল। সে দিন এই নিতাইয়ের মত আনন্দ আর কাহারও হয় নাই; তেমন করিয়া বর-কনে লইয়া 'বরের ঘরের মাসি ও কনের ঘরের পিসী' সাজিয়া আমোদ করিতেও আর কেহ পারে নাই। তার পর এ কয় বৎসর নিরপরাধে, অপরাধের লজ্জা মুখে মাখিয়া কুণ্ঠিত নিতাই দুর্গাসুন্দরীকে মুখ দেখাইতে পারে নাই। মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুর দিনে শুধু কোঁচার কাপড়ে চোখ ঢাকিয়া দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর আজ আসিয়াছিল বড় আশা করিয়া,—অনেক দিনের অনেক আক্ষেপ মিটাইবার উল্লাসে।—তা মিটিল ভাল!

ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া নিতাই সেই পাষণ্ডের অনুসরণোদ্দেশ্যে চরণ উঠাইয়াই, সহসা একটা ব্যথাভরা আগন্তুক কৌতূহলের বশে তাহার সম্মুখস্থিতা সদ্য-অবমানিতাগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য চকিত দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়া যেন পার পাইল না। দেখিয়া বিস্মিত হইল, দুর্গাসুন্দরী তখনও যেমন, এখনও ঠিক তেমনি করিয়া বসিয়া জপের মালা ফিরাইতেছেন। মুখের ভাবেও কোন পরিবর্ত্তন সে লক্ষ্য করিতে পারিল না। কিন্তু মনোরমার দিকে চাহিতে সে যেন সাহস করিতে পারিতেছিল না। শুধু তাহার হাতের অঙ্গুলী হতবুদ্ধি-প্রায় বালকের বাহু পীড়ন করিয়া কি একটা ইঙ্গিত করিতে চাহিতেছিল, যে ইঙ্গিতের বিশদার্থ না বুঝিয়াই অজ্ঞ শিশু তাহাকে মায়ের অর্থহীন আদর মাত্রে ভুল করিয়া এতটুকু ঔৎসুক্য অবধি প্রদর্শন করে নাই। এইটুকু চোখে পড়িতেই, নিতাই নিজের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞায় অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিয়া, বিনা বাক্যে ফিরিয়া চলিল। আজ আর বন্ধুত্বের কোন খাতিরই সে রাখিবে না। পত্নীত্যাগে তাহার হাত খুব বেশী ছিল না, ইহা সেও বুঝিয়াছিল; কিন্তু এমন করিয়া এই নির্য্যাতিতাগণকে অবমাননা করিবার তাহার কি অধিকার আছে? ইহাও তাহার বুদ্ধির অগোচর।

একটা ঘর পার হইয়া দ্বিতীয় অন্ধকার ঘরটায় পা দিয়াছে, এমন সময় তাহার পিছন দিকে, অন্ধকারের মধ্যে, ঠুন্ করিয়া একগোছা চাবি বাজিয়া উঠিল। কোন স্ত্রীলোক হয় ত এই ঘরের মধ্য দিয়া আসিবে, ইহা মনে করিয়া, তাহাকে পথ দিবার জন্য নিতাই একটু পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইতেই, কে একজন অতিশয় ব্যস্ত ভাবে দ্বারের নিকট আসিয়া ব্যগ্রস্বরে ডাকিল, "নিতাই দা!" "কে রে, মনু?" "হাঁ, তুমি কোথা নিতাই দা?" নিতাই দ্বারের নিকট একটু সরিয়া আসিয়া, অত্যন্ত করুণমিশ্র স্নেহস্বরে উত্তর

করিল, "এই যে আমি, কেন বোন, আমায় ডাকচো?" মনোরমা ক্ষণকাল কোন উত্তর দিতে পারিল না। তার পর বড় তাড়াতাড়ি করিয়া বলিয়া ফেলিল, "তুমি এখন যেও না।" "কেন, বোন?" নিতাইয়ের স্বরে পুঞ্জ-পুঞ্জ বিস্ময় প্রকাশ পাইল।

মনোরমাও ইহা বুঝিল। বুঝিল বলিয়াই প্রশ্নের উত্তর প্রদান তাহার পক্ষে একটুখানি কঠিন বোধ হইল। কিন্তু এবার আর সে দ্বিধা না করিয়াই জবাব দিল, "তা'হলে তুমি নিজেকে চুপ করিয়ে রাখতে পার্বে না!"

নিতাই ঈষৎ উত্তেজিত হইয়াই উত্তর দিল; বলিল, "না-ই বা পারলুম! চুপ করবার দরকারও তো কিছু আমি দেখিনে।" মনোরমা কহিল, "সেই জন্যেই তো তোমায় মানা করচি নিতাই-দা!" তাহার কণ্ঠস্বর অতি সহজ, পরিষ্কার। ঘাত-প্রতিঘাতের কোন আভাষ ইহার মধ্য হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নিতান্তই বিস্ময়ের সহিত নিতাই বিস্ফারিত নেত্রে সেই অন্ধকারের মধ্যে চাহিয়া শুধু এক অস্পষ্ট মূর্ত্তি মাত্র দেখিতে পাইল। সে আলোকে পরিচিতেরও মুখ চেনা যায় না। সে ঈষৎ নিরুদ্যম হইয়া নিস্তেজ স্বরে কহিয়া উঠিল, "তবে কি অনর্থক এমন অপমানটা আমাদের মুখ বুজে সয়ে নিতে হবে, এই তোমার মত?"

মনোরমা কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর করিল, "আমার জন্যে তোমরা তো অনেক অপমানই সহ্য করেছ নিতাই-দা!"

"করেছি। কিন্তু তাই বলে কি চিরদিনই করতে হবে? ও রাখেলটা কিছুতেই আজ আর এমন নাটক অভিনয় করে ফিরে যেতে পাবে না,—না, কিছুতেই না। হয় ও তোমাদের মাথায় করে নিয়ে যাবে, না হয়—"

"নিতাই-দা!"

উত্তপ্ত-মস্তিষ্ক, উত্তেজিত-চিত্ত নিতাইচরণ অকস্মাৎ এই কম্পিত বেদনা-ভরা অতি ক্ষীণ আহ্বান-শব্দে শরীরে-মনে চমকিয়া উঠিয়া থামিয়া গেল; এবং বহুক্ষণ সেই মশক-রবে শব্দিত নির্জ্জন অন্ধকারের মধ্যে উভয়েই নীরবে দাঁড়াইয়া থাকার পর, এক সময়ে যেন এই বিস্ময়াহত অবস্থা হইতে সংজ্ঞ হইয়া উঠিয়া, নিতাই নিজেকে সম্পূর্ণ সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল, "আয় মনো, জ্যেঠাইমার কাছে যাই আয়।"

"এসো।" বলিয়া মনোরমা অগ্রসর হইয়া চলিল। চলিতে-চলিতে মুখ ফিরাইয়া অতি সংক্ষেপে বলিল, "মাকে এ সব কথা না বলাই ভাল।"

নিতাই বলিল, "হুঁ।"

দুজনে একসঙ্গেই দালানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, দুর্গাসুন্দরীর জপ সারা হইয়াছে। তিনি কোলার মধ্যে মালা তুলিয়া রাখিয়া, নাতি লইয়া বসিয়াছেন। আর অমিত তাঁহার গায়ে হেলান দিয়া শুইয়া পড়িয়া, দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছিল, "হ্যাঁ দিদিমামণি! নহুষের প্রেতাত্মাটা আমাদের বাড়ী কি করতে এসেছিল গা?"

মনোরমা পাশের প্রাচীর ধরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইল।

মনোবিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ, এম-এ]

কল্পনা

স্মৃতি ও কল্পনা

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে নদীর উপকূলে পাদচারণা করিবার সময় একটি অনিন্দ্য-সুন্দরী বালিকা দেখিয়াছিলে। এখন তুমি তাহার বর্ণনা করিতেছ—

"শতদলনিভ কে ঐ বালিকা?
রূপভরে যেন পড়িছে নুয়ে।
এলান চিকণ রেশমের গোছা—
কাল চুল পিঠে পড়েছে ছেয়ে।"

বালিকাটি এখন তোমার সম্মুখে নাই; কিন্তু তবুও তাহার রূপ, তাহার বর্ণ ইত্যাদি সমস্তই তোমার স্মৃতিপটে উদিত হইতেছে। তোমার মনে বালিকাটির সম্যক প্রতি-

কৃতির উদয় হইতেছে। কিন্তু, আমি ত ঐ বালিকাকে কখন দেখি নাই। আমি যখন তোমার বর্ণনা পড়িতেছি, আমার মনেও ত তখন একটী প্রতিকৃতির উদয় হইতেছে! তোমার মানস-প্রতিকৃতি এবং আমার মানস-প্রতিকৃতির মধ্যে কি কোন পার্থক্য নাই? তুমি যাহা দেখিয়াছ তাহাই ভাবিতেছ; আর আমি যাহা দেখি নাই তাহাই ভাবিতেছি। তোমার মানস-প্রতিকৃতি স্মৃত বস্তু মাত্র। কিন্তু আমার মানস-প্রতিকৃতি স্মৃতিমাত্র নহে। আমি যদি "শতদল" না চিনিতাম, "রেশমের গোছা" না দেখিতাম—যদি আমার ঐ সকল বস্তুর স্মৃতি না থাকিত—তবে কি আমি তোমার বর্ণিত বালিকার রূপ মনে করিতে পারিতাম? অতএব, তুমিও স্মৃতির সাহায্য লইতেছ, আমিও স্মৃতির সাহায্য লইতেছি। কিন্তু তুমি যেমনটি দেখিয়াছ, তেমনটি স্মরণ করিতেছ—তোমার স্মরণে কৃত্রিমতা নাই। আমি যেমনটি দেখিয়াছি, তেমনটি স্মরণ করিতেছি না—আমার স্মরণে কৃত্রিমতা আছে। তোমার চিচ্ছায়া অবিকৃত স্মৃতি; কিন্তু আমার চিচ্ছায়া অবিকৃত স্মৃতি নহে। তোমার চিচ্ছায়া স্মৃতি, আমার চিচ্ছায়া কল্পনা। যখন পড়িলাম "খর্জ্জুরং মূলতন্তুং গজেন্দ্র বদনং—নযোদরং সুন্দরং," তখন আমার মনে একটী চিচ্ছায়ার আবির্ভাব হইল। এই চিচ্ছায়াটি নিশ্চয় স্মৃতি নহে; কারণ, এরূপ বস্তু আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। ইহা আমার পক্ষে একটী নূতন বস্তু। নূতন হইলেও ইহা আমার ধারণাতীত নহে, আমার কল্পনা মাত্র। আমি হাতী দেখিয়াছি, মানুষও দেখিয়াছি। হাতী এবং মানুষের স্মৃতি আমার আছে। হাতীর শরীর বাদ দিয়া মাথা, এবং মাথা বাদ দিয়া মানুষের শরীর চিন্তা করিতে পারি। পরে মনে-মনে মানুষের শরীরের উপর হাতীর মাথাটি সংযোগ করিয়া দিয়া, একটি নূতন বস্তুর ধারণা করিতে পারি। এরূপ ধারণা প্রকৃত বস্তুর স্মৃতি নহে—ইহা কল্পনামাত্র। স্মৃত বস্তু হইতেই কল্পনার সৃষ্টি হয়। হাতী এবং মানুষের স্মৃতি না থাকিলে "গণেশের" কল্পনা হইত না। কিন্তু স্মৃত বস্তুর উপর সংযোগ এবং বিয়োগ এই দুইটি মানস-ক্রিয়ার আবশ্যক। তুমি হাতী হইতে হাতীর শরীরটি বাদ দিলে, এবং মানুষ হইতে মানুষের মাথাটি বাদ দিলে (বিয়োগ)। পরে হাতীর মাথাটি মানুষের শরীরে যোগ করিয়া (সংযোগ) একটি নূতন বস্তুর কল্পনা করিলে। স্মৃত বস্তুর সংযোগ এবং বিয়োগের দ্বারা অনভিজ্ঞাত বস্তুর ধারণার নাম কল্পনা। একবারে নূতন বস্তুর কল্পনা অসম্ভব। "সুবর্ণ পর্ব্বৎ" নূতন বস্তু বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহা একবারে নূতন নহে—আমাদের নিকট সুবর্ণ নূতন বস্তু নহে, পর্ব্বতও নূতন বস্তু নহে। সুবর্ণ এবং পর্ব্বৎ এই দুইটি স্মৃত বস্তুর সাহায্যে "সুবর্ণ পর্ব্বতের" কল্পনা সম্ভব।

কল্পনার ক্রম

তুমি যাহা কল্পনা করিতে চাও, পূর্ব্ব হইতেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ থাকা প্রয়োজন। পূর্ব্বাভাষের ক্ষীণ সূত্র অবলম্বন করিয়া কাল্পনিক চিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কল্পিত বিষয়ের জন্য উপকরণের আবশ্যক। স্মৃতিশক্তি হইতে এই উপকরণ সংগৃহীত হয়। সংযোগ এবং বিয়োগ-প্রণালীর সাহায্যে উপকরণগুলিকে কল্পনানুযায়ী পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্জ্জন করিয়া একত্র সমাবেশ করিলে, তোমার ইপ্সিত কল্পনার সৃষ্টি হইবে; এবং ইপ্সিত বস্তু পাইলে তোমার সন্তোষলাভ অবশ্যম্ভাবী। অতএব—আভাষ, স্মৃত বস্তু সংগ্রহ, সংযোগ এবং বিয়োগ, একত্র সমাবেশ এবং তুষ্টি—এই কয়টিকে কল্পনা-কার্য্যের ক্রম বলা যাইতে পারে। মনে কর, তুমি নরকের নদীর চিত্র কল্পনা করিতে চাও।—

১। আভাষ—নরকের নদী।

২। স্মৃত বস্তু—রুধির, অস্থি, নদী, কুম্ভীর, বালুকা, লৌহ, সূচি ইত্যাদি।

৩। বিয়োগ—জলশূন্য নদী; মাংসশূন্য কঙ্কাল, প্রাণশূন্য দেহ, বালুকাহীন নদীতীর, ইত্যাদি।

৪। সংযোগ—রুধির-পূর্ণ নদী; অস্থিময় কুম্ভীর, লৌহসূচিপূর্ণ নদীতীর, ভীষণ অন্ধকারেও দর্শন ইত্যাদি।

৫। সমাবেশ—"রুধিরের নদী, গলিত শব, স্রোতো-বাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ, সকলই ভীষণান্ধকারে দেখা যাইতেছে। নদীতীরে বালুকা নাই—তৎপরিবর্ত্তে লৌহসূচি সকল অগ্র-ভাগ ঊর্দ্ধ করিয়া রহিয়াছে।"

৬। এইরূপে কল্পিত চিত্রের সমাধান হইলে সন্তোষ-লাভ অবশ্যম্ভাবী।

কল্পনা দ্বিবিধ—সংভাবিনী ও সংগ্রহণী

কবি কালিদাস যখন মেঘদূত রচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি কল্পনার আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমি যখন মেঘদূত পড়িতেছি, তখন আমিও তাঁহার কল্পিত চিত্রের কল্পনা করিতেছি।

"অন্ধকার রুদ্ধ গৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত; গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশ-দেশান্তরে।"

কবি কালিদাসের কল্পনা এবং আমার কল্পনা এক নহে—উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। কালিদাস আত্ম-শক্তি-প্রভাবে অনভিজ্ঞাত বিষয়ের উদ্ভাবন করিতেছেন; মেধাশক্তি প্রভাবে পূর্ব্ব-পরিচিত বিষয় স্মরণ করিতেছেন; এবং তাঁহার ইচ্ছামত সেগুলির পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্জ্জন করিয়া একটি সম্পূর্ণ মানস চিত্র ফুটাইয়া তুলিতেছেন।

——"এই পুষ্পবন
তোমারি সৃজিত প্রভু! রচনা তোমার;
তোমারি কুসুম তুমি করেছ চয়ন।
জ্ঞানের অনন্তাকাশে তুমি প্রভাকর।"

আর, আমি একপ্রকার নিশ্চেষ্ট; আমাকে কল্পিত বস্তুর উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইতেছে না—আমার জন্য অপরে সংগ্রহ করিতেছে। সংগৃহীত উপকরণের সমাবেশ আমাকে করিতে হইতেছে না—আমার জন্য অপরে করিতেছে।

"আমি মাত্র মালাকার। জ্ঞানের উদ্যানে
ফুটিয়াছে গোবিন্দের যে ফুলনিচয়
গাঁথিয়াছি গীতাহার তুলি সেই ফুল,—
চির সুবাসিত, পুণ্য পরিমলময়।"

এখানে কালিদাস স্রষ্টা—আমি দ্রষ্টা মাত্র। অতএব কল্পনা দুই প্রকার—সংভাবিনী এবং সংগ্রাহিকা। কালিদাসের কল্পনা—সংভাবিনী কল্পনা এবং আমার কল্পনা সংগ্রাহিকা কল্পনা।

সচেষ্ট কল্পনা ও নিশ্চেষ্ট কল্পনা

কবি গাহিতেছেন—

"আকাশে চন্দ্রমা হাসে জোছনায় ধরা ভাসে;
চকোর পিয়ায় সুধা পরাণ ভরে।
শিথিল যমুনা বারি বহে যায় ধীরি ধীরি
গণিতেছে ঢেউগুলি কে বসে তীরে।"

আর ঐ দেখ, প্রদোষকালে উদ্যানমধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া কুন্দনন্দিনী ভাবিতেছে—"ভাল, মানুষ মরিলে কি নক্ষত্র হয়? তা হ'লে ত বাবা, মা, সবাই নক্ষত্র হইয়াছেন? তবে তাঁরা কোন্ নক্ষত্রগুলি? ঐটি? না ঐটি? কোন্‌টি কে? কেমন করিয়া জানিব? তা যেটিই যিনি হউন, আমায় ত দেখতে পেতেছেন? আমি যে এত কাঁদি—তা দূর হউক, ও আর ভাবব না—বড় কান্না পায়। কেঁদে কি হবে? আমার ত কপালে কান্নাই আছে—নহিলে মা—আবার ঐ কথা! দূর হউক—ভাল, মরিলে হয় না? কেমন করিয়া? জলে ডুবিয়া? বেশ ত! মরিলে নক্ষত্র হব—তা হ'লে হব ত?" ইত্যাদি। এখানে কবি ও কুন্দনন্দিনী দুইজনেই কল্পনাস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন; কিন্তু দুইজনেরই কি কল্পনা একরকম? কবি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া নিজের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন এবং নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করিতেছেন। কবির কল্পনার উদ্দেশ্য আছে, শৃঙ্খলা আছে, বন্ধ আছে; আর কুন্দনন্দিনীর কল্পনা উদ্দেশ্যহীন, অসংলগ্ন এবং অবন্ধ-শিথিল। কল্পনা কবির ক্রীড়নক; কিন্তু এখানে কুন্দনন্দিনীই কল্পনার ক্রীড়নক। কুন্দনন্দিনী নিশ্চেষ্ট। কুন্দ তাহার কল্পনাকে নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করিতেছে না। কবির কল্পনা কবির ইচ্ছানুশাসিত; আর কুন্দনন্দিনীর ইচ্ছা কল্পনানুশাসিত। কবির কল্পনা সচেষ্ট কল্পনা, কুন্দনন্দিনীর কল্পনা নিশ্চেষ্ট কল্পনা।

কল্পনার উদ্দেশ্য বা উপকারিতা

সত্য-নিরূপণ, ঐহিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সম্পাদন এবং সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি—এই তিনটি সচেষ্ট কল্পনার উদ্দেশ্য। কোন তথ্যের অনুসন্ধান করিতে হইলে, প্রথমতঃ কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। কল্পনা ব্যতীত অনুসন্ধান-কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। কি বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইবে, কি উপায়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে, ইত্যাদি পূর্ব্বসূচি কল্পনা করিয়া লইতে হয়। কার্য্যের কারণ নির্ণয় করা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। কিন্তু কাল্পনিক কারণের আশ্রয় না লইলে, যথার্থ কারণ নিরূপিত হয় না। নিউটন একদিন দৈবযোগে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী আতা-বৃক্ষ হইতে একটী ফল

পতিত হইতে দেখিয়া, বস্তুমাত্রের পতন-নিয়ামক সাধারণ কারণের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি কল্পনা করিলেন যে, হয় ত যে কারণবশতঃ আতা ভূতলে পতিত হইল, সেই কারণেই চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী স্ব-স্ব কক্ষে ব্যবস্থাপিত আছে। পরে বহু পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিলেন যে, সেই কারণই পরম অদ্ভুত শক্তি সহকারে অতি সহজে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর গতি নিয়মিত করিতেছে। এইরূপে গুরুত্বের নিয়ম আবিষ্কৃত হইল। কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইল। কল্পনা আমাদিগের লক্ষ্য স্থির করিয়া দেয়। কল্পনা আমাদিগকে সত্যান্বেষণের পথে প্রবর্ত্তিত করে। কল্পনা-প্রভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম অবধারিত হইতেছে।

"আজি কল্পনা-দূতী লয়ে যায় মোরে
স্মরণ সরণি-পারে
যত মৃত্যু বিজয়ী সাধকের সাথে
সত্যের অভিসারে,
পুণ্যের দীপে দীপালি যেথায়
বিধাতার সেই দ্বারে।"

প্রথমে কল্পনা, পরে পরীক্ষা। যে কল্পনা পরীক্ষামূলক এবং যুক্তিমূলক তাহাই স্বীকার্য্য; অপরগুলি পরিহার্য্য। কল্পিত বিষয় পরীক্ষা এবং আলোচনার দ্বারা সম্যক প্রকারে প্রমাণিত হইলে, সত্যে পরিণত হয়। কল্পনা কেবল অবাস্তবের স্রষ্টা নহে—বাস্তবেরও স্রষ্টা। আমাদের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদনের জন্যও কল্পনার প্রয়োজন। মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। ইহারা আমাদের সুখের হেতুও বটে; আবার দুঃখেরও হেতু। কি উপায়ে ইহাদিগকে মানুষের সুখের কারণ করিতে পারা যায়, আমরা সতত সেই চিন্তা করিয়া থাকি। এই উপায় নির্দ্ধারণের জন্য উদ্ভাবনী কল্পনার প্রয়োজন। কল্পিত উপায়কে কার্য্যে পরিণত করিলেই বলিতে পারিব—

"অগ্নি জল অচেতন, নাহি বুঝে কথা;
আমার আদেশ হ'লে
তারাও নিয়ত চলে
কিঙ্করের মত, আমি চলি যথা তথা।"

আরও, ছুরি, কাঁচি, ঘড়ি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে প্রস্তুতকর্ত্তাকে কি কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না? কোন্ জিনিস হইতে আমাদের কি অভাবের অপনোদন হইবে, কোন্ জিনিসটি কেমন করিয়া প্রস্তুত করিলে আমাদের উপকারে আসিবে, ইত্যাদি স্থির করিয়া লইয়া মানুষ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

"অপূর্ব্ব ঘটিকা-যন্ত্র করেছি কৌশলে;
বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত,
কার্য্য করে অবিরত,—
তখনও সময় সেই জানায় সকলে।"

মানুষ যেমন সত্যের জন্য লালায়িত, সুখের জন্য লালায়িত, তেমনি আবার সৌন্দর্য্যের জন্যও লালায়িত। সেই জন্য মানুষ সৌন্দর্য্যেরও সৃষ্টি করিতেছে;—এখানেও মূল কল্পনা। শিল্পে সৌন্দর্য্য আছে, কাব্যে সৌন্দর্য্য আছে, সঙ্গীতে সৌন্দর্য্য আছে। শিল্প, কাব্য এবং সঙ্গীত সৌন্দর্য্যের ভাষা। কবি সৌন্দর্য্যের কল্পনা করিতেছেন, এবং পরে সেই কল্পিত সৌন্দর্য্যকে তাঁহার কবিতায় প্রকাশ করিতেছেন।

"'ব্রজাঙ্গনা' 'বীরাঙ্গনা', নয়নের জলে,
—প্রেম বিগলিত,—
সাজায়ে সুন্দর ডালা, গাঁথিয়া নূতন মালা,
আদরে তোমার অঙ্গ করিল ভূষিত।"

তেমনি শিল্পী এবং গায়কও তাঁহাদের কল্পিত সৌন্দর্য্যকে শিল্পের নৈপুণ্যে এবং সঙ্গীতের সুললিত স্বরে প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে কল্পনা হইতে সত্যের আবিষ্কার হইতেছে, সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতেছে। কল্পনা সত্যের স্রষ্টা, কর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং সৌন্দর্য্যের উদ্বোধক। সুতরাং উদ্দেশ্য অনুসারে কল্পনা তিন প্রকার—বৈজ্ঞানিক, ব্যাবহারিক এবং রূপক কল্পনা।

কল্পনার বিকাশ।

কল্পনা-প্রভাবে, যাহা আমরা কখনও দেখি নাই বা দেখিব না, এমন বিষয়েরও চিন্তা করিতে পারি।

"দেখাইল;—বেড়াইল কল্পনার পক্ষে
লইয়া তোমারে,—
স্বর্গ মর্ত্ত্য ধরাতলে, প্রচণ্ড জলধিতলে;
শুনাইল 'মেঘনাদ' গম্ভীর ঝঙ্কারে।"

পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, আমরা নূতন বস্তুর কল্পনা করিতে পারিলেও, সম্পূর্ণ নূতন বস্তুর কল্পনা করিতে পারি না।

"ছাড়া নাহি পাই, ছেড়ে দিয়ে তাই দেখি
ছেড়ে দিতে বাঁধি,—অজানার স্বাদ পেতে
কল্পনা ফিরে আসে রে আকাশে ঠেকি'—
কল্পলতার সন্ধানে যেতে যেতে।"

কল্পনার জন্ম উপকরণের আবশ্যক। শ্রুত বস্তুসমূহই কল্পনার উপকরণ। সুতরাং অভিজ্ঞতা এবং মেধাশক্তির প্রয়োজন। অতএব যখন অভিজ্ঞতা নিতান্ত কম, যখন মেধাশক্তির তেমন বিকাশ হয় নাই, তখন কল্পনাশক্তি অপ্রকাশ থাকে। সুতরাং মনুষ্য-জীবনের প্রারম্ভ হইতেই কল্পনার সূচনা দেখা যায় না। পরে যখন অভিজ্ঞতার প্রসার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইল, স্মৃতিশক্তির কিঞ্চিৎ উন্মেষ হইল, পরে—

"সংসার সোপানে যবে করে পদার্পণ।
অলস কল্পনা বুকে ভাসিয়া বেড়ায় সুখে;
ভাবে, বুঝি হেসে খেলে কাটিবে জীবন।"

এই সময়ে কল্পনা-শক্তি বড়ই প্রবল; এমন কি, তখন নির্জ্জীব পদার্থকেও সজীব বলিয়া মনে হয়। বালক-বালিকারা পুতুল লইয়া খেলা করে। তাহাদের মাটির পুতুলের ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে; তাহাদের কাঠের ঘোড়া জল খায়, তাহাদের পুতুলের মা-বাপ আছে, ভাই-বোন আছে।

শৈশবে আমরা উপকথা শুনিতে বড়ই ভালবাসি। পরে, শৈশবের সীমা অতিক্রম করিলাম। অভিজ্ঞতার বলে বাস্তবের সহিত অবাস্তবের তুলনা করিতে শিখিলাম। অবাস্তবে বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাগিল। কল্পনা-স্রোত সংযত করিতে শিখিলাম। উপকথা শ্রবণে স্পৃহা কমিয়া গেল। মিথ্যা গল্পে আর আনন্দ পাইলাম না। আমার অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধ বিষয়ে আর আস্থা থাকিল না। আমার কল্পনার রূপান্তর হইয়া গেল। কল্পনা অন্তর্হিত হয় নাই;—কল্পনা বর্ত্তমান। যাহা আমার নিকট বাস্তব বলিয়া মনে হয় না, তাহা আমার ভাল লাগে না। কিন্তু বাস্তব ঘটনার নূতন 'বিন্যাস-সমুদ্ভূত গল্প লহরীতে বড়ই আমোদ পাইতে লাগিলাম। উপন্যাস, কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনা বড়ই প্রীতিকর হইয়া উঠিল। কিন্তু এ সুখটুকুও কয়দিনের জন্য? "অম্বর মাঝে ক্ষণপ্রভাসম" ইহাও শীঘ্রই বিলীন হইয়া গেল।

"চকিতে দেখিনু চেয়ে সুমুখে সংসার।
প্রশস্ত কার্য্যের স্থল চারিদিকে কোলাহল
অনন্ত শিক্ষার দ্বার রয়েছে বিস্তার।"

এইবার কল্পনার রাজ্য ত্যাগ করিয়া বাস্তবের রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। কঠোর কর্ত্তব্যের কষাঘাতে কল্পনার অলীক মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। এখন—

অন্ধকার জীবনের মাঝে
চেয়ে দেখি সর্ব্বত্র বিষাদ।
নিত্য ঘটে কত অঘটন
নিদ্রিতে জাগ্রতে পরমাদ।
সংসার-কারার মাঝে রহি
যে দিকে বাড়াতে যাই পদ,
সেই দিকে মহা ঝঞ্ঝাবাত,—
প্রতি পদে ব্যর্থ মনোরথ।"

কল্পনার মোহ কাটিয়া গেল। এখন জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম। এইবার কল্পনার পরাজয় হইল, কর্ম্মের জয় হইল। কল্পনা এখন জ্ঞানের সহায়ক, কর্ম্মের প্রবর্ত্তক।

কপালকুণ্ডলা ও মিরাণ্ডা

[শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল]

প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য—এই উভয় শিক্ষার ফলে, বঙ্গের সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল "নবেল" বা উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার "কপালকুণ্ডলা" একখানি অত্যুৎকৃষ্ট উপন্যাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র যখন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নাগোয়া মহকুমার সব্‌ডিভিসনাল অফিসর ছিলেন, সেই সময়ে এই "কপাল-কুণ্ডলা"র সমুদায় উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল। শুনা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র "দরিয়াপুর" বাংলোয় অবস্থিতিকালে এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন;—লিখিতে না কি পনের দিন সময় লাগিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নাগোয়াতে সরকারি কর্ম্মোপলক্ষে গমন করেন। মেদিনীপুর জেলার বর্ত্তমান মহকুমা "কাঁথির" (Contai) সন্নিকটে নাগোয়া। "কাঁথি" এবং "নাগোয়া" বঙ্গোপসাগরের অতি নিকটে। "কাঁথির" যে অট্টালিকার একতলায় আদালত এবং দোতালায় সবডিভিসনাল অফিসারের বাসস্থান, সেই অট্টালিকার ছাদে উঠিলে বঙ্গোপসাগর দেখিতে পাওয়া যায়।

"কপালকুণ্ডলা" ইংরাজী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার পরে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় উহার অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছে। লেখকের জীবদ্দশাতেই উহা ইংরেজী এবং ফর্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

নাগোয়া মহকুমায় অবস্থিতি কালে কর্ম্মোপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রকে মাঝে-মাঝে দরিয়াপুর গ্রামে যাইতে হইত। এই দরিয়াপুরে সরকারি কর্ম্মচারিগণের থাকিবার সুবিধার জন্য একটি "ইন্‌স্পেক্‌সন্ বাংলো" আছে। যে বালিয়াড়ির বর্ণনা "কপালকুণ্ডলা" পুস্তকে দেখিতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্র সেই বালিয়াড়ি সর্ব্বপ্রথমে এই নাগোয়া মহকুমায় অবস্থিতিকালে দেখিতে পান; এবং এইখানেই অবস্থিতিকালে তিনি মধ্যে-মধ্যে সমুদ্র দেখিতে যাইতেন। কেহ কেহ বলেন, "নাগোয়া"য় অবস্থিতিকালে বঙ্কিমচন্দ্র এক কাপালিকের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। এ কথা সত্য হউক, বা না হউক, তৎকালে দরিয়াপুর গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ দেখিলে, স্বতঃই উহা কাপালিকের ও তান্ত্রিকের বাসস্থান বলিয়া প্রতীতি হইত। এতদ্ভিন্ন শুনিতে পাই, ঐ দরিয়াপুর গ্রামে না কি একটী কালী মূর্ত্তি ছিল। এখন উহা আছে কি না জানি না।

নাগোয়া মহকুমায় আসিবার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র সেক্‌স্‌পীয়রের "টেম্‌পেষ্ট" (The Tempest) নাটকখানি বেশ করিয়া পড়িয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পঠদ্দশায় ভবভূতি, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের কাব্যও পাঠ করিয়াছিলেন। সেই সময়ের প্রচলিত তন্ত্র-গ্রন্থাদিও যে বঙ্কিমচন্দ্রের পড়া ছিল না, তাহা নহে। সর্ব্বোপরি, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাশীল, কল্পনা-কুশল, ঊর্ব্বর মীমাংসা ত ছিলই। তাঁহার "কপালকুণ্ডলা"র এই সকলের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র সেক্‌স্‌পীয়রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াই যেন "কপালকুণ্ডলা" পুস্তকখানি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। যেন বঙ্কিমচন্দ্রের মনে-মনে এইরূপ ভাব হইল, "ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি সেক্‌স্‌পীয়র তাঁহার মানসী কন্যা 'মিরাণ্ডা'র সৃষ্টি করিয়াছেন—আমিও আমার মানসী কন্যা 'কপালকুণ্ডলা'র সৃষ্টি করিব,—দেখি, লোকে কাহার মানস-দুহিতাকে অধিক মনোনীত করে।" বস্তুতঃ, সমুদায় "টেম্‌পেষ্ট" এবং সমুদায় "কপালকুণ্ডলা" পাঠ করিলে ইহাই মনে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" সেক্‌স্‌পীয়রের "মিরাণ্ডা"র টীকা ও সমালোচনা (-Commentary); এবং বঙ্কিমচন্দ্র কোন-কোন বিষয়ে সেক্‌স্‌পীয়রকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সফলকাম হইয়াছেন কি না, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

সেক্‌স্‌পীয়রের মানসী দুহিতা মিরাণ্ডা তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে ঘটনা-বিপর্য্যয়ে পিতার সহিত সাগরমধ্যবর্ত্তী দ্বীপে আগমন করেন। সেই দ্বীপে অবস্থিতিকালে, 'ফার্ডিনাণ্ড'কে দেখিবার পূর্ব্বে 'মিরাণ্ডার' নিত্য সহচর ছিলেন তাঁহার পিতা প্রস্পেরো এবং ছিল সেই নরপশু ক্যালিবান্। ইহাদের ছাড়া 'মিরাণ্ডা' অন্য স্ত্রী বা পুরুষকে দেখেন নাই; অথবা দেখিলেও, তাহা তিন বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে, সুতরাং তাহা স্মরণ-পথের অতীত।

Miranda. "I do not know
One of my sex; no woman's face remember
Save, from my glass, mine own; nor have I seen
More that I may call men than you, good friend,
And my dear father; how features are abroad
I am skillless of."

—'The Tempest', Act III, Sc. I.

মিরাণ্ডা—"আমি আমার জাতির (স্ত্রীজাতির) কাহাকেও জানি না। দর্পণে আমার নিজের মুখ ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোকের মুখ দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে পড়ে না। এবং প্রিয় বন্ধু, তুমি এবং আমার সমাদৃত পিতা এই দুইজন ভিন্ন মানুষ বলিতে পারি, এমন অন্য আর

কাহাকেও দেখি নাই। অন্তর (মানুষের) অবয়ব কিরূপ তাহাও আমি জানি না।"—টেম্‌পেষ্ট, তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।

যে সময়ে ঐন্দ্রজালিক ঝড়ের প্রভাবে ফার্ডিনাণ্ড ও তাঁহার পিতা তাঁহাদের লোকজনসহ এই দ্বীপে আনীত হ'ন, সে সময়ে মিরাণ্ডার বয়স পনের বৎসর মাত্র।

Prospero. "Canst thou remember
A time before we came unto this cell?
I do not think thou canst, for then thou wast but three years old."—Act I. Sc. II.

প্রস্পেরো—"এই আশ্রমে আসিবার পূর্ব্বেকার কথা কি তোমার মনে পড়ে? আমার বোধ হয় তোমার মনে পড়ে না; কারণ তখন তুমি মোটে তিন বৎসরের মেয়ে।" প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য।

Prospero. "Twelve years since, Miranda twelve years since.
Thy father was the Duke of Milan and
A prince of power."—Act I. Sc. II.

প্রস্পেরো—"বার বৎসর পূর্ব্বে, মিরাণ্ডা, তোমার পিতা বার বৎসর পূর্ব্বে, মিলানের ডিউক, এবং একজন ক্ষমতাপন্ন রাজা ছিলেন।" প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য।

যে বার বৎসরকাল মিরাণ্ডার ঐ দ্বীপে বাস, সেই বার বৎসরের মধ্যে তাঁহার পিতা তাঁহাকে অনেক পুস্তক পড়াইয়াছেন এবং অনেক শিক্ষা দিয়াছেন।

Prospero. "And here
Have I, thy school-master, made thee more profit
Than other princes can."—Act. I. Sc. II.

প্রস্পেরো, "এবং এখানে আমি তোমার শিক্ষক হইয়া অপর রাজপুত্রগণের অপেক্ষা তোমার (মানসিক) উন্নতি সম্পাদন করিয়া দিয়াছি।" প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য।

এই ত গেল মিরাণ্ডার পূর্ব্ব-সংস্কার। মিরাণ্ডা লোকালয় ও সমাজ হইতে দূরে,—বহুদূরে, একটি দ্বীপের মধ্যে, পিতার সাবধানে ও তত্ত্বাবধানে লালিতা, পালিতা ও পরিবর্দ্ধিতা। মিরাণ্ডা পিতার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু লোকালয়ের বা জনসমাজের সংস্কার সম্বন্ধে মিরাণ্ডা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। মিরাণ্ডা প্রকৃতি-দুহিতা। এক কথায়, মিরাণ্ডা দ্বিতীয় স্ত্রী-স্বভাবশূন্য। ফার্ডিনাণ্ডের প্রথম সন্দর্শনে মিরাণ্ডা তাঁহাকে "spirit" "thing divine" পরীরাজ্যের বা স্বর্গরাজ্যের লোক মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু মিরাণ্ডা পরদুঃখকাতরা; ফার্ডিনাণ্ডের বিপদের কাহিনী শ্রবণে সমদুঃখে দুঃখিতা। ক্রমশঃ মিরাণ্ডা ফার্ডিনাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন; ফার্ডিনাণ্ডের প্রতি তাঁহার পিতার আপাত-কর্কশ ব্যবহারে মিরাণ্ডার হৃদয় মথিত হইতেছিল এবং ফার্ডিনাণ্ডের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক হইতেছিল। মিরাণ্ডা আপন মনে বলিতেছেন

Miranda. (aside)—"Why speaks my father so ungently? This
Is the third man that e'er I saw; the first
That e'er I sigh'd for: pity move my father
To be inclin'd my way." Act I. Sc. II.

মিরাণ্ডা (জনান্তিকে)—"আমার পিতা এরূপ কর্কশ-ভাবে কথা বলিতেছেন কেন? আমি জীবনে এই তৃতীয় মনুষ্য দেখিলাম এবং প্রথমে ইঁহারই জন্য (সহানুভূতিসূচক) দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলাম। আমার পিতার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হউক—তিনি যেন ইঁহার প্রতি আমার ন্যায় ভাবাপন্ন হয়েন।" প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য।

তার পর যখন প্রস্পেরো ফার্ডিনাণ্ডকে "spy" গুপ্তচর বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন, তখন মিরাণ্ডার—প্রকৃতি-কন্যকা মিরাণ্ডার লজ্জার লেশ নাই—পিতার সমক্ষেই ফার্ডিনাণ্ডের জন্য কাতরোক্তি করিতেছেন। তার পর যতই প্রস্পেরো মিরাণ্ডাকে ফার্ডিনাণ্ডের হইয়া কোনও কথা বলিতে নিষেধ করিতেছেন এবং ফার্ডিনাণ্ডের প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করিতেছেন ও তাঁহাকে কঠোর অনুশাসন করিতেছেন, মিরাণ্ডা—পরদুঃখকাতরা, সমাজ-সংস্কার-শূন্যা—অতএব লজ্জা-বর্জ্জিতা, কিন্তু পবিত্রচিত্তা মিরাণ্ডা—ততই পিতার নিকট ফার্ডিনাণ্ডের স্বপক্ষে আবেদন করিতেছেন,—এমন কি, পিতার সমক্ষে ফার্ডিনাণ্ডের প্রতি তাঁহার অনুরাগের কথা ব্যক্ত করিতে বা পিতার সমক্ষে ফার্ডিনাণ্ডকে প্রবোধ দিতে কোনও কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ করিতেছেন না। আর,

মিরাণ্ডার লজ্জা না পাইবারই ত কথা ফার্ডিনাণ্ড। সুন্দর পুরুষ—বিপদে পড়িয়াছেন—তাঁহাকে দেখিয়া মিরাণ্ডার মনে প্রথমে দয়ার উদ্রেক হইল—পরে তাঁহার প্রতি অনুরাগ জন্মিল। এই অনুরাগ যে কোনও দোষের —বা ইহা পিতার নিকট ব্যক্ত করা যে সমাজ-বিরুদ্ধ, তাহা ত মিরাণ্ডা জানেন না;—মিরাণ্ডা যে সমাজ ও লোকালয় হইতে আজীবন বহু দূরে অবস্থিতা, মিরাণ্ডা যে সরলা, পবিত্রা প্রকৃতি-তনয়া;—তাই পিতার সম্বন্ধে মনোভাব ব্যক্ত করিতে মিরাণ্ডার কোনও কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ হইল না।

এই পর্য্যন্ত মিরাণ্ডাচরিত্র একভাবে দেখাইয়া, সেক্সপীয়র আবার তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ফার্ডিনাণ্ড ও মিরাণ্ডাকে আমাদের সম্মুখে আনয়ন করিতেছেন। ফার্ডিনাণ্ড প্রস্পেরো কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কাষ্ঠ বহন করিতেছেন। ধনীর পুত্র,—এরূপ কার্য্য করিতে অনভ্যস্ত —কষ্ট বোধ হইতেছে। কিন্তু তিনি মনে-মনে মিরাণ্ডাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—সম্মুখে মিরাণ্ডাকে দেখিতে পাইতেছেন এবং মিরাণ্ডার সহিত কথোপকথন করিতেছেন; তাহাতে পরিশ্রমের ও কষ্টের অনেক লাঘব হইতেছে। মিরাণ্ডা ফার্ডিনাণ্ডের কষ্ট দেখিয়া মনে কষ্ট অনুভব করিতেছেন,—পিতার নিষেধ সত্ত্বেও ফার্ডিনাণ্ডের সহিত কথোপকথন করিতে বিরত নহেন—প্রত্যুত ফার্ডিনাণ্ডের কষ্ট লাঘব করিবার অভিপ্রায়ে কাষ্ঠভার নিজে বহন করিবার প্রস্তাব করিতেছেন। এই অঙ্কের এই দৃশ্যেই মিরাণ্ডা ফার্ডিনাণ্ডকে বলিতেছেন,

"I would not wish
Any companion in the world but you."

"আমি পৃথিবীতে তোমা ছাড়া অন্য সঙ্গী চাহি না।"

এ পর্য্যন্ত মিরাণ্ডার আশৈশব শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কারের সহিত বেশ সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে। কিন্তু মিরাণ্ডা ফার্ডিনাণ্ডকে ঐটুকু মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছেন না। মিরাণ্ডা আরও বলিতেছেন,

"I am your wife, if you will marry me,
If not, I'll die your maid; to be your fellow
You may deny me, but I'll be your servant
Whether you will or no."

"যদি তুমি আমাকে বিবাহ কর, আমি তোমার পত্নী হইব; যদি বিবাহ না কর আমি চিরকাল অনূঢ়া থাকিব। আমাকে তোমার জীবন-সঙ্গিনী করিতে তুমি অস্বীকার করিতে পার, কিন্তু স্বীকৃত হও বা না হও, আমি আজীবন তোমার দাসী হইব।"

তার পর শেষ অঙ্কে শেষ দৃশ্যে আমরা আবার মিরাণ্ডা ও ফার্ডিনাণ্ডকে দেখিতে পাই। শেষ দৃশ্যে ফার্ডিনাণ্ডের পিতা এবং তাঁহার লোকজন আগত হইলে, তাঁহাদিগকে দেখিয়া মিরাণ্ডা বলিতেছেন,

"O wonder!
How many goodly creatures are there here!
How beautious mankind is."

"কি আশ্চর্য্য! এই পৃথিবীতে কত সুন্দর সুন্দর জীব আছে! মানবজাতি কি সুন্দর!"

তার পর—তার পর আর কি—মিরাণ্ডা ও ফার্ডিনাণ্ডের বিবাহ ও বিবাহিত জীবন—তাহার পরিচয় সেক্সপীয়র কৌশলপূর্ব্বক উহ্য রাখিলেন—কেবল ইঙ্গিতে আভা জানাইলেন মাত্র।

Prospero. "And in the morn
I'll bring you to your ship. and go to Naples
Where I have hopes to see then uptial
Of these our dear beloved solemniz'd."
Act V. Sc I.

প্রস্পেরো—"এবং প্রভাতে আমি আপনাদিগকে আমাদের জাহাজে লইয়া যাইব; এবং সেই জাহাজে নেপল্‌সে লইয়া যাইব। তথায় আমাদের আদরের বস্তু (মিরাণ্ডা ও ফার্ডিনাণ্ড) উভয়ের বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে দেখিবার আশা করি।"

মিরাণ্ডা—সংসারানভিজ্ঞা, সমাজ-সংস্কার-বর্জ্জিতা—লোকালয় হইতে সুদূরে পিতৃ-সাহচর্য্যে লালিতা, পালিতা ও পরিবর্দ্ধিতা—লজ্জা-বর্জ্জিতা সরলা, বিশুদ্ধা, প্রকৃতি-দুহিতা মিরাণ্ডা, বিবাহ কাহাকে বলে তাহা জানিল কিরূপে? ফার্ডিনাণ্ডকে দেখিয়া মিরাণ্ডার হৃদয়ে বিস্ময়ের উদ্রেক হওয়া,

বা কার্ডিনাণ্ডের বিপদের বার্ত্তা শ্রবণে তাহার মনে করুণা বা দয়ার উদ্রেক হওয়া খুবই স্বাভাবিক; এমন কি, কার্ডিনাণ্ডের প্রতি মিরাণ্ডার চিত্তে অনুরাগের সঞ্চার হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ঐ অনুরাগই যে সামাজিক বিবাহের পূর্ব্বরাগ, বা ঐ অনুরাগের সহিত সামাজিক বিবাহের কোনও সম্বন্ধ আছে, তাহা মিরাণ্ডা কোথা হইতে বা কিরূপে জানিলেন? প্রকৃতি-সুতা মিরাণ্ডা কি করিয়া কার্ডিনাণ্ডকে তাঁহার বিবাহিতা পত্নী হইবেন বলিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র যেন মনে-মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন যে, আমি মিরাণ্ডার ন্যায় আমার মানসী কন্যার সৃষ্টি করিব; কিন্তু তাহাকে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমাজ হইতে দূরে রাখিব; এবং সমাজের নিকটে আনিয়াও, সমাজের সংস্পর্শে আনিয়াও তাহাকে সমাজ হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিব। যেমন তৈল ও জল কখনও পরস্পর মিশে না, সেইরূপ আশৈশব সমাজ ও লোকালয় হইতে বহু দূরে লালিতা ও পালিতা, সমাজ ও সংসারের সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা প্রকৃতি-দুহিতা কখনও সমাজ ও সংসারের সহিত ভাল করিয়া মিশিতে পারে না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মানসী কন্যা কপালকুণ্ডলাকে মিরাণ্ডা হইতে একটু ভিন্ন রকমের করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা"র বিশেষ ভাবে আলোচনা কালে ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, সমুদায় "কপালকুণ্ডলা" পুস্তকখানি সেক্সপীয়রের মিরাণ্ডার কথিত "I am your wife, if you will marry me" ইত্যাদি কথাগুলির সমালোচনা মাত্র।

কপালকুণ্ডলাকে পাঠকের সম্মুখে আনিবার পূর্ব্বে সৃষ্টি-কুশল বঙ্কিমচন্দ্র অন্য ঘটনার অবতারণা করিয়া পাঠকের মনকে প্রস্তুত করিতেছেন। পুস্তকের প্রথম তিন পরিচ্ছেদে নবকুমার ও তাঁহার সঙ্গিগণের গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে আসা, নবকুমারকে ফেলিয়া সঙ্গিগণের পলায়ন করা এবং নবকুমারের একাকী সমুদ্রতীরবর্ত্তী নিবিড় বনমধ্যে অসহায় অবস্থায় পতিত হওয়ার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। বঙ্কিম-চন্দ্র নাগোরাতে সমুদ্র-দর্শনে বিহ্বল হইয়াছিলেন—নীল সিন্ধুর অনন্ত সৌন্দর্য্য দর্শনে বঙ্কিমের হৃদয় বিভোর;—সেই বিভোর ভাবের কতক পরিচয় তিনি কপালকুণ্ডলাতে দিয়াছেন। তাই প্রথম পরিচ্ছেদে নবকুমারের মুখে আমরা শুনিতে পাই, "আমি ত আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব সাধ ছিল, সেই জন্যই আসিয়াছি।" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আহা! কি দেখিলাম! জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না। 'দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বি তমালতালী বনরাজিনীলা। আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।" পঞ্চম পরিচ্ছেদে এই বিভোর ভাবের আবার পরিচয় দেখিতে পাই, "ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র! উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষুঃ যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ প্রক্ষিপ্ত ফেণার রেখা, স্তূপীকৃত বিমল কুসুমরাশি-গ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেণরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ নীল-জলমণ্ডল মধ্যে সহস্র স্থানে সফেণ তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখনও এমত প্রচণ্ড বায়ু বহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে-সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগর-তরঙ্গ-ক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতি দূরে কোন ইউরোপীয় বণিক-জাতির সমুদ্রপোত শ্বেত পক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধি-হৃদয়ে উড়িতেছিল।"

নবকুমার স্বজন-পরিত্যক্ত, অসহায়, বিপন্নাপন্ন, কাপালিকের হস্তে পতিত—কাপালিকের কুটীর হইতে খাদ্যান্বেষণে বনমধ্যে আগত—নবকুমার তীরে বসিয়া একমনে বিভোর হইয়া ঐ নীল সিন্ধুর অসীম সৌন্দর্য্য দেখিতে-দেখিতে একেবারে বাহ্যজ্ঞানহীন। "প্রদোষ-তিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল।" তখন নবকুমারের জ্ঞান হইল যে, আশ্রমের সন্ধান করিয়া লইতে হইবে। অসীম সিন্ধু-সৌন্দর্য্য-সুধা-পানে বিভোর ভাব ভঙ্গ হওয়ায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নবকুমার সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিবা মাত্র সেই "গম্ভীর-নাদি বারিধিতীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি দেখিলেন।" এই রমণীমূর্ত্তিই বঙ্কিমের মানসী কন্যা কপালকুণ্ডলা। ঐ রমণীমূর্ত্তির কি সুন্দর বর্ণনা! বর্ণনা পড়িতে পড়িতে—(মূর্ত্তি দেখিয়া নবকুমার ত নিস্পন্দ হইয়াছিলেনই)—পাঠককেও নিস্পন্দ হইতে হয়। ঐ রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া নবকুমার নিস্পন্দ। রমণীও স্পন্দহীনা। উভয়ে উভয়ের প্রতি অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন। নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ

কিছুমাত্র নাই। কিন্তু রমণীর দৃষ্টিতে নবকুমারের বিপদে সহানুভূতিসূচক উদ্বেগ প্রকাশিত। রমণী মৃদুস্বরে নবকুমারকে কহিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" কি সুন্দর, সজীব ছবি! কি মনোরম নাটকীয় সুস্পষ্টতা! বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ অবস্থায় নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার প্রথম সন্দর্শন ঘটাইয়াছেন, তাহা কি চমৎকার! কি হৃদয়-গ্রাহী! কি শিল্পকুশলতাপরিচায়ক! পড়িতে-পড়িতে মন-প্রাণ বিমোহিত হইয়া উঠে! এইখানেই স্রষ্টার সৃষ্টি-কৌশল! এইখানেই কবির নিপুণতা!

এই কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণ-কন্যা; বাল্যকালে দুরন্ত খৃষ্টিয়ান তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ প্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা সমুদ্রতীরে পরিত্যক্তা;—তার পর নবকুমারের সহিত দেখা হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, কাপালিকের ও অধিকারীর (নিজের পিতার নহে) সাহচর্য্যে ও তত্ত্বাবধানে, লোকালয় ও সমাজ হইতে বহু দূরে লালিতা, পালিতা ও পরিবর্দ্ধিতা—স্বচ্ছন্দ-বন-বিহারিণী—সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা—সরলা, বিশুদ্ধা, ভবানী-ভক্তি-ভাব-বিমোহিতা—অধিকারীর নিকট সামান্য শিক্ষা-প্রাপ্তা। নবকুমারের সহিত যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন কপালকুণ্ডলা ষোড়শী। মিরাণ্ডা কিন্তু পঞ্চদশী।

ফার্ডিনাণ্ডকে দেখিয়া মিরাণ্ডার যেরূপ মনের ভাব হইয়াছিল—নবকুমারকে দেখিয়া কপালকুণ্ডলার মনে ঠিক সেইরূপ ভাবের উদয় হয় নাই। নবকুমারকে প্রথম দেখিয়া কপালকুণ্ডলা তাঁহার প্রতি অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বিস্ময় নাই—কেবল নবকুমারের বিপদের আশঙ্কায় স্ত্রী-জন-সুলভ উদ্বেগ প্রকাশ পাইতেছিল। তার পর নবকুমার পথ হারাইয়াছেন ভাবিয়া, কপালকুণ্ডলা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন। তাহাতে দয়ার ভাব আছে, কিন্তু নবকুমারের প্রতি অন্য আকর্ষণের ভাব নাই। নবকুমারের হৃদয় কিন্তু কপালকুণ্ডলার প্রথম সন্দর্শনে কিছু প্রণয়সিক্ত। তার পর কাপালিকের হস্তে নবকুমারের আসন্ন বিপদ দেখিয়া, কপালকুণ্ডলা দয়ার্দ্রচিত্তা। কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে কাপালিকের নিকট হইতে বার-বার পলাইতে উপদেশ দিতেছেন। তার পর যখন কাপালিক নবকুমারকে বন্ধন করিয়া, জগন্মাতার নিকট বলি দিবার জন্য খড়্গের অন্বেষণ করিতেছেন, তখন পরদুঃখকাতরা কপালকুণ্ডলা—(পূর্ব্ব হইতেই এই বলির আশঙ্কা করিয়া তিনিই খড়্গ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন) নবকুমারের বন্ধন ছেদন করিয়া নবকুমারকে সঙ্গে লইয়া অধিকারীর নিকট পলায়ন করিলেন। এখানেও নবকুমারের প্রতি স্ত্রী-জন-সুলভ পরদুঃখ-কাতরতা ভিন্ন কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে অন্য ভাব নাই—প্রণয়ের ভাব ত নাই-ই।

তার পর অষ্টম পরিচ্ছেদে অধিকারী যখন নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা—উভয়ের মঙ্গলার্থ,—যাহাতে কাপালিক তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া পাইয়া তাঁহাদিগের অপকার না করিতে পারে, তাহার প্রতিবিধানার্থ, উভয়ের মধ্যে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, তখন কপালকুণ্ডলা বিবাহের নামে বিস্মিত, স্তম্ভিত;—কপালকুণ্ডলা যে, বিবাহ কাহাকে বলে, জানেন না! কপালকুণ্ডলা যে সমাজ ও লোকালয় হইতে বহু দূরে লালিতা-পালিতা—কপালকুণ্ডলা যে সমাজ-সংস্কারানভিজ্ঞা;—তাই কপালকুণ্ডলা বিবাহের নামে চমকিয়া উঠিতেছেন। —কেবল মা ভবানী এই বিবাহ-কার্য্যে অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন ইহা দেখিয়া, এবং এই বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইলে নবকুমারের ও কপালকুণ্ডলার বিপদের পরিত্রাণ হয়, এবং অধিকারী সন্তুষ্ট হয়েন, এই সকল কারণেই পরিশেষে নবকুমারকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাহা কেবল অধিকারীর আদেশে,—মা ভবানীর আদেশে—নবকুমারের প্রতি প্রণয়-সঞ্চারের জন্য নহে,—কারণ তখন পর্য্যন্ত কপালকুণ্ডলার হৃদয় প্রণয়-স্পৃষ্ট হয় নাই।

নবকুমারকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া কপালকুণ্ডলা তাঁহাকে কালী-মন্দিরের সন্নিকটবর্ত্তী অধিকারীর আলয়ে আনয়ন করিলেন এবং অধিকারীকে সকল কথা নিবেদন করিলেন। তৎপরে কপালকুণ্ডলা—স্বচ্ছন্দচিত্তা অতএব নির্ভীকা—কপালকুণ্ডলা পুনরায় সমুদ্রতীরে কাপালিকের নিকট গমন করিতে উদ্যত হইলে, স্নেহপরায়ণ অধিকারী কাপালিকের হস্তে কপালকুণ্ডলার বিপদ বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে নবকুমারের সহিত দেশান্তরে যাইবার উপদেশ দিলেন। তাহাতে "কপালকুণ্ডলা নীরব হইয়া রহিলেন। অধিকারী কহিলেন, 'মা, কি ভাবিতেছ?'" তদুত্তরে সরলা, পবিত্রা, সমাজ-সংস্কারানভিজ্ঞা কপালকুণ্ডলা বলিলেন, "যখন তোমার শিষ্য আসিয়াছিল, তখন তুমি কহিয়াছিলে যে,

যুবতীর এরূপ যুবাপুরুষের সহিত যাওয়া অনুচিত; এখন যাইতে বল কেন?" কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের সহিত এই উক্তির কি সামঞ্জস্য! অধিকারী অন্য যুবাপুরুষের সহিত যাওয়া অনুচিত বলিয়াছিলেন, তাই কপালকুণ্ডলার আপত্তি! অন্য আপত্তি তাঁহার নাই! কি সরলতা, কি মধুরতা!

নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার মধ্যে বিবাহ শুভ হইবে কি না জানিবার জন্য,অধিকারী করালী কালী-মূর্ত্তির নিকট মন্ত্রপূত বিল্বপত্র প্রদান করিলে, মা কালী তাহা গ্রহণ করিলেন। অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে বলিতেছেন, "মা দেখ, দেবী অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন; বিল্বপত্র পড়ে নাই। যে মানস করিয়া অর্ঘ্য দিয়াছিলাম, তাহাতে অবশ্য মঙ্গল। তুমি এই পথিকের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে গমন কর; কিন্তু আমি বিদেশী লোকের রীতি-চরিত্র জানি। তুমি যদি গলগ্রহ হইয়া সঙ্গে যাও, তবে এ ব্যক্তি অপরিচিতা যুবতী সঙ্গে লইয়া লোকালয়ে লজ্জা পাইবে। তোমাকেও লোকে ঘৃণা করিবে। তুমি বলিতেছ, এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-সন্তান, গলাতেও যজ্ঞোপবীত দেখিতেছি। এ যদি তোমাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যায়, তবে সকল মঙ্গল। নচেৎ আমিও তোমাকে ইহার সহিত যাইতে বলিতে পারি না।" এখানে অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে আভাবে লোক-চরিত্রের ও সমাজের আচার-ব্যবহার বুঝাইয়া দিতেছেন। কপালকুণ্ডলা কিন্তু অত বুঝে না।

অধিকারী ঐরূপ বলিলে পর—"'বি—বা—হ' এই কথাটি কপালকুণ্ডলা অতি-ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করিলেন। বলিতে লাগিলেন, 'বিবাহের নাম ত তোমাদের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?' অধিকারী ঈষন্মাত্র হাস্য করিয়া কহিলেন, 'বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্মের সোপান; এইজন্য স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে; জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।' অধিকারী মনে করিলেন, সকলই বুঝাইলেন। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, সকলই বুঝিলেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদের এই অংশটুকু বিশদভাবে উদ্ধৃত করিলাম। এক্ষণে পাঠকগণ এই উদ্ধৃত অংশের সহিত টেম্‌পেষ্টের তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে ফার্ডিনাণ্ড ও মিরাণ্ডার প্রণয়-কথোপকথনের তুলনা করিয়া দেখুন। কোন্ চিত্রটির উৎকর্ষ্য কোথায়? কপালকুণ্ডলা আশৈশব অরণ্য-মধ্যে পালিতা,—সমাজ ও লোকালয়ের সংস্কার কিছুই জানেন না,—অধিকারীর নিকট বিবাহের কথা শুনিয়াছেন মাত্র—কিন্তু বিবাহ কাহাকে বলে জানেন না। বিবাহের নামে চমকিতা, সরলা প্রকৃতি-কন্যকার ন্যায় "কি করিতে হইবে?" জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কপালকুণ্ডলা ষোড়শী—এতদ্দেশবাসিনী। পাশ্চাত্য দেশবাসিনী মিরাণ্ডা পঞ্চদশী হইলেও, কিন্তু ফার্ডিনাণ্ডকে বলিতেছেন, "তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর, আমি তোমার পত্নী হইব।" ইত্যাদি—।

তার পর মিরাণ্ডার মন-প্রাণ ফার্ডিনাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল—মিরাণ্ডা ফার্ডিনাণ্ডকে ভালবাসিয়াছিলেন—তাই মিরাণ্ডা একেবারে বিনা আপত্তিতে ফার্ডিনাণ্ডকে আত্ম-সমর্পণ করিতেছেন। কিন্তু কপালকুণ্ডলা, স্বচ্ছন্দ-বন-বিহারিণী কপালকুণ্ডলা ত নবকুমারকে ভালবাসেন নাই,—নবকুমারের দুঃখে বিগলিত-হৃদয়া কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্পা বটে—কিন্তু তাহার বেশী অন্য কোনও ভাব কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে নাই—প্রণয় ত দূরের কথা। কপালকুণ্ডলা পরিশেষে নবকুমারকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইতেছেন;—কিন্তু কি জন্য? পাঠক একবার তাহাই দেখুন। কপালকুণ্ডলা অধিকারীর বিবাহের প্রস্তাবে বলিতেছেন, "তাহাই হউক। কিন্তু তাঁহাকে (কাপালিককে) ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন।" এখানে কপালকুণ্ডলা, কৃতজ্ঞহৃদয়া কপালকুণ্ডলা, কাপালিককে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন। "অধিকারী। 'কি জন্য প্রতিপালন করিয়াছেন তাহা জান না।' এই বলিয়া অধিকারী তান্ত্রিক সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ, তাহা অস্পষ্ট রকম কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কপালকুণ্ডলা তাহা কিছু বুঝিল না; কিন্তু তাহার বড় ভয় হইল। বলিল, 'তবে বিবাহই হউক।'"

তার পরদিন "গোধূলি-লগ্নে নবকুমারের সহিত কাপালিক-পালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইল।" এখানে পাঠক বঙ্কিমচন্দ্রের "কাপালিক পালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ" এই শব্দসংযোজনার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। কি

কৌশলের সহিত, কি নিপুণতার সহিত, বঙ্কিমচন্দ্র ঐ কথাগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন!

তার পর অধিকারীর নিকট কপালকুণ্ডলার বিদায়-গ্রহণ—কপালকুণ্ডলা কাঁদিয়া আকুল—তাঁহার একমাত্র সুহৃদ বিদায় লইতেছেন;—অধিকারীও কাঁদিয়া আকুল—তাঁর পালিত কন্যা চলিয়া যাইতেছেন, জন্মের মত চলিয়া যাইতেছেন! কি মর্ম্মস্পর্শী, কি হৃদয়ভেদী, কি করুণ-রসাত্মক! বাঙ্গালী পাঠকের নিকট এই করুণ রস বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই।

আবাল্য-বনবাসিনী কপালকুণ্ডলার সরলতা ও সমাজ ও সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার পরিচয় আবার আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে পাই। ভিক্ষুক ভিক্ষা চাহিতেছে—কপালকুণ্ডলা অকপট হৃদয়ে মতিবিবি প্রদত্ত কৌটা সমেত বহুমূল্য গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন—অঙ্গের অলঙ্কারগুলিও খুলিয়া দিলেন। দাসদাসী জানিতে পারিল না। ভিক্ষুক ক্ষণমাত্র বিহ্বল হইয়া থাকিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া গহনা লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কপালকুণ্ডলা ভাবিলেন, 'ভিক্ষুক দৌড়িল কেন?' শিল্পীর কি শিল্প-নৈপুণ্য!

কপালকুণ্ডলাকে দর্শন অবধি নবকুমারের হৃদয় কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তিতেই ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু গৃহে লইয়া গেলে আত্মীয়-কুটুম্ব-স্বজনগণ অজ্ঞাত-কুলশীলা সন্ন্যাসিনীকে সমাজে গ্রহণ করিবে কি না, এই সংশয়ে এ পর্য্যন্ত নবকুমার কপালকুণ্ডলার সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ করেন নাই। কিন্তু গৃহে আসিয়া, যখন সমাজ নবকুমারের এই বিবাহে সন্তোষ প্রকাশ করিল, তখন নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—নবকুমারের মন-প্রাণ কপালকুণ্ডলাময় হইয়া উঠিল—সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু কপালকুণ্ডলার মনের কি ভাব? গ্রন্থকার দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তাহা কপাল-কুণ্ডলা ও তাঁহার ননদ শ্যামাসুন্দরী কথোপকথনে সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে নবকুমারের প্রতি বিন্দুমাত্র প্রণয়ের সঞ্চার হয় নাই—সংসার-বন্ধনে কপালকুণ্ডলা আদৌ সুখী নহেন—পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গীর ন্যায় কপালকুণ্ডলা এই সংসারে বাস করিতেছেন—আবার সেই আবাল্যের পরিচিত সমুদ্রতীরে স্বচ্ছন্দ-বনবিহারিণী হইয়া বেড়াইতে পারিলে কপালকুণ্ডলার সুখ—নচেৎ কোনও সুখ নাই। সংসারের, সমাজের কোনও বন্ধনে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। সংসার,—সমাজ,—শাশুড়ী,—ননদ,—পাড়া প্রতিবাসীর আদর যত্ন স্নেহ—সর্ব্বোপরি স্বামী নব-কুমারের সেই উদ্বেলিত প্রণয়সিন্ধু—কিছুই কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে কোনও রেখাপাত করিতে সমর্থ হইতেছে না। ইহা দেখাইবার জন্য এই পরিচ্ছেদের কথোপকথন একটু উদ্ধৃত করিতেছি।—শ্যামাসুন্দরী বলিতেছেন,—"'তুই কি লো একা তপস্বিনী থাকিবি?' মৃণ্ময়ী (সংসারে আসিয়া কপালকুণ্ডলার এই নামকরণ হইয়াছিল)—'কেন, কি তপস্যা করিতেছি?' শ্যামাসুন্দরী—'তোমার এ চুলের রাশি কি বাঁধিবে না?'" (বলিতে ভুলিয়াছি, কপালকুণ্ডলা সেই সমুদ্র-তীরে স্বচ্ছন্দ-বনবিহারিণী থাকা কালে যেমন অবেণীসংবদ্ধা ছিলেন, সংসারে আসিয়াও সেইরূপ আছেন)। "মৃণ্ময়ী কেবল ঈষৎ হাসিয়া শ্যামা-সুন্দরীর হাত হইতে কেশগুলি টানিয়া লইলেন।" "শ্যামাসুন্দরী আবার কহিলেন, 'ভাল, আমার সাধটি পুরাও। একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কতদিন যোগিনী থাকিবে?' মৃণ্ময়ী—'যখন এই ব্রাহ্মণ-সন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।'—শ্যামাসুন্দরী—'বল দেখি, ফুলটি ফুটিলে কি সুখ?' মৃণ্ময়ী—'লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি?'—শ্যামাসুন্দরী—'আচ্ছা, তাই যদি না হইল, তবে শুনি দেখি, তোমার সুখ কি?' মৃণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, 'বলিতে পারি না। বোধ করি সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।'"

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা আবার কপাল-কুণ্ডলাকে দেখিতে পাই। সমুদ্র-প্রান্তে থাকা কালে তাঁহার যেরূপ পরদুঃখকাতরতা দেখিয়াছি—এখানেও সেই পরদুঃখকাতরতা দেখিতে পাই। রাত্রে শ্যামাসুন্দরীর স্বামী বশ করিবার ঔষধ খুঁজিবার জন্য কপালকুণ্ডলা খুব ব্যস্ত—নিজের স্বামী নবকুমারের নিষেধ সত্ত্বেও তাহা করিতে কৃতোদ্যমা। কপালকুণ্ডলা বলিতেছেন, 'আমি গাছে দেখিলে চিনিতে পারি, কিন্তু নাম জানি না। আর তুমি তুলিলে ফলিবে না। স্ত্রীলোকে এলোচুলে

তুলিতে হয়। তুমি পরের উপকারের বিঘ্ন করিও না।' যখন শ্যামাসুন্দরী কপালকুণ্ডলাকে একা রাত্রে বনে যাওয়া গৃহস্থের বৌ-ঝির ভাল নহে বলিয়া বুঝাইতেছেন ও মন্দ লোকে মন্দ বলিতে পারে বলিতেছেন, তখন কপালকুণ্ডলা বলিতেছেন, 'বলুক, আমি তাতে মন্দ হব না।' যখন শ্যামাসুন্দরী বলিতেছেন, 'কিন্তু দাদাকে কেন অসুখী করিবে?' তাহাতে কপালকুণ্ডলা যে উত্তর দিতেছেন, তাহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য;—এখানেই কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের বিশেষত্ব। গ্রন্থকার আমাদিগকে দেখাইতেছেন,—কপালকুণ্ডলা বলিতেছেন, "ইহাতে তিনি অসুখী হয়েন, আমি কি করিব? যদি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।"

কপালকুণ্ডলাকে যে শেষ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেই আবাল্যের সরলা, স্বচ্ছন্দ-বনবিহারিণী,—সংসার ও সমাজ ও সংস্কার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা রাখিয়াছেন, তাহার আরও পরিচয় আমরা চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই। 'ব্রাহ্মণবেশী'র পত্র পাইয়া, তাহার সহিত রাত্রিকালে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করা যুক্তিযুক্ত কি না, তাহাই কপালকুণ্ডলা ভাবিতেছিলেন। "পতিব্রতা যুবতীর পক্ষে রাত্রিকালে নির্জ্জনে অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ যে অবিধেয়, ইহা ভাবিয়া তাঁহার মনে সঙ্কোচ জন্মে নাই, তদ্বিষয়ে তাঁহার স্থির সিদ্ধান্তই ছিল যে, সাক্ষাতের উদ্দেশ্য দূষ্য না হইলে এমন সাক্ষাতে দোষ নাই—পুরুষে পুরুষে বা স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যেরূপ সাক্ষাতের অধিকার, স্ত্রী পুরুষে সাক্ষাতের উভয়েরই সেই রূপ অধিকার উচিত বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল।"

বিবাহিত জীবনেও কপালকুণ্ডলা যেখানে-সেখানে একাকিনী যাইতেন, যাহার-তাহার সহিত যথেচ্ছ আচরণ করিতেন—নিশীথে একাকিনী বনভ্রমণ করিতেন। এক কথায়, সমাজ বা সংসারের গণ্ডীর ভিতর আসিয়াও, কপালকুণ্ডলা তাহার বাহিরে;—কপালকুণ্ডলা যে সংসার বা সমাজের সহিত মিশিয়া যাইতে পারিতেছেন না—তাঁহার সেই আশৈশব অভ্যাস যে তাঁহাকে ছাড়িতেছে না।

তার পর যখন চতুর্থ খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে ব্রাহ্মণবেশী লুৎফ-উন্নিসা কপালকুণ্ডলাকে বলিতেছেন, 'আমারও প্রাণ দান দেও—স্বামী ত্যাগ কর।' কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?' তদুত্তরে লুৎফউন্নিসা কহিলেন, 'বিদেশে—বহু দূরে,—তোমাকে অট্টালিকা দিব—ধন দিব—দাস দাসী দিব—রাণীর ন্যায় থাকিবে।' তখন কপালকুণ্ডলা পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানসচক্ষে চাহিয়া দেখিলেন, কোথায়ও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না;—অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, কৈ সেখানে নবকুমারকে দেখিলেন না। তাই কপালকুণ্ডলা দ্বিধা না করিয়া স্বামী ত্যাগ করিয়া বনের পাখী আবার বনে যাইতে স্বীকার করিলেন—ধন জন অট্টালিকা কিছুই চাহিলেন না।

গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত আমরা কপালকুণ্ডলাকে পরদুঃখকাতরা—নবকুমারের কষ্টে বিগলিত-হৃদয়া দেখিতেছি বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে নবকুমারের প্রতি ইহা ভিন্ন অন্য ভাবের উদয় দেখিতেছি না—প্রণয়ের চিহ্ন ত বিন্দুমাত্রও দেখিতেছি না। কবি বঙ্কিমচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন, এ সংসার-বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। সংসার-বন্ধন বশতঃই জীব মরিতে চায় না। কপালকুণ্ডলার প্রণয় ছিল না—সে বন্ধন ছিল না—কোনও বন্ধনই ছিল না। তাই ভবানী-ভক্তি-বিমোহিতা, সরলা কপালকুণ্ডলা স্বপ্নে ভৈরবীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন;—তাই কপালকুণ্ডলা মরিবার জন্য কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছিলেন। কিন্তু নবকুমারের প্রতি প্রণয় না থাকিলেও—সংসার বা সমাজের প্রতি কোনও আকর্ষণ না থাকিলেও—সম্পূর্ণ বন্ধন-হীন হইলেও—শেষ পরিচ্ছেদেও আমরা কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের জন্য ব্যথিত-হৃদয়া দেখিতে পাই। "কপাল-কুণ্ডলা দেখিলেন, নবকুমারের হস্ত কাঁপিতেছে; কপাল-কুণ্ডলা স্বয়ং নির্ভীক, নিস্পন্দ। কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভয় পাইতেছ?'.....অতি গম্ভীর স্বরে নবকুমার উত্তর করিলেন, 'ভয়ে, মৃণ্ময়ি? তাহা নহে।' কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে কাঁপিতেছ কেন?' এই প্রশ্ন কপালকুণ্ডলা যে স্বরে করিলেন, তাহা কেবল রমণীকণ্ঠেই সম্ভবে। যখন রমণী পরদুঃখে গলিয়া যায়, কেবল তখনই রমণীকণ্ঠে সে স্বর সম্ভবে।".....কপাল-কুণ্ডলা জিজ্ঞাসিলেন, 'কাঁদিলে কেন?' আবার সেই কণ্ঠ!" তাই বলিতেছিলাম যে, শেষ পর্য্যন্ত সেই পরদুঃখ-বিগলিত-হৃদয়া, অথচ প্রণয়সংস্পর্শবিহীনা কপালকুণ্ডলা। এ যে রমণীর হৃদয়,—পরের দুঃখে গলিয়া যাইবেই—প্রণয় হউক বা না

হউক! রমণী যে মাতৃমূর্ত্তি! তাই কপালকুণ্ডলার অন্য কোনও বন্ধন না থাকিলেও, কোনও সংস্কার না থাকিলেও, সংসারের কোনও অভিজ্ঞতা না থাকিলেও, হৃদয়ে প্রণয়ের নামগন্ধ না থাকিলেও, রমণী-হৃদয়ের সহজাত পরদুঃখকাতরতা তাঁহাকে ছাড়ে নাই—সে যে রমণীত্বের সহিত বিজড়িত! তাই কপালকুণ্ডলা নিজে মরিতে আসিয়াও, পরের দুঃখে গলিয়া যাইতেছেন,—তাই কপালকুণ্ডলা—তাঁহার প্রতি সন্দিগ্ধ, মদিরাসক্ত, চৈতন্য-বিলুপ্ত কাপালিক-চালিত নব-কুমারের প্রতি করুণায় বিহ্বলা। তার পর কপালকুণ্ডলা গঙ্গা-প্রবাহে বিসর্জ্জিত-দেহা; নবকুমারও তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে গিয়া গঙ্গা-প্রবাহে নিমজ্জিত। উভয়ের কেহ আর উঠিলেন না। এখানে গ্রন্থকার খুব নৈপুণ্য সহকারে এইরূপে গ্রন্থ শেষ করিতেছেন, "সেই অনন্ত গঙ্গা-প্রবাহ-মধ্যে বসন্তবায়ু-বিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?" পাঠকগণ ভাবিয়া দেখুন, কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার "কোথায় গেল!"

তাই বলিতেছিলাম যে, বঙ্কিমচন্দ্র সেক্‌স্‌পীয়রের টেম্‌-পেষ্ট নাটকে মিরাণ্ডা-চরিত্রের সমালোচনা ও টীকা স্বরূপ কপালকুণ্ডলার সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা উপরে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটু বিশেষত্বের উল্লেখ করিব। তাহা এই যে, তিনি পদ্মাবতী বা মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসাকে কপালকুণ্ডলার "foil" করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আশৈশব প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিতা, সরলা, পবিত্রা, সমাজ-সংস্কারানভিজ্ঞা কপালকুণ্ডলার চরিত্র ফুটাইবার জন্যই পাশাপাশি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আশৈশব প্রকৃতি হইতে দূরে জনমানবসমাকীর্ণ সহরে লালিতা, পালিতা, শৈশবেও ধনী মাতাপিতার সংসারে পালিতা, কৈশোরে স্বামীর সহবাসে মানিনী উদ্ধতা, যৌবনে নাগরিকা কুলে-কুলে বিহারিণী, অপবিত্রা, ধনমানমদগর্ব্বিতা, পরিশেষে ঘটনা-সমাবেশে স্বামীসন্দর্শনে তাঁহার প্রতি আসক্তচিত্তা, পরে অগ্নি-প্রবিষ্ট দ্রবীভূত পাষাণের ন্যায় স্বামীর প্রতি প্রণয়রস-বিহ্বলা অতএব ধনজন মানমর্য্যাদা-বীতরাগিণী স্বামী-প্রীতিলোলুপা পদ্মাবতী তথা লুৎফ-উন্নিসা বা মতিবিবির চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এই দুইটি চরিত্র একত্র পাশাপাশি সন্নিবেশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উভয় চরিত্রই বিশদভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং তাহাতে উভয় চরিত্রের মাধুর্য্য অতি সুন্দর ও মনোরম হইয়াছে। এই উভয় চরিত্রের প্রত্যেকটিই প্রত্যেকটির গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। বিশেষতঃ, এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র কপাল-কুণ্ডলার সমুদায় সৃষ্টি-কৌশল এই মতিবিবির চরিত্র থাকায় বিশেষ প্রতীয়মান হইতেছে। টেম্‌পেষ্টে কিন্তু আমরা মিরাণ্ডা চরিত্রের এরূপ কোনও "foil" দেখিতে পাই না।

কপালকুণ্ডলা এবং মিরাণ্ডা এই উভয় চরিত্রই পাঠকের সম্মুখে ধারণ করিলাম। কোন্ চরিত্রের উৎকর্ষ কোথায়, তাহাও যথাসাধ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কোন্ কবির চিত্র অধিক মনোরম হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

ত্রিহুতের মন্দির

[অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রত্নতত্ত্ববারিধি, বি-এ]

ফার্গুসন তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠিত "ভারতীয় এবং পূর্ব্বদেশীয় সৌধশিল্পের ইতিহাসে" হিন্দু-দেবমন্দিরসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, শ্রেণীত্রয়কে 'দ্রাবিড়', 'চালুক্য' এবং 'উত্তর' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির (ক চিত্র) এবং কোনারকের মন্দিরকে তিনি তাঁহার তৃতীয় শ্রেণীর প্রধান দৃষ্টান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উড়িষ্যার মন্দিরসমূহের আলোচনাকালে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐগুলিই উত্তর ভারতের মন্দিরাবলীর আদর্শ; এবং এই শ্রেণীর মন্দির বর্ণনাকালে তিনি বলিয়াছেন যে, দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গোলাকার মন্দির, তদুপরি শিখর, তদূর্দ্ধে আমলক এবং সর্ব্বোপরি কলস, এইগুলিই এই সকল মন্দিরের স্বধর্ম্মসূচক লক্ষণ। সাধারণতঃ শিখর এরূপ

ভাবেও নির্ম্মিত হইয়া থাকে যে, তাহাতে একটী জগমোহন সংযুক্ত হয়; এবং কোন-কোন সময় ইহাতে অন্যান্য অঙ্গও যোগ করা হয়। কিন্তু, এই শ্রেণীর মন্দিরমাত্রই তিন-ভাগে বিভক্ত, এবং বক্র রেখাচিত্রই ইহাদের বিশেষ লক্ষণ। ফার্গুসন উত্তর ভারতের প্রাচীন মন্দিরগুলি এই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও, এই সকল লক্ষণের উৎপত্তির কোন কারণ নির্দ্ধারণ করেন নাই। যদি এই শ্রেণীর প্রাচীন মন্দিরসমূহ সম্বন্ধে এই কথা প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তবে ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক (যাহাকে ফার্গুসন "বঙ্গদেশীয় মন্দির" (খ চিত্র) আখ্যা প্রদান করিয়াছেন) মন্দির সম্বন্ধে ইহা অধিকতর প্রযুজ্য হইতে পারে। ফার্গুসন বলিয়াছেন যে, "বঙ্গদেশীয় মন্দিরের ভিত্তি বা শীর্ষ দেখিয়া ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন ধারণায় উপনীত হওয়া যায় না। কেবল মনে হয় যে, সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্যই এইগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছিল; এবং উৎপত্তির দিন হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত এই "ছাপ"ই রহিয়া গিয়াছে।" অন্যত্র ফার্গুসন বলিয়াছেন যে, "হয় ত কোন দিন অধিকতর প্রাচীন মন্দির আবিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে ইহাদের বিবর্ত্তনের ইতিহাস আবিষ্কৃত হইবে।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ফার্গুসন সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াও, এই সরল সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই।

ফার্গুসন যে বলিয়াছেন যে, বারাণসীর তথাকথিত বঙ্গ-মন্দির (খ চিত্র) উড়িষ্যার মন্দিরেরই বংশধর, তাহা আমরা স্বীকার করিতে চাহি না। আমাদের মনে হয় যে, খ চিত্রে প্রদর্শিত মন্দির ফার্গুসন-কথিত ভবে উৎপন্ন হয় নাই; এবং, ফার্গুসন প্রারম্ভেই এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হওয়াতেই, তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিও এই সকল মন্দিরের উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ধারা প্রণিধান করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

ফার্গুসন যে মন্দিরসমূহকে "উত্তর ভারতীয় মন্দির" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, এবং যাহাদিগকে আমরা "ত্রিহুতের মন্দির" আখ্যা প্রদান করিব, সেইগুলির বিশেষত্বই এই যে, তাহারা তিন ভাগে বিভক্ত—মূল কক্ষ, শিখর ও জগমোহন। শেষোক্তটী মন্দির নির্ম্মাণের পরে সংযোজিত, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সরল ভাবে বর্ণনা করিলে বলা যায় যে, সর্ব্বপ্রথমে দেব-মূর্ত্তি সংস্থাপনের জন্য ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ কক্ষ, এবং বৃষ্টি ও আতপ নিবারণের জন্য ছাদ, এবং তাহার পরে মন্দির-প্রবেশার্থিগণের জন্য দ্বারমণ্ডপ নির্ম্মিত হয়। যদিও এইরূপ মন্দিরে বক্ররেখাবিশিষ্ট কিছুই নাই, তথাপি ইহাপেক্ষা সরল গৃহ আর আমরা অনুমান করিতে পারি না।

সাধারণতঃ, সৌধ-শিল্প-বিচারে, নির্ম্মাণের সময়ানুযায়ী সৌধগুলিকে বিন্যস্ত করিতে পারিলে তাহাদের উন্নতির ক্রমবিকাশও সহজে অনুমিত হইতে পারে। অবশ্য, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দিরগুলি খুব সম্ভব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকিবে; এবং সেগুলিকে এই কারণে সময়ানুযায়ী বিন্যস্ত করাও সম্ভবপর হইবে না। বস্তুতঃ, যদি প্রথম অবস্থা হইতে সকল মন্দিরই অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যাইত, এবং আমরা তাহাদের নির্ম্মাণের সময়ও জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করা সহজসাধ্য হইত। কিন্তু ত্রিহুতে এরূপ বিবর্ত্তন লক্ষ্য করা সম্ভবপর নহে। ত্রিহুতে এখন সুপ্রাচীন মন্দির বর্ত্তমান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এবং যে সকল মন্দির আছে, তাহাদের নির্ম্মাণের সময়ও স্থির করা যায় না। বস্তুতঃ, এই প্রদেশের সৌধসমূহের বিবর্ত্তন পর্য্যালোচনার ইচ্ছা করিলে, আমাদিগকে প্রথমেই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, এই জনপদের আদিম মন্দিরগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান মন্দিরসমূহের সহিত পুরাতন মন্দিরগুলির সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, যে মন্দিরগুলিকে আমরা পুরাতন আখ্যা প্রদান করি, সেগুলিও অনেকাংশে নূতন। সুতরাং, বিবর্ত্তনের ইতিহাসের অনুসন্ধান সহজসাধ্য নহে; এবং আধুনিক মন্দিরগুলি হইতে বিবর্ত্তনের প্রত্যেক ধাপ সঠিকরূপে নির্ণয় করাও সম্ভবপর হইবে না।

উল্লিখিত কারণে, বর্ত্তমান কালে ত্রিহুতে অত্যন্ত সুপ্রাচীন এরূপ কোন মন্দির নাই, যাহা হইতে বিবর্ত্তনের প্রভাবে বর্ত্তমান মন্দির উদ্ভূত হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে সোণপুরের (প্রথম চিত্র) ক্ষুদ্র গ্রাম্য মন্দির হইতে আমরা প্রাচীন মন্দির—অর্থাৎ যেরূপ মন্দির হইতে বর্ত্তমান কালের মন্দির উদ্ভূত হইয়াছে—কল্পনা করিয়া লইতে পারি। আমরা পূর্ব্বে এইরূপ মন্দিরে যে সকল উপাদান আবশ্যক মনে করিয়া লইয়াছিলাম, এই মন্দিরেও সেই

সকল উপাদান দৃষ্ট হয়—একটী ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ কক্ষ, সাধারণ ছাদ (যাহা উচ্চে শৃঙ্গভাবে উঠিয়াছে) এবং একটী অপ্রশস্ত অলিন্দ। সর্ব্বাপেক্ষা "সাদাসিদে" মন্দিরের এইগুলিই উপাদান ; এবং বক্ষ্যমান দৃষ্টান্তে আমরা এই সকলই সুস্পষ্ট-রূপে দেখিতে পাই। সহজেই ইহা স্বীকার্য্য যে, আদিকালের হিসাবে ইহা অপেক্ষা সোজা আর কিছুই হইতে পারে না। তবে এই মন্দিরগুলিতে একটী নূতনত্ব দৃষ্ট হয় —সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য কয়েকটী খিলান, মন্দির-গাত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। এইগুলি খুব আধুনিক—চূড়াগুলিতে সহজেই মুসলমানী আমলের শৃঙ্গের প্রভাব দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, "বাদশাহী প্রভাব"বিশিষ্ট এই চূড়াগুলি বাদ দিলেই, আমরা আমাদের স্বতঃসিদ্ধ আদিম মন্দিরের অরঞ্জিত দৃশ্য দেখিতে পাই।

আমাদের মনে হয় যে, এই বৈচিত্র্যহীন মন্দিরগুলিই ক্রমে-ক্রমে বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় সূর্য্য-রশ্মির জ্যোতিঃর প্রখরতার জন্যই হউক, অথবা হিন্দুদের সৌন্দর্য্যানুরাগের জন্যই হউক, ভারতবর্ষে যেরূপ আলো ও ছায়ার সমন্বয়ের প্রতি অনুরাগ দৃষ্ট হয়, এরূপ আর কোন দেশের কোথাও দৃষ্ট হয় না। বাস্তবিক পক্ষে, যে কারণেই হউক, সুরুচিসম্পন্ন ছায়ার রসবোধ সকল ভারতীয় স্মৃতি-স্তম্ভেই সুপ্রতীয়মান হয়। আদিম মন্দিরে যে "একঘেয়ে" প্রাচীর দৃষ্ট হয়, তাহা যে শীঘ্রই অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ছায়ার খেলা দেখাইবার জন্যই, এই "একঘেয়ে" প্রাচীরে শিল্পী, প্রাচীরের মধ্যস্থল উঁচু করিবার কল্পনা করে ও তাহা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত করে (দ্বিতীয় চিত্র—শিবমন্দির)। এই কল্পনা ও তাহা কার্য্যে পরিণত করা এক হিসাবে যুগান্তরকারী বলা যাইতে পারে। প্রাচীরের মধ্যস্থলে নির্গম নির্ম্মাণ করিয়া শিল্পী প্রাচীরকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিল ; এবং সঙ্গে-সঙ্গে আলো ও ছায়ার সমাবেশ দেখাইল। এই প্রসঙ্গে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে,—ছাঁইচের অভাব। ছাদ ও প্রাচীরের ঊর্দ্ধদেশে সামান্য কিছু নির্গম দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু উহা সুস্পষ্ট নহে ; এবং আমাদের বিশ্বাস যে, আদিম মন্দিরে কোন ছাঁইচ একেবারেই ছিল না।

প্রাচীরে এই যে আলো ও ছায়ার সূত্রপাত হইল, ইহারই ক্রমোন্নতি হইয়া হিন্দুশিল্পের অলঙ্কারের বিশেষত্ব হইল—একটী ক্ষুদ্র সুন্দর মন্দির। ফার্গুসন একস্থানে বলিয়াছেন, "বৌদ্ধ মন্দিরসমূহের হর্ম্ম্যমুখের অলঙ্কার সর্ব্বত্রই একপ্রকার। কিন্তু, হিন্দুগণ এরূপ প্রথা এত শীঘ্র অবলম্বন করে নাই ; এবং ইহা যেরূপ ভাবে অবলম্বিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে হিন্দু-মন্দিরসমূহের প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।" উড়িষ্যার মন্দিরসমূহে এরূপ আকৃতির বিবর্ত্তন কি প্রকারে হইয়াছে জানি না ; কিন্তু উল্লিখিত দ্বিতীয় চিত্রের পাশ্বের শিবমন্দির দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, মন্দির-নির্ম্মাণ-শিল্পের জন্যই এরূপ করা আবশ্যক হইয়াছিল। উড়িষ্যার মন্দিরগুলি ত্রিহুতের মন্দিরগুলি অপেক্ষা বেশী প্রাচীন না হইলে মনে করা যাইতে পারিত যে, এরূপ বিবর্ত্তনের প্রারম্ভ ত্রিহুতেই সমদ্ভূত হইয়াছিল। এবং এরূপ প্রসাধক প্রথমে এই প্রদেশের শিল্পে প্রবর্ত্তিত হইয়া, পরে অন্যত্র অন্য ভাবে গৃহীত হইয়াছিল। ত্রিহুতে সুপ্রাচীন মন্দিরের অভাব থাকা সত্ত্বেও মনে করা যাইতে পারে যে, কার্য্যে হয় ত ইহাই ঘটিয়াছিল। তবে, উড়িষ্যার মন্দিরসমূহে যাহাই হউক, ত্রিহুতে যে এরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা আমাদের পর্য্যালোচনা আর কিছু দূর অগ্রসর হইলে, সহজেই প্রতীয়-মান হইবে। প্রথমে এইরূপ ভাবেই, অর্থাৎ প্রাচীরের একাংশের বৃদ্ধির দ্বারা আলো ও ছায়ার সমাবেশ করিয়া, শিল্পী স্বভাবতঃই প্রাচীরের প্রথম বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে শিখরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া, প্রথমে ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ, এবং পরে এইরূপে প্রাচীরের সমতল ভাগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, আলো ও ছায়া সমাবেশের বৃদ্ধি ও সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিতীয় ক্ষুদ্র প্রসাধক মন্দিরের সৃষ্টি করিল। মজঃফরপুরের ঘাটাঙ্গর হর-মন্দিরই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ (তৃতীয় চিত্র)।

এই হর-মন্দিরটী সুন্দর ;—পবিত্রতা যেন ইহার সর্ব্ব অঙ্গে জড়িত ; এবং ইহা যে সোণপুরের মন্দির অপেক্ষা শিল্পকলায় উন্নত, তাহাও সকলে স্বীকার করিবেন। মন্দিরের সৌন্দর্য্য এইরূপে বৃদ্ধি পাইল দেখিয়া, শিল্পী অবশ্য আরও আলো ও ছায়ার সমাবেশের কল্পনা করিল, সুরুচি বৃদ্ধির আশা করিল। তাই সে তাহার মন্দির-প্রাচীরের সমতা তৃতীয় একটী ক্ষুদ্র মন্দির দ্বারা বিনষ্ট করিল। ফলে আমরা, ছাপরা মহল্লা গাড়ীভিয়ের মহাদেব-মন্দির পাইলাম। শিল্পী আর ইহাদের বেশী অগ্রসর হইল না—ত্রিহুতের আর কোন মন্দিরেই এই ভাবে অধিকতর প্রকাশ পায় নাই।

ছাপরার এই মন্দিরই এই শ্রেণীর মন্দির-শিল্পের চূড়ান্ত নিদর্শন। এরূপ মন্দির ভারতবাসী ও য়ুরোপীয় সকলেরই চক্ষে প্রীতিপ্রদ বোধ হইবে। যদিও এই শ্রেণীর মন্দির দেখিতে "পশ্চিম-পৃথিবীর" পিরামিডের ন্যায়, তথাপি, (আমরা পূর্ব্বেই যেরূপ বলিয়াছি) এইগুলির প্রারম্ভ ও বিবর্ত্তন উভয়ই এতদ্দেশীয় এবং এগুলি সম্পূর্ণ উত্তর ভারতীয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পাত্রাদের শিবমন্দির-লাভীয় হর্ম্ম্যে প্রাচীর-গাত্রে একটি নির্গম স্থাপিত হওয়াতে, প্রাচীর-গাত্র দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে, এবং তজ্জন্য প্রাচীরে তিনটি ছক হইয়াছে,—একটী ঐ নির্গম বা প্রতিক্ষেপ, এবং অন্য দুইটি এই প্রতিক্ষেপের উভয় পার্শ্বস্থ প্রাচীর। হর্ম্ম্য-শিল্পের ইতিহাসের কোন সময়ে এইরূপ বিভাগ অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করে; এবং সঙ্গে-সঙ্গে শিল্পী মন্দিরের শিখরটিও তিনটি সমতল শিখরে পরিণত করিবার কল্পনা করে (পঞ্চম চিত্র)। চম্পারণ জিলার বাগহোর শিবমন্দিরে এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার চিত্র পরিদৃশ্যমান। এই স্থানে প্রাচীরের তিনটি ছকের সঙ্গে-সঙ্গে আমরা শিখর-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র তিনটি শ্রেণী-বিশিষ্ট মন্দির দেখিতে পাইতেছি।

প্রথমে মনে হইবে যে, প্রাচীরের তিনটি ছকের সহিত ঊর্দ্ধের তিনটি শিখরের কোন সম্পর্ক নাই; কিন্তু ত্রিহুতের সকল মন্দিরই যখন এই প্রকারের, তখন এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে, ঐরূপ করিবার কোন উদ্দেশ্য আছে। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, দুই-একটি মন্দিরে কিছু-কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়; কিন্তু এই শেষোক্ত মন্দিরগুলি প্রায়ই আধুনিক; এবং নির্ম্মাতা সেরূপ দক্ষ শিল্পীও নহে। প্রায় সকল মন্দিরেই প্রাচীরের বিভাগ ও শিখরের সংখ্যার সমন্বয় বিশেষভাবে রক্ষিত হইয়াছে। ইহা হইতে আরও একটী বিষয় পরিলক্ষিত হয় যে, এরূপ সমতল তলার সংখ্যা অসমান। প্রাচীরের প্রক্ষেপ দ্বারা স্বভাবতঃই প্রাচীর ৩, ৫, ৭ ছকে বিভক্ত হইবে—প্রক্ষেপ দ্বারা প্রাচীর ২।৪।৬ অর্থাৎ সমান ছকে বিভক্ত হইতে পারে না। এই জন্যই আমরা সমতল তলগুলিকে অসমান সংখ্যায় দেখিতে পাই।

চম্পারণ জিলার ত্রিবেণীর কমলেশ্বরনাথের মন্দিরের (ষষ্ঠ চিত্র) প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা বিবর্ত্তনের আর এক পর্য্যায় দেখিতে পাই। এস্থলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, প্রাচীরকে দুইটি প্রক্ষেপ দ্বারা পাঁচ অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু, ঘাটাকর হর-মন্দিরে আমরা যেরূপ দেখিতে পাই, সেইরূপ না করিয়া শিখরের চতুর্দ্দিকে পাঁচটি শ্রেণীবিশিষ্ট ক্ষুদ্র শিখরসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে। যদ্য চিত্রে চিত্রিত এই মন্দিরটি আধুনিক; এবং ক্ষুদ্র শিখরগুলির সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে চিত্র-দৃষ্টে, ঐগুলির সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যায় না। কিন্তু, পরবর্ত্তী (সপ্তম চিত্র) মন্দিরে—দ্বারবঙ্গের অন্তর্গত সৌরথের মহাদেব-মন্দিরে—এবং আমরা অন্যান্য যে সকল মন্দিরের বিষয় আলোচনা করিব, সে সকলে—সৌন্দর্য্য-প্রসাধক ক্ষুদ্র শিখরের সংখ্যা-গণনা সুসাধ্য। মহাদেব-মন্দিরের প্রাচীরে তিনটী প্রক্ষেপ করা হইয়াছে; এবং তজ্জন্য প্রাচীর-গাত্র সাতটি সুবিন্যস্ত ছকে পরিণত হইয়াছে। এই সাতটি ছক শিখরের সাতটি তলার সহিত মিলাইয়া করা হইয়াছে—পাঁচটি তলার সমন্বয়ে পাঁচ শ্রেণীর ক্ষুদ্র মন্দির, চতুষ্কোণ শিখরের প্রত্যেক পার্শ্বে একটী করিয়া এবং সর্ব্বোচ্চশিখর—মোট সাতটি দেখাইতেছে। আমরা এরূপ বলিতে চাহি না যে, যতগুলি খাড়া ছক হইবে, ঠিক ততগুলিই ক্ষুদ্র মন্দিরশ্রেণী হইবে। তবে, শিখরে যতগুলি বন্ধনী থাকিবে, ঠিক ততগুলি ছক থাকিবে। নিয়মানুযায়ী নির্ম্মাণ শেষ হইলে, পরে বন্ধনীগুলিকে ইচ্ছামত সুসজ্জিত করা যাইতে পারে; অথবা, শিল্পী তাহার সৌন্দর্য্য-ভক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন ভাবে ব্যবস্থা করিতে পারে। এই জন্যই সারণ জিলার সেমারিয়ার রামজী মন্দিরে (অষ্টম চিত্র) প্রাচীর নয়টি ছকে বিভক্ত, এবং উর্দ্ধস্থ শিখরের বন্ধনীও নয়টী—ক্ষুদ্র শিখরগুলি শিল্পী ইচ্ছানুযায়ী সুসজ্জিত করিয়াছে। শিল্পী সৌভাগ্যবশতঃ, বুঝিতে পারিয়াছিল যে, অনর্থক শিখরশ্রেণী বৃদ্ধি করিলে সৌন্দর্য্যহানি হইবে—বৃদ্ধি হইবে না।

দ্বারবঙ্গ জিলার (নবম চিত্র) আহিয়ারির রামচন্দ্র-মন্দিরে—আমরা যে সকল মূলতত্ত্বের আলোচনা করিতেছি, তাহাদেরই পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। ফার্গুসন-কথিত বারাণসীর মন্দিরের সহিত এই মন্দিরের সাদৃশ্য দেখা যায়। অকস্মাৎ দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি না যে, কি ভাবে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমরা ইহাও স্থির করিতে পারি না যে, কিরূপে এই মন্দিরটিকে আমাদের আলোচ্য মন্দির

চিত্র ৯
কাশীর আধুনিক মন্দির

চিত্র ৯
কাশীর আধুনিক মন্দির

প্রথম চিত্র—সোনপুরের মন্দির

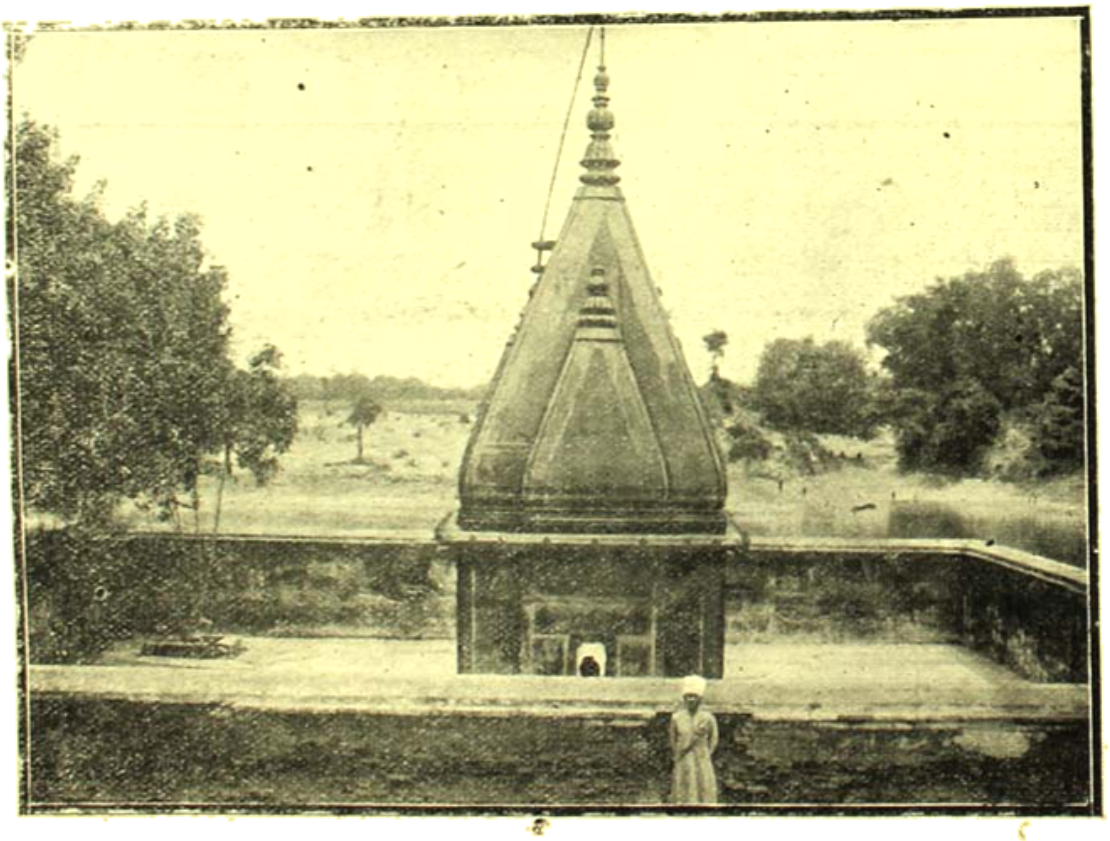

দ্বিতীয় চিত্র—পাহাড়ের শিবমন্দির

চিত্র ৭৫৩
রামচন্দ্র

চিত্র ৭৫৪
রামচন্দ্র শিবমন্দির

পঞ্চম চিত্র
বাগদাদে নিজামিয়া

ষষ্ঠ চিত্র
কাজেমেনের মসজিদ

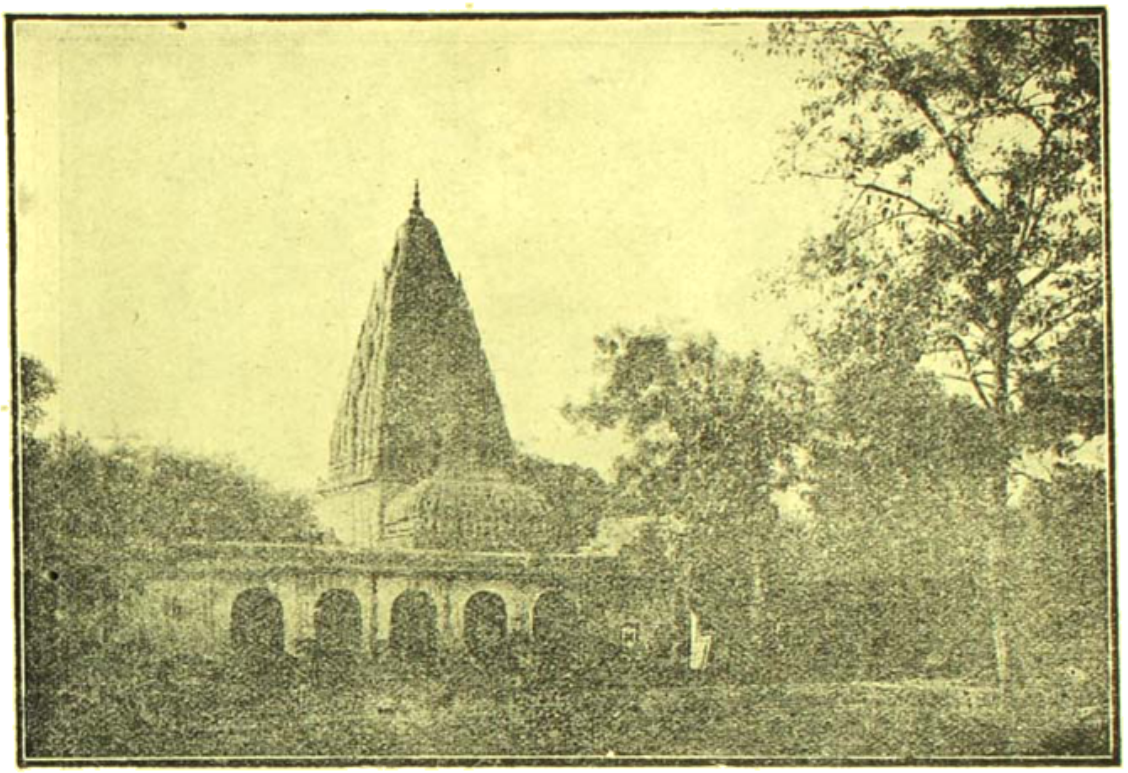

সপ্তম চিত্র—গৌরেশ্বরমহাদেবের মন্দির

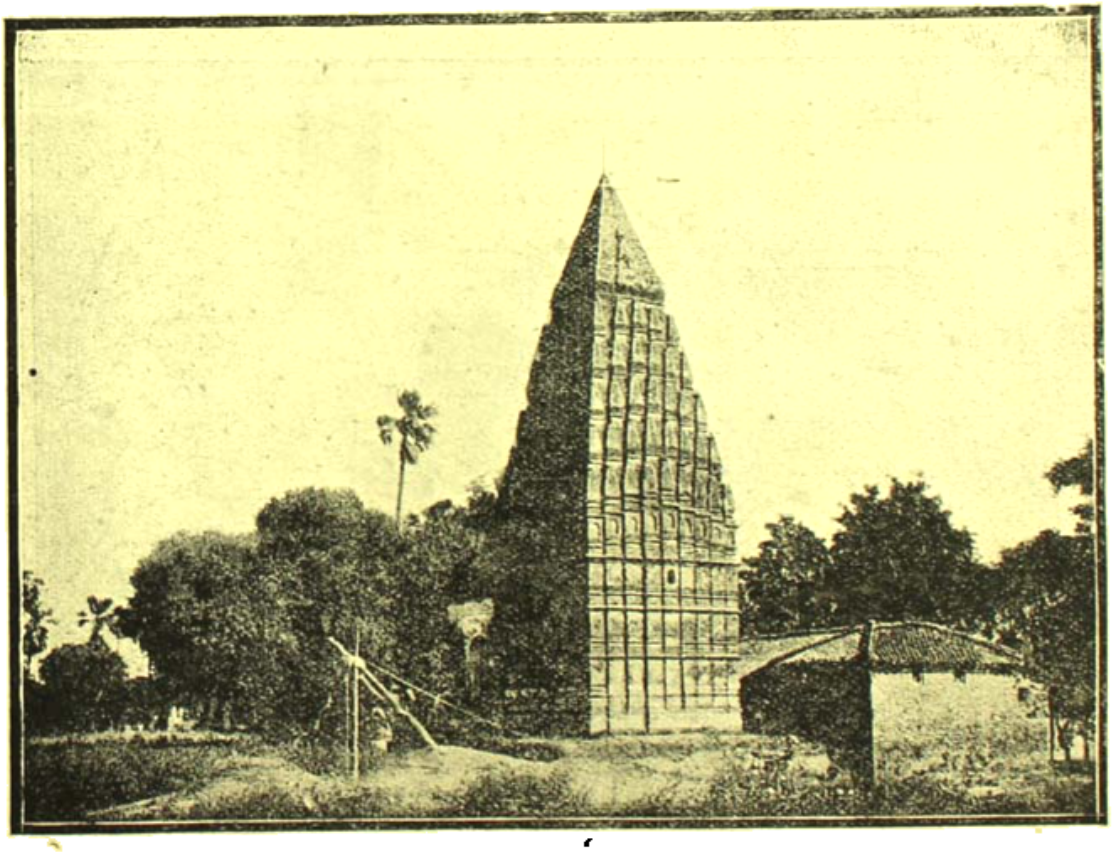

অষ্টম চিত্র—রামলীমন্দির

নবম চিত্র
মাণিকচন্দ্রের মন্দির

দশম চিত্র
ধামোদরপুরের বিষ্ণুমন্দির

৩৩৮৫ চিত্র
মাধাইপুর মন্দির

৩৩৮৬ চিত্র
মাধাইপুর শিবমন্দির

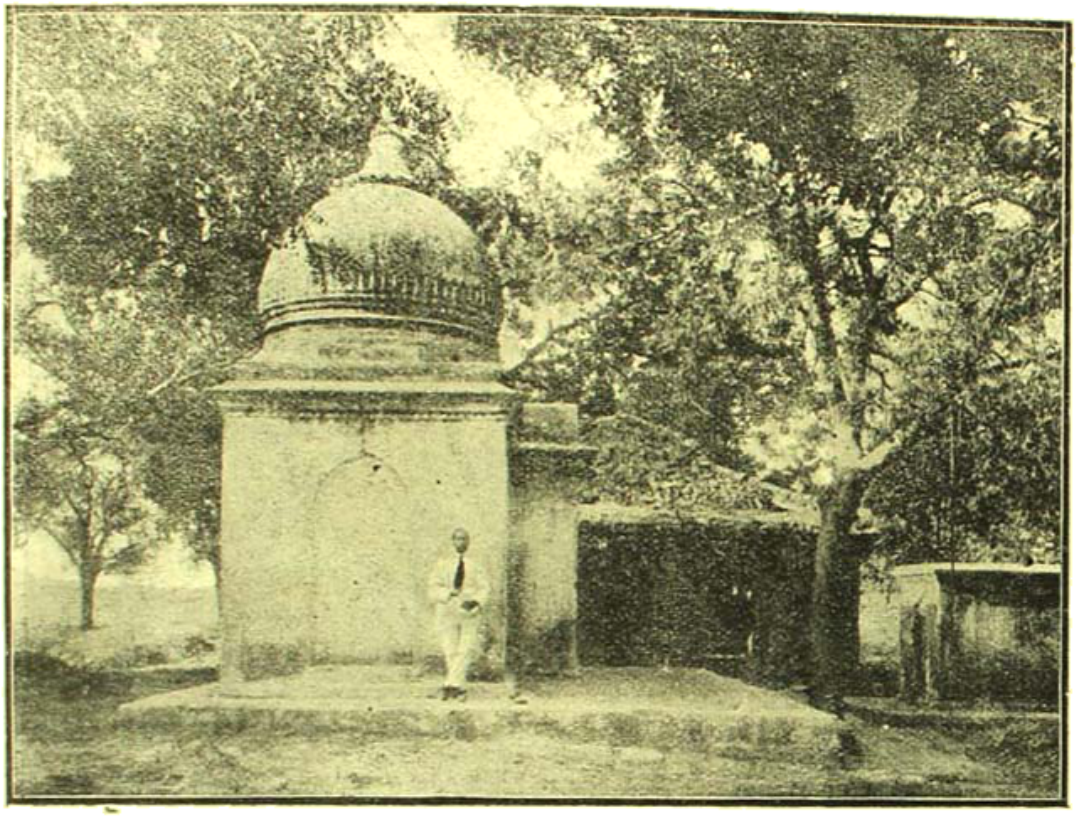

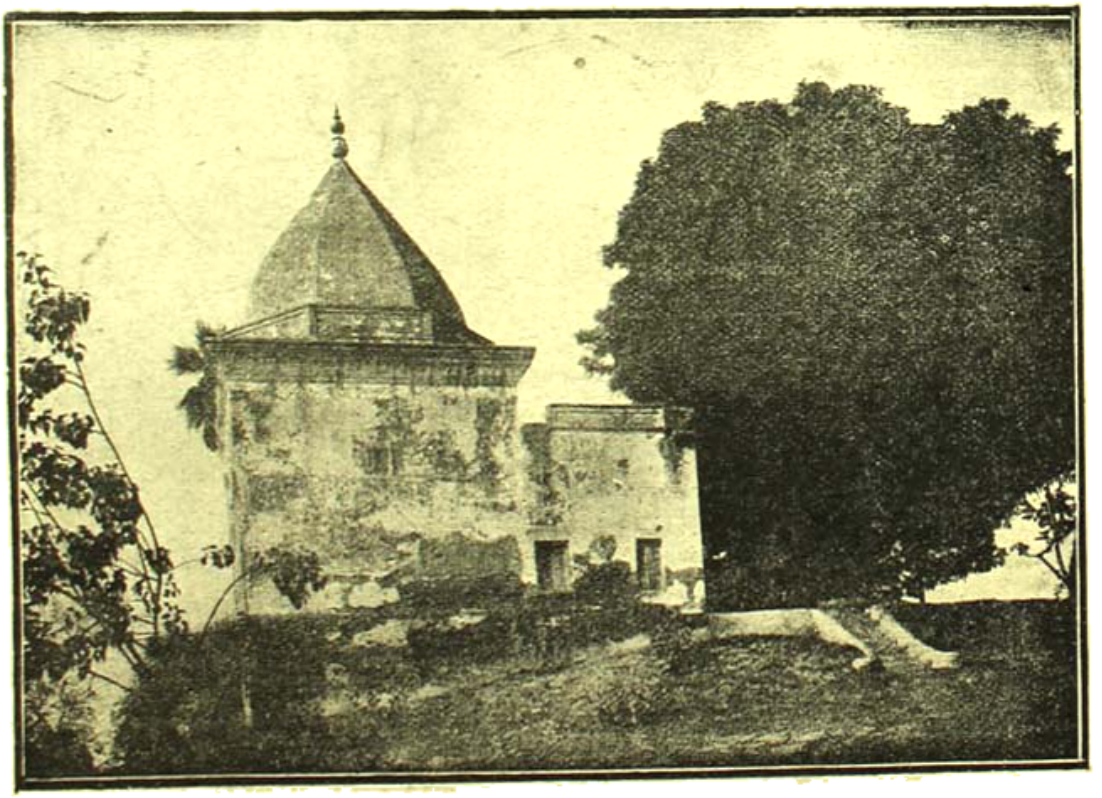

পঞ্চবটী [চিত্র—মাধবশিব]

মহাদেব ও নন্দী—ত্রিহুত

হরগৌরী মন্দির—ত্রিহুত

সপ্তদশ চিত্র
শ্রীমন্দিরের শিব ও ঠাকুরমন্দির

অষ্টাদশ চিত্র
আলাহাবাদের মহাদেব মন্দির

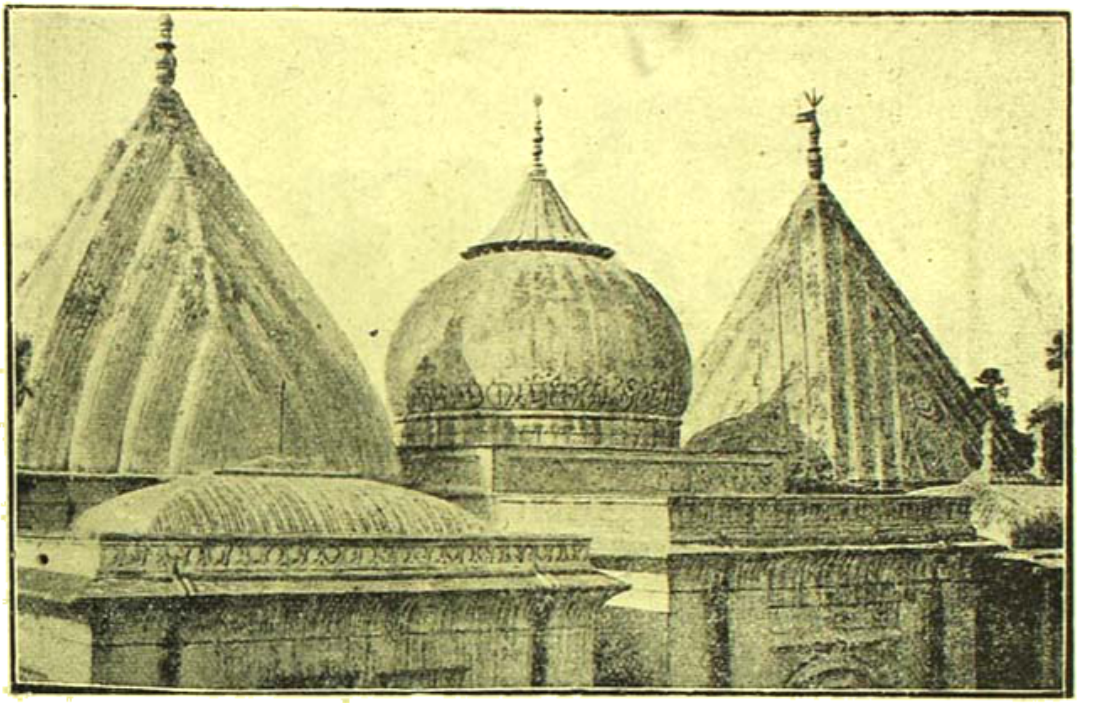

অষ্টাদশ চিত্র—[illegible] গণ্ডকীর মন্দির

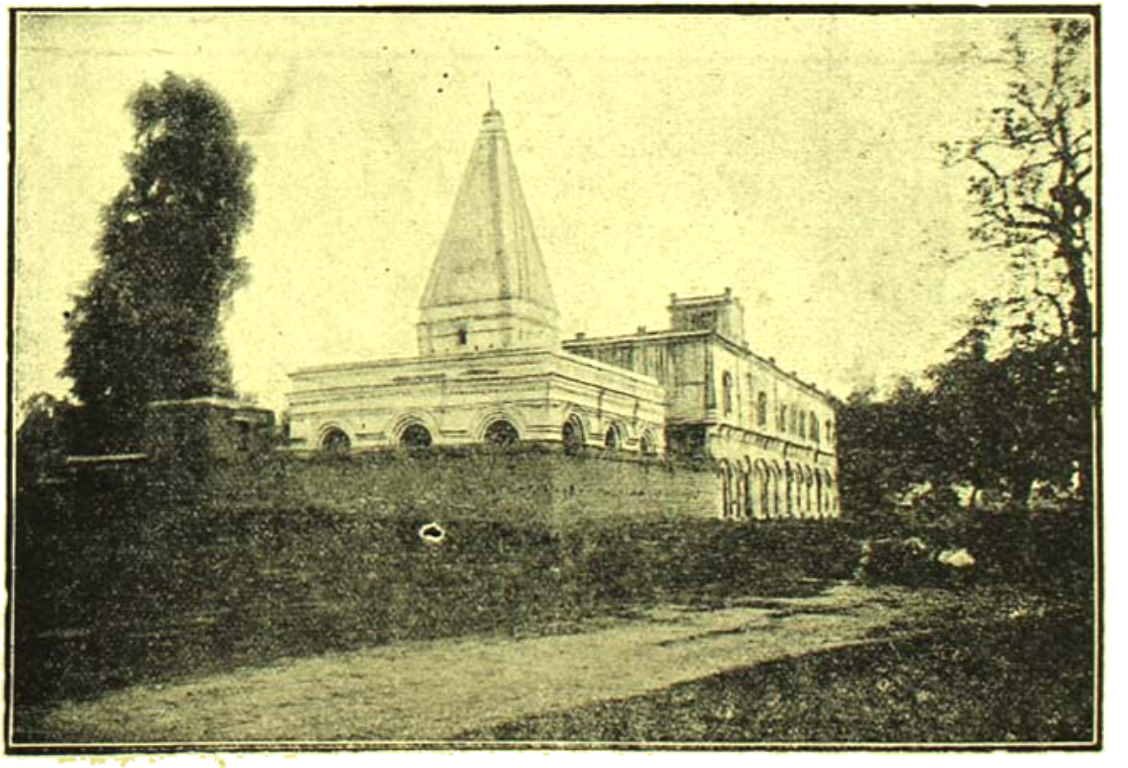

ঊনবিংশ চিত্র—কমলাকালী দেবীমন্দির

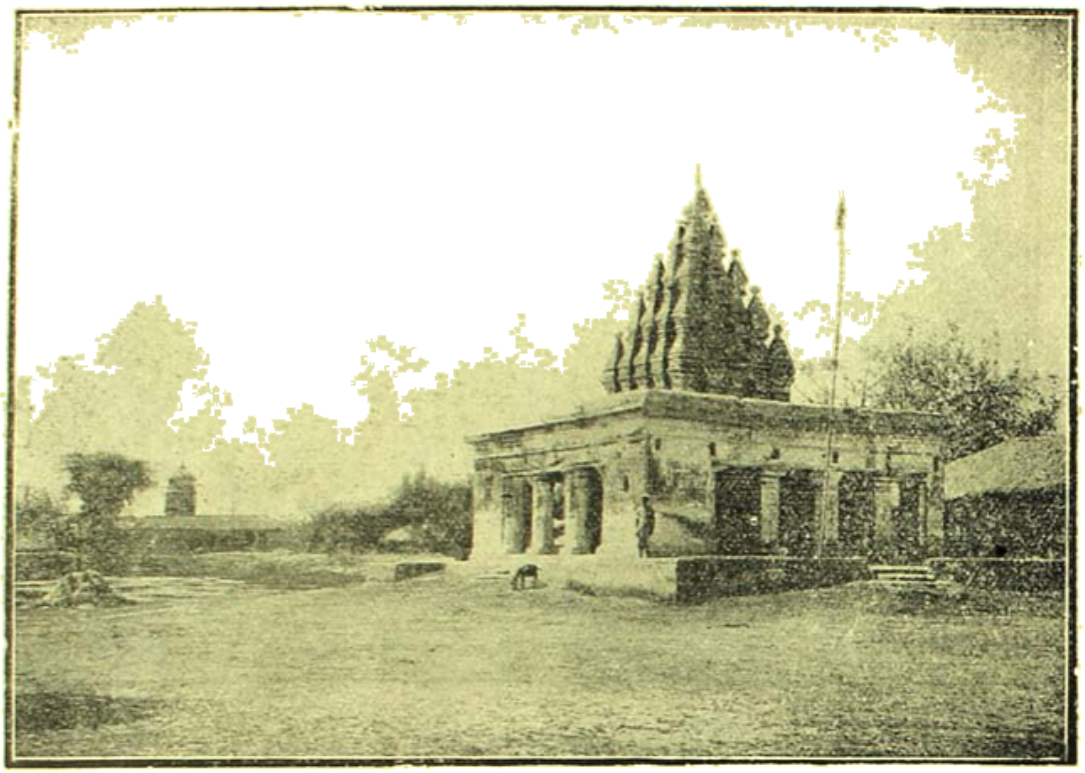

বিংশ চিত্র—সিংহলের শিবমন্দির

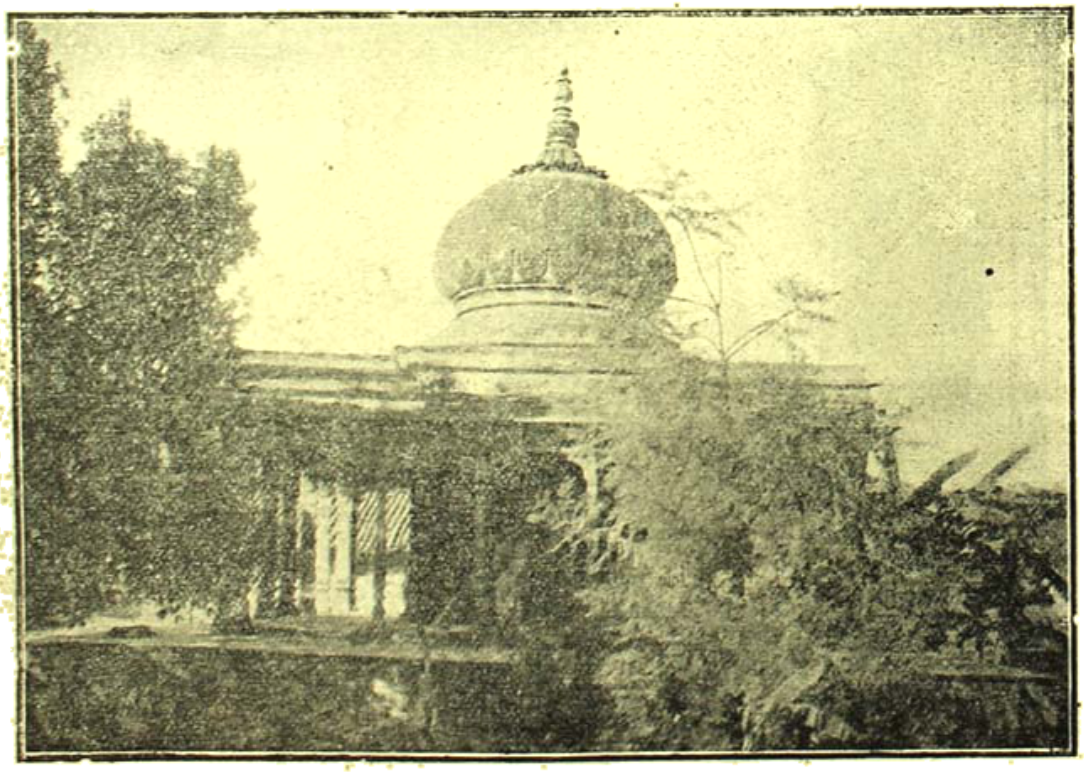

একবিংশ চিত্র- মুরশীদপুরের রাধাজী মন্দির

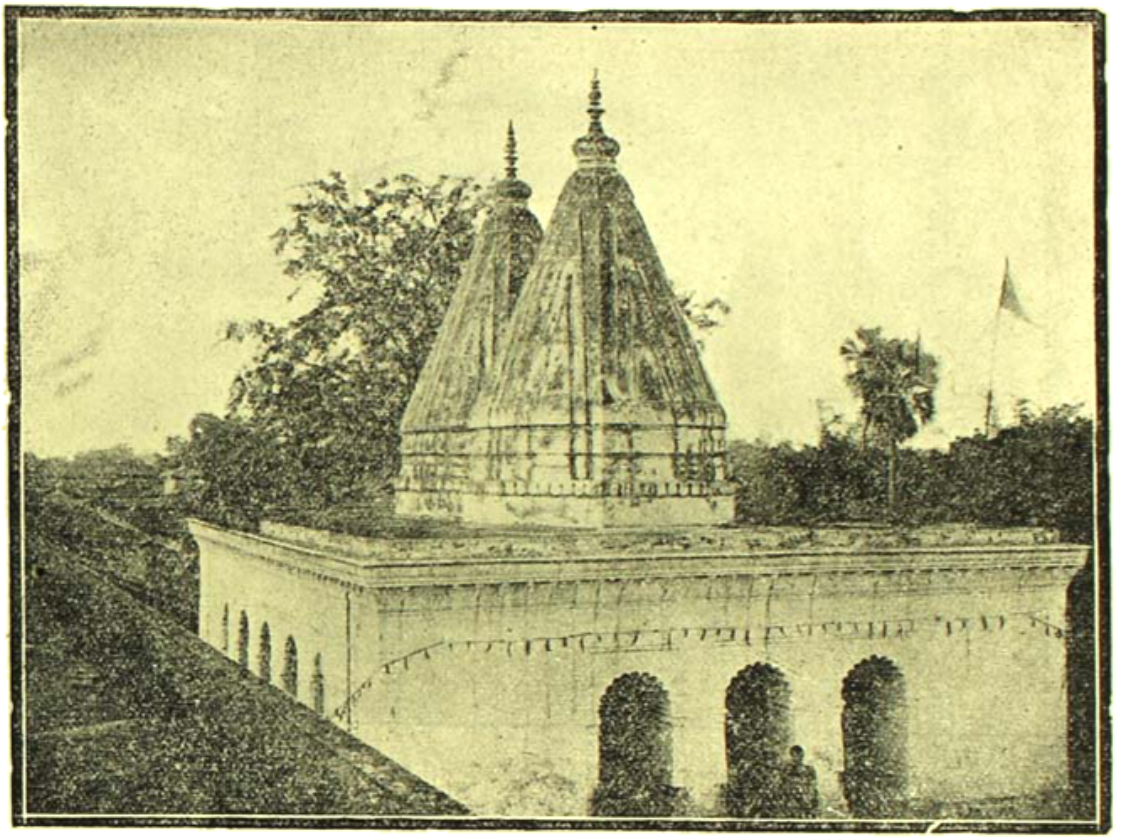

ত্রয়োবিংশ চিত্র—বাংড়ার চারটি মন্দির

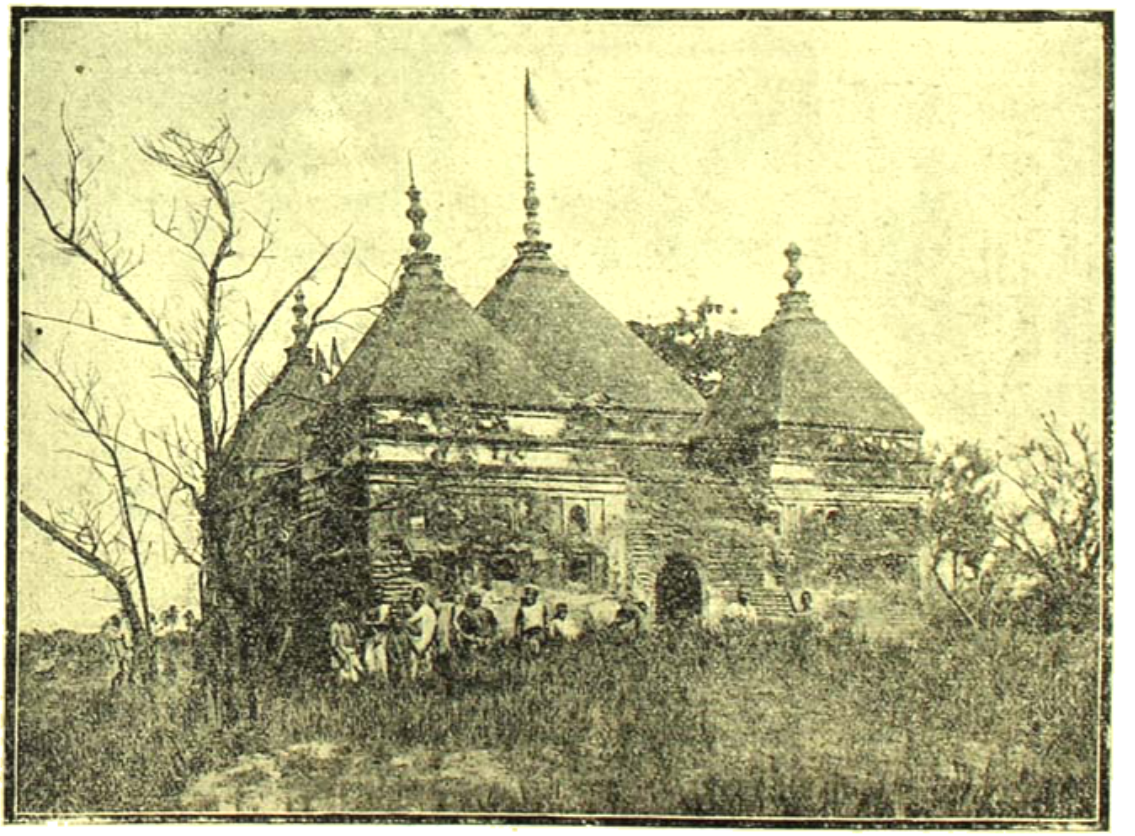

চতুর্ব্বিংশ চিত্র—পকরর মন্দির

শকুন্তলা চিত্র
বাংলার শকুন্তলা

ঋষি বিশ্বামিত্র
বাংলার শকুন্তলা

সপ্তবিংশ চিত্র—ইমলুয়ের পঞ্চরত্ন মন্দির

অষ্টাবিংশ চিত্র—আমাথ পঞ্চরত্ন মন্দির

ত্রিবর্ণ চিত্র—রামলক্ষ্মণের মন্দির

ত্রিবর্ণ চিত্র—কলেজিয়েট মাদ্রাসা

ত্রিংশ চিত্র—শিপড়ার রাজমাতা মন্দির

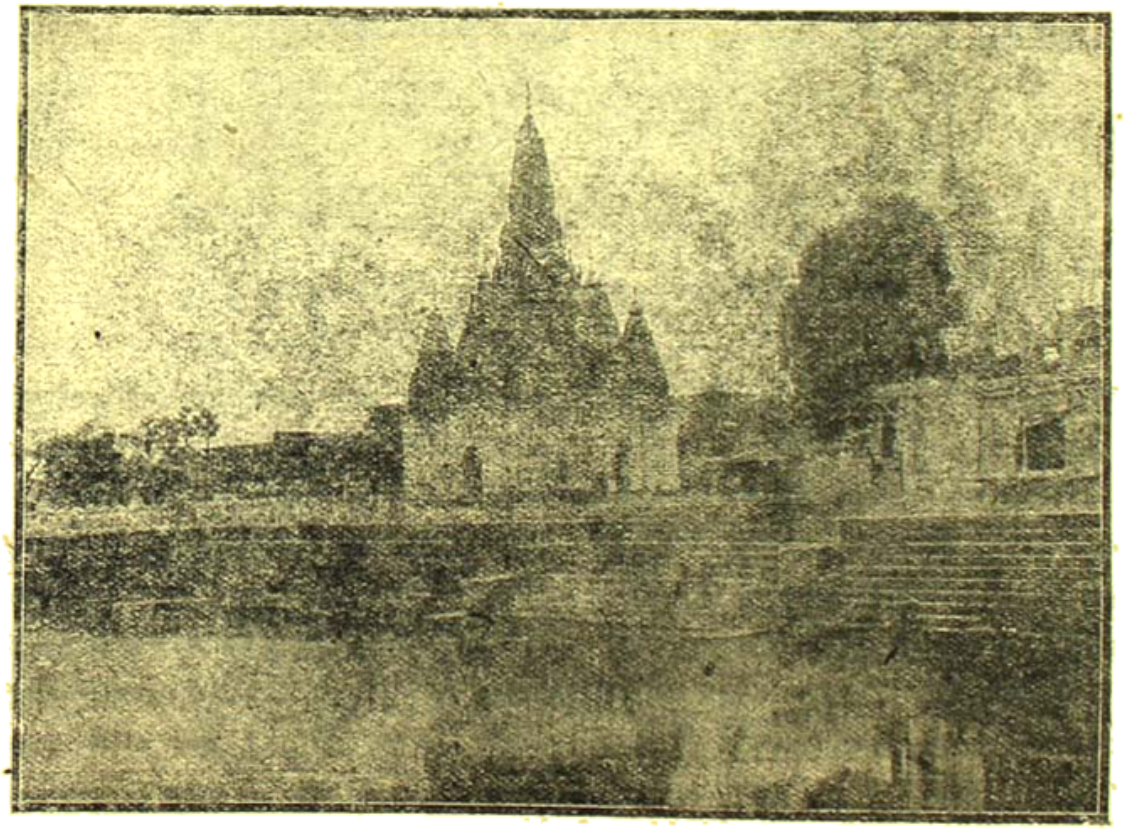

একত্রিংশ চিত্র—মহেশপুর রামমন্দির

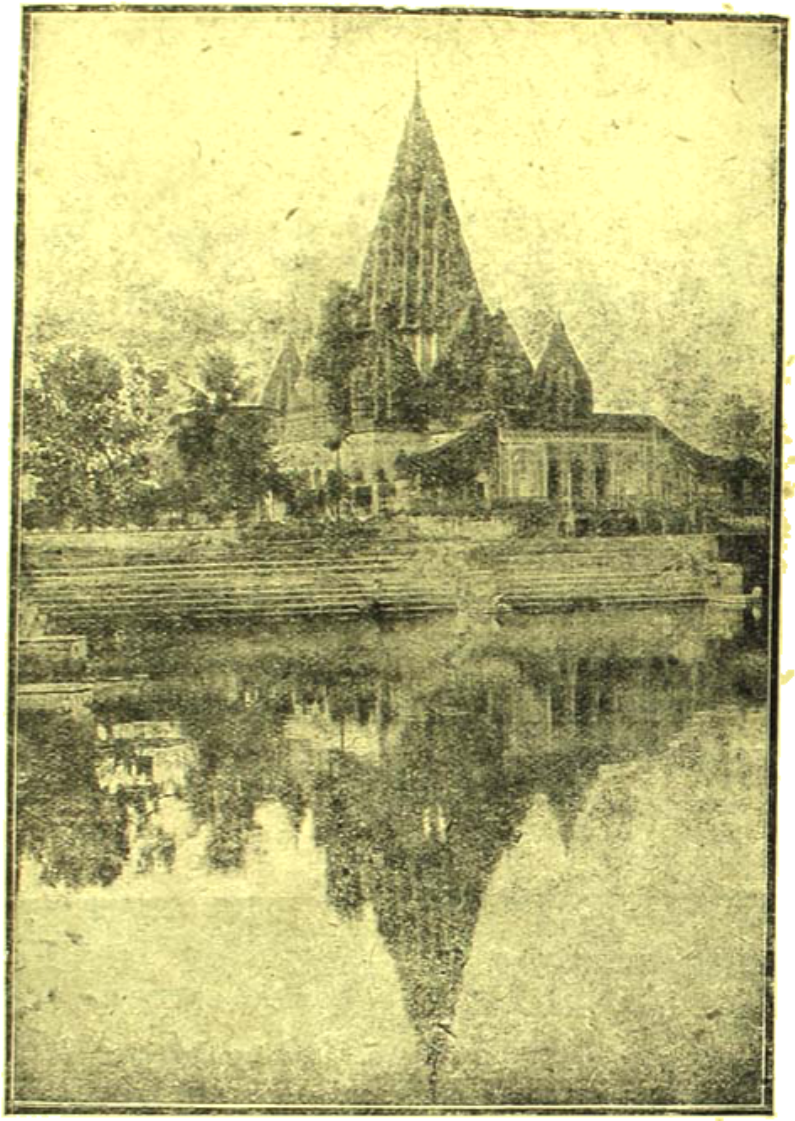

ত্রয়োত্রিংশ চিত্র—বড়কর্‌পুরের রাম ও রামজী মন্দির

সমূহের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি। অবশ্য, সহজেই ইহা প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীরের ছক সম্বন্ধে রামচন্দ্র-মন্দির পূর্ব্বোক্ত রামজী-মন্দির অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। রামজী-মন্দিরে নয়টি ছক—রামচন্দ্র-মন্দিরে একাদশটি ছক। কিন্তু, এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, শেষোক্ত মন্দিরের ছকগুলি প্রক্ষেপ বা নির্গমের জন্য হয় নাই—সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে। সংখ্যায় তাহারা এগারটি, এবং আমরা স্বভাবতঃই মনে করিব যে, যে সকল মন্দিরের বিষয় আমরা এতক্ষণ পর্য্যালোচনা করিতেছি, তাহাতে শিখরের সংখ্যার সহিত ছকের সংখ্যার সমন্বয় হওয়া উচিত। কিন্তু একাদশ তলবিশিষ্ট একটী মন্দির ক্ষুদ্র ভিত্তির উপরে নির্ম্মাণ করা কষ্টসাধ্য হইবে, এবং দেখিতেও সুন্দর হইবে না। যাহা দেখিতেছি, তাহাতেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, মন্দিরের ঊর্দ্ধাংশ অত্যন্ত ভারী হইয়াছে। আমাদের মনে হয় যে, এইরূপ ভারী হওয়াতে, এবং এই অসুবিধা দূরীকরণ মানসে, শিল্পীকে হর্ম্ম্য-নির্ম্মাণের সাধারণ পথ পরিত্যাগ, অথবা স্বীয় সুবিধানুযায়ী ভিন্ন পথ অবলম্বন—ইহার মধ্যে একটী গ্রহণ করিতে হওয়াতে, সে শেষোক্তটীই গ্রহণ করিল। প্রধান শিখরের উভয় পার্শ্বে সর্ব্বনিম্নে পাঁচ ধাপ ক্ষুদ্র শিখর, তদুপরি চারিটী ধাপ বিশিষ্ট

ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শিখর, তৃতীয় স্তরে তিনটী, এবং এইরূপে ঊর্দ্ধাভিমুখী সুনির্দ্দিষ্ট শিখরশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের দিকে দেখিতে হইলে, চক্ষুকে ঊর্দ্ধাভিমুখী করিতে হয়। একদিকে ঊর্দ্ধে চাহিতে-চাহিতে ক্রমান্বয়ে পাঁচটী তলা দেখা শেষ করিয়া, দর্শক ষষ্ঠ তলা দেখিতে পায়; এবং পরে অন্যদিকের নিম্নাভিমুখী পাঁচটী তলা দেখা অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ একাদশটী তলা দেখা শেষ করিতে হয়। সুতরাং, হঠাৎ দেখিলে এই মন্দিরটী ফার্গুসন-বর্ণিত বারাণসীর মন্দিরের ন্যায় অবোধগম্য হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহাও আমাদের আলোচিত অন্যান্য মন্দিরের ন্যায়। বারাণসীর মন্দিরের ন্যায় ইহাতেও বক্ররেখাবিশিষ্ট চিত্র থাকিলেও, আমাদের মনে হয় যে, এই বক্ররেখা আকস্মিক উপায়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা অত্যাবশ্যক নহে।

আমরা যে সকল মন্দিরের কথার আলোচনা করিয়াছি, সে সকলগুলিরই শিখর চতুষ্কোণ। এই চতুষ্কোণ শিখরের চারিটী পার্শ্বদেশ একটু কাটিয়া শিখরগুলির উন্নতি সাধন করা হয়। সারণ জিলার দান্দাশপুরের শিব-মন্দিরকে দৃষ্টান্তস্বরূপ (দশম চিত্র) গ্রহণ করা যাইতে পারে। মজঃফরপুরের রাধাকৃষ্ণ মন্দিরও (একাদশ চিত্র) এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই মন্দিরের প্রাচীরে দুইটী নির্গম গঠন করা হইয়াছে; ফলে, ছকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে পাঁচটী। দ্বাদশ চিত্রে চম্পারণ জিলার গণপৎরামের শিব-মন্দিরে সাতটী তলা এবং অষ্টভুজ শিখর দেখা যায়। এই শেষোক্ত বিষয়ে একাদশ চিত্রের রাধাকৃষ্ণ মন্দির ও এই শিব-মন্দিরে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। বিবর্ত্তনের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে কোন-কোন সময়ে শিখর ও ছকের সংখ্যার সম্বন্ধে ব্যতিক্রম ঘটে বটে, কিন্তু এই বিভিন্নতা কদাচিৎ ঘটে – সকল সময়েই নহে।

শিখর অষ্টভুজাকার হইতে গোলাকারে পরিণত হইয়াছিল; (ত্রয়োদশ চিত্র) মজঃফরপুরের সুবেসড়ের ভগবতী-মন্দিরে আমরা ইহাই দেখিতে পাই। কথিত হয় যে, নেপাল হইতে নির্ব্বাসিত এক ব্যক্তির দ্বারা এই মন্দির নির্ম্মিত হয়; এবং তজ্জন্যই ত্রিহুতের মন্দিরসমূহের বিবর্ত্তনের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই। এরূপ আর কোন মন্দির ত্রিহুতে নাই।

শিখরের আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া, এইবার আমরা গম্বুজের আলোচনা করিব। চতুর্দ্দশ চিত্রের গম্বুজের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই মন্দিরে আমরা দেখিতে পাই যে, সর্ব্বপ্রথমে প্রদর্শিত সোণপুরের মন্দিরে যে ভাবে প্রাচীর বিভক্ত হইয়াছিল, এ মন্দিরেও সেইরূপ পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। পঞ্চদশ চিত্রের গম্বুজের চিত্রটী দেখুন—চতুষ্কোণ বা গোলাকার গম্বুজ হইতে অষ্টভুজে পরিণত হইয়াছে।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়ের আলোচনা করিতেছি, তাহাতে ত্রিহুতের মন্দিরের আর কোন উন্নতি দেখিতে পাই না। অবশ্য আমরা উত্তর-ভারতের মন্দিরের ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস শেষ করি নাই; কিন্তু অবশিষ্ট ইতিহাস, কেবল যে সকল চিত্র দেখাইয়াছি, তাহাদেরই সহিত অল্পবিস্তর সংশ্লিষ্ট। মজঃফরপুরের হরৌলিস্থ হর-মন্দির (ষোড়শ চিত্র) দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, আমরা একই প্রকারের দুইটী মন্দির একস্থানে দেখিতে পাইতেছি। সপ্তদশ চিত্রে, সারণের শ্রীনগরের শিব ও ঠাকুর-মন্দিরেও সেই এক কথা—একই রকমের দুইটী মন্দির। এক্ষেত্রে বহুভুজবিশিষ্ট তলদেশ হইতে শিখর ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী চিত্র (অষ্টাদশ চিত্র) দেখিলে আমরা বিবর্ত্তনের অন্য এক চিত্র পাই—ইহা ছাপরা জিলার মোহান্ত ভগবান দাসজীর মন্দির। এরূপ ত্রিরত্ন-মন্দির ছাপরায় আর নাই।

এক-একটী মন্দির হিসাবে ত্রিহুতে আর পর্য্যালোচনার যোগ্য মন্দির নাই। কিন্তু দুই কি তিনটী মন্দির একই পীঠে থাকা ব্যতীত অন্য উন্নতিও সংঘটিত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, এই সকল মন্দির তিন অংশে বিভক্ত—দেবমূর্ত্তি রাখিবার কক্ষ, শিখর, ও জগমোহন। কিন্তু কোন-কোন স্থলে অলিন্দটী মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বারান্দায় পরিণত হইয়াছে। নেপাল রাজের অন্তর্গত—ত্রিহুতের সন্নিকটস্থ—কনকালি দেবী-মন্দির (ঊনবিংশ চিত্র) এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইতে পারে। অলিন্দকে বারান্দায় পরিণত করাতে, মন্দিরটী এক নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে মজঃফরপুরের সিওহরের শিবমন্দিরেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে (বিংশ চিত্র)। সারণ জিলার জগদীশপুরের রাধাজি-মন্দিরের শিখর গম্বুজাকৃতি হইলেও, মন্দির-নির্ম্মাণের মূল তত্ত্ব একই রহিয়াছে (একবিংশ চিত্র)। দ্বাবিংশ চিত্রে—বাংড়ার রামজী-মন্দির ত্রিশিখরবিশিষ্ট হইলেও সেই একই কথা। মজঃফরপুরের

আষাড়া-ঘাটের মহাদেব-মন্দিরে (ত্রয়োবিংশ চিত্র) একটী অলিন্দের পরিবর্ত্তে চতুষ্পার্শ্বে বারান্দা থাকিলেও, শিখর সম্বন্ধে কোনরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না। চতুর্ব্বিংশ চিত্রে মঙ্গলপুরের পঞ্চরত্ন-মন্দিরে—প্রথম চিত্রানুযায়ী (সোণপুরের) মূল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে—চারিটী কোণে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্দির-চতুষ্টয় শোভা পাইতেছে। প্রত্যেকটী কিন্তু সেই প্রথম চিত্রেরই অনুরূপ। তবে, পঞ্চরত্ন মন্দিরসমূহে মধ্যবর্ত্তী শিখর পার্শ্ববর্ত্তী শিখর-চতুষ্টয় অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর। পঞ্চবিংশ চিত্রস্থ বাংড়ার পঞ্চরত্ন মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী শিখর চতুর্থ চিত্রের ন্যায়—অন্যগুলি তৃতীয় চিত্রের ন্যায়। এবম্প্রকারে বৈচিত্র্য সাধন করা হইয়াছে। ইহাতেও পঞ্চরত্ন-মন্দিরসমূহের রূপভেদ দৃষ্ট হয়। ষড়বিংশ চিত্রস্থ ছাপরার পঞ্চরত্ন মন্দিরের চিত্রে শিল্পী সুকৌশলে মধ্যবর্ত্তী শিখর সমান্তরাল ও পার্শ্ববর্ত্তীগুলি সোজা গড়িয়াছে। কোণের শিখরগুলিতে আমরা পূর্ব্বের সেই মূল তত্ত্বেরই পুনরালোচনা দেখিতে পাই—যতগুলি ছক, ততগুলি শিখর। সারণ জিলার চৈনপুরের (সপ্তবিংশ চিত্র) পঞ্চরত্ন-মন্দিরে যদিও চিত্র হইতে মন্দিরের ছক দৃষ্ট হয় না, তথাপি মধ্যবর্ত্তী শিখরের সাতটী তলা দেখিয়া আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি; এবং চিত্র দৃষ্টে এইরূপ অনুমান করিলে, কার্য্যেও তাহাই প্রমাণিত হইবে।

ছাপরার অন্য একটী পঞ্চরত্ন মন্দিরের চিত্র (অষ্টাবিংশ চিত্র) যেখুনক প্রাচীনতা ইহাতে স্পষ্ট দেদীপ্যমান এবং ইহা দেখিতে অনেকটা য়ুরোপীয় গির্জ্জার ন্যায়। ইহাতে ফার্গুসনের উড়িষ্যার মন্দিরাবলীর সহিত বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নাই। এ মন্দির নির্ম্মাণে শুদ্ধ কিছুই নাই। সোণপুর মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া, বিবর্ত্তনের প্রভাবে ক্রমোন্নতিতে আমরা এই মন্দির পাই। প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই মন্দিরটীর সহিত য়ুরোপীয় অনেক প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ গির্জ্জার সাদৃশ্য রহিয়াছে। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকিলেও এই মন্দির ও য়ুরোপীয় গির্জ্জার মধ্যে অনেক প্রভেদ রহিয়াছে। ঊনত্রিংশ চিত্রস্থ রামনগরের মহাদেবের মন্দিরের সহিত রুসদেশের গির্জ্জার সাদৃশ্য রহিয়াছে।

ত্রিংশ চিত্রের গম্বুজটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। পরবর্ত্তী চিত্রে—মঙ্গলপুরের কনৌলির ঠাকুরবাড়ী—পার্শ্বের মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী স্থান এরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যে, পার্শ্ববর্ত্তী শিখর ও এইগুলি প্রায় একই ভাবাপন্ন হইয়াছে। ক্রমোন্নতি ধরিয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াই আমরা (দ্বাত্রিংশ চিত্রের) মঙ্গলপুরের অন্তর্গত নবরত্ন-মন্দির পাই। অবশ্য ইহাই ক্রমোন্নতির শেষ নহে। মঙ্গলপুরের রাম ও জানকী-মন্দিরই ক্রমোন্নতির শেষ—ইহাতে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অলিন্দ ব্যতীত সম্মুখে আরও একটী অলিন্দ দেওয়া হইয়াছে। ত্রিহুতের মন্দিরাবলীর অতঃপর আর কোন বিবর্ত্তন হয় নাই। *

* এই প্রবন্ধের জন্য ডাঃ স্পুনার এবং চিত্রগুলির জন্য বিহার ও উড়িষ্যার রিসার্চ্চ সোসাইটীর সহকারী সভাপতি মাননীয় ওয়াজল্ মহোদয়ের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ছবি

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত]

(১)

আগ্রার বিখ্যাত তাজ রোডের উপর একখানি বড়-বড় থামওয়ালা বাগান-বাড়ীতে ফাল্গুনের এক সকাল বেলায় একজন দীর্ঘ শ্বেত-শ্মশ্রু বৃদ্ধ মুসলমান ওস্তাদ তাঁহার ছাত্রী একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বাঙ্গালী মেয়েকে গান শিখাইতেছিলেন। কিশোরী ছাত্রী এস্রাজের মিঠে সুরের সঙ্গে আপনার মিঠে গলা মিলাইয়া গাহিতেছিল—

"কি জানি কবহু সখি স্বপনে কি জাগরণে
কৈছন দরশন ভেলি।

অপরূপ সো রূপ হিয়াপর রোপিনু
নয়নে নয়ন রূপ মেলি।"

"ওয়া—ওয়া,—ঠিক্ হুয়া—বাঃ!"

নিমীলিত নয়নে বৃদ্ধ ওস্তাদ খাঁ-সাহেব দাড়ি নাড়িয়া মাথা দুলাইয়া গর্ব্বভরে বলিলেন,—"ঠিক্ হুয়া!"

গুরুজীর প্রশংসায় ছাত্রীর এস্‌রাজের ছড়ি থামিয়া গেল। মুখ তুলিয়া বালিকার মত হাসিয়া প্রশংসা-গর্ব্বে পুলকিত কণ্ঠে আবার গাহিল—

"না জানি সজনি কো সো চিতচোরা
হাসি হরল মঝু হৃদয় বিভোরা।

না ওস্তাদজী, ঠিক্ হচ্ছে না। আপনি একবার গাইয়ে দিন।"

"নেহি খোকী, বহুৎ ঠিক হুয়া!" বলিয়াই আবার ওস্তাদজী চক্ষু বুজিলেন, ও মাথা নাড়িতে লাগিলেন। মৃদু হাসিয়া 'খোকী' আবার এস্‌রাজে ছড়ি বুলাইল। আবার থামিল। কিশোরী কোল থেকে এস্‌রাজ নামাইয়া রাখিল।

"ক্যা হুয়া?"

"আমি আর গাইব না, ওস্তাদজী।"

"কাহে খোকী, তবিয়ৎ কুছ্ মান্দা হায়?"

ছাত্রী এ প্রশ্নের কোনই উত্তর দিল না। বাহিরে এক-দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। ওস্তাদ বলিলেন, "হুঁয়া কি সুর মিলি? কেয়া দেখতী হো?"

কিশোরী এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "এ গান আমি গাইব না।"

"পহেলা এহি গান তু পসন্দ কিয়েথী, মাঈ। ইয়ে তো আচ্ছা গান, বহুৎ মিঠি গান, তোমারা-কিষণজীকা গান। সব বাঙ্গালী লোক তু এহি গান পসন্দ করতা।" বলিয়াই বৃদ্ধ চক্ষু মুদিয়া মাথা দোলাইয়া মধুর অথচ গম্ভীর পরুষ কণ্ঠে গাহিলেন—

"না জানি সজনি কো সো চিতচোরা
হাসি হরল মঝু হৃদয় বিভোরা।"

ছাত্রী সঙ্গে-সঙ্গে তখনি এস্‌রাজ ধরিয়া গাহিল—"না জানি—" একছত্র গাহিয়াই দুষ্ট ছাত্রী বলিল, "তার পর কি ওস্তাদজী?—ভুলে গেছি!"

ওস্তাদজী ধরাইয়া দিলেন—"বিজুরি চমক—"

"ওঃ" বলিয়া কিশোরী গাহিল—

"বিজুরি চমক সম আওত যাওত,
মরম দহিয়ে কিয়ে কেলি।"

শেষ কলি গাহিবার সঙ্গে-সঙ্গে কিশোরীর চক্ষু দুটি ছল-ছল করিয়া উঠিল। ওস্তাদ সে ভাব লক্ষ্য না করিয়া, মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা, বাচ্চা!—কেয়া তারিফ্। ফিন্ এক দফে গাও।"

কিশোরী গাহিল,

"কি জানি করহু সখি স্বপনে কি জাগরণে
কৈছন নয়ন ভেলি।
অপরূপ সো রূপ হিয়া পর রোপিনু
নয়নে নয়ন রূপ মেলি।
না জানি সজনি কো সো চিতচোরা
হাসি হরল মঝু হৃদয় বিভোরা।
বিজুরি চমক সম আওত যাওত
মরম দহিয়ে কিয়ে কেলি॥

আর কিন্তু গাব না, ওস্তাদজী।" বলিয়া অবাধ্য ছাত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল।

থামওয়ালা বারাণ্ডার সম্মুখে বাগানের মধ্যে লাল সুরকীর সরু রাস্তায় একজন প্রৌঢ় বাঙ্গালী ধীরে-ধীরে পায়চারী করিতেছিলেন। বালিকা উঠিয়া দাঁড়াইলে, তিনি বারাণ্ডার সিঁড়ির কাছে আসিলেন; বলিলেন, "কেন আর গাইবে না, মা? অসুখ করেছে না কি?"

"না—না—আচ্ছা, গাইছি বাবা।"

পিতা বলিলেন, "যখন ইচ্ছে নেই, তখন আজ থাক্। এস মা, আমরা বাগানে বেড়াই। ওস্তাদজী, আজ আপনার ছাত্রীটিকে ছুটি দিন।"

ওস্তাদজী হাসিলেন। "বহুৎ আচ্ছা, বাবু-সাহেব। লেকেন ছোটি খালি আজ কা ওয়াস্তে!—হা—হা—হা—"

হাসিতে বারাণ্ডা ভরিয়া গেল। ছাত্রী লজ্জায় চক্ষু নত করিয়া, তখনই আবার সে চকিত ভাব ভুলিয়া, পিতার হাত ধরিয়া দুটি আঙুল টানিয়া বাগানের মধ্যে লইয়া গেল। বৃদ্ধ ওস্তাদ দেখিলেন, ফাল্গুনের প্রভাত-কিরণে বাগানে একটী নূতন সজীব গোলাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বেড়াইতে-বেড়াইতে কিশোরী হঠাৎ বলিল, "বাবা!"

"কি, মা?"

"বাবা, তুমি আমায় বল—বীণা, মা বলে—খুকী, ওস্তাদজী কখনো বলে—মায়ি, কখনো বলে—খোকী।—আমার কোন্ নামটা ঠিক? আচ্ছা, আমরা তো বাঙ্গালী? কই, বাঙ্গালী মেয়েদের 'বীণা' নাম তো কোন বইতে দেখি নি! আগ্রার বাঙ্গালীদের আমাদের মতন কাউকে তো দেখি নি! দু'চারজন যা দেখেছি, তারাও এই আগ্রাওয়ালা হয়ে গেছে। সে দিন দেখ্‌লে না? একজন এসেছিল, তোমাকে ডাকলে—'বাবু হো।' আমি তো ভাবলুম,—হিন্দুস্থানী, মাথায় টুপি, কেমন লম্বা গোঁফ, কেমন বাঁকা-বাঁকা বুলি; বলে—হা—হা—হা—হামারা নাম, ডাগ্‌তর বাবু, হামারা নাম—গণেশ চন্দোরটি আছে। হা—হা—হা! আবার বলে কি না, সে বাঙ্গালী। বাঙ্গালীরা বেশ!—বাঙ্গালাদেশ কতদূর, বাবা?"

"বাঙ্গলায় যাবে মা? কিন্তু সেখানে তাজ নেই, যমুনা নেই।"

"না থাক, অনেক কিছু আছে ত! ধূ ধূ যেন স্বপ্নের মত মনে পড়ে—সেই কল্‌কাতার কথা। আমাদের বাড়ীতে কত লোক আস্‌তো। বড় বড় মেয়েরা—মার মত, ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা—আমার মত সেজে-গুজে। তাদের সঙ্গে খেল্‌তুম—মনে পড়ে। এখন তারা নিশ্চয়ই আমারি মত বড় হয়েছে, ভুলে যাচ্ছে। আমি থাক্‌লে, আমিও এক সঙ্গে যেতুম!"

"গেলে তুমি খুসী হও মা? আচ্ছা—আচ্ছা, আমরা যাব।"

"বাবা!"

"কি মা?"

"গানটি কি চমৎকার! ও তো বাংলা গান নয়, তবু এত সুন্দর কেন? হিন্দুস্থানী গানের চেয়ে বাঙ্গলা গান আমার গাইতে ভাল লাগে। এখন হতে আমি বাঙ্গলা গানই গাইব। আমিও অমনি গান রচনা করব।"

পিতা স্নেহভরে হাসিয়া বলিলেন, "সেই জন্যেই ত তোমার নাম বীণাপাণি রেখেছি।"

"বীণাপাণি, সরস্বতী, শ্বেতবরণা, শ্বেত-পদ্মাসনা—বাবা, সরস্বতীর মূর্ত্তি ছবিতে আঁকব। লতা-পাতা, কুকুর, বেরাল, ছাই-ভস্ম—এসব আর আঁকব না। দেখ বাবা, কি চমৎকার রোদ উঠেছে, সমস্ত বাগান যেন হাস্‌ছে। ছাদের উপর উঠে এই সময় তাজের চূড়া কি চমৎকার দেখায়! আমি বসে-বসে তাই ভাবি—এ তাজ কে গড়লে! এত সুন্দর! আমার ইচ্ছে করে, বাঙ্গালীরা সব এসে এই তাজ দেখুক। সবাই কেন আসে না বাবা?"

এমন সময় বেহারা আসিয়া খবর দিল—"খোকী বাবুকে মায়ি ডাকছেন।"

বেণী ঘোলাইয়া বীণা মাতার কাছে ছুটিল—যেন বালিকাটী। স্নেহমুগ্ধ নেত্রে পিতা চাহিয়া রহিলেন। বীণা চলিয়া গেলে, মিঃ মুখার্জ্জি একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আবার পায়চারী করিতে লাগিলেন।

(২)

বৎসরের পর বৎসর অতীত হইয়া আজ পূর্ণ সপ্ত বৎসর এই প্রবাসী বাঙ্গালী, দেশ, সমাজ, আত্মীয়স্বজন, ঐশ্বর্য্য, প্রতিপত্তি—সব পরিত্যাগ করিয়া, বাঙ্গলার সকল সম্পর্ক মুছিয়া আগ্রায় আসিয়া বসতি করিয়াছেন। এই প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবারের আত্ম-কাহিনী ওই দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত গভীর, নীরব ও মর্ম্মভেদী।

আগ্রার অতীত ইতিহাসের মত এই পরিবারের কলিকাতার জীবনও ঐশ্বর্য্যে, গরিমায়, প্রতিষ্ঠায়, আভিজাত্যে এক অতীত ইতিহাস।

শীর্ণা যমুনাতীরে অতীতের স্মৃতি, অতীতের সাক্ষী ওই তাজ এই প্রবাসীর প্রবাসগৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কিশোরীর মতই স্বপ্নময়ী। স্বপ্নময়ী, প্রিয়স্মৃতিবিহ্বলা, শুভ্র, পূত-বসনা, ধ্যানমগ্না তাজ এমনি চিরদিন যমুনা-বক্ষে বিরাজ করুক, আর বাঙ্গালার পবিত্রতা, শুভ্রতা, ধ্যানমগ্নতা এমনি চিরদিন বাঙ্গালার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকুক।

আগ্রার যে অংশে এই তাজ রোড—ইহা বাদশাহী আমলের সহর আগ্রা হইতে কিছু দূরে। এই অংশে বাংলো, বাগান, রাস্তা, রোড কক্‌ঝকে, তক্‌তকে, খোলা-মেলা। আর প্রাচীন অর্থাৎ বাদশাহী আমলের আগ্রা? সেই সরু-সরু গলি, গায়-গায় বাড়ী—ঘিন্‌জি, ঘিন্‌ঘিনে। মুসলমান-প্রধান আগ্রার এই অংশে বেড়িলে মনে হয়, ইহা যেন সেই সেকালের হারুন-অল্‌রসিদের বোগদাদ্ সহর—অধুনা জীর্ণ, পূতিল। আর চালচলন, হাবভাব, আদব-কায়দা, খানাপিনা, পয়জার-পায়জামা সেই রসের

বাদসাহী ডোলের। নূতন এবং পুরাতন এই উভয় আগ্রাই পাশাপাশি দাঁড়াইয়া; কিন্তু যেন ব্যবধান একটা দীর্ঘ সহস্র শতাব্দীর।

আগ্রায় বাঙ্গালীর সংখ্যা অতি অল্প। যা দু'চারজন আছে, তা' সেই প্রাচীন আগ্রায়,—এই মলরোড বা তাজরোডের দিকে মোটেই নাই। একমাত্র ডাক্তার মুখার্জ্জিই এই অংশের বাঙ্গালী অধিবাসী, আর সব সাহেব-সুবা। সুতরাং এই প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবারের প্রবাস-জীবন সত্য-সত্যই প্রবাস-জীবন।

আজ ফাল্গুনের প্রভাতে আগ্রার এই প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবারের প্রথম প্রবাস-ব্যাকুলতায় বাঙ্গালার সুখ-দুঃখের অতীত কাহিনী, সুখ-দুঃখের স্মৃতি প্রভাতের আলোর মতই তাঁহার মনে চমকিয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তার পর স্নেহমাখা একটু করুণ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"বীণা এখনো বালিকাটি!" সঙ্গে-সঙ্গে মিঃ মুখার্জ্জির অন্তরের গভীর প্রদেশ হইতে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস উত্থিত হইল—"গত যা গত হয়েছে। বীণার কলিকাতার কথা কিছুই মনে নাই।"

৩

"মা, তোমরা এত ভাব কি? বাবাও ভাবেন, তুমিও ভাব। বাবার চেয়েও তুমি বেশী ভাব। কেন, কি হয়েছে?"

মা স্নেহগম্ভীর মুখে বলিলেন, "তুমি আর তেমন হাস না, বাগানে ছুটোছুটি করো না, চীৎকার করে সুর করে হাফেজ পড় না, আমার উপর তেমন আর দৌরাত্ম্যি কর না, আমার কাছে বাংলা বই পড়তে চাও না—"

কৃত্রিম অভিমানের অভিনয় করিতে-করিতে সত্য-সত্যই মাতার হৃদয়ে অভিমান আসিয়া পড়িল। বীণা মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, যে বক্ষের সুধা পান করিয়াছে, সেই সুধাসিক্ত বক্ষে মুখ লুকাইয়া বলিল, "মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা।"

নীরবে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। মা আস্তে-আস্তে কন্যার মুখে স্নেহকর বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "মেয়ের চেয়ে ছেলেরা মাকে বেশী ভালবাসে।" বলিয়াই কন্যার মুখ-চুম্বন করিলেন—"এই যে—এই যে আমার ছেলে—আমার খোকা!"

বীণা আদরে কুটিয়া ঢল-ঢল নয়নে মায়ের মুখ পানে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—"ও—বুঝেছি—বুঝেছি—তাই বুঝি মা ছেলের ছবি লুকিয়ে রেখেছিলে, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখ্‌তে!"

"লুকিয়ে রেখেছি কি রে?"

"তোমায় বলব কেন? তুমি তো আমায় বলনি।"

মাতা বিস্মিতা হইলেন। তার পর ভাবিলেন। সেই যে ক্ষুদ্র শিশু পুত্রটি একদিন তাহার কোলে আসিয়াছিল, বীণা তাহারই কথা বলিতেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, কন্যাটি কক্ষে নাই।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া বীণা একবার চারিদিকে চাহিল। বেলা দ্বিপ্রহর; রৌদ্র ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে; কিন্তু এখনো তত প্রখর নয়। কি যেন ভাবিয়া, একবার মৃদু হাসিয়া মুক্ত চিকুর দোলাইয়া কৌতুকময়ী আপন কক্ষের দিকে চলিল। সবুজ পরদা সরাইয়া দিয়া কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল।

এইটি বীণার নিজের ঘর।—যেন ছোটখাটো একটা একজিবিশন্। কিন্তু একটু এলোমেলো, জিনিসপত্র যেখা-সেখা ছড়ানো,—যেন বহু যত্নের জিনিস আদরে হাতে তুলিয়া লইয়াছে, কিন্তু তাহার ভিতর মনের মতন কিছু পায় নাই বলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। যেন এই সব খেলনা—কাগজের ফুল লতা পাতা তোড়া, মাটির কল, কুকুর বেরাল পাখী, শাদা কালো পাথরের ছোট ছোট তাজ মস্‌জিদ—যেন কৃত্রিম এই সব খেলনাগুলির কৃত্রিমতা ধরা পড়িয়াছে। পিয়ানো, গ্রামোফোন, এস্‌রাজ—তারাও অনাদরে। সেলাইয়ের খড়ের চুপড়ি মেজের কার্পেটের উপর ঢাকা-খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালা মাসিকপত্রগুলি কোনখানা সোফায়, কোনখানা বিছানায়, কার্পেটে, টেবিলে পাতাছেঁড়া, কোনখানা বা আধখোলা ছড়াইয়া রহিয়াছে। এত অনাদর কেন? যে যত্নে, যে আদরে, যে ভালবাসায় এই সব সজ্জা করা হইয়াছিল—কোথায় গেল? কে আসিয়া লুঠিয়া লইল? এতদিন সে কোথায় লুকাইয়া ছিল? বুঝি এই গৃহেই ছিল, কিন্তু দেখা দেয় নাই!

বীণা কক্ষে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল,—কি করিবে। একবার একখানা বই তুলিয়া

লইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। সেলাইয়ের বাক্সটাকে আরো ওলট্-পালট করিল। আবার চারিদিক চাহিয়া এস্‌রাজ লইয়া বসিল। বসিয়া অন্য মনে বাজাইল—

"বিজুরি চমক সম আওত যাওত।"

সঙ্গে-সঙ্গে বীণা অন্যমনা হইয়া এস্‌রাজ রাখিয়া দিল। তার পর গ্রামোফোন লইয়া বসিল। বীণার আবদারে কয়েক দিন হইল মিঃ মুখার্জ্জি কতকগুলি বাঙ্গলা গানের নূতন রেকর্ড আনাইয়া দিয়াছেন। সেগুলিও তেমনি ছড়াইয়া ফেলিতে-ফেলিতে একখানি গান পছন্দ করিল। রেকর্ড গাহিল—

কি জানি কখন সে আসে,
নিশিদিন পথ পানে চেয়ে থাকি তারি আশে।
জানিনে কে কেন আমায় চায়,
থাকে সে কোথায়,
শোনে না কোন কথা উধাও হয়ে ধায়,
ধরতে ভরি তায়,
সোণার স্বপন সাধের ছবি পাছে ভেঙ্গে যায়।
চাঁদের আলোয় কখন লুকোয়
মিশিয়ে যায় ফুলের বাসে।
(আমায়) ঘোরায় বেন খেলার ছলে
মন বলে সে ভালবাসে॥

গান শেষ হইলে বীণা বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিল—গ্রামোফোন আমার মনের কথা কি করিয়া জানিল?

৪

রাত্রি হইয়াছে। একটু বেশী হইয়াছে। মলয়োভের বাংলোয়-বাংলোয় দিয়াশো নীরব হইয়াছে। হাসি, গল্প, খানাপিনা শেষ হইয়াছে। এখন বাড়ীগুলি নীরব, নিস্তব্ধ কেবল নিভৃত কক্ষে এখন নিভৃত কাহিনী। দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে, শুধু যাহারা জাগিয়া, তাহাদের দীপ এখনো নিভে নাই। সে কেবল দু-একটী বাংলোয় মাত্র। মিঃ মুখার্জ্জির বাংলোয় এখনো আলো জ্বলিতেছে। মিঃ মুখার্জ্জি ড্রয়িং-রুমে জাগিয়া। মুখে চুরুট। পার্শ্বে মিসেস্ মুখার্জ্জি; কক্ষে আর কেহ নাই। বীণা আপন কক্ষে নিদ্রিত কি জাগরিত, অন্ধকারে দেখা যায় না।

স্ত্রীর কথা সমাপ্ত হইতে-না হইতেই মিঃ মুখার্জ্জি টেবিলের উপর অর্দ্ধ-দগ্ধ চুরুট রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমারই কথায় আমার আগ্রায় আসা। আমি তখনই আবার বীণার বিবাহ দিতুম, কিন্তু তুমি দিতে দিলে না। তোমার ভয় সমাজকে;—কি, বিধবার বিবাহ! আমি সমাজের ভয় করিনে, লোকের কথায় আমার কিছুই আসে যায় না।"

"সমাজ-ভয় নয়, ধর্ম্মের ভয়! আরো একটা কথা—যখন বুঝলুম, তুমি নিশ্চয়ই বে দেবেই, তখন ভাবলুম, কলিকাতায় থাকলে বীণা সবই জানতে পারতো, সবই শুনতো, সবই বুঝতে পারতো। এই জন্য তোমায় আগ্রায় আসতে বলেছি। ভেবেছিলুম, দূর দেশে সমুদ্র সব কথা ভুলে যাবে। কিন্তু আমার এখনো ভয় যায় নি, বিবাহের স্মৃতি হয় তো বীণার মনে আছে। যত ছোট থাক, তবু এ স্মৃতি যায় না। আমার ভয় হচ্ছে, কিছুদিন ধরে বীণা যেন সে বীণা নাই; কি যেন ভাবে, ডাকলে চমকে ওঠে, আবার তখনই চোখ দুটি নীচু করে। এত পরিবর্ত্তন বীণার মত চরিত্রের মেয়ের সহসা কেমন করে হ'ল? তুমি পুরুষমানুষ, তুমি তো পারবেই না,—আমি মেয়েমানুষ, আমিই বুঝতে পারছি না।"

"মেয়েমানুষের সূক্ষ্ম বুদ্ধি কি না; অর্থাৎ তোমার ইচ্ছে নয়, বীণার বিবাহ হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আবার তুমিই বলছ, বীণার বিবাহের সময় হয়েছে!"

"দেখ, অমন ক'রে আমায় বলো না। দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! আমি যে কেন বেঁচে আছি, কেমন ক'রে বেঁচে আছি—"

"আবার ঐ কথা!"

"রাগ করো না। মেয়েমানুষ যদি হ'তে, তবে বুঝতে—বুঝতে—এত দুঃখেও বেঁচে থাকতে হয়!"

ভূমিকম্পের আলোড়নের মত মিঃ মুখার্জ্জির সমস্ত অন্তর আলোড়িত হইয়া উঠিল; তিনি বেদনায় অধীর হইয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িলেন। সে ব্যথা প্রকাশ করিবার মত কথা মুখে যোগাইতেছিল না।

স্ত্রী স্বামীর হাত ধরিয়া আবার চেয়ারে বসাইলেন, এবং আপনি স্বামীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, কাণের কাছে মুখ আনিয়া, অতি কোমল স্বরে বলিলেন, "এখন বীণার

বিবাহের সময় হয়েছে। যদি বিয়ে দিতে হয়, শীগ্‌গীর সম্বন্ধ ঠিক কর।"

"হাঁ, করব। কিন্তু আর চোখের জল ফেলো না। কে বলে আমার মেয়ে বিধবা? শীগ্‌গীরই ঠিক করব। কিন্তু আমার বড় ইচ্ছা ছিল, বীণা নিজের বর নিজেই পছন্দ করে নেয়।"

"তা বেশ ত। পাত্র ঠিক কর, বীণার যদি পছন্দ হয়, তবেই বিবাহ হবে।"

"দেখ, বাঙ্গালায় আর খোঁজ করব না। সেখানে খুঁজতে গেলে, ভারি গোলমাল হবে। বীণার সে বিবাহের কথা এখনো ত অনেকেরই মনে আছে,—আবার খুঁজতে হ'লে, তাদের দ্বারাই খোঁজ করাতে হবে। তাই ভেবেছি, এই প্রবাসে আমাদেরই মত প্রবাসী বাঙ্গালীর ছেলের সন্ধান করব।"

মিসেস্ মুখার্জ্জি স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বেশ ত।"

"দেখ, আমার আর কে আছে? বীণাই আমার সব, সবই আমার বীণার। ছেলে আমাদের কাছেই থাক্‌বে।"

"এমনটি পাবে?"

"কেন পাব না?"

সহসা মিঃ মুখার্জ্জির মুখ আবার গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। এমনটিই ত একদিন পাইয়াছিলেন। অনিন্দ্য সুন্দর সেই কিশোর কুমার না-ডাকিতে, না খুঁজিতেই তো তাঁহার গৃহে আসিয়াছিল! দরিদ্র, পিতৃমাতৃহীন—আসিয়াছিল, যদি পড়াশুনার কিছু সুবিধা হয়, এই আশায়। সে আশা বিফল হয় নাই। কিশোর অতিথি প্রথম দর্শনেই এই পুত্রহীন পিতার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। পুত্রের স্থান অধিকার করিয়াই সে চিরদিন তাঁহার গৃহে অবস্থান করুক, পুত্রের মত চিরদিন লালিত-পালিত, শিক্ষিত হউক, —স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আনন্দে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। দেবকুমারের সহিত বীণার বিবাহ হইয়া গেল। এই বাল-দম্পতির খেলা-ধূলা, কলহ-মিলন, হাসি-কান্না দেখিয়া প্রবীণ দম্পতি আনন্দে বিভোর হইলেন। কিন্তু সে আনন্দের হাট বসিতে-না-বসিতেই ভাঙ্গিয়া গেল; বালিকা বীণা বিধবা হইল।

এই করুণ পূর্ব্বস্মৃতি মনে উদিত হওয়ায়, মিঃ মুখার্জ্জির মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। কিন্তু তিনি সে স্মৃতি দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া, বীণাকে পুনর্ব্বার দাম্পত্য-বন্ধনে সুখী করিতে চান।

(৫)

বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে একটা রমণীয় কাল আছে, যাহাকে কবিগণ বয়ঃসন্ধি, কৈশোর প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই বয়ঃসন্ধির কালের মনস্তত্ত্ব অতীব জটিল। জাগরণ ও সুষুপ্তির মাঝে যেমন স্বপ্ন, এ বয়সও তেমনি। আপনি যেমন স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, সংসারকেও তেমনি স্বপ্নময় দেখে। স্বপ্নরাজ্যে যেমন যুক্তির বাঁধাধরা কোন নিয়ম নাই, কেবল কল্পনার অবাধ বিহার,—এ বয়সও তেমনি কোন লাগাম মানে না, আপনার খেয়ালে চলে। নহিলে বীণা একখানি ছবি লইয়া এমন বিভোর হইবে কেন?

দরজা বন্ধ, কক্ষে এখনো আলো জ্বালা হয় নাই। কেবল খোলা জানালা দিয়া যেন কিশোরীর এই নিভৃত কক্ষের রহস্য হাসিবার জন্য জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। বীণা সেই খোলা জানালার কাছে একখানি ছবি লইয়া বসিয়াছে। তোমার-আমার কাছে চাঁদের আলোয় সে ছবিখানি বাহিরের ঐ আলো-ছায়ার ছবির মতই অস্পষ্ট। কিন্তু বীণার কাছে তাহার চেহারা বুঝি পরিস্ফুট; নহিলে বলিতেছে কেন—"বল না, কোথায় তোমায় দেখেছি? তুমি কে? আমি দিন-রাত তোমার কথা ভাবি। মনে করতে পারি নি, তোমায় কোথায় দেখেছি,—কিন্তু দেখেছি নিশ্চয়। কিন্তু তখন কি তুমি এত সুন্দর ছিলে? সে কি স্বপ্ন? না—না, স্বপ্নে নয়—স্বপ্নে নয়। কিন্তু তোমায় দেখ্‌তে-দেখ্‌তে মনে হয়, তুমি স্বপ্নেরই মানুষ। তোমার চোখ দেখে মনে হয়, তুমি যেন আমার কাছে কি চাও। মুখ দেখ্‌লে মনে হয়, যেন কি বলি-বলি কর। বল না, কি চাও? চাঁদের আলোর মত, ফুলের গন্ধের মত কেন তুমি আমাকে দিন-রাত ঘিরে রেখেছ? আর আমায় কত দোঁকায় রাখ্‌বে? বল, বল—তুমি কে? কোথায় তোমায় দেখেছি? কি তুমি চাও?"

এই ছবির কথাই বীণা মাকে সে দিন বলিয়াছিল, "বুঝেছি, বুঝেছি—তাই বুঝি মা ছেলের ছবি লুকিয়ে রেখেছিলে—লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখ্‌তে!"

কিন্তু সে কথা বীণার নিজেরই মনের কথা। মাতার একখানি অযত্ন-রক্ষিত পুস্তকের ভিতর হইতে এই ছবি বীণাই আবিষ্কার করিয়াছে। আবিষ্কারমাত্রেই ছবি তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে। সেই অবধি সে নিজের কক্ষে একটী ছোট চন্দন-কাঠের কৌটায় অতি সন্তর্পণে ছবিখানি লুকাইয়া রাখিয়াছে, এবং সময়ে-অসময়ে লুকাইয়া লুকাইয়া দেখে।

ছবির পানে চাহিয়া বীণা আবার বলিতে লাগিল—"সে দিন স্বপ্নে তুমি আমায় দেখা দিলে। আমি আগ্রহে ছুটে তোমায় ধরতে গেলুম; কিন্তু তুমি হাস্‌তে-হাস্‌তে যেন চাঁদের আলোয় মিলিয়ে গেলে। তুমি কেন এ লুকোচুরি খেল? তোমায় দেখে আমার কত কথা মনে হয়। মনে হয়, যেন কোথায় তোমায় হারিয়ে ফেলেছি, আর কি খুঁজে পাব না? তুমি কে জানিনে, কিন্তু মনে হয়—তুমিই আমার সব,—তুমি আমার বড় আপনার। তোমায় ভালবাসতে ইচ্ছে করে কেন—বাসি, বাসি, তোমায় ভালবাসি। তুমি কি তা বুঝতে পার না? ছবি—ছবি—তুমি কি শুধুই ছবি?"

ঠিক এই সময় বীণার মাতা ডাকিলেন, "বীণা!"

বীণা তাড়াতাড়ি ছবিখানি বক্ষান্তরালে লুকাইয়া ধরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্ধকারে একলা বসে কি কচ্ছিলে মা? ঘরে আলো জ্বালতে বল নি কেন?" বীণা শুধু বিহ্বল নেত্রে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

(৬)

আজ বীণার ভাবী বর আসিবে—বীণাকে দেখিতে এবং দেখা দিতে। ছেলেটি রাজপুতানা—উদয়পুরে থাকে। আজ তিনপুরুষ ধরিয়া উদয়পুরে তাহাদের বাস। সুতরাং একেবারে খাঁটি প্রবাসী। ছেলের বাপ উদয়পুর রাজসরকারে বড় চাকুরে ছিলেন। কিন্তু বড় বেশী খরচে ছিলেন বলিয়া, বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ছেলেটি উদয়পুর কলেজ হইতে সম্প্রতি বি-এ পাস করিয়াছে। বয়স বছর চব্বিশ।

এখন বর্ষা সুরু হইয়াছে। যমুনার জল বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে; এবং স্রোতও ক্রমশঃ খরতর হইয়া উঠিতেছে। আকাশে নবীন, সজল মেঘের আনাগোনা হইতেছে। মাঝে-মাঝে বর্ষণ ও গর্জ্জন চলিতেছে।

এমন দিনে বীণার ভাবী বর আসিবে। কিন্তু বীণা সে কথা জানে না; শুধু জানে, কে একজন আসিবে।

"মা, মা, কে আসবে?"

মাতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কে আবার আসবে! কে তোমায় বল্‌লে?"

"আসবে না?" বলিয়াই বীণা স্খলিত আঁচল কাঁধে তুলিয়া দিয়া গমনোদ্যত হইল। মাতা মেয়ের ভাবখানা দেখিয়া মনে-মনে হাসিয়া বলিলেন, "কি পাগ্‌লী মেয়ে! এই বালিকা, এই প্রবীণা!"

বীণার পিতা-মাতা বীণাকে,—আজ কে আসিবে, কিছুই এখনও বলেন নাই। বলিবার অবসর বুঝিয়া মাতা ডাকিলেন, "মা!"

মনোহর সাজে সজ্জিতা বীণা মহিমময়ী দেবী-মূর্ত্তির মত ফিরিয়া দাঁড়াইল। নয়নে কোন অজ্ঞাত রাজ্যের উদাস দৃষ্টি, মুখে কি এক অপার্থিব মাধুরী! মাতা স্নেহ-মুগ্ধ নেত্রে সে দেবীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। কি বলিবেন, ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গেলেন, তিনি এই সুখ-দুঃখ পূর্ণ মর্ত্ত্যে, না শান্ত-স্নিগ্ধ, চির-জ্যোৎস্নার কোন্ অপূর্ব্ব লোকে! মাতাকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, বীণা মৃদু হাসিয়া বলিল, "মা, ও কি! চেয়ে রইলে যে! কি দেখছ?"

'দেখছি—সংসার স্বর্গ, না মর্ত্ত্য।' মনে-মনে কন্যার প্রশ্নের উত্তর দিয়া, সস্নেহে তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, "আজ আমাদের বাড়ীতে একজন বেড়াতে আসবে। তার আদর যত্নের ভার তোমার উপর। দেখো, যেন কোন ত্রুটি না হয়।"

"ও—তাই বুঝি এত সাজ-সজ্জা, এত আলো জ্বালা! কে সে?"

"এলেই দেখ্‌তে পাবে। দেখ না গিয়ে, এঁলো কি না?"

বীণা ছুটিয়া বাহিরে আসিল। আলোয় আলো বড়-বড় থামওয়ালা বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া, এদিকে-ওদিকে, বাগানে-রাস্তায় চাহিয়া দেখিল, কেউ কোথাও আসে নাই।

একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বাগানের ভেজা লতা-পাতায় গৃহের উজ্জ্বল আলোকরশ্মি নিপতিত হওয়ায় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। স্নিগ্ধ সজল হাওয়া, বাগান

হইতে সদ্য-ফোটা চামেলীর গন্ধ বহিয়া আনিয়া বীণার রঙিন্ সাড়ীতে মাখাইয়া দিতেছিল। অজানা অচেনা, অভিনব এক সুখস্পর্শে বীণার মনে সহসা তাহার ছবির মুখ ভাসিয়া উঠিল।

বীণা আপন আলোকোজ্জ্বল সজ্জিত কক্ষে ছুটিয়া গেল,—যেন তাহার দর্শন আশায়। কিন্তু ব্যর্থ আশা! অভিমানে বীণার বুক ভরিয়া উঠিল। কক্ষের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিল। তার পর পিয়ানোয় গিয়া বসিল। পিয়ানোর সুরে গাহিল—

আমি নিশি দিন কত তব পথ চেয়ে
　　কেবলই ঘিরিয়া আসে।
বাঁধিয়া রাখিব বিকল হৃদয়
　　বিকল বাসনা-পাশে।
নিতি নিতি কত করিয়ে গোপন
　　বিরহ শয়নে রচিব স্বপন,
অবিরত কত করিব যাপন
　　আপন ছলনা ভাবে॥
মনে মনে ফুল তুলি বনে বনে
　　ভরিয়ে সাধেরি ডালা,
সুখেরি বাসর সাজায়ে যতনে
　　শুধু আঁখিজল ঢালা॥
স্বপনে স্বপনে দিন বয়ে যায়
　　দুরু দুরু হিয়া আশা নিরাশায়,
ব্যাকুল পিয়াসা তারি পানে ধায়
　　অভিমানে ফিরে আসে॥

বীণা বিভোর হইয়া গাহিতেছে। কক্ষের বাহিরে দ্বারে কাহারা দাঁড়াইয়া, সেদিকে মোটেই লক্ষ্য নাই। গান শেষ হইলে সে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল। অপরিচিতের সম্মুখে একটু সঙ্কুচিত হইয়া, বীণা মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল। মিঃ মুখার্জ্জি সঙ্গী যুবককে বলিলেন,—"এইটি আমার মেয়ে।"

যুবক অন্যমনস্ক ছিল, মিঃ মুখার্জ্জির কথা শুনিতে পায় নাই। মিঃ মুখার্জ্জির সম্ভাষণে একটু চমকিয়া বলিল, "আজ্ঞে?—ও—"

মিঃ মুখার্জ্জি আবার বলিলেন, "এইটি আমার মেয়ে।"

যুবক মৃদু হাসিয়া বীণার উদ্দেশে নমস্কার করিল। কিন্তু বীণা প্রতি-নমস্কার করিতে পারিল না,—কেমন থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু আজ তাহার সংজ্ঞা এ কি ভাব! কোমল হাতখানি বুকের উপর রাখিয়া, সে যেন কি আঘাত সামলাইতেছে। কর ধীরে-ধীরে বক্ষোপরি সঞ্চালিত হইতেছে। বীণা ভাবিতেছে,—এ কি! এ কি! আমার বুকের ভেতর এমন কাঁটা ফুটলো কেন? আহত বীণা সে আঘাত সামলাইতে সামলাইতে কোন রকমে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—এ এমন ক'রে চায় কেন? সে ত এমন ক'রে চায় না। এর চাউনিতে আমার মনে যেন কি হচ্ছে। কি হচ্ছে, ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে; কিন্তু বড় ব্যথা পেয়েছি। তার চাউনিতে ত এমন হয় না। সে চাইলে আমার বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে—ঝুর ঝুরে বাতাসে পাতা যেমন কাঁপে, তেমনি কেঁপে ওঠে। এ কে? এ কে?—

বীণার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ছুটিয়া পালাই। কিন্তু তখনই মনে হইল,—মা এর কথাই বলেছিলেন,—আমাকে আদর-যত্ন করতে হবে। বীণা চোখ তুলিয়া চাহিল। আবার সেই দৃষ্টি।

মিঃ মুখার্জ্জি কন্যার সঙ্কোচভাব লক্ষ্য করিয়া, যুবককে লইয়া ড্রইংরুমে চলিয়া গেলেন।

বীণার মাতা কন্যাকেও তথায় পাঠাইবার জন্য বলিলেন, "যাও মা, ইনি আমাদের নিমন্ত্রিত অতিথি, আদর যত্ন করবার ভার তোমার।"

বীণা মায়ের অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া কেবলি বলিতে লাগিল, "না মা—না মা—আমি যাব না—যেতে পারব না। আমার লজ্জা করে—লজ্জা করে।"

বিস্মিতা মাতা কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—সে মুখে ঘৃণার আভাষ।

(৭)

মিঃ মুখার্জ্জি ভাবিতেছিলেন, উদয়পুরে গিয়াই ছেলেটি—তার যা'রা আত্মীয়-স্বজন আছেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, চিঠি লিখিবে; কিন্তু পরামর্শ করিতে কি এতদিন লাগে? তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, বীণাকে দেখিয়া তার পছন্দ হইয়াছে; এবং সঙ্গে-সঙ্গে এ বিশ্বাসও হইয়াছে, বীণারও তেমনি পছন্দ হইয়াছে। ছেলেটি এখানে আসার পর হইতে, বীণার মনের ভাবটা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে যাইয়া, ডাক্তার মুখার্জ্জি বুঝিয়াছেন, বীণার মনে এই

অতিথিটি একটা নূতন চিন্তার সৃষ্টি করিয়া দিয়া গিয়াছে; এবং ইহা স্বাভাবিকই। ডাক্তার মুখার্জির মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আশঙ্কা হইল—যদি ছেলের আত্মীয়-স্বজন এই বিবাহে অমত করেন! তাই আজ মিঃ মুখার্জি কেবলই এই কথা ভাবিতেছিলেন—এখনো উদয়পুরের চিঠি আসিতেছে না কেন?

ভোর হইতে আজ অবিশ্রান্ত বর্ষণ হইতেছে। আর এই কথাটা কেবলই ডাক্তারের মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। চিন্তার সঙ্গে চিন্তাস্রোত আসিয়া মিলিত হইয়াছে, বীণাও হয় ত মনে-মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। কি বলিয়া তিনি বীণাকে সান্ত্বনা দিবেন!

বারান্দায় পায়চারি করিতে-করিতে এমনি ভাবিতেছেন, আর বাহিরে বর্ষণ হইতেছে,—এমন সময় বীণার মাতা আসিয়া বলিলেন, "তোমার মেয়েকে নিয়ে তো আর পারি নে!"

"কেন, কি হয়েছে?"

"হবে আর কি—আমার মাথা আর মুণ্ডু। বারণ করলে শোনে না, ডাকলে কথা কয় না। এস, দেখবে এস।"

মিঃ মুখার্জি ব্যস্তসমস্ত ভাবে স্ত্রীর সঙ্গে-সঙ্গে গিয়া দেখিলেন, বাগানের এক কোণে মার্বেলে বাঁধানো একটী বেদীর উপর ঠায় বসিয়া বীণা বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। মাতা তাড়াতাড়ি গিয়া বীণার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিলেন। তার পর একটু তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "এত বড় মেয়ে, একটু বুদ্ধিশুদ্ধি নেই! ভাগ্যিস আমার চোখে পড়ল, নইলে কতক্ষণ যে ভিজতো, কে জানে!"

বীণা অম্লান বদনে বলিল, "কেন; কি হয়েছে মা! বৃষ্টিতে ভিজতে আমার বেশ লাগছিল। বাবা, বৃষ্টিতে ভেজা কি খারাপ?"

পিতা বলিলেন, "অসুখ করতে পারে যে!"

বীণা গম্ভীর হইয়া বলিল, "ও—অসুখ!"

"তা ভিজেছ, বেশ করেছ। যাও মা, শুকনো কাপড় পরো গিয়ে।"

মাতা ঈষৎ রোষযুক্ত স্বরে বলিলেন, "শুকনো কাপড় ত পরবে,—এ ভিজে চুলের রাশ নিয়ে কি করব বল ত?"

মিঃ মুখার্জি ইহার কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। মনে-মনে বলিলেন,—আর ক'দিনই বা এমন পাগলামী করতে পারবে,—বিয়ে হয়ে গেলে যে সব বদলে যাবে!

ড্রইং রুমে ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তার দেখিলেন, বেয়ারা এই মাত্র টেবিলের উপর ডাক রাখিয়া গিয়াছে। দেখিলেন, উদয়পুরের চিঠি আসিয়াছে। চিঠি খুলিয়া পাঠ করিলেন। চিঠির মর্ম্ম এইরূপ—এই বিবাহে ছেলে এবং ছেলের আত্মীয়-স্বজন সকলেরই সম্পূর্ণ মত আছে।

চিঠি পাঠ করিয়া মিঃ মুখার্জি ভিতরে স্ত্রীর নিকট যাইবার জন্য উঠিলেন। এই সময় বীণা শুকনো কাপড়-চোপড় পরিয়া আসিয়া হাজির। মিঃ মুখার্জি সস্নেহে কন্যার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "মা!"

"কি বাবা?"

"খুসী হয়েছিস্?"

"মা ভিজতে দিলে না যে!"

মিঃ মুখার্জি হাসিয়া বলিলেন, "না—না—সে কথা নয়। তুমি যাতে খুসী হবে—তাই হবে।"

বীণা বিস্ফারিত নেত্রে পিতার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হবে, বাবা?"

পিতা বলিলেন, "হবে—হবে—সে আসবে।"

বীণা অষ্টপ্রহরই সেই ছবির কথা ভাবে। সে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল, "আসবে?"

"শীগ্‌গীরই আসবে। সে এলে ত তুমি খুসী হও মা?"

বীণা স্বপ্নাবিষ্টের মত যেন আপন মনে বলিল, "আসবে!—আসবে! কবে আসবে? সত্যি বলছ? মা ত কিছু বলে না।"

পিতা পাগলী মেয়ের মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "তোমার মা ভারি দুষ্ট। তার আসার চিঠি পেয়েছি।"

"চিঠি—চিঠি—চিঠিও আসে!—"

পিতা স্নেহভরে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সে এলে কিন্তু আর এমন পাগলামী কোরো না। তাকে আদর-যত্ন কোরো।"

"সে যে থাকে না বাবা।"

"এবার এলে আর যাবে না।"

নির্ব্বাসিতা

[শিল্পী—শ্রীবরণজী

Emerald Printing Works
CALCUTTA

"কেন, কেন বাবা? তুমি তাকে ধরে রাখ্‌তে পারবে? এত দিন পারনি কেন?"

মিঃ মুখার্জ্জি হাসিয়া বলিলেন, "পাগ্‌লী মেয়ে! এবার তোর সঙ্গে যে হবে, আর সে কোথাও যাবে না।"

বীণা ঈষৎ লজ্জিত হইয়া ছুটিয়া আপন কক্ষে গেল। গিয়াই ছবিখানি বাহির করিয়া একদৃষ্টে ছবির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আনন্দে তাহার দুটি চোখ দিয়া ধারা বহিল। ছবিখানি মাথায় ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া, তার পরই দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "আর তো পালাতে পারবে না।—কেমন জব্দ!"

স্নেহের আবেশ তন্দ্রার মত ছুটিয়া গেলে, মনে-মনে একটু লজ্জিত হইয়া, মিঃ মুখার্জ্জি আপন মনে বলিলেন, "পাগ্‌লী মেয়েটা আমাকেও পাগল করে তুল্‌লে। ভয় হয়, পাছে বীণার বর বীণারে এই অলৌকিক সরলতা ঠিক-ঠিক না বোঝে।" এমনি ভাবিতে-ভাবিতে মিঃ মুখার্জ্জি চিঠি হাতে করিয়া ভিতরে গেলেন।

বীণার মাতা তাড়াতাড়ি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, স্বামীর হর্ষোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া, হাসিয়া বলিলেন, "মেয়েটিকে কোথায় রেখে এলে?"

"ভয় নেই, আর বৃষ্টিতে ভিজবে না। এখন সকাল-সকাল বিয়েটা হয়ে গেলে হয়। মেয়ের আমার এত মন-মরা ভাব,—বসে-বসে ভাব্‌না,—খাওয়া দাওয়া না,—দেখ, এই তার চিঠি।"

মাতা তখনও অন্যমনস্ক,—হঠাৎ চিঠির কথায় শিহরিয়া উঠিলেন। বিস্মিত নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চিঠি?—কে বীণাকে চিঠি লিখ্‌লে?—ওমা!—কি হবে!"

স্বামী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "হবে আর কি, এইবার শীগ্‌গীর-শীগ্‌গীর বে দিয়ে দাও।"

"কে সে? কার সঙ্গে? বীণা আমাদের ছাড়া আর কাউকে জানে না, এক রকম ধরতে গেলে আর কাউকে দেখেই নি—কে সে? কে চিঠি লিখ্‌লে?"

মিঃ মুখার্জ্জি স্ত্রীর গম্ভীর উদ্বেগপূর্ণ আননের দিকে চাহিয়া, মনের কৌতুক মনে চাপিয়া, কৃত্রিম ক্রোধস্বরে বলিলেন, "তা কি ক'রে বলব? তোমার মেয়ে; তুমি মেয়ের মা হয়ে বুঝতে পাচ্ছ না,—আমি বাপ, আমি কি ক'রে জানব?"

"জানব—কি আর জানব?—জানব আমার কপাল! তাই বীণা সব সময়েই আমার কাছে কি একটা লুকিয়ে রাখ্‌তে চায়! ভেবে ভেবে শুকিয়ে যেন আধখানা হয়েছে। যখনই একা থাকে, আবোল-তাবোল কি বকে। খায় না, দায় না। ক্রমে আরো যেন পাগলা ভাব বেড়ে যাচ্ছে। ডাক্‌লে ঠিকমত উত্তর দেয়! আমার আশঙ্কা হয়েছিল—বুঝি সেই বিবাহের কথা মেয়ের মনে জেগে উঠেছে! ও—এইবার বুঝেছি। সে দিন জানালার ধারে বসে, এক দৃষ্টে হাতে করে কি একখানা ছবির মত দেখ্‌ছিলো—আমি যাওয়া মাত্র অম্‌নি লুকিয়ে ফেল্‌লে। তাই ত, ছবির মতই দেখ্‌লুম যেন—কোথায় গেলে? কার ছবি? বল, কে সে? সে কি এই আগ্রায় থাকে? কোথায়, কখন সে আমার মেয়েকে দেখ্‌তে গেলে? আর ঐ-ই বা কখন তাকে দেখ্‌লে? ছবি কখন দিলে?"

মিঃ মুখার্জ্জি এইবার উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এমন পাগল মা না হলে, অমন পাগল মেয়ে হয়!" বলিয়া চিঠিখানি চিন্তাক্লিষ্ট সহধর্ম্মিণীর হাতে দিলেন।

"দেখ,—কবে, কোথায়, কেমন করে দেখা-সাক্ষাৎ হল, আর কোথায় থাকে, সে কে—সব কথা চিঠিতে আছে।"

বীণার মাতা চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, মৃদু হাসিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "এতও জান! আমি বলি তাই ত!" বলিতে-বলিতেই তাঁহার মুখ আবার গম্ভীর হইল। বলিলেন, "উত্তর দিয়েছ?"

"না—দেব। তুমি কি বল, এই মাসের মধ্যেই দিন স্থির—এমনি লিখে দি?"

বীণার মাতা কাতরভাবে বলিলেন, "আমার একটা কথা শুনবে?"

"কি?"

"বিয়ের উদ্যোগ করো না।"

"ও কথা তো বরাবরই শুন্‌ছি। ও আর নূতন কথা কি?"

"নূতন-পুরোনো জানি নি,—আমার যা মনে হয়, তাই বল্‌ছি।"

"কেন বল দেখি? তোমার মনে কি হয়?"

বীণার মাতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "দেখ, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা যুক্তি জানি নি, তর্ক জানি নি, বোঝাবার শক্তি আমাদের নেই—"

"তবে কথা ক'য়ো না, চুপ্ করে থাক।"

"তাও যে পারিনে। প্রাণের ভেতর কেমন করে ওঠে—মেয়েমানুষের দুবার বিয়ে তো হয় না! আমার কেবলই মনে হচ্ছে, এ বিবাহে ভাল হবে না—ভাল হবে না—ভাল হবে না!"

"তুমি ব'লে আর-জন্মে দাঁড়কাক হবে,—কেবল অমঙ্গলের ডাক ডাকছ! তোমার কথা আমি শুনব না। তুমি তো ঐ মেয়ের মা! আমি লিখে দি গে—" বলিয়াই চলিয়া গেলেন। হতাশ নয়নে মিসেস্ মুখার্জ্জি খানিকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন; পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কক্ষান্তরে গেলেন। তাঁহার চক্ষু তখনো জলে ভরা।

(৮)

আজ গোধূলি-লগ্নে বীণার বিবাহ। বীণার মেম শিক্ষয়িত্রী ও সঙ্গীত-শিক্ষক বৃদ্ধ ওস্তাদজী বিশেষ সমাদরে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। মেম পুষ্প-পত্রে গৃহ সাজাইতেছেন; এবং ওস্তাদজী একমনে বসিয়া সানাইয়ে ভৈরবী রাগিণীর আলাপ শুনিতেছেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সানাইয়ের তুলনা হয় না। শুনিতে-শুনিতে কখন-কখন উত্তেজনায় বৃদ্ধের শরীর দুলিতেছে, এবং হৃদয়ের কোন নিভৃত প্রদেশ হইতে দুই-এক বিন্দু অশ্রু আসিয়া তাঁহার পক্ক শ্মশ্রু বহিয়া কোলের উপর করিয়া পড়িতেছে। এই আনন্দের দিনেও কেমন একটা বিষণ্ণতার ভার তাঁহার মনের উপর চাপিয়া বসিয়াছে,—দীর্ঘশ্বাসের জোর বাতাসেও বৃদ্ধ তাহাকে উড়াইতে পারিতেছেন না। আজ তাঁহার প্রাণসমা 'বাইয়া মারী' নূতন সঙ্গীসহ নূতন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আজ হইতে তাঁহার শিক্ষা-কার্য্যের শেষ। সংসারের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বৃদ্ধ কতবার কত তিক্তফল আস্বাদন করিয়াছেন। জীবনে কত মিলন, কত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কত ছাত্রী আসিয়াছে, গিয়াছে; কিন্তু তাহারা বীণা নহে। সৌন্দর্য্যে, সুকণ্ঠে কেহ-কেহ হয় ত বীণা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তবু তাহারা বীণা নহে। বীণা তবে কি? বীণা—বীণা! কোন বিশেষণে তাহাকে বুঝানো যায় না। বোধ করি, আজ সানাইয়ে টোড়ি-মিশ্রিত ভৈরবী রাগিণী বৃদ্ধকে এমনি কতকগুলা কথাই বলিতেছিল। মেমসাহেবের নিপুণ হস্তের প্রসাধনে, সুরে-সৌন্দর্য্যে আজার এই গৃহ যেন ধীরে-ধীরে নন্দনের উৎসব-মন্দিরে পরিণত হইয়া উঠিল।

মিঃ মুখার্জ্জি আজ ভারি ব্যস্ত; চারিদিকে তত্ত্বাবধারণ করিয়া ফিরিতেছেন। মনে হইতেছে, আজ তাঁহার সকল কার্য্যের অবসান। ইহলোকে সকল আত্মার চরম চরিতার্থতা। এ জীবনে আর তাঁহার কামনা করিবার কিছুই নাই। কিন্তু তথাপি অকস্মাৎ কোথা হইতে এক-একখানা কাল মেঘ তাঁহার হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া, তাঁহার অন্তরের প্রফুল্ল আলোককে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। দুহিতাকে আজ দান করিতে হইবে, একেবারে নিঃস্ব হইয়া তাহাকে বিলাইয়া দিতে হইবে। সত্য বটে সে তাঁহারি কাছে থাকিবে, কিন্তু তাঁহার অধিকারে তো নয়! কন্যার শুভাশুভ আর তাঁহার নয়, সেজন্য আর একজন দায়ী। একেবারে নিঃস্ব হইয়া দান। কোথাকার এক জন কে, তাহার হাতে কন্যাকে সমর্পণ করিয়া দিয়া, বলিতে হইবে—'এতদিন আমার ছিল, আজ হ'তে তোমার।' তাঁহার এই প্রাণসমা কন্যাকে সে সুখে রাখুক, দুঃখে রাখুক, যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করুক, পিতার আর কোন কথাই খাটিবে না।

সহসা মিঃ মুখার্জ্জির মনে হইল,—এমনি করিয়া এই কন্যাকে একদিন আর একজনকে দান করিয়াছেন। এ ত তাঁহারই দ্রব্য। ইহাতে তাঁহার অধিকার কি? দত্তাপহারী!—কথাটা তীক্ষ্ণ তীরের মত গিয়া মিঃ মুখার্জ্জির হৃদয়ে বিঁধিল। তিনি প্রবল মানসিক বলে এই চিন্তা দূরে ঠেলিয়া রাখিলেন। জোর করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—'আমি যা-ই হই, বীণা সুখী হইবে। আর আমার কি চাই? কেবল বীণার মুখ চাহিয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। গৃহিণী পায় ধরিয়া কাঁদিয়াছে, তাহার কথায় কর্ণপাত করি নাই। বীণা যদি সুখে থাকে, আমি নরকে যাইতেও প্রস্তুত।'

কন্যার মুখে সেই সুখের পূর্ব্বাভাস দেখিবার জন্য মিঃ মুখার্জ্জি ছুটিয়া গিয়া ডাকিলেন,—"বীণা!" কোন উত্তর পাইলেন না। মিঃ মুখার্জ্জি একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায়

'বীণা' 'বীণা' বলিয়া দ্বারে আঘাত করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সে তাঁহার আগমন লক্ষ্য করিল না, যেমন বসিয়া ছিল, তেমনি বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিল।

"বীণা, অমন ক'রে কি ভাবছিস্?" বলিয়া মিঃ মুখার্জ্জি বীণার মাথায় হাত দিলেন। বীণা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "বাবা!—মার ভারি অন্যায়।"

"কি অন্যায়, মা!"

"আমাকে কেন ধ'রে রাখলে?"

"কোথায় যাচ্ছিলে, মা?"

"বাবা, তুমি বস, আমি বলি—"

বলিয়া বীণা পূর্ব্বরাত্রি দৃষ্ট এক অপূর্ব্ব অভিযানের কথা বলিতে লাগিল—সে যেন একজনের সঙ্গে কোথায় কোন দূরদেশে হাওয়ায় ভাসিতে-ভাসিতে চলিয়াছে। ঊর্দ্ধে—ঊর্দ্ধে—মেঘের রাজ্য ছেড়ে আরো ঊর্দ্ধে নক্ষত্র বিছানো পথের উপর দিয়া চলিয়াছে। সে আগে, বীণা পিছে। সে যত ছুটে যায়, বীণা তত ছোটে। ঠিক এমনি সময় পিছন হইতে বীণার অঞ্চলে টান পড়িল। বীণা ফিরিয়া দেখিতেই মা বলিল, 'এলোচুলে পাগলের মত কোথায় ছুটেছিস্? আয়, ভাল ক'রে সাজিয়ে গুজিয়ে দি, তার পর যাবি।'

বীণা বলিল, 'ছেড়ে দাও, মা। ঐ দেখ, আমায় ডাকছে।'

কিন্তু মা কিছুতেই ছাড়িলেন না।

মিঃ মুখার্জ্জি বুঝিলেন, এ স্বপ্ন। ভাবিলেন, কন্যা সত্য ও স্বপ্নে প্রভেদ করিতে পারিতেছে না। এ কি আশ্চর্য্য! তিনি ঔৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কে, মা, যার সঙ্গে যাচ্ছিলে?"

বীণা এইবার একটু বিপদে পড়িল। সে কে, তা ত বীণা জানে না। কোথায় থাকে, কি নাম, কিছুই জানা নাই। অথচ তাহার কথা পিতাকে বলিবার জন্য বড়ই আগ্রহ হইতেছে।

"তার নাম জানি না, বাবা। কোথায় থাকে, তা-ও জানি না। কিন্তু সে আমার কাছে রোজ এসে কত গল্প করে। সে আমায় কত ভালবাসে। সে যদি রাগ ক'রে আর না আসে!—"

মিঃ মুখার্জ্জি বলিলেন, "আসবে বই কি, মা। আজই সন্ধ্যার সময় সে আসবে।"

কন্যাকে এই আশ্বাস দিয়া মিঃ মুখার্জ্জি চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনের ভিতর একটা চিন্তা জলৌকার মত তাঁহার হৃদয়ের রক্ত শোষণ করিতে লাগিল। বীণা কি শেষে সত্যি-সত্যি পাগল হবে!

আপাততঃ বাহিরে চলিয়া গেলেন; কিন্তু তাঁহার মন ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাকে বীণার কাছেই উপস্থিত করিতে লাগিল।

গৃহে আত্মীয় স্বজন নাই। বিবাহের সমস্ত আয়োজনের তত্ত্বাবধারণ করিতে-করিতে ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। বীণার মাতা বীণাকে বধূবেশে সাজাইতে বসিলেন।

একদিন, সে ত বেশী দিন নয়, এমনি তিনি নিজহস্তে বালিকা বীণাকে বধূবেশে সাজাইয়াছিলেন। বীণা আহ্লাদে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, চুমো খাইয়া, খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—'মা, তুই সাজবিনি?'

অতীতের সেই স্মৃতি মূর্ত্তিমতী হইয়া মাতার সম্মুখে উদিত হইল। চোখের জল মুছিতে-মুছিতে মাতা কন্যার শুভ্র ললাট ক'রে চন্দনে অঙ্কিত করিলেন। কিন্তু প্রসাধনে নিপুণ হস্ত হইলেও উহা দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল না।

এই বিবাহ ব্যাপার লইয়া স্বামীর সহিত কত আন্দোলন হইয়াছে। তাঁহাকে কত অপ্রিয় কথা বলিয়াছেন, অবশেষে পত্নীর কর্ত্তব্য শিরোধার্য্য করিয়া পতির আদেশ দেবাদেশ জ্ঞানে পালন করিতে বসিয়াছেন। তিনি সাধ্বী সতী, কিন্তু সর্ব্বোপরি তিনি মাতা। নানা আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল।

প্রসাধনে মাতার বিলম্ব হইতেছে, বীণা তাই অধীর হইয়া উঠিয়াছে। মাতা তাহার মুখ চাহিয়া ভাবিতেছিলেন, সেখানেও ছোট্ট মেয়েটি এমনি অধীর হইয়াছিল। বীণা বলিল, "মা, কতক্ষণে সন্ধ্যা হবে?"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "কেন মা, এত তাড়া কেন?"

বীণা প্রবীণা গৃহিণীর ন্যায় উত্তর দিল, "বেশ বাপু, তুমি একটী আস্ত পাগল। তাড়া বুঝি হয় না! আমি কত ব্যস্ত রয়েছি, বল দেখি!"

মন নিরতিশয় মেঘাচ্ছন্ন না হইলেও, বীণার মাতা একটু হাসিয়া ভাবিলেন,—এই সরলতা—এ কি কেউ বুঝবে!

মায়ের মন আবার আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। কি জানি, যদি বাঘের গলায় হীরের হার হয়! কন্যাকে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য বলিলেন, "আচ্ছা বীণা, বরের সঙ্গে কথা কইতে তোর লজ্জা করবে না?"

"ও মা! মা যেন কি রকম! আমি বুঝি তার সঙ্গে নতুন কথা কইব? কথা তো রোজই কই!"

মাতা বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার সঙ্গে কথা ক'স্ লো?"

"আমি অত জানিনে—বকতে পারিনি আর। এই তোমরা যাকে 'বর' 'বর' কচ্ছ—তার সঙ্গে।"

মার মনে একটী মুখের ছবি উদিত হইল। এই সরলা কন্যা! যদি তাঁর সমক্ষে জামাতার সঙ্গে এমনি সরলভাবে হাসে খেলে—সে কত সুন্দর! উৎসুক হইয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা দেখব, কেমন লজ্জা না করে।"

"কেন লজ্জা করবে?—আমি তোমার মেয়ে, সে ছেলে—লজ্জা কিসের?"

মা একটু দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তবে যে সে দিন বড় 'লজ্জা করে, লজ্জা করে' ব'লে আমার আঁচলে মুখ লুকিয়েছিলি?"

বীণা বিস্মিতা হইয়া বলিল, "কবে?"

মাতা একটু আশ্চর্য্য হইলেন, "সে কি রে! এরই মধ্যে সব ভুলে গেছিস? সেই যে সে দিন এলো—"

"সে এসেছিল! তোমরা তাকে দেখেছ? কই, আমাকে তো ডাকলে না?"

মাতা অধিকতর বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "ওমা! তোকে আবার ডাকিনি কি! সে তোকে দেখতে এলো, আমরা কত করে তোকে তার সঙ্গে কথা কইতে বল্লুম, তুই সেই যে 'লজ্জা করে' ব'লে আমার আঁচলে মুখ লুকোলি!"

বীণার যেন ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার কথা ব'লছ, মা?"

"কেন তোর বরের কথা!"

"কে আমার বর?"

বীণার চাহনি দেখিয়া জননী ভীতা হইলেন। ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "মা, মা! অমন করছ কেন মা?"

"মা, শীগ্‌গীর বল, কে আমার বর? তবে যে বাবা বল্‌লেন—সে আসবে? সে আসবে না! তবে মা এ সব কি করলে? কার জন্যে সাজ—সেই যে কটমট্ ক'রে চেয়েছিল?"

বীণা কাঁপিতে লাগিল, যেন হতাশ ভগ্নহৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে কাতর তীক্ষ্ণ স্বর উত্থিত হইল, "কি হ'ল! কি হ'ল!"

দেখিতে-দেখিতে বীণার মুখ যেন সর্পদষ্টের ন্যায় বিবর্ণ হইল। হঠাৎ উঠিয়া টলিতে-টলিতে সে চলিয়া গেল।

মাতা ভয়ে, বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বাহিরে স্বামীর নিকট ছুটিয়া গেলেন,—"ওগো! এস, এস, শীগ্‌গীর!"

"কি! কি! কি হয়েছে?"

"শীগ্‌গীর এস—বলবার সময় নাই—বীণা কেমন কচ্ছে!"

মিঃ মুখার্জ্জি হতবুদ্ধি হইয়া সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।—"বীণা! বীণা!"

বীণার মাতা কোন কথা না বলিয়া, স্বামীর হাত ধরিয়া, বীণার কক্ষের দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। কম্পিত পদে, কম্পিত হৃদয়ে উভয়ে কক্ষে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে উভয়েরই যেন হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হইল।

সোফার উপর বীণার দেহ এলায়িত—নিথর, নিস্পন্দ—মুখে মৃদু হাসির রেখা—বক্ষের উপর একখানি ছবি!

"বীণা! বীণা!"

বীণা নীরব।

"বীণা! বীণা!"

কোনই উত্তর নাই।

পিতামাতা উভয়ে বীণার উভয় দিকে পাষাণে-গড়া মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া সেই প্রাণহীন প্রতিমাকে দেখিতে লাগিলেন।

মরুভূমা শুষ্ক চক্ষে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া মিঃ মুখার্জ্জি অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার ছবি?"

মাতা ছবির দিকে বারেক চাহিয়া তেমনি অস্ফুট স্বরে উত্তর দিলেন, "দেবকুমারের!"

বিবিধ প্রসঙ্গ

রস-সাগর

স্বর্গীয় কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী

[কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন, উত্তরসাগর, বি-এ]

(৩৬)

একদা নবদ্বীপ-নিবাসী কোন এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয় এই সমস্যাটী রস-সাগরকে পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন :—"কালী পদ বুকে তাই ধরেন শঙ্কর।" রস-সাগর ইহা এই ভাবে পূরণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"কালীপদ বক্ষে তাই ধরেন শঙ্কর।"

ওমা কালি! এই ভব চরণ কমল
মুক্তিপ্রদ তায় পুনঃ পরম শীতল।
তাই মাগো! মনে মনে বুঝিয়া শঙ্কর
রেখে তব পা দুখানি বক্ষের উপর
পাইয়া পরম সুখ বিভোর হইয়া
দুর্জ্জয় বিষের জ্বালা গেছেন ভুলিয়া।
ছাড়িলে বিষের জ্বালা পাবে যোরতর,
'কালী-পদ বক্ষে তাই ধরেন শঙ্কর।"

(৩৭)

একদা রাজ-সভায় সমস্যা উঠিল,—"বিষ্ণুর পাইতে মোর ইচ্ছা নাহি হয়!" রস-সাগর তাহা এইরূপে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"বিষ্ণুর পাইতে মোর ইচ্ছা নাহি হয়!"

ওমা গঙ্গে! তব জলে তরঙ্গ সকল
বিস্তারিয়া বিষ্ণু-পদে থাক অবিরল।
পরম-আদরে থাকি' শিবের মাথায়
কি অপূর্ব্ব শোভা মাগো! ধরে থাক তায়।
তাই বলি ওমা গঙ্গে! তোমায় যখন
এই দেহ খানি মোর করিব অর্পণ,
দেখ মা! শিবের মোরে দেওয়া যেন হয়,
'বিষ্ণুর পাইতে মোর ইচ্ছা নাহি হয়!' কে)

ব্যাখ্যা। অন্তিম কালে পতিত-পাবনী গঙ্গা দেবীর গর্ভে দেহত্যাগ করিতে পারিলে মনুষ্য শিবত্ব বা বিষ্ণুত্ব লাভ করিয়া থাকেন, ইহা শাস্ত্রীয় কথা। এই বিবিধ পদার্থই সকল মানবের চির-প্রার্থনীয় ধন। কিন্তু গঙ্গা-ভক্ত সাধক কবি এই কবিতায় বিষ্ণুত্ব প্রার্থনা না করিয়া শিবত্ব প্রার্থনা করিতেছেন। শিবত্ব লাভ করিলে তিনি গঙ্গা-দেবীকে পরম-সুখে মস্তকে ধারণ করিতে পারিবেন; কিন্তু বিষ্ণুত্ব লাভ করিলে অবশ্যই তাঁহাকে বিষ্ণু-পদে ঠেলিয়া রাখিতে হইবে। এই হেতুই কবি এই কবিতায় গঙ্গা-দেবীর নিকটে বিষ্ণুত্ব কামনা না করিয়া শিবত্ব কামনা করিতেছেন।

(৩৮)

একদিন প্রাতঃকালে মহারাজ শিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে লইয়া ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, এক রজক-পুত্র বয়ঃ গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বসিয়া ও তাহাতে কতকগুলি মলিন বস্ত্র চাপাইয়া বাটী যাইতেছে। ইহা দেখিয়া মহারাজ কহিলেন "রস-সাগর! ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!" একথা শুনিবামাত্র রস-সাগর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "রসের সাগরে ভাসে এ রস-সাগর!" তখন মহারাজ কহিলেন, "আপনার সমস্যাটী আপনাকেই পূর্ণ করিতে হইবে।" রস-সাগরও তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"রসের সাগরে ভাসে এ রস-সাগর!"

জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ,
হংসে চড়ি' চিরদিন পাইলেন সুখ।
জগৎ-পালন-কারী দেব নারায়ণ,—
গরুড়ের পৃষ্ঠ তাঁর অতি প্রিয় ধন।
হইয়াও জগতের পরম ঈশ্বর
ষাঁড়ে চড়ি' চিরকাল কাটালেন হর।
গাধা জুড়ী পায়হরি' অম্বর উপর
ভ্রমণ করেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
দেবতারা পোড়া ভাগ্য,—কি করিবে নর,
'রসের সাগরে ভাসে এ রস-সাগর!

(ক) মৎপ্রণীত "স্তব-সমুদ্র: (প্রবন্ধ-প্রবাহ:)"-নামক গ্রন্থে অনেক-গুলি সংস্কৃত স্তব বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ সহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে ওয়াজ খাঁ নামক একজন ভক্ত মুসলমান কবির একটী গঙ্গা-স্তব আছে। এই স্তবের দ্বিতীয় শ্লোকে ভক্ত খাঁ সাহেব যে ভাব সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন, রস-সাগর মহাশয়েরও কবিতায় সেই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। খাঁ সাহেবের রচিত শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

"অচ্যুতচরণতরঙ্গিণি শশিশেখরমৌলিমালতীমালে।
তুমি তনুবিতরণসময়ে দেয়া হরতা ন যে হরিতা।"

(৩৯)

একদিন কোন পণ্ডিত রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন :—"তুমি কার, কে তোমার, বল কার তরে !" রস-সাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"তুমি কার, কে তোমার, বল কার তরে !"

নিবেদন করি আমি, ওরে মূঢ় নর !
যাহা কিছু দেখিতেছ, সকলি নশ্বর।
কোথা রবে বাড়ী গাড়ী, কোথা ঘর বাড়ী
কিছুদিন পরে সব যাবে গড়াগড়ি।
ওইযা সোণার খাটে কর কত ঠাট্,
খাটে গেলে হায় কোথা রবে সেই খাট !
যে মুখে খাইতে সুখে সন্দেশ মিঠাই
তারা পুত্র কন্যা সেই মুখে দিবে ছাই।
কোথা পেলে টাকা পাব,—ভাবিয়া বিরলে
দিবানিশি ঘুরিতেছ এই ভূমণ্ডলে।
ছুয়াচুরি বাটপাড়ি করিয়া বিস্তর
ঘুরে যম মাথে-ঝোড়া বলদের মত।
অপরে ঠকাতে গিয়া নিজেই ঠকিলে,
ভাবিলে না একবার বসিয়া বিরলে।
ওরে জীব ! শুন শিব,—বিলম্ব না সয়,
এখনি আসিয়া কাল করিবে প্রলয়।
এ রস-সাগর কয় পড়িয়া ফাঁপরে,—
'তুমি কার, কে তোমার, বল কার তরে !'

(৪০)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন :—"সিংহ-সম পশু।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"সিংহ সম পশু।"

শিব-সম দেব নাই, শিবা-সম সতী,
পার্থ-সম বীর্য্যবান্, রাম-সম পতি ;
কাশী-সম বাসস্থান, মেরু-সম গিরি,
গজরাজ-সম বল, ভৃগু-সম মুনি ;
সুর সম বন্ধুত্ব, সূর্য্য-সম তাপ,
অগ্নি-সম সর্ব্বভুক্, চুরি-সম পাপ ;
দুগ্ধোদন-সম দানী, স্বর্গ সম সুখ,
যাদ-সম প্রহরায়, রোগ সম দুঃখ ;
ভগীরথ-সম পুত্র, ভূপ সম বীর,
একলব্য-সম শিষ্য, গুরু-সম ধীর ;
স্বর্ণ-সম রম্য ধাতু, কর্ণ-সম দাতা,
বিপ্র-সম শুক্ল-বর্ণ, জীব-সম জ্ঞাতা ;
বিদ্যা সম শ্রেষ্ঠ ধন, ধ্রুব-সম পিতৃ,
চিত্ত-সম দ্রুতগামী, 'সিংহ-সম পশু।'(ক)

(৪১)

যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের এক তৃতীয় প্রভুর প্রতি নানা প্রকারে বিদ্যাবাতকতা প্রকাশ করিয়াছিল। একদিন তিনি কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! বিদ্যাবাতক লোককে আমি শাস্তি দিতে পারি কি না ?" ইহা শুনিয়া রস-সাগর হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "ভগবান্ সাজা যেন বেইমান্ জনে !" তখন শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "আপনার সমস্যাটী আপনিই পূর্ণ করুন।" ইহা শুনিয়া রস সাগর ইহা এই ভাবে দিয়া পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"ভগবান্ সাজা যেন বেইমান্ জনে !

জিহ্বা মাঝে এক ছোটা ভল্লী দেখা যায়,
ধরাসু কোমলা তার মত কে কোথায় !
যতিন বস্তুই তার কবিষ্ঠ গোচর
ঘিরিয়ে ঘেরিয়া সবে আছে নিরন্তর।
তাইগুলি ছোট ছোট,—করিয়া দর্শন
করিতে লাগিল জিহ্বা তাদের পালন।
তাহাদের কোনরূপ কিছু কষ্ট হ'লে
দুর ক'রে দেয় তাহা জিহ্বা কুতুহলে।
দন্তগুলা ক্রমে ক্রমে বড় বড় হয়,
পরম কঠিন তত হয় সুনিশ্চয় !
সময় পাইয়া তারা অমনি তখন
ঘিরিয়ে রংসন করি' করে আলাতন।
সুকোমলা দয়াবতী জিহ্বা খানি হায়
সব সহ্য করে,—শাপ দিতে নাহি চায়।
ঈশ্বর এ সব কাণ্ড হেরি' অনিবার
অবশেষে ক'রে যেন সুস্থ সুবিচার,—
দন্তগুলা একে একে সব যায় ন'ড়ে,
একটীও নাহি থাকে,—দেখে যায় প'ড়ে !
হায় রে জিহ্বার কিন্তু ধ্বংস নাহি হয়,
অন্তিম কালেও তাহা একরূপ রয় !
এ রস সাগর এই যুক্তিরাজে মনে,—
'ভগবান্ সাজা যেন বেইমান্ জনে !'

(৪২)

একদিন রাজ-সভায় সমস্যা উঠিল, "বাঙ্গালীর মত হায় কাঙ্গালী কে আর !" রস-সাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"বাঙ্গালীর মত হায় কাঙ্গালী কে আর !"

বাঙ্গালার জল বায়ু অতি চমৎকার,—
একবার সেবিলেই চক্ষু অন্ধকার।

(ক) কবিবর স্বর্গীয় রাসরথি রায়ের পাঁচালীতে এই ভাবের একটী কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়।

ম্যালেরিয়া হারবার করিল দেশ,
ধনে প্রাণে ক'রে দিল মানুষের শেষ।
পরা ছিনে, পেট মোটা, পীলে ভরা তায়,
চক্ষু দুটি ঢুকিয়াছে কোটরেতে হায়।
এক মুটা অন্ন হেতু দুয়ারে দুয়ারে
চাকুরীর উমেদারী করিবারে ঘুরে।
মাসে মাসে আসে যাহা, না তাহে কুলায়,
কুড়ি দিন কাটে কষ্টে,—পরে নিরুপায়।
স্বদেশী ফ্যাসান্ ছাড়ি' বিদেশী ফ্যাসান্
ভাল বলিয়াই তার মনে অভিমান।
দিশি চা'ল ছেড়ে দিয়ে বিলাতের চা'ল
লইয়া বাঙ্গালী বাবু ঘটালে জঞ্জাল।
বিলাতের ডাল টুকু করি' পরিহার
সুখ টুকু লইয়াই মত অনিবার।
দৈত্যকুলাচার্য্যের কোল ভাল না লাগিল,
কুক্কুটের বংশাবলী ধ্বংস ক'রে দিল।
বাবুয়ানা ষোল আনা যেনায় অস্থির,
ষোল আনা মিথ্যা বলি' লাজে যুধিষ্ঠির।
ধন্য ওরে কলিকাতা! এই বুঝি আমি,—
যত কিছু ফ্যাসোনের সৃষ্টিকর্ত্রী তুমি।
এ রস-সাগর তাই বুঝিয়াছে সার,—
'বাঙ্গালীর মত হায় কাঙ্গালী কে আর!'

(৪৩)

একদিন শ্রীশচন্দ্র রস-সাগরকে নিমন্ত্রণ করিয়া ও স্বয়ং সম্মুখে বসিয়া তাঁহাকে আহার করাইতেছিলেন। রস-সাগর নানাবিধ ফল এক একটী উদরস্থ করিয়া আঙ্গুরগুলি সর্ব্বশেষে খাইবেন বলিয়া একপার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি রস-সাগর হইয়া রসের সাগর আঙ্গুরের প্রতি এরূপ বিরূপ কেন?" তখন তিনি আঙ্গুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "বধূর অধর নয় এত সুমধুর!" ইহা শুনিবামাত্র শ্রীশচন্দ্র তাঁহারই সমস্যাটী তাঁহাকে পূর্ণ করিতে দিলেন। তিনিও এইভাবে ইহা পূর্ণ করিলেন :—

সমস্যা—"বধূর অধর নয় এত সুমধুর!"

জামা'য়ের যে আদর শ্বশুর-বাটীতে,
আঙ্গুরের সে আদর কাঠের কৌটাতে!
কৌটার ভিতরে তারে গদীর উপরে
থরে থরে সোয়াইয়া রাখে সমাদরে।
কি কব তাহার রূপ,—বলা নাহি যায়,
কালিদাস হা'র মানে বর্ণিতে তাহায়!
কোথা লাগে মুক্তামালা আঙ্গুরের কাছে,
করি গলে ধরি,—গলে যায় পাছে।
তুল্-তুলে দেহখানি কিবা সুকোমল,
টল্ টল্ চল্ চল্ করে অবিরল।
তাহার গুণের কথা কি কহিব আর,
গণ্ডা গণ্ডা বণ্ডা খাও,—তার কাছে হার।
ধনে ভরে গরীবের কালঘামে ছোটে,
হায় হায় পুরে যেন ভাগ্যবান্ পেটে।
ধন্য হে কাবুল! ধন্য তোমার আঙ্গুর!
বধূর অধর নয় এত সুমধুর!

(৪৪)

একদিন মহারাজ শিরীশ-চন্দ্রের সভায় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহি দেখিতে হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ; কিন্তু ইঁহার কথায় বিলক্ষণ বুঝিতে পারা গেল যে, ইনি নিরক্ষর! তখন মহারাজ রস-সাগরকে কহিলেন, "বিদ্যাহীন ভট্টাচার্য্য—মহা বিড়ম্বন!" রস-সাগর হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ এই সমস্যাটী এইরূপে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"বিদ্যাহীন ভট্টাচার্য্য,—মহা বিড়ম্বন!"

হরি-হীন শেষ-নাগ, গঙ্গা-হীন দেশ,
তৈল-হীন কেশপাশ, উর্ণা-হীন মেষ।
ভূমি-হীন ভূমি-পতি, গন্ধ-হীন ফুল,
নারী হীন অট্টালিকা, পুত্র-হীন কুল।
বারি হীন সরোবর, বর্ষ-হীন ঘন,
বিদ্যা-হীন ভট্টাচার্য্য,—মহা বিড়ম্বন!

(৪৫)

একদিন রস-সাগর ও আর কয়েকটী ভদ্রলোক মহারাজ শিরীশ-চন্দ্রের বাটীতে আহার করিয়া স্ব স্ব বাটীতে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে একজন মহারাজের বাটীতে আহার করিবার সম্বন্ধে নিন্দা করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া রস-সাগর আর থাকিতে না পারিয়া কহিলেন,—"কার্য্য শেষ হ'লে আর কেহ কারো নয়!" তখন আর একজন রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে বলায় তিনি ইহা এই ভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"কার্য্য শেষ হ'লে আর কেহ কারো নয়!"

পুরুতের নিন্দা করে শ্রাদ্ধ শেষ হ'লে,
মাঝিকের নিন্দা করে নদী-পারে গেলে।
সেনানীর নিন্দা করে বিজয়ী হইলে,
বাহকের নিন্দা করে বাটীতে পৌঁছিলে।
গণিকার নিন্দা করে যৌবন যাইলে,
ডাক্তারের নিন্দা করে ব্যাধি দূর হ'লে।
শিক্ষকের নিন্দা করে পণ্ডিত হইলে,
জননীর নিন্দা করে বিবাহ করিলে।
মনোজের নিন্দা করে ধন নাহি পেলে,
পুরুষের নিন্দা করে পেটটী ভরিলে।
এ রস-সাগর তাই মনোদুখে কয়,—
কার্য্য শেষ হ'লে আর কেহ কারো নয়!

(৫৮)

একদা সমস্যা উঠিয়াছিল, "চিরদুঃখী হ'লে তার মঙ্গল মরণ!" রস-সাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"চিরদুঃখী হ'লে তার মঙ্গল মরণ!"

বিষের মঙ্গল, সৃষ্টি হ'লে ধরাকারে,
বিত্তের মঙ্গল নহা, যদ্যপি হইলে।
শিষ্যের মঙ্গল, যদি সাধু গুরু পায়,
শস্যের মঙ্গল, যদি পতঙ্গ না খায়।
সতীর মঙ্গল, যদি থাকে লজ্জা-ডর,
বেশ্যার মঙ্গল, যদি লজ্জা বাহি রয়।
রোগীর মঙ্গল, যদি না পায় আহার,
ভোগীর মঙ্গল, যদি ক্ষুধা থাকে তার।
ত্যাগীর মঙ্গল, যদি ধন পরিহরে,
রোগীর মঙ্গল, যদি কুপথ্য না করে।
বিদ্বের মঙ্গল, যদি মনে দুঃখ রয়,
রাজার মঙ্গল, যদি অসন্তুষ্ট হয়।
চিরদুঃখী হ'লে তার মঙ্গল জীবন,
'চিরদুঃখী হ'লে তার মঙ্গল মরণ!'

(৫৯)

একদা রাজ-সভায় কোনও এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "বজ্রাঘাতে মরে।" তিনি আরও বলিয়া দিলেন, "ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়াই আপনাকে ইহার উত্তর দিতে হইবে।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ এই ভাবে ইহার উত্তর দিলেন :—

সমস্যা—"বজ্রাঘাতে মরে।"

বীর-হাকিরের পুত্র দুরন্ত বীরণ,—
নিষ্ঠুর তাহার মত না কেহ কখন।
অকারণে রক্তপাত করিত কেবল,
রক্তপাত না করিয়া নাহি খেতো জল।
বধিবারে তিন শত শত্রুর জীবন
নাম লিখে রেখে ছিল খাতায় বীরণ।
ধরিয়া সুতীক্ষ্ণ অসি করে আপনার
কত শত মুণ্ডপাত করিল বেতার।
বেসেলী বেগম সেই সিরাজের মাসী,
আনিবা সিরাজ-মাতা পরম রূপসী।
বন্দিভাবে দুই জনে ছিলেন চাকায়,
বীরণ বধর-খাঁকে পাঠালে তথায়।
বধর কৌশল করি আনি দুই জনে
পদ্মা-গর্ভে ডুবাইল পরম গোপনে।
মৃত্যুকালে দুই জনে কোরাণ ছুঁইয়া
পদ্মা-গর্ভে ডুবিলেন এই শাপ দিয়া,—
"আসিবর্ষী যার কন্যা আমরা দুজন,
তার বাবের [illegible] দুই যে বীরণ!
আমরা ত চলিলাম জনমের তরে,
"বজ্রাঘাতে মৃত্যু তোর হইবে অচিরে।"
শাহানশা সনে যুদ্ধ করে পাটনায়,
বীরণ তাম্বুতে গিয়া নিশি নিদ্রা যায়।
অবিশ্রান্ত বজ্র বৃষ্টি হইতে লাগিল
বীরণ পাইয়া ভয় জাগিয়া উঠিল।
বীরণের হুঙ্কারও থামিতে না পারি'
ইস্ত নিক্ষেপিলা বজ্র তার শিরোপরি।
অকারণে মনস্তাপ যে দেয় সংসারে,
সেই জন শুনিলেন 'বজ্রাঘাতে মরে।'

[প্রস্তাব। সিরাজ উদ্দৌলার রাজ্যচ্যুতি ও মৃত্যু হইলে মীর-জাফর সমস্ত বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন। কিন্তু মাত্র কিছু দিন পরেই তিনি স্বীয় রাজ্যভার জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণের উপর অর্পণ করেন। মীরণ নিষ্ঠুরতার দুরাত্মা ও দুর্বৃত্ত ছিলেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার নিষ্ঠুরতায় বিরক্তিত হইয়া রাজ্যের লোক সকল ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি যে সকল নর-হত্যা করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ রস-সাগর মহাশয়ের কবিতাতেই প্রকাশ হইয়াছে। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ২ জুলাই তারিখে বজ্রাঘাতে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভগিনী-পতি মীরকাশিম তথায় সিংহাসনে আরোহণ করেন।]

অবেস্তা

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার, বি-এ]

হিন্দুদিগের যেমন বেদ, পার্সীদিগের সেইরূপ অবেস্তা। এই অবেস্তা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ যজ্ঞবাদ, বিস্পেরদ ও যস্ন লইয়া গঠিত। যস্নীয়াদে ধর্মসংক্রান্ত বিধি ও উপকথাসমূহ দেখিতে পাই। বিস্পেরদে কতকগুলি যজ্ঞ-মন্ত্র আছে, যস্নতেও তাহাই আছে। তবে যস্ন-ভাগে পাঁচটি গাথা আছে—এই গাথাগুলি অতি প্রাচীন ভাষায় রচিত। অবেস্তার দ্বিতীয় ভাগের নাম খোরদে অবেস্তা অর্থাৎ ক্ষুদ্র অবেস্তা। ইহাতে ছোট-ছোট প্রার্থনাসমূহ আছে। এই প্রার্থনা-গুলি পুরোহিত এবং অন্যান্য পার্সীগণ কর্তৃক দিবস, মাস ও বৎসরের সময়বিশেষে উচ্চারিত হয়।

ঐতিহাসিক প্লিনি (Pliny) বলেন যে, জরথুস্ত্র ২০ লক্ষ শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। আরব ঐতিহাসিক তবরি (Tabari) বলেন যে, জরথুস্ত্রের রচিত গাথাসমূহ ১২ হাজার গোচর্মের উপর লিখিত হইয়াছিল। আলেকজান্দারের পারস্য-আক্রমণের সময় এই সকল অমূল্য রচনা নষ্ট প্রাপ্ত হয়। লোক-মুখে ও ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে যাহা অবশিষ্ট ছিল, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মুসলমান-আক্রমণে তাহারও

অধিকাংশ বিলুপ্ত হয়। এই আক্রমণে সুবিশাল পার্শী সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কিছুদিন পরেই, পারসীগণ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ধর্মরক্ষার্থে ভারতের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবেস্তার এই ধ্বংসাবশেষের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র এখনো পাওয়া যায়।

খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই বারো শত বৎসরের ইরানীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক তথ্যের কতক-কতক পরিচয় অবেস্তা হইতে পাওয়া যায়। অবেস্তায় ধর্ম্ম ব্রহ্মণ্য, বৌদ্ধ, গ্রীক এবং ইহুদীয় ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে অনেক জিনিস ধার করিয়া লইয়াছে, এবং স্থানে-স্থানে ঐ সকল ধর্ম্মের নিন্দাবাদও করিয়াছে।

অবেস্তার গাথা-অংশ ছন্দঃপ্রবন্ধের সময় পদ্যে রচিত হয়; কিন্তু অন্যান্য অংশ পরে গদ্যে রচিত হয় এবং বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। পরবর্ত্তী অবেস্তার "হওম যস্ত্রের" (সোম প্রসঙ্গের) মধ্যে আলেক-জান্দারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত জেবল্ দারমেস্তেতে বলেন, "অবর অন্যথা বৈদিক অসুর, যবন হইতে বিশেষ বিভিন্ন নয়। জরথুস্ত্রীয় সূর্য্যদেবতা মিত্র বৈদিক মিত্র ভিন্ন আর কেহই নয়। উভয় ধর্ম্মেই সোম (অং হওম) এবং অগ্নিকে (অং, আতর্) কেন্দ্র করিয়া সমস্ত পূজা এবং যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইত। নক্ষত্রদেবতা বজ্রধারী ইন্দ্রের সহিত সর্ব্বাগ্রগণ্য অহির যুদ্ধ, অবেস্তায় আতর্ এবং অজির (সং অগ্নি এবং অহির) যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। বিবস্বন্তের পুত্র যিম এবং ত্রিতান, বেদের বিবস্বতের পুত্র যম এবং ত্রিতান বই আর কেহই নয়। এই সকল বিষয় ভারতীয় এবং ইরানীয় জাতিদ্বয় একত্র থাকার সময় ছিল, অথবা পরে কে কাহার নিকট হইতে ধার করিয়া লইয়াছে—তাহা এখনো নিঃসন্দেহে বলা কঠিন।"

বৈদিক ধর্ম্মকে হীনপ্রভ করিবার জন্য প্রধান তিনটি বৈদিক দেবতার নাম লইয়া অবেস্তার প্রধান দৈত্যত্রয়ের নামকরণ হইয়াছে। এই তিন দেবতার নাম—ইন্দ্র, শিব ও অগ্নি। বেদের যাহা দেব, অবেস্তায় তাহা দএব (দেব) অর্থাৎ দৈত্য; বেদের যাহা অসুর (দৈত্য) অবেস্তায় তাহা অহুর (অসুর) অর্থাৎ দেবতা। পরে আমরা দেখিতে পাই সূর্য্য, চন্দ্র, জল, বায়ু আবার পুরুষের ন্যায় পার্শীদিগের পূজা পাইতেন। এই সকল দেবতার পূজা বৈদিক ধর্ম্মের অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

অবেস্তায় বুদ্ধদেবের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। দএব বুইতি বা বুতাদ বা বুইধি অর্থাৎ দৈত্য বুদ্ধ জরথুস্ত্রীয় ধর্ম্মকে জন্ম হইতেই বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু 'মূর্খ গওতম' (গৌতম) জরথুস্ত্রের সঙ্গে পারিয়া উঠে নাই। অবেস্তায় হপ্ত হিন্দ অর্থাৎ সপ্তসিন্ধুর উল্লেখও আমরা দেখিতে পাই।

এখন সংস্কৃত ভাষার সহিত অবেস্তা ভাষার কিরূপ মিল আছে, তাহা কিঞ্চিৎ দেখাইয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আধুনিক পার্শীভাষার ন্যায় অবেস্তা ভাষাও ডানদিক হইতে বামদিকে লিখিত হয়। সমস্ত অক্ষর পৃথক-পৃথক পাশাপাশি লেখা হয়। যুক্তাক্ষর মাত্র দুয়েকটি আছে। এমন কি স্বরবর্ণও ব্যঞ্জনের গায়ে যুক্ত হয় না। সংস্কৃত বর্ণমালার মত অ আ ইত্যাদি ক্রমে অক্ষর সংখ্যা অনেকগুলি। তন্মধ্যে অনুনাসিকের ছড়াছড়ি একটু বেশী।

অবেস্তা গাথা—

(১) কে যে না থ্রাতা বিস্পো অস্তো (অর্থাৎ) যাৎ (চা)

মহাভারত—

(২) ন যস্ ত্রাতা বিদ্যতে (বৈ) বৃদ্ধ অন্তঃ

একটু উল্টাইয়া পাল্টাইয়া লিখিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

(১) কে মোই না থ্রাতা বিস্পো অস্তো খৃৎ?

(২) য যে না ত্রাতা বিদ্যতঃ অন্তঃ যৎ?

আর দু একটি গদ্য উদাহরণ :—

(১) হাবনীম্, আঃ, য়ত্বম্, আ, হওম, উপাইৎ জরথুস্ত্রম্ আথরেম্ পইরি য ও ম বথেস্তেম্ গাথাওস্ চ শ্রাবয়ন্তেম্।

সংস্কৃত—সাসনীম্ আ কতুম্ আ সোম উপৎ জরথুস্ত্রম্ আথরম্ পরি যজে বথস্তম্ (চ) গাথাশ্চ শ্রাবয়ন্তম্।

(২) অহুরো-মজ্দাও যো, ইমাম্ ভূমিম্, অবাৎ, যো, অওম্, অসমনেম্, অবাৎ যো নমীম্, অবাৎ যো বিবতিম্, অবাৎ।

সংস্কৃত—অসুরো মেধাঃ য ইমাম্ ভূমিম্ অবাৎ, যো অয়ম্ অস্মানম্ (আকাশম্) অবাৎ, যো নর্ত্তীম্ অবাৎ যঃ বিততিম্ অবাৎ।

যিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি মানুষ ও মানুষের জন্য বাসস্থান সৃষ্টি করিয়াছেন—পার্শীর সেই অসুর মহত্ম, বেদের বরুণ এবং সকল জাতির সেই পরমেশ্বরকে অভিধাবন করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম। যদি ইহাতে কাহারও মনে পার্শী ধর্ম্ম ও আমাদের পার্শী ভ্রাতৃগণের বিষয়ে কিছুমাত্র আসক্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

বিশনোয়ী

[শ্রীআশুতোষ ভরদ্বাজ]

বিশ=২০, নও=৯; বিশনও=২৯; বিশনোয়ী=২৯ সংখ্যক উপদেশ পালনকারী।

বিশনোয়ী এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়। মীরট ও রোহিলখণ্ড বিভাগে ইহাদের সংখ্যা অত্যধিক। ইহাদের বাসস্থান পঞ্জাব; তথা হইতে আগমন করতঃ ইহারা উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশে বাস করিতেছে। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক জাম্ভজী। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে জাম্ভজী বর্ত্তমান ছিলেন। তৎসম্বন্ধে জনপ্রবাদ এইরূপ :—

যোধপুর রাজ্যের বিকানেরের দক্ষিণে পিপ্পাসর নামক এক গ্রামে এক পাবোয়ার রাজপুত বাস করিত; তাহার নাম লোট। লোট বহুবর্ষ বয়সেও অপুত্রক ছিল। একদা একজন প্রতিবেশী ক্ষেত্রে শস্য বপন করিতে যাইবার সময় লোটকে দর্শন করে; সুতরাং বপন-আশায় জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন

করে; কারণ, কোন শুভ কর্ম্মোদ্দেশে গমন সময়ে অপুত্রকের মুখ দর্শন করিত। এই ব্যাপারে লোট অতিশয় ব্যথিত হইয়া মন মনে পুত্রের ঐ অবস্থাভাবের বিষয়ে সর্ব্বদা পর্য্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহার নিকট এক ফকির আগমন পূর্ব্বক কহিলেন যে, আজি হইতে নবম মাস অতীত হইলে লোট পুত্র মুখ সন্দর্শন করিয়া অতীব আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইবে। ফকীর ফকীর অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা বলে পাত্রী-বদন হইতে দুগ্ধ মোচনপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

নয় মাস অতীত হইলে সম্বৎ ১৪০৮ (১৪৪১ খৃষ্টাব্দ) একদা দৃষ্ট হইল যে, লোট-পত্নী হংসা একটী শিশু সন্তান ক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইতেছে। দশমবর্ষ পর্য্যন্ত বালক সমবয়স্ক বালকগণের সহিত বালক্রীড়া করিত। এই বালক বিষ্ণুর অবতার। ২৭ বর্ষ বয়স অবধি সে গোচারণ করিত; কিন্তু এই সময় পর্য্যন্ত লোটের পুত্র বাক্‌শক্তিহীন বলিয়া সাধারণ জনগণ জ্ঞাত ছিল। পুত্র বাক্‌শক্তিহীন হইলেও, এবং গোচারণের কার্য্য করিলেও, নানাপ্রকারে আপন অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করে। তাহার সহচরগণের প্রীতি নিমিত্তার্থে সে সামন্ত-সমাজ হইতে মিষ্টান্ন নিমন্ত্রণপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রদান করিত। ক্রমে সে সকলের নিকট হইতে 'আচেব' (আশ্চর্য্য জ্ঞান) এবং পরিশেষে 'আচব' হইতে 'বাব' নাম প্রাপ্ত হয়। বাবের ৩৪ বর্ষ বয়ঃক্রমে তাহাকে কথা কহাইবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ তৎসমীপে প্রেরিত হন; কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপন অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন। একদা বাব অগ্নি বাতীত কেবল মাত্র আপন অঙ্গুলি-স্পর্শে দীপ জ্বালিয়া আপনার অদ্ভুত ক্ষমতায় সকলকে মোহিত করেন, এবং এই দিবস তাঁহার মুখ হইতে প্রথম কথা নির্গত হয়। তিনি উপদেশকের ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক পাহাড়ে গমন করেন। এই পাহাড় হিলাবের হইতে ৫৮ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। তিনি এই স্থানে ৫১ বৎসর অতিবাহিত করেন। জীবলীলা শেষ হইলে তিনি এই স্থানেই সমাধিত হন। হিন্দু প্রথানুসারে তদীয় মৃতদেহ চিতানলে ভস্মীভূত হয় নাই।

বাবজী সকল বর্ষে শিষ্যের গোপাল লইয়া কূপ-সমীপে জলপান করাইতে গমন করিতেন। প্রত্যেক পশুর নিমিত্ত তাঁহার স্বতন্ত্র বংশী ছিল। তিনি বংশীধ্বনি করিলে, নির্দ্দিষ্ট রবে নির্দ্দিষ্ট পশু আসিয়া জল পান করিয়া প্রস্থান করিত; একত্র সকল পশু কখনো আগমন করিত না। এক দিবস উদাসী নামক একব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন; এবং বালক কূপ-তীর হইতে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলে উদাসী অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। বালক পশুরক্ষাকারী, আর উদাসী অশ্বারূঢ়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উদাসী দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিয়াও পশুরক্ষাকারী বালককে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইলেন। অবশেষে উদাসী অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক বালকের পদতলে পতিত হইলেন। যদিও বালকের সহিত উদাসীর এই সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ, তথাপি বালক উদাসীর নাম গ্রহণপূর্ব্বক সম্বোধন করিলেন। হতবুদ্ধি উদাসীর মুখ হইতে অকস্মাৎ 'বাবজী' (সর্ব্বজ্ঞ) শব্দ বহির্গত হইল; এবং তদবধি সকলে বালককে 'বাবজী' নামে আহ্বান করিতে লাগিল। প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া বাবজী গৃহত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিলেন। হিলাবেরের নবরঙ্গ নামক পাহাড়ে বাবজীর ৫১ বর্ষ অতিবাহিত হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বাবজী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই সময়ে ঋষিতুল্যকে অন্ন দান করিয়া বাবজী বহু সাধক শিষ্য সংগ্রহ করেন। কথিত হয় যে, ৮৪ বর্ষ বয়সে এই পাহাড়েই তিনি লোকলীলা সম্বরণ করেন; এবং এই স্থান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে তদীয় শব সমাহিত হয়। অনেকে কহেন যে, যদিও তদীয় মৃতদেহ ছয় মাস পর্য্যন্ত মৃত্তিকার উপর পতিত ছিল, তথাপি পচিয়া গলিয়া যায় নাই বা দুর্গন্ধযুক্ত হয় নাই। অনেক বিশ্বাসীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা প্রহ্লাদ-বংশী বা প্রহ্লাদ-পন্থী; কারণ, প্রহ্লাদ ভগৎ (ভক্ত) কে তুষ্ট করিবার জন্য বিষ্ণু 'বাবজী' নামে অবতার হইয়াছেন। হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক ৩৩ কোটী বাক্তি বিনষ্ট হয়; বিষ্ণু নরসিংহ অবতারে প্রহ্লাদের জীবন রক্ষা করেন এবং প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহার প্রিয়তম বাঞ্ছা কি? প্রহ্লাদ উত্তর করেন যে, অবশিষ্ট ২৮ কোটীকে মুক্তিদান করুন। ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য বিষ্ণু বাঞ্ছিত হয়েন এবং তৎফলে এই বাবজী অবতারের গ্রহণ করিয়াছেন।

বাবজীর ২১ উপদেশ।

"তিন দিন সুতক পাঁচ রোজ রজবলী নারী
দিন করো স্নান তিন সন্তোষ তব পারী
পানি বাণী ইধ্‌নি ইউন্ লিজো জান
দহা বরষ হুয়ে বরো গুরু বাতাই জান
চোরী নিন্দা ঝুঠ বর্জ্জো বাদ না করিও কোই
অবল তামাকু ভাঙ্গ নীল ঘুমহি তিয়াগো
ঘর মাল সে দেখ্‌কে ঘুমহি জাগো
অমর হুয়াও ঠাট বৈল গুরুনিনা বাহো
অমাক্কা বরত রঁধ নিলো না খাও
হোম জপ সমাধ পুজা বাস বৈকুণ্ঠ পাও
উন তিন্ বর্ষ কি আখরি গুরু বাতাই সোই
পাহল সোই পত্র চাবা জিস্‌কো নাম বিশ্বনাথী সোই।

তিন=৩০, সুতক=অশৌচ, পাঁচ=৫, রোজ=দিন, রজবলী=রজঃস্বলা, সোধ=সন্তোষ, দিল=সন্তুষ্টি, গুরু=গুরু, পারী=স্ত্রী, পানি=জল, বাণী=বচন, ইধ্‌নি=ইন্দ্রিয়, লিজো=গ্রহণ করিও, জান=নির্ব্বাচন করিয়া, পরীক্ষা করিয়া; অর্থাৎ আমানি গ্রহণ করিবে যেন কোন কীট খণ্ড না হয়, বরষ=বর্ষ, বাতাই=বলেন, চোরী=চুরি, ঝুঠ=মিথ্যা, বর্জ্জো=ত্যাগ কর, বাদ=বিবাদ, বিসমাদ, সোই=সেই ব্যক্তি, অবল=আফিম, ভাঙ্গ=সিদ্ধি, নীল=নীল মদ, ঘুমহি=ঘুমে

ভিয়াগো = ত্যাগ কর, মদ = মদ্য, মাস = মাংস, ভাগো = পলায়ন কর, অমর = জীবিত, রখাও = রক্ষা কর, ঠাট = ছাগ, বৈল = বলদ, তামিনা = অল্প সময়ের জন্যও নহে, বাহো = তুমি কর্ণে নিযুক্ত কর, অমাস্যা অমাবস্যা। বরত = ব্রত, রখ = রক্ষা কর। নীলো = হরিদ্বর্ণ বৃক্ষ, বাঢ = কর্ত্তন কর, সমাধ = সমাধি, বাস বৈকুণ্ঠী পাও = বৈকুণ্ঠে বাস করিতে পাও, উনতিস = ২৯, আখরি = শেষ, বাতাই = বলেন, সোই = সেই, পাহল = পাদ প্রক্ষালন জল, সোই = স্নান করায়, চাখা = সন্তান, হোই = হয়।

প্রসব হইলে ৩০ দিন ও পঞ্চমঠী হইলে ৫ দিন রমণী রন্ধন করিবে না। প্রাতে স্নান কর। ব্যভিচার করিও না। সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রহ। সতত পরিমিতাচারী ও শুচি রহ। পানের পূর্ব্বে পানীয় জল ছাঁকিয়া লইবে। মিথ্যাবাক্য বা মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিবে না। অগ্নিতে কাষ্ঠ প্রদান করিবার সময় পরীক্ষা করিয়া লইবে, যেন ইন্ধনে কোন কীট না থাকে। হৃদয়ে দয়া ও ধর্ম্ম রাখ যেরূপ গুরু উপদেশ দেন। চুরি করিও না। অপরের নিন্দা করিও না। মিথ্যা কথা কহিও না। বিবাদ করিও না। অহিফেন, তামাক, ভাঙ্গ ও নীল বস্ত্র পরিত্যাগ করিবে। মদ্য ও মাংস হইতে দূরে থাকিবে। তোমার ছাগগুলি যেন জীবিত রহে; মুসলমানের নিকট বিক্রয় করিও না; তাহা হইলে তাহারা আপনাদিগের আহারার্থ তাহাদিগকে হত্যা করিবে। তুমি কখন করিতে বলদ নিযুক্ত করিও না। অমাবস্যার দিবস কর (উপবাস কর)। হরিদ্বর্ণ বৃক্ষ কর্ত্তন করিও না। হোম, জপ, ধ্যান, পূজা করিয়া বৈকুণ্ঠবাসী হইবে। ২৯ উপদেশের শেষ উপদেশ, উপদেশক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন—যদি প্রকৃত বিশ্নোই হও তাহা হইলে তোমার সন্তানগণকে দীক্ষিত কর। (১)

প্রাগুক্ত উপদেশসমূহ সকলে সমানরূপে প্রতিপালন করে না। নীলবস্ত্র-পরিধান নিষিদ্ধ হইলেও, সরকারী কর্ম্মচারিগণ বাধ্য হইয়া নীল পরিচ্ছদ (Blue uniform) পরিধান করে। অধিক অনেকে তুলি কর্ণার্থ উহা বিযুক্ত করে বটে, কিন্তু অধিকাংশই বসন দ্বারা হলকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ কলহ-প্রিয়—পরস্পরকে ইতর ভাষায় গালি প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু ইহারা তামাক, আফিম, ভাঙ্গ ও সুরা ব্যবহার করে না, এবং আপনারা কোন জীবহত্যা করে না; অধিকন্তু, অপরেও যাহাতে জীবহিংসা না করে, তজ্জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহাদিগের গ্রামসমূহে কৃষকগণ দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত উপযোগী অন্যান্য পশু দলে দলে ভ্রমণ করিয়া থাকে; কিন্তু ইহারা সর্ব্বদাই ইহাদিগের মুসলমান প্রতিবেশীদিগকে পশু বধ করিতে নিষেধ করিয়া থাকে; এবং য়ুরোপীয় শিকারীগণকে পশু শিকার করিতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া থাকে। ইহারা চাহে যে, ইহাদিগের গ্রামস্থ কোন পশু কোন ব্যক্তি হত্যা করিতে পারিবে না। তাহারা সরকার বাহাদুরের নিকট আবেদন করে যে, তাহাদিগের রাজস্বের পরিমাণ অপর প্রতিবেশীদিগের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে গ্রহণ করা হউক; কারণ, পশুসকল অধিক পরিমাণে তাহাদিগের শস্যের অপচয় করিয়া থাকে। তদুত্তরে সরকার বাহাদুর আদেশ করেন যে, কর প্রতিবেশীগণের সমতুল্য প্রদান করিতে হইবে; ইহা তদপেক্ষা ন্যূন হইতে পারে না। যখন পশু-হত্যার ভয়ে শস্যের অপচয় সহ্য করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছ, তখন রাজস্বের পরিমাণ প্রতিবেশীগণ অপেক্ষা অল্প করিয়া দিলে, সেই পুণ্যের ফল প্রাপ্ত হইবে না।

ইহারা সচরাচর কপোত ও অন্যান্য পক্ষিগণের আহারার্থ স্থানে-স্থানে শস্য ছড়াইয়া রাখে। অমাবস্যার দিবস ইহারা উপবাস করে—সাংসারিক কোন কর্ম্ম করে না। ত্রিসন্ধ্যা স্নান ও ভজনা করিয়া থাকে। রমণীরা কৃষ্ণবর্ণ পশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতে ভালবাসে এবং পবিত্রতা সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখে। রজস্বলা বিংশতি উষ্ট্র গমন করিতেছে, সর্ব্বাগ্রগামী উষ্ট্রের উপর যাত্র রক্ষিত; কিন্তু সর্ব্বপশ্চাদ্গামী উষ্ট্রকে অপর জাতি স্পর্শ করিলে যাত্র অশুচি হয়, এবং ইহারা তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করে।

দীক্ষা।

কতিপয় বিশনোই একস্থানে সমবেত হয়। তাহাদিগের সম্মুখে একজন সাধ (সাধু) বা বিশনোই পুরোহিত অগ্নি জ্বালিয়া হোম করেন এবং দীক্ষার্থীকে বিশনোই ধর্ম্ম সংক্রান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে নূতন মৃন্ময় পাত্রে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ পূর্ব্বক আপন গলদেশস্থ মালা দ্বারা পাত্রস্থিত জল আলোড়ন করিয়া বিষ্ণু-গায়ত্রী পাঠ করেন; এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক পাত্রস্থ জল দীক্ষার্থীকে পান করিতে দেন। দীক্ষার্থী বারত্রয় সেই জল পান করে। তৎপরে তাহার চোটী (শিখা) কর্ত্তনপূর্ব্বক মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয়। বিশনোই সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করে। হিন্দুদিগের ন্যায় মস্তকের মধ্যস্থলে শিখা রক্ষা করে না। কিন্তু শ্মশ্রু কখন মুণ্ডন করে না। কেবল পিতৃবিয়োগ ঘটিলে চিবুকের কেশমাত্র কর্ত্তন করিয়া থাকে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ত্রিংশ দিবস পরে দীক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে বিষ্ণু-গায়ত্রী স্থানে গর্ভগায়ত্রী পঠিত হয় এবং সাধ (সাধু) শিশুর মুখ মধ্যে কয়েক বিন্দু জল প্রদান করেন এবং শিশুর আত্মীয়গণের প্রত্যেককে তিন গণ্ডুষ জল পান করিতে দিয়া থাকেন। এই সময়ে শিশুর মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয়। ঐ পবিত্র জল দ্বারা গৃহাদিও পূত হয়; কারণ, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ায় অপবিত্র হইয়াছিল।

রীতি-নীতি।

বিবাহ আপনাদিগের (বিশনোইদিগের) মধ্যে সম্পন্ন হয়। বিবাহে হিন্দুদিগের ন্যায় পবিত্র অগ্নির প্রদক্ষিণ নাই। ইহাদিগের পুরোহিত সাধ বা সাধু। ইহারা সপ্ত ফের দিয়া বিবাহ সমাধিত করে। সমাধির স্থানে—যে স্থানে সচরাচর গো-পাল অবস্থিতি বা গমনাগমন করে। হোলী ইহাদিগের পর্ব্ব বটে, কিন্তু ইহারা বিভিন্ন প্রকারে

(১) Punjab Census Report, 1891, page 139, sqq.

হোলী উৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকে। সেই দিবস সূর্য্যাস্ত হইতে পর দিবস বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত উপবাসী থাকে; পরে কথা শ্রবণ করে। কথা—প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, কিরূপে প্রহ্লাদকে তাঁহার দুষ্ট পিতা হিরণ্যকশিপু যন্ত্রণা দিয়াছিল, অবশেষে নরসিংহ অবতার কর্ত্তৃক কিরূপে তাঁহার যন্ত্রণার অবসান হয়; কিরূপে অবশেষে প্রহ্লাদ অগ্নিমুখ হইতে মুক্তিলাভ করেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কথা সমাপ্ত হইলে সকলের মধ্যে গুড় ও পবিত্র জল বিতরিত হয়। প্রহ্লাদের মুক্তি লাভের স্মরণার্থে সকলে গুড় ও জল পান করে।

তীর্থ।

বাবজীর সমাধি ইহাদের তীর্থ। এই তীর্থ বিকানের নগরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। বাবজীর সমাধির উপর একটী মঠ এবং একটী মন্দির আছে। পুজারিগণ তথায় বাস করে। আষাঢ় ও ফাল্গুন মাসে এখানে মেলা হয়। যে পাহাড়ে বাবজী বাস করিতেন, যাত্রিগণ সেই পাহাড়ে গমনপূর্ব্বক প্রস্তর-পাত্রে চলি কাষ্ঠ জ্বালিয়া হোম করে; এবং ঘৃত, তিল, গুড় ও সাকুরা আহুতি প্রদান করে। যাত্রিগণ মন্দিরের কর্ম্মচারিগণকে পারিতোষিক এবং তত্রত্য দরিদ্র ও পাণ্ডাবটগণের আহারার্থ অন্ন প্রদান করিয়া থাকে। যদি কেহ পাপগ্রস্ত হয়, অর্থাৎ কোন জীব হত্যা করিয়া থাকে, কিম্বা গরু বা গো মুসলমানের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে, অথবা ক্ষমতা সত্ত্বেও যদি কোন গো হত্যা ব্যাপারে নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহা হইলে সমবেত বিশনোইগণ তাহার অর্থদণ্ড করিয়া পাপ হইতে তাহাকে বিমুক্ত করেন। এই অর্থ মন্দিরের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ও তত্রত্য পশু-পক্ষিগণের আহারার্থ ব্যয়িত হয়। ইহাদের দ্বিতীয় তীর্থ যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী সমাধি-স্থান; ইহার নাম 'জম্বোলা'। চৈত্র মাসে এই স্থানে মেলা হইয়া থাকে। যাত্রিগণ অত্রত্য সরোবরে স্নান, স্ব-স্ব সামর্থ্যানুসারে পশুদান, বাদ্য সহকারে সঙ্গীত এবং স্থানীয় মন্দির ও কপোতদিগকে অন্ন প্রদান করিয়া থাকে। বিশনোই অতীব যত্নের সহিত হোম কার্য্য সম্পন্ন করে। সম্ভ্রান্তগণ ব্যক্তিগণ প্রতিদিন এবং হীন অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ কেবল অমাবস্যায় হোম করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের ব্রাহ্মণ-ভোজনের ন্যায় ইঁহারাও সাধু বা সোহান্ (সাধু বা জ্ঞানী) ভোজন করাইয়া থাকেন। সাধুগণ পুরুষানুক্রমে পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়া থাকেন এবং অপর বিশনোইর সহিত তাঁহাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। ইঁহারা বিশনোই ব্যতীত অপরের দানও গ্রহণ করেন না। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ বিশনোই হইতে পারেন। বিশনোইর মধ্যে জাঠ সুত্রধরের (খাটি) সংখ্যা যেরূপ অধিক, রাজপুত ও বেণিয়ার সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক কম। বেণিয়া বিশ-নোই পঞ্জাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগের স্থান উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মুরাদাবাদ জেলায়। বিশ্নোই হইলে আর আপনাকে জাঠ বা খাটি বলিতে পারিবেন না; কিন্তু বিবাহ অবশ্যই জাঠ বা খাটি বিশ্নোইর সহিত হইবে। বিশনোইর আদি গোত্রই থাকে; গোত্র পরিবর্ত্তিত হয় না এবং স্বগোত্রে বিবাহও নিষিদ্ধ। বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব। হিন্দু বৈষ্ণবগণের সহিত বিশনোইগণের প্রভেদ এই যে, বিশনোইগণ জন্মের সময় শিখা সহিত সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করে, বৈষ্ণবগণ শিখা রক্ষা করে। বিবাহে বিশনোইগণের পবিত্র অগ্নি প্রদক্ষিণ প্রথা নাই; কিন্তু বৈষ্ণবগণের বিবাহে অগ্নি-প্রদক্ষিণ অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। তৃতীয়তঃ বিশনোইগণ কোন ক্রিয়া-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের সাহায্য গ্রহণ করে না; কিন্তু বৈষ্ণবগণের সকল কর্ম্মে ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ বিশনোইগণের ধর্ম্মগুরু মহাত্মা আত্মারাম বিশনোইগণের নিম্নলিখিত প্রকার শ্রেণী বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—জাঠ বিশনোই, বেণিয়া বিশনোই, ব্রাহ্মণ বিশনোই, আহীর বিশনোই, সুনার বিশনোই, নাই বিশনোই, চৌহান বিশনোই, ও বরহর বিশনোই। ইহারা স্বগোত্রে অথবা অন্যান্য আত্মীয়গণের গোত্রে স্মরণাতীত কাল পর্য্যন্ত বিবাহ করিবে না।

একশত পঞ্চাশ (১৫০) বৎসরেরও অধিক কাল গত হইল মুরাদাবাদের বিশনোইগণ মুরাদাবাদে বাস করিতেছে। যে সময় ইহারা মুরাদাবাদে আগমন করে, তৎকালে মুরাদাবাদ অযোধ্যার নবাব-উজিরের হস্তগত ছিল। ইহাদিগের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। বিবাহ-উৎসব উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দুগণের ন্যায়। সগাই প্রথায় বিবাহ বা বিবাহ হইয়া থাকে। বাবজীর 'উপাসনা' ব্যতীত, ইহারা হিন্দু প্রতিবেশীর ন্যায় শিব ও ভবানীর অর্চ্চনাও করিয়া থাকে। জন্মশৌচ চল্লিশ দিন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে ব্রহ্মণ কিম্বা তাঁহার নির্ব্বাচিত কোনও শিষ্য আগমনপূর্ব্বক প্রসূতি দ্বারা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করাইয়া থাকেন। এই উৎসবের নাম 'বহুতরছুনা।'

কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারী কুপোষকে নূতন কলস পূর্ণ করিয়া নব বস্ত্রে কলস-মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক তবনদ্বারে রক্ষা করে। নব বস্ত্রের উপর কয়েকখানি পুরী (ঘৃতপক্ক আটার পুরী) রাখিয়া দেয়। দিবাবসানে জ্ঞাতিগণ সমবেত হয় এবং প্রত্যেকে এক এক গণ্ডুষ জল গ্রহণপূর্ব্বক মৃতের নামে ভূমিতলে নিক্ষেপ করে। তৃতীয়, দশম, বিংশতি ও চত্বারিংশৎ দিবসে এবং তৃতীয়, ষষ্ঠ ও দ্বাদশ মাস অতীত হইলে পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়ার পুনরনুষ্ঠান করিয়া থাকে। মৃতদেহের শ্মশানে বারুকাপূর্ণ কলস বন্ধনপূর্ব্বক গঙ্গায় মৃতদেহ নিক্ষেপ করে। হিন্দুদিগের ন্যায় অপরপক্ষে পিতৃ-পুরুষের তর্পণ করিয়া থাকে। মৃত ব্যক্তি অনুত্রক হইলে, তাহার নিকট-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি শ্রাদ্ধ করে। শ্রাদ্ধের বস্ত্রাদি ব্রাহ্মণকে দান করে। স্বজাতি ভিন্ন ইহারা অপরের স্পৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য ভোজন করে না।

সামাজিক নিয়ম।

ইহারা মদ্য, মাংস ও তামকূট ব্যবহার করে না। যে যে স্থানে ইহা-দিগের সংখ্যা অধিক, তত্তৎস্থানে আপনাদিগের মধ্যে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া

বিষ্ণু-মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। প্রত্যেক অমাবস্যার সকলে মন্দিরে সমবেত হয় এবং রাধাজী সম্বন্ধীয় সঙ্গীত মোহান্ত, সাধু বা পুরোহিত কর্তৃক গীত হয়। এই সম্মিলনের নাম 'ভুমুলা'। আশ্বিন ও চৈত্র মাসদ্বয়ে ইহারা অধিক সংখ্যায় সমাগত হইয়া মিষ্টান্ন ও অর্থ প্রদান করে। মিষ্টান্ন ও অর্থের কিয়দংশ মোহান্ত গ্রহণ করেন; অবশিষ্টাংশ উপস্থিত জনগণের মধ্যে বিতরিত হয়। মোহান্ত ও তাঁহার সাধুগণ বিবাহ করেন না। বিজনৌরের বিশ্নোইগণের উপাধি সেবজী। ইহারা 'সেলাম আলৈকুম' বলিয়া মুসলমানী প্রথায় অভিবাদন করে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, কোন সময়ে এক মুসলমান কাজী সতীদাহে বাধা প্রদান করিতে আগমন করিলে, তাহারা তাঁহাকে হত্যা করে; কিন্তু মুসলমানগণের ভয়ে ভীত হইয়া মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া ভাণ করে এবং মুসলমানগণ তাহাদিগের বাক্যে প্রত্যয় করিয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করে।

আধুনিক আলোক-তত্ত্ব

[শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, বি-এসসি]

আলোক তত্ত্ব সম্বন্ধে বিপুল গবেষণার তরঙ্গ শনৈঃ শনৈঃ বৈজ্ঞানিক জগৎ পরিপ্লাবিত করিয়া ফেলিল। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই আলোক-তত্ত্বের সবিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও কেহ জানিত না যে, আলোকের একটা নির্দিষ্ট বেগ আছে। কোন একটী জ্যোতির্ময় পদার্থ হইতে দেখিতে-দেখিতে চারিদিক সমুজ্জ্বল করিয়া, চমৎকার শোভা বিস্তার পূর্ব্বক আলোক মানুষের মনকে এত মুগ্ধ করিত যে তাহার আর ভাবিবার সময় থাকিত না—আলোকের কোন নির্দিষ্ট বেগ আছে কি না। ১৬৭৫ খৃঃ অঃ ওলাফ রোমার (Olaf Romer) প্রথম আবিষ্কার করিলেন যে, আলোকের একটী নির্দিষ্ট গতি আছে। আলোক পলকে বিশ্ব ব্যাপিয়া ফেলে না; কিছুদূর যাইতে হইলে তাহার কিছু-না-কিছু সময় লাগে। রোমারের গণনা অবশ্য নির্ভুল হয় নাই। পরে ফিজো (Fizeau) ও ফুকোর (Foucault) সূক্ষ্মতর গণনায় আলোক-বেগ (velocity) সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। রোমার এই আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিক জগতে একটী নূতন যুগ টানিয়া আনিলেন। বৈজ্ঞানিক সমাজে তখন একটী বিচিত্র সোরগোল পড়িয়া গেল। সকলেই তখন আবার নূতন ভাবে ভাবিতে লাগিলেন যে—"আলোক কি? কোন ভাস্বর পদার্থ হইতে প্রবাহিত হইয়া, একটী নির্দিষ্ট বেগে দিকে-দিকে ব্যাপ্ত হইয়া, অভাবনীয় বর্ণচ্ছটায় মানুষকে পুলকিত, চমৎকৃত ও বিমোহিত করিয়া দেয়—এ তরল সৌন্দর্য্যের মূলীভূত কারণ কি?"

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ভাস্বর পদার্থ আলোক নামে এমন একটী জিনিস বিকীরণ করে, যাহার অভাবনীয় প্রভাবে দর্শন-ক্রিয়া সংসাধিত হয়, এবং ঐ আলোক একটী নির্দিষ্ট বেগে প্রবাহিত হয়। এই আলোক আর কিছু নহে—উহা বিশ্বব্যাপিনী শক্তির একটী রূপান্তর মাত্র। শক্তি এ বিশ্ব জগতের প্রাণ, আর পদার্থ তাহার দেহ বা অঙ্গ। বিশ্বের এই বিপুল, অসীম অঙ্গ ব্যাপিয়া ঐ নিবিড় প্রহেলিকাময়ী শক্তির সত্তা সতত প্রকটিত রহিয়াছে। শক্তি ও পদার্থের সম্বন্ধে বহির্জগৎ। কিন্তু পদার্থের যেমন বিনাশ নাই, উৎপত্তিও নাই—শক্তিরও সেইরূপ বিনাশ নাই। শক্তি এক আকার হইতে অন্য আকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; কিন্তু মূল শক্তির পরিমাণ চিরকাল সমান থাকে। পদার্থ ব্যতীত শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। পদার্থের মধ্য দিয়া শক্তি কার্য্য করিয়া বহির্জগতে নানা বিচিত্র তরঙ্গ তুলিয়া ক্রীড়া করিতেছে। পদার্থ শক্তির বাহন—শক্তির রঙ্গমঞ্চ। দূর সমুদ্রে কোন একখানি জাহাজে যদি কোন নবশক্তি সঞ্চারিত করিতে হয়, তবে আমাদের কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয়? সাগর-কূলে দাঁড়াইয়া জলকে এরূপভাবে আলোড়িত করিতে হইবে, যেন জলরাশি তরঙ্গাকারে নাচিয়া-নাচিয়া জাহাজে আঘাত করিয়া তাহাকে শক্তি প্রদান করে; তরঙ্গরাজি যেন আমাদের নিকট হইতে শক্তি লইয়া জাহাজকে সমর্পণ করে। অথবা কামানের গোলা নিক্ষেপ করিয়া জাহাজকে নবশক্তিতে উত্তেজিত করা যাইতে পারে। এস্থলে গোলাটী শক্তির বাহনের কাজ করিল। ঘোটের উপর বলা হইতেছে যে, শক্তি-প্রবাহ পরিচালনের প্রয়োজন হইলে একটী বাহনের প্রয়োজন; পদার্থ সেই বাহনের কাজ করে।

কখন বা একটী নির্দ্দিষ্ট পদার্থ শক্তিকে এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে লইয়া যায়; কখন বা একটী পদার্থ শক্তির বোঝাটী অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়—সে আবার অন্যকে সমর্পণ করে—এইরূপ বহু পদার্থে মিলিয়া শক্তিকে গন্তব্যস্থানে লইয়া যায়; ঠিক যেমন কুলিরা একজনের মাথায় বোঝা আর একজনের মাথা হইতে লইয়া পরবর্ত্তী কুলির মাথায় চাপায়—সে আবার পরবর্ত্তীকে অর্পণ করে; এইরূপে নির্দ্দিষ্ট স্থানে মোট পৌঁছাইয়া দেয়। এখন আলোক যদি শক্তির একটী রূপান্তর হয়, তবে এই শক্তি-প্রবাহের বাহন কে? সেই বাহন একজন, না বহু কুলি সম্প্রদায়ের মত? শক্তি পদার্থের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়; স্ব-প্রবাহে তাহার গমনাগমন অকল্পনীয়। তাহা হইলে এই আলোক-শক্তি যে কিরূপে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই মহা সমস্যার বিষয়। কোন দৃষ্ট বস্তু ও দর্শকের মাঝে কি এমন বস্তু আছে, যাহা শক্তিকে আলোক রূপে দর্শকের চক্ষু পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যায়? এই প্রশ্নের সমাধান করাই বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের নিকট এক মহা প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সূর্য্য হইতে আলোক কিরণ পৃথিবীতে আসিতে প্রায় আট মিনিট লাগে। এই আট মিনিট কাল শক্তি কোথায় পুঞ্জীভূত থাকে? সূর্য্য হইতে শক্তি বিচ্ছুরিত হইয়া, মধ্যবর্ত্তী এই বহু ক্রোশব্যাপী পথে অপ্রকটিত অবস্থায় থাকিয়া, আমাদের নিকট পুনরায় আবির্ভূত হয়—এরূপ কল্পনা যেন যুক্তি ও বাহুল্যের অতীত বলিয়া মনে হয়। পদার্থ ও শক্তি বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থান

করিতে পারে না—ইহাই পদার্থ-বিদ্যার মূল সূত্র। আলোক-শক্তির পরিচালনের জন্য পদার্থের সহায়তা নিশ্চয়ই আবশ্যক।

এই সম্বন্ধে ক্রমে দুই প্রকার সূত্র কল্পিত হইল। প্রথম মহামতি নিউটনের (Newton) বিকীর্ণ সূত্র (emission theory)। নিউটন বলেন যে, তাপের পদার্থ নিজে তাহার চতুর্দিকে অতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জ্যোতিকণা (luminous corpuscles) বিকীরণ করিতেছে। এই বিকীর্ণ জ্যোতিকণাগুলি আলোক-শক্তিকে বহন করিয়া নির্দ্দিষ্ট বেগে সরল ও ঋজু। মধ্যবর্ত্তী বায়ুকে ঋজুভাবে ধাবমান হয়। কিন্তু এ সূত্র অবলম্বনে কয়েকটী প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া ব্যর্থ মনোরথ হওয়ায়, বৈজ্ঞানিকগণ নূতন তথ্য আবিষ্কারের জন্য মনোযোগ দিলেন। ক্রমে স্পন্দন-সূত্র (wave-theory) সঙ্কলিত হইল। এই সূত্রে বলে যে, আলোক-শক্তি তাপের পদার্থ হইতে আবির্ভূত হইয়া, এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম গন্ধবহ-স্তরের সহিত স্পন্দন প্রবাহে, পরিচালিত হইয়া, নির্দ্দিষ্ট বেগে দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই আলোক-শক্তির গন্ধবহ-স্তরের নাম ঈথার (ether) দেওয়া হইল; এবং কল্পনা করা হইল যে, ঈথার বিশ্বব্যাপী। এই ঈথারকে আমরা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ প্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করিতে পারি না; কিন্তু আলোকের কতকগুলি বিচিত্র ঘটনা-বৈচিত্র্য ও বিদ্যুতের কয়েকটী অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পাদনে ঈথারের মত একপ্রকার অপূর্ব্ব গন্ধবহ-স্তরের কল্পনা না করিয়া থাকা যায় না। আধুনিক বিজ্ঞান এই ঈথারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহু প্রমাণ সংগ্রহ ও ঈথার বিচিত্র ক্রিয়ার বর্ণনা করিয়া নূতন জ্ঞানালোক বিশ্বকে সমুদ্ভাসিত করিবার নিমিত্ত জীবন মরণ পণে বিপুল গবেষণা-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া আছে। স্পন্দন-সূত্রে বলে যে, তাপের পদার্থ আভ্যন্তরীণ শক্তিতে ঈথার সমূহ আলোড়িত করে। এই আলোড়নে ঈথার স্পন্দিত হইয়া তরঙ্গে-তরঙ্গে নাচিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই প্রবাহই আলোক-কিরণ রূপে প্রকটিত হয় এবং এই প্রবাহ চক্ষুতে আসিয়া আঘাত করিয়া দর্শন-ক্রিয়া সংসাধিত করে। ঐ প্রবাহ আলোকের নির্দ্দিষ্ট বেগে চলিতে থাকে, এবং তাপের পদার্থ হইতে শক্তি বহন করিয়া লইয়া আসে।

বিকীরণ-সূত্রের পরিপোষণে প্রথম আপত্তি এই হইল যে, আলোক যদি তাপের পদার্থের জ্যোতিষ্ক কণিকারাজি হয়, তাহা হইলে যখন বিভিন্ন উপাদানের পদার্থ হইতে উহা বহির্গত হয়, তখনও উহার গুণের কোন বিভিন্নতা দেখা যায় না; এবং উহার বেগ একই থাকে। এক পদার্থের কণা অন্য পদার্থের কণার সহিত এক গুণযুক্ত হইতে পারে কেমন করিয়া? রসায়ন-শাস্ত্র মতে উহা অকল্পনীয়। উপরন্তু, সূর্য্য ও প্রজ্বলিত বাতি একই গুণযুক্ত একই পদার্থ নহে। কিন্তু প্রত্যেকেরই জ্যোতি-কণা একই গতিতে, একই ভঙ্গীতে ধাবমান হয়। ইহার কারণ কি? আরাগো (Arago) ইহার উত্তরে বলিলেন যে—"বিভিন্ন তাপের পদার্থ হইতে বিকীর্ণ কণিকার বিভিন্ন বেগে বিচ্ছুরিত হওয়া উচিত স্বীকার করি; কিন্তু আলোক উৎপাদন করিতে হইলে জ্যোতিকণাগুলির একটা নির্দ্দিষ্ট বেগসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন; এবং যে সকল কণিকা আলোক-রশ্মি রূপে দৃষ্ট হয়, তাহাদের সেই এক নির্দ্দিষ্ট বেগসম্পন্ন হওয়া সম্ভব। আলোক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল চলে। এই বেগে তাপের পদার্থের যে সকল কণিকা ছুটিতে পারিবে, তাহাই আলোক রূপে প্রকটিত হইবে। সেই কারণে আলোক-কণা বিভিন্ন পদার্থ হইতে বহির্গত হইলেও, তাহারাও যে একই বেগসম্পন্ন তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।"

এ সূত্রের সাহায্যে আলোক-রশ্মির ঋজু গমনের ব্যাখ্যা অতি সরল হইয়াছে সন্দেহ নাই। ক্ষুদ্র জ্যোতিকণা সরল পথে ছুটিয়া যায়। কাজেই কোন অস্বচ্ছ দ্রব্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া যখন ঐ কণিকারাজি অগ্রসর হইতে পারে না, তখন ঠিক ঐ দ্রব্যের বাহ্যিক আকার অনুযায়ী ছায়া দেখা যায়; আলোক-রশ্মির প্রতিফলনের ব্যাখ্যাও এই সূত্র সাহায্যে দেওয়া যায়। কোন মসৃণ ক্ষেত্রে আলোক-রশ্মি নিপতিত হইলে আলোক প্রতিফলিত হয়। প্রতিফলনের নিয়ম এই যে, পতিত কিরণ (incident ray) ও প্রতিফলিত কিরণ পতন-বিন্দুতে (incident point) লম্বের (normal) সহিত সমান কোণ গঠন করে। বিকীরণ-সূত্রে এই ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করা যায়। *

বিকীরণ-সূত্রের মর্ম্মানুসরণে প্রতিফলন ক্রিয়ার সুন্দর রূপে ব্যাখ্যা করা যায় বটে, কিন্তু আলোক-রশ্মির দিক-পরিবর্ত্তন-ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মহা সমস্যায় পড়িতে হয়। ঐ সূত্র অবলম্বনে এই দিক-পরিবর্ত্তন ঘটনার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া দেখা যায় যে, আলোক এক গন্ধবহ-স্তর হইতে অন্য কোন গন্ধবহ-স্তরে প্রবেশ কালে (যেমন বায়ু হইতে জলে) দিক-পরিবর্ত্তন করে; এবং ঐ দুইটী গন্ধবহ-স্তরের মধ্যে যেটী গাঢ়তর, তাহাতে আলোক-রশ্মিকে অধিক বেগে প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু কার্য্যতঃ পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে, আলোক লঘু গন্ধবহ-স্তরে গাঢ়তর গন্ধবহ-স্তর অপেক্ষা অধিক বেগে প্রবাহিত হয়। যাহা আমরা পরীক্ষার দ্বারা চোখে দেখিতে পাইতেছি, কল্পিত বিকীরণ-সূত্র তাহার বিপরীত প্রমাণ করিতে চায়। এইখানেই বিকীরণ-সূত্র পরিপোষণে ঘোর প্রতিবাদ জাগিয়া উঠিল। পরীক্ষাগারের বাস্তব পরীক্ষা দ্বারা যে সত্যের উপলব্ধি হইতেছে—বিকীরণ-সূত্র সে সত্য উপেক্ষা করিতে চায়। বিজ্ঞান সত্যানুসন্ধিৎসু। কাজেই বিজ্ঞান-সমাজে ঐ সূত্রের বিরুদ্ধে বহু আলোচনা চলিতে লাগিল; এবং ক্রমে-ক্রমে স্পন্দন-সূত্র একটু-একটু করিয়া মাথা উঁচু করিতে লাগিল। বহুকাল ব্যাপিয়া এই দুই সূত্র পাশাপাশি থাকিয়া পরস্পরকে রণে আহ্বান করিয়াছে। স্পন্দন-সূত্রে

* ইহার প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হইলে একটু বেশী গণিতের সাহায্য প্রয়োজন, তাহাতে সাধারণ পাঠক-পাঠিকার অসুবিধা হইবে আশঙ্কা করিয়া প্রতিফলন ও দিক পরিবর্ত্তনে আলোচনা করিতে পারিলাম না।

প্রতিফলন ও দিক-পরিবর্ত্তনের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু আলোক-রশ্মি যে কম্পথ অবলম্বন করে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রথমে মহা সমস্যা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আলোক যদি ঈথারের প্রবাহই হয়, তবে আলোক-রশ্মি সরলপথে চলিতেছে—এ কথা আমরা বলি কেমন করিয়া? অথচ আমরা চোখে দেখিতে পাই যে, আলোক-রশ্মি সরল পথ অবলম্বন করিয়া চলে। এ প্রশ্নের কোন উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত শব্দন-সূত্রের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং বিকীরণ-সূত্রের মূল উৎপাটিত হয় নাই। সুবিখ্যাত নিউটন বিকীরণ-সূত্রের জন্ম উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন; এবং নানা রকম কৈফিয়ৎ, নানা রকম যুক্তির দ্বারা উহার পোষণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। মহামতি ইয়ং (Young) এর সময় পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কেহ চরম মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। ইয়ং ঈথারের গুণাগুণ, কার্য্যকলাপ, আকার-প্রকার অতি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া শব্দন-সূত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রযত্নবান হইয়াছিলেন।

ডেকার্টেকে (Descartes) অনেকে ভুল করিয়া প্রতিফলন ও দিক-পরিবর্ত্তন ক্রিয়ার আবিষ্কর্ত্তা মনে করেন; তাঁহাকে আবার অনেকে ভুল করিয়া শব্দন-সূত্রেরও আবিষ্কর্ত্তা বলেন। ডেকার্টেকে ঠিক শব্দন-সূত্রের আবিষ্কর্ত্তা বলা যায় না। তিনি বলিতেন বটে যে, একটা তরল পদার্থ-স্তরে একটা চাপ (pressure) পাইয়া সৃষ্টি ক্রিয়া লাগিয়া হয়। আলোক যে একটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঈথারের মত কোন জিনিষের প্রবহমান একটানা স্রোত, তাঁর কথায় এরূপ কিছু বোঝা যায় না।

অতি প্রাচীন যুগে এ্যারিষ্টটলের (Aristotle) আলোচনায় শব্দন-সূত্রের একটা ক্ষীণ কল্পনার আভাষ পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়। ঐরূপ লিউনার্ডো (Lionardo de Vinci) এবং গ্যালিলিও (Galilio) যেন কিছু-কিছু আভাষ দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। গ্রিমাল্ডি (Grimaldi) ও হুকের (Hooke) বর্ণনাতেও ঐ সূত্রের একটা "আবছায়া" দুই হয়। হুক বলেন—"Light is a quick vibratile movement of extreme shortness"। ডেকার্টে হুকের সূত্রের একটা সংস্কার করিয়াছিলেন মাত্র। যাঁহারা শব্দন-সূত্রের একটা আবছায়া ভাবে কল্পনা করিয়াছেন মাত্র, তাঁহাদিগকে উহার প্রকৃত আবিষ্কর্ত্তা বলা যাইতে পারে না। উহার আবিষ্কর্ত্তা তিনিই, যিনি উহা বুক বলে ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মহাজ্ঞানী হাইজিনস্‌কেই (Huygens) শব্দন-সূত্রের প্রকৃত আবিষ্কর্ত্তা বলা যাইতে পারে। ১৬৭৮ খৃঃ অঃ তিনি ঐ সূত্র ঘোষণা করেন, এবং ১৬৯০ খৃঃ অঃ আলোক-রশ্মির প্রতিফলন ও দিক-পরিবর্ত্তন ক্রিয়া (আলোককে ঈথার শব্দন-প্রবাহ কল্পনা করিয়া) সুন্দর রূপে বর্ণনা করেন। ১৬৭০ খৃঃ অঃ বার্থোলিনস (Bartholinus) লক্ষ্য করেন যে, কিয়-কিয় ওপটক আলে সংঘটিত আলোক প্রবেশ কালে দুইবার দিক পরিবর্ত্তন করে (double refraction)। হাইজিন উহার কারণ নির্দ্ধারণ করেন। কিন্তু আলোকের কম্পথাবলম্বনের কৈফিয়ৎ দিতে তিনি অসমর্থ হওয়ায়, শব্দন-সূত্র প্রাণহীন হইয়া পড়িল। অবশেষে ইয়ংএর সূক্ষ্মালোচনায় সঞ্জীবনী-মন্ত্রে শব্দন-সূত্র সঞ্জীব হইয়া উঠে।

দুইখানি টুরমালিন * প্লেট † সমান্তরাল ভাবে ধরিয়া, একখানি স্থির ভাবে রাখিয়া, অন্যখানি ঘুরাইয়া-ঘুরাইয়া, উহাদের মধ্য দিয়া কোন আলোক-বিন্দুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ঐ আলোক-বিন্দু কখন দেখা যায়, কখনও আবার দেখা যায় না। যে অবস্থায় দেখা যায় সে অবস্থা হইতে, যে অবস্থায় দেখা যায় না সেই অবস্থায় আসিতে হইলে, দ্বিতীয় প্লেটখানি প্রায় ৯০ ডিগ্রি ঘুরাইতে হয়। এই ঘটনাকে polarisation অর্থাৎ একদিগাবলম্বন বলে। হাইজিনই প্রথম ঐ ঘটনা লক্ষ্য করেন; কিন্তু শব্দন-সূত্রের সাহায্যে উহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। ইয়ংও কৃতকার্য্য হয়েন নাই। পদার্থ-কণিকায় শব্দন-প্রবাহ দুই প্রকারে ঘটিতে পারে। প্রথম, যে দিকে প্রবাহের গতি সেই দিকের সমান্তরাল ভাবে (অর্থাৎ প্রবাহ-গতি-রেখার উপর কণিকাগুলি একবার অগ্রসর হয় একবার পিছাইয়া যায় এইরূপ ভাবের শব্দন); দ্বিতীয়তঃ, শব্দন প্রবাহের যে দিকে গতি সে দিকের লম্বের সমান্তরাল ভাবে (perpendicularly) (অর্থাৎ কণিকাগুলি একবার গতিরেখার উপরে একবার নীচে যায় এইরূপ ভাবে শব্দন)। ঈথার কিরূপ ভাবে স্পন্দিত হয়, হাইজিন বা ইয়ং কেহ বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, উহা প্রথমোক্ত প্রকারে স্পন্দিত হয় এবং সেই কারণে তাঁহারা আলোক-রশ্মির একদিগাবলম্বনের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই।

ফ্রেনেল (Fresnel) সপ্রমাণ করিলেন যে, ঈথার আলোক-রেখার লম্বের সমান্তর ভাবে স্পন্দিত হয়। তাঁহার এই অভাবনীয় আবিষ্কার শব্দন-সূত্রের বহু বিঘ্ন অপসারিত করিল। আলোকের দুইবার দিগাবর্ত্তন এবং আলোক-রশ্মির একদিগাবলম্বন প্রভৃতির কারণ অনুধাবন করা সরল হইয়া আসিল। বিজ্ঞান আলোক-তরঙ্গের বহু সমস্যার চরম মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য একটা নব আশার মাধুরী-মোহে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। শব্দন-সূত্রের বিজয়-কেতন মাধুরী-বিনাদে নিখিল বিশ্ব মুখরিত হইয়া উঠিল। তখন সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে চাহিল—"আলোক আর কিছুই নহে, শক্তির রূপান্তর মাত্র; ঐ শক্তি ভাস্বর পদার্থ হইতে নিসৃত হইয়া ঈথার-কণিকায় পুঞ্জীভূত হইতে থাকে এবং ঈথার-শব্দন-প্রবাহে রূপান্তরিত হইয়া আলোক রূপে প্রকাশ পাইয়া হিল্লোলে ভাসিয়া আসিয়া দর্শন-ক্রিয়াকে উত্তেজিত করে। তখন বৈজ্ঞানিকগণ দেখিলেন কি একটা

* এক প্রকার স্বচ্ছ পদার্থ।

† পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট আকারে কর্ত্তিত অংশ।

মহিমময়ী নূতন সত্যের মধুর আলোক তাহাদের নয়নে-মনে স্নিগ্ধতা ছড়াইয়া প্রভৃতির বন্ধ-দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক একটা চিরন্তন প্রহেলিকার সরল মীমাংসা করিয়া দিতেছে।

গ্রিমাল্‌ডি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ক্ষুদ্র ছিদ্র-পথে আলোক-রশ্মিগুচ্ছ প্রবেশ করিয়া একখানি সাদা পটের উপর পড়িলে স্থানে-স্থানে আলোক বিলীন হইয়া অন্ধকার উৎপাদন করে। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানে Interference (বা বিকাশে প্রতিবন্ধকতা) নামে অভিহিত। গ্রিমাল্‌ডি উহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু যথার্থ Interference তাঁহার কাছে অজ্ঞাত ছিল।

ইং আলোক-বিকাশের প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা করেন। তিনি একটী ছিদ্র-পথে আলোক-রশ্মি প্রবেশ করাইয়া পুনরায় দুইটি পাশাপাশি ছিদ্র-পথ দিয়া আনয়ন করেন; এবং একখানি নির্ম্মল আদর্শ-পট ধরিয়া দেখেন যে, ঐ দুইটি ছিদ্রপথ হইতে একটু দূরে পটখানি ধরিলে, উহার উপর সারি-সারি কতকগুলি আলোক-রেখা দৃষ্ট হয়। আলোক ক্রমান্বয়ে একস্থানে উজ্জ্বল, আর একস্থানে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এখন যদি মধ্যস্থ দুইটি ছিদ্রের একটী বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে ঐরূপ আর দৃষ্ট হয় না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, একই আলোক-বিন্দু হইতে আগত রশ্মি দুইটি পথে প্রবাহিত হইয়া পরস্পরকে কোথাও বিলীন করিয়া দিতেছে, কোথাও উজ্জ্বলতর করিয়া দিতেছে। বিকীরণ-সূত্র মতে তেজকণা সকল আলোক-বিন্দু হইতে সরল পথে ছুটিতে থাকে। এই পরীক্ষায় (যদি বিকীরণ-সূত্র সত্য হয়) তেজকণা সকল এক পথে আসিয়া দুই পথে প্রবেশ করিল। কিন্তু তাহারা পরস্পর কোথাও নষ্ট হইতেছে, কোথাও অধিক প্রভাসম্পন্ন হইতেছে কেমন করিয়া? তবে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, আলোক একেবারে নষ্ট হইতেছে না (কেন না শক্তির লয় অসম্ভব); যেখন একস্থানে অন্ধকার হইতেছে, তেমনি আলোকিত স্থানে অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছে। আদি আলোক-রশ্মির এতটা উজ্জ্বলতা ছিল না। এই ঘটনা অবশ্য বিকীরণ-সূত্রকে একেবারে ভাসিয়া চুরিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিতেছে না; তবে ঐ তেজ-কণা যে পরস্পর পরস্পরের উপর প্রতিহত হইয়া কোথাও বিস্তৃত, কোথাও উজ্জ্বল হইয়া উঠে, উহার একটা ব্যাখ্যা "আদায়" করিতে চায়। তাহা বাস্—"তেজকণাগুলি দুই প্রকার গুণযুক্ত। বিপরীত গুণযুক্ত কণিকা প্রতিহত হইয়া অন্ধকার, ও সমান গুণযুক্ত কণিকা উৎপন্নতর আলোক সৃজন করে"—এইরূপ ব্যাখ্যা কিম্বা অন্যপ্রকার একটা কিছু কৈফিয়তের প্রয়োজন।

স্পন্দন-সূত্রের সাহায্যে ঐ ঘটনা অতি সুন্দর ভাবে, অতি সহজে বোধগম্য হয়। আলোকের এক-একটি রশ্মি ঈথারের একটানা প্রবাহ। ঐ প্রবাহে ঈথাররাশি প্রবাহ-গতি-রেখার কোথাও উপরে, কোথাও নীচে, কোথাও রেখাতেই অবস্থান করে। যেমন জলের বহন একটা ঢেউ চলে—জলের বিন্দুগুলি স্রোতের গতিরেখার উপর-নীচে করিয়া নাচিতে থাকে। দুইটি পাশাপাশি প্রবাহ (একই উৎপত্তি স্থান হইতে বাহির হইয়া) চলিতে-চলিতে যখন দুইটির দুই উর্দ্ধগামী ঢেউ, কি দুই নিম্নগামী ঢেউ মিলিত হয়, তখন ঢেউটী আকারে পরিবর্দ্ধিত হয়। আর যখন একটী নিম্নগামী ও অপরটি উর্দ্ধগামী হইয়া মিলিত হয়, তখন, তরঙ্গাকার বিলীন হইয়া যায়। এই ঘটনাটি একটা সামান্য পরীক্ষার দ্বারা লক্ষ্য করা যায়। কোন স্থির জলে যদি দুইটী লোষ্ট্র (পাশা-পাশি ভাবে) নিক্ষেপ করা যায়, তখন যে দুইস্থানে লোষ্ট্র পতিত হয়, সেই দুই স্থান হইতে তরঙ্গ উঠিয়া চলিতে থাকে; ঐ তরঙ্গ দুইটীর পরস্পরে ঘাত-প্রতিঘাত হয়। তখন একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, স্থানে-স্থানে জল যেন স্থির ভাবে আছে। (জলের স্থির অংশ যেন এক-একটী ফুল রেখার মত দেখায়।) ঈথারের প্রবাহ ঠিক ঐ ভাবেই কোথাও আলোক এবং কোথাও অন্ধকার সৃষ্টি করে, এ কথা খুবই যুক্তিসঙ্গত।

নিউটন ও বিকীরণ-সূত্রের অন্যান্য পোষকগণ বলিতে আরম্ভ করিলেন, "If light consists of undulation in an elastic medium, it should diverge in every direction from each new centre of disturbance and so, like sound, bend round interposed obstacles and obliterate all shadow."

গ্রিমাল্‌ডি পরীক্ষা দ্বারা দেখাইলেন যে, একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র-পথে রশ্মি অন্ধকার গৃহে প্রবেশ কালে ছিদ্রের চারিধারে অতি অল্প পরিমাণ স্থান আলোকিত করে। এই ঘটনা বিজ্ঞানে diffraction (বা বাধা ঘুরিয়া গমন) নামে অভিহিত। এই diffraction যেদিন পরিদৃষ্ট হইল, সেই দিন আলোক-রশ্মি যে ঋজুপথগামী, এ বিষয়ে মহা সন্দেহ আসিয়া উঠিল। বিকীরণ-সূত্র মতে আলোক ঋজু পথে চলে; মোটা-মুটি পরীক্ষা দ্বারাও আমরা উহা দেখিতে পাই। কোন বাধা অতিক্রম করিবার জন্য আলোক ঘুরিয়া চলে না। কিন্তু এই diffraction আবিষ্কৃত হওয়ায় সকলকে ক্রমে-ক্রমে স্বীকার করিতে হইল যে, আলোক-রশ্মি বাধা অতিক্রম করিবার নিমিত্ত অতি অল্প পরিমাণে ঘুরিয়া যাইবার চেষ্টা করে। তাহা হইলে সূক্ষ্ম বিচারে আলোক-রশ্মিকে ঋজুপথগামী বলা যাইতে পারে না। বিকীরণ-সূত্রানুযায়ী তেজকণা সরল পথে ছুটিয়া চলে; কাজেই ঐ সূত্র মতে আলোক-রশ্মি মোটেই ঘুরিয়া চলে না। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, আলোক-রশ্মি ঘুরিয়া চলে; কিন্তু এত অল্প যে, সহসা চুলচাবে দেখিতে গেলে ঋজু বোধ হয়, আলোক ঠিক ঋজু পথে চলিতেছে। তাহা হইলে স্পন্দন-সূত্রের অনুমোদন করিবার যে শেষ আপত্তি, তাহা আর দাঁড়াইতে পারে না। পরন্তু এই আলোকের "বাধা ঘুরিয়া গমন" আবিষ্কৃত হওয়ায় বিকীরণ-সূত্র একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এবং তাহার ভিত্তি পড়িয়া গেল। স্পন্দন-সূত্রের আর কোন প্রতিবাদ তুলিবার কারণ রহিল না। কিন্তু ঈথারের মত একটা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থের কল্পনা ব্যতিরেকে ঐ স্পন্দন-সূত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আরও দেখা গেল যে, তাপ-বিজ্ঞান ও তড়িৎ-বিজ্ঞানের কয়েকটি ঘটনার জন্য ঈথারের মত একপ্রকার বস্তুর কল্পনা অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। অতএব নির্ব্বিবাদে ঈথার কল্পিত হইল—এ সকল কথার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। অতঃপর এই ঈথার

যে কি-কি গুণযুক্ত, উহার ক্রিয়া কিরূপ, গুরুত্ব কত, চঞ্চলতা কতখানি প্রভৃতির পরীক্ষা চলিতে লাগিল। আজিও ঐ পরীক্ষার শেষ হয় নাই; আজিও ইহার চরম নিষ্পত্তি হয় নাই।

ঈথার অতি সূক্ষ্ম, অতি হালকা। উহাতে স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। উহা সৌরজগতের প্রত্যেক পদার্থে, প্রত্যেক স্থানে, আকাশে, কাননে, সলিলে, স্থলে, গ্রহ-নক্ষত্রে বিদ্যমান। এই বিপুল সমুদ্র অতি দূর—অতি দূর গ্রহ-নক্ষত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জালের মধ্য দিয়া যেরূপ জল চলিয়া যায়, বৃক্ষপত্রের ছিদ্র দিয়া যেরূপ বায়ু গমনাগমন করে, সেইরূপ ঈথার জড় পদার্থের মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে পারে। এইখানে একটা প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি প্রত্যেক জড়পদার্থের মধ্য দিয়া ঈথারের গমনাগমন সম্ভব হয়, তাহা হইলে অবশ্য পদার্থের মধ্য দিয়া আলোক যাইতে পারে না কেন? ইহার উত্তর এইরূপ ভাবে দেওয়া যাইতে পারে যে, অবশ্য পদার্থের অণুগুলি এরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট যে, তাহারা ঈথারের স্পন্দনে কিন্তু ব্যাঘাত জন্মায়; যেরূপ দ্রুত স্পন্দন হইলে শক্তি আলোক রূপে প্রকটিত হয়, অণুগুলির প্রতিবন্ধকতার জন্য ঈথার সেরূপ দ্রুত স্পন্দিত হইতে পারে না। বিভিন্ন পদার্থ-স্তরে যে আলোকের বেগ বিভিন্ন হয়, তাহার ব্যাখ্যাও ঐরূপ ভাবে করা যাইতে পারে। ঘনস্তরে ঈথার দ্রুত প্রবাহিত হইতে পারে না; কাজেই লঘুস্তর অপেক্ষা ঘনস্তরে আলোক কম বেগে চলে। উপরি-উক্ত কথাগুলি যে ধ্রুব সত্য, তাহা ঠিক বলা যায় না; এবং একটু গভীর ভাবে আলোচনা করিতে গেলে, বহু প্রশ্নের তরঙ্গ আসিয়া মনকে ধাক্কা দিতে থাকে। জড় পদার্থের অণুপরমাণুগুলি ঈথারের স্পন্দনে বাধা দেয়,—না, সমগ্র পদার্থ নিজে উহার গতির কিরূপ প্রকারে প্রতিবন্ধক হয়? জালের ছিদ্র দিয়া জলের মত, বৃক্ষপত্রের ছিদ্রপথ দিয়া বায়ুর মত—ঈথার জড়পদার্থের মধ্য দিয়া গমনাগমন করে—না, উহার মধ্যে অন্য কোন প্রকার প্রহেলিকাময় ক্রিয়া বিদ্যমান? প্রত্যেক পদার্থের অভ্যন্তরে ঈথার বর্ত্তমান। কিন্তু যখন ঐ পদার্থ চলিতে থাকে, তখন তাহার মধ্যস্থ ঈথার বহিয়া লইয়া যায়—না, উহার চলন্ত অবস্থায় ঈথারের জল বাহির হইয়া নূতন জল উহার মধ্যে প্রবেশ করে? (ঠিক যেমন জলের মধ্যে একখানি চালনী ডুবাইয়া তুলিতে থাকিলে, জলকণারাজি ছিদ্রপথে বাহির হইয়া যায়, এবং নূতন-নূতন জলকণার দল তাহাদের স্থান অধিকার করে।) ঐ ঈথারের অস্তিত্ব যেমন পৃথিবী, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রের গতির কোন প্রতিবন্ধকতা হয় কি? অথবা গ্রহগণ পরিভ্রমণকালে ঐ ঈথার-সমুদ্রে কোন তরঙ্গ তুলে কি? ঈথারকে "পদার্থ" বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে কি না? এই সকল প্রশ্ন এখনও জটিল সমস্যা বলিয়া মনে হয়। পরীক্ষাগারে পরীক্ষা দ্বারা উহাদের চরম মীমাংসায় উপনীত হইবার আশা এখনও স্বপ্ন বলিয়া ধারণা হয়। তবে এইটুকু আশার বিষয় যে, এই সকল প্রশ্নের সমাধানের পথে কোন-কোন বৈজ্ঞানিক কিছু দূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন। সে সব বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে পরবর্ত্তীকালের প্রয়োজন।

যে দিন স্পন্দন-সূত্র সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল, সে দিন আলোক-বিজ্ঞানের এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন হইল; বৈজ্ঞানিকগণ নূতন আনন্দে পুলকিত হইয়া ঐ অনন্তকল্পনীয় অদ্ভুত ঈথার সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইলেন। এই আলোক-বিজ্ঞানের নূতন যুগের নূতন প্রভায় মোহিত হইয়া বৈজ্ঞানিকগণ নূতন সত্য আবিষ্কারের জন্য জ্ঞানের অর্চ্চনায় মনোযোগে মাতিয়া উঠিলেন।

ভারতের নীতি-শিক্ষা-সমস্যা

[অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-টি]

আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতেছে না, ইহা শাসকবর্গ ও শাসিত জনসাধারণ সকলেই এখন সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। চিন্তাশীল সমাজহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই প্রথায় নীতি বিবর্জ্জিত শিক্ষাপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া সমাজ দিন-দিন অন্তঃসারশূন্য, শ্রীহীন, স্বার্থপর ও বিপথগামী হইয়া পড়িতেছে। এই উচ্ছৃঙ্খল সমাজকে সুসংযত ও সুপথগামী করিতে হইলে, নীতিশিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন। অর্থোপার্জ্জন শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই, আমাদের এত দ্রুত অধোগতি হইতেছে। অর্থ-চিন্তাকে মন হইতে একেবারে দূর করিয়া, সমাজ কখনও সুপরিচালিত ও সুশৃঙ্খলিত হইতে পারে নাই, পারিবেও না। আমরা অসংযত ভাবে অর্থলিপ্সাপ্রণোদিত হইয়া, নীতিবিগর্হিত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, সমাজ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছি, এইরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। কাজেই অর্থ ও ধর্ম্মের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া তাহাদের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রী স্থাপন করিতে হইবে, এবং সমাজ যাহাতে প্রকৃত জ্ঞানালোকের উদ্ভেকে ধীরে-ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার বিধান প্রণয়ন করিতে হইবে। প্রকৃত জ্ঞানবান্ ব্যক্তি নিজেকে অজর ও অমর মনে করিয়া বিদ্যা ও অর্থের চিন্তা করিবেন, এবং মৃত্যু আসন্ন ভাবিয়া ধর্ম্ম আচরণ করিবেন।* বস্তুতঃ এই প্রাচীন সার সত্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া আমরা অধঃপতিত হইয়াছি। এই শৈথিল্যের ও অবহেলার জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া আমাদিগকে সেই শ্রেষ্ঠ সত্য হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে হইবে।

ভারতীয় বিদ্যালয়সমূহে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার কোনও সুব্যবস্থা করা যাইতে পারে কি না, এই সম্বন্ধে মতামত চাহিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্ট এক আদেশপত্রের প্রচার করিয়াছেন। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের মধ্যে কি প্রণালীতে পরিচালিত হইলে, এইরূপ অনুষ্ঠান ফলবান্ হইতে পারে, সুধিবর্গ তাহা বিবেচনা করিতেছেন ও করিবেন।

---

* অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত এব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥

কিন্তু চরিত্র-গঠনই যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য সাধনই যে শিক্ষাপদ্ধতির চরম লক্ষ্য—এ বিষয়ে শিক্ষাবিজ্ঞ ও শিক্ষানুরাগিবর্গ নিঃসন্দেহ এক মত হইবেন। হিন্দুর প্রাচীন স্মৃতি মনু-সংহিতা জগতের সমক্ষে প্রচার করিয়াছে যে, নীতিশিক্ষাই প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ ছিল। বর্ত্তমান যুগসভ্য জগৎও সেই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং মনুরই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া একবাক্যে বলিতেছেন, চরিত্র-গঠনই শিক্ষার মূলমন্ত্র।

নীতিশিক্ষা যদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত না হইলে কার্য্যকরী ও ফলপ্রদ হইবে না, ইহা আমাদের দেশের অনেকের অভিমত। সেই জন্যই আমাদের দেশের ও সমাজের কল্যাণকামী বুধিবর্গের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহারই ফলস্বরূপ আমরা আজ কাশী-ধামে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি। আবার শীঘ্রই ভারতে ভারতীয় অপূর্ব্ব পূজার সূচনা হইবে। গয়ার নিকটে নালান্দার বিদ্যামন্দিরে এক সময়ে যেরূপ বহু সহস্র ছাত্র বসবাস, জ্ঞান, বর্দ্ধন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও চিকিৎসা বিদ্যার অপূর্ব্ব চর্চ্চা ও আলোচনা দ্বারা জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিল, পবিত্র বারাণসীধামে নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আবার সেই নালান্দার স্থান অধিকার করিয়া দেশ-বিদেশে ভারতীয় জ্ঞানের বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিবে, এবং জ্ঞানপিপাসু যুবকবৃন্দ পঙ্গপালের ন্যায় সমবেত হইয়া সেই স্থানকে আবার সাড়-রবে মুখরিত ও তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিবে।

এইরূপ শিক্ষাকেন্দ্র আমাদের দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু এরূপ বিদ্যালয়ের উপর আমরা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারি না। এইরূপ দুই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া উচ্চশিক্ষিত যুবকদের জন্য নীতিশিক্ষার পথ প্রশস্ত করা যদিও সম্ভবপর বলিয়া ভাবা যায়, তথাপি সাধারণের জন্য নীতিশিক্ষার পথ এই ভাবে উন্মুক্ত করা যাইতে পারে না। যাহারা উচ্চশিক্ষা লাভে সমর্থ নয়, যাহারা পাঠশালার সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ না করিয়া কার্য্যকরী শিক্ষালাভেই সমুৎসুক, তাহাদের জন্য কি নীতিশিক্ষার প্রয়োজন নাই? সুতরাং ভারতে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে অবস্থায় নীতিশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে কি না, তাহাই এক্ষণে গুরুতর সমস্যারূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতকে ভিত্তি না করিয়া, ভারতে জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কি না, তাহাই বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রধান প্রশ্ন।

এশিয়ার গৌরব স্থল সুসভ্য জাপান এই প্রশ্নের অতি সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিয়াছে। জাপান এই গুরুতর সমস্যার সুন্দর মীমাংসা করিয়া গত কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর সমুন্নত দেশ সমূহের-আদর্শ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতকে উপেক্ষা করিয়া জাপান নীতিশিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছে। জাপানের আমি অদ্য তাহারেই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব। এ বিষয়ে আমি দেশের নেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। জাপানের নীতিশিক্ষা-ব্যবস্থার কতটা আমাদের দেশের উপযোগী, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করিবেন। বিজ্ঞতর ব্যক্তি হইতে এই গুরুতর বিষয়ে আলোচনা শুনিবার বাসনায় আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

জাপানের শিক্ষাব্যবস্থা (System of Education) অনেক বিষয়ে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা হইতে বিভিন্ন। জাপানের নিম্ন, মধ্য, উচ্চ—সর্ব্বশ্রেণীর বিদ্যালয়েই মাতৃভাষা প্রচলিত; এবং তথায় শারীরিক ব্যায়াম ও নীতিশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা আছে। বালিকা-বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাতেও ইহাদের স্থান অক্ষুণ্ণ। এমন কি, পরিণত-বয়স্ক শিক্ষকবর্গের জন্য যে সকল নর্ম্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতেও এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ, জাতীয় জীবনের সঙ্গে এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে অতি নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে। জাতীয় চরিত্র গঠন করিতে হইলে মাতৃভাষার সাহায্যের যেরূপ প্রয়োজন, শারীরিক ব্যায়ামের সহায়তাও তদ্রূপ অপরিহার্য্য। বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীগণের মধ্যে নীতিশিক্ষা বদ্ধমূল করিতে হইলে, মাতৃভাষার সাহায্যে যেরূপ আশু ফললাভের আশা করা যায়, বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে সেরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। নীতি-শিক্ষার সহিত ব্যায়াম শিক্ষার অতি নিকট সম্পর্ক। যে সকল ছাত্র নীতিসঙ্গত ব্যায়াম করে, তাহাদের দেহ সুগঠিত হয় এবং মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও পবিত্র থাকে। যে গ্রীকজাতি এক সময়ে সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, যাহাদের মধ্যে সক্রেটীসের ন্যায় পণ্ডিত, প্লেটোর ন্যায় দার্শনিক ও আরিষ্টটলের ন্যায় উপদেষ্টার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাদের উন্নতির মূল কোথায়? সাধারণ ক্রীড়াক্ষেত্রই সেই উন্নতির মূল।

ক্রীড়ার প্রভাব বা উপকারিতা যে শুধু আমাদের শরীরের উপরই দৃষ্ট হয়, তাহা নয়। ইহার নৈতিক প্রভাবও অতুলনীয় ও অভাবনীয়। ক্রীড়াক্ষেত্রে ছাত্রগণ যে আত্মাধীনতা শিক্ষা করে, এক উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার যে শক্তি অর্জ্জন করে, নিজ-নিজ দলের উন্নতি ও সুখ্যাতির জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্বাধীনতা যেরূপ অম্লান বদনে বিসর্জ্জন করে, তাহা কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং যাঁহারা ছাত্র-সমাজে নীতি-শিক্ষার প্রসারের অভিলাষ করেন, তাঁহারা কোন মতেই এই অমূল্য কল্যাণজনক ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যায়াম শিক্ষার প্রতি অবহেলা ও অনাস্থা প্রদর্শন করিতে পারেন না।

তাই জাপানে আমরা নীতিশিক্ষা ও ব্যায়াম-শিক্ষাকে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত দেখিতে পাই। নীতি-শিক্ষার প্রচলন করিতে হইলে, ব্যায়াম-শিক্ষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিলে চলিবে না—জাপান এই সত্যের জ্বলন্ত প্রমাণ প্রদান করিতেছে। এই দুই বিষয়েই জাপান হইতে ভারত অনেক কথা শিখিতে পারে।

জাপান এই প্রশ্নেরও সদুত্তর প্রদান করিয়াছে। নানা ধর্ম্মাবলম্বী ও নানা মতে বিভক্ত ভারত-সমাজে বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্মশিক্ষার প্রচলন করা কঠিন ও অসম্ভবপ্রায় হইলেও, নীতিশিক্ষার প্রচলন যে সম্ভবপর, জাপানের জাতীয় শিক্ষার ইতিহাস সেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। জাপানের জাতীয় নেতৃবর্গের অভিমত এই যে, শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম্মমতকে ডাকিয়া আনা ঘোর মূর্খতার কার্য্য। তাঁহারা ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক ভাবকে শিক্ষা-ক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিয়া, নীতি শিক্ষাদান কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহারা বলেন—রাজনীতি-ক্ষেত্রে ধর্ম্মমতের দলাদলি প্রাধান্য লাভ করিলে, জাতীয় জীবন যেরূপ অব্যাহত ভাবে স্বভাবানুমোদিত পথে অগ্রসর হইতে পারে না, শিক্ষা ক্ষেত্রেও তদ্রূপ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মভাব আধিপত্য বিস্তার করিলে, সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের উপর নীতি-শিক্ষার মূল ভিত্তি স্থাপন করিলে, ভবিষ্যতে ইহা জাতীয় জীবনের পথে কণ্টক স্বরূপ হইবে, উহার শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইবে, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে মতভেদ স্থায়ী হইবে, নিত্য নূতন কলহের কারণ সৃষ্ট হইবে, দেশে সুশাসন ও শান্তির ব্যাঘাত ঘটিবে,—এক কথায় জাতীয় উন্নতি অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে,—এই আশঙ্কা অমূলক নহে। জাপানের নেতৃবর্গ এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াই ধর্ম্মমতকে তাঁহাদের শিক্ষার ত্রিসীমা হইতে বিদূরিত করিয়া, সেই শূন্য সিংহাসনে নীতি শিক্ষাকে সাদরে সংস্থাপন করিয়াছেন। তাই জাপানের জাতীয় উন্নতি অবিরাম ও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

জাপান বলিতেছে, জাতীয় জীবন জাতীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দেশবাসী সকলের সাধারণ মিলন-ক্ষেত্র। জাতীয় নীতির মূল সূত্রগুলি, যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, সাদরে গ্রহণ করিবেন। জাপানে যদি ইহা সত্য রূপে গৃহীত হইয়া থাকে, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী নানা জাতির বাসস্থান ভারতবর্ষে উহা ততোঽধিক সত্য রূপে গৃহীত হওয়া উচিত। ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই রাজভক্ত প্রজা এবং রাজভক্তিকে নৈতিক জীবনের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন এবং সাম্রাজ্য ও জন্মভূমির রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কেহই সমাজ-সেবায় অর্থ ও সামর্থ্য প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠা অনুভব করেন না। পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই ব্যগ্রতা প্রদর্শন করেন; সাধু ও সচ্চরিত্র হইতে সকলেই বাসনা করেন, রিপুপরতন্ত্র না হইয়া বিবেকানুমোদিত পথ অনুসরণ করিতে কাহারও অনিচ্ছা নাই; উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে কেহই কুণ্ঠিত নহেন; নীচতা ও স্বার্থপরতা হইতে নিজকে বিমুক্ত রাখিতে সকলেই সচেষ্ট, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই এই সকল নীতির সমর্থন করিয়াছেন (যদিও অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়)। সুশিক্ষিত ও সুসংস্কৃত চরিত্রে এই সকল গুণ বর্ত্তমান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব এই মূল সূত্রগুলি অবলম্বন করিয়া জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতের বিদ্যালয়সমূহে নীতিশিক্ষা প্রদত্ত হইতে পারে কি না, তাহা চিন্তনীয় বিষয়। জাপানের ন্যায় ভারতে সরকারী বেসরকারী প্রতি বিদ্যালয়ে এইরূপ নীতিমূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইতে পারে কি না তাহা বিবেচ্য।

জাপানের নীতিশিক্ষা-প্রণালী রাজভক্তি শিক্ষা দানে যথেষ্ট সহায়তা করে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জাপানে নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে রাজকীয় অনুশাসন-লিপি প্রকাশিত হয়। এই অনুশাসন লিপি এবং সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি জাপানের প্রতি বিদ্যালয়ে রক্ষিত হয়, এবং ইঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শনের জন্য প্রতি বৎসর প্রতি বিদ্যালয়ে মহাসমারোহে উৎসব কার্য্য সম্পাদিত হয়। কোন কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে, বিশেষতঃ সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে, এই অনুশাসন-লিপি প্রতি বিদ্যালয়ে পঠিত হয়, এবং সকলেই অবনত মস্তকে সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। জাপানবাসীর অকৃত্রিম ও প্রগাঢ় রাজভক্তির নিদর্শন দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়; এবং তাহাদের নীতিশিক্ষা প্রণালীর মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। একবার কোন এক বিদ্যালয়ে অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইল। দেখিতে না দেখিতে সুরম্য বিদ্যালয়-গৃহটি ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তৎসঙ্গে বিদ্যালয়-সংরক্ষিত বহু মূল্যবান্ পুস্তক-সম্বলিত পাঠাগার এবং অপূর্ব্ব যন্ত্রাদি-পরিশোভিত বিজ্ঞান-মন্দির ভস্মসাৎ হইল। এইরূপে বিদ্যালয়ের প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতি হইল। কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই আর্থিক ক্ষতির কথা একবারেও মুখে আনিল না। রাজভক্ত সরলপ্রাণ বালকগণ সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি অগ্নিমুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিল না বলিয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে ম্রিয়মান হইয়া পড়িল।

জাপানের জনসাধারণকে রাজভক্ত, দেশভক্ত, সমাজভক্ত, কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন করিয়া তুলিবার জন্য সম্রাট যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। তিনি তাঁহার অনুশাসন-লিপির সাহায্যে দেশমধ্যে সর্ব্বত্র এই সকল বিষয়ে উপদেশ প্রচার করিতেছেন। জাপানের রাজকীয় অনুশাসন লিপির সার মর্ম্ম এই—

"আমাদের সাম্রাজ্য সংস্থাপক ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ দেশের প্রতিষ্ঠানগুলি এক চমৎকার ও চিরস্থায়ী ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রাধান্য তাঁহাদের মহান্, উদার, রাজোচিত দয়া দাক্ষিণ্য-ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত।

"আমাদের প্রজাকুল চিরকাল তাহাদের রাজভক্তি ও শ্রদ্ধার দ্বারা এবং তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন সহযোগিতা দ্বারা, রাজ্যের উপযুক্ত প্রজা বলিয়া যে পরিচয় দিয়াছে, তাহা আমাদের দেশের বিশিষ্ট চরিত্রেরই অনুরূপ হইয়াছে। আমাদের শিক্ষাও এই মূলনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

"অতএব, হে আমার প্রজাবৃন্দ, পিতামাতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হও, ভ্রাতার প্রতি স্নেহশীল হও, স্বামী-স্ত্রী-রূপে একপ্রাণ হইয়া সুখে দুঃখে কালযাপন কর, বন্ধুর প্রতি সর্ব্বদা বিশ্বস্ত হও, সাবধানে ও শিষ্টোচিত ভাবে জীবন পরিচালন কর, প্রতিবাসীর প্রতি দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শন

কর, অধ্যয়নে মনোযোগী হও এবং নিজ নিজ ব্যবসায় অবলম্বন কর, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন কর, এবং নৈতিক উন্নতি বিধান কর, সাধারণের কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান কর এবং সমাজের উন্নতি-বিধানে তৎপর থাক, দেশের শাসন ও আইনের প্রতি সর্ব্বদা সম্মান প্রদর্শন কর, প্রয়োজন অনুসারে দেশের জন্য তোমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া সাহস ও ত্যাগ প্রদর্শন কর।

"আমি-বিশ্বাস করি যে, আমাদের প্রত্যেক এই সকল পবিত্র উপদেশ-বাক্য এক মনে এক প্রাণে এক লক্ষ্য সাধনের উপায়স্বরূপ মনে করিয়া সাদরে গ্রহণ করিবে।"

ইহা সত্য যে, শুধু এইরূপ উপদেশ-বাক্য প্রচার করিয়া নীতিশিক্ষার প্রকৃত ফললাভের আশা করা যায় না। এই প্রকার উপদেশ অনেক সময় চরিত্রের উপর বা জীবনের উপর আশানুরূপ ফল প্রসব করে না। চরিত্রের উপর দৃষ্টান্তের প্রভাব প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক। ছাত্রদিগকে উপযুক্তরূপে শাসন করা ও তাহাদের কার্য্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাই বলিয়া উপদেশ বাক্যকে একেবারে অবহেলা করা যায় না। তবে এইরূপ উপদেশ-বাক্য প্রয়োগেরও একটী বিশিষ্ট প্রণালী আছে। উপযুক্ত শিক্ষক সেই বিশিষ্ট প্রণালীতে সেই নীতিবিষয়ক শিক্ষা প্রদান করিবেন। জাপানে মিয়েজির বিদ্যালয়ে গল্পের সাহায্যে অতি সুন্দর ভাবে এই সকল উপদেশ দেওয়া হয়। খ্যাতনামা, আদর্শ-চরিত্র, দেশপূজ্য ব্যক্তিগণের জীবন হইতে বিশেষ বিশেষ শ্রবণযোগ্য ঘটনার সাহায্যে এই সকল উপদেশ-বাক্যের সজীবতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হয়। উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে এই সকল নৈতিক উপদেশ নীতিবিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন করা হইয়া থাকে। কিন্তু কি উচ্চ, কি নিম্ন সকল বিদ্যালয়েই, নীতিশিক্ষার মূলমন্ত্র প্রভুভক্তি ও সন্তানোচিত পিতৃমাতৃভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

নৈতিক শিক্ষা কার্য্যকরী করিতে হইলে শুধু উপদেশ-বাক্যের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। নিম্ন বিদ্যালয়ে কোমলমতি বালক-বালিকাগণ শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর উপদেশ বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিণতবয়স্ক বালক-বালিকাগণ শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যের সমালোচনা করিয়া তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং নৈতিক শিক্ষার প্রধান উপাদান আদর্শ শিক্ষক। শিক্ষক নিজে নীতিমান্, সচ্চরিত্র ও আদর্শ পুরুষ হইলে, তাঁহার গুণ, লক্ষিতে হউক, অলক্ষিতে হউক, ছাত্রগণের মধ্যে প্রতিভাত হইবে। আবার শিক্ষক নীতিহীন হইলে, তাঁহার দোষও তরুণ ছাত্রচরিত্রে সংক্রামিত হইবে। নীতিশিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকের চরিত্রের প্রভাব অত্যাবশ্যক ফল প্রসব করে। চরিত্রের উপর ক্রীড়া-কৌতুক ও শারীরিক ব্যায়ামের পুরুষোচিত প্রভাবের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বিদ্যালয়ের সুশাসন এবং সুখ্যাতি অল্পেক পরিমাণে ছাত্রচরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিদ্যালয়ের সুখ্যাতি রক্ষার জন্য ছাত্রগণ অনেক সময় অনেক অপকর্ম হইতে বিরত হয়। সুপরিচালিত ছাত্রাবাসও ছাত্রচরিত্র-গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করে। অতএব ভারতের বিদ্যালয়সমূহে নীতিশিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, প্রথমে এই সকল বিষয়ে বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধান করিতে হইবে। এইরূপ উন্নতি বিধানে শিক্ষা বিভাগ অগ্রসর হইয়াছেন। দেশবাসীর সহযোগিতায় ও সহায়তায় শীঘ্রই শিক্ষা বিষয়ে এই সকল উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। নিয়মিত ব্যায়ামের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ে সুশাসন-প্রতিষ্ঠা; সুপরিচালিত ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ প্রভৃতি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এখন আদর্শ শিক্ষকের হস্তে নীতি-শিক্ষার প্রদানের সময় উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের শিক্ষাবিভাগে আদর্শ পুরুষের অভাব হইবে না, সুতরাং ভারতের বিদ্যালয়সমূহে নীতি-শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সময় আর অধিক দিন স্থগিত রাখা উচিত নয়। ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক মতকে বিদ্যালয়ে স্থান না দিয়া, জাপান যেরূপ নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে, ধর্ম্মবৈচিত্র্য রক্ষা করিয়া ভারতেও কি তদ্রূপ বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না?

পুরীর কথা

[শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ]

ইতঃপূর্ব্বে কোনারকের কথা বলিয়াছি। কোনারক হইতে পুরীতে ফিরিয়া আসিয়া পথিশ্রমে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; সুতরাং স্থির হইল, বাসায় পঁহুছিয়াই কয় বন্ধুতে, মিলিয়া সমুদ্রে স্নান করিতে যাইব। অবগাহনমাত্র সকল ক্লান্তি দূর হইয়া গেল, শরীরে নূতন স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইল। স্নানান্তে বলরামের "আটিকা" প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া আমরা শ্রীমন্দির অভিমুখে গমন করিলাম। আমাদের এ শুধু রথ-দেখা নহে—যে হেতু দলপতি ভায়ার পরাতত্ত্বরূপ কল্প-

বেচারও যথেষ্ট পরিমাণে গরজ রহিয়াছে। ঘ—মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাড়াতাড়ি সূর্য্যবেদীর মাপ ঠিক করিয়া লইলেন। কথিত আছে যে, সূর্য্য-মূর্ত্তিটি রাজা নরসিংহ দেবের রাজত্ব কালে কোনারক হইতে পুরীতে আনীত হয়। সম্ভবতঃ খৃঃ অঃ ১৬২১-২২ হইতে ১৬৪৪—৪৫ অব্দের মধ্যে উহা ইন্দ্র-মন্দিরে রক্ষিত হয়। এই মূর্ত্তিটি প্রাচীন হইলেও, ইহার সেরূপ শিল্প-সৌন্দর্য্য নাই। মূর্ত্তির দুই হাতে সনাল পদ্মপুষ্প। মাত্র উরুদেশ পর্য্যন্ত তক্ষিত। নিম্নে অরুণ ও সপ্তাশ্বের চিত্র আছে। কোনারকে একাধিক সূর্য্য-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভগ্ন স্তূপের ভিতর যে দুইটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে ৬।৭ ফিট উচ্চ একটি মূর্ত্তি ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা যাদুঘরে লইয়া আসেন। সুতরাং কোন্ মূর্ত্তিটি প্রধানতম বিগ্রহ রূপে গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা বলা সহজ নহে। শুনিয়াছি, এ বিষয়টি এখনও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। সূর্য্য-মন্দিরে যে মূর্ত্তিটি ইন্দ্রবিগ্রহ বলিয়া পরিচিত, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহা সোমদেবের মূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পক্ষান্তরে শ্রীযুক্ত বিনয়স্বরূপ এটিকে বুদ্ধ-মূর্ত্তি বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন। কিন্তু আমাদের মূর্ত্তি-পরিচয় লইয়া গবেষণার আর সময় ছিল না। মিত্র মহাশয় আসিতে-না-আসিতেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া গেল। Casualty মহাশয় আহু-ক্ষতে প্লেসর লাগাইতে নিকটস্থ বাঙ্গালী ডাক্তারের দাওয়াইখানা অভিমুখে রওনা হইলেন। কোনারক দর্শনের পর উৎকলের মন্দিরগুলির বিভিন্ন অংশ ও উহাদিগের সংস্থান সম্বন্ধে ধারণা করার একটু সুবিধা হইল। উড়িষ্যার প্রধান মন্দিরগুলি প্রায় একই প্রণালীতে নির্ম্মিত। বহির্দ্দেশে প্রাচীরাদির জন্য সাধারণতঃ laterite প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমে ভোগমণ্ডপ, তাহার পর নাটমন্দির, তৎপরে জগমোহন বা অন্তরাল এবং সর্ব্বশেষে গর্ভগৃহ ও তদুপরিস্থ শেখরধ্বজ বা সমুচ্চ মন্দির-চূড়া। কোনারকের মন্দিরে কিন্তু একই গৃহ ভোগমণ্ডপ ও নাটমন্দির রূপে বর্ণিত হইয়াছে। 'অন্তরাল' হইতে দর্শকগণ দেব-বিগ্রহাদির জগন্মোহন মূর্ত্তি দেখিতে পায় বলিয়া, ইহারই অপর নাম জগমোহন। উৎকল-রাজ যযাতি-কেশরীর রাজত্ব কালে জগন্নাথের মন্দির প্রথমে নির্ম্মিত হয়—মাদলা পঞ্জীতে (তালপত্রে লিখিত শ্রীমন্দিরের ইতিহাসে) এইরূপই বর্ণিত আছে। খোদিত লিপি প্রভৃতির বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গঙ্গাবংশীয় রাজা চোড়গঙ্গ দেব সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে বা উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বর্ত্তমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পুরীর শ্রীমন্দিরের উত্তরদ্বারের সম্মুখস্থিত তিরমল মন্দিরে রাজা চতুর্থ নৃসিংহদেবের যে তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছে, (J. A. S. B. LXIV, p. 128) তাহা হইতে, পুরুষোত্তমের মন্দির গঙ্গেশ্বর বা রাজা অনন্তবর্ম্মণ চোড়গঙ্গ দেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা স্পষ্টই অবগত হওয়া যায়।

"প্রাসাদং পুরুষোত্তমস্য নৃপতি কঃ নাম কর্ত্তুং
ক্ষমঃ তস্যৈত্যাদি নৃপৈরুপেক্ষিতময়ং চক্রেশ গঙ্গেশ্বর

• • • •

নির্ম্মিতঃ পুরুষোত্তমঃ প্রমুদিতস্তদ্ধামে
লাভান্নমাপ্যেত তস্মর্দ্ধগৃহং বরং
পিতৃগৃহাৎ প্রাপ্য প্রমোদান্বিতা।"

পুরুষোত্তমের এরূপ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ কোন্ রাজারই বা নামোল্লেখ করা যাইতে পারে? প্রথম রাজগণ কর্ত্তৃক অনারব্ধ এ মন্দির গঙ্গেশ্বরই নির্ম্মাণ করেন। • • • নির্ব্বেদযুক্ত (আত্মগ্লানিযুক্ত) দেব পুরুষোত্তম এই নবগৃহ প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং প্রমোদান্বিতা লক্ষ্মী দেবীও পিতৃগৃহ হইতে শ্রেষ্ঠতর ভর্ত্তার এই নূতন গৃহেরই অনুরাগিণী হইয়াছিলেন।

রাজা দ্বিতীয় নৃসিংহ দেবের ১২১৭ শকের কেন্দুপাটন তাম্রপট্টে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি প্রায় অবিকল লিখিত আছে (J. A. S. B. Vol. XLV); সুতরাং এরূপ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বর্ত্তমানে শুধু মাদলা পঞ্জীর উক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া, "অনিয়ঙ্ক" ভীমদেবকে মন্দির-নির্ম্মাতা বলিয়া স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। সম্ভবতঃ অনঙ্গ ভীমদেব উত্তরকালে প্রাচীর ও পার্শ্বস্থিত মন্দির প্রভৃতির নির্ম্মাণ করিয়া মন্দিরের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নামের সহিত এ প্রখ্যাতি বিজড়িত হইয়া থাকিবে। বিগ্রহের পূজা ও সেবা-পদ্ধতিও সম্ভবতঃ তাঁহারই আমলে যথারীতি প্রণালীবদ্ধ হইয়াছিল। (J. A. S. B. p. 135, No. 2—1895).

ডাঃ কীলহর্ণ (Kielhorn) ১১৩৭ খৃঃ অব্দে খোদিত গয়ার গোবিন্দপুর লিপির যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মনোরথ নামে এক ব্যক্তি পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র দর্শন করিতে আসিয়া, চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে পারাবার-তটে যথেষ্ট দান-ধ্যানাদি করিয়াছিলেন। লিপি-খানি মনোরথের পুত্র কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী (১১০৪-৫ খৃঃ অব্দে খোদিত) একখানি লিপিতে মানব-রাজের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে পুরুষোত্তম তীর্থের উল্লেখ আছে দেখা যায়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে, মন্দিরটি ১০৮৫—৯০ খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। (J. A. S. B., 1898)। ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, কূর্ম্মবেষ প্রভৃতি মন্দিরের বিভিন্ন অংশগুলি কিন্তু একই সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই।

মাদলা পঞ্জীর বর্ণনা মতে ভোগমণ্ডপ পুরুষোত্তম দেবের রাজত্বকালে ১১৬৯—৯১ খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়া-ছিল। নাটমন্দির নির্ম্মাণের প্রকৃত সময় নির্ণয় করা কঠিন। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহাশয়ের মতে শ্রীমন্দির খৃঃ ১১০০ অব্দে নির্ম্মিত হয়।

অলিন্দের সম্মুখভাগে রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের (১৪৯৭ হইতে ১৫৩২—৪০ খৃঃ অব্দ) ও গোবিন্দ বিদ্যাধরদেবের (১৪৪১—২ হইতে ১৫৪৯ খৃঃ অব্দ) সময়ের শিলালিপি সংলগ্ন আছে শুনা গেল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সুবিখ্যাত Antiquities of Orissa গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয়ের সাহায্যে জগমোহনের প্রবেশ-দ্বারের দুই পার্শ্বে খোদিত লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে গোবিন্দ বিদ্যাধরদেবের উল্লেখ দেখিলাম না। প্রতাপপুরুষোত্তমদেব, প্রতাপ-কপিলেশ্বরদেব ও প্রতাপরুদ্রদেবের যে সকল শিলালিপি অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার কয়েকটির সার মর্ম্ম সঙ্কলিত হইল। রাজা রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন, এই স্থলে প্রতাপইন্দ্রদেবেরও একখানি লিপি পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার সন ও তারিখ ব্যতীত আর কোনও অংশই পাঠযোগ্য নহে।

জগমোহনের প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণ ধারের লিপিগুলির মধ্যে প্রথমটিতে রাজা প্রতাপপুরুষোত্তমদেব কর্ত্তৃক জগন্নাথ দেবের উদ্দেশে আট খানি রত্নরত্ন (হস্তীদন্ত নির্ম্মিত) পালঙ্ক, রত্নকলস, বংশী, সিঙ্গা, অষ্টসংখ্যক স্বর্ণ ছড়ি, ১৮টি রত্ন-বাজনী, রত্ন-"কাণ ফুল" "মেরুগর্ভ", বাউটি তিন জোড়া, ৩টি স্বর্ণখচিত চামর, "শ্রীসোণাপাগ" (জড়ীয় পাগড়ী ?) প্রভৃতি দানের কথা উল্লিখিত আছে। রাজা এই সকল দ্রব্য "শ্রীপুরুষোত্তম কটকে" অবস্থান কালেই যে দান করিয়াছিলেন, তাহা লিপি হইতেই স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। লিপিখানির সন তারিখের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই। লিপি বর্ণিত গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাট কলবরকেশ্বর প্রভৃতি রাজোপাধি রাজা কপিলেশ্বর দেবের শিলালিপিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। কলবরক বোধ হয় কোলবর্গারই প্রাচীন নাম। ডাঃ রাজেন্দ্রলালের ইহাই অভিমত। আমাদিগের গৌড়দেশ যখন উড়িষ্যা রাজগণের নামমাত্র অধীনতাও স্বীকার করিত না, তখন পর্য্যন্তও উড়িষ্যারাজ গৌড়াধিপতি উপাধির মোহ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডের ইতিহাসেও ষ্টুয়ার্ট রাজগণের ফরাসী-দেশাধিপতি বলিয়া পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়।

দ্বিতীয় শিলালিপিখানি প্রতাপকপিলেশ্বরদেবের রাজত্ব-কালের বিংশতি বর্ষে কেশাই খুটিয়া কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। রাজা বিজয় গৌরবে মল্লিক-পরিখা হইতে কটক হইয়া পুরুষোত্তম দুর্গে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর, যখন জগবন্ধুর বীরমুনহি ভোগ প্রদত্ত হয়, সেই সময়ে কোটঘরের সামন্ত 'পরিছা' মহাপাত্র রঘুদেয়ান ও নরেন্দ্র অনাইকে আহ্বান করিয়া আদেশ দিলেন যে, আমি পুরুষোত্তমের সেবায় পুণ্ডরীক গোপ (গ্রাম) উৎসর্গ করিলাম। যে ইহা লঙ্ঘন করিবে সে জগন্নাথ-দ্রোহী রূপে বিবেচিত হইবে। তৃতীয় শিলাখণ্ডটি কপিলেশ্বরদেবের রাজত্বকালের ৩৮বর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। লিপিতে লিখিত আছে যে, পুরুষোত্তম কটকে দক্ষিণ দ্বারে "মাজনা" মণ্ডপে (স্নান-মন্দিরে) মহারাজা নিজ সম্মুখে এই আদেশ খোদিত করাইলেন,—"জগন্নাথ তুমি ও আমার "বাহ্য অভ্যন্তর" সকল তত্ত্বই অবগত আছ। আমার "রত্ন পদার্থ" যাহা আছে সকলই তোমার। আমার ধন ধন যাহা কিছু আছে, আমি সে সকলই এই প্রদত্ত ভূমি-খণ্ডের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগকে যথাযথা অর্পণ করিব। তুমি অনুগ্রহ করিও। এ সকল কিছুই আমার নহে।"

চতুর্থ লিপিখানি প্রতাপপুরুষোত্তমদেবের নিজ

রাজ্যের উনবিংশতি বর্ষে খোদিত। ইহার সার মর্ম্ম এইরূপ —"উড়িষ্যার রাজগণ শান্তিপুর কটকস্থ ব্রাহ্মণগণের সম্পত্তি কখনও অপহরণ করেন নাই। এই আদেশ স্মরণ রাখিলে ব্রাহ্মণগণ অপকর্ম্ম করিবে না। সকলে যেন এ কথা স্মরণ রাখিয়া এ আদেশ পালন করে।" বাম পার্শ্বের লিপিগুলির প্রথম দুইখানির অর্থোদ্ধার সম্ভব হয় নাই। প্রথমখানিতে মাদলা পঞ্জীতে উল্লিখিত রাজা ত্রিশোনা দেবের নাম পাওয়া যায়। তৃতীয় লিপি বেশ কৌতূহলজনক। ইহা প্রতাপকপিলেশ্বরদেবের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে উৎকীর্ণ। ইহাতে রাজা পরমেশ্বর জগন্নাথের দর্শন সময়ে মহাপাত্রগণ ও মহাসেনাপতি পট্টনায়ক ভোগমোদক ও ভোগ পরিচ্ছা (Examinar of the Lord's larder) অগ্নিশর্ম্মা "মুদ্রা হস্ত" (Keeper of the Royal Seal) প্রভৃতির গোচরে মন্দির-দ্বারে এই আদেশ খোদিত করাইলেন যে, "আমি অদ্য হইতে উড়িষ্যা রাজ্যে "লোন কৌড়ি (লবণ ও কৌড়ির উপর শুল্ক) মূল কর" ছাড়িলাম, ছাড়িলাম, ছাড়িলাম। এ আদেশ যে লঙ্ঘন করিবে সে জগন্নাথ-দ্রোহী হইবে।"

চতুর্থ লিপিতে উক্ত রাজার রাজত্ব-কালের পঞ্চম বর্ষে জগন্নাথদেবের পাদপদ্মে হীরক, মরকত-মুক্তাদিখচিত রত্নালঙ্কারাদি দানের উল্লেখ আছে। বাম ভাগের পঞ্চম লিপিখানির একটু বিশেষত্ব আছে। এই লেখের ন্যায় হৃদয়ের সরল অভিব্যক্তি কঠিন শিলাপটে কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা প্রতাপকপিলেশ্বরদেবের রাজত্বের পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষকালে খোদিত। রাজা সামন্তগণের অকৃতজ্ঞ ব্যবহার ও বিশ্বাসঘাতকতায় মর্ম্মাহত হইয়া বলিতেছেন, 'আমি এখন হইতে যত সামন্তকে পাইব, সকলেরই প্রতি দাসের ন্যায় ব্যবহার করিব। আমি রাজা হইয়া অবধি বাল্য-কাল হইতে তাহাদিগকে পোষণ করিতেছি; এখন তাহারা আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল ("রাজধিলা বালু কালু পোষি আনিলি এথানে সাতে সমুদ্রে ছাড়িলে")। আমি সকলের প্রতি বিহিত ব্যবহার করিব। নীলগিরীশ্বর জগন্নাথ—আমার "দোষ অদোষ" তুমিই বিচার কর।'

ষষ্ঠ লিপিখানি মহারাজ প্রতাপরুদ্র দেবের পঞ্চম বর্ষে খোদিত। মহারাজা আদেশ করিতেছেন যে, বড়ঠাকুর (বলরাম দেবের) 'ভোগ-বেলায়' গীতগোবিন্দ গীত হইবে। সন্ধ্যাকালে ধূপদান হইতে "বড় সিঙ্গার" (শৃঙ্গার) পর্য্যন্ত এই গীতই চলিতে থাকিবে। ঠাকুর নিদ্রাগত হইলে তৈলঙ্গী (তেলেগু) গায়কগণ কপিলেশ্বর ঠাকুরের "খিল" গীতাদি গান করিবে। তাহাদিগকেও গীতগোবিন্দ গান শিখিতে হইবে। তাহারা ইহা ব্যতীত অন্য গান করিবে না, বা অন্য নাটকাদি অভিনয় করিবে না। উনপঞ্চাশজন বৈরাগী আছে, তাহারাও কেবল গীতগোবিন্দের সঙ্গীতাদি গান করিবে। তাহাদিগের নিকট অশিক্ষিতেরা ইহাই তাল-লয়-মানে গান করিতে শিখিবে, অপর কিছুই শিখিতে পাইবে না। যে "পরিছা" (মন্দিরের তত্ত্বাবধারক কর্ম্মচারী) এই আদেশ পালন না করিয়া অন্য "গীতনাট" করাইবে, সে জগন্নাথ-দ্রোহীরূপে বিবেচিত হইবে। কেন্দুবিল্বের ভক্ত কবি জীবিত কালে বৈষ্ণবের প্রধানতম ধর্ম্মমন্দিরে ইহা অপেক্ষা নিজ-রচিত কাব্যের অধিকতর সম্মান প্রত্যাশা করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। কথিত আছে, জয়দেব * কবি-জীবনের শেষ কয় বৎসর পুরুষোত্তম-ধামেই অতিবাহিত করেন।

সপ্তম লিপিটি মহারাজ প্রতাপইন্দ্রদেবের রাজত্বকালে লিখিত। রাজার নাম উপাধি ও সন তারিখ ব্যতীত ইহার অবশিষ্টাংশ পাঠযোগ্য নহে।

এ লিপিগুলি যে স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানটি বড়ই অন্ধকার। বিদেশী যাত্রীর পক্ষে মন্দির মধ্যে যথেষ্ট আলোকের ব্যবস্থা করা সহজ নহে; এই কারণে আমাদিগের সহিত যে দুইজন অভিজ্ঞ সহযাত্রী ছিলেন, তাঁহাদিগের লিপিগুলি পরীক্ষা করার কোনও সুযোগ ঘটে নাই!

ভুবনেশ্বরের মন্দিরে দেখিয়াছিলাম যে, দেওয়ালের গায়ে খোদিত লিপি গুলির অধিকাংশই পাণ্ডাগণের কৃপায় চূণ-বালির "পলস্তারায়" ঢাকা পড়িয়াছে। জগন্নাথের শ্রীমন্দিরেও প্রাচীন লেখমালার কতকাংশের এইরূপ সদ্ব্যবস্থা হওয়া বড় বিচিত্র নহে।

পুরী সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বারান্তরে বলিব।

---

* জয়দেব যে রাজা লক্ষ্মণ সেন দেবের সমসাময়িক জয়দেব নাটকের কৃপায় অনেক থিয়েটার-দর্শকই তাহা অবগত আছেন। রাজা লক্ষ্মণসেন দেব ১১১৯ খৃঃ অব্দে সিংহাসনাধিরোহণ করেন এবং ১১৯৯—৭১ খৃঃ অব্দের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। (J. A. S. B. Vol. IX, No. 7. 1913)

লক্ষ্মী

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

জ্যোছ্‌নাপুরীর শুভ্র সুধায়
অঞ্চল মেখে,
কুয়ুকুয়ে এই চাঁদ্‌নী রাতে
আজ এসেছে কে!
মধুর কা'র নূপুর-ধ্বনি
হরিৎ ক্ষেতে আজ্‌কে শুনি,—
চক্ষে উজল সুর্ম্মা-কাজল
কে দিল এঁকে!
আজ্‌কে ঘাটে এলো গো কা'র
সোণার তরণী,
ঝরণাসম কর্‌ঝরিয়ে
ঝর্‌ছে যে মণি!
শূন্য মোর এ-দগ্ধ ঘরে
মৃত্যু যেথা নৃত্য করে,
প্রেমের সুধায় ভর্‌ল কে তায়
বল্‌লো সজনী।
মরা গাঙে বান ডেকেছে,
প্রাণ জেগেছে আজ;
দুলিয়ে হৃদি আশার নদী
বইছে বুকের মাঝ।
কুঞ্জ-হিয়া মুঞ্জরিয়া
উঠ্‌ছে ভ্রমর গুঞ্জরিয়া,
লক্ষ কলি অঙ্কি মেলি
পর্‌ল রঙ্গিন সাজ।
জ্যোছ্‌নাপুরীর শুভ্র সুধায়
অঞ্চল মেখে,
বিশ্বে আজি হাস্যময়ী
লক্ষ্মী এল সে।
ফুল্‌বালারা দেখ্‌ছে ছবি,
মানব শুধুই ঘুমিয়ে রবি,
নিদ্রা কি তোর হবে না ভোর—
উঠ্‌বি না জেগে!

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

[শ্রীঅনাথনাথ বসু]

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বসন্ত, হেমন্ত ও শিশিরকুমারের কার্য্যক্ষেত্রের সীমা এতদিন তাঁহাদের জন্মভূমি মাগুরা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহাদের কার্য্য-ক্ষেত্রও ক্রমশঃই প্রসারিত হইতে লাগিল। স্বার্থকে পদদলিত করিয়া যাঁহারা সমাজের মঙ্গলজনক কার্য্যে আপনাদিগকে নিয়োগ করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত জননায়ক বলিয়া দেশবাসীর আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হ'ন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে যশোহরের নীলকরদিগের অত্যাচার যখন চরম সীমায় উপনীত হয়, তখন উৎপীড়িত প্রজাগণ যুবক শিশিরকুমারের প্ররোচনায় দলবদ্ধ হইয়া নীলের চাষ বন্ধ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। বসন্ত ও হেমন্ত-কুমার শিশিরকুমারের সহিত মিলিত হইয়া প্রজাবর্গের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

নীলকরগণ নিরীহ প্রজাদিগের উপর কিরূপ অত্যাচার করিত, এখানে তাহার কতকটা আভাস প্রদত্ত হইল। নীলকর সাহেবগণ নীল উৎপাদনের জন্য সাধারণতঃ দুইটী প্রণালী অবলম্বন করিত। প্রথম—নিজ তত্ত্বাবধানে ভৃত্য-দিগের দ্বারা নিজের জমিতে, এবং দ্বিতীয়—দাদন দিয়া

রাইয়তদিগের দ্বারা তাহাদিগের জমিতে নীল উৎপাদন করা হইত। রাইয়তরা নীলের চাষ করিবে বলিয়া, নীলকরগণ রাইয়তদিগকে অগ্রিম কিছু-কিছু টাকা দিত; ইহাকে বাদন বলা হয়। এই বাদন গ্রহণের সময় কৃষকদিগকে নীলকর সাহেবদিগের নিকট এই মর্ম্মে একখানি অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দিতে হইত যে,—আমি এত পরিমাণ জমিতে নীল উৎপাদনের জন্য এত টাকা অগ্রিম লইতেছি, চুক্তিসন্ধি পূর্ব্বক যদি নীলের চাষ না করি, তাহা হইলে আপনার যে ক্ষতি হইবে, তাহা আমি ও আমার উত্তরাধিকারিগণ পূরণ করিতে বাধ্য থাকিব। অনেক স্থলে এক বৎসর হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত এই অঙ্গীকার পালনের নিয়ম থাকিত। কৃষকগণ প্রতি বিঘায় দুইটাকা হিসাবে বাদন পাইত; এবং তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা ভূমিই নীলকরগণ কর্ত্তৃক নীল উৎপাদনের জন্য নির্দ্ধারিত হইত। অঙ্গীকার-পত্রে যে পরিমাণ বাদনের টাকার উল্লেখ করা হইত, কৃষকগণ তাহা সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হইত না। যাহা পাইত, তাহার কতক অংশ নীলকুঠীর কর্ম্মচারিগণ গ্রাস করিত। সাধারণতঃ ধর্ম্মজ্ঞানহীন লোকেরাই নীলকর সাহেবদিগের অধীনে কার্য্য করিত। প্রভুর সন্তোষ বিধান ও নীয় স্বার্থ সাধনের জন্য তাহারা কোন গর্হিত কার্য্য করিতেই কুণ্ঠিত হইত না। প্রায়ই অঙ্গীকার-পত্রে লিখিত পরিমাণ নীল জমিতে উৎপন্ন হইত না, তাহার উপর কৃষকগণ সমুচিত মূল্য কখনই পাইত না; সুতরাং বাদনের দায় হইতে তাহারা কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারিত না। যে কৃষক একবারমাত্র বাদনরূপ জালে পতিত হইত, তাহার কষ্টের সীমা থাকিত না; তিন-চারি পুরুষ পর্য্যন্ত ঐ বাদন পরিশোধ হইত না(১)। যাহারা নীলের চাষ করিতে অসম্মত হইত, তাহাদের জাতি, কুল, মান, ধন ও প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। অত্যাচারের ভয়ে কৃষকগণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাদন লইতে বাধ্য হইত (২)। নদীয়া ও যশোহর জেলায় নীলকরদিগের অত্যাচারের মাত্রা অন্যান্য জেলা অপেক্ষা অতিরিক্ত ছিল। প্রতিকারের আশায় রাইয়তগণ বিচারালয়ে উপস্থিত হইত বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল প্রাপ্ত হইত না। কারণ, তদানীন্তন ইংরেজ রাজপুরুষরা নীলকরদিগের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন; এবং সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে ভয়ও করিতেন। (৩)

১৮৫৮ খৃঃ শিশিরকুমারের প্ররোচনায় যশোহরের কৃষকগণ নীলের চাষ বন্ধ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে। তাহাদের একতা ও দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমারের নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইয়াছিল। বসন্ত ও হেমন্ত এই সময়ে মাগুরায় ছিলেন। দাদা ও মেজদাদাকে এই আনন্দের সংবাদ প্রদানের জন্য শিশির স্বয়ং যশোহর হইতে মাগুরায় গমন করিলেন। পথিমধ্যে বিশ্রাম নাই, শিশির পৌঁড়িতে-পৌঁড়িতে বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিলেন, "দাদা, বড় সুসংবাদ! এতদিনে কৃষকগণের চৈতন্য হইয়াছে। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, জীবন থাকিতে আর নীল বপন করিবে না।" শিশিরকুমারের মুখে সকল কথা অবগত

(১) তৎকালীন নীলগঞ্জ রীমেমব্র্যান্সার মিষ্টার এফ, এল, বুফোর্ট (Mr. F. L. Beaufort) ইণ্ডিগো কমিশনের সমক্ষে বলিয়া ছিলেন,—"In practice, I believe, that these contracts are supposed to descend from father to son, but of course such an idea would not be allowed in Court. Practically I have no doubt the planter holds such inheritence of liability in terrorism over the ryot."

(২) লর্ড মেকলে তাঁহার ১৮৪৪ খৃঃ অব্দের মন্তব্যে লিখিয়াছেন—"But, it is said, these contracts are not freely made. Force and deception are employed. The peasant assents to disadvantageous terms for fear of bludgeon man, or is tricked into signing some paper which he does not understand."

(৩) ইণ্ডিগো কমিশনে সাক্ষ্য প্রদানের সময় সার এডলি ইডেন বলিয়াছিলেন,—"There certainly was failure of justice, which, in my opinion, may, to a great extent, be attributed to the strong bias, which, the Governor of many of the officers of the Government have always displayed in favour of those engaged in this particular cultivation. * * * I consider that it has frequently been the case that the Government officials have sacrificed justice to favour the planters. I will go further and say that, as a young Assistant, I confess, I have favoured my own countrymen in several instances."

হইয়া বলরাজ প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি আবেগভরে শিশিরকে বক্ষে ধারণ করিলেন, কয়েক বিন্দু আনন্দাশ্রু তাঁহার নয়ন হইতে ঝরিয়া পড়িল। অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক যুবক শিশিরকুমার এইরূপে জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমাগ্রজের সহিত অশিক্ষিত কৃষকগণের নায়ক রূপে হৃদয়বিহীন নীলকরদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাদের এই মহৎ কার্য্যে তাঁহাদের গ্রামের অনেকে নানারূপে তাঁহাদের সহায়তা করিয়াছিলেন।

কৃষকগণের দৃঢ়তা ও একতা লক্ষ্য করিয়া নীলকরদিগের রোষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। নীলকর সাহেবদিগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তাহাদের কর্ম্মচারিগণ কৃষকদিগের উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইল। উৎপীড়নের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কৃষকগণের একতার বন্ধন ততই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। তাহারা প্রত্যেক বিষয়েই শিশির-কুমারের পরামর্শ মত কার্য্য করিত। যুবক শিশিরকুমার যশোহরের দলবদ্ধ কৃষকগণকে সঙ্গে লইয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক, নীলচাষের অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন করিয়া সকলকেই নীলের চাষ বন্ধ করিতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। নীলকরদিগের অত্যাচারের হস্ত হইতে প্রজা-গণকে রক্ষা করিবার জন্যই যেন শিশিরকুমার ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন, এই মনে করিয়া কৃষকগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। তাহারা তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ মনে করিয়া "সিদ্ধিবাবু" নামে অভিহিত করিয়াছিল। শিশির-কুমারের কথায় তাহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হইত না। যশোহর বাতীত নদীয়া, রাজসাহী, পাবনা প্রভৃতি জেলাতেও নীলকরদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল। তথাকার উৎপীড়িত কৃষকমণ্ডলী শিশিরকুমারকে চক্ষে না দেখিলেও, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত; এবং তাঁহারই প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে নীলকরদিগের অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। নীলকর সাহেবরা যখন ধর্ম্মজ্ঞানহীন, পশুপ্রকৃতি কর্ম্মচারি-গণের সহায়তায় লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া রাইয়তগণের যথা-সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবার চেষ্টা করিত, রাইয়তগণ তখন প্রাণের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বার্থরক্ষার জন্য লাঠিয়ালগণের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইত। লাঠিয়ালগণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য কৃষকগণ এক অপূর্ব্ব কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিল। প্রত্যেক পল্লীর প্রান্তে তাহারা এক-একটী করিয়া দুন্দুভি রাখিয়াছিল। যখন লাঠিয়াল-গণ গ্রাম আক্রমণ করিবার উপক্রম করিত, কৃষকগণ তখন দুন্দুভি-ধ্বনি দ্বারা পরবর্ত্তী গ্রামের রাইয়তগণকে বিপদ্ সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, তাহারা আসিয়া দলবদ্ধ হইত। এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চারি-পাঁচখানি গ্রামের লোক একত্র হইয়া নীলকর সাহেবদিগের লাঠিয়ালগণের সহিত তুমুল সংগ্রামে ব্যাপৃত হইত।

অপমানিত নীলকরগণ আদালতে কৃষকগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিলে, কৃষকগণ সহাস্য বদনে কারাগারে গমন করিত। তাহারা ভাবিত যে, তাহাদের এই কারা-বাসের ফলেই দেশ হইতে নীলকরদিগের অত্যাচার দূরীভূত হইবে। যশোহরের আইন-ব্যবসায়িগণ নীলকর-দিগের অত্যাচারের ভয়ে কৃষকগণের পক্ষাবলম্বন করিতে সাহস করিতেন না। কলিকাতা হইতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যগণ মধ্যে-মধ্যে দুই-একজন মোক্তার উৎপীড়িত কৃষকগণের পক্ষাবলম্বনের জন্য প্রেরণ করিয়া মহৎ উপকার করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার সর্ব্বদাই কৃষকগণের সহিত অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে সৎপরামর্শ প্রদান করিতেন। যাহাতে তাহারা কোনও আইন-বিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, তৎপ্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। এই সময় স্বনামধন্য স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়, হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রে অসীম ভাষায় নীলকর-দিগের অত্যাচারের প্রকৃত চিত্র অঙ্কিত করিয়া মাননীয় গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক যথেষ্ট উপকার করিয়া-ছিলেন। শিশিরকুমারও এই সময় স্বীয় নাম অপ্রকাশ রাখিয়া উক্ত পত্রে নীলকরদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে কতকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রগুলি M. L. L. স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইত। শিশিরকুমারের আর একটী নাম ছিল—মন্মথলাল ঘোষ। তিনি পত্রগুলি লিখিয়া তাহার নিম্নে M. L. G. স্বাক্ষর করিতেন, কিন্তু মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃ M. L. G. স্থলে M. L. L. প্রকাশিত হইত। হরিশ্চন্দ্র যুবক শিশিরকুমারের লিপি-চাতুর্য্য লক্ষ্য করিয়া শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতেন ও সর্ব্বদাই তাঁহাকে উৎসাহ দিতেন। শিশিরকুমারের কার্য্যকলাপ দেখিয়া নীলকরগণ বিস্মিত হইয়াছিল।

তাহারা তাঁহাকে গভর্ণমেণ্টের নিকট একজন দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কোনও উপায়ে যুবককে কারাগারে প্রেরণ করিতে পারিলে, কৃষকগণ হীনবল হইয়া পড়িবে এই ভাবিয়া, নীলকরগণ তাঁহাকে আদালতে অভিযুক্ত করিবারও বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক যুবকের কথায় যে সহস্র সহস্র কৃষক একমন; একপ্রাণ হইয়া নীলের চাষ বন্ধ করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, গভর্ণমেণ্ট তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। যখন প্রকাশ পাইল যে, হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রে M. L. L. স্বাক্ষরিত পত্রগুলি শিশিরকুমারের লেখনী-প্রসূত, তখন তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তাঁহার ন্যায় অল্পবয়স্ক যুবকের লেখনী হইতে যে এরূপ সারগর্ভ ও সদ্‌যুক্তিপূর্ণ লিপি নিঃসৃত হইয়াছে, ইহা গভর্ণমেণ্টও প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কলিকাতাবাসী অনেকে নীলকরদিগের অত্যাচারের জন্য কৃষকদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও, দূর হইতে তাহাদের বিশেষ কোনও উপকার করিতে পারিতেন না। শিশিরকুমার কৃষকদিগের সহিত সর্ব্বদা একত্র অবস্থান করিয়া, তাহাদের অভাব-অভিযোগ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচনা করিয়া, সংবাদপত্রে পত্র লিখিতেন বলিয়া, সেগুলি শিক্ষিত সমাজে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। শিশিরকুমারকে দমন করিবার জন্য নীলকরগণ সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। পাঠককে এইখানেই বলিয়া রাখি, হরিশ্চন্দ্র, শিশির-কুমার প্রভৃতি এদেশবাসিগণের ন্যায় মিষ্টার লঙ্, সার এস্‌লি ইডেন প্রভৃতি কয়েকজন ইংরেজও কৃষকদিগের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কার্য্যের বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। লঙ সাহেব "হরকরা" পত্রে প্রায়ই নীলকরদিগের অত্যাচারের বিষয় আলোচনা করিতেন। ইনি কবিবর দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের নীল দর্পণ নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া-ছিলেন। কবিবর মাইকেল মধুসূদন সেই অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। লঙ সাহেবকে ইহার জন্য শেষে বিচারালয়ে দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। মহাভারতের অনুবাদক মহানুভব কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় অর্থ দণ্ডের সমস্ত টাকাই প্রদান করিয়াছিলেন। তৎকালে "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড" নামক একখানি সংবাদপত্র ছিল; ইহাতেও নীলকরদিগের অত্যাচারের কথা আলোচিত হইত।

১৮৫৮ হইতে ১৮৬০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত প্রজা ও নীলকর-গণের মধ্যে বিবাদ চলিয়াছিল। ইহাতে প্রজাগণ একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছিল। নীলচাষ না করিলেও, তাহারা সর্ব্বদাই হাঙ্গামায় ব্যাপৃত থাকায়, আপন-আপন জমিতে অন্য কোন শস্য উৎপাদনের অবকাশ পাইত না। শান্তি-প্রিয় রাইয়তগণ বাধ্য হইয়াই নীলকরদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। বঙ্গদেশের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা সার জন পিটার গ্রাণ্ট একদিন কালীগঙ্গা নদীতে বীমার-যোগে গমন করিতেছিলেন। উৎপীড়িত কৃষকগণ তাহা জানিতে পারিয়া, প্রতীকারের আশায় আপনাদিগের দুরবস্থার কথা লাট বাহাদুরের নিকট নিবেদন করিবার জন্য নদীর উভয় তীরে সমবেত হইল। লাট বাহাদুর প্রথমে বীমার থামাইতে সম্মত হন নাই; কিন্তু কুণ্ডীরপূর্ণ নদীতে যখন সহস্র-সহস্র কৃষক ঝম্প প্রদান করিতে লাগিল, তখন আর তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই; তিনি বীমার থামাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সার জন পিটারের গ্রাণ রাইয়তগণের দুরবস্থায় বিগলিত হইয়াছিল। তাঁহারই আদেশে নীল কার্য্যের প্রচলিত প্রণালীর তত্ত্বানুসন্ধান জন্য একটী অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। মিষ্টার ডব্‌লিউ, এস, সিটনকর, মিষ্টার আর, টেম্পেল, মিষ্টার ডবলিউ, এস্, ফারগুসন, রেভারেণ্ড জে, সেল ও বাবু চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই সমিতির সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশই নীল কার্য্যের প্রণালীর বহুবিধ দোষ প্রদর্শন করিয়া, গভর্ণমেণ্টের নিকট একটী মন্তব্যলিপি প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। এই মন্তব্যলিপিতে তাঁহারা নীলকরদিগের অত্যাচারের প্রতীকারের কয়েকটী উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। ছোটলাট বাহাদুর সার জন পিটার গ্রাণ্ট ও বড়লাট বাহাদুর লর্ড ক্যানিং সদস্যগণের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া ইংলণ্ডে একটী রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন। নীল-করগণের অত্যাচারের বিবরণ অবগত হইয়া পার্লামেণ্টের সদস্যগণ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত

হইয়াও যে নীলের চাষ করিতে বাধ্য হইত, তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। (৪) যাহা হউক, এই সময় হইতেই নীলকরদিগের অত্যাচার কমিয়াছিল।

নীলকর ও কৃষকদিগের বিবাদের সময় শিশির-কুমারকে বিপদগ্রস্ত করিবার জন্য নীলকর সাহেবগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারে নাই,—পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন। শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে নীলকরগণ পুনঃ পুনঃ রিপোর্ট করায়, তাঁহার গতিবিধি ও কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিবার জন্য, গভর্ণমেণ্ট প্রসন্নচন্দ্র রায় নামক একজন পুলিশ ইনস্পেক্টরকে আদেশ করেন। প্রসন্নচন্দ্র একদিন শিশিরকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ভাই, তোমার বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের নিকট একটী রিপোর্ট প্রেরণ করিব; কিন্তু তাহাতে তোমার কোনও অনিষ্ট হইবে না।" কয়েক দিবস পরে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে একটী রিপোর্ট প্রেরণ করিলেন যে, শিশিরকুমারই রাইয়তগণকে নীলের চাষ করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। তখন মিষ্টার মলোনী (Mr. Moloney) যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিষ্টার স্কিনার (Mr. Skinner) তাঁহার সহযোগী ছিলেন। নীলকর-দিগের বিশেষ অনুরোধে তাঁহারা শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আরম্ভ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের আদেশ প্রার্থনা করিলে, গভর্ণমেণ্ট এই উত্তর দিয়াছিলেন যে, শিশিরকুমারকে আইন অনুসারে অভিযুক্ত করিবার কোন কারণই দেখা যায় না। কারণ, তিনি রাইয়তগণকে কোন আইন-বিগর্হিত কার্য্য করিতে পরামর্শ প্রদান করেন নাই।

(৪) পার্লামেণ্টের মেম্বর মিষ্টার জে, লেয়ার্ড (Mr. J. Layard) বলিয়াছিলেন—"He read their Report from beginning to end and he must say had risen from its perusal with a feeling of shame and indignation which he could find no words to express."

১৮৬১ খৃঃ অঃ সার চার্লস উড্ (ইনি পরে লর্ড হ্যালিফক্স নামে পরিচিত হন) বড়লাট বাহাদুরকে লিখিয়াছিলেন—"I entirely concur with the commissioners, with the L. G. of Bengal, and with your Lordship, that the evidence taken before the Commission including that of the planter himself is conclusive as to the fact that the cultivation was unprofitable to the ryot who was required to furnish the plant at a price which with the extra charge to which he was subjected did not reimburse him for the cost of production."

মুচি

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

সেদিন রবিবারের প্রাতঃকাল। আমাদের নিভৃত পাঠ-গৃহের চা-পান-সভাটি পরিপাটীরূপে জমিয়া গিয়াছিল। পাউরুটি, বিস্কুট, ডিম সিদ্ধ হইতে চানাচুর, পাপর-ভাজা পর্য্যন্ত সকল রকমের সুখাদ্য-কুখাদ্য মহাসমারোহে সে আসরে চলিয়া যাইতেছিল। সদস্যবৃন্দের উল্লাসব্যঞ্জক সিংহনাদে সভাগৃহ গম্‌গম্ করিতেছিল।

হঠাৎ বারেণ্ডায় সেজদার দ্রুত-চালিত চটিজুতার শব্দ পাইয়া আমরা সন্ত্রস্ত ভাবে চুপ করিলাম। ক্ষণকাল পরে টাট্‌কা কালি-মাখান কলম হাতে সেজদা ঘরে ঢুকিয়া—সটান আমার দিকে কঠোর বিরক্তিপূর্ণ রুক্ষ ভ্রূভঙ্গি হানিয়া কঠিন কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁরে, ও রাঙ্কেল,—তোর কি কাজ-কর্ম্ম কিছুই নাই? খালি ফক্করদালালিই করে বেড়াস্?"

সেজদার কণ্ঠোর ভ্রূভঙ্গির ধাক্কা খাইয়া, মগজের মধ্যে যত কিছু স্ফূর্ত্তি, সজীবতা এতক্ষণ ধরিয়া বহাল তবিয়তে, পরমানন্দে তুড়িলাফ খেলিতেছিল,—সব এক মুহূর্ত্তে শোচনীয় রূপে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। আমি শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম, "কেন? কি করেছি?"

সেজদা অধিকতর উগ্র হইয়া বলিলেন, "কি করেছি?—উল্লুক, আবার কথা বলে! দেখ্‌গে যেথি বাইরের রাস্তায়—ফটকের পাশে একপাল মুচি এসে হল্লা করছে।

ছাঃ, ছাঃ, মান-ইজ্জত কিছু রইল না! মোহিনীবাবু মোটরে করে' এসেছিলেন, আমার কাছে একখানা উকীলের চিঠি লিখিয়ে নিতে—তিনি মোটারে উঠতে যাচ্ছেন, আর এমনি সময় তারা এসে হাজির! আমার ত লজ্জায় মাথা কাটা গেল....."

মোটরারোহী বড়লোক মক্কেলের সামনে, একদল ছোট-লোক মুচিকে ফটকের কাছে আসিতে দেখিয়া, আমার সূক্ষ্মবুদ্ধি অগ্রজের কেন যে এমন নিদারুণ লজ্জা অনুভূত হইয়াছে, তাহার কোনই অর্থ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, আমি হতবুদ্ধির মত হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম!—সেজদা মাত্রাতিরিক্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"তুই কি অপমানের কথা বলেছিস—সেই নিয়ে তাদের ভেতর মহা হাঙ্গাম বেধেছে,—এবার যা, বুঝগে।"

থতমত খাইয়া আমি বলিলাম, "কই, আমি ত কিছুই বলিনি!"

ধমকাইয়া সেজদা বলিলেন, "বলিস্ নি! ওরা তো তোরই কথা বলছে!—'গোরা বাবু, থোড়াতি মোচ হায়, এত্তা বড়া—' সে তুই ছাড়া বাড়ীতে আর কে আছে?—হুঁপীড, তোকে ছুতিয়ে....."

সেজদা রাগে আগুন হইয়া, আমার যথোচিত সংকার সম্বন্ধে এমন এক উপাদেয় ব্যবস্থা করিলেন, যাহার তাল সামলাইতে আমারও মেজাজ অনেকখানি উষ্ণ হইয়া উঠিল। তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "আচ্ছা, দেখছি তাদের। হতভাগারা খামকা জ্বালাতে এসেছে,—আমি আচ্ছা করে.....বোঝাচ্ছি!"

চটির ভিতর আধখানা পা চুকাইয়া, খসড়াইয়া টানিয়া তিন লাফে, বাহিরের বৈঠকখানার ভিতর দিয়া, সদর-বাড়ীর উঠানি পার হইয়া রাস্তার আসিয়া পড়িলাম। চায়ের আড্ডার সদস্যরাও পিছু-পিছু ছুটিয়া আসিল। দেখিলাম, বৈঠকখানার পাশে ছায়াটুকুতে গামছা বিছাইয়া সারি-সারি সাত-আটজন প্রৌঢ়, যুবা নানা বয়সের নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তি বসিয়া আছে। একপাশে একজন বুড়া বসিয়া ক্রুদ্ধভাবে গজ্-গজ্ করিতেছে। আর সকলের ও-পাশে একজন বলিষ্ঠ চেহারার, অল্পবয়স্ক লোক মাথা নীচু করিয়া বসিয়া, অন্য মনে ভূমিতে আঁকজোক কাটিতেছে,—লোকটার চোখ-মুখে একটা ক্ষুব্ধ, বিষণ্ণ ভাব।

সেজদার নিকট হইতে পাওয়া গুর্খসনার কালটুকু সুদ সমেত সেই নিরীহ প্রাণীগুলির মাথায় প্রচণ্ডবেগে বর্ষণ করিয়া, মনের আক্রোশ মিটাইবার জন্য, আমি নির্দয়, কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, "ক্যা হুয়া?"

"সেলাম বাবুজি!"—যুগপৎ সমস্ত মাথাগুলা নুঁকিয়া অভিবাদন জ্ঞাপন করিল; তার পর সব চক্ষুগুলা একসঙ্গে আমার উপর নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইল। কুদ্ধভাবাপন্ন সেই বুড়া মুচিটা উত্তেজিত-ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ও-পাশের সেই অল্পবয়স্ক লোকটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "দেখুন তো বাবুজি,—ঐ শালা আপনাকে বলেছে নয় যে, আমি ওর শ্বশুর হই?"

আমি অবাক হইলাম। এমন অদ্ভুত অভিযোগ ত কখনও শুনি নাই! শালক যে ভগিনীপতির জ্যায্য সম্মান বাজেয়াপ্ত করিয়া, তাহাকে শ্বশুর বলিয়া চালাইতে চাহিবে—এমন নিরুকরণ প্রতারণা বড় ভয়ানক ত! বৃদ্ধের প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিলাম না, হতভম্ব হইয়া, হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম!

লোকগুলি ব্যগ্র উৎকণ্ঠার সহিত আমার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। ছোকরা মুচিটি মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে ক্ষুব্ধ ভাবে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল,—দলের মধ্যে শুধু সেই একটী লোক আমার পানে চাহিল না।

আমাকে নির্ব্বাক দেখিয়া, বৃদ্ধ মুচি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্র ভাবে বলিল, "ভদ্দর আদ্মি আপনি বাবু,—সাচ্চা করে সাচ্চা বাৎ বলুন!"

সঙ্গে-সঙ্গে দলের ভিতর হইতে আর একজন মাতব্বর গোছের লোক অগ্রসর হইয়া সেলাম করিয়া, আমায় বুঝাইয়া দিল যে, ব্যাপারটা অত্যন্ত জবর! আজ তাহাদের মুচিপাড়ায় মহা ঘোঁট বাধিয়াছে;—পঞ্চায়েত বসিয়াছে,—পাড়ার কোন লোক আজ কামাইতে বাহির হয় নাই। আমার নিকট হইতে সাকাই সাক্ষ্য জানিয়া যাইবার জন্য তাহাদের মণ্ডল, বাদী ও প্রতিবাদী—অর্থাৎ আসামী সন্দেহে অবরুদ্ধ ছোকরাটিকে রক্ষীবেষ্টিত করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়াছে,—এখন আমার না কি মেহেরবাণী করিয়া আসল কথাটা খুলিয়া বলিতে হইবে। নচেৎ মহা অনর্থ ঘটিবে!

আমি তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া সত্যই একটু ভীত

হইলাম। কিন্তু কিসের জন্য যে এত কাণ্ড,—সেটা আদৌ হৃদয়ঙ্গম হইল না। জেরা করিয়া অনেক কষ্টে বুঝিলাম—আমার একটী মাত্র ধাক্কাই উহাদের এতখানি বিপ্লবের মূল!—ব্যাপারটা এই :—

কিছুদিন আগে আমার কলেজ যাইবার জুতা জোড়াটির গোড়ালি ছিঁড়িয়া যাওয়ায়, এই বুড়া মুচিকে দিয়া তাহা সেলাই করাই। তার পর একদা হাপশূল মারিবার জন্য আর একটী ছোকরা মুচির হাতে জুতা জোড়াটি দেওয়ায়, প্রথম সেলাইটা দেখিয়া সে আমায় জিজ্ঞাসা করে, ইহা কাহার কৃত? উত্তরে বুড়া মুচির নাম উল্লেখ করিতেই—সেই মুচি বলিয়া উঠে—"ওঃ, সে বুড়া আমারই শ্বশুর!"

তার পর গত কল্য আবার জুতার অন্য জায়গা সেলাই করাইবার জন্য একটা মুচির দরকার হওয়ায়, খোঁজ করিয়া বুড়া মুচিকে পাইলাম। জুতা হাতে লইয়াই মুচি মহাশয়, কি উদ্দেশ্যে জানি না, আমায় প্রশ্ন করিলেন, "বাবু, এ হাপশূল কে মারিয়াছে?"

আমি অপরাধের কথা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পাই নাই,—সরলভাবেই উত্তর দিলাম, "তোমারই জামাই হয় সে বয়ে—একজন ছোকরা মুচি, মাথায় কাঁকড়া চুল—সেই মেরেছে।"

বুড়া মুচি দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "আমার জামাই? কতদিন আগে এসেছিল?"

আমি তখন ফুটবল খেলিতে যাইবার জন্য অতি ব্যস্ত—কাজেই মুচির অবস্থা-বৈলক্ষণ্যে কিছুমাত্র চিন্তিত প্রকাশ না করিয়া, তাড়াতাড়ি বলিলাম, "দিন্ পনের হবে বাপু—এখন দাও শীগ্রী জুতোটা।"

নূতন জুতা সারিয়া দিবার কোন লক্ষণই না দেখাইয়া, মুচি মহাশয় হাত গুটাইয়া লইয়া কঠিনভাবে বাঁকিয়া বসিলেন!—আমার মুখপানে চাহিয়া উপর্য্যুপরি প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিলেন—সে লোকটার বয়স কত? গা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সমস্ত চেহারার কি-কি বিশেষত্ব আছে? সে এই পাড়ায় প্রায়ই জুতা ক্রস্ করিতে আসে কি না?..... ইত্যাদি।

আমি তাড়াতাড়ি তাহার কথাগুলার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলাম। বুড়া মুচি জুতা সেলাই আরম্ভ করিয়া, ভীষণ গম্ভীর হইয়া আমাকে জানাইল, উক্ত দ্বিতীয় মুচি আমাকে নির্ব্বোধ পাইয়া, মিথ্যা পরিচয় দিয়া ঠকাইয়াছে,—সে বুড়ার জামাই নয়, ভ্রাতুষ্পুত্র! বুড়ার জামাই আজ মাসাবধি কাল দেশে চলিয়া গিয়াছে।

বুড়ার নিকট হইতে ঐ তত্ত্বজ্ঞানটুকু লাভ করিয়া, আমার অন্তরাত্মা যে কৃত-কৃতার্থ হইয়া যায় নাই, সে কথাটুকু তাহাকে সুস্পষ্ট-রূপে জানাইয়া দিবার জন্য আমি প্রবল তাচ্ছিল্যের সহিত "বহুৎ আচ্ছা" বলিয়া, চাকরকে ডাকিয়া জুতা জোড়াটা সারাইয়া লইবার উপদেশ দিয়া—টেনিস ব্যাট ঘুরাইতে-ঘুরাইতে খেলিতে বাহির হইলাম।

তার পর আজ প্রাতঃকালে এই আকস্মিক বিপৎপাত!

(২)

মগজটা যেন গুলাইয়া গেল! ইহা লইয়া হাসিব কি কাঁদিব, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া, মেজাজটা অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল! উঃ, কি সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ, সামাজিক সম্মান-আড়ম্বর! একটা ছোট কথার জন্য এমন ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়াছে!.....আহাম্মুক আর কাহাকে বলে! সাধ করিয়া কি এই অজ্ঞ, ইতর লোকদের পরিপূর্ণমাত্রায় অবজ্ঞা করিয়া না চলিলে, আমাদের বিজ্ঞতা-গৌরব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়! ইহারা যে কাঠ-গোঁয়ার এবং চক্ষুহীন উদ্ভুকের সর্দ্দার!

সেই অনাবশ্যক-বিরক্তকারী ইতর বর্ব্বরগুলিকে মনে-মনে যথেচ্ছ ভাষায় গালাগালি দিয়া, অনেক কষ্টে কিঞ্চিৎ সংযত হইয়া বলিলাম,—"এ মি, বুঢ্ঢা,—ইসকো বাস্তে তোম্ এত্তা খাপ্পা হোতা কাঁহে?"

অগ্নিবর্ষী অনন্ত কটাক্ষ আমার দিকে নিক্ষেপ করিয়া বৃদ্ধ রুঢ় স্বরে বলিল, "কেয়া বোলিন্ বাবু?"

আমি থতমত খাইয়া গেলাম; বুঝিলাম, কথাটা বলা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। আমি আর কোন কথা বলিতে পারিলাম না।

অভিযুক্ত সেই ছোকরা মুচিটি এবার ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিয়া, আমার সামনে দাঁড়াইল। ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া সবিনয়ে বলিল, "বাবু সাব,—আপনি ভাল করে আমায় দেখুন, ভুল করবেন না,—ঠিক বলুন দেখি, আমি সেই লোক কি না?"

আমি সনাক্ত করিবার জন্য দৃষ্টি তুলিয়া ভাল করিয়া

তাহার দিকে চাহিলাম। কুচ্‌কুচে কাল রং, এ মাগা ইতর মুচির মুখই বটে,—কিন্তু সে রকম স্নিগ্ধ কোমলতা, —উজ্জ্বল সরলতার প্রশান্ত-মিলন, অনেক ধব্‌ধবে কর্সা ভদ্রলোকের ভদ্র মুখে দেখি নাই! লোকটা এতক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া দূরে বসিয়া ছিল,—তাই তাহাকে ভাল করিয়া দেখি নাই—এইবার নিকটে, ভাল করিয়াই দেখিলাম, আশ্চর্য্য হইলাম! আমি নিঃসন্দেহে ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়ভাবে বলিলাম, "না—না, তুমি ত সে লোক নও!"

সে নিঃশব্দে পিছাইয়া গিয়া বৃদ্ধের মুখপানে চাহিল। সে দৃষ্টির অর্থ যেন 'শুনিয়া লও'!—দলের অন্যান্য সকলে হল্লা করিয়া উঠিল,—"এ লোক সে নয়!"

আমি মাথা নাড়িলাম।

বৃদ্ধ মুচি তীব্রকণ্ঠে বলিল—"ঠিক করে বলুন বাবুজি,—এ লোক সে আদ্‌মি নয়? তবে সে কে?"

এবার সাংঘাতিক বিপদে পড়িলাম! দুই আনার জুতা সেলাই করাইয়া মানুষ যে এত জব্দ হইতে পারে, তাহা কখনও শুনি নাই! কষ্টে আত্মদমন করিয়া বলিলাম, "তাকে আমি চিনি না,—সেই একটীবার মাত্র তাকে দেখেছি, আর দেখি নাই।"

মুচির দল নিরুপায় ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। বৃদ্ধ মুচির একজন্মী ঔদ্ধত্যটা জল করিয়া দিয়া, তাহাকে প্রসন্ন বানাইবার অভিপ্রায়ে আমি মুরুব্বি চালে মীমাংসা-বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। গম্ভীরভাবে বলিলাম, "দ্যাখো বাপু, সে লোক যে কোন বদমাইসি মতলবে তোমার জামাই বলে চল্‌তে চেষ্টা করেছিল, তার ত প্রমাণ নেই! হতে পারে, সে অন্য কোন বুড়া মুচির মেয়েকে বিয়ে করে থাক্‌বে।"

আমার কথা শেষ হইতে-না-হইতে অসহ্য ক্রোধে বৃদ্ধ মুচি চীৎকার করিয়া উঠিল,—কি! এত অধর্ম্ম, এত অন্যায়, এত অসত্য মুখ বুজিয়া সহিতে হইবে! সে কি মানুষ, না জন্তু! তাহার 'ভাই-বেরাদার গোস্' বাঁচিয়া আছে, না মরিয়া গিয়াছে! কোথাকার কোন্ বুড়া মুচির দুই জামাতা আসিয়া, তাহার কত জুতা সেলাই দেখিয়া, নষ্টামি করিয়া, যা-খুসি-তাই বলিয়া যাইবে, আর রাজাশুদ্ধ লোক তাই সহিবে!.....তার পর? সামাজিক শাসন অভাবে সকল লোক নির্ভয়ে অমনি স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিবে, তখন তাহাদের দায়ে কে মাথা দিবে?

কলেজের এক শ্রেণীর সহপাঠী, পাড়ার প্রতিবেশী ও চা-পান সভার চিরন্তন সদস্য আমার ননী-কাকা, ওরফে ননে-কা, আমার পাশে দাঁড়াইয়া পরম বিজ্ঞতার সহিত মাথা নাড়িয়া বলিল, "খুব, খুব, তা খুব! সুতরাং পূর্ব্বাহ্নেই কড়া প্রতিকার কর্ত্তব্য, যেহেতু—Punishment must have a deterrent effect."

আমার দিকে চাহিয়া ননে-কা আরও গম্ভীর হইয়া বলিল, "না—বলবার যো নাই,—এ ত যথার্থ একটা right royal battle বটে। অস্বীকার করা ভয়ানক পাপ!"

কাজলামীতে 'ননে-কার' প্রসিদ্ধ খ্যাতি! তাহার কথায় না হাসিয়া থাকে, কার সাধ্য! সুতরাং আমাদের দলের সবাই হাসিতে লাগিল; আমিও মুখ টিপিয়া সে হাসিতে যোগ দিলাম।

বৃদ্ধ মুচি আমাদের ব্যবহারে দৃকপাত করিল না; পঞ্চায়েতের কাছে চরম মীমাংসার জন্য লাঠি ঠুকিয়া প্রস্থানোপক্রম করিল। দলস্থ সকলে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। শুধু স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার সেই ভ্রাতুষ্পুত্র ছোকরা মুচি!

দলের লোকেরা অগ্রসর হইয়া একটু দূরে গেলে, ছোকরা মুচি একবার ক্ষুব্ধ, ভর্ৎসনা-পূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া আমাদের হাস্যলাঞ্ছিত নির্লজ্জ মুখগুলা দেখিয়া লইল। তার পর ধীরকণ্ঠে বলিল, "বাবু জি,—আপনারা বড়লোক, বুঝ্‌বেন না। কিন্তু গরীব আমরা ছোটলোক,—রাস্তার ধূলায় বসে চামড়া সেলাই করে' রোজ আনি বলে' আমরা যে মানুষ নই,—তা নয় বাবু! মানুষের 'লহু' আমাদেরও শরীরে আছে! মা-বোনের ইজ্জত আমরাও বুঝি বাবু,—সেটা ত দরিয়ায় ভাসিয়ে দিতে পারি না! মাথার ওপর খোদা আছে, মরণান্তি এক রোজ হায় বাবু,—বদমাস্ লোকের বেইজ্জতি ঝুটা বাৎ চুপচাপ বরদাস্ত করণে, হামিলোকের ধরম যায়!"

মাথা নোয়াইয়া সম্মান জানাইয়া, লোকটা দৃপ্তভাবে মাথা উঁচু করিয়া, দ্রুতপদে সঙ্গীদের উদ্দেশে চলিয়া গেল! আমি হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।

একটু পরে হাসির শব্দে চমক ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া

দেখিলাম,—আমাদের দলস্থ সবাই আকুল হাস্তে অধীর হইয়া উঠিয়াছে! মনে-কা'র সরস পরিহাসে (তা সে যত বড়ই শ্লীলতা-বিগর্হিত বাক্য হউক না কেন) সকলেই নিরঙ্কুশ কৌতুকে উল্লসিত! মুচিদের বুদ্ধি কি তীক্ষ্ণ বর্ব্বর! কি ভয়ানক বিজ্ঞ!···

• • • •

মুচিদের সেই মহা সমস্যার কি মীমাংসা হইল, কিছুই জানি না। তাহারা আর আমার কাছে কোন সাক্ষ্য লইতে আসে নাই। কিন্তু সেই গল্পটা আমাদের হাসির মজলিসের একটা মহৎ সম্পদ হইয়া রহিল! সকলেই একবাক্যে বলিত—সেই ভয়ঙ্কর নির্ব্বোধ বা অতি বিকট বুদ্ধিশালী লোকগুলা, হাজার হউক,—মুচি কি না!

(৩)

তার পর বছর-দশেক কাটিয়াছে। আমি এখন কলেজের ছাত্র নই, কলিকাতা ছোট আদালতের উকীল। সেজদা আমার সিনিয়ার, আমি প্রায়শঃ তাঁহার সাকরেদ। মক্কেল ও মামলা লইয়া দিনগুলা বেশ কাটিতেছে। পরের পয়সা স্বচ্ছন্দ ভাবে পকেটস্থ করিবার জন্ত, আইনানুযায়ী কগড়ার কৌশল খুব ভাল করিয়াই রপ্তও করিতে লাগিয়াছি। গুরুজনের আশীর্ব্বাদে অল্পদিনেই বেশ নামজাদা উকীল হইয়া উঠিয়াছি।

সে সময় খুব একটা সঙ্গীন মামলা হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। মক্কেল খুলনার বাঙ্গাল জমীদার। লোকটা মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিতেছে, আমরা খুসি হইয়াছি। বাড়ি ফেলিয়া, মামলা জিতাইব প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহাকে আশ্বাস দিয়াছি। বাস্তবিক আমাদের পক্ষের অবস্থা খুব ভাল।

সেদিন রবিবার। চৈত্রের দুপুরে মামলার কাগজপত্র লইয়া পরামর্শ হইতেছি,—এমন সময় সেজদা এক হাঁও মারিয়া আসিয়া হাজির!·····ব্যাপার শুনিয়া আমার চক্ষু স্থির!

আমাদের মক্কেলের প্রতিবাদী পক্ষ আসিয়া সেজদাকে ধরিয়াছে,—সেজদা তিন হাজার টাকা চুক্তি পূরণ করিয়া, "কুচ পরোয়া নাই"—অভয় দিয়াছেন!—এবার আমার উপর এ পক্ষের ভাল সামলাইবার ভার! সেজদা বাঙ্গাল জমিদারের হইয়া কেস কণ্ডাক্ট করিবেন—কিন্তু····· মূল ঘটনাটা আর বেশী কিছু খুলিয়া বলিতে হইবে কি? সেজদা আমাকে জিতাইবার জন্তই হারিবেন! তিনি এবার আলগোছ হইয়া বসিলেন। কারণ ও-পক্ষের মাথাটি খাইতে হইবে কি না?

মনটা ভারি ছোট হইয়া গেল। ছিঃ! ব্যবসাদারী করিতে বসিয়াছি বলিয়া কি এমনই করিয়া বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া নিরীহের সর্ব্বনাশ করিব! এই কি উচিত? শিক্ষা, সভ্যতা, শুভ্রতা, সুনাম,·····

সেজদা, হাঁকিলেন, "তিন হাজার!"

তথাস্তু!·····শিক্ষা, সভ্যতা উৎসন্ন যাউক! কিসের জন্ত শিখিয়াছি? অর্থোপার্জ্জনের জন্তই ত?

হাত বাড়াইয়া প্রতিবাদী পক্ষের কাগজ হাতে লইলাম। সঙ্গে-সঙ্গে অগ্রিম দাদন তিন শত টাকা সেজদার হাত বদলাইয়া টেবিলের ড্রয়ারে আসিয়া জমা হইল! আমি কাগজের তাড়া খুলিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া কাগজ দেখিতে বসিলাম।

যথানির্দ্দিষ্ট দিনে মামলা শেষ হইল,—আইনের সূত্র ধরিয়া ঝগড়া করিয়া সেজদাকে হার মানাইলাম। বাঙ্গাল জমীদার মাথা চাপড়াইয়া বসিয়া পড়িল!—আমার মক্কেল জয়ের গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া, আদালতের বাহিরে গাড়ীতে উঠিবার সময় আমার জুতার ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া, নগদ দুই হাজার সাত শ' টাকা গণিয়া তোড়া বাঁধিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিল। গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

সেজদার তখনও কিছু কাজ বাকী ছিল। তিনি আদালতেই রহিলেন; আমি অত্যধিক শ্রমক্লান্তির কথা জানাইয়া বিদায় লইয়া আসিলাম। সত্যই আমার শরীর কেমন এক অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, মনটা বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। ছিঃ, ছিঃ,—ভদ্রলোক, শিক্ষিত মানুষ আমি,—টাকার লোভে করিলাম কি? এমনই ভাবে বিশ্বাসহন্তা হইয়া পরের গলায় ছুরি বসাইলাম! বাদীপক্ষের সমস্ত কাগজপত্র হস্তগত করিয়া, সমস্ত মারাত্মক সন্ধানগুলি জানিয়া লইয়া, শেষে ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে মজিয়া—না-হক্ অন্যায়ের জয় ঘটাইলাম! জগতের অগ্রগণ্য জাঁদরেল নীতিবেত্তাগণের কূটনীতিময় আবৃত্তি করিয়া, মনে-মনে মনকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম,—

কর্ত্তব্য কর্ত্তব্যের জন্যই! আমি নিজের ন্যায্য কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি! ইহার জন্য দ্বিধা-সঙ্কোচ বোধ করা—সে শুধু দুর্ব্বলতা ব্যাধির লক্ষণ! মহামূর্খতা! ভয়ঙ্কর অন্যায়!

পায়ের উপর পা তুলিয়া, গাড়ীর পিছনে গদিতে হেলিয়া পড়িয়া, অন্যমনা হইয়া বসিয়া আছি,—গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে। ক্রমে বাড়ীর কাছাকাছি হইয়া, বৈঠকখানার পাশের পথ ঘুরিয়া গাড়ী ফটকে ঢুকিবার উপক্রম করিল। এমন সময় পথের ওপাশে একজন মুচি যন্ত্রপাতি-ভরা চামড়ার থলিয়া কাঁধে ঝুলাইয়া, বীর মন্থর গমনে চলিতে-চলিতে অলস-গম্ভীর কণ্ঠে হাঁকিল "জুতা লাই—জুতা ব্রাস্—"

গাড়ী থামিল। মুক্ত দ্বারপথে লোকটার সুস্পষ্ট মূর্ত্তি তিনহাত তফাতে দেখিতে পাইলাম,—কি কদাকার আকৃতি! লোকটা যেন নোংরামির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! পরণে পতছিন্ন, মলিন চিরকুট কাপড়; পায়ে বেচপ্ গঠনের প্রকাণ্ড নাগ্‌রা! মাথার বাবরি চুলেও তেমনি তেলের বাহার!

আইনের বই পড়িয়া, আর ব্রিফের বস্তা মেরিয়া, চোখ ত একেই ঝলসিয়া গিয়াছে,—তাহার উপর রং-বেরং'এর পোষাক-পরা ধনী মক্কেলগণের সলজ্জ, সুচিক্কণ মূর্ত্তি অহরহ ধ্যান করিয়া—চিত্ত জিনিসটাও তদ্‌ভাবাভিভূত তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছে। কাজেই এই অনাহূত, অসজ্জিত মলিন মূর্ত্তিটা হঠাৎ চোখের সামনে আসিয়া চক্ষুকে যেন খোঁচা মারিল! মনে হইল, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত এই সমস্ত মূর্ত্তিটাই এক আস্ত বীভৎস কদর্য্যতা! আমি ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইলাম। পরক্ষণে গাড়ী ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।—তখনি মনে হইল ঐ মুখ যে চেনা!·····একটু চেষ্টা করিতেই মনে পড়িল, ঐ মুচি সেই বুড়ার ভ্রাতুষ্পুত্র!

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বের দেখা। কিন্তু একদিনের দেখা ঐ লোকটার মুখ অনেক দিন ভুলিতে পারি নাই কি না—তাই আজ দেখিবামাত্র মনে পড়িল! অতীত দিনের সমস্ত কথাগুলার একটা অস্পষ্ট স্মৃতি ধাঁ করিয়া মনে পড়িয়া গেল,—আমার মনটা কেমন বিচলিত হইল!

বৈঠকখানায় আসিয়া, টেবিলের উপর টাকার তোড়া রাখিয়া, বিদ্যুৎ-পাখার সুইচ্ টানিয়া পাখা খুলিয়া দিয়া, পোষাকশুদ্ধ ক্লান্ত দেহে আর্ম-চেয়ারে শুইয়া পড়িলাম। বারেণ্ডার ওপাশে বড়দার দুই বছরের শিশু 'নাদু' গান গাহিতেছে, শুনিতে পাইলাম। চাহিয়া দেখিলাম, থামের পাশে পা ঝুলাইয়া বসিয়া, বালক ভাব-উদ্গত চিত্তে চক্ষু বুজিয়া, মাথা দুলাইয়া, হাততালি দিয়া, পরম উল্লাসে চীৎকার করিয়া গাহিতেছে :—

"এমন্ তাঁতের আলো, মলি চদি হেও বালো
হে মরণ খড়্গ সমান!"

এই ঠিক দুপুরের রৌদ্রে নাদু যে কেমন করিয়া চাঁদের আলোক দেখিতে পাইল, বলা শক্ত। কিন্তু আমার কর্ণে সে সময়ে সেই অপূর্ব্ব উচ্চারণ-বঙ্কার-অলঙ্কৃত সুমিষ্ট সঙ্গীত খড়্গ সমানই বাজিল। নাদুকে কিছু না বলিয়া, নিঃশব্দে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম।

রাস্তার দিকে খোলা জানালা হইতে দেখিতে পাইলাম, —সেই কদাকার-মূর্ত্তি মুচিটা রাস্তার ওপাশে ভূতনাথ বাবুর বাড়ীর দুয়ারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বোধ হয় বাড়ীর লোক কেহ ডাকিয়া থাকিবে। পরক্ষণে দেখিলাম, ভূতনাথ বাবুর সাত বৎসরের বালক পুত্র ভূপতিলাল বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া, তাহার ছোট ছুতা জোড়াটি মুচির হাতে দিল। মুচি ছুতাটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। তার পর চামড়ার থলিয়াটা কাঁধের উপর হইতে নামাইয়া, ডান হাতের আঙুল দুইটি উঁচু করিয়া হাসি-হাসি মুখে বলিল, "দো আনা লেগে বাবুজি।"

"দু আনা? আচ্ছা তাই দেব।" বলিয়া ভূপতি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। মুচি থলিয়ার ভিতর হইতে যন্ত্রপাতি বাহির করিল। তার পর বাঁ পা ছড়াইয়া, ডান পা গুটাইয়া ছুতা সেলাই করিতে বসিল। সঙ্গে-সঙ্গে মুচি প্রফুল্ল মুখে গুন্-গুন্ করিয়া গান ধরিল,—"ক্যায়সে হোলি খেলুড়িয়া শ্যামরায় কি সং!—"

অদ্ভুত সৃষ্টিরাজ প্রাণ ঐ ইতর শ্রেণীর বর্ব্বর মূর্খ-গুলার! এই চৈত্রের কড়া রৌদ্রে, আবর্জ্জনাপূর্ণ পথের পাশে বসিয়া, দুইগণ্ডা মজুরির ছুতা সেলাই করিতে-করিতে, লোকটা প্রসন্ন চিত্তে গান জুড়িয়াছে!

সেই ঘৃণা-অবজ্ঞার পাত্র অধম মুচিটার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া,—হঠাৎ আমার কেমন একটা তৃপ্তি ও আনন্দবোধ হইল! কৃতবিদ্য, উপার্জ্জনশীল ভদ্রলোক আমি,—তিন হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়া বাড়ী ঢুকিয়াছি,—সুসজ্জিত

ঘরের মধ্যে সুখাসনে বসিয়া বিদ্যুতের পাখার হাওয়া খাইতেছি,—কিন্তু কি শোচনীয় অস্বস্তি-ক্লেশপূর্ণ আমার চিত্ত! কিন্তু ঐ মূর্খ অকৃতি অন্ত্যজটা.....!

আর ভাবিতে পারিলাম না,—লাফাইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম!—দূর হউক, অত ভাবুকতা অসহ্য! ভারি মন খারাপ হইয়া যায়!.....সংসারে কাজের লোক হইতে গেলে, অত দ্বিধা-কুণ্ঠা চলে না! এই ত মোটে জীবনের আটাশ বৎসর কাটিয়াছে, আরও অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর কাটুক; তার পর ধর্মভীরু, ন্যায়পরায়ণ মানুষ হইয়া সংসারের নিকট বাহবা লইলেই চলিবে। এখন পার্থিব উন্নতির মুখ চাহিয়া, পৃথিবীর যত কিছু ন্যায়ান্যায়-বোধ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া চলাই আমার পক্ষে যথার্থ ন্যায়পরায়ণতা!

(৪)

ঘণ্টা টিপিলাম। দীনু বেহারা দ্বিপ্রহরের সুখ-নিদ্রা ছাড়িয়া চক্ষু রগড়াইতে-রগড়াইতে ছুটিয়া আসিল। তাহার সাহাবো পোষাক, জুতা খুলিয়া আবার চেয়ারে শুইয়া পড়িলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম, "বরফ আনা হয়েছে?"

দীনু উত্তর দিল "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, একটা ডাব কেটে,—কি, ডাব থাক, একটা লেমনেড ভেঙ্গে বরফ দিয়ে নিয়ে আয়।"

আদালত হইতে ফিরিয়া প্রতিদিন বাড়ীর ভিতর গিয়াই জলযোগ করি। আজ বাহিরের বৈঠকখানার তাহার স্থান পরিবর্ত্তনের আদেশে দীনু বোধ হয় বিস্মিত হইল; কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আজ্ঞে, সে সব ছোটমার ঘরে গুছিয়ে রেখে এসেছি।"

কেন জানি না,—এই একটীমাত্র ছোট কথার ছল পাইয়া, হঠাৎ গ্লানি-বিক্ষিপ্ত মনটা উগ্র, ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল! চীৎকার করিয়া ধমকাইয়া উঠিলাম, "হতভাগা নচ্ছেদ, দূর হ—আমার সাম্‌নে থেকে দূর হ—হুকুমের ওপর হুকুম-দারি শিখ্‌ছো? বল্‌ছি নিয়ে আয় এখানে!"

ক্ষণপরে নিজের সেই অস্বাভাবিক ঔদ্ধত্যে নিজেই কেমন একটা লজ্জা অনুভব করিলাম! নরম হইয়া বলিলাম, "কেন বকিয়ে মারিস্? এখন আর বাড়ীর ভেতর যেতে পারি না, যা—এইখানে নিয়ে আয়। উঃ যে গরম, বাপ্!"

দীনু থতমত খাইয়া "যে আজ্ঞে"—বলিয়া চলিয়া গেল। আমি নিজের ব্যবহারে নিজেই হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলাম। অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন কদর্য্য ক্রোধ কেন আমার প্রকৃতিকে আক্রমণ করিল! বাহিরের রাস্তায় সেই মুচিটা তখনও জুতা সেলাই করিতে-করিতে, নির্ব্বিকার চিত্তে মাথা নাড়িয়া পূর্ব্বারব্ধ সঙ্গীতের সুর ভাঁজিতেছে। যতখান হইতে একটু গান আমার কাণে আসিয়া পৌঁছিল—

"·····আউর বাজে মৃদং
কিষণজীকো মুরলী বাজে·····"

আর গান শোনা হইল না। দীনু পাথরের রেকাবিতে সাজান ফলমূল, ঘোলের সরবৎ, বরফ, লেমনেড্ ইত্যাদি আনিয়া হাজির করিল। আমি আইস্-গ্লাসে লেমনেড্‌টা ভাঙ্গিয়া লইয়া, বাকী সব ফেরৎ দিলাম,—আজ এখন ওসব ভাল লাগিতেছে না।

দীনু চলিয়া গেল। নিতাই মুহুরী আদালতের ফেরত এক রাশ কাগজ বগলে লইয়া, ধূর্ত্ততার হাসি হাসিতে-হাসিতে, ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "সাবাস ছোটবাবু, মেজবাবুকে হারিয়ে দিয়ে এলেন!"

গ্লাসের বরফটা গলিল কি না, মনোযোগের সহিত তাহাই পরীক্ষা করিতে-করিতে, শুষ্ক কণ্ঠে বলিলাম, "হরদয়ল্ হুকমলের মামলার দিনটা কি কাল?"

নিতাই বলিল "আজ্ঞে হ্যাঁ।" তার পর আরও খানিক হাসিয়া বলিল, "আজকের মামলা নিয়ে-যার লাইব্রেরিতে হলস্থূল বেধে গেছে! শ্যামানন্দ উকীল আমার পিঠ চাপ্‌ড়ে বল্লে, 'তোমাদের ছোটবাবু গুরুমারা বিদ্যে শিখ্‌লেন! দাদাকে হারিয়ে দিয়ে চল্লেন! আজ সন্ধ্যা-বেলায় আমরা গিয়ে ধরছি হে নিতাই! বল গে,—খাওয়াতে হবে!"

হায় রে অদৃষ্ট! কি নিষ্ঠুর, কঠোর পরিহাস! অতি কষ্টে আত্মদমন করিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলাম।

টেবিলের উপরকার টাকার তোড়ার দিকে স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিতাই বলিল, "এটা কি ব্যাঙ্কে জমা করে দেওয়া হবে, না—সেক্‌রার পাওনা আড়াই হাজার টাকাটা

শোধ করে দেওয়া হবে,—সেই ছোট বৌমার কাণের হীরের টপ্ আর টায়রার দরুণ ?"

মনটা কেমন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল! রুক্ষ স্বরে বলিলাম, "এখন তুমি যাও নিতাই,—হাত মুখ ধোওগে। সেজ-দা আসুক,—তার পর যা বলে তাই করা যাবে।"

নিতাই চলিয়া গেল। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ঐ সব লক্ষ্মীছাড়া উকীলের মুহুরীগুলা,—উহারা কবে আলাপ্তামে যাইবে!—উহারা ঐ যে দাঁত বাহির করিয়া, স্বার্থপরতার ধূর্ত্ত চাতুরীর হাসি হাসে,—দেখিলে আমার হাড় জ্বলিয়া যায়! কুক্কুর কুক্কুরের দল!

মনটা হঠাৎ ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল! তখনই আবার ঠাণ্ডা হইলাম। নিজের অবস্থা-বৈলক্ষণ্যে নিজেই বিস্ময় অনুভব করিলাম!.....ইহাকেই বুঝি বড়লোকের মেজাজ বলে? ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট—আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!—কিন্তু সত্য,—বড় শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছি!

এক নিঃশ্বাসে লেমনেডের গ্লাসটা শেষ করিয়া, চেয়ারের হাতার উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া, এলাইয়া পড়িয়া, উদাস দৃষ্টিতে সামনের দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

একটু পরে রাস্তার সেই মুচিটার চীৎকার কাণে আসিয়া পৌঁছিল,—"জুত্তা হো গিয়া বাবু, লে যাও।"

চাহিয়া দেখিলাম, ভূপতি বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। মুচির নিকট হইতে জুতা লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া সন্তোষ জ্ঞাপন করিল। তার পর হাতের দুয়ানিটা মুচিকে দিল।

দুয়ানিটা থলিয়ার ভিতর ফেলিয়া, মুচি তিনটি পয়সা বাহির করিয়া ভূপতির হাতে দিয়া, একটু হাসিয়া বলিল, "লেও বাবু, তোমরা তিনো পয়সা।" একটু থামিয়া, প্রশ্নোৎসুক ভূপতির বিস্মিত চক্ষুর উপর শান্ত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ধীর স্বরে বলিল, "এ কাজটার ঠিক মজুরী দু' আনা নয় বাবু, পাঁচ পয়সা,—তুমি দর কস্‌বে বলে আমি দু-আনা বলেছিলাম, কিন্তু দর কস্‌লে না,—তখন কি আর বলব? তোমার পয়সা ফেরৎ নাও।"

বালক ভূপতি অবাক্ হইয়া মুচির পানে চাহিয়া রহিল,—তাহার সঙ্গে,—স্তম্ভিত চমৎকৃত আমিও,—বিস্ফারিত দৃষ্টিতে, সেই নোংরামির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি, অভদ্র ইতর যুবকটার পানে চাহিয়া রহিলাম!

তিনটি পয়সা! সামান্য বস্তু! কিন্তু সেই তুচ্ছ তিনটি পয়সা,—ঐ দরিদ্র শ্রমজীবীর পক্ষে কত মহার্ঘ! এই চৈত্রের ঠিক দুপুরের রৌদ্রে দশ-বাড়ীর দুয়ার ঘুরিয়া তবে উহাকে ঐ তিনটি পয়সা উপার্জ্জন করিতে হইবে,—তাহাও অনিশ্চিত! হয় ত আজ সারাদিনের চেষ্টার ফলেও সেই তিনটি পয়সা সংগ্রহ করা, ঐ হতভাগার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না! তবুও সে স্বচ্ছন্দে এই অনায়াস-লভ্য—বুঝি নাযা প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—এই তিনটি পয়সা হাতে পাইয়া পরিত্যাগ করিয়া চলিল!

ক্ষণমধ্যে নিজের কথা স্মরণ হইল! বিদ্যুদ্বেগে কে যেন সর্ব্বাঙ্গে জল-বিছুটির আঘাত করিল! অস্থির ভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম! সামনেই টেবিলের উপর টাকার তোড়া! ঘৃণায় চক্ষু দুইটা যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল! দুই হাতে চোক ঢাকা দিয়া ঘরের মেঝের বসিয়া পড়িলাম!

সভ্য, সম্ভ্রান্ত সমাজের মানুষ আমি! আইনজ্ঞ, শিক্ষিত—দশজনের একজন আমি!—কিন্তু কি ক্ষুদ্র, কি নীচ, কি জঘন্য লুব্ধতাপূর্ণ অন্তঃকরণ আমার! জগতের সমস্ত সুনীতির আইন মুখস্ত করিয়া মহাপণ্ডিত আমি,—কই আমি ত কার্য্যক্ষেত্রে অন্যায় লোভকে পরাহত করিতে পারিলাম না! তিন হাজার টাকার মূল্যে নিজের আভ্যন্তরিক সততা—আত্মনিষ্ঠা—বিক্রয় করিয়া দিয়াছি! ধিক্!...আর ঐ ইতর সমাজের দরিদ্র মুচি, উহার ঐ তিনটি পয়সা,—সে যে উহার পক্ষে তিন লক্ষ টাকার সমান! কিন্তু সে ত অবহেলায় উহা অগ্রাহ্য করিয়া সততার মান রাখিল!

মনে পড়িল—একদিন ঐ পথের মুচিটাকে তাহার 'ভাই-বেরাদার' লোকের সহিত আমাদের ফটকের কাছে আসিতে দেখিয়া—আমার 'ভাই-বেরাদার'—আইনজ্ঞ সেজদার মাথা কাটা গিয়াছিল—লজ্জায়! আর আজ! —আমার চোখ জলে ভরিয়া আসিতে চাহিতেছে,—পরের কাছে মুক্তকণ্ঠে সত্য স্বীকার করিবার সাহস আমার নাই, কারণ শিক্ষিত ভদ্রলোক আমি!—কিন্তু নিজের কাছে ত আজ অস্বীকার করিতে পারি না,—আজ ঐ মুচিটার ব্যবহারের সহিত নিজের ব্যবহার তুলনা

করিয়া—নিজের কাছে, আমার নিজের মাথাই আজ কাটা যাইতেছে,—মর্ম্মান্তিক ঘৃণায়!

ভদ্র-সমাজের বক্র-বুদ্ধি-বিজ্ঞতার দম্ভ-লাঞ্ছিত ইতর-অন্তঃকরণ নরাধম আমি,—ওরে ভাই ইতর সমাজের সরল, দৈন্যতাপ্রিয় অলসস্তঃকরণ মূর্খ দরিদ্র—তোমার মূর্খতার নিকট আজ আমি সসম্ভ্রমে মাথা হেঁট করিতেছি। বাকো, ব্যবহারে ভদ্র, পরিচ্ছদে ভদ্র, জনসমাজের গণ্যমান্য ভদ্রলোক আমি,—কিন্তু যথার্থ ন্যায়ের কাছে, ধর্ম্মের কাছে, সত্যের কাছে,—ভদ্রত্বের সত্য পরিচয় দিতে আমি পারি নাই, তুমি পারিয়াছ। তোমার মূর্খতাও ধন্য, তোমার নির্ব্বুদ্ধিতাও ধন্য! অন্যে না জানে, না জানুক, কিন্তু আমি জানি—তোমার ঐ মূর্খতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার আসন,—আমার বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার ঢের—ঢের উপরে!

আমি বিহ্বলের মত ঘরের মেঝের দাঁড়াইয়া রহিলাম। মোড়ের মাথায় মুচি গান গাহিতে গাহিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার উদাস আনন্দময় কণ্ঠের সঙ্গীত-সুর বায়ুস্তরে ভাসিয়া আসিতে লাগিল!—

"কায়সে খোলি খেলুড়িয়া শ্যামরায় কি সং!"

অন্বেষণ

[শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায় বি-এল]

কাঁহা আসি খুঁজিতেছি কোথা বিশ্বেশ্বর;
কোথা অন্নপূর্ণামাতা করুণা-পাথার!
ঘাটে-ঘাটে তরি বাহি খুঁজি নিরন্তর;
মন্দিরে-মন্দিরে যাই খুঁজি বারবার।
লোকস্রোত বহে যায়—হেরে না নয়ন;
পণ্য-বীথি নাহি পড়ে নয়নে আমার;
আনন্দের কোলাহল শোনে না শ্রবণ—
রুদ্ধ হয়ে গেছে যেন ইন্দ্রিয়ের দ্বার।
অবগাহি পুণ্য-নীরে মাতা জাহ্নবীর,
করুণার মমতায় কিবা সুশীতল—
কির্ কির্ বহে যায়—স্নেহেতে অধীর
ফুটাইয়া হৃদিমাঝে ভক্তি-শতদল।
ধীরে যাই বিশ্বনাথ-মন্দির ভিতর;
কাঁপে অঙ্গ; কাঁপে হৃদি অপূর্ব্ব চিন্তায়;
দেশ-দেশান্তর হতে যুগ-যুগান্তর
কত সাধু কত যোগী আসিছে হেথায়।
পৃথিবীর ভোগরাশি জীর্ণ কন্থাসম
দূরে ফেলে দিয়া,—ত্যাগে ভোগ, দুঃখে সুখ
লভি মগ্ন জীবনের—সাধু পুণ্যতম
আনন্দে ভাসেন হেথা হেরি হরমুখ।
আমি কি পাব না দেখা—পাব না তোমার
চরণ-পরশ-রজ—যাবে না পরশি
পুঞ্জীকৃত পাপ-স্তূপ—কঠিন কুধার
তোমার কিরণে এই মন্দিরে পশিয়া?
বিল্বদলে করি পূজা, ঢালি গঙ্গাজল
"শিব শিব শম্ভু" বলি, মুদি দুনয়ন—
বাহিরিয়া আসি পুনঃ শুনি কোলাহল,
বিশ্ব দেখি বিশ্বেশ্বরে পূর্ণ অগণন।
অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগী সবি বিশ্বেশ্বর!
সাধু, দণ্ডী, ত্যাগী, যতি সবই বিশ্বপতি!
ভিক্ষা দেয় ভিক্ষা লয় আপনারি কর—
লীলা-স্রোতে ফুটে উঠে বিভিন্ন মূরতি।
যারি মুখ দেখি তারে ভাবি বিশ্বেশ্বর;
পাপ-পুণ্য, রোগ-শোক, হাসি-অশ্রুরাশি—
অণু-পরমাণু হ'তে গ্রহ-গ্রহান্তর
সর্ব্বত্র স্বয়ম্ভু নিজ লীলায় বিকাশি।
তোমারে খুঁজিব কোথা ওগো বিশ্বপতি!
তোমারে হারাব কোথা খুঁজিয়া না পাই।
ভূলোকে দ্যুলোকে প্রভু তোমারি মূরতি—
বিশ্বময় তব রূপ যে দিকেতে চাই।

উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে চায়ের চাষ

[অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন সিংহ এম্-এ]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে "চা"-ব্যবসায়ে চীন দেশেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল। তখন কেহ জানিতও না যে, 'চা'-গাছ পূর্ব্ব-ভারতের প্রকৃতি-দত্ত নিজস্ব সম্পত্তি। কিন্তু আজকাল প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ১৫ কোটী টাকার চা বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। কিরূপে এ বিশাল বাণিজ্যের সৃষ্টি হইল, কিরূপ সামান্য আরম্ভ হইতে ধীরে-ধীরে এই ব্যবসায় ভারতে চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছে, বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় আসিতে ইহাকে কিরূপ বিপদ ও নিষ্ফলতার সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১৮২৩ অব্দে রবার্ট ব্রুস (Robert Bruce) নামক একজন ইংরেজ পণ্যের সন্ধানে বাহির হইয়া আসামের জঙ্গলে চায়ের গাছ দেখিতে পান। তখন আসাম ব্রহ্ম-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

ইহার অল্পকাল পরেই ব্রহ্মরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণস্বরূপ, আসাম প্রদেশ কোম্পানীকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধে পূর্ব্বোক্ত ব্রুসের এক ভ্রাতা কোম্পানীর তরফে কামানবাহী নৌবহরের অধ্যক্ষ ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি চায়ের সম্বন্ধে আরও অনেক অনুসন্ধান করিয়া, কয়েক শত গাছ ও বিস্তর বীজ সংগ্রহ করেন; এবং তাহাদের কতক-গুলি কলিকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনের অধ্যক্ষের নিকট পাঠাইয়া দেন। ১৮৩২ অব্দে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক কাপ্তেন এফ্, জেঙ্কিন্‌সকে (Captain F. Jenkins) আসাম প্রদেশে কি কি দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রেরণ করেন; এবং ব্রুস্ তাঁহাকে চায়ের কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন। ১৮৩৪ অব্দে গভর্ণর জেনারেল এই বিষয়ে একটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। ইহাতে দেখিতে পাই যে, ১৮২৭ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন কালে এই বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল। এই মন্তব্য অনুসারে আসামে চায়ের চাষের প্রবর্ত্তন এবং তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য একটী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি চীন দেশ হইতে চা-গাছের চারা ও বীজ এবং অভিজ্ঞ কৃষক ও চা প্রস্তুত করিবার কারিগর আনয়নের বন্দোবস্ত করেন; এবং উদ্ভিদবিদ্যাভিজ্ঞ কয়েক জন ব্যক্তিকে এই বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিবার জন্য আসামে পাঠাইয়া দেন। আসাম প্রদেশে অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণ হয় যে, চীন হইতে চা-গাছের চারা বা বীজ আনয়নের কোন আবশ্যকতা নাই; কারণ, আসামে চা গাছ প্রচুর আছে, এবং ইচ্ছামত তাহাদের সংখ্যা-বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের সময়েও চীনা কৃষক ও কারিগর আমদানী করা হয়। এই সমস্ত কার্য্যই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর (অর্থাৎ তৎকালীন ভারত গবর্ণমেণ্টের) ব্যয়ে হইতেছিল। কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ স্থির করিয়া-ছিলেন যে, উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে চা উৎপন্ন হইতে পারে—ইহা হাতে কলমে করিয়া দেখাইয়া দিয়া, তাঁহারা এই ব্যবসায় ব্যবসায়ীগণের হস্তে ছাড়িয়া দিবেন। ব্রুস সরকারী চা-কৃষিক্ষেত্রগুলির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, এবং স্থানে-স্থানে কৃষি-ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। জঙ্গলের অন্যান্য গাছ কাটিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, কেবল চা-গাছগুলি রাখিয়া দিয়া এই ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করা হইত। ১৮৩৬ অব্দে ১ পাউণ্ড, ১৮৩৭ অব্দে ৫ পাউণ্ড (/২৷৷০ সের), ১৮৩৮ অব্দে ১২ বাক্স, ১৮৩৯ অব্দে ২৫ বাক্স এবং ১৮৪০ অব্দে ১৩০ বাক্স আসাম চা লণ্ডনে প্রেরিত হয়। আসামে চা উৎপন্ন হইতে পারে প্রমাণিত হইলে, ১৮৩৯ অব্দের প্রথম ভাগে কলিকাতায় ও লণ্ডনে একই সময়ে দুইটী কোম্পানী সরকারের হস্ত হইতে কৃষিক্ষেত্রগুলি গ্রহণ করিয়া চায়ের কারবার চালাইবার প্রার্থী হয়। চা-চাষের এই অবস্থায় দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীর উপযুক্ত স্থান নাই দেখিয়া, কোম্পানী দুইটি অবিলম্বে মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। ইহাদের সম্মিলনে আসাম কোম্পানীর

উৎপত্তি। এই কোম্পানী এখনও বর্ত্তমান আছে। এই কোম্পানী ১৯০৭ অব্দ পর্য্যন্ত ১১,৭০,০০০০০ পাঃ (এগার কোটী সত্তর লক্ষ পাউণ্ড) চা প্রস্তুত করিয়া স্বত্বাধিকারীগণকে প্রায় ২,০০০০০০০ (দুই কোটী) টাকা লাভ দিয়াছে। এই আসাম কোম্পানীর প্রথম ১০ বৎসরের ইতিহাসই উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে চা-চাষের সঙ্কট অবস্থার ইতিহাস। কত কষ্টে, কত বিঘ্ন-বিপদের মধ্য দিয়া নূতন ব্যবসায়কে অগ্রসর হইতে হয়, ব্যক্তিবিশেষের দোষে অনেকের সমবেত চেষ্টা কিরূপে ব্যর্থ হয় এবং ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র-বলে ও বুদ্ধিতে কিরূপে ধ্বংসোন্মুখ ব্যবসায়ও উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইতে সমর্থ হয়—এই ক্ষুদ্র ইতিহাসে পাঠক তাহা পরিস্ফুট দেখিতে পাইবেন।

আসাম কোম্পানীর দুইটি পরিচালক-সভা ছিল; (১) স্থানীয় অর্থাৎ কলিকাতার পরিচালক-সভা। ইহারা চা-কৃষির উপযুক্ত ভূমি ক্রয়, অফিস, গুদাম প্রভৃতির জন্য বাটী নির্ম্মাণ, কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য লোকজন নিয়োগ ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যই করিতেন; কিন্তু সকল বিষয়েই ইঁহাদিগকে লণ্ডনের সাধারণ পরিচালক-সভার (General Board of Directors) কৃত নিয়ম মানিয়া চলিতে ও তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিতে হইত। কোম্পানীর গঠন সম্পূর্ণ হইলে, ১৮৪০ অব্দের মার্চ্চ মাসে সরকারী পরীক্ষা-কৃষিক্ষেত্রগুলির দুই-তৃতীয়াংশ এই কোম্পানীকে অর্পণ করা হয়। ক্রস ইহার উত্তর-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন; এবং মাটার্স নামক এক ব্যক্তি নাজিরা হইতে অন্যান্য আবাদগুলির তত্ত্বাবধারণ করিতে থাকেন।

সরকারের সহিত বন্দোবস্ত হয় যে, প্রথম ১০ বৎসর কোম্পানী জমিগুলি নিষ্কর ভোগ করিবেন; এবং ইহার পর এই সমস্ত জমির খাজনা ধানজমির অপেক্ষা কখনও অধিক হইবে না।

কোম্পানী প্রথম হইতেই শ্রমজীবীর অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। মাটার্স মনে করিয়াছিলেন যে, আসামীগণকে এই কার্য্যে পাওয়া যাইবে। তিনি জানিতেন না যে, বহুকালব্যাপী অন্তর্বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে আসাম তৎকালে প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে চীনা কুলি দিয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা হয়, এবং সেই উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুর হইতে একদল চীনা সংগ্রহ করিয়া পাঠান হয়। কিন্তু তাহারা পাবনা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া সেইখানে স্থানীয় অধিবাসীদিগের সহিত মারামারি করে এবং তাহাদের মধ্যে ৬০ জন ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ধৃত হয়। অবশিষ্টাংশ তাহাদের না লইয়া আসাম যাইতে অস্বীকার করিলে, তাহাদের সহিত চুক্তি না-মঞ্জুর (cancel) করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহারা পথে চুরি-ডাকাতি করিতে-করিতে কলিকাতায় চলিয়া আসে। কলিকাতাতেও দিন কতক তাহারা বিলক্ষণ উপদ্রব করে। অবশেষে তাহাদের ধরিয়া আইল অব ফ্রান্সে (Isle of France) চালান করা হয়। অতঃপর কোল ধাঙ্গড় সংগ্রহের চেষ্টা হয়। অনেক কষ্টে ৬৫২ জন ধাঙ্গড় সংগৃহীত হইল; কিন্তু আসামে চালানের সময়ে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলির কলেরা হইতে দেখিয়া বাকী সকলে রাত্রির মধ্যে কোথায় উধাও হইয়া গেল, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অতঃপর চট্টগ্রাম হইতে লোক সংগ্রহের চেষ্টা হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল যে, চট্টগ্রামের লোক এ কার্য্যের অনুপযুক্ত। ইহার উপর, কুলি ও ডাক্তার এবং ইংরেজ তত্ত্বাবধারকদিগের মধ্যে মৃত্যুর হার বিলক্ষণ উচ্চ ছিল।

পূর্ব্বোক্ত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও ১৮৪০ অব্দের মধ্যে কোম্পানীর কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। ১৮৪২ অব্দের কোম্পানীর বাৎসরিক অধিবেশন-বিবরণীতে দেখিতে পাই যে, মোট ২৬৩৮ একার (অর্থাৎ প্রায় ৮০০০ বিঘা) জমিতে চাষ হইয়াছে। এই বৎসরে সর্ব্বসমেত ১০,৭১২ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত কোম্পানী, ৬৫,৪৫৭ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১০ লক্ষ টাকা লণ্ডন হইতে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহার মধ্যে অধিকাংশই মূলধন খরচ হইয়াছিল। ইহা হইতে একখানি টীনার খরিদ ও একটী করাত কল স্থাপন করা হইয়াছিল। মোট ১,২৩,২৭৫ টাকা মজুরী লোকসান বলিয়া ধরা হইয়াছিল। এই সমস্ত বিঘ্ন-বাধা সত্ত্বেও কোম্পানী হতাশ হন নাই। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে ১৮৪১ অব্দে ৪১,০০০ এবং ১৮৪৫ অব্দে ৩২০,০০০ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৮৪১ অব্দে ১০৪০৪, ১৮৪২ অব্দে ৩১,৩৯৮, ১৮৪৩ অব্দে ৮৭৭০৪ এবং ১৮৪৫ অব্দে ১২০,৪২২ পাউণ্ড মাত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এদিকে খরচের অঙ্ক ক্রমাগত বাড়িয়াই

চলিয়াছিল। ১৮৪১ অব্দে ১২৯৮৪০৲ টাকা, ১৮৪১ অব্দে ২৬১৬০০৲ টাকা এবং ১৮৪৩ অব্দে ১৩১৪৬০৲ টাকা খরচ হয়। ১৮৪৪ অব্দে একটু খরচ কমিয়াছে দেখিয়া, ডিরেক্টরগণ সেয়ার-প্রতি ৫৲ লভ্য বলিয়া প্রদান করেন। এই লভ্যাংশ অবশ্য মূলধন হইতেই প্রদত্ত হয়; কারণ এই সময় পর্য্যন্ত এক কানা কড়িও প্রকৃত পক্ষে লাভ হয় নাই। (পাঠক দেখিবেন, শুধু স্বদেশী কোম্পানীগুলিই এই পাপে পাপী নহে)। ১৮৪২ অব্দে কোম্পানীর চীনারখানি বেচিয়া ফেলা হয়; কারণ, চালাইবার সময় দেখা গেল যে, উহা ব্রহ্মপুত্রের টান ঠেলিয়া চলিতে অক্ষম। ইহাতে লোকসানের অঙ্ক অবশ্যই ভারী হইয়াছিল। ১৮৪৩ অব্দে কলিকাতার ডিরেক্টরগণ, কাযে গলদ কোথায় বাহির করিবার জন্য, কলিকাতা হইতে একজন ক্ষমতা-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী আসামে পাঠান; এবং ক্রস্ এবং হাটার্স উভয়কেই সরাসরি ভাবে জবাব (summary dismissal) দেন। ঐ সময়ে লণ্ডনের ডিরেক্টরগণ কলিকাতার ডিরেক্টরগণকে আর অর্থ-সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন। ১৮৪৫ অব্দে পার্লামেণ্ট্ মহাসভা কোম্পানীর অংশিগণের দায়িত্ব (Liability) সীমা বদ্ধ (Limited) করিয়া দেন। ইহাতে এবং ১৮৪৪ অব্দের লভ্যাংশ দেখিয়া, সকলে উৎসাহিত হইয়া নূতন উদ্যমে কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহাতে লোকসানের পরিমাণ বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন ফল হয় নাই। লণ্ডনের ডিরেক্টরগণ ক্রমে বুঝিলেন যে, চীনাদিগের নিকট শিক্ষিত চা প্রস্তুতের উপায় আসামে চলিবে না; এবং অল্প খানিকটা স্থানে পরীক্ষা দ্বারা নূতন প্রথা আবিষ্কারের চেষ্টা এই ধ্বংসোন্মুখ ব্যবসায়কে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। এই জন্য তাঁহারা কোম্পানীর উত্তর এবং পূর্ব্ব অঞ্চলের বাগানগুলির কাজ বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে লোকসানের পরিমাণ কমিয়া গেল বটে, কিন্তু ব্যয়-সঙ্কুলানের মত অবস্থা হইল না। অবশেষে ১৮৪৭ অব্দে তাঁহারা কলিকাতার ডিরেক্টরদিগের উপর দোষ চাপাইয়া, তাঁহাদের উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছে স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহারা কলিকাতার ডিরেক্টরদিগকে সমস্ত মিনিসটার জন্য যাহা-কিছু একটা দর দিতে বলিলেন। কিন্তু কলিকাতার ডিরেক্টরগণ তাহা দিতেও অস্বীকৃত হইলে, উভয় পক্ষই আর একটা বৎসর কাজ চালাইবার কল্পনা করিলেন। এই সময় কোম্পানীর অদৃষ্টক্রমে দুইজন প্রকৃত কর্ম্মী মিলিয়াছিল। ইহাঁদের একজনের নাম হেন্‌রী বাকিন ইয়ং; অপর ব্যক্তির নাম ষ্টিফেন মর্নে। ইহাঁদের একজন কলিকাতায় ও অপর জন আসামের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ইহাঁদের দুই-জনের পাঁচ বৎসরের চেষ্টার ফলে, আসামের ধ্বংসপ্রায় চা-ব্যবসায় নবজীবন লাভ করে। ইঁহারা কার্য্যভার গ্রহণের সময় দেখিলেন যে, গৃহ-নির্ম্মাণে ও কৃষিকার্য্যে প্রায় ২১ লক্ষেরও অধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে; উপযুক্ত পরিদর্শক থাকিলে, ঐ কার্য্যে ইহার দশমাংশের অধিক ব্যয় হওয়া উচিত ছিল না। নির্ম্মিত গৃহগুলির সে সময়ে কোন আবশ্যকতা ছিল না; এবং সেগুলি প্রায় সমস্তই পতনোন্মুখ অবস্থায় পড়িয়া ছিল। আসামে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পরিষ্কৃত হইয়া তথায় চায়ের চাষ হইতেছে বলিয়া বর্ণিত ছিল, তাহার কোন নিদর্শনও ছিল না। সামান্য যাহা কিছু আবাদ হইয়াছিল, তাহার অবস্থাও অতি শোচনীয়। আর এক বর্ষায় তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পাইবার সম্ভাবনা ছিল। তখন কোম্পানীর তহবিল শূন্য, ঋণের পরিমাণ কলিকাতায় ৪০,০০০ ও লণ্ডনে প্রায় ১০০০০০ টাকা। বাজারে আর ধার মিলে না। কিন্তু উপযুক্ত লোকের হাতে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ ব্যবসায়ের অবস্থা ফিরিতে লাগিল। ১৮৪৮ অব্দে ৪৫০০০ টাকা লাভ হয়। ইহা হইতে ৩০,০০০ টাকা ধার শোধ করা হয়। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া, চায়ের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য কোম্পানীর অংশি-দারগণের দেয় টাকা হইতে ১৫০,০০০ টাকা আদায় করিবার প্রস্তাব হয়। কলিকাতার পরিচালক-সভা এক্ষণে কারবার ফালাও করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন; কিন্তু লণ্ডনের সাধারণ পরিচালক-সভা এই ব্যাপারে তাঁহাদের শীঘ্র অগ্রসর হইতে দেন নাই। ১৮৪৯ অব্দে কোম্পানী উত্তর ও পূর্ব্ব বিভাগে নূতন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। ইহাতেও লণ্ডনের সাধারণ পরিচালক-সভা ক্রোধ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু নূতন কর্ম্মচারীদিগের যত্নে ও চেষ্টায় আবাদের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; এবং তজ্জনিত ব্যয়-বৃদ্ধি সত্ত্বেও কিছু কিছু লাভ হইতে লাগিল। ১৮৫০ অব্দে ২১৬০০০ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। এই বৎসরে প্রায় ৩১,০০০ টাকা ধার শোধ হয়। পর বৎসর প্রায় ৭৫,০০০

টাকা লাভ হওয়ায়, সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়া যায়। অবশেষে ১৮৪২ অব্দে কোম্পানী শতকরা ২৷৷০ হারে লভ্যাংশ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, ইহা প্রকৃত লাভেরই অংশ। পর বৎসর শতকরা ৩৲ হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। এই সময়ে টীকেন মর্ণে এবং বাকিন্ ইষ্ট কোম্পানীর কার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ইহার পর জর্জ উইলিয়মসন চা'র পাতা তুলিবার সময় পরিবর্ত্তন দ্বারা বিঘা প্রতি উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া পূর্ব্বভারতে এই ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন।

বাহাদুর

[শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ]

বাহাদুর ডোম হাসপাতালে মুদ্দফরাসের কাজ করিত। সে হাসপাতালে 'লাশ' চিরিত, আর তাহার স্ত্রী লছমী মোড়া বানাইতে বাড়ীতে বাঁশ চিরিত। স্বামি-স্ত্রীতে যথাক্রমে লাশ ও বাঁশ চিরিয়া যা' উপায় করিত, তাহাতে খাইয়া-পরিয়া তাহাদের দু-পয়সা জমিতে পারিত। কিন্তু জমে নাই বাহাদুরের দারুণ দারু-পানের দরুণ। জমা দূরের কথা, সেই সর্ব্বনেশে দারুর দৃষ্টিতে, বাহাদুরের অকুর গায়ে যে কয়খানা রূপার গহনা ছিল, তাহাও একে-একে নষ্ট হইতেছিল। লছমী কিন্তু সেজন্য কোনও দিন স্বামীর সঙ্গে কোন্দল বাধায় নাই। তবে, স্বামীকে বেশী মাতোয়ালা হইতে নিষেধ করিতে গিয়া অনেক সময় মার খাইয়াছে।

লছমীকে কিন্তু ডোমের ঘরে মোটেই মানাইত না। নীচবংশে দু-একটা সুন্দর, সুশ্রী স্ত্রীলোক কদাচ-কখন দেখা যায় বটে, কিন্তু এমন নিখুঁত, নিটোল সৌন্দর্য্য বড়-একটা দেখা যায় না। তাহাকে দেখিলে মনে হইত, বিধাতা তাহাকে এ সংসারে পাঠাইবার সময় ঠিকানা ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলেন!

বাহাদুর লোকটাও এদিকে যাই হৌক্, তার মনটা ছিল সাদা। সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। হাসপাতালের ডাক্তারবাবুটিও তাহাকে প্রথমটা ভালবাসিয়াছিলেন, এবং তাহার প্রতি করুণা দেখাইয়া তাহার স্ত্রী লছমীকে বাড়ীর উঠান, নর্দ্দমা ঝাঁটের কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বাহাদুরকে শুধু যে স্নেহ করিতেন, তাহা নয়; তাহার নিকট অশেষ ঋণে ঋণী মনে করিতেন। সেবার দীঘির অতল জল যখন তাঁহার বক্ষে পুত্রশোকের অনির্ব্বাণ চিতা জ্বালাইয়া তুলিবার আয়োজন করিয়াছিল, তখন বাহাদুর ছিল বলিয়াই তাহা নিবারিত হইয়াছিল। সেই সাংঘাতিক দুর্দ্দিনের কথা উঠিলেই, ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বাহাদুরের প্রতি হৃদয়ের অফুরন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। ডাক্তার বাবুর কিন্তু স্ত্রীর এতটা কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ ভাল লাগিত না। তিনি একদিন বলিলেন—"সে যেমন উপকার করেছিল, তেমনি তাকে পাঁচ টাকা বখশিশ্ দেওয়া হয়েছে; গরীব লোকের পক্ষে তাই যথেষ্ট।" স্ত্রী একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন—"না গো, সে যা উপকার করেছে, তা' টাকায় শোধ হবার নয়।" ডাক্তারবাবু ব্যঙ্গভরে বলিলেন—"তবে কি গলবস্ত্র হয়ে সকাল-সন্ধ্যে তার পায়ের ধুলো নিতে হবে?"

২

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবার পর, দুই দিন লছমী পূর্ব্বের মত ডাক্তারবাবুর বাড়ী ঝাঁট দিতে গিয়াছিল, তৃতীয় দিনে আর গেল না। বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলে লছমী বলিল—"ডাক্তারবাবু বোলা, মাগী লোক আনেসে ঝিন ঝাড়ু দেনা।" বাহাদুরও সোজা বুঝিয়া গেল। সেইদিন বৈকালে ডাক্তারবাবুর চাকর আসিয়া গোপনে লছমীর হাতে পাঁচটা টাকা দিল। লছমী জিজ্ঞাসা করিল—"কিসের টাকা?" ভৃত্য বলিল—"ডাক্তারবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন; আর কাল ঝাড়ু দিতে যেতে বলেছেন।" লছমী টাকা-পাঁচটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিল—"হামি ঝাড়ু দিতে যাবে না।"

পরদিন আবার বাহাদুরের অগোচরে একখানা দশ টাকার নোট আসিয়া হাজির হইল। সেও পূর্ব্বদিনের

পাঁচ টাকার মত শুধু হাসিয়া দিয়াই চলিয়া গেল। ক্রমে বিশ,—ত্রিশ,—পঞ্চাশ,—একশ' টাকার প্রলোভন পর্য্যন্ত লছমীকে নিষ্ফল আরাধনা করিয়া ফিরিয়া গেল। তখন ডাক্তারবাবুর ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কত চাও?" এবার লছমী চোখ-দুটো কটমট্ করিয়া চাপা গলায় বলিল—"চলা যাও—কুত্তা!"

ছোটলোকের ঘরের মেয়ে এত টাকার লোভ সামলাইতে পারে, ডাক্তারবাবু এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, নিশ্চয়ই বাহাদুর বাড়ী দিতে বারণ করিয়াছে। পরদিন আবার চর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাহাদুর কি বারণ করেছে?" লছমী বাহাদুরের উগ্র স্বভাবের জন্য ডাক্তারের ব্যবহারের কথা তাহাকে জানায় নাই। ডাক্তারের প্রলোভন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উদ্দেশ্যে বলিল—"হাঁ, মেরা আদমী বারণ করেছে।"

ভৃত্যের মুখে এই কথা শুনিয়া ডাক্তারবাবু ভাবিলেন, বাহাদুর তবে সব শুনিয়াছে; এবং হয় ত তাঁহার অনিষ্ট করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে—যে ডাকাতে চেহারা, কোন্ দিন কি করিয়া বসিবে! উহাকে সরাইতে হইবে। তার পর ডাক্তারবাবু খোঁজ লইয়া জানিলেন যে, বাহাদুরের বাড়ী গয়া জেলায়, আর সে বাস্তবিকই 'কয়েদ-খালাসী'—তাহাকে শোধরাইবার জন্য, পূর্ব্বেকার এক ডাক্তারবাবু তাহাকে মড়াকাটা শিখাইয়া, এই কাজে বাহাল করিয়াছিলেন; এবং সেইদিন হইতে সে না কি চুরি-ডাকাতি ছাড়িয়া দিয়াছে।

ডাক্তারবাবু মনে-মনে স্থির করিলেন—এ গয়ার পাপ যাতে গয়ায় যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩

মাসখানেক পরে শোনা গেল, বাহাদুর মদ খাইয়া 'মাতোয়ালা' হইয়া, সরকারী কাজে অবহেলা করায়, ডাক্তারবাবুর রিপোর্টে তাহার চাকরী গিয়াছে। বাহাদুর এক দরখাস্ত করিয়াছিল, এবং তাহাতে না কি জানাইয়াছিল যে, সে বরাবরই দারু পান করে—এ অভ্যাস তাহার অনেক কালের; এবং তাহার জন্য সে পূর্ব্বে কি বর্ত্তমানে কখনও সরকারী কাজে অবহেলা করে নাই। তাহার কাজে ডাক্তারবাবুরা সকলেই খুসী হইয়া তাহাকে ভাল-ভাল 'সার্টিফিকেট' দিয়া গিয়াছেন। দরখাস্তের শেষভাগে চাকরী ফিরিয়া পাইবার জন্য সে বিস্তর সানুনয় প্রার্থনা করিয়া জানাইয়াছে যে, তাহার চাকরী গেলে তার স্ত্রী-পুত্র না খাইতে না পাইয়া মারা যাইবে, এবং তখন হয় ত বাধ্য হইয়া তাহাকে অন্য পথে যাইতে হইবে; কিন্তু তাহার একান্ত ইচ্ছা, সে জীবনের বাকী দিনগুলা বিনা ঝঞ্ঝাটে কাটাইয়া দেয়।

কিন্তু দাতব্য চিকিৎসালয়ের সহৃদয় সভ্যগণ বাহাদুরের কাতর প্রার্থনাতে কর্ণপাত করা সমীচীন বোধ করিলেন না!—ডাক্তারবাবু যখন তাহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিয়া তাহাকে বরখাস্ত করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন, তখন কি তাহা রক্ষা না করিলে চলে!

সুতরাং বাহাদুরের চাকরী গেল। বাহাদুর বাড়ী আসিয়া লছমীকে বলিল—"এ কেয়া তাজ্জব! দারু পিনেকে লিয়ে নকরি ছুট গেলো!—এত্না রোজ ত নকরি নেহি গেলো!"

লছমী বুঝিল, কোন্ আক্রোশে ডাক্তারবাবু তাহার স্বামীর নকরি ছুটাইয়া দিলেন। সে তখন এমন ভাব প্রকাশ করিল, যেন ওটা একটা এমন তুচ্ছ ব্যাপার যে, ও বিষয়ে অধিক মনোযোগ দিবার প্রয়োজন নাই। বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিল—খানা-পিনার উপায় কি হইবে? লছমী বলিল—"কাঁহে, দুসরা কাম করবে!" তখন বাহাদুর আর একটা আশঙ্কার কথা তুলিল—তাহারা থাকিবে কোথায়?—হাসপাতালের সরকারী ঘরে ত আর আশ্রয় পাইবে না!

লছমী ক্ষণেক চিন্তিয়া বলিল—"সুরেন্দ্রবাবুকা পাস্ যাও—হাসপাতালকা বিচমে বহুৎ জমীন্ হায়—বাবুকো মেহেরবাণি হোনেসে, জমিন্ মিল যাবে।"

লছমীর বুদ্ধি-পরামর্শগুলি বাহাদুরের বেশ ঠেকিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—"আউর একনকে ডাক্তারবাবুকো পাস্—"

বাহাদুরের কথায় লছমী হঠাৎ ঝপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; বলিল—"নেহি, খানা বিগর মরণা ভি আচ্ছা।"

অগত্যা, বাহাদুর স্ত্রীর যুক্তিমতই কাজ করিল। হাসপাতালের নিকটেই এক বিরাট বটের ছায়ায় বাহাদুর তার "চালাঘর" বাঁধিল।

৪

গয়ার পাপ গয়ায় না দিয়া, তাঁহারই বাসার নিকটে আস্তানা গাড়িল দেখিয়া, ডাক্তারবাবু একটু চিন্তিত হইলেন। একদিন তিনি সুরেন্দ্রবাবুকে বলিলেন—"বাহাদুরকে ওখানে বসতে দিয়েছেন থাকতে?" সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"হ্যাঁ—এসে ধরলে, তাই একটু দিইচি।" ডাক্তারবাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"ও রকম লোককে আশ্রয় না দিলেই ভাল কর্ত্তেন।" সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"কেন, কি হয়েচে?" "ওটা একটা 'দাগী'।" সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"তা জানি; আর সেই জন্যেই গোপালবাবু ডাক্তার ওকে শোধরাবার জন্য হাসপাতালে কাজ দিয়েছিলেন। কিন্তু আপনারা তো বেচারাকে তাড়িয়ে দিলেন।" ডাক্তারবাবু বলিলেন—"লোকটা ভারী বদ।" সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"কিন্তু এখানে চুরি-ডাকাতি কর্ত্ত না।" ডাক্তারবাবু বলিলেন—"এখন থেকে আবার করবে।" সুরেন্দ্রবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তার জন্যে দায়ী আপনারা।" ডাক্তারবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন—"আমরা! —কি রকম?" সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন "আপনারাই ত ওকে চাকরী থেকে তাড়িয়ে চুরি-ডাকাতি করবার সময় ও সুবিধা করে দিলেন!"

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"আমরা যদি ওর ডাকাতির জন্য দায়ী হই, তবে আপনিও ত কম দায়ী ন'ন। আপনি ওকে আশ্রয় না দিলে, ও এখানে থাকতে পারত না!"

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"আমি আশ্রয় না দিলে, ও এ অঞ্চলে না থাকতে পারত—এই যা। কিন্তু চুরি-ডাকাতি করা কি ছাড়ত?"

"অন্ততঃ, এ অঞ্চলটায় অশান্তি একটু কম হ'ত!—একে তো কেনারাম দাসের দৌরাত্ম্যে এ অঞ্চল অস্থির।"

সুরেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন—"ও, আপনি দেখ্‌চি local treatmentএর পক্ষপাতী!—গোপালবাবু ডাক্তার ছিলেন radical cureএর প্রয়াসী; আর সেইটেই বোধ হয় বিজ্ঞ ডাক্তারের লক্ষণ।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"আপনি কি বলেন, হাসপাতালের চাকরী পাওয়া থেকে বাহাদুর চুরি-ডাকাতি ছেড়ে দিয়েছিল?"

"শুধু আমরা কেন, সকলেরই তাই বিশ্বাস!"

"অসম্ভব!—চোর-ডাকাতের স্বভাব না কি আবার শোধরায়?" সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"সে শোধরায় না কাদের?—যত সব ভদ্রলোকের চোর-ডাকাতের! আর যারা পেটের জ্বালায় চুরি-ডাকাতি করে, তাদের দুবেলা পেট ভরবার ব্যবস্থা করে দিলেই, চুরি-ডাকাতি সেরে যায়!"

৫

ডাক্তারবাবু সপরিবারে কর্ম্মস্থলে ফিরিতেছিলেন। কর্ম্মস্থলের নামানুসারে ষ্টেশনের নামকরণ হইয়াছিল—'কণ্টাই রোড'। ষ্টেশন হইতে কর্ম্মস্থল বেশী দূরে নয়—ছত্রিশ মাইল মাত্র! এক-একটা ছেলে যেমন পর্য্যাপ্ত আহারেও পুষ্টিলাভ করে না, তেমনি এই রাস্তাটা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রদত্ত বাৎসরিক পর্য্যাপ্ত সিল্ভার টনিক পান করিয়াও আরোগ্যলাভ করিয়া উঠিতে চাহে না! তবে দুর্ম্মুখ জনরব বলিয়া বেড়ায় যে, সিল্ভার টনিকের সবটুকু না কি রাস্তার গায়ে পড়ে না—তাই কাহিল ভারটুকুও ঘোচে না। যাই হোক, এই সুদীর্ঘ পথ সুরভিত উষ্ট্র-যানে অতিক্রম করিতে হইলে, বারো হইতে চৌদ্দ ঘণ্টা লাগে। তবে যদি কদাচিৎ উষ্ট্রের পথিমধ্যে পতন ও মূর্চ্ছা, বা অলিঙ্গিত নূতন উটের দৌরাত্ম্যে যান-বিপর্য্যয় ঘটে, তাহা হইলে তো কথাই নাই! সুবিধার মধ্যে এই যে, এই উষ্ট্রযানে বারো হইতে চৌদ্দ বা তদূর্দ্ধ ঘণ্টা টিকিয়া থাকিতে পারিলে, কোনরূপ চর্ম্মরোগাক্রান্ত যাত্রীকে ভবিষ্যতে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের 'এসেন্স অভ্ নিম' আর ব্যবহার করিতে হয় না; অথবা কোন সুস্থ যাত্রীর ভবিষ্যতে চর্ম্মরোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না!

ডাক্তারবাবুর জন্য ঐরূপ একখানি অপূর্ব্ব উষ্ট্র-যান রিজার্ভ করা ছিল। সেদিন স্বনামধন্য বাগ কোম্পানীর অন্যান্য উষ্ট্রগুলির 'তবিয়ৎ-আচ্ছা' না থাকায়, ঐ একখানি-মাত্র গাড়ী বেলদা (কণ্টাইরোড ষ্টেশনের দেশী নাম) হইতে কাঁথি পাড়ি দিবে স্থির হইয়াছিল। ডাক্তারবাবুর জানা ছিল, ও-অঞ্চলের পথঘাট সব সময়ে ততটা নিরাপদ থাকে না; সুতরাং একখানিমাত্র গাড়ি যাইবে শুনিয়া তিনি একটু চিন্তিত হইলেন। গুলজার গাড়োয়ান ডাক্তার বাবুকে অভয় দিয়া বলিল—"আমি যাচ্ছি—কিছু ভয় নেই হুজুর!" গুলজারের চেহারায় সাহস দিবার মত কিছু

ডাক্তারবাবু দেখিতে পাইলেন না ; কেবল থাকার মধ্যে ছিল—তার হাত-দেড়েক লম্বা দাড়ি !

কিন্তু ডাক্তারবাবুকে সেই দিন যাইতেই হইবে। প্রথমতঃ, ছুটি ফুরাইতে আর একদিনমাত্র আছে। দ্বিতীয়তঃ, পর দিন বৈকাল চারিটার আগে তাঁহাকে কাঁথি পৌঁছিতেই হইবে—স্কুল-কমিটির মিটিং আছে ; এবং সে মিটিংএ তিনি না থাকিলে, স্কুলের শিক্ষকদের এক মিনিট বিলম্বে উপস্থিতির জন্য মাহিনা কাটার প্রস্তাবটা পাকা করিয়া তোলা হইবে না ! এই সব কারণে শ্বশুর-সার গুলজার গাড়োয়ানের উপর আধা-নির্ভর করিয়া, ডাক-বাংলোর অপেক্ষা করার বাবদে চাপরাশীকে আটআনা ঘুষ —(ডাক্তারবাবুর মতে বকশিশ্) ও সৌচাগারের দক্ষিণা তিন আনা মোট এগার আনা দিয়া, সন্ধ্যার সময় উট্টবানে আরোহণ করিলেন।—সঙ্গে তাঁহার পত্নী প্রিয়ম্বদা, পুত্র নান্টু ও দাসী করুণা। স্থাবর সাজ-সরঞ্জামের অধিকাংশ উপরের তালায় রহিল—চালকত্রয়ের একজন ডাক্তারবাবুর বকশিশের আশায়, সেই দ্রব্যসম্ভার পাহারা দিবার উদ্দেশ্যে উপর তালায় গিয়া, গত রাত্রি-জাগরণের প্রতিশোধ লইল ! কোচবাক্সে বসিয়া গুলজার ও তাহার সঙ্গী সার্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় গাড়ী চালাইতে লাগিল এবং সুবিধামত ডাক্তার-বাবুর অগোচরে দু'একজন যাত্রী উপর তালায় বসাইয়া লইল !

রাত তখন দুটা-আড়াইটা। দুই পার্শ্বে বড়-বড় গাছ কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার আরও ঘোরাল করিয়া তুলিয়াছিল। গুলজার বিড়ি মুখে দিয়া ঝিমাইতেছিল ; এবং তাহার সঙ্গী দিবা নাসিকাধ্বনি আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। উট্টদ্বয় কীণদৃষ্টি আধুনিক বঙ্গীয় যুবকের ন্যায় ঊর্দ্ধে দৃষ্টি সঞ্চালন-পূর্ব্বক মন্থর-গতিতে চলিয়াছিল। হঠাৎ সেই গভীর নিস্তব্ধতা কাঁপাইয়া কে কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিল—"এই ! —গাড়ী খাড়া করো !" ডাক্তারবাবু তখন স্বপ্নে স্কুল-কমিটির মিটিংএ উপস্থিত হইয়া, শিক্ষকদের সময়ানুবর্ত্তিতার আবশ্যকতার গুরুত্ব সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেছিলেন। এমন সময়ে পত্নী প্রিয়ম্বদা স্বামীকে ঠেলিয়া আর্ত্তস্বরে কাণে-কাণে বলিলেন—'ওগো !—কে গাড়ী থামাতে বল্‌চে !"

ডাক্তারবাবু ভয়-জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"এঁ্যা—এঁ্যা—তোমার গয়নার বাক্সটা—"ডাক্তারবাবুর পত্নী খুব চাপা গলায় বলিলেন—"চুপ কর—চুপ কর।"

ডাক্তারবাবুর অগোচরে গুলজার যে তিনজনকে পথের ভিন্ন-ভিন্ন স্থান হইতে অর্থের লোভে গাড়ীতে তুলিয়াছিল, তাহারা ইতোমধ্যে ক্ষিপ্রগতিতে গাড়ী হইতে নামিয়া, উট্টের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা দস্যুরই অনুচর। গুলজার এই আচম্‌কা ব্যাপারে খুব ভয় পাইলেও, বাহিরে তাহা প্রকাশ করিল না ; বরং লোকগুলা যেন রহস্য করিবার জন্য গাড়ী আটক করিয়াছে, এইরূপ বুঝিবার ভান করিয়া, সে তাহাদের বলিল—"আরে-ভেইয়া, গাড়ি ছোড় দেনা, তামাসা কা বাত নেহি—ডাক্তার বাবু সওয়ার।"

ডাক্তারবাবুর নাম শুনিয়া এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল—"ডাক্তারবাবু !—কাঁহাকা !—কাঁথিকা ?" সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া ডাক্তারবাবু ও তাঁহার স্ত্রী চমকিয়া উঠিলেন। দাসী করুণা থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল ; এবং তদবস্থায় তাহার পাঁচসিকা দামের মূল্যবান রূপার আংটিটি পেট-কোঁচোড়ে লুকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে আঁচল হইতে খুলিবার চেষ্টা করিতেছিল ; কিন্তু কিছুতেই খুলিতে না পারিয়া স্যাকরাকে মনে-মনে গালি পাড়িতেছিল।

দস্যুর প্রশ্নে গুলজার ভাবিয়াছিল—দস্যু ভয় পাইয়াছে, তাই সে তাহাকে আরো ধমাইবার উদ্দেশ্যে বলিল—"হুঁ—কাঁথিকা বড়া ডাক্তার !"

দস্যু একটা ভীষণ পৈশাচিক আনন্দে বলিয়া উঠিল "ব্যস্।"

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন—"এ ঠিক বাহাদুরের গলা ! সে নিশ্চয় আবার ডাকাতি ধরেছে !—তোমার কাছে চাকরী করে, তবু তোমার নামে ভয় পেলে না !"

ডাক্তারবাবু চুপিচুপি বলিলেন—"ও মাতলামী করায় ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলুম—সেই থেকে ওর আমার ওপর ভারি রাগ !"

প্রিয়ম্বদা বলিয়া উঠিলেন—"তবেই ত সর্ব্বনাশ ! আহা, কেন ছাড়াতে গেলে !" ডাক্তারবাবু রুদ্ধ রোষে বলিলেন—"আচ্ছা, একবার কাঁথি যাই ত ! তখন দেখে নেব !" প্রিয়ম্বদা বলিলেন—"তোমায় দেখচি মাথা খারাপ হয়ে

গেচে—আগে এই বিপদ এড়াও তো! ঐ গো। লোক-গুলো বুঝি গাড়ির দরজা ভাঙতে আসচে!"

এমন সময় গাড়ির দ্বারে সজোরে আঘাত হইল—এবং ছিটকানি ভাঙিয়া দরজা খুলিয়া গেল। পরমুহূর্তে বাহাদুর তীব্র ব্যঙ্গভরে বলিল—"আভি ক্যা হোয়!" কে একজন পশ্চাৎ হইতে বলিল "কাম হাসিল করেঙ্গে?"

প্রিয়ম্বদা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—জড়িতকণ্ঠে ডাকিলেন—"বাহাদুর!"—সেই পরিচিত মাতৃস্নেহে-ভরা স্বর!—ছয় মাস বাহাদুর এ স্বর শোনে নাই! মুহূর্তে সে কেমন বিহ্বল হইয়া গেল, সে উচ্ছ্বাসে ডাকিয়া ফেলিল—"মায়ি!"

"বাহাদুর! তুই আমার ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছিলি একদিন—আজ আমার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষে দে বাবা!"

স্নেহময়ী মায়ীর সে করুণ আর্তস্বর,—ডাকাত বাহাদুরের প্রাণের যেখানটা আজ কাঁচা ছিল—পাথর হইয়া যায় নাই,—সেইখানটায় গিয়া আঘাত করিল! সে আর্দ্র কণ্ঠে বলিল—"চলা যা মায়ি!—মেরা শিরমে বাজ গিরনে দে!"

কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে প্রিয়ম্বদা কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন—"বাবা, তোকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব—এ পাপ পথে থাকতে দেব না—আজ থেকে তোর ভার আমি নিলুম!"

এবার সত্য-সত্য বাহাদুরের চক্ষু ফাটিয়া দুই বিন্দু জল অন্ধকারে ঝরিয়া পড়িল। সে মোটা গলায় বলিল—"সো নেহি হোগা মায়ি!—হাম্‌কো এ লোক নেহি ছোড়েগা—হামে ডাক্তারবাবু বো পাকড়ে নেহি দে—এ মেহেরবাণী রাখনা।"

"তোকে ধরিয়ে দেবো?—বাহাদুর!—না—না—এত অকৃতজ্ঞ হব না!" ডাক্তারবাবু মনে-মনে ভাবিতেছিলেন—একবার কাঁথি যেতে পারলে হয়!

সরলপ্রাণ বাহাদুর তার মায়ীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া তাহার সঙ্গীদের বলিল—"যানে দেও—ইন্ লোককা!"

তাহারা সর্দারের কথা মত গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বাহাদুরের দলে আটজন ছিল। তাহাদের মধ্যে রাঘব মণ্ডল নামে এদেশীয় এক ব্যক্তি ছিল। বাহাদুর শিকার হাতে পাইয়া এমন ভাবে ছাড়িয়া দেওয়ায় তাহার কেমন সন্দেহ হইল। সে ভাবিল—বাহাদুর ধরা পড়িবার ভয়ে এই ফন্দীটা করিল। কাল সে ডাক্তারের কাছে তাহাদের নাম প্রকাশ করিয়া দিবে, এবং নিজে সরকারী সাক্ষী হইয়া বাঁচিয়া যাইবে! সে বাহাদুরের অলক্ষ্যে আর একজনের কাণে কাণে কি বলিল। সে ব্যক্তি আবার আর একজনের কাণে চুপিচুপি কি বলিল। এইরূপে সাতজনের মধ্যে বাহাদুরের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়া উঠিল। বাহাদুরের এসব দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে রাস্তার ধারে বসিয়া আজিকার ঘটনাটা আগাগোড়া আর একবার পর্য্যালোচনা করিতেছিল। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—"এ রেইয়া লোক—কালসে হাম্‌কো ছুটি দেও...হাম হিঁয়া নেহি রহেঙ্গে... দেশ্‌মে যাউঙ্গা!"

এই কথায় সকলেই মনে করিল—তবে ত যা ভাবিয়াছি, তাহা সত্য! তাহারা একসঙ্গে মিলিয়া হঠাৎ বাহাদুরকে আক্রমণ করিল!

• • • •

দুই দিন পরে কাঁথির 'মড়াকাটা'র ঘরের চারিপাশে বিপুল জনতা হইল। কাঁথি অঞ্চলের নামজাদা ডাকাত কেনারাম দাসের মৃতদেহ না কি মেদিনীপুর সড়কের (রাস্তা) উপর পাওয়া গিয়াছে—পুলিশ পোষ্টমর্টমের জন্য চালান দিয়াছে। এই কেরারী কেনারামকে ধরিবার জন্য পুলিস কত না চেষ্টা করিয়াছে! কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারে নাই! তাহার মৃত্যু-সংবাদে সকলের বুক হইতে আতঙ্কের একটা বোঝা যেন নামিয়া গেল। যে শুনিল, সে-ই মড়াকাটার ঘরের দিকে ছুটিল। পুলিশের লোক ভাবিল—লোকটা মরিয়াও নিস্তার দিল না—আবার একটা খুনের ফ্যাসাদ রাখিয়া গেল।

যথা সময়ে ডাক্তারবাবু 'মর্গে' (মড়াকাটার ঘর) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মর্গের কক্ষে প্রবেশ করিতেই ডাক্তারবাবু চমকাইয়া উঠিলেন—"এ যে বাহাদুরের লাশ!" তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন!—আজ এই প্রথম বাহাদুরের দুঃখে তাঁহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল।

অনুরক্ত ভৃত্য জন্মের মত স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে যেমন পুরাতন প্রভুর বাটীতে বিদায়ের শেষ দেখা করিতে যায়, বাহাদুর যেন তেমনি তাহার সমস্ত চিহ্ন এ পৃথিবী হইতে জন্মের মত লুপ্ত হইবার পূর্ব্বে, তাহার প্রিয় কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা করিতে আসিয়াছে!

বাহিরে বসিয়া মুদ্ধফরাসেরা তখন গান গাহিতেছিল—

"দৌলত দুনিয়া মাল খাজানা
যেনিয়া বয়েস চড়াই—
এক বাহ্ সে ঠাণ্ডা লাগে
দৌড় খবরা নাই—"

হাফেজ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

পারস্যের অমর কবি হাফেজের নাম জগতের সুধি-মণ্ডলীর অবিদিত নাই। সিরাজের কাব্যকুঞ্জবন একদা যে বুলবুলের মধু-কলতানে মুখরিত হইয়াছিল, আজিও তাহার মোহন মূর্চ্ছনায় নিখিল ভুবনের কবি-চিত্ত পরিতৃপ্ত হইতেছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পারস্যের অন্তর্গত সিরাজ নগরে খাজা সামসুদ্দীন মহম্মদী হাফেজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সদ্বংশজাত, সুশিক্ষিত ও ব্যবহার-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইংরাজী সর্ব্ববৃত্তান্তাভিধান (Encyclopædia Britannica) লিখিতেছেন যে, "হাফেজের জীবনী সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই। সিরাজে তাঁহার নিবাস ছিল। তিনি নির্জ্জনে সাহিত্য-চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শেখ মহম্মদ আত্তারের নিকট তিনি দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের হিসাবে তিনি 'শিয়া' শ্রেণীভুক্ত ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার রচনার মধ্যে যে ধর্ম্মভাব প্রকাশিত, তাহা হইতে অনেকে তাঁহাকে 'সুফী' সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করেন।" ক্লার্ক (১) সাহেবের মতে "হাফেজ 'সুফী' সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী ছিলেন। কোরাণের শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ তিনি মানিয়া চলিতেন না। মস্‌জিদ্ ও মন্দিরের প্রতি তাঁহার সমানই শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। তিনি তাঁহার 'দেওয়ানে'র (২) একটী কবিতায় বলিয়াছেন, 'মন্দিরের প্রদীপ আনিয়া, আল যদি মস্‌জিদের আলো, উজ্জ্বলতা কমে না তাহার।' সেই সর্ব্বশক্তিমান পরম পিতা—যাঁহার চরণে সমগ্র বিশ্ব-জগৎ সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করে—একমাত্র সেই অনন্ত নিত্য-সত্তায় তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল।" হৌলৎসা বলেন, "জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরাজ হাফেজ তৎকালের এক বিস্ময়ের সামগ্রী ছিলেন। তাঁহার রচনাবলী মানবের সমালোচনা-শক্তির বহির্ভূত! কোটী-কোটী যুগের সাধনার ধন সেই মহান অপ্রকাশের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইবার একান্ত আকাঙ্ক্ষায়, তাঁহার ফকিরী পদের (সন্ন্যাস) উপর একটা প্রবল আকর্ষণ হইয়াছিল। লোকে তাঁহাকে 'লিসানুল্ গায়েব' (অপ্রকাশের বাকোক্তিরূপ) বলিয়া উল্লেখ করিত।" ষ্টুয়ার্ট সাহেব (Charles Stewart) বলেন, "হাফেজ তাঁহার প্রগাঢ় ভগবৎ-ভক্তির জন্য খ্যাত ছিলেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় নির্জ্জন-বাসে অতিবাহিত করিতেন। ঈশ্বর-প্রেমে আত্মোৎসর্গ করিয়া তিনি সতত তাঁহার স্তুতিগানে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তাঁহাকে কোন দৈবানুপ্রাণিত মহাত্মা বলিয়া মনে করিত। তাঁহার রচনাবলী ধার্ম্মিক নরনারীবৃন্দ এতদূর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন যে, তাঁহার রচিত গ্রন্থ মহম্মদীয় ধর্ম্ম-পুস্তক 'কোরাণ শরিফের' অব্যবহিত নিম্নে স্থান পাইত। ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ভক্তগণ প্রায়ই তাঁহার রচনাবলীর গভীর আলোচনা করিতেন। ইংরেজী সর্ব্ব-বৃত্তান্তাভিধানে প্রকাশ যে, মধ্যযুগে ভার্জ্জিলের (Virgil) অনেক কবিতা যেমন গির্জ্জার উপাসনা কালে অতীব ভক্তির সহিত পঠিত ও গীত হইত, হাফেজের অনেক কবিতাও সেইরূপ তৎকালীন মুসলমানগণের ভজনালয়ে উপাসনা কালে উচ্চারিত হইত, এবং এখনও অনেক স্থানে হইয়া থাকে।"

মহাকবি ফেদৌসীর উন্নত ও গম্ভীর ভাষা, ঋষি কবি সাদীর নিবিড় নীতিকথা পারস্যের বহুমূল্য ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সন্দেহ নাই ; কিন্তু হাফেজের স্থান তাঁহাদেরও অনেক উচ্চে। হাফেজের সমুদায় রচনার মধ্যে আমরা একজন পারস্যবাসীর জীবন-কাহিনী, তাঁহার মনের গতি ও চিন্তার ধারা, তাঁহার সদসৎ কার্য্যকলাপের বিবরণী দেখিতে পাই। কল্পনা-সুলভ, আনন্দ-বিজড়িত, উচ্চ ভাবাবেশে নিয়ত মগ্ন থাকিয়া, তিনি সমাধিস্থ যোগীর ন্যায় অবিরাম যে সুখদ পরমানন্দ উপলব্ধি করিতেন, সে দুর্লভ সৌভাগ্যের তুলনায়,

(১) Lieut. Col. H Wilberforce Clarke R. E.

(২) হাফেজের রচিত ৫০০টী গজল সংগৃহীত হইয়া 'দেওয়ান-ই হাফেজ' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সামাজিক কর্ম-জীবনের প্রসার ও প্রতিপত্তি এবং বন্ধুজন-প্রার্থিত রাজ-সম্মানের উগ্র প্রলোভন তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ বস্তু বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

যৌবনের অল্প কয়েকটি দিন তিনি ইয়ার-বক্সী লইয়া দিবা-রাত্রি আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করিয়াছিলেন; কিন্তু পরবর্তী জীবনে ধর্মের চরণে সমস্ত মন-প্রাণ নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। সকল বিলাস-বিভ্রম হেলায় পরিত্যাগ করিয়া, দারিদ্র্যের অনন্ত দুঃখভার স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। স্বীয় প্রতিভার গর্ব্বে তিনি কখনও রাজ-দরবারে অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়া দাঁড়ান নাই। যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা হাফেজকে একজন অতীব উৎসাহী, ধর্ম্মোন্মত্ত মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতেন; এবং অল্প-পরিচিতগণ তাঁহাকে একজন উদারচেতা, স্বাধীন-মতাবলম্বী, প্রেমিক কবি বলিয়া জানিতেন। আরিফ্ (৩) ও দরবেশ-গণের প্রতি তাঁহার একটা সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল। বহু রাজেশ্বর ও উজীর-ওমরাহ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার জন্য লালায়িত হইতেন। সর্ব্ব বিষয়ে উৎকর্ষতা ও গুণ-গরিষ্ঠতা সত্ত্বেও তিনি দোষ-গুণ-নির্ব্বিশেষে যুবকগণের প্রতি সাতিশয় স্নেহশীল ছিলেন। তাহাদের পক্ষে সদাসর্ব্বদা তাঁহার আশ্রম-দ্বার উন্মুক্ত ছিল। তাঁহার সরল ও জ্ঞানগর্ভ কথামৃতে তিনি সকলকেই প্রীত করিতেন ও সকলেই তাঁহার প্রিয় ছিল। তিনি সামাজিক সঙ্কীর্ণ বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। যে বিধি-বিধান সকল দেশেই সকল যুগেই এক, যাহা সত্য, সরল ও সার্ব্বভৌমিক—তিনি সেই উদার বিশ্ব-নিয়মের পক্ষপাতী ছিলেন।

তিনি গজল্ ব্যতীত অপর কোনও ধরণের গীতি ও কবিতা পছন্দ করিতেন না। তাঁহার নিজের অধিকাংশ কবিতাই বিশুদ্ধ গজলের ছন্দে ও সুরে বিরচিত। তাঁহার রচনা দুরূহতাবিহীন ও সহজবোধ্য—তথাপি তন্মধ্যে সত্য ও পরমার্থ-জ্ঞানের অনন্ত তত্ত্ব নিহিত আছে। শুধু তাঁহাকে একজন উচ্চ ভাবের ও শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর কবি বলিলে তাঁহার সম্যক পরিচয় দেওয়া হয় না। কোরাণ প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্ম-গ্রন্থের জটিল দর্শন-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি অতুল জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ সম্বন্ধে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতায় তৎ-কালে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁহার সমুদায় রচনার মধ্যে একটা স্বতন্ত্র মৌলিকতা বিদ্যমান। তিনি কাহারও অনুকরণ করিতে ঘৃণা বোধ করিতেন। তাঁহার যাহা কিছু, সমস্তই তাঁহার নিজস্ব ও স্বাভাবিক। এরূপ অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি অন্য কোনও দেশে অতি বিরল।

তাঁহার কবিতা উচ্চ ভাবে বৈভবশালী, কল্পনা-শক্তিতে প্রবল, মৌলিকত্বে অতুলনীয় ও পবিত্রতায় নিষ্কলঙ্ক। উহা যেন বিহঙ্গের পক্ষপুটের ন্যায় লঘু, ভূজঙ্গের শিরোমণির মত উজ্জ্বল, নিবীড় জলধারার ন্যায় গম্ভীর ও শিশুর সরল হাস্যের মত আনন্দময়! তৎকালের সামাজিক ও নৈতিক অবনতি সম্বন্ধে তিনি স্বীয় রচনার মধ্যে প্রভূত আলোচনা করিয়াছেন। সংসারের অসারতা, পাপের প্রভাব, যৌবনের অকিঞ্চিৎকর সুখাভিলাষ, ঐহিক বিলাস-লালসার আপাতমধুর মোহ, বিবেকের অব্যাহতি শক্তি ও স্বাধীনতা, জগদীশ্বরের অনন্ত মহিমা এবং বিশ্বপ্রেম সম্বন্ধে তিনি বহু বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার গীতিকবিতাগুলির মধ্যে কোথাও নীচ ও অপকৃষ্ট ভাবের ছায়ামাত্র নাই; উহার কোনটিই প্রকৃত অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট নহে। এই রচনাগুলির মধ্যে কোথাও অযথা বিস্তারের প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় না—উহা অতি সংক্ষিপ্ত, অথচ সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ—স্বল্প কথার মধ্যে বহু অর্থের সমাবেশ। উহার কোনও একটী শব্দ পরিত্যাগ করিলে, যেন অনেকটা সৌন্দর্য্য হারাইয়া যায়। প্রতি শব্দে, প্রতি বাক্যে, প্রত্যেক শ্লোকের মধ্যে যেন প্রগাঢ় ভাবব্যঞ্জনার এক কুহকী শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা যেন মনের অজ্ঞাতসারে চিত্তকে অধিকার করে। অতি সুললিত, শ্রুতিসুখকর, তৃপ্তিদায়ক ও রোমাঞ্চকারী এই কবিতাবলী একেবারেই অননুকরণীয়।

ক্লার্ক সাহেব বলেন, "বাগ্মিতায় ও ছন্দ-মাধুর্য্যে, কল্পনা ও ভাবের নবীনত্বে পারস্য সাহিত্যের মধ্যে হাফেজের সহিত আর কাহারও তুলনা হয় না। কঠোর ও জড়

(৩) যোগী পুরুষ।

গভীর চিন্তা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার লঘু কল্পনা-বৈচিত্র্য ও রচনার সহজ সরল উচ্ছ্বাস সাধু ও অধার্ম্মিক উভয়বিধ পাঠকেরই মনোরঞ্জন করিত। সুন্নকরা তাঁহার কবিতার দোহাই দিয়া যৌবনটাকে ঐহিক সুখামোদে অতিবাহিত করিতে চাহিত। ধার্ম্মিকেরা কবির ধর্ম্মোন্মত্ততাকে ঈশ্বরানুগ্রহের লক্ষণ মনে করিয়া—উপাসনা-কালে তাঁহার নিগূঢ়ার্থক ক্ষুদ্র কবিতাগুলির আবৃত্তি করিত। তাঁহার 'দেওয়ান-ই হাফেজ' গ্রন্থের রচনাবলী যে পূর্ণতার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, ইহা সেখ ও সুফী উভয় সম্প্রদায়েরই সমালোচকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।"

ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলেন, "পারস্যের কবিগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বভাব-কবি ছিলেন। অল্প কয়েকটি ভিন্ন হাফেজের প্রায় সমুদায় কবিতায় সুফী মতের প্রভাব বর্ত্তমান। ধন-দৌলত ও ঐহিক সুখ-ভোগ যদি হাফেজের অভিপ্রেত হইত, তবে তাহা চরিতার্থ করিবার তিনি বহু সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—পারস্যের ও ভারতের বহু বাদশাহ ও শাহ-জাদাগণের প্রচুর বদান্য প্রস্তাব তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী কবি দারিদ্র্য ও বৈরাগ্যকেই জীবনের অবলম্বন রূপে নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি পারস্যের কবিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প আত্মশ্লাঘী ছিলেন। অতি অল্পসংখ্যক কবিতার মধ্যেই তাঁহার নিম্নলিখিতরূপ ঈষৎ শ্লাঘার পরিচয় দৃষ্টিগোচর হয়—

'হাফেজ গজল্ গাও, আলাময়, প্রফুল্ল, সুন্দর;
কবিতা তোমার ওগো! প্রাণময়, আনন্দ-নির্ঝর!'

তিনি সহযোগিগণের যশ-বিদ্বেষী ছিলেন না। তাঁহার প্রতিযোগী কবিগণের খ্যাতি ও প্রশংসা তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে শ্রবণ করিতেন। 'তাখ্‌লাস্' বা কবির উপাধিস্বরূপ তিনি "হাফেজ" এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'হাফেজ' অর্থে রক্ষক ও তত্ত্বাবধারক এবং কোরাণজ্ঞ ব্যক্তি বুঝায়।"

আমাদের দেশে মহাকবি বাল্মীকি ও কালিদাস প্রভৃতির কবিত্বশক্তি লাভ সম্বন্ধে যেমন এক-একটি রূপকের সৃষ্টি হইয়াছে, হাফেজ সম্বন্ধেও সেইরূপ নিম্নলিখিত গল্পটি প্রচলিত আছে। সিরাজ হইতে চারি মাইল দূরে 'বাবাকুহী' নামে এক পর্ব্বতের উপর 'পীর-সাবাজের' (সবুজপীর) এক আস্তানা আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, যদি কোনও যুবক একাকী ঐ স্থানে চত্বারিংশৎ রজনী উপর্য্যুপরি বিনিদ্র হইয়া যাপন করিতে পারে, তবে নিঃসন্দেহে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হইতে পারিবে। হাফেজ তাঁহার যৌবনে ইহা পালন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন; এবং উক্ত পর্ব্বতের উপর একা বিনিদ্র রাত্রি অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দেবতার কৌশলে এই সময়ে ব্রতাচারী হাফেজ একদা পর্ব্বত হইতে ফিরিবার পথে 'শাখেনবাত' (মধুকুন্দডালি!) নামে এক অলোকসামান্যা সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইলেন; এবং দর্শনাবধি উক্ত যুবতীর প্রতি গভীর প্রেমে আকৃষ্ট হইলেন। শাখেনবাত কিন্তু সেদিন কবির প্রেমের প্রত্যাখ্যান করিলেন। হাফেজ শুনিলেন, সিরাজের যুবরাজ শাহান্-শা শাহজাদা—ইঁহার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া, এই সুন্দরীর পাণি-প্রার্থী হইয়াছেন। অবসন্ন হৃদয়ে হাফেজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পীর সাবাজের আস্তানায় সেদিন রাত্রিতে নিঃসঙ্গ, নিদ্রাহীন হাফেজের প্রাণের ভিতর শাখেনবাতের ইন্দুমুখ রহিয়া-রহিয়া উঁকি মারিতে লাগিল। পরদিন প্রভাতে,—পূর্ব্ব-গগনে উষার অরুণ-রেখা ফুটিতে-না-ফুটিতে অনুরাগ-বিদ্ধ হাফেজ শুধু নিমেষের দেখা পাইবার আশায় প্রণয়িনীর—কুটীর সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া পাদচারণা করিতে লাগিলেন। ভাগ্যবান্ হাফেজের এই ক্ষুদ্র আশাটুকু সেদিন পূর্ণ হইয়াছিল। তার পর হইতে প্রতিদিনই, এই প্রেম-লোলুপ কবি সারা সকালটী শাখেনবাতের কুটীর-প্রান্তে, এই ক্ষণেকের দর্শন-আশায়, সুতৃষ্ণদৃষ্টিতে বাতায়ন মুখে বাহিরে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন; ও রাত্রিকালে পীরসাবাজে তাঁহার জাগরণ-ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে উনচত্বারিংশৎ রজনী অতীত হইল। চত্বারিংশৎ প্রভাতে প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ী হাফেজ সেদিবারের মত দেখিয়া যাইবার জন্য আজ দীন ভিক্ষুকের ন্যায় বান্ধিতার কুটীর-দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার সেই অতি-আকাঙ্ক্ষিতা সুন্দরী যেন কাহার আশাপথ চাহিয়া স্বয়ং আজ দুয়ার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন! দূর হইতেই উভয়ের তৃষিত আঁখির আর্ত্তদৃষ্টি পরস্পর মিলিত হইয়া, আজ যেন সহসা এক তীব্র তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করিল! সুন্দরী তখন কবিকে নিকটে আসিবার জন্য ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন;—প্রেমার্ত্ত কবি এই আশাতীত আনন্দে বিহ্বল হইয়া প্রিয়তমার পার্শ্বে

ছুটিয়া গেলেন,—সুন্দরীর মৃণাল-বাহু নিমেষে কবির কণ্ঠলগ্ন হইল। প্রণয়ী তাঁহার স্পন্দিত বুকে ইপ্সিতা প্রণয়িনীকে ধারণ করিয়া পূর্ণকাম হইলেন। সুন্দরী তখন প্রিয়তমের কাণে মৃদু-গুঞ্জনে বলিতে লাগিলেন—"ওগো! আমার প্রাণপ্রিয়, আমি শাহজাদাকে চাই না;—আমি পারস্যের সিংহাসন চাই না;—আমি রাজমুকুটও চাই না;—ওগো, আমি কেবল তোমাকে চাই!—সুলতানের পুত্রের পরিবর্ত্তে আমি আজ প্রতিভার বরপুত্রকে বরণ করিয়া আমার নারী-জীবন সার্থক করিব!"

সুন্দরী শাখেনবাত হয় ত সারানিশি হাফেজকে তাঁহার বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন; কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ হাফেজ তাঁহার অনুষ্ঠিত জাগরণ-ব্রত স্মরণ করিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, সেই পরম আকাঙ্ক্ষিতা প্রণয়ীর আকুল আলিঙ্গন-পাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া, 'পীর-সাবাজে' তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপনের শেষ রজনী জাগ্রত যাপন করিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। নিশি প্রভাতে তথায় সবুজ অঙ্গবাসে আবৃত-দেহ এক শুভ্রকেশ বৃদ্ধ হাফেজের শিয়র-দেশে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে একপাত্র অমৃতবারি পান করাইয়া দিলেন; এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন, যে, "অদ্যাবধি একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া তোমার নাম জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে!" (৪)

অতি অল্প বয়সেই যে হাফেজের কবি-প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল, তৎসংক্রান্ত এইরূপ একটী গল্প আছে যে, একদা কিশোর-বয়স্ক হাফেজ তদীয় শ্বশুরতাত সাদী সাহেবের (শেখ সাদী নহে) নিকট বসিয়া ছিলেন। সাদী সাহেব তখন সুকীর্ণর্ণ সম্বন্ধে একটি কবিতা রচনা করিতেছিলেন। প্রথম চরণটি লিখিয়া তিনি দ্বিতীয় চরণের জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। হাফেজ উক্ত কবিতার প্রথম অংশটি পাঠ করিয়া দ্বিতীয় অংশটুকু তৎক্ষণাৎ মনে-মনে রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন; এবং উহা লিখাইয়া দিবার জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছাও হইয়াছিল। কিন্তু খুড়ার ভয়ে ও লজ্জায় তাহা বলিতে পারিতেছিলেন না। ইতিমধ্যে কোনও বিশেষ কার্য্য-বশতঃ তাঁহার শ্বশুরতাত কবিতাটি অসম্পূর্ণ ফেলিয়া রাখিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন। সেই অবকাশে হাফেজ উক্ত কবিতার নীচে দ্বিতীয় চরণটি লিখিয়া রাখিলেন; এবং তাঁহার খুড়াকে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া, লজ্জিত হইয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। হাফেজের শ্বশুরতাত ভ্রাতুষ্পুত্রের সেই পাদপূরণ পাঠ করিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং তাঁহাকে কবিতাটি সম্পূর্ণ লিখিয়া দিবার জন্য আদেশ করিলেন। হাফেজ যখন কবিতাটি শেষ করিয়া শ্বশুরতাতকে দেখাইলেন, বৃদ্ধ তাহা পাঠ করিয়া, অধীর আনন্দে তাঁহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া, এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন—"প্রিয় বৎস! একদিন তুমি এই পারস্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিচিত হইবে; এবং তোমার কবিতা পাঠে বিশ্বের লোক বিস্মিত ও আত্মহারা হইয়া মুক্তকণ্ঠে তোমার প্রশংসা করিবে। জগদীশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন!"

কেহ-কেহ অনুমান করেন, হাফেজ বিবাহিত ছিলেন; কারণ, তাঁহার দু'একটী কবিতায় পত্নী-বিয়োগজনিত শোক ও পুত্রহীনের বিলাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতে তিনি কিছুদিনের জন্য তদীয় আলয় হইতে প্রিয়তমার প্রস্থানের জন্য দুঃখ করিয়াছেন—

"গিয়েছিলেম আমরা প্রিয়ে!
দেখ্‌তে তোমায় বিদায় নিয়ে যাওয়া;—
জানই ত সে করুণ কত,
বুকের ভিতর কেমন ব্যথা পাওয়া!
তোমায় ছেড়ে জীবন যেন
হাল-ছাড়া নৌ ঢেউয়ের মুখে ভাসে;
বিচ্ছেদের এ বেড়া আগুন
আমায় কেবল জ্বালিয়ে যেতেই আসে!"

নিম্নলিখিত কবিতা দুইটিতে তাঁহার পত্নী-বিয়োগজনিত শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে—

(১)

"ওগো সখী, প্রেয়সী আমার!
অবগুণ্ঠনে তব কে দিতেছে টান?
অধরার পিয়াসী চাতকী!
শুষ্ক কণ্ঠে বারিধারা কে করিছে দান?
চিন্তা তব তীব্র মর্ম্মঘাতী
আঁখি-নীরে নিদ্রা মম করেছ হরণ;

(৪) কথিত আছে, এই বৃদ্ধই খেজর পয়াম্বর যিনি সত্য-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কার হৃদি-নদ হয়ে প্রিয়ে,—
সুখ-স্বপ্ন মাঝে আজি আছ অচেতন ?
সহসা ছিঁড়িয়া বাহু-পাশ
চূর্ণ করি হৃদি মোর গিয়াছ চলিয়া !
আজি কার বুকবুক মাঝে
বাঁধা আছ প্রেম ডোরে দিবে কি বলিয়া ?
প্রাণের পুতলী আদরিণী !
জানি আজি বহু উচ্চে তোমার আসন,
আর না পশিবে দুটি কাণে
আমার এ আর্ত্তনাদ করুণ রোদন !

* * *

আঁখির মদিরা যথা আনে
মোহমুগ্ধ প্রেমিকের চিত্তের বিকার,
তোমার চাহনি প্রিয়তমে !
এনেছিল প্রাণে মোর মত্ততা সুধার !

* * * *

এস ফিরে দয়া করে সই !
ভিক্ষা দাও অভাগারে একটু যতন ;
অবহেলি তুমি গেছ চলি
আজি তাই হাফেজের দারুণ পতন !"

(২)

"সেই প্রিয়, স্পর্শে যার
গৃহে মম অমরার
ফুল হাসি সদা ছিল ফুটে ;
অপরূপ তনুরুচি
উদ্ভাসিত স্বর্ণ-শুচি
চরণে ধরণী পড়ে লুটে !
ছিল সে জ্যোছনাসম,
আলোকিত করি মম
অকিঞ্চিৎ জ্ঞানবুদ্ধি যত ;
হৃদয়-মাধুরী তার,
করেছিল সুকুমার
স্বপ্নময় জীবনের পথ !
চিত্ত কাঁদি কহে কাণে
আসিবে সে এইখানে
এই পথে রহ প্রতীক্ষায় ;
সে নহে যে ধরণীর
এ যে মন শোকাধীর
কিছুতেই মানিতে না চায় !
কত চন্দ্র অস্তমিত,
তবু আশাহত চিত
অপেক্ষায় আছে বুক বেঁধে,
হারায়ে ফেলেছি যারে
আর কি পাব না তারে
বিফলে কি দিন যাবে কেঁদে !
অশ্রু না ফুরায় চোখে,
তোমার বিরহে শোকে
নিশিদিন রয়েছি মগন ;
কৃষ্ণ-যবনিকা পড়ি
দিয়াছে আঁধার করি
অভাগার হৃদয়-গগন !
তরঙ্গ হিল্লোল ছলে
আজো নেচে আসে কূলে
সেই গতি অতি সুমধুর !
গোলাপের সজীবতা,
প্রিয়তমে ! আজো হেথা
শত প্রাণ করিছে বিধুর !
তুমি শুধু গেলে, অয়ি !
আমার চৈতন্যময়ী,
প্রাণাধিকা প্রাণের জীবন !
মোর গৃহ হতে দূরে
কোন্ অজানিত পুরে
নিশান্তের পথিক যেমন !
তব সঙ্গ-সুখে ভুলি
যৌবনের দিনগুলি
অচেতনে কেটেছিল প্রিয়ে ;
অপ্রাপ্ত আমোদলীন,
কে জানিত একদিন
দিন যাবে এমনি কাঁদিয়ে !

হৃদয়! প্রশান্ত হও,
তুমি ত অবোধ নও,
বুঝে দেখ, এ গৃহে, ফকীর!
রহে কি রূপের রাণী
লাবণ্য-মুকুট-মণি
উজলিয়া ছিল যার শির?
ধরণীর শ্রেষ্ঠ দান
দিয়াছিল ভগবান
অবনীর অমূল্য রতন!
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পুণ্যফল,
জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, বল
হাফেজের সাধনার ধন!"

বারান্তরে আমরা হাফেজের অন্যান্য সুন্দর কবিতার পরিচয় প্রদান করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীকৃষ্ণ

[শ্রীদরবেশ—]

ব্রজ-অঙ্গনা-আঙ্গিনা লঙ্ঘি', গোপী-অঞ্চল হইয়া মুক্ত,
যেদিন কংসে করিয়া ধ্বংস হইলে বীর্য্য-গরিমা-যুক্ত;
কুব্জা-জননী উদ্ধার করে সাধিলে যে-কাজ ছিল অসাধ্য;
হস্তে লইলে সুদর্শন হে,—ছাড়িয়া মোহন মুরলী-বাদ্য;—
সেই দিন হ'তে ভারত গাথায় গ্রথিত হইল নবীন সূক্ত,
জীর্ণ ভারতে বীর্য্য পাদপে শ্যাম পল্লব হইল মুক্ত।
পাঞ্চজন্য-শঙ্খ নিনাদি' আবার এস হে ভারতবর্ষে,—
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া বিপুল পুলকে, অমিত হর্ষে!

জরাসন্ধ ও কাল্‌যবনের দারুণ দম্ভ না-করি' গ্রাহ্য,
রৈবত-শিরে রত্নধী-তীরে প্রতিষ্ঠাপিলে নবীন রাজ্য।
রাজসূয়-যাগে পাণ্ডব জাগি' পাইল তোমার অচল সৌখ্য,
দিগ্বিজয়ী সে বাহিনী ফিরিল সকল ভারত করিয়া ঐক্য।
সমরে অটল বীর-বিক্রমী নারায়ণী সেনা তোমার সৃষ্টি;
তোমার কুহকে ক্ষত্রিয় যত চমকি' চাহিল মেলিয়া দৃষ্টি।
পাঞ্চজন্য-শঙ্খ নিনাদি' আবার এস হে ভারতবর্ষে,—
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া বিপুল পুলকে, অমিত হর্ষে।

তব ইঙ্গিতে সে কুরুক্ষেত্রে বাজিল ধামামা ভীম বাদিত্র,
করি' একত্র ক্ষত্রিয় যত রচিলে রাজ্য নব-বিচিত্র।
ধন্য তুমি হে যাজ্ঞ সারথী, শক্তি তোমার ভারতে ব্যক্ত,
তোমার তূর্য্যে আর্য্য-জাতির ছুটিল তপ্ত ধমনি-রক্ত।
প্রিয়া প্রাণাধিকা দুখিনী রাধিকা,—তাজিলে তাহারে
বহুর কার্য্যে।
ধন্য হে তব পুণ্য-কাহিনী,—মুগ্ধ ভারত তোমার শৌর্য্যে!
পাঞ্চজন্য-শঙ্খ নিনাদি' আবার এস হে ভারতবর্ষে,—
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া বিপুল পুলকে, অমিত হর্ষে।

সুপ্তি-স্বপন ভঙ্গ হইল লভিয়া তোমার দীপ্ত সঙ্গ!
চিত্রক-তুলি কারো-কাকলি কেন কহে শুধু চারু ত্রিভঙ্গ?
বাজুক না কেন বৃন্দা-বিপিনে মুরলীর গান ললিত ছন্দে,
মদির-বিভোলা ব্রজকুল-বালা ছুটুক না কেন প্রণয়ানন্দে;
চঞ্চলা নারী-অঞ্চলোপরি রচিত হেরিয়া তোমার শয্যা,
লাঞ্ছিত মোরা ব্যথিত আজি বুঝিতে তোমার মহতী চর্য্যা!
পাঞ্চজন্য-শঙ্খ নিনাদি' আবার এস হে ভারতবর্ষে,—
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া বিপুল পুলকে, অমিত হর্ষে।

যে একছত্র রাজ্য রচিতে করিয়াছ তুমি বিপুল চেষ্টা,
পৃথ্বি গ্রথিত সে মহা-মিলনে কোন্ ক্রূর বিধি হইল শ্লেষ্টা?
যতেক বর্ণ, জাতি ও ধর্ম্ম, শাশ্বত এক পতাকা লক্ষ্যে,
বিমল সৌখ্যে দুঃখ ভুলিয়া ঐক্য হ'বে না মাতৃ-বক্ষে?
ভাঙিবে না কি হে তম-ঘুম ঘোর?. জাগিবে না কেহ
সত্য হর্ষে?
ভারতের গীতি, বিদ্বেষ-বাঁধা শেলসম র'বে বিঁধিয়া মর্ম্মে?
পাঞ্চজন্য-শঙ্খ নিনাদি' আবার এস হে ভারতবর্ষে,—
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া বিপুল পুলকে, অমিত হর্ষে।

হে পুরুষ, ওহে চতুর সারথী, চে'য়ে দেখ মেলি' অরুণ নেত্র,—
নিকষ-নিবিড়-তন্দ্রা-জড়িত নিদ্রা-মগ্ন ভারতক্ষেত্র!
আবার ভারতে বাজাও শঙ্খ, ধর্ম্ম-রাজ্য হোক্ প্রতিষ্ঠা,
শিখাও সকলে তোমার কর্ম্ম, তোমার ঐক্য, তোমার নিষ্ঠা।
কুরু-প্রাঙ্গণে বস্ত্র-হরণে যে পাপ-কালিমা হইল যুক্ত,
এত অপমানে দৈন্য-দাহনে সে কলঙ্ক কি হয় নি মুক্ত?
পাঞ্চজন্য-শঙ্খ নিনাদি' আবার এস হে ভারতবর্ষে,—
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া বিপুল পুলকে, অমিত হর্ষে।

উৎকল-সাহিত্য

[শ্রীরমেশচন্দ্র দাস]

উৎকল-সাহিত্য—ভাদ্র, ১৩২৫।

"কেউঝর প্রথমবিদ্রোহ"—(২) পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পদাতিকগণের মধ্যে কেহ-কেহ সাহসী ও বুদ্ধিমান ছিল। তথাপি তাহাদের বীরত্বের আস্ফালন দেখিয়া যুগপৎ সাহস ও হাস্যের উদ্রেক হইল। যাই হউক, ভূক্রাদের সংখ্যা ও গতিবিধি অনুসন্ধান করিয়া অগ্রসর হইলাম। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই ত সৈন্যবল—তাহার উপর পরামর্শ করিতে সঙ্গে কেহই নাই; অধিকন্তু যাহাদিগকে গুপ্তচররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহারাও প্রচ্ছন্নভাবে ভূক্রাগণের হিতৈষী ও পক্ষাবলম্বী। দিবাবসান সময়ে আমরা বসন্তপুরে উপস্থিত হইলাম। বসন্তপুর ও কেউঝর গড়-মধ্যে, পর্ব্বত-শ্রেণীর ভিতরে 'ঘাঁটি' বা সঙ্কীর্ণ গিরিপথ। সেই স্থানটীর সম্বন্ধে আমার বিশেষ ভয়। ঘাঁটির পার্শ্বস্থ পর্ব্বতে দুই-চারিজন অদৃশ্যভাবে থাকিয়া, সহজেই শত ব্যক্তির গতিরোধ করিতে পারে। সেখানে ভূক্রাদের লুক্কায়িতভাবে থাকিবার আশঙ্কা হইয়াছিলাম। আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না; ঘাঁটির সন্ধান লইতে বসন্তপুরের কৌজদারকে পাঠাইলাম। কৌজদার রাজ-সরকারের কর্ম্মচারী। সে ঘণ্টা-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া পথ পরিষ্কার বলিয়া সংবাদ দিল।

রজনী সমাগত। অন্ধকার পথে আর ঘাঁটি অতিক্রম করিতে ইচ্ছা হইল না। সৈন্যগণও বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাজধানী সবে পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। প্রাতঃকালে যাত্রা করিব স্থির করিয়া, বিশ্রামের জন্য আদেশ প্রচার করিলাম। বসন্তপুরের পশ্চিমদিকে 'কানিজোর' তীরে আম্র-কাননে সৈন্যগণ রন্ধনের আয়োজন করিতে লাগিল। একটী বৃহৎ আম্র-বৃক্ষমূলে আমি বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধির অল্পতা হেতু এইখানে বিষম ভুল করিয়া, পরে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। তখন ঘাঁটিতে অন্ততপক্ষে বিদ্রোহী ছিল; সেই মুহূর্ত্তে যাত্রা করিলে নিরাপদে রাজধানীতে পৌঁছিতে পারিতাম। কিন্তু বিপৎকালে বিপরীত বুদ্ধি হইল! বসন্তপুরের যে কৌজদার গুপ্তচররূপে প্রেরিত হইয়াছিল, সে বিদ্রোহী পক্ষের প্রহরীকে আমাদের সমস্ত সংবাদ প্রদান করিলে, তাহারা রাইগড়া গ্রামে তাহাদের নেতা বন্দী ভূক্রাকে অবিলম্বে জানাইয়া আসে। যেখানে শত ভূক্রা ছিল, তীরধনু, বল্লুক, তরবারি লইয়া আমাকে বধিবার জন্য ঘাঁটির দুই-পার্শ্বে গুপ্তভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। অতি প্রত্যূষে সেই কৌজদারকে পুনরায় প্রেরণ করিয়া, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলাম। দাসদাসী ও হাতী কয়াকষিতে প্রায় একঘণ্টা অতিবাহিত হইল। তখন সূর্য্যদেব উদিত হইয়াছেন। আমরা 'কানিজোর' উত্তীর্ণ হইয়া অল্পদূর গমন করিয়াছি। পথে কৌজদার পূর্ব্বমত ঘাঁটি পরিষ্কার বলিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। আমরা সহজ-ভাবে চলিয়াছি। পর্ব্বতমূলে উপস্থিত হইতে-না-হইতে এককালে বন্দুকের শব্দ ও মনুষ্য-কণ্ঠের উচ্চ চীৎকারে তিন দিকের পর্ব্বত কয়েক মুহূর্ত্ত কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষণকাল মাত্র হাতীর উপরে বসিয়া চিন্তা করিলাম। পদাতিকগণকে স্থির রাখিয়া উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিবার জন্য হাতী ছুটাইয়া দিলাম। অভিপ্রায়—কোন উচ্চ বৃক্ষবহুল স্থানে সৈন্যদের রাখিয়া আত্মরক্ষা করিব। দুর্ভাগ্য-বশতঃ সেরূপ স্থান পাইলাম না। সম্পূর্ণরূপে বিনাশ হইয়া পড়িলাম। শত বন্দুক প্রস্তুত ছিল—মুড়িবার আদেশ করিলাম। তাহারা যেন সহস্র বন্দুকের শব্দ করিয়া ছুটিল। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। শত্রুপক্ষের সংখ্যা তাহা হইলে নিশ্চয়ই বেশী নয়। প্রতিধ্বনি শুনিয়া অকারণ ভীত হইয়াছিলাম। বৃথা চিন্তা, সব শেষ হইয়াছে! হাতী ছুটাইয়া অনায়াসে আনন্দপুরে যাইতে পারিতাম; কিন্তু পাইকদিগকে শত্রুহস্তে ফেলিয়া পলায়ন করিতে লজ্জা বোধ হইল। বসন্তপুরের সেই আম্রকাননে ফিরিয়া আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছি, ইত্যবসরে ভূক্রাগণ আসিয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

ভূক্রারা আমাকে বন্দীর নিকটে যাইতে আদেশ করিল। আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া সদলবলে যাত্রা করিলাম। বসন্তপুরের পশ্চিম-ভাগে 'বরারাণি' পর্ব্বতমূলে ভূক্রাগণের প্রধান আড্ডা। বন্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোপালিয়া তাহার রক্ষক ও ভূক্রা সৈন্যগণের সেনাপতি। ছয়মাস পূর্ব্বে কেউঝর কারাগারে তাহাকে পদযুগলে স্থূল লৌহ-শৃঙ্খল ধারণ করিয়া অবেদ্ধ থাকিতে দেখিয়াছিলাম। গোপালিয়া বিষম বলবান। তাহার শরীর বিশাল, স্থূল মাংসপেশীগুলি যেন লৌহ-নির্ম্মিত। বক্ষঃ প্রশস্ত, মুখটা ভেণ্টা, ও বিকৃতাকার; এবং চক্ষু দুইটী ক্ষুদ্র ও ভয়ঙ্কর। লোকটা যেরূপ দুর্দ্ধ সেইরূপ নৃশংস ও অত্যাচারী। দুইপার্শ্বে মুক্ত তরবারি ও বন্দুক রক্ষা করিয়া সে একখানি প্রস্তর-ফলকে উপবিষ্ট ছিল। অনেকগুলি ভূক্রা ধনুর্ব্বাণ লইয়া আদেশ-প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। আমি উপস্থিত হইলে, আমার ক্ষুদ্র মেয়ে কর্কশ ভাবে কণকাল আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, সে আদেশ করিল,—"চল, রাইগড়ায় বন্দীবর বাবুর নিকটে চল।" আমি হাতীতে উঠিলাম। গোপাল উত্তরীয়ে উত্তম তরবারি লইয়া আমার পার্শ্বে উপবেশন করিল ও আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ রে,

তোর কাছে কি সিমুল আছে?" আমি "না" বলিলে পুনরায় কহিল—"বেশ, বেশ! কিন্তু পলায়ন করিবার কোনও রূপ চেষ্টা করিলে, তোমায় কাটিয়া ফেলিব।" কোমরে টাঙ্গি ও তরবারি বাঁধিয়া এবং ধনুকে জ্যা সংযোগ করিয়া চল্লিশ-পঞ্চাশজন প্রহরী আমাকে বেষ্টন করিয়া রাইহুয়ার দিকে লইয়া চলিল। পথে দলে-দলে লোক যাঁটির দিকে আসিতেছিল। সম্মুখে লোক দেখিলেই প্রহরী হাঁক ছাড়ে, "হুঁসিয়ার"। তাহারা যদি প্রত্যুত্তরে ঐ শব্দ আবৃত্তি করে, তবে আর কোনও কথা নাই; কিন্তু উত্তর না পাইলেই হুকুম হয় "তফাৎ, তফাৎ।" তাহাদের বিশ্বাস, কেবল আত্মপক্ষীয় লোকেরা 'হুঁসিয়ার' বলিয়া থাকে।

বেলা প্রায় তিনটা,—আমরা রাইহুয়ায় পৌঁছিলাম। হাতী হইতে নামিতে-না-নামিতে, বরণী বেগে আমার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া বলিল,—"আমার পাগে পড়, আমার পাগে পড়।" আমি কণকাল চিন্তা করিয়া, অবনত-মস্তকে নমস্কার করিলাম। বরণীর আনন্দের সীমা নাই,—আমার হস্ত ধারণ করিয়া তাহার পার্শ্বে বসাইল। দিবা অবসান প্রায়। স্নানাহার করিবার অনুমতি পাইলাম। বরণীর দরবার-গৃহের অনতিদূরে আমার রাত্রিবাস জন্য একটী 'কুমুড়িয়া' ঘর নির্দ্দিষ্ট হইল। ঘরটী দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে পাঁচ হাত মাত্র। কয়েকটী বাঁশের খাম্বার উপর বেতের জাল ও চাল ছৈয়ারী। চালের মধ্য দিয়া আকাশ দেখা যায়। দিন কয়েক পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়াছিল। ঘরের মেজে ভিজে ও সেঁতসেঁতে। তাহারই উপর বিছানা পাতা হইল। বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সন্ধ্যার পরে আহার করিয়া শুইলাম। ঘরের সম্মুখে ও পশ্চাতে দলে-দলে কুকা তরবারি ঘুরিয়া পাহারায় নিযুক্ত হইল। অল্পক্ষণ পরে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন ডেঁও পিপড়ার কামড়ে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে। এইরূপে গাত্র কণ্ডুয়নে ও পিপীলিকা তাড়াইতে রজনী প্রভাত হইল।

এইখানে বরণীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করা আবশ্যক। বরণীর কুকা বালকমাত্র। মহারাজা বলরামনারায়ণ তাহাকে কটকের রাজবাটীতে রাখিয়া 'সার্ভে' পড়াইয়াছিলেন। পাশ হইয়া কেউঝর সরকারে কিছুদিন কার্য্য করিবার পরে, বরণী প্রচার করিয়াছিল, মহারাজা প্রজাপীড়ক ও অত্যাচারী। রাজ্যে তার বিচার করিবার জন্য সে (বরণী) কটক হইতে মহারাণীর 'ধর্ম্মপুত্র' হইয়া আসিয়াছে। কুকাগণ নানা কারণে অসন্তুষ্ট ছিল। এই কথা শুনিয়া, তাহারা বরণীর বক্তৃতা স্বীকারপূর্ব্বক রাজশক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হইল। আত্মীয়-স্বজনকারী অন্য প্রজাও রাজ-সরকারের সঞ্চিত শস্যাদি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের হস্তে কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারীও বন্দী হইলেন। এদিকে আমার নিরুদ্দেশ অকলের মহাপাত্র নামে এক বুদ্ধিমান ও সুচতুর কুকা বরণীর সহিত যোগদান করিল। বিদ্রোহের প্রাবল্য দেখিয়া মহারাজা রাজধানী ত্যাগ করিয়া আনন্দপুরে চলিয়া আসিলেন।

সকালে মহারাণী-পুত্র বরণীর দরবারে বসিলেন। কেউঝরের প্রধান-প্রধান কুকাগণ সভাস্থলে উপস্থিত। সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। কিয়ৎক্ষণ পরে আমার ডাক পড়িল। বরণী আমাকে পার্শ্বে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"অভিরামোহন বাবু, বর্ত্তমানে আপনার বলিবার কি আছে?" আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলাম—"আমার আর কথা কি? আমি কিছু এদেশের লোক নহি। চাকরী করিতে বালেশ্বর হইতে আসিয়াছিলাম। মহারাজা আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আপনি বর্ত্তমানে দেশের অধিপতি। আর প্রকৃত পক্ষে এই দেশ ও কুকাগণের। যদি মাসেজার পদে রাখেন, থাকিব; নচেৎ দেশে ফিরিয়া যাইব।" বরণী আমার কথায় বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া বলিল,—"বাবুটা সত্য বলিয়াছে। আমি তোমাকে মাসেজার রাখিব।" কুকাদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিল,—"তোমাদের মত কি?" তাহারা একবাক্যে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"না—না, এ মহারাজার লোক; ইহাকে রাখা যাইতে পারে না।" বরণী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—"মহারাজা আবার কে? আমি মহারাণী-পুত্র—আমিই মহারাজা। এ আমার মাসেজারবাবু।" কুকাদলের একটা অন্ধ বিশ্বাস ছিল, কেউঝর রাজা প্রকৃতপক্ষে তাহাদের। ইচ্ছানুসারে যেন রাজাকে পদচ্যুত করিয়া, নূতন রাজা নির্ব্বাচন করিবার অধিকার তাহাদের আছে। এই গ্রাম্য ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, তাহারা ইতঃপূর্ব্বে বহুবার বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে। এ প্রকার মারাত্মক বিশ্বাসের ঐতিহাসিক কারণ কি? প্রথমে ময়ূরভঞ্জ ও কেউঝর এক রাজ্য ছিল। দূরবর্ত্তী ময়ূরভঞ্জ রাজধানীতে যাইয়া অভাব-অভিযোগ উত্থাপন করা কেউঝরবাসী কুকাদের বড়ই অসুবিধাজনক ছিল। তাহারা ময়ূরভঞ্জ রাজবংশীয় একটী বালককে অপহরণ করিয়া কেউঝরের নূতন সিংহাসনে স্থাপিত করে। সে সময়ে নবীন রাজার হাতী ঘোড়া, সাজসজ্জা কিছুই নাই। দুইজন কুকা হামাগুড়ি দিয়া হাতী ঘোড়া হইল। শিশুরাজা তাহাদের উপর চড়িয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। আর এক কুকা করিত অপরাধী রূপে সিংহাসনের সম্মুখে নতভাবে পতিত হইল। মহারাজ তাহার গলদেশে উন্মুক্ত তরবারি রাখিয়া দিলেন। ইহার অর্থ—অপরাধী কুকাকে বধ করিবার অধিকার রাজাকে প্রদত্ত হইল। এখনও নূতন রাজার সিংহাসনে আরোহণের সময় এইরূপ অভিনয় হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান বিদ্রোহের কারণ—মাসকাবনা জোর। নিজগড়ের বৈষম্য কোপে অযুক্ত পর্ব্বতশ্রেণী ভেদ করিয়া মাসকাবনা জোর প্রবাহিত। অধিত্যকাস্থিত কেউঝর গড় হইতে পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইবার পথে পূর্ব্বোক্ত জোর বা গিরিনদী উত্তীর্ণ হইতে হয়। পর্ব্বতপৃষ্ঠের অল্প অংশ কাটিয়া সমর কাটিয়া নদীর জল পূর্ব্বদিকের প্রান্তর ডুবাইয়া প্রবাহিত করিবার কল্পনা চলিতেছিল। কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া, জোরের মুখে বাঁধ দিয়া হ্রদে পরিণত করিবার প্রস্তাব করিয়া, আনুমানিক ব্যয় তের হাজার টাকা স্থির করিলাম। মহারাজা টাকার কথা শুনিয়া বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন।

যাই হউক, মহারাজার আদেশে অল্প ব্যয়ে কটক হইতে ইস্পাতের বড়-বড় সাবল আনীত হইলে, সুকাগণকে বেকারে আনিয়া খনন-কার্য্য চলিতে লাগিল। সহকারী ম্যানেজার বিচিত্রানন্দ বাবু ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইলেন। বিচিত্রানন্দ বাবু পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু বলিয়া শেষকার হইতে সহকারী ম্যানেজার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁর ইচ্ছা, বেকারগণও বিশেষরূপ পরিশ্রম করে। সুকাগণ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিরত প্রস্তর কাটিতেছে। মধ্যে কেবল আহারাদির জন্য দুই ঘণ্টার ছুটী পায়। কার্য্যে কোনরূপ অবহেলা করিলে প্রহার লাভ! বেকারগণ বাড়ী হইতে চাউল আনিয়া রন্ধন করিয়া খায়। যাহার ঘরে কিছুই নাই, সে বেচারী অনাহারে শুইয়া পড়ে। কে আবার তাহাদিগকে চাউল দিবে? নিতান্ত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া সুকারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে বরণী কটক হইতে আসিয়া আপনাকে 'মহারাণীর পুত্র' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিল।

সেদিন সভায় নিযুক্তি সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে নাই। অন্যান্য বিষয় আলোচিত হইবার পরে সভাভঙ্গ হইল। দ্বিতীয় দিবস সভার প্রারম্ভে উক্ত প্রসঙ্গ উঠিলে, অধিকাংশ সর্দ্দার প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিল। কিন্তু মহারাণী-পুত্র বরণীর রাজা-পালনের জন্য একজন সহকারী আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমাকে নিযুক্ত করিলেন। কেহ কোন কথা তুলিল না। বিশেষতঃ সে সময়ে সুকাগণ বরণীকে দেব-অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে। নিয়োগ-পত্রিকার উপর লিখিত হইল—"মহারাণী-পুত্র বরণীর সুকা"। প্রত্যেক কাগজে এইভাবে হাকর-কার্য্য চলিতে লাগিল। বরণীপদে নিযুক্ত হইবার পরে বেতনের বিষয় উত্থাপন করিলাম। বরণী আজ্ঞা প্রদান করিলেন—"কোন কর্ম্মচারী কোনরূপ বেতন পাইবে না; কিংবা কোনও প্রজাকে খাজনা দিতে হইবে না। আমার ও রাজ্য বিচার করিতে হইবে।" রাণী ও সর্দ্দারগণ যাহাতে সামান্য বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়া, মহারাজা কি রাজ-পরিবার সম্বন্ধে কোন কথার আলোচনা করিবার সময় না পায়, সেইজন্য আমি নানারূপ আপত্তি করিতে লাগিলাম; এবং স্পষ্টই বলিলাম, আমার ইচ্ছা থাকিলেও, বিনা বেতনে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারিব না। বহু প্রার্থনা ও বাদানুবাদের পরে বেতন স্বরূপ সাত 'মান' ভূমি নিষ্কর ভোগ করিবার অনুমতি পাইলাম।

রামের চাকরী

[শ্রীযশোদালাল তালুকদার]

রাম—ডাক-নাম। প্রকৃত নাম, পিতা-মাতা রাখিয়াছেন—শ্রীরামচন্দ্র। অদৃষ্ট-গুণে রামের সুনামও খুব। বোকা ও নির্ব্বোধ। যেহেতু সে সারাদিন গাধার ন্যায় খাটে, আর তাহার কথাবার্ত্তা সামঞ্জস্য-হীন। তাই, যে স্থানে যাইয়া রাম পা' ফেলে, সেখানকার লোকই তাহার কথাবার্ত্তায়, চালচলনে বুঝিয়া ফেলে যে, রাম একটী অপূর্ব্ব ধরণের কুকের জীব। তাই লোকে রামকে খাটাইয়া পয়সা দেয় না। রামও পাওনা পয়সার জন্য বড় একটা তাগিদ বা জুলুম করে না। যাহার ইচ্ছা হয় দাও—ইচ্ছা না হয় না দাও। তা'তে তাহার বড় আসে-যায় না। ইহার একটী কারণও ছিল—রামের সংসারে কেহ নাই। পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-ভগিনী, আত্মীয়-স্বজন—এ সংসারে 'আমার' বলিতে রামের কেহই ছিল না। কাজেই টাকা-কড়ির প্রতি রামের বড়-একটা টান নাই। সংসারে মাত্র তাহার এক উদর! সেই উদরটী, সে যেখানে পরিপূর্ণ করিতে পারে, সেখানেই রাম নির্ব্বিঘ্নে চাকরী করে। তবে চাকুরী গ্রহণের পূর্ব্বে, দেশাচার মত, মাসিক মাহিনার একটা কথাবার্ত্তা স্থির না করিয়া, রাম প্রাণান্তেও দাস-খত কাহাকেও লিখিয়া দেয় না। খোরাক ও মাহিনা বাবদে মাসিক ১৲ ২৲ বা ৩৲ টাকা—যাহা হয় একটা কথা বলিয়া লইয়া, পরে মাহিনা দাও বা না দাও—তাহাতে রামের কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু মাহিনার কথা থাকা চাই-ই চাই, নহিলে না কি রামের ইজ্জৎ থাকে না। লোকে তাহাকে বোকা বলে! কাজেই সে মাহিনা ঠিক করিয়া পরে দাস-খত লিখিয়া দেয়। রাম এভাবে চাকুরী করিতে-করিতে তাহার অর্দ্ধেক বয়স কাটাইয়া দিয়াছে। এখন তাহার শেষ অবস্থা, এ বয়সে কি আর সে নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে পারে? তাই সে পূর্ব্ব নিয়ম বজায় রাখিয়াই চাকুরী করে।

এ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া রাম কিন্তু একটী পয়সাও সঞ্চয় করিতে পারে নাই। সে মাহিনা যাহা পায় তাহা—হয় সে যে বাড়ীতে কার্য্য করে, সেই বাড়ীর কর্ত্তার ছেলে-মেয়েকেই যখনকার যা ভাল, কিংবা রামের প্রাণে যে জিনিস

মধুর ও প্রীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই আনিয়া দেয়, তাহাতেই বায় করে; অথবা কর্ত্তার অপরাপর ঝি-চাকর "রাঙ্গাদাদা, ভাই রামু" প্রভৃতি মিষ্ট সম্বোধন করিয়া, এবং অভাব-অভিযোগ জানাইয়া রামের যৎকিঞ্চিৎ মাহিনা আত্মসাৎ করিয়া থাকে। রাম মনে করে, যাহার সংসারে স্ত্রী-পুত্র পরিবার থাকে, তাহার টাকা উপার্জ্জন করা দরকার। সে হয় ত উপার্জ্জিত টাকা আনিয়া গিন্নির পায়ের কাছে ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল—বিনিময়ে গিন্নি একটু মিষ্টি হাসি হাসিল। উভয়েই যেমন খুসী। রামের ত আর সে হাসিরাশির আধার নেই। তবে সে কাহার জন্ত অর্থ-সঞ্চয় করিবে?

যাক্, আজ কয়দিন হইল রামের চাকুরী গিয়াছে। তাই সে চাকুরীর অন্বেষণে এবাড়ী-ওবাড়ী ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে; কিন্তু কাজ জুটিয়া উঠিতেছে না—যেহেতু সর্ব্বত্রই তাহার গুণের বিভা বিকাশিত। দিনের পর দিন যায়—রামের কার্য্য হয় না। রাম কিন্তু নাছোড়বান্দা। কার্য্যের জন্ত সে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছে। ধৈর্য্যশীলতা রামের একটা মহৎ গুণ। সে কোন কাজেই অধীর হয় না। আর "লেগে থাকলে মেগে খায় না"—এ নীতি, রাম আদরের সহিত অনুসরণ করিয়া থাকে। এ জন্ত সহজে সে কোন কাজ ত্যাগ করে না। কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় যখন কাজ গিয়াছে, তখন চেষ্টা-কিকির করিয়া আবার একটী যোগাড় করিতে হইবে ত! তাই সে বাড়ী-বাড়ী তন্ন-তন্ন করিয়া কার্য্যের উমেদারী করিতেছে। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে "কি রে রাম, আজও তোর কাজ জোটে নি?" রাম অমনি বলে, "কর্ত্তা মশায়, আমায় কি সকলে রাখ্‌তে পারে? জহুরী ছাড়া জহরতের কদর কে জানে বলুন? আমায় যিনি চিনবেন, তিনিই রাখবেন। রামের কাজ একদিন-না-একদিন হবেই মশায়, ভাবনা কি?"

ভাবনা থাক বা না থাক, অধ্যবসায়ের বল-স্বরূপ রাম অবশেষে মাতব্বর শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে 'আশ্রয়' লাভ করিল। খোরাক-পোষাক বাদে মাস-মাহিনা দুই টাকা। আজ আর রামের আনন্দের সীমা নাই। খোস-মেজাজে বাহাল-তবিয়তে সে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গেল।

রায় মহাশয়ের সংসারে অনেক কাজ। সে কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে, এমন চাকর তিনি খুঁজিয়া পান না। তাঁহার ভাগ্যবশে ঘুণাক্ষরে কৃপণকের মত যদিও কেহ তাঁহার হস্তগত হয়—তাঁহার অপরিসীম দয়া বরদাস্ত করিতে না পারিয়া, হাঁড়ি কাল না হইতেই, সে বেচারা পলাইয়া মুক্তি লাভ করে। রাত নাই, দিন নাই, সময় নাই, অসময় নাই, ঝড় নাই, বাদল নাই—তোমায় খাঁটিতেই হইবে! বেচারী না পলাইয়া কি ক'রে? যা'ক সে কথা।

নির্ব্বোধ রামেরও কিন্তু, কাজের মাত্রাটা বেশী কি কম, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। মাস-দুই পরেই সে দেখিল যে, কাজ প্রত্যহ তাহার শক্তি ছাপাইয়া উঠিতেছে। রায় মহাশয় রামের অক্লান্ত পরিশ্রমে সুখী; কিন্তু বৃদ্ধ বেচারার যে প্রাণান্ত, সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই! অরুণোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত রামের কাজ! কাজের শেষ নাই—তাহারও বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। অফুরন্ত কাজ—অবিশ্রান্ত পরিশ্রম। ফলে, কোন দিন হয় ত সে দুবেলা দুমুঠো ভাত মুখে দিবারও অবসর পায় না। রামের ধৈর্য্য প্রায় সীমা অতিক্রম করিয়া চলিল। একদিন সে ক্রোধে ফুলিতে-ফুলিতে কর্ত্তা মহাশয়ের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "কর্ত্তা মশায়, হয় আমার কাজ কমিয়ে দিন—না হয় অন্ত লোক দেখুন—আমি আর পারব না।" রায় মহাশয় পাকা লোক। বুঝিলেন, এ শুধু শরতের মেঘের গর্জ্জন—একটু 'মিষ্টি কথার' হাওয়াতেই আকাশ মেঘ-মুক্ত হইতে পারে। তাই অতি-বড় ভালমানুষের ন্যায় তিনি সস্নেহে, কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "তা, কাজ ত এমন বিশেষ কিছু নয়।" তবে তুমি বুড়ো মানুষ যখন বলছ—তখন কিছু কমিয়ে দেওয়া যাবে। সোণার মানুষ তুমি। বড় ভাল—মাটীর ন্যায় খাঁটী—একটু নড়ন-চড়ন নেই। তোমার কাজ না কমালে কি চলে? এ কি কথা!!"

কিন্তু দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া গেল,—রামের কাজ আর কমিল না। তাহার আশা-ভরসা নিরাশায় মগ্ন হইয়া গেল। সে আবার ভাবনায় পড়িল! আর একবার সে রায় মহাশয়কে বলিয়া দেখিবে স্থির করিল। বিমা আদেশেই খুব ভাল করিয়া এক কলিকা তামাক সাজিয়া লইয়া সে রায় মহাশয়ের সম্মুখে

উপনীত হইল। কলিকা-হস্ত রামকে দেখিয়াই রায় মহাশয় এক গাল হাসিয়া বলিলেন, "রাম! বেশ, বেশ! আরে এখন না হলে কি হয়! কলকেটা রেখে ধী করে কোচম্যানকে গাড়ী বুতে বলে এসো ত বাপু।"

রাম অমনি ছুটিল। আস্তাবল নিকটেই ছিল। কোচম্যানকে কর্ত্তার আদেশ জানাইয়াই, সে আবার আসিয়া কর্ত্তার সম্মুখে দাঁড়াইল। উদ্দেশ্য, তাহার মনোগত ভাব কর্ত্তার নিকট ব্যক্ত করিবে। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই আবার তাহার মনোরথ ব্যর্থ হইয়া গেল। তাহাকে সম্মুখীন দেখিয়াই কর্ত্তা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আরে! খুব ফীল্‌গির ত বলে' এলে। তা' ভালই হল। যাও ত বাপু, চট্ ক'রে ওস্তর থেকে আমার বাইরে যাবার কাপড়, জামা, জুতো নিয়ে এস ত।"

রাম আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, তড়িৎ-গতিতে যাইয়া কর্ত্তার আদিষ্ট কাপড় ইত্যাদি লইয়া আসিল। রামের সাহায্যে সেগুলি পরিধান করিয়া, বাবু গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন। বলি-বলি করিয়াও রামের বলা হইল না। উপরন্তু, যাইবার সময় কর্ত্তা তাহার ঘাড়ে কতকগুলি কাজের ভার চাপাইয়া দিয়া বলিয়া গেলেন, ফিরিয়া আসিয়া যেন তিনি সেগুলি সম্পন্ন দেখিতে পান।

বেলা তখন তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। রাম ক্ষুণ্ণমনে তাড়াতাড়ি কোন রকমে খানাহার সারিয়া লইয়া, কর্ত্তার আদিষ্ট কাজে মনোনিবেশ করিল। কর্ত্তা বাহির হইতে ফিরিলেই, তাহার কাজের একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইবে বলিয়া মনে-মনে বদ্ধপরিকর হইল। তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না; যন্ত্র-চালিত পুতুলের মত সে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। তাহার মন মুক্ত বিহঙ্গমের মত শান্তি-সুখের অন্বেষণে অনন্ত দেশ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ঘরের কর্ত্তা ঘরে ফিরিলেন। রাত্রি তখন দশটা। কর্ত্তা পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন; হুসিয়ার রাম তাই এক কলিকা তামাক সাজিয়া, আগুনে ফুঁ দিতে-দিতে কর্ত্তার নিকটে যাইয়া হাত বাড়াইয়া ধরিল। রামের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া রায় মহাশয় বলিলেন, "রাম, তোমার গুণের তারিফ করিতে হয়। আজকাল মনিবের প্রতি এমন দরদ কোন্ চাকরের আছে? বেশ-বেশ! তোমার ব্যবহারে আজ আমি বড় খুসী হয়েছি। বেঁচে থাক বাপু, বেঁচে থাক। তা' তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ত?"

রাম শির নত করিয়া করযোড়ে বলিল, "আরে মশায়, খাওয়া-দাওয়া চুলোয় যাক—কাজেরই শেষ নাই। উদয়াস্ত খেটে-খেটে হাড় কালি হ'য়ে গেল। না কর্ত্তাবাবু, আপনি লোক দেখুন। আমার এখন জিরুবার সময়—এ হাড়-ভাঙ্গা খাটুনী কি এখন আর আমার পোষায়?"

রায় মহাশয় যেন কিছুই জানেন না। রামের প্রতি যেন তাঁহার অসীম দয়া। ছলনাময় রায় মহাশয় স্নেহোচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিলেন, "তা' ঠিক কথা রাম। এত কাজ যে বুড়ো মানুষের পোষায় না, তা আমি বেশ বুঝি। তা' তুমি চিন্তা করো না। কালই আমি একটা ব্যবস্থা করে দেব। অনেক দিন থেকে একটা লোক খুঁজছি—কিন্তু পাচ্ছি না। পেলে আর তোমায় এত কাজ করতে হবে না। সে-ই সব করবে—তুমি দেখবে-শুনবে। তা' থাক্, কালই এর একটা বিহিত করব। এখন একটা কাজ কর ত। একবার দেখে এস, কোচম্যান বেটা গাড়ীখানা আস্তাবলে রাখলে কি না। আর আসবার সময় শোভা-বাজারের নরেন্দ্র বাবুকে বলে এসো, কাল সকালে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।"

কর্ত্তার কথা শুনিয়া রামের মনে আর আনন্দ ধরে না। অপরিসীম হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া রাম কর্ত্তার আদেশ পালন করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। কিন্তু দ্বার অতিক্রম না করিতেই, কর্ত্তা আবার তাহাকে পিছন হইতে ডাকিলেন। রাম ফিরিয়া দাঁড়াইল। কর্ত্তা কহিলেন, "দেখ, নরেন্দ্রবাবুর কাছে ত যাবেই—কিন্তু বলছিলুম কি—রাত্রিও প্রায় এগারটা বাজে—অথচ না গেলেও নয়—অফিসের কাজ—"

কর্ত্তাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া রাম বিপদ গণিল। বুঝিল—কর্ত্তা এখন যা' আদেশ করিবেন, তাহা পালন করা তাহার পক্ষে বড় সোজা হইবে না। ভয়ে তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।

এ সংসারে যাহারা শক্তিমান, তাহারা নিরীহের করুণ আবেদনে কখন কর্ণপাত করে না। কর্ত্তা অবিচলিত চিত্তে কহিলেন, "তোমায় এখন একবার বৌবাজার যেতে হবে—এটর্নীর বাড়ীতে। তাকে শুধু বলে আসবে, তার কথামত

কাল দুটার সময় আমি আপিসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবো।"

আদেশ শুনিয়া রামের ত চক্ষুস্থির! একবার বাহিরের দিকে চাহিল। দেখিল—চতুর্দ্দিক হিমাচ্ছন্ন। শীত-রজনীর এই হিম-জাল ভেদ করিয়া, সেই সুদূর বহুধারার যাইয়া, এটর্নী মহোদয়কে কর্ত্তার উদ্ভট আদেশ জ্ঞাপন করিয়া, আবার তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে! এ ঘুম-ধরা কাঁকরা পাঁজর-খানা টিঁকিবে ত? তাহার দীর্ঘ হৃদয় মথিত করিয়া একটা তীব্র দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া অনন্ত বাতাসে মিশিয়া গেল। সে তখন ধীরে-ধীরে বাটীর বাহির হইয়া পড়িল। রায় মহাশয় রামের বাধ্যতায় বড় আনন্দ অনুভব করিলেন। হাসিমুখে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া, গিন্নীর সহিত দু' চারিটা গল্প সল্প করিয়া শয়নে পদ্মনাভ করিলেন। তাঁহার নাসিকা-গর্জ্জনে ঘরটি মুখরিত হইয়া উঠিল। সময় বুঝিয়া কিও রামের ভাত কয়টা চাপা দিয়া রাখিয়া স্বীয় গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

পথক্লিষ্ট রাম যখন ফিরিয়া আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল—তখন পাশের বাড়ীর একটা ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। অনেক হাঁকাহাঁকির পর রাম গৃহে প্রবেশাধিকার লাভ করিল। সে রাত্রে আর তাহার খাওয়া হইল না। একটু শান্তি লাভের আশায় আর কালবিলম্ব না করিয়া, তাহার শত-ছিন্ন মলিন শয্যায় শয়ন করিয়া সে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

"রাম, রাম, ও রাম!"—ধাক্কা খাইয়া রাম ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চাহিল, চাহিয়া দেখিল—পূর্ব্বাকাশে তখনও উষার আলো ফুটিয়া উঠে নাই। কিন্তু রায় মহাশয় তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। রাম কহিল, "হরি হে!"

কর্ত্তা কহিলেন, "ওহে, শিগ্‌গির এক কড়া গরম জল কর ত। যে শীত!—ঠাণ্ডা জলে হাত পা ধুলে বরফের মত জমাট বেঁধে যাব। যাও-যাও, জলটা গরম কর—আমি এ ফাঁকে প্রাতঃকৃত্যটা সেরে আসি।"

দীর্ঘ একঘণ্টা কাল ধরিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, বাহিরে আসিয়া কর্ত্তা রামকে স্মরণ করিলেন। সদাশয় রাম তখন মাত্র গরম জল লইয়া উপস্থিত হইল। উষ্ণ জলে আরামের সহিত হস্ত-পদ-মুখ প্রক্ষালন করিয়া রায় মহাশয় পুনরায় অন্দরে প্রবেশ করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, রাত্রে ঘুম হয়নি—এখন একটু ঘুমুব—ঘুম থেকে উঠেই তোমার কাজের একটা ব্যবস্থা করবো—কোন চিন্তা করো না। সকালের কাজ কটা সেরে ফেল।"

বেলা প্রায় ১০টার সময় কর্ত্তা শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া রামকে ডাকিলেন। রাম তখন কি একটা কাজ করিতেছিল—কর্ত্তার গলার আওয়াজ শুনিয়া কাজ ফেলিয়া, কর্ত্তার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কর্ত্তা আদেশ করিলেন, "কুলন তেলের শিশিটা ও গামছাখানা নিয়ে এস ত—বেলা হয়ে গেছে—তাড়াতাড়ি স্নানাহ্নিকটা সেরে নি।" তেলও আসিল, গামছাও আসিল। কিন্তু তেল ত আর নিজে মর্দ্দন করিতে জানে না—তাহাকে মর্দ্দন করিতে হইলে একটা লোকের আবশ্যক। অগত্যা কর্ত্তার আদেশানুযায়ী রামই মর্দ্দন-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গেল। তৈলাভিষিক্ত রায় মহাশয় এক ঘণ্টা পরে স্নানপরবশ হইয়া বলিলেন, "থাক্—আর মাখাতে হবে না। হাতটা ধুয়ে আহ্নিকের আয়োজন করে রেখে—সামিটা নিয়ে যাও—যেখান থেকে হ'ক কিছু ফুল, তুলসী আর বিল্বপত্র নিয়ে এস।"

কর্ত্তার আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিতে রামের বড় বেশী বিলম্ব হইল না। কর্ত্তা স্নান সমাপনান্তে আহ্নিক করিতে আসনে উপবিষ্ট হইয়াই বলিলেন, "ঠাকুরকে হাত চালিয়ে রান্না সারতে বলে এস—আহ্নিক ক'রে উঠেই যেন আমি সব প্রস্তুত দেখতে পাই, বুঝলে?"

"আজ্ঞে" বলিয়া রাম রন্ধনশালাভিমুখে ছুটিল। ঠাকুরকে কর্ত্তার হুকুম জানাইয়া যেমন আসা, অমনি রায় মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "ছিঃ রাম, কি করেছ? ফুল-তুলসী এনেছ—অথচ চন্দন ঘষে রাখনি। এটা তোমার মস্ত ভুল। এস—এস—চট্ করে একটু চন্দন ঘষে দাও—এতক্ষণ আমার আহ্নিক হয়ে যেত।" রাম আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চন্দন ঘষিতে বসিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই কর্ত্তা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "সেদিন যে মিশ্রিটুকু এনেছিলে—তা' সব ফুরিয়ে গেছে। একবার যাও ত—নূতন বাজার, শিবুবেণের দোকান থেকে আমার হিসাবে খরচ লিখিয়ে আধপো মিশ্রি নিয়ে এস—আমি এ ফাঁকে আহ্নিকটা সেরে নি।"—কার্য্য-ছলের এ অপরূপ নিদর্শন দেখিয়া রামের রক্তহীন পাণ্ডুর মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু

তখনও একটা ক্ষীণ আশা হৃদয়ের মাঝে উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল। সেই আশার বুক বাঁধিয়া রাম শিবুবেণের দোকানে যাইয়া উপস্থিত হইল। আধপোয়া মিশ্রি লইয়া যখন সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল—কর্ত্তা তখন পূজার্চ্চনা শেষ করিয়া আহারে বসিয়াছেন। "রাম এসেছ?" "আজ্ঞে" বলিয়া রাম হুজুরে হাজির হইল। ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া রায় মহাশয় পাচক ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "দেখছো বে-আক্কেল বেটার কাজ? কতকগুলি মাথামুণ্ডু কি ছাইভস্ম রেঁধে রেখেছে! এ কি খাওয়া যায়! তুমি যাও ত—দৌড়ে কিছু খাবার নিয়ে এস। এ বেটাকে আমি আজই তাড়াচ্ছি।"

রামের অন্তরাত্মা জলিয়া গেল। বেলা প্রায় একটা বাজে। ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও একটু বিশ্রাম করিতে পায় নাই। কিন্তু বেদনা-ক্লিষ্ট হৃদয়ে খাবার আনিয়া সে কর্ত্তার সম্মুখে ধরিল। কর্ত্তা ধীরে-ধীরে সেগুলি গলাধঃকরণ করিয়া উদর পূর্ণ করিলেন। অতঃপর হাতমুখ ধৌত করিয়া, রামকে এক কলিকা তামাকু সাজিতে আদেশ দিয়া, পালঙ্কে যাইয়া শয়ন করিলেন।

রাম তামাকু সাজিয়া আনিয়া, আলবোলার নলটী রায় মহাশয়ের হাতে তুলিয়া দিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল। রায় মহাশয় অমনি বলিলেন, "ওহে, পাখাখানা দিয়ে যাও ত।"

রাম ফিরিয়া বলিল, "শীতের দিনে পাখা দিয়ে কি করবেন, বাবু?"

কর্ত্তা বলিলেন, "কি জানি কেন, আজ একটু গরম বোধ হচ্ছে। পাখাখানা দিয়ে একটু বাতাস কর।"

ক্রোধে রামের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। বেলা দু'টা বাজিতে চলিল—এক বিন্দু জলও সে এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই। সে বলিয়া ফেলিল, "কাল রাতে যে এটর্নীর বাড়ী বলে পাঠিয়েছিলেন, আজ দু'টোর সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন—কৈ গেলেন না?"

ঈষৎ হাসিয়া রায় মহাশয় বলিলেন, "তা' দুপুরটা বাদে গেলেও চলবে। বুড়ো মানুষ—খেয়ে দেয়ে একটু না ঘুমুলে কি চলে? তা' বাপু, একটু বাতাস কর—কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নি।"

পাখাখানা পালঙ্কের একপাশে রাখিয়া রাম শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "না বাবু, এই রৈল আপনার পাখা। বাবা! এই না কি কাজ কমান! নমস্কার বাবু। আজ হ'তে আমার ভোগের শেষ।"—এই বলিয়াই রাম বাটীর বাহির হইয়া গেল।

আর রাখে কে?

নারীর দাগাবাজী

[শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী]

যৌবনে পা দিতে দিতেই
'কাবি' রোগে ধরলে মোরে,
পাকা গিন্নি মা অমনি
বর আনলেন বাছাই ক'রে।
আমি মত্ত কাব্য নিয়ে,
তিনি পড়েন উপন্যাস;
জীবনটারে ভাবতাম তখন
আরব-রাতের ইতিহাস।
মুখোমুখি দুটি প্রাণী—
যেন একটী দ্বন্দ্ব-সমাস!
দুটি প্রাণের একটী তান—
যেন নিখুঁত অনুপ্রাস।
তবু দুনিয়া শুধুই মোদের!—
অংশীদারের কোথায় স্থান?
হঠাৎ একটী ফুলে বীরের
প্রেমের রাজ্যে অভিযান!
আমি ক্রমেই চটছি পাছে,
প্রিয়ার যতন নূতন আজ,
বুঝলেম,—প্রণয় ধোঁকার টাটী,
নারীর জাত দাগাবাজ!

মুখে মধু, হৃদয়ে বিষ—
নারীর প্রাণ মিছরীর ছুরী!
পড়ে না সে আপনি ফাঁদে,
পরের মনটী করে চুরি!
স্বপন ভেঙ্গে গেল যখন
হয়ে গেছে অনেক দেরী!
ভাঙ্গা প্রেমের বেড়া দিয়ে
দৈন্য নিলে কবে ঘেরি!
তাসের ঘরের মত হঠাৎ
চৌদহলা গেল উড়ে,
তিনটী প্রাণী করেম সার
ছিন্ন বাস, ভগ্ন কুঁড়ে!
ছেলের বাটী দুধ্ যোগাচ্ছি
গায়ের রক্ত ক'রে জল,
বাছার হাড়ে লাগে না মাস!
হত ভাগ্যের এম্‌নি বল!
বৈদ্যি দেখাই, তিনি বলেন,
স্বভাবতই ধাতুক্ষীণ,
আড়াল থেকে ফেল্‌লাম ধরে'
প্রিয়ার দাগাবাজী সেদিন।
সুধাই—"ওগো, দুধ্ খাও ত?"
"হাঁ" বলেন রোজ পরিপাটী!
মিথ্যা কথা!—ছেলেকেও জল
আমার দুধ্‌টী রাখ্‌তে বাঁটী!
ধরা পড়ে' অপরাধী
পালিয়ে যাবে যখন লাজে,
হাত দুখানি ধরে তাহার
ভরে' রাখ্‌লাম বুকের মাঝে।
দুধ্ না সুধা?—কি এ মহাভাব?
প্রাণের মাঝে এ কি প্রলয়!
সারা দেহ রোমাঞ্চিত,
চোকে খালিই ধারা বয়!
বল্লেম,—নারী, চাই না মুক্তি,
তোরাই মোদের গয়া-কাশী,
জনম-জনম দুনিয়া ভুলে'
তোরেই যেন ভালবাসি!

স্বপ্ন-মিলন

[শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য]

(১)

শশিশেখর সংস্কৃত-কলেজ হইতে সম্মানের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর, প্রতাপনগরের ভূতপূর্ব্ব জমিদার শ্রীযুক্ত মনোহরচন্দ্র রায় মহাশয়ের ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া প্রথমা কন্যা শ্রীমতী ঘনপ্রভা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। শশিশেখরের জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্রীমান্ চন্দ্রনাথকে মাত্র সেই বৎসরেই তাঁহার শ্বশুর-শ্বশ্রূ তাঁহাদের আদরের কন্যা ধীরাদেবীকে দান করিয়া গর্ভধাস ধরিয়া গৌরীদানের ফললাভ করিয়াছেন। সুতরাং বড় বধূমাতা হইতে গৃহ-স্বামীর কোনও কার্য্যে সাহায্য পাইবার আশা সম্প্রতি দুই-চারি বৎসর চন্দ্রনাথের মাতাঠাকুরাণী আদৌ করিতে পারেন নাই। এ কারণ তিনি এক্ষণে শশিশেখরের বিবাহ দিয়া একটী কর্ম্মপটু বয়স্থা বধূ গৃহে আনিতে মনন করিলেন। যেমন সঙ্কল্প অমনি কার্য্যে পরিণতি! চন্দ্র-নাথদের এক নিকট-কুটুম্বের সহিত মনোহর বাবুর বিশেষ পরিচয় ছিল; এবং তিনি কন্যার জন্য একটী সুপাত্র অন্বে-ষণের ভারও সেই কুটুম্বটীর উপর দিয়াছিলেন। শশিশেখর এক্ষণে তাঁহার চক্ষে সুপাত্র বলিয়া পরিগণিত হওয়ায়, তিনিই চন্দ্রনাথের মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া, আর ক্ষণমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া, "শুভস্য শীঘ্রং" এই মহাজন-বাক্য অনুসারে সেই জ্যৈষ্ঠেই ঘনপ্রভা ও শশিশেখরের শুভ-পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদন করাইয়া দিলেন।

চন্দ্রনাথরা দুই ভাই। চন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ, শশিশেখর

কনিষ্ঠ। ভ্রাতৃদ্বয় দেড় বৎসর হইল পিতৃহারা হইয়াছেন। সংসারে কর্ত্রী কোন অভাবই রাখিয়া যান নাই; দেখিয়া-শুনিয়া চলিতে পারিলে, উঁহাদের সংসার বেশ উত্তমরূপেই চলিয়া যায়। গিন্নী আজ দুইটী পুত্রবধূ গৃহে আনিয়া স্বর্গীয় কর্ত্তা মহাশয়ের বহুদিনের সাধ পূরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজের আশা মিটিল না। ছোটবউ ঘনপ্রভা বয়স্থা বটে, সুশীলা বটে, কষ্টসহিষ্ণু বটে, কিন্তু শিশুকাল হইতে আদর-যত্নে লালিত-পালিত হওয়ায়, অনভ্যাস হেতু কার্য্যদক্ষা নহেন। তাঁহাকে রন্ধন করিতে দিলে, কর্ত্রীকে সর্ব্বদাই নিকটে থাকিতে হয়; এমন কি, হয় ত হাঁড়িও উনন হইতে নামাইয়া দিতে হয়। আর রান্নাবান্না করা ও লোকজনকে খাইতে দেওয়া—এটা কর্ত্রী ঠাকুরাণীর বোধ করি পৈতৃক রোগ; এবং তাঁহাতে ঐ রোগটা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তাইয়াছিল। তাঁহার হেঁসেলে প্রতিদিনই অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ-সাতজনের অন্ন-ব্যঞ্জন উদ্বৃত্ত পড়িয়া থাকিত; যখন দেখিতেন যে আর কেহই সে অন্নগুলির সৎকার করিতে আসিল না, তখন তিনি প্রতিবেশী দুঃখীদিগকে ডাকিয়া,—অভাবে গাভীগুলির মুখেও গিয়া ধরিয়া দিতেন। এই নিমিত্ত স্বর্গীয় কর্ত্তা মহাশয়ের নিকট কতদিন কত অনুযোগও তিনি সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? যাহার যাহা স্বভাব, তাহা হুরপনেয়। কে না জানে যে, অগ্নিশিখাকে যতই অধোমুখে ধরা যাউক না কেন, তাহার শিখা ঊর্দ্ধমুখে উঠিবেই উঠিবে। কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সে রোগ আজিও সারে নাই। ঘনপ্রভা তাঁহার রন্ধনশালার কার্য্য কোনদিনই সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতে পারে নাই; কিংবা গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের ভোগান্তে মহাপ্রসাদ বিতরণও সুচারুরূপে করিতে পারে নাই। কোন দিন হয় ত এত অধিক পরিমাণে দান করিত যে, পরে যাহারা আসিত তাহাদের আর উদর-পূর্ত্তি হইত না; আবার কোনও দিন বা সোড়া হইতেই কষাকষি আরম্ভ করিয়া দিত। এই সব দেখিয়া-শুনিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণী একপ্রকার হতাশ হইয়া পড়িলেন; এবং ছোট বধূমাতা হইতে যে আর কখনও তাঁহার বিশেষ কিছু সাহায্য বা আসান হইবে না, তাহা বুঝিতে পারিয়া আর তাহাকে ততটা স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারিলেন না।

(২)

এইরূপে তিন-চারি বৎসর অতিবাহিত হইল। এক্ষণে বড়বধূ ধীরা স্বামিগৃহে আসিয়াছে। ধীরা যথার্থই ধীরা; সকল কার্য্যই শ্বশ্রূঠাকুরাণীর হস্ত হইতে তাড়াতাড়ি করিয়া কাড়িয়া লয়। সুতরাং কর্ত্রী ঠাকুরাণী এক্ষণে সংসারের কাজ সমাপ্ত করিয়া পারমার্থিক নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও যথেষ্ট অবকাশ পাইতে লাগিলেন। এইরূপে ধীরাদেবী ক্রমে-ক্রমে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর স্নেহ-রাজ্যের প্রায় সমগ্রাংশটুকুই অধিকার করিয়া বসিল। ঘনপ্রভার মর্ম্মে আঘাত লাগিল। ক্রমে ছোট বউএর অদৃষ্ট-গুণে চন্দ্রনাথও তাহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি সাদাসিধা লোক, অতশত ফের ফাঁপর বোঝেন না। একদিন মাতা ঠাকুরাণীর আহ্নিকের আসনখানি লইয়া যখন ঘনপ্রভা তাহার পিত্রালয় হইতে আগত তদীয় মাতুল কালীচরণ বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে বসিতে দিল, এবং সামিয়ানা পরিবেষণ করিল, তখন চন্দ্রনাথ তাহা দেখিয়া একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। একে ত সেই আসনখানি তাঁর মার জপের আসন; তার উপর আবার সেখানি ধীরার হাতের বোনা ও তার নাম লেখা। সেই আসন দিয়েছে মাছ-ভাত খাইতে বসিবার জন্য! আর যায় কোথা! তিনি সেই অতিথির সাক্ষাতেই ঘনপ্রভাকে দশ কথা শুনাইয়া দিতে ত্রুটি করিলেন না। তাতর হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর প্রতি এরূপ রূঢ় ব্যবহারে, ঘনপ্রভা যথার্থই মর্ম্মাহত হইয়া গেল। এরূপ বাক্য-যন্ত্রণা তাহার ভাগ্যে মধ্যে-মধ্যে ঘটিত বটে, কিন্তু আজ তাহার মাতুল মহাশয়ের সম্মুখে তাহা বড়ই দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। সে কাঁদিতে-কাঁদিতে তার মামাকে বলিল, "মামা, আমি রোজ-রোজ আর এ যাতনা সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না। অনেক সহ্য করেছি, এ হতভাগিনীর জন্যে আমার বাপ-পিতামো, এমন কি তোমাদিকে পর্য্যন্ত যে কত অখাদ্য, কত অবাচ্য, অশ্রাব্য নিবেদিত হয়েছে ও হচ্ছে তার অন্ত নাই। মামা, আমার আর এ মুখে কাজ নাই। তুমি বাবাকে ব'লো, তিনি যেন এই মাসেই এসে আমাকে নিয়ে যান; নইলে আমাকে আর তোমরা অধিক দিন জীবিত দেখ্‌তে পাবে না—এ কথা ঠিক জান্‌বে।"

"না, মা, ও কথা কি বল্‌তে আছে? আচ্ছা, বেশ,—আমি বাড়ী গিয়েই তোমার বাবাকে এ সব কথা বল্‌ব, আর তোমায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও কর্‌ব।"

(৩)

কালীচরণ বাঁড়ুয্যে ও সে দিন একরূপ কিছু না খাইয়াই বাড়ী ফিরিয়া গেলেন; এবং তৎক্ষণাৎ মনোহর বাবুকে ঘনপ্রভার শ্বশুরালয়ের কথা পল্লবাদি দ্বারা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিয়া দিলেন। কালীচরণের দিদি, ঘনর মাতা শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "আমি যে আমার মেয়েকে সুপাত্র দেখে দান করেছি গো! শেষে কি তার হাতে প'ড়ে বাছা আমার অপঘাতে প্রাণ হারাবে? হায়, হায়! আমার কপালে এতও লিখেছিলে বিধি!" পত্নীর কান্না দেখিয়া পত্নীবৎসল মনোহর বাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখনই উঠিয়া বলিলেন, "ট্রেণ কখন্? আমি এখনই ঘনাকে আন্‌তে যাব।" কালীচরণ বলিল, "তা এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ট্রেণের এখনও অনেক বিলম্ব আছে। বেলা ১১টার সময় হাটতলা ষ্টেশন হ'তে গাড়ী ছাড়ে। ততক্ষণ স্নানাহারটা ক'রে নিন, আর কি কথা ব'লে ঘনকে আন্‌তে হবে, তারও একটা যুক্তি করুন।"

ভ্রূকুটি করিয়া মনোহর বাবু বলিলেন, "যুক্তি আবার কি? আমার মেয়েকে অসহ্য কষ্ট দেয়, সে আত্মহত্যা কর্‌বে বলেছে, তাকে আর আমি সেখানে রাখব না—ব্যস্। এর আবার যুক্তি কি? আমি মেয়ের বিবাহই দিয়েছি—মেয়েকে ত সশ্রম কারাবাসে দিই নাই!"

"অত উতলা হবেন না বাবু! কেন, এই ত বেশ বল্‌বার পথ রয়েছে। শুন্‌ছি না কি আপনাদের ছোট বাবুর মেয়ে মনুর এই আগামী পরশু তারিখে বিয়ে। এই উপলক্ষ ক'রেই ত বেশ আন্‌বার কথা বলা যেতে পারে। কি বলিস্ দিদি?"

ভ্রাতার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দর্শনে ভগিনী ঈষৎ প্রীতি-গর্ব্বভরে গ্রীবাভঙ্গিপূর্ব্বক কহিলেন, "হাঁ, তা ত বটেই। তাই ব'লেই ত আন্‌তে হবে। কালীচরণ, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, তুমি শুদ্ধ যাও ওঁর সঙ্গে; গিয়ে ঘনকে আমার এনে দাও। বাছা আমার কত কষ্টই না পাচ্ছে! আমরা যে তাকে ভাল বিদ্বান্ পাত্র দেখে বিয়ে দিলাম। ভেবেছিলাম, সে সুখী হবে; কিন্তু অদৃষ্ট-দোষে যে সেও এমন বিগ্‌ড়ে যাবে, তা কি করে' জান্‌ব বল দেখি? যা হোক, তোমরা স্নান কর; আমি মাছের ঝোল-ভাত ক'টা রেঁধে দিই।"

স্নানাহার সমাপনান্তে শালা-ভগিনীপতিতে রেলওয়ে ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(৪)

এদিকে শশিশেখর বি-এ পাশ করিয়া সতানালা হাই-স্কুলের হেড-মাষ্টারি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সতানালা খুব বড় না হইলেও, মধ্যম গোছের সহর। শশিশেখর কি জানি কি মনে করিয়া, পরিবারকে নিজের নিকটে সতানালায় কখনও আনিতেন না; ঘনপ্রভাকে তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর কাছেই রাখিতেন। ছুটীর সময় এবং বিশেষ প্রয়োজন হইলেই শশিশেখর বাড়ী যাইতেন। অধিকন্তু তিনি এম-এ পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হইতেছিলেন বলিয়া, বড় একটা অন্য কোথাও যাইতেন না। কারণ, সতানালায় তাঁহার অধ্যয়নের যথেষ্ট সুবিধা হইত। বাড়ীতে থেকা হইলে, ঘনপ্রভা মধ্যে-মধ্যে তাহাকে কর্ম্মস্থলে লইয়া যাইবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিত। কিন্তু মাতাঠাকুরাণী এ বিষয়ে শশিশেখরকে কিছু না বলায়, তিনি স্ত্রীর সে কথা গ্রাহ্যই করিতেন না। তিনি বলিতেন, "এখন আমার পড়া-শুনার সময়,—এখন তোমার বাসায় গিয়ে কাজ নেই। বিশেষ, তোমার শরীরও ভাল নেই। এখানেই থাক—প্রাণ দিয়ে মায়ের সেবা কর, তা হ'লেই আমি খুব সুখী হব।"

সেদিন শয়নকক্ষে নানা কথাবার্ত্তার পর শশিশেখর পত্নীর মৃণালকোমল বাহুযুগল ধারণপূর্ব্বক স্কন্ধদ্বয় হইতে তাহার মুখপদ্মখানি উত্তোলন করিয়া স্বকীয় ওষ্ঠপুটে স্থাপন করিতে গিয়া দেখিলেন যে, সে নীল কমল সহসা কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন এবং নীহার-বিমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। করস্পর্শে বিচলিত হওয়াতেই যেন সেই নীহার-বারি ঝর্‌ঝর্-ধারে বিগলিত হইয়া শশিশেখরের বক্ষ সিক্ত করিয়া ফেলিল। শশিশেখর সে অশ্রুর উষ্ণতা অনুভব করিয়া বুঝিলেন যে, উহা তাঁহাদের দাম্পত্য প্রণয়ের ফলস্বরূপ কন্যা সতিরই সদ্যোবিয়োগজনিত শোকাশ্রু। মাত্র এই তিনমাস পূর্ব্বে ঘনপ্রভা যে ললিতার মুখ দেখিয়া শশিশেখরের বিরহ দুঃখ ভুলিয়া যাইয়া এক অপূর্ব্ব বাৎসল্য

স্নেহে মগ্ন হইয়া রহিত, তাহাকে—সেই প্রাণপুত্তলি কন্যাকে যে সে নিজে হাতে তুলিয়া দুরন্ত কালের কবলে নিক্ষেপ করিয়াছে—এ দুঃখ যে যাবার নয়! তাই আজ শশিশেখরকে পাইয়া, লতিকে লইয়া তখন যে আনন্দ-কোলাহল দম্পতীর মধ্যে উপস্থিত হইত, তাহাই স্মরণ-পথে উদিত হওয়ায়, আজ ঘনর নয়ন ফাটিয়া হৃদয়ের আবেগ বিগলিত হইয়া বহির্গত হইতেছে। উভয়েই নীরবে অনেক অশ্রু মোচন করিবার পর শশিশেখর পত্নীকে সান্ত্বনা করিলেন; বলিলেন, "দেখ ঘন, তুমি যদি অমন করে খালি গুমরে গুমরে কাঁদ, আর ভেবে ভেবে দেহ কালি করে ফেল ত আমি আর এখানে আস্‌ব না, আমি সেই সতানালাতেই বাকী জীবনটা অজ্ঞাতবাসেই কাটিয়ে দেব। এও যে তাঁরই দান! ভিখারীকে আবার দান বেছে নিতে আছে? যা দেবেন তিনি, তাই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ কর্‌তে হবে। নৈলে কি দাতা ভালবাসে? বুঝলে প্রভা, তাই বলি কেঁদো না।"

"আমি আর কখ্‌খন কাঁদ্‌ব না, খালি আমাকে তোমার চরণসেবার অধিকার আর অবসরটুকু দাও। তুমি যেখানে থাক, এ দাসীকে তোমার নিকটে রাখ। আমি আর কোন সুখ চাই না, কেবল তোমার সব কাজগুলি আমি করে দিই—এই এক আকাঙ্ক্ষা। আমার এ বাঞ্ছাটি পূর্ণ কর্‌বে না? বল, তা হলে আমি কোন দুঃখকে দুঃখ মানি না। যদি অধিক দিন না রাখ, দিন কয়েকের জন্য আমায় তোমার কাছছাড়া ক'র না।" এই বলিয়া স্বামীর দুটি পায়ে মাথা নোয়াইল।

শশিশেখর কন্যা-শোকাতুরা ঘনপ্রভাকে বুকের নিকট টানিয়া তুলিয়া তাহার বেপমান আরক্তিম অধরে স্বীয় অধর সংশ্লিষ্ট করিয়া দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তাই হবে, আমি মায়ের অনুমতি লইয়া সে ব্যবস্থা করিব।"

পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনের পরদিন অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া ঘনপ্রভা বাসি পা'ট সমাধা করিয়া স্নান করিয়া আসিল। আসিয়া আপন মনেই প্রফুল্লচিত্তে ঠাকুর-মন্দির ধৌত ও পরিষ্কৃত করিয়া, শ্বশ্রূঠাকুরাণীর আহ্নিক-পূজার নিমিত্ত মন্দির-সংলগ্ন পুষ্পবাটিকা হইতে দূর্ব্বা, তুলসী, পুষ্পাদি চয়ন করতঃ পুষ্পভাজন পরিপূর্ণ করিয়া যথাস্থানে রক্ষা করিল। মনে ভাবিতেছে—শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণী না জানি আমার উপর আজ কতই সন্তুষ্ট হইবেন!

স্নান করিয়া শ্বশ্রূ সর্ব্বমঙ্গলাদেবী ঠাকুর-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, পূজার আয়োজনাদি করিয়া দিয়া, নিজের আহ্নিকের জন্য আসন পুষ্পপাত্র প্রভৃতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার চির-নির্দ্দিষ্ট কোণটীতে গিয়া বসিয়া, পুষ্পপূর্ণ সাজি হইতে ফুলগুলি লইয়া পুষ্পপাত্রে রাখিতেছেন, এমন সময় যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার আপাদ-মস্তক রাগে জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার আহ্নিকের ফুলের সঙ্গে এ কি রহিয়াছে! সর্ব্বনাশ! এ যে রক্তজবা! এ্যাঁ! আবার ত্রিপত্রও রহিয়াছে! এখন উপায়? কর্ত্রী-ঠাকুরাণী সংকল্প করিয়া আসনে বসিয়াছেন; এখন উঠেনই বা কি প্রকারে! অথচ তাঁহার উপাস্য দেবতা শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনজীউর শ্রীচরণকমলে কেমন করিয়াই বা সেই রক্তজবা ত্রিপত্র-সংশ্লিষ্ট পুষ্প-তুলসীর অঞ্জলি প্রদান করেন? মহা সমস্যায় পতিত হইয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী উপায়ান্তর না দেখিয়া ডাকিলেন, "বউমা'রা কে আছ গো? একবার শুনে যাও ত মা!"

ঘনপ্রভা আজ উৎকর্ণ হইয়া আছে। কখন্ শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণী আহ্লাদিত হইয়া তাহার প্রশংসা করিবেন, আশীর্ব্বাদ করিবেন—এই চিন্তাই তাহার মনে সতত বিরাজ করিতেছে। ডাক শুনিয়া ঘনপ্রভা তাড়াতাড়ি মন্দির-দ্বারে গিয়া "কি বল্‌ছেন মা, আমায় ডাক্‌ছেন?"—এই বলিয়া জিজ্ঞাসু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কর্ত্রী একেই ত যুগলমন্ত্রের উপাসিকা, যুগলমন্ত্রে দীক্ষিতা; তার উপর আবার পরম নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব আচার্য্য-প্রভুর বংশের দুহিতা। পুত্রবধূর এই অনাচার-দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধা ও রুষ্টা হইয়া তিনি কহিলেন, "বলি, আমার মাথা খেতে আজ কোন্ আবাগীর বেটী, কোন্ বুনো সাঁওতালের বেটী আমার আহ্নিকের জন্য ফুল তুলে রেখে দিয়েছে, বল ত?"

ঘনপ্রভা বিস্ময়চকিত নেত্রযুগল স্থির করিয়া কহিল, "কেন মা, কি হয়েছে তা'তে মা! আমিই ত সকাল বেলায় উঠে, শুচি হ'য়ে, কত যত্ন ক'রে সমস্ত ফুলগুলি একটী-একটী ক'রে তুলে, আপনার সাজি ভ'রে রেখে দিয়েছি। আপনি মালা গেঁথে ঐ যুগলমূর্ত্তির গলায় দিতে ভালবাসেন ব'লে, ঐ দেখুন, আমি তিনগাছি ধূই ফুলের মালা গেঁথে রেখেছি—তার মাঝে-মাঝে এক-একটা ক'রে বড়

লাল জবা পরিয়ে দিয়েছি। ঐ কাল গায়ে কেমন মানাবে!"

"আর মরুক্ তোমার মানান! এত বড় মাগী হ'লে বাছা, তা তোমার ঘটে এ বুদ্ধিটুকু নেই যে, লাল জবাফুল, কি ঐ তে-ফেংড়া পাতাগুলো শ্রীপাদপদ্মে দিতে নাই? এ কি তোমার বাপের বাড়ীর সেই ধাঁড়াধরা নেংটা ঠাকুর—গা-ময় ঘুন-খারাপির দাগ—যে, যা মন যাবে তাই দেবে, আর তিনিও তাই নেবেন! খবরদার বল্‌ছি, তুমি আর আমার এ-সব কোন কাজেই হাত দিও না—আমার ইহকাল-পরকাল—দুইকালের পথেই কাঁটা দিও না। যদি কখন রাধারাণীর কৃপায় মদনমোহনের চরণে তোমার কিঞ্চিৎ প্রেম-ভক্তির উদয় হয়, তখন আবার এ সকল কাজ করিও, নতুবা নয়। হরি হে পাতকিপাবন, দয়াময়, এ অধীনের অপরাধ নিও না ঠাকুর! আর ঐ অজ্ঞানের পাপ মাফ কর—ওর সুমতি দাও—তোমার ঐ রাঙা চরণে ওর রতি-মতি দাও।"

"হাঁ, মা, তবে এখন কি হবে মা, কি কর্‌বো?"

"যাও, ঈগ্‌গির ক'রে গাছ থেকে গোটাকতক ধুঁই, বেলফুল তুলে আন। আজকের মত তুমিই নিয়ে এস, আমি আর আসন হ'তে উঠ্‌ব না।"

সেদিন ফুলগাছগুলিতে আর একটি ফুলও ফুটিয়া ছিল না। ঘনপ্রভার পুষ্পচয়নের পরেও যে দুই চারিটি ফুল গাছে-গাছে অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ও-পাড়ার লাবু আসিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। ঘনপ্রভা ভীতিকম্পিত-পদে গিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে জানাইল যে, পুষ্পবীথিকা একেবারে পুষ্পহীন। তখন কর্ত্রী অধিকতর উচ্চগ্রামে সুর তুলিয়া ঘনপ্রভার মাতা-পিতার ও তাঁহাদের বংশের কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেরই উদ্দেশে যথেষ্ট পরিমাণে সুধাস্তব বন্দোবস্ত করিতেছেন, এমন সময় শশিশেখর কলার পাতার ঠোঙ্গা করিয়া একঠোঙ্গা চাঁপাফুল এক হাতে, আর এক হাতে কয়েকটি শতদল লইয়া, ঠাকুর-ঘরের দরজায় আসিয়া বলিলেন, "কি হ'য়েছে মা? তোমার আহ্নিক কি হ'য়ে গেল? আজ যে চম্পক-চতুর্দ্দশী; তাইতে ঐ চণ্ডীমণ্ডপের উঠোনের চাঁপাগাছটা থেকে এই ফুলগুলো নিয়ে এলাম যে মা, এই নেও। তোমার ঠাকুরকে বেশ ক'রে সাজিয়ে দেও। আর এই পদ্মগুলো জগো দাদা আমাকে দিয়ে বল্লে, 'দাদাঠাকুর গো, এই ফুলগুলো নাও ত। ঐ কোণার গাবার ফুটেছিল, তোমাদের ঠাকুরের আটোনে বেশ মানাবে। আমি ওখুনি পেসাদ পেতে এসে দেখ্‌ব বেশ, দাদাঠাকুর'!"

কর্ত্রীঠাকুরাণী পুত্রের আগ্রহাতিশয্য-দর্শনেই হউক, কিংবা বাৎসল্যবশতঃই হউক, তৎক্ষণাৎ নরম হইয়া স্মিত-মুখে কহিলেন, "হ্যাঁরে, জগোর ছেলে হরিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে প্রসাদ খেতে আস্‌তে বলেছিস্ ত?"

"না মা, তা ত আমি জানি না। তা' আমি ব'লে আস্‌বো?"

"না,—না, তা আর তোকে অতদূর এখন যেতে হবে না। কিন্তু তোর তখনই বলা উচিত ছিল। যাক্, সে এলে তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেই হবে। আর এক কথা—এই যে, চাঁপা-ফুলগুলি গাছে উঠে পেড়ে আন্‌লি—তা চম্পক-চতুর্দ্দশী হ'লো ত আমার রাধাগোবিন্দের কি? সে ত শিবের পর্ব্ব! এই জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে চাঁপাফুল দিয়ে যে শিবের অর্চ্চনা করে, তার শিবলোক-প্রাপ্তি হয়—এই ত তোর তন্ত্র-পুরাণকর্ত্তারা বলেন। তা নইলে আর ছোট-বউমা আমার এমন সৃষ্টিছাড়া সর্ব্বনেশে কাজ করে? যেমন দেবার বুদ্ধি, দেবীও তাই। এ বাবা বিধাতার নির্ব্বন্ধ! তিনি ঠিক যোগো যোগোই যোজনা করেন।"

"কেন মা, কি হ'ল মা!"

"কিছুই হয় নি বাছা, যা আর জ্বালাস্‌নে। যে ঐ পদ্ম ক'টা। আর ও চাঁপার ঠোঙাটাও দিয়ে যা,—হরকে বল্‌ব পদ্মফুলের মাঝে-মাঝে এক-একটা ক'রে সাজিয়ে দেবে এখন। যা, আমি মন্ত্র-সোঞ্চরণটা ক'রে নিই।"

শশিশেখর মাতার ভাব দেখিয়া আর কথা কহিতে সাহস করিলেন না। পুষ্প-পাত্রটি মাতার পার্শ্বে নামাইয়া দিয়া, বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

ভিতর-বাটীতে প্রবেশ করিয়াই শশিশেখর, রান্নাঘরের রোয়াকের উপর রবিকর-পরিম্লান স্থলপদ্মটির মত ম্লানবদনে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় ঘনপ্রভা উপবিষ্ট রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন। পত্নীকে একাকিনী ওরূপ বিমর্ষভাবে অবস্থিত দেখিয়া, শশিশেখর নিঃশব্দ পদক্ষেপে তাহার পার্শ্বদেশে গমনপূর্ব্বক, সহসা ঘনপ্রভার দাড়াবর্ণত চিবুক স্পর্শ করিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরাতে, সে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের

ভায় চমকিত হইয়া উঠিল। এবং মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শশিশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েছে খুকু তোমার? আর মাকেই বা আজ এরূপ বিরূপ দেখ্‌লাম কেন?"

"দেখ, আমার এই অদৃষ্টের দোষেই তোমাদের যত কিছু ভাবান্তর ঘট্‌ছে। আমি ভাল ব'লেই তোমার নিজ হাতে লাগান ঐ জবাগাছটা থেকে ভাল-ভাল জবার ফুলগুলি ও আর আর সমস্ত ফুল তুলে, সাজিটি ভ'রে মায়ের আহ্নিকের জন্য রেখে দিলাম; কিন্তু হ'তে হ'য়ে দাঁড়া'ল বিপরীত। মা ত সেই জবা আর বিল্বপত্তর দেখে একেবারে আগুন! আমাকে ডেকে আমার ও আমার বাপ-মায়ের বংশের কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেরই বিশেষ আপ্যায়ন কর্‌লেন। আমি ত আর এত জানি না যে মা আমাদের ঘোর গোঁড়া বৈরিগির ঘরের মেয়ে। তা হ'লে আর কি আমি তাঁর আহ্নিকের ফুলে বেলপাতা ঠেকাই, না জবা মিশিয়ে রাখি? কি কর্‌ব বল দেখি? আমি ভাব্‌লাম এক, হ'ল আর। এ-সব আমার পোড়া অদৃষ্ট বই আর কারও দোষ নয়—তা আমি এখন বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি।" এই বলিয়া মনপ্রভা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বামীর দিক্ হইতে তাহার ছলছল নেত্রদ্বয় ফিরাইয়া লইল।

শুনিয়া শশিশেখর স্মিতাস্যে কহিলেন, "তা এতে দোষ তোমারও নাই, মায়েরও নাই। মা আমার অতিরিক্ত নৈষ্ঠিক আর তুমিও মুগ্ধা। নইলে মা কি আর জানেন না যে জগদম্বার পদে জবাঞ্জলি দিলে সে দান শিবই বুক পেতে নেন? আর হরিহর যে মূলে এক, প্রত্যয় মাত্র পৃথক। সুতরাং জবা যে কৃষ্ণ-কালীরূপধারী শ্রীহরির অপ্রিয় নয় তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। তবে যে মা ও-টুকু করেন সে কেবল আমাদি'কে—মূঢ়দি'কে নিষ্ঠা শিক্ষা দিবার জন্য। এতে যদি দোষ কিছু থাকে ত সে বিষ্ণুমায়ারই। কেননা—

'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'॥"

(বারান্তরে সমাপ্য)

আলোচনা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

বাঙ্গালা সাহিত্য ক্রমশঃ যে বিশ্বসাহিত্যে নিজের স্থান ধীরে ধীরে অধিকার করিতেছে, ইহা শুনিয়া, আশা করি, বাঙ্গালা সাহিত্যিক মাত্রেই আনন্দিত হইবেন। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচনাগুলির অনুবাদ হইয়াছে; এবং তাহা ক্রমশঃ বিশ্বসাহিত্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—এই সংবাদ বোধ হয় বাঙ্গালী পাঠকগণের এখন অগোচর নাই। 'ভারতবর্ষে'র অন্যতম প্রধান লেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দুইখানি পুস্তক সম্বন্ধে লণ্ডন টাইম্‌সের Literary Supplement-এর ১৯১৮ অব্দের ১১ই জুলাই তারিখের সংখ্যায় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। শুনিতেছি, ঐ দুইখানি পুস্তক ইংরেজী ভাষায় অনূদিতও হইতেছে। এই ইংরেজী অংশটুকুর বাঙ্গালা অনুবাদ দিতে পারিলাম না, ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। মোটকথা, টাইম্‌সের সমালোচক মহাশয় পুস্তক দুইখানির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন:—

"A NEW BENGALI WRITER."

VINDUR CHELE. By SARAT CHANDRA CHATTERJEE. (Calcutta: Gurudas Chatterjee. Ir. 8 annas net.)

MEJ DIDI. By SARAT CHANDRA CHATTERJEE. (Calcutta: Gurudas Chatterjee. Ir. 4 annas net).

Our publicists discourse with a disquieting audacity of India at large, just as, we fear, our Indian fellow-subjects lump all Europeans together, probably with dismal conviction that, so far as they are concerned, Turks, Germans, Englishmen and Frenchmen are all "white men," and therefore uncomprehending, unintelligent, intolerant creatures. There is, let us admit, some slight ground

for this rash conclusion. Only the other day, in an admirably written article in *Blackwood's Magazine*, entitled "Top-Hat or Turban," "Zeres" committed himself to the following sweeping statement :—"With one solitary exception—and the exception is, of course, Sir Rabindranath Tagore—the *intelligenzia* of modern India have added not one jot or one tittle to the ancient treasures of the country's culture in the realms of literature, scholarship, art, or architecture." Such an assertion as to the literature of any one country would be paradoxical and improbable. Applied to the literature of what is in fact a continent, it can only distress those who know something of contemporary intellectual life in one or other of the Indian provinces. Of Indian art, pictorial or plastic, let others speak. Yet we may be mildly surprised that one who knows India so well as "Zeres" evidently does should be unaware of the interesting paintings (he is, of course, free to like or detest them) of, say, Avanindranath Tagore and Nandalal Bose. But of the Bengali language and literature (and Sir Rabindranath Tagore, after all, is a Bengali) "Zeres" is evidently quite ignorant. That were no shame to him if he had not rashly glorified the author of "Gitanjali" at the expense of predecessors to whom the poet owes much and of contemporaries who, in their own language, are his not unworthy rivals.

Another Anglo-Indian once, in his haste, wrote that "Bengali unites the mellifluousness of Italian with the power possessed by German of rendering complex ideas" : and this generous estimate has been copied into many school handbooks of Bengali literature. Bengali, well spoken, is pleasant to the ear, and it inherits from Sanskrit a copious supply of compound words which, to a Frenchman or an Englishman, may have a Teutonic aspect. But the really characteristic and surprising quality of Bengali speech is its remarkable resemblance to French, and, above all, its phrasal *accent de durée*, on which its metre, like that of French verse, is based. Oddly enough, not only has the Bengali language something of a Gallic intonation and syntax, not only are many Bengali idioms singularly parallel to French idioms, but there is something in the Bengali literary genius which Frenchmen are perhaps better capable of understanding than we are. Has "Zeres" ever heard that when his favourite Sir Rabindranath won the Nobel prize French journalists inquired eagerly from what part of Jewry came "le rabbin Dranath"? That was before M. Jules Bloch began his course of lectures on Bengali at the E'cole des langues vivantes orientales. Bengalis themselves seem to have a dim suspicion that they have some affinities with our gallant Allies. Was it the Bengalis of French Chandernagere who put about the rumour that Rabindranath's short stories were similar if not superior to those of Guy de Maupassant? The comparison was an inept one, for in Rabindranath's work there is neither the cruel observation, the pessimistic sadness, nor the Rabelaisian humour of Maupassant. Rabindranath's genius is essentially poetical, not to say sentimental, and his art consists in finding exquisitely fit expression for a somewhat sensuous optimism. His short stories are better than the English versions of them ("by various hands") would lead us to suppose. They are marvels of delicate style in the original and have been rendered into English which makes little claim to beauty and distinction. And even in the original Tagore is not seen at his best in his Short Stories.

There has, however, recently arisen a young Bengali writer of stories for whom we may with some confidence already claim parity with Guy de Maupassant. He lacks, fortunately for him, the morbid preoccupation with sex of the Frenchman. His knowledge of the ways and thoughts and language of women and children, his power of transferring these vividly to the printed page, are such as are rare indeed in any country. In India, and especially in the great "joint-family" residences of Bengal, swarming with women of all ages and babes of all sizes, there is a form of speech appropriated to women's needs, which Mr. Kipling somewhere describes as *choti boli*, the "little language." Of this Mr. Chatterjee is an admirable master, to an extent indeed not yet attained, we believe, by any other Indian writer. For those

who read dictionary at elbow, his transcripts of homely revealing conversations in the *zenana* are subjects for despairing admiration. Yet what a significant glimpse they permit into the more recondite features of social life in modern Bengal. Mr. Chatterjee is much too true an artist to allow his gift of kindly yet scrupulously accurate observation to be distracted by social or political prejudice. He is, we gather, on the whole inclined towards a sane conservatism ; he remains a Hindu at heart in a country whose whole civilization is based on Hindu culture. He has, we dimly suspect, his doubts as to the wisdom and working of Europeanized versions of the old religion and the old customs. But he is so keen and amused a spectator of the life about him, whether in cosmopolitan Calcutta or in somnolent little villages buried in dense verdure among the sunny rice-fields, that it is not without doubts and diffidence that we attribute to him a tendency to praise past times and comfortable old conventions.

In the two little volumes before us are, in all, six admirable short stories, which should be read and re-read by every one whom official duty or private inclination calls to a just comprehension of Bengali mentality, a right sympathy with the best side of Bengali social life. Here are adorable naughty children (always boys, somehow) whom any healthy English mother would love. Here is a remarkable picture-gallery of the women of Bengal, some gently pious, yet bold in the defence of the humble and oppressed : some termagants or pretentious humbugs, such as would have delighted the creator of Philamante or Bélise. All these are depicted with unflagging vigour and vivacity. It is pleasant, too, to find that, even where the purdah still hangs between male and female, women are quite conscious of their own natural powers and manage their menkind with a sometimes charming, sometimes appalling, determination. There are Chrysales, it seems, in modern Bengal as in the France of Louis XIV. ; and, above all, there are humble Martines for whom we can feel an amused admiration. In the story headed "Andhare Alo," ("light in darkness") is a masterly and pathetic sketch of a beautiful nautch-girl. The tale is told so delicately and with such deep comprehension of the feminine mind that it would be a shame to spoil it by an attempt to summarize its incidents. Edmund White would have admired this singularly intimate picture of the mental workings of one who is named (like the heroine of one of the best of White' novels) Bijli the Dancer.

It may be doubted whether Mr. Chatterjee's tales can be adequately rendered into English, and therefore, perhaps, some apology is due to English readers who may never come across any of the work of this talented young Bengali. Yet it is well that the British elector should know, if only at second-hand, that in one Indian province at least exists a literature as copious, as varied, as full of hope and promise as that of any Western nation. English readers have heard of Sir Rabindranath because, being that rarest of things, a true biglot, he has been able to put his singularly accomplished and varied verse forms into a fairly adequate English prose rendering. He is not, of course he is not, a *rara avis* in Bengali, much less in Indian literature. To suppose such a thing is to misunderstand the nature of literary evolution —to think of literary eminence as an isolated, a volcanic, fact, like the Puy de Dôme or Fusiyama. Tagore is one of the greatest of Bengali authors, as Mont Blanc is one of the greatest of mountains. But his is not a solitary height, as he would be one of the first to protest. Mr. Chatterjee's tales, let us add in conclusion, have more than a literary merit. His is not predominantly a satirical temperament. Yet his keen and courageous picture of Hindu life may well be recommended to those who hold that political remedies can be provided for social sores. It may be that his wise and witty comprehension of the life about him is itself a symptom, and that "il est moral comme l'expérience." There is in him, at times, a touch of discouragement and sadness ; but that reminds us once more of Alfred de Musset's wise and penetrating lines on

> Cette mâle gaieté, si triste et si profonde,
> Que, quand on vient d'en rire, on devrait en pleurer.

It is of excellent omen that Mr. Chatterjee's art has received such instant and wide appreciation in his own country. Let us hope that in other Indian provinces there are rising authors as keenly observant and gifted with a like faculty of easy and natural expression. When all is said, it is rather by intellectual effort than by political agitation that Indians will win for themselves the place they claim in the great society of nations—a place for which their share in our own Imperial responsibilities will in due course fit them if they have the wit and wisdom to comprehend and use rightly that "policy of association" which is the watchword of the French administration of what Frenchmen prefer to call "colonies"—intellectual colonies of the French spirit—rather than, in our more dubious phrase, "dependenceis."

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, "বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস লিমিটেড" এবার উক্ত কলের অংশীদিগকে প্রতি অংশে ১০ টাকা, অর্থাৎ শতকরা বার্ষিক ২০ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দিয়াছেন। ১৯১৮ অব্দের ৩০শে জুন যে অর্দ্ধ বর্ষ শেষ হইয়াছে, সেই সময়ের রিপোর্টে এই শুভ সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। ইহা অতি আনন্দের, অত্যন্ত আশার কথা। রিপোর্টে দেখা যাইতেছে, ১৯১৮ অব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয়মাসে 'মোট' লাভ হইয়াছে ৬২০২৫৩।০ পাই। তাহা হইতে দীমা, টাক্স, সুদ প্রভৃতি বাবদে খরচ বাদ দিয়া 'নেট' লাভ দাঁড়াইয়াছে ৪৪০৭৫৩।২ পাই। ইহার মধ্য হইতে depreciation হিসাবে ৩০০০০ টাকা খরচ ধরা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ৪২০৭৩৩।২ পাইয়ের মধ্যে ৩৪২৯০৩।২ পাই রিজার্ভ ফণ্ডে জমা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ১৭৭৮০ টাকা অংশিগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। এত দিনে যে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের অংশীরা লাভের টাকা ঘরে তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাতে কোন বাঙ্গালী আনন্দিত না হইবেন? বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল আমাদের ছই দশটা নাই। ইহা আমাদের নবে ধন নীলমণি! স্বদেশীর পুণ্যপ্রতিষ্ঠা! বাঙ্গালীর অধ্যবসায়ের সফলতার পরিচয়! ইহার উপর দিয়া বিপদাপদের কত যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শুনিয়াছি, এক সময়ে ইহার এমন দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল যে, অংশীরা এবং জনসাধারণ ইহাকে 'লিকুইডেশনে' দিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার কর্ত্তৃপক্ষ দমিয়া থাকিয়া, অধ্যবসায় সহকারে কাজ করিয়া এই শুভদিনে শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন। বঙ্গলক্ষ্মী মিল স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যের অন্যতম শিক্ষাগার; ব্যর্থতা হইতে কিরূপ সার্থকতার উৎপত্তি হয়, ইহা তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন।

আমাদের বিশ্বাস ছিল, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে কাপড়ও যেমন প্রস্তুত হয়, সুতাও তেমনি প্রস্তুত হয়। কিন্তু কার্ত্তিক মাসের "ভারতবর্ষে" রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের "বস্ত্রসঙ্কট" প্রবন্ধে যেরূপ আভাষ দেখিলাম, তাহাতে মনে হইয়াছিল, এই কলে সুতা তৈয়ারী হয় না, বিলাতী সুতায় কেবল বস্ত্র তৈয়ারী হয়। ইহা কি ঠিক? রিপোর্টে দেখিতেছি, তুলার বাবদে ৮৪০০৩৭।১০ পাই ব্যয় ধরা হইয়াছে, এবং সুতা বিক্রয় করিয়া ৪০০০৭৮/০ পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গলক্ষ্মী যখন লক্ষ্মী-তুলসী মিলেরও পূর্ব্বে শ্রীরামপুর কটন মিল নামে পরিচিত ছিল, তখন উহার সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল। উহার সুতা লইয়া নাড়াচাড়ি করিতে হইত, তুলা হইতে সুতা প্রস্তুত করিবার পড়তা স্থির করিতে হইত; এবং সেই সুতা বেঙ্গুন, হংকং প্রভৃতি বাজারে বিক্রীত হইতেও দেখিতাম। এই সুতায় যেন্ট তাঁতীদের তাঁতে "মোটা কাপড়" কিছু পরিমাণে তৈয়ার হইতে পারে, এবং হয়ও বোধ হয়। কলেও সম্ভবতঃ এই সুতা বস্ত্র নির্ম্মাণে কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সে যাহা হউক, এখন আমাদের কামনা এই যে, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের সাফল্য দর্শনে বাঙ্গলা দেশে আরও কাপড় ও সুতার কল স্থাপিত হইবে এবং বাঙ্গালা দেশকে আর বস্ত্রের জন্য বাহিরের দিকে হাত পাতিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না।

কলিকাতা সহরে শিশু ও রোগীদিগের জীবন-ধারণের জন্য দুগ্ধ কি উপায়ে সংগৃহীত ও সরবরাহ হয়, এবং তাহার গুণাগুণ কিরূপ, এ সম্বন্ধে রায়বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু মহাশয় ১৯১৮ অব্দের ১৭ই আগষ্ট তারিখে "সোসিয়াল হাইজি সোসাইটীর" একটী অধিবেশনে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটীতে সাধারণের জ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে এবং উহা আলোচনার যোগ্য।

কলিকাতার কিছুপূর্ব্বে হেল্‌থ্ অফিসার ডাক্তার পীয়ার্স গ্রাট বৎসর পূর্ব্বে একবার হিসাব করিয়াছিলেন যে, কলিকাতাবাসী প্রত্যহ ২০০০ মণ দুগ্ধ পান করে। ডাক্তার চুনিলাল বাবুর হিসাবে দেখা যাইতেছে, ই, বি, রেলপথে শিয়ালদহ ষ্টেশন দিয়া প্রত্যহ ৩০০ মণ, এবং ই, আই ও বি, এম রেলপথে হাবড়া ষ্টেশন দিয়া প্রত্যহ ১০০ মণ দুগ্ধ আমদানী হয়। ইহা ছাড়া, কলিকাতার উপকণ্ঠ এবং চিৎপুর, বালীগুঞ্জ, দমদমা প্রভৃতি স্থান হইতে হাঁটাপথে গোয়ালারা প্রত্যহ ৩০০ মণ দুগ্ধ সহরে আমদানি করে। বাকী দুধটা সহরের গোয়ালারা সরবরাহ করে; ইহার কিয়দংশ গৃহস্থের পালিত গরু হইতেও পাওয়া যায়।

কলিকাতার লোকসংখ্যা মোটামুটি ৯০০০০০ ধরিলে, গড়পড়তা প্রত্যহ প্রত্যেক লোকের ভাগে এক সেরের ষাটভাগের এক ভাগ বা আড়াই আউন্সের বেশী ছোটে না। তবে বড়লোক ব্যক্তিরা (খুব ধনী না হইলে) প্রায়ই দুধ খায় না। ইহা যে দুধের প্রতি অরুচিবশতঃ, তাহা নহে। কর্ত্তা যে কারণে মুগের ডাল খান না, ইহারাও সেই কারণে দুধ খায় না।

দুধ বলিলে পূর্ব্বে লোকে গাভী-দুগ্ধই বুঝিত। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রকৃত অবস্থাও তাহাই ছিল। কিন্তু এখন দুধ বলিলে মহিষের জল মিশ্রিত দুধ বুঝিতে হয়। কলিকাতার দৈনিক প্রয়োজনীয় ৫০০০ মণ দুধের মধ্যে গাভী দুগ্ধের পরিমাণ কতখানি, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ—অথবা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। বাকীটা অবশ্য মহিষের দুধ; তবে তাহাতে জল কতখানি থাকে, তাহা অনুমান করা তেমন কঠিন নহে। এক্তারা বহু হিসাব করিয়াছেন, প্রায় সের-করা আধা-আধি জল থাকে।

তাহার পর ডাক্তার বসু দুধের গুণাগুণের কথা কহিয়াছেন। তিনি বলেন, "it is not only poor in quality, but it is exposed to so many unfavourable conditions during production and transport, that it is an absolutely unsafe article of food." অর্থাৎ, এই দুধ কেবল যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর, তাহা নহে, দুধ দোহন এবং আনয়ন করার অবস্থা এমন খারাপ যে খাদ্যের হিসাবে উহা নিরাপদ নহে। কিন্তু উপায় কি? ডাক্তার বাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, রেলপথে যে দুধ আমদানী হয়, কেবল তাহাই পরীক্ষা করা চলে। কিন্তু হাঁটাপথে আমদানী এবং অন্য সূত্রে উৎপন্ন দুধ "are practically outside the control of the Health Department of the city." অর্থাৎ উহা নগরের স্বাস্থ্য বিভাগের এক্তারের বহির্ভূত।

এরূপ অবস্থার প্রতিকারের দুইটী মাত্র উপায় আছে। কিন্তু এই দুইটীই এখন অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। প্রথমতঃ, ধর্ম্ম-ভয়ে গোয়ালারা দুধের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা রক্ষায় যত্নবান্ হইতে পারে। কিন্তু তাহা কেবল সত্য যুগেই সম্ভব। এবং যেহেতু, সত্যযুগের শীঘ্র ফিরিয়া আসিবার আপাততঃ কোনই সম্ভাবনা নাই, তখন গোয়ালার ধর্ম্মের উপর ভার দিয়া বিশুদ্ধ দুধ পান করিবার আশায় বসিয়া থাকা, আর আকাশের চাঁদ ধরিবার প্রত্যাশা করা সমান কথা। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক গৃহস্থ পূর্ব্বেকার মত নিজ-নিজ গৃহে দুই-একটী করিয়া গরু অথবা মহিষ পালন করিতে পারিলেও অনেকটা সুবিধা হইতে পারিত। কিন্তু, সহরে ও দুই-একজন ধনী লোক ব্যতীত সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে গরু পোষা একেবারেই অসম্ভব—কল্পনার অতীত ব্যাপার; এমন কি, পল্লীগ্রামেরও অবস্থার এমন এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, সকল গৃহস্থের পক্ষে গো-পালন সম্ভবপর নহে। সহরে দে'শের নিজের খাদ্য করিবারই এমন দুরবস্থা ঘটিয়াছে যে,—গরু পুষিবার জন্য যে গোয়াল ঘর প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাতেও মানুষ বাস করিতে পাইলে বাঁচিয়া যায়। তার পর, কলিকাতার মত সহরে একগাছি ঘাসও বিনা পয়সায় পাইবার উপায় নাই। যাহাদের গোয়াল প্রস্তুত করার স্থান আছে, যাতায়াতের অসুবিধা বশতঃই তাহারা গরু পুষিতে পারে না। পল্লীগ্রামে গরু রাখিবার স্থানের যদিও এখনও একেবারে অভাব নাই, কিন্তু গোচারণ মাঠ অনেক স্থানেই আর নাই। তাহার উপর, খড়, খোল, ভুসি প্রভৃতি গরুর খাদ্যের মূল্য পল্লীগ্রামেও তেমন সুলভ নহে। অতএব, গোয়ালারা অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিবে, আমাদিগকে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। তাহারা যদি দুধ বলিয়া টাকায় তিন সের হিসাবে বিষও দেয়, তাহা হইলে তাহাই আমাদের শিশুদের ও রোগীদের খাওয়াইতে হইবে। ইহার প্রতিকারের কোনই উপায় নাই,—নাই,—নাই। দুধে জল মিশাইয়া তাহা স্বীকার করিলেই আর আইনে বাধে না। দুগ্ধ পরীক্ষার যত রকম উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমাদের বৈজ্ঞানিক গোয়ালারা তাহার প্রায় প্রত্যেকটিই নিষ্ফল করিয়া দিয়াছে। আর, সব শিয়ালেরই যখন এক রা, তখন জল ও ভেজাল মিশ্রিত দুধ ব্যবহার করা ছাড়া আর অন্য উপায় কি আছে?

যথেষ্টর শুভ যোগে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ন্যায় এদেশে কয়েকটি সাবান ও চামড়ার কারখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু ঠুনির যথেষ্টর প্রভাব মন্দীভূত হইয়া আসিবার পর হইতে, এই সাবানের কারখানা-গুলির অবস্থা কেমন দাঁড়াইয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় ছিল না। এমন কি, মনোহারী দোকানে যথেষ্ট সাবান চাহিলেও পাওয়া যাইত না—কোন দোকানদারই তাহা রাখিত না। দোকান-দারেরা যথেষ্ট সাবান কেন রাখে না,—জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সদুত্তর পাইতাম না। যাহাকেই ঐরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহারই নিকট শুনিয়াছি, খরিদ্দার চাহে না, তাই তাহারা রাখে না। সুতরাং ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, কারখানাগুলির অবস্থা আশানুরূপ ভাল ছিল না। কেবল সাবানের কারখানা নহে, অনেক দেশী কলকারখানার অবস্থাই এইরূপ। ইহা কাহার দোষ? খরিদ্দারের (consumers), না দোকানদারের (middlemen), না কারখানাওয়ালার? আমাদের বোধ হয়, তিন পক্ষেরই দোষ। খরিদ্দার patronize না করিলে, কোন কারবারেরই উন্নতি হইতে পারে না। খরিদ্দারের পছন্দমত জিনিস সংগ্রহ করিয়া খরিদ্দারের সাম্নে ধরা দোকানদারের কাষ। দোকানে জিনিস না পাওয়া গেলে, খরিদ্দার কি করিবে? সে যা' পায়, তাই লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়। দোকানদারের এইখানে ত্রুটি। কারখানাওয়ালার ত্রুটী অনেক। কেবল জিনিস তৈয়ারী করিয়া দিলেই কারখানা ওয়ালার কায শেষ হয় না। জিনিসটি খরিদ্দারের মনের মত হওয়া

চাই; তাহার দাম এমন হওয়া চাই যে, ওপের তুলনায় ক্রেতা তাহা সস্তা বলিয়া মনে করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, মাল তৈয়ার করিয়া তাহা গুদামজাত করিয়া রাখিলেই কারবার চলে না। তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে; খরিদ্দারের চক্ষের সমক্ষে ধরিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারখানা এবং মালের কথা যাহাতে সকলে জানিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেবল একবার জানাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে না। ক্রেতা যাহাতে তাহার কথা ভুলিয়া না যায়, তাহারও বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আমাদের দেশের কারখানাওয়ালারা এইগুলি করেন কি না, তাহা জানি না। বোধ হয় করেন না। কারণ, করিলে, মধ্যে মধ্যে তাহাদের নাম শুনিতে পাইতাম। দুঃখের বিষয়, বস্ত্রশূন্য কটন মিলের কাপড়ও বাজারে বড় একটা পাওয়া যাইত না। আশা করি, যুদ্ধের সুযোগে বাঙ্গলার একমাত্র কাপড়ের কলের ন্যায় সাবানের কারখানাগুলিরও উন্নতি হইতেছে।

সাবানের কথাটা আজ বিশেষ করিয়া তুলিবার একটু কারণ ঘটিয়াছে,—মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং এদেশে সাবানের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন, এবং সেই কারখানার কিঞ্চিৎ বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। সাবান জিনিসটা সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গ। ইহা যুদ্ধ বিগ্রহ মানে না। এমন কি, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধে নিযুক্ত সৈন্যগণেরও প্রচুর সাবান আবশ্যক; এবং প্রধানতঃ তাহাদের প্রয়োজন সাধনেই মাদ্রাজ,—কালিকট সহরের সরকারী সাবানের কারখানাটি নিযুক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, জনসাধারণের অর্ডারও কিছু-কিছু সরবরাহ করা হইতেছে। কারখানার অনারারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সার ফ্রেডারিক নিকোলসন কে-সি-আই-ই ১৯১৭-১৮ অব্দের রিপোর্ট লিখিয়াছেন যে, এই কারখানার উৎপন্ন সাবান উত্তম এবং সস্তা। "তাল-নারিকেলের দেশ" দাক্ষিণাত্যে সাবানের কারখানা স্থাপনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এ অঞ্চলে নারিকেল তৈল, পাম অয়েল, জলপাইয়ের তৈল প্রভৃতি সাবানের উপাদান সুলভ এবং সুপ্রাপ্য। কেবল অস্তুতম উপাদান কষ্টিক সোডা বিদেশ হইতে আমদানী হইত। যুদ্ধের দরুণ তাহার আমদানী নিষিদ্ধ হওয়ায়, কারখানার কিছু অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছিল; পরে কারখানাতেই কষ্টিক প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হওয়ায় সে অসুবিধা বিলক্ষণপরিমাণে দূর হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কারখানাটি বিলাত ছোট এবং এই কারখানার মালের খরিদ্দার অনেক। সেই জন্য যা' কিছু অসুবিধা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট বড় রকমের কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু যুদ্ধের দরুণ তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব ঘটিতেছে। এইরূপ আরও অনেক অসুবিধার মধ্যে কাজ চালাইতে হইতেছে। তথাপি আলোচ্য বর্ষে কারখানার ২৮৪০২ টাকা লাভ হইয়াছে। মাদ্রাজের সরকারী কারখানার সাবান খুব জনপ্রিয়ও হইয়াছে; কারণ, ইহা অতি বিশুদ্ধ। মাদ্রাজের ব্যবস্থাপক সভায় কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, কারখানাটি কোন লোককে বা কোন কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়া ফেলা হউক। কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় তাহা করা সঙ্গত বিবেচনা করেন না; যেহেতু, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের বা কোম্পানীবিশেষের উপকার হইতে পারে; কিন্তু মাদ্রাজ প্রদেশে একটী নূতন শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে না। পক্ষান্তরে সরকারী কারখানায় শিক্ষিত লোকদের দ্বারা লোকে নূতন নূতন কারখানা স্থাপন করিতে পারিবে; এবং তদ্দ্বারা ক্রমে-ক্রমে মাদ্রাজ প্রদেশে একটী নূতন ব্যবসায়ের সূত্রপাত হইবে। অতএব বলিতে হয়, শুভক্ষণেই ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল।

কেবল সাবানের কারখানা নয়, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট একটী সেলসিলের কারখানাও স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সেটী জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা স্থির হওয়ায় উহার জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, এবং ১৮টি টেণ্ডার পাওয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া একটী কোম্পানীকে কারখানাটি বিক্রয় করিয়া ফেলা হইয়াছে। মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট নিজ এলাকা মধ্যে বিবিধ শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন দেখিতেছি। গবর্ণমেণ্ট এইরূপে পথপ্রদর্শন করিলে যেসে শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা অচিরে সুসাধ্য হইয়া উঠিবে। আমরা মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টান্তে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছি।

এবার প্রসঙ্গক্রমে আমরা রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু মহাশয়ের আর একখানি পুস্তিকার আলোচনার অবসর পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। এই পুস্তিকাখানির নাম "Some Practical Hints to Improve the Dietary of the Bengalis." পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পড়িবার পর এই নামটিতে অনেকের একটু আপত্তি হইতে পারে,—আমাদেরও হইয়াছে। Bengalis বলিলে বাঙ্গালী হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই বুঝিতে হয়। বাঙ্গলার অধিবাসী হিন্দুও যেমন বাঙ্গালী, মুসলমানও তেমনি বাঙ্গালী। দেশ এবং জাতির কথায় মুসলমানকে বাদ দিয়া কেবল হিন্দুকে লইলে চলিবে না। হেম বাবুর "ভূতলে অতুল বাঙ্গালী জাতি" যদিও কেবল হিন্দু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল, কিন্তু সে দিন এখন আর নাই। এখন বাঙ্গালী জাতি বলিয়া উল্লেখ করিতে হইলে—সে বাঙ্গালী জাতি অধম, মধ্যম বা উত্তম, যাহাই হউক না কেন, হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়কেই বুঝাইবে।

পুস্তিকার প্রারম্ভে সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি পত্র মুদ্রিত হইয়াছে। এই পত্রে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, "The great deficiency of nutritive ingredients in the Bengali's dietary tells materially

on his body and indirectly also on his mind; and if the defect is not cured in time, things will go from bad to worse. But the problem of improvement is as difficult as it is important and is enhanced by religious sentiment excluding several articles from the dietary." অর্থাৎ বাঙ্গালীর খাদ্যে পুষ্টিকর উপাদানের অভাবে তাহার শরীরের ও যথেষ্ট ক্ষতি হয়ই; অধিকন্তু তাহার মনের উপরও ইহা পরোক্ষ ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। সময়ে ইহার প্রতিকার না হইলে অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্গীন হইয়া উঠিবে। কিন্তু ইহার প্রতিকার করা যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি কঠিন। বিশেষতঃ ধর্ম্মগত সংস্কারবশতঃ বহু খাদ্য বাঙ্গালীর খাদ্য তালিকা হইতে বর্জ্জিত হওয়ায় প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

সকলে জীবেন, সার গুরুদাস পরম হিন্দু; উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও কেমন করিয়া হিন্দুয়ানী বজায় রাখা যাইতে পারে, সার গুরুদাস তাহার আদর্শ স্থল; এবং এজন্য সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দুর কৃতজ্ঞতার পাত্র। তিনিও এখানে হিন্দুর কথাই বলিয়াছেন। কারণ, মুসলমানের খাদ্য-তালিকায়—ডাক্তার বসুর সিদ্ধান্ত অনুসারে—অনেক পুষ্টিকর খাদ্য আছে। ডাক্তার বসুও এই বিষয়টিকে ভিত্তি করিয়াই বাঙ্গালী হিন্দুর খাদ্য-তালিকার আলোচনা করিয়াছেন; এবং হিন্দুয়ানী বজায় রাখিয়াও কিরূপে আমাদের খাদ্যে পুষ্টিকর অংশের পরিমাণ বাড়াইতে পারা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। বিষয়টি অত্যন্ত গুরু; সেজন্য আমরা একটু বিস্তৃত ভাবে ইহার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি; এবং পাঠক-পাঠিকাগণের ধৈর্য্য ভিক্ষা করি।

আমরা মাছ-ভাত-খেকো বাঙ্গালী হিন্দু। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, মানুষের শরীর-গঠনের প্রধান উপাদান proteid বা muscle-forming constituent। বাঙ্গালী হিন্দু যাহা সচরাচর আহার করে সেই ডাল, ভাত ও মৎস্যে এই উপাদানটি কি পরিমাণে আছে, তাহা নির্ণীত হইলেই, বাঙ্গালীর খাদ্য কতখানি পুষ্টিকর তাহাও সহজে স্থির হইতে পারে। বাঙ্গালীর খাদ্য-তালিকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে, বাঙ্গালীর খাদ্যে উক্ত উপাদানের অংশের পরিমাণ খুব কম; পক্ষান্তরে, উহাতে Carbo-hydrate element অর্থাৎ শ্বেতসার ও তিলির ভাগ খুব বেশী। Major D. McCay, I. M. S. বাঙ্গালী ছাত্রের খাদ্য পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, উহাতে proteid খুব কম পরিমাণে আছে। সুতরাং বাঙ্গালীর খাদ্য-তালিকার সংশোধন করা অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কেবল সংশোধন করিলেই চলিবে না। আমাদের ধর্ম্ম, জাতি, আচার-ব্যবহার এবং চিরন্তন অভ্যাসের কথাও ভাবিতে হইবে। অর্থাৎ হিন্দুয়ানী বজায় রাখিয়া তবে পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। রায়-বাহাদুর ডাক্তার বসুও সেই চেষ্টাই করিতেছেন।

ডাক্তার বসু বলিয়াছেন, "and the selection of a dietary, therefore, which will be acceptable to the people in general, as not going against their cherished notions, and at the same time, being well within the easy reach of everybody, is a matter of careful thought and judgment." অর্থাৎ এমন ভাবে খাদ্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, যাহা সর্ব্ব শ্রেণীর লোকে বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিতে পারিবে; ঐ খাদ্যে আবার তাহাদের সংস্কারের বিরুদ্ধে যাইবে না; অথচ, সকল অবস্থার লোকের পক্ষেই তাহা সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হইবে। এই কাযটি খুব বহু সহকারে, সুবিবেচনা এবং বিচারবিতর্ক করিয়া সাধন করিতে হইবে।

ভাত, ডাল, মৎস্য, তরিতরকারি, শাকসব্জি, ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, সময়ের ফল প্রভৃতি বাঙ্গালীর সাধারণ খাদ্য; কিন্তু সর্ব্ব-সাধারণের খাদ্য নহে। স্থানভেদে, অবস্থাভেদে এবং কারণভেদে ইহার অনেক ইতরবিশেষ হয়। তবে ইতর-ভদ্র, ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে ভাত সকলকেই খাইতে হয়। ডাল বহুবিত্ত ভদ্রলোকের কিয়ৎ পরিমাণে জুটে; দরিদ্রের যোগে হয় আধৌ জুটে না। মৎস্য দরিদ্র ব্যক্তিরাও যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে, তবে তাহা খুব বেশী নহে। পূর্ব্বে ভাত এবং মাছ সুলভ ছিল; সকলেই সংগ্রহ করিতে পারিত। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে, মৎস্য খুব দুর্লভ হইয়া উঠায়, দরিদ্রের পাতে সব সময়ে মৎস্য জুটে না।

ডাক্তার বসু ছাত্রদের সম্বন্ধে অনেক দুঃখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কলিকাতায় হোষ্টেল এবং মেসে যে সকল ছাত্র বাস করে, তাহারা বেশ আহারের জন্য দুটি পুচি পায় না। কলিকাতায় এবং অন্যান্য অনেক নগরে ভদ্রলোকেরা রাত্রিতে লুচি-রুটি আহার করিয়া থাকেন। রুটি লুচির উপাদান আটা, ময়দা, ঘৃত অনেকটা পুষ্টিকর পদার্থ। যে সকল ছাত্রের অভিভাবকেরা কলিকাতাবাসী, বা সহরবাসী, যাহাদিগকে হোষ্টেলে বা মেসে থাকিতে হয় না, তাহারা রাত্রিতে রুটি-লুচি হয় ত খাইতে পাইতে। কিন্তু কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের হোষ্টেলে বা মেসে সাধারণতঃ রাত্রে রুটি লুচি হয় না; দুই বেলাই ভাতের ব্যবস্থা আছে। তাহা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু ছাত্রেরা একে-বারেই যে ভাতের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহাও নয়। হোষ্টেলের যেটুকু অভাব, তাহা তাহারা,—নিতান্ত দরিদ্র না হইলে—নিজেরাই অনেকটা পোষাইয়া লয়। কলিকাতার রাস্তার ধারে আজকাল অসংখ্য চা চপ, কাটলেট, কোর্মা, কোপ্তা, কাউল, ঘটমের দোকান হইয়াছে। ডাক্তার বসু একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবেন,

ছাত্রেরাই প্রথমতঃ এই সকল হোটেল patronise করিয়া থাকে। এখন, ছাত্রদের অভিভাবকদের এবং ডাক্তার বহুর ন্যায় হিতৈষীবর্গের ইহাই দেখা কর্ত্তব্য যে, এই সকল হোটেলে (যেখানে নহে) ছাত্রেরা যাহা খায়, তাহা আমাদের অধিকাংশ আপামরসাধারণ ছাত্রবৃন্দের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে সম্যক উপযোগী কি না। এই সকল 'হোটেলে' যে খাদ্য সংগৃহীত ও বিক্রীত হয়, তাহা তেমন উৎকৃষ্ট নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সেই জন্য কথাটা এখানে পাড়িলাম। ছাত্রগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ এই সকল হোটেলের খাদ্যাদি পরিদর্শন ও পরীক্ষা করাইবার একটু বিশেষ রকম ব্যবস্থা করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। কেবল মিউনিসিপ্যালিটীর পেশাদার Food Inspectors বা খাদ্য-পরীক্ষকদিগের উপর এই ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা এই হইতে পারে যে, ছাত্রেরা হোটেলে চপ-কাটলেট খাইবার জন্য যে অর্থ ব্যয় করে, সেই অর্থে (কারণ তাহা বিলাস অঙ্গ নহে) হোটেলে না যেয়েই কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাহাদের রুচি অনুযায়ী চপ কাটলেটের ব্যবস্থা হউক। তাহা হইলে ছাত্রদের একটা প্রধান অভাব দূর হয়, এবং তাহাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায়।

যাক্। আমাদের প্রধান খাদ্য অন্নে পূর্ব্বোক্ত proteid নামক পুষ্টিকর পদার্থের পরিমাণ মাত্র শতকরা ৫ অংশ। আর সম মকাই, যব এবং ওট প্রভৃতি শস্যে উহার পরিমাণ যথাক্রমে ১৩, ১১ ও ১৫। অতএব, হিসাব মত আমাদের ঐ সেরোক্ত দ্রব্যগুলি ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গম, যব প্রভৃতি বঙ্গের বিলক্ষণ সম্পত্তি নহে, কাযেই তেমন সুলভও নহে। সুতরাং দরিদ্র দেশের অধিবাসীদের পক্ষে ওদিকে লক্ষ্য করা বিড়ম্বনা মাত্র। বঙ্গদেশ নদীবহুল; এখানে পূর্ব্বে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যাইত। মৎস্যে proteid এর পরিমাণও যথেষ্ট; সুতরাং আমাদের তেমন ভাবনাও ছিল না। কিন্তু এখন মৎস্য দুর্লভ হওয়ায় এবং একমাত্র খাদ্যের উপর নির্ভর করিতে হওয়ায়, ভাবনার কিঞ্চিৎ কারণ ঘটিয়াছে। কিন্তু শ্রীভগবান আমাদিগকে একেবারে বঞ্চিত করেন নাই। ডাল আমাদের দেশেই উৎপন্ন হয়। ডাক্তার বহু ডাল আমাদের একটু বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলেন, ডালে proteid এর পরিমাণ শতকরা ২২ অংশ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যেদিয়াছিলাম, এই "ভারতবর্ষেই" "বাঙ্গালীর শিক্ষা" নামক প্রবন্ধে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় এল-এম-এস মহাশয় বাঙ্গলার ছাত্রগণকে ডালের বাটী চাটিয়া নিঃশেষে খাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। সেকালে আমাদের দুগ্ধ পানের রীতিও অনেকটা ঐ রকমই ছিল। মা-জননীর আদেশে দুগ্ধ পান করিবার পর দুধের বাটীতে একটুখানি জল ঢালিয়া সেই জলটুকুও পান করিতে হইত। অর্থাৎ দুগ্ধের একটি, কোঁটাও ব্যর্থ হইতে দেওয়া হইত না। এইখানে ডাক্তার বহু বাঙ্গালী জননীদের এবং ভুঁড়িওয়ালা লোকদিগের প্রতি একটু কটাক্ষপাত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "The mistake our people generally make is to take a large quantity of rice (which for the time being appeases the appetite) with small quantities of other foods rich in proteids and fats. The result is that we get fattened (for it is the excess of starch and not so much any excess of fat actually taken in that food that causes deposition of fat in the body), the belly becomes bulging, etc" অর্থাৎ সাধারণতঃ লোকে ভুল করিয়া বেশী পরিমাণে ভাত খায় (তাহাতে ঐ সময়ের জন্য ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় মাত্র, অন্য কোন উপকার বেশী হয় না), এবং proteid ও তৈলাক্ত পদার্থবহুল খাদ্য সামান্য পরিমাণে খায়। ইহার ফলে তাহারা মোটা হয় (কারণ, শ্বেত সারের বাহুল্য বশতঃই দেহের ভিতর চর্ব্বি জমে, তৈলাক্ত পদার্থ ভোজনের ফলে নহে) ভুঁড়ি বাহির হয় ইত্যাদি। এ বিষয়ে সাধারণের ধারণা যথার্থই অনুরূপ ছিল। কিন্তু যখন ডাক্তার বহুর ন্যায় অভিজ্ঞ চিকিৎসক বলিতেছেন সাধারণের ধারণা ভুল, তখন তাহা মানিতেই হইবে।

ডাক্তার বহু ডালের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। তুলনায় সমালোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, proteid এর পরিমাণ মাংসে শতকরা ২০, মৎস্যে ১৮, ডিম্বে ১৪, দুগ্ধে ৪ এবং ডালে শতকরা ২২ অংশ। অর্থাৎ ডাল মাংসের অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর; সুতরাং খাদ্যের হিসাবে ডাল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে যে কারণে গম, যব সাধারণ এবং নিত্য মৈমিত্তিক খাদ্য হইতে পারে না, ঠিক সেই কারণেই অর্থাৎ মূল্যাধিক্যবশতঃ ডালও সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুলভ্য নহে। তার পর, মাংস ভারতবাসী হিন্দু ছাড়া, অপর প্রায় সমস্ত মানব-সমাজের প্রধান খাদ্য। অথচ ডাল মাংসের অপেক্ষাও পুষ্টিকর; তথাপি, ডাল কেন যে সকল দেশের লোকের নিকট সমাদরের আদরণীয় হয় নাই, তাহাও বিবেচ্য। ডাক্তার বহুই ইহার সমাধান করিয়াছেন। তিনি বলেন, মাংস পুষ্টিকর বটে, কিন্তু প্রথমতঃ ইহা সুখরোচক বলিয়াই লোকে বেশী পছন্দ করে। তাহা ছাড়া ইহার আরও একটি গুণ আছে—ইহা উত্তেজক। এই গুণটির বলেই লোকে ইহা বেশী পছন্দ করে কি না, তাহা ডাক্তার বাবু বলেন নাই। সে যাহা হউক, মাংসের এই উত্তেজক গুণের কথাটি বিশেষভাবে আলোচ্য। আমাদের মনে হয়, হিন্দু সাধারণ যে মাংস ব্যবহারের ততটা পক্ষপাতী নহে, তাহার প্রধান কারণ, মাংসের উত্তেজক গুণ। হিন্দুর ধর্ম্ম এবং স্বভাব অনুসারে হিন্দু সংযমের পক্ষপাতী। বাঙ্গালাদেশ, তথা ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান। এই দেশে অতি অল্প কারণে দেহ মন উত্তেজিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। তাহার উপর উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ করিলে ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে উত্তেজনার সঞ্চার হইবে, তাহার ভার সামলানো বড় সোজা কথা নহে। তবে এটাও ঠিক যে, উত্তেজক খাদ্য বর্জ্জন করিয়া আমরা দেব-তুল্য নিরীহ হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের এই নিরীহ স্বভাববশতঃ

আমরা যে পৃথিবীর অনেক সুখ-সম্পদ এবং মানব সমাজের সাধারণ ঈশ্বরদত্ত অধিকার ভোগে বঞ্চিত রহিয়াছি, এ কথাও অস্বীকার করিতে পারি না। এইজন্য, প্রাচীনকালের হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এবং সমাজপতি-গণ যে কারণেই হউন আমাদের খাদ্য-তালিকা হইতে বর্জ্জন করিবার উপদেশ দিয়া থাকুন না কেন, সময় ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলে এই প্রশ্নটির সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে।

মাংসের পর মৎস্য, ডিম এবং দুগ্ধ উৎকৃষ্ট খাদ্য। যাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহারা এই খাদ্যের যথেষ্ট সদ্ব্যবহারও করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা প্রধানতঃ ধনীর এবং অল্প পরিমাণে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের খাদ্য—দরিদ্রের পক্ষে সুলভ নহে। ইহা বিবেচনা করিয়াই ডাক্তারবাবু পুনরায় ডালের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। এইখানে তিনি ডালের দোষ-গুণের আলোচনা করিয়াছেন; এবং ডালের বিরুদ্ধে যাহার যে কোন আপত্তি আছে, তাহারও খণ্ডন করিয়াছেন। ডালের গুণমুগ্ধ ডাক্তার বহু ডালের প্রশংসায় ত মুক্তকণ্ঠ হইয়াছেনই, অধিকন্তু মাংসের বিরুদ্ধে ডালের পক্ষ সমর্থন করে বলিয়াছেন, "A seer of 'dal' of good quality would cost you not more than two and a half annas, whereas the cost of a seer of meat would be about twelve annas." অর্থাৎ এক সের উৎকৃষ্ট ডাল দশ পয়সায় পাওয়া যায়, আর এক সের মাংসের মূল্য বার আনা। কথাটা বুঝিতে পারিলাম না। আমরা ত ডাল নিত্য খাই। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যে ডাল তাহার মূল্য তিন আনা বা সাড়ে তিন আনা এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট অর্থাৎ সোণামুগের ডালের মূল্য খুব কম করিয়া ধরিলেও পাঁচ আনার কম নহে—ইহাই ত জানি। আর উৎকৃষ্ট ছাগ বা মেষ মাংস আট আনাতেই যথেষ্ট পাওয়া যায়। আমরা অবশ্য ডালের বিরুদ্ধে রায় দিতেছি না। তবে ডালের পক্ষপাতিত্ব করিতে গিয়া মাংসের প্রতি অবিচার করাও সঙ্গত মনে করি না। যে সময়ে দশ পয়সায় এক সের উৎকৃষ্ট ডাল পাওয়া যাইত, সে সময়ে এক সের মাংসের মূল্যও চারি আনা ছিল। তার পর যখন ক্রমে পাঁচ আনা, ও পরে ছয় আনা হইল, তখনই আমাদিগকে চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হইত। তার পর এখন পা-সহা হইয়া গিয়াছে—এখন আট আনা দিতেও তেমন অসুবিধা বোধ হয় না।

আমাদের ভাত রাঁধিবার প্রণালী সম্বন্ধে ডাক্তার বসু যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি সমীচীন। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে, "The way in which we usually prepare rice for our daily meals seems to be faulty, as thereby we lose some of the nutritive principles present in rice." অর্থাৎ ভাত রাঁধিবার দোষে আমাদিগকে উহার পুষ্টিকর অংশের অনেকটা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ডাক্তার বসু আর একটা কথা বলেন নাই; কিন্তু সেটাও অগ্রাহ্য করিবার কথা নহে। আমরা সিদ্ধ চাউল খাই। ধান সিদ্ধ করিবার সময়ও তাহার পুষ্টিকর অংশ কিয়ৎপরিমাণে বাহির হইয়া যায়। তার পর বাকীটুকু কেন ফালিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। যাহা আমাদের উদরস্থ হয়, তাহা প্রকৃত পক্ষে চাউলের সারাংশ নহে, উহার সিটা মাত্র। আমাদের দিবারাত্র আলোচনার ভাত যে প্রণালীতে রাঁধেন, তাহাই ঠিক। শুনিতে পাই, জাপানে এই প্রণালীতে ভাত রাঁধা হয়। আমাদেরও জাপানী প্রথা গ্রহণ করা উচিত। এ সম্বন্ধে আলোচনা অনেক দিন ধরিয়া চলিতেছে। মনে হয়, "ভাতের কেন গলা উচিত কি না" এই মর্ম্মের একটা প্রবন্ধের জন্য একটা বড় রকমের পুরস্কার এক সময়ে ঘোষিত হইয়াছিল, এবং প্রবন্ধ রচিত, পুরস্কৃত এবং মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়াও যেন শুনিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার ফলে কি হইল?

ডাক্তার বসু খিচুড়ী খুব ভালবাসেন দেখিতেছি, এবং খিচুড়ী ভাল-বাসিবার কিনিসও বটে। উহার অনেক গুণ। খিচুড়ীর ফেন ফালিতে হয় না; ডালের সঙ্গে অনেকটা অনাবশ্যক জল উদরস্থ করিতে হয় না। ঘৃত এবং মসলা সংযোগে রসনার পক্ষেও ইহা অতি উপাদেয় হইয়া থাকে। কিন্তু নিত্য খিচুড়ী সকলের ভাগ্যে সহ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান লেখক একদা হাতের ব্যথায় রাত্রিতে লুচি রুটি চর্ব্বণে অসমর্থ হইয়া দিন-চারি-পাঁচ উপর্য্যুপরি খিচুড়ীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে, এক পক্ষ কাল রক্তামাশয় রোগে শয্যাগত থাকিয়া প্রভূত অবসন্ন কাতর হইয়াছিলেন।

এই সকল কথা ছাড়া, ডাক্তার বসু অন্য যে সকল খাদ্যের সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিই ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের "বাঙ্গালীর শিক্ষা" প্রবন্ধে "ভারতবর্ষে" পাঠক-পাঠিকার অবগত হইয়াছেন, এবং তাহার অধিকাংশই মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র এবং দরিদ্রের পক্ষে পুষ্টিকর অথচ সুলভ খাদ্যের সন্ধান করাই সমস্যার বিষয়। সকল দিক বিবেচনা করিয়া, দেখিতেছি, ডালই আমাদের দরিদ্র দেশের সর্ব্বপ্রধান (এমন কি চাউলের অপেক্ষাও) খাদ্য হওয়া উচিত। তবে তাহার মূল্য আরও কম হওয়া আবশ্যক। ডাক্তার বসু তাঁহার প্রবন্ধের শেষে যে দুইটী তালিকা দিয়াছেন, তদনুসারে খাদ্যের ব্যবস্থা করা দরিদ্রের পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইল না।

বস্ত্রের অভাবে বাতিব্যস্ত হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশ তুলার চাষ করিয়া, চরকায় সুতা কাটিয়া, তাঁতে কাপড় বুনিয়া নিজেদের বস্ত্রাভাব দূর করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। এই ভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিলে অবশ্য মন্দ হইত না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা কতদূর সম্ভবপর, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন না। দেশের লোকের অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া, এবং গত ১৯শে আষাঢ় তারিখে ঢাকা নগরে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত মন্তব্য অনুসারে, বাঙ্গালার কৃষি-বিভাগের

ডাইরেক্টার মহাশয় বাঙ্গালা দেশে তুলার চাষের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য একটী রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এই রিপোর্টে বঙ্গদেশে তুলার চাষের সুবিধা-অসুবিধার কথা আলোচিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে দেখা যায়, বাঙ্গালার ভূমি বিস্তৃত ভাবে তুলার চাষের উপযোগী নহে। তবে অল্প পরিমাণে জাপান গাছ রোপণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও খুব বিশ্রাহারির ন্যায় ঢুকেশ্বরে অস্থায়ী ভাবে করা চলে। স্থায়ীভাবে রীতিমত তুলার চাষ করিয়া তাঁতের সাহায্যে বস্ত্রাভাব দূর করা বঙ্গদেশে আর সম্ভবপর নহে। বাঙ্গালায় তাঁতের দিন গিয়াছে—বন্ধের জন্য, লজ্জানিবারণের জন্য আমাদিগকে চিরদিনই বিদেশের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। তবে আমরা যদি কোন ভালে সৌখিন সূক্ষ্ম বস্ত্রের মায়া কাটাইয়া আবার মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি, তবেই আমরা আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিব। কিন্তু সে দিন কি আর ফিরিয়া আসিবে?

পুস্তক-পরিচয়

বাঙ্গলা ভাষার অভিধান—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, মূল্য ৭৲ টাকা।

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষার যতগুলি অভিধান বা কোষ-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই অভিধানখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গলা ভাষায় নূতন জীবনের সঞ্চার দেখা যাইতেছে। সুতরাং বাঙ্গলা ভাষার নূতন-নূতন অভিধানের অভাবও অনুভূত হইতেছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই অনুভূতির প্রত্যক্ষ নিদর্শন। কোন জীবিত ভাষার একখানি অভিধানের প্রথম সংস্করণকে কোন ক্রমেই সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে না; এখানিকেও সেই জন্য এখনও সম্পূর্ণ বলিতে ভরসা করিতেছি না; কারণ, বাঙ্গলা ভাষায় নিত্য নূতন ভাবের সৃষ্টি হইতেছে, এবং অন্য ভাষা হইতেও নূতন-নূতন শব্দ বাঙ্গলা ভাষার সহিত মিশিয়া যাইতেছে। সে যাহা হউক, বাঙ্গলা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থায় এই গ্রন্থখানি সাধারণের অনেক প্রয়োজন সাধন করিবে। আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, সঙ্কলয়িতা ইহার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার এই শ্রম-স্বীকার এবং বাঙ্গলা ভাষার অভাব-মোচন-চেষ্টা সফলযুক্ত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

উহট-সাগর—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, উহট-সাগর, বি-এ, প্রণীত; মূল্য, কাগজের বাঁধা ২৲ টাকা, কাপড়ে বাঁধা ২৷৹ আড়াই টাকা।

ছাত্রগণ উহট শ্লোকগুলি যাহাতে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে পূর্ণবাবু "উহট-সাগর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনটী প্রবাহ আছে। প্রথম প্রবাহে ২০১ শ্লোক, দ্বিতীয় প্রবাহে ২৫০ শ্লোক, তৃতীয় প্রবাহে ৩০০ শ্লোক বিন্যস্ত হইয়াছে। পূর্ণবাবু অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া এই শ্লোকগুলির শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। 'দেবতাস্তবন', 'জীবস্তবন', 'উদ্ভিৎস্তবন', 'অবাধোক্তিস্তবন', 'নিন্দা-প্রশংসাস্তবন', 'প্রশংসাস্তবন', 'রসস্তবন', 'বিবিধস্তবন'—এই ভাবে প্রতি প্রবাহেই শ্লোকের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। এই স্তবগুলির মধ্যেও আবার অবান্তর নানা বিভাগ আছে। ফল কথা, গ্রন্থখানি যাহাতে সুখপাঠ্য হয়, পূর্ণবাবু সে পক্ষে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। তার পর, প্রত্যেক প্রবাহের পরিশিষ্টে কঠিন ও বিশুদ্ধ ভাবগর্ভ শ্লোকগুলির বিশুদ্ধ টীকাও প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি "কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েসনের" ব্যবস্থাপিত সংস্কৃত আদ্য, মধ্য ও উপাধি—এই ত্রিবিধ পরীক্ষাতেই কাব্য ও ব্যাকরণ বিভাগের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আদ্য পরীক্ষার জন্য প্রথম প্রবাহ, মধ্য পরীক্ষার জন্য দ্বিতীয় প্রবাহ এবং উপাধি পরীক্ষার জন্য তৃতীয় প্রবাহ অধ্যয়ন করিতে হইবে। এই গ্রন্থখানি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত না হইলে, এই উহট শ্লোকগুলি কখনই বিদ্যার্থিবৃন্দের কণ্ঠস্থ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অমূল্য রত্নের ন্যায় এই উহট শ্লোকগুলি যে বিদ্যার্থিগণের কণ্ঠের আভরণ হওয়া উচিত, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। পূর্ণবাবু এই "উহট সাগর" গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত নার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে উৎসর্গ করিয়াছেন। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে পূর্ণবাবুর অসামান্য কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রত্যেক কবিতাই প্রসন্ন-গম্ভীর। মূল গ্রন্থমধ্যেও পূর্ণবাবুর নিজের রচিত অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা স্থান পাইয়াছে। এই সকল কবিতা সর্ব্বাংশেই প্রাচীন কবিতার সহিত উপবিষ্ট হইবার যোগ্য। আমরা এই পুস্তকের বহুলপ্রচার কামনা করি। পরীক্ষার্থী ছাত্র ব্যতীত অন্য সকলেও এই পুস্তক পাঠে যথেষ্ট আনন্দ ও উপকার পাইবেন।

পুরাণের গল্প—

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত, মূল্য আট আনা।

এই পুস্তকখানি বালকবালিকাদিগের জন্য রচিত। লেখক শ্রীযুক্ত সুরেনবাবু এই পুস্তকের গল্পগুলি ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ঝাঁকো-বেতালীর গল্প অপেক্ষা এই সকল গল্পের সার্থকতা অধিক।

লেখকের ভাষা অতি সরল ও সুন্দর। বালকবিগের জন্য রচিত তাঁহার অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় এখানিও আদৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি।

নববর্ষের গল্প—

শ্রীসরলা দেবী প্রণীত, মূল্য আট আনা।

এখানি আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার অষ্টাবিংশ গ্রন্থ। লেখিকা শ্রীযুক্তা সরলা দেবীচৌধুরাণী মহাশয়া বাঙ্গালা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিতা। তিনি যখন "ভারতী" পত্রিকার সম্পাদন করিতেন, সেই সময়ে উক্ত পত্রে যে সমস্ত মনোহর গল্প লিখিয়াছিলেন তাহারই কয়েকটি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। গল্পগুলি অতি সুন্দর; লেখিকা মনোরমার রচনা-কৌশলের প্রশংসা অনাবশ্যক,—তাহা বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেরই পরিচিত। আমরা সকলকেই এই সুন্দর পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

মধুমল্লী—

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী প্রণীত, মূল্য আট আনা।

এখানি আট-আনা সংস্করণের চতুর্বিংশ গ্রন্থ। লেখিকার পরিচয় দিতে হইবে না; বাঙ্গালাদেশের উপন্যাস-সাহিত্যে শ্রীযুক্তা অনুরূপার নাম সর্বজনপরিচিত, তাঁহার লেখার প্রশংসা সর্বত্র। তিনি এই গ্রন্থে কয়েকটি ছোট গল্প দিয়াছেন; গল্প কয়েকটির মধ্যে এমন একটা মাধুর্য্য আছে, যাহা সকলেরই উপভোগ্য। আমরা সবগুলি গল্প পড়িয়াই বিশেষ প্রীত হইয়াছি। বিলাতী গল্প হইলেও এগুলি উপভোগ্য। প্রথম গল্প 'মা' অতি সুন্দর।

নীলমাণিক—

রায় সাহেব শ্রীবীরেশচন্দ্র সেন, কবিশেখর, বি-এ প্রণীত, মূল্য ।৹ আট আনা।

নীলমাণিক আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার ঊনত্রিংশ গ্রন্থ। ইহা একটী সম্পূর্ণ গল্প। লেখক শ্রীযুক্ত বীরেশ বাবুর এই পুস্তকখানির নাম শুনিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন, তিনি হয় ত পুরাতন বাঙ্গালা-সাহিত্য-সাগর হইতে এই নীলমাণিককে উদ্ধার করিয়াছেন। তাহা নহে, ইহা একখানি ছোট উপন্যাস। লেখক মহাশয় বৈষ্ণব সাহিত্যে একেবারে মসগুল। তাঁহার নীলমাণিক একজন উৎকৃষ্ট কীর্ত্তন-গায়ক; পরম প্রেমিক ব্যক্তি। নীলমাণিকের মুখ দিয়া লেখক মহাশয় যে কয়েকটী মহাজন-পদ গান করাইয়াছেন, এবং ধীরে-ধীরে তাহার যে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা বড়ই উপভোগ্য; মহাজন-পদাবলী যে কত সুন্দর, লেখকের হৃদয়ে তাহাদের যে কি অতুল প্রভাব, তাহা এই পুস্তকে অতি সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং তাহাতেই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের সার্থকতা।

সীমন্তিনী—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, মূল্য আট আনা।

'বাদি-মুলের' প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই গল্পটী আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালায় প্রকাশিত করিয়াছেন। গল্পটীর একটী বিশেষত্ব আছে। 'জাতিস্মর' কথাটা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া পরম আনন্দলাভ করিবেন; যাঁহারা অতদূর যাবেন না, তাঁহারাও প্রবীণ লেখক মহাশয়ের সুমধুর ভাষা, মনোরম প্রকাশ-ভঙ্গী এবং প্রাণস্পর্শী বর্ণনা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে সহিত বলিতে পারি।

হাসি ও অশ্রু—

শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য্য, বি-এ প্রণীত, মূল্য এক টাকা।

এই সংগ্রহের নয়টী গল্প নানা মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; আমাদের ভারতবর্ষেও কয়েকটী প্রকাশিত হইয়াছিল; এবং সকলেই গল্পগুলির প্রশংসা করিয়াছিলেন। মাসিকপত্রের পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধার করিয়া এই গল্পগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। পুস্তকের নামকরণ বেশ হইয়াছে; ইহাতে সুন্দর হাসির লহরও আছে এবং হৃদয় ভেদী অশ্রুর প্রবাহও আছে। গল্পগুলির রচনাভঙ্গী ও বর্ণনাংশ বড়ই সুন্দর। আমরা এই সংগ্রহ পুস্তক পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিয়াছি।

পার্ব্বণী—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, মূল্য চল্লিশ আনা মাত্র।

পূজার পার্ব্বণী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুই এবার ছেলেদের দিয়াছেন। এমন সুন্দর বই যে তিনি কেমন করিয়া এই দুর্ম্মূল্যের দিনে এত অল্প মূল্যে দিলেন, আমরা ঠিক করিতে পারিতেছি না। পার্ব্বণীর লেখক লেখিকা আমাদের দেশের যাঁহারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, তাঁহারাই। লেখক শ্রেণীতে স্যর রবীন্দ্রনাথ আছেন; সুধীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর আছেন; পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আছেন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আছেন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ আছেন, জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাক্তার চুনীলাল, আপক্ক পর্য্যন্ত অব্যাহতি পায় নাই। সুতরাং পার্ব্বণী যে এক অভাবনীয় ব্যাপার তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ঘরে ঘরে এই পার্ব্বণী উঠিলে তবে যাঁহাদের সম্পাদকের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

তাড়ানো ছেলে

[শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী]

আমি ফিরছিলুম কুতুব-মিনার দেখে। বাংলার মোলায়েম জমির-উপর-চরে-বেড়ান এই ললিতলবঙ্গ দেহযষ্টি, দিল্লীর কঃমারেলী একার তালকানা ঝাঁকুনি খেতে-খেতে যখন প্রায় বেঁকে এসেছে, এমন সময় নেমে পড়লুম।

একাওয়ালা আমায় নামিয়ে দিয়ে গেল পুরোন দিল্লীর ভগ্নস্তূপের মধ্যিখানে। চতুর্দ্দিকে বড়-বড় প্রাসাদ, কবর, দুর্গ—কোনটা হাত-পা-ভাঙ্গা, বিকট রাক্ষসের মত দাঁত-খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কোনটা বা একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে শুধু কতকগুলো ইট আর পাথরের রাশি হয়ে পড়ে রয়েছে। এরি মাঝে-মাঝে এক-একটা চক্‌চকে পাথরের কবর অরক্ষিত জঙ্গলময় বাগানের মধ্যে বসোরার গোলাপের মত ফুটে রয়েছে। সৃষ্টি আর প্রলয়ের এমন কোলাকুলি এর আগে আর চোখে পড়েনি। যতদূর চোখ যায়—দেখতে পেলুম, এই সৃষ্টি আর সংহারের সীমা-রেখা গিয়ে মিশেছে; নতুন দিল্লীর টক্‌টকে লাল পাথরের কেল্লার পায়ের কাছে,—ঠিক যেন আহত বীর জেতার পায়ের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে রয়েছে। সমস্ত দিন রোদে পুড়ে পাথরগুলো থেকে একটা গরম ভাঁপ বেরুচ্ছিল; সেগুলোর উপর দিয়ে চলতে-চলতে আমার মনে হচ্ছিল, আহতের তপ্ত শোণিতের উত্তাপে বুঝি পায়ের তলাটা একেবারে কল্‌সে গেল।

সেই জনশূন্য নির্জ্জন শ্মশানে তার সঙ্গে আমার দেখা—

তখনো সন্ধ্যে হতে অনেক দেরী। সমস্ত দিন ঘুরে-ঘুরে দেহটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; তাই বিশ্রামের জন্য একটা চাতাল-দেওয়া কবরের উপর শুয়ে পড়েছিলুম। জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল। মনে হল, একটু গড়িয়ে নিয়ে, অন্ধকার হবার আগেই উঠে পড়া যাবে। একটু ক্ষণ শুয়ে থাকার পরই, আমি যেন তার গলার আওয়াজ পেলুম। মনে হল, অনেক দূরে কে যেন গান গাইছে। গানের আওয়াজটাই ভেসে-ভেসে আমার কাণে আসছিল; কোন্ ভাষা, কি সুর—তা' সেখান থেকে একেবারেই বোঝা যাচ্ছিল না। কৌতূহল হল, কে গায়! সেই নির্জ্জন প্রান্তরে বুঝি বা একজন সঙ্গী পাওয়া গেল মনে করে, উঠে পড়লুম। আওয়াজ শুনে-শুনে সেই দিকে অগ্রসর হতে লাগলুম। কিছুক্ষণ ঠোকর খেতে খেতে অগ্রসর হবার পর তার সঙ্গে দেখা হল। সে গাইছিল—

"মহুয়া দিন তেরে কৈইসে গুজারা—
আবু রাতি কারি ঘন—"

লোকটার চেহারা রুক্ষ, মাথার চুল কতকগুলো পেকে গিয়েছে, বাকিগুলো না পেকেই সাদা হয়ে রয়েছে,—বোধ হয় ধুলোতে। গোঁফ একেবারে নেই বল্লেই হয়। চোয়ালের কাছে চাঁছি করে দাড়ি—মাঝখানে একটু ফাঁক আছে। আবার ঠোঁটের নীচে কয়েকগাছা দাড়ি। অত্যন্ত রোগা। কাপড়-চোপড়ের অবস্থাও দেহের মতন। তার চেহারাটা তার চারপাশের ইট-পাটকেলগুলোর সঙ্গে এমন ভাবে মিল খেয়ে গেছে যে, প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয় যে, তাদেরি একজন বুঝি অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য দেবার জন্য এখনও এই জায়গাটাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বয়সটা তার ঠিক অনুমান করতে পারলুম না,—পঞ্চত্রিশও হতে পারে, আর তিপ্পান্ন বল্‌লেও অসম্ভব বলে মনে হবে না। আপনার মনে গান ধরেছে—"মহুয়া দিন তেরে কৈইসে গুজারা—"

সেইখানে বসে-বসে তার সঙ্গে আস্তে-আস্তে আমার পরিচয় হয়েছিল। সে অনেক দিনের কথা। তার পর আমি অনেকবার দিল্লীতে গিয়েছি,—অনেকবার সেই জনমানবহীন ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে তার সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছি; কিন্তু তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। সেইখানে বসে-বসে সে তার জীবনের কাহিনী আমায় শুনিয়েছিল। তারই যতটা আমার মনে আছে, এখানে বলছি—

"দিল্লীর কাছে বুঁদলদর নামে এক গ্রাম আছে—সেই গ্রামে আমার বাড়ী। আমার বাড়ী মানে, সেইখানে আমি

জন্মেছিলুম। এর বেশী সে জায়গা আমার কাছে আর কিছু দাবী করতে পারে না।

বাড়ীর কথা আমার বড় বেশী মনে নেই। স্বপ্নের মত মনে পড়ে, আমার একটী ছোট ভাই ছিল। আমার খেলার সঙ্গীদের কারো নাম বড়-একটা মনে নেই—শুধু একজন ছাড়া। সে একটী ছোট্ট মেয়ে,—তার নাম ছিল রত্না। সুন্দর ফুটফুটে মেয়েটি আমার বড় অনুগত ছিল। আমার কেন জানি না, আর সকলের চেয়ে তার সঙ্গেই বেশী বনি-বনাও হত; তাকে আমি বড় ভালবাসতুম।

শৈশবেই মা মারা গিয়েছিলেন। শুনেছিলুম, আমার ছোট ভাই হবার মাসখানেক পরেই তিনি মারা যান। মাকে জান্‌বার অবসর আমার কখনো হয় নি। আমাদের বিমাতা ছিলেন। তিনি আমার উপর কেমন ব্যবহার করতেন, মনে নেই; আর সে সময় বিমাতার ব্যবহার বুঝতে পারবার মতন বয়স আমার হয়নি। তবে একদিন বুঝতে পেরেছিলুম, বিমাতা কেন, অতি-বড় শত্রুও সে রকম ব্যবহার করতে পারে না। সে কথাটা শেষে বলছি।

তখন আমার ছয় কি সাত বছর মাত্র বয়েস, এমন সময় আমাদের গাঁয়ে এক বাজীকর এসে উপস্থিত হল। তার হাতে একটা ডুগডুগি; সঙ্গে এক রামছাগল—তার পিঠে একটা পুঁটলীর মত কি চাপানো; বগলে একটা ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটলী—এই তার সম্বল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে তার বিদ্যের জোরে গ্রামের মধ্যে বেশ প্রতিপত্তি জমিয়ে নিলে। পায়ের নীচে লোহার গুলি রেখে, সেটাকে নাক দিয়ে বার করা,—হাতের ভিতর টাকা রেখে দিয়ে, বনমানুষের হাড় ঠেকিয়ে, সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া,—আমের আঁটি পুঁতে তখনি-তখনি গাছ বের করা,—এই রকম সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখে, গ্রামের লোকেরা তাকে বাহবা ত দিলেই, সঙ্গে-সঙ্গে পয়সাও দিতে লাগল।

আমরা—ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরাও দল বেঁধে মাঠের ধারে তার বাজী দেখতে যেতুম। সে রোজই বিকেলবেলায় ডুগডুগি বাজিয়ে, লোক জমিয়ে এই সব বাজী দেখাত, আর পয়সা উপায় করত।

একদিন দুপুরবেলা কি যেন একটা কাজে আমি রাস্তায় বেরিয়েছিলুম। সে সময় গরমের চোটে লোকে ঘরে বসেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। বাইরে ঝম্‌ঝম্ রোদ—মনে হচ্ছিল, যেন আগুনের বৃষ্টি হচ্ছে। সে সময় যে কি করতে রাস্তায় বেরিয়েছিলুম, তা ঠিক মনে নেই, বোধ হয় রত্নাদের বাড়ীতে যাচ্ছিলুম। যেতে-যেতে দেখলুম, সেই বাজীকর একটা গাছের নীচে বসে রুটি খাচ্ছে, আর তারই একটু দূরে ছাগলটা বসে-বসে জিমুচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়ে আমি বল্লুম—"সেখমি সেলাম!"

লোকটা খেতে-খেতে মুখ তুলে আমায় বল্লে—"এই,—এত রোদে রাস্তায় বেরিয়েছিস্ কেন? তোর কি বাপ-মা নেই না কি?"

আমার কি খেয়াল হল—আমি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে, তাকে বল্লুম—"আমায় তোমার বিদ্যে শেখাবে সেখজি?"

সে বল্লে—"আচ্ছা, শেখাব; দাঁড়া, আমার খাওয়াটা শেষ হয়ে যাক্।"

পাছে তার ছোঁয়া লাগে, এই ভয়ে আমি একটু দূরে বসে তার খাওয়া দেখ্‌তে লাগলুম। খেতে খেতে সে এক-একবার আমার দিকে মুখ তুলে তাকাতে লাগল, আর যেন বিড়-বিড় করে কি বকতে লাগল।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে, সে আমাকে আমার বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করলে,—আমার বাড়ীতে কে-কে আছে, বাপ মারে কি না ইত্যাদি সব প্রশ্ন। আমার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে তার চোখ দুটো-থেকে-থেকে জ্বলে উঠতে লাগল। মানুষের সে রকম চোখ একমাত্র তার ছাড়া আর আমি দেখি নি। ক্ষুধাতুর জানোয়ারের সামনে খাবার পড়লে তার চোক যেমন হয়, এও ঠিক সেই রকমের। তার চোখে সেই রকম চাহনি দেখে, আমার শিশু-হৃদয় ভয়ে আঁতকে উঠল। আমি ভয় পেয়েছি বুঝতে পেরে, সে আমার হাত দুটো ধরে বল্লে—"ভয় কি! কিছু ভয় নেই। আজ সন্ধ্যে-বেলা কোন রকমে আমার কাছে আসিস্, আমি সব শিখিয়ে দেব। দেখিস, সঙ্গে আর কাউকে আনিস্ নি, তা'হলে কিছু শেখা হবে না।"

ভয়-মেশানো একটা আনন্দে সে দিন সমস্ত ক্ষণটা আমার কোথা দিয়ে কেটে গেল। সঙ্গীদের সঙ্গে ভাল করে খেলায় যোগ দিতে পারলুম না। কথাটা আর কাউকে বলি নি; কারণ, সে বলতে বারণ করে দিয়েছিল। কিন্তু রত্নাকে না বলে থাকতে পারলুম না। আমার কথা শুনে

সে বল্লে, "তবে আমিও যাব।" আমি তাকে বুঝিয়ে বল্লুম, "অন্য লোক গেলে সে দেখাবে না বলেছে। তার কি,—আগে আমি শিখে আসি, তার পর তোমায় শিখিয়ে দেব।" সন্ধ্যা হবার একটু পরেই সকলের অজ্ঞাতসারে আমি বেরিয়ে পড়লুম। আমার জন্য সেই গাছতলায় সে অপেক্ষা করছিল। আমি কাছে যেতেই, সে আমার হাত ধরে বল্লে—"এখানে না—চল, একটু ঘুরে যাই। কেউ দেখ্‌তে পেলে হবে না।" এই বলে সে আমাকে টেনে নিয়ে চলতে লাগল।

সেই জমাট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে—কখনো রাস্তা, কখনো মাঠ—কিছুক্ষণ দৌড়ে, কিছুক্ষণ হেঁটে,—আমরা যে কতদূর চলে গেলাম, তার ঠিকানা নেই। হাত-পা সব অবশ হয়ে আসছিল, ঘুমে চোখ ঢুলে আসতে লাগল। কোথায় যাচ্ছি,—কেন সে আমায় এতদূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—এ সব কথা তাকে জিজ্ঞাসা করবার আগেই, আমি এক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়লুম!

ঘুম যখন ভেঙ্গে গেল, তখন দেখি, সকাল হয়ে গিয়েছে। জেগে দেখি, যে জায়গাটাতে শুয়ে পড়েছিলুম—সেখানে নেই,—একটা রেল-ষ্টেশনের বেঞ্চির উপর আমি শুয়ে আছি। ঘুম ভাঙ্গতেই বাড়ীর কথা মনে হল,—আমি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম। আমার কান্না দেখে, চুপি চুপি সে আমায় বল্লে,—"কাঁদিস নে; তা'হলে কোতোয়ালে ধরে নিয়ে যাবে।" কোতোয়ালের নাম শুনেই ভয়ে আমার কান্না থেমে গেল। সে আমার হাতে কিছু খাবার দিয়ে বল্লে—"এই নে, খা। খবরদার, আর কাঁদিস না।"

একটু পরে একখানা ট্রেনে করে সে আমায় এই সহরে নিয়ে এল। সহর থেকে মাঝে-মাঝে গাঁয়ে গিয়ে সে তামাসা দেখাত, আর আমায় শিখিয়ে দেয়। কিন্তু সহরে থাকতে সে আমায় বাড়ী থেকে বেরোতে দিত না। লোকে জানত, আমি তার ছেলে,—ছেলে বলেই সে সকলের কাছে আমার পরিচয় দিত। অন্য সময় সে আমায় খুবই আদর-যত্ন করত বটে; কিন্তু বাড়ী যাবার জন্য কাঁদলে, সে ভীষণ মূর্ত্তি ধরত। শেষে আমি মুখে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতুম না বটে; কিন্তু যখনই একমনে বাড়ীর কথা ভাবতুম,—কি করে যে সে বুঝতে পারত, তা বলতে পারি না। আমার মুখে মনের কথাগুলো ফুটে উঠত, না, আমার মনের কথাগুলো তার কাণে গিয়ে বাজতে থাকত—ঠিক বুঝতে পারতুম না। কত দিন স্বপ্নে তার সেই সময়কার ভীষণ মূর্ত্তি দেখে, ভয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়েছি, তার ঠিকানা নেই।

ক্রমে এমন হয়ে গেল—আস্তে-আস্তে বাড়ীর কথা, দেশের সেই উন্মুক্ত মাঠ, শৈশব-সহচরী বয়া এদের স্মৃতি আমার মন থেকে মুছে যেতে লাগল। তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াই—মাঠে, ঘাটে, পথে-পথে, এক সহর ছেড়ে অন্য সহরে। কোন দিন ভাল খাওয়া জোটে; কোন দিন আধ-পেটা, কোন দিন অনাহার,—এমনি করেই আমার দিন কাটছিল। প্রায় বছর ছয়েক এমনি করে কাটবার পর, একদিন আমরা আলিগড় সহরে, রাস্তার এক জায়গায় লোক জমা করে বাজী দেখাচ্ছি, এমন সময় ভিড়ের ভিতর থেকে একজন লোক ঠেলে বেরিয়ে এসে, আমার পালককে জিজ্ঞাসা করলে—"এ ছেলেটী কার?" লোকটার প্রশ্ন শুনেই মোবারকের (তার নাম মোবারক) হাত থেকে লোহার গুলি, হাড়—সব মাটিতে ঠস্‌ঠস্ করে পড়ে গেল। আগন্তুক চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "এই বদমাইস আমাদের গ্রাম থেকে ছেলেটাকে আজ কয়েক বছর হল চুরি করে নিয়ে এসেছে। এ হিন্দুর ছেলে—একে মোসলমানের রুটি খাইয়েছে—" আর বলতে হল না,—এই অবধি শুনেই ভিড় ভেঙ্গে যত লোক তার উপর গিয়ে পড়ল। কিল, চড়, লাথি মেরে তাকে সবাই মিলে প্রায় আধ-মরা করে ফেল্লে। তাকে মারার পর সকলে আমাকে প্রশ্ন করতে লাগল। সে সময় এমন একটা করুণ মিনতি-ভরা দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়েছিল, তা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। পৃথিবীতে সে-ই আমার একমাত্র বন্ধু ছিল। বাবু সাহেব, আজও তার কথা মনে হলে, আমি চোখের জল রাখতে পারি না।"

এই বলে, সে একবার তার জলভরা, চক্‌চকে চোখ-দুটো হাত দিয়ে মুছে নিলে।

"আগন্তুক আমাদের গাঁয়ের লোক, দু-একদিন বাদে সে দেশে যাবে। সকলে মিলে ঠিক করে দিবে, সে আমাকে ও মোবারককে আমাদের গাঁয়ে ধরে নিয়ে যাবে। সেখানে পঞ্চায়েতের বিচারে তার যা সাজা হয় হবে,—কিন্তু এখানে তাকে ছাড়া হবে না। কয়েকদিন পরে ট্রেনে চড়ে আমরা দেশে ফিরলুম। আমার জন্মভূমি,—যেখানকার মাটির

উপর প্রথম আমি দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখি,—পৃথিবীতে এসেই যেখানকার বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে আমি ধন্য হয়েছিলুম,—সেখানকার ধূলো-বালি—সে যে আমার সোণা ;—অনেক দিন পরে আবার সেখানে পা দিতেই, আমার সর্ব্বাঙ্গে একটা পুলক খেলে গেল,—চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। একেবারে-ভুলে-যাওয়া সেই রাস্তা, গাছ, মোয়ারের ক্ষেতগুলো বাতাসে দুলে উঠে এই অভাগাকে অভিনন্দন করতে লাগল।

সন্ধ্যেবেলা মাঠের মধ্যে আমাদের গাঁয়ের পঞ্চায়েত বস্‌ল। গ্রামশুদ্ধ লোক—ছেলে-বুড়ো সকলেই আমাকে দেখতে এসেছে। আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে, হাঁ করে, তারা আমায় দেখতে লাগল। কিন্তু কেউ আমার কাছে আস্‌ছিল না,—যেন আমি কি একটা অদ্ভুত জীবে পরিণত হয়েছি। আমার খেলার সঙ্গীরাও কেউ-কেউ আমায় দেখতে এল। দেখলুম, রত্নাও তাদের একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখলুম, তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন আমায় কিছু বলতে চায়,—কিন্তু সাহস করে বলতে পাচ্ছে না। তার সঙ্গে কথা বলবার জন্য, বন্ধুদের সঙ্গে আবার সেইরকম করে খেলে বেড়াবার জন্য আমার প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগল।

পঞ্চায়েত আরম্ভ হল। এক-একজন উঠে তার বক্তব্য বলতে লাগল। কেউ বল্লে, মোসলমানের রুটি খেয়েছে—ওকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কেউ বল্লে, বদমাইসকে ধরে কোতোয়ালীতে নিয়ে যাও। কেউ বল্লে, ওকে ধরে কয়েক ঘা দিয়ে, টাকাকড়ি যা আছে সব কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দাও। একজন দয়ালু বৃদ্ধ উঠে বল্লে, ছেলে ফিরিয়ে পাওয়া গেছে, আবার কি! ওকে ছেড়ে দাও। এই রকম প্রায় জন-দশ-বারো লোকের মন্তব্যের পর আমার বাবা উঠে দাঁড়ালেন। চারিদিকে একবার চেয়ে নিয়ে, গলাটা একটু সাফ করে' তিনি কি বল্লেন ;—কি যে বল্লেন, তা শুধু আমি নয়, সেখানে কেউ শুনতে পেলে না। সকলে বলতে লাগল, "কিছু শুনতে পাচ্চি না, একটু জোরে।" একটু পর বাদে এই কথাগুলো আমার কাণে এসে পৌঁছল—"আমি অনেকদিন হল, এই মোসলমানকে আমার ছেলে দান করেছি ; ছেলের উপর আমার কোন দাবী-দাওয়া নেই।" বাবার কথা শুনে, সেই জনসঙ্ঘ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য একেবারে স্থির, নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তার পর একটা অস্ফুট আওয়াজ ভিড়টার একদিক থেকে আরম্ভ করে, ক্রমে সমস্ত জায়গাটাতে ছড়িয়ে পড়ল। আমার মনে হল, কে যেন আমার পা দুটো ধরে খানিকক্ষণ জোরে ঘুরপাক দিয়ে, ছুঁড়ে ফেলে দিল।

পঞ্চায়েত ভেঙ্গে গেলে। সে যার বাড়ী ফিরে গেল। গ্রামের ধারের মাঠের উপর বাজীকর একটা ছোট তাঁবু ফেলেছিল। আমার হাত ধরে, সে সেখানে নিয়ে এসে, আমাকে তার বুকের মধ্যে চেপে ধরে বল্লে—"বেটা, দুঃখ করিস্‌নি। ও তোর বাপ নয়,—বাপ হলে এমন কথা বলতে পারত না।"

সে দিন কি পৃথিবীর যত অন্ধকার নিজেদের বাসা ছেড়ে আকাশে বেড়াতে বেরিয়েছিল? আমি তাঁবুর বাইরে একটা জায়গায় বসে ছিলুম। সংসারের উপর একটা ভীষণ আক্রোশ আমার বুকের ভিতর ফুলে-ফুলে গর্জ্জে উঠছিল। ভাবছিলুম, আমার কি কেউ নেই? আমি কি কারো নই? প্রাণের ভিতরকার সেই ভীষণ অন্তর্দ্দাহে আমি এক-একবার নিষ্ফল আক্রোশে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলুম। উপরকার চাঁদটা অন্ধকার চাপা পড়ে, দম আট্‌কে মরবার উপক্রম হয়ে, মধ্যে-মধ্যে হাত-পা ছুঁড়ে বেরিয়ে পড়বার চেষ্টা করছিল। একবার আলো, একবার অন্ধকার—দেখে-দেখে আমার মনে হচ্ছিল, সমস্ত পৃথিবীটাই বুঝি আমার সঙ্গে পরিহাস করতে আরম্ভ করেছে। মাটির দিকে মুখ করে আমি চোখ বুঁজিয়ে ফেললুম। কতক্ষণ এ রকম ভাবে বসেছিলুম, বলতে পারি না। সেই রকম অবস্থায় আমার প্রাণের মধ্যে সাড়া পেলুম,—কে যেন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখ চেয়ে দেখি, সত্যই কে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে ;—সেই ভীষণ অন্ধকারের ভিতরেও সে মুখ চিন্‌তে আমার দেরী হল না। দেখলুম সে কাঁদছে—সচল মুক্তোর মত বড়-বড় অশ্রুবিন্দু তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

সংসার তার বন্ধন থেকে আমায় মুক্তি দিয়াছিল,—সে মুক্তি ত আমি চাই নি। রত্নাকে দেখে আমার মনে হল, আবার বুঝি সংসার তার একজন অনুচরকে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। বেরাল যেমন মুমূর্ষু ইঁদুরটাকে এক-একবার ছেড়ে দিয়ে দূরে বসে মজা দেখে,

—আমার মনে হল, সংসার বুঝি আমার সঙ্গে সেই রকম মজা আরম্ভ করেছে। আমার বিপদ যে একমাত্র সেই অনুভব করে' আমার সান্ত্বনা দিতে এসেছে, তা তখন আমার মনে হয় নি,—বুঝি সে কথা মনে হবার মত অবস্থা আমার তখন ছিল না। আমি তার হাতটা ধরে চীৎকার করে বল্লুম—"রত্নাবলি! কি করতে এসেছিস্? আমার জোলাতে? বল কে তোকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে?"

কাঁদতে-কাঁদতে আমার নাম ধরে সে বল্লে, "মনুয়া—" রাগে, দুঃখে আমার ইচ্ছা করছিল, তাকে ধরে তখুনি আছড়ে মেরে ফেলি। কিন্তু তা পারলুম না। তার কান্না দেখে আমারও কান্না আসতে লাগল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তাকে বললুম, "রত্না, গ্রামশুদ্ধ লোকের মধ্যে তুমিই একমাত্র আমার দুঃখে সহানুভূতি জানিয়েছ। কাল সকালেই আমরা এখান থেকে চলে যাব,—জানি না, আর আমাদের কখনো দেখা হবে কি না—" বলতে-বলতে আমার গলাটা কে যেন চেপে ধরলে, আর আওয়াজ বেরুল না। অনেক কথা আমার তাকে বলবার ছিল, কিন্তু কিছু বলা হোল না। রত্না বল্লে, "তোমার বিমাতার মন্ত্রণায় তোমার বাবা এই রকম করেছে; নইলে—" আমি পাগলের মত চীৎকার করে বলে উঠলুম, "নইলে—নইলে, কি হ'ত রত্না"—আমার চীৎকার শুনে সে থেমে গেল—আর কোন কথা তার মুখ দিয়ে ফুটল না। অনেকক্ষণ আমরা সেই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম। তার পর আস্তে-আস্তে সে ফিরে গেল। সেই আলো-আঁধারে-মেশা রাত্রির অন্ধকার ঠেলে, আমার সজল চোখের দৃষ্টি যতদূর যায়, তাকে দেখতে লাগলুম, দেখলুম। রাত্রির সেই ক্ষুব্ধিত অন্ধকার আমার প্রাণের আলোকে নিমিষের মধ্যে গ্রাস করে ফেল্লে।

রত্না চলে যাবার পর আমার প্রথম কথা মনে পড়ল, আমার বিমাতার ব্যবহার। মনে হল, হায়, আমার নিজের মা যদি থাকত! নিজের মাকে মনে করবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলুম; কিন্তু সে মুখ আমার মনে পড়ল না। প্রাণ খুলে একবার মা বলে চীৎকার করে উঠলুম। আমার সেই চীৎকারে উপরকার অন্ধকার কেটে গিয়ে, চাঁদের আলোতে পৃথিবীটা ভেসে উঠল। ঘুমের গাছগুলাও যেন সহস্র কণ্ঠে মা বলে' সাড়া দিয়ে উঠল। আমি আর সহ্য করতে পারলুম না, সেইখানে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলুম। যখন জ্ঞান হল, দেখলুম মোবারকের কোলে আমি শুয়ে রয়েছি।

পরদিন সেখান থেকে ডেরাডাণ্ডা তুলে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। তারই সঙ্গে বেড়াই; সে যা করতে বলে কলের মত করে যাই। লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন দিনগুলো কেমন ভাবে কাটত, তা বুঝতে পারতুম না,—বোঝবার কোন দরকারও ছিল না। সেই ব্যাপারের পর থেকে আমার উপর মোবারকের যত্ন যেন আরো বেশী বেড়ে গেল। আমার একটু অসুখ করলে সে অস্থির হয়ে পড়ত। আমার কিন্তু তার যত্ন একেবারেই সহ্য হ'ত না। আমি ভাবতুম, সংসারের আপনার লোকজন সব যখন আমাকে তাদের কাছ থেকে এমনি করে বিদেয় দিয়েছে, একজন বাইরের লোক কেন আমায় বাঁধবার চেষ্টা করছে? সময়-সময় এমন হয়েছে, মাসাবধি আমি তার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলিনি। এমনি করে আমাদের দিন কাটতে লাগল।

বাড়ীর লোকেরা আমায় যেমন নিষ্ঠুর ভাবে তাদের কাছ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আমিও ঠিক তেমনি করে বাইরের আকর্ষণগুলোকে তাড়াতে থাকতুম। আমার পালক-প্রভু ছাড়া অন্য কেউ যদি আমার সঙ্গে কথা কইতে, কিম্বা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে আসত, তাদের সঙ্গেও আমি সেইরকম ব্যবহার করতুম। ক্রমে এমন হল, কেউ আমার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কইত না।

আমার বন্ধন ও মুক্তির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম সংযোগ-তন্তু ছিল এই মোবারক। এই সময়ে একদিন আমাকে মুক্তির নির্ভাবনা আরাম উপভোগ করবার অবকাশ দিয়ে, আমার নিদারুণ শত্রু,—আমার একমাত্র সহায়, বন্ধু ও প্রতিপালক হঠাৎ পৃথিবী থেকে সরে পড়ল।

মোবারকের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই সংসারের সঙ্গে আমার বন্ধনের শেষ গ্রন্থিটাও ছিঁড়ে গেল। আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নিশান উড়িয়ে দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম। দুনিয়ার কারো খবর আমি রাখতুম না, আমার খবরও বড়-একটা কেউ রাখত না। একদিন বাজী দেখিয়ে যা রোজগার করতুম, দশদিন ধরে বসে তাই খেতুম। পয়সা ফুরিয়ে গেলে আবার রোজগার করতে বেরোতুম!

কেমন করে' আমার এই উড়ো প্রাণটা জুড়বার বাঁধবে

ধরা দিল, সেই কথাটা এবার বলব। দেখলুম, একেবারে মুক্ত হওয়া বুঝি ভগবানের বিধান নয়। মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করতে পারে বটে; কিন্তু সে সময় তাকেও আমার অগ্রাহ্য করবার স্পর্দ্ধা যে কেন হয়েছিল, তা আমি জানি না। আমার মনে হয়, মানুষই এর জন্য দায়ী।

একদিন বিকালবেলায় এই জায়গাটাতে বসে ছিলুম। সেদিন সকাল থেকেই, কেন জানি না, আমার মনটা বড় উতলা হয়েছিল। সে রকম অনুভূতি আমার সেই প্রথম। সেটা কি রকম, তা' ঠিক করে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। পেটে ক্ষিধে পায় জানি; আমার ভাগ্য-ক্রমে সেটা আমাকে খুব বেশী করেই জানতে হয়েছিল। কিন্তু বুকেরও যে ক্ষিধে পায়, সেও যে খাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠে—সেটা সেই দিনই প্রথম টের পেলুম। ভাবছিলুম, জীবনটা কেমন করে কাটল। এই কোলাহলময় পৃথিবীতে আমিই শুধু একা। যেখানে সবাই ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়তমদের নিয়ে সুখে গলাগলি হয়ে দিন কাটাচ্ছে, সেখানে আমারই শুধু আপনার বলবার কেউ নেই। ভাবতে-ভাবতে আমার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সহচর এই নীরস ইটপাটকেলগুলোর মধ্যে এসে এক জায়গায় বসে পড়লুম।

কতক্ষণ এই রকম ভাবনায় বিভোর হয়ে বসে ছিলুম, জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ কার গলার আওয়াজ আমার চমক ভেঙে গেল। দেখলুম, কয়েকটী ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে আমার সামনে ছুটোছুটি করে খেলে বেড়াচ্ছে। তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আমার মনে হল, আকাশ থেকে একটা পৃথিবী জোড়া অন্ধকার নীচের দিকে নেমে আসতে-আসতে, হঠাৎ মাঝ-পথে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আমার বহুদিন-বিস্মৃত ছেলেবেলাকার কথাগুলো একে-একে মনে পড়তে লাগল। আমার বন্ধু, আমার ভাই, আমার সেই সহচর—কোথায় তারা?

তাদের ছুটোছুটি দেখে মনে হচ্ছিল, বুঝি আমার দম-আটকে-মারা সেই ছেলেবেলাটা এতদিনে সুযোগ পেয়ে, আমার বুকের ভিতর থেকে পালিয়ে গিয়ে আমার সামনে খেলতে আরম্ভ করেছে। আমি বর্ত্তমান হারিয়ে ফেললুম; তাদের সেই ছুটোছুটি, হাসির রোলে যোগ দেবার জন্য, আমি আমার জায়গাটা ছেড়ে, লাফিয়ে তাদের সঙ্গে খেলতে ছুটে গেলুম। আমাকে তাদের কাছে যেতে দেখেই, একটী ছেলে চেঁচিয়ে তার সঙ্গীদের সাবধান করে দিলে—"ওরে পাগলা—পাগলা,—পালিয়ে আয়।"

আচম্‌কা গালের উপর জোরে একটা চড় এসে পড়লে যে রকম অবস্থা হয়, তার কথা শুনে আমার সেই রকম অবস্থা হল। দেখলুম, তারা সবাই ছুটে আমার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে গেল। তাদের কোলাহল আমার এই দুঃসহ, বিষাদপূর্ণ জীবনটা হঠাৎ এক নিমেষের জন্য আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল, বুঝতে পারলুম না। জ্ঞান ফিরে আসবার পর দেখতে পেলুম, দূরে স্মৃতি-সাগরের ওপারে আমার অতীত জীবনটা এই সুখ-দুঃখ-মাখা সংসারের মধ্যে ফিরে আসবার জন্য দুহাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উপরে চেয়ে দেখলুম, সন্ধ্যা-সুন্দরী অস্তরবির সোণালী পাড়ওয়ালা নীলাম্বরী পরে' পৃথিবীর সামনে এসে মোহন বেশে দাঁড়িয়েছে। চারদিকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের মাঝখানে আমার এই জীবনটা নিষ্ফলে কেটে গেছে। এতদিন কি অন্ধ ছিলুম? কিসের মোহ আমাকে এই সুখ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল? পুবের একটা দমকা বাতাস লেগে এই মৌন পাথরগুলো আমার দুঃখের সঙ্গে সুর মিলিয়ে একটা বিষাদের গান গেয়ে উঠল। আমি আস্তে-আস্তে একটা পাথরের উপর শুয়ে পড়লুম।"

* * * *

এই পর্য্যন্ত বলেই সে চুপ করল। আমি একমনে তার কথা শুনছিলুম। সে চুপ করতেই, তার দিকে চেয়ে দেখি, ততক্ষণে সে উঠে পড়েছে। আর একটী কথাও না বলে সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল।

সামনে চেয়ে দেখলুম দিনান্তের নিভন্ত চিতার শেষ রশ্মিটা তখনও কুতুবমিনারের চূড়ার উপর ধক্-ধক্ করে জ্বলছে। পূর্ব্বদিক থেকে একটা বিরাট অন্ধকার পাখা মেলে সেই আলোটুকুকে গ্রাস করবার জন্য ছুটে আসছে।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা (La Grippe)

বা

বহুব্যাপক সর্দ্দি-জ্বর

[ডাক্তার শ্রীরাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়]

সংক্ষিপ্ত বিবরণ।—এই ব্যাধি ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে প্রথমে রুসিয়া (Russja) হইতে আরম্ভ হয়; তৎপরে সমগ্র য়ুরোপ খণ্ডে, অবশেষে আমেরিকায় প্রকাশ পায়। রুসিয়া হইতে প্যারী-নগরীতে যাইতে ইহার ছয় মাস লাগিয়াছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র য়ুরোপ খণ্ডে ও পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র ইহার প্রাদুর্ভাব হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার হ্যারিস্ বৃটিস কংগ্রেসে ইহার চিকিৎসাদি বিষয়ে বিশেষরূপ আলোচনা করেন।—[কোয়েক্‌স ডিক্‌সনারী অভ্ মেডিসিন্ দ্রষ্টব্য] তদানীন্তন এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় কুইনাইন, এন্টিপাইরিণ্ এবং উত্তেজক ঔষধাদি দিয়া সুফল হয় নাই। ১৫০০০ রোগী হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসিত হয়; তন্মধ্যে মাত্র ৮২ জন মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

সমসংজ্ঞা। ইহা স্পর্শাক্রমক এবং বহুব্যাপক; শ্বাসপথ প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সর্দ্দিজ প্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায়, চিকিৎসকগণ ইহাকে বহুব্যাপক সর্দ্দিরোগ বলিয়াছেন; কিন্তু সাধারণ সর্দ্দি রোগ হইতে ইহা বিশেষরূপে বিভিন্ন। ইহার অন্যান্য নাম—এপিডেমিক্ ব্রন্‌কাইটীস বা নিউমোনিয়া; স্বল্ প্রেগ; লা গ্রাইপি ইত্যাদি।

প্রকার।—ডাক্তার জুসেট্ ইহাকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(ক) কমন (Common) বা সর্দ্দিজ (Catarrhal); (খ) বিনাইন (Benign); এবং (গ) ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট (Malignant)।

(ক) কমন প্রকার পীড়ার সংক্ষিপ্ত লক্ষণাদি

(১) সর্দ্দিজ প্রকারের পীড়া—সাধারণ সর্দ্দিজ্বর; অস্থি-বেদনা, ক্লান্তি, কাসি, পিপাসা, ঘর্ম্ম, মাথা-ব্যথা, জিহ্বার নীলাভ শ্বেতবর্ণ (Grippal tongue) প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা প্রকাশিত হয়। কাহারও নাক দিয়া রক্তস্রাব, কাহারও কর্ণপ্রদাহ, কাহারও কর্ণমূল প্রদাহ, কাহারও টন্‌সিলাইটীস্ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(২) ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া।—সামান্য কম্প দিয়া প্রবল জ্বর, শ্বাসকষ্ট, কাসি, (পার্শ্বে বেদনা প্রায় থাকে না); প্রচুর ঘর্ম্মার উঠা, নাড়ী সবিরাম ও দুর্ব্বল ইত্যাদি। এই পীড়ায় উত্তেজক ঔষধাদি প্রয়োগে বড়ই কুফল উৎপন্ন হয়; এমন কি, রোগী শীঘ্রই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। পুরাতন প্রকারের হইলে, যক্ষ্মায় পরিণত হয়।

(৩) প্লুরিটিক ভ্যারাইটী।—ফুস্‌ফুসাবরণ প্রদাহের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(খ) বিনাইন (Benign)

(১) জ্বর-প্রাধান্য—জ্বর, মাথা-ব্যথা, ক্লান্তি, অক্ষুধা, অনিদ্রা, কোষ্ঠবদ্ধতা, পিপাসা ইত্যাদি। ৩৪ দিন থাকিয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়। পীড়ার পরিণাম ভোগ অনেক দিন থাকে।

(২) সবিরাম ও স্বল্প বিরাম জ্বর সদৃশ পীড়া, প্রকার।—অনেক সময় ম্যালেরিয়া জ্বরের ন্যায় লক্ষণ ধারণ করে, সাংঘাতিক হিমাঙ্গাবস্থাও আনীত হয়। Widal reaction দ্বারা সান্নিপাতিক হইতে বিভিন্ন করিতে হয়।

(৩) রিউমেটারিড্ ভ্যারাইটী।—বাতের ন্যায় বেদনা, জ্বর, রাত্রিতে বৃদ্ধি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। পীড়ার স্থায়িত্ব-কাল সপ্তাহ মাত্র।

(৪) কলেরিক ভ্যারাইটী। সামান্য জ্বরভাব সহ ভেদ-বমন, ক্লান্তি, অবসাদ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(৫) এতদ্ব্যতীত টন্‌সিলাইটীস্ (Follicular Tonsil-lites) প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে; অনেক সময় ডিপ্‌থিরিয়াহ্‌র মত লক্ষণ প্রকাশ পায়। শিশু বা বালকদিগের মধ্যে এই পীড়া অধিক হয়।

(গ) ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট (Malignant)

অবসাদ, জ্বর, ক্যাপিলারী ব্রন্‌কাইটীস্, ফুস্‌ফুসে রক্ত প্রধাবন প্রভৃতি হইয়া শীঘ্রই মৃত্যু আনীত হয়। ইহাতে

তন্দ্রা-ভাব বা কোমা সঙ্গে-সঙ্গে বা দ্বিতীয় দিনে প্রকাশ পায়। প্রলাপ, আক্ষেপ, শ্বাসরুদ্ধ, অতিসার, শোথ, কর্ণমূল-প্রদাহ, গ্যাংগ্রীণ প্রভৃতি সাংঘাতিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে মৃত্যু ঘটে। কদাচিৎ সপ্তম দিবসে সাংঘাতিক হইতেও পারে। অনেকে ইহাকে প্লেগের সঙ্গে ভ্রম করেন। মস্তিষ্ক, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ও মূত্র-গ্রন্থির্ ডিজেনেরেশন জন্মে।

কারণ তত্ত্ব।—ফুসফুসে বা শ্বাসনলীতে সাধারণ ভাবের প্রদাহ জন্য পীড়ার যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, ইহাতেও তাহাই থাকে। কীটাণুতত্ত্বের স্থির মীমাংসা হয় নাই; নানা মুনির নানা মত; কেহ বলেন "পেফার" কেহ বলেন "নিউমোকক্কাই" প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। ফলতঃ ইহা স্পর্শ-সংক্রামক ও বহুব্যাপক। শৈত্য, ক্লান্তি উত্তেজক কারণ।

ডায়াগ্নোসিস্।—বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন প্রকার পীড়ায়, বিভিন্ন চিকিৎসা প্রভৃতির উপর বা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের উপর রোগ-নির্ণয় নির্ভর করে; ইহার কিছুই স্থিরতা থাকে না। দুর্ব্বলতা, বৃদ্ধত্ব, বা শিশুত্ব, বহুমূত্র, হৃৎপিণ্ডের দোষ প্রভৃতি কারণ।

চিকিৎসা।—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার লক্ষণানুসারে বিভিন্ন এপিডেমিকে বিভিন্ন ঔষধ দ্বারা উপকার হইয়াছে। লক্ষণানুসারে চিকিৎসা, সুতরাং ঔষধের নাম করা কঠিন; তবে, বহুদর্শন দ্বারা নিম্নলিখিত ঔষধগুলি অনেক স্থলে লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হইয়া সুফল প্রদান করিয়াছে। "We treat the patient and not the disease" ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

প্রতিষেধক চিকিৎসা।—হোমিওপ্যাথিতে এই চিকিৎসার দ্বারাও ফল হয়। (Nothing to blush for) সুতরাং কুণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই। যে বাড়ীতে বা যে পল্লীতে যে প্রকার পীড়া হইতেছে, তাহার একটী ঔষধ (আরোগ্যকর) নির্ব্বাচন করিয়া সুফল হইলে, উহার উচ্চতর বা উচ্চতম ক্রম বটিকা সপ্তাহের মধ্যে দুইবার বা তিন বার দেওয়া যায়। 'ইনফ্লুয়িজিনাম' ২০০ অনেকে বলেন। কিন্তু ইহাও এলোপ্যাথিক ঔষধ এবং ইহা কোন্ প্রকারের পীড়ার বিষ হইতে প্রস্তুত, জানা নাই, সুতরাং মন্দ ফলও উৎপন্ন হইতে পারে।

লক্ষণানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ।

একোনাইট ৩—জ্বরের প্রথমে, অস্থিরতা, পিপাসা ইহার নির্দ্দেশক। ডাঃ ডিউয়ি ও হুসেট্ বলেন, শিশুদিগকে ইহা দিলে জ্বরের প্রাবল্য কমায়,—রক্তের দোষ (Toxemia) নিবারণে ইহা অসমর্থ।

জেল্‌সিমিনম ১×। নিউইয়র্কে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এই ঔষধ এই পীড়ায় বিশেষ উপকার করিয়াছিল। তন্দ্রা, পিপাসাহীনতা, সার্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা ইহার নির্দ্দেশক।

বেলাডোনা ৬।—মাথাধরা বেশ, চক্ষু লাল, টনসিলাইটীস ইত্যাদি। কেরম্ ফল ৬।—একোনাইটের ও বেলাডনার মধ্যবর্ত্তী লক্ষণে মেলিলোটসে মাথাধরা আছে।—হুসেট।

ব্যাপ্‌টিসিয়া ১ ×।—যখন থাকাশয় ও যকৃৎ অধিক আক্রান্ত হয়। বেদনা ও দুর্ব্বলতা ও দুর্গন্ধ অতিসার লক্ষণ থাকে। ডাঃ ক্লার্ক ইহার ৩০ ক্রমের পক্ষপাতী। ফাইটোলেক্কা ৩০।—যখন টন্‌সিলাইটিস্ সংজড়িত।

ব্রায়োনিয়া ১২।—শ্বাসনলী অধিক আক্রান্ত, সঞ্চালনে বৃদ্ধি। রসটক্স ৬।—অস্থিরতা, গাত্র-বেদনা, জ্বর ইত্যাদি; বর্ষায় ও আর্দ্রতায় ইহা ডল্‌কামারার সদৃশ।

ইয়ুপেটোরিয়ম পার্কোলিয়েটাম ৬।—যখন বমন, জ্বর, মাথা ব্যথা ও অস্থিমধ্যে বেদনা (ডেঙ্গুজ্বরের মত ভাব) লক্ষণে ইহা ব্যবস্থা।

ফস্ফরস ৩০।—ফুসফুস্ ও শ্বাসনলী প্রদাহ। পরবর্ত্তী দুর্ব্বলতা এবং কাসিতেও ইহা নির্দ্দোষ। এতৎসহ এণ্টিম টার্ট ও তুলনীয়। রক্তস্রাবী প্রকারের পীড়ায় বিশেষ উপযোগী।

আর্সেনিক ১২।—সাংঘাতিক জ্বরের পীড়া, সবিরাম জ্বরে ইহা কুইনাইনের সদৃশ কার্য্য করে।

রসব্যাডিকান্স।—এই পীড়ায় যখন উপান্ত্রি প্রদাহ (Appendicites) আসিয়া উদয় হয়, তখন ইহাতে প্রতিষেধ করে।

পরিণাম বা পরবর্ত্তী অবস্থার চিকিৎসা

এই পীড়ার পরে আরোগ্যোন্মুখ কালে,—অক্ষুধা, অনিদ্রা লক্ষণে ডাঃ এভিনা স্যাটাইভা ৩। ভাল ঔষধ। ঘুসঘুসে কাসিতে,—রিউমেকস বা স্পঞ্জিয়া। আরোগ্যোন্মুখ কালে—সোয়াইনম ২০০ একমাত্রা হন্দ নহে। হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি জন্মিলে—ডাঃ প্রক্টার আইবিরিস্ (Iberis) দিতে বলিয়াছেন। ডাঃ হ্যাস লিখিয়াছেন,—টন্‌সিলাইটীস প্রভৃতিতে ফাইটোলেক্কার কাজ না হইলে—নেট্রাম স্যালিসিলেট কাজ।

বিজয়া

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

কি কাজ থাকিয়া আজ মা বিনে শূন্য ভবনে,
ছেড়ে ভবখেলা মন চলরে জননী সনে।
জগত জড়ভাময়, কঠিন নাহি হৃদয়,
হয়েছিল সচেতন, মা'র শুভ আগমনে।
চিন্ময়ী হইয়া হারা, পুনঃ শাকারা ধরা,
দেহে কিবা প্রয়োজন, কাল হরিলে জীবনে।
চল সেই কূট পুরে, মেরু শিখর উপরে,
বিরাজেন যথা উমা, সতত শঙ্কর সনে।
সে শুভ মিলন দেখি, জুড়াও এ পোড়া আঁখি,
বিজয় কেন হে দুঃখা সংসার-বিষ-দহনে॥

[শ্রীলশ্রীমন্মহারাজাধিরাজ সার বিজয় চন্দ মহতাব বাহাদুর কর্ত্তৃক রচিত।]

[স্বরলিপি—সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।]

আস্থায়ী।

II{ ২ ০ ০ ১ ২ ০ ০ ১
মা না | মা -া মা | পা মা | জ্ঞা -া জ্ঞা I ঋ মা | ঋ -া মা | জ্ঞা জ্ঞা | ঋ সা -া }I
কি কা জ • থা কি য়া আ • জ মা বি নে • শূ ন্য ভ ব নে •

২ ০ ০ ১ ২ ০ ০ ১
সা সা | দা -া দা | পা দা | পা -া জ্ঞা I মা পা | মা না দা | মা জ্ঞা | ঋ সা -া II
ছে ড়ে ভ • ব খে লা ম • ন চ ল রে • জ ন নি স নে •

অন্তরা।

২ ০ ০ ১ ২ ০ ০ ১
II দা দা | পা -া পা | র্সা র্সা | র্সা র্সা -া I দা পা | র্সা র্ঝা জ্ঞা ঝা | র্সা পা | দা পা -া I
জ গ ত • জ ড় তা ম য় • ক ঠি ন • • না হি হৃ দ য় •

২ ০ ০ ১ ২ ০ ০ ১
জ্ঞা পা | পা -া পা | দা পা | দা পা -া I জ্ঞা পা | পা দা পা | মা জ্ঞা | ঋ সা -া II
হ য়ে ছি • ল স চে ত ন • মা র্ শু • ভ আ গ ম নে •

২য় অন্তরা।

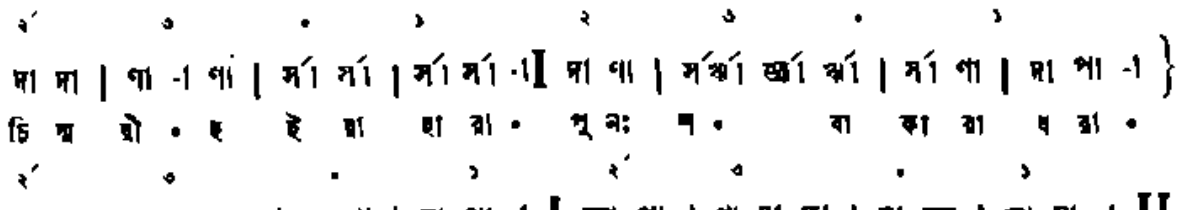

সঞ্চারী।

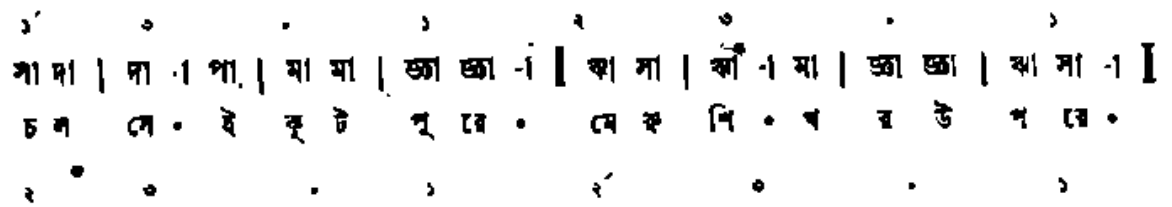

আভোগ।

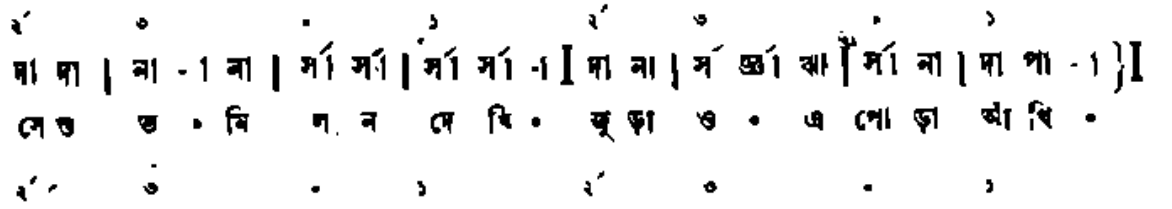

৺গোবিন্দচন্দ্র দাস

বাঙ্গালীর খাঁটি কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মরিয়াছেন——না, না, মরিয়া বাঁচিয়াছেন। নানা কষ্ট সহ্য করিয়া, অর্দ্ধাশনে, অনশনে সুদীর্ঘ কাল কাটাইয়া আমাদের চির-দরিদ্র পল্লীকবি গোবিন্দ দাস মরিয়া গিয়াছেন,—এখন তোমরা সভা কর, বক্তৃতা কর, তাঁহার 'চিতায় মঠ' দেও। সুজলা সুফলা মলয়-শীতলা শস্য-শ্যামলা বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়া যে এত কষ্ট পাইয়া মরিয়াছে, সাবধান! তাহার জন্য কেহ শোক প্রকাশ করিও না,—সে অধিকার আমাদের নাই।

গোবিন্দবাবু নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—

"ও ভাই বঙ্গবাসি,
আমি মর্‌লে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ?

আজ যে আমি উপোস করি,
না খেয়ে শুকায়ে মরি,
হাহাকার দিবানিশি ক্ষুধায় করি ছট্ ফট্।

ও ভাই বঙ্গবাসি,
আমি মর্‌লে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ?"

শোক-সংবাদ

৺রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, প্রসিদ্ধ নাটক-লেখক রামলালবাবু পরলোকগত হইয়াছেন। রামলাল বাবুর নাটকগুলি কলিকাতায় ও মফস্বলের বঙ্গমঞ্চে অনেকবার অভিনীত হইয়াছে। তিনি অনেক মাসিক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলেই রামলালবাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। আমরা রামলাল বাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

৺জ্ঞানপ্রিয় মিত্র

কলিকাতায়, শুধু কলিকাতার কেন বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানেরই শিক্ষিত-সমাজের চিরপ্রিয়, সদানন্দ জ্ঞানপ্রিয়-মিত্র আর ইহজগতে নাই। তিন দিন আগে-পাছে জ্ঞানপ্রিয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী দেহত্যাগ করিয়াছেন; সতীকে আর বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। কলিকাতায় যখন যে সভাতে গিয়াছি, সেইখানেই জ্ঞানপ্রিয়ের গান শুনিয়াছি; সেখানেই তাঁহার আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখিয়াছি। সেই মুখ অকালে চলিয়া গেল। তাঁহার কথা অনেকেই অনেক দিন ভুলিতে পারিবে না।

৺রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর

রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর মেদিনীপুরবাসী ছিলেন; মেদিনীপুর সাহিত্য-সভার তিনি সভাপতি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন; বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁহার লিখিত অনেক প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি, তাঁহার ন্যায় বিদ্বান্, উদার-চরিত, আত্মীয় ও বন্ধুবৎসল ব্রাহ্মণ আজকাল অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ন্যায় অকৃত্রিম বন্ধু, মহানুভব সুহৃদকে অকালে হারাইয়া আমরা বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। ভগবান তাঁহার বিধবা পত্নী ও পুত্রদ্বয়ের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা—লিখিত মনোরমার জীবন চিত্র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৷৹

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত আট আনা সংস্করণের একত্রিংশ গ্রন্থ "মায়ের প্রসাদ" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ।৹ মাত্র।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "তুমিই কি সেই" বহুকাল পরে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল মূল্য ।৹ মাত্র।

শ্রীযুক্ত তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায় প্রণীত সরল স্বরলিপি শিক্ষার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৷৹

শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ দত্ত প্রণীত 'মাখাতা' নাটক প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১৷৹

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত "মহাত্মা গান্ধী" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ৷৹

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র বসু উইটসাপর সঙ্কলিত 'সুখ সমুদ্র' প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ২৲

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'মেয়েদের' প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১৷৷৹

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত "দিদির" তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ২৲ বাঁধাই ২৷৷৹

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত নূতন উপন্যাস "পরাধীন" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ২৲

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের নূতন কবিতা পুস্তক "বন মল্লিকা" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ৸৹

শ্রীযুক্ত কবিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'তপস্যার ফল' ১৷৹ দিলে পাওয়া যাইবে।

বাড়াগোলাধিপতি রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন প্রণীত "পরিব্রাজিনী শিক্ষা বা সপ্ততন্ত্রী বিজ্ঞান" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন ঐতিহাসিক উপন্যাস "সাহাজাদা খসরু" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ২৲।

শ্রীনগেন্দ্রভূষণ বিশ্বাস প্রণীত "বঙ্গবাণী" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১৲।

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত "জীবনের পথে" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১৷৹।

নিবেদন—ভারতবর্ষের ষষ্ঠ বর্ষের প্রথমার্দ্ধ (আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ) শেষ হইল। ষাণ্মাসিক, গ্রাহকগণের নিকট শেষার্দ্ধের (পৌষ হইতে জ্যৈষ্ঠ) মূল্যের জন্য পৌষ সংখ্যা ৩/০ আনায় যথাসময়ে ভিপিতে পাঠান হইবে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA